॥ সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়		লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
কথামৃত	(যুগবাণী)	...	৫২৯
ভারতীয় অপরা বিদ্যা	(প্রবন্ধ)	ইন্দুচন্দ্র বেদান্তভূষণ	৫৩৩
বধিরতার কারণ	(প্রবন্ধ)	নির্মলেন্দু চক্রবর্তী	৫৩৫
রকেট	(সংগ্রহ)	...	৫৩৮
মাতাজী গঙ্গাবাঈ	(জীবনী)	জর্জ এ্যালেন	৫৩৯
কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ	(প্রবন্ধ)	বিপিনবিহারী মিশ্র	৫৪১
বস্তির কাব্য	(কবিতা)	শশাঙ্ক পাণিগ্রাহী	৫৪২
কালিদাস সাহিত্যে ধর্ম ও দর্শন	(প্রবন্ধ)	রঘুনাথ মল্লিক	৫৪৩
শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা		অমিতাভ চৌধুরী	৫৪৫
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুই প্রান্তবর্তী কবি	(প্রবন্ধ)	বিভাস সরকার	৫৪৬
জনারণ্যে এক মুখ	(উপন্যাস)	বাণী রায়	৫৪৮
বিজ্ঞান বিচিত্রা	(প্রবন্ধ)	জ্যোতির্ময় হুই	৫৫৪
চারজন	(বাঙালী পরিচিতি)	...	৫৫৬
(ক) ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত			
(খ) শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত			
(গ) ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত			
(ঘ) শ্রীমতী ইলা ঘোষ			
অতিশব্দ	(প্রবন্ধ)	হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫৯
অব্যক্ত	(কবিতা)	মদন চক্রবর্তী	৫৬০
আলোকচিত্র—		...	৫৬০(ক), ৬২৪(খ)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বাহক

—বিবেক সাহা অঙ্কিত

॥ প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ॥

মাসিক বসুমতী

॥ ৪৯ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৭৭ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ॥

কথামৃতকথা

মুক্তি

"যতদিন না 'তুমি কর্তা' এইটি বোধ হবে, ততদিন ফিরে ফিরে আসতে হবে—আবার জন্ম হবে। 'তুমি কর্তা' বোধ হলে—'তুঁহু তুঁহু' করলে তবে গতায়াত বন্ধ হবে, মুক্তি হবে।

"জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা। সেই স্বরূপে স্থিতির নামই মুক্তি। জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকো—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, জ্ঞানীর মুক্তি হবেই। তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।"

('যতিপঞ্চকে' আছে—'জ্ঞান-প্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা'—অর্থাৎ বিমল জ্ঞানপ্রবাহই আদিগঙ্গা; আবার আছে 'ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞান গঙ্গা'—কিনা, জ্ঞানই ত্রিভুবনব্যাপিনী জননী গঙ্গা। সেই গঙ্গাতীরে যিনি বাস করেন তিনি জ্ঞানী ছাড়া আর কেউ নয়। তাই বলা হয় গঙ্গাতীরে মৃত্যু হলে মুক্তি হয়।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলেছেন—"পুরাণ মতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি থাকে, তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম করলেই মুক্তি হয়—যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র—এ সব দরকার নাই; ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে; রুহিদাস—যার যাবার সময় ঘণ্টা বাজতো,—এরা সব শূদ্র। এদের ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হয়েছে।

"বেদ মতে ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না। (এখানে ব্রাহ্মণ বলতে ব্রহ্মজ্ঞ বুঝায়)। আবার ঠিক মত মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ-যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র—সব বিধি অনুসারে করতে হবে। কর্মযোগ নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। কলিতে একে অন্নগত প্রাণ, আবার সব কর্ম বিধি অনুসারে করবার সময়ও নাই, তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি,—তাঁর নামকীর্তন করাই ঠিক। সংসারে কর্ম যতদিন ভোগ আছে করো; কিন্তু ভক্তি, অনুরাগ চাই—তাঁর নামগুণ কীর্তন করলে কর্মক্ষয় হবে।

"যখন তিনি মুক্তি দিবেন তখন সাধুসঙ্গ করিয়ে নেন, আর ব্যাকুলতা এনে দেন—যে ব্যাকুলতা হলে ঈশ্বরকে পাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে।"

মুমুক্ষু ও মুমুক্ষুত্ব

সংসার বন্ধন থেকে কিভাবে কখন মুক্তি হতে পারে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে যে এ কথা ভাবে এবং সে ভাবনার অনুকূল সাধন হিসেবে যে কোন ত্যাগই সহজসাধ্য মনে করে, তাকেই মুমুক্ষু বলে। গভীর অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হওয়ার অথবা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা যার হয়েছে সে-ই মুমুক্ষু। পার্থিব ভোগৈশ্বর্য, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াকর্ষণ ছাড়িয়ে প্রেমের প্রবল আকর্ষণে যিনি ব্যাকুল হয়ে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে চলেছেন, তিনিই মুমুক্ষু। মুমুক্ষুর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা এবং আপ্রাণ চেষ্টাই মুমুক্ষুত্ব।

জ্ঞানীরা বলেন, নিত্য নিত্য বস্তু বিচারই সাধনার মস্তক, তীব্র বৈরাগ্যই দেহ, শমদমাদিই হস্তপদাদি এবং মুমুক্ষুত্বই সাধনার প্রাণ। দেহ ও প্রাণহীন সাধনা নিষ্ফল—পণ্ডশ্রম মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যারা মুক্ত হতে ইচ্ছা করে এবং সে উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে তারাই মুমুক্ষু। তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না। যেমন, জালে অনেক মাছ পড়েছে, এদের মধ্যে যেগুলি পালাবার চেষ্টা করে তারাই মুমুক্ষু জীবের উপমাস্থল। মুমুক্ষু জীবের সংসার জাল ভাল লাগে না; তবে নিরুপায় হয়ে সংসারে থাকে।

"ব্যাকুলতা মুমুক্ষুর প্রধান লক্ষণ। ব্যাকুলতা থাকলে সংসারের সব কাজ করেও মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর থাকে। সে সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মত থাকবে।

"মুমুক্ষুর শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নাই। মুমুক্ষুত্ব বা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা সময় সাপেক্ষ।"

মূর্তি চিন্তা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলতেন—ধ্যান, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (নিজকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি? এখানকার উপর তোদের বিশ্বাস আছে কিনা। একে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়ে যাবে। মন নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে কিনা, একে ভাবলেই মনটা গুটিয়ে আসবে, আর ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে।

"আর যে মূর্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান করবি, কিন্তু জানবি যে সবই এক।

"কারু উপর বিদ্বেষ করতে নেই। শিব, কালী, হরি—সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সে-ই ধন্য। বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।"

মূলাধার

মেরুদণ্ডের নিম্ন অংশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে গুহ্যদ্বারের প্রায় নিকটে পৌঁচেছে। সর্বনিম্ন অংশের একটু উপরে অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ্যের মধ্যবর্তী স্থলে উক্ত অস্থির (Coccyx) নিম্ন প্রান্তে মজ্জানালী মধ্যে মূলাধার নামে একটি চক্র বা পদ্ম আছে। ইহা দেহস্থ ষটচক্রের সর্বনিম্ন চক্র। এরই নাম 'মূলাধার পদ্ম' বা 'আধার পদ্ম'। এই পদ্মটি চতুর্দল বিশিষ্ট; বর্ণ শোন পুষ্পের ন্যায় পীতাভ লোহিত বা অরুণ বর্ণ। এই পদ্মের কোরকে পর পর ভিতরে অবস্থিত সাতটি বৃত্ত আছে—ইহারা সপ্তসমুদ্রের অনুকল্প। সবার ভিতরের বৃত্তটির মধ্যে চতুষ্কোণ পৃথ্বীতত্ত্ব এবং পৃথ্বীতত্ত্বের ক্ষেত্রমধ্যে নিম্নমুখী ত্রিকোণ যন্ত্র অবস্থিত। এই শক্তিযন্ত্রের ডানদিকের বাহুটি রক্তাভ বা রজোগুণযুক্ত ব্রাহ্মীরূপা ইচ্ছা-শক্তি, সম্মুখের বাহু নীলাভ বা তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণযুক্ত বৈষ্ণবীরূপা ক্রিয়াশক্তি এবং বাম বাহু পীতাভ বা সত্ত্ব মিশ্রিত তমোগুণযুক্ত মাহেশ্বরীরূপা জ্ঞানশক্তি। ত্রিকোণের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বহ্নিমণ্ডল এবং তার কেন্দ্রস্থলে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বিদ্যমান। এই লিঙ্গটিকে কুণ্ডলিনী সাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করে আছেন। এই চক্রের মধ্যে ঐরাবতে সমাসীন ইন্দ্রের ক্রোড়ে রক্তবর্ণ চতুর্মুখ ব্রহ্মা আছেন; ইনিই ষট্‌শিবের মধ্যে প্রথম শিব স্বয়ম্ভু—ব্রহ্মা। এখানে লং পৃথ্বীবীজ।

মূলোর ঢেকুর

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন আকর তেমন কথাও বেরোয়। রাতদিন বিষয়চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা, এ সব করে করে কথাগুলোও সেই রকম হয়ে যায়। যা খায় তারই ঢেকুর উঠে। কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারী স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বরচিন্তা করলে মানুষ সরল হয়।

"বঙ্কিম ভোজালের একজন পণ্ডিত। তার সঙ্গে দেখা হতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'মানুষের কর্তব্য কি?' তা বলে,—'আহার, নিদ্রা, মৈথুন।' এই সকল কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হলো। বললুম, 'তোমার এ কি রকম কথা? তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া!' যা সব রাতদিন চিন্তা করছো, কাজে করছো, তাই আবার মুখ দে' বেরুচ্ছে! মুলো খেলেই মুলোর ঢেকুর উঠে!

"সেদিন একজন গান গাচ্ছিল। গানের ভিতরে 'লাভ' 'লোকসান' এই রকম সব কথা অনেক ছিল। শুনে আমি ও-রকম গান গাইতে বারণ করলুম। যা ভাবে রাতদিন, সে বুলিই উঠে। মুলোর ঢেকুর!"

মৃত্যু

বিভিন্ন জীবদেহ বিভিন্ন কারণে অক্ষম হয়ে পড়ে—ইন্দ্রিয়াদি অকেজো হয়। তখন জীবের জ্ঞান ও কর্মানুসারে যে পথে তার আত্মা নির্গত হবে সেই দ্বারটি আত্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং যে সতেরটি অবয়বে বা উপাদানে লিঙ্গশরীর গঠিত সেগুলি ঐ দ্বারে সজ্জিত হয়ে আত্মার নির্গমনের প্রতীক্ষা করে। আত্মা এই লিঙ্গশরীর অবলম্বনে পরলোকে যায়। ইহাই জীবদেহের মৃত্যু।

মৃত্যু একেবারে অস্তিত্বের বিলোপ নয়, জীবন থেকে চরম মুক্তিও নয়, অমরত্বের প্রবেশদ্বারও নয়। মর্ত্যবাসীর মৃত্যু হচ্ছে মর্ত্যলোক থেকে লোকান্তর গমন। জড়দেহ লোকান্তরে যেতে পারে না। আত্মা ও দেহের শ্বাসগ্রন্থি যখন ছিন্ন হয় তখন দেহস্থ জড়কোষগুলি তাদের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফিরে যায়—সূক্ষ্ম দেহটি লোকান্তরে গমন করে। নিজ নিজ কর্মানুসারে জীব-গণ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে সংসারে গমনাগমন করে, নিজ নিজ কর্মানুসারেই পঞ্চভূতের সম্মিলনে সৃষ্ট হয়ে নবজন্ম লাভ করে।

এই জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। মৃত্যু এই অগ্রগতির পথে মোটেই বাধাস্বরূপ হয় না; বরং সূক্ষ্ম জগতের অধিকতর উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্তির সুযোগ করে
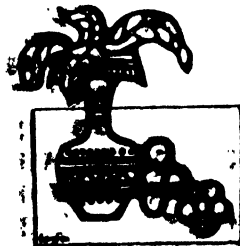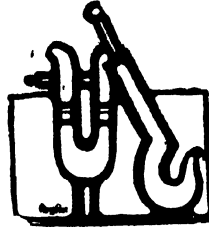
দেয়। কিন্তু সে অগ্রগতি বড় মন্থর ; তাই অসংখ্য জন্মমৃত্যুজানত ক্লেশ জীবকে সহ্য করতে হয়। পৃথিবীর এই স্থূলভূমির উপরেই প্রগতিশীল মানবকে তার আধ্যাত্মিক সম্বল তৈরি করে নিতে হয় ; কারণ এই মর্ত্যভূমিই একমাত্র সাধনলোক—অন্য সব লোকই ভোগভূমি। তাই সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতি-দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে মানবকে পরিণামে জড়দেহ হতে চরম মুক্তির সাধনা করতে হবে এই মর্ত্যলোকেই ; যত শীঘ্র হয়, তত শীঘ্র ক্লেশের অবসান হবে।

মুমূর্ষু অবস্থায় জীবের বাসস্থান হৃদয়ে অর্থাৎ জীবাত্মা তখন হৃদয়ে আশ্রয় লন। জীব সেখানে প্রদ্যোতিত হয়। প্রদ্যোতন কাকে বলে? প্রদ্যোতন হচ্ছে তৎকালীন দীপ্তি। প্রদীপ নিবে যাওয়ার আগে যেমন একটু উজ্জ্বলতর হয়, তেমনি দেহত্যাগের পূর্বে জীবদেহও মুহূর্তের জন্য দীপ্তিমান হয়। তখন জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গুলির সহিত লিঙ্গশরীর রূপে উৎক্রমণের জন্য সম্পিণ্ডিত হয়ে হৃদয়ে আসে। উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। তখন এর পরে সে যা হবে তারই অনুরূপ ভাবনা হয়ে একটা ভাবনাময় শরীর গঠন করে। যদি তার কোন জন্তু বা জানোয়ার হবার মত কর্ম উত্তেজিত হয়ে থাকে, তবে সে ভাবে সে যেন তাই। অথবা যদি তার মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব প্রাপকশরীর স্ফুরিত হয়ে থাকে তা হলে তদ্রূপই ভাবে এরূপ ভাবনা বা ভাবী ফলের দ্যোতনা হওয়ার নামই প্রদ্যোতন বা উজ্জ্বলন।

আগে এই প্রদ্যোতন হয়ে ভাবনাময় শরীর গঠনের পর লিঙ্গশরীরের উৎক্রমণ হয়ে থাকে। শাস্ত্রে আছে জোঁক যেমন অন্যতৃণ না ধরে পূর্বতৃণ ছাড়ে না। তেমনি জীবের লিঙ্গ-শরীরও অন্য শরীর গ্রহণ না করে পূর্বশরীর ছাড়ে না। এই অন্য শরীর কিন্তু স্থূলশরীর নয়—ইহা পূর্ববর্ণিত ভাবনাময় শরীর। এই ভাবনাময় শরীরটি জীব আজীবন যে কর্ম করছে, বা যে চিন্তা করেছে, তারই অনুরূপ শরীর। গীতায় ভগবান বলেছেন (৮।৬)—

'যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬'

অর্থাৎ প্রাণবিয়োগকালে যে যে ভাব স্মরণ করে কলেবর ত্যাগ করে, সে সেই স্মৃত ভাব প্রাপ্ত হয়। কারণ সে ভাব অভ্যাসের ফলে হয় এবং তদ্রূপ ভাবনাময় শরীর তার হয়।

গীতায় ভগবান আরো বলেছেন (১৫।৮)—
'শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥' ১৫।৮

অর্থাৎ প্রবহমাণ বায়ু যেমন পুষ্পাদি থেকে গন্ধ নিয়ে যায়, তেমনি শরীরান্তর গ্রহণকালে জীবাত্মা পূর্বদেহ থেকে মন ও ইন্দ্রিয়াদি (লিঙ্গশরীর) সঙ্গে নিয়ে যায়।

মানবের বিভিন্ন কর্মানুসারে দেহের বিভিন্ন স্থান দিয়ে উৎক্রমণ হয় ; কারু ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে, কারু চক্ষু বা কর্ণ দিয়ে, কারু বা নিম্নাঙ্গ দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"গীতার মতে মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে। ভরত রাজা আদুরে হরিণকে মৃত্যু সময়ে ভেবে হরিণ জন্ম পেয়েছিল। তাই যাতে মরবার সময় তাঁর চিন্তা আসে সে জন্য রাতদিন তাঁর চিন্তা করতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন করতে হয়।"

মৃত্যুকালে ঈশ্বর-চিন্তা

মৃত্যুকালে দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে অবসর গ্রহণ করে, স্মৃতিশক্তি লোপ পায় এবং প্রাণের সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়-গুলিও উৎক্রমণের জন্য তৈরি হয়। তাই সে সময়ে জীবনে অধিক অভ্যস্ত ভাবনাগুলিই কেবল স্মৃতিপথে উদিত হয়, অন্য-গুলি হয় না। ঈশ্বর চিন্তায় অভ্যস্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালে শরীরে হাজার কষ্ট হলেও ঈশ্বর-চিন্তা বিস্মৃত হন না—সকল কষ্ট তুচ্ছ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে ঈশ্বরীয়ভাবে নিমগ্ন থাকতে পারেন। নিয়তির অব্যর্থ লিপি অবশ্য শেষ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হয়। ঈশ্বর-চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।

"সংসারী জীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাইরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে,—কি হবে? সংসারাসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়—বিকারের খেয়ালে কত আবোল-তাবোল বকে। বিল্লী ধরলে পাখির ক্যাঁ ক্যাঁ বুলিই আসে, তখন আর 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে রাম' বেরোয় না। গীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে করবে তা-ই হবে। ভরত রাজা মৃত্যু সময়ে একটা পোষা হরিণের কথা ভাব-ছিল, তাই তাঁর হরিণ হয়ে জন্মাতে হয়েছিল।

"দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে, ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখন স্পর্শ করবে? হাতীকে নাইয়ে যদি আস্তাবলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তা হলে আর ধুলোকাদা মাখতে পারে না। তাই মৃত্যুসময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল—শেষ বয়সে নির্জনে গিয়ে কেবল ঈশ্বর-চিন্তা ও তাঁর নাম করা। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তাই আসবে ; তাঁর নাম-জপ, নামকীর্তন অভ্যাস যদি থাকে মৃত্যুসময়ে তাঁরই নাম মুখে আসবে।

"মন মত্তকরী। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর-চিন্তা করে তা হলে শুদ্ধ মন হয়—সে মন আবার কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হবার অবসর পায় না। তাই মৃত্যু সময় যাতে ঈশ্বর-চিন্তা হয় আগে থাকতে তার উপায় করতে হয়। সে উপায় অভ্যাস যোগ। ঈশ্বর-চিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে। তাই, জপ, ধ্যান, পূজা, এ সব রাতদিন অভ্যাস করতে হয়—তা হলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর-চিন্তা আসে অভ্যাসের গুণে।

"রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সে চিন্তা আসবে। সে জন্য বলছি উপায় আর কিছু নয়, রাতদিন তাঁর নাম জপো—নামকীর্তন অভ্যাস করো। এ অভ্যাস যদি থাকে মৃত্যু সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে।"

মোক্ষ

মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্যের মত বিভিন্ন। রামানুজ মতে ভক্তবৎসল ভগবান জীবকে স্বীয় আনন্দধাম দান করেন (সালোক্য)—উহাই মোক্ষ। মাধ্ব মতে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সামীপ্যই মোক্ষ। আর বল্লভাচার্যের মতে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের

...ত্বাসই মোক্ষ। আচার্য শঙ্কর বলেন, ভগবানের সেবা দ্বারা ভগবৎসামীপ্য ও ভগবৎস্থান লাভ করাই মোক্ষ নয়। পদে পদে সেবাপরাধ হতে পারে;—তা হলে আবার সংসারে আসতে হবে। ভাগবানের পার্ষদ জয় বিজয়-এর দৃষ্টান্ত। জয় এবং বিজয় বিষ্ণুর পার্শ্বচর ছিলেন। বিষ্ণু বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় সনকাদি ঋষিগণ তাঁর দর্শনে এলেন; বিষ্ণুর শান্তিভঙ্গ হবে মনে করে জয় বিজয় ঋষিগণের হরিদর্শনে বাধা প্রদান করেছিলেন। ফলে ঋষিদের শাপে এরা দুজন সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু রূপে, ত্রেতাযুগে রাবণ কুম্ভকর্ণ রূপে এবং দ্বাপর যুগে শিশুপাল দন্তবক্র রূপে জন্মগ্রহণ করে নারায়ণের অবতারত্রয়ের হস্তে নিহত হয়ে সেই শাপ থেকে মুক্ত হন।

সালোক্য সামীপ্যাদি গৌণ মুক্তি। উহা স্বর্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। নির্বাণ মোক্ষই প্রকৃত অমৃত। মুক্তি আর মোক্ষ একই কথা।

মোড় ফিরিয়ে দাও

শ্রীরামকৃষ্ণ—"কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু একেবারে যাওয়া তো সহজ নয়, তাই ঈশ্বরের দিকে তাদের মোড় ফিরিয়ে দাও। যদি কামনা করতে হয় তবে ঈশ্বরকে লাভ করার কামনা, ঈশ্বরে ভক্তি কামনা করবে—সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ করা, এই কামনা করবে। যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়, তাদের উপর ক্রোধ করবে। তাঁকে পাবার লোভ করবে। তাঁর রূপে মুগ্ধ হবে। 'আমার' 'আমার' করতে হলে তাঁকে লয়ে আমার আমার করবে—যেমন আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, তবে 'আমি ঈশ্বরের দাস' 'আমি ঈশ্বরের সন্তান'—এই বলে মত্তা করবে। যদি অহংকার করতে হয় তো বিভীষণের মতো। বিভীষণ বলেছিল—'আমি রামকে প্রণাম করেছি; এ মাথা আর অন্য কারু কাছে অবনত করবো না। এভাবে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দাও।"

শ্রীমদ্ বালানন্দ স্বামীজী বলতেন—'উলট্ দেও—তব্ হোগা।'

যজ্ঞ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য'। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবের প্রধান প্রশ্ন কি ক'রে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়। শাস্ত্র তার জন্য মানুষের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন—বিধিপূর্বক একটা ধারা অবলম্বন ক'রে কার্যে অগ্রসর হ'তে বলেছেন। কিন্তু বেদবিধি অনুযায়ী কর্ম করা কলিকালে এক জীবনে সম্ভব নয়। তাই ভগবান গীতায় বলেছেন (৩-৮),—'যেহেতু কর্ম ছাড়া শরীর যাত্রাও সম্ভব নয়, তাই যজ্ঞার্থে কর্ম কর—অর্পণ বুদ্ধিতে কর্ম কর'। অর্পণের ক্রিয়া হবে ভগবান; যা অর্পণ করা হবে তা ভগবানেরই একটা বিশেষ রূপ; যিনি অর্পণ করবেন তিনিও মানুষের অন্তরস্থ ভগবান; ক্রিয়া, কর্ম, যজ্ঞ—সকলই গীতিরূপে কর্মরূপে ভগবান; আর এই যজ্ঞ দ্বারা যে লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে তাও ভগবান। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা"॥৪।২৪

এই যজ্ঞের সাধন বহুবিধ; অর্পণও নানা প্রকারের। দ্রব্য যজ্ঞ, দৈব যজ্ঞ, প্রাণ যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় যজ্ঞ, জ্ঞান যজ্ঞ ইত্যাদি বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞবিদ্‌গণ পাপ ধ্বংস ক'রে যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত পানে পরাগতি লাভ করেন। এর মধ্যে জ্ঞান যজ্ঞই সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ জ্ঞানেই অখিল কর্মের পরিসমাপ্তি—মোক্ষলাভ।

এ জ্ঞান লাভের জন্য আচার্যের কাছে গিয়ে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। তবেই গুরুতে ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবান, জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় মুমুক্ষু অচিরে জ্ঞানলাভ ক'রে পরম শান্তি লাভে সমর্থ হন।

অনন্ত ব্রহ্মের কল্পনায় তাঁর যজ্ঞও অনন্ত। সকল যজ্ঞ এক জীবনে সমাধান অসম্ভব। সুতরাং সব যজ্ঞের মধ্যে নিজ নিজ জন্মহেতু ঋণ মুক্ত হওয়ার জন্য পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান সকলেরই করা উচিত। মনু বলেছেন—(৩।৭০)—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥*

(১) ব্রহ্ম যজ্ঞ—অধ্যয়ন, অধ্যাপন; ইহাই ঋষিযজ্ঞ।
(২) পিতৃ যজ্ঞ—তর্পণ;
(৩) দৈব যজ্ঞ—হোম;
(৪) ভূত যজ্ঞ—বলি অর্থাৎ আহার্যবস্তু দান; এবং
(৫) নৃ যজ্ঞ—অতিথি পূজন; দীন দরিদ্রের সেবাও এরই অন্তর্গত।

যদৃচ্ছালাভ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যে ঠিক ভক্ত, যার কোন কামনা নাই, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মুসোহারা পায়—তার খাবার জন্য ভাবনা হয় না। যার কোন কামনা নাই সে না চাইলেও আপনিই আসে। এরই নাম 'যদৃচ্ছালাভ'।

"সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগুনোর জন্য অতো ভেবো না। যদৃচ্ছালাভ—এই-ই ভালো। সঞ্চয়ের জন্য অতো ভেবো না। যারা তাঁকে মন-প্রাণ সমর্পণ করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত, তারা ওসব অতো ভাবে না। যত্র আয়, তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে টাকা আসে, আর এক দিক থেকে খরচ হয়ে যায়। গীতায় একেই যদৃচ্ছালাভ বলেছে (৪।২২)।"

যম

'যম' অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ। সংযম সাধনার উপায় হিসাবে যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বনীয়, সেই সকল যমের অঙ্গ। যমের অঙ্গগুলির অভ্যাস দ্বারা ক্রমে চিত্ত ব্রহ্ম-প্রবণতার উপযুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলির পথে কত বিভিন্ন ভাব যে চিত্তের সমীপবর্তী হচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু যমের অঙ্গগুলির অভ্যাস দ্বারা যদি সে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাব নিষ্কামভাবে চিত্তের নিকট নিতে পারা যায়, তবে চিত্তের সহসা বিকার সম্ভবে না। তাই 'যম'-এর প্রয়োজন।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

প্রচ্ছদপরিচিতি

এই সংখ্যার প্রচ্ছদের চিত্রটি শ্রীঅমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

বেদের সরমা

ভূপেন্দ্র বাচস্পতি

সরমা নামটি শুনিলেই আমাদের মনে পড়ে 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে' বিলাপ-রতা সীতা **দেবীর নর্মসখী সরমার কথা।** কিন্তু **আজ আমরা** যে সরমার **প্রসঙ্গ আলোচনা করিব,** সে **বিভীষণ-পত্নী সরমা** নহে। সে কোন দেবী নয়, **মানবী** নয়, নিতান্তই একটি "দেবশুনী"—অর্থাৎ দেবতাদের কুক্কুরী। কিন্তু কুক্কুরী হইলেও ঋগ্বেদের অন্তত দশটি ঋকে তাহার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে এবং ১১টি ঋকে গ্রথিত দশম মণ্ডলের ১০৮ সংখ্যক সূক্তটি সম্পূর্ণভাবে এই সরমার উদ্দেশেই ব্যয়িত হইয়াছে।

আজকাল পাশ্চাত্য জগতে ক্রাইম ডিটেক্‌সনে (অপরাধীর সন্ধানে) কুকুর নিয়োগ প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের বাংলা দেশেও পুলিশ ডগ লালা ও নিতার কৃতিত্বের কথা শোনা যায়। আমরা দেখিতে পাইব বৈদিক যুগেও অপরাধীর সন্ধানে কুক্কুর নিয়োগ প্রচলিত ছিল।

দেব-কুক্কুরী সরমার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৬২ সূক্তের তৃতীয় ঋকে। সেখানে বলা হইয়াছে—

ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চ ইষ্টৌ বিদৎ
সরমা তনয়ায় ধাসিং।
বহস্পতি ভিনৎ অদ্রিং বিদৎ গাঃ
সমুস্রিয়াভিঃ বাবশন্তনরঃ।।

ইন্দ্র ও অঙ্গিরা বংশীয়গণের ইষ্ট সাধনের জন্য অনুসন্ধান কার্যে নিযুক্ত হইয়া সরমা আপনার তনয়ের জন্য "ধাসিং" (অন্নাদি)-প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৃহস্পতি (দেবগুরু নহেন; বৃহতাং দেবানাং অধিপতি = ইন্দ্র) পর্বত বিদীর্ণ করিয়া গোধন উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তখন অঙ্গিরাবংশীয় ও দেবগণ আনন্দে হর্ষধ্বনি করিয়াছিলেন।

এই ঋকের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলেন—এই সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। সরমা নামে এক দেবশুনী (দেব-কুক্কুরী) ছিল। পণিগণ কর্তৃক অঙ্গিরাগণের গাভীসমূহ অপহৃত হইলে, ইন্দ্র ঐ সরমাকে গাভীগুলির অনুসন্ধান করিতে বলেন। সেই সময় সরমা ইন্দ্রকে বলিয়াছিল, "হে ইন্দ্র! যদি আমার শাবককে ঐ সকল গাভীর দুগ্ধাদি পান করিতে দেওয়া হয়, তবে আমি ঐ সকল গাভীর অনুসন্ধানে যাইতে পারি।" ইন্দ্র বলিলেন, "তাহাই হইবে"।

অতঃপর সরমা সন্ধান করিয়া অপহৃত গাভীগুলিকে যে স্থানে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই স্থান অবগত হইয়া তাহা ইন্দ্রকে জ্ঞাপন করে। ইন্দ্র সেই পণি নামক অসুরদিগকে বধ করিয়া গাভীগুলি উদ্ধার করেন।

সায়ণাচার্য এই উপাখ্যানের সমর্থনে শাট্যায়নের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা "অন্নাদিনাং তে সরমে প্রজাং করোমি যা নো গা অন্ববিন্দ ইতি। ততো গত্বা গবাং স্থানমজ্ঞাসীৎ। জ্ঞাত্বা চাস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। তথা নিবেদিতাসু গোষু তমসুরং হত্বা তা গাঃ স ইন্দ্রঃ অলভতেতি।"

অর্থাৎ "হে সরমে! অন্নাদিতে তোমার সন্তানকে অধিকারী করিব। অপহৃত গাভীগুলির অন্বেষণ কর।" অতঃপর সরমা অনুসন্ধানে যাইয়া গাভীগুলির গোপন অবস্থিতির স্থান অবগত হয় এবং ইন্দ্রকে তাহা নিবেদন করে। ইন্দ্র সেই অসুরদিগকে বধ করিয়া গাভীগুলি লাভ করে।

দ্বিতীয় উল্লেখ প্রথম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে। সেখানে অগ্নিকে বলা হইতেছে, "তোমার প্রসাদে সরমা অঙ্গিরাগণের নিকট হইতে প্রচুর গো-দুগ্ধ লাভ করিয়াছিল।" ("বিদৎ গব্যং সরমা দৃহ্লং ঊর্বং")।

তৃতীয় উল্লেখ তৃতীয় মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে। যথা—যখন সরমা পর্বতের ভগ্নদ্বার-প্রাপ্ত হইল, তখন ইন্দ্র পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাকে অন্যান্য সামগ্রীর সহিত প্রচুর অন্নদান করিলেন। উত্তম-গমনসমর্থা সরমা শব্দদ্বারা (অর্থাৎ গাভীগুলির হাম্বারব দ্বারা) স্থানটি নির্ণয় করিতে পারিয়া তদভিমুখে গমন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

চতুর্থ উল্লেখ চতুর্থ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে। "হে ইন্দ্র! তুমি বহুলোক কর্তৃক আহূত। তুমি যখন সেই অদ্রিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার পূর্বেই সরমা সেই গোধন-সমূহের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।"

পঞ্চম উল্লেখ পঞ্চম মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে। "সরমা অঙ্গিরাদের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পণিগণের নিকট হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত ধেনু সকল পুনরায় দেখিতে পাইয়াছিল"।

৬ষ্ঠ উল্লেখ পঞ্চম মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে।

"অর্চনীয়া ঊষার উদয়কালে যখন অঙ্গিরাগণ পুনরায় উদ্ধারপ্রাপ্ত ধেনুগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সেই উৎকৃষ্ট যজ্ঞসভার উপযুক্ত প্রচুর দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল—কারণ, সরমা

যথার্থ পথে যাইয়াই ধেনুগুলিকে দেখিতে পাইয়াছিল।"

সরমা কুক্কুরগণের আদিমাতা এবং সরমার পুত্রগণই সারমেয় (কুক্কুর) নামে অভিহিত। ৭ম মণ্ডলে ৫৫ সূক্তে সরমা ও সারমেয়র কথা আছে। ৮টি মন্ত্রের মধ্যে ৪টি মন্ত্রেই সারমেয়র কার্যাদির কথা বলা হইয়াছে।

সরমা অপহৃত গাভীগুলির অন্বেষণে বাহির হইয়া পণি নামক অসুরদের দুর্ভেদ্য আবাস স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার সহিত পণিদের যে কথোপকথন হয়, তাহা দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

পণিগণ---হে সরমে! তুমি কি বাসনায় এই স্থানে আগমন করিয়াছ? এ অতি দূরের পথ। এ পথে আসিতে আসিতে একবার যদি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়, তবে আর আসা যায় না। আমাদের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ? পথে কয় রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে? নদীস্রোত অতিক্রম করিলে কিরূপে?

সরমা---আমি ইন্দ্রের দূতীরূপে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি। হে পণিগণ! তোমরা যে প্রচুর ধেনু সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা গ্রহণ করাই আমার অভিপ্রায়। জল আমাকে রক্ষা করিয়াছে, কারণ তাহার ভয় ছিল, পাছে আমি তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাই। তাই নদীস্রোত অতিক্রম করিতে পারিয়াছি।।২।।

পণিগণ---হে সরমে! যে ইন্দ্রের দূতীরূপে তুমি অতি দূর-দেশ হইতে আসিয়াছ, সেই ইন্দ্র কি রূপ? তাঁহাকে দেখিতে কেমন? তিনি আসিলে আমরা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি আমাদের গোধন লইয়া তাহার স্বত্বাধিকারী হউন।।৩।।

সরমা---যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া আমি এখানে আসিয়াছি, তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে, এমন ব্যক্তি তো কাহাকেও দেখি না। তিনি-ই সকলকে পরাভূত করেন। সুগভীর নদীগণও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে না। হে পণিগণ! তোমরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের দ্বারা নিহত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে।।৪।।

পণিগণ---হে সুন্দরী সরমে! তুমি স্বর্গের শেষ প্রান্ত হইতে আগমন করিয়াছ। অতএব, এই সকল গাভীর মধ্যে যেগুলি তোমার অভিলাষ, তোমাকে দিতেছি। বিনা-যুদ্ধে এই সকল গাভী কে-ই বা তোমাকে দিত? স্মরণ রাখিও, আমাদের নিকট বহুবিধ শাণিত অস্ত্র রহিয়াছে।।৫।।

সরমা---হে পণিগণ! তোমাদের এই সকল বাক্য সৈনিক পুরুষদের উপযুক্ত হয় নাই। তোমাদের দেহে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। তোমাদের এই দেহ যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোমাদের দেশে আসিবার এই যে পথ, ইহা যেন দেবতাদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়। আমার আশঙ্কা: বৃহস্পতি (অর্থাৎ দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র) তোমাদিগকে ক্লেশ দিবেন। (অর্থাৎ যদি তোমরা নত হইয়া গাভীগুলি প্রত্যর্পণ না কর, তবে তোমাদের বিপদ আসন্ন)।।৬।।

পণিগণ---হে সরমে! আমাদের ধন-ভাণ্ডার পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত। ইহা ধেনু, অশ্বাদি বহুবিধ সম্পদে পরিপূর্ণ। উত্তমরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ পণিগণ তাহা রক্ষা করিতেছে। তুমি গাভীগণের হাম্বারব শুনিয়া এই স্থান নির্ণয় করিয়াছ। কিন্তু তোমার আগমন বৃথাই হইয়াছে।।৭।।

সরমা---আয়স্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগণ সোমপানে উৎসাহিত হইয়া এখানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা এই বিপুল সংখ্যক গাভী নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবেন। হে পণিগণ! তোমাদের এই সদম্ভ উক্তি প্রত্যাহার করিতে হইবে।।৮।।

পণিগণ---হে সরমে! দেবগণ ভয় প্রদর্শন করিবার জন্যই তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন; সেই জন্যই তুমি আসিয়াছ। তোমাকে আমরা ভগ্নিরূপে গ্রহণ করিতেছি। তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। হে সুন্দরি! তোমাকে আমরা এই গোধনের অংশ দিতেছি।।৯।।

সরমা---আমি তোমাদের এই ভ্রাতা-ভগ্নি বিষয়ক প্রস্তাব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ইন্দ্র এবং অঙ্গিরাগণ আমার যথোচিত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই আমাকে গোধন উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের আশ্বাস পাইয়াই আসিয়াছি। সুতরাং তোমরা এই স্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর।। ১০।। হে পণিগণ! পলায়ন কর। ঋষিদের গাভীগুলি কষ্ট পাইতেছে। তাহারা ধর্মের আশ্রয় লাভ করিয়া এই পর্বত পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া চলুক। বৃহস্পতি ইন্দ্র, সোম এবং মেধাবী ঋষিগণ এই গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত গোধনের সন্ধান পাইয়াছেন।।১১।।

আচার্য ম্যাক্সমূলার মনে করেন Dawn বা উষাই সরমা। তাঁহার মতে: সমস্ত আখ্যানটিই উষাকালের প্রাকৃতিক

দৃশ্যাবলীর রূপকের আঙ্গিকে বর্ণনা। সূর্য-রশ্মিকেই গাভীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অন্ধকারই পণিরূপে কল্পিত হইয়াছে। উষাকালে ইন্দ্র (অর্থাৎ দিনের আলো) পণির (অর্থাৎ অন্ধকারের) সহিত সংগ্রাম করিয়া অবরুদ্ধ গাভী-গণকে (অর্থাৎ তিমির যবনিকার অন্তরালবর্তী রশ্মিগুলিকে) অপাবৃত করেন। (Science of Languages, Vol. II pp 513 to 516). আচার্যের এই ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ করেন না; কারণ, তিনি গাভীগণ কর্তৃক দুগ্ধদান এবং সরমাকে দেবশুনী বলার কারণ সম্বন্ধে নীরব।

('বেদের সরমা' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

[প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয়, মহাভারতে একবার এই সরমা এবং সারমেয়র সাক্ষাৎ পাই। আদি পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই দেখা যায়, মহারাজ জন্মেজয় কুরুক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ সত্র অনুষ্ঠান করিতেছেন। তথায় একটি কুকুর উপস্থিত হইলে রাজভ্রাতাগণ তাহাকে প্রহার করে। কুকুর রোদন করিতে করিতে মায়ের নিকট অভিযোগ করিল: এই মাতাই সরমা। সারমেয় তাহাকে বলিল, "জন্মেজয়ের ভ্রাতাগণ আমাকে প্রহার করিয়াছেন।" সরমা বলিল "তুমি বোধহয় তাঁহাদের কোন অপকার করিয়াছ।" সারমেয় বলিল, "আমি তাঁহাদের কোনই অপকার করি নাই। যজ্ঞের হবিও দর্শন করি নাই। তাঁহারা বিনা দোষে আমাকে প্রহার করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া দেবশুনী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমার পুত্র তোমাদের কোন অপকার করে নাই; যজ্ঞের হবি অবেক্ষণ বা অবলেহন করে নাই। তোমরা কেন তাহাকে অকারণে প্রহার করিয়াছ, তাহা বল।" তাঁহারা কোনই উত্তর দিলেন না। তখন সরমা বলিল, "তোমরা নিরপরাধীকে প্রহার করিয়াছ, অতএব, অনুপলক্ষিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" জন্মেজয় দেবশুনীর এই অভিশাপ শ্রবণে অতিশয় বিষণ্ণ ও ভীত হইয়া সরমার অভিশাপ নিবারণের জন্য উপযুক্ত পুরোহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।]

মহাত্মা গান্ধী : আধুনিক কবিদের চোখে

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি : আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে, তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি।
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

বাতাসে ভাসিছে আজিকে তোমার প্রার্থনাতীত বাণী
আকাশে হাসিছে তব প্রসন্ন হাসি,
ওগো মহাত্মা—দেবতা, তোমারে নিবেদি প্রণামখানি,
মন বলে, যেন চিরদিন ভালবাসি।

—সজনীকান্ত দাস

মূর্ত সত্য, প্রতীক অহিংসার,
সাধ্য যে নাই দেখিয়া তা চিনিবার,
তেজোময় এক দীনতার ছবি,
অমৃত-উৎস প্রাণে। —কুমুদরঞ্জন মল্লিক

"শতবর্ষ দিগন্তের পার হ'তে গান্ধী জন্মদিন
একখানি জলভরা মেঘ।"

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বীর্যবতী ধরা চায় বীর্যবান নয়,
হে বীর, তুমিই তার মনোমতো বর।

—অন্নদাশঙ্কর রায়

দুঃখ তার দয়ার সুন্দর হাতে ধরে আছে এই
রাত্রির পবিত্র রক্ত; যত ঝরে, তত ধরে হাতে।
কিন্তু রক্ত ঝরে যাবে, কিন্তু এই কান্নার পরেও
আবার অব্যর্থ ভোর ঘরে-ঘরে জাগাবে—তখন?

—বুদ্ধদেব বসু

নয়ন-জল
নয়নে থাক,
শুনেছি বন্ধু তোমারি ডাক,
যুগযুগান্তে সে আহ্বান
মথিয়া তুলিবে পাষাণ-প্রাণ
অসাড় হৃদয়, বারম্বার।
নমস্কার— —বনফুল

"মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসা
মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় বলে।"

—জীবনানন্দ দাশ

মারণ অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয়।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

জীবনে জীবন দিলে মরণে জীবন তুমি, জীবন-মৃত্যুর
হলাহলে

ভেদ দিলে মুছে
ধুয়ে দিলে মন্দাকিনী নির্ঝর শীকরে।

—বিষ্ণু দে

একটি অপূর্ব মন—পৃথিবীর, মানুষের মন
আলো হয় তারার মতন,
একটি অপূর্ব মনে আশা থাকে, থাকে ভালোবাসা।

—সঞ্জয় ভট্টাচার্য

হিংসানাশন পঞ্জরাস্থি মন্ত্রঃপূত অহিংসাতে,
বজ্রসমান দধীচির দান, নির্যাতিত এ জাতির হাতে।

—মনীশ ঘটক

ভস্ম তোমার বীজের মতই ছড়িয়ে গেল আকাশতলে
জলে স্থলে॥ —দীনেশ দাশ

হে তুমি প্রেমের যোগী।
হিংসার সংগ্রামে
রক্ত আজ ফুল হয়ে ফোটে পায়ে পায়ে। —বাণী রায়

※ মিতা-পিতা ※

[শিরোনামটি একটু অদ্ভুত হলেও অর্থবহ। যে অর্থের ব্যবহার,—সেটা হচ্ছে 'মিতার (অর্থাৎ মিত্রের) মত পিতার।']

পুত্রের প্রতি পিতার আচরণ কেমন হওয়া উচিত—এ নিয়ে সেকালের ও একালের অনেকেই অনেক কথা বলেছেন: পিতার কিরূপ ব্যবহার—পুত্রের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশের পরিপন্থী, নীতিশাস্ত্র ও শিশু মনস্তত্ত্বের বইয়ে তার বহুবিধ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চবর্ষোত্তীর্ণ বালক-পুত্রকে শাসন ও তাড়নার দ্বারা চালনার বিধান দিয়ে গেছেন স্বয়ং কৌটিল্য। আবার পাঠশালা ও ইস্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে ঢুকবার পর ছেলের (ষোড়শ বা তদূর্ধ্ব বয়সী) সাথে বন্ধুবৎ ব্যবহারের কথাও বলেছেন তিনি। অবিশ্যি, এই মিত্রজনোচিত আচরণের ধরনটা কেমন হবে, সে বিষয়ে খুলে কিছু বলেন নি।

বয়:প্রাপ্ত প্রবাসী ছেলে বাড়ি ফিরলে সাহেবরা বোতল থেকে হুইস্কী ঢেলে গ্লাস তুলে দেন তার হাতে, সিগারেটের টিন খুলে তার সামনে এগিয়ে ধরেন। কিন্তু ভারতীয় পিতাদের অনেকেই এ ধরনের আপ্যায়নটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারবেন না। কেউ কি নিজের হুঁকোটা ছেলের হাতে তুলে দেবেন? বড়জোর পানের ডিবে থেকে দু'-একটা পান, না হয় নস্যির কৌটো থেকে দু' এক টিপ নস্যি দিতে পারেন।

পিতার স্নেহের দৌর্বল্যের সুযোগ নিয়ে পুত্র যাতে যথেচ্ছাচারী হয়ে না ওঠে, সে জন্য অনেকের মতে: 'পুত্রের কাছে অপত্যস্নেহের প্রকাশ কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। ছেলেকে যতই স্নেহের চক্ষে দেখা যাক না কেন, তার কু-প্রবৃত্তি ও বদ-অভ্যাসগুলো কঠোরহস্তে দমন করা চাই।' এ জন্য প্রয়োজনবোধে চরম নিষ্ঠুর হতে হবে। এ বিষয়ে মহাত্মাজীর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

গান্ধী পুত্রের লঙ্কাপ্রীতি দূর করার জন্যে তাকে এক প্লেট কাঁচালঙ্কা চিবোতে বাধ্য করেছিলেন। ঝালের চোটে মুখে লালা ঝরে ছেলে যায় আর কি। তবে ভবিষ্যতে আর তার লঙ্কা খাবার বাসনা জাগে নি।

ছেলেকে নৈতিক শিক্ষায় মানুষ করে তুলতে গিয়ে শেষপর্যন্ত আদর্শবাদী পিতাদের অনেকের আশা ও শ্রম ব্যর্থ হয়েছে। এ সম্পর্কে কট্টর ব্রাহ্ম, কলকাতার কোন নামকরা কলেজ-অধ্যক্ষের আশৈশব নীতিশিক্ষাপ্রাপ্ত তনয়ের জনৈকা গোত্রহীনা ছায়াচিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে। আবার এও দেখা গেছে যে, অনেক কর্তব্যবিমুখ, নীতিজ্ঞান বিবর্জিত পিতার জীবনে বিনয়ী, সুশীল ও কৃতী সন্তান লাভের সৌভাগ্য ঘটেছে।

জুলফিক্কার

অধিকাংশ বাপেরই ছেলের ওপর কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব করবার ইচ্ছা দুর্বার। তাই এঁদের আচরণ বেশির ভাগ কর্তৃত্বসূচক ও পুত্রের পক্ষে ত্রাসোদ্দীপক হয়ে থাকে। প্রাচীনপন্থী পিতাদের অনেকেই শাসনপ্রিয়। এখনও তাই অনেক চল্লিশ বছরের বুড়ো খোকাদের (সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও) রাত্তির আটটার পর বাড়ি ফিরে বাপের সামনে যেতে রীতিমত হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপককে জানি, যাঁর ছেলে দেরাদুন মিলিটারী এ্যাকাডেমী থেকে পাশ করে আর্মিতে ঢুকেছিলেন। খুব স্মার্ট অফিসার, বছর সাতেকের মধ্যেই মেজর র‍্যাঙ্ক পেয়েছেন।

মেজর সাহেবের কোয়ার্টার্সে একদিন ককটেল পার্টি। জঙ্গী অফিসারদের অনেকেই এসেছেন; কেউ পত্নী বা শ্যালিকাসহ উপস্থিত। জোর মদ্যপান ও হৈ-হুল্লোড় চলছে।

এমন সময় রাত্তির সাড়ে ন'টার ট্রেনে ভূতপূর্ব অধ্যাপক ছেলের কোয়ার্টার্সে এসে হাজির। তার-যোগে আগমনের বার্তা পূর্বাহ্ণেই পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু লাইনে কি এক গণ্ডগোল হওয়ায় টেলিগ্রাম তখন এসে পৌঁছয় নি।

বৃদ্ধ অধ্যাপক বাড়িতে ঢুকতেই আঁচ পেলেন, বাইরের ঘরে মাতালদের আড্ডা চলছে। স্খলিত কণ্ঠে গানের কলি, অসংযত উল্লাসধ্বনি, মেয়ে-পুরুষের সম্মিলিত উচ্চহাসি। ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

সোজা আসরে ঢুকে হাতের মোটা লাঠিখানা উঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, —'ক্লিয়ার আউট।'

আর ছেলের পিঠের ওপর বসিয়ে দিলেন আচ্ছা কয়েকটা লাঠির ঘা।

হৈ-চৈ, মহা কেলেঙ্কারী ব্যাপার।—

যুগের হাওয়া বদলের সাথে সাথে বাবাগিরির চংটিও যথেষ্ট পাল্টেছে। কিন্তু তা'বলে পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা আদর্শের কাছাকাছি খুব একটা এগিয়ে এসেছে, তাও মনে হয় না। বয়স্ক পুত্রের প্রতি মিত্রবৎ আচরণ শাস্ত্রানুমোদিত, কিন্তু এক ধরনের পিতা আছেন, পুত্রের সঙ্গে যাঁদের বরাবরই সখ্যভাব। চাণক্য-শ্লোকোক্ত পাঁচ, দশ ও ষোল বছরের সীমানা—সব তাদের কাছে একাকার হয়ে গেছে। বড় বয়সী ছেলের সঙ্গে সমানভাবে মেশাটা বিশেষ কঠিন নয় কিন্তু ছোটদের তালে তাল দিয়ে মিশতে গেলে, নিজেকেও অনেকখানি ছোট করে আনতে হয়—যেটা

যৌবন বা প্রৌঢ়ত্বের সীমানাতিক্রান্ত লোকদের পক্ষে সহজ নয়; যতটা সহজ বৃদ্ধ ও কর্ম থেকে অবসরপ্রাপ্তদের পক্ষে। তাই দাদু হিসাবে নাতির সঙ্গে যেমন সহজ ও বন্ধুভাবে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চালিয়ে মেশা যায়, ছেলের বেলায় সেটা হয়ে ওঠে না। এর আরও একটা কারণ হচ্ছে, নাতির সম্বন্ধে দায়-দায়িত্বের ভাবনা না থাকা।

●

অনেকদিন আগের কথা বলছি।

কুমিল্লা যাবার পথে দেখি স্টিমারে চলেছে আমার ছোটভায়ের এক বন্ধু ও তার বাবা। ছেলেটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশের ছাত্র। বয়স একুশ-বাইশ। বাবা সব-জজ, বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। দু'জনেরই বিশাল বপু—যেমনি লম্বা, তেমনি চওড়া; মুখে জাঁদরেল গোঁফ-পাটা ও গোঁপ।

বাবা ও ছেলেকে দেখলে ভাই-ভাই মনে হয়। স্টিমারের ডেকে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সমানে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে দু'জনে গল্পে মশগুল। ওদের অট্টহাসিতে চারিদিক ক্ষণে ক্ষণে প্রকম্পিত হয়ে উঠছে।

ছেলেটির সঙ্গে আমার পরিচয় যৎসামান্য। সব-জজ বাবুর সাথেও আলাপ নেই। এমত অবস্থায় ওদের সামনে গিয়ে ওদের রসভঙ্গ করাটা সমীচীন মনে করলাম না।

দুপুরবেলায় বাটলারের ওখানে খেতে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। বাপ ও ছেলে এক কোণে খেতে বসেছেন। তখনকার দিনে এক প্লেট ভাত আর মুরগীর ঝোলের দাম ছিল বারো আনা। ওঁরা একখানা ৫ টাকার নোট দিয়ে দু'জনের খাবার চুক্তি করেছিলেন।

যাত্রীদের মধ্যে খাবার লোকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, তবুও ওঁদের দু'জনকে পৃথক একটা ছোট টেবিলে বসানো হয়েছিল। শুনলাম গোটা ছয়েক মুরগী কেটেও কুল পায় নি বাটলার।—

খাবার পর ডেকে ফিরে বাবা ধরালেন চুরুট, ছেলে সিগারেট। সামনের টিপয়ে পাতলেন দাবার ছক। চলল খেলা সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

এর পর বাজনার পালা। বাবা নিলেন এসরাজ, ছেলে বাঁশী। কূলহারা প্রশস্ত নদীর বুকে সান্ধ্য বাজনায় ওঁদের আসরটি সত্যই খুব সুন্দর জমেছিল। যতক্ষণ না স্টিমার চাঁদপুরের ঘাটে এসে ভিড়ল, ততক্ষণ পর্যন্ত চলল বাবা-ছেলের সুর-চর্চা।

●

আর এক ভদ্রলোকের কথা জানি। দুই ছেলে তাঁর।

বড়টি বছর দশেক হল বিলেতে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে আর ফেরে নি, ওখানেই মেম বিয়ে করে প্র্যাকটিস সুরু করেছে। বাড়ির সাথে সম্পর্ক-রহিত। ছেলেটিকে ভদ্রলোক জোর শাসনে রেখেছিলেন। নৈতিক শৈথিল্য যাতে না হয়, সে দিকে ছিল তাঁর খরদৃষ্টি। যাক্, ছোট ছেলেটির বেলায় শাসন আপনি থেকেই ঢিলে হয়ে পড়লো। বড় ছেলের কোন কিছুতে ত্রুটি হলে মিলত তিরস্কার, সময় সময় প্রহার, কিন্তু এছেলের সাতখুন মাপ। বছর বারোর ছেলে, একটা আসল বিচ্ছু। ওর উপদ্রবে পড়শীরা তটস্থ। অনবরত নালিশ শুনতে শুনতে মায়ের কান ঝালাপালা। বাপ কিন্তু নির্বিকার। তাঁর কথা হল—একটার বেলায় শাসন করে দেখা গেল, এটাকে না হয় ধর্মের নামে ছেড়েই দেওয়া যাক। ছেলেবেলায় অনেকেই দুরন্ত থাকে, বড় হলে সেরে যায়। আমিও কি কম দুরন্ত ছিলুম ছোটকালে!

গৃহিণী কিন্তু বাপের ঔদাসীন্য ঠিক বরদাস্ত করতে পারলেন না। একদিন ছেলের অপকর্মের রিপোর্ট পেয়ে অসম্ভব চটে গিয়ে বাপকে যাচ্ছেতাই গালাগাল সুরু করে দিলেন। সেদিন ভদ্রলোকটির মেজাজ কি একটা কারণে এমনিতেই বিগড়ে ছিল। গৃহিণীর রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না।

দেওয়ালে টাঙানো বেতের ছড়িখানা তুলে নিয়ে ছেলের হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে এসে ঢুকলেন শোবার ঘরে। ঢুকেই বন্ধ করে দিলেন দরজা। বাপের রুদ্রমূর্তি দেখে ছেলে হতভম্ব। ছেলের ভয়বিহ্বল ভ্যাবাচাকা-খাওয়া মুখের পানে চেয়ে ভদ্রলোকের উষ্মার তাপমাত্রা অনেকখানি নেমে পড়ে।

ফিস্‌ফিস্ করে বললেন ছেলেকে—'ভয় পাস নি, তোকে আমি মারবো না। এই খাটের ওপর গোটানো তোষক-বালিশের ওপর সপাং সপাং বেত মারবো, আর যেই বেতের ঘা পড়বে, অমনি তুই চীৎকার করে কেঁদে উঠবি। দেখি কেমন পারিস!'

বাপের ছড়ি সশব্দে বিছানার ওপর পড়তেই ছেলেটি চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। একদিকে শপাশপ আওয়াজ, অন্যদিকে উৎকট সরব ক্রন্দন; মেকি কান্নায় আর্তভাব চমৎকার ফুটিয়ে তোলে ছেলেটা। বাহাদুর ছেলে! ঘরের বাইরে খাড়া মায়ের রাগ তখন পড়ে গেছে। শেষে দুমদাম্ দরজা-ধাক্কা।

—'কর কি, কর কি, ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি?' মায়ের কাতর কণ্ঠ শোনা যায়।

●

স্যর হিরাম ম্যাক্সিম ছিলেন একজন মার্কিন-প্রবাসী প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওঁরই উদ্ভাবিত কলের বন্দুক 'ম্যাকসিম গান'-এর ব্যাপক চল হয়েছিল। ছেলের সঙ্গে ঠিক সমবয়সীর মত মিশতেন স্যর হিরাম। তাঁর আচরণে ছিল কৌতুকমেশানো প্রশ্রয়। ছেলেটা স্কুলে যাবার পথে রোজই দেখতে পায় এক ড্রাগিস্ট স্টোরের মালিকের টেবিলে বসা চমৎকার একটা ছোট্ট শাদা পুড্‌ল্ (Poodle) কুকুর। চেয়ে চেয়ে দেখে আর আশ মেটে না। কুকুরটি পাবার বাসনা ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে তার মনে। একদিন সাহস করে স্টোর মালিকের কাছে গিয়ে জিগ্গেস করল,

—আচ্ছা স্যর, আপনার কুকুরটার দাম কত?

---সে শুনে তোমার লাভ? তুমি কিনবে নাকি?

---হ্যাঁ। ছোট দেখে ভাববেন না টাকা দিতে পারবো না। আমার বাবার অনেক টাকা। যে দাম চাইবেন তাই দেবেন তিনি।

---এ কুকুরটা বিক্রির জন্যে নয়।

ছেলেটা না-ছোড়। কুকুরটা কিনবার জন্য কাকুতি মিনতি করেই চলে।---

কেমিস্ট ভদ্রলোকের হঠাৎ একটা দুষ্টুবুদ্ধি চাপে মাথায়।

---আচ্ছা খোকা, কুকুরটা যখন এত করে চাইছ, তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু এর জন্যে আমাকে এমন একটা ডলার দিতে হবে যার দু'পিঠেই প্রেসিডেণ্টের মুখ।

---এ আর এমন কি কথা, বাবাকে বললেই এমন ডলার জোগাড় করে দেবেন।

ছেলেটা ফিরে এসে দেখে বাবা বাইরে কোথায় বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছেন।

---'আচ্ছা বাবা, তোমার কাছে দু'দিকে প্রেসিডেণ্টের মুখআঁকা ডলার আছে?

ছেলের কথায় ম্যাক্সিম সাহেব বেশ একটু কৌতুকই বোধ করেন।

---দু'ধারেই প্রেসিডেণ্টের মুখ? ---তা' খুঁজলে হয়ত দু'-একটা পাওয়া যাবে। কিন্তু কি হবে তা দিয়ে?

---কুকুর কিনব। ড্রাগ স্টোরের শাদা পুডলটা দেখ নি? আর কী সুন্দর কুকুর। দোকানী বলেছেন ঐ রকম একটা ডলার পেলে কুকুরটা আমাকে দেবেন।

---আচ্ছা এখন এক জায়গায় কাজ দেখতে যাচ্ছি। ফিরে এসে খুঁজে দেখব, কেমন?'---

হেড মিস্ত্রিকে বলে দুটো ডলারের মাঝ দিয়ে সমানভাবে চিরে ফেলে মাথাআঁকা পিঠ একত্রে জুড়ে লেদ মেশিনে চমৎকার একটা দু'মুখো ডলার তৈরি করালেন। নাড়াচাড়া করেও কেউ বুঝতে পারবে না যে, ওটা টাঁকশালের তৈরী নয়।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে ম্যাক্সিম সাহেব দেখেন ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিনি ছোট একটা থলেতে কয়েকটা ডলারের সাথে কারখানায় তৈরি ডলারটি মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে মিশিয়ে আপিস ঘরের ড্রয়ারে তুলে রাখলেন।

পরদিন ঘুম ভেঙেই ডলারের কথা মনে পড়ে যায় ছেলেটির। আফিস ঘরে এসে দেখে টেবিলের ওপর নক্সা বিছিয়ে বাবা নিবিষ্টচিত্তে কাজ করে চলেছেন।

---বাবা।

---উঁঃ

---আমার ডলার?

---কিসের ডলার?

---ভুলে গেলে এরই মধ্যে। সেই যে দু'পিঠেই প্রেসিডেণ্টের মুখ আঁকা---

---অঃ----আচ্ছা কতকগুলো ডলার দিচ্ছি তোমাকে। দেখত খুঁজে পাও কি না?'

ম্যাক্সিম সাহেব ড্রয়ার খুলে থলেটা ছেলের হাতে তুলে দিলেন।

ছেলেটি থলে থেকে ডলারগুলো মেঝেতে ঢেলে ফেলে, এক-একটা তুলে দেখতে থাকে।

---বাবা। ছেলেটির উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা যায়।

---এই যে পেয়েছি---এই দেখো!

ছেলে বাবার হাতে ডলারটি তুলে দেয়।

ম্যাক্সিম সাহেব মুদ্রাটি নেড়েচেড়ে ছেলের হাতে ফেরত দিলেন।

---'বেশ, যাও, এইবার এটা দিয়ে কুকুরটা নিয়ে এস। ছেলের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা দেখে মনে ভারি একটা তৃপ্তি অনুভব করলেন।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে ছেলেটি চলহ এ্যাপোথিকারীর দোকানে।

বাবাও ছিলেন তাকে তাকে।

চললেন ছেলের পিছুপিছু মজা দেখতে।

ডলারটি হাতে পেয়ে দোকানীর চোখ দুটো ড্যাবডেবে হয়ে ওঠে। মুখে প্রচণ্ড বিস্ময়।

বাইরে দাঁড়িয়ে হিরাম ম্যাক্সিম কাঁচের জানলার ওপাশে। দোকানীর ড্যাবাচাকা ভাবটা দিব্যি উপভোগই করছিলেন।

---কই কুকুরটা দিন।

ছেলেটার কথায় দোকানীর চমক ভাঙে।

---'দেখ খোকা, কুকুরটা সত্যিই আমি বেচব না। তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলুম।---কিন্তু এই ডলারটা পেলে কোথায় বলত?

---বাবা দিয়েছেন।---আপনি যা চেয়েছিলেন তা যখন পেলেন তখন কেন দেবেন না কুকুরটা?

ঠিক এই সময় হিরাম এসে ঘরে ঢুকলেন।

---আপনি বলেছিলেন দু'দিকে মুখওয়ালা ডলার পেলে কুকুর দেবেন?

---দেখুন, ওটা নিছক তামাসার কথা, তা স্যর, কোথা থেকে যোগাড় করলেন ডলারটা?

---সে খবরে আপনার দরকার কি? এতটুকু ছেলে, ও কি আপনার পরিহাসের পাত্র? আপনি যখন ব্যবসাদার লোক, আপনার কথার খেলাপ কেন হবে?

কি করেন ড্রাগিস্ট ভদ্রলোকটি। অগত্যা কুকুরটাকে তুলে দেন ছেলেটার হাতে।

সারা পথ নাচতে নাচতে চলল ছেলেটা।

ছেলের আনন্দ দেখে বাবাও মহা খুসি।

অবশ্য বাড়ি ফিরে একখানা পঞ্চাশ ডলারের চেক পাঠিয়ে দিলেন ড্রাগিস্ট ভদ্রলোকের নামে, কুকুরের দাম বাবদ।

●

ম্যাক্সিম সাহেব নক্সা নিয়ে হিসাব কষতে সারা সকালটাই প্রায়ই ব্যস্ত থাকেন। ছেলে সেদিন ভোরেই এসে ঢুকল তাঁর ঘরে।

---বাবা!

---উঁ' কাগজপত্র থেকে মুখ না তুলেই সাড়া দেন।

---আচ্ছা বাবা, আমাদের আপেল-গাছটিতে আপেল ধরে না কেন, পাশে

চালিদের বাগানের দুটো গাছ আপেলে ভেঙে পড়ছে।

—তা ত' দেখছি।

—আমাদের গাছে আপেল ধরানো যায় না? তুমি ত' কত ব্যাপার জানো। আপেলগাছে ফল ধরাতে জানে না?'

তা—তা একটু-আধটু জানি বই কি!'

—কি করলে ফল ধরবে?

—(একটু ভেবে) হাঁ, তা একটা কাজ করে দেখতে পার।—একটা মরা বেড়াল গাছটার নিচে পুঁতে দিলে ফল ধরবে।

—কত দিন লাগবে?

—তা ধর, এক সপ্তাহ।

চলল মৃত বিড়ালের খোঁজ।

শেষকালে মিলেও যায় একটা। পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলো সেটাকে বাগানে। মালীর সহকারী ছোকরাটাকে দিয়ে গাছের নিচে গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিল বেড়ালটাকে। সাত দিন পর আবার বাবার আপিস ঘরে হানা দেয় ছেলেটা।

—বাবা

—উঁ

—'আজ শনিবার, গত শনিবার বেড়াল পুঁতেছি।'

—বেড়াল?, কিসের বেড়াল?

—মরা বেড়াল,—তুমি বড্ড ভুলে যাও, সব কথা।

—তুমি যে বলেছিলে বেড়াল পুঁতবার সাতদিন বাদেই আপেল ধরবে গাছে। সাতদিন ত' প্রায় হয়ে গেল।

—ও:—হ্যাঁ—তা ধরবে বই কি?

—কই, ফুল-টুল ত' কিছুই ধরল না এখনও?'

—ও-সব ফুলটুলের বালাই নেই। একদম এক রাত্তের মধ্যে পাকা ফলে গাছ ছেয়ে যাবে।

—তাই নাকি, বেশ মজা ত?

আপিস ফেরার পথে নিজেই বাজারে গেলেন ম্যাক্সিম্ সাহেব। ফলের দোকান থেকে বেছে বেছে মস্ত এক টুকরী লাল টুকটুকে আপেল নিয়ে ফিরলেন। তখন রাত প্রায় ন'টা।

ছেলে তখন ঘুমিয়ে গেছে।

একটা ঝুলিতে আপেলগুলো ভরে, চাকরটাকে গাছে উঠে শক্ত শুকনো ডালের ডগায় ডগায় এক-একটা করে আপেল গেঁথে দিতে বললেন।

চাকর এঞ্জিনীয়ার সাহেবের মেজাজের সঙ্গে সুপরিচিত। আধ ঘণ্টার মধ্যে আপেলগুলোকে গেঁথে নেমে এলো।

ছেলেটার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে গাছটাকে দেখা যায়। ভোরে ঘুম ভেঙে বাইরের দিকে তাকাতেই চমকে লাফিয়ে ওঠে ছেলেটা।

আরে কি তাজ্জব কাণ্ড, গাছটা যে রাঙা টুকটুকে আপেলে ভরে গেছে!

ছুটতে ছুটতে বাবার ঘরে এল।

—বাবা, বাবা!

—কি ব্যাপার?

—দেখে যাও, কত আপেল ধরেছে।

ছেলের হর্ষোৎফুল্ল ও বিস্ময় বিজড়িত ভাব দেখে ম্যাক্সিম সাহেবের মনটা খুসিতে ভরে ওঠে।

—আরে ও ত' হবেই।—(চাকরকে ডেকে) জোন্স, জোন্স,—যাও গাছ থেকে আপেলগুলো পেড়ে আনো তো। সবগুলোই গাছপাকা। গাছে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে।

●

নীলকান্ত মিত্র—এন্ কে মিটার সাহেব একটা নামকরা বিদেশী ফার্মের মোটা মাইনের এক্সিকিউটিভ অফিসার। আমার মামার সহকর্মী ও বিশেষ বন্ধু। আমরা থাকি মির্জাপুরে, ওঁর বাড়ি সাউথ ক্যালকাটা—গড়িয়াহাটে। তবুও আমাদের দু'বাড়ির মধ্যে খুব হৃদ্যতা, যাওয়া-আসা লেগেই আছে। মিটার সাহেব সব সময়ে টিপ্‌টপ দারুণ রাশভারী লোক। ফার্মের কর্মচারীরা ওঁকে যমের মত ভয় করে।

আমাকে খুব ভাল করেই চেনেন ভদ্রলোক। সেদিন কি একটা ব্যাপারে আপিস সব বন্ধ। মামার কাছ থেকে একটা খুব জরুরী কাগজপত্রের ফাইল নিয়ে দিতে গেছি নীলকান্তবাবুকে, কালকের মধ্যেই নাকি ওর রিপোর্ট চাই এ-ব্যাপারে। সন্ধ্যে তখন চারটে সওয়া চারটে।

বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে চোখে পড়ল ডান ধারের কিচেন গার্ডেনের পাশে পাঁচিল-সংলগ্ন ফাঁকা লম্বা ফালি জমিটাতে গোটা চারেক ছেলের সাথে একটা শুকনো আমের আঁটি নিয়ে কি যেন খেলছেন নীলকান্তবাবু।

মাটিতে দাগ কেটে পর পর কতকগুলি চৌকো ঘর আঁকা। আমের আঁটিটা ছুঁড়ে একটা ঘরে ফেলছেন, আর এক পা তুলে লাফাতে লাফাতে দাগগুলো ডিঙিয়ে আঁটিটার কাছে এসে পায়ের ধাক্কায় সেটাকে বাইরে আনবার চেষ্টা করছেন। মাঝের একটা ঘর—প্রায় হাত খানেক চওড়া—তার মাঝে সারি সারি কাটা দাগ বা ক্রশ চিহ্ন। এ-ঘরটা গোটাগুটি লাফিয়ে পার হতে হবে। দাগের ওপর যদি পা পড়ে যায় কিম্বা আঁটিটা যদি দাগের ওপরে এসে থামে, কিম্বা এই কাটা ঘরের মধ্যে পড়ে, তবে খেলোয়াড় মোর হবেন। অন্য খেলোয়াড় তখন চান্স পাবে।

মিত্তির সাহেবের খালি পা, পাজামা হাঁটু অবধি গোটানো, গেঞ্জী ঘামে চুপচুপে। খেলোয়াড় ছেলেদের মধ্যে দুটো তাঁর নিজের সন্তান, বয়স নয় ও এগার। অন্য দু'টী ওদের বন্ধু, পাশের বাড়ির ছেলে।

বলতে গেলে অমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মিটার সাহেবের এই বালসুলভ ক্রীড়ারত মূর্তি দেখে যতটা কৌতুক অনুভব করলুম, তার চেয়ে ঢের বেশি হলুম বিস্মিত। এটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত।—

এর মধ্যে ছেলেদের হট্টগোল শোনা যায়।

—এই তোমার পা দাগের ওপর পড়েছে—মোর—মোর!

—কক্ষণো না।

—আমি দেখেছি বাবার পায়ের আঙুল দাগের ওপর পড়েছিল।

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে আমাকে দেখে ফেলেছেন।

—সলিল্ প্লীজ ওয়েট এ হোয়াইল। আই হ্যাভ এ কেন টু পিক উইথ দিজ কিডস্। ড্রয়িং রুমে গিয়ে বোসো—আমি আসছি।

কিছুক্ষণ বাদে মিস্টার মিটার এসে ঘরে ঢুকলেন।

সদ্য-স্নাত, পরণে সিল্কের পাজামা ও পাঞ্জাবী, গায়ে দামী পাউডারের সৌরভ।

আমার দিকে তাকিয়ে [illegible] হাসি হেসে বললেন—বুঝলে এই ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করলে দেহ ও মন-মেজাজ দুইই বেশ তাজা থাকে। ইউ উড নট ফীল দ্যাট ইউ আর এ্যজিং।—

সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

সারা বিশ্বে [illegible] ২,৫০০ বিভিন্ন শ্রেণীর সাপের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে ২১৬টি বিভিন্ন শ্রেণীর সাপ রয়েছে, এদের মধ্যে মাত্র ৪২টি শ্রেণীর সাপ বিষধর এবং অবিশষ্ট নির্বিষ বলে জানা গেছে। ১৯৫৪ সালে গবেষক বিজ্ঞানী এস, স্বরূপ এবং বি, গ্র্যাব ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যাগত তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। তাঁরা অন্যান্য কারণে মৃত্যুর (রোগ-ভোগে, দুর্ঘটনায়, বন্যজন্তুর আক্রমণে ইত্যাদি) সংগে সাপের কামড়ে মৃত্যুর একটি তুলনামূলক তালিকা প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায়, অন্যান্য কারণে মোট মৃত্যুর সংখ্যার তুলনায় সাপের কামড়ে মৃত্যু-সংখ্যা খুবই নগণ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ-সমূহে সাপের কামড়ে মৃত্যু-সংখ্যার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো (১৯৪৮ সালের হিসাব এটি)।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা (হাজারে)	সাপের কামড়ে মৃত্যু-সংখ্যা	বিভিন্ন কারণে মোট মৃত্যু-সংখ্যা	সাপের কামড়ে মৃত্যু সংখ্যা মোট মৃত্যু-সংখ্যার শতকরা অংশ
পশ্চিম বাংলা	২২,৩৩৪	১,৭৬৮	৩,৮৭,১৬৫	০-৪৬
আসাম	৭,৪৯৩	৬৮	৬৩,৯৮৪	০-১১
বিহার	৩৭,৫৯২	২,৬২৭	৫,১৭,১৬৯	০-৫১
বোম্বে	২২,৫৪০	৭,৯৮	৪,৯৪,৫৮১	০-১৬
মধ্যপ্রদেশ	১৭,৫৮৬	৯,৯৬	৫,১৮,৪৩০	০-১৯
পাঞ্জাব	১৪,১৩৫	১,১৩	২,০৫,০৯১	০-০৬
উত্তরপ্রদেশ	৫৮,৬৫৮	১,৫৭০	৮,১৯,২৬৬	০-১৯
মাদ্রাজ	৫২,২৬৮	১,৯৮৯	৯,৪৮,০৬৯	০-২১
উড়িষ্যা	৭,৬৪১	৬,৮১	১,৭৯,৮২৮	০-৩৬

বিহার ও মাদ্রাজ প্রদেশ দুটির সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যে বন্যজন্তুর [illegible] মৃত্যুর সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার হিসাবটি ১৯৪৭ সালের।

বিশেষজ্ঞদের মতে : সাপকে আমরা যতটা ভয় খাই ততটা ভয়ংকর তারা নয়। বিনা কারণে সাপ কখনো মানুষকে কামড়ায় না, কোনো কারণেই তাদের বিরক্ত বা উত্তেজিত করলেই (তাদের মুখের গ্রাস শিকার সরিয়ে দেওয়া বা ভুল করে তাদের গায়ে পা দেওয়া) কেবলমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদে তারা কামড় দিয়ে থাকে। নির্বিষ সাপের কামড়ে ক্ষতস্থানে প্রায় সমাকৃতি দু'সারি দাঁতের দাগ দেখা যায় কিন্তু বিষধর সাপের ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে অন্যান্য সমাকৃতি দাঁতের দাগের সংগে বিষ-দাঁতের গভীরতর দাগ দেখা যায়। সাপেরা (নির্বিষ বা বিষধর) কিন্তু মানুষ দেখলে দারুণ ভয় পায় এবং সবসময় পালানোর জন্য চেষ্টা করে। একান্ত বেকায়দায় পড়লেই তবে কামড় দিয়ে থাকে। ব্যস্ততার জন্য বেশির ভাগ

ক্ষেত্রে তারা উপযুক্ত প্রাণঘাতী পরিমাণ বিষ ঢালতে পারে না।। একজন সুস্থ সবল মানুষের মৃত্যুর জন্য গোখরো সাপের বিষ ১২ মিলিগ্রাম, কেউটের বিষ ৬ মিলিগ্রাম, রাশেলের ভাইপারের বিষ ১৫ মিলিগ্রাম এবং করাত-দাঁত ভাইপারের বিষ ৮ মিলিগ্রাম রক্তের সংগে মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সুবিধামতো কামড়াতে পারলে গোখরো ২০০ মিলিগ্রাম, রাশেলের ভাইপার ১৫০ মিলিগ্রাম, কেউটে ৩০ মিলিগ্রাম এবং করাত-দাঁত ভাইপার ২৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে পারে। যদি প্রাণঘাতী পরিমাণ বা তার অধিক পরিমাণ বিষ মানুষের রক্তে একবার মিশ্রিত হয়, তাহলে ৬।৭ মিনিটের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সাধারণত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে কিন্তু যদি দেহের কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিরার মধ্যে (যা খুবই বিরল) বিষ প্রবিষ্ট হয়, তাহলে ৪ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য। নির্বিষ সাপের কামড়ে শুধুমাত্র দারুণ মানসিক-ভীতিতে বহু রোগীর মৃত্যু হতে শোনা গেছে। এগুলিকে 'সাইকোলজিক্যাল ডেথ' বলা হয়। এ সম্পর্কে একটি শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করছি।

কোনো পরিবারের বড় ভাইকে সাপে কামড়ায় কিন্তু কামড়ানোর পর সাপটি বিষধর না নির্বিষ চেনা যায় না, কারণ রাতের অন্ধকারে সাপটি দ্রুত কাছাকাছি একটা গর্তে ঢুকে পড়ে। ক্ষতস্থানে কিঞ্চিৎ জ্বালা ছাড়া ভদ্রলোকের আর কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না। নির্বিষ সাপে কামড়েছে ধরে নিয়েই ভদ্রলোক পরের দিন সকালে অফিসে চলে যান। অফিস ছুটির কিছুক্ষণ আগে ভদ্রলোকের ছোট ভাই ছুটতে ছুটতে তাঁর অফিসে আসে এবং তাঁকে জানায় যে, গতরাত্রে যে সাপটি তাঁকে কামড়েছিল, সেটাকে দেখা গেছে---সেটি একটি বিষধর কেউটে। ভদ্রলোক একথা শোনামাত্র হার্টফেল করে মারা যান। প্রকৃতপক্ষে ভদ্রলোককে নির্বিষ সাপেই কামড়েছিল কিন্তু যখনি তিনি শুনলেন তাঁকে বিষধর সাপে কামড়েছিল, তখনি তাঁর মনে দারুণ ভীতির সৃষ্টি হলো---তিনি কোনো চিকিৎসাও করান নি অথচ তাঁকে কেউটেয় কামড়েছে---এই মানসিক আঘাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আমাদের দেশে সাপের ওঝাদের সাপের কামড়ে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে মন্ত্রতন্ত্র ও বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার সাহায্যে সারিয়ে তোলার বিভিন্ন বিস্ময়কর কীর্তিকলাপের কথা শোনা যায়। ওঝাদের ঐসব অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। আমি আগেই বলেছি যে, সাধারণ সুস্থ-সবল মানুষের মৃত্যু সংঘটনের জন্য গোখরো সাপের বিষ ১২ মিলিগ্রাম রক্তের সংগে মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেছে, গোখরো সাপ বেশির ভাগ কামড়েই এই প্রাণহরণকারী পরিমাণের বিষ ঢালতে পারে না। এসব রোগী এবং নির্বিষ সাপের কামড়ের দরুণ আতঙ্কগ্রস্ত রোগীদের ওঝারা সারিয়ে তুলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। (লক্ষণীয় যে, ওঝারা যে-সব ক্ষেত্রে সত্যিকার বিষধর সাপের কামড়ের রোগীদের বাঁচিয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সাপই গোখরো)। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বের হফকিন ইনস্টিটিউটের এণ্টোমোলজি বিভাগে জয়পুরের একজন অধ্যাপক বিহার থেকে অনুরূপ দু'জন ওঝাকে নিয়ে আসেন। দাবি করা হয় যে, উক্ত ওঝা দু'জন যে-কোনো বিষধর সাপের কামড়ের রোগীকে বাঁচাতে পারে। দু'টি খরগোশের দেহে কয়েক মিলিগ্রাম গোখরো সাপের বিষ প্রবিষ্ট করিয়ে তাদের দেওয়া হয় এবং একটি কেউটে সাপে কামড়ানো ভেড়াকেও বাঁচাতে বলা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উভয়ক্ষেত্রেই ওঝা দু'জন তাদের আয়ত্তাধীন সকল প্রকার বিদ্যা প্রয়োগ করেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এজন্য বিপদের সময় ওঝাদের বুজরুকিতে বিশ্বাস না করে যত শীঘ্র সম্ভব সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। চিকিৎসক দংশন-স্থান পর্যবেক্ষণ করে সাপটি বিষধর, না নির্বিষ বলে দিতে পারবেন এবং মারাত্মক বিষক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই সঠিক 'অ্যাণ্টিভেনিন' বা প্রতি-বিষ রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেবেন। এখানে প্রতি-বিষ নির্মাণের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।
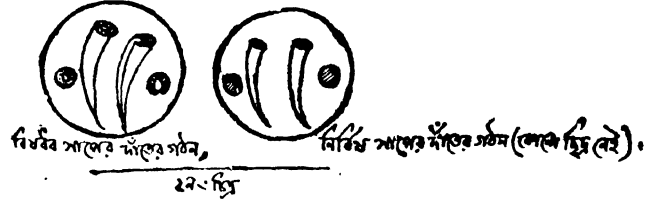
মজার ব্যাপার হচ্ছে---'অ্যাণ্টিভেনিন সিরাম' বা সাপের বিষের কার্যকারিতা বিনাশকারী প্রতি-বিষ সাপের বিষ থেকেই উৎপন্ন করা হয়। নতুন ধরা কোনো বিষধর সাপ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে বিষ সংগ্রহ করে অধিক জলে মিশ্রিত করা হয়। পরীক্ষার জন্য একটি ঘোড়ার দেহে বিষের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়, ফলে ঘোড়াটি ক্রমশ তার দেহের মধ্যে বিষের বিরুদ্ধে 'ইমিউনিটি' বা প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে তোলে। কয়েক মাসের মধ্যে ঘোড়াটির রক্তস্রোতে এমন একটি পদার্থের সৃষ্টি হয়, যা সাপের বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্ট করতে সক্ষম। এখন উক্ত ঘোড়ার দেহ থেকে খানিকটা রক্ত টেনে নিয়ে তা থেকে নির্দিষ্ট সিরামটি পৃথক করে ফেলা হয়। সাপের কামড়ের রোগীকে বাঁচানোর একমাত্র অব্যর্থ ওষুধই হলো এই প্রতি-বিষ।

নির্বিষ ও বিষধর উভয় শ্রেণীর সাপেরই রয়েছে দু'সারি কঠিন দাঁত। কিন্তু বিষধর শ্রেণীর সাপের একটা অতিরিক্ত দাঁত আছে, যার নাম 'পয়জন

বিষধর সাপের দাঁতের গঠন, নির্বিষ সাপের দাঁতের গঠন (দাঁতে ছিদ্র নেই)।

১২নং চিত্র

ফ্যাং' বা বিষদাঁত। এই দাঁতটির গঠন একটু বিচিত্র। এর অভ্যন্তরে রয়েছে একটি খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ, যার মধ্য দিয়ে সাপ তার শত্রুর দেহে কামড়ের সময় বিষ ঢেলে দেয়। ওপর পাটিতে অবস্থিত এই বিষদাঁতের মূলদেশের সংগে 'ভেনম ডাক্ট' বা বিষনালীর সাহায্য 'ভেনম গ্ল্যাণ্ড' বা বিষগ্রন্থি সংযুক্ত (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বিষ দাঁতের অগ্রভাগ থেকে বিষগ্রন্থি পর্যন্ত পথটি অবিচ্ছিন্ন, ফলে কামড়ের সময় বিষগ্রন্থি থেকে সরাসরি বিষদাঁতের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বিষ চলে আসে। গোখরো এবং কেউটে সাপের বিষদাঁত ওপর পাটিতে দৃঢ়ভাবে আটকানো কিন্তু রাশেলের ভাইপারের বিষদাঁত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং মূলদেশস্থিত মাংসপেশীর সাহায্যে তারা দাঁতটি ওঠানামা করাতে অর্থাৎ দৈর্ঘ বাড়াতে কমাতে পারে। যার ফলে, কামড় দিয়ে বিষ ঢালার সময় রাশেলের ভাইপারকে মাথা নাড়া করতে হয় না।
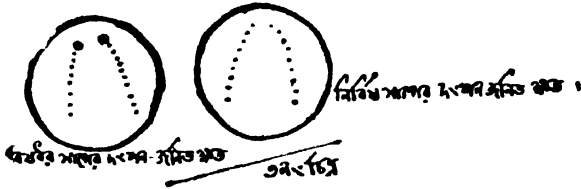
চিকিৎসা জগতে বহুল প্রয়োগের জন্য সাপের বিষের মূল্য ও চাহিদা অত্যধিক। সাপের বিষের মূল্য সোনার বর্তমান মূল্যের দশ গুণেরও অধিক। কেউটে সাপের বিষ (যা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণেই উৎপন্ন হয়) প্রতি গ্রামের মূল্য ২৫০ টাকা অর্থাৎ সোনার চেয়ে প্রায় ১৫গুণ বেশি মূল্যবান।

সাধারণ সাপুড়েরা সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়ে অবৈজ্ঞানিক পন্থায় বিষ সংগ্রহ করে থাকে (সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিলে অবশ্য কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন বিষদাঁত গজায় কিন্তু এতে সাপ খানিকটা জখম হয়, যার জন্য বিষ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কমে যায়)। বম্বের হফকিন ইনস্টিটিউটে যেভাবে বিষ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, আমি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করছি।

মদের গ্লাসের ওপর প্লাস্টিকের চাদর চাপা দিয়ে গোখরো সাপকে ছোবল মারতে উত্তেজিত করা হয়। তার ফলে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ ঝরতে থাকে এবং তা সংগ্রহ করা হয়। বিষধর ভাইপারের ক্ষেত্রে শুধু মদের গ্লাসের ওপর (চাদর চাপা না দিয়ে) ছোবল মারানো হয়। আমি আগেই বলেছি, এদের বিষদাঁত স্থিতিস্থাপক। গ্লাসের গা বিষদাঁতের সংস্পর্শে আসে এবং গা বেয়ে বিষ ঝরতে থাকে ও সংগৃহীত হয়। দেখা গেছে, বছরের বিভিন্ন মাসে একই সাপের বিষের মোট পরিমাণ (নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন) ভিন্নতর হয়। এই পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হয় জুলাই-আগস্ট মাসে এবং সর্বাপেক্ষা কম হয় নভেম্বর - ডিসেম্বর মাসে। শীতকালে নিষ্কাশিত সকল সাপের বিষই বাদামী রংয়ের হয়ে থাকে, না হলে গোখরোর বিষ বর্ণহীন। এ ছাড়া শীতকালে সাপের বিষ আঠালোভাবের থাকে।

বিষধর সাপের দংশন-চিহ্নিত ক্ষত

নির্বিষ সাপের দংশন-চিহ্নিত ক্ষত।

৩নং চিত্র

রাশেলের ভাইপারের বিষ বেশির ভাগ সময় হলদে রঙের দেখতে। সূর্যালোকে রেখে দিলে ধীরে ধীরে বর্ণহীন স্বচ্ছ হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে সাপের বিষের মারাত্মক প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন হয়। গ্রীষ্মকালীন বিষ শীতকালীন বিষ অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক। আবার দেখা গেছে, গোখরো এবং কেউটে সাপকে উন্মুক্ত স্থানে রাখলে তাদের বিষের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উক্ত দুই সাপের ক্ষেত্রে পুরুষ-সাপেরা স্ত্রী-সাপের চেয়ে বেশি পরিমাণ বিষ উৎপাদন করে। (বম্বেতে সাপের বিষ সংগ্রহ ও সাপের বিষ নিয়ে গবেষণার জন্য 'স্নেক ফার্ম' নির্মিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এরূপ ফার্ম এই প্রথম। উদ্যোক্তা হ'লেন হফকিন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ পি; জে; দেওরাজ)। রাশেলের ভাইপাররা আবার জানা গেছে, আবদ্ধ কক্ষে থাকলে বেশি বিষ উৎপন্ন করে। রাশেলের ভাইপারের বিষ অপেক্ষা গোখরো ও কেউটে সাপের বিষে নিউরোটকসিক কঠিন পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি। সম্ভবত এটা প্রমাণ করে যে, নিউরোটকসিক পদার্থ-সম্বলিত বিষের সাপেরা উন্মুক্ত স্থানে থাকলে অধিকতর বেশি পরিমাণ বিষ দিয়ে থাকে।

নিউরোটকসিক কঠিন পদার্থের আধিক্যের জন্য গোখরো এবং কেউটে সাপের বিষ অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল। রাশেলের ভাইপারের বিষ অপেক্ষাকৃত বেশি তরল বলে দংশন-স্থান ফুলে উঠে থাকে।

সাপের বিষ নিয়ে ব্যাপক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সাপের বিষ অম্লধর্মী। গবেষক বিজ্ঞানী ডাঃ ন্যান্দার পোর্জেস সাপের বিষকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করেছেন -- নিউরোটকসিক এবং ভ্যাসোটকসিক। গোখরো ও কেউটের বিষ নিউরোটকসিক গোষ্ঠীর। রাশেলের ভাইপার, করাত-দাঁত ভাইপার প্রভৃতি সাপের বিষ ভ্যাসোটকসিক গোষ্ঠীর। সাপের বিষ বিশ্লেষণ করে নিউরোটকসিন, কোলিনেস্টারেজ, হায়ালিউরোনিডেজ, রিবোনিউক্লিজ, ওফিও-অক্সিডেজ, ফসফোডাই-এস্টেরেজ, নিউক্লিওটাইডেজ এবং লেসিথিনেজ নামক উৎসেচক পাওয়া গেছে। এগুলি প্রতিরোধ-বিজ্ঞানীর নিকট মূল্যবান। কারণ প্রতি-বিষ নির্মাণে এগুলি সহায়তা করে থাকে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা গোখরো সাপের বিষের পরিমিত দ্রবণ রোগীর যন্ত্রণা উপশমের কাজে ব্যবহার করে থাকেন। দাঁত থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য রাশেলের ভাইপারের বিষ-দ্রবণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'হেমোফিলিয়া'র বিরুদ্ধে কার্যকর ওষুধেরও একটি অত্যাবশ্যক উপাদান এই রাশেলের ভাইপারের বিষ। আমাদের দেশের আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানে যক্ষ্মারোগের ওষুধ 'শুক্তভরণ রাস' ও

'বিষায়ন' প্রস্তুতিতে সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের গোখরো সাপ থেকে বিশুদ্ধ নিউরোটকসিন পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য দেশের গোখরো সাপ থেকে এত বিশুদ্ধ ও পরিমাণে এত অধিক পাওয়া যায় না। বিষ ছাড়াও সাপের চর্বি, ত্বক, খোলস ও মাংসপেশী থেকে বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুত হয়। বিদেশে কুকুরের একপ্রকার চর্মরোগ 'মেনজ্' সারানোর জন্য সাপের খোলস ব্যবহৃত হয়। সাপের চর্বি (বিশেষ করে গোখরোর) চোখের মলম প্রস্তুতিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা কেউটে সাপের বিষ থেকে তাদের বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুত করে থাকেন। স্নায়বিক, কুষ্ঠ এবং অস্ত্রোপচারের অযোগ্য ক্যান্সার রোগীর নিদারুণ যন্ত্রণা লাঘবে সাপের বিষের (প্রধানত গোখরোর) লঘু দ্রবণ বিস্ময়কর ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। কলকাতার 'ভেনম ক্যান্সার রিসার্চ ল্যাবরেটরী'র গবেষক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ আর. সি. ভট্টাচার্য গোখরো সাপের বিষ থেকে 'ইনজেকটবল' বা সূঁচ দেওয়ার যোগ্য, এমন একটি ওষুধ প্রস্তুত করেছেন—যা সায়টিকা, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের অসহ্য যন্ত্রণা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উপশম করতে সক্ষম। ডাঃ ভট্টাচার্য ভাইপারের বিষ থেকে আর একটি ওষুধ প্রস্তুত করেছেন যা যে-কোনো রক্তক্ষরণ (দাঁত থেকে, হেমোরেজিক টাইফয়েড, কিংবা প্রসবের পরবর্তী রক্তক্ষরণ) বন্ধের কাজে ম্যাজিকের মতো কাজ করে থাকে।

ডাঃ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'এপিলেপসি' বা মৃগীরোগের বিরুদ্ধেও গোখরো সাপের বিষকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার গবেষক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা গোখরো সাপের বিষের সাহায্যে মৃত্যুপথ-যাত্রী থ্রম্বোসিসের রোগীকে বাঁচানোর এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন—জীবনহানিকর বিষকে জীবন রক্ষার কাজে ব্যবহার করার পদ্ধতি অভিনব তো বটেই। ব্যাপারটা আমি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছি।

আমরা জানি যে, দেহের কর্তিত স্থান থেকে রক্ত বাইরে এলে জমাট বাঁধে। তার কারণ হলো বাইরের বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে রক্তস্থিত দ্রবণীয় প্রোটিন ফাইব্রিনোজেন সুতোর মতো অদ্রব্য ফাইব্রিনে পরিণত হয় এবং রক্তকে জমাট বাঁধায়। মানুষের হৃদপিণ্ডে কিংবা কোনো ধমনীতে রক্ত প্রবহমাণ কোনো কারণে জমাট বাঁধলে তা মানুষের জীবনের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে। দেহের অভ্যন্তরে থ্রম্বোপ্লাস্টিনের উপস্থিতিতে থ্রম্বিন নামক উৎসেচকটি রক্তের ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত করে এবং রক্তকে জমাট বাঁধায়। এই প্রক্রিয়া সংঘটনে থ্রম্বোপ্লাস্টিনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের অণুচক্রিকাগুলি ভেঙে গেলে এই থ্রম্বোপ্লাস্টিনের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সাধারণত 'হেপারিন' প্রয়োগে থ্রম্বোপ্লাস্টিনের সৃষ্টি রোধ তথা রক্তের জমাট বাঁধা বন্ধ করে থাকেন। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার গবেষক-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, গোখরো সাপের বিষে থ্রম্বোপ্লাস্টিন গঠনের বিরোধিতা করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই বিষকে মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট করানোর আগে এর ক্ষতিকারক উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিষ থেকে ক্ষতিকারক উপাদানগুলিকে পৃথক করা যায় এবং তারপর সেই বিষ থ্রম্বোসিসের মৃত্যু-পথযাত্রী রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে আশানুরূপ ফল আশা করা যাবে। এ নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে।*

[* প্রবন্ধটি রচনায় সাহায্য নিয়েছি :

1. 'Snakes of India'—Dr. P. J. Deoras.
2. 'Venomous Animals and their venoms'—Dr. Buchery and Buckley.
3. 'Snake Venoms—Origin, Chemistry and medicinal uses—Dr. R. C. Bhattacherya.

জীবনে কল্পনার স্থান

'কল্পনা বিলাসী' বলে পার্থিব অর্থে সফল মানুষের নাক উঁচু করার স্বভাব এবার বোধহয় পালটাতেই হবে। কেননা, যদিচ সাধারণ বুদ্ধিবলে তাদেরও সাফল্যের মূলে কল্পনা হতে পারে ভিন্ন জাতের। —সক্রিয়, তারা তা হেসে উড়িয়ে দিতেন তাচ্ছিল্যভরে। এবার কিন্তু ঠিক সে বলা চলবে না। কারণ আছে।

দুঁদে মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞবৃন্দ —এঁদের মধ্যে ডাঃ নরম্যান ভিন্সেন্ট পীলে-র মত জগদ্বিখ্যাতরাও আছেন। বেশ কয়েক বছর আগেই এই বলে মত প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ নিজের সম্বন্ধে যা ভাবে—সে সফল বা অ-সফল —তার তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

'মানবচরিত্রের একটা সর্বস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী নিজের সম্বন্ধে অবিরাম যা কল্পনা করে তাই হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত।' এ উক্তি একজন বিশেষজ্ঞের। কল্পনা আর 'ফ্যানটাসী' অ-ভিন্ন নয়। কল্পনাকে বলা হয়েছে—art or science of the projected. image. এবং এই ইমেজ—যা মানুষ নিজের সম্পর্কে গড়ে তোলে—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ওই ইমেজ-ই বাস্তব সত্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

কাব্যে অশ্লীলতা

প্রমথ চৌধুরী

আলঙ্কারিক মত

সংস্কৃত সাহিত্য শ্লীলই হোক, আর অশ্লীলই হোক, অশ্লীলতা যে কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ, সে বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা বোধহয় সকলেই একমত।---

আমি দু-একটি আলঙ্কারিকের দু-চারটি কথা ধ'রে, সে কালের বিদগ্ধমণ্ডলীর এ বিষয়ে রুচির পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়।

কাব্যের দোষগুণের একটি সহজ-লভ্য ফর্দের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যাদর্শেই পাই। কাব্যাদর্শ পুরনো গ্রন্থ, সুতরাং এ বিষয়ে প্রথমেই কাব্যাদর্শের কথা ধরা যাক্। দণ্ডি বলেছেন,---

"কামং সর্বোঽপ্যলঙ্কারো
রসমর্থে নিষিঞ্চতি।
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারং
বহতি ভূয়সা॥"

অর্থাৎ---যদিও সর্বপ্রকার অলঙ্কার অর্থে রসসিঞ্চন করে, তবুও অগ্রাম্যতাই এ ভার বিশেষরূপে বহন করে। দণ্ডির মতে: অলঙ্কারের সার্থকতা হচ্ছে কাব্যের অর্থের রস ফুটিয়ে তোলায়। কিন্তু অগ্রাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই তা সুসাধ্য হয়। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, "সালঙ্কারতয়া রসব্যঞ্জকোঽর্থো মধুর ইতি প্রতিপাদিতম্"। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে: "বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ"। অতএব দাঁড়াল এই যে, কাব্যের অর্থগত মাধুর্য অলঙ্কারের সাহায্যে আরও মধুর হয়, যদি না কাব্যের শব্দ ও অর্থ গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হয়।

আমরা অশ্লীল বলতে যা বুঝি, দণ্ডি গ্রাম্য বলতে তাই যে বুঝতেন, তার প্রমাণ তাঁর উদাহৃত কোন কোনও শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পাওয়া যায়। গ্রাম্য শব্দের অর্থ অবশ্য vulgar, তবে ইংরাজীতে যাকে indecent বলে, তাকে vulgar বললে অত্যুক্তি হয় না।---

আলঙ্কারিকদের বক্তব্য যে কি, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তাঁদের মতে: অশ্লীলতা দোষ হচ্ছে কাব্য-দেহের দোষ---অপর কোন বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার poetics অন্তর্ভুক্ত, ethics-এর নয়। সম্ভবত এই কারণে Hall প্রমুখ ইংরাজদের মতে যে কাব্য ঘোর অশ্লীল ব'লে গণ্য, সে কাব্য আলঙ্কারিকদের কাছে সরস ব'লে মান্য হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাব্যবিচারের মার্গ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গমার্গ হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকাশকার বলেছেন যে, কবির ভারতী---

'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈক-
ময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।'

যাঁদের মতে কবির প্রতিভা নিয়তি-কৃত নিয়মের অধীন নয়, তাঁরা যে কবি-প্রতিভাকে মানুষের হাতে গড়া সামাজিক বিধি-নিষেধের অধীন ব'লে স্বীকার করবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেকালে কাব্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত; সত্য অথবা শিবের হাত ধ'রে নয়।

গ্রাম্যতা অবশ্য শব্দেরও দোষ, অর্থেরও দোষ। এ কালের মত সেকালেও ভাষা---সাধুভাষা ও ইতর-ভাষা---এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সংস্কৃত ভাষার সাধু শব্দের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় আছে, ইতর শব্দের সঙ্গে নেই বললেই হয়। সুতরাং শব্দের গুণদোষ বিচার না ক'রে, আলঙ্কারিক-দের মতে শব্দের অর্থগত গ্রাম্যতার পরিচয় নেওয়া যাক। সেকালে গ্রাম্য-তার অর্থ একালের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিল। দণ্ডির মতে---

"কন্যে কাময়মানং মাং ন ত্বং
কাময়সে কথম্।"

উক্তিটি অর্থের গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। অপর পক্ষে---

"কামং কন্দর্পচাণ্ডালো ময়ি
বামাক্ষি নির্দয়।"

এই উক্তিটি শুধু "অগ্রাম্যোঽর্থঃ" নয়, উপরন্তু রসাবহ।

এ উভয়ের ভিতর প্রভেদ কোথায়, তা ধরতে একটু চেষ্টা করা যাক্। কেন-না, বিনা চেষ্টায় তা ধরা শক্ত। এক বিষয়ে এ দু'য়ের ভিতর একটা মস্ত মিল আছে। এ দুটি উক্তিই সমান কবিত্ব-ছুট। তারপর দু'টিতেই একই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে, দুয়ের ভিতর প্রভেদ মাত্র এই যে, প্রথমটি স্পষ্ট কথায় বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। এর থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনদের মতে: কথা সোজাসুজিভাবে বললে তা গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হয়, আর বেঁকিয়ে-চুরিয়ে বললেই তা শুধু অগ্রাম্য নয় ---রসাবহ হয়। অর্থাৎ বুক ও মুখের ভিতর chordline-ই গ্রাম্য এবং

loop এগ্রাম্য। সেকালের সমালোচকদের দল কি বলা হ'ল, তাতে বিচলিত হতেন না, কি ক'রে বলা হ'ল, তাই ছিল তাঁদের কাছে বড় জিনিস। এ কালের ভাষায়, content-এর চাইতে form-কে তাঁরা বেশি মর্যাদা দিতেন।---

কালক্রমে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বাক্যের পৃথক পৃথক দোষ ব'লে গণ্য হয়। দণ্ডির পরবর্তী আলঙ্কারিক বামন বলেন—"লোকমাত্র প্রযুক্তং গ্রাম্যম্।" অর্থাৎ যে কথা শুধু জন-সাধারণের মুখে শোনা যায়—কিন্তু শাস্ত্রে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না,—সেই কথাই গ্রাম্য। এ কথা শুনে মনে হয় যে, তাঁরা লোকভাষা ও শাস্ত্রীয় ভাষাকে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা ব'লে গণ্য করতেন। অর্থাৎ লেখায় মুখের কথা চল্‌বে না,—আর মুখে বইয়ের কথার স্থান নেই। সংক্ষেপে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। এ রকমের মত এ কালের অনেক বঙ্গ আলঙ্কারিক ব্যক্ত করেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা অবশ্য এ মতের সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে গ্রাম্য শব্দের ন্যায় 'অপ্রতীত' পদ কাব্যে অব্যবহার্য। অপ্রতীত শব্দের অর্থ কি?

"শাস্ত্রমাত্রপ্রযুক্তমপ্রতীতম্"

অর্থাৎ "শাস্ত্রে এব প্রযুক্তং, ন লোকে তদপ্রতীতং পদম্।" অর্থাৎ পণ্ডিতী শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ দুই কবির কাছে সমান অস্পৃশ্য। এ বিষয়ে আমাদের দেশের আলঙ্কারিকদের সঙ্গে ফরাসী দেশের Classical আলঙ্কারিকদের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। তাঁরাও সাহিত্যরাজ্য থেকে Pedantic ও Vulgar শব্দ সকল বহিষ্কৃত ক'রে দেবার জন্য ধনুক ধারণ করে-ছিলেন।---

বামন বলেছেন যে, সেই বাক্য অশ্লীল যা "ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্ক-দায়ী।" অর্থাৎ যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। এই হচ্ছে এ বিষয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের শেষ কথা। কারণ, কাব্য প্রকাশ, সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতি নামজাদা অলঙ্কারশাস্ত্রের অর্বাচীন গ্রন্থ সকলে, ঐ বামনের উক্তিই পুনরুক্ত হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস, এই কথাই এ বিষয়ে চরম কথা। অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলে যাতে লোকের মনে লজ্জা কিম্বা জুগুপ্সার জন্ম দেয়—তাই হচ্ছে অশ্লীল বাক্য। এখন জিজ্ঞাসা, কার মনে? আলঙ্কারিকদের মতে সামাজিক-দের মনে। তাঁরা সামাজিক বলতে বুঝতেন সেই সম্প্রদায়ের লোক—যারা যুগপৎ সভ্য ও সহৃদয়, এক কথায় Cultured Society। দেশভেদে ও যুগভেদে Cultured Society-রও রুচি বিভিন্ন। Anatole France-এর কথা ইংরাজের রুচিতে অশ্লীল ঠেকে, ফরাসীদের রুচিতে নয়। আলঙ্কারিকরা অবশ্য স্বদেশী সামাজিকদের কথা বলেছেন, বিদেশী সামাজিকদের নয়।

শ্লীলতা-অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিক-দের সেকেলে মতামত এ-কালের লোককে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেহে এখন ত' আর সেকালের মত নেই। যুগে যুগে লোকের মনে পরিবর্তন ঘটে, সুতরাং সেকালের বিধি-নিষেধের এ-কালে সার্থকতা নেই। এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের মতামত যে পরিমাণে বদলায়, তার মনের প্রকৃতি সে পরিমাণে বদলায় না। অতএব অনেক সেকেলে মতামতের অন্তরে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সে মনোভাব কস্মিনকালেও একেবারে বাতিল হয়ে যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা আবিষ্কার করি যে, প্রাচীন মন বর্তমান মনের চাইতে এক ধাপ উঁচুতে উঠেছিল।---

আমাদের পূর্বপুরুষরা সাহিত্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কখনও মাথা ঘামান নি, তাঁরা যার আলোচনা করেছেন, সে হচ্ছে কাব্যের রূপ। আর যার রূপ নেই, তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসম্বাদী।---

আলঙ্কারিকদের মতে অশ্লীলতা একটি দোষ; কেন না, তা কাব্যের রূপ নষ্ট করে; কারণ, ব্রীড়া, জুগুপ্সা প্রভৃতি মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনের বিঘ্ন ঘটায়;—একটি বদ্-সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়। কারণ, শ্রোতার কানে তা বেসুরো লাগে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, বে-সুর তার কানেই শুধু ধরা পড়ে—যার কানে ও প্রাণে সুর আছে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ; কেন না, তা সামাজিক লোকের রুচিতে বে-খাপ্পা ঠেকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক বলতে আলঙ্কারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক। মানুষের ভিতর কাব্যরসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীত-রসিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। এ জাতিভেদ ডিমো-ক্রাসিও দূর করতে পারবে না। আলঙ্কারিকদের মতে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাব্য-রসিক সমাজের রুচি।

এখন সকল সমাজের লোক সমান কাব্যরসিক নয়। দার্শনিক হিসাবে জার্মানদের যেমন খ্যাতি আছে, নৈতিক হিসেবে ইংরাজদের, কাব্যরসিক হিসাবে ফরাসীদের তেমনই খ্যাতি আছে।---

অথচ ফরাসী রুচি ইংরাজী রুচির সঙ্গে মেলে না। সুতরাং আমাদের পূর্বপুরুষদের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা ইংরাজদের ধারণার সঙ্গে মেলে না ব'লে যে তা নিকৃষ্ট, এমন কথা মূর্খ ছাড়া আর কেউই বলবেন না। কাব্য সম্বন্ধে সুরুচি ও কুরুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের ওপরেই নির্ভর করে, কোনরূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নৈতিক কিম্বা সামাজিক মতামতের ওপর নির্ভর করে না। এই সত্যটিই আলঙ্কারিকরা বহু পূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন।---

সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা, ইংরাজীতে যাকে বলে morality তার বিশেষ বিচার করেন নি। তবুও এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে উক্তি মানুষের moral

senseকে পীড়িত করে, তাও ছিল তাঁদের মধ্যে কাব্যে বর্জনীয়। কবি রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় বলেছেন,—

"অসদুপদেশকত্বাত্তর্হি নোপদেষ্টব্যং
কাব্যম্ ইত্যপরে।"

অর্থাৎ, অপর আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া অকর্তব্য। কিন্তু তাঁর মতে "অস্তয়মুপদেশঃ কিন্তু নিষেধ্যত্বেন ন বিধেয়ত্বেন"। অর্থাৎ অসাধুপদেশেরও কাব্যে স্থান আছে, কিন্তু নিষেধ হিসাবে, বিধি হিসাবে নয়।- - -

কাব্যের প্রভাব যে লোকের মনের ওপর প্রবল, সে ধারণা তাঁদেরও ছিল। রাজশেখর বলেছেন, "কবিবচনায়ত্তা লোকযাত্রা" "সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্।" এর বাঙালা —লোকের জীবযাত্রা, কবিবচনের আয়ত্ত এবং সে জীবন-যাত্রার মূল হচ্ছে নিঃশ্রেয়স, ইংরাজীতে যাকে বলে virtue welfare অশ্লীলতার ন্যায় অসদুপদেশও সে-কালেও কাব্যের দোষ বলেই গণ্য ছিল; তবে আমাদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এইমাত্র যে, তাঁরা অসৎ বাক্যকে aesthetic emotion এর প্রতিবন্ধক হিসেবে দুষ্ট মনে করতেন, অপর পক্ষে আমরা আমাদের সোনার সংসার ছারখারে যাবে, এই ভয়েই অস্থির। এ প্রভেদ মস্ত প্রভেদ। কাব্যমীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন beautyর অনুরক্ত; আমরা হয়েছি utilityর ভক্ত।

আমরা যে aesthetic emotionsকে আমল দিই নে, তার কারণ আমরা ইংরাজী শিক্ষিত। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে এ রসে বঞ্চিত, একথা সর্ববাদিসম্মত। আমি পূর্বে বলেছি, ইংরাজ জাতি ঘোর নৈতিক ব'লে গণ্য, তারা moralityকে তারা utilityতে পরিণত করেছে। আমরা ইংরাজের শিষ্য, ফলে আমাদের সুন্দর-অসুন্দর, সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যার জ্ঞান, ইংরাজী জ্ঞানের অনুরূপ। কাব্যজিজ্ঞাসা ধর্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে। আমাদের কাব্যে সুরুচি-কুরুচি ইংরাজী অরুচির তর্জমা মাত্র।

* মাসিক বসুমতী ১৩৩৬
বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

যদিও অশ্লীল এ-জীবন কিন্তু—তথাপি

হীরালাল দাশগুপ্ত

এবং
তথাপি, আসে দিন— আসে রাত্রি!
কেউ ডাকে না—কেউ আসতে বলে না—
তবু আসে—আসে, আর যায়, আর আসে!
কিন্তু কেন? কেন এই আসা আর যাওয়া?
কেউ জানে না! কুঁড়িগুলো ফোটে—ফুল
হোয়ে ফোটে—
কিন্তু, তার পর? ক্ষণিকের যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষণিকেই
ব্রহ্মবাদে শেষ!
কিন্তু কেন? কেউ তা জানে না!
যৌবনের অবাস্তব ইতিকথা শঙ্করের মায়াবাদে
অর্থ খুঁজে পায়?
পায় না যদিও জানি,—কিন্তু, তথাপি ......
সব শেষে এসে একদিন, সব শেষ কোরে
দিয়ে যায়......
সেই দিন এলো আজ আমার জীবনে—
এমনি একটি দিন এসেছিলো, ভূমধ্যসাগরে
কোনো এক এটলান্টিস দ্বীপে
তার পর? তার পর, বিস্মৃতির মতো শুধু
শাদা অন্ধকার—
বিকৃত বীভৎস এক গন্ডারের মুখ।
সময় আমারে খুন করে—
আর—আর—আমি খুন করি সময়েরে।

কিন্তু কেন? প্রকৃতি যেমন ছিল—
পৃথিবী যেমন ছিলো—ঠিকতো তেমনি আছে!
আমার মাথায় শুধু হাস্যকর শাদা পরচুলা—
সারা মুখে যুক্লিডের জ্যামিতির
চিত্রের মিছিল
আর, পিছনে পিছনে রোজ ধাওয়া করে
সময়ের ডিটেক্‌টিভ্‌, শার্লক্‌স্‌ হোম্‌স্‌!
কিন্তু, তার পর? জানে না তো কেউ।
তার আগে? স্তব্ধ বিজ্ঞান—স্তব্ধ দর্শন!
আর এই মধ্যখানে এক পাগলাগারদ
এবং যদিও—
কিন্তু তথাপি—
রাত্রি আসে—হুইস্কির গেলাসে
গেলাসে শুনি শুয়োরের খন্ড খন্ড ডাক!
ভাড়াটে নারীর বুকে ক্লেদাক্ত কুকুর ছানা!
এবং তথাপি
আসে দিন—আসে রাত্রি—প্রাগৈতিহাসিক!
সুতরা—
সেই চিরপুরাতন—
সেই, আদমের প্রথম আহার—
তার পর, অরণ্যের অন্ধকার-ঘুম
তার পর অন্ধকার অরণ্যের
আদিম পিপাসা—
বার্ধক্যের বিকৃত মৈথুন!

সুরের নয় সুরার নেশা

প্রদীপ লাহিড়ী

আজকের দুনিয়ায় সুরা পান বা মদ্যপানের অভ্যাস ক্রমবর্ধমান। অনেক দেশে লোকেরা পোষাক, গাড়ী, রেডিও, টেলিভিশন সেট ইত্যাদির পেছনে যে টাকা খরচ করে, তার চেয়ে বেশী টাকা অপব্যয় করে মদ্যপান করে।

এমন কি মাসে মাসে বাড়ী ভাড়া দিতে যা লাগে, তার সমতুল অংশ মদ্যপান করে খরচা করার নজিরও মেলে বহু।

সংখ্যাতাত্ত্বিকের মতে দুনিয়ায় পাঁড় মাতালের সংখ্যাই দু'লক্ষের উপর। এ ছাড়া ঠিক ঐ শ্রেণীভুক্ত না হলেও, নিয়মিতভাবে মদ্যপান করে থাকে অসংখ্য মানুষ।

হতাশাময় বা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় শঙ্কিত মদ্যপায়ীরাও নাকি সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান; বলা বাহুল্য, পানাভ্যাসকে সমর্থন করার জন্যই এরা উপরোক্ত যুক্তির আশ্রয় নেয়। সুরাপানরূপ কু-অভ্যাসের এক উল্লেখ্য শিকার হল সোভিয়েট ইউনিয়ন। সেখানকার শাসন কর্তৃপক্ষের মতে সেদেশে যত হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে, তার বারো-আনার পেছনেই আছে মদ।

একাত্তর পার্সেণ্ট মারামারি ঘটে সুরার প্রভাবে, যার ফলে গুরুতর দৈহিক ক্ষতি ঘটে থাকে। এ ছাড়া সোভিয়েট সরকার স্থিরনিশ্চয় যে, সমগ্র দেশে যে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে সারা বছরে তার নব্বুই ভাগই সংঘটিত হয় পানোন্মত্ততার ফলে। [illegible] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সোভিয়েট দেশের মানুষের পানের পরিমাণ অপরাপর দেশের মানুষের তুলনায় কম।

এ বিষয়ে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এ. হার্টসেনসন যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, [illegible]তে প্রতি ব্যক্তি বছরে ৪'৪ লিটার মদ্যপান করে, ওয়েষ্ট জার্মাণীতে ৫'২ লিটার, ইটালীতে ১৫'৫ লিটার, ফ্রান্সে ২'৯ লিটার এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে মাত্র ৪'৭ লিটার পান করার হদিশ মেলে।

মাত্র কিছুদিন আগেই সোভিয়েট দেশের প্রধানতম সংবাদপত্র প্রাভ্দায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, আগে এদেশে সুরাপানাসক্তির কারণ স্বরূপ গণ্য করা হত দারিদ্র্য, অত্যাচার, নিরাপত্তার অভাবজনিত আশঙ্কা ও বেকারীকে, কিন্তু কমিউনিষ্ট সরকার হয়ে পর্যন্ত এর কোনটারই আর অস্তিত্ব নেই, তবু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এখনও পানাসক্তি পূর্ববৎই প্রবল।

এই সুরাসক্তির ফলে সোভিয়েট নাগরিকবৃন্দ ক্রমেই হয়ে পড়ছে ভগ্নস্বাস্থ্য, অভিযুক্ত হচ্ছে আইনের আঙ্গিনায়, তাদের ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে ও তাদের সন্তানেরা হয়ে পড়ছে দৈহিক বিকলাঙ্গতার শিকার।

দশ বছরেরও বেশী হল পানাসক্তির ক্রমবর্ধমান গতিতে ভীত হয়ে সোভিয়েট সরকার এ সম্বন্ধে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। আইন প্রণয়ন করে নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে সুরা বিক্রয় করার কাজটা সীমিত করা হয়েছে, তাছাড়া উচ্চহারে ট্যাক্সও ধার্য করা হয়েছে মদ্য বিক্রয়ের উপর, যাতে ক্রয়মূল্য বর্ধিত হয়ে এর চাহিদা কিছু কমিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারের যে বিশেষ কিছু সুরাহা হয়েছে তা নয়।

মদ্যপায়ীদের পানাসক্তি প্রশমনের জন্য সরকারী খরচায় বহুবিধ খুচরা কফি পানাগার খোলা হয়েছে, যেখানে উষ্ণ কফি পানের মাধ্যমে মদ্যপান-বিহ্বলতাকে কমানোর সুন্দর ব্যবস্থা বর্তমান, তাছাড়া মত্ত ব্যক্তির জন্য আরামপ্রদ শয্যারও ব্যবস্থা আছে।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম সোভিয়েট এক ডিক্রী জারী করে পাঁড় মাতালদের, যাদের পানাসক্তি এ ধরণের মৃদু ব্যবস্থায় কমার কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে এক বৎসর থেকে দু'বৎসরব্যাপী এক চিকিৎসাধারার অধীনে থাকার ব্যবস্থা করেছেন।

এই জন্য বহু চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হয়েছে, যে সব স্থানে বদ্ধ মাতাল বা অ্যালকহলিক শুধু সময়োচিত চিকিৎসারই সুযোগ পায় না, সুস্থ এক জীবন যাত্রার অনুসরণ করে নিজের বিধ্বস্ত জীবনকে মেরামত করে নেওয়ারও অবকাশ লাভ করে।

ফ্রান্সে পানাসক্তি আজ এক বিরাট সমস্যায় দাঁড়িয়েছে।

এই দেশে প্রতি বছর অত্যধিক সুরাপানের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা হাজারেরও বেশী।

সরকারী মানসিক চিকিৎসাগারগুলির অর্দ্ধেকেরও বেশী এই ধরণের রোগীতে সর্বদাই পূর্ণ থাকে।

চিকিৎসাখাতে সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা চল্লিশ ভাগ সেখানে খরচা হয় মাতালদের চিকিৎসাখাতে।

কারণ পরিসংখ্যান বিভাগের মতে, ফ্রান্সেই সুরাসক্তি সবচেয়ে বেশী, দুনিয়ার মোট মদ্য উৎপাদনের শতকরা সত্তর ভাগই নাকি খরচা হয় ফ্রান্সে।

সীমিত পানাভ্যাসের পক্ষে জোর আন্দোলন চালিয়েও দুধ, ফলের রস, মিনারেল ওয়াটার্স জাতীয় পানীয়ের অধিকতর প্রচলনের পক্ষে সর্বাধিক প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও নাকি বিশেষ কিছু সুফল পাওয়া যায় নি ফ্রান্সে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই সমস্যা বিশেষভাবেই প্রবল।

আশঙ্কাজনক সংখ্যায় আমেরিকার নাগরিক ক্রমেই এই সর্বনাশা নেশার দাসত্ব বরণ করে নিচ্ছে, যার ফলে

সেখানকার শিল্প উৎপাদন কমে বিশেষ বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বৃটেনেও পানাসক্তের সংখ্যা বছর বছর বেড়ে চলেছে, বৃটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃটেনের পঞ্চান্ন লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দুই থেকে তিন লক্ষের মত ব্যক্তি গভীর-ভাবে সুরাসক্ত, পাঁচ লক্ষ মানুষ পায়ে পায়ে এগুচ্ছে সেই একই পরিণতির দিকে। তবু পঞ্চাশ বছর আগের তুলনায় গ্রেট বৃটেনের সুরাপায়ীদের আচরণ যে কিছুটা সংযত একথা স্বীকার করতেই হয়, কারণ ঐ সময় বৃটেনের আদালত-গুলিতে পানোন্মত্ততাজনিত অপরাধের সংখ্যা ছিল এখনকার প্রায় তিনগুণ।

পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশ অর্থাৎ ভারতে সুরাপানের অভ্যাস এতদিন ছিল অনেকটাই কম, কারণ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিই ছিল এই কুঅভ্যাসের বিরোধী, কিন্তু বর্তমানে এদেশেও এই সর্বনাশা ব্যাধি ক্রমবর্ধমান।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই এখন মদ্যাসক্তির পরিচয় মেলে, যা নাকি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের একান্তই পরিপন্থী।

কাটা দাগের মানুষটি

নারায়ণ দত্ত

(সমারসেট মমের অনুসরণে)

মুখে কাটা দাগটার জন্যেই লোকটার ওপর আমার প্রথম নজর পড়েছিল। কপালের পাশ থেকে থুতনি পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে নেমে গিয়েছে চওড়া লাল কাটা দাগটা। নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক আঘাত থেকে দাগটা হয়েছে—হয়ত কোন তলোয়ারের কোপে বা গোলার টুকরোর আঘাতে। গোলগাল, মোটা-সোটা, হাসিখুশি মুখখানায় বাস্তবিকই দাগটা অপ্রত্যাশিত। চেহারাটা কিছু চোখে পড়বার মত নয়। কথা বলবার ধরণটাও শাদামাটা। আর তাঁর স্থূল দেহে মুখখানা ছিলো বেমানান। দেহটা বেশ শক্ত-সমর্থ, সাধারণের চেয়ে একটু বেশি লম্বাই হবে। পুরনো ধূসর রঙের একটা স্যুট, খাকী শার্ট, একটা তাল-তোবড়ানো চওড়া কানাত টুপি ছাড়া অন্য পোশাকে তাঁকে কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। গোয়াতেমালা শহরের সান্ধ্য মদের আড্ডায় প্রত্যহই তাঁর হাজিরা পাওয়া যেত। হোটেলের বিভিন্ন খরিদ্দারদের কাছে ঘুরে ঘুরে তিনি লটারীর টিকেট বিক্রি করতেন। এই যদি তাঁর পেশা হয় তা হলে তাঁকে যথেষ্ট দারিদ্র্যের মধ্যেই দিনযাপন করতে হয় বলেই আমার বিশ্বাস। কেন না, আমি ত কাউকে কোনদিন তাঁর কাছে টিকেট কিনতে দেখি নি। কিন্তু প্রায়ই দেখতাম, কেউ-না-কেউ তাঁকে দু'এক পাত্র এগিয়ে দিচ্ছে। তিনি কখনও তা' প্রত্যাখ্যান করতেন না। এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে এমনভাবে তিনি ঘুরে বেড়াতেন যে, মনে হত পায়ে হেঁটে দূরপাল্লার ঘোরাতে বেশ রপ্ত তিনি। প্রত্যেক টেবিলে তিনি থামতেন। সামান্য হেসে যে নম্বরের টিকেটটা বিক্রি আছে সেই নম্বরটা উল্লেখ করতেন—আর তারপর তাঁকে যখন আর কেউ লক্ষ্য করছে না বুঝতে পারতেন তখন মৃদু হেসে অন্য টেবিলে সরে যেতেন। বেশির ভাগ লোকই তাঁকে তখন মদের আড্ডায় একটা ঝুটঝামেলা বলে মনে করত।

একদিন সন্ধ্যায় পরিচিত এক ভদ্রলোক ছিলেন সঙ্গে, গোয়াতেমেলা শহরের প্যালেস হোটেলের বারের রেলিঙ-এ পা দিয়ে ভাবছিলাম এখানকার অনবদ্য ককটেল মার্তিনি'-র কথা। এমন সময় এলেন কাটা দাগের ভদ্রলোকটি। এখানে আসার পর এই নিয়ে বিশবার মাথা হেলিয়ে কুশল বিনিময় করতে হল আমায়। তিনি তাঁর টিকেটগুলি দেখবার জন্যে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গীটি দেখলাম বেশ শ্রদ্ধা-সহকারে ঘাড় নাড়লেন।

: তারপর জেনারেল, ভালো তো? কেমন চলছে?

: মন্দ কী? কোন্ ব্যবসাই বা আজকাল তেজী? তবে আরো মন্দা হতে পারত। হয় নি, এই যা'।

: আপনি কি পান করতে ইচ্ছা করেন, জেনারেল?

: ব্র্যাণ্ডি।

একচুমুকে সেটুকু নিঃশেষে পান করে গ্লাসটা বারে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। তারপর আমার সঙ্গীটিকে বললেন: অশেষ ধন্যবাদ। একটু কাজ আছে। তিনি সরে গিয়ে আমার পাশের ভদ্রলোককে তাঁর টিকেটগুলি দেখাতে লাগলেন।

: বন্ধুটি কে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। ওঁর মুখের কাটা দাগটা কি ভয়ানক।

: এতে তার সৌন্দর্য বাড়ে নি, নয় কি? নিকারাগুয়া থেকে ওঁকে

বহিষ্কৃত করা হয়েছে। দুর্দান্ত লোক। খুনে। তবে মানুষ হিসাবে খারাপ নয়। মাঝে মাঝে আমি তাঁকে কিছু সাহায্য করতে চেষ্টা করি। বিদ্রোহী দলের উনি একজন সেনাপতি ছিলেন। আর ওঁর অস্ত্রশস্ত্র যদি না ফুরিয়ে যেত তাহলে আজকে আর তাঁকে গোয়াতেমালায় লটারী টিকেট বিক্রি করতে হত না; সেখানকার নতুন সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তাঁকে দেখা যেত। বিরুদ্ধপক্ষীয়রা দলবলসহ তাঁকে বন্দী করেছিল এবং সোজাসুজি কোর্ট-মার্শালে হয়েছিল তাঁর বিচার। এই সব বিচারের ফলাফল যা হয়, তাই হয়েছিল। প্রত্যূষে তাদের গুলি করে মারবার আদেশ হয়েছিল। আমার ধারণা, ধরা পড়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভাগ্যে কি আছে। সারা রাত তিনি আর তাঁর সঙ্গী-সাথীরা 'পোকার' খেলেই কাটালেন। টাকাকড়ির বদলে তাঁরা দেশলাই-এর কাঠি বাজি রেখেছিলেন। পরে অবশ্য বলেছিলেন আমাকে যে, সেদিনের মত হারের বরাত আর কখনও আসে নি তাঁর। ছোট বাজিতে তারা খেলছিলেন। গোলাম বড়। সমস্ত খেলাতে বোধ হয় মোট বারছোকের বেশি তিনি হাত পান নি। কাজেই নতুন কাঠি কেনবার আগেই সেগুলো তিনি হেরে যাচ্ছিলেন। বুঝি-বা, হেরে যাবার জন্যেই সেগুলো তিনি কিনছিলেন। ভোর হ'বার সঙ্গে-সঙ্গেই শান্ত্রীরা যখন তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার জন্যে এল তখন একটা সাধারণ মানুষ সারা জীবনে যতগুলো দেশলাই-কাঠি ব্যবহার করে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণ কাঠি তিনি হেরে গিয়েছিলেন।

তাঁদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে একটা দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সারি সারি পাঁচজন। আর তাদের সামনেই হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে শস্ত্রপাণির দল। কিছুক্ষণ নিরবতায় কাটতেই বন্ধুটি অসহিষ্ণু হয়ে অফিসারটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের এমনি করে দাঁড় করিয়ে রাখবার অর্থ কি? উত্তরে অফিসারটি বললেন যে, সরকারী দলের প্রধান সেনাপতি এই দণ্ডাদেশ পালনের সময় উপস্থিত থাকবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর জন্যেই তাঁরা অপেক্ষা করছেন।

: তাহলে আর একটি সিগারেট ধরাতে পারি। ওই ভদ্রলোকের চিরকালই দেরি করার অভ্যাস—বন্ধুটি বললেন।

সিগারেটটি সবেমাত্র ধরিয়েছেন, এমন সময় প্রধান সেনাপতি স্যান ইগন্যাশিও, তাঁকে তুমি দেখেছো কি না জানি না—তাঁর 'এডিকং'-এর সঙ্গে এসে হাজির। আনুষ্ঠানিক ঝামেলা মিটে যাবার পর স্যান ইগন্যাশিও অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের মৃত্যুর পূর্বে কোন অভিলাষ আছে কি না। পাঁচজনের মধ্যে চার জন ঘাড় নেড়ে জানালেন যে, তাঁদের এমন কোন বাসনা নেই। কিন্তু কথা কইলেন আমার বন্ধু: হ্যাঁ, আমি আমার স্ত্রীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে চাই।

: বেশ। আমার কোন আপত্তি নেই। তিনি কোথায়? সেনাপতি বললেন।

: জেল-দরজার বাইরেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

: তাহলে মিনিট পাঁচেকের বেশি দেরি হবে না, আশা করি।

: বড় জোর মিনিট পাঁচেক মেজর জেনারেল—জবাবে বললেন বন্ধুটি।

: এঁকে সরিয়ে রাখো।

দু'টি সৈনিক এগিয়ে গেল আর তাদের মাঝখানে বধ্য বিদ্রোহীটি নির্দেশিত জায়গায় সরে এসে দাঁড়ালেন। ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের অফিসারটি প্রধান সেনাপতির ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই আদেশ দিলেন। পরক্ষণেই একটা কঠিন শব্দ হ'ল আর চারটে মানুষ ছিঁড়ে পড়ল। বিস্ময়করভাবে তারা পড়ল—এক সঙ্গে নয়—একটির পর একটি। এমন একটি বিশ্রী ভঙ্গী করে তারা পড়ল যে, মনে হল তারা পুতুলনাচের পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। অফিসারটি তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁদের মধ্যে যে লোকটা তখনও বেঁচে ছিল তার ওপর তাঁর রিভলভারের নলচে দুটো খালি করে দিলেন। আমার বন্ধুটি তাঁর সিগারেটটি শেষ করে এনেছিলেন ইতোমধ্যে। তার শেষাংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে।

দরজার কাছে খানিকটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। একজন ভদ্রমহিলা দ্রুতপদে এগিয়ে এলেন। তারপর বুকের কাছে হাত দুটো চেপে ধরে হঠাৎ থেমে পড়লেন। অকস্মাৎ অস্ফুট চিৎকার করে হাত দুটো প্রসারিত করে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন।

সেনাপতি বললেন: এই মেয়েটি?

মাথার একটি অবগুণ্ঠন, মেয়েটি ছিলো কালো পোশাকে আবৃতা আর মুখটি ছিল মরার মত শাদা। নিতান্ত অল্প বয়সী একটি তরুণী, ছিপছিপে গড়ন। একটু খাটো। আর বড় বড় দুটো চোখ। কিন্তু তার ওপরও শোকের ঝড় নেমেছে। তার মিষ্টি ভাবটা এত চমৎকার যে, যখন সে দৌড়চ্ছিল তখন তার একটু ফাঁক-হওয়া আস্য, তার বেদনাহত মুখখানির সৌন্দর্য নিতান্ত নির্বিকার অপেক্ষমাণ সৈন্যগুলোকেও বিচলিত করেছিল মুগ্ধবিস্ময়ে।

বিদ্রোহীটিও তার দিকে দু'এক পা এগিয়ে গেলেন। মেয়েটি তাঁর বাহুবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে কামনামথিত কণ্ঠে বললে: ওগো আমার, তুমি আমার, তুমি আমার।

নায়কটির ঠোঁট দুটি তার ওপর নেমে এল কঠিন তীব্র পেষণে। সেই মুহূর্তেই তাঁর ছেঁড়া শার্টের পকেট থেকে একটা ছোরা বের করে ফেললেন। জানি না কেমন করে তিনি সেটা লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। আর দেরি না করে সেটিকে তাঁর প্রিয়তমার কণ্ঠে আমূল বসিয়ে দিলেন। কাটা ছেঁড়া শিরা হতে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত—রাঙিয়ে দিলো তাঁর শার্ট। তারপর আবার তাঁর নিবিড় বাহুবন্ধনে আটকে

ফেললেন তাকে। তাঁর ঠোঁট দুটির পীড়ন নেমে এল অপর ঠোঁট দুটিতে।

ঘটনাটা এতই দ্রুত ঘটে গেল যে, অনেকেই বুঝতে পারল না যে কি ঘটে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আতঙ্কের একটা ধ্বনি ভেসে এল দর্শকমহল থেকে আর তারা লাফিয়ে এসে ধরে ফেললে তাঁকে।

তাঁর হাত থেকে মেয়েটিকে ছাড়িয়ে দিতেই সে পড়ে যেত, যদি না 'এডিকং'-টি তাকে ধরে ফেলত। মেয়েটি তখন জ্ঞানশূন্য। তারা তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে আর কেমন যেন আচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে ঘিরে দেখতে লাগল। বন্ধুটি জানতেন, যে মরণান্ত আঘাত তিনি হেনেছেন, তাতে রক্ত বন্ধ করা একেবারে অসম্ভব। হাঁটু ভেঙে 'এডিকং'টি তাকে লক্ষ্য করছিল; ক্ষণকাল পরেই সে উঠে দাঁড়ালো। চাপা স্বরে বললে: ও মারা গেছে। বন্ধুটি ক্রশ চিহ্ন এঁকে তার শান্তিকামনা করলেন।

: এ-কাজ আপনি কেন করলেন?
—জিজ্ঞাসা করলেন প্রধান সেনাপতি।

আমি ওকে ভালোবাসতাম।

যে ভীড় জমা হয়েছিল তারা সবাই যেন একসঙ্গে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আর তারা তাদের বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি তুলে খুনীটির দিকে তাকাল। প্রধান সেনাপতিও কিছুক্ষণের জন্যে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

: এটা খুবই মহৎ দৃষ্টান্ত, অবশেষে বললেন তিনি: আমি এঁকে ফাঁসী দিতে পারি না। এঁকে আমার মোটরে করে এই রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে রেখে এস। বিদ্রোহীটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: সেনর, পৃথিবীর সাহসী লোকেরা তাদের সুজাতীয়দের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা পায় আমি আপনাকে তাই দিলাম।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক অস্ফুট অভিনন্দন ভেসে এল। এডিসিটি তাঁর কাঁধ জাপটে ধরলেন। আর কোন কথা না বলে দু'ধারে দু'জন সৈনিকের সঙ্গে তাঁরা পাশে দাঁড়ানো গাড়ীটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমার বন্ধুটি থামলেন। কিছুক্ষণের জন্যে আমারও বাকস্ফূর্তি হল না। এটা বলা দরকার, আমার বন্ধুটি ছিলেন গোয়াতেমালার লোক আর কাহিনীটি বললেন স্প্যানিশ ভাষায়। যতটা সম্ভব আমি সেটা অনুবাদ করে দিলাম। কিন্তু তাঁর অনবদ্য ভাষার কোন্‌খানে আমি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করতে চাই নি। সত্যি বলতে কি, কাহিনীর পক্ষে এই ভাষাটিই যথেষ্ট। অনেক পরে আমি বললাম, কিন্তু ওর কাটা দাগটা এলো কোত্থেকে?

: ও হো, ওটা? 'জিঞ্জার এল'-এর একটা বোতল—খুলতে গিয়ে কেটে গেল তাই থেকে ঐ কাণ্ড।

: দাগটা কিন্তু আমার কাছে বিসদৃশ ঠেকছে—আমি বললাম।

বৃষ্টি এসো

মনোজ ঘোষ

প্রস্ফুটিত সতেজ স্নিগ্ধ লাবণিতে
অপরূপ ফুলেরা
প্রথম ঊষার রঙে দীপ্ত, আহা,
বিগত দিনের ভরা বুকের অসীম কোমলতা
বিন্দু বিন্দু পান করে চিরজীবী হবে ভেবেছিল।
নিদাঘে তাদের কেউ বিমলিন, ছন্নছাড়া হতশ্রী
হবার আগে অভিমানে ঝরে পড়ে গেছে,
কেউ তারা অনেক বাঁচার মোহে
রুগ্ন শীর্ণ দেহে
পৃথিবীর সব মায়া ব্যাকুল আলিঙ্গনে হৃদয়ে ভরেছে।

কখনো ভাবার আগে পিছনে অনেক স্মৃতি ফেলে
নিঃশব্দসঞ্চারী মন পাখামেলা ময়ূরের কেকার ধ্বনিতে
কনকবিথারী রূপে
চাঁদের সখীরা সব মিটিমিটি তারকার দলে
আদিগন্ত সতেজ শ্যাম শাখার পাতার ফাঁকে ফাঁকে
ছোট ছোট পাখিদের চপল ডানার মাতামাতি
নিশ্চিত আনন্দে মেতে পান করেছিল।

অথবা যৌবনমত্তা সে রূপসী ঝর্ণাটির বৃষ্টিছুট রঙে
আমার বিভোর ভালোবাসার উদাত্ত কলকাকলি
নেচেছে গেয়েছে গান
সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে মাতাল হয়েছে—

দুর্গম পাহাড়ে ঘেরা নিষ্ঠুর পাষাণ-কারাগারে
সে আজ বন্দিনী একা:
সুতীব্র যদিও ক্ষীণ মুক্তির আকুতি।

তপ্ত হাওয়ার ঝড়ে মনে পড়ে হারানো সজল সেই স্মৃতি
ও মেয়ে, মেঘের মেয়ে, ঝর্ণা ওরে, বৃষ্টি চা, বৃষ্টি তোর বুকে।
শীতল হাওয়ার সখী
বিমনা মেঘের কালোকাজল আঁখিতে
অশ্রু চাও, অশ্রুভরা আমোদে আহ্লাদে নেচে উঠে।

ঝরেছে যা পড়েছে যা
আমার কাননে আর আঙিনার পাশে
বিদায় নিয়েছে তারা
নতুন জলেতে মেশা কোমল স্মৃতির উচ্ছ্বাসে।

এসো ঝড়,
জীবনের মৃতকল্প মগ্নশাখা-আকুল কন্দরে,
সুধা ঢালো যূথিবনে
গন্ধবাণী ভাসাও ছড়াও দেশে দেশে,
রিক্ত প্রাণের ঘরে
বৃষ্টি এসো,
কজ্জলিকা নবীনা মেঘের প্রতি অণু ছেয়ে ছেয়ে।

ভারতীয় দর্শনের পরিধি

[বেদের মন্ত্রসংখ্যা বিশ সহস্রেরও অধিক; তাহাদের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা যাঁহারা তাঁহারাই ঋষি। এই প্রবন্ধে অন্যত্র ঋষি মহর্ষি কেবলমাত্র গৌরবাত্মক, ইঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা নহেন---মহাভাষ্যকার বা ভাষ্যকারমাত্র। ---লেখক]

মাসিক বসুমতীর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ত্রয়ী ও উপনিষদ সমূহ'---প্রবন্ধে উল্লিখিত যে বেদ ও বেদান্ত কেবলমাত্র ধর্মসম্বন্ধীয় নহে, যথেষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব-সমন্বিতও। সেই সকল সূক্তের অনুসরণে আমাদের মহাভারতে বহু বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহাদের পরিধি আশ্চর্য-জনকরূপে অপরিসীম এবং যাহা এখনও জগতের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনালোচনার অনতিক্রান্তই রহিয়াছে। এই সুপ্রাচীন মহাজাতির ঐতিহ্যের বাহক আমরা, নিশ্চয়ই তাহাতে পুলকিত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

আমাদের মহাদেশ মহা-ভারতে ধর্ম ও দর্শন ব্যতীত অন্যান্য অর্থ-কামমূলক, ইহলোকের মঙ্গলজনক, অপরাবিদ্যা অবশ্য অনুসরণীয় ছিল ও এখনও আছে---সেই বেদাঙ্গ-উপবেদের যুগ হইতে, ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য; কারণ পর্যায়ক্রমে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ উপদিষ্ট যুগে যুগে ---কোন একটি নহে, পর্যায়ক্রমে বা যুগপৎ ঐ চারিটিরই, ব্যবহারিক জীবনে, সমন্বয়-সাধন।

এক্ষণে, ভারতীয় দর্শনের বিস্ময়কর পরিধির কথা আলোচনায় আসি। বৈদিক দর্শন-শাস্ত্রসমূহ আমাদের অল্পাধিক পরিচিত ষড়দর্শন,---সাংখ্যসূত্র, যোগসূত্র, ন্যায়সূত্র, বৈশেষিকসূত্র, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র। অবৈদিক দর্শনগুলির মধ্যে চার্বাক প্রভৃতি লোকায়তদর্শন ও বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বা অর্হৎ দর্শন, জৈন বা তীর্থঙ্কর দর্শন প্রভৃতি। ষড়দর্শনের সঙ্কলয়িতৃবর্গকে আমরা মহর্ষি আখ্যায় যেমন ভূষিত করি, সেইরূপই অবৈদিক দর্শন-কারদিগকে মহর্ষি, তথাগত বা অর্হৎ বা তীর্থঙ্কর বলিয়াই শ্রদ্ধা দেখাই। ষড়দর্শনগুলি সকলই 'সূত্র' অর্থাৎ তৎ তৎ সম্বন্ধে প্রাচীনতর ও বিশালতর জ্ঞানরাশি যাহা ছিল তাহারই সংক্ষিপ্ত সুসংস্কৃত আকার।

এই সকল দর্শন শাস্ত্রের পরিধি বিস্ময়কররূপে সকল প্রকার সম্ভাব্য আলোচনায় ব্যাপৃত, অতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে, নূতনতর কোন দৃষ্টিভঙ্গী এমন নাই, যাহা ইহাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। যেমন, ঈশ্বর-বাদ, অনীশ্বর-বাদ, পরমাত্ম-বাদ, অনাত্ম-বাদ, বহু-আত্ম-বাদ, একাত্ম-বাদ, সপ্রপঞ্চ পরমেশ্বর-বাদ, নিষ্প্রপঞ্চ-পরব্রহ্ম-বাদ, বৈদিক কর্মকাণ্ড-অস্বীকৃতি-বাদ, বৈদিক উভয়-কাণ্ডের অস্বীকৃতি-বাদ, শূন্যবাদ, পূর্ণ-বাদ; ইহকাল সর্বস্ববাদ, চির অক্ষয়-স্বর্গবাদ, পরব্রহ্মলীনত্ববাদ প্রভৃতি।

শ্রীইন্দুচন্দ্র বেদান্তভূষণ

আদিবিদ্বান মহর্ষি কপিলের সাংখ্য-সূত্রের বা সাংখ্য-প্রবচনের পঞ্চবিংশ-তত্ত্ব ও তন্মধ্যে প্রকৃতি এবং পুরুষের অন্যথা-খ্যাতি বিশিষ্ট অবদান। এই-গুলিই সকল শাস্ত্রালোচনার মেরুদণ্ড-স্বরূপ; যোগসাধনার বিবেকখ্যাতি, ন্যায়ের অলৌকিক-সংস্পর্শ, বৈশেষিকের নিঃশ্রেয়স, ও মীমাংসার অপূর্ব সংযোগের তত্ত্বাববোধের পথ সুগম করিয়া দেয়। সর্বসমন্বয়কারী ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনের ইহারাই পূর্ব-প্রস্তুতি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ষড়-দর্শনে যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্ততার জন্য উল্লিখিত হয় নাই, সেগুলি ইহারা বেদানুগ হওয়ায়, বেদ ও উপনিষদের আপ্তবচনের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এই সকল দুরূহ দর্শনের ভাষ্যকার, দীপীকাকার ও বর্তিকাকারগণ তাহাই করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে (অবশ্য ইহা একেবারেই সহজ নহে) এই সকল দুরূহ চিন্তা ও সাধনার সমন্বয় করা সম্ভব হয় এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী ও উপকারী হয়, সন্দেহ নাই।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ভারতীয় দর্শনসমূহের বিশাল পরিধির পরিচয় দেওয়া। মূল দর্শনগুলি অধিগত করিতে হইলে পাঠকবর্গকে এতদ্‌সম্বন্ধীয় যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংস্কৃতে, বাংলায়, ইংরাজী ও জার্মাণ ভাষায় সংক্ষিপ্ত বা বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেগুলি একেবারেই দুর্লভ নহে, তাহা হইতে যাহার যেমন সাধ্য, এই সকল আমাদের অতি গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারা, জ্ঞাত হইতে হইবে---উপায়ন্তর নাই।

এইবার অবৈদিক ভারতীয় দর্শন-গুলির কথা কিছু বর্ণনা করি। বৈদিক দর্শনগুলির ন্যায় এইগুলিরও---মতবাদ যাহাই হউক না কেন---সমভাবে নৈতিক চরিত্রোৎকর্ষের উপরও তাহাদের বিশেষ যোগসাধনার উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি। মহর্ষি চার্বাক, মহর্ষি জাবালী ও লোকায়ত দর্শনবাদিগণ ইহলোকসর্বস্ববাদী হইলেও কেহই নৈরাজ্যবাদী নহেন। বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শনগুলি অতি উচ্চাঙ্গের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দশাঙ্গ-যোগ-পদ্ধতি, নির্বাণ-পরিনির্বাণ-মহানির্বাণ, অতি উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব, বৌদ্ধদর্শনের, যাহা বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবাদের অতি নিকটবর্তী। জৈনদর্শনের (জিন) জিতেন্দ্রিয়তাতত্ত্ব ও নির্গ্রন্থতত্ত্ব বা সর্বগ্রন্থি (বন্ধন)---শূন্যত্ব, অপূর্ব। বোধিসত্ত্ব ও তীর্থঙ্কর বৌদ্ধ ও জৈন অর্হৎ (পূজনীয়)

দিগের সঙ্গলাভ, যাঁহারা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি তাঁহাদের পক্ষেও শুভ—একথা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

প্রবন্ধের শেষে, ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। বেদান্ত-দর্শন বেদ-(সংহিতা ও ব্রাহ্মণ) ও বেদান্ত-(আরণ্যক-উপনিষদ)—সমূহের সামগ্রিকরূপের উপর মহাভাষ্য, যাহা জগতের সর্বদর্শনরাজির উজ্জ্বলতম মধ্যমণি। পাশ্চাত্য জগতের মনস্বিগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, বিশেষত জার্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলর, গোল্ডস্টুকার, ডয়সন, থিবো, সোপেনহুর ও ফিক্টের নেতৃত্বে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আমেরিকা ও ইউরোপের বেদান্ত-সমিতির অপূর্ব মাধ্যমে। এই মহাভাষ্যের উপর পরবর্তীকালে বহু আচার্যের ভাষ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে,—তন্মধ্যে সম্পূর্ণ অবিমিশ্র-কেবলাদ্বৈত-পরব্রহ্ম-বাদী আচার্য্য গৌড়পাদের প্রশিষ্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য (শারীরক-ভাষ্য-প্রণেতা) ভিন্ন সকল আচার্যই একটি মূলতত্ত্বে একমত; তাহা হইল, পরমব্রহ্ম, পূর্ণ-ব্রহ্ম পরমেশ্বরই হইতেছেন উচ্চতম তত্ত্ব—যাহার অন্তর্গত অপর-ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্ম) ও পর-ব্রহ্ম (নির্গুণ:ব্রহ্ম) উভয়ই;—পরব্রহ্ম উচ্চতম তত্ত্ব নহে, পরমেশ্বরের অন্যতম বিভূতিমাত্র। এ সমন্ধে পূর্বপ্রকাশিত 'ত্রয়ী ও উপনিষদ সমূহ'—প্রবন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে—তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিই করা যাইতে পারে—তাহা হইল, এই যে, পরব্রহ্ম-তত্ত্ব কেবলাদ্বৈতরূপে যখন অভিহিত হয়, তখন ইহা বিকল্প বা সমান্তরাল ভাবেই করা হয়, পরমেশ্বরের অন্যতম বিভূতি বলিয়াই করা হয়; এবং পরমেশ্বরতত্ত্ব পরমব্রহ্ম বা পূর্ণ ব্রহ্ম তত্ত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে; কারণ যতই ক্ষুরধার যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করা যাউক না কেন, শ্রুতিবচনে বা আপ্তবচনেই এই সকলের চরম-সমন্বয়;—কোন ভাষ্যই সে স্থান অধিকার করিতে পারে না, শ্রুতিবচনগুলির মধ্যে কতকগুলি মুখ্য আর কতকগুলি গৌণ, কতকগুলি অমায়িক ও কতকগুলি মায়িক, কতকগুলি অব্যবহার্য ও কতক-গুলি ব্যবহার্য, এই প্রকার উক্তির অধিকার কোন বেদানুগ ভাষ্যকারেরই নাই; মহাভাষ্য ব্রহ্মসূত্রে মহর্ষি বাদ-রায়ণ ব্যাস স্বয়ং সকল শ্রুতিবচনই সাক্ষাৎ দর্শন, আপ্তবাক্য হওয়ায়, সম-পর্যায়ের এবং তাহাদের সমন্বয় উচ্চতম পরমেশ্বর পূর্ণব্রহ্মতত্ত্বে, ইহাই যথাযথ ভাবে প্রতিপাদিত করিয়াছেন, যাহার অন্তর্গত অপর ও পরতত্ত্ব উভয়ই এবং এ দুটি পরমেশ্বরের বিভূতি হওয়ায় ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধই তত্ত্বত নাই। যদি কোন জীব পরব্রহ্মেলীনত্ব চাহেন, তাহা পাইতে পারেন,—পর-মেশ্বর-তত্ত্বের বাহিরে নহে, অভ্যন্তরেই। ইহা পরমেশ্বরের সান্নিধ্য বা নৈকট্য-অপেক্ষা কোন উচ্চতর অবস্থা নহে,—কারণ পরমেশ্বরই সৎ বা সদা ও সর্ব-সামর্থ্যাধার। অলং বিস্তারেণ।

চার্‌চিল

ইংলণ্ড-এর পরলোকগত সুবিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী চারচিল সম্পর্কিত রসিকতার অভাব নেই। স্বদেশে বিদেশে—সর্বত্র তার ব্যাঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছে, অসংখ্য কৌতুকের তিনি কেন্দ্রীয় পুরুষ। এমন কি, আমাদের শৈশবে বাংলা দেশের গ্রামেও শুনেছি—'কোন্ চিলের দুই পা?—না, চার্‌চিল-এর।' জাতীয় স্থূল রসিকতা।

একই রংগ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা বেশেও চোখে পড়ে। যথা:—

স্যার উইন্‌সটন চার্‌চিল যখন চেম্বার থেকে বেরুলেন, দু'জন তরুণ রক্ষণশীল সংসদ-সদস্য তখন হাউস অব্ কমন্‌স-এর লবী-তে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন ফিস্‌ফিস ক'রে অন্য-জনকে বললেন, 'শুনতে পাই, উনি হাঁটার সময় কিঞ্চিৎ টল্‌মল্ করেন।'

'হ্যাঁ, এবং শোনা যায় ওঁর দৃষ্টি-শক্তিও কমতে সুরু করেছে; অন্যজন ফিস্‌ফিস ক'রে জবাব দিলেন।

'এবং আরও শোনা যায় তিনি শুনতেও পান না', স্যার উইন্‌সটন গোঁ গোঁ ক'রে বলে উঠলেন ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে।

এরই রকমফের:

ওয়েস্‌মিনিস্‌টার্‌-এ শ্রুত। দু'জন পেছনের সারিতে বসা সংসদ-সদস্য তাঁদের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, 'উনি বুড়ো হয়ে পড়ছেন, না?' অন্যজন সায় দিয়ে যোগ করলেন, 'হ্যাঁ—তাঁর স্মৃতিশক্তিও আগের মত প্রখর নেই, এবং আজকাল বিতর্ক চলাকালে কখনও কখনও তিনি ঘুমিয়ে পড়েন পর্যন্ত।' চার্‌চিল বসেছিলেন সামনের সারিতে। ঘাড় ফিরিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, 'এবং আমার ধারণা আমি ভালমত শুনতেও পাচ্ছি না আজকাল।'

প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র

রাখহরি চট্টোপাধ্যায়

কোনও একটি বিশেষ কার্যের জন্য কতকগুলি লোক সর্বসম্মতিক্রমে সমবেত হইয়া কোনও কার্যের উপযুক্ত হইলে সেই জনবৃন্দের সমবায়কে 'সংঘ' অথবা 'গণ' বলা যাইতে পারে। কথা দুইটি পাণিনির সময়ে ও খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। মহা পরিনির্বাণসূত্রে আছে: বুদ্ধের সমসাময়িক পুরাণ কাশ্যপ প্রভৃতি নামে সাতজন 'সংঘিনো' অর্থাৎ সংঘপতি ছিলেন। তাঁহাদিগকে 'গণিনো' অর্থাৎ গণপতি এবং 'গণাচরিয়া' অর্থাৎ গণাচার্য বলা হইয়াছে। Craft Guild কে বা ব্যবসায় সমবায়কে কৌটিল্য 'শ্রেণী' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রাজার পরিবর্তে কোনও কোনও সংঘ। এই প্রকার সংঘের দ্বারাই কোন কোনও প্রদেশ শাসিত হইত। জৈনদিগের আচারঙ্গ সূত্র নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে এবং বৌদ্ধগণের অবদান শতকে (৮৮ সংখ্যা) আছে—কতকগুলি প্রদেশ রাজ শাসিত এবং অপর কতকগুলি স্থান গণতন্ত্রাধিষ্ঠিত ছিল। কাত্যায়নের সময়ে সংঘ অথবা গণশাসিত প্রদেশ ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে, তিন প্রকার 'সংঘ' অথবা 'গণ' ছিল। ঋগ্বেদে ৫।৬৬।৬ 'স্বরাজ্য' পদের প্রয়োগ আছে। সায়ন 'স্বরাজ্য' পদের ব্যাখ্যায় স্বরাটত্ব পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসনকে স্বরাটত্ব বলা যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও 'স্বরাট' পদের প্রয়োগ আছে। মহাভারত অর্থশাস্ত্র শুক্রনীতি প্রভৃতি পুস্তক হইতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে ৪।১।১৮৪ "রাষ্ট্রপাত ও গণপতি" শব্দে প্রভেদ দেখান হইয়াছে। পাণিনি ও (৪।১।১৮৪) "গণপতি" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বের (১০৭এর অধ্যায় ৩৯৫৬ হইতে ৩৯৮৯ এর শ্লোক) 'গণ' প্রজাশাসিত প্রদেশ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। বরাহমিহির 'গণপুঙ্গব" গণপ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কথাসরিৎসাগরেও গণনায়কের' উল্লেখ আছে। গৌতমগণও গণতন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১৫।৯।১৮)। মনু (৩।১৫৪), যাজ্ঞবল্ক্য (১।১৬) গণতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহমিহির 'গণনায়ক' ও গণতন্ত্রের বৃহৎ সংহিতা (ল: ২৬ অ: ৩৩) উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজাতন্ত্রাধিষ্ঠিত কতকগুলি রাজ্যের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পুরাকালীন ভারতে সময়ে সময়ে রাজ-নির্বাচন কার্যও প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই সকল নির্বাচিত রাজা কখনও যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, কারণ তাঁহাদের ভয় থাকিত যে, প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিলে তাঁহারা অপসারিত হইবেন।

উত্তর ভারতে বিশেষত পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে যে পুরাকালে সেকন্দরের আক্রমণের পূর্বে ও পরে প্রজাতন্ত্র ছিল সে বিষয়ে গ্রীক্ লেখকগণের পুস্তকে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস তাঁহার বিবরণে লিখিয়া গিয়াছেন, মগধে তিনবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন যে, Abastomi mathaaioi এবং Avohitoi প্রভৃতি জনবৃন্দ স্বাধীন ছিল অর্থাৎ তাহারা রাজশাসিত ছিল না।

কার্টিয়াস ক্ষুদ্রক জাতিকে স্বাধীন এবং নায়ক (প্রেসিডেণ্ট) দ্বারা শাসিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

Sabarcae নামে আর এক ক্ষমতাশালী জাতি ছিল; তাহারা রাজশাসিত ছিল না এবং তাহাদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। Codrosin জাতি স্বাধীন ছিল এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনার আলোচনা করিবার জন্য তাহাদের একটি স্থায়ী সভা ছিল (Permanent Council) (Mc. Crindle "Ancient, India" P P 167-9-762)।

প্রাচীন গ্রীস দেশে অনেক City State অর্থাৎ নগর রাজ্য ছিল; এই সকল নগরপ্রজাদের দ্বারাই স্বাধীন ভাবে শাসিত হইত। ডিয়োডোরাস City State-এর উদাহরণস্বরূপ পাতালনগরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই City State-এর যুদ্ধবিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা বংশানুক্রমিক দুই রাজবংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল; তদ্ভিন্ন অপরাপর সকল বিষয়ে "বৃদ্ধ সভাই" (A Council of elders প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসক ছিল। [Mc. Crindle PP, 2, 292, 296, m. 356,574] এই দুই প্রজাতন্ত্রাধিষ্ঠিত রাজ্য ব্যতীত ব্রাহ্মণদিগেরও আর একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। Sambu জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে সেকেন্দরকে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা শাসিত একটি নগর আক্রমণ করিতে হইয়াছিল, এ-কথা ডিয়োডোরাস স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যের কথা আরিয়ানও উল্লেখ করেন। সেকেন্দর প্রত্যাবর্তনকালে সিন্ধু দেশস্থ উপত্যকার মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় তৎপ্রদেশস্থ গণতন্ত্র স্থানসমূহের অধিবাসিগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এই সকল জাতিকে উৎসাহিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রীক লেখকগণ আরও লিখিয়াছেন যে, স্বাধীন প্রজাবৃন্দ যাহাতে স্বাধীনতার বিনিময়ে সেকেন্দরের সঙ্গে সন্ধি না করে, তদ্বিষয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণগণই উদ্যোগী ছিলেন।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পাঞ্জাব পূর্ব রাজপুতানা এবং মালব দেশে প্রভূত ক্ষমতাশালী কয়েকটি প্রজাতন্ত্র রাজ্য ছিল। মদ্রকগণ পাঞ্জাবের মধ্য অংশে স্বাধীনভাবে বাস করিত। যৌধেয়গণ

[illegible] উভয় তীরে বিস্তৃত রাজ্যশাসন করিয়াছিল।

খৃস্টের জন্মের পূর্বে ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রভাব ভারতে খুব বেশি ছিল।

সেকেন্দরের আক্রমণ কালে প্রজাদের দ্বারা শাসিত স্থানের সংখ্যা বড় কম ছিল না এবং অনেক প্রদেশেই 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বর্তমান বিহার প্রদেশের নিকটবর্তী স্থানসমূহে পূর্বে অন্যূন দশটি প্রজাতন্ত্র ছিল। এই দশ স্থানের অধিবাসিগণের [illegible] সর্বপ্রধান ক্ষমতাশালী কপিলবস্তুর শাক্যগণ, মিথিলার বিদেহগণ এবং বৈশালীর লিচ্ছবিগণ। পরবর্তীকালে শেষে দুই জাতি একত্র হইয়া বৃজ্জি নামে পরিচিত হইয়াছিল। রাজ্য-শাসন ও বিচার সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের সুচারু মীমাংসা করিবার জন্য তাহাদের একটি স্থায়ী সাধারণ সভা ছিল। দেশের শাসনকার্যে বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই সমভাবে আগ্রহ প্রদর্শন করিত এবং দেশের অধ্যক্ষ সকল অধিবাসীর দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। অধ্যক্ষের উপাধি ছিল 'রাজা'।

বৃজ্জিদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রজাতন্ত্র কতকটা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ধরনে গঠিত হইয়াছিল। আটটি বিভিন্ন স্থানের সমবায়ে ইহাদের রাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশ পরস্পর অনেক বিষয়ে স্বাধীন ছিল।

কবিতার মতো

[illegible] ভট্টাচার্য

সুলতা!
একটা কবিতা লিখতে বলেছিলি
তোকে নিয়ে।
তুই নিজেই যে কবিতা হয়ে উঠতে পারিস
তা ভাবি নি!
নিজেকে বড় বেশী গদ্য
বলতে চাইতিস তুই
তার চেয়ে বেশী কখনো
আমরাও ভাবি নি।
কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা
টুকরো টুকরো কথা
কখনো জমাট বাঁধা আসর
তোর হা হা করে হাসাহাসি
যৌবনের উদ্ধত প্রকাশ সম্বন্ধে
মৃদু সচেতনতা
চলার দোলায় লীলায়িত হয়ে ওঠা
দেহবল্লরী
কখনো উদাস চোখে চেয়ে থাকা
সকরুণ দৃষ্টি
হয়তো দোলা লাগাতে পারত
সুরুদের মনে
আমাদের মনে কিন্তু কখনো আনে নি
কাব্যের ছোঁয়াচ।
সেদিন যখন দ্রুত ওঠা-পড়া বুকে
ভীরু ভীরু চোখে চেয়ে বলেছিলি
বড্ড কিন্তু ভাই ভয় করছে।
অস্ফুট প্রেমের কোমল সজলতা ছিল
তোর দেহ ঘিরে

তখনো, তোকে নিয়ে কবিতা লিখব
তা ভাবি নি!

অভিসারের নূপুর পায়ে
সানাইয়ের মধুর রাগিণীতে
সেদিনটি এগিয়ে এল।

আর সুলতা তুই!
একটি ছোট্ট—গীতি-কবিতা,
আর কেউ দেখেছিল কি না জানি না
তোর চারিদিকে হাল্কা একটু রহস্যের ঢাকনা
আর তার মধ্যে—একটি শাশ্বত সত্য।

আমি জানি, সুলতা!
তুই আবার গদ্য হয়ে উঠবি
কিন্তু সেদিনের উৎসবে
সাদা শাড়ীতে—ফুলের মালায়
চোখের কোণের গভীর দৃষ্টিতে
হারিয়ে যাওয়া তোকে দেখেছিলাম
রবীন্দ্রনাথের কুমুর মতো
যেন একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ফুল।

তুই হয়তো নিজেও জানিস নি
কেমন করে
দিনে দিনে একটি কবিতা হয়ে উঠেছিস।
তুই আমার গদ্য হয়ে উঠবি

আজকের কথা মনে থাকবে না
শুধু একটু সুর
না বলতে পারা এক রহস্যময় উপলব্ধি
সেটুকুই শাশ্বত সত্য
সেটুকুই কবিতা।

প্রথম পুরস্কার, [illegible] টাকা ।। দ্বিতীয় পুরস্কার, ১৫৲ টাকা ।।

।। শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা ।।

অমিতাভ চৌধুরী

■	১	২		■	৩ ব	৪ সু	৫ ম	৬ তী
৭	■		■	৮	■	৯		
১০		■	১১		১২	■		
	■	১৩	■	১৪		১৫	■	
■	১৬		১৭	■	১৮			■
১৯	■	২০		২১	■		■	২২
২৩	২৪	■	২৫			■	২৬	
২৭			■		■	২৮	■	
২৯				■	৩০			■

।। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ।।

১। পাশাপাশি এবং উপর নীচে যে সূত্রগুলি দেওয়া আছে নম্বর অনুযায়ী সেইমত শব্দ-শৃংখলের ঘরগুলি পূরণ করতে হবে।

২। প্রতি ঘরে একটি করে অক্ষর অথবা যুক্তাক্ষর বসবে।

৩। কোন শব্দের বানান অশুদ্ধ হলে সেটিকে ভুল বলে ধরা হবে।

৪। অস্পষ্ট লেখা অথবা কাটাকুটির দরুণ বুঝতে অসুবিধা হলে ছকটিকে বাতিল করে দেওয়া হইবে।

৫। অবশ্যই পত্রিকার অন্যত্র প্রকাশিত ছকটি পূরণ করে নীচে স্পষ্টাক্ষরে নাম ঠিকানা লিখে পাঠাতে হবে।

৬। একই নামে একাধিক ছক পাঠানো যেতে পারে কিন্তু প্রেরিত ছকগুলি অবশ্যই পত্রিকার অন্যত্র প্রকাশিত ছক হওয়া চাই নতুবা বাতিল করে দেওয়া হবে।

৭। একটি শব্দের অনেক রকম অর্থ হতে পারে, কিন্তু আমাদের দপ্তরে শব্দ-শৃংখলের ছকটি ঠিক যেভাবে পূরণ করা আছে একমাত্র তার সংগে যেগুলি হুবহু মিলে যাবে সেগুলিকেই সঠিক বলে ধরা হবে।

৮। যে কোন বিষয়ে আমাদের বিচারকের রায়ই চূড়ান্ত বলে ধরতে হবে।

৯। আপনার পূরণ করা ছকটি আমাদের দপ্তরে অবশ্যই প্রতি বাঙলা মাসের ১৮ তারিখের মধ্যে পৌছানো চাই। স্থানীয় প্রতিযোগীরা বসুমতীর পোস্টবক্সে এসে সরাসরি জমা দিয়ে যেতে পারেন।

১০। আগামী সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে এই শব্দ-শৃংখলের সমাধান ও সঠিক উত্তরদাতাদের নাম মুদ্রিত করা হবে।

১১। শব্দ-শৃংখলের সমাধান পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক বসুমতী। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২।

১২। বন্ধ খামের উপরে লিখিত হবে 'শব্দ-শৃংখল প্রতিযোগিতা' : মাসিক বসুমতী।

১৩। শব্দের ছক পূরণের পরে কেটে পাঠানোর জন্য পত্রিকার অন্যত্র একটি ছক মুদ্রিত হয়েছে।

।। সূত্র ।।

● পাশাপাশি ●

১। ঈগল জাতীয় পক্ষীবিশেষ
৩। সব রকম রচনা থাকে এমন একটি মাসিক পত্রিকা
৯। পদ বা শব্দের প্রতিপাদ্য
১০। সোজা নয় এমন
১১। বাহান্নটি তাসের একটি
১৪। ক্রয়াদির অঙ্গীকার স্বরূপ অগ্রিম প্রদত্ত অংশ
১৬। বর্তমানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই —পন্থীর অভাব নেই
১৮। পৌরাণিক জলজন্তুবিশেষ (উল্টোপাল্টা)
২০। আগুন (উল্টোপাল্টা)
২৩। আমার
২৫। বর দেয় যে (উল্টোপাল্টা)
২৬। এক জাতীয় ফল
২৭। জাহাজ চলে যেথা
২৯। রচনা করে যে (উল্টোপাল্টা)
৩০। আধুনিক যুগের সর্ববৃহৎ জন্তু

● উপরে নীচে ●

২। উপাধিবিশেষ (উল্টো)
৪। সুরুয়া
৫। কৃষিকার্যে প্রয়োজন এর (উল্টোপাল্টা)
৬। জৈন সিদ্ধপুরুষ
৮। বহন করে যে (উল্টো)
১২। ফরসা জামাকাপড় পরে—ঘাটাঘাটি না করাই ভালো (উল্টো)
১৩। —ক্রন্দন মর্মপীড়াদায়ক
১৫। কমলালেবু
১৭। প্রকার (উল্টো)
১৯। শাসক (উল্টোপাল্টা)
২১। মৎস্যবিশেষ
২২। একটি সংখ্যা
২৪। মসলা রূপে ব্যবহৃত ফলবিশেষ
২৮। শস্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের স্থান

ডাঃ দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়

[রবার শিল্প-জগতের দিকপাল, উচ্চশক্তিসম্পন্ন রবার স্প্রিং-এর আবিষ্কর্তা।]

ভারতের যে সুসন্তানদের সাধনায় দেশের রবার শিল্পের ক্রমোন্নয়ন ও ব্যাপক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের শিল্পগত গৌরব ও ঐতিহ্য বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, উচ্চশক্তিসম্পন্ন রবার স্প্রিং-এর আবিষ্কর্তা ডঃ দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। একালের ভারতীয় রবার শিল্প জগতের এক বরেণ্য দিক্‌পালরূপে তাঁকে বর্ণিত করলে অতিরঞ্জিত হয় না। তাঁর গৌরবময় জীবনের বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ উজ্জ্বল ইতিকথাই এই ধারণার এক স্পষ্ট সাক্ষ্য।

আটান্ন বছর আগে আরামবাগে তাঁর জন্ম। স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয়া মানদা দেবীর পুত্র দাশরথির শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়েছে শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্সে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে তিনি স্নাতক হন। ১৯৩৫ সালে কিছুদিন একটি বৃটিশ সংস্থায় তিনি চাকরী করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাধিকামোহন স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণায় লিপ্ত হন। রবার শিল্পের উন্নয়নে তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি হ্যানকক পদকে সম্মানিত হন। তাঁর পূর্বে এশীয়দের মধ্যে আর কেউ এই পদক লাভ করেন নি। ১৯৩৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি, এইচ, ডি উপাধি অর্জন করেন।

দেশের ও বিদেশের বহু সংস্থার তিনি সদস্য, পরিচালক, উপদেষ্টা, সহকারী সভাপতি ও সভাপতিরূপে জড়িত আছেন।

ডঃ দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা সংক্রান্ত কমিটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অফ সায়েন্স, বোম্বাইয়ের রাবার নিউজ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর ট্রেণিং ইন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনীয়ারিং, নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের কাস্টমস এ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল এক্সাইস এ্যাডভাইসারী কাউন্সিল প্রভৃতির সভ্যপদ ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইনষ্টিটিউট অফ কেমিস্টস, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ ইনষ্টিটিউশান, লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অফ রাবার ইণ্ডাষ্ট্রীজ ও যুক্তরাজ্যের রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রির সদস্য পদ ক্যাপেস্কিল (এজেন্সি) লিমিটেড, ইণ্ডিয়া আলকালীজ লিমিটেড, দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ লিমিটেডের পরিচালকপদ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিনান্স কর্পোরেশান ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলোপমেণ্ট কর্পোরেশন বোম্বাইয়ের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলোপমেণ্ট, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কারিগরী উপদেষ্টার পদ, ন্যাশনাল রবার ও ইংচেক টায়ার প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কারিগরী উপদেষ্টার পদ, ব্যুরো অফ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্ট্যাটিসটিক্সের সহকারী সভাপতি পদ এবং নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনষ্টিটিউশানের রবার উৎপাদন বিভাগীয় কমিটির চেয়ারম্যানের পদ তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়া আরও বহু প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় আসন তাঁর অধিকারে এসেছে।

বিভিন্ন সময়ে রবার শিল্পকেন্দ্রিক সরকারী বা বেসরকারী শুভেচ্ছা সফরে বা সম্মেলনসমূহে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে পৃথিবীর বহু দেশ তিনি সফর করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যবহুল সার্থক রচনা তাঁর লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র

[ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার রিজিওন্যাল ম্যানেজার]

সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাকে মূলধন করে লক্ষ্যস্থির রেখে জীবনের চলার পথে যাঁরা পা ফেলেন, যাত্রাশেষে তাঁরা অবশ্যই ভাগ্যলক্ষ্মীর স্মিত প্রসন্ন হাসির লক্ষ্য হন ও সার্থকতার আলোয় জীবনকে আলোকিত করতে সমর্থ হন—এ ধারণা অমূলক নয়। আমাদের পরিপার্শ্বে এই উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ বহু গৌরবময় নামে উল্লেখ করা যায়। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার রিজিওন্যাল ম্যানেজার শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র উপরোক্ত ধারণার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অতি সামান্য সূচনা থেকে এক অসামান্য আলোকদীপ্ত পরিণতি শ্রীমিত্রের জীবনকে এক আদর্শ ও ভাবীকালের কাছে অসীম উদ্দীপনাময় প্রেরণাদায়ক জীবনে পরিণতি দিয়েছে।

জীবনের অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। বাঙলার সামগ্রিক গর্ব ও গৌরব নির্মাণে যশোহরের অবদান অন্তহীন। প্রতাপাদিত্য, শ্রীমধুসূদনের পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত যশোহরই তাঁর পিতৃভূমি। ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর জন্ম। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ও স্বগত ইন্দুপ্রভা মিত্রের পুত্র প্রফুল্লকুমার স্কুল জীবন অতিবাহিত করেন খুলনা ও গোবরায়।

১৯৩৩ সালে কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন কলেজে। ১৯৩৭ সালে কলাবিদ্যায় স্নাতক হলেন রিপণ (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে। ১৯৪৯ সালে যোগ দিলেন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় একজন সাধারণ করণিক হিসাবে। স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতা তাঁকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে এল চৌরঙ্গী শাখায় এজেণ্টের আসনে। জামসেদপুর শাখায়ও এজেণ্ট হিসাবে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন। ফিরে এলেন কলকাতায়। অধিষ্ঠিত হলেন বৈদেশিক মুদ্রা বিভাগের প্রধান হয়ে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র

১৯৬২ সালে তাঁকে পাঠান হল লণ্ডনে ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার তত্রস্থ শাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী করে। ১৯৬৪ সালে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। এবার কর্মস্থল বোম্বাই। বৈদেশিক মুদ্রা বিভাগের প্রধানের পদটি তাঁর অধিকারে রইল। জয়েণ্ট ম্যানেজার হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। সাব-ম্যানেজার, ম্যানেজার প্রভৃতি আসনগুলি অলঙ্কৃত করার পর আজ তিনি রিজিওনাল ম্যানেজারের আসনে সমাসীন। কলকাতায় ফরেন ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-চেয়ারম্যানের আসনেও তিনি সমাসীন।

যে ব্যাঙ্কে একদিন তিনি যোগ দিয়েছিলেন অসংখ্য করণিকের অন্যতম হয়ে সেই ব্যাঙ্কেরই এক শীর্ষস্থানীয় আসন আজ তাঁর অধিকারে। তাঁর কুশলতা ও প্রতিভা শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কটির নয়, ব্যাঙ্কটিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের কল্যাণ সাধন ও ক্রমোন্নয়নে অপরিসীম সহায়তা করে চলেছে।

সন্তোষকুমার দে

[বিশিষ্ট প্রচারবিদ ও সাহিত্যসেবী]

জীবনের সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরকাল যিনি প্রচার এবং বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্রমোন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, প্রচার বিজ্ঞাপন ও সাহিত্য জগতের সুপরিচিত সেই অক্লান্ত কর্মীর নাম—সন্তোষকুমার দে। অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৩২৩ সালের ৬ই বৈশাখ (এপ্রিল ১৯১৬) তাঁর জন্ম হয়। বালক বয়স হতেই তাঁর সাহিত্য-প্রীতি গুরুজনদের ও শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দান দু'ইটি ক্ষেত্রে। প্রথম ও প্রধান—বিজ্ঞাপন, প্রচার-ব্যবস্থা এবং সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর বাংলা বই-গুলি সর্বপ্রথম এবং আজিও অনন্য। "উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন" বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞানের সর্ব-প্রথম বই। তাঁর "সাংবাদিকতার গোড়ার কথা" যদিও "উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপনের" মত মৌলিক গ্রন্থ নয়, তবু সন্তোষকুমারের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এই গ্রন্থখানিকে বাংলা সাহিত্যে সাংবাদিকতা সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য ও সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসাবে উপস্থাপিত করেছে। এই দু'খানি গ্রন্থই বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের অভাব পূর্ণ করেছে।

নিজে সুদীর্ঘকাল বিজ্ঞাপন-জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এই বিশেষ ক্ষেত্রের অনেক রহস্য নিয়ে তিনিই বাংলা

ভাষার প্রথম বিজ্ঞাপন পটভূমিকায় বিধৃত উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসখানির নাম—"সঞ্জয় উবাচ"।

তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দান—রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ—'কবিকণ্ঠ'। সুদীর্ঘ ১২ বৎসর গবেষণার ফল—'কবিকণ্ঠ' নামক গ্রন্থখানি, যার প্রথম খণ্ডে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠের রেকর্ডিং তথা রবীন্দ্র-সঙ্গীত রেকর্ডিং সম্পর্কে সুদীর্ঘ ৬০ বৎসরের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হওয়ার পরে তিনি সেলস্‌ম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং লণ্ডনের ই, এম, আই ইনষ্টিটিউট হতে বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞানের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি ১৯৩৮ সালের শেষ হতে বিজ্ঞাপন-জগতের সঙ্গে এই সুদীর্ঘকাল নানাভাবে তিনি যুক্ত আছেন। তিনি এক সময়ে একটি এজেন্সিতে "ভিসুয়্যালাইজার" এবং "কপি রাইটার" হিসাবে কাজ করেছেন। বিখ্যাত ন্যাশনাল টোবাকোর বিজ্ঞাপন বিভাগে থাকাকালীন তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সহ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন এবং ব্যাপকভাবে হোর্ডিং ব্যবস্থা ও জনসংযোগ সম্পন্ন করেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েস সর্ব-ভারতীয় শ্লোগান রচনা প্রতিযোগিতায় তাঁর লেখা "Happy Homes have Gramophones" শ্লোগানটি প্রথম পুরস্কার পায়। শ্লোগানটি ইংলণ্ডের মূল কোম্পানীর চেয়ারম্যান কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত হয়। "সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন" নামক বঙ্গানুবাদের শ্লোগানটিও তাঁরই রচিত। তাঁর রচিত গ্রন্থের সামগ্রিক সংখ্যা সাতাশ।

'রবিবাসর' নামক বিখ্যাত সাহিত্য-সভার জনপ্রিয় সম্পাদক হিসাবে তিনি সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। রবীন্দ্র-নাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলা দেশের সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সস্নেহ সহযোগিতাধন্য 'রবিবাসর' সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে চলছে। সন্তোষকুমার তাঁর "রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে রবিবাসরের ঐতিহ্যময় ইতিহাস-সহ রবীন্দ্র জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য পরিবেশন করেছেন।

স্নাতকোত্তর ছাত্রজীবনেই তিনি "স্বাস্থ্য সমাচার" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি দেন। পরে "গায়ত্রী' নামক একখানি সাহিত্য পত্রিকার তিন বৎসর সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে "রেকর্ড সঙ্গীত" নামক একখানি জনপ্রিয় সঙ্গীত পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাছাড়া গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষে "দি ভয়েস" নামক ইংরাজি এবং বাংলা দু'খানি হাউস ম্যাগাজিন তিনি সম্পাদনা করেন।

বিজ্ঞাপন জগতের সেবায় তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ এবং ছোট গল্পও লিখেছেন। Advertlink নামক বিজ্ঞাপন বিষয়ক পাক্ষিক ইংরাজি পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাতেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। Calcutta Abvertising Club-এরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই আন্দোলন এখন সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এডিটরস্‌" এবং "পাবলিক রিলেশন্‌স্‌" বিষয়ক দুইটি সর্বভারতীয় সমিতিরও তিনি সদস্য। কলকাতার বিখ্যাত "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রী" নামক প্রতিষ্ঠানেও তিনি দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন।

কর্মজীবনে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রচার বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে সুদীর্ঘকাল নিযুক্ত আছেন। কোম্পানীর প্রচারিত বিবিধ প্রচার পুস্তিকা, গানের বই প্রভৃতি তাঁর সৃষ্টি-শীল মন ও পরিমার্জিত রুচির পরিচয়, বহন করে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(প্রবন্ধ) উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন ; সাংবাদিকতার গোড়ার কথা ; কবিকণ্ঠ ; রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ ; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ; বাংলা সাহিত্যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও আজগুবি রচনা (একাংশ)। (ছোট গল্প)—পরিচয় স্ট্রাইক, সরস গল্প, কৌতুক যৌতুক, রক্তগোলাপ, বৈঠকী গল্প। (উপন্যাস) মনে পড়ে, পাণ্ডুলিপি, সঞ্জয় উবাচ (২য় খণ্ড)। (শিশুসাহিত্য)—সেক্স-পীয়ারের গল্প; এণ্ডারসনের রূপকথার রাজ্য ; ভক্ত প্রহ্লাদের গল্প, ভক্ত ধ্রুবের গল্প। (কবিতা ও গান)—একতারা, (নাটক)—১৩৫০ সাল।

শ্রীমতী অনুপমা বসু

[পশ্চিমবঙ্গ নারী শিক্ষায়তনের প্রধানা পরিদর্শিকা]

একদল মানুষ আছেন প্রচারের ঢক্কা-নিনাদ থেকে যথাসম্ভব নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে আপন সাধনাতে এবং কর্মে বিভোর থাকা শ্রেয় বলে মনে করেন। আত্মপ্রচার থেকে দেশের কল্যাণকর কার্য সাধনাই এঁদের জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। এই তালিকায় যে কটি নাম উল্লেখের দাবী রাখে শ্রীমতী অনুপমা বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অনমনীয় উদ্যম এবং একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সরকারী প্রশাসনের জগতে এক বিরাট আসনে তিনি আজ উপবিষ্টা।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলা রত্ন-গর্ভা নামে পরিচিত। এখানেই এক সাধারণ পরিবারে ১৯১৮ সালের ১৪ই আগষ্ট শ্রীমতী অনুপমা বসুর জন্ম। ঢাকা ইডেন স্কুলে শিক্ষারম্ভ। মা শৈবলিনী বসু বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠিকা এবং সুবোদ্ধা। একদিকে সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ, অপর দিকে সমাজের প্রতি একনিষ্ঠ দান উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বিকশিত হয়। পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু ছিলেন ঢাকার প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী। পুত্র কন্যাদের শিক্ষা

ব্যাপারে তিনি কোনদিন কার্পণ্য করেন নি। আজ তাঁরা প্রত্যেকেই সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী হিসেবে অনুপমা বসু সকলের প্রিয় ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুইটি বিষয়ে লেটার সহ পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন। বাইশ বৎসর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ঢাকা ইডেন স্কুল ও কলেজের প্রথমে লেকচারার ও পরে অবসর-কালীন সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্তা হলেন। '৪২ সালে ইউ-পিতে ডিগ্রী কলেজের লেকচারার হিসেবে কাজ করলেন। এরপর মোরাদাবাদ উইমেনস্ কলেজ, পাটনা গভর্ণমেন্ট কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন বহু সম্মানজনক পদ অলংকৃত করলেন তেমনি আপন অভিজ্ঞতার ঝুলিও পূর্ণ করলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের বছরে তিনি ইউরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন এবং চার বছর লণ্ডনে থেকে টিচার্স ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করা ছাড়াও শিক্ষা বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী অর্জন করলেন। ১৯৫০ সালে দেশে ফিরে কলকাতার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা হিসেবে চার বছরের জন্য নিযুক্তা হয়েছিলেন। এরপর ১৯৫৫ সালে বর্ধমান এম, ইউ, সি কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমতী বসুকে দিয়ে তার জয়যাত্রা শুরু হয়। পুরো ছ'টি বছর
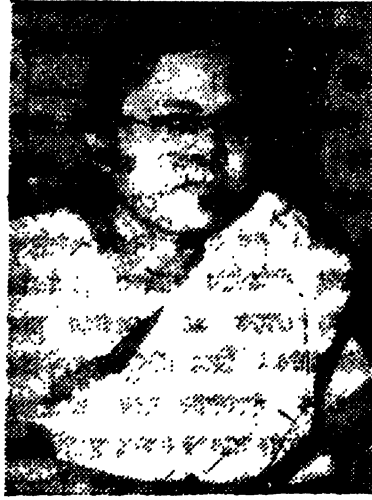
শ্রীমতী অনুপমা বসু

তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির হাল ধরেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বর্তমানে এই কলেজের যিনি অধ্যক্ষা তিনি শ্রীমতী বসুরই মেজ বোন চারুপমা বসু। তাঁর সেজ বোন সুচন্দ্রিমা রায়ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিতা। তাঁর অন্যতম ভাই ডাঃ সুধীর বসু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রীমতী বসু এরপর হেষ্টিংস হাউসে অবস্থিত ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর উইমেনস্-এর প্রথমে সহকারী অধ্যাপিকা ও পরে সহকারী অধ্যক্ষার পদ অলংকৃত করেন। দীর্ঘ আট বছর এই পদে থাকার পর ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষা বিভাগের প্রধানা হিসেবে নিযুক্ত হন। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও অনুপমা বসু অবসর সময়ে ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম যেমন নিজ হাতে করে থাকেন তেমনি ছেলেমেয়েরা এলে তাদের পড়ানও তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ বলে মনে করেন। স্কুল, কলেজে থাকাকালীন তিনি ভলি, বাস্কেটবল, দৌড় এবং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান দখল করতেন এবং সে সময়ে ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়নশিপও লাভ করেছেন। সাময়িক কয়েকখানি ইংরেজী পত্রিকাতেও তথ্যসমৃদ্ধ তাঁর কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

একদিকে ধর্মের প্রতি অনুরাগ, অপরদিকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী অবিবাহিতা শ্রীমতী অনুপমা বসু তাঁর বিনয়-নম্র ব্যবহার, ও অমায়িক সৌজন্যবোধের জন্য সকলের কাছেই আজ সমাদৃত।

বিজ্ঞান-সন্দেশ

চীজ: 'পাস্তুরাইজেসন্', অর্থাৎ নির্বীজকরণ প্রক্রিয়ায় দুধের পুষ্টিকর 'মাইক্রো-অরগ্যানিজম্'-গুলো আর 'এনজাইম' নষ্ট হয়। চীজ—যা তৈরী হয় দুধ থেকে—তাও এর ফলে স্বাদ-গন্ধ ইত্যাদির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে একটা নতুন পদ্ধতি ইংলণ্ড-এ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে কেবলমাত্র ক্ষতিকর জীবাণুগুলো ধ্বংস করা যাবে, 'পেরোক্সাইড'-এর সাহায্যে এমনটা করা সম্ভব। 'হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ক্যাটালস্ প্রসেস' 'এনজাইম' এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু রক্ষা করে—ফলে চীজ্ আরও বেশি স্বাস্থ্যসম্মত এবং পুষ্টিকর হয়ে তৈরী হচ্ছে।

বহুমূত্র: মাঝবয়সে যখন বহুমূত্র সুরু হয় তখন সাধারণতঃ তা এত মৃদু থাকে কোন লক্ষণই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। এ সব ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়ে হঠাৎ মূত্র পরীক্ষা করার দরকার হলে, হয়ত জীবনবীমা বা ঐ ধরণের কোন কোম্পানী করায়। কিংবা যারা নিয়মিত করান রুটিন চেক-আপ-এর উদ্দেশ্যে, তাদেরও হঠাৎ ধরা পড়তে পারে। বেশি খেলে প্যান্‌ক্রিয়াস্-এ চাপ সৃষ্টি হয়, এবং ফলতঃ মৃদু বহুমূত্র হওয়ার বেশ সম্ভাবনা থাকে।

গত ১৯৬৩-তে দু' লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষ ডায়াবেটিস রোগে ভুগতেন। মজার কথা এই যে, এদের অধিকাংশই ঘুরে ফিরে অভিযোগ করেন এ ব্যাপারে আদৌ ওয়াকেফহাল না হয়ে। এর কারণ, প্রথম দিকে বহুমূত্র বেশ মৃদু থাকায় তা ঠিক নজরে আসে না।

বিলেতী পোনা

গৌর আদক

আজকাল মাছের বাজারে শুধু পুকুরের রুই, কাৎলা, শিংজি, কৈ, মাগুর প্রভৃতি মাছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সুদূর পাশ্চাত্য দেশের "সাইপ্রিয়ান্স কার্প" নামে এক নতুন ধরণের বিলেতী মাছ, মাছের বাজারে দেখা যাচ্ছে, তা হয়তো নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই অনেকেই এই মাছটির সাধও উপলব্ধি করে থাকবেন। আমাদের দেশে এই মাছটিকে "মহা শোল" বলা হয়। কেউ কেউ আবার একে বিলেতী পোনাও বলে থাকেন। তার কারণ এটিকে বিলেতেরই পোনা মাছ ব'লে, অনেকেই তাই একে বিলেতী পোনা বলে থাকেন।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়াই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই মাছটি যদিও ইয়োরোপের পোনা মাছ বলে পরিচিত, কিন্তু আসলে এই মাছটির আদি জন্মস্থান ইয়োরোপ মহাদেশে নয়। এশিয়া মহাদেশের উত্তরে অবস্থিত চীন দেশেই এর আদি জন্মস্থান। চীন দেশের লোকেরা একে চীনা পোনা বলে থাকেন। মাছটি যদিও চীন দেশের, তথাপি এই মাছটির এখন আর চীনা নামগন্ধটুকুও নেই। এখন ইয়োরোপেরই মাছ বলে পরিচিত হয়েছে। তার কারণ, বর্তমানে ইয়োরোপে বিভিন্ন দেশে এর ব্যাপক উৎপাদন করা হচ্ছে। আজ থেকে বহু শতাব্দী পূর্বে ইয়োরোপের কোন এক ভদ্রলোক মৎস্য চাষের জন্য চীন দেশের এই মাছটিকে ইয়োরোপের সাইপ্রাস দ্বীপে নিয়ে যান এবং সেখানকার জলবায়ু ও আবহাওয়ার মধ্যে এদের সহনক্ষম করেন। সেখানকার জলবায়ু ও আবহাওয়ার মধ্যে সহনক্ষম হয়ে সেখানেই এরা বংশ বিস্তার করতে সুরু করে এবং এইভাবেই এঁরা আস্তে আস্তে সারা ইয়োরোপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ইয়োরোপের মাছ বলেই পরিগণিত হয় এবং চীনা নামগন্ধটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাইপ্রিয়ান্স কার্প বা বিলেতী পোনা দুই ভাগে বিভক্ত : একটি 'মিরারকার্প' অপরটি স্কেল কার্প।'

ভারতে এই মাছের চাষের জন্য জার্মান থেকে 'মিরার কার্প' আর ইন্দোনেশীয়া থেকে 'স্কেল কার্প'কে আনা হয়। সর্ব প্রথম মিরার কার্পকে মাদ্রাজের নীলগিরি পার্বত্য এলাকার উটকামণ্ড লেকে এনে সেখানে চাষ সুরু করা হয়। কিন্তু প্রাথমিক ব্যর্থতার পর প্রচুর গবেষণার পরে ভারতের জলবায়ুর মধ্যে সহনক্ষম হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং আস্তে আস্তে বংশ বিস্তার সুরু করে। বর্তমানে উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে মিরার কার্প-এর চাষ ব্যাপকভাবে সুরু হয়েছে, এর মধ্যে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, কাশ্মীর, মণিপুর, ত্রিপুরা ও আসামের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যথা— পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মহারাস্ট্র, গুজরাটেও মিরার কার্প-এর ব্যাপক চাষের গবেষণা চলছে।

স্কেল কার্প যদিও শীতল আবহাওয়া এবং শীতল জলের মাছ তথাপি স্কেল কার্প পূর্ব হতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলবায়ুর সঙ্গে ভারতের সমতল অঞ্চলের উষ্ণ জলবায়ুর সাদৃশ্য থাকায়, ইন্দোনেশিয়ার ব্যাঙ্কক থেকে ১৯৫৭ সালে সর্ব প্রথম স্কেল কার্পের চারা ভারতে আনা হয় এবং কলকাতা ও কল্যাণীতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এর গবেষণা সুরু হয় এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই এরা এখানকার জলবায়ুর ও আবহাওয়ার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বংশ বিস্তার সুরু করে।

পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন অঞ্চলের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর মধ্যে যদি একবার এরা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে তাহলে সেখানে এরা ব্যাপক বংশ বিস্তার সুরু করে দেয় এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই এদের ওজন ও দৈর্ঘ্য বেড়ে ওঠে। বর্তমানে ইয়োরোপের এই সমস্ত মাছের ওজন ৬০ থেকে ৭০ পাউণ্ড হয়ে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে মাদ্রাজের নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে যে মিরার কার্প-এর চাষ করা হচ্ছে সেগুলি বর্তমানে চার বছরের মধ্যে ওজন দাঁড়িয়েছে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড আর দৈর্ঘ্য হয়েছে প্রায় তিন ফুটের মতন, আর স্কেল কার্প-এর প্রথম বছরে দৈহিক ওজন হয় ৩ থেকে ৪ পাউণ্ড আর দৈর্ঘ্য হয় ১৪˝ থেকে ১৬˝ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বছরে এই সমস্ত মাছ ওজনে ও দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ আমাদের দেশের দেশী পোনা রুই কাৎলা অপেক্ষা এই সমস্ত মাছ প্রায় দুই-তিন গুণ বেশী বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে যে মিরার কার্প-এর চাষ হচ্ছে তা তিন, চার বছরে প্রায় বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড ওজন হয় আর দৈর্ঘ্য হয় প্রায় তিন, চার ফুটের মতন। কিন্তু ইয়োরোপে এই মাছ একই সময় পঞ্চাশ থেকে ষাট পাউণ্ড ওজনের হয় কিন্তু দৈর্ঘ্য একই থাকে, অর্থাৎ আমাদের দেশের দেশী পোনা অপেক্ষা বিলেতী পোনা বছরে প্রায় দুই-তিন গুণ বেশী বৃদ্ধি পায়।

দেশী পোনা অপেক্ষা বিলেতী পোনার শুধু যে দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে তাই নয়, আমাদের দেশী পোনা অপেক্ষা এরা প্রচুর পরিমাণে ডিম পাড়ে। আমাদের দেশী পোনা বছরে একবার মাত্র, বর্ষা ঋতুতে ডিম পাড়ে কিন্তু বিলেতী পোনা বছরে চারবার অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট দিন অন্তর ডিম পাড়ে। এই নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও বর্ষার সময় আরো একবার ডিম পাড়ে। আমাদের দেশী পোনা অপেক্ষা বিলেতী পোনার ডিম পাড়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। দেশী পোনা প্রবহমাণ জলাশয়ের মধ্যেই শুধু ডিম পাড়ে, কিন্তু বিলেতী পোনা যে কোন বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যেও ডিম পাড়তে পারে।

বীট বা হাঁকা শিকার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কোন্ জঙ্গলে কোথায় বাঘ আছে, না জেনে শিকারে যাওয়া নিষ্ফল চেষ্টা। বাঘ যদি থাকে, শিকারের গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে টোপ বাঁধা। জ্যান্ত টোপের ওপর মাচাতে বসা ও মড়ি হলে মাচাতে কি ভাবে বসতে হয়, আগেই বলা হয়েছে। এই দু'টিই হল সন্ধ্যা এবং রাতের ব্যাপার। মড়ির ওপর বসা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর, বিশেষত মশা ও শীতকালে ঠাণ্ডার জন্য। রাতে শিকার, একা বসে থেকে অনেকেই পারেন না। এক্ষেত্রে মড়ি হলে 'বীট' বা হাঁকা হচ্ছে উপযোগী। বীট দিনেই হয়।

সব জায়গায় হাঁকা ঠিকমত করতে পারে না। আগেকার দিনে বিহারেই সব চেয়ে ভাল হাঁকা হত, অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই। এখন খুব কম জায়গাতেই হাঁকা অথবা বীট ঠিকমত চালাতে পারে।

বীট হওয়ার আগের দিন দুপুর ৩টার মধ্যে বোদা অর্থাৎ মোষের বাচ্চা বাঁধতে হবে। সকালে তাকে চরিয়ে জল খাইয়ে আনতে হবে। যদি ৩।৪ দিন উপরি-উপরি বাঁধতে হয়, তবে প্রতিদিন সকালে ৯টার পর সাবধানে গিয়ে ও চারিদিক দেখে বোদাকে খুলে নিয়ে এসে খাবার, জল দিয়ে চরতে দিতে হবে। কিছু ঘাস সামনে রেখে দেওয়া ভাল। বোদার বয়স যেন এক থেকে দুই বছরের মতন হয়। ক্ষীণকায় বোদাকে বাঘ খাবে না। একেবারে ছোট হলে বাঘ ত' বাঁধার জায়গাতেই খেয়ে যাবে, টেনে নেবার দরকার হবে না ও বাঘ কোথায় গিয়েছে জানা যাবে না, তাকে বের করার জন্য বীটও সম্ভব হবে না। বীটের জন্য টোপ বাঁধবার দড়ি যেন খুব শক্ত না হয়; বোদা যেন ছিঁড়তে না পারে; অথচ বাঘের পক্ষে বিশেষ শক্ত না হয়—

এক ইঞ্চি পরিধির পাটের কি শনের দড়ি হলেই চলবে; রং যেন সাদা না হয়, তাতে বাঘের সন্দেহ হবে। মাটি ঘসে কালচে করে দিতে হবে। দড়ি যেন লম্বা না হয়। এক হাত লম্বা হলেই চলবে। এটা বাঁধতে হবে একটা মোটা গাছ কি শিকড়ের সঙ্গে। না হলে একটা মোটা শক্ত কাঠের খুঁটির দু' হাত মাটিতে পুঁতে দু' হাত মাটির বাইরে রেখে তার সঙ্গে দড়ি শক্ত করে বাঁধতে হবে। বোদার গলায় দড়ি বাঁধতে নেই; তার সামনের পায়ের হাঁটুর নিচে বাঁধা দরকার।

নালা ও ছোট শুকনো নালার সংযোগ স্থানে, কি দুটি জঙ্গলের পথ যেখানে এক হয়েছে, কি নালার কাছে মিশেছে মিশেছে—এমন জায়গা পেলে ভাল। দেখতে হবে যে, নিকটে জঙ্গল যেন থাকে ও জলও থাকে।

বোদা না পাওয়া গেলে বলদ, ঘোড়া, গাধা বা গ্রাম্য শূয়োর বাঁধলেও চলবে।

টোপ বাঁধার পরের দিন সকাল ৯টার আগে গেলে হয়ত বাঘকে মড়ির ওপরেই দেখা যাবে। যারা টোপ

বাঘ

বোদাকে একটু খোলা জায়গায় না রাখলে কি লম্বা দড়ি লাগিয়ে শুতে দিলে বাঘ তাকে দেখতে পাবে না। চার-পাঁচশ হাতের মধ্যে জল আছে, এমন জায়গাতে বোদা বাঁধা উচিত। কারণ, বাঘ শিকার করে জল খেতে যাবে এবং জল যদি খুব দূরে হয়ে থাকে, সে দূরে চলে যাবে এবং বীটে তাকে পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ বড় মাটির গামলায় কাছেই জল রেখে দেন।

বিঘ্ন

এক্ষেত্রে পাত্রটি সম্পূর্ণ মাটিতে বসিয়ে দিতে হবে, শুধু জল ওপরে থাকবে। টোপ বাঁধবার জায়গার কাছে কোন গুহা থাকলে আগে থেকেই কাঁটা গাছ দিয়ে সেটা বন্ধ করে দিতে হবে; না হলে বীটের সময় বাঘ সেখানে ঢুকে পড়বে। যেখানে গরু চরে বা কাঠ কাটা হয়, সে রকম জায়গাতে টোপ বাঁধতে নেই। কাছেই যেন ঘন ঝোপ থাকে, তা হলে বাঘ দিনের বেলায় ঠাণ্ডায় মড়ির কাছেই থেকে যাবে। এবং কাছে ছোট পাহাড় থাকলে বাঘ তারই নিচে ঠাণ্ডা ঝোপে দিনের বেলায় বিশ্রাম করবে। বড়

বাঁধার জায়গা দেখতে যাবে তারা যেন খুব সকালে না যায় এবং খুব সন্তর্পণে দূর হতে দেখবে যে, টোপ বাঁধা আছে, না নেই। টোপ না দেখতে পেলে খুবই সতর্ক হয়ে তারা শুধু দেখবে কোন্ দিকে মড়ি টানার দাগ আছে এবং বাঘের কি বাঘিনীর, কিংবা চিতার পায়ের দাগ কিনা, বাঘিনী হলে তার বাচ্চা সঙ্গে ছিল কিনা—একেবারে মড়ির কাছে যাবার চেষ্টা করবে না। উঁচু গাছে উঠে তারা সাবধানে দেখতে পারে কোথায় মড়ি আছে। এ সব সময়ে কথা বলা কি কোনও শব্দ করা নিষেধ। শুধু আস্তে আস্তে হাত নেড়ে বা চোখের ইশারায় পরস্পরকে জানাবে।

মড়ির কথা শকুনেরা জানিয়ে দেবে। বাঘ যদি মড়ি না ঢেকে রাখে কিংবা ঘন ঝোপের মধ্যে না রাখে, শকুনের চোখ এড়াতে পারবে না। শকুন যদি গাছে থাকে ও নিচে নামতে সাহস না পায়, ধরে নিতে হবে যে, মড়ি নিকটেই আছে ও বাঘও তার কাছে। বাঘ নিকটে থাকলে পাখীরা কিচির-মিচির করে জানিয়ে দেবে। আর জঙ্গলে হনুমান থাকলে 'ত কথাই নেই। চিরশত্রু বাঘকে দেখলেই হল; তারা

[illegible] খড়্‌কড়-খড়্‌কড় শব্দ করে জঙ্গলের সব প্রাণীকেই জানিয়ে দেবে খবরটা। এই সব থেকেই মড়ি কোথায় আছে ও বাঘই বা কোথায় থাকতে পারে, জানা যায়। ভাল হয়, যদি জলের ধারে গিয়ে পাঞ্জার দাগ দেখা যায়। তাতে বোঝা যাবে জল খেয়ে বাঘ কোন্ ধার দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে।

সব চেয়ে ভাল হয় যে, গ্রাম্য শিকারীর ওপর ভার ছেড়ে না দিয়ে শিকারী যদি নিজেই এই সব গোড়ার জিনিষ অনুসন্ধান করেন। তাঁকে নিজের হাতে রাইফেল রাখতে হবে এবং গ্রাম্য শিকারী তাঁর ২।৩ হাত পেছনে থাকবে। কোনও শব্দ, কি কথাবার্তা করা চলবে না। তাঁকেও দেখতে হবে মড়ি টানার দাগ, মড়ি নয়। সব দেখা-শোনার পর দু'জন বিশ্বস্ত লোক গাছে রাখতে হবে। তারা দেখবে ও শুনবে বাঘের খবর, না নড়েচড়ে, না কেশে বা গল্প করে, জোরে থুথু ফেলাও চলবে না। গরুর কিংবা মোষের গাড়ী যেন চলাফেরা না করে। বাঘ খেয়ে-দেয়ে, জল খেয়ে ১১টা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়বে। বীট বা হাঁকার আগে তাকে শব্দ করে জাগিয়ে দিলে বীট পণ্ডশ্রম হবে।

এবার বীট বা হাঁকার লোক একত্র করতে হবে। তারা নিঃশব্দে জড়ো হবে যেখানে মড়ি আছে, কি থাকা সম্ভব সেখান থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে (যদি বীট ৪০০ গজ লম্বা হয়) বা ২৫০ গজ দূরে (যদি বীট ৭৫০ গজ পর্যন্ত লম্বা হয়)। বীট আরম্ভ হবার আগে যেন কোন শব্দ না হয়। এর ভার একজন নির্ভরযোগ্য লোকের হাতে দিতে হবে। বীটাররা কিভাবে অগ্রসর হবে, আগেই বলে দিতে হবে। পরে টাকা দেবার সময় যেন গোলমাল না হয়। এ জন্য নম্বর ও সই দেওয়া একএকটা কাগজ প্রত্যেক বীটারের হাতে দিয়ে বলতে হবে যে, ওগুলি যেন তারা কাপড়ের খুঁটে বা পকেটে যত্ন করে রেখে দেয়। বড় হরফে ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলো কেটে কেটে দিলে শ্রম লাঘব হবে।

এখন এদের মধ্য হতে বুদ্ধিমান লোক বাছতে হবে, যারা ঘাবড়ে যাবে না বা কেশে ফেলবে না। যদি ৮০ কি ৯০জন লোক পাওয়া যায়, এই রকম বাছাই করা অন্তত ৪০জন 'স্টপ' অথবা 'রোখ'-এর কাজ করবে। 'রোখ'রাই খুব কাজ দেয়। এরা যেন খুব বৃদ্ধ কি কম বয়সী না হয়। ঘুরে ঘুরে এসে নিঃশব্দে এরা দু'ধারের গাছে চড়ে বসবে। মাচা হতে দূরের স্টপরা বীটের দু'ধারে সমান্তরালভাবে গাছে থাকবে। বীটের পাশে জন্তুদের যাতায়াতের পথ তাদের দেখতে হবে, যেন বীটের প্রথম দিকেই বাঘ যেখান দিয়ে পালিয়ে না যায়। যদি স্টপ সংখ্যায় কম থাকে, সাদা কাগজ কি কাপড় সে-সব জায়গায় লাগিয়ে দিলে বাঘ ঐ পথ ধরে পাশ কাটিয়ে যাবে না।

মাচার কাছে যে দু'পাশে ১২জন স্টপ থাকবে, তারা ছাড়া অন্য স্টপরা মাঝে মাঝে শব্দ করবে এবং বাঘকে তাদের দিক থেকে পালাতে না দেবার জন্য গাছে লাঠি দিয়ে একটু শব্দ করতে পারে, হাত তালি দিতে পারে বা খুব জোরে কাশতে পারে। মাচার কাছের ১২জন স্টপ কিন্তু বেশী শব্দ করবে না। তাদের কাজ হচ্ছে বাঘকে ভয় না দেখিয়ে মাচার কাছে নিয়ে যাওয়া। বাঘ দেখতে পেলে তারা একটু ছোট কাশি দিতে পারে, কিংবা ছোট ডাল ভেঙে শব্দ করবে, যদি সেরকম দরকার হয়। তা না হলে না, তারা আস্তে আস্তে পাগড়ী ফেলে দিতে পারে। বীট আরম্ভ হবার আগে কোন স্টপই কিছু শব্দ করবে না। এটা তাদের আগেই বলে দিতে হবে।

সবচেয়ে দরকার ৪জন পর্যবেক্ষক। তারা মাচার পেছনে ৫০ গজ ও ১০০ গজ দূরে ডাইনে ও বামে গাছের ওপর থাকবে। তারা একবারও কোন শব্দ করবে না। তাদের কাজ হবে শুধু দেখা, বাঘগুলি থেকে [illegible] [illegible] না হয়ে কোথায় কোনদিকে গেল। বীট শেষ হয়ে গেলে তারা শিকারীকে সতর্ক করে বলে দেবে, কোন্‌দিকে বাঘ চলে গেল। এতে পরে অনেক সুবিধা হবে।

মাচার নিকটবর্তী ডাইনের ৬জন ও বামের ৬জন মাচা থেকে ২০ হাত দূরে দূরে রোখ হয়ে গাছে থাকবে; তাদের কাপড় যেন একেবারে সাদা না হয়। তারা বীটের সমান্তরাল না থেকে বোতলের মুখের মত ক্রমশ দৈর্ঘ্য ছোট করে মাচার কাছে এগিয়ে আসবে। অবশ্য অনুরূপ গাছের ওপর বসে। এই ১২জনই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী রোখ; এরা যেন সবচেয়ে সেরা লোক হয়। এই ১২০ হাতের পর দু'ধারে ৪জন করে ৮জন থাকবে প্রায় ৩৫ হাত দূরে দূরে এবং তারও পর দু'ধারে ৫জন করে ১০জন ৫০ হাত দূরে দূরে, এরপর ৭০ হাত দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকবে। এদের আগেই বলে দিতে হবে কিভাবে স্টপের কাজ করতে হবে।

মাচার কাছের স্টপদের ৭।৮ জন তাড়াতাড়ি মাচা তৈরী করে যে-যার গাছে উঠে পড়বে। মাচার সবচেয়ে কাছের ছ'জন করে লোক ছাড়া অন্য স্টপরা বীটের লোক কাছে এসে গেলে তাদের সঙ্গে মিলে যাবে বীটারের কাজ করতে। শেষ ছ'জন করে ১২জন গাছ থেকে নামবে না।

দেখা গিয়েছে যে, বীটে জন্তুরা তাদের সাধারণ চলাফেরার রাস্তা দিয়েই বেরিয়ে যেতে চায়। বীটাররা বলবে কবে কোন্ বছর কোন্ শিকারীর কাছ দিয়ে বাঘ গিয়েছিল। বাঘ যদি আহত হয়ে পালায়, পরে বীটে সে অন্য রাস্তা ধরবে, যেন আগের মাচার রাস্তায় না যেতে হয়। এরকম পূর্বের ইতিহাস থাকলে মাচা একটু কাছে বাঁধতে হবে কিংবা একটু সরিয়ে। মাচা তৈরী করার সময় এবং বীটের গতিরেখা ঠিক করার সময় দু'টি জিনিষ মনে রাখা উচিত,—প্রথম, বাঘের সাধারণ চলে যাবার পথের বীট যেন হয়; দ্বিতীয়, ভাল ঝোপঝাড় হতে তাকে খোলা জায়গার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা অনুচিত। এতে সে

ক্ষিপ্ত হয়ে বীটারদের লাইন ভেদ করে চলে যাবে এবং দু' একজন বীটারের প্রাণ যাবে। সে চাইবে সব সময়ই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে।

শিকারী নিঃশব্দে মাচায় উঠে পড়বেন এবং যতক্ষণ থাকবেন নড়াচড়া করবেন না, যতদূর সম্ভব। দিনের বীটের মাচা, রাতের মড়ির ওপর মাচার মত বেশী লতাপাতা দিয়ে ঘিরে দিতে হয় না; আর 'রেস্টে' রেখে রাইফেল বা বন্দুক চালাতে হয় না, কারণ বাঘ ত' স্থিরভাবে বসে থাকবে না। সে যখন আসবে, রাইফেলের সামনের মাছিতে (যাকে ইংরাজীতে ফোরসাইট বলে) চোখ রেখে বাঘের ওপর তাক করতে হবে, বাঘকে দেখে তারপর মাছি তার ওপর রেখে ট্রিগার টানলে চলবে না। সঙ্গে কোন সাথী না রাখাই ভাল; সাথীর দোষে সব পণ্ড হতে পারে। যদি-না সেও পাকা শিকারী হয়। বাঘ যদি দূর থেকে মাচার দিকে তাকায়, নড়া একেবারে নিষেধ, এমন কি চোখের পাতাও ফেলা চলবে না। না নড়লে বা শব্দ না হলে বাঘ সহজে বুঝবে না যে, মানুষ মাচায় আছে। চিতার বেলায় বোধহয় এটা পুরোপুরি খাটে না। চিতা একেবারে বীটের শেষে বেরিয়ে পড়ে, অতি সন্তর্পণে ও এমন কি অতি সামান্য ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে। বাঘ বীটারদের আগে আগেই চলে, যদিও কখন কখন সামান্য আগেই চলে আসে। বীট সুরু হলে জঙ্গলে ময়ূর থাকলে আগেই সেটি উড়ে আসবে। তারপর সাধারণত শূয়োর ও হরিণ বাঘ ও চিতার আগে বেরিয়ে পড়ে। শিকারীর মনে রাখতে হবে যে, বাঘের বীটে বাঘ ছাড়া আর কিছু মারা চলবে না। যদি আগে থেকে ঠিক করা থাকে যে, মিশ্র বীট (যাকে ইংরাজীতে 'মিক্সড্ বীট' বলে), অর্থাৎ বাঘের সঠিক খবর নেই, তখনই শূয়োর, হরিণ, চিতা মারা চলবে। যে-কোন জন্তু দেখেই যেন শিকারের নিয়মকানুন ভেঙ্গে শিকারী গুলী না চালান।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে বীট আরম্ভ হবে। বীট সাধারণত ৫০০ গজ হতে ৮০০ গজ লম্বায় হয়, সুরু করার জায়গা হতে মাচা পর্যন্ত। কতখানি চওড়া হবে, সেটা ঠিক হয় জঙ্গল বুঝে ও বীটারদের সংখ্যা দেখে।

বীটারদের একজন নেতা থাকবেন, যিনি তাদের সব কাজ বুঝিয়ে দেবেন। তাঁর কাজ হবে এবার হুইসেল দিয়ে বীট সুরু করা। বীটাররা যেন একজোট বেঁধে না চলে, বীটের প্রস্থ বরাবর তাদের ছড়িয়ে থাকতে হবে। খুব জোর দু'জন করে একত্রে থাকতে পারে, —অন্তত ১০ হাত ফাঁকে ফাঁকে তারা চলবে এবং মাঝে মাঝে দরকার হলে বীট লীডার বা নেতা জোট ভাঙিয়ে দেবেন। বাঘের বীটে অনেকেই ভয়ে জোটে চলতে চান; তাঁদের দোষ দেওয়া
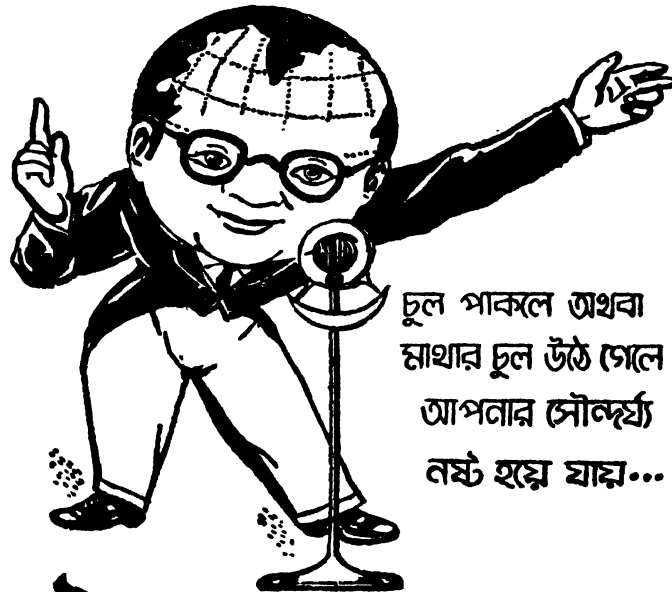
যায় না। সঙ্গে দু' একজন গ্রাম্য শিকারী বন্দুক নিয়ে থাকলে ভাল হয়; বীটারদের সাহস একটু বাড়বে। ওরা বাঘ দেখলেই যেন গুলী না করে। অবশ্য বাঘ কোন বীটারকে আক্রমণ করলে তাকে বাঁচাতে হবে। তাদের আগে থেকে বলে দিতে হবে, বিশেষত বাঘের জন্য বীটে গুলীর আওয়াজ হলে কি করতে হবে। কাছে গাছ থাকলে বীটাররা সঙ্গে সঙ্গে গাছে উঠে পড়বে। গাছ না থাকলে তারা যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটাছুটি না করে একত্রে থাকে, বন্দুকধারী গ্রাম্য শিকারীর কাছে। বাঘ আহত হলে শিকারী মাচা থেকে একটা লম্বা হুইসল দেবেন। এতে বীটারদের সাবধান করা হবে যে, 'বিপদ, এগুবে না, গাছে চড়ে যাও।' আহত হয়ে মাচা থেকে দূরে চলে গেলে এবং পিছনের পর্যবেক্ষকরা সমর্থন করলে দু'বার হুইসল্। এতে বীটারদের জানান হবে যে, 'বিপদ কেটে গিয়েছে। এগিয়ে এস।' আর যদি গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তা হলে তিনবার হুইসল-এর শব্দ করতে হবে। এতে বলা হবে 'এগিয়ে এস।' অনেক সময় ঘাবড়ে গিয়ে কোন অসতর্ক শিকারীর আঙ্গুল ট্রিগারে হাত লেগে গিয়ে গুলীর আওয়াজ হয়ে গেলে কিংবা লোভে পড়ে বাঘের বীটে হরিণ কি শূয়োরেরর ওপর গুলী চালালে তাতেও তিনবার হুইসল্। বীটারদের হাতে ছোট ছোট কুড়ুল কি সড়কী থাকবে; বড় সড়কী বিপদে কাজ দেবে না।

বাঘ যেখানে আছে বলে অনুমান করা হয়, সেখান থেকে খুব কাছে বীট সুরু করতে নেই; তা হলে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দ্রুত পালিয়ে যেতে পারে। বীটাররা প্রথমে যত জোরে পারে চেঁচাবে; এতে বাঘের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। এবার বীটাররা চেঁচামেচি করে এগুতে আরম্ভ করবে লাঠি কি বল্লম অথবা কুড়ুল দিয়ে গাছে শব্দ করে এবং ঘন ঝোপে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে। বীটের একেবারে কাছের স্টপরা নেমে পড়বে এবং বীটারদের সঙ্গে কাজ চালাবে। ধীরে ধীরে আওয়াজ তারপর কমিয়ে দিতে হবে। যখন "বোতলের মুখের" কাছে এসে যাবে, তখন না চেঁচিয়ে শুধু কথা বলাবলি করবে ও গাছে লাঠি দিয়ে আওয়াজ করবে। বাঘকে ভয় দেখানো উদ্দেশ্য নয়। তাকে ভুলিয়ে বোতলের মুখের ভিতর দিয়ে মাচার কাছে নিয়ে যেতে হবে। স্টপরা যদি তিন-চারবার বাঘকে ঠুকঠাক শব্দ করে আটকে দেয়, তবে বাঘ ঘাবড়ে গিয়ে গর্জন করে বীট ভেদ করার চেষ্টা করতে পারে।

এতক্ষণ সশব্দ বীটের কথা বলা হল। ঘন জঙ্গলে কিংবা যেখানে বড় বড় গর্ত কি গভীর নালা আছে, সেখানে এই রকম বীটই কাজ দেয়। কিন্তু যদি বীটার বেশী না থাকে, সশব্দ বীট বিপজ্জনক হতে পারে; কারণ যেখানে শব্দ কম শুনবে, সেখানে দিয়েই বাঘ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। বীটারের সংখ্যা কম হলে নিঃশব্দ বীট ভাল। এ বীট কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ নয়। কারণ, বাঘের ঘুম ভাঙাবার জন্য বীট সুরু হবার সময় গাছের গায়ে বেশ কিছু শব্দ করা হয়। তারপর সাধারণভাবে কথা বলার মত আওয়াজ করে বীটাররা এগিয়ে যায়; তাদের পায়ের শব্দ ও কথা বলা ছাড়া আর কোন গোলমাল থাকে না। বাঘ ভাববে, কাঠুরেরা বোধহয় জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছে। এতে ধীরে ধীরে তাকে স্টপদের সাহায্যে মাচার কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। বাঘের যদি আগেই বীটের অভিজ্ঞতা থাকে এবং গুলীর শব্দ শোনা থাকে, অথবা আগের বীটের শিকারী মাচাতে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়ে থাকেন, তা হলে সে একাধারে খুব সতর্ক ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে পরের বীটে। আগে যদি সশব্দ বীট হয়ে থাকে, পরে নিঃশব্দ বীট করাই ভাল। জঙ্গলে পূর্বে কিরকম বীট হয়েছে এবং কিরকম ফল পাওয়া গিয়েছে এখবর জানা, দরকার। গুলী খেয়ে বাঘ মাটিতে পড়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে ধীরভাবে আর একবার গুলী করা দরকার। চিতার বেলায় এটা অপরিহার্য, কারণ চিতা ভান করে পড়ে থাকে এবং এমনো হয়েছে যে, শিকারী কাছে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন কিংবা নিহত হয়েছেন। চিতা সম্বন্ধে চলতি কথা আছে যে ছাল না, ছাড়ান পর্যন্ত চিতা মরে না। চামড়ার ক্ষতি হবে—এই ভেবে যে শিকারী পুনরায় গুলী করেন না, তিনি অনর্থক নিজের বা বীটারদের জীবন বিপন্ন করছেন। বাঘ ও চিতা মরবার আগে নিজের থাবা কামড়ে কি চিবিয়ে থাকে এবং শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই জিভ একটু বেরিয়ে পড়ে, ঠিক তার আগে লেজ একবার খাড়া হয়ে ওঠে। মাচা থেকে নামবার আগে ঢিল ফেলে দেখতে হবে বাঘ নড়ছে কিনা। বাঘ শিকারে পদে পদে সাবধান হওয়া উচিত।

আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, মাচায় সঙ্গী নিতে নেই, বিশেষত আনাড়ী সঙ্গী। অনেক বছর আগে শিকারে একবার ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম। ডালটনগঞ্জ থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে। সেই আমার প্রথম বীট শিকার। বাঘের খবর পেয়ে বীট হবে। তিনটে মাচা হয়েছে; দু'পাশে দু'টি, তাতে একজন করে বসেছেন। বাঘ যেন বীট থেকে বেরিয়ে না যেতে পারে সেইজন্য। কারণ, স্টপ যেভাবে রাখা হয়েছিল, তাতে স্বভাবতই বাঘকে আসতে হবে মাঝের মাচার দিকে। সেখানে আমরা তিনজন বসলাম এক-একটি ছোট মোড়ার ওপর,—বন্ধুবর মিঃ গুপ্ত, এক ডাক্তার (যিনি কখনও শিকার করেন নি বা দেখেন নি) ও আমি। মাচা মাটি থেকে মাত্র ৮ফুট উঁচুতে। সামনের দিকে হাল্কা করে লতাপাতা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চির ওপর। বীট আরম্ভ হল বেলা প্রায় ১২টার পর। মিনিট কুড়ি পর হঠাৎ ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মোড়া থেকে পড়ে গেলেন, অবশ্য মাচার ওপরেই। আমি ছিলাম মাচার বাঁ পাশে; ডাক্তার মাঝখানে ও গুপ্ত ডান দিকে। গুপ্ত ও আমি আমাদের রাইফেল পাশের বাঁশে ঠেকিয়ে রেখে ডাক্তারকে তুলতে

গিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি ২০ হাত দূরে একটা বিরাট বাঘের মাথা। মাচাতে শরীরের নড়াচড়া দেখে বাঘের দৃষ্টি সেদিকে পড়েছে। আমরা অপলক-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকলাম, বিন্দুমাত্র না নড়ে, এমনকি, ডাক্তারের গায়ে যে হাত লাগিয়েছিলাম তাও না নেড়ে। দু'জনের গায়ে খাকী জামা, খাকী টুপী। বাঘ মানুষ বলে ভাবতেই পারল না, তার নিশ্চয় মনে হয়েছিল, আমরা জঙ্গলের একটি অংশবিশেষ? আমাদের অবস্থা তখন চরম!! মোটে ৮ফুট ওপরে আছি, অস্ত্র ত্যাগ করে; সামনে বিশাল বাঘ ২০ হাত দূরে। বাঘ দাঁড়িয়েই আমাদের ধরতে পারে, লাফাতে হবে না। আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেল বোধহয় চারগুণ, মনে হল ঢাকের মত শব্দ করছে। এই বুঝি হার্ট বেরিয়ে এল বুক থেকে! মনে হল যে, ৬০ মাইল দূরে ডালটনগঞ্জের লোকেরা আমাদের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। দু' এক মিনিট, যাকে মনে হয়েছিল এক যুগ, আমাদের মাচার দিকে তাকিয়ে থেকে বাঘ মাচার বাঁ দিকে, অর্থাৎ আমার দিকে ফিরে, চলা আরম্ভ করল। তার বুক থাকল গুপ্তর দিকে ও মাথা আমার দিকে। বাঘকে সহজে মাথায় গুলি করতে নেই, কারণ তার মগজ থাকে পিছনে এমন জায়গায়, যেখানে গুলি সহজে পৌঁছবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না হলে সে চার্জ্জ করবে সামনের দিকে,—যেদিকে মুখ করে যাচ্ছিল, গুলি লাগার ঠিক আগে। আমি পা দিয়ে গুপ্তকে ইঙ্গিত দিলাম তার পায়ে। গুপ্ত ভাল শিকারী, মুহূর্ত্তে তিনি রাইফেল তুলে গুলি করলেন। কিন্তু তাঁর অবস্থাও আমার মত শোচনীয় ছিল। তাই তাড়াতাড়িতে ঠিক হৃৎপিণ্ডে না লেগে গুলি একটু পাশে পেটে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট গর্জ্জন করে বাঘ লাফ দিল মাচার বাঁ দিকে, আমার দিকে, অর্থাৎ যে দিকে তার মাথা ছিল গুলি মারার পূর্ব মুহূর্তে। ভীষণ তার রক্তমাখা মুখ, প্রকাণ্ড দাঁত, যেন এখনি আমার ঘাড়ে বসিয়ে দেবে। যে মুহূর্তে গুপ্ত গুলি করলেন, আমিও নিজের রাইফেল নিয়ে তৈরী ছিলাম। মাচা হতে দশ হাত দূরে, শূন্যপথে বাঘের বিশাল বুকে গুলি করলাম। ৪২৩-এর ৩৪৭ গ্রেণ বুলেট কাজ দিল। বাঘ ধড়াস করে মাটিতে পড়ে গেল, মাচা থেকে মাত্র একহাত দূরে। পাঁচ মিনিটের বেশী হতভম্ব হয়ে বসে থেকে গুপ্ত ও আমি একই সময়ে ডাক্তারকে তুলে একটি করে চড় মারলাম। তিনি আগেই বাঘ দেখেছিলেন। কিছুমাত্র সঙ্কেত না দিয়ে তিনি ভয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। মনে হল, আমাদের সেদিন পুনর্জন্ম হ'ল।

তার দু'দিন পর আর এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। সেখানকার ঠাকুরাইন বা জমিদার বীটার জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তাঁর ২০ বছর বয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র নতুন ১২-বোর বন্দুক কিনেছেন, শিকারের কিছুই জানেন না। আমাদের সঙ্গে তিনি থাকতে চাইলেন; অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতে হল। বলে দিলাম যে, তিনি যেন শুধু দেখেন, গুলি না ছোঁড়েন। বীট—মিশ্র বীট হবে বলে দেওয়া হল। প্রথম বীটে শুধু একটি ময়ূর এল, একটি মাচা হতে একজন তাকে গুলি করে মারলেন। স্ফূর্তি করে আমার টুপীতে ২টি পালক গুঁজে দিলেন। তারপর দ্বিতীয় বীটের জায়গা ঠিক করতে হবে। আমি মাচা থেকে নেমে গিয়ে একটি নালা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি, দ্বিতীয় বীট ঠিক করার জন্য। এমন সময় টুপীতে ছড়ছড় শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ। বুঝলাম আমাকেই গুলি করছে। নালাতে শুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বললাম 'থাম,' 'থাম!' ঠাকুরাইনের ভ্রাতুষ্পুত্রের এই কাণ্ড। ময়ূরের পালক দেখেই তিনি তাঁর বীরত্ব দেখাতে চাইলেন। ভাবলেন এ ময়ূরটি আমি মারব না কেন? তাঁকে সকলে খুব বকাবকি করলেন। আমার টুপী খুব উঁচু ছিল বলে ৪।৫টি ছোট গুলির চোট ছাড়া আর কিছু জখম হই নি। তখনকার দিনের বিশেষ টুপী 'বাঘ মারি'ই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। পরে তাকে শাস্তি কম দিই নি। সন্ধ্যার সময় গাড়ীতে সকলের বন্দুক তুলে দিয়ে আমরা একটু হাঁটতে আরম্ভ করলাম। আমি এগিয়ে গিয়ে এক গাছের ডালে উঠলাম; সঙ্গীরা একটু পিছিয়ে পড়ল, শুধু বীর শিকারী এগোতে থাকলেন। যেমনি গাছের নিচে এল, আমি ডাল থেকে লাফিয়ে পড়লাম তার ঘাড়ে, বাঘের গর্জ্জন অনুকরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পতন ও মূর্চ্ছা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সগোত্র শিশুর মতো

কামাখ্য সরকার

দৈনন্দিন হাতে খড়ি
পাল্টাতে
ঝরনায় রোদ
হাততালি দিয়ে দিয়ে
পুতুলেরা
প্রতিবিম্ব মোছে
কিছু কিছু শরীরী রোমাঞ্চ
এবং তন্ময়তায় ঘন;

সময় পাল্টে গেছে
জলে ধোয়া নুড়িতে বয়স
গা মুছে
ইন্দ্রিয় স্তবে নিত্য অভ্যাসের
স্নায়ু শিরা জল করে
ধামাধড়ি শব্দেরা
আয়নায় মুখ রেখে
প্রতিদিন প্রতিবিম্ব মোছে—
মুক্তাঙ্গনে সগোত্র শিশুর মতো॥

(জাতীয় গ্রন্থাগারে নিউ ইণ্ডিয়া ১৯০৪-এর February-র পরের সংখ্যাগুলি নেই এবং এগুলির হদিশও বোধ হয় কারুর জানা নেই। Report of Native papers ও বিপিনচন্দ্রের নিজস্ব সংকলন গ্রন্থ "New Spirit" থেকে অবশ্য বেশ কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়) স্বদেশীযুগে যিনি খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আসীন ছিলেন, এই সময়ে যিনি এক চরমপন্থী নবচেতনার প্রবক্তা, যিনি তরুণকুলের পরম আদর্শ, তাঁর সম্পাদিত "নিউ - ইণ্ডিয়া" যে নতুন যুগের নতুন কথা শোনাবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ধীরপন্থী বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা অনেকেই এই মত পোষণ করতেন যে, বিপিন পালের সাপ্তাহিক "নিউ ইণ্ডিয়া" অনেক চরমপন্থী কংগ্রেসীর জন্ম দিয়েছে। ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় আদালত অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্র ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং এরপর থেকেই "নিউ ইণ্ডিয়া" বন্ধ হয়ে যায়।

সাংবাদিক বিপিনচন্দ্র পাল

অধ্যাপক নিশীথকুমার দত্ত

বিপিনচন্দ্রের অপর অমর সৃষ্টি হ'ল "বন্দেমাতরম্", এটিও একটি ইংরাজী দৈনিক। এই পত্রিকারও তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, পরে সম্পাদক-মণ্ডলীতে অরবিন্দ ঘোষের যোগদানে এই পত্রিকা সংবাদপত্র - জগতে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো।

১৯০৬ সালের ৬ই আগস্ট "বন্দেমাতরম্" দৈনিকের প্রথম প্রকাশ। কলকাতার কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের ক্লাসিক প্রেস এই দৈনিকের মুদ্রণভার গ্রহণ করে। হাতে মাত্র পাঁচশত টাকা নিয়ে বিপিনচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" প্রকাশভার গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত গ্রন্থ—"Sri Aurobindo on Himself"-এর একটি উদ্ধৃতি যুক্তি-যুক্ত হবে "Bipin Pal, who had been long expounding a policy of self-help and non-co-operation in his weekly journal now started

(শেষাংশ)

a daily with the name of "Bandemataram" with only Rs. 500 in his pocket .... He asked Sri Aurobindo to join him to which a ready assent was given."

কিছুদিনের মধ্যেই অর্থসঙ্কট দেখা দেওয়ায় ঠিক হ'ল যে একটা Joint Stock Company-র মাধ্যমে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করা হবে। তখন থেকে এটি কলকাতার কিক-রো থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। বিপিনচন্দ্র "বন্দেমাতরমের" প্রতিষ্ঠাতা হলেও মুখ্যত: এটি অরবিন্দরই মুখপত্র হয়ে উঠেছিল, কারণ এই দৈনিক প্রকাশিত হবার কিছু পরেই বিপিনচন্দ্রকে পূর্ব-বাঙলা ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বদেশী ও বয়কটের প্রচারে ব্যস্ত থাকতে হত। পরে সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্যদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে মতের অমিল হওয়ায় বিপিনচন্দ্র ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসেই বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই সময় অবশ্য অরবিন্দের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় নি, কারণ অরবিন্দ রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র ছাড়া সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্যরা মনে করতেন যে, বোমা বারুদকে একেবারে শিকেয় তুলে না রেখে কিছু কিছু কাজে লাগান ভাল। অপর পক্ষে বিপিনচন্দ্র মনে করতেন যে, বোমার দ্বারা ইংরেজ সরকারের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা যাবে না, উল্টে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। অনেকে মনে করেন এটাই হল বিপিনচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্"-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার একটা অন্যতর কারণ। "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার উপর ইংরেজের শ্যেনদৃষ্টি থাকায় এটি বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি। ১৯০৮ সালে সরকার এই পত্রিকাকে বেআইনী ঘোষণা করে ছাপাখানাটিকে বাজেয়াপ্ত করে দেয়।

বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিকতা তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাদেশিকতায় ও দেশপ্রেমে। পট্টভি সীতারামাইয়া ও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—

"History of the Indian National Congress"-এ কথাটি বলতে ভুলে যান নি। তিনি লিখেছেন—

"It must be admitted that Bipin Babu was one of the few men that exercised a magical influence, through his speeches and writings in "New India" and "Bandemataram" on the young men of his time."

বাস্তবিকই সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ যে নব-মতবাদের জন্ম দিয়েছিলেন তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ইউরোপীয় সভ্যতায় মোহান্ধ ভারতবাসী প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল আত্মবিশ্বাস, তাই বিশ্বাস ছিল না আত্মনির্ভরতায়। শ্রদ্ধাশীল ছিল না ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতায়। এমন সময়ে বাঙলাদেশের অল্প যে কয়জন মনস্বী আত্মনির্ভরতার অভয়বাণী শোনালেন, বিপিনচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। এঁদের লেখায় তরুণদল পেলো নতুন আস্বাদ, নতুন রাজনৈতিক চেতনা। ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতায় বিজয়-বিষাণ যেমন ভারতীয়দের স্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল করল, বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দর সাংবাদিকতাও ভারতবাসীকে "স্ব"-রাজনীতিতে আস্থাবান করে তুলল। এই "স্ব"—রাজনীতি কি? তা হ'ল "স্বদেশী ও স্বরাজ"। এই রাজনীতির বীজমন্ত্র ছিল আত্মবিশ্বাস। বিপিন পাল, অরবিন্দ ও আর যাঁদের নাম অবশ্যই করতে হবে তাঁরা হলেন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় ও গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দে।

দর্পণে। "British Paramountcy and Indian Renaissance." (Vol. II). এই বিপুল সংকলন গ্রন্থে National Movement and Politics নামক অধ্যায়ে ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার লিখেছেন যে, "The writings and speeches of these men breathed a new spirit of boldness and self-confidence. They instilled a reverence for the past and confidence for the future, and asserted the inalienable right of the Indians to shape their destiny without caring for the frowns or smiles of the alien rulers."

এই তো গেল "নিউ ইণ্ডিয়া" ও "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার কথা। বিপিনচন্দ্র সম্পাদিত আর একটি উল্লেখযোগ্য পাক্ষিক ইংরাজী পত্রিকা "Swaraj" বক্সার জেল থেকে মুক্তি পাবার মাস পাঁচেক পরে বিপিনচন্দ্র দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৯০৯ সালের ১লা মার্চ তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করে সম্পাদনা করতে থাকেন। এই পত্রিকার সুর কিন্তু খুব কড়া ছিল না। এই পত্রিকায় Etiology of the Bomb in Bengal নামে এক প্রবন্ধে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, বাঙলাদেশের সন্ত্রাসবাদের কারণ হ'ল বৃটিশ অত্যাচার ও অবিচার। এই প্রবন্ধটির জন্য ইংরেজ সরকার এই পত্রিকার ভারত প্রবেশ বন্ধ করে দেয়, ফলে বিলেতেও এটি আর চালান সম্ভব হয় নি। উক্ত প্রবন্ধটি থেকে ধারণা পোষণ করলে ভুল করা হবে যে, তিনি বোমাপন্থী ছিলেন। একথা আবার বলছি যে, তিনি আমৃত্যু নিরস্ত্র প্রতিরোধের সমর্থক ছিলেন। ১৯১১ সালের মার্চ মাসে ইংলণ্ডবাসী ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি "Indian Student" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে সম্পাদনা করতে থাকেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, তাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পড়াশোনা করা, রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করা নয়। তিনি মনে করতেন যে, ছাত্রসমাজের উচিত একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাতৃভূমির রাজনৈতিক পরিবেশের কথা চিন্তা করা। এই পত্রিকাটিকে রাজনীতি-বর্জিত উচ্চমানের শিক্ষামূলক পত্রিকায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তিন-চার মাসের মধ্যেই এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেন। বিপিনচন্দ্র নিজেও সেপ্টেম্বর মাসে ভারত উদ্দেশে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন।

বিলেতে থাকাকালীন বিপিনচন্দ্র এক আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক জাতীয়তাবাদের কল্পনা তিনি করেছিলেন এবং তাঁর এই মতবাদকে স্ব-প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "Hindu Review" নামে এক ইংরাজী মাসিক পত্রে প্রকাশ করতেন। ১৯১১ সালের শেষে কলকাতায় ফিরে আসার পর ১৯১৩ সাল থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ নিঃসন্দেহে মহৎ এবং বর্তমান পারমাণবিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে এই আদর্শের নবমূল্যায়ন ও সার্থক রূপায়ণ অপরিহার্য। তা না-হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সভ্যতা-অবলুপ্তির অশুভ লগ্ন ক্রমেই এগিয়ে আসবে। যাই হোক, একথা স্বীকার করতে হবে যে, স্বদেশী যুগের বিপিন পাল, যিনি নব-জাতীয়তার প্রবক্তা, ইংরেজের এক নম্বর শত্রু, আর বিলেত ফেরৎ বিপিন পাল—এই দু-এর মধ্যে বেশ আদর্শগত পার্থক্য আছে। এর কারণ হ'ল তাঁর ওপর উন্নত পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাব।

বিপিনচন্দ্রের সাংবাদিক প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে "নিউ ইণ্ডিয়া" ও বন্দে মাতরমের" পৃষ্ঠায়, কিন্তু আরও অনেক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সাংবাদিক জীবনের কীর্তি বহনকারী অন্যান্য পত্রিকাগুলি হ'ল :—

"পরিদর্শক" —শ্রীহট্টে থাকাকালে বিপিনচন্দ্র এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮০ খৃঃ। এটি বাঙলা সাপ্তাহিক। তাঁর সাংবাদিক জীবনের হাতেখড়ি হয় এই পত্রিকার সম্পাদনার দ্বারা। ১৮৮২ খৃঃ থেকে Bengal Public Opinion-এর এবং ১৮৮৭ খৃঃ থেকে লাহোরের "Tribune" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। এলাহাবাদের দৈনিক "The Independent"-এরও তিনি কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার কিছুকালের মধ্যেই তিনি পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। স্মরণ করা যেতে পারে, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক তিনি ছিলেন না। জিতেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রম-বিষয়ক পত্রিকা "সংহতি"-তে শ্রমিক-উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। "সংহতি" নামটিও বিপিনচন্দ্রের দেওয়া।

১৯৩২ সালে মৃত্যুর অল্পদিন আগে তিনি Freedom and Fellowship" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রকাশের সংকল্প করেন কিন্তু কোন কারণে পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয় নি। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের বহু প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন (নব-পর্যায়), বিজয়া, নবারুণ, নব্য-ভারত, বঙ্গবাণী প্রভৃতি মাসিক পত্রে ছড়িয়ে আছে। নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ এই মনস্বীর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—(১)জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত New India পত্রিকাগুচ্ছ।

(২) British Paramountcy and Indian Renaissance. Vol. II.
(৩) History of the Indian National Congress (Vol. II)—By Pattavi Sitaramya.
(৪) Bipin Chandra Pal and Indian Struggle for Swaraj—By H. and U. Mukherjee.
(৫) Bipin Chandra Pal Centenary Volume.

গোয়েন্দা কাহিনী — উদ্ভব ও বিবর্তন

অধ্যাপক—হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(শেষাংশ)

॥ আট ॥

॥ বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী ॥

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী সম্বন্ধে একটি আশ্চর্যজনক সত্য এই যে, এর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। এমন কি, বিবর্তন হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনীর ধাপগুলি স্পষ্ট নয়। ১৮৯২ সালে আমরা প্রথম বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী পাই। এই কাহিনীর নাম 'দারোগার দপ্তর'। লেখক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। তবু উল্লেখযোগ্য না হলেও বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর চর্চা যে এর আগে একেবারেই হয়নি, একথা বলা যায় না। একেবারে বিশুদ্ধ গোয়েন্দা কাহিনীর সংখ্যা অবশ্য খুবই অল্প। কিন্তু বিভিন্ন ভৌতিক, রোমাঞ্চকর এবং আধা-গোয়েন্দাজাতীয় গল্পের প্রাবল্যে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের ক্ষেত্রটি ভালভাবেই প্রস্তুত হয়েছিল।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম দিককার লেখায় রোমাঞ্চ-ধর্ম খুবই বেশী। পরবর্তীকালের উপন্যাস বিচার করলেও দেখা যায়, সাধারণভাবে গোয়েন্দা কাহিনীর উপযোগী একটি দিক অন্তত তাঁর উপন্যাসে ছিল। সেটি ডাকাতজাতীয় চরিত্রের প্রতি তাঁর romantic admiration, Rajmohan's wife থেকে শুরু করে দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক পর্যন্ত সব 'ডাকাইত'ই সমাজকল্যাণের ব্রত পালনের জন্য বা সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অসমাপ্ত ভূতের গল্পও লিখেছেন বলে জানা যায়।

রহস্য-গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতেই হবে। সম্পূর্ণ মৌলিক রচনার চেয়ে অনুবাদ এবং সংযোজন ধরনের উপন্যাস রচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব বেশী। কিন্তু মোটের ওপর রহস্য-রোমাঞ্চ ধরনের একটি আবহাওয়া সৃষ্টি তাঁর বেশীর ভাগ রচনারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কলিন্স-এর দ্য উওম্যান ইন হোয়াইট উপন্যাসটির যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন 'শুক্লবসনা সুন্দরী' নাম দিয়ে—তিনখণ্ডে প্রকাশিত সেই উপন্যাসকেই রহস্য-গল্পের এক সমালোচক 'বাংলার প্রথম স্মরণীয় রহস্য উপন্যাস'-এর মর্যাদা দান করতে চেয়েছেন। (১) এই অনুবাদের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫, ১৮৮৮ এবং ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে।

এই প্রসঙ্গে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামও স্মরণীয়। সাহিত্যসাধক চরিতমালার ৮ম খণ্ডে আচার্য ব্রজেন্দ্রচন্দ্র এঁকে 'রহস্যোপন্যাসের রাজা' আখ্যা দিয়েছেন। তৎকালীন রহস্য উপন্যাস লেখক জর্জ রেনল্ডস-এর একটি উপন্যাস অবলম্বন করে তিনি লিখেছিলেন 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। ১৮৭০ থেকে চার বছর ধরে 'এই এক নূতন। আমার গুপ্তকথা।' নামে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর গোয়েন্দা গল্পের জয়যাত্রা সূচিত হবার পর তিনিই সুরু করলেন ১৮৯৬ সাল থেকে ছ'টি গল্পে সম্পূর্ণ 'মার্কিন পুলিশ কমিশনার সিরিজ'।

এখানেই শেষ নয়, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সহযোগিতায় 'নন্দন-কানন উপন্যাস সিরিজ'ও তিনি বার করেন বিশ শতকের সূচনায়।

তবে প্রথম সার্থক সৃষ্টি নিঃসন্দেহে 'দারোগার দপ্তর'। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থাকাতে এই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তারপর তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্মিলনই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে সার্থক গোয়েন্দা কাহিনীর প্রবর্তকের সম্মান দান করেছে।

ফ্রান্সের ভিদোক-এর মতই ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন জাঁদরেল দারোগা। অবশ্য কর্মজীবনের পূর্বে ভিদোক-এর মত অতোটা বহু ব্যাপ্ত ও বিচিত্র জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। কিন্তু কর্মজীবনে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করলেন, তাও কম আকর্ষণীয় নয়। সেই অভিজ্ঞতার ডালি সাজিয়ে তিনি 'দারোগার দপ্তর' নাম দিয়ে প্রতি মাসে এক-একটি করে খণ্ড প্রকাশ করতে সুরু করলেন। এক-একটি খণ্ডে আবার কাহিনী থাকতো চার-পাঁচটি করে। উদারণ-স্বরূপ প্রথম খণ্ডটির অন্তর্গত কাহিনী-গুলির নাম করা যেতে পারে। এতে ছিল—'বনমালী দাসের হত্যা', 'যমালয়ের ফেরতা মানুষ', 'জুয়াচোরের বাহাদুরী', 'জালিয়াৎ যদু'। শেষ পর্যন্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের সঞ্চয় নিঃস্ব হয়ে এলো, অথচ গল্পের চাহিদা

---

(১) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: রহস্য উপন্যাস (গ্রন্থ পরিক্রমা, ষষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)।

চ লেছে ক্রমশই। বাধ্য হয়ে শেষের দিকে তাঁকে বেশ কিছু বিদেশী গল্পের অনুবাদ করে দিতে হলো।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রাপ্য খ্যাতি থেকে বঞ্চিত হননি। সমকালীন বহু পত্র-পত্রিকা, যেমন—বঙ্গবাসী, ভারত সংবাদ, সোমপ্রকাশ, ঢাকা গেজেট, সমাজ ও সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। এঁর সম্বন্ধে দামোদর মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'আমাদের দেশে মৌলিক Sensational উপন্যাস নাই বলিলেই হয়।---- শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Detection storyগুলি বঙ্গভাষায় মৌলিক Sensational Novelরূপে পরিগণিত হইবার উপযোগী।'

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সম-সময়েই অফুরন্ত রহস্য এবং গোয়েন্দা কাহিনী লিখে এই ধারাটিকে সজীব করে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। তবে গোয়েন্দা কাহিনী পরিবেশনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মৌলিক অথবা অনুবাদ—এ ব্যাপারে তাঁর কোন সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় না। অফুরন্ত সৃষ্টি তাঁর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেবল 'রহস্য লহরী' সিরিজেই তিনি মুদ্রিত করেছিলেন দুশো সতেরো-খানি উপন্যাস। তাঁর মৌলিক কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি সঙ্কলন 'পট'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। এর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির নাম 'শত্রুহস্তে', 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে', 'চক্ষুদান', 'হত্যার রহস্য', 'জাল ডিটেকটিভ', 'গল্প লেখার বিড়ম্বনা'।

তবে দীনেন্দ্রকুমার মুখ্যত তাঁর অনুবাদগুলির জন্যই বিখ্যাত। আচার্য ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র সপ্তম খণ্ডে এঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এই শতকের গোড়ার দিকে নিছক সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ Sensational Hypnotic উপন্যাস নিয়ে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর নাম পাঁচকড়ি দে। অসাধারণ জনপ্রিয় এই ঔপন্যাসিকের নাম বর্তমান সাহিত্য পাঠকেরও সম্ভবত অজানা নয়। তাঁর গ্রন্থগুলির চাহিদা এখন প্রায় কিংবদন্তীর মত মনে হবে। বিভিন্ন ভাষাতেও তাঁর উপন্যাস অনূদিত হয়েছিল। কেবলমাত্র গোয়েন্দা কাহিনী লিখে যে খ্যাতি পাঁচকড়ি দে অর্জন করেছেন—যে-কোন সাহিত্যিকের তা ঈর্ষার বস্তু। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

পাঁচ কড়ি দে'র বিখ্যাত উপন্যাস-গুলির মধ্যেও 'হত্যাকারী কে?' এবং 'নীলবসনা সুন্দরী' উজ্জ্বলতম। তাঁর নামের সঙ্গে এ-দু'টি উপন্যাস অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। সাধারণত বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনী লেখকরা যে একটি-মাত্র গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন, ইনি তার ব্যতিক্রম। বিভিন্ন কাহিনীতে তিনি বিভিন্ন গোয়েন্দা সৃষ্টি করেছেন, অথচ তাঁর নাম করলেই আজও অনেক পাঠকের একটিমাত্র নামই মনে আসবে—জাঁদরেল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর দেবেন্দ্রবিজয়। আসলে, এই ডিটেকটিভের কার্যকলাপই 'নীলবসনা সুন্দরী'র প্রাণ। এই উপন্যাসে 'অরিন্দম' চরিত্রটিও ভুলবার মতো নয়।

কিন্তু এ সত্ত্বেও বলতে হবে, তিনি যখনই যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, সেই চরিত্রই প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। 'পরিমল' উপন্যাসে তাঁর গোয়েন্দা সঞ্জীবচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক রীতির বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়ে তিনি সমকালীন পাঠকের মনে প্রচণ্ড দাগ কাটতে পেরেছিলেন।

লেখক হিসেবে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যও পাঠকদের মনে দাগ কাটতে পেরেছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলি সেই সময়ে বেশ খ্যাতিও অর্জন করেছিল, কিন্তু পাঁচকড়ি দে'র সঙ্গে মূলগত একটি পার্থক্য তাঁর ছিল। গোয়েন্দার বিচার-বিশ্লেষণকে বড় করে না দেখিয়ে চোরের চাতুর্যের কথাই তিনি বেশি করে লিখেছেন। এতে ঠিক গোয়েন্দা কাহিনীর যে আবেদন বর্তমান পাঠকের কাছে রয়েছে—তার অনেকাংশই সে রচনায় অনুপস্থিত। কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনীর বাল্য জীবনে এই কাহিনীগুলি রীতিমত চাঞ্চল্যকর হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল 'মরামেম'—প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে। তাঁর ছোটগল্পের সঙ্কলনগুলিও রীতিমত আকর্ষণীয়। এই ধরনের একটি সঙ্কলন 'নকল রাণী' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে।

গোয়েন্দা-কাহিনীর নবোদ্ভূত শ্রেণীতে তৎকালীন যুগে লেখকের সংখ্যা অল্প ছিল না। কিন্তু বিবর্তনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে এই পর্যায়ের পরবর্তী লেখককুলের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। এই সময়ের যে প্রবণতা তা উল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যেই প্রায় পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য যে-সব লেখক ধারাটি বহন করে বর্তমান যুগে পৌঁছে দিয়েছেন—সাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক কারণে তাঁরা মূল্যবান। সেই দৃষ্টিতে বিচার করলে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, যতীন পাল, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্র রায়, নুরুন্নেসা খাতুন, কফিলুদ্দিন আহমদ, শরচ্চন্দ্র সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখ করতেই হবে। এঁদের অনেকেরই রচনা পরিমাণের দিক থেকে অল্প নয়। সম-সময়ে পাঠকমহলে এগুলি কিছুটা খ্যাতিও লাভ করেছিল।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ বর্তমান যুগে গোয়েন্দা কাহিনীর যে বিবর্তন—তাকে বিবর্তন না বলে একটি বিশিষ্ট মানসিকতা বলাই ভাল। বিশেষ একটি ধারার বিবর্তনের পরিবর্তে বর্তমান যুগে দেখা যায় স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে সাহিত্য-রচনার প্রয়াস। অর্থাৎ একজাতীয় কাহিনী সৃষ্টির পরিপুষ্টির পরিবর্তে বিভিন্ন স্বাদের কাহিনী নিয়ে এক সামগ্রিকতা অর্জনের চেষ্টা এই যুগের বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ দিকে কোন বিশেষ

সাহিত্যিক সাফল্য লাভ করেছেন, সে কথা কিছুটা বিস্তৃতভাবে বলা দরকার

বর্তমান যুগের গোয়েন্দা গল্পের আদিপুরুষ হেমেন্দ্রকুমার রায়। অবশ্য মূলগতভাবে তিনি শিশু-সাহিত্যিক। গোয়েন্দা-গল্পের ক্ষেত্রেও এইটেই তাঁর রচনার বিশিষ্ট দিক। গল্প-উপন্যাসগুলি সবই কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা। গোয়েন্দাগিরি, বিশ্লেষণ—সবকিছু থেকেও হেমেন্দ্রকুমারের রচনার বিশিষ্ট গুণে সমস্ত কাহিনীই শেষ পর্যন্ত এমন হাস্যরসাত্মক হয়ে পড়েছে যে কেউ হয়তো সন্দেহ করতে পারেন যে, গোয়েন্দা গল্পের 'সিরিয়াসনেস' এতে নষ্ট হয়েছে। কিন্তু হাসি-কান্নার ওজনে যেহেতু গোয়েন্দা গল্পের স্বাদ নিরূপিত হয় না, কেউ সে দাবী করেন নি আজ পর্যন্ত অতএব এ অভিযোগ যুক্তিসহ নয়। বরং আদ্যন্ত গোয়েন্দার কার্যকলাপের দিকে লেখার আকর্ষণ থাকায় গোয়েন্দা গল্পের স্বভাবধর্মটি বজায় আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সেই কারণেই 'যখের ধন', 'মিনু ও কাপালিক', 'বিশালগড়ের দুঃশাসন' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি আজ পর্যন্ত তাদের আকর্ষণ হারায় নি। তাঁর গল্পের কয়েকটি চরিত্র -- গোয়েন্দা বিমল, কুমার, জয়ন্ত অথবা পুলিশ ইনসপেক্টর সুন্দরবাবু, প্রতি কথায় যিনি একবার করে 'হুম্' বলেন--এমন কি কুকুর বাঘা পর্যন্ত ছোটদের মুখে এখনও অমর হয়ে আছে।

শিশুপাঠ্য গোয়েন্দা-কাহিনী থেকে সাধারণের উপযোগী কাহিনীর সার্থক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা হলো বোধহয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন এইসব গল্প-উপন্যাসে হয়তো রহস্যের গ্রন্থি কোথাও শিথিল হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যিক আকর্ষণ কমে নি একবিন্দু। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে নয়, ভিন্ন রসের সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই তিনি এ জাতীয় রচনায় বেশ পরিকল্পিত উপায়ে হাত দিয়েছিলেন। একটি মাত্র গোয়েন্দা তিনি বেছে নিয়েছিলেন — ব্যোমকেশ বক্সী, সহকারী অজিত — আজ পর্যন্ত তারাই তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনীর নায়ক।

কেউ কেউ মনে করেন, গোয়েন্দা নায়ক ব্যোমকেশের ওপর শার্লক হোমস্-এর এবং সঠিকভাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর কোনান ডয়েল-এর প্রভাব আছে। এ কথা স্বীকার করে নেওয়া শক্ত। কোনান ডয়েল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় লেখক নিশ্চয়ই---কিন্তু প্রভাবের প্রশ্নটি আরও বিচারসাপেক্ষ। কাহিনীতে কখনো কখনো সাদৃশ্য যে সন্ধান করা যায় না তা নয়—কিন্তু বেশী সাদৃশ্য আছে মুখ্য চরিত্র দু'টির। কোনান ডয়েল নিজে ছিলেন ডাক্তার, তাই সহকারী ওয়াটসনকে তিনি ডাক্তার করেছেন। একই কারণে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতকে করেছেন সাহিত্যিক। উপন্যাসের চেয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলি অনেক বেশী আশ্চর্যনীয়। ব্যোমকেশের রহস্য ভেদের ছোট ছোট গল্পগুলি বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে বিদ্যুৎচমকের মত। লেখার ভঙ্গীটি অত্যন্ত মনোরম। উপন্যাস-গুলিও প্রথম শ্রেণীর---সে যুগের 'আদিম রিপু' বা এ যুগের 'বেণীসংহার' এর আকর্ষণ কোনটিরই কম নয়। কিন্তু ছোট গল্পগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনীর পাশে স্থান পাবার যোগ্য।

এই প্রসঙ্গে আর একজন গোয়েন্দা কাহিনীকারের নাম মনে পড়তে বাধ্য। তিনি নীহাররঞ্জন গুপ্ত। গোয়েন্দা-কাহিনী লিখে এ যুগে যাঁরা জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন—নীহার গুপ্তকে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বললে সম্ভবত অত্যুক্তি করা হয় না। তিনিও একক গোয়েন্দা সৃষ্টি করেছেন এবং আজ পর্যন্ত সেই একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। বাংলা দেশে এককালে দেবেন্দ্রবিজয় যে জাতীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—নীহার গুপ্তর কিরীটী রায় এবং সহকারী সুব্রত—বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনীর পাঠকের কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম। লেখক হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নীহার গুপ্তের পার্থক্যের পরিমাণ বিরাট। সাহিত্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল কম। তাঁর গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সাসপেন্স, ঘটনার আকস্মিকতায় এবং দ্রুতগতিতে তিনি সর্বদাই এই সাসপেন্স বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। প্রধানত এই সাসপেন্স-এর জন্যই তাঁর রচনা আজো সমান আকর্ষণীয়।

উপন্যাস এবং ছোট গল্প কোন্ ক্ষেত্রে নীহাররঞ্জন গুপ্ত অধিকতর সফল, সে কথা বলা সহজ নয়। 'কালো ভ্রমর-'এর মত দুর্ধর্ষ উপন্যাসও যেমন লিখেছেন, তেমনি 'নেশা'র মত অত্যাশ্চর্য ছোটগল্পও তাঁরই প্রতিভার স্বাক্ষর।

গোয়েন্দা কাহিনীর একটি নতুন দিক সন্ধান করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সাহিত্য-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁর এই প্রবণতাকে কিছুটা সখের অনুপ্রবেশ বলে ধরা গেলেও গোয়েন্দা কাহিনীতে তিনি একটি নতুন দিক দেখাতে পেরেছেন। সেটি কাহিনীতে অত্যন্ত পরিহাস-রসিকতা। এটি অবশ্য হেমেন্দ্রকুমার রায় পূর্বাহ্নেই সূচিত করেছিলেন। কিন্তু যা ছিল কিশোর-জগতে সীমিত, তাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র মুক্তি দিলেন সাধারণের জগতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রর গোয়েন্দা পরাশর বর্মা (২) আজ আর বাংলা সাহিত্য পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। অনেক-গুলি কাহিনীর মাধ্যমে তাকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

গোয়েন্দা কাহিনীতে এই হাস্যরস পরিবেশনের প্রবণতা প্রসঙ্গে প্রণব রায়ের নামও উল্লেখ করবার মত। কবি ও গীতিকার হিসাবে খ্যাতিমান এই সাহিত্যিক গোয়েন্দা গল্পের রাজত্বে লঘু পরিহাসমুখর এক রীতি নিয়ে এসেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ হাস্যরসাত্মক

২। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়---'ঘনাদা' অর্থাৎ ঘনশ্যাম দাসকেও অন্যতম গোয়েন্দা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ জাতীয় 'সায়েন্স ফিক্সন'-কে এই সূত্রে স্মরণ না করাই ভাল।

একটি উপন্যাস 'ভানু গোয়েন্দা জহুর অ্যাসিস্টান্টের' উল্লেখ এখানে করতেই হয়।(৩)

বাংলা দেশে ভিদোক-এর সার্থক উত্তরাধিকারী যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল। ভিদোক-এর মত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ও 'দারোগার দপ্তর' লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে কল্পনার রং ছিল কিছুটা। পঞ্চানন ঘোষাল সাহিত্যিক-প্রতিভা খুব বেশী লাভ করতে পারেন নি—কিন্তু নিজে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার হওয়ার দরুণ প্রচুর অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করতে পেরেছেন। জীবনের সেই অভিজ্ঞতা যখন তিনি রূপায়িত করতে সুরু করেন—পাঠক সমাজে আলোড়ন পড়ে যায়। তাঁর 'রক্ত নদীর ধারা' একসময় হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকাকে হতবাক করে দিয়েছিল।

অবশ্য অপরাধ-বিজ্ঞানের ওপর লেখা তাঁর আট খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিও প্রচুর মূল্যবান। ভবিষ্যতের গোয়েন্দা কাহিনী-প্রিয় পাঠক বা অপরাধমুখ্য সাহিত্য-গবেষকের কাছে এটি অমূল্য সম্পদ।

গোয়েন্দা কাহিনীর আর একজন শক্তিশালী লেখক গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। সাহিত্যিক প্রতিভাসম্পন্ন এই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আশ্চর্যরকম বাস্তবমুখী। তাঁর গোয়েন্দা সুরেশ গুপ্তভায়াকে তিনি রক্ত-মাংসের সজীব একটি মানুষ করে গড়ে তুলতে পেরেছেন —এইটেই তাঁর রচনা সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা। বিশ্লেষণ এবং সাসপেন্সও তাঁর কাহিনীতে আছে।

গোয়েন্দা নাটক রচনার ক্ষেত্রটি প্রায় নির্জন বলা যেতে পারে। সাধারণ-ভাবেই গল্প-উপন্যাসের চেয়ে বর্তমানে নাটকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, গোয়েন্দা নাটক আরও কম। যে ক'জন এ প্রচেষ্টা করেছেন, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। বিশ্লেষণের পরিবর্তে কৌতূহল আদ্যন্ত জাগিয়ে রাখাতেই তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন।

গোয়েন্দা কাহিনীর রচনার ক্ষেত্রে সখের অনুপ্রবেশ বলতে আর একজন সাহিত্যিকের নাম মনে পড়ে, তিনি বিমল কর।

বিমল করের গল্পের আবহাওয়া কিছুটা অপরাধমুখ্য। সচেষ্টভাবে যে গোয়েন্দা উপন্যাস তিনি লিখেছেন তার আকর্ষণ উপন্যাস হিসাবে যত বেশী—গোয়েন্দা উপন্যাস হিসাবে ততো নয়। তাঁর সেই নিজস্ব-ভঙ্গীতে উজ্জ্বল বলেই বিমল করের সঙ্গে পরিচিত পাঠক এসব রচনা থেকে অনায়াসেই তাঁদের প্রিয় লেখককে খুঁজে নিতে পারবেন। উপন্যাসের মতই 'চতুষ্কোণ' ইত্যাদির মত গল্প বিমল করের নিজস্ব রচনা-রীতিতে উজ্জ্বল।

গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথম যুগে বেশ কিছু ভাল অনুবাদক ছিলেন। এ যুগেও অনুবাদ যে হয়নি, তা নয়, তবে, সেই অনুপাতে ভাল অনুবাদ কম হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনী যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে সাম্প্রতিক দু'জনের নাম উল্লেখ করা চলে। এঁরা অদ্রীশ বর্ধন এবং মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অদ্রীশ বর্ধন শার্লক হোমস-এর অনেক-গুলি গল্প অনুবাদ করেছেন। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়াও রোমাঞ্চকর কিছু গল্প অনুবাদ করেছেন।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে গোয়েন্দা-কাহিনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মেয়ে-গোয়েন্দার সৃষ্টি। ডিকেন্স সহকারী হিসাবে স্ত্রী-চরিত্র নিয়েছেন; কলিন্স দু'টি গোয়েন্দা উপন্যাসে স্ত্রী-গোয়েন্দার সৃষ্টি করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

প্রভাবতীর সৃষ্ট দু'জন মেয়ে-গোয়েন্দা আমরা পাই, একজন কৃষ্ণা এবং অপরজন শিখা।

কৃষ্ণা সিরিজের সাতখানি উপন্যাসই একসময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কুমারিকা সিরিজে শিখার অভিযান-মূলক বই-এর সংখ্যাও ছিল সাত। তুলনামূলকভাবে শিখার জনপ্রিয়তাই বেশী বলে মনে হয়।

অভিনবত্ব হিসাবে এই দু'টি সিরিজ আকর্ষনীয় হলেও বেশীদিন যে এদের আকর্ষণ থাকে নি তার দু'টি কারণ আছে।

প্রথমত, বাঙ্গালী মেয়েকে এতখানি শক্তি-সামর্থ্যসম্পন্না ও সাহসী করে তোলার জন্য যে পরিমাণ প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল—সে সময় তিনি সাধারণ পাঠককে তা দেন নি। ফলে, কতকাংশে তা অবিশ্বাস্য হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের বীরত্ব বেশী দেখাতে গিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপই তিনি বেশী দেখিয়েছেন, ফলে, আধুনিক পাঠকের পক্ষে তা নির্বিশেষে রুচিকর হয়নি। কিশোর-কিশোরীদের মনে আকর্ষণ জাগিয়েই এর আবেদন শেষ হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান যুগের বিশিষ্ট ধারাগুলি প্রবর্তনার কথা বলা হলো। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনীর আকর্ষণ বর্তমানে বাড়ছে বই কমছে না। তাই মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদেরও এই পথে পদার্পণ করতে দেখি। বিমল মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রাণতোষ ঘটক অথবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিকও গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছেন কখনো-না-কখনো। তিনটি পত্রিকা নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প পরিবেশণ করে চলেছে—এগুলি হলো মাসিক রোমাঞ্চ, মাসিক রহস্য পত্রিকা, মাসিক গোয়েন্দা। যাঁরা লিখছেন তাঁরা অনেকেই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। কিন্তু বিশেষ কোন প্রবণতা প্রকটভাবে এখনো কারো লেখায় ফুটে ওঠে নি। কোন নতুন প্রবণতাও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি। অস্ফুট আকারে, অনেক সম্ভাবনা অবশ্য ছড়িয়ে আছে, যেমন চিরঞ্জীব সেনের বলিষ্ঠ লেখায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে। একটি শিশু মাসিকে কোন লেখকের পশু গোয়েন্দা নিয়ে কয়েকটি

৩। প্রসঙ্গত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভেজিটেবল্ গোয়েন্দা' গল্পটির কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু এটি হাসিরই গল্প, গোয়েন্দা গল্প নয়।

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

একশ বছর আগে জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের ভাষার নমুনা (১৮৯৮) সালে মুরলীধর চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত:—

"এক ঝনকার দুই ঝন্ বেটা আছিল্। অমহার মধ্যত্ ছোট বেটা অর্ বাপক্ কহিল্ কি বোলে বা হামার সম্পত্তির মুই যে ভাগ্ পাম্ তা তুই মোক্ দে। তাতে উঁয়ায় অমহার মধ্যত্ সম্পত্তি বাঁট করে দিলেক। খোড়ায় কয়দিন বাদ শিশুরা বেটা তামান্ সম্পত্তি একেঠে কোরে দুরদেশহ পালায় গেল্। ঐঠে যায়া হানে যেই সেই খরচ কোরে অর্ সম্পত্তি ফুরায় দিল্।"—ইত্যাদি

(একজনের দুই ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোট ছেলে তার বাপকে বললে, বাবা, আমার ভাগে যা পড়ে তা আমাকে দাও। বাপ তার বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে বেটে দিল। দিনকতক পরে ছোট ছেলে তার সমস্ত জিনিষপত্তর নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে বদখেয়ালি করে সব উড়িয়ে দিলে।) ইত্যাদি।

কোচবিহার

কোচবিহার অঞ্চলটি প্রাচীনকালে কামরূপের রাজার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড়াধিপতি হোসেন শাহ আসামের কামতাপুর রাজ্য জয় করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তখন এই অঞ্চলের কতক অংশ তাঁর অধিকারে আসে। তারপর কামতাপুর রাজ্যের পতন হয়। তাতে কিছুকাল দেশের মধ্যে অরাজকতা হয়। এই সময় উত্তর দেশ থেকে কিছু অসভ্য জাতি এসে এই দেশকে বিধ্বস্ত করে। তাদের কোচেরা এক জাতি। কোচেরা উত্তরবঙ্গে কুচবিহার রাজ্য স্থাপন করে। হাজি নামে এক কোচ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অপর মতে তাঁর নাম হারিয়া। উভয়ের মতে হীরা আর জীরা নামে দুই বোন বা সপত্নীর উল্লেখ আছে। বিশুই এই রাজ্যের প্রথম রাজা। তাঁর নাম বিশ্ব সিংহ বা বিশু সিংহ। ১৫৫০ খৃস্টাব্দে তিনি এই রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। এই কুচবিহার রাজ্য ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত কতক পরিমাণে স্বাধীনভাবে শাসিত হয়েছিল---করদ রাজ্য হিসেবে। বিশ্ব সিংহের ছেলে মল্লদেব বা নরনারায়ণের সময় তাঁর ভাই ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ বহুদূর পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্য বিস্তার করেন। কামরূপ, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি জয় করে এই সকল প্রদেশের রাজাদের বশে এনেছিলেন। শুক্লধ্বজ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের রাজাদের পরাজিত করে জয়ন্তিয়া পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন।

সোলেমান কররাণীর শাসনকালে নরনারায়ণ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু সোলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় শুক্লধ্বজকে পরাজিত করে অনেক দূর পর্যন্ত অধিকার করেন। সোলেমান খাঁ কোচ রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর নিজের রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি ফিরে আসেন। সোলেমানের পুত্র দায়ুদ খাঁর আকবর বাদশাহকে সাহায্য করেছিলেন। দায়ুদ খাঁ পরাজিত হন। আকবর দায়ুদ খাঁর রাজ্য তিনি নিজে ও নরনারায়ণকে ভাগ করে দেন। দায়ুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় শুক্লধ্বজ পীড়িত হয়ে পড়েন এবং কিছুকাল পরে মারা যান। তাঁর ছেলে রঘুদেব তারপর কোচ-সৈন্যের সেনাপতি হয়েছিলেন।

কোচবিহারের রাজাগণ নারায়ণ নামযুক্ত। নরনারায়ণ 'নারায়ণী' মুদ্রার প্রচলন করেন। এই মুদ্রা তৈরি করার অধিকার একমাত্র এই বংশেরই ছিল। ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্তও ইহা অক্ষুণ্ণ ছিল।

নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহার রাজ্য অনেক দূর বিস্তৃত করেন। তাঁর অনেক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। হাতী ও রণতরীও ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ একবার মোগল বাদশাহের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে ধৃত ও দিল্লীতে প্রেরিত হন। রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এই সময় রাজ্য মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ তখন আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে লন। তাতে তাঁর আত্মীয়গণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন বাঙলার মোগল সুবেদার রাজা মানসিংহের সাহায্যে তাদের দমন করেন। রাজা মানসিংহ কোচবিহারের এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন বলে শোনা যায়।

এই রাজবংশের তিনটি শাখা—বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত, নাজীর দেও ও দেওয়ান দেও। এঁরা রাজ্য গ্রহণ করবার অভিপ্রায়ে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করেন। ভুটানরাজের সাহায্যে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীরা নাজীর দেওকে বিতাড়িত করে, তখন নাজীর দেও ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। তখন হেস্টিংস সৈন্য

গল্পও প্রকাশিত হয়েছে, (৪) কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা এখনই সম্ভব নয়।

তাই, গোয়েন্দা কাহিনীর আলোচনার উপান্তে এসে বলতে পারি—একটি বাংলা সাহিত্যের একটি জীবন্ত অধ্যায়, গোয়েন্দা গল্পের উপান্তে যেমন একটি অব্‌ চমক থাকে—সেইভাবেই হয়ত বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর একটি অভিনব দিক অকস্মাৎ উন্মোচিত হবে। কিন্তু সে-কথা নিঃসংশয়ে বলার জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

॥ সমাপ্ত ॥

৪। মাসিক শুকতারা : শার্লক ওয়াকভাট।

পাঠিয়ে ভুটান সৈন্যকে বিতাড়িত করেন ও ভুটানরাজ সন্ধি করতে বাধ্য হন।. এই সময় কোচবিহারের রাজা ধরিন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়ারাজ কর্তৃক বন্দী হন ও ইংরেজদের সাহায্যে উদ্ধার লাভ করেন এবং তাতে যে সন্ধি হয়, (এপ্রিল, ১৭৭৩) তার সর্ত অনুসারে কোচবিহারের রাজা ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নন ও রাজ্যের আয়ের অর্ধাংশ ইংরেজকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। ঐ সময় এই করের পরিমাণ ছিল ৬৭,০০০ টাকা। সেই থেকেই কোচবিহার রাজ্যে বিশেষ কিছু অশান্তি দেখা দেয়নি।

সীমা—উত্তরে—মাথাভাঙ্গা নদী, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণে—দিনহাটা, তারপরে পূর্ব-পাকিস্তান ; পূর্বে—জলপাইগুড়ি ও পশ্চিমে আসাম।

আয়তন—এর পরিমাণ কল ১,২৮৯ বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা— ৯,০১৯,৮০৬ (১৯৬১)।

মহকুমা—এ জেলার মহকুমা ৫টি।

(১) কোচবিহার সদর—আয়তন ৪১,৯২২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪১,৯২২ (১৯৬১)।
(২) মাথাভাঙ্গা আয়তন ৩৪৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা—১,৪৮,৬৭১ (১৯৬১)।
(৩) দিনহাটা—আয়তন ২৭২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা—১'৬১'০৪৫ (১৯৬১)
(৪) তুফানগঞ্জ—আয়তন ২২৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—৯৭'৭১৩ (১৯৬১)।
(৫) মেখলিগঞ্জ—আয়তন ১৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা—৯১'৮৩৫ (১৯৬১)

নদী—তিস্তা, তোরসা, সংকোশ, জলঢাকা ইত্যাদি।

কোচবিহার রাজবংশ

রাজা দরিদ্রনারায়ণ—(১৭৮০)। ইনি ভুটিয়ারাজ কর্তৃক বন্দী হন ১৭৭২। ইংরেজদের সহায়তায় উদ্ধারলাভ করেন। এঁর মৃত্যু হলে এঁর পিতা ধুজিন্দ্রনারায়ণ রাজা হন। ধুজিন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র হরীন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৯) রাজা হন। ইনি প্রায় ৫৬ বছর রাজত্ব করেন। এঁর মৃত্যুর পর রাজা শিবীন্দ্রনারায়ণ—(১৮৪৭) রাজা হন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। এঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে ইনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এঁর মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন। ইনি ১৬ বছর রাজত্ব করেন। মৃত্যু ১৮৬৩ সালে। এঁব মৃত্যুর পর নৃপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৬২-১৯১১) রাজা হন। ইনি এই রাজ্যের বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ইনি যখন অপ্রাপ্ত বয়সেই রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন ইংরেজরা এই রাজ্যের তত্ত্বাবধান করছিল। ইনি বেনারশ ওয়ার্ড ইনসটিটিউশন, পরে বাঁকিপুর ও পাটনায় পড়েন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ইনি মহারাজা বাহাদুর ও ১৮৮৩ সালে ইনি ইংরেজদের হাত থেকে সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি জি সি এস আই ও ১৮৯৮ সালে সি বি উপাধি পান। ইনি ৬ষ্ঠ বেঙ্গল অশ্বারোহী সেবাদলের অনাবাসী কর্নেল ও ভারতেশ্বরের অনারারী এডি-কং জেনারেল ইয়েটম্যান বিগ্রস সাহেবের সঙ্গে তিরা-যুদ্ধে সৈনিক কর্মচারী হন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীকে বিয়ে করেন। মহারাণী সুনীতি দেবীই প্রথম বাঙালী মহিলা—যিনি এই রাজবংশে বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হন। মহারাণী সুনীতি দেবী ১৮৮৭ খৃঃ সি আই ই সম্মানের অধিকারিণী হন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ সুনিপুণ শিকারী বলে পরিচিত, টেনিস ও পোলো খেলায়ও পারদর্শী।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া এঁর অন্যতম ধর্মমাতা ছিলেন। এজন্য মহারাণীর নামানুসারে এঁর ভিক্টর নাম হয়। কুচবিহার রাজ্য এঁর শাসনে সমৃদ্ধি লাভ করে। জনহিতকর কার্যে উৎসাহী ছিলেন। কলেজ, চিকিৎসালয়, আদালত প্রভৃতি এঁর সময়েই স্থাপিত হয়। শিল্পশিক্ষায় মহারাজের অনুরাগ ছিল। কলকাতার ইণ্ডিয়া ক্লাব এঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। ইনি বহুবার ইংলণ্ডে যান। ব্রিটিশ সরকার এঁকে ১৩টি তোপধ্বনি দ্বারা সম্মানিত করার অধিকার দেন। এঁর কর্মচারী প্রায় সকলেই বাঙালী ছিলেন। ১৯১১ খৃস্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে বেক্স হিলে মারা যান। সম্রাট পঞ্চম জর্জের আদেশে সামরিক সম্মানে এঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অধিবাসী

কোচবিহার রাজ্যের প্রধান অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান। এ ছাড়া মেচ, গারো ও অন্যান্য আদিবাসী। কোচবংশীয়েরা রাজবংশী : কোচবংশীয়দের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মত আছে। কিংবদন্তী—বর্তমান রাজবংশীয়েরা খেন হিন্দু জাতি বলে পরিচিত।

কোচবিহার রাজ্যের রাজবংশীদের একশ বছর আগেকার প্রচলিত বাংলা ভাষার নমুনা (গ্রীয়ারসন সাহেব সংগৃহীত)—

"এক জনা মানুসির দুই কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্দে ছোট জন উয়ার বাপেকে কইল্, বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুঁই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন। তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক বাটিয়া চিরিয়া দিল্। টেইল্ দিন নাই যাইতে ছোট ব্যাটা কুল্লে মালমাত্তা গোটেয়া নিয়া দুরান্তর এক দেশোত্ গেইল। সেটে নুচ্চামি গুণ্ডামি করিয়া কুল্লে টাকা কড়ী উরিয়া দিল্।" ইত্যাদি।

উৎসব ও মেলা

কোচবিহারে প্রধান উৎসব রাসপূর্ণিমায় মদনমোহনের মেলা। এই মেলা প্রায় মাসাধিককাল থাকে। কোচবিহারের মহারাজা এই মেলা পরিচালনা করেন। এই মেলায় বহু দূরদেশ থেকে নানাবিধ পণ্যাদির সমাগম হয়। এ ছাড়া সাধারণ পূজাপার্বণেও নানা উৎসব হয়ে থাকে।

অবিশ্বাস্য

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

থানা অফিসার মিস্টার দত্তকে ঘটনাটি বিশ্বাস করাতে অনেক কথা ব্যয় করতে হয়েছিল স্বল্পবাক ডাক্তার অনুপম চৌধুরীর।

মিস্টার দত্ত বলেছিলেন---আপনাদের মতো শিক্ষিত, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী মানুষও যদি এসব ঘটনাকে বিশ্বাস করেন, তবে গেঁয়ো, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের আর দোষ কি?

শুনুন মিস্টার দত্ত, এমনও অনেক ঘটনা ঘটে, যা বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দিশেহারা হতে হয়। তা ছাড়া ঘটনাটি ঘটেছে আমারই দাদার জীবনে, যিনি চিরকাল বেপরোয়া এবং এইসব ব্যাপারকে কখনো স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে: মানুষের মনের দুর্বলতা থেকে এগুলির জন্ম এবং এগুলি মনের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়। সর্বোপরি তিনি ডাক্তার।

---হ্যাঁ, সেটাই আশ্চর্য। আচ্ছা চলুন, আমি আর আপনিই না হয় যাই। তারপর প্রয়োজন বুঝে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কী, রাজী আছেন তো?

---না-রাজী হবার কি আছে?

---আমরা মশাই নিশাচর জীব। যে কোন ঘটনার অন্ধকারে আমাদের চোখ জ্বলে। আপনারা তো অভ্যস্ত নন্, আই মীন স্ট্রং নার্ভ না হলে---।

---আপনার আইডিয়াটা বরং মিস্টার দত্ত। আমি ডাক্তার। আপনি বোধহয় জানেন না, ডাক্তার হতে হলে স্ট্রং নার্ভের প্রয়োজন।

---ও, য়্যাম্ সরি।

মিস্টার দত্ত বেল্টে-আঁটা রিভলবারটা ছুঁয়ে নিয়েছেন একবার। ড্রাইভারকে গাড়িতে উঠতে নিষেধ করে নিজেই গিয়ে বসেছেন ড্রাইভারের সিটে। পাশের সিটে বসেছেন অনুপম চৌধুরী।

---এর আগে আপনার দাদা কি কখনো লোকটিকে দেখেছিলেন। জীপে স্টার্ট দিয়ে প্রশ্ন করেছেন মিস্টার দত্ত।

---ঠিক মনে নেই তাঁর। তবে বেশ কিছুদিন আগে সম্ভবত ওই ভদ্রলোক ওই একই সময়ে তাঁকে ডাকতে এসেছিলেন মনে হয়। অবশ্য সেদিন তিনি যান নি।

---ও।

জীপটা ছুটতে ছুটতে মফস্বল শহরের পীচের রাস্তা পেরিয়ে গেছে।

ডাক্তার অনুপম চৌধুরীর দাদা ডাক্তার নিরুপম চৌধুরী। মোটরখানা কাল রাত্রে ছুটেছিল ওই একই রাস্তা দিয়ে। তখন রাত প্রায় একটা।

ক্রী-রি-রি-রি--- রিং, ক্রী-রি-রি-রি---রিং---।

কলিং বেলের তীব্র চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসলেন ডাক্তার নিরুপম চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী স্বর্ণলতা। ব্লাডপ্রেসারের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইদানীং রাত্রে কল্-এ বেরুচ্ছিলেন না ডাক্তার চৌধুরী। রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করা নিষেধ করা ছিল পেশেন্টদের এবং তাঁদের বাড়ির লোকজনদের। তবু ঘন ঘন চিৎকারে বিরক্তির সঙ্গেই উঠতে হয়েছিল তাঁদের।

এ্যালসেসিয়ানটাও চিৎকার করছিল। দুটো পা ওপরে তুলে আঁচড়াচ্ছিল গেটটা।

স্যুট্-পরনে একজন ভদ্রলোককে গেটের বাইরে ছায়া ছায়া আলো-অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল।

দোতলার ব্যালকনি থেকে স্বর্ণলতা ধমকে উঠলেন এ্যালসেসিয়ানটাকে। তারপর স্বামীকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ভর্ৎসনার সুরে আগন্তুক ভদ্রলোককে বললেন, এত রাত্রে কেন বিরক্ত করছেন? কাল সকালে আসবেন।

আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন---আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকেই শুনতে চাই।

---আমি তো বলছি আপনি সকালে আসবেন।

---যে প্রয়োজনে, আসা সকালে হয়তো সেই প্রয়োজন থাকবে না। আমাকে তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে দিন। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ধারাল ছোরার মতো।

---আমি এখানেই রয়েছি। বলুন, আপনার কি চাই? জিজ্ঞেস করলেন নিরুপম।

---এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জানি, রাত্রে আপনি কল্-এ বেরোন না, এর আগেও আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন একদিন। কিন্তু আজ যে না গেলেই নয় ডাক্তারবাবু। আমার মাকে অন্তত একবার চোখের দেখা দেখবেন চলুন, যাতে মরার আগে সান্ত্বনা পেয়ে মরতে পারেন তিনি। এতে আমিও সান্ত্বনা পাব এই ভেবে যে, এই শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার এ্যাটেণ্ড করেছিলেন তাঁকে।

---আপনি এক কাজ করুন। ডাক্তার দাসকে এখন নিয়ে যান, আমি বরং সকালে---।

---আমি অনেক আশা করে এসেছিলাম ডাক্তারবাবু। আমি জানি, আমার মা বাঁচবেন না, তবু আপনি যদি একবার যান, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কান্না-ভারাক্রান্ত মনে হয়েছে এবার।

মানবতাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ডাক্তার নিরুপম চৌধুরীর মনের মধ্যে। মানুষের সেবক তিনি। মৃত্যুর হাতছানিকে উপেক্ষা করে মানুষের জীবনদানই তাঁর ধর্ম।

স্বর্ণলতার বিরক্তি এবং ক্রোধে-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণকাল থমকে গিয়েছিলেন নিরুপম। তারপর চোখ ফিরিয়েছিলেন আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে। মায়ের জীবনের জন্য এত রাতে ছুটে এসেছে সন্তান তাঁর কাছে।

---স্পীড্ বাড়াও ড্রাইভার।

ড্রাইভারের পাশের সিটে বসা মানুষটির কণ্ঠস্বরে আদেশ আর মিনতি যেন একত্র হয়ে ঝরে পড়েছে।

শহর ছাড়িয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে এগুচ্ছিল মোটরটি। এদিকের বাড়িগুলো ছাড়া ছাড়া। ড্রাইভার মাখনলাল বুঝতে পারছিল না, ঠিক কোথা দিয়ে কোথায়

চলে এসেছে পাঁচশ মত ভদ্রলোকটির নির্দেশে। এদিকে সে কোনদিন এসেছে কি না—এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছিল না সে। কেমন যেন গোলকধাঁধার মতো লাগছিল তার। ছমছম করছিল শরীরের ভেতরটা।

স্বর্ণলতার বিরক্তিভরা মুখখানা বারবার মনে পড়ছিল নিরুপম চৌধুরীর। কোনকালেই শান্তি পেলেন না তিনি। তাঁর সব ব্যাপারেই স্ত্রী কর্ত্তৃত্ব করতে চান। তাই নিয়ে অশান্তির শেষ নেই। এত বয়স হল, এখনো কথায় কথায় অভিমান, অকারণ ক্রোধ।

—গাড়ি থামাও।

হঠাৎ ব্রেক কষায় চমকে উঠেছেন ডাক্তার নিরুপম চৌধুরী। দরজা খুলে নিজেই ব্যাগ হাতে নেমে পড়েছেন তিনি।

---সাব। কী যেন বলতে চেয়েছিল মাখনলাল। থেমে গেছে অপরিচিত লোকটির দিকে তাকিয়ে।

---কেয়া?

---কুছ নেহি।

ভদ্রলোকের পিছন পিছন এগিয়ে গেছেন নিরুপম। মরচে-ধরা গেটটা আর্তনাদ করে খুলে গেছে ভদ্রলোকের হাতের চাপে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের জ্যোৎস্নার লুকোচুরি। চাপ চাপ আলো-অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে। বহুদিনের পুরানো, নিঝুম বাড়িটার আনাচে-কানাচে। চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে শুকনো পাতা। আগাছা।

---অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। একটু আলো হলে ভালো হত। বলেছেন ডাক্তার চৌধুরী।

---আলো? আচ্ছা, একটু দাঁড়ান এই সিঁড়িতে।

নিরুপমকে দাঁড় করিয়ে রেখে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উঠে গেছেন ভদ্রলোকটি।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নিরুপমের মনে হয়েছে বাড়িটা পোড়ো। এত জঙ্গল, এত অপরিষ্কার, ভ্যাপসা গন্ধ, এর মধ্যে মানুষের বাস করা অসম্ভব। ভদ্রলোককে দেখে তো এত বনজঙ্গলের মধ্যে থাকার মানুষ মনে হয় না। বেশ টিপটাপ। পোষাকে, কথা-বার্তায়, চালচলনে ছিমছাম। তবে, তবে কি কোন ডাকাতের আস্তানা? কিংবা - - -।

শরীরটায় হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেছে যেন। অস্বস্তিবোধ করতে লেগেছেন নিরুপম। হাতের মুঠোটা শক্ত হয়ে এসেছে তাঁর। হাসিও পেয়েছে হঠাৎ। কী আবোল-তাবোল ভাবছেন তিনি? অন্ধকার বলেই জঙ্গল মনে হচ্ছে বাড়িটাকে। মনে হচ্ছে পোড়ো। সকালে হয়তো এই বাড়িটাকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখবেন তিনি। অন্ধকার জিনিসটিই বড় ভয়ের।

একটুকরো মৃদু আলো এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক নেমে এলেন মোমবাতি হাতে।

—একটু তাড়াতাড়ি আসুন।

—চলুন। আচ্ছা, চারদিক এত নোংরা হয়ে রয়েছে কেন? এতে যে-কোন সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কথা বলেছেন নিরুপম।

—কে আর পরিষ্কার করবে বলুন? ছোট ভাই আর মা থাকতেন। ভাইটি যে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, জানতেই পারিনি। জানতে পারলেও অবশ্য উপায় ছিল না। কারণ, তখন যুদ্ধ চলছে। ছুটি বন্ধ। ভাই চলে যাওয়ার পর থেকে বুড়ী মা একা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পেরিয়ে গিয়ে যে ঘরখানা, তার সামনে গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। দরজাটা ভেজানো ছিল। একটু জোরেই যেন ধাক্কা দিলেন তিনি।

বিশ্রী আর্তনাদ করে উঠলো দরজাটা। অনেকগুলো চামচিকে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। দু'একটা নিরুপমের গায়ে আছড়ে পড়েই উড়ে পালাল। অত্যধিক ভ্যাপসা গন্ধ ঘরখানায়।

মোমবাতির মৃদু আলোতে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন না নিরুপম। তাঁর মনে হল ঘরখানা অনেক দিন পর খোলা হল।

—ওই যে আমার মা।

ডাক্তার নিরুপম চৌধুরী দেখলেন, একটি চৌকিতে কাঁথা দিয়ে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে একটি মানুষ। চৌকির এক পাশে বসলেন তিনি। কাঁথাটা মুখের ওপর থেকে সরিয়েই চমকে উঠলেন। হয়তো আর্তনাদ করে পড়ে যেতেন তিনি। কিন্তু টাল সামলালেন। ভাবলেন ভুল দেখছেন। পেশেন্টের হাতটা খুঁজলেন ডাক্তার। এবার হাতটা তুলে নিয়েই ছেড়ে দিলেন তিনি। শরীরটা থরথর কেঁপে উঠলো তাঁর। গলাটা শুকিয়ে এল। কী যেন বলবেন ভাবলেন। মুখটা নড়ে উঠলো। স্বর বেরুলো না। একটু ঘুরে পেছনে দাঁড়ানো মানুষটির দিকে যে তাকাবেন, সে ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। একটু জোরে নিশ্বাস টানতে চেষ্টা করলেন ডাক্তার। সেই নিশ্বাসের শব্দ এত জোর হল যে, নিজেই চমকে কেঁপে উঠলেন। অবশেষে কোনমতে বললেন, একটা ওষুধ আনা দরকার।

—বলুন।

—আমি লিখে দিচ্ছি।

কম্পিত হাতে ব্যাগ খুললেন ডাক্তার। প্যাডটা বের করলেন। বের করলেন পেনটা। পেনের খাপ খুলতে গিয়ে পড়ে গেল সেটা। কিন্তু নীচু হয়ে সেটা যে কুড়িয়ে নেবেন, সে শক্তিও যেন তাঁর নেই। সাদা কাগজের ওপর হিজিবিজি কী যেন লিখলেন। ভদ্রলোকের দিকে না তাকিয়ে হাত বাড়ালেন।

ভদ্রলোক যেন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন মনে হল নিরুপম চৌধুরীর। - - - "এবার কী করবো আমি? পোকা-ধরা কঙ্কালটির সামনে কি বসে থাকবো সারারাত? তারপর ওই মানুষটি যখন ফিরে আসবে - - তারপর - - - তারপর - - -।"

উঠলেন ডাক্তার। এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর যেমন এসেছিলেন

তেমনিভাবে আন্দাজে আন্দাজে সিঁড়ির মুখে এলেন---। তারপর যে কীভাবে ছুটে এসে মোটরের মধ্যে আছড়ে পড়েছিলেন, মনে নেই ডাক্তার নিরুপম চৌধুরীর। শুধু মনে আছে মাখনলালকে বলেছিলেন 'জল্‌দি চালাও' এবং সেই মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে হারাতেও যেন তিনি শুনতে পেয়েছিলেন 'খুব জোর বেঁচে গেলে ডাক্তার। আগে যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন তুমি আসনি। যার জন্য আমার না মরেছে। সেই না আসার প্রায়শ্চিত্ত তোমায় করতে হত।'

ড্রাইভার মাখনলালের কাছ থেকে যতটুকু জানা গিয়েছিল তার বেশী প্রয়োজন লাগে নি মিস্টার দত্তর। এই এলাকার সব তাঁর নখদর্পণে।

জীপটা শহরের পীচের রাস্তা ছাড়িয়ে মেঠো রাস্তা ধরে চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছে একসময়। এখানকার ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলো লক্ষ্য করেছেন মিস্টার দত্ত। এই গ্রামটায় দুটি মাত্র দোতলা বাড়ি। একটিতে থাকেন সিধু দাস। সুদের কারবার ভদ্রলোকের। আর একটি পুরোনো পোড়ো বাড়ি।

সিধু দাসকে ডাকলেন দত্ত। পোড়ো বাড়িটা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সিধু দাস হাত কচলিয়ে কৃতার্থের ভঙ্গীতে যা নিবেদন করলো, সেটা হচ্ছে এই যে----এঁজ্ঞে স্যার, সে দুঃখের কাহিনী আর বলবেন না। সব হেঁজে-পেঁজে গিয়ে দুটো ছেলে বেঁচে ছিল পাল-গিন্নীর। বড় ছেলেটা মিলিটারীতে চাকরি করতো আর ছোট ছেলেটা বাড়িতে থাকতো। গত সনের আগের সনে ছোট ছেলেটা মলো ভেদবমিতে। সেই থেকে বুড়ির মাথার গোলমাল দেখা গেছিল। শুনেছি, বড় ছেলেটাও নাকি মরেছে শেষের যুদ্ধে। তারপর যে কী হল, বুড়ির আর খোঁজ পাইনি। লোকে বলে, ও বাড়িটায় নাকি দোষ আছে, তাই ওমুখো মাড়ায় না কেউ ভয়ে। কথাটা সত্যি। নইলে একটা বংশ নিব্বংশ হয়?

---আপনিও কি মাড়ান নি সেই ভয়ে?

---এঁজ্ঞে বুঝতেই পারছেন, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি---।

—আচ্ছা, আচ্ছা আপনি যান।

তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। সূর্য ঢাকা পড়েছে এক খণ্ড কালো মেঘে।

দূরে দূরে কৌতূহলী মানুষের ভিড়।

মিস্টার দত্ত আর অনুপম চৌধুরী বাড়িটার পুরোনো গেটটা পেরুলেন। সারা বাড়িটায় আগাছা আর নোংরা চোখে পড়লো তাঁদের। বাদুর, চামচিকে, পোকা-মাকড়ের আস্তানা। কেমন একটা ছমছমে ভাব। রিভালবারের খাপে হাত রাখলেন মিস্টার দত্ত। দোতলার বারান্দা পেরুতেই হাট করে খোলা দরজাটা চোখে পড়লো। চোখে পড়লো এক-খানা কাগজ পড়ে রয়েছে বারান্দায়। তুলে নিলেন মিস্টার দত্ত। ডাক্তার নিরুপম চৌধুরীর প্যাডের কাগজ ওষুধের নাম নয়। হিজিবিজি টানা। ওঁদের সাড়া পেয়ে দুটো শেয়াল বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে পালাল। কাল রাত্রে দরজা খোলা পাওয়ায় ঘরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিল বুঝি তারা।

অনুপম চৌধুরী এবং মিস্টার দত্ত ঘরে পা দিয়ে আবার একই সঙ্গে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পোকায় ভর্তি পাল-গিন্নীর কঙ্কাল দেহটা শেয়ালে টানতে টানতে খাট থেকে নামিয়েছে, বুঝতে পারলেন তাঁরা। নিরুপম চৌধুরীর ব্যাগ, কলম মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো।

ঠিক পেছনে কার যেন উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ।

সিঁড়িতে কাদের পদশব্দ।

চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন মিস্টার দত্ত। রিভালবারটা হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন।

---স্যার, গুলি করবেন না, আমরা। যদি তেনারা কোন বিপদে ফেলেন ভেবে লোকজন নিয়ে এসেছি স্যার, ----হে-হে-হে। আপনার নুন খাই, নেমকহারামি করতে পারবো না স্যার। হে-হে-হে---। একমুখ বিগলিত হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল সিধু দাস। সঙ্গে বেশ ক'জন লোক লাঠি, সরকি, কুড়োল হাতে।

একটি বড় নিশ্বাস বেরিয়ে এল দত্তর বুক উজাড় করে। বুকের কাঁপুনি বন্ধ করতে অনেকটা সময় নিল তাঁর।

পরিচয়

অহিভূষণ ভট্টাচার্য

রাত্রি সাঙ্গ হলে
আসিলাম চলে
তোমারি দুয়ার পাশে।

তুমি এসে,
খুলে দিলে দ্বার
সম্মুখে দাঁড়ালে আমার।

তারপরে,
কৌতুক ভরে
আমার কণ্ঠ জড়ায়ে কহিলে মোরে,
হেসে,
'জানতেম তুমি আসবে রজনী শেষে।'

আবেগে গভীর সুখে,
চুম্বন রেখা অধরে দিলেম এঁকে॥

আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হ'ল এ বাণী,
নদী ও সাগরে চিরদিন জানাজানি॥

পাকদণ্ডী বেয়ে—বনপাহাড় পার হয়ে ওরা যেতো বাঘমুণ্ডির হাটে। সিতাই-এর বাঁশীর সুর উঠতো ধামনী ঝর্ণার জলের কলস্বরে। বনে বনে তখন পলাশ ফুটতো—মহুয়া ঝরতো টুপটাপ ছন্দে। সিতাই-এর সঙ্গে বিয়ের কথায় ওর বাবাই আপত্তি তোলে। বুধিয়ার বাবা বলে—সি হবেক নাই। চাল নাই—চুলো নাই উটোর। কাজ-কাম নাই করবেক। শুধু ছোঁ নাচলেই হবে।

সিতাই মনে মনে ছিল শিল্পী। বাতাসের সুর ঝর্ণার, শব্দ সব মিলিয়ে এই বিশাল পর্বতরাজ্যের প্রাণ সাড়া তুলতো ওর বাঁশীতে। বুধিয়ার মনে ভেসে উঠতো ওই সুর।

বাঁশীর সুর শুনলেই সে হয়ে উঠতো উৎকর্ণ, মেঘ-দেখা ময়ূরের মত মনে জাগতো সাড়া, মনে হতো তার অন্তরের সব চাওয়াগুলো পেখমের মত মেলে মেলে সে ফুটে উঠতো ওই বলিষ্ঠ সিতাই-এর সামনে।

তাই বাবার অমতেও বিয়ে করেছিল তারা। সিতাই-এর কুঁড়েঘরখানা যেন ভরে উঠেছিল কি পরম পাওয়ায়।

বুধিয়ার ডাগর দু'চোখে সেই ক্ষণিক পাওয়ার তৃপ্তির আলো জাগে—বড় ভালো ছিল সিতাই। বাবটো বললেক—কিছুই নাই দিব তুকে। আমি নিলম নাই, সিতাই-এর লেগে সব ছেড়েছিলম।

আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। হাতিনাদার শালবনে পাখীগুলো কলরব করছে। ঘরে ফিরে চলেছে মাঠ থেকে গরু-মোষের দল। ছাগল-ভেড়াগুলো চীৎকার করছে। প্রতিটি শব্দ এখানে স্বতন্ত্র, স্পষ্ট। বাতাসের শব্দটা এখানে মুখর। বুধিয়ার জীবনেও যেন এমনি আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিল তারা। সিতাই-এর সংসারে তবু অভাব মেটে নি। তাদের একঘরে করে রেখেছিল—কাজকর্মও ছিল না। বুধিয়া বলে—মানুষটো কাজ করতে গেলো—তখন না করছিলম—বলছিলম আমিও সাথে যাই। কিন্তু সি বললেক—তু থাক ইখানে বুধনি, আমি আবার তাহলেই ঐ বনে পাহাড়ে ফিরে আসবো। খপরও দিইছিল—টাকা পাঠাইত হু ডাকের বাবুর কাছে; কিন্তু তারপর আর খবর এলো নাই। লুকটো কি জানি কুথায় হারাই গেল—

শূন্য উদাস চাহনিতে সে দূর আঁধার নামা দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে। দু'চোখের কোলে জল নামে। এখনও সে সেই হারানো মানুষটার সন্ধান করে। বিশ্বাস করে কোন দিন সে ফিরে আসবে—

শাড়ির ভাঁজ থেকে বের করে জীর্ণ মলিন একটা পোস্ট কার্ড—তার ছাপও বোঝা যায় না। বারাসতের কাছে একটা ইটখোলার নাম যেন রয়েছে। —একটো চিঠি লিখে দিবি ইখানে? কলকাতায় ঘর তুদের —সিতাইকে চিনতে পারবি গেলেই, সরেস বাঁশী বাজায়—মাদল বাজায়। দগুড়ে সিড়িং লাগ্ সিড়িং, বহা সিড়িং সব জানে উ।

ও জানে না সভ্য জগতের মানুষের কাছে সিতাই একজন মাটি কাটা কুলি মাত্র। ওই বিভিন্ন সিড়িং-এর সুরের কোন দাম নেই সেখানে।

সেখানের মানুষ সুর ভুলেছে, তারা হৃদয়হীন পাথর হয়ে গেছে, কোন সবুজ স্নিগ্ধতার স্পর্শ সেখানে নেই। তারই ছোঁয়ায় সিতাইও পাথর হয়ে গেছে, নইলে সে ফিরে আসতো বুধনীর কাছে, এই বনের শ্যাম ছায়ায়;—এপথ সে ভুলে গেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে, পাহাড়ের মাথার আড়াল থেকে রূপালী থালার মত চাঁদ জেগে ওঠে, শিশির-ভেজা বাতাসে ওঠে মিষ্টি সুবাস। বনের ফুল—চন্দনের গাছগুলোর হালকা গন্ধ—ইউক্যালিপটাস পাতার তীব্র সুবাস, সব মিশে একটি গন্ধময় আবেশ জাগে—পাখী ডাকে। বৌ কথা কও, চন্দনা, বাজবৌরী, বনতিতির-এর ডাক আলাদা হয়ে ফুটে ওঠে, দু'একটা ময়ূর ডাকছে। শব্দ-গন্ধ-বর্ণময় এই শান্ত জগৎ।

বনবাস

শীতও পড়েছে। কনকনে পাহাড়ে শীত। ফরেস্টের ক'জন ছেলেও এই সময় এসে জোটে, বসবার ঘরে আড্ডা জমে, গ্যাস-এর মৃদু আলো ডিসটেম্পার করা ঘরখানায় কি ছায়া আনে। বনের রহস্যময় জীবনের সঙ্গে এঁরা পরিচিত। এঁদের কেউ কাটিয়েছেন সুন্দরবনের গহনে, কেউ বেশ কয়েক বছর বাস করে এসেছেন তরাই শুক্নার বনে। সিল্‌ভিকালচারিস্ট মিঃ ভট্টাচার্য তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন।

শক্তিপদ রাজগুরু

এ বনরাজ্যকে সুন্দর করে তোলা যায়। ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা জায়গায় ওঁরা এ বনের যত রকম শিসিক-এর গাছ আছে ফুল গাছ আছে, এনে লাগিয়েছেন—ফুলের সেই গাছগুলোকে দেখেছি। মনে পড়ে আরণ্যকের বিভূতিবাবুর সৃষ্ট চরিত্র যুগলপ্রসাদের কথা, সেও চেয়েছিল সরস্বতী কুন্তীকে মনের মত করে সাজিয়ে তুলতে। পাখীরা আসবে—ক্ষণিকের জন্য আসবে বনহরিণীর দল, ডাগর কালো চোখ মেলে মানুষের চোখে সুন্দরতর হয়ে উঠবে প্রকৃতির রাজ্য।

বন্ধ দরজাটা কে নাড়ছে বাইরে থেকে। খট্ খট্ খট্ —কে? ডাক দিই, কোন সাড়া নেই। জবাবে দরজাটা আর একটু জোরে নড়ে ওঠে। বোধহয় কেউ এসেছে দেখা করতে। উঠতে যাবো—তার আগেই আলোটা নিয়ে উঠে পড়েছে একজন। অত্যন্ত সংযত মানুষ ওরা। দরজাই

খুলে, খোলা জানলা দিয়ে বাইরে চাইতে থাকে। আমিও উঠে এসেছি। বাইরে জ্যোৎস্নার ঝলমলে আলো। হাতীনাদার বনে বনে জোনাকি জ্বলছে। ঝিঁঝি ডাকার একটানা শব্দ ওঠে। দেখা যায় কালো মত একটা লোমশ মূর্তি দু'পায়ে টলমল করতে করতে ঘন পাইন বনের আড়ালে চলে গেল বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে।

ছায়ামূর্তিটার পিছন দিকটা দেখেছি। বোধ হয় একটা ভালুকই হবে। বনের কর্মচারীরা বলে ওরা মাঝে মাঝে খাবার নিতে আসে। তবে ভয়ের কিছুই নেই।

চুপ করে থাকি। ভরসারই বা কি আছে তা জানি না, দাশ বলেন। খাঁকিকে ওরাও ভয় করে। তাই উৎপাত করে না এখানে। খাবারের সন্ধানে আসে।

রাতের অন্ধকারে ওদের যে এসব চারণভূমিতে পরিণত হয় সেটা ভেবেই নিয়েছিলাম।

তবু ঘুম আসতে দেরী হয় না। সারাদিন বনে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করার ক্লান্তি সারা দেহে, ঠাণ্ডাও জমে রাতের সঙ্গে সঙ্গে। একটা লেপের ওপর র‍্যাগ চাপিয়ে আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছি। মনে হয় কলকাতার কথা। সেখানের পথে পথে এখনও লোক চলছে। ইভনিং শো-এর পর লোকজন কলরব করে ট্রামে-বাসে উঠছে—শ্যামবাজারের মোড়ে পানের দোকানগুলোয় ঝলমল আলো জ্বলে, ট্রাকগুলো পাহাড়প্রমাণ মাল নিয়ে ছুটে চলেছে, আর এখানে কর্মব্যস্ততা নেই, আছে শুধু অন্তহীন স্তব্ধতার জগৎ, পাখী ডাকে, ঝিঁঝি ডাকে চাঁদের আলোয় এজগৎ স্বপ্নের অসীমে হারিয়ে যায়। মানুষের চাওয়া পাওয়ার হাহাকার এখানে পৌঁছে না—কি সম্পদে এর অন্তর পূর্ণ—সমৃদ্ধ।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেদ করে কলরব ওঠে, কতকগুলো মানুষের ক্ষীণ কলরব। মাদল-ক্যানাস্তারার টিন পেটার শব্দ ওঠে—মশাল জ্বেলে ওরা চীৎকার করছে।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠেছে রাজু চৌকিদারও। মুখে-চোখে ওর জমাট আতঙ্ক। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলে—গণেশঠাকুর বটে স্যর। ধান খেতে আইছে হাতি। বুনো-হাতির পাল মাঝে মাঝে ওদের ধান মকাই ক্ষেতে হানা দেয়। ভালুক আসে মহুয়া আর কুল পাকলে। লোকালয়েও ওরা হানা দেয়।

বনপর্বতে ওদের অব্যক্ত আতঙ্ক জড়ানো চীৎকার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে, মশালের আলোর আভা উঠছে, ও পাশের কোন গাছের টং থেকে কারা চীৎকার করছে, পাহাড়-বস্তীর আদিম মানুষগুলো যেন অসহায় আতঙ্কে চীৎকার করছে প্রাণপণে। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় কালো ছায়ামূর্তির দল এগিয়ে আসছে ধানক্ষেতের দিক থেকে। চাঁদের আলোয় হাতিগুলোর বলিষ্ঠ সুন্দর সুঠাম দেহগুলো দেখা যায় খানিকটা। সঙ্গে একটা বাচ্চাও রয়েছে বিস্মিল চাওনিতে আমরা চেয়ে আছি ওই বন্যযূথের দিকে। রাজকীয় ভঙ্গীতে ওরা আসছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে।

ওরা যদি এদিকে আসে তাহলেই বিপদ, জানলার গরাদগুলো শুঁড় দিয়ে টানলে দাঁতন কাঠির মত ওগুলো উঠে যাবে, শুঁড় বাড়ালেই বিপদ। গা ঘসে গেলে খসে পড়বে জানলাগুলো। আমরা ওদের দিকে চেয়ে থাকি, মৃত্যুর কালোছায়ার মত এগিয়ে আসছে ওরা। মাত্র কয়েক শো গজ দূরে এসে পড়েছে। সামনেই গেট। কাঠের গেটটা ওদের লাথিতে ছিটকে পড়বে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তারা। শুঁড় তুলে বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকছে। কি ভেবে ওরা ওপাশের হাতীনাদার বনের ঢালু পথে নেমে গেল, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

বনের সেই স্তব্ধতা আবার ফিরে আসে—কোথাও কোন অশান্তির লেশমাত্র নেই। চাঁদের আলোভরা পর্বতসীমার জীবনে এ বোধহয় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এখানের মানুষগুলোর সঙ্গে তারাও বেঁচে আছে এই বনের অংশ হয়ে।

তবু এখানেও পরিবর্তন আসছে। এ পরিবর্তন কালের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে আসে। এ পালাবদল দিনবদল ঘটে বেদনার সঙ্গে, স্বাভাবিক নিয়মেই।

এই বেদনার ছায়া দেখেছিলাম সেদিন সাঁওতালপ্রধান প্রবীণ মুশাই সর্দারের চোখেমুখে। বলেছিলেন তিনি—ছাওলান বদ হইছে। লুভী হইছে গ'।

কথাটা জানিয়েছিলেন দাশমশায়। রতনমাঝিকে দেখবেন না? সে একটি চিজ। তাকে না দেখলে আগামী কালের অযোধ্যা পাহাড়ের মানুষগুলোকে না-দেখাই থেকে যাবে।

বনরাজ্যের মানুষদের অনেককেই দেখেছি, এই প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একটি নিবিড় সাযুয্য রয়ে গেছে। এ মাটি, পাহাড়, বনকে তারা ভালবাসে। এর জীবনের সঙ্গে তাদের অজান্তেই জড়িয়ে ফেলেছে। সিতাই মাঝির কথা মনে পড়ে। 'বুধনী যেন এই পাহাড় বনরাজ্যের ভেসে যাওয়া সুর, সিতাই তাকে ভুলে গেছে। বুধনী আজও তাকে ভোলে নি।

সিতাই মাঝির কথা ভাবলে মনে হয় ওরাই এখানের আগামীকালের মানুষ, যারা এই প্রকৃতির ভালবাসার সৌন্দর্যের দামটাকে অস্বীকার করে সরে যায়। বুধনীরা এ মাটির অসহায় রূপ—ওরা বাতাসে বাতাসে কান্নার সুর মিশোয়। বুকচাপা সে কান্নার প্রকাশ এর ফুলগন্ধে—ভ্রমরের কানাকানিতে—রাতজাগা পাখীর কলকাকলিতে।

অযোধ্যার বসতির পরই মালভূমি বেশ কিছুটা নেমে গেছে। ফাঁকা সবুজ একটু জায়গা, সেখান থেকে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমেছে, সামনে বিশাল বনরাজ্য, চারিপাশে তার উঁচু উঁচু আকাশছোঁয়া পাহাড়; একদিকে জিপের রাস্তাটা এঁকেবেঁকে বনের মধ্যে ঢুকেছে, দু'দিকে শাল, হরিতকী, বহড়া আর কুসুম গাছের ঘন ছায়া-প্রহরীর দল, নির্জনতার মাঝে পথটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে, দাশ বলেন।

—ওইটা শিকাবাদ যাবার পথ।

বনের মধ্যেকার পথ বেশ শক্ত আর মজবুত। শিকাবাদ দেখা যাচ্ছে দূরে, পাহাড়ের পাদদেশে সেই জনবসতি—তার কিছু দূরেই 'পাহাড়-সীমা' শেষ হয়ে সুরু হয়েছে উষরপ্রান্তর, মাঝে মাঝে ছড়ানো-ছিটোনো বস্তি, পুরুলিয়ার দূরত্ব শিকাবাদ থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল, এখান থেকে শিকাবাদ সাত মাইল। এই পাহাড় বনের সাত মাইল পার হয়ে সমতলে পিচঢালা পঁচিশ মাইল রাস্তা পড়ে পুরুলিয়া। যদি এই রাস্তাটায় জিপ বা বাস চলে তাহলে পুরুলিয়ার দূরত্ব অনেক কমে যায়। আমরা পঞ্চাশ মাইলের উপর ঘুরে এসেছি বাংলোয় আসতে।

দাশ বলেন—কিন্তু একথা কেউ ভাবেন না। তাহলে এদের কতোখানি ভালো হয়, সেটা ভাবাতো দূরের কথা।

ওই রাস্তা ছেড়ে আমরা ঢালু পাকদণ্ডী বেয়ে নামছি জঙ্গলে, এগুলো পায়ে-চলা পথ। বনগড়ানি জল যায় সহজ পথ ধরে। এগুলোও তাই। বর্ষাকালে এর বুক বয়ে স্রোত নামে। এখন শুকনো। শুধু পাথরগুলো দাঁত বের করে আছে। বনভূমির ঘনত্ব এখানে অনেক বেশী। বড় বড় শাল-গাছ সোজা হয়ে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। মাটিও স্যাঁতসেতে আর নীচেও আগাছার জঙ্গল। বেশ কিছু লতা গাছে গাছে জড়িয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। নিম্নভূমির অরণ্যে ঠাঁই ঠাঁই জন্মেছে ফার্ণ—গাছে অর্কিড, পরগাছাও ভিড় করেছে। এ অরণ্য অনেক গভীর বেশ ঠাণ্ডা আর প্রায়ান্ধকার। সরু রাস্তা নীচের দিকে নেমে চলেছে, আরও নীচে। কোথায় ঝিরঝির শব্দ ওঠে। গাছের ফাঁক দিয়ে বহু নীচে একফালি জলের চিকণ রেখা ফুটে রয়েছে—শুদ্ধ বনরাজ্য। আমাদের পা ফেলার শব্দ ওঠে। আবার সব নিস্তব্ধ। প্রকৃতির গভীর গহনে আমরা চারটি প্রাণী যেন চোরের মত প্রবেশ করেছি।

শর্-র---র--- একটা শব্দ ওঠে। গভীর বনের মধ্যে ওই ঘন গাছগাছালির ফাঁকে কি যেন সরে গেল, থমকে দাঁড়ালাম।

অজানা আতঙ্কে সারা শরীরের লোমকূপ অবধি খাড়া হয়ে ওঠে। দাশও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, গার্ড মিশিরজী এদিকে-ওদিকে সাবধানী দৃষ্টি মেলে কি সন্ধান করছে।

আমাদের হাতে একটা করে লাঠি। ওটা পাহাড়ী পথ উঠতে নামতে সাহায্য করে মাত্র। ওতে আত্মরক্ষা করা যায় না। আর যে গভীর বন, তাতে বাঘ, ভালুক, বনশূয়োর যে-কোন মুহূর্তেই বের হতে পারে। হাতীও আছে আশপাশে, একটা নাকি দলছুট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে সেইটাই হবে কিনা।

হঠাৎ আমার সঙ্গী দেবশঙ্কর কি যেন দেখে শিউরে উঠে একটু এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই ওর পায়ের কলকাতাইয়া বাহারি স্লিপার পিছলে গেছে, ঢালু পাথুরে

অযোধ্যাপাহাড়ের ঘন বনের মধ্যে

পাহাড়ের গায়ে দেবুর গোলগাল শরীর গড়ান দিচ্ছে। কাঁচি ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবীতে লেগেছে ছাপ ছাপ লালচে কাদার দাগ।

গোলমালে একটা ময়ূর বন থেকে ঝটপট করে উড়ে গেল, লাফ দিয়ে ঝরণাটা পার হয়ে গেল একটা হরিণ। ওর হলুদ-কালো ছোপানো দেহটাকেই দেখেছিলাম আমরা। দেবু ততক্ষণে উঠেছে গার্ড মিশিরজীর হাত ধরে। নইলে আরও কয়েকটা গড়ান দিয়ে ঝোরার ঠাণ্ডা পাথুরে জলেই গিয়ে পড়তো।

দেবুর ক্যামেরা ছিটকে পড়েছে, দেবু বলে —ইস্, এমন সুন্দর ছবিটা নিতে পারলাম না।

অর্থাৎ ময়ূর আর হরিণ দুটোকে ও নাকি আগেই দেখেছিল। মোটেই ভয় পায়নি আমাদের মত। দেবু পড়ে গিয়েও হার স্বীকার করতে রাজী নয়।

ঝোরা পার হয়ে আবার উঠছি চড়াই ঠেলে। বুক-ভাঙ্গা চড়াই। এঁকেবেঁকে সব পথটা উঠছে। উৎরাই-এর এই নিয়ম। তারপরই আবার সুরু হবে চড়াই। ক্রমশ বন পাতলা হয়ে আসছে। দূরে মানুষের গলার শব্দ পাই। গরু-মোষের গলায় কাঠের ঘণ্টা বাজছে ঘড়-ড়-ড়---

পথটা এইবার বন থেকে ফাঁকায় বের হয়ে আসে। সামনে মুক্ত, বেশ খানিকটা সমতল মত। ঢালু হয়ে সেই

উপত্যকা চারিদিকে নেমে গেছে। সব দিকেই এমনি গভীর বন আর তারপরই আকাশছোঁয়া পাহাড়। নির্বাচন বাবার সেই গাড়ির রাস্তার অস্তিত্বটুকুও বন থেকে ঢালু পাহাড় ও গা বেয়ে এইখানে নেমে এসে গ্রামবসতির দিকে এগিয়ে গেছে। মাঠের এদিক-ওদিকে সরষের ক্ষেত। মকাই কাটা হয়ে গেছে। গরু-মোষগুলো শূন্য মকাই ক্ষেতের এদিকে-ওদিকে ঘুরছে।

সামনেই রাস্তাটার দু'দিকে কয়েকখানা ঘর। তেমনি নিকোনো আর তকতকে। রাস্তার এক পাশে একটা শাল খুঁটির মাথায় কাঁচ বসানো চৌখুপি বাতিদান আগেকার দিনের মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় অমনি বাতিদান দেখেছি, হঠাৎ এই বনপর্বতের মাঝে সাঁওতাল বস্তীতে ওই সভ্য জগতের আলোর অস্তিত্বটুকু কেমন বেমানান ঠেকে। ওই একটুকু আলো যেন সব অন্ধকারকে দূর করে দেবে।

এদের ব্যাপারটা এমনিই। এর মধ্যে গ্রামে বসতিতে গিয়ে দেখেছি বাইরের লোক দেখলে পুরুষরা প্রথমে বের হতে চায় না। বাড়ির মেয়েরাই জবাব দেয়। ঘরকে নাই বটেক।

এবারও প্রথমে সেই জবাবই মিলেছে। বাকী দু'চারজন সকালের রোদে পিঠ তাতাচ্ছিল, তারা দেখছে আমাদের দিকে কৌতূহলী বিচিত্র চাহনিতে, সঙ্গে রয়েছে ফরেস্টের খাঁকি পোষাকপরা মানুষগুলো আর আমরা সহরের বিচিত্র জীব, নানিতত অবিশ্বাস করারই কথা। দু'একজন চেনামুখ বের হতে তারাই খবর দেয় রতন মাঝিকে খুঁজছিস? দাঁড়া ডেকে দিই।

সামান্য কয়েকঘর বসতি, তবু মনে হয় এখানে কিছু সমৃদ্ধি আছে। ফল-ফসল হয়। একটা চালায় রাশিকৃত মকাই-এর স্তূপ পড়ে আছে, গাছে উঠেছে শিমের লতা, বেগুন গাছ-গুলোও সবুজ সতেজ নকনকে।

ইতিমধ্যে রতন মাঝি ও আরও দু'একজন এসে পড়েছে। লোকটার দিকে চেয়ে থাকি। লম্বা পাকানো চেহারা, বয়সের তুলনায় ওর মুখের রেখাগুলো অনেক স্পষ্ট, কেমন যেন কুটিল বলেই বোধহয় ওকে। ওর পরনে পরিষ্কার একটা ধুতি, গায়ে সাবান কাচা গেঞ্জি। পায়ে টায়ারকাটা একটা স্যাণ্ডেল। এখানে বিশেষ কারো পায়ে স্যাণ্ডেল দেখিনি; ওকে তাই স্যাণ্ডেল পরতে দেখে একটু অবাক হই। মুশাই সর্দারের মুখখানা মনে পড়ে। সারা পাহাড়বস্তীর প্রধান সর্দার সে, তার পোষাকেও এই সহুরেপনা দেখিনি। রতন মাঝি একটু স্বতন্ত্র সব দিকে থেকেই। ও বলে—

—কলকাতা থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

রতন শোনায়—এই সাল ক'বারই কলকাতা গেছি। মনুমেণ্ট, হাওড়ার ব্রিজ, কালীঘাট সব দেখেছি।

—তাহলে কলকাতা যাও মাঝে মাঝে?

সঙ্গের লোকরা অবাক হয়ে রতনের এলেম দেখছে। তারা যে রতনের বশংবদ চেলা তা দেখেই অনুমান করা যায়। রতন সায় দেয়।

—তা যেতে হয় প্রায়ই। ওরা এসে ধরে। এবার তো তিন দলের সঙ্গে তিনবার গেলম সহরে লুকজন লিয়ে। পতাকাও থাকে। এক একবার এক এক দলের পতাকা আর সঙ্গের লুকরা যা বলে আমরা তাই ধুয়ো ধরি। বিনভাড়ায় কলকাতা গেলম—গঙ্গা সিনালম্—

—কোন্ কোন্ দল হে?

রতন যে বিশেষ একটি এলেমদার বস্তু তা বুঝতে পারি এরই মধ্যে, যেইই ডাকে তার হয়েই দলবৃদ্ধি করতে চলে যায়; নিজে যে কার দলের, সে খবর সেও রাখে না। তার পাওনা ওই সর্দারি আর বিনাভাড়ায় ভ্রমণ আর খাওয়া।

পরের স্বার্থও নিশ্চয়ই কিছুটা আছে। ওরই বাড়ির সামনে ওই অঞ্চলের পথ আলোকিত করার চেষ্টা দেখে এমনি ব্যাপার আগেই অনুমান করেছিলাম।

রতন বলে—আমরা সদরের কত্তাদের বলেছি—একটু জল আর রাস্তার আমাদের ব্যবস্থা করে দেন। তা ইবার ভাবছি এম-এল-এ'র সঙ্গেই কলকাতা যাবো ইসব বলতে, বনের লুকদের কাছে চাঁদাও তুলছি—

অর্থাৎ রতন এবার নেতা হবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে এবং সহজ পথগুলোর খবর ও সব জেনে ফেলেছে। এর মধ্যে লোকজন—মুনিষদের কি ফরমাইস করছে। হঠাৎ কার ডাকে রতন একটু ভিতরে চলে গেল। আড়ালে একটা পলাশ গাছের নীচে জঙ্গলের ওদিকে দেখা যায় পাঁচ ছ'জন লোক ওর সঙ্গে কি কথা বলছে।

ওরা বোধহয় আমাদের দেখিয়েই কি বলাবলি করছে। রতনও মাথা নাড়ে। তারপর কি কথাবার্তা হতে লোকগুলো ওদিকে বনে ঢুকে গেল। গরু-মোষের পালের সঙ্গে।

দাশ আর গার্ড মিশিরের মধ্যে কি চোখে চোখে ইসারা হয়ে যায়। দাশ হাসছে। রতন ততক্ষণে আবার হারানো কথার খেই ধরে সুরু করে তার কৃতিত্বের কথাগুলো।

—আমাদের কথা শুনতেই হবে বাবু। সরকার আমাদের বন কেড়ে নিলেক—জলের ব্যবস্থা নাই, রাস্তাঘাট নাই।

রতন মাঝি বলে চলেছে ওর কথাগুলো। ইতিমধ্যে আমাদের কিছু তরিতরকারীর দরকার, টম্যাটো, বেগুনও কিনলাম কার ক্ষেত থেকে। কুড়ি পয়সা সের দরে। দুটো মুরগীও কিনতে হলো। খুব বড় মিললো না—ছোট আকারের দুটো মুরগীর জন্য দাম নিল দু'টাকা। নিজেরই অবিশ্বাস্য ঠেকে তাকে আর একটা টাকা দিতে যাই। লোকটা ঘাড় নাড়ে।—নাই লিব। নাই লিব। ঢের লিইছি।

টাকাটা সে নিল না। ফেরৎ দেবার জন্য তার তরফ থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষোভও নেই। কিন্তু দেখলাম রতন মাঝি

এই সৌজন্যটুকু [illegible] [illegible] লাগে না। তার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে।

লোকটাকে আর দু'একটা মুরগীর কথা বলতে রতনই আগ বাড়িয়ে বলে—আমি দেখছি।

নিজেদের মধ্যে ওদের ভাষায় কি কথা বলতে বলতে ওরা ফিরে আসে। রতন জবাব দেয়।

—সিমিগুলোন সব উড়ে বেড়াচ্ছে, ওদের দিলেক নাই।

মুরগীগুলো নাকি ঝাঁকায় চরছে। অর্থাৎ রতনও যে ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিল না তা বুঝলাম। একটা প্রাইমারী স্কুলও রয়েছে। মাটির দোচালা ঘর। সামনে কয়েকটা ছায়া-ঘন গাছগাছালির ভিড়। ওপাশে মাটির দেওয়ালে কে কচি আঙুলের ডগে নাম লিখে রেখেছে। শ্রীকালীপদ বাবু, ছেলেরা আজকাল পড়াশোনা করছে। ওকে শুধোই, কালিপদ কোথায় গো?

—পড়তে গেছে শিকাবাদে।

অর্থাৎ নিদেন মাইল পাঁচেক পথ বনপবত পার হয়ে ওরা যাতায়াত করে।

—এখানের স্কুলে পড়ে না?

রতন একটু চুপ করে গেল কথাটা শুনে। নিজেদের মধ্যে ইশারায় কি কথা হল। রতন বলে, আছে ইস্কুল। মাষ্টারও আছে। তবে এখন ক'দিন ছুটি কিনা।

কিসের ছুটি তা জানি না। তবে এ বনপর্বত রাজ্যে কাজের ছুটি সর্বদাই মেলে। রতন কেমন এড়িয়েগেল প্রশ্নটা। একটা গোলমাল যেন রয়ে গেছে। অর্থাৎ মাষ্টার আছে খাতায়-কলমে, আসেও কালে ভদ্রে। আর মাইনেটা ঠিক মাস মাস আদায় হয়ে যায়। রতনের কোন হাত সেখানে আছে কি না তা জানি না।

রতন বোধহয় এড়াবার চেষ্টা করে। ও চায় না এই সব অযথা প্রশ্নে তাকে আমরা বিব্রত করি। এতক্ষণ ধরে এ-দিক-ও-দিকে ঘুরে এ সব দেখেছি। কথাবার্তা হয়েছে। বসবার সময় সুযোগও পাইনি। বেলা হয়ে আসছে। পাহাড়-বন পার হতে হবেই। সকালের সেই ভূরিভোজ কোন্‌দিকে নস্যি হয়ে গেছে। এ জলে পাথর হজম হয়। খানচারেক খাঁটি ভইসা ঘিয়ের পরটা, আলুভাজা, দুটো ডিমসিদ্ধ আর আধ সের মোষের দুধ—এই ছিল আজকের ব্রেকফাষ্ট। তা হজম হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং এইবার ফিরছি আমরা মাইল তিনেক বনপথ; রতন মাঝিই এ গ্রামের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোক, বেশ গুছিয়ে নিয়েছে সে। এদিক থেকে ওদিক অবধি তার ক্ষেত-খামার। সরষের ক্ষেতই অনেক। গরু-মোষগুলো চরছে।

দাশ বলেন,—ফরেষ্টের জমি দখলের রীতিটা দেখেছেন রতনের? বেশ খানিকটা জায়গায় শালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। নীচের মাটিতে চাষ দিয়ে, সরষে বুনেছে। দাশ বলেন, গাছগুলো এখন কাটবে না। দু'এক বছর চাষ দিয়ে দিয়ে হঠাৎ রাতারাতি গাছ কেটে একমাথায় আল দিয়ে জমি দখল করে নেবে। এমনি করে বনকে বন অনেক জায়গাকে ওরা শেষ করেছে। তাছাড়া বনতো যেন ওদেরই দখল। আগে এ-সব ছিল না—এখন রতনের মত কিছু রতন আছে, যারা এখানের অনেকের মনে ঢুকিয়েছে দরকার হলে বনে গিয়ে গোটা দু'চার রোলা কেটে হাটে বেচে আসবি, বিশ টাকা হবে। অবশ্য রতনের মত নেতাদের একটা বখরা এতে থাকে। আগে ওরা ভাবতো বনের কাঠ কাটা মানেই চুরি করা—সেটাকে ওরা ঘৃণা করতো।

লোকটা গাছতলায় বসেছিল, বয়েস হয়ে গেছে। ডান হাতটা তার নেই। কনুই-এর ওপর থেকে কাটা, বাঁ হাতে একটা গরু তাড়াবার পাঁচন। লোকটার চোখমুখ বসে গেছে। বলে সে—রতনের কথা বলছিলি তুরা?

ওর দিকে চাইলাম। লোকটার শীর্ণ মুখে ওই কোটরাগত দু'চোখে কি তীব্র জ্বালা। বলেছে—উটো একটা শয়তান আছে বাবু। লুককে ভুলাইছে মিছা কথা বলে—ঠকাইছে, পথে বসাইছে উদের। আমারও সব গেইছে বাবু উয়ার চালে পড়ে। জমি গ্যালো—জারাত গ্যালো—সব কুন দিকে হারাই গেলো।

গার্ড মিশির লোকটাকে চেনে। ওকে চেনে এ অঞ্চলের অনেকেই। পঙ্গু অক্ষম লোকটার দু'চোখে, সারা মনে কি তীব্র জ্বালা ফুটে ওঠে।
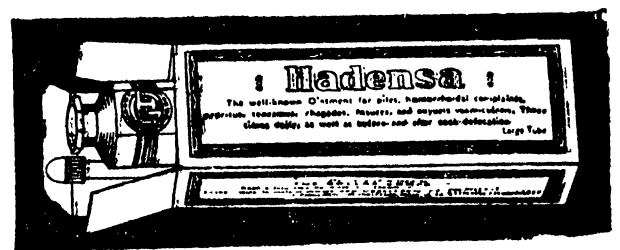
মাধাই মাঝির এই মর্মবেদনার কথা সেদিন আমার সামনেও জানিয়েছিল সে। এ যেন বুধিয়ার বিপরীত সত্তা। ওরা শুধু ঠকে আর চোখের জল ফেলে অসহায়ের মত। ও কান্নার শেষ নেই।

রতন মাঝির বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকদিন থেকেই। পুরুলিয়া-বলরামপুর ছাড়িয়ে ধানবাদে চিনকুঠির লোকদের সঙ্গেও যোগাযোগ, জানাচেনা ছিল তার। মাধাই আরও অনেককে সে বলে-কয়ে কিছু টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে কয়লা কুঠিতে নাহয় চা-বাগানে কাজ করতে পাঠিয়েছিল আড়কাঠির মারফৎ। সেবার পাহাড়েও খুব আকাল —ধান-মকাই-বাজরাও হয়নি। বনের ফলপাকড়ও ছিল না, ছিল না ঝরণার জল। সেদিন বন-সবুজেও হাহাকার উঠেছিল।

মাধাই বলে—সিদিন ওই রতনই ডংরীর চেক লুককে পাঠালেক চিনকুঠিতে। বললেক, সিখানে কাম পাবি। কয়লা কাটার কাজ—পয়সা পাবি। থাকতে পাবি—খেতে পাবি—কতো ট্যাকা লিয়ে আসবি ঘরকে। বৌটো বিস্তক না করেছিল। বলেছিল—নাই যাবি উখানে। বিস্তক ডংরীতে থাকতে লারলাম,—সোনারপারা বৌটো উপোস দিবেক গতর থাকতে? তাই গেলম কয়লা কাটতে উই ধানবাদ পার হয়ে কুন মুলুকে।

দুপুরের রোদ নেমেছে গাছ-গাছালিতে। ঘন সবুজ পাতাগুলো তেল রোদের আভা মেখে মসৃণ চকচকে হয়ে উঠেছে, যেন সবুজ পত্ররসার চুঁইয়ে পড়বে ওদের গা বেয়ে। দূরে কোন্ বনের ধারে রাখাল বাঁশীর উদাস সুর ওঠে। দিন বয়ে যাওয়া বেদনার সুর। লোকটার শীর্ণ মুখে কি বেদনার ছায়া ফুটেছে। করুণ বিষণ্ণতার ছায়া।

মাধাই বলে—কিন্তু কি হ'ল তাতে? কয়লার চাংগড় খসে পড়ল ডান হাতটোর ওপর। পরাণ লিয়ে বেঁচে এলম, গতর গেল—মুরোদ গেল ট্যাকার জন্যে। ফিরে এলম ডুংরীতে, ভাবলম তবু ঘরে এসে চাষবাস করবো। দুঃখ-ধান্দা লিয়ে থাকবো।

কিন্তুক এসে দেখলম ঘরটো নাই। বর্ষার জলে চালাগুলোন পড়ে গেইছে, পাঁচীল ও নাই ঘরের। আর বৌটো? সীও কার সাথে পিরিত করে উই রতনের চালে পড়ে ডুংরী ছেড়ে কুন মুলুকে পালাইছে। জমি জাথা সব দখল লিয়েছে ওই রতনা। আমার সব কেড়ে লিলেক উ। আমার কেনে? এখানের কতো ডুংরীতে খপর লে—উ কতো লুকের কি করেছে। এখনও করছে, সাইতানকে উ চোর বানাইছে—মনগুলানকে বিষিয়ে দিইছে। উদের পথে বসাইছে।

চুপ করে কথাগুলো শুনছি, কি বেদনার কথা। বঞ্চনার কথা। এই শান্ত সুন্দর পার্বত্য জীবনের আড়ালেও করুণ জীবন-ইতিহাস রয়ে গেছে। মানুষের এই লোভের আগুনে পুড়েছে অনেক ঘর, অনেক মন।

মাধাই মাঝি বলে—বৌটো আর এলো নাই বাবু,—উ হারাই গেল। আর সব হারিয়ে আমি পড়ে রইলাম এ ডুংরীতে, রতনারই মোষ চরিয়ে বাগালি করে আর লাথি খেয়ে পড়ে রইছি। পরাণটা তবু বাইরোয় না। শুধু ধুঁকছি আর ধুঁকছি।

বনের মধ্যেকার সরু পায়ে চলাপথ ধরে চড়াই ঠেলে উঠছি। বেলা হয়ে গেছে।

ফরেষ্ট বাংলো এখান থেকে বেশ খানিকটা পথ। তেষ্টা পেয়েছে। দুপুরের রোদে আর চড়াই-এ ওঠার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছি। গার্ডটা সামনের একটা আমলকী গাছ থেকে কতকগুলো আমলকী পেড়ে বলে—

—মুখে দিন, ভালো লাগবে। বেশ টক টক মিষ্টি মিষ্টি ফলগুলো।

মাধাই মাঝির সেই করুণ ইতিহাসটা এখনও মনে পড়ে। লোকটা আজ শোষণের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্য-জগতের এই লোভ বনপাহাড় পার হয়ে এখানেও তার কঠিন থাবাটা মেলে ধরেছে। বুধিয়ার কথা মনে পড়ে। মেয়েটাও এমনি কোন চক্রে পড়ে তার প্রিয়জনকে হারিয়েছে। সিতাই আর ঘরে ফেরেনি, আজও মেয়েটার সারা-মনে ওকে হারানোর দুঃসহ জ্বালা। শবরীর মত অন্তহীন প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে সে—কবে তার শূন্য মন, শূন্য ঘর পূর্ণ হবে। সে আশা মেটে না মানুষের। কিন্তু বুধিয়ার দেহে মনে এখনও যৌবনের উত্তাল সাড়া, আজও সে অন্য কাউকে ভালোবেসে ঘর বাঁধতে পারে। সুখী হতে পারে সব ভুলে। কিন্তু কেন সে এই চাওয়াটুকু পূর্ণ করেনি তা বুঝতে পারিনি। ভালবাসারও একটা প্রতিদান থাকে, শূন্য নিঃস্ব হয়ে কোন হারানো মনের ভালবাসার জিম্মাদার হয়ে জীবন কাটে না। সে পাত্র বদলায়, রূপ বদলায়। বেঁচে থাকে অন্য কিছুকে কেন্দ্র করে। চলমান জীবনের এইটাই প্রতীক। সে শত পরিবর্তনের মাঝে, নানা সমস্যার মাঝে রূপ বদলায়, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে। ভালবাসার গতিপ্রকৃতিও বদলায়।

কিন্তু জীবন এখানে স্থির। সেই চিরন্তন শাশ্বত সুরে বাঁধা। তাই ভালবাসার বস্তুও বদলায়নি বুধিয়ার সামনে।

বনভূমির নিস্তব্ধতার মাঝে একটা শব্দ ওঠে। দূর বনের দিক থেকে শব্দটা উঠছে, পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে এগিয়ে আসছে। সেই একটানা ভারি শব্দটা। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

গার্ড আর দাশ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ওই শব্দ তারা চেনে। কোথায় বনের গভীরে চোরাই গাছ কাটাই হচ্ছে। গার্ড বলে—শুনছেন স্যার। আমরা ঐদিকে ফিরবো জেনে রতনার লোকজন গেছে কয়মার জঙ্গলের দিকে। সেইখানেই কাটাই হচ্ছে।

রতনের ওখানে কয়েকজন লোককেও পাশের বনে ঢুকতে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে ফিস্‌ফাস করে কি সব কথা

বলে। রতন তার বশংবদ কিছু লোককে এই বিদ্যাটা শিখিয়েছে। তারা গাছ কাটাই করে নীচের ওদিকে হাটে, গঞ্জে নিয়ে গিয়ে বেচে আসে, আর রতনকে তার জন্য কিছু দালালি দেয়। দায়ধাক্কা হলে কোর্টঘর করতে হলে ওসব ঝক্কি সেই-ই পোয়াবে। দাশ বলেন।

—বৈকালেই উদিককার বনে একবার যেও।

ওরা বনের মধ্যে একটা বিপদ নিয়েই বাস করে। জঙ্গলের বাঘ-ভালুককে তাদের ভয় তত নেই, ভয় রয়েছে এই মানুষ জন্তুদের। চোরাকাটাই-এর দল মাঝে মাঝে বাধা পেয়ে কুড়ুল নিয়ে তেড়ে আসে। তারাও মরীয়া হয়ে যায়। ওদের ধরে কোর্ট কাছারিতে নিয়ে গেলে অনেকেই বলেন,—মাত্র দু'চারটে গাছ কেটেছে, তাতেই এই ?

আর বাধা পেয়ে প্রাণ বাঁচাতে যদি গুলীই চালাতে হয় তাহলে তো চাকরী নিয়ে টানাটানি। বলবেন, ট্যাক্টলেস। আর সুযোগ পেলে ওরা জখম করে যাবে, মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। বনের বিট অফিসার, গার্ড কর্মীদের তাই চিরন্তন বিপদের মধ্যেই বাস করতে হয় নানা ঝক্কি নিয়ে।

দাশ বলেন,—বনের জন্তু-জানোয়ারদের ভয় করি না। কতবার বাঘ-ভালুক-হাতীর সামনেও পড়েছি। কিন্তু ভয় করি এই সব মানুষ নামক জীবদের।

এ ধারণা আমারও আছে। বনে বনে ঘুরেছি। সুন্দর-বনের গহন গাঙ্ গহিন বনেও দেখেছি—তখন কোনো নৌকা দেখলেই প্রথমেই মনে হতো ডাকাতের নৌকা। ওরা এই নির্জন দূর বনে —নোনা গাঙ্-এ চড়াও হয়ে আমা-দের সব কেড়ে নিয়ে যাবে, প্রতিবাদ করলে গাঙ্-এর জলে ভাসিয়ে দেবে। কমেট, কুমীরের খাদ্য হয়ে উঠবো।

তাই চাইতাম যেন কোন নৌকা আর মানুষ না চোখে পড়ে। বনে ওদের দেখা পেয়ে কাজ নেই। ওরাও বনের গভীরে সেই মানুষদের এড়িয়ে চলে। বিপদও আসে অতর্কিতে।

তবু বনের মায়ায় এর সীমাহীন নির্জনতার রাজ্যে কোথায় এরা বন্দী হয়ে গেছে। বনের কানুনেই আছে—মানুষকে এ টানে। প্রবাদ আছে—সুন্দরবন এত যে ভীষণ, তবু একবার যে সুন্দরবনে গেছে, সে আবার যাবে। অযোধ্যার বনপাহাড়ের মায়ায় যে একবার জড়িয়ে যায়, সে আবার যাবে ওখানে। ওই বন ছেড়ে আসতে তার মন কেমন করবে। যারা এ মাটির মানুষ—তারা তো পারবেই না। তাই সাঁওতালরা বাইরে বড় একটা আসে না, যদিও হাটে নামে, পাহাড় থেকে দিনান্তের শেষ আলো নামবার আগেই, আবার তাদের ছায়ান্ধকার নানা ডুংরীতে ফিরে যায়। আকাশের তারাগুলো তখন জ্বলে ওঠে পার বনের ওপারের আকাশে। বাতাসে ওঠে মিষ্টি একটু সুবাস। বনবনে হাওয়া বয়—পাহাড়ী কোন ডুংরীতে দু'একটা বাতি জ্বলে, মনে হয় কে যেন আকাশপ্রদীপ জেলেছে।

বুধিয়াকে কথাটা বলেছিলাম।

সন্ধ্যার মুখেই সে এসেছিল বাংলোয়। হাতে নীচে থেকে সংগৃহীত একটা পোস্ট কার্ড। ওতে চিঠি লিখে বাঘ-মুণ্ডির হাটতলায় বটগাছে টাঙানো লাল বাক্সে ফেলে দিলে ওই চিঠিখানা ঠিক গিয়ে কোন্ দূর দেশে সিতাইকে খুঁজে বের করবে। সিতাইও এর আগে তাকে চিঠি দিয়েছিল কিন্তু কতোদিন হয়ে গেল আর তার খবর পায়নি সে।

—একটো চিঠি লিখে দিবি বাবু সিতাইকে ?

ওর দিকে চাইলাম। মেয়েটা বোধহয় বাইরে অপেক্ষা করছিল। একটু আগে এসেছিলেন নীচে বাঘমুণ্ডি থেকে এখানকার বি-ডি-ও। অল্পবয়সী একটি ভদ্রলোক—চোখে সেলফ্রেমের চশমা, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। তরুণ ভট্টা-চার্যকে প্রথম নজরেই ভালো লেগেছিল।

সঙ্গে ছিলেন ব্লক এগ্রিকালচারালের এক্সটেনশন অফিসার। তাঁরা পাহাড়ের উপরের সাঁওতাল চাষীদের দিকে নানা রকম নোতুন চাষের ব্যবস্থা করছেন। পাহাড়ি আলু এখানের মাটিতে ভালো হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভালো ফুলকপি ওঠে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। টম্যাটো বারোমাসই হতে পারে। কথাটা বলেছিলেন পাহাড়ের মুগাই সর্দারও।

শুধু একটু পথ-এর ব্যবস্থা আর জল। ফসল হবেক। ভালো দাম পেলে এরাও করবেক উসব।

কিন্তু এগ্রিকালচারাল অফিসার বলেন—

—এরা সেই গণ্ডী সেই সংস্কার ছেড়ে বেরুতেই চায় না। আলুর চাষ করার জন্য বীজ দিলাম—সার দিলাম। জোর করে আলু পোঁতা হল, রাতারাতি এরা সেই বীজ

নির্জন বনভূমি

আলু তুলে খেয়ে নিয়ে বলে—বনশুয়োরে খেয়ে গেছে। ব্যস দেখুন না, রাজ্য জোড়া মকাই আর সরষে বুনেছে। বলে, বাবার বাবাটো ও মকাই বুনেছিল—সরষে বুনেছিল। বাবাও তাই করেছিল। কাজ কি উসবে, আমিও মকাই-বাজরা, সর্ষে বুনবো ওই জমিগুলোনে।

মনে হয় ওদের মনের সেই শক্ত পর্দাটাকে সভ্য জগতের মানুষের প্রতি অবিশ্বাস আর অহেতুক সন্দেহই আরও শক্ত করে রেখেছে। ওরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না এই এদের কথায়। ওরা ঠকেছে শুধু, জানাই।

—আগে এদের জন্য আরও কিছু করা দরকার। পথ-ঘাট, চিকিৎসার ব্যাপারে সভ্যতা এদের দিয়েছে কতটুকু তা জানি না। নিয়েছে তার থেকে অনেক বেশী। তাই এরা সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। নিজেদের খোলসের মধ্যেই নিজেদের দুঃখ, অভাবটাকে মেনে নিয়েই পড়ে থাকে।

বি-ডি-ও ভদ্রলোকও এখানের সব সমস্যাগুলোকে দরদ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। বলেন—আমরা তো দেখছি এ সব। বুঝি, অনেক কিছু করা দরকার। জলের ব্যবস্থা তো চাই আগেই। আর রাস্তা। কিন্তু ওই পাহাড়ের রাস্তা নিয়ে গোলমাল রয়েই গেছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট বলে ওটা আমাদের, পি-ডবলিউ-ডি বলে আমাদের হাতে না এলে ওর মেরামত বা তৈরী করার কাজ আমরা করি কি করে? ও ছাড়া আমাদের ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমিত। আমরা বহু ক্ষেত্রে একেবারে অসহায়। করার ইচ্ছে থাকলেও হাত নেই। তবে এবার এ রাস্তা তৈরী হবে—সরকারও অযোধ্যা পাহাড়কে একটা হেলথ্ রিসর্ট করতে চান।

মনে হয় এ সবই অনেক দিনের কথা। নিজেদের সামান্য স্বার্থ আর দলের সমস্যা তার সমৃদ্ধির কথা ভাবতে গিয়ে তাঁরা বহু বৃহত্তর স্বার্থ আর কল্যাণকে পায়ের নীচে মাড়িয়ে চলেছেন। একটিমাত্র মানুষের এই সব দূরদৃষ্টি ছিল, কল্পনা ছিল। তিনি বিধান রায়। তিনিই গড়েছিলেন দুর্গাপুর শিল্পনগরী, কল্যাণী; তাঁর কল্পনার চোখে এই বনপর্বতঘেরা অযোধ্যা পাহাড় একটি সুন্দর মনোরম শৈলনিবাসে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে রূপদেবার সময় তিনি পান নি।

তাই অযোধ্যা পাহাড় তেমনি আদিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর জীবনযাত্রার মধ্যেই সুপ্ত রয়ে গেছে। কাছাকাছি বলতে নেতারহাট। বিহার সরকার তাকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। মনোরম ছবির মত হয়ে উঠেছে সেই পর্বতশিখর; যার সব কিছুই সম্ভাবনা রয়ে গেছে এই অযোধ্যা পাহাড়ের।

জানি না, কবে এর দিন বদলাবে, এই বনপর্বতের রূপ মানুষের সামনে আনবে শান্তির আশ্বাস। বিশ্রামের আনন্দ।

তাই এখানকার জীবন আর মানুষগুলো তেমনিই রয়ে গেছে নিজেদের সুখ-দুঃখ আর তুচ্ছ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়ে।

—বাবু।- - -

কথাগুলো ভাবছিলাম। চাঁদ তখনও ওঠেনি। পূর্ণিমার কয়েক দিন পরের রাত্রি। চাঁদ এটু দেরীতে উঠবে। তার অস্তিত্বটুকু পাহাড়ের মাথায় সবে প্রকাশ পাচ্ছে। ঝিঁঝি ডাকে, জোনাকী জলে বনরাজ্যের জমাট অন্ধকারে। বুধিয়ার ডাকে ফিরে চাইলাম।

রাজু হ্যারিকেন জেলে দিয়ে গেছে। ম্লান আলোয় ওর দিকে চাইলাম। হাতের পোষ্ট কার্ডটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে বুধিয়া—সিতাইকে একটো চিঠি লিখেদে কেনে?

মেয়েটার মুখে-চোখে কি বেদনার ছায়া। দুপুরের দেখা সেই মাথাই মাঝির কথা মনে পড়ে। সেও এমনি অসহায় অন্তহীন প্রতীক্ষায় রয়েছে তার সব হারিয়ে। কিন্তু তার তুলনায় বুধিয়ার অনেক কিছু আছে। জমি জারাত, ঘর যৌবন—যার জন্য অনেক পুরুষই তার কাছে আসবে। তার কাছে আসার চেষ্টাও করছে। ওর নিটোল পুরুষ্ট সুন্দর দেহটাকে ঘিরে অরণ্যের শ্যাম সজীবতা উন্নত বুকের রেখায় যৌবনের উন্মাদনা, ও চায় সেই সিতাইকে। কিন্তু সে চাওয়ার মধ্যে কোনো সত্য আজ নেই, এই কথাটাই সে বুঝতে পারেনি।

জবাব দিই—সে পালিয়ে গেছে, তবু তার জন্যই এত কাঁদিস কেন?

বুধিয়া আমার দিকে চাইল। কালো ডাগর দু'চোখে শাওন মেঘের কালো ছায়া নেমেছে, ওই রাতের অন্ধকারে থমথমে পাহাড়ের নির্জনতার ছায়া ওর মনে। বলে চলেছি। ও সব পাগলামী ছেড়ে দিয়ে আবার বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার কর। কতো ভালো ছেলে আছে তোদের মধ্যে, তাদেরই একজনকে দেখে-শুনে বিয়ে কর।

হঠাৎ শান্ত কালো পাহাড় বনের মাথায় যেন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, গুরু গুরু কাঁপছে আকাশ-বাতাস। ঝড় উঠেছে কোথায়। অস্ফুট কণ্ঠে বুধিয়া আর্তনাদ করে ওঠে—বাবু!

ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ওর দিকে চাইলাম। সেই কমনীয়তার আড়ালে এমনি কঠিন একটি সত্তা লুকোনো ছিল তা জানতাম না। মেয়েটি বলে।

—সাঁওতালদের মধ্যে কুন মেয়ে একপুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গেলে তাকে সাতাশীর মজলিসে গাঁয়ের বসতির বাইরে করে দেয়। তাকে বলে লষ্টা। বংহা-বুরু কেউই তাকে বাঁচাতে পারে না। শুনেছি বটে পড়ালিখা জানা মেয়েগুলান ইসব করে। সাঁওতালরা করে না। উ কথা কাখুকেই বলিস না কুনদিন। হ্যাঁ—

বুধিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। সতেজ বলিষ্ঠ দেহটা কঠিন হয়ে ওঠে। অজানতেই ওকে বোধহয় চরম অপমান করেছি। দাঁড়াল না সে। বের হয়ে গেল বাংলোর বাইরে, আবছা অন্ধকারে তাকে আর দেখতে পাই না। পাইনবনের আড়ালে হারিয়ে গেল।

মনে হয় ওই যুবক অফিসারের কথাগুলো সত্যিই। ওরা কোনো পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারে না। পাথরের মত কঠিন ওরা—সবুজের অন্তরালে সে কাঠিন্য ওদের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে আছে। বুধিয়ার মনের অতলেও সেই ঋজু বলিষ্ঠতা আমি দেখছিলাম। শহরে মন নিয়ে ওর স্বার্থের দিকে চেয়েই ওই কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রাত্যাহিক জীবনে যারা অভাবটাকে আমল দেয় না—অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না, তাদের কাছে এই প্রয়োজন অতি সামান্যই। তার জন্য নীতিকে বিসর্জন দিতে তারা পারে না।

শহরের মানুষ তা পারে। ওদের কাছে সত্য আর নীতির দাম বোধহয় কানাকড়িরই সমান। এদের কাছে সেইটাই অনেক বেশী মূল্যবান। বুধনিও সেই সত্যটাকে আমার সামনে প্রকাশিত করে গেল। নিজেকে তাই অনেক ছোট বলেই বোধহয় ওর সামনে।

অযোধ্যা পাহাড়ে আজকের রাত্রিই আমাদের কাছে শেষ রাত্রি। কয়েক দিন-রাত্রি কাটিয়েছি এই বন-নির্জনে, পার্বত্য ভূমিতে। শান্ত স্তব্ধ এ রাত্রি—কাল ফিরে যাবো আবার সেই বাতিআলা চোখ ঝলসানো কর্মব্যস্ত জগতে। সেখানকার মানুষগুলো শুধু শুধু দৌড়ায় আর সামান্যতম স্বার্থহানিতেই উন্মাদ পশুর মত ঝগড়া করে। এখানে ট্রাম, বাস নেই, পয়সাও ছড়ানো নেই, যার বখরার জন্য মানুষ দিন-রাত পশু হয়ে থাকবে। সব চেয়ে বড় কথা মানুষ নেই, তাই এ জগৎ শান্তির মধ্যে ডুবে আছে, সেই আদিম ন্যায়-অন্যায়ের বোধ নিয়ে, আর অন্তরের ভালোবাসা প্রেমটুকুকে পাথেয় করে।

এদের সর্দার মুশাই মাঝিকে দেখেছি—ভগ্নপ্রায় অবস্থা। রাজ্য গেছে, সম্পদ গেছে, বন গেছে। তবু কোনো দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই। যা পেয়েছি তাই ঢের, এই মেনেই সে শান্ত, তৃপ্ত। পাহাড়ের মানুষগুলোর জন্য তার বেদনা, তাদের ভালোর জন্য তাদের সুখ দেখার জন্য সে ব্যাকুল, দেখেছি আমাদের চৌকিদার রাজুকে। দিন-রাত দৌড়ে দৌড়ে কাজ করছে। কোনো দাবী নেই—চাওয়া নেই।

বুধিয়াকেও দেখেছি, তার কথায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। ভালবাসার এই মূল্যবোধ আজকের সভ্য মানুষের কাছে নিছক পরিহাসের বস্তু, কিন্তু এদের কাছে তার মূল্যবোধ স্বতন্ত্র। ওর দুঃখ-বেদনা নিয়ে সে স্বপ্ন দেখবে। বনে বনে পাতা ঝরবে, শীতের শেষে রং বদলাবে বন-পাহাড়ের। বাতাসে জাগবে মহুয়া কুরুবকের মদির গন্ধ, ভ্রমর, মৌমাছির দল গুণগুণ করবে; বর্ষার কালো মেঘের দল বন-পাহাড়ের গায়ে ক্লান্ত চোখের জলে শাওনধারা আনবে, ডেকে উঠবে ময়ূরের দল—ওই মেয়েটা তখনও কার পথ চেয়ে থাকে ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়ে।

ওর চিঠি লিখে দিতে পারিনি, মনে হয় অপরাধই করেছি।

রাত কতো জানি না। আজকের রাতটা যেন খুব ভালো লাগে।

বন-বিভাগের বন্দী এই ছেলেদের কথা মনে পড়ে। সভ্য জগৎ থেকে এসেছে ওরা—এখানে তাদের সঙ্গে সভ্য জগতের সম্পর্ক বলতে ওই তিনদিনের বাসি সংবাদপত্র আর ট্রানজিস্টার রেডিও।

ওরা বলে আমরা সভ্য জগতের খাতায় বাতিল হওয়া কয়েকটি প্রাণী। অবশ্য তার জন্য তাদের দুঃখ নেই। যদিও বা থাকে, সেটা সাময়িক। বলে কলকাতায় গেলে হাঁপিয়ে উঠি লোকজনের ভিড়, আর ওই কারণ-অকারণে বোমা-ছুরি-মারামারির কথা শুনে। ট্রামে-বাসে উঠতেও পারি না। মনে হয় এই বনই ভালো—এখানেই ফিরে এসে ভাবি বহু দিন যেন এ জগৎ থেকে বাইরে ছিলাম। কি হারিয়েছিলাম সেখানে, এখানে এসে আবার সেটা ফিরে পাই।

তবু ওদের মনে এই সঙ্গকামনার সাধ মুছে যায় নি। ওরা বলে—থেকে যান আরও দু-চারদিন।

কিন্তু আমাদের উপায় নেই। নাগপাশে জড়িয়ে আছি, মুক্তির স্বপ্ন আমাদের কাছে অর্থহীন।

রাতের অন্ধকারে জেগে উঠেছে বনরাজ্য। পাখীগুলো ডাকছে—একদল হরিণের চোখ জ্বলে বনের অন্ধকারে—হরিণ ডাকে, ময়ূর কলরব করে। পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে চাঁদটা কখন আপন মনে এই বনরাজ্যের আতিথ্য গ্রহণ করেছে—ভালোবেসেছে এই বনপাহাড়, পাইন, শালবনকে। তার সেই ভালবাসা ছড়িয়ে পড়েছে রংবাহার নিয়ে। শির-শির শিহর জাগে ইউক্যালিপটাস বনে।

ভোরের আলো এসে পড়েছে জানলার ফাঁক দিয়ে—লাল আবীরের আভায় পাহাড়-সীমার ললাট রঞ্জিত, ওখানে এই ফাগ্ খেলা চলবে প্রতিদিন, পাখীগুলো কলরব করবে—বাতাসে উঠবে ভিজে বনভূমির স্বাদ; গরু-মোষের গলার কাঠের ঘণ্টা বাজবে অলস মন্থর সুরে। সবুজ ক্ষেতে ফুটে থাকবে ঘন হলুদ সরষে ফুলগুলো, এ রাজ্যে আমি ক'দিনের জন্য এসেছিলাম শূন্য মন নিয়ে, ফিরে গেলাম কি পূর্ণতার স্বাদে তৃপ্ত হয়ে।

মনে হয় দেবতার মহাকাব্যের দেশে এসেছিলাম, হঠাৎ পথভুলে মানুষগুলো এখনও সৎ, তাদের ভালোবাসার কথাও মনে থাকবে। হঠাৎ উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে আরণ্যক-এর নাঢ়াবইহয়া লবটুলিয়ার দিনগুলো ফিরে এসেছিল, আর তাকে দেখবার চোখ পেয়েছিলাম সেই দৃষ্টির স্বাদের মধ্যে।

তাই অযোধ্যার এই বনরাজ্য তার বিভীষিকা, অসুবিধা আর আদিম বন্য-জীবনের দুঃখের মধ্যেও সুন্দর হয়ে আছে। সভ্য মানুষের জন্য এরা আমন্ত্রণ জানায়—যাতে আজকের আদর্শে গড়েওঠা লোভী মানুষ ক'দিনের জন্য এসেও জীবনের প্রকৃত চাওয়া আর শান্তির স্বরূপটাকে চিনতে পারে।

এ মন নিয়ে গেলে মনে হবে অযোধ্যা পর্বত, বন অপরূপ সুন্দর, সত্য।

জিনিষপত্র বাঁধা হয়ে গেছে। আজই ফিরে যাবো পুরুলিয়া শহরে এই পাহাড় থেকে নেমে। তারপর হারিয়ে যাবে জনারণ্যে ছায়ানিবিড় বনসমাকীর্ণ এই পাহাড় পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে খুশীতে উপছে পড়া এর টুর্গা জলপ্রপাত বামনি ধারা তেমনই বয়ে চলবে, দিন কেটে যাবে এই উপ-ত্যকায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে। পাখী ডাকবে—বন্য জানোয়ার-এর দল বের হবে ধান-মকাই-এর ক্ষেতে, আরক্তিম সকাল, অপরূপ সন্ধ্যা, রহস্যময়ী রাত্রি নামবে এর বুকে।

আমরা তখন বহু দূরে। এ রাজ্য ভুলে যাবে দু'দিনের যাত্রীকে। সে তখনও মহানগরীর পথে পথে কর্মব্যস্ত-জীবনের ফাঁকে একটুকু স্নিগ্ধতার অনুসন্ধান করবে—মনে পড়বে এই অযোধ্যার বনভূমির কথা।

জিপটা এসে গেছে—আমাদের ফেরার বাহন।

দেখি জিপ থেকে নামছেন স্বয়ং লাবণ্যপ্রভা দেবী। বৃদ্ধা এই বয়সেও ভোর থেকে উঠে এই শীতের ঠাণ্ডায় পাড়ি দিয়ে উঠে এসেছেন পঞ্চাশ মাইল পথ ঠেলে, এই আড়াই হাজার ফিট পাহাড়ের মাথায়। বলেন——ছেলেদিকে বনবাসে রেখে গেছলাম—নিতে এলাম বাবা।

আলোভরা সকাল—শিশির ঝলমলে চামর দোলানো পাইন বনে—শাল-মহুয়ার মাথায় পাহাড়ে পাহাড়ে জেগেছে দিনের আলো।

সভ্য জগতের মানুষের জন্যও কোথাও বোধহয় ঠাঁই ঠাঁই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সবুজ স্মৃতি রয়ে গেছে। তাই মানুষ আজও মরে নি।

বন-বিভাগের ছেলেরা, গার্ড---অনেকেই এসেছে বিদায় জানাতে। ওদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। ক'দিন বেশ ছিলাম। জিপটা বের হয়ে আসছে, বাজরা ক্ষেতের ধারে দেখি দাঁড়িয়ে আছে বুধিয়া---কালো নিটোল মেয়েটা, দীঘল চাহনি মেলে চেয়ে দেখছে। ওর দু'চোখে এই বনরাজ্যের প্রাণময় শ্যামলতা।

আজও বোধহয় সে সিতাই-এর পথ চেয়ে আছে। সিতাই আজও ফেরার, সে ফেরেনি সেই সবুজের জগতে।

আমরা সেই বনজগৎ থেকে ফেরার হয়ে গেলাম। জিপটার আর্তনাদে বনভূমির নিস্তব্ধতা খান্‌খান হয়ে যায়। নীচের সমতলের দিকে নামছি আমরা---পিছনে পড়ে রইল সেই ছায়া-তীর---আর তার মানুষগুলো।

॥ সমাপ্ত ॥

স্বীকৃতি

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কোন্ এক সুদূর অতীতে, জীবনের প্রথম প্রভাতে
জানি না কখন শুনেছিনু কোন গান;
গান শুনে উঠেছিনু জেগে,
দেখেছিনু চেয়ে ঊষার আলোকচ্ছটায়
বিচিত্র এই ধরণীর বিচিত্রতর রূপ,
আমার একান্ত অজ্ঞাতে।
ভালো যেন লেগেছিল সব—
বিপুল এই ধরণীর যত কলরব;
যেন ভালবেসেছিনু তারে—
যে আমারে দিয়েছিল ঠাঁই,
করুণার স্নেহস্পর্শ দিয়ে
পরিচয় দিল যে করায়ে,
এই মাটি, এই জল, এই সব মানুষের সাথে
সেদিন সে প্রথম প্রভাতে।
তারপর কত দিন, কত বর্ষ হয়ে গেছে গত,
কৈশরের সীমা ছেড়ে যৌবনে হয়েছি উপনীত;
শৈশবের সুখ বিজড়িত
আনন্দের দিনগুলি ফেলে,
জীবনের কালস্রোতে পার হয়ে আসিলাম চলে
কঠিন কর্তব্য ঘেরা সংসার আবর্ত মাঝে
সুখ-দুঃখ, বেদনাকাতর,
হিংসাদ্বেষ যেখানে বিরাজে।
আবার নূতন করে চিনিতে হইল সবই
জীবনের মাঝে একি জীবনের অদ্ভুত প্রতিচ্ছবি।
বিশাল এ পটভূমে দেখিলাম আমি
মানুষের মাঝে শুধু মানুষের মেলা
প্রাণহীন মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা।
জীবনের সর্ব ব্যাকুলতা দিয়ে
তারে আমি যতবার দিয়েছি ফিরায়ে,
ততবার আমারে বাঁধিবার পেয়েছে প্রয়াস
ছলনার অট্টহাসি হেসে।
আমি শুধু কালক্ষণ গুণি,
সময়ের সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া নিয়ত,
যাত্রা করিয়াছি সুরু অসীমের মাঝে অবশেষে।
এখানেও কাটে দিন একান্ত একেলা;
ফেলে আসা দিনগুলির
লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলাতে
কেটে যায় বেলা।
এখানে নতুন করে জীবনের পেতেছি পরিচয়,
কতখানি গেছে অপচয়ে, কতটুকু রহিল সঞ্চয়
তাহাদের তরে, যাহারা রহিল পশ্চাতে।
যদি ব্যর্থতার হতাশ্বাস হেথা ওঠে ফুটে,
মনে হয় নিষ্ফল হয়েছে গাওয়া গান;
তবে সকাতরে বলে যাই আজ,
জীবন অতীত তীর হতে
ব্যর্থ আর ইতিহাসখানি যদি কেঁদে ফেরে,
তবু এতটুকু করুণার আশীর্বাণী
পাই যদি তাহাদের কাছে,
হাসিমুখে চলে যাবো বিশ্বসভাতলে,
ফিরিয়া আসিব আমি চির ঈপ্সিত
ভারতীর শ্বেত শতদলে।

আট বছর আগে

ভৌতিক রহস্য

নারায়ণ চক্রবর্তী

বিকেল বেলা থেকেই আকাশের ঘোলাটে চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল আর তার সঙ্গী ছিল ছুঁচের তীক্ষ্ণতা-মাখা শীতের বাতাস। শূন্যের অঙ্গন থেকে হা-হা করা অপরিসীম শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ছিল দিকে দিকে।

মেট্রোতে শেষ শো'র ছবি দেখে চৌরঙ্গীর প্রশস্ত পথে দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায় সীতাংশু। কালো কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে এতক্ষণে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে আকাশটা। অশ্রুবর্ষণের পালা শেষ, তবু নৈশ বাতাসের সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে তার তুহিন নোনা স্পর্শ।

চিনি মাছের পিঠের মতো তেলালো চকচকে কালো চৌরঙ্গীর রাস্তায় অনেকক্ষণ পরে পরে দু' একটা ট্যাক্সি যেন উড়ে চলেছে।

বর্ষাতির কলারটা উল্টে দিয়ে কান পর্যন্ত ঢেকে দেয় সীতাংশু। ফেল্ট হ্যাটের মাথায় চাপ দিয়ে নামিয়ে নেয় ইঞ্চি কয়েক। সদ্য দেখে আসা ছবিটার রোমাঞ্চের শিরশিরানি এখনো যেন ওর মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বিভীষিকা-ভরা ছবিটার কোনো কোনো অংশ এখনো ওর মস্তিষ্কে পাক খাচ্ছে।

সীতাংশুর পায়ে দামী কোম্পানীর জুতো। চলতে শব্দ হচ্ছে না একটুকুও। পার্কস্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসে পকেট থেকে সিগারেট কেসটি বার করে একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটে চেপে ধরে সীতাংশু। লাইটারটা জ্বালতে যাবে, এমন সময়ে কে যেন প্রচণ্ড এক চাপড় মারে ওর পিঠে। অনেক দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসে,—"কী রে সীতাংশু, কলকাতা এলি কবে?"

ভীষণভাবে চমকে ওঠে সীতাংশু। হাত থেকে লাইটারটা পড়ে যায় মাটিতে, নিচু হয়ে সেটা তুলে নিয়ে পিছুন ঘুরে তাকিয়ে দেখে—দামী স্যুটপরা এক দীর্ঘ মূর্তি গগলস্-এর ভেতর দিয়ে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর অ্যামেরিকান ফেল্ট হ্যাটটি এমনভাবে নিচু হয়ে ওর ভ্রূদুটি ছুঁয়ে আছে যে, অদূরের ল্যাম্প পোস্ট-এর অকৃপণ আলোতেও ওর মুখখানি দেখা যায় না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সীতাংশু মস্তিষ্কের স্মরণ কেন্দ্রে অস্পষ্ট স্মৃতির গুঞ্জরণ ওঠে।

"চিনতে পারলি না তো,—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—"সীতাংশুর চেনার অপেক্ষাতেই যেন কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে শেষে জনহীন রাজপথ কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে আগন্তুক, ডান হাত তুলে টুপিটা দেয় ওপরের দিকে ঠেলে, আর অমনি আড়াল করা বিদ্যুতের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর সারা মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো পরিচয়ের আলো পৌঁছুল সীতাংশুর অন্ধকার মনে।

হাত বাড়িয়ে সীতাংশু বলে ওঠে, —"কী আশ্চর্য তুই, বিমল।"

সীতাংশুর প্রসারিত হাতটা চেপে ধরে বিমল বলে,—"ওঃ কতোকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা—"

বরফের মতো ঠাণ্ডা বিমলের হাত। সেই শৈত্যের স্পর্শ সীতাংশুর হাত বেয়ে ওপরে উঠে হৃৎপিণ্ডটাকে চেপে ধরে। অশুস্তিবোধ করে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় সীতাংশু। তবু সঞ্চরণমান কীটের মতো একটা অনির্দেশ্য অনুভূতি তার দেহে-মনে রোমাঞ্চ আনে।

একটু থেমে সীতাংশু বলে,—"তা বছর আটেক তো হবেই। আট বছর আগে এক ডিসেম্বরের শীতে কলকাতা ছেড়ে ছিলাম আর ফিরলাম আজ সকালে—"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সীতাংশুর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল বিমল, ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে,—"তা হলে এই আট বছর ধরে কলকাতার কোনো খবর তুই রাখিস না?"

"কী করে রাখবো বল"? আস্তে আস্তে সীতাংশু বলে,—"কলকাতা ছেড়ে প্রথমে গেলাম মালয়ে, সেখান থেকে সুমাত্রা, তারপর ইন্দোচীন। বারো দেশ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আটটা বছর যে কোনদিক দিয়ে কেটে গেল, টেরই পেলাম না। শেষটায় মাসখানেক আগে ইন্দোচীন মেডিকেল মিশনের সঙ্গেকলকাতা আসবার প্রস্তাবটা পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। চলে এলাম ওদের সঙ্গে।"

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে বিমল, তারপর হঠাৎ সচকিতে সীতাংশুর

মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—"হ্যাঁ শুনেছি তোর নাম, মানে পড়েছি আজকের কাগজে। এখন যাচ্ছিস কোথায়?"

"পার্ক স্ট্রীটে আস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে ইন্দোচীন সরকারের তরফ থেকে, ওখানেই উঠেছি আমরা"—মৃদুস্বরে সীতাংশু বলে, তারপর একটু ইতস্তত করে বলে,—"ও, মানে কল্যাণী ভালো আছে তো?"

পলকের জন্য যেন বিমলের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, পরক্ষণেই লঘুকণ্ঠে হেসে ওঠে সে। ডান হাত দিয়ে সীতাংশুর বাহু চেপে ধরে বলে,—"চল না আমার সঙ্গে দেখে আসবি ওকে। এতদিন পরে তোকে দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবে ও—"

সীতাংশুর মনে হল যেন বিমলের হাত নয়, একটা লোহার সাঁড়াশী চেপে ধরেছে ওর বাহু। তারই কঠিন নিষ্পেষণে বিদ্যুৎ স্পর্শের মতো তীব্র যন্ত্রণাবোধ হাতটাকে অসাড় করে ফেলে।

কিন্তু একবার অন্তত কল্যাণীকে না দেখে, তার সঙ্গে দুটো কথা না বলে কী করে ফিরে যাবে সীতাংশু? একদিন ঐ নামটা মনে হতেই যে অব্যক্ত বেদনার তীর তার হৃদয়কে বারংবার বিদ্ধ করতে থাকতো, বহুদিনের ভুলে-থাকা সেই রকম ব্যথায় ঠিক তেমনি-ভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে সীতাংশুর বুক।

আর কোনো কথা না বলে নীরবে বিমলের সঙ্গ নেয় সীতাংশু।

কল্যাণী। এই নামটা ভুলবার জন্য এই দীর্ঘ আট বছর ধরে কত-না চেষ্টা করেছে সীতাংশু। এই নামটাই তো ওকে দেশ থেকে দেশান্তরে তাড়া করে ফিরেছে। তারপর দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর সীতাংশু যখন ভেবেছিল যে অতীতের ঘুম বুঝি আর ভাঙবে না, জেগে উঠে আর রক্তাক্ত করবে না তার হৃদয় ক্ষতকে, ঠিক তখনি কি না দেখা হয়ে গেল বিমলের সঙ্গে।

নিশিতে-পাওয়া মানুষের মতো বিমলের সঙ্গে হাঁটতে থাকে সীতাংশু। কেউ আর কোনো কথা বলছে না, জনহীন রাজপথ তাদের ছায়া দুটো পাশে থেকে পেছনে, ছোটো থেকে বড়ো হতে হতে বিরাটকায় দৈত্যের মতো হয়ে আসে, পাশের ওৎপাতা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে থাকে।

অতীত স্মৃতির রোমন্থনে তন্ময় সীতাংশু বুঝতেই পারে না, কোন্ কোন রাস্তা দিয়ে কতক্ষণ ধরে বিমলের সঙ্গে হাঁটছে। সারা পথে একবারের জন্যও মুখ খোলে নি বিমল। লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা সুমুখের দিকে তাকিয়ে হেঁটে চলেছে সীতাংশুর পাশাপাশি। ওর দামী চেস্টারফীল্ডের গায়ে আটকে থাকা বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জলে ল্যাম্প পোস্টের আলো পড়ে চিক চিক করে। জনহীন প্রশস্ত রাজপথের দু'ধারে সারিবদ্ধ অট্টালিকা শ্রেণী শীত রাত্রির অন্ধকারে যেন গুটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। কৃচিৎ কখনো দু'একটি লোক সুরার প্রভাবে স্খলিত চরণে এলোমেলো পথে চলেছে।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে একটা প্রায়ান্ধকার গলিতে ওরা ঢোকে। চুন-সুরকী খসে পড়া দগদগে ঘাওয়ালা একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামে বিমল।

সীতাংশুর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে চার পাশে তাকিয়ে বলে ওঠে,—"এ কোথায় এলাম বিমল?"

সে কথার কোনো জবাব দেয় না বিমল। কয়েক পা এগিয়ে সুমুখের বন্ধ দরজার কড়া দুটো নাড়তে থাকে সে।

অনেক দূরের ল্যাম্প পোস্টের ক্ষীণ আলো জায়গাটাকে আলো-আঁধারীতে ঘিরে রেখেছে। সুমুখের দোতলা বাড়িটার সবগুলো জানালাই বন্ধ, কোথাও একটু আলোর ইসারা নেই। চেয়ে থাকতে থাকতে সীতাংশুর মনে হল যেন বাড়িটার সর্বাঙ্গ থেকে একটা ঘনতর শৈত্যপ্রবাহ ওর রক্ত, মাংস, অস্থি মজ্জায় ঢুকে পড়েছে আর একটা অননুভূতপূর্ব শিহরণ তুলছে সমস্ত শরীরে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা অল্প নিচু করে কড়া নেড়ে চলেছে বিমল, খট্ খট্ খটা খট্। চারদিকের অতন্দ্র স্তব্ধতার কঠিন নিষেধ যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সীতাংশুর মনে হল যেন কাছাকাছি সবগুলো বাড়ির জানালা খুলে কতকগুলো বিরক্ত মুখ উঁকি দেবে নিচের রাস্তায়, আর তাদের মোলায়েম তন্দ্রা-বিজড়িত চোখে জ্বলে উঠবে অসন্তোষের আগুন।

কিন্তু না, কিছুই হল না। কুয়াশার ভারী বায়ুস্তরে শব্দের ঢেউগুলো দূর থেকে দূরান্তরে গিয়ে মিলিয়ে গেল এক সময়ে। আবার আগের মতোই মৃত্যুর স্তব্ধতা ঘিরে ধরল তাদের চারপাশ।

এখানে দাঁড়িয়ে বিমলের পেছনটাই শুধু দেখতে পায় সীতাংশু। কলার ওল্টানো ওভার কোটের অনেকখানি ঢেকে ছড়িয়ে আছে ফেল্ট হ্যাটের চওড়া প্রসারিত শেষ অংশটুকু। বিমলের ঐ অনড় দীর্ঘ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা নাম না-জানা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে সীতাংশুর মন। কে যেন তার কানের কাছে ফিসু ফিসিয়ে বলতে থাকে,—"পালাও, পালাও—"

কিন্তু কিছু একটা ঠিক করবার আগেই ভেতরের দিক থেকে ঘড়াং শব্দে খিল খুলে যায়। খোলা দরজা দিয়ে ঢোকা আলো রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে একেবারে সীতাংশুর পা ছুঁয়ে। চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা নারী মূর্তির দিকে সম্মোহিতের মতো স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে সীতাংশু। এক মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায় দীর্ঘ আট বছরের ব্যবধান। তার কণ্ঠ চিরে একটা উল্লাস ধ্বনি বেরিয়ে আসে—"কল্যাণী"।

মৃদু হাসে কল্যাণী। বহুদিন আগে দেখা সেই অতি পরিচিত এবং অবিস্মরণীয় হাসি দেখে দুলে ওঠে সীতাংশুর বুক। শরীরের সব রক্ত যেন মুখে এসে জমা হয়। কান দুটো দিয়ে আগুন ছুটতে থাকে।

পিছিয়ে এসে সীতাংশুর হাত ধরে বিমল, বলে, "আয় সীতাংশু—"

দোতলার বসবার ঘরে ওদের দুজনকে বসিয়ে রেখে পাশের ঘরে

ইলেকট্রিক স্টোভে চা করতে গেছে বিমল। যাবার আগে ওদের দিকে চেয়ে যে বাঁকা হাসিটুকু ছড়ে দিয়ে গেল তা লক্ষ্য করে আট বছর আগেকার একটি দিনে পৌঁছে যায় সীতাংশু। সেদিনেও ওদের দু'জনাকে এক ঘরে বসিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল বিমল এমনি বাঁকা হাসি হেসে। সেদিনের সেই দুর্লভ নির্জন মুহূর্তটির সদ্ব্যয় করতে পারে নি সীতাংশু তাকাতে পারে নি কল্যাণীর চোখের দিকে, প্রেমের সুনিবিড় স্নিগ্ধতা উবে গিয়ে সে চোখ দু'টি দিয়ে মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। তার রোষ-রক্তিম মুখ থেকে গন্‌গনে আঁচ লাগছিল সীতাংশুর গায়ে, আর তার ঘনকম্পিত নাসারন্ধ্রের দুরন্ত ঝড় যেন উড়িয়ে নিতে চেয়েছিল তাকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সীতাংশু, পাশে বসা কল্যাণীর মুখের দিকে তাকায়। না, শান্তমুখে তারই দিকে অপলক চোখে চেয়ে আছে কল্যাণী। আশ্চর্য! সুদীর্ঘ আট আটটা বছর সামান্যতম আঁচড়টুকুও কাটতে পারে নি কল্যাণীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখে। ঠিক তখনকার মতোই অর্ধস্ফুট কমল — কলিকাটির মতো মুখে স্নিগ্ধ পবিত্রতা মাখা।

সহসা নিজের মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নটার মতোই টকটকে লাল সিন্দুর রেখাটির ওপর চোখ দুটো আটকে যায় সীতাংশুর। বিদ্যুতের আলোপড়া চিকচিকে কালো সিঁথি চিরে সরু ঐ সিন্দুর রেখাটির প্রতি বিন্দুর গায়ে লেখা আছে সীতাংশুর পরাজয়ের কাহিনী।

দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখার মতো শীর্ণ হাসি খেলে যায় কল্যাণীর মুখে। রক্তিম ওষ্ঠের খাপ খুলে ঝিলিক দিয়ে ওঠে শাণিত ঝকঝকে তলোয়ারের মতো একসার দাঁত। মৃদুস্বরে কল্যাণী বলে,—"তোমার সে অসুখটা সেরে গেছে তো"?

"অসুখ, আমার? কোন্ অসুখ?" বিভ্রান্ত মনে আশ্চর্য চোখে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে সীতাংশু বলে।

"সেই যে —"বলে এক মুহূর্তের জন্য যেন দ্বিধা করে কল্যাণী, তারপর ফিস ফিস করে বলে,—"সি ফি লি স?"

"সিফিলিস?" ভয়ানক চমকে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে সীতাংশু, তীব্রস্বরে বলে,—"তুমি বলছ কি কল্যাণী? পাগল হলে নাকি?"

হঠাৎ পাগলের মতোই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে কল্যাণী,—পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতারের সবগুলো তার যেন একসঙ্গে ঝংকৃত হয়ে ওঠে।

আট বছর আগেকার সেই সর্বনাশা সন্ধ্যার রহস্যের কুহেলী একটু যেন ফিকে হয়ে ওঠে। ব্যগ্র পদে এগিয়ে এসে কল্যাণীর কাঁধ দুটো চেপে ধরে নাড়া দিতে দিতে তীব্র কণ্ঠে বলে চলে সীতাংশু,—"এই মিথ্যা ধারণাটাই কি আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল সেদিন? বলো বলো কল্যাণী, কে তোমার মনে এই মিথ্যা সন্দেহের বীজ বুনে দিয়েছিল?" গভীর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সীতাংশুর গলা।

নাড়া খেয়ে গলার চারদিকে জড়ানো আঁচলটা খুলে খসে পড়ে যায় কল্যাণীর কোলের ওপর, আর সেই শুভ্র মরাল গ্রীবার ওপর চোখ দুটো আটকে যায় সীতাংশুর। হিম হয়ে যায় সমস্ত শরীর, অসাড়ের মতো ঝুলে পড়ে তার হাত দুটো।

কল্যাণীর গলার চারদিকে গভীর কালো দাগ, যেন একটা কাল কেউটে বেষ্টন করেছে তার গলাটা।

সোফার পেছনে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়েছে কল্যাণী। সুগভীর শ্রান্তিতে চোখ দুটো বোঁজা। নিশ্বাস পড়ছে কিনা, বোঝা যায় না।

উৎকণ্ঠিত সীতাংশু কল্যাণীর এলিয়েপড়া ডান হাতটি তুলে নেয় নিজের হাতে। নাড়ি দেখে। জীবনের স্পন্দন অনুপস্থিত সেখানে।

একটা অতিপ্রাকৃত অনুভূতির ছোঁয়ায় সীতাংশুর গায়ে কাটা দেয়। খাড়া হয়ে ওঠে মাথার চুল।

ঠিক তখনি পিছনে মৃদু শব্দ শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়ায় সীতাংশু। নিচু হয়ে তিনটে পেয়ালা সহ চা-এর ট্রে-টি টি-পয়ের ওপরে রাখছে বিমল। উর্ধ্ব চোখে সীতাংশুর আঁৎকে বেঁকেযাওয়া মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে নিজের মনেই হাসল সে।

কল্যাণীর কাছে গিয়ে তাকে মৃদুভাবে নাড়া দেয় বিমল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকায় কল্যাণী। সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখে বিচিত্র দৃষ্টিতে চা-এর পেয়ালাগুলির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে সে।

একটা ক্রূর হাসি খেলে যায় বিমলের মুখে,—বলে,—"এক কাপ চা খাবে নাকি কল্যাণী?"

কল্যাণীর দুচোখে আতংক জাগে। সবেগে হাত-মাথা নেড়ে বলে,—"না, না, না—"

"তবে আমিই খাই,—" সীতাংশুর দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বিমল বলে। তারপর সোফায় আরাম করে বসে একটা চা-এর পেয়ালা তুলে নেয়। দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলে,—"আঃ" —

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে কল্যাণী! তার হাত দুটো বোড়ো হাওয়ার গাছের পাতার মতো থর থর করে কাঁপে।

হঠাৎ বিমলের দিকে চোখ পড়তেই লাফিয়ে ওঠে সীতাংশু। বিমলের সারা শরীর যেন কিসের কঠিন যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঠোঁটের দুই কোণে ফেনপুঞ্জ।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরেই স্থির হয়ে যায় বিমলের শরীর। তার আধবোঁজা নিষ্পলক চোখের তারা দু'টি কল্যাণীর দিকে স্থির হয়ে থাকে।

ভয়ে, ভাবনায় পাগল হয়ে সীতাংশু ছুটে বিমলের কাছে গিয়ে তুলে ধরে তার হাত।

বরফের মতো তুহিন সেই হাতে যেন বহুবর্ষের মৃত্যুর শীতলতা মাখা।

এমন সময়ে বহু দূরের কোন এক জগৎ থেকে যেন ভেসে আসে কয়েকটি কথা,—"পরীক্ষা করে কোনো লাভ নেই সীতাংশু, যতো বড়ো ডাক্তারই হও না কেন, ওকে বাঁচাবার ক্ষমতা নেই তোমার। ও যে পান করেছে

আমার সারা জীবনের অভিশাপের বিষ। হ্যাঁ, নিজের হাতেই আমি মিশিয়ে দিয়েছি ওর চা-এ।"

সীতাংশু চেয়ে দেখে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চোখ দুটো বিমলের বিগত-জীবন দেহটার দিকে নিবদ্ধ করে তাকিয়ে আছে কল্যাণী। ক্রূর হাসিতে বেঁকে গেছে ওর ঠোঁট দু'টি।

—"ভালো বেসেছিলাম শুধু তোমাকেই সীতাংশু,—" আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে কল্যাণীর মুখ। ঘনায়মান স্বপ্ন-ছাওয়া দু'চোখ মেলে তন্দ্রাচ্ছন্ন সুরে বলে চলে কল্যাণী,—"বিমলের লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারাটা শুধু একটা সাময়িক মোহ এনেছিল আমার মনে। তোমরা দু'জনে ছিলে আমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী—"

অল্পক্ষণের জন্য চুপ করে থাকে কল্যাণী। আট বছরের পুরু যবনিকাটা তুলে ধরতে সময় লাগে তার। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলতে থাকে,—"বিমল যেদিন জানল যে তার আশা নেই, সেদিন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল সে। সেই ক্ষিপ্ততা যে তার মনের শয়তানটাকে জাগিয়ে তুলবে, তা কি আর তখন জানি?"

সীতাংশুর মনে পড়ে সব কথা। সিনেমার ছায়াছবির মতো কয়েকটা ঘটনা ফুটে ওঠে ওর মনের পর্দায়।

সন্ধ্যার একটু পরে তার চেম্বারে এসে হতাশভাবে একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে বিমল বলেছিল,—"তুই-ই জিতলি সীতাংশু।"

বন্ধুর মুখের সেই আর্তস্বর তীরের মতো বিঁধেছিল সীতাংশুর মনে। একদিকে আকৈশোর বন্ধুত্ব আর অন্য দিকে সদ্যোজাত গরুড়ের মতো অসীম ক্ষুধা নিয়ে জেগেওঠা যৌবনের প্রথম প্রেম। হৃদয়ের এই সুগভীর দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পায় নি সীতাংশু।

রুগীশূন্য নির্জন ঘরে ভেনারেয়ল ডিজিজ সম্বন্ধে নতুন একটা বই পড়ছিল সীতাংশু। বিমল আসার রেখে দিয়েছিল টেবিলের ওপর উপুড় করে। হঠাৎ সেদিকে চোখ গেল বিমলের আর সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে জেগে উঠলো বিচিত্র আলো। পরক্ষণে আর কোনো কথা না বলে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গিয়েছিল সীতাংশুর চেম্বার থেকে।

বিমলের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আশ্চর্য হয় নি সীতাংশু।

সীতাংশুর চোখে চোখ রেখে আবার বলতে থাকে কল্যাণী—"দিন তিনেক পরে আবার এল বিমল। সকাল বেলা। বিকেলেই তোমার আসার কথা। নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করবার অলস প্রস্তুতিতে মগ্ন ছিল আমার মন।"

"বিমল এসে আগুন জ্বেলে দিল সে মনে। তার হাতে ছিল একটা ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট। বিখ্যাত ডাক্তার ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ অমূল্য সেনের লেখা।"

"পড়ে দেখলাম লেখা আছে সীতাংশু মৌলিকের রক্তে আছে সিফিলিসের বিষ।"

"হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেলাম। সারাদিন ধরে কি করলাম আর কিনা করলাম কিছুই আমার মনে নাই। শুধু অনেক রাতে তারাভরা আকাশের নিচে খোলা ছাতে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল যে, তুমি এসেছিলে বিকেল বেলা। প্রত্যাশার দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখে, আর ঘৃণাভরা নিশ্বাসের ফুৎকারে সে মুখ কালো করে দিয়েছি আমি। কথার চাবুক দিয়ে টুকরো টুকরো করেছি তোমাকে। বজ্রাহতের মতো নিস্পন্দ তোমার মুখ আমার বুকের প্রতিহিংসার আগুনকে আরও উস্কে দিয়েছে। আমার জীবনের সব সাধ আর কামনার আকাশ থেকে ভস্মীভূত উল্কার মতো চিরকালের জন্য নিভে গেছ তুমি।"

হঠাৎ চীৎকার করে দাঁড়িয়ে ওঠে কল্যাণী, টলতে থাকে ওর পা দুটো সূচের মতো তীক্ষ্ণ তার কথাগুলো তীরের মতো বিঁধতে থাকে সীতাংশুর কানে।

"বিয়ের পর জানতে পারলাম সিফিলিসের বিষ ছিল বিমলের রক্তে"। নাম ভাঁড়িয়ে তোমার নামে নিজেরই রক্ত পরীক্ষা করিয়েছিল সে ডাক্তার। সেনের কাছে।"

তীব্র ঘৃণা যেন শারীর মূর্তি ধরে বেরিয়ে আসছে কল্যাণীর মুখ থেকে। কখন যেন আঁচলটা তুলে দিয়েছিল গলায়, আবার খসে পড়ে সেটা।

আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে সীতাংশু তাকিয়ে থাকে কল্যাণীর গলার বক্রাকারে গভীর কালো দাগটার দিকে।

আট বছর আগের এক নাটকীয় অধ্যায়ের সব রহস্য তার কাছে সূর্যের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে যায়।

জোয়ারের জলের মতো গভীর আবেগ সীতাংশুর মনে ফেনিয়ে ওঠে, ডুবিয়ে দেয় আর সব অনুভূতি। একটা বন্য আনন্দে এগিয়ে যায় কল্যাণীর দিকে।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দু'হাতে নিজের গলা চেপে ধরে কল্যাণী। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায় পাশের ঘরে।

সীতাংশুর মনের ভূমিকম্প থামে নি তখনো। অনেক ধ্যান-ধারণার সুদৃঢ় প্রাসাদগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়ে সেই প্রচণ্ড আলোড়নে।

—"কল্যাণী"—বলে চিৎকার করে কল্যাণীর পিছু পিছু ধাওয়া করে সীতাংশু।

পাশের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে উর্ধ্বমুখে তাকিয়ে থাকে সীতাংশু।

ছাতের সঙ্গে বাঁধা দড়ির অন্য প্রান্তের ফাঁস গলায় পরে এদিক-ওদিক দুলছে কল্যাণীর শরীর।

আর একবার তাকে না ছুঁয়েও বুঝতে পারে সীতাংশু যে, বরফের মতো তুহিন সেই শরীরে বহু বর্ষের মৃত্যুর শীতলতা মাখা।

॥ ৩ ॥

জগন্নাথ চৌধুরীর ছেলের বিয়ে। আড়াই বছরের বর, ছ'মাসের কনে, কিন্তু যৌতুক পাওয়া যাচ্ছে দু'লক্ষ টাকা, সেটাই মুখ্য, কনেটি ফাউ। জগন্নাথের স্বর্গীয় পিতা ইন্দ্রনারায়ণ বেঁচে থাকলে পুত্রের বৈষয়িক বুদ্ধি দেখে খুশি হতেন সন্দেহ নেই, কারণ, শিক্ষাটি তাঁরই দেওয়া। নগদ ঐ দু'লক্ষ টাকার সঙ্গে বহু সোনাদানাও আসবে, যখন শ্রীমতী বড় হয়ে শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করবে।

মেয়েটি গোবিন্দ মিত্তিরের নাতনী, লক্ষ্মী মিত্তিরের কন্যা। গোবিন্দ মিত্তির স্বনামধন্য পুরুষ, ইংরেজদের বাঙলাদেশে ব্যবসা-পত্তরের বাল্যপর্বে যেসব বাঙালী তাঁদের দালালি গোমস্থাগিরিতে টাকার কুমীর হয়ে গেলেন রাতারাতি, সেই ধুরন্ধর গোষ্ঠীর, যথা নবকৃষ্ণ, মদন দত্ত, হুজুরী মল্ল, কালীপ্রসাদ দত্ত, বনমালী সরকার, শোভারাম বসাক, নিমু গোঁসাই, শশিকান্ত দেব, পিরালী বামুনবংশের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন ঠাকুর প্রমুখ। উত্তর কলকাতায় অনেক রাস্তা-ঘাট, বাজার এখনো ওঁদের স্মৃতি বহন করে আসছে। কারণ ওদিকটায়ই থাকতেন ওঁরা। সাহেবপাড়ার পরেই মুর্গীহাটা, আর্মানি, ফিরিঙ্গী, আরবী, কাফ্রী, হাবসী, ইরাণী আফগানীদের আড্ডা। তার উত্তরে বড়বাজারে শেঠ, বসাক, তাঁতী, কুন্ডু, স্বর্ণবেনেদের জমজমাট, ব্যবসাপত্তর ওঁদেরই একচেটে। ওর উত্তরে সুতানুটিতে মুখুজ্যে, বাড়ুজ্যে, চাটুজ্যে, পাঠক, ঘোষাল, সরকার, পাল, দত্ত, গোঁসাই, ঠাকুর, মল্লিক, রায়, সেনদের ভীড়।

গোবিন্দ মিত্তির ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে হলেন ব্ল্যাক-জমিদার ওরফে ডেপুটি কলেক্টর। হলওয়েল ডাক্তারি ছেড়ে হলেন কলেক্টর। কোম্পানী ব্যবসা করতে এসে সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি ছোট গ্রাম তের হাজার টাকায় কিনে গুদোম, কেল্লা, বাড়ীঘর বানিয়ে সুরু করে। সাবর্ণ চৌধুরীদের বাগানবাড়িটায় কেরানী, রাইটারদের অফিস ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে সামনের বড় পুকুরটা কুড়ি টাকায় পরিষ্কার করিয়ে ছাপান্ন টাকায় বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে নেয়। লোকে ওটার নাম দিয়েছিলো লালদীঘি। চৌধুরীরা দোলের সময় ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝি নিয়ে এত আবির খেলতেন যে পুকুরটা সেই রঙে লাল হয়ে যেতো। তার পাশেই দোলের সময় বাজার বসতো, সেখানেও রঙের ছড়াছড়ি, লাল-বাজার। ডাক্তার হ্যামিল্টন দিল্লীর বাদশাকে চিকিৎসায় খুশি করে আরো ত্রিশটি গ্রামের ফরমান পেলেন কলকাতার কাছে-পিঠে— চিৎপুর, সিমলে, মির্জাপুর, আড়পুলি, [illegible], চৌরঙ্গী, বির্জিতলাও, [illegible], উল্টোডিঙ্গি, [illegible], [illegible], বাগ-মারি, ট্যাংরা, সুঁড়ো, তিলজলা, গোবরা, [illegible], এন্টালি, ডিহি শ্রীরামপুর, হাওড়া, শালিখা ইত্যাদি। ফাঁকরেও পড়ে গেল ইংরেজ কোম্পানী। তারা ব্যবসা করতে এসেছে, ব্যবসাই বোঝে, জমিদারি সামলানো তাদের কর্ম নয়।

নবাব আলিবর্দী বামুন থেকে মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু পশ্চিমা মুসলমানদের খুব বিশ্বাস করতেন না। হিন্দু বাঙালীর রক্ত তাঁর দেহে, তাই বোধহয় হিন্দুদেরই বেশী বিশ্বাস করতেন টাকা-পয়সার ব্যাপারে। মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই যে ব্যবসাপত্তর হিসেব-নিকেশ ভাল বোঝে, সেটা হয়তো ইংরেজরাও বুঝেছিলেন।

দিব্যদর্শী

গোবিন্দ মিত্তির বুদ্ধির দৌলতে সাঁচ হয়ে ইংরেজের চাকরিতে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোলেন। সস্তা দামে বেনামীতে জমির পত্তন নিয়ে মোটা দামে বিক্রি করে, খাজনার টাকারও সিকিটা-পয়সাটা সরিয়ে ফেলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হলেন। হাঁকালেন জুড়িগাড়ি, বানালেন প্রকান্ড বাড়ি। কেউ কলকাতায় বেড়াতে এলে সে-বাড়ি না দেখে ফিরে যেতো না, এমন ঠাট-ঠাটের বাড়ি। বাড়ির পাশে গোবিন্দজীর সেবাপূজার জন্যে নয়টি উঁচু চূড়ার মন্দির, নবরত্ন। পাপের পয়সার কিছুটা পুণ্যার্থে দান করলে পাপ কেটে যায়, তাই নবরত্ন ছাড়াও সে-পয়সায় তৈরী হলো বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির ও চিৎপুরে চিত্রেশ্বরীর মন্দির। চিৎপুরের আদি নাম চিত্রপুর।

ব্ল্যাক-জমিদার গোবিন্দ মিত্তিরের দাপটে বাঘ-ছাগল একসঙ্গে জল খায়। তাই তাঁর হাতের সোনা-বাঁধানো ছড়িটির নামে ছড়া বাঁধলো দিশি লোকরা—গোবিন্দ মিত্তিরের ছাড়, জগৎ শেঠের কড়ি। কিন্তু যমরাজ সেই ছড়িটিকে গ্রাহ্য করবেন কেন? বড় ছেলে কাশী মিত্তিরকে একদিন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন পরপারে। শোকে কিছুকাল অধৈর্য হয়ে শুয়ে ছিলেন, তারপর গঙ্গাতীরে— যেখানে ছেলেকে দাহ করা হয়েছিলো, সেখানে বাঁধিয়ে সর্বসাধারণের জন্য শ্মশানঘাট বানিয়ে দিলেন। নাম হলো কাশী মিত্তিরের ঘাট।

এ-হেন কুটুম্ব লাভ ভাগ্যের কথা। মিত্তির-বংশে কালোমরিচের চাষ, কনেটি কুচকুচে। চৌধুরী-বংশ ফুটফুটে, সে বংশে কালির ছোপ পড়ে যাবে, কিন্তু কালো যদি টাকায় আলো করে দেয়, তবে রঙে কী এসে যায়? ছেলেটা বড় হলে বুঝবে তার কিরকম হিল্লে করে গেছে পিতাঠাকুর। গোবিন্দ মিত্তির বুড়ো হয়ে পড়েছেন, তাই শুভস্য শীঘ্রম্, ছ'মাসের কনে, কি ষোল বছরের কনে, ভাববার সময় নেই। হামেসাই তো হচ্ছে এরকম কচি-কাঁচার বিয়ে!

বিয়েটা হয়ে গেছে খুব ধুমধাম সহকারে কলকাতায়। লাখ টাকার বেশী খরচা করেছেন গোবিন্দ মিত্তির সেই জৌলুসে। তাঁর ইচ্ছে ছিল না ছ'মাসের নাতনীকে একদিনের বেশী চন্দননগরে রাখা হয়, কিন্তু জগন্নাথ চৌধুরী কনের বাপকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'সে কী বেয়াই মশাই, বৌভাতের ভোজ তিনদিন চলবে, শেষের দিন ওখানকার সাহেব-সুবোদের নেমন্তন্ন হবে, ওরা তো

রূপ
রস
বর্ণ

আমার বৌমাকে দেখতে চাইবে? বুড়োকে বলে-কয়ে রাজী করুন, না হলে আমার যে মাথাকাটা যাবে লজ্জা-ঘেন্নায়।' শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মী মিত্তিরও এসেছেন কনের মাকে নিয়ে দাস-দাসী-পরিবৃত হয়ে, ব্ল্যাক-জমিদারের বাড়ির ঠাট-মাফিক তিনটি বজরায় ধুমধাম করে। আছেনও বজরায়, কারণ কুলপ্রথা অনুসারে কুটুম্ববাড়ির জলস্পর্শ করতে নেই যদ্দিন পর্যন্ত মেয়ের ছেলে না হয়।

চৌধুরীবাড়ির সামনে প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল। চাঁদোয়া, ঝালর ও থামগুলি রঙ-বেরঙের ডুরে, গিলে, গিমাম, কস্তা, হুরী, ছিটাল, খাসা, মলমল, মসলিন প্রভৃতি চন্দননগরের নিজস্ব বয়নশিল্পের কাপড় দিয়ে সাজানো। সোলার গাছ, লতা, ফুল, মাছ, জন্তুজানোয়ার, পাখী এখানে-সেখানে এগুলিও চন্দননগরের 'কাগজী'রাই বানিয়েছে, আসল বলেই ধাঁধা লাগে।

আজ ফরাসী সাহেবরা আসবেন, তাই মাটির ওপর গালিচা পাতা হয়েছে, টেবিল-চেয়ার বসেছে, কলকাতা থেকে ছুরি, কাটা-চামচ, চীনেবাসন এসেছে। মাছভাজা, মুড়ি-ঘন্ট, ছানার মিষ্টি প্রভৃতি যা বাঙালীর সুখাদ্য তা সাহেবদের মুখে রুচিকর হবে না, অথচ ও'রা দিশিখানা খাবেন আবদার ধরেছেন। তাই চৌধুরী মুর্শিদাবাদ থেকে জনকয়েক বাবুর্চি আনিয়েছেন। মোগলাই খাদ্যের ব্যবস্থা—জর্দাবিরঞ্জ, সেরাবিরঞ্জ, কিমা-পোলাও, সওলা, দমপোক্ত, কাবাব দুনিয়াজা, দিলদার। পণ্ডিচেরী থেকে আনানো হয়েছে চার রকমের দুষ্প্রাপ্য মদ্য। খানাপিনার পরে ম্যাজিক দেখানো হবে অভ্যাগতদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য। কলকাতার এক ওস্তাদ যাদুকরকে ঠিক করে দিয়েছেন গোবিন্দ মিত্তির।

সাতদিন ধরে রোশনচৌকি চলেছে প্যাণ্ডেলের মাথার ওপরে বাঁশের মাচার কুঠুরিতে, ?জ রতন ধুপীর ডাক পড়েছে। রতনের সঙ্গে সুতো বাগদী, শিবু মণ্ডল, বিশু পোদ, ভজহরি মল্ল, শ্যাম কুড়ুর, ফটিক কোঠমা, বীরু মাল, তারক তা', যদু মান্না, দেবু নন্দী, সুরেন মালাকার, বংশী চামার প্রমুখ সাঙ্গোপাঙ্গোরা বাঁশী, সানাই, ডুগি-তবলা, ঘণ্টা, পাখোয়াজ নিয়ে হাজির, দেশী বাজনা শোনাবে।

ফরাসী সাহেবেরা সবাই এসেছেন, আধা-ফরাসী মলিনারি, রৌশন ও রাবেয়াও। মোট তেত্রিশজন, চৌধুরীর ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণে কেউ না এসে পারেন না। দেশী খানা এবং ছমাসের কনে দেখবার লোভও সামলানো কষ্ট। চৌধুরীর দৃষ্টি চতুর্দিকে, ভার্তানেস ও লাটকুঠীর সেফ ফন্তেনরোও বাদ যায় নি, তারা আসরে বসবে না, বসবে ভিতরের ঘরে, ফন্তেনরোর জিভ নিসপিস করছে দিশি খানা চেখে দেখতে।

খানাপিনার পরে সুরু হলো ম্যাজিক দেখানো। চিকের আড়াল থেকে বাড়ির মেয়ে-ছেলেরাও দেখবে। আত্মীয়কুটুম্বতে চৌধুরীর বাড়ি ভর্তি এই শুভকার্য উপলক্ষে।

বাজিকর বাঙালী মুসলমান, সাদা আল-খাল্লা পরা, মাথায় ইয়া বড় পাগড়ী, হাতে একখানা আস্ত লম্বা মানুষের হাড়। বিড়বিড় করে একগাদা কি বলে যায় বাজিকর, কেউ বুঝতে পারে না, তারপরে সে বুঝিয়ে দেয় ঐ হাড্ডিতে যে জিন্ ভর করে আছে, সে-ই ভেল্কী দেখাবে, ও নিজে শুধু সেই জিনের হাতের পুতুল। চৌধুরী বুঝিয়ে দেন জিন্ মানে ভূত।

কমান্দান্ত আঙ্গোয়ার চুলে পাক ধরেছে, এ-বয়েসে ভেল্কীবাজির ছেলেখেলা দেখবার আগ্রহ নেই, চুপিসারে গভর্নর রেনোর অনুমতি চাইলেন, চলে যাবার ইচ্ছা।

রেনো অনুমতি দিলেন না, চৌধুরী মনে কষ্ট পাবে। দ্বিতীয়ত, দেহটাই শুধু ঘুনে ধরে, মনটা বুড়ো হয় না। মনের দরজা বন্ধ করে দিলে অল্পবয়সেই লোক বুড়ো হয়ে যায়। পৃথিবীটার কোটি কোটি বছর বয়েস হয়েছে, কিন্তু রুক্ষ জীর্ণ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে নি, কারণ যেখানেই পুরাতনের হিমস্পর্শ লাগে, সেখানেই অন্তরালে প্রকৃতি সঙ্গোপনে সঞ্চার করেন সরস তরুণতার নতুন প্রাণশক্তি।

'ঝক্কর ঝা, তুরুক ধা, যা ওস্তাদ নিয়ে যা, বলে বাজিকর হাতেব হাড্ডিটা ওপরে ছুড়ে মারলো, সেটা বাতাসে ঝুলে রইলো। 'ঝক্কর ঝা, তুরুক ধা, যা ওস্তাদ দূরে যা' হাড্ডিটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। 'ঝক্কর ঝা, তুরুক ধা, আয় ওস্তাদ দিয়ে যা', হাড্ডিটা আবার হাতে ফিরে এলো। চটাপট করতালি, বাজিকর সেলাম জানালো সবাইকে।

একজনের কাছ থেকে আংটি, আরেকজনের কাছ থেকে একটা টাকা এবং রৌশনের রুমালটি চেয়ে নিল বাজিকর এর পরে। রুমালের ওপরে একপাশে টাকাটা, আরেক পাশে আংটিটা রেখে বলতে সুরু করলো হাড্ডি ঘুরিয়ে—'ওঠ ওঠ বাদশা-পুত্তুর, ঘোড়ায় চড়ে চলে যা ঐ নবাবজাদীর কাছে, নবাবজাদী মান করে বসে আছে, পায়ে ধরে মাফ চা।' টাকাটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সোজা হয়ে, আস্তে আস্তে আংটির দিকে এগিয়ে চললো, কাছে গিয়ে সত্যিই ধপ করে পড়ে গেল, আংটি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঙ্গোয়া লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেলেন, হাতের বেটনটি চারিদিক ঘুরিয়ে দেখলেন কোনো সুতো বাঁধা আছে কি-না বাজিকরের আঙুলের সঙ্গে, কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন।

বাজিকর মুচকে হাসলো, আংটিটা আঙ্গোয়ার হাতে দিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিল হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখতে। আবার বিড়বিড় সুরু হলো এবং কিছুক্ষণ চললো। যখন মুঠো খুলতে বলা হলো তখন আঙ্গোয়া চিৎকার করে উঠলেন। টাকাটা কোথায়? এ-যে মস্তবড় একটা সাপ। লাফিয়ে পড়ে সাপটা দেলার্দের দিকে রওনা হতে তিনিও চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ারের ওপরে, হঠাৎ তাকে বোকা বানিয়ে সাপটি টাকা হয়ে গেল। আঙ্গোয়া এবং দেলার্দ ছাড়া সবাই করতালি দিয়ে বাহবা জানালেন।

কিন্তু আংটিটা কই। মঁশিয়ে সেভালিয়ের হীরের আংটি! বাজিকর বলে তার কাছে নেই। সেভালিয়ে চটে আগুন। লোকটা বাটপার, নবাবের আইনে চোরের একটা হাত কাটা যায়। কেটে দেও ওর হাত।

বাজিকর হাতজোড় করে ক্ষমা চায়, সাহেবের পায়ে মাথা ঠোকে, তারপর পাদ্রী-সাহেব ক্রিস্তফের কাছে গিয়ে তাঁর ক্যাসকের পকেট আঙুলে দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ফাদার হেসে পকেট থেকে বার করলেন তাঁর রুমাল। এ-কী? রুমালের এক কোণে বাঁধা আছে দেখা গেল আংটিটা। সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো, পাদ্রীকে চোর বানিয়েছে লোকটা।

একটির পর একটি অনেক খেলা চললো। তাক লেগে গেছে সবার।

বাজিকর একটি সুতোর গুটি তার ঝুলির মধ্য থেকে বার করে একটা দিক একটা থামের সঙ্গে বেঁধে আরেকটা দিক ধরে এমনভাবে দাঁড়ালো যে সাহেবরা সব দড়ির অন্য পাশে পড়লো। তারপরে কিছুক্ষণ হিজিবিজি মন্তর পড়ে চৌধুরী মশাইকে বললো, 'হুজুর, সাহেবরা ঐ সরু সুতোটি ছিঁড়ে যদি কেউ এদিকে আসতে পারেন, আমি দশ টাকা জরিমানা দিতে রাজী আছি।'

প্রথমেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন মলি-নারি। তারপরে ক্যাপ্টেন ফ্লেমেন্ত, তারপরে একে একে দুমেন, বার্নার্দ, সেভালিয়ে, হার্দাকুর, দুলিভিয়ে, দুরান্দ, মেনার্দ। সুতো ছিঁড়ে এগিয়ে আসার অনেক চেষ্টা করেও সবাই হার মেনে ফিরে এলেন। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ভিতরে এ'রাই বেশী তাগড়াই চেহারার, বাকি যাঁরা ছিলেন, চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। গভর্নর রেনো মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। এরপরে বাজিকর রাবেয়াকে লক্ষ্য করে এক সেলাম দিল। 'গোলামের গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুরণী, এই সুতোয় যে জিন্ ভর করেছে, সে বলছে আপনি এলে পথ ছেড়ে দেবে কুর্নিশ করে, সাহেবদের মুখে চুনকালি পড়বে, আসুন মেহেরবানি করে।'

রাবেয়া অগত্যা উঠলো। তাকে উঠতে দেখে একটা সোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে।
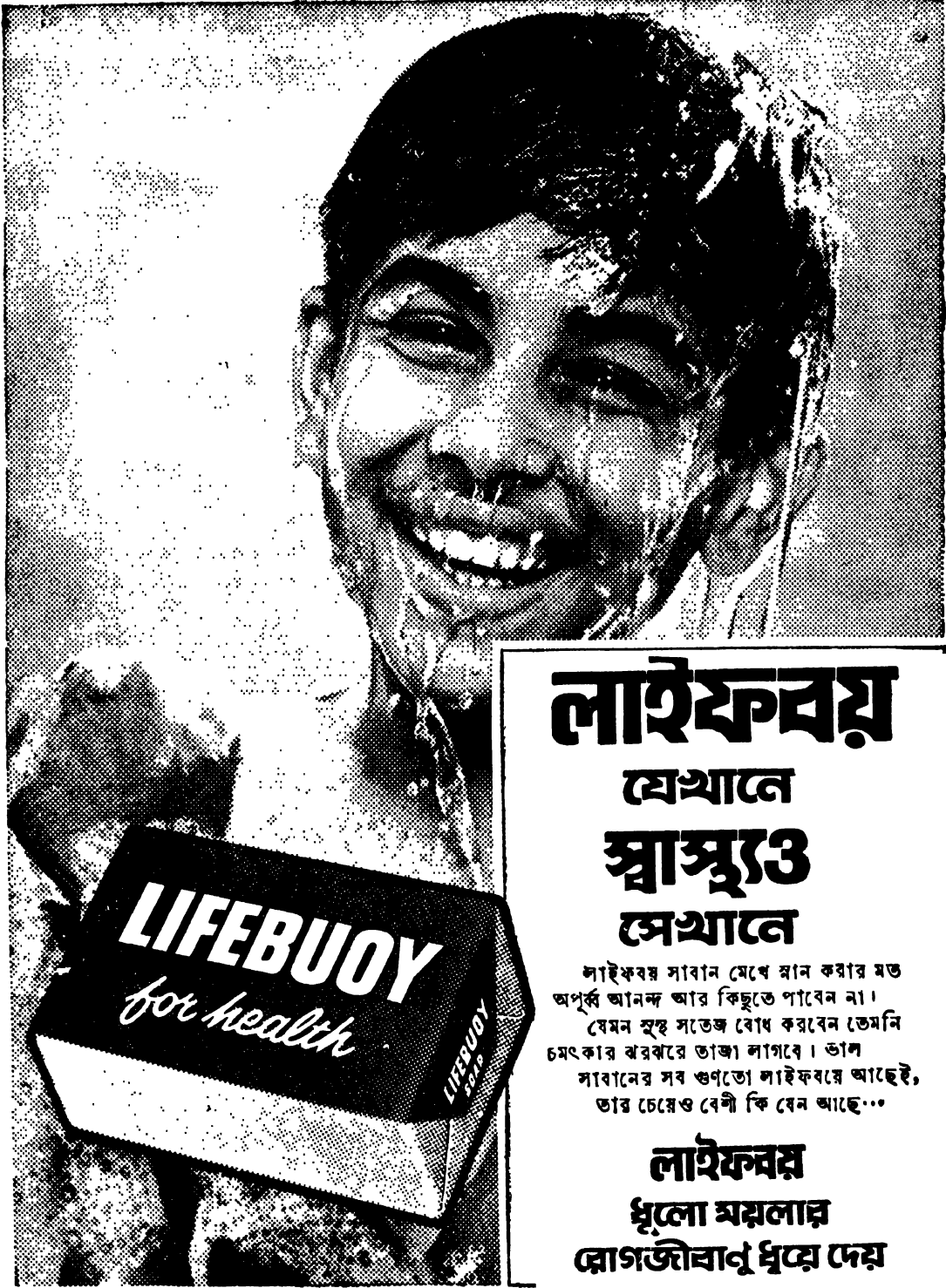
সাহেবরা বাজিকরের কথা কেউ বুঝতে পারেন নি, তাঁরা হেসে উঠলেন। দোতলার বারান্দায় চিকের আড়ালে মেয়েদের কথাবার্তার আওয়াজ এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল, সেখানে সব চুপচাপ। অ্যালবার উত্তেজিত ; ভাবলো চেঁচিয়ে নিষেধ করে, কিন্তু তা হলে ধরা পড়ে যাবে রাবেয়ার সংগে তার বিশেষ নৈকট্য আছে। রাবেয়া এই সোরগোল ও ব্যংগ হাস্যে প্রথমটা থতমত খেলো, তারপর এক পা-দু'পা করে এগিয়ে গেল সুতোর বন্ধনী ভেদ করে। দু' টুকুরো হয়ে সুতোটা মাটিতে পড়ে গেলো।

তুমুল করধ্বনি। তারপরেই হঠাৎ নিঃশব্দ, বিস্ময়ে সবাই হতভম্ব। রাবেয়াকে দেখা যাচ্ছে না, বায়ুর সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে। অ্যালবারের মুখ কাগজের মত সাদা, রোশন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, মলিনারি গর্জন করে হাত গুটিয়ে বাজিকরের দিকে ছুটেছে। একমাত্র রেনোই চুপ করে বসে আছেন, তিনি ভুলে যান নি এটা ম্যাজিকের একটা খেলা বই আর কিছুই নয়, ম্যাজিক মানেই চোখের ধাঁধা। তাঁর জাত-ভাইরা বেশীর ভাগই এ-বিদ্যাটি চাক্ষুস দেখে নি, তার ওপর ভারতীয় যাদুবিদ্যার কাছেও দাঁড়াতে পারে না ইউরোপের যাদুকররা।

মলিনারির প্রচণ্ড ঘুষি ঠিক জায়গাতেই পড়েছিলো, কিন্তু সে মুষ্টি ঘাতের বেগে বাজিকর ধরাশায়ী হলো না, ধরাশায়ী হলো মালিনারি নিজে। লোকটাও হাওয়ার সংগে মিলিয়ে গিয়েছে হঠাৎ। চৌধুরীর মুখও বিবর্ণ, কারণ বাজিকররা সবাই লোক ভাল নয়, মন্ত্রতন্ত্রের বলে নারীহরণের কথা তিনি শুনেছেন। কমান্দান্ত আংগোয়া পিস্তলহাতে প্যাণ্ডেলের গেটের দিকে ছুটতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাজিকরের গলা শোনা গেলো, 'হুজুররা কসুর মাফ করবেন।' ঠিক যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো, ঠিক সেখানেই সে দাঁড়িয়ে আছে, রাবেয়াও বসে আছে তার জায়গায়, রোশন ও কমান্দান্তের দুই চেয়ারের মাঝ-খানের চেয়ারে।

ওপরে চিকের আড়ালে হাসির রোল উঠলো। এ হাসির বিদ্রুপতরংগ যে তাঁদেরই লক্ষ্য করে, সাহেবরা তা বুঝতে পেরে সব পুতুলের মত বসে থাকলেন। বাজিকরের বুকে একটা সোনার পদক ঝুলছিলো, কলকাতার ইংরেজ কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ড্রেক সাহেবের দেওয়া। গভর্ণর রেনোর ইংগিতে চৌধুরী ঘোষণা করলেন ফরাসী লাটসাহেবও খেলা দেখে খুশি হয়েছেন, তিনিও আরেকটি মেডেল দেবেন।

এবার সারা প্যাণ্ডেলে তুমুল করধ্বনি উঠলো। ওপরের বারান্দার চিকের আড়াল থেকে খানতিনেক দামী শাল এসে পড়লো বাজিকরের পায়ের কাছে। মলিনারি একমুঠো টাকা ছুড়ে মারতেই আর সব সাহেবদের কাছ থেকে টাকার বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল।

'সেলাম' 'সেলাম' 'সেলাম' বাজিকর হাসিমুখে বলে চলেছে আর টাকা তুলে থলিতে ভরছে একমাত্র আংগোয়াই গুম হয়ে রইলেন। ডাক্তার বুভিয়ার মন্তব্য করলেন, লোকটি সম্মোহন-বিদ্যা জানে।

মৈনুদ্দীন অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছে লাটকুঠীর পেছনের বাগানে। ফটকরক্ষীরা তাকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেয় না। পুর্ণিয়া থেকে ফিরে সোজা চলে এসেছে এখানে। চৌধুরী মশাইর বাড়ি থেকে বেগমসাহেব লাটসাহেবের সংগেই ফিরবেন জানতে পেয়ে সে ফটকের সামনে না দাঁড়িয়ে চলে এসেছে পিছনের দিকে, লাটসাহেবকে সে ভয় করে, সামনে পড়তে চায় না, এড়িয়ে চলে।

বেগমসাহেব ইংরেজদের ভিতরকার খবরা-খবর সব হদিস রাখতে এত ব্যস্ত কেন সে বোঝে না, তবে বুঝতে পারে কোনো মতলব আছে নিশ্চয়ই এর পেছনে। সেও পছন্দ করে না ইংরেজদের, ফরাসীদেরও পছন্দ করে না, সাদা জাতরা সবাই দুষমন, এদেশে এসেছে ব্যবসা ফেঁদে টাকাপয়সা লুটে নিয়ে যেতে। দেশের টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে, দেশের লোক দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। ওদের সবাইকে তাড়াতে হবে।

একটা খটকা মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দেয় মৈনুদ্দীনের মনে। নবাবজাদী হয়ে এই বেগমসাহেব কেন ঐ সাদা সাহেবকে সাদী করলো! দিল মহম্মদ বলে, সাদী করে নি, আর মুখ বুজে হাসে। কিন্তু মৈনুদ্দীন বিশ্বাস করে না, আলবৎ খেষ্টানি মতে সাদী হয়েছে, দিল মহম্মদ জানে না।

বহুৎ আফসোস যে বেগমসাহেবের কোনো বালবাচ্চা হয় নি। কিন্তু হবার বয়েস তো ঢের পড়ে আছে। বালবাচ্চার কথা মনে হতে মৈনুদ্দীনের চওড়া বুকের চাতিটায় খচ্ করে কাঁটার মত কি যেন খোঁচা দেয়। সাদী করলে তার ঘরেও কাচ্চবাচ্চা পয়দা হতো, কিন্তু দুটো আধ-বয়সী আম্মাজান এবং তাদের আটটি লেড়কা-লেড়কীকে খাওয়াতো-পরাতো কে? তার নিজের আম্মাজানের কথা মনে পড়ে না, কিন্তু বাবাজানের এই দুদুটো নিকে করার কী দরকার ছিল দুই কুড়ি বছর পার হয়ে যাবার পরে? দুটো আম্মাজান, আটটা ভাই-বহিন, এই দশটার দানাপানি যোগাতে সতের বছর বয়সেই তাকে রোজ-গারের ফিকিরে ধরতে হলো লাঠি, ঢুকতে হলো লুঠেরাদের দলে, হায়রে নসীব! অনেক মাথা ফাটিয়েছে সে এ ক'বছরে, কিন্তু খোদা জানেন, কোনো আওরাতের গায়ে সে হাত দেয় নি, কোনো জেনানা তার হাতে বেইজ্জৎ হয় নি কোনো দিন, সে অন্যসব লুঠেরাদের মত নয়। দিল মহম্মদ শয়তানের পয়জার, হিন্দু কাফেরের জেনানা হাতে পড়লে তার ইজ্জৎ নষ্ট করে কুত্তার মত।

ফটকের সামনে গাড়ির আওয়াজ, ঘোড়ার পায়ের শব্দ থেমে গেল। বেগমসাহেব এসেছে বোধহয়। পাগড়ীর ভাঁজ থেকে চিঠিটা বার করে মৈনুদ্দীন ভাল করে দেখে। কুর্তাটা ঘামে ভেজা, পায়ের নাগরাই ধুলোয় ভর্তি, ভালই করেছে সে পাগড়ীর মধ্যে রেখে। পুর্ণিয়ার নবাবসাহেবের চিঠি। প্রায় দু'মাস লেগেছে যেতে-আসতে, কেটেছে পথে-জংগলে, রাতের বেলা থাকতে হয়েছে উঁচু গাছের ডালে বুনো জানোয়ারের নাগালের বাইরে, অনেক দিনই দানাপানি জোটে নি, খেতে হয়েছে বুনো ফল, যা হোক কাজ হাসিল করেছে সে। বেগমসাহেবের কাজ সে জান কবুল করেও হাসিল করবে। ঐ যে বেগমসাহেব আসছেন।

'একী মৈনু, এত রোগা হয়ে গেছ যে, চেনা যাচ্ছে না, আহা! খুব কষ্ট হয়েছে তোমার এতদূরে যেতে-আসতে, না?'

'না-জী, বয়েসটাও তো বাড়ছে? এই নিন নবাবসাহেবের জবাব।'

রোশন তাকিয়ে থাকে মৈনুদ্দীনের মুখের দিকে। ধুলিধুসরিত পরিশ্রমক্লিষ্ট অর্ধভুক্ত চেহারা, কিন্তু সাফল্যের আনন্দে হাসিমুখ। এই বিপদসংকুল ও শ্রমসাধ্য দৌত্যকর্মটি আর কারুর দ্বারা সম্ভব হতো না, আর কেউ সাহসও পেত না, বিশ্বাস করাও যেত না।

'বাড়ি হয়ে এসেছো?'

'না, সোজা এখানে।'

'খেয়েছো?'

'পরে হবে।'

অপরাহ্ণ প্রায় শেষ। চৌধুরীবাড়ির মোগলাই খানা রোশনের উদরে প্রায় জীর্ণ হয়ে এসেছে, আর এই লোকটি এখনো কিছু খায় নি। হাততালি দিল রোশন, সে হাততালির শব্দে ছুটে এলো একজন পাইক হুকুম নিতে।

'মৈনুদ্দীনকে তোমাদের লঙরখানায় নিয়ে যাও, ছোট বাবুর্চিকে বোলো যেন আচ্ছা করে খাইয়ে দেয়। চলে যাও জলদি, ও এখুনি যাচ্ছে ওদিকে।'

মৈনুদ্দীন কোমরের থলিটা বার করে বললো, 'দু'শো টাকা পুরোপুরি খরচা হয় নি বেগমসাহেব, চল্লিশ টাকার মত আছে, কার কাছে ফেরতে দেব?'

'কারুর কাছে নয়, ও টাকাটা তোমার। খেয়েদেয়ে যাবার সময় হালদারের কাছে থেকে আরো ষাট টাকা নিয়ে যেও, বোলো আমার হুকুম।'

ছলছল চোখে মৈনুদ্দীন বলে, 'হুজুরণীর মেহেরবানি, কিন্তু অত বেশী দেবার দরকার নেই বেগমসাহেব।'

মৈনুদ্দীনের জীর্ণ মলিন কুর্তার কাঁধে হাত রাখে রোশন। সুবাসিত সুকোমল শঙ্খধবল হাতখানি। 'তোমার দরকার না থাকতে পারে মৈনু, কিন্তু আমার দরকার

আছে। আমাকে তুমি মায়ের মত ভালবাসো, মায়ের স্নেহের দাম তুমি দিতে না-রাজী হতে পার না।'

পাগড়ায় খ'ুটে চোখ মুছতে মুছতে বলিষ্ঠ দস্যুসর্দার নরহন্তা মৈনুদ্দীন চলে যায় লঙ্গরখানার দিকে। রৌশনের হাতে পূর্ণিয়ার নবাব শৌকৎ জঙ্গের চিঠি, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে সে তার বিশ্বস্ত অনুচরের অপসৃয়মান দেহযষ্টি তারপরে ধীরে ধীরে চলে যায় তার শয়নগৃহের সুগোপন অন্তরালের আশ্রয়ে।

সীলমোহর ভেঙ্গে ফেলে রৌশন। অধৈর্য প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে বটে, কিন্তু কী লিখেছে শৌকৎ? চিনতে কী পেরেছে?

বাহিনজী রৌশন,

খোদাতালার মেহেরবানিতে তুমি ভাল আছ জেনে বহুৎ খুশি হলাম।

ঢাকার দরিয়ামঞ্জিলের সেই ছোট্ট মুখখানি আমার বেশ মনে আছে। তোমার বয়েস তখন বোধহয় সাত বছর, হারেমের পর্দার বাইরে আসবার তখন তোমার বাধা ছিল না, ছুটে আসতে যখন-তখন আমার সঙ্গে খেলা করতে। আমর বয়েস তখন বোধহয় আট। বাল্যকালের মধুমাখা দিনগুলি আর ফিরে আসে না মানুষের জীবনে, ফিরে আসে না সেই হাসিভরা মন।

হঠাৎ যেদিন চাচাসাহেব নওয়াজিস খাঁর মৃত্যু হলো, দুনিয়াটা কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল আমাদের কাছে। মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে ফিরে এসে তুমি চলে গেলে হারেমের পর্দার অন্তরালে, আমি চলে গেলাম আমার আম্মাজান ঘিসেটি বেগমের জহরৎঝিল মঞ্জিলে। কিন্তু সেই পুরানো দিনের কথা তুলে আর কাজ নেই।

তুমি ঠিকই বলেছ রৌশন, সুবে-বাঙলার মসনদে বসবার দাবি সিরাজের চাইতে আমারই বেশী। কিন্তু দাদুসাহেব বরাবরই স্নেহে অন্ধ ছিলেন তার প্রতি। মীরজাফর ও জগৎ শেঠের চক্রান্তে আমাকে বিহারের নবাব করে এই পূর্ণিয়ায় পাঠানো হলো। ঘসেটি বেগমও আমাকেই সুবে-বাঙলার নবাব-উল-মুলুক দেখতে চেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের চিহেলসুতুন দরবারে। ধূর্ত জগৎ শেঠ এবং ধূর্তশিরোমণি মীরজাফর ভেবেছিলেন পঁচিশ বছরের শৌকৎ-এর চাইতে উনিশ বছরের সিরাজকে হাতের পুতুল করে চালানো সহজ হবে। স্নেহময়ী ঘসেটি ভেবেছিলেন, সিরাজের গুপ্তঘাতকের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে দূরে পূর্ণিয়ায় পাঠানোই ভালো। একই ষড়যন্ত্রের মূলে এই তিনজন, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। সিরাজের হাতে এখন লাঞ্ছিত হচ্ছে জগৎ শেঠ ও মীরজাফর, নির্যাতিত হচ্ছেন ঘসেটি বেগম।

দাদু সাহেবও বিকারের ঘোরে মৃত্যুশয্যায় কী ভুলই করে গেলেন। সিরাজের মতিগতি শেষ পর্যন্ত তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু অন্তরে বেহুঁস হয়ে কেবল 'সিরাজ' 'সিরাজ' চেঁচাতে লাগলেন। হয়তো বলতে চেয়েছিলেন সিরাজ মসনদ পাবে না, কিন্তু জগৎ শেঠ ও মীরজাফর নিজেদের সুবিধা-মাফিক প্রচার করলেন উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে সিরাজের নামই বলে গেছেন। নসীবের বেইমানি, নইলে আজ সুবে-বাঙলার সিংহাসনে সিরাজ মীর্জা মহম্মদ বসতে পারতো না, বসতো শৌকৎ মোহাব্বৎ জঙ্গ। আলিবর্দীর মেজ মেয়ে ঘিসেটি বেগমের ছেলে আমি, সিরাজ সেজ মেয়ে আমিনার ছেলে, আমি বয়সেও বড়। সিরাজের কুকীর্তি সবই শুনেছি, রৌশন। প্রজাদের দুর্দশার কথাও শুনেছি। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরের রাণী ভবানী, মীরজাফর, জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ সবাই আমাকে চান, লিখেছো। এ'রাই তো দেশের মাথা, এ'দের হাতেই তো দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে। মুসলমান আমীর-ওমরাহদের আমি পরোয়া করি না, ওরা ভোগবিলাসে অপদার্থ হয়ে পড়েছে, হিন্দু রাজা ও প্রজাদের সমর্থনই আমার প্রকৃত বল।

অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে, আমি জানি, মোহনলাল, রাজারাম সিং, মদন রায় প্রমুখ হিন্দু সেনাপতিরা প্রাণপণে লড়বে সিরাজের পক্ষে, তার নিমকের মান রাখতে। মীরজাফর, মীরমদ্দীন, নফরালি? ওদের আমি বিশ্বাস করি না, হয়তো পল্টনের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখবে, শেষ পর্যন্ত যে-দিকে জয়ের সম্ভাবনা সে-দিকে যোগ দেবে, ওরা যে আমাদের জাতভাই মুসলমান।

লিখেছো ফরাসীরা আমাকে সাহায্য করবে, ভাল। যদি আমার সুদিন আসে, ওদের সে-ঋণ আমি ভালভাবেই শোধ করবো, শয়তান ইংরেজদের কোণঠাসা করার ফিকিরও আমি জানি, ওদের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ রাখবো না। একথা তুমি ওদের বলতে পারো।

পেয়ারের রৌশন, রাজদণ্ড ধারণ করতে আমার হাত দুর্বল নয়। তুমি হয়তো জানো আমার সাদী করবার মতলব নেই। কিন্তু তোমার মত সঙ্গিনী পেলে আমার ঘরে-বাইরে জোর বাড়বে, সে ইচ্ছা বদলাবো। চন্দননগরের লাট-হারেমে নিশ্চয়ই তুমি খুব সুখী নও, আমার মনে হয়।

আমি প্রস্তুত হচ্ছি। যুদ্ধ ছাড়া সিরাজের সঙ্গে কোনো মীমাংসা হতে পারে না, আমি জানি।

—শৌকৎ জঙ্গ বাহাদুর

রৌশন হাসে চিঠির শেষটুকু পড়ে। কপট লম্পট শৌকৎ তাকে প্রলোভন দেখাচ্ছে! শৌকৎ জানে না, সে দাবার ঘুঁটি মাত্র, চালের মারপ্যাচে যদি সিরাজকে হটানো যায়, তবে অন্য চালে তাকেও কুপোকাৎ করা মোটেই শক্ত হবে না। নির্বোধ শৌকৎ জানে না রৌশনের লক্ষ্যস্থলও মুর্শিদাবাদ, যাবে সে সিংহের সহচরী হয়ে, শৃগালের সহচরী হতে নয়। [ক্রমশ।

সময়

অবনীকুমার মণ্ডল

সময়ের স্রোত চলেছে কোথায়—
কোন সে সুদূর অজানায়,
দূর হতে দূরে গিরিকন্দরে
সীমাহীন কোন পথে প্রান্তরে
অথবা অতল সুনীল সাগরে,
আগামী দিনের ইসারায়॥

শত বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে
এ চলার নাই শেষ।
লহরির পর লহর তুলিয়া
সৃষ্টিরে বহু পিছনে ফেলিয়া
বাধা বন্ধারে মথিয়া দলিয়া,
রেখে যায় তারি রেশ॥

ফুলবাসরের কুঞ্জে কুঞ্জে
মরণ শয়নাগারে।
তমশায় ঘেরা গভীর নিশিথে
নব ফাগুনের শ্যামলবীথিতে
স্নিগ্ধ উজল শুক্লা তিথিতে
বন্দীর কারাগারে॥

তোমার চলারে রুখিতে পারিনি
কালের কঠিন হুংকার,
নিয়মিত কালো কুটিল চিহ্ন
চলার আঘাতে করেছে ছিন্ন
প্ররোচনা তার করেছে ভিন্ন
টানি অন্যবিধ টংকার॥

কবে কোন্ সেই সৃষ্টির আগে
সুরু হয়েছিল গতি।
বিজয়ীর টিকা আঁকা ঐ ভালে
এখনো চলেছ সেই বেগে তালে
আরো কত পথ যেতে হবে চলে—
জানি না কোথায় ইতি॥

বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে রাষ্ট্র-নীতি

অমিতাভ

মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক রাষ্ট্রের নামে জনগণকে নিজ উদ্দেশ্যের সহায়ক মনে করে কাজে লাগায় কিন্তু জনগণের শ্রমের ফল রাষ্ট্রের পাওনা ঘোষণা করে নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ-সিদ্ধি করে। স্বামীজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহজেই এ রহস্য ভেদ করেছিলো—'আমাদের যুবকেরা সভা-সমিতি করে, ইংরেজের হাত থেকে আরো ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে চায়; তবে অন্যকে স্বাধীনতা দিতে যারা অনিচ্ছুক, স্বাধীনতা তাদের প্রাপ্য হবে কেমন করে?'' 'উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়'' (—পত্রাবলী)।

তাই, রাষ্ট্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে একটি উপায়।

॥ চার ॥

রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি আগেই দেখেছি, স্বামীজীর ভাষায়—'আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ' (—পত্রাবলী)। রাষ্ট্রশাসন প্রবর্তিত হবে এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

(১) শৈশবে পিতা দৃঢ় নিয়মের সাহায্যে পুত্রকে পালন করেন; কিন্তু ছেলের বয়স ষোল হলে তার সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করতে হয়; তেমনি সমাজের বিকাশ হলে জনসাধারণের মত নিয়েই রাষ্ট্রশাসন করা দরকার। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন—উপযুক্ত শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ জনগণের মতামতে নির্ভরশীল রাষ্ট্রশক্তি কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে জনসাধারণকে করে তুলতে হবে স্বাধীন চিন্তাশীল মানব। রাষ্ট্র-শাসনের দ্বারা কেবল ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ খুলে দিতে হবে। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সুযোগ করে

(শেষাংশ)

দেওয়া ছাড়া রাষ্ট্রের অন্য কোন অধিকার নেই। স্বামীজী লিখছেন—''সর্ববিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনো হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনো স্বায়ত্ত-শাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'-ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল'' (—বর্তমান ভারত)।

(২) রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে দেশের জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা দরকার। নেতাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, তারা দেশবাসীর প্রতিনিধি। জনসাধারণের থেকে মনের সামান্য বিচ্ছিন্নতাও শাসক-শ্রেণীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। স্বকীয় ভঙ্গিতে এই দিকটির প্রতিই স্বামীজীর সচেতনতা—''সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃ-সম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।

কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃ-সম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্য-শক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায়ে রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ—প্রজাসহায়ে বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যকজ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তির মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে'' (—বর্তমান ভারত)।

(৩) ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দিয়ে জনসাধারণকে আদর্শ নাগরিক করে তোলাও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ। বস্তুত এরই উপর নির্ভর করছে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব। তাঁর ভাষায়—''সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারাই মাত্র জয়লাভ করিবে, যাহারা জীবনে চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখাইতে পারিবে''(—পত্রাবলী)।

আদর্শ নাগরিকের সংখ্যা যত বেশি হবে ততই রাষ্ট্রের কর্মসাফল্য বাড়বে। এই বিষয়ে তাঁর উক্তি দেখা যায়—''প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য জগৎ বিভিন্ন জাতিরূপে সংগঠিত আর আমরা তাহা নহি।---সংগঠন এবং সংযোগশক্তিই পাশ্চাত্য জাতির কর্মসাফল্যের হেতু; আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং সহায়তা হইতেই উহার উদ্ভব হইয়া থাকে'' (—পত্রাবলী)। অতএব, রাষ্ট্রশক্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করছে জনসাধারণের উপর।

(৪) প্রতিটি রাষ্ট্রের পরিচালনারই কতকগুলি বিশেষত্ব থাকে। শাসকদের উচিত, বাইরের রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্বগুলি পর্যালোচনা করে নিজ দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উন্নতি করা। ভাবের আদান-প্রদানের উপর স্বামী বিবেকানন্দ খুবই জোর দিয়েছিলেন, কারণ, যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সাথে সাথে তার সমা-

…নের নানান উপায়। তাঁর ভাষায়—"আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় এক জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে" (—পত্রাবলী)। অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নিজ দেশের বৈশিষ্ট্যের প্রতিও শাসকদের তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার—

"We as a nation lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses."

(—পত্রাবলী)।

(৫) রাষ্ট্রশাসনকে স্বামীজী খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এইভাবে—"জনগণের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে, জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নর-নারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে।—কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে" (—পত্রাবলী)। অতএব বিভিন্ন প্রকারের মতবাদের অবাধ চর্চা জনগণকে করতে দিতে হবে। বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি ও ভাবধারা জনসাধারণকে করে তোলে অন্যের প্রতি সহনশীল এবং উন্নত সংস্কৃতির নাগরিক।

(৬) চিন্তা-বাক-বিশ্বাস ও কর্মের স্বাধীনতা দান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সকলের থাকবে সমান সুযোগ ও অধিকার। রাষ্ট্রের একতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে শাসকদের।

(৭) আদর্শ রাষ্ট্রের আলোচনায় তিনি বলছেন—"যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এইসবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে" (—পত্রাবলী)। এর বিশদ ব্যাখ্যা স্বামীজী দিয়েছেন তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে। সংক্ষেপে তিনি বলছেন—"পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সঙ্কীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদের অধিকার রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে, তাঁরা ব্যতীত বিদ্যা শিখবার কারো

স্বামী বিবেকানন্দ

অধিকার নেই, বিদ্যা দানেরও কারো অধিকার নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়, কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।—ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।—তারপর বৈশ্য-শাসন যুগ। এর ভেতরে ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ। এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরো উদার, কিন্তু এই সময় থেকেই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।—সর্বশেষে শূদ্র-শাসন যুগের আবির্ভাব হবে। এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে" (—পত্রাবলী)। তাই স্বামী বিবেকানন্দের মতে—ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সংস্কৃতি, বৈশ্যের ভাব-সম্পদ বিতরণের প্রবৃত্তি ও শূদ্রযুগের সাম্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে যদি কোন রাষ্ট্র গঠন করা যায়, তবে তাই হবে আদর্শ রাষ্ট্র।

(৮) রাষ্ট্রের শাসনকর্তারা কেমন হবেন তার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন প্লেটো। স্বামীজীর মানসপটেও হয়তো এমন ছবিই আঁকা ছিলো; তবে তিনি ভাবী দেশসেবকদের উদ্দেশ করে তিনটি প্রশ্ন রেখেছেন—"সত্যই কি তুমি আমাদের ভ্রাতৃগণের জন্য অনুভব কর? সত্যই কি তুমি অনুভব কর যে এই জগতে এত দুঃখ, এত অজ্ঞতা, এত কুসংস্কার রহিয়াছে?—সেই সহানুভূতির ভাব কি পূর্ণমাত্রায় তোমার মধ্যে রহিয়াছে? যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে এইটিই হইল প্রথম পদক্ষেপ। ইহার যদি কোনরূপ প্রতিকার করিতে পার, তবেই অন্য চিন্তা। হইতে পারে, সমুদয় প্রাচীন ভাবধারাই কুসংস্কারযুক্ত, কিন্তু এই সকল কুসংস্কারের আবর্জনার মধ্যে সদ্যগঠিত সোনার তাল সত্যও তো থাকিতে পারে। কোনরূপ উপায় আবিষ্কারে কি সক্ষম হইয়াছ যাহাতে এই স্বর্ণকে খাদ্‌বিহীন করা যায়? আরো একটি জিনিষের প্রয়োজন। তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি নিশ্চিন্ত যে, নাম-যশ ও কাঞ্চন লাভের তৃষ্ণার জন্য এই সব কার্যে লিপ্ত নও?"

(৯) সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা জনগণকে শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন

করে তোলে। একদলীয় নেতৃত্ব বা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বামীজীর লেখনী তীব্র হয়ে উঠেছে সময়ে-সময়ে—"সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশজন বড় জাত!।। আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে আমরা সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?—যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয় তাহাই করা উচিত" (—পত্রাবলী)।

(১০) রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের (ডিসেণ্ট্রালাইজড্) সাহায্যেই জনসাধারণকে রাষ্ট্র-নীতি ব্যাপারে দক্ষ করে তুলতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষার সাহায্যে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশাসনে তাদের উপযুক্ত করে তোলা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সাহায্যে যেরকম সমাজ-শাসন চলতো তাতে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার ও গোষ্ঠীর সমবায়-শক্তির কার্যের উন্নতি ঘটতো। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই চেতনা গোষ্ঠী ছাড়িয়ে সমগ্র ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মবোধ না করায়, দেশের সম্রাট ও জনগণের মাঝে এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিলো বলেই ভারত সুদৃঢ় রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীন ভারতের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলছেন—"কর-গ্রহণে, রাজ্যরক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই—হিন্দুজগতেও নাই, বৌদ্ধজগতেও তদ্রূপ। যদিও যুধিষ্ঠির বৈশ্য-শূদ্রের গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাসের জন্য গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে রাজ্যের প্রথাস্বরূপ, প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃংখলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনো জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে।—শাসিতগণের শাসনকার্যে অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসন-পদ্ধতি পত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, 'এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে', তাহা যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিলো না, তাহাও নহে। যবন (গ্রীক) পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন তন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতি (প্রজা) দ্বারা অনুমোদিত শাসন-পদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম-পঞ্চায়েতে বর্তমান ছিলো এবং এখনো স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বীজ যে স্থানে উপ্ত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্‌গত হইল না; এ ভাব ঐ গ্রাম-পঞ্চায়েত ভিন্ন সমাজমধ্যে কখনো সম্প্রসারিত হয় নাই" (—বর্তমান ভারত)।

তাই বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যেই কেন্দ্রীভূত শক্তি রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে তুলনা দিয়ে একটি সুন্দর চিত্র পাই 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে—"শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধির সঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু।—সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

(১১) রাষ্ট্রের আরেক দায়িত্ব হচ্ছে স্বয়ংনির্ভর হওয়া। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, শিল্পোন্নয়ন, সামরিক শক্তি, বিদ্যার নানান ক্ষেত্র, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েই রাষ্ট্রকে স্বাবলম্বী করে তুলতে স্বামীজী বারবার শাসকদের সচেতন করে দিচ্ছেন। জাপানের কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি এক চিঠিতে লিখছেন—"জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে; তারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হয়েছে। ওদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। ওদের যে কামান আছে, তা ওদেরই একজন কর্মচারী আবিষ্কার করেছেন।—আমি একজন জাপানী স্থপতি নির্মিত প্রায় এক মাইল লম্বা একটি টানেল্ দেখেছি। এদের দেশলাইয়ের কারখানা এক দেখবার জিনিষ। এদের যে-কোন জিনিসের অভাব, তাই নিজের দেশে করবার চেষ্টা কচ্ছে। জাপানীদের নিজেদের একটি স্টীমার লাইনের জাহাজ চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করে; আর এরা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়াকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাবে মতলব কচ্ছে।—আর তোমরা কি করছো? সারাটা জীবন কেবল বাজে বক্‌ছো।"

(১২) খাদ্য-বস্ত্রের সমস্যা সমাধান না হলে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি দাঁড়াতে পারে না। বলছেন স্বামীজী—"কোন প্রকার রাজনীতিই সার্থকতা লাভ করতে পারে না—যতদিন না ভারতের জনগণের শিক্ষা ও খাওয়া-পরার পুনরায় সুষ্ঠু সমাধান হচ্ছে" (—ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড হার প্রব্লেম্‌স্)। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মত হচ্ছে যে, মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে শেখানোই প্রকৃত শিক্ষা—"আদর্শ সংস্কার কোনদিনই বাস্তবে

পরিণত হবে না ; তাহাতে শক্তি ক্ষয় হয় করে বরং একটি আইন-প্রণয়ন সংস্থা গঠন করো অর্থাৎ আমাদের জনগণকে শিক্ষাদান করলে তারাই তাদের নিজ সমস্যাগুলির সমাধান করবে।---নারীদের সমস্যা সমাধানের তুমি কে। দূরে থাকো ; তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করবে। আমাদের কর্তব্য সমাজের নর-নারীকে প্রকৃত শিক্ষাদান করা। সেই শিক্ষা লাভের ফলেই তারা তাদের ভাল-মন্দ বুঝতে পারবে (—ঐ)। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকাকে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন—"ভারতীয় জন-মানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্যন্ত এখনো অণুমাত্র হয় নাই।---প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যা-বুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত।"

আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—"লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান না যায়, তবে জগতের যত ঐশ্বর্য আছে সব ঢাললেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না।" সরকার থেকে কেবল দানের দ্বারা সমস্যার সাময়িক সমাধান হতে পারে ; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতে এর ফলে গ্রহীতার নৈতিক অবনতি ঘটে। তিনি বলছেন—"মানুষের আগ্রহ না থাকিলে কেহ খাটে না। সকলকে দেখান উচিত যে, প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে ও কার্যধারা সম্বন্ধে মত প্রকাশের ক্ষমতা আছে। আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ যে, আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না, আর তার কারণ হচ্ছে আমরা অপরের সঙ্গে কখনো দায়িত্ব ভাগ করতে চাই না এবং আমাদের পরে কি হবে, তা কখনো ভাবি না" (—পত্রাবলী)।

(১৩) উপরে আলোচিত বক্তব্যের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, কি ভাবে রাষ্ট্রশাসন পরিচালিত হবে, সংবিধান রচিত হবে। সংবিধানে থাকে কতকগুলি নিয়ম। এখন, সাধারণত নিয়মগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত সামাজিক নিয়ম, যেমন শাসন-ব্যবস্থা, কর-ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাসমূহের নিয়মাবলী। দ্বিতীয়ত প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি। তৃতীয়ত নৈতিক নিয়ম, যার উপর ভিত্তি না করলে সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস হতে বাধ্য। স্বামীজী বলছেন—"নানা কল-কারখানা করিয়া ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যে জাতি বিশেষ সভ্য হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন-দিন বৃদ্ধি করিতেছে।" আরেক জায়গায় তিনি বলছেন—

"Excess of knowledge and power without holiness makes human beings devils. Tremendous power is being acquired by the manufacture of machines and other appliances and privilege is claimed today, as it never had been claimed by the history of the world."

প্রথম প্রকারের নিয়ম জন্ম দেয় সভ্যতার, দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানের এবং তৃতীয়টি সংস্কৃতির। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এই তিনটিরই সামঞ্জস্য থাকবে। সাধারণ মানুষ প্রথমটি নিয়েই সন্তুষ্ট ; আরেকটু উন্নত মানুষ দ্বিতীয়টিও চায়, কিছু শ্রেষ্ঠ মানুষেরা প্রথম দুটিকে নিয়েও সবচেয়ে বেশি জোর দেয় তৃতীয়টির উপর। শুধু সার্বভৌম (সভেরিন) রাষ্ট্র গঠন করলেই হবে না, সার্বভৌম মানুষও তৈরী করতে হবে, আর এ সম্ভব হবে নৈতিক নিয়মকে আশ্রয় করে। এর ভিত্তি হচ্ছে বেদান্ত দর্শন যা ঘোষণা করে—মানুষ সর্বশক্তিমান এবং প্রতিটি মানুষই আত্মিক চেতনায় এক।

(১৪) সমাজ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকায় স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রতিটি সমাজেই মোটামুটি চারটি শক্তি বিদ্যমান—জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ ও কায়িক শ্রম। যাকে শোষণ বলে অভিহিত করা হয়, তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এই চারটির কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়ে বাকীগুলিকে অবদমিত করা। তাই তিনি চেয়েছিলেন এমন এক সর্বাঙ্গীণ সমাজ, যেখানে এই চারটি শক্তিরই পূর্ণবিকাশ, এক সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবিক সুস্থতা।

(১৫) রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি যে নৈতিক মান, তাকে স্বামী বিবেকানন্দ বৈদান্তিক মতে ব্যাখ্যা করে তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন। কোনরকম বিবেক বা সুবিধাবাদের স্তর থেকে এর ব্যাখ্যা তিনি দিচ্ছেন না। নৈতিক আদর্শবাদীরা যখন বলেন—পরের ভালো করো, তখন উল্টো প্রশ্ন করা যায়—কেন করবো ? সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন—এ ছাড়া অন্য কোন যুক্তি তাঁরা দেখাতে পারেন না। স্বামীজী বৈদান্তিক ভিত্তি থেকে বলছেন—অন্যের ভালো করবো, কারণ অন্য যে সে আমিই ; অজ্ঞানের বশেই বিভিন্ন বোধ করছি—"কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গল স্থাপনের একটিমাত্র সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে—সে সূত্র হইতেছে এইটুকু জানা যে, আমি ও আমার ভাই এক" (—পত্রাবলী)।

এই সাম্যবাদ কিন্তু জগতে বহুল প্রচারিত সাম্যবাদী মতসমূহের অনুরূপ নয়, এর মূলভিত্তি—ফলিত বেদান্ত দর্শন (প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত)। যে বাস্তব তত্ত্ব আত্মিক একত্ব ঘোষণা করে, তারই সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দ নৈতিকতার ব্যাখ্যা দিলেন। জনসাধারণ ও শাসকেরা যদি সুদৃঢ় নৈতিকতাকে আশ্রয় না করেন, তবে রাষ্ট্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসের বহু ঘটনার উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে অস্ত্রের সাহায্যে

দেশ শাসন করার চেষ্টা বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

(১৬) আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ রাষ্ট্রের কাছে প্রতিটি জনসাধারণের সমান অধিকারের পক্ষে সমর্থন করেছেন। এবং সাথে সাথে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি যে অনগ্রসর, ও দুর্বল নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ নজর থাকা চাই। শিক্ষিত পিতামাতার সন্তানের জন্য একজন শিক্ষক প্রয়োজন হলে, জেলে মুচি-মেথর পিতা-মাতার সন্তানের পক্ষে দশজন শিক্ষকের প্রয়োজন হতে পারে। তাই রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া।

॥ পাঁচ ॥

গণতন্ত্র? না, সমাজতন্ত্র?

স্বামী বিবেকানন্দের লেখাগুলি পড়লেই মনে হয় যে, এত বড় গণতন্ত্রের পূজারী দুর্লভ। নিজেও তিনি বলেছেন, 'আমার মূল মন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ' (—পত্রাবলী)। যে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলোপ ঘটাতে চায়, সে রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধনে তিনি আহ্বানও জানিয়েছেন বারবার, কারণ, তাঁর মতে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের একমাত্র সর্ত হচ্ছে স্বাধীনতা। 'চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা'—ভাববার কথা: 'বর্তমান সমস্যা'—বিবেকানন্দের কামনা এটাই। তাঁর মানসপটে যে আদর্শ রাষ্ট্রের ছবি ভেসে উঠেছিলো, সে রাষ্ট্রের শিক্ষা, সংস্কৃতি ধন-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে থাকবে জনসাধারণের অবাধ সমান অধিকার। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বকীয়তা আছে বলে তাকে স্বাধীনভাবে বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য।

গণতন্ত্রের এই জয় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী এর দু'টি ত্রুটির উল্লেখও করেছেন,—একটি আসে প্রজাদের দিক থেকে এবং অন্যটি শাসকদের কাছ থেকে। গণতন্ত্রের অত্যধিক প্রয়োগে প্রজাদের উচ্ছৃঙ্খল হবার সম্ভাবনা, ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বার্থপর স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়—'বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে' (—বর্তমান ভারত)। আর শাসকেরা? স্বামীজীর ভাষায়—'ও তোমার পার্লেমেণ্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।—রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে,—যে ঘুষের ধুম, সেদিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে।" (—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)।

সমাজতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে, এতে কেবল একটিই গুণ, তা হচ্ছে—সমাজ নির্দেশিত কর্মে ব্যক্তির নিপুণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর ফলে সমাজের কাছে ব্যক্তির দাসত্বের পরিণামে উৎসাহ-উদ্যম, মননশীলতা তীব্র অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়; এই সব হতভাগ্য লোকেরা কখনো বুঝতে পারে না স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় দ্যুতি কি বস্তু। বলছেন তিনি — "(সমাজ নির্দেশিত কর্ম) মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া করে;—নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিষের আদর নাই।—এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।" (—পত্রাবলী)।

এইখানে বিবেকানন্দ-চিন্তাধারাকে পর্যালোচনা করে অনেকে তাঁকে গণতন্ত্রী, অনেকে আবার সমাজতন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের মত হচ্ছে। —"আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী বা সোস্যিয়ালিস্ট, তার কারণ এই নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কাণা-মামা ভাল'—এই হিসাবে। অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে এবং পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। এটিরও অন্তত আর কিছুর জন্য না হলেও, জিনিষটার অভিনবত্বের দিক থেকে একবার পরীক্ষা করা যাক।" (—পত্রাবলী)।

বিংশশতাব্দী যে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংঘর্ষে মুখর হয়ে উঠছে তার বীজ বহু পূর্বেই বপন করা হয়েছে। স্বামীজীর মতে—'ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কিনা এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা-আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না এই প্রশ্নই সমাজের আদিকালের বিচার্য" (—পত্রাবলী)। তাই তিনি চেয়েছিলেন, এই দুই মতবাদের সার্থক বিশ্লেষণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবার জন্য নয়, বরং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা লাভে সহায়তা করবে এই উদ্দেশ্যই সমাজের প্রধান লক্ষ্য। তাই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দেখতে পাই ব্যক্তি ও সমষ্টি, বৈচিত্র্য ও ঐক্য, সংগঠন ও স্বাধীনতা, বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নতি সব কিছুরই সার্থক সমন্বয়। ইতিহাস চেতনার সাহায্যে তিনি বুঝেছিলেন যে, রেজিমেণ্টেড সমাজ—সভ্যতার অনুকূল নয়। বৈচিত্র করণের উপর গণতন্ত্রী যে অধিক গুরুত্ব দেন, তা যেমন সম্পূর্ণ সঙ্গত, তেমনি সমাজতন্ত্রী কথিত যৌথস্বার্থের গুরুত্বও সঙ্গত। এই জায়গাতেই স্বামীজী বেদান্ত দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে সমন্বয় সাধনের পথ দেখিয়েছেন। এক কথায়

[illegible]কেই বৈচিত্র্যময় [illegible] বেরিয়ে এসেছে, যাতে ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্মই জড়িয়ে আছেন। বহুত্বের মধ্যে একত্ব ও একত্বের মধ্যে বহুত্ব—এই বৈদান্তিক তত্ত্বকেই তিনি রাষ্ট্রনীতির মূলে লাগিয়েছেন। বৈদান্তিক মতে—বহুত্ব একটা ভ্রম এবং ব্যক্তিগত স্বকীয়তা স্বীকার করে নিয়েই সেই এক ব্রহ্মরূপ সত্যাতে পৌঁছুতে হবে। বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে যেমন বৈষম্য ও বিশেষ-সুবিধারূপ অন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তেমনি একত্বের ভিত্তিতে জীবনের ধর্মপ্রাণের খেলা রুদ্ধ হয়। তাই দুইয়েরই প্রয়োজন রাষ্ট্র সংগঠনে। ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণ—এই নীতির সাহায্যেই স্বামীজী যুগ-সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। আর এর সার্থক হবে একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষ যখন স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থ হতে পারবে। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—"বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে—ঘষে মেজে রূপ কি হয়? ধরে বেঁধে প্রীতি কি হয়? —ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ আশাহীনের সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ?---আমি বলি বন্ধন খোল জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল।---সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে। তখন তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে। (তবে) সে ঢের দূর।---জগৎপ্রেম অনেক দূর। ---একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়।---অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে, তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা বলা উচিত, তার আগে নয়।"

আর এ সম্ভব হবে একমাত্র বেদান্তের ভিত্তিতে, কারণ বেদান্তই এর যুক্তিসঙ্গত আশ্রয়। আস্তিক-চেতনার সাহায্যেই কেবল এই সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য মানুষ করতে পারে। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে সাম্য—এই ছিলো স্বামীজীর ধ্যাননেত্রে। হেগেল-মার্কস, বোসাঙ্কে গ্রীণ প্রমুখের সঙ্গে মিল-বেন্থাম-স্পেন্সারের চিন্তাধারার একটি সার্থক সমন্বয় তিনি দেখিয়েছেন। বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই তিনি যুগ-সমস্যার অপূর্ব সমাধান খুঁজে পেলেন —ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র"—(—বর্তমান ভারত)। এ সম্ভব হবে আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির দ্বারা। আদর্শ নাগরিক কে? তিনি এক চিঠিতে লিখছেন—"তুমি কি সমতা, স্বাধীনতা ও কর্মশক্তির দিক দিয়া সমভাবে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়াও যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে ভাবগম্ভীর প্রাচ্যের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সহজাত প্রকৃতির হতে পারো?"

॥ ছয় ॥

শ্রেণী সমস্যার সমাধান কোন্ পথে?

সমাজে ক'টি শ্রেণী আছে এবং তাদের পরিচয় কি, এই নিয়ে নানারকম মতবাদ আছে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস যে শ্রেণী-বিন্যাস দেখিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, প্রাচীন রোমে চারটি শ্রেণী ছিলো (অভিজাত, সাধারণ লোক, নাইট ও ক্রীতদাস), মধ্য যুগে ছটি মূল শ্রেণী (জায়গীরদার, রায়েত, সমাজ-নেতা, মজুর, শিক্ষানবিশ, কারিগর ও ক্রীতদাস)। বর্তমানে শ্রেণীবিন্যাস অনেক সহজ হয়ে দুটিতে এসে দাঁড়িয়েছে—ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণী এবং পরবর্তী কালে একটিই শ্রেণী থাকবে—শ্রমিক। মার্কসের এই শ্রেণী-বিন্যাস অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা এবং কায়িক শ্রমকেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু আরো গভীরে ঢুকে গিয়ে সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস বুঝিয়েছেন। তিনি মানুষের স্বভাব এবং সামাজিক মূল্য উৎপাদক কার্যসমষ্টি বিশ্লেষণ করে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করেছেন সমাজকে। অতীত - বর্তমান - ভবিষ্যৎ সর্বকালেই সর্বদেশে এর অস্তিত্ব।

(ক) বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান-ভিত্তিক মানুষ—ব্রাহ্মণ,

(খ) সমাজ-ব্যবস্থার পরিচালক মানুষ—ক্ষত্রিয়,

(গ) ধনোৎপাদন ও পণ্য পরিচালক মানুষ—বৈশ্য,

(ঘ) ধনোৎপাদনে কায়িক শ্রম দানকারী মানুষ—শূদ্র।

স্বামীজী ঐতিহাসিক নজির দিয়ে দেখিয়েছেন যে, অতীত - বর্তমান - ভবিষ্যৎ এই চারশ্রেণীর মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর মতে —জন্ম নয়, বরং গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই এই শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে। এই শ্রেণী বিন্যাসের অর্থ—সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তোলা। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে সকলেরই সমান অধিকার ও মর্যাদা—"সিংহাসনে আরূঢ় রাজা যেরূপ মহান ও গৌরবান্বিত রাস্তার ঐ ঝাড়ুদারও সেইরূপ।--- প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুতো প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, সেই বড়" (—কর্মযোগ)।

এখন প্রশ্ন —এই শ্রেণী বিন্যাসের প্রয়োজন কি? আমরা আগেই বলেছি যে, প্রতিটি ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে এবং প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই উপরোক্ত চারটির মধ্যে পড়ে। স্বামীজীর ভাষায়—"কোন সমাজে সকল নরনারীর মন এক ধরণের নয়, সকলের ধারণা শক্তি বা কর্মশক্তিও একরূপ নয়; তাহাদের আদর্শগুলির কোনটিকেই অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের নাই।---আমাকে তোমার ঘা

তেজবৃক্ষকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়।---আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওকবৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদর্শ লইয়াই বিচার করা আবশ্যক" (—কর্মযোগ)। অতএব শ্রেণী-বিন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যে ভালো মেশিন চালাতে পারে তাকে মেশিন চালাতে দিলে এবং যে ভালো যুদ্ধ করতে পারে, তাকে যুদ্ধ করতে দিলে কিংবা যে অর্থ-নীতি বোঝে তাকে অর্থনীতি পরিচালনার ভার দিলে সমাজই অধিকতর উপকৃত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে বিকশিত হবে।

এবারে আরেকটি বিরাট সমস্যা তুলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যোদ্ধার সন্তানকেও কি সমাজ যুদ্ধ শিক্ষাই দেবে? তিনি বলছেন যে, সেটা নির্ভর করবে যোদ্ধার ছেলের সংস্কারের উপর। শৈশবে তাকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে যোদ্ধা করার চেষ্টা হোক কারণ পিতামাতার গুণ সন্তানের মধ্যে আসে। কিন্তু যদি দেখা যায়, ছেলেটির মধ্যে অন্য কোন শ্রেণী সংস্কার প্রবল তবে তাকে সেই শ্রেণীগত শিক্ষাই দেওয়া হোক। প্রাচীন ভারতের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন—"বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র, সত্যকাম, জাবাল, ধীবর, ব্যাস, অজ্ঞাত পিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল" (—বর্তমান ভারত), আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, বিদ্যা-বিহীন পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে তারই ব্রাহ্মণ পিতা অপারগ। আধুনিক পৃথিবীর উদাহরণ দিয়ে স্বামীজী বলছেন—"মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত পদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে" (—বর্তমান ভারত), আবার উল্টোদিকে যে জাপান ছিলো শ্রমজীবী শূদ্র, সেই জাপান পাশ্চাত্য বস্তুবিজ্ঞান আয়ত্ত করে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হচ্ছে।

এইভাবে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণী সমস্যার সমাধান করে স্বামীজী এমন এক রাষ্ট্র চেয়েছেন যেখানে

সকল শ্রেণীর সমান অধিকার ও মর্যাদা

মার্কস চেয়েছিলেন এক-একটি বিপ্লব এক-একটি শ্রেণীকে ধ্বংস করবে এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া আর কিছু থাকবে না। স্বামী বিবেকানন্দের মত হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। তিনি বলছেন, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা রকম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে শ্রমজীবী শূদ্রেরা আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পেশা গ্রহণ করবে এইভাবে শূদ্র শ্রেণীর লোপ হবে।

মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির আরো উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক দুর্দশার বিলুপ্তি ঘটবে। যার ফলে বৈশ্য শ্রেণীর লোপ এবং সংস্কৃতির অগ্রগমনের সাথে সাথে মানুষ অন্তরের দিক থেকে আরো কাছাকাছি আসায় যুদ্ধ বিগ্রহ কমে গিয়ে ক্ষত্রিয়শ্রেণীর বিলোপ ঘটবে। ভবিষ্যতের মানুষ বুঝবে, জ্ঞানচর্চাই মানবজাতির সর্বপ্রধান কাম্য। এইভাবে সমস্ত শ্রেণীকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করে স্বামীজী শ্রেণী সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন।

॥ সাত ॥

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

রাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তা অথবা আন্তর্জাতিকতা প্রাধান্য লাভ করবে এই নিয়ে রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ফ্যাসিজম্ বা নাজিজম্ যেমন জাতীয়তাকেই প্রাধান্য দেয় তেমনি কম্যুনিজিমে জোর দেওয়া হয় আন্তর্জাতিকতার উপর।

উগ্র জাতীয়তাবোধের সাহায্যে একটা জাত যে উন্নতি করতে পারে তার ঐতিহাসিক নজির দিয়ে তিনি বলছেন—"একান্ত স্বজাতি বাৎসল্য ও একান্ত ইরান বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ বিদ্বেষ রোমের, কাফের বিদ্বেষ আরব জাতির, মুর বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের ফ্রান্স বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানীর এবং ইংলণ্ড বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতি এক প্রধান কারণ নিশ্চিত" (—বর্তমান ভারত)। আবার জাতীয়তাবোধের অভাবে কি প্রকারে পতন হয় তার উল্লেখ করে বলছেন—'ভিয়েনা শহরে জার্মান পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবল —আছে, কিন্তু যে কারণে, তুর্কি ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল সেই কারণ এখানেও বর্তমান—অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অস্ট্রিয়ার জার্মান ভাষী, ক্যাথলিক; হুঙ্গারির লোক তাতার বংশীয়, ভাষা আলাদা; আবার কতক গ্রীক ভাষী, গ্রীকমতের ক্রীশ্চান। এ সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অস্ট্রিয়ার নেই। কাজেই অস্ট্রিয়ার পতন। বর্তমান কালে ইউরোপে বড়ো জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্ছে সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ" (—পরিব্রাজক)।

গভীর বেদনার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতবর্ষে বাঙালী জাতি আছে, মারাঠি জাতি আছে, আছে হিন্দুস্থানী জাতি, ম্যাড্রাসী জাতি, গুজরাটী জাতি; কিন্তু হায়, 'ভারতীয়' নামে কোন জাতি নেই। আর সেজন্যই ভারতীয়দের শত শত বছরের দাসত্ব—"ভারতবর্ষ জয় করা ইংরেজদের পক্ষে এত সহজ হইয়াছিল কেন? হেতু, তাহারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিলো আর আমরা তাহা ছিলাম না" (—পত্রাবলী)। তাই তিনি উপলব্ধি করলেন, ভারতকে উঠতে হলে একটি জাতি হিসাবে জনসাধারণকে সঙ্ঘটিত হতে হবে। গর্জন করে বললেন তিনি—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটি-মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই —ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত,—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" (—বর্তমান ভারত)

কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন কি? স্বামীজী বলছেন যে, প্রত্যেকটি জাতিরই একটি বিশেষত্ব থাকে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন জাতির উদাহরণ দিয়ে একথা সবিস্তারে বুঝিয়েছেন। ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইংরেজদের তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা; ভারতের আবার ধর্ম। এই জাতীয় বিশেষত্বের উপর দাঁড়িয়েই একটা জাতকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হয়। বলছেন তিনি —"আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে সেই জন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে।" (—পত্রাবলী)।

এইভাবে জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি তুলে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের চেতনা জাগ্রত করছেন। কিন্তু এরই সাথে সাথে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে, উগ্র জাতীয়তা পৃথিবীতে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করেছে এবং বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ও নানা রকম চিন্তাধারার বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রয়োজনও খুব বেশি—"আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র" (—ভারতে বিবেকানন্দ)। নিজ জাতির অহঙ্কারে অন্যান্য জাতিকে অবহেলায় নিজেরই ক্ষতি—"আমাদিগকে দেখিতে হইবে। অন্যান্য দেশে সমাজ কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় এক জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে" (—পত্রাবলী)। ভগিনী নিবেদিতাকে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পার উহাতে যোগ দাও; আর যদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি ভারত রমণীদের সমিতিকে ঐতে যোগ দেওয়াতে পার, তবে আরো ভাল হয়।"

এইভাবে জাতি হিসাবে গড়ে উঠে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টি নিয়ে চলতে হবে। স্বামীজী এই দুইয়ের সামঞ্জস্যের

সাহায্যেই যুগ-সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, এই বিশ্ব যেন একটি পিয়ানোর মতো এবং প্রতিটি জাতি পিয়ানোর এক-একটি রীড। প্রতিটি রীডেরই বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যটিতে তাঁকে নিখুঁত হতে হবে। কিন্তু পিয়ানোতে সিম্ফনী বাজার সময় প্রতিটি রীডই তার বৈশিষ্ট্যময় সুর-লহরীর সাহায্যে এক অপূর্ব সম্মিলিত ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করবে। প্রতিটি রীডেরই এতে প্রয়োজন, আবার পিয়ানোতে সম্মিলিত সুরের সিম্ফনী এক প্রাণ-মাতানো সুর-লহরী। স্বামী বিবেকানন্দের এই অমৃত-নিঃসারী মতই আজ পৃথিবীকে যুদ্ধের দামামার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। মস্কোর বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ডঃ চেলিশভ্ স্বামীজী সম্বন্ধে বলছেন—

"Urging people to be fearless and bold, to fight the dark forces for their happiness and a better future, Vivekananda at the same time declared that it was hopeless and useless to try and rule the world by force of arms. Vivekananda called for the establishment of friendly relations between all nations, based on love of men for each other. That is why we must regard Vivekananda as one of the initiators in India of the most humane movement of our time, the peace movement."

॥ আট ॥

রাষ্ট্রবিহীন এক অখণ্ড পৃথিবী সম্ভব কি?

শ্রেণী বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বিলোপের পক্ষে যে সমস্ত মতবাদ ওকালতি করে, তার মধ্যে মার্কসবাদ অন্যতম। এই যে 'ক্লাস লেস্ স্টেট-লেস্ ওয়ান ওয়ার্ল্ড এর বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব কি? স্বামীজীর মতে—না। তাঁর মত আলোচনাকালে আমরা আগেই দেখেছি যে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে জাতীয়তায় সুদৃঢ় হয়ে আন্তর্জাতিকতাকে বরণ করা। প্রতিটি জাতিরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে; সেইটিকে রক্ষা করার জন্যই বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজন। বৈচিত্র্য প্রাণের লক্ষণ, জীবনের ধর্ম।

এবারে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বলছেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে এমন অবস্থা আসা সম্ভব নয়, মানুষের হিংসাদ্বেষের জন্য। মানুষ যতদিন না নিজ-অন্তরকে জয় করে বুদ্ধের মতো হচ্ছে ততদিন এ চিন্তা বাতুলতা। বর্তমানে সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদেরও নৈতিক মান রক্ষা করছে পুলিশ বা রাজদণ্ড। তাই রাষ্ট্রবিলোপ কখনোই সম্ভব নয়; এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহর বিলোপও কোন রকম প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করে সম্ভব নয়—এর একমাত্র ভিত্তি আধ্যাত্মিক চেতনা।

উপসংহার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—নরেনের মধ্যে আঠারোটা শক্তি আছে।" নিজের জীবনে তার পর্যাপ্ত পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাসী, দেশপ্রেমিক, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ্ প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র দিক তাঁর আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শেষ যে পরিচয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে তা হচ্ছে তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরূপ দিকটি। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি যে স্বচ্ছন্দগতিতে দিঙ্‌নির্দেশ করে গেছে, তার মুক্তিতীর্থে অবগাহন করলেই বর্তমানের এই রাজনৈতিক সংঘাত থেকে পৃথিবী শান্তি পাবে। একদিকে ভাবাদর্শের সংকট অন্যদিকে নেতৃত্বের দেউলেপনায় মানষ যখন আজ বিভ্রান্ত, তখন স্বামীজীর মহিমময় ব্যক্তিত্ব এক স্থির আলোক-রশ্মির মতো। 'পরিব্রাজক' 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ', 'পত্রাবলী' প্রভৃতি পুস্তকে রয়েছে তারই দিঙ্‌নির্দেশ। বিবেকানন্দের রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র কতকগুলি বৌদ্ধিক তত্ত্বের ওপর নয়, তা দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষ অনুভূত ফলিত বেদান্ত-দর্শনের ওপর। ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এক শোষণহীন সমাজ গড়তে তাই তিনি ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে আরেকটি বিবেকানন্দেরই প্রয়োজন। সত্যনিষ্ঠা ও প্রগাঢ় মানবপ্রেমই আমাদের এগিয়ে দেবে তাঁর কাছে। তিনি আজ নরদেহে নেই, কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করছেন সেই সব বিপ্লবীদের জন্য, যারা তাঁর নির্দেশিত পথে পৃথিবীকে ঢেলে সাজাতে প্রাণ বিসর্জন দেবে। তাঁর আহ্বান-বাণী আজো আমাদের উদ্দাম করে তোলে—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—আমাদের জন্য; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ্‌—জাগ্, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

"পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। ......যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারী পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।" —রবীন্দ্রনাথ।

দূরদিগন্তে

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

মার্শাল শর্টির নির্দেশে মালি প্রথম থেকেই তৈরি। পোলটনকে জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে এল জুলিয়া, তারপর খিড়কির দিকে গাঢ় অন্ধকারে তাদের চাপা স্বরে তর্ক-বিতর্ক। সবই দেখেছে মালি, সবই শুনেছে। কিন্তু কিছুই দেখে নি, কিছুই শোনে নি, এমনি নিখুঁত অভিনয় ক'রে গেছে আগাগোড়া। তারপর অকৃতজ্ঞ পোলটন যখন জুলিয়াকে ঠেলে ফেলে দিয়ে পিচফোর্কের দিকে ছুটলো, মালিও দেরি করলো না, অন্ধকারে চোরের মতো পিছু নিল।

কিন্তু এই অনুসরণ কাজটি সোজা নয়। একে তো মিটমিটে তারার ঝাপসা আলোয় কিছুই পরিষ্কার দেখা দেখা যায় না, তার ওপর পেছনের ব্যবধান বেশ কয়েক ফার্লং না হ'লে চলে না। নইলে মালির ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলে ধূর্ত পোলটন মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যাবে। তখন তো সবটাই মাটি। তাছাড়া, জুলিয়ার পিস্তলটি পোলটন ছিনিয়ে এনেছে কিনা কে বলতে পারে। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ছুটতে লাগল মালি। এর মধ্যে বার কয়েক পোলটন মাঝপথে ঘোড়ার লাগাম টেনে পিছন ফিরে তাকালো—কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না বুঝতে চেষ্টা করলো। বারকয়েক পথের বাঁকে-বাঁকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে সে হারিয়ে গেল। সতর্ক মালি হতাশ হয়ে পড়ল। আবার পাওয়া গেল তাকে। আলো-অন্ধকারে এমনি ক'রে লুকোচুরি চলতে লাগল। তারপর এক সময় পিচফোর্ক যখন আর মাত্র তিন মাইলের মাথায় হঠাৎ একটা পথের বাঁকে এসে পোলটনকে আর দেখা গেল না। পাশেই ঘন জঙ্গল। মালি ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল। অস্পষ্ট আলো-আঁধারে সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, ধুধু পথ—জনমানব শূন্য। এত তাড়াতাড়ি এতটা পথ ভেঙে পোলটন উধাও হয়ে গেল? অসম্ভব। জঙ্গলের একধারে ঘোড়া থেকে নামলো মালি। অন্ধকার জঙ্গল, মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ, রহস্যময়।—হঠাৎ পটাস্ ক'রে একটা শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ হলো। মালি সট্ ক'রে সরে গেল একটা গাছের আড়ালে। একটু পরে কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে ঝোপ-ঝাড় নড়ে উঠল। মালির বুঝতে বাকি রইল না যে, পোলটন এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

ঘোড়াটাকে গাছের আড়ালে রেখে মালি ক্ষিপ্রবেগে অথচ সন্তর্পণে এগোতে লাগল। ঝোপের যে-জায়গাটা নড়ে উঠেছে, অর্থাৎ যে-জায়গাটায় পোলটন আছে বলে মালির ধারণা, ঠিক সেদিকটা লক্ষ্য রেখে পশ্চিমে ঘুরে গিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে মালি

এগোতে লাগল। খানিক পরে মনে হলো, হ্যাঁ, পোলটন খুব কাছাকাছি আছে। মালি শুয়ে পড়ল। রুদ্ধ-নিশ্বাসে কান খাড়া ক'রে রইল। কিন্তু না, দশ মিনিট কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। কোনো সন্দেহ নেই, পোলটনও মালির মতো কান খাড়া ক'রে চুপচাপ আছে।

অগত্যা মালি উঠল। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। খানিক দূরে সেই ভাঙা মরা ডালটি পাওয়া গেল। মালির মাথায় খাঁ ক'রে এক ফন্দি এল। সে সন্তর্পণে ঐ মরা ডালটি তুলে নিয়ে ঝোপের একদিকে খুব জোরে ছুঁড়ে দিল। ডালটি ঝপাৎ করে পড়তেই দুম্ ক'রে একটা রাইফেলের গর্জন উঠল। ঝোপের যেদিকে ডালটিকে ছুঁড়ে দিয়েছে মালি, ঠিক সেইদিকে একটা বুলেট শাঁ ক'রে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বুলেটটা এল যেদিক দিয়ে ওদিকেই আছে মালির ঘোড়া। তার মানে, মালি যেমন কৌশলে গা-ঢাকা দিয়ে পোলটনের ঘোড়ার কাছে এসে পৌঁচেছে, পোলটনও তেমনি মালির ঘোড়ার কাছে। শুধু তাই নয়, মালির ঘোড়া থেকে রাইফেলটি হাতিয়ে নিয়েছে পোলটন। নইলে পলাবার সময়ে পোলটন যে অত ভারী রাইফেল জুলিয়ার কাছ থেকে আনতে পারে নি সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সমস্তটা আঁচ ক'রে মালি ধিক্কার দিল নিজেকে। নিজের রাইফেলটি হারিয়ে এখন পিস্তল নিয়ে রাইফেলের সঙ্গে যুঝতে হবে তাকে। সে যে অসম্ভব।

ঝোপের আড়ালে পোলটনকে আন্দাজ ক'রে খরগোশের মতো এগোতে লাগল মালি। আবার একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ঝপাৎ ক'রে ছুঁড়ে দিল একদিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের গর্জন। এবং রাইফেলের আওয়াজের নিশানা থেকেই বোঝা গেল পোলটন অন্য দিকে সরে গেছে। পোলটন এক জায়গায় থাকছে না, ঘুরে-ঘুরে সরে-সরে যাচ্ছে। মালি চুপচাপ ভাবতে লাগল। কী করবে সে, কী করা যায়। রাইফেলধারী পোলটনের নাগালে এলে রক্ষা নেই তার, অথচ পোলটনকে ঘায়েল করবে সে কী ক'রে। ঝোপে-ঝাড়ে মৃত্যুর ফাঁদ-পাতা অন্ধকার। মাঝে-মাঝে দু'দিক থেকে ঘোড়া দু'টোর ভয়ার্ত চীৎকার, এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। আবার একটা ফন্দি আঁটলো মালি। আবার সন্তর্পণে এগোতে লাগল। মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে গাছের ডাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে পোলটনকে বিভ্রান্ত ক'রে তুললো। তারপর এক সময় পোলটনের ঘোড়ার কাছে এসে দশ-বারো গজ তফাতে মালি একটা গাছের ডাল সজোরে ছুঁড়ে মারলো ঘোড়াটার পায়ে। আচমকা সেই আঘাতে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে দে ছুট। মালির প্ল্যান নির্ভুল। ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে ঝোপের আড়ালে পোলটন নিজের বিপদ বুঝতে পারল। সত্যি-সত্যি তাকে ফেলে রেখে ঘোড়াটা কতদূর যাচ্ছে দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন পোলটন ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুললো। অমনি মালির পিস্তল গর্জে উঠল। মাথার একপাশে গুলীটা লেগেছে, পোলটন পড়ে গেছে মাটিতে। পরক্ষণেই হামাগুড়ি দিয়ে সে ছুটতে লাগল। তাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে মনে হচ্ছে তার চোটটা তেমন মারাত্মক নয়। অতএব মালি হাঁটু গেড়ে বসে জায়গাটা আন্দাজ ক'রে পরপর গোটা কয়েক গুলী ছুঁড়লো। যন্ত্রণার ঈষৎ কাতরোক্তি শোনা গেল যেন। কিন্তু তারপরেই ঘন ঝোপ-জঙ্গলের দ্রুত নড়াচড়া দেখে কোনো সন্দেহ রইল না যে, পোলটন তার ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে যাবার জন্য পথ ক'রে নিচ্ছে। নিঃশব্দে মালি তার ছয়-ঘড়া পিস্তলটাতে গুলী ভ'রে নিলো। তারপর ঐ ঝোপ-ঝাপের নড়াচড়া লক্ষ্য ক'রে সেও হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল সন্তর্পণে। ঝোপের বাইরে খানিকটা পাতলা জায়গায় এসে সে শুয়ে-শুয়ে মাথা গলিয়ে দেখতে লাগল। পাঁচ-সাত মিনিট বাদে বোঝা গেল, ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে পোলটনের ঘোড়াটা এগোচ্ছে। যতক্ষণ সেটা বাইরের ফাঁকা জায়গায় না আসে ততক্ষণ যে পোলটনও ঘোড়ার পিঠে উঠবে না সেটা এক রকম নিশ্চিত।

আরো কিছুক্ষণ পর ঘোড়াটা ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এল একেবারে ফাঁকা জায়গায়। আর তারই পাশে-পাশে রাইফেল বাগিয়ে পোলটন। আরো একটু ফাঁকায় আসুক পোলটন, মালি ওৎ পেতে রইল। আরো, আরো একটু। তারপর যেই সুযোগ এল অমনি গুলী করলো পোলটনের হাতে, তাকে নিরস্ত্র করবার জন্যই। কিন্তু আবছা আলোর গুলীটা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হ'লো। পোলটন অমনি লাফ দিয়ে সরে গেল এক পাশে, তারপরেই রাইফেল তাক ক'রে পাল্টা গুলী ছুঁড়লো। মালির বরাত ভালো, কেন না, তক্ষুণি ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ত্রস্তে লাফিয়ে উঠল—আর তারই ধাক্কায় পোলটনের গুলীটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লো। আবছা আলো-আঁধারে বিপদের ঝুঁকি অনেক বেশি। মালি সময় নষ্ট করল না। পোলটন সামলে নেবার আগেই সরাসরি তার বুক লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়লো। এবারে অব্যর্থ লক্ষ্য-ভেদ। ক্ষিপ্রহস্তে দ্বিতীয়বার রাইফেল তুলেছিলো পোলটন, সহসা যেন বজ্রাঘাতে পাথর হয়ে গেল। রাইফেল খসে পড়ল হাত থেকে, তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কপালের ঘাম মুছে ঝোপ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল মালি। পোলটনের হাত থেকে কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে রাইফেলটি, তবু কোনো ঝুঁকি নিতে রাজী নয় সে। সদ্য নিহত ব্যাঘ্রের প্রতি অভিজ্ঞ শিকারী যেমন সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে থাকে, মালিও তেমনি পিস্তল উঁচিয়ে শায়িত পোলটনের দিকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। তারপর যখন

দেখল গুলীটা পোলটনের হৃৎপিণ্ড সোজাসুজি ভেদ ক'রে গেছে এবং পোলটন নিঃসংশয়রূপে মৃত, তখন সে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল।

অদূরে পোলটনের অর্থাৎ জুলিয়ার ভীত-সন্ত্রস্ত ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। মৃতদেহটা ঘোড়ার পিঠে তুললো মার্লি। দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলো। রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঝোপের একপাশে, সেখানে তার নিজের ঘোড়া তারই অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

চিনাটাউনে ফেরার পথটি দীর্ঘ। অথচ দু'-দু'টো ঘোড়া আর একটা মৃতদেহ নিয়ে অস্পষ্ট আলোয় জোর কদমে চলবার উপায় নেই। তারাভরা আকাশে তাকিয়ে মার্লি অবাক হলো; লড়াইটা তাহ'লে অনেকটা সময় নিয়েছে? তা মার্লির বরাত ভালো, দু'-দু'বার পোলটনের গুলী ফস্কে গেছে, নইলে এই মৃতদেহ পোলটনের না হয়ে তারই তো হ'তে পারত। এ বরাত ছাড়া কী? কিন্তু কী ধূর্ত এই পোলটন, কী দুর্ধর্ষ।-----

ঘোড়া থেকে নেমে মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে মার্লি যখন মার্শালের অফিস ঘরে এসে ঢুকল, দেখল মার্শাল সোফার ওপর নিদ্রামগ্ন। ভারী পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। মার্শাল লাফিয়ে উঠলেন। স্পষ্টতই তিনি মার্লির প্রতীক্ষা করছিলেন। মিনিট খানেক থ' হ'য়ে দেখলেন মার্লিকে। তারপর হাজত-ঘরের কাঠের পাটাতনে মৃতদেহটি রাখবার আদেশ দিয়ে তিনি নিজের হাতে মার্লির জন্য কফি তৈরি করতে লাগলেন।

হাজত-ঘর থেকে ফিরে এল মার্লি। কফির মগ হাতে নিয়ে আরাম ক'রে বসল। তার মুখে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শুনতে লাগলেন মার্শাল।

মৃত পোলটনের দেহ তল্লাসী ক'রে টুকিটাকি অনেক জিনিস পাওয়া গেল। সব জিনিস একটা রুমালে বেঁধে মার্শাল তাঁর আপিস-ঘরে ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে বসলেন। একগাছা বিল, কিছু ব্যাঙ্ক-নোট, ব্যাঙ্কের চেক বই, কিছু খুচরো। পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেল জুলিয়ার কোনো ভাবনা নেই। আর যাই হোক পোলটন, লোক ছিল বেশ শাঁসালো। এগুলো সরিয়ে রাখলেন মার্শাল। একে-একে সরিয়ে রাখলেন ছোটো একটা ছুরি, তামাকের টিন, সিগারেট বানাবার কাগজ, ইলেকট্রিক শেভার, এমনি আরো অনেক টুকিটাকি। তারপর তিনি ছোটো একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে পড়লেন। নানা আকারের হরেক রকম কাগজপত্র। কয়েকটি চিঠি, কিছু কারেন্সি বিল।---একটু হতাশ হতে হলো, টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন এই সব কাগজপত্রের মধ্য দিয়ে জুয়াড়ি পোলটনের কিছু গোপন সংবাদ মিলবে। কিন্তু তিনি না পেলেন দলের লোকদের খবরা-খবর, না কোনো টাকার কোনো হদিশ। পোলটনের সে-সব দলিলপত্র গেল কোথায়? হয়তো পিচফোর্কে আছে। জুলিয়া কি সে-সবের খবর জানে না?

মার্শাল চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। জুলিয়াকে জেরা করলে হয়তো কিছু তথ্য বেরোতে পারে। কিন্তু তার আগে জুলিয়াকে তো তার পিতার মৃত্যুসংবাদ দিতে হবে। দিতেই হবে, উপায় কী?

মুখ-হাত ধুয়ে ড্রেস পরলেন মার্শাল। কফি খেলেন আরেক পেয়ালা। তারপর লালকুঠির দিকে পা বাড়ালেন। এখনো অস্পষ্ট আঁধার, আবছা আকাশে ভোরের আগমনী। চারিদিকে নিঝুম ঘুম, জীবনের কাকলি জাগল বলে।

লালকুঠির বাইরে রোরি। ঝাড়-পোঁছ করছে। মার্শালকে দেখে সেলাম ক'রে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। রোরিকে জিগেস ক'রে মার্শাল জানলেন জুলিয়া অনেকক্ষণ জেগেছে, খানিক আগে খাবার দিয়ে এসেছে রোরি। লালকুঠিতে ঢুকে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন মার্শাল। জুলিয়ার ঘরে গিয়ে দেখলেন খাবার তেমনি পড়ে আছে, জুলিয়া চুপচাপ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। চেয়ার টেনে বসলেন মার্শাল, বিবর্ণ মুখে হাসি টেনে জুলিয়া অভ্যর্থনা জানাল।

'খারাপ খবর নিয়ে এলাম, জুলিয়া।' শান্ত গলা মার্শালের।

'খারাপ যা তা তো চুকেই গেছে। তার চেয়ে খারাপ আর কী বলবেন?' ম্লান হেসে বলল জুলিয়া।

না, সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। কঠিন দুঃসংবাদে কোনো মধুর প্রলেপ দেওয়া সঙ্গত হবে না। সুতরাং মার্শাল সোজাসুজি বললেন, 'তোমার বাবা কাল রাত্রে পালাতে গিয়ে বন্দুকের গুলীতে নিহত হয়েছেন।'

চেয়ারে বসেছিল জুলিয়া। একটা ধাক্কা খেয়ে সোজা হ'য়ে গেল। তারপর যেন কিছু হয় নি এমনি একটা শিথিল ভঙ্গিতে বসে রইল। তার ম্লান চোখ নত হলো। কিন্তু সে-চোখে জলের কোন আভাসমাত্র না-দেখে মার্শাল বিস্মিত হলেন।

'এটা দুর্ভাগ্যজনক নিঃসন্দেহে। তবু এতে দুঃখ ক'রে লাভ নেই জুলিয়া।' সান্ত্বনা দিলেন মার্শাল। 'ভেবে দেখতে গেলে এক হিসেবে এ-ভালোই হলো: তোমরা উভয়েই ভবিষ্যতের অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পেলে। আর যাই হোক, তোমার বাবার শেষ পর্যন্ত এ-রকম একটা পরিণতি হতোই।'

'জানি, মার্শাল।' ধরা গলায় আস্তে-আস্তে বলতে লাগল জুলিয়া। 'সত্যি বলতে, এর জন্য আমি যে খুব একটা শোক পেয়েছি তা বলতে পারি নে। বাবার স্নেহই পেলুম না কোনোদিন। আমি যে তাঁর মেয়ে সে-কথা প্রাণভরে জানতেই পারলাম না। তার চেয়ে বড়ো ক্ষোভ আর কী আছে বলুন?'

মার্শাল মাথা নেড়ে আন্তরিক সমর্থন জানালেন। তারপর টুকিটাকি অন্যান্য

জিনিসের সঙ্গে কাগজে বাঁধা অনেক টাকার বাণ্ডিলটি তুলে দিলেন জুলিয়ার হাতে : 'নাও, রাখো। এ-সব এখন তোমার সম্পত্তি।'

জুলিয়া হাত বাড়ালো না দেখে মার্শাল টেবিলের ওপর রাখলেন। জুলিয়া ভয়ে-ভয়ে তাকাল। এতগুলো টাকার বাণ্ডিল দেখে আঁৎকে উঠল। 'এ যে অনেক টাকা! না, না, এ আমার না।'

'তোমারই।' দৃঢ়স্বর মার্শালের। 'হ্যাঁ, তোমারই। কোত্থেকে কী ভাবে এত টাকা এলো সে তোমার দেখবার নয়। এ-টাকা তোমার বাবা পোলস্টনের, সুতরাং তার অবর্তমানে তোমার। ব্যস্। এখন শোনো।' একটু ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বললেন মার্শাল, 'তোমার বাবার জরুরী কাগজপত্রগুলো কোথায় আছে বলতে পারো?'

'কাগজপত্র?' ঠোঁট কামড়ে একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে জুলিয়া বললো : 'তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ, ছোট্টো একটা চামড়ার ব্যাগে বাবা প্রায়ই কিছু কাগজপত্র রাখতেন দেখেছি। সেগুলো আসলে যে কী তা বলতে পারব না। তবে তাকপাতিক দেখে মনে হ'তো খুব জরুরী।'

'সেই ব্যাগটা কোথায়?'

'বোধ হয় পিচফোর্কে, তাঁর ঘরে। একটা কাবার্ডের ভেতর।'

'পোলস্টনের ঘরে? ঠিক কোন্ ঘরে বলো তো?'

'পিচফোর্কে পাইনভিলার দোতলায় আমাদের ঘর মাত্র দুটো। তারই উত্তরের দিকে যে-ঘরখানা—'

'হুঁ।' গম্ভীর মুখে মার্শাল কী ভাবলেন খানিক। তারপর ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়ে পায়ের ওপর চাপড় মারলেন। 'হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু এতক্ষণে সে-ব্যাগ কি আর আছে? কে জানে। কাল রাত্রে মালির সঙ্গে লড়াই ক'রে তোমার বাবা খতম হয়েছেন এ-খবর কি তারা পায় নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে। আর খবর পাওয়া মাত্র ব্যাগটা হাতিয়েছে। অসম্ভব কী। দেখা যাক—' মার্শাল উত্তেজনায় লাফিয়ে নামলেন। দরজার দিকে ছুটে গিয়ে একবার থামলেন। 'জুলিয়া, পিচফোর্কের ঐ দলিলপত্রের মালিক এখন তুমি। ও-সব নিয়ে এখন গোলমাল বাধতে পারে। যাতে না বাধে, যাতে তোমার হ'য়ে আমি ওগুলো নাড়াচাড়া করতে পারি, এ-বিষয়ে একটা 'অধিকার' দাও আমাকে—একটা 'অথরিটি।'

'অথরিটি? নিশ্চয়ই।' জুলিয়া অবাক হ'লো।

'লিখে দাও তাহ'লে।—দাঁড়াও, এ-পাড়ার ভালো উকিল ব্রেসকোর্ড, তাকে ডেকে নিয়ে আসি।----'

ঐ ভোরে ব্রেসকোর্ডকে ধরে নিয়ে এলেন মার্শাল। সেই সঙ্গে সাক্ষী হিসেবে মাইকও এল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ব্রেসকোর্ড একটা আইন সংগত খসড়া করলেন, জুলিয়া এবং আর-সকলের যথাযোগ্য সই-সাবুদ হ'লো। পর মুহূর্তে কাগজটি পকেটে পুরে মার্শাল উঠে পড়লেন, 'ওরা টের পাবার আগেই আমাকে পিচফোর্কে যেতে হচ্ছে, মাইক। এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।'

'কিন্তু মার্শাল'—মাইক ব্যস্ত হয়ে পড়ল—'একা যেয়ো না সেখানে। গোলমাল হবে। ঝুঁকিটা মস্ত বড়ো।'—

'যেতেই হবে আমাকে।' মার্শাল নির্ভীক। 'এখন সাত-কান ক'রে লোক সংগ্রহের প্রয়োজন দেখি না। তাতে সময় নষ্ট হবে, কাজ হবে না।'

'আমি তাহলে সঙ্গে যাব।' মাইক টান মেরে তার সাদা অ্যাপ্রোন খুলে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে বেশ পরিবর্তনে মনে হ'লো যেন সে আগে থেকেই প্রস্তুত। 'চটপট তৈরি হয়ে নাও, মার্শাল। তিন মিনিটে আমি ঘোড়া নিয়ে হাজির হচ্ছি।'

মার্শাল মৃদু হাসলেন। কিন্তু ললাটে তাঁর চিন্তার ঘন রেখা। তিনি জানেন সিংহের গুহায় তিনি মাথা গলাচ্ছেন। সামান্য অসতর্কতায় অসামান্য বিপদের সম্ভাবনা : প্রাণ নিয়ে তিনি ফিরতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তবু তাঁকে যেতেই হবে। পোলস্টনের গোপন দলিলপত্রের হদিশ পেলে সেইসূত্রে খুনেদের সমস্ত দলটা ধরা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা। আর তারই জন্য কালবিলম্ব না ক'রে একেবারে খুনেদের আস্তানায় তাঁকে যেতে হবে। উপায় নেই। মরতে তো হবেই একদিন সকলকে। না হয় সৎ কর্মে জীবনটা উৎসর্গ করা যাক। সংকল্পে কঠিন মার্শাল দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন।

[ক্রমশঃ

অদৃশ্য মুখোস

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

কে কার খবর রাখে বিরাট শহরে
পাড়ায়, গলিতে কিংবা এ-ঘরে ও-ঘরে?
যে যার নিজের দলে কাজে বা অকাজে
ব্যস্ত, বেহুঁস! হৃদয় পঙ্কজ লাজে।

এ যুগে—'সমাজ?' নাকি—'স্বার্থ'ই বড়?
সকলেই ভাবে : 'আমি বুদ্ধিতে দড়।'
সাধনা, সততা, সেবা, ত্যাগ, মানবতা
অহিংসা, মৈত্রী—মুখে মালজমা কথা।

কোথায় আদর্শ? গণতন্ত্রকে মেনে চলা?
অদৃশ্য মুখোস যেন ঝরছে ঝলা-ঝলা!
বিষাক্ত দেশের হাওয়া অক্সিজেন নেই।
একাকার অন্ধকার, 'তুমি'—'আমি' নেই॥

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

জীবন-কাহিনী

সমীরণ চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'প্রোলেতারি' ছাপান, সম্পাদনা, রাশিয়ায় তা গোপনে চালান করা ইত্যাদি কাজে তিনি দিনরাত অত্যন্ত ব্যস্ত। এর সঙ্গে সঙ্গে চলল বিগত বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন; কেন না, তিনি জানতেন, গণ-বিপ্লবের অবসানে প্রধান কর্তব্য তার সাময়িক বিফলতার কারণ বিশ্লেষণ এবং তা থেকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার দৃঢ় নির্দেশ আবিষ্কার। ব্যর্থতা কোনদিন লেনিনকে হতোদ্যম করতে পারে নি। তাঁর মহত্ত্ব এবং নজির-বিহীন সাফল্যের একটি বড় কারণ এই অপরাজেয় দৃষ্টিভঙ্গি -- ব্যর্থতাকে যা সত্যি সত্যি সাফল্যের সোপানে রূপান্তরিত করেছিল।

তিনি দেখালেন, এই বিপ্লবের অবদান নিজ শক্তি সম্পর্কে সর্বহারার সচেতনতাপ্রাপ্তি; সারা পৃথিবীর প্রোলেতারিয়েতদের মধ্যে একতার সূচনা হয়েছে; বিশেষত এশিয়ার নিপীড়িত জনগণ স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহিত, যার প্রমাণ তুর্কী, পারস্য এবং চীন দেশের বিপ্লব। অর্থাৎ আপাত ব্যর্থতার অন্তরালে রয়েছে বিজয়সূর্য —মেঘ কেটে গেলেই যা আপন বিভায় উদ্‌ভাসিত করবে দশদিক। স্বদেশে, বিদেশে তিনি যেদিকে তাকান শুধু আলোর ইসারা -- অন্ধকার নয়।

এই সময় লেনিন কৃষকদের নিয়ে চিন্তা সুরু করেন। তাঁর মনে হল, অসময়ে যাতে তারা হঠাৎ আন্দোলন আরম্ভ না করে সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কৃষি ও কৃষক আন্দোলনের পদ্ধতির আমূল সময়োপযোগী পরিবর্তন করলেন তিনি মারকসীয় পন্থায়। বললেন, সব জমির রাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া নান্য: পন্থা:।

রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক ব্যর্থতা বহু নকলতত্ত্বের সৃষ্টি করেছিল। সব্যসাচী লেনিন এক হাতে সব ভ্রমাত্মক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জঞ্জাল দূর ক'রে অন্য হাতে সঠিক তত্ত্ব প্রচারে ব্যাপৃত হলেন। মারকস্-এর পঞ্চবিংশতিতম মৃত্যু দিবসে (এপ্রিল, ১৯০৮) প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মারকসিজম অ্যাণ্ড রিভিশনিজম্' (মারকস্‌বাদ ও শোধনবাদ)

এপ্রিল মাসেই তিনি ইতালীর ক্যাপ্রি দ্বীপে গেলেন গোরকীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রধানত তাঁরই অনুরোধ ও উৎসাহে গোরকী লিখলেন আত্মজীবনী তিন খণ্ডে। গোরকীর সঙ্গে তিনি নেপ্‌লস্ শহর ও উপকণ্ঠ, পম্পীর ধ্বংসাবশেষ ও বিসুবিয়স্ আগ্নেয়গিরি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ক্যাপ্রি-র জেলেদের সঙ্গে মিশলেন অন্তরঙ্গভাবে। তাদের সুখ-দুঃখের আলোচনা করলেন একান্ত-ভাবে।

একত্রবাসের ফলে প্রোলেতারিয়েত নেতা এবং স্রষ্টা আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন, এরপর ১৯১১-১২-য় প্যারিস-এ একত্রে থাকা এবং তাঁদের পত্রালাপ --সব মিলিয়ে নেতার দূরদর্শিতা বেশ বোঝা যায়। উপযুক্ত এবং মহান সাহিত্য যে রাজনীতি আর বিপ্লবের ধারক-বাহক তা তাঁর জানা ছিল এবং গোরকীকে সত্য অর্থে জনগণের লেখকরূপে দেখার আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে ফুটে উঠেছে। গোরকীর ভাষায় লেনিন অত্যন্ত 'কড়া শিক্ষক এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধব'।

১৯০৯-এর মে মাসে লেনিন-এর 'মেটিরিয়ালিজম্ অ্যাণ্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম' নামক বিখ্যাত বই ছাপা হল। এ বইতে তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের একমাত্র কাজ জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ--এর বাইরে কোনও কাজ থাকা অসম্ভব। এই বই বেরোবার ফলে সর্বত্র উত্তপ্ত আলোচনায় ঢেউ উত্তাল; রাশিয়া, জেনেভা, লণ্ডন, প্যারিস--সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনার প্রতিটি কেন্দ্র তখন আলোচনা-মুখর। 'মাচিজম' নামক নকল তত্ত্বের সমাধি রচিত হল এই পুস্তকসঞ্জাত আলোচনার মাধ্যমে।

১৯০৮-এর শেষভাগে 'প্রোলেতারি' জেনেভা থেকে প্যারিস-এ স্থানান্তরিত হল। কাজেই লেনিন-দম্পতিও এলেন সেখানে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর 'রুয়েমারী রোস্' নামক রাস্তায় একটা দু'কামরার ফ্ল্যাট মিলল; এখন সেখানে 'লেনিন মিউজিয়ম' হয়েছে। প্যারিস-এ প্রবাসী রুশরা কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন। লেনিন নিজের বক্তৃতা-লব্ধ সমস্ত অর্থ দান করতেন এঁদের সাহায্যার্থে, তাঁদের কাজকর্ম পাইয়ে দিতেও আপ্রাণ সাহায্য করতেন।

সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সময় ক'রে লেনিন-দম্পতি থিয়েটার দেখতেন। প্যারিস্-এর উপকণ্ঠের একটি থিয়েটার-এ তিনি বিশেষ ক'রে যেতেন—এখানে বিপ্লব-সম্পর্কীয় নাটক অভিনীত হত।

প্যারিস্-এর উপকণ্ঠবাসী মারকস্-কন্যা লরা এবং তাঁর স্বামীর সাহায্যে লেনিন ফরাসী শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন।

চতুর্দিকে প্রতিবিপ্লবী বেষ্টিত লেনিন-এর অবস্থা তখন সপ্তরথী

দেখুন! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে...

টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে

Tinopal

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোয়ার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়—এমন সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে।

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম। টিনোপাল কিনুন—রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা "এক বালতির জন্যে এক প্যাকেট"।

টিনোপাল—জে আর গায়গী এস এ, বাসল, সুইজারল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গায়গী লিঃ, পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

Shilpi SGT-1A/69 Ben

He knows only his mother-tongue. Yet he reads a NEWSPAPER every day

Which other medium can reach millions like him in 14 languages at so little cost?

Millions in this country do not know English. Does your message have to go unheard? Not the least bit! There are 3,924 publications—Dailies and Periodicals—that can bring your goods and services to their attention in as many as 14 different languages of India.

There are 105.5* million Indians today who can read and write.** They do not all own radios or go to the cinema; but 16.3 million of them read one or more newspapers and magazines in their own language. This is the surest way to reach them with your advertising message.

There is a newspaper or magazine to reach every reader in his language at the lowest cost per thousand.

(Publication: 'INDIA 1969')
**(Remember literacy is growing in this country at the rate of 5 million persons per year—and readership is growing with it.)*

Address through the Press—it costs far less

IENS

Inserted in the interest of providing information for better advertising value by
THE INDIAN & EASTERN NEWSPAPER SOCIETY

বেষ্টিত অভিমন্যুর মত। তবে তিনি পরিণত যোদ্ধা। এ সময় ট্রট্‌স্কী-র সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ প্রায় চরমে উঠেছিল—সেণ্ট্রাল কমিটির কাছে একটি চিঠিতে লেনিন লিখেছেন:

'ট্রট্‌স্কী-র ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণ্য-দলবাজের মত ----হয় তিনি সেণ্ট্রাল কমিটির কথা মেনে চলবেন, না হলে শয়তানকে তাড়িয়ে দিতে হবে, এবং তাঁর মুখোস খুলে ধরতে হবে---'

পার্টি দখলের দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে একদল শোধনবাদী---যাদের বলা হত 'অত্‌জোভিস্‌ত'---ক্যাপ্রিতে এক 'পার্টি স্কুল' খুলে লেনিনকে পর্যন্ত বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানাল। লেনিন সে আমন্ত্রণ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান ক'রে জবাবে তাদের গোপন শয়তানি প্রকট ক'রে দিলেন।

প্যারিস-এ বসে লেনিন অক্লান্ত-ভাবে রাশিয়া থেকে আগত শ্রমিক-কর্মীদের শিক্ষণকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সকাল আটা থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি পর্যন্ত বিব্‌লিওথেক্ ন্যাশিওনেল্ লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন, বেলা দু'টোর সময় স্বল্পাহার, তারপর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দলীয় কাজ। একটানা এই রুটিন।

১৯১০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেণ্ট্রাল কমিটির সভা বসল প্যারিস-এ। চতুর্দিকে শোধনবাদী এবং সুবিধাবাদী পরিবেষ্টিত বলশেভিক-রা তখন অত্যন্ত বিব্রত।---লেনিন গোর্কীকে লিখেছেন সভার বর্ণনা প্রসংগে: 'তিন সপ্তাহব্যাপী---নরক বিশেষ।'

এ সময় বিদেশে প্রকাশিত সেণ্ট্রাল পার্টির মুখপত্র 'সোত্‌সাল্ দেমেক্রাত্‌'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য নির্বাচিত হন তিনি। অন্য সম্পাদক দু'জন—মার্‌তভ্ ও ড্যান্---প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে বাধা দিতে লাগলেন, মার্‌তভ্ ত' খোলাখুলি বলে বসলেন তিনি লড়াই' করবেন লেনিন-এর সংগে।

আসন্ন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের কালো-ছায়া লেনিন-এর চোখে ধরা পড়েছিল এবং তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এই বিপদ এড়াতে। সাম্রাজ্যবাদীদের আসল বীভৎস মূর্তি তুলে ধরলেন লেনিন।

য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া এবং আফ্রিকায় যে নারকীয় অত্যাচার করত, তা লেনিন-এর লেখনীতে প্রকাশ হতে লাগল---য়ুরোপ-এর তথাকথিত 'সভ্য' জাতের শাসকরা আসলে যে 'ব্রুট্'—'জন্তু'—ছাড়া কিছু নয়, তা তিনি খোলাখুলি লিখতে লাগলেন।

গ্রীষ্মশেষে লেনিন এলেন কোপেনহেগেন-এ, 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর অষ্টম কংগ্রেস-এ যোগ দিতে। এখানে মেনশেভিকদের সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্ব হল পার্টির অধিকার নিয়ে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পাদক ড্যান্ দুঃখ ক'রে বললেন, যে লোক (অর্থাৎ লেনিন) '২৪ ঘণ্টা বিপ্লবের কাজ করেন অনন্যমনা হয়ে, এমন কি স্বপ্নেও বিপ্লব দেখেন,' তাঁকে নিয়ে কী করা যাবে।

এখানে ট্রট্‌স্কী এবং অন্যান্য শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে আবার প্লেখানভ্-এর সঙ্গে তাঁর সমঝোতা হল।

স্টক্‌হোম-এ এক বক্তৃতার সময় লেনিন-জননী উপস্থিত ছিলেন---এই প্রথম মা তাঁর কালজয়ী সন্তানের বক্তৃতা শুনলেন--হয় ত' তখন তাঁর শহীদ পুত্র আলেক্‌জান্দার-এর কথা মনে পড়েছিল, কে জানে।

বড় বিষাদপূর্ণ মাতা-পুত্রের বিদায় ক্ষণ। রুশ জাহাজে উঠলেন মা—কূলে দণ্ডায়মান পুত্র, পরস্পরের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। লেনিন-এর পক্ষে জাহাজে ওঠা সম্ভব নয়, উঠলেই গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা। দু'জনেই ভাবলেন, হয়ত এই শেষ দেখা!

হয়েছিলও তাই। মা দেহরক্ষা করেন ১৯১৬ খৃস্টাব্দে---পুত্রের বিজয়-গৌরব দর্শন তাঁর ভাগ্যে হয় নি।

সপ্তম অধ্যায়

বিপ্লবের নবজন্ম

১৯১০-১১ খৃস্টাব্দ রুশ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ: নববলে বলীয়ান শ্রমিকদল আন্দোলন আবার সুরু করল। ১৯১১-য় এক লাখেরও বেশি সংখ্যক শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনে উত্তাল। সেণ্ট্ পিটারস্‌বার্গ-এর শ্রমিক সংস্থাগুলো দাবী করল ১৯০৭-এ অন্যায়ভাবে নির্বাসিত 'ডুমা'র সভ্যদের অবিলম্বে

সেণ্ট্রাল কমিটির সভায় লেনিন (১৯২২ সাল)

মুক্তি দিতে হবে। লেনিন-এর সহযোগিতায় জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে শ্রমিকদের এই দাবীর সমর্থনে সমাজবাদীদের সভা হল।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির বল্‌শেভিক সভ্যরা গ্রেপ্তার হওয়ায়, একদিকে কমিটি অচল, অন্যদিকে আন্দোলন নেতাহীন। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য লেনিন সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। প্লেখানভ্‌-এর মেন্‌শেভিকদের সঙ্গে সংঘাত হল আরও ঘনিষ্ঠ—প্রবলতর শত্রুর মোকাবিলার জন্য; এবং প্যারিস-এ তিনি 'ওয়ার্কার্সার গেজেট' নামে পত্রিকা (রাবোচায়া গাজেটা') প্রকাশ আরম্ভ করলেন ১৯১০-এর ৩০শে অক্টোবর। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে বলশেভিকরা ১৯১০-এই সেণ্ট পিটার্সবার্গ শহরে 'দ্য স্টার' নামে পত্রিকা প্রকাশ করলেন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে; এমনকি, ঠিক ঐ সময় মস্কোতে 'থট্‌' নামক আর একটি পত্রিকাও লেনিন-এর নির্দেশে বেরুল, কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই। এ অসম্ভব কী করে সম্ভব হল বলা শক্ত। লেনিন-এর অনুরোধে গোর্কী 'ওয়ার্কার্স গেজেট'-এ তাঁর বিখ্যাত 'টেল্‌স অব ইতালী' সাতটি গল্প লিখলেন।

এই দু'টি পত্রিকাতেই লেনিন-এর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

প্যারিস-এর কাছাকাছি একটি গ্রাম লঁজুমো। এখানে লেনিন বলশেভিক পার্টি কর্মীদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুললেন ১৯১১ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে। ১৮ জন শ্রমিককর্মী নিয়ে কাজ সুরু হল—লেনিন বক্তৃতা দিলেন অনেকবার: পলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে ২৯টি, 'কৃষি ও কৃষক' আর 'রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ' সম্বন্ধে ১২টি ক'রে মোট ২৪টি। মোট চার মাস এই শিক্ষাকেন্দ্র চলেছিল। শিক্ষান্তে সব ছাত্ররা রাশিয়ায় ফিরে গেল গোপন পার্টির কাজ করতে।

অলেশে সেণ্ট্রাল কমিটির সব বলশেভিক সভ্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় কমিটির অস্তিত্ব ছিল না। দেশের বাইরে যে সব সভ্য ছিলেন, তাঁদের এক সভা হয় প্যারিস-এ, ১৯১১-র মে-জুন মাসে। উদ্যোক্তা লেনিন।

১৯১২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রাহা শহরে দলের 'রাশিয়ান্ অর্গানাইজিং কমিটি'র ষষ্ঠ অধিবেশন হল। ৭নং গিবার্ন স্ট্রীট-এর ছোট হল ঘরে—সেখানে এখন লেনিন 'মিউজিয়ম্'।

এই সভাতেই বল্‌শেভিক আর মেন্‌শেভিক দল সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল এবং ১৯০৩ খৃস্টাব্দে লেনিন প্রতিষ্ঠিত বল্‌শেভিক দল স্বাধীন ভাবে যাত্রা সুরু করল।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে মহাচীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা স্বাগত, তার পৃথিবীব্যাপী প্রভাবের কথাও উল্লিখিত। সেণ্ট্রাল কমিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল লেনিন, গোলোশচেকিন, ওর্‌জনোকিদ্‌জে প্রমুখকে সভ্য করে, স্টালিনও কমিটির ভেতরে স্থান পেলেন।

সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেনিন কখনও গোর্কীকে চিঠি লিখতে ভোলেন নি।

১৯১২ খৃস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল সুদূর সাইবেরীয় তাইগায় এক নৃশংস ঘটনা ঘটল। জার্-এর সৈন্যদল লেনা স্বর্ণখনির শ্রমিকদের ওপর গুলী চালাল। কারণের মূলে অসুবিধার বিক্ষোভ—সারা রাশিয়ায় ধর্মঘটের বন্যা বয়ে গেল প্রতিবাদ হিসেবে। সমস্ত রুশ শ্রমিক গর্জন ক'রে উঠল প্রচণ্ড প্রতিবাদে।

এই ঘটনায় অসম্ভব চাহিদা বাড়ল 'দ্য স্টার' পত্রিকার। কর্মিবৃন্দ তখন একখানি দৈনিক পত্রিকার অভাব বোধ করছেন। অবশেষে সরকারী অনুমতি পেয়ে পোলেতাইয়েভ্ 'প্রাভদা' (সত্য) প্রকাশ করলেন ১৯১২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। প্রকাশের সব খরচ এল শ্রমিকদের কাছ থেকে—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মহান দান।

প্রকাশের প্রথম বছরেই ছত্রিশটা মামলা হয়েছিল 'প্রাভদা'র বিরুদ্ধে সরকারী তরফ থেকে। অনবরত ফাইন দিতে হত; সম্পাদকরা চার বছরেরও বেশি জেলে কাটালেন। মোট আটবার 'প্রাভদা' বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়,—তারপর নামান্তরে পুনর্জন্ম হতে থাকে—'ওয়ার্কার্স প্রাভদা', নর্‌দার্ন প্রাভদা' 'লেবার 'প্রাভদা', ফর প্রভদা' প্রোলেতারিয়ান প্রাভদা,' প্রাভদা'স পাথ,' 'ওয়ারকার', 'ওয়ারকিংমেনস প্রাভদা।

এত বাধা অতিক্রম ক'রেও 'প্রাভদা' দু'বছরের বেশি টিকে ছিল এবং তার মোট ৬৩৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'প্রাভদা'র প্রতিষ্ঠা দিবস ২২শে এপ্রিল এখন উদ্‌যাপিত হয় 'ওয়ারকার্স' প্রেস ডে' হিসেবে।

১৯১২ খৃস্টাব্দের ১০ই জুন লেনিন-দম্পতি প্যারিস থেকে পোল্যাণ্ড-এর অন্তর্গত ক্রাকো শহরে গেলেন—তখন ক্রাকো অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরীর মধ্যে। বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য তাঁকে অসংখ্য পুলিশী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

কেন তিনি ক্রাকো শহর বেছে নিলেন থাকার জন্য, তার ব্যাখ্যা লেনিন স্বয়ং করেছিলেন গোর্কীর কাছে:

'আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন আমি অস্ট্রিয়ায় এলাম---(রুশ) সীমান্ত অত্যন্ত কাছে, আমরা তার সদ্ব্যবহার করি; এ স্থান পিটার্সবার্গ-এর অনেক কাছে, সেখান থেকে কাগজপত্তর তৃতীয় দিনে পাই---'

এখানে এসেই লেনিন পোল্যাণ্ড-এর শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। ভাষা মোটামুটি জানতেন বলে তাঁর কোন অসুবিধে হয় নি।

১৯১৪-য় আল্‌ফ্রেড মেকোসেন্ নামে জনৈক পোলিশ সাংবাদিক লেনিনকে প্রশ্ন করলেন:

'আপনি যুদ্ধকে স্বাগত জানাবেন কী?'

লেনিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন:

কখনও না।----আমি সর্বদাই যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য প্রাণপণ

করেছি এবং করবও। কয়েকজন ভদ্রলোকের অর্থগৃধ্নুতার জন্য কোটি কোটি শ্রমিক পরস্পরকে খুন করবে, এ আমি দেখতে চাই না। ----যুদ্ধ হলে তার সুযোগ নেওয়া এক কথা, আর যুদ্ধ চাওয়া ভিন্ন কথা।'

প্রাভদা'র প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন লেনিন, নাম থাকত ভি মলোটভ-এর। 'ইলিন্', 'ফ্রে', 'কে টি', 'ভি আই', 'প্রাভদিস্ট্', 'স্ট্যাটিশ্টিশিয়ান', 'রীডার', 'এম, এন', ইত্যাদি বহু ছদ্মনামে 'প্রাভদা'য় লিখতেন ভ্লাদিমির ইলিচ্।

১৯১২-র হেমন্তকালে চতুর্থ 'ডুমা'র (শাসন পরিষদের) নির্বাচন হল। লেনিন নির্বাচনে 'লেফ্ট্ ব্লক, অর্থাৎ অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে সাময়িক আঁতাতে বিশ্বাসী—উদ্দেশ্য : দক্ষিণপন্থীদের পরাজিত করা। নির্বাচনে দশ লক্ষেরও বেশি শ্রমিকদের ভোট পেয়ে তাঁরা শ্রমিক অঞ্চল থেকে মোট ছ'টি নির্বাচনে জয়ী হন।

১৯১৩-র মার্চ-এ প্রধানত লেনিন-এর আপ্রাণ চেষ্টায় 'প্রাভদা'র প্রচার-সংখ্যা দাঁড়াল ৪০।৪২ হাজার। কিন্তু ভ্লাদিমির-এর ধাতু আত্মসন্তুষ্টিহীন—এই সংখ্যাটি বাড়িয়ে অন্তত এক লাখে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে বলশেভিকদের বারংবার উদ্বুদ্ধ করতেন লেনিন।

সমসাময়িক বহু প্রবন্ধে লেনিন 'প্রাভদা'র পাতায় নবজাগ্রত এশিয়ার জয়গান গেয়েছেন এবং প্রত্যেক খাঁটি গণতান্ত্রিককে এশিয়ার সাহায্যে এগিয়ে যেতে বলেছেন ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে। নবজাগ্রত চীনের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ পুরুষ সান্-ইয়াত্-সেন সম্বন্ধে লেনিন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বলশেভিকরা হয়ে উঠলেন উপনিবেশবাদের কঠোরতম শত্রু। আফ্রিকার ট্রিপোলিটানিয়া জবরদখল করল ইতালী ১৯১১-১২ খৃস্টাব্দে — লেনিন এই 'রক্তস্নাত নৃশংসতা', ---'সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র দ্বারা আরবদের গণহত্যা'র নিন্দা করলেন তীব্র ভাষায়। বুর্জোয়া-সমর্থিত আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তিনি আন্তর্জাতিক প্রোলেতারিয়েত্-এর সংগ্রামের অংশ বলেই চিরকাল মনে করতেন।

দলীয় কাজ ক্রমেই 'প্রাভদা'-কেন্দ্রিক হয়ে উঠল—এর মাধ্যমেই লেনিন এবং সেণ্ট্রাল কমিটি সব দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিতেন এবং এর সাহায্যেই কর্মীরা নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলতেন। 'প্রাভদা'র প্রভাব এত বেড়ে উঠল যে, বল্শেভিকদের নাম হয়ে গেল 'প্রাভদিস্ট'। 'প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলী এবং প্রতিটি লেখককে লেনিন চিনতেন। 'ইস্ক্রা, 'ভপারইয়ভ্', এবং 'প্রোলেতারি'র ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক 'প্রাভদা' রাশিয়ায় আজও স্মরণীয় নাম।

'প্রাভদা' ছাড়া ছিল 'প্রস্ভেশচেনিয়া' ('এন্লাইটেন্মেণ্ট') নামক মাসিক পত্রিকা, এর পরমায়ু ১৯১১-র ডিসেম্বর থেকে ১৯১৪-র জুলাই মাস পর্যন্ত। এর রম্য সাহিত্য বিভাগের ভার লেনিন অর্পণ করেন গোর্কীর সুযোগ্য হাতে। এই পত্রিকায় লেখা একটি প্রবন্ধে লেনিন ঘোষণা করেন :

'The Markist doctrine is omnipotent because it is true!'—মার্ক্সীয় মতবাদ সর্বশক্তিমান, যেহেতু তা সত্য।'

১৯১৩ খৃস্টাব্দে স্টুট্গারট্ শহরে প্রকাশিত হল 'মার্ক্স-এঙ্গেল্স পত্রাবলী' সারাংশ লেনিনকৃত। অসমাপ্তভাবে এটি 'প্রভাদা'য় প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খৃস্টাব্দে। সম্পূর্ণ সারাংশ ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে রাশিয়ায় প্রথম প্রকাশিত।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ-এ 'প্রাভদা'

শ্রমিকবন্ধু লেনিন ক্রেমলিন প্রাসাদে

সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লেনিন মস্কোতে একখানি দৈনিক প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে ১৯১৩-র ২৫শে আগস্ট 'নাশ্‌পুত্‌' ('আওয়ার-পাথ') নামক দৈনিক বেরোল মস্কোতে। দুঃখের বিষয়, ১২ই সেপ্টেম্বর পুলিশের শ্যেন দৃষ্টিপাতে এটি বন্ধ হয়ে যায়। বেরোয় সবসমেত ষোলটি সংখ্যা—তাতে লেনিন-এর দশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৪-য় পাঁচ মাস স্থায়ী 'রাবোত্‌-নিত্‌সা' ('ওম্যান ওয়াকার') পত্রিকা প্রকাশিত হল সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ। লেনিন-জায়া ক্রুপ্‌সকায়া এর অন্যতম প্রধান লেখিকা।

চতুর্থ 'ডুমা'য় নির্বাচিত হন দু'জন বল্‌শেভিক এবং সাতজন মেন্‌শেভিক্‌। প্রথম প্রথম সকলে একত্রে কাজ করতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মেন্‌শেভিক্‌ দল নিজস্ব একটা বাড়তি ভোট-এর জোরে বল্‌শেভিকদের অগ্রাহ্য ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রবৃত্ত হল। লেনিন এবং সেন্ট্রাল কমিটি দাবী করলেন, বল্‌শেভিক্‌ আর মেন্‌শেভিক্‌ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট-এর এই দুই শাখার সমতা চাই। কিন্তু বল্‌-শেভিক্‌ স্তালিন এতে আপত্তি জানান।

মেন্‌শেভিক্‌দের প্রবল আপত্তি সহজেই অনুমেয়; কাজেই লেনিন-এর নির্দেশে বল্‌শেভিক্‌-রা সম্পূর্ণ পৃথক গোষ্ঠী তৈরি করলেন। এঁদের কাজ হল, লেনিন-এর ভাষায়, 'ব্ল্যাক্‌ হান্‌ড্রেড্‌স' দলকে (জমিদার এবং অটোক্র্যাট্‌-বর্গকে) সর্বদা মনে করিয়ে দেওয়া শ্রমিক প্রোলেতারিয়েত্‌-রা সর্বশক্তিমান এবং অদূর ভবিষ্যতেই বিপ্লবের মাধ্যমে তারা শোষকশ্রেণী এবং তাদের তাঁবে-দার মন্ত্রী আর সরকার নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে।—তাদের প্রধান কাজ সরকার এবং স্বৈরাচারী শোষকদের ভয়ঙ্কর স্বরূপ উদঘাটন করা এবং অত্যাচারিত জনগণের ভয়াবহ অবস্থা সর্বসমক্ষে তুলে ধরা—' এই সভ্যদের সমস্ত প্রধান বক্তৃতা লেনিন লিখে দিতেন। এমন কি, ১৯১৪ খৃস্টাব্দে সামাজিক সাম্য আন-য়নের জন্য দু'টি বিল-এর খসড়াও তিনি করেছিলেন।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী একটা সুনি-দিষ্ট পদ্ধতি লেনিন-এর সব কাজের পেছনে সক্রিয়। 'ডুমা'র সভ্যদের অবিরাম নির্দেশ এবং উপদেশ দানের উদ্দেশ্য ছিল প্রোলেতারিয়েত্‌ দলকে পরিষদীয় শাসন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করা।

দুর্ভাগ্যক্রমে বল্‌শেভিক্‌দের 'ডুমা' দলে একজন 'মীরজাফর' ছিলেন —নাম মালিনোভ্‌সকি। সেন্ট্রাল্‌ কমি-টিরও সভ্য হন ইনি। 'ডুমা'র সভ্যপদ ত্যাগ করার পর জানা যায়, তিনি পুলিশ-এর গুপ্তচর এবং তাঁর কার্য-কলাপের ফলে অনেক দলীয় সভ্যর কপালে নির্বাসন জোটে, কয়েকজনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

১৯১২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লেনিন-এর ক্রাকো শহরের বাসভবনে মিলিত হন সেন্ট্রাল্‌ কমিটির সভ্যরা, 'ডুমা'র বল্‌শেভিক্‌ সদস্যবৃন্দ এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ মস্কো, দক্ষিণ রাশিয়া, উরাল প্রদেশ এবং ককেশাস-এর গুপ্ত সমিতিসমূহের প্রতিনিধিগণ। ফলে উচ্ছ্বসিত লেনিন অসীম উৎসাহে আলোচনা চালাতে লাগলেন। এই সভায় বহু বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হয়—সর্বনিম্ন স্তর থেকে একতা শিক্ষা, শাসন পরিষদের বল্‌শেভিক্‌ সভ্যদের কর্মপদ্ধতি, 'প্রাভদা'র সম্পাদক-মণ্ডলীর পুনর্গঠন, ইত্যাদি।

১৯১৩-র বসন্তকালে লেনিন-জায়া ক্রুপ্‌সকায়া-র স্বাস্থ্য খুব খারাপ হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে লেনিন-দম্পতি পোরোনিন্‌ নামক এক পার্বত্য গ্রামে গিয়ে বাস সুরু করলেন এবং ১৯১৪-র গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সেখানেই কাটালেন। কিন্তু ক্রুপ্‌সকায়া-র স্বাস্থ্যর কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত না হওয়ায় লেনিন আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বার্ন শহরে গেলেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কোচার্‌-এর উপদেশ নিতে। তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হল ক্রুপ্‌সকায়াকে। এঁরা পেরোনিন্‌-এ ফিরলেন ১৯১৩-র আগস্ট মাসে।

স্ত্রীকে নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত থাকলেও লেনিন-এর কর্মপদ্ধতির কোনও পরি-বর্তন হয় নি—দলীয় কাজ এবং লেখা-লেখি চলেছে অবিরাম। বার্ন-এ থাকা কালে তিনি জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিখ্যাত প্রবন্ধাবলী রচনা করেন।

একাধারে তিনি প্রেম ও কর্তব্য—স্ত্রী এবং দেশের প্রতি—উভয় মানবিক গুণের মূর্ত প্রতীক। অত বড় দেশ রাশিয়া, সেই সুবিশাল ভূখণ্ডে নবীন মতানুসারী নবীন জীবনযাত্রা প্রবর্তনের অনন্যসাহসিক কর্তব্যপালনের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় বহন করেছিলেন সানন্দে, অন্তরের তাগিদে। অথচ, সেই সুমহান কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন ক'রেও স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসা আমৃত্যু সজীব ছিল—কঠোর কর্তব্যভারে তাঁর জীবনে 'দারুণ দহনবেলা' আসে নি কোন-দিনই। স্ত্রীর ভালবাসার আহ্বানে তিনি আজীবন সাড়া দিয়েছেন। এমন একটা সজীব, প্রাণময় জীবন অতি দুর্লভ। সাহিত্য-প্রীতি সংগীতের প্রতি তাঁর আন্ত-রিক টান এই প্রাণময়তাতেই তার প্রকাশ।

বিখ্যাত জার্মান্‌ শ্রমিক নেতা অগস্ট বেবেল্‌-এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লেনিন পেরোনিন্‌ থেকে সম-বেদনা জানালেন।

এই বছরের শরৎকালে দলীয় সভ্যরা ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে পেরো-নিন্‌-এ একত্রিত হয়ে লেনিন-এর সংগে আবার মিলিত হন—পার্টির ইতিহাসে এর নাম 'পেরোনিন্‌' সভা।

লেনিনদম্পতি ক্রাকো-তে ফিরে এলেন ১৯১৩-র ৭ই আগস্ট। ঐ বছরের গ্রীষ্মকালে সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর মেটাল ওয়ার্কার্স য়ুনিয়ন-এর নির্বাচনে বল্‌শেভিক্‌ দল সগৌরবে জয়লাভ করল—মোট প্রায় ৩০০০ ভোটের মধ্যে শোধনবাদীরা পেয়েছিল মাত্র ১৫০ ভোট, বাকি সব ভোট বল্‌শেভিক্‌ দলের ভাগে। লেনিন স্বভাবতই খুব আনন্দিত।

১৯১৩-র অক্টোবর্‌ থেকে ১৯১৪-র প্রথম দু'-এক মাস ধরে লেনিন জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর সুস্পষ্ট মত,

ধনতন্ত্রর আওতায় কখনও জাতীয় সমস্যার পূর্ণ সমাধান বা অত্যাচারের অবসান সম্ভব নয়—কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রবাদই এই সম্বন্ধে পূর্ণ সমাধান করতে সক্ষম। এবং এ জন্য চাই সব দেশের শ্রমিক-কৃষকের একতাবদ্ধ সংগ্রাম। কিয়েভ্ শহরের লেনিন মনুমেন্ট-এর প্রস্তরফলকে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করা আছে জাতীয় সমস্যা ও ঐক্য সম্পর্কে তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত মতামত।

মার্ক্স্-এর সর্বজনবিদিত মত— যে জাতি অন্য জাতির ওপর অত্যাচার করে, সে কখনও প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না—লেনিন সহকর্মীদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, রুশ স্বাধীনতা আসবে তখনই, যখন অ-রুশ জাতিবৃন্দের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুশ জনগণ রুখে দাঁড়াবে। আন্তর্জাতিক ঐক্যে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েও লেনিন বারবার সাবধানবাণী উচ্চারণ ক'রে গেছেন এই মর্মে যে, 'অত্যাচারী' এবং 'অত্যাচারিত' জাতির মধ্যে সীমারেখা টানতে হবে এবং 'অত্যাচারী' জাতির সংগে কোনও সহযোগিতা করা চলবে না। এ জন্যই তাঁর সর্বাত্মক সমর্থন ছিল এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা-র অত্যাচারিত জাতিপুঞ্জের ওপর। 'অত্যাচারী' শোষকদের তিনি ঘোরতম বিরোধী।

ট্রট্স্কীপন্থী এবং অন্যান্য শোধনবাদীর দল অনবরত 'একতা'র কথা বলতো—তাদের মতে সর্ব নিম্ন কার্যসূচীর ভিত্তিতে সব দলের একতাই সাফল্য আনতে পারে। এই মতবাদের কঠোর বিরোধী লেনিন বললেন, একমাত্র সমমতাবলম্বী শ্রমিক প্রোলেতারিয়েত্-এর ঐক্যই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। জোড়াতালি দেওয়া তথাকথিত ঐক্য মূল্যহীন। সুতরাং মার্কসীয় মতাবলম্বীদের সর্বদা আলোচনাভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠর যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণই এগোনর পথ—এ পথ সংখ্যালঘিষ্ঠকে মানতেই হবে। জার্শাসিত রাশিয়া-র পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতে এ ছাড়া নান্যঃ পন্থা। তিনি সুদৃঢ় মত প্রকাশ করলেন, এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে 'শতের শক্তি হবে লক্ষ'র শক্তি', কেন না, 'সংগঠনই শক্তি-র উৎস'।

এই সময় থেকেই তিনি ট্রট্স্কী-কে 'সব চাইতে সাংঘাতিক বিভেদপন্থী' মনে করতেন।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে মে মাসে লেনিন-দম্পতি আবার পেরোনিন্ গ্রামে ফিরলেন। এ সময়, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে, ব্রুসেল্স শহরে অনুষ্ঠিত ইণ্টার্ন্যাশনাল্ সোস্যালিস্ট ব্যুরো-র সভায় রুশ দেশের শ্রমিক সংগঠন থেকে বিতাড়িত মেন্শেভিক্দের সংগে বল্শেভিক্দের কলহ চরমে উঠল। অবশ্য লেনিন এ সভায় যান নি, তিনি তিনজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত পরের জুলাই মাসে বল্শেভিক্ দলের সেণ্ট্রাল কমিটি এবং সাধারণ সভ্যবৃন্দ লেনিন-এর সভাপতিত্বে আর একটি সভা করলেন পেরোনিন্ গ্রামে।

'মে' দিবসে ব্যাপক ধর্মঘট হল—বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং তৈলক্ষেত্র বাকু-তে সাধারণ ধর্মঘট। সেণ্ট পিটার্সবার্গ-এ জার্-এর জুলিস পুতিলভ্ কারখানার সম্মিলিত সমাবেশের ওপর গুলী চালাল—শ্রমিকশ্রেণী এর জবাবে ঐ শহরে, বাকু-তে এবং লোড্জ অঞ্চলে ধর্মঘট এবং ব্যাপক বিক্ষোভ সংগঠিত করলেন। প্রোলেতারিয়েত্রা চরম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছিল।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ-দামামা বেজে উঠল দ্রিমি দ্রিমি শব্দে—জার্ সরকার ইংরেজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজসে জার্মানির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ-প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। বল্শেভিক্ পার্টি সভ্যদের আর প্রগতিশীল মতাবলম্বীদের ব্যাপক ধরপাকড় সুরু হয়ে গেল—৮ই জুলাই সেণ্টপিটার্স বার্গ-স্থিত 'প্রাভ্দা' অফিসে হানা দিয়ে পুলিশ অনেক কর্মচারীকে ধরে নিয়ে গেল অকারণে। ওদিকে তখন সুরু হয়েছে 'ব্ল্যাক্ হান্ড্রেড্'-দের গগনভেদী চিৎকার: 'বল্শেভিক্ জুদা-সভ্যদের গ্রেপ্তার করা হোক্।'

[ক্রমশঃ।

পূজা করি কারে

সময় চক্রবর্তী

পূজা কার কারে?
অলক্ষ শক্তিরে না কি প্রাণহীন শুষ্ক মৃত্তিকারে?
মূর্তি নেই। সাক্ষ্য দুটি চোখ
আধুনিক রঙিন আলোক
ধাঁধিয়ে রেখেছে যেন সব
তাই আজ রমরম রঙের উৎসব।

মন্ত্রপাঠে কি বা এসে যায়
নিরিবিচ্ছিন্নতা পাখা মেলে যদি শূন্যে ধায়।
ভক্তি শ্রদ্ধা অপমৃত্যুর হাতে বহুদিন সঁপেছে তো প্রাণ,
তাই আজ সদা ম্রিয়মাণ
অন্তরের কর্মশক্তি, মৃতপ্রায় তেজদীপ্ত শিখা
প্রতিটি রক্তকণায় নাচে শুধু শান্ত অহমিকা।

পূজাতির লক্ষ্য আজ প্রাচীন প্রণামী,
তাই তার বাণী
বাসনার কামনার নিত্যের পসরা
মানব অন্তরে যার নিরন্তর অনুভূতি।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

ইহুদী রান্নার প্রকরণ

জুবা ইহুদীদের রন্ধন প্রণালী আন্তর্জাতিক, কারণ এই জাতি মূলত যাযাবর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসতি স্থাপন করার ফলেই ইহুদী জাতির রন্ধন প্রণালী এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে।

নীচে তারই কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

১। বামিয়া খুভা

উপকরণ :—আধ কে-জি মাটন, ১০০ গ্রাম কচি ঢেঁড়স, আড়াইশো গ্রাম টোম্যাটো, তিন কি চার কোয়া রশুন, এক কে জি পেঁয়াজ, চায়ের কাপের দেড় কাপ চাল, সামান্য চিনি, নুন ও একটু তেঁতুল, সামান্য হলুদ গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়ো ও কিছু গরম মশলা।

প্রণালী :—কিছুটা মাংস খণ্ড খণ্ড করে নিন এবং একপাশে সরিয়ে রাখুন। ঢ্যাড়সগুলি কেটে আস্ত আস্ত রেখে ধুয়ে নিয়ে মাঝখানে একটু চিরে নিন, তারপর ওগুলি সর্ষে বা বাদাম তেলে ভেজে তুলুন। একটা বড় পেঁয়াজ চাকা চাকা করে কেটে নিন, এইবার টোম্যাটো কয়টি ও রশুনের কোয়াগুলি কুচি কুচি করে কেটে নিন।

কড়াইয়ে অল্প তেল গরম করে প্রথমে রশুনকুচিগুলি একটু ভাজা ভাজা করে নিন, তারপর তাতে পেঁয়াজ ও টোম্যাটোকুচি ছেড়ে দিন। ভাল করে সবটা ভাজা হলে তাতে হলুদ ও গোলমরিচের গুঁড়ো ঢেলে দিন আন্দাজমত। এবার ওই পাত্রে খণ্ডকরা মাংসের টুকরা, আন্দাজমত নুন, চিনি ও একটু তেঁতুলগোলাজল ঢেলে দিন। এবার ওতে আর একটু জল দিয়ে ওটা কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নিন, মাংস সুসিদ্ধ হয়ে গেলে ভাজা ঢ্যাঁড়সের টুকরোগুলি ওতে ছেড়ে দিন।

সব শেষে তৈরিকরা খুভাগুলি ওতে মিশিয়ে দিন।

চিত্রা দেবী

এবার ওই খুভা কি-করে প্রস্তুত করে নিতে হবে তা বলা হচ্ছে।

যেদিন এই পদ রাঁধবেন, তার আগের দিন রাত্রে চাল ধুয়ে শুকিয়ে নিন, পরদিন সকালে ওই চালের সঙ্গে ছোট ছোট টুকরো করে কাটা মাংস মিশিয়ে নিন। একটু নুন দিয়ে দিন ওই মাংসমাখা চালে, তারপর জল দিন ওটার মধ্যে। এবার ওটা একটু সিদ্ধ করে জল শুকিয়ে ভাল করে সমস্তটা চট্‌কে নিন।

অবশিষ্ট মাংসটা এবার কিমা করে নিতে হবে, এর পর ওই কিমাতে পেঁয়াজের রস, অল্প নুন, একটু হলুদ গুঁড়ো, অল্প গোলমরিচের গুঁড়ো ও একটু গরমমশলার গুঁড়া দিয়ে ভাল করে চটকে মেখে নিন।

খুভা তৈরি করার সময় হাতের কাছে এক পাত্র জল রাখা প্রয়োজন।

হাতের তালুতে বেশ করে জল মাখিয়ে নিয়ে ওই ভাত ও মাংসের মণ্ড থেকে কিছুটা করে হাতে নিয়ে গোল গোল বলের আকারে গড়ে নিন, ভেতরে ঐ মিশ্রিত কিমার পুর দিয়ে দিয়ে। এবার আগে যে মাংসটা কারি আকারে ফোটানো হয়েছে, তাতে ওই বল বা খুভাগুলি ঢেলে দিয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিট ফোটান।

এবার সবটা একটা পাত্রে ঢেলে নামিয়ে রাখুন।

২। মাহাশ্শা

উপকরণ :—কিছু বাদামগাছের পাতা, এক কে জি ছোট ছোট টোম্যাটো, আধ কে-জি বড় পেঁয়াজ, এক কে জি ছোট বেগুন, একটি ছোট বাঁধাকফি, দেড় কাপ চাল, এক কে জি মাংস, মাটন হলেই ভাল। এছাড়া কিছু হলুদ গুঁড়ো, দু-এক কোয়া রশুন, গোলমরিচ ও গরমমশলার গুঁড়া।

আন্দাজমত নুন, চিনি, সর্ষে বা বাদাম তেল ও কিছুটা তেঁতুল।

প্রণালী :—বাদামগাছের পাতাগুলি ভাল করে ধুয়ে নিয়ে ছড়িয়ে সাজিয়ে রাখুন একটা থালায়। চাল ধুয়ে রাখুন, এবার মাংসটা কুচি কুচি করে কেটে

নিয়ে তাতে একটু তেল, কুচি কুচি করে কাটা পেঁয়াজ, নুন, কিছুটা গরমমশলা ও গোলমরিচের গুঁড়া, চিনি ও অর্ধেকগুলি টোম্যাটো কুচি কুচি করে কেটে মিশিয়ে দিন। এক-একটি বাদাম পাতায় আন্দাজমত ওই মাখা মাংসের পুর দিয়ে দিয়ে পাতাগুলি গুড়িয়ে গুড়িয়ে রাখুন।

এবার ওই বাঁধাকপি ও দুটো বড় আস্ত পেঁয়াজ জলে সিদ্ধ করে নিন, সিদ্ধ হয়ে গেলে পর মুখটা কেটে কপির পাতাগুলো আলাদা করে রাখুন। এবার বেগুনগুলি ও অবশিষ্ট টোম্যাটো কয়টি কুচি কুচি করে কেটে নিন। একটা পাত্র গরম করে নিয়ে তাতে কিছু তেল ঢেলে দিন।

এবার তাতে তেঁতুলগোলা জল, কিছু চিনি আর নুন মিশিয়ে নিন। এবার সমস্ত উপকরণগুলি এইভাবে ব্যবহার করুন।

একটি বড় ছড়ানো পাত্রের মধ্যে প্রথমে পুরভরা গোটানো বাদাম পাতাগুলি সাজিয়ে রাখুন, তার ওপর বাঁধাকপির সিদ্ধ পাতাগুলি সাজিয়ে দিন, তার ওপর সিদ্ধ পেঁয়াজের কুচি ছড়িয়ে দিন, এবার কুচো টোম্যাটো ছড়িয়ে দিন, তার ওপর দিন বেগুনের কুচি।

এবার সমস্তটার ওপর ওই তেঁতুল-গোলা জল ও কিছু তেল ছিটিয়ে দিন।

এবার অল্প আঁচে ভাপে সিদ্ধ করে নিন সমস্তটা। হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলুন।

হাঁড়ি কাবাব

উপকরণ :---আধ কেজি ছোট আলু, এক কে-জি মাংস, (ভেড়ার মাংস হলেই ভাল হয়)। আধ কেজি পেঁয়াজ, নুন, হলুদ গুঁড়া, গোলমরিচ, গরম-মশলা গুঁড়া, বাদাম বা সর্ষের তেল।

প্রণালী :---পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন, আলুগুলি ছাড়িয়ে নিন, এবার ওগুলি তেলে বাদামী করে ভেজে তুলুন।

মাংসটা টুকরো টুকরো করে কেটে রাখুন এবং ভাল করে ধুয়ে ওটা জলে সিদ্ধ করতে বসান। ওই জলে একটু হলুদ গুঁড়া ও নুন দিয়ে দিন। ভাল করে সিদ্ধ হয়ে গেলে মাংসের টুকরাগুলি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে একটু ভেজে নিন। এবার ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে আর একটু পেঁয়াজ কুচিয়ে ভাজতে চড়ান, ওগুলি বেশ ভাজা ভাজা হয়ে গেলে পর ওতে কিছুটা গরমমশলার গুঁড়া ও নুন দিয়ে দিন।

এবার পাত্রটি ঢাকা দিয়ে দশ মিনিট ফোটান, তারপর ভেজে রাখা মাংস, পেঁয়াজ ও আলুগুলি ওতে ঢেলে দিয়ে ঢিমে আঁচে সমস্তটা কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখুন।

কিছুক্ষণ এইভাবে বসিয়ে রাখার পর পাত্রটি আগুন থেকে নামিয়ে গরম থাকতে থাকতে পরিবেশন করে ফেলুন।

সুরুবা

উপকরণ :---আড়াইশো গ্রাম ভেড়ার মাংস, এককাপ মিহি চাল, দুটি পেঁয়াজ, আড়াইশো টোম্যাটো, হলুদ গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া, কিছু তেল বা ঘি, একটি বা দুটি এলাচ।

প্রণালী :---পেঁয়াজ, মাংস ও টোম্যাটোগুলি কুচিয়ে নিন। একটু তেল বা ঘি দিয়ে মাংসের সঙ্গে পেঁয়াজ কুচিগুলি ঢেলে দিয়ে জলে সিদ্ধ করে নিন। ওই জলে কিছু নুন, হলুদ গুঁড়া ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিন।

মাংস একটু সেদ্ধ হয়ে এলে ওতে কুচোনো টোম্যাটো, চাল ও এলাচ গুঁড়ো ছেড়ে দিন।

মাংস নরম না হওয়া পর্যন্ত ফোটান, তারপর নামিয়ে ফেলুন।

মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারিণী বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিনীদের সমাবেশ

★ কাল পরিক্রমা ★

কালের পৃষ্ঠাগুলোকে উল্টিয়ে নিয়ে, বর্তমানের সীমা লঙ্ঘন করে সুদূর ভবিষ্যতের পাতায় চোখ রাখুন, দেখতে পাবেন, এমন কিছু বাস্তব কালিতে লেখা, যা আজকের মানুষের কাছে শুধু মাত্র কল্পনা। চলুন বর্তমান পেরিয়ে যাই সেই ভবিষ্যতের জগতে, না, না, এখন আর কল্পনার পাখার দরকার নেই, রীতিমত অস্তিত্বময় সার্থক বিজ্ঞানের সৃষ্টিই ত' রয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে ত' শুধু স্থানের দূরত্ব লঙ্ঘন করলেই চলবে না, কিছু কালও যে ফেলে যেতে হবে। তাই কল্পনার যানেই চলুন। আসুন---দেখছেন ত' ছোট্ট খোকন তার কর্মব্যস্ত বাবাকে বিরক্ত করছে। বারবার বলছে—"বল না বাবা, তোমার সেই ছোট-বেলাকার গল্প, সেই যে, যখন তুমি পৃথিবীতে ছিলে।"

----হ্যাঁ, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ শিশুর জন্ম কোথায়? হ্যাঁ, বর্তমানের বিস্ময় সেই চাঁদে। চাঁদে যারা জন্মাবে, মানুষ হবে সেখানেই, তাদের কাছে এই পৃথিবী হবে বিস্ময়ভরা অন্য জগৎ। চাঁদের মানুষরা ইতিহাস লিখবে এই পৃথিবীর পটভূমিকায়। তাদের শিশুরা গড়বে সেই ইতিহাস। '১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের একটি তারিখে পৃথিবী-বাসীরা চাঁদের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেছিল।' সেই নতুন মানুষরা শুনতে চাইবে পৃথিবীর গল্প। পৃথিবীর আকাশ-বাতাস নদী, গাছপালা—সবই তাদের কাছে বিস্ময় নিয়ে দেখা দেবে। পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রকৃতিকে দেখবার জন্য তখন নতুন মানুষরা আসবে পৃথিবী ভ্রমণে। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া থেকে তখন হয়ত সে যুগের মানুষ আসতে চাইবে পৃথিবীতে একটু খোলা হাওয়া খেতে, প্রাণভরে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিতে। কিম্বা হয়ত এ কল্পনা ভুল। হয়ত চন্দ্রবাসীদের তখন সেখানকার কৃত্রিম আবেষ্টনীই মনে হবে স্বাভাবিক। পৃথিবীর প্রকৃতিগত স্বাভাবিকত্ব হয়ত তাদের কাছে তখন অস্বাভাবিকত্বের রূপ নেবে।---

আচ্ছা, এবার সময়ের পাতা আরও কিছু পার করে আসুন। দেখবেন পাবেন চাঁদের শিশুরা বড় হয়েছে। কৈশোর পেরিয়ে তারা এখন জীবনের পরিপূর্ণতায় এসেছে। তাদের ভাষা দেখছেন? বলছে—'এই চল না এবার একবার পৃথিবীটা ঘুরে

শ্রীমতী মৈত্রী গুপ্ত

আসি। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাব ওখানে। বেশ মজাতে কটা দিন কাটানো যাবে। ওখানের লোকেদের ভারী মজা। কি স্বাধীন ওরা। দেখ না—পৃথিবীটা দূর থেকে কি সুন্দর। কাছে গেলে নিশ্চয়ই আরও সুন্দর। চল না, ওখানে বেড়াতে যাই আমরা।'----

আচ্ছা ভাবুন ত' আমাদের সৌন্দর্যের উপমাস্বরূপ যে চাঁদ, সেই চাঁদের মানুষের কাছেও আবার এই পৃথিবী এত সুন্দর? ওরা পৃথিবীকে দূর থেকে দেখে তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আসতে চাইছে পৃথিবীতে। কিন্তু আমাদের বিস্ময় ঐ সুন্দর চাঁদের মানুষের মুখে এ ভাষা কেন? দূরের চাঁদ কি তবে কাছ থেকে অসুন্দর? স্নিগ্ধ সৌন্দর্য কি শুধু কঠিন কর্কশতার বাহ্যিক আবরণ? তা না হলে চাঁদের মত সুন্দর জায়গাতে বাস করেও সে দেশের মানুষ সৌন্দর্য-পিপাসী কেন? ওরা কেন পৃথিবীতে আসার জন্য ব্যস্ত।

—না, না, ঐ দেখুন চাঁদের দু'জন আধুনিক বৈজ্ঞানিক কি বলছেন—"যা বলেছ, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের তখনকার আইডিয়াগুলো বড় সেকেলে ছিল। যদিও আমাদের পূর্বপুরুষরাও ঐ পৃথিবীরই মানুষ ছিল, তবু তারা কত যুগ ধরে ঐ পৃথিবীর গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ ছিল। তারপর এই চাঁদে আসার জন্য কত সময়, কত পরিশ্রম তারা নষ্ট করেছে, এইটুকু দূরত্ব লঙ্ঘন করতে।"

দেখুন, চাঁদের মানুষের কাছে আজকের পৃথিবীর বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি নিছক সাধারণ বলে মনে হচ্ছে। আজকের এই বিস্ময়কর অভিযান ভবিষ্যৎ যুগের কাছে খুবই সহজ ছেলেমানুষী বলে করুণা ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কারণ, তাদের বিজ্ঞান যে আরও উন্নত। শুধু চাঁদে নয়, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে জয় করার স্বপ্ন দেখে তারা। সে যুগের বৈজ্ঞানিকের মাথায় ঘুরছে অজেয় সূর্যকেও জয় করার আইডিয়া। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাদের বিজ্ঞানের উন্নত প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে। প্রকৃতিকে তারা বিজ্ঞানের হাতে কৃত্রিম বানিয়ে ইচ্ছেমত ব্যবহার করবে। তাই আজকের পৃথিবীর বিস্ময়ভরা বিজ্ঞানের দান তাদের বিজ্ঞানের কাছে করুণা ছাড়া কিছুই পাবে না।

আসুন, সময়ের পাতা আরও কিছুদূর উল্টে যান। দেখতে পাবেন ভবিষ্যৎ-যুগের একজন কর্মব্যস্ত মানুষের একদিনের কর্মসূচী। দেখুন, সুদূর ভবিষ্যৎ যুগের একজন চন্দ্রবাসী ডাক্তার তাঁর রোগীকে কি বলছেন।

—'ঠিক আছে, তোমার কেসটা ওবেলায় দেখব। শুধু তোমার জিভটা বদলাতে হবে ত'? সুন্দর উচ্চারণের জন্য একটা সুন্দর জিভ লাগিয়ে দিলেই হবে। এখন আমার সময় নেই। একটু তাড়া আছে। কারণ—আজ 'জুপিটারে' একটা মিটিং এ্যাটেণ্ড করতে হবে। তারপর ওখান থেকে পৃথিবীতে যাব। একটা লেকচার দিতে হবে। তাই ফিরতে একটু বেলা হবে।'

অবাক হচ্ছেন ত'? সুদূর ভবিষ্যৎ-যুগের মানুষের দৈনিক কর্মসূচী দেখছেন ত'। ওদের কাছে সময়, স্থান সবই এসে ধরা দিয়েছে। শুধু ইচ্ছেমত চালনা করার অপেক্ষা। ওরা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাচ্ছে কত কম ঝামেলায়। ওদের কাছে গ্রহান্তরে যাওয়া কিছুই বিস্ময়কর নয়। কারণ তাদের বিজ্ঞান যে আরও উন্নত। সমস্ত প্রকৃতি যে সে যুগের কাছে হার স্বীকার করেছে। স্থল, জল, বায়ু সব কিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে।----

-----আসুন, এবার কালের ভারী ভারী পৃষ্ঠাগুলো চটপট করে উল্টে যান। দেখছেন? সে যুগের মানুষের জীবনেও এসেছে বার্ধক্য। বিজ্ঞানের হাজার কেরামতিতেও তারা পারেনি বার্ধক্যকে ঠেকাতে। সময়ের কিছু এদিক-ওদিক হলেও তাদের জীবনেও দেখা দিয়েছে জরা। এখন কি তারা পৃথিবীতে আসতে চাইছে? পৃথিবীর মাটিতে শেষ কটা দিন কাটিয়ে যেতে চাইছে? নাকি মৃত্যুকেও জয় করার স্বপ্ন দেখছে? আচ্ছা দু'জন চন্দ্রবাসী বৃদ্ধের কথা শুনুন—'কি মশাই, আপনার হার্টটা চেঞ্জ করার পর কিছু ভাল আছেন 'ত? আমি ভাবছি, এবার আমার স্টম্যাক্‌টা বদলে নেব। বড্ড ভুগছি।'-----

----অন্য বৃদ্ধের উত্তর—'তা একটু ভাল আছি মশাই, কিন্তু এই বুড়ো বয়সে আর এত সব ঝামেলা আর জোড়াতালি লাগানো ভাল লাগে না। এবার ভাবছি শেষ কটা দিন পৃথিবীতে গিয়ে কাটাব। সেখানে ত' এখনও এমন জায়গা আছে, যেখানে প্রকৃতির নিজস্ব রূপ কিছু কিছু পাওয়া যায়। সব কিছু কৃত্রিমতা দিয়ে ঢাকা নয়। প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে, মুক্ত আবহাওয়াতে মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে আরামে কটা দিন কাটাতে চাই।''

----'ঠিক বলেছ, চল আমরা পৃথিবীতে যাই। আমাদের পূর্বপুরুষরা ত' ওখানে বেশ শান্তিতেই ছিলেন। এখানকার মত তাঁদের জীবন শুধু কৃত্রিমতার আবরণে ভরা ছিল না। ওঁরাই সুখী ছিলেন। চল, আমরাও যাই পৃথিবীতে।'----

একি? দেখছেন ত' চাঁদের মানুষ যে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইছে। তাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জয় করার নেশা বুঝি কেটে গেছে, তাই তারা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইছে। চাইছে একটু শান্তি, প্রকৃতির কোলে একটু অযান্ত্রিক অনুভূতি।

তাদের কাছে বিজ্ঞানের অজস্র অভাবনীয় দান তখন ভারস্বরূপ মনে হচ্ছে। যান্ত্রিক যুগ পেরিয়ে তারা তাই আবার ফিরে আসতে চাইছে প্রকৃতির কোলে। সেই সৃষ্টির আদিম মুহূর্তের সমস্ত প্রাকৃতিক সুখ তারা আবার করে ফিরে পেতে চাইছে। এরা কি তবে অসুখী? এদের সব কিছু জয় করা হয়ে গেছে, তাই বুঝি সর্বজয়ের নেশাও গেছে কেটে। তাই ওরা চাইছে পৃথিবীর কোলে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সব কিছু ধ্বংস করে ফিরে যেতে চাইছে সেই সৃষ্টির আদিম সম্ভাবনাময় নতুন মুহূর্তে।------

এবার আসুন, 'সুদূর ভবিষ্যৎ' থেকে আবার আমরা ফিরে আসি এই বাস্তব বর্তমান দুনিয়ায়। আমাদের পৃথিবীতে, যেখানে মানুষের ভাবনা শুধু চন্দ্র জয় করা। চাঁদে গিয়ে বসবাস করার কথা ভাবছে এখন মানুষ। কারণ তারা ত' সুদূর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না। তাদের মনে যে রয়েছে সর্বজয়ের দুর্বার নেশা। বিজ্ঞান-এর মারা তুলি দিয়ে তাই ত' তারা ছুটে চলেছে এখনও অজানাকে জানার আশায়। অসম্ভবকে সম্ভব করার নেশায় তারা ছুটছে। পৃথিবীর গণ্ডীতে তাদের মন মানছে না, তাই তারা পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুটছে, ছুটছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে জয় করার নেশাতে। প্রকৃতিকে হাতে মুঠোয় তারা আনতে চায়। সমগ্র সৃষ্টিকে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়। তাই তারা ছুটে চলেছে। কিন্তু এই ছোটার কি একদিন শেষ হবে না? নতুন সৃষ্টির মধ্যে কি তারা নতুন ধ্বংসের বীজ পুঁতছে না? বিজ্ঞানের যুগের মানুষ কি নিজেদেরই সৃষ্ট নতুন জগতকে নিজেদেরই সৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করে দেবে? তখন কি আসবে আবার সেই আদিম সৃষ্টির ক্ষণ?

ধ্বংসের পর আবার চলবে সৃষ্টির খেলা?

★ বিশিষ্টের চোখে চন্দ্র পাড়ি ★

মানবজাতির ইতিহাসে ১৯৬৯ অব্দটি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। মানব সভ্যতাকে চরম উৎকর্ষে এই অব্দটি উপনীত করল। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের সাধনা যে সভ্যতাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই অগ্রগরণের একটি অধ্যায় যেন এক পরিপূর্ণ সার্থকতায় উজ্জ্বল স্পর্শে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠল। যা সীমার বাইরে, যা গণ্ডীর বাইরে, যা নাগালের বাইরে, তাকে সীমায়, গণ্ডীতে ও নাগালে আনার যে দুরন্ত-দুর্বার কৌতূহল স্মরণাতীত যুগ থেকে মানুষের মনে দৃঢ় ভিত্তিতে বাসা বেঁধে আছে, তা চরিতার্থ করার সাধনায় মানব-শক্তি

এলা উইণ্টার

এবার চূড়ান্ত জয়ের সম্মুখীন হল। দূর আকাশের চাঁদ, কবির কল্পনায় চাঁদ, পুরাণের দেবতা চাঁদ এবার বাধ্য হল মানুষের পদচিহ্ন বুকে ধারণ করতে।

১৯৬৯ সালে মানুষের চন্দ্রবিজয় মানব সভ্যতার অগ্রগতির একটি অসামান্য নিদর্শন। এই অভাবনীয় ঘটনা মানবসমাজে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে তা কারো অজানা নয়। রাজপ্রাসাদ থেকে কৃষকের পর্ণকুটীর পর্যন্ত নির্বিশেষে এই ঘটনা এক ব্যাপক আলোড়ন এনেছে। দেশ, শ্রেণী-সমাজ—নির্বিশেষে এই ঘটনা জাগিয়ে তুলেছে এক স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া।

এই ঘটনা বিদগ্ধসমাজেও স্বভাবতই এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কবি, শিল্পী, গায়ক, ধর্মনেতা, ঐতিহাসিক, নাট্যবিদ, ভাস্কর প্রমুখ সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ এ প্রসঙ্গে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

এঁদের মধ্যে বয়েসে সবার বড় প্যাবলো কাসালস, সঙ্গীতবিদ। আর অল্প কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হলেই তিনি পরমায়ুর শতাব্দীরও পরিক্রমা সমাপ্ত করবেন। তিনি বলেছেন, এর

সুব্রতা মজুমদার

অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আজকের দিনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে বাস্তবের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকে হয় তো এর বিরোধিতা করবেন কিন্তু বিজ্ঞানের ঐ অভিধানে "থামা" কথাটি নেই। তাকে এগিয়ে যেতেই হবে।

ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক আর্থার কোয়েস্তলার বলছেন, প্রমিথিয়াস এগিয়ে চলেছেন তারকাপুঞ্জের দিকে। অবয়বে তাঁর শূন্য গাম্ভীর্যের স্বাক্ষর। ভাস্কর জ্যাকুয়েস লাইপচিজের মতে : এ শুধু আমেরিকার জয় নয়, এ সমগ্র মানবজাতির জয়। মানব-শক্তির উর্ধ্বে যে দৈবশক্তি, সেই শক্তির মাহাত্ম্য যেন এই ঘটনার মাধ্যমে প্রকট হয়ে উঠেছে। ভ্লাদিমির বসোয়াবভ কবি ও সাহিত্যিক জগতে একটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ নাম। তিনি এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাটিকে দেখেছেন, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যেমন তিনি একটি বিশেষ চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, এ ঘটনাটিও তাঁর কাছে প্রতিভাত এক স্বতন্ত্র কোণ থেকে। এই অভিযানের যে পুলক, রোমাঞ্চ, শিহরণ—সেইটিই তাঁর হৃদয়ে রেখাপাত করে সবচেয়ে বেশী। এই অন্যান্য দিকগুলি তাঁর কাছে কোন মূল্যই বহন করে না। নাট্যকার সমাজে আর্থার মিলার এক বিশেষ ব্যক্তি। তিনি বলেছেন যে, এ ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। চন্দ্রকে ঘাঁটি করে মানুষ আরও দূর-দূরান্তরে পাড়ি জমাতে সক্ষম হবে। যাদের নাম বা অস্তিত্ব পর্যন্ত আজও তাবৎ পৃথিবীর অজানা, তারা হয়তো এর ফলে আমাদের একেবারে মুঠোর মধ্যেও একদিন আসতে পারে। এদিক দিয়ে এ অভিযানের গুরুত্ব অপরিমাপ্য। লেখিকা এলা উইণ্টারের দৃষ্টিতে ঘটনা সাহসিকতার এক চরম নিদর্শন। ফরাসী অর্থনীতিক জাঁ মোনের মনে এই চন্দ্রবিজয় এক নিদারুণ আনন্দের প্লাবন বইয়েছে। তিনি বলছেন, মানব-প্রগতির এক চূড়ান্ত বাধা এবার অপসারিত হল। কবি ও ঔপন্যাসিক পল

প্যাবলো কাসালস্

গুডম্যানের অভিমতে এই ধরনের মহৎ প্রচেষ্টার জন্য যত অর্থই ব্যয় হোক, সে ব্যয় সঙ্গত এবং সর্বতোভাবে সার্থক। মহামান্য দালাই লামার মতে : চন্দ্রবিজয় বৈজ্ঞানিক প্রগতির এক অত্যুত্তম নিদর্শন। কিন্তু এতগুলি বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে যাঁর মত এ ব্যাপারে একেবারে মিলছে না, মানুষের এত বড় সফলতা যাঁর মর্মে এতটুকু দাগ কাটে না, যিনি প্রকাশ্যে বলছেন, এর কোন মূল্যই আমার কাছে নেই—তিনি পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের একজন। শিল্পলোকের তিনি এক বিস্ময়। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাম পাবলো পিকাসো।

★ মৃত্যুমুখে সেই দিন ক'টির ডায়রি ★

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দলে দলে চলেছে পাহাড়ী মেয়ে পুরুষের দল। শ্রমদান করবে ওরা। এতদিন সবকিছু দেখছিল ওরা সহিষ্ণু প্রতীক্ষায়। কিন্তু এতদিনেও শুধু কথা আর কথার ফুলঝুরি আলান ছাড়া আর কোন কাজই যখন হল না, সোজা হয়ে থাকা মেরুদণ্ডে ছুটল তখন ওদের পাহাড়ী রক্ত। শক্ত হাতে কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিল, কোন কাজ করতেই ভয় না-পাওয়া ওদের মেয়েরা। ছেলেরা নিঃশব্দে কোদাল তুলে নিল কঠিন কাঁধে। ওরা সরল, তাই ওরা বোকা। আর এমন ভীষণভাবে বোকা ওরা যে, ঠিক সময় বুঝে নিজের কাজটুকু গুছিয়ে নেবার কায়দাটি রপ্ত করে উঠতে পারে নি আজও। তাই পরের জন্য শাবল হাতে ছুটতে পারে ওরা নির্দ্বিধায়, নিজেদের সব কাজ ফেলে।

পথে নেমে পড়লাম আমরাও সবাই। হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম মাটি। যে মাটি এতদিন সবুজ মাঠের বুকে সোনার ফসল ফলিয়ে আমাদের অন্ন দিয়েছে---যে মাটি আজ প্রলয়ঙ্করী রূপ নিয়ে আমাদের বন্দী করেছে।

সারাদিন চলল মাটিকাটার কাজ। ওপর-নিচে সব দিক থেকেই খবর আসতে লাগল একইভাবে কাজ চলেছে, সেই সব ধসের মধ্যেও। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য চলেছে কয়েকটা সরকারী বুলডোজারও। মোটর চলার মতন খানিকটা পথ হয়ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যেতে পারে।

বিকেল চারটে। বাড়ি ফিরেছি সারাদিন পর। অনেকটা পথ হাঁটা হয়েছে আজ—হয়েছে অনেকখানি মেহনতও। আর পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে। খাড়া চড়াইয়ের পথে যেমন করে মোটর যাবার রাস্তা তৈরী হয়, প্রকাণ্ড ধসটার মাথার ওপরদিকে, তেমনিভাবে মাটি কেটে কেটে সমান করে দু'পাশটা টেনে নামান হয়েছে নিচের দিকে। 'লো-গীয়ারে' রেখে নতুন করে স্টার্ট দিলে উপরে যাবার সম্ভাবনা আছে যে কোন গাড়ির সে পথে। ঝুলেপড়া রেল আবার সুন্দর করে গুছিয়ে বসান হয়েছে লাইনে, অবিশ্বাস্য রকম তাড়াতাড়ি আর অমানুষিক পরিশ্রমে।

পথ তৈরী হয়ে গেছে। রেল কোম্পানীর ভারী ভারী অনেকগুলো গাড়ি নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাও

নীলিমা চক্রবর্তী

শেষ হয়ে গেছে সে পথ। এবার যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অনিল। বলছে, রাতেই পাড়ি দিতে হবে। ছেলেরাও সবাই রাজি।

"যেতে হবে এক্ষুনি? ওমা এইসবে মাংসটা চড়ালাম।" বেশ যেন বিপদগ্রস্ত করুণ-করুণ স্বর মেজদির। এখানে এসে পর্যন্ত এই কদিন একনাগাড়ে দুবেলা শুধু লাউডাঁটা, চচ্চড়ি আর ডাল খেতে খেতে একেবারে জেরবার হয়ে গিয়ে বহুকষ্টে হাঁটাপথে কার্শিয়াং-এ লোক পাঠিয়ে কোনরকমে এক কেজি মতন মাংস আনান গেছে সবে আজ। শুধু লাউডাঁটা আর লাউ-শাক (বাবা বলতেন, দুটো তো পদ হল) খেতে খেতে খাদ্যভীতি রোগ দেখা দিয়েছিল এর মধ্যেই সকলের। আজ সেই মাংসের গন্ধে রসাল রসনা চঞ্চল হয়ে উঠছিল বহুক্ষণ ধরে। এ হেন সময় এমন অকিঞ্চন যোগাযোগ। হোক না সে বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রার্থিত মুক্তিলগ্ন।

কি যে বলেন", কথা শুনে একেবারে যেন ক্ষেপে ওঠে অনিল। "আপনাদের কথাবার্তার কোন যেন মাথামুণ্ডু নেই। সামান্য এক কেজি মাংসের জন্যে--- এদিকে দেখছেন আকাশের অবস্থা আবার?" একেবারে লোকসভায় বিল পাশের বলার ভঙ্গীতে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ও।

পশ্চিম আকাশে সত্যিই কখন থেকে যেন মেঘ জমে উঠেছে ঘন কালো হয়ে।

"আজ রাত্তিরে যদি আবার বৃষ্টি নামে, তাহলে এত কষ্ট করে তৈরী করা রাস্তাঘাট আবার সব ভেঙ্গে পড়বে। যেটুকু হাত সরকার এতদিনে লাগিয়েছে, আবার ভেঙ্গে পড়লে হবে সে কাজ মনে করেন আর কোনদিন? মানুষই বা নিজেদের কাজকর্ম ফেলে পরের জন্যে ব্যাগার খাটতে যাবে কতবার বলুন?"

অকাট্য যুক্তি।

"কিন্তু এই সবে তৈরী পথে প্রথমে আমরাই গাড়ি নিয়ে যাব?" প্রশ্নে আবার দ্বিধা মেজদির।

"কিন্তু যেতে তো প্রথমে কারুকে হবেই।" এবার সায় দিলাম সবাই মিলে। "আগে ও যাকে বলে সবাইকে পাশ থেকে ঠেললে হবে কি করে?"

"তা বলে মরব নাকি আমরাই আগে যেতে গিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে?"

"আরে বাপু, মরতে তো একদিন হবেই,"—এতক্ষণে উক্তি চক্রবর্তীর, "এবার মরলে জলজ্যান্ত আস্ত শহীদ হয়ে যাব এক-একজন। পরার্থে আত্মদান করছি বলে, চাই কি বহু মুনি-ঋষি ঈপ্সিত স্বর্গপ্রাপ্তিও হয়ে যেতে পারে একেবারে সশরীরে।"

কিন্তু আর বিতণ্ডাতেও তো সত্যিই লাভ নেই কোন। সুরু হল তাই তল্পি-তল্পা গোটান। সংসার কি এখানেই কম বড় হয়ে উঠেছে এই কদিনেই?

"মাংসটা সত্যি সত্যিই আর রান্না করে ওঠা গেল না।" ছড়িয়ে থাকা বাসন-কোসনগুলো গোছাতে গোছাতে খেদোক্তি করে মেজদি আর একবার।

১০ই অক্টোবর।-কাল আমাদের যাওয়া হয় নি। বিছানা বাক্স বাঁধলাম আমরা, তল্পি-তল্পা গোটালাম আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারায় নামল

বর্ষা। আশ্চর্য। একি প্রকৃতির বৈচিত্র্য সুরু হয়েছে আমাদের সঙ্গে ? নাকি অনন্ত সেই মহা রসিকের অসীম রসিকতায় এও এক ? বাঁধা বাক্স-বিছানা আবার কি খুলব আমরা ? সংসার কি আবার ---

"তোমার সব সময়ই কেবল সংসার আর সংসার। মাংস মাংস করে তখন এমন হ্যাংলামি করলে—" মেজদির দিকে ভীষণ রোষ-কটাক্ষ করল কেষ্ট কেষ্ট। যেন মাংসটা রান্না হলে গরম ভাতে ঢেলে ঢেলে একাই খেত ও বেচারা! আর যেন এই একটি চিন্তাতেই অনেকেরই জিহ্বা অল্প-বিস্তর রসাপ্লুত হয় নি এতক্ষণ আর শুধু মাংস রাঁধবার কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এমন ঘনঘটা করে সাজিয়ে এল মেঘের দল।

বিপদে পড়লে মানুষ এমন যুক্তি বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু আজ আমরা যাবই। কাল বেশ প্রচণ্ডভাবে কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আর কোথায় নতুন কোন ধস নামে নি। নতুন করে তৈরী রাস্তাঘাটেরও কোন ক্ষতি দেখা যায় নি।

তবু পথ আমাদের সমানে দুর্গম। অজানা। আবার নতুন করে সেই অজানা নিয়তির পথে পা বাড়াচ্ছি আমরা। কিন্তু জানায়-অজানায় মানুষের গোটা জীবনটাই তো প্রতি মুহূর্তে এক একটা অপরিচিত নিয়তির গহ্বরে পা বাড়াল। কে বলতে পারে, এই যে আমি এখন হাসছি, কথা বলছি, এক্ষুনি হৃৎপিণ্ডের একটি ধাক্কায় এর সবকিছু এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে কি না ? কে বলতে পারে আর এক মুহূর্তে ওপর থেকে বাড়ির ছাতটাই হঠাৎ ভেঙ্গে পড়বে না আমাদের মাথার ওপর ? কিংবা ছুটন্ত ঐ গাড়ির চাকাটা বুকের ওপর দিয়ে ছুটে চলে যাবে কি না ? কি অসহায় ক্ষণভঙ্গুর একটা মানুষের জীবন, তবু এই নিয়েই তো কত কুরুক্ষেত্র, কত ট্রয়ের যুদ্ধ, কত ভিয়েৎনাম আর কেন্দ্র আর রাষ্ট্রের মারামারি।

না, এত কথা শুধু বসে বসে ভাবছিলাম না। সময় কোথায় অত কথা ভাবতে ? ডাল-ভাতে আর আলু সেদ্ধ দিয়ে কতগুলো ফেন চটকানো আগুনের মতন গরম ভাত কোন-রকমে গলার ভেতর পাঠাতে পাঠাতে ভাবছিলাম কথাগুলো।

ঠিক হয়েছিল কিছু খেয়ে নিয়ে বেরোতে হবে। কোনরকমে চারটি ভাত-যা দিয়েই হোক। দার্জিলিং থেকে আসার সময়ের অভিজ্ঞতার স্মৃতিটা সদ্য সদ্য মনে জ্বল-জ্বল করছে এখনও। ফ্লাসকেও তাই ভরে নেওয়া হয়েছে এক ফ্লাস্ক গরম জল। অনেক কষ্টে জোগাড় হয়েছে দু'কৌটা বাচ্চাদের দুধ আর কিছু বিস্কুট। আমরা এতেই খুশী। কত অল্পে খুশী হতে শিখে গেছি আমরা এই ক'দিনেই।

এবার আমাদের যাত্রা সুরু। কাঁধে হালকা ব্যাগটা ঝুলিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। রোদ উঠেছে। মেঘ-ভাঙা আলো লুটিয়ে পড়েছে ছোট ছোট বাড়িগুলোর মাথা ডিঙিয়ে সবুজ ঘাসের বুকে আর বাতাবি লেবু গাছ-গুলোর মাথার ওপর। সোনালী রদ্দুর। সবুজ জীবন। নিঃশব্দে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ছোট্ট একটা প্রবাদের কথা মনে হল। আকাশ

জাপানের ওসাকাতে এক্সপো-৭০ মেলার উদ্বোধন দিবসে ইণ্ডিয়ান প্যাভিলিয়নের ভারতীয় পরিবেশিকাদের সমবেতভাবে যেতে দেখা যাচ্ছে

যেখানে মিশে গেছে দূর পাহাড়ের নীল চক্রবালে, সেইখানে সেই সীমা-রেখায় স্থির হয়ে আছে এক মহা-মৌনতা। নির্বাক, অচঞ্চল, মৌন। সেই স্থির-স্তব্ধ মহামৌনের দিকে চেয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলাম প্রণাম, তোমাকে প্রণাম। প্রণাম তোমায় এই স্নিগ্ধ-শ্যামল অপরূপ রূপরাশিকে। প্রণাম তোমার প্রলয়ঙ্করী, তোমার ভয়ঙ্করকে—প্রণাম তোমার সব সর্ব-নাশকে। প্রণাম, তোমাকে প্রণাম—প্রণাম।

আমাদের গাড়ি স্টার্ট দিল। আবার আমরা আগের মতই বেশ গুছিয়ে বসেছি। ছোট গাড়িতে আমরা মেয়েরা আর বাবা। ল্যাণ্ডরোভারে ছেলেরা আর জিনিসপত্র।

ঘড়িতে এখন সবে দশটা পঁচিশ। আকাশে রদ্দুর। বাতাসে নরম উষ্ণতা। সহযোগী প্রকৃতি। গাড়ি চলেছে বেশ আস্তে। খুব সাবধানে ষ্টিয়ারিং ধরে বসেছে অনিল। ব্রেকের ওপর পা সতর্ক। পথ ঢেকে আছে ছড়িয়ে-থাকা নুড়ি আর পাথরে। মাঝে মাঝে তার ওপর আবার বড় বড় গর্ত হাঁ করে আছে বিরাট মুখ খুলে। বিরাট বিরাট সরকারী বুলডোজার কাজ করে চলেছে অক্লান্তভাবে।

নামতে হল। বার মাইলে এসেছি আমরা। এই সেই বার মাইল, যেখানে এই কয়েক দিন আগেই এক গেলাস তৃষ্ণার জলের জন্য প্রায় হাহাকার করেছে বন্দী কতগুলো অসহায় মানুষ। এক মুঠো ক্ষুধার অন্ন বিক্রী হয়েছে সমান ওজনের অর্থমূল্যে। আজ চলে গেছে তারা। সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা মাথায় নিয়েই পালিয়েছে। পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু আমাদের এখানে আবার নামতে হবে। সামনে পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে যে পাহাড়ের চূড়াটা, তাকে সরাতে হাঁপিয়ে উঠছে বড় বড় বুলডোজারগুলোও। কাজ চলেছে তাই অতি মন্থর গতিতে।

আমরা নেমে দাঁড়ালাম। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে খুব আস্তে একেবারে থেমে, থাকার মতন করে চলল সেই ধ্বংস-স্তূপের ওপর দিয়েই যে-কোন মুহূর্তে পাশে হাজার হাজার মাইল গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার সবটুকু সম্ভাবনা নিয়ে।

অনিল ড্রাইভার। শান্ত হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে ওকে থাকতেই হবে। সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মৃত্যুকে দু'চোখ মেলে দেখতে দেখতে। ওর বাবা মৃত্যুশয্যায়, আসার সময় তাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল ও। এখন অসহ্য দুশ্চিন্তায় একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে ছেলেটা। নিজের জন্যে নয়, বাবার জন্যে। কাল থেকে ক্রমাগত বলে চলেছে, যদি কোন রকমেই কারুর মুখ থেকে এখানের এসবের একটুকুও খবর কানে যায়, তাহলে আর রাখা যাবে না বাবাকে। সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করবে বাবা।

কিন্তু হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাবে অনেকেরই তো ঐরকমভাবেই। এতগুলো লোকের মা-বাবা, প্রিয় পরিজনের। (পরে শুনেছিলাম ছোট ভগ্নিপতির বাবা ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার চিফ ইণ্টারনাল অডিটার, রেডিওতে ধসের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্ক করেন কলকাতায়। কোন খবর নেই সেখানে। তারপর আটদিন ক্রমাগত দিনরাত ট্রাঙ্ক করে চলেছেন ব্যাঙ্কের অফিসে আর কলকাতার ঠিকানায়। সারাদিন টেলিপ্রিণ্টারের আদান-প্রদানে ব্যাঙ্ক তোলপাড়। খবর দাও, খবর দাও। একমাত্র সন্তান তাঁর। পৃথিবীর সব আলো বুঝি নিভে গেল এমনি করে। কিন্তু কোথায় খবর, কেউ জানে না। আর প্রত্যেক দিনকার মতন ভোরে উঠে কাগজ দেখছিল ভাই। হঠাৎ চোখ পড়ল একটা খবরের শিরোনামায়। চমকে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল বুঝি গোটা হৃৎপিণ্ডটাই। সবটুকু রক্ত এসে জমা হল বুকের তলায়। কি সর্বনাশ। হঠাৎ ভয়ানক ধসে দার্জিলিং-এ বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ছুটল ভাই টেলিফোনের দিকে। আর দার্জিলিং-এ ট্রাঙ্ককল করেই মাথা ঘুরতে লাগল চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা করে দিয়ে। খবর দিল দার্জিলিং "ওঁরা এখান থেকে তো বেড়িয়ে গেছেন চার তারিখ। না, তারপর আর কোন খবর তো আসে নি। জানার সম্ভাবনাও নেই। শিলিগুড়ি পর্যন্ত গোটা পথটার মাঝে মাঝে ধসে রাস্তাঘাট নির্মূল হয়ে গেছে অনেক জায়গাতেই। টেলিফোন-টেলিগ্রাম লাইন সব বিচ্ছিন্ন। হ্যাঁ, পথে কয়েকটা গাড়ি লোকশুদ্ধ পড়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে বটে। তবে ও গাড়িটা তাদের মধ্যে নেই নিশ্চয়ই। সান্ত্বনা দিলেন ওঁরা। ভীষণভাবে কাঁপতে-থাকা হাতে রিসিভার নামাল ও। এবার কি করা যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তার তরঙ্গ খেলল মাথায়। উত্তেজনার মুহূর্তে কাগজখানা মাটিতেই ছড়িয়ে ফেলে এসেছে। সর্বনাশ। ঐ কাগজ খুলে মা যদি এখন'---ছুটল আবার ও খাবার ঘরের দিকে। পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা। হাতে খোলা কাগজের পাতাটার মতনই রক্তহীন সাদা মুখ। তিন মেয়ে, তিন জামাই, পাঁচটি নাতি-নাতনি আর স্বামী। এক-একটি জীবন্ত মুখ যেন হেসে হেসে নেচে বেড়াচ্ছে সমস্ত কাগজটা জুড়ে। ছেলের দিকে চাইলেন একবার। চাইলেন শূন্য দৃষ্টিতে। "পেলি কিছু খবর?" প্রশ্ন করলেন অস্ফুটে। "না," নিঃশব্দে মাথা নেড়ে উত্তর দিল ছেলে, "চেষ্টা করছি"। প্রাণপণ চেষ্টায় যেন উচ্চারণ করল কতগুলো শব্দ সমষ্টির। চেষ্টা বৃথা, জানে ও। যে ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ধসে এতগুলো বসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এক-একটি মুহূর্তে, সেখানে পথের ওপর দৌড়ে-চলা ছোট্ট একটা গাড়ি তো প্রচণ্ড তুফানের মুখে একটা ঘাসের শিষের মতনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে নিতান্ত অবলীলায়, অবহেলায়। নিঃশব্দে মা গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। আগের দিন থেকেই শরীরটা জ্বর জ্বর করছিল। দেখতে দেখতে কয়েকটা ঘণ্টা কাটল। জ্বর

উঠল ১০৩°। বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে দিক-বিদিকে। খবর নেই। কোন খবরের সামান্য আশ্বাস-মাত্র নেই কোনখানে।

মায়ের ছবি ভাসছে আমাদেরও চোখের ওপর। যেরকমভাবে যে কোন উপায়েই হোক, একটা খবর যে পাঠাতেই হবে। ঝড়ে পড়ে, পাহাড় ধসে মরিনি আমরা। বেঁচে আছি। ভাল আছি। সে ভাল থাকা যেমনভাবেই হোক। কিন্তু অসম্ভব। টেলিগ্রাম-টেলিফোন লাইন কেটে গেছে অনেক আগেই। মানুষজন আসা-যাওয়া বন্ধ। চিন্তিত উদ্‌ভ্রান্ত পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমাদের, রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব যে করতেই হবে। যেমন করে, যে ভাবেই হোক।

ছুটলো ছেলেরা এখানকার ছোট-বড় সব অফিসগুলোতে। তাদের প্রাত্যহিক আদান-প্রদান চলছে কেমন করে জানতে। চলছে না। জানালেন তাঁরা। বাইরের জগৎ থেকে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন তাঁরা। এবার রেলওয়ে। ক'দিন ধরেই তিনধরিয়া স্টেশনে খবরাখবরের জন্যে গিয়ে সেখানকার স্টেশন মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে সখ্যতা জন্মে গেছে বেশ। অতি অমায়িক মিশুকে মানুষ। তাঁর দ্বারা খবর পাঠাবার যদি কোন উপায় পাওয়া যায়। অসম্ভব। ওয়্যার-লেস কাজ করছে না ওঁদের ক'দিন থেকেই। ওদের সামনে খুলে ধরলেন সকালে পাওয়া নিজেদের টেলিগ্রাম। লাইনশুদ্ধ গোটা ট্রেণটা পড়ে গেছে খাদে। তাই সবদিকে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কলকাতায় কোনরকম খবর পাঠাবার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। থাকলে যেমন করেই হোক, তিনি নিশ্চয়ই তা করতেন। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তো সংসার করেন তাঁরাও। সুন্দর কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে লাভ হল কি? অনুপায় অস্থিরতায় মাথা কুটে কুটে মরে সমস্ত মনপ্রাণ। আমরা যে বেঁচে আছি, যেমন ভাবেই হোক দিন কাটছে—সূর্য উঠছে আমাদেরও পৃথিবীতে—শুধু এই ক'টা কথাই মাকে জানাবার কোন উপায়ই যদি থাকত। অসহ্য দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন যিনি দিনরাত।)

আস্তে আস্তে গাড়ি পার হয়ে এল একটা মৃত্যু। ছুটল আবার। কাজ হচ্ছে গোটা রাস্তাটা জুড়ে। পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ কোথাও শ্রমদান করে চলেছে নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে পরার্থে। কোথাও বা ঠিকাদারের বাঁধা মজুরিতে। গাড়ি দেখে থামছে ওরা। নিঃশব্দে কাছে এসে সাহায্য করছে যতটুকু সম্ভব। একান্ত প্রিয় পরিজনের উৎকণ্ঠ মুখ নিয়ে চেয়ে দেখছে এই ভয়ঙ্কর মরণোত্তরণ। আর একটা একটা বিপদ পার হয়ে গেলেই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে।

আমরা নেমে যাচ্ছি। নেমে যাচ্ছি মৃত্যু থেকে জীবনের পথে। আমাদের চোখের সামনে ধোঁয়ার মতন অস্পষ্ট হয়ে উঠছে দূরে পর্বতশ্রেণী। রূপগরবী কাঞ্চনজংঘা আর হাসছে না আলোর হাসি। সমতলে নামছি আমরা। আর আমাদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছে কচি সবুজ ধানক্ষেত। মানুষের ক্ষুধার অন্ন। জীবনের সঞ্চয়ন। সেই দিগন্তছোঁয়া শ্যামল বিস্তারের দিকে চেয়ে থেকে চোখ যেন জলে ভরে আসছে। কত সহজ একটা মৃত্যু। অথচ কত ঈপ্সিত জীবন। কিন্তু চোখের সামনে কেবল প্রলয় আর ধ্বংস, মৃত্যু আর তাণ্ডব দেখতে দেখতে এত স্পর্শ কাতর হয়ে গেলাম নাকি আমরা? তাই কি এত সহজে চোখে জল এসে পড়ছে এতটুকু একটুমাত্র কোমল ছায়ায়?

আমরা সমতলে নেমে যাচ্ছি, পাশে এখনও দেখা যাচ্ছে ভুটানের পাহাড়। মাঝে মাঝে রক্তক্ষয়ী ক্ষতের মতন তারও সবুজ বুকের মাঝে মাঝে হলুদ ধসের চিহ্ন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এতদূর থেকেও। ওখানেও হয়ত এরই মধ্যে লেখা হয়ে গেছে কতই মৃত্যু আর ধ্বংসের ভয়াল ইতিহাস।

কিন্তু আর দেখব না আমরা ওদিকে, আর দেখতে চাই না। এবার আমরা ভুলতে চাই। অনেক তো দেখা হল, প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি দিন আর রাতের অসহ্য দুঃস্বপ্ন ভুলে একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রামে শ্বাস নিতে চাই এবার সুস্থ মানুষের পৃথিবীতে।

শিলিগুড়ি, ১০ই অক্টোবর। কত যুগ? এক যুগ? এক শতাব্দী? তারও বেশী কোন এক অতীত জীবন পার হয়ে হয়ে কি এলাম আমরা এখানে পৌঁছুতে? কিন্তু পায় পায় ছড়ান এত মৃত্যু পেরিয়ে ঘরে ফিরে আসা মানুষগুলোর জন্যে অভ্যর্থনায় হাসছে না তো এখানকার পরিচিত পৃথিবীটা? কেন পরিচিত অপরিচিত প্রতিটি মুখে এমনভাবে লেখা হয়েছে শুধু সীমাহীন বিষাদ আর ভাষাহীন আতঙ্কের ছবি?

দেখা হল ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে। কুচবিহার থেকে এসেছেন রিলিফে। জলপাইগুড়ি ভেসে গেছে। আমরা যখন বন্দী পর্বত-প্রাচীরের অন্তরালে, নিচে তখন মহানন্দা আর তিস্তা নেমেছে আরও সর্বনাশা কোন মরণ-খেলায়। গভীর রাত্রে নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম-রত একটা গোটা জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে স্রোতে ভাসা একমুঠো খড়কুটোর মতন। এখন শুধু একটা মৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষটুকু নিয়ে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে আছে গন্ধওঠা ঘোলাজলের একটা মহাসমুদ্র। হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেললেন ডাক্তার। কি করে হল? কি করে হল এই তাণ্ডব? মানুষের পৃথিবীতে একটা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ-ব্যবস্থায় কি করে এ সম্ভব?

মার বুকে নির্ভয় আশ্বাসে ঘুমিয়ে থাকা শিশু হঠাৎ হারিয়ে গেল কোন মহা-প্রলয়ের অতল অন্ধকারে। দুই বলিষ্ঠ বাহুতে ধরে রেখেও স্বামী রক্ষা করতে পারল না স্ত্রীকে। আকুল আর্তনাদে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে ভেসে চলে গেল সে চোখের সামনে দিয়ে। ভেসে গেল এক-একটা গোটা সংসার। একটিমাত্র নিশ্বাস ফেলবার অবসরটুকুরও আগে সব শেষ হয়ে গেল।

[ক্রমশ]

আশ্চর্য পদার্থ পলিথিন

আ...নদী মিসৌরীতে এল বন্যা। বন্যার সর্বগ্রাসী জলের তলায় একে একে অন্তর্হিত হতে লাগল কত প্রাণ, কত সম্পদ। দেশের স্থপতিরা বিরামহীনভাবে বালি ভর্তি চটের বস্তা দিয়ে বাঁধ গড়ে এই সর্বনাশা বন্যাকে রুখতে গেলেন। কিন্তু তাঁরা আর কত জায়গায় এইভাবে বাঁধ গড়ে বন্যাকে বাধা দেবেন; শেষে একদিন চটের বস্তার সরবরাহ নিঃশেষ হয়ে গেল। স্থপতিরা চিন্তিত চিন্তায় পড়ে গেলেন। এইবার কি-ভাবে এই অগাধ অনন্ত জলরাশিকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। এই সময় একজন ভাবলেন আচ্ছা, কৃষকেরা কৃষির সরঞ্জাম বা খড়ের গাদা ঢাকা দেওয়ার জন্য ভারী চটের পরিবর্তে যে পাতলা প্লাস্টিকের আবরণ ব্যবহার করেন, সেটা কি এখানে কোন কাজে লাগানো যায় না।

যত শীঘ্র সম্ভব পঁচাত্তর থেকে একশ পাউণ্ড বালি ধারণে সক্ষম প্লাস্টিকের ব্যাগ সরবরাহ করার জরুরী বার্তা পাঠানো হল অ্যালকো প্লাস্টিক কোম্পানীতে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল যে, পাতলা প্লাস্টিকের ব্যাগ জলের বেগ ও চাপ সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে কি না। যাই হোক্ সত্বর প্লাস্টিকের ব্যাগের সরবরাহ এসে পৌঁছল এবং সামরিক ও অসামরিক কর্মীদের সাহায্যে সেগুলো কাজেও লাগানো হল। স্থপতিরা চরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, পাতলা ব্যাগগুলো ঘণ্টায় প্রায় কুড়ি মাইল বেগে আছড়ে-পড়া জলের প্রচণ্ড গতিবেগ ও চাপ সহ্য করে সম্পূর্ণ অক্ষত রইল।

অত্যন্ত হাল্কা ধরণের প্লাস্টিকের চাদরের এই রকম স্থায়িত্ব স্থপতিদের বিস্মিত করলেও এটির প্রস্তুতকারক সংস্থা এতে কিছুমাত্র অবাক হন নি। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, পদার্থটি পলিথিনের। আধুনিক যুগে এই অত্যাশ্চর্য পদার্থ যে কত শত রকমে ব্যবহার করা হচ্ছে তার অন্ত নেই।

শাক-সব্জী টাটকা রাখতে, আসবাবপত্রের ওপর সৌখিন আবরণ-রূপে, বাচ্চাদের খেলনা এবং খাদ্যের পাত্র হিসাবে, পলিথিন আজ বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার নানা ঔষধ-প্রস্তুতকারক সংস্থা ও রাসায়নিক প্রকল্পে তরল পদার্থ পলিথিনের নল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

পলিথিন বিদ্যুৎ অপরিবাহী বলে টেলিভিশন কেন্দ্রে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে, সমুদ্র-গামী জাহাজে ইনসুলেটর রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ-ছাড়াও পলিথিনের বিস্তৃত করণীয়ের তালিকায় রয়েছে তুষার-পাতের হাত থেকে শস্য বাঁচিয়ে রাখা, উন্মুক্ত স্থানে রাখা মেশিনপত্র রক্ষা করা, স্যাঁতসেঁতে খনির ভেতরে বিস্ফোরক পাউডার শুকনো রাখা, ভর্যাদবাহী বেলুনরূপে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে আনা।

বিদরা দেখলেন যে, অ্যালডিহাইড অপরিবর্তিত রয়েছে আর ইথিলিন এক সম্পূর্ণ নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। এইভাবে তাঁরা এক নতুন ধরণের প্লাস্টিক পেলেন বটে, কিন্তু এর কোন সঠিক ব্যবহার নির্ণয় করতে সক্ষম হলেন না।

এরপরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল আর নাটকীয়-ভাবে বৃটেনের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল পলিথিন।

পলিথিনের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। পলিথিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল। নাজি প্লেনের সন্ধানে সদাসতর্ক রাডারের ইনসুলেটর থেকে শুরু করে শত রকমের প্রতিরক্ষার কাজে পলি-থিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিল। ইম্পিরিয়াল কোম্পানী এক

প্লাস্টিকের অন্যান্য নানা সঙ্কেতের মধ্যে পলিথিন অনন্যসাধারণ। অবশ্য পলিথিনের প্রারম্ভিক যুগ খুব সমা-রোহের নয়। আজ থেকে প্রায় তেত্রিশ বছর আগে ইংলণ্ডে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজের পরীক্ষাগারে রসায়নবিদরা তরল ইথিলিন ও পেট্রো-লিয়ামের উপজাত মিশ্রিত করে এক নতুন ধরণের সিনথেটিক পদার্থ উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, উচ্চচাপে এই দুই পদার্থের অণুগুলি সংযোজিত হবে এবং এক নতুন ধরণের প্লাস্টিক পাওয়া যাবে।

কিন্তু মুশকিল হল সেখানেই, কারণ এই দুই পদার্থ কিছুতেই সম-ভাবে মিশ্রিত হল না। বকযন্ত্রে রসায়ন-

বৃহৎ প্রকল্প চালু করেও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে না পারায় যুক্ত-রাষ্ট্র প্রতিরক্ষাবাহিনী বৃটেনকে সাহায্য করতে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের একত্র প্রয়াসে বৃটেনের নৌ ও স্থলবাহিনীর বহুল চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।

ইতিমধ্যে শিকাগোর ভিসকিং কর্পোরেশনের বিজ্ঞানীরা আর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় স্থল-নৌ-বিমানবাহিনীর অবশ্য প্রয়ো-জনীয় দ্রব্যাদির তালিকায় পলিথিন স্থায়ী আসন লাভ করে। এই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত নেন যে, পলিথিন যে শুধু চমৎকার বিদ্যুৎ অপরিবাহী তাই নয়, পলিথিনের চাদর যেমন হাল্কা নমনীয় অথচ শক্ত,

কারেও বেশ সস্তা, স্বচ্ছ ও জল-নিরোধক। শীঘ্রই পলিথিনের কার্য-ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার হয়। সামরিক বাহিনীর সরঞ্জাম ও লোকজনদের চরম উষ্ণ আবহাওয়া থেকে প্রবল শীতের মধ্যেও রক্ষা করার জন্য পলিথিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

পলিথিনের প্রস্তুতকারক সংস্থা এই পদার্থের যুদ্ধকালীন চাহিদা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও শান্তির সময়ে এটা কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন।

কিন্তু তাঁদের চিন্তার আকস্মিক-ভাবে অবসান ঘটে। একদিন এক পলিথিন-বিক্রেতা গোল করে পাকানো পলিথিনের বিরাট লম্বা চাদর নিয়ে হাজির হলেন একটা পোষাক তৈরির কোম্পানীতে তিনি ঐ সংস্থার পরিচালকের সামনে লম্বা চাদর খুলে দিলেন পরীক্ষার জন্য। তিনি বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে বিক্রেতাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটা সেলাই করা যাবে কিনা। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে এই ব্যাপারটা জানা যায় নি। কারণ, এ-পর্যন্ত পলিথিনকে কেউ সেলাই করবার চেষ্টা করে নি। যাই হোক্, বিক্রেতাটি ত' কপাল ঠুকে বলে দিলেন যে, পলিথিন যখন এত রকমভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন সেলাই করাই বা যাবে না কেন, নিশ্চয়ই যাবে। পরিচালক-মশায় তখন একটুকরো পলিথিন তাঁর দোকানের সেলাই মেশিন চালকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে সেলাই মেশিন চালক একটা সুন্দর টেবিল ঢাকা এনে দিলেন। পরিচালক-মশায় মন্তব্য করলেন, 'চমৎকার', আরো জানালেন যে, ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের পলিথিন তিনি ক্রয় করবেন। বিক্রেতা আনন্দে দিশেহারা। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি পরিচালকটিকে প্রশ্ন করলেন—'আশা করি, আপনি বেশ চিন্তা করেই আমায় পনেরো টন পলিথিনের অর্ডার দিচ্ছেন। কারণ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পঁয়তাল্লিশ হাজার স্টার্লিং খুব একটা কম কথা নয়।'

মালিক জানালেন, 'পলিথিনের যে রকম গুণগান আপনি করলেন তাতে মনে হয়, এক মাসের মধ্যেই আমি ঐ পরিমাণ স্টার্লিং অর্জন করতে পারব।'

তাঁর কথা বিফল হয় নি, প্রকৃতই পলিথিনের টেবিল ঢাকা এক চাঞ্চল্যকর সাফল্য।

আজ পলিথিন ঘরে বাইরে সর্বত্র। বাইরের কাজে এই শক্ত পদার্থটি যথেষ্ট কাজ দিচ্ছে। যেমন বহনযোগ্য গ্যারেজ, পকেটস্থ করা যায় এমন আশ্চর্য তাঁবু, উন্মুক্ত আসবাব ও মেশিন পত্রের আবরণ, বহনযোগ্য গ্রীনহাউস যাতে গাছপালা বেশ ভালই জন্মাবে এমন আরও কত কি আজকাল পলিথিনে তৈরি হচ্ছে।

কৃষিকার্যেও পলিথিন অনেক সাহায্য করছে। ফসল বপন করার আগে জমির ওপর পলিথিনের চাদর বিছিয়ে তার তলায় এমন এক গ্যাস স্প্রে করে দেওয়া হয় যে, আর আগাছা জন্মাতে পারে না। সব্জী সংরক্ষণেও পলিথিন অসাধ্যসাধন করেছে। আগে যেখানে সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর সবজী ও ফল নষ্ট হয়ে যেত, আজ লক্ষ লক্ষ পলিথিনের ব্যাগে পঞ্চাশ রকমেরও বেশি সবজী ও ফল সংরক্ষণ করার ফলে সেগুলি যেমন টাটকা থাকছে আর ভয়াবহ ক্ষতির পরিমাণও কমেছে তেমন সেচের কাজে হাল্কা পলিথিনের পাইপ খুবই উপযোগী হয়েছে।

সাধারণ ক্ষেত্রে পলিথিনের ব্যব-হার শুধু পলিথিনের চাদর বা পলিথিনের ব্যাগ ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ নেই। আর্ল পুপার নামে এক শিল্প-পরিকল্পনাকারক ছাঁচে-গড়া পলিথিনের এমন সব খাবার পাত্র আবিষ্কার করেছেন, যেগুলি স্থায়িত্বের দিক থেকে তুলনারহিত।

এইগুলি হাতুড়ি দিয়ে পিটলে, কঠিন জায়গায় আছাড় মারলে, বেঁকালে গরম জলে ফেলে দিলে বা চরম শৈত্যের মধ্যে রেখে দিলেও সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকবে।

খেলনার রাজ্যে পলিথিনের আবির্ভাব বেশ দেরি করে ঘটলেও আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই আশ্চর্য পদার্থটি খেলনার জগতে বেশ আধিপত্য বিস্তার করবে। কারণ শিশুরা তাদের খুশিমত খেলনাগুলিকে দুমড়ে-মুচড়ে বেঁকিয়েও কিছুতেই শায়েস্তা করতে পারবে না।

পলিথিনের বিরাট প্রকল্পগুলি অবিরাম উৎপাদন করে চলেছে। কারণ উৎপাদকেরা নিশ্চিত জানেন যে, পলিথিন কখনও অব্যবহার্যরূপে পড়ে থাকবে না। আজ দশ হাজার রকম ভাবে পলিথিন ব্যবহৃত হচ্ছে, কে জানে এই ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের তালিকায় আরো কত সংখ্যা যুক্ত হবে।

—সন্ধানী

'Poetry is the nascent self-consciousness of man, not as an individual but as a sharer with others of a whole world of common emotion.' —*Coudwell*

মাটি জল আকাশ
—মালবিকা মিত্র
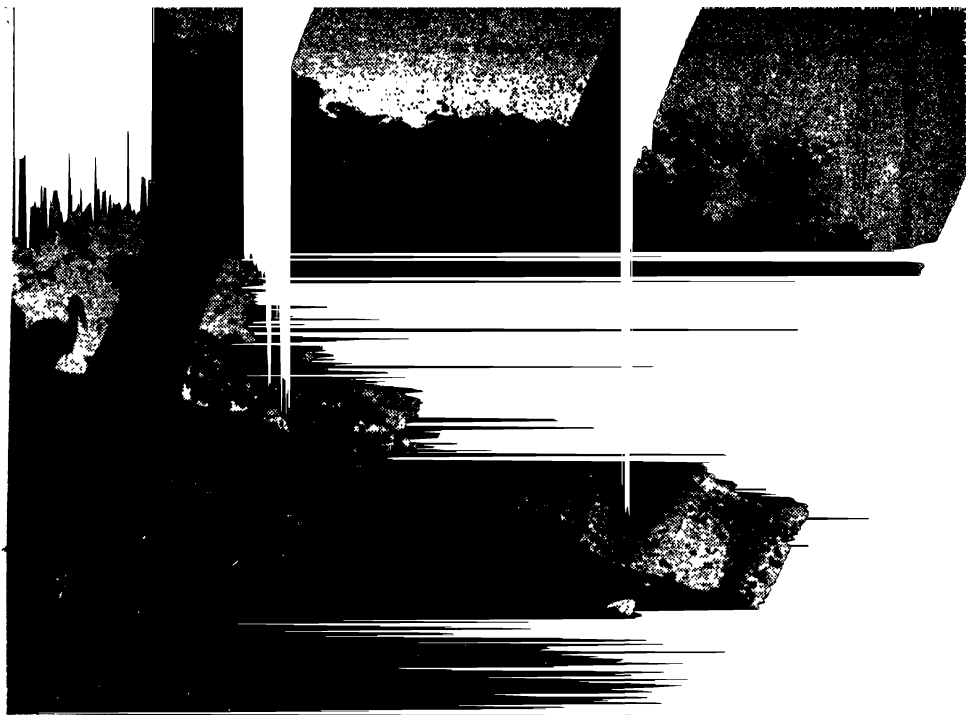
আলোক চিত্র

মাসিক
বসুমতী
বৈশাখ
১৩৭৭

আলোছায়া
—সুবীর গুপ্ত

ভোরের শুভেচ্ছা
—বিশ্বনাথ গোস্বামী

আমি ভীষণ ক্লান্ত
—মধুকর রায়চৌধুরী

আমি অত্যন্ত মুগ্ধ
—সঞ্জয় ধর

প্রাকৃতিক
—সত্যকিঙ্কর সিংহ

হিজিবিজি
—অরুণ মিত্র

পাহাড়তলী
—আশীষ মিত্র

দেবী শীতলার বাহন

কোন একটি বিশেষ ব্যাধি ভয়াবহ আকার নিয়ে মানুষের দেহে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন ভীত মানব সেই ব্যাধির রাহুগ্রাস থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে দেবীর চরণে প্রণত হয় ও তাঁর প্রসন্নতা প্রার্থনা করে তিনি দেবী শীতলা। তাঁর বাহনরূপে যে জীবটিকে কল্পনা করা হয়েছে, সে জীবটি রজক-বাহন হিসাবেও প্রসিদ্ধ। পশুকুলেও গর্দভের স্থান অনেকেরই নিচে। অন্যান্য পশুপক্ষীদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য পরিদৃশ্যমাণ—গর্দভের মধ্যে তাদের অনেক কিছুই অনুপস্থিত। তাই পশুসমাজেও কোন মর্যাদার আসন তার জন্যে সংরক্ষিত নেই।

মানুষের মধ্যেও যারা স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন, যারা নির্বোধের মত কাজ করে—তাদের অশ্বেতর এই জীবটির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। যাদের কর্মে ও চিন্তায় কোন প্রকার সূক্ষ্মতার প্রকাশ নেই, কোন প্রকার বুদ্ধির দীপ্তি মেলে না তারাই রাসভের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে থাকে। এই উপমার মধ্যেই গর্দভের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারণা গঠন করা যায়।

কিন্তু, গর্দভ সম্বন্ধে সকলক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবেই যে এই সচরাচর সাধারণ ধারণা কার্যকর নয়—এ মন্তব্যের স্বপক্ষেও কিছু প্রমাণ তুলে ধরা যায়। এমন অনেক গর্দভের সন্ধান মিলবে, যাদের বিবরণ তৎসম্পর্কিত আমাদের সমস্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সে ধরণের গর্দভের নিদর্শন বাংলা দেশে মিলবে না। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে বিশেষত বন্য ও মরু অঞ্চলে এদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই জাতীয় গর্দভের সর্বাধিক সমাগম এককালে দেখা গেছে হবলুচিস্তানে---বর্তমানে সে অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

এই বন্য ও মরুদেশীয় গর্দভদের মিছিল একটি দেখবার জিনিস বলে প্রত্যক্ষদর্শীর দল বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন অন্তত কুড়ি গজের দূরত্ব বজায় রেখে এই মিছিল দেখতে হয়। একটি মিছিলে অন্তত কুড়িটি রাসভ থাকবেই, তার কমে না-কি এদের মিছিল হয় না।

এদের মধ্যে নানা রঙের সমন্বয় দেখা যায়। রঙের বাহার এদের ভেতর একটি দেখার বস্তু। কোনটি শাদা—যেন শুভ্রতার সমারোহ, কোনটি আবার হাল্কা ঈষৎ রক্তিমাভযুক্ত ধূসর। এই বর্ণ-সম্পদ এদের এক অপরূপ সৌন্দর্য দিয়েছে।

এই ভারবাহী জীবটি যে কী প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন হতে পারে সে সম্বন্ধে এই বন্য ও মরুদেশীয় গর্দভদের বিবরণ না জানলে বোঝা যাবে না। এই গর্দভদের যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁদের কাছে অজানা নয় যে, এই জীবটি দৌড়য় ঘণ্টায় ছাব্বিশ-সাতাশ মাইল বেগে। পাঁচ-ছয় মাইল এরা তো স্বাভাবিকভাবে দৌড়ে বেড়ায়।

আফ্রিকার গহন অরণ্য অঞ্চলে যে সব গর্দভ আছে, তাদের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে এদের সাদৃশ্য আছে। সব মিলিয়ে একে আকর্ষণকারী প্রাণী বলে উল্লেখ করা যায়। পশু-প্রাণী সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ---তাঁরা নানাভাবে এই বিশেষ প্রাণীটির প্রশস্তি-বাক্য উচ্চারণ করেছেন।

এদের স্ত্রীজাতির ভেতর থেকে একটিকে কৌশল করে শিশু অবস্থাতেই বন্দিনী করা হয়। পরে পিঙ্গলবর্ণের এক টাট্টু ঘোড়ার সঙ্গে তার দেহগত মিলন সংঘটিত হয়। সেই মিলনের পরিণতিস্বরূপ যে সন্তান সে প্রসব করল, আকৃতিতে মায়ের তুলনায় সেই সন্তান খর্বাকৃতিই হল কিন্তু রঙ তার হল উজ্জ্বল বাদামী।

আমরা যারা ভারতের পূর্বপ্রান্তের শ্যামবঙ্গদেশের বাসিন্দা, তারা ক'জন এই বিশেষ জাতীয় প্রাণীটি সম্বন্ধে খবর রাখি?

—বাসুদেব

বন্দী অবস্থায় বন্য গর্দভ

গতিবেগের মূর্ত প্রতীক বন্য গর্দভ

সতীত্ব সংযম নম্রতা

ভৈরবপ্রসাদ হালদার

সংযম ও সতীত্ব দুটো কথাই হয়ত একদিক দিয়ে ভিন্ন—কিন্তু যৌন-সম্পর্কীয় ব্যাপারে যখন কথা দু'টো ব্যবহৃত হয় তখন এদের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সতীত্ব রাখতে গেলে সংযমী হতেই হবে। অসংযমী কোনও নারী তার সতীত্ব রাখতে পারে কি? কাজেই সতীত্ব কথাটার সঙ্গে সংযম কথাটাও যেন জড়িয়ে রয়েছে। অতএব পুরুষ যখন কোনও সতী নারীর কল্পনা করে কিংবা কোনও সতী কুমারীকে নিজের বধূরূপে গ্রহণ করতে চায়—তখন স্বভাবত সে তাকে সংযমী ধরে নেয়।

আবার পুরুষের বেলায় সংযমের সঙ্গে চরিত্রবান কথাটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অসংযমী পুরুষের পক্ষে চরিত্রবান হওয়া সম্ভব হয় না। এক নারীর প্রতি বিশ্বস্ত জীবন যাপন করতে হলে এবং সে নারী হবে তার প্রেমিকা, তার বধূ—পুরুষকে যৌন-ব্যাপারে নিশ্চয় সংযমী হতে হবে।

ফলে মানব সমাজে যখন থেকে যৌন-সম্বন্ধে সংযমী হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং সমাজের নারী ও পুরুষ উভয়ে যখন থেকে এই অনুশাসনকে মেনে নিতে সুরু করেছে, সেই তখন থেকেই চেস্টিটি কথাটারও জন্ম হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রাচীন ও আধুনিক নারী-পুরুষ চেস্টিটি'র কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে।

তবে আদিম সমাজে চেস্টিটিকে মানা হয়েছে এক প্রয়োজনে আর সভ্যসমাজে একদম ভিন্ন প্রয়োজনে। আদিম সমাজের মানুষ নর-নারীর যৌন-মিলনকে একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলে চিরকাল মনে করে আসছে। দেহ ধারণের জন্য যেমন জল, খাদ্য প্রয়োজন, বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র দরকার—তেমনি সন্তান প্রজননের জন্য প্রয়োজন নর-নারীর যৌন-মিলন। তাই যৌন-মিলনকে তারা শাদা চোখে বিচার করত। সমাজের মিলনক্ষম যুবক যৌবনবতী কন্যাকে মিলনের সঙ্গিনী করতে চাইবে—এতে সমাজ বাধা দেয় নি, দিতে চায়ও না। কিন্তু তবু আদিম সমাজে সতীত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কারণ প্রাচীনকাল থেকে আদিম সমাজের মানুষরা বিশ্বাস করে যে, সতী নারীকে ঐন্দ্রজালিক শক্তি ভর করে। সমাজের মঙ্গলের জন্যই ইন্দ্রজাল শক্তির অধিকারিণী কন্যার প্রয়োজন রয়েছে। একজন সমাজ-বিজ্ঞানী লিখেছেন:

Primitive men esteemed chastity, when he considered it at all, because to him it represented a magical value.

কিন্তু সভ্য মানব সমাজ সংযোগের মধ্যে মর‍্যালিটির স্বাদ পেয়েছে। নর-নারীর জীবনে মর‍্যালিটি অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছে। অসতী নারী এবং চরিত্রহীন নারী ও পুরুষ কখনই সামাজিক নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। তাই সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে:

Civilized people esteem chastity as a desirable virtue because it is accord with the accepted code of morality.

আদিম সমাজে একদিন নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল।

পরবর্তীকালে শক্তিমান পুরুষ সমাজের শিরোমণি হয়ে বসল। সন্তান প্রজননের জন্য নারীর প্রয়োজন এই অনুশাসনের চেয়ে পুরুষের নীতিকে [illegible] জন্য নারীর [illegible] এই অনুশাসন চালু হল। তখন থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটল। নারী কেবল সন্তানের জননী নয়—নারী পুরুষের যৌন আনন্দ ভোগের সঙ্গিনী। জীবনে যত বেশী নারীর সঙ্গে যৌন-মিলন ঘটানো যাবে, তত বেশী আনন্দ লাভ করা যাবে এই চিন্তা শক্তিমান পুরুষের মন জুড়ে বসল। ফলে ছলে-বলে-কৌশলে নারী, বিশেষ করে যুবতী নারী আহরণের প্রবণতা দেখা দিল পুরুষের মনে। নারী হল বীর্যশুল্কা আর না হয় লুঠের সম্পত্তি। এর পরবর্তী কালে নারী হয়েছে পণ্যের সামগ্রী। আর তখন থেকে নারীর—বিশেষ করে কুমারী ও যুবতী নারীর চরিত্রের ভূষণ হল সতীত্ব।

শক্তিমান পুরুষ আপন অঙ্গশায়িনী নারীকে সতী নারী হিসাবে কল্পনা করে তখন থেকেই রোমাঞ্চিত হতে সুরু করে। অনাঘ্রাতপুষ্প সব সময় পুষ্প-প্রেমীকে মুগ্ধ করবেই। উচ্ছিষ্ট ফুলে যেমন দেবতার পূজো হয় না তেমনি স্পৃষ্ট নারীও পুরুষের কাছে বাঞ্ছনীয়া নয়। তাছাড়া যারা নারী সওদা নিয়ে দেশে দেশে বাজারে বাজারে বেসাতি সাজাত, তারাও প্রচার করত যে, তারা সতী কুমারী-কন্যা আমদানী করেছে। লোভী আনন্দ-সন্ধানী পুরুষ সতী-যুবতীকে হাটের ব্যাপারীর কাছ থেকে কেনবার জন্য আগ্রহান্বিত হত। এবং woman as salable property had on added value if chaste.—এই ধারণাও সত্য।

তারপর যুগে যুগে সমাজ পাল্টেছে—মানুষের অনেক ধারণা পাল্টেছে।

কিন্তু সতী নারীর প্রতি মোহ এবং কুমারী কন্যাকে অনাঘ্রাতা রাখবার প্রবণতা ও রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আদিম মানবের ধর্ম সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক ধারণা ছিল—যুগে যুগে সে ধারণা সংস্কৃত হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে মানবিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে। নারীর মূল্যবোধ, প্রয়োজনীয়তা, অধিকার

সবকিছু সম্বন্ধে ধারণা সুসংস্কৃত হয়েছে—কিন্তু সতীত্ব সম্বন্ধে ধারণা বদলায় নি। বরং সতীত্বের প্রতি পুরুষের মোহ আরও বেড়েছে। এই বোধকে আরও কঠোর করার জন্যই চেস্টিটিকে একেবারে মর্‍্যালিটির ভিত্তিভূমি করা হয়েছে।

অনাঘ্রাতা কুমারী (virgin) কন্যারা ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারিণী হয়—আদিম মানবসমাজে এ-ধারণা ছিল এবং কোনও কোনও সমাজে এখনও এ ধারণার অস্তিত্ব রয়েছে। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এ রকম আদিম মানবসমাজ রয়েছে—সভ্যতার সংস্পর্শে তাদের এই ধারণা আজও নির্লুপ্ত হয় নি।

আফ্রিকার কঙ্গোলি সর্দাররা সুপরিচিত কুমারী কন্যার (যে কন্যাকে কোনও পুরুষ মিলনে সঙ্গিনী করে নি বা যে কন্যাকে কোনও পুরুষ স্পর্শও করে নি) কাছে দলের অস্ত্র-শস্ত্র গচ্ছিত রাখে। কন্যাটি তার ঘরে কিংবা ঘরের কাছে কোনও গাছের ডালে অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলিয়ে রাখে। এর ফলে কুমারী কন্যার আত্মিক-শক্তি অস্ত্র-শস্ত্রে প্রবেশ করে। এই গুণ অস্ত্র-ধারীকে আরও শক্তি দেয়। লড়াইয়ে এবং শিকারে যোদ্ধা সফলতা লাভ করে। কিন্তু কুমারী কন্যা কোনও পুরুষের কাছে দেহদান করলে রক্ষিত অস্ত্র-শস্ত্রের গুণ চলে যায় এবং সে-সব অস্ত্র ব্যবহার করলে তখন বিপদ দেখা দেয়—তাই অস্ত্রগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়। প্যারাগুয়ের গুয়ারানি গোষ্ঠীতে কুমারী কন্যারা রোগে ওষুধ দেয়। তাদের দেওয়া ওষুধের গুণ ততদিন বজায় থাকে যতদিন তারা নিজেরা নিজেদের চেস্টিটি বজায় রাখে।

সীজারের আমলে রোম-সাম্রাজ্য ছিল দুরন্ত শক্তিশালী। সে-সময় কুমারী-কন্যা কর্নোলিয়া ছিল অনৈসর্গিক শক্তির অধিকারিণী। সীজার নিজেও এই কুমারী কন্যার শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। দোমিতিয়ানের আদেশে কর্নোলিয়াকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন কর্নোলিয়া বলেবলেছিল—সীজার নিজেও কি বিশ্বাস করেন যে আমি পাপী (Polluted)? অথচ আমার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তিনি কত যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন।

টাইবার নদীর তীরে ছিল ভেস্টা দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের দেখাশুনার ভার ছিল সতী কুমারী কন্যাদের ওপর। তাদের বলা হত ভেস্টাল। এরাই দেবীর পূজো করত, ফুল তুলত, জল তুলত। মন্দিরের অনির্বাণ অগ্নি-শিখা এদের শক্তিতে জ্বলত। দেশের আইন অনুযায়ী এই সব কুমারীরা ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকত। নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

সেকালে ইতিহাসে একটি চমৎকার কাহিনী লেখা আছে। চেস্টিটির এক আশ্চর্য শক্তির নিদর্শন সেটা। সিবেলির (Cybale) প্রতিমূর্তি নিয়ে একখানা জাহাজ পেসিনাস থেকে রোমে আসছিল। টাইবার নদীর মুখে জাহাজ গেল আটকে। তখনকার রীতি অনুযায়ী একদল কুমারী-কন্যা গিয়েছিল জাহাজ থেকে প্রতিমূর্তিকে বরণ করে আনতে। কিন্তু জাহাজ ত' নদীর মুখে অচল। দড়ি-দড়া-কাছির সাহায্যেও জাহাজকে সচল করা গেল না। কুমারী-কন্যার দলে ছিল কুডিয়া। সবাই সে-সময় সন্দেহ করত যে, কুডিয়া সতীত্ব হারিয়েছে। গোপনে পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছে। কুডিয়া এগিয়ে এসে কাছিতে হাত রাখল। দেবীকে উদ্দেশ করে তার সতীত্ব রাখতে প্রার্থনা করল। তারপর জাহাজের কাছিতে টান দিল—তুমি যদি সতী হও, আমার মতন সতীকে অনুসরণ করবে।' (Chaste thyself thou will follow my Chaste hand.) জাহাজ মুক্ত হল।

প্রাচীন ভারতে ত' কুমারী কন্যা অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। সতীত্ব-সংযম-নম্রতা ভারতীয় নারীর জীবন-সাধনা। সীতা-সাবিত্রী ত' রীতিমত ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। নিজের সতীত্ব যে অটুট আছে তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য সীতা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেও অক্ষতা ছিলেন—ছিলেন অ-পাপ-বিদ্ধা।

খৃস্টান-ধর্মেও সতীত্বকে নারীর আদর্শ বলা হয়েছে। সতী-কুমারী কন্যা যে অপার শক্তির অধিকারিণী তা' স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। মিলটন তাঁর কাব্যে এ ধরণের একটা কথা বলেছেন যে, কুমারী-কন্যার শক্তির কাছে ভূত-প্রেত কারো কোনও জারি-জুরি খাটে না।

আদিম সমাজ ব্যবস্থায় এক সময় নারী ছিল লুঠের সম্পত্তি। বিজয়ী বীর মণিমুক্তা-সোনা-দানার সঙ্গে যুবতী নারীকেও লুঠ করে নিয়ে আসত। বিজয়ী পুরুষের সমস্ত নির্যাতন সহ্য করতে হত বন্দিনী নারীকে। স্বাভাবিকভাবে সেই মেয়ের স্বভাব ভীরু হত। পুরুষ সম্পর্কে এই ভীতি থেকে মেয়েদের মনে নম্রতার জন্মলাভ ঘটেছে। আবার যৌন-মিলনের সম্পূর্ণ আনন্দ লাভ করতে হলে পুরুষকে সঙ্গিনী নারীর সাহায্য নিতেই হয়। নারী বিমুখ হলে পুরুষ আনন্দলাভে বঞ্চিত হয়। নারী দুই অবস্থায় পুরুষকে সুখী করতে পারে—ভালবাসার দ্বারা অথবা ভয়ে পরিচর্যা করে। যেখানে নারী ভালবাসে সেখানে ভয় থাকে না। কিন্তু যেখানে দৈহিক নির্যাতনের ভয় থাকে সেখানে নারী-মনে নম্রতা বাসা বাঁধে। দুর্দান্ত পুরুষের কামনার অগ্নিতে সে নিজেকে আহুতি দেয়।

কাজেই প্রেম যদি নারীমনের প্রথম প্রবৃত্তি হয় তাহলে নম্রতা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রবৃত্তি।

ভাস্করের দৃষ্টিতেও যুবতী নারী-মনের এই দ্বিতীয় প্রবৃত্তির রূপ ধরা পড়েছে। উলঙ্গিনী দেবী ভেনাসের মূর্তি রচনা করেছেন ভাস্কর। অদৃশ্য পুরুষকে দেখে দেবী ভেনাস লজ্জায় পড়েছেন। অথচ ভালবাসার সঙ্গলিপ্সার চিহ্ন তাঁর দু'চোখে। কিন্তু তবু প্রেমের চেয়েও লজ্জার আবেগ সেই মুহূর্তে তাঁর মনে প্রবল আলোড়ন জাগিয়েছে। দৈহিক লজ্জার স্থানগুলি পুরুষের

বাঁকানোর দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে তাই ভঙ্গি ব্যগ্র। একটি হাত তাই বুকের ওপর ন্যস্ত—অপর হাতের তালু দিয়ে ঢাকা যোনীদেশ। বাঁকানো ঘাড়—ত্রুকোন দৃষ্টি নিবদ্ধ পুরুষের ওপর। ভেনাসের মনের ভয় থেকে এই দৈহিক নম্রতার সৃষ্টি হয়েছে। একজন যৌনবিজ্ঞানী এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

The whole inference of this artistic expression is Feminine defen-e of the sexual centres against the undesired advances of the male.

নম্রতা আবার দর্শনেন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল।

তাই নর-নারী, বিশেষ করে সভ্য সমাজের, যৌন-মিলনের জন্য অন্ধকারের আড়াল খোঁজে। অন্ধকারে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর নগ্ন দেহ মিলনকামী দু'টি নর-নারীর মনে কামনার আবেগ বৃদ্ধিই করে—লজ্জা-নম্রতা বিশেষ ভয় তাদের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না—modesty, which seems so deeply rooted in women, only resides in the linen that covers them, and vanishes when it vanishes.

সভ্য-সমাজে যেমন পোশাক ইত্যাদির সঙ্গে লজ্জার সম্পর্ক—তেমনি আদিম সমাজে নর-নারী উলঙ্গ থাকাটাই রীতি বলে মনে করে। সেখানে নম্রতা বা লজ্জা তাদের সহবাসকে ব্যাহত করে না।

আদিম সমাজের এই রীতি সম্পর্কে আফ্রিকার—অভিযাত্রী লিভিং স্টোন সাহেব চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। উলঙ্গ থাকতে অভ্যস্ত আফ্রিকার নিগ্রো পুরুষদের তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, ইউরোপীয়ান মেয়েদের সামনে উলঙ্গ থাকা লজ্জাকর ব্যাপার। শুধু বুঝিয়ে তিনি নিবৃত্ত থাকেন নি, লিভিং স্টোন সাহেব—নিগ্রো পুরুষদের পরবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ জুতো-টুপি দিয়েছিলেন।

তাঁর উপদেশে ফল হয়েছিল।

একজন নিগ্রো-পুরুষ স্রেফ মাথায় টুপি আর পায়ে চটি দিয়ে মেয়েদের সামনে হাজির হয়েছিল। অথচ এই সব উলঙ্গ-দেহী আফ্রিকান নরনারী লজ্জার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভীষণ সচেতন। চিকিৎসককে নিজেদের যৌনাঙ্গ দেখাতে এরা কিছুতেই রাজী হয় না।

সুতরাং সতীত্ব - সংযম - নম্রতা প্রত্যেকটি অবস্থার সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক রয়েছে। যে-সমাজে যৌন ব্যাপার যত জটিল সেখানে এদের অর্থও জটিল। আবার যেখানে যৌন-মিলনকে সহজভাবে দেখা হয় সেখানে এগুলোও কম জটিল। *

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় বহু গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

লেখনীর সেকাল একাল

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

'কালি-কলম-মন' লেখে তিনজন। উদ্ধৃতির এই সংজ্ঞা কতদূর সত্যি তা বলা হয়ত সম্ভবপর নয়, ভাল কলম যে লেখার প্রাণ, এতে তাহলেও বোধহয় সেরা লিখিয়েরাও দ্বিমত পোষণ করবেন না। অবশ্য এমন অনেক যুগন্ধর লেখকের কথাও জানা গেছে, যাঁরা অম্লানবদনে যে-কোন বস্তুকেই লেখনী হিসেবে ব্যবহার করে অমরত্ব লাভে ধন্য হয়েছেন। এঁদের সংখ্যা সীমিত সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষ লেখনীর ওপর খুবই নির্ভরশীল, এতে আর তর্কের কারণ একেবারেই নেই।

লেখনী নিয়ে মানুষ মাথা ঘামিয়েছে বহুদিন আগেই। আদিম গুহাবাসী মানুষও লেখনী হাতে করেছে। তাদের লেখনী ছিল অবশ্য পাথরের টুকরো। মানুষ সুযোগ পেলেই আঁকি-বুকি কেটেছে, যখন যেখানে এতটুকু সুযোগ পেয়েছে। পাহাড়ের গুহায় তাই পেয়েছি তার প্রমাণ আদিম মানুষের আঁকার প্রচেষ্টার। মানুষ লিখতে শেখার পরেই এসেছে লেখনীর প্রয়োজন। আর তাই স্বাভাবিক কারণেই মানুষ চেয়েছে আরও ভালো লেখনী সংগ্রহ করতে। লেখনীর বর্তমান বিবর্তনের মূল কথাই তাই।

প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ সভ্যতার আলোকে স্নাত বহু হাজার বছর আগে থেকেই। মায়া, আজটেক বা প্রাচীন সুমের সভ্যতাতেও লেখনীর প্রচলনের প্রমাণ আছে। সে লেখনী ছিল নানা জিনিসের। গাছের ডাল, পাখীর পালক এই সবই লেখনীর কাজ করেছে সে যুগে। মিশরীয়রাও লেখনী ব্যবহার করেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে অঢেল। ভারতবর্ষও পিছিয়ে ছিল না মোটেও। প্রাচীন ইতিহাসই তার জলন্ত প্রমাণ। রামায়ণ, মহাভারতের কথাই ধরা যাক। যে যুগে লেখনী মানে ছিল পাখীর পালক। স্বয়ং গণপতি ব্যাসদেবের হয়ে ঐ লেখনীতেই লিখলেন মহাভারত। রামায়ণ, মহাভারত ছাড়াও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও লেখনী ব্যবহারের স্বাক্ষর বহন করছে।

প্রাচীন পৃথিবীতে সবচেয়ে আগে সুন্দর লেখনীর প্রচলন হয় চীন দেশেই। বহু কাল আগে চীনারা তুলির সাহায্যে লেখার কাজ চালাতো, এর নিদর্শন মিলেছে। ঐতিহাসিকরা এই কথা বলেন। চীনারা তাদের প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার কাজেই তুলিকে লেখনীরূপে ব্যবহার করেছে। মজার কথা—চীন দেশেই সর্বপ্রথম লেখার কাগজও আবিষ্কৃত হয়। চীনারা যে লেখনীর রূপ-পরিবর্তনে আগ্রহী ছিল এরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীন দেশের মত প্রাচীন মিশরেও লেখনীর কদর ছিল। মিশরীরাও নানা ধরনের লেখনী ব্যবহার করতে শিখেছিলো।

জয়দেব তাঁর অমর গীতগোবিন্দ ঐ পালকের লেখনীতেই সৃষ্টি করেছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নেমে এসেছেন মর্ত্যে ঐ লেখনী ধরতেই। কবির অসম্পূর্ণ সেই পংক্তি 'দেহী পদপল্লভ মুদারম' সৃষ্টি করতেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস আর মহাকবি কালিদাস তাঁদের অমর সৃষ্টি উপহার দিয়েছেন ঐ পালকের সাহায্যেই। পরের যুগও পিছিয়ে ছিল না মোটেই। তখন এসেছেন ভারতচন্দ্র এঁরাও। পৃথিবীর অন্য দেশও ছিল না পিছিয়ে। মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁর অমর রচনা সৃষ্টি করলেন ঐ লেখনীরই সাহায্যে।

পালকের লেখনী দখল করেছিল

যেমন—তারা গাছের ডাল ছেঁটে বা সরু বাঁশ কেটে বানাতো চমৎকার লেখনী। এর পর পৃথিবীর নানা অঞ্চলেও লেখনীর প্রয়োজন খুবই বেড়ে চলে, আর তারই ফলশ্রুতি ঘটে বৈচিত্র্যময় লেখনী ব্যবহারের মধ্যে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলতি পাখীর পালকের তৈরী লেখনী। বিশেষত হাঁসের বা অন্য কোন পাখীর তৈরী পালকেই বানানো হত লেখনী। পাখীর পালকের গোড়ার অংশ ধারালো করে কেটে নিয়ে বানানো হত লেখনী। বিভিন্ন দেশে অনেক দেশ থেকে আবার ঐ লেখনী চালান দেওয়াও হত। এটা বেশ লাভজনক ব্যবসা হয়েও দাঁড়িয়েছিল। যেমন প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় আর পারস্যে।

আজকের মানুষ সাধারণ ঐ লেখনীর কথায় হয়তো হেসে উঠতে চাইবে। কিন্তু আগেকার মহান্ কথাশিল্পী কবিতার অমর সৃষ্টি করেছেন ঐ সব বিচিত্র লেখনীর মধ্য দিয়েই। কবি

অনেক যুগ। মানুষ চাইছিল আরও ভালো, আরও চমকদেওয়া লেখনী। আস্তে আস্তে তাই এল ধাতুর তৈরী লেখনী। পম্পেই শহরেও ঐ ধাতুর কলম ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে। আঠারো শতকে ফ্রান্স আর ইংলণ্ডেও ইস্পাতের তৈরী লেখনীর ব্যবহার হয়েছে, ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করেছে। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে যোসেফ প্রিস্টলে নামক একজন ধাতুর এক চমৎকার লেখনী তৈরী করেন। ১৮০৯ সালে এই ইংলণ্ডেরই আর একজন সন্ধানী মানুষ যোসেফ ব্রামা ধাতুর সাহায্যে লেখনীর মুখ অর্থাৎ 'নিব' তৈরী করেন। এর পরও চলে আরও উন্নত লেখনীর জন্য অনন্ত প্রচেষ্টা। আর তার ফলে ১৮২৮ সালে জেমস পেরী বানাতে পারেন ইস্পাতের তৈরী সম্পূর্ণ একটি লেখনী বা কলম।

অবশ্য মানুষ এতেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কারণ, ঐ কলম বা লেখনীতে কালি ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কালিতে ডুবিয়ে লেখাই ছিল অসুবিধার কারণ। গবেষণা চলল দেশে দেশে অবিরাম গতিতে। অবশেষে

১৮৮৪ সালে আমেরিকা দেখাল পথ সারা পৃথিবীর আগ্রহী মানুষকে। ওয়াটার-ম্যান নামের মানুষটি সেখানে তৈরী করলেন আজকের 'ঝরণা কলম' অর্থাৎ ফাউন্টেন পেন। নিঃশব্দ এক বিপ্লব ঘটে গেল মানুষের জীবনে। যে মানুষ শিল্প সৃষ্টির তাগিদে অহরহ প্রস্তুত করতে চেয়েছে বিচিত্র লেখনী, যার সাহায্যে সে ভরে তুলবে শুভ্র পাতার বুক, তারই শেষ পরিণতি বর্ত-মানের বিচিত্র কলম। বর্তমানের লেখনী যদিও বর্তমান দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রাখতে এনেছে বৈচিত্র্য আর সময় সংক্ষেপের উপকরণ, তবুও মানুষ হয়তো একদিন চিন্তা করতে চাইবে বর্তমানের এ লেখনী কি সেকালের পাখীর পালকের মূল্যের মর্যাদা পেয়েছে। হয়তো পায় নি। আজকের বিজ্ঞাননির্ভর মানুষ হয়তো সৃষ্টি করতে পারবে-না কোনদিন 'গীত-গোবিন্দ', 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা' আর 'ইলিয়াড', 'অডিসি'র মত মহাকাব্য। সেকালের হালকা শুভ্র ঐ লেখনী আজকের মানুষের কাছে চিরকাল এনে দেবে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভাবনা। লেখনীর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ বুঝি মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতার মধ্যেও এসেছে বিবর্তন।

যৌন-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদিও প্রত্যেক পুরুষের নিজস্ব যৌন-বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যেমন আছে মেয়েদের, যৌন ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটা সকলের মধ্যেই সংলক্ষ্য। মেয়েদের এটি বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রায় প্রতিটি পুরুষ যৌন বিষয়ে নারীর তুলনায় বেশি আত্মসচেতন। মন্তব্যটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কারণ নারীর চেয়ে পুরুষ যৌন ব্যাপারে ঢের বেশি প্রকাশ্যে মাথা ঘামায়, বকে অনেক বেশি, তার আগ্রহও পর্যাপ্ত, এমন কি সময় বিশেষে মাত্রাতিরিক্ত মনে হয়। কিন্তু দেখা দরকার, বকছে কিভাবে —প্রায় সব সময় তার ভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক এবং পরোক্ষ, গল্প, হাসিঠাট্টা বা গম্ভীর আলোচনা যাই হোক্ না কেন। ব্যক্তিগত যৌন অভিজ্ঞতা, নিজস্ব বিড়ম্বনা বা হতাশার কথা সে বলে না বললেও চলে। একাধিক 'ম্যারেজ গাইডেন্স কাউন্সেলর' (বিবাহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা) বলছেন, স্বামীদের তুলনায় স্ত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের যৌন জীবন সম্পর্কে তন্নিষ্ঠ ছবি অনেকটা নির্বিকারভাবে তুলে ধরতে পারেন।

এর কারণ একাধিক। পুরুষের মনে যৌনেচ্ছার সুতীব্র ক্ষমতা,

যৌন জ্ঞান

যৌনেচ্ছা উদ্রেককারী ছবি বা গল্পে তার অতি দ্রুত অভিভূত হওয়া (মেয়েরা যা সাধারণত হয় না), যৌন প্রয়োজনে তার আক্রমণাত্মক ভংগী— এই সব বিস্ফোরক শক্তি এমন সংক্ষোভ সৃষ্টি করে, যার ফলে হতবুদ্ধি হয়ে ভয় পায় যে, এইবার হয় ত' আর সে নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না। সুতরাং অন্য কারো সঙ্গে যৌন বিষয়ে কথা বলার সময় সে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঐ প্রসঙ্গ কখনও একান্ত ব্যক্তিপর্যায়ে উপনীত হতে না দিতে

পুরুষের যৌনানুভূতি

শিখে নেয়। সে সর্বদা সাবধানে থাকে, পাছে তার তীব্র এবং আকস্মিক সংক্ষোভ অন্যের চোখে তাকে হাস্যকর বা উপহাসের পাত্র ক'রে তোলে। এইজন্য বলা যায়, নারীর তুলনায় পুরুষ যৌনতার সঙ্গে ভালবাসা এবং মমতাময় সংক্ষোভ জুড়ে নিতে অনেক কম সক্ষম। অন্তত আংশিকভাবে এ কথা ঠিক।

কোন পুরুষই ভালবাসা ছাড়া যৌনতা চায় না। কিন্তু কেউ কেউ নিজের মমত্ব এবং মমতালাভের প্রয়োজন ব্যক্ত করতে এত অক্ষম যে, তাঁদের স্ত্রীদের মনে হতে পারে যৌন অভিজ্ঞতা স্বামীদের সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক এবং এটি স্ত্রীদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক ' কারণ তাঁরা মনে করেন, তাঁদের বস্তু হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, মানুষ হিসেবে নয়। বুঝি নিছক যৌনতৃপ্তির উপকরণ।

অবস্থাটি মহিলারা ভালভাবে বুঝতে পারবেন, যদি তাঁরা মনে রাখেন যে, যৌনসংগীদের ভূমিকায় মৌল পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের ভূমিকা মোটামুটি গ্রহীতার এবং নারী দাতা। পুরুষ জয় করতে ইচ্ছুক, স্ত্রী আত্ম-সমর্পণে। বক্তব্যটি ঘুরিয়ে বলা যায়: পুরুষ ভালবাসা দেয় যৌনতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে, নারী যৌন তৃপ্তি দেয় ভাল-বাসা পাওয়ার জন্য।

পরিণত ভালবাসা অবশ্যই এই অতি সরলীকৃত মন্তব্য ছাড়িয়ে বহু দূরগামী, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষেই এটি খুবই প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এটি শুনলে এবং মানলে পারস্পরিক বোঝা-পড়া বাড়তে বাধ্য।

পুরুষ সম্পর্কে আর একটি লক্ষণীয় তথ্য এই যে, তার যৌন-স্বভাবে তার আত্ম-গব (বা 'অহং') গভীরভাবে প্রোথিত। নিজের নির্বাচিত স্ত্রীর প্রতি পুরুষসুলভ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে নিজের কাছে নিজের পৌরুষ প্রমাণ করতে সচেষ্ট। এ সময় তার পৌরুষের গর্ব অন্য সব কিছুর তুলনায় বেশি সক্রিয়। এ জন্যই সে যৌন বিষয়ে এত সংবেদনশীল এবং এত বেশি ভঙ্গুর। প্রত্যেক বৈবাহিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা জানেন 'অ-ক্ষম' স্বামীর মনোবেদনা কী মর্মান্তিক! সে তখন পরাজিত, মানুষের ভগ্নাংশমাত্র বলে নিজেকে মনে করে, সেভাবে সে আর পুরুষই নয়।

এই সূচীতীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা

মহিলাদের তলিয়ে বোঝা [illegible]। কেন না, তাঁদের জীবনে এ জাতীয় অভিজ্ঞতা আসতে না। পুরুষের যৌন-ক্রিয়া অতিমাত্রায় জটিল এবং স্বীয় 'অ-ক্ষমতা'র কথা টের পাওয়ার পর সে মাত্র আর একটাই যন্ত্রণা [illegible] পারে যা দুঃসহতম, অনেক বেশি মর্মান্তিক, তা হল স্ত্রীর ঘৃণা।

মনে হয় না পুরুষ নিজের যৌনতা, সম্পর্কে সংবেদনশীল। কিন্তু সে তাই, নিঃসন্দেহে। যৌনক্রীড়ায় ইচ্ছুক হয়ে যে স্বামী এগোবার পর স্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন, তাঁর পক্ষে এটা অত্যন্ত আত্ম-অবমাননাকর। 'না' স্ত্রীরা নিশ্চয়ই বিশেষ সময়ে বলতে পারেন, কিন্তু বলা দরকার খুব সাবধানে, অন্যথায় স্বামীর আত্মসম্মানবোধ উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকররূপে আহত হতে পারে।

স্ত্রীকে যৌনমিলনে সুখী করতে পারার ব্যাপারেও পুরুষ বেশ সংবেদনশীল। স্ত্রী তৃপ্ত না হলে স্বামী নিজেকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করেন। অনেকে আবার প্রত্যেকবার স্ত্রীর চরমপুলক লাভ না হলে পর্যন্ত স্বস্তি পান না।

নিজস্ব যৌন স্বভাবে কী কী অসুবিধা ভোগ করে তার কয়েকটা ওপরে বলা হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর যৌন অনুভূতি এবং যৌনসাড়ার সঙ্গে নিজেরটা মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও তার অসুবিধা হতে পারে। অনেক [illegible] ক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য রয়েছে মনে হয়।

পুরুষ স্ত্রীর তুলনায় ঢের বেশি আবেগে যৌনেচ্ছার তীব্র আবেগে আলোড়িত হন, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে উত্তেজিত পুরুষই স্ত্রীকে উত্তেজিত করে। স্ত্রী বেশ ধীর-সুস্থে যৌন উত্তেজনা অনুভব করেন, যা আবার দৈহিক সংস্পর্শে এবং রোমান্টিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রভাবিত। অধিকাংশ পুরুষের পক্ষে এটি সারা জীবনের একটি সমস্যা, কেন না, আজীবন স্ত্রী দেহে মনে সাড়া দেওয়ার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ব্যক্তিগত উত্তেজনা বার বার দমন করতে হয়।

এমন কি মিলিত অবস্থায়ও এমনটা হতে পাবে, ফলে নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হতে পারে এবং উভয়েই মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন। এ সমস্যা সমাধানের অতীত নয়। দরকার স্বামীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার ছন্দ স্ত্রীর সঙ্গে যথাসাধ্য তাল মিলিয়ে নেওয়া এবং স্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতা।

যৌন মিলনের পর সমস্যাটি আবার মাথাচাড়া দেয়। পুরুষের যৌন অনুভূতি আসে যেমন ঝড়ের বেগে, যায়ও তেমনই; স্ত্রীর যৌন অনুভূতি আসার মতন যায় ধীরে সুস্থে। তৃপ্তিদায়ক রোমান্টিক আমেজে তার দেহমন ভরিয়ে দিতে। স্ত্রী তাই স্বামীর সঙ্গে দৈহিক এবং আত্মিক মিলনকাল যথাসাধ্য দীর্ঘায়িত করতে ইচ্ছুক। বহু নারীর অভিযোগ এই যে, মিলনান্তে ঠিক যখন স্বামীর কাছ থেকে তারা ভালবাসাপূর্ণ কথা এবং আদর আশা করেন, তখনই স্বামীরা পাশ ফিরে সুরু করেন নাসাগর্জন।

স্ত্রীকে ভালবাসতে, স্বামী সানন্দে স্ত্রীর সুবিধার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চান। কিন্তু তাঁর মনে তৃপ্তি আসে যদি তিনি বুঝতে পারেন এটি যে তাঁর বহু আয়াসজাত এবং দৃঢ় ইচ্ছার ফল, ভালবাসা যার মূল প্রেরণা, এই কথাটি স্ত্রী বুঝতে পারছেন এবং তাঁর প্রচেষ্টা স্ত্রীর কাছে অভিনন্দিত। প্রেমময়ী স্ত্রী সব সময় এটি অনুভব করেন এবং তা স্বামীকে জানান।

বিবাহ এবং যৌনতা সার্থক নয়। অর্থাৎ, যৌনতাই বিবাহিত জীবনের সব কিছু নয়। সুতরাং যৌনতার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেখা অপ্রয়োজনীয় এবং অনুচিত। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, সত্যিকার যৌন তৃপ্তি স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের অন্যান্য দিকগুলো কত মধুর, কত গভীর সুখকর ক'রে তুলতে পারে।

—বাৎস্যায়ন

নাসা সম্পর্কে

জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে: নাসারন্ধ্রের ভেতরে তিনের চার ইঞ্চি ওপরে অবস্থিত 'সেপ্টাম্'-এর এক দিকে বা দু' দিকে দৃষ্ট ছোট বা বড় ক্ষতই প্রায় সব ক্ষেত্রেই নাসা হওয়ার কারণ। এগুলো 'সেপ্টাম-এর রক্তবাহী ধমনীগুলো ক্ষতযুক্ত করার ফলে রক্তক্ষরণ সুরু হয়। শতকরা নিরানব্বইটা ক্ষেত্রে এই সব ক্ষত নাক খোঁটার বদভ্যাসজাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাত্রে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়, তখন মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন থাকে না।

নাসায় আক্রান্ত অধিকাংশ মানুষই শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান। ইনিই অন্যত্র নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন: অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ত কয়েক ফোঁটা থেকে আধ আউন্স-টাক পড়ে; প্রায়ই তা প্রাত্যহিক ব্যাপার এবং রোজ এ রকম হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে তা সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে পারে। নাসার কারণ ক্ষত। প্রায়ই তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। 'সেপ্টাম্'-এর ধমনীতে রক্তক্ষরণ ধমনী চেপে সংগে সংগে বন্ধ করা যায়। সোজাসুজি বা বাইরে থেকে চাপ দিয়ে। সাধারণতঃ সকলেই এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আর একটা সহজ উপায় নাকের দুইপাশ আঙুল দিয়ে চেপে রাখা। সাধারণও অত্যন্ত সহজ। 'সেপ্টাম্'-এর শৈষ্মিক ঝিল্লি ১০%. কোকেন-এর ফোঁটা দিয়ে অসাড় ক'রে ধমনীর মর্মনিম্ন অংশ বিচ্ছিন্ন করলেই হল। তাহলে রোগীর রক্তক্ষরণ চিরতরে বন্ধ। সে যদি অভ্যাস বশে বা অন্য কোন কথার উদ্দেশ্যে নাকের মধ্যে আঙুল ঢোকায় তাহলেও রক্ত পড়বে না।

চাষ আবাদ ফসল

জলপদ্মের চাষ করুন

দ্ম ফুলের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। কেন না পূজা-পার্বণে ও সাজ-সজ্জায় পদ্মের চাহিদা প্রচুর। সংস্কৃত-সাহিত্যে জলপদ্মের একষট্টিটি বিভিন্ন নাম আছে। সনাতনধর্ম এবং সংস্কৃতির বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে জলপদ্মকে সর্বদাই দেখা যায় শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে—ব্রহ্মার আসন জলপদ্মে, আবার স্বয়ং বিষ্ণুর নাভিমূলে জলপদ্ম।

জলপদ্ম এবং স্থলপদ্ম—দু'জাতের পদ্মই ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। তবে, দু'জাতের পদ্মের সমাদর সমান নয়। জলপদ্মই দেখতে বেশি ভালো বলে বেশির ভাগ লোকের ধারণা। রঙের দিক থেকে জলপদ্মের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। জল যতো গভীর হবে, পদ্মের রঙ্‌ও ততোই মনোমুগ্ধকর হতে দেখা যায়।

উভয় রকম পদ্মই অবশ্য শাদা এবং গোলাপী দু' রঙেরই হয়ে থাকে। তবে পদ্মফুল বলতে বোধ হয় আমাদের রঙ্‌টা ভেসে ওঠে এবং তা জলপদ্মের।

সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর নামটা মনে এলেই একটি পদ্মের ছবিও আমাদের মনে ফুটে ওঠে, আর সে পদ্মের রঙ গোলাপী, সে পদ্ম জলপদ্ম। তার রঙ গোলাপী—কখনো তা আধ-ফোটা কখনো বা পুরো ফোটা।

পদ্মের পাতাগুলি (বিশেষত জলপদ্মের) সব সময়ই গোলাকৃতি হয়ে থাকে। বড়ো বড়ো পদ্মের পাতার ব্যাস দু'ফুট পর্যন্তও হয়ে থাকে।

'আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর'—নিশ্চয়ই মনে আছে। ব্যাপারটা রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। অ্যালকালয়েড নীলামবিয়াম নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে পদ্মপাতার ওপরে।

জলপদ্ম সাধারণত চার, পাঁচ কি বড়ো জোর ছয় ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট হয়ে থাকে। জলপদ্ম উভলিঙ্গী।

ভারতের বাইরেও জলপদ্মের সমাদর প্রচুর। জন্মায়ও প্রচুর। মিশর, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ এবং উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাংশেও জলপদ্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ভারতের পূর্বে চীন দেশেও অল্প-বিস্তর জলপদ্ম জন্মে থাকে। তবে গ্রীষ্মের আবহাওয়া ব্যতীত জলপদ্ম প্রায় ফোটে না বললেই চলে।

ভারতবর্ষ ব্যতীত মিশরেও জলপদ্ম বিশেষ পবিত্র ফুল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও জলপদ্মের আদর সমধিক।

জলপদ্মের প্রতিটি অংশেরই কিছু-না-কিছু গুণ এবং উপযোগিতা আছে—পাপড়ি বলুন, শিকড় বলুন, বোঁটা
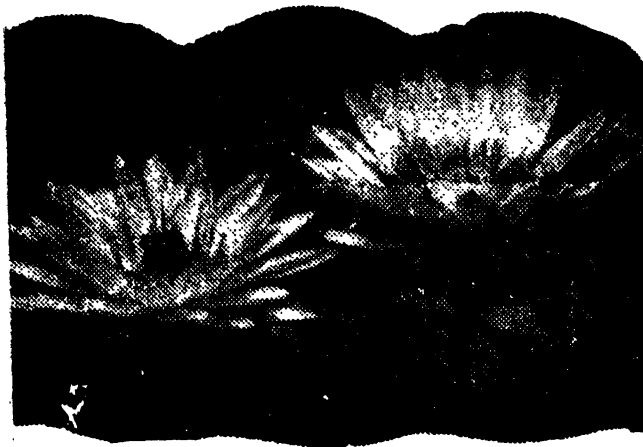
ল, বীজ—প্রতিটি অংশই কোন না কোন আয়ুর্বেদীয় ওষুধের কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রায় গোটা ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়, যেখানেই কোন প্রাচীনকালের মঠ বা মন্দিরের ভগ্নাংশ বিদ্যমান জলপদ্মের কিছু-না-কিছু নিদর্শন তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বুদ্ধ, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মীর মূর্তি ও জলপদ্ম ব্যতিরেকে কল্পনাই করা যায় না।

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ রকম অনেক মন্দির আছে, যার বাইরের অংশেই বলুন আর ভেতরের অংশেই বলুন সর্বত্রই জলপদ্মের কোন-না-কোন অংশের ব্যবহার করা হয়েছে। অজানা শিল্পীদের নিপুণ হাতের খোদাই করা জলপদ্মের বোঁটা, পাতা বা গোটা ফুলটাই দর্শকদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে থাকে। কেবল মন্দিরের পাথরে নয়, বা গুহার গাত্রে নয়, অনেক বড়ো বড়ো মন্দিরের প্রধান দ্বারের ভারী কাঠের পাল্লায়ও জলপদ্ম খোদিত হয়েছে দেখা যায়।

আজও আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এ রকম অনেক ধার্মিক প্রকৃতির সাধারণ মানুষ দেখা যায়, যাঁরা পদ্মপাতা ভিন্ন অন্য কিছুতে পরিবেশিত হলে সে খাদ্য গ্রহণ করেন না। সাধু-সন্ন্যাসীরা পদ্মপত্রকে বিষ্ণুর অংশ হিসেবে শ্রদ্ধা করে থাকেন।

পদ্মাক্ষী, পদ্মনয়নী নামে আজও নিশ্চয়ই বহু ভারতীয় ললনা দেখা যাবে— পদ্মিনী ভারতীয় ধারণা অনুযায়ী নারীর চারটি শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। —পুষ্পপ্রিয়

বৈশাখ মাসের বপন ও রোপণ

বৈশাখ মাসে যে সমস্ত ফসলের চাষ হয়ে থাকে তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হোল। কোন্ কোন্ মাটিতে এই সব ফসলের চাষ করে ভাল ফল পাওয়া যায়, ফসলের নামের পাশে তার উল্লেখ করা হোল।

ফসলের নাম	ক্ষেতের মাটি
ঝিঙে —	বেলে, দো-আঁশ
বেগুন —	উঁচু দো-আঁশ
ঢেঁড়স —	দো-আঁশ
লাউ —	দো-আঁশ
কুমড়া (বর্ষায়) —	দো-আঁশ
চালকুমড়া —	দো-আঁশ
চিচিঙ্গা —	দো-আঁশ
করলা —	দো-আঁশ
মূলা (বর্ষাতী) —	বেলে, দো-আঁশ
শিম —	বেলে, দো-আঁশ
কচু —	বেলে, দো-আঁশ, এঁটেল
মানকচু —	বেলে, দো-আঁশ
শাক—নটে, পুঁই —	যে কোন মাটিতে
চুবড়ি আলু —	বেলে, দো-আঁশ
বরবটি —	এঁটেল, দো-আঁশ
সয়াবীন —	বেলে, দো-আঁশ
উচ্ছে —	দো-আঁশ
হলুদ —	বেলে, দো-আঁশ
লঙ্কা —	বেলে, দো-আঁশ
আদা —	বেলে, দো-আঁশ
খাদা —	বেলে, দো-আঁশ
কলা —	উঁচু দো-আঁশ
শসা —	বেলে, দো-আঁশ
চীনাবাদাম —	বেলে, দো-আঁশ
পাট —	দো-আঁশ
শণ —	এঁটেল, দো-আঁশ
কাপাস —	উঁচু উর্বর মাটিতে
রেড়ি —	উঁচু দো-আঁশ
আউশ ধান (বোনা) —	বেলে, দো-আঁশ, এঁটেল
আউশ ধান (রোয়া) —	বেলে, দো-আঁশ, এঁটেল
আমন ধান (বোনা) —	দো-আঁশ, এঁটেল
ভুট্টা বা জনার —	উঁচু দো-আঁশ
জোয়ার —	উঁচু দো-আঁশ

'বপন ও 'রোপণ' অধ্যায়ে চির প্রচলিত শ্রেণীর ধানের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে ধান চাষের কথা উঠলেই পদ্মা, জয়া, হামসা, আই-আর-৮, তাই চুং, নেটিভ ১নং, তাইনান প্রভৃতি ঋতু বিজয়ী উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করে জমি হতে বেশি পরিমাণে ধান উৎপাদনের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সেচের ও জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকলে এ জাতীয় ধানের চাষ করা সম্ভব নয়। সেচ ও জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত যে অল্প পরিমাণ জমি আছে কেবল সেখানেই চাষীরা এ সমস্ত ধান চাষ করার সুযোগ পান। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের ইচ্ছা থাকলেও অধিকাংশ চাষীকে সেচের অভাবে চির-প্রচলিত শ্রেণীর ধান চাষ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

মাটি পরীক্ষা

জমির মাটি পরীক্ষা করেই জানতে পারা যায়, কোন্ জমিতে কি ধরণের ফসল ফলিয়ে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া

যায়। আর এ জন্য কোন্ সার কত পরিমাণে খরচ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের দু'জায়গায় দুটি মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের রসায়নবিদের তত্ত্বাবধানে ২৩০নং নেতাজী সুভাষ রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৪০-এ এবং অন্যটি বর্ধমান জেলা বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে। জমি হতে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে এই দুই কেন্দ্রের যে কোন একটিতে পাঠিয়ে দিলে বিনামূল্যে জমির মাটির গুণাগুণ জানতে পারা যায়। নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি ও পরীক্ষা কেন্দ্রে নমুনা পাঠাবার পদ্ধতি স্থানীয় ব্লক অফিসে জেনে নেওয়া যায়।

—জয়দেব বৈতালিক

গোলাপ গাথা

॥ আদি কথা ॥

অধিকাংশ ইতিহাসের বইতে দেখা যায় মোগল-সম্রাজ্ঞী জাহাঙ্গীর-প্রিয়া নূরজাহানের ছবি : নিবিষ্ট মনে একটি গোলাপের ঘ্রাণ নিচ্ছেন। মূলত এ ছবিটি কে এঁকেছিলেন সঠিক জানা নেই। তবে, গোলাপের ঘ্রাণের প্রতিক্রিয়া সম্রাজ্ঞীর মুখচোখে যে আবেশ ছড়িয়েছিল তার রেশটুকু তিনি অব্যর্থ ভাবেই ধরে রাখতে পেরেছেন। রূপের রাণী নূরজাহান ফুলের রাণী গোলাপের সঙ্গে সই পাতিয়ে নিজের জীবন ঘিরে রচনা করেছিলেন এক অভূতপূর্ব স্বপ্নময় পরিবেশের সে স্বপ্নের প্রভাব এমনই প্রচণ্ড যে, তিন শতাব্দী পরেও আজ ফুলের রাণী গোলাপের কথা মনে এলেই রূপের রাণী নূরজাহান ইতিহাসের পাতা ফুঁড়ে গুটি গুটি উঠে এসে সসঙ্কোচে দাঁড়ান মানসপটে।

যতোদূর জানা যায় গোলাপ একটি ভারতীয় ফুল। অবশ্য অনেকে আবার ভারত এবং পারস্য---এ দুটি দেশকেই যুগপৎ গোলাপের জন্মদাত্রীর সম্মান দিয়ে থাকেন। তারপর গ্রীস রোম হয়ে পশ্চিমের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে গোলাপ। নূরজাহানই গোলাপের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম ধরতে পেরেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে অন্য কেউ কোথায়ও কখনো ভুল করেন নি। ইউরোপ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ পেয়েছে শ্রেষ্ঠ সম্মান---রাণীর আসন। ইয়োরোপের রাজপরিবারগুলি শত শত বছর ধরে পরস্পরের সঙ্গে অন্য সমস্ত বিষয়ে যতোই রেষারেষি চালিয়ে থাকুক না কেন, গোলাপের ঐশ্বর্য সম্পর্কে তাঁরা সর্বদাই সকলে একমত হতে পেরেছেন। এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নেই---বোধহয় যে কোনও সন্দেহাতীত শ্রেষ্ঠ বস্তু সম্পর্কে এমনিই ঘটে থাকে।

গোলাপফুল

গোলাপের নানা জাত

অন্ততঃ বারোটি বিভিন্ন জাতের গোলাপের কথা কয়েক শ' বছর ধরেই জানা আছে। একেবারে দুধের মতো শাদা থেকে সুরু করে ঈষৎ গোলাপী হতে টকটকে লাল---গোলাপের নানা বর্ণ। আবার একেবারে গন্ধহীন থেকে সুরু করে ঝাঁঝালো গোলাপ---নানা তার গন্ধ।

এটা অবশ্য আজকের বিজ্ঞানের জন্মের আগের কথা।

আজকের বিজ্ঞানও গোলাপকে অস্বীকার করতে পারে নি, বা অস্বীকার করে নি। বিজ্ঞানের কৃপায় আজকের দিনে সৃষ্টি হয়েছে অনেক সঙ্কর জাতের গোলাপ---তার কোনোটায় মাখনের রঙ তো আর একটায় চায়ের গন্ধ। কোনোটা কণ্টকময় তো অন্যটা একেবারে নিষ্কণ্টক।

বলাই বাহুল্য, আজকের দিনের গোলাপ-বিলাসী বিজ্ঞানীরা গোলাপের আকারেও মৌলিক বিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। আধফোটা মনে হবে---অথচ প্রস্ফুটিত। এ-রকম কুঁড়ি গোলাপ বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে বিশেষ করে আদর পায়। আবার প্রকাণ্ড, প্রায় ছোট সাইজের পদ্মপাতার মতো গোলাপও আজকাল ফোটানো হচ্ছে।

গোলাপের চাষ

বিভিন্ন দেশে গোলাপের চাষ করা হয়। ইয়োরোপের পশ্চিমাঞ্চলে গোলাপের চাষ আরম্ভ হয় অগস্টের শেষ দুই সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহ পর্যন্ত। আমাদের দেশে বিশেষ করে উত্তর ভারতে গোলাপের চাষ সুরু হয় জানুয়ারীর দ্বিতীয় পক্ষ এবং ফেব্রুয়ারীর প্রথম পক্ষের মধ্যে। এ-সব চারায় ফুল ধরে ঠিক এক বছরের মাথায়।

তৈরি মাটি হলে অবশ্য টবেও যে গোলাপ না ফোটে তা নয়, কিন্তু সে গোলাপ হয় নিস্তেজ, কিছুটা বা নিষ্প্রভ। সুগন্ধ জাতের হলেও তার গন্ধ যথেষ্ট জোরালো হয় না। অনেকের ধারণা আছে যে, একটা টবের সামান্য মাটিই গোলাপের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা মোটেই নয়। যে কলম কেউ টবে লাগিয়ে দু'টি-চারটি গোলাপ ফোটায় সেই চারারই আর একটি কলম বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি মাটিতে (অর্থাৎ জমিতে) লাগিয়ে কয়েক শ' গোলাপ ফোটানো সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, অন্তত তিন ফুট গভীর করে মাটি খোঁড়া দরকার গোলাপের চাষের জন্যে। সে-মাটি খুব ভালো করে নেড়ে-চেড়ে ঝুরো করতে হবে। একটিও আগাছা বা তার শিকড় না থাকে। জল দাঁড়াতে না পারে—সে জন্য বড়ো বড়ো ইটের টুকুরো ছড়িয়ে জল নিষ্কাশনের পথ করে রাখতে হবে। কারণ গোলাপ চারায় জল সব সময়ই প্রয়োজন হবে। কিন্তু সে জল যেন দাঁড়িয়ে না থাকে।

গোবর আর পচানো পাতার সার পেলে গোলাপের চারা বিশেষ সতেজ হতে দেখা যায়। অনেকে কিছু পরিমাণে হাড়ের গুঁড়োও ছড়িয়ে দেন তৈরি মাটিতে। হাড়ের গুঁড়ো জমিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য কিছু কাজ হয় না। কিন্তু পরে বিশেষ কাজ হয়। প্রথম দিকে গোবর আর পচানো পাতার সার গোলাপের চারাকে সাহায্য করে, কিন্তু তারপর মাটির সংস্পর্শে ঐ হাড়ের গুঁড়ো অশেষ উপকার করে গোলাপ চারার।

পোকা-মাকড়, বিশেষ করে সাদা পিঁপড়ের হাত থেকে গোলাপ-চারাকে বাঁচানো একটা মস্ত বড়ো সমস্যা। এর জন্যে অনেকে অনেক রকম উপায় অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু সবচাইতে সহজ উপায় হলো নিমের সাহায্য নেওয়া। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, এক কিলো পরিমাণ নিম-পাতার গুঁড়ো আট বর্গ মিটার তৈরি মাটিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিলে যে-কোন প্রকার পোকা-মাকড়ের কবল থেকে গোলাপ চারাকে বাঁচানো সম্ভব।

বাড়ির পুব পাশে গোলাপ চারা লাগানই প্রশস্ত। কারণ, তার ফলে সে চারা পাবে প্রচুর রোদ, তেমনি পশ্চিমা বাতাসের কবল থেকে বাড়িটা করবে তাকে রক্ষা। অন্য কারো বাড়ির দক্ষিণ দিকটা যদি উন্মুক্ত থাকে তা' হলে দক্ষিণ দিকেও ভালোই হয়।

গোলাপ চারার সারি একটির থেকে আর একটির দূরত্ব অন্তত ৯০ সেন্টিমিটার হওয়া দরকার; আর একই সারিতে দুটি চারার দূরত্ব হওয়া চাই অন্তত ৬০ সেন্টিমিটার। বলাই বাহুল্য, পুরনো গোলাপ গাছের আশেপাশে যেন কখনো নতুন চারা লাগাবেন না। কারণ, নতুন চারার প্রয়োজন হয় প্রচুর খাদ্যের অথচ শরীর তার দুর্বল (অর্থাৎ অক্ষম); কাজেই তৈরি জোয়ান গাছটি সমস্ত খাদ্য, সার শুষে নেবে আর নতুন চারাটি কার্যত বুভুক্ষায় শুকিয়ে যাবে। তবে একই জায়গায় কয়েকটি নতুন চারা লাগাতে কোনো বাধা নেই—সেখানে একে অপরের শত্রু হবে না বরং একে অপরের বন্ধু হিসেবেই বেড়ে উঠবার প্রতি-যোগিতায় লিপ্ত হবে। নতুন এবং পুরনো গোলাপ চারা এক জায়গায় লাগালে আর একটি ভয় হলো পোকা-মাকড়ের। ওরা অনায়াসেই নতুন চারাটিকে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করে থাকে।

বিভিন্ন দেশে গোলাপ চাষের জন্যে মাটি তৈরির অবশ্য কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সব সময়ই থাকে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে: মাটিতে বালির পরিমাণ যেন ৬০ থেকে ৭০ ভাগ থাকে; কাদা-মাটি চাই ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ আর অন্তত ১০ ভাগ জল। বলা যায় যে, এইটেই অন্তত আমাদের দেশে গোলাপ চাষের পক্ষে আদর্শ মাটি। এ অবস্থাতেও কিন্তু একটা জিনিষ বিশেষভাবে নজরে রাখতে হবে। বালি সহজেই তপ্ত হয়ে ওঠে, কাজেই মাটির বালি কি পরিমাণ তপ্ত হয়ে কার্যত উঠছে সেদিকে সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। বালি তপ্ত হয়ে উঠে অনেক সময় চারার শিকড়ের বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করে। তা' ছাড়া তপ্ত বালির থেকে যে তাপ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে, তার ফলে চারার নতুন গজানো কচি পাতারও স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। বালি আবার শীতলও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। অথচ বালি না হলেও চলে না। তা ছাড়া বালিতে পটাশের ভাগ থাকে কম। তাই অনেকে নরম মাটির কথা বলে থাকেন, কারণ নরম মাটিতে পটাশ এবং ফসফেট দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে থাকে; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এ দুটো জিনিসই আবার পোকা-মাকড়ের বিশেষ প্রিয়! কাজেই ঐ বেলে মাটিই গোলাপ চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন —কেবল অতিরিক্ত কিছুটা গোময়, ফসফেট এবং পটাশ মেশানো দরকার।

গোলাপ চারার বৃদ্ধির পক্ষে পটাশ এবং ফসফেটের চাইতেও নাইট্রোজেন অধিকতর প্রয়োজনীয়। পরিমিত নাইট্রোজেন পেলে গোলাপের চারা দেখতে দেখতে তরতর করে বেড়ে উঠবে। কিন্তু তাই বলে যেন বাড়াবাড়ি করবেন না। নাইট্রোজেনের মাত্রাধিক্য ঘটলে গোলাপ চারার কাণ্ডগুলি যাবে মোটা হয়ে এবং ফুল যাবে ছোট হয়ে।

সার দু'রকমের হয়: জৈব সার এবং অজৈব সার। জৈব সারের প্রয়োজন মেটায় গোময়, পচা পাতা এবং তিসি বা সরষের ছিবড়ে। নাইট্রোজেন শতকরা ১০ ভাগ থাকে গোময়ে এবং ৬ ভাগ তিসি বা সরষের ছিবড়েতে। ভেড়া বা ছাগলের মলে নাইট্রোজেন সর্বাধিক থাকে।

অজৈব সার থেকেও নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সোডার নাইট্রেটে শতকরা ১৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে, চুনের নাইট্রেটে থাকে ১৩ ভাগ, ক্যালসিয়াম সিনা-মাইডে ১৮ ভাগ, নাইট্রেট অব অ্যামোনিয়াতে ২৫ সাড়ে ৩৩ ভাগ, সালফেট অব অ্যামোনিয়াতে ২৫ ভাগ। যাঁরা টবেই

গোলাপ ফোটাতে চান, গোলাপ চারার নাইট্রেটের প্রয়োজনের দিকে তাঁদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। জলে গুলে নাইট্রোজেন তৈরি মাটিতে ছিটিয়ে দেওয়াই সব চাইতে ভালো।

সোডার নাইট্রেট বা অ্যামোনিয়াম সালফেটের নাইট্রেট দ্রুত স্বকর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এক আউন্স পরিমাণ নাইট্রেট দেড় গ্যালন জলে মিশিয়ে স্বচ্ছন্দে ১২টি টবে দেওয়া যায়। প্রথম চার সপ্তাহ এই ভাবে সপ্তাহে একবার করে দিলে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। লক্ষ্য রাখবেন এই নাইট্রেট মেশানো জল যেন এক ফোঁটাও গোলাপ চারার কাণ্ড কিম্বা পাতায় না লাগে। ফসফরাস বেশি হলে ফুলের সংখ্যা বেশি হবে, কিন্তু চারা তাড়াতাড়ি মরে যাবে---নাইট্রেট বেশী হলে ফুলের সংখ্যা কমে যাবে কিন্তু গাছ সতেজ হবে---পুরু পাতা হবে। ফসফরাস অবশ্য ফুলের বর্ণকে অধিকতর গৌরবান্বিত করে এ কথা ঠিক। আর এ ছাড়া ফুলের আকার বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

ফসফরাসের পরিমাণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, ১৪০ গ্রাম ফসফরাস ১ বর্গ মিটার জমির তৈরি মাটির পক্ষে যথেষ্ট। হাড়ের গুঁড়ো বা মাছ থেকে লব্ধ এই ফসফরাস তিন মাস অন্তর একবার দিলেই যথেষ্ট। অজৈব ফসফরাস প্রয়োগ করলে বর্গ মিটার জমির জন্যে ৮০ গ্রাম ফসফরাসই যথেষ্ট।

পটাশের প্রয়োজন বিশেষ করে গোলাপ চারার দেহ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যে, তাকে বিভিন্ন ঋতুতে আত্মরক্ষার উপযোগী শক্তি সরবরাহ করবার জন্যে। যথাসময়ে সঠিক পরিমাণে পটাশ প্রয়োগ করা হলে নানা ধরণের পোকা-মাকড়ের হাত থেকে গোলাপ চারাকে রক্ষা করা সহজ হয়ে আসে। অঙ্গারে শতকরা ১২ ভাগ পটাশ থাকে। এক কে জি ৭৫০ গ্রাম পটাশ ১২ বর্গ মিটার জমির পক্ষে যথেষ্ট।

[আগামী সংখ্যায় শেষ।

—স়ুনীলকুমার নাগ

পুষ্প কা

সেকাল একাল সর্বকালেই ফুলের কদর। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় ফুল আমাদের নিত্যসঙ্গী। বিবাহে পুষ্পমাল্য, রূপ-চর্চায় পুষ্পাভরণ, ভালবাসায় পুষ্প বিনিময়, পূজার্চনায় পুষ্পাঞ্জলি, গৃহসজ্জায় পুষ্পস্তবক, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নে পুষ্প প্রদান, মৃত্যুতে পুষ্পার্পণ অপরিহার্য। এজন্য বাগানে বাগানে ফুল ফোটানোর সাধনা চলেছে। বাড়ীর ছাদেও ফুল-চর্চার আসর জমেছে। বাগানে বাগানে দেশী-বিদেশী নানা জাতের নানা আকারের ফুল মূর্তিমান দধীচির মত আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সকল ঋতুতে ভোরের আগেই মেদিনীপুরে সযত্নে লালিত পুষ্পবাটিকাগুলিতে চয়নপর্ব চলে। শীতকালে মধুপুরের বাগানে চলে বহুবিচিত্র চন্দ্রমল্লিকার চয়ন। উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা মাথায় উঠে, সাইকেলের ক্যারিয়ারে, রেলগাড়ি আর মোটর-বাসে চেপে কলকাতা-হাওড়ার জগন্নাথ ঘাটে ফুলের হাটে এসে রঙ-বেরঙের ফুলের দল স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে পড়ে থাকে। মধু অন্বেষী মৌমাছির মত ভোরেই ছুটে এসেছেন সারা কলকাতা ও কলকাতা-হাওড়ার কাছাকাছি শহরের যত ফুলের পাইকার। ট্যাঁকে টাকা, চোখে লাভ-লোকসানের নিখুঁত হিসাবের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতেই চলে ফুলের বিচার---তার সৌন্দর্যের গন্ধের মহিমার, আর দামের। বিচার-পর্বের শেষে চলে গণনা আর ওজন। শেষে মূল্য প্রদান। ঋতু ও ফুলের মান অনুসারে দামের বাহারই বা কত! বেল ফুল কে জি প্রতি ৭৫ পয়সা হতে দশ টাকা। গাঁদার কে জি চার পয়সা হতে দু'টাকা। জুঁই-এর কে জি তিন টাকা হতে আঠার টাকা। রজনী গন্ধার কে জি পাঁচ টাকা হতে বার টাকা। গোলাপ প্রতি একশটির দাম ৬ টাকা হতে দশ টাকা। চন্দ্রমল্লিকার ডজন এক টাকা হতে আট টাকা। এছাড়া আছে পদ্ম, টগর, অপরাজিতা ও নানা ধরনের মরসুমী ফুলের কেনাকাটা। পাইকারী হাটে কেনাকাটার পর্ব তাড়াতাড়ি চুকে যায়। যাঁরা পাইকারী হাটে ফুল বিক্রি করতে এসেছিলেন, তাঁরা রেলগাড়িতে চড়ে মুড়ি-ঘুগনী খেতে খেতে ঘরে ফেরেন। আর যাঁরা ফুল কিনতে গিয়েছিলেন, তাঁরা আশা-আনন্দে, লাভ-লোকসানের আশায় দুলতে দুলতে রেলগাড়ি ও মোটর বাসের ঝাঁকুনি খেতে খেতে নিজের নিজের দোকানে এসে পড়েন। পুরনো শহর চুঁচুড়ায় পুষ্প-ব্যবসায়ী শ্রীগৌরচন্দ্র দাসও এমনি করে দিনের পর দিন সাড়ে দশটা-এগারটার মধ্যে পাইকারী হাটের ফুল নিজের দোকানে এনে ফেলেন। আরম্ভ হয় পুষ্প-শিল্পীর কাজ। অর্ডার ও উৎসব অনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুতহাতে চলতে থাকে ফুলের কাজ। মালা গাঁথা আরম্ভ হয়। রজনীগন্ধা, বেল, টগর, গাঁদার ছোট, বড়, মাঝারি, সাধারণ ও গোড়ে মালা। দু-চারটে গোলাপের স্পর্শে মালা সুন্দরতর হয়ে ওঠে। তৈরি হয় বিভিন্ন আকারের তোড়া, ঝাড়, 'গার্ডনার'। বিয়ের সাজ—'চূড়', 'শিয়ারা'। তৈরি হয় কবরে দেওয়ার চাদর। ততক্ষণে কেনাকাটা সুরু হয়ে গেছে। নিত্যপূজার প্যাকেট পাঁচ পয়সা হতে পনের পয়সা। গোলাপ একটি দশ পয়সা হতে পনের-কুড়ি পয়সা। মালা একটি ছ' পয়সা হতে তিন

টাকা। তোড়া একটি পঁচিশ পয়সা হতে দেড় টাকা। ঝাড় একটি দেড় টাকা। 'গার্ডনার' একটি পঁচাত্তর পয়সা হতে তিন টাকা। বিয়ের গহনা—একটি 'চূড়', দুটি উপর হাতের ও দুটি নিচের হাতের চুড়ি একসঙ্গ দু'টাকা হতে চার টাকা। 'শিয়ারা' একটি দু টাকা। কবরের চাদর আড়াই/তিন হাত সাড়ে তিন টাকা হতে চার টাকা। এমনি রকমারী দরে সাজসজ্জার কেনাকাটা চলে।

দোকানের পাশে বেঞ্চিতে বসে দাসমশায়ের সঙ্গে লাভ-লোকসানের কথা হচ্ছিল। টাকায় কমপক্ষে পঁচিশ পয়সা লাভ রেখে বিক্রি করতে হয়, তা না হলে চলে না। ছোট শহরে বিক্রি কোথায়। বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া গৃহ-সজ্জার জন্য, টেবিল বা ফুলদানিতে দেওয়ার জন্য ফুল এখানে প্রায় বিক্রিই হয় না। দৈনন্দিন প্রসাধনে বা রূপচর্চায় ফুলের ব্যবহার এখানে নেই বললেই চলে। নিত্যপূজার জন্যই রোজ যা কিছু বিক্রি হয়, সেও ত' মাত্র পাঁচ-দশ পয়সার গুটিকয়েক প্যাকেট। বিবাহ বা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনেই দু-চার পয়সা হয়, অন্যান্য দিন কিছু থাকে না, শুধু জেগে বসে থাকা। নিত্যপূজার খদ্দেরগুলিকে হাতে মালা ছাড়া কিছু হয় না। যেদিন কাজের চাপ থাকে সেদিন ছেলে আর ভাগনেকে দোকানে ফুলের কাজে লাগিয়ে দিই। তাছাড়া আছেন একজন পূজারী ব্রাহ্মণ। ব্যক্তিগত বা যজমান বাড়ির নিত্যপূজার জন্য তাঁর অতি সামান্য ফুলের দরকার। সেগুলি তাঁকে বিনামূল্যে দিই। পরিবর্তে তিনি দোকানের কাজ করে দেন। উৎসব অনুষ্ঠানের দিন তাঁর মারফৎ কিছু অর্ডারও পাওয়া যায়। উৎসব অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া অন্যান্য দিন ফুলের চাহিদা বেশি না থাকায় জগন্নাথঘাটে ফুল কেনার জন্য রোজই যাওয়ার দরকার হয় না। এমন দিনে নিজের বাগানের ফুল আর আগের দিনের ফুল দিয়েই কাজ চলে যায়। নিজের বাগান—সে আর কতটুকু। হুগলী জেলার সুগন্ধা ইউনিয়নে সরস্বতী নদীর পাড়ে পিতামহ ঠাকুরদাস মালাকার বায় বিঘা জমিতে ফুলের বাগান করেছিলেন। এখন মাত্র তিন বিঘার মত জমিতে গাঁদা, টগর, জুঁই, নবমল্লিকার চাষ আছে। বাকি জমিতে কলাবাগান হয়েছে। এ ছাড়া অন্য জমিতে আছে অন্যান্য চাষবাস। শুধু ফুলের ব্যবসায়ে চলে না। চাষবাস, ব্যবসা—সব মিলিয়ে মোটামুটি চলে যাচ্ছে। ব্যবসার সবচেয়ে অসুবিধার কথা বলতে গিয়ে বললেন, ফুল দেড় দিন দু'দিনের বেশি টেকে না। সময়ে বিক্রি না হলে সবটাই লোকসানে যায়। ফুল রাখার জন্য কোল্ড স্টোরেজ ত' নেই যে, ফুল রেখে দেব। জল দিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করি, কিন্তু থাকে কই। রঙ-বেরঙের ফুলে সাজানো দোকানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, দেখুন না, কাল বিয়ের যোগ গিয়েছে। কত আশা করে নানা ধরনের ফুল কিনে আনলাম। বিক্রি ভালই হয়েছিল। কিন্তু সব হোল না। যে ফুল পড়ে রয়েছে সে আর কতক্ষণ টিকবে? সকালের দিকে ঈশ্বরের কৃপায় একটা মড়া পাওয়া গিয়েছিল। টাকা সাতেকের মত বিক্রি করেছি। কিছুটা উদ্ধার করা গেছে। উদ্বৃত্ত ফুল বিক্রির জন্য মড়ার আশায় থাকলে ত' চলে না। সব সময় মড়াও পাওয়া যায় না। উদ্বৃত্ত ফুল সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকলে সত্যিই বড় উপকার হোত।

তিন পুরুষ ধরে সুগন্ধার দাসেরা ফুলে ফুলে কাঞ্চনের স্বপ্ন রচনা করেছেন। স্বপ্নে দেখা কাঞ্চন কখনও হাতের মুঠোয় এসেছে। আবার কখনও আসে নি। ফুলের সৌন্দর্য ও গন্ধের প্রাণ-মাতানো সোহাগ দাসমশায়ের দেহ-মনকে ভরে রেখেছে। কত অসুবিধা। তবু দাস পরিবারের পক্ষে কাঞ্চনময় সৌরভের মোহিনী যাদুর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

—জয়দেব বৈতালিক

রমণী কথা

অবনী নাগ

মানুষের মুখ শুনি মনের নির্মোক
কই প্রেমের ঝঙ্কার স্বাদ মুখে তো পড়ে না।
যখন সে নারীকে দেখি লজ্জা হয় কেন।
পাছে হারাই তাকে সদাই ব্যাকুল
মৃত্যুর কালোপর্দা যদি ঢেকে দেয়
সে মনের আয়ত চোখ সুন্দর প্রতিমা।

তার চেয়ে দুঃখ দিয়ে চাপা থাক
সে রমণী কথা : যে শুধু চেয়ে ছিল
আমার জীবন, মন আর সমস্ত যৌবন।

দয়ানন্দ সরস্বতী

জর্জ এ্যালেন

প্রত পবিত্র ভারতভূমির শাশ্বত সনাতন সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায়, সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জন-মানসে আধ্যাত্মিক-চেতনার বীজ অঙ্কু-রিত হয়েছে। সুদীর্ঘ সময়ের পরিসরে, সময়ের ক্রমাগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই চেতনা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে বীজ থেকে মহীরুহে। ক্ষুদ্র বীজ রূপ-পরিগ্রহ করেছে পত্রপল্লব সমন্বিত, ছায়াসমৃদ্ধ বিরাট বিশাল মহীরুহে। এই দীর্ঘ-কালের সেতু বেয়ে এসেছে কত ঝঞ্ঝা, কত প্লাবন, কত ধ্বংস, কত বিপর্যয়, কত আঘাত, কত সংঘাত, কত বেদনা, কত কান্না, আবার কত আনন্দ, কত সৃষ্টি, কত জয়, কত সাফল্য---এইভাবে কত সাম্রাজ্যের ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। কত পতন-উত্থানের লীলা বয়ে গেছে, তথাপি ভারতের নরনারীর সত্তা থেকে সেই চেতনা তিলমাত্র অন্তর্হিত হয় নি।

এ-দেশের ধর্মধারণা চিরকালই অবশ্য এক নির্দিষ্ট রূপের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নি। যুগে যুগে, কালে কালে ধর্মকে কেন্দ্র করে নব নব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ভাষ্য, অধ্যাত্ম-ইতিহাসকে বর্ণসমৃদ্ধ করে তুলেছে। সময় যেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, ধর্ম-চেতনাও একটি নির্দিষ্ট রূপে, একটি গণ্ডীবদ্ধ ধারণায় আবদ্ধ থাকে নি। মানুষের ধর্মদৃষ্টি ক্রমশই স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হয়ে এসেছে। কিন্তু মুখে এক থেকে গেছে। দৃষ্টিকোণ বদলা-লেও দৃষ্টির মূল লক্ষ্য বদলায় নি।

যুগে যুগে দেখা দিয়েছেন ধর্ম-নায়কের দল। ধর্মনেতাদের আবির্ভাব হয়েছে কালে কালে, যা গ্রহণীয়, যা বর্জনীয়, সে সম্বন্ধে মানব-সম্প্রদায়কে চিরকাল অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায়, তাঁরা নির্দেশ দিয়ে এসেছেন। যতকিছু জটিলতা, অস্পষ্টতা, সংশয় তাদের রাহুগ্রাস থেকে উদ্ধার করে মানুষকে তাঁরাই পৌঁছে দিয়েছেন সত্যের, শাশ্বতের নিত্যের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। নিশ্ছিদ্র তামসী অন্ধকার যখনই পুঞ্জীভূত হয়ে আক্রমণ করেছে মানবসমাজকে, বিপন্ন মানব তখনই আলোর স্পর্শ পেয়েছে এঁদেরই কল্যাণে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং ধর্মের নামে চরম ব্যভিচার যখনই বিস্তৃতিলাভ করে সমাজের আলেখ্য ভীতিপ্রদ করে তুলেছে, তখনই এই যুগত্রাতাদের মাভৈঃ সেই বাণী অসহায় শিকারদের দিয়েছে মুক্তির মন্ত্র।

এই যুগনায়কেরা এসেছেন সময়ের অবিচ্ছিন্ন ধারায়। এসেছেন প্রতি শতাব্দীতে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে। পথভ্রান্ত মানবকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে, অস্পষ্টতা, জটিলতা, বিভ্রান্তির মূলোচ্ছেদ ঘটাতে।

উনবিংশ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে এক স্বর্ণপ্রসূ শতাব্দী। জাতীয় জীবনের নবজাগরণে এই শতাব্দীর ভূমিকা যেমনই গৌরবময়, তেমনই অবিস্মরণীয়। নবজাগৃতির প্রতিটি দিক, প্রতিটি শাখা, প্রতিটি ধারার বহুযুগের অবরুদ্ধ বাতা-য়নের অর্গলমোচন এই শতাব্দীরই উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজোন্নয়ন, রাষ্ট্রসাধনার মতই ধর্মচর্চার ক্ষেত্রেও এই শতাব্দীর দান অবিস্মরণীয়।

গত শতকে যে ধর্মব্যাখ্যাতাদের আবির্ভাব মানুষের ধর্মজিজ্ঞাসা এবং ধর্ম সম্বন্ধে সংশয়ের বহু অবসান ঘটিয়েছে, সেই তালিকায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী একটি চিরপ্রণম্য কালজয়ী নাম। এ-কালের ধর্মীয় আন্দোলনের পুরোধাদের দরবারে একটি বিশিষ্ট আসন তাঁর অধিকারে।

এক কালের পতিতপাবন ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য আবি-র্ভাবের ঠিক ন'বছর আগে দয়ানন্দের জন্ম, ভারতের নবযাত্রাপথে প্রথম পথিক, সর্বোপরি ধর্মীয় জগতের এক মহান দিকপাল পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি রামমোহন তখনও নরদেহে বর্তমান।

কাথিয়াবাড়ে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে দয়ানন্দের জন্ম। মোরভি অঞ্চলে তাঁর বাড়ি। এক সম্ভ্রান্ত, নিষ্ঠাবান, মার্জিত পরিবারের সন্তান তিনি। ধর্মানুশীলনের দিক দিয়ে এই পরিবার শৈবপন্থী। বাংলা দেশ শক্তিসাধনা এবং বিষ্ণু অর্চ-নার লীলাভূমি---শাক্ত এবং বৈষ্ণবের লীলাভূমি। দক্ষিণভারতে (এবং পশ্চিমভারতেও) শৈব ও গাণপত্য আরাধনাই বিশেষভাবে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। শিশু দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় বড় হতে থাকে। তার কলহাস্য চপল-তায় সারা গৃহ মুখরিত। বিদ্যার্জনের বয়েস এসে গেল। ভাষাজননী সংস্কৃত এবং দেশের প্রাচীনতম মহাগ্রন্থ বেদ পড়া আরম্ভ হ'ল।

সংস্কৃত কাব্য, দর্শন, তথা সামগ্রিক ভাষায় রীতিমত ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে থাকেন দয়ানন্দ। মেধাবী ছাড়াও তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য বাল্যকাল থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ছেলেবেলা থেকে কোন কিছু চোখ বুজে হজম করতে তিনি যেন রাজী নন, যা তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়, তাই নীরবে নতমস্তকে মেনে নিতে তাঁর মন কখনই সমর্থন জানায় না। বা কোন বিষয়বস্তু ওপর ওপর দেখে সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুপ্রেরণা মন থেকে কখনও পান নি। যে কোন ব্যাপারে নিখুঁৎ পর্যালোচনা, ব্যাপক পর্যবেক্ষণ, শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে তবে যেন তাঁর স্বস্তির শ্বাস পড়ে। একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে তখনই তিনি উপনীত হন।

একদিন দেখতে দেখতে এসে গেল সেই লগ্ন। ঘর ছাড়ার মুহূর্ত। সমগ্র বিশ্ব-সংসারকে ঘর ভাবার উপলব্ধির

জাগরণ হ'ল। ঈশ্বরের দুনিয়ায় মুসাফিরের ঘর সর্বত্রই। সর্বত্রই তাঁর ঘর আছে। জগন্মাতা তাঁর কোল পেতে বসে আছেন নিখিল মানবেরই জন্যে। নিখিলমানব তাঁরই সন্তান। দয়ানন্দ সেই প্রেরণায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন; যে-প্রেরণা তাঁকে সেই মন্ত্র দিল—যার সার মর্ম—গৃহকোণে তোমার কর্মক্ষেত্র নয়, ঘরের বাইরে অসীম অনন্ত ভুবন-প্রাঙ্গণে তোমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমার ডাক এসে পৌঁছেছে, তৈরি হও, সাড়া দাও সেই ডাকে। পিছন ফিরে তাকিও না। পিছুটান তোমার জন্যে নয়। অসমাপ্ত কাজের জন্যে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কোন কাজই তোমার নয়, সবই তাঁর কাজ, তিনি তাঁর যে কাজ যখন তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন, ক্রীড়নকের মত তখনই তুমি সেই কাজ করে যাচ্ছ। এবার তোমার যাত্রা সুরু হোক। এ যাত্রার লক্ষ্য হোক ধ্রুব, আনন্দ, সত্য। এ যাত্রা হোক রূপ থেকে রূপাতীতে। অরূপ থেকে অপরূপে। সীমা থেকে অসীমে, জীব থেকে শিবে, মানব থেকে মাধবে, রণ থেকে চরণে, প্রগতি থেকে প্রণতিতে। ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে।

ঘর ছাড়লেন দয়ানন্দ। এ ডাক প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য তাঁর নেই। এলেন সেই কাশীতে—সেই মহাতীর্থ—সর্ব তীর্থসার, ভারতের শাশ্বত সনাতন ভাব ও ভাবনার, চিন্তা ও চেতনার, ধ্যান ও ধারণার মহাসঙ্গমকেন্দ্রে। জ্ঞানের, সাধনার, অনুভূতির সার্থক বিকাশের মহাকেন্দ্র সেই কাশীতে—যে কাশী রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতের শুধু একটি প্রদেশই নয়, ভারতের আত্মা। কাশীতে রইলেন দয়ানন্দ। পর্যটন করলেন নর্মদার তীরবর্তী স্থান সমূহে। নিলেন সন্ন্যাস। নামগ্রহণ করলেন দয়ানন্দ সরস্বতী—(এ নাম তাঁর সংসারাশ্রমের নাম নয়)।

প্রকৃত অন্বেষণ এবার সুরু হোল। গৃহীর ভূমিকা তখন শেষ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসের চিহ্ন তখন সর্বাঙ্গে। ব্রাহ্মণ-কুমার সেদিন তরুণ তাপস। প্রভাতের অরুণরশ্মীর অকৃপণ আলো তরুণ তাপসের ললাটে সেদিন রেখে গেল আপন উজ্জ্বল স্বাক্ষর। দয়ানন্দ বুঝলেন যোগসাধনা সকলের শ্রেষ্ঠ সাধনা। স্মরণে-মননে-চিন্তনে শুধু যোগ অর্থাৎ সেই পরমের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। সেই পুরুষোত্তমে বিলীন হয়ে যাওয়া, সেই চিরসুন্দরের পদতলে নিঃশর্ত ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

নানাস্থানে যোগের অনুশীলন সুরু হ'ল। প্রাণপণ ঢেলে দিলেন যৌগিক সাধনায়। যোগের অনগূঢ়তত্ত্ব, দর্শন পুংখানুপুংখরূপে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলেন। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসে রইলেন না। হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারীকা পর্যন্ত যে ভারতভূমির সসাগরা বিস্তৃতি—সেই ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে পদার্পণ করলেন দয়ানন্দ। আবু, হরিদ্বার, শ্রীনগর, উত্তর হিমালয় প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে ব্যাপক-ভাবে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকেন প্রকৃত সাধকের—যিনি লোকলোচনের অন্তরালে, কোলাহল—কলরবের ঢক্কা-নিনাদ থেকে বহু দূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সেই অসীমের, সেই অব্যক্তের, সেই অনুপমের সাধনায় নিজেকে বিভোর রেখেছেন।

১৮৮০ সাল। জীবনের অর্দ্ধশতক তখন অতিক্রান্ত। এলেন মীরাটে। জীবনের নতুন ভূমিকা সুরু হয়ে গেল। এবার ধর্মপ্রচারক, ধর্মব্যাখ্যাতার ভূমিকা। এলেন সংস্কারকের মূর্তি নিয়ে। ধর্মকে কেন্দ্র করে কত আবিলতা, জঞ্জাল, আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। সেগুলি সরিয়ে ধর্মকে তার নিখুঁৎ আলেখ্য সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ মহিমায় তুলে ধরার ভূমিকায় দয়ানন্দ রেখে গেলেন এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। প্রতিষ্ঠা করলেন আর্যসমাজ। কিন্তু নশ্বর জীবনের খেলা তখন শেষ হয়ে আসছে। খুব কাছা-কাছি এসে পড়ছে অনন্তলোকের ডাক। ধরণীর খেলাঘর ছাড়ার সেই মুহূর্তটি আর দুয়ার থেকে অদূরে রইল না। ১৮৮৩ সালের ৩০এ অক্টোবর আজমীঢ়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ভারতীয় অধ্যাত্মজগতের দিকপাল শতাব্দীর এক উজ্জ্বল রশ্মি—দয়ানন্দ সরস্বতী।

করুণা

বীণাপাণি সেনগুপ্ত

(নানকের দোঁহার ভাবাবলম্বনে রচিত)

পৃথিবীর হে করুণাধার,
অগণিত গণি গুণ তোমার;
বিতরিছ তুমি কৃপা পারাবার
বহু বিচিত্র রূপ তোমার॥

অশেষ জ্ঞান, অসীম ধ্যান,
জপ তপ আর প্রভু গুণগান;
লালন করিছ ধর্ম পরাণ
তব করুণা অনন্ত আধার॥

বিচিত্র স্বাদ পলকে পলকে
সীমাহীন বাণী ধ্বনিতে ঝলকে;
শুনি গুণগাথা মহিমালোকে
ঘুচে দুখ সন্তাপ অনিবার॥

নানক সোঁপিছে প্রভুর চরণ
বহু ব্রত পূজা নামের সাধন;
গহন ভবন যাত্রাকরণ
ভরিল সফল পুণ্যে অপার॥

পশু-পক্ষী-পালন

কাক মারবেন না

ঐতিহাসিক কাককে কখনও মারবেন না। কেন না কাক অত্যন্ত উপকারী পাখি। যতেক ময়লা ও নোংরা পদার্থ কাককুল খেয়ে ফেলে আমাদের মহান উপকার করছে। দাঁড়কাক, কাক, ম্যাগপাই সব এক জাতের পাখি। কিন্তু এদের মধ্যে দাঁড়কাকই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং অনুকরণপটু। বাচ্চা অবস্থায় পোষ মানাতে পারলে এর গুণ পরিস্ফুট হয় এবং এমন কি কিছু শব্দও নকল করতে শেখানো যায়।

স্বজাতীয় পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী দাঁড়কাক। দাঁড়কাক অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, তীব্র ঠাণ্ডাও সে সহ্য করতে পারে। অগোছালো পালক, বিশেষত ঘাড়ের কাছে, একটা লম্বা ত্রিভুজাকৃতি মাথা, ভারিক্কী তীক্ষ্ণ ঠোঁটে, তীক্ষ্ণমুখ পাখা, নাতিদীর্ঘ লেজ আর পাখা ফুট চারেক বিস্তৃত—এই দৈহিক বর্ণনা। লম্বায় ১২ থেকে ১৬ ইঞ্চি। এর দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ।

দাঁড়কাকের পিঠের রং ঝক্‌ঝকে কালো এবং তা নীল, নীলাভ লাল বা ধূম্রবর্ণ এবং সবুজ রং দিয়ে সাজা; শুরু হয়েছে গা ধূসর রং দিয়ে, পেটের দিক ম্যাড়মেড়ে সবুজ। কখনও কখনও কটা রঙের আভাস মেলে। স্ত্রী বা শিশু দাঁড়কাকের রঙে এত গাঢ় বৈচিত্র্য নেই।

এদের ডাকও বৈচিত্র্যপূর্ণ: ভরাট কণ্ঠস্বর, বিলাপপূর্ণ ক্যাঁ-ক্যাঁ, সুরহীন খড়খড়ে ডাক, কর্কশ, ভারিক্কী, এবং কখনও ঘণ্টা ধ্বনিবৎ চীৎকার।

প্রায় সর্বভুক্ দাঁড়কাক—মাংস, মরামাছ, সাপ, পাখির ডিম, পাখির ছানা, ক্ষুদে স্তন্যপায়ী, বাদাম, ব্যাং, পোকামাকড়, গঙ্গাফড়িং, ঝিঁ-ঝিঁ পোকা কাঠবেড়াল, শাকপাতা, ফলমূল—কোন কিছুতেই তার অরুচি নেই।

বৈচিত্র্যময় দাঁড়কাকের বাসা; কাঠকুটো, গাছের ডাল, তার ইত্যাদি ঠেসে তৈরি; মাঝখানটা গোলালো, মাটিলেপা। চারপাশে ঘাস, শেওলা, চুল, গাছের ছাল, পশম খরগোসের লোম - লভ্য পাঁচ রকম টুকিটাকির বেড়। সুচলো জায়গায়, বন্ধুর পর্বতে, অব্যবহৃত পাথরের খনিতে, ফাটাল অথবা গাছের উঁচু ডালে এরা বাসা বাঁধে। ডিম পাড়ে প্রতিবার তিনটে থেকে আটটা। রং হাল্‌কা সবুজে বা ধূসর বা হাল্‌কা ল্যাভেন্ডারের থেকেও কালো, মাঝে মাঝে কটা, গাঢ় সবুজ বা ধূসর ছোপ। কখনও কখনও লাল রঙের ডিমও চোখে পড়ে।

এদের দেখা যায় মরুভূমির বন্য, শান্ত, অনুর্বর অঞ্চলে, পর্বতসংকুল এবং উচ্চাবচ উপকূলে, খাড়া পাহাড় আর উচ্চ স্থানে এবং তুন্দ্রাভূমির উত্তরাঞ্চলে আর পাইন জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ বনভূমিতে। খোলামেলা জায়গা পছন্দ করলেও সন্ধ্যাকালে বনে ফিরে যায়। দাঁড়কাক একটি সংগিনী নিয়ে জীবন কাটায়; একই বাসায় বছরের পর বছর বাস করে। খাঁচায় আটকানো দাঁড়কাক সর্বাধিক ৬৯ বছর বেঁচেছে। কিন্তু সাধারণত এদের আয়ুসীমা ৩৫ বছর।

এরা কোলাহলমুখর, আক্রমণপ্রবণ এবং বদমায়েসীতে পটু; এদের অনুকরণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য, অনেক শব্দ এবং কথা ওগ্‌রাতে পারে, অন্য পাখিদের ব্যঙ্গ করতেও এরা দড়। বুদ্ধিবলে এরা নিজেদের বাঁচায়। কখনও এদের রক্ষা করার জন্য কোনও আইন হয়েছে কি না সন্দেহ।

একসময় দাঁড়কাক প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর অগ্রদূত, মড়ক এবং ব্যাধির সন্দেশবহরূপে গণ্য হত। কিন্তু এদের চালাকি, আশপাশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, চেহারা এবং নিঃশঙ্ক অভ্যাস মানুষের প্রশংসা আদায় করেছে। একাধিক জাতির উপকথায় তার প্রমাণ মেলে। একে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বহু কুসংস্কার এবং উপকথা।

সাধারণত 'একক' দাঁড়কাক পো-র কবিতায় অমর হয়ে আছে। বাইবেল-এ প্রথমে উক্ত পক্ষীকুলের মধ্যে দাঁড়কাক অন্যতম, একেই সর্ব-

প্রথম নোয়া-র নৌকো থেকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল — মহাপ্রলয়ের পর।

দাঁড়কাক উড়তে পটু—অনেক ওপরে ওঠে বৃত্তাকারে; খাড়াই পাহাড়ের আশপাশে এদের ওড়ার কৌশল দেখার মত। সংগিনী নির্বাচনের সময় এদের কায়দা লক্ষণীয় — একটা ছোট গাছের ডাল বা নুড়ি ফেলে তার পেছনে ধাওয়া করে। শিকারী পাখির হাত থেকে আত্মরক্ষার সময়ও এরা এই কৌশলটি কাজে লাগায়। প্রায় সকলেরই দৃষ্টিকটু, কর্কশকণ্ঠ দাঁড়কাক কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ঝাড়ুদার। প্রকৃতির এও এক বিচিত্র সৃষ্টি।

পক্ষী-তত্ত্ব

রমেশ মজুমদার

প্রায় প্রত্যহই কত নিত্য-নতুন জিনিস আমাদের চোখে পড়ছে, কিন্তু তা ভাল করে দেখি না। আমাদের দৈনন্দিন দেখা অবহেলিত সাধারণ জিনিসগুলির মধ্যেই হয়তো কত রকম আশ্চর্য তথ্য নিহিত রয়েছে কিন্তু তা আমাদের অনুসন্ধিৎসা জাগায় না। ঠিক এখানেই সাধারণ মানুষের সাথে বৈজ্ঞানিকদের প্রভেদ। বৈজ্ঞানিকের মত প্রবল অনুসন্ধিৎসা সাধারণ মানুষের নেই। সাধারণের উদাসীন চোখ যে জিনিসটা উপেক্ষা করে, বৈজ্ঞানিকগণ তা থেকেই কত নতুন নতুন চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করে থাকেন। নিউটনের আগে ও পরে কত মানুষ গাছ থেকে আতা পড়তে দেখেছে এবং নিউটনের সাথে তার আদরের কুকুর ডায়মণ্ডও সেই আতার মাটিতে পড়া লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু সেই নিতান্ত সাধারণ ঘটনা অপর কারো মনে কোন কঠিন সমস্যার উদ্রেক করে নি।

প্রায় রোজই আমরা নানা বর্ণের নানা আকারের পাখী দেখতে পাই। কিন্তু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন কেমন, জীবনযাপন-প্রণালী কেমন, কেমন করে তাদের উৎপত্তি হলো, তা জানবার জন্য ক'জনের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায়? পাখী কি? পাখী উষ্ণরক্ত-বিশিষ্ট, অণ্ডজ। পালক আচ্ছাদিত দেহ, দ্বিপদ প্রাণী বিশেষ। এর দুটি হাত পাখার আকার ধারণ করেছে। অপর প্রাণীর দাঁতের পরিবর্তে পাখীর কঠিন পদার্থে গড়া এক জোড়া ঠোঁট আছে এইটুকু বললেই বোধ হয় সাধারণ লোকের কৌতূহল চরিতার্থ হবে। কিন্তু আসল জিজ্ঞাসু বলবেন, এর দ্বারা পাখীর একটা সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হলো বটে, কিন্তু সব জানা হলো না।

আমি জানতে চাই, কোথা থেকে এই ঘোর জাতির উদ্ভব হলো এবং এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনই বা কেমন এবং দেহের পালক-বিন্যাসই বা কেমন করে হয়? গায়ক পাখীর গানের কারণ কি? এর সুস্বরের উৎপত্তিস্থান কোথায়? এই জাতির গার্হস্থ্য জীবনের সব কথা জানতে চাই; তা ছাড়া এদের বিয়ের নিয়ম, নীড় নির্মাণ, সন্তান পালন এবং দাম্পত্য-প্রণয় সম্পর্কে সব কথা জানতে না পারলে আমার পক্ষী জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য শেষ হবে না।

বংশ পরিচিতি

সম্ভবত অধুনালুপ্ত টিক্‌টিকি জাতীয় এক প্রকার সরীসৃপ পক্ষী-জাতির আদি পুরুষ। শূন্যবিহারী সুন্দর পাখীগুলি যে ভূতলচারী কদাকার সরীসৃপের বংশধর একথা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য এই মতের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিকগণ যেসব প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন, তা উপেক্ষা করা সহজ নয়। পাখী এবং সরীসৃপের মধ্যে এমন কতকগুলি সৌসাদৃশ্য আছে যা অন্য প্রাণীদের ভেতর নেই। পক্ষী এবং সরীসৃপ উভয়েই অণ্ডজ। পক্ষীজাতি পেছনের পায়ের ওপর শরীরের ভার স্থাপন করে এবং অধুনালুপ্ত 'ডায়োনোসর' নামক বিশালকায় সরীসৃপও পেছনের পায়ের উপর দেহভার ন্যস্ত করতো। পাখীর সামনের পা দু'খানিই পরিবর্তিত হয়ে পাখার আকার ধারণ করেছে এবং অধুনালুপ্ত এক জাতির টিকটিকিরও ওড়বার জন্য এক প্রকার পাখা ছিল। এই রকম পক্ষযুক্ত সরীসৃপের ফসিল পাওয়া গেছে। সরীসৃপের বছরে এখন একবার করে খোলস পরিবর্তন করে। পাখীরাও বছরে একবার পালক পরিবর্তন করে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পাখীর ঠোঁটে এই সরীসৃপের দাঁতের অভাব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, লক্ষ লক্ষ বছরের পরিবর্তনের প্রভাবে পাখীরা তাদের এই নতুন দেহ লাভ করেছে। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বীপে 'টুটেরা লিজার্ড' নামে এক রকম দন্তহীন সরীসৃপ আছে। 'আর্কিয়োপটারিক্স' নামে অধুনালুপ্ত পাখীর প্রস্তরদেহ ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত ইকস্টাড নামক স্থানে লিথোগ্রাফিক প্রস্তরে পাওয়া গেছে। এই পাখীদের ভেতর 'আর্কিয়োপটারিক্স' সব চেয়ে প্রাচীন। সম্ভবত এর চেয়ে প্রাচীনতর পাখীর কথা এ-পর্যন্ত জানা যায় নি। এই পাখীর চঞ্চুতে দাঁতের অস্তিত্ব ও এদের পুচ্ছের সাথে সরীসৃপ পুচ্ছের আশ্চর্য সাদৃশ্য, এই দুটি জাতির জ্ঞাতিত্ব প্রমাণ করছে। এ ছাড়া সরীসৃপের মত কোন কোন পাখীর শরীরে শল্কাবরণও দেখতে পাওয়া যায়। পাখীর বংশ বিবরণ সম্বন্ধে যা বলা হলো হয়তো তাই যথেষ্ট বলা চলে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সরীসৃপ থেকে পক্ষীজাতির উদ্ভব হলো কেমন করে? উত্তর দেওয়া যায় যে, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নন। তবে ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রাকৃতিক

নির্বাচনের ব্যাখ্যাই সর্বাধিক আদৃত হয়েছে। এঁদের মতে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন ঘটে। অর্থাৎ যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পারে তাদেরই জীবন ও বংশ রক্ষা পায়। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি দুটি বালককে হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে রাখা যায়, তবে এদের ভেতর যে বালকটির দেহ সেখানকার শীত সহ্য করবার বেশি উপযোগী হবে, কেবল-মাত্র সেই জীবিত থাকতে পারবে। তার বংশধরগণ কয়েক পুরুষ পরেই সমতলবাসিগণ অপেক্ষা বেশি শীত সহ্য করতে পারবে। অনেকেই হয়তো নেকড়ে কর্তৃক পালিত মানব সন্তানের দেহ ও মনের পাশবিক জীবনোপযোগী বিকারের কথা জানেন। দেহের গঠনের ওপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। পরিবেশ প্রভাবেই এক সময় ভূচর সরীসৃপের সামনের চরণ দু'খানি ডানায় পরিবর্তিত হয়েছিল। আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবেই কতকগুলো পাখীর পক্ষ ক্রমশ উঠে গিয়ে সন্তরণকার্যের উপযোগী অঙ্গবিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। স্তন্যপায়ী তিমি এবং শুশুকের চরণ যেমন তাদের জলে বসবাসের প্রভাবে অঙ্গুলীহীন মাংসদণ্ডে পরিণত হয়েছে, তেমনি মৎস্যজীবী পেঙ্গুইনের পক্ষ এখন তার জলে চলার সহায়তা করছে। উটপাখী এবং তার জ্ঞাতি এমু ওয়িয়া প্রভৃতিরও পক্ষের ক্রমশ এত অবনতি হয়েছে যে, এরা এখন আর উড়তে পারে না। হাঁস জাতীয় পাখীগুলি গগনপথে হাজার হাজার মাইল বিনা বিশ্রামে ভ্রমণ করে থাকে। কিন্তু আমাদের গৃহপালিত হাঁসগুলির উড়বার ক্ষমতা একেবারে নেই একথা বলা না গেলেও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে এটা সবাই জানেন।

বিশেষ ক্ষমতা কি?

একটি বিষয়ের উত্থাপন করতে হচ্ছে যাকে ইংরাজীতে বলে স্পেশালাইজেশান। কতকগুলি জীব কতকগুলি বিশেষ অবস্থার উপযোগী অঙ্গ লাভ করেছে কিম্বা বিবর্তনের প্রভাবে গঠন করেছে, আমরা এদের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বলবো। মালয় দ্বীপের ক্ষুদ্রকায় হামিং বার্ডের ঠোঁট শরীরের অনুপাতে দীর্ঘ এবং ফুল থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য সেই দীর্ঘ ঠোঁট দুটির অগ্রভাব একটু বাঁকানো। এই হামিং বার্ডেরই শিশুকালের ঠোঁট সুইফট-এর ঠোঁটের মত ত্রিকোণ। অন্যান্য নানা লক্ষণ থেকেও হামিং বার্ড যে সুইফটেরই জ্ঞাতি তা জানতে পারা যায়। এবার বলা যেতে পারে যে, হামিং বার্ড ফুল থেকে খাদ্য আহরণে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পাখী। আমাদের দেশের কাঠঠোকরার ঠোঁট এমনি কাঠের ভেতর থেকে খাদ্য সংগ্রহে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন। কাঠঠোকরার জিভের গঠনও বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

এই বিশেষ ক্ষমতার পাখীগুলি যে অবস্থার মধ্যে এটা লাভ করেছে, কেবল সেই অবস্থায়ই জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে। এদের এক একটি ক্ষমতা যে পরিমাণে সুপরিণত হবে, সেই পরিমাণেই এরা পরিবর্তিত অবস্থায় জীবনধারণের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। সাধারণ একজন মজুর যেমন সকল দেশে সকল অবস্থায়ই কিছু কাজ জুটিয়ে নিতে সক্ষম, সেইরূপ সাধারণ পাখীগুলি অনেকটা পরিবর্তিত অবস্থার ভেতরও জীবনধারণের বন্দোবস্ত করে নিতে পারে। কিন্তু মসলিনের কাটতি কমে যাওয়ায় ঢাকার তন্তুবায়দের যেরূপ হীনাবস্থা হয়ে পড়েছে, তেমনি পারিপার্শ্বিক ক্ষমতার পরিবর্তনে মোয়া, গ্রেট অক, ডোডো প্রভৃতি পাখীর বংশ লোপ পেয়েছে।

অতএব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, পক্ষীজাতি সম্ভবতঃ কোন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সরীসৃপ জাতীয় জীবের বংশধর। এবং বায়ুমণ্ডলে ভ্রমণ-শক্তিতে সেই বিশেষ ক্ষমতাটি লাভ করেছে। এদের অন্যান্য জীবিত ও লুপ্তজীবের পাখার গঠনের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা পরে হবে। অবশ্য এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, স্পেশালাইজেশনের ফলে পাখীজাতি সূক্ষ্ম গ্রীবা, ঈষৎ দীর্ঘ ও গোলাকার লঘু দেহ, ও উড়বার জন্য পাখা ও গাত্রাবরণের নিমিত্ত লঘু পালক লাভ করেছে। পাখীর দেহের এটাই বিশেষত্ব।

পালক বৈচিত্র্য

পাখীর সর্বাঙ্গ পালকে আবৃত, কেবল ঠোঁট ও পা দুটি ছাড়া। পাখীর দেহের প্রায় সকল অংশই পালকে আবৃত বললে কোন ভুল হয় না বটে। কিন্তু পাখীর দেহের সকল অংশেই পালক জন্মে মনে করলে ভয়ানক ভুল হয় না বটে, কিন্তু পাখীর দেহের সকল অংশেই পালক জন্মে মনে করলে ভয়ানক ভুল হবে। কুকুর, বিড়াল, গরু বা ঘোড়ার ন্যায় পক্ষীদেহ ঘন লোমে আবৃত নয়। এদের দেহের অতি অল্প অংশেই পালক জন্মে। এই সকল অংশকে পালক-অরণ্য বলা হয়। এক-একটি পালক অরণ্যের কাছে অনেকখানি খালি চামড়া থাকে। জার্মান পণ্ডিত নিটসই সর্ব-প্রথম পালক-বিন্যাসের এই অপূর্ব প্রণালী লক্ষ্য করেন। প্রায় ৬০ বছর আগে এই সম্বন্ধে তিনি একখানি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন। তা থেকে টারিলোগ্রাফি নামক এক নতুন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে। এই বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে জানা গেছে যে, কেবল যে পাখীর দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে পালক জন্মে তা নয়, বিভিন্ন পাখীর দেহে পালক-অরণ্যের আয়তন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সাধারণত গলা থেকে মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে পুচ্ছ পর্যন্ত একটি, গলার নীচ হতে বুকে ও পেটের উভয় পাশ দিয়ে দেহের প্রান্ত পর্যন্ত একটি, উভয় স্কন্ধের উপরিভাগে দুইটি, ও উভয়

জঙ্ঘায় দুটি। এই মোট ছয়টি পালক-অরণ্য আছে। এই পালক-অরণ্যের সংস্থান এমন সুনিয়ন্ত্রিত যে, পণ্ডিত-গণ কোন পাখীর দেহের যে কোন একটি পালকারণ্যের বিবরণ হতে পাখীটি কোন্ বিভাগের কোন জাতীয় তা সঠিক অনুমান করতে পারেন।

এই প্রকার পালক-বিন্যাসের কারণ কি, তা এখনও ঠিক হয় নি। কেউ কেউ বলেন, ওড়বার সময় পক্ষ-সঞ্চালনের সুবিধার জন্যই পক্ষী দেহের নানা অংশ পালকবিহীন হয়েছে। কিন্তু এই মত নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। বোধ হয় প্রকৃতি দেবীর শক্তি ব্যবহারের মিত-ব্যয়িতা ও সুবিবেচনারই পরিচায়ক।

পালকের সংখ্যা অথবা পালকারণ্যের আয়তন সাধারণত পাখীর বিশেষ ক্ষমতার পরিমাণ বা জীবনযাপন-প্রণালী অনুসারে কমবেশী হয়ে থাকে। পাখীদের ভেতর বিশেষ ক্ষমতার উৎকর্ষ হিসাবে পেসারাস শ্রেণীর পাখীরাই শ্রেষ্ঠ।

কাক এই পেসারাস বিভাগের পাখী। কাকের দেহের পালকারণ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও খালি অংশ অত্যন্ত বিস্তৃত। অপর দিকে উটপাখীর পালকারণ্যের আয়তন এত বড় যে, এর বিভিন্ন অংশ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

এতক্ষণ আমরা যে পালকের কথা বলেছি, বিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম কণ্টুর ফেদার বা গাত্র পালক। এই গাত্র পালকের নীচে বহু পাখীর আর এক প্রকারের পালক থাকে। সেটাকে বলে ডাউন ফেদার। হাঁসের গাত্র পালক তুললেই তার নীচে ডাউন ফেদার দেখা যায়। ডাউন ফেদার গাত্র পালকের ফাঁকে ফাঁকে খুব ঘন হয়ে জন্মে। সারস ও বাজ জাতীয় কোন কোন পাখী ও তোতাপাখীর দেহে এক প্রকার ডাউন ফেদার জন্মে। তাকে পাউডার ডাউন বা চূর্ণ ডাউন বলে। কারণ এগুলি সর্বদাই সূক্ষ্ম ধুলোর মত চূর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়া আর এক প্রকারের পালক আছে। ইংরাজীতে ফিলোপ্লুম বলে। খালি চোখে এটাকে পালক বলে চেনা যায় না। হাঁস বা মোরগের মাংস প্রস্তুত করবার জন্য পালক তুলে নিলে চর্মের উপরিভাগে যে সূক্ষ্ম লোমগুলি দেখা যায়, তাই ফিলোপ্লুম বা ছদ্ম পালক। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে এদের পালকত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। কখন কখন এই-সব ছদ্ম পালক খুব লম্বা হয়ে থাকে। সন্তানোৎপাদন ঋতুতে কর্মোরেন্ট নামে এক মৎস্যাশী পাখীর দেহের দুই পাশে সুদীর্ঘ ছদ্ম পালকের দুটি বড় বড় শাদা দাগ দেখা যায়। কখন চক্ষু রোমের আকারেও এক প্রকার পালক দেখা যায়। গোটসাকার ও ফ্লাই ক্যাচারদিগের মুখের চারিদিকে চুলের মত এক প্রকার শক্ত পালক জন্মে। উটপাখী ও ধনেশের চক্ষু-রোম আছে। এছাড়া কোন কোন পাখীর চরণেও শল্ক বা চর্মের আবরণের পরিবর্তে পালকের আচ্ছাদন লক্ষ্য করা যায়।

পক্ষী পালক আমাদের নিতান্ত পরিচিত। বিলাসীর উপাধান ও বসবার গদি নির্মাণে এটা ব্যবহৃত হয়। পালক য়ুরোপীয় সুন্দরীর সুন্দর মস্তকের শোভা বর্ধন করে। ভারতের সম্রাট পুত্রের ও সম্রাটের সেনাপতিগণের শিরোভূষণ-রূপে শোভা পায়।

—দীর্ঘচঞ্চু

শূকর কাহিনী

আমেরিকা-র নিগ্রোরা, যে কোন কারণেই হোক্, শ্বেতকায়দের নানান গুপ্ত নামে সম্বোধন করে এসেছে। আজকাল তারা অনেক সময় ওদের বলে 'দ্য ম্যান'---লোকটা। এক সময় বলত 'পিংক্স'-গোলাপী। বর্ণনাটি বার্নার্ড শ'-এর মতের সঙ্গে মেলে ভাল। তিনি সর্বদা বলতেন, শ্বেতকায়রা আসলে গোলাপী বই নয়। কে জানে হয়ত এই 'লিংক' থেকেই শ্বেতকায় পুলিশ আর জনপ্রিয়তাহীন সামাজিক বা রাজনৈতিক মোড়লরা 'পিগ্' বা বরা আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন ওদেশে---আমেরিকা-য়।

সম্প্রতি আলবামা ফারম ব্যুরো ফেডারেশন ঘৃণা এবং ক্রোধের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন: উপযুক্ত অর্থে 'পিগ্' শব্দটির ব্যবহার বরাহকুলের পক্ষে অপমানজনক। বাৎসরিক কন্ভেন্শন্-এ গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এই নামে যারা ডাকতে অভ্যস্ত তারা যেন মনে রাখেন বরাহ প্রকৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সব গৃহপালিত পশুর মধ্যে এরাই বুদ্ধিতে সেরা। স্টেট্-গুলোয় প্রায় লাখ চল্লিশেক শুয়োর উৎপাদন করা হয় এবং বরাহ-মাংস জাতীয় অর্থনীতির একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কাজেই, যাঁরা এই নামে ডাকাডাকি করেন, তাঁদের বলছেন ঐ নামে ডেকে বরাকে যেন ছোট না করেন।

অহো! কী শুনিলাম! যিনি এ প্রস্তাব পড়েন নি বা শোনেন নি, তাঁর উদ্দেশ্যে নির্ভয়ে বলা যায় -- আপনি জানেন না আপনি কি হারাইলেন!!

বস্তুত, বরাহর প্রকৃত মর্ম বোঝার জন্য দরকার একজন লর্ড এম্সওয়ারথ' এবং তাঁর উপলব্ধ মর্ম আমাদের বোঝানর জন্য আবশ্যক একজন ওড্হাউস্। 'পিগ্‌স হ্যাভ্ উইংস্'-এর দ্বিতীয় খণ্ড কি আর কোনদিন লেখা হবে না?

—সন্ধানী

পোল্ট্রী ফার্ম লাভজনক করতে হলে কি কি প্রয়োজন

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়
(সম্পাদক, "পোল্ট্রী" পত্রিকা)

সুপরিকল্পিতভাবে যদি পোল্ট্রী ফার্ম গড়ে তুলতে পারেন তবে স্বাভাবিক কারণেই লাভটাও হবে বেশী। সেইজন্য প্রয়োজন সুপরিচালনা---ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

স্থান নির্বাচন ঃ

এমন একটা জায়গা বেছে নিন যার কাছাকাছি মুরগীর বাচ্চা এবং তাদের খাবার সহজেই পাওয়া যায়।

গৃহনির্মাণ ঃ

যে-কোন ধরনেরই ঘর করুন না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মুরগীগুলো শীত, রোদ, বৃষ্টি, ঝড় এবং ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ঘর তৈরি করার সময় নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে:

(১) মেঝে থেকে ছাদের শীর্ষদেশ পর্যন্ত ১৪ ফুট এবং ছাদ ৯ ফুট হওয়া প্রয়োজন।

(২) মেঝে থেকে মাত্র আড়াই ফুট পর্যন্ত দেয়াল এবং তারপর থেকে সবটাই জাল দিতে হবে।

(৩) শীর্ষদেশে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৪) ছাদ সামনের দিকে বাড়ানো থাকবে।

(৫) মেঝে কংক্রীটের করতে হবে। যে সব মুরগী ডিম পাড়ার উপযোগী তাদের মাথাপিছু মাত্র আড়াই বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন হয়।

যদি আপনি প্রচুর ডিম পেতে চান তবে মুরগীর বাচ্চা পালন এবং ডিম পাড়বার ব্যবস্থার জন্য পৃথক ঘর তৈরি করতে হবে।

খাবার ও জলের পাত্র ঃ

যে-সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে মুরগীর খাবার বা জল সরবরাহ করবেন, সেগুলি ভালো ধরনের হওয়া প্রয়োজন। বাজারে এসব যন্ত্রপাতি কিনতে পাওয়া যায়। নিজেও আপনি কম খরচায় তৈরি করে নিতে পারেন।

পরিচালনা ঃ

যিনি মুরগীর খামার করবেন তিনি মালিকই হন আর ম্যানেজারই হ'ন, তাঁর অবশ্যই মুরগী পালন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি একাই এক হাজার মুরগীর দেখাশোনা করতে পারেন। অবশ্য রাতের জন্য আলাদা লোক দরকার হয়। (Night Guard).

বাচ্চা মুরগী ঃ

মুরগীর বাচ্চা কেনবার বা সংগ্রহ করবার সময় ভালো জাতের কি না সেটা দেখে নেবেন। একদিনের বাচ্চা কেনাই সবচাইতে ভালো।

মোরগ ঃ

বিনা প্রয়োজনে ফার্মে মোরগ রাখবেন না---মুরগী মোরগ ছাড়াই ডিম দেয়---ফার্মে মোরগ রাখলে খাদ্যের অপচয় হবে।

আপনি যদি প্রচুর মাংস পেতে চান তবে ফার্মে প্রতি মাসে সুপরিকল্পিতভাবে ব্রয়লার আনুন এবং আড়াই মাস পরেই তাদের বিক্রি করে দিন। ব্রয়লারের জন্য জায়গা কম লাগে।

মুরগীর খাদ্য ঃ

মুরগীর খাদ্য আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নয়। নিজেরাও খাদ্য তৈরি করে নিতে পারেন। খাদ্য অপচয় যাতে না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। সস্তায় সরকারের নিকট থেকেও খাদ্য পাওয়া যায়।

হিসাবপত্র ঃ

আয়-ব্যয়ের হিসাব বেশ সতর্কতার সঙ্গে রাখতে চেষ্টা করবেন। প্রতিদিন কতো ডিম পাওয়া যাচ্ছে---কতো খাদ্য লাগছে তার সঠিক হিসাব রাখুন। হিসাবপত্র ঠিক ঠিক না রাখতে পারলে লাভের আশা কম।

পরিকল্পনা ঃ

কিভাবে খামার তৈরি করার ইচ্ছে আপনার তা' সঠিক ও বিস্তারিতভাবে লিখে ফেলুন। কবে কোনটা প্রয়োজন তাও ঠিক করে ফেলুন আগে থেকেই। তারপর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করে যান। কাজে এগুতে গেলে ধাপে ধাপে এগোন

যেমন :

(১) ঘর তৈরি শেষ করুন।

(২) জল সরবরাহের ব্যবস্থা, মুরগীকে খাওয়াবার জিনিসপত্র, যেখানে বাচ্চা রাখা হবে তার ব্যবস্থা---সব সেরে ফেলুন।

(৩) মুরগীর খাদ্য কিনুন।

(৪) এবারে বাচ্চা আনবার ব্যবস্থা করুন।

(৫) রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থার কাজ করে ফেলুন।

(৬) মুরগীর বাচ্চা রাখার খাঁচের ব্যবস্থা এবং আলোর ব্যবস্থা করুন।

(৭) ডিম ও মাংস বিক্রির ব্যবস্থার দিকে নজর দিন।

বাজার :

মালিকের প্রধান কাজই হলো ডিম ও মাংসের বিক্রির ব্যবস্থা করা। তাই ডিম ও মাংস বিক্রি কোথায় কিভাবে করা যাবে সেদিকে সদাসর্বদা নজর রাখতে হবে। বাজারে ঘুরতে হবে সর্বদা।

ভালো বই :

মুরগী পালন সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো বই-এর পত্রিকা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। বড় বড় বইয়ের দোকানে খোঁজ করলে প্রয়োজনীয় বই পাওয়া যাবে। দেখে কিনতে হবে। বই না পড়লে আপনি ভাল ফার্ম করতে পারবেন না।

লিটার :

খড়, কাঠের গুঁড়ো প্রভৃতিকে লিটার বলে---মেঝেতে ৪।৫ ইঞ্চি পুরু করে খড় বা কাঠের গুঁড়ো বিছোতে হয়। মুরগীরা পা দিয়ে আঁচড়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে এবং অতে এদের ব্যায়াম হয়। প্রতি মাসে একবার করে লিটার বদলালে ভাল হয়। কারণ প্রায়ই এরা জমাট বেঁধে যায়। লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে লিটার জলের সংস্পর্শে না আসে।

মুরগীর ওষুধ :

অপ্রয়োজনে মুরগীদের জন্য ওষুধ ব্যবহারে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। মুরগীর রোগ হলে সেটাকে বাছাই করে অন্য ঘরে রাখতে হবে এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সব মুরগীকে অহেতুক ওষুধ খাওয়াবার প্রয়োজন নেই। পোল্ট্রীতে প্রতিষেধক ব্যবস্থার দিকে বেশি নজর দিতে হবে।

সাবধানতা :

(১) পোল্ট্রী ফার্মে বাইরের কোন লোককে প্রবেশ করতে দেবেন না। প্রবেশ করলে পটাশ বা ডেটল জলে ধুয়ে প্রবেশ করাবেন। বাইরে থেকে এসেই পোল্ট্রী ঘরে ঢুকবেন না, (২) বাজার বা হাট থেকে ক্রয় করা মুরগী ফার্মে রাখবেন না, (৩) পানীয় জল পরিষ্কার রাখবেন, পানীয় জল ও খাবারের পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করবেন, (৪) ভিজে যাওয়া লিটার ফেলে দেবেন, (৫) অসুস্থ পাখীদের সুস্থ পাখীদের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলবেন, (৬) বাচ্চা ক্রয় করবার পরেই অভিজ্ঞ ভেটেরেনারী ডাক্তার বা ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়মিতভাবে নেবেন। সময়মত রাণীক্ষেত্র ইনজেকসন ও বসন্তের টিকা মুরগীদের দিয়ে দেবেন। প্রতি মাসে অন্তত একবার মুরগীদের ওয়াসিং করাবেন, (৭) রুগ্ন-হালকা বা ডিম দেয় না---এরকম মুরগীদের মাঝে মাঝে বাছাই করে বিক্রি করে দেবেন। মুরগী বাছাই ফার্মের একটা প্রধান কাজ। এতে খাদ্যের অপচয় বন্ধ হবে।

টুকিটাকি

ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্প

গ্রামীণ সমাজে, শিশু, ছাত্র, প্রসূতির অবশ্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য ডিমের নিয়মিত বিনামূল্যে সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঐ প্রকল্প চালু হয়েছে। ১০০টি ডিম-পাড়া মুরগীর গ্রাম-কেন্দ্রিক খামার তৈরী এবং প্রথম তিন বছরের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। খামারী ৩ বছর ৫ হাজার হারে ডিম বিনামূল্যে সরবরাহ করবেন। ৩ বছর পর খামারী ব্যক্তি মালিকানায় বর্তায়। এ-নাগাদ ৩৯টি ব্লকের আওতায় মোট ৪৪১টি গ্রাম-কেন্দ্রিক খামার স্থাপিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় খামার

উৎপাদন, প্রতিপালন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সহযোগিতা এবং উন্নততর পদ্ধতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ-রাজ্যে এতাবৎকাল মোট ৯টি রাষ্ট্রীয় মুরগী পালন খামার স্থাপিত হয়েছে। খামারগুলি যথাক্রমে---টালিগঞ্জ, গোবরডাঙ্গা, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, দুর্গাপুর, মেদিনীপুর, ডিগুরী, মোহিতনগর ও কালিম্পং।
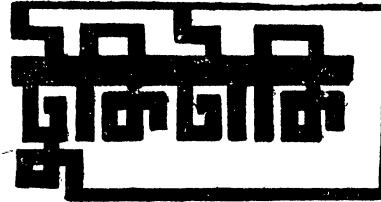
পশ্চিম জার্মানীর এ্যানসবাখ কেন্দ্রের সম্মুখে পশু প্রজনন সম্পর্কিত ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শ্রীশান্তি গুপ্তকে দণ্ডায়মান দেখা যাচ্ছে

মুরগী উন্নয়ন কর্মসূচী

এ-রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি সুদৃঢ় এবং পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মুরগী-পালন শিল্পের বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। আপাততঃ কোলকাতা, বারাসাত, দুর্গাপুর ও চুঁচুড়া শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে চারটি মুরগী-উন্নয়ন এলাকায় কার্যসূচী রূপায়িত হয়ে চলেছে।

উত্তরবঙ্গে মুরগী খামার

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার এবং সংলগ্ন এলাকায় উৎসাহী মুরগীপালকদের সহায়তা এবং ছোট-বড় খামার স্থাপনের সাহায্যের জন্য শিলিগুড়িতে একটি বড়ো খামার স্থাপনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এই সঙ্গে থাকবে হ্যাচারি অর্থাৎ ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলার সকল বন্দোবস্ত। সেখান

থেকে মুরগী পালকেরা তাঁদের খামারের ডিম ফুটিয়ে নিতে পারবেন।

বিপণন প্রকল্প

খামারীর ডিম-মাংসের উৎপাদন সম্বৎসর নিয়মিত ন্যায্যমূল্যে বিপণনের উদ্দেশ্যে বিপণন কর্মসূচী চালু হয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় এ-রাজ্যে ১০ হাজার ছোট-বড় মুরগী খামারী তাঁদের খামারের উৎপাদন ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করছেন। সেই ডিম-মাংস হাসপাতাল, ইস্কুল, কলেজ, সমবায় এবং জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং শহর কোলকাতায় স্থাপিত বিভিন্ন ডিপোর মাধ্যমে ডিম-মাংসের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করছে।

প্রশিক্ষণ

অধিক সংখ্যক মানুষের মুরগী পালনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য দেশের নানা প্রান্তে ছোট-বড় খামার স্থাপনের উদ্যোগ চলছে। মুরগী প্রতিপালন সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞানের জন্য নবাগত খামারীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদানের কাজ চলছে। প্রতি ৩ মাসের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এতাবৎকাল এ-রাজ্যের নানা প্রান্তের ১ হাজার খামারী শিক্ষালাভ করেছেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টালিগঞ্জ, কার্সিয়াং ও ডিগরী'র সরকারী খামারে স্থাপিত।

সরকারী ঋণ

অনেক খামারী আর্থিক অনটনে ছোট খামার আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে অপারগ। সেজন্য সরকারী ঋণের ব্যবস্থা আছে; এর মারফৎ খামারী স্বল্প ঋণের সহায়তায় খামার আধুনিকীকরণ করে থাকেন।

হিন্দলিভার গবাদি পশুর খাবার

শস্য, তেলের খইল, ভুষি, ডালের আনুষঙ্গিক জিনিস আর খনিজ পদার্থের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। ঝোলাগুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে এটি পুরোপুরি এক খাবারের আকারেই তৈরি করা হয়েছে।

এই খাবারটি এমন সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত, যা'তে গবাদি পশুরা সঠিক পরিমাণে প্রোটিন পায় এবং তাদের শক্তি ও ক্ষমতা বেড়ে ওঠে। এছাড়া, খনিজ পদার্থ, ট্রেসএলিমেন্ট আর ভিটামিন মিশিয়ে এটি আরও বলবর্ধক ক'রে তোলা হয়েছে।

আমাদের হিন্দলিভার গবাদিপশুর খাবার পাবেন ৩ রকমের:

স্পেশ্যাল মিল্ক রেশন: অত্যন্ত সুস্বাদু এই খাবারটি সুপারিশ করা হচ্ছে যে-সব গরু আর মোষ পরিমাণে বেশি দুধ দেয় তাদের জন্য। এছাড়া, বেশ ভাল পুষ্টিকর মোটাচারা যখন পাওয়া সম্ভব নয় বা দুধোলো গরু মোষ যখন কেবলমাত্র ধানের খড়, গমের খড়, খুব অল্প পরিমাণ ঘাস ও জোয়ারের 'কাড়বী" পাচ্ছে তখনও এই খাবারটি খাওয়াবেন। বিশ্লেষণ: প্রোটিন ২৪%; শ্বেতসারের সমতুল ৬৪।

মিল্ক রেশন: যে-সব গরু-মোষ সাধারণ স্তরের এবং মোটামুটি ভাল দুধ দেয়—এই খাবারটি তাদের জন্য। উন্নতমানের পুষ্টিকর খড়-বিচালী যখন পাওয়া যাচ্ছে বা দুধোলো গবাদিপশুদের যখন যথেষ্ট পরিমাণে সবুজ ঘাস দেওয়া হচ্ছে তখনই এই খাবারটি দেওয়া যায়। বিশ্লেষণ: প্রোটিন ২১%; শ্বেতসারের সমতুল ৬০।

ড্রাই স্টক রেশন: যে সব পশু দুধালো নয়—বিশেষভাবে পরিকল্পিত এই খাবারটি তাদের জন্য। দুধ দিচ্ছে না এ রকম গরু ও মোষ, ৬ মাসের বেশি বয়সের বকনা বাছুর বলদ আর ষাঁড়দের এ খাবার দিতে পারেন। বিশ্লেষণ: প্রোটিন ১৮%; শ্বেতসারের সমতুল ৫৬।

খাওয়াবার নিয়ম: হিন্দলিভার গবাদিপশুর খাবার,—সবুজ ঘাস-পাতা, খড় আর বিচালী দেবার পর এক অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার হিসাবে গরু-মোষকে খাওয়াতে হবে। হিন্দলিভার গবাদিপশুর খাবার খাওয়াতে হবে শুকনো অবস্থায়। কেন না, শুকনো অবস্থায় দেওয়া-থোওয়া সহজ, ওজন করাও সুবিধে। তবে, আপনার গরু-মোষ যা'তে প্রচুর পরিমাণে খাবারের জল পায়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। ওদের শরীর ভাল রাখতে হ'লে আর ভাল দুধ পেতে হ'লে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়ানো দরকার। আমরা এমন পদ্ধতিতে এই খাবার তৈরি করেছি যা'তে এগুলো সারা রাত ধরে জলে ভিজিয়ে নেবার প্রয়োজন পড়ে না। তবে আপনি ইচ্ছা করলে গরু-মোষকে খেতে দেবার আগে একটু ভিজিয়ে নিতে পারেন। তবে তা যেন আধ ঘণ্টার বেশি না হয়। হিন্দলিভার গবাদিপশুর খাবার গরু-মোষকে ১৫ থেকে ২০ দিন ধরে ধীরে ধীরে খাইয়ে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হবে। তারপর দুধের পরিমাণ বুঝে খাওয়াতে হবে, নিচের তালিকা অনুযায়ী:

কতটা খাওয়াবেন

হিন্দলিভার স্পেশ্যাল মিল্ক রেশন আর হিন্দলিভার মিল্ক রেশন

	গরু প্রতিদিন	মহিষ প্রতিদিন
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য—যেখানে উচ্চ শ্রেণীর খড়-বিচালী জাতীয় খাবার পাওয়া যাচ্ছে না———	১॥ কে, জি	২ কে জি
এর সঙ্গে দেবেন দুধ দেবার জন্য———	১ কে জি প্রত্যেক ২॥ লিটার দুধ বাবদ	১ কে জি প্রত্যেক ২ লিটার দুধ বাবদ

ওদের প্রাত্যহিক খাবারের পরিমাণটা সমান ভাগে ভাগ ক'রে প্রত্যেকবার দুধ দুইবার আগে খেতে দিন।

কতটা খাওয়াবেন

হিন্দলিভার স্ট্যান্ডার্ড রেশন

গবাদি পশুর শ্রেণী		প্রতিদিন কতটা খাওয়াতে হবে
দুধ দেয় না এমন গরু - - -		১॥ কে, জি
দুধ দেয় না এমন মোষ - -		২ কে, জি
যে বলদ হাল্কা কাজ করে - - -		২ কে, জি
যে বলদ ভারী কাজ করে - -		৩ কে, জি
পাল দেবার ষাঁড় - - -		২-৩ কে, জি (প্রতি সপ্তাহে প্রজননের সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে)
বাড়ন্ত গবাদি পশু : ওজন	৫০ কে, জি	¾ কে, জি
,, ,, ,, ,,	১০০ কে, জি	১॥ কে, জি
,, ,, ,, ,,	১৫০ কে, জি	২ কে, জি
,, ,, ,, ,,	২৫০ কে, জি	২। কে, জি
,, ,, ,, ,,	৩০০ কে, জি	২॥ কে, জি

মনে রাখবেন

মনে রাখবেন হিন্দলিভার গবাদিপশুর খাবার অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহা কেবলমাত্র খাঁটি আর পুষ্টিকর উপাদানে তৈরি। তৈরি করার প্রতি ধাপে সতর্ক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দ্বারা এর গুণমান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নেওয়া হয়। পরীক্ষিত এ উপকরণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিশিয়ে হিন্দলিভার গবাদিপশুর খাবার তৈরি করা হয়েছে। এটি নিয়মিত খাওয়ালে কম খরচে বেশি দুধ পাবেন এবং আপনার গরু-মোষের স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। হিন্দলিভার গবাদিপশুর খাবার খেতে দেওয়াও সহজ। মেশাবার বা ভিজিয়ে নেবার প্রয়োজন হয় না। থলে থেকে বের ক'রে সোজা পাত্রে ঢেলে দিতে পারবেন। হিন্দলিভার গবাদিপশুর খাবার তৈরির পেছনে রয়েছে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড আর বৃটেনে তাদেরই সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সুদীর্ঘ গবেষণা, যে-প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ ৫০ বছরেরও বেশি কাল ধ'রে উঁচুদরের গবাদিপশুর মিশ্রিত ও পুষ্টিকর খাবার তৈরি ক'রে আসছে। হিন্দলিভার পশু আহার উপদেষ্টা কেন্দ্র (হিন্দলিভার এনিমেল ফিড-এডভাইসারী সার্ভিস) আপনাদের সেবায় তৎপর। আপনার গবাদিপশুদের খাওয়ানো এবং দেখাশুনো করার ব্যাপারে যদি কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে অথবা স্থানীয় হিন্দলিভার পশু আহার পরিবেশকের (হিন্দলিভার এনিমেল ফিড-ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে আজই যোগাযোগ করুন। হিন্দলিভার পশু খাবারগুলো ভারতের বাজারে ছাড়া হয়েছে ১৯৬১ সালে। বহু সংখ্যক সরকারী ও বে-সরকারী ফার্ম এগুলো ব্যবহার ক'রে বেশ সন্তোষজনক ফল পেয়ে আসছে।

আরও বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন : হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, এনিমেল ফিডিং স্টাফস্ ডিপার্টমেণ্ট। ইলাকো হাউস, ১ এবং ৩ ব্রাবোর্ন রোড, পোঃ অঃ বক্স নং ৩৫৮ কোলকাতা-১ টেলিঃ ২২-৩৪৯১।

ঘুম পাচ্ছে ?

ডাক্তাররা বলেন ঘুম চলে চক্রাকারে। যদি অ্যালার্ম বাজার ঘণ্টাখানেক আগে আপনার ঘুম ভাঙে ত আর এক দফা নাক না ডেকে উঠে পড়ুন। অভ্যাস হয়ে যাবে।

এই উপদেশটি যুগান্তকারী। যখন স্বাভাবিকভাবেই আপনার ঘুম ভাঙে তখন আপনি চক্রের তুংগে এবং সারাদিন পরিশ্রম করার জন্য দেহ-মনে পুরোপুরি প্রস্তুত।

যদি মাঝ রাত্তে ঘুমোতে গিয়ে ছ'টার ঘণ্টা বাজামাত্র উঠে পড়েন তা হলে সকালে সব টুকিটাকি কাজ সেরে কেওড়ার মত পারেন—কাগজ পড়া, বাজার করা, দাড়ি কামান—সব কিছু ধীরে সুস্থে সেরে নিয়ে কাজে বেরুবেন খোশমেজাজে। সন্ধ্যের পর সে ক্ষেত্রে অখণ্ড অবসর। আড্ডা দিতে পারেন, একটা পছন্দমত বই নিয়ে বসা হলেও আপত্তি নেই। দেখবেন, দৈনন্দিন জীবন কেমন সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠছে এবং ডাক্তারদের মত অনুসারে, সাধারণতঃ যেমন ঘুম-ঘুম ভাব থাকে তা আদৌ থাকবে না।

কি বললেন? রোজ ছ' ঘণ্টা ঘুমের এই ব্যবস্থা প্রকৃতই কার্যকর কিনা? হা-আ-আ-আ-আ-উ যু---পরে বলবো মশাই, এখন---ইয়ে--- আমার ---বড্ড ঘুম---পাচ্ছে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জনারণ্যে এক মুখ

ধারাবাহিক উপন্যাস

শ্রীমতী বাণী রায়

ধানবাদের গল্প শুনেছিল পাঞ্চালী নন্দার মুখে অতঃপর। 'জানো, চালি সকালবেলায় বেড-টি পাঠাত মীণাক্ষী। গেস্টরুমের সঙ্গে লাগোয়া ছাদে বাগান আছে। টবের বাগান। বিকাশ সেখানে সকালে ফুল দেখতে যেত ওদিককার দরজা দিয়ে। একদিন চাকর চা নিয়ে বিকাশের চা-ও দিল ওখানে। সেই ছাদভরা ফুলের মধ্যে সেই সকালটা অপূর্ব হয়ে নামল। কিন্তু পরের সকাল আবার বন্ধ। মীণাক্ষী দেখল ওখানে চা খাওয়া চললে, বিকাশের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাব। তাই বিকাশের চা দিল না। কত হীন, দেখেছ?''

বলছে নন্দা চেয়ারে ঠেস দিয়ে। মুখ লাল হয়ে উঠল নন্দার। তিক্ত স্বরে সে বলল, 'কি করতে হবে আমি জানি।'

নিশ্বাস ফেলে পাঞ্চালী চুপ করে গেল।

'আমি উঠছি এখন। আজ একটু তাড়াতাড়ি বার হব। আমি যাব দক্ষিণেশ্বরে।'

'ও, ভটচাযের কাছে?' প্রশ্ন করল পাঞ্চালী।

মুখ খুলেও চুপ করতে হল পাঞ্চালীকে। কারণ, যাই বলা যাক না, নন্দা মানবে না। উপরন্তু পাঞ্চালীর সাহচর্য পরিত্যাগ করবে। ফলে, অন্য একটি অপূর্ব সাহচর্যে বঞ্চিত হ'বে পাঞ্চালী,—জীবনের পরম আনন্দে।

নন্দা বলে চলল, 'সেদিন রাত পর্যন্ত বসে রইলাম। যদি কথা বলতে পারি নিরিবিলিতে। হল না সুযোগ। আমি আবার যাব বড়দিনে।'

'আর যেও না, নন্দাদি।'

'কেন নয়?' অফিসে বসে কথা

'হ্যাঁ, চল, যাবে নাকি? কী অদ্ভুত গণনাশক্তি দেখবে চলো। বিশ্বাস হয় কি না হয়।'

পাঞ্চালীর একদম বিশ্বাস নেই জ্যোতিষী বচনে। কিন্তু নিজের বাড়িতে ফিরে করবে কি? নন্দাদির মন যুগিয়ে লেজুড় হয়ে নন্দার বাড়ি যাওয়া এখন চলবে না। নন্দাদি যাচ্ছে না বাড়ি। বরঞ্চ নন্দাদির সঙ্গ নিলে হয়তো প্রিয় প্রসঙ্গ আলোচিত হতে পারবে স্বচ্ছন্দে। অতএব যাওয়া যাক।

'ঠিক আছে, চল, যাওয়া যাক।'

দু'জনে অফিস থেকে বার হয়ে দক্ষিণেশ্বরগামী বাস ধরল।

আজ নন্দা দোকানে চা খেতে যেতে চাইল না।

একটা গলির মধ্যে যোগেন ভট্টাচার্যের বাড়ি।

নিজের বাড়ি হলেও গলিত অবস্থা। বাইরের ঘর বলতে একখানা টিনের ছাউনী আছে। একটা চৌকির ওপর মাদুর পাতা। সম্মুখে অবশ্য একখানা এক ইটের গাঁথনী দালান একতালা।

দুই'চোখ জ্বলছে, শীর্ণ মূর্তি, কৃষ্ণবর্ণ প্রৌঢ়। দেখামাত্র একটা অশ্রদ্ধার ভাব এল পাঞ্চালীর। পাঞ্চালীর পরিচয় দেওয়া হ'লে যোগেন জ্যোতিষী গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মা, মা! কৃপা কর, মা!' পাঞ্চালী চৌকির ওপর বসেছিল নন্দার পাশে। মৃদু হাসল।

কিছু কিছু জ্যোতিষী দেখা আছে ওর। মা সাতিশয় আচারপরায়ণা হওয়াতে জ্যোতিষীর আনাগোনা ছিল না যে তা নয়।

দেখে নি বলে নয়, অনেক দেখেছে বলে জ্যোতিষীর বচনে অবিশ্বাস জন্মেছে পাঞ্চালীর।

একটা-আধটা হাত আন্দাজে বা দূরদৃষ্টি হেতু এঁরা বলতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন যুগিয়ে কথা বলার প্রবণতা দেখিয়ে থাকেন। পাঞ্চালীর হাসি তীক্ষ্ণদৃষ্টি যোগেন জ্যোতিষী দেখে ফেললেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'আগুন দেখছি, চারপাশে আগুন। সেখানে মরণ সমতুল্য কষ্ট অন্তে ভাগ্যোদয়।'

পাঞ্চালী চমকে উঠলেও নিজেকে সম্বরণ করে নিল। যোগেন জ্যোতিষী একটা মৃগচর্ম মাটির মেঝেয় পেতে বিশেষ আসনে বসে পড়লেন। চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানস্থ রইলেন।

নন্দার মুগ্ধ সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। পাঞ্চালীর গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। চারদিকে বুনো গাছপালা। দূরে একটা ডোবা। তার তীরে বেলগাছে বেল ঝুলছে। কাঁঠালগাছে কতকগুলো কাক। আগম

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে পৃথিবী।

'এদিকে আসুন, মা।' আদেশ জারি হ'ল।

'যাও নন্দাদি, তোমার ভাগ্য শুনে এসো।' পাঞ্চালী ঠেলে দিয়ে নন্দাকে জোর করে লঘু হ'বার চেষ্টা পেল।

'আমাকে নয়, তোমাকে উনি ডাকছেন।' পাঞ্চালী পদার্পণ মাত্রে জ্যোতিষীর মনোযোগ পাওয়াতে নন্দা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ। নিজের চঞ্চলতা সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে, সেটাই স্বাভাবিক নন্দার ধারণা।

'না, আমি দেখাতে আসি নি। এঁর সঙ্গে এসেছি মাত্র।"

আধভাঙা টিনের ছাউনীর নিচে পাঞ্চালীর গলায় অতি রূঢ় স্বর বেজে উঠল।

সেই স্বর ডুবিয়ে কঠোরতর কণ্ঠে যোগেন জ্যোতিষী বলে উঠলেন, "আসুন, এধারে। মায়ের আদেশ পেয়েছি আপনার বিষয়ে।'

নন্দা পাঞ্চালীকে ধাক্কা দিল, 'যাও না, ভয় পাচ্ছ কেন?' 'ভয়' কথাটি সহ্য করতে পারে না পাঞ্চালী। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ভঙ্গিতে উঠে গেল মৃগাসনের দিকে।

'বসুন'।

মেঝেয় একখণ্ড চাটাই বিছানো আছে মৃগচর্মের সম্মুখে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না।

সেখানে বসল পাঞ্চালী।

ধক্‌ধক্‌ করে চোখ জ্বলে উঠেছে জ্যোতিষীর। শীর্ণ মুখে অতি উগ্র ভাব-বিকাশ।

পাঞ্চালীর কপাল, চোখ ঝুঁকে দেখলেন। দু' হাত তুলে চক্ষের কে কি যেন দেখে নিলেন।

অতঃপর রহস্যভরা বচন দিলেন,—

'ধলার প্রেমে অনেক জ্বালা,

কালার গলায় পরাবে মালা।"

'মানে?' হতবাক্‌ পাঞ্চালী।

"মানে আপনি নিজে বুঝে নেবেন। মা এর বেশি আমাকে কিছু বলেন নি। এবার, নন্দা—মা, আসুন।"

কথা না বাড়িয়ে পাঞ্চালী উঠে চৌকিতে বসল।

'একটু গোপনে কথা আছে বাবা।'

এহেনকালে লণ্ঠন হাতে এক ছোট ছেলে এল। পশ্চাতে দু'কাপ চা হাতে কিশোরী কন্যা।

ফাটা কাপের কড়া চা-এ চুমুক দিয়ে মনে হ'ল পাঞ্চালীর; বুক থেকে শুকিয়ে উঠেছে ওর।

এ কী পরিবেশে এসে হাজির হল সে? নন্দার যে মাথার অবস্থা ঠিক নেই বুঝাতে পেরে শঙ্কিত হয়ে উঠল। প্রতিভাশালী পিতার প্রতিভা বিকৃতরূপে আশ্রয় নিয়েছে নন্দার সত্তায়। আজ প্রথম সন্দেহ হল পাঞ্চালীর গৈরিক সেন নিজে স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ মানুষ কি না।

যোগেন জ্যোতিষী বললেন, 'আপনি একটু আমার গৃহের মধ্যে যান, মা। আমার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করুন। নন্দা-মায়ের নির্জনতা চাই।'

অতি বিরক্ত হয়ে অগত্যা পাঞ্চালী কিশোরীর সঙ্গে গেল অন্দরে। সে ইতস্তত করছে দেখে নন্দা অনুনয় জানাল, 'আমার কথাগুলো সেরে নিই, চালি। এতদূরে নিত্য আসা-যাওয়া হয়ে ওঠে না। তুমি একটু মাঠাকুরুণের সঙ্গে কথা বলে এসো। বেশিক্ষণ তোমাকে বসিয়ে রাখব না।'

অগত্যা যেতে হ'ল বিরক্ত হয়েও।

'তোমার আবার নতুন কথা কি আছে? সবই তো জানি আমি গোড়া থেকে। আমার সঙ্গে যাচঞা থেকেই তো উদ্ভব ওই জটিলতার। নির্জনতার আয়োজন হঠাৎ?' —

নিঃশব্দে পুরনো দালানে প্রবেশ করল পাঞ্চালী, নিজেকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে আসার জন্য ধিক্কার দিল।

লালপাড় শাড়িপরা অতি সাধারণ প্রৌঢ়া জ্যোতিষী পত্নীকে কিন্তু দেখে আশ্বাস পেল সে। যোগেন জ্যোতিষীর অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গি গৃহিণীর মধ্যে অদৃশ্য।

প্রায় ঘণ্টাভোর সময় নিল নন্দা। যোগেন জ্যোতিষীর পূজার ঘরে প্রণাম ঠুকে এল পাঞ্চালী। নিচু চালের ছোট ছোট ঘরগুলির একখানায় আবৃত সাজসজ্জা, পুষ্পপাত্র ভর্তি রক্তজবা। দক্ষিণাকালীর বিরাট পট কাঠের বেদীর ওপর। পাশে পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম।

রান্নার চালা ঝড়ে উড়ে গেছে বলে বাড়ির লম্বা দালানেরই এক প্রান্তে রান্না চেপেছে। গৃহিণীর জা রান্না করছেন। অন্য একটা ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে পড়ার অজুহাতে গল্পে মত্ত।

গৃহিণী পাঞ্চালীর কুলজী নিলেন। নিজের কুলজী দিলেন। বড়ছেলে অফিসে বেরুচ্ছে। ছোট স্কুলে যায়। কিশোরী কন্যাটি জায়ের, বিবাহ দেবার জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে, ইত্যাদি।

বললেন, 'ওনার সঙ্গে কত গল্প হয়। যজ্ঞের দিন তো সকাল থেকে নন্দা এখানে।'

'যজ্ঞ?'

'কেন, জানেন না? মাসখানেক আগে নন্দা যে যজ্ঞ করালেন। অনেক খরচপত্র করেছেন।'

জ্যোতিষী গৃহিণীর মুখে তৃপ্তির হাসি। বোঝা যায় ঘরে বিত্তর উঠেছে আগযজ্ঞ বাবদ।
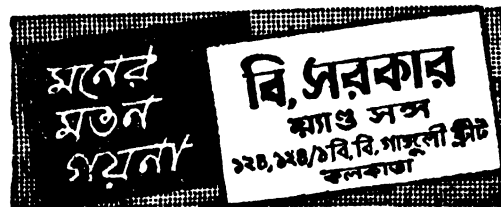
পাঞ্চালী ঘটনার উন্মোচনে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সময় কাটানো অথবা মানসিক ভরসার উদ্দেশ্যে অনেকেই জ্যোতিষী করে থাকেন। আজকাল মানুষের জীবনে নানা জট পাকিয়ে যায়, তাই সখের জ্যোতিষ আলোচনায় সকলেই উৎসুক।

'যজ্ঞ কেন?' অস্পষ্ট ভাষণে পাঞ্চালী জিজ্ঞাসা করল।

'গ্রহ-শান্তি করলেন। বেশী কিছু জানিনে। ওনার সঙ্গে কথা হয় কিনা।'

হতবাক পাঞ্চালী।

কিছুক্ষণ পরে নন্দা এল।

'চল, চালি, ওঠা যাক। দেখে শুনে গেলে। ইচ্ছেমত যখন খুশি নিজেই আসতে পারবে।' নন্দা বচন দিল।

যেন উৎকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্র দেখাচ্ছে নন্দাদি, কিম্বা মিষ্টির দোকান; ইচ্ছেমত এক বাক্স সন্দেশ কেনা যাবে।

পথে, বাসে নন্দা নিরুত্তর কেন, বুঝতে না পারায় অস্বস্তি - কবলিতা পাঞ্চালী প্রশ্ন করল, খারাপ কিছু শুনলে, নন্দাদি?'

'না'।

'আমাকে কি যা-তা বললেন, দেখেছ?' লঘুম্বে প্রয়াস পেল পাঞ্চালী।

'যা-তা কেন? তুমি কথাটা লিখে রেখো। দেখো ঠিক মিলে যাবে। সব কিছু উনি মিলিয়ে দেন।'

নন্দার কণ্ঠ শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে আর্দ্র।

'তুমি নাকি যজ্ঞ করিয়েছ?''

বিদ্যুৎ চমকে ফিরে তাকাল নন্দা, 'কে বলেছে তোমাকে?' নন্দার ভাবান্তর দেখে ভীত পাঞ্চালী, 'জ্যোতিষী ঠাকরুণ বলছিলেন। তা তে কি? অনেকেই এসব করান।'

নন্দা আত্মসম্বরণ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'গ্রহ বিরুদ্ধ আমার, স্বয়ং শনি। তাই শান্তি করিয়েছি।'

'যদি এতজো করলে কল হয়, তবে জ্যোতিষী মহোদয় স্বয়ং গ্রহশান্তি কেন করান না দারিদ্র্য নিবারণে?' পাঞ্চালী ব্যঙ্গপরায়ণা।

'তা করা যায় না। নিজের জন্য কিছু করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গলায় ক্যান্সার হয়ে ভুগলেন, তিনি মায়ের কাছে নিজের জন্যে রোগমুক্তির বর চাইতে পারেন নি।'

স্বয়ং রামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগেন জ্যোতিষীর তুলনা শ্রবণে পাঞ্চালী স্তম্ভিত। নন্দার মুখে চেয়ে দেখল সেখানে কোনও দ্বিধা অথবা সংশয়ের ছায়া নেই।

'আজ তোমাকে কি বললেন?'

'সে গোপনীয়। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললে কাজ হবে না।'

বাস্ কলকাতার জনাকীর্ণ পথে উভয়কে ততক্ষণে পৌঁছে দিল।

বাস বদলে নিজস্ব পাড়ার বাসে উঠল তারা।

আমতা — আমতা করে পাঞ্চালী বলল, 'বড্ড রাত হয়ে গেছে। নইলে তোমার মোড়ে নেমে একখানা বই নিতাম। গৈরিকবাবু নিশ্চয় এত রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন।

কোনমতে কথাটা গৈরিকের দিকে ফেরানো যায় যদি।

অন্যমনস্ক নন্দা চিন্তা-বিহ্বল। দায়সারা উত্তর দিল, 'এখন দাদার বাড়ি থাকা-না-থাকার বিষয়ে বলা শক্ত। শীগগির জার্মেনী যাবে কি না।'

'জার্মেনী? কেন?' বুকে শরাঘাত হল পাখীর।

'ওদের সমিতির সঙ্গে যে জার্মেনীর যোগাযোগ আছে। তাঁদেরই নিমন্ত্রণে যাবে।'

'ক — ত — দি— ন থাকবেন?'

'বলা যায় না, ছ'মাস, এক বছরও হতে পারে হয়তো।' নন্দার নির্লিপ্ত উত্তর।

—সুখ তুমি পালিয়ে গেলে কেন? কেন আমার বুক থেকে তুমি পলাতকা?

'এতদিন? তুমি কি করে একা থাকবে?' বিস্তৃত গলায় প্রশ্ন পাঞ্চালীর।

'বাড়িতে থেকেই বড় দায়িত্ব নেয় দাদা, চলে গেলে ক্ষতি হবে না। মামা এসে থাকবেন। বৌ মারা গেছে। সংসারে মামার মন নেই। যে ডাকে তারই।'

এককথায় নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা শেষ করে দিয়ে নন্দা অন্য কোন গভীর গহ্বরে ডুবে গেল। সে আজ কথাবার্তায় বিমুখী স্পষ্ট বোঝা যায়। কোনও গুরুতর সমস্যার বিচলিত মনে সুরাসুরের যুদ্ধ লেগেছে। মুখমণ্ডল রক্তিম, চোখে তীব্র সংকল্প চিহ্নিত। চরম পরীক্ষায় প্রস্তুত সত্তার দৃঢ় অথচ ছন্নছাড়া অভিব্যক্তি দ্রুত বিচ্ছুরিত হচ্ছে সর্বাঙ্গে নন্দার।

কথা বাড়াল না পাঞ্চালী। গৈরিকের বিষয়ে বিশদ জানে না নন্দা, তাছাড়া এখন বলবেও না। আলোচনায় অনিচ্ছুক নন্দাকে উত্যক্ত করে ক্রুদ্ধ করে তুলে লাভ নেই, লোকসান। নন্দা আজকাল একটুতে মেজাজ হারায়।

নন্দা বাড়ির মোড়ে নিরুত্তর নেমে গেল। পাঞ্চালী যে 'কাল অফিসে দেখা হবে'' বলে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণে মুখর, চোখেও পড়ল না নন্দার।

আসন্ন বিচ্ছেদ-ভীতার ভীরু ব্যথা বুকে নিয়ে এল পাঞ্চালী আশ্রমে-ঘেরা পিতৃগৃহে।

তবু মন্দের ভালো, বিমলাদির কাছ থেকে দূরে থাকবে গৈরিক কিছুকাল।

কিন্তু, অতৃপ্ত প্রণয়িনীর দ্বিধা-সন্দেহ প্রকট হয়ে উঠল সামান্য কয়েকদিনের দূরত্বে কি আসে যায়, যদি পূর্বেই বিঘ্ন ঘটে থাকে।

তাছাড়া, বিমলাদি সঙ্গে যেতে পারেন না কি? তিনিও কর্মী।

কাল গিয়ে খবর নিতে হবে।

কালো পালিশধরানো খাটে বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত হল পাঞ্চালীর।

পরের প্রভাতে অফিসে প্রথমেই নন্দার তল্লাস করল পাঞ্চালী। বিমলা

বাড়ি গিয়ে খবর নেবে সে স্থির করেছে। তবু নন্দাকে উক্ত বিষয়ে পাম্প করা প্রয়োজন। নন্দার সিটে নন্দা নেই।

একটা বড় পার্টিশানের ওধারে নন্দা, এধারে পাঞ্চালী বসে। মাইনে যোগ্যতায় বেশি হ'লেও কর্মকালের পরিধি দীর্ঘতর হওয়াতে নন্দার বসবার আসন একটু আরামপ্রদ বেশি। একটা পৃথক টেবিল মিলেছে নন্দার। টিফিনের সময় লাঞ্চরুমে না গেলেও চলে।

হয়তো দণ্ডিস্বামীর ঘরে গেছে। 'দণ্ডিস্বামী' প্রকৃতপক্ষে ওপরওয়ালা কর্মাধিনী শাসনবীশের ডাকনাম অফিস কর্মীদের কাছে। অতি খিট্‌খিটে খুঁতখুঁতে মেজাজ। তাই মেয়েরা তামাসা করে ডাকে। যেন যতি সন্ন্যাসী দণ্ডধারীর মত কঠোর। তাছাড়া দণ্ড দেবারও কর্তা।

লাঞ্চে দেখা হবে নিশ্চয়। মাসের প্রথমে এবং মেজাজ দিলদরিয়া থাকলে দু'জনে মিলে বাইরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে যথেচ্ছা ভক্ষণ করে থাকে। অবশ্য এই সফল অভিযানের নেত্রী নন্দা।

পাঞ্চালী নিজের ফাইল্-সমুদ্রে ডুব দিল। টিফিনে সীটে পেল না নন্দাকে, হয়তো বা তাহলে খাবার ঘরে গেছে।

সেখানেও নেই।

দণ্ডিস্বামী কি এতক্ষণ আটকে রাখবেন?

কোন দণ্ড নাকি?

দণ্ডিস্বামীর খাসবেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল পাঞ্চালী অপেক্ষায়।

'মেমসাহেবের কাছে নন্দা সেন মেমসাহেবকে দেখলে, হামিদ?'

'এঁজ্ঞে না, উনি সকালে একবার এসে ছুটি নিয়ে চলে গেছেন। কলকাতার বাইরে যাবেন, দরকারে।'

বিস্মিত হ'ল পাঞ্চালী। দেখা করল না নন্দা যাবার আগে?

নন্দার টেলিফোনবিহীন বাড়ি হলেও পাঞ্চালীর টেলিফোন আছে। কেন টেলিফোন করল না যদি এখানে বলে যাবার সময় না পেয়েছিল?

কাল অত দীর্ঘ যাত্রার পথে একবারও বলে নি নন্দা যাবে বলে বাইরে।

কোথায় হঠাৎ গেল?

বিদ্যুৎ চমকে এক সুখচিন্তা এল মস্তিষ্কে। অজুহাত সুন্দর, এই জিজ্ঞাসা নিয়ে যাওয়া সহজ। যে সংশয় মনে তোলপাড় তুলে দীর্ঘ যামিনী নিদ্রাছুট করেছিল, সহসা নিরসনের পন্থা। নন্দার সংবাদে যাবে সে, স্বাভাবিক বিস্ময় যে, নন্দাদি গেল কোথায়? শুভার্থী বন্ধু হিসাবে কোন অঘটন ঘটেছে কিনা জানতে চাওয়াটাই ন্যায্য। নন্দাকে ধন্যবাদ, বলে যায় নি। একান্তে প্রিয়সম্ভাষণ সম্ভবপর হয়েছে।

নন্দা কোথায় গেল, না জানলেও এখন যায়-আসে না। হয়তো জ্যোতির অন্বেষণে।

বাড়ি ফিরল না পাঞ্চালী।

ক্লোক্‌রুমে মুখটা ধুয়ে হাতব্যাগের প্রসাধনী ব্যবহারে শ্রমক্লান্ত রূপকে উজ্জীবন দিল।

সেই গলির স্বর্গ।

প্রবেশমাত্রে দেখা গেল নিরঙ্কুশ নয়। বাইরে সদরে বসার ঘরে লোকজন মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করছেন।

রান্নার এলাকায় পুরাতন লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'নন্দাদি কোথায় গেছেন?'

'কি জানি, দিদিমণি কি বলে যায় নাকি? হঠাৎ ব্যেগে ভরে নিল জামাকাপড়। 'চল্লু, দু'-একদিন বাদে আসব। দাদাবাবুকে দেখ।'

পানখাওয়া লাল দাঁতে হেসে লোকটি একটা মোড়া এগিয়ে দিল রোয়াকে।

'বসুন, দিদি। চা করি?'

'না, না। চা খেয়েই এসেছি। তা, দাদাবাবু জানেন নিশ্চয়?'

'তা জানতে পারেন। ওনার সঙ্গে কথা কইবে কে?'

চাকর উনুনে তরকারী চাপান। পাঞ্চালী ইতস্তত করে মোড়ায় বসল। চাকর-বাকরের সঙ্গে পারিবারিক আলোচনায় অশ্রদ্ধা থাকলেও কন্দর্পাহত কন্যাটি চলে যেতে পারছে না। সে আছে, একটু দূরে বসে আছে। যদি আসে একবার। যদি কোন কথা জানা যায় চাকরের কথার জাল থেকে।

'দাদাবাবু নাকি বিলেত যাচ্ছেন?' সাগ্রহ প্রশ্ন পাঞ্চালীর।

'তা যেতে পারেন। হরদম বাইরে যাচ্ছেন কি না।' নির্বিকার উত্তর দিয়ে জল ঢেলে দিল সনাতন। 'এবারে হয়তো বেশি দিনের জন্যে যাচ্ছেন। মামাবাবু আসবেন দেখাশোনার তরে, বলছিলেন বটে দিদিমণি। হ্যাঁ, ঠিকই, এবার বোধ করি দূরে যাবেন। নইলে মামাবাবু আসবেন কেনে ওনার পাগলী মাকে রেখে?'

'ও, নন্দাদির দিদিমা পাগল নাকি? জানতাম না।'

'বদ্ধ পাগল, ধন্দধরা পাগল। দিদিমণির মা বেঁচে থাকতে এখানে মাঝে মাঝে আসতেন। তখন কি জ্বালা আমাদের। খাবেন না, কথা বলবেন না। মধ্যে মধ্যে উদোম হয়ে উঠে ভাঙা-চোরায় মন দিতেন। কি ঝন্‌ঝন্ করে বাসনপত্র ভাঙতেন, বাবা! কত চিকিচ্ছেপত্তর হল কিন্তু, ভাল হয় নি।'

সনাতন গল্প করার ছুতো পেয়ে মুখ খুলল।

'তাই নাকি, কখনও শুনি নি।' পাঞ্চালী একটু অপ্রস্তুত।

'দিদি, এনাদের বংশের রোগ। এদানীং দিদিমণিও যেন কেমনধারা হয়ে গেছেন। একদম খান না। আহা, দিদিমণি আমার আগে কত থালা-থালা ভাত খেত গো। রাত্তিরে ঘুমোয় না দিদিমণি। ঠক্‌ঠক্ করে মাথার ওপর

জো-জ্বালায় চলাফেরা করেন, আমি টের পাই। নিজের মনে হাসে-কাঁদে। আমার বড় ভয় হয়, দিদি। কারে বা কই? আপনি এত আসা-যাওয়া করেন, দিদি-মণি আপনারে ভালবাসে, তাই আপ-নারে কইলাম। ওনার বংশডা ভাল না। এখন থেকে আপনারা চিকিচ্ছে করান।'

পাঞ্চালী বিচলিত হল না। নন্দার প্রেমজীবন যে জানে না পুরাতন ভৃত্য। তাই ভয় পেয়েছে।

সে কথাটা গৈরিকপানে ঘোরাতে বলল, 'আজকাল কি খান দাদাবাবু, রাঁধছ কি?'

'দু'খান রুটি আর মাছের তরকারী আজ খাবেন। ব্যস।'

"আমি—একটু জিজ্ঞাসা করে যাব ওঁকে নন্দাদির কথা। কখন ভেতরে আসবেন?'

'সেটা বলা যায় না।'

'ওখান থেকে, ওখান থেকে বাইরে চলে যাবে না তো?'

পাঞ্চালী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল।

'এঁজ্ঞে না, উনি আজ আটটায় খাবেন বলে দিয়েছেন কি না। আমি চা করি, আপনি বসুন। দাদাবাবু ভেতরে এলে শুধিয়ে নেবেন।'

তরকারীটা নামিয়ে সনাতন এক কেৎলি জল বসাল। ঠিকে-ঝি বিকালের চা-জলখাবারের বাসনগুলি কল থেকে ধুয়ে পাঁজা ধরে ঘরে রাখতে রাখতে মুখ টিপে হেসে বলল, 'তবে আমারেও একটু চা দিও সনাতনদাদা। তুমি নিজে আর একবার খাবেক বলে না সাধছ দিদিরে। নইলে চা করতে বললে তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে না?'

'দেখ্, গৌরী, তোর চা খাবার নোলা শক্‌শক্ করছে না? আমি ইচ্ছা হলে কতবার চা খেতে পারি না? সবই আমার হাতে।'

'তুমি যা কুঁড়ে, করেকম্মে খেতে গেলে পেরাণ বেরিয়ে যাবে, না?'

সনাতন ছুকরী ঝি গৌরীর কথায় চটে উঠল। গৌরীর লীলাবিভ্রমটুকু তার কাছে নিরর্থক। সে বেশি বুড়ো হয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ সনাতন বলল, 'ইস্ দিদি-মণি তোকে তা দিতে বারণ করে গেছে।'

'বটে? নাও নাও, রাগ করো নি গো। এ দিদির যাবার তাড়া নেই, অনেকক্ষণ বসবেক।'

গৌরীর মুখের হাসির ইঙ্গিতে বোবা প্রেম নন্দাদিদিমণি নিজেকে নিয়ে তন্ময় থাকায় সনাতন যা বোঝে নি গৌরী তা বুঝেছে নিঃসন্দেহে।

গৈরিকজালে আবদ্ধ মক্ষিকা।

চা-এর পরিবেশ কী ইতরসাজমে। কাল এক বিচিত্র, অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে আজ আরও অধমে—ঝি-চাকর সাহচর্যে। নন্দা সেনের গ্রহনক্ষত্র কোনদিকে চলেছে?

ঝি-চাকরের মধ্যে আড্ডা না জমিয়ে ওপরে চলে এল পাঞ্চালী। গ্লানি মনে অবাঞ্ছিত কথা শোনার ফলে।

ছিঃ, কত নেমে গেছি! চাকরের কাছ থেকে কথা বা'র করবার আশায় ওখানে বসেছিলাম।

নন্দার ঘরের সম্মুখে পদধ্বনি শুনে বাইরে এল সে।

'নন্দাদি কোথায় গেছেন?'

'কি জানি, বলে যায় নি।' তির্যক চোখে তাকিয়ে থামল গৈরিক।

'কোন খারাপ খবর নেই তো?'

'পারিবারিক হ'লে আমি জানতাম।'

'আমি অফিসে খবর পেলাম নন্দাদি হঠাৎ বাইরে চলে গেছে। তাই এলাম কি হয়েছে জেনে নিতে।'

নন্দাশূন্য বাড়িতে নিজের উপ-স্থিতির সাফাই গেয়ে পাঞ্চালী বলল।

'কাল জ্যোতির্মীর বাড়িতেও জানতে পারলেম না, আশ্চর্য।'

'আপনাকে নন্দাদি বলেছিলেন বুঝি কাল যাবার কথা?'

'আমাকে কিছু বলতে হয় না।' গৈরিক নিজের ঘরে পা বাড়াল।

মরিয়া পাঞ্চালী।

'একটা বই দেবেন? পড়বার কিছু নেই।'

'নিয়ে যান।'

গৈরিকের ঘর থেকে একখানা বই সংগ্রহান্তে পাঞ্চালী বলে উঠল, 'বিদেশ যাচ্ছেন কবে?'

'যে-কোন দিন।'

'ফিরবেন কবে?'

'যে-কোন দিন।'

প্রতিহত পাঞ্চালী প্রশ্ন করল, 'একা যাচ্ছেন?'

'পথ চিনতে পারব।'

অপ্রতিভ পাঞ্চালী বলল, 'না, না, সে অর্থে বলি নি।'

গৈরিকের অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা, না?

সাহসে বুক বেঁধে পাঞ্চালী বলল, 'আমাদের বিমলা দত্তকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো, না?'

'হ্যাঁ, চমৎকার কর্মী।'

তার মানে? তার মানে সব।

ঈর্ষাদগ্ধ পাঞ্চালী কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে উঠল, 'একদিন আমার বাড়ি আসবেন নন্দাদির সঙ্গে?'

'কেন? ক্ষীরের সিঙাড়া খেতে?'

একবার গৈরিকের কণ্ঠে প্রগাঢ় কৌতুক। শেষ খাদ্য পাঞ্চালী এনেছিল উক্ত বস্তু।

'শুধু ক্ষীরের সিঙাড়া নয়।'

'বলুন দেখি, কী কী জানেন। শুনে নিয়ে বুঝব যেতে পারি কি না।'

গৈরিক এত সহজ হয়ে গেল?

জার্মেনী যাবার নামে এত উল্লাস? না, অন্য কারণ। কখনও এত প্রশ্রয় পায় নি পাঞ্চালী। আজ কণামাত্র পেয়ে চন্দ্রে হাত বাড়াল।

'এখন বলব না। তাহলে চমকে দেব কেমন করে?'

'চমকে দিতে চান?' কেমন নরম গলা গৈরিকের।

'বা রে, আমি দেখাব না আমার কৃতিত্ব?'

[ক্রমশঃ।

সাহিত্য পরিচয়

বিদ্যাসাগর / আনন্দধারা প্রকাশন

এই মহৎ জীবনী-গ্রন্থটির নব কলেবরে আত্মপ্রকাশকে সাহিত্যরসিক মাত্রই অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করবেন। সেকালের এক প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী জীবনীকার, বিদ্যাসাগরের মহৎ চরিত্র ও জীবনকে সুষ্ঠুভাবেই প্রকাশ করেছেন এই রচনার মাধ্যমে। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মধারার এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় এতে বিধৃত। দয়া ও বিদ্যার আধার এই পুরুষসিংহ কোনদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ না করে যে বিচিত্র সংগ্রামবহুল জীবনযাপন করে গিয়েছেন, তার তুলনা সত্যই মেলা ভার। দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও মমতা এই তিনটি গুণের সমন্বয়েই প্রধানত বিদ্যাসাগর চরিত্র গঠিত। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকও এ-সত্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত যে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। বস্তুত শুধু জ্ঞানের অধিকারী মহা পণ্ডিতরূপেই বিদ্যাসাগরকে ব্যাখ্যা করা চলে না; তাঁকে জানতে হলে, বুঝতে হলে তাঁর মমতামধুর বিশাল হৃদয়টিকেও বুঝতে হবে, জানতে হবে। আলোচ্য জীবনকথায় সেই প্রচেষ্টার পূর্ণ স্বাক্ষর বর্তমান। আর এজন্যই এই গ্রন্থটিকে শুধু প্রামাণ্যই নয়, হৃদ্যও বলা যায় স্বচ্ছন্দেই। এই মূল্যবান গ্রন্থটির নতুন রূপকার হিসাবে প্রকাশক সংস্থাও আমাদের ধন্যবাদ ভাজন। প্রচ্ছদ অনবদ্য, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচ্ছদকার—খালেদ চৌধুরী, প্রকাশনা—আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম: আঠার টাকা মাত্র।

নজরুল-স্মৃতি / সাহিত্যম

বিদ্রোহী কবি নজরুলের নাম কে না জানে। এই পরাধীন দেশে একদিন তিনি জনচিত্তকে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছিলেন, জাগিয়ে তুলে ছিলেন দেশপ্রেমের প্রেরণা, তীব্র আবেগ-প্রবণ লেখনীর মাধ্যমে। অবিভক্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম ফসল এই কবি আজও জীবিত, কিন্তু সে নামে মাত্রই। দুরন্ত রোগের প্রকোপে অগ্নিক্ষরা সে লেখনী আজ অচল, স্তব্ধ। আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি সুলিখিত রচনার মাধ্যমে সেই কবিকেই আবার তুলে ধরতে চেয়েছেন এই গ্রন্থের সম্পাদক পাঠকের সামনে। পশ্চিম ও পূর্ববাংলার এক-শতজন কবি, শিল্পী, সমাজসংস্কারক ও সাহিত্যিক তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে যা বলেছেন: নজরুল সম্বন্ধে তাই নিয়ে রচিত হয়েছে এই স্মৃতিকথা। কবি নজরুলের ভাবরূপটি সুন্দরভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে গ্রন্থোক্ত রচনাবলীর মাধ্যমে। এ পর্যায়ে যাঁদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা অনেকেই ছিলেন কবি নজরুলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের অধিকারী। সেই জন্যই হয়ত রচনাগুলি হয়ে উঠতে পেরেছে এত প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল। এই মূল্যবান স্মৃতিকথাটি উপহার দেওয়ার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। কবির চিত্র ক'খানি এই সংকলন গ্রন্থের আর এক সম্পদ। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। সম্পাদক—বিশ্বনাথ দে। প্রকাশক—সাহিত্যম, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম: ছয় টাকা।

কেয়াপাতার নৌকা / বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ

অখণ্ড বাংলা, সোনার বাংলার যে রূপটি আজ বাঙালী ভুলে গেছে তারই নিখুঁত ছবি এঁকেছেন কুশলী লেখক আলোচ্য উপন্যাসে। শস্য-শ্যামলা প্রাচুর্যে ভরা পূর্ববাংলা তার পরিপূর্ণ রূপ-মূর্তিতে ধরা দেয় পাঠকের মনে। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থের কাহিনী দেশ স্বাধীন ও দ্বিখণ্ডিত হওয়ার আগের। প্রবাসী গৃহস্থ অবনীমোহন রাজদিয়ায় এলেন মামাশ্বশুরের আমন্ত্রণে, সঙ্গে রুগ্না স্ত্রী সুরমা ও দুই যুবতী কন্যা। সুধা ও সুনীতি ও কিশোর পুত্র বিনু। নদী-মাতৃক পূর্ববাংলার স্নিগ্ধ-শ্যামল এক গঞ্জ এই রাজদিয়া। এর আকাশে কত রং-এর খেলা, বাতাসে কি যেন এক মাদকতা জড়ানো, আর এর মাটি তো মাটি নয় যেন একতাল সোনা। স্বাচ্ছল্যে, সমৃদ্ধিতে মানুষের হৃদয় উপছানো সুধার স্পর্শে রাজদিয়া যেন স্বর্গেরই একটি টুকরো। বস্তুত পূর্ববাংলার এমন মনোহর রূপ আর কোন লেখকের লেখনীতে এর আগে ফুটেছে বলে তো মনে হয় না। অবিশ্বাস্য আন্তরিকতার সঙ্গে লেখক দেশ ভাগের পূর্বের পূর্ববাংলাকে উপস্থিত করেছেন এই রচনায়। আর এই পরিবেশে কাহিনীর গতি বয়ে গিয়েছে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনীর মতই। চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেন পাঠক খুব সহজেই। মনুষ্যত্বের এই নিদারুণ অবক্ষয়ের দিনে হেমনাথ ও লালমোহনের মত চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক যেন হারিয়ে যাওয়া মনুষ্যত্বকেই পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিও যেমন জীবন্ত, তেমনই উজ্জ্বল। গ্রাম্য কামলা যুগল, বা ছোট্ট হিংসুটে মেয়ে ঝিনুককেই কি আমরা সহজে ভুলতে পারি? এককথায় অনবদ্য এই রচনা আমাদের যত আনন্দ দিয়েছে, ততই উৎসুক করে তুলেছে, আমরা সাগ্রহে এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডের প্রত্যাশায় রইলাম। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—প্রফুল্ল রায়। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স,

প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রচ্ছদ-শিল্পী—নবীন দত্ত, দাম : বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ঝড় / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ, লিঃ

মানুষের মনের এক বিচিত্র দিক উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য রচনায়। ঘর বাঁধার ইচ্ছা যে নারীর মনে কত প্রবল, সেই সত্যই যেন সোচ্চার হয়ে উঠেছে এই কাহিনীর নায়িকা সুখীর মাধ্যমে। নায়ক সীতাংশুর সংসারে শান্তি ও আরাম যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েও বুঝি সেজন্যই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারে নি সুখী কোনদিনই।

সীতাংশুর সংসারে পূর্ণ কর্তৃত্ব-লাভেও সন্তুষ্ট হতে পারে নি সুখী। তার নারীসত্তা বিদ্রোহই করেছে ভেতরে ভেতরে। শুধু ঘর পাওয়াই তো সব নয়, সে ঘরে একজন সাথী থাকাও যে প্রয়োজন। সীতাংশু যে চোখ মেলে চেয়ে স্বীকার করে নিতে পারে নি সে-প্রয়োজনকে। তাই সদ্য-বিপত্নীক রণধীরের হাত অত সহজেই ধরতে পারলে সুখী। ঘর বাঁধলো আবার নতুন করে রণধীরের সঙ্গে। ঝড় উঠলো সীতাংশুর জীবনে, কিন্তু সেজন্য কি সে নিজেই দায়ী নয়? অনবদ্য কৌশলে মানবমনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন লেখক বর্তমান রচনার মাধ্যমে। তাঁর বর্ণনার কেরামতি এককথায় তুলনাহীন। কলমের টানে টানে কাহিনীর আরণ্যক পরিবেশ যেন প্রাণ পেয়ে সাড়া দিয়ে উঠেছে। চরিত্র সৃষ্টিতেও নিপুণ তিনি। রণধীর, ব্রততী, সীতাংশু, সুখী ও মাধব প্রতিটি চরিত্রই গভীর ছাপ ফেলে যায় পাঠকের মননে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন, লেখক—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। প্রকাশক - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, প্রচ্ছদ - সুবোধ দাশগুপ্ত। দাম : আট টাকা মাত্র।

লোকরহস্য / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ, লিঃ

আলোচ্য গ্রন্থটিকে চরিতমালা হিসাবে বর্ণনা করাই সঙ্গত। অবশ্য চরিতমালা বলতে সচরাচর যা বোঝায় এটি তা নয়। বিখ্যাত মানুষের জীবন এতে বিধৃত হয় নি, শুধু জীবনে লেখক যে অসংখ্য লোক-চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন তার মধ্যে বেছে বেছে কয়েক-টিকে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। এক-একটি চরিত্রকে ঘিরে যেসব ঘটনা ঘটেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে, সঠিকভাবে তাই ধরেই লেখক এগিয়েছেন নির্ভুলভাবে। ফলে প্রতিটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক-একটি নিটোল ছোট গল্প। ছোট গল্পের মেজাজ ও ভঙ্গী এ দুটোই এখানে উপস্থিত। লেখকের অভিজ্ঞ ও রসজ্ঞ লেখনীর ছোঁয়ায় রচনাগুলি সহজেই হয়ে উঠতে পেরেছে শিল্পোত্তীর্ণ। প্রচ্ছদ চমৎকার, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক — আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, প্রচ্ছদ - পূর্ণেন্দু পত্রী। দাম : পাঁচ টাকা মাত্র।

প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রবন্ধ সংগ্রহ / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ, লিঃ

আলোচ্য গ্রন্থে আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও তার প্রথম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত করা হয়েছে। লেখক খ্যাতনামা সাংবাদিক ও বাংলা ভাষার ওপর তাঁর দখলও বড় কম নয়। ভাষা, সামাজিক সমস্যা, শিক্ষা, ইতিহাস ও নারী-সমস্যা বিষয়ক তাঁর সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভেরই যোগ্য। এই গ্রন্থের মাধ্যমে সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বৌদ্ধ পাঠকমাত্রেই আনন্দ লাভ করবেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—প্রফুল্ল-কুমার সরকার, সংকলক ও সম্পাদক—নকুল চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, প্রচ্ছদ - পূর্ণেন্দু পত্রী, দাম-পাঁচ টাকা মাত্র।

সমাজসংস্থা—আশা-নিরাশা / রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

আলোচ্য গ্রন্থটিতে কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বারো-তেরো বছর ধরে দেশের সমাজজীবনে যে বিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ধারণার কথা বলেছেন লেখক রচনাগুলির মাধ্যমে। সব অবস্থা ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে অবশেষে লেখক এই ধারণায় স্থিত হয়েছেন যে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পটপরিবর্তন না ঘটলে এবং সমাজের শ্রেণীগত সম্পর্ক না বদলালে ভারতের আর্থিক প্রগতি ব্যাহত থাকারই সম্ভাবনা অধিক। এ মত সম্বন্ধে আরও আলোচনার অবকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রবন্ধগুলি পড়লে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, লেখক পর্যাপ্ত বিচার-বিশ্লেষণের পরই স্বীয় মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধগুলি যে সুচিন্তিত এ সম্বন্ধে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। প্রচ্ছদ রুচিস্মিত, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—অশোক মিত্র, প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। প্রচ্ছদ—গণেশ বসু। দাম : সাত টাকা মাত্র।

প্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা / নবভারত পাবলিশার্স

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার লীলার মধ্যে রাস অন্যতম প্রধান বলেই খ্যাত। এই লীলার রূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক গৌহাটি শহরে থাকাকালীন সেখানকার সনাতন ধর্মসভায় ভগবান কৃষ্ণের রাসলীলা প্রসঙ্গে বড় বড় পণ্ডিতদের মুখে যেসব পাঠাদি শোনার সুযোগ লাভ করেছিলেন, তারই সারাংশ নিয়ে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। অতএব

এই রচনায় রাসলীলার যে-ভাবে প্রসঙ্গ, সেটিকে প্রাধান্য বলে গ্রহণ করা যায় সহজেই। রাসলীলা প্রসঙ্গে উৎসুক ভক্ত পাঠক মাত্রই যে এই গ্রন্থটি হাতে পেয়ে খুশী হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদ অতি মনোরম, অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। লেখক—শ্রীরমণীমোহন রায়। প্রাপ্তিস্থান—নবভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, প্রচ্ছদশিল্পী—শ্রীঅরুণ গুপ্ত। দাম: তিন টাকা মাত্র।

কৃষ্ণকলি / বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড।

কৃষ্ণকলি, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ যখন হাসির আলোয় ঝলমল করতে থাকে, তখন তার দীপ্তিতে মুগ্ধ হবে না এমন কে আছে? তেমনি এক অনবদ্যাঙ্গিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু। পদস্থ অফিসারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সীমা এক আশ্চর্য মেয়ে। অন্তরের মাধুর্যে ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় তার শ্যামোজ্জ্বল কান্তি পেয়েছে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। সবরকম অন্যায় ও নিচতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ সোচ্চার। এই মেয়ে কেমন করে গড়ে নিল নিজের ভাগ্যকে, খুঁজে নিল নিজের প্রেমাস্পদকে, গ্রন্থের কাহিনীর মাধ্যমে তাই বিধৃত। লেখিকার রসোজ্জ্বল রচনাশৈলী কাহিনীর আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে সহায়ক। আমরা এই উপন্যাসটি পাঠ করে প্রভূত আনন্দ পেয়েছি ও এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—অলকা চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা -৯, প্রচ্ছদ—শ্রীঅজিত গুপ্ত। দাম: আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

কারাগার / ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে কয়েকটি কবিতা সংকলিত করা হয়েছে। লেখিকা রাজনৈতিক কর্মী, এই বাবদ কিছুদিনের জন্য কারাবরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। সেই ক'টি দিনের অভিজ্ঞতাকেই তিনি প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন আলোচ্য কবিতাবলীর মাধ্যমে। কবিতাগুলির পেছনে যে ভাবসমৃদ্ধ উপলব্ধির অনুভূতি বর্তমান, সেটাই এঁদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। জেলের বদ্ধ প্রাচীরের অন্তরালে বসে লেখিকা জীবনকে যেভাবে অনুভব করেছেন, তারই রম্য আভাসে এরা সমুজ্জ্বল। লেখিকার রচনাশৈলীও প্রশংসার দাবী রাখে, আধুনিক কাব্য রচনা রীতি তিনি ভালভাবেই অধিকার করেছেন। প্রচ্ছদ ও অপরাপর আঙ্গিক প্রশংসনীয়। লেখিকা—কনক মুখোপাধ্যায়। পরিবেশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ, লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। প্রচ্ছদ - খালেদ চৌধুরী। দাম: চার টাকা মাত্র।

Interation of Bondey Matoram

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বন্দে-মাতরমের পূর্ণ সংজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেছেন লেখক; ইংরাজী ভাষায় রচিত আলোচ্য গ্রন্থে। বন্দেমাতরমের মূল তাৎপর্য এই রচনার মাধ্যমে স্বপ্রকাশ। বাঙালী পাঠকের সঙ্গে বিদেশী পাঠকও এই তাৎপর্যকে অনুসরণ করতে পারেন স্বচ্ছন্দে। এ-রচনা প্রয়োজনীয় সাহিত্যের কোঠায় পড়ে। লেখকের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—এস কে দিনদা এম এ, বি এল। পরিবেশক—স্যাঙ্গুইন, পাবলিশার্স 'কনসার্ন' ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, দাম: চার টাকা মাত্র।

একটি প্রেমের মৃত্যু / রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

রাজনৈতিক কচকচিতে পূর্ণ গ্রন্থ কাহিনীর স্বাভাবিক গতি পদে পদে ব্যাহত। লেখক রাজনীতির সঙ্গে প্রেম মিশিয়ে যে অপখিচুড়ির সৃষ্টি করেছেন, নৈপুণ্যের অভাবে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে নি। এই রচনা এককথায় বোরিং বা ক্লান্তিকর। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭, প্রচ্ছদ—শ্রীঅজয় মুন্সী। মূল্য: চার টাকা মাত্র।

রমেশচন্দ্র দত্ত / সারস্বত লাইব্রেরী।

বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ঔপন্যাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তের জীবনায়ন করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। রমেশচন্দ্রের ন্যায় কৃতী সাহিত্যকার সম্বন্ধে আজও যথোচিত আলোচনা করা হয় নি, কাজেই গ্রন্থ-লেখকের এই প্রচেষ্টাকে মহৎ বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। স্বল্প পরিসরের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের গৌরবোজ্জ্বল জীবনের একটি সুষ্ঠু পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। জীবনীমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বর্তমান গ্রন্থটি এক উল্লেখ্য সংযোজন হিসাবেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশনায়—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। প্রচ্ছদ-চিত্র—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, দাম: তিন টাকা মাত্র।

মাটি ছেড়ে মহাকাশে / বিচিত্রা-প্রকাশন।

বহুদিনের সাধনা ও প্রস্তুতির ফলে মানুষের মহাকাশ অভিযান সফলতায় পর্যবসিত। চাঁদের মাটিতে মানুষের সত্যই পদক্ষেপ ঘটেছে। মানুষের ও বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য সাফল্যের কথা আজ সকলেরই জানা। কিন্তু এর পেছনে যে দীর্ঘ ইতিহাস রয়ে গেছে, সে-সম্বন্ধে আমরা কতটুকু ওয়াকিবহাল? আলোচ্য গ্রন্থে সে সম্বন্ধেই কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন বলে মনে হয়। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—গোলোকেন্দু ঘোষ। প্রকাশনা—বিচিত্রা-প্রকাশন, ১৮, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯, অলঙ্করণ ইন্দু গুপ্ত, শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত, শ্রীসূর্য রায়। দাম: দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

সামান্য-অসামান্য / আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ, লিঃ।

দু খানি নতুন ধরনের গল্প সংকলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। পুরনো দিনের কলকাতায় ছিল অনেক রকম মানুষ আবার তারই মধ্যে কিছু ছিল একেবারে অন্যরকম তারা সম্ভ্রান্ত অভিজাতদের দলে দলে নয় আবার মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদেরও কেউ নয়। এরা খেটে-খাওয়া মানুষ—তবু চাষী শ্রমিক বলতে যাদের বোঝায়, এরা তাদেরও দলের নয়। অই বিগত-যৌবনা ন'টি গোলাপ সুন্দরী ম্যাজিক-ওয়ালা প্রফেসর পীতাম্বর, আর বিনোদিনী নাট্য সঙ্ঘের বিনোদিনীর মত মানুষদের কথা বুঝি আজও আমাদের জানা হল না তেমনভাবে। এইরকম মানুষদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রন্থোক্ত গল্প দুটির বিষয়বস্তু। গ্রন্থকারের মুন্সীয়ানায় চরিত্রগুলি প্রাণোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে। বক্তব্য বিশ্বাস যোগ্য। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রকাশনা - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, প্রচ্ছদ - সুবোধ দাশগুপ্ত, দাম ঃ পাঁচ টাকা মাত্র।

সামনে সাগর / বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস।

গঙ্গাসাগর হিন্দুর পরমতীর্থ। প্রতি বছর ভারতের নানা দিক-দিগন্ত থেকে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমে এই ছোট্ট জায়গাটিতে, মকর সংক্রান্তিতে স্নান করে পুণ্য অর্জনের আশায়। যাত্রীর ভিড়ে গা ভাসিয়ে নির্মলও চলেছিল সেবার গঙ্গাসাগরে শীতের এক হিমেল প্রভাতে। পথে-প্রান্তরে কেটে গেল কয়েকটা যাযাবর দিন, কত লোকের হাসি-কান্না দোলা দিয়ে গেল তার মনে। এরই মধ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে ভারী হয়ে উঠল তার ঝুলি। তারপর এল ফিরে যাওয়ার পালা। সচকিত হৃদয় উপলব্ধি করল, দু'দিনের এই খেলায় সে দিয়েছে যতটুকু—পেয়েছে বুঝি তার অনেক বেশি। মনোরম ভঙ্গীতে সাগরতীর্থ যাত্রার এক অনবদ্য ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক এই কাহিনীর মাধ্যমে। তাঁর ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছ। প্রচ্ছদ শিল্পসুষম। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক - শক্তিপদ রাজগুরু, প্রকাশক—বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, প্রচ্ছদ - গণেশ বসু, দাম : পাঁচ টাকা মাত্র।

মলিন আয়না / সারস্বত লাইব্রেরী।

আলোচ্য ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থটি নাট্য-সাহিত্যের অন্তর্গত। আধুনিক গদ্য-কাব্যের রীতিতে নাটকটি পরিবেশিত। লেখার মধ্যে কিছুটা মৌলিকত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—রাম বসু। প্রকাশনায়—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, প্রচ্ছদপট—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দাম: আড়াই টাকা মাত্র।

মুক্তাবিন্দু

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবী

এসো বসি এই ছায়াতলে,
শ্রান্ত মুখ ক্লেদাক্ত গ্লানিমা, সর্বম্লান থাক্ অন্তরালে।
ক্লান্তমুখে রক্তরেখা, নগ্নপদ থাক্ ধূলিমাখা,
এখনো তো হৃদয়ে জ্বলিছে অনির্বাণ দীপ্ত আলোশিখা।
শক্তিহীন বাহু যদি কোল দিতে চায় মৃত্তিকারে,
দিব তারে আলিঙ্গন আমার শ্বাশ্বত অধিকারে।
এসো বসি এই ছায়াতলে,
একবার ফিরে যাই, শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের
বিস্মৃত কল্লোলে।
যে সমুদ্র পার হতে হাতছানি দিয়েছিলো জীবনের উষা,
যে সমুদ্র মিটাইছে অহর্নিশি লক্ষ মরুতৃষা।
বক্ষোমাঝে তৃষ্ণা জ্বলে কত শত কী বিচিত্র রূপে
শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের সুরভিত ধূপে।
দেবালয়ে সাঙ্গ পূজা ; দেবতার প্রাণ তবু হয়নিতো হারা,
নন্দনবনের ধারে যেন বহে মন্দাকিনী ধারা।
সেই স্রোতে মিশে যাক্ যত অশ্রুকণা,
যদি থাকে হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা।
যদি মোর অবিমিশ্র পাপ-পুণ্য রাশি,
ভাসাইয়া দিতে পারি পুণ্যতীর্থে বসি।
সহস্র বর্ষের পরে সমুদ্র কি কলনাদে কবে সে বারতা?
আমার অতল তলে আত্মার আনন্দ স্বর্গে
শুক্তিগর্ভে অম্লান জ্বলিছে "একটি মুক্তা"।

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত নব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য

॥ চিত্র সংবাদ ॥

মাসিক

॥ বৈশাখ, ১৩৭৭ ॥

ভারতসভা হলে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনে ভাষণরত শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মৈত্রী সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী পোপোভা

মেক্সিকো শহরে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি মিঃ অর্ডাজ

যুবরাজ বীরেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ সহ নেপালের নবপরিণীতা যুবরাজ্ঞী শ্রীমতী ঐশ্বর্য দেবী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওয়াই, বি, চ্যবনের জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান
বিরোধী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা

মাসিক বসুমতী, বৈশাখ / '৭৭

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস (ক্ষমতাসীন) সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের সংগে পঃ বংগের প্রাক্তন
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
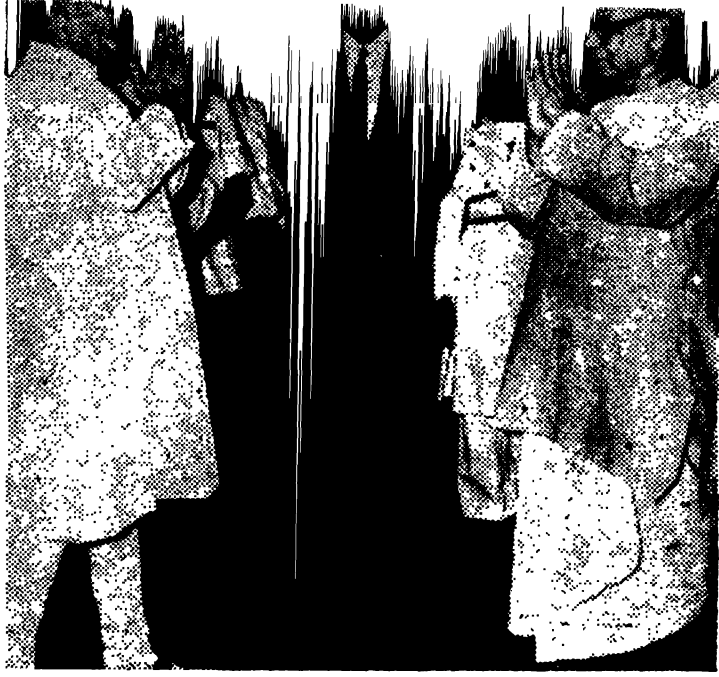
মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেবার পর রাজ্যপাল শ্রী এস, এস, ধাওয়ানের নিকট
থেকে বিদায় নিচ্ছেন শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

টিটাগড় কেলভিন জুট মিলের প্রধান গেটের সম্মুখে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রাক্তন কেন্দ্রীয়
আইনমন্ত্রী ও বর্তমান সংসদ সদস্য শ্রীঅশোককুমার সেন ও প্রদেশ কংগ্রেস
সভাপতি শ্রীবিজয়সিং নাহার

স্যামুয়েল পেপিস

যে দিকগুলি ইংল্যাণ্ডকে এক প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত দিয়েছিল, নৌবহর তাদের অন্যতম। আবার এই নৌবহরের সমৃদ্ধিসাধনে যাঁদের গৌরবময় ভূমিকা যেমনই সার্থক তেমনই অবিস্মরণীয়—তাঁদের মধ্যে স্যামুয়েল পেপিস একটি উজ্জ্বল নাম। ইংল্যাণ্ডের অসামান্য নৌবহরকে কেন্দ্র করে অনেকানেক কৃতবিদ্য প্রতিভাধরের আবির্ভাব সারা জাতির গর্ব ও গৌরব-বর্ধনে যে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্যামুয়েল পেপিস এই প্রতিভাধরদের একটি মহান দৃষ্টান্ত। স্বীয় পিতৃভূমির নৌবহরের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ এবং অসামান্য অবদান ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হয়ে আছে।

সপ্তদশ শতাব্দী ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এক সন্ধিলগ্ন। এই সময়েই ইংল্যাণ্ড অল্পকালের জন্য একবার মাত্র সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। এই শতাব্দীই নানা বিপ্লব ও ব্যাপক পরিবর্তনের কাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই শতকেই ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিলন ঘটল। এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে বর্তমান দেখা গেছে রাণী এলিজাবেথকে---আবার এই শতকেই ইংল্যাণ্ডের রাজাকে প্রাণ দিতে হল জনতার বিচারে।

স্যামুয়েল পেপিসও এই শতকেরই ফসল। সাংবাদিকতার প্রাণকেন্দ্র ফ্লিট স্ট্রীটের নিকটবর্তী স্যালিসবারি কোর্টের এক দর্জির সন্তান। স্যামুয়েলের জন্ম ১৬৩৩ সালে। ১৬৫৫ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিবাহিত জীবনে বরণ তখন ষোল। ত্রিশ বছর বয়সে ১৬৬৯ সালে তাঁর দেহান্তর ঘটার পর পেপিস আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নি।

১৬৬৯ সাল থেকেই বলতে গেলে পেপিসের জীবনের ইতিহাসের বৃহত্তম পর্বগুলি রচিত হতে থাকে। এই সময় থেকে ১৬৮৩ পর্যন্ত পেপিসের জীবনের এক অত্যন্ত ব্যস্ততাময় কর্মমুখর কাল হিসাবে গণ্য করা যায়। পেপিসের জীবনের যা কিছু মহান সাধনা, যা কিছু বিরাট অবদান---এই সময়-সীমার

স্যামুয়েল পেপিস (সাঁইত্রিশ বছর বয়সে)

মধ্যেই তাদের পরিকল্পনা, পরিচর্যা, রূপায়ণ ঘটেছে বা ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকেও নানাবিধ সমস্যা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দ্বিতীয় চার্লস তখন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে সমাসীন।

১৬৭৩ সালে চল্লিশ বছর বয়স্ক পেপিসকে নিযুক্ত করা হল ইংল্যাণ্ডের লর্ড হাই এ্যাডমিরালের দপ্তরের সচিব হিসাবে। যে নৌবাহিনী হয়ে পড়েছিল এক অতীব দুর্বল ভারস্বরূপ, সেই বাহিনী সজীব হয়ে উঠল অফুরন্ত শক্তিতে। পরিপূর্ণ হয়ে উঠল পেপিসেরই কুশলী হাতের যাদুকরী স্পর্শে। রাজ-শক্তির যে উপেক্ষা, অবহেলায় ভরে উঠেছিল জাতীয় নৌবহর, স্যামুয়েলের মত দক্ষ কর্ণধার সেই উপেক্ষা, অনাদরের বীজ সমূলে উৎপাটিত করে ছাড়লেন। যে দিকটি ছিল শুধু অকারণ ব্যয়ের কারণ, তারই চেহারা বদলে দিলেন পেপিস। এককথায় পেপিসের কুশলতায় সবুজ প্রাণপ্রাচুর্যে ঝলমলিয়ে উঠল দেশের নৌবাহিনী।

শুধু বরণীয় নৌবীর হিসাবেই নন, নৌবাহিনী সংক্রান্ত প্রশাসক হিসাবেও স্মরণীয় হয়ে আছেন পেপিস। কিন্তু এই প্রাণপাত সাধনা, দুশ্চর তপস্যা, অক্লান্ত কর্মোদ্যম সেদিন কি স্বীকৃতি পেল---অভাবনীয় নৈপুণ্যের বিনিময়ে কতটুকু সমাদর পেলেন পেপিস? বারংবার প্রতিনিয়ত তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণের। নানা অভিযোগ বারংবার আনীত হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। হাউস অফ কমন্স-এ আসন লাভ করার পরও এ অবস্থা থেকে মুক্তি পান নি পেপিস। আসামীর কাঠগড়াতেও দাঁড়াতে হয়েছে এই অসামান্য বীরকে। যার আর্থিক ধাক্কা সামলাতে তাঁর সর্বস্ব বিকিয়ে গেছে। হৃতসর্বস্ব হয়েছেন তিনি।

১৭০৩ সালে সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। হার্ট স্ট্রীটের সেণ্ট অলেভস চার্চে তাঁর স্ত্রীর স্মৃতি-স্তম্ভের পাশে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

—অনুসন্ধানী

মীরা কী মল্লার

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

॥ উনিশ ॥

ফাল্গুন এসে গেছে। কেটে গেছে শীতের প্রকোপ। তবু সকালের হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা আমেজ। প্রথম দু'-চার দিন বেশ ভালো লাগছিলো মীরার। ভেবেছিলো গিরধরজীর মন্দিরে এবার খুব ঘটা করে করবে হোলির উৎসব। তার জন্যে সব ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলো নিজের গোমস্তাকে।

কিন্তু ফাল্গুনের কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। কোনো কিছুতেই মন লাগে না। পূজোয় নয়, গানে নয়, পড়াশুনোয় নয়।

শুধু এমনি চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে। এক এক সময় আপনা থেকে চোখে জল আসে। কোনো কারণ ভেবে পায় না।

কেন? বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে মীরা মনে মনে জিজ্ঞেস করে,—কেন? কেন এই বিষাদ আমার মনে?

পাথরের বিগ্রহের চোখে স্তব্ধ দৃষ্টি।

মীরার মনে কোনো সাড়া জাগে না। কোনো উত্তর পায় না মনের মধ্যে।

এক বিরাট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে গেছে মহারানা সাঙ্গা। এবার মোকাবিলা হবে বাবর শা'র সঙ্গে।

দু'বেলা হরকরা আসে খবর নিয়ে। চিতোরগড়ের পুরুষেরা তাদের মুখে খবর শোনে বাইরের দরবার ঘরের সামনে। সে সব খবর অন্য লোকের মুখে মুখে চলে আসে রাওলার ভেতরে। যে খবর নিয়ে আসে তাকে ঘিরে ধরে অন্তঃপুরের রাজপুতানীরা। তাদের কেউ-না-কেউ আসে মীরার কাছে। খবর শোনে মীরাও।

শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাশ

কানুয়ার ময়দানে মুখোমুখি সেনা-সন্নিবেশ করেছে বাবর ও সাঙ্গা।

এত বিশাল বাহিনী নিয়ে এ পর্যন্ত যুদ্ধ করে নি কোনো রাজপুত রাজা।

কিন্তু মোগলদের আছে কামান বন্দুক।

সারা রাজপুতনায় একটা অধীর প্রতীক্ষা, একটা বিপুল উৎকণ্ঠা।

চিতোরগড়ে রাণী ধনবাঈয়ের মুখ শুকনো। দুবেলা পুজো দিচ্ছে মন্দিরে গিয়ে।

বনবীর, কুমার মলদেব, যুবরাজ রতন সিংহ এঁরা যান নি রানা সাঙ্গার সঙ্গে। রানা এঁদের চিতোরগড়ে রেখে গেছেন। এমনি বলা হয়েছে দুর্গরক্ষা করার দায়িত্ব এঁদের এবং যুবরাজকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা হয়েছে [illegible] যে মহারানা [...] বিশ্বাস করেন না। তাই এঁদের সঙ্গে নিয়ে যান নি। যুবরাজ ভোজরাজ যখন বেঁচে ছিলেন এমন কোনো যুদ্ধ নেই যেখানে তিনি যান নি রানার সঙ্গে।

বনবীর, মলদেব, রতন সিংহ এঁদের মুখ পাথরের মতো। মনের ভাব আঁচ করার উপায় নেই। কিন্তু ওঁদের চোখ উদ্বিগ্ন। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

ওঁদের মনেও সংঘাত। রানা যদি যুদ্ধে হেরে যান কিংবা যদি মারা যান, মেবার রাজ্যের ওপর এক নিদারুণ সংকট ঘনিয়ে আসবে। মোগল বাহিনী যদি মেবারের দিকে এগিয়ে আসে, সিসোদিয়া সৈন্যের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা রতন সিংহের নেই। চিতোরগড়ে যাঁরা আছেন, তাঁদের কারোরই নেই।

যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসেন রানা সাঙ্গা, তাহলেও এঁদের তিনজনের বিপদ কম নয়। সামনে এই বিপদ বলেই রানা সাঙ্গা মলদেবকে কিছু বলেন নি যোধপুরের রাঠোরদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে চান না বলে। বনবীরকে কিছু বলেন নি মেবারের ভেতরে কোনো রকম গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে চান না বলে। কিন্তু মোগলদের হিন্দুস্থান থেকে বার করে দিতে পারলে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবেন রানা সাঙ্গা। তখন রাঠোরদের পরোয়া করতে হবে না। শক্তিমানের পেছনে এসে দাঁড়াবে রাজপুতনার অন্যান্য রাজারা। সুতরাং মেবার রাজ্যে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা বনবীরের থাকবে না।

সবাই জানে রানা ফিরে এলে কুমার জয়মলকে যোধপুরে ফিরে যেতে হবে, বনবীরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। শোনা যায়, মহারানা নাকি প্রধান মন্ত্রী পুরণমলকে গোপনে জানিয়েছেন, তাঁর মনের এই বাসনা।

কিন্তু কথাটা গোপন থাকে নি। কি করে যেন জানাজানি হয়ে গেছে। মীরাও জানে।

এতবড়ো এই চিতোরগড়ে মীরা একেবারে একা। ঝালী রাণী তো আগেই মারা গেছেন। রাণী কারমেতনবাঈও এখানে নেই, চিতোরগড় ছেড়ে চলে গেছেন রণথমভোর দুর্গে। রাণী ধনবাঈয়ের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই মুখ দেখাদেখি নেই। মহারাণী কুবরনবাঈও নিজের মহল থেকে একেবারেই বেরোন না।

মীরা একেবারে নিঃসঙ্গ। তবু নিজেকে একা মনে হয় নি এ পর্যন্ত। কিন্তু এবার সত্যি সত্যি নিজেকে একা মনে হোলো।

শুধু আমি একা নই, মীরা বললো গিরধরজীর বিগ্রহকে, এখন তুমিও একা। এত বিশাল এই চিতোরগড়ে তুমি আর আমি, আমরা দু'জনেই একা।

আগে তোমার ওপর আমার খুব ভরসা ছিলো, মীরা ভাবলো, কিন্তু এখন আমি মনে মনে ভয় পাচ্ছি। আমি তোমার কাছে মনের জোর চাইছি, কিন্তু আমি তো পাচ্ছি না।

মীরা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো।

অনেক কিছুই মীরার চোখে পড়ে। গোপনে কারা যেন আসে বনবীর, রতন সিংহ ও মলদেবের কাছে, অন্ধকারকক্ষে চুপি চুপি তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। গভীর রাতে শোনা যায় একজন কি দু'জন অশ্বারোহীর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, অনেক দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ।

নানারকম কথা বলে রাওলার রাজপুতানীরা, নিচু গলায় বলে নানারকম কথা।

বনবীর নাকি গোপনে যোগাযোগ রাখছে বাবর শা'র সঙ্গে। তার কি মতলব বোঝা মুশকিল, নিশ্চয়ই চিতোরগড় তুলে দিতে চায় না বাবরের হাতে।

অতো সহজ নাকি? এখনো তো বেঁচে আছেন মহারানা সাঙ্গা।

কিন্তু যদি তিনি হেরে যান যুদ্ধে? যদি ফিরে না আসেন?

রাজপুতানীদের কিসের ভয়? হাসতে হাসতে আগুনে ঝাঁপ দেবে।

মুখে বললো বটে একথা, কিন্তু দেখা গেল অনেকেই এখন নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে রাণী ধনবাঈয়ের কাছে। যাই হোক, মোগলরা যে চিতোর অধিকার করবে একথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। রতন সিংহ হয়তো মেনে নেবে বাবরের কোনো শর্ত, হয় তো অনেক টাকা উপঢৌকন দেবে ওঁকে। মেবারের ওপর রতন সিংহের অধিকার বাবর মেনে নেবে এই শর্তের বিনিময়ে। আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে না রাজপুতানীদের, রাণী ধনবাঈয়ের কৃপাদৃষ্টি থাকলে রাওলার কোনো মহিলার কোনো অসুবিধে হবে না।

একজন এসে বললো, মীরাও যদি একদিন যান রাণী ধনবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে, রাণী ধনবাঈ খুশি হবেন।

মীরা একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

আরেকজন এসে বললো, রাণী ধনবাঈ একটু চটেছে মীরার ওপর।

তখনো মীরা হাসলো, উত্তর দিলো না।

দু-চার-পাঁচজন এখনো এসে দেখা করে মীরার সঙ্গে। কিন্তু তাদের মনে বড়ো ভয়। বেশিক্ষণ থাকতে চায় না, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। বেরোবার সময় চকিতদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকায়, কেউ লক্ষ্য করেছে কি না যে ওরা এসেছে মীরার মহলে?

দু'একজন বললো, মীরাজী আপনি মেড়তায় চলে যান, আপনার ভায়ের কাছে।

কেন?

এখানে আপনি নিরাপদ নন।

মীরা সহজভাবে জিজ্ঞেস করে, এখানে আমার ভয়ই বা কিসের? আমার সঙ্গে তো কারো কোনো শত্রুতা নেই।

যুবরাজের ধারণা, আপনি কারমেতনবাঈয়ের পক্ষে। যদি কোনোদিন সিংহাসন নিয়ে গণ্ডগোল বাধে, যদি সিংহাসন দাবি করেন কুমার বিক্রমজিৎ, আপনি তাঁকে সমর্থন করবেন এবং আপনি ওঁর পক্ষে গেলে মেড়তার রাঠোরেরা দাঁড়াবে তাঁর পেছনে এবং সেই সঙ্গে মেবারের সেই সব সর্দার, যাঁরা ছিলেন কুমার ভোজরাজের অনুগত। মেবারের সাধারণ প্রজারাও যে আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, একথা যুবরাজ রতন সিংহের অজানা নয়।

কিন্তু মীরার মনে কোনো ভয় নেই। সে বলে, চিতোরগড় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। সিংহাসন নিয়ে এসব ঝগড়া-বিবাদে আমার কোনো রকম আগ্রহ নেই।

তবু আপনি চলে যান। যুবরাজ মনে মনে আপনাকে ভয় পান। হাতে ক্ষমতা এলে তিনি নানারকমভাবে আপনার অসুবিধে সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন।

আমার গিরধরজী আছেন আমার সঙ্গে,---মীরা মনে মনে ভাবে,---আমার কোনো বিপদ হবে না, কোনো অসুবিধে হবে না, হতে পারে না।

এখানে গিরধরজীর মন্দির। এখানেই থাকতে হবে আমাকে। এখানে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন আমার স্বামী কুমার ভোজরাজ। আমার শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে আমাকে।

কিন্তু এসব কথা এখন উঠছে কেন?—গুমরে ওঠে মীরার মন। সবই কি শেষ হয়ে গেছে নাকি। কেন সবার মনে এই হতাশা। কেন সবার মনে একটা পরাজয়ের ভাব। রানা সাঙ্গা আর বাবরের মধ্যে যুদ্ধ তো এখনো আরম্ভই হয় নি। কেন সবাই ধরে নিচ্ছে যে, রানা হেরে যাবেন এই যুদ্ধে? আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে তো হেরে আসেন নি রানা সাঙ্গা।

এর পেছনে আছে বনবীর। চিতোরগড়ের আবহাওয়া সে বিষিয়ে দিয়েছে। নানারকম গুজব সৃষ্টি করে নষ্ট করে দিয়েছে সবার মনের জোর।

সবাই শুধু একটি কথাই বলছে, মোগলদের কামান আছে, বন্দুক আছে, দূর থেকে ওরা শত্রু ঘায়েল করতে

পারে, শত্রুর কাছে এসে যুদ্ধ করতে হয় না। রাজপুতরা যতোই সাহসী হোক, বেপরোয়া হোক, এই নতুন অস্ত্রের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ওদের নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে রাজপুত মরবে, মোগল মরবে দু'জন-চারজন।

রাজপুতবাহিনীর আয়তন অনেক বড়ো। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ-দলাদলি। অম্বরের সঙ্গে বুঁদির ভাব, সিসোদিয়াদের অনেকের সেটা পছন্দ নয়। রাঠোরেরা সর্বান্তঃকরণে সহায়তা করবে না সিসোদিয়াদের, কারণ রানা যুদ্ধে জিতলে রাজপুতনায় রানা সাঙ্গার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে, যেটা রাঠোরেরা চায় না। রানা যোধপুরের রাঠোরদের একেবারে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস করেন শুধু মেড়তিয়া রাঠোরদের। বেশ, তাদেরই নিয়ে যুদ্ধ করুন রানা, দেখা যাক, কি রকম যুদ্ধ জেতেন।

শোনা যাচ্ছে সর্দারদের কাউকে কাউকে নাকি ঘুষ দিয়ে কিনে নিয়েছে বাবর শা। ওরা রানার পক্ষে থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো লড়বে না।

এসব কথা চিতোরগড়ে লোকের মুখে মুখে ফিরছে। মেবার রাজ্যে সাধারণ প্রজারাও আলোচনা করছে এসব কথা।

বনবীর, শুধু বনবীর এজন্যে দায়ী,—মীরা জানে,—সে আর তার অনুগত লোকেরা নানারকম রটনা করে ভেঙে দিচ্ছে সবার মনের জোর।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই যে আমরা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি, মীরা ভাবলো। চারশো বছর আগেও কি এরকমই পরিস্থিতি হয়েছিলো, যখন পৃথ্বিরাজ চৌহান হেরে গিয়েছিলো মহম্মদ ঘোরীর কাছে?—মীরা জিজ্ঞেস করলো নিজেকে।

তারপর গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে তাকালো। শান্ত সেই বিগ্রহের দৃষ্টি। হাতে বাঁশি।

তুমি না বলেছিলে, সম্ভবামি যুগে যুগে? তুমি এখন কোথায়?

নিশ্চল নিস্তব্ধ বিগ্রহ। মীরার মনের মধ্যেও কোনো উত্তর নেই।

এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

মনে শুধু একটা শূন্যতা, শুধু একটা বিষাদ।

আমরা হেরে গেছি,—মীরা ভাবলো,—আমরা বার বার হেরে যাচ্ছি। তলোয়ার হাতে নিলেই কেন হেরে যাচ্ছে আমাদের যোদ্ধারা?

কিন্তু হার মানলে তো চলবে না। তাহলে তো জীবনের কোনো মানে হয় না। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকা? না, তা তো নয়।

আমাদের জিততেই হবে, যে করেই হোক।

ওরা পারবে না,—মীরা ভাবলো,—কিন্তু আমি পারবো। যেভাবে পেরেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু, যেভাবে পেরেছেন গুরু নানক, সন্ত কবীর, সেভাবেই আমি পারবো। আমার আর অন্য রাস্তা নেই।

তুমি আছো গিরধরজী। তুমি আছো আর আমি আছি। আমাকে পারতেই হবে।

যুদ্ধ তো রাজায় রাজায়, সাধারণ প্রজাদের কি? ওরা সাধারণভাবে একটু সুখ একটু শান্তি নিয়ে দু'বেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়। তাদেরই জন্যে চাই শান্তির রাজত্ব, কিন্তু কি ভাবে, গিরধরজী, কি ভাবে?

দিনরাত মীরা শুধু ভাবছে। মীরা আনমনা। মীরা বিষণ্ণ। যারা আসে, শুধু ওরাই কথা বলে, মীরা কিছু শোনে, কিছু শোনে না, আর কোনো উত্তর দেয় না।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে মীরাজী। সাংঘাতিক যুদ্ধ।

যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি। রাইসিনের রাও সিলহাদি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নাম শোনা যাচ্ছে আরো অনেকের।

আমি জানি, ভাবলো মীরা।

রানাজী খুব জখম হয়েছেন। তাঁকে অচেতন অবস্থায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

মীরা ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলে নিলো কোনো রকমে।

হাজারে হাজারে মারা পড়েছে রাজপুত সৈন্য।

আমি জানি।

রাজপুতেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি।

পালিয়ে গেছেন মেড়তার বীরমদেবজীও।

কোথায় গেছেন তিনি?—মীরা একটু উৎকণ্ঠা বোধ করলো তার জ্যাঠামশায়ের জন্যে।

রাণাজীর সঙ্গে,—রণথমভোর দুর্গে।

একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলো মীরা। শুধু বীরমদেবজীর জন্যে নয়, রাণা সাঙ্গার জন্যেও। রণথমভোর দুর্গে আছেন রাণী কারমেতনবাঈ, কুমার বিক্রমজিৎ, কুমারী উদাবাঈ। আদেশ, আছেন সব বিশ্বস্ত সর্দারেরা। ওখানে রানার ভয় নেই। রণথমভোর দুর্গে রানা নিরাপদ। সে দুর্গ দখল করা অসম্ভব। বাবর সেদিকে যাবে না।

আরো একটা খবর আছে।

কিন্তু ওরা কেউ মুখ ফুটে বলতে পারছিলো না। ওরা ইতস্তত করছিলো।

তবু বলতে তো হবেই।

শেষ পর্যন্ত বললো মীরাকে। খুব মৃদু গলায় জলভরা চোখে মাথা নিচু করে বললো।

মেড়তার রতন সিং,—মীরার বাবা,—উনিও মারা গেছেন কানুয়ার যুদ্ধে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো মীরা।

রতন সিং,—বীরমদেবজীর ছোটো ভাই,—রাও দুদাজীর ছোটো ছেলে। মীরা বাবার সঙ্গ বিশেষ পায় নি। মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবা চিরকালই বাইরে বাইরে ঘুরেছে রানা সাঙ্গার সঙ্গে, রানা সাঙ্গার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচরদের একজন হয়ে।

মীরার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

এই প্রথম গিরধরজীকেও কিছুক্ষণ ভুলে গেল মীরা। কিছুক্ষণের জন্যে ভাবল, সে শুধু বাবার অত্যন্ত আদরের একমাত্র মেয়ে। মাটিতে লুটিয়ে আর দশটি সাধারণ মেয়ের মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদলো। তারপর একসময় উঠে চোখের জল মুছে নিজের গোমস্তাকে ডাকিয়ে বললো, আমার ভাই জয়মলকে খবর পাঠাও মেড়তায়। ওকে অনেক দিন দেখি নি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।

না, মীরাজী না, জয়মলকে এখানে আসতে বলবেন না,—বললো রাজপুতানীরা,—যুবরাজ রতন সিংহ, বনবীর, মলদেবজী এরা কেউ পছন্দ করে না মেড়তিয়া রাঠোরদের। ওদের সঙ্গে ভীষণ শত্রুতা। জয়মল এখানে এলে বিপদে পড়তে পারে।

মীরা উঠে দাঁড়ালো। নাক দু'টো তার ফুলে উঠেছে। চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

যতক্ষণ মীরা বেঁচে আছে, তার ভায়ের কোনো বিপদ হতে পারে না চিতোরগড়ে।

কে যেন যুবরাজ রতন সিংহকে গিয়ে বললো। রতন সিংহ, মলদেব, বনবীর এরা খুব জমিয়ে গল্প করছিল। আজকাল শুধু ওদেরই মুখে হাসি।

কে আসবে?—গর্জে উঠলো যুবরাজ রতন সিংহ,—মেড়তার জয়মল? না, না, কিছুতেই না।

আ হা, তুমি ক্ষেপে উঠছো কেন? আসতে দাও না,—বললো বনবীর।

সে আসবে মীরাবাঈকে নিয়ে যেতে।

কোথায় নিয়ে যাবে?

রণথম্ভোরে, রানাজীর কাছে, কারমেতনবাঈয়ের কাছে।

তার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে,

মীরাজীও যাবেন না,—বললো মলদেব।

কে বললো?

আমি জানি উনি এখান থেকে নড়বেন না কিছুতেই।

কেন?

ও পক্ষের অন্য মতলব আছে। মীরাজী চিতোরগড়ে থাকলেই ওদের সুবিধে। ওদের ধারণা মীরাজীর মারফতেই এখানকার প্রজাদের ওরা নিজেদের দলে টানতে পারবে।

পারবে?—বনবীর হেসে জিজ্ঞেস করলো।

মলদেব হেসে উঠলো।

যুবরাজ রতন সিংহ হাসলো না। দাঁতে দাঁত ঘষে বললো,—বেশি বাড়াবাড়ি করলে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো।

বনবীর রতন সিংহের কাঁধে হাত রাখলো।

অতো ভাবনা কিসের? আমরা কি মরে গেছি নাকি?

রতন সিংহ শান্ত হোলো।

বেশ, আসতে দাও জয়মলকে।

খবর পেতেই সে চলে এলো।

দুর্গের দরজায় তাকে আটকালো কুমার মলদেব।

মীরাজীর কাছে যাওয়ার আগে যুবরাজ রতন সিংহের কাছে গিয়ে অভিবাদন জানাতে হবে।

কেন?

তাই রেওয়াজ।

না, রেওয়াজ, অভিবাদন জানাতে হবে মহারানাকে। তিনি এখানে নেই। যদি কুমার ভোজরাজ বেঁচে থাকতেন, তাঁকে গিয়ে অভিবাদন জানাতাম। সেটাও রেওয়াজ। কিন্তু তিনিও নেই। যদি আর কারো কাছে যেতে হয় মীরাবাঈয়ের সঙ্গেই যাবো, একা নয়।

রতন সিংহ রাজকুমার।

রাজকুমার আমিও—উত্তর দিলো জয়মল।

যোধপুরের রাঠোর রাজকুমার মলদেব বাঁকা হাসি হেসে বললো,—মেড়তা আবার একটা রাজ্য।

আমার সঙ্গে কথা বলবে মুখ সামলে,—জয়মল ঝনঝন করে তলোয়ার আধখানা বার করলো।

জয়মল আর মলদেব দু'জনের গায়ে একই রক্ত। জয়মলের পিতামহ রাও দুদাজীর বাবা যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধা। সেই রাও যোধার আরেক ছেলে রাও সুজার নাতি রাও গাঙ্গার ছেলে মলদেব।

চিতোরগড়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। বাবর শাহ চান্দেরী দখল করেছিলো। বাবরের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করার জন্যে রণথম্ভোর থেকে রওনা হয়েছে রানা সাঙ্গা।

জয়মল আর মলদেব দু'জন দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দু'জনেই তলোয়ার পুরোটা বার করেছে। চারদিকে লোক জমে গেছে। সবাই তাকিয়ে আছে একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে।

খবর চলে গেছে যুবরাজ রতন সিংহের কাছে।

বেশ তো, খেলাটা জমেছে ভালো,—বললো রতন সিংহ।

বনবীর বললো,—ঠিকই করেছে মলদেব। জয়মল আগে এসে অভিবাদন
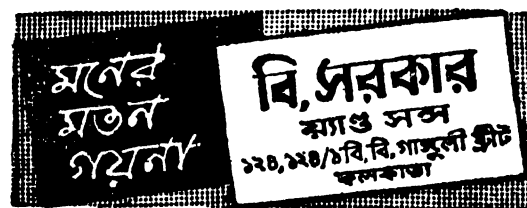
জানাবে রতন সিংহকে, তারপর দেখা করতে পারবে মীরাবাঈয়ের সঙ্গে। ভাই দেখা করবে না বোনের সঙ্গে? নিশ্চয়ই দেখা করবে। কিন্তু তার আগে মহারানা কি যুবরাজের কাছে এসে অভিবাদন জানাতে হয়। সেটাই রেওয়াজ।

কি হে মেড়তিয়া রাঠোর,—মলদেব বললো,—লড়াই করে চিতোরগড়ের ভিতর ঢুকতে চাও?

না, আমি অতিথি, দেখা করতে না দিলে এমনিই চলে যাবো,—বললো জয়মল,—কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কথা বলেছো অত্যন্ত অভদ্রভাবে। সুতরাং ফিরে যাওয়ার আগে তোমাকে একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে।

বেশ, এগিয়ে এসো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল আশপাশের লোকজন সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে।

মলদেব আর জয়মল দু'জনেই অবাক হয়ে দেখলো, এগিয়ে আসছে মীরাবাঈ।

তলোয়ার নামাও,—বললো মীরা,—দু'জনেই।

জয়মল আর মলদেব দু'জনেই আস্তে আস্তে তলোয়ার খাপে পুরলো।

মীরা মলদেবকে বললো,—এখানে এসে কি রেওয়াজ মানতে হবে-না-হবে সেটা ওকে জানানোর অধিকার শুধু আমার, আর কারো নয়।

তারপর জয়মলের দিকে ফিরে বললো,—এসো আমার সঙ্গে মহারাণী কুঁয়রণবাঈয়ের কাছে। কুমার রতন সিংহকে খবর দেওয়া হয়েছে। সেও সেখানে আসবে। তারপর তার সঙ্গে আমরা যাবো রাণী ধনবাঈয়ের কাছে।

দেখাশোনার পাট শেষ হতে মীরা জয়মলকে নিয়ে এলো নিজের মহলে। জয়মল মীরার জ্যাঠতুতো ভাই, বীরমদেবজীর ছেলে, কিন্তু মীরার আপন ভায়ের চেয়েও বেশি। দু'জনে একসঙ্গে বড়ো হয়েছে তাদের পিতামহ রাও দুদাজীর কাছে।

ওরা যখন মহলের ভেতর বসে কথা বলছিলো ঠিক সে সময় খবর এলো।

চিতোরগড়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে অন্দরমহলে। আবার তূর্যধ্বনিও ভেসে এলো।

কি ব্যাপার? কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করলো জয়মল।

মারা গেছেন মহারানা সাঙ্গা,—একজন এসে জানালো।

রানাজী? মারা গেছেন?—মীরা পাথর হয়ে গেল।

যুদ্ধে যাচ্ছিলেন মহারানা, বাবর শা'র কাছ থেকে চান্দেরী উদ্ধার করবার জন্যে।

ইরিচের কাছে এসে ছাউনি ফেলেছিলেন। সেখানে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে।

আমি জানি এর মধ্যে আছে যোধপুরী রাঠোরেরা,—জয়মল ঠোঁট কামড়ে বললো,—বুঁদির রাও সূরযমল তাঁর বোন রাণী কারনেতনবাঈয়ের ছেলে বিক্রমজিৎকেই মেবার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করতে রাজী করিয়েছেন মহারানাকে। এ-কথাটা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই বনবীর, রতন সিংহ, মলদেব এরা বিচলিত হয়ে উঠেছিলো। মহারানা সাঙ্গা জানতে পেরেছিলেন যে, বনবীর যোগাযোগ করেছিলো বাবর শা'র সঙ্গে।

আরো দু'তিনজন এলো অন্য খবর নিয়ে। রানার মৃত্যু সংবাদ আসতে বনবীরের আর তর সয় নি। দরবারে গিয়ে নতুন রানা বলে ঘোষণা করেছে রতন সিংহকে।

মীরা আস্তে আস্তে বললো,—তুমি মেড়তায় ফিরে যাও জয়মল। —এক্ষুণি। —দেরি কোরো না। এই হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যে কেউ লক্ষ্য করবে না। পরে হয়তো এরা তোমায় যেতে দেবে না। এখানে আটকে রাখবে।

এতদিন পরে ভায়ের সঙ্গে দেখা। কিন্তু ভালো করে দু'টো কথাও হোলো না।

কুমার ভোজরাজ চলে গেল, মেড়তার রতন সিং চলে গেল, এখন চলে গেলেন মহারানা সাঙ্গা।

আমার আর কে রইলো,—গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ভাবলো মীরাবাঈ,—রইলে শুধু তুমি।

মনের মধ্যে গুন্‌গুন্ করে উঠলো একটি গানের কলি,—মেরে তো গিরিধর গোপাল, দু সরা ন কোঈ- - - - -।

[ক্রমশ।

ইংরেজ / ফরাসী

(ফরাসীদের তুলনায়) ইংরেজরা ঢের বেশি সহনশীল। একদিন দেখলাম বেশ বয়স্কা জনৈকা মহিলা বৃটিশ ম্যুজিয়াম লাইব্রেরী রুম-এর মধ্যে গ্রন্থাগারিকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন: 'আমি আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি। কুমারী হওয়ায় এতদিন বই নেওয়ার অ্যাপ্‌লিকেশন্ ফরম্-এ কুমারী নামই সই ক'রে এসেছি। সে যাই হোক, কিছুদিন যাবৎ পরলোকগত লরড্ নেলসন আমাকে স্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন। কাল রাত্রে তিনি আমাকে তাঁর স্ত্রী হতে অনুরোধ করেন এবং আমি রাজি হই। এই অবস্থায় জানতে চাই অ্যাপ্‌লিকেশন্ ফরম্-এ আমার কুমারী নামই সই করবো, না, লেডি নেলসন হিসেবে সই করবো?'

ব্যস্ত গ্রন্থাগারিক লিখছিলেন; প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে আদৌ না তাকিয়ে তিনি উত্তর দিলেন: 'বিয়েটা যেহেতু সম্পূর্ণ আত্মিক, আপনি আপনার কুমারী নামই ব্যবহার ক'রে যান।' একই অবস্থায় কোনও ফরাসী গ্রন্থাগারিক হয় পুলিশ ডাকতেন, নয় ত সব চেয়ে কাছাকাছি পাগলাগারদে খবর পাঠাতেন।

—আঁদ্রে মরিও

ছোটদের আসর

নানা রঙের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

স্বপনবুড়ো

তবে ছেলেদের উত্তেজনা কিছু কিছু ছিল বৈকি। চৈত মাসের সংক্রান্তির দিন কলকাতা শহরে বিরাট জেলে-পাড়ার সঙ বেরুত। বউবাজার অঞ্চল থেকে এই সঙ বেরুত। সারা বছর ধরে এই সঙ-এর মিছিলের তোড়জোড় চলত। কত রকম ছড়া লেখা হত—কত রকম সঙে লোকে সাজ্‌ত, নাচ্‌ত আর অঙ্গভঙ্গী করে পথের আসর জমিয়ে তুলত।

সারা বছর ধরে যে সব মজাদার ঘটনা কলকাতার বুকে ঘটত,—সাধারণত তাই নিয়েই ছড়া আর টিপপনি কাটা হত। জেলেপাড়ার সঙ-এর মিছিলের মাঝে মাঝে নানা জাতীয় ঘটনাকে রূপ দেওয়া হত বিচিত্র সব সাজ-সজ্জা করে। আর সেই সঙ্গে মজাদার ছড়া লিখেও পথচারীদের আনন্দবিধান করা হত।

বৌবাজারের জেলে সম্প্রদায়ের তখন অনেক পয়সা। তারাই সারা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সঙ-এর মিছিল বের করত। তখনকার দিনের অনেক নাম না-জানা কবি নেপথ্যে থেকে এই জেলেপাড়ার সঙ-এর জন্যে ছড়া আর নক্সা রচনা করে দিত। গোটা কলকাতা শহরে সাড়া পড়ে যেতো এই সঙ দেখবার জন্যে। পথ-চারীদের সুবিধের জন্য ফুটপাথে—পথের ধারে ধারে যেন মেলা বসে যেত। নানা জাতের সরবতের দোকান, ঘোলের দোকান; ফল-ফুলুরীর দোকান, আবার তারই পাশে তেলেভাজা, ফুলুরী - বেগুনীর দোকান। রকমারী সব মাটির আর কাঠের পুতুল বিক্রি হত ছেলেদের জন্য। ছেলেরা বাপ-কাকা - দাদাদের হাত ধরে সঙ দেখতে আসবে—তাদের হাতে কিছু কিনে দিতে হবে বৈকি। সেদিন মধ্য কল-কাতার এই বিচিত্র মিছিল দেখতে যেন সারা কলকাতা শহর ভেঙে পড়ত।

আমরা ছাত্ররাও উত্তর কলকাতা থেকে দল বেঁধে মধ্য কলকাতায় যেতাম জেলেপাড়ার সঙ উপভোগ করতে।

এই মিছিল দেখতে গিয়ে কত ছেলেমেয়ে যে হারিয়ে যেত, তার হদিশ পাওয়া শক্ত ছিল। তখনকার দিনে ত' মাইকে ঘোষণা করবার রেওয়াজ ছিল না। অভিভাবকেরা শুধু থানায় ছুটোছুটি করত। মিছিল চলার ফাঁকে ফাঁকে ছেলের দল ঝালমুড়ি, চিনে-বাদাম, আলুকাবলি, গোলাপী লেউড়ী এই রকম নানা জাতীয় মুখরোচক খাদ্য চেখে বেড়াতো। তারপর পেটের অসুখ হয়, হোক না। এখন ত' বন্ধুদের সঙ্গে মজা করে বেড়াই। এই ছিল ছাত্রদের মনোভাব। মিছিল যখন শেষ হয়ে যেত—তখন পথের ধারে ধারে চোখে পড়ত, ফেলে-যাওয়া জুতোর পাটি— ছোটদের নিকার-বোকার, খুচরো পয়সা, কলম—আর অনেক সময় মেয়েদের গয়নাও অনেকে কুড়িয়ে পেতো।

যেন একটা পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র,—সৈন্যদল সব পালিয়ে গেছে।

আর একটি মিছিল দেখবার জন্যে ছেলে-মেয়েরা উৎসুক হয়ে থাকত।

পরেশনাথের মিছিল।

এই মিছিলটি সাধারণত বের হত পুজোর ঠিক পরে। পরেশনাথের মিছিল—জৈন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বের করা হত।

এই মিছিল দেখবার জন্য ইস্কুলগুলির হাফ-হলিডে হয়ে যেতো। আর ছেলে-মেয়ের দল সেজেগুজে ঠাকুমা-দিদিমাদের হাত ধরে পথের

দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়াতো। বাবা-কাকা-দাদারা ত' সব অফিস-আদালতে।

তখন ঠাকুমা-দিদিমা-মাসিমা-পিসিমা ছাড়া উপায় কি?

পরেশনাথের মিছিলে শুধু ঐশ্বর্যের আধিক্য।

নানা রকম অলঙ্কার ও সাজ দিয়ে ঘোড়াগুলোকে সাজানো হত। দলে দলে প্রহরীরা নক্সাকাটা আসাসোটা নিয়ে পথের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা নানা পোশাকে সজ্জিত হয়ে সেই মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলেছে।

মিছিলের মাঝে মাঝে ছোট ছোট মন্দির—নক্সাকাটা দড়ি ধরে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই চলন্ত মন্দিরগুলিও নানাভাবে সজ্জিত।

আগে এই পরেশনাথের মিছিলে সজ্জিত হাতী বের করা হত। কিন্তু কলকাতার রাস্তার নিচে অসংখ্য ড্রেন, নল, পাইপ ইত্যাদি আছে বলে হাতী চালানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

চিৎপুর, গ্রে স্ট্রীট দিয়ে মিছিল এসে পরেশনাথের মন্দিরে চলে যেতো। এই মিছিল চলাচলের জন্য সাময়িকভাবে ট্রামের তার কেটে ফেলা হত।

আমাদের কিশোর কালের কলকাতায় কার্তিক পূজোর খুব ধুম ছিল। কলকাতার বনেদী বাবুরা এই কার্তিক পূজোয় দু'হাতে খরচ করত। কোন্ পাড়ার কোন্ বাবু বেশি খরচ করেছেন, এই নিয়ে যেন একটা প্রতিযোগিতাও চলত।

একবার শোনা গেল—চিৎপুর অঞ্চলে কোন্ বাবু কার্তিক পূজোয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রতিমা তৈরি করিয়েছে। আমরা ইস্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে গেলাম সেই ঠাকুর দেখতে। বাসায় ফিরে খুব বকুনি খেতে হল।

এই স্কটিশ ইস্কুলে পড়বার সময় একবার আমাদের কানে এলো যে, রবীন্দ্রনাথ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ব্রাহ্ম সমাজ হলে বক্তৃতা দিতে আসছেন। সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইবে।

আমাদের এক বন্ধু হেদোর সান্ধ্য-আসরেই খবরটা জানিয়ে দিল।

সংবাদটা শোনা অবধি আমাদের চোখের পাতা থেকে কে যেন ঘুম কেড়ে নিল। কখন সেই শুভ লগ্নটি আসবে, আর কখন রবীন্দ্রনাথকে নিজের চোখে দেখবো।

অবশেষে দিন-ক্ষণ জানা গেল।

তখন হেদোতে বসে ঠিক করা হল—আমরা বন্ধুর দল এই হেদোতে এসেই জমায়েত হবো। তারপর এক সঙ্গে চলে যাবো ব্রাহ্ম সমাজের সামনে। হেদো থেকে ব্রাহ্ম সমাজ বেশি দূর নয়। কাজেই কোনো অসুবিধেই হবে না।

নির্ধারিত বিকেলে আমরা হেদোর কোণে এসে দাঁড়ালুম। কিন্তু যে বন্ধুটি আসল সন্দেশ পরিবেশন করেছিল, তার আর দেখা নেই।

অবশেষে অনেক দেরি করে তার আবির্ভাব ঘটল।

ওর ওপর সবাই আমরা খাপ্পা।

এত দেরি করতে হয়? রবীন্দ্রনাথ হয়ত এর ভেতর এসে পৌঁছে গেছেন। কি করে তাঁর দর্শন মিলবে?

আর কথা বলবারও সময় নেই।

সবাই তখন সোজা কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে—ছুট—ছুট—ছুট।

ব্রাহ্ম সমাজের সামনে এসে দেখলাম—লোকে লোকারণ্য।

সামনে বহু গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আশে-পাশে ভদ্রলোক আর মহিলাদের ভিড়। ব্রাহ্ম সমাজের সামনের সিঁড়িতে এতটুকু ঠাঁই নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রবীন্দ্রনাথ তখনো এসে পৌঁছন নি।

হলের ভেতরে ঢোকবার আশা আমরা তখুনি ছেড়ে দিলাম। আমাদের মতো অল্পবয়েসী ছেলেদের কে আর ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে?

ফুটপাথে দাঁড়িয়েই ডিঙি মেরে দেখতে হবে। এক সময়ে সোরগোল উঠল, এসেছেন—এসেছেন। সেই জনারণ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শুভ্র কেশগুচ্ছ একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল। তারপর সামনে অনেক মানুষ দাঁড়ানোর ফলে আর কিছুই দেখা গেল না। সেই কুণ্ডলী-করা ভিড় হলের ভেতর ঢুকে গেল। আমরা কয়েকটি ছেলে বোকা-বোকা চোখ-মুখ করে ফুটপাথে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাদের স্কটিশ ইস্কুলের পশ্চিম দিকে—মূল বিল্ডিংয়ের প্রায় লাগোয়া সিমেণ্ট দিয়ে ভারতবর্ষের একটি প্রকাণ্ড রিলিফ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছিল। পাহাড়-পর্বতগুলো উঁচু উঁচু, নদীগুলো সিমেণ্ট খুঁড়ে বেশ সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। তাছাড়া উপত্যকা, অধিত্যকা, মালভূমি, দক্ষিণে সমুদ্র—সব কিছুই বেশ ভালোভাবে ভূগোলকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছিল। এরপর আবার নদী ও সমুদ্রের জল দেখাবার জন্য কলের জল ছেড়ে দেওয়া হত। একটু নীল গুলে দিলে, সমুদ্রের জল চমৎকার নীল রঙের দেখাতো। আমরা যারা ভূগোল সম্পর্কে উৎসুক ছিলাম, তারা মাঝে মাঝে গিয়ে এই রিলিফ ম্যাপটা দেখতাম। তার ফলে ভারতবর্ষে কোন্ অঞ্চলে কি শহর, নদী, পাহাড় আছে—সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ইচ্ছেমত খাতায় এক টানে ভারতবর্ষের ম্যাপ এঁকে দিতে পারতাম।

উৎসাহে ভাঁটা পড়লে আমাদের দু'টি হাতের লেখা পত্রিকাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'দিবাকর' আর 'অরুণ' দুই-ই নিষ্প্রভ হয়ে শেষ পর্যন্ত নির্বাণ লাভ করল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্যের কামড়—একেবারে কচ্ছপের কামড়। ধরলে ছাড়ানো মুস্কিল।

তাই হাতের লেখা পত্রিকা বন্ধ হল বটে, সাহিত্যের নেশা কিন্তু গেল না।

কোথায় সাহিত্য সভা হচ্ছে—জানতে পারলেই আমরা ছুটতে ছুটতে গিয়েই হাজির হতাম। [ক্রমশ।

হাসির ঝর্ণা

—সুবীর গুপ্ত

মাসিক আলোকচিত্র

বসুমতী

বৈশাখ / '৭৭

ঝর্ণা

—তারাপদ বসু

একা

—অশোক গুপ্ত

–প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

(১ম পুরস্কার)

শ

হ

রে

স
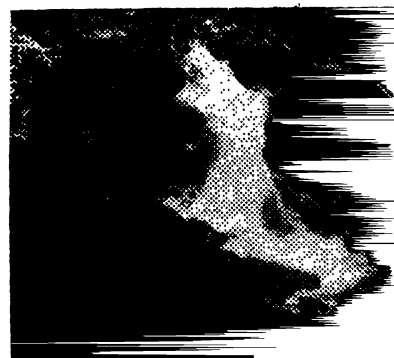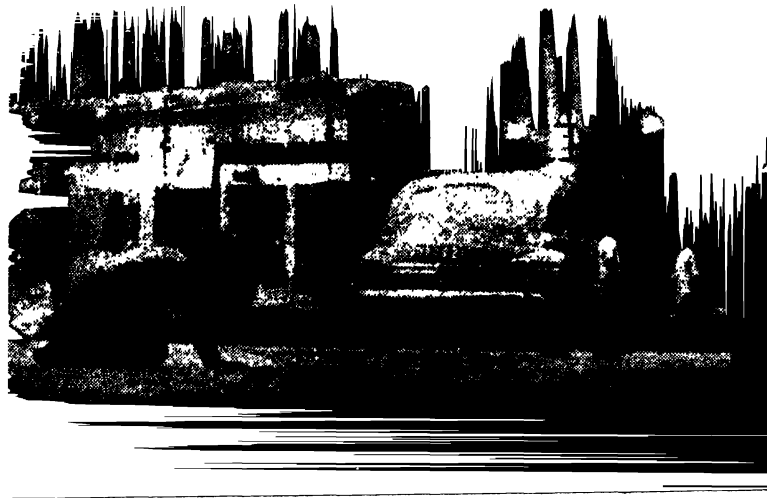
ন্ধ্যা

—কে বাগচী

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

বিষয়বস্তু

জ্যৈষ্ঠ

জননেতা

আষাঢ়

জননেত্রী

ঝড়

—দিলীপকুমার দত্ত

—বিশ্বনাথ গোস্বামী
(২য় পুরস্কার)
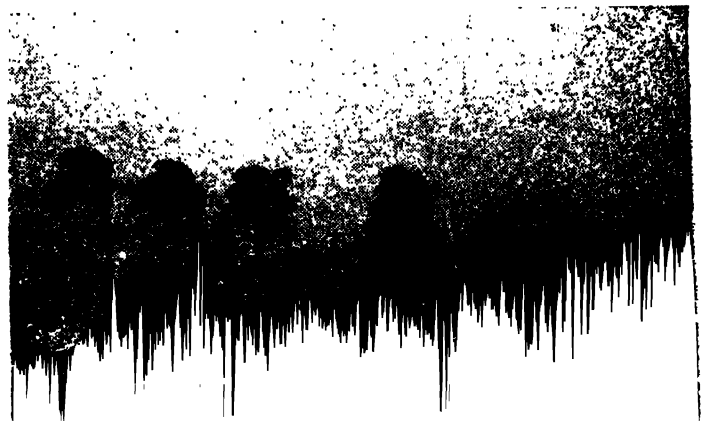
শহরে সন্ধ্যা
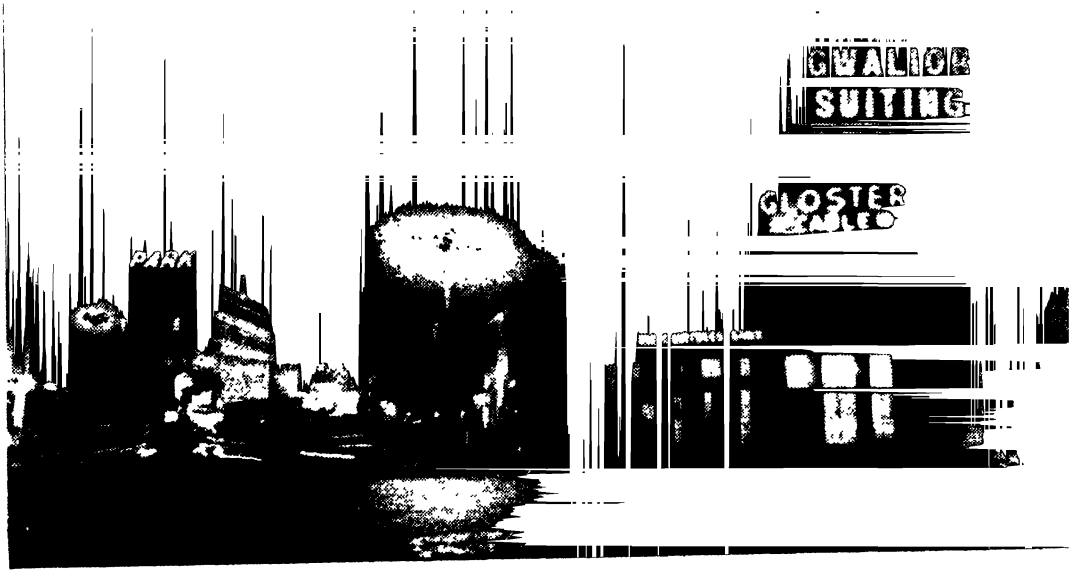
মাসিক বসুমতী ॥ বৈশাখ / '৭৭

১ম পুরস্কার ২০ টাকা ২য় পুরস্কার ১৫ টাকা
৩য় পুরস্কার ১০ টাকা

—উমেশচন্দ্র জানা
(৩য় পুরস্কার)
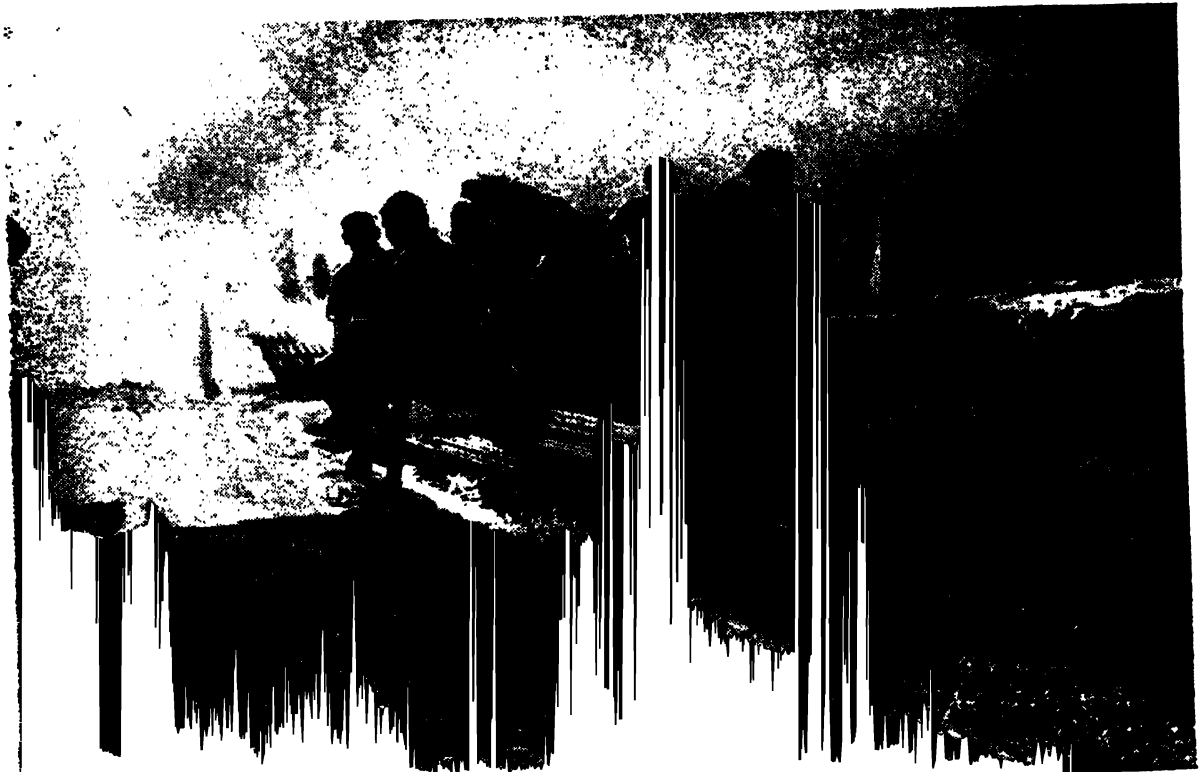
ফুলের বাহার —বিশ্বরূপ সিংহ

ঋষি অগস্ত্যের দক্ষিণ দেশে বসবাস

ঋষি অগস্ত্যের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। অগস্ত্য বড় তেজী ঋষি ছিলেন। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে দেখলে তোমরা যেমন আনন্দ উপভোগ কর, আবার ভয়ও পাও—কি, পাও না? ঋষি এমনি একটি সমুদ্রকে এক গণ্ডূষে পান করে ফেলেছিলেন। অসুররা কত শক্তিশালী আর অত্যাচারী ছিলো তাও তোমরা কিছু কিছু জানো। ঋষি অসুরদের নিজবলে জব্দ করেছিলেন।

শোন, আজ তোমাদের ঋষি অগস্ত্য ও তাঁর সরল মনোভাব, বিরাট পাণ্ডিত্যের কথা কিছু বলবো।

সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার আশ্রম ছিলো কাশীতে। এই আশ্রমটি বড় বড় ঋষিদের দ্বারা চালিত ছিলো। ঋষি অগস্ত্য ছিলেন এই আশ্রমের একজন সদস্য।

আগেকার দিনে সংস্কৃত ভাষা মুনি-ঋষি আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত ছিলো। অন্য কোন জাতি সংস্কৃত ভাষা হাজার শেখার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শিখতে পারতো না।

ঋষি অগস্ত্যের মনে সংস্কৃত ভাষা বহুল প্রচারের জন্যে বাসনা জাগলো। একদিন তিনি সংঘের সদস্যদের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন। বললেন, জ্ঞান-শিক্ষার জ্যোতি এরপর আমাদের সমুদ্রপোকূলে দক্ষিণের দ্বীপ-দ্বীপান্তরের মাঝেও প্রচারের চেষ্টা করতে হবে।

অগস্ত্যের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না সংঘের অন্যান্য ঋষিরা। তাঁরা বললেন, সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে জ্ঞানপিপাসুরা কাশীতে এসে জ্ঞান আহরণ করুন। জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ছড়িয়ে পড়লে ভাষার গরিমা নষ্ট হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

অগস্ত্য ঋষিদের এরকম মনোভাব দেখে বিস্মিত হলেন। এসব মনোভাব সত্যিই স্বার্থপরতার সাক্ষর রাখে। জনসাধারণের মধ্যে সে ভাষা ছড়িয়ে না পড়ে এবং যদি একমাত্র ব্রাহ্মন-মুনি-ঋষিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, তা হলে ভাষার প্রসার কমে আসবে এবং সংস্কৃত ভাষা শূদ্রস্থানীয়রা ক্রুদ্ধ মনে করবে। তাদের মনে ব্যথা কি লাগবে না যে, ব্রাহ্মণ-মুনি-ঋষিরা তাদের ভাষা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছেন বলে? অগস্ত্য বললেন, প্রচারের মাধ্যমে যে জ্ঞান সবার মধ্যে বিতরণ করা যায়, তাই শুদ্ধ।

সংঘের ঋষিদের মনোভাব অগস্ত্যের কথায় পাল্টালো না। তিনি তো ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সংঘের ঋষিদের জ্ঞানের অহমিকা খর্ব করবেনই।

মনিমোহন তেওয়ারী

অগস্ত্য সংঘ থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং নিজের সংকল্প দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে ব্যক্ত করলেন অকপটে। অগস্ত্য শংকরের সাথে যে মণ্ডপে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, হঠাৎ একটি মিষ্ট সুবাস তাঁর নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করলো। তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে মিষ্ট সুবাসের উৎস লক্ষ্য করতে লাগলেন। কোথা থেকে এ গন্ধ আসছে?

মহাদেব অগস্ত্যের মনোভাব লক্ষ্য করে তাঁকে মণ্ডপের কোণে নিয়ে এলেন। তিনি দেখলেন, তালপাতার পাণ্ডুলিপির স্তূপাকৃতি হতে ঐ সুবাস সুভাষিত হচ্ছিলো। অগস্ত্যের মুখ থেকে 'তামিল' অর্থাৎ মধুর শব্দ নিঃসৃত হলো। তালপাতার লেখা তখন হতে 'তামিল' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলো।

মহাদেব অগস্ত্যকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'হে ঋষিবর, জ্ঞান একটি ভাষার মধ্যে কখনও সীমিত নয়। আপনি দক্ষিণে গিয়ে আপনার বাসনা চরিতার্থ করুন।'

অগস্ত্য মহাদেবের কাছে বর পেয়ে তাঁকে প্রণাম করে দক্ষিণের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পোদিয়মলৈর এর গুহায় তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন।

ভগবান শংকরের নির্দেশে অগস্ত্য ঋষি তামিল ভাষায় দু'টি ব্যাকরণ লিখলেন। ব্যাকরণ দু'টির একটি হলো—'পের আগস্তিয়াম' (বৃহৎ অগস্তিয়াম), অপরটি হলো 'শিরু আগস্তিয়াম' (লঘু অগস্তিয়াম্)। ঋষি অগস্ত্যের অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের কথা ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। শুনলে তো অগস্ত্যের কথা। কেমন লাগলো জানাবে।

ভোজের গান

বিশ্বনাথ বারিক

ডাক্‌ডুম টাক্‌ডুম ঢাক বাজে
ডুম্ ডুমা ডুম্ বাদ্য।
পথের ধারে শিউলি তলে
কাঠবিড়ালীর শ্রাদ্ধ॥
শালিক টিয়া শিউলি ডালে
বগল বাজায় খুশির চালে
টুনটুনিতে ভাজছে লুচি
হায়রে ভোজের খাদ্য॥
হুতুম পেঁচা পৈতা গলে
কিড়িং মিড়িং মন্ত্র বলে
কেঙ বেঙাচির গণ্ডগোলে
নেইকো বোঝার সাধ্য॥
লম্বা গলা শকুনগুলি
ঝগড়া করে হল্লা তুলি
শিয়াল মামা চশমা চোখে
পড়ছে মহাকাব্য॥

ছোট পাঠিকা

গল্প হলেও সত্যি

সে আজ প্রায় হাজার বছর আগের কথা। আমাদের দেশে তখন নানা ধর্মের লোক বাস করত। তবে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই ছিল বেশী।

দেশের রাজা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী; দেশবাসী রাজধর্ম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতেন রাজঅনুগ্রহ লাভের আশায়। আর রাজা স্বয়ং তাঁর ধর্মের প্রচার ও প্রসার বিস্তৃতভাবে করেন দেশ-দেশান্তরে ধর্ম-প্রচারক পাঠিয়ে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাও তখন বড় অল্প ছিল না। হিন্দু ধর্মাবলম্বী-দের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল—হিন্দু ধর্মের অনুশীলন করা, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা। তাঁরা দিবারাত্রি এমনি অনন্যমনা হয়ে ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করতেন যে, আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলে যেতেন, এমনি অহর্নিশি পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের ফলে তাঁরা এক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এক-একজন মহান পণ্ডিত হয়ে উঠতেন।

পণ্ডিতরা এর পর সব বের হতেন দিগ্বিজয়ে। দেশ-দেশান্তরে গিয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় ধর্মযুদ্ধে, তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতেন।

রাজাধিরাজ নয়পাল দেবের রাজত্ব-কালে একজন বিখ্যাত হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বের হন। অনেক দেশ-দেশান্তর ঘুরে, অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে বাঙলা দেশে এসে উপস্থিত হন।

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

বাঙলা দেশে উপস্থিত হয়ে তিনি বাঙালী পণ্ডিতদের ধর্মযুদ্ধে আহ্বান করেন। হিন্দু পণ্ডিত বয়সে যেমন ছিলেন প্রবীণ, তেমনি পাণ্ডিত্যে ছিলেন প্রাজ্ঞ। এই জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধে এগিয়ে এলেন একজন নবীন বৌদ্ধ পণ্ডিত। নবীনের তখনও ছাত্রজীবন অতিক্রান্ত হয় নি। তা হলে কি হয়। এই নবীন বয়সেই তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর অনন্য-সাধারণ মেধা ও ধীশক্তিতে সকলেই মুগ্ধ, বিস্মিত হন।

তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল বিরাট উন্মুক্ত এক মাঠ প্রাঙ্গণে। প্রবীণ ও ও নবীন — হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ শোনার জন্য মাঠ ভরে উঠলো, মাঠ-প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান রইল না।

সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করছেন। কে হারবে, কে জিতবে, কার গলে উঠবে জয়মাল্য। সকলের মনেই জয়-পরাজয়ের উত্তেজনা। হিন্দুরা ভাবছে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতই জয়ী হবেন। বৌদ্ধরা ভাবছেন নবীন জ্ঞানসাধকই জয়যুক্ত হবে। সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিত নবীন বৌদ্ধ পণ্ডিতকে একটি কঠিন শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করলেন। তরুণ অবলীলাক্রমে তাঁর সেই প্রশ্নের মীমাংসা করে উত্তর দিলেন, আর একটি কঠিন প্রশ্ন করলেন প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিত। এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নবীন পণ্ডিতের সাধ্যাতীত মনে করে প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিত জয়ের আনন্দে পুলকিত চিত্তে মৃদু হাস্য করতে লাগলেন, কিন্তু হায়! পরক্ষণে প্রবীণের হাস্য ওষ্ঠপ্রান্তে মিলিয়ে গেল। তরুণ সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে প্রবীণের কঠিন প্রশ্নের সমাধান করে যথাযথ উত্তর দিলেন। প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিত এবার অধিকতর কঠিন আর একটি প্রশ্ন করলেন। নবীন বৌদ্ধ পণ্ডিত এবারও প্রবীণের কঠিন প্রশ্নের সুমীমাংসা করে দিলেন।

অবশেষে প্রবীণের প্রশ্ন করার পালা শেষ হলো। এবার নবীন বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিতকে একটি প্রশ্ন করলেন, হিন্দু পণ্ডিতও হাস্য-সহকারে তার যথোচিত উত্তর দিলেন। নবীন পণ্ডিত এবার আর একটি প্রশ্ন করলেন। এবারও হিন্দু পণ্ডিত অতি সহজেই সেই প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন। তরুণ পুনরায় আর একটি

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

প্রশ্ন করলেন। তরুণের প্রশ্ন শুনে এবার হিন্দু পণ্ডিতের মুখ শুকিয়ে গেল। হাসি অন্তর্হিত হলো। এহেন কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করা তো দূরের কথা, প্রশ্ন বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত পর্যন্ত করতে পারলেন না। পরাজয়ের গ্লানি ফুটে উঠল তাঁর মুখমণ্ডলে। ম্লান মুখে সভায় বসে রইলেন অধোবদন হয়ে।

এদিকে প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিতকে তরুণের প্রশ্নের জবাব দিতে অসমর্থ দেখে সকলেই নবীন বৌদ্ধ পণ্ডিতের নামে চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। হর্ষধ্বনিতে সভা মুখরিত হয়ে উঠলো।

অবশেষে প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিত তরুণ জ্ঞান-সাধকের যুগপৎ পাণ্ডিত্য ও মনীষায় চমৎকৃত হয়ে তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। দেশবাসী নবীন জ্ঞান-সাধকের গলে পরিয়ে দিলেন বিজয়ীর জয়মাল্য, ললাটে এঁকে দিলেন জয়টীকা আর মস্তকে পরিয়ে দিয়ে দিলেন বিজয়-মুকুট। তরুণ জ্ঞান-সাধকের নামে জয়ধ্বনি ও হর্ষধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কে এই নবীন জ্ঞান-সাধক? যেমন অনন্যসাধারণ মনীষা, তেমনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, যেমন অসাধারণ তর্ক করার শক্তি, তেমনি অদ্ভুত বিচার-কৌশল। আর কি যুক্তিনিপুণ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ। তাই বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ হিন্দু পণ্ডিতকে পরাস্ত করতে সমর্থ হন।

এই নবীন বৌদ্ধ পণ্ডিত আর কেউ নন, বাঙলা দেশের ছেলে, বাঙালীর গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশ। মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশ বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্রে এতই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে, সমতুল জ্ঞানী ও ধর্মশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত শুধু বাঙলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেউ ছিল না। গৌড়বঙ্গ মগধের অধীশ্বর নয়পাল দেব তাঁর অনন্যসুলভ ও অপরাজেয় পাণ্ডিত্য প্রতিভার প্রতি প্রণতি জানিয়ে তাঁকে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ও মহান্ দায়িত্বপূর্ণ সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশ প্রায় ষা[illegible] বছর বয়সে বাঙলা দেশ থেকে হিমগি[রি] হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে চিরতুষার[া]বৃত রহস্যময় পর্বতসঙ্কুল সুদূ[র] তিব্বত দেশে গমন করেন। সেখা[নে] তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের গ্লানি কলুষতার অপহার সাধন করেন সেখানে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ক[রে] তিব্বতীয় জনগণের অধ্যাত্ম কল্যা[ণ] সাধন করেন। শুধু তাই নয়, ভারতে[র] ধর্ম, সভ্যতা, শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞান ও মনীষার ঐশ্বর্য মুক্তহস্তে বিতর[ণ] করে ভারতের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রচার প্রসার করে বাঙালী তথা ভারতের বিজয় ও গৌরব পতাক[া] উড্ডীন করেন। এই জন্যই ত[ো] বাঙালীর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গর্বভরে গেয়েছেন :—

বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি,
তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে
বাঙ্গালী দীপঙ্কর।

বিবেকানন্দের সাম্যবাদ

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন এক রাজনীতিবিদ বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা। সে জানতে চাইলো, আমি কেন রাজনীতির সংস্রব এড়িয়ে চলি। আমি তাকে বললাম যে, কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই বরং আমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে বেশী বিশ্বাসী। সে আমায় উপদেশ দেবার ছলে বললো যে, এ যুগে রাষ্ট্রের সমস্যাগুলো বুঝতে এবং জনগণের মধ্যে সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনীতির মঞ্চে নামতে হবেই; রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের ভক্ত হয়ে শুধু ধর্ম ধর্ম করে কাটালে চলবে না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তার এই ভ্রান্ত ধারণায় আমি অবাক হলাম। তাঁরা যে ধর্মের প্রচার করে গেছেন, সে ধর্ম কি এতই সংকীর্ণ? এযুগে তা কি অচল? অন্তত তাঁরা যেভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, রাজনীতির মূল লক্ষ্য যেমন জনকল্যাণ, ধর্মের মূল লক্ষ্যও তাই। ধর্মেরও মানুষের কল্যাণ করার শক্তি কম নয়। আর সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রকৃত কল্যাণ করতে হলে সাম্যের আদর্শ অনুসর[ণ] করাই বাঞ্ছনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য উত্তরাধিকারী বিবেকানন্দ এই সাম্যের আদর্শের ধর্মীয় জোয়ার এনেছিলেন, শুধু কথায় নয়, কাজেও। পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আমাদের দেশে আধুনিক সাম্যবাদের রাজনৈতিক জোয়ার তো এসেছে এর পরেই।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু একজন ধর্ম প্রচারক সন্ন্যাসী ছিলেন না, তাঁকে এক মহান সাম্যবাদীর প্রবক্তা বললে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুত তাঁর ধর্ম সাম্যধর্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসা, এটাই ধর্মের

ভুল কথা। আর মানুষের সমাজের অধি-বাসী হয়েও যারা মানুষের মর্যাদা পায় না, নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করেও নিঃশব্দে যারা সমাজের এক অংশের সমৃদ্ধির উপাদান জুগিয়ে চলে, সেই নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যেই বিবেকানন্দ ঈশ্বরকে বেশী জাগ্রত দেখেছেন। ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে তাই তাঁর তুচ্ছ মনে হয়েছে। আক্ষেপ করে বলেছেন, "দেশের লোক দু'মুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়, ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া, নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা। সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসিও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।" নারায়ণ তো শুধু ধনীর পূজার ঘরেই নেই, নারায়ণ বা ভগবান শুধু মন্দিরে বা মসজিদে পড়ে নেই, তিনি বরং মানুষের মধ্যেই বেশী প্রকাশিত হয়ে আছেন। আর মানুষ বলতে সব রকমের মানুষকেই বোঝাচ্ছে। সামাজিক মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন শ্রেণীগত, আর্থিক অবস্থাগত বৈষম্য রয়েছে, সেই বৈষম্যকে ছাড়িয়ে সকলের মধ্যে আছে এক মহান্ ঐক্য ও সমতা। অর্থাৎ সবার সমান অধিকার, কেউ কারো চেয়ে ছোট বা বড় নয়। "আমি ও আমার ভাই এক।" কারণ, আমার মধ্যে যে ঈশ্বর, তোমার মধ্যেও সেই ঈশ্বর। সুতরাং টাকার গরম আছে বলে কিংবা শিক্ষা ও সভ্যতার গর্বে অন্ধ হয়ে কারো উচিত নয়—মুচি, মেথর, চাষী, মজুর শ্রেণীর লোক-দের ঘৃণা করা ও তাদের মানবিক অধিকার কেড়ে নেওয়া।

যার ক্ষমতা আছে সে যদি বেশী ধন সঞ্চয় করে তো করুক না। কিন্তু তাই বলে আর সবাইকে তাদের মান-বিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বা তাদের শোষণ করার এক্তিয়ারও তার আছে, একথা বিবেকানন্দ বলেছেন,—এ ভুল যেন কেউ না করে। বিবেকা-নন্দের মতে, শুধু ঐশ্বর্য বেশী আছে বলেই কারো সম্মান বেশী হতে পারে না। টাকার জোর আছে বলেই কেউ সামাজিক অধিকারগুলো একচেটিয়া-ভাবে ভোগ করতে পারে না। কারণ, বিস্তৃত বৈষম্য সত্ত্বেও ধনী আর গরীব তো একই সত্তা, একই ঈশ্বর। "তা হলে ধনী, তুমি কি করে অন্যকে শোষণ-পীড়ন করো, তার দুঃখে নিরপেক্ষ থাকো?" যদি সবাইকে ঈশ্বর বলে ভাবা যায়, তবে আর লুণ্ঠন, পীড়ন, ঘৃণা, নিন্দা থাকে না।

"এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর চেয়ে স্বভাবতই বেশী বুদ্ধিমান, এ আমাদের সমস্যা নয়"—বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ। —"আমাদের সমস্যা এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের সুযোগ নিয়ে এই শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি লোকদের থেকে তাদের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও কেড়ে নেবে কিনা। এই পীড়নকে রোধ করার জন্য চাই সংগ্রাম।" জগতের এক অংশের অপেক্ষাকৃত শক্তিমান শ্রেণী, বুদ্ধিমান শ্রেণী অপেক্ষা-কৃত অসমর্থকদের ওপর শোষণ-পীড়ন চালাবার যে বিশেষ অধিকার ভোগ করছে, তা মোটেই নীতিসম্মত নয়। বিবেকানন্দের মতে, নীতিধর্মের লক্ষ্য হবে, এই বিশেষ অধিকারবাদকে বিলোপ করা। জগতের নিপীড়িত শ্রেণীর আপোষহীন সংগ্রামে কায়েমী স্বার্থবাদীদের এই বিশেষ অধিকারবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন আর লুণ্ঠন-উৎপীড়ন থাকবে না। সমাজের নিচু-তলার মানুষও বেঁচে থাকার অধিকার পাবে। কিন্তু স্বামীজীর মতে, শোষণ, অত্যাচার বন্ধ হলেও আমাদের কাজ শেষ হবে না। এর পর আমাদের কাজ হবে, অশিক্ষার অন্ধকার দূর ক'রে মানুষের মধ্যকার সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলা, সমস্ত মানুষকে ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ করা। সকল বৈষম্যের উপর যে একত্ব আছে, সেই একত্বেই মানুষের মহামিলন ঘটাতে হবে। তবেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত হবে। নতুবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আদিম প্রবৃত্তিটা রাষ্ট্র তার চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন দিনই নিঃশেষে মুছতে পারবে না। যেদিন এক মহান্ প্রেরণায় সব মানুষ সবাইকে ভাই বলে ডাকতে পারবে, একমাত্র সেদিনই সম্পূর্ণ সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হবে। কিন্তু তার জন্য অনেক চেষ্টা করতে হবে, অনেক মূল্য দিতে হবে।

আর, চেষ্টা স্বামীজী করেওছিলেন, করেছিলেন সেই সব মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য, যারা শত শত বছর ধরে শিক্ষা, সভ্যতা ও আভিজাত্যাভিমানের চাপে মনুষ্যত্বের মর্যাদাহীন হয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে। তিনি ভারতের গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে ঘুরে দেখেছেন যে, একদিকে কেমনভাবে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ও আর একদিকে সাধারণ শ্রমজীবীরা সকলের ঘৃণ্য, হেয় আর পতিত হয়ে জীবনের বোঝা বয়ে চলেছে। তাই ভারতের তথাকথিত নীচজাতি, পতিত মানুষদের জন্য তাঁর বেদনাটা অত্যন্ত আন্তরিক,—লোক-দেখানো মোটেই নয়। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি অনেক দেশীয় রাজাদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে সাধারণ গরীব প্রজাদের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য প্রেরণা দিতেন। আবার এ সময় তিনি অনেক নিম্নশ্রেণীর গরীব লোকদের ঘরে আশ্রয় নিতেন। একবার তিনি এক মেথর পরিবারে অনেকদিন বাস করেছিলেন এবং এই অবহেলিত নীচ জাতীয়দের

কার ছায়া　　চিত্র : এস এম হালদার

হৃদয়ের মহত্ব দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবংশীয়েরা এদেরকে যে ঘৃণার চোখে দেখে এবং শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে সনাতন হিন্দুধর্মে এদের যেভাবে অপাংক্তেয় করে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ মূর্তিমান বিদ্রোহী হয়েই আবির্ভূত হন। চাষী, মজুর, তাঁতী, মুচি, মেথর প্রভৃতি ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবীদের নীরব শ্রমদানেই ভারতের যা কিছু সম্পদ ও ঐশ্বর্য গড়ে উঠছে। আজ ভারতের সূতী কাপড়, পাট, তুলা, লাক্ষা, চা, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি যে সব জিনিষ রপ্তানি করে আমরা কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় করছি কিংবা যে-সমস্ত ভারতীয় পণ্যের বাণিজ্যে একদা ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতির ঐশ্বর্য-স্ফীত হয়েছে, সে সব জিনিষগুলো তা' কাদের নিঃস্বার্থ নীরব শ্রমদানে উৎপন্ন হচ্ছে? অথচ এইসব শ্রমজীবীদের বেশীর ভাগই আজ অধঃপতিত নীচজাতি হয়ে বঞ্চনা ভোগ করছে এবং আধুনিক সভ্য-জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বিবেকানন্দের প্রাণ এদের দুঃখের বোঝা দূর করার জন্য আকুল হয়েছিলো এবং তিনি ভারতের কোটি কোটি পতিত সন্তানকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করতে ছুটেছিলেন, ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলেন। এদেরকে সমাজের বৈষম্যের চাপ থেকে মুক্ত করে আর সকলের সঙ্গে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠা করতে সঙ্কল্প করেছিলেন। এদের প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন, "বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তে যিনি সেই নিঃস্বার্থতা ও কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী,—তোমাদের প্রণাম জানাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ

মঠের জঙ্গল সাফ ও মাটি কাটার জন্য একদল সাঁওতাল মজুর নিযুক্ত হয়েছে। তাদের ভেতর একজনের নাম কেষ্টা। স্বামীজী সব কাজ ফেলে তার সঙ্গে গল্পে মেতেছেন। গল্প করতে করতে হঠাৎ বললেন, "হ্যাঁরে কেষ্টা, তোরা আমাদের এখানে আজ খাবি?" মঠ থেকে কেষ্টা ও তার সঙ্গীদের জন্য প্রচুর দই, মিষ্টি, লুচি, তরকারী আনা হলো। স্বামীজী কাছে বসে খাওয়াতে লাগলেন। খেতে খেতে কেষ্টা বললো, "হ্যাঁরে স্বামীবাপ, তুরা এমন জিনিষটা কুথা পেলি? হামরা এমনটা কখুনো খাইনি।"

"তোরা আমার নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণ ভোগ দেওয়া হলো—" বললেন স্বামীজী।

উল্লিখিত ঘটনাটির মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিবেকানন্দের সাম্যধর্ম শুধু চিন্তা নয়, জীবন্ত কর্ম, আমাদের ভাব আছে ঠিকই, আমরা মিছিল করে, সভা করে, বক্তৃতা আর শ্লোগান দিয়ে জাতীয় ঐক্য, শ্রমিক-কৃষক স্বার্থের উন্নয়ন প্রভৃতি বড় বড় কথার প্রচার করি বটে, কিন্তু কাজে সেটা কতটুকু দেখাতে পারি? "হে শ্রমজীবী, আমি তোমায় প্রণাম জানাই"—একথা শুধু ভাবাবেগ নয়, একথা তাঁর জীবনে মূলমন্ত্রের মতো ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম তো নিছক ধর্ম নয়, শুধু পূজাপাঠ, প্রার্থনা নয়, তাঁর ধর্মের ভগবান তো আকাশে নেই, তাঁর ধর্মের ভগবান আছেন সেইখানে—যেখানে "মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস"।

[গঙ্গাপুরী শিক্ষা সদনের পত্রিকা হইতে]

'খুকু শিল্পী হবে'

নিতাই ঘোষ

বই-এর পাতায় ছবি এঁকে
আহ্লাদে আটখানা
দুষ্টু মেয়ে, লাজুক হাসি
নামটি সবার জানা,
ছবি আঁকে মাছরাঙা, তার
হাতির মত শুঁড়—
ক্ষণেক পরে নিজেই বলে—
দূর-দূর-দূর।
ছবি আঁকার কষ্ট কত—
চিন্তা কতই হয়।
এমন ছবি আঁকবে খুকু—
করবে বিশ্বজয়।
এমনতর চিন্তা যদি—
থাকে খুকুর মনে।
কল্পলোকের গল্পকথা—
আঁকবে তুলির টানে;
বলছে দাদা, বলছে মামা—
বলছে পাড়ার লোকে—
কান দেয় না খুকু তাতে—
কেবল ছবি আঁকে।

মাসিক রাশিফল
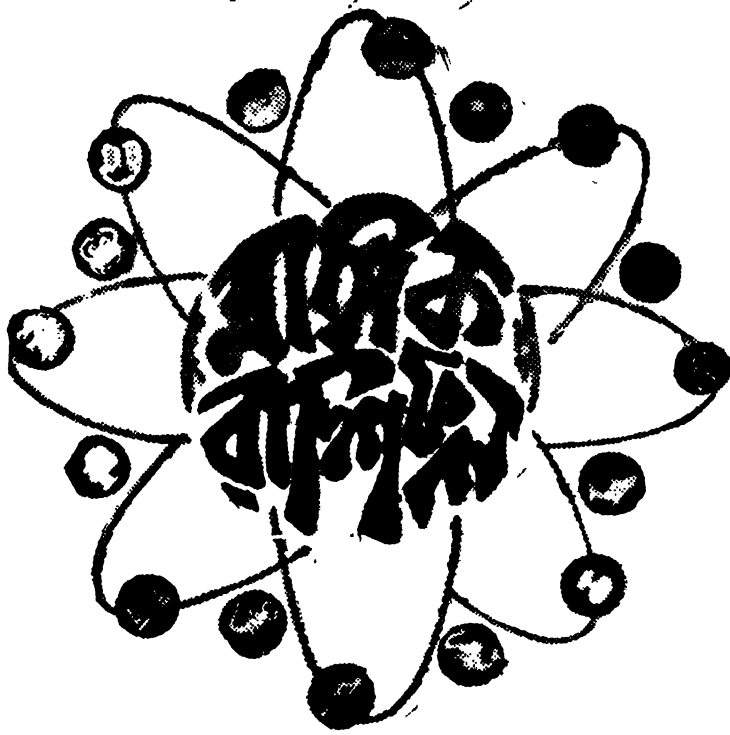
॥ বৈশাখ মাসের ফলাফল ॥

এবার ১৩ই এপ্রিল যখন রবি মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে, তখন মকর লগ্নের উদয় থাকবে। রবি গিয়ে মিলিত হবে শনি, বুধ ও শুক্রের সঙ্গে। মঙ্গল থাকবে বৃষে এবং চন্দ্র থাকবে মিথুনে। তুলায় বক্রী বৃহস্পতির সঙ্গে পাঁচটি গ্রহের হবে দৃষ্টি বিনিময়। রাহু আছে কুম্ভে এবং কেতু আছে সিংহে। বিজ্ঞানী-মন ধর্মের আনবে নূতন ব্যাখ্যা। নশ্বরতাবাদ এবং ধরিত্রী-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য মানবতাবোধের ওপরই বেশী আলোকপাত করবে। অতীন্দ্রিয়বাদ ও তথাকথিত লীলাবাদের ওপর পড়বে আঘাত। শনি কায়েমী স্বার্থের ওলট-পালট করে দিতে পারে। অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই বর্ষপ্রবেশ। অশ্রু ঝরাবে শনি। বিশ্বের পক্ষে বাংলা নববর্ষ একাধিকবার সঙ্কট সৃষ্টি করবে। শ্রাবণ থেকে পৌষ আবার ফাল্গুন থেকে বর্ষশেষ পর্যন্ত দুর্যোগের ঘনঘটার আভাস রয়েছে। বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প ও যুদ্ধাদি সংঘর্ষের প্রবল আশঙ্কা। বৈশাখে যাঁদের জন্ম, কিংবা মেষ লগ্ন ও মেষ রাশির ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত। তুলা লগ্ন ও তুলা রাশির ব্যক্তির পক্ষেও এ বর্ষ লক্ষণীয়। মনীষী ও প্রবীণ প্রধানদের পক্ষে বাংলা বর্ষের শেষাংশ শারীরিক সঙ্কটসূচক। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নববর্ষ নূতন অধ্যায় সূচনা করতে পারে। প্রাতের উদীয়মান সূর্যদর্শন এবং সবুজ-শ্যামলিমার পরিবেশ মানসিক শান্তির পক্ষে এ বছর অনেক রাশি ও লগ্নের ব্যক্তির পক্ষে উপকারী হবে। যাক্ এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের শুভাশুভ আভাস দিচ্ছি :---

শ্রী[illegible]চন্দ্র শর্মাচার্য

মেষ : নববর্ষের গোড়ার দিকে ভবিষ্যৎ কোনো কর্মধারার সুরাহা হতে পারে। কিন্তু উৎকণ্ঠা থাকবে ছেলেমেয়েদের আশ্রয় কোনো ব্যাপারে। গুরুতর মতভেদ কিংবা পরিবারে কারো গুরুতর পীড়াদি সঙ্কটও দেখা দিতে পারে। শরীর একাধিকবার উৎপাত করবে। উদরঘটিত ও বাতাদিঘটিত উৎপাত হলে সাবধান। নূতন কোনো পরিকল্পনা রূপায়িত করতে আর গড়িমসি করা উচিত হবে না। [illegible] ও শিল্পীদের কাজের যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। খাদ্যদ্রব্য ও ফ্যান্সি জিনিসের ব্যবসায়ে আশাপ্রদ নয়। বাদ-বিসম্বাদ এবং মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার এড়িয়ে চলা ভাল। কাজের চাপ বাড়বে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মনোমত হবে না। চাকুরী ক্ষেত্রে নূতন কিছু ঘটতে পারে। নূতন প্রার্থীদের চাকুরী হতে পারে। মহিলাজাতকের পক্ষে কোনো সূত্রে লাভের সম্ভাবনা। মেষ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট, নৈরাশ্য ও আর্থিক ব্যাপারে বিচলিত হবার মত অবস্থা দেখা যায়। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ও বিবাহাদির ব্যাপারে অশান্তি ঘটতে পারে।

বৃষ : এমাসে যে সকল যোগাযোগ ঘটবে, বিশেষ বিবেচনা করে সেগুলো বেছে নিন্। পারিবারিক ব্যাপারে একাধিকবার অশান্তি ঘটতে পারে। দূরে কোথাও কোনো কাজে যেতে হতে পারে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে এ মাস অত্যন্ত লক্ষণীয়। ব্যবসায়-ঘটিত সমস্যা ও আর্থিক ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট বিচলিত করতে পারে। ব্যবসায় কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান সুরু করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। চাকুরীক্ষেত্রে মতবিরোধ সম্পর্কে সাবধান। পুরনো প্রাপ্য আদায় কিংবা কারো সহায়তায় মাসের তেরো দিনের পর কোনো সুরাহা হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে নৈরাশ্য ভোগের আশঙ্কা। জমি-বাড়ির ব্যাপারে অনুকূল নয়। পরিবারের কারো জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা যেতে পারে। কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে সাবধান। নববিবাহিতদের দাম্পত্য-জীবনে কোনো কারণে অশুভ ছায়া পড়তে পারে। মহিলাজাতকের উদ্যমে সাফল্য কিন্তু পারিবারিক ব্যাপারে বারবারই হতাশ হবার আশঙ্কা। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে কর্মের প্রসার ও বন্ধু লাভ কিন্তু কাজ-কারবারে নৈরাশ্য আঘাত দেবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার পক্ষেও বাধা রয়েছে।

মিথুন ঃ কোনো ব্যাপারে আপনার ভালো উৎসাহিত করবে। [illegible]-অর্থ-করী ব্যাপারে মনোনিত হবে না। নিজে অভীষ্ট কোনো ব্যাপারে শেষ কালে পিছিয়ে আসতে হবে। হিতৈষী-দের কারো বিপদ-আপদে উৎকণ্ঠা ভোগেরও আশঙ্কা রয়েছে। পত্নীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। বিশেষ করে পত্নী সন্তানসম্ভাবা হলে সতর্কতা আবশ্যক। কারো প্ররোচনা কিংবা বিশ্বাসভঙ্গে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায়ে মধ্যভাগে আয় কিছু বাড়লেও মোটা রকমের কোনো ব্যাপারে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। চাকুরী ক্ষেত্রে গতানুগতিক ভাব চলবে। কিন্তু ওপরওয়ালাদের কারো আচরণ উত্যক্ত করতে পারে। সহযোগীদের কারো অসুখ-বিসুখ সঙ্কটের আভাস আছে। শেষাংশে নিজের শরীর উৎপাত করবে। মহিলা জাতকের পক্ষের এ মাস কোনো নূতন খবর আনতে পারে। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে নিজের ভুলে অশান্তিকর পরিবেশে মানসিক শান্তি হারাতে পারেন। মনে রাখবেন, বর্তমানের তিন মাসের কার্য-কারণের ওপর হয়ত আপনার বাকী জীবনের ধারাই নির্ভর করছে।

কর্কট ঃ সামাজিক যোগাযোগ এবং বন্ধুত্বের প্রসারের দিক্ থেকে ভাল। কিন্তু ভবিষ্যতের ব্যাপারে এখন থেকে সাবধানে নিজের কর্ম-ধারা ঠিক করে নিন। যৌথ কারবার কিংবা যৌথ সম্পত্তির ব্যাপারে অশান্তি ও জটিলতা দেখা দিতে পারে। রাজ-নৈতিক ব্যাপারে বর্তমান বাংলা বর্ষ বিশেষ লক্ষণীয়। চাকুরী ক্ষেত্রে আশাপ্রদ কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু বর্তমান চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে লাগারও সমস্যা দেখা দিতে পারে। যে ব্যবসায়ই করুন না কেন, টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যাপারে ও পণ্য-মজুতের ব্যাপারে বিশেষ হিসাব করে চলুন। কূটনৈতিক বিভ্রান্তি এবং দলীয় লোকের জন্য অসহনীয় অবস্থায় পড়তে পারেন। ছাত্রছাত্রী-[illegible] এ বছর মোটামুটি অনুকূল। সর্দিকাশিজনিত অসুখ-বিসুখ ও বিস্ফোটকাদি কষ্ট দিতে পারে। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্যের গোলযোগ ও সন্তানজনিত ঝঞ্ঝাট প্রায়ই উত্ত্যক্ত করবে। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে কর্ম ক্ষেত্রের অবস্থা মাঝে মাঝে অসহনীয় হয়ে উঠবে।

সিংহ ঃ এ বাংলা বছরটাই আপ-নার পক্ষে বিশেষ লক্ষণীয়। তোষা-মোদকারী ও স্বার্থান্বেষী লোকের কথায় বিশেষ এবং নিজের যোগ্যতা বা ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরিক্ত আশা পোষণ আপ-নাকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। যৌথ কারবারী ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালক ও শরিকদের পক্ষে জটিলতা বাড়বে। নিকট সম্পর্কের শরিকদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার। রাজনৈতিক ব্যাপারে পঁয়ত্রিশ থেকে ষাটের ভেতর যাঁদের বয়স, তাঁদের পক্ষে কঠিনতম জটিলতা দেখা দিতে পারে। এ মাসে নূতন কোনো ব্যাপারে জড়িত হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ব্যাপারে নৈরাশ্য, ব্যয়বৃদ্ধি ও পারিবারিক পীড়াদির আশঙ্কা। নিতান্ত বিশ্বাসী ও প্রিয়জনদের কারো আচরণ সমস্যায় ফেলতে পারে। দাম্পত্য ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা দরকার। মহিলা জাতকের সাংসারিক ব্যাপারে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক সমস্যা ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিচলিত হবার আশঙ্কা। শনি কিংবা বুধের দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান।

কন্যা ঃ কর্মধারা হবে সমস্যা-সঙ্কুল। পুরনো সম্পর্কিত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কেও নিজে কোনো ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে পারেন। আইনঘটিত ব্যাপার কিংবা মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কে সাবধান। আপনার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, সে ব্যাপারে গাফিলতি কিংবা পক্ষ-পাতিত্ব আপনাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলতে পারে। ব্যবসায়ে অর্থাগম হ্রাস পেতে পারে। আবার নূতন কোনো কাজে অর্থনিয়োগ করে বিপাকেও পড়তে পারেন। চাকুরী ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চুপচাপ থাকুন। কোনোরূপ উত্তেজনায় প্ররোচিত হতে পারেন। পথ-ঘাটে কিংবা যানবাহনে ওঠানামায়ও সাবধান। উদর ও মূত্রাশয়ঘটিত কোনো উৎপাত হতে পারে। নূতন প্রার্থীরা চাকুরী পেতে পারেন। নব-বিবাহিতদের সামনে কোনো নূতন সমস্যা দেখা দিতে পারে। মহিলা-জাতকের স্বাস্থ্যের উৎপাত ও আর্থিক ব্যাপারে নৈরাশ্য যাবে। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে অর্থাগমের উন্নতি এবং বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল অবস্থা দেখা যায়।

তুলা ঃ —সৃষ্টিমূলক কাজ, গবেষণা ও পুস্তকাদি রচনার ব্যাপারে সাফল্য এবং স্বীকৃতি লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে তেমন নয়, নূতন কোনো কারবারে অর্থনিয়োগ করে দুর্ভাবনায় পড়তে পারেন। আত্মজদের মধ্যে কারো অসুখ-বিসুখ কিংবা তার আচরণ বিচলিত করতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে মতবিরোধ এবং এর জন্য অশান্তি ঘটতে পারে। দূরে

কোথাও যাবার যোগাযোগও ঘটতে পারে। শরীর কিছু উৎপাত করবে। যাতায় থেকে বাহাত্তর বর্ষের মধ্যে যাদের বয়স, তাদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সাবধান। চুরি কিংবা অন্যভাবে ক্ষতিরও আশঙ্কা আছে। প্রণয়মূলক ব্যাপারে অখ্যাতি ও অশান্তি হতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে নূতন কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কারো শত্রুতা উৎপাত করবে। তুলা লগ্নে জন্ম হলে কর্ম ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং নূতন উদ্যমের সম্ভাবনা। বিংশোত্তরী মঙ্গল কিংবা বুধের দশান্তর্দশা কষ্টপ্রদ হতে পারে।

বৃশ্চিক :—বিশেষ চিন্তা ও হিসাব খতিয়ে কাজের ধারা ঠিক করুন। যোগাযোগ ও সুযোগ আসবে কিন্তু তা কাজে লাগানোর ব্যাপারটাই আসল। চাকুরী ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপারে দলাদলি ও অশান্তির আভাস দেখা যায়। কিন্তু নিজের নির্লিপ্ত হয়ে থাকা উচিত। ধাপ্পা দিয়ে কেউ প্রতারিত করতে পারে। অসতর্কতায় দামী কিংবা দরকারী জিনিষ হারাতেও পারেন। চাকুরীপ্রার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে সুযোগপ্রদ। নূতন ব্যবসায় সুরু করার পক্ষে মাসের মধ্য-ভাগ ভাল। বিবাহেচ্ছুদের যোগাযোগ ফলপ্রসূ হবে। মাসের সাত থেকে এগারো এবং তেইশ থেকে উনত্রিশ তারিখ লক্ষণীয়। বিদেশ গমনেচ্ছুদের সুযোগ আসতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে মাসের তেরো তারিখের পর একুশ তারিখ লক্ষণীয়। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলমাল ও আর্থিক ব্যাপারে মাঝে মাঝে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হবে। দূরে কোথাও যাবারও সম্ভাবনা আছে।

ধনু :—এ মাসে ধৈর্য ধরে নিজের হাতের কাজগুলো করে যান। মন্তব্য প্রকাশ এবং উত্তেজনামূলক কার্যকারণ সম্পর্কে সাবধান হোন। দূরে কোথাও যাবার পক্ষে এখন অনুকূল হবে না। নূতন কোনো কাজকারবার আরম্ভ করতে হলে মাসের একুশ থেকে সাতাশ তারিখের মধ্যবর্তী সময় দেখুন। পুরনো অসুখ-বিসুখ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কাজকার-বারে বা ব্যবসায়ে আয় বাড়লেও জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। যৌথ ব্যবসায়ের শরিক হলে বিশেষ সাবধান। বিবাহিতা কন্যা কিংবা জামাতার জন্য আকস্মিক উদ্বেগ যেতে পারে। চাকরী ক্ষেত্রে নূতন সুযোগ আসবে। শিল্পী, সাহিত্যিক ও আইনজীবীদের এখন যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। মহিলা জাতকের প্রীতির প্রসার ও ছাত্রীদের পক্ষে নিজের গুণপণার স্বীকৃতি পাবার সম্ভাবনা, প্রণয়মূলক বিবাহের ব্যাপারে এখন যোগাযোগ অনুকূল হতে পারে। ধনু লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক উন্নতি ও কর্মক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে।

মকর : কর্মক্ষেত্রে নূতন সমস্যা ও প্রতি পদক্ষেপে বিশেষ বিবেচনা করে চলা উচিত। ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। কিন্তু নূতন কিছু করতে গেলে সতর্ক হবেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে অনুকূল না-ও হতে পারে। অবশ্য নূতন চাকুরী-প্রার্থীদের এখন কারো সহায়তায় চাকুরী লাভের কিংবা সাময়িকভাবে কোনো কাজে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসবে। মধ্যভাগে শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। প্রিয়জনের কারো অসুখ-বিসুখ উত্যক্ত করতে পারে।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম- ……………………………………

ঠিকানা- ……………………………………

……………………………………

মাসিক বসুমতী

রাজাবদল ॥ বিমল মিত্র ॥ ৭·০০

লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে, স্ত্রীর গয়না-বেচা টাকা দিয়ে, সারাটা জীবন পাত করে বলরামপুর হাই স্কুল গড়ে তুলেছিলেন গৌর পণ্ডিত। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, এই স্কুল থেকেই তাঁকে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে একদিন চলে যেতে হল। এই নিদারুণ ট্র্যাজিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক বর্তমানকালের একটি বিরাট সমস্যা তুলে ধরেছেন তাঁর এই নবতম উপন্যাসে।

ওম মধ্যম ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫·০০

বর্তমান বইটিতে ন'টি বিভিন্ন স্বাদের এবং রসের কাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে। এগুলির উপজীব্য মূলত সমকালের মানুষ, তাদের জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা প্রভৃতি ; এবং এগুলির আবেদনও সম্পূর্ণ নান্দনিক। এই ন'টি কাহিনীর মধ্যে দু'টিকে অনায়াসে ছোট উপন্যাস বা নভেলেট বলা যায়—যাদের বৃহত্তরটি আবার পরম আকর্ষক এক অপরাধ-কাহিনী।

যার যা ভূমিকা ॥ সমরেশ বসু ॥ ৭·০০

নাট্যকার, নাট্য-প্রযোজক, নাট্য-পরিচালক, অভিনেত্রী এবং নাট্য-প্রযোজকের গাড়ির ড্রাইভার—এই পাঁচজনের জবানীতে 'যার যা ভূমিকা' একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের রূপ নিয়েছে। পাঁচটি মোট চরিত্র—কিন্তু তাদের মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক অনেক চরিত্র, যাদের ভিতর দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে একটা যুগ এবং তার মানুষ।

দেবদাসী ॥ শ্রীপান্থ ॥ ৬·০০

দেবদাসী, সতী, বিষকন্যা—এই তিন ভারত-কন্যার অন্তরঙ্গ জীবনকাহিনী 'দেবদাসী'। বিষকন্যা যদি উপকথার নায়িকা, সতী আর দেবদাসী তবে এই সেদিনের কথা—ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাদের নিয়ে নানা গৌরবময় উপাখ্যান। কিন্তু সত্যই কি এই ইতিবৃত্ত গৌরবের? এই সরল প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে লেখক উদ্‌ঘাটন করেছেন অনেক জটিল রহস্য।

রৌরব ॥ বনফুল ॥ ৪·০০

যা কোনওদিন ভাবেনি, ভাবতে পারেনি, একদিন অমা দেখল তা-ই হয়েছে। সবাই মশাল হয়ে গেছে, দাউদাউ করে জ্বলছে সব নিজের নিজের জ্বালায়। জ্বলছে আর জ্বালাচ্ছে। রৌরব—ঘোর রৌরবে পরিণত হয়ে গেছে সকল সমাজ, সমগ্র সংসার।... 'রৌরব' বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং তার মানুষদের এক অভূতপূর্ব চরিত্রবিশ্লেষণ।

নিশীথ ফেরী ॥ বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০

বেকার প্রকাশের বিশ্বাস হয়েছিল : পার্টিই একদিন সুদিন ফিরিয়ে আনবে ওদের। সেই বিশ্বাসে পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী হয়ে উঠেছিল সে। একদিন পার্টি থেকে এক গোপন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে বলা হল ওকে। সে-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিন্তু তার মনে একটি প্রশ্ন বারবার জাগছিল : কেন, কেন এই হত্যাকাণ্ড? এবং এ প্রশ্নের উত্তর সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না।

দিনরাতের খেলা ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ ১০·০০

সার্কাস—বাইরে থেকে এ যেন এক স্বপ্নের জগৎ। কিন্তু ভিতরে? আলোর নীচের অন্ধকারের মতন সে এক সম্পূর্ণ বিপরীত জগৎ। সেখানে শুধু দারিদ্র্য, অর্ধাশন, অনিরাপত্তা, লালসা, পীড়ন, দুঃখ। সব মিলিয়ে যেন এক আদিম অসামাজিক জগৎ—এ পৃথিবীর অন্তর্গত হয়েও যা এ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। 'দিনরাতের খেলা' সেই অন্ধকার অভিশপ্ত জগতের এক অসাধারণ কাহিনী।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

ঘাটের প

-বি. বি. পালচৌধুরী অ

মাসিক বসুমতী
বৈশাখ, ১৩৭৭

কোনো কারণে মোটা রকমের অর্থ-সংকটেরও আশঙ্কা আছে। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রেম-প্রণয়ের পুরণো ব্যাপার নূতন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে কোনো সূত্রে প্রাপ্তি ও ভ্রমণের সম্ভাবনা। বিবাহ-যোগ্যাদের বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। মকর লগ্নে জন্ম হলে সম্মান বৃদ্ধি ও কার্যকারণে মাসের মধ্যভাগ লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

কুম্ভঃ এখন প্রত্যেক ব্যাপারে সতর্ক হয়ে চলা দরকার। এখন থেকে পাঁচ মাসের কার্যকারণের ওপর আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনেকখানি নির্ভর করছে। কাজ-কারবারে যাদের ওপর নির্ভর করে চলছেন, তাদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী লোক সম্বন্ধে সাবধান! ব্যবসায়ে সামান্য বিভ্রান্তিতে বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। নিজের উপর অতিরিক্ত আস্থা আপনাকে বিভ্রান্তির পথে চালাতে পারে। হঠাৎ স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কারো সঙ্কট পীড়াদির আভাষ আছে। মাসের শেষের দিকে কোনো সুখবর পেতে পারেন। বিবাহাদির ব্যাপারে এখন এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। মহিলা জাতকের পক্ষে এখন অভীপ্সিত ব্যাপারে সাফল্য এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে উদ্যমে সাফল্য, কর্মের প্রসার ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকর। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

মীনঃ বর্ষারম্ভের গ্রহ সন্নিবেশ এমনি যে, প্রায় পৌষ মাস পর্যন্ত সময় সময় বিশেষ সমস্যা উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ সৃষ্টি করবে। এ মাসে চাকুরী ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল আভাস রয়েছে। ব্যয় বাড়বে। ছেলেমেয়েদের কারো জন্য উৎকণ্ঠা যেতে পারে। ব্যবসায়ে আয় বাড়লেও নূতন কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। নূতন প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরী পাবার সম্ভাবনা। অবশ্য স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। জিনিষপত্র চুরি যাওয়া কিংবা কোনোভাবে ক্ষতির সম্ভাবনাও রয়েছে। জনহিতকর সমিতি, ক্লাব কিংবা পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পক্ষে এখন অনুকূল। এরূপ কাজে জড়িয়ে পড়ারও সম্ভাবনা। পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশকদের পক্ষে এখন সময় অনুকূল হবে না। পথ-ঘাটে চলা এবং সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সতর্ক হওয়া উচিত। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রীতির প্রসার ও সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি বুঝায়। মীন লগ্নে জন্ম হবে স্বাস্থ্যের গোলমাল ও আর্থিক দুশ্চিন্তা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

● পত্রোত্তর ●

শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু (মাবলা, লোহার পুল)---(১) প্রথমটির চাকুরী জুনের পর হতে পারে। কিন্তু দু'বছর বিশেষ ভাল নয়। (২) আপনার নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। কোনো ব্যবসায় কিংবা কারো এজেণ্ট হয়ে কাজ করতে পারেন। শ্রীপ্রণব-কুমার চ্যাটার্জী (খড়্গপুর)--- (১) হাত দেখা কিংবা জ্যোতিষ চর্চায় উন্নতি হবে। (২) কোনো সূত্রে আর্থিক উন্নতি হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান। শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা)---(১) চাকুরীতে উন্নতি হবে কিন্তু এখন শরীর ও শত্রু সম্বন্ধে সাবধান! (২) শিল্পিজীবনেও বেশ ভাল কিন্তু সম্ভব হলে বিধিমত পরীক্ষা করে ইন্দ্রনীল মণি পাঁচরতি রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখুন। শ্রীশোভনকুমার মুখার্জী (বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলি)---(১) দু'বছর সামলে চলুন। ভালই হবে। (২) আর্থিক দিক থেকে দু'বছর পর ভাল। শ্রীপ্রদীপকুমার মুখার্জী (বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলি)--- (১) এবারই হতে পারে; কিন্তু দু'বছর পর অনিবার্য। (২) এখন হবে না। শ্রীকৃষ্ণশেখর আচার্য (বিডন ষ্ট্রীট, কলি)---(১) সম্ভাবনা আছে। (২) সরকারী চাকুরে। শ্রীনির্জন (এস কে পাল রোড, কলিঃ) (১) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে এবং তার জন্য রক্তমুখী প্রবাল আট রতি রূপার আংটিতে এবং মুক্তা তিনরতি সোনার আংটিতে ধারণ করা উচিত। (২) সরকারী ফার্মে যাওয়া উচিত। শ্রীঅনিরুদ্ধ বিশ্বাস (বিজয় ঘোষ লেন, বেলুড়)---(১) বিদেশ যাত্রার যোগ আছে। (২) এখন থেকে এক বছর দেখুন। শ্রীসমীর গাঙ্গুলী (সংহতি কলোনী, কলিকাতা-৪৭)---(১) কুম্ভ রাশি ও কুম্ভ লগ্ন। (২) শনিবারে মাকালীর পায়ে নীল অপরাজিতা ও জবাফুল দেবেন। শ্রীশুভ্রজ্যোতি মুখার্জী (গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, চন্দননগর)---(১) তিন থেকে চার রতি ভাল আসল মুক্তা সোনার আংটিতে এবং রূপার আংটিতে আট রতি গোমেদ ধারণ করা চলে। (২) বিংশোত্তরী বুধের দশা চলছে। শ্রীনিখিলকুমার বিশ্বাস (ভূপেন রায় রোড, কলি)---(১) পরে হতে পারে। (২) দেড় বছর পর, উন্নতি হবে কিন্তু লেখাপড়ায় দেড় বছর লক্ষণীয়। শ্রীনবকৃষ্ণ রায়চৌধুরী (কালীগ্রাম)---(১) বৃষ লগ্ন, মীন রাশি ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। (২) চাকুরী করতে হবে। দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না। শ্রীমতী ভারতী সেন (মিলনপুর, রিহাবাড়ী, গৌহাটি)---(১) নিজের মনোমত। (২) উক্ত সালেই। শ্রীসুখেন্দু-শেখর দেব পুরকায়স্থ (ভুবনেশ্বর)---(১) উন্নতি হবে। কিন্তু পারিবারিক ঝঞ্ঝাট ও নানাভাবে অশান্তি আসতে পারে। তিন রতি ইন্দ্রনীল মণি রূপার আংটিতে ধারণীয়। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ (গোন্দলপাড়া)---(১)বাংলা নূতন বছরে হতে পারে। (২) ভাল জায়গায় কিন্তু শনি ও মঙ্গলের অবস্থান এমনি

যে উভয় রাশিচক্র মিলিয়ে যথাবিধি দেওয়া উচিত। শ্রীরামপ্রসাদ সেন (ঘোষপুর পার্ক)---(১) আগামী নভেম্বর পর্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। (২) এখন অর্থাৎ দেড় বর্ষ মধ্যে না হলে আপাতত হবে না। শ্রীমুরারিমোহন চ্যাটার্জী (স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া) ---পান্না তিন-চার রতি সোনার আংটিতে কিন্তু ফ্যান্সী পান্না ধারণ না করে আনকাট পরিষ্কার পান্না ধারণ করলেই কাজ হবে। (১) পাঁচ বছর ধৈর্য ধরে চলুন। (২) হতে পারে। শ্রীভূপালচন্দ্র রায় সরকার (মতিবাগ, নিউ দিল্লী) --- (১) এ বছরেই। (২) তিন বছর দেখুন। কুমারী বুলা (মুদিয়ালী রোড, গার্ডেন রীচ)---(১)মজবুত না হলেও দু'-বছর মধ্যে ভাল হবে। (২) নিজের মনোমত হবে। শ্রীসত্য চ্যাটার্জী (পাইকপাড়া)---(১) এই বর্ষে উন্নতি হতে পারে। (২) বাধা অনেক। সোনার আটিতে তিন রতি লাল চুনী। বিল্বপত্রে দুর্গানাম লিখতে পারেন। শ্রীঅশোক মিত্র (সীতানাথ বোস লেন, কলি)---(১) এ বছরে হতে পারে কিন্তু এখন না হলে আরো তিন বছর দেরী। (২) স্বাস্থ্যর সম্বন্ধে সাবধান, পরে উন্নতি। শ্রী পি কে ব্যানার্জী (ভুবনেশ্বর)---(১) চন্দ্র ও মঙ্গলের অবস্থান বিরূপ। (২) একই বাধা দিচ্ছে গ্রহসন্নিবেশ। প্রতিকারের জন্য তিন-চার রতি সাদা আসল মুক্তা সোনার আংটিতে এবং রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। শ্রীমতী নীলিমা দেবী (পিয়ারী দাস লেন, কলি)---(১) ভৃগু আচার্য এ বিভাগে আর নেই। (২) দেওয়া হবে কিন্তু সংক্ষেপে। শ্রীগোপালচন্দ্র ব্যানার্জী (পিয়ারী দাস লেন, কলিকাতা)---(১) এখন দু'বছর ভাল নয়। (২) অনেক বাধা, তবু আগামী বছর দেখুন। শ্রীজিয়াউল হক (ধুবড়ী)---(১) আকস্মিকভাবে কষ্ট হতে পারে, (২) তীর্থ ভ্রমণ হবে। শ্রীঅমিয় হালদার (চেলিডাঙ্গা, রেল কলোনী, আসানসোল)--- (১) দু'বছর পর। (২) নিজের মনোমত হবে।

শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী (হীরালাল বোস ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া)---(১) ব্যবসায়ের যোগ। (২) রাহুর দশার শেষাংশ থেকে খারাপ চলছে এবং গোচরে শনিও অশুভ। প্রতিকারের জন্য গোমেদ আটরতি এবং আটরতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করা চলে। শ্রীপ্রণবকুমার সাহা (ফিয়ার্স লেন, কলি)---(১) লটারীর যোগ নেই। (২) কারো সহায়তায় উন্নতি। শ্রীমতী ডলিরাণী সাহা (ফিয়ার্স লেন, কলিঃ)---কোনোভাবে আর্থিক সুরাহার যোগ। (২) কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাধু খাঁ (ফিয়ার্স লেন, কলিঃ)---এ রকম কোনো যোগ দেখি না। শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য (আন্দুলমৌড়ী---(১) মঙ্গল-বুধে বিবাহ ও চাকুরী হতে পারে। '২' মঙ্গল-শুক্রও লক্ষণীয়।

কুমারী রাধা চ্যাটার্জী (বাবুবাগান, ঢাকুরিয়া)---(১) দেড় বছর পর বেশ ভাল জায়গায়। (২) পদস্থ হবে। শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জী (বাবুবাগান, ঢাকুরিয়া)---(১) এখন হবে না। (২) আর্থিক দিক থেকে দু' বছর বিশেষ ভাল নয়। শ্রীমহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (মখদুমপুর)---(১) আটচল্লিশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত বিশেষ ভাল নয়। (২) এর পর উচ্চপদে যাবার সম্ভাবনা। আট রতি পীত পোখরাজ সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। শ্রীঅলোককুমার ঘোষ (হরিমোহন বোস রোড, হাওড়া)---(১) এই পর্যন্ত হতে পারে এবং এর পর কোনো বিশেষ পরীক্ষা। (২) আট-নয় রতি রক্তমুখী প্রবাল ও উৎকৃষ্ট সিংহলী মুন স্টোন ছয়-সাত রতি রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। শ্রীমতী সুষমাময়ী ঘোষ (হরিমোহন বোস রোড, হাওড়া)---(১) আরো দু' বছর পর হতে পারে। (২) এখনো দীর্ঘকাল। শ্রীমেঘনাথ সিন্‌হা (বেলডাঙ্গা)---(১) গাড়ী এখন হবে না। (২) লটারির যোগ নেই। উচ্চশিক্ষার পক্ষে দেড় বছরের কার্যকারণ দেখুন। এখন বিদেশ যাত্রারও সম্ভাবনা দেখি না। শ্রীসুধীরকুমার মিত্র (এল সি আই অফিস, ব্যারাকপুর)---উক্ত তারিখে মীন রাশি হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় না জানালে গণ ও লগ্ন ঠিক হবে না। শ্রীআদিনাথ চ্যাটার্জী (তাঁতিগেরিয়া, মেদিনীপুর)---(১) দু' বছর নানা ঝঞ্ঝাট। (২) তিন বছর পর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠার কাল। শ্রীমতী স্নেহলতা বিশ্বাস (হাজরা রোড, কলি)---(১) কন্যা লগ্ন ও কুম্ভ রাশি এবং নরগণ। (২) বাংলা নূতন বছরের শেষাংশে হতে পারে। কিন্তু তার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

শ্রীমতী ভবানী মিত্র (লিণ্টন ষ্ট্রীট, কলি)---(১) আগামী জুলাই থেকে ডিসেম্বর দেখুন। (২) উক্ত সময়ের কার্যকারণের ওপর নির্ভর করছে। শ্রীমতী ডলি মুখার্জী (বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলি)---(১) আগামী বছরের মধ্যে হতে পারে। (২) তিন-চার রতি মুক্তা সোনার আংটিতে যথাবিধি ধারণীয়। শ্রীশঙ্কর দে (বাগমারী রোড, কলি) ---(১) উন্নতি হতে পারে। (২) বিবাহে দেরী হবে। শ্রীঅয়স্কান্ত রায় (নস্করপাড়া লেন, শিবপুর)---(১) যোগ আছে। (২) নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ই প্রধান। প্রতিকারের জন্য উৎকৃষ্ট মুনস্টোন রূপায় ধারণ করা চলে। শ্রীসুনীলকুমার ঘোষাল (গাঙ্গুলীপাড়া লেন, কলি)---(১) আরো দু' বছর ধৈর্য ধরে চলতে হবে। (২) বর্তমানের চেয়ে ভাল হবে। শ্রী বি কে রায় (মদনগোপাল লেন, কলি)---(১) মুক্তা সোনার আংটিতে ধারণীয়। (২) প্রতিকার করলেই যে সব ঠিক হয়ে যাবে, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই। চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলুন। শ্রী এস মৈত্র (রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলি) ---(১) সোনার আংটিতে তিন-চার রতি উৎকৃষ্ট ক্যাটস্ আই ধারণ করে দেখতে পারেন। (২) এখন হবে না। শ্রী এ মৈত্র (রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলি)---(১) এ বছর হবে না। (২) তিন বছর মধ্যে হতে

পারে। শ্রীএম মৈত্র (রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলি)—জন্মের সময় কিংবা জন্মগত নক্ষত্র জানালে কোন্ দশায় জন্ম বলা চলে। (২) পরীক্ষার ফল বলা হয় না। শ্রী এস কে মৈত্র (রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলি)—(১) শুধু মঙ্গল তুলায় হবে। (২) বর্তমান ইংরেজী বছরেই হতে পারে। শ্রী কে মুখার্জী (রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলি)—(১) শনি। মীন রাশি ও তুলা লগ্ন। (২) আগামী বছর। শ্রী জে মৈত্র (রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলি)—(১) আগষ্টের মধ্যে হতে পারে। (২) ইংরেজী সামনের বছর হতে পারে। শ্রী পি সান্যাল (রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলি)—(১) কন্যা লগ্ন ও কর্কট রাশি। পড়াশোনার যোগ ভাল। (২) কিন্তু গ্রহাবস্থান নানাভাবে শরীর ও মনের ওপর প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। শ্রীমতী প্রীতি গাঙ্গুলী (ডোভার লেন, কলি)—(১) মীন রাশি ও কন্যা লগ্ন। (২) কুম্ভলগ্ন ও কর্কট রাশি। শ্রীশীতল গঙ্গোপাধ্যায় (ডোভার লেন, কলি)—(১) তুলা লগ্ন ও মকর রাশি। (২) কর্কট লগ্ন ও ধনু রাশি। শ্রীসমর বিশ্বাস (শিলিগুড়ি)—(১) উচ্চশিক্ষার যোগ, (২) সম্ভাবনা আছে। শ্রীমঙ্গল সেন (একডালিয়া রোড, কলি)—(১) বাংলা নূতন বছরের মধ্যে না হলে আরো দু'বছর দেরী হবে। (২) পরিবর্তন হতে পারে। শ্রীঅশোককুমার মিত্র (অবধায়ক: শ্রীসুধীর মোদন, (ময়নাডাঙ্গা, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ)—(১) ধনুলগ্ন, মৃগশিরা নক্ষত্র ও বৃষরাশি। (২) গোমেদ আটরতি ও উৎকৃষ্ট কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই আড়াই থেকে থেকে সাড়ে তিনরতি ধারণ করা চলে। শ্রীমতী হাসি (জামির লেন, কলি)—(১) কন্যারাশি, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, নরগণ এবং বৃশ্চিক লগ্ন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে তিন বছর লাগবে। (২) আরো পড়াশোনা করা উচিত। শ্রীমতী আশা শেঠ (ধলভুম রোড, জামসেদপুর)—(১) হবে। (২) নিজের মনোমত হবে। শ্রীএস পাল (বাগডোগরা)—(১) ব্যবসায়। (২) সাঁইত্রিশের পর প্রকৃত জীবন। শ্রীমৃণাল (কলি-২)—(১) হবে না। (২) আরো দু' বছর পর। শ্রীমতী সুধা (শ্রীরামপুর)—(১) দেড় বছর মধ্যে। (২) লটারীতে হবে না। শ্রীমতী পূর্ণি ভট্টাচার্য (ঢাকুরিয়া)—(১) এখন বাধা। (২) দেড় বছর অপেক্ষা করতে হবে। শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলি-১০)—উচ্চতর পদ হবে। (২) তিন বছর পর বাড়ীর যোগ। শ্রীবিষ্ণুকুমার আদিত্য (কবি ভারতচন্দ্র রোড, কলি)—(১) ভাল চাকুরী হবে,। (২) কোনো সূত্রে হতে পারে। শ্রীকালীকিঙ্কর ব্যানার্জি (কৃষ্ণনগর)—(১) এখন কিছু কিছু ঝঞ্ঝাট হবেই। তবু লগ্ন অনুযায়ী কৃষ্ণাভ বৈদূর্য আড়াই থেকে সাড়ে তিন রতি ও আট রতি গোমেদ এবং আট রতি রক্তমুখী প্রবাল সবই রূপায় ধারণীয়। (২) ক্যাটস আই নানা বর্ণের আছে। বর্ণ অনুযায়ী চন্দ্র, কেতু, শনি প্রভৃতি গ্রহের জন্য দিতে হয়; আর সাদা পলা, মুক্তা মঙ্গল কিংবা মঙ্গল রাহুর জন্য অবস্থান ভেদে দেওয়া চলে।

জন্মদিনে

অলক গুপ্ত

ফুল বাগানে ফুলের মেলা,
হাওয়ায় চলে নিত্য খেলা
ঘনায় আজও মেঘের মুখ-ভার
'হা-রে-রে-রে' রোলে গগন ফাটা
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঢাল তলোয়ার
গায়ে যেন শিউরে ওঠে কাঁটা,
মহিম, রঘু ডাকাত দলে,
রক্তে ভীষণ খেলা চলে,
সাহস-বলে হর্ষে ব্যথায়,
ইতিহাসের গল্প-গাঁথায়
'বিদ্রোহী বালক', নয় 'যাদুপুরী'
'বাংলার ডাকাত'-এ নেই জুড়ি।
'রূপকথার দেশে' আর 'শিশু-ভারতী'
ফুল-বাগিচায় ওলো সারথি,
সাজিয়ে হরেক গল্প কথার ঝুলি
জন্মদিনে, জেনো প্রণাম শ্রদ্ধাঞ্জলি *

* যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের জন্মদিনে নাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র

(জনৈক বিপ্লবীর জীবনকাহিনী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণত আত্মচরিত বা জীবন-কাহিনী চিত্রাঙ্কনের উপর নামকরণ কদাচ দৃষ্ট হয়। কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহ জীবনধারার নিজের ভাষায়ই উধৃত হইতেছে। আমি শুধু মাত্র ভাষ্যকারের কাজ করিয়া চলিয়াছি। ইহাতেও মূলভাব পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। যদিও প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইলেও পাঠক-মনে যাহাতে চাপ সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য সামান্য বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানুষের জীবনই ঘটনাবহুল। সুখে, দুঃখে, কখনও মর্যাদা বা অসম্মানে মানুষের জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে। কালের গতিবেগে মানুষ নানাভাবে আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়া চলে। এইরূপ ছুটিয়া চলার পশ্চাতে নানারূপ রোমাঞ্চ ও দুঃসাহসিকতা দেখা যায়। সাহিত্যিকের কাজ হয় সমাজের অগ্রগতিতে মানুষের চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রগতিশীল করিয়া তুলিবার জন্য জনসমক্ষে নৈমিত্তিকভাবে এইসব ঘটনাগুলিকে উপস্থিত করা। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহাই করিয়া চলিয়াছি। জানিনা, তাহাতে কতটা কৃতকার্য হইব। এইবার উপরের চিত্রাঙ্কন ও নামকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।

কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্র লাভ

দৈব প্রভাবে অনূঢ়া কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। ক্ষত্রিয় গর্ভসম্ভূত হইয়াও সে বাল্যকালে সূত পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু প্রকৃতির প্রভাবে ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম মৃত্যুজনিত স্বর্গলাভ হইবার নিমিত্তই কর্ণ মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিল। ভীমসেন ও অর্জুনের পরাক্রম,

দণ্ডপাণি

যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব এবং তাঁহাদের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ-চিন্তা করিয়া কর্ণ নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইত এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্যোধনের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিয়াছিল। পাণ্ডবগণও সর্বদা তাঁহার দ্বেষ করিত। পক্ষপাতমূলক শিক্ষায় ব্যথিত হইয়া সে একদা নির্জনে দ্রোণাচার্যের নিকট গমনপূর্বক কহিল, 'গুরো! আপনি আমাকে মন্ত্র-সমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। কি পুত্র, কি শিষ্য—সকলের প্রতি আপনার সমান স্নেহ আছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার প্রসাদে পণ্ডিতেরা যেন আমাকে অস্ত্রবিদ্যায় অসম্পূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারেন।'

তখন অর্জুন-পক্ষপাতী দ্রোণাচার্য কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণে অর্জুনের প্রতি তাঁহার অত্যাচার-বাসনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 'কর্ণ! নিত্যব্রতচারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয়, ইহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে। অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই।'

কর্ণ দ্রোণ কর্তৃক এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের নিকট গমন করিল এবং আপনাকে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক তাঁহার শিষ্যত্ব যাচঞা করিল। তারপর পরশুরাম-অনুগৃহীত হইয়া ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার বাহুবল, বিনীত ভাব, সংযম ও শুশ্রূষায় একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া পরশুরাম তাঁহাকে বিধিপূর্বক নিক্ষেপ ও প্রত্যাহারের মন্ত্রযুক্ত সমুদয় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া যত্নপূর্বক ধনুর্বেদ আলোচনা করিয়া পরম সুখে সেই পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা উপবাসকাতর পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূত-পুত্রের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিঃসংশয়ে নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক ক্লেদ ও রক্তপায়ী মেদ-মাংস-

লোলুপ দারুণ কীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে সে কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিল না। ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক সেই কীটদংশনজনিত দারুণ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিত দেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধির নির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন জমদগ্নি-তনয় জাগরিত ও বস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, 'আ: আমি অশুচি হইলাম। তুমি কি কর্ম করিতেছ? ভয় পরিত্যাগপূর্বক আমার নিকট সবিশেষ কীর্তন কর।' তখন কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। পরশুরাম ক্রোধ বিশিষ্টচিত্তে কর্ণকে কহিলেন, 'হে মূঢ়! তুমি কীট-দংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে কখনই সেইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি। অতএব, আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর।'

তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, 'ব্রহ্মণ! আমি সূতপুত্র, সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা, আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্রলাভে আপনার শিষ্য হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম।' তখন পরশুরাম কর্ণকে কহিলেন, 'সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলাভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব, এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশকালে বা সঙ্কটসময়ে স্ফূর্তি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে। অতএব, তুমি ঐ স্থান হইতে যথা ইচ্ছা হয়, গমন কর। যাহা হউক, অতঃপর কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না।'

কাহিনীর নামাকরণ

বর্ণ-বিদ্বেষজনিত সামাজিক প্রতারণার ফলে ব্যক্তিজীবন গভীরভাবে প্রবঞ্চিত হইতে থাকে। ব্যক্তির সত্তা তখন কঠিন বিদ্রোহীরূপে দেখা দেয়। জীবনের যে কোন স্তরেই সে অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, সৎ ও দুষ্ট—যে কোন পক্ষেরই সে সমর্থক হোক না কেন, তাহার অবহেলিত মর্যাদা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য যে উন্মাদ হইয়া উঠে। ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইলেও ব্যষ্টির স্বার্থ সংরক্ষিত প্রয়াস। তাই মহাকাব্যের যুগে মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত কর্ণ চরিত্র একটি মহান্ সৃষ্টি। যাহা যুগ-যুগান্তব্যাপী অবিসংবাদিতরূপে সমাজ বিপ্লবের দিকে ন্যায়নীতির সাক্ষর বহন করিয়া চলিয়াছে। সেই মহান্ চরিত্রেই এই জীবনধারার গভীর প্রেরণা।

এই পটভূমিকায় পরবর্তীকালে ভারতে ইংরেজ শাসনের আমলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, জমিদারী প্রথার উচ্ছৃঙ্খল আচরণে ও স্বেচ্ছাচারিতায় জনৈক সামান্য মধ্যবিত্তের জীবনে যে অবিচার, অত্যাচার ও প্রতারণা দেখা গিয়াছে এবং সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ফলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রচণ্ড দমননীতির দ্বারা তাহার পুত্রকে যেভাবে প্রবঞ্চিত করা হইয়াছিল, তাহারই প্রমাণস্বরূপ এই ক্ষুদ্র জীবনকাহিনী।

ইংরেজ জননীর সন্তান-পালন

হিসেবটা বেরিয়েছিল ঠিক ষোল বছর আগে, ১৯৫২ খৃস্টাব্দে।

মা'র কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে কীভাবে পালন করা যায়, সে সম্পর্কে স্বাস্থ্য বিভাগ, রেডিও, সংবাদপত্র, বই, আর মহিলাদের সাময়িকীতে নিয়মিত যে হারে উপদেশ অকৃপণ হাতে বিলোন হত, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক—বিশ শতকের পঞ্চম দশকের শিশুরা সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিপালিত হচ্ছে, আদৌ তা নয়। সে সময় যত তরুণী মায়েদের প্রশ্ন করা হয়েছিল তাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কবুল করেন, তাঁরা কোনদিন মা'র কর্তব্য সন্তান পালনের ব্যাপার সম্পর্কে কিছুই পড়েন নি। অন্যদের অভিমত যে, কিছু কিছু পড়লেও তা বিশেষ কাজে লাগান নি। অনেকে ক্লিনিকে-এ যে কেবল যাননি, তাই নয়, হেলথ ভিজিটর-দের কাছে পর্যন্ত ঘেঁষতে দিতে তাঁরা নারাজ। কেউ কেউ নির্দেশ অনুসারে শিশুপালন সুরু করে ঘাবড়ে যান, কারণ বিশেষজ্ঞর ছকেবাঁধা প্রতিক্রিয়া শিশুর আচরণে ফুটে ওঠে না, কিংবা এমনও হয়—তাদের ঐ সব খুঁটিনাটি নির্দেশ মেনে চলার সময় বা সামর্থ্য কোনটাই নেই।

তা হলে এরা কী করেন? এরা নিজেদের সহজাত প্রবণতা, নিজেদের মা এবং সময়বিশেষে শাশুড়ির ওপর নির্ভরশীল। চিরাচরিত প্রথার সংগে বিশেষজ্ঞের মতামত না মিললে এরা প্রথানুগই থেকে যান, বিশেষজ্ঞদের পাত্তা দেন না।

এ অবস্থা আমাদের দেশ সম্পর্কে আরও সত্যি। কেননা, এ দেশের অধিকাংশ জননী পল্লীবাসী—চরম অনটনে দিন কাটে তাঁদের। শিক্ষা নেই, তায় আবার আর্থিক সঙ্গতি অনুল্লেখ্য, অবস্থা সুতরাং সহজেই অনুমান ক'রে নেওয়া যায়।

খেলাধুলা

মহিলা জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়ান

ডর্টমুণ্ডে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পর্যায়ে মর্যাদার লড়াইয়ে রাশিয়ার যে মেয়েটি একদিন সকলের চোখ ঝলসে দিয়েছিল, 'বিম'-এর অপূর্ব ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে দশটি পয়েণ্ট অর্জন করা ছাড়াও তিনটি বিশ্বখেতাবের অধিকারিণী হয়েছিল, সেই মেয়েটি পুনরায় পাদপ্রদীপের সামনে এসে হাজির হয়েছে। বিমের ওপর আশ্চর্যজনক সব আতসবাজির খেলা দেখিয়ে দর্শক ও বিচারকদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল। ব্যায়াম প্রদর্শনীতেও নাটাশা আশ্চযজনকভাবে সফল হয়েছিলেন। ২০ পয়েণ্টের মধ্যে ১৯·৭৩৩ পর্যন্ত অর্জন করে তিনি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। চারটি বিভাগের সব কটিতেই উত্তীর্ণ হয়ে একটি করে পদক তাঁর গলায় তো ঝুলেই ছিল, উপরন্তু পদক অর্জনের তালিকায় তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানে। তাঁর নিজস্ব ঝুলি সেদিন পূর্ণ হয়েছিল তিনটি স্বর্ণপদক, দু'টি রৌপ্যপদক, একটি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে, একটি আপন টিমকে জেতানোর জন্য এবং আর একটি ব্রোঞ্জপদক পেলেন লম্ফনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য। সব মিলিয়ে ৮টি পদক সেদিন প্রতিযোগিতা থেকে ছিনিয়ে এনে আপন দেশকে গৌরবান্বিত করলেন নাটাশা কুচিলম্‌কয়া। সোভিয়েট ক্রীড়া সাংবাদিকদের সেদিন গোপন ভোটে কুমারী নাটাশা দশজন শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রথম স্থানটি পেয়েছিলেন মাইকেল ভরোলিন কিন্তু মহিলাদের মধ্যে নাটাশাই সেদিন দেশের শ্রেষ্ঠা এ্যাথলেট। পারিবারিক সূত্রেই নাটাশার খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ জন্মে। কোচ হিসেবে তাঁর মা'র প্রভূত সুনাম ছিল। তাঁর বোন মেরিনা মাস্টার অফ স্পোর্ট উপাধিতে ভূষিতা হয়েছিলেন। নাটাশার উন্নতির মূলে পারিবারিক উৎসাহ যেমন আছে, তেমনি তাঁর নিজের চিন্তা, ভাবনা এসব চারিত্রিক দৃঢ়তাও কতখানি ছিল তা তাঁর নিজে-লেখা ডায়েরি থেকেই উদ্ধৃতি করছি। নাটাশা বুঝতে পারেন না স্পোর্টস বা খেলাধুলাতে একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিভাবে জোর করে তার মধ্যে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। খেলাধুলা হচ্ছে সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। ট্রেনিং শেষে বাড়ী এসে আমি ঘুমুতে ভালবাসতাম কিন্তু ট্রেনিং নেওয়াকালে কোন একটি বিষয় যদি বাদ যেত, তাহলে বাড়ী ফিরে আমি নিজেকে বড় নিস্তেজবোধ করতাম। কোন কাজে মন লাগত না এবং পরদিন সকলের জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকতাম। কারণ জিমন্যাস্টিক্‌স্ আমাকে আনন্দে ভরিয়ে রাখত। কলেজে অঙ্ক শাস্ত্রের চেয়েও সাহিত্য আমাকে বেশী করে আকৃষ্ট করে রাখতো। অনেকে শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবে বিমের ওপর খেলা দেখানোর সময়েও আমি কবিতার লাইন মনে মনে আওড়তাম। কখনও কখনও আমার ইচ্ছে যেত অভিনেত্রী

হওয়ার জন্য এবং দু'একবার করেছিও। জিমন্যাস্টিক্ আমার মনে প্রচুর সাহস এনে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আগে আমি ডুব-সাঁতার কাটতে ভয় পেতাম, কিন্তু এখন আমি অনেক উঁচু বোর্ড থেকে জলের বুকে ঝাঁপ কাটি। ছোটবেলা থেকে আমার ভ্রমণের খুব সখ ছিল। ঠিক চরকীর মত। বর্তমানে জিমন্যাস্ট হয়ে কিছু কিছু ঘুরছি। তার মধ্যে ছোট জায়গা থেকে বড় শহরও আছে। জীবজন্তু পোষাও আমার বিশেষ একটি সখ।

বীমের উপর আমার খেলা দেখানোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার জোড়া চোখ উৎকণ্ঠিত হয়ে যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো, তা আমি জানতাম না। সেবারেই বুঝলাম যখন বীমের উপর মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যাওয়ায় পড়ে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যেই দেখি বাড়ীতে চিঠির স্তূপ। কেউ বা দিয়েছেন উপদেশ, কেউ ব্যথিত হয়েছেন আবার কেউ ভর্ৎসনাও করেছেন---কেন এটুকু বয়সে আমি এইভাব দুর্ধর্ষ খেলা দেখাই।

নাটাশার বয়স এখন কুড়ি। বিজ্ঞানের উচ্চতর প্রথা প্রকরণের দ্বারা তিনি আজ বিশ্বখ্যাতা। পলিনা এ্যাসটাকোভাকে তাঁর চলার পথে গুরু হিসেবে মেনে চলেন। তাঁর প্রতিটি ভঙ্গীকেও তিনি অনুকরণ করে থাকেন। লেনিনগ্রাড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী নাটাশা কমপিউটার বিজ্ঞানেও আজ বিশেষ পারদর্শিনী।

১৯৬৬ সালে বিশ্ব-জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনটি স্বর্ণপদক বিজয়িনী নাটালিয়া কুচিনস্কায়া

—ক্রীড়ারসিক

মায়াকেলী সরোবর

সুব্রত দাস

যেদিন যাবে তুমি মায়াকেলী সরোবরে
দেখবে পাঁতিহাঁস অনেক অনেক,
ভেসেছে নৌকা যেন অদূরে—সুদূরে
হাজারো শালুক ফুল হাসেরা এখন।

কখন গিয়েছ ভুলে এসেছ কখন
নিবিড় স্থাবির মৌন একান্ত দুপুরে,
হঠাৎ অবাক তুমি হয়ত ক্ষণেক,
তবু ইচ্ছা হবে নাকো ফিরে যেতে ঘরে।

ইনসমনিয়া বা নিদ্রাহীনতা

প্রদীপ লাহিড়ী

ই আজ সমাজজীবনে এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রায়ই শোনা যায়—অমুক ব্যক্তির রাতে ঘুম হয় না, তিনি নিদ্রাহীনতায় ভোগেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এ রোগের মূল কোথায়? এর উত্তরে বলা যায়, সমস্যাই হল এ রোগের উৎস। নানান সমস্যায় ভারাক্রান্ত মানুষ, রাত্রির বিশ্রামক্ষণটুকুও যে কাজে লাগাতে পারে না, ইনসমনিয়া বা নিদ্রাহীনতা তারই জলন্ত উদাহরণস্বরূপ।

ইনসমনিয়াক বা নিদ্রাহীন মানুষ সত্যিই বড় কৃপার পাত্র, বিবাহিত হলে পাশেই স্ত্রীকে সে দেখে তলিয়ে যেতে নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে, অতন্দ্র-চোখে অপর মানুষের নিশ্চিন্ত নিদ্রা নিশ্চয়ই তার কাছে উপভোগ্য ঠেকে না। তাছাড়া এর ফলে সে নিজে আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এই আতঙ্ক নিদ্রাহীনতার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, আমার আর ঘুম হবে না—এ কথা একবার মনে গেঁথে গেলে, ঘুম সত্যিই আর ধারে কাছে ঘেঁসে না নিদ্রাহীনের।

এই নিদ্রাহীনতা ১০০ ঘণ্টা ধরে চললে পরই, এতে আক্রান্ত ব্যক্তি মনোবিকারের শিকার হয়ে পড়ে। তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহও তার মনে থাকে না এবং পরিচিত মানুষকেও সে চট্ করে চিনতে পারে না।

তার ক্ষুধা কমে যায়, রক্তের চাপ বেড়ে যায় এবং সাময়িকভাবে দৃষ্টিশক্তিও ব্যাহত হয়।

সচরাচর বিলম্বিত নিদ্রাহীনতার ফলে এই সব উপসর্গেরই আবির্ভাব ঘটে।

অবশ্য কোন কারণে একদিন বা পড়াটা উচিত নয়।

কারণ আগেই বলেছি যে, আতঙ্ক নিদ্রাহীনতার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

ঘুম না হওয়ার জন্য বাজার-প্রচলিত ঘুমের বড়ি খাওয়াটাও খুবই ক্ষতিকর, কারণ এগুলো নার্ভের পক্ষে অনিষ্টকর।

মাত্রা বেশী হয়ে গেলে, এগুলো মেডুলা অবলংটাকে আক্রমণ করে, যার ফলে শ্বাসনালীতে চাপ পড়ে। কাজেই মাত্রাধিক্য ঘটলে শ্বাসনালী অবরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়।

প্রত্যেক বছর এইভাবে বহু ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায় সাল-তামামি হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে।

খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহৃত হলেও এইসব পিল বা বড়ি সেবনের ফলে ব্যবহারকারী ক্রমেই এত অভ্যস্ত হয়ে যান যে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক নিদ্রা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

নিদ্রাহীনতার শিকাররা, ঘুমের জন্য নানান ধরনের শয্যা পছন্দ করেন, কেউ চান শক্ত বিছানা, কারুর বা পছন্দ নরম তুলতুলে শয্যা, তাছাড়া ঘুমের আগে উষ্ণ বা শীতল পানীয় গ্রহণের অভ্যাসও অনেকের আছে।

অনেকে পৃথক শয্যা পছন্দ করেন, কেউ বা সঙ্গী চান শয্যায়।

সম্প্রতি আমেরিকায় দুটি বিচিত্র ধরনের ইনসমনিয়াকের কথা জানা গেছে। এঁদের একজনের বালিশের নীচে একটা কথা বলার যন্ত্র রাখা থাকে, তিনি যখন ঘুমোতে যান তখন যন্ত্রটা চালু করে দেন, সেটা বলতে থাকে "ঘুমাও, কোন ভয় নেই"। যন্ত্রমুখে এই আশ্বাস শুনতে শুনতে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েন প্রতি রাত্রে।

আরেক রকম ব্যবস্থা করেছেন।

বৈদ্যুতিক এক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর শয্যা আন্দোলিত হয় ধীরে ধীরে, বোতাম টিপলেই সুগন্ধি বর্ষিত হয় শয্যার উপর, এ ছাড়া বিদ্যুতের সাহায্যে শয্যা গরম রাখার ব্যবস্থাও আছে।

আমার এক বন্ধু আবার এ সম্বন্ধে বড় মজার উপদেশ দেন সকলকে, তিনি বলেন—"সাররাত নিজেকে কোন-না-কোন কাজে ব্যস্ত রাখো, দেখবে রাত্রিশেষে ঘুম আপনা হতেই নেমে আসবে তোমার চোখের পাতায়। দুনিয়ার অধিকাংশ লোক যখন জাগবে, তুমি তখন থাকবে নিদ্রার অতলে তলিয়ে। ব্যাপারটা বেশ মজাদার নয় কি? তাঁর মতে কখন ঘুম আসে সেটা নিয়ে মাথাব্যথার কিছু নেই, যখন হোক ঘুমটা হলেই হল।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মনস্তত্ত্ববিদ এডগার ডি অ্যাড্রিয়ান একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্কের সব রকম কার্যকলাপই একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

এতেই বোঝা যায় যে, মনুষ্যদেহে শক্তি সঞ্চারের পক্ষে ঘুম কতটা প্রয়োজনীয়।

নিদ্রাহীনতা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ নিম্নোক্ত কয়েকটি বিধান দিয়েছেন।

ঠাণ্ডা জলে ভেজানো, নিংড়োনো তোয়ালে দিয়ে তলপেট ঢাকা দিয়ে শয্যা গ্রহণ করাটা বাঞ্ছনীয়, এতে নাকি উত্তেজিত স্নায়ুসমূহ শান্ত হয়।

বালিশ মাথায় না দিয়ে শুধু উঁচু পাশ বালিশ ব্যবহার করাটা, শ্রান্ত শরীরের পক্ষে নাকি খুবই উপযোগী।

শয্যা গ্রহণের পূর্বে হালকা ধরনের কয়েক রকম শারীরিক ব্যায়াম নিদ্রা আকর্ষণে সহায়ক। চোখের পাতার উপর নরম কাপড়ের প্যাড চাপা দিয়ে রাখলেও সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু নিদ্রাহীনতাকে সর্বতোভাবে জয় করতে হলে, মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজনই বোধহয় সর্বাধিক।

আরোগ্য বিভাগ

● শ্রীসত্যব্রত দাস, এন এন এম হোস্টেল, কুচবিহার—

আপনি স্বাস্থ্য ভাল করতে চান। ভোরবেলায় আধঘণ্টা এবং বিকেলে আধঘণ্টা ব্যায়াম করবেন। প্রত্যহ দু'বার ভাত খাবার পর পেট ভরে খাবেন, যা জোটে। খাবার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম করবেন।

● শ্রীমতী, বাগার জার্মাল, বাটারওয়ার্থ, পেনাং, মালয়েশিয়া —

প্রশ্ন ১ : আমার তিন বৎসরের ছেলের গায়ে ৭।৮ জায়গায় সাদা ছুলির মতো দাগ বেরিয়েছে। এদেশে বহু লোকের গায়ে এই জাতীয় দাগ আছে।

উত্তর : আমার মনে হয়, এগুলো ছত্রাকাক্রান্ত (Fungus) জাতীয় কোন রোগ। আমি যে ওষুধের নাম লিখব, তা হয়ত ওখানে পাবেন না, তাই ওখান থেকে Fungicidal ওষুধ নিয়ে ব্যবহার করবেন, তাছাড় নীচের নিয়মগুলি পালন করবেন।

(১) আপনার ছেলের তোয়ালে আলাদা করে দেবেন।

(২) রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে সেই তোয়ালে দিয়ে গা-হাত-পা মোছাবেন।

(৩) ময়লা জামা একদম পরতে দেবেন না।

(৪) সাবান দিয়ে যথারীতি গা ধুইয়ে দেবেন (cidal soap)।

(৫) চালমুগরা তেল মাখাবেন।

(৬) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন।

(৭) Abdec Drops (Park Davis) অথবা Siovite Drops (Albert David) পাঁচ ফোঁটা করে খেতে দেবেন দুমাস।

এছাড়া ক্রিমি থাকলে তার চিকিৎসা করাবেন।

প্রশ্ন ২ : একদম দুধ খেতে চায় না ----

উত্তর : ও নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না। এ বয়সে বাচ্চারা একটু দুষ্টু হয়, তাছাড়া শক্ত খাদ্য খেতে চায়। আপনি ওকে ভাত অথবা রুটি খাওয়ানো অভ্যেস করুন।

আপনার মা অকারণে চিন্তিত হবেন কেন? আপনি চিন্তার বিষয় কিছু লেখেন নি; শুধু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছেন। আপনার হয়ে

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

আপনার মাকে জানালাম, তিনি যেন কোন চিন্তা না করেন। যাই হোক আপনাদের ব্যক্তিগত পত্র দিচ্ছি।

● মিঃ কে মণ্ডল, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা—

আপনার ন'টি প্রশ্ন ও উপপ্রশ্ন পড়লাম। আসলে আপনার মনের অবচেতন স্তরে একটি ভীতি বাসা গেড়ে বসেছে এবং আপনার self Confidence নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি মনে জোর করুন। কে কি বলল বা ভাবল ভ্রূক্ষেপ করবেন না। নিজের কাজ সৎ পথে থেকে এবং ধৈর্যের সঙ্গে পালন করবেন; দেখবেন সব দূর হয়ে গেছে।

●শ্রীরজত সেনগুপ্ত, রাঁচি ৯—

প্রশ্ন : বছরখানেক ধরে দেখছি দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে।

উত্তর — দাঁতের মাজন আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে মাজবেন। ভিটামিন সি সকালে একটি সন্ধ্যায় একটি বড়ি নিয়মিতভাবে খাবেন।

●ছদ্মনাম '২০০৯', নোয়াপাড়া, ২৪-পরগণা।

আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন। ও-ধরণের ব্যথা ও অবস্থায় প্রত্যেকের হয়। তবে অভ্যাস কমিয়ে দেবেন।

● শ্রীহারাধন চন্দ্র ও শ্রীঅমিতাভ মণ্ডল, রাণীগঞ্জ—

আপনারা অযথা চিন্তা করছেন। ভালভাবে খাওয়া দাওয়া করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

●ক, খ, গ, বর্ধমান—

প্রশ্ন : আমরা M. Sc. ছাত্রী, বয়স ২০। আমাদের স্তনদ্বয় অপরিণত। Injection ছাড়া অন্য কোন ওষুধ লিখুন।

উত্তর : বৃটিশ মেডিকেল জার্নালে সম্প্রতি এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের অভিমত তেল মালিশ ছাড়া স্তনবৃদ্ধির আর কোন সম্ভাব্য চিকিৎসা নেই।

●শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, হালিশহর, ২৪ পরগণা—

বিরাশী বছর বয়সে সাধারণত ঘুম কম হয়। যিনি নিয়মিতভাবে শুশুনিয়া শাক খেতে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। শুশুনিয়া শাক নিয়মিতভাবে খেলে সুনিদ্রা হয়। ক্রমাগত ওষুধ না খাওয়াই ভাল।

● শ্রীহৃষীকেশ দাস, গালবারী রোড, কলি-১৮—

প্রশ্ন ১ : খুব অম্বল হয়, বুক জ্বালা করে—।

উত্তর : দু'বেলা খাবার আগে দু' চামচ করে Takacombex (Park Devis) অথবা Sioplex Enzymes (Albert Devis) খাবেন এক মাস। খাবার পর এক পোয়া করে দুধ খাবেন দু'বেলা নিয়মিতভাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই বি নিউরোন ফোর্ট বড়ি ২টি করে দুবেলা দিন পনেরো খাবেন।

●শ্রীটি কে মণ্ডল, বড়শাবাড়ী, কোচবিহার---

আপনি অতিরিক্ত উতলা হয়ে পড়েছেন। ভয় পাবার মত কিছু ঘটে নি। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য নিয়মিত ইসফগুলের ভুষি ভিজিয়ে রাতে খাবেন। খুস্কির জন্য Loxene Sampoo অথবা Cidal Sampoo সপ্তাহে একদিন করে করবেন। মাথায় প্রত্যহ Hyjol Hair Oil (Smitha Pharmaceutcal) মাখবেন।

●শ্রীঅমরেশচন্দ্র মুখার্জি, বাকসা, হুগলি---

আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দিয়ে বলছি, স্বাস্থ্য ভাল হলেই সব উপসর্গ চলে যাবে। উপসর্গ দূর করতে হলে আগে স্বাস্থ্য ভাল করুন। স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য কোন ওষুধের দরকার হয় না। কেবল খাওয়া দাওয়া করে পরিশ্রম করলেই শরীর ভাল হয়। লেখাপড়া করা অভ্যেস করলেই লেখাপড়া হবে।

●শ্রীবিভূতিকুমার মিত্র, সি এন পি ও, কলি-১---

প্রশ্ন ১ : হজম হচ্ছে না। মাঝে মাঝেই পায়খানা হয়।

উত্তর : আপনি ভাত খাবার আগে Eemcizyme বড়ি ২টি করে দুবেলা খাবেন এক মাস; তাছাড়া সকালে ১টি, দুপুরে ১টি রাতে ১টি করে Davoquin বড়ি খাবেন দশদিন।

প্রশ্ন ২ : মাথার চুল অসম্ভব রকম উঠিয়া যাইতেছে।

উত্তর : অনেকসময়ে হজমের গোলমালে মাথার চুল উঠে যায়।

● শ্রীবাশীনকুমার পাল, নীলকমল চক্রবর্তী লেন, হাওড়া —

প্রশ্ন ১ : কি উপায়ে চুল উঠা এবং খুস্কি হওয়া বন্ধ হবে জানাবেন।

উত্তর : Loxene Sampoo অথবা Cidal Sampoo সপ্তাহে একদিন করে মাথায় ঘষবেন, তাছাড়া Higol Hair Oil মাখবেন।

প্রশ্ন ২ : কলগেট ডেণ্টাল ক্রীম এবং ব্রাশ ব্যবহার করি; কিন্তু দাঁত মাজবার সময় দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। ব্রাশ ব্যবহার না করলে দাঁত ভাল পরিষ্কার হয় না। প্রতিকার জানাবেন।

উত্তর : ব্রাশ মাড়ি থেকে দাঁতের দিকে নেবেন, দাঁত থেকে মাড়ির দিকে যাবেন না।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, অ্যাণ্থ্রপোলজি ডিপার্টমেণ্ট, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি —

আপনার দীর্ঘ পত্র পড়লাম। আপনি অকারণে ভীত ও উত্তেজিত হয়েছেন। যেসব উপসর্গের কথা বলেছেন, তা প্রত্যেক পুরুষ মানুষেরই হয়। ও নিয়ে একদম ভাববেন না, শুধু শরীরটাকে সুস্থ রাখুন।

● শ্রীরণধীরকুমার সিন্হা, শহরপুরা, ধানবাদ---

প্রশ্ন ১ : স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা যায় কি করে?

উত্তর : রোজ ভোরবেলায় উঠে ভাল করে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে পড়তে বসবেন, অন্তত তিন ঘণ্টা। সন্ধ্যার সময় ভাল করে হাত-পা ধুয়ে মুছে পড়তে বসবেন অন্তত তিন ঘণ্টা। পৃথিবী রসাতলে যাক, ঝড়-ঝঞ্ঝায় সৃষ্টি

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাংকেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না: দুটির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

আরোগ্য বিভাগ

নাম---------------------------------

ঠিকানা---------------------------------

মাসিক বসুমতী

দ্বারখারে যাক, তবু এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না, এই হচ্ছে স্মরণশক্তি সাধনার প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় হল, প্রত্যেক রাতে পড়ার কাজ করবেন। প্রয়োজন হলে চেঁচিয়ে পড়বেন। তারপর একদিন বাদ দিয়ে সেই পড়া বই না দেখে খাতায় লিখবেন।

তৃতীয় অধ্যায় হল, পরের দিন বই খুলে মিলিয়ে দেখবেন ঠিক লিখেছেন কি না। কোথাও কোন ভুল থাকলে অন্য রঙের কালি বা পেনসিল দিয়ে কেটে সংশোধন করবেন। তারপর সেই কাটা শুদ্ধ মুখস্থ করবেন, দেখবেন সব মনে থাকতে সুরু হয়েছে।

প্রশ্ন ২ : স্বাস্থ্য ভাল করা যায় কি করে?

উত্তর : পেটভরে খেয়ে, বিশ্রাম করে, ভাল ভাল চিন্তা করে।

● শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯---

প্রশ্ন ১ : বয়স ৩৬। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে খাওয়াদাওয়া। পেটে বায়ু হয়।

প্রশ্ন ২ : মাথার চুল অল্প অল্প পাকছে ---

উত্তর : ১নং প্রশ্নের কারণে ২নং উপসর্গ ঘটছে। আপনি দু'বেলা খাবার আগে চা-চামচের দু'চামচ করে Diacom অথবা Takacombex একমাস খাবেন। সকালে ১টি, রাতে ১টি করে Mexaform বড়ি দশ দিন খেয়ে দেখতে পারেন।

●শ্রীসোমনাথ ব্যানার্জি, মহিয়াড়ী, আন্দুল---

প্রশ্ন ১ : আমার কান দুটি মাঝে মাঝে গরম হয়ে ওঠে। কেন হয়? খারাপ কি?

উত্তর : শরীরের মধ্যে কোন কারণে (যথা ভয়, আনন্দ, শোক, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি যদি Adrenaline) রস মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহলে রক্ত-চলাচলের গতি বৃদ্ধি পায়, আর তাইতেই গরম অনুভূত হয়। এ কোন খারাপ নয়।

প্রশ্ন ২ : মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে ধরফড় করে।

উত্তর : উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই সাধারণত ঘটে।

●শ্রীগণেশচন্দ্র শীল, দাসপুর, মেদিনীপুর---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি পুরনো আমাশয়ের চিকিৎসা করলে উপকার পাবেন। সবচেয়ে ভাল হয়, আপনি কলকাতার Tropical School of Medicine-এ দেখালে।

●শ্রীমতী তৃপ্তি সেন, লিণ্টন স্ট্রীট, কলি ১৪---

আপনি Liver Extract ইঞ্জেকশন দশটি নিয়ে দেখুন, উপকার পাবেন। পেটের যন্ত্রণা আমার মনে হয় ক্রমাগত কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যে। রোজ রাতে শোবার সময় ত্রিফলার জল খাবেন।

●শ্রীঅরিন্দম মিত্র, ফরডাইস লেন, কলি--১৪

আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তার কোন ওষুধ নেই।

●শ্রীমতী অনিতা রায়, বাগবাজার স্ট্রীট, কলি-৩---

প্রশ্ন ১ : তিন মাস আগে দ্বিতীয় সন্তান হয়েছে। এখনও মাসিক না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : জরায়ু সংক্রান্ত দুর্বলতা থাকার জন্য অনেক সময় সন্তান প্রসবের দীর্ঘদিন পরে মাসিকের সূচনা হয়। এছাড়া পুনর্বার অন্তঃসত্তা হলেও মাসিক না হতে পারে। কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে অথবা যেখানে সন্তান প্রসব হয়েছে সেখানে দেখালেই তাঁরা সঠিকভাবে বলে দেবেন কেন মাসিক বন্ধ আছে।

প্রশ্ন ২ : আমার একটি দাঁতে পোকা লেগেছে---

উত্তর : দাঁতে পোকা লাগলে তুলে না ফেলা পর্যন্ত নিস্তার নেই---।

●শ্রীজগদীশচন্দ্র ধর, আলিপুর, কলি-২৭---

আপনার কন্যাকে রাতে শোবার সময় ২টি করে Probanthine বড়ি খাওয়াবেন ১৫ দিন।

●শ্রীএস এস এম, নারায়ণপুর ২৪ পরগণা----

আপনার হয় অর্শ আছে আর নইলে রক্ত আমাশয় আছে। আপনি স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে পরামর্শ নিন।

●শ্রীসোমনাথ বসু, আমলাগোড়া, মেদিনীপুর---

প্রশ্ন : টাক কি বংশগত? উহার কি প্রতিবিধান আছে?

উত্তর : অনেক সময়। না।

মিসেস মুখার্জি, মাণিকতলা কলিকাতা--

আপনার সমস্যার কথা পড়লাম। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের একজন বিখ্যাত ডাক্তার Placentrex (Albert David) ইনজেকশন দিয়ে অনুরূপ অনুরূপ অবস্থায় প্রভূত উপকার দেখতে পেয়েছেন। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

● এন, গুহরায়, দুর্গাপুর -৪---

আপনার প্রশ্ন ছাপলাম না। যে জায়গা দুটিতে চুলকানি হয়েছে, প্রথমে ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলবেন, তারপর Scabalcid জাতীয় ওষুধ লাগাবেন। বেশ ঘষে ঘষে লাগাবেন, তারপর হাওয়া লাগিয়ে শুকিয়ে নেবেন। প্রত্যহ তিন-চারবার করে করবেন। প্রথম প্রথম জ্বালা করবে, তারপর দেখবেন সেরে গেছে। অন্তর্বাস প্রত্যহ কেচে শুকিয়ে পরবেন। ভিজে অন্তর্বাস কখনও পরবেন না। জায়গা দুটিতে যেন ঘাম না জমে থাকে।

● শ্রীভাস্কর চৌধুরী, বড়বাজার, চন্দননগর---

প্রশ্ন ১ : প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর : শরীরের কোষসমষ্টির পুষ্টি ও পুষ্টি।

● শ্রীবি বাঙ্গর, কালীবাজার, ঘাটাল, মেদিনীপুর —

কোন ভয় নেই। ও সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

শ্রীমতী মনীষা চট্টোপাধ্যায়, চ্যাটার্জি পাড়া, শেওড়াফুলি —

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার আগে চা-চামচের দু' চামচ করে Digeplex জাতীয় ওষুধ এক মাস ধরে খাবেন। সমস্ত উপসর্গই অজীর্ণতার জন্যে হচ্ছে।

● শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায়, ডিব্রুগড়, আসাম —

আপনার সমস্ত উপসর্গ পড়লাম। চিকিৎসককে দেখান। এ ধরনের উপসর্গ চিঠিতে আলোচনা করে কোন ফল পাবেন না।

● শ্রীননীগোপাল রায়, কাঁচরাপাড়া, ২৪পরগণা —

প্রশ্ন ১ : আমার এক ভাইঝি'র বারো মাস হাত ঘামে।

উত্তর : খবনোত্তন মনে মানসিক উত্তেজনার জন্যে।

প্রশ্ন ২ : আমার বোনের নাকে 'পলিপাস্' হয়েছে। দু' নাকেই। স্থানীয় হাসপাতালে দেখিয়েছিলাম। স্বাস্থ্য খারাপ বলে অপারেশন করতে চান নি। যে ওষুধ দিয়েছেন, তাতে ফল হয় নি।

উত্তর : একবার পলিপাস্ হলে, অপারেশন না করলে তার নিরাময় হওয়া সম্ভব নয়। রোগিণীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করুন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে পলিপাস কমে যায়, তখন থাকলে অপারেশন করিয়ে নিতে পারেন।

● শ্রীশান্তিরঞ্জন গুপ্ত, মাণিকতলা, মাখলা, হুগলী—

প্রশ্ন ১ : আমি বহুদিনের পুরাতন আমাশয়ে ভুগিতেছি --

উত্তর : Methylene Blue দিয়ে Rectal wash প্রত্যহ একবার করে সাতদিন করবেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে ১টি করে Amicline দিনে তিনটে করে ৭ দিন খাবেন, তৃতীয় সপ্তাহে Mexaform বড়ি দিনে দুটো করে ৭ দিন খাবেন।

প্রশ্ন ২ : স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগিতেছি।

উত্তর : আপনি Neurobion ইনজেকশন নেবেন দশটি।

• শ্রীমতী কাকলি চৌধুরী, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি -৬—

আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন, তাহলেই সব দূর হয়ে যাবে।

৪নং শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার ছক

(কেটে পাঠাতে হবে)

■	১	২		■	৩ ব	৪ মু	৫ ঘ	৬ তী
৭	■		■	৮	■	৯		
১০		■	১১		১২	■		
	■	১৩	■	১৪		১৫	■	
■	১৬		১৭	■	১৮			■
১৯	■	২০		২১	■		■	২২
২৩	২৪	■	২৫			■	২৬	
২৭			■		■	২৮	■	
২৯				■	৩০			■

৩নং শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার সমাধান

সূত্র (পাশাপাশি) : ১। বসুমতী ৪। বীতংস ৮। টনাক (নাটক) ১০। প্রাসাদ ১১। কাঞ্জিক ১৩। রেস ১৪। বড়াইবুড়ী ১৬। বাননা (বানান) ১৭। লিআম (আলিম) ১৯। সাকাধয়না (কায়সাধনা) ২২। বৌমা ২৪। ডাকং (কড়াং) ২৫। ড়াদা (দাড়া) ২৬। ররুধি (রুধির) ২৭। বিষয় ২৮। বীতিহোত্র ২৯। বাঁদিপোতা

সূত্র (উপর-নীচে) : ১। বটখেরা ২। সুনাভ ৩। মক (কম) ৫। তপ্রা (প্রাত) ৬। ংসারে (সারেং) ৭। সদসৎ ৯। নঞ্জিই (ইঞ্জিন) ১১। কাড়ানাকাড়া ১২। কবুলিয়ৎ ১৪। বনসা (সাবন) ১৫। ড়ীয়ানা (আনাড়ী) ১৮। লিবোরবী (বীরবৌলি) ২০। ধকল ২১। দদায়তা (তায়দাদ) ২৩। মারুতি ২৫। ড়াষপো (পোষড়া)

নির্ভুল সমাধান পাঠাবার জন্যে প্রথম পুরস্কার পঁচিশ টাকা পাবেন—

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪৬এফ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা—৩

একটি ভুলের জন্যে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন। এঁরা প্রত্যেকে পাবেন পাঁচ টাকা করে। (১) **প্রবীর সমাদ্দার,** ৬/৬, যাদবগড়, পোঃ হালতু, ২৪ পরগণা। (২) **অমলকৃষ্ণ মুখার্জী,** ৮২/২, কাশীনাথ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া এবং (৩) **দেবাশীষ বর্মণ,** ১১, ডাঃ জি. সি. গোস্বামী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর।

পূর্বপল্লী, হালতু থেকে পাঠানো গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়ের ছকে ভুল থাকা সত্ত্বেও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কারণ নিয়মানুযায়ী নির্দেশিত ছকে তিনি তাঁর সমাধান পাঠান নি।

অসকার ওয়াইল্ডের বিচার

স্বপনকুমার চৌধুরী

[অস্‌কার ওয়াইল্‌ড (১৮৫৬-১৯০০), খ্যাতনামা বৃটিশ নাট্যকার, কবি, ছোটগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক এক চাঞ্চল্যকর বিচারে সমকামের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। সমসাময়িক তথ্যপঞ্জী প্রমাণ করে তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় দোষারোপ করা হয়েছিল। শাস্তি তাঁর পাওনা ছিল না। তাঁর প্রতিভা আইনী শাসকদের কাঠিন্য এবং অজ্ঞতায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।]

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে অসকার্ ওয়াইল্‌ড-কে কারাগারে প্রেরণ করা হলে তাঁর শত্রুরা ভেবেছিল, ল্যাঠা চুকে গেছে চিরতরে। দ্য লন্‌ডন ডেইলী টেলিগ্রাফ্ পত্রিকা মন্তব্য করল, তিনি 'অখ্যাতি এবং বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবেন, এ তাঁর ন্যায্য পাওনা।' এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে পারত কর্তৃপক্ষ তাঁর সব বই পোড়ালে এবং তাঁর বন্ধুদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে। কিন্তু হায়, মূর্খ আইনী কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা তাঁকে তিলমাত্রও নিষ্প্রভ করতে পারে নি। ওয়াইল্‌ড্ আজ—মৃত্যুর সত্তর বছর পরেও—সাহিত্যজগতের অন্যতম জ্যোতিষ্ক হিসেবে । তাঁর খ্যা তি ক্রমবর্ধমান—হারিয়ে গেছে তার কাণ্ডজ্ঞানহীন বিচারক এবং শত্রুর দল।

সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দ এক দুঃখময় স্মৃতিবাহী। ওয়াইল্‌ড্ তখন খ্যাতিমান, তাঁর বয়স মাত্র ৩৯ বছর। বহু কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প এবং একটা উপন্যাস 'দ্য পিকচার অব্ ডোরিয়ান্ গ্রে' তাঁকে খ্যাতি এবং সম্মান এনে দিয়েছে। নাট্যকাররূপেও তিনি বিখ্যাত, এবং তাঁর চারটি নাটক—লেডী উইন্‌ডারমেয়ার্'স ফ্যান্, এ ওম্যান অব্ নো ইম্‌পরটেন্স, অ্যান্ আইডিয়েল্ হাস্‌ব্যানড এবং দ্য ইম্‌পর্‌টান্স অব্ বিইং আর্‌নেস্ট—সাফল্যের জয়টীকাধন্য। সামনে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রসারিত।

১৮৯১-র গ্রীষ্মকালে তিনি কুইন্‌সবেরী-র অষ্টম মার্‌ক্যুইস্-এর তৃতীয় পুত্র লর্‌ড আল্‌ফ্রেড্ ডগলাস্-এর সঙ্গে পরিচিত হন। লর্‌ড আলফ্রেড্ তাঁর চেয়ে ১৬ বছরের ছোট। পরিচিতি ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হল আল্‌ফ্রেড্ তাঁর সাহায্য চাওয়ার পর থেকে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের ফলে লর্‌ডকে নাকি ব্ল্যাকমেইল্ করা হচ্ছিল। ডগ্‌লাস্ শেষ পর্যন্ত ডিগ্রী না নিয়েই অক্‌সফোর্‌ড্ য়ুনিভার্‌সিটি ছাড়তে বাধ্য হন।

কুইন্‌সবেরী-র মার্‌ক্যুইস্ ওয়াইল্‌ড-এর সঙ্গে নিজ পুত্রের বন্ধুত্বকে তীব্র ঘৃণার চক্ষে দেখতেন, সেই বন্ধুত্ব বিনষ্ট করায় তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁর আক্রমণ আল্‌বার্‌মার্‌ল ক্লাব-এর দ্বাররক্ষীর হাতে নিজস্ব কার্‌ড দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। ওয়াইল্‌ড ঐ ক্লাব-এর সভ্য। তিনি কার্‌ড-এ দেখলেন লেখা রয়েছে, 'সমকামী-র ভাগকারী অস্‌কার্ ওয়াইল্‌ডকে'। এর ফলেই তিনি মার্‌ক্যুইস্-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যার ফলে বিচার অন্তে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান।

মার্‌ক্যুইস 'জাস্টিফিকেশন'-এর প্রার্থনা জানান এবং একদল সমকামী পুরুষ বেশ্যা এবং ব্ল্যাকমেইলার মিথ্যা, ক্ষতিকর সাক্ষী দেয়। কাজেই মার্‌ক্যুইস্-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হয় এবং পরে 'পুরুষের সঙ্গে অত্যন্ত আপত্তিজনক ব্যবহার'-এর জন্য ওয়াইল্‌ড গ্রেপ্তার হন।

বিচার

১৮৯৫-র এপ্রিল মাসে ওয়াইল্‌ড বিখ্যাত বৃটিশ আদালত 'ওল্‌ড বেইলী'-তে বিচারের জন্য আসেন। চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্ত আসে, যখন তিনি আলোড়নকারী, তীব্র সংরাগময় ভাষণ দেন 'I am the love that dare not speak its name'---পংক্তিটির অর্থ ব্যাখ্যা করে। লর্‌ড আল্‌ফ্রেড্ ডগ্‌লাস্-এর লেখা একটি কবিতার এই শেষ পংক্তিটি আদালতে উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হয়েছিল। ওয়াইল্‌ড বলেন, এই ভালবাসা 'নবীনের প্রতি প্রবীণের মহান অনুরক্তি যা ডেভিড্ এবং জোনাথন-এর মধ্যে ছিল, যা প্লেটো তাঁর দর্শনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন, এবং যা মাইকেল্ এন্‌জেলো এবং শেক্‌স্‌পীয়র্-এর সনেট-এ সংলক্ষ্য - - - এ জন্য আজ আমাকে এখানে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। এটি সুন্দর, চমৎকার, অনুরক্তির মহত্তম রূপ।'

বিচারে জুরীরা একমত না হওয়ায় মে মাসে আবার ওয়াইল্‌ড-কে আদালতে আনা হয়। জুরীরা এবার তাঁর দোষ

কারাগারে অসকার ওয়াইল্ড। জেলেও নারীজাতির সহানুভূতি থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি
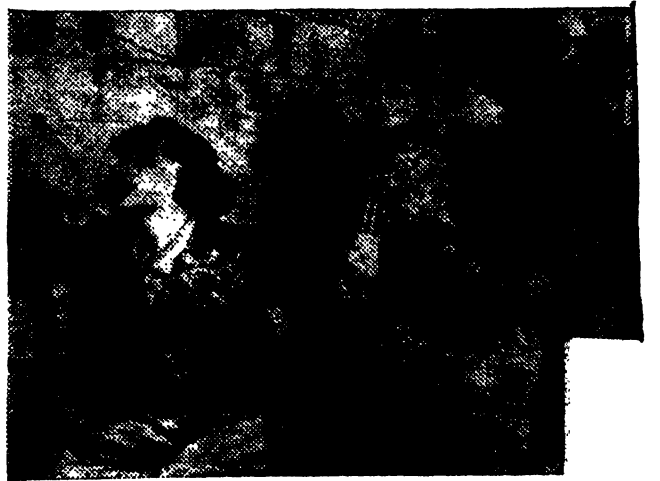
সম্পর্কে একমত হওয়ায় বিচারক উইল্স (বেচারা। ওয়াইলডকে শাস্তি দেওয়ায়, তবু প্রসংগক্রমে স্মৃত।) তাঁকে সর্বাধিক দণ্ড দিলেন: দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড। তাঁর মতে এর চেয়ে খুনের মামলার বিচার বাঞ্ছনীয় এবং ওয়াইল্ড যুবকদের মধ্যে ব্যভিচার ছড়ানোয় তাঁর প্রাপ্য শাস্তি ঢের বেশি হওয়া উচিত ছিল।

অভিনেতা স্যার সীমুর হিক্স ঐ বিচারের অন্যতম দ্রষ্টা। ৩৫ বছর পরে তিনি লেখেন, 'আমি 'ওল্ড বেইলী'-তে বহু ভয়ংকর ঘটনা দেখেছি, কিন্তু বিচারক উইল্স কর্তব্যের খাতিরে যখন শাস্তি দিলেন এমন একজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য, যিনি অনেক দিয়েছেন, তখন মনে হল কোনও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাও বুঝি এত সাংঘাতিক হতে পারে না।' বস্তুত ঐ দণ্ডাজ্ঞা ওয়াইল্ড-এর পক্ষে মৃত্যুদণ্ডাদেশের সমান ভয়ংকর, পরে তিনি 'ডি প্রোফান্ডিস্' এবং 'দ্য ব্যালাড্ অব্ রিডিং জেল' লিখলেও শিল্পী হিসেবে তিনি তখন অস্তগামী।

অবস্থাটি ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ওয়াইলড-এর সত্য পরিচিতি এবং তদানীন্তন কারাগারের প্রকৃতি মনে রাখা দরকার। ওয়াইল্ড বিদগ্ধ হাস্যরসিক, শৌখীন মানুষ। ডাব্লিন্ য়ুনিভারসিটী-র অন্যতম সেরা ছাত্র। অক্সফোর্ড্-এ তিনি 'অনার্স' লাভ করেন এবং স্বরচিত 'র‍্যাভেন্না' কবিতার জন্য 'নুডিগেট্' পুরস্কার পান। তিনি সুকর্ষিত মনন এবং সংবেদনশীল মনের অধিকারী, ভাষার যাদুকর এবং সমসাময়িক-দের মধ্যে সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ আলাপচারী।

১৮৮২ সালে আমেরিকাতে তাঁর এক সম্বর্দ্ধনা সভায় অস্কার ওয়াইল্ড

কারাগারে

এবং, এই অ-তুলনীয় বাক্‌বিদ্‌কে ওয়ান্ড্‌ওয়র্থ জেল-এ কথা বলতে দেওয়া হত না। অন্যকোনও কারগারবাসীর সঙ্গে কথা বলা মানেই কয়েকদিন খাদ্য-পানীয় হিসেবে শুধুমাত্র রুটি এবং জল। জেল-এর ডাক্তারের সন্দেহ তিনি অসুস্থতার ভাণ করেন; চ্যাপলিন-এর ধারণা তাঁর মুক্তির আশা প্রায় শূন্য, এবং তাঁর অবনতির কারণ পারিবারিক জীবনে পরিবারের সমবেত প্রার্থনার প্রভাব তাঁর জীবনে নেই। ওখান থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে রিডিং জেল-এ নেওয়া হল, রাস্তায় তিনি উপহসিত হলেন বিরুদ্ধবাদী জনতা দ্বারা। দু'বছর এই অতি-মাত্রায় সংবেদনশীল স্রষ্টা পাশব পরিশ্রম করতে বাধ্য হন; তাঁর পরিহাস-হাস্যমুখর বাক্যালাপ স্তব্ধ হয়ে যায়, খেতে পেতেন যা খাওয়ার অযোগ্য। আর পরিবেশ—জঘন্য; তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসহনীয়। তাছাড়া, তাঁকে দেউলিয়া ঘোষণা করায় তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বিক্রীত কিংবা অপহৃত হল। তাঁর স্ত্রীকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, এমন কি নিজের ছোট ছেলে দু'টিকে পর্যন্ত আর কখনও দেখার অনুমতি পান নি।

নির্বাসন, অসম্মান

ভাবলে অবাক লাগে তিনি কী ক'রে জেল থেকে সুস্থ দেহে, সুস্থ চিত্তে বেরিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু বেরিয়ে দেখলেন বাইরের পৃথিবী তাঁর পক্ষে জেল খানারই বৃহত্তর সংস্করণমাত্র পদে পদে অপমান, নিগ্রহ। তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের পর্যন্ত একটা সুইস্ হোটেল থেকে বের ক'রে দেওয়া হল। ছেলেরা নামের শেষে 'ওয়াইল্ড' পদবীর বদলে 'হল্যান্ড' পদবী বসাতে বাধ্য হল। তাদের পিতা মৃত, অথচ একথা শোনানোর পরও তাদের শোক প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হল না।

১৮৯৭-তে মুক্তি পেয়ে অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর দুই বন্ধু রেজিনাল্ড টারনার এবং রবার্ট্ রস্-এর সঙ্গে দিপ্পে-তে কগেলেন। খনও আর তিনি ইংলন্ড-এ ফেরেন নি। কিন্তু ফ্রান্স-এও কি স্বস্তি আছে। ইংরেজ আগন্তুকদের তাগিদে তাঁর অপমান চলতে লাগল। হোটেল-এ তাঁর প্রবেশাধিকার নেই রেস্তোরাঁ-য় তিনি খাদ্য পান না। এর ওপর মার্কুইস্-নিযুক্ত গুপ্তচর তাঁর গতি-বিধির ওপর নজর রাখত।

ছাড়া পাওয়ার পর তিনি 'ব্যালাড্ অব্ রিডিং জেল' সমাপ্ত করেন। গ্রীষ্ম শেষে লর্ড্ 'আল্‌ফ্রেড্ ডগলাস'-এর সঙ্গে 'রুয়েন্'-এ তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কয়েক সপ্তাহ পরে রবার্ট্ রস-এর মিনতি সত্ত্বেও ইতালীর নেপ্‌লসএ তিনি ডগ্‌লাস্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর বেদনাদায়ক এই বন্ধুত্ব নভেম্বর মাসে ছিন্ন হয়ে গেল।

বিদেশে তাঁর অপরিসীম নিঃসংগতাবোধ কল্পনা করলে বৃটিশ আইনী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণায় সমস্ত অন্তর রি রি ক'রে ওঠে। জেলবাস যতটা, তার চেয়েও ঢের বেশি এই পারিপার্শ্বিক অসামান্য নিষ্ঠুরতা এবং অন্তহীন নিঃসংগতা

অনুভূতি শিল্পী, স্রষ্টা অস্কার ওয়াইল্ড-কে তিলেতিলে খুন করেছিল। যখন প্রশংসা, মমতা, অনুরাগ তাঁর সব থেকে বেশি প্রয়োজন, সেই সময় তিনি পেলেন কুৎসিত নিন্দা, নির্মমতা এবং বিরক্ত-ব্যবহার। মর্ম না বুঝে যারা ধর্ম ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হয়, বিশেষত যদি তার মূলে সক্রিয় থাকে জিঘাংসা প্রবৃত্তি, সে ধরনের ক্যুইন্সবেরীর অষ্টম মার্ক্যুইস্-দের মানুষ বললে মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়। এদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সামন্ততান্ত্রিক শোষণপুষ্ট এই জাতীয় মানবরা সভ্যতার কলংক।

শেষের ক'দিন

মিথ্যা অভিযোগ এবং পাশবিক অত্যাচারে একজন উজ্জ্বল স্রষ্টার জীবনদীপ অকালে নিভে গেল কালিমালিপ্ত হয়ে। সে কালিমা মার্ক্যুইস্-দের গালে অনপনেয় হয়ে রয়েছে আজও।

প্যারিস-এ সংগবর্জিত অবস্থায় তাঁর শেষ জীবন কাটে। একটা চিঠিতে তিনি লেখেন, 'এখন চোর এবং খুনীদের সঙ্গেই আমাকে মিশতে হবে।' ক্রমে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা কমে এল, কেউ কেউ অবিচ্ছিন্ন অর্থের তাগিদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নিঃসঙ্গতা ক্রমবর্ধমান।

১৯০০ খৃস্টাব্দে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দ্যুপইরিয়েব-এর কোলে মাথা রেখে তিনি অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই ভদ্রলোক হোটেল দ্য' অ্যাল্সাক-এর মালিক। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ভীভীয়ান-এর স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

ওয়াইল্ড-এর বিচারের ফলে একটা পরিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, একটি উজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি থেকে বঞ্চিত হল ইংরেজি সাহিত্য।

মিস্টার মন্টগোমারী হাইড্ দেখিয়েছেন ওয়াইল্ড কখনও সৎ তরুণকে সমকামে প্রলুব্ধ করেন নি। ১৮৮৬ পর্যন্ত ইংলণ্ডীয় 'ক্রিমিন্যাল ল' নিভৃতে বয়স্ক পুরুষদের অশালীনতা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। নতুন আইনকে বলা হত 'দ্য ব্ল্যাকমেইলার্স্ চারটার্।' ভিক্টোরীয় ইংলন্ড-এর নীতিবোধ অদ্ভুত, বিকারগ্রস্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ইংলণ্ড-কে চমকে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ইংলণ্ডও তাঁকে চূড়ান্ত চমক দিল, যখন তিনি জেল-এ দেখলেন কয়েকটি বালককে—তাদের অপরাধ? অনধিকার প্রবেশের ফলে মহামান্য বিচারকনির্দিষ্ট জরিমানা তারা দিতে অক্ষম।

আজ আমরা নির্দ্বিধায় তাঁর জুনিয়র কাউন্সেল স্যার ট্রাভার্স্ হাম্ফ্রেস্-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি; 'একটা কথা তর্কাতীত। অস্কার ওয়াইল্ড-কে বিচারের জন্য আনাই ঠিক হয় নি।'

তাঁর স্মৃতি আজ মানব জাতির শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার ধন। বিরুদ্ধবাদীরা উপহাস এবং ঘৃণার পাত্র। প্রতিভাকে বিদ্বেষ মুছে দিতে পারে নি। কোনদিন পারবেও না।

নিরাপদ এবং সাপদ নাসা

কল্পনা করুন—একটি ছেলের নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। মাথা উঁচু ক'রে সে পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়েছে, যাতে তার জামা লাল ফোঁটায় ভর্তি না হয়ে যায়। ভাবুন, চিকিৎসক তার কানে ফিসফিস ক'রে দাঁতভাঙা গ্রীক শব্দ 'এপিস্ট্যাক্সিস্' শুনিয়ে দিলেন,—ঐটাই তার রোগের নাম কিনা ছেলেটি বলবে, 'দয়া ক'রে আপনার চাবির গোছা আমার পিঠের ওপর থেকে নিচে নামান।'

একটা জনপ্রিয় প্রতিকার বই নয়। জনৈক ফরাসী বিশেষজ্ঞের মতে: এই জনপ্রিয় প্রতিকার ঔষধবিজ্ঞানের চেয়েও বেশি বয়সী। তা ছাড়া, অপ্রাতন ঔষধবিজ্ঞান এটা বিজ্ঞান-সম্মত বলে মেনে নিয়েছে।

কোনও কোনও ছেলে কোনও আপাত কারণ ছাড়াই কখনও কখনও নাসায় ভোগে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান এর কারণ সম্বন্ধে কি বলে? বলে 'ব্লাড-ভেসেল'গুলো বড় হওয়ার জন্যই এমনটা হয়।

ধাতুর হিমভাব সংকোচন সৃষ্টি করে প্রসারণের বিরুদ্ধে সম্ভবত নাসা-ঝিল্লীর শ্লেষ্মা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে। প্রতিকারের মতই ব্যাখ্যাটি ঠেকসই, কারণ, রক্তক্ষরণ স্বতই বন্ধ হয়ে যায়। নাকের প্রান্ত টিপে ধরলে ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে ওঠে।

কেন বুঝতে না পেরেও বাচ্চারা নাসায় ভোগে। অদ্ভুত। এর কারণ 'রিফ্লেকস—সম্ভবত সে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছচ্ছে বলেই, কেন না, 'এপিস-ট্যাক্সিস্' এই সময় প্রাই হয়ে থাকে। ডাক্তার বলেন: কখনও কখনও সামান্য রক্তক্ষরণ টাইফয়েড জ্বরের সম্ভাবনাসূচক; কখনও তা অপর্যাপ্ত যকৃৎও বোঝায়। এই ধরণের নাসা চলতে থাকলে বা বারবার হলে ছেলেকে দুর্বল ক'রে রক্তশূন্যতার শিকারে পরিণত করবে। দীর্ঘস্থায়ী হলে 'হেমো-ফিলিয়া' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে—অর্থাৎ রক্ত ঠিকমত জমাট না বাঁধায়, দশ থেকে বারো ঘণ্টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন রক্তক্ষরণ হওয়া সম্ভব কোন কোন ক্ষেত্রে। অপারেশন হয় ত দরকার হতে পারে, কাজেই এ ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। রক্তের জমাট বাঁধার পরিমাপ সহজসাধ্য। সে ক্ষেত্রে নাসা বন্ধ করার জন্য নাসারন্ধ্রে 'সিরাপ'-ভেজানো তুলো দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

সেকালের রঙ্গমঞ্চ

সংস্কৃতির নানা অঙ্গ। সেই বহু অঙ্গের অন্যতম--নাটক। ভারতবর্ষের নাট্যকলার অনুশীলনের ইতিহাস যেমনই গৌরবময়, তেমনই সুসমৃদ্ধ। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে নাট্যচর্চার যে বেগবান ও অপ্রতিহত ধারা বইছে, তার পুঙখানুপুঙখ বিবরণ ইতিহাস ধরে রেখেছে। সংস্কৃতির যে মুখ্য শাখাগুলির মাধ্যমে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীল মনের মহৎ প্রকাশ ঘটে, আমাদের মানসলোকে নব নব চেতনার ও অনুভূতির লক্ষ প্রদীপ জ্বলে উঠল--নাটক তাদেরই মধ্যে একটি। তাই জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নাটক শুধু নিছক আনন্দ সংগ্রহেরই উপাদান নয়। মহৎ বক্তব্য প্রকাশেরও এক বলিষ্ঠ মাধ্যম। সেই বিচারে বলা যায়, জাতীয় জীবন গঠনে এক মহান্ ভূমিকার অধিকারী।

নাট্যানুশীলনে ভারতের মতই পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশের ঐতিহ্য ও গৌরব শিরোধার্য। এ দেশের মতই গ্রীস, রোম ও ইংল্যাণ্ডের শাশ্বতকাল থেকে নাট্য-সরস্বতীর বেদীমূলে অর্ঘ্যদান হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীস ও রোমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বহুলাংশে তাঁদের নাট্যশাস্ত্রের উপরও নির্ভরশীল। সমগ্র ইওরোপের মধ্যে গ্রীক রঙ্গমঞ্চই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতার দাবিদার। সেকালে গ্রীসের এক-একটি রঙ্গশালার পরিধি হত বিপুল ও বিশাল। বহু জন-সমাগম যাতে সম্ভবপর হতে পারে সেই অনুযায়ী রঙ্গালয়ের আয়তন নির্ধারিত হোত। এর দ্বারাই সেই প্রাচীনকালেও লোকের নাট্যপ্রবণতা কতখানি গভীর এবং স্বতস্ফূর্ত ছিল, সে সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা গঠন করা যেতে পারে। গ্রীক রঙ্গমঞ্চগুলির গঠনপদ্ধতিও ছিল কিছুটা বৈশিষ্ট্যসমন্বিত। মঞ্চের পশ্চাতে তিনটি প্রধান দরজা সাধারণভাবে রাখা হোত। মাঝেরটি আকারে বড় হোত। ও বাকি দুটি দরজা এক আকারের হত, মাঝেরটির গুরুত্বই সর্বাধিক। রাজা বা বিশেষ কোন চরিত্রকে ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হোত। কোন প্রাসাদের প্রবেশপথ হিসাবেও এ দরজাটির ব্যবহার হোত। কোন ভগ্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির বা কারাগৃহ মঞ্চের বাম দিকে দেখানো হোত। নাটকের দ্বিতীয় পুরুষের প্রবেশপথ হিসাবে ডানদিকের দরজাটি নির্দিষ্ট থাকত।

গ্রীক নাটকের সেদিন অপরিহার্য বস্তু ছিল মুখোশ। মুখোস ব্যতিরেকে কোন অভিনয়ই সেদিন চিন্তা করা যেত না। মুখোস ব্যবহারের একটি বিশেষ কারণও বিদ্যমান ছিল। বিরাট বিশাল প্রেক্ষাগৃহ। শেষ সারির দর্শকরা শিল্পীর অভিব্যক্তি ভাল করে দেখতেই পেতেন না। শিল্পীর প্রাণঢালা অভিনয় তাঁর শিল্পসৃষ্টির সূক্ষ্ম চাতুর্য সব কিছুই দূরত্বের জন্য পিছনের সারির দর্শকদের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যেত। মুখোসগুলি সেই অভাব পূরণ করত। মুখোসগুলির পরিকল্পনা ও অলংকরণও যথেষ্ট শিল্পে-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করত। যে অভিব্যক্তিগুলি মুখোসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হোত --সেই অভিব্যক্তিগুলিই মুখোস-শিল্পীকে ফুটিয়ে তুলতে হত, তার সৃষ্টির মাধ্যমে।

কলো কাকলি

তবে এ পরিশ্রম সার্থক হোত। দর্শকের অতৃপ্তি থাকত না আর শিল্পীকেও তাঁর পরিশ্রম নিষ্ফল হওয়ার জন্য বেদনায় ভারাক্রান্ত হতে হোত না।

মঞ্চগৃহের বিপুল আয়তনের জন্য আর একটি বিশেষ ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হোত। কিছুটা উচ্চতা আনতে না পারলে শেষ সারির দর্শকদের চোখের সামনে নিজেকে তুলে ধরা যেত না। স্বাভাবিক দৈহিক উচ্চতা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত না। তাই এক বিশেষ উচ্চতাসম্পন্ন অভিনব ধরনের কাষ্ঠ নির্মিত বিনামা ব্যবহার করে প্রধান শিল্পীরা নিজেদের দৈহিক উচ্চতা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে তুলতেন। এই পদ্ধতির অনুসরণ বহুকাল পরে চীনদেশের রঙ্গমঞ্চে দেখা গেছে। এই জুতোগুলিও চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী বিচিত্রবর্ণে বর্ণাঢ্য করে তোলা হোত এবং এগুলি ব্যবহারে একজন ছ' ফিট দৈর্ঘ্যবান অভিনেতা সাড়ে সাত ফিট দৈর্ঘ্যে পরিণত হতেন।

রোমের রঙ্গমঞ্চে মুখোস ছিল এক কথায় অপরিহার্য। সেখানকার কৌতুকশিল্পীরা সব সময়েই মুখোস পরে দর্শকদের সামনে এসে দাঁড়াতেন। পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে রোমীয় রঙ্গমঞ্চে একটি নির্দিষ্ট গতানুগতিক প্রথা প্রচলিত ছিল। বেশ পরিকল্পনা হোত সেই বিশেষ রীতি অনুযায়ী। কোন্ কোন্ শিল্পীর কোন্ কোন্ পরিচ্ছদের কি কি রং হবে তাও স্থির হোত এক বিশিষ্ট রীতি অনুসারে। অতএব দেখা যাচ্ছে পরিচ্ছদের বর্ণ-বিন্যাস ও বিশেষ রীতির প্রতি নির্ভরশীল। এইখানে প্রথা বা নিয়মের প্রতি রোমীয় শিল্পীদের প্রগাঢ় নিষ্ঠার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলছে। শুধু বেশভূষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রচলিত রীতির প্রতি তাদের আনুগত্য প্রেক্ষাগৃহ অলংকরণের মধ্যেও ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগের রঙ্গমঞ্চে মুখোস বর্তমান থাকলেও তার পূর্ব প্রাধান্য আর রইল না। তার অপরিহার্যতা শেষ হয়ে গেল। সামগ্রিকভাবে সে বস্তু না হলে চলবে না, এ মনোভাব নষ্ট হল। মুখোসের প্রাধান্য কমলো এবং সঙ্গে মঞ্চে কলা-কৌশলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হতে সুরু হ'ল। অবশ্য আজকের দিনে রঙ্গমঞ্চ কলাকৌশলগত যে উৎকর্ষে উপনীত হয়েছে সেদিন সে উৎকর্ষ তার ছিল না এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মধ্যযুগ থেকেই তার পদক্ষেপণ সুরু—এ-কথা বলা চলে। ফ্রান্সের রঙ্গমঞ্চে দেখা গেছে সেণ্ট পিটারের মুখোস সজোরে মঞ্চের উপর তিনবার পড়ছে এবং প্রতিবারই তার ভিতর থেকে ঝরনা নিঃসারিত হচ্ছে।

বাঁদিক থেকে—(১) বিরহিনী নায়িকা, (২) রাজদূত ও (৩) রঙ্গনটী। প্রাচীন কালের গ্রীক রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী তিনটি মুখোসের প্রতিকৃতি
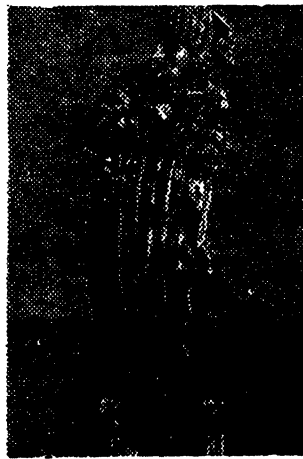
প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমঞ্চে মুখোস পরিহিত নায়ক

পাশ্চাত্য ইতিহাসে মধ্যযুগ স্মরণীয় হয়ে আছে। আজ সারা ইয়োরোপ যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কল্যাণে সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করেছে এবং যে সভ্যতার আলো পৃথিবীর আরও নানা দেশকে উজ্জ্বল করে তুলেছে সেই সভ্যতার মঙ্গলারতির পবিত্র লগ্ন হিসাবে ইতিহাসে সগৌরবে চিহ্নিত হয়ে আছে মধ্যযুগ। সেই কারণেই মধ্যযুগের কাছে ইয়োরোপের জাতীয় ঋণ অসামান্য।

এই রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দিয়ে ইতালীরও নব্য সংস্কৃতির শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল বললেও নিতান্ত ভ্রমে পতিত হতে হয় না। ইতালীতে কলাকৌশলের ন্যায় মঞ্চসজ্জার দিকেও এবার নজর দেওয়া আরম্ভ হল। কাহিনী ও পরিবেশ অনুযায়ী মঞ্চ নির্মাণ, তার অলংকরণ তাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বস্তুর সংস্থাপন প্রভৃতি দিকগুলি সম্বন্ধে ইতালীয় মঞ্চ-সেবীরা যথেষ্ট মাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন। মঞ্চসজ্জা যে নাটকের অন্যতম প্রাণস্বরূপ—এই সত্যটি ইতালীর মাধ্যমে সেদিন চারিদিকে প্রচারিত এবং সেই সঙ্গে প্রমাণিত হল। মঞ্চসজ্জার সঙ্গে সঙ্গেই আলোকসজ্জার বা আলো নিয়ন্ত্রণের দিকেও নজর দেওয়া হল। অবশ্য এর বহু পূর্বে প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমঞ্চে আলোক সম্পর্কিত সচেতনতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি ঘটতে লাগল বিদ্যুতের বেগে। অপ্রতিহত গতিতে সে ব্যাপক ও ক্রমোন্নয়নের মুখোমুখি হতে থাকল।

পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এর পর স্বভাবতই ইংল্যাণ্ডের নাম আসে। প্রথম এলিজাবেথের সময় রঙ্গমঞ্চ এক চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং অসাধারণ

জনাপ্রিয়তায় বিভূষিত হয়। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চের পরিমণ্ডলে অগণিত দিকপাল মহারথীর আবির্ভাব ঘটে ইংলণ্ডীয় মঞ্চজগতে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে সহায়তা করে। এই তালিকায় সর্বাগ্রে যে নাম উল্লেখনীয়—সে নাম উইলিয়াম সেক্সপীয়ার ইংল্যাণ্ডের মঞ্চজগতের গর্ব ও গৌরব সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডের রাজ দরবারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নাট্যাভিনয় প্রসারতা লাভ করেছে এবং মঞ্চসজ্জা ও পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চ পূর্বের তুলনায় আরও বহুগুণ উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—নারী চরিত্রে পুরুষের পরিবর্তে মহিলাদের দিয়েই অভিনয় করানো রীতিসিদ্ধ হয়ে উঠল। রঙ্গমঞ্চের প্রগতির ইতিহাস একটি যুগ থেকে আর একটি সমৃদ্ধতর যুগে উপনীত হল।

—বাসুদেব

নিশিপদ্ম

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও নচিকেতা ঘোষের সুর-সমৃদ্ধ হয়ে যে বইখানি অচিরেই মুক্তি পেতে চলেছে তার নাম 'নিশিপদ্ম'। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন, উত্তমকুমার, সাবিত্রী, অনুপকুমার, তপতী, জহর রায়, মাঃ মলয় ও গঙ্গাপদ বসু। কাহিনী রচনা করেছেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। মুভি মায়া রিলিজ পরিবেশনায় থাকছেন।

পদ্ম গোলাপ

পরিচালক অজিত লাহিড়ীর পরবর্তী ছবি 'পদ্ম গোলাপ'। শ্যামল মিত্রের সুরে এ ছবিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন প্রখ্যাত শিল্পীরা। কাহিনী রচনা করেছেন ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক বারীন্দ্রনাথ দাস। এস বি পি প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে নির্মিত এ ছবিতে অভিনয় করছেন সৌমিত্র, অর্পণা, অজিতেশ, অনুপ, অনুভা, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখার্জী।

বিলম্বিত লয়

অনুরাধা পিকচার্সের পরবর্তী নিবেদন 'বিলম্বিত লয়'। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনীর উপর রচিত ও অগ্রগামী পরিচালিত এ ছবির বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, নির্মলকুমার, কণিকা, মৃণাল, পদ্মা দেবী, শোভা সেন, শ্যামল ও নবাগতা দীপা। চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত এ ছবিতে সুর-সংযোজনের দায়িত্ব নিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ।

মাল্যদান

বহুদিন পর আবার দেখা যাবে পরিচালক অজয় করকে। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' কাহিনীর সফল রূপদানে তিনি এখন অতি মাত্রায় ব্যস্ত। হেমন্ত

বাংলা ছায়াছবি

মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত এ-ছবির বিভিন্ন কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র, নন্দিনী, সাবিত্রী, শৈলেন, ভানু, গীতা প্রভৃতি। অজয় কর ও বিমল দে প্রযোজিত এ ছবির বিশ্ব-পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রলিপি ফিল্মস।
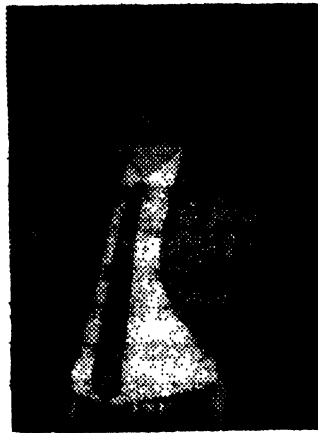
উত্তমকুমার—একটি বিশেষ ভঙ্গীমায়
চিত্র : [illegible]

কলঙ্কিত নায়ক

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের অপর যে কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হতে চলেছে তার নাম 'কলঙ্কিত নায়ক'। এর চিত্রনাট্য এবং পরিচালনায় আছেন সলিল দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চ্যাটার্জী। নেপথ্যে কণ্ঠদান করছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও বাসবী নন্দী। এম বি ফিল্মসের পরিবেশনায় এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন উত্তম, অপর্ণা, বিকাশ, ছায়া দেবী, অরুণ, অনুপ, সাবিত্রী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, উৎপল দত্ত, এন, বিশ্বনাথন, মিহির ভট্টাচার্য, বেবী বুচন, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী প্রভৃতি।

এখানে পিঞ্জর

খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস এখানে পিঞ্জর। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ই বইটি বাজারে আলোড়ন তোলে। এবারে ছবির আকারে বইটিকে দেখতে পাওয়া যাবে ছায়াছবির পর্দায়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে আজকের মধ্যবিত্ত সমাজ কি দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে তারই চমকপ্রদ কাহিনী এ-ছবিতে বিধৃত। যাত্রিক পরিচালিত ও ভূপেন হাজারিকার সুরে এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার, অর্পণা, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, দোলনচাঁপা দাশগুপ্তা, রত্না ঘোষাল, অপর্ণা দেবী, গৌর শী, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ ও জহর রায়।

বিশ্বের

ফ্রান্সের জঁ্যা লুক গদার বিশ্বের সমসাময়িক চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে যে আজ সবচেয়ে বিতর্কতম পরিচালক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনেকের কাছে তিনি যেমন একজন বিদগ্ধ চিত্রপরিচালক অপরদিকে গদার যদি 'worst' নাও হন তবে একেবারেই অসহনীয়। যাই হোক বহু বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি একদিকে যেমন যশ অর্জন করেছেন অপরদিকের কাছে তেমনি ঘৃণার পাত্র। যাই হোক গদার আজ যেমন বহুজনের অন্তঃকরণে শ্রেষ্ঠতম পরিচালক, রেঁনেকে বাদ দিয়ে তেমনি শ্রেষ্ঠতম শিল্পীও বটে। অনেকে বলেন, গদারের এই যে কীর্তি এর আসল চাবিকাঠি কিন্তু লুকোনো আছে তাঁর কল্পিত চিত্র এবং দলিল চিত্রের মধ্যে যে ব্যবধান তারই মধ্যে। এ সম্বন্ধে গদার নিজেই লিখেছেন সত্য ও সুন্দর উভয়েরই দুটি দিক আছে। একটি দলিল চিত্র অপরটি সংঘাতময়। এর যে কোন একটিকে নিয়ে শুরু করা চলে। আমার শুরু দলিল চিত্র দিয়ে, কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে সংঘাতের মধ্যেও যে সুন্দর রূপটি আছে তারই রূপ দিতে চেষ্টা করি। গদার একসময় সম্ভবত ১৯৫০ সালে একখানি রাশিয়ান ফিল্মের প্রশংসা করেন, কারণ হিসেবে বলেন, It oscillated constantly between two poles, Its heartbeat shinging back and forth from absolutes to fiction. তাই গদার সবসময়ে একটি থেকে অপরটিতে যাবার যে প্রবণতা সেদিকে খুব সতর্ক থাকতেন। তাঁর মতে play between doqumentary and fictionই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত বিষয় যা তাঁর চলচ্চিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলে। উল্লেখযোগ্য, গদার হেগেলিয়ান ধ্যান ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তাঁদের সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে শিল্পী হিসেবে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সাহিত্যে বস্তুবাদ, নয়াবস্তুবাদ, রোমান্টিসিজম, সুরিয়ালিজিম প্রভৃতির আলোক যেমন সময়ে, অসময়ে সর্বব্যাপী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তেমনি দেখা যায়, আজ বাস্তববাদ, কাল রোমান্স, আগামীকাল প্রতীকীবাদ, চলচ্চিত্র জগৎকে মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত করে তোলে। গদার ও তাঁর সমসাময়ি-

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কেরা যার সাহায্যে চলচ্চিত্রকে নতুনভাবে রূপায়িত করেন তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রতীকীবাদ। নবযুগ অধ্যায়ের তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং সবকিছু বিতর্কের ঊর্ধ্বে সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর-কালে যে শূন্যতা, অস্থিরতা ও চঞ্চলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার সুস্পষ্ট ছাপ এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ বা নবযুগ বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই অর্থে একে বিচার করা শক্ত, তবে এটা যে, কতিপয় নবীন ও আধুনিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট পরিচালক যুদ্ধোত্তর যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে চিত্র পরিচালনা করতে থাকেন। আরও মজার ব্যাপার তাঁরা সকলেই সর্বপ্রথম সিনেমার সমালোচক ছিলেন কিন্তু পরে যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তা হচ্ছে স্রষ্টার। ফরাসী চলচ্চিত্রে এই গোষ্ঠীর মধ্যে ফ্রান্সিস ট্রুফো, জঁ্যা লুক গদার, কুড চ্যাবরোলেনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলকার দানই অপরিমেয়, এবং সকলেই লে-কেঁহিয়া ডু সিনেমার সদস্য।

যদিও ১৯৩০ সালে প্যারিসে জন্ম, গদারের বাল্যকালের বেশীর ভাগ সময়ই কাটে সুইজ্যারল্যাণ্ডের মনোহর ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যে। যার জন্যে আমরা দেখতে পাই তাঁর পরিচালিত অনেক নাটকই সুইজ্যার-ল্যাণ্ডের আলোয় আলোকিত।

সুইজ্যারল্যাণ্ডে থাকাকালে তিনি সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এথনোলজি পাঠ করেন। তাছাড়া ক্যামেরাম্যান হিসেবে এবং জুরিখের টেলিভিশনে সহকারী সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন। চলচ্চিত্রের উপর তাঁর সারগর্ভ একটি প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে, গেজেট ডি সিনেমা পত্রিকায় ও ক্যাঁইয়ে দি সিনেমা পত্রিকায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ফরাসী দেশের চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলি পৃথিবীর

গদার পরিচালিত 'ইউনিফেমিনিন' জনৈকা নায়িকা

বহু দেশের পত্রিকার চেয়ে উন্নত মানের। বহু বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও চলচ্চিত্রবিদ্‌দের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং যাদের বিক্রীর সংখ্যা আমাদের কল্পনাতীত। যাই হোক ১৯৫১ সালে গদার উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা সফরে গেলেন। তারপর আজকের ইউরোপের চলচ্চিত্র চিন্তা ও কর্মের অন্যতম কর্ণধার জ্যঁ। লুক গদার তার প্রথম ছবি তৈরি করলেন। সুইজারল্যাণ্ডের একটি বাঁধ নির্মাণ কার্যের উপর রচিত এটি একটি দলিল চিত্র। সেটা ১৯৫৪ সাল। নাম 'অপারেশন বেটন'। এর পরই তিনি প্যারিসে লে কোহেমিয়ার ডি সিনেমা নামক গোষ্ঠীতে যোগদান করে ছোট ছোট গল্পকে কেন্দ্র করে কমেডি জাতীয় চিত্র পরিচালনা করতে থাকেন। এইসব চিত্রের মাধ্যমেই তিনি প্রচলিত সহজ সরল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে নতুন পথের ইঙ্গিত দিলেন এবং নিজস্ব একষ্টাইলের প্রবর্তন করেন। এগুলোর চিত্রকাহিনীও এমন কিছু ছিল না। তবু এইসব ফিচার ফিল্মের মাধ্যমেও তিনি সুখ্যাতি পেলেন। এরপর কিছুদিনের জন্য গদার প্যারিতে একটি আমেরিক্যান প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল জি ডি বুরেগার্ড-এর সঙ্গে। বলা চলে তাঁরই উৎসাহ এবং প্রযোজনায় মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে তিনি যে ছবিটি তৈরি করলেন তার নাম দি A BOUT DE SOLLFFLEI ১৯৫৯ সালে। নায়কের ভূমিকায় নিলেন সম্পূর্ণ নতুন একটি মুখ। ছবি তোলার জন্য কত খরচ পড়েছিল জানেন? যে কোন সাধারণ মানের ছবি তোলার খরচের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। অথচ আর্থিক সফলতা এনে দিয়েছিল তিন লক্ষ ডলার বা একলক্ষ পাউণ্ড। ছবিটির স্যুটিং সুরু হয়েছিল ৫৯ সালের আগষ্ট সেপ্টেম্বর এবং প্রথম চিত্রায়িত হয়েছিল ১৯৬০ সালের ১৬ই মার্চ প্যারিসে। '৬১ সালের মে মাসে আমেরিকায় এবং জুলাই মাসে গ্রেট বৃটেনে। অথচ এই ছবিটি আত্মপ্রকাশ করার কয়েকদিন মাত্র আগে তিনি প্রযোজককে এক চিঠি মারফৎ জানালেন, ভীষণ ভয় এবং ভাবনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। স্বর্গ না নরক কি খোলা আছে আমার জন্যে জানি না, তবে যে জুয়াখেলা শুরু হতে যাচ্ছে তাতে জিৎ হবে আমাদেরই— এই আমার বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, জুয়ায় জিত হল গদারেরই এবং অচিরেই তিনি ফরাসী চলচ্চিত্রাকাশে নব জ্যোতিষ্ক বলে স্বীকৃত হলেন। এই চরম সাফল্যের কারণ যথেষ্ট ছিল। এর প্রধান চরিত্র দর্শক সমাজের মাথার মণি হয়ে রইল। অর্থাৎ দর্শকদের স্বপ্ন এবং বাসনা তারই মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল। কারণ পরিচালক এই অভিনেতাকে আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর হিরো-ভিলেনরূপে সাজিয়েছিলেন। এই 'হিরো -ভিলেন' তথাকথিত আইন-কানুনকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছে। হাতের কাছে যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই পেয়ে যাচ্ছে। তবে গদার সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পান নি। কেউ কেউ বললেন, এই চরিত্র সমাজকে তছনছ করতে চাইছে, যেমন কাম্যুর চরিত্র সমাজের বাধা বন্ধনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চায়। আবার অনেকে বিপরীত কথাও বলেন। আসলে গদারের কি মতলব ছিল এই চরিত্রের পিছনে তা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত।

(ক্রমশ।

গদার পরিচালিত একটি চিত্রের স্যুটিং-এর অবসরে পরিচালক গদার ও নায়িকা এনা [illegible]

নাট্যলোক

বিগত ২৫।২।৭০ ইং তারিখে কলিকাতার মহাজাতি সদনের মঞ্চে পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ ক্লেমস্ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে মহেন্দ্র গুপ্তের রায়গড় ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়।

নাটকের প্রারম্ভে ডেপুটি সি-সি-এস (ক্লেমস), শ্রীভানুপ্রকাশ ও ডেপুটি সি-সি-এস (জেনারেল) শ্রীদেবাশীষ দাশগুপ্ত এবং শ্রীপরেশনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষণ প্রদান করেন।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী প্রিয়তোষ ভৌমিক; পাঁচুগোপাল সান্যাল, কবি ও সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়; ভবানী রায়; বিজয় সরকার; লক্ষ্মী ঘোষ; সুকুমার মুখার্জী ক্ষিতীশ পাঠক; ত্রিদিবজ্যোতি দাস; মিলন চ্যাটার্জী; পরিমল ব্যানার্জী; অক্ষয় মুহুরী; চন্দ্রশেখর সরকার; অনিল মৈত্র; মান্যবর মণ্ডল; মৃত্যুঞ্জয় দত্ত; বাসুদেব কোলে সবিতা মুখার্জী; দীপা হালদার; শাশ্বতী রায়; ইরা মিত্র; দীপ্তি গুহ; মিহির ভট্টাচার্য; সুধীর ঠাকুর; ব্রজগোপাল নন্দী ও তারাপদ চক্রবর্তী।

পরিচালনা করেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়। এ উপলক্ষ্যে সংগৃহীত উদ্বৃত্ত অর্থ দুঃস্থ রোগগ্রস্তদের সাহায্য করা হবে। সৌখিন অভিনেতারূপে সকলেই সমবেতভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

শিল্পী তপন ঘোষ

ছোটখাটো জলসা। তাই একটু দেরী করেই হাজির হয়েছিলাম আসরে। কিন্তু আসরে ঢোকার মুখে লাউড স্পীকারে ভেসে আসা অপ্রত্যাশিত এক কণ্ঠের সুর মূর্চ্ছনায় হোঁচট খেলাম যেন। পরমুহূর্তে গতি হল দ্রুত, মনে আপশোষ, ইস,—"আসবেন এটা আগে বলতে হয়। যত্তো সব—।"

আসরে ঢুকে মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই চম্‌কে চেয়ে থম্‌কে থাকলাম। না, আমি যাঁকে ভেবেছিলাম তিনি নন। নেহাৎই কিশোর একটি। গানের শেষে হাততালিতে ফেটে পড়ল আসর।

বিস্মিত বিমুগ্ধ শ্রোতাদের সহর্ষ উৎসাহে পর পর বারোটি গান গাইল ছেলেটি। প্রতিটি গানই যার দুর্লভ কণ্ঠের মহিমায় চিহ্নিত।

সমাপ্তিতে পরিচয় করলাম কিশোরটির সঙ্গে। নাম—তপন ঘোষ। বয়স—চোদ্দ বছর। পড়ে ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলের দশম শ্রেণীতে। থাকে দেওয়ালে গা-ঠেকে যাওয়া অপরিসর গলি গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের এক বস্তীতে। স্বল্পবিত্ত পরিবারের মানুষরা যেমন বাড়িতে যেমন ভাবে থাকে আর কি।

অর্থ ব্যয় করে সঙ্গীতের পাঠ নেওয়ার সামর্থ্য নেই ছেলেটির।

শিল্পী তপন ঘোষ

গ্রামোফোন রেকর্ড আর রেডিওই ওর সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ওর অনুকরণ ক্ষমতা, আশ্চর্য ওর কণ্ঠের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকাজের চমক।

সঙ্গীত সাধনার পথ অত্যন্ত দুর্গম, তবু সব বাধা-বিপত্তি ঠেলে শ্রীমান তপনকুমার একদিন ভারতের সঙ্গীতাকাশে তপনের মতো প্রখর ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হবেই—এ বিশ্বাস আমার মনের আকাশে ধ্রুবতারার মতোই জাজ্বল্যমান।

কমরেড

সৌখিন মঞ্চে নাটক উপস্থাপনে অনেক 'এক্সপেরিমেণ্ট' হচ্ছে। গত ২রা মার্চ রঙমহলে ন্যাশানালিষ্ট ইউথ্ ফোরাম-এর মণিশঙ্কর রচিত 'কমরেড' নাটকটি যা দেখলাম তা সত্যিই নতুন। বুদ্ধিদীপ্তও বটে। বর্তমান যুগযন্ত্রণার পটভূমিকায় নাটকটি রচিত।

শ্রম যাদের জীবিকা তাদের নিয়েই 'কমরেড'। মূল্যবোধের অনিবার্য সংঘাত নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। মালিক, শ্রমিক ও তাদের ইউনিয়ন নেতাদের নিয়েই নাটকটি রচিত।

চরিত্র চিত্রণে যাঁরা সব চাইতে ভাল করেছেন তাঁরা হলেন প্রমোদরঞ্জন কুণ্ডু, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর দাস, দীনেন রায় ও কেয়া রায়। সু-অভিনয় যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশ্বনাথ পাল, প্রসাদ কুণ্ডু, বিশ্বনাথ বিশ্বাস, অনিল সেন, দেবিদাস রায়চৌধুরী, শান্তি গাঙ্গুলী ও লক্ষ্মী রায়। নাটকটি পরিচালনা করেন মণি চট্টোপাধ্যায়। নাটক শেষে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅনন্ত ভারতী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া।

কৌতুক শিল্পী দিলীপ গাঙ্গুলী

সম্প্রতি, বাংলা ও বিহারে কয়েকটি অনুষ্ঠানে, তাঁর স্বরচিত কৌতুক নাটিকা "শেষে পাগল" ও "মাদা বাঘ" গলার ভিন্ন - ভিন্ন - স্বরে একক, শিল্পিরূপে অভিনয় করিয়া জনগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন, আমরা শিল্পী দিলীপ গাঙ্গুলীর শিল্পী জীবনে সাফল্য কামনা করি।

লেক বালিকা শিক্ষালয়ের নাট্যাভিনয়ের একটি দৃশ্য

লেক বালিকা শিক্ষালয়ের নাট্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি (১লা, ২রা এবং ৩রা মার্চ) লেক বালিকা শিক্ষালয়ের পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে ছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে 'মুক্তধারা' এবং 'চিত্রাঙ্গদা', বাল্মীকি রামায়ণ হইতে সংগৃহীত ও সংকলিত 'পাদুকা গ্রহণম', ইংরাজী নাটিকা 'মানি লেণ্ডার', নাটকাকারে রূপায়িত বাইবেলের অংশ বিশেষ এবং সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' মঞ্চস্থ করেন। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের এবং প্রধান শিক্ষিকার অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং উৎসাহে ও ছাত্রীদের অক্লান্ত উদ্যমে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

বারাণসীর সর্বভারতীয় শিশু-সাহিত্যের মেলায়

গত ৭ই ও ৮ই মার্চ পুণ্যবারাণসী ধামের টাউন হলের সুন্দর মঞ্চে নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন বসে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ও মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ ডি, পি, পট্টনায়কের সভাপতিত্বে। সম্মেলনের দু'দিনব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন কাশী বিদ্যাপীঠের উপাচার্য রাজারাম শাস্ত্রী। এই উপলক্ষে সারা ভারতের প্রায় একশ' জন প্রতিনিধি বারাণসী ধামে উপস্থিত থাকেন। বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি, উড়িয়া, অসমীয়া ভাষায় রচিত শিশু সাহিত্যের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলার স্বপনবুড়ো। ভারতের বিভিন্ন ভাষার দু'হাজার পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকার এই প্রদর্শনীতে বারাণসীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। শিশু সাহিত্যের বিভিন্ন আলোচনা সভায় শিশু সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন উড়িষ্যার ডঃ গোপালচন্দ্র মিশ্র, ডি পি পট্টনায়ক, গুজরাটের আর পি সোনী, বারাণসীর তরুণ ভাই, রাজারাম শাস্ত্রী, শ্রীবেরী, উত্তর প্রদেশের সোহনলাল দ্বিবেদী এবং বাংলার মন্মথ রায়, অখিল নিয়োগী, ধীরেন বল, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল হোম রায় ও রবীন বল প্রভৃতি। শিশু পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধীয় আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন বিভিন্ন ভাষার শিশু পত্র-পত্রিকার কুড়িজন সম্পাদক। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সম্মেলনের মূল সভাপতি পট্টনায়কজী। কয়েকটি সংগঠনমূলক প্রস্তাব এই আলোচনা সভায় গৃহীত হয়। আগামী ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে বারাণসী, পাটনা, দিল্লী ও কলিকাতায় শিশু পুস্তকের এক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করার এক প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য তরুণ ভাই, রঞ্জিতভাই ও উৎপল হোম রায়কে লইয়া এক উপ-সমিতি গঠন করা হয়। বারাণসী ধামে নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম কার্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। বিষয় নির্বাচনী সভায় সংবিধানের কয়েকটি ধারার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন-মূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। চিলড্রেণ বুক ট্রাষ্টের কাজে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন ভাষার শিশু সাহিত্যের পুস্তক সংগ্রহ করার একটি প্রস্তাবও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনের বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৭০-৭১ সালের জন্য এক শক্তিশালী কার্য নির্বাহক সমিতি গঠন করা হয় শ্রীপট্ট-নায়কজীকে সভাপতি এবং ডঃ অনিল-বরণ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক, বেতার জগৎ) ও সুশীল সিংহ (শিশু স্বর্গ)কে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মন্মথ রায়ের 'মরা হাতি লাখ টাকা' ও বনফুলের 'কবয়ঃ' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন শিশু সাহিত্যিক প্রতিনিধিরা। স্থানীয় হরিশ্চন্দ্র কলেজের ছাত্রবৃন্দের কাওয়ালী সঙ্গীত পরিবেশন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৯ই মার্চ বাঙ্গালী টোলায় 'জয়যাত্রা সব পেয়েছির আসর'-এর পক্ষ থেকে শিশু সাহিত্যিকদের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

মরা হাতী লাখ টাকার একটি দৃশ্য

চিত্রঃ এস, প.ল

ঝিঁঝিপোকার কান্না

বেদুইনের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক গত ২১শে ডিসেম্বর বিনানী হলে নির্মল ভৌমিকের পরিচালনায় অগ্নিদূতের 'ঝিঁঝিপোকার কান্না' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

নাটকটি একটি পাগলাগারদের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। সমাজতত্ত্ববিদ কুমারেশের ভূমিকায় বরুণ দাসের অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের দাঙ্গায় বিতাড়িত পরিমল বুড়ো - অজিত ভট্টাচার্য ও রবি—নির্মল ভৌমিকের অভিনয় প্রশংসনীয়, এককথায় অপূর্ব। বড়সাহেবের নিষ্ঠুর অত্যাচার - মরালেশ সেনগুপ্তের অভিনয় অনেকদিন দর্শকের মনে রেখাপাত করে থাকবে।

ডাঃ নীলরতন চৌধুরী - নকুল দাস, নিরুপম - দিলীপ দত্ত ও নাট্যকার - শান্তি মল্লিকের অভিনয় আকর্ষণীয়। নপুর—সুনিতা সেন, সরমা - মানসী সোম মাতাল - প্রদীপ সাহা, কেষ্ট - দিলীপ গোস্বামীর অভিনয় দর্শকদের তৃপ্তি দেয়। অভিনেতা - দীনেশচন্দ্র, মিঃ খাঁড়া—ভোলানাথ ঘোষ, নীরব পাগল - নারায়ণ দাস, আগরওয়ালা - সুনীল সাহা ও সহদেবের ভূমিকায় - সুভাষ মজুমদারের অভিনয় মোটামুটি ভাল। রুস্তমজীর অভিনয় খুবই দৃষ্টিকটু। আলোক-সম্পাত ও আবহসঙ্গীত ভাল।

ফাঁস

সম্প্রতি ন্যাশনাল রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ ওয়ার্কস রিক্রিয়েশন ইউনিট ষ্টার রঙ্গমঞ্চে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। বিমানের চরিত্রে প্রশান্ত গুপ্তের অভিনয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের অনাবিল আনন্দরসে মাতিয়ে রাখে। সুভাষ, সোমনাথ, অলোক এবং তপনের চরিত্রে যথাক্রমে প্রকৃতি ঘোষ, দিলীপ ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য এবং গীতা দেও দর্শকদের মন জয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন পাঁচুগোপাল দাস, পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, তপন হালদার, অসীম ভট্টাচার্য, নীহার রায়, অমরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, তপন চক্রবর্তী, অমিয় চট্টোপাধ্যায় ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হালকা রসের নাটকটিকে মনোগ্রাহী করে তুলতে পরিচালক অরুণ চৌধুরীর প্রশংসাধন্য কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

সংক্রান্তি

গত ১৩ই জানুয়ারী '৭০, সি, এস, ও অফিস (পূর্ব রেলওয়ে) রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক রঙমহল মঞ্চে শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায় বিচরিত 'সংক্রান্তি' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটি সুপরিচালনার জন্য শ্রীসেুহময় রায়-চৌধুরী কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। এই সংস্থার দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। তন্মধ্যে পুরুষ চরিত্রে হর্ষনারায়ণের ভূমিকায় শ্রীঅসীম হাজরার অভিনয় এক কথায় অনবদ্য। বিশেষ করে রোগগ্রস্ত হর্ষনারায়ণের অভিনয়দৃশ্যে শ্রীহাজরার অভিনয় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। অন্য চরিত্রে সু-অভিনয় করেন শুক্কুর, রতন ও কালীনারায়ণের ভূমিকাভিনেতা যথাক্রমে সর্বশ্রী দীপক রায় চৌধুরী, পঞ্চানন অধিকারী ও তরুণ সরকার। ইহা ছাড়া সনাতন, নায়েব ও আদিত্যনারায়ণের চরিত্রগুলিও সু-অভিনীত হয়। স্ত্রী-চরিত্রে একমাত্র দুর্গার ভূমিকায় শ্রীমীরা বোসের অভিনয় প্রশংসনীয়। আলো ও আবহসঙ্গীতের কাজ যথাযথ। সাইকেল দৃশ্যের পরিকল্পনায় পরিচালকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাটানগরে নৃত্যাবিচিত্রা

বাটানগর, ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে ইয়ুথ হোষ্টেল এসোসিয়েশনের বাটানগর আঞ্চলিক শাখার ব্যবস্থাপনায় নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের "নৃত্যকলা" প্রদর্শনের আয়োজন করা হইয়াছিল। পূর্ণিমা হালদারের ভরত-নাট্যম্, রিঙ্কু ভাদুড়ী, অনীতা ঘোষ, রুনু সেনের আগানৃত্য, নীরেন্দ্র নাথ, পানু কুমার ও স্বর্ণা বাগচীর জেলে-জেলেনী নৃত্য, পূর্ণিমা হালদার ও কৃষ্ণা হালদারের রাজস্থানী লোক-নৃত্য দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীঅজয়কুমার গাঙ্গুলীর "হরবোলা" উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে আনন্দদান করে। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, নন্দদুলাল হালদার।

দক্ষিণ গোবিন্দপুর বালিকা বিদ্যালয়

দক্ষিণ গোবিন্দপুর জ্ঞানদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি অন্যান্য অনুষ্ঠান ছাড়াও নটীর পূজা নাটকটি নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়। নৃত্যে নটীর ভূমিকায় শীলা মুখোপাধ্যায়ের গতি মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে গেছে। সে তুলনায় রত্নাবলীবেশী শ্রাবণী মুখোপাধ্যায় অনেক বেশী জড়তামুক্ত। নির্দেশনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও কয়েকটি দৃশ্যে মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটি যেমনই সুসংবদ্ধ, তেমনিই সংবেদনশীল। নৃত্যকে নাট্যের ভাবসূত্রে সুষ্ঠুভাবে এখানে যেন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীতাংশ এবং গ্রন্থনায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রশংসা না করে পারা যায় না। গানগুলি অত্যন্ত সুগীত। আলোর মায়া বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টিতে আশানুরূপ সাহায্য করে নি। সব মিলিয়ে ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত এবং শিক্ষিকাদের দ্বারা পরিচালিত নৃত্য-নাট্যটি সেদিনের দর্শকমন জয় করতে সমর্থ হয়েছে।

বর্ষীয়ান কৌতুক অভিনেতা গ্রোকো মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাহবন্ধনও ছিন্ন হয়েছে। জানা গেছে, কিছুসংখ্যক বন্ধু ও অতিথির সামনে এই পঁচাত্তর বছর বয়স্ক শিল্পীর তাঁর উনচল্লিশ বছর বয়স্কা সহধর্মিণী এডনার বন্ধনের সমালোচনাই পনের বছরকাল স্থায়ী তাঁদের এই বিবাহবন্ধনের অবসানের কারণ। সকলের সামনে স্বামীর দ্বারা রন্ধনের সমালোচনা এডনা অত্যন্ত অপমানকর এবং তীব্র অবজ্ঞাসূচক বলে মনে করেছেন এবং এর ফলে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মানসিক আঘাত পেয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। আদালত বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছেন ও এডনার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য এক লক্ষ মিলিয়ান ডলার অর্থাৎ দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তৎসহ দু লক্ষ দশ হাজার ডলার (সাত বছরে দেয়) এডনার অনুকূলে ধার্য করেছেন।

●

হলিউডের স্ক্রীণ এ্যাক্টার্স গিল্ডের কর্মকর্তা নির্বাচন সম্প্রতি সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। সভাপতি-পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন প্রখ্যাতনামা শিল্পী চার্লটন হেস্টন (টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস, বেন হার। এল সিড প্রভৃতি)। এই নির্বাচনে তিনি পাঁচ হাজার সাতাত্তর ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেভিড গ্রীণ পেয়েছেন মাত্র এক হাজার চার শ' চুয়াল্লিশ ভোট। জন গেভিন রিকার্ডো সল্টালবান প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীরা এই নির্বাচনে সংস্থার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

●

হলিউডের প্রথম শ্রেণীর চিত্র-তারকাদের অন্যতম রেক্স হ্যারিসন (৬৩) এবং তাঁর তরুণী স্ত্রী র‍্যাচেল রবার্টসের সাত বৎসরব্যাপী বিবাহিত জীবন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। রেক্স ও র‍্যাচেল বর্তমানে পৃথক জায়গায় বসবাস করছেন।

●

'এতাবৎকাল যতগুলি ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়েছে তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক সাফল্যের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে দেখা গেছে 'গ্যন উইল দ্য উইণ্ড' (ক্লার্ক গেবল ভিভিয়েন লে)কে ১৯৩৯ সাল থেকে

সাগর পেরিয়ে

দীর্ঘ ত্রিশ বছর সারা বিশ্বে সাড়া জাগানো এই অনবদ্য ছবিটির এই গৌরবের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ ছিল। তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন টলল। দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে অন্য ছবি সে আসনে অধিষ্ঠিত হল। এই দীর্ঘ সময়ের পরিসরে গ্যন উইথ দ্য উইণ্ড যে টাকা ঘরে এনেছে দেখা গেল সেদিক দিয়ে ১৯৬৫ সালের ছবি সাউণ্ড অফ মিউজিক সে রেকর্ড অতিক্রম করে গেল।

লাস্যময়ী অভিনেত্রী কিম্‌ নোভাক

ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রে আবার যে সময়ে দীর্ঘকাল পরে চুম্বন ও ও নগ্নতার পুনরাবির্ভাব ঘটতে চলেছে ঠিক সেই সময়ে সিংহলে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য ছবিগুলির যৌন উত্তেজনা-মূলক দৃশ্যসমূহ ও কামোদ্দীপক চুম্বন দৃশ্যগুলি বাদ দিয়ে স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহ-গুলিতে সাধারণ্যে প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে।

●

চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতার প্রয়োগের যৌক্তিকতাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের চিত্রামোদী সমাজে তথা সমগ্র জনসাধারণ্যে এক প্রবল বিতর্কের তরঙ্গ উঠেছে। কিন্তু যে পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ রাষ্ট্রে ছায়াছবির রাজ্যে চুম্বন ও নগ্নতা অতি স্বাভাবিকভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে যৌনক্রিয়াও প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না—সেই প্রতীচ্যেরই এক দিক্‌পাল শিল্পী ছবিতে নগ্নতার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই স্বনাম-ধন্যা শিল্পীই প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ অসংখ্য ছায়াছবিতে আত্মপ্রকাশ করে প্রথম শ্রেণীর তারকা সমাজে নিজের আসনটি স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ইনগ্রিড বার্গম্যান (৫৪)। প্যারিস থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পর কেনেডি বিমান বন্দরে তিনি কথাপ্রসঙ্গে চলচ্চিত্রে নগ্নদেহের প্রদর্শন অশোভন ও অনুচিত বলেই মন্তব্য করেছেন।

●

এ কালে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পরিসরে চিত্রামোদী সমাজে যাঁকে কেন্দ্র করে অন্তহীন কৌতূহল এবং বিপুল বিস্ময় তিনি এলিজাবেথ টেলার (৩৯)। সমগ্র দর্শক-সমাজে যে সুগভীর মোহময় প্রভাব তিনি সৃষ্টি করেছেন তা এক কথায় অনতিক্রম্য। সম্প্রতি এই ভুবনমনোমোহিনী শিল্পী মানব কল্যাণমূলক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে

সাধুবাদার্হ ; প্যারাপ্লেগিয়া রোগের নিরাময়কল্পে গবেষণার জন্য একটি মেডিক্যাল রিসার্চ ফাউণ্ডেশান প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি চিন্তা করছেন। দেহের কটিদেশ থেকে সমগ্র নিম্নভাগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত পক্ষাঘাতকে প্যারাপ্লেগিয়া বলা হয়। এই গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁকে ব্যয় করতে হবে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড। তাঁর এই মহান হৃদয়বৃত্তির সুস্পষ্ট পরিচায়ক এই অভিনন্দনীয় মনোভাবটি তিনি ব্যক্ত করেছেন সুইজারল্যাণ্ডে। তাঁর যে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা শুধু চিত্ররসিক সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল, এই মহৎ সিদ্ধান্তে তার ধারা নির্দিষ্ট গণ্ডী লঙ্ঘন করে এবার সমাজের বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত হতে থাকবে। এই মহৎ মানকল্পনাটি যথা শীঘ্র বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে অসহায় আর্ত মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করতে থাকুক—মানবতার পূজারী মাত্রেই এ কামনা করে থাকবেন।

পাশ্চাত্য ছবির রাজ্যে "সেক্স-কুইন" হিসাবে যে অভিনেত্রীরা বিশেষভাবে চিহ্নিত সেই তালিকায় জেন ফণ্ডা (৩৩) একটি শীর্ষস্থানীয় নাম। উচ্ছল যৌবনের মাদকতাময় হিল্লোলে দর্শকচিত্তে যাঁরা প্লাবন সঞ্চারিত করেছেন ইনি তাঁদেরই অন্যতমা। এ ক্ষেত্রে এঁর পূর্বেই যে নামটি উল্লেখিত হতে পারে সেই ব্রিজিড বার্দোর (৩৫)। প্রাক্তন স্বামী রোগার ভাদিম বর্তমানে জেনের সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ। সম্প্রতি কোন কোন মহল থেকে শোনা যাচ্ছে তাঁদের মিলনের রাগিণীর মধ্যে বিচ্ছেদের সুর আভাসিত হচ্ছে। দুটি হৃদয়ের মধ্যে ক্রমশই বিচ্ছেদের প্রাচীর প্রকট হয়ে উঠছে। দুটি হৃদয়ের নিবিড় বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে। হয়তো শীঘ্রই জেন এই বন্ধন পুরোপরিভাবে ছিন্ন করার ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠতে পারেন।

সাউণ্ড অফ মিউজিক' প্রমুখ বহু সার্থকনামা ছায়াচিত্রের নায়িকা জুলি এ্যাণ্ড্রুস (৩৫) অভিনেত্রী হিসাবে আজ বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধির অধিকারিণী। নানা চরিত্রের শিল্পী হিসাবে তাঁর সার্থকতা আজ প্রমাণিত। বহু চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করে তিনি যথেষ্ট কুশলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমানে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভূমিকায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে। এ-আত্মপ্রকাশ রূপালী পর্দায় নয়। রূপালী পর্দার বাইরে। এ-ভূমিকা কথাশিল্পীর। জুলি বর্তমানে শিশু সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, যে কাহিনী তিনি রচনা করছেন—সে কাহিনী তাঁর সপত্নী কন্যা জেনিফারকে কেন্দ্র করে। পরিকল্পিত গ্রন্থটির উৎসর্গও করা হবে তাকেই এবং বইটির নামও হবে তারই নামানুসারে। সাহিত্যসেবী হিসাবেও জুলি প্রতিষ্ঠা, সমাদর ও জনপ্রিয়তা অর্জন করুন—এ সকলেরই কাম্য।

●

এ-কালের সাড়া জাগানো শিল্পীদের মধ্যে বার্বারা স্ট্রেসাঁ একটি মুখ্য নাম। অস্কার বিজয়ের মাধ্যমে

এলিজাবেথ টেলর

ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে দৃঢ়ভিত্তিক করে তুলেছেন। কানাডার বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আজ বহুজনের আলোচনার বস্তুতে পরিণত হওয়ায় সাধারণের দৃষ্টি তাঁর দিকে আরও অধিকতর সন্নিবদ্ধ হয়েছে। এই বিখ্যাত শিল্পী আরও একটি বিষয়ে দ্বিতীয় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন যে সব মহিলা হাল-ফ্যাসানের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক-শূন্য, সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, অপরকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বেশভূষা পরিধান করেন, সেই নিকৃষ্ট আকর্ষণবিহীন পরিচ্ছদে সজ্জিত। এ যুগের মহিলাদের মধ্যে বারবারার নাম উঠেছে দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী হিসাবে। এই তালিকায় তাঁর নামের পরে মানানুযায়ী আরও অনেক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নাম সন্নিবেশিত হয়েছে। মে ওয়েষ্ট র্যাকেল ওয়েলস, ডোরিস ডে, এ্যান মার্গারেট এবং শার্লে টেম্পল প্রভৃতি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিখ্যাত নাম। এই তালিকায় সকলের উর্ধ্বে প্রথম পংক্তিতে যে নামটি শোভা পাচ্ছে সে নামটি পরিচিতির মাপকাঠিতে ছায়ালোকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হলেও মানবসমাজে সে নাম যথেষ্ট আকর্ষণ এবং ব্যক্তিত্ব বহন করে। একদা যে দেশের সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পরিসরে সাম্রাজ্য বিস্তার, স্বীয় পরিধির মধ্যে সূর্যের অস্তগমন পর্যন্ত প্রতিরোধ করতে সফলকাম হয়েছিল এবং মিশরের শেষ রাজা নির্বাসিত ফারুকের স্থায়িত্বের বিচারে তাসের চারটি রাজার সঙ্গে যে দেশের রাজার উল্লেখ করেছিলেন—এই নাম—সেই বৃটেনের চুয়াল্লিশ বছর বয়স্কা বর্তমান অধীশ্বরী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এই বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত ভোট সাধারণ্যে কিভাবে গৃহীত হবে তা চিন্তার খোরাক বহন করে।

—চিত্রদূত

বিচিত্র বোম্বাই

নামা প্রবীণ চিত্রাভিনেতা শ্রীজয়রাজ অত্যন্ত বন্ধুবৎসল বলতে হবে। দিলীপকুমার, রাজ কাপুর প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা খুবই। কিন্তু এটা হয়তো অনেকেই জানেন না, জয়রাজ তাঁর ছেলের নামকরণ করেছেন ওই বন্ধুদ্বয়ের নামের সাহায্য নিয়ে। দিলীপরাজের কথা আমি বলছি। উদীয়মান এই নায়ক জয়রাজের ছেলে এটা বোধ হয় অনেকেই জানেন, জানেন না হয়তো ওঁর নাম অমন হলো কেন? এ সত্য প্রকাশ করেছেন দিলীপরাজ স্বয়ং।

গত মাসে দিলীপরাজের বিয়ে হয়ে গেছে দিল্লীতে। দিল্লীর প্রযোজক শ্রীযোগরাজ উবেরয়ের মেয়ে অনুর সঙ্গে দিলীপের পরিচয় প্রথম 'কন্যা-দান' ছবির প্রিমিয়ার উপলক্ষে ওই রাজধানীর বুকেই। কখন যে কিভাবে প্রথম দেখা চিরকালের বাঁধনে জড়িয়ে ফেলে সে হিসেব কে দেবে। ওদের জীবনে তাই-ই ঘটেছে। পাত্র-পাত্রী উভয় তরফের গুরুজনের সম্মতি নিয়ে এরপর মন দেওয়া নেওয়ার বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে সংসার সমুদ্রের কূলে ভেড়ানো মিলিত জীবন-তরণীটিকে বেঁধে ফেলতে সমর্থ হলেন। পাত্রের বাড়িতে প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোলো। একেবারে চোখ ধাঁধানো কাণ্ডকারখানায়। জয়রাজ নিয়মমাফিক দায়সারা করে ছেলের বিয়ের এই অনুষ্ঠানটিকে সারতে চান নি, তাই কোনো হোটেলের চার দেয়ালের মধ্যে বসে নি আসর। বিরাট প্যাণ্ডেল খাটিয়ে আলোর বান ডাকিয়ে বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের তারকাদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এসেছিলেন পৃথ্বীরাজ, তাঁর তিন ছেলে রাজ, শাম্মী, শশি আর তাদের তিন অর্ধাংগিনী, অনেক পরিচালক, প্রযোজক, কবি, সুরকার, বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। সকলেই তারিফ করে গেছেন আয়োজনের, বর কনের। করে গেছেন প্রীতি কামনা, জানিয়ে গেছেন শুভাশিস। আমরাও জানাই শুভেচ্ছা এক ফাঁকে।

●

'বোম্বে টকিজ'। যদি ভেবে থাকেন 'বন্ধন' 'কংকন' প্রভৃতি চিত্রনির্মাতা অতীতের সেই প্রতিষ্ঠানটির কথা আমি বলতে বসেছি, তাহলে ভুল করবেন। এ হোলো ইসমাইল প্রযোজিত ইংরিজি

বাংলা ও বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় নায়ক
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
চিত্র : বিশ্বনাথ গোস্বামী

ছবি 'বম্বে টকিজ'। এর চিত্র গ্রহণ করা হচ্ছে এখন বোম্বাইতে। এতে একটা হিন্দী ডুয়েট গান রাখা হয়েছে। গানটি গেয়েছেন কিশোরকুমার ও আশা ভোঁসলে। ছবিতে শশী কাপুর ও হেলেনকে ওর লিপ দিতে দেখা যাবে। দৃশ্যটি খুবই চমকপ্রদ করে তোলা হবে। এই সেটটিকে বিরাট অর্ধবৃত্তে নির্মাণ করা হবে — দেখতে হবে মস্তবড়ো একটা টাইপরাইটার। তার চাবিগুলো হবে বিরাট বিরাট —যাতে মানুষের ভার সইতে পারে, কেন না ওই চাবির ওপর শশী কাপুর এবং হেলেন নাচবেন। মধুর কল্পনাই বটে। এই দৃশ্য দিয়েই ছবির সূচনা হবে।

গল্পটা সংক্ষেপে এই :---গরীব এক কেরাণী। কিন্তু হলে কি হয় তার শয়নে স্বপনে একটি মাত্র চিন্তা —সে হবে ছায়ালোকের মায়াধর। যাকে বলে নাম-করা চিত্রনায়ক। তখন সে বিখ্যাত কোনো এক নায়িকার প্রেমের পাত্র হয়ে জীবন সার্থক করবে। ভাবনায় হাত ধরেই তো কর্মে সফলতা আসে---এই আপ্তবাক্য অনুযায়ী সেই কেরাণী সত্যিই একদিন নামী নায়ক হোলো। যে নায়িকার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার স্বপ্ন সে দেখেছে সেই নায়িকা এখন তার সর্বক্ষণের সংগিনী। ওই টাইপরাইটারে ওরা দু'জনে তখন নৃত্যে আত্মহারা। এরপরে ওই চিত্রনায়ক জনৈকা বিদেশিনী ঔপন্যাসিকার প্রেমে মশগুল হবে। এই ঔপন্যাসিকার চরিত্রে রূপ দেবেন শশীর বিদেশিনী স্ত্রী জেনিফার। স্ত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে অপর্ণা সেনকে। প্রখ্যাত অভিনেতা জিয়া মহিউদ্দীন এ-ছবির অপর একটি উল্লেখনীয় চরিত্রে অভিনয় করতে চুক্তিবদ্ধ। এছাড়া সুগায়িকা উষা আয়ার, উৎপল দত্ত, পিনটু কাপুরকেও অন্য কয়েকটি চরিত্রে দেখা যাবে।

●

একসঙ্গে দু'টো কিংবা তিনটে চরিত্রে অভিনয় করাটা আজকাল হিন্দীতে খুবই চালু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই এ ধরনের ছবি দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ শিল্পীই এগিয়ে এসেছেন এ কাজে। এতে যেন ব্যক্তিগত শক্তি-মত্তার প্রশ্ন রয়ে গেছে। অমুক শিল্পী পারে, কিন্তু তমুক হয়তো সাহস পাচ্ছে না সুনাম হারাবার ভয়ে। এখন তাই ছোট বড় অনেকেই ঝুঁকছে একটা

ছবিতে ডুয়েল রোল করছেনই। কিন্তু এ ধরনের দ্বৈত চরিত্র যে দর্শকদের আর অনুপ্রাণিত করতে পারছে না সেটা বুঝতে পেরেছেন নির্মাতারা। চেষ্টা করছেন চরিত্রগুলো তাই নতুন ধরনের করতে। প্রযোজক রতনমোহনের ভাই ভাই' ছবিতে সুনীল দত্তকে দ্বৈত চরিত্রে যে দেখা যাবে সেটা এমনি কায়দায় করা হয়েছে যে, আদালত দৃশ্য পর্যন্ত জানাই যাবে না ব্যাপারটা। ওইখানেই দর্শকরা বুঝতে পারবেন খেলাটা। সুনীল দত্ত সৎ এবং অসৎ প্রকৃতির দুটি ভাইয়ের ভূমিকায় এমনভাবে রূপ দিয়েছেন যে শয়তান ভাইটা একটা খুন করে বসলে সে দায়িত্ব সৎ ভাইয়ের কাঁধে চেপে যায়। একেবারে শেষে প্রমাণিত হবে কে দোষী। সেই মুহূর্তে খোলসা হবে গোটা জিনিসটা। আশা পারেখ এ ছবিতে নায়িকার রূপসজ্জা গ্রহণ করেছেন। মেহমুদ ও মুমতাজকেও দুটি আকর্ষণীয় ভূমিকায় দেখবেন সবাই। গানে সুর দিয়েছেন শঙ্কর জয়কিষণ।

●

শেক্সপীয়রের 'কমেডি অভ এররস্'-এর ছায়ায় নির্মিত (বর্তমানে আসন্ন মুক্তি) 'গুস্তাকি মাফ' ছবিতে তনুজাকেও দ্বৈত ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে। এটিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে বলে প্রকাশ যে, দর্শকরা কিছুতেই ধরতে পারবেন না কে কি। ওঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন সঞ্জীবকুমার।

●

প্রযোজক টি, সি, দেওয়ান এখন তুলবেন 'রেশম কা ডোরি'। রঙিন এই ছবিটির মুখ্য চরিত্র দুটিতে রূপ দেবার জন্যে সায়রাবানু এবং রাজেশ খান্নাকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন প্রযোজক। প্রাথমিক কাজ শেষ করেই পরিচালক আত্মারাম অচিরে দৃশ্য গ্রহণ করবেন। সুর সংযোজনার ভার নিচ্ছেন শঙ্কর জয়কিষণ।

কাহিনীকার পরিচালক বীরেন নাগ বোম্বাইয়ের আসল রূপটিকে ধরে ফেলেছেন তাঁর 'এক্সপ্রেশন' ছবিতে। এমন করে নাকি এর আগে কেউই বোম্বাইয়ের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোনো দৃশ্য গ্রহণে ব্রতী হন নি। এই দলিল চিত্রটির সূচনা দিনের শুরুতে। শেষ হয়েছে রাত্রি নিশীথে। বোম্বাইয়ের অনেক বিচিত্র কাহিনী এই ছবির কল্যাণে জানতে পারবেন দর্শক সাধারণ। পাত্র-পাত্রীরা দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের অভিব্যক্তি। পি সি সিনহা এই উল্লেখনীয় প্রয়াসটির চিত্রগ্রহণ করেছেন।

●

'লাইফ'-এ এই চুম্বনের ব্যাপার নিয়ে অনেক কথাই ফলাও করে লেখা হ'য়েছে। নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব, নায়কের আচরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। দৃশ্য গ্রহণের সময় সেটে মুষ্টিমেয় কলাকুশলী প্রভৃতিরা ব্যাপারটায় কি ধারণা করেছিলেন তবে ব্যাখ্যানে রয়েছে সবিস্তারে। যাক, এ দেশের তৃষিত চাতককুল হয়তো এ থেকে এক টুকরো জল-ভরা মেঘের আভাসের দেখা পেতে পারেন।

●

খাজা আহম্মদ আব্বাস গোয়ার মুক্তি যুদ্ধের বিরাট পটভূমিতে নির্মাণ করছেন তাঁর নতুন পরীক্ষামূলক 'সাত হিন্দুস্তানী' ছবিটি। এখন দৃশ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে। যাবতীয় দৃশ্যই গোয়ায় গৃহীত হয়েছে। শিল্পীদের কারুর মুখেই কোনো গান শোনা যাবে না। তবে আবহসঙ্গীতের সুচারু ব্যবস্থা রয়েছে, ফলে গানের অনুরাগীরা সন্তুষ্ট হতে পারবেন। সঙ্গীত পরিচালক কৌশিকের এফেক্ট মিউজিক খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে বলে প্রকাশ।
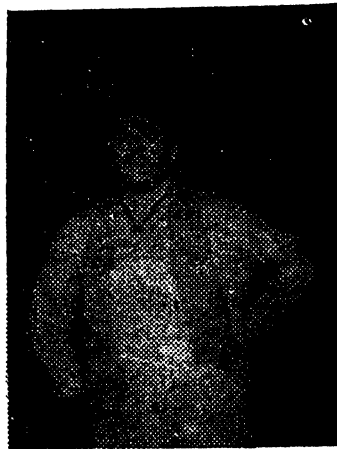
'সাগিনা মাহাতো'র নায়ক দিলীপকুমার
চিত্র: বিশ্বনাথ গোস্বামী

●

বাঙলা দেশের উৎপল দত্ত, মহারাষ্ট্রের জালাল আগা দিল্লীর অমিতাভ বচ্চন এবং কেরালার মধুকে নিয়ে আন্তঃরাজ্য শিল্পী সমাবেশ ঘটেছে ছবিতে। একটি মাত্র স্ত্রীচরিত্রের শিল্পী শাহনাজ। শ্রীমতী শাহনাজ বিখ্যাত কৌতুকশিল্পী আগার মেয়ে। উনি বিদেশী বিমান সংস্থায় কর্মরত এক এয়ার হোস্টেসের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

●

অন মোল কলামন্দিরের রঙিন ছবি 'ধরতী বাজে পায়েল'-এর প্রাথমিক কাজ সারা। নায়ক ও নায়িকার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে—জিতেন্দ্র ও সায়রাবানুকেই দেখা যাবে ও দুটি ভূমিকায়। ফেব্রুয়ারীমাসেই সুটিং আরম্ভ করে দেবেন পরিচালক মাসুদ বেগ।

●

পুষ্পা পিকচার্সের ১৪নং প্রোডাকসনের দৃশ্য গ্রহণে মেতে উঠেছিলেন আশা পারেখ, জিতেন্দ্র সেই সঙ্গে নর্তক-নর্তকীর বিরাটবাহিনী শুধু রঙ রঙ আর রঙ। আবিরে ফ্লোরের আকাশ-মাটি লালে লাল। জিতেন্দ্র (নায়ক) কাউকে অক্ষত রাখেন নি।

ইব্রাহিম নাদিয়াদবালা প্রযোজিত রঙিন ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব খলীদ আখতারের। আশা পারেখ নায়িকা, জিতেন্দ্রকে তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে। সহশিল্পীর তালিকার কয়েকটি নাম: বলরাজ সাহনী, সুজিত কুমার, ফরিদা জালাল ও কিলাস মেহতা। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন কৌশল ভারতী। এন দত্তা ছবির সুরকার।

—রমেন চৌধুরী

যাত্রা-সমাচার

মাধবী নাট্য কোম্পানী

স্বনামধন্য মাধবী নাট্য কোম্পানীর সম্প্রতি আসাম, কাছাড় ও ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের সুখ্যাত ও জনপ্রিয় পালাগান দুটি বিশাল দর্শকমণ্ডলী কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। প্রথম পালাগানটি হ'ল প্রসাদ ভট্টাচার্যের রচনা। রক্ত দিয়ে কিনলাম ও দ্বিতীয় পালাগানটি হ'ল কানাই নাথের 'আগুন নিয়ে খেলা'। দুটি পালাগানই মাধবী নাট্য কোম্পানীর প্রখ্যাত শিল্পীরা আন্তরিকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন এবং প্রতিটি শিল্পীই পালাগান দুটিতে মুন্সিয়ানার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শিল্পীদের অভিনয়-নৈপুণ্য সত্যই প্রশংসনীয়। পালাগান দুটি প্রতিটি আসরেই বিপুলভাবে অভিনন্দন লাভ করেছে। এবং প্রতিটি দর্শককে গভীরভাবে তৃপ্তি দান করেছে। দর্শকদের মনে এই পালাগান দু'টির রেশ দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পালাগান দুটিতে যেসব শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন দাস, ফণী চক্রবর্তী, বাবুল ভট্টাচার্য, পাঁচু অধিকারী, বেলা দেবী, সোনালী গোস্বামী, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, রমেন ভাদুড়ী প্রমুখ।

শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী

বর্তমান যাত্রাজগতের একটি সুপরিচিত ও স্বনামধন্য নাট্য সংস্থা।
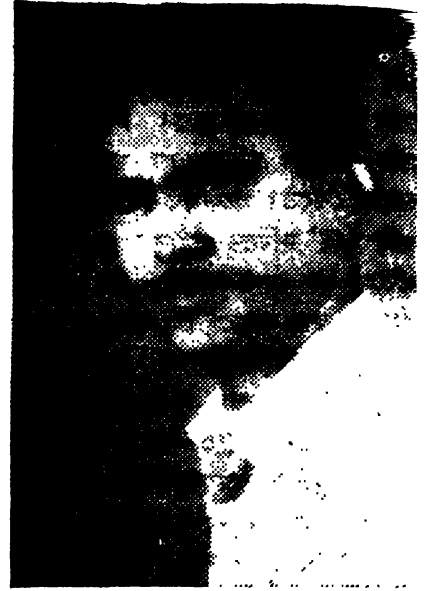
উদীয়মান বেতারশিল্পী নীলকৃষ্ণ দ
বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে লোকসংগী
পরিবেশন করে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জ
করেছেন। শ্রীদাস ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবং
যুব উৎসবে লোকসংগীতে প্রথম স্থা
অধিকার করেছিলেন। কলকা
বিশ্ববিদ্যালয়েরও ইনি একজন কৃতী ছ

সম্প্রতি শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী দীর্ঘদিনব্যাপী আসাম, কাছাড় ও ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের বেশ কয়েকটি পালাগান মঞ্চস্থ করে এলেন। এবারে তাঁদের পালাগানের তালিকায় যেসব বইয়ের নাম ছিল সেগুলি হ'ল জব চার্ণক, সাবিত্রী সত্যবান, পথের ছেলে, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, ফরিয়াদ ও জলদস্যু। প্রতিটি পালাই বিরাট সংখ্যক দর্শককে কিছুক্ষণের জন্য বিমোহিত করে রেখেছিল। এবং শিল্পীরা দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের অভিনয়-মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে যে অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা বহুদিন দর্শকমনে গভীরভাবে দাগ কেটে থাকবে। এবং পালাগানগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলা চলে। জলদস্যু পালাগানটিতে অংশ গ্রহণ করে যেসব শিল্পী অভিনন্দিত হয়েছেন তাঁরা হলেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বিমল লাহিড়ী, শান্তি হাজরা, সাধন দাস, অসীম বোস প্রমুখ।

নিউ প্রভাস অপেরার 'মজদুর' পালাগানের একটি ভীষণ মুহূর্তে অনাদি চক্রবর্তী ও অতুল ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন প্রসঙ্গে

যুক্তফ্রণ্টের এক বছরের শাসনের অপকর্ম বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে গত এক শ' বছরে অনুষ্ঠিত অপকর্মগুলির তুলনায় ওজনে ভারী। শ্রেণী সংগ্রামের নামে ভ্রাতৃহত্যা, যত্র তত্র অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার যারা করেছে, তাদের অপরাধের সীমা নেই। জনসাধারণ তাদের চিনে নিয়েছে।

গত এক বছরে বাংলা দেশের বুকে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, যুক্তফ্রণ্টের পতনের পর তার অবসান হতে সুরু করেছে। এতদিন জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের ভয়ে ও চাপে যে পুলিশ বিভাগ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, তারা এখন শান্তি-শৃঙখলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে -----এই রকম পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার মানুষ আর অঘটনের প্রত্যাশা না করে কামনা করে দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রপতির শাসন---"

১৯৭০ সালের ১৯শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন। দেশের রাজনীতি এইদিন এক নবতর অধ্যায়ের কক্ষপথে পদার্পণ করিল। নানা আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে উপনীত হইল। যুক্তফ্রণ্টের ভয়াবহ কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করিয়া পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইল। এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন অল্পকাল পূর্বেও একবার প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেদিন এই রাজ্যে রাজ্যপাল ছিলেন শ্রীধর্মবীর। ধর্মবীরের শাসন—এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে উপলক্ষ করিয়া উপরি-উল্লিখিত কলিকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সম্পাদকীয় স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত মন্তব্যটি আমরা যথোপযুক্ত ও সর্বাংশে যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া মনে করি। এই বিরাট রাজ্যের অগণিত মানুষ যুক্তফ্রণ্টের ভয়াবহ বিভীষিকাময় কুশাসনে যে চরম সর্বনাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। সেই দুর্যোগময়ী অন্ধকারের সহিত, নৃশংস পৈশাচিক অত্যাচারের সহিত তুলনীয় বীভৎস কুশাসনের স্মৃতি সাধারণের চিত্ত
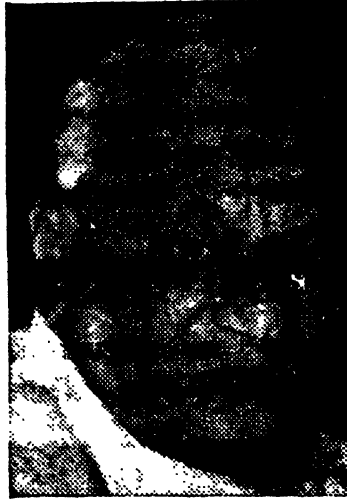
শ্রীভি, ভি, গিরি

হইতে সহজে বা স্বল্প সময়ের পরিসরে অপসৃত হইবে না। তাই এই রাহুগ্রাস হইতে মুক্তিস্নানের মতই পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ রাষ্ট্রপতির শাসনকে স্বাগত জানাইতেছে। স্বাগত জানাইতেছে কার্যকরী শাসনকর্তা রাজ্যপালকে এবং সেই সঙ্গে শোষিত, নিপীড়িত, হৃতসর্বস্ব পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে মহামান্য রাজ্যপালের নিকট একটি আন্তরিক আবেদন আমরা পেশ করিতেছি।

পশ্চিম বাঙলার প্রকৃত চিত্র আজ তাঁহার মত বিবেচক, স্থিতধী ব্যক্তির নিকট সুপরিচিত—এইরূপ ধারণা পোষণে আমরা বিশ্বাস করি, কোন বাধা নাই। অতি অল্পকালের মধ্যে একটি সুসমৃদ্ধ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আলেখ্য যে কতখানি আমূল বিপরীত করিয়া দেওয়া যায়, তাহারই একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ রাখিয়া গেলেন যুক্তফ্রণ্ট সরকার। সেই বিষাক্ত ক্ষত নিরাময় হইতে এখন বহু বছরের অনুশীলন প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে আজ সর্বাপেক্ষা যাহা ভীতি এবং উৎকণ্ঠার কারণ তাহা হইল সাধারণ নিরাপত্তার অভাব। পথে-ঘাটে প্রকাশ্য দিবালোকে রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন এমন কি নারীর সম্ভ্রমহানি, নারী লুণ্ঠন ইত্যাদি আজ যেন নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিগণিত হইয়াছে। কোন মানুষেরই জীবনের যেন কোন নিরাপত্তাই নাই। যে কোন সময়ে যে কোন সর্বনাশের সম্ভাবনা সমধিক বিদ্যমান। গুণ্ডা সম্প্রদায় বেপরোয়া হইয়া নির্ভয়ে তাদের লীলা চালাইয়া যাইতেছে, অথচ কোন প্রতিবিধান নাই। সমাজদ্রোহীরা সরকারী মহলে পাইতেছে জামাই-আদর।

রাজ্যের শিক্ষা জগতের পরিণতি দেখিলে আজ প্রকৃতই চক্ষুদ্বয় বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। যে দেশের শিক্ষাগত কৃতিত্ব সারা পৃথিবীর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছে, সেই দেশের শিক্ষা মন্দির আজ কয়েকটি স্বার্থান্বেষী তথাকথিত রাজনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তির কার্যোদ্ধারের ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শিক্ষা

উপদ্রব, সম্মানিত প্রণম্য শিক্ষকবৃন্দের লাঞ্ছনা এবং সর্বোপরি দেশের শিক্ষার ভবিষ্যতের একেবারে সমাধি রচনা কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই মনে স্বস্তির আমেজ ঘনাইতে পারে না।

কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাজ্যের শ্রমিক সম্প্রদায়কে তাতাইয়া দিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কবরভূমি রচনার জন্য দায়ী বলিয়া অনায়াসে চিহ্নিত হইতে পারেন। শ্রমজীবী কর্মিবৃন্দ তাঁহাদের ন্যায়সম্মত ও নীতিসঙ্গত প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হোন---এ কামনা আমরা কখনই করি না। তাঁহাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় লাভ করুন---ইহাই আমাদের কাম্য; কিন্তু দাবী জানাইবার যে সকল পন্থা এই সকল নেতৃবৃন্দরূপে পরিচিত অভিনেতৃবৃন্দ উদ্ভাবন করিলেন তাহা যেমনই নিন্দনীয় তেমনই নারকীয়; ফলে, দেশ হইতে শিল্প-পতিরা অনেকেই বাধ্য হইয়া প্রাণের দায়ে কারবার তো গুটাইলেনই এবং তাহার প্রত্যক্ষ পরিণতি স্বরূপ দেখা গেল সারা পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা, এমনিতেই যাহা বিপুল সংখ্যক ছিল, এই ঘটনায় তাহা বহু গুণ বিবর্ধিত হইয়া গেল।

পশ্চিম বাঙলার আজ বিশেষ বিপজ্জনক অবস্থার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল বাজার দর। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশই যে ভাবে আকাশচুম্বী হইতেছে তাহা সাধারণ্যে হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃই যেভাবে মানুষকে অনশন-অর্ধাশন মানিয়া লইতে বাধ্য করিতেছে তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার বিষয়। বিলাসদ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। জঠরের জ্বালা নিবারিত হয় যে সকল দ্রব্যের দ্বারা বা যে সকল দ্রব্য শ্রেণীস্তর নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনে আসে, সেইগুলির দর এত আকাশচুম্বী, যাহার সহিত পাল্লা দেওয়া অল্প আয়সম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তিদের (বলা বাহুল্য, যাহাদের সংখ্যা সর্বাধিক) পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থা আয়ত্তে না আনিলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইবে। গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কেও আজ যথেষ্ট চিন্তার প্রয়োজন।

পশ্চিম বাঙলার সামগ্রিক চিত্র এই। রাজ্যের শাসনযন্ত্র কোন বিশেষ দলের প্রভাবে যে সর্বনাশা পরিণতির দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিল রাষ্ট্রপতি শাসনে সে আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হউক---ইহাই আমাদের কামনা। উপরোক্ত সমস্যাসঙ্কুল দিকগুলিকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যপালের নিকট আমরা আবেদন জানাই---তিনি অচিরে এই সর্বনাশা পরিস্থিতি হইতে পশ্চিমবঙ্গের উদ্ধার সাধন করুন।

রাষ্ট্রপতির শাসন আজ শুধু আমাদের কাম্য নয়, দেখা যাইতেছে দু'একটি দল ছাড়া কংগ্রেস প্রমুখ প্রায় রাজনৈতিক দলই এই শাসনকে সাদর আবাহন জানাইয়াছেন। তাই এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাতে একটি গোষ্ঠীর লম্ফ-ঝম্প কোন মূল্যই বহন করে না।

রাষ্ট্রপতির শাসন হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যরবিকে রাহুমুক্ত করুক---ইহাই আজ সকলের প্রার্থনা।

রাষ্ট্রপতির শাসনের পর

দেশের স্বার্থ পরিপূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া নিছক দলীয় স্বার্থে আচ্ছন্ন এবং ক্ষমতার অন্ধ মোহের বশীভূত হইয়া পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত যে বিরাট দলটি ফ্রণ্ট সরকারেরই পতন আমন্ত্রণ করিয়া আনিল সেই দলটি আজ বলা বাহুল্য লোকসমাজে যে ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। রাজ্যের পুলিশ-বাহিনীর মত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর এই দলটিরই অধিকারে ছিল, তাহার ফলে, তাহাদের প্রয়োজনীয় জায়গায় নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখায় সমগ্র রাজ্যে যে ভয়াবহ, বীভৎস অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার স্মৃতি মন হইতে বিলুপ্ত হওয়ার নয়। আপন ক্রিয়াকলাপে দলটি সাধারণ্যে, বিশেষ করিয়া শান্তিকামী নিরীহ ভদ্রসমাজে এক আতঙ্কের কারণ-স্বরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।
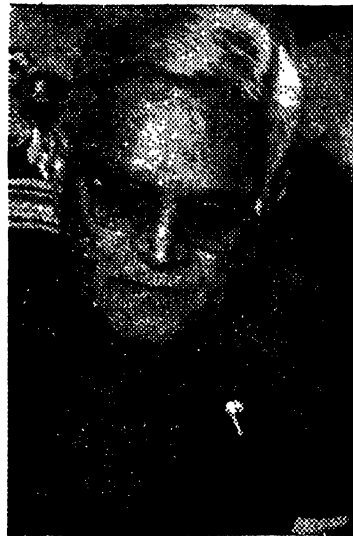
শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান

কিন্তু আজ রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর দেখা গেল, তাহারা পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শূন্যগর্ভ আস্ফালনও করিয়াছিল। যাহাতে তাঁহাদের গদী না টলে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জনসাধারণকে এই দলের নেতারা অনেক হুমকী দেখাইয়াছিলেন ও নানাপ্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শনও করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটিলে দেশের সমগ্র অংশে রক্তগঙ্গা বহিবে---এ ধরনের ভয়াবহ হুমকীর দ্বারা আপন আপন কুৎসিত মনোবৃত্তির সম্যক প্রকাশ ঘটাইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার অতি অল্প সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা গেল তাহাদের সৃষ্ট বিভীষিকাগুলির একে একে অবসান ঘটিয়া রাজ্যের

সমগ্র চিত্র আমূল পরিবর্তিত হইতে চলিতেছে। ইহার মাধ্যমে তাঁহারা তাঁহাদের অনাচার ও কুৎসিত ক্রিয়াকলাপের মুখের মত জবাবই পাইয়াছেন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সহযোগী 'যুগবাণী' যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমাদের পাঠক-পাঠিকার সামনে এই রচনার মধ্যে তুলিয়া ধরি। ---

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং বেআইনী বন্দুক, কার্তুজ, বোমা তৈরীর মালমশলা, বর্শা, বল্লম, তরবারি ইত্যাদি অগণিত পরিমাণে উদ্ধার করিতে সুরু করিয়াছে এবং শত শত সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশের এই অভিযান অব্যাহত থাকিলে হাজার হাজার গুণ্ডা ও গুণ্ডাশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তার হইবে সন্দেহ নাই।

জ্যোতি বসু ইহাতেও ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁর ক্ষোভের কারণ বোঝা সহজ। তিনি পুলিশমন্ত্রী থাকাকালে এই গুণ্ডাদের তিনি প্রশ্রয় দিয়াছেন এবং তাঁর পার্টির ছত্রচ্ছায়াতলে সমাজবিরোধীরা নিরাপদে আশ্রয় লাভ করিয়া বাংলাদেশের জনসাধারণের উপর এমন উন্মত্ত ও নারকীয় অত্যাচার চালাইয়াছিল, যার তুলনা বাংলার ইতিহাসে নাই। ঠগী ও বর্গীরা, পর্তুগীজ জলদস্যু ও মগেরাও এমন নির্মম অত্যাচার চালাইতে পারে নাই, কারণ বাংলার রাজশক্তি তাদের হাতে ছিল না। তারা বাংলার এক এক কোণে যে বর্বরতা চালাইয়াছিল, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের এক বছরের আমলে সারা বাংলা জুড়িয়া তার চেয়েও বীভৎস বর্বরতা চালানো হইয়াছে এবং পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসু উহার নিন্দা করা দূরে থাকুক, উহাদের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবাহিনী ও প্রশাসনিক কাঠামোকে ব্যবহার করিয়াছেন। আজ তাই যখন তাঁর সেই দুষ্কৃতি হাতেনাতে ধরা পড়ার ও তথ্য ও দলিল দ্বারা প্রমাণিত হইবার সময় আসিয়াছে, তখন তিনি বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন এবং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আবার তিনি ছুটিতেছেন দিল্লী, ইন্দিরা গান্ধীর চরণে কাতর নিবেদন জানাইতে। কিন্তু তাতে তাঁর লাভ হইবে না। আজ জ্যোতি বসু ও তাঁর পার্টির এমনই দুর্ভাগ্যের পালা সুরু হইয়াছে যে—যে ডাল তাঁরা ধরিতেছেন সেই ডালই ভাঙিয়া পড়িতেছে। গদি আঁকড়াইয়া থাকার উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে, বিড়লাজীকে ও রাজ্যপাল ধাওয়ানকে অনেক খোসামোদ করিয়াছিলেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত আত্মগরিমার পুঁটুলিটি দূরে ফেলিয়া সি পি আই অফিসে পুরাতন শত্রু সোমনাথ লাহিড়ীকে তোয়াজ করিতে গিয়াছিলেন, ফরোয়ার্ড ব্লককে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ সহ) দপ্তর, এমনকি মুখ্যমন্ত্রিত্বও দিতে চাহিয়াছিলেন, সুবোধ ব্যানার্জীকে শ্রম ও অর্থ দপ্তর যৌতুক দিবার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। এত করিয়াও লাভ হইল কতটুকু? প্রত্যাখ্যান ও অপমান ছাড়া কারও কছেই অতিরিক্ত কিছু তাঁরা পান নাই। এবং জনগণ হইতে ও অন্যান্য বামপন্থীদের নিকট হইতে তাঁরা এখন এমন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁদের শক্তি ও গুরুত্ব সম্পর্কে কেহই আর তাঁদের বিশেষ পাত্তা দিতেছেন না। রাষ্ট্রপতির শাসন হইলে তাঁরা বাংলা দেশের জীবনযাত্রা অচল ও স্তব্ধ করিয়া দিবার যে রণহুঙ্কার আগে দিয়াছিলেন, এখন ঢোক গিলিয়া তাহাও হজম করিয়া ফেলায় তাঁরা লোকের বিদ্রূপ ও করুণার পাত্র হইয়াছেন। কে তাঁদের কথায় আর বিশ্বাস করে? প্রতিটি ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট নেতারা রাশি রাশি মিথ্যা বলিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্বে সময়ে সময়ে সেইসব মিথ্যার নমুনা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। হরেকৃষ্ণ কোঙার ১৫ই মার্চ বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের জনসভায় দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন যে, বাংলা কংগ্রেসের দশটি এম, এল এ, তাঁদের পকেটে ঢুকিয়াছে, পরদিন আরও দশটি ঢুকিবে। জ্যোতি বসু রাজ্যপালের কাছেও বানানো গল্প করিয়াছিলেন যে-সব পার্টি হইতে এম, এল, এ-রা দল ভাঙিয়া আসিয়া তাঁর পার্টিতে যোগ দিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কোনো দলেরই একটিও এম-এল-এ তাঁদের দিকে আসে নাই, বরং লোকসেবক সংঘ ও আর এস পি শেষ মুহূর্তে জানাইয়া দিল যে, মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কোনো গাঁটছড়া তারা বাঁধে নাই। জ্যোতি বসু দলত্যাগে উৎসাহ দিয়া বাহাদুর হইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁর পার্টি যে রাজনৈতিক দিক হইতে কতদূর অসৎ তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ১৮ই মার্চ রাজভবন হইতে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনি যখন বাহির হইতেছিলেন, রাজভবনের উত্তর দ্বারে তাঁর একদল পার্টি চেলার সঙ্গে তখন আমরাও উপস্থিত ছিলাম। জ্যোতিবাবুর মুখ তখন থমথমে, কালো ছায়ায় ঢাকা। তিনি গাড়ি হইতে নামিলেন না, ভাষণও দিলেন না, কিন্তু চেলাদের কহিলেন, বিধানসভা ভবনে শিল্প পর্ষদের নির্বাচন উপলক্ষে বেইমান অজয় মুখার্জী ও বেইমান অন্যান্য নেতারা আছেন, তাঁদের আপনারা ঘেরাও করুন। উস্কানি পাইয়া কে, জি, বসু ও অরবিন্দ ঘোষের কো-অর্ডিনেশন কমিটির লাল শালুর নিচে সমবেত পার্টি চেলারা ছুটিল বিধানসভা ভবনে, সম্ভবত অজয় মুখার্জিকে মারধোর করিতে। পুলিশ প্রহরা থাকায় সেটা অবশ্য সেদিন সম্ভব হয় নাই।

ইহাই জ্যোতি বসু ও তাঁর পার্টির স্বরূপ। হিটলারের ফ্যাসিস্ত অনুগামীরাও এদের আচরণে লজ্জা পাইবে। মাত্র এক বছরের রাজত্বে বাংলাদেশকে এরা পঞ্চাশ বছরের মতো পিছাইয়া দিয়াছে। আবার ভোট হইবে, আবার এরা ক্ষমতায় আসিবে একথা ভাবিতেও লোকে এখন ভয় পায়। লোকে এখন আশু কোনো নির্বাচন চায় না, তাতে গণতন্ত্রের মর্যাদা থাকুক আর যাক তাতে কিছু আসে যায় না!

গণতন্ত্রের নামে যাহা চলিতেছে তার আর দরকারটাই বা কি? মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যে জ্যোতি বসুর পুলিশ দপ্তর পরিচালনার নীতির বিরুদ্ধে এত অভিযোগ তুলিলেন, এত হস্তক্ষেপ করিলেন এবং অবশেষে প্রতিবাদে পদত্যাগ পর্যন্ত করিলেন, যে জ্যোতি বসুর পুলিশ নীতির বিরুদ্ধে আরও তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছিলেন ও দশটি রাজনৈতিক পার্টি বহু অভিযোগপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছে,—অজয় বাবুর শূন্যস্থান পূরণ করিতে সেই জ্যোতি বসুকেই তো গণতন্ত্রের প্রথা অনুসারে ডাকিতে হইয়াছিল। তিনি সামর্থ্যের অভাবে মুখ্যমন্ত্রী হইতে পারেন নাই সেটা আলাদা কথা, কিন্তু দলের আরও জোর থাকিলে ঐ গুণ্ডাশাহীর পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিটিই তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসিতেন? এ কেমন গণতন্ত্র, যেখানে অভিযুক্তের বিচার হয় না, বরং প্রমোশন দিবার কথা ওঠে? যাঁর অপরাধের সীমা পরিসীমা নাই, আদালতের যাঁর বিচার হওয়া উচিত, সেই ব্যক্তিকে রাজভবনে ডাকিয়া আনিয়া রাজ্যপালকে বলিতে হইল, মশাই, আপনি মুখ্যমন্ত্রী হইতে চান এবং আপনার কি সে সামর্থ্য আছে? অন্যায়ের প্রতিবাদে যিনি পদত্যাগ করিয়াছেন সেই অজয় মুখার্জীকে তখন 'হা অদৃষ্ট' বলিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। বাংলার জনগণও এই নাটক প্রত্যক্ষ করিল যে গণতন্ত্রে অভিযোগকারীরই দণ্ড হয়, তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়িতে হয়, আর যে অভিযুক্ত, যে দোষী তাঁর বিচার হওয়া দূরে থাকুক, তাঁকে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এ গণতন্ত্র আমাদের মাথায় থাকুক, আমরা বরং জেনারেল কারিয়াপ্পার কথাই সমর্থন করিব যে এ হেন গণতন্ত্রের চেয়ে সৎ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তির ডিক্টেটরশিপ ভালো। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গণতন্ত্রের সুযোগ লইয়া ফাসিস্ত জহ্লাদ সাজিয়া বসিয়াছিল, কাজেই এই সুযোগ কাকে কতখানি দেওয়া উচিত তাহা বিবেচনার সময় আসিয়াছে। কোনো বস্তুর প্রতি অনাবশ্যক মোহ ক্ষতির কারণ হয়। গণতন্ত্রের ফলে কংগ্রেস আমলে গণশোষণ কায়েম হইয়াছে ও যুক্তফ্রণ্ট আমলে গুণ্ডাশাহী কায়েম হইয়াছে সেই গণতন্ত্রের মৃত্যু হইলে হাপুসনয়নে আমরা কেন কাঁদিতে বসিব তাহাতো বুঝি না। জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল ও প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা কর্ম ইত্যাদির বিধান যে তন্ত্র দিতে প্রস্তুত আছে আমরা তাহাকেই স্বাগত জানাইব। মিথ্যা নামের মোহ ও মরীচিকার পিছনে ছুটিবার প্রবৃত্তি আজ আর থাকা উচিত নয়।

রাজায় রাজায় ঝগড়া হয় আর তাহার জন্য প্রাণ দিত হয় উলুখাগড়াকে, ক্ষমতার উন্মত্ত নেশায় তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মাতিয়া উঠেন আর তাহার জন্য প্রাণ বলি দিতে হয় কত অসংখ্য নিরীহ নিরপরাধ নরনারীকে। এইভাবেই সোনার বাঙলা আজ দ্বিখণ্ডিত, এই কারণেই ভুবনমনোমোহিনী বঙ্গদেশ আজ শ্মশানে পরিণত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ধ্বংসলীলাও রূপে রসে পরিপূর্ণা বঙ্গজননীর এতখানি সর্বনাশ করিতে পারে নাই, যতটা করিয়াছে এই রাজনৈতিক গুণ্ডাবাজী। করুণাময় ঈশ্বর এইবার হতভাগ্য বাঙলা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুন।—ইহাই আজ একমাত্র কামনা।

শোক সংবাদ

ডাঃ অমূল্যচন্দ্র উকিল

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমূল্যচন্দ্র উকিল গত ৯১ই ফাল্গুন ৮২ বছর বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। প্রথম যৌবনে দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি কারাবরণ করেন। ১৭৪৯ সালে তিনি প্রথম ভারতীয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ-তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত হন। ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও সুপ্রসিদ্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। মহানগরীর শেরিফের আসনেও তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী

বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ, ভারতবর্ষে স্কাউট আন্দোলনের অগ্রদূত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-টি ডিপ্লোমা প্রাপকদের অন্যতম মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী সম্প্রতি ৮৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইংরেজ সরকার প্রদত্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষাব্রতীর জীবনই তিনি বরণ করে নেন। পার্ক সার্কাস মডার্ণ স্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (এবং সহকারী সভাপতি) ও ওয়াই এম সি এ'র পরিচালকমণ্ডলীর এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন সংস্থার পাবলিসিটি ফোরামের অন্যতম পরিচালক হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮শে অঘ্রাণ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। একজন অনলস সমাজকর্মী ও কুশলী অভিনেতারূপেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

॥ বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্তমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।॥

মাসিক বসুমতী

॥ ৪৯ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥

কথামৃতম্

যম

বিভিন্ন শাস্ত্রে যমের অংগ সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। ঋষি বাক্যে দশ প্রকার অংগের নির্দেশ আছে ঃ—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যং দয়ার্জবম।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচমেতে যমাদশঃ॥"

অর্থাৎ (১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অস্তেয়, (৪) ব্রহ্মচর্য, (৫) দয়া, (৬) আর্জব (সরলতা, ঋজুতা), (৭) ক্ষমা, (৮) ধৃতি (ধৈর্য, সন্তোষ), (৯) মিতাহার ও (১০) শৌচ—যমের এই দশ অংগ।

আদি যামলে সদাশিব সাধকের পক্ষে ছয় প্রকার অংগের কথা বলেছেন ঃ— (১) শান্তি, (২) সন্তোষ, (৩) মিত ভোজন, (৪) নিদ্রার ন্যূনতা, (৫) চিত্তের দমন এবং (৬) অন্তঃকরণের শুদ্ধতা ও শূন্যতা।

পাতঞ্জল মতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে 'যম' বলে। একটু বিশদভাবে এই পাঁচটি অংগকে বুঝতে চেষ্টা করা যাক্।

(১) অহিংসা—কায়, মন ও বাক্যদ্বারা যেভাবে হোক্ কোন জীবকে পীড়ন করাকেই হিংসা বলা হয়। সর্বপ্রকারে সর্বকালে প্রাণিগণের প্রতি হিংসা পরিত্যাগের নামই অহিংসা। শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম হ'লে কোনও জীবের প্রতি হিংসাত্মক কর্মও অহিংসা বলে গণ্য হয়। অহিংসাব্রতে সিদ্ধ হ'লে সে যোগীর নিকট হিংস্র জন্তুও হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে।

(২) সত্য—বাক্য এবং মনঃ যথার্থ হ'লে তাকে 'সত্য' বলে, অর্থাৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ, যেরূপ অনুমান এবং যেরূপ শ্রুত হয়েছে, বাক্য এবং মন সেরূপ হ'লে তাকে 'সত্য' বলে। নিজের বোধ অপরকে জানাবার জন্যই বাক্য; সেই বাক্য যদি ভ্রান্ত, বঞ্চনা-হেতুক বা অযথার্থ-জ্ঞানোৎপাদক না হয়, আর যদি তাহা সকলের উপকারে প্রবর্তিত হয়, কারুই অনিষ্টের হেতু বা বিনাশের কারণ না হয়, তা হ'লেই তাকে সত্য বলে। বাক্য উপরোক্তরূপ হ'য়েও যদি প্রাণীহিংসাত্মক হয়, তবে তাহা সত্য নয়। সত্যে সিদ্ধ হ'লে সাধক বাক্সিদ্ধ হয়।

(৩) অস্তেয়—অবিধিপূর্বক পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করাকে 'স্তেয়' বলে। এর উল্টো অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পরের দ্রব্যে লোভ বা স্পৃহাশূন্যতাকে 'অস্তেয়' বলে। অস্তেয় সিদ্ধিতে সকল রকম ভোগ্যবস্তু আপনিই এসে হাজির হয়।

(৪) ব্রহ্মচর্য—এটা হচ্ছে উপস্থের সংযম, অর্থাৎ কায়-মনোবাক্যে দেহক্ষয়কর ও স্মৃতিধ্বংসকর মৈথুন পরিত্যাগ। কিন্তু গৃহীর পক্ষে যথা বিধানে কেবল ঋতুরক্ষার্থে নিজভার্যা-গমন শাস্ত্রে বিহিত আছে। আহার-বিহারাদি সকল দৈহিক ব্যাপারে সংযম এবং গুরুজনের সেবাও ব্রহ্মচর্যের অংগ। ব্রহ্মচর্য সিদ্ধিতে শরীর ও মনের অসীম বীর্যলাভ ও ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হয়।

(৫) অপরিগ্রহ—বিষয়ের উপার্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ইত্যাদিতে দোষ দর্শন ক'রে বাসনা বশে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাত্মক ভোগ্যবস্তুসমূহ গ্রহণ না করাই অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ সিদ্ধিতে পূর্ব পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মৃতি-পথে আসে। বাসনা ত্যাগ না হলে অপরিগ্রহ অভ্যাস হয় না; আর বাসনা ত্যাগ হ'লে ইহজন্মে নূতন সংস্কার চাপে না। তাই যোগী তখন তার চিন্তাশক্তিকে পূর্ব-পূর্ব-জন্মার্জিত-সংস্কার-গঠিত "আশয়" নামক অন্তঃকরণ বৃত্তির উপর প্রয়োগ করে জন্মান্তর-স্মৃতি লাভ করতে পারেন।

এই পঞ্চাঙ্গ 'যমে'র ব্রতগুলি নিখুঁতভাবে অভ্যাস করতে পারলে প্রতি অংগ সম্বন্ধীয় সিদ্ধিগুলি লাভ হয়। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য এ সব সিদ্ধির প্রয়োজন নাই।

যমুনায় উজান বহা' কাকে বলে?

জীবের মুখ্যপ্রাণ বা জীবনী শক্তিকে (কুণ্ডলিনীকে) সাধনার অলৌকিক শক্তিতে বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা প্রবৃত্তিমূলক মনোবৃত্তি ত্যাগ করে নিবৃত্তির পথে চালিত করলে তখনই তাকে যমুনায় উজান বহা বলে। আমরা শুনে থাকি, দ্বাপরান্তে যমুনায় উজান বয়েছিল—প্রতি দ্বাপরান্তেই নাকি যমুনা উজানেই বয়।

দ্বাপর কাকে বলে? দ্বি (দুই)+পর (শ্রেষ্ঠ বা প্রধান)= দ্বাপর (যে অবস্থায় দুটিই শ্রেষ্ঠ বা প্রধান বলে মনে হয়, সে অবস্থাই দ্বাপর); অর্থাৎ যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার (অথবা ভক্ত ও ভগবানের) মধ্যে ভেদবুদ্ধিজাত বা দ্বৈতভাবজাত সংশয় বর্তমান থাকে, তখনই দ্বাপর অবস্থা; সে অবস্থার—সে সংশয়ের অন্ত বা নাশই দ্বাপরান্ত। আবার দুইটি যুগের পরবর্তী তৃতীয় যুগই দ্বাপর (সত্য ও ত্রেতা যুগের পরে দ্বাপর যুগ)। এই দ্বাপর যুগের অন্তকালে যখন ভগবান পরাভক্তির আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলেন তখন এই দ্বৈতভাবজনিত সংশয় ছিন্ন হওয়াতে গোপীদের হৃদয়-যমুনায় তাদের প্রবৃত্তিপ্রবাহ মন্দীভূত হ'য়ে নিবৃত্তির উজানপথে প্রবাহিত হয়েছিল; তাই বলা হয়, তখন যমুনায় উজান বয়েছিল। অর্থাৎ 'অন্তর-বৃন্দাবনে হৃদয়নাথের চরণ স্পর্শে পিঙ্গলা-রূপিণী যমুনাও উজানে (ঊর্ধ্বমুখে বা প্রবৃত্তির বিপরীত গতিতে) প্রবাহিত হয়েছিল।'

পরমহংস সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহোদয় বলেছেন—"দ্বৈত ভাবময় সংশয়ের অবসানে সাধকের সাধন পুষ্টিরূপ একেন্দ্রিয় বৈরাগ্যের অবস্থায় তাঁর সেই 'সপ্তস্বরা' শব্দ ব্রহ্মের মোহিনী শক্তি সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট প্রণব ঝংকারে বা নিত্য বংশী-নিনাদরূপে যখন সাধকের সূক্ষ্ম মানস কানের ভিতর দিয়া তাহার গুপ্ত অনাহত কমলরূপ মর্মস্থলে প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তর-বৃন্দাবনে সেই হৃদয়নাথের চরণ স্পর্শে উষ্ণ প্রবাহিনী পিঙ্গলারূপিণী যমুনাও উজানে (উ+যানে বা ঊর্ধ্বযানে বা বিপরীত গতিতে) প্রবাহিতা হন।"

যাদের চৈতন্য হয়েছে

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যাদের চৈতন্য হয়েছে,—যাদের ঈশ্বর সৎ, আর সব অসৎ, অনিত্য ব'লে বোধ হ'য়ে গেছে, তারা জানে যে ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা—আর সব অকর্তা। তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসেব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না; ঈশ্বরের উপর তাদের এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে সেই কর্মই সৎকর্ম। কিন্তু তারা জানে, এ কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস,—আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; তিনি যেমন করান, তেমনি করি; যেমন বলান তেমনি বলি; যেমন চালান, তেমনি চলি। তারা দেখে ঈশ্বরই সব করছেন—তারা পাপ-পুণ্যের পার।

"মঠের এক সাধু মাধুকরী করতে বেরিয়ে দেখলে এক জমিদার একটি লোককে খুব মারছে। সে এগিয়ে গিয়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার এত রেগেছিল যে, সে তখন সমস্ত রাগটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। প্রহারের চোটে সাধুটি অচৈতন্য হ'য়ে গেল। মঠের অন্য সাধুরা খবর পেয়ে দৌড়ে এসে তাকে মঠের ভিতরে নিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগলো। মাথায় জল দিয়ে, বাতাস ক'রে, মুখে একটু গরম দুধ দিতে দিতে সাধুটি চোখ চাইলে। জ্ঞান হয়েছে কি না বুঝবার জন্য একজন জিজ্ঞাসা করলো—'মহারাজ, তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?' সাধুটি আস্তে আস্তে বললেন—'ভাই, যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

"ঈশ্বরকে জানতে না পারলে, সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় ঈশ্বরই কর্তা' এ জ্ঞান না হ'লে এ ভাব হয় না।"

যা চায় তাই কাছে, অথচ ঘুরে মরে

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণই অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা তখনই জ্ঞান। একজন তামাক খাবে, তাই পড়শীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হয়েছে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। দোর ঠেলাঠেলি করতে এক-জন দোর খুলে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি গো, কি মনে করে?' সে বললে, 'আর কি মনে করে? তামাকের নেশা আছে জান তো? টিকে ধরাব বলে এসেছি।' লোকটি অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাঃ! আচ্ছা লোক ত তুমি! তোমার হাতে লণ্ঠন রয়েছে, আর এন্দুর এসে দোর ঠেলাঠেলি করছ?

"অনেক লোকই এই রকম। যা চায় তা কাছেই আছে, অথচ নানাস্থানে ঘুরে মরে। কাঁধে গামছা রেখে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ব্যস্তবাগীশ!

"সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়,—যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। কামিনী-কাঞ্চন ভোগে ত ক্ষণিক আনন্দ!
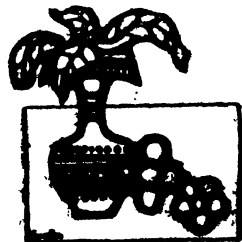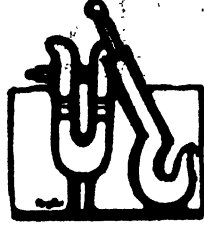
এই আছে, এই নাই! প্রায়ই মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সূর্য দেখা যায় না। দুঃখের ভাগই বেশি—কামিনী-কাঞ্চন মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না। অনেক ঘোরাঘুরির পরে তবে চৈতন্য আসে।

"সবারি হৃদয়ে তিনি আছেন, অথচ তাঁকে খুঁজতে আবার অনেকে তীর্থ ভ্রমণে যায়!"

যিশুখৃস্টে ও শ্রীরামকৃষ্ণে অনেক মিল আছে

কতকগুলি বিষয়ে যিশুখৃস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ একই ধরনের কথা বলতেন। আরো কয়েকটা অদ্ভুত মিল দু'জনের ছিল। যেমন ঃ—

(১) ভক্তদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কঠোরতা যিশুরও ছিল না, শ্রীরামকৃষ্ণেরও ছিল না।

(২) ঠাকুর বলতেন নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়, দই-পাতা হাঁড়িতে নষ্ট হবার সম্ভাবনা; যীশু বলতেন 'পুরোনো বোতলে নূতন মদ রাখলে বোতল ফেটে যেতে পারে.' কিম্বা বলতেন 'পুরোনো কাপড়ে নূতন কাপড়ের তালি দিলে শীঘ্র ছিঁড়ে যায়।'

(৩) ঠাকুর বলতেন 'মা আর আমি এক'; যিশু বলতেন 'বাবা আর আমি এক' (I and my father are one).

(৪) ঠাকুর বলতেন 'ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন'। যিশু বলতেন 'দোরে ঘা মার, দোর খুলে যাবে' (knock and it shall be opened unto you).

(৫) দুটি বোন (শোকাতুরা ব্রাহ্মণী ও তার ভগ্নী) ঠাকুরের খুব ভক্ত ছিলেন; যিশুরও Martha আর Mary নামে দুই বোন খুব ভক্ত ছিলেন।

এরকম আরো মিল আছে।

যুগধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ—"শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম কলিকালে করা কঠিন। একে অন্নগত প্রাণ, তার উপর আয়ু কম; বেশি কর্ম চলে না। তাই কলিতে ভক্তিযোগ—ভগবানের নাম-গুণ-গান, আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। তাই প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর, আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হ'য়ে করতে পারি। আর যেন বেশি কাজ জড়াতে ইচ্ছা না হয়।' ভক্তিলাভ করলে বিষয়কর্ম আপনা-আপনি কমে যায়।

"বিচার পথও বড় কঠিন—দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। যতই বিচার করো, থেকে থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, সুখ-দুঃখ, নানা প্রকারে দেহাত্মবোধ অতর্কিতে এসে যায়। তাই এ-যুগের পক্ষে ভক্তিযোগই সহজ পথ। নারদীয় ভক্তি—ঈশ্বরের নাম-গুণ-গান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

"ভক্তিযোগ যুগধর্ম, তার মানে এ নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্মী অন্য জায়গায় যাবে। এর মানে হচ্ছে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি ভক্তিপথে গিয়েও সে জ্ঞান পেতে পারেন। জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে—তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন।'

যুগলমূর্তির মানে

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যুগলমূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ; তাদের ভেদ নাই। পুরুষ প্রকৃতি না হ'লে থাকতে পারে না; প্রকৃতিও পুরুষ না হ'লে থাকতে পারে না। একটি বললেই আর একটি তার সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি, আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না, আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তিকে ভাবা যায় না। যুগল-মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আদ্যাশক্তি; পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ অকর্তা, কিছু করেন না, প্রকৃতিই সকল কার্য করেন। প্রকৃতির এই সকল কার্য পুরুষ সাক্ষীরূপে দেখেন। কিন্তু পুরুষকে ছেড়ে প্রকৃতি আপনি কোন কাজ করতে পারেন না। উভয়ে উভয়কে দেখছেন। তাই যুগল-মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌরবর্ণ বিদ্যুতের মত; তাই কৃষ্ণ পীতাম্বর পরিহিত। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নীল পদ্মের মত, তাই শ্রীমতী নীলাম্বর পরিহিতা এবং নীলকান্তমণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর, তাই কৃষ্ণও নূপুর পরেছেন; অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল।

"যুগলমূর্তি সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্তি—শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন; শিব শব হ'য়ে পড়ে আছেন; কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব কাজ কচ্ছেন।

"অর্ধনারীশ্বর এই যুগলেরই বিভিন্ন প্রকাশ—একই কথা। পুরুষ-প্রকৃতি দুই-ই তিনি। এই পুরুষ-প্রকৃতির যোগই যোগ-মায়া—যা দ্বারা তিনি নিজকে ঢেকে রাখেন" (গী ৭।২৫)।

যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণ

"আমি যুগে যুগে অবতার।"

"এবার গুপ্তভাবে আসা—সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।"

"আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন।"

উল্লিখিত উক্তিগুলি ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হয়েছে, তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে। অনেকেই তখন, তখন এর উপর ততটা গুরুত্ব অর্পণ করেন নি বটে, কিন্তু ভক্তদের ভিতর কথাটা আলোচনার ফলে নরেন সন্দেহ দোলায় দুলছিল। মনের এই অবস্থায় কাশীপুর উদ্যানে যখন ঠাকুর রোগযন্ত্রণায় অস্থির, তখন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের পাশে বসে বসে ভাবছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে যদি তিনি বলেন যে আমি ঈশ্বরের অবতার তা হ'লে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলে উঠলেন—"নরেন তোর এখনো সন্দেহ? যে রাম যে কৃষ্ণ,

ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" নরেন এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর স্বামী বিবেকানন্দ ইয়োরোপ ও আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আরতির পর ঠাকুরকে এই বলে প্রণাম করতে বলতেন :—

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

যোগ

একের সহিত অন্যের মিলনসাধনই যোগ। পরমাত্মার সহিত কুণ্ডলিনীশক্তি (জীবনীশক্তি) সহ জীবাত্মার মিলনসাধনই যোগ। অসংখ্য প্রকার যোগের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; কিন্তু যোগের মূলীভূত বিষয়গুলি বা উদ্দেশ্যগুলি একই। প্রক্রিয়ার বিভিন্নতাকেই বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন যোগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ যোগের কথা শাস্ত্রে আছে। ভাগবতে ভগবান বলেছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তং নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্মশ্চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

—আমি মানবের মঙ্গলার্থে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিন প্রকার যোগের কথা বলেছি। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

সাধকের অধিকার অনুসারে সে বিভিন্ন যোগের অনুষ্ঠানে রত হয়। যাদের ষড়দর্শনের গভীরতম তত্ত্বগুলি বুঝবার শক্তি, প্রবৃত্তি বা প্রবণতা কম, শারীরিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের শক্তিও খুব বেশি নাই, কিন্তু চিত্তসংযমের শক্তি আছে, হৃদয়ও ভাবপ্রবণ, তাদের ভক্তিযোগে অধিকার। যাদের ভাব কম, চিত্তসংযমের শক্তি কম এবং দার্শনিক তত্ত্বাদিও সহজবোধ্য মনে হয় না; কিন্তু ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান ও স্থূল কর্মাদি সহজসাধ্য মনে হয়—তাদের কর্মযোগে অধিকার। আর যাদের হৃদয়ে ভাবপ্রবণতা, ভক্তি, বিশ্বাস, চিত্তসংযমের শক্তি তেমন নাই, কর্মক্ষমতাও কম, অথচ দার্শনিক তত্ত্বাদির বিচার করে বোঝবার ক্ষমতা আছে, তারাই জ্ঞানযোগে অধিকারী। এই তিন পথের একান্ত পথিক যোগী হ'লেও নিম্নস্তরের যোগী।

ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান—এই তিন পথের যোগীই নিজ নিজ অবলম্বিত যোগকে শ্রেষ্ঠ বলেন। কিন্তু উন্নত সাধকগণ বলেন, ভক্তি সাধনার প্রাণ এবং প্রধান অবলম্বন হ'লেও ইহা সাধনার শেষ কথা নয়। ভক্তির মূলে আর একটি অমূল্য সামগ্রী আছে, যার নাম 'বিশ্বাস'। বিশ্বাস দ্বারা পুষ্ট হ'লে সাধক অনাবিল ভক্তি লাভ করতে পারে, এভাবে কোন বস্তুতে বা তার শক্তিবিশেষে ভক্তিমান হ'লে তখন তার ক্রিয়া করবার অভিলাষ আসে। ক্রিয়াবান ভক্ত সাধক আবার সাধনার উচ্চ অবস্থায় জ্ঞানের অধিকার পান। এভাবে যথাক্রমে ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান অবলম্বিত হ'লেই সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছিতে হয়। পূর্ণযোগী হতে হ'লে তিন প্রকার যোগেরই সমন্বয় করতে হয়।

সূর্যরশ্মিতে অন্তর্নিহিত দাহিকাশক্তি আছে; কিন্তু সে শক্তি বিক্ষিপ্তভাবে আছে বলে দ্রব্যাদি উষ্ণমাত্র হয়—পোড়ে না। যদি বিক্ষিপ্ত সূর্যরশ্মিগুলিকে আতসী কাচের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করা যায়, তবে দ্রব্যাদি পোড়ে। তেমনি আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি কামাদি বিষয়ের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে বলে অন্তরের সম্যক্ বিকাশ হয় না। এই মনোশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার আতসী কাচই হল যোগ; অর্থাৎ যে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাধারা মানবমনে জীবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধির প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায় তাকে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার বিধিনিষেধক প্রণালীই যোগ। অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার বেগ সংযমের জন্যই যোগের প্রয়োজন।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"—চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ—বলেছেন পতঞ্জলি। চিত্তের বৃত্তিসকল নিরুদ্ধ হ'লে দ্রষ্টাপুরুষস্বরূপে অবস্থান করেন; আর নিরুদ্ধ না হ'লে বুদ্ধি যেরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট হয় তা-ই পুরুষেও প্রতিভাত হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বৃত্তি নিরোধ করতে হয়। নিরন্তর দীর্ঘকাল যোগ প্রণালীর অনুষ্ঠানে অভ্যাস দৃঢ় হয়ে বৈরাগ্য আসে।

মৈত্র্যুপনিষদে উপদিষ্ট যোগপ্রণালী পাতঞ্জল যোগপদ্ধতি থেকে কিছু ভিন্ন। পতঞ্জলির যোগপ্রণালী অষ্টাঙ্গ—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি—এই আটটি অঙ্গ। 'মৈত্রী'র যোগপদ্ধতি ষোড়ঙ্গ—প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, তর্ক ও সমাধি। মৈত্রী মতে তর্ক হচ্ছে ধারণার পরীক্ষা অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি; অন্যান্য অঙ্গগুলি পাতঞ্জল পদ্ধতিরই মত।

শ্রীসদাশিব তাঁর পঞ্চমুখে দশ প্রকার যোগের কথা বলেছেন—(১) মন্ত্র, (২) হঠ, (৩) ভক্তি, (৪) লয়, (৫) লক্ষ্য, (৬) ক্রিয়া, (৭) রাজ, (৮) জ্ঞান, (৯) বাসনা ও (১০) পরা। এই দশটিকে স্থূলভাবে চার ভাগ করা যায়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপে অন্তঃকরণের চারটি অঙ্গের মধ্য দিয়ে আত্মোন্নতি দ্বারা বৃত্তিসমূহের নিরোধ বা লয় করে জীব ক্রমশ পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে পারে। স্থূলে বিভাগ চারটি হচ্ছে—মন্ত্র, হঠ, লয় এবং রাজযোগ। মন্ত্র জপ করতে করতে মন মন্ত্রাত্মক দেবতায় লয় হওয়াই মন্ত্রযোগ।

স্থূলে দেহের উপর মুদ্রাদির হঠক্রিয়া দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির লয় সাধনই হঠযোগ।

অভীষ্ট দেবতার চৈতন্যময় সত্তার সূক্ষ্মতর স্বরূপের ধ্যান দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধই লয়যোগ।

মনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা চিত্ত নিরোধের প্রণালীই রাজযোগ।

যোগের প্রধান বিঘ্ন চতুর্বিধ :—

(১) ভোগবিঘ্ন—বিষয়সম্ভোগে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ। ভোগ্য বিষয় বহুবিধ; আসন, শয্যা, বস্ত্র, ধন, রত্ন, নারী, ভোজ্যাদি মাদকদ্রব্য, যানবাহন, ঐশ্বর্য, বিভূতি, নৃত্যগীতাদি, পাণ্ডিত্য, স্ত্রীপুত্র পরিবার ইত্যাদি।

(২) ধর্মবিঘ্ন—ইহাও বহুবিধ। বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানাধিক্য, ব্রতোপবাসাদি নিয়মধারণ, সকাম মন্ত্র জপাদি, তীর্থ পর্যটন, দানাদি সৎকর্মের এবং লোকহিতকর কর্মের কল্পনা বা প্রচেষ্টা ইত্যাদি ধর্মমূলক কার্য হ'লেও ধর্ম বা পুণ্যসঞ্চয়ের অভিলাষে এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি মোক্ষার্থীর পক্ষে বিঘ্নকর।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

গ্রন্থপরিচিতি

বর্তমান সংখ্যার [illegible]
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

স্বামী বিবেকানন্দ

"আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী দেখেছি ; এইবার সাগর দেখছি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আলাপের এই সূচনাটি দুই পরম রসিক মানুষের অন্তরের পরিচয় বহন করে এনেছে। 'বিদ্যাসাগর' একটি উপাধি মাত্র, তবুও বিদ্যাসাগর বাংলায় একজনই ছিলেন। তিনি যে কিসের সাগর ছিলেন না, সেইটি বলাই কঠিন। মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব, দয়া, কর্ম, জ্ঞান—যেদিক থেকে দেখা যাক না কেন—তাঁর চরিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালে সোজা আমাদের মনে হয়, সত্যিই 'সাগরে এসে মিললাম।'

গোষ্পদ থেকে শুরু করে খানা, ডোবা, খাল, বিল, হ্রদ, নদী পার হয়ে বাঙালী-চরিত্রের ইতিহাসে এই একটি সাগর। অর্থের দিক থেকে 'সাগর' এবং 'সমুদ্র' এদের সূক্ষ্ম পার্থক্য বাংলাভাষায় করা চলে। সাগর খুব বিরাট হলেও আমাদের মনে তাকে ঠিক সীমাহীন অনন্ত বলে ধারণা হয় না। সাগর থেকে সায়র তো অনেক হ্রদেরই নাম। তবু সাগর বলতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমুদ্রই বুঝিয়েছেন, সন্দেহ নেই। আমাদের কাছে বিদ্যাসাগর যদি সাগর বা সমুদ্র হয়ে থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমুদ্র—যে অনন্ত জলধি সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে আছে। তটের সংগে সম্বন্ধ রেখে যে বিশালতা, তাকে যদি বলি সাগর, তটহীন কারণার্ণব তবে সমুদ্র। সেই মহাসমুদ্র সাগরকে চিনতে পেরেছিলেন—সাগরের পূর্ণতা এবং অপূর্ণতা, এই দুয়েরই সন্ধান পেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের দয়া ও মনুষ্যত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু তিনি জানতেন বিদ্যাসাগরের অন্তরে সোনা চাপা আছে, অর্থাৎ যে ঈশ্বরানুভূতি থেকে দয়ার সার্থকতা, সেই ঈশ্বরানুভূতির স্বাদ বিদ্যা-সাগর লাভ করেন নি! আর শ্রীরামকৃষ্ণের চাবায়, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য।'

বস্তুত ঈশ্বরলাভ ও মানবপ্রীতি—একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ, 'আধুনিক' যুগের মানুষে মানবপ্রীতিকে আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বড়ো, ঈশ্বরলাভকে মনে করে সেরেছেন। আর মানুষ কি দাঁড়াতে পারে, তা স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেই প্রমাণিত। যে নিরন্তর নির্বিচার দানে শতসহস্র মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তার প্রতিদানে এসেছে নির্মম অকৃতজ্ঞতা, অকারণ শত্রুতা ও লাঞ্ছনা। শেষ অবধি সভ্য সমাজের সংসর্গের চেয়ে কারমাটারে সাঁওতাল সমাজের অকৃত্রিম সারল্য বিদ্যাসাগরকে আকর্ষণ করতো বেশী। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন থেকে বাঙলার সমসাময়িক শিক্ষিতসমাজ—এঁদের সকলের কাছেই তিনি যে পরিমাণ বিরূপতা পেয়েছেন, তার তুলনায় শ্রদ্ধা পেয়েছেন অনেক কম। অথবা হয়তো এই বেদনায় বিক্ষত হওয়ার ফলেই তাঁর অদমনীয় পৌরুষ বাঙলার সমতল থেকে আকাশ স্পর্শ করে দাঁড়িয়েছিল। সে মহিমান্বিত পৌরুষের অন্তরালে যে বিক্ষোভ ও যন্ত্রণার ঝড় বয়ে যেত, তার প্রমাণ মেলে তাঁর শেষ জীবনের নানা খেদোক্তিতে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী দুটিতে বিদ্যাসাগরের ক্রমবর্ধমান তিক্ততা ও অতৃপ্তির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা পাঠ করে ব্যথিত বিস্ময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমর বাণীটিই মনে পড়ে, 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।'

কিন্তু সেবা যেখানে ধর্মে পরিণত, কর্ম যেখানে সত্যোপলব্ধির নিগূঢ় প্রয়োজনে রূপান্তরিত, সেখানে তৃপ্তি অতৃপ্তির, আনন্দ বিরক্তির প্রশ্ন কখনো বড়ো হয়ে দেখা দেয় না। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সীমান্ত উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ সেই চিরন্তনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়—যিনি 'কারণং কারণানাং।' যাঁকে জানলে এ জগতকে ঠিক ঠিক জানা যায় এবং মানুষ 'স্থিতধী' হয়, উদ্বেলিত করুণাসাগর ঈশ্বর-চন্দ্র তাঁকে জানা প্রয়োজন মনে করেন নি।

অথচ বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না—তাও নয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের অগণিত মৃত্যুসংখ্যা শুনে

অসাধারণ সত্ত্বগুণ থেকেই দয়ার উদ্ভব। এই দয়া বা সেবা থেকে মানবজীবনের যা কিছু মহৎ সৃষ্টি। সাধারণ মানবমন এই মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। স্বার্থের রঙীন চশমার যারা জগতকে দেখতে অভ্যস্ত, নিঃস্বার্থ সেবার অমলধবল শুভ্রতার তাদের বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক। কৃতজ্ঞ হতে হলে যে বিরাট হৃদয়ের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন—সেই হৃদয় কয় জনের? মহান মানুষের অকৃতজ্ঞতা বিদ্যাসাগরের মতো মহামানবদের চিরকাল বিদ্ধ করেছে এবং করবে।

তিনি নাকি বলেছিলেন, 'আর মানি না', —যদি তাঁর এ উক্তি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে ভগবান না মানার অর্থ নাস্তিকতা নয়, বরং সেখানে আছে মানবমনের ক্ষোভ ও অভিমান।

বরাহনগর মঠে স্বামীজীর মাস্টারমশাই বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে যে গল্পটি শুনিয়েছিলেন, সেটাই বরং এ ব্যাপারে আলোকপাত করে—

মাস্টার (নরেন্দ্রের প্রতি) —বিদ্যাসাগর বলেন—আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।

নরেন্দ্র—বেত খাবার ভয়?

মাস্টার—বিদ্যাসাগর বলেন, মনে কর মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ-টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হল, তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন ওকে পঁচিশ বেত মারো। তারপর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি। তার জন্য বেতের হুকুম হল। তখন আমি হয়ত বললাম, কেশব সেন আমাকে ঐরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর হয়ত দূতদের আবার বলবেন, তুই একে উপদেশ দিচ্ছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিচ্ছিলি? ওরে কে আছিস—একে আর পঁচিশ বেত দে। (সকলের হাস্য)

"তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া। (সকলের হাস্য)। আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব?"

সমসাময়িক কালের ধর্ম-বিতণ্ডা থেকে দূরে থেকে বিদ্যাসাগর আপন হৃদয়ের প্রেরণায় যা কর্তব্য বলে মনে করেছেন, তা যুক্তি, বিচার ও কর্মোদ্যমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অনুমানমূলক বিতর্ক থেকে প্রত্যক্ষ কর্মের প্রতিই তাঁর আগ্রহ বেশী। কিন্তু তার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, ঈশ্বরসত্যে তাঁর নিশ্চিত অনাস্থা ছিল। বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গে' কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিলেও একথা মনে রাখতে হবে যে, তাঁর সব চিঠির উপর 'শ্রীহরি শরণং' লেখা থাকতো। বাউল গানের ভক্তিরসে তাঁর দু'চোখ বেয়ে ধারা নামতো এবং শিশুপাঠ্য রচনাতে তিনি লিখেছিলেন—'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।'

'কথামৃত'-কার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকারের উপলক্ষ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কথার সংগ্রহে মহেন্দ্রনাথ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, বিদ্যাসাগরের কথা সংগ্রহের কথা তাঁর মনে হয় নি। বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থগুলিতে তাঁর কথাবার্তার যেটুকু উদাহরণ মেলে, তাতে তাঁর ব্যঙ্গনিপুণ স্পষ্টভাষী হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতির সামান্য রশ্মি দেখতে পাই মাত্র। বিদ্যাসাগরের বসওয়েল ছিল না ভেবে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হয়েছিলেন, সে দুঃখ আমাদেরও; মহেন্দ্রনাথের পক্ষে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যের আহ্বানই বড়ো হওয়া স্বাভাবিক।

বিদ্যাসাগরের বেত খাওয়ার গল্প শুনে স্বামীজী যা বলেছিলেন, সে কথাও বিদ্যাসাগর-চরিত্রের উপলব্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরের বিষয় বোঝেন না শুনে স্বামীজী প্রশ্ন করেছিলেন—'যে এটা বোঝে নি সে আর পাঁচটা বুঝলে কি করে?'

মাস্টার—আর পাঁচটা কি?

নরেন্দ্র—'যে এটা বোঝে না, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলে-মেয়ের বাবা হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে? যে একটা ঠিক বোঝে সে সব বোঝে।'

এই সঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি-কথনের একটি অংশও উল্লেখযোগ্য —'একজন বলিলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বর ব্রহ্ম কিছুই মানেন না। তিনি বোঝেন জগতের কল্যাণ, বিদ্যাচর্চা—ইহাই প্রধান। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আরে, সে কখনও হতে পারে? আগে ব্রহ্ম না জানলে কেউ কি জগৎ বুঝতে পারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাহলে যে ভুল পথ ধরা হয়। আগে জগৎ, তারপর ব্রহ্ম, একি হয়? আর দেখ অত বড় লোক, ওকি কখনও ভুল করে? ও নিশ্চয় আগে ব্রহ্মের জ্ঞান বা আভাস পেয়েছে, তারপর জগৎ বা ব্রহ্ম বুঝেছে।'

নিখিল মানব-জীবনের সঙ্গে যে সহমর্মিতা বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন, হয়তো ব্রহ্মসত্যের আভাস তারই মধ্যে নিহিত। অন্তত মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তির যে বিকাশে মানুষ দেবত্ব লাভ করে, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বে সে শক্তির অনেকখানি বিকাশ ঘটেছিল, একথা মানতেই হবে। তাই সেকালে কলকাতায় যাঁরা কালীঘাটে কালী দর্শন করতে আসতেন, তাঁরা বিদ্যাসাগর দর্শনও কর্তব্য বলে মনে করতেন।

উনিশ শতকের একপ্রান্তে বিদ্যাসাগর অপর একপ্রান্তে বিবেকানন্দ। দৃপ্ত পৌরুষে, নিঃস্বার্থ সেবায়, আমরণ সংগ্রামে এ দুই চরিত্রের অন্তরতম মিল আমাদের বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। উত্তরকালে নিবেদিতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নেই, যার উপর তাঁর প্রভাব পড়ে নি।' বিদ্যাসাগর যে সেবাব্রত একাকী উদ্‌যাপন করে গেছেন, বিবেকানন্দ সেই সেবাকে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শানুযায়ী পূর্ণ পরিণত রূপ দিয়ে সেবা ও সাধনাকে এক করে দিয়ে গেছেন। যা ছিল ব্যক্তির প্রচেষ্টা, তাকে ধর্মের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় রূপদান করেছেন। বস্তুত এই সেবাধর্ম উনিশ শতকের মানবতাবাদ ও ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্রহ্মচেতনার সংযোগে সৃষ্ট—বিদ্যাসাগর থেকে বিবেকানন্দে এসে এই সেবাধর্মের পরিপূর্ণতা।

বিদ্যাসাগর নিজে মনে করতেন, বিধবা বিবাহ তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তিনি নিজে। তাঁর কোন গ্রন্থ বা সংস্কার-প্রচেষ্টাই তাঁর বিপুল চারিত্রকীর্তিকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। বিধবা বিবাহ তাঁর সমকালেও খুব সফল হয় নি, তাঁর মৃত্যুর পরে স্বল্পতর হয়েছে। অবশ্য এর কারণ আমাদের দেশের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো। যে দেশে আর্থিক কারণে বিবাহই সমস্যা, সে দেশে বিধবা বিবাহ কখনো সুপ্রচলিত হতে পারে না। তবুও বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্বামীজী বিদ্যাসাগরকে "বীর" (Hero) আখ্যা দিয়েছিলেন। এই সঙ্গে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনও স্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের সংগ্রামশক্তি কেবল 'বিবাহ' সমস্যাতেই আবদ্ধ ছিল না। মাতৃভাষার শিক্ষাবিস্তারে এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা চলে যে, দেশের মূল সমস্যা যে 'শিক্ষা' —এ সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক হিন্দু সমাজের কূর্মবৃত্তিকে আঘাত না করলে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিবেকবোধকে জাগ্রত করা যাবে না—এ কথাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বিবাহসমস্যা নিয়ে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রমন্থন সম্বন্ধে বলা চলে 'এহ বাহ্য' —সবার আগে এবং সবার উপরে বিদ্যাসাগরের হৃদয়। দেশাচারের তামসিকতায় সমাচ্ছন্ন মানুষের ন্যায়বুদ্ধিকে জাগ্রত করার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রচেষ্টার সার্থকতা।

বিবেকানন্দের ব্যক্তিজীবনের আর একটি দিকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর অন্তরের মিল। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কোন দিন তাঁর জীবনে পিতামাতার দানের কথা ভুলে যান নি। যৌবনে পিতৃবিয়োগের পর থেকে মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আমরণ অটুট ছিল। মাতৃভক্তি যে মহাপুরুষদের মহত্ত্বের বড়ো কারণ, এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল। সে দিক থেকে বিদ্যাসাগর আদর্শ জনক-জননী-উপাসক। তাঁর অন্তরে বৈদিক বা পৌরাণিক অন্যান্য দেবতার স্থান ছিল না, তার কারণ, তাঁর পিতামাতাই সে হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করেছিলেন। কাশীধামে গিয়েও তিনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণারূপে দেখেছিলেন নিজের জনকজননীকে। অর্থলোভী ব্রাহ্মণেরা তাঁর কাছে ভগবৎপ্রতিনিধিত্ব দাবী করলে তিনি বলেছিলেন, 'এখানে আছেন বলে আপনাদের যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করি,

মানসতীর্থ

[illegible]

ভুল বোঝ না—
আমিনি, না আসতে পারিনি কি?
নাও রক্তময় কুন্দ,
চুলের ফিতে,
আর ফুল ;—
দেখতে দাও মন-মাধুরী।

বিলাস নয়;—চাই ব্যাকুলতা
আশা নয়,—জাগো অনুরাগ
সাগরের পরিধি বেয়ে
আকাশের ব্যাপ্তি ছেয়ে
চিরদিনের মানসতীর্থে ॥

তা হলে আমার মতো নরাধম আর নেই।' 'তবে আপনি কি মানেন?'

'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী বিরাজমান।'

পরিব্রাজক অবস্থায়, আমেরিকায় বক্তৃতা-দানের সময় অথবা বেলুড় মঠ বাসের যুগে মায়ের কথা স্বামীজী সব সময় মনে রেখেছেন এবং সন্ন্যাসী হয়েও মায়ের সেবার ব্যাপারে কখনো ত্রুটি রাখেন নি। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগরের পিতৃ-মাতৃ ভক্তি [illegible] আধুনিক যুগের ভঙ্গুর পারিবারিক পরিমণ্ডলে আজো প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

কিন্তু, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের সবচেয়ে বেশী মিল ছিল বোধ করি স্বাজাত্যাভিমানে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে প্রচলিত যে গল্পটি বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে শুনিয়েছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা অনিশ্চিত। তবুও গল্পটি বিদ্যাসাগর চরিত্রের একটি প্রধান সত্য মনে করিয়ে দেয়। 'একদিন ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) থেকে ফিরবার সময় বিদ্যাসাগর এ ধরনের জায়গায় যেতে হলে সাহেবী পোষাক পরবেন, কি পরবেন না, এই চিন্তা করতে করতে আসছিলেন। তাঁর সামনে দিয়ে এক স্থূলকান্তি মোগল ধীর পদক্ষেপে বাড়ী ফিরছিলেন। হঠাৎ পিছন থেকে তাঁর চাকরটি দৌড়ে এসে বললে, 'মশায়, আপনার বাড়ীতে আগুন লেগেছে।' একথা শুনেও মোগল মহোদয় বিশেষ বিচলিত হলেন বলে মনে হ'ল না। যেমন চলছিলেন তেমনি চলতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে চাকরটি স্বভাবতঃই বিস্ময় প্রকাশ করলে। তাতে চটে গিয়ে মোগল মশাই বললেন, 'আরে বেতমিজ, খান কয়েক বাখারি পুড়ে যাচ্ছে বলে আমি আমার বাপ-দাদার চাল ছেড়ে দেব?' পিছনে আসতে আসতে বিদ্যাসাগরও প্রতিজ্ঞা করলেন কোনমতেই ধুতি, চাদর, ছাড়া চলবে না।

আধুনিককালে আমরা যখন smart হবার তাড়নায় বিদেশী পোষাক সর্বাঙ্গের আভরণ করতে চলেছি, তখন বিদ্যাসাগরের এই চটিজুতা আমাদের আত্মস্থ হতে সহায়তা করবে, সন্দেহ নেই। তেজস্বিতা বা smartness-এর জন্য ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন সর্বাগ্রে; জাতীয় পোষাক ছেড়ে দিলে জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাবারও ভয় থাকে এবং শুধু পোষাকেই তেজবৃদ্ধি পায় না।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব মতামত পাই স্বামী-শিষ্য সংবাদ উত্তরকাণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে। অফিস-ফেরৎ সাহেবী পোষাক-পরা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছিলেন—'আহার, পোষাক ও জাতীয় আচারব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে জাতিত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতিত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না —অধঃপাতের সূচনাই হয়।

অফিস অঞ্চলে কার্যানুরোধে ঐরূপ পোষাক পরবি বৈকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালীবাবু হবি। সেই কোঁচা-ঝুলান, কামিজ গায়, চাদর কাঁধে।........ পোষাকের ব্যাপারে তোরা কি ছাই অনুকরণ করতেই শিখেছিস। আজকালকার ছেলেছোকরারা যেসব পোষাক পরে তা না এদেশী, না ওদেশী—এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। উদ্ধৃত কথাগুলি সাম্প্রতিক যুব-সমাজের ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রযোজ্য। বাংলা-দেশের সবচেয়ে তেজোময় পুরুষ ধুতি, চাদর, চটিজুতাপরা মানুষটিই বলতে পারতেন— 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নেই, যার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক করে লাথি না মারতে পারি। বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ের মূলেও তাঁর অসীম আত্মপ্রত্যয়বিজড়িত স্বদেশাভিমান।

বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ—দুইজনেই কর্মযোগী। একজন নিজের অজান্তে কর্ম-সাধনা করেছেন ও আর একজন সজ্ঞানে এই কর্মব্রত গ্রহণ করেছেন। উত্তরজীবনে বিদ্যা-সাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য তালিকা থেকে "বেদান্ত" বর্জন করতে চেয়েছিলেন ভ্রান্ত দর্শন হিসাবে। বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনই কর্মে পরিণত বেদান্ত। দার্শনিক জিজ্ঞাসায় এঁদের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু দুই মহামানবের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের ভারতীয় সংস্কৃতির নবরূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

যে পাশ্চাত্য জীবনবোধ ও প্রাচ্য ঐতিহ্যের সমন্বিত রূপে এই নব জাগরণের মূলকথা—বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে আমরা সে সমন্বয়ের অনেকগুলি [illegible] পাই। শুধু আদর্শের ক্ষেত্রেই নয়, আদর্শকে বাস্তবজীবনে রূপায়িত করার জন্য এঁদের যে বিপুল উদ্যম, অধ্যবসায় ও প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি, বাক্যসম্বল বাঙালী-জীবনে তা সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়।

বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে বিবেকানন্দ ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাসাগরের বৌবাজারের ইস্কুলে কিছুদিন প্রধান শিক্ষকতাও তিনি করেছেন। সুতরাং বিদ্যাসাগরের জীবনধারার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে অনেকবার। উত্তরজীবনেও বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ কতখানি সজাগ ছিল, মহেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষ্যে তার আর একটি প্রমাণ রয়েছে। বলরাম বসুর বাড়ীতে বসে একদিন নরেন্দ্রনাথ নিবিষ্ট চিত্তে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগখানি দেখছিলেন। বাবুরাম মহারাজ তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি এখন আবার প্রথমভাগ পড়ছ নাকি?" নরেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত নেত্রে বাবুরাম মহারাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আগে প্রথম-ভাগ পড়েছিলুম, এখন বিদ্যাসাগরকে পড়ছি।"

বিদ্যাসাগর-প্রতিভার উপলব্ধির জন্য তাঁর বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয় প্রভৃতি গ্রন্থমালাও অভিনিবেশযোগ্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বামীজী ঠিক কি উদ্দেশ্যে প্রথমভাগ পড়ছিলেন, তা অনুমান করা চলে মাত্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলতি-ভাষার পক্ষপাতী হলেও সংস্কৃতপ্রধান সাধু গদ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ হয়তো বিদ্যাসাগরী রীতি অনু-ধাবনেরই ফল।

অকালমৃত্যু হলেও বিবেকানন্দ জীবনের শেষ পর্বে (১৯০২) সাঁওতাল কুলী-মজুরদের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ এবং বিদ্যা-সাগরের শেষ জীবনে কারমাটারে সাঁওতালদের সঙ্গে আত্মীয়তার মধ্যে কোথায় যেন মিল আছে। জীবনের জটিল অভিজ্ঞতাগুলি হয়তো শেষ অবধি এমনি সরল উত্তর আকাঙ্ক্ষা করে।

ভালবাসাই একদিন মানুষের ভগবানকে প্রকাশিত করে। বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে সাঁওতাল মজুরদের ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে তাই তো স্বামীজী বলেছিলেন, "তোমরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।" জীবে দয়া থেকে জীবসেবা বড়, সন্দেহ নেই; বিবেকানন্দের অন্তরের কথাটি হল "পূজো।" [আন[illegible] হইতে

রামায়ণীয় যুগের বয়ন-শিল্প

বৈদিককালে কার্পাস দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হইত এবং এই বস্ত্র বয়নে রমণীগণ পুরুষের সাহায্য করিতেন। (ঋগ্বেদ২।৩।৬) ঋগ্বেদের একটি ঋকে আছে বস্ত্রা পুত্রয়া মাতরো বয়ন্তি (৫।৪৭।৬)।

কালে রামায়ণীয় যুগে আমরা বয়ন-শিল্পের প্রভূত উন্নতির পরিচয়-প্রাপ্ত হই। রামায়ণের বহুস্থানে ক্ষৌম ও কৌশেয় বসনের উল্লেখ আছে। তাহা কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

তিসির অন্য নাম ক্ষুমা। ক্ষুমার তন্ত হইতে সেকালে যে বস্ত্র প্রস্তত হইত, তাহা ক্ষৌমবস্ত্র নামে পরিচিত ছিল। অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ আর্যেরা ভারতে আসিবার পূর্বে তাঁহারা তিসির সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিতেন। আর্যদের যে শাখা পশ্চিম অভিমুখে গিয়াছিলেন তাঁহারাও পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া তিসির সূতারই বস্ত্র প্রস্তত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

ইউরোপে এই বস্ত্র এখন সাটিন নামে পরিচিত। প্রাচীন মিশরীয়রা তিসির বস্ত্রকে খুব পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। সে জন্য তাঁহারা মিশরের সমাধি মন্দিরগুলির গাত্রে তিসির গাছকে পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া অঙ্কিত করিয়া সযত্নে রাখিয়াছেন। তিসির কাপড়কে মিশরীয়রা পবিত্র বস্ত্র (Coffin cover) রূপে ব্যবহার করিতেন।

ক্ষৌমবাস অতি প্রাচীনকালে চীন দেশেও উৎপন্ন হইত। চীনারা ক্ষুমাকে বলিত 'চুমা'। এই চুমাবাসই চীনাংশুক নামে এ দেশে পরিচিত ছিল। কবি কালিদাস চীনাংশুক বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত হইতে একদিন এই বস্ত্র-শিল্পটি উঠিয়া গিয়াছিল, তখন চীন হইতে ভারতে চীনাংশুক আমদানি হইত।

রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি রাজপুত্রগণ বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের মাতৃগণ ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বধূদিগকে বরণ করিয়াছিলেন। (আদিকাণ্ড, ৭৭ সর্গ, ১২ শ্লোক)।

ক্ষৌমবাস নানা বর্ণের ছিল। মন্থরা কৈকেয়ীর ধাত্রীকে পাণ্ডু বর্ণ ক্ষৌমবাস পরিহিত দেখিয়াছিল (অযোধ্যা কাণ্ড ৭ সর্গ, ৭ শ্লোক)।

কৌশল্যা শুক্লবর্ণ ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া পুত্রের যৌবারাজ্যাভিষেকের জন্য মঙ্গলাচরণ করিতেছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ, ১৫ শ্লোক)। সীতার বিবাহে জনক রাজা স্বীয় কন্যাদিগকে অন্যান্য দানসামগ্রীর সহিত বহু ক্ষৌমবস্ত্র, এক কোটি সাধারণ বস্ত্র ও বহুমূল্য কম্বল প্রদান করিয়াছিলেন। কম্বলাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌমান্ কোট্যা স্বরিণ চ। (বা-৭৪ সর্গ)।

ডাঃ হিরেন তাঁহার Indian Reserch গ্রন্থে মুখ্য কম্বলকে উৎকৃষ্ট শাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধারের উৎকৃষ্ট মেষলোম হইতে এই সূক্ষ্ম কম্বল প্রস্তত হইত। গান্ধারের মেষলোমের উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে (১ মণ্ডল ১২৬ সুক্ত)।

কৌশেয় বসন কোশকীটের তন্ত হইতে প্রস্তত হইত। এই কোশকীট ভারতের পূর্বদিকস্থিত কোশকারভূমি নামক গুটিপোকার জন্মস্থানে উৎপন্ন হইত (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৪০ সর্গ, ২৩ শ্লোক)।

কেহ কেহ আসাম প্রদেশকেই সেকালের কোশকার ভূমি বলেন।

বর্তমানেও আসাম প্রদেশে কোশকার পোকার তন্ত হইতে কৌশেয় বসন প্রস্তত হইয়া থাকে।

সীতা কৌশেয় বসন পরিধান করিতেন। রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি রাজপুত্রেরা সর্বদা সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিতেন।

রাম ও লক্ষ্মণ ও কৈকেয়ীর নির্দেশে নিজ নিজ পরিধেয় সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া মুণি-ঋষিদিগের পরিধানযোগ্য চীর গ্রহণ করিলেন।

সীতা সেরূপ করিতে লজ্জাবোধ করায়—রাম চীরং ববন্ধ সীতায়াঃ কৌশেয়স্যোপরি স্বয়ম্। সেকালের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া যজ্ঞক্রিয়াদি সম্পাদন করিতেন।

পর্যঙ্কের উপর শয্যাস্তরণরূপে তখন একপ্রকার চিত্র কম্বল ব্যবহৃত হইত (অযোধ্যা কাণ্ড ৩০ সর্গ)।

লঙ্কায় লোমজ কম্বল ব্যবহৃত হইত (লঙ্কাকাণ্ড, ৭৪ সর্গ)।

তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অঙ্গে অঙ্গরক্ষা বা কঞ্চুকী ব্যবহার করিতেন। কঞ্চুকী আপাদগ্রীবালম্বিত হইত।

তখন সূঁচ দ্বারা পট্ট ও কৌশেয় বস্ত্রাদির উপর ফুল-পত্র চিত্রিত করা হইত। সাধারণ বস্ত্রকে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া (আজকালকার ঢাকাই জামদানীর ন্যায়) রচিত করিয়া তুলিবার উল্লেখ রামায়ণে আছে (সুন্দরকাণ্ড, ১০ সর্গ ও অযোধ্যা কাণ্ড, ৭০ সর্গ)।

"মণিকাঞ্চন ভূষিতম্ পরমাসনম্।"

৩৪

তখন উষ্ণীষের প্রচলন ছিল, শতশলাকাযুক্ত ছত্র ও চর্ম পাদুকার প্রচলন ছিল (অঃ ৯১ সর্গ)।

রামায়ণে রাজ-রাজড়াদের সাজ-পোষাকের কথা আছে। রাম ভরতকে বলিতেছেন---"তুমি রাজবেশ পরিধান করিয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া থাকো তো।" কিন্তু কোনস্থানেই পোষাকের পৃথক পৃথক্ নাম নাই।

বাস্তবিক পক্ষে রামায়ণী যুগে সীবন-শিল্প প্রচলিত ছিল এবং রামায়ণে প্রদত্ত শিল্পের তালিকায় সীবনকারের উল্লেখ আছে। যথা—"রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রাম ঘোষমহত্তরাঃ।" ১৫

(অযোধ্যা কাণ্ড ৮৩ সর্গ)।

তুন্নবায় অর্থ দর্জী। রামায়ণে সূচির উল্লেখও আছে। যথা---

বিবাহে ভরতোঁহতীব বুপেতুদ্যেব
ফুচিনা। ১৭
(অযোধ্যা কাণ্ড ৫৭ সর্গ)
দর্জির কার্য বৈদিককালেও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে সীবন-করা বস্ত্রের উল্লেখ আছে। তখন বস্ত্র কাটিয়া সূত্রের ও সূঁচের সাহায্যে যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা হইত তাহা উইলসন সাহেব তাঁহার অনুবাদিত ঋগ্বেদে প্রতিবাদকারীদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। Wilson's Rigveeda 11. Page 28 & Vol. IV Page 60.
তখন মুঞ্জাতন্ত দ্বারাও বস্ত্র প্রস্তুত হইত। উর্ণাতন্ত দ্বারাও সূক্ষ্ম বসন ও উত্তরীয় বা ওড়না প্রস্তুত হইত (লঙ্কাকাণ্ড ৭৪ সর্গ)।

বল্কল হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহার নাম ছিল অজিন।

রাক্ষসপুরী লঙ্কায় বোধ হয় চর্মবসন ব্যবহারই অধিক হইত। তথায় শয্যায় নানাবিধ চর্মাস্তরণ ব্যবহৃত হইত। অর্গ ভ চর্ম (সুন্দর কাণ্ড, ১ম সর্গ) রক্ত-চর্মাসন (লঙ্কাকাণ্ড, ১১২ সর্গ), ব্যাঘ্র-চর্মাসন (লঙ্কা ৭৪, সুন্দরকাণ্ড ১০) প্রভৃতির উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় অনেকস্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃদুল উর্ণায়ু-চর্মের উল্লেখও আছে।

লঙ্কার প্রতি ঘরে মেঝের পরিমাণমত চতুষ্কোণ মেঝ-আস্তরণ ছিল (সু ৯)। রাঙ্কব বা রঙ্কু---লোমজাত কম্বলেরও তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

—সৌরভ, আষাঢ়

চলন্ত ছবির বই

শিশুদের বইয়ে ডাইনীরা আর চুপচাপ নিশ্চল বসে নেই। এখন তারা মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করতে পারে, কর্কশস্বরে চেঁচাতে পারে, এমন কি কঙ্কালসার আঙ্গুলগুলি নাড়াতে-চাড়াতেও পারে। তবে খুব বদমায়েসী শুরু করলে আবার খুদে পাঠকরা একটা কাগুজে বোতাম টিপে তাদের ডুবিয়েও দিতে পারে। এ সব বিস্ময় লকিয়ে আছে পপ বইয়ে। পশ্চিম জার্মানীর বইয়ের বাজারে শিশুদের নতুন আকর্ষণ এই সব পপ বই, যা হল একাধারে ছবি, ধাঁধা ও খেলার মিশ্রণ।

এই বইগুলি হ'ল তিন মাত্রার। থ্রি-ডাইমেনশন্যাল। ছবিগুলির বিচিত্র ও পাটে পাটে খোলা যায়। শিশুরা ওপর থেকে, পাশ থেকে অবাক বিস্ময়ে বইয়ের পাতায় রূপকথার শহরকে দেখে, মজা পায় আর তারিফ করে। আঁকা মূর্তিগুলোকেও ইচ্ছেমত এদিকে-ওদিকে সরানো যায়। সুতরাং এরকম একটি বই শিশুকে পড়া, দেখা ও কিছু কাজ করা---তাই তিনদিক থেকেই ব্যস্ত রাখছে। এই বই থেকে শিশুরা যেমন অনেক কিছু জানতে পারছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিছু কাজও করতে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুটো জিনিষকে একসঙ্গে শিশুরা কেমন করে হজম করছে। একজন বিশিষ্ট জার্মান শিশুমনস্তত্ত্ববিদ হামবুর্গের নামকরা এক পত্রিকায় এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ উত্তর মেলে।

মিউনিখের পেডা জিওলজিক্যাল অ্যাকাডেমীতে ইনস্টিটিউট ফর ইয়ুথ রিসার্চ অ্যাণ্ড ইনস্ট্রাকশন সাইকোলজি'র ডিরেক্টর অধ্যাপক লুকহার্ট ছ' থেকে ন' বছরের শিশুদের নিয়ে তিনভাগে পপ বই সম্পর্কে পরীক্ষা চালান। সাধারণভাবে তিনি যা দেখেন তা হ'ল---চলন্ত ছবি দেওয়া বইগুলিই শিশুদের সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তবু কতকগুলি বিষয়ে নজর এড়িয়ে গেলে চলবে না। লুকহার্টের মতে---আজগুবি গল্পগুলি জোরে জোরে পড়া ও শোনা উচিত। খুব একটা বিস্তৃত বিবরণে না যাওয়াই ভাল, কেননা, এতে শিশুদের কল্পনাশক্তিতে বাধা পড়ে। জ্ঞানপ্রদ এই পপ বইয়ের মূল্য সম্পর্কে গবেষণা বিশেষজ্ঞদের মত ভিন্ন। তাঁদের মতে---চলমান ছবিগুলিই শিশুদের জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে। যেমন ধরা যাক---চিড়িয়াখানার লুকোচরি খেলার কথা। এখানে শিশুকে গল্পটা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে সব পশুর কথা বলা হচ্ছে, তাদের সে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে এবং এ-ব্যাপারে তাকে চিন্তাও করতে হচ্ছে। আর এর সঙ্গে সাধারণভাবে সে গুণতেও শিখছে। মনস্তাত্ত্বিকর মতে---এই বয়সে চলন্ত ছবি দেখে শিশুরা এতই মোহাবিষ্ট হয়ে যায় যে, গল্প কোথায় এগুচ্ছে তার চেয়ে চলন্ত ছবিগুলো আবার উল্টে-পাল্টে তাদের দেখাতেই চেষ্টা হয়ে থাকে।

পপ বইয়ের মধ্যে সেরা হল হেঁয়ালী ধরনের বই; ছবিতে ও লেখায় মজার মজার প্রশ্ন দেওয়া হয় সমাধানের জন্য। সমাধান কিন্তু ওসবের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। ছবির কোন কোন অংশ ঘুরিয়ে, কোন কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে বেশ মজার মজার সব বর্ণনা, কাহিনী বেরিয়ে আসে। অধ্যাপক লুকহার্ট মনে করেন, পপ বইয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কেননা বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে এইসব বই তার পাঠকের ভাবনা ঠিক, কি ভুল তা দেখিয়ে দেয়।

লেনিন ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে লেনিনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। লেনিনের চিন্তাধারা এই সংগ্রামকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে। খুব বেশী দিনের কথা নয়। ইংরেজ অধ্যাপক ডেভিড মরিসনকে এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, হাল আমলের আফ্রিকান নেতারা লেনিনের চিন্তাধারার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত এবং তার দ্বারা প্রভাবিত। মরিসন জোর দিয়েই বলেছেন যে, আফ্রিকার সমস্যা সমাধানে লেনিনের চিন্তাধারা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, সেটা একটা গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

এ কালের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিকরা এশিয়া-আফ্রিকার অগণিত মানুষের ওপর লেনিনের বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাবের কথা আর অস্বীকার করতে পারেন না। এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেও তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে লেনিনের শিক্ষাকে বিকৃত করতে। চেষ্টা করছেন---যাতে জনগণের মনে লেনিনের ওপর যে অটুট বিশ্বাস আছে, তা নষ্ট হয়। এই সব মতলববাজরা বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ওই শিক্ষা এশিয়া, আফ্রিকার পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। লেনিনের শিক্ষার আলোই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের দুর্গম পথ আলোকিত করে।

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসে তার স্থান-নির্দেশ মার্কসই প্রথম করেন। লেনিন মার্কস-এর ভাবধারাকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি খুব স্পষ্ট-ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা একটা বিশ্বজোড়া লড়াই এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম সেই সামগ্রিক লড়াই-এর এক-একটি অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। লেনিন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, উপনিবেশবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং তার ফলে বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট জাতীয় সরকার গড়ে উঠবে। লেনিন দেখালেন যে, এই সংগ্রামের জয় নির্ভর করছে একটি জিনিষের ওপর। সেটা হচ্ছে সমাজবাদী শক্তির সঙ্গে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের শক্তির ঐক্য। যদি এই ঐক্য অটুট হয়ে গড়ে ওঠে, তাহলে ইওরোপের শোষক সম্প্রদায় যত
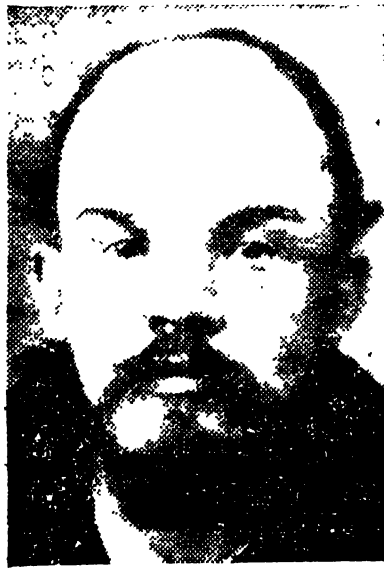
১৮৯৫ খৃস্টাব্দে গ্রেপ্তারের সমসাময়িককালে লেনিন

শক্তিশালীই হ'ক, সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে দলিত মানুষ নিশ্চয়ই নিজেদের মুক্ত করে নেবে।

লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সমাজ-বাদী দুনিয়ার ঐক্যের ওপর ভরসা রেখে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম এক ঐতি-হাসিক সাফল্য লাভ করেছে। সত্তরটি দেশ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। যারা এতদিন শোষিত ছিল, পিছনে পড়েছিল, তারাই এখন নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে। তারাই এখন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণ করছে, স্বাধীনভাবে নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু লেনিন কখনো বলেন নি যে, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের জয়টাই শেষ কথা। সেই সংগ্রাম সারা পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাবে। মিশে যাবে বিপ্লবের মূল স্রোতের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, আলজিরিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে এই দুই ধারার মিলনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া লেনিন এই সব দেশের মানুষের জীবনে কি ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি হতে পারে, তারও এক সম্ভাবনাময় চিত্র তুলে ধরেছেন।

লেনিন একথা উড়িয়ে দিয়েছেন যে, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর পক্ষে ধনতন্ত্রের পথে হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উন্নয়নের জন্য একটি দেশকে ধনতান্ত্রিক হতে হবে, এটা একেবারে বাজে কথা। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য তাদের যদি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম বা সম্পদ না-ও থাকে, তবু ধনতান্ত্রিক পথ পরিহার করা সম্ভব।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছ থেকে সাহায্য-সহায়তা নিয়ে এইসব সদ্য-স্বাধীন দেশ ধাপে ধাপে সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে এগোতে পারে, সাম্যবাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে সচেষ্ট হতে পারে। ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে না গিয়েই এসব করা সম্ভব।

লেনিনের চিন্তা যে সঠিক, তা মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়। জারের আমলে যে দেশ ছিল পেছিয়ে-পড়া, জনগণের উপনিবেশ, অল্পদিনের মধ্যেই সেই দেশ হয়ে উঠল অত্যন্ত উন্নত এক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। লেনিনের অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল মঙ্গোলিয়া। এখন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, আলজিরিয়া, সিরিয়া, বার্মা, গিনি, কঙ্গো এবং অন্যান্য সদ্য-স্বাধীন দেশ এই পথেরই যাত্রী। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সহায়তায় এই সব দেশ অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে অনেক-

দূর এগিয়েছে। তাদের সফলতা বিস্ময়কর। এই বন্ধুত্বের জন্য, উদার, মানবিক পররাষ্ট্রনীতির জন্য তরুণ, মুক্ত জাতিগুলো সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছে। আরব রাজ্যগুলোকে এবং সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোকে সোভিয়েটের এই সাহায্যের গুরুত্বের কথা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নাসের তাঁর সাম্প্রতিক সোভিয়েট সফরের সময় বলেছেন। সভাপতি নাসের আরো বলেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন, তার জনগণ এবং নেতারা এই পৃথিবী থেকে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাবার জন্য, রাজনৈতিক দাসত্ব এবং অর্থনৈতিক শোষণের সমাপ্তির জন্য এবং অতীতের অমানুষিক চিহ্নগুলো ধুয়ে-মুছে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে।

যাঁরা ভাবেন যে, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার সমস্যা তেমন জটিল কিছু নয়, লেনিন তাঁদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন যত সফল হবে, সাম্রাজ্যবাদ ততই মরিয়া হয়ে উঠবে; কেননা, এশিয়ায়, আফ্রিকায় যে সব সুযোগ-সুবিধে ওরা পাচ্ছিল, সে সব ওরা সহজে ছাড়বে না। এশিয়া, আফ্রিকার মানুষ এটা ভালোভাবেই জানে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদী এবং নয়া-উপনিবেশবাদীরা প্রতি-আক্রমণ চালাচ্ছে এবং নানা কৌশলে মুক্তি-সংগ্রামকে বানচাল করার চেষ্টা করছে।

সাম্রাজ্যবাদ সংযুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়া এবং অন্যান্য আরব দেশগুলোর অগ্রগতি প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সেই হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ করতেও তারা পিছ-পা হয় না। ইস্রায়েল আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাচ্ছে, আসলে তার পেছনে রয়েছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ। ১৯১৩ সালে লেনিন বলেছিলেন যে, সব সমস্যারই সমাধান মানুষ নিজে করে নিতে পারে। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদ নাক গলায় বলেই যত গণ্ডগোল।

লেনিনের এইসব কথা আজ আরো বেশী করে মনে হয় এইজন্য যে, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম নতুন নতুন দিকে প্রসারিত হয়েছে। দেশে দেশে সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা সুদৃঢ় হচ্ছে, স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতি রূপায়িত হচ্ছে, জনগণের স্বার্থে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকার জনগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এখন আর একা নয়। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং সারা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণী তাদের লড়াইয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে এবং সব রকমের সাহায্য দিচ্ছে। এই তিন শক্তির ঐক্য যত দৃঢ় হবে, ততই সাম্রাজ্যবাদের শেষ দিন ঘনিয়ে আসবে। এটাই লেনিনের শিক্ষা এবং ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই শিক্ষা ফলপ্রসূ।

১৯২২ খৃস্টাব্দে ভ্রাতুষ্পুত্র ভিক্টর সহ লেনিন

—সন্ধানী

বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিমায় জনৈক রেড ইণ্ডিয়ান

বৈচিত্র্যে ভরা রেড ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতি

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্পনৃত্য দেখাচ্ছে একদল রেড ইণ্ডিয়ান। মাথার ওপরে আগস্ট মাসের মেঘেঢাকা আকাশ। পরনে তাদের বিচিত্র জমকালো দেশীয় পোষাক, মাথায় রামধনু রঙের পাখির পালক দিয়ে তৈরী মুকুট। মুখের মধ্যে ধরে আছে কুণ্ডলী পাকানো বিষধর সাপ। তাদের প্রতিটি ভ্রূভঙ্গে ছন্দের দোলা। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে অপূর্ব সুষমা।

বেশ একটা ছোট-খাটো ভীড় মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এ-নাচের একটা তাৎপর্য আছে। খরতাপের পর জ্বালাজর্জর মানুষকে শীতল শান্তি দেওয়ার জন্য বৃষ্টি নামানোই এ নাচের লক্ষ্য। নাচের পর সাপগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ভূগর্ভে। বিশ্বাস করা হয়, সাপগুলি পৃথিবীর অতলতলে প্রেতাত্মাকে জাগিয়ে তুলবে। ওরা প্রেতাত্মাদের বোঝাবে পৃথিবীতে তাপ-ক্লিষ্ট মানুষের পক্ষে বৃষ্টির প্রয়োজন [illegible] নয়নে আসবে মেঘভাঙা বৃষ্টি।

বৃষ্টি নামে ঠিকই, কিন্তু তা কতখানি এই নাচের ফলে, কতখানি বা বর্ষার স্বাভাবিক নিয়মে, তা বিচার করার দায় আমাদের নয়। তবে এই হল এদের বিশ্বাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বিশ্বাসটুকু এরা মনের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এরা হল হোপি শ্রেণীর রেড ইণ্ডিয়ান। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা আমরা সকলেই জানি। এরা আমেরিকার আদিম উপজাতীয় মানুষ। ওদেশে এদের বলা হয় আমেরিকান ইণ্ডিয়ান। তবে রেড ইণ্ডিয়ান নামটির সঙ্গেই আমাদের বেশী পরিচয়। তাই এ-প্রবন্ধে আমরা এই নামটাই ব্যবহার করছি।

রেড ইণ্ডিয়ানদের নানা শ্রেণী রয়েছে। সাপের নাচ যারা দেখাচ্ছিল, ওদের বলে হোপি ইণ্ডিয়ান। এরিজোনার মরুভূমি অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদের বাস। তাই বৃষ্টি নামানোর দিকে এদের ঝোঁক। তবে এ-ব্যাপারে যে প্রক্রিয়ার আশ্রয় তারা নিয়েছে, তার উৎস খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে, কারণ তা প্রাচীনত্বের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এইসব রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতিরাও কিন্তু এখন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এরা অনেকেই এখন আধুনিক শিক্ষা লাভ করছে এবং আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে। এরা নানাবিধ পেশায় নিজেদের নিযুক্ত রেখে নিজেদের ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করেছে। এদের কেউ শিক্ষক, ব্যবসায়ী বা মিস্ত্রী, আবার কেউ মেষপালক, অথবা কেউ কোন হাতের কাজে দক্ষ বা কোন অফিসের কর্মী।

এমনিভাবে বৈচিত্র্যময় প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতি যে লুপ্ত হতে চলেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিকতার আলোক যে রেড ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত

'সংস্কৃতি' থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তা সত্য। কিন্তু এর মধ্যেও এটুকু আশার আলোক দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক সমাজ-জীবনের অঙ্গীভূত হয়েও রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতিরা নিজেদের ঐতিহ্যের কথা একেবারে বিস্মৃত হয় নি। তাই দেখি, উত্তর আমেরিকার সর্বত্র রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতিয়রা নানাস্থানে বার্ষিক উৎসব, মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে স্বীয় জাতীয় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। এটা অবশ্যই একটা সুলক্ষণ বলতে হবে। কারণ, এমন বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তির অর্থ—একটা দেশের অতীত ইতিহাস অংশত মুছে যাওয়া।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত---এই চার মাসে আমেরিকার আঠাশটি অঙ্গরাজ্যে প্রায় তিনশটি রেড ইণ্ডিয়ান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইসব উৎসবের অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হয় রেড ইণ্ডিয়ানদের সংরক্ষিত এলাকায়। সরকারী অনুদান হিসেবে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চল রেড ইণ্ডিয়ানদের অধিকারে রয়েছে। তারা সেগুলি ভোগদখল করছে। এ রকম সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা বর্তমানে হবে প্রায় ২৯০টি। বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসকারী রেড ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা হবে আনুমানিক ৬ লক্ষ। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ রেড ইণ্ডিয়ান এইসব সংরক্ষিত এলাকায় বসবাস করে। অবশিষ্টরা সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে মিশে একসঙ্গে বাস করছে।

রেড ইণ্ডিয়ানদের এইসব উৎসব-প্রদর্শনীতে রেড ইণ্ডিয়ান হস্তশিল্পের অনেক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। শিল্প-সুষমামণ্ডিত নানা অলঙ্কার, কাঠখোদাই, মৃৎশিল্প, চিত্রশিল্প, কারুকার্যমণ্ডিত পোষাক-পরিচ্ছদ, হাতে-তৈরী কম্বল ইত্যাদি কত কিছুর নমুনা এইসব প্রদর্শনীতে স্থান পায়। রেড ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতির একটা মোটামুটি পরিচয় এগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য ছাড়াও আর একটি দিক আছে। তা হল—এগুলির উচ্চশ্রেণীর নিপুণ শিল্পকলা। উৎসবে আগত প্রতিটি দর্শকের দৃষ্টি এগুলি আকর্ষণ করে।

এমনি একটি খুব জনপ্রিয় মেলা হল চেরোকী ইণ্ডিয়ান উৎসব। উত্তর ক্যারোলাইনার ঘনবনাঞ্চলে চেরোকী ইণ্ডিয়ানদের সংরক্ষিত এলাকায় এই মেলাটি বছর বছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এ মেলায় রেড ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক অনেক অনুষ্ঠান দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। এ-সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কারুশিল্পের প্রদর্শনী। তীর-ধনুক ও বন্দুক ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা এই মেলায় এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সঞ্চার করে। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় আনন্দ ও উত্তেজনা দুই-ই আছে। চেরোকীদের এই মেলায় প্রতি রাত্রে একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে। পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত একটি নাট্যমঞ্চে এই নাটক অভিনীত হয়। নাটকে চেরোকী উপজাতিয়দের ইতিহাসের একটা রূপরেখা অঙ্কিত করার চেষ্টা করা হয়। এই নাটকে প্রায় ১৪০ জন চেরোকী ইণ্ডিয়ান অংশগ্রহণ করে। নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ঈগল-নৃত্য। স্মরণ রাখতে হবে ঈগল আমেরিকার জাতীয় প্রতীক।

চেরোকীদের হস্তশিল্পও বৈশিষ্ট্যময়। তাদের তৈরী ঝুড়ি, কাঠখোদাই, হাতে বোনা কাপড় ও পশমের জামা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কারুকৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। ওকলাহোমার উপজাতীয় রেড ইণ্ডিয়ানরাও এমনি মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রে নিজেদের অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এই উপজাতিদের আদি বাসস্থান ছিল আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের তৃণাচ্ছাদিত সমভূমি অঞ্চলে। এখানে এদের পূর্বপুরুষেরা হোগলা ও ঘাসের তৈরী কুটিরে অথবা মহিষের চামড়া

পূর্বপুরুষদের পোষাকে [illegible]

মুক্ত জীবনের খোঁজে

অনল মুখোপাধ্যায়

এই মেঘঢাকা পৃথিবীতে
তোমারা যে যার ইচ্ছা মেঘমল্লার গাও—
তোমরা যদ্দিন খুশি পড়ে থাকো নিশ্চিন্তে
বর্ষণ-সিক্ত এই অন্ধ কুটীরে।

এই মেঘাচ্ছন্ন উর্বীর অনচ্ছ বুকে
আর এক মুহূর্তও নয়
এই অত্যাচার নির্যাতনের বন্ধ কারাগারে।

আমি তাই উষসীর সঙ্গে হাতে হাত ধরে
গাঢ় নীলে উড়ন্ত বিহঙ্গের মত
রোশনাই ছড়াতে ছড়াতে মুক্ত জীবনের ঈপ্সায়
একদিন চলে যাব রক্তিম বলয়ে
শাশ্বত আকাঙ্খার আহ্বানে।

দিয়ে তৈরী তাঁবুর মধ্যে বসবাস করত। তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রধান উপায় ছিল পশু শিকার। এই উপজাতিটির পূর্বপুরুষেরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। এখন এরা সম্পূর্ণ শান্তিপ্রিয়। এদের এই প্রদর্শনীটিও যথার্থ মনোমোহপূর্ণ।

ঢাক-ঢোলের দামামায় আর উপজাতীয় সঙ্গীতের কলরোলে প্রদর্শনীস্থল জমজমাট হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে চলে এদের বৈশিষ্ট্যময় সূর্য-নৃত্য ও অন্যান্য আরও অনেক নৃত্য। নৃত্যশিল্পিদের মাথায় রঙ-বেরঙের পালকের মুকুট, গলায় বিচিত্র হার, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। সূর্য-নৃত্য এরা পুরুষানুক্রমে প্রদর্শন করে আসছে। এখানে এদের হস্তশিল্পের প্রদর্শনীও খোলা হয়।

অ্যারিজোনার নাভাজো ইণ্ডিয়ানদের মেলাও বেশ উল্লেখযোগ্য। সবশেষে আন্তঃউপজাতীয় উৎসবের কথা না বললে রেড ইণ্ডিয়ান উৎসবের পরিচয় পূর্ণাঙ্গ হবে না। এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নিউ মেক্সিকোর গ্যালাপ নামক স্থানে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো থেকে রেড ইণ্ডিয়ানরা এসে সমবেত হয় এখানে। এখানে তারা কলাশিল্প প্রদর্শনী, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, খেলাধূলা, নৃত্যগীত ও অন্য নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

এক কথায় বলা যায়, আমেরিকার অধিকাংশ রেড ইণ্ডিয়ান বংশই চার'শ বছরেরও অধিককাল ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বাইরের চাপ সত্ত্বেও স্বসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের শ্রেণীগত চরিত্র-বজায় রাখতে পারবে কি-না তা পরের কথা। আপাতত এইটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, তারা ইতিমধ্যেই মার্কিন জীবনধারার সঙ্গে অনেকখানি জড়িয়ে পড়েছে। আজ অনেক রেড ইণ্ডিয়ান-নাম আমেরিকার মানচিত্রে শোভা পাচ্ছে। যেমন, মিনেসোটা, আপ্পালাচিয়ান প্রভৃতি। যুক্তরাষ্ট্রের বহু অঙ্গরাজ্যের নামকরণ করা হয়েছে রেড ইণ্ডিয়ান জাতির নামানুসারে। কোন কোনটি আবার কোন রেড ইণ্ডিয়ান শব্দ থেকে ধার দেওয়া হয়েছে। ম্যাসাচুসেটস্, ইলিনয়, মিজুরী, ডাকোটা এসব নাম দেওয়া হয়েছে রেড ইণ্ডিয়ান বংশাবলীর নাম থেকে। এদের অনেক শব্দ মার্কিন ইংরেজী ভাষার শব্দ ভাণ্ডার পুষ্ট করেছে। এমন কি, আজকের দিনে আমেরিকানদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় যে সমস্ত আহার্য স্থান পেয়েছে, তার অনেকগুলির জন্যই আমেরিকানরা রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে ঋণী।

মার্কিন সংস্কৃতিতে ও সমাজে রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রভাব কম নয়।

আত্মচরিতে সমাজচিত্র

প্রেমচর্চায় ও পারিবারিক জীবনে মার্ক টোয়েন

দক্ষিণারঞ্জন বসু

বিচিত্র জীবন মার্ক টোয়েনের। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ঔপন্যাসিক যেভাবে তাঁর আত্মকথাকে সাজিয়েছেন তাতে তাঁর কর্মজীবনের পাশাপাশি তাঁর প্রেমিক জীবনের ধারা-বাহিত তার সুন্দর একটি ছবি পাওয়া যায়।

বাস্তবিক পক্ষে কর্মজীবন শুরু হবার অনেক আগেই মার্ক টোয়েনের জীবনে প্রেমচর্চার সূত্রপাত ঘটে। মেরী মিলারের বিষয় বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মেরীই তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমিকা নন, তবে প্রেমলীলার এই নারীই তাঁর হৃদয়কে সর্বপ্রথম প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার করে দিয়েছেন। মেরী তখন অষ্টাদশী আর তিনি তখন ন' বছরের বালকমাত্র। তারও আগে মার্ক টোয়েন প্রেমের নন্দন-কাননে বিচরণ শুরু করেছেন, এ বিশ্বাস করাও যেন কঠিন।

যাই হোক, আত্মচরিতকার নিজেই তারপরে লিখেছেন যে, প্রথম আঘাতের বেদনা খুব বেশিদিন তাঁকে সহ্য করতে হয় নি। কারণ, তার অল্প কিছুকাল পরেই তিনি ভালোবাসার পূর্ণ অর্ঘ্য জানিয়ে শ্রীমতী আর্টিমিসিয়া বিগস্-এর বন্দনা আরম্ভ করেন। মেরী মিলারের চেয়েও এক বছরের বড়ো শ্রীমতী বিগস্। তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করলে আর্টিমিসিয়া তা নিয়ে কোনো হাসি-তামাসা করেন নি কিংবা মার্ক টোয়েনের প্রতিও কোনোরূপ উপেক্ষার ভাব দেখান নি। তবে জোরের সঙ্গেই তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে, শিশুদের দ্বারা জ্বালাতন হতে তিনি চান না। এই ভাষায় বালক মার্ক টোয়েনকে প্রত্যাখান করার কিছুদিন বাদেই তাঁরই রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক মিঃ রিশমণ্ডকে বিয়ে করেন শ্রীমতী আর্টিমিসিয়া বিগস্।

স্কুল-জীবনের আরেক বয়স্কা ছাত্রীর কথাও উল্লেখ করেছেন মার্ক টোয়েন। স্বাধীনচেতা মেরী লেসির সৌন্দর্যও তাঁকে আকর্ষণ করে থাকবে। কিন্তু তাঁর কড়া মেজাজকে বশীভূত করা সহজসাধ্য হবে না বলেই বোধ হয় সেদিকে আর এগোন নি তিনি। পরে তাঁর মনে হয়েছে, সে ধারণা ভুল। বিয়ের পর মেরী লেসি আদর্শ গৃহিনীর পরিচয় দিয়েছেন।

মার্ক টোয়েনের আত্মচরিতের পাতায় পাতায় এমনি সব প্রেমের কাহিনীর ছড়াছড়ি। বৈচিত্র্যের বিচারে তার কোনো কোনো কোনটি আবার অভিনব।

তেমনি একটি বিচিত্র প্রণয়-কাহিনীই মূর্ত হয়ে উঠেছে দীর্ঘ আটচল্লিশ বছর একমাস সাতাশদিন পর হঠাৎ এক প্রণয়িনীর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়ে। শ্রীমতী লওড়া রাইট সেই প্রণয়িনীর নাম। নিউ অরলিন্সে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই টোয়েনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল চতুর্দশী সেই তরুণীর সঙ্গে।

মাত্র কয়েকটি দিনের সেই প্রেম আবার যে তাঁর মনে ধূমায়িত হয়ে উঠবে বা সেই স্মৃতির উদয় ঘটবে তাঁর মানসপটে, তা ভাবতেই পারেন নি মার্ক টোয়েন। একাত্তর বছর বয়সে হঠাৎ যেদিন তিনি বাষট্টি বছর বয়স্কা লওড়া রাইটের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন, সেদিন সঙ্গে-সঙ্গেই সেই চতুর্দশী তরুণীর ছবিই তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল, কোনো বৃদ্ধার নয়।

ঐ চিঠি পেয়েই সেই পুরনো স্মৃতিকথায় মনভরে উঠেছে মার্ক টোয়েনের। আত্মচরিত রচনায় তখন তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি আত্মকথায় জুড়ে দিলেন শ্রীমতী লওড়া রাইটের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের কাহিনী।

যৌবনে মার্ক টোয়েন

শ্রীমতী অলিভিয়া

মাত্র তিনটি বা চারটি দিনের সেই প্রেম। তার যে বর্ণনা মার্ক টোয়েন দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় তিনি তখন নিউ অর্লিন্স-এ থাকতেন। সেখানে একটি মালবাহী স্টীমবোটে কিছুকাল হালধরার কাজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। কাজেই সেখানকার নাবিকদের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অন্যত্র বাণিজ্য সেরে সেই বোট যখন ঘাটে এসে ভিড়তো, মাঝে মাঝেই সেখানে গিয়ে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে এবং নবাগত যারা আসতেন সে বোটে, তাঁদের সঙ্গে যেয়ে মিলিত হতেন।

মালবাহী বোটে সেকালে যাত্রী নেবার কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও বিনা ভাড়ায় সম্পূর্ণভাবে ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে দশ বারোজন বন্ধু-বান্ধবের নৌ-ভ্রমণে কোনো বাধা ছিল না। সংশ্লিষ্ট স্টীমবোটের এক পাইলটের আত্মীয়া শ্রীমতী লাওড়া রাইট তেমনি এক সুযোগ নিয়েই সেণ্ট লুই থেকে বেড়াতে এসেছিলেন নিউ অর্লিন্স-এ। স্টীমবোটে ঐ সুন্দরী তরুণীকে দেখেই মজে গেলেন মার্ক টোয়েন। তারপরের তিনদিন শ্রীমতী রাইটকে নিয়ে কতই না ঘোরাঘুরি, গল্প-গুজব করেছেন তিনি। এমন কি ঐক'টা দিন চার ইঞ্চিও নয়, এতটুকু দুরত্বে প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ওঁরা দু'জনে যখন তখন পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন। তার পরে এতকালের মধ্যে কোনো খবরই আর শ্রীমতী রাইটের পাওয়া যায় নি। হঠাৎ প্রায় অর্ধশতাব্দী পর তাঁর চিঠি পেয়ে একটু অবাক হয়েছিলেন বৈকি টোয়েন।

আর কিসের জন্যে সে চিঠি? আরো আশ্চর্যের কথা, আর্থিক সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন শ্রীমতী রাইট। তাঁর নিজের জন্যে এবং সাঁইত্রিশ বছর বয়স্ক তাঁর পঙ্গু ছেলের জন্যে এক হাজার ডলার প্রয়োজন। সে পরিমাণ অর্থ টোয়েন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু এক হাইকোর্ট জজের কন্যা এবং নিজেও যিনি শিক্ষকতা করে উপার্জন করেন তাঁকে এমনি দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হবে কেন? সে কথা ভাবতে গেলে অনেক বাজে কথা মনে এসে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় মার্ক টোয়েন আর বেশি আলোচনা করেন নি এ ব্যাপার নিয়ে। রাইটের চিঠি পড়তে পড়তে তিনি কেবল ভাবছিলেন আরেকটি বিষয় ---সেই প্রথম সাক্ষাতের পর যখন মিসিসিপি নদীতে জাহাজ ডুবে দুর্ঘটনায় মরতে মরতে দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমতী রাইট। ফিরে চলছিল তখন তাঁদের স্টীমবোট। কিন্তু কিছুদূর যেতেই বোটে গোলমাল দেখা দিলে তাড়াতাড়ি তীরে চলে আসতে হলো। বোট তখন ডুবছে। সবাইকেই উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী রাইট কোথায়? তাঁর আত্মীয় পাইলট এবং আরেকজন কেবিনে খুঁজতে গিয়ে জানতে পারেন যে পোষাক পাল্টাতে গিয়ে তিনি তাঁর হুপ-স্কার্ট নিয়ে অসুবিধায় পড়েছেন। পোষাক ছাড়াই চলে আসতে হবে জীবন বাঁচাতে হলে, একথা শোনার পরেও শ্রীমতী রাইট দমে যান নি। হুপ-স্কার্ট ঠিকমতো পরেই শ্রীমতী শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে এসে কোনো রকমে রক্ষা পেয়েছিলেন।

মনে যখন এই ঘটনার স্মৃতি-প্রবাহ শেষ হয়ে আসছিল, রাইটের চিঠির এক জায়গায় এসে টোয়েন দেখতে পেলেন তখনো শ্রীমতী রাইট তাঁকে তাঁর 'ছিবো' হিসাবেই দেখছেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, '

'..I must nor weary your nor take up your valuable time with my chatter. I really forget that I am writing to one of the world's most famous and sought-after men, which shows you that I am still roaming in the Forest of Arden.'

এতে মার্ক টোয়েন বেশ বিস্মিতই হয়েছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর প্রেমের গল্প রয়েছে টোয়েনের জীবনে।

নিজের জীবনের তেমনি একটি বিস্ময়কর প্রণয় কাহিনীর অবতারণা করেছেন মার্ক টোয়েন তাঁর আত্মকথায় এবং সে কাহিনী কলকাতাকে জড়িয়ে রয়েছে বলেই আমাদের কাছে তা বেশি আকর্ষণীয়। কেন জানি না, টোয়েন তাঁর এই প্রণয়িনীর সঠিক নামোল্লেখ করেন নি আত্মচরিতে, তাঁর একটি কাল্পনিক নাম দিয়েছেন মেরী উইলসন। সেটা ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের কথা। মার্ক টোয়েনের বয়েস তখন মাত্র চৌদ্দ বছর। হ্যানিবলে মিসিসিপি নদীর তীরে পাঁচ বছর আগের তৈরি তাঁর বাবার নতুন বাড়িতে তাঁরা আছেন। সেই গ্রামেরই কুড়ি বছরের মেয়ে কুমারী মেরী উইলসনকে তাঁর ভীষণ ভালো লেগে গেছিল। মেয়েটির উচ্ছ্বসিত রূপ - বর্ণনা দিয়েছেন টোয়েন তাঁর আত্মকথায়। তাঁকে তিনি স্বর্গের দেবীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে তাঁর মতো 'অপবিত্র' ছেলের পক্ষে সেই তরুণীর কাছে ঘেঁষাই সম্ভব ছিল না। যাই হোক বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে তিনি কেবল তার চিত্তহারী অতুলনীয় সৌন্দর্যই দেখতেন। তার পরের আর কোনো কথা তিনি লেখেন নি আত্মচরিতে, সোজা চলে এসেছেন ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে তাঁর কলকাতা সফর প্রসঙ্গে।

সে আর এক অবাক কাণ্ড। মার্ক টোয়েন কলকাতার হোটেলে সবেমাত্র এসে উঠেছেন, হঠাৎ তাঁর মনে হলো যেন তাঁর ছোটবেলার মনোময়ী সেই মেরী উইলসনই তাঁর পাশ কেটে চলে গেলেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, এ হয়তো চিত্তবিভ্রম। কিন্তু তা নয়, যাঁকে তিনি দেখেছেন তিনি রক্ত-মাংসেরই মানুষ। তবে যাঁকে দেখে যে মানসসুন্দরীর কথা তার মনে পড়েছিল---এ তিনি নন, তাঁর নাতনী। অবশ্য সেই মেরী উইলসনও সে হোটেলে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে গভীর আলাপও জমে উঠেছিল। সে সম্বন্ধে টোয়েন লিখেছেন,

'We sat down and talked. We steeped our thirsty souls in the reviving wine of the past, the pathetic past, the beautiful past, the dear and lamented past; we uttered the names that had been silent upon our lips for fifty years and it was as if they were made of music; with reverent hands we unburied our dead, the mates of our youth, and caressed them with our speech; we searched the dusty chambers of our memories and dragged forth incident after incident, episode after episode, folly after folly and laughed such good laugh over them, with the tears running down...'

বৃদ্ধা মিনা সেবী উইলসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে, আমেরিকায় এ ধরনের প্রেম অস্বাভাবিক প্রেম বলে বিবেচিত কিনা জানি না, তবে আত্মচরিতের এ অধ্যায়ের আলোচনার উপসংহারে মার্কিন সমাজ সম্বন্ধে মার্ক টোয়েন একটি অতি বড়ো সত্য কথা বলেছেন। নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়েই তিনি লিখেছেন,

'I realize that from the cradle up I have been like the rest of the race—never quite sane in the night.'

আত্মচরিত সম্বন্ধে আত্মগোপন প্রয়াসের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু মার্ক টোয়েনের আত্মচরিত সম্বন্ধে তেমন অভিযোগের কোনো অবকাশই নেই। কারণ, তিনি নিজের গলদ ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশে কোথাও যেমন দ্বিধা বা কুণ্ঠার কোনো পরিচয় দেন নি, তেমনি নিজেদের ব্যাধিগ্রস্ত সমাজরূপকে প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি।

সেকথা থাক। টোয়েন তাঁর নিজের বিয়ের যে বর্ণনা রেখেছেন, আত্মকথায় তাও একটি সুন্দর প্রেমের গল্পেরই শামিল। সে প্রসঙ্গেই আসা যাক এবার।

মার্ক টোয়েনের বয়েস তখন প্রায় পঁয়ত্রিশ। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে শুরু হলো তাঁর বিবাহিত জীবন। বিয়ে করলেন কুমারী ওলিভিয়া এল ল্যাংডনকে। নিউইউয়র্ক রাজ্যের এলমিরা শহরে বিয়ে হবার পরের দিনই সস্ত্রীক তিনি ঐ রাজ্যেরই বাফেলো শহরে চলে যান সেখানকার 'বাফেলো এক্সপ্রেস' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে এবং আংশিক মালিক হিসেবে।

কিন্তু এ বিয়ের পটভূমিকা, উভয়ের বিবাহিত জীবন এবং এ বিয়ের পরিণতিই জানবার মতো বিষয়। সে সম্বন্ধে টোয়েন যে বিবরণ দিয়েছেন আত্মকথায় তাতে জানা যায়, ওলিভিয়ার যখন বাইশ বছর বয়স, সে সময়ে (১৮৬৭) স্মার্না উপসাগরে 'কোয়েকার সিটি' জাহাজে তাঁর দাদা চার্লির ঘরে আইভরির তৈরি শ্রীমতীর একটি ছোট মূর্তি প্রথম তিনি দেখতে পান। রক্ত-মাংসের শরীরে তাঁকে তিনি প্রথম দেখেন সে বছরেই ডিসেম্বর মাসে নিউইয়র্কে। যাঁর মূর্তি দেখেই ভালো লেগেছিল সেই তন্বী সুন্দরী তরুণীর বাস্তব রূপ যে টোয়েনের মতো স্বভাব-প্রেমিককে মোহিত করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। 'ওলিভিয়ার অকৃত্রিম সহানুভূতি, সীমাহীন প্রেম, উদ্যম ও উৎসাহের প্রশংসা করে টোয়েন বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রীর মধ্যে তিনি শেষ পর্যন্ত একই সঙ্গে একটি তরুণী-জীবন এবং একজন গৃহিণী মহিলাকে লক্ষ্য করেছেন।

এর পরেই টোয়েন তাঁর স্ত্রীর জীবনের করুণ অংশটুকুর বর্ণনা দিয়েছেন। ষোল বছর বয়েসে বরফের ওপর পা পিছলে পড়ে গিয়ে ওলিভিয়া আংশিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েন এবং জীবনে বেঁচে থাকলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে আর কোনো দিনই সম্ভব হয়ে ওঠে নি। পুরো দু'টো বছর তিনি শয্যা ছেড়েই উঠতে পারেন নি, এমন কি এপাশ-ওপাশ হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। একের পর এক সব বড়ো বড়ো ডাক্তার এসেছেন এলমিরায়, কিন্তু তাঁরা কেউ রোগিণীকে কোনোরূপ আরাম দিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত হাতুড়ে চিকিৎসক ডাক্তার নিউটনকে ডাকা হলো।

অদ্ভুত চিকিৎসা-রীতি নিউটনের। তিনি এসেই ওলিভিয়ার ঘরের জানলাগুলি খুলে দিলেন, প্রার্থনা করলেন কিছুক্ষণ ধরে এবং তারপর ওলিভিয়াকে বললেন, ধীরে ধীরে উঠে বসতে। সবাইতো ভয়ে তটস্থ, কিন্তু রোগিণী সত্যি সত্যি উঠে বসলেন এবং কয়েক মিনিট ধরে বসে থাকলেন। এরপর তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে যাবার জন্যে। আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলেন সবাই। তা'হলে কি হবে, নিউটনকে ভর করে ওলিভিয়া বেশ কয়েক পা হেঁটে গেলে চিকিৎসক বললেন, 'আমার চিকিৎসায় যতটুকু হবার হয়ে গেছে। রোগিণী সেরে ওঠেন নি, সারবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। তিনি কখনো বেশি দূর পায়ে চলতে পারবেন না। তবে রোজ অভ্যাস করতে করতে একশ' বা দু'শ গজ হাঁটতে পারবেন আশা করা যায়।

এই চিকিৎসার জন্যে নিউটনকে দেড় হাজার ডলার দিতে হয়েছিল, কিন্তু মার্ক টোয়েন মনে করেন, এজন্যে তাঁকে লক্ষ ডলারও দেওয়া চলতো। কারণ, নিউটনের এই চিকিৎসার ফলেই ওলিভিয়া তাঁর আঠারো বছর বয়েস থেকে ছাপ্পান্ন বছর বয়েস পর্যন্ত বিনা বিশ্রামেই কয়েকশ' গজ পথ হাঁটতে পেরেছেন। এমন কি তেমন ক্লান্তিবোধ না করেই একাধিকবার তাঁকে এক-চতুর্থাংশ মাইল হেঁটে বেড়াতে দেখা গেছে, বলেছেন মার্ক টোয়েন।

নিউটনের চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে টোয়েন যে আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায়, সে যুগের মার্কিন সমাজে এবং ইয়োরোপেও হাতুড়ে ডাক্তারদের ওপরেও লোকের যথেষ্ট আস্থা ছিল, আর নিউটনকে নিয়ে তো ইয়োরোপ আমেরিকার নগরে নগরে টানাটানিই চলতো। অনেককাল পরে নিউটনের সঙ্গে একবার দেখা হলে মার্ক টোয়েন জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর সাফল্যের

রহস্যের কথা। নিউটন তার উত্তরে বলেছিলেন, কোনো রহস্য কোথাও আছে বলে তাঁর জানা নেই, তবে তাঁর মনে হয় তাঁর দেহ থেকে একটা বৈদ্যুতিক শক্তি যেন সূক্ষ্মভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে রোগ-নিরাময় করে দিয়ে যায়।

পারস্পরিক ভালোবাসার উষ্ণতায় ভালোই কেটেছে টোয়েন দম্পতির বিবাহিত জীবন। আত্মচরিতের এ অধ্যায়টি টোয়েন লিখেছেন তাঁদের বিয়ের ৩৬তম বার্ষিকীর আগের দিন। স্বভাবতই বেশ কিছুটা আবেগ সংযোজিত হয়েছে এ অধ্যায়ে। তবে সত্যবর্জিত নয় সে আবেগ। বিবাহিত জীবনের প্রথম ন'টি বছর তাঁকে যখন ঋণ ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয় সে সময় স্ত্রীই টোয়েনকে ভেঙে পড়তে দেয় নি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা শুনিয়েছে। সেই সব স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেই মার্ক টোয়েন লিখেছেন,---

'I have compared and contraster her with hundreds of persons and my conviction remains that hers was the most perfect character I have ever met.'

এতই গভীর ছিল মার্ক টোয়েনের পত্নী প্রেম যে, ইতালীতে ওলিভিয়ার মৃত্যুর পরেও তাঁর আঙুল থেকে বাগদানের আংটিটি খুলে নেবার প্রস্তাবে তিনি রাজী হতে পারেন নি। সন্তানদের জন্যে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখবার ইচ্ছেকে বাতিল করে দিয়েই টোয়েন-পত্নীকে ঐ আংটি সহই সমাধিস্থ করা হয়, আংটি খুলে নেওয়া হলে মার্ক টোয়েন তাকে অনাচার বলেই মনে করতেন।

শব্দগত অর্থেও শ্রীমতী ওলিভিয়া ছিলেন টোয়েনের যোগ্য সহধর্মিণী। টোয়েন নিজেই লিখেছেন তাঁর আত্মকথায়। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন, বাগদানের সময় থেকে অর্থাৎ টোয়েনের প্রথম বই 'দি ইনোসেন্টস অ্যাব্রড'-এর প্রুফ সংশোধন থেকে শুরু করে পরলোকগমনের কয়েক মাস আগে পর্যন্ত স্ত্রীই ছিলেন তাঁর গ্রন্থনিচয়ের প্রকৃত সম্পাদক। শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় জুড়ে যিনি ছিলেন তাঁর জীবন-সঙ্গিনী ও সাহিত্য-সঙ্গিনী, মার্ক টোয়েনের আত্মকথায় তিনি যে একটা বড়ো অংশ অধিকার করে থাকবেন, সেতো স্বাভাবিক।

এই আত্মজীবনীখানির মধ্যে আমেরিকার তৎকালীন পারিবারিক জীবনের একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন মার্ক টোয়েন।

একেবারে বিয়ের আগে থেকেই শুরু করা যাক। ওলিভিয়ার ভাই চার্লির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই ল্যাংডন পরিবারের নিউ ইয়র্কের এলমিরা ভবনে টোয়েনের যাতায়াত। ওলিভিয়ার সঙ্গে সেখানেই ভাবের সূত্রপাত। জার্ভিস ল্যাংডন মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছিলেন, তিন-চারটি সম্বন্ধের প্রস্তাবও এসেছিল। এদিকে মার্ক টোয়েনও একজন প্রার্থী হয়ে বসলেন। চার্লি ল্যাংডনের নিমন্ত্রণে একবার তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন তাঁদের এলমিরার বাড়িতে, তারপর চার্লি আর টোয়েন একসঙ্গে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কিছুদূর যেতেই গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে ল্যাংডন ভবনে ফিরে গিয়ে আরো তিন দিন সেখানে থাকবার সুযোগ মেলে। বাস্তবিক পক্ষে কোনো রকম আঘাত না পেলেও, তিন দিনের বিশ্রামের এই সুযোগে বাগদানের পথ তিনি করে নিতে পেরেছিলেন ওলিভিয়ার সঙ্গে। ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে অবশ্য মার্ক টোয়েনের মতো অজ্ঞাত ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে রাজী হন নি জার্ভিস ল্যাংডন এবং যদিও টোয়েনের পরিচিত ছয় জনের কাছ থেকে পাওয়া সব ক'টি রিপোর্টই তাঁর সম্বন্ধে ছিল বিরূপ। এই অবস্থায় কন্যার পিতা নিজেই মার্ক টোয়েনকে ডেকে একদিন বললেন, 'তোমার একান্ত প্রতিবেশীদের মধ্যে সেই দেখছি। বেশ, আমিই তোমার বন্ধু হবো। মেয়েটিকে তুমি গ্রহণ করো। যাদের কথা তুমি আমার কাছে বলেছিলে তাদের থেকে তোমায় আমি বেশি ভালো করে জেনেছি।

এই নাটকীয় ঘটনার পরেই বাগদান, তারপরে বিয়ে এবং বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাফেলো শহরের ধনেদী পাড়ায় শ্বশুর-ক্রীত সাজানো বাড়ি, গাড়ি এবং ঝি-চাকর ও কোচোয়ান ইত্যাদি যৌতুক লাভ। মার্ক টোয়েন নিজেই অবাক বনে গিয়েছিলেন এসব দেখে শুনে।

যাই হোক, এমনিভাবেই শুরু হলো টোয়েনের পারিবারিক জীবন। দেখা গেল, একশ' বছর আগের আমেরিকায় ভালো করে ছেলের খোঁজ-খবর নিয়েই মেয়ের বিয়ে দেওয়া হতো এবং অভিভাবকের ইচ্ছা সেখানে উপেক্ষিত হতো না। এছাড়া মেয়ের বিয়েতে কন্যার বাপ-মা যে যৌতুক দিতেন সামর্থ্যমতো, এও মার্ক টোয়েনের বিয়ের বর্ণনা থেকে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়।

বেশ শান্তিময় পরিবেশে বিবাহিত জীবনের আরম্ভ হলেও তিনটি বছর না কাটতেই বিষাদের ছায়া পড়লো মার্ক টোয়েনের সংসারে। দশ মাসের মধ্যেই একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল শ্রীমতী ওলিভিয়ার। বাপের ভারি আদরের ছেলে। কিন্তু তাঁরই ভুলে বাইশ মাস বয়েসের শিশু ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মারা গেলে টোয়েন তাঁর অন্যায়ের কথা ভয়ে কারো কাছে মুখ ফুটে বলতে পারেন নি। গাড়িতে চড়িয়ে ছেলেটিকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে এই সর্বনাশ তিনি ঘটিয়েছিলেন। একি আর কাউকে বলার মতো কথা।

দু' বছর পরে বড়ো মেয়ে এলো তাঁদের সংসারে। নাম সুসি। টোয়েনের এই প্রথম কন্যা-সন্তানটিও দীর্ঘায়ু পায় নি। তবে শিশুকাল থেকে তার চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই মেয়ে বাপ-মাকে এমনি সব স্বপ্ন ও বিস্ময়ের জগতে ঘিরে রেখেছে যে, আত্মকথায়

কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে মার্ক টোয়েনকে সুসির কথা নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে।

মামা বাড়িতে জন্ম হয়েছে সুসির এবং মামা বাড়ির লোকদের সঙ্গে প্রথম গ্রীষ্ম কাটিয়ে সুসি তার বাবার তৈরি নিজ বাড়িতে চলে আসে হার্টফোর্ডে। সদাপ্রফুল্ল মেয়েটির অনুসন্ধানী মন সেই শিশুকাল থেকেই বাপ-মায়ের এবং অন্য সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বছর ছয় বয়সে মিউনিখে গিয়েছিল সে বাপ-মার সঙ্গে। সেখানে প্রায়ই সে একটা হিংস্র ভালুকের স্বপ্ন দেখত, সব ব্যাপারের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা শিশু বয়েস থেকেই সুসির অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভালুকটাই বারবার তাকে কেবল খেতে আসছে, সে তাকে আক্রমণ করছে না, এটা সুসির খুবই খারাপ লেগেছে। কারণ এই একতরফা আক্রমণ যে তারই দুর্বলতার পরিচায়ক। ঐ ছয় বছর বয়েসেই দু' বছরের ছোট বোন ক্লারার সঙ্গে সুসির হরদম ঝগড়া হতো। শাস্তি দিয়েও তেমন বিশেষ ফল পেতেন না বাপ-মা। শেষে পুরস্কার ঘোষিত হলো---যেদিন তারা ঝগড়া না করে কাটাতে পারবে সেদিন দু' বোনকে মিছরির টুকরো উপহার দেওয়া হবে। একবার সুসি মিছরির টুকরো ফেরৎ দিয়ে দিয়েছিল, ক্লারা দেয়নি। সুসি সুন্দর কারণ দিয়েছিল তার। বলেছিল, 'ক্লারার অন্তর পরিষ্কার ছিল কিনা বলতে পারবো না, তবে আমার মধ্যে ঝগড়ার ভাব ছিল।' মাত্র ছয় বছরের শিশু-মনে এমনি ন্যায়বিচার বোধের দৃষ্টান্ত সত্যি অতুলনীয়।

এই সুসি সম্বন্ধে মার্ক টোয়েন তাঁর আত্মকথায় বাস্তবিকই উচ্ছসিত। এবং তার সম্পর্কে যে সব বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, সে সব পড়লে স্বতঃই মনে হবে যে, এমন সন্তানের কথা বলতে কোন্ বাপ-মা না উচ্ছ্সিত হয়ে উঠবেন?

ঐ টুকুন মেয়ে সুসিই একদিন মাকে এসে বললে যে, এক সপ্তাহ ধরে সে নার্সারির সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগ দেয় নি। মা এর কারণ জানতে চাইলে সে বলেছে যে, তার শিক্ষিকা মিস ফুট ইণ্ডিয়ানদের (রেড ইণ্ডিয়ান না, ভারতীয়) ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে যে বিষয় তাদের জানিয়েছেন, তাতে তার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। ইণ্ডিয়ানরা যে অনেক দেবতায় বিশ্বাসী সে বিশ্বাসই ঠিক, না, ঈশ্বর এক সে মতই ঠিক--এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে সে ক'দিন ধরে প্রার্থনায় যাওয়া বন্ধ করেছে। মায়ের আরো প্রশ্নের উত্তরে সুসি বলেছে, এক ঈশ্বর এবং এক স্বর্গরাজ্য অথবা আরো কিছু ভালো থাকুক--এই প্রার্থনাই সে করে আসছে সেই থেকে।

মায়ের সঙ্গে মেয়ের এই কথাগুলো লিখে রেখেছেন টোয়েন। শিশুদের কথা রেকর্ড হিসেবে টুকে রাখার একটা রেওয়াজ ছিল তাঁদের পরিবারে। এর মূল্য টোয়েন বিশেষ-ভাবে স্বীকার করেছেন।

যে মেয়ে ছয় বছর বয়েসে এমনি বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দেয়, সাত বছর বয়েসে সে জন্ম ও জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে চিন্তা করে বলে যে, একদল মানুষ আসে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে ও রুটির জন্যে কঠোর শ্রম স্বীকার করে সংগ্রাম করে, সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্যে ঝগড়া-বিবাদ করে এবং এমনি করতে করতে তারা বুড়িয়ে যায়, অসম্মান-অপমান তাদের ওপর বর্ষিত হতে হতে সব অহংকার তাদের চূর্ণ হয়ে যায়, তখন তারা বিদায় নিয়ে নেয় এই পৃথিবী থেকে এবং সেই সময়েরই মধ্যেই নতুন এক একদল মানুষ এসে তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করে। এই চিন্তা বিস্মিত করেছে সুসিকে তার সাত বছর বয়েসে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই যে এই রহস্য মানুষের কাছে পরম বিস্ময়।

সাত বছর বয়েসে সুসির আরেকটি বড়ো প্রশ্নের কথাও আত্মচরিতের পাতায় উল্লেখ না করে পারেন নি মার্ক টোয়েন। মা বলেছিলেন মেয়েকে, 'সুসি, ছোট-খাটো ব্যাপারে তুমি অমন কান্না জুড়ে দিও না।'

মায়ের এই ছোট্ট কথাটি সুসিকে ভাবিত করে তুলেছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তার মনে আলোড়ন তুলেছে। যদি একটা কিছু ভেঙে যায়, বজ্র-বিদ্যুৎ এবং বৃষ্টির জন্যে যদি পিক্‌নিক বন্ধ রাখতে হয়, নার্সারির একটা ইঁদুর যখন পোষমানা হয়ে উঠেছে, তখন হঠাৎ যদি একটা বেড়াল সেটাকে খেয়ে ফেলে, তা'হলে সেগুলোকে কি বড়ো রকমের দুর্ঘটনা বলে ধরা হবে না? কেন ধরা হবে না? কোন্ গুলো তা'হলে বড়ো দুর্ঘটনা এবং কোন্‌গুলো ছোট? এবং ছোট-বড়ো দুর্ঘটনা পরিমাপের উপায় কি? দু' তিন দিন ধরে এমনি সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তার পর মাকে গিয়ে সুসি জিজ্ঞেস করলো, 'ছোট-খাটো ব্যাপার তুমি কাকে বলছ মা?'

মা আপাত সহজ এ প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে সুবিধে করতে না পারলে সুসিই মাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বলে, তার জন্যে যে খেলনা ঘড়িটি কিনে আনার কথা, সেটি নিয়ে আসতে মা যদি ভুলে যান, তাকে কি ছোট ব্যাপার বলে ধরা হবে? মা বেড়াতে বেরিয়ে তার জন্যে প্রতিশ্রুত ঘড়িটি যে নিয়ে আসবেন সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই, কাজেই উদ্বেগও নেই। তবু কেন এই প্রশ্ন? এ শুধু মাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে, দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যের পরিমাপ করা বাইরের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়---এ নিছকই ভুক্তভোগীর ব্যাপার। বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুসির অসামান্য প্রতিভার আরো পরিচয় পাওয়া যেতে থাকে। সতেরো বছর বয়েসে গ্রীক নাট্য-রীতির অনুসরণে সুসি একটি নাটক রচনা করেছিল এবং তাদের হার্টফোর্টের বাড়িতে সে ও ক্লারা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে অভিনয় করে বিশিষ্ট শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল।

এর চেয়েও মার্ক টোয়েন আরো বেশি অভিভূত হয়েছিলেন, চৌদ্দ বছর বয়েস সুসির এক অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় পেয়ে। টোয়েনের বয়স তখন পঞ্চাশ, বড়ো মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার জীবনী লিখেছে, এ তথ্য আবিষ্কৃত হলে, তিনি স্বভাবতই গর্বে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায়, ইতিহাস ও সঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষায় সুসির পারদর্শিতার প্রশংসা করলেও, টোয়েন তাঁর কন্যার বানান ভুলের যে ত্রুটির কথা আত্মকথায় উল্লেখ করেছেন, তার অনেক দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে টোয়েনের আত্মচরিতে সুসির পিতৃ-জীবনীর বিভিন্ন উদ্ধৃতির মধ্যে। তা হলেও যেরূপ নিখুঁতভাবে নিজস্ব ভাষায় সে তার পিতৃ-পরিচয় চিত্রিত করেছে এবং শুধু তাই নয়, তাঁর সাহিত্য নিয়েও আলোচনা করেছে তা সত্যি কৃতিত্বের। বাবার জীবনী সুসি আরম্ভই করেছে এই বলে---

We are a very happy family. We consist of Papa, Mamma, Jean, Clara and me. It is Papa I am writ'ng about, and I shall have no trouble in not knowing what to say about him, as he is a very striking character.

সুসি তার বাবার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও একটি খুব বড়ো কথা বলেছে। পিতৃ-জীবনীর এক জায়গায় সে লিখেছে,---

Papa very seldom writes a passage without some humour in it somewhere, and I don't think he ever will.

বাস্তবিকই মার্ক টোয়েন তাঁর হাস্য-রসিকতায় তাঁর কালের মার্কিণ সমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন এবং তার আত্মকথায় দেখা যায় যে, নিজের বাড়ির চোর ধরা ও চুরির ব্যাপার নিয়েও রসিকতা করতে তিনি ছাড়েন নি।

মার্ক টোয়েনের আত্মচরিত পড়ে স্পষ্টই জানা যায়, সমকালীন আমেরিকায় চোরের যথেষ্ট উৎপাত ছিল এবং রাত্রিতে গৃহস্থদের খুবই সতর্ক থাকতে হতো। শুধু ঘরে ঢুকে জিনিষপত্র চুরি করে নেওয়াই নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকাশকের চুরির কথা অর্থাৎ লেখকদের ঠকানোর কথাও টোয়েন প্রকাশ করেছেন তাঁর স্মৃতি-চারণায়। দৈন্যেই হোক, আর প্রাচুর্যেই হোক, মোটামুটি এক রকম আনন্দেই কাটছিল মার্ক টোয়েনের পারিবারিক জীবন। কিন্তু চব্বিশ বছর বয়েসে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সুসির পরলোকগমনে এবং তার আট বছর পর স্ত্রীকে হারিয়ে টোয়েনকে বাকী জীবন বিষণ্ণতার মধ্যেই কাটাতে হয়েছিল। তবু দুই কন্যা ও সাহিত্য নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। মিঃ রোজার্স-এর মতো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সান্নিধ্য ও অসংখ্য ভক্ত পাঠকের স্তুতি সঞ্জীবিত রেখেছিল তাঁকে। কিন্তু অন্ধকার ক্রমে ক্রমে আরো ঘনীভূত হয়ে এলো চারদিক থেকে।'

আত্মকথার শেষ অধ্যায়ে মার্ক টোয়েন লিখছেন, ---

'I lost Susy thirteen years ago; I lost her mother—her incomparable mother! —five and a half years ago; and now I have lost Jean. How poor I am, who was once so rich!'

শুধু জীন নয়, মৃত্যু যেন মিছিল করে আসছিল মার্ক টোয়েনের জীবনের শেষ অধ্যায়ে। মাত্র সাত মাস আগে তিনি তাঁর প্রিয়তম বন্ধু রোজার্সকে এবং জীনের মৃত্যুর আগের ছয় সপ্তাহের মধ্যে আরো দুই জন প্রিয় সাথী গিল্ডার ও লাফানকে হারিয়ে খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। তারপর এত শীঘ্র খৃষ্টমাস ইভ-এর প্রত্যূষে এমন সংবাদ তাঁকে শুনতে হবে তা ছিল মার্ক টোয়েনের ধারণারও অগোচর।

আগের দিনও বিকেল থেকে অনেক রাত অবধি ছোট মেয়ের সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটিয়েছেন টোয়েন। তার সঙ্গেই বা আর গল্প করবেন একে একে সবাই যে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। সুসির এবং তার মায়ের মৃত্যুর পর দুই কন্যাকে নিয়ে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁর স্টর্মফিল্ডের নতুন বাড়িতে। মেজ মেয়ে ক্লারা তার স্বামীর সঙ্গে ইয়োরোপ চলে গেছে দিন তেরো আগে। তারা বার্লিনে রয়েছে।

ভোর না হতেই মার্ক টোয়েনের ঘরের দরজা খুলে গেলো। তাঁর মনে হয়েছিল জীন তাঁকে 'সুপ্রভাত' জানাতে এসেছে, তাঁর কাছে আদর খেতে এসেছে রোজকার মতো।

কিন্তু এ কী কথা বলছে কেটী? জীন নেই, জীন মারা গেছে!

দীর্ঘকালের পুরনো পরিচারিকা কেটীর কথা অবিশ্বাসের তো কোনো কারণ নেই। তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মার্ক টোয়েন। তিনি ছুটে গেলেন জীনের ঘরে। সারা ঘরময় খৃস্টমাসের সব উপহার। অন্যান্য বারের মতো সেবারও জীন নানা রকমারি সব উপহার কিনে এনে রেখেছে খৃষ্টমাসের দিন সকলকে দেবার জন্যে।

জীনের চিরবিদায়ে শূন্যতায় ভরে উঠেছে চারদিক। এই শূন্যতাকে আশ্রয় দেবার জন্যেই কি মাত্র দু'বছর আগে এই নতুন বাড়িটি তৈরি করিয়েছেন তিনি? ১৯০৯ খৃস্টাব্দের খৃস্টমাস ইভ-এর ডাইরীতে জীনের মৃত্যুর বিবরণ লিখতে লিখতে নিজেকেই নিজে এই প্রশ্ন করেছেন মার্ক টোয়েন। তারপর জীনের কর্মকুশলতা, তার পশু-পাখি-প্রীতির কথা এবং আমেরিকায় ও ইয়োরোপে তার জনসেবামূলক উদ্যোগ ও সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা তিনি পাতার পর পাতায় লিখে গিয়েছেন। তাঁর সেক্রেটারী হিসেবে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হতো জীনকে। এ মৃত্যু সেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল নয় তো? এমনি প্রশ্নও জেগেছিল টোয়েনের

শ্রীশিবরাণী সেনগুপ্ত

(নানকের গ্রন্থের ভাব অবলম্বনে রচিত)

হরির নাম বিনা মোর বৃথা যায় দিন
সদা জপ নাম বিরাম বিহীন॥

মিছে হয় যবে আঁখি মণিহারা
বৃথা হয় জন্ দ্নয়ন হারা
হরির নাম বিনা তেমতি আমার রিক্তহৃদয় বিষাদ লীন॥

প্রভাত যেমন পুরুষ ছাড়া
বেদ বিহীন জ্ঞানের ধারা
তেমনি প্রভুর নাম বিনা মোর শূন্য পরাণ হয় দীনহীন॥

যেমতি শূন্য সলিল কূপ
ক্ষীর বিনা হায় ধেনুর রূপ
তেমতি হরির নাম বিনা মোর হিয়া লাবণ্যহীন॥

দীপবিহীন মন্দির সম
ফুলহীন তরু বিরূপে বিষম
তেমনি হরির নাম বিনা মোর অন্তর হলো আঁধারে বিলীন॥

বাসনা কামনা ক্রোধ মদ যত
লোভ মোহ আর মায়া শত শত;
ছাড়ি মন লহ শরণ প্রভুর চিরমালিন্য হীন।

নানক কহিছে হে ভকত জন
এ জগতে নাহি কেহ তো আপন
শুধু হরি নাম রূপ রাজিছে ভকত পরাণে নিত্য অমলিন॥

নে। ঐ দিনের ডাইরীর উপসংহারে তিনি লিখেছেন, 'এক মাস আগেও আমি কত হাসির কথা, কত মজার গল্প লিখেছি, আর এখন আমি এসব লিখছি।'

পরদিন খৃস্টমাস দিবসের ডাইরীতে টোয়েন একবার দুপুরে এবং আরেক বার রাত্রিতে সেদিনের সমস্ত কাহিনী লিখেছেন। ২৬শে ডিসেম্বর তারিখেও তিনি তাঁর ডাইরীতে কলম চালিয়েছেন। আগের রাতে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সকাল আটটায় জীনের জার্মান কুকুরটা তাঁর কাছে এসে বসেছিল। টোয়েনের ঘরেই যে তখন ঐ অনাথ কুকুরটির আশ্রয়। চারদিক তুষারাবৃত, আকাশ মেঘে ঢাকা। অ... ...। কিন্তু জীন কাছে নেই, লিখেছেন টোয়েন। বেলা আড়াইটায় লিখেছেন, এই সেই নির্দিষ্ট সময় যখন চারশ' মাইল দূরে ল্যাংডনদের বাড়িতে পারিবারিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে, যেখানে মার্ক টোয়েন ও শ্রীমতী ওলিভিয়া তাঁদের বিয়ে উপলক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যেখানে তের বছর আগে সুসিকে ও সাড়ে পাঁচ বছর আগে তাঁর মাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, জীনকেও সমাহিত করা হচ্ছে। কিছুদিন পরে তাঁর নিজেরও স্থান হবে সেখানেই, সে ভবিষ্যদ্বাণীও টোয়েন করে রেখেছেন, সেই সঙ্গে বিকেল পাঁচটায় লিখেছেন, সব শেষ।

মাত্র চার মাস পরেই ১৯১০ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল মার্ক টোয়েনও চিরবিদায় নিলেন।

হাস্য-কৌতুকের শ্রেষ্ঠ মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন আঘাতের পর আঘাত সহ্য করেও মাথা উঁচু করে ছিলেন। কর্ম-জীবনে সাংবাদিক জগতের নীতিহীনতায় তিনি আহত বোধ করেছেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রকাশকের প্রতারণা তাঁকে ব্যথিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর অকরুণ রীতি এই হাসির মানুষটিকে চরম বিষাদের মধ্যে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করেছে। এ বাস্তবিকই নিয়তির এক দুর্বোধ্য পরিহাস।

যাই হোক, সহৃদয়তায় অনন্য, বন্ধুত্বে অকৃত্রিম পারিবারিক জীবনে একনিষ্ঠ স্বামী ও পরম স্নেহশীল পিতা মার্ক টোয়েন যথার্থই মার্কিন সমাজের প্রতীকস্বরূপ। তাঁর জীবন ও সাহিত্য সেই সমাজেরই প্রকৃত সাক্ষ্য এবং তাঁর আত্মচরিত যথার্থই সমকালীন মার্কিন সমাজের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

ভবতারিণী দেবী

[বসুমতীর প্রবর্তক উপেন্দ্রনাথের শতাব্দী-সমীপবর্তিনী সহধর্মিণী]

সারা বাঙালী জাতির অশেষ সৌভাগ্য যে, পরম ভট্টারক ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান। শুধু প্রত্যক্ষ করা নয়, ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের এবং সেই দিব্যদেহ স্পর্শের অতুল সৌভাগ্যের অধীশ্বরী এই মহীয়সী মহিলা। ইনি শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও বসুমতী পত্রিকাগোষ্ঠির প্রবর্তক ঠাকুরের অন্যতম মানস সন্তান স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্যা এবং আদর্শ সহধর্মিণী।

ঠাকুরের এবং শ্রীশ্রীমার উভয়েরই সম্পর্কের দিক দিয়ে বোনের পর্যায়ে পড়েন ভবতারিণী। জয়রামবাটী ভবতারিণী দেবীরও দেশ। বালিকা বয়সে বিয়ে হয়েছিল উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে। উপেন্দ্রনাথের বয়েসও সেদিন পনের ষোলর বেশী নয়। তার উপর উপেন্দ্রনাথ সেদিন মাতুলাশ্রয়ে নির্ভরশীল। নিঃস্ব, বিত্তহীন। এদিকে ভবতারিণী দেবীও গৌরাঙ্গী নন, রীতিমত কৃষ্ণাঙ্গী। কনের গায়ের রঙ নিয়ে এবং বরের অবস্থা নিয়ে যথাক্রমে বরপক্ষ ও কনেপক্ষ উভয় দিক থেকেই মৃদু আপত্তি ওঠে, কিন্তু উঠলে কি হবে—এ বিবাহের ঘটক যে স্বয়ং রামকৃষ্ণ—তাঁর ইচ্ছা কে খণ্ডায়—ভবতারিণীকে তুলে দিলেন একটি ন্যায়নীতিনিষ্ঠ, সংগ্রামশীল, উত্থানধর্মী সম্ভাবনাময় কিশোরের হাতে আর উপেন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করলেন একটি সর্বকল্যাণের আধার, মমতাময়ী, লাবণ্যবতী গৃহলক্ষ্মীকে।

ভবতারিণী দেবী

নাম ছিল 'হাবি'। ঠাকুরই নতুন নাম দিলেন। "ভবতারিণী" তাঁরই দেওয়া নাম। ঠাকুরের শেষ অসুখের সময়ে বালিকা ভবতারিণী রামকৃষ্ণের মুখের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন শীতলা মা'র প্রসাদ। স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশ যাত্রার সময় ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেন উপেন্দ্রনাথ। সেই অর্থ-ভাণ্ডারে হাসিমুখে ভবতারিণী খুলে দিয়েছিলেন নিজের বহু অলঙ্কার।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন কর্মবীর। গত শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে কটি কর্মনায়ক ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের বরেণ্য পথিকৃতের আবির্ভাব হয়েছিল, উপেন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম। উপেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন এক বিপুল কীর্তির একটি অমলিন স্বাক্ষর। এই দেশবন্দিত কর্মনায়ককে জীবনের চলার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে অন্তরাল থেকে যিনি অন্তহীন প্রেরণা ও সাহস জুগিয়ে গেছেন, অনির্বাণ উৎসাহের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন সেই নেপথ্যচারিণী ভবতারিণী দেবী।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির শুধু সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিল্পীদেরই মিলনক্ষেত্র ছিল না, এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু ভক্ত, সন্তান, মিশনের বহু স্বামীজী এসে মিলিত হতেন। এইভাবে বসুমতী ভবনেও একটি রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি অভ্যাগতের পরিচর্যার দিকে তাঁর সযত্ন লক্ষ্যের ফাঁক ছিল না। বসুমতীর প্রতিটি কর্মী বা যিনি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তিনিই তাঁর কাছে জননীর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছেন।

১৯১৯ সালে উপেন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হলেন। ১৯৪৪ সালে দেড় মাসের ব্যবধানে প্রথমে একমাত্র পৌত্র রামচন্দ্র ও পরে একমাত্র সন্তান মাসিক বসুমতীর

প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র ভবতারিণীর চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলেন তাঁর কোল শূন্য করে। একমাত্র সন্তান সতীশচন্দ্র নেই---এই চরম সত্য ও নিষ্ঠুর সত্যটি যখন তাঁর উপলব্ধিতে এল---সেই মুহূর্তে কলকাতার ভবন ত্যাগ করলেন এবং তাঁর যাত্রা থামল সোজা কনখলে। সেখানে শ্মশানবাস চলল কিছুদিন। অল্পকাল পর পুত্রবধূ [illegible] অনুপ্রেরণা দেবীর প্রচেষ্টায় তাঁর কাশীবাসের ব্যবস্থা হয়। তদবধি একাদিক্রমে কাশীধামেই তিনি বসবাস করছেন। শোকের প্লাবন বয়ে গেছে তাঁর মধ্যে---একমাত্র সন্তান, পুত্রবধূ, একমাত্র পৌত্রের অকালপ্রয়াণও তাঁকে দেখতে হয়েছে। দিনান্তে একবার মাত্র তিনি আহার গ্রহণ করেন, মাটির পাত্রে সেই আহার। সামান্য পরিমাণ [illegible] আর দু'একটুকরো কলা---এই তাঁর সারাদিনের খাদ্য। মুখে মুখে রচনা করেন ভক্তিমূলক গান। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ ছুটে আসে তাঁর দর্শন পেতে, ফিরে যায় এই মূর্তিময়ী করুণার স্নেহের প্লাবনে পরিষিক্ত মন্দাকিনী হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। শতাব্দীর কক্ষে পদার্পণের আর মাত্র বছর চারেক বাকী।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

[দেশীয় শিল্পপ্রচারের অন্যতম পথপ্রদর্শক, বর্ষীয়ান জননেতা]

যে জীবন স্বাদেশিকতার মন্ত্রে সামগ্রিকভাবে উদ্বুদ্ধ, দেশ ও জাতির সেবায় পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গিত, এক দিকে সারল্য ও হৃদয়বত্তার মূর্ত প্রতীক, অন্যদিকে অনুপ্রেরণা এবং উদ্দীপনার মহান উৎস---সেই জীবন আজ শতাব্দীর শেষ দশকে উপনীত-প্রায়। সেই জীবনের সার্থক অধিকারী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। বাঙলা দেশের জাতীয় জীবনের গৌরবময় ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের রূপদানের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে তাঁর। এ কথা অনস্বীকার্য। বঙ্গদেশে জনজীবনে খাদি সম্পর্কিত সচেতনতা ব্যাপকভাবে সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি বরেণ্য পথিকৃত। মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারা এবং আদর্শের সঙ্গে বাঙ্গালীর বিস্তৃত পরিচয় তাঁরই অনন্যসাধনার ফলস্বরূপ বলা যায়।

১২৮৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (জুন, ১৮৮০) মাতুলালয়ে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের জন্ম। পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সহদেবপুর গ্রামে। স্বগত ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র সতীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন রংপুর থেকে। কুচবিহার কলেজ থেকে প্রাক-স্নাতক পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করে বিজ্ঞানে (রসায়ন) স্নাতক উপাধি অর্জন করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। এ কালের নাগার্জুন নব্যভারতের রসায়ন চর্চার পথপ্রদর্শক আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে সতীশচন্দ্র ছিলেন অন্যতম।

১৯০৫ সাল--- ভারতের মুক্তি-সাধনায় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। জাতির মুক্তি-সংগ্রামে এই সময়ে যে অভূতপূর্ব গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল এবং এই সময়ে যে ভাবে ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে দেশবাসী জাতীয় মন্ত্রে

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

উদ্বোধিত হয়ে উঠেছিল, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তরুণ সতীশচন্দ্র সেই দেশব্যাপী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের গাড়ী সেদিন যে তরুণরা আনন্দচিত্তে নিজেরাই টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাঁর সঙ্গে এই মহৎ কর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁর শ্যালক---পরবর্তীকালে বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল, ধুরন্ধর আইনজীবী স্বর্গত ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বেঙ্গল কেমিক্যাল রূপপরিগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে সেই সদ্যগঠিত সংস্থায় যোগ দিলেন সতীশচন্দ্র তত্ত্বাবধায়করূপে। পরে নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রধান রাসায়নিক হিসাবে। কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের আর এক বরেণ্য দিক্‌পাল পণ্ডিতপ্রবর আচার্য রাজশেখর বসু।

১৯২১ সালে গান্ধীজীকে দেখলেন। গান্ধীজীর ভাবধারায় এবং আদর্শে পরিপূর্ণ সমর্পিত হয়ে গেলেন। ১৯২৪ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে গান্ধীজীর আদর্শ সাধারণ্যে ব্যাপক প্রচারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। বঙ্গীয় সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি, খাদি প্রতিষ্ঠান, খাদি কমিশন প্রভৃতি তাঁরই অভূতপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভার এক-একটি আশ্চর্য নিদর্শন।

দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের ইতিহাসে তাঁর অবদান এবং নায়কত্ব চিরন্তনের ভিত্তিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিল্পক্ষেত্রে বাঙালী যে পশ্চাদবর্তী নয়, তার প্রমাণ দিয়েছিলেন সতীশচন্দ্র নানাভাবে। নিজের বিপুল অঙ্ক অর্থ ব্যয় করে নানাবিধ শিল্পের প্রবর্তনে তাঁর গৌরব অনস্বীকার্য। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র 'ফায়ার কিং', 'সুলেখা কালি' নানাবিধ প্রসাধন, ঔষধ এবং সাংসারিক জীবনের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্বীয় অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালে থাকাকালীন তাঁর উদ্ভাবিত দ্রব্যসমূহের সমধ

যখন ঐ প্রতিষ্ঠানকে তিনি দান করে আসেন, যখন তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তুলসীদাসের রামায়ণের বাঙলা ভাষায় রূপান্তরের কাজ সর্বপ্রথম তাঁরই দ্বারা সম্পন্ন হয়। সারা ভারতবর্ষে গাভী সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত 'কাউ ইন ইণ্ডিয়া' একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে তাঁর ভাষ্য যথেষ্ট মূল্যবান। তাঁর গ্রন্থ 'হোম এ্যাণ্ড ভিলেজ ডক্টর' এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী সম্পর্কে তুলনামূলক একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন, পরে সেই গ্রন্থটির ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরও করেছেন। এ ছাড়া আরও বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

বর্তমানে তিনি বাঁকুড়া জেলার গোয়ালা গ্রামের অধিবাসী। বিজলী-বিহীন সেই স্থানে কোন সহায়কের সাহায্য না নিয়েই সতীশচন্দ্র রচনা ও সাংগঠনিক কার্যে ব্যাপৃত আছেন।

তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী হেমপ্রভা দাশগুপ্তা বছর তিনেক পূর্বে স্বর্গলাভ করেছেন। দীর্ঘজীবনে দুই পুত্র, একমাত্র জামাতা এবং একমাত্র দৌহিত্রের শোকও তিনি প্রশান্ত সমাহিতচিত্তে বরণ করে নিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দকুমার ঘোষ

[পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পূর্ত ও সেচ বিষয়ক উপদেষ্টা]

উনিশ শো সত্তর সালের উনিশে মার্চ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। রাজ্য-রাজনীতির ইতিবৃত্ত তার একটি অধ্যায়ের যাত্রা সমাপ্ত করে আর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এইদিন পদার্পণ করল। পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হ'ল। এই প্রবর্তনের ফলে নিয়মানুযায়ী রাজ্যের শাসনভার গেল রাজ্যপালের হাতে সমগ্র রাজ্যের প্রশাসনের ক্ষেত্রে এক নবরূপায়ণ সুরু হ'ল। প্রশাসনিক কাঠামোর এই নবরূপায়ণের ফলে সেখানে শীর্ষস্থানে যাঁরা এলেন রাজ্যপালের উপদেষ্টা হিসাবে সেই উপদেষ্টা পঞ্চকের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দকুমার ঘোষ অন্যতম।

রাজ্যপালের অন্যতম উপদেষ্টা—এই পরিচয়টুকুর মধ্যে তাঁর অসামান্য দক্ষতা এবং অতুলনীয় প্রতিভা সীমাবদ্ধ নয়। ইঞ্জিনীয়ারিং জগতের আজ যাঁরা নেতৃস্থানীয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যাঁদের কৃতিত্ব সসম্মানে সমাদৃত, সেই তালিকায় শ্রীঅরবিন্দকুমার ঘোষ একটি দীপ্তোজ্জ্বল মালিন্যবিহীন নাম। এ কালে যে কুশলীদের সাধনায় দেশের ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা প্রভূত সমৃদ্ধির মুখাবলোকন করে চরম উৎকর্ষে উপনীত হয়েছে, শ্রীঘোষের আসন তাঁদেরই পুরোভাগে।

স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র ঘোষের পুত্র অরবিন্দকুমারের জন্ম এই মহানগরীতেই। মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভবানীপুর শাখায় তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করেন। সিটি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরও ছাত্রশ্রেণীভুক্ত ছিলেন অরবিন্দকুমার, বারাণসীতেও তিনি শিক্ষালাভ করেছেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর ছাত্রজীবন এক গৌরবময় পরিণতির সম্মুখীন হয়।

জীবনের প্রায় ত্রিশটি বছর ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অনুশীলনে তাঁর অতিবাহিত হয়। এই সময়সীমায় তাঁর সঞ্চয়ের পাত্র পূর্ণ হয়েছে বিপুল অভিজ্ঞতায় এবং নানাভাবে বিকাশলাভ করেছে তাঁর সংশ্লিষ্টবিষয়ক প্রতিভা, যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে তাঁর আসন সমমর্যাদায় নির্দিষ্ট।

পশ্চিম বাঙলার জাতীয় জীবনের নবগঠন এবং সমৃদ্ধিসাধনের ক্ষেত্রে দুর্গাপুর প্রকল্পের গুরুত্ব এককথায় অসাধারণ। এই জনকল্যাণকর মহৎ প্রকল্পটি পরিকল্পনা থেকেই শ্রীঘোষের সেবার স্পর্শ পেয়ে সর্বাংশে লাভবান হয়ে এসেছে। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের গৌরব শ্রীঘোষ নিঃসন্দেহে দাবী করতে পারেন। এর পরিচর্যায় এবং রূপায়ণে শ্রীঘোষের ভূমিকা যেমনই বিরাট, তেমনই অবিস্মরণীয়। সেণ্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার কমিশনও তাঁকে লাভ করেছে সদস্য এবং সহকারী সভাপতিরূপে।

পৃথিবীর নানা প্রান্ত তিনি পর্যটন করেছেন বিভিন্ন সময়ে। বহু বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাঙলার এই কৃতী সন্তান যোগ দিয়েছেন কোথাও প্রতিনিধি হিসাবে, কোথাও বা দলনেতা হিসাবে। শ্রীঘোষের প্রসঙ্গে আলোচনায় যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত—তা হ'ল পেশায় তিনি ইঞ্জিনীয়ার, এমন কি ইঞ্জিনীয়ারিং জগতের তিনি একজন দিক্‌পাল, এ কথা যেমনই সত্য, আবার নানা ধর্মগ্রন্থের তিনি একজন একাগ্র, একনিষ্ঠ ও বিদগ্ধ পাঠক ও রসগ্রাহী—এ কথাটিও ততখানিই সত্য।

বর্তমানে রাজ্যপালের সেচ ও পূর্তবিষয়ক উপদেষ্টার আসনে তিনি সমাসীন। তাঁর মহৎ প্রতিভার স্পর্শে ও সুচিন্তিত এবং বলিষ্ঠ নির্দেশে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তর দু'টি প্রভূত কল্যাণের সম্মুখীন হবে—এ আশা আমরা সর্বান্তঃকরণে পোষণ করি।

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

[পশুপালন, পশু-চিকিৎসা, বন ও মৎস্য দপ্তর সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব]

ছাত্র জীবনের অসাধারণ প্রতিভা ও অতুলনীয় মেধার সার্থক বিকাশ পরবর্তীকালে যাঁদের রাজ্য সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অতীব দায়িত্বপূর্ণ এক শীর্ষস্থানীয় আসনে অধিষ্ঠিত করেছে --শ্রীঅমিয়কুমার সেন সেই তালিকায় একটি উজ্জ্বল নাম। কি বিদ্যাবত্তায়, কি হৃদয়বত্তায় তাঁর জীবন-প্রকাশ নিঃসন্দেহে এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

রত্নপ্রসূ বরিশালের সন্তান তিনি। যে বরিশাল পুণ্যশ্লোক মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ বহু বরেণ্য কৃতী সন্তানের স্মৃতিতে ভাস্বর, সেই বরিশাল অমিয়কুমারেরও পিতৃভূমি। ১৯২৪ সালের ৭ই জুলাই বরিশালে শ্রীযুক্ত বনমালী সেনের পুত্র অমিয়কুমারের জন্ম। শিক্ষার সূচনা হয় রাজশাহীতে। রাজশাহী থেকে ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৯৪৪ সালে অর্থনীতিতে অনার্স সহ স্নাতক পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৯৪৬ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সফলতারই মুখোমুখি হলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রজীবন তাঁর স্মৃতিতে এক অসামান্য গুরুত্ব নিয়ে বিরাজমান। একাধিক দিকপাল বরেণ্য শিক্ষাবিদের নিকট প্রত্যক্ষ পাঠলাভের সুযোগে তাঁর এই সময়কার ছাত্রজীবন স্মরণীয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি পাঠ নিয়েছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, জে সি সিনহা,

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

সুশোভন সরকার প্রমুখ মনীষী অধ্যাপকদের কাছে। বি-এ অনার্সে তাঁর নাম ছিল প্রথম শ্রেণীতে। অর্থনীতিতে এম-এ পরীক্ষায় এবং বি-সি-এস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানটি ছিল তাঁরই অধিকারভুক্ত।

আই-সি-এস পরীক্ষা অবলুপ্ত হওয়ার পর আই-এ-এস-এফ যখন প্রবর্তিত হ'ল সেই সময়ে ঐ পরীক্ষার প্রথম ব্যাচের প্রথম কৃতকার্য ছাত্র হিসাবে দেখা গেল শ্রীযুক্ত সেনকে।

গৌরবময় ছাত্রজীবনের পর ঘটনাবহুল কর্মজীবনের সূত্রপাত হ'ল মালদহে। বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর—এই তিনটি প্রধান প্রধান জেলায় বিভিন্ন সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আসনে তাঁকে সমাসীন দেখা গেছে। ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে যোগ দিলেন প্রথম সচিবের কার্যভার নিয়ে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সহযোগী সচিবরূপে নিযুক্ত হলেন। এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর আসনে সমাসীন ছিলেন মোরারজী দেশাই ও টি টি কৃষ্ণমাচারী। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জাপানে তিনি মোট ছ'মাস অতিবাহিত করেন। ১৯৬৪ সালে এলেন রাইটার্স বিল্ডিংসে, তাঁর বর্তমান কর্মক্ষেত্রে। প্রথমে গ্রহণ করলেন অর্থদপ্তরের যুগ্মসচিবের কর্মভার, তারপর হ'লেন অতিরিক্ত সচিব। বর্তমানে পশুপালন, পশুচিকিৎসা, বন ও মৎস্য দপ্তর-সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনি সচিব।

রাজনীতি ও অর্থনীতি-সংক্রান্ত রচনাদি তিনি অবসর সময়ে গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠে নিরত হন।

জিপসী-বিবাহ

পশ্চিম জার্মানী-র ছোট্ট গ্রাম বিংগেন হাইম্-এ সেদিন বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ব্যাপার কি? না, জিপ্সী-দের বিয়ে। কনের নাম লোলা। সে পঁচিশ বছর আগে এই গ্রামেই জন্মেছিল তার বাবা-মা দলের সঙ্গে যাওয়ার সময়। পাত্রটির নাম গেকত্রা। সত্যি সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেদিন। নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা সব মিলিয়ে আড়াইশ' জনের মত। বাঙালি মধ্যবিত্তর বিয়েতে সাধারণত এর বেশি-সংখ্যক অতিথি নিমন্ত্রিত হন না। সে যাক্। ভোজের জন্য একটা ষাঁড়, চারটে শুকর, আর দু'শ চল্লিশটা মুরগী কাটা হয়েছিল। এলাহী ব্যাপার। যাকে বলে, দীয়তাং ভুজ্যতাং। এছাড়া ছিল পাঁচশ' বোতল কড়া মদ, কয়েক পিপে বীয়ার আর সুমিষ্ট সুরা। কনে যৌতুক পেল প্রচুর কাপড় এবং দলের লোহার সিন্দুক থেকে জমানো পনের হাজার মার্ক জোরমান মুদ্রা।

পশু-পক্ষী-পালন

পোলট্রির অ আ ক খ

সমরেন্দ্রনাথ রায়

ভারতীয়দের কাছে অথবা ভারতের সন্নিহিত দেশগুলিতে মুরগি পোষা নতুন কিছু নয়। পুরোনো ও পরিচিত জিনিষ আমাদের কাছে নতুন পোষাকে এলেও দুই অথবা তিন হাজার বছর আগের মানুষ আজ যদি ফিরে আসে, তা হলে দেখতে পাবে তাদের সময়ে যে মুরগি পাওয়া যেত, সেই জাতের মুরগি এখনও রয়েছে। আজও যে জাতের মুরগি পাওয়া যায়, তা তাদের পূর্বপুরুষদের ছবির মত হ'লেও তাদের অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটেছে। মুরগির উৎপত্তি কোথায়, সে সম্বন্ধে গবেষণা করে চূড়ান্তভাবে স্থির হয়েছে যে, গৃহপালিত অথবা অন্যান্য প্রকার মুরগির জন্মভূমি ভারত। কোন কোন গবেষক পণ্ডিত এই থিওরী বাতিল করবার জন্য যা বলেছেন, তার যুক্তি এত দুর্বলও ত্রুটিপূর্ণ যে, গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু লেকে এই প্রিয় পক্ষীর সমৃদ্ধির দিকে নজর দেয় নি, তাই তাদের বংশধররা পূর্বপুরুষদের মত ভাল ও মন্দ রয়ে গেছে। মুরগি যেকোনভাবে ইউরোপে গিয়ে পড়েছিল এবং প্রথমে ব্যক্তিবিশেষে সৌখীন লোক মুরগির উন্নয়নের কাজে হাত দেয়, বিশ্বের নানাস্থানের পণ্ডিতদের মনোযোগ আদৌ আকৃষ্ট করে নি।

মুরগির উন্নতি সাধনে আমরা এত উদাসীন কেন, তা বিবেচনা করা যাক। কারণ অনেক রকম, কিন্তু মনে হয় সামাজিক অজ্ঞতাই অতীতের সামাজিক-আর্থিক স্থায়িত্বহীনতা এনেছিল, এটাও অন্যতম কারণ। তবে একথাও ঠিক, মুরগির যেটুকু গুরুত্ব প্রাপ্য তা আমরা কখনও দিইনি ও কখনও তাদের প্রতি মনোযোগ দিইনি, সমাজের নীচের স্তরের মেয়েদের এটা কাজ ছিল। পণ্ডিতরা এটা পুনরাবিষ্কার করেছিলেন ও আমাদের জানিয়েছেন যে, মুরগি ভারতীয় পক্ষী ও তাদের পূর্বপুরুষরা বৈদিক যুগে হিমালয়, তরাই ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাস করতো। অধুনা যে মুরগি আমদানী করা হচ্ছে, তা মাজাঘষা করে শেষ পোঁচ দেওয়া মুরগির জাত। এদের পূর্বপুরুষরা একদা ভারত থেকেই গেছলো। যাই হোক, আমরা ক্ষুদ্র প্রাণীর আর্থিক লাভের দিকটা বুঝতে পেরেছি ও মুরগি ও বাচ্চা মুরগির প্রতি বহু যুগের গোঁড়া মনোভাব ত্যাগ করেছি। সামাজিক ধর্মীয় বাধা দূর হয়েছে ও দূর হচ্ছে এবং এখন আমরা কোন বাড়ীতে মুরগি না দেখলে বিস্মিত হই। এটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন নয় কি? সম্ভবতঃ ভারত ছাড়া আর কোন দেশ, এমন কি কোন প্রগতিশীল দেশ এ রকম দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন দাবী করতে পারে না। এই কুটির-শিল্প এখন শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে।

ছোট ব্যবসায়ী ও বড় ব্যবসায়ীরা পোলট্রি শিল্পে নিযুক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে মতৈক্য নেই। কার্যত তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক, তাই সাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়া অবাস্তব। অল্প সময়ের মধ্যে ও স্বাধীনতা লাভের পর বৈপ্লবিক পটভূমিকায় দেশে পরিবর্তন এসেছে। প্রত্যেক দেশ কোন-না-কোনভাবে এই পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের যে কারণ দেওয়া হচ্ছে, তা সব ক্ষেত্রে এক রকম নয়। দুটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারতে এই পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতালাভ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকারীর ফলে যে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়, তাই শক্তি জুগিয়েছে। মূলধন লগ্নী করলে তা থেকে সহজে মুনাফা লাভের প্রতিশ্রুতি ও যে-কোন অবস্থার মধ্যে মুরগি পালনে মদৎ দিয়েছে। কারিগরী জ্ঞান পাওয়া সত্ত্বেও ও ভেষজ বিজ্ঞান, জীবাণু-বিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি সত্ত্বেও পোলট্রি শিল্পের নিজস্ব বাধা ও ত্রুটি আছে। অন্যান্য ধরনের বাধা থাকলেও হাঁসমুরগির রোগ তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে। অন্যথায় মহামারী রোগ যে ব্যাপক ধ্বংস আনে তা সমস্ত রকম বাধার মধ্যে প্রধান। একটি বিশ্বস্ত সংস্থা সমীক্ষা করে দেখেছে যে, দশম বছরে শতকরা ৫ ভাগ উদ্যোগ টিকে থাকে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শতকরা ৪০ ভাগ উদ্যোগ প্রথম বছরেই বন্ধ হয়ে যায়, দ্বিতীয় বছরে শতকরা ২০ ভাগ ও তার পরবর্তী দু' বছরে শতকরা ১০ ভাগ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। এটাই ঘটে

থাকে ও ঘটছেও। পোলট্রি শিল্পে নবাগতদের কাছে এই পরিসংখ্যান নিরুৎসাহজনক। তবুও তাড়াহুড়া করে ঝাঁপিয়ে পড়বার কিছু নেই, সব দিক বিবেচনা করে কাজ করাই ভাল, এতে সুফল হয়। নতুন খামারীদের কাজে নামবার আগে হাতে-কলমে ট্রেণিং নেওয়া উচিত। ফিজিওলজি ও অ্যানাটমির ছাত্রদের মত ধাপে ধাপে মুরগিকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। মুরগির দেহ, দেহের বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ, মুরগি পোষার উদ্দেশ্য, কি ধরনের মুরগি পুষতে চান, মুরগির খাদ্য ও খাদ্যের কার্যকারিতা, মুরগির ঘর, মুরগির রোগ ও রোগ নিবারণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইনকিউবেটর যন্ত্রে ডিম ফোটানোর কুফল সম্পর্কেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। সব বিষয়ে ভাল জ্ঞান লাভ হলে ডিম ফোটানোর সুখকর অভিজ্ঞতা হবে, অল্প অভিজ্ঞতায় সব কিছু নষ্ট হবে। মোট কথা পোলট্রি বিজ্ঞান সবার কাজ হতে পারে না, এর জন্য যথেষ্ট শিক্ষানবিশী ও ট্রেণিং চাই। সারাজীবন ধরে আমি একজন খামারী, তবুও অন্যান্য খামারীদের কাছ থেকে কিছু জানতে বা শিখতে আমি দ্বিধা করি না। অনুকরণে লজ্জা নেই। কোন জিনিষ অনুকরণ করতে করতে সেটা নিজস্ব হয়ে যায়, অবশ্য যদি সেটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি বা হজম করে নেবার ক্ষমতা থাকে। প্রাক্-যুদ্ধ সময়ে জাপান অনুকরণ করতো এবং এই কাজের বিরুদ্ধে কেউ কেউ কিছু বলতো, কিন্তু বর্তমান জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আজ সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন জিনিষের পুরোধা এবং গর্বিত। পশ্চিমী জগৎ তার দিকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছে এবং ইঙ্গ-মার্কিণ বুক নতুন ক্ষেত্রে নতুন জিনিষ দেখবার জন্য সর্বদাই জাপানের দিকে তাকাচ্ছে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মাসিক বসুমতী পশুপালন সম্পর্কে এক নতুন বিভাগ খুলেছে ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে ফটোগ্রাফ, পরিসংখ্যান ও নানাবিধ চিত্র সহ উপযুক্ত রচনা আহ্বান করছে। অধ্যাপক, গবেষণা কর্মী, সরকারী কর্মচারী ও কার্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞ যে-কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ পাঠাতে পারেন। প্রবন্ধ ইংরাজীতে লেখা যেতে পারে। কিন্তু বাংলা প্রবন্ধ গ্রহণ-যোগ্য হবে। প্রবন্ধ সম্পাদনা করার অধিকার সম্পাদকের থাকবে ও প্রবন্ধে কোন রাজনৈতিক রং চড়ানো চলবে না। কর্তৃপক্ষগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য আদান-প্রদানকারী ব্যবসায় সংস্থাগুলিকে বিজ্ঞাপন পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

॥ সম্পাদকীয় ॥

ভারতের আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র লক্ষ্য করবেন যে, ভারতীয় জনগণের মেজাজের বৈশিষ্ট্য এত স্পষ্ট যে, তা' মনোযোগ আকৃষ্ট না করে পারে না। ইউরোপীয়দের কাছে অপরিচিত বহু জিনিষের জন্য ভারতের কঠোর সমালোচনা করা হয়।

পোলট্রি পালন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এ রকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। লোকে সাধারণভাবে মুরগিকে নোংরা বলে গণ্য করে ও কোন ভদ্রলোক ভাবতে পারেনি যে, দৃষ্টিভঙ্গীর এ রকম ভয়ঙ্কর পরিবর্তন আসছে। ভারতে মুরগি পালন বলতে আমরা মনে করে থাকি যে, লাভের উদ্দেশ্যে কেউ মুরগি পালন করতে পারে না, গড়পড়তা পাঁচশোর বেশী কেউ মুরগি রাখে না ও যারা ১০০ মুরগি রাখে তারাই মনে করতো যে, তাঁরা উঁচু দরের পোলট্রি গ্রোয়ার। কিন্তু এখন যিনি সবচেয়ে কম মুরগি রাখেন, তাঁরও ২.৩শো মুরগি থাকে। গ্রোয়াররাও যেমন পোলট্রি শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করেছে, তেমনি হ্যাচারিগুলিও কিন্তু শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটছে ও গোঁড়া মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাচ্ছে। এগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে, আমরা পরিবর্তনকালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি। দৃষ্টিভঙ্গীর এ ধরনের পরিবর্তন সত্যই অচিন্তনীয় ছিল। অন্যথায় মনে হয়, লোকে খুব সচেতন হয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত পোলট্রি সম্পর্কে পুস্তক ও পত্রিকাদি এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করছে। মাসিক বসুমতী কর্তৃক পশু-পালনের এক নতুন বিভাগ খোলা নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সুতরাং পথপ্রদর্শক হিসেবে ইতিহাসে এটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মাসিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভারতীয় পাঠকগণ যথেষ্ট গল্প ও উপন্যাস পাঠ করেছেন ও এখন তাঁদের কিছু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। পত্রিকা-গুলির দৃষ্টিভঙ্গীর এই নব-রূপায়ণ সময়োচিত ও যথাযথ হয়েছে।

দাঁড়কাকের বাসা

কাক এবং দাঁড়কাক—এই দু'টি প্রাণীর মিল যতটা, অমিলও ততখানি। দাঁড়কাকের ঠোঁটের নিচু অংশ ধূসর চামড়ায় ঢাকা। কাকের ঠোঁটের নিচু অংশে কালো পালক ছড়ানো।

কাক হয় একা কিংবা দোকা। দাঁড়কাক দল বেঁধে থাকে। তবে, উল্টো-টাও কখনও কখনও হয়। কাজেই এটি চেনার অভ্রান্ত উপায় বলা চলে না। কিন্তু ডাকলে তফাৎ করা সহজ। ডাকার কালে দাঁড়কাক মাথা নোয়ায়, ফলে তার মাথা আর শরীর মোটামুটি সমতলে আসে, আর পুচ্ছটি সে উঁচে তুলে ধরে। কাকের বৈশিষ্ট্য ডাকার সময় মাথা ওপর-নিচে দোলানো, লেজ থাকে নিচের দিকে।

কালো রঙের পালকে ধাতব উজ্জ্বলতা আছে। সৌন্দর্য নয়, দাঁড়কাকের খ্যাত, অখ্যাতি, কুখ্যাতি তার (দুষ্ট) বুদ্ধির জন্য। সব পাখীর মধ্যে এটি ধূর্তামিতে অদ্বিতীয়। দু'শ বছরের পুরোণো একটি বিশ্বাস হলে এরা বারুদের ঘ্রাণ পায়। সব পাখীরই ঘ্রাণশক্তি স্বল্প, কাজেই এ বিশ্বাস খুব সম্ভবতঃ ভ্রান্ত। আর একটি অদ্যাবধি প্রচলিত ধারণা, খাওয়ার সময় ওরা কেউ বন্দুকপাণি হয়ে ঢুকলে ওরা তা টের পায়।

আগে কঞ্চি কাঁধে গেলেও ওরা সমান ভীত হয়ে উড়ে পালাবে। কাক এবং অন্য কয়েক জাতীয়ের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওড়ার কালে প্রাণপণে চিৎকারও অপ্রতিরোধ্য।

এদের সম্বন্ধে আর একটি বিশ্বাস প্রচলিত : এরা এত নিপুণভাবে দল বাঁধে যে, 'পুলিশ বেষ্টনী' পর্যন্ত দলে লভ্য। অধিকাংশ যখন মাঠে পোকামাকড়, শস্যদানা, অন্যান্য ফেলে-দেওয়া টুকিটাকির খোঁজে ব্যস্ত, কয়েকটি দাঁড়কাক উঁচু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পাহারা দেয়। সন্দেহজনক কেউ আসামাত্র এরা অন্যান্যদের সাবধান করে এবং সত্যিকার বিপদ হলে গোটা দলটাই উড়ে পালায়। সন্ধ্যের পর বাসায় বিশ্রামের সময়ও এই সাবধানতা নেওয়া হয়। কয়েকটা গাছের ঝোপে এদের বাসা—এখানে এক সঙ্গে কয়েক শ' দাঁড়কাক বাস করে।

দাঁড়কাকের শব্দসম্ভার উল্লেখযোগ্য। আমরা শুনি বটে, একঘেয়ে কা কা রব, কিন্তু এরা নানা ধরনের শব্দ করতে পারে। প্রত্যেকটা ধরনের মানে আলাদা। দাঁড়কাকের ডাক রেকর্ড ক'রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা বাজানও হয়। রেকর্ড করা ডাক পাহারাওলার সাবধান বাণী হলে দল শুদ্ধ সরে পড়ে।

স্বভাবে সামাজিক দাঁড়কাক বাসা বাঁধার কালে একসঙ্গে বহু সংখ্যায় এক জায়গায় জড়ো হয়। এদের স্বাভাবিক অভ্যাস বনের প্রান্তে বাসা বেঁধে পার্শ্ববর্তী পরিষ্কার জমি থেকে খাদ্য খুটে নেওয়া। কৃষি বাড়ার ফলে এদের গোলাবাড়ির কাছাকাছি গাছে বাসা বাঁধার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এরা বহুসংখ্যায় দল বেঁধে প্রায় যে-কোন উঁচু গাছের ওপর বাসা তৈরী করে। এরই নাম দাঁড়কাকের বাসা—ইংরেজিতে 'রুকারী'। কতকগুলো বাসা খুব ঘেঁষাঘেঁষি। ভাবলে অবাক লাগে, নিজেদের বাসা ওরা কী ক'রে চিনতে পারে। কিন্তু চিনে নেয় ঠিক-ঠিক এবং কয়েক বছর সাবধানে নজর রাখলে দেখা যায়, কয়েকটা জোড়া প্রতি বছর একই বাসায় ফিরে আসে। ফেব্রুয়ারীর শেষ কিংবা মার্চের গোড়া থেকে এরা বাসায় থাকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তারপর বাসা ছেড়ে শীত কাটায় ঘন ঝোপে এবং চিরসবুজ ঝাড়ে।

দুঃখের কথা, এরা মানুষের চক্ষুশূল। হাত যেন উঁচিয়েই রয়েছে এদের আঘাত দেওয়ার জন্য। ফলে, শীতে এদের অনেকেই অকালে মারা যায়। প্রতি বসন্তে বিধবা এবং বিপত্নীকরা পুরোণো বাসায় ফিরে দেখে, নবীন দম্পতির নবীন ঘরকন্না এবং বুড়োদের সঙ্গে ছোঁড়াদের কলহে দাঁড়কাকের উপনিবেশ মুখর হয়ে ওঠে।

ফেব্রুয়ারী থেকেই দাঁড়কাকের বাসা অবিরাম কর্মচাঞ্চল্যে পূর্ণ। এরা বাসন্তী পরিচ্ছন্নতায় অভিযাননত্ত হয়। প্রতিটি বাসা ভালভাবে ঝেড়েপুঁছে, নতুন ক'রে মেজেঘষে, দেওয়াল নবীন শাখায় মেরামত ক'রে তবে নতুন বসন্তে নতুন জীবন সুরু করে। পপলার গাছের কচি ডালে দোল খেয়ে পর্যন্ত তা এরা ভেঙে নেয় বাসা মেরামতের জন্য।

নিচু থেকে দেখলে মনে হয়, দাঁড়কাকের বাসা অসংখ্য টুকিটাকির অবিন্যস্ত স্তূপ মাত্র বস্তুতঃ, বাসাটি মোটামুটি সুবিন্যস্ত। প্রতিটি ডাল দিয়ে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ বাসা চতুর শিল্পীর নিদর্শন। এ কথা ঠিক যে, ডিম রাখার গোলাকৃতি অংশটুকু তুলনায় ছোট, কিন্তু যেভাবে ওখানে নরম ঘাস, পাতা, পালক ইত্যাদি কাদা দিয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট করা হয়, তাতে এদের নির্মাণকৌশল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ওরা যে কিছুই চিন্তাহীনভাবে করে না, এটি তার অন্যতম উদাহরণ।

কৃতিত্ব অবশ্য মূলতঃ দাঁড়কাকীর, কারণ সেই প্রায় গোটা বাসাটাই তৈরী করে, তা বলে দাঁড়কাক আদৌ অলস নয়। বাসা তৈরীর প্রায় সব মাল মসলা যোগাড় করা ছাড়াও সে ধর্মপত্নীকে প্রতিদিন সুস্বাদু খাদ্য এনে জোগা

দাঁড়কাক ধূর্ত পাখী। এদের গার্হস্থ্য নিয়মকানুন কড়া এবং নিখুঁত। ছেলে-বুড়োনির্বিশেষে সবাই কয়েকটা নিয়ম মেনে চলে। একটি নিয়ম অনুসারে কেউ নিজের বাসা বাঁধতে অপরের বাসা থেকে কাঠকুটো নিতে পারবে না, তাকে সাধারণ বাসায় যোগ দিতে হবে। কেউ চুরি ক'রে ধরা পড়লে অন্যরা তাকে ভীষণ শাস্তি দেয়। তার পালক ছাড়িয়ে ঠোঁট আর নখ দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে আর সকলে। কখনও কখনও মেরেও ফেলে।

বাসা এত উঁচুতে এবং নাগালের বাইরে যে, এরা বাসা লুকোনোর কোনও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। সাধারণতঃ গোটা চারেক ডিম পাড়ে। রং মোটামুটি হাল্‌কা সবুজে, তাতে বাদামী আর ধূসর রঙের ছিটে। দাঁড়কাকীই ডিম ফোটানোর প্রায় সব ঝামেলা পোহায়, অনুগত পতিমহারাজ প্রত্যহ তাকে খাদ্য যোগায়।

সাধ্বী স্ত্রী পতির এই আনুগত্যকে খাদ্যগ্রহণের সময় গলা খুলে সাধুবাদ জানায়, পাখা ঝাপ্‌টে প্রকাশ করে মনের আনন্দ।

১৮ থেকে ২০ দিন লাগে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের করতে। বাচ্চাগুলো কুৎসিত---হাঁ করেই আছে যেন, সব সময় খাবার খেতে উৎসুক। প্রথম সপ্তাহে পিতৃদেবই গোটা গুষ্টিকে খাদ্য যোগান, কারণ মাতা ঠাকুরাণী তখন প্রায় সব সময় বাচ্চাদের ঢেকে বসে থাকেন। দ্রুতবেগে যে বাচ্চাগুলো সাবালক হয়, তা দেখলেই বোঝা সম্ভব। কর্তব্যে ত্রুটি দাঁড়কাক করে না। তার পর এক শুভ দিনে তার বউ তার সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহে যোগ দেয়। খাই ক্রমেই বাড়ছে, যোগানও তাই ক্রমে বাড়ানো অবশ্য প্রয়োজন। বাচ্চাগুলোর পালক ঔজ্জ্বল্যহীন। ওরাও শীগ্‌গিরই নিজেদের খাবার নিজেরা সংগ্রহ করতে শেখে।

একসঙ্গে শস্যক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি দাঁড়কাক করতে পারে ঠিকই, তবে করে কম এবং পোকামাকড় খেয়ে, ফেলে-দেওয়া নোংরা খেয়ে ওরা আমাদের যথেষ্ট উপকার করে।

—বিভা চৌধুরী

মার্জার ঃ মিশরীয় দেবতা

মিশরের অধিবাসীরা মার্জার পুজো করতো ভক্তিভরে।

তিন হাজার বছরেরও আগে তারা আফ্রিকার বন্য মার্জার পোষ মানায়। কালক্রমে বেড়াল তাদের পূজ্য হয়ে ওঠে। বেড়াল এবং বেড়ালের মূর্তিপূজা মিশরীয় ধর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং বেড়ালকে আহত করার শাস্তি ছিল চরম---মৃত্যুদণ্ড। বেড়াল মারা গেলে শোকচিহ্ন হিসেবে ভ্রূ কামানো হত এবং মৃত বেড়ালকে প্রায়ই কবর দেওয়া হত বিশিষ্ট ব্যক্তির শবদেহের মত সাড়ম্বরে।

এইসব 'পূজ্য' বেড়ালই য়ুরোপ-আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত প্রায় সব বেড়ালের পূর্বপুরুষ। কয়েক শ' বছর ধরে য়ুরোপ-এর বনবেড়ালের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এদের উদ্ভব। মিশ্রণজাত বেড়ালের রং এবং আকৃতি বহু বিচিত্র, এদের মধ্যে ২৬টি 'শুদ্ধ' রকম প্রদর্শনীরূপে ব্যবহৃত---প্রায় চ্যাপ্টামুখো লম্বা চুলঅলা নীল থেকে শুরু ক'রে ইংলণ্ডীয় ট্যাবী পর্যন্ত এই দলে। কিন্তু এদের একটি প্রজাতি মিশরীয়দের দ্বারা পূজিত প্রজাতিরই প্রায় সমগোত্রীয় বলে মনে করা হয়।

দুর্লভতম 'শুদ্ধ' বেড়ালের এই প্রজাতি 'অ্যাবিসিনীয়' নামে পরিচিত। বর্তমানে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় এই বেড়ালের মালিক-সংখ্যা পঞ্চাশ ক'রে। ইংলণ্ড থেকে আমদানীকৃত অ্যাবিসিনীয় বেড়ালই আমেরিকায় সযত্নে লালিত। ফ্রান্স-এ এদের সংখ্যা ডজনখানেক, ডেন্‌মার্কে দুই, কিন্তু খোদ অ্যাবিসিনিয়ায় একটিও নেই। পৃথিবীর অন্যত্রও না। এই বিস্ময়কর তথ্যটি কিছুদিন আগে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মুষ্টিমেয় মালিকদের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে। তারা 'নতুন রক্ত' আমদানী করতে উৎসুক হলে তথ্যটি জানা যায়। অ্যাবিসিনিয়ায় বেড়াল এমনিতেই দুর্লভ (শ'খানেক বছর আগে জনৈক লেখক লিখেছিলেন, বেড়াল থাকার 'গুণে' একজন অ্যাবিসিনীয় বালিকা উত্তরাধিকারীরূপে বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়), ইতালীয় যুদ্ধের পর তা একেবারে লোপ পেয়েছে।

গোষ্ঠীটিকে 'অ্যাবিসিনীয়' বলার কারণ, এই প্রজাতির প্রথম বেড়ালটি অ্যাবিসিনিয়া থেকে ইংলণ্ড-এ আনা হয়েছিল। কিন্তু মিশরীয় চিত্রপর্যবেক্ষণ এবং বেড়ালের মামী পরীক্ষা ক'রে অনেক বিশেষজ্ঞ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এরা মিশরীয়দের 'পূজ্য' বেড়ালের বংশধর না হলেও অন্য যে-কোন প্রজাতি অপেক্ষা তাদের বেশি কাছাকাছি। আকৃতি এবং রঙের মিল ছাড়াও আধুনিক অ্যাবিসিনীয় বেড়াল প্রাচীন মিশরীয় বেড়ালের কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সে-কালের দেয়াল-চিত্রে দেখা যায়, এরা শিকার করা পাখি মুখে ক'রে নিয়ে আসছে। আধুনিক অ্যাবিসিনীয় বেড়ালের মধ্যেও এই প্রবৃত্তি সংলক্ষ্য। ওদের জলের মধ্যেও দেখা যায় এবং এখন এদের মালিকরা লক্ষ্য করেছেন, বেড়ালের স্বাভাবিক জলভীতি এদের মধ্যে নেই! জনৈক ইংরেজ মালিকের অ্যাবিসিনীয় বেড়ালটি নদীর জলে ইঁদুর, মাছ, এমন কি সাপ পর্যন্ত খেতে যেত।

প্রমাণ হিসেবে প্রাচীনতম প্রজাতির মধ্যে এদের ভয়হীনতা এবং বন্ধু-জনোচিত বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়। হাজার বছরেরও আগে বৃটেনে বেড়ালের আগমন এবং সেই থেকে এরা স্নেহ-

ভালবাসা এবং মর্যাদা পেয়ে আসছে। মানুষের সঙ্গে এই সুদীর্ঘকাল বাস করার ফলে অ্যাবিসিনীয় বেড়াল খুব জনপ্রিয় না হলেও মালিকরা এদের ক্ষমতা এবং সঙ্গদানের বৈশিষ্ট্য উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেন।

এই বেড়াল খুব কম মানুষই দেখেছেন। এর বর্ণনা দুঃসাধ্য। কারণ, রং তেমন চোখে পড়ার মত নয়, ক্যামেরাতেও এর সূক্ষ্ম রংবাহার তেমন খোলে না। অথচ, এইটাই এর আকর্ষণ। প্রত্যেকটি চুলে তিন রং, ঘসা বাদামী থেকে কালো বা ঘোর পিঙ্গল। লাল্‌চে আভা ফুটে বেরোয়। সামনের পায়ের ভেতর এবং পাকস্থলীর তলার দিকের রং লাল্‌চে বাদামী, মূল রঙের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। ভাল নমুনায় গাঢ় 'ট্যাবী'-সুলভ চিহ্ন নেই। লোম সুন্দর রেশমী।

এদের মাথা লম্বা এবং ছুঁচলো; থাবা ছোট। সাধারণ বেড়ালের মাথা গোলগাল। চেহারা অদ্ভুত রমণীয় এবং নমনীয়। চলনের শোভা মার্জারের বাঘের কথা মনে করায়, অন্য প্রজাতির মধ্যে এ বস্তু চোখে পড়বে না। চোখ দু'টি দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল, রং হলুদ কিংবা সবজে, কান লম্বা এবং সতর্ক। নমনীয় সৌন্দর্যে এর সঙ্গে সম্ভবতঃ একমাত্র সিয়ামীজ্ বেড়াল তুলনীয়। তবে, এদের শান্ত কণ্ঠ সিয়ামীজদের নেই। এরা দৌড়ঝাঁপে সিয়ামীজ বেড়ালের সমকক্ষ, কিন্তু ওদের মত উত্তেজিত হয় না।

এদের রং এবং আকৃতি চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু প্রদর্শনযোগ্য বেড়াল উৎপাদন এত ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার যে, এদের অস্বাভাবিক এবং মনোমুগ্ধকর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া তা আদৌ সম্ভব হত কি-না সন্দেহ। সব মালিকই সোৎসাহে বলেন, এরা কৌতুকপ্রদ এবং অতুলনীয়---মাধুর্য আর সঙ্গদানের ব্যাপারে। এরা মানুষের সঙ্গপ্রেমী, বস্তুতঃ এটা এদের প্রয়োজন এবং অনেক সিয়ামীজ্ বেড়ালের মত বেড়াতে নিয়ে গেলে অত্যন্ত খুশী হয়।

প্রায় শ'খানেক বছর আগে 'ম্যাপিয়ার' অভিযানের অন্যতম অফিসার সম্ভবতঃ প্রথম অ্যাবিসিনীয় বেড়াল ইংলণ্ডে নিয়ে আসেন। পরের পনের বছর ক্রমে বেশি সংখ্যায় ওদের প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এরা হু হু ক'রে সংখ্যায় না বাড়ার ফলে এবং অন্যান্য কারণে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ধীরে ধীরে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম অ্যাবিসিনীয় বেড়ালের ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ঐ ক্লাবের রেকর্ডে শ'খানেক অ্যাবিসিনীয় বেড়ালের উল্লেখ রয়েছে।

খাওয়ানোর অসুবিধা এবং নিরাপত্তার জন্য আমেরিকায় প্রেরণ---দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই দুই কারণে প্রদর্শনী এবং মিলন প্রায় অসম্ভব হওয়ায় বৃটেনে এরা যুদ্ধকালে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৪৫ থেকে অবশ্য আবার সংখ্যা বাড়তে থাকে।

প্রায় বছর আশি আগে আমেরিকায় প্রথম অ্যাবিসিনীয় বেড়াল রপ্তানী করা হয়েছিল। মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এরা ছিল বিরলদৃষ্ট, যুদ্ধান্তে হঠাৎ সংখ্যা বেড়ে ওঠে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় এখন সম্ভবতঃ সমান সংখ্যক অ্যাবিসিনীয় বেড়াল দেখা যাবে। শেষোক্ত দেশের মালিকরা যদিচ এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁরা এদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতিসাধনের জন্য একটা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহাযুদ্ধের আগে ফ্রান্সে মাত্র দু'টি ছিল। যুদ্ধকালে তারা নিশ্চিহ্ন, কিন্তু এখন সেখানে কুড়িরও বেশি সংখ্যক অ্যাবিসিনীয় বেড়াল আছে। ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশেও এর চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে।

মনে হয়, তিন হাজার বছরেরও আগে আফ্রিকার যে বন্য মার্জারকুল মিশরীয়রা পোষ মানিয়েছিল, তাদের উত্তরপুরুষ ক্রমে বিশ্বময় পড়িবে সবে ছড়ায়ে।

—বসুবন্ধু

সাম্প্রতিক এক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকটি মার্জার শাবক

গির্ অঞ্চলের গোধন

বাংলাদেশে দুধ দুর্মূল্য। খাঁটি দুধ প্রায় অমিল। এখানকার গরুগুলোর চেহারা আজও ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের ২০ বছর পরেও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দুর্গাহাসম্বল গ্রাম বঙ্গনন্দনের মত। দুধ দেবে কোত্থেকে? গির্ অঞ্চলের গরুগুলোর যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই তাদের দুধ দেওয়ার ক্ষমতা। বম্বে এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গির্ অঞ্চলীয় গরু সর্বাধিক জনপ্রিয়।

সিন্ধি, শাহীওয়াল্ ইত্যাদি জাতের মত গির্-গরুও প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়। ডেয়ারী-তে বাচ্চা হলে এগুলো ৪,০০০ পাউণ্ড দুধ দেয় নিয়মিত। তবে, ৬,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত দুধ দেওয়ার ঘটনা ঘটে ডেয়ারী-র বাইরে।

কাথিয়াবাড় অঞ্চলের গির্ অরণ্য এবং তৎসংলগ্ন অরণ্যভূমি এদের আদি বাসস্থান। ভূতপূর্ব জুনাগড়, ভবনগর আর বরোদা রাজ্যে এদের পর্যাপ্ত সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে। পেশাদার গো-উৎপাদকরা যে কেবল এদের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়েছেন তাই নয়, বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যাপারেও তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক। কেবল দুগ্ধবতী গরু নয়, এঁড়ে বাছুর রক্ষণাবেক্ষণও এরাই করে সাফল্যের সঙ্গে।

বছর দু'য়েক বয়স হলেই চাষীরা ষণ্ড কিনতে চায় কাজে লাগাবে বলে। বহু দূরের পথ অতিক্রম করার জন্য এগুলো খুব মজবুত বাহন।

গির্ অঞ্চলের গরুর রং সাধারণত লাল। তবে, হল্‌দেটে লাল থেকে প্রায় কালো রঙের গরুও চোখে পড়ে। শাদার ওপর গাঢ় লাল বা খয়েরী ছোপঅলা গরুর সংখ্যাও যথেষ্ট। দেহের এক বা উভয়দিকে গাঢ় বা হাল্‌কা রঙের জোরালো পোঁচ্ এদের বৈশিষ্ট্য।

গির্-গরুর মাথার সামনেটা বেশ চওড়া,—চোখে পড়ার মত। মনে হয় যেন, মাথার সামনে একটা ভারী, চওড়া হাড়ের ঢাল সাঁটা রয়েছে। এটা এতখানি চওড়া যে, চোখের খানিকটা ঢাকা পড়ে এবং তার ফলে ওগুলো দেখলে কিছুটা বিমর্ষ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কান দু'টো লম্বা এবং দোলায়মান, অনেকটা কোঁকড়ানো পাতার মত। শিং দু'টো অদ্ভুতভাবে বাঁকানো। গলকম্বল মোটামুটি বড় সড়।

গত শতাব্দীর শেষার্ধে বহু সংখ্যক গির্ অঞ্চলের গোধন ব্রেজিল-এ রপ্তানী করা হয়েছিল। সেখানে 'বীফ্-ক্যাট্‌ল' হিসেবে এদের রক্ষা করা হয়েছে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে।

বঙ্গীয় গোধন সংখ্যায় যাই হোক্ না কেন, তার দুগ্ধ-সম্পদ অনুল্লেখ্য। গির্ থেকে গরু আনা যায় না কি? ষণ্ড আমদানী ক'রে মিশ্রিত গো-প্রজাতির জন্ম দেওয়াও কি কঠিন ব্যাপার?

কাংক্রেজ্ গোধন

কয়েক জাতের গরুর খ্যাতি অনেক দুধ দেওয়ার জন্য। আবার কয়েক জাতের ষাঁড় জমি চষা, বোঝা বওয়া বা অন্যান্য ভারি কাজ অনায়াসে করার জন্য বিখ্যাত।

ভারতে কয়েকটি জাত আছে, যে গরু ভাল দুধ দেয় এবং ষাঁড় খুব পরিশ্রমী। কাংক্রেজ্ জাতের গরু দুধ দেয় প্রচুর, ষাঁড় বোঝা বইতে

দ্রুপটু। অর্থাৎ, এই জাতটি দ্বিমুখী উদ্দেশ্যসাধক।

এদের জন্মভূমি কুচের রান্ অঞ্চল। গরুগুলো বেশ দুগ্ধবতী, যদিও সিন্ধি বা তার্পার্কর্ গরুর তুলনায় নীরেস। ষাঁড়গুলো চট্পটে, কর্মক্ষম, শক্তপোক্ত এবং কী জমি চষাতে, কী গাড়ি টানতে খুবই পটু।

এদের মুখ সরু, কপাল চওড়া, কিছুটা চ্যাটালো। বড় বড় চোখের পাতার ওপরটা কোঁচকানো। সুসম, পুরু শিংগুলো সুঁচলো, পেছন দিকে হেলানো। উদরগহ্বর গভীর, লম্বা এবং আঁটোসাঁটো। দণ্ডবৎ ঋজু, সবল পায়ের ক্ষুরগুলো কঠিন। বাঁটগুলো মাঝারো আকৃতির এবং দেখতে সুন্দর। এদের রং সাধারণতঃ রূপালী বা ধূসর। এঁড়ে এবং বক্না বাছুরের সমান কদর। পালক দুয়েরই সমান যত্ন নেন। কারণ, দুটিই প্রয়োজনীয়।

পশু প্রজননে নয়া সাফল্য

সম্প্রতি এক আশার খবর পাওয়া গেছে যে, হিমাচলপ্রদেশের মাণ্ডি অঞ্চলের শ্রীশান্তি গুপ্ত নামে এক ব্যক্তি পশ্চিম জার্মানীতে বৎসরাধিককাল অতিবাহিত করেছেন গো-মহিষাদির প্রজনন ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি গবেষণার বিষয় নিয়ে। তাঁর গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, গো-মহিষাদির বিকল্প প্রজনন ব্যবস্থা। তাছাড়া এই পদ্ধতি গৃহ-পালিত জন্তুদের ওপরও সমভাবে প্রয়োগ করে সফল হওয়া যায় কি না এবং এর দ্বারা চাষের সফলতা ও মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব কিনা। পশুদের উত্তম অবদান এবং প্রোটিনযুক্ত শাক-সব্জি ভবিষৎ - পৃথিবীর মানবজাতির পুষ্টির সহায়ক হবে এবং সেজন্য তিনি উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছেন যে, একটি মুরগী বছরে ২৫০টি ডিম প্রসব করতে পারে। আর একটি গরু বছরে ৩৫০০ লিটার থেকে ৪০০০ লিটার দুধ দিতে পারে।

শ্রীগুপ্ত তাঁর স্বদেশ মাণ্ডিতে ফিরে এসেছেন। 'ইণ্ডো-জারমান এগ্রিকাল-চারাল টিম' এখন সেখানে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। তাঁরা এই পরিবর্তনীয় প্রজনন পদ্ধতির দ্বারা উচ্চভূমি-অঞ্চলের গো-মহিষাদির ওপর প্রয়োগ করে উল্লেখযোগ্য ফল লাভ করেছেন। শ্রীশান্তি গুপ্তর এই কিম্ভূতকিমাকার নয়া প্রচেষ্টার দ্বারা যাদুকরী পৃথিবীর পিতামাতার নয়া রূপদান করবেন। মাণ্ডি সমীক্ষার দ্বারা উদাহরণস্বরূপ গরুর দুধ অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। যা পাওয়া গেছে, তা হলো ১০০০ থেকে ১৫০০ লিটার এবং যা পাওয়া যাবে সম্ভবত এই অসাধারণ প্রক্রিয়ায় ৩০০০ লিটার।

শ্রীশান্তি গুপ্ত প্রজনন পদ্ধতির নয়া প্রয়োগে সাফল্য লাভ করবেন এবং আশা করা যাচ্ছে, তার দ্বারা দুধের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে যাবে। তিনি তাই পরীক্ষা চালাচ্ছেন ক্রমান্বয়ে। পশ্চিম জার্মানী 'নিয়সটাট - আইচ' প্রজনন কেন্দ্রে তিনি বহু শিশু ষাঁড়ের ওপর প্রয়োগ করেছেন নয়া পদ্ধতি এবং তার দ্বারা তিনি বহু উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়েছেন। পোল্ট্রি ফার্মিং-এ অপর উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুরগীর ক্ষেত্রে শতকরা ৯৭ ভাগ সাফল্য লাভ করেছেন। শ্রীগুপ্তের মাণ্ডি অঞ্চলে 'ইণ্ডো-জারমান' এগ্রিকালচারাল টিম' চাষীদের যথেষ্ট সহায়তা করেছেন এবং ফলস্বরূপ দুধ পাওয়া গেছে ১৯৬৪ সালে ১'১৭ লিটার থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৫'৪০ লিটার। যখন শ্রীগুপ্ত নিজ অঞ্চলে পশ্চিম জার্মানী থেকে ফিরে এসেছেন তখন তিনি বহু সময় নষ্ট করবেন দুধের ক্ষেত্রে এবং মুরগী-হাঁস পালনের ক্ষেত্রে, ভেড়া ভেড়ার প্রজনন ক্ষেত্রে। তাঁর উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হতে চলেছে।

টেনিস জগতের বারাণসী

লণ্ডন-এর সহরতলীতে পৃথিবীর সর্বাধিক বিখ্যাত ও পরিচিত এবং সযত্ন লালিত এক খণ্ড তৃণাচ্ছাদিত জমি রয়েছে। লম্বায় এটি একশ' চৌত্রিশ ফুট, চওড়ায় বাহাত্তর ফুট। এই বিরাট ভূমি খণ্ডর চারপাশে দেওয়াল এবং দেওয়াল আইভী-লতাচ্ছাদিত। নয়নমনোহর হরিৎ আচ্ছাদন।

অনেক রোমাঞ্চ এর ঘাসে ঘাসে ঢুকে হয়ে রয়েছে। অনেক নাটকীয় মুহূর্ত, মানসিক উদ্বেগ, চালিয়াতি, আর উত্তাল আনন্দোচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করেছে। সবুজ ঘাসে ঢাকা এই ভূমিখণ্ড।

উইম্বলডন---টেনিস জগতের বারাণসীর বর্ণনা দিচ্ছিলাম এতক্ষণ। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই জমির আগাছা সাফ্, ঠিক মাত্রামাফিক জলসিঞ্চন এবং অন্যান্য আর পাঁচটা যত্ন নেওয়া হয়, যাতে জুন মাসে মাত্র দিন বারো আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতি-যোগিতার সময় মাঠের অবস্থা একেবারে নিখুঁত থাকে।

বিবেকানন্দের মানবতাবাদ

শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য

সেদিন ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে চা খেতে খেতে একদল তরুণ-তরুণী তাদের আগামী বিপ্লবের কথা বলছিল। কি করে তারা জারকে হঠিয়ে দিয়ে ফরাসী দেশের মত রিপাবলিক গড়ে তুলবে রাশিয়ায়, তারই পরিকল্পনায় তারা যখন মগ্ন হয়ে উঠেছে, তখন বিষণ্ণ ডস্টয়েভস্কি আস্তে আস্তে তাদের থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—Stay children, what we need in order to regenerate the world is not an act of violence but a great deed, a great revolution from withen---পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে হলে যা চাই, তা হিংসাত্মক কাজ নয়, তার চেয়েও বড়, অনেক বড় কাজ এবং সেই কাজ হল মহান্ বিপ্লব, যে বিপ্লব অন্তর থেকে উৎসারিত হবে।

বিক্ষুব্ধ তরুণ-তরুণীরা প্রতিবাদ করে উঠলেন : কি করে আপনি আপনার মহান্ বিপ্লবের কাজে সকল মানুষকে জড়ো করে আনবেন?

ধীরে ধীরে ডস্টয়েভস্কি বলতে লাগলেন---why do we need to summon all men---সকল মানুষকে ডাকার দরকার কি?

Do you realise how powerful one right man be? Let there appear one right man and all will follow him!---একজন খাঁটি সৎ লোক কী অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী, তা তোমরা জান? তেমনি একজন মহান্ ব্যক্তির আবির্ভাব হলে মানুষ দলে দলে তাঁকে অনুসরণ করে চলবে।

সেই 'One right man'—ইস্পাতের মত খাড়া, কঠিন, তীক্ষ্ণ একটি মানুষের কথা মনে এলে স্বামী বিবেকানন্দের ছবিটি মনে পড়ে। সেই জ্বলন্ত দু'টি চোখ, যে চোখে মধ্যাহ্ন-সূর্যের শপথ, সেই উন্নত দেহ অথচ সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতা যাঁর সারা অঙ্গে। সমগ্র ভারতবর্ষে, সমগ্র ভারতবর্ষেই বা কেন, সমগ্র পৃথিবীর মহান্ বিপ্লবীদের মিছিলে এ মানুষ যেন একটি কঠিন স্বতন্ত্র সত্তা।
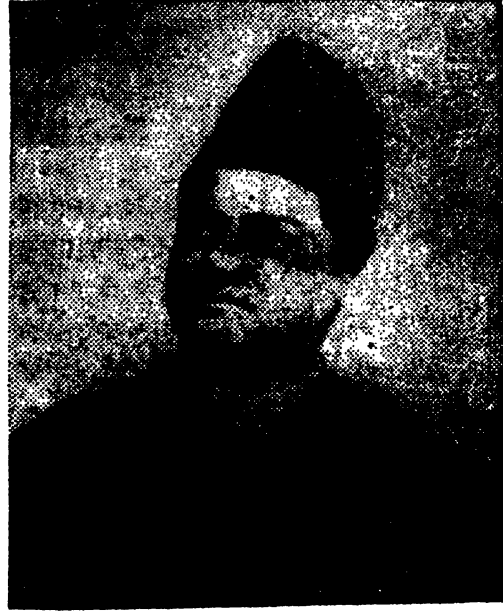
শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন : নরেন যেন খাপখোলা তলোয়ার এবং সেই খাপখোলা তলোয়ার নিয়েই এই নির্ভয় মানুষটি সমাজের সব কুসংস্কারের শেকড় ছিন্ন করতে আমৃত্যু এগিয়ে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারতবর্ষের সেই মৃতপ্রায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে---যখন জাতিকে একটা প্রবল নাড়া দেবার প্রয়োজন ছিল। পরাধীনতা, আত্মসম্মানহীনতা, ঈর্ষা, দলাদলি, কুসংস্কার যখন জাতিকে স্থবিরতর করে তুলছিল, সেই সময় একটি জ্বলন্ত যৌবন নিয়ে এলেন বিবেকানন্দ। ধর্ম, পূজার্চনা সব কিছুর মধ্যে সৃষ্টি করলেন একটা বিপ্লব বললেন, যদি দেবতার সন্ধান চাও, তবে পীড়িত, দরিদ্র, নিঃস্ব মানুষের মাঝে এসে দাঁড়াও, তাদের সেবা কর। পড়েছ—মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব। আমি বলি, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—এরাই তোমার দেবতা হোক। যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম?

জাতিভেদ প্রথার মধ্যে মানবাত্মার যে অপমান পুঞ্জীভূত হয়েছিল, মানবতাবাদী বিবেকানন্দের পক্ষে তাকে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। জাতি নয়, বংশ নয়, অর্থ নয়, মানুষকে তার স্বমহিমায় ও মর্যাদায় স্বীকার করে নেওয়াই মানবতাবাদের মূল কথা।

Man is the measure of all things. তাঁর সারা জীবনের সাধনায়

শকুন্তলা

শ্রীমতী [illegible] দেবী

বিস্মৃত দিনের কোন্ বিস্মৃত বরষে,
প্রফুল্ল প্রভাতকালে কিংবা দিবাশেষে,
কবে কোন্ শুভলগ্নে না জানিরে জনম আমার?
সেদিন কি অন্তস্তল ভেদি দীর্ঘশ্বাস বহেছিল
এই বসুধার?
সেদিন কি কেঁদেছিল স্তব্ধ যত ম্লান বনভূমি?
সেদিন কি কেঁদেছিল উত্তরোলে উতলা তটিনী?
[illegible] কোন্ ধূমকেতু,
রচিল নিঃশব্দে মোর দুর্ভাগ্যের নিরলম্ব সেতু?
সেই সেতু পার হয়ে আসিলাম তোমার দুয়ারে,
বিনে অভিজ্ঞান আজি চিনিলে না মোরে।
স্মৃতির দুয়ারখানি খুল দেখ প্রিয়,
কার অঙ্গে পরাইলে তব অঙ্গুরীয়।
কার উত্তরীয়ে প্রান্তে বাঁধা ছিল উত্তরীয়খানি
একটি প্রণামকালে এঁকেছিলে কার ভালে
চির আশীর্বাণী।
একদিন আধো আলো আধো অন্ধকারে
দূর নীল তমসার তটে,
চিনেছিল একজন, পরম সোহাগে
ঢেকেছিল মোরে তার উষ্ণ পক্ষপুটে।
মোর লাগি মর্মে মর্মে তার লেগেছিল দোল,
তারি পরিচয়ে আজ আমি শকুন্তলা।
ছিঁড়েছে বন্ধন মোর;
বিস্মৃতির চিতাভস্মে পরিব কুঙ্কুম।
আমি রব পথপ্রান্তে একধারে—
গোত্রহীনা বনের কুসুম।

[illegible] এই বাণী চিরন্তন হয়ে আছে—"মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" তথাকথিত নীচু জাতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার, তার দুঃখ ও অপমানের দায়-ভাগে নিজেকে অংশীদার করার শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে দিয়েছেন। মেথরের প্রতি যাতে ঘৃণার ভাব না থাকে, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর রাতে উঠে মেথরদের ঝাড়ু হাতে নিয়ে মন্দিরের নর্দমাদি পরিষ্কার করতেন। নিজে নানা জাতির ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করতেন। পংক্তি-ভোজনের স্থান পরিষ্কার করতেন। মৃত্যুপথযাত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকের উপকার হয়, তবে তাহার জন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।

পরাধীন ভারতবর্ষের নিস্তরঙ্গ সমাজের ভীরু মানুষদের তিনি একবার নাড়া দিয়ে বলে উঠলেন: হে ভারত, ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

আমাদের ঘরের কাছে, আমাদের ইতিহাসের নিকটতম অধ্যায়ের মধ্যে এমনি একটি বিরাট মানুষ জন্মেছিলেন [illegible] ভাষায় যাঁকে—One right man বলা যায়, তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল মাত্র শত বৎসর আগে। তাঁকে আজ স্বাধীন ভারতের নির্মীয়মান দিনগুলিতে নতুন করে স্মরণ করতে হবে। কারণ, স্বাধীনতার অর্থই হোল মানুষের সেবার অধিকার অর্জন। ব্যক্তিগত জীবনের সীমারেখার অনেক ঊর্ধ্বে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন আর ব্যক্তিগত মুক্তি-চিন্তার অতীত লোকে—যিনি মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ সম্মানকে স্থান দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আজ এই [illegible] তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

— [illegible]

[ছোট গল্প]

পাপ

সুভাষ সমাজদার

খেয়ে নে সোরাবী মহব্বত। বাদশা, তুইও খা। চানা, ভুষি, বালি আর ঘোষের ঘন দুধ দিয়ে খুব ভাল খানা তৈরি করেছি—খেয়ে নে—ভোরের আবছায়া অন্ধকার জড়ানো হর্স ওয়ার্ডের গাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতরে কার যেন চাপা সুরে ফিসফিস কথা ফুটে উঠল। এত আদর করে এই সাতসকালে ভাগাড়ের দিকে পা বাড়ানো ঘোড়াগুলোকে খাওয়াচ্ছে কে? ভেটেরিনারী কলেজের হর্স ওয়ার্ডের সুপারিনটেন্ডেণ্ট সমর রায় তাঁর কোয়ার্টারের দোতালা থেকে নিঃশব্দ নেমে এল। ঘোড়ার পায়ের নাল তৈরির জন্য কামারশালার পাশ দিয়ে লম্বা টিনের শেডের কাছে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একী। কাঠের রেলিং দেওয়া এক-একটা ঘরে যেখানে সোরাবী মহব্বত, বাদশা, নবদ্বীপ নামে ঘোড়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, সেখানে ঐ কেয়ারটেকার সুখাইয়া এত সকালে ঘুর-ঘুর করছে কেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সমর দেখল, পরম আদরে সোরাবী মহব্বতের গলাটা জড়িয়ে ধরল সুখাইয়া আর ডান হাত দিয়ে একথাবা চানা আর ভুষির মণ্ড তুলে নিয়ে তার মুখে গুঁজে দিল। মসমস্ করে মহব্বত খেতে লাগল, তার খাওয়ার দিকে তাকিয়ে সুখাইয়ার কোঁচকানো চোখ দুটোর দৃষ্টি যেন কি একটা অনুভবের সুখে স্নিগ্ধ হয়ে এল। চাপা অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলল—রামজী, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হবে? ভুষিমাখা হাত দুটো নিজের মুখের সামনে তুলে ধরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কি যেন দেখতে লাগল সুখাইয়া। বিষাক্ত একটা যন্ত্রণায় তার মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। হাতে কি হয়েছে ওর? লোকটা পাগল নয় তো। কৌতূহলে জ্বলে যেতে লাগল সমরের চোখ দুটো।

—চিঁ---হিঁ করে ডেকে উঠল "মাস্টার দিল্লী" ছুটে এল তার কাছে সুখাইয়া। মাস্টার দিল্লীর মুখে এক থাবা ভুষি গুঁজে দিয়ে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—মাস্টার দিল্লী, তুই রাগ করেছিস? না। পাগল নয় লোকটা। ঘোড়াদের অতিরিক্ত ভালবাসে। যত্ন করে। নিজের হাত দুটোকে বারে বারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাটা হয়তো কোন মুদ্রাদোষ। সুখাইয়ার অলক্ষ্যে যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল সমর।

একে একে সব ঘোড়াকে খাওয়ানো হয়ে গেল। হর্স ওয়ার্ড ছেড়ে আসার আগে সারি সারি দাঁড়িয়ে-থাকা ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে সুখাইয়ার চোখে বেদনার ছায়া নামল। এই সোরাবী মহব্বত, পবনসুত, বাদশা—সব, সব ঘোড়াকে এ্যানাটমী বিভাগে নিয়ে গিয়ে জবাই করে তাদের দেহের অংশগুলোকে ছাত্রদের দেখানো হবে। একদিন কত আদর করে ওদের মালিকরা ওদের এইসব নাম রেখেছিল। যেই একটু বয়স হয়ে গেছে ঘোড়াগুলোর, তখুনি ওদের পরিণতি জেনেই মালিকরা এখানে বিক্রী করে গেছে। কেন? শুধুই কি টাকার লোভে? না। উল্টাডিঙির হনুমান ফ্লাওয়ার মিলের হেড দারোয়ান, পণ্ডিত শিউপ্রসাদ দোবেজী বলে, যন্ত্রের যুগ রে সুখাইয়া। হাওয়াগাড়ী, সাইকেল না রেখে বড়লোকরা কি ঘোড়া রাখবে? ঠিকই বলেছে দোবেজী। রাস্তায় রাস্তায় গর্জন করে ছুটে-চলা ঐ দোতলা বাস, ছোট ছোট ট্যাক্সী, সাইকেল-গুলোর জন্যই আজ এই ঘোড়াগুলো নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছে। ক্রুদ্ধ চোখে দৈত্যের মত দোতালা আর একতলা সরকারী বাসের শব্দে কম্পিত বেলগাছিয়া মেন রোডের দিকে তাকালো সুখাইয়া।

বেলা বাড়ল। আউট ডোরে রুগ্ন ঘোড়া, গরু আর কুকুরের ভিড় কমে গেল। সকালের উজ্জ্বল রোদে বেলগাছিয়ার চকচকে পীচের রাস্তাটা ধারালো কালো ইস্পাতের অস্ত্রের মত ঝকমক করছে। রাস্তার ধারে মোহিনী বিড়ির দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল

কুঁজোহয়া। এইখানেই এক বছর আগে তার একমাত্র ছেলে বাসুদেব দোতলা বাসের নিচে চাপা পড়েছিল। মাথাটা থেঁতলে রাস্তার সঙ্গে পিষে গিয়েছিল। ঘন লাল তাজা থক্‌থকে রক্তের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে-থাকা বাসুদেবের বিকৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে সে কাঁদতে পারে নি সেদিন। বদ্ধ একটা উন্মাদের মত বিচিত্র দৃষ্টিতে নিজের হাত দুটো দেখেছিল আর অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করে বলেছিল, রামজী তার পাপের শাস্তি দিয়েছে তাকে। ডুক্‌রে কাঁদতে কাঁদতে এসে বাসুদেবের দেহের ওপরে আছড়ে পড়েছিল তার মা—জানকী। আজও জানকী তার কোয়ার্টারের ছোট ঘরটার অন্ধকার কোণে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর থেকে থেকে সাপিনীর মত ফুঁসে ওঠে তাকে বলে—তোর পাপেই।

পাপ। হ্যাঁ ঠিকই বলে জানকী। রোদ-জ্বলা বেলগাছিয়া মেন রোডের ধারে দাঁড়িয়ে সেই দুঃসহ জ্বালাধরা স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে যায় সুখাইয়া। এত যত্ন করে সে ঘোড়াগুলোকে খাওয়াচ্ছে, এত আদর করছে, তাতেও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না? অসহ্য একটা অস্থিরতায় সুখাইয়ার হাত দুটো নিস্‌পিস করতে থাকে। আজই রাত্রে যেতে হবে দোবেজীর রামায়ণ গানের আড্ডায়। দোবেজীকে সে সব বলবে। বহুদিন রামায়ণ শোনাও হয় নি। তার মনের তীব্র অস্বস্তিটা কমে গেল। কিন্তু বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কি হবে কোয়ার্টারে গিয়ে। সেখানে গেলেই জানকী হিংস্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবে। ও বোধহয় পাগলই হয়ে যাবে। সুখাইয়ার বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পাইকপাড়ার রাজবাড়ির সামনে বিশাল মাঠে সন্ধ্যা নেমেছে। বটগাছের নিচে একদল লোক গোল হয়ে বসে তন্ময় হয়ে দোবেজীর রামায়ণ পাঠ শুনছে। মৃদু করুণ একটানা সুরে রামায়ণ শুনতে শুনতে বুক ঠেলে কান্না আসে সুখাইয়ার। তার ঠেলে-ওঠা গালের হাড়ের ওপরে অশ্রুর বিন্দু ঝিক্‌মিক করে। সবাই চলে গেলে সে আকুল হয়ে দোবেজীকে বলল, দোবেজী, ঘোড়াগুলোকে খুব যত্ন করছি, তাতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না? কোন কথা বলল না দোবেজী। তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে দোঁহা আওড়াল—

শুভ আর অশুভ করম অনুসারী।
ইস দেই ফল হৃদয় বিচারী॥

একটু থেমে উদাস গলায় বলল, দেখ সংসারে এসে যে পুণ্যকাজ করে, সে ভাল ফল পায়, আর যে পাপ কাজ করে রামজী তাকে দুঃখ দেয়, শাস্তি দেয়। ঘোড়াগুলোর সেবা করছিস, তাতে তোর ভাল হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু—

সেদিন রাত্রে আরও অনেক কথা বলেছিল দোবেজী। কিন্তু ঘোড়াদের খুব যত্ন করলে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে শুনেই আনন্দে ভরে গিয়েছিল সুখাইয়ার মন। বাড়িতে এসেই জানকীকে বলল—তুই গোঁসা করিস না। আমার পাপের জন্য রামজী আমাকে মাফ করবে। আবার আমাদের কোলে বাসুদেব আসবে। চোখ দুটো জলজল করছিল সুখাইয়ার। কিন্তু—

কিন্তু পরদিন সকালে হর্স ওয়ার্ড থেকে সব ঘোড়াকে খাইয়ে যে-ই সুখাইয়া বাইরে বেরিয়েছে, অমনি একজন বেয়ারা এসে বলল—তোমাকে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব ডাকে—

হর্স ওয়ার্ডের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সমরের ঘরে এসে দাঁড়াল সুখাইয়া হাতজোড় করে।

সমর বলল—তোমার নামে অর্ডার আছে। বদলী। এ্যানাটমী ডিপার্টমেণ্ট। তুমি—

—বদলী। অ্যানাটমী ডিপার্টে। আতঙ্কের ছায়া পড়ল তার মুখে। সমরের পা দুটো শক্ত করে চেপে ধরে বলল, বাবু, আমার বদলী রদ করিয়ে দিন—আমি পারবো না—

—প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের অর্ডার। আমার কোন হাত নেই, বড়সাহেবের অর্ডার। উঠে দাঁড়াল সুখাইয়া। চোখ দুটো দু'খণ্ড আগুনের মত চক্‌চক্‌ করে উঠল। ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলল, নোকরী আর করবো না বাবু—বলেই ঝড়ের বেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চীৎকার করে সমর বলল, শোন—শোন—সরকারী চাকরী। রাগের মাথায় এমন বেকুবি—

কিন্তু কে শোনে কার কথা। সুখাইয়া তখন উন্মত্ত একটা আবেগে ছুটে চলেছে এ্যানাটমী ওয়ার্ডের দিকে। ওয়ার্ডের সামনে রাশি রাশি সূর্যমুখী আর কলাবতী ফুলেভরা বাগানের ভেতরে এসে দাঁড়াল। একটা নয়, দুটো নয়, আট বছর ধরে সে সোরাবী মহব্বত আর মাস্টার দিল্লীর মত শত শত ঘোড়ার সামনের দুই পা বেঁধে এই বাগানের মাটিতে শুইয়ে ফেলে জবাই করেছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে এখানকার মাটি ভিজে গেছে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে সুখাইয়া যেন তার দেহের শিরায় শিরায় অসংখ্য ঘোড়ার উষ্ণ তাজা রক্তের শিহরণ অনুভব করল। কানের কাছে দোবেজীর কথাগুলো বাজতে লাগল—আট বছর ধরে বহু ঘোড়া জবাই করেছিস বলেই রামজী তোর ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে রে! যে হাওয়া গাড়ির জন্য ঘোড়াগুলোর ঐ অবস্থা হয়, সেই যন্ত্র দিয়েই তোর বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েছে রামজী। তুই তো কশাই—

কশাই। হ্যাঁ জানকীও তাই বলে। চলতে চলতে সে মর্গের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার ওপরে শিমুলগাছের ডালে অসংখ্য শকুন মরা গোরু-ঘোড়ার মাংস পেট ভরে খেয়ে ঝিমোচ্ছে। বাতাসে ভাসছে উৎকট দুর্গন্ধ। তার পায়ের কাছে সাঁই ঘাসে ছেয়ে-থাকা মাঠে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে ঘোড়ার হাড়, মাথার খুলি। হঠাৎ সুখাইয়ার মনে হল, সেই-ই তৈরি করেছে পশুদের এই নির্জন ভয়ঙ্কর মৃত্যুপুরী। দম্‌কা একটা হাওয়া এল, শিমুলগাছের ডালে ডালে শাঁ-শাঁ করে

কান্নার মত শব্দ বাজল। হাওয়াটা যেন তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলতে লাগল, কশাই! কশাই!

সুখাইয়ার মাথার ভেতরটা ঘুরে উঠল। শত শত ঘোড়ার মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর চোখের দৃষ্টি, বাসুদেবের মুখ, জানকীর মুখ মিলিয়ে তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। দোবেজীর আস্তানায় দেখা রঙিন কাগজের সখের ভেতরে রামজীর মুখ। কিন্তু তার চোখ-মুখ আক্রোশে জ্বলছে কেন? বাসুদেবকে কেড়ে নিয়েও তার রাগ মেটে নি। দু'হাতে বুক চেপে ধরে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ঘোড়ার হাড়ের স্তূপের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সুখাইয়া।

সখের জন্য

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

সখ কার নেই? সখের জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করতেও রাজী অনেকে। কেউ সখের খাতিরে ছুটে যান উত্তুঙ্গ পর্বত চূড়ায়, আবার কেউ পাড়ি জমাতে চান একাকী নিঃসীম বুকে। মোট কথা, সখ ছাড়া মানুষকে কল্পনাই করা যায় না। সখ মেটাতে গিয়ে নানা ভয়ানক বিপদেও পড়েছেন অনেকে তবুও নিরাশ হন নি একটুও। সখ যে কেবলমাত্র কিছু বাজে কাজের ব্যাপারে তা নয় একেবারেই। এই সখ নিয়ে গবেষণাও করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা। সখ মানুষের চরিত্র বুঝতে বেশ সাহায্য করে একথা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। শুধুমাত্র চরিত্র নয়, এই সখ ব্যক্তিত্বও প্রকাশ করে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, একজন মানুষের সখের বিষয় দেখে সহজেই তার সম্বন্ধে সমস্ত কিছুই অম্লানবদনে বলে দেওয়া চলে। যেমন তারা বলেন, বিভিন্ন ধরনের সখ বিভিন্ন ধরনের মানুষের পরিচয় সহজেই বহন করে। এই সখের বিষয়বস্তু দেখে অনায়াসে বলা যাবে আপনার মনের গঠন কেমন, বুদ্ধির পরিমাপই বা কি ধরনের আর ব্যক্তিত্ব কেমন।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, একজন মানুষ তাঁর ইচ্ছামতই সখ নির্বাচন করেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সখ মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করে। সখ কিন্তু সাধারণ কাজকর্মের ব্যাপার নয় একেবারেই। মানে নির্দিষ্ট কাজের হিসেব করে সখ মেটানোর দরকার হয় না। সব চিন্তা-ভাবনা ছেড়েই সখের পেছনে ছোটে মানুষ। সখ মেটাবার তাগিদে আর কিছু মনেই থাকে না মানুষের। দৈনিক জীবনযাত্রার ঝামেলা থেকে বাঁচতে সাহায্য করে সখ; এতে কোন সন্দেহ করার কারণ নেই।

সখের ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষও বোধ হয় সখের জন্য অনেক কিছু করেছে। প্রাচীন গুহার গায়ে শখ করে তাদের ছবি আঁকার চিহ্ন আধুনিক মানুষ আবিষ্কার করেছে বহুদিন আর বহুদেশে। মানুষের প্রাচীনতম সখই বোধ হয় চিত্রশিল্পী হওয়ার ইচ্ছা। গুহাগাত্রের ছুটন্ত ষাঁড়ই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সখের প্রমাণ, যা প্রথম আমাদের চোখে পড়েছে।

এর পরের সমস্ত যুগই মানুষের বিচিত্র সখের নানা প্রমাণ হাজির করেছে আমাদের কাছে। যেমন মানুষ পরের যুগে গেঁথেছে পিরামিড আর স্ফিংস্ যা আজও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সখের উদাহরণ হয়ে বেঁচে রয়েছে। মিশরের মানুষ সে যুগে তাদের আরও বিচিত্র সখের উদাহরণ রেখেছে 'মমি'র মধ্যে। মৃতদেহ অবিকৃত রাখার এ-সখ তাদেরই প্রথম আবিষ্কার সন্দেহ নেই। মিশরীয়দের পর রোমানরাও সখ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে ছাড়ে নি। তাদের সখের জন্য কম মানুষ মৃত্যুবরণ করে নি। রোমান এ্যাম্ফি থিয়েটার আজও তাদের সেই উৎকট শখের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আমৃত্যু লড়াইরত গ্ল্যাডিয়েটরদের মৃত্যু-যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখা—সেকালের সভ্য রোমানদের সখ ছিল সাংঘাতিক সখ, সন্দেহ নেই। এর পরে এল গ্রীকবাসীদের শখ। জন্ম নিল অলিম্পিক। বিভিন্ন খেলাধুলার উৎপত্তিও তখনই।

মানুষের ইতিহাসের সমস্ত অধ্যায়-গুলিই মানুষের নানা সখের বহু নিদর্শন হয়ে আছে। সখের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত দেশের জাতীয় চরিত্রও বেশ বোঝা যায়। ঐতিহাসিকরাও একথা স্বীকার করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসও অনেক বিচিত্র সখের নজির উপস্থিত করেছে। যেমন ধরুন এক সময়ে, বিশেষ করে গুপ্তযুগে বা সম্রাট অশোকের সময়ে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা মানুষের বিশেষ সখে পরিণত হয়েছিল। এ সখ সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে ছিল। মোগল যুগের সম্রাটদের সখ তো কিংবদন্তীতে পরিণত। সে সখের প্রমাণ আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তাজমহল লালকেল্লা আর অন্যান্য অগুনতি নিদর্শনের মধ্যে।

সখের চরিত্রও যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক বা তার পরবর্তী যুগের সখ আজ অচল। আজকের মানুষের সখ আত্মকেন্দ্রিকতায় ভরপুর। ঐতিহাসিকদের মতে আজকার মানুষ

অভিব্যক্তি

শাশ্বতী সেনগুপ্ত

আমার মনের একটি গোলাপ ফুল
তোমার হৃদয় আয়নাটিতে ফুটে,
কখন কোথায় হারিয়ে গেল হায়
আমার মনের লজ্জাটুকু লুটে।

তোমার চোখের একটু কৌতূহল
ছড়িয়ে পড়ল আমার মুখটি ঘিরে,
লজ্জারাঙা হল আমার মুখ—
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি পেলাম ফিরে।

ছিল সমাজকেন্দ্রিক, প্রায়শই তাঁদের শখ ছিল জাতীয় উদ্যমের মধ্য দিয়ে কাজ করার। বর্তমানে অতি আধুনিক যুগের মানুষ চায় একাকী সখ মেটাতে। তাই সেই সখ এসেছে, ফোটোগ্রাফি, ডাকটিকিট সংগ্রহ, মাছধরা, শিকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, গান-বাজনা, সাহিত্য শিল্পকলায় আগ্রহ সঞ্চয়ের মধ্যে। এগুলি একাকীত্বে আর একক কৃতিত্বে উজ্জ্বল হয়েছে।

বর্তমানের অতিব্যস্ত মানুষ অনেক ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার একঘেয়েমী বা বিরক্তিকর পরিবেশের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে অনেক সময় সখের দাস হতে চান। যেমন দেখা গেছে আমেরিকার অতিব্যস্ত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মাঝে মাঝে শিকারে ছুটে যেতে চাইতেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কোন প্রাকৃতিক নির্জনতার মধ্যে গিয়ে এঁকে চলতেন রঙতুলির টানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি ক্যানভাসের বুকে। ভারতের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ছুটে যেতেন প্রকৃতির বুকে সৌন্দর্য উপভোগ করতে। শুধু অর্থবান আর সমাজের উঁচুতলার মানুষই নয়, সাধারণ মানুষও শখের দাস, এর অনেক উদাহরণ দেওয়া সম্ভবপর।

ডঃ পল বয়নটন নামে একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী মানুষের শখ নিয়ে আজীবন গবেষণা করে বহু মজার মজার ব্যাপার প্রমাণ করেছেন। যেমন তাঁর মতে যেসব মানুষ কোন কিছু সংগ্রহ করে শখ মেটান তাঁদের 'ইণ্টেলিজেণ্ট কোশেণ্ট' সবচেয়ে বেশি। এঁরা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত হন। যাঁদের একেবারেই কোন শখ নেই, তাঁরা বেশ নিচুমানের মানুষ। সংগ্রহকারীদের মধ্যে আবার যাঁরা ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন তাঁরা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে থাকেন। এর কারণ যাঁরা ডাকটিকিট সংগ্রহ করেন, তাঁদের জ্ঞানের পরিধি নানা কারণে বিস্তৃত হতে থাকে। যেমন, ভৌগোলিক জ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য রাজনীতি সমস্ত বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান বেড়ে চলে। এঁদের দৃষ্টিশক্তিও উদার আর মহৎ থাকে। একজন মনোবিজ্ঞানীর মতে যেসব মানুষের অন্তত দুটি সখ থাকে তাঁরাই সত্যিকারের জীবনকে উপভোগ করতে সক্ষম। এ ধরণের মানুষের মধ্যে উইনস্টন চার্চিলের নাম করা চলে। চার্চিল চিত্রশিল্পী আর সাহিত্যিক দুই-ই ছিলেন। এ ধরণের আরও বিখ্যাত মানুষের নাম করা চলে। তাঁদের মধ্যে টমাস জেফারসন আর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তো পৃথিবীখ্যাত হয়ে আছেন।

মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণার পর সখপ্রিয় মানুষকে তিনটি আলাদা ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম দলে যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানপ্রিয় মানুষ আর খেলোয়াড় দল। এঁরা সহজেই যেরকম জীবনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। এঁদের সহজে কাবু হতে দেখা যায় না।

আর একদল হচ্ছেন যাঁরা শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহী। যেমন বই পড়া, গান বাজনায় আগ্রহ। এই ধরণের মানুষ সহজে ভাবপ্রবণতার শিকার হন।

তৃতীয় দলে পড়েন যাঁরা, কোন কিছু তৈরি করতে আনন্দ পান তাঁরাই যেমন ছোট্ট উড়োজাহাজ, খেলনা, ইত্যাদি। এঁরা দ্বিতীয় দল থেকে বেশি বাস্তববাদী হন।

এই তিনটি বিভিন্ন দল ছাড়াও এঁদের মধ্যে অনেক ছোট ভাগ করা সম্ভব। সখ নানাভাবে মানুষের মনকে কেড়ে নেয় বলেই এর মধ্যে সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। দেশে দেশে মানুষের চরিত্রের বিভিন্নতা আর ধর্ম বা ভাষার বিভিন্নতা থাকলেও সখের মধ্যে দিয়ে তাদের অনেক মিল ফুটে উঠতে চায়।

পৃথিবীর সব দেশের বিখ্যাত মানুষেরই সখ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাঁরাই তাঁর নিজের নিজের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন সখ ছিল, এর দৃষ্টান্ত আছে। সম্রাট নেপোলিয়নের সখ ছিল চশমা সংগ্রহ করা। নানা ধরণের সুন্দর চশমা তাঁর সংগ্রহে ছিল। মোগল সম্রাট সাজাহানের সখ ছিল দামী হীরা সংগ্রহ করা। এর জন্য যে কোন মূল্য দিতেও তিনি রাজী ছিলেন। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান ভালোবাসতেন গোলাপ ফুল। নানা জাতের গোলাপের চারা তিনি সখ করে লাগিয়েছিলেন নিশাতবাগে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ সংগ্রহ করতেন ডাকটিকিট। বহু মূল্যবান ডাকটিকিট তাঁর সংগ্রহে ছিল। আমাদের দেশেও বহু মনীষীর সখ কিম্বদন্তীতে নেমে এসেছে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে অনেকে বিখ্যাত হয়েছেন। স্যার যদুনাথ সরকার এ ব্যাপারে প্রথম সারির মানুষ।

মোট কথা সখ মানুষের জীবনে শুধু সময় নষ্ট করার ব্যাপার নয়, একথা সন্দেহাতীত। ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র গঠনে এর দান অপরিসীম। তাই জীবনের প্রারম্ভেই মানুষকে সখে উৎসাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। শৈশবই এর ভাই উপযুক্ত সময়। শিশুর খেয়ালী মনকে বাধা দিয়ে একে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা একান্ত অন্যায় ভাই।

[ছোট গল্প]

পাশাপাশি

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

যত কিছু কাজ ছায়ার সকাল থেকে উঠে। একসঙ্গে একপ্রস্থ হৈ হৈ। ন'টার মধ্যে খেয়ে বেরিয়ে যায় অবনী অফিসে। তারপর আর সারাদিন কাজ থাকে না। এ-ঘর ও-ঘর ক'রে। বিছানাটা ঠিক ক'রে, চাদরটা উল্টে দেয়, টেবিল ক্লথটার ময়লা ঝাড়ে, ফুলদানীর শুকনো ফুলগুলো বাইরে ফেলে। এই ধরণের নানা টুকিটাকি কাজ তারপর। তা এ আর কতক্ষণ? এগুলো শেষ হ'লে কাজ আর খুঁজে পায় না ছায়া। সারা দুপুর সামনে পড়ে। বারান্দায় দাঁড়ায়। রাস্তায় লোকজন, গাড়ী-ঘোড়ার যাওয়া আসা দেখে। তাও আর ভাল লাগে না, এ-পাশের জানলাটায় এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে পাশের বাড়ীর ভেতরের উঠোন দেখা যায়, দু' একটা ঘরও।

বাড়ীটা এখন খালি। নতুন কোনো ভাড়াটে আসে নি। কেউ এলে, তাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে সময়টা হয়তো কাটতো ছায়ার। আগের ভাড়াটেকে দেখেনি, শুনেছে তাদের বউ নাকি বিষ খেয়ে মরেছিল ওখানে। কেন, কে জানে। ভাবে ছায়া। হয়ত স্বামীর ভালবাসা পায় নি বউটা। সেও কি ভালবাসা পেয়েছে অবনীর? ঘৃণা তাকে করে না অবনী, কিন্তু এমন পাথরের ভালবাসার চেয়ে ঘৃণা বোধ করি অনেক ভাল। তাতে শান্তি না থাক, অশান্তি নেই। তবে কি তাকেও ওই বউটার মত একদিন আত্মহত্যা করতে হবে? ভাবে ছায়া।

দুপুরের মিনিটগুলো এমনি ঝিইয়ে চলে যে অবাকও লাগে এক এক সময়। ঘড়ির কাঁটা কখন বিকেলের দিকে এগোবে, তারই খোঁজ করে ওই কাল দুটো ছটফটে চোখ। আর বিকেল এলেই বা কি? অবনী বাড়ী ফিরবে এই পর্যন্ত। একজন কথা বলার লোক হবে এই পর্যন্ত। তার বেশী কিছু নয়। কটা কথাই বা শোনে ও আর ক'টারই বা জবাব দেয়। খালি আছে নিজের তালে। ক্লাব আর ক্লাব। কোথায় ব্রীজ টুর্নামেন্ট—কোথায় থিয়েটারের রিহার্সাল, ফুটবল ম্যাচ আছে, নানা ফাংসানের টিকিট বিক্রি। মস্ত কাজের লোক অবনী, হাঁক-ডাক বাইরে। আর ছায়া কোন কাজ বললেই হাজার বায়নাক্কা, তখন একনম্বরের কুঁড়ের বাদশা যাকে বলে। রেগে গরগর ক'রে ওঠে ছায়া, আর রাগলেই কান্না পায় তার। কাজের লোক না হাতি।

দুপুর কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেলে এল। তারপর সূর্য ডুবল। একে একে জ্বলল আলোগুলো রাস্তার। তবু দেখা নেই বাবুর। কাজ করবেন দুনিয়াশুদ্ধুর, কাজ করে কলিযুগ উদ্ধার করবেন। কি যে বলতে হয় লোকটাকে।

জুতোর আওয়াজ হ'ল দরজায়। দরজাটা খুলে দাঁড়াল ছায়া। অফিস থেকে ফিরতে রোজ রোজ এতো দেরি কর কেন বলো তো?

দেরি? তা একটু হ'ল, কেন, কি হয়েছে।

কি আবার হবে। সেই সকাল থেকে একা একা একলা বাড়ীতে রয়েছি, আমার ভয় করে না বুঝি একটুও।

ভয় দেখিয়েছে? কে বল তো, কোন বাড়ীর ছেলে? এক ঘুঁষিতে পেট ফাটিয়ে দোব।

এত দুঃখেও হাসি পেল ছায়ার। তা দেবে না কেন। ওই সবই তো পার। গুণ্ডা কোথাকার। মারতে হয় তো আমাকেই মার।

অবনী অবাক হ'ল, বারে তোমায় মারব কি জন্যে?

আদর তো খাওয়া হ'ল না, মারই খাই, তাতেও শান্তি।

ও, রাগ, হাসল অবনী, তাড়াতাড়ি চা করতো।

তাড়াতাড়ি কেন? এই তো এলে, এরই মধ্যে আবার যাবে কোথায়?

একটু ক্লাবে যেতে হবে।

শুনে ক্ষেপেই উঠল ছায়া। খালি ক্লাব আর ক্লাব। দোব একদিন আগুন ধরিয়ে হতচ্ছাড়া ওই ক্লাব ঘরটায়।

পাগল, ও সব করতে যেয়ো না।

আচ্ছা, বাইরে বিশ্ব্রহ্মাণ্ডের তো কাজ করে বেড়াও। আর বাড়ীর কাজ করতে বুঝি যত তোমার কুঁড়েমি।

কে বললে, কক্ষণো নয়। আর বাড়ীর কাজই বা কি। সংসারে দু' জন মাত্র তো লোক আমরা।

ওঃ তবে বুঝি কাজ নেই? কেন, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পার না, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে পার না? আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করাও বুঝি কাজ নয়?

ও, রাগই শুধু নয়, অভিমানও। হাসল অবনী, বেশ, কাল বিকেলে রেডি হয়ে থেকো, সিনেমা নিয়ে যাব।

ঠিক বলছ?

একেবারে ঠিক।

আগেরবারের মত ধাপ্পা নয় তো?

কক্ষণো নয়।

বিশ্বাস নেই অবনীকে। কতবার কথা দিয়ে কথা রাখে নি। দিন-রাত আড্ডা আর ক্লাব। বাড়ীর কথা মনে থাকলে তো। তবু তৈরি হ'ল। শাড়ীটা ছাড়ল, চুল আঁচড়ালো। মুখে পাউডার মাখল। ঢং-ঢং করে পাঁচটা বাজল। তারপর ছটাও। চোখ ফেটে জল এল ছায়ার। সাড়ে সাতটায় অবনী অপরাধীর মত বাড়ী ঢুকল।

বিশ্বাস কর, একেবারে মনে ছিল না। মনে যখন পড়ল, টু লেট। তবে তোমার জন্যে লাইব্রেরী থেকে নতুন একটা বই এনেছি, দেখো।

দেখল না ছায়া। বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানায়। অবনী ডাকল, শোনো।

শুনল না ছায়া। রান্নাঘরের দরজা খুলল। অবনী এল পিছন পিছন। বলল, কাল ঠিক নিয়ে যাব—কথা দিচ্ছি।

কোনো জবাব দিল না ছায়া। ভাত বাড়তে বলল। তারপর ডাকল, ভাত দেওয়া হয়েছে, এখন খেয়ে আমায় উদ্ধার কর।

খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট শেষ করল অবনী। তার অনেক পরে ছায়া ঘরে এল সংসারের নানা কাজ সেরে। বিছানায় অবনীর পাশে শুয়ে ছটফট করল অনেকক্ষণ। এক সময় না বলে আর পারল না, আচ্ছা, আমার জন্যে তোমার কি একটুও মন কেমন করে না? একটুও কি ভালবাসতে ইচ্ছে হয় না আমাকে?

কে, কে বলেছে এমন কথা। ক্ষেপে উঠল অবনী। দোষ হারাম-জাদার এক ঘুঁষিতে মুখ ফাটিয়ে।

কে আবার বাইরে থেকে এসে বলতে যাবে? শোন কথা। আমিই বলছি।

ও তুমি? হাসল অবনী। রাগ, খুব রাগ, না? পাশ ফিরে ওর একটা হাত ধরল। কি শক্ত হাত। কি স্বাস্থ্যবান, ছায়ার নরম হাতটাকে গুঁড়িয়েই দেবে। তবু সারা দেহে আশ্চর্য এক শিহরণের ঢেউ, ভাল লাগল ছায়ার, লোভ বাড়ল। আরো পরশ, আরো আদরের আশায় চোখ বুজল। কিন্তু না, ক্ষণিকেরই উচ্ছ্বাস অবনীর। এ রকম বহু হয়েছে। হাতটা আরো শক্ত হ'ল না, আরো এগিয়ে এল না, এক সময় আস্তে আস্তে শিথিলই হয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়ল অবনী। নাক ডাকা সুরু হল একটু পরে। রাগে সর্বশরীর আবার জ্বলে উঠল ছায়ার। ইচ্ছে হ'ল ঠেলে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। জাগিয়ে রাখে সারা রাত। এই এক ঘুম হয়েছে সর্বনেশে। তারপর কি মনে হল, থাক, ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। দুনিয়াশুদ্ধুর কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে, খেটে খেটে বেড়াচ্ছে—তাইতো বিছানায় পড়লেই ঘুম। যতই রাগ হ'ক, এ ঘুম কি ক'রে ভাঙাবে অবনীর।

এমনি করেই একটা দুটো ক'রে দিন যাচ্ছে অনেকগুলো, পাশের জায়গায় দাঁড়িয়ে এক দুপুরে একদিন হঠাৎই লক্ষ্য করল ছায়া, পাশের বাড়ীটা পরিষ্কার হচ্ছে। দরজাগুলো সব খোলা হ'ল, জানলাগুলোও, দেয়ালে চুণকামও সুরু হ'ল, বুঝল ছায়া, নতুন কেউ ভাড়াটে আসছে। খুশীই লাগল, যাক, কথা বলবার লোক পাওয়া যাবে। গল্প ক'রে সময় কাটবে এরপর। বাঁচলই যেন ছায়া।

ক'দিন পরেই এল অরুণ আর বিশাখা। তাদেরই মতন নতুন বিয়ে হয়েছে। তাদেরই মত ছোট সংসার দু'জনের।

দেখা হতেই যা দেরি, ভাব হ'তে একটুও দেরি হল না।

যাক, বাঁচলাম বাবা, হাসল ছায়া।

কি থেকে বাঁচলে? প্রশ্ন করল বিশাখা। কি হয়েছিল?

একা একা সময় কাটাবার হাত থেকে বাঁচলাম। পাশের বাড়ীতে কবে ভাড়াটে আসে তারই দিন গুণছিলাম, এবার এখন গল্প করব।

ও। হাসল বিশাখা।

এমন গল্প কিছুই হয় না, শুধু দুপুরটুকু ছাড়া। বিকেল ছ'টার মধ্যেই অরুণ ফিরে আসে অফিস থেকে। আর তারপর সারারাত অরুণকে নিয়ে বিশাখাকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

চায়ের টেবিলে চায়ের পেয়ালা নিয়ে দু'জনে মুখোমুখি বসে। একটু চায়ে চুমুক দেয়, একটা দুটো কথা বলে আর একগাদা হাসে। তারপর বেড়াতে বেরয় দু'জনে, রোজ নিয়ম ক'রে, কোন কোন দিন সিনেমাও যায়। এক একদিন রাতে রান্নাও করে না বিশাখা।

আজ কোথাও নেমন্তন্ন বুঝি?

না, না, নেমন্তন্ন কেন হবে। হাসে বিশাখা। আজ হোটেলে খাব। মাঝে মাঝে এক-একটা দিন এমনি মজা করি আমরা।

তবু দুপুরের পরো গল্প রোজ হয় কৈ? এক-একদিন হঠাৎ বাড়ীতে হাজির হয় অরুণ। গল্প তখন বন্ধই হয়ে যায়।

পরের দিন ছায়া প্রশ্ন করে, কাল কি হয়েছিল ভাই অরুণবাবুর? হঠাৎ অফিস থেকে দুপুরে চলে এলেন যে।

হবে আবার কি ঘোড়ার ডিম। পেট কামড়াচ্ছে বলে ছুটি নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমি কি আর বুঝি না ওসব বজ্জাতি। হাসে বিশাখা।

ওদের বজ্জাতির কথা অবাক হয়েই শোনে ছায়া।

কথায় কথায় বলল একদিন বিশাখা, অবনীবাবুকে দেখিই না বাড়ীতে যে।

দেখবে কি ক'রে ? বাড়ীতে থাকে কতক্ষণ। খালি ক্লাব আর আড্ডা। দুনিয়াশুদ্ধু লোকের বেগার খেটে বেড়াবে।

বকতে পার না ?

শুনলে তো।

আমার কর্তাটিও বিয়ের আগে নাকি খুব আড্ডাবাজ ছিল। এখন ঠিক উল্টো। আড্ডা ক্লাব সব চুলোয় গেছে, এখন আমাকেই জোর ক'রে ঠেলে পাঠাতে হয়।

অবনী-অরুণ দু'জনেই নতুন বিয়ে করেছে, অথচ কত তফাৎ দু'জনের মধ্যে। একজন বউয়ের জন্যে অফিস পালায়, আর একজন অফিস পালানো তো দূরের কথা, ছুটির পরও বাড়ী ফেরবার কথা মনে রাখে না। এক একটা করে দিন যায় আর নিজেকে পাশের বাড়ীর তুলনায় ভীষণ দুঃখী মনে হয় ছায়ার, ভীষণ অসহায়। অবনীকে বললে, বকলে কি চীৎকার ক'রে জানালে এক্ষুণি ও হৈ হৈ ক'রে উঠবে, উচ্ছ্বাসের চোটে এমন ভালবাসা দেখাবে যে হাঁপিয়েই উঠবে ছায়া। তারপর আবার সেই। ওর আর কি, বাড়ীতে থাকে কম, বেঁচে গেছে। সারাক্ষণ পাশের বাড়ীর ওদের দু'জনের হাসি-গল্প শুনতে হয় না, শুনে শুনে হিংসাতে জ্বলতে হয় না, ছটফট করতে হয় না অসহ্য অস্বস্তিতে। বেঁচেছে অবনী। আর থাকলেই কি এসব দেখে শুনে অনুশোচনা হ'ত অবনীর, চৈতন্য হত অবনীর ? মনে তো হয় না ছায়ার।

ঘুমোলে নাকি ? ছায়া ডাকল পাশে শুয়ে।

না তো।

তবু ভাল, তোমার তো বিছানায় পড়লেই ঘুম।

বারে, রাত তো ঘুমোবারই জন্যে।

তা তো নিশ্চয়ই। বিয়ের আগে কি জানতাম যে, একজন কুম্ভকর্ণের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।

অর্থাৎ রাগ। পাশ ফিরল অবনী। কেউ নিশ্চয়ই বলেছে যে, আমি তোমায় ভালবাসি না। লোকেদের কথায় কক্ষণো কান দিও না। ওদের আর কি, ক্ষ্যাপাতে পারলেই হ'ল।

আমায় তুমি ভালবাস কি না সে খবর অন্যের কাছ থেকে জানতে হবে, এমন অধঃপতন আমার এখনো হয় নি। আর পৃথিবীতে বিয়ে যেন তুমিই প্রথম করলে, আর কেউ কক্ষণো করেনি। বউকে কি ক'রে ভালবাসতে হয়, পাশের বাড়ীতে দেখে এসো।

ও, এই কথা। ভালবাসতে আমি জানি না, না পারি না ? বিছানায় উঠে বসল অবনী। চল ছাদে। গল্প করব।

থাক, আর ওস্তাদি করতে হবে না। বলল ছায়া।

ওস্তাদি নয়, চল বলছি, তারপর আর কথা নয়, দু'হাতে ওকে উঠিয়েই নিল অবনী।—এই ছাড় ছাড়। হাত পা ছুড়ল ছায়া। কিন্তু পারবে কেন ? একেবারে ছাদে এনে থামল অবনী। ধুপ করে ফেলল মেঝেতে, ধমকাল ছায়া, গুণ্ডা কোথাকার।

রাগল না অবনী, হাসলই। বলল, কোথায় পাশের বাড়ী ওরা ? ডাক একবার, দেখে যাক, খালি যা তা বলা আমাদের। কই ডাক।

থামো তো পাগলামি কোর না।

এমনি পাগলামিই মাঝে মাঝে করে অবনী। তারপর আবার সব ঠাণ্ডা। এমন হঠাৎ ভালবাসার কোনো মানে নেই। জোর ক'রে চাইতে হয় ভালবাসা, বলতে হয় ভালবাস। তাহলে হুঁস হবে, চৈতন্য হবে। পাথরের মূর্তিকে দু'হাতে ধরে জোর ক'রে নাড়া দিতে হবে। একথা কাউকে জানাতে লজ্জাই করে ছায়ার। না জানালেও, জানতে কি পারেনি বিশাখা, বুঝতে কি পারে নি ? তাই কি ছায়াকে শুনিয়ে শুনিয়েই আরো বেশী ক'রে কথা বলে অরুণের সঙ্গে ভালবাসার, তাই কি ইচ্ছে করেই জোর গলায় হাসে যাতে কানে যায় ছায়ার ? তাই, তাই। ওদের হাসি গানে, কথার কলকাকলিতে কান পাততে আগে ভালই লাগত, এখন আর লাগে না। হিংসেতে বুকটা জ্বলে ওঠে এখন, সারা শরীর রি-রি ক'রে ওঠে। তাকে ছায়া, ওরা না এসে অন্য কেউ ভাড়াটে এলে ভাল হ'ত। এ-যন্ত্রণা সইতে হত না, এ অবজ্ঞা। অবনী বিশাখা ওদেরই মত নব বিবাহিত, তাই অহরহ তুলনা করতে হচ্ছে। এ তুলনার অসহ্য বেদনা।

কিন্তু কি আছে বিশাখার ? কিই বা রূপ ? ছায়ার কাছে কিছুই নয়। ওই রূপেই ও অরুণকে ভুলিয়েছে। ছায়া যদি সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অরুণের, একটু মদিরতায়, একটু কটাক্ষে, ভোলাতে কি পারবে না ? সরাতে কি পারবে না বিশাখাকে, তার জায়গা থেকে ? ভাঙতে কি পারবে না ওদের ভালবাসার লোভনীয় সংসারকে। ভাবল ছায়া। এগোতে লাগল এক একটা অসহনীয় দিন আর রাত।

অবনী তো পাথর। ওকে বুঝিয়ে লাভ নেই। জোর করে কাড়তে হয় ভালবাসা ওখান থেকে। বিশ্রী লাগে ভালবাসার মত ভাললাগার মত ছায়ার কাছে কিছুই কি নেই ? আছে আছে, অনেক বেশী বিশাখার চেয়ে, অনেক মোহনীয়, তা হ'লে কিসের গরবে ও গরবী, দেখে নেবে ছায়া। রোজ রোজ ওদের হাসি আর গান বাড়ছে, ছায়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্যেই। অপমান করবার জন্যেই। উপহাস করবার জন্যেই। দুঃসহ এ— অসহ্য, ভালবাসার ঘর ওদের ভাঙতেই হবে।

একটু আগে ঘড়িতে রাত আটটার ঘণ্টা বেজেছে। আলোটা নিভিয়ে নামল ছায়া। এগোলো, একটা একটা ক'রে পা ফেলল সন্তর্পণে। পাশের বাড়ী কতই বা দূর ? পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল আস্তে আস্তে। ওদের হাসিগল্পের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। নেই নাকি কেউ ? ভয় হল ছায়ার—নিরাশাও, একটু দাঁড়াল।

কে ? হঠাৎ গলা এল অরুণের।

পাশের ঘরে খুট ক'রে [illegible] জ্বলল।

ও, আপনি। আসুন।

চারদিকে তাকাল ছায়া। জিজ্ঞেস করল, বিশাখা কোথায়?

ওতো নেই। দুপুরের দিকে দিদির ওখানে গেছে। ফিরতে একটু রাত হবে।

এই তো সুযোগ। অপূর্ব সুযোগ। ভগবানই পাইয়ে দিয়েছেন ছায়াকে। এখন একটু শুধু হাসি, একটু মদির কটাক্ষ। আকর্ষণের মায়াজাল [illegible]তে কতক্ষণই বা লাগবে। কতক্ষণই বা। কিন্তু আশ্চর্য, সাহস নয়—একগাদা ভয়ই জমে উঠল ছায়ার মনের মধ্যে একলা ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অরুণের। বলল তাড়াতাড়ি, আচ্ছা এখন চলি তাহ'লে।

সে কি, এই তো এলেন। বসুন না। এক্ষুণি এসে পড়বে বিশাখা।

না থাক, আসব আর একদিন। যেতে পারলে বাঁচে ছায়া।

[illegible] যেতে দিল না অরুণ। [illegible] অরুণ, শুনুন।

বলবেন কিছু?

হ্যাঁ, একটা কথা বলবার আছে অনেকদিন থেকে। বিশ্বাস করুন, যেদিন ও বাড়ীতে প্রথম দেখেছি আপনাকে, সেদিন থেকেই ভাল লেগেছে, সেদিন থেকেই ভালবেসেছি।

চুপ করে শুনল ছায়া। তারপর বলল, জানেন নিশ্চয়ই আমি বিবাহিতা।

জানি। আর এও জানি এত রূপ-যৌবন নিয়েও আপনি দুঃখী। আপনার স্বামী এর মূল্য দেয় না—এর কদর করতে জানে না।

বাড়ীতে আপনার স্ত্রী আছে। বিশাখাকে আপনি ভালবাসেন। মনে করিয়ে দিল ছায়া।

না, না, ভালবাসি না। ওর চেয়ে আপনি অনেক ভাল, অনেক সুন্দর। [illegible] পেলেন, [illegible] এক্ষুণি ঠেলে সরিয়ে দেবে।

আবেগে হাত ধরল অরুণ। শক্ত সমর্থ হাতের রোমাঞ্চময় পরশ নয়, বিষেরই জ্বালা যেন ছোঁয়ায়। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল হাতটা ছায়া। তারপর ছুটেই পালিয়ে এল। পেছনের দরজা দিয়ে কোনরকমে অন্ধকারটুকু পার হ'ল। বাড়ী ফিরে দরজাটা বন্ধ করে দিল তাড়াতাড়ি। ভয় আর উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল অনেকক্ষণ। ও লোকটার ভালবাসার মিথ্যে মুখোশ এমনি ক'রে হঠাৎ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, কে জানতো! অবনীর ভালবাসায় অন্যমনস্কতা আছে, উদাসীনতা আছে, কিন্তু এমন কলুষতা নেই। অনেক দিনের পর ও বাড়ীর তুলনায় নিজেকে আজ অনেক সুখী মনে হল ছায়ার।

হাজার বছর আগের নিদান

আবু আলি ইবন্ সেনা—'চিকিৎসক সম্রাট'—প্রাচ্যের বিখ্যাত প্রাচীন চিকিৎসক। তাঁর লিখিত "দি ক্যাননৃ অফ্ মেডিকাল সায়ান্স" নামক গ্রন্থ বহু বিখ্যাত এবং গ্রীস, রোম, প্রাচীন ভারত ও চীনদেশে সুপরিচিত ছিল। বইখানি চারখণ্ডে বিভক্ত -- তার মধ্যে দু'খণ্ডে ৭৮৫ রকমের ভেষজ, প্রাণীজ ও খনিজ ঔষধাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়। এর ভেতরে উল্লিখিত অনেক ঔষধ বর্তমানেও ব্যবহার হয়।

বর্তমানে সোভিয়েত ভেষজ বিজ্ঞানীরা এ ধরণের প্রাচীন নিদানসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন। অনেকানেক লৌকিক ব্যবস্থাও দেখে শুনে তাঁরা মনে করেন যে, এগুলিও পরীক্ষার যোগ্য।

আবু সিনা লিখে রেখে গেছেন যে, যে কোনরকম পিত্ত রসই চক্ষুরোগে ফলপ্রদ। পামির উপত্যকার অধিবাসীরা বিশ্বাস করে যে স্বর্ণ ঈগলের পিত্তরস মাথাধরা এবং মানসিক ব্যাধির পক্ষে উপকারী।

আবু সিনার সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি নাকি মৃত্যুর সময় তাঁর প্রধান শিষ্যকে নির্দেশ দিয়ে যান যে, তাঁর মৃতদেহকে পর পর চল্লিশটি নির্দিষ্ট কলসীস্থিত সালসা দিয়ে একের পর এক মালিশ করতে। শিষ্য নাকি তা করেছিল উপদেশ মত। পর পর মালিশ করতে করতে সে অবাক হয়ে দেখল যে, গুরুর প্রাচীন দেহ ক্রমে ক্রমে নবীন যুবকের রূপ ধারণ করছে -- সে ভীত হয়ে পড়ল, এবং ৩৯টি মালিশ হবার পর নবীন দেহে প্রাণসঞ্চারের লক্ষণ দেখে সে এত ভীত হয়ে পড়ল যে, শেষ কলসী তার অবশ হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

এটি হ'ল আবু সিনার সম্বন্ধে অসংখ্য গল্পের মধ্যে একটি। তাঁকে বলা হত, 'চিকিৎসকদের গুরু' 'বৈদ্য সম্রাট' ইত্যাদি।

দূর দিগন্তে ঝড়

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

কয়েক মিনিট পর পাথর-ছড়ানো টিলাটাউনের সড়ক ধরে ঝড়ের বেগে উড়ে চলল দুটো টগবগে তেজী ঘোড়া। অনেকদূরে এসে ঘোড়া দুটোর গতি ঈষৎ মন্থর হ'লো। ধুলোয় ধূসর মুখের উপর রুমাল বুলিয়ে নিয়ে মাইক বললো: 'শর্টি, তোমার প্ল্যানটা কী?'

মার্শাল বললেন: 'ঠিক বলতে পারি নে। তবে এটা ঠিক যে, মার্শাল লিটন টের পেলে কোনো সাহায্য তো হবেই না তাকে দিয়ে, বরং পোলটনের নথিপত্র নিয়ে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে আসা অসম্ভব হবে।'

'কেন, পোলটনের নথিপত্র তো জুলিয়ার এখন। আর তার অথরিটি তো দেয়া আছে তোমাকে।---ভেবেছিলুম তুমি লিটনের মুখোমুখি একটা হেস্তনেস্ত করবে, আর সেইজন্যই তোমার সঙ্গে আসা।'---

'পাগল নাকি! সুযোগ পেলে লিটন নিজেই ঐ সব দলিলপত্র হাতাবে। কোনো আইন-কাইনের ধার ধারে নাকি সে? তা ছাড়া কেবল সম্পত্তি নয়, হয়তো দলের অনেক গোপন খবর আছে ঐ সব দলিলে; হাতছাড়া ক'রে সে নিজের আখের খোয়াবে ভেবেছ?'

অর্থাৎ লিটনের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া, কোনো সঙঘর্ষ নয়। আইনের রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও পোলটনের সমস্ত দলিলপত্র নিয়ে আসতে হবে চুপিসারে---চুরি করে। মাইক কেমন নিরুৎসাহ বোধ করল। চুপ ক'রে শুনতে লাগল মার্শালের গোপন মতলব।

দুপুরের এই নিদারুণ গরমে সাধারণত সকলে ঘুমিয়ে থাকে। সেই সুযোগে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকতে হবে পাইন ভিলায়। পাইন ভিলা তো লালকুঠির মতোই কাঠের তৈরি। সে যাক গে।---খিড়কি দিয়ে ঢুকে আস্তে আস্তে দোতলায়। ---পোলটন আর জুলিয়ার ঘর নিশ্চয়ই এখনো খালি পড়ে আছে। দোতলায় উঠে উত্তরের ঘরখানা পোলটনের।--- তাড়াতাড়ি কাজ গুছোতে হবে।---চটপট সেরে আবার সুট ক'রে সরে এসো সেই একই পথে। ব্যস্।

'কিন্তু ধরো, যে জন্যে যাওয়া, সেই নথিপত্র যদি না-পাওয়া যায়?'

মাইকের এ-প্রশ্নের কোনো জবাব হয় না। সুতরাং মার্শাল শর্টি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন: 'দেখা যাক।'

গুলীভরা পিস্তলটা একবার

আছে।

আবার ঘোড়া ছুটল জোর কদমে। অবশেষে মধ্যাহ্নের ঝাঁঝালো রৌদ্রে পিচফোর্কের বাড়িগুলো দেখা গেল। লোকজনের নজর এড়াতে হ'লে সদর রাস্তায় যাওয়া চলবে না। সরু রাস্তা ধ'রে পিচফোর্ক শহরের এক পাশ দিয়ে ঢুকতে হবে। সুতরাং অনেকখানি ঘুরে অর্ধবৃত্তাকারে ছুটতে লাগল দু'জনে।

এখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাণ্ডব। মার্শাল শর্টির অনুমান নির্ভুল: প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাছাকাছি একটা লোককেও দেখা গেল না। পাইন ভিলার পিছনে এসে তারা থামল। কেউ কোথাও নেই। নিঃসাড়। ঘোড়া দুটোকে একপাশে রেখে উভয়ে সোজা খিড়কি দিয়ে ঢুকল।

একটু অপেক্ষা। না, কেউ নেই। আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরের বারান্দায়। আগে-আগে মার্শাল শর্টি, পিছনে মাইক। ডানদিকের দরজা ঠেলতেই একটি ঘর। মেয়েলি পোশাক-আশাক ছড়ানো। কোনো স্ত্রীলোকের শোবার ঘর নিঃসন্দেহে। মাইকের চোখে সন্দেহ-কুটিল প্রশ্ন। শর্টি ফিস-ফিসিয়ে বললেন: 'এটা বোধহয় জুলিয়ার।'

মাইক হাঁফ ছাড়ল। তার অন্ধ সংস্কার এই যে, মেয়েদের উপস্থিতি মানেই পরিস্থিতি জটিল। গোলযোগ আসন্ন।

মোড় ঘুরতেই আরেকটি ঘর: সবই আছে, লোক নেই। নিঃসন্দেহে এটা পোলটনের। ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন শর্টি। মাইক দরজার কাছটিতে এমন জায়গায় দাঁড়াল, যেন বাইরে থেকে কেউ হঠাৎ এসে পড়লেও দরজার আড়ালে সে অদৃশ্য থাকতে পারে।

সমস্ত ঘরে ক্ষিপ্রগতিতে শর্টির তল্লাসী চলল। দু-মিনিটে তিনি পেয়ে গেলেন নথিপত্র-বোঝাই চামড়ার ব্যাগটি। কাবার্ড থেকে বের ক'রে [illegible] খুশি।—ব্যাগের [illegible] তুমি যে [illegible] তালাবন্ধ, ভিতরের কাগজপত্র খোলা যাবে না তো। না থাক্‌, টিলাটাউনে গিয়ে দেখা যাবে'খন। এখন চটপট সরে পড়ো। তিনি বিছানা থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল মার্শাল লিটন স্বয়ং। হাতের বন্দুকটি শর্টির দিকে তাক-করা।

'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি।' লিটনের চোখে প্রতিহিংসার আগুন; 'পোলটন মারা যেতে-না-যেতেই ঘরে ঢুকে তার জিনিষ চুরি করতে এসেছ? এত বড়ো আস্পর্ধা।'

'কে বললে পোলটন মারা গেছে?' শর্টির কণ্ঠস্বর নিষ্কম্প, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। লিটনের উদ্যত বন্দুক সত্ত্বেও শর্টির হাত দু'খানা যেমন ছিল তেমনি রইল।

শর্টির প্রশ্নের ধার দিয়েও গেল না লিটন। শর্টির হাতে চামড়ার ব্যাগটি দেখেই বলে উঠল: 'আমি আগেই আঁচ করেছিলুম কী তোমার উদ্দেশ্য।'

'ঠিকই আঁচ করেছ।' শর্টি অকম্পিতকণ্ঠে বললেন: 'এই ব্যাগ আর মৃত পোলটনের যাবতীয় সম্পত্তি এখন তার মেয়ে জুলিয়ার প্রাপ্য। এ-গুলো নিয়ে যেতেই এসেছি।'

'তোমার নেবার অধিকার আছে?'

'আছে। জুলিয়ার সই-করা অথরিটি আছে আমার কাছে---আইনগত অথরিটি।'

লিটন একটু মুষড়ে পড়ল যেন। দ্বিধাগ্রস্ত হ'লো। কিন্তু তাক-করা বন্দুকটি নড়ল না।

'না, জুলিয়া অথরিটি দিতে পারে না।' গর্জে উঠল লিটন: 'যেহেতু সে আমাকে বিয়ে করবে এবং তারপর তার সম্পত্তির তদারকির ভার আমারই ওপর ন্যস্ত হবে। এটাই আইন।'

'আইন!' শর্টি শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন: 'আইন তোমাকে সে-রকম কিছু সুবিধা দিত নিশ্চয়ই, যদি তোমরা বিয়ে করতে। কিন্তু যতদূর জানি, [illegible] তো আমাকে তার অথরিটিতে কাজ চালিয়ে যেতেই হবে।'---

'না, হবে না।' ছমকে উঠল লিটন: 'ঐ ব্যাগটি নিয়ে যেতে দেব না।' এক পা এগিয়ে এল।

কিন্তু মেরুদণ্ডে হঠাৎ কঠিন আঘাত অনুভব ক'রে লিটন চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে মাইকের কঠোর কণ্ঠস্বর: 'বন্দুকটা ফেলে দাও, লিটন। তোমার বকবকানি আর সহ্য হয় না।'

বন্দুক ফেলে দিল লিটন। তার মুখ ক্রোধের আগুনে, পরাজয়ের গ্লানিতে বীভৎস হয়ে উঠল। 'না, না---কিছুতেই না---ঐ ব্যাগ---নিতে দেব না---দেব না---দেব না।'

'ইউ শাট আপ।' প্রচণ্ড ধমক দিলেন শর্টি।—'যদি মুখ বন্ধ না-করো তো টিলাটাউনে টেনে নিয়ে গিয়ে জোচ্চুরির দায়ে ঝুলিয়ে দেব ফাঁসিতে। তোমার মতো কুকুরকে ঝুলিয়ে দিতে টিলাটাউনের জুরিরা একমত হবেন নিশ্চয়ই।'---

লিটন দস্তুরমতো ভয় পেল এবারে। শর্টিকে সে চেনে। নির্ভীক দৃঢ়স্বভাব শর্টির মুখের কথা অবিশ্বাস্য নয়। তবু প্রতিবাদ না করে সে পারল না: 'ভিন রাজ্যে বিচার করার অধিকার তোমার নেই।'

'ইডিয়ট। পিচফোর্কটা ভিন-রাজ্য হ'লো কবে থেকে? সে যাক গে, তোমার মতো গবেটকে আইন বোঝাবে কে? এখন এসো, ভালো করে বেঁধে ফেলা যাক তোমাকে, নয়তো তোমার মতো শয়তানকে বিশ্বাস কী?'

অতঃপর মার্শাল লিটনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেশ শক্ত ক'রে বাঁধলেন মার্শাল শর্টি। লিটনের গলার মস্ত বড়ো রুমালটি তার মুখে গুঁজে দিলেন ভালো ক'রে। তারপর তাকে খাটের নিচে, সকলের দৃষ্টির বাইরে, ঠেলে ছুঁড়ে দিলেন।

আপাতত নিশ্চিন্ত। মার্শাল শর্ট পোলটনের চামড়ার ব্যাগটি তুলে নিলেন হাতে। আরেকবার সন্ধানী দৃষ্টি ফেললেন ঘরের চারদিকে। তারপর ঘরের বাইরে এসে দরজায় শিকল তুলে দিলেন। ---'চলো মাইক, সরে পড়া যাক।'

কয়েকমিনিটের মধ্যে আবার পিচফোর্কের সরু রাস্তা। আবার আগুন-ঝরানো ধুলো-ওড়ানো প্রান্তর। ঝড়ের বেগে পক্ষীরাজের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

●

টিনাটাউনে পৌঁছেই সোজা লালকুঠির ভিতরে। ---মাইকের প্রাইভেট চেম্বারে। সর্বাঙ্গে ধুলোর আস্তরণ, প্রখর গ্রীষ্মে গলা শুকিয়ে কাঠ। গেলাসের পর গেলাস চালল দু'জনে, তারপর অবসাদে ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ল চেয়ারে।

কিন্তু এলিয়ে পড়লে চলবে না। অনেক কাজ, অনেক ঝকমারি, সময়ের ঢেউ পেছোয় না। সুতরাং মুখ-হাত ধুয়ে চাঙ্গা হ'য়ে আবার দু'-জনে মুখোমুখি বসল চেয়ারে। চামড়ার ব্যাগের মুখটি খোলা হ'লো। বেরোল একটা মোটা খাম, অনেক রকম কাগজ পত্র। নানা জনের সই-সাবুদ করা দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ। তাতে পোলটনের প্রাপ্য যা যে-কোনো লোকের পক্ষে তা অভাবনীয়।---

ব্যাঙ্কের পাশ বই আর চেকবই একপাশে সরিয়ে রাখলেন মার্শাল। ও সব অন্য সময়ে দেখা যেতে পারে কিন্তু এগুলো কী? আরে, এ যে জমি-বিক্রির দলিল।

'দেখো মাইক। গোলমালের সূত্রপাত বোধহয় এখানেই।' কাগজটা তুলে ধরলেন মার্শাল: 'পোলটনের কাছে প্রিস্টলি মাসখানেক আগে সোলোল্যাণ্ডের খামারটি বিক্রি করেছে, কিন্তু দলিলটা এখনো রেজেস্ট্রী হয় নি।'

মাইক দেখে আশ্চর্য হ'লো।---'পোলটন জমি কিনলো অথচ দলিলটা রেজিস্ট্রী করল না, তার মানে?'

'তার মানে, নিজের নাম-প্রকাশে অনিচ্ছা। নতুন ক্রেতা হিসেবে এক্ষুণি সবাই তাকে জানুক এটা সে চায় না।'

কাগজ উল্টে গেলেন মার্শাল। হঠাৎ চাপা উল্লাস শোনা গেল তার গলায়: 'পেন্সিল দিয়ে দাগ-কাটা এই অংশটা শোনো, মাইক।---প্রিস্টলিকে সে যা লিখেছিল তারি নকল এটা।---অর্থাৎ প্রিস্টলি যদি গোটা স্টারল্যাণ্ডটা পাইয়ে দেয় তো পোলটন তাকে আরো শ' পাঁচেক দেবে---এবং আগের টাকার সঙ্গে এ-টাকাটা কাটান-ছাড়ান হবে না।'---

'তার মানে?' ---মাইকের কেমন গুলিয়ে গেল: 'ব্লেইনের স্টারল্যাণ্ডের দাম তো পঞ্চাশ হাজারের বেশি। ব্লেইন কেন অত কমে প্রিস্টলিকে---'

'চাপে পড়লেই দেবে, এই আর কি।'

'তার মানে? ব্যাপারটা কি দাঁড়াল তাহ'লে?'

'বলছি। প্রথমত, পোলটন, মানে, জুলিয়া এখন সোলোল্যাণ্ডের মালিক।--- দ্বিতীয়ত, পোলটনের মতলব ছিল প্রিস্টলিকে দিয়ে ফোঁকটে স্টারল্যাণ্ডটাও হাতিয়ে নেবে। পঞ্চাশ হাজারের খামারটি পাঁচশোয়---ফোঁকটে ছাড়া আর কি।---তা ঐ সুযোগে প্রিস্টলিরও কিছু লাভ হতো। পরের ধনে পোদ্দার যাকে বলে।'---

'বুঝলুম। স্টারল্যাণ্ড আর সোলোল্যাণ্ড মিলিয়ে এক বিরাট সম্পত্তি। এ অঞ্চলে, শুধু এ-অঞ্চলে কেন, এই রাজ্যেরই এক বিশাল ও অদ্বিতীয় খামার হতো নিঃসন্দেহে।'—মাইক, আপনমনেই বলতে লাগল যেন। তারপর কিছুক্ষণ তার ভুরু কুঁচকে রইল। ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক মনে হ'লো তার কাছে।

---'কেমন গোলমেলে লাগছে, মার্শাল। প্রিস্টলিই বা অত কম দামে তার নিজের খামারটি বিক্রি করল কেন? বলতে পার প্রিস্টলির ওপর পোলটনের আধিপত্য ছিল। কিন্তু তা-ই বা থাকবে কেন?'---

মার্শাল শর্ট চুপ। চুপ করে একটার পর একটা কাগজ পড়ে চললেন। মাইক আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

'এই যে তোমার উত্তর।' আবার মার্শালের উল্লসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।---'এই নাও।'

শর্টের হাত থেকে কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিল মাইক। কাগজটা ছাপানো। টেক্সাসের সংবাদপত্রের অংশ। বড়ো-বড়ো হরফের বিজ্ঞপ্তি: 'খুনের আসামী দুর্ধর্ষ ডাকাত লী ওঅর্টনকে চাই।' ঠিক তার তলায় লী ওঅর্টনের একটি ফোটোগ্রাফ। ফোটোর সঙ্গে প্রিস্টলির চেহারার অবিকল মিল।

'অর্থাৎ টেক্সাসের দুর্ধর্ষ ডাকাত লী ওঅর্টন নাম ভাঁড়িয়ে হয়েছেন পিচ-ফোর্কের প্রিস্টলি?'

'এবং এ-খবর পোলটন জানতো বলেই প্রিস্টলিকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল। চোরের ওপর বাটপাড়ি আর কি।'

এতক্ষণে সব পরিষ্কার। মাইক হাত উল্টে বললো: 'কিন্তু শর্ট, বিপদ যে বাড়লো। চামড়ার ব্যাগটির ওপর লোভ তো শুধু লিটনের নয়, প্রিস্টলিরও। অন্তত ছাপানো এই কাগজটিকে সে বেহাত হতে দেবে না।'

'হ্যাঁ, প্রিস্টলি যখন জানতে পারবে তার ঐ গোপন তথ্য রয়েছে আমাদের কাছে---লিটনের কাছে, সে জানল বলে---তখন সে নির্ঘাত এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'সদলবলে। মুখোশধারী ডাকাত-দের সর্দার তোমাকে আমাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে খাবে। তার মানে বুঝলে?---একটা বীভৎস লড়াই আসন্ন।'

'তবে চট পট তৈরি হও, মাইক। তোমার লোক জন ডাকো, ডাকাতদের কথা বুঝিয়ে বলো তাদের। সশস্ত্র

সঙ্ঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হও।'—মার্শাল উঠে দাঁড়ালেন: 'আমি ততক্ষণে জুলিয়ার কাছে যাই, জিনিষগুলো ওকে দেখিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখবার ব্যবস্থা করিগে।'

মার্শালের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে জুলিয়া অবাক হয়ে গেল। ঐ বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক এখন সে। অত বড়ো প্রকাণ্ড গোলোল্যাণ্ড এখন তার—এ কি অভাবনীয়। অ্যালের দিকে তাকাল জুলিয়া: স্টারল্যাণ্ডের মালিক মুখ টিপে হাসছে।

কিন্তু এখন আনন্দ উৎসবের সময় নয়। বিপদ আসন্ন। মার্শাল ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। অ্যাল লাফিয়ে উঠল: 'মার্শাল, এখন তো আমি অনেক ভালো, আমাকে বাদ দেবেন না যেন। আমার টিপ যে অব্যর্থ, সেটা ঐ জানোয়ারদের ওপর একবার যাচাই করতে দিন।'

'বেশ, তৈরি থাকো।' মার্শাল ঘুরে দাঁড়ালেন: 'জুলিয়া, খুব সাবধান।'

'আমি ঠিক আছি, মার্শাল।' দৃঢ়স্বরে বলল জুলিয়া: 'আমারো রাইফেল আছে। একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার।'

ঠিক। এই মুখোশধারী পিশাচদের একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার। ভবিষ্যতে টিলাটাউনে আর এ-সব উৎপাত না-ঘটে।'

কিন্তু জিনিষগুলো কোথায় লুকোন যায়?—কেন, ব্যাঙ্কে, ব্যাঙ্কের লকারে?—সেই ভালো। দুর্গের মতো দুর্গম এই ব্যাঙ্ক চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরা। খুব দূরেও নয় এখান থেকে। চামড়ার ব্যাগটি নিয়ে মার্শাল উঠলেন ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

●

মাইকের ডাকে অনেক লোক জমা হয়েছে: কেইট, বেন, উলকি---। বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও হিংস্র কাউবয়ের দল। তাদের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল, রক্তে নাচল সঙ্ঘর্ষের বিপুল মত্ততা। কিছুদিন ধরে এই অঞ্চলে মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারদের অত্যাচার ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ডাকাতদের সম্মুখীন হতে হলে চাই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি, চাই দুঃসাহসী নেতৃত্ব। এতদিন তারই অভাবে এই হিংস্র কাউবয়ের দল বাধ্য হ'য়ে চুপ ক'রে ছিল। আজ দুর্দ্ধর্ষ মাইকের আহ্বানে এরা একটুও দেরি করল না, ভিড় ক'রে এলো। তারপর একটার পর একটা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনল মাইকের কাছে। ক্ষেপে গেল তারা, টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলো: বদলা চাই, রক্তের বদলে রক্ত চাই!---

'তবে যাও, যার-যার রাইফেল নিয়ে এসো জলদি। আর সঙ্গে আনবে হাজার হাজার কার্তুজ—যার যত আছে।'—মাইকের কম্যাণ্ড শোনা গেল: 'মনে হচ্ছে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইটা জমবে ভালোই।'

'আমাদের ঘাঁটি কোথায় করবে মাইক?'—জানতে চাইল কেইট্।

'মার্শালের ঐ জেলখানার কুঠিতে খেয়ে দেয়ে মার্শালের কুঠিতে বিশ্রাম করবে সকলে, তারপর লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকতে হবে। যাও, হারি আপ, হারি আপ।'---

আসন্ন বারুদের গন্ধে উন্মত্ত কাউবয়ের দল লড়াইয়ের জন্য তৎপর হয়ে উঠল।

[ক্রমশ।

ঘড়ি বিচিত্রা

বিচিত্র পৃথিবীর মানুষ এবং বিচিত্র তার রুচিবৈচিত্র্য। ঘড়ি সময় নির্দেশক যন্ত্র; নির্দিষ্ট সময় পর পর আমাদের জানিয়ে দেওয়া তার কাজ যে, 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।' কিন্তু এই নির্দেশক কতরকমের করেছে মানুষ। কাশীর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে একটি ঘড়ি ছিল—যার কোন 'মুখমণ্ডল' ছিল না; কেবল বারোটার সময় বারোটি কংকাল লাফাতে লাফাতে ঘণ্টা বাজাত বারবার।

কলকাতায় মহারাজা ঠাকুরের গৃহেও একটি ঘড়ি ছিল, যাতে প্রত্যেক ঘণ্টা শেষ হতেই দুর্গামূর্তি সহ মিছিল বেরুত ঘণ্টা বাজাতে। এ ঘড়ি হস্তান্তর হয়েছে।

দক্ষিণ ফ্রান্স-এ একটি ঘড়ির ডায়াল আছে, কিন্তু ভেতরে কোন যন্ত্রপাতি নেই। একজন লোক প্রতি মিনিট শেষে নিজের ঘড়ি দেখে এই বিচিত্র ঘড়ির মিনিটের কাঁটা সরিয়ে দেয়। অপরূপ ঘড়ির অপরূপ 'মানবিক যন্ত্র।' আমেরিকাতেও এইরকম আভ্যন্তরীণ যন্ত্রহীন ঘড়ি আছে, কিন্তু সেখানে মানুষের বদলে ভূগর্ভোত্থিত বাষ্প শক্তি দ্বারা প্রতি মিনিটে কাঁটা সরান হয়।

স্টার্সবার্গ-এর ঘড়ি আরো বৈচিত্র্যময়। সময় নির্দেশ করা হয় এতে ঘূর্ণায়মান ভূগোলকের সাহায্যে— অন্যান্য অংশে আছে ক্যালেণ্ডার, গ্রহাদির গতিবিধি এবং চাঁদের কলা পরিবর্তন; উপরন্তু রথবাহিত মূর্তি দ্বারা সপ্তাহের দিন নির্দেশ করা হয়। প্রথম পনের মিনিট পরে ঝুমঝুমি বাজায় শিশুমূর্তি, আধঘণ্টা পরে আসে তীরন্দাজ যুবক, তিন কোয়ার্টার পরে বেরোয় তরবারী হাতে সৈনিকপ্রবর এবং পুরো ঘণ্টা শেষে ক্রাচে ভর দিয়ে আসে খঞ্জ বৃদ্ধ। যীশুর মূর্তি প্রদক্ষিণ করেন দ্বাদশ শিষ্য এবং ওপরে বসে এক মোরগ ডাকে আর ডানা ঝাপটায়। আরও আছে: যীশু স্বয়ং ক্রশ চিহ্ন দেখান!!

মরোক্কোতে আবার আরো অদ্ভুত। দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে বারোটি লাঠি। যখন যে কটা বাজল, তখন একজন লোক এসে ঠিক সেই ক'টি ফুলের টব ঝুলিয়ে দিয়ে যায়!!

কালোহ্যয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী!

আহত বাঘের অনুসরণ

পায়ে হেঁটে আহত বাঘের পেছু পেছু যাওয়া ভীষণ বিপজ্জনক।

কিন্তু প্রকৃত শিকারী প্রাণপণ চেষ্টা করবেন আহত বাঘকে মারবার জন্য। সখের শিকারী, যাঁরা রাত্রে গাড়ী থেকে চোখ দেখেই গুলি ছুড়ে পালিয়ে যান, তারা ত' শিকারী পদবাচ্য নয়। অধিকাংশ জায়গাতেই হাতী নেই, সেখানে পায়ে হেঁটে যেতেই হবে। এইরকমভাবে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অনেক শিকারী প্রাণ পর্যন্ত দেন। তিলে তিলে কোন আহত প্রাণী মরবে—এটা চিন্তা করাই কষ্টকর। আর যদি বাঘ গুলি খেয়েও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে ওঠে, সে হিংস্র নরখাদক হয়ে উঠবে। সে বন্যজন্তু শিকার করতে পারবে না, দৌড়ে ধরতে পারবে না, কিংবা ধরলেও দাঁত দিয়ে বা পা দিয়ে শিকারকে চেপে রাখতে পারবে না।

অনেক মানুষের জীবনহানি করার পর যে সব নরখাদক বাঘ বা চিতা মারা পড়েছে, ছাল ছাড়াবার সময় দেখা গেছে, তাদের অনেকের গায়ে গাদা বন্দুকের গুলি বা ছররার আঘাত চিহ্ন আছে, হয়ত গুলি ভিতরে রয়ে গিয়েছে। কোন বাঘের একটি পা জখম, কারও চোয়াল ভেঙ্গে গিয়েছে, কিংবা একটা চোখ নষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে বাঘ যে মানুষ মারবে, আশ্চর্য কি। সাধারণত সে মানুষকে ভয় করে এবং এড়িয়ে চলতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় সে ক্ষেপে উঠবে। মানুষ মারা যে কত সহজ ও মানুষ যে কত অসহায়, দু-একবার চেষ্টা করার পরই সে তা বুঝতে পারে। মানুষের রক্তে লবণ থাকায় এটি খুবই প্রিয় শিকার হয়ে পড়ে। মানুষ ছাড়া কিছুই তখন বাঘের ভাল লাগে না। একটা আহত বাঘ ভয়ঙ্কর মানুষখেকোতে পরিণত হয়।

আহত বাঘকে অনুসরণ করে মারতে হলে সব চেয়ে দরকার সাবধানতা, অপূর্ব সতর্কতা ও শিকার-দক্ষতা। হঠকারিতার জন্য কত শিকারীকে বিপদে পড়তে হয়, এমন কি প্রাণ দিতে হয়।

(শেষাংশ)

আহত বাঘের পিছনে সঙ্গে সঙ্গে যেতে নেই, কারণ অন্তত ৩।৪ ঘণ্টা পার না হলে তার আক্রমণ করার ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকে। তাই নিয়ম হচ্ছে একটু দেরী করা, দেখা, ভাবা, পেছনে যদি স্টপ বা পর্যবেক্ষক থাকে, তাদের জিজ্ঞাসা করা এবং গ্রাম্য শিকারীদের কাছে খবর নেওয়া—পাঁচ মাইলের মধ্যে কোনদিকে কোথায় কোথায় জল আছে।

গুলি লাগার ৩।৪ ঘণ্টা পরে রক্তপাতের জন্য বাঘ একটু কাবু হয়ে পড়বে ও তার পেশীতে জড়তা আসবে, আর যদি বিকালের দিকে আহত হয়, পরের দিন সকালের আগে তাকে অন্ধকারে খুঁজতে যাওয়া বিপজ্জনক।

বিঘ্ন

কয়েক বছর আগে বিহারে এক ডেপুটি কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটু ভুলের জন্য জীবন দিতে বসে-ছিলেন। দু'টি মাচা হয়েছে। একটিতে সস্ত্রীক তিনি, অপরটিতে সস্ত্রীক আর এক শিকারী। যার নাম ধরা যাক গুপ্ত। বীটে বাঘ বেরিয়ে এল এবং তিনি গুলি করলেন। বাঘ গুলি খেয়ে পালিয়ে গেল।

ডেপুটি কমিশনার হলে কি হয়, তিনি শিকারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বাহাদুরী ত' নিতে হবে। এইজন্য তাড়াতাড়ি মাচা থেকে নেমে পড়লেন। গুপ্ত বারবার তাঁকে নিষেধ করে-ছিলেন।

অনভিজ্ঞ শিকারী গুপ্তর কথা না শুনে যেমনি একটা নালা পার হয়েছেন, বাঘ তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়ে সব শরীরটা ঢেকে কামড়াতে আরম্ভ করল। তিনি ক্ষুদ্রকায় লোক, বৃথা চেষ্টা করলেন কোমর হতে রিভলবার বের করতে। তাঁর স্ত্রী মাচা থেকে সব দেখছিলেন ও আর্তনাদ করছিলেন। ঐ একগুঁয়ে অবাধ্য লোকের উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে। এবার গুপ্ত তাঁর সাহায্যে এগিয়ে গেলেন অতি সন্তর্পণে। তিনি এক বিচক্ষণ শিকারী। যতদূর সম্ভব কাছে গিয়ে মানুষকে এড়িয়ে বাঘকে গুলি করে মেরে ফেললেন। ভাগ্যক্রমে বাঘ আগেই ভালভাবে আহত হয়েছিল, এজন্য শিকারীকে প্রাণে মারতে পারে নি। ভদ্রলোক ৬ মাস হাস-পাতালে থাকার পর একটু সুস্থ হন।

আহত বাঘকে খুঁজে বার করতে হলে দুটো জিনিষ জানতে হবে,—বাঘের শরীরের কোন্ অংশে গুলি লেগেছে এবং সে কোনদিকে চলে গিয়েছে। শিকারী যদি বাঘের মাথায় গুলি করে থাকেন ও তা সত্ত্বেও সে যদি চলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে মাথার খুলি কি মস্তিষ্ক নষ্ট হয় নি। মাথায় গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে না পড়লে যতই সময় যাবে, ততই আঘাতের গুরুত্ব ও যন্ত্রণা কমে যাবে ও বাঘ আক্রমণ করার জন্য তৈরী থাকবে। এমন কি হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগার পরও দেখা গিয়েছে যে, বাঘ ৪০।৫০ গজ দৌড়ে গিয়েছে, তারপরে অবশ্য মরেছে। এরই মধ্যে কিন্তু সে মানুষ মেরে ফেলতে পারবে। থাবাতে কি পায়ের নীচের দিকে গুলি লাগতে তিন পায়ে ভীষণ জোরে দৌড়ে আক্রমণ করতে বাঘের কষ্ট হয় না। পায়ের ওপর দিকে লাগলে জোরে চার্জ

করতে পারে না। ঘাড়ের ভিতরে গুলি হয়ে থাকলে কি মেরুদণ্ডে আঘাত পেলে সে আক্রমণ করতে পারবে না। পেটে গুলি লাগলে বাঘের আক্রমণ করার ক্ষমতা চলে যায় না। কোনও আঘাত যদি সামান্য হয়, পুরা একদিন পর দেখামাত্র বাঘ আক্রমণ করবে না, কিন্তু গুরুতর আঘাত হলে ক্রুদ্ধ বাঘ দেখামাত্র সম্ভব হলে চার্জ করবে।

মনে রাখা দরকার যে, অনেক সময় আহত বাঘ গর্জন না করেই, শুধু শব্দ শুনেই অনুসরণকারী শিকারীকে আক্রমণ করে। বেশী রক্ত পড়লেই মনে করা উচিত নয় যে, বাঘ শীঘ্র মারা পড়বে। পেশীতে গুলি লাগলে রক্ত বেশী পড়ে। মারাত্মক আঘাতে বেশীর ভাগ সময় শরীরের ভিতরেই রক্তক্ষরণ হয়। রক্ত থেকে বোঝা যায় কোথায় গুলি লেগেছে। পেটের গুলিতে রক্ত বেশী পড়ে না, যা পড়ে তা পাতলা। ফুসফুসে গুলি লেগে থাকলে গাঢ় রক্তে প্রায়ই ফেনা থাকবে। কখনও কখনও চাপ রক্তের টুকরা। ঘাসে ও গাছের পাতায় রক্ত দেখে বোঝা যাবে শরীরের কোন্ অংশে, ওপরে না নিচে আঘাত হয়েছে। যে পথে বাঘ গিয়েছে তার দু'ধারে রক্ত দেখলে বুঝতে হবে যে গুলি শরীর-ভেদ করে গিয়েছে। রাস্তায় কোণা-কুণিভাবে রক্ত থাকলে অনুমান করতে হবে যে, পায়ে আঘাত হয়েছে। পেছনের পা যদি রক্ত মাড়িয়ে থাকে, বুঝতে হবে শরীরের সামনের দিকে আঘাত হয়েছে। পা ভেঙে থাকলে ঘষটে টানার দাগ থাকবে।

এখন রক্ত দেখে ও পায়ের ছাপ (পাঞ্জা) দেখে তাকে অনুসরণ করতে হবে। যদি জানা যায়, বাঘ কোথায় আছে, কাজ অনেকটা সোজা হয়ে যায়। প্রায় ২০।২৫ জন লোককে গাছে চড়িয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেলতে হবে। তারপর দু'জন বিশ্বাসী লোক ও দু'জন সন্ধানী গ্রাম্য শিকারী (যারা পায়ের চিহ্ন দেখতে যাবে) নিয়ে একজনকে ১০।১৫ গজ দূরের গাছে চড়াতে হবে; শিকারী অবশ্য দেখবেন যে, বাঘ যেন তখন তাকে আক্রমণ না করে। সে গাছ থেকে যদি ইঙ্গিতে বলে, কিছু দেখা যাচ্ছে না, আর একটা লোককে ১০।১৫ গজ দূরের আর এক গাছে উঠতে হবে। সে-ও যদি ইঙ্গিতে জানায় যে বাঘ নেই, ৫।৭ গজ দূরে আর একজন লোক গাছে উঠবে ও যদি ইশারায় জানায় যে, বাঘ দেখা যাচ্ছে, কি কিছু নড়ছে, শিকারীকে গাছে চড়ে ভালভাবে বসে দেখে গুলি করতে হবে। বাঘকে না দেখে শুধু গাছপালা কি ঘাস নড়লেই গুলি করা উচিত নয়। মনে থাকে যেন—কোন কথাবার্তা বলা চলবে না, শুধু সঙ্কেত করে জানাতে হবে।

বাঘ কোথায় আছে না জানতে পারলে কষ্ট বেশী করতে হবে ও বিপদও বাড়বে। গুলি খেয়ে বাঘ জলের ধারে, ঝোপের কাছে যাবার চেষ্টা করবে। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে রাইফেল তৈরী রেখে যেতে হবে। যদি দেখা যায়, বাঘ জলের সন্ধানে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে, তা হলে বোঝা যাবে যে, চোট খুব মারাত্মক হয় নি। যদি জলের ধারে যাবার চেষ্টা করে না থাকে, গুলিতে ভীষণ জখম হয়েছে মনে করা অন্যায় হবে না। দু'জন গ্রাম্য শিকারী ও দু'জন 'সন্ধানী' (ট্র্যাকার) নিয়ে নিঃশব্দে, অতি সাবধানে শিকারী এগিয়ে যাবেন ধীরে ধীরে। শিকারী নিজে বাঘের পদচিহ্ন অনুসরণ করবেন না। তিনি সঙ্গের লোকেদের চেয়ে একটু এগিয়ে থাকবেন, তাদের আক্রমণ হতে বাঁচাবার জন্য। শিকারীর নজর থাকবে সামনের ঝোপ-জঙ্গলের ওপর, কোনও কিছু নড়ছে কি-না।

হনুমান কি পাখীরা অনেক খবর দেবে। হরিণ যদি একদৃষ্টে কোনদিকে তাকিয়ে থাকে, সে কি দেখছে জানা দরকার। নালা পার হবার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে। আহত বাঘ প্রায়ই নালার ওপর দিয়ে যায়, সুতরাং নালা পার হবার আগে নালার ওপরের দু'ধারে ঢিল ফেলা উচিত। নালার ভিতর দিয়ে যাবার চেষ্টা করার দরকার নেই। সাধারণত বাঘ দরকারমত পাহাড়ের ওপর হতে কিংবা নীচু হতে ওপরে আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু আহত হলে সে সহজে নীচে হতে পাহাড়ের ওপরে আক্রমণ করবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে বাঘ নদী পার হতে চেষ্টা করে নি। বুঝতে হবে, আঘাত গুরুতর। আর যদি জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে কি বসে থাকে, বাঘের অবস্থা খুবই কাহিল। শেষ কথা যেন মনে থাকে,—আহত বাঘ যদি আক্রমণ করে, স্থির-ভাবে দাঁড়িয়ে ধীরে, ভালভাবে লক্ষ্য করে তাকে গুলি করতে হবে এবং দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়তে হবে বাঘ খুব কাছে এসে পড়লে।

এমন যদি হয় যে, পায়ে হেঁটে এগোতে পারা যাচ্ছে না, একদল মোষ ও তার সঙ্গে ৬।৭ জন রাখাল জোগাড় করতে হবে। শিকারী মাঝখানে থাকবেন ও ঠিক তাঁর পেছনে গ্রাম্য শিকারী দু'জন। বাঘ দেখে বা বাঘের গন্ধে মোষরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে পারে, তখন তাদের সামলান দায়। হয়ত শিকারীকেই আক্রমণ করে বসবে। বাঘও সেই সুযোগে পাশের কি পেছনের রাখালকে হয়ত আক্রমণ করবে। ধীরভাবে শিকারীকে তখন গুলি ছুঁড়তে হবে। এমনও দেখা গিয়েছে যে, বাঘ দেখে পুরুষ মোষরা বাঘকে আক্রমণ করে শিং দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে।

মোষের দল না পাওয়া গেলে সম্ভব হলে কুকুরের সাহায্য নেবেন। গ্রামের কুকুর মাঝে মাঝে ভাল শিকারী হয়। আদিবাসীদের কুকুর এ বিষয়ে ওস্তাদ, কারণ তারা শিকার করতে অভ্যস্ত। কুকুরেরা বাঘের অবস্থান নির্দেশ করে দেবে, ঘেউ ঘেউ শব্দ করে বাঘকে বিরক্ত করবে। শিকারীর দিকে নজর না দিয়ে বাঘ তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, সেই

সুযোগে শিকারী সাবধানে গুলি করার সুবিধা পাবেন।

এত করেও যদি আহত বাঘের খবর না পাওয়া যায়, সন্ধান পাবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে দেওয়া ভাল। তাতে লোকে উৎসাহ নিয়ে সাহায্য করবে আহত বাঘকে মারতে।

পরিশিষ্ট—(ক)

বাঘের জঙ্গলে কখন কখন শিকারী হাতী, মোষ, গণ্ডার, ভালুক কি বরাহ অর্থাৎ বুনো শুয়োরের সামনেও পড়তে পারেন। মারাত্মকভাবে গুলি কোথায় লাগাতে হয়, জেনে রাখা ভাল।

হাতীর মস্তিষ্ক থাকে মাথার পিছনে নীচের দিকে। সহজে ওখানে গুলি করা যায় না। তার মাথার সামনের হাড় কোথাও ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু। যখন মানুষ মারবার জন্য তৈরী হয়ে হাতী আক্রমণ করে, তার শুঁড় বুকের সামনে থাকে, সেটার অগ্রভাগ ভিতরের দিকে সামনের পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। কখনও কখনও শুঁড় মাথার সামনে পাকান থাকে, কখনও বা ধরবার জন্য সামনের দিকে সোজা লম্বাভাবে প্রসারিত থাকতে পারে। মাথা ভালভাবে দেখা গেলে মারাত্মক গুলি মারবার প্রধান জায়গা হচ্ছে মাথায়, দুই চোখের মাঝখানের ৩ ইঞ্চি ওপরে, যেখানে ডিসের মত একটু খোঁদল আছে। এটা হচ্ছে ছোট স্ফীত স্থানের (যাকে ইংরাজীতে 'বাম্প' বলে) ঠিক উপরিভাগে। দ্বিতীয় মারাত্মক জায়গা হচ্ছে কপালের পাশে অর্থাৎ রগে, চোয়াল ও গলার সন্ধি-স্থানের কাছে। তৃতীয় মারাত্মক গুলি এক কাণের ভিতর দিয়ে আর এক কাণে। চতুর্থ জায়গা হচ্ছে শুঁড়ের ভিত্তি ভূমির (অর্থাৎ 'বেস্'-এর) ভিতর দিয়ে মুখে, এতে অন্তত আক্রমণ থামান যাবে। পঞ্চম জায়গা, হৃদপিণ্ড, কিন্তু অন্য জন্তুদের তুলনায় এটা থাকে নীচের দিকে, একটু অগ্রভাগে, সেইজন্যও অনেক মাংস ও চর্বির স্তর থাকে বলে গুলি মারার পক্ষে খুব নির্ভরযোগ্য জায়গা নয়। অন্য কোনো উপায় না থাকলে হাতীর সামনের দুই পায়ে হাঁটুতে গুলি করে তাকে থামাতে হবে।

একদল হাতী যদি শিকারীর দিকে দৌড়ে আসে, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, মোটে নড়তে নেই। তারা সম্ভবত দু'পাশ দিয়ে চলে যাবে। যদি হাতীর কাছ থেকে দৌড়ে পালাতেই হয়, উঁচু জায়গা হতে নীচুতে যাওয়া উচিত; নীচু থেকে উঁচুতে নয়। টুপী, জামা বা অন্য কিছু সামনে ফেলে দিলে, হাতী যখন সেটা ছিন্নভিন্ন করে, সেই অল্প সময়ের মধ্যে, খুব বড় গাছে উঠতে পারলে প্রাণ বাঁচবে। শেষ চার্জ করার সময় হাতী প্রথমবারের মত তীক্ষ্ণ চীৎকার প্রায়ই করে না।

হাতীর দৃষ্টিশক্তি প্রখর নয়, কিন্তু শ্রবণশক্তি বেশ ভাল এবং ঘ্রাণশক্তি অত্যধিক ভাল। যূথভ্রষ্ট দাঁতলা হাতী, এবং কোন কোনও দন্তবিহীন পুরুষ হাতী বা 'মাক্না' ভয়ঙ্কর শয়তান। দলপতি দাঁতলা হাতী সাধারণত সামনের দিকে থাকে না। বোধহয় তাকে বাঁচাবার জন্যই একটি বয়স্কা মাদী হাতী সামনে থেকে সাধারণত দলপতির কাজ করে।

জেনে রাখা ভাল, পুরুষ হাতীর সামনের পায়ের ব্যাস সাধারণত ১৬ থেকে ২০ ইঞ্চি হয়, মাদী হাতীর ১৪ থেকে ১৬ ইঞ্চি। ব্যাসকে ৬-২-৭ দিয়ে গুণ করলে পরিধির দু'গুণ মাপ পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে হাতির মাটি হ'তে কাঁধের উচ্চতা।

মোষ সাধারণত আহত না হলে মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু গুলি লাগলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করবে, হয় শিকারীর প্রাণ নেবে কিংবা নিজের প্রাণ দেবে। আহত মোষ প্রায়ই ঘুরে গিয়ে শিকারীর গন্ধ অনুসরণ করে পিছন থেকে আক্রমণ করে। শিকারী গাছে উঠে পড়লে গাছের তলায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহারা দেবে। এত দুর্দান্ত, ধূর্ত, প্রতিহিংসা-পরায়ণ যে, চলে যাবার ভাণ করে একটু দূরে যায় এবং শিকারী যেমনি গাছ থেকে নামে, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে আক্রমণ করে।

একে মারবার সবচেয়ে মারাত্মক নিশানা স্থান হচ্ছে ঘাড়ে। এই জায়গাটি ভালভাবে না পাওয়া গেলে গুলি যদি পাঁজরার কোণাকুণি গিয়ে অপরদিকের ঘাড়ের দিকে যায়, তা হলেও খুব কাজ দেয়। মোষ শিকারীর একেবারে সামনে থাকলে বুকের মাঝখানে, সামনের দু'পায়ের মধ্যে গুলি লাগলেও মারাত্মক হবে, কিন্তু মরতে দেরী হতে পারে। শিকারী খুবই সুদক্ষ হলে, নির্ভুলভাবে গুলি মারার মত হাত থাকলে, দুই চোখের মাঝখানে গুলি মারবেন। মাঝখান থেকে সামান্য একটু নীচে হলেই ভাল; ওপরে নয়, কারণ শিকারীকে আক্রমণ করার সময় মোষ মাথা সম্পূর্ণ না তুলে নাক তুলে দেখে। যে দুই উঁচু জায়গা হ'তে দু'টি শিং বেরিয়েছে, একেবারে ঠিক তাদের মাঝখানে গুলি লাগলে চলে; একটু এদিক-ওদিক হলেই তাকে আটকান যাবে না। কানের ঠিক পেছনে গুলি মারলেও কাজ দেবে। নাকের দু'টি ছিদ্রের একটু ওপরে, ঠিক মাঝখানে গুলি লাগলে মোষ কাবু হয়ে পড়বে। শেষের চার রকমভাবে গুলি ছুঁড়তে প্রকৃষ্ট লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা দরকার। মনে রাখতে হবে, মোষের নাক ও চোখ খুবই প্রখর, কানও কম যায় না।

গণ্ডারের শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি প্রখর, দৃষ্টিশক্তি ভাল নয়। আহত না হয়ে যদি আক্রমণ করে, চটপটে লোকের পক্ষে তার সামনে থেকে পাশে সরে যাওয়া খুব শক্ত নয়। কিন্তু আহত হলে ঘুরে এসে বাতাসে মানুষের গন্ধ ভাল করে শুঁকে আবার চার্জ করবে। গলার মাঝখানে গুলি মারা সবচেয়ে কার্যকর। একটি চোখ ও কানের মাঝখানে গুলিও খুব ভাল কাজ দেয়।

সামনের দুই পায়ের মধ্যে বুকের ঠিক মাঝখানে, কিংবা পাশ থেকে বুকের ঠিক মাঝখানে—একটু ওপরে হলেই ভাল—গুলি কার্যকর হবে। ঘাড়ে গুলি মেরেও গণ্ডারকে থামান যায়।

লেজ উঁচু করে দৌড় দিলে প্রায় সবক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, গণ্ডার চার্জ করার জন্য ছুটে আসছে না। আক্রমণ করার সময় সাধারণত লেজ উঁচু থাকে না।

গণ্ডার একই জায়গায় মলত্যাগ করে। এতেই তার বিপদ। কারণ, লাইসেন্সবিহীন শিকারী বুঝে ফেলে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। গণ্ডার সংরক্ষিত জন্তু, কিন্তু তার শিং (খড়্গ) চোরাবাজারে প্রায় দশ হাজার টাকায় বিক্রী হয়। কুসংস্কারবশে এটা কোন কোন ব্যাধি আরোগ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এই রকম গুণ এর কিছুমাত্র নেই। তবুও অনেক গণ্ডার বে-আইনীভাবে 'পোচার'-দের হাতে প্রতি বছর নিহত হচ্ছে।

লালচে রংয়ের ভালুক ৭000 থেকে ১১000 ফুট ওপরে পাহাড়ে থাকে। হিমালয়ের কালো ভালুক কি তার চেয়ে ছোট সমতলবাসী 'শ্লথ' ভালুকের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল। ৪00।৫00 গজ দূর হতে মানুষের গন্ধ শুঁকতে পারে। লালচে রংয়ের ভালুকের সামনের পায়ের চিহ্নতে গোড়ালি ও আঙ্গুলের তলার তালু ছাড়াছাড়ি থাকে, কিন্তু পিছনের পায়ে এমন ফাঁক থাকে না। হিমালয়ের কালো ভালুক কিংবা সমতলবাসী ছোট কালো 'শ্লথ' ভালুকের পায়ের ছাপ দেখে মনে হবে যে, খালি পায়ে একটি বালক হেঁটে গিয়েছে; তাতে ওপর ও নীচের ভাগে কোন ফাঁক থাকে না। এরা ক্ষুধার্ত হলে গরু-ছাগল মারে। ভালুক সাধারণত গুহাতে থাকে। খুব সকালে যখন গুহাতে ফেরে কিংবা বেলা ৫টা থেকে সন্ধ্যার সময় পর্যন্ত যখন সে গুহা হ'তে বেরিয়ে আসে, শিকারী যেন বন্দুক নিয়ে তৈরী থাকেন।

সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত কিংবা বিকাল ৪টা হতে সারা রাত এরা সাধারণত খাবার খুঁজে বেড়ায়। এরা মাঝে মাঝে মাংস খায় এবং শিকারকে জ্যান্ত থাকতেই খেতে আরম্ভ করে; বন্য কুকুরেরা যেমন করে থাকে। ভালুক গাছে উঠতে পারে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পারে না; নামবার সময় মাথা ওপর দিকে থাকে। এরা প্রথমে চার্জ করার সময় চারপায়েই আসে। তখন সুবিধামত ঠিক গলার মাঝখানে কি ঘাড়ের মাঝখানে, কি একটু পেছনে গুলি মারতে হয়। সব সময় মনে রাখতে হয় যে, ভালুকের শরীরের লোম স্থানবিশেষে ৫ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। গুলি যেন শুধু লোমেই না লাগে। কাছে এসে পড়লে প্রায় ১৫ ফুট দূর হতে দু'পায়ে ভর করে চার্জ করে। তখন তার বুকের মাঝখানে ঘোড়ার নালের মত সাদা দাগ দেখা যায়। তার মাঝামাঝি গুলি মারতে হবে, এটি মর্মস্থান। ভালুক ওপরে থাকলে সহজে গুলি মারা উচিত নয়, কারণ একেবারে মরে না গেলে সে ঝড়ের মত নেমে এসে আক্রমণ চালাবে। সঙ্গে অস্ত্র না থাকলে টুপী কি জামা কিছু ফেলে জোরে পালালে, ভালুক সেটা যখন ছিঁড়বে, গাছে উঠে পড়ে কি জোরে দৌড় দিলে চটপটে লোক বেঁচে যেতে পারে।

দাঁতলা শুয়োর, অর্থাৎ বন্য বরাহ আহত হলে ভীষণভাবে চার্জ করে; আহত মোষের চেয়ে কম নয়। গাছে, কি একটু উঁচু জায়গায় উঠে গেলে এর হাত থেকে বাঁচা যায়। অনেকের ধারণা যে, শুয়োর একবার যেদিকে যায়, সেদিক হতে ফেরে না; এটি সম্পূর্ণ ভুল। তীব্রবেগে পেছনের পায়ে ঘুরে এরা চার্জ করতে পারে। এদের মারতে হলে গলার মাঝখানে গুলি করতে হবে, না হলে হৃৎপিণ্ডে।

দেশে আজকাল ভাল নূতন রাইফেল, কি ১২-বোর বন্দুক পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না। গুলি যোগাড় করাও দুষ্কর, যা গুলি পাওয়া যাবে তা-ও পুরানো এবং সামনাসামনি বাঘ শিকারের সময় বিপদ ডেকে আনবে। কারণ, হয়ত ফুটবেই না অথবা দশ-বিশ গজ দূরে মাটির ঢেলার মত পড়ে যাবে। ১২-বোরের লীথল কি 'কণ্ট্র্যাকটাইল' বুলেটও দুষ্প্রাপ্য। পাওয়া গেলেও টাটকা হবে না এবং দুর্মূল্য। এক্ষেত্রে কোন বিশ্বাসী ভদ্রলোক বা দোকানদারের কাছ হ'তে ব্যবহৃত অর্থাৎ পুরাতন রাইফেল কি বন্দুক কিনতে হয়। ব্যারেলের ভিতর ভাল করে দেখতে হবে, যেন বেশী ক্ষয়ে না গিয়ে থাকে, কিংবা মরিচা পড়ে ছোট ছোট গর্তে ভরতি না থাকে। প্রায় সব সহরেই পুলিশদের গুলি ছোড়ার জন্য 'রেঞ্জ' বা লক্ষ্যভেদ কেন্দ্র থাকে। কলিকাতার কোন কোন বন্দুক বিক্রেতা দোকানদারের এই প্রকার রেঞ্জ আছে। সেখানে কিংবা গভীর জঙ্গলে রাইফেলে গুলি চালিয়ে দেখতে হবে যে, ১00 গজ দূরের লক্ষ্যস্থলে গুলি ঠিক পড়ে কি না। বাঘ প্রভৃতি সঙ্কটজনক শিকারে গুলি ঠিক না চললে যে-কোন মুহূর্তে শিকারীর প্রাণ যাবে।

এসব শিকারে একনলার চেয়ে দুইনলা রাইফেলই ভাল, কারণ কাঁধ থেকে না নামিয়েই তাড়াতাড়ি দু'টি গুলি উপর্যুপরি চালান যায়। একনলা রাইফেল যতই ভাল হোক না কেন, দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার সময় বোল্ট ঘুরাবার শব্দে জানোয়ার জেনে যাবে শিকারী কোথায় এবং গুলি ছুঁড়তে দেরীও হবে। দুইনলাতে গুলি আটকে যাবার (অর্থাৎ জ্যামিং) সম্ভাবনাও কম। একনলার সুবিধা হচ্ছে যে, এটা সস্তা, জঙ্গলে ঘুরবার পক্ষে হালকা এবং জানোয়ারের দলের যথা প্রাচীর সামনে সামনে এসে পড়লে অন্তত [illegible] গুলি পর পর পাওয়া যায়।

সম্ভব হলে দুইনলা রাইফেলই (এবং ১২-বোর বন্দুক) ব্যবহার করা উচিত।

জঙ্গলে ঘোড়াওয়ালা ('হ্যামার') বন্দুক ব্যবহার করা বিপজ্জনক। লতায় জড়িয়ে ঘোড়া বা হ্যামার উঠে গিয়ে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। এতে নিজের যত বিপদ, সঙ্গীদের ততোধিক। শুধু তাই নয়, শিকারী হয়ত গুলি ছুঁড়বার জন্য ঘোড়া তুলেছেন। কিন্তু শিকার সরে গেল; এ অবস্থায় ঘোড়া আবার নামিয়ে রাখতে হবে। অতি সাবধানে, আস্তে আস্তে টিপে এ কাজটি না করলে গুলি বরিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী, কিন্তু ঘোড়াবিহীন অর্থাৎ "হ্যামার-লেস" বন্দুকে এটা অনেক সোজা। শুধু সেফটি ক্যাচ্ নামালেই হবে। লতা লেগে হ্যামার পড়ে যাবারও সম্ভাবনা নেই। কেউ কেউ ভাবেন যে, ঘোড়াওয়ালা বন্দুকই জঙ্গলে ভাল। এটা ভুল ধারণা। কয়েক বছর আগে ঝিনাইদা (অধুনা পাকিস্তানে) মহকুমাতে নলডাঙ্গা জঙ্গলে চিতার জন্য বীটের ব্যবস্থা করা গেল। বন্ধুবর সেন ও আমি কলকাতা হতে গিয়েছিলাম। সেখানকার স্কুলের এক শিক্ষক ও আরও তিনজন স্থানীয় শিকারী ভদ্রলোক আমাদের দলে যোগ দিলেন। শেষোক্ত চারজনের ঘোড়াওয়ালা বন্দুক, আমাদের দু'জনের 'হ্যামারলেস'। বীট আরম্ভ হবার আগে চায়ের টেবিলে, কি বন্দুক ভাল—এই প্রশ্ন উঠল। স্থানীয় চারজন দৃঢ়ভাবে বললেন যে, ঘোড়াওয়ালা বন্দুকই জঙ্গলে প্রশস্ত। ভোটে আমাদের দু'জনের পরাজয় হল। কিন্তু এত শীঘ্র যে আমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে, তা কল্পনাতীত। মাচা করা গেল না, সময় অল্প। গাছের আড়ালে থাকা ঠিক হল। প্রথমে আমি, তারপরে সেন, শিক্ষক মহোদয় ও পরপর তিনজন স্থানীয় ভদ্রলোক গাছের তলায় ছোট ছোট ঝোপের আড়ালে থাকা সাব্যস্ত করলাম। সেন অভিজ্ঞ শিকারী, ভারতবর্ষ ও বার্মায় অনেক বড় বড় শিকার করেছেন। তিনি বললেন যে, চিতার চার্জ মাটিতে দাঁড়িয়ে নিতে রাজী নন। একটি মই দিয়ে তাঁকে গাছের ওপর তুলে দেওয়া হল। শিক্ষক বললেন যে, তিনি চিতাকে ভয় করেন না, অনেক বাঘ মেরেছেন, মাটিতেই থাকবেন। কিছুক্ষণ পরেই বীট আরম্ভ হল। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের আর্ত-চীৎকার কানে এল—আমাকে বাঁচাও।

ভাবলাম, গুলি খেয়ে চিতা তাঁকে আক্রমণ করেছে। সেনকে গাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমিই নিকটে, আমাকেই যেতে হবে সাহায্যে। ভীষণ বেতবন, কাঁটাতে আমার হাত ও পা রক্তাক্ত হয়ে গেল, শুধু হাফ সার্ট ও হাফ প্যাণ্ট ছিল পরনে। ছুটে গিয়ে দেখি যে শিক্ষক গাছের তলায়, হাত রক্তে মাখা। জিজ্ঞাসা করলাম, বাঘ কোথায়?

তিনি বললেন যে, বীট আরম্ভ হওয়ার পর একটু ভয় হল, তাই বন্দুক নিয়ে গাছে চড়বার চেষ্টা করেন। বন্দুকে গুলি ভরা ছিল, গাছের ডালে লেগে ঘোড়া উঠে আবার পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে গেল। তাঁর হাত ছিল বন্দুকের নলের ঠিক ওপরে। প্রথম তিনটি আঙুল ও হাতের তালুর অর্ধেক একেবারে থেঁতলে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কব্জীতে ও কনুই-এ খুব শক্ত করে রুমাল বেঁধে রক্ত বন্ধ করলাম। জঙ্গলের পাঁচ মাইল দূরে এক ডাক্তারকে ডেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা গেল। তারপর ঝিনাইদা হাসপাতালে এবং সেইদিন সন্ধ্যার ট্রেনে গিয়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হল। তিন মাস অসম্ভব ভুগে ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেন, কিন্তু তিনটি আঙুল ও অর্ধেক তালু আর থাকল না। কে চেয়েছিল এ রকম মর্মান্তিক প্রশ্নোত্তর?

বাঘ শিকারের জন্য সাধারণত ৪০০ গ্রেন ভারী বুলেট দরকার। বাঘের মত পাতলা চামড়ার জন্তুর জন্য 'সফট্' অর্থাৎ সীসার নরম গুলি ব্যবহার করতে হয়। ভালুক ও বুনো শুয়োরের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু হাতী কি মোষ, বাইসন, গণ্ডারকে মারতে হবে 'হার্ড' বুলেটে। এ সব শিকারের পক্ষে রাইফেলের বোর ৪৫০/৪০০, ৪৬৬, ৪৭০, ৩৭৫ ম্যাগনাম হলেই ভাল—অন্ততপক্ষে ৪২৩। কিন্তু শিকারী সুদক্ষ না হলে রাইফেল বা বন্দুক কি করবে। মাচা হ'তে ৩০ গজের মধ্যে বাঘ বা চিতা মারতে ১২-বোর বন্দুক দরকার হলে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু লীথল বা কনট্র্যাকটাইল কি রোটাক্স 'সফট্', গুলি, যা ব্যবহার হবে, তা যেন তাজা হয়। ১২-বোরের গুলির ওজন বেশী, কিন্তু ধাক্কা দেবার ক্ষমতা অনেক কম, সেইজন্য একেবারে মারাত্মক স্থানে গুলি না লাগলে তাকে রোখা যাবে না। এক্ষেত্রে বোঝাই যায় যে, পায়ে দাঁড়িয়ে মারলে কি অবস্থা হবে। প্রথমেই এল, জি কি এস, এস, জি মাচা হতে কখনও ব্যবহার করতে নেই। মাটিতে চার্জ করলে ঐ সব ছোট গুলি সময় সময় হয়ত আক্রমণ থামাবে, বিশেষত চিতার। কিন্তু বাঘের বেলায় চার্জ থামাতে এস, জি কি এস, এস, জি সব সময় কাজ দেবে না। আহত বাঘ অনুসরণ করার সময় রাইফেলই ভাল কিন্তু শিকারী একটু কাঁচা হলে ও রাইফেল শিকারে পারদর্শী না হলে, ১২-বোর বন্দুক ব্যবহার করতে পারতে পারেন 'সফট্' বুলেট ভরে। এল, জি কাজ দিতে পারে।

জঙ্গলে ঢুকলে রাইফেল কি বন্দুক নিজের হাতে এমনভাবে নিতে হবে যে, মুহূর্তের মধ্যে যেন গুলি ছোঁড়া যায়। রাইফেল তাক করার সময় শিকারীকে মনে রাখতে হবে যে, আলো কম থাকলে কিংবা জমি যদি সমতল হয়, পাল্লা অর্থাৎ দূরত্ব আসলের চেয়ে বেশী মনে হয়। পরিষ্কার আলোতে কিংবা উপত্যকা কি জলের ওপারে লক্ষ্যবস্তু থাকলে মনে হয় আসলের চেয়ে কম দূরবর্তী, রাইফেলের পাল্লা ঐ ভাবে ঠিক করা দরকার।

॥ সমাপ্ত ॥

প্রাচীন এ্যাগোরা

পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি হিসাবে ইতিহাসে যে ক'টি দেশ সসম্মানে চিহ্নিত হয়ে আছে, গ্রীস সেই তালিকায় একটি মুখ্য নাম। মানব-সভ্যতার অপ্রতিহত নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রার প্রথম স্বাক্ষরে যে ক'টি দেশের মাটি ধন্য হয়েছিল, গ্রীস তাদেরই একটি। অতি প্রাচীনকালে শিক্ষা-দীক্ষা শিল্প-সংস্কৃতি, শৌর্য-বীর্য, অভিনয়-মহাকাব্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্রীস যে শ্রেষ্ঠত্ব, মৌলিকত্ব ও কুলীয়ানার পরিচয় দিয়েছিল তা সমগ্র বিশ্বের মানবসমাজকে শুধু অভিভূতই করে নি, প্রভাবিতও করেছিল বিপুল পরিমাণে, যার বলিষ্ঠ ধারা আজও অব্যাহত।

সময়ের অপ্রতিহত অগ্রসরণের নির্দিষ্ট নিয়মে বহমান নদীস্রোতের ন্যায় কত কিছু গড়ে ওঠে, আবার কত কিছু ভেঙে যায়। কত কিছু রূপ পরিগ্রহ করে, আবার কিছুই চোখের আড়াল হতে হতে একদিন স্মৃতির আড়ালেও চলে যায়। কত গহন গভীর অরণ্য হয়ে ওঠে সুরম্য লাবণ্যমণ্ডিত শোভাময়ী মহানগরী। আবার কত আলো ঝলমলে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ জনপদ চলে যায় মাটির তলায়।

সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধানে কত অবলুপ্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর আবার লোকলোচনের সামনে ধরা দেয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্যে। যেভাবে ভারতবর্ষ জেনেছে, তার মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার কথা, যেভাবে আজকের দিনের গ্রীকবাসীরা জানতে পেরেছে তাদের প্রাচীন এ্যাগারোর কথা। অথচ কিছুকাল পূর্বেও এই অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী এ্যাগারো সাধারণ মানুষের জানার বাইরেই ছিল। বর্তমান শতকের ত্রিশের দশকে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে তার হারানো গৌরব সম্বন্ধে একালের মানুষ অবহিত হল।

সমসাময়িক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখাবয়বের ছাঁচ

এথেন্সের কাছে এই এ্যাগোরার অবস্থিতি। অষ্টম খৃস্টপূর্ব প্রত্নতাত্ত্বিক খননে। সুতরাং এই শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই হাজার বছরের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে, এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে সেই হাজার বছরের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর আঙিনায় আত্মপ্রকাশ করছে। সেকালের জীবনযাত্রার, মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তার, সমাজব্যবস্থার, রীতিনীতির সম্যক পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর হল। সেকালের মানুষের জীবনযাত্রার এই সম্যক পরিচয়লাভে সংশ্লিষ্ট যুগটির সম্বন্ধেও একটি সুস্পষ্ট ধারণা রূপ পরিগ্রহ করার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা রইল না।

এই আবিষ্কারের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। শুধু ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র ছাড়াও আরও কিছু পাওয়া গেছে, যা সেই যুগের বিশেষত্ব পুরোপুরি বহন করছে, যার প্রত্নতাত্ত্বিক তথা ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সে যুগের ভাস্কর্যকলার নিদর্শন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উক্ত যুগের মানুষ সংশ্লিষ্ট বিদ্যায় কি গভীর দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অধিকারী ছিল, যার গুরুত্ব সময়ের প্রভাবও ম্লান করতে করতে পারে নি।

সেকালের সমাধি ভূমিগুলিও বহুল পরিমাণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। সবসমেত একুশটি সমাধির সন্ধান মিলেছে। দু'টি শিশুর দেহও পাওয়া গেছে। বিশেষত্ব এই যে, মৃতদেহগুলির সঙ্গে কিছু মাটির জিনিসও সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দেখা যাচ্ছে, মিশরের মত এ দেশেও মৃতদেহের সঙ্গে জিনিসপত্রাদি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

এই আবিষ্কারে তৎকালীন নির্বাসন রীতির একটি পূর্ণ বিবরণ জানা যাচ্ছে। সেকালে দেশের ও দশের মঙ্গলার্থে যাঁদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হোত, সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য ক্ষেত্রে ভোট নেওয়া হোত। ছ'হাজার ভোট এই মর্মে সংগৃহীত হলে নির্বাসন প্রস্তাবটি গৃহীত হোত। কয়েকটি প্রস্তরখণ্ডে তাঁদের নাম খোদিত করে সর্বসাধারণকে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হোত। সেই বিশেষ প্রস্তরখণ্ডগুলি আবিষ্কৃত হয়ে হয়ে ইতিহাস চর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে বলা চলে। দেশের যে বিখ্যাত সন্তানদের এইভাবে নির্বাসন-বরণ করতে হয়েছে, সেই তালিকায় দু'টি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে নাম—আরিস্টিডেস ও থেমিসটকলস্। এই খননকার্যেতে সে ঘটনা পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

গ্রীক প্রত্নতাত্ত্বিক কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে এই প্রচেষ্টার রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক শিয়ার এবং এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও উল্লেখিত থাকে যে, এই প্রচেষ্টার রূপ দেওয়ার জন্য যে আধুনিক বাড়ীগুলি কিনে নিয়ে সেগুলি ভাঙতে হয়েছে, তাদের সংখ্যা দুশো।

—অনিল ভট্টাচার্য

অতল সাগরের রহস্য

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

সা[illegible] মানুষের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। সম্প্রতি অবশ্য 'ওসেনোগ্রাফি' নিয়ে বেশ মাতামাতি সুরু হয়েছে এবং কিছুদিন আগে ভারত মহাসাগর অতলের রহস্য উদ্ঘাটনার্থে অনুসন্ধানও হয়ে গেছে এক চোট। ঐ গবেষণান্তে ভারত মহাসাগরের তলদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা আনুমানিক বিবরণও কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিবরণে যতদূর মনে পড়ে, সাগরের অতলে তলিয়ে যাওয়া সুদূর অতীতের কোনও মহাদেশের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে বলেও যেন দাবী করা হয়েছিল। ভারতীয় নৌবহরের জাহাজ 'আই. এন. এস—কৃষ্ণা'ও এমনি 'ওসেনোগ্রাফির' কাজে ব্যাপৃত আছে। আর ঐ জাহাজের কমাণ্ডার কোলকাতারই ছেলে। শ্রীজে মৈত্র। এত করেও কিন্তু সাগর অতলের রহস্য প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে।

এত রহস্যময় বলেই ' মরণাতীত-কাল থেকেই প্রচলিত আছে সাগর অতলের রহস্যকে নিয়ে এত রূপকথা আর উপকথা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে। এককালে ঐসব রূপকথা-উপকথার কাহিনীও মানুষ কিঞ্চিৎ সন্দেহের সাথে হলেও বিশ্বাস করতো। তবে, সে যুগ চলে গেছে। বিজ্ঞানের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐসব রূপকথা আর উপকথা ক্রমে অবিশ্বাসের আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আজ সেসব অলীক কল্পনার কথা। ওদের স্থান দখল করেছে 'সাবমেরিণ রক্' 'সাবমেরিণ ভলক্যানো'র কথা। কারণ আছে। সাক্ষীসাবুদের অভাব। যার জোর অস্তিত্বের সত্য নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়। আর বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণবিহীন অস্তিত্ব স্বীকৃতই বা হয় কোন্ যুক্তিতে? ঠিক এই কারণেই আজ সাগরের উপকথা-রূপকথা ওসব বিস্মৃত। বিস্মৃত আজ সাগরতলের রাজা-রাণী, দৈত্যদানো আর ভয়াবহ সর্পকুল।

কিন্তু একটি কথা। অস্তিত্ব ওদের আছে বলে যেমন কোনও প্রমাণ নেই, আছে কোথায়? যদি অই থাকবে, তবে মাত্র ১৫ বছর আগে, ১৯৫২ সালে 'সেলাকাণ্ড' আবৎ বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কী অমন করে বোকা বানাতে পারতো? পারতো না। কিন্তু পারলো যখন, তখন স্বীকার করতেই হবে যে, আপাতদৃষ্ট সাক্ষী-প্রমাণই যথেষ্ট নয়, সাগর অতলের রহস্য পরিধি নিরূপণের ব্যাপারে।

বিজ্ঞানীদের মতে: 'সেলাকাণ্ড' প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৎস্য। বহু সন্ধান-অনুসন্ধানের পর তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, 'সেলাকাণ্ড' ৫০,০০০,০০০ বছর আগেই পৃথিবী হতে তথা সাগর-বক্ষ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেমন গেছে 'ডাইনোসরাস্,' 'ম্যাস্টোডন' আর 'ডোডো পাখী' প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরাও রায় দিলেন, ওদিকে 'সেলাকাণ্ডের' মনে ছিল কিন্তু অন্য অভিসন্ধি। ঝাড়া ৫০,০০০,০০০ বছর বিজ্ঞানীর চোখে ধুলি দিয়ে গা'ঢাকা দিয়ে থেকে হঠাৎ ১৯৫২ সালে সদন্ত বিকশিত মুখে এসে 'সেলাকাণ্ড' আবির্ভূত হল 'কেপ কমরোর অনতিদূরে। বিজ্ঞানীরাও অবাক। এ আবার কী করে সম্ভব? তা' সে যেভাবেই সম্ভব হোক—এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটি প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। সাগর অতলের রহস্য সন্ধানে আপাতদৃষ্ট সাক্ষী-প্রমাণই যথেষ্ট কী? যদি তাই হবে, তবে 'সেলাকাণ্ড' বোকা বানালো কী করে? আবার আপাতদৃষ্ট বা প্রাপ্ত সাক্ষী-প্রমাণই যদি পাওয়া যায়ে গ্রহণ কাহিনীই বা কী করে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করা চলে? সেই ভয়াবহ সর্পের অস্তিত্বের সমর্থনেও ত' এ-অবধি একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। তবে? তা থাক, যুক্তিতর্কের প্রশ্ন থাক। এ লেখার উদ্দেশ্যও তা নয়। বরং এক-এক করে সব প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বিবরণগুলিই লিপিবদ্ধ করে যাই আগে দিন-ক্ষণ ও তারিখ দিয়ে। এই বিবরণগুলি পাঠ করলেই বুঝা যাবে, সামুদ্রিক সর্প কী কেবল রূপকথারই কল্পনা, না বস্তুত ও[illegible]র অস্তিত্ব আছে। একবারে অনন্তের জন্য।

প্রথমেই শুনুন আই. এম. এস—ডেড্যালাস্ জাহাজের কাপ্তেন ম্যাক্কোহির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের কথা। ঘটনাস্থল উত্তমাশা অন্তরীপের অদূরে অতলান্তিক মহাসাগর। কাপ্তেন ম্যাক্কোহি উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি লিখে গেছেন,—"তখনও সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক দেরী ছিল। পড়ন্ত সূর্যের সোনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে সারা অতলান্তিকের বুক জুড়ে চলছিল সোনালী উৎসব। তার মাঝে অশান্ত সাগরের ফেনিল উচ্ছ্বাস এক অপূর্ব নৈসর্গিক শোভার সৃষ্টি করেছিল। জাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে আমি সেই অপরূপ শোভাই দু'চোখ ভরে দর্শনে মত্ত ছিলাম। হঠাৎ নজরে এল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সেই অশান্ত স্বর্ণসমুদ্রের বুক চিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো এক অতিকায় সর্প-দানব। জাহাজ থেকে আনুমানিক মাইল

খানেক দূরে বলে মনে হ'ল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে 'বাইনোকুলার' এনে পর্যবেক্ষণে রত হলাম। এবার সেই দানবদেহ পরিষ্কার চোখে ধরা দিল। তার দেহ নিঃসন্দেহে সর্পদেহ। দেহের পরিধি ১৫।১৬ ইঞ্চির মত বলে মনে হ'ল। দেহের রং কালচে বাদামী, তবে বুকের রং হলদেটেমত। আর অদ্ভুত ছিল তার মুখ ও মাথার গড়ন। সাপেরই মত লম্বাটে আর থুতনির দিকটা ছুঁচালো। বেশীর ভাগ তার সাপের মুখের গড়ন হলেও ঘোড়ার মুখের সাথেও যেন তার কোথায় একটা মিল ছিল। ঘাড়ের ওপর ঘোড়ার মত কেশরও ছিল। সেই সর্পদানব বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাথা উঁচু করে ভেসে বেড়ালো। তারপর এক সময় ডুব মেরে উধাও হল। দ্বিতীয়বার আর তাকে দেখা গেল না।" এই সমস্ত দৃশ্য ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌কোহির 'বাইনোকুলা'রে এত সুস্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল যে, তার পর্যবেক্ষণে কোন ভুলত্রুটি হতে পারে বা হয়েছে—এমন মন্তব্য তিনি আদৌ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌কোহি-বর্ণিত এই ঘটনার পর আরও একাধিক সমগোত্রীয় ঘটনার কথাও কর্ণগোচর হয়েছে। তার ভিতর অনেকগুলিই এ্যাডমিরালটির দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

এমন একটি অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন মিঃ আর্থার রোস্ট্রন। তিনি ছিলেন কানার্ড ফ্লিটের জাহাজ "কোম্পানিয়া" কমডোর্। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তিনিও তাঁর জাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক অতিকায় সমুদ্র সর্পের লীলাখেলা। তার দেহের পরিধি ছিল প্রায় ১৪ ইঞ্চির মতন। দেহের বর্ণ ছিল মিশ্‌মিশে কালো। পেটের দিক সাদাটে ধূসর বর্ণ। জলের ওপর সে যখন এপাশ-ওপাশ করে চলছিল তখন তার দেহের যতটুকু দৃষ্টিগোচর হয়েছিল তা' থেকে মিঃ রোস্ট্রনের মতে দেহ ছিল লম্বায় প্রায় ৩০।৪০ ফিটের মত। আর সাগরপৃষ্ঠ থেকে মাথার উচ্চতা ছিল ৮ফিটের মত।

ঐ একই দৃশ্য দেখেছিল অবাক বিস্ময়ে যুদ্ধ জাহাজ এইচ. এম. এস— হিলারীর নাবিকরা। ঐ অভিজ্ঞতার কথাও লিপিবদ্ধ করা আছে জাহাজের 'লগবুকে।' ঐ সর্পদানবও ছিল বিরাটাকৃতির। দেহের পরিধি প্রায় ১৭ ইঞ্চির মত। লম্বায় প্রায় ত্রিশ ফিটের মত। দেহের বর্ণ ছিল কালসাপের মত কুচকুচে কালো। মুখটা ঘোড়া আর সাপের মাঝামাঝি গড়ন। ঘাড়ে কেশর ছিল। আর মাথায় ছিল গরুর শিং-এর মত ছোট ছোট দু'টি শিং! ওদের ঐ সর্পদানবের সাথে মোলাকাৎ ঘটে 'আইসল্যাণ্ড' অনতিদূরে। দানব নাকি জাহাজের দিকেই এগিয়ে আসছিল ছুটে। জিহ্বা নেড়ে-চেড়ে। গোড়াতে অবশ্য নাবিকরা ওকে এগিয়ে আসতে দিল আরও ভাল করে পর্যবেক্ষণ করার অভিপ্রায়ে। কিন্তু যখন বুঝলো ঠেকানো দরকার, তখন গুলী চালাতে সুরু করলো। আর গুলী সুরু হতেই সর্প-দানব ডুব মেরে গা-ঢাকা দিল।

এ সব ত' না-হয় অনেকদিন আগের পুরানো কাহিনী। এবার ইদানীংকালের কথাই দু'একটা বলি। ত্রিশ দশকের কথা। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে "মোরেটানিয়া" জাহাজ যাচ্ছিল ক্যারিব উপসাগর বেয়ে। পথে মাথা তুলে দাঁড়ালো বিকটাকৃতি এক সর্পদানব। লম্বায় সে ছিল প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ ফিটের কাছাকাছি। দেহের পরিধি ছিল ২৭ ইঞ্চির মত। মুখ লম্বা। অবিকল সাপের মত। থুতনি ছুঁচালো আর বর্শার ফলকের মত ছিল জিহ্বা। সদা সঞ্চরমাণ। দেহের রং ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এই ঘটনার কথাও লিপিবদ্ধ করা আছে 'মোরেটানিয়া' জাহাজের 'লগবুকে'। ঐ একই বছর যাত্রীবাহী জাহাজ 'লার্জেস বে'র যাত্রীরাও দেখেছিল ঐ একই মূর্তির দানবকে। আকৃতি, দেহের গড়নে সে-ও ছিল ঐ 'মোরেটানিয়ার' নাবিকদের দেখা সর্পদানবের সমগোত্রীয়। কেবল দর্শনের স্থান ছিল ভিন্ন। এরা সব দেখেছিল ঐ দানবকে 'এডেন' বন্দরের কিছু দূরে।

ঐ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দেই আবার সর্পদানব দৃষ্ট হয় উত্তর অতলান্তিক সাগরে। এবারের দর্শক ছিল এক রাশিয়ান যুদ্ধ জাহাজের কতিপয় নাবিক। এ কাহিনীও ঐ জাহাজের 'লগবুকে' লিপিবদ্ধ করা আছে।

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে বিলাতের সাফোক্ অঞ্চলের দু'জন জেলে—নাম যথাক্রমে আর্নেস্ট ওয়াটসন আর বিল হেরিংটন গিয়েছিল মাছ ধরতে। বেচারারা ছিল নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ সোঁ সোঁ শব্দ করে তাদের প্রায় ৪০ ফিট দূর দিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে গেল এক অতিকায় সমুদ্র সর্প। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য হলেও ওরা দু'জনেই বেশ পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল সেই-দানবের আকৃতি। সে আকৃতি ছিল বিকট ও বিরাট। লম্বায় প্রায় ৩৪।৩৫ ফিটের মত, পরিধি আনুমানিক ১৭ ইঞ্চির মত, আর দেহের বর্ণ আলকাতরার মত কালো। ছুঁচালো মুখ, ঘাড়ে কেশর আর ছিল পিঠে উটের মত কুঁজ। অবিশ্বাস্য! কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী দু'দুটি লোকের একই বিবৃতি ত' আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এ ধরনের বিবৃতি আরও বহু আছে। সবই প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ। একই ধরনের তিনশো বিবৃতি এ-অবধি সংগ্রহ করা হয়েছে বিলাতের এ্যাড্‌মিরালিটির দপ্তরে। এই তিনশো বিবৃতির মাঝে এমন সব উচ্চপদস্থ দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরা আছেন যে, তাঁদের বিবৃতি হেসে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌কোহি বা কমাণ্ডার আর্থার রোস্ট্রন ছিলেন ঠিক সেই পর্যায়ের উচ্চপদস্থ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 'লক্‌নেস্' তীরে দাঁড়িয়ে যে হাজারখানেক মানুষ বিকটদর্শন অতিকায় সমুদ্র সর্পের লীলা-খেলা দেখেছিলেন, ভয়ে-বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে তাঁদের মাঝে বহু ধর্মযাজক এবং স্কুল টিচারও ছিলেন। তা ছাড়া ঐ এক হাজারের মত লোক একই কণ্ঠে হুবহু একই বিবৃতি দিয়ে একটা

যোধপুর পার্ক

জ্যোতির্ময় দাশ

যো... অভিজাত বাসস্থান। পাড়ার মধ্যে কুলীন শ্রেণীর। প্রত্যেক পাড়ার একটা অর্থনৈতিক চেহারা আছে। জনসাধারণের মতই পাড়ায় পাড়ায় অসাম্য থাকতে পারে। বিত্তের ও পেশার মাপকাঠিতে পাড়ার শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে যেমন দেখতে পাওয়া যায়—ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ও ভাষার লোকেরা বিশেষ একটি অঞ্চলে জোট বেঁধেছে, তেমনি কোন একটি পাড়া কেরাণী মহল্লা, কোনটা চাপবাসী কলোনী আবার কুলীন শ্রেণীদের অফিসার্স এনক্লেভ — অর্থাৎ বড়বাবুদের ডেরা।

এই এক জাতের, এক গোত্রের একত্রে থাকায় সমাজ কল্যাণে বা দেশের-দশের কতদূর উন্নতি হয়েছে জানা যায় নি, কিন্তু প্রতিবেশী অর্ধাঙ্গিনীদের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় হয়েছে। একথা আজ আর কারো অজানা নয় যে, কেরানী মুখুজ্যের সঙ্গে অফিসার মল্লিকের অন্তরঙ্গ আলাপ থাকলেও তাঁদের গৃহিণীরা দুপুরে একত্রে পরচর্চা করতে বসবেন না কখনই। আর বসলেও মল্লিক গিন্নীর নাকের চেহারা স্বাভাবিক থাকবে না, তা কুঞ্চিত হবেই এবং মুখার্জি গৃহিণীও সে আসরে মন খোলসা করে অন্যের হাঁড়ির খবর নাড়া-চাড়া করতে পারবেন না।

দুই গিন্নীর সমস্যা প্রায় এক হলেও মিসেস মল্লিকের অবস্থা কিছুটা বেশি জটিল। তিনি অন্যের স্বামীর অবস্থা ও অফিসের পদমর্যাদা নিজের কর্তার সমগোত্রের হলেই যে আলাপ করতে যাবেন, এমন ভাবা উচিত নয়। কারণ, তাঁর স্বামীর টেলিফোন ও কতিপয় ইম্পোর্টেড তৈজসপত্র—যথা, ফ্রিজিডেয়ার ইত্যাদি আছে। প্রতিবেশীর সেই বস্তুগুলি না থাকলে তার গিন্নীর সঙ্গে আলাপ জমতে নাও পারে। কিন্তু মিসেস মুখার্জির ক্ষেত্রে শুধু কেরাণী হলেই

চলে — থালা, ঘটি, বাসন কটা রইলো তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। এ এক বিচিত্র অনুভূতি — স্বামীর মাইনের পরিমাণ বন্ধুত্বের মাপকাঠি হতে পারে, বিধাতা থেকে বুদ্ধ কেউ ভাবতে পারেন নি। পারলে যীশুর "দশটি প্রধান অনুজ্ঞার" মধ্যে এর প্রতিকার বিষয়ক একটি অনুজ্ঞা থাকার সম্ভাবনা ছিল।

যোধপুর পার্ক ও তার আশে-পাশে যারা থাকেন, তাঁরা রূপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মে ছিলেন কিনা, সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু তাঁদের ছেলে-মেয়েরা এখন চাঁদির চামচ ছাড়া অন্য চামচ মুখে তোলে না। তাঁদের ষোড়শী কন্যারা শাড়ীর বদলে পূর্ব বাংলার বাউলদের অনুকরণে আলখাল্লা পরে এবং বাড়ীতে ইংরাজীতে কথা বলে। তাঁদের মায়েরা ম্যানিকিওর-করা নখের বিজ্ঞাপন করতে করতে প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে সব্জীর বাজার করেন এবং প্রতিবেশীর ছেলের স্কুলের কৌলীন্য যাচাই করে আলাপ করতে যান।

যোধপুর পার্কের স্বামী মহোদয়েরা সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরে বড়-সাহেব, মাঝারি-বড়সাহেব বা ছোট-বড়সাহেবের দল। ওদের অফিসের খরচায় টেলিফোন, গাড়ীর পেট্রল আর বাড়ীর আসবাব প্রভৃতি কেনা, বদলান ও অপচয় করা হয়ে থাকে। কোম্পানীর টাকা গৌরী সেনের টাকার সঙ্গে অনবদ্যভাবে তুল্য বলে এঁদের ছেলেমেয়েরা ট্রাঙ্ক-কলে প্রেমালাপ, বিয়ের সিদ্ধান্ত বা ডিভোর্সের ঘোষণা করে। কর্তা উইক-এণ্ডে

অদ্ভুত খবর পরিবেশন করবেন আর তাতে কণ্ঠ মেলাবেন ধর্মযাজক ও স্কুল টিচাররা, এমন কল্পনাও আজগুবি অনুষ্ঠানেই সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। অতএব, এতসব শুনে অনুমান করলে হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় গিরগিটিজাতীয় সরীসৃপ 'প্লেসিওসরাস্'-এর গুটি কয়েক আজও অবধি সাগর অতলে লুকিয়ে থেকে অস্তিত্ব রক্ষা করে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে সহসা দর্শনদান করেই এই অতিকায় সমুদ্র সর্পের প্রহেলিকার সৃষ্টি করছে। ৫০,০০০,০০০ বছর আগে বিলুপ্ত বলে কথিত 'সেলাকাণ্ঠ' যদি মাত্র ১৯৫২ সালে পুনরায় দর্শন দিয়ে বোকা বানাতে পেরে, থাকে তবে প্লেসিওসরাসই বা পারবে না কেন? কথাটা এবার ভেবেচিন্তে দেখার সময় এসেছে। বেশী অবিশ্বাসেও ভয় আছে। শেষে না আবার 'সেলাকাণ্ঠে'র হাতে নাকাল হবার মত কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়।(১)

১। (Ref. Do Sea Serpents Really Exist? By B.S. Breed.)

কিসনেজ ট্যুরের নামে খাঁদুরেক মাইল ঘুরে সপরিবারে পিকনিক করেন এবং গরমের সময় বাড়ীতে তালাচাবি দিয়ে চাকর, গিন্নী, কুকুর সমেত পাহাড়-পর্বতের ঠাণ্ডায় পনেরো-বিশ দিনের (সুবিধে থাকলে এক মাস) প্রমোদভ্রমণের ক্যামোফ্লেজে কনফারেন্স নামক বিচিত্র আলোচনায় যোগ দিতে যান। তখন বাড়ীর সব ঘরদোরের পাখাগুলো ফুল স্পিডে চালিয়ে যান। উদ্দেশ্য সাধু—একমাস বন্ধ ঘরে যাতে ধুলোময়লা জমতে না পায়, নইলে ফিরে এসে চাকরবাকরদের খুব কষ্ট হয় পরিষ্কার করতে। অবশ্যই জল ও আলোর বিল গৌরী সেন প্রাইভেট লিমিটেড মিটিয়ে থাকেন। মার্কিনীরা চাঁদে লোক পাঠালেও, বন্ধ বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখার এই অভিনব রীতি তাদের ওপর-নীচে, চোদ্দ পুরুষ কোনদিন ভাবতে পারবে কিনা সন্দেহ কিন্তু মিসেস দত্তের এটা ভাবতে মিনিট তিনেকও লাগে নি। নিত্য নতুন এ ধরনের চিন্তা তিনি করতে পারেন।

যোধপুর পার্কের তিন প্রতিবেশী—মিত্র-বাসু-দত্ত এবং তাঁদের গৃহিণীত্রয় এ কাহিনীর চরিত্রেরা। বলা বাহুল্য, এঁরা কাল্পনিক। বাস্তবের সাথে মিল থাকলে আমি দুঃখিত।

মিঃ সঞ্জীবন মিত্র একসঙ্গে দু'তিনটি বেসরকারী কোম্পানীর (একই গ্রুপ-চালিত) তাবড় অফিসার। জাঁদরেল মাইনে পান। পায়ের ডগা থেকে তাঁর মাথার চুল পর্যন্তের তত্ত্বাবধান কোম্পানী নিজ খরচে করে থাকে। মিঃ মিত্র একদা বেশ নীচুতলার থেকে যাত্রা সুরু করেন। সে সময়ে মাসের মাইনে বাড়ীতে এনে একনাগাড়ে তিনদিন হিসেব কষতেন ডাইনে-বাঁয়ে সঠিক মেলানোর প্রচেষ্টায়। মিসেস মিত্র তখন কোমরে কাপড় বেঁধে এক হাতে সংসারের ছুঁচ থেকে লাঙ্গল সব কিছুকেই খাড়া রাখার চেষ্টায় প্রাণপাত করতেন।

মিঃ মিত্র কর্মে তৎপর ও মেধাবী ছিলেন এবং বেসরকারী অফিসে উন্নতির জন্য করণীয় অন্যান্য সহযোগী কাজকর্মে মনোযোগী ছিলেন। ফলে একসময়ে উন্নতি ধাপে ধাপে বিভিন্ন পাড়া ও বাড়ী বদলের পর এখন যোধপুর পার্কে এনে ফেলেছেন তাঁকে।

মিঃ মিত্রের সামনের বাংলোয় নিচের তলায় খানসাতেক ঘর নিয়ে থাকেন নিঃসন্তান দম্পতি মিষ্টার ও মিসেস দত্ত। মিঃ দত্তের বয়স চল্লিশোর্ধ। যোধপুর পার্কে আসার ইতিহাস তাঁর বেশ সহজ ও সরল। মিঃ মিত্রের মতন অধ্যবসায় ও তৎপরতার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নি। কলেজ জীবনে তিনি বিখ্যাত শিল্পপতি মিঃ চাকলাদারের কন্যার সহপাঠী ছিলেন। শিল্পপতির কন্যা বাবার ব্যাঙ্কের সাদা-কালোয় মিশ্রিত ব্যালেন্সের প্রকৃত অঙ্কটি জানতেন, তাই তিনি সতীর্থদের মানুষের পদমর্যাদায় ফেলতেন না। ফলে বর্তমানে কো-এডুকেশন কলেজে প্রত্যেকের দু'তিনজন প্রিয় পাত্র-পাত্রী থাকা আবশ্যিক হিসেবে গণ্য হলেও মিস চাকলাদার ''প্রেমের জন্য নয়''—এমন একটা প্রবাদ কলেজে প্রচলিত ছিল। মিঃ দত্ত খেলোয়াড় ছিলেন। অসীম অধ্যবসায়ে তিনি মিস চাকলাদারের কুমারী-মন জয় করলেন। সে ঘটনা গল্পের মূলকাহিনী নয় বলে আমরা বর্ণনা করলাম না, তবে যে-কোন হিন্দী সিনেমা দেখলেই সেই প্রাক্-বিবাহ প্রেমের সচিত্র ইতিহাস জানা যাবে।

স্ত্রী-রত্ন লাভের পর মিঃ ভবতোষ দত্ত শ্বশুর মশাইয়ের জাঁদরেল অফিসে মাঝারি বড়সাহেবের একটা চেয়ার পেলেন বসার জন্য এবং প্রথামত যোধপুর পার্কের সাত কামরার ফ্ল্যাটে উত্তরণ।

মিঃ দত্তের মাথার ওপরে দোতলায় থাকেন মিষ্টার ও মিসেস বাসু। মিঃ বিপদবারণ বাসু একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের বিনীত থার্ড মাষ্টারের কনিষ্ট পুত্র। লেখাপড়ায় তেমন উজ্জ্বল ছিলেন না এবং পাড়ায় ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোন আলোড়ন না তুলেই কোন এক সময়ে বি-এ পাশ করেছিলেন। সেটা নির্বাচনের বছর। সে বছর মিঃ বাসুর মামা অক্লান্ত বক্তৃতা ও অপরিমিত অর্থ ব্যয়ে ভোটে জয়লাভ করে একটা মধু-মধু বিভাগের মন্ত্রিত্ব পেলেন। পুরুষাকারে কি না হয়, তার প্রমাণ অতঃপর মিঃ বাসুর মামা রাখতে পেরেছিলেন। মন্ত্রিত্বের বিভাগটি নিতান্ত এলেবেলে হলেও তাতেই তিনি সব করলেন। স্বনামে-বেনামে খানতিনেক বাড়ী করলেন, কিছু জমি-জায়গা হল এবং অনাবিল ঔদার্যে যে পরিমাণ কালো টাকা স্বদেশে ও বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা করলেন, তাতে তাঁর অধস্তন চোদ্দপুরুষ পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দিতে পারতেন। কিন্তু পুরুষাকারের দাবীতে তিনি এর পরেও চুপ করে বসে থাকেন নি। নিজের ছেলে-মেয়েদের লণ্ডনে রাজকুমারদের সঙ্গে লেখাপড়া করালেন। নিজের ও স্ত্রীর ছিটেফোঁটা রক্তের অংশীদারদের চাকরী ও বিদেশ যাত্রার পথ নির্মল করলেন। সেই সুবাদেই মিঃ বাসু একদিন পঃ জার্মানী থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা নিয়ে খাদ্য দপ্তরে গেজেটেড অফিসার হলেন। খাদ্য দপ্তরে মিঃ বাসুর জন্য উদ্ভাবিত তিন মাসের অস্থায়ী আসনটি সাত বছর পরেও কী করে একইভাবে অস্থায়ী থাকে এবং সরকারী বৃত্তিতে বিদেশ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী নিয়ে এসে খাদ্য দপ্তরে গমের বণ্টননীতিতে নিযুক্ত হয়ে দেশের কতটা উপকার সাধন হল—এ কথা কখনো আলোচিত হয় নি। কারণ মিঃ বাসুর মামা পরবর্তী নির্বাচনেও জিতেছিলেন এবং এখনও যথারীতি মন্ত্রিপদে সমাসীন।

মিসেস মিত্র-বাসু-দত্ত কেউ কাউকে চিনতেন না যোধপুর পার্কে বছর তিনেক থাকার পরেও। মিসেস মিত্র একদা দুপুরে তাস খেলার সময় পরচর্চা করতে অভ্যস্তা ছিলেন বলে যোধপুর পার্কে এসেই প্রতিবেশীদের খোঁজ করার বাসনা মনে এঁটে ছিলেন কিন্তু মিসেস দত্ত-বাসুর খোঁপার কোঁপানী আর জামার ভয়াবহ সংক্ষিপ্ততা জানলা দিয়ে দেখার পর আলাপ করতে

একটু ইতঃস্তত করছিলেন। কিন্তু পরে নিজের স্বামীর পদমর্যাদা ও নিজের ফ্ল্যাটের ঘরের সংখ্যা হিসেব করে সমান জানবার পর ভয় কাটিয়ে উঠলেও যাচ্ছি-যাবো করে যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

সেবারে মিঃ মিত্রের কোম্পানীর জোনাল কনফারেন্স জয়পুরে হয়। তিনি তাতে যোগ দিতে সপরিবারে রামবাগ প্যালেসে উঠলেন। বিকেলে রাণী সিসোদিয়ার বাগানে বেড়াতে এসে মিসেস মিত্র বাসু-দত্তকে দেখতে পেলেন পরিবারবর্গ সমেত।

মুখ চেনা ছিল, ফলে যোধপুর পার্ক ছেড়ে বারশো মাইল দূরে তাঁদের মধ্যে প্রথম হৃদ্যতার বাক্য বিনিময়ে আলাপ পরিচয় হল। আলাপে জানা গেল, মিসেস দত্ত দিন-তিনেক আগে স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন উদয়পুরে কোম্পানীর গেস্ট হাউসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। ফেরার পথে জয়পুর ঘুরে যাচ্ছেন। মিসেস বাসুর সঙ্গে দেখা হয় গতকাল সিটি প্যালেসে। আলাপ করে জানতে পারলেন, ওঁরা নাকি যোধপুর পার্কে একই বাড়ীতে ওপর-নীচে আজ তিন বছর একসঙ্গে আছেন। তাই ভীষণ ভাল লেগেছে পরিচয় হতে, আর সেই খুশির অবসরে আজ দু'জনে সিসোদিয়া রাণীর বাগান দেখতে এসেছেন।

মিঃ বাসু দিল্লী এসেছিলেন নিজের ডিপার্টমেণ্টের জন্য কেন্দ্র থেকে খামচা-খামচি করে কিছু বাড়তি গ্র্যান্ট আদায় করার ব্যাপারে। সেই ফাঁকে ট্যুর এক্সপেন্সে কিছু এধার-ওধার করে সস্ত্রীক উত্তর ভারত দর্শন করে যাচ্ছেন। সকলেই মাছের তেলে মাছ ভাজার ব্যাপারে সুপটু, এটা বুঝতে পারার পর তাঁদের আলাপ ক্রমশ গভীর হল জয়পুরে এবং স্বামীর অফিসের খরচায় সকলেই সপরিবারে প্রমোদ ভ্রমণ করতে পারেন—এই সাম্যতার জন্য জয়পুরের আলাপের গভীরতা যোধপুর পার্কে ফিরে এসেও তরল হল না।

মিসেস মিত্র-বাসু-দত্ত এরপরে মাঝে মাঝে মিলিত হতে লাগলেন। মধ্যবিত্ত তিন গৃহিণী বিনা কাজে মিলিত হলে পরচর্চা হয়, কিন্তু উচ্চবিত্ত তিন গৃহিণীর মিলনে শুধু আত্মচর্চায় আত্ম-প্রচার হয়ে থাকে। এই স্বাভাবিক সূত্র-পথেই মিসেস মিত্র প্রায়ই কিছুটা আহত হতে লাগলেন। মিসেস দত্ত ও বাসু প্রাক্‌বিবাহ জীবনে বাবার দৌলতেই কিছু ইঙ্গ-বঙ্গ আদব-কায়দা ও নাক বাঁকানোর ধাত রপ্ত করতে পেরেছিলেন। একদা সাধারণ গৃহস্থ-বৌ মিসেস মিত্র তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন? আজ তাঁর স্বামীর পদ ও মাইনের পরিমাণ অন্য দু'জনের চেয়ে অনেক বেশি হলেও তিনি দত্ত-বাসুর নিত্য নতুন খাম-খেয়ালীর ধাক্কায় কিছু কিছু সঙ্কুচিত হতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ঘাবড়ে যাবার মত মেয়ে নন্, কোন মেয়েই যায় না সাধারণত, নিজের স্বামীর প্রতাপ ও আভিজাত্য প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক উল্টো-পাল্টা কাজ করে ফেলতে লাগলেন।

সেদিন মিসেস বাসুর বাড়ীতে দুপুর বেলা তিনজনে জমায়েত হয়েছিলেন। তিনজনেই শরতের উজ্জ্বল রোদে উলের গোলা নিয়ে সোয়েটারজাতীয় কিছু বুনছিলেন। (ওঁরা এখন তিনজনেই প্রতিযোগিতা করে এক কাজ করার চেষ্টা করেন)।

—আপনি ভাই কার জন্য নিটিং করছেন? মিসেস মিত্র কথা শুরু করার জন্য বললেন।

—আর বলবেন না, মিসেস বাসু জানালেন, শীতের সময় বিকেলে মিতাকে (কুকুরের নাম) নিয়ে বেড়াতে যান তো, তাই একটা আলাদা পুল-ওভার করতে বলেছিলেন। ভাই, এগারোটা এক্কেবারে নতুন কার্ডিগান রয়েছে কিন্তু সেগুলো এক-একটা এক-এক কাজের জন্যে চিন্তা করে কিনে-ছিলেন বলে কুকুর বেড়ানোর সময় সেগুলো আর পড়তে চান না।

মিসেস মিত্র হেসে মিসেস দত্তের উলের প্রশংসা করলেন এবার। উত্তরে মিসেস দত্ত বললেন — তাঁরটা লিজির (পোষা বেড়াল) জন্য। সে নাকি আবার খুব ভাল উলের ছিমছাম ডিজাইন না হলে গায়ে জামা রাখতে চায় না।

মিসেস মিত্র বুঝতে পারলেন দু'জনেই টেক্কা দিয়েছেন। তাই দাবার চাল নিজের দিকে টানতে গিয়ে গণ্ডগোল করে ফেললেন। মিসেস বাসু যখন জানতে চাইলেন তাঁর বোনাটি কার জন্য—মিসেস মিত্র চিন্তা করতে করতে উত্তর দিয়ে ফেললেন—উনি তো গরমের জামা গায়ে দিতেই চান না। আমি জোর করে স্যুট পরিয়ে অফিসে পাঠাই। এটা ভাই আমাদের ঝাড়ুদারের জন্য। গেল বার শুধু গেঞ্জী গায়ে আসতো বলে উনি নিজের সার্জের কোট দিয়ে দিচ্ছিলেন। এবারে তাই—

মিসেস দত্ত ও বাসু একবার নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে তাকালেন। তারপরেই মিসেস দত্ত লিজির ঘুম ভাঙলো কিনা দেখার জন্য নীচে নেমে গেলেন আর মিসেস বাসুর হঠাৎ মাথাটা টিপ-টিপ করছে মনে হচ্ছে "কোডপাইরিন" খেতে ভেতরে গেলেন।

এই আচমকা সভা-ভঙ্গে মিত্র গিন্নী বুঝতে পারলেন তিনি বেফাঁস কিছু বলেছেন। একটুখানি বসে থেকে তিনি তেতো-মুখে বাড়ী ফিরলেন, কিন্তু পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার এই প্রতিযোগিতা এ ঘটনার পর বিন্দুমাত্র কমলো না। বরঞ্চ অলিখিতভাবে মিসেস মিত্র-বাসু-দত্ত যুদ্ধে নেমে পড়লেন যেন।

মিসেস দত্ত ও বাসু কুঞ্চিত নাসা একনাগাড়ে উর্ধ্বে রাখার অনেক টেকনিক জানতেন, তাঁরা প্রতিযোগিতার বেটার সাইডেই রইলেন। মিসেস মিত্র ঠিক পাল্লা সমান রাখতে পারছিলেন না কিন্তু সহজাত কারণে পশ্চাৎ অপসরণ করতে শেখেন নি; দুর্বল ক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়ে বেফাঁস কথা বলে লজ্জায় পড়তেন, কিন্তু অবদমিত হতেন না।

সেদিন রাত্রে মিত্র গিন্নী খাবার

ছুটিতে ছেলে-মেয়েরা চলে যাবার পর মি: মিত্রকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—হ্যাগো Joint Secretary, Under Secretary, আর Deputy Secretary-র মধ্যে কে বড়?

—কেন, তোমার মাথায় এসব আবার কে ঢোকালে? মি: মিত্র বিস্মিত হলেন প্রশ্নের কূটনৈতিক দিকটা উপলব্ধি করে।

—না সে থাক, তুমি তো জয়েণ্ট সেক্রেটারী। তুমি ঐ আণ্ডার সেক্রেটারী মিসেস দত্ত আর ডেপুটি সেক্রেটারী মিসেস বাসুর থেকে বড়, না ছোট?

—এসব চাকরী তোমার ঐ বান্ধবীরা করেন বলে তো জানতাম না। মি: মিত্র ঠাট্টা করলেন।

—ওই একই হল। ওরা আজ শোনাতে এসেছিল, আমিও চুপ করে থাকি নি।

—ব্যাপারটা কী?

সংক্ষেপে জিনিষটা এরকম ঘটেছিল।

এসেম্বলীতে নানা বিচিত্র প্রশ্নের উত্তরের জন্য এবং খাদ্যে চিরকালীন অনটনের জন্য মি: বাসুকে ইদানীং খাদ্যমন্ত্রী ঘন ঘন তলব করছিলেন নানা ফরমাশে। মিসেস বাসু দুপুরের মজলিশে ঘটনাটি ভাঙলেন যে, তাঁর স্বামীর চেম্বারে এখন খালি খালি মন্ত্রীরা ভালমন্দ পরামর্শ নিতে আসেন। ওনার উনি এখন নাইতে-খেতে সময় পাচ্ছেন না।

মিসেস দত্ত তার উত্তরে জানিয়েছিলেন, তাঁর উনিকেও মন্ত্রীরা যখন-তখন মিটিং করতে ডেকে পাঠাচ্ছেন।

মিত্র গিন্নী দু'জনের ডাহা মিথ্যে কথাগুলো হজম করতে পারলেন না। তিনি ফস করে জানালেন,—মি: মিত্র নাকি ভীষণ ভাবনায় পড়েছেন কারণ মন্ত্রীরা তাঁকে একদম ছাড়তে চান না বলে তিনি এখন মন্ত্রীর সঙ্গে একই চেম্বারে বসছেন। শুধু তাই নয়, সকাল-বিকেল অফিসের আগে-পরে মন্ত্রীর বাড়ীতে যেতে হচ্ছে।

অতএব সেই উত্তরের কাহিনীর মত্তই ব্যাপার ঘটল। মিসেস দত্ত ভিজির ঘুম ভেঙেছে কিনা জানতে নীচে নেমে গেলেন, আর মিসেস বাসুর হঠাৎ মাথাটা ধরে উঠতে তিনি 'কোড়পাইরিন' খেতে শোবার ঘরে গেলেন।

মিত্র গিন্নী বুঝলেন তিনি আবার কিছু বেফাঁস কথা বলেছেন। অতঃপর তেতো-মুখ করে ফিরে আসা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু যোধপুর পার্কের মিসেসদের কাছে এ একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়াল। ওপরের ঘটনার ভেতরের মানে তাঁদের মাথায় কোনদিন আসবে না এবং আবার পরবর্তী কোন সুযোগে তাঁরা নিজেদের মধ্যে টেক্কা দিতে নেমে পড়বেন।

দিন পাঁচেক বাদে মিত্র গিন্নী যথারীতি দুপুরের বৈঠকে গিয়ে দেখেন, মিসেস দত্ত টেলিফোনে কথা বলছেন, আর মিসেস বাসু একটু যেন শুকনো মুখে বসে আছেন। মিসেস দত্ত কার সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলছিলেন, বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর উদ্ভাসিত মুখের রেখায় আনন্দের ছবি ছিল। টেলিফোন শেষ হতে মিসেস দত্ত ভীষণ খুশি স্বরে বললেন—

—জানেন ভাই, এই নিয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে তিপ্পান্নটা টেলিফোন এল।

একটা ছোট নোটবুকে কিছু লিখতে লিখতে আবার বললেন—আমি নাম আর ফোন নাম্বার লিখে রেখেছি, সবাইকে তো চিনিও না। উনি ফিরে এসে যাতে এই অভিনন্দনের জন্য টেলিফোন করতে পারেন।

—সেতো ঠিকই করছেন ভাই, মিসেস বাসু একটু নিরস সুরে কথা বললেন।

মিসেস মিত্র ব্যাপারটা তখনও কিছু ধরতে পারেন নি। তিনি ব্যাপারটা কী জানতে চাইতেই মিসেস দত্ত কলস্বরে গেয়ে উঠলেন—ভীষণ আনন্দের খবর ভাই! উনি কাল অফিসে গিয়ে আজ বেলা এই তিনটে অবধি এখনো ফিরে আসেন নি।

মিত্র গিন্নীর বুকটা একবার ছ্যাঁৎ করে উঠলো; হলেই বা যোধপুর পার্ক, মেয়েমানুষ তো। তাও আবার সীতা-সাবিত্রীর দেশের।

—উনি বুঝি অফিস থেকেই ফরেন-টরেনে ট্যুরে গেছেন? তাই সবাই অভিনন্দন করছেন? মিত্র গিন্নী প্রাঞ্জল হবার চেষ্টা করলেন। না ভাই, ফরেনে যাওয়া আনন্দের কোন খবর নয়। এখন তো সব মিনিস্টার থেকে শুরু করে ঝিয়াগুলোরা পর্যন্ত ফরেনে যাচ্ছে। (এইখানে মিসেস দত্তের নাকটা কুঁচকালো একটু)। সত্যি ভাই, এ যে আমার কী ভীষণ আনন্দ হচ্ছে কী বলবো। আ: উনি যদি আরও দু'চার দিন বাড়ী না আসেন, তা হলে যে কী ভাল হবে!

মিসেস দত্ত একটু থামলেন। অন্য দু'জনের উদ্বেলিত মুখ দেখে যুদ্ধ জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। এবার ওঁদের ওপর যেহাৎ করুণা করছেন, এমন ভাব দেখিয়ে আনন্দ সংবাদটি পরিবেশন করলেন। উনি কাল বেলা এগারোটা থেকে "ঘেরাও" হয়েছেন।

মিসেস্ বাসু পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে অপেক্ষায় ছিলেন খবরটি শোনার জন্য কিন্তু একটার পর একটা টেলিফোনে মিসেস্ দত্ত এনগেজড্ ছিলেন। তিনি অভিনন্দনের কারণটি শুনে বিমূঢ় হলেন।

মিসেস্ মিত্র তবু মিনমিন করে বললেন—ঘেরাও তো ভাই বিচ্ছিরি ব্যাপার।

মিসেস্ দত্ত কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন—খাওয়া-শোওয়া, বাথরুমে যাওয়া বন্ধের কথা বলছেন তো ভাই? ও কিছু না, বিচার করে দেখলে সত্যিই কিছু না। আ:, এ রকম আরও তিন-চার দিন যদি উনি 'ঘেরাও' থাকেন, তা হলে ভীষণ ভাল হবে।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে মি: দত্তের মুখখানা কল্পনা করে মিসেস্ মিত্রের কান্না পেল। না খেয়ে তবু দু'একদিন থাকা যায়, কিন্তু বাথরুম বন্ধ? অথচ

...সেস্ দত্ত কলের গানের মত "কি আনন্দ, কি আনন্দ" করেই চলেছেন। ...ছে বোকা বনে যান, তাই অন্য ...জনেই চুপ করে রইলেন।

শেষে প্রায় আরো ঘণ্টাখানেক টেলিফোন ও মিসেস্ দত্তের "কি আনন্দে"র পর আসল তত্ত্বটি জানলেন। নিতান্ত বড় অফিসাররা ছাড়া কেউ 'ঘেরাও' হন না, ঘেরাও হয়েছেন বলে এবার সকলে মিঃ দত্তকে ...ত্রি করবে, কাগজে রোজ নাম ছাপবে, চাই কি পরের গ্রেডে প্রমোশন হতে পারে। মিসেস্ দত্ত আরো জানালেন, যে যত বড় অফিসার হবে, সে তত বেশি দিন ঘেরাও হয়ে থাকবেন। আজে-বাজে ছোট অফিসাররা ঘেরাও হন না। ঘেরাও নাকি এখন স্ট্যাটাস সিম্বল'।

---আপনার উনিও ঘেরাও হয়েছেন বুঝি? মিত্র গিন্নী মিসেস্ বাসুর করুণ মুখ দেখে জানতে চাইলেন।

মিসেস্ বাসু দমবার পাত্রী নন, বললেন---না, হন নি এখনো, তবে যখন-তখন হতেও পারেন। অর্থাৎ তিনি মচকালেন না।

সেদিন রাত্রে মিসেস্ মিত্র স্বামীর কাছে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

---তুমি অন্তত একবার আমার মুখ রাখো। মিসেস্ বাসুর স্বামী ঘেরাও হবেন খুব শিগগির, কিন্তু তার আগেই তুমি ঘেরাও হয়ে আমার মুখ রক্ষা করো।

মিঃ মিত্র বিস্মিত কণ্ঠে বললেন---আবার তোমার মাথায় এসব পাগলামি কে ঢোকালো। ঘেরাও হবে, একথা কেউ আগে থেকে জানতে পারে নাকি? না, ইচ্ছে করলেই ঘেরাও হওয়া যায়?

---কেন যায় না, তুমি চেষ্টা করলেই সব পারো। মিত্র গিন্নী ফোঁস করে উঠলেন স্বামী-সৌভাগ্যে।

রাশভারী মিঃ মিত্র হেসে ফেললেন। বললেন---ঘেরাওটা খুব ভাল জিনিষ, এটা তোমার মাথায় কেন এল, কে আনলে জানি না।

---ভাল-খারাপের দরকার নেই, তুমি হয়ে দেখাও না।

অন্য কেউ হলে এ-ধরনের বেহিসেবী কথায় মিঃ মিত্র ক্ষেপে উঠতেন। কিন্তু বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় ঘণ্টাখানেক ধরে উকিলের মত বোঝাতে চেষ্টা করলেন, ঘেরাও হওয়াটা প্রশংসার ব্যাপার হওয়া উচিত নয়, কোয়ালিফিকেশন তো নয়ই। অফিসের পরিচালনায় গোলমাল থাকলে, কর্মচারীদের মনে অসন্তোষ জমা হলে অথবা তাদের কোন দাবী সোচ্চার হলে, তারা প্রতিবাদ হিসেবে "ঘেরাও"-পন্থা ব্যবহার করে।

তিনি বোঝালেন, ঘেরাও হওয়াটা সেদিক থেকে বিচার করলে কর্ম-পরিচালনার অযোগ্যতার বিজ্ঞাপনই প্রায়শ প্রচার করে।

তিনি বললেন---তোমার তো আমার জন্য গর্ব হওয়া উচিত যে, আমি যে তিনটি কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত আছি, তার কোনটায় আজ পর্যন্ত ঘেরাও হয় নি। আমার পরিচালনায় কর্মচারীরা খুশি।

মিসেস্ মিত্র চুপ করে শুনছিলেন এতক্ষণ---তাতে মনে হচ্ছিল তিনি এই গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ক্রমশ। কিন্তু উত্তর শুনে মিঃ মিত্র হতাশ হলেন।

মিসেস্ মিত্র বললেন---ওসব কথা তুমি অফিসের বড়কর্তাদের বুঝিও, আমি খালি চাই, তোমার আগে মিঃ বাসু যেন ঘেরাও না হয়। আর তা যদি হয়, তা হলে আমি যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাবো।

মিঃ মিত্র বুঝলেন, তিনি পণ্ডশ্রম করছেন। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর রইল না।

এই একই দৃশ্য প্রায় এমনভাবেই মিঃ বাসুর বাড়ীতে অভিনীত হয়েছিল। সেখানে কেবল মিঃ বাসুর ডায়ালগ একটু ভিন্নতর ছিল। তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন---কিছু ভেবো না, ঘেরাও হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু স্টাফেরা আজকাল ভীষণ চালাক হয়ে গেছে। জানে, ঘেরাও হলে খাতির বাড়বে। তাই চুপ করে একমনে কাজ করছে। তবে তুমি দেখে নিও, এ মাসের মধ্যেই ফাইন্যাল করে ফেলবো ব্যাপারটা। দরকার হলে নিজের কিছু টাকা ঢালতেও রাজী আছি।

মিঃ বাসু স্ত্রীকে একটু বেশি ভালবাসতেন। স্ত্রীর দাবী তাঁর কাছে অবশ্যপালনীয় আদেশ।

ফলে মিত্র গিন্নী এবং মিসেস্ বাসুর মধ্যে স্বামীর ঘেরাও নিয়ে আবার একটা অলিখিত প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল। সকালে স্বামীকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে অফিসে পাঠানোর পর ঠাকুরকে সাহেবের লাঞ্চ দেরীতে করতে বলতেন, হয়তো টেলিফোনে খবর আসতে পারে, সাহেব আর লাঞ্চ খেতে বাড়ীতে আসবেন না। কিন্তু দিনের পর দিন নির্ধারিত সময়ে স্বামীরা খেতে আসছে দেখে হতাশ হয়ে পড়তেন।

ইতিমধ্যেই একদিন খবর পাওয়া গেল মিঃ বাসুর অফিসে গোলযোগ সুরু হবে-হবে হচ্ছে। মিসেস্ বাসু কালীঘাটে সেদিন পুজো দিয়ে এলেন। তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে সেই প্রথম কালীদর্শন। কালীর প্রসাদ বিতরণের নামে মিসেস মিত্রের কাছে শুভ সংবাদটি প্রচার করে গেলেন।

মিসেস্ মিত্র সে রাত্রে স্বামী বাড়ী ফেরার পর বললেন---তুমি পুরুষ মানুষ, না কী বলতো। এতটুকু উদ্যম তোমার শরীরে নেই।

মিঃ মিত্র দুপুরেই মিঃ বাসুর অফিসের খবর পেয়েছিলেন এবং বাড়ীর আসন্ন কাল-বৈশাখীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া করে নিঃশব্দে শয্যা নিলেন। মিসেস্ মিত্র সে রাত্রে খেলেন না এবং খাটে না শুয়ে মেঝেতে আলাদা বিছানা করে শুলেন।

মিঃ মিত্র অসহায়ভাবে করুণাময়কে

কালের কার্ডিও-গ্রাফ

শম্ভুনাথ ঘোষ

নিঃসীম নীলিমা হতে
মর্তের মাটিতে কখন ঝরে পড়ে
রহস্যের স্বর্ণভস্ম রেখা,
মুঠো মুঠো আলোকের আবীর,
পুষ্পমালা রাশি রাশি,
বিন্দু বিন্দু লাবণ্যের নির্ঝর,
প্রসন্ন প্রত্যুষে।
কুয়াসার কাঁচুলি ছিন্ন-ভিন্ন করে
সোনালী সূর্যের পদসঞ্চার
পূর্ব দিগন্তে, নবীন অভ্যুদয়ে।

সুপ্তি-মৌন পৃথিবীর প্রাঙ্গণে
নবারুণ এনে দিল
নব জাগরণের বাণী
আশা সঞ্জীবনী।

আমার ঘুমন্ত বুকে দুলে দুলে ওঠে
স্বপ্নের রেশমে মোড়া
কামনার দুরন্ত শিশুরা,
চেতনার চঞ্চল জোয়ারে
আলোকের অভিসারে।

জ্যোতির কম্পন সহসা দোলা দিল
আমার মগ্নমনের রুদ্ধদ্বারে,
মুমূর্ষু জীবনের বেলাভূমিতে,
রজত-শুভ্র ফেনিল উচ্ছ্বাসে।

আলোর নেশায় ডানা মেলে
নীড়-হারা পাখিরা উড়ে চলে ঊর্দ্ধ-বিহারে
অনির্দেশ্য সুন্দরের কল্পলোকে
কে জানে—কোন্ খানে।

আর এখানে মর্মস্পর্শী মিছিলে
বিপন্ন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে
উদয়াস্ত সংগ্রাম করে চলেছি আমরা
অন্তহীন প্রতিকূলতার সংগে।
তথাপি আলোর তৃষ্ণায় মেতেছি আমরা
দুঃসাহসী অভিযাত্রী দল,
ছুটে চলেছি সুদূরের অভিসারে,
গ্রহ হতে গ্রহে, কাল হতে কালান্তরে,
অনির্বচনীয় অমৃতের সন্ধানে।
মৃত্যুঞ্জয়ী সেই মানুষের ধারাকে
মহাকাল বয়ে নিয়ে চলেছে আপন বক্ষে।

আগামী দিনের ইতিহাসের পাতায়
বিদ্যুতের রেখায় রেকর্ড হবে
এ-কালের সংগ্রামী মানুষের
কার্ডিও-গ্রাফ।

চিন্তা করলেন। স্ত্রীকে কাছে পাবার আশায় সঙ্কল্প করে উঠতে পারলেন না।

তারপরেই সেই অমোঘ ব্যাপারটি ঘটল। বিধাতার দুর্বোধ্য রসিকতায় মিত্র গিন্নী প্রতিযোগিতায় এবারও পরাজিত হলেন। আর যুদ্ধ জয়ের সংবাদটি মিসেস্ বাসু তাঁর সবচেয়ে দামী বেনারসী পরে জড়োয়ার ঝলসিত গৌরবে এক বাক্স সন্দেশ সহ পরিবেশন করে গেলেন যে, মিঃ বাসু গতকাল অফিস থেকে বাড়ীতে আসেন নি। আগামী দিনতিনেক আসবেন বলে মনে হয় না। তিনি ঘেরাও হয়েছেন।

মিঃ মিত্র যথারীতি সংবাদটি অফিসে জানতে পেরেছিলেন। স্ত্রীর মানসিক অবস্থা কল্পনা করে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য একটা মূল্যবান নেকলেস কিনে সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর পথ ধরলেন। পথে এক বিরাট মিছিলে বেশ কিছুক্ষণ তাঁর গাড়ী আটকে গিয়েছিল। প্রায় নটায় বাড়ীতে পৌঁছে দেখলেন, আবহাওয়া অত্যন্ত শান্ত। গিন্নীকে খুঁজতে গিয়ে শোবার ঘরে একটুকরো চিঠি পেলেন—“ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবার কাছে গেলাম”। ঘেরাও না-হলে আমাকে ফিরিয়ে আনতে যেতে হবে না।”

ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মিঃ মিত্র ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর চিন্তা করার শক্তি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। কেবল কিছুক্ষণ আগে পথে অবরুদ্ধকালীন মিছিলের শ্লোগানটি তাঁর চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো—“ইনকিলাব জিন্দাবাদ।”

ভাস্কর্যের দেশ চম্পা

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভাবীকালের ইতিহাসে যে কটি-গুণের জন্যে বিংশ শতাব্দীর একটি গৌরবময় অধ্যায় অধিকার করে থাকবে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলন তার মধ্যে একটি। যে সকল বৈশিষ্ট্য এই শতাব্দীকে আগামীকালের বিশ্বসমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত রাখবে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলন তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা বর্তমান শতকে যে উৎকর্ষে উপনীত হল তা নিঃসন্দেহে বিশেষ স্বীকৃতি আকর্ষণ করতে পারে।

আমাদের ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার এই শতকেই ঘটেছে। শুধু মহেঞ্জোদারোই নয়, ভারতের মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে বহু অবলুপ্ত সুপ্রাচীন নগর-জনপদের সন্ধান মিলেছে যা আমাদের ইতিহাস-চেতনায় এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছে। তেমনই শুধু ভারতবর্ষেই নয়, এশিয়ার তথা সমগ্র পৃথিবীর নানাস্থানে এইভাবে ব্যাপক প্রত্নতত্ত্বের চর্চায় বহু অবলুপ্ত নগর-জনপদ আমাদের জানার গণ্ডীতে এসে প্রাচীন পৃথিবীর স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা এখানেই।

ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর-জনপদের সন্ধানের মাধ্যমেই প্রাচীন জীবনযাত্রার যে পরিচয় আমরা পাই, তার মাধ্যমে সেকালের শিল্প-কলা-সংস্কৃতি-শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধীয় বিবরণও আভাসিত হয়ে থাকে। এইভাবেই ইতিহাসের একটি পরম্পরা আমাদের সামনে ধরা পড়ে। এই শতাব্দীর সাধনায় এইভাবেই ধরা পড়েছে প্রাচীন চম্পা রাজত্বে ভাস্কর্যের নিদর্শন।

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর পূর্বে একদল প্রত্নতাত্ত্বিক প্রায় আঠার শ' বছর পূর্বের ভাস্কর্য প্রতিভার এই অমূল্য নিদর্শন সুদীর্ঘ কাল অজ্ঞাতবাসের পর এ কালের মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করল।

পরবর্তীকালে যে রাজ্য পরিচিত হয়েছিল এ্যানাম নামে—সেই এ্যানামেরই পূর্ব নাম চম্পারাজ্য। এখানকার থালমাস অবলের নিকট প্রাচ্যের একদল ফরাসী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান রূপ নেয় বর্তমান শতাব্দীর দ ত্রিশের দশকে। এই অভিযানের ফলে যে সকল অমূল্য সামগ্রীর পুনরুদ্ধার হয় তন্মধ্যে কিছু মহামূল্য ভাস্কর্য বিশেষ উল্লেখনীয়। এদের মধ্যে একটি মুখোসপরা ড্রাগনমূর্তিই সকলের দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণে সমর্থ হয়। এর আয়তন দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ফুট। প্রাচীন চম্পারাজ্যের বহু কীর্তির মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব নানাস্থানে পরিলক্ষিত হয়। কাল তারিখের বিচারে দেখা যায় যে, সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষ আরও প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহন করছে। অতএব ভারতের সভ্যতা প্রাচীন চম্পা-রাজ্যকে আলোকিত করেছে এ মন্তব্য করলে বোধহয় ভুল করা হবে না।

এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর জাঁ ইঁভে ক্লে বলেছেন যে, এই মুখোস এবং মূর্তিটির পরিকল্পনায় এবং রূপায়ণে যে পদ্ধতি এবং প্রণালী অনুসৃত হয়েছে তার উৎস ভারতভূমি। তাই অনায়াসে বলা চলে আঠার শ' বছর পূর্বের চম্পারাজ্যও ভারতের যা বিরাট, যা মহান, যা শাশ্বত তার দান গ্রহণ করে নিজেকেই সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

উল্লিখিত ড্রাগনমূর্তিটির একটি আলোকচিত্র এই রচনার সঙ্গে প্রকাশ করা হল।

প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে প্রাপ্ত প্রাচীন চম্পারাজ্যের একটি ড্রাগনমূর্তি—ভারতীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

প্রোলেতারিয়েত, আন্তর্জাতিকতাবাদ

১৯১৪-র গ্রীষ্মকাল। সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছে—
'ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা,
একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা।
শ্মশানের প্রান্তচর,

সাম্রাজ্যবাদীর দল ছিঁড়েকুটে নিতে চাইল শস্যশ্যামলা ধরণীকে। পৃথিবী জুড়ে তখন প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের কালোছায়া। স্বয়ংসৃষ্ট আবর্জনাকুণ্ড ঘিরে।

'তারা রাত্রি-দিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।

বস্তুত সে এক দুঃস্বপ্নের দিন এসেছিল—সেই প্রথম বার; সারা পৃথিবী জুড়ে। 'মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে' তখন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

গালভরা বুকনীর জটিলতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, এ যুদ্ধ বিবদমান দুই সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে উপনিবেশ ভাগাভাগি নিয়ে মরণান্তক কামড়া-কামড়ি—যেন দু'টো ক্ষ্যাপা কুকুর লোভনীয় মাংসের টুকরো নিয়ে খেয়োখেয়ি করছে। একদিকে জার্মানীর নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া-হাংগেরী - তুরস্ক -বুলেগেরিয়া, অপর পক্ষে বৃটেন - ফ্রান্স - রাশিয়া এবং শেষের দিকে জাপান, ইতালী, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ।
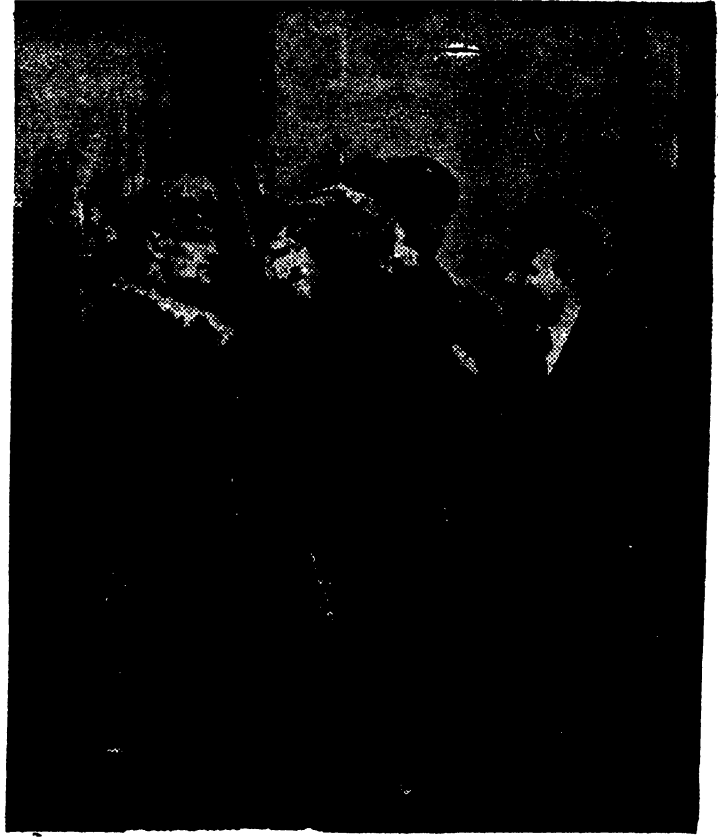
পোলানিতে লালরক্ষীদের সমাবেশে লেনিন

ঘনিয়ে এল 'দুঃখের আঁধার রাত্রি';
'একমাত্র অস্ত্র তার—কষ্টের বিকৃত ভাণ,
ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।'

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

সমীরণ চৌধুরী

লেনিন তখন পোরোনিন্-এ। তিনি জানতেন, ভয়ের মুখোস তার যতবার বিশ্বাস করা যায়, ততবার অনর্থ পরাজয় অনিবার্য।

যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বল্‌শেভিকরা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সমবেত হলে লেনিন তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন পরিবর্তিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সর্বপ্রথমে মাতৃভূমির সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন অত্যাবশ্যক। লেনিন-এর স্থির বিশ্বাস—যুদ্ধের ফলে ধনতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত বৈপরিত্য প্রকটতর হবে, সব দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের পালে লাগবে প্রবলতর বাতাস, রাজনীতি দেখা দেবে উৎকটরূপে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে রাশিয়ার নবীন বিপ্লবকে সাফল্যের পথে দ্রুততর বেগে এগিয়ে নেওয়া যাবে। সে হিসেব নির্ভুল—অঙ্কের মত।

২৫শে জুলাই হঠাৎ লেনিনকে গুপ্তচরবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগে বন্দী ক'রে ক্রাকোতে নিয়ে গেল অস্ট্রিয়ার পুলিশ। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বিশেষত রাশিয়াস্থ বলশেভিকরা খুব ভয় পেলেন,

কেন না, রুশ সৈন্য সে সময় ক্রাকো-সীমান্তের অনতিদূরে—তারা ক্রাকো দখল করতে পারলেই লেনিন জারের-পুলিশের হাতে পড়বেন। রাশিয়ার পুলিশও এ খবর রাখত; তারা উপর্যুক্ত সৈন্যদলের অধ্যক্ষ জেনারেল আলেক্সেইয়েভ্‌কে লিখিত অনুরোধ জানিয়েছিল লেনিনকে ধরে পেত্রোগাদ (অতীতের সেন্ট্ পিটারসবার্গ্—নাম পালটান হয় ১৯১৪-র আগস্ট মাসে) পুলিশের হাতে সমর্পণ করতে।

পোল্যাণ্ড এবং অস্ট্রিয়ার প্রগতি-শীল মহলে তুমুল ঝড় উঠল। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ নিতান্তই হাস্যকর। পুলিশও শেষে জানাতে বাধ্য হল তারা উক্ত অভি-যোগের সমর্থনে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে নি।

আগস্ট মাসের ৬ তারিখে ছাড়া পেয়ে লেনিন তখনই পেরোনিন্-এ ফিরে গেলেন। সেখানে ফেরার তীব্র উৎকণ্ঠায় তিনি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা না ক'রে জনৈক চাষীর গাড়ি চড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। এর এক সপ্তাহ পরে ক্রাকোয় এসে নিরপেক্ষ সুইৎজারল্যাণ্ড-এ যাওয়ার পার-পত্র সংগ্রহ করে ২৩শে আগস্ট পত্নী এবং শাশুড়ী সহ সুইৎজারল্যাণ্ড-এর বারন্ শহরে এসে বাবাস শুরু করলেন।

যুদ্ধ বাধবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদীদের জোড়াতালি দেওয়া তথাকথিত 'একতা'র ঠুনকো দেওয়ালে চিড় দেখা দিল। নেতাদের প্রায় সকলেই শ্রমিক স্বার্থের প্রতি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন জানাচ্ছেন। ১৯১৪-র ৪ঠা আগস্ট জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাট দল খোলাখুলি কাইজারকে যুদ্ধ পরি-চালনার জন্য পাঁচ হাজার মার্ক দেওয়ার প্রস্তাবে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল। বেলজিয়াম্ এবং ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ [illegible] [illegible] [illegible] করলেন না—বৃটেনেও [illegible] তথৈবচ। রুশ মেনশেভিক নেতারা যুদ্ধকে সমর্থন জানালেন প্রকাশ্যে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মৃত্যু হল এইভাবে অপরিসীম লজ্জায়, তীব্র ঘৃণায়।

কেবলমাত্র ভ্লাদিমিরের নেতৃত্বে বলশেভিক দলই আন্তর্জাতিক প্রোলে-তারিয়েত্ একতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলশেভিক সেণ্ট্রাল কমিটি শ্লোগান দিলেন: 'যুদ্ধ মুর্দাবাদ, বিশ্ব-শান্তি জিন্দাবাদ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।' সারা বিশ্বের শ্রমিক প্রোলে-তারিয়েত্‌দের উদাত্ত আহ্বান জানালেন লেনিন; যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে গণ-বিপ্লব সফল করতে লেনিনের নেতৃত্বে সেণ্ট্রাল কমিটি যুদ্ধের সংজ্ঞা নির্ণয় করল এইভাবে:—

[জীবন-কাহিনী]

('যুদ্ধ হচ্ছে') পরদেশ জয় ক'রে, অন্য জাতিকে পরাধীন ক'রে লুণ্ঠন-প্রচেষ্টা, যার দ্বারা যুদ্ধবাজদের স্বদেশের শ্রমিক প্রোলেতারিত-এর মন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক বেসামাল অবস্থা থেকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তাদের নেতৃবৃন্দকে দাবানো এবং ঐভাবে গণবিপ্লব দুর্বল ও নিশ্চিহ্ন করা যায়।'

ভ্লাদিমির এবং বলশেভিকদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে যুদ্ধ তার লোলজিহ্বা বিস্তৃত করল। কাজেই লেনিন শ্লোগান দিলেন: 'এই সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধকে 'গণ'-যুদ্ধে পরিণত কর।' সর্বব্যাপী যুদ্ধের সুযোগে বিপ্লব সার্থক ক'রে তুলতে হবে। যখন আর

[illegible] পরিবার (১৮৭৯ [illegible])

এবং তাঁর হিংস্র পদলেহীরা বাইরের য়ুরোপ-এ যুদ্ধ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তখনই তাঁর মতে: বিপ্লব এগিয়ে গিয়ে চরম আঘাত হেনে সাফল্য লাভ সম্ভব। এই উপদেশ তিনি সব জাতিকে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে: সাম্রাজ্যবাদী পরদেশলিপ্সু যুদ্ধ যেহেতু অন্যায়, সে জন্য বিপ্লবীর পক্ষে নিজ দেশের পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করা বিন্দুমাত্র অন্যায় নয়; কেন না, স্বদেশে গণদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা এই-ই প্রকৃষ্ট সুযোগ।

বিশেষত জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাট্‌দের অকুণ্ঠ যুদ্ধ-সমর্থন তাঁকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছিল। তাঁদের এই প্রত্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে যাওয়ার কারণ।

লেনিন এবং সেণ্ট্রাল কমিটির চেষ্টায় দলীয় মুখপত্র 'সোস্যাল ডেমোক্রাট'-এর প্রকাশ আবার সুরু হল জেনেভায়।

যুদ্ধকালেও লেনিন বল্‌শেভিক দলকে একতাবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। জার সরকারের অত্যাচার তখন হিংস্রতম মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে—হাজার হাজার দলীয় কর্মী নির্বাসিত, দলীয় সংবাদপত্রাদির প্রকাশ বন্ধ এবং সব ট্রেড য়ুনিয়ন ও সেগুলোর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ সরকারী আদেশে। রাশিয়ার সঙ্গে সুইৎজারল্যাণ্ডে স্বাভাবিক যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ হওয়ায় অনেক ঘুরে চিঠিপত্র পৌঁছত।

নানা কারণে সে সময় লেনিন-দম্পতির আর্থিক অবস্থা খারাপ। ১৯১৬ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে লেখা একটি চিঠিতে লেনিন 'জীবনযাত্রা নির্বাহে'র জন্য যে কোনও উপায়ের খোঁজ করেছেন। তিনি জিনিসপত্রের আকাশ-ছোঁয়া দামের কথা উল্লেখ করে তাঁর রাশিয়ান প্রকাশকদের অনুরোধ জানিয়েছেন নিজের প্রাপ্য রয়্যালটি দিয়ে দিতে এবং 'কিছু অনুবাদের কাজ' পাঠিয়ে দিতে। 'এ সব যদি না করা হয়,' লেনিন লিখেছিলেন, 'তা হলে আমি সত্যিই টিকে থাকতে পারবো না। এ-ব্যাপারটা জরুরী, অত্যন্ত—অত্যন্ত জরুরী।'

রাশিয়ান 'ডুমা'র ছ'জন বল্‌শেভিক সভ্য ১৯১৪-র নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হন; তাঁদের 'বিচার' হয় ১৯১৫-র ফেব্রুয়ারী মাসে। এঁদের মধ্যে 'মীরজাফর' কামেনেভ্ মেনশেভিক্ সাক্ষী ডেকে নিজের মত নির্দোষিতা প্রমাণ করলেন। বাকি পাঁচজনকেই সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হল।

ক্লান্তিহীন পরিশ্রম আর সর্বগ্রাসী চিন্তার ফলে লেনিন দুর্বল এবং শীর্ণ হয়ে পড়লেন। যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের প্রস্তুতি তাঁকে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে। লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন, প্লেখানভ্ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রথমে একথা অবিশ্বাস করলেও ১৯১৪-র সেপ্টেম্বর মাসে লুসেন-এ তাঁর বক্তৃতা শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন—প্লেখানভ যুদ্ধের সমর্থক। অসংখ্য শ্রোতার মধ্যে কেবল লেনিন প্রতিবাদ জানালেন, তাঁকে বলার জন্য মাত্র দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল।

বল্‌শেভিক মতবাদ প্রচারের জন্য লেনিন লুসেন এবং জেনেভায় পরপর দু'দিন—১লা ও ২রা অক্টোবর বক্তৃতা দিলেন। তিনি যুদ্ধের সমাজতন্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, সর্ব দেশের সোস্যালিস্টদের উচিত রাশিয়ার কমরেডদের অনুসরণ ক'রে নিজ নিজ সরকারের যুদ্ধবাজের ভাঁওতা খুলে দেওয়া। তাঁর মতে: আসল শত্রু দেশের বাইরে নয়—ভেতরে। স্বৈরাচারী শাসন, শোষণরত জমিদার আর ধনী—এদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলনই মুক্তির যথার্থ উপায়; মুষ্টিমেয় ধনী এবং স্বৈরাচারী শাসকের অন্ধ অনুসরণ ক'রে পরদেশীকে হনন করা চরম অন্যায়।

খাঁটি আন্তর্জাতিকতার প্রথম প্রচারক এবং স্থাপক ভ্লাদিমির ইলিচ্—তাঁকে পৃথিবী চেনে 'লেনিন' নামে।

১৯১৫-র মার্চ মাসে ক্রুপস্কায়া-জননী পরলোকগমন করেন। সাইবেরিয়ার নির্বাসনকালে এবং প্রবাসে ইনি সর্বদা লেনিন-দম্পতীর সঙ্গিনী; নিবিড় স্নেহে তিনি সব সময় কন্যা-জামাতার তত্ত্বাবধান করতেন। গৃহস্থালীর ঝঞ্ঝাট থেকে কন্যাকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়ে তিনি পরোক্ষে দলের সহায়তা করেছিলেন। এই মহীয়সী মহিলা শেষ জীবনে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে নিজের মরদেহ ধর্মীয়-কৃত্য ছাড়াই দাহ করার নির্দেশ দিয়ে যান, উইলে সে নির্দেশ ছিল। তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রম করা হয় নি।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আন্তর্জাতিক ঐক্য সম্বন্ধে লেনিন এ-সময় বারবার দলকে এবং প্রতীচ্যের সব সমাজতন্ত্র-বাদীদের সতর্ক ক'রে দিতেন। তিনি বলতেন, প্রোলেতারিয়েতের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা সব বিবদমান জাতিকে শান্তির প্রস্তাব দেবেন সর্তাধীনে। সর্ত হল সব উপনিবেশকে স্বাধীনতা দিতে হবে, কোন জাতিকেই পরাধীন রাখা চলবে না।

প্রাথমিক সাফল্যের পর তখন জার সরকারের হারের পালা সুরু হয়েছে—১৯১৫-র বসন্ত কালে গ্যালিশিয়া থেকে পশ্চাদপসরণ, পোল্যাণ্ডের হস্তচ্যুতি, এবং বাইলোরুশিয়া আর বাল্টিক প্রদেশের একাংশ হারিয়ে জার বিব্রত। এর ফলে সীমান্ত থেকে কোটি কোটি ছিন্নমূল নরনারী দেশের অভ্যন্তরে উপস্থিত হল—দেশের সর্বত্র দেখা দিল প্রকট দৈন্য, মুদ্রাস্ফীতি এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিজনিত অপার দুর্দশা। জার এবং কালো টাকায় স্ফীত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ বাড়তে লাগল।

প্রধানত লেনিনের চেষ্টার ফলে রুশ প্রোলেতারিয়েত্‌বৃন্দ সমাজের অন্যান্য বুর্জোয়া অংশের মত তথাকথিত 'স্বদেশ প্রীতি'তে উন্মত্ত হয় নি এবং অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আন্তর্জাতিক প্রোলেতারীয় সৌহার্দ্য বজায় রেখেছিলেন। [ক্রমশ।

মাসিক বসুমতীর

পাঠক-পাঠিকার বিশেষ সুবিধা কী ?

মাসিক বসুমতীর বর্ধিত আকৃতিতে পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের নানাভাবে উপকার হয়েছে—আশা করি কেউ অস্বীকার করবেন না। মাসিক বসুমতীর আকার বড় হওয়ায় পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বেশি পাঠ্যবস্তু ও ছবি প্রকাশিত হচ্ছে। ছাপার অক্ষরও এখন আরও বড় হয়েছে। পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার মন এবং চক্ষুর প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের এই রূপান্তর-পরিকল্পনা। মাসিক বসুমতীর সূচীপত্রেও আপনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। সুখপাঠ্য বিচিত্র রচনা ও নয়নাভিরাম ছবির এমন বিশিষ্ট সমাবেশ—বাঙলা দেশের অপর কোন মাসিক পত্রিকায় আপনি দেখতে পাবেন না।

পাঠক-পাঠিকা গ্রাহক-গ্রাহিকা ও অনুগ্রাহকবর্গের সহৃদয় সহযোগিতায় মাসিক বসুমতীর অগ্রগতি আজও অটুট আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আপনাদের প্রিয়তম মাসিক বসুমতী ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ৪৯ উনপঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ করছে।

মাসিক বসুমতীর বর্ষারম্ভ বৈশাখে। বর্ষশেষে আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য

বিশেষ সুবিধা

একসঙ্গে দেড় বৎসরের মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা হবেন—কেবলমাত্র তাঁদের জন্য

২৭৲ টাকার স্থলে ২৪৲ টাকা

অর্থাৎ তিন টাকাই লাভ !!

ব্যক্তিগত যে কেউ এবং যে-কোন পাঠাগার, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও বিদ্যালয়সমূহ এই সুবিধা পেতে পারেন

পত্রালাপ করুন

মাসিক বসুমতী

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা - ১২
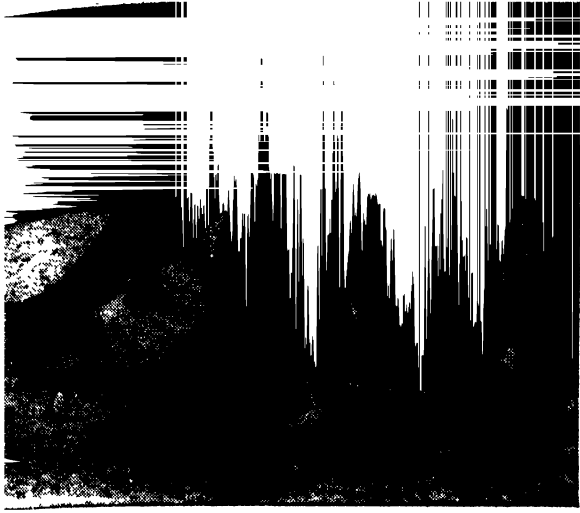
বালীস্তরে গ্রাম্যশিল্প
—নারায়ণচন্দ্র হালদার

আলোকচিত্র

যীশুর ভজনালয়
—বাবলি সুর

জগন্নাথের মন্দির (পুরী)
—দেবনারায়ণ সেনগুপ্ত
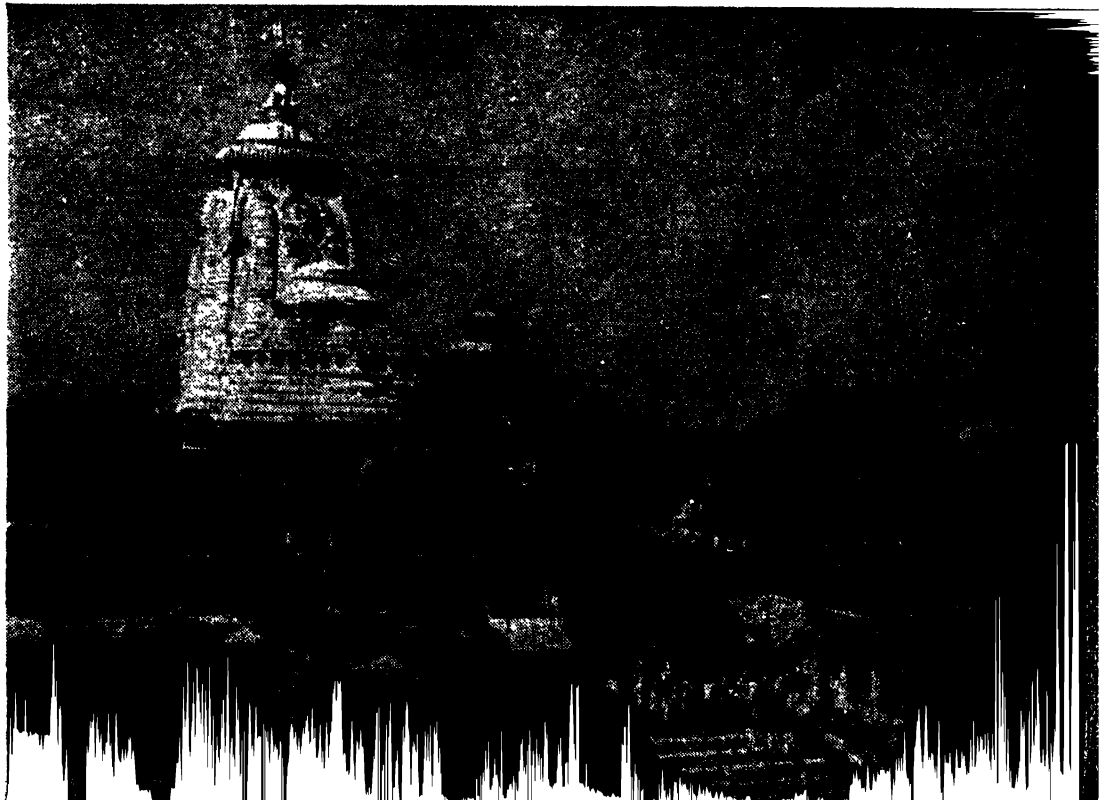
—রণজিৎ পাল
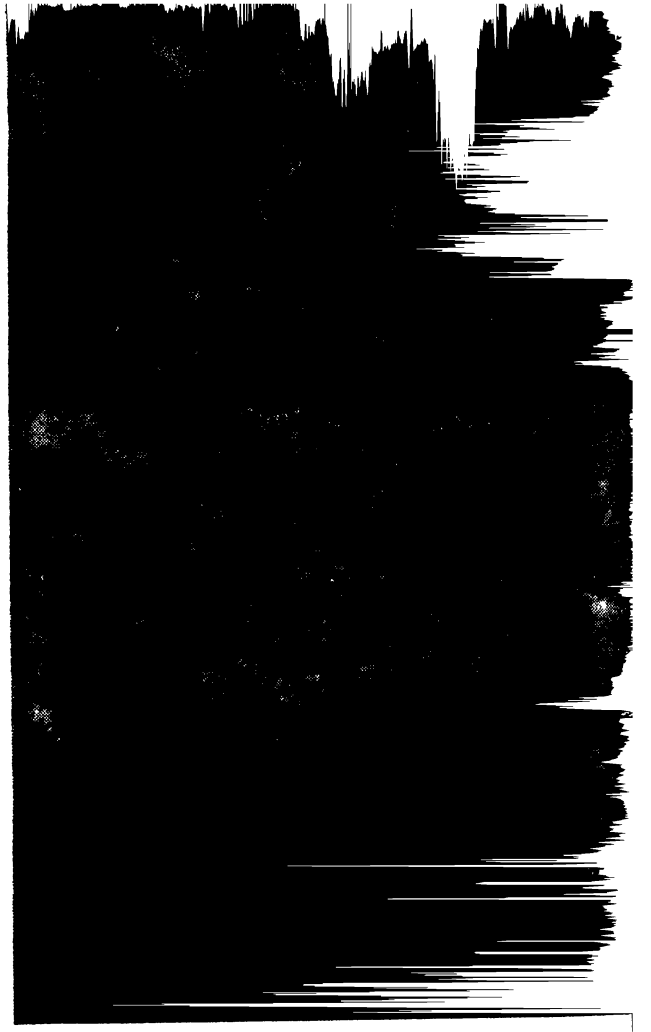
—ডি, পাল

গাছ

অজয় নদী (বীরভূম)

—অজিতকুমার কর্মকার

প্রথম সন্ধ্যা
—গীতা গুহ

স্বপ্নসাধ
—আশীষকুমার সিংহ

প্রহরী
—বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যমুখী
—বি, এন, চট্টরাজ

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন। ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সংগে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন
* ছবি পাঠাবেন এই নামে

—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১২

মাসিক বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ / '৭৭

বুলান দরজা (ফতেপুরসিক্রী)
—দীপঙ্কর [illegible]

ধর্মঘটের বিরুদ্ধে জার সরকার এক নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করল---ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাকড়াও ক'রে দলে দলে যুদ্ধে পাঠানো। ফলে হল হিতে-বিপরীত---বল্‌শেভিক শ্রমিকরা সৈন্য-দলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সব সৈনিকদের বল্‌শেভিক বিপ্লববাদে দীক্ষিত ক'রে তুলল। ফলত জারের অত্যাচারী সৈন্যদল ধীরে ধীরে বিপ্লবের সুদৃঢ় হাতিয়ারে পরিণত হল। লেনিন এই কাজের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন, তিনি এবং সেণ্ট পিটারস্‌বার্গের বলশেভিক কমিটির সভ্যবৃন্দ সৈন্যদলে এবং বাল্‌টিক সাগরস্থ নৌ-সৈন্যদের মধ্যে বল্‌শেভিক গোষ্ঠীর সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করতে লাগলেন।

লেনিনের আপ্রাণ চেষ্টায় সুইৎজার-ল্যাণ্ড-এ একটি অতি-বাম আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠতে লাগল। এ সময় তিনি খুব উৎসাহিত হলেন একটি খবর পেয়ে। আমেরিকার সমাজতন্ত্র-বাদী গোষ্ঠীর নেতা য়ুনিন ডেব্‌স যুদ্ধের প্রবল বিরোধিতা করছেন। আমেরিকান সরকার অবশ্য সেজন্য ডেব্‌সকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে-ছিল।

খোদ জার্মানীতেও ধীরে ধীরে লিয়েব্‌নেখ্‌ট, রোজালুক্‌সেম্‌বার্গ, ক্লারা জেট্‌কিন, মেহ্‌রিং, উইলহেল্‌ম পিয়েক্ প্রমুখের নেতৃত্বে যুদ্ধ-বিরোধিতা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছিল। এঁদের মধ্যে লিয়েব্‌নেখ্‌ট রাইখ্‌স্টাগ-এ যুদ্ধ পরিচালনার ব্যয় বরাদ্দের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

লেনিন জানতেন, প্রতীচ্যে বামপন্থী মতবাদ তখনও দানা বাঁধে নি। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে তিনটি সোস্যালিস্ট কন্‌ফারেন্স হল---প্রথমে লণ্ডনে মিলিত হলেন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং রাশিয়ার সমাজতন্ত্রিবৃন্দ; পরে বার্‌ন্ সহরে হল আন্তর্জাতিক মহিলা সংঘ এবং আন্তর্জাতিক যুব কন্‌ফারেন্স। এ তিনটির কোনটিতেই বল্‌শেভিকদের আনীত প্রস্তাব গৃহীত হয় নি।

যুদ্ধের অবসরে লেনিন আবার হিগেল্‌, আরিস্‌তত্‌ল্, ফ্যুয়েরবাক্ এবং অন্যান্য দার্শনিকদের লেখা পড়তে লাগলেন এবং এই পুনঃপাঠের ফলশ্রুতি হল তাঁর 'ফিলসফিক্যাল নোটবুকস্‌'---'দার্শনিক নোটবুক'।

লেনিনের লেখা পড়লে আজও অবাক হতে হয়---অবস্থা বিচারে তাঁর মূল্যায়ন আজও সমান সত্য।

১৯১৬-র ডিসেম্বরে ক্লান্ত লেনিন লিখলেন---ইনেসা আর্মাদকে:

'আমার ললাট-লিখনই এই রকম---রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা, সুবিধাবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দ থেকেই এ রকম চলে আসছে। অনেক ঘৃণা এবং শত্রুতা কুড়িয়েছি এ জন্য।---কিন্তু আমি এর পরিবর্তে 'শান্তি' চাই না---'

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়াবহ স্বরূপ তাঁর অমর লেখনীতে উন্মোচিত হল:

'অন্যায়ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারকল্পে অপর দেশ লুণ্ঠন এবং তাদের স্বাধীনতা অপহরণ, নির্মমভাবে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন দমন।'

অবশ্য স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধকে তিনি সর্বদা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো প্রতিটি সমাজ-তন্ত্রীকে তা সমর্থন করতে বলতেন।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত করার কথা তিনি বারবার বলেছেন। সাম্রাজ্যবাদ যে ধনতন্ত্রবাদের চরম অবস্থা, তা প্রমাণ করার জন্য ১৯১৬-র গ্রীষ্মকালে প্রকাশিত হল তাঁর 'ইম্পি-রিয়ালিস্‌ম, দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ্ অব্ ক্যাপিটালিস্‌ম'---'সাম্রাজ্যবাদ---ধন-তন্ত্রবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' নামক যুগান্ত-কারী গ্রন্থ। পাণ্ডিত্য, গবেষণা এবং বিপ্লববাদের সুষম সমন্বয় এই গ্রন্থ-খানি। তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী সাম্রাজ্য-বাদ হল---

'সেই অবস্থা, যখন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দল গজে উঠেছে, যখন মূলধন বিদেশে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে, যখন আন্তর্জাতিক ধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথিবী ভাগ সুরু হয়ে গেছে এবং যখন শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ পৃথিবী নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে।'

লেনিন দেখালেন, একচেটিয়া কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রমিক-শোষণ বাড়ে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকে না; এ ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক বৈপরীত্যও প্রকটতর হয়। কৃষককুল এগোয় ধ্বংসের পথে, আর সঙ্গে সঙ্গে শহরের পেটি-বুর্জোয়া-রাও মারা পড়ে। ফলে, শ্রমিক-কৃষক আঁতাত দৃঢ়তর হয়ে ওঠে এবং এই আঁতাতই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া-দের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্টতম হাতিয়ার। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ধনতন্ত্র-বাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ক'রে লেনিন সিদ্ধান্ত করলেন: 'সাম্রাজ্য-বাদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা।'

তাঁর মতে: বিপ্লবের পথে সমাজ-তন্ত্রে পৌঁছনো এমন অবস্থায় অবশ্য-কর্তব্য।

ঋষিকল্প ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে লেনিন দেখলেন, একচেটিয়া ধনিক-দের আন্তর্জাতিক সমবায়ের সম্ভাবনা। তিনি লিখলেন:

'এভাবে সংযুক্ত য়ুরোপ (য়ুনাই-টেড স্টেটস অব্ য়ুরোপ) হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হতে পারে য়ুরোপের একচেটিয়া কারবারীদের চুক্তির ফলস্বরূপ---কিন্তু কী উদ্দেশ্যে? কেবলমাত্র য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্রকে দাবিয়ে রাখতে এবং একযোগে লুণ্ঠিত উপনিবেশগুলো রক্ষা করতে।'

১৯১৫-র জুন মাসে লেনিন-দম্পতি বার্‌ন শহর থেকে গেলেন সোরেন্‌বার্গ নামক নির্জন পার্বত্য-গ্রামে বাস করতে। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর তাঁরা বেরিয়ে পড়তেন পাহাড়ে---হাতে ঝুড়ি। উদ্দেশ্য: বেড়ানর পর গোলাপ, চেরীজাতীয়

[illegible], আর ছত্রাক খুঁজি ভরে নিয়ে আসা। আনন্দেও। প্রায়ই তাঁদের সঙ্গে থাকতেন ইনেসা আরমাঁদ।

ঐ বছরের ২৩শে থেকে ২৬শে আগস্ট পর্যন্ত সুইৎজারল্যাণ্ডের জিমারওয়াল্ড্ গ্রামে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল। এগারটি দেশ থেকে ৩৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করলেন। লেনিন এই সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ। এখানে গৃহীত প্রস্তাবে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানালেন:

'শ্রমিক ভাই-বোনেরা, মা-বাবারা, বিধবা এবং অনাথ শিশুর দল, আহত ও বিকলাঙ্গ কমরেডবৃন্দ! তোমরা, যারা যুদ্ধের শিকার হয়েছ, তোমাদের সকলকে—সব সীমান্ত অতিক্রম ক'রে, রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে, যুদ্ধবিধ্বস্ত গ্রাম, নগর ছাড়িয়ে আমরা তোমাদের ডাকছি—

—দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।

—Workers of all countries Unite!

কর্মক্লান্ত লেনিন ক্রুপস্কায়াকে নিয়ে অক্টোবর মাসে বার্নে ফিরে গেলেন।

১৯১৬-র জানুয়ারী মাসে 'হেরাল্ড' নামক জার্মান পত্রিকা প্রকাশে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। জিমার্-ওয়াল্ড সম্মেলনের বামপন্থীরা এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোক্তা।

ফেব্রুয়ারী মাসে লেনিন-দম্পতি জুরিখে গিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে ঘর ভাড়া ক'রে রইলেন। বাড়ির মালিক পেশায় চর্মকার—নাম কাম্মেরার। এখানে অসুবিধা অনেক —নিচের উঠোনে সসেজ তৈরির কারখানা। কাজেই সারাদিন দুর্গন্ধের চোটে জানলা খোলার উপায় নেই। অন্যান্য [illegible] অসুবিধা সত্ত্বেও লেনিন এ বাড়ি ছাড়েন নি; ১৯১৭-র এপ্রিল মাসের ঐতিহাসিক পেত্রোগ্রাদ্ যাত্রা পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। এর একমাত্র কারণ, একদিন বাড়ির মালিকের পত্নী মধ্যাহ্নভোজনের [illegible]

পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেছিলেন, তাঁর মতে 'সৈন্যদের উচিত তাদের নিজেদের সরকারকে গুলি ক'রে মারা।'

নিজ মতের সার্থক প্রয়োগের এমন সমর্থন যেখানে, সেখান থেকে কি লেনিন যেতে পারেন?

জুরিখ মিউনিসিপ্যালিটি এই গৃহে লেনিনের বসবাসের স্মারক হিসেবে একটি ফলক স্থাপন করেছেন।

১৯১৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সুইৎজারল্যাণ্ডের কিয়েনথাল্ গ্রামে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল দশটি দেশ থেকে তেতাল্লিশ জন প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। লেনিনের নেতৃত্বে ঘোষিত হল—'যুদ্ধ কখনও যুদ্ধ শেষ করতে পারে নি—পরন্তু হিংসা থেকে হিংসার উৎপত্তি হয়। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী সরকারের (নিজের দেশের সরকার হলেও) মিথ্যা প্রচারে ভুলে কখনও যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থন করা উচিত হবে না।'---'স্থায়ী শান্তি আসবে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে।'

ঐ খৃস্টাব্দেই প্রকাশিত হয় লেনিনের 'দ্য সোস্যালিস্ট রিভল্যুশন্ এণ্ড দ্য রাইট্ অব নেশন্‌স টু সেল্ফ-ডিটারমিনেশন্'—'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' —সমস্ত উপনিবেশ এবং পরাধীন জাতিসমূহের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকারকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গণ্য করা হল। অত্যাচারী জাতির শ্রমিকদেরও তিনি আংশিকভাবে অসহায় জাতির ওপর অত্যাচারের জন্য দায়ী ক'রে ঐ পাপস্খালনের উপায় হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

তাঁর মতে: রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া মানেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি নয়,—কেননা, মূলধন এমন একটি বস্তু যে, তার বিনিয়োগের মাধ্যমে 'শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পন্ন অধিকারী রাষ্ট্রকেও কব্জা করা সহজ এবং তা করা হয়েও থাকে।' অর্থনৈতিক সাহায্যের ছদ্মবেশে উপনিবেশবাদী ধনী দেশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ছোট রাষ্ট্রগুলিকে সর্বদা আয়ত্তাধীন আনবার চেষ্টারত।

এ থেকে উদ্ধারের উপায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য—নান্যঃ পন্থা।

গ্রীষ্মকালে লেনিন-দম্পতি জুরিখ ছেড়ে এক পার্বত্য গ্রামে গেলেন দুই উদ্দেশ্য—প্রথমত ব্যয় সঙ্কোচ (যা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল) এবং দ্বিতীয়ত, নাদেজদা কনস্তানতিনোভনার স্বাস্থ্যোদ্ধার। পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো লেনিনের কাছে বিলাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

সর্বাত্মক ধ্বংসাভিলাষীদের (অ্যানারকিস্ট) বিরুদ্ধে এ সময় তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়। বুখারিনের মত অ্যানারকিস্ট-রা সর্বাত্মক ধ্বংসের সমর্থক—এমন কি রাষ্ট্র ও সরকারকেও তাঁরা নস্যাৎ করতে সমুৎসুক। মার্কসবাদ বিশ্লেষণ ক'রে লেনিন এঁদের ভুল বুঝিয়ে দিতেন---অর্থাৎ, পুরনো বুর্জোয়া সরকার ভেঙে নতুন ক'রে প্রোলেতারিয়েৎ প্রাধান্য সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমেই আসবে প্রার্থিত সামাজিক পরিবর্তন, তারপর সমাজতন্ত্রবাদের সিঁড়ি বেয়ে খাঁটি কম্যুনিজম্ আসবে।

যুদ্ধ-পরবর্তীকালে গোটা য়ুরোপ জুড়ে নেমে এল কবরের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা---চরম বিকারের ঘোরে উন্মত্ত রণনৃত্যের পর যেন সারা মহাদেশ কিসের স্তব্ধ প্রতীক্ষায় নিশ্চুপ হয়ে অপেক্ষমাণ। ১৯১৭-র ৯ই জানুয়ারী লেনিন এক সভায় মন্তব্য করলেন, 'বর্তমান য়ুরোপ-এ কবরের নিস্তব্ধতা দেখে আমাদের ভুল বোঝা উচিত নয়—য়ুরোপ বিপ্লবের প্রতীক্ষায় অগ্নিগর্ভ।'

এই ভবিষ্যদ্বাণীর একমাস পরে —১৯১৭-র ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হল। জার স্বৈর তন্ত্রে

টেনে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে দিল রাশিয়ার নবজাগ্রত শ্রমিক-প্রোলেতারিয়েৎ। বিপ্লবের পুরোধা বল্‌শেভিক্ পার্টি—শ্রমিক এবং চাষীদের ঐক্য সুদৃঢ় ক'রে বহু আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবকে সফল করল তারা।

মার্চের দুই তারিখে সুইস্ পত্রিকাতে বিপ্লব সন্দেশ পেয়ে লেনিন আনন্দে আত্মহারা হলেন। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী লৌহ কপাটে প্রথম ফাটল তৈরির অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করলেন রুশ বল্‌শেভিক ভ্রাতৃবৃন্দ লেনিনের মহান্ নেতৃত্বে।

এবার বিপ্লবকে সার্থক করার পালা। প্রথম উচ্ছ্বাসের ঘোর কাটামাত্র লেনিন এই সুকঠিন কর্তব্য সম্পাদনে উদ্যোগী হলেন। দেশের বাইরে তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত চঞ্চল হয়ে উঠলেন পুরুষসিংহ লেনিন, দেশে ফিরতেই হবে। কিন্তু কী ভাবে? নিরপেক্ষ সুইৎজারল্যাণ্ড এবং যুযুধান রাশিয়ার মধ্যে যাতায়াতের পথ অধিকার ক'রে ছিল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স—তারা যুদ্ধ সমর্থকদের সাদর অভ্যর্থনা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকলেও কিছুতেই যুদ্ধ-বিরোধী বল্‌শেভিকদের রাশিয়ায় যেতে দিতে রাজি নয়। কাজেই ভিন্ন পন্থা নিতে হল লেনিনকে। ক্রুপস্‌কায়া লিখেছেন—

'ইলিচের চোখে ঘুম ছিল না—একদিন মাঝরাতে সে বলল, 'দেখ, আমি বোবা সুইস্ সেজে যেতে পারি।' আমি হেসে বললাম, 'ওতে চলবে না, তুমি ঘুমের ঘোরে কথা বলতে পার ত'। —আর তা' হলেই সব মাটি।'

পরে জার্মান যুদ্ধবন্দিদের পরিবর্তে রুশ রাজনৈতিক প্রবাসীদের জার্মানী হয়ে স্বদেশে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। এতে আবার তথাকথিত বিপ্লবের ধ্বজাধারীরা সোরগোল তুলল এই বলে যে, 'যুদ্ধাপরাধী, পৈশাচিক' কাইজার সরকারের 'সাহায্য' নেওয়া অন্যায়। এ সব 'ন্যাকমি' ঘৃণাভরে সরিয়ে লেনিন বললেন, এক্ষেত্রে 'স্বদেশ' ও 'বিদেশ'-এর যুদ্ধবাজ সরকার সমান অপরাধী এবং যখন দেশে বিপ্লবের পবিত্র হোমশিখা জ্বলছে, তখন এই সব ছল-ছুতো ক'রে বিদেশে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চরম অপরাধ।

তবুও, কথা যখন উঠেছে, তখন লেনিন এক সঙ্গে জার্মান, ফরাসী সুইস, পোল, নরওয়েজিয়ান্, সোয়েড্ ইত্যাদি বামপন্থী দলের লিখিত অনুমতি নিয়ে তারপর শুভযাত্রা সুরু করলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বদেশ অভিমুখে, বিপ্লবে অংশগ্রহণ অভিলাষে। ক্রুপ্‌স্‌কায়া লিখেছেন:

'বার্ন থেকে পত্রযোগে যখন জানা গেল স্বদেশযাত্রার সব বন্দোবস্ত শেষ এবং আমরা রাশিয়ায় রওনা হতে পারি, তখন ইলিচ্ বলল, 'চল, চল, প্রথম ট্রেনেই যাত্রা করি।' মাত্র দু'ঘণ্টা গোছ-গাছ করার সময় থাকতে আমি ইতস্তত করলাম—ঘরসংসার গুছনো, পাঠাগারের বই ফেরৎ দেওয়া, বাড়ি ভাড়া চোকানো ইত্যাদি সারা দরকার। আমি বললাম, 'তোমরা যাও, আমি কাল যাবো।' 'না, না, সবাই এক সঙ্গে যাবো,' লেনিন বলল।—ঘর-সংসার গুছনো, বই ফেরৎ দেওয়া, ভাড়া চোকানো, বাঁধাছাঁদা, চিঠিপত্র পোড়ান, কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করা—সবই হয়ে গেল এবং সেই প্রথম ট্রেনেই আমরা রওনা হলাম।

২৭শে মার্চ লেনিন-দম্পতির ঐতিহাসিক স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন সুরু হল—ত্রিরিশ জন প্রবাসীর সঙ্গে। জার্মান সীমান্ত গটমুডিংগেন নামক স্থানে রুশযাত্রীদের আলাদা কামরায় পুরে তার তিনটে দরজা বন্ধ ক'রে চতুর্থ দরজা (পেছনে) খুলে রাখা হল। বগীর শেষ কামরায় উঠল দু'জন জার্মান অফিসার এবং তাদের আর রুশীয়দের 'সীমারেখা' হিসেবে খড়ি দিয়ে একটি রেখা টেনে দেওয়া হল। সমর্থনসূচক আন্দোলনের ভয়ে জার্মান পত্র-পত্রিকাতে বল্‌শেভিক্‌দের স্বদেশ-যাত্রার সংবাদ প্রকাশ করতে দেওয়া হয় নি।

৩০শে মার্চ বাল্‌টিক্ সাগরের উপকূলে জাস্‌নিট্‌স বন্দরে বল্‌শেভিক যাত্রীদের ট্রেন থেকে একটা সুইডিশ মালবাহী জাহাজে তুলে দেওয়া হ'ল। পরে ট্রেনযোগে তাঁরা স্টক্‌হোমে পৌঁছলে তাঁদের সাদর সম্বর্ধনা জানালেন স্থানীয় বল্‌শেভিকরা। এখানে লেনিন একদিন ছিলেন।

৩১শে মার্চ সদলবলে লেনিন ফিন-প্রান্তে থোরনিও সহরে পৌঁছলে তাঁকে দেখে বৃটিশ অফিসাররা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন (তখন ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত)। বহুক্ষণ ধরে নানান প্যাঁচালো জেরা ক'রেও বৃটিশ অফিসারকুল তাঁকে বেকায়দায় ফেলতে পারল না।

ব্যর্থ মনোরথ অফিসারদের দিকে তাকিয়ে হেসে লেনিন মন্তব্য করলেন—

'পরীক্ষার আজ অবসান হল—আজ আমরা মাতৃভূমির পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে জগৎকে দেখিয়ে ছাড়ব যে, আমরা আমাদের ভবিষ্যতের উপযুক্ত অধিকারী।'

[ক্রমশঃ

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ও বাঙালীর একমাত্র মুখপত্র ॥

কৃষ্ণপক্ষ

শুধু যায় কেন, প্রতিদিনই এমনি সময়ে আসে শর্বরী।

ঠিক এমনি সময়ে, যখন আকাশী নীলায় সান্ধ্য বিস্ময় ছড়িয়ে যায় পথে-ঘাটে; দক্ষিণ দিকের রাস্তার মোড়ে মেহেদিগাছ-ঘেরা দোতালা বাড়ীটার জানালা দিয়ে ভেতরে বৈদ্যুতিক আলো ছিটকে এসে রাস্তার বুকে চপিত চপলতা ছড়ায়, আর দূরে রেল লাইনের পাশে সিগন্যালের আলোটা লাল চোখে আকাশের তারার দিকে মিটিমিটি চেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। আর নরম কিছু বাতাস এসে অমিতের টেবিলের কাছের জানালা-টার রেশমী পর্দাখানা অল্প অল্প কাঁপিয়ে যায়। অমিতের ভাল লাগে এই সন্ধ্যাটা। ভাল লাগে এই জন্যে যে, স্মৃতির ভগ্নাংশগুলো এমনি, ঠিক এমনি আঁধারের ভালবাসা আর আলোর ছলনার বুকে চুপি চুপি কথা কয়। ভাল লাগে, আবার ব্যথাও বাজে বুকে। ভাল লাগার ব্যথা বুকে নিয়ে অমিত থাকে বাইরের দিকে চেয়ে। বাইরের দিকে চেয়ে তার মুক্তি-খোঁজা মন কিছু যেন আজও চায়। আর চাইতে গিয়ে আরামের ঝুরু ঝুরু নিশ্বাসের পরিবর্তে বেদনার জল ফেলে। গত-যৌবন অমিতের মনে যৌবনের কান্না দুঃসহ ব্যথায় ফেটে ফেটে পড়তে চায়।

পঁয়তাল্লিশের অমিতের ব্যথা কেঁপে কেঁপে ওঠে রাতের আকাশে। সন্ধ্যার অন্ধকারটা ততক্ষণে ধূসরতা কাটিয়ে চার-পাশের গাছপালাগুলো নিজের কালো চাদরের অন্তরালে লুকিয়ে ফেলে একটি রাতের মত।

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বারান্দায় চটির শব্দ ওঠে।

শর্বরী আসে। ডাকে, মাষ্টারমশাই!

যেন ঘুম ভেঙ্গে যায় অমিতের। ভাবনা-কল্পনাগুলো মন থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে বলে ওঠে, হ্যাঁ, এসো।

নীলাভ মেঘ-মলমল পর্দাখানা শিরশির করে শিউরে ওঠে একবার। নরম একটি সুর দিয়ে তৈরী শরীর ঘরে ঢোকে সেই মুহূর্তে। চোখে-মুখে স্নিগ্ধ পেলবতা। কচি লাউলতার মত কচি সবুজতা। অথচ আশ্চর্য। চোখ তুলে চাইলো অমিত।

অমিত বললো---ওকি! আজ তান-পুরা নিয়ে এলে না যে?

হাসলো শর্বরী। হয়ত ঘরের বিদ্যুৎ-আলোটাও একটু ঝলকে উঠলো। গ্রীবা বাঁকিয়ে কোমল পাতলা দু'টি ঠোঁট কথা কইলো, আমি এক্ষুণি চলে যাবো মাষ্টারমশাই!

অমিয় চৌধুরী

—তার মানে? গান শিখবে না আজ?

—না, আজ আর গান শিখবো না। আপনাকে বলেছিলাম না, আজ আমার মা আর বাবার আসবার কথা আছে কলকাতা থেকে। তাঁরা এসেছেন। আগামীকাল আমার বিয়ের আশীর্বাদ হবে, আপনি কিন্তু যাবেনই।

শর্বরীর কথা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো অমিত। আজকাল আজ শর্বরীর বিয়ের কথা শুনে মনের কোণে এত বিস্ময় জমছে কেন? অমিতের মনে পড়লো, যে বয়েসে কল্পিতাকে সে ভালবেসেছিল, সে বয়েসে যদি ওর বিয়ে হ'ত, তা হলে শর্বরীর মতই একটি মেয়ে হ'ত হয়ত। এমনি সুরেলা গলা আর মিষ্টি চেহারা নিয়ে সেও যেত শ্বশুরবাড়ী, স্বামীর হাত ধরে।

শর্বরীর দিকে চেয়ে হাসলো অমিত। বললো—নিশ্চয়ই যাবো। আচ্ছা, সেই প্রফেসর ছেলেটির সঙ্গেই তো তোমার বিয়ে হচ্ছে।

সামান্য একটু লজ্জার লাল আভা দেখা গেল শর্বরীর মুখচোখে। খানিক থামলো। তার পরে আস্তে আস্তে বলে গেল—হ্যাঁ মাষ্টারমশাই। আমার বাবা সেদিক দিয়ে খুবই ভাল। মা অবশ্য একটু কেমন ধরনের, কিছুতেই মত দিতে চায় নি। মায়ের নজর খালি টাকার দিকে। ছেলেটির অবস্থা যেহেতু ভাল নয়, সেই হেতু যেন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়াও উচিত নয়, এমনি মায়ের ভাব। কিন্তু তবু, আমি যাকে ভালবেসেছি, একবার যাকে স্বামী বলে স্বীকৃতি দিয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কারুকে বিয়ে করার মত অতখানি নীচে আমি এখনো নামি নি মাষ্টার-মশাই।

—হ্যাঁ, সেই তো ভাল শর্বরী। হাজার হলেও তোমরা ভারতীয় নারী। আর ছাড়া যাকে ভালবাসা যায়, তার সঙ্গে বিয়ে না হলে জীবনের ওপর যে ক্ষতির বোঝাটা চাপে, তাও তো নেহাৎ কম নয় এই যেমন দেখো? আমাকে। তুমি আমার মেয়ের বয়েসী, তবু বলছি, এমনি একটি বিচ্ছেদ আমার জীবনে অনেকখানি ক্ষতি করেছে শর্বরী। যাই হোক—তোমরা সুখী হও, এই কামনাই করি।

—আচ্ছা, আজ তা হলে আসি মাষ্টারমশাই। আপনি কিন্তু কাল সন্ধ্যের যাবেনই। আপনার আশীর্বাদ না পেলে আমি নিজেও শান্তি পাবো না মাষ্টারমশাই।

বারবার অনুরোধ করে গেল শর্বরী। আর একটুখানি পাণ্ডুর হাসি ফুটে উঠলো অমিতের মুখে। সত্যিই যেন পুঞ্জ পুঞ্জ বিস্ময়ে তৈরী একটি শরীর—শর্বরী। বাইরে থেকে দেখে বোঝাবার কিছু উপায় নেই। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে, নির্জীব একটি প্রাণহীন আত্মা। কিন্তু ওরই মধ্যে কত সুন্দর আর শুদ্ধ একটি নিষ্ঠাবোধ। যে নিষ্ঠার জোরে ভালবাসার কথাকে কলুষতা ভেবে গোপন করার ইচ্ছা জাগে না। বরং ও যা ভাবে, ও যা চিন্তা করে, মন আর প্রাণ দিয়ে ও যা উপলব্ধি করে, বাইরেও তার প্রকাশের প্রবণতা জাগে।

শর্বরীর অন্তরের এই পরিচয়টা এই প্রথম পেল অমিত। এতদিন শর্বরী তানপুরা হাতে সঙ্গীতবিশারদ অমিত চক্রবর্তীর ছাত্রী হিসেবে আসত। ছাত্রী শর্বরীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শেখাত। কেন জানে না অমিত, শর্বরীকে গান শেখাতে গিয়ে অপূর্ব এক স্নেহে সারা বুক ভরে যায় ওর। ভাল লাগে। ক্লান্তি আসে না। একঘেয়েমীর বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে যায় না। অমিত নিজেই জানে না, ও কেন অতখানি স্নেহ করে শর্বরী নামে একটি আত্মাকে, যে আত্মা সর্বক্ষণ তাকে অতীতের বুকে ঠেলে ঠেলে দেয়। হারিয়ে-যাওয়া অতীতের কোঠায় যে কবিতা তাকে সব সময়ই একটি মধুর মায়ার বেড়ায় আটকে রাখতো, সেই কবিতাকে মনে পড়িয়ে দেয় বলেই কি শর্বরীকে এত ভাল লাগে অমিতের? কে জানে!

অথচ শর্বরীর সঙ্গে অতীত কথামালার রাজকন্যা কবিতার কতই না অমিল! আজকের এই চিকন হাওয়া-ছড়ানো সন্ধ্যার মুহূর্তে মনে হল অমিতের, কবিতা সেদিন যদি এই শর্বরীর মত নিজের বিশ্বাস আর ভালবাসাটাকে গৌরবের কথায় মুড়ে সবারই সামনে প্রকাশ করে দিতে পারত। তা হলে, তা হলে দীর্ঘ বিশ বছরের দুর্বিষহ যন্ত্রণাকাতর আর অশান্তিময় দিনগুলো এমন ব্যর্থ হয়ে যেত না অমিতের। সেদিনকার অমিতের মনে হত, কবিতার একটি বুকের ভালবাসায় জীবনের সব লেনা-দেনার আকাঙ্খা মিটে যেত। সকালের কচি সূর্যের মত দিবসের উজ্জ্বলতার সম্ভাবনা নিয়ে অনেক স্বপ্ন-কণা ছড়িয়ে পড়ত ওদের দু'জোড়া চোখের তারায়।

কিন্তু কবিতা তা পারে নি।

সত্যিই কি পারে নি? সন্দেহ হয় অমিতের। সন্দেহ নয়। স্থির সিদ্ধান্ত। কবিতা তা করে নি। পারে নি নয়। বড় নির্মম আর অপ্রত্যাশিত একটি রূঢ় সিদ্ধান্ত। প্রথমদিকে সেকথা টের পায় নি অমিত। অমিতের ভালবাসার জীবনে সেদিন কোনওরকম সন্দেহের অবকাশ ছিল না। উপরন্তু এই কথাই ভাবত সে, বর্ধমান জেলার অখ্যাত একটি ঘুঘু-ডাকা আর ছায়ায় ঢাকা গ্রামের গাছপাতার আড়ালে যে একটি প্রাসাদের মত বাড়ী নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ভালবাসে, তারই দেয়ালে ঘেরা যে একটি স্বপ্ন চুপি চুপি আত্ম-পরিচয় লিখে যেত কবিতার চোখের তারায়, সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্যে ভীরু-চোখ কবিতা ভীরুতা কাটিয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে পারে।

এবং কখন না জানি দু'টি আত্মা কাছাকাছি সরে এসেছিল। একেবারে বুকে বুকে। সেদিন অমিত আলতো করে ডাকত,—কবিতা!

কবিতা উত্তর দিত,—বলো।

—তুমি তোমার বাবা-মাকে আমাদের ভালবাসার কথা জানাবে তো?

—জানাবো। আমি ঠিক আছি অমিত, আমার জন্যে ভেবো না।

ভাবতে হবে না বললেও ভাবনা কি আর অত সহজে যায়! ভালবাসা মানেই তো আকাশ-পাতাল ভাবনার বোঝায় মাথা ভারী করা। চিন্তা করে করে স্নায়ু ছিঁড়ে ফেলা। এত জ্বালা, তবু তো মানুষ ভালবাসে। যেখানে ধুলো-কাদার পঙ্কে দূর আকাশের তারারা, স্বপ্ন দেখা নিতান্তই বেমানান, সেখানেও তো জীবনের প্রশ্ন আসে। প্রশ্ন আসে কল্পনার। অমিত জানত—অমিতের সঙ্গে কবিতার বিয়ে হওয়াটা বিরাট একটা অঘটনেরই সামিল। অন্তত কবিতার বাবা-মা, ভাই-বোনেদের কাছে তো তাই। সামাজিক বাধা কিছু ছিল না। তবু সাত-শো বিঘে জমির মালিক মুরলীবাবু তার ছোট মেয়ের অমিতের মত ভাগ্যহীন কপর্দকশূন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার মত আহম্মক নন্। শাশ্বতী অর্থাৎ অমিতের দিদির বিয়ে হয়েছিল কবিতার বড়দাদা নরহরিবাবুর সঙ্গে। সেটা সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ নরহরিবাবু বড়লোকের ছেলে। বড়লোকের ছেলে বলেই শাশ্বতীর মত সুন্দরী আর মিষ্টি চেহারার মেয়েকে বিয়ে করার অভীপ্সা মেটাবার পথে কোনও বাধা টেকে নি। বা কোনও বাধা আসেও নি। টাকার পায়ে মাথা নোয়ায় না এমন, লোক আর ক'জন আছে এই পৃথিবীতে?

বুঝি সেই কারণেই প্রথমবার যখন কবিতা - অমিতের ভালবাসার সম্পর্কটা একটা কদর্য রূপ নিয়ে ওদের চোখে ধরা পড়লো, তখন সমস্ত টালটা গিয়ে পড়লো শাশ্বতীর ওপর। যেন শাশ্বতীই এ জন্যে দায়ী।

সেদিনকার কথাটা স্পষ্ট মনে আছে অমিতের। আর মনে আছে বলেই বুঝি নিজের কাছে নিজেকে এমনি করে জবাবদিহি করতে হয় অনুক্ষণ।

কবিতাদের বাড়ীতে লক্ষ্মীপুজো হয় খুব ধুমধাম করে। সেই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন সবাই আসে। সেই লক্ষ্মীপুজোর কয়েকদিন পরের ঘটনা। শাশ্বতী ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত সব সময়। ঐ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নিজে হাতে চিঠি লেখা ওর পক্ষে বড্ড অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল। অথচ এখানে-ওখানে আত্মীয়-স্বজন যারা ছড়িয়ে আছে, তাদের চিঠি না দিলে মনক্ষুণ্ণও হয়। তাই কবিতাকে দিয়ে নিজের নামে চিঠি লিখিয়ে নিত শাশ্বতী। সেবার শাশ্বতী নিজের ঘরে বসে বসে বলে যাচ্ছিল আর কবিতা উবুর হয়ে বসে চিঠি লিখছিল। চিঠিটা লেখা হচ্ছিল অমিতকে।

অনেকদিন অমিতের কোনও খবর পায় নি শাশ্বতী। সেই কারণে মনটা খানিক উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছিল।

এমন সময় ওর ঘরে এসে ঢুকলো লক্ষ্মী। কবিতার মেজদিদি। ঢুকেই কবিতাকে জিজ্ঞেস করলো,—কি লিখছিস্‌রে কবিতা?

কবিতা উত্তর দিল,—বৌদির চিঠি লিখে দিচ্ছি।

—ও—বলে কেমন এক দৃষ্টিতে চাইলো লক্ষ্মী। তারপর দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চিঠি থেকে মুখ তুলে বৌদির দিকে তাকালো কবিতা। শাশ্বতী ঠিক অতখানি বুঝতে পারে নি। তাই যেমনি ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছিল, তেমনি-ভাবেই নির্বিকার রইলো। চিঠি লেখা শেষ হলে কবিতাকে বললো,—ওটা তুলে রাখ এখন। পরে কেষ্ট যখন বাড়ী যাবে, তখন ওর হাতে দিয়ে দিবি, পোস্টাপিসে ফেলে দেবে।

কিন্তু মেজদি বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করতে লাগলো কবিতা, সেকথা টের পেল না শাশ্বতী। কোনও রকমে চিঠিটা শেষ করে বেরিয়ে এলো।

আরও কিছুক্ষণ চাপড়ে চাপড়ে ছেলে ঘুম পাড়িয়ে নীচে নেমে এল শাশ্বতী, রান্না-বান্নার পাট তখনো চুকে যায় নি। কিন্তু নীচে এসে অবাক হয়ে গেল শাশ্বতী। নীচে তো একটাও লোক নেই। শাশুড়ী, লক্ষ্মী, কবিতা এরা সবাই গেল কোথায়। এদিক-ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলো শাশ্বতী। শেষে এক জায়গায় গিয়ে চোখ দুটো কেমন যেন আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। দোতালার মধ্যখানকার ঘরে বসে বসে কি সব কথা বলছে শাশুড়ী, কবিতা, লক্ষ্মী আর শাশ্বতীর ছোট-জা কণিকা। ওরা কথা বলছে আর মাঝে মাঝে চাপা রাগে ফেটে ফেটে পড়তে চাইছে। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো শাশ্বতী। পারলো না। শুধু একটু ভয়ের বাষ্প যেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে লাগলো ওর বুকের গভীরে।

ভয় আর কাউকেই নয়। ভয় শুধু লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী। নামটা শুনে হাসি পায় শাশ্বতীর। যেন ঐ নামটাকে ব্যঙ্গ করবার জন্য আর কলুষিত করবার জন্যই জন্মেছে লক্ষ্মী। চরিত্রহীনতার চরমতম বিপর্যয় যে কোন্‌ পাঁকের মধ্যে গিয়ে ঠেকতে পারে, তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ ঐ লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মানে যার বিয়ে হয়েছে অমিতদেরই শহরের বিখ্যাত রায়বাহাদুর মনীষবাবুর বড় পুত্রের সঙ্গে। প্রথম প্রথম লক্ষ্মীর প্রতি কিছুটা যে মমতাবোধ আর বেদনাবোধ ছিল না শাশ্বতীর, তা নয়। বরং আর দশজনে ঘৃণা করলেও শাশ্বতী ওকে প্রথমদিকে কাছে টেনে নিয়েছিল। সেদিন সে এই কথাই ভাবতো, আহা! মেয়েটার জীবনটাকে অকালে নষ্ট করে দিল ওর বাপ-মা। শুধু টাকা দেখলেই চলে না। জীবন মানে ধন নয়, মান নয়, যশগৌরব কিছুই নয়। জীবন মানেই হল দু'টি আত্মার শান্তি সফলতা। লক্ষ্মীর জীবনে তা আসে নি। রায়বাহাদুর মনীষবাবুর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকলেও তার পুরুষত্বহীন জরদ্গব রাঙামুলো পুত্রটি যেন একটি অভিশাপের ছায়া নিয়ে এসে ছিল লক্ষ্মীর জীবনে। হাবা-গোবা পুরুষত্বহীন স্বামী—ও স্বামী নিয়ে সুখের বাসা কোন মেয়েই বাঁধতে পারে না। লক্ষ্মীও পারে নি। তাই সামাজিক স্বামী হিসেবে জড়ভরতটার নাম লেখা থাকলেও দেহ-মন, এই দুই মিলে যে লক্ষ্মীর অস্তিত্ব, তার স্বামী নির্বাচিতও হল ঐ জড়ভরতটারই ভাই শ্যামল। সেটাকেও শাশ্বতী সমর্থন করেছিল। কারণ শাশ্বতী জানে, লক্ষ্মীর মন বলে যেমনি একটি জিনিষ আছে, দেহ বলেও তেমনি আরও একটি বস্তু আছে। দেহ ও মন—দুইয়ের সমন্বয়েই জীবন। সুতরাং লক্ষ্মী যদি তার যৌবন-পিয়াসাভরা দেহের কোষে কোষে যে তৃষ্ণা নিরন্তর সৃষ্টির বাসনায় চঞ্চল, তার খাতিরে শ্যামলকেই স্বামী বলে গ্রহণ করে থাকে তার গোপন জীবনে, তবে সেটা তার অপরাধ নয়। বাপ-মায়ের ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে লক্ষ্মীই বা কেন তার ফাল্গুনীর বুকে এমন পাতা-ঝরা আর্তি ডেকে আনবে? তাই ওটা শাশ্বতীর চোখে লক্ষ্মীর পাপ বলে ধরা পড়ে নি, কিন্তু যখন তারই কিছুদিন পর শোনা গেল এবং বোঝা গেল, লক্ষ্মীর যৌবনের মধুগন্ধায় অংশীদার হয়েছে পর পর আরও কয়েকজন, লক্ষ্মীর পিসতুত দাদা জানকীনাথ, নন্দাই ননীবাবু, সীতাপুর হাটের কমলাক্ষ উকিল, ওরই বড় জামাইবাবু বদনবাবু আর দূর সম্পর্কের আত্মীয় বঙ্কুকিশোর, তখন সেই মুহূর্তে শাশ্বতীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল লক্ষ্মী নীড়-পিয়াসী গৃহিনী নয়। পথে-ঘাটে রেঁস্তোরাঁয়, সিনেমায় আর পান-দোকানের সামনে সামনে দাঁড়িয়ে যারা নিজেকে পণ্যের মত পুরুষের চোখে ভাসিয়ে আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে ক্লেদাক্ত হাসি হাসে, আর নিজের যৌবনের লোভ ছড়ায় নোংরা পুরুষগুলোর বিষাক্ত চোখে, যারা দিনে ঘুমোয়, রাতে জাগে, লক্ষ্মী তাদেরই জাতের মেয়ে। অভাবে পড়ে নয়, ওটা ওর মজ্জায় মজ্জায় কিল্‌বিলিয়ে বেড়াচ্ছে অনুক্ষণ। অভাবে নয়, স্বভাবে।

তারপর থেকেই লক্ষ্মীকে ভয় করে শাশ্বতী। কারণ মানুষ নিজের মনের কষ্টিপাথরে বিচার করতে গিয়ে অনেক সময় অনেকের সম্বন্ধেই ভুল করে বসে। ঠিক সেইরকমই কি কোনও ভুল শাশুড়ী, জা এদের কানে তুলেছে লক্ষ্মী?

চোখ তুলে আবার দৃষ্টি ফেরালো শাশ্বতী। তারপর ডাকলো—মা, মা?

কোনও সাড়া এল না ওপর থেকে। কেবল এইটুকু বুঝতে পারলো শাশ্বতী, দুজোড়া চোখ যেন হিংস্র জানোয়ারের মত দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে তার দিকে চেয়ে। কিন্তু কি কি এমন দোষ করলো শাশ্বতী, যার জন্যে তাদের এই অকারণ রাগ?

শাশ্বতী আবার ডাকলো—মা
আপনার ভাত বেড়েছি।

এবারেও কোনও সাড়া পেল না।
তার খানিক পরে অত্যন্ত জোরে জোরে
পা ফেলে নেমে এল শাশুড়ী। কিন্তু
শাশুড়ীর দিকে চেয়েই আঁৎকে উঠলো
শাশ্বতী। শাশুড়ীর চেহারা এমনিতেই
ও রুক্ষ এবং কর্কশ। তার ওপর আজ
মন আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে।
মন এই মাত্র এক তাণ্ডব জিঘাংসার
অপদেবতা ভর করে বসেছে শাশুড়ীর
নে আর মুখে। মুখে আর চোখে।
ই আগুন-জ্বলা চোখের দৃষ্টির সামনে
মন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ঐ শক্ত
বের বাসসে-যাওয়া দাঁতের বিকট
নের তোড়ে এই মুহূর্তে ভেসে যাবে
শ্বতী।

শাশ্বতী তবু নরম গলায় বললো—
মা, এইখানে আপনার জায়গা
রেছি।

—হুঁ, কটমট করে তাকালো
তানা শাশ্বতীর মুখের দিকে। তার
ন ধপ্ ধপ্ করতে করতে গিয়ে শুয়ে
ড়লো দাওয়ার মেঝোতে আঁচল
বিছিয়ে। অপরিসীম ক্রোধে ফুলতে
লাগলো।

শাশ্বতী বুঝলো, ওদের পরামর্শের
সিদ্ধান্তে শাশ্বতীই অপরাধী সাব্যস্ত
য়েছে। কিন্তু পরামর্শটা যে কি, তাই
তা এখনো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলো
না শাশ্বতী।

হঠাৎ ঝাল-ঝাড়া গলায় চীৎকার
করে উঠলো নিভাননী—যা, যা,
হারামজাদী ভাত তুলে রেখে দেগে —
খাবো না—হারামজাদী।

ধ্বক্ করে উঠলো শাশ্বতীর
বুকটা — মা।

—মা, —যেন কিছু জানে না
সর্বনাশী। ছোটলোকের ঝিটি আমার
বাড়ীটাকে কি ছোটলোকের ঘর পেয়েছিস্
একেবারে বোমার মত ফেটে পড়লো
শাশুড়ী।

আর অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো
শাশ্বতী—মা, এ আপনি কি বলছেন?

—আহা, পোড়াকপালী যেন ভাজা
মাছটি উল্টে খেতে জানে না। না না
ভাইকে ডেকে কবির সঙ্গে প্রেম করিয়ে
দেগা। হা-ঘরের ঝিটি, বাপের কালেও
ঘর দেখে নাই তোর ভাই, তাই কবিকে
নিয়ে ঘরে খিল দিতে গেছিলি।

—মা, আপনি অমন করে বলবেন
না মা। আমি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে
বলছি, ওদের ব্যাপার আমি কিছু জানি
না। কেঁদে ফেললো শাশ্বতী।

আর আরও খেঁকিয়ে উঠলো
নিভাননী—না জানিস্ না, তুই কেন
চিঠি লিখে লিখে ভাইকে ডেকে
আনিস্ এখানে। হারামজাদী ভাইকে
ডেকে নিয়ে আসে ভাল-মন্দ খাওয়াবার
জন্যে। হারামজাদা, দুশ্চরিত্র লম্পটটা
এখানে আসে প্রেম করতে। স্পর্ধা তো
কম নয়। —চিবিয়ে চিবিয়ে বিষ ছড়িয়ে
কথাগুলো বলে গেল শাশুড়ী। চোখে-
মুখে আগুনের ফুল্কি ছড়িয়ে।

ঐ আগুনের ফুল্কি এখনো
অমিতের বুকে জ্বলছে। অমিত ভোলে
নি। অমিত ভুলতে পারে নি। যদিও
অমিত সব কথাই শুনেছে একমাত্র
শাশ্বতীর মুখ থেকে। অমিত শুনেছে,
নিরুপায় কান্নায় সেদিন শাশ্বতীর বুক
ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল।
কাঁদতে কাদতে এক সময় কান্না
থেমেছিল।

তারপরে শাশ্বতীও ফুঁসে উঠেছিল,
অমনভাবে যা-তা বলবেন না বলে
দিচ্ছি। আমার ভাই না হয় চরিত্রহীন
লম্পট, সবই হল; কিন্তু আপনাদেরই বা
মেয়ে কেন ওকে ভালবাসতে যায়।

—যা, যা, তুই আর কথা বলিস্ না
হারামজাদী। আমার কবি যাবে তোর
ভাই-এর সঙ্গে প্রেম করতে, অত দায়
পড়ে নি ওর। তোর ভাই-ই তো আসে
ফ্যাক্ ফ্যাক্ করতে। বিষাক্ত সাপের
মত কোঁ করে উঠলো নিভাননী।
বলে উঠলো,—তুই কি ভাবিস্ তোদের
মত ছোটলোকের ঘর থেকে তোকে
নিয়ে এসেছি বলে তোদের ঘরে
আমার কোল-পোঁছা মেয়েটাকে মরতে
দিতে যাবো। কি আছে রে, তোদের
দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না।
এই তো তোদের অবস্থা। অনন্তি
অবস্থা নিয়ে কোন্ মুখে তোর ভাই
ছোঁড়াটা কবিকে বিয়ে করার আশা
করে? লজ্জা লাগে না তার?

—আপনাদের মেয়ে ভালবেসেছিল
বলেই তো ও-ও ভালবাসতে গেছিল।

—আর বাজে বকিস্ না। আমার
কবি —

—বাজে বকছি না মা, আপনাদের
মেয়েই তো আমাকে দিয়ে আপনার
ছেলেকে বলা করিয়ে ছিল, অমিতকে
ছাড়া ও অন্য কারুকে বিয়ে করবে না।

—কি বললে — কি বললে বৌদি?
হঠাৎ ওপর থেকে খেঁকে উঠলো
কবিতা। এতক্ষণ চুপ করে ছিল ও।
এবারে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে
এসে শাশ্বতীর সামনে দাঁড়ালো। শক্ত
গলায় বলে উঠলো, কি বললে তুমি
বৌদি, আমি তোমাকে দিয়ে বলা
করিয়ে ছিলাম দাদাকে, মিথ্যে কথা
বলবার জায়গা পাওনি?

—অ্যাঁ, কি বললি, আমি মিথ্যে
কথা বলছি।

অবাক আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য
স্তব্ধ হয়ে গেল শাশ্বতী। কিছুক্ষণের
জন্য চেয়ে রইলো কবিতার মুখের
দিকে। তারপর বললো—তুই আমাকে
দিয়ে তোর দাদাকে বলা করাস্ নি যে,
অমিতকে ছাড়া অন্য কারুকে বিয়ে
করবি না?

—হুঁ বলেছি তাই, প্রমাণ দেখাতে
পারো?

—প্রমাণ। —হুঁ পারি।

বলে খাংলা ঘর থেকে স্বামী
নরহরিবাবুকে ডেকে আনিয়েছিল
শাশ্বতী। মুখে মুখে প্রমাণ করে
দিয়েছিল। দাদা নরহরিবাবুর সামনে
আর কোনও কথা বলতে পারে নি
কবিতা। কিন্তু তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মী হিসিয়ে
উঠেছিল—তুমি কেন কথুকে দিয়ে
অমিতকে চিঠি লিখিয়ে নাও, সে কথার
জবাব দিতে পারো বৌদি?

সে কথার জবাব সত্যিই শাশ্বতী
দিতে পারে নি। শাশ্বতী কল্পনাও
করতে পারে নি যে, তার কাজের

[illegible] দরুণ সময় না থাকায় যদি কবিতাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেয়, তবে তার মধ্যে থেকেও ওরা অনেক দূরের কথা ভেবে নিয়ে অমনিভাবে ওকে জবাবদিহি করতে পারে। শাশ্বতী সেদিন আর একবার কবিতার দিকে চেয়ে দেখে নিয়েছিল। উঃ! মেয়েদেরকে চেনা কতখানি শক্ত। কবিতা যে এমনিভাবে তার নিজেরই মনের এক চরম সত্যকে অস্বীকার করে শাশ্বতীকে এক-ঘর লোকের সামনে অমনভাবে ছোট করে দিতে পারবে, সেকথা এর আগের মুহূর্তেও টের পায় নি। ভাবতেও পারে নি। সেদিন শুধু একটি কথাই মনে হয়েছিল শাশ্বতীর, কবিতার ভালবাসায় যতখানি না আন্তরিকতা ছিল, তার থেকে অনেক বেশী ছিল ছলনা। কিংবা অন্য এক কুৎসিত সুখের ঈপ্সার ভালবাসা। নইলে ও কথা সে কিছুতেই বলতে পারত না।

দিদির কাছে শুনে অমিতের প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, কিন্তু মেনে নিতেও কষ্ট হয়েছিল অত্যন্ত। কবিতার মনের পরশ সেদিন পর্যন্ত ও যা পেয়েছিল, তাতে ও ধরনের বিষাক্ত মনোবৃত্তি অবিতার মধ্যে কল্পনা করাটাই নিতান্ত কষ্টকর ছিল তার পক্ষে। সে জেনেছিল, কবিতা তাকে ভালবাসে। কবিতার প্রেমের ভুবনে এসে নতুন করে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল অমিতের মনে। নতুন দিনের গান আর নতুন দিনের প্রাণ। নতুন করে তানপুরা নিয়ে সুরের অতলে তলিয়ে যেতে চেয়ে ছিল, যে সুর জীবনের পাঁপড়িগুলিকে একটি একটি করে মেলে ধরে সূর্যের পানে, যার কম্পনে জোয়ারিতে কবিতার দু'টি চোখের মুগ্ধতার আবেশ। হয়ত সেই জন্যেই কবিতার ঐ কথাগুলোকে ঠিক ওর মনের কথা বলে মনে হয় নি।

কবিতাও ঠিক সেই কথাই বলেছিল—ও কথা ওর মনের কথা নয়। একঘর লোকের সামনে অতখানি কদর্যভাবে নিজের কথা প্রকাশ পাক, কবিতা তা চায় নি। কবিতা বলেছিল—ঐ নীচু-মনের লোকগুলোর কাছে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ও কথা বলতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। বলে ফেলে আমার নিজেরই কি আর শান্তি ছিল ভাবছো? কিন্তু না বললেও তো উপায় ছিল না। —তুমি জানো না অমিত, ওরা কতখানি নীচ। ও কথা স্বীকার করে নিলে ওরা আমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দিত।—তুমি সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করো অমিত।

—ক্ষমা? একটি মুগ্ধ বিস্ময়ে যেন সেই নিমেষে অমিতের সারা চেতনায় অপূর্ব আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। কবিতাকে একেবারে নিজের বুকে টেনে নিয়েছিল। ভাললাগা মুহূর্তটিকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়েছিল।

কবিতা অমিতকে চিঠি দিয়েছিল। সে চিঠি পেয়ে আশা পেয়েছিল অমিত। অনেকখানি আশা। কবিতা লিখেছে, অমিতকে ভালবেসেছে বিয়ে করবে বলে। প্রয়োজন হলে সে বাপ-মায়ের অমতে বিয়ে করবে অমিতকে। চিঠি পেয়ে আশা পেয়েছিল অমিত, সে কথা যেমনি সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি, তার মনও খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিছু। মন খারাপ হয়েছিল তার নিজের কথা ভেবে। কবিতা বড়লোকের মেয়ে। ওদের টাকা আছে, সুতরাং অমিতের থেকে অনেক ভাল ঘরে আর ভাল বরে বিয়ে হতে পারে কবিতার। কবিতা রাজকন্যা। আর সেই ক্ষেত্রে অমিত? সত্যিই তো, কি আছে অমিতের; না আছে রূপ, না আছে গুণ, না আছে বিদ্যা, সবের ওপর না আছে তার বৈভব। শুধু একটি বস্তু আছে, ভালবাসার মত একটি নিকলুষ প্রাণ। অমিত জানত তার যদি ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থাকত, তা হলে কবিতার বাবা-মা কারুরই আপত্তি থাকত না ও বিয়েতে। বরং ওরা নিজেরাই বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতো; তা নেই বলেই এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা, শাশ্বতীর এত অপমান।

তবু শত অপমান সত্ত্বেও ঐ চিঠি পাওয়ার পর অমিত মাত্র আর একবার গিয়েছিল দিদির বাড়ী এবং সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। সেবার গিয়ে দিন তিন-চারকে ছিল। সেই ক'টি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত ওদের দু'জনকে কাছে কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দু'টি মনকে নিবিড় গ্রন্থিতে এক করে দিয়েছিল। অমিতের বুকে কবিতার অস্তিত্ব ওদের দু'জনকে নতুন করে স্বপ্ন বোনার মত দৃষ্টি দিয়েছিল। অমিতের ডান হাতের আঙুলে একটি রক্তিম দার্জিলিং পাথর বসানো আংটি পরিয়ে দিয়েছিল কবিতা। পরিবর্তে অমিত তার বাঁ হাতের মণিবন্ধের একটু ওপরে ব্লেড দিয়ে কেটে সেই রক্তের স্মৃতিলিখা এঁকে দিয়েছিল কবিতার সিঁথিতে। প্রতিশ্রুতি। রক্তের প্রতিশ্রুতিতে অমিত নামে একটি পুরুষ কবিতা নামে একটি নারীর স্বামীর অধিকার চেয়ে নিয়েছিল।

স্বামীর অধিকার।

হাঁ, বাইরের জগতে কবিতা দূরে সরে গেলেও মনের জগতে কবিতা আজও তার স্ত্রী। তার স্বপনচারিণী কল্প-প্রতিমা। হাতের আংটিটার দিকে তাকালো অমিত একবার। বৈদ্যুতিক আলোর ছটায় ঠিক তেমনি উজ্জ্বল আর স্বচ্ছ হয়ে বিশ বছর আগেকার একটি গোপন অথচ সত্য শুভ স্মৃতি বুকে নিয়ে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে আকাশের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের স্পন্দমান দ্যুতির দিকে। বিশাখা, অরুন্ধতী, শতভিষা আর স্বাতীর চোখের দূর-স্বপ্ন চোখে নিয়ে। আর হাতের কালচে দাগটাও ঠিক তেমনিই আছে। একটুও আবছা হয়ে যায় নি।

থাকুক্। ওরাই তো অমিতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ঐ শুভ আর সত্য-ফাল্গুনী স্মৃতি বুকে দু'টি বস্তু; ওর মধ্যেই তো আত্মগোপন করে আছে অমিতের স্বামিত্ব। যে স্বামিত্বের শক্তি তাকে এতকাল বাঁচিয়ে রেখেছে।

কিন্তু তারপরে যে কোন্‌দিক দিয়ে দিয়ে কি হয়ে গেল, সেটা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারে নি অমিত। সেই সময় সব দিক দিয়েই দুর্ভাগ্য জমে এসেছিল অমিতের জীবনে। আর কবিতার বড়দি এবং মেজদি দু'জনেরই বিয়ে হয়েছিল

অমিতদেরই শহরে, সেটাও তো কম দুর্ভাগ্য নয়।

সব কথাই মনে আছে অমিতের। অমিতের চরম প্রতিশ্রুতির পর কবিতা নিজেই আসে শাশ্বতীর সঙ্গে অমিতদের বাড়ী কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে শাশ্বতীও যেন বড় বেশী নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছিল। তাই সে রাত্রে শাশ্বতী এসে পৌঁছলো নিজের বাপের বাড়ী, সেই রাত্রিতেই কবিতাকে পাঠিয়ে দিল তার বড়দিদির বাড়ী। দিদির জিম্মায়। অর্থাৎ অমিত-কবিতার ব্যাপার নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও কথা না ওঠে, কিংবা উঠলেও শাশ্বতীকে যাতে দোষ না দিতে পারে, তারই অবকাশ রেখে ছিল।

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন অমিত নিজেও। মানুষ কেমন করে মানুষকে এতখানি হীন চোখে দেখে, সেই ভেবে। অমিতের ওপর কবিতার দুর্বলতার কথা জানত লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর বাড়ী আর বড়দির বাড়ী এপাড়া-ওপাড়া। সুতরাং প্রতিদিনই লক্ষ্মী বেড়াতে আসত বড়দির বাড়ী। বিশেষ করে কবিতা থাকাকালীন। লক্ষ্মীই জানিয়ে ছিল বড়দিকে। বলেছিল---তুমি তো জানো না দিদি, অমিত একটি মহা দুশ্চরিত্র ছেলে, ওকে আমি খুব ভাল করে জানি। কবুকে বিয়ে করতে চায় কেন জানো, বাবার কাছ থেকে টাকা আদায় করবার জন্যে। ওকে কি কম শয়তান ভাবো!

বড়দি বলেছিল---তাই নাকি?

বলে খানিক থেমে বলেছিল, ---তা হলে তো কবুকে খুব চোখে চোখে রাখা দরকার।

চোখে চোখেই রেখেছিল ওরা কবিতাকে। সব সময় কবিতার চলা-ফেরা, কথা বলা---সব কিছুর দিকে তীক্ষ্ণ অনুষণী দৃষ্টি সজাগ রেখেছিল ওরা। শাশ্বতীদের বাড়ী বেড়াতে আসতে দিত না। যদি বা দু'একদিন আসতো, সেদিন বড়দি কিম্বা মেজদি সঙ্গে আসতো। যাতে অমিতের সঙ্গে কোনও কথা বলার বা দেখা করবার সুযোগ না পায়। এমন কি, অমিতের ছোট বোন ধীরা কবিতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও ওরা সন্দেহ করতে ছাড়তো না।

আর লক্ষ্মী সব সময় চেষ্টা করত কবিতাকে তার নিজের পঙ্কিলতায় ডুবিয়ে দিতে। হ্যাঁ, সেইটাই স্বাভাবিক। মানুষ যখন নিজে তলিয়ে যায়, তখন সে আরও অনেককে সঙ্গে নিয়েই তলিয়ে যেতে চেষ্টা করে। বহুচারিণী লক্ষ্মী তাই নিজের বোনকেও ঐ পথে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। কবিতার মনের একনিষ্ঠ ভালবাসাকে ভেঙ্গে-চুরে খান্‌খান্‌ করে দিতে চেয়েছিল। সে কারণে সব সময় কবিতাকে পরামর্শ দিত---তুই যে ওকে বিয়ে করবি বলছিস্‌---তুই কি জানিস্‌, ও এইখানকারই আর একটা মেয়েকে ভালবাসে। আমি এখানে থাকি, আমি যতখানি ওকে জানি, তুই তো ততখানি জানিস্‌ না। ওর চরিত্র বলে কোনও জিনিষই নেই। বরং মা যেখানে ঠিক করেছে, সেই ছেলেটা তো অমিতের থেকে অনেক ভাল। ও ছেলেটা কলকাতায় বি-এ পড়ছে, বড়-লোকের ছেলে, ওর সঙ্গে বিয়ে হলে কেমন রাজার হালে থাকবি বলদিকিনি। ওর পাশে অমিত লাগে নাকি? কি আছে কি ওর, ঐ তো ফুটো চালার ঘর! হুঁঃ!

বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছিল লক্ষ্মী। তার পর বলেছিল---ওই লম্পট ছোঁড়াটার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমি যা বলছি তাই কর। আমি তোকে ভাল ভাল বড়লোকের ছেলে দেখিয়ে দেবো। তাদের সঙ্গে---

শেষ করেনি কথাটা। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর তাই শুনে চমকে উঠেছিল কবিতা। একবার নয়। দু'বার নয়। বারবার একই কথা ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলত লক্ষ্মী, যাতে অমিতের ওপর আকর্ষণটা কবিতার দিক থেকে ভেঙ্গে যায়। বলেছিল---তুই জানিস্‌, ও একবার একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল।

কথাটা যে কতখানি মিথ্যে, তা লক্ষ্মী নিজেও ভালভাবে জানে। তবু বলেছিল। অমিত আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, অমিতের ওপর লক্ষ্মীর এত রাগ কেন। ওদের হাজার বাধা সত্ত্বেও অমিতের সঙ্গে দেখা করত কবিতা। সব কথা বলত। বলতো---জানো মেজদি নিজে যেমনি, সবাইকে তেমনি ভাবে। ঐ মেজদিই তো মায়ের মন ভেঙ্গে দিচ্ছে। তোমার নামে যা-তা মিথ্যে করে লাগিয়ে তোমার ওপর মায়ের মন চটিয়ে দেয়। নইলে বছর খানেক আগে পর্যন্ত মা তোমার সঙ্গেই আমার বিয়ে দেওয়ার কথা বলতো। আচ্ছা অমিত, বলো তো, সত্যিই তুমি এখন অন্য কোনও মেয়েকে ভাল-বাসো নাকি?

অমিত বলেছিল---তোমার ও-কথা বিশ্বাস হয়?

---না, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। জোর গলায় বলেছিল কবিতা।

অমিতের ওপর কবিতার বিশ্বাসের গভীরতা দেখে সেদিন ভারি ভাল লেগেছিল অমিতের। এত বিপত্তি সত্ত্বেও মনে হয়েছিল, কবিতা নিজেই ওদের বিয়ে সম্ভব করবে। বিশেষ করে সেদিন, যেদিন কবিতা আবার তার নিজের বাড়ী ফিরে যায়, তার আগের দিন সন্ধ্যায়। বেড়াতে এসেছিল কবিতা। সেদিনও সঙ্গে এসেছিল তার মেজদি। কিন্তু সেদিন মেজদির বাধা মানে নি। অমিত সন্ধ্যার সময় বাড়ী ছিল না। ধীরার কাছে শুনলো, একটু পরেই ফিরবে। সুতরাং যাবার আগে অমিতের সঙ্গে সে একবার দেখা করবেই। সে কি আকুলি-বিকুলি কবিতার। ধীরার মুখে শুনেছে অমিত, শত আকুতি-মিনতি সত্ত্বেও যখন ওর মেজদি ওকে টেনে নিয়ে চলে গেল অমিতদের বাড়ী থেকে, তখন ঝর্‌ঝর্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ে-ছিল কবিতার চোখ দিয়ে। যাবার সময় দেখা হল না। সেই ব্যথা সহ্য করতে গিয়ে কবিতা কেঁদে ফেলেছিল।

কিন্তু দেখা হয়েছিল। সেদিন নয়, তার পরের দিন ভোরে। বাস্‌ স্ট্যাণ্ডে। মাত্র করেক সেকেণ্ডের জন্যে দেখা করে চুপি চুপি ফিরে এসেছিল অমিত।

আসবার সময় বলেছিল—গিয়ে চিঠি দিও। দেবে তো ?

—হ্যাঁ দেবো। কিন্তু সত্যিই কি আর তুমি আমাদের ওখানে যাবে না ?

সরাসরি না বলতে পারেনি অমিত, কবিতার মুখের ছায়া-ম্লান ভাবটুকুর দিকে চেয়ে। বলেছিল—তুমি চিঠি দিও তো, তার পরে দেখা যাবে।

অথচ আশ্চর্য !

আশ্চর্য এই যে, সেই কবিতাই কেমন করে নিজেকে অমিতের দিক থেকে গুটিয়ে নিতে পারলো, সে কথাটা উপলব্ধি করবার মত শক্তি অমিতের আজও আসে নি। সে কথা ভাবতে গেলে সমস্ত মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে আজও। কবিতা নিজের বাড়ী ফিরে যাওয়ার পর আর কোনও চিঠিপত্র দেয়নি এবং তার পরের ঘটনাও অমিতের নিজে চোখে দেখা নয়। অমিতের দিদির কাছে শোনা। ও ঘটনা সুখের নয়, দুঃখের। দুঃখেরও ঠিক নয়। ও ঘটনা ঘৃণিত মানসের পঙ্কিলতা।

যে ভয়টা অমিত প্রথম থেকেই করেছিল, সেই ভয়টাই বাস্তবে রূপ নিল। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্মী কবিতাকে বিষনীল করে তুলতে লাগলো। রাত্রে, দিনে, বৈকালে, সন্ধ্যায়—সব সময়। লক্ষ্মীর চক্রান্ত সফল হয়েছে। বড়লোকের ছেলে বিকাশ, যাকে নিয়ে লক্ষ্মীর নিজের দিক থেকেও চাহিদা মিটতে পারতো, তারই সঙ্গে জুটিয়ে দিল কবিতাকে। বড়লোকের মেয়েকে বড়লোকের ছেলের ঐশ্বর্য আকর্ষণ করলো। অমিতের প্রতিশ্রুতির স্মৃতি মুছে দিল কবিতা মন থেকে। তারপর আবার আশ্চর্যভাবে বিকাশকে ছেড়ে ভালবাসলো মিলনকুমারকে। শাশ্বতী সবই দেখে যেতে লাগলো। তবু কিছু বললো না। কিছু বলবার নেই আর। পাঁকে ডুবে যাওয়ার স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে স্বাদের মাদকতা সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না। লক্ষ্মী পারে নি। কবিতাও পারবে না। কবিতা তার লক্ষ্মী এক হয়ে গেছে। আশ্চর্য। আপন মায়ের পেটের বোনের সর্বনাশ যে কোনও মেয়ে এমনি জঘন্যভাবে করতে পারে, তেমন অভিজ্ঞতা শাশ্বতীর জীবনে এই প্রথম। লক্ষ্মীর হিংস্র আর কদর্য পরিকল্পনার কথা টের পায়নি কবিতা। সেই জন্যেই হয়ত জীবনের কোন্‌টা সত্যি, আর কোন্‌টা মিথ্যে, তাই দেখতে ভুল করেছিল।

এবং সেই জন্যেই শেষ পর্যন্ত হয়ত কবিতা বলে উঠেছিল অমিতের প্রসঙ্গে, ওকে আমি বিয়ে করতে যাবো কোন্ দুঃখে ? টাকা না হলে কি মানুষ বাঁচতে পারে নাকি ? তা ছাড়া ওদের ঐ ফুটো চালার ঘরে অত কষ্ট করে আমি থাকতে পারবো না।

আর তাতে সায় দিয়ে বলে উঠেছিল লক্ষ্মী—ঠিক বলেছিস্। টাকা না হলে কি এই দুনিয়ায় সম্মান থাকে।

বলে আড়-চোখে শাশ্বতীর দিকে চেয়ে হেসেছিল লক্ষ্মী। বিদ্রূপের হাসি।

সেদিন সত্যিই মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল শাশ্বতীর। অমিতের নিজেরও। অমিত কোনওদিন কোনও এক দুর্বল মুহূর্তেও ভাবতে পারে নি, কবিতা এতখানি নীচে নেমে যাবে। সত্যিই বিচিত্র এই পৃথিবী। কিন্তু তার থেকেও বুঝি আরও বিচিত্র মানুষের মন। যা কোনও দিন সম্ভব নয় বলে মনে হয়, হঠাৎ তাই-ই একদিন ঘটে যায় মানুষের মনকে চমকে দিয়ে।

কবিতার এ রূপ আশা করে নি অমিত। তাই তারপর থেকে বাইরের দিক থেকে একেবারে নীরব হয়ে গেল অমিত।

তারপর ?

তারপর অন্তর্দ্বন্দ্বের পালা। যে জ্বালার খবর বাইরের লোকের জানা নেই। যার একটুখানি যন্ত্রণাও বাইরের কেউ টের পায় না। অমিতের জীবনে এর থেকে বড় অভিশাপ আর কি থাকতে পারে ? অভিশপ্ত জীবন নিয়ে তারপরেই চলে এসেছে এই দিল্লী শহরে। বাস্তব পৃথিবীর কাছে একথা নিছক মনোবিলাস হলেও অমিতের জীবনে এইটাই চরম সত্য। সঙ্গীত-বিশারদ অমিত চক্রবর্তীকে আজ সবাই চেনে। চেনে না শুধু একজন—কবিতা। যার চেনা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল অমিতের কাছে।

কত বছর হল ? বিশ বছর পার হয়ে গেছে। কবিতা এখন কেমন আছে ? কোনও এক ভুলের মুহূর্তেও কি অমিতের কথা ভাবে না কবিতা ? কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কবিতার ? নিশ্চয় হোমরা-চোমরা কারুর সঙ্গে। সেইটাই তো স্বাভাবিক। কবিতার মুখে ও কথা শোনার পর থেকেই আর কিছু ভাল লাগে নি অমিতের। কিছু ভাল না-লাগা একটি মন নিয়ে লুকিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিল অমিত এখানে। কেন যে পালিয়ে এসেছিল, তা এখনও জানে না অমিত। হয়ত কবিতার কলঙ্ক দেখতে পারে নি, সইতে পারেনি তারই সামনে যখন এখানে-ওখানে কবিতার কথা নিয়ে নোংরা আলোচনা করেছিল লোকে। পালিয়ে আসার পর থেকে কবিতার আর কোনও খবরই পায়নি অমিত। শুধু কবিতার নয়, ওর দিদি শাশ্বতীরও না। এমন কি, ওর নিজের বাড়ীর লোকেরাও যে কেমন আছে, সে খবরও পায় নি অমিত। অজানাই থাক্। এই বেশ আছে অমিত। সময়ে-অসময়ে এখানে-ওখানে এ আসরে ও আসরে গান গায়। কান্না-সুরের করুণ ভাষায় মানুষের চোখে জল আনে। ব্যথায় আনন্দ দেয় অমিত চক্রবর্তী। সঙ্গীতশ্রী আর সঙ্গীত বিশারদ অমিত চক্রবর্তী।

আর তারই ছাত্রী শর্বরী। শর্বরীর কাকার বাড়ী দিল্লী। কর্মের খাতিরে ওর বাবাকে প্রায়ই এখান-ওখান করতে হয়। তাতে শর্বরীর পড়াশুনোর ক্ষতিও যথেষ্ট হয়। সেটা যাতে না হয়, তাই কাকার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করে শর্বরী। পড়াশুনোর সঙ্গে গান। গানের আসরেই আলাপ হয়েছিল শর্বরীর সঙ্গে। ভারী মিষ্টি আর দরদী গলা। ঠিক কেন জানে না অমিত, শর্বরীকে দেখেই কেমন যেন ভাল

লেগে গিয়েছিল। কবিতার সঙ্গে অমিতের বিয়ে হলে হয়ত তারও এমনি একটি মেয়ে হত। এমনি সুরেলা গলায় বাবার গান বাঁচিয়ে রাখতো। হ্যাঁ, অমিত তার বহুদিনের সাধনার ফল শর্বরীর গলায় বাঁচিয়ে রাখবে।

একটি সার্থক ছাত্রী শর্বরী। চমৎকার গাইতে পারে। সব থেকে বড় কৃতিত্ব তার, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুরের প্রতিটি মীড়, তান, গিটকিরি অনায়াসে তুলে ফেলতে পারে। তা ছাড়া নিষ্ঠাও আছে ওর। প্রত্যেকটি সন্ধ্যায় এসে প্রাণ ঢেলে গান গায়, গান শেখে। একদিনও কামাই করে না। রূপ এবং গুণের সমন্বয় যে এত সুন্দর আর নিপুণভাবে হতে পারে, সে কথা এর আগে কোনওদিন জানে নি অমিত চক্রবর্তী। সুতরাং এমনি একটি সমন্বয়-ভরা শর্বরীর অনুরোধ রাখাটা শুধু কর্তব্যই নয়, অনুরোধ না রাখাটা অমিতের পক্ষে চরম অপরাধও। সে যাবে। আশীর্বাদ করবে শর্বরী আর তার জীবন-সঙ্গী প্রফেসর ছেলেটিকে।

তাই পরের দিন সন্ধ্যের মুখে গিয়ে দাঁড়ালো অমিত শর্বরীদের বাড়ীর সামনে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রমেশবাবুর মেয়ে শর্বরীর বিয়ের আশীর্বাদীর দিন। কাজে কাজেই ভিড় একটু হবেই। এবং ভীড় একটু হয়েও ছিল।

বাইরের ঘরে একটা হাই পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে অনেক লোক আনাগোনা করছে। কিছুক্ষণ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকলো অমিত। তারপর গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর সমবয়েসী একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিল শর্বরী। হঠাৎ অমিতকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে উঠলো, —আসুন, আমি আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। আসুন, ভেতরে আসুন, বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

শর্বরীর দিকে একবার তাকিয়ে ওর পিছুন পিছুন চলতে আরম্ভ করলো অমিত। সত্যিই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ মেয়েটাকে। সাদা সিল্কের শাড়ী পরেছে, মাথার খোঁপায় সাদা বেল-ফুল গুঁজেছে। চিকন ত্বকের ওপর হাই পাওয়ারের আলো পড়ে সোনালী লোমগুলো চিক্‌চিক্ করছে। চোখের দু'টি তারায় স্নিগ্ধ স্বপ্ন-লেখা। অমিতের মনে হল, এই মুহূর্তে একগোছা পবিত্র রজনীগন্ধা যেন তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আজ থেকে বহু, বহু বছর আগের কবিতাকে মনে পড়লো আবার। তাকেও ঠিক এমনি শ্বেত-সুন্দর দেখাত। কিন্তু তার শ্বেত-কমলের পত্রালীতে যে কীটের দংশন লেগেছিল, তার যন্ত্রণায় আজ আবার সমস্ত বুকটা টন্‌টন্ করে উঠলো অমিতের।

অনেক ভিড় কাটিয়ে এসে বাবার ঘরে ঢুকলো শর্বরী। আর তার পিছন পিছন অমিত। ঘরে ঢুকে দেখলো অমিত একটা ইজি চেয়ারের ওপর বসে বসে কি একখানা জার্নাল পড়ছেন রমেশবাবু। শর্বরীর বাবা। আর দশটা অফিসারের মত রমেশবাবুকে ঠিক অতখানি গম্ভীর আর এ্যারিস্টোক্র্যাট দেখাল না অমিতের চোখে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পরণে সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী। একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী-সুলভ চেহারা।

শর্বরী বললো—বাবা, ইনি আমার গানের মাষ্টার মশাই! জার্নাল থেকে চোখ তুলে নমস্কার করলেন রমেশবাবু। বললেন—আসুন। আপনার নাম শুনেছি। আরে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন রমেশবাবু। ঐ চেয়ারটাতেই বসলো অমিত। শর্বরী উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, জানো বাবা—মাস্টার মশাই কি সুন্দর গা-ন, অমন গান তুমি জীবনেও শোন নি।

—না, না, শর্বরীর কথা আপনি শুনবেন না। ও ওর মাষ্টার মশাইকে একটু বেশী ভক্তি করে কি-না, তাই অমনি বাড়িয়ে বলছে।

তাড়াতাড়ি করে বলে উঠলো অমিত অপ্রস্তুতের মত। আর হাসলেন রমেশবাবু—শর্বরী বাড়িয়ে বলেনি অমিতবাবু, আপনার নাম শোনেনি, এমন লোক এ দেশে আছে নাকি ভাবছেন?

—কি যে বলেন—

শর্বরী বললো—তা বাবা, তুমি যাই বলো, আমি মাত্র এই ক'দিন থেকে গান শিখছি মাস্টার শাই-এর কাছে, কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে গেছি।

—তা তো যাবেই মা। অমিত চক্রবর্তীর মত ওস্তাদকে তুমি তোমার শিক্ষক হিসেবে পেয়েছো, সেইটাই তো তোমার চরম সৌভাগ্য।

ওদের কথা চলছিল। ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়ে গেল অমিতের। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। একি। কবিতা। কবিতা এখানে কি করে এল। মুহূর্তে সমস্ত চেতনাটা যেন থমকে দাঁড়ালো একবার। আর তারই পর মুহূর্তে নিজেকে সামলেও নিল অমিত। আজ বিশ বছর পর কবিতাকে এইখানে এমনি একটি ছাত্রীর গৃহে আশীর্বাদ করতে এসে একেবারেই আকস্মিকভাবে দেখতে পেয়ে যাবে, এতখানি ভাবতে পারে নি অমিত। তাই কিছুক্ষণ কথা সরলো না তার মুখ দিয়ে।

ততক্ষণে মা-কে দেখে আর এক ঝলক উৎসাহের বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে শর্বরী।—মা, এসো তোমার সঙ্গেও মাস্টারমশাই-এর আলাপ করিয়ে দিই।

কিন্তু কি আশ্চর্য। কবিতা যেন নিতান্তই এক অপরিচিতা মেয়ে অমিতের কাছে, এমনি ভাবে বললো—ও আপনি, মানে আপনার নাম অমিত চক্রবর্তী, আপনিই শর্বরীর গানের শিক্ষক।

আহত চোখ তুলে তাকাতে গিয়েও তাকাতে পারলো না অমিত। কেমন যেন ভালও লাগলো না ঐ তামাটে ঝলসানো মুখটার দিকে চাইতে। এই বিশ বছরে কবিতা এতখানি পাল্টে গেছে। হ্যাঁ, পাল্টেই গেছে। দেহে, চেহারায় এবং মনে—সব দিক থেকে। তাই বললো, —হ্যাঁ, আমার নাম অমিত চক্রবর্তী।

তুষারে রজতশুভ্র যেখানে

নিকোলাই তিখোনভ

তুষারে রজতশুভ্র যেখানে ফার্ তরু
স্বর্ণিল দক্ষিণে সেই তালীবন বীথি—
ঘরে ঘরে দেশে দেশে ও-কণ্ঠ অমরু
বাজে, মুখে মুখে ফেরে বাণীর উদ্ধৃতি।

কাছে দূরে সমুদ্রের একুলে-ওকুলে
পঞ্চ মহাদেশ জুড়ে আজ দশ দিকে
নব নব পুরুষের কণ্ঠে ওঠে দুলে
তবুও এমন যাত্রা ত্রিকাল দ্যাখে নি।

জনগণ মনোরাজ্যে সিংহাসন ওঁরই,
জলবায়ুভেদ, সে তো প্রেমের ত্রিবেণী,
একটি দেশে যদি ওঁর যাত্রা শুরু, ধরি,
অবুও এমন যাত্রা ত্রিকাল দ্যাখে নি।

দোর্দণ্ড একদা ক্রোধ-শোক রাজ্যপাটে
যে-দেশে গর্জাত ক্ষণে ক্ষণে বজ্রধ্বনি
মাতৃভাষাপ্রেমমুগ্ধ সে-দেশে কে হাঁটে
কে খোঁড়ে অজ্ঞাত সুপ্ত ভাষা-স্বর্ণখনি।

দেশের আকাশ স্তেপভূমি ছিল প্রিয়
ভালোবাসতেন মুক্তিপবনে নাও-ভাসা......
কী আছে এমন শ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠ বরণীয়
লেনিনের তুল্য যথা দেশকে ভালোবাসা!

অনুবাদ—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

---হ্যাঁ, আপনার গান রেকর্ডে শুনেছি। কিন্তু আমার একটা কথা বলার আছে আপনাকে।

---বলুন।

---আচ্ছা বলুন তো, দুনিয়াতে এত রকমের গান থাকতে, আপনি কেন ঐ প্রেমের ন্যাকামিভরা গানগুলো গা-ন?

---মা! তুমি কি বলছো মা! মাস্টার মশাই-এর সামনে যেন অপরাধী হয়ে যাবে, তারই লজ্জায় মা-কে সামলাতে চেষ্টা করলো শর্বরী।

কিন্তু তবু বলে উঠলো কবিতা—আশ্চর্য! আপনাদের মত এমনি প্রেমের সুড়সুড়ি দিয়ে যে সমস্ত গায়করা গান গায়, তাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ঠিক সেই জন্যেই শর্বরী যখন চিঠিতে লিখেছিল যে, আপনার কাছে গান শিখছে, তখনই বারণ করেছিলাম ওকে। তা ও কি আমার কথা শুনবে, অবাধ্য মেয়ে কোথাকার।

তার মানে! স্তব্ধ এক জোড়া চোখ তুলে চাইলো অমিত। আশ্চর্য! আশ্চর্য হবারই কথা আজ এত বছর পরে কবিতার দিকে চাইতে গিয়ে আবার চোখ নেমে এলো। ও মুখের দিকে চেয়ে থাকা যায় না। কদর্য একটি ইঙ্গিত আর দুঃস্বপ্নভরা দুটো চোখের চাউনী—সব মিলিয়ে কবিতার এমনি একটি অপ্রত্যাশিত রূপ দেখে ম্লান একটু হাসলো অমিত। তারপর একবার চেয়ে দেখলো শর্বরীর দিকে। ও বেচারা ঠিক এমনি একটি অঘটন আশা করে নি হয়ত। হয়ত সেই জন্যেই ওর সমস্ত মুখখানা ছায়া-ছায়া বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। চোখে জল ছল্‌ছল্‌ করছে। আর রমেশবাবু কিছু না-বোঝা একটি অনুভূতি নিয়ে একবার অমিতের পানে আবার কবিতার পানে চাইছেন।

আবার জোর করে হাসতে চেষ্টা করলো অমিত। তারপর গলা পরিষ্কার করে বললো---ক্ষমা করবেন, আর কোনওদিন আপনার মেয়েকে গান শেখাতে যাবো না।

এবং তার পরেই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অমিত। উৎসব বাড়ীর হট্টগোল তখনও থামে নি। শুধু বহুদিনের পুরোণো স্মৃতির কোলাহল আস্তে আস্তে মুখ থুবড়ে চুপ করে যাচ্ছে অমিতের মনে। চোখে জল এলো অমিতের। তবু একবার তাকালো হাতের দার্জিলিং পাথর-বসানো আংটিটার পানে। আর একবার বাঁ-হাতের কালচে কাটা দাগটার পানে। ওগুলো ঠিক তেমনিই আছে।

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো অমিত। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। কবিতার কোনও স্মৃতি সে রাখবে না। হাতের আংটিটা খুলে ফেললো অমিত। তারপর সামনের লেকের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। টুপ করে একটি শব্দ হল। তারপর আবার নিঝুম।

নিঝুম সামনের গাছপালা! আকাশের কাঁপা-কাঁপা তারা। নিঝুম অমিতের মন। কিন্তু এই কালচে কাটা দাগটা? এটাকে কেমন করে মুছে ফেলবে অমিত? অসহায় কান্নার টুকরো বুক ঠেলে আসতে চাইলো চোখের জল হয়ে। আকাশ কালো। বিশ্ব চরাচর কালো। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

কৃষ্ণপক্ষ। হ্যাঁ, অমিতের মনে হল, ওর হাতের ঐ কালচে দাগটাই তার জীবনের কলঙ্ক হয়ে থাকবে। চির-কালের মত ওর জীবনের আকাশে কৃষ্ণপক্ষ হয়ে।

এভারেস্টে প্রথম বৈমানিক অভিযান

প্রণীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় অব্দ। পুণ্য পবিত্র ভারতভূমির মাথার ওপরে অতন্দ্র প্রহরীর মত গিরিরাজ হিমালয় বর্তমান। তাকে জয় করার যে দুশ্চর সাধনা বহুকাল ধরে রূপ নিয়েছিল, সেই সাধনা পরিপূর্ণ সিদ্ধির মুখ দেখল এই সময়ে—আজ থেকে সতের বছর আগে মানুষের সভ্যতার, মানবসমাজের প্রগতির এ এক অসামান্য অগ্রগতির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

কিন্তু এ ঘটনার প্রায় কুড়ি বছর আগেও মানবশক্তি এ ক্ষেত্রে সাফল্যাই করেছিল এ ধরনের মন্তব্য করলে সে মন্তব্য ভুল বলে প্রতিপন্ন হবে না। সে সময়ে মানুষ বিমানের মাধ্যমে এভারেস্ট শৃঙ্গকে জয় করল—একথা অনায়াসে বলা চলে।

পৃথিবীর মধ্যে হিমালয়ের চেয়ে উচ্চতাসম্পন্ন গিরিশৃঙ্গ আর নেই, এ কাহিনী সর্বজনবিদিত। বিশ্বের সেই সর্বোচ্চ গিরিচূড়ার ওপর দিয়ে মানুষ বিমান চালিয়ে নিয়ে গেল চূড়ান্তভাবে এভারেস্ট বিজয়েরও প্রায় বছর কুড়ি আগে। যুক্তরাজ্যের হাউস্টন এভারেস্ট এক্সপিডিশান এই অভাবনীয় অভিযান চালালেন। এভারেস্টের মাথার ওপর দিয়ে সেই সর্বপ্রথম মনুষ্যচালিত বিমান পাখা মেলে উড়ে চলে গেল।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে, পার্বত্য অঞ্চলের ওপর দিয়ে এর আগে মানুষের বিমান চালনার নজির অনুপস্থিত নয়—সে দিক দিয়ে উল্লিখিত সংস্থার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এক বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এমন কি, এ ঘটনার অল্পকাল পূর্বেও এ জাতীয় পরিকল্পনা চিন্তায় আসে নি।

দু'টি বিরাট ওয়েস্টল্যাণ্ড বিমান, চারজন যাত্রী এবং প্রয়োজনীয় সর্ববিধ উপকরণসামগ্রী নিয়ে তার যাত্রা সুরু করল। দরকারী জিনিসপত্র এবং বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলিও পর্যাপ্ত পরিমাণে সঙ্গে নেওয়া হল, সেদিন ৩রা এপ্রিল ১৯৩৩। যাত্রারম্ভের সময় সকাল আটটা বেজে পঁচিশ মিনিট।

নব্বুই মিনিটে তারা অতিক্রম করে ৬.৬ মাইল। ঊর্ধ্বমার্গে বায়ুর গতি যেন ঘণ্টায় ষাট মাইল অর্থাৎ মিনিটে এক মাইল। সে এক রীতিমত রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চার। প্রতি পদে পদে শিহরণ, রোমাঞ্চের অভূতপূর্ব সমাবেশ। যাত্রাপথ যেন অসংখ্য পরমাশ্চর্যের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। ডাইনে, বাঁয়ে সামনে শুধু অজানা অদেখার সমাবেশ। কত হিমবাহ, তুষারস্তূপ অতিক্রম করে হাজার হাজার ফুট এগিয়ে যেতে থাকে বিমানটি।

অক্সিজেন এ্যাপারেটাস সঙ্গে সঙ্গে দু'প্রস্থ। লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পর বিমান থেকে ছবি তোলা হল—বিশ্ব-মানবের ইতোপূর্বে অদেখা শ্রেষ্ঠতম পর্বতশীর্ষের চেহারা। এই অভিযানের নায়করা সেই অসামান্য বস্তুটি উপহার দিলেন ধরার মানবকে।

এই বিচারে বলা যায় যে, মানুষের দুস্তর দুর্গম পর্বতজয়ের সাধনার ইতিহাসে ১৯৫৩ সাল অবিস্মরণীয় দীপ্তিতে ভাস্বর। ১৯৩৩ সালও সেই বিচারে কোন অংশে কম গৌরবের অধিকারী নয়।

বিমান থেকে গৃহীত এভারেস্টের সর্বপ্রথম আলোকচিত্র

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

নীড় হারা

অর্চনা মিত্র

সতেরোর পাঁচ-এর এক-এর ডি, নম্বরের বাড়ীটা চেনেন? জমীর আলী লেনের খুব সরু গলিটাতে, চুন-বালি খসে-পড়া, ইঁট বার করা লাল মেটে রংয়ের বাড়ীটা। অনেকদিন মেরামত করা হয় নি বোধ হয়। ঐ বাড়ীটার রকে এক কানা বুড়ি থাকে।

হর্তুকীবাগানের কাছে এই গলিটা। বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তিনটে গলি পার হয়ে তবে জমীর আলী লেন।

ঐ বাড়ীটায় থাকে এক হাড়-পাঁজরা বার করা, নুয়ে-পড়া বুড়ী। বসন্ত রোগের প্রকোপে শরীরটা, বিশেষত মুখটা ক্ষত-বিক্ষত দাগে ভর্তি। মিশমিশে আবলুস কাঠের মতো রং তার। ক'গাছা সাদা চুল শনের দড়ির মতো।

সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা বীভৎস চেহারা তার।

বাড়ীর মালিক বুড়িকে দয়া করে তাঁর বাড়ীতে থাকতে দিয়েছেন।

আমার মামারবাড়ীর রাস্তাটা জমীর আলী লেনের সামনে দিয়ে সোজা চলে গেছে। মামারবাড়ী আমি প্রায়ই যাই। সেখানে গানবাজনার আসর জমে প্রায়ই। আমি খুব ভক্ত গান-বাজনার। তাই প্রায়ই যেতে হয় ঐখান দিয়ে। মামারাও আমাকে সঙ্গীতের সমঝদার মনে করে, নিমন্ত্রন করেন।

আমাকে দেখলেই বুড়ী একটা টিনের বাটি আমার দিকে এগিয়ে ধরতো। আমার কাছে যা কিছু খুচরো পয়সা থাকতো, সবটাই দিয়ে দিতাম। বুড়ী আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করত।

তার রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে আমার মনে একরকম বৈরাগ্যভাবের সঞ্চার হতো। কেন যে হতো, তা বলতে পারি না।

তার পূর্ব-জীবনের কথা, সে একরকম জোর করেই আমাকে শুনিয়েছিল। সেই কথাগুলোই গল্পের মতো করে লিখতে চেষ্টা করছি।

তার চোখে, মুখে, দেহে কোথাও অল্প বয়সের, যৌবনের, পূর্ব-রূপ-লাবণ্যের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন ছিল না। পরনে তার শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন। বসনের অপ্রাচুর্যে তার পিঠ, মাথা অনাবৃত থাকতো। ধূলিধূসরিত, জটাযুক্ত মাথার চুলকে কোন এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী সুন্দরীর ঘন কালো কুঞ্চিত কেশদাম ভেবে নিয়ে কল্পনা করা—এক অসম্ভব কাণ্ড।

যৌবনে তার সৌন্দর্য-প্রাচুর্য দিয়ে, টলমলে রসালো দু'খানি ওষ্ঠাধর দিয়ে বহু পুরুষের হৃদয় লালসায় পরিপূর্ণ করেছিল, একথা তাকে দেখে একেবারে ভাবাই যায় না।

তবুও কল্পনা করে নেওয়া যাক—সে এককালে পরমাসুন্দরী ছিল। সুতরাং তাকে এই গল্পের নায়িকা করে নেওয়া হল।

সে অনুরোধ করেছিল-বাবু, আপনি আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন। আমি জানি, আপনি গল্প লেখেন। ঐ যে কম্পাউণ্ডারবাবু আমাকে বলেছেন।

হাতটা প্রসারিত করে বুড়ী 'জগদম্বা ঔষধালয়ের' দিকে দেখালো। ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গেও পরিচয় ছিল। মাঝে-মাঝে ওষুধ নিয়ে যেতাম তাঁর কাছ থেকে। আমার লেখা গল্প কেউ পড়তে চায় না, তাই কম্পাউণ্ডারবাবুকেই পড়তে দিতাম।

—আমার গল্পট লিখবেন তো বাবু? আবার প্রশ্ন করলো ঐ নুয়ে-পড়া বুড়ী। দেখি, যদি লিখতে পারি। বললাম আমি।

গল্পটা বইতে ছাপা হবে তো বাবু? আমার জীবনী। আমার গল্প।

সেকথা ঠিক জানি না। আমি তো আর নিজে ছাপাই না। যিনি সম্পাদক মশাই, তাঁর যদি গল্পটা না পছন্দ হয়, কেন ছাপাবেন তিনি? সম্পাদক মানে বোঝ তো? যিনি বই লেখেন আর কী।

বুড়ি ঘাড় নাড়লো। না বললো, কি হ্যাঁ বললো, ঠিক বুঝতে পারলুম না। বললো---না ছাপা হোক, তবু তো আপনি জানবেন, অন্ন চিরদিনই খারাপ ছিল না, 'পতিত' ছিল না। মানুষ ---ঐ যে ভগবান খারাপ মানুষগুলোকে গড়েছে, তারাই তো আমাকে খারাপ করেছে। বুড়ির চোখটা মিটমিট করছিল।

---মানুষ আমার অনিষ্ট করেছে বাবু। আবার মানুষই আমায় আশ্রয় দিয়েছে। আপনার মতো মানুষরা আমায় পয়সা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। আজ আমি যখন অক্ষম, অসহায়, তখন ভালো মানুষেরা আমায় দেখছে। বুড়ীর খোলা চোখটা দিয়ে জল পড়ছিল। আর একটা চোখ বোজা ছিল।

---ভগবান যে দু'রকমই মানুষ গড়েছে বাবু। ভালো আর মন্দ।

বুঝলাম---বুড়ীর ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আছে এতো দুঃখে-কষ্টেও।

বুড়ীর গল্প শুরু হল—সন্ধ্যার অন্ধকারে। আমি মন দিয়ে শুনতে লাগলাম।

●

---বাবাকে মনে নেই অন্নপূর্ণার। মা মানুষ করেছিল। বাবা রেখে গিয়েছিল পাঁচ বিঘে ধানীজমি, দুটো ঘর, একটা গরু আর নগদ পাঁচশো টাকা। তাই কোন কষ্ট হয় নি ওদের। মা তার নাম রেখেছিল অন্নপূর্ণা।

অন্নর বাবার বন্ধু কয়লাচরণ বোয়াল---অন্নর কয়লাকাকা ওদের সব দেখাশোনা করতো। মা'র অগাধ বিশ্বাস ছিল কয়লাকাকার ওপরে।

অন্নর যখন মোটে সাত বছর বয়স—বিয়ে হয়ে গেলো পাশেরই গ্রামে। কয়লাকাকাই সম্বন্ধ করেছিল। বাবার পাঁচশো টাকা খরচ হয়ে গেলো তার বিয়েতে। একটিই মেয়ে তো। মা'র শখ-সাধ কিছুই পূর্ণ হয় নি। অনেক লোক খাওয়ালো মা। মা'র ছিল রূপোর বিছেহার, বালা, তাগা, মল, সোনার কানের ফুল আর ফাঁদিনথ। সবই মেয়েকে দিয়ে দিলো। মা তো আর পরবে না। বিধবা মানুষ। কয়লাকাকা বারণ করেছিল। মা কিন্তু শোনে নি। কলকাতা থেকে মিষ্টি আনিয়ে তত্ত্ব করতো মা।

তাই প্রথম দিকে অন্নর শাশুড়ী খুব খুশি ছিল। তত্ত্ব-তালাস আসতো খুব বেয়াইবাড়ী থেকে। বিয়ের সময়ও যথেষ্ট দিয়েছিল। কলকাতার, অন্নর মা'র কে এক মাসী থাকে—সে ক'খানা শাড়ি কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিল। মা অবশ্য টাকা পাঠিয়েছিল। জামাইকে সোনার আংটি, সোনার বোতাম, ধুতি-চাদর, পাঞ্জাবী, বিদ্যাসাগরী চটি সবই দিয়েছিল। কলকাতা থেকে আনিয়ে ছানার মিষ্টি, চিনির মঠ, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীর, কাঁসা-পেতলের বাসন, তুলোর বিছানা-বালিশ, নারকেলের

বিতানীর বিপণিতে দুর্মূল্য শিল্পসম্ভারের এক মনোরম প্রদর্শনী

মিষ্টি, মোয়া আরো কতো কি কুশেশ্যের তত্ত্বতে দিয়েছিল। কয়লাকাকা কলকাতা থেকে সবই নিজে গিয়ে এনেছিল। মা খুব শৌখিন ছিল যে।

অন্নর বরের মুখটা মনে পড়ে মাঝে-মাঝে। কতোদিন হল মরে গেছে সে। লম্বাটে ফর্সা মানুষটা। তাকে খুব ভালোবাসতো।

মা যখন তত্ত্ব-তালাস বন্ধ করলো, অন্নর শাশুড়ী খুব রেখে গেলো। খুব শোনাতো কথা অন্নকে। মাঝে- মাঝে দু'চার ঘা পিটেও দিতো, ঘর-কন্নার কাজে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে। শাশুড়ী খাওয়া বন্ধ করে দিতো তার।

অন্ন, পুকুর পাড়ে, বসে কাঁদতো। অন্নর বর চুপি চুপি, আমটা, জামটা নিয়ে এসে অন্নর হাতে দিতো। ফিসফিস করে বলতো আমি বড় হয়ে, যখন রোজগার করবো, তোকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবো। আর এদের কাছে থাকবো না। এরা তোকে বড় কষ্ট দেয়।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো অন্ন বরের দিকে।

মানুষটার শখ-সাধ কিছুই মিটলো না। কলেরা রোগ হল সকালে। পরের দিন চলে গেলো। আর চোখ চাইলো না।

অন্ন, প্রথমটা বুঝতে পারে নি। তারপরে বুঝলো---তার কপাল ভেঙেছে। বরের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে বাসা বাঁধা তার হল না।

কতোই বা তখন বয়স অন্নর? চোদ্দ বছর হয়তো। তখনই সব শেষ। যে মানুষটা তাকে অতো ভালবাসতো, তার বয়স কতো? আঠারো বোধ হয়।

অন্ন ভেবে পায় না, কী করে জলজ্যান্ত মানুষটাকে সে নিজে পেটে পুরে ফেললো? শাশুড়ী যে প্রায়ই বলে তাকে---সোয়ামীখাকী, রাক্ষুসী, কালামুখী, ডাকিনী। সোয়ামীকে খেয়ে ফেললে---আরো কতো কী।

এই ধরনের মধুর সম্ভাষণে, অন্ন ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। তবে শাশুড়ী যখন খুব মারধোর করতো তখন শুধু সে অসহ্য বোধ করতো। তবে, মুখে সে কথা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। চুপচাপ সবকিছু সহ্য করতে হতো।

গ্রামে একটা কুৎসা রটেছিল। কয়লাকাকার সঙ্গে অন্নর মা'র অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মা 'পতিত' হয়েছে। কয়লাকাকার স্ত্রী মারা যাবার পরে এই ধরনের গুজব উঠলো। অন্নর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামেও একথাটা প্রচার হয়ে গেল।

অন্নর শাশুড়ী তো জ্বলন্ত কয়লার মতোই রেগে উঠলো। হাতের কাছে অন্নর মাকে না পেয়ে, অন্নকেই গালাগালি শুরু করলো।

অন্নর কিন্তু বিশ্বাস হয় না। এ কী সম্ভব? মা কী এমন? না। পাড়ার ফুলেশ্বরী মাসী, বগলা খুড়ি, বিধবা -বামুন পিসী, নেত্যকালী ঠাকরুন সকলেই দলে-দলে এসে, অন্নকে জানিয়ে গেলো অন্নর মা কুলত্যাগিনী গণিকা, কুলটা। আর অন্ন তারই ভাগ্যহীনা মেয়ে। যার মা এরকম, তার মেয়ে আর কতো ভালো হবে?

অন্ন আর কতো কাঁদবে? পাড়াতুতো মাসী, পিসী, আত্মীয়-স্বজনের দল কিছুতেই বুঝলো না---অন্ন পতিহীনা, ভাগ্যহীনা দুঃখিনী, দোষ-শূন্যা বালিকামাত্র। যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলেই তার মা'র নামে যাতা বলে, অন্নকে দেখলে কটু কথা বলে। অন্ন শুধু কাঁদে আর কাঁদে।

অন্নর বাপেরবাড়ী যাওয়া নিষেধ। মাও ডাকে না। অন্নর ইচ্ছে হয়---মা'র কাছে যেতে। মুখ ফুটে বলতে পারে না।

একদিন অন্নর বকাটে দেওর খবর আনলো অন্নর মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। গ্রামের কেউ তাকে ছোঁবে না। কয়লাচরণ বোয়ালও আসে নি।

এবার অন্ন রান্নাঘরের দোরে আছড়ে পড়লো। শুধু কান্না ছাড়া আর তার কোন গতি নেই। সে তো আর বলতে পারবে না মরা মাকে দেখতে যাবো।

শাশুড়ী বললো---মুখে আগুন। আদিখ্যেতা দেখো। অমন পাপিষ্ঠা মা'র জন্যে কেউ আবার কাঁদে? যে মা পেটের মেয়ের কথা ভাবলো না।

পাড়ার বামী, শামী, কালীদাসী, ক্ষ্যান্তমণি, সকলে এসে পড়লো অন্নদের বাড়ীতে। সারাদিন ধরে শুধু গুলতানি। শুধু অন্নর মা'র কথা বলছে তারা।

শেষ পর্যন্ত সব মহিলারা 'মিটিং' করে স্থির করলো---অন্নর মা'র মতো এমন বেহায়া মেয়েমানুষ, নির্লজ্জ, কলঙ্কিনী আর কেউ নেই পৃথিবীতে। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছিল---না হলে আত্মহত্যা করলো কেন? বিধবাদের যা হওয়া কলঙ্ক, নিশ্চয়ই তাই হয়েছিল।

না জেনে, না দেখে এতো বড় কলঙ্কটা আরোপ করতে গ্রাম্য মহিলাদের এতোটুকুও দ্বিধা হল না।

কী যে হল অন্ন জানতেও পারলো না, বুঝতে পারলো না। মাকে শেষ দেখাও দেখা হল না। মা সব সম্পত্তি নাকি কয়লাকাকার কাছে বাঁধা দিয়ে গেছে।

কালের গতি গড়িয়ে চললো। ভোর হওয়ার আগে থেকে উঠতে হয় অন্নকে। শাশুড়ী ওঠবার আগে চান করে, শাশুড়ীর পূজোর ঘরে, পূজোর সব সামগ্রী সাজিয়ে রাখতে হয়। ত্রুটি হলেই বকুনী। যদি বেলপাতায় কাঁটা একটি থেকে যায় অথবা দূর্বার শিষটি ঠিকমতো বাছা না হয়---শাশুড়ী বকে। শাশুড়ী বেলায় ঘুম থেকে উঠে চান করে। বয়স হয়েছে, কাজ করতে পারে না।

অন্ন তারপর পুকুর থেকে জল তুলে বাড়ীর ভেতরে এনে দেয়। তোলা জলে স্নান করে শাশুড়ী। পুকুরে চান করতে যায় না। শাশুড়ীর চান হলে পূজোর ঘরে শাশুড়ী ঢুকে যায়। সেখান থেকে ফরমাস করে একশোটা।

[ক্রমশ।

★ কবির স্মৃতিতে ★

কমলা দাস

রাইন নদীর তীরবর্তী ডুসেলডর্ফের যে বস্ত্রব্যবসায়ীর পুত্রটি একদিন নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন--আমি ডুসেলডর্ফের ছেলে। তবে, আমি স্থির নিশ্চিত যে, আমার মৃত্যুর পর এর আশপাশের অন্তত সাতটি অঞ্চল আমার জন্মভূমি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আপন আপন গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হবে---সেই কালজয়ী কবির নাম হাইনরিখ হাইনে।

লিরিকের ক্ষেত্রে আইনশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধিধারী হাইনের অবদান এককথায় অতুলনীয়। তাঁর কন্দর্পতুল্য আকৃতি এবং লালিত্যসমৃদ্ধ, ঝঙ্কারবহুল লাবণ্যবর্ষী রচনা তাঁকে এককথায় এক মূর্তিমন্ত বিস্ময়ে পরিণতি দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর শতবার্ষিকীও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় চোদ্দ বছর আগে। কবির জন্মস্থান ডুসেলডর্ফের বুকের ওপর আজ শোভা পাচ্ছে তাঁর স্মৃতিমন্দির। উপরি উদ্ধৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে কবির ভবিষ্যদ্বাণী কতদূর সত্যে পরিণত হয়েছিল, সে সংবাদ আমাদের জানা নেই, তবে, ডুসেলডর্ফ তার দিগ্বিজয়ী সন্তানকে বঞ্চিত করতে পারে নি। ডুসেলডর্ফ তার দিগ্বিজয়ী সন্তানের পবিত্র স্মৃতি সগৌরবে বক্ষে ধারণ করে রেখেছে, যা তার বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। হাইনের এই স্মৃতিতীর্থটি নিয়মিতভাবে কাছের ও দূরের পর্যটকদের তার পবিত্র প্রাঙ্গণে সমবেত করে তোলে।

এই ভবনের অভ্যন্তরে কবির লেখার টেবিলে স্তূপীকৃত রাশি রাশি বই, পত্র-পত্রিকা, পাণ্ডুলিপি থরে থরে সংরক্ষিত আছে। হাইনের সামগ্রিক রচনাবলী সতেরটি খণ্ডে প্রকাশ করার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তৎসংক্রান্ত কাগজপত্রাদি এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। এরপর আসছে কবির গ্রন্থাগার। সেখানে কবির যা-কিছু লেখা, প্রত্যেকটি সংরক্ষিত আছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সাঁইত্রিশটি ভাষায় কবির যে সকল রচনা অনূদিত হয়েছে, তাদেরও একটি সংগ্রহ গ্রন্থাগারটির এক প্রধান আকর্ষণ। প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে কবির চিত্রাদি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদির, পাণ্ডুলিপিসমূহের, পত্রাবলীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। কবির জনক-জননীর প্রতিকৃতি তৎসহ বিভিন্ন শিল্পীদের আঁকা কবির প্রতিকৃতি এবং ১৯০৬ সালে সেমেডিং নির্মিত কবির একটি আবক্ষমূর্তি এখানে শোভা পাচ্ছে। এই সংগ্রহশালায় আছে তিন হাজার চারশ' ছেষট্টিটি পাণ্ডুলিপি, যার মধ্যে এক হাজার আটানব্বইটি কবির স্বহস্তে লিখিত। অন্যগুলিও কবির স্বহস্তে সংশোধিত। হাইনের ব্যক্তিগত একশ' পাঁচখানি পত্র ও তাঁকে লেখা অন্যের সাতশ' বিরাশিখানি পত্রের সমাবেশ সংগ্রহশালার মূল্যবৃদ্ধি করছে।

হাইনে সংগ্রহশালার পরিকল্পনা প্রথম রূপপরিগ্রহ করে ১৮৮৭ সালে। এই বিষয়ে আর্থিক সাহায্যের পরিপূর্ণ আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিশ্বরী হিসাবে সেদিন যিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, অস্ট্রিয়ার সেই সমাজ্ঞী এলিজাবেথ। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে এলিজাবেথকে এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হয়। এলিজাবেথ ব্যক্তিগতভাবেও ছিলেন কবির এক বিশেষ অনুরাগিণী। জার্মানীর শেষ সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম কবির স্মৃতি সংরক্ষণে যথেষ্ট আন্তরিকতা এবং সবিশেষ আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯০৪ সাল থেকে স্মৃতিমন্দির গড়ে উঠতে থাকে।

কবির জন্মভূমি ছাড়া আরও একটি মহানগরীতেও হাইনেকেন্দ্রিক সংগ্রহশালা দেখতে পাওয়া যাবে। সে মহানগরী ফ্রান্সের রাজধানী, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী—অতুলনীয় শোভা-সম্পদের অধীশ্বরী প্যারিস। প্যারিসে হাইনে সম্পর্কিত সংগ্রহশালা দর্শনও রসিক-সমাজের আনন্দ যথেষ্ট পরিমাণে বিবর্ধিত করার ক্ষমতা রাখে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

একদিন যিনি ছিলেন বাঙালী ও বাংলা সমাজের প্রতিনিধি কবি---তাঁর মৃত্যুর মাত্র সত বছর পরেই, সবাই তাঁকে ভুলে যাচ্ছে দেখে, কবি মধুসূদন আক্ষেপ করে বলেছিলেন ---

'আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি, নানা খেলা, খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপ গ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা?'

শুধু মধুসূদনই আক্ষেপ করেন নি ---ঈশ্বর গুপ্তের জীবন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে, তাঁর কাব্য-সংকলনের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রও লিখেছেন, "বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন আমরা আর সে ঋণ শোধের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন।"

বঙ্কিমের যুগের পাঠকসমাজ যেটুকু তাঁকে মনে রেখেছিলেন, আজকের দিনের সাধারণ পাঠকরা সেটুকুও ভুলেছে। যদিও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কেউ কুণ্ঠিত হয় নি। তবে সেই মর্যাদাটুকুর ভিত্তি কোথায়, সেটা ভেবে দেখতে গেলে অনেকেই বলবেন যে, ঠিক কবি হিসেবে নয়, সাংবাদিক ও সাহিত্যগুরু হিসেবে তিনি ঐ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' সেযুগে সাময়িক পত্রিকার আসরে আসরে আলোড়ন জাগিয়েছিল এবং শিক্ষিত সমাজেও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষালাভের সুযোগ না পেয়েও, শুধুমাত্র তীক্ষ্ণ বাস্তব ও ব্যবহারিক বুদ্ধির বলে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন বিদগ্ধ সমাজে। এই পত্রিকাটি শুধু যে বাংলা ও বাঙালী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে স্মরণীয় যে, দেশীয় ব্যক্তির চেষ্টায় প্রকাশিত প্রথম প্রত্যাহিক সংবাদপত্রের মর্যাদাও 'সংবাদ প্রভাকর'-এরই প্রাপ্য।

এছাড়া সাহিত্য-গুরুরূপে তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধির কারণ হল, যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'দিকপাল' বলে গণ্য হয়েছেন,

মঞ্জুশ্রী সিংহ

তাঁরা অনেকেই ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁর গভীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভে ধন্য হন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল ও অক্ষয় কুমারের নাম করা যেতে পারে বিশেষভাবে।

অনেকের মতে, ঈশ্বর গুপ্ত কবি-মর্যাদা যেটুকু পেয়েছেন, তা কেবলমাত্র 'যুগসন্ধিকালের কবি' ব'লেই। কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে যে যুগ শেষ হ'য়ে গেল, আর যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করলেন কবি মধুসূদন, সেই দুই যুগের সংযোগ-সাধন করলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর কাব্য-কাননের একদিক বিগত যুগের অস্তরাগে রঞ্জিত, অপরদিক ঊনিশ শতকীয় ভাবধারায় উদ্ভাসিত। তাঁর এই মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে তখনই, যখন দেখি অন্তরের গভীর সহানুভূতি ও উৎসাহ নিয়ে তিনি সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের লুপ্তপ্রায় কবিতা ও কবি-জীবনী ---যা পরবর্তীকালে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপযোগী অনেক উপকরণ যুগিয়েছে; আবার নবীন লেখকদের প্রেরণা দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি।

উচ্চ কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না তিনি, এ কথা সত্য। কিন্তু মানুষ ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝতে হলে তাঁর কবিতার মধ্যেই খুঁজতে হবে তাঁকে---অন্যান্য কীর্তির মধ্যে সে পরিচয় পাওয়া যাবে না। তাঁর অকপট মনের যথার্থ পরিচয় নিহিত রয়েছে ঐ সহজ-সরল, নাতিবৃহৎ, মিঠেকড়া, লঘু ও চটুল সুরের বস্তুধর্মী কবিতাবলীর মধ্যেই। সেখানে যে বিশেষ মনোভাব বা মনোধর্ম প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছেন, তিনি 'খাঁটি বাঙালী কবি।'

বর্তমানের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের কালের, সময়ের ব্যবধানটাই বড় কথা নয়; আধুনিক রুচি ও রসের সঙ্গে তার বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই অবসর সময়ে যখন আমরা কবিতা পড়ার জন্যই কবিতা পড়ি, তখন হয়তো কেউই আমরা ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সংগ্রহ হাতে নিই না। তাই ব'লে উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর কবিতা পড়তে গেলে বোঝা যাবে না তাঁকে; দরদী মন নিয়ে জানতে গেলেই জানা যাবে।

দেশ, কাল, পরিবেশ সব সময়েই মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কবি জন্মেছিলেন কলকাতার কাছেই কাঁচরাপাড়া গ্রামে---১৮১২ খৃস্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে (১২১৮ বঙ্গাব্দ, ২৫শে ফাল্গুন)। সহজাত কবি-প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন তিনি। তাই মাত্র তিন বছর বয়সে যখন কলকাতায় এলেন, তখন মুখের ভাষাই রূপ নিল কবিতায়। বলে উঠলেন---

'রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

তাঁর জীবনের পরিধি মাত্র

পাঁচচল্লিশ বছর। খুব যে সুখে অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর জীবন, তা নয়। শৈশবেই হারালেন তিনি মাকে, মাত্র দশ বছর বয়সে। তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন জীবন সম্পর্কে। আবার যৌবনে স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সাহচর্যলাভের সুযোগও তাঁর ঘটে নি বিশেষ কারণে। কাজেই স্বাভাবিক স্নেহ-প্রেমের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। এর জন্যে তাঁর মনে যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ছিল, তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ভিন্নরূপে। রঙ্গ ব্যঙ্গপ্রবণ কবির দৃষ্টি হয়ে উঠল তির্যক। তাঁর ব্যক্তিজীবনেই রয়েছে এর উৎস।

তাঁর রচিত প্রেমের কবিতাগুলি পড়লে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছিলেন, তা সত্য ---"যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে" ---তার পরিচয় এতে আছে।

"গুপ্ত প্রেম গুপ্ত থাক
ফুটিবে না আর---
রহিল মনের খেদ মনেই আমার ।।"
(নায়কের উত্তর)

কিন্তু আবার এর মধ্যে কৃত্রিমতাও প্রকাশ পেয়েছে। যখন শুনি---

"পান-খয়ের প্রায়---তোমায় আমায়।"
(মান-ভঞ্জন)

তখন বৈষ্ণব সাহিত্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনধর্মী প্রেম কবিতার পাশে, এই জাতীয় গদ্যধর্মী ভাব ও ভাষা অসহ্য মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিতার মধ্যে দেখেছেন "অনেকটাই ইয়ারকি।" এমন কি, 'ইয়ারকি' করার স্পৃহাটি দমন করতে না পেরে ভগবানকেও 'হাবা আত্মারাম' বলে সম্বোধন করতেও দ্বিধা করেন নি তাঁর 'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতায়।

পরিমার্জিত রুচির অভাব যত্রতত্র চোখে পড়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্যে। যেমন---ইংরেজ শাসনের যুগে পাশ্চাত্য দেশীয় মহিলাদের অহরহই দেখা যেত। অনেকে তাঁদের সুনজরে না দেখলেও, কোন রুচিশীল ব্যক্তি কি অত সহজে বলে উঠতেন---

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।'
(ইংরেজী নববর্ষ)

এখানে যুগরুচির প্রভাব নিশ্চয়ই কিছুটা আছে, আর সেই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার অভাবও কিছু পরিমাণে দায়ী। যথারীতি শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের সুযোগ তাঁর জীবনে বিশেষ ঘটে নি---কি সংস্কৃত, কি ইংরেজী শিক্ষা। নিজের চেষ্টাতেই কিছু কিছু শিখেছিলেন, তার ওপরে ছিল তাঁর সহজ বুদ্ধি ও প্রখর বাস্তব জ্ঞান।

বাংলা দেশের স্বরূপটি আবিষ্কার করেছিলেন, পরিহাস রসিক কবি---

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"
(পৌষ পার্বণ)

সে যুগের আর পাঁচজন বাঙালীর মতো---তিনিও ছিলেন ভোজনবিলাসী তাই পাঁঠা দেখেই মনে হয়েছে---

'রসময় রসভরা রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল ।।'
(পাঁঠা)

কবি জোর গলায় আমিষভোজীদের পক্ষ সমর্থন করেছেন, বিশেষত মাংস ভোজী যারা---

'যে নর না মাংস খায় পেয়ে কলেবর।
বৃথায় শরীর তার বৃথায় উদর ।।
(হেমন্তে বিবিধ খাদ্য)

তপ্‌সে মাছ দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না---

'প্রাণে নাহি দেরী সহে কাঁটা আঁশ বাছা।
ইচ্ছে করে একেবারে গালে দিই কাঁচা ।।
(এণ্ডা ওয়ালা তপ্‌স্যা মাছ)

আনারস সম্পর্কেও কবির মনে যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। তাই কামনা করেছেন তিনি---

'অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো মরণের কালে ।।
(আনারস)

ইওরোপীয় তরুণীরা এক ধরনের প্লাস্টিক ব্রাশ দিয়ে তাঁদের চরণযুগল-এর সবিশেষ যত্ন নেন। কয়েকজন তরুণীকে তাঁদের পা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে দেখা যাচ্ছে।

খাদ্য সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যাই থাক না কেন, তবে কাঁটা ছুরি নিয়ে পাশ্চাত্য রীতিতে খাওয়া-দাওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না মোটেই। এটি যেন বিড়ম্বনার বিষয় বলেই মনে হয়েছে তাঁর কাছে। অকপটে তাই বলেছেন---

'কাঁটা চুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা॥'
(ইংরেজী নববর্ষ)

বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যেও পাওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়েও কাব্য রচনা করেছেন অথবা নিতান্ত নগণ্য ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকে নিয়ে যত অজস্র খণ্ড কবিতা রচনা করেছেন---এমনটি ঠিক আগে দেখা যায় নি। এখানে বাঙালী ঘরের অন্তরঙ্গ চিত্র যেমন আছে, তেমনি বাঙালীর পছন্দ-অপছন্দ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের হাওয়া লেগে বাংলা দেশের মানুষের মনে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগ জেগে উঠল, তার পরিচয় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যে একেবারেই নেই তা নয়। যেমন, স্বদেশ-প্রেম বা জাতীয় চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। তিনি দেশকে যে ভালবেসেছিলেন, এটা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তার ব্যক্ত হয়েছে, উৎকট বিদ্রূপের আকারে---

'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।' (স্বদেশ)

এখানেও সেই সূক্ষ্মরুচির প্রশ্ন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

★ মৃত্যুমুখে সেই দিন ক'টির ডায়রি ★

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তী

রাস্তাঘাট সব ভেসে গেছে। আমাদের এগোবার কোন পথ নেই। আস্তে আস্তে শুকিয়ে-ওঠা মুখে আমরা চাইলাম পরস্পরের দিকে। স্তব্ধ, ভাষাহীন।

ছেলেরা নেমে এল শুকনো মুখে। কোন হোটেলে ব্যবস্থা করতে হবে এবার। করতে তো হবে কিন্তু জায়গা কই? বিভিন্ন বেশে বিভিন্ন দেশে যেন গোটা হিন্দুস্থানটাই নেমে এসেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বেচারা শহরটার ওপর। কিন্তু উপায় তো একটা করতেই হবে।

শ্রীমিত্রদের কথা

অনেক কষ্ট আর খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছন গেল একটা হোটেলে। বন্যায় জলঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ক্ষতি হয়েছে। ক'দিন ধরেই তাই শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। বিদ্যুৎ নেই, তাই কলে জল নেই। ঘরে আলো নেই। পাখা নেই। আছে শুধু মানুষের ভিড়। ঘরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, নিচে খাবার ঘরে শুধু মানুষ আর মানুষ। এতদিন পথে-বিপথে বন্দী থেকে আজ সাধারণ মানুষের জন্যে পথ খোলামাত্র সবটুকু বিপদ দুর্ভোগের ঝুঁকি নিয়েই পথে নেমে পড়েছে সকলে। শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠায় গোটা পথটা পেরিয়ে এখন অপেক্ষা করছে সরকারী বেসরকারী যে কোন প্লেনে আসন পাবার অপেক্ষায় সমান শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠায়। ক্লান্ত, বিচলিত, বিধ্বস্ত প্রতিটি মুখ। বহু মৃত্যু আর ধ্বংস পার হয়ে এসে ঘরে ফেরবার আগ্রহে উন্মুখ।

যাচ্ছিলাম নিচে খাবার ঘরে। পাশের টেবিলে কে যেন হাসলেন মিষ্টি করে। থমকালাম। চমকালাম। তারপরে প্রায় চীৎকার করে উঠলাম অকুণ্ঠ উল্লাসে। শ্রীমতী মিত্র। পাশে শ্রীমিত্র আর পুত্র সোমনাথ। যাক বেঁচে আছেন তাহলে? (তিনধরিয়ার স্টেশন-মাস্টার মশাই-এর টেলিগ্রামে রেল লাইন সুদ্ধু ট্রেন খাদে পড়ে গেছে খবর পাবার পর আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষজন সব সেই ট্রেনের সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ইত্যাদি গুজব শোনার পর এই দেখা) প্রথম দর্শনমাত্র যে কয়টি কথা মুখে এসেছিল ঠোঁটের ওপর জিভ দিয়ে ফেরৎ পাঠালাম তাদের সকলকে।

"ভাল আছেন?" প্রশ্নটা সশব্দে বাজল নিজেরই কানে। মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন শ্রীমতী। আরও কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হলাম। ওঁর চোখের তারায় কাঁপছে তখনও নিঃশব্দ কান্নার সমুদ্র। নিঃশব্দ শ্রীমিত্র। কিছুটা বুঝি আত্মস্থ। পরে শুনলাম ওঁদের কাহিনী।

সেদিন প্রলয়ে দার্জিলিং যখন ভেঙে পড়ছিল তখনও অতটা ব্যস্ত হতে হয় নি ওঁদের। ফেরার টিকিট কাটা আছে আগেই। জিপ আর ল্যাণ্ড-রোভারের খোঁজে ভিজে কাক হয়ে দৌড়দৌড়ি করতে হল না আমাদের মতন। এখন কোন রকমে জিনিসপত্র নিয়ে ঠিক সময় ট্রেনে উঠতে পারলেই হয়। "কি ভাগ্যবান" ভেবেছি সেদিন ওঁদের সেই নিশ্চিন্ত আরাম দেখে।

বেলা সাড়ে তিনটেয় ট্রেন। দু'টোয় সময় তৈরি হয়ে নিলেন ওঁরা। বাক্স বিছানা তৈরি। হঠাৎ খবর এল ট্রেন চলবে না। পাহাড়ে ধস নামা সুরু হয়ে গেছে। এখন এই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেবেন না রেল কোম্পানী।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ওঁরা। তবে? এদিকে বৃষ্টি পড়ে চলেছে অঝোরে ক'দিন ধরে। অসহ্য লাগছে এই বন্দীদশা। নতুন কিছু খবরের আশায় ছুটোছুটি করতে লাগলেন আবার। ঘড়িতে তখন তিনটে বাজে প্রায়। হঠাৎ আবার খবর এল ট্রেন চলছে। প্রচণ্ড খুশিতে দৌড়লেন ওঁরা। তিল-ধারণের জায়গা নেই কোন কামরায়।

কোন শ্রেণী বিচারের বালাই নেই। অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় নিজেদের নির্দিষ্ট কামরায় উঠলেন ওঁরা। ঠিক ছাড়ে তিনটেয় গাড়ি গতি নিল।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝ'রে চলেছে, সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের মাতন। জানলা-দরজার সব শাসি কপাট টেনে বসেছেন ওঁরা। বাইরে শুধু ধোঁওয়া ওঠা অন্ধকার। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা প্রচণ্ড আক্রোশে আছড়ে আছড়ে পড়ছে শাসির বন্ধ কাচে। রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ওঁরা চেয়ে আছেন বাইরের পথে।

কতক্ষণ চলেছেন ওঁদের মনে নেই। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে তোলপাড় হল সমস্ত গাড়িটা। থেমে গেল সেই মুহূর্তে। আর তারপর মুহূর্তের পর মুহূর্ত জমা হয়ে প্রহরে পৌঁছল। একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন ওরা। আস্তে আস্তে বিচলিত হলেন, অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন সকলে। কাটল আরও কিছুটা উৎকণ্ঠ সময়। তেমনি থেমে রইল গাড়ি। যেন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাতে গতিরুদ্ধ হয়ে গেছে মস্ত বড় একটা যন্ত্র-দানবের।

নামলেন ওরা। বাইরে তখন চলেছে প্রলয়। বৃষ্টির আঘাতে ঝড়ের মাতনে চোখ চাওয়া যায় না। সোজা দাঁড়ান আরও অসম্ভব। হঠাৎ অস্ফুট একটা চীৎকারে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল একজন। চমকালেন সকলে। ভীত-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মাথার ওপর চেয়ে আছে ছেলেটি। ভয়ে বিস্ময়ে শিলীভূত হয়ে দেখলেন ওঁরা ওপরে পাহাড়ের গায় আস্তে আস্তে যেন মুখ-ব্যাদান করছে মস্ত বড় এক রাক্ষুসী। দড়ছে। কাঁপছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ফাটল ধরে যাচ্ছে যেন গোটা পাহাড়টার বুকে। মুহূর্তে এই ফাটল ধসে পড়বে ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে থাকা ইঞ্জিনটার ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তে অতি সহজেই গোটা গাড়িটা উল্টে পড়বে পাশে হাজার হাজার ফুট গভীর খাদে।

দৌড়ে গেলেন ওঁরা ড্রাইভারের কাছে। আঙুল তুলে দেখালেন ওঁকে সেই মরণ যজ্ঞের সূচনা। কিন্তু ভয়-লেশহীন শান্ত মুখে চেয়ে আছে পাহাড়ী ড্রাইভার। দেখেছে সে। কিন্তু গার্ড সাহেবের কাছ থেকে অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত গাড়ি এক চুলও সরাবে না সে। সরাতে পারবে না। গার্ড সাহেব যদিও আছেন বহুদূর পথে ফেলে-আসা শেষ অংশের গাড়িতে। সর্বনাশ। এতগুলো মানুষের জীবন যেন থেমে আছে নিশ্চিতপ্রায় এগিয়ে আসা একটা মৃত্যুর মুখে। অনুনয় করলেন শ্রীমিত্র। হাতজোড় করলেন। পায়ে ধরলেন। না। পাষাণ গলল না। নিষ্ঠুর মরণ যেন নিশ্চিত বিশ্বাসে কঠিন মুখে দাঁড়িয়েছে বুদ্ধিহীন একটা জিদের রূপ নিয়ে। পাষাণ গলল না তাই কিছুতেই।

দৌড়ে ফিরে এলেন ওঁরা আবার। "নেমে পড়ুন সকলে যেমন আছেন।" সৈনাধ্যক্ষের কঠিনতায় আদেশ করলেন শ্রীমিত্র। ওপরে তখন সুরু হয়ে গেছে ভাঙন। পায়ের তলার মাটিও বুঝি কাঁপছে---দুলছে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে। এই বীভৎস এই ভয়ঙ্কর এই অস্বাভাবিকতা থেকে পালাতেই হবে। এক্ষুণি। যেমন করেই হোক। দুমদুম করে বুকের মধ্যে পড়ছে বুঝি একশ' হাতুড়ির ঘা। দাঁতে দাঁত-লাগা উত্তেজনায় ঠকঠকিয়ে কাঁপছে সমস্ত শরীর। দূরে কোথায় যেন একটা আলো জ্বলছে। পাগলের মতন ছুটলেন ওঁরা সেদিকে। আলো নয় হয়ত আলেয়া সে। তবু একটা আশ্রয় তো পেতেই হবে?

প্রচণ্ড ভয় আর হাড়কাঁপান শীতে সপসপে ভিজে চীৎকার করে কাঁদতে সুরু করেছে বাচ্চাগুলো। ভিজে টপটপ করে জল ঝরছে ওদের মায়েদেরও মাথা মুখ গড়িয়ে। অবশ হয়ে আছে হাত দুটো সেই ভিজে অসাড় করা কনকনে শীতে। বাচ্চাগুলোকেও সেই অবশ হাতে বুঝি আর বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না বুকে।

আলোর পথে ছুটলেন ওঁরা। একটি বিদ্যায়তন। ম্যালেসিয়ান কলেজ। আশ্রয় তাহলে একটা পাওয়া গেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন মেয়েদের কেউ। জীবনের শেষ আশাটুকুও শেষ হচ্ছে যাওয়া দম-বন্ধ করা অসহ্য উত্তেজনার পর এই সামান্য একটু আশার আশ্বাসেই ভেঙে পড়ল বুঝি এতক্ষণের টানটান হয়ে থাকা শিরা-উপশিরা।

দরজায় ধাক্কা দিলেন ওঁরা। বেরিয়ে এলেন শাদা পোষাকে সুন্দর একজন ফাদার। এক মুহূর্ত শুনলেন এই বিভীষিকার ঘটনা। আর পরমুহূর্তেই ছুটে এলেন গভীর মমতায় মাখা সাহায্যের হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে। ছুটে এল ছাত্রের দল। সব বুঝি আবার রক্ষা পেল। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল শ্রীমিত্রের তখনও অনেকে নামে নি তো গাড়ি থেকে? হয়ত ভয়। না হলে আরও নতুন কোন অজানা বিপদের আশঙ্কায় সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে ছুটলেন ওঁরা আবার পেছনে। সেখানে তখন প্রাণপণ বেগে সুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড ধ্বংসের মাতন। মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করা শব্দে আস্ত এক-একটা পৃথিবীর বুঝি গড়িয়ে পড়ছে নিচে কোন অন্ধকারের অতল গহ্বরে। আর সেই প্রলয়ের অন্ধকারে ছিটকে ছিটকে পড়ছে কাদা পাথর আর শিকড় সুদ্ধ উপড়োন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ মাটি আরনুড়ি। আর সেই সর্বনাশা মৃত্যুর মধ্যে বাইরে আসার আকুল চেষ্টায় দিশেহারা চীৎকার করছেন গাড়ির কামরায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়জন।

ভাববার সময় নেই। দাঁড়াবার উপায় নেই। মুহূর্তের বিলম্বে এই আকুলস্বরেই আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে দিয়ে চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এতক্ষণ এক সঙ্গে থাকা এতগুলো মানুষ। নিজেরই অজান্তে কখন সেই গাড়ির মধ্যে উঠে পড়েছেন শ্রীমিত্র। দু'হাতের সবটুকু শক্তি দিয়ে টেনে ধরেছেন দরজার হাতল। সকলে, শেষ প্রাণীটি পর্যন্ত নেমে এসেছে সেই সাহায্যে আর সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে নেমে এসেছে বুঝি গোটা ব্রহ্মাণ্ডটা। আর কিছু দেখতে পান নি। আর কিছু বুঝতে পারেন নি। শুধু রসাতলের

অন্ধকারে ডুবে গেছে সব কিছু। কিসের ঘন আঘাতের পর আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে বুঝি সমস্ত শরীরটা। ছুরির মতো ধারালো নুড়ি আর পাথরের অবিশ্রাম বৃষ্টিতে অন্ধ চোখে খুঁজে পেলেন না বাইরে বেরোবার দরজাটা কিছুতেই।

"আলোটা কেন জ্বেলে দিলে না এখনও ?" ম্লান হয়ে প্রশ্ন করলেন প্রথম।

"আলো ? আলো তো জ্বালাই আছে ?" বুক কাঁপান আতঙ্কে নীল হয়ে যাওয়া মুখে চাইলেন শ্রীমতী মিত্র ফাদারের দিকে। দাঁত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরলেন থরথর করে কেঁপে ওঠা কান্নাভাঙা ঠোঁট দুটো। চিন্তার সেই ভাষা যেন কোন রকমেই উচ্চারিত না হয় মুখের একটি কথাতেও।

"না। আলো জ্বালা হচ্ছে না।" গলার স্বর একটুও কাঁপল না। মাথার কাছে তেমনি স্থির অচঞ্চল ভাবে বসে বললেন শান্ত স্বরে। "এখানে আরও অনেকে অসুস্থ আছেন। আলো জ্বাললে ওঁদের অসুবিধে হবে।"

"ও, আচ্ছা থাক তাহলে। কিন্তু তুমিও কখন থেকে এই অন্ধকারে বসে আছ কেন ?"

"না। আমি তো অন্ধকারে নেই। আলোর মধ্যে কাজ করছি।" তেমনি স্থির অচঞ্চল স্বরে কতকগুলো শব্দ যেন ছড়িয়ে দিলেন আবার। শুধু দেখা গেল না কতখানি বুকের রক্ত উঠল স্থির শান্ত সেই শব্দের এক-একটি অক্ষরে। চোখের জলে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ঝাপসা চোখে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। অন্ধ হয়ে গেছেন শ্রীমিত্র। বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে সে কথা সবাই। বড় বড় পাথরের টুকরো ঢুকে নষ্ট হয়ে গেছে দু'চোখেরই দৃষ্টিশক্তি।

থরথর করে কাঁপলেন শ্রীমতী মিত্র এখনও সেকথা বলতে গিয়ে। বললেন, সবই যখন শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন কি করে নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেঙে-পড়া গাড়ির কামরা থেকে তাঁকে বার করে এনেছিল মহাপ্রাণ যুবক ক'টি। দার্জিলিং স্টেশনে সেই অমানুষিক ভিড়ে কোনখানে এতটুকু জায়গা না খুঁজে পাওয়া ছেলে কটিকে উচ্চ শ্রেণীর উন্নাসিকতায় সরে না থেকে হাত ধরে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন শ্রীমিত্র। বলেছিলেন, "আরে আসুন না মশাই এখানেই। ঠেসাঠেসি করে চলে যাওয়া যাবে'খন কোনরকমে। কতটুকুই আর পথ। সেই সুরু। সামান্য ক'টি কথাতে একটু অন্তরের ছোঁওয়াতেই বয়সের সব ব্যবধান ছাড়িয়ে সুরু হল নিবিড় সৌহার্দ্যের। আর সেই সুরুতে আর সেই স্মৃতিতেই হয়ত নিজেদের তরুণ প্রাণগুলো এমন করে তুচ্ছ করে ছুটে যেতে পেরেছিল ওরা ওঁকে রক্ষা করতে। কত অল্পে সুখী হয় মানুষ। দুটো মিষ্টি কথা---একটু মমতার স্পর্শ কত সহজে কিনে নিতে পারে একটা গোটা মানুষকে।

বললেন, এতগুলো ভেঙে-পড়া মৃতপ্রায় মানুষকে কি করে বুকে টেনে নিলেন ফাদাররা। দিনরাত প্রাণপাত পরিশ্রমে কি করে সেই ক্ষুধার্ত মুখগুলিতে জোগালেন অন্ন। আশ্চর্য। দুধও পেল বাচ্চারা আর কোথা থেকে কতটুকু সময়ের মধ্যে গরম কাপড়ে ঢাকতে পেল শীতে-কাঁপা নরম শরীরগুলো। বললেন, ব্রাদারদের কথা। নিজেদের মুখের অন্ন অন্যের মুখে তুলে দিয়ে কি করে মানুষের কর্তব্য করে গেল তারা হাসিমুখে। বয়সে ওরা অনেক ছোট। তবু ওদের কাছে জীবনের অনেক পাঠ নিয়ে এসেছেন ওঁরা। দুঃখের ঘনঘটায় সমস্ত আকাশ যখন কালো হয়ে ওঠে---নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তখন হাসিমুখেই তো তার মধ্যে জ্বালিয়ে নিতে হয় বিশ্বাসের প্রদীপখানি। দুঃখ হয় সেদিন মহান—মৃত্যুর হয় অমৃত।

সেই অমৃতের স্পর্শ পেয়েছেন ওঁরা, তাই বয়সের সবখানি ব্যবধান ঘুচিয়ে ওরা হয়েছে অনুকরণীয়, হয়েছে প্রণম্য।

"এই তো বেশ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। একটুখানি ম্রিয়মাণ ক্লান্ত সোমনাথকে বলেছিলেন ফাদার, 'একশ' বছর পর তুমি যখন তোমার নাতি-নাতনিদের কাছে একটা বীরত্বের গল্প করতে বসবে তখন বলতে পারবে তো তাদের আজকের কথা।"

একশ' বছর পর সত্যিই যদি সোমনাথ গল্প করে আজকের অভিজ্ঞতার। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বসে বসে ভাবছিলাম, তবে এঁদের কথা স্মরণ করে সেদিন নিজেরই অজান্তে হাত দু'খানি ওর কখন উঠে আসবে কপাল স্পর্শ করে। যেমন করছেন শ্রীমিত্র নতুন করে আবার দৃষ্টি ফিরে পেয়ে ভাষাহীন কৃতজ্ঞতায়—শ্রদ্ধায়।

* * *

একটা ডিমের ওমলেট এক টাকা। চোখে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে কোন একটি কুক্কুট শাবকের শরীরের দুটি অংশ খুঁজে বার করতে পারা এক প্লেট 'চিকেন কারী' আড়াই টাকা। একটা লেডিকেনি (সাইজ বিচার্য নয়) আট আনা থেকে এক টাকা। এক প্লেট ভাত ---না, বাজার দর বলা হচ্ছে না আকাশবাণীর কোন কেন্দ্র থেকে। খোলা একটা কাগজে কালি দিয়ে লেখা দামগুলো পড়ে পড়ে হোটেলের মেনু বলছেন ডাক্তার, টিকাগুলো অবশ্য ওঁর স্বরচিত। আমরা শুনছি।

দূরে হঠাৎ সুরু হল ছোট-খাট একটা খণ্ডযুদ্ধ প্রায়, ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়েছে কতকগুলি তরুণ। "একি মগের মুল্লুক নাকি ? যা খুশি দাম বসালেই হল ? একটা নিয়ম-কানুন নেই কিছুর ?

হাসলাম আমরা। ওরা তরুণ তাই ওরা জানে না---এই তো মওকা। সবদিকে পথ বন্ধ দিশেহারা কতকগুলো হতভাগা মানুষের বেশি কথা ভাববার সময় কোথায় এখন ? ক্ষমতা কই ? মুরগী খাবার ক্ষমতা না থাকে ডাল-ভাত খাও। তাও তো আছে। দেড় হাতা ডাল (যদি সে পদার্থকে ডাল বলে চেনা যায় আদপেই---স্বাদ তো পরের কথা) আট আনা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বাঙালীর প্রথম চা পান

সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু চা না হলে আজকাল কারুরই চলে না। শীতকাল হলে তো কথাই নেই। শীতের সকালে একটু গরম চা এনে দেয় শতগুণ শক্তি। জড়তা নাশ করে মনে এনে দেয় বল, কাজে উৎসাহ।

যেসব দেশে চা উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতবর্ষের চা জগদ্বিখ্যাত। এমন উৎকৃষ্ট চা পৃথিবীর আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। যেমন উপাদেয় তেমনি স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। তাই তো ভারতবর্ষের চা পান করে আজ বিশ্ববাসী পরিতৃপ্ত। ভারতবর্ষের চা সকলের প্রিয়। ভারতীয় চায়ের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। জয়যাত্রা সুরু হয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে।

এই সর্বজনপ্রিয় চা বাঙালীর মধ্যে প্রথম কে পান করেন---কোন্ ভাগ্যবান বাঙালী প্রথম এর অমৃত আস্বাদ গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হন তা জানার কৌতূহল সকলেরই হয়---হওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমান নিবন্ধে আমরা বাঙালীর মধ্যে প্রথম কে, কোথায়---কোন্ দেশে এবং কিরূপ পরিবেশে চা পান করেন, সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করলাম :---

সে আজ প্রায় হাজার বছর আগের কথা। বাঙলা দেশ থেকে তিব্বত দেশে যাচ্ছিলেন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। হিমগিরি হিমালয়ের ওপারে তিব্বত দেশ। তিব্বত চির তুষারাবৃত।---সে সময়ে তিব্বতে যাওয়া যেমন ছিল দুরূহ তেমনি কষ্টসাধ্য। অনেক বন-বনানী, অনেক অত্যুচ্চ পর্বতমালা অতিক্রম করে তবেই সে দেশে যাওয়া যায়। এই কারণে এই পর্বত-সঙ্কুল দেশটি বহুদিন সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। রহস্যাবৃত অন্ধকারের দেশ রূপে পরিচিত ছিল।

এই রহস্যাবৃত তিব্বত দেশে ১০৩৮ খৃস্টাব্দে বাঙালীর গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ যাত্রা করেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কারের জন্য তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। ধর্মপ্রাণ রাজ তাঁকে সানুনয় অনুরোধ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তথাগতের পরম ভক্ত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত রাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। বৃদ্ধ বয়সে দুর্গম হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করে---অনেক পথ ক্লেশ সহ্য করে চিরতুষারাবৃত পর্বত-সঙ্কুল তিব্বত দেশে প্রবেশ করেন।

তিব্বতের মাটিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতবাসী বিপুলভাবে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে সম্বর্ধনা জানায়। তিব্বতের ধর্মপ্রাণ জনগণ দলে দলে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যায়। প্রণাম জানিয়ে যায় বৌদ্ধ জগদ্‌গুরুর পাদপদ্মে।

দীপঙ্কর নন্দী

তিব্বতের 'গুজে' নামক স্থানে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি ভীষণ ক্লান্ত। দুর্গম পথ-ক্লেশে পরিশ্রান্ত। গুজেতে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। এখানে একজন প্রবীণ রাজপ্রতিনিধি এসে দীপঙ্করকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। তারপর পাঁচ আউন্স পরিমাণ স্বর্ণ, একপাত্র গরম পানীয় ও তিব্বতীয় রাক্ষসের মূর্তি শোভিত একটি থালা শ্রদ্ধাভরে তাঁর সম্মুখে রাখেন।

দীপঙ্কর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওইসব জিনিসগুলির দিকে তাকান।

রাজপ্রতিনিধি নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা-পুত কণ্ঠে বলেন, হে পূজ্যপাদ প্রভু, যদি অনুমতি করেন, আপনাকে আমাদের দেশের কল্পবৃক্ষের নির্যাস স্বর্গীয় পানীয় পান করার জন্য অনুরোধ করি।

---এ কিরকম পানীয়,---এর নাম কি? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করেন।

---এ পানীয়ের নাম চা। আমাদের দেশের এক গাছের পাতার নির্যাস।

---কিভাবে এই পানীয় প্রস্তুত করতে হয়।

কৌতূহলী হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

---আমাদের দেশে পাহাড়ের গায়ে এই গাছ জন্মায়। এই চা গাছের পাতা রৌদ্রে শুকনো ও বিচূর্ণ করে রাখা হয়। পরে প্রয়োজন মত সেই শুকনো গুঁড়ো পাতা গরম জলে সিদ্ধ করে সেই পাতার নির্যাস পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ পান করা হয়। প্রভু, এ পানীয়ের অনেক গুণ।

---কি গুণ এ পানীয়ের? পান করলেই বা কি উপকার হয়? রাজ-প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

---প্রভু, এই পানীয় গরম পান করলে শরীরের সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হয়। দেহ-মনে আসে নতুন বল আর কাজকর্মে জাগায় উদ্যম-উৎসাহ। এই পানীয় লবণ, সোডা ও মাখন সহযোগে কেউ কেউ পান করে থাকে। প্রভু! এই পানীয় অতি পবিত্র; তিব্বতীয় সাধু-সন্ন্যাসীরাও পান করেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতঃপর রাজ-প্রতিনিধির দেওয়া কল্পবৃক্ষের নির্যাস স্বর্গীয় পানীয় চা পান করেন। এই উপাদেয় পানীয় পান করে তিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। দেহমনে সত্য-সত্যই বল পান; সহজেই তাঁর পথ-ক্লেশ ও ক্লান্তির অবসান ঘটে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রফুল্লচিত্তে এই উপাদেয় স্বর্গীয় পানীয় চায়ের অশেষ গুণকীর্তন করেন। তিনি রাজ-প্রতিনিধিকে বলেন, সত্যই এ অতি উত্তম পানীয়। শ্রীভগবান তথাগত বুদ্ধদেব নিশ্চয় এই উপাদেয় স্বর্গীয় পানীয় তিব্বতীয় ভক্ত সন্ন্যাসীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই স্বর্গীয় পানীয় পান করে আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম।

এই হল বাঙালীর প্রথম চা পান। আজ যে আমরা চায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তার সূচনা করেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। বাঙালীর মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানই প্রথম চায়ের অমৃত আস্বাদন গ্রহণ করেন প্রথম চা-পানের গৌরব অথবা সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। তিনি চা পান করেন তিব্বত দেশে। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে।

এ হেন চায়ের ব্যবহার আমাদের দেশে কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা বলা খুবই কঠিন। তবে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যখন দেশ থেকে দেশান্তরে ধর্মপ্রচারে বহির্গত হতেন, তখন তাঁদের সঙ্গে থাকত 'চা'। এই চাই তাঁদের পথক্লেশ ও ক্লান্তি নিবারণ করত। হয়তো তিব্বত দেশের কাছ থেকেই তাঁরা চায়ের ব্যবহার শিখেছিলেন।*

* রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস প্রণীত 'ইণ্ডিয়ান পণ্ডিটস্ ইন দি ল্যাণ্ড অফ স্নো' ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বৃহৎবঙ্গ' (১ম ভাগ) গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আরণ্যক শিল্পী

প্রদীপ লাহিড়ী

শাশা সিমেল একজন সৃজনশীল শিল্পী।

একথা সত্যি যে তার অঙ্কন পদ্ধতি অনেকের কাছেই একটু অদ্ভুত বলে মনে হয়, কিন্তু ভুললে চলবে না যে, তাঁর শক্তি ও ধৈর্য সত্যই প্রশংসনীয়।

বেশীরভাগ চিত্রকর যেখানে রং ও ক্যানভাস এবং বেহালা বা কলম ব্যবহার করে, শাশা সেখানে কিছুটা জলাভূমি বা খাল বিল পেলেই খুশি।

ছবি আঁকার জন্য শাশার দরকার একটি ঘোড়া কয়েকটি মংগ্রেল কুকুর, একটি ছয় ফিট দীর্ঘ শাণিত বর্শা, কোন একজন বন্য পথপ্রদর্শক ও একটি বন্য জন্তু, বন্য জন্তুটি আবার যা তা হলে চলবে না হিংস্র জাগুয়ার হওয়া চাই।

তার জীবন যেন এই শ্রেণীর আরণ্যক বিভীষিকার পশ্চাদ্ধাবন করার জন্যই উৎসর্গীকৃত।

এই জাতীয় বাঘের সাপ্তাহিক খাদ্যের জন্য কম করে মাথাপিছু একটি করে গরু লাগে, আর সে খাদ্য অন্বেষণে তাদের উৎসাহও অপরিমিত, কাজেই গোপালকরা যে শাশার পক্ষ নেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

জাগুয়ারকে অনেকে হিংস্র আরণ্যক মার্জারও বলে থাকেন, এবং আমি যতদূর জানি, তাতে এমন শ্বেতকায় মানুষ দুনিয়ায় কমই আছে, যারা শুধুমাত্র একটি বর্শা সম্বল করে এদের মুখোমুখি হতে পারে।

আফ্রিকার উপজাতি মাশাইরা সিংহ শিকারের সময় যেভাবে দূর থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে শাশা তা করে না জাগুয়ার শিকারের সময়, তার শিকার পদ্ধতি আরও আদিম।

দক্ষিণ আমেরিকার এক আদিবাসীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছে সে এই বিচিত্র শিকারের কলা-কৌশল।

শাশার গুরু একলা সম্মুখীন হত জাগুয়ারের, অপেক্ষা করত জন্তুটার আক্রমণ মুহূর্তের জন্য, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বর্শা হাতে নিয়ে।

অসমসাহসী এই শিকারীর প্রতি শাশার শ্রদ্ধার সীমা-পরিসীমা ছিল না, এবং একদিন বনের মধ্যে একটি বর্শার পাশে ছড়ানো গুরুর দেহাংশ দেখতে পেয়ে তার মনের অবস্থা যে কিরূপ ধারণ করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

এই ধরণের এক দৃশ্য দেখার জন্য শাশা আমাকে একদিন আহ্বান করল, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, হিংস্র ভয়াল আরণ্যক পশুর সঙ্গে মাটির মানুষের একক লড়াই।

তার জীবনী লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম আমি, তাই এই আমন্ত্রণ সে চেয়েছিল কঠোর বাস্তবের পটভূমিতে প্রতিফলিত হতে সত্যের রং-এ রঞ্জিত হয়ে।

সেই দিনটির কথা আমি জীবনেও ভুলব না। ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার, আমাদের ছোট কুটিরটির সামনে মাটির উপর আগুন জ্বলছিল তখনও, এপাশে শস্যের গাদার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলো খেয়ে নিচ্ছিলো তাদের প্রাতরাশ।

শিকারী কুকুরগুলো ডেকে ডেকে উঠছিলো ব্যগ্রভাবে, যেন তারা আর সময় নষ্ট করতে চায় না।

আমাদের পথপ্রদর্শক বন্য মানুষটি দাঁড়িয়েছিল দোরগোড়ায়।

শাশা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বর্শার ধার পরীক্ষা করে নিচ্ছিলো হাত বুলিয়ে বুলিয়ে।

ওর গভীর একাগ্র মুখের দিকে তাকালাম আমি। ওর শরীর ছন্দোময়, যেন বিড়ালের সতর্ক পদক্ষেপ ওর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন।

যে কাজে প্রতিমুহূর্তে জীবনহানির আশঙ্কা সেই কাজের জন্যই সতর্কভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলোও।

অস্ত্রটি নিয়ে যেভাবে ও নাড়াচাড়া করছিল, তাতে বুঝলাম, কি গভীর মমতা ওর সেটির ওপর।

ও নিজের হাতে প্রস্তুত করেছিল অস্ত্রটি এবং এ কাজে ওর দক্ষতাও ছিল অপরিসীম।

ওর সতর্কতা দেখে মনে হল,

এ বাবদে ও সত্যিই এক মহৎ শিল্পী ; ভাগ্যের হাতে কিছুই ছাড়তে রাজী নয়।

"তোমার অশ্ব প্রস্তুত" বলে উঠলো ও, বর্শার মুখে চামড়ার খাপ পরাতে পরাতে।

অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের যাত্রা সুরু হল, বাতাসে তখনও হিম শীতলতা।

কুকুরগুলোকে নেওয়া হল জোড়া গেঁথে গেঁথে, যাতে তারা অন্য কোন শিকারের পশ্চাদ্ধাবন না করতে পারে।

প্রভাতের অব্যবহিত পরেই আবহাওয়া ভরে উঠল এক অনৈসর্গিক সজীবতায়, উষ্ণপ্রধান দেশের প্রভাত সত্যিই বিস্ময়কররূপে মনোরম।

তারপর ধীরে ধীরে প্রখর হয়ে উঠতে লাগলো রৌদ্রতাপ, ঘাসের শিসে শিসে জমা শিশির বিন্দুগুলি উঠলো শুকিয়ে।

জলার বিস্তৃত আরণ্যক পরিবেশে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম আমরা।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে এগিয়ে চললাম, ভিজে বালির চড়া, গুল্মপূর্ণ জলা পার হয়ে চলে গেলাম, কিছু দূরে গিয়ে বেশ গভীর জলের মধ্যে গিয়ে পড়লাম, জলাভূমি সেখানে একটা হ্রদের রূপ ধারণ করেছিল।

ঘোড়াশুদ্ধ সাঁতরে পার হয়ে যেতে হল সে হ্রদ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছিল, যে গুলির ব্যাস মাইল খানেকের বেশী নয়।

ঘন জঙ্গলে আবৃত ওই ক্ষুদ্রকায় দ্বীপগুলি, প্রত্যেকটি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছিল শাশা, কারণ দিনের উত্তাপময় প্রহরে ওই সব দ্বীপেই বিশ্রাম করে জাগুয়ার।

শাশা এর মধ্যে একবারও কথা বলে নি।

একাগ্রদৃষ্টিতে শিকারের সন্ধানে চলেছিল সে, কোথাও শকুনি ওড়াওড়ি করছে কিনা লক্ষ্য করছিল, কারণ হিংস্র জন্তুর ভুক্তাবশেষের ওপরই সচরাচর জমায়েৎ হয় শকুনিরা, তা ছাড়া জলের ধারে ভিজা মাটিতে জাগুয়ারের পদচিহ্ন আবিষ্কারেরও চেষ্টায় ছিল সে।

কুকুরগুলো মুহ্যমানভাবে অনুসরণ করছিল তাকে, পথপ্রদর্শক আদিবাসীটিও নিষ্ক্রিয়ভাবেই বসেছিল ঘোড়ার পিঠে, কিন্তু শাশার তীক্ষ্ণদৃষ্টি কেবলই সঞ্চারিত হচ্ছিল এদিকে-ওদিকে।

শাশা ছাড়া আমরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম ও নিদ্রালুবোধ করছিলাম।

হঠাৎ একটা কুকুর জলার এক বিশেষ অংশে ছুটে গিয়ে ডাকতে সুরু করে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিবেশটাই যেন বদলে গেলে।

জায়গাটি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল শাশা।

আদিবাসী লোকটাও নেমে দাঁড়ালো, তারপর জোড়গাঁথা কুকুরগুলোকে আলাদা করে ছেড়ে দিল ওরা।

প্রায় তিনশো গজ দূরে অবস্থিত একটি বনময় উপদ্বীপের দিকে তীরবেগে ছুটে গেল কুকুরগুলো।

আমরা ঘোড়ার পিঠে চেপে কুকুরগুলোকে অনুসরণ করলাম।

দ্বীপটায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো দ্রুতবেগে বনের মধ্যে

অদৃশ্য হয়ে গেল, শাশা হাত তুলে আমাদের সেখানেই থামতে ইঙ্গিত করলো।

ঘোড়ার পিঠে বসে আমরা কুকুরের ডাক শুনতে লাগলাম।

সেই মুহূর্তে আর কিছুই করার ছিল না আমাদের। এখন শুধু জাগুয়ারের প্রতীক্ষায় থাকা।

কোথায় যে লুকিয়ে আছে জানা নেই, কোথায় ওকে পাওয়া যাবে, তাও সম্পূর্ণ অজানা।

কুকুরের ডাক থেমে গেলে বুঝতে হবে যে, জন্তুটা গ্রাহ্যমাত্র না করে, নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে, হয়ত বা কোন গাছে চড়েই বসে আছে, কারণ সকলেই হয়ত জানেন যে, মার্জারজাতীয় এই বাঘ গাছে চড়তে অত্যন্ত পটু।

যদি জন্তুটা গর্জন করে ওঠে এবং কুকুরের ডাকেও ছেদ না পড়ে তা হলে কালবিলম্ব না করে আমাদের ছুটে যেতে হবে অকুস্থানে, না হলে কুকুরগুলোকে বাঁচানো যাবে না জন্তুটার কবল থেকে।

শিকারের সময় কুকুরগুলো যাতে না মরে, সেজন্য শাশা সর্বদাই সচেষ্ট থাকত।

দেখতে দেখতে কুকুরের ডাক আরও তীব্র হয়ে উঠল, মনে হল, যেন আর্তনাদ করছে ওরা।

ঘোড়াটাকে একটা গাছে বেঁধে খাপখোলা বর্শা হাতে নিয়ে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল শাশা।

আমি হতবাক হয়ে পড়েছিলাম, শেষপর্যন্ত ক্ষুদ্রকায় আদিবাসী পথপ্রদর্শকের সাহায্যে এগিয়ে গেলাম শিকার ও শিকারীর সন্ধানে।

বনের মধ্যটা কেমন এক মৃদু সবুজ আলোয় ভরা, মাংসপচার হালকা গন্ধ বাতাসে, কোন গাছ-গাছড়া যখন ঝড়ে পড়ে যায় বনের মধ্যে, তখন তার চারপাশে সৃষ্ট হয় আগাছার জঙ্গল, বিশেষ সাবধান না হলে চলতে চলতে সেগুলি পায়ে বেধে পদস্খলন হওয়া প্রায় অনিবার্য।

তাছাড়া বড় বড় গাছ থেকে নামা মোটা মোটা ঝুরিগুলিও বনের মধ্যে চলাফেরার পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক।

তাছাড়া ওই বনে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বুনো পাইন, অ্যাপলের ঝোপ যার পাতা গায়ে লাগলে চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, এমনই ধারালো ও কাঁটাগার এই সব পত্রগুচ্ছ।

চলতে চলতে একটা ছোট উষ্ণ জলের কুণ্ড পার হয়ে গেলাম আমরা, কাপড়-জামা প্লাস্টারের মত সেঁটে গেল গায়ে।

কিন্তু গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কোন দ্বিধাই ছিল না আমাদের মনে, কারণ কুকুরের ডাক ক্রমেই তীব্রতর হয়ে কানে আসছিল, আর সেটাই ছিল আমাদের নিশানা।

হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম, চারিদিকে বিচিত্র ধরনের সব আওয়াজ উঠছিল, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছিল না।

চশমার কাঁচও জল-কাদা লেগে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো একটা সাফ করে নেব যে তারও উপায় ছিল না কারণ পকেটের রুমালটিও হয়ে গিয়েছিল কর্দমাক্ত।

আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে ক্ষুদ্রকায় পথপ্রদর্শকের বোধহয় করুণা হোল। মৃদু হাসির সঙ্গে একটা বড় ঝকঝকে সবুজ পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সে আমার হাতে গুঁজে দিল।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাতাটার সাহায্যে চশমার কাঁচ দুটো মুছে ফেললাম চকচকে করে, তারপর চোখ ফেরাতেই সমস্ত দৃশ্যটা সামনে ভেসে উঠল। পর্যবেক্ষণ করলাম শাশার চাঞ্চল্যকর কীর্তিকলাপ।

একটা হালকা সবুজ পাতায় ভরা বড় ডুমুর গাছের তলায় নিশ্চিন্তভাবে বসেছিল প্রকাণ্ড জাগুয়ারটা।

বনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া সোনালী রোদের ঝলক এসে পড়ছিল ওটার গায়ের সোনালী রং-এর চামড়ার ওপর আঁকা গোল গোল কাল দাগের ওপর।

কুকরগুলো উত্তেজনায় পাগলের মত হয়ে গিয়ে জন্তুটার চারপাশে ঘুরছিল ওকে দংশন করার জন্য, কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ নজর ছিল না।

মাঝে মাঝে অবশ্য আলস্যভরে ওটা থাবা উঁচোচ্ছিল, কিন্তু সে যেন নেহাৎই খেলাচ্ছলে। যেন কেউ মশা তাড়াতে হাত বাড়াচ্ছে অনিচ্ছাভরে।

শাশার দিকেই প্রধানত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওর। গম্ভীরভাবে কিন্তু আশঙ্ক-দৃষ্টিতে জন্তুটা নিরীক্ষণ করছিল শাশাকে।

যেন কোন বনের রাজা চেয়ে দেখছে তার রাজসভায় উপনীত এক আগন্তুককে।

নবাগতকে দেখে ভয় পাওয়ার কোন কারণ আছে বলে যেন বুঝতেই পারে নি ওটা।

শাশার ঠিক দু' গজের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম আমি একটু বাদিক ঘেঁসে।

অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ নতুন ও রোমাঞ্চকর বলে বোধ হচ্ছিল।

শাশা ডান হাতে বর্শাটা উঁচিয়ে ধরেছিল ঠিক জন্তুটার বুক লক্ষ্য করে।

সুন্দরের সাধনা

রবিরতন ভৌমিক

(Poet Robert Bridges-এর "I love all beautious things-এর বঙ্গানুবাদ)

ঐ ধরণীর সুন্দর সবি
সদা ভালোবাসি,
খুঁজে বেড়াই অহর্নিশি
আনন্দ প্রকাশি'।

যত কিছু আছে মনোরম
বিধাতার সৃষ্টি,
তারই মাথায় ঝ'রে পড়ে
প্রশংসার বৃষ্টি।

জীবনটা যে ধরার মাঝে
দ্রুত ধাবমান,
সুন্দরের স্রষ্টা যারা
লভে সে সম্মান।

আমিও তাই একটা কিছু
করবো আজি সৃষ্টি,
পরাণ ভ'রে মাখবো গায়ে
আনন্দের বৃষ্টি।

নিত্য যে জাগরণের শেষে
আমার এই সৃষ্টি,
আসার-শব্দে ধাঁধিয়ে দেয়
স্বপ্ন-মাখা দৃষ্টি।

জাগুয়ার অবশ্য তা দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। অত ছোট একটা জীবকে দেখে ভয় পাওয়ার বা বিচলিত হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি ওটা সম্ভবত।

শাশা কিন্তু দেখলাম স্পষ্টতই বিচলিত হয়েছে, সম্ভবত এত অদ্ভুত জাগুয়ার ও দেখে নি এর আগে।

সত্যি বলতে কি জাগুয়ারের নিয়মই হচ্ছে—এহেন পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়া, যাতে সুদক্ষ শিকারীর বর্শার মুখে সে নিজেকে স্থাপিত করতে পারে।

ওটা যদি স্বাভাবিক আচরণ করত, তাহলে শাশাও একটু পেছিয়ে গিয়ে বর্শার আগায় ওটাকে ফুঁড়ে ফেলতে পারত স্বচ্ছন্দেই।

কিন্তু জাগুয়ার যদি যথোচিত আচরণ না করে তা হলে সমস্ত পরিস্থিতি-টাই যে ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, শাশাও এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিল না।

এ অবস্থায় সে যদি এগিয়ে যায় জন্তুটার দিকে, তা হলে ওটা থাবা উঁচোবেই।

আর তা হলেই তো হয়ে গেল, কারণ থাবার ঘায়ে বর্শা লক্ষচ্যুত হতেও বাধ্য।

এক্ষেত্রে শিকারের চেয়ে শিকারীর প্রাণের আশঙ্কাই বেশী।

এইসব ভাবনাই বোধহয় ভাবছিল শাশা থমকে দাঁড়িয়ে এবং ইতিমধ্যে কুকুরগুলো হয়ে উঠলো আরও উদ্দাম, আরও চীৎকারপরায়ণ।

"আর বিলম্ব অনুচিত, এবার জন্তুটাকে যে-কোন উপায়ে আক্রমণোদ্যত করে তুলতেই হয়" ভাবলো শাশা।

মনস্থির করে ফেললো ও।

ওর পেশীগুলি নমনীয় হয়ে উঠলো, এক পা এগিয়ে একমুঠো ধূলি তুলে ও নিক্ষেপ করলো জন্তুটার মুখের ওপর।

অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটলো মুহূর্তের মধ্যে। প্রথমটা জাগুয়ার যেন বিশ্বাসই করতে পারলো না যে, তার সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন জীবের সাহস হবে তাকে উত্যক্ত করবার, কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললো সে। ক্রোধে ভয়াল দর্শন হয়ে উঠলো তার মুখ।

হিংস্র গর্জন করে শাশার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা। মুহূর্তের জন্য তার লাল টকটকে মুখগহ্বর চোখে ভেসে উঠলো আমার।

বর্শা ঢুকে গেল ওটার বুকের মধ্যে, সামনের দুটো থাবা আছড়ে পড়লো বর্শার বাকি অংশের ওপর।

সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি উত্তেজনায়। বুকে বিদ্ধ বর্শাটার দিকে সক্রোধে দৃক্‌পাত করে জন্তুটা হাঁ করে শাশাকে কামড়াতে চেষ্টা করলো।

দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালো শাশা, কুকুরগুলো দলবদ্ধভাবে চীৎকার করতে করতে জন্তুটার লেজে কামড় বসাতে লাগলো।

তারপর ওটার চোখ বুঁজে এল, ওর আক্রমণোদ্যত থাবা দুটো ঝুলে গেল, আর এক গভীর শ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুকের মধ্য থেকে।

অতিকষ্টে ওটার বুক থেকে বর্শার ফলাটা বার করে আনলো শাশা, দু পা পেছিয়ে গিয়ে পর্যুদস্ত শত্রুর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর আবার এগিয়ে এসে ওটার লুটিয়েপড়া মাথায় সস্নেহে কয়েকটা চাপড় মারলো।

এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বিজয়ীর সহজাত সৌজন্য প্রদর্শন।

কুকুরগুলোকেও পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানালো সে।

কিছুক্ষণ পরে মাটির ওপর গোল হয়ে বসে ঐ আদিবাসী প্রদত্ত কয়েকটি কমলালেবু ভক্ষণ করে কিছুটা শ্রান্তি অপনোদন করলাম আমরা। অদূরে পড়েথাকা মৃত জাগুয়ার, চীৎকার-পরায়ণ সারমেয়কুল ও শ্যামল অরণ্যানীর দিকে একবার চোখ তুলে তাকালাম আমি। মনে হল, শিল্পী হিসাবে সেই মানুষ নিশ্চয় মহৎ, যে না-কি এইসব কাঁচা মালের সহায়তায় এমন একটি নিখুঁত শিল্পকর্ম সম্পাদনে সক্ষম।

[বিদেশী লেখার ভাবাবলম্বনে]

ছোটদের আসর

জগৎজোড়া পাখির মেলায় যে পাখি নানা কারণে এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী—তার নাম পেঙ্গুইন। মানবসমাজে, পেঙ্গুইন একটি সুপরিচিত পাখি। পক্ষীসমাজে পেঙ্গুইন এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন আসনের অধিকারী। এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে বিদ্যমান, যার কল্যাণে অন্যান্য পাখিদের তুলনায় এই পাখি যথেষ্ট গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বহন করে থাকে।

কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, আকৃতি এবং কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল ; যে-মিল অন্যান্য পক্ষীসমাজে অনুপস্থিত বললেই চলে। এঁদের কতকগুলি অভ্যাসও মানুষের অভ্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। এর মধ্যে এদের দলতন্ত্রব্যবস্থা ও সামাজিক সংগঠন বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

এ-হেন পাখিকে কিন্তু লোকালয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না, আমাদের মাথার ওপরে অন্তহীন অসীম মহাকাশের বুকে ডানা মেলে একে উড়ে বেড়াতে দেখা যাবে না। শহরাঞ্চলের নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোন গহন বিজন অরণ্যের গভীরে এর বাসার হদিশ মিলবে না। এ পাখির দেখা মিলবে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায়—যেমন অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে, নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ এবং পূর্ব উপকূলে, ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে। অন্য দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলসমূহে এবং ভারত মহাসাগরের নির্জন দ্বীপপুঞ্জগুলিতেও এদের কিছু কিছু দেখা মিলতে পারে। এক কথায় এরা নাগরিক পাখি নয়। সামুদ্রিক পাখি হিসাবেও এদের চিহ্নিত করা চলে না। এরা মেরুপ্রদেশীয় বিহঙ্গ।

একাধিক শ্রেণীতে এরা বিভক্ত। আকৃতি, আয়তন প্রভৃতি অনুসারে এই শ্রেণীবিন্যাস ঘটেছে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ যে

মেরু বিহঙ্গ

স্নিগ্ধা মজুমদার

পেঙ্গুইন সে "এম্পারার পেঙ্গুইন" নামে অভিহিত। পৃথিবীর সামাজিক ঔপনিবেশিক প্রাণীদের মধ্যে এর নাম অনায়াসে উল্লেখ করা চলে। এর দৈর্ঘ্যের পরিমাণ শুনলে বিস্মিত হতে হয়। সাড়ে তিন ফুট লম্বা এই পাখির ওজন আশি পাউণ্ডেরও বেশি। শীতের মাঝামাঝি সময়ে ডিম পাড়ে।

এর পরই নাম করতে হয় "কিং পেঙ্গুইন-এ"র। এর উচ্চতা তিন ফুট এবং ওজন চল্লিশ পাউণ্ড ; এর সারা দেহে যেন রঙের সমারোহ। শাদা, নীল, কালোর অপূর্ব সমাবেশ বিস্ময়-বিহ্বল না করে ছাড়ে না।

এদের কর্তব্যপরায়ণতা লক্ষ্য করার মত। মানুষের মতই এরা গোষ্ঠীবন্ধনে বাস করে। বাপ-মা শিশু সন্তানদের প্রতি যত্নশীল। সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি সেবাপরায়ণ।

সব চেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা হল, এ পাখি ওড়ে না। এর ডানা ওড়ার কাজে লাগে না। স্থলপথে এরা চলে বেড়ায় ঠিক মানুষের মত—সোজা, খাড়াভাবে। আকাশে এর স্থান নেই কিন্তু জল একে সাদরে বক্ষে স্থান দিয়েছে। সাঁতারু হিসাবে এরা সুদক্ষ। তাছাড়া জল এদের সমাজে অপরিহার্য। জল শুধু এদের তৃষ্ণাই মেটায় না, জল থেকে এরা ঠোঁটে করে খাদ্যও সংগ্রহ করে।

এদের মিলন-পর্বও যথেষ্ট পরিমাণ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের স্পর্শ করে। স্ত্রী এসে উপস্থিত হয় কোন পাথরের স্তূপের কাছে। পুরুষ আসে ঠোঁটে করে একটি নুড়ি নিয়ে। নুড়িটি রাখে স্ত্রীর পায়ের কাছে। স্ত্রী সম্মত থাকলে সেটি ঠোঁটে করে তুলে নেয়। তারপর—তারপর তখনই সেই দু'জনের চেয়ে দেখা যার ফলে স্বর্গ-মর্ত হয়ে যায় একাকার।

দুই বোনের গল্প

শ্রীদিবাকর গোস্বামী

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে ছিল এক বুড়ি। বুড়ির দুই মেয়ে ছিল। বড়টি ছিল খুব অহঙ্কারী ও হিংসুটে। কিন্তু ছোট মেয়েটি ছিল ভদ্র ও নম্রভাষী।

বুড়ি তার বড় মেয়েকে সব থেকে বেশী ভালোবাসতো। কিন্তু বড় বোন ছোট বোনকে সর্বদা এড়িয়ে চলতো। ছোট মেয়েটিকে সারাদিন কাজ করতে হতো। সে রোজ মাইল দু'য়েক দূর থেকে একটি কলসী করে জল আনতো। একদিন সে যখন কুয়োর থেকে জল তুলে বাড়ি ফিরছে, এমন সময় একটি অতিবৃদ্ধা তার দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'মা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দেবে?'

'কেন দেবো না, নিশ্চয়ই দেবো।' স্বভাবসুলভ কণ্ঠে মেয়েটি বললো। তারপর তার কলসী থেকে বুড়ির হাতে জল ঢেলে দিল। বুড়ি আঁজলাভরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই জল পান করল। জল খেয়ে বুড়ি বললো, 'আমি মানুষ সেজে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। আসলে আমি পরী। তোমার দয়ালু প্রাণের পরিচয় পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমাকে আমি একটি বর দিচ্ছি; তুমি যখন কথা বলবে, তখন তোমার মুখ দিয়ে ফুল ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়বে।' এই বলে পরী অদৃশ্য হলো।।

বাড়ি ফিরতেই মেয়েটির মা মেয়েটিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বললো, 'এত দেরী হলো কেন, বল—'

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বললো, 'আমার কোন দোষ নেই মা, একটা বুড়িকে জল খাওয়াতে দেরী হয়ে গেল।'

তার কথা বলা শেষ হওয়া-মাত্র মুখ দিয়ে একটি সুগন্ধ গোলাপ ফুল আর অনেক মণি-মুক্তা ঝরে পড়লো মাটিতে।

মেয়েটির মা অবাক বিস্ময়ে সেই সব মণি-মুক্তার দিকে চেয়ে মনোরম কণ্ঠে মেয়েকে আদর করে শুধালো, 'ব্যাপার কি মা, এ কি রকম হলো?'

তখন মেয়েটি জল আনতে গিয়ে যা-যা ঘটেছিল সব বললো। তার কথা বলা শেষ হতে দেখা গেল এক-রাশ ফুল আর মণি-মুক্তা তার ঠোঁট থেকে ঝরে পায়ের নীচে পড়ে রয়েছে।

ব্যাপার দেখে বুড়ি তখনই তার বড় মেয়েকে ডেকে আনলো। তাকে একটি কলসী দিয়ে কুয়ো থেকে জল আনতে বললো। বড় মেয়ে নিমরাজী হয়ে বললে, 'ঠিক আছে যাচ্ছি, কিন্তু এই বিরাট মাটির কলসী নিয়ে আমি যেতে পারবো না। আমি ঐ ছোট রূপোর কলসীটি নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে কলসী নিয়ে হন্ হন্ করে সে বেরিয়ে গেল।

কুয়োর কাছে এসে দেখে একটি মেয়ে খুব সুন্দর পোষাক পরে সেখানে বসে আছে। মেয়েটি তাকে তার কলসী থেকে একটু জল পান করতে দেবার জন্যে অনুরোধ করলো।

'তুমি কি মনে করেছ তোমাকে জল দেবার জন্যে আমি এতদূর এসেছি?' বড় মেয়েটি চিৎকার করে বললো, 'তুমি নিজে কুয়ো থেকে জল তুলে খাও।'

মেয়েটির হিংসুটে ও দুষ্ট স্বভাব দেখে পরীটি বললো, 'তোমার ধৃষ্টতা দেখে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, যখন তুমি কথা বলবে তখন তোমার মুখ দিয়ে সাপ অথবা ব্যাঙ বেরিয়ে আসবে।'

এই বলে পরী অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বাড়ি ফিরতেই তার মা ছুটে এলো, 'আয়, আয় মা, কি আনলি বল?'

'মা—' মেয়েটির কথা শেষ হলো না। তার মুখ থেকে একটি ব্যাঙ বেরিয়ে এসে থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে পালালো। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল মেয়েটির মা, 'একি করলি তুই! অ্যাঁ!!'

মেয়েটি বললো, 'ঐ ধড়িবাজ পরীটাকে দেখে নেব আমি—' বলা মাত্রই মেয়েটির মুখ থেকে একটা সাপ বেরিয়ে এসে মেয়েটিকে ছোবল মেরে পালিয়ে গেল।

বিষের জ্বালায় তখনই বড় মেয়েটি প্রাণ হারাল। *

* ইংরিজি গল্পের অনুবাদ

আমার বল চিত্রঃ [illegible] দাস

নতুন সাজে চিত্রঃ দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়
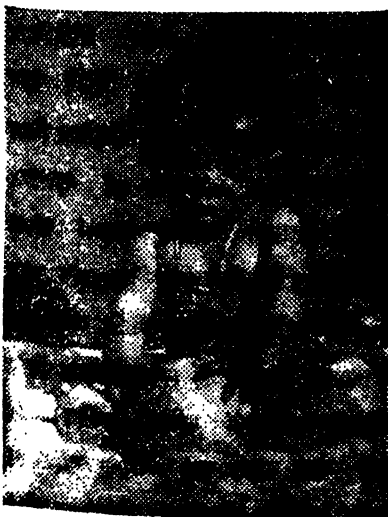
অনেক দিন আগের কথা। বিখ্যাত এক বাংলা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, একদিন পত্রিকার অফিসে বসে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছেন। টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার, সেনসাস রিপোর্ট এবং আরও দু'তিনখানি ইংরাজী জার্নাল। সম্পাদক তন্ময় হয়ে লিখছেন, কোনো দিকে তাঁর খেয়াল নেই। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ্দুর, চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু দেওয়ালের ঘড়িটা নীরবতা ভঙ্গ করে অবিরাম টক্ টক্ শব্দ করে চলেছে।

হঠাৎ সিঁড়ির দিক থেকে একটি যুবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "স্যার, ভিতরে আসতে পারি?"

সম্পাদক লেখার প্যাড থেকে মুখ তুলে দেখলেন দরজার সম্মুখে একটি যুবক দাঁড়িয়ে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর হবে। কিছুক্ষণ তিনি যুবকটির দিকে তাকিয়ে তাকে ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর ঈষৎ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে যুবকটিকে ভেতরে একটা চেয়ারে বসতে বলে তিনি আবার লেখার মধ্যে ডুবে গেলেন।

যুবকটি অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। সম্পাদক তাঁর সদ্যলিখিত অনুচ্ছেদটি শেষ করে বেশ অভিনিবেশ সহকারে পড়লেন সেটা। তারপর কি যেন একটু চিন্তা করে লিখিত একটি পংক্তির কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে, কলমটি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন:

"তারপর---কী খবর, কি মনে করে এখানে---। সম্পাদক প্রশ্ন করলেন যুবকটিকে।

"আমায় চিনতে পারছেন স্যার।" যুবকটি জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চয়ই। সেদিন যে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ, তার জন্য আমার চিরকাল তোমাকে মনে থাকবে। তুমি সেদিন না থাকলে নির্ঘাৎ আমাকে মণিকর্ণিকার ঘাটে জলে ডুবে মরতে হত। বল, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?"

যুবকটি মুখ নীচু করে হাসতে লাগল।

শ্রীগণেশ দত্ত

কিছুক্ষণ পরে সম্পাদককে ছেলেটি বলল, "আপনাকে একটা কথা বলছিলুম স্যার।"

"কি কথা?"

গল্প হলেও সত্যি

যুবকটি তখন পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরা বের করে সম্পাদকের হাতে দিল। সম্পাদক মহাশয় ভেবেছিলেন হয়ত চাকরির দরখাস্ত; রেকমেণ্ডেশানের জন্য ছেলেটি এসেছে। তাই কিছু না বলে টেবিলের উপরের কাগজগুলি সরিয়ে কলমটি তুলে নিলেন।

প্রতীক্ষায়   চিত্র : আশীষকুমার সিংহ

কিন্তু একি? চমকে উঠলেন সম্পাদক। কাগজখানি খুলে দেখলেন, সেটা চাকরির দরখাস্ত নয়। অতি দুর্বল বিষয়বস্তু সম্বলিত ও অপরিচ্ছন্ন মেয়েলি ঢঙে লিখিত একটি কবিতা, নাম "এক নৌকায় তুমি আর আমি"। পরক্ষণেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। কবিতাটি পড়ে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি তুমি কাগজে ছাপতে চাও?"

যুবকটি ঘাড় নেড়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সম্পাদক করুণভাবে যুবকটিকে বললেন, "এ কবিতা আমি তো বাপু ছাপতে পারব না। তার চেয়ে তুমি আমাকে যেখানে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে, সেই কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে আবার ফেলে দিয়ে এস।"

যুবকটি সম্পাদকের কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মাথা নীচু করে রইল।

কে জান এই মানুষটি? বিখ্যাত বাংলা ও ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। লেখার যদি সাহিত্যিক মূল্য না থাকে, তবে তিনি খ্যাত লেখকদের রচনা পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কড়া। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যাঁরা চেষ্টা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। তাঁর মত গদ্য লেখকও বাংলা সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। বড় হয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবে।

বুদ্ধিই বল

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

খুব গরীব এক কৃষক। নাম তার আইভ্যান। ছোট্ট একটুকরো মাত্র বাগান তার। সেই বাগানে সারাদিন পরিশ্রম ক'রে সে সামান্য কিছু সব্জি ফলায়। একটি গাইগরু, কয়েকটা মোরগ-মুরগী এবং একজন মুখ-পাতলা বৌ নিয়ে তার ছোট্ট সংসার।

সারাদিন পরিশ্রম করেও আইভ্যানরা একটু ভালো খাবার খেতে পায় না। শুকনো রুটি এবং সামান্য একটু সব্জি সেদ্ধ—এই তাদের নিত্যকার খাবার। গাইগরুটি সামান্য কিছু দুধ দেয় সত্যি, কিন্তু রোজ সেই দুধের মাখন তুলে আইভ্যানের বৌ জমিয়ে রাখে এবং কয়েকদিন জমানোর পর বাজারে বিক্রি ক'রে দেয়। মাখন আর মুরগীর ডিম বিক্রির টাকায় সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হয়। কালেভদ্রে রুটির সাথে এক-আধটু মাখন খেয়ে মুখ পাল্টায় তারা।

একদিন আইভ্যানের বৌ বাজারে গেল ডিম আর মাখন বিক্রি ক'রতে। আর একটা ভারী শাবল নিয়ে আইভ্যান গেল তার বাগানের এক কোণে একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে কিছু আবর্জনার জঞ্জাল চাপা দিতে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ একটা পুরোনো মাটির কলসীর সাথে তার শাবলটার একবার ঠোকাঠুকি হ'য়ে গেল। আইভ্যানের একটু কৌতূহল হ'ল। অতি সাবধানে গর্তের চার পাশের মাটি সরিয়ে কলসীটি তুলে এনে আইভ্যান দেখে—কলসীটি আগাগোড়া সোনার টুকরোয় ভর্তি হয়ে আছে।

গরীব আইভ্যান ত' খুশীতে প্রায় পাগল। এইবার নিশ্চয়ই তার ভাগ্য খুলল। কিন্তু সে তার মুখ-পাতলা স্ত্রীয়ের কথা ভেবে খানিকটা নিরাশ হ'য়ে পড়ল। তার বাচাল বৌটা নিশ্চয়ই এই সোনা পাবার খবর খুব বেশীক্ষণ পেটে লুকিয়ে রাখতে পারবে না; পাড়ার প্রত্যেকটি বৌয়ের কাছেই শুভ সংবাদটি পরিবেশন ক'রে আসবে। কোনক্রমে এই সংবাদ গ্রামের সামন্ত-জমিদারের কানে গেলে আর রক্ষে নেই। তিনি নিশ্চয়ই প্রায় সবটা সোনা জোর ক'রে কেড়ে নেবেন।

এই জমিদার মহাশয় ছিলেন ভীষণ অর্থলোভী এবং ভারী নীচু মনের লোক। আর মেজাজখানাও তাঁর খারাপ। প্রচুর মুনাফার আশায় কৃষকগণকে তিনি কঠোর পরিশ্রম করাতেন।

ব্যাপারটা আগাগোড়া আরেকবার ভেবে আইভ্যান একটা উপায় বের ক'রে ফেলল। বুদ্ধির জোরে সে এমন একটা চাল দেবে যাতে তার বৌ এই রসালো সংবাদটি পাড়ায় পাড়ায় রটিয়ে বেড়ালেও কেউ তা' বিশ্বাস করবে না; বরং সবাই তাকে উপহাসই ক'রবে। তারপর সুযোগমত একদিন আইভ্যান গ্রাম ছেড়ে দূরের কোন শহরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে বড়লোক হবে।

পর্যবেক্ষণ — চিত্র : অনিল ভট্টাচার্য

এইবার আইভ্যান তার কলসীটি জংগলের একটা ওক গাছের ওপর বড় একটা পেঁচার বাসায় রেখে এল। তারপর নদীতীরে গিয়ে তার মাছ ধরার জালের ভেতর একটা ছোট্ট শূকরছানা পুরে নদীর চরায় খুব অল্প জলে রেখে জালের দড়িটিকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে দিল। তারপর আগুনে সেঁকা কিছু গোলআলু একটা কাঁচভর্তি ঝোপের মাথায় রেখে বাড়ী চ'লে এল।

খানিক বাদে আইভ্যানের বৌ বাজার থেকে ফিরে এসে আইভ্যানকে বাজারের নানা গল্প শোনাতে শুরু করল। একজন যাদুকর মন্ত্রবলে একজন মুচির ধূম্রপানের পাইপের ভেতর থেকে কী ক'রে একটা সোনার টুকরো বের ক'রে এনেছিল, সেই গল্প শুনিয়ে বৌ আইভ্যানকে অবাক ক'রে দিতে চাইল। কেননা, এমন আশ্চর্য ব্যাপার সে আর দেখেনি এ জীবনে। সব শুনে আইভ্যান বলল, সে তার বৌকে এর চেয়ে অনেক বেশী আশ্চর্য বস্তু দেখাতে পারে। কিন্তু আইভ্যানের বৌ এ' কথা বিশ্বাসই করল না। আইভ্যান তখন তার বৌকে নিয়ে সেই জংগলের পথে যেতে যেতে বলল, সে প্রথমে নদীর পারে গিয়ে জাল তুলে দেখবে কোন ভালো মাছ ঢুকেছে কি-না। তারপর সে জালটি তুলে আনল। কিন্তু কী আশ্চর্য! জালের মধ্যে মাছের বদলে একটা হৃষ্টপুষ্ট ছোট্ট শূকরের বাচ্চা ঢুকে আছে এবং বেরিয়ে আসার জন্যে ভয়ানক দাপাদাপি ক'রছে। এ' দৃশ্য দেখে আইভ্যানের বৌ বিস্ময়ে যেন বোবা হ'য়ে গেল। আইভ্যানকে সে বলল, মাছ ধরার জালে নদী থেকে যে শূকর ছানা শিকার করা যায়, এমন অদ্ভুত ব্যাপার জীবনে সে আর দু'বার দেখেনি বা কারুর মুখে শোনেওনি।

আইভ্যান তার বৌকে বলল, এই জংগলের ভেতর এমন কয়েকটা যাদুকরী পেঁচা আছে, যেগুলি তাদের বাসায় ডিম প্রসব না ক'রে কেবল সোনার টুকরোই প্রসব ক'রে থাকে।

যে-গাছে সোনার টুকরো-ভরা কলসীটি রাখা আছে, সেই পথে যেতে

জেনে রাখো

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বল তো কে পার দেখি
আকাশটা কেন নীল?
কেন বা পাতার বুকে
সবুজের ঝিল্‌মিল্‌?
কেন যে পাহাড় থেকে
নদী আসে নামিয়া?
ভেবে ভেবে তোমাদের
মাথা ওঠে ঘামিয়া!
দিন কেন আলোময়?
কালো কেন রাতটি?

ক্রমে আর বাড়ে কেন
আকাশের চাঁদটি?
মেঘ থেকে ঝরে পড়ে
কেন যত বৃষ্টি?
মা'র কোল সবচেয়ে
কেন লাগে মিষ্টি?
জবাবটা জেনে রাখো
রোজই সাঁঝ-সকালে,—
ঘটে চলে সব কিছু
প্রকৃতির খেয়ালে।

যেতে আইভ্যানের বৌ হঠাৎ উত্তেজনায় চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, দ্যাখো—দ্যাখো, এই ঝোপটায় কত সুন্দর সুন্দর সেঁকা আলু জন্মেছে। সত্যি, আজ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার সব দেখছি।

তারপর তারা সেই ওক গাছের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছাল। আইভ্যান সেই পেঁচার বাসার ভেতর থেকে খুব সাবধানে সোনার টুকরোগুলি বের ক'রে আনল। তার বৌ এমন তাজ্জব ব্যাপার দেখে এমন অবাক হ'য়ে গেল যে, নিজের চোখ দুটোকে পর্যন্ত যেন বিশ্বাস করতে পারল না। আইভ্যান তাকে সতর্ক ক'রে দিল, যেন পাড়ার কারুর কানে ঐ সব কথা না তোলে সে। এ'কথা জানাজানি হ'লে তাদেরই বিপদ। চোর বা ডাকাত এসে তাদের সব কিছু নিয়ে যেতে পারে। আইভ্যানের বৌ প্রতিজ্ঞা ক'রে বলল, এ কথা সে কারুর কাছেই বলবে না।

এইবার আইভ্যান তার গ্রাম ছেড়ে দূরের কোন এক শহরে গিয়ে ব্যবসা করার মনস্থ ক'রল। গ্রামের প্রত্যেকটি লোক এই ভেবে অবাক হল, কী ক'রে গরীব আইভ্যান শহরে যাবার পাথেয় জোগাড় ক'রল। এদিকে আইভ্যানের বৌ পাড়া বেড়াতে গিয়ে সবার কাছে অহঙ্কার ক'রে ব'লতে লাগল, কী কী আশ্চর্য বস্তু সে দেখেছে এবং কেমন ক'রে কোথায় তার স্বামী অতগুলো সোনার টুকরো পেয়েছে। তার কথা শুনে প্রথমে অনেকেই উপহাসের হাসি হেসে নিজেদের ভেতর বলাবলি ক'রল, আইভ্যানের নির্বোধ বৌটা দিন দিন বড্ড বেশী বাচালতা শুরু ক'রে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত না বৌটা পাগলই হ'য়ে যায়।

এইসব বিদ্রূপের কথা শুনেও আইভ্যানের বৌ মোটেই চুপ ক'রে থাকল না বরং যাকে সামনে দেখল তাকেই তার নতুন নতুন অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে থাকল। তখন পাড়ার দু'য়েকজন মাতব্বর লোক বলাবলি শুরু করল, আইভ্যানের বৌয়ের কথার সবটা মিথ্যে না হ'তেও পারে। নইলে গরীব আইভ্যান শহরে গিয়ে ব্যবসা করার মত অত টাকা পাবে কোথায়।

এক কান-দু'কান ফিরে ফিরে এই কথা অবশেষে গ্রামের সেই অর্থপিশাচ জমিদারের কানে উঠল। তিনি আইভ্যানের বৌকে ডেকে পাঠালেন। আইভ্যানের বৌ বেশ সেজেগুজে আনন্দে বুক ফুলিয়ে জমিদারের প্রাসাদে চ'লে গেল। তাকে দেখে জমিদারের একজন কর্মচারী জিজ্ঞাসা ক'রলেন, মাননীয় জমিদার মহাশয় জানতে চাইছেন, তোমার স্বামী নাকি এক কলসী সোনা পেয়েছে? আইভ্যানের বৌ সরল প্রাণে বলল, অতি সত্যি কথা মশায়। আমি নিজের চোখে সে ব্যাপার দেখেছি। প্রথমে আমার স্বামী মাছ ধরার জাল পেতে নদী থেকে ছোট্ট একটা শূকর ছানা ধ'রেছে।

এই কথা শুনে জমিদার তাকে ধমকের সুরে ব'ললেন, কী বাজে বকবক ক'রছ তুমি? আইভ্যানের বৌ তাতে দ'মে না গিয়ে বলল, কোথায় কাঁটা ঝোপের মাথায় কতকগুলি সেঁকা আলু জন্মেছে এবং কোন্ ওক গাছটায় একটা পেঁচা তার বাসায় ডিমের পরিবর্তে কতকগুলি সোনার টুকরো প্রসব ক'রেছে—সেই সব কথা।

তার কথা শুনে জমিদার তো বিশ্বাসই ক'রলেন না বরং ভয়ানক রেগে গিয়ে গম্ভীর গলায় হুকুম করলেন, এই বাজে নির্বোধ এবং বাচাল বৌটাকে এখুনি এখান থেকে চলে যেতে বল। এই সব গাঁজাখুরী বানানো গল্প শোনার মত ধৈর্য ও সময় আমার নেই।

মুখ গোমড়া ক'রে আইভ্যানের বৌ ধরে ফিরে এল। আর তার দিকে তাকিয়ে গ্রামের লোকেরা বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকল।

আইভ্যান এখন সত্যিই বিপন্মুক্ত হ'ল। শহরে চ'লে যাবার পাকা বন্দোবস্ত ক'রে বৌকে নিয়ে একদিন সেখানে চলে গেল। সেখানে সে বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের বলে একজন মস্ত বড় ধনী হ'য়ে উঠল। তার আর কিছুরই অভাব রইল না।

তার নির্বোধ বাচাল বৌ কিন্তু সময় সময় তার আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে পাড়ার মেয়েদের অবাক করে দেবার লোভ সামলাতে পারত না। কিন্তু কেউ কোনদিন তার আজগুবি গল্প আর বিশ্বাস করেনি।

○ একটি রুশীয় উপকথার ইংরেজী তর্জমা অবলম্বনে রচিত। —লেখক

LIFEBUOY

for health

LIFEBUOY SOAP

লাইফবয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও

সেখানে
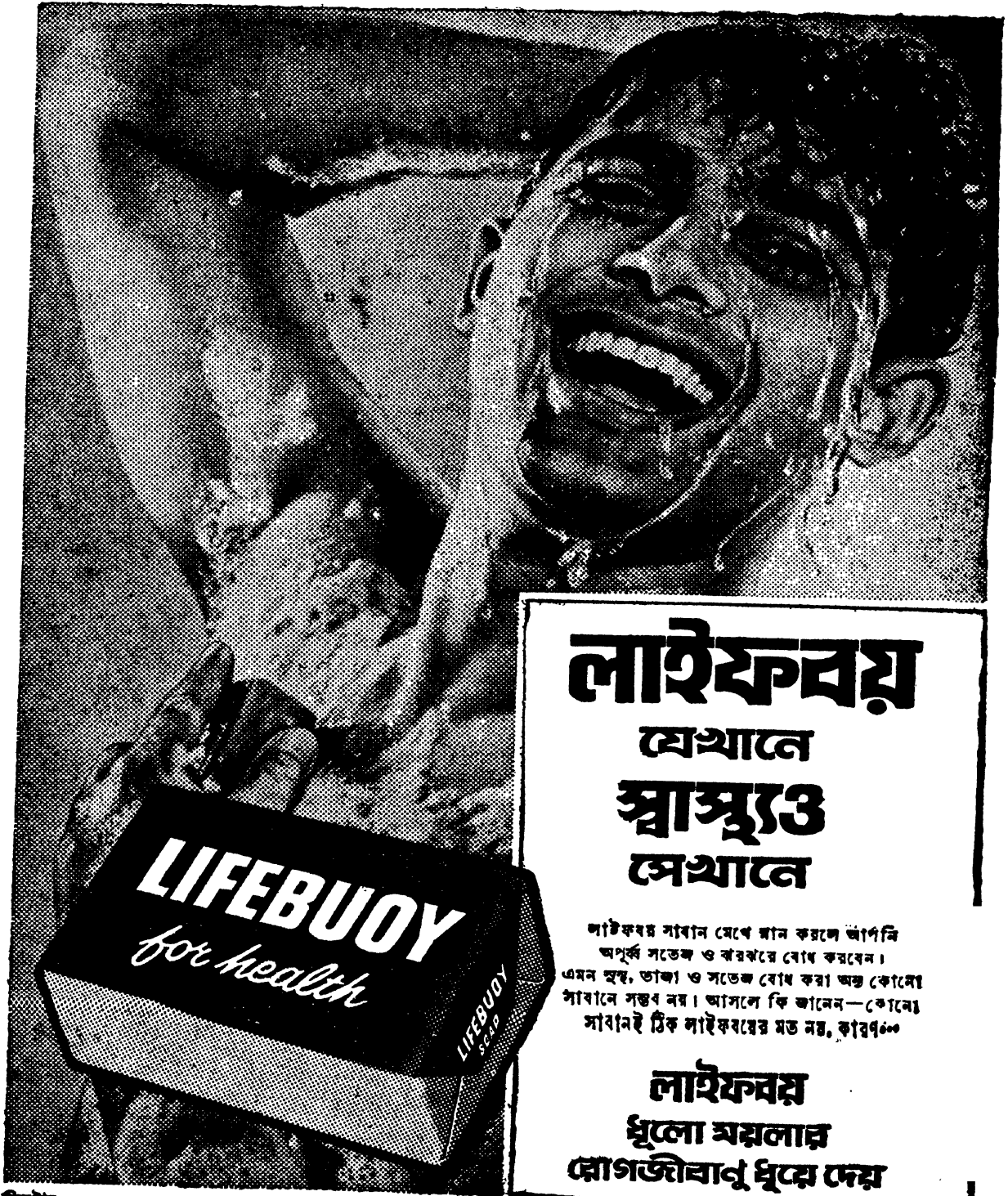
লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করলে আপনি
অপূর্ব্ব সতেজ ও ঝরঝরে বোধ করবেন।
এমন সুস্থ, তাজা ও সতেজ বোধ করা অন্য কোনো
সাবানে সম্ভব নয়। আসলে কি জানেন—কোনো
সাবানই ঠিক লাইফবয়ের মত নয়, কারণ...

লাইফবয়

ধুলো ময়লার
রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়

L. 62-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সাহসী হবার উপায়

(লেনিন-এর বাল্যজীবনের একটি ঘটনা)

—এন, নেচ্ ভোলোদোভা

প্রতি রাত্রে শুতে যাবার আগে ভোলোদিয়া উলিয়ানোফ যেদিনটি চলে যাচ্ছে তার দিকে কিছুক্ষণ মন দিত। যা কিছু ঘটেছে ওই দিনে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি স্মরণ করত ও আর পরের দিন যা যা করতে হবে ওকে, তার পরিকল্পনা করত। আর তখন এক-আধটুকু "দার্শনিকতা" করতে ভালো লাগত ওর।

এমনই এক রাত্রে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে পাশের ঘরের দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভোলোদিয়া চুপিচুপি দাদাকে ডাকল।

"শাশা, ঘুমুচ্ছ?"

"না। কেন রে?"

"আচ্ছা, বোলোতনিকফ লোকটি কে একটু বলবে?"

"কাল বলব। এখন ঘুমো, রাত হয়েছে।"

"লক্ষ্মীটি দাদা, লোকটি কে শুধু বলে দাও, তাহলেই হবে।"

"বলব। কাল মনে করিয়ে দিস, কেমন? এখন ঘুমোই, আচ্ছা?"

"তুমি আর আনিয়া মিলে কী বই পড়ছিলে, দাদা?"---হঠাৎ আবার ভোলোদিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"এই---উপন্যাস আর-কি," অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল শাশা।

"কী উপন্যাস?"

"কী করতে হবে।"

"সত্যি? আচ্ছা, কী করতে হবে বল তো?"---ভোলোদিয়া জিজ্ঞেস না করে পারল না।

"অনেক, অনেক। অত কথা বলার সময় নয় এখন।"

ভোলোদিয়া তবু নাছোড়বান্দা।---"না। তবু। আচ্ছা, আমাকে দেখে আনিয়া বইটা লুকলো কেন বল তো?"

"কেন?---বইটা নিষিদ্ধ, তাই।"

"নিষিদ্ধ?" ভোলোদিয়া আর থাকতে পারল না। বিছানার ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে উঁচু হল।---"কেন, কেন?"

"দ্যাখ, ভোলোদিয়া, একটু রেহাই দিবি আমাকে? ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

"না—সত্যি, শাশা, বল-না বইটা কেন নিষিদ্ধ?"--ভোলোদিয়া তবু ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

দাদা এবার এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে জবাব দিল, "বইটা জেলখানায় বসে লেখা।"

"সত্যি, সত্যি বলছ? কে লিখেছে বইটা? দাদা, লেখক কেন জেলে ছিল?"

"কারণ, লোকটি সত্যি কথা বলেছিলেন আর কী করে বাঁচতে হয় তাই মানুষকে শিখিয়েছিলেন।"

"ঠিক বলছ? তুমি কি বলতে চাও, এর জন্যে লোককে জেলে পোরা হয়"?

"নিশ্চয়ই। এমন কিছু সত্যি আছে যা নিষিদ্ধ।"

"নিষিদ্ধ কেন?"

শাশা জবাব দিল না।

কিন্তু ভোলোদিয়া অদম্য। প্রশ্ন করল, "আচ্ছা দাদা, লোকটি কি এখনও জেলে আছেন?"

"আজ আঠারো বছর উনি কয়েদীদের শ্রম-শিবিরে আটক আছেন।"

"আ-ঠা-রো বছর! কয়েদীদের শ্রম-শিবিরে টানা আঠারো বছর আটক? লোকটি কে বল তো?"

"চেরনিশেভ্স্কি।"

কৌতূহল দমন করতে না পেরে ভোলোদিয়া ফের খুঁচিয়ে অবস্থাটা বুঝতে চাইল: "ঘুমুচ্ছ, শাশা?"

তারপরই লাফ দিয়ে বিছানা

মহানায়ক লেনিন

"কিন্তু ওরা ভদ্রলোকের সঙ্গে অত নিষ্ঠুর ব্যবহার করল কেন?"

"কেন? কেন---বড় হও', সব জানতে পারবি।"

"আবার ওই কথা। বলছি না, আমি বড় হয়ে গেছি।" হতাশ হয়ে বালিশে ফের মাথা রাখল ভোলোদিয়া।

কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। বড়রা আচ্ছা মজার লোক যা-হোক! যখনই কোন কিছু লুকোনোর দরকার হবে, অমনি ওরা বয়সের খোঁটা দেবে। কী?---না "এখনও সবকিছু জানার বয়স হয় নি," কিংবা "এখনও ধেড়ে ছেলেমানুষ আছ"। যেন ওতেই যা বলার সব বলা হয়ে গেল, বোঝানোর আর কিছু রইল না।

ছেড়ে উঠে এক দৌড়ে দাদার ঘরে ঢুকে বিছানার একধারে জাঁকিয়ে বসল। "লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না দাদা। একটা কথা জিজ্ঞেস করব শুধু।" —দাদার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

"আচ্ছা, জারকে যাঁরা খুন করেছিলেন, উনি কি তাঁদের মধ্যে কেউ?"

"বাজে বকিস না তো। শুতে যা, এখখুনি শুতে যা বলছি।' দাদা ধমকে উঠল। ভোলোদিয়াকে চিন্তাগ্রস্ত দেখাল।

"লোকটি নিশ্চয়ই ভী-ষ-ণ সাহসী আর বেপরোয়া, না শাশা?"

"এক্ষুণি গিয়ে দরজাটা ওদিক থেকে বন্ধ করে দে। দিবি কি না?"

এতক্ষণে ভোলোদিয়া চটল। নিজের বিছানায় ফিরে চলল ও। কিন্তু শাশার ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখে আবার কানে এল শাশার গলা।

"মানুষ যখন ন্যায়-পথে থাকে তখন সে কাউকে ডরায় না। পৃথিবীতে সব চেয়ে জঘন্য পাপ হচ্ছে, ছলনা আর ভীরুতা।" "তাই নাকি? ভারি তাজ্জব কথা তো।" কৌতুহল ফুটিফাটা হবার যোগাড় হয়ে ভোলোদিয়া দাদার ঘরের দরজায় ফাঁকে মাথাটা আবার সেঁধিয়ে দিল। দেখতে পেয়ে শাশা ভাণ করল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মা আসছেন, ওদের গায়ের ঢাকাগুলো ঠিকঠাক করে চাপাচুপি দিয়ে দিতে। অমনি ভোলোদিয়া ঘুমের ভাণ করে পড়ে রইল। ঘরে এসে ওর গায়ের কম্বলটা ঠিক করে দিলেন মা। তারপর নিচু হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন।

"হুঁ, বুঝতে পেরেছি, তুমি একটি ছোট্ট দুষ্টু শেয়াল" বললেন উনি। ভোলোদিয়ার বিছানার কিনারায় বসে ওর এলোমেলো চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটতে লাগলেন। বললেন, "না-না ভুরু কুঁচকে থেকো না। কী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ চটপট বলে ফ্যালো দিকি।" "আমি ভিতু কি না তাই ভাবছি, মা-মণি।"

"সত্যি? তা শেষ পর্যন্ত ভেবে কী ঠিক করলে বলো তো?" মায়ের গলায় কৌতূহলের আভাস।

"ঠিক বুঝতে পারছি না। কখনও মনে হয় ভয় পাওয়া মোটেই উচিত নয়, আবার কখনও কখনও ভীষণ ভয় করে আমার--কেন, তা বুঝতে পারি না। আচ্ছা মা, সত্যি সত্যি সাহসী হতে গেলে কী করা উচিত?"

মারিয়া আলেক্‌সান্‌দ্রোভ্‌না এবার না হেসে পারলেন না।

"যে কেউ ইচ্ছে করলে সাহসী হতে পারে।" উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসল ভোলোদিয়া।

"অ্যাঁ, যে কেউ? কিন্তু সাহসী হওয়া খুব শক্ত নয়?"

"না খোকন। কেবল সব সময়ে সত্যবাদী হতে হবে, এই যা। যদি তুমি বোঝ যে, তুমি ন্যায়পথে চলেছ, তাহলে ককেই বা ভয়, কিসের ভয়? সত্য আর সাহস যেন দুই সহোদর ভাই। তুমি তো জানোই, সত্য আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। সত্য কারোর তোয়াক্কা রাখে না।"

আদর করে ছেলের গালে মৃদু চাপড় দিলেন উনি। "খোকা, আরও জেনে রাখো, ছলচাতুরির মনোভাব থেকেই ভীরুতা আর ভণ্ডামির জন্ম।"

চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইল ভোলোদিয়া। মায়ের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করতে লাগল। অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল ও। তারপর ওঁর হাতের তেলোয় নিজের গালটা চেপে ধরে সগর্বে বলল:

"তোমার কী বুদ্ধি, মা-মণি,---রোসো, সব কথা আমাকে আবার ভালো করে ভেবে দেখতে হবে।"

"বাঃ, এই তো চাই। তবে সব ভাবাভাবি কাল হবে, কেমন? এখন ঘুমোয় দেখি। চোখে চাঁদের আলো পড়ছে, পর্দাটা টেনে দিই, কেমন?"

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সজোরে চোখ বন্ধ করে থাকল ভোলোদিয়া। চোখ বুজিয়েই ও অনুভব করল, মা ওর কপালে চুমো দিলেন তারপর পর্দা টেনে ঘরের জানলাটা বন্ধ করে, শাশার ঘরের দরজা খুলে একবার উঁকি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন উনি।

বিছানায় বহুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে লাগল ভোলোদিয়া, নিজেকে ঘুমোতে বলল বারবার। ঘুম তবু আসতে চায় না কিছুতেই। অবশেষে মনে পড়ল, পরদিন নতুন রাইফেল নিয়ে ওর শিকারে যাওয়ার কথা।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত মরা পাখির মালা পরে শিকার সেরে বাড়ি ফিরতে কী মজা। একদিন ইস্কুলে থেকে ফেরার পথে মস্ত ঢোলা বুটজুতো পায়ে সেই যে শিকারীটির সংগে দেখা হয়েছিল, অবিকল সেইরকম দেখতে লাগবে তখন। শিকারীর সংগে অবিশ্যি প্রকাণ্ড দুইটা কুকুর ছিল। তা নাইবা রইল দুটো মস্ত কুকুর, কী এসে যায় তায়---ওদের পড়শীর কুকুর ভালেতকাকেই তো একদিনের জন্যে ধার নেওয়া যায়। না না, ভালোত্‌কাটা আবার দো-আঁশলা, শিকার ধরতে গিয়ে খেয়েই ফেলবে একেবারে! তাহলে, কী করা যায়? কুকুর ছাড়া তো আর শিকার হয় না, হয় কি? কুকুর নেই সংগে অথচ শিকারীর মতো শিকারী, এমনটা দেখা যায় না।

জোর করে চোখ দুটো খোলার চেষ্টা করল ভোলোদিয়া। কিন্তু জানলায় চাঁদের আলোর চৌকো ফালি লাফিয়ে উঠে ভেসে ভেসে সরে যেতে লাগল। দাদাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করা দরকার, কিন্তু, ভাবনাগুলো হাত ফস্কে পালিয়ে যাচ্ছে, মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যচ্ছে সবকিছু, কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না যে। পাশ ফিরে গালের নিচে একটা হাত রেখে ছোট্ট গভীর শ্বাস ফেলে অতল ঘুমে তলিয়ে গেল ও। এইভাবে সিম্‌বির্‌স্ক ক্লাসিকাল জিম্‌নাসিয়ামের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ভ্লাদিমির উলিয়ানোভের একটি দিন সাংগ হল।

অনুবাদ—মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ভুলে যাওয়ার গল্প

অতীন মজুমদার

আমাদের দেশে ভোলা ধান নামে এক রকমের ধান জন্মায়। কাজে ভুল হলে লোকে বলে ভোলা ধানের ভাত খেয়েছে বলে এ-রকমটি হচ্ছে। জাপানে একরকমের আদা পাওয়া যায়। তার নাম ভোলা আদা। জাপানীদের ধারণা ঐ আদা খেলে মানুষ সব কিছু ভুলে যায়।

জাপানের এক লোভী ধূর্ত হোটেল মালিক মনে মনে ফন্দি আঁটল, ঐ ভোলা আদাকে কাজে লাগিয়ে খদ্দেরদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেশ দু'-পয়সা রোজগার করে নেবে। সে তার এক বিশ্বস্ত সাকরেদের সঙ্গে এই ব্যাপারে পরামর্শও করল। ঠিক হল, সাকরেদটি হোটেলে এমন সব খদ্দের ধরে নিয়ে আসবে, যাদের কাছে যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে। হোটেল মালিক ঐ সব খদ্দেরদের খাবারে ভোলা আদার রস মিশিয়ে দেবে। ফলে তারা হোটেল ছেড়ে যাবার সময় টাকাকড়ির কথা বেমালুম ভুলে চলে যাবে। হোটেল-মালিক তখন সুযোগ বুঝে তাদের ঐ টাকাকড়ি হস্তগত করবে।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ।

একদিন সাকরেদটি বেশ এক শাঁসালো খদ্দের ধরে নিয়ে এসে হোটেল মালিককে চুপি চুপি জানাল, হুজুর, এর আছে মোটা রকমের একটা টাকার থলে আছে। কথাটা শুনেই লোভে হোটেল মালিকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর একটি কামরাতে তার থাকার ব্যবস্থা করে হোটেলের পাচককে ডেকে সে হুকুম দিয়ে দিল, ঐ খদ্দেরের সব খাবারে —ঝালে, ঝোলে, অম্বলে —যেন ভোলা আদার রস মিশিয়ে দেওয়া হয়।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। সাকরেদটি এতদিন ধরে ঐ খদ্দেরটির টাকার থলের দিকে কড়া নজর রেখেছে। খদ্দেরটিও দিব্যি আরামে আছে আর আদার রস মেশান খাবার খেয়ে চলেছে।

একদিন সাকরেদটি হোটেল মালিককে বলল,—হুজুর, অনেকদিন তো হয়ে গেল,—এ যে দেখছি নড়ার নামটি করছে না।

হোটেল মালিক হাসতে হাসতে জবাব দিল,—যাবে কোথায় হে, বাড়ির ঠিকানাটা কি আর মনে আছে? হেঁ হেঁ বাবা, ভোলা আদার গুণে যে সব কিছু ভুলে বসে আছে।

এর বেশ কিছুদিন পর একদিন সাকরেদটি ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল,—হুজুর কামরা খালি, মক্কেল নেই।

তাই নাকি?—লোভী হোটেল মালিকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল সে বলল,—যাও যাও, ওর কামরায় গিয়ে দেখো তো, টাকার থলে ভুলে ফেলে গেছে কিনা?

সাকরেদ ছুটে গেল। তারপর—কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, না হুজুর, টাকার থলে তো দূরের কথা, একটা কুটো পর্যন্ত ফেলে যায় নি।

এঁ্যা, সে কি?—কপাল চাপড়ে হোটেল মালিক এবার চীৎকার করে উঠল,—হায় হায় হায়। এতদিন ধরে কি তবে খাওয়ালাম, কি রকম ভোলা আদা,—কিছুই তো ভুলল না। হায় হায়।

সাকরেদটি বেশ একটু হকচকিয়ে গেল মালিকের এই অবস্থা দেখে। সে আমতা আমতা করে বলে উঠল, কেন হুজুর, ভোলা আদার গুণ ত' ঠিকই ফলেছে। যাবার সময় ও তো ঠিকই ভুলে গেছে হুজুর একটা কথা—

মানে?—অবাক হয়ে হোটেল-মালিক প্রশ্ন করে—কি, কি কথাটা ভুলে গেছে?

সাকরেদটি জবাব দিল,—আজ্ঞে হুজুর, আপনার হোটেলের বিলের পাওনা টাকাটা মিটিয়ে যাবার কথাটা, ভোলা আদার গুণ-হুজুর, না ফলে উপায় আছে। *

* জাপানী উপকথা অবলম্বনে

নানা দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

স্বপনবুড়ো

এই সব সাহিত্যসভায় গিয়ে আমরা লেখকদের চেনবার চেষ্টা করতাম। আমাদের একটা দল জুটে গিয়েছিল, কাজেই দলবদ্ধভাবে গিয়ে সভার একান্তে বসে লেখক চেনার ধাঁধার জবাব দিতে চেষ্টা করতাম। কে প্রভাত মুখুজ্জে, কে সত্যেন দত্ত, কে সৌরীন মুখোপাধ্যায়, কে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—এই সব খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতাম। দেখা যেত, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের অধিকাংশক্ষেত্রেই মিল ছিল না। তবু আমাদের উৎসাহের কিছুমাত্র কমতি ছিল না।

এক কবির কবিতা শুনে মনে করলাম, ইনি নিশ্চয়ই সত্যেন দত্ত। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল—সত্যেন

[illegible] এ সভাতে আদপেই আসেন নি।

কবি নরেন্দ্র দেব সেই সময়ে ভারতবর্ষ কাগজে নানা দেশের খবর-বার্তা প্রকাশ করতেন। আমরা ভাবতাম, এই কবি সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নরেন্দ্র দেব কখনো বিশ্ব ভ্রমণে বহির্গত হন নি। অবশ্য বহুকাল পর পরিণত বয়েসে তিনি স্ত্রী রাধারাণী দেবী ও কন্যা নবনীতাকে নিয়ে ভুবন-ভ্রমণে সাত সাগর পার হয়ে গিয়েছিলেন।

লেখক চেনবার একটা সহজ পথ আমরা পরে আবিষ্কার করেছিলাম।

বারোয়ারী উপন্যাস বলে একটি উপন্যাস পরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বারোজন সাহিত্যিক বারোটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদ সুরু হবার মুখে সেই লেখকের একটি করে ফটো বইটিতে ছাপা হয়েছিল। আমরা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে গিয়ে ফটোর সঙ্গে বক্তার চেহারার মিল আছে কি না দেখবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই আমরা সফলকাম হতে পারি নি।

কারণ, তখনকার দিনে যাঁরা লেখনী চালনা করতেন—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সাহিত্যিকই সভা-সমিতি এড়িয়ে চলতেন। তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে সাহিত্য সৃষ্টি করতে ভালো-বাসতেন।

আর একটি নেশা আমাদের পেয়ে বসেছিল—সর্বভারতীয় নেতারা তখনকার দিনে প্রায়ই কলকাতায় আসতেন এবং কোথাও-না-কোথাও তাঁদের বক্তৃতা শোনা যেত। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, কলেজ স্কোয়ারে কিম্বা বিডন স্কোয়ারে সাধারণত এই জাতীয় রাজনৈতিক সভা আহ্বান করা হত।

সেটা ছিল—লাল - বাল - পালের গৌরবময় যুগ।

লালা লাজপত রায় - বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল। এই তিন বক্তা সারা ভারতের এক ডাকে চেনা নেতা ছিলেন।

লালা লাজপত রায় পঞ্জাব কেশরী, বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রের [illegible] বিপিনচন্দ্র পাল বাংলা দেশের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন।

কতদিন যে আমরা দল বেঁধে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক - কলেজ স্কোয়ার আর বিডন স্কোয়ার ধাওয়া করতাম তার লেখাজোখা নেই।

শ্যামসুন্দর গোস্বামী কলেজ স্কোয়ারে প্রায়ই বক্তৃতা করতেন। কথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলেন এই শ্যামসুন্দর গোস্বামী। তিনি ইংরেজীতে "সার্ভেন্ট" কাগজ প্রকাশ করেছিলেন। এই সংবাদপত্রটি সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

আর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি প্রতিদিন কলেজ স্কোয়ারে বেদের গল্প বলতেন। তাঁর নামটা আজ আর মনে পড়ছে না। কিন্তু তাঁর বেদের ব্যাখ্যা শোনবার জন্যে বহু বৃদ্ধের সমাগম হত, সে-কথা মনে আছে।

আর একজন কথকের কথা মনে পড়ে। তিনি অতি সুন্দর রূপকথা আর কাহিনী বলতে পারতেন। গল্প কি করে রসিয়ে জমিয়ে দিতে হয় সে আর্ট তাঁর বিলক্ষণ জানা ছিল। এক-একটা গল্প সুরু হলে এক মাস ধরে চলত। তাঁর মুখের রূপকথা শোনবার জন্যে প্রত্যহ বিকেলে ও সন্ধ্যায় অনেক লোকের ভিড় হত। গল্পের আকর্ষণ এমনই ছিল যে, একবার শুনতে আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত না শোনা পর্যন্ত মনে এতটুকু স্বস্তি থাকত না। ফলে প্রত্যহই তাঁকে গল্প শুনতে আসতে হত।

ভাষার কারুকার্যে, ভাবের অভি-ব্যক্তিতে আর মজাদার ছড়া কেটে তিনি অল্প সময়ের ভেতরই শ্রোতার অন্তর জয় করে নিতে পারতেন।

এই কথকের গল্পের আকর্ষণে আমি বহু দিন শ্যামবাজার থেকে হেঁটে হেঁটে কলেজ স্কোয়ারে চলে যেতাম।

আমার কিশোর জীবনে এই গল্প বলার কথক মনে এমন একটা অনবদ্য আমেজ এনে দিয়েছিলেন যে, কোনো দিনের তরেও তা ভুলতে পারি নি। আজ স্বপনবুড়ো রূপে যখন ছোটদের কাছে নানা জায়গায় গল্প বলে তখনও সেই ছেলেবেলার কথক আমার অন্তরে ভেতরে ভেতরে প্রেরণা সঞ্চার করেন কি না বলা শক্ত।

সত্যি কথা বলতে কি, গল্প বলার আর্ট অথবা কৌশল আমি সেই কলেজ স্কোয়ারের কথকের কাছ থেকেই আয়ত্ত করেছিলাম। অবশ্য ছেলেবেলায় রূপকথা প্রথম শুনেছি—দাদী, মাসি আর আমাদের পাচক বামুন আত্মারাম ঠাকুরের কাছে। তাদের কথা আমি "স্বপনবুড়োর শৈশবে" ছোটদের কাছে বলেছি। জীবনের প্রথম প্রত্যূষে ওরাই আমাকে রূপকথা শুনিয়েছে।

এই বয়েস থেকেই আমার গল্প শোনা আর গল্প লেখার দিকে ঝোঁক বেড়ে গিয়েছিল।

প্রথমে আমি শুধু কবিতা লিখতাম। তারপর মনে হল,—শুধু কবিতা লিখে কিছু হবে না। ধীরে ধীরে গল্প লেখাটাও শিখে নিতে হবে। তারই ফলে আমি আপনমনে ছোট ছোট গল্প লিখতে সুরু করি।

উদ্যমের অভাবে আমাদের হাতের লেখা পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল বটে, তবে আমাদের মগজে সাহিত্যের যে বীজ অজান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা থেকে ধীরে ধীরে অঙ্কুর আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করল।

রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটাই বার বার মনে হয় যে, সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়, একবার ধরলে আর ছাড়ান নেই।

কলকাতায় এসে আমি যে পাড়ায় প্রথম ছিলাম, সেই কাশী ঘোষ লেনে, সেখানে আমার একটিও বন্ধু জোটে নি। আশে পাশে যে-সব প্রতিবেশী ছিলেন—তাঁরা একেবারে খাঁটি কলকাতার লোক। নিজেদের নিয়েই তাঁরা মত্ত থাকতেন। যাকে বলে, প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত।

তা ছাড়া আরো একটি অসুবিধে ছিল, আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে

আমার বয়েসী কোনো ছেলে ছিল না। থাকলেও তারা এই বাঙাল ছেলেটির সঙ্গে মিশত কিনা সন্দেহ।

আমি তেতলার জানলা থেকে আমার নিকটতম প্রতিবেশীদের জীবন-যাত্রা প্রণালী লক্ষ্য করতাম। ওরা সকালে উঠেই গামছা পরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করত। এটা তখন আমাদের কাছে লজ্জার বিষয় ছিল। সব সময়ই আমরা তখন ধুতি পরতে অভ্যস্ত ছিলাম। রাত্তিরের ভোজনটা ওদের আরো অভিনব বলে মনে হত।

নিজেদের মেঝেকে ওরা তক্-তকে করে মুছে নিত। সেই মেঝেটাকেই ওরা থালা হিসেবে ব্যবহার করত। রুটি, শুক্‌নো আলুর দম, বেগুন ভাজা চাট্‌নী ইত্যাদি দিয়ে রাত্তিরের খাবার শেষ করত। আর সেজন্যে কোনো আলাদা বাসন-পত্রেরই ব্যবহার বিধির চলন ছিল না। আমরা কলকাতায় এসে তখনো আটার রুটি খাওয়া অভ্যেস করি নি। বাঙালদের দু'বেলাই ভাত চাই। তাই কলকাতার ঘটিদের এই অভিনব নৈশ-ভোজন প্রণালী দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। খুব কম খরচে, কম কাপড়ে আর কম খাদ্যে কি করে সংসার চালানো যায় প্রতিবেশীদের জীবন-যাত্রা প্রণালী দেখে আমরা তা হৃদয়-ঙ্গম করবার চেষ্টা করতাম।

এই পাড়ায় আমি যতদিন ছিলাম —একেবারে বন্ধু ও সঙ্গী-সাথীহীন অবস্থায় জীবন-যাপন করেছি। কারণ চেষ্টা করেও এই পাড়ায় কোনো সমবয়েসী বা খেলার সাথী জোটাতে পারি নি।

কলকাতায় এসে রোজকার খাওয়ার ব্যাপারে যে বস্তুটির অভাব বোধ করেছি বহুকাল—সেটি হচ্ছে দুধ। আমি একেবারে পূর্ব বাংলার খাঁটি বাঙাল ছেলে।

অতি শৈশব অবস্থা থেকে দুধের ওপরই মানুষ হয়েছি। আমার দিদিমা চিরকাল ঘন দুধ অথবা ক্ষীর—তাও বাটি ভর্তি খাওয়াতে ভালোবাসতেন। দুধের তৈরি সব রকম খাদ্যের ওপর আমার অসীম আসক্তি—সে কথা আমার দিদিমা ভালো রকমই জানতেন। তাই তিনি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় রসিকতা করে বলতেন, 'ধলা দিব্য না অইলে অই খলাটার খাওয়ন অয় না।"

দিদিমা অনেক সময় ছানা কেটে আমাকে ছানার পায়েস তৈরি করে বাটি ভর্তি এনে দিতেন। সে সব সুখের দিনের কথা এখন এই বৃদ্ধ বয়েসে মনে পড়ে। এ ছাড়া সন্দেশ, চন্দ্রকান্ত ক্ষীর পুলি, পানতুয়া, মালপো প্রভৃতি বহুবিধ মুখরোচক খাদ্য বাড়িতেই তৈরি হত।

সেই দুধের রাজ্যি ছেড়ে কল-কাতায় এসে শুধু কাঁদতে বাকি রেখে-ছিলাম। [ক্রমশ।

খোকনের ভাবনা

নিতাই ঘোষ

ছাড়লো গাড়ী সোনারপুরে
যাচ্ছে কতদূরে
দুপুর বেলা বেজায় গরম
কাটফাটা রোদ্দুরে
বাজত না বাঁশী পেরিয়ে গেছে
চাঁদমারির ঐ মাঠ
কালকেপুরের খাল পেরলেই
মাতলা নদীর হাট।
মাঝখানেতে পড়ে গেছে
চম্পাহাটির মাটি
ভাবছে খোকন জীবনটা তার
ষোল আনাই খাঁটি
এমন ভরো চললে পরে
কেমন মজা হবে
থামবে কখন জীবন গাড়ী
দিন ফুরবে কবে।

রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ

স্বর্গত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম ঈশান-স্কলার, ইংরাজি সাহিত্যে ডক্টরেট, আবার বাংলা সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক, বিশিষ্ট বাগ্মী এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ১৬ই ফাল্গুন শনিবার তাঁর কলকাতার ৫১, সাদার্ন এভেনিউ-স্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

বীরভূম জেলার হাতিয়া গ্রামে ১৮৯২ খৃস্টাব্দের ২৩শে মার্চ তাঁর জন্ম হয়। ১৯১০ খৃস্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ হতে ইংরাজিতে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ইংরাজি অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্য ঈশান স্কলারশিপ পান। তাঁর পূর্বে ইংরাজিতে আর কেউ ঈশান স্কলারশিপ পান নি। ১৯১২ খৃস্টাব্দে তিনি ইংরাজিতে এম-এ পরীক্ষায় আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

এম-এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ১৯১২ সালের জুলাই মাসে তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন এবং পরীক্ষার ফল বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ২৩ বৎসর, তখনই তাঁকে স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে পড়াবার জন্য আহ্বান জানান। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে তিনি ইংরাজি সাহিত্যের রোমান্টিক কবিতার ওপর গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসূচক ডক্টরেট (Ph. D.) উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর এই গবেষণা গ্রন্থখানি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাকে একটি কাহিনী বলেন, তা এখানে উল্লেখ করছি।

সন্তোষকুমার দে

(সম্পাদক: রবিবাসর)

তাঁর একজন ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম-এ পাশ করবার পর উচ্চতর শিক্ষালাভের পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে ইংরাজি সাহিত্যের অনুশীলনে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্পর্কে কোন নতুন মন্তব্য লেখায় তাঁর অধ্যাপক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন -- এই সিদ্ধান্ত তিনি কোথায় পেলেন। বাঙ্গালী ছাত্রটি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেন। তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলেন, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোমান্টিক কবিতার বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থ তিনিও পড়েছেন এবং ঐ গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হতে আনিয়ে দেখান, ডঃ শ্রীকুমারের গবেষণা ইংলণ্ডের অধ্যাপকমণ্ডলী কত যত্নের সঙ্গে পড়েছেন। বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নানা স্থানে দাগ দেওয়া এবং মন্তব্য লেখা ছিল।

এই ঘটনা ইংলণ্ড হতেই সেই বাঙালী ছাত্রটি ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। একজন বিদেশী সমালোচকের গভীর গবেষণাও যে ইংরাজ পণ্ডিতগণ কিরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাতেই প্রমাণিত হয়, শ্রীকুমারের সাহিত্য-জ্ঞান এবং ইংরাজি ভাষার ওপর অধিকার কত গভীর ছিল।

দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সি কলেজ, রাজশাহী কলেজ প্রভৃতি স্থানে সরকারী চাকুরী করবার পর তিনি ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রধান অধ্যাপক পদে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এই পদে তিনি ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, ডীন অব দি ফ্যাকালটি অব আর্টস, কাউনসিল অব পোষ্ট - গ্রাজুয়েট স্টাডি ইন আর্টস (ইংরাজি) বিভাগের সভাপতি প্রভৃতি অত্যুচ্চ সম্মানের পদে আসীন ছিলেন, রাজ্য বিধানসভার সদস্য হিসাবেও তিনি একবার নির্বাচিত হন। তাছাড়া ব্রতচারী সংঘ, নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স এসোসিয়েশন, রেলওয়ে ইউজার্স কমিটি, ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন, প্রভৃতি নানা সংস্থার সঙ্গে তিনি নানা পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যালামনি এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে তিনি কিছু গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। এ ব্যতীত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কলকাতা শাখার সভাপতি এবং বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। কয়েকবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিভাগীয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এ ব্যতীত দূর দূর স্থানে, এমন কি সুদূর গণ্ডগ্রামেও তিনি নানা সভা-সমিতির আমন্ত্রণে সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম

প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে মূল্যবান ভাষণে সকলকে চিরদিন তৃপ্ত করেছেন।

কিন্তু তাঁর অতি আপনার এবং প্রিয়তম প্রতিষ্ঠান ছিল—'রবি-বাসর'। এই সাহিত্য প্রতিষ্ঠানটি ১৩৩৬ সালে ভারতবর্ষ - সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায় প্রথমাবধিই রবি-বাসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও রবি-বাসরের সঙ্গে যুক্ত হন এবং রবি-বাসরের "অধিনায়ক" পদে বৃত হন। আমরণ তিনি রবি-বাসরের সঙ্গে এই প্রীতির সম্পর্কটুকু বজায় রেখে ছিলেন। এমন কি, শান্তিনিকেতনেও রবি-বাসরের অধিবেশন ডেকেছিলেন।

'রবি - বাসর' বাংলা দেশের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য সভা, তাই প্রথমাবধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকবর্গ এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আচার্য শ্রীকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে ছিলেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর মহাশয়। জলধর সেনের মৃত্যুর পর তিনিই রবি-বাসরের প্রধান অর্থাৎ সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং সুদীর্ঘ ২৬ বৎসরকাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর বিজন-বিহারী ভট্টাচার্য, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, সিনেট সদস্য, সাংবাদিক ও সংসদ সদস্য চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, কাউন্সিল - সদস্য সুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়, সাংবাদিক অশোককুমার সরকার এবং লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবি-বাসরের সদস্য আছেন।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথের আহ্বানে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা কালেই আচার্য শ্রীকুমার সাধারণ সদস্য হিসাবে রবি-বাসরে যোগদান করেন। পরে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং নরেন্দ্রনাথ বসুর পর ১৩৭০ সালের ৭ই বৈশাখ শ্রীকুমার রবি-বাসরের চতুর্থ সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এই গৌরবময় পদে তাঁর সাত বৎসর পূর্ণ হতে আর মাত্র দু মাস বাকি ছিল।

তাঁর পরিচালনা-গুণে 'রবি-বাসরের' প্রতিটি অধিবেশন অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। কলকাতায় উপস্থিত থাকলে এবং শরীর সুস্থ থাকলে তিনি রবি-বাসরের পক্ষান্তে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে অবশ্যই উপস্থিত হতেন এবং যে সকল বিষয় পঠিত বা আলোচিত হত, সভাপতির ভাষণে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। এ জন্য তাঁর মন্তব্য যেমন সারগর্ভ হত, তেমনই হত সকল সদস্যের পক্ষে একান্ত আগ্রহের।

রবি-বাসরের কয়েকটি বিশিষ্ট অধিবেশনের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। প্রবীণ এডভোকেট কেশবচন্দ্র গুপ্তের ভবনে অনুষ্ঠিত রবি-বাসরে সেক্সপীয়রের চতুঃ শততম জন্মবার্ষিকী উৎসবে মূল বক্তা ছিলেন আচার্য শ্রীকুমার। কেশবচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে শ্রীকুমার সেদিন সেক্সপীয়র সম্পর্কে ভাষণে একটিও ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ না করে প্রায় দু ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। উপস্থিত বিদ্বজ্জন অবাক বিস্ময়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীকুমারকে যেন আবার নতুন করে ফিরে পেলেন।

গত বৎসর লেডী রাণু মুখার্জির আহ্বানে অনুষ্ঠিত রবি-বাসরে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ৮০তম জন্মদিবস পালিত হয়। তাতে আচার্য শ্রীকুমারের আহ্বানে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রমেশচন্দ্র ও শ্রীকুমারের সমসাময়িক ছাত্রগণ যেন একত্র মিলিত হন—এমনই এক আনন্দের হাট বসে। রমেশচন্দ্রের অগণিত ছাত্র - যাঁরা আজ প্রখ্যাত অধ্যাপক, তাঁরাও এই গুরুজন সমাবেশে মুগ্ধ হন। সেদিন আচার্য শ্রীকুমারের ভাষণে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।

তিন বৎসর আগে এই মার্চ মাসেই আমরা রবি-বাসরে শ্রীকুমারের ৭৫-তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করি। তিনি তাতে যেরূপ গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজনকে গ্রহণ করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। তাঁর অন্তরের কথাই তিনি স্পষ্ট অক্ষরে লিখে রেখে গেছেন —'রবি-বাসর' নামক গ্রন্থখানির "আমাদের রবি-বাসর" নামক প্রবন্ধটিতে। বাংলা দেশের সাহিত্য সভার ইতিহাস যদি কোন দিন লিখিত হয়, সেদিন তাঁর এই প্রবন্ধটি গবেষকদের প্রভূত মূল্যবান উপাদান যোগাবে।

পরিণত বয়সেই আচার্য শ্রীকুমার

ছবিতে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অশোককুমার সরকার, লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার দে প্রমুখ।

পরলোকগমন করেছেন। তিনি ছিলেন পরম ভক্ত এবং ভগবদ্‌বিশ্বাসী। আমরাও একান্তভাবে বিশ্বাস করি, তিনি তাঁর সাধনোচিতধামে পরম শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছেন। আমরা তাঁর একান্ত অনুরাগী রবি-বাসরের সদস্য ও গুণগ্রাহিগণ চিরদিন তাঁকে স্মরণ করব। স্মরণ করব শুধু তাঁর গবেষণামূলক বিবিধ অমূল্য ইংরাজি এবং বাংলা গ্রন্থরাজির জন্যই শুধু নয়, স্মরণ করব মানুষ শ্রীকুমারকে, সেই মিষ্টভাষী, সহৃদয়, স্নেহপ্রবণ, উদার মানুষটিকে, যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় এই অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যসেবী মাত্রেই নানাভাবে পুষ্ট ও উপকৃত হয়েছেন। তিনি তো কেবল সাহিত্যের সমালোচক ছিলেন না, ছিলেন দিগ্‌দর্শক। তাই তাঁর শূন্য আসন সহজে পূর্ণ হবার নয়।

হংসেশ্বরী

কলকাতার লোকেরা যাঁরা চিড়িয়াখানা, যাদুঘর কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—আর না হয় বড় জোর দক্ষিণেশ্বর ঘোরার—একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেয়ে কাছাকাছি অন্য কোথাও যেতে চান, তাঁদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপনি ইচ্ছে করলেই শীতের কুয়াসা-ভরা সকাল থেকে সুরু করে দুপুরের উপভোগ্য মিষ্টি রোদ আর সব শেষে মনোরম বিকেল কাটিয়ে আবার সন্ধ্যার ট্রেন ধরে কলকাতা চলে আসতে পারেন।

আপনি যদি এরকম অনাবিল আনন্দের স্বাদ উপভোগ করতে চান, তবে যে-কোন ছুটির দিনে চলে আসুন বাঁশবেড়িয়ায়। কলকাতা থেকে বেশী দূরের পথ নয়। ট্রেনে আসতে মাত্র এক ঘণ্টা লাগে।

সম্ভবত এককালে বাঁশের জন্য বিখ্যাত এবং নীল চাষের ক্ষেত্র-ভূমি (১) এই বাঁশবেড়িয়া নানা দিক দিয়েই স্মরণীয় স্থান। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' বাঁশবেড়িয়া সম্বন্ধে লিখেছিলেন :—

পরিপাটী বংশবাটী (২) স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর।
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।

১। দীনবন্ধু মিত্র সম্ভবত: এই বাঁশবেড়িয়ার পটভূমিকায় 'নীলদর্পণ' রচনা করেন।

২। বংশবাটী বাঁশবেড়িয়ার প্রাচীন নাম।

এই স্থানে জন্মেছিল শ্রীধর রত্তন
কথককুলের হেতু কাঞ্চনবরণ।
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয়।

বাঁশবেড়িয়াতেই আছে সেই বিখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির। যার জুড়ি বাংলা দেশে অপরটি নেই এবং বলা হয় ভুবনেশ্বরের মন্দিরও এর কাছে হার মানে।

মাণিক ঘোষাল

বাঁশবেড়িয়া স্টেশন থেকে দশ কি পনের মিনিট হাঁটা-পথ পেরিয়েই হংসেশ্বরী মন্দির। স্টেশন থেকেই এর সু-উচ্চ চূড়া দেখা যায়।

অপূর্ব এই মন্দিরটি নির্মাণে যদিও নৃসিংহদেব রায়ের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা ছিল সর্বাধিক কিন্তু তাঁর জীবিতকালে মন্দিরটি নির্মাণ শেষ হয় নি। তাঁর সাধ্বী স্ত্রী রাণী শংকরী দেবী (৩) মন্দির নির্মাণ সুসম্পন্ন করান —১৮১৪ খৃীস্টাব্দে।

৩। কালীঘাটে কালীশঙ্করী লেন তাঁরই নামানুসারে।

চতুর্দিকে খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং গাছপালা শোভিত এই মন্দিরের সংলগ্ন রাজবাড়ী থেকেই এককালে হানাদার বর্গীদের আক্রমণ রোখা হতো। বলাই বাহুল্য, সেকালের বহু আশ্রয়হীন উৎপীড়িত ও ভীতসন্ত্রস্ত অসহায় নর-নারী এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল।

শোনা যায়, বাইরের সাথে এখানকার যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাঠের পুল ব্যবহার করা হতো। তবে সন্ধ্যার পর সে পুল তুলে নেওয়া হতো। খাল পেরোলেই সিংহদ্বার। তারপর ডানদিকে একটু এগোলেই মায়ের মন্দির।

ইঁট, পাথর এবং নিমকাঠের তৈরী নীল রং-এর এই মন্দিরটি আজও বহু দর্শনার্থীর দ্রষ্টব্য স্থান।

পঞ্চতলা এবং ত্রয়োদশ মিনার বিশিষ্ট এই মন্দিরটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল পাঁচ লাখ টাকা।

মন্দিরটি ঘিরে চারিদিকে বহু শিবলিঙ্গও স্থাপিত হয়েছিল। মন্দিরের উপরতলাগুলিতে গোলকধাঁধার ব্যবস্থা ছিল যাতে চট করে কোন অচেনা বা শত্রুপক্ষের লোকের পক্ষের উপরে উঠা সম্ভব না হয়।

মন্দিরের মাঝে সুড়ঙ্গ পথ ছিল। ওই সুড়ঙ্গ পথ গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মিশেছিল। শোনা যায় গঙ্গার ঘাটে অহরহই বজরা বা নৌকা বাঁধা থাকতো। কোন কারণে বিপদ হলে রাজবাড়ীর বিশেষত অন্তঃপুরস্থ লোকেদের পলায়নের ওটাই ছিল সহজতম পথ। বর্তমানে সুড়ঙ্গটি নষ্ট হয়ে গেছে।

একবার এই মন্দিরের দেবী হংসেশ্বরীর অলঙ্কারাদি চুরির ঘটনাও

প্রকাশিত হয়েছিল ১২২৬ খৃস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে।'

চুরি।—মোং বাঁশবেড়িয়াতে নৃসিংহ দেবরায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অলঙ্কার দুই-তিন হাজার টাকার স্বর্ণ রৌপ্যাদি দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত অমাবস্যার রাত্রিতে পূজাবসানকালে তাঁহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে। তাহার তদারক অনেক হইতেছে (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২০)।

হংসেশ্বরী মন্দিরের সংলগ্ন বাসুদেবের মন্দিরটি আরও আকর্ষণীয়। রামেশ্বর রায় ১৬৭৯ খৃস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। বাসুদেবের মন্দিরে পোড়ামাটিতে আঁকা হিন্দুদিগের নানা দেবদেবীর মূর্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী এই হংসেশ্বরী মন্দিরের কালী-প্রতিমা 'জাগ্রতা' বলেই এখানকার অধিবাসীরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। শুধু তাই নয়, এই বিশ্বাসে আস্থা রেখেই দূর-দূরান্তর থেকে মানুষেরা এখানে ছুটে আসে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কারের অভাবে দুটি মন্দিরই বর্তমানে অবহেলিত অবস্থায় দিন দিন জীর্ণ ও দৈন্যতর হচ্ছে।

এই দর্শনীয় অমূল্য স্থানটিতে শীতের মরশুমে উৎসাহী যুবকরা দল বেঁধে পিকনিক করতে ছুটে আসে। কিম্বা বড়দিনের ছুটিতে দর্শনার্থীদের ভিড়ে সারাটা এলাকা সরগরম হয়ে উঠে।

তারপর।

আবার সেই নৈঃশব্দের রাজত্ব ফিরে আসে। নীরব যন্ত্রণায় গোটা এলাকাটা যেন হাহাকার করে।

সরকারের উচিত এদিকে দৃষ্টি দেওয়া। হংসেশ্বরী মন্দিরকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং আকর্ষণীয় করে তোলার দায়িত্বও সরকারেরই। রাজ্যের টুরিস্ট বিভাগও এদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। কলকাতা থেকে অনায়াসে একদিনের মধ্যে চুঁচুড়া, ইমামবাড়া, ব্যাণ্ডেল চার্চ, হংসেশ্বরী মন্দির, গাঁজীর দরগা এবং অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখানো চলে।

আশা করি, এদিকে সবাই নজর দেবেন।

শিশুর রোগশয্যায়

শিশু অসুস্থ হলে ডাক্তার যখন তাকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে উপদেশ দেন, তখন বেশীর ভাগ মা-ই পড়ে যান দুশ্চিন্তায়। বাচ্চার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার সঙ্গে এ ভাবনাও তাঁদের মনে উঁকিঝুঁকি দেয় যে কাজটি আদৌ সম্ভবপর কিনা। উত্তরে বলা যায় এটি যে কোন মায়েরই অবশ্যকর্তব্য, যে করেই হোক না কেন, এ কাজে তাঁকে সফল হতেই হবে, নচেৎ শুধু অসুস্থ শিশু নয়, সমস্ত সংসারটাই এক বিশ্রী অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে এসে পড়ে।

শিশু চিকিৎসকের মতে অসুস্থ শিশু যত বেশী বিশ্রাম পায় তত তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

অবশ্য একথা কোন মা ভাবতে পারেন যে ছটফটে বাচ্চাকে সমস্তক্ষণ বিছানায় শুইয়ে রাখতে বলাটা বড় সহজ কাজ তত সহজ নয়, কারণ সদা চলমান শিশু হঠাৎ বিছানায় বন্দী হলে প্রতিবাদ জানাবেই। কেন তাকে আটকে রাখা হচ্ছে এ কথাটা বোঝা তার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নয়।

বাচ্চা যত সজীব প্রাণচঞ্চল হয় মায়ের পক্ষে ডাক্তারের নির্দেশ পালন করাটা ততই কঠিন। খুব আনন্দময় স্বভাববিশিষ্ট শিশুও এমতাবস্থায় বিদ্রোহী হয়ে উঠতে বাধ্য, আর তখনই বেচারী মা পড়ে যান বিপদে।

সংসারের সহস্র রকম কর্তব্যের চাপে পীড়িতা মা অসুস্থ শিশুর মনোরঞ্জন করতে করতে হয়ে ওঠেন শ্রান্ত ও বিচলিত। অথচ স্বভাবত শিশু পরিবর্তন-কামী, দৈনন্দিন বাঁধা রুটিনের জীবন-যাত্রায় কিছুটা রদবদল ঘটলে সে বিরক্তির পরিবর্তে আনন্দই অনুভব করে। তবে প্রত্যেক শিশুই চায় মা তার দিকে একটু বেশী নজর দিন।

"প্রত্যেক মায়েরই উচিৎ দিনের মধ্যে খানিকটা সময় শিশুর জন্য একেবারে আলাদা করে সরিয়ে রাখা, সে সময় আর কিছুতেই মন না দিয়ে শিশুর সঙ্গে খেলা করে, তাকে গল্প বলে বা গল্প পড়ে শোনালে সে উপলব্ধি করে যে মায়ের কাছে তার একটা বিশেষ দাবী আছে, শিশুচিত্তের প্রসারের পক্ষে এই উপলব্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয়। মায়ের পক্ষেও এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক, কারণ এর ফলে ওই নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময় শিশু মাতৃসঙ্গের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হয় না। যার ফলে সংসারের অপরাপর কাজ কর্ম সারতে পারেন মা সহজেই। এই ধরনের বাঁধা একটা সময়ে সম্পূর্ণভাবে মায়ের সঙ্গ পেলে শিশুর আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়" বলেছেন এক খ্যাতনামা শিশু চিকিৎসক—"তবে অত্যধিক মনোযোগের প্রভাবও শিশু-চিত্তের পক্ষে খুব শুভ নয়, এর ফলে শিশু স্বার্থপর হয়ে ওঠে ওই মনোযোগটা তার স্বতঃসিদ্ধ পাওনা হিসাবে গণ্য করে, ফলে কোন সময়ে মায়ের পক্ষে ওটা দেওয়া সম্ভবপর না হলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে।" অসুস্থ শিশুকে কোন না কোন রকমে ভুলিয়ে রাখাটা খুবই কঠিন, অথচ এটাই তার সেরে ওঠার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অবশ্য একটু বড় হলে ছবিওলা গল্পের বইটই দিয়ে তাকে বিছানায় রাখা যায়, কিন্তু একেবারে বাচ্চাদের তো আর সেভাবে রাখা যায় না। কিছু খেলনা পুতুল বা মায়ের বা আর কারুর মুখে গল্প শোনাটাই তার রোগশয্যার একমাত্র অবলম্বন।

অসুস্থ শিশু যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই তার মা বা অপর কোন প্রিয়জনকে কাছে ধরে রাখতে চায়, অভিভাবকদের পক্ষে এটা একটা বড় রকমের সমস্যা। [illegible] শিশুকে এমন কোন জায়গায় স্থানান্তরিত করা উচিৎ, যাতে সে সর্বদা আশেপাশে মা এবং বাড়ীর অপরাপর লোকজনের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারে। তাছাড়া খোলা জানালার পাশে তাকে রাখা [illegible] রঙের [illegible], লোকজনের বাইরের দৃশ্য তার মনকে ভুলিয়ে রাখতে বেশ বড় রকমের সহায়ক।

চারদিকে খেলনা নিয়ে খেলা করতেও শিশু খুবই ভালবাসে, কাজেই অসুস্থতা সত্ত্বেও সে যদি বিছানায় উঠে বসে খেলা করতে চায়, তবে তাকে তা করতে দেওয়াই মঙ্গলজনক।

এক খেলনা নিয়ে খেলা করতে চায় না শিশু বেশীক্ষণ, শিশুমন চির-দিনই নতুনত্বের পূজারী, সেজন্য নানা ধরণের খেলনা দেওয়া দরকার, সেগুলির মূল্য কম হলেও কোন ক্ষতি নেই, বৈচিত্র্য থাকলেই হল। এবং এক সঙ্গে সব খেলনা তাকে না দিয়ে কিছু কিছু করে দেওয়াই উচিৎ, তাতে তার মন বহুক্ষণ পর্যন্ত নবীনত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। রোগশয্যার খেলনা নির্বাচন করতেও হবে সাবধানে, টেড্ডী, বিয়ার বা বড় পুতুলের প্রতি এ সময় শিশুর একটু আকর্ষণ জন্মাতে দেখা যায়, কারণ তার কল্পনা-প্রবণ মন ওগুলিকে রোগশয্যার সঙ্গী হিসাবে সহজেই মেনে নিতে পারে।

ছবি আঁকাটাও অধিকাংশ শিশুরই খুব প্রিয় ব্যসন, একটা রঙীন পেন্সিল ও কাগজ নিয়ে আঁকিবুঁকি কেটে তারা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিতে পারে, রোগ-শয্যার পাশে এদুটি বস্তুর জোগান দেওয়াটাও তাই মা-বাবার অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। নানাভাবে শিশুর মনকে প্রমোদিত করতে পারার মধ্যেই নিহিত আছে তার সুস্থতার সম্ভাবনা, রোগশয্যায় তার মন যত প্রফুল্ল থাকে ততই তাড়াতাড়ি সে সেরে ওঠে, এবং ওষুধ-পথ্যের চেয়ে এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই কর্তব্যের প্রতি বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে শিশুর মাকেই, কারণ অসুস্থ শিশুর ঝামেলা পোয়াতে হয় প্রধানতঃ তাঁকেই।

একটু মাথা ঘামালেই শিশুর রোগশয্যাকে মনোরম করে তুলতে পারেন তার মা বা অপরাপর অভি-ভাবকেরা এবং তাতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবেন তাঁরাই।

—রেবা দেবী

সাহিত্য পরিচয়

রহস্যকুহেলি / আনন্দ পাবলিশার্স।

অলৌকিক বা অতিলৌকিকের উপর মানুষের একটা দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ আছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন না তুলেও বলা যেতে পারে যে, চেনা-জানার জগতের বাইরে একটি রহস্যময় অস্তিত্বের জগৎ কল্পনায় মানুষের মন সদাই আকুল। এই আকুলতা থেকেই জন্ম একদিকে চন্দ্রাভিযানের, অপর দিকে অলৌকিক কাহিনীর। আলোচ্য সংকলনের গল্পগুলিও এই জাতীয়। দুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটি আজও তেমন সুপরিণত নয়। সার্থকনামা সাহিত্যকারদের মধ্যে অনেকেই যেন এই ধরনের বিষয়বস্তু অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি করাটাকে সমুচিত বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। বস্তুতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকবৃন্দের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থ লেখকই বোধ হয় প্রধানতম—যিনি এই ধরনের সাহিত্য রচনায় বিশেষ আগ্রহী এবং প্রধানতঃ তাঁরই অবদানের ফলে বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটিতে গর্ব করার মত কিছু সম্পদ আহৃত হতে পেরেছে। মোট একুশটি মিষ্টিক জাতীয় রচনা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। সবগুলির মেজাজ সমান নয়, কিন্তু উপভোগ্যতায় এরা সকলেই সমান। যেমন অনবদ্য শৈলী, তেমনই অনন্য কথকতা। লেখকের ভাববিলাসী কল্পনা-প্রবণ মনের রোমাণ্টিক আমেজ ছড়িয়ে আছে গল্পগুলির ছত্রে ছত্রে এবং পড়তে পড়তে পাঠকের মনেও সে আমেজের ছোঁয়া লাগে। মনে হয় গ্রন্থকলেবর আরও একটু বড় হলে ভাল হত। অন্ততঃ জাতিস্মরবাদের উপর লেখকের যেসব অনবদ্য রচনা আছে, তার মধ্যেও কিছু এতে সংকলিত করা হলে গ্রন্থটির আকর্ষণ ও মর্যাদা—এ দুটোই আরও বেড়ে যেত। প্রসঙ্গত তাঁর এই জাতীয় তিনটি বিখ্যাত রচনা "মৃৎপ্রদীপ," "রক্ত সন্ধ্যা" ও "প্রত্নকেতকী" নামোল্লেখ করাটা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচ্ছদ—অজিত গুপ্ত, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, মূল্য—আট টাকা।

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি / ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

একথা অনস্বীকার্য্য যে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে লেখকের মত ওয়াকিবহাল ব্যক্তি বর্তমানে খুব কমই আছেন। এই গ্রন্থে তাঁর পূর্বজীবন থেকে শুরু করে কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়াপত্তন এবং ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তার ইতিহাস বিধৃত। ঐ সময়কার তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য কোন ইতিহাস এযাবৎ ছিল না এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই রচনার মূল্যও অপরিসীম। তাশখন্দে কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়াপত্তন এবং তৎকালীন কমিউনিষ্ট নেতাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে লেখক স্মৃতিচারণ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু তথ্যাদি মুহাফিজ-খানার দলিল সহ উপস্থিত করেছেন। সেকালের বহু খ্যাতনামা নেতাদের সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এই রচনায়। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস এবং তৎকালীন শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন ও আন্দোলন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রই যে গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দলাভ করবেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। লেখকের আন্তরিকতাও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—মুজফফর আহমদ। প্রচ্ছদ—শ্রীগণেশ বসু, প্রকাশনায়—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ষোলা টাকা।

নাগচম্পা / প্রকাশ-ভবন

বিজ্ঞান ভিত্তিক এই রহস্য উপন্যাস-খানিতে পাঠক কৌতূহল আকর্ষণ করার মত অনেক উপাদানই খুঁজে পাবেন। আজীবন জ্ঞান-তপস্বী, ইঞ্জিনীয়ার ডঃ সদাশিব চট্টোপাধ্যায় বিশেষ একটা রাসায়নিক পদার্থের ফরমূলা আবিষ্কার করেছিলেন—যার সহায়তায় ইট তৈরী করা যায় অত্যন্ত অল্প খরচে। বলা বাহুল্য, এই ফরমূলা হাতে পেলে ব্যবসায়ীরা স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন। অতএব অর্থগৃধ্নু শিল্পপতি আগরওয়াল যে তাঁকে সসম্মানে নিজের এক সুরম্য বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত করে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা করে দেবেন, তাতেও বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের হঠাৎ মৃত্যু হল এবং তাঁর বুদ্ধিমতী কন্যা সুজাতা অতিকষ্টে ওই ফরমূলা আগর-ওয়ালের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হল। এর পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে কাহিনী ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বসুর সাহায্যে সুজাতা ও অন্য প্রণয়ী তরুণ ইঞ্জিনীয়ার কৌশিক সক্ষম হল রহস্যের গ্রন্থিমোচন করতে, আগর-ওয়াল নিহত হল তারই পাপ সহচর ও কর্মচারী সকলের হাতে। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে কাহিনীর জাল বুনেছেন

লেখক। একদিকে অপরাধ রহস্য ও অপরদিকে মানব-মনের চিরন্তন বৃত্তি প্রেম আত্মপ্রকাশ করেছে অনবদ্য ভঙ্গীতে। পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। নাগচম্পা ফুল ফোটার যে কাব্যময় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে একাধিকবার, তাতে লেখকের রোমাণ্টিক মননের আভাস সুপরিস্ফুট। লেখকের শৈলী অনবদ্য, ভঙ্গী সাবলীল। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীন সাফল্যকামী। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—নারায়ণ সান্যাল, প্রচ্ছদপট-কানাই পাল, প্রকাশক—প্রকাশ-ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—নয় টাকা।

দেবদাসী / আনন্দ পাবলিশার্স

ভারতের সুপ্রাচীন কয়েকটি প্রথা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। সকলেই জানেন, সতীদাহ, দেবদাসী রক্ষণ প্রথা ইত্যাদি লুপ্ত হয়েছে খুব বেশীদিন নয়। সতীদাহ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে কাগজে-কলমে এযাবৎ—যার ফলে আমরা আজ একদা প্রচলিত ভয়াবহ এই প্রথাটির সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ওয়াকিবহাল। অন্ততঃ এটুকু প্রায় সকলেই জানে যে, এই ঘৃণিত প্রথা বিলুপ্ত হয় প্রধানতঃ রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টায় ও তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের উদ্যোগে। কিন্তু দেবদাসী প্রথা সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছুই জানবার আছে। দেবদাসী নামটি যদিও আমাদের অপরিচিত নয়, তবু এর গূঢ় ব্যঞ্জনা আমরা প্রায়শঃ ধরতে পারি না। আসলে দেবদাসী একশ্রেণীর গণিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মন্দিরে মন্দিরে দেবতার চিত্তবিনোদনের জন্য যে সব সুন্দরী তরুণী নর্তকীদের নিয়োজিত করা হত, আসলে পুরোহিত ও অন্যান্য সম্পন্ন পুরুষের মনোরঞ্জন করাটাই ছিল তাদের আসল পেশা। দক্ষিণ ভারতেই এ-প্রথা সমধিক চালু ছিল এবং সেখানকার দেবস্থানগুলি সদাই অসংখ্য দেবদাসীতে পূর্ণ থাকত। বহু নামকরা ব্যক্তি এই প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করলেও বহুদিনাবধি সে মত কার্যকরী করার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নি। অবশেষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিধান পরিষদে এই প্রথা উচ্ছেদকল্পে এক বিল উত্থাপিত হয় এবং তৎকালীন সংসদ সদস্যা ডাঃ মিসেস মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি বিলটি তোলেন। তাঁর পেছনে ছিল মাদ্রাজের সমগ্র নারীসমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন—যার ফলে শেষ পর্যন্ত এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করাটা সম্ভবপর হয়। এই ঐতিহাসিক বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরেই ধীরে ধীরে এই ঘৃণিত প্রথাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর পরে আছে বিষকন্যা প্রসঙ্গ এবং অপরাপর দুটি বিষয়ের মতই এই প্রসঙ্গেও লেখক যথেষ্ট তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। শুধু নীরস আলোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বিষয়বস্তুর সূত্র ধরে যেসব কাহিনী শুনিয়েছেন, তাও বড় কম উপভোগ্য নয়। এ ধরনের তথ্যপূর্ণ রম্যরচনার জন্য লেখকের খ্যাতি সমধিক এবং আলোচ্য গ্রন্থটিও যে সে খ্যাতি বহুগুণে বর্ধিত করবে, তাতে আমাদের সন্দেহ মাত্র নেই। প্রচ্ছদ শিল্পশোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শ্রীপান্থ। প্রচ্ছদ—পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। দাম—৬.০০ টাকা।

লাল গোলাপের পাপড়ি / বসুমল্লিক ব্রাদার্স

জমিদারদের ঐশ্বর্যময় অতীতের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী। আর সব জমিদারদের মতই পৌরুষদৃপ্ত অনন্তনারায়ণ ঘরে প্রেমময়ী পত্নী থাকতেও একদিন ছুটেছিলেন পণ্যা নারীর পিছনে, যার ফলে তাঁর বাঈমহলে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে এল একদিন সুন্দরী হীরাবাঈ। আদরিণী পত্নী জয়াবতীকে উপেক্ষা করে নর্তকী হীরাকে নিয়ে মত্ত হয়ে উঠলেন অনন্তনারায়ণ। আদর করে প্রেয়সীর নব নামকরণ করলেন তিনি পাপড়িবাঈ। লাল গোলাপের পাপড়ির মতই মধুর নাকি তার রূপ—তাই এই নাম। কিন্তু এত সুখ সইলো না। ঝড় উঠলো অনন্তনারায়ণের জীবনে। আত্মহত্যা করে দুরাচারী স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেলেন জয়াবতী। তারপর এল হীরাবাঈয়ের পালা। মিথ্যা সন্দেহের বিষে জ্বলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন অনন্তনারায়ণ নিজের হাতেই। বেশ বিশ্বাসযোগ্য করেই পরিবেশন করা হয়েছে কাহিনীটি। লেখক নতুন হলেও তাঁর মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—প্রশান্ত রায়চৌধুরী, প্রকাশক—বসুমল্লিক ব্রাদার্স, ৬৫, শ্যামনগর রোড, কলিকাতা-৫৫। মূল্য—ছয় টাকা মাত্র।

রৌরব / আনন্দ পাবলিশার্স।

বর্তমান সমাজ জীবনের অসংখ্য গ্লানি, মিথ্যাচার ও কপটতাকে কশাঘাত করেছেন লেখক আলোচ্য রচনায়। নায়িকা অমা তেজস্বিনী মেয়ে, কিন্তু তাহলেও আদর্শবাদের গোড়ায় নিজের সরসতা ও বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে সে রাজী নয়। সেজন্যই সংস্কারমুক্ত স্বামীর প্রস্তাবে সায় দিতে যেমন সে পারে না, তেমনি বাপের কঠোর আদর্শবাদী নীতির মূলে নিজের পরিচ্ছন্ন জীবনবাদকে হারিয়ে যেতে দিতেও সে রাজী হয় না। সেজন্যই শেষ পর্যন্ত তার জিজ্ঞাসা, জীবন কি যে-কোন নীতির চেয়েই মহৎ নয়? সুন্দর নয়? হেরে গেল অমা, তবু হার সে মানলো না—মানতে পারে না। অনবদ্য ভাষায় রচিত এই উপন্যাস পাঠকের মনে অনেক প্রশ্নকেই সোচ্চার করে তুলবে—যার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রশ্ন হল জীবনের সার্থকতা কিসে? লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যকারের এই জীবন জিজ্ঞাসাই বর্তমান রচনার মূল উপজীব্য। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বনফুল, প্রচ্ছদ—শ্রীদিনেশ দাস, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ মূল্য— ৪.০০ টাকা।

(দে) মন্র মন / আনন্দ পাবলিশার্স।

"দেহ নয় মনের" পবিত্রতাই যে জীবনের আসল সম্পদ, জীবন বিসর্জন করে শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থের নায়িকা মিনি বুঝি তাই প্রমাণ করে গেল। ধনীকন্যা স্বাধীনা। তরুণী মিনির জীবনাদর্শ ছিল বুঝিবা কিছুটা অন্য ধরণের। সাম্প্রতিক সমাজ-জীবনের উচ্ছৃংখলতাকে সে ভয় পায় নি, দ্বিধা করে নি সে জীবনধারায় অবগাহন করতে একবারও, কারণ তার অন্তরে বিশ্বাস ছিল অবিচলিত। মিনির প্রেমাস্পদ অভি কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল প্রেমিকার প্রাণোচ্ছলতায়, তার মধ্যে জাগলো ঈর্ষা, জাগলো অবিশ্বাস। মিনির কলুষমুক্ত হৃদয় মেনে নিতে পারলো না সে অবিশ্বাসকে। অভিমানে—অপমানে দিশেহারা মিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর আলিঙ্গনে সঁপে দিল নিজেকে প্রেমিকের বাহুবন্ধন এড়িয়ে আর সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই অভিও আবিষ্কার করলো। নিজেকে যেন নতুন করে। সে দেখলো মিনির সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে তার মূল সত্তারও। সবলা এক নারী মৃত্যুর ওপার থেকেও যেন বিজয়িনী হয়ে করুণাভরা দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। লেখকের অপরাজেয় বলিষ্ঠ শৈলী রচনার মর্যাদা ও আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। লেখক—প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। প্রচ্ছদ—পূর্ণেন্দু পত্রী। মূল্য ৪·০০ টাকা।

প্রেমের রং ময়ূরকণ্ঠি / রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

প্রেমের নানা রূপ, নানা স্বাদ, নানা বৈচিত্র্য, তারই নিখুঁত চিত্রায়ন করা হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। সুন্দরী বিদুষী সুরঙ্গমার জীবনে প্রেমের পাত্র পূর্ণ হয়ে কানায় কানায় উপচে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার দয়িত ও স্বামী শুভেন্দুর মনে দেখা দিল সন্দেহের বিষ। সেই বিষে নীল হয়ে উঠলো সুরঙ্গমার জীবন। অনেক ভুল বোঝাবুঝি—অনেক বেদনার পরে শুধু সে একদিন ফিরে পেল শুভেন্দুকে। ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্নার পালা শেষ করে দুটি বিক্ষত হৃদয় আবার এসে মিললো প্রেমের মহাসঙ্গমে। এই সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে আছে ডরোথী ও অমিত্রর কাহিনী। প্রেমের বিচিত্র লীলাভঙ্গে তারাও বিচলিত—তারাও অশান্ত। লেখিকার রোমাণ্টিক মনের ছোঁয়ায় কাহিনী উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। তাঁর শৈলীও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা—অমিয়া চক্রবর্তী। প্রচ্ছদ—গণেশ বসু, প্রকাশনায়—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

॥ কনিষ্ঠা মিনি পত্রিকা ॥

ক্ষুদে সাহিত্যপত্র কনিষ্ঠার ফাল্গুনী ও চৈতালী সংখ্যাদ্বয় আমাদের হস্তগত হয়েছে। বহু বিখ্যাত লেখকের রচনা এগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধের সঙ্গে গল্প-কবিতারও অভাব নেই। বলাই বাহুল্য যে, রূপ-রস-গন্ধে রচনাগুলি সত্যই সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদ—চিত্ত সরকার, যুগ্ম-সম্পাদক—অজয়কুমার মল্লিক ও স্বপনকুমার ঘোষ। মূল্য—প্রতি সংখ্যা—কুড়ি পয়সা, প্রকাশিকা-রেণুকা ঘোষ, ১৭।২।১, ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯।

হেনরী ডিরোজিও কবি ও প্রাবন্ধিক / সারস্বত লাইব্রেরী

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নাম আমাদের সকলেরই পরিচিত। নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত হলেও আসলে জাত সাহিত্যিক। কবি ও প্রাবন্ধিক হিসাবে তাঁর যথোচিত মূল্যায়ন করাটা বোধ হয় আজও সম্যক্‌রূপে সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি; আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই বিষয়েই আলোকপাত করেছেন। ডিরোজিওর প্রতিভাকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে এই রচনা বিশেষভাবেই সহায়ক। এদেশের আধুনিক চিন্তাধারার অন্যতম জনক ডিরোজিওর প্রতিভাকে নানা দিক থেকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই রচনায়। লেখকের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—পল্লব সেনগুপ্ত। প্রকাশনায়—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য—দেড় টাকা।

প্রজাপতি জীবন / রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

বিখ্যাত উপন্যাস "লোলিটা"র লেখক নবোকভ রচিত "দি রিয়্যাল লাইফ অফ সেবাস্তিয়ান নাইট" নামক উপন্যাসেরই বাংলা অনুবাদ "প্রজাপতি জীবন"। খ্যাতিমান লেখক সেবাস্তিয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তাঁর জীবনী রচনার কাজ আর এ-কাজের ভার নিলেন তাঁরই বৈমাত্রেয় ভাই। খুব সহজসাধ্য হল না কাজটা। উপাদান সংগ্রহ করতে হল অনেক যত্নে—অনেক কষ্টে, তারপর খণ্ড খণ্ড সেই উপাদানসমূহের সাহায্যে ধরা দিল এক অত্যাশ্চর্য প্রণয় কাহিনী, প্রজাপতির পাখার মতই বর্ণবৈচিত্র্যে ভরা সে প্রেমগাথা। সফল হল জীবনীকার, তৃপ্ত হল এবং সবিস্ময়ে অনুভব করলো যে, নিজেরও অজ্ঞাতসারে কখন যেন সে একাত্ম হয়ে গেছে কাহিনীর নায়কের সঙ্গে। বিখ্যাত উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। অনুবাদকের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ রঙীন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—ভ্লাদিমির নবোকভ, অনুবাদ—দেবব্রত রেজ, প্রচ্ছদ—গণেশ বসু, প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম – ছয় টাকা।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর ও মাধব পাগলা
দ্বিতীয় খণ্ড

সাধক মাধব পাগলা ও তাঁর গুরু শ্রীশ্রীরামঠাকুরের অধ্যাত্ম জীবন কিছুটা আলোকপাত করার প্র চেষ্টা করা

হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। প্রধানতঃ গুরু ও ইষ্টের সম্বন্ধ নির্ণয়েই গ্রন্থোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা। ভক্তিমার্গের ক্রমবিকাশের পথে গুরু ও ইষ্টের ভূমিকাটিকে বড় সুন্দরভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। ধর্মপিপাসু পাঠক এই রচনাটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—মুক্তানন্দ। প্রকাশক—শ্রীননীকুমার চক্রবর্তী, ৮।৩৭, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য—২টা, ৫০ পয়সা।

অনন্ত স্বপ্নের মাঝে তুমি মিশে আছো / গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা একত্রিত করা হয়েছে। কবিতাগুলি জাতিতে আধুনিক হ'লেও এদের মাঝে ছন্দ ও মিলের একটা অনুরণন আছে। ভাবমাধুর্য্যেও এরা সমৃদ্ধ। কাব্যামোদী পাঠক কবিতাগুলি পাঠ করে আনন্দলাভ করবেন। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—মৃণাল হালদার। প্রচ্ছদপট—সুনীল গুহ, পরিবেশক—গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আড়াই টাকা।

ভিয়েতনাম / বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

আলোচ্য গ্রন্থটিতে ভিয়েতনামকে উপলক্ষ্য করে রচিত কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলির মাধ্যমে লেখকের রাজনৈতিক চেতনা বিশেষভাবেই সপ্রকাশ। শৈলীও মনোহারী। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—মনীন্দ্র রায়, প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দুই টাকা।

অবিস্মরণীয়

'অবিস্মরণীয়' স্বাধীনতা-সংগ্রামের বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত মহান্ সংগ্রামীদের সংগ্রাম-গাথা। গাথা হয়েছে লেখকের স্মৃতিচারণার সূত্রে। এ গাথা প্রাণময়, নিবিড় শ্রদ্ধার নম্র স্বাক্ষরবাহী। স্বয়ং বিপ্লবী লেখক শৈশব-বাল্যের সূচনায় তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতির প্রসঙ্গেই টেনে এনেছেন নমস্য বিপ্লবী অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে। গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধাবনত অধুনাদুর্লভ নিবেদন হৃদয়গ্রাহী। তারপর থেকে মিছিল—মিছিলের মুখে একে একে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু, কানাইলাল, সুশীল সেন, চারুচন্দ্র বসু, প্রমদারঞ্জন চৌধুরী, হরিশনারায়ণ চন্দ্র, উপেন বাঁড়ুয্যে, রাসবিহারী বসু, অতুল মুখুজ্যে, অতুল বসু থেকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পর্যন্ত অসংখ্য ভারতীয় স্বাধীনতা-যোদ্ধার সঙ্গে সাদরে স্থান পেয়েছেন মা কাই, না পো খিন, না পো সুং, না বা থ, না পো থেক, না পো টা, না বো পুক প্রমুখ স্মরণীয় বর্মী স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিশিষ্ট যোদ্ধৃবৃন্দ। নির্দ্বিধায় বলা চলে 'অবিস্মরণীয়' ভারত-বিপ্লবের একটি তথ্যনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাপূর্ণ ইতিহাস। একটু তথ্যভারাক্রান্ত বুঝিবা। ভাষা স্থানে স্থানে আর একটু সংযত হলে বোধ হয় ভাল হত। কিন্তু তাতে বইয়ের গুরুত্ব বিশেষ হানি হয় নি। অসংখ্য মানুষ দেশজননীর শৃংখল মোচনে কিভাবে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন, কী অপরিসীম ভালবাসা থাকলে তাদের মত সর্বরিক্ততা হাসিমুখে বরণ করা সম্ভব, তা লেখকের বর্ণনা থেকে অনুভব করতে পারা যায়। এইখানেই 'অবিস্মরণীয়'র সার্থকতা। আজকের ইতোভ্রষ্টস্ততোভ্রষ্টতার পারিপার্শ্বিকে ক্ষুদিরাম বা সুশীল সেন, ইন্দুমতী দেবী বা মাতঙ্গিনী হাজরা আদর্শপরায়ণতার নিষ্কম্প দীপশিখা। তাঁদের জীবনের প্রবাহ সকল আজ আর সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয় কি না সন্দেহ আছে। কিন্তু তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা, আদর্শ রূপায়ণের জন্য হাসি মুখে জীবনদান সর্বকালে, সর্বযুগে অনুকরণীয়। লেখক আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন। লেখকঃ শ্রীগংগানারায়ণ চন্দ্র। প্রাপ্তিস্থান: 'মনীষা', সমবায় প্রেস লিঃ। দাম: দশ টাকা। ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

—সমীরণ চৌধুরী

ঈশ্বরের জন্ম / গ্রন্থজগৎ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংগ্রহ। একই কবির রচিত মোট চল্লিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে এতে। কবির গভীর জীবনবোধ তাঁর রচনাগুলির মাঝে প্রতিফলিত। তা ছাড়া তাঁর কাব্যানুভূতিও খুবই বলিষ্ঠ। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মোটামুটি। লেখক—সুব্রত রুদ্র। প্রচ্ছদ—গণেশ বসু, প্রকাশক—গ্রন্থজগৎ, ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য—তিন টাকা।

ঝুমঝুমি—দোল ও সাধারণ সংখ্যা / মিনি পত্রিকা

ক্ষুদে পাঠক-পাঠিকার মিনি পত্রিকা ঝুমঝুমির দোল ও চৈত্র সংখ্যাটি হাতে পেয়ে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা লেখকের লেখা গল্প ও কবিতায় সমৃদ্ধ পত্রিকা দুটি সহজেই এর ছোট ছোট পাঠকদের হৃদয় জয় করে নেয়। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ভাল। সম্পাদনা—গীতা দাশ ও সরল দে, প্রচ্ছদলিপি-সুব্রত ত্রিপাঠি। মূল্য—প্রতি সংখ্যা—পঁচিশ পয়সা।

কৃষ্টি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটিতে নানা বিষয়ক প্রবন্ধাদি সংগৃহীত হয়েছে। স্বল্প পরিবেশে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। অঙ্গসজ্জা—পরিচ্ছন্ন। সম্পাদনা—শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশ্যামসুন্দর বসু, প্রকাশনা—কৃষ্টি সাহিত্য মন্দির, ৫ ই, কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ, মূল্য—দশ পয়সা।

স্থান পরিচিতি

দার্জিলিং

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে দার্জিলিং জেলা। দার্জিলিং নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায়, কেহ বলেন—এখানের অবজারভেটারি হিলের গহ্বরের মুখে দুর্জয় লিঙ্গ শিবের মূর্তি আছে, সেই দুর্জয় লিঙ্গের নাম অনুসারে দার্জিলিং। আবার তিব্বতীয় ভাষায় Rdo-je-ling দোর-।-জি-।-লিঙ্গ, দোরজি অর্থে ইন্দ্রের রাজদণ্ড অর্থাৎ বজ্র এবং লিঙ্গ্ মানে স্থান। অর্থাৎ রাজদণ্ড বজ্র আকারে স্থান। (The mystic thunder-bolt of the religion of Lama.)

এই জেলার অধিকাংশ স্থান হিমালয়ের পর্বতীয় অঞ্চলে। অধিকাংশ স্থানই ক্রমশ নীচু হয়ে সমতল ভূমিতে মিশেছে। দার্জিলিং দুভাগে বিভক্ত। সিকিমের দক্ষিণদিকস্থ হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশ ও অপরটি নিম্নভূমি বা তরাইএর অঞ্চল।

এই জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। ১৯শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-তত্ত্ব স্যার জোসেফ হুকার দার্জিলিং থেকে জাং-রি দেখতে এসেছিলেন। তিনি সেই সময় দার্জিলিংএর পথের মনোরম বর্ণনা করে বলেছেন—ঢালু পথগুলি দেখাচ্ছে যেন বেশ পরিষ্কার ও স্পষ্ট। পুষ্প আর তরুবীথি দিয়ে সাজানো যেন গিরিপথ। সামনে ভোজনরত গৃহপালিত পশুর দল। ইতস্তত পত্রপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষরাজি। নীচে উপত্যকায় রোডোডেণ্ড্রন গুচ্ছ আর বিচিত্র রঙের পুষ্পিত চারা গাছ। সূর্য দেবের বিদায়-কালীন রশ্মি তুষার ধবল পর্বতচূড়া রক্তিমাভায় রাঙিয়ে দিয়েছে তার পারিপার্শিক পরিবেশকে। বামে বরফে ঢাকা উঁচু পাহাড়, সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রয়েছে। - - - -

দার্জিলিং-এর তরাই দুর্গম অরণ্য। এই অরণ্যে বহু হিংস্র জন্তুর বাস। বাঘ, ভালুক, হাতী এই অঞ্চলে অধ্যুষিত।

পূর্বে এই সব অঞ্চল সিকিমের অন্তর্গত ছিল। নেপালের গুর্খাগণ সিকিমের কাছ থেকে এই অঞ্চল বলপূর্বক কেড়ে নেয়। ইংরেজদের সঙ্গে নেপাল যুদ্ধের অবসানে তরাই খণ্ডটি ইংরেজরা গুর্খাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এর পূর্বাধিকারী সিকিম রাজকে ফেরৎ দেন। ১৮৩০ খ্রীঃ লর্ড বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে ইংরেজরা স্বাস্থ্যনিবাস করবার জন্য পর্বত বেষ্টিত দার্জিলিংকে বার্ষিক বৃত্তির বিনিময়ে কিনে নেন। কিন্তু ১৮৫০ খ্রীঃ ডাঃ হুকার ও দার্জিলিং জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ ক্যাম্বেল ইংরেজ ও সিকিম রাজের অনুমতি নিয়ে সিকিম রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে রাজার প্রধানমন্ত্রী তাঁদের আবদ্ধ করে রাখেন। ইংরেজরা তাতে চটে যান। তাঁদের উদ্ধার মানসে ও সিকিম রাজকে শাস্তি দেবার অভিপ্রায় তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধের ফলে তরাই দেশ ইংরেজদেশর অধিকারে আসে। সিকিম রাজের সঙ্গে পরে সন্ধি হয়, তাতে সিকিম রাজ্যের মধ্যে দিয়ে ইংরেজরা তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা চালান।

সীমা—উত্তরে সিকিম, দক্ষিণে জলপাইগুড়ি, উ-পূর্বে ভূটান ও জলপাইগুড়ি ও পশ্চিমে নেপাল।

মহকুমা—এই জেলার ৪টি মহকুমা দার্জিলিং (সদর), কালিম্পং, কার্শিয়াং ও শিলিগুড়ি।

তিস্তা—সংস্কৃত নাম ত্রিস্রোতা। কালিকাপুরাণে এর উৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে একবার পার্বতী এক ভীষণ দানবের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। সেই সময় সেই শিবভক্ত দানব তৃষ্ণা মেটাবার জন্য শিবের কাছে জল প্রার্থনা করে। শিবের বরে পার্বতীর বক্ষ হতে তিনটি ধারায় এই নদী বেরিয়ে আসে। লেপচারা তিস্তাকে বলে রংভু বা সোজা নদী। সমতল ভূমিতে একে সোজা যেতে দেখা যায়। তিস্তার উৎস মুখ রয়েছে উত্তর সিকিমের এক হিমবাহে, যার উচ্চতা ২১ হাজার ফুট সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে। এর পথগতি প্রবাহিত হয়েছে কালিম্পং মহকুমার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে রংপুর জেলার ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ভীষণ বন্যায় তিস্তা তার পুরাণো গতিপথ পদ্মায় না পড়ে পরিবর্তন করে ব্রহ্মপুত্রে পড়ে। উত্তরবঙ্গের লোকেরা তিস্তাকে বলে দুঃখের নদী, কান্নার নদী। বন্যা প্লাবিত হয়ে বহুবার শত শত গ্রাম বিধ্বস্ত করেছে, শত শত জীবন হানি করেছে এই তিস্তা। আজও এর ভয়াবহ খরস্রোত দমিত হয়নি।

মহানদী বা মহানন্দা—গয়াবাড়ী ষ্টেশনের কাছে পাগ্‌লাঝোরা ছেড়ে শিলিগুড়ি থেকে ২৮ মাইল দূরে মহানদী ষ্টেশন। ষ্টেশনের সামনে জঙ্গলের মধ্যে মহলদীরাম পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে মহানদী বা মহানন্দার উৎপত্তি হয়েছে বলে জানা যায়। লেপ্‌চা ভাষায় মহলদীর মানে আঁকা বাঁকা নদী। মহলদী কথার বাংলা অপভ্রংশ মহানন্দী বলে অনুমিত হয়।

বালাসন বা বালু আসন নদী—এর বিস্তৃত সোনালী রঙের বালুপূর্ণ নদীগর্ভ। কার্শিয়াংএর পশ্চিম দিকে নীচেই বালাসন উপত্যকা।

বড় রঙ্গিত নদী—লেবং হতে উত্তরে ৬ মাইল আরও নেমে সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৪000 ফুট উঁচুতে ও বাদামতাম ডাক বাংলো থেকে ২000 ফুট নীচুতে এই নদী। এর দৃশ্য অপূর্ব।

রঙ্গিত নদী—সিঙ্গলের ৭000 ফুট নীচে রঙ্গিত নদী তিস্তায় গিয়ে মিশেছে।

সেবক---শিলিগুড়ি রোড ষ্টেশন থেকে তিস্তা উপত্যকা শাখা বেরিয়েছে। এর কিছু পরে সেবক নদী তিস্তায় গিয়ে মিশেছে।

রিয়াং নদী---শিলিগুড়ি থেকে ২৫ মাইল দূরে। এ ছাড়া রম্মম, জলঢাক, প্রভৃতি নদী আছে।

দার্জিলিং শহর পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পর্বতীয় স্থান যা হিল ষ্টেশন। ভারতে যতগুলি পর্বতীয় নগরী আছে, তার মধ্যে দার্জিলিং সর্বাপেক্ষা সুন্দর, এ জন্য এর নাম "কুইন অফ দি হিল ষ্টেশন।" এটি এই জেলার সদর মহকুমা। এর আয়তন ৩৬১ বর্গ মাইল আর লোকসংখ্যা ৪৬'৬৫১ (১৯৬১)। কলকাতা থেকে উত্তরে ৩৬৯ মাইল অথবা ৬০০ কিলো মিটার দূরে। শিলিগুড়ি থেকে ৬১ মাইল ও ঘুমপাহাড় থেকে ৩ মাইল দূরে। এই শহর হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৬৭৫ ফুট উচ্চে। গ্রীষ্মকালে এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি ও শীতকালে সর্বনিম্ন তাপ ৩৫ ডিগ্রি।

কলকাতা থেকে দার্জিলিং যেতে গেলে শিয়ালদহ ফরাক্কা ট্রেণে অথবা হাওড়া ফরাক্কা ট্রেণে যেতে হয়। ফরাক্কার ওপারে খাজুরিয়া ঘাট। পারাপারের জন্য সরকারী ষ্টীমার বা সাধারণ লঞ্চ আছে। এখান থেকে ট্রেণে করে নিউ জলপাইগুড়ি যেতে হয়। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে টয় ট্রেণে (ছোট ট্রেণে) দার্জিলিং। টয় ট্রেণে সুখনা। সুখনার জমি অসমতল। এখান থেকে রেলপথ চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে। সর্পিল পথ দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। দার্জিলিংএর আগের ষ্টেশন ঘুম ষ্টেশন।

দার্জিলিং

দার্জিলিং শহর একটা অভিনব শহর। যে সমতল ভূমির ওপরে শহরটি অবস্থিত তার উঁচুতে ও নীচুতে অনেকগুলি স্তর আছে। সেই স্তরগুলিতে অনেকেই বসবাস করে। এই শহরটি অর্ধ বৃত্তাকারে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এখানকার বাড়ীগুলি কাঠের ও দরজাগুলি কাঁচের সার্সি দিয়ে আটা। ১৮২৯ সালে ইংরেজরা প্রথমে দার্জিলিংয়ে আসে। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে একটা স্বাস্থ্য নিবাস স্থাপনের জন্য সিকিম রাজকে বার্ষিক ৬ হাজার টাকা কর দেয়। ১৮৪০ সালে কার্শিয়াংএর নীচে পাঙখাবাড়ী থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত একটা পাকা রাস্তা তৈরি করে। সিকিম রাজ যখন দুজন ইংরেজকে বন্দী করে তখন ইংরেজরা ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে খাজনা বন্ধ করে দেয়।

দার্জিলিং-এর দ্রষ্টব্য স্থান

কাঞ্চনজঙঘা---দার্জিলিং থেকে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। শহর থেকে কাঞ্চনজঙঘার দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। এর সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অবর্ণনীয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গগুলির মধ্যে কাঞ্চনজঙঘার স্থান তৃতীয় হলেও এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য কোথাও দেখা যায় না। এর উচ্চতা ২৮'১৪৬ ফুট। এই পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়াগুলি যেন আকাশ-চুম্বী। পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘ ভেসে বেড়ায়।

মাউণ্ট এভারেস্ট---এই শৃঙ্গ পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড় বলে পরিগণিত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২৯ হাজার ফুট উচ্চ। কেউ কেউ একে গৌরীশঙ্কর বলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর এভারেস্ট থেকে ৫ হাজার ফুট নীচে। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে সার্ভে অফিসের সার্ভেয়ার জেনারেল কর্ণেল এভারেস্টের অধীনে রাধানাথ শিকদার গণনা করে মাউণ্ট এভারেস্টের উচ্চতা ২৯০০২ ফুট স্থির করেন। এভারেস্টের এই শৃঙ্গের নাম 'মাউণ্ট এভারেস্ট' হয়। এটি নেপাল সীমানায় অবস্থিত।

রাজভবন---অবজারভেটারি পাহাড়ের নীচে ম্যাল রোডের কোণে ইংরেজ সরকারের আমলে এই রাজভবন তৈরি হয় গ্রীষ্মকালে বাসের জন্য। এর নাম ছিল 'স্রুবেরি।'

অবজারভেটারি হিল---শহরের মধ্য-স্থলে এই পাহাড়। আগে এখানে একটা মানমন্দির ছিল বলে এর নাম অবজার-ভেটরি পাহাড়। এখান থেকে কাঞ্চন-জঙঘার দৃশ্য ভাল করে দেখা যায়। এই পাহাড়ের শিরোদেশে একটা গহ্বর দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে তিব্বতের প্রধান শহর লাসায় যাওয়া যায়। অপরে বলেন, মহাদেব এই সুড়ঙ্গ দিয়ে কুচনীপাড়ায় আসতেন। এই গহ্বরের মুখে দুর্জয়লিঙ্গ নামে এক মূর্তি আছে। অনেকের অনুমান এই নাম থেকেই দার্জিলিং হয়। এই অঞ্চলে পূর্বে তিব্বতীয় বৌদ্ধদের একটি মঠ ছিল। নেপালীরা এ অঞ্চলে জয় করার সময় মঠটি নষ্ট হয়ে যায়।

কাঞ্চনজঙঘার নামটি তিব্বতীয় ভাষা হতে। কাং-ছেন-দ্‌জোং-গা। এর সঠিক অনুবাদ বরফ-বড়-খাজাঞ্চিখানা পাঁচ অর্থাৎ এই পাহাড়ের পাঁচটি চূড়া যেন বরফে ঢাকা খাজাঞ্চিখানা। সকলের উঁচু চূড়াটি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সোনালি রং ধারণ করে বলে একে সোনার খাজাঞ্চিখানা বলে। দক্ষিণের চূড়াটি সূর্য উঠলে রূপোর মত ঝক্‌ঝক্ করে বলে একে রূপোর খাজাঞ্চিখানা। বাকিগুলিকে শস্য রত্ন ও শাস্ত্রের খাজাঞ্চিখানা বলা হয়।

বোটানিক্যাল গার্ডেন---শহরের নিম্নস্তরে অবস্থিত। কাগঝোরা নামে এক ছোট পর্বতীয় নদী এখানে আছে।

সিঞ্চল লেক---ঘুম ষ্টেশন থেকে দু মাইল চড়াই উঠে সিঞ্চল পাহাড়। আগে সিঞ্চল নামে উঁচু পাহাড়ে ইংরেজদের সৈন্যাবাস ছিল। কিন্তু শীতের প্রকোপে এই স্থান থেকে সৈন্যা-বাস তুলে নিয়ে জলাপাহাড়ে আনা হয়।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত--- শহরের নিম্নস্তরে অবস্থিত।

টাইগার হিল---দার্জিলিং থেকে ৭ মাইল। এখান থেকে অক্টোবরে পরিষ্কার আকাশে মাউণ্ট এভারেস্টের ওপর সূর্যোদয় দেখা যায়।

মিউজিয়াম---বার্চ হিল পার্কের নীচে।

দোলা দেবে রাত্রির সন্ধানে

সোমনাথ চক্রবর্তী

কুঙ্কুমের স্নিগ্ধ টিপ মুছে ফেলে সিঁথিতে সিঁদুর
পরেছো হে শুচিস্মিতা, দিনশেষে তাইতো বিস্বাদ।
সমস্ত রঙের মৃত্যু, তবু কেন চোখে নীল স্বাদ,
ম্রিয়মান রাত্রি বয়ে কি আলোকে হয়েছো মধুর?

সমস্ত ধূষর ঋতু কুমারীত্বে তোমার মনন;
প্রাসাদের শ্বেত গাত্রে কখনো ফেলেছো অশ্রুজল?
সেদিনো প্রেমিক ছিলো, উপহাস যাহার সম্বল
সন্ধ্যা রঙে নেশাতুর ডানা ভাঙা পাখির কম্পন।

ফিরে আসে পথপ্রান্ত, চেনাজানা মাঠের সকাল,
ভিজে ঘাসে পদচিহ্ন এঁকে রেখে দূরান্তরে যেতে
একবার মদিরতা মেখেছিলে স্খলিত অঙ্গেতে—
যৌবন যাদুর দিন এঁকে দেয় অনির্দেশ্য কাল।
মালাগাঁথা শেষ হলে নৈঃশব্দের নিষ্ফল আকুতি
নূপুরের ছোঁয়া পেয়ে বেজে উঠে চরণে তোমার
যে আলোকে জেবলে দিলো তার চোখে, অপূর্ব সত্তার
একেকটি নবজন্ম ছিন্ন দিনে আলেয়ার দ্যুতি।

খেয়া পার হয়ে প্রিয়া বারবার এসো না এখানে;
নিকটকে দূরে ফেলে কিছুক্ষণ মিথ্যার বেসাতি
গড়ে রেখে আস্তানার স্নেহলিপ্সা প্রবঞ্চিতা সাথী;
নীল জলে পুরাতনী দোলা দেবে রাত্রির সন্ধানে।

ম্যাল রোড---অবজারভেটরি পাহাড়ের নীচে চারদিক ঘিরে ম্যাল রোড। এটি দার্জিলিংএ বেড়াবার প্রধান রাস্তা।

বার্চ হিল পার্ক---রাজভবনের পাশেই এটি একটি সুন্দর উদ্যান। দার্জিলিং শহরের সবচেয়ে উঁচু স্থানের নাম কাটিপাহাড়। তার নীচেই জলা পাহাড় বা লেবংএর ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও একটা সৈন্যাবাস আছে।

হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট---পর্বত আরোহণের প্রশিক্ষণ এখানে দেওয়া হয়।

দার্জিলিংএ মিশনারি স্কুলের, কলেজের, ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা অনেক। কলকাতার পর এত সাহেবী স্কুল পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও নেই। এখানে কলকাতা থেকে বহু ছাত্র পড়তে আসে, বিদেশী ছাত্ররাও আসে।

গীর্জাও এখানে অনেক আছে। রামকৃষ্ণ মিশন, গৌড়ীয় মঠ, ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরও এখানে আছে।

স্টেপ অ্যাসাইড গৃহ---ম্যাল এবং তার পাশে সামান্য একটু নেমে গেলেই স্টেপ অ্যাসাইড গৃহ। দেশবন্ধুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয় এখানে ১৯২৫ সালে ১৬ই জুন।

স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য এখানে প্রথম শ্রেণীর স্যানাটোরিয়াম ইডেন স্যানাটোরিয়াম, লুইস জুবিলী স্যানাটোরিয়াম প্রভৃতিতে অনেকেই গ্রীষ্মকালে আসেন। শীতকালে স্থানীয় কর্মচারীরা ছাড়া আর কেউ বিশেষ থাকে না।

গ্রীষ্মকালে এখানে মাছ ধরা, বন্দুক নিয়ে শিকার করা, ঘোড়ায় চড়া, গলফ খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। সিঞ্চল অঞ্চলে গলফ খেলার মাঠ ১৯৬৮ সালে রাজ্যপাল ধরমবীর কর্তৃক উদ্বোধিত হয়েছে। এই মাঠটি ৮০০০ ফিট উঁচুতে।

দার্জিলিং হিল ষ্টেশনে দোকান-বাজার, হোটেল জমজমাট। রাস্তার চারপাশে রডোডেনড্রন ফুলের সারি।

হিমালয় যেন রূপকথার বিচিত্র দেশ। তার শীর্ষে শীর্ষে যেন তুষারময় স্বপ্নপুরী; সমতল মানুষের কাছে অত্যুচ্চ গিরিশিখরবাসীদের কথা জানার কৌতূহল যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কৌতূহল আছে তার প্রকৃতির মধ্যে, তার লতা-পাতা, ফল-ফুল, নর-নারীর মধ্যে, কৌতূহল আছে পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ী, নদ-নদী, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির মধ্যে, সবই নতুন। সেই নতুনকে জানার জন্যে যুগে যুগে পর্যটকগণ শতশত বাধা বিপত্তিকে বরণ করেছে। বাঙালীর জীবনে এই অভিযান নতুন হলেও বিস্ময়কর নয়। এই পথ দিয়ে অভিযান করেছেন এককালে রাজা রামমোহন রায়, শরৎচন্দ্র দাস। শোরপা তেনজিং প্রভৃতি।

দার্জিলিংকে এক সময় বলা হত 'টি' টিম্বার, টুরিজম---এই নিয়ে দার্জিলিং।' আগে দার্জিলিংএ বিদেশী টুরিষ্টদের আগমন খুব হত। বর্তমানে হয় না, এখন বেশীর ভাগ দেশী টুরিস্ট। বাঙলা দেশের মধ্যে ইহা একটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান বলে এখানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বহু লোকের আগমন হয়।

ঘুম ষ্টেশন--শিলিগুড়ি থেকে ৪৮ মাইল। এর পরের ষ্টেশন দার্জিলিং। সোনাদার গভীর জঙ্গল পার হয়ে সিঞ্চলের পাদদেশে ঘুম পাহাড়। ঘুম পাহাড় ঘুম ষ্টেশন থেকে ৩ মাইল। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৭'৬৭৫ ফুট উঁচু। দৃশ্য অতি মনোহর। ঘুম গ্রামটি তিনটি প্রধান রাস্তার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। ঘুমের রেলপথ সর্বাপেক্ষা উঁচু স্থান।

---(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রূপ রস বর্ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ৪ ॥

রবার্ট ক্লাইভের পদোন্নতির সংবাদ এসেছে লণ্ডনের কোম্পানীর বড় অফিস থেকে, ক্যাপ্টেন থেকে একেবারে কর্নেল।

নাজির জঙকে হায়দারাবাদের নিজাম এবং আঁতাদ সাহেবকে আর্কটের সিংহাসনে বসাতে পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্ণর-জেনারেল দুপ্লে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে চেষ্টা করেছিলেন ক্লাইভ তা চূর্ণ করে দিয়েছেন এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের প্রভাব একচ্ছত্র হয়ে উঠেছে। সম্ভবত এই পদোন্নতি তারই পুরস্কার।

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীর এই ক্রমবর্ধমান বৈরীভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সিলভেস্টার। ইংরেজ ও ফরাসীর অস্ত্রবল ও জনবলও এই সংঘাতে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে প্রকাশ্যে ও গোপনে। দেশীয় রাজন্যদের গৃহবিবাদে একপক্ষ বা অন্যপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে ইংরেজ ও ফরাসীর ভিতরে এই শত্রুতার সম্ভাব বাঙলা দেশেও ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ? মাদ্রাজে আবারও সৈন্য আসছে, কামান আসছে লণ্ডন থেকে, নেটিভ তেলেঙ্গী সিপাই পল্টনও বাড়ানো হচ্ছে, ভিতরকার উদ্দেশ্য কী?

রবার্ট ক্লাইভের ব্যক্তিত্ব সিলভেস্টারের কাছে একটি বিরাট রহস্য। অল্পবয়সে এল কোম্পানীর কেরানি হয়ে মাদ্রাজে, ক্রমে কলমের ধরজো কলম ত্যাগ করে, কূটবুদ্ধি অধ্যবসায় এবং রণকৌশলে হয়ে উঠলো প্রধান সেনাপতি, অথচ কূটনীতি ও সামরিক শিক্ষা কখনো পায় নি। ছিল অসাধারণ কর্মশক্তি ও সংগঠনশক্তি এবং অসামান্য মনোবল ও উচ্চাভিলাষ। সেই সঙ্গে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করতে ধূর্তের শিরোমণি। দিল্লীতে মোগল সম্রাটের আসন টলমল, দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদের নিজাম ও কর্ণাটকের নবাব-মসনদ নিয়ে চক্রান্ত, পূর্ব ভারতে আত্মঘাতী অন্তর্কলহ এই লোকটির চোখের সামনে কোন ভবিষ্যতের স্বপ্ন তুলে ধরেছে কে জানে? প্রেসিডেন্ট বুর্শিয়ার প্রতিবাদ করে বলেন কোম্পানী ব্যবসা করতে এসেছে এদেশে, রাজ্য প্রতিষ্ঠার

দিব্যদর্শী

জন্য নয়। ক্লাইভ বলেন অরাজকতার অনিশ্চয়তা ব্যবসার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ নয়, অর্থ উপার্জন বজায় রাখতে অর্জন করতে হবে সামরিক শক্তি, আগে মাটি পরে টাকা, যার হবে মাটি তারই হবে টাকা, সেই মাটি দখল করার সুযোগ এসে পড়েছে, চোখ বুজে থাকলে চলবে না। বেশ জোর দিয়েই ক্লাইভ জানিয়ে দেন তিনি স্বপ্নবিলাসী নন বাস্তববাদী।

হুজুর হলেও বুর্শিয়ার মাদ্রাজের প্রেসিডেন্ট, কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা, তাঁর কথাই কোম্পানী শুনবে, ক্লাইভের সমরদক্ষতার উপর যতই বিশ্বাস থাক না কেন। তাই হায়দারাবাদ ও কর্ণাটকের যুদ্ধের আগে ক্লাইভ শরণাপন্ন হলেন তাঁদের রিচার্ডসনের, যদি প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাগে আনতে পারেন। প্রেসিডেন্ট বুর্শিয়ার রিচার্ডসনকে খুব খাতির করেন, কিন্তু ডাক্তার প্রত্যক্ষভাবে এই মতবিরোধের মধ্যে আসতে চান না। কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি একটি পরামর্শ দিয়ে বললেন 'ঠিক মত যদি অভিনয়টি করতে পারো তবে জয় তোমারই হবে, কর্ণেল রবার্ট।'

হয়েছিলোও তাই। ক্লাইভ নৈশভোজে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বুর্শিয়ারকে। এরূপ ভোজ-আপ্যায়ন মাঝে মাঝে হয়ে থাকে, কিন্তু সেদিনকার ভোজ-পর্বের পশ্চাতে একটি ফাঁদ পেতে রেখেছি'। ক্লাইভ, যেমটি রিচার্ডসন শিখিয়ে দিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে যখন হুইস্কীর বোতল খালি হতে চলেছে তখন ক্লাইভ গম্ভীরভাবে বললেন 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, কোম্পানীকে লিখুন আরো কিছু বেশী করে গোলাগুলি ও কামান যত শীঘ্র সম্ভব পাঠিয়ে দিতে, আমি দু-শো তেলেঙ্গী সিপাইকে মহড়া দিচ্ছি, যদি রাজী না হন তবে ডান পকেটে আমার পিস্তল আছে, আপনার সামনে এখানেই আমি আত্মহত্যা করবো। যদি কোম্পানী জানতে চায় এবং অবশ্যই জানতে চাইবে আপনার কাছে—কী কারণে কর্ণেল ক্লাইভ আত্মহত্যা করলো, তবে আপনার রিপোর্টের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন আমার বাঁ পকেটে যে চিঠিটা আছে সেটা। আমি আপনাকে রাজী হতে বলছি না আমার রসদের প্রয়োজন সঞ্চয় করতে, নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অনুযায়ীই আপনি চলুন, তবে আমারও দাবি আছে আমার নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে চলতে, সেটা নিশ্চয়ই অনুমোদন করবেন?'

সিলভেস্টারের শরীর মাদ্রাজে এসে অসম্ভব উন্নতি লাভ করেছে। সুগোল মুখমণ্ডল, প্রশস্ত বক্ষস্থল, বলিষ্ঠ বাহু, কলকাতা বা চন্দননগরের কেউ দেখলে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু শান্তি নেই মনে। শান্ত স্রোতের মত ধীরে প্রবাহিত হচ্ছিলো তার জীবন, ভাগীরথীবক্ষে একটি সন্ধ্যা সেই শান্ত স্রোতধারায় যে আলোড়নের সঞ্চার করে দিয়ে চলে গেল সেই আলোড়নের তরঙ্গ বোধহয় আর কোনোদিনই থামবে না। মানুষের জীবনে এমন এক-একটি দিন আসে কেন যা সব যেন উলট-পালট করে দিয়ে চলে যায়, যা রেখে যায় তা ভোলা যায় না?

ভুলতে চেষ্টা করছে সিলভেস্টার নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে। নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারলেই আর সব ভুলে থাকা যায়। সিলভেস্টার নজরে পড়েছে ক্লাইভের। ক্লাইভ নতুন তেলেঙ্গী পল্টনটির শিক্ষাদানের ভার তুলে দিয়েছেন এই তরুণ সেনানীর হাতে, সেই সঙ্গে হুকুম হলো খুব তাড়াতাড়ি ওদের তৈরি করে শিখে

শহর ছাড়িয়ে পেরাম্বুরের ময়দান, ফোর্ট সেন্ট জর্জ কেল্লা থেকে তিন মাইল দূরে। ভোর থেকে এগারোটা পর্যন্ত কুচকাওয়াজ। এগারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত ছুটি। কেল্লায় ফিরে এসে মধ্যাহ্নভোজন। আবার পল্টন নিয়ে পেরাম্বুরের ময়দানে বন্দুক চালানোর মহড়া তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত। সেপাইদের দীর্ঘ অবসর ভোর পাঁচটা নাগাদ কিন্তু সিলভেস্টারকে অনেক রাত পর্যন্ত তেলুগু শিখতে হয়। কলকাতায় সে কিছু কিছু উর্দু যা শিখেছিলো মাদ্রাজে তা একেবারেই অচল।

মাদ্রাজে এসে দুখানা চিঠি লিখেছে সিলভেস্টার রাবেয়ার কাছে। প্রথমখানি পৌঁছসংবাদ, দ্বিতীয়খানি লেফ্‌টেনেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন হবার সুসংবাদ। কোনোটারই জবাব আসে নি, তবে কী সে চিঠি দুটি পায় নি? দ্বিতীয় চিঠিতে বর্ণনা ছিল কী করে মাত্র পঁচিশজন সৈন্যের একটি দল ও মাত্র দুটি কামান নিয়ে শ্রীরঙ্গপট্টনের পাথরের কেল্লাটি দখল করেছিলো সে। কিন্তু হাতের একটি আঙুল তার উড়ে গেছে, এখবরেও রাবেয়া বিচলিত হয়ে চিঠি দিল না?

চিঠি না পাওয়ারই সম্ভব বেশী। সহকর্মী ক্যাপ্টেন ভিলিয়ার্স বলে মাদ্রাজ থেকে বেঙ্গলে পৌঁছবার কোনো নিশ্চয়তা নেই, কোম্পানীর নিজের ডাক ছাড়া, কলকাতা থেকে চন্দননগরে পৌঁছনো একেবারেই অসম্ভব। তবে যদি লোক মারফৎ পাঠানো যায়, সে-কথা আলাদা।

সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরে, অনেক রাতে সিলভেস্টার যখন বিছানায় এলিয়ে পড়ে তখন তার মনে এসে যায় একখানি মুখ। ভ্রমরকৃষ্ণ চুল, ভ্রমরকৃষ্ণ দুটি চোখ, রক্তিম ওষ্ঠাধর, নিম্নাধরের বঙ্কিম রেখা। ঘুম এসে যায়।

ফোর্ট সেন্ট জর্জের যে ঘরে সিলভেস্টার থাকে তার ডানপাশের ঘরে থাকে ক্যাপ্টেন ভিলিয়ার্স, বাঁপাশের ঘরে ক্যাপ্টেন কিলবার্ণ। ভিলিয়ার্স সুরসিক, নারীঘটিত নিজের অভিজ্ঞতা ফলাও করে বলতে পারে, হাসাতে জানে। মাদ্রাজে আসবার আগে ছিল সুরাটে। তার মতে নারী ভোগ্যপণ্য, সাদা হোক কালো হোক ফ্যাকাশে হোক বিন্দুমাত্রায় যায়-আসে না, যেমন হুইস্কী, জীন, ব্রাণ্ডি, বিয়ার যে-কোনো মদ্যই নেশা জমাতে পারে। বিশেষত পল্টনের চাকরিতে অনিশ্চয়তা এত বেশী যে, যে-কদিন বেঁচে আছ ফুর্তি করে নাও, ওব্যাপারে বাছবিচার করা পোষায় না। সিলভেস্টারের পেটগুলিয়ে ওঠে এ-সব শুনে ঘৃণায়।

কিলবার্ণের প্রকৃতি ঠিক বিপরীত। সে বলে জন্মমাত্রই মৃত্যু অবধারিত, সুতরাং সেই দিনের জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত এবং স্বর্গরাজ্যের পথ খোলা রাখাই হলো খৃষ্টানের ধর্ম। রোজ সে বাইবেলের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে, শুতে যাবার সময় বালিসের তলায় বাইবেলটি রেখে দেয়। বেশ ভালো লাগে তাকে সিলভেস্টারের।

ভিলিয়ার্সের পিতা পাদ্রী, ধর্মনিষ্ঠ চরিত্রবান পুরুষ, কিলবার্ণের পিতা ঘোরতর নাস্তিক, কিন্তু জন্মগত সংস্কারের এই বৈপরিত্য সিলভেস্টারের নিকট বিস্ময়কর।

*　　　*　　　*

রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় নবাব নওয়াজিস খাঁর দেওয়ান ছিলেন এবং গোপন রন্ধ্রপথে নবাব সরকারের বিরাট একটি অংশ নিজের ধনভাণ্ডারে এনে সঞ্চিত করেছিলেন। নওয়াজিসের মৃত্যুর পরে সিরাজের দৃষ্টি পড়লো সেই দিকে, চতুর রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণদাসকে দিয়ে পাচার করিয়ে দিলেন সেই অর্থ কলকাতায়। ইংরেজ কোম্পানীর দালাল উমিচাঁদ শেঠের সুপারিশে প্রেসিডেন্ট ড্রেক তাকে দিলেন আশ্রয়। এই আশ্রয়ের মূল্য-বাবদ উমিচাঁদ ও ড্রেক বেশ কিছু টাকা খেলেন কৃষ্ণদাসের কাছে। উমিচাঁদ ইংরেজ কোম্পানীরও বেনিয়ান, অর্থাৎ দালাল, ওদিকে সিরাজেরও প্রিয়পাত্র, টাকার দরকার হলেই সিরাজের ভরসা এই শেঠজী, দুমুখো সাপের মত উভয় পক্ষেই আছেন। ড্রেকেরও ভরসা উমিচাঁদ। সিরাজকে ধোকা দেওয়া হলো, কৃষ্ণদাস মালসহ সপরিবারে কাশীধামে চলে গিয়েছে।

কিন্তু আসল কথা ফাঁস করে দিলো মেদিনীপুরের ফৌজদার নারায়ণ সিং। সিরাজ যখন শৌকৎ জঙ্গকে খতম করবার উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়ার পথে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজমহল পৌঁছেছেন তখন ড্রেকের কাছে অপমানিত হয়ে নারায়ণ সিং সোজা সেখানে গিয়ে বললেন, কৃষ্ণদাস বিলকুল ধনসম্পত্তি নিয়ে কলকাতায়েই আছে ইংরেজের আশ্রয়ে এবং ইংরেজরা একটা নতুন কেল্লার ভিত্তি গাঁথছে গঙ্গার পাড়ে।

ড্রেক তবে মিথ্যা বলেছিলো যে পুরোনো কেল্লাটাই মেরামৎ করছে? কৃষ্ণদাসও কলকাতায়েই আছে? সিরাজ অগ্নিশর্মা হলেন, পূর্ণিয়া যাওয়া আর হলো না, ফিরে চললেন মুর্শিদাবাদে, তার আগে হুকুম পাঠালেন রায়দুর্লভকে, কাসিমবাজারের কুঠি দখল কর। শয়তান ইংরেজদের আমি দেখে নিচ্ছি। রোষে ক্ষিপ্ত নবাবের মনে পড়লো নবাবী তক্তে উঠবার সময় ইংরেজরা কোনো ভেট পাঠায় নি তাকে, দেখাদেখি ফরাসী ও ডাচরাও হাত গুটিয়েছিলো। ঐ সাদা ইন্দুরদের বেয়াদবি বেড়েই চলেছে?

রায়দুর্লভ কাসিমবাজারের কুঠি দখল করে কুঠির ফ্যাক্টর ওয়াট্‌স্‌কে হাতে দড়ি বেঁধে হাজির করলো মুর্শিদাবাদে, সেই সঙ্গে কুঠির যাবতীয় মালপত্তর, টাকাকড়ি, কামান-বন্দুক। সিরাজ ওয়াট্‌স্‌কে মুচলেকায় খালাস দিয়ে তিরিশ হাজার সেনাসহ রওনা হলেন কলকাতার দিকে।

সিরাজের কলকাতা অভিযানের সংবাদটি একই সঙ্গে পৌঁছল গভর্নর রেণো এবং রৌশনের কাছে চন্দননগরে। রৌশনের যেমন মৈনুদ্দীন, মঁশিয়ে রেণো তেমনি অনেক খবর পান উমিচাঁদের গোমস্তা কিষণরামের কাছ থেকে। কিষণরাম বিহারী ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবী বেনিয়া উমিচাঁদকে সে মনে মনে ঘৃণা করে। কর্তা বিস্তর টাকা লুঠছে, অথচ সেই টাকার হিসেব রাখে যে সে পায় মাত্র তিরিশ টাকা মাসে। ফরাসী গভর্ণরের কাছে সে বার্ষিক ছশো টাকা পায়, তাই গোপন সংবাদ সরবরাহে তার গরজ যথেষ্টই আছে।

খারাপ কোনো খবরই চাপা থাকে না, আগুনের মত দপ করে জ্বলে ওঠে, যতই চেপে রাখবার চেষ্টা করা যাক না কেন। মঁশিয়ে দ্যুমেনের রাম-মদ্য কলকাতায় খুব চালু। মঁশিয়ে বার্ণর্দের বিস্তর সুতো কলকাতার শেঠও বসাকরা কেনে। দুজনেই ছুটলেন কলকাতায়, কয়েক হাজার টাকার মাল পড়ে আছে সেখানে, কয়েক হাজার টাকা বকেয়া আছে।

বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডে মিঃ ওয়েস্টনের বাড়ি, দ্যুমেন প্রথমেই ছুটে গেলেন সেখানে, ওয়েস্টন তাঁর এজেন্ট। কিন্তু কোথায় সে? বাড়ি-ঘর খাঁ খাঁ করছে। বাড়ির নীচের তলায় গুদাম, কলকাতার সাহেবসুবোদের মাংস মদ, ডিম, কফি, মাখন, রুটি, ফলফুলুরি ওয়েস্টনের গুদাম থেকেই সরবরাহ হয়, কিন্তু সব মাল উধাও। নোংরা কাপড়চোপড় পরা একটা লোক বললো, সাহেব মেমসাহেব বিলকুল মাল নিয়ে কেল্লার ভিতরে উঠে গেছে, কলকাতার সব সাহেব-মেম কাচ্চাবাচ্চা ও আয়া-চাকর নিয়ে ওখানে, ওখানেই খায়দায় কুচকাওয়াজ শেখে। দ্যুমেন ছুটে গেলেন ওয়েস্টনের মীরমুন্সীর কাছে। সে বললো, টাকা পয়সার কথা ভুলে যাও সাহেব, ইংরেজদের রেড ল্যাম্প জ্বলতে আর দেরী নেই, রেড ল্যাম্প কি বুঝলে? লালবাতি। ওদের ফরচুনের গণেশ ফ্ল্যাট, ওরা সব রাঙ্গ-পরা বন্দুকগুলি ছাপ করছে, আর কেল্লার উঠনে রাইট লেফ্‌ট্‌ করছে, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? বড়সাহেব ড্রেক ও পাদ্রীসাহেব মেপল্‌টনও রাইট লেফ্‌ট্‌।'

সাহেবপাড়া শূন্য। ফিরিঙ্গীপাড়া ও দিশিপাড়ায়ও পালাও পালাও রব। বার্ণার্দ দেখলেন জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে, আগুন লাগাচ্ছে ইংরেজের সেপাইরা, যাতে নবাবের সৈন্যরা সহজে এগুতে না পারে। দলে দলে মেয়েমর্দ ছেলেপুলে নিয়ে ছুটছে গঙ্গার দিকে, নৌকা, ডিঙি, পানসী,

আওয়াজে না জুটলে সাঁতার দিয়ে প্রাণ বাঁচাবে। ফিরিঙ্গী ও আর্মানি মেয়েরা মুখে-হাতের ফর্সা রঙ কালির ভুষোয় ঢেকে, ফ্রক ছেড়ে ধুতি পায়জামা পরে পাগলের মত দৌড়চ্ছে। বার্ণার্দ চিনতে পারেন না সুতোনুটির বাজার, পাত্তা পেলেন না শেঠ বসাকদের।

দ্যুমেন ছুটলেন উমিচাঁদের হালসী-বাগানের বাড়ি। উমিচাঁদ ইংরেজ কোম্পানীর বাকী-বকেয়ার জামীন, লেনদেনের জিম্মেদার। বরকন্দাজরা পাহারা দিচ্ছে বাড়ি, সাফ-সাফাই চলছে। হাঁকডাকের বিরাম নাই। দ্যুমেনকে হাঁকিয়ে দিল তারা, শেঠজী বাড়ি নাই। রাস্তার একটি লোক বললো, শেঠজী নবাবের ভয়ে গায়ে ছাই মেখে গেড়ুয়া পরে সন্নেসী হয়ে বেরিয়ে গেছে। আরেকজন চুপি চুপি বললো, নবাবকে সেলাম বাজিয়ে আনতে গেছে।

গভর্নর রেণো, রৌশন ও কমান্দান্ত আগ্লোয়া সকাল হতে বসে আছেন লাঠকুঠীর ভিতরের ঘরে। ঘন ঘন খবর আসছে কিষাণ-রামের কাছ থেকে। সে চিরকুট পাঠাচ্ছে উর্দুতে, রৌশন তরজমা করে শোনাচ্ছে রেণো ও আগ্লোয়াকে। ঢিপ করে শব্দ হয় পেছনের বাগানে, কুড়িয়ে আনে রেণোর খোদ খিদমৎগার আলি আসগর, কখনো কখনো একটা বাঁশের চোঙা, কখনো একটা ঝুনো নারকেল, কখনো একটা মদের বোতল, চিরকুট লুকোনো থাকে ভিতরে। কারা ফেলে যায়, কেউ দেখতে পায় না। কিষণরাম হুঁশিয়ার লোক।

রৌশন তরজমা করে শোনায়ঃ—

—নবাবের সৈন্য চিৎপুর দিয়ে ঢুকে পড়েছে। গুটি কয়েক সৈন্য ও দুটো কামান নিয়ে এনসাইন পিচার্ড রুখতে গেল, কিন্তু মারা পড়েছে। চিৎপুরের নালা পারিয়ে নবাব হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছেন। সঙ্গে এসেছে মীরজাফর রায়দুর্লভ মাণিকচাঁদ মীরমদন এবং আরো কয়েকজন বড় বড় সেনাপতিরা। মীরমদন লাল-বাজারের মোড়ে মেয়র্স কোর্ট ঘেরাও করেছে।

আগের চিঠিটা পেয়ে থাকবেন হুজুর। লালাবাজারের যুদ্ধ এখনো চলছে, কিন্তু শেষ হতে বোধহয় বেশী দেরী নাই। ইংরেজদের খালি বাড়িগুলো ও পাথুরে গীর্জার মধ্যে গা' ঢাকা দিয়ে নবাবের সৈন্যরা মেয়র্স কোর্টের উপর কামান দাগছে। ওখানে ক্যাপ্টেন ক্লেটন বিশজন গোরা সৈন্য নিয়ে লড়ছিলো, সে এবং বারোজন সৈন্য মারা পড়েছে, বাকি সব পালাচ্ছে। একজন ভিখারী অন্ধ আপনার ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে পাঁচশো টাকা পাঠালে বাধিত হব, খরচায় কুলোতে পারছি না।

—সন্ধ্যের অন্ধকারে নবাবের সেনারা আর এগুতে চায় না, চৌরঙ্গীর মধ্যেই ছাউনী ফেলেছে। ওখানে মাত্র পাঁচ হাজার, বাকী পঁচিশ হাজার এদিকটায় ছড়িয়ে আছে। ওদিকে শুনছি ফোর্ট-উইলিয়ামে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। সেখানে ইংরেজদের মাত্র পাঁচশো পনের-জন সৈন্য, তার মধ্যে একশো আশিজন দিশি কালা সেপাই ও মেটে-ফিরিঙ্গী। এরা কেন, এদের কর্তারাও কোনোদিন যুদ্ধ করা দূরে থাক যুদ্ধ দেখেও নি। কামান বন্দুকগুলোর জন্যে গোলাগুলির টান পড়েছে এরই মধ্যে, কেল্লার দেওয়ালও মজবুত নয়। টাকাটা এইমাত্র পেলাম হুজুর, কাল ভোরে আবার চিঠি পাঠাবো। ওঃ একটা কথা, আপনি যে বারুদ পাঠিয়েছিলেন তাতে নবাব খুব খুশি হয়েছেন শুনলাম।

'আমি বারুদ পাঠিয়েছিলাম নবাবকে? কিষণরাম বলে কী!' স্বগতোক্তি করেন রেণো। 'মশিয়ে আগ্লোয়া, আপনি কিছু জানেন?'

আগ্লোয়া চুপ করে থাকেন, জবাব দেয় রৌশন।

'চালানটা পাঠানো হয়েছিলো পুর্ণিয়া শৌকৎজঙ্গের জন্যে, কিন্তু দেরী হয়ে গেল, ত্রিবেণীর ওখানে তখন কলকাতা-মুখো নবাবের একদল সৈন্য পৌঁছে গেছে। মৈনুদ্দীন পাখোয়াজ লোক, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে চালানটা ওদের হাতে তুলে দেয়, বলে ফরাসী লাটসাহেব নজরাণা পাঠিয়েছেন, এটা বেশী কাজে লাগবে খোদাবন্দের।'

'আমাকে না জানিয়ে পাঠানো ঠিক হয় নি।' মন্তব্যটি করলেন রেণো আগ্লোয়াকে লক্ষ্য করে।

'বারুদ আমাদের বিস্তর জমে গেছে মশিয়ে গভর্নর।'

'কিন্তু এ-ব্যাপারের আরো একটা দিক আছে, সেটা রাজনৈতিক, যাক, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। নবাব খুশি হয়েছেন, চন্দননগরের আর ভয় নেই।'

ভার্তানেসের ডাক পড়লো। কমান্দান্ত সাহেব এখানেই আজ খেয়েদেয়ে শুয়ে থাকবেন। আলি আসগরেরও ডাক পড়লো। কমান্দান্ত সাহেবের রাতের পোষাক সব ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখতে ও গোসলের বন্দোবস্ত করতে।

লাট-কুঠির হালদার গুঁইরাম নন্দী বিকেল বেলায়েই কাজ সেরে রোজ চলে যায়। গঙ্গা পার হয়ে আসা-যাওয়া করে সে। তার গ্রাম নয়হাটি নদীর ওপারে, চন্দননগর এপারে। ভার্তানেস বাবুর্চীখানার দিকে যাচ্ছিল, দেখে কয়েশবারাত বন্ধ করে গুঁইরাম চুপটি করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

'কিগো নন্দী, এখনো যাওনি যে?'

নন্দী শুকহাসি হেসে জবাব দেয় 'আজ আর যাবো না ভাবছি।'

'কেন?'

'ওপারে নবাবের সেপাইরা চলাফেরা করছে। ফোঁটা তিলক আর মাথায় চৈতন-চুটকি দেখলে কেটে ফেলবে।'

'বৌটা আর ছেলেমেয়েগুলো?'

'বিয়ে করা বৌ তো নয়, সাহেব, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

'বস্টুমীটার কপালে আজ কী আছে কে জানে।'

'তাই তো ভাবছি।'

'তোমার না আজ কেত্তন বলেছিলে?'

রেখে দাও কেত্তন, কেষ্ট নামে কি ঐ মামদো ভূতরা ভাগবে? বরং তেড়ে আসবে।'

'তবে না বলেছিলে কেষ্ট নামে সব বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।'

'আরে, সে তো গোঁসাই মশাইরা বলেন, হাতেনাতে প্রমাণ পেলাম কোথায়? সেবার ছোট ছেলেটার ওলাউঠো হলে পুরো চব্বিশ ঘন্টা নাম-কেত্তন চালিয়ে-ছিলাম, ছেলেটাকে বাঁচানো গেল কই?'

'তাহলে মুখে যা বলে বেড়াও মনে তা বিশ্বাস কর না, কেমন?'

গুঁইরাম চটে গেল। 'তুমি খৃষ্টেন, এসব কি বুঝবে? আগের আগের জন্মে অনেক পুণ্যি করলে তবে হিন্দু হয়ে জন্মানো যায়।'

ভার্তানেস হাসে। 'এখানেই তবে চারটি মুখে দিয়ে শুয়ে থাকো নন্দীমশাই?'

'ধ্যাৎ, তোমাদের মেলেচ্ছোর ছোঁয়া খেলে যে জাত যাবে?'

জাত তোমাদের এমন ঠুনকো জিনিষ নাকি?

'তবে মাথা মুড়িয়ে গোবর খেলেই আবার জাতে ওঠা যায়, ঠুনকো হবে কেন?'

'না হয় তাই খেয়ো, গোবরের সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে?'

ভার্তানেস চলে যায় নিজের কাজে। হিন্দুদের জাত-ফাৎ সব ঐ বামুনদের বজ্জাতি এবং এই লোকটা একটা আস্ত ভণ্ড, অমানুষ। বিয়ে না করলেও তো ঘর করছে একসঙ্গে ঐ মেয়েমানুষটা নিয়ে, গুচ্ছের কাচ্চাবাচ্চা পয়দা করেছে, তাদের কথা না ভেবে নিজের প্রাণের কথাই শুধু ভাবছে?

সারাদিন চিৎপুর ও লালবাজারের কামানগর্জন চন্দননগরের অধিবাসীরা কান পেতে শুনেছে, নানারকম গুজব ছড়িয়েছে, ফরাসীরা খুশিমুখে মদের বোতল খুলে ইংরেজদের হেনস্তায় ফুর্তি করেছে, সেই

উত্তেজনা ক্রমে ঘুমোর পার্টির জন্য পাচ্ছ গেল। ঘুমোর নি মাদমেন, বার্দার্ক, লোকসানের জঙ্গলাটা বড় ধিকধিকি করছে। ঘুমোর নি গুইরাম নন্দী, বস্টুমী আর কাচ্চাবাচ্চা ছাড়াও তার গোলায় পঞ্চাশ মণ চাল মজুদ, হয়তো তাও লুট হয়ে গেছে। আর ঘুমোর নি খিদমৎগার আলি আসগর। তিন দিন আগে তার আর্মানি পিয়ারী চিড়িয়াবিবি খুড়তুতো বোনের বিয়েতে কলকাতা গেছে, আলি বারে বারে বলছিলো যাস নি চিড়িয়া, তোকে না দেখে আমি একদিনও বাঁচবো না, কিন্তু সে নিষেধ শোনে নি। কলকাতা থেকে পিলপিল করে লোক আসছে গঙ্গা পেরিয়ে হাঁটাপথে, আলি পাগলের মত ছুটোছুটি করছে সারারাত, চিড়িয়া তো এল না, তবে কী সে আটকা পড়ে গেছে, না নবাবের ফৌজের হাতে পড়েছে? ব্ল্যাকটাউন দিশিপাড়াটা একেবারে পুড়ে ছাই, একজনের কাছে শুনলো, কিন্তু সাহেবপাড়াটা একদম খালি, কিন্তু মাঝখানের মুর্গীহাটার বিশেষ কিছু হয় নি। আর্মানি ও ফিরিঙ্গীরা বেশীর ভাগ ওখানেই থাকে তারা আগেই পালাতে সুরু করেছিলো অনেকে ফোর্টউইলিয়ামে আশ্রয় নিয়েছে, তবে বোধহয় চিড়িয়াও ঐ দলে।

ভোর-ভোর সময়ে আর একখানা চিঠি এল বিষণরামের,

—আচ্ছা বীরপুরুষ বটে ইংরেজরা। রাতের অন্ধকারে কেল্লার সব স্ত্রীলোক ছেলেমেয়েদের তিনখানা জাহাজ ভর্তি করে দক্ষিণমুখো পাঠানো হয়, সে সময়ে কাউন্সিলের মেম্বর উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যান্ড ও চার্লস ম্যানিংহাম তাদের উঠিয়ে দেবার অজুহাতে যে জাহাজে চড়লেন আর নামেন নি। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ড্রেকসাহেব ও মেমসাহেবের বেশে যখন উঠতে যাচ্ছিলেন তখন একজন গোরাসৈন্য তাকে চিনতে পেরে গুলী ছোঁড়ে, কিন্তু গুলীর তাক ফস্কালো, সেই সঙ্গে ড্রেকও ফস্কে বেরিয়ে গেলেন। শোনা যাচ্ছে কেল্লার বড় সেনাপতি কর্ণেল মিচেলও ভেগেছে গোলমালের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে। কেল্লায় খাবারদাবার প্রচুর জমা করা হয়েছিল, কিন্তু চাকরবাকর নেই, রাঁধবে কে? বাকি যারা আছে শুধু মদ খেয়ে কাল রাতটা কাটিয়েছে। শুনেছি ডাক্তার হলওয়েল এখন ওখানকার বড়কর্তা। উপযুক্ত লোকই বটে!

—আরো কিছু টাকা দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন হুজুর। গোলামকে নিরাশ করবেন না। নবাবের ফৌজ ফোর্টউইলিয়মের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে, কিন্তু লড়াই সুরু করছে না কেন বোঝা যাচ্ছে না। বড় বড় সেনাপতিরা সব এই হালসীবাগানের বাড়িতে নবাবের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করছেন, বোধহয় সন্ধ্যের আগে গোলাবাজি সুরু হবে না, শোনা যাচ্ছে। আজ দিনের আলোয় দেখা যাচ্ছে কাল রাতে জাহাজে উঠে সটকানোর ঠেলাঠেলিতে দু-তিনশো সাহেব-মেম ফিরিঙ্গী আর্মানি ও গোরাসৈন্য জলে ডুবে মরেছে, শবগুলি ভাসছে। নবাবের সিপাইরা চুপ করে বসে নেই, লুঠতরাজ করছে। মনে হচ্ছে পাঠানোর মত কোন খবর থাকবে না কাল সকাল পর্যন্ত। সেলাম।

সত্যিই কোনো চিঠি এলো না সারাদিন, রাতের বেলাও নয়, এলো পরদিন সকালেঃ

—ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে রাত্তিরে। হলওয়েল একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমার কর্তা উমিচাঁদকে কাল দুপুরে, এখন জানতে পারলাম। সে চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন বলে-করে নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজী করান, ইংরেজরা মোটা খেসারৎ দিতে রাজী। ভিতরকার ব্যাপার কি জানি না, সন্ধ্যের সময় দেখা গেল কেল্লার চারিপাশে ইংরেজদের বাড়ি, আপিস, রসদখানা, গুদোমগুলি দাউ-দাউ করে জ্বলছে। শুধু আগুন লাগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি নবাবের ফৌজ, কেল্লার পূবের দিকের দেওয়ালটাও ভেঙে ফেলেছে। ইংরেজরা তোপ দাগতে সুরু করে, কিন্তু গোলার অভাবে তোপগুলি একে একে চুপ হতে থাকে, তখন হলওয়েল হঠাৎ দেখতে পেলেন নবাবের একজন সেনাপতি ইশারা করে কি যেন বলছে। হলওয়েল ভাবলেন উমিচাঁদের কাছে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন তার ফল এতক্ষণে ফললো, সাদা নিশান তুলে দিলেন কেল্লার বুরুজে। এখানেই হয়তো সব চুকে যেত, কিন্তু যে ভীষণ কাণ্ডটার কথা বলছি এই চিঠির গোড়ায়, সেটা এখন বলি। রাতেরবেলা কয়েকটি গোরাসৈন্য মদে চুর হয়ে নবাবের লোকদের মারধর সুরু করে, তখন তারা ঐ মাতালদের ছোট্ট একটা কুঠুরীতে বন্ধ করে রাখে। ওটা কেল্লার গারদঘর, মাত্র দু-তিনজনের মত জায়গা, সেখানে দমবন্ধ হয়ে জনতিরিশেক মারা যায় শোনা যাচ্ছে।

বিকেলবেলা কিষণচাঁদের আরো একটা চিঠি এলঃ

—এদিকের ব্যাপার সব চুকে গেল মনে হচ্ছে, হুজুর। হলওয়েলসাহেব ও আর সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ওরা ফলতার দিকে পালিয়েছে। যে তিনটে জাহাজ পরশুদিন ছেড়েছিলো সেগুলি নাকি ওখানেই নোঙর ফেলে আছে। নবাব কলকাতার নাম পাল্টে দাদুর নামে নাম রেখেছেন আলিনগর, ভাঙা কেল্লার ভিতরে একটি মসজিদ তৈরী করবার হুকুম হয়েছে। নবাব মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে চুর হয়ে আছেন ইংরেজদের খতম করার আনন্দে, এখানে খুব খানাপিনা জলসা-জমায়েত চলছে রাতদিন। এই গোলামের কাজে হুজুর খুশি হয়েছেন আশা করি।

প্রাতরাশের আগেই এসে হাজির হলেন চুঁচুড়োর বার্গোমাস্টার ব্যারণ ভ্যান্ডারবিল্ট।

'বন্জুর মঁশিয়ে গভর্নর, বন্জুর মঁশিয়ে কমান্দান্ত, বন্জুর মাদাম, বিপদে পড়ে হঠাৎ আসতে হলো?'

'আপনার আবার কী বিপদ, ব্যারণ?' জিজ্ঞাসা করেন রেণো।

'পিলপিল করে লোক আসছে কলকাতা থেকে চুঁচড়োয়, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত কপর্দকহীন। আমিও মানুষ, ঐ হতভাগ্যদের একটা কিছু বন্দোবস্ত না করলে তো চলে না? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খিদেয় কাঁদছে, বড়দেরও খিদে-তেষ্টায় মুখ শুকিয়ে গেছে। কিছু টাকা চাই।'

'আগে বসুন ব্যারণ, প্রাতরাশ আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিন, আমি চৌধুরীকে ডাকিয়ে আনছি, ওটা তারই এক্তিয়ারে।'

চৌধুরীকে ডাকতে পাঠাতে হল না। হন্তদন্ত হয়ে সে নিজেই ছুটে এসেছে।

'ভিতরে আসতে পারি, মঁশিয়ে-লা-গভর্নর?' কণ্ঠস্বর শোনা গেল তার।

'আসুন ভিতরে, খবর কী?'

'প্রায় তিন হাজার আর্মানি ও ফিরিঙ্গী মেয়ে-পুরুষ ছেলেপিলে সারারাত কাল কেল্লার মাঠে এসে বসেছিলো, ওরা কলকাতায় শীঘ্র ফিরে যেতে চায় না। এমনিই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এখন উপায়?'

রেণো তাকালেন ভ্যান্ডারবিল্টের মুখের দিকে। 'মঁশিয়ে-লা-ব্যারণ, আপনি ঠিকই বলেছেন, এই বিপদে আমরা ছাড়া ওদের মুখে রুটি দেবার আর কেউ নেই। আমরা খৃষ্টান, প্রভু যীশু আমাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন। আমি আগে খবর পাই নি ওরা এখানেও কিছু কিছু এসেছে। আপনার কত আপাতত প্রয়োজন?'

'পাঁচ হাজার, সামনের মাসেই শোধ দিতে পারবো। মাদাম, একগেলাস ব্রান্ডি পেতে পারি? সারারাত কাল ছুটোছুটি করতে হয়েছে।'

আলি আসগর নিকটেই ছিল, রেণোর হুকুমে একবোতল ব্রান্ডি ও গেলাস নিয়ে এলে সে নিজের হাতেই ঢেলে দিল ভ্যান্ডারবিল্টকে। পশুর মত ইন্দ্রিয়াসক্ত স্থূলদেহী এই লোকটিকে সে এতদিন ঘৃণা করে এসেছে, আজ তার ভিতরে একটি নতুন মানুষের সন্ধান পেয়ে সে-ঘৃণা শ্রদ্ধায় পরিণত হলো।

'মঁশিয়ে চৌধুরী, খাজাঞ্চিখানা খুলতে তো দেরী আছে, আপনার বাড়িতে পাঁচ হাজার টাকা হবে?' প্রশ্ন করেন রেণো।

'হবে মঁশিয়ে।'

[ক্রমশঃ]

মাসিক রাশিফল

॥ জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলাফল ॥

ধনু লগ্নের উদয়ে রবি বৃষে প্রবেশ করেছে। এবার ১৫ই মে শুক্রবার থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস শুরু হয়েছে। গ্রহ সন্নিবেশ অনুযায়ী এমাসও জটিল। শুধু বাঙলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাসের নয় তারিখ থেকে লক্ষণীয়। বাংলা নববর্ষ এবং পরবর্তী বর্ষ বিশ্বশান্তির বিঘ্নকর। বারবার বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা ঘটতে পারে। বর্তমান বর্ষের ভাদ্র থেকে পৌষ পর্যন্ত সময় ভারতবর্ষের পক্ষে জটিল ও বিশেষ লক্ষণীয়। আমেরিকার পক্ষে এ দুই বৎসর অভিশপ্ত বর্ষ রূপে চিহ্নিত হতে পারে। ভারতের রাশি মকর এবং খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় অনুযায়ী গ্রহ-সন্নিবেশ এবং তার ফলাফল বর্তমান বর্ষ একটি জটিল ক্রান্তির মুখে। রাষ্ট্রিক, সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কীয় এমন কি বৈষম্যের মধ্যেও শনির প্রতিক্রিয়া এ দু'বছরে ওলট-পালট পরিবর্তন আনতে পারে। পুরনো ঐতিহ্য কিংবা ধর্ম সংস্কৃতির রূপ পালটাবে। নূতনের পালা শুরু করছে শনি। তার মাঝে জাগবে মানবতা বোধ। এ মাসে দুর্ঘটনা বাড়বে। কোনো আকস্মিক রোগ প্রবল হয়ে উঠতে পারে। মাসের সূত্রপাত সিংহে চন্দ্র ও কেতুর মিলন, তার দু পাশে কোনো গ্রহ নেই। রাজনৈতিক নেতা ও প্রধান ব্যক্তিদের পক্ষে এ গ্রহ-সন্নিবেশ প্রতিকূল। তারুণ্যের কারক বুধ গ্রহ এখন মঙ্গলের ক্ষেত্রে শনিযুক্ত এ যোগও জটিলতাসূচক। রবি এসে শুক্রের ক্ষেত্রে মঙ্গল ও শুক্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে "যুদ্ধং দেহি" মনোভাব, অসহিষ্ণুতা ও পরকে পীড়নের মনোভাব বিশ্বের সর্বত্রই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আরব-ইস্রাইল ও কম্বোডিয়াকে নিয়ে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আতঙ্কজনক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। যাক্, এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের শুভাশুভ আভাস দিচ্ছি :---

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

মেষ : : ব্যবসায়ে যোগাযোগের দিকে ভাল। অতিরিক্ত কাজের চাপ শরীর খারাপ করতে পারে। ছেলে-মেয়েদের কারো সম্পর্কে সুখবর পেতে পারেন। শির:পীড়া ও বাতের উৎপাত সম্পর্কে সাবধান। ব্যয় বাড়বে। [illegible] অর্থে টান পড়বে। কোনো জিনিস বিক্রী করারও আশঙ্কা। চাকুরীক্ষেত্রে নূতন খবর ও ব্যবসায়ে নূতন কিছু করার সম্ভাবনা। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে পদোন্নতি হবে। পারিবারিক পীড়াদি উৎপাত করতে পারে। আকস্মিক অর্থ কিংবা সম্পত্তি লাভ হতে পারে। লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে শুভদ্যোতক। গায়ক ও অভিনেতার পক্ষে প্রতিকূল। বিবাহেচ্ছু তরুণ ও তরুণীদের এখন সাবধান থাকা উচিত। দূরে কোথাও যাবার সম্ভাবনা আছে। ধর্মের দিকে ঝোঁক থাকলে কিংবা রাজনীতির দিকে সক্রিয় হলে তার ফল ভাল হবে না। বেকারের চাকুরী হতে পারে। চাকুরে মহিলাদের পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা। স্বজনদের কারো জন্য উদ্বেগ যাবে। মেষ লগ্নে জন্ম হলে ব্যয় বাহুল্য। কর্মক্ষেত্রে বিশৃঙখলা ও আর্থিকদুশ্চিন্ত মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করবে।

বৃষ : গোড়ার এগারো দিন লক্ষণীয়। পারিবারিক দিক্ থেকে মনের উপর চাপ পড়বে। মধ্যভাগে শরীর খারাপ করতে পারে। গুরুজনদের মধ্যে কারো অসুখ-বিসুখে সাবধান। দাম্পত্য ক্ষেত্রে দুর্ভাবনার সম্ভাবনা। বয়স্কা বা বিবাহযোগ্যা মেয়েদের জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা। ব্যবসায়ে আগের চেয়ে কিছু ভাল হতে পারে। দূরে কোথাও যেতে হলে বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা উচিত। পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। ঘনিষ্ঠদের কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ও আর্থিক ক্ষতির কারণ রয়েছে। জমি বাড়ি নিয়ে ও উত্তরাধিকার নিয়ে গোল-মাল হতে পারে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতারিত হবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা। সিনেমা হাউস মালিকদের পক্ষে এ মাস সঙ্কট-সূচক। নতুন ব্যবসার পক্ষে এখন অনুকূল নয়। মহিলাজাতকের প্রীতির প্রসার ও আর্থিক উন্নতি হবে। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে সম্মান বৃদ্ধি ও নূতন যোগাযোগ আনন্দ বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু পারি-বারিক ব্যাপার প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে।

মিথুন : পারিবারিক ক্ষেত্রে সদস্য ও গুরুজনদের কারো স্বাস্থ্য আকস্মিক উৎপাত সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নূতন দায়িত্ব বাড়বে ও সমস্যা উৎপাত করবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত হবারও সময় এসেছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কারো ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসায়ের প্রসার ও নূতন উদ্যমে সাফল্যের আভাস রয়েছে। আয়ও বাড়বে। কিন্তু জমি-বাড়ি ও বৈষয়িক ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। কোনো কন্যার বিবাহের ব্যাপারেও আকস্মিক ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করতে পারে। দূরে কোথাও যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। গায়ক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে সুযোগ-প্রদ। বিলাসী তরুণীদের পক্ষে সংসর্গ সম্পর্কে সাবধান। প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে চাকুরী লাভ হতে পারে। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে অনুকূল নয়। মহিলাজাতকের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে আয় বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল হবে না। স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে।

কর্কট : আগের কোনো প্রচেষ্টা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে নৈরাশ্য আনতে পারে। স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে। যাঁদের উপর নির্ভর করে চলেছেন, তাদের মতিগতিও প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে। প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকদের পক্ষে এ মাস বিশেষ লক্ষণীয়। পত্নী ও সন্তানাদির স্বাস্থ্যও উৎপাত করবে। বেশ মোটা রকমের আর্থিক অপচয়ের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা। দূরে কোথাও গিয়ে অসুবিধায় পড়তে পারেন। নববিবাহিতদের দাম্পত্য ক্ষেত্রে অশান্তির আশঙ্কা। ব্যবসায়ে ধীরস্থিরভাবে চলা উচিত। রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা। চাকুরীক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে কুৎসা এবং ক্ষতির আশঙ্কা। চাকুরীপ্রার্থীর কারো সহায়তা উপকার করবে। লেখক, অভিনেতা ও অ্যাকাউণ্ট-বিভাগের কর্মীদের পক্ষে প্রতিকূল এ মাস। মহিলাজাতকের দেহকষ্ট হলেও প্রীতির যোগ আছে। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পেলেও যে-কোনো কারণে মানসিক উৎকণ্ঠা যাবে এবং কোনো কারণে দূরে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ে বিশেষ সাবধান।

সিংহ : বুদ্ধিজীবীর প্রোফেশনে আয় বাড়বে। আমদানি-রপ্তানীর ব্যাপারে রাসায়নিক দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের কারবারে অনুকূল। বস্ত্র ব্যবসায়ে নৈরাশ্য। খেলোয়াড়দের এখন প্রতিকূল সময়। পরীক্ষাদির ব্যাপারে বিশেষ সাবধান। চাকুরীক্ষেত্রে উচ্চাশা পূরণের পক্ষে বাধা। নূতন ব্যবসায়ের মধ্যে ছোট-খাটো কারখানা স্থাপনের অনুকূল। পারিবারিক ক্ষেত্রে পীড়াদি সঙ্কট এবং নিজের স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। পত্নীর জন্য উৎকণ্ঠা যেতে পারে। মন্তব্য প্রকাশ ও বক্তৃতা করার সময় বিশেষ সাবধান। আয় বাড়বে। এখন বাইরে থাকা ভাল। বয়স্ক ছেলে ও পুত্রবধূ সম্বন্ধে উত্যক্ত হবার আশঙ্কা। পুঁজিপতি ও রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে এ বছর অত্যন্ত গোলমেলে। গায়িকা, অভিনেত্রী ও বিলাসিনী মেয়েদের সংশ্রব সম্পর্কে সাবধান। মহিলাজাতকের স্বাস্থ্য খারাপ যাবে। প্রিয়জনের জন্য দুশ্চিন্তা হবে। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। নীলা ও চুণী ধারণে উপকার হতে পারে। নূতন ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগে বিশেষ সাবধান।

কন্যা : স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। মানসিক দুর্বলতা ও অকারণ আত্মসচেতনতা আপনার ক্ষতি করছে। নিজের কাজ করে যান। কোনো মন্তব্য করবেন না। পরের ঝঞ্ঝাটে যাবেন না। চাকুরীক্ষেত্রে শত্রুতা বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু উত্তেজিত হবেন না। পুরণো ব্যবসা হয়ত প্রায় অচল হয়ে উঠতে পারে। ছয় মাস ধৈর্য ধরে থাকুন। চাকুরীক্ষেত্রে নূতন সুযোগ এলে গাফিলতি করে তা নষ্ট করবেন না। সম্পত্তি কিংবা কোনো জিনিস বিক্রী করার মত সম্ভাবনাও আছে। কারো বিয়ের ব্যাপারও হতে পারে। পরিচিত আত্মীয় কিংবা বন্ধুদের মধ্যে কারো বিপদে নিজে জড়িয়ে পড়তে পারেন। পৌত্র পৌত্রী কিংবা দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদের মধ্যে কারো সঙ্কট পীড়াদি উত্যক্ত করতে পারে। নববিবাহিতদের দাম্পত্য সম্পর্কে সাবধান। মহিলাজাতকের গায়ক ও অভিনেতাদের মোহ থাকলে তা এড়িয়ে চলা উচিত। হৃদ্‌দৌর্বল্য ও উদর-বায়ুর উৎপাত সম্পর্কে সাবধান। কন্যা লগ্নের জাতক-জাতিকার আয় বৃদ্ধি, কিন্তু সাংসারিক ঝঞ্ঝাট যেতে পারে।

তুলা : বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্য ও সুযশ বাড়বে। নূতন ব্যবসায় পত্তনের পক্ষে এ মাস অনুকূল নয়। কোনো কারণে সঞ্চিত অর্থও ব্যয় করতে হবে। কাউকে উপহার দেবার জন্যও ব্যয় বাড়বে। চাকুরীক্ষেত্রে প্রমোশনের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট আছে। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। জ্বর ও পেটের গোলমাল উৎপাত করতে পারে। তরুণ ও তরুণীদের পক্ষে গান কিংবা অভিনয় শিখতে গিয়ে অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ার আশঙ্কা। রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রতিকূল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদিতে ভাল হতে পারে। বেকারের কর্মলাভের সম্ভাবনা। ফাটকা ও শেয়ারের ক্ষতি হবে। ওষুধপত্র খাওয়া ও ব্যবহারের

ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। মহিলা জাতকের হঠাৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিবাহের এখন অনুকূল সময় নয়। প্রণয়মূলক বিবাহে আফশোষ হতে পারে। তুলা লগ্নে জন্ম হলে পারিবারিক ঝঞ্ঝাট ও ব্যবসায়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। সরিকী ব্যাপারে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ গোড়ার দিকে অস্বস্তিকর হলেও নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। নূতন কোনো ব্যাপারে মর্যাদা বৃদ্ধির অনুকূল। শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকদের পক্ষে শুভদ্যোতক। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ছেলেমেয়েদের কারো জন্য উদ্বেগ যাবে। ব্যবসায়ে নূতন সম্ভাবনা গুরুজনদের কারো স্বাস্থ্যসঙ্কট ঘটাতে পারে। চুরি, আগুনে ক্ষতি, পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া কিংবা যান-বাহনে উঠতে গিয়ে আঘাত লাগা প্রভৃতি সম্বন্ধে সাবধান। দূরে কোথাও যাবার আমন্ত্রণ আসতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা উচিত। কোনো মহিলা বন্ধুর মোহে কুৎসাভাজন হতে পারেন। পরীক্ষার্থীদের এ মাস অনুকূল। শেষাংশে স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। অভিনেতা ও সিনেমার প্রযোজকদের এখন সময় গোলমেলে। মহিলা জাতকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। চাকুরে মেয়েদের উন্নতি হবে। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে শত্রুতা, ঝঞ্ঝাট ও ব্যয়বাহুল্য উত্ত্যক্ত করবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। মুক্তা ধারণে উপকার হতে পারে।

ধনু : আগের কোনো ব্যাপারে সুরাহা হতে পারে। কারো সহায়তা উপকার করবে। কিন্তু ব্যবসায়ে অর্থাগম যেমন বাড়বে, তেমনি সাংসারিক চাহিদাও উত্ত্যক্ত করবে। কারো অসুখ-বিসুখ কিংবা বিপদ-আপদে আর্থিক টান পড়বে। পুরনো শত্রুতা নষ্ট হতে পারে। কিন্তু নিতান্ত ঘনিষ্ঠ কোনো মহিলার সঙ্গে এমন কোনো সম্পর্ক না থাকলেও কার্যকারণে তার সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি কিংবা কারো সাহায্য পাবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ হোন। ডাক্তার ও রসায়নবিদদের পক্ষে শুভ। যাঁরা 'থিসিস' লিখছেন, তাঁরা সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করে দাখিল করতে চেষ্টা করুন। জমি-বাড়ির হাঙ্গামায় সতর্ক থাকা উচিত। তরুণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সুযোগ আসবে। কিশোরী মেয়েদের স্বজন-সান্নিধ্য ছাড়া বেড়ানো ক্ষতিকর হতে পারে। মহিলাজাতকের মনোমত দ্রব্য লাভের সম্ভাবনা। ধনু লগ্নে জন্ম হলে বিবাহেচ্ছুদের যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। কর্মক্ষেত্রে নূতন দায়িত্ব বাড়বে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে সুফল হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান।

মকর : প্রীতির সম্পর্কের প্রসার ঘটবে। মৌলিক কাজ অর্থাৎ গবেষণা, গ্রন্থাদি রচনা কিংবা শিল্পকর্মের জন্য যোগাযোগের দিক থেকে ভাল, কিন্তু গুপ্ত শত্রুতা এবং পুরনো সম্পর্কের কোনো জটিলতা উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। বিবাহিতদের পূর্ব প্রেম-প্রণয় বা ঘনিষ্ঠতা নূতন উৎপাত সৃষ্টি করতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল উন্নতির আভাস। বেকারের চাকুরী লাভ ও ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধির যোগ। আকস্মিক কোনো ব্যাপারে নিজের মর্যাদার উপর আঘাত পড়তে পারে। ফাটকা, জুয়া কিংবা অবৈধ সংসর্গের ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। রাজনৈতিক ব্যাপার অনুকূল হবে না। সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিদের মৌলিক রচনা

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাঙ্কেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম— ....

ঠিকানা— ....

....

মাসিক বসুমতী

কিংবা শিল্পসৃষ্টির কাজের অনুকূল। বিবাহেচ্ছুদের প্রলোভনে পড়া উচিত হবে না। মোহঘটিত ভুল ক্ষতি করতে পারে। ছেলেমেয়েদের কারো সম্পর্কে সুখবর পেতে পারেন। মহিলাদের জ্ঞাতি ও পুরুষ বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা। মকর লগ্নে জন্ম হলে কর্মের বিস্তার, কিন্তু শত্রুতা ও পারিবারিক ঝঞ্ঝাট উত্যক্ত করতে পারে। গোমেদ রত্ন ধারণে উপকার হতে পারে।

কুম্ভঃ মন্তব্য প্রকাশ ও বর্তমান কার্যধারা যথাযথ হচ্ছে কি না, এ ব্যাপারে বিশেষ চিন্তার সময় এসেছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ কোনো জটিলতা আকস্মিকভাবে পীড়িত করতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপার ও কোনো সাংগঠনিক অথবা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। পরিবারে কিংবা ঘনিষ্ঠদের মধ্যের কোনো ঘটনা আপনার কার্যধারায় বাধা আনতে পারে। ব্যবসায়ে আয় বাড়লেও ঝঞ্ঝাট ও জটিলতা বাড়বে। পুরনো প্রীতির কিংবা প্রেমঘটিত ব্যাপারের জের এখন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটাতে পারে। বয়স্ক লোকদের ও বিবাহিতদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। অভিনেত্রী ও গায়িকা, মহিলাদের প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে ও পুরুষ বন্ধুদের ব্যাপারে নূতন কিছু ঘটতে পারে। সামান্য ভুলে জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে দেহকষ্ট, ব্যয়-বৃদ্ধি ও বাধাবিঘ্ন কাজে অনীহা জন্মাতে পারে। বিবাহেচ্ছুদের পক্ষে এ সময়ে শুভ নয়।

মীনঃ বাংলা নববর্ষের গ্রহসন্নিবেশ আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাঝে মাঝে আপনাকে উত্যক্ত করবে। সন্তান ও কন্যাসমা কারো জন্য উদ্বেগ যেতে পারে। প্রতিবেশী শত্রুতা করতে পারে। চুরি ও অযথা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। অগ্নিভয় ও উপর থেকে কোনো জিনিস পড়ে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাংশে উদ্যমে সাফল্য ও ব্যবসায়ে শুভ ইঙ্গিতসূচক। চাকুরী ক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলুন। স্বজনদের কারো জন্য উদ্বেগ যাবে। ব্যবসায়ে নূতন যোগাযোগ ও রপ্তানির কাজে ভাল হতে পারে। ফাটকা কিংবা লটারীতে লাভ হতে পারে। পুষ্যা নক্ষত্র দেখে কাজ করুন। অভিনেত্রী, গায়িকা কিংবা শিল্পী ও কবি—এরূপ মহিলাদের সংসর্গ সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। গলার অসুখ এবং কোনোরূপ ব্যথাবেদনা কষ্ট দিতে পারে। মহিলা-জাতকের উদ্যমে সাফল্য ও প্রীতির প্রসার বুঝায়, কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। গায়িকা ও অভিনেত্রীদের আকস্মিক কোনো ঘটনা বিচলিত করবে। অর্থক্ষতি হবে। কিন্তু প্রতিভা ও কর্মক্ষেত্রে সুযশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীফণিভূষণ চ্যাটার্জী (ফুলবেড়িয়া), (১) হবে, (২) দেড় বছর মধ্যে হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। ● শ্রীএম পুরী (মীনাক্ষী গার্ডেন, নিউ দিল্লী), (১) তিন রতি কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই, (২) হতে পারে, চেষ্টা করুন। ● শ্রীদর্পণা (হাওড়া), (১) কন্যা লগ্ন ও সিংহ রাশি এবং মঘা নক্ষত্র। দশা এবং গ্রহসন্নিবেশ বিরুদ্ধ; দেড় বছর সহ্য করতে হবে, (২) আগামী পৌষের পর কিছু ভাল; নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সংসারীও হবে। ● শ্রীসর্বেশচন্দ্র বিশ্বাস (উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি), বৃষ লগ্ন, শ্রবণা নক্ষত্র, মকর রাশি এবং দেব গণ। ● শ্রীএ কে জি (জামসেদপুর), (১) রক্তমুখী প্রবাল আট রতি ও তিন রতি মুক্তা, (২) কচি কলাপাতায় নিজের নাম লাল কালিতে আঠারোবার ও দুর্গানাম আঠারোবার লিখে দেখুন, উপকার হতে পারে। ● শ্রীপঞ্চানন দে (বি এল গাঙ্গুলী লেন, কলিঃ), শনি-মঙ্গলবারে কচি কলাপাতায় আঠারোবার করে লাল কালিতে নিজের নাম লিখুন। কোনো সুরাহা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● ডাঃ এ কে সরকার (ষ্টেশন রোড, উলুবেড়ে), (১) বড্ড গোলমেলে। পাঁচ রতি নীলা ও পাঁচ রতি পান্না, (২) খুব ভাল হবে না এবং শরীর ও মনের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াও বিশেষ প্রয়োজন। ● শ্রীএপোলো ১৩ (দরং), (১) হবে না, (২) ব্যবসায়ে হবে, কিন্তু এখন পাঁচ বছর নানা ঝঞ্ঝাট আছে। ● শ্রীমৃণাল চক্রবর্তী (আনন্দমোহন বসু রোড, দমদম), (১) পঁচিশ, (২) পঁচিশ বর্ষে হতে পারে। তিন রতি চুণী ধারণ। ● শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরী (কালনা), (১) ভাদ্রে যাঁর জন্ম, তাঁর বাংলা নূতন বর্ষে, (২) দ্বিতীয়টির আগষ্টের পর কার্যে উন্নতি। ● শ্রীমতী অঞ্জনা সেনগুপ্ত (বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ), (১) হবে, (২) মোটামুটি ভদ্রভাবে চলার মত হবে। ● শ্রীমতী মিতা রায়চৌধুরী (পুরাচুনি, মালদহ), (১) বর্তমান আষাঢ়ের মধ্যে না হলে অনেক দেরী, (২) পাত্র ভাল ও পদস্থ হবে। ● শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখার্জী (গোবরডাঙ্গা), (১) পরীক্ষা দিতে পারেন, (২) আশানুরূপ ফল না হতে পারে। ● শ্রীসলিলেন্দু ঘোষ (দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিঃ), (১) হবে, (২) নূতন বছরের শেষাংশে। ● শ্রীমতী মিতা চ্যাটার্জী (কসবা), এ বছরে হবে না। আর নানাভাবে এ বছর ঝঞ্ঝাট যেতে পারে। ● শ্রীগোপালকৃষ্ণ চৌধুরী (হাজরাপাড়া, কুচবিহার), (১) ভাদ্রের পর কিছু ভাল হবে, (২) দেড় বছর ধৈর্য ধারণ করুন। ● শ্রীআর্যকুমার বসু (জামসেদপুর), (১) রক্তমুখী প্রবাল আট-নয় রতি এবং তিন-চার রতি মুক্তা ধারণ কর্তব্য। মুক্তা সোনায় এবং প্রবাল রূপায়। শাস্ত্রসম্মত শোধনাদি প্রয়োজন। এর সঙ্গে সূর্য কবচ, (২) উক্ত প্রতিকারে শরীর ও মনের উভয় দিক থেকেই উপকার হবার সম্ভাবনা।

● কুমারী দেবী মুখার্জী (গন্ধের বাজার, কলিকাতা), (১) কুম্ভ রাশি ও মকর লগ্ন, (২) বাংলা বছরের প্রথম পাঁচ মাস পর যোগ পড়বে। ● শ্রীঅজিত-কুমার গাঙ্গুলী (পঞ্চানন চ্যাটার্জী লেন, হাওড়া), (১) মিথুন রাশি ও কন্যা লগ্ন, (২) জুলাইয়ের মধ্যে না হলে ডিসেম্বরের পর। ● শ্রীউজ্জ্বলাদিত্য ব্যানার্জী (উত্তরপাড়া), (১) আট রতি গোমেদ ও দশ রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপায় ধারণ করে দেখতে পারেন। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলুন। ● শ্রীবিশ্বনাথ আইচ (বেলডাঙ্গা),(১) অ্যাকাউন্ট্যান্সির দিকে গেলে ভাল হত, (২) ব্যবসায়ে এখন দু'বছর বিশেষ সুবিধা হবে না, তবে সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়সের পর ব্যবসায়ে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর লিখি-,-মনের দৃঢ়তা রাখতে হবে; এরূপ যোগাযোগ একাধিক হতে পারে। ● অশোক সিনহা (কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিঃ), (১) চাকুরী ক্ষেত্রে জুলাই মাসের আগে কোনো সুপরিবর্তন না হলে সাঁইত্রিশ বর্ষ কাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে, (২) উক্ত সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়স থেকে ধীরে ধীরে ভাল সময়। ●শ্রীকান্তিকুমার খান (ট্যাংরা হাউস স্টেট, কলি-১৫), (১) বিবাহে বিশেষ বাধা। পাত্র শিক্ষিত হত, কিন্তু পাত্রীর কোষ্ঠীর গ্রহযোগ অনুকূল আবহাওয়ার নয়, (২) বাংলা নূতন বছরে না হলে অত্যন্ত দেরী হবে। ●শ্রীশিবশঙ্কর সুর (তারাগুনিয়া), (১) পড়াশোনার যোগ আছে, (২) ঈপ্সিত প্রোফেশন হবে। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। ●শ্রীইন্দ্র (বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ), (১) চাকরীই ভাল, (২) দু'বছর পর বিবাহের সম্ভাবনা, কিন্তু পাঁচ বছর নানাভাবে প্রতিকূল। ●শ্রীঅসীম গুপ্ত (আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিঃ), পরীক্ষার বিষয় বলা হয় না। ●শ্রীমতী খোরে (কলিকাতা), (১) বর্তমান নূতন বছরের শেষাংশে মোটামুটি ভাল, (২) স্বাস্থ্যের উৎপাত হবে। ●শ্রীআশীষ খোরে (কলিঃ), (১) ভাল হবে, (২) স্বাস্থ্যের গোলমাল হতে পারে। ●শ্রীবিশ্বনাথ (কলিকাতা), (১) নববর্ষে অনুকূল, (২) আটাশ থেকে একত্রিশ বর্ষ অনুকূল নয়। ●শ্রীআশুতোষ জানা (মানসিংহপুর), আট রতি শ্বেত প্রবাল সোনার আংটিতে যথাবিধি ধারণ। ●শ্রীরণেন্দ্রনাথ পান (কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলিঃ), (১) এখন কোনো যোগ নেই, (২) সুতরাং এ প্রশ্ন ওঠে না। ●শ্রীএস এম চ্যাটার্জী (রবীন্দ্রনগর), (১) তুলা লগ্ন ও মীন রাশি, (২) বাংলা নূতন বছরের শেষাংশে হতে পারে। বিপ্র বর্ণ ও দেব গণ। শ্রীধর্মেন্দ্র মুখার্জী (গুসকরা), (১) এস্থলে হবে কিনা বাংলা নূতন বর্ষে বুঝতে পারবেন, (২) নূতন বর্ষের শেষাংশে। ●শ্রীসুশীল-কুমার রাউত (ডি এন মিত্র রোড, বর্ধমান), (১) চাকুরী হবে, (২) বিবাহের ব্যাপারে বছরের শেষাংশে অনুকূল। ●শ্রীসি চ্যাটার্জী (অবধায়ক : পি চ্যাটার্জী, খড়্গপুর), মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট এবং অগ্রহায়ণের পর মোটামুটি অনুকূল, (২) কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা ও বাধাবিঘ্ন। শ্রী পি কে চ্যাটার্জী (খড়্গপুর), (১) পরিবর্তন নিজের ইচ্ছামত হবে না, (২) শারীরিক ও স্বজনজনিত চিন্তা বুঝায়। সূর্য কবচ ধারণীয়। ●শ্রীমিত্র (দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা), (১) বর্ষকাল মধ্যে না হলে আর হওয়া কঠিন, (২) উৎকৃষ্ট চূণী সোনার আংটিতে তিন রতি থেকে চার রতির মধ্যে। ●শ্রীবিষ্ণুকুমার আদিত্য (কবি ভারতচন্দ্র রোড, কলিকাতা), (১) সাঁইত্রিশ থেকে অনুকূল, (২) ডিগ্রি বা উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করুন। ●শ্রীসুনীল রায় (বেলঘরিয়া), (১) সাধারণ চাকুরী হতে পারে, (২) কিন্তু তিন বছর পর্যন্ত বিশেষ অনুকূল অবস্থা আসবে না। ●শ্রীমতী সুবর্ণলা কলিতা (কলেজ রোড, শিলচর), (১) বর্তমানে আগস্টের মধ্যে না হলে উক্ত সময় থেকে দেড় বছর পর, (২) শিক্ষা বিভাগের কিংবা বিচার বিভাগের হতে পারে। ●শ্রী[illegible] ব্যানার্জী (পার্ক স্ট্রীট, কলিঃ), (১) দেরী হবে, (২) অন্যত্র বুঝায়। ●শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জী (নিউ ট্র্যাফিক কলোনী, জামসেদপুর-২) (১)দশা ও বর্তমান গোচর অনুযায়ী নানাভাবে এখন সময় প্রতিকূল, তবু এর মাঝে অগ্রহায়ণ থেকে বৃহস্পতি কিছু শুভ ফল দেবে। তবু চল্লিশ বর্ষ বয়সের আগে বিশেষ ভাল হবে না, (২) যোটক বিচারে বিবাহের সংক্ষিপ্তভাবে শুভাশুভ বলা হবে। ●শ্রীমতী চৈতালী রায় (ডায়মণ্ডহারবার), (১) হতে পারে এবং সম্ভব হলে আট রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করুন, (২) পড়াশোনায় সাধারণভাবে ভাল। দেড় বছর সব কাজেই সাবধান। ●শ্রীমতী মাধবী বৈরাগী (ডায়মণ্ডহারবার), (১) পুনরায় সন্তান-যোগ, (২) আর্থিক উন্নতি হবে। ●শ্রীদিবাকর সিংহ(পার্ক সার্কাস, কলিঃ), (১) বর্তমান বাংলা নূতন সালে অর্থার্জনের যোগ, (২) বছরের শেষাংশ দেখুন। ●শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য (পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, বেহালা), (১) তিন-চার রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে যথাযথ পরীক্ষা ও শোধনাদির পর ধারণ করতে পারেন, (২) বাংলা বছরের শেষাংশে কিছু ভাল হতে পারে। ●শ্রীমতী মীরা দেবী (অবধায়ক : এস, বি, করণ, হালিশহর), (১) নূতন বছর দেখুন, (২) সম্ভাবনা আছে। ● শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (ক্ষেত্রমোহন ব্যানার্জি লেন:, কলি), (১) জুলাই মাসের মধ্যে চাকুরী হবার সম্ভাবনা। সম্ভব হলে শনি ও মঙ্গলবারে কচি কলাপাতায় লাল কালিতে আঠারোবার করে নিজের নাম লিখুন, (২) ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, কুম্ভরাশি, বৈশ্য বর্ণ, দেবারি গণ এবং বৃষ লগ্ন। ● শ্রীশঙ্কর দে (মাণিকতলা মেন রোড, কলিঃ), (১) অগ্রহায়ণের পর হতে পারে, (২) উক্ত কাল সাফল্যসূচক। ● মিসেস ডি রায় ([illegible]), (১) আগামী পৌষের আগে সকল ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, (২) যুক্ত পরিবারের শান্তির [illegible]। রূপায় আট রতি রক্তমুখী

প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীশংকরনাথ সিংহ (গোবিন্দ খটিক রোড, কলি:) (১)এখন কোনো ব্যাপারেই অনুকূল নয়। সুতরাং চাকুরী করাই ভাল, (২) দেড় বছর ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। ● শ্রীভ, চ (বিলাসপুর), (১) এরকমই চলবে, (২) তিন বছরের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে। ● শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে (কাপাসডাঙ্গা), (১) আগস্টের মধ্যে হতে পারে, (২) কচি কলাপাতায় আটাশবার করে নিজের নাম প্রত্যেক শনিবারে লিখুন, উপকার হতে পারে। ● শ্রীভি পি চক্রবর্তী (টালিগঞ্জ), (১) [illegible] এরূপ যোগ নেই, (২) আর্থিক অবস্থা পরে ভাল হবে। ● শ্রীমতী [illegible] চক্রবর্তী (টালিগঞ্জ), মিথুন লগ্ন, [illegible] রাশি ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। শ্রীকালী-[illegible] ভট্টাচার্য (শুড়া ইস্ট রোড, [illegible]), (১) উভয়ের রাশি-লগ্নাদি [illegible] বাংলা নূতন সাল আর্থিক [illegible] থেকে কিছু ভাল হবে; কিন্তু শারীরিক ও মানসিক ব্যাপারে মাঝে মাঝে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হতে পারে। ● শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য (পানবাজার গৌহাটি), (১) পত্নীর কোষ্ঠি ভাল; এবং দেড়বছর পর বর্তমানের চেয়ে শুভ সময়, (২) নিজের পক্ষে আট-নয় রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণীয়। ● শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য (শুড়া ইস্ট রোড, কলি:), (১) পড়াশোনায় ও কৃতিত্বে ভাল হবে, (২) স্বাস্থ্য তেমন ভাল হবে না। ● কুমারী সাধনা ভট্টাচার্য (শুড়া ইস্ট রোড, কলি:), (১) জন্মকালীন শনি, চন্দ্র ও রাহুর যোগ বাধাজনক। সম্ভব হলে তিন-চার রতি মুক্তা সোনার আংটিতে ধারণ করো, (২) পড়াশোনা ভাল হবে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে কচি কলাপাতায় আঠারোবার দুর্গানাম লিখো। উপকার হতেপারে। ● শ্রীঅনিল-কুমার সরকার (পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া), (১) কোনো কাজ পাবার সম্ভাবনা, (২) দেড় বছর খুব সাবধানে চলতে হবে। ● শ্রীবকু নন্দী (শিব-গোপাল ব্যানার্জী লেন, সালকিয়া), (১) স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হবে, (২) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান এবং তিন রতি মুক্তা এবং এক রতির তিন ভাগের এক ভাগ হীরক ধারণ করতে পারেন। ● শ্রীবিশ্বরঞ্জন দাস (ট্র্যাঙ্গল কলোনী, গৌহাটী), (১) এখনো দেড় বছর তত ভাল নয়, (২) প্রতিকারের জন্য রক্তমুখী প্রবাল আট-নয় রতি রূপার আংটিতে ধারণ করলে উপকার হতে পারে। প্রত্যহ কচি কলাপাতায় আঠারোবার নিজের নাম লাল কালিতে লিখে দেখুন। ● শ্রীবিকাশচন্দ্র ঘোষ (রাসেল ষ্ট্রীট, কলি-১৭), বাংলা বছরের শেষাংশে অন্য যোগাযোগে আয় বাড়বে, (২) বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে তিন বছর জটিলতাসূচক। ● শ্রীমতী পাপড়ি চৌধুরী (বিজয়গড়), (১) বর্তমান বাংলা বর্ষের মধ্যে, (২) উক্ত স্থলে সম্ভাবনা। ● শ্রীঅনন্তকুমার দোস্তি (নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড, হাওড়া), (১) এবারে হতে পারে, (২) পারিবারিক ক্ষেত্রে তিন বছর পর উন্নতির সম্ভাবনা। ● শ্রীমতী মঞ্জু বসু (টেলকো, জামসেদপুর), (১) রক্তমুখী প্রবাল আট-নয় রতি এবং তার সঙ্গে অন্তত: এক রতির তিন ভাগের এক ভাগ হীরা ধারণীয়। প্রবাল রূপায় ও হীরা রূপায় ধারণীয়। চিন্তায় দুর্বলতা থাকলে প্রত্যেক জন্মবারে সকালে বেলপাতায় নিজের নাম লাল কালিতে আঠারো-বার করে লিখুন। উপকার হলে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন। ● মিস বাসু (নবীন সেন রোড, নবগ্রাম), (১) শিক্ষিত চাকুরে, (২) কন্যা লগ্ন, রেবতী নক্ষত্র, মীন রাশি, বিপ্র বর্ণ ও দেব গণ। ● শ্রীমতী স্বাতী রায় (রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলি:), (১) এখন দেড় বছরে মধ্যে হবার সম্ভাবনা, (২) সুখী হবে। কাজ এবং ভবিষ্যৎ মোটামুটি ভাল। ● শ্রীকল্যাণ রায় (রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলি:), (১) দেড় বছর পর উন্নতি, (২) সম্ভাবনা কম। ● শ্রীবাবুলাল ভট্টশালী (সাকচী), (১) রাশি ও লগ্ন ঠিক আছে, দু' বছর পর বর্তমানের চেয়ে ভাল, (২) বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা এখন নেই। ● কুমারী গৌরীরাণী কাহানা (শহাদনগর কলোনী), (১) আশঙ্কা নেই, (২) দেড় বছরে মধ্যে। ● শ্রীবিষ্ণুকুমার আদিত্য (কলি-২৮), (১) সাঁইত্রিশ বর্ষের ফলাফল দেখুন, (২) পত্নীর জন্মকুণ্ডলী প্রয়োজন। ● শ্রীদেবী-চরণ সেন (নিমু গোস্বামী লেন, কলি-৫), (১) আগামী ভাদ্রের মধ্যে কিংবা অগ্রহায়ণ মাসে, (২) সঙ্গীতে সুনাম হবে। ● শ্রীজগৎ (কলি:-২), (১) এখন যাই করুন না কেন, বিশেষ সুবিধা হবে না, পোলট্রি করতে পারেন, (২) হবে, কিন্তু অনেক দেরী। ● শ্রীপি মণ্ডল (প্রাণনাথ সুর লেন, কলি:), (১) ন্যায্যমূল্য পাবেন না, (২) অগ্র-হায়ণের মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীপ্রশান্ত-কুমার সুর (রসুলপুর), (১) কন্যা রাশি ও কন্যা লগ্ন, (২) এখন চাকুরীর চেষ্টা করুন। ● শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (ডিগবয়), (১) কতকগুলি বিরুদ্ধ যোগ আছে, তবু রসায়ন বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে দেখুন, (২) স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। ● শ্রীপ্রিয়নাথ দাস (পি নস্কর লেন, কলি:), (১) আগামী নভেম্বর পর্যন্ত বিশেষ সাবধান, (২) ছয় রতি উৎকৃষ্ট সিংহলী গোমেদ ও আটরতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণীয়। ● শ্রীউৎপল রায় (তিলুড়ী), (১) ভাদ্রের আগে হওয়া কঠিন, (২) মোটামুটি ভদ্রভাবে চলার মত। ● শ্রীমতী স্বাতী ঘোষ (জগাছা), (১) আবার পড়াশোনার চেষ্টা করা উচিত, (২) বর্তমান বাংলা বর্ষের আষাঢ় থেকে একটা ভাল পরিবর্তন আসতে পারে। ● শ্রীমণিমোহন মুখার্জী (খড়দহ), (১) কুম্ভ রাশি, (২) বাংলা বছরের প্রথম পাঁচ মাসের পর যোগ আসবে। ● শ্রীঅমরনাথ সেনগুপ্ত (বিলাসপুর), (১) দেড় বছর পর, (২) বেলপাতায় প্রত্যহ আটবার নিজের নাম লিখুন।।

যৌন জ্ঞান

স যৌনাচারের সীমা লংঘনকারীদের আগে বলা হত, 'যৌন বিকৃতির শিকার। হ্যাভলক্ এলিস্ই প্রথম 'বিকৃতি' শব্দটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 'বিচ্যুতি' চালু করেছিলেন।

কিছুদিন আগে সুপরিচিত কিন্সেব প্রতিবেদনে দেখা গেছে মানবিক যৌন আচার কত বিচিত্র এবং কত বিস্তৃত। প্রাপ্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায়, স্বাভাবিক যৌন আচার এবং যৌন বিচ্যুতির মধ্যে সীমারেখা টানা দুঃসাধ্য। বস্তুত যৌন 'বিচ্যুতি বলতে ঠিক কি বোঝায় তা সংজ্ঞার সীমায় আনা অসম্ভব'।

এ ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে যে, যৌন বিচ্যুতিকেও স্বাভাবিক যৌনাচার বলা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিপরীত লিংগ-সহবাস ছাড়াই যৌনতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং তুষ্টিসাধন হয়ে থাকে। তবে, এটি বাস্তবে কিংবা বিদেশ পক্ষে কল্পনায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই, এবং এটি কখনও বিষম লিংগ-সহবাসের বিকল্প হিসেবে অধিকতর কাঙ্ক্ষণীয় হলে চলবে না; পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায় যা হয়ত লাভ করা দুরূহ। সুতরাং আত্মতৃপ্তির সাধারণ রূপগুলো এর আওতায় আসছে না।

কিন্তু, মিলনের পূর্বে এবং মিলনের জন্য যে সব ছোট-বড় বিচ্যুতি ঘটে সে সম্পর্কে কি বলা হবে? সামান্য মাত্রার ধর্ষকাম এবং মর্ষকাম যৌন-ইচ্ছার অংগ হিসেবে মোটামুটি স্বীকৃত। প্রতীকানুরাগ সম্পর্কে একথা বলা চলে। কারও পছন্দ কটা চুল, কারও বা কালো। সাধারণ ভাল লাগা আর বিশেষ প্রয়োজন—যৌন তৃপ্তির জন্য—এ দু'টো পৃথক ব্যাপার, এবং এ ক্ষেত্রে স্তর ভেদ বর্তমান। স্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এটি যৌনতৃপ্তির জন্য সামান্য প্রভাবশালী, কিংবা সম্পূর্ণ প্রভাবহীন।

কার্যত, মূল কথা যৌনেচ্ছা প্রকাশের আপাত অস্বাভাবিকত্ব নয়, তার গুরুত্ব। কাজেই বলা যায়, যৌন বিচ্যুতিগ্রস্ত মানুষ তিনিই, যিনি অধিকাংশ মানুষের পক্ষে যৌন ব্যাপারে যা স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন অথবা গুরুত্বহীন সেই সব ব্যাপারে অতি মাত্রায় গুরুত্ব যৌন বিচ্যুতির কারণ আরোপকারী।

যৌন বিচ্যুতি

যৌন বিচ্যুতির কারণ

যৌন বিচ্যুতির উৎস খুঁজতে হয় (ক) আমাদের দৈহিক গড়নে, এবং (খ) যে সব বিশেষ অভিজ্ঞতা আমাদের অন্তর্লীন প্রবণতা থেকে আমাদের বিচ্যুতির পথে টানে তার মধ্যে।

যৌন তাড়না অনির্দিষ্ট প্রেরণার মত আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিক যৌন-ক্রিয়া সাধারণত স্বয়ং মৈথুন হয়ে থাকে (যান্ত্রিকভাবে প্রথমে হয়—স্বতঃস্ফূর্তভাবে)। উদ্রিক্ত তৃপ্তির সংগে আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠে নানান যোগাযোগ এবং কল্পনা। একই বা বিপরীত লিংগর কারও সঙ্গে এটি যুক্ত হতে পারে; ক্ষেত্র বিশেষে কোনও প্রাণী বা নিষ্প্রাণ বস্তুও এই তৃপ্তিলাভের সঙ্গে জড়িত থাকা সম্ভব। হয়ত তা বাড়বে মানবিক কোনও সংক্ষোভের সঙ্গে জড়িত হয়ে। কাজেই, যৌন সংক্ষোভ বাস্তবিক এবং কাল্পনিক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা বা নিষ্ঠুরতা ভোগ, বা প্রদর্শনকাম, পোশাক ইত্যাদি নানা অভিজ্ঞতার সংগে সংযুক্ত হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব যৌনরূপ গড়ে তোলে। অনেকেই বাল্য বা যৌবনের এমন ঘটনা মনে করতে পারেন, যা পরবর্তীকালে তাঁদের যৌনরূপ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

রোগের লক্ষণ

যৌন বিচ্যুতির সংগে দৈহিক বা মানসিক রোগের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে, বিশেষত আইনী অসুবিধা দেখা দিলে, ঐ বিশেষ কাজের পূর্বে কৃত রোগের অন্যান্য লক্ষণও সযত্নে সংগ্রহ করা দরকার। ছোট-খাট দৈহিক বিকার সাধারণত সমকালে সংঘটনশীল, কারণসম্ভূত নয়। এটা স্বাভাবিক যে, বিশেষ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি মনমরা হবে, ঘুমোবে কম, তার ওজন কমবে; কিন্তু এগুলো অভিযুক্ত হওয়ার ফল, তার আচরণের কারণ নয়। যে ক্ষেত্রে কেবল যৌন বিচ্যুতিই রোগের লক্ষণ হিসেবে উত্থাপিত, সে ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারে অভিনিবেশ করা যুক্তিসংগত। তা বলে বলা চলে না যে, যৌন বিচ্যুতি কখনও প্রধানতঃ রোগ-জাত হতে পারে না। অনেক যৌন বিচ্যুতিসম্পন্ন মানুষই স্বাস্থ্যবান।

নিরাময়ের সম্ভাব্যতা

যৌনবিচ্যুতির ঝোঁক সম্পূর্ণ দূর করা সাধারণত দুরূহ; কিন্তু মূল অসুবিধা অজ্ঞতা এবং ছোট-খাট ঝামেলায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা থেকে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সান্ত্বনা এবং যথোপযুক্ত ব্যাখ্যার ফলে দূরীভূত হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসক কেবল বুঝিয়ে দেবেন, যৌন বিচ্যুতি সচরাচর ঘটে এবং আসল কথা হল তা রোগীর ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ কি না। তার অস্বাভাবিকত্ব নিয়ে চিন্তিত হওয়া নিরর্থক। যৌন অভ্যাস গড়ে তোলা সহজ, এবং যত বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা পাল্টান তত বেশি কষ্টকর হয়ে ওঠে, কাজেই প্রয়োজন সহজ যৌনানুভূতির স্বাভাবিক তৃপ্তিসাধন।

নিরাময়ের সম্ভাবনা বয়োবৃদ্ধি এবং অভ্যাসের দীর্ঘস্থায়িত্বের অনুপাতে হ্রাস পায়, বিশেষত এটি অন্য কারও সহযোগিতায় চলতে থাকলে অবস্থা জটিলতর হবেই। ঝুঁকি যে কতটা তা

হৃদয়তার সংগে মেখিয়ে দিতে পারলে ক্ষেত্র বিশেষে কাজ হয়।

এব্যাপারে প্রত্যেকের সচেতন হওয়া কাম্য। তবে, সব সময় মনে রাখা দরকার, মানুষ প্রকৃতিগত প্রেরণায় যৌনতৃপ্তি খোঁজে, এবং যৌনজীবন যাপনের সামাজিক অনুমোদন প্রাপ্তি পর্যন্ত যৌন-নিষ্ক্রিয়তা তার পক্ষে অসম্ভব। শুধু খেয়াল রাখা চাই—যৌন তৃপ্তিলাভ যেন ক্রমানুয়ে বিচ্যুতির পথে এগিয়ে না যায়।

—বাৎস্যায়ন

★ আদিম সমাজের যৌন আচার ★

আধুনিক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান গর্ভ ধারণ, গর্ভাবস্থা এবং সন্তানের জন্মদান প্রক্রিয়া ক'টিকে এত সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক নিরাপত্তা দিয়েছে যে, এ সম্পর্কে আদিম সমাজের চিন্তা-ভাবনা আমাদের কাছে বিস্ময়কর।

গর্ভ ধারণ

আদিম জাতিগুলি পিতৃত্বর প্রকৃতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। কোনও কোনও উপজাতি মনে করে গর্ভধারণ ঐন্দ্রজালিক কারণজ; প্রবল বেগে বহমান বায়ুর বিরুদ্ধে হাঁটা, বা উচ্ছ্বসিত ফেনপুঞ্জে স্নান ইত্যাদিই এর হেতু। মধ্য অস্ট্রেলিয়ায় সন্তান-লাভে অনিচ্ছুক মহিলারা পাছে 'শিশু-আত্মা' উর্বর গর্ভে ঢুকে পড়ে, সেই ভয়ে সুপরিচিত এবং নির্জন পাহাড়ে জায়গা এড়িয়ে চলেন।

তবুও অনেক উপজাতির ধারণা মূলে সত্য। ওরা বলে, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা কিছু দেয়, যা সেখানে বেড়ে ওঠে। সে যাই হোক, পুং বীজ দ্বারা স্ত্রীডিম্ব নিষিক্তকরণ হওয়ার ব্যাপারটা ওরা বোঝে না।

মা হওয়ার সাধ মেয়েদের মধ্যে বিশ্বজনীন। যাঁরা চান মা হতে, তাঁরা প্রায়ই এজন্য ইন্দ্রজালের আশ্রয় নেন। একটি বহু প্রচলিত পদ্ধতি হল ডিম্বাকৃতি, ভিতর-ফাঁপা, স্ত্রী-অংগ-সদৃশ অলংক-অলংকার বা মালা পরিধান।

পর্তুগীজ দক্ষিণ আফ্রিকার ওভিম্বান্দুদের আচার এবং বিশ্বাস আদিম ধারণা এবং আচারের সুন্দর উদাহরণ। গর্ভবতী হলে মেয়েরা উপজাতির চিকিৎসকের কাছে যান। চিকিৎসক বদ-আত্মার প্রভাব দূর করার জন্য তাদের মুখ লাল-সাদা দাগে ভরিয়ে দিয়ে গর্ভফুল ইত্যাদি সন্তান জন্মদানকালে ঠিকমত বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটা তরল ওষুধ দিয়ে থাকেন। ঐ সময় গর্ভবতী নারীকে কয়েকটা নিষিদ্ধ বস্তু সম্পর্কে সাবধান করা হয়; এই সব বাধানিষেধ নাকি গর্ভস্থ ভ্রূণের সহজ বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক জন্মদানের পক্ষে সহায়ক।

কয়েকটি ভ্রান্ত বিশ্বাস : গর্ভিণী নারী চুরি করলে সন্তানের জন্মদান কষ্টকর হয়। খরগোসের মাংস খেলে বাচ্চার ঠোঁট বিভক্ত হবে। পেঁচার মাংস খেলে বাচ্চার চোখ হবে অত্যন্ত বড় এবং গোলাকৃতি। শক্ত পাথরের ওপর বসলে জন্মদান দীর্ঘায়িত হয়।

মনে হয় মেয়েরা বোঝেন গর্ভ-ধারণকালে তাঁদের দুর্বলতা এবং খিট্‌খিটে হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই ঝগড়া হলে তাঁরা মাঠে গিয়ে কাপড়ে চোর কাঁটা লাগিয়ে আসেন। স্বামী সেগুলো তুলে দিলেই তক্ষুণি ঝগড়া মিটে যায়। এ সময় তাঁরা ভাবেন, স্বামীরা তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন না; তাই তখন খাদ্যের মধ্যে স্বামীর অজান্তে এক ধরণের সব্‌জী মিশিয়ে দেন। বিশ্বাস যে, ঐ তরল খাদ্য খেলে স্বামী বিশ্বস্ত থাকবেন।

যে নারীর কেবল মেয়ে হয়েছে এবং যিনি ছেলে চান, তিনি এমন কন্যাকামী, সপুত্রক নারীর খোঁজ করেন। তাঁরা দু' জন কোনরবন্ধ পাল্‌টিয়ে নেন। এটি তন্তজ, ঝাগড়া আটকানর জন্য ব্যবহৃত হয়। অথবা তাঁরা কুঁড়ের দেয়ালের গর্ত দিয়ে খাদ্য বিনিময়ও করতে পারেন। এছাড়া উপহার বিনিময় ক'রেও সন্তানের লিংগ নির্ধারণ করা সম্ভব বলে তাঁদের বিশ্বাস। কন্যাসন্তানের জননী পুত্রসন্তানের জননীকে দেন ঝাঁটা, শস্য রাখার পাত্র, মাঠ থেকে ফসল আনার ঝুড়ি। তিনি পান একটা ছুরি'একটা তীর এবং একটা কুঠার--- পুরুষত্বর প্রতীক।

স্বামী এবং সন্তান আসন্নপ্রসবা মাতাকে ধরে আছে—
প্রাচীন বালিদ্বীপের ভাস্কর্য

সন্তানের জন্মদান

এই সংকটকালে বদ-আত্মারা উপস্থিত হতে পারে। কাজেই, কিছু কিছু ঐন্দ্রজালিক সাবধানতা অপরিহার্য। স্বামীর উপস্থিতি নিষিদ্ধ ; তিনি থাকলে নাকি শিশু জন্ম নিতে লজ্জিত বোধ করবে। প্রসবকাল দীর্ঘায়িত হলে শুশ্রূষাকারিণীদের চাপ কমানোর সব রকম বন্দোবস্ত থাকে। ধাত্রী জিজ্ঞেস করেন ক্লিষ্ট গর্ভিণী অবিশ্বস্ত কিনা, তার প্রেমিকের নাম জানতে চাওয়া হয় ; এই স্বীকারোক্তি করলে তবেই শুধু প্রসব স্বাভাবিক হবে। নাড়ি কাটা হয় নিড়ানি দিয়ে, কন্যা সন্তান হলে ; কারণ, এটি নারীর কাজের প্রতীক, নিড়ানি দিয়ে কাটলে সে কালে মাঠে ভালভাবে কাজ করবে। পুত্রসন্তান হলে নাড়ি কাটা হয় তীর দিয়ে, যাতে সে সুদক্ষ শিকারী হয়।

ওভিম্বান্দুদের মধ্যে একসংগে তিনটি সন্তান প্রসূত হলে তার মধ্যেকার পুত্রটিকে উপজাতি প্রধানের বাড়িতে পাঠাতেই হবে, সে শাসক পরিবারভুক্ত হয়ে যায়। যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে নানা জায়গায় নানা ধরণের প্রথা প্রচলিত। এ ব্যাপারে অনির্দিষ্ট দুষ্টাত্মা জন্ম-সংগী হতে পারে বলে অনুভূত হয়। কোনও কোনও আফ্রিকান উপজাতি মা এবং সন্তানকে মেরে ফেলে। কোন ক্ষেত্রে দুষ্টশক্তির অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে একটি শিশুকে উৎসর্গ করার প্রথা রয়েছে। কিন্তু সবক্ষেত্রে মা এবং শিশুদের শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথক করতে হয়।

নিউ গায়নার নারী কড়ির মালা ধারণ করে বহু সন্তান লাভের আশায়

গর্ভকালে যৌন বিধিনিষেধ

এ সময় যৌনমিলন অ-জাত শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। এ বিশ্বাস বাস্তবক্ষেত্রে ঠিক কতখানি প্রভাব বিস্তারী তা বলা শক্ত ; তবে একথা ঠিক, নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠান করলে নিষেধ শিথিল করা হয়। অজ্ঞ উপজাতীয়রা বিপদে পড়লেই আসে ইন্দ্রজাল আর তাদের নিজস্ব চিকিৎসক।

বহুপত্নীক পুরুষ সম্ভবত যৌন-নিষেধের দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রাহ্য। সে-ক্ষেত্রে আইন কিন্তু পুরুষকে গর্ভিণী নারীর তুলনায় বেশি সুযোগ দেয়। নিজের চেয়ে কম বয়সী বহু পত্নীর স্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন কি কোনও পুরুষের পক্ষে সম্ভব? তাদের সংখ্যা যখন অনেক হয়—শাসকের কয়েক গণ্ডা বউ থাকে—তখন তারা যৌন-অতৃপ্তি অনুভব করতে বাধ্য ; বিবাহিত জীবনের ন্যায্য পাওনা বঞ্চিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় আগে অবিশ্বস্ততার শাস্তি ছিল নির্যাতন ও মৃত্যু। ওভিম্বান্দুদের মধ্যে বহু পত্নীক পুরুষের জন্য বিধান হল সে প্রত্যেক পত্নীর কাছে চারদিন রাত বা সাতদিন রাত একটানা থাকবে ঘুরিয়েঘুরিয়ে। প্রত্যেক স্ত্রীর কুঁড়ে ভিন্ন।

দীর্ঘস্থায়ী স্তন্যদান

আদিম সমাজে প্রচলিত দীর্ঘস্থায়ী স্তন্যদান প্রথা স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে বাধা-স্বরূপ। সাধারণ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত : দুষ্টশক্তি পিতার মাধ্যমে সন্তানের ক্ষতি করতে পারে। কয়েকটি উপজাতির মধ্যে সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরেই পিতা কয়েকদিন কৌচ-এ শুয়ে থাকেন। পরে উঠলেও সম্ভবত তাঁকে শিকার করতে দেওয়া হয় না ; কারণ, তাঁর ক্ষত নবজাতকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাবে। আফ্রিকার কোনও কোনও অংশে তিন বছরের শিশুকেও নবজাতকের মত একই সময়ে স্তন্যদান করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায়ও অনেকদিন পর্যন্ত স্তন্যদানের প্রথা চোখে পড়ে।

জাভাদ্বীপের জননী চার বছরের স্তন্যপানরত শিশুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন। বহুদিন পর্যন্ত সন্তানকে স্তন্যপান করান আদিম জাতিদের একটা বৈশিষ্ট্য

এই সময় দম্পতি সম্ভবত চিকিৎসকের নির্দেশমত বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মিলনের বাধা অপসারিত করে। স্বামীর অবশ্য অন্য পত্নী রয়েছে। তবে বিকল্প ধাই-মাও নিয়োগ করা সম্ভব। তাছাড়া প্রমাণ আছে, সন্তান ধারণে অক্ষম পিতামহী, মাতামহী বা অন্য কোনও নারীও স্তন্যদান করতে পারেন।

আদিম সমাজের রীতিনীতি ভিন্ন হতে বাধ্য। ওদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি যে অন্য রকম, নানান পারিবারিক এবং সামাজিক কারণ ওদের যৌন-জীবনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রক। সেজন্য ওদের উপহাস করা বৃথা। আমাদের সুসভ্য সমাজেও বহু যুক্তিহীন বাধা-নিষেধ বর্তমান। হাস্যকর যৌন রীতিনীতির কবল থেকে আজও আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারি নি।

—কামরাজ

চাষ আবাদ ফসল

তড়াগ তথ্য

গ্রাম জীবনকে সুস্থ-সতেজ করে তোলার বহুমুখী প্রয়াসের কথা বহুজনবিদিত। ব্যাপক হারে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপন, উন্নত ধরনের সার প্রচলনের চেষ্টা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন, ভাল ভাল রাস্তা-ঘাটের বিস্তার, পঞ্চায়েৎ সংগঠন প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টার মধ্যে কল্যাণ রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক চিন্তার প্রকাশ দেখি। এত করা সত্ত্বেও গ্রাম-জীবনের প্রাণোচ্ছল বিকাশ বড় একটা দেখা যায় না।

পুকুরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীনতা প্রাণোচ্ছল বিকাশের অন্যতম কারণ, সে সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই পুকুর গ্রাম-জীবনের সহায়ক না হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে। পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপনের পর হতে এর প্রতি অবহেলা চরমে উঠেছে। পুকুর নীতি সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা না করলে আমরা যত স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করি না কেন, গ্রামের স্বাস্থ্য কিছুতে রক্ষা করতে পারব না। গ্রামের অধিকাংশ লোকের ঘরের দেওয়াল মাটি দিয়ে তৈরী। মাঠের জল, বিশেষ করে বর্ষাকালে বৃষ্টির জল যাতে বাড়ীর কাছাকাছি জমতে না পারে, সেজন্য বাড়ী করার জায়গাটিকে (বাস্তুভিটাকে) আশেপাশের জায়গা হতে কিছুটা উঁচু করা দরকার। বাড়ীর কাছাকাছি কোন একটি জায়গা গর্ত করে সেখানকার মাটিকে দেওয়াল ও বাস্তুভিটা তৈরির কাজে লাগান হয়। ফলে সেখানে একটি পুকুর সৃষ্টি হয়। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে বাড়ী আর বাস্তুভিটার আকার-আয়তনের উপর পুকুরের আকার-আয়তন নির্ভর করে। গ্রাম-বাংলার অধিকাংশ পুকুর ডোবার পর্যায়ে পড়ে। কদাচিৎ দু'চারটে বড় পুকুর চোখে পড়ে। পুকুর নিজের বুকের মাটি দিয়ে আমাদের বাসস্থান গড়ে দিয়েই তার ভূমিকা শেষ করেনি। সে আমাদের জীবন যাপনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে বিরাজ করছে। বাসস্থানহীন সভ্য সমাজের যেমন কল্পনা করতে পারি না, তেমনি পুকুরবিহীন গ্রাম-বাংলার কল্পনা করা যায় না। পুকুরের প্রয়োজনীয়তার তালিকা সুদীর্ঘ না করে শুধু এইটুকু বলেই যথেষ্ট হয়—পানীয় জল ছাড়া আজও যখন কোন কাজের জন্য জলের দরকার হয় তখনি অনিবার্যভাবে পুকুরে উপস্থিত হতে হয়। গ্রাম-বাংলার অধিকাংশ মেটে বাড়ী নির্মাণ-কৌশল ও পরিচ্ছন্নতার বিচারে অত্যন্ত নিম্ন মানের। বাড়ীগুলিকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী করা বা এগুলিকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত রাখার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট না হলেও সচেতন হয়ে উঠছি। কিন্তু বাসস্থানের মতই প্রয়োজনীয় পুকুরকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও জীবাণুমুক্ত করার ব্যাপারে আমরা সচেতনও নই। আমাদের ঔদাসীন্য যেমনি ব্যাপক-বাংলার স্বাস্থ্যহীনতা তেমনি মারাত্মক।

গ্রাম-বাংলার পুকুরের দুর্গতি কি পর্যায়ে এসেছে, তার পরিচয় নেওয়া যাক। ঘর ও উঠান পরিষ্কার করার ফলে জমে ওঠা আবর্জনা, উনুনের ছাই, কুটনো কুটার ফলে পড়ে থাকা আনাজের খোসা পুকুর ঘাটের কাছে পুকুরের পাড়ে জমিয়ে রাখা হয়। পুকুর পাড়ে ফেলে দিয়ে পুকুরে হাত-পা ধোয়ার কাজ তাড়াতাড়ি করা যায় বলে এগুলিকে ঘাটের কাছেই রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বর্ষা নামলে স্বাভাবিকভাবেই এগুলি পুকুরে গিয়ে পড়ে। এছাড়া খাওয়ার পর এঁটো বাসন-কোষণ ও এখানে-ওখানে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট সমস্ত কিছুকে পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পুকুরঘাটই কাপড় কাচা ও সাবান মাখার প্রশস্ত জায়গা। বাচ্চাদের মলমূত্রযুক্ত কাঁথা, কাপড়-চোপড় পুকুরেই ধোয়া হয়। শুধু বাচ্চাদের কেন? বড়রা এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। গ্রাম-বাংলার সমস্ত পুকুর পাড়ে না হলেও অধিকাংশ পুকুরের পাড়ে কর

গাছ, বাঁশগাছ বা অন্যান্য গাছগাছড়া লাগিয়ে ঝোপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সব ঝোপের মধ্যে বাড়ীর মহিলাগণ মল-মূত্র ত্যাগ করেন। শৌচাদি পুকুরেই নিষ্পন্ন করেন। বর্ষার জলে মল-মূত্র পুকুরে আসে। এর পর আছে গরু স্নান করানোর ব্যাপার। এ কাজটিও পুকুরেই সমাধা করা হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে পাতা, কাঠ, বাঁশ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পচানোর জন্য পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। অধিকাংশ পুকুরের পাড়ে কিছু-না-কিছু গাছ থাকেই। সেই গাছের পাতা সারা বছর জলে পড়ে। অনেক সময় এই সকল গাছ পুকুরকে সবদিক ঘিরে ধরার ফলে জলের সঙ্গে সূর্যরশ্মির কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। বর্ষা ও গ্রীষ্ম-কালে পুকুরের জল কর্দমা বাহিত তরল পদার্থ বলে মনে হয়। গ্রীষ্মকালে অনেক পুকুরে ত' জলই থাকে না। পুকুরের পক্ষে এত অত্যাচার সহ্য করা সম্ভব নয়। সে অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষিত পল্লীবাসীও এই অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে সচেতন নন। সাধারণ গ্রামবাসীর মতই এঁরাও এই অস্পৃশ্য পুকুর হতেই রান্নার জল সংগ্রহ করেন। এতেই অবগাহন করে শুচি হন। দুঃখের বিষয়, প্রকাশ্য স্থানে মল ত্যাগের পর পুকুরে শৌচ করতে এঁদের বাধে না। পুকুর সম্পর্কে বেদনা-দায়ক নির্লিপ্ততার অবসান এখুনি চাই। একটু সচেষ্ট হলে পুকুর হতে স্বাস্থ্য, খাদ্য ও উৎপাদন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পেতে পারি।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের সঙ্গে পুকুরের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। কিন্তু পুকুরের জলকে কেমন করে স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী রাখা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি কার্যকর ব্যবস্থার কথা ভাবা যেতে পারে।

পুকুর পাড়ে মল-মূত্রাদি ত্যাগ ও জলে শৌচাক্রিয়াদি বন্ধ করা, আবর্জনা ও ভুক্তাবশেষ পুকুরে নিক্ষেপ না করে পুকুর হতে দূরে ঢাকা দেওয়া গর্তে ফেলার ব্যবস্থা করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, গরু স্নান করান, কাঠ, পাতা, বাঁশ ইত্যাদি পচানো বন্ধ করা, পুকুরে পাতা ঝরতে পারে বা জলে সূর্যরশ্মি পড়ার বাধা সৃষ্টি করতে পারে— এমন গাছ পুকুর পাড়ে লাগান বন্ধ করা, থাকলে কেটে ফেলা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, গরু স্নান করান প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়াকর্মের ফলে জল দূষিত হতে পারে, বালতিতে করে বা হাত-পাম্পের সাহায্যে জল পুকুর হতে দূরে কোন স্থানে নিয়ে গিয়ে সে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পাদিত করতে হবে। পাড় এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে বৃষ্টি হলে আবর্জনাযুক্ত দূষিত জল পুকুরে আসতে না পারে।

স্বাস্থ্যরক্ষা সংস্থা স্থাপন

প্রতিটি গ্রামে গ্রামসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে একটি করে স্বাস্থ্যরক্ষা সংস্থা গঠন করতে হবে। গ্রামের শিক্ষকগণ, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হবেন। সংস্থার সভ্য-সংখ্যা পুকুরের সংখ্যা অনুপাতেই হবে। গ্রামে ডাক্তার থাকলে তাঁকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। এই সংস্থা স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে পুকুরের জলকে বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। সরকার প্রতিটি ব্লকে একটি করে পুকুর বিভাগ রাখবেন। এই বিভাগ জল বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত রাখার উপায় ও কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকবেন। এই বিভাগের প্রতি-নিধিগণ পূর্বোক্ত সংস্থার সহযোগিতায় গ্রামের পুকুর নিয়মিত পরিদর্শন ও জল পরীক্ষা করবেন। এঁদের সুপারিশ অনুযায়ী পুকুরের মালিকগণ পুকুরের পরিচ্ছন্নতা ও জলকে জীবাণুমুক্ত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। জলবাহিত রোগ দেখা দিলে রোগযুক্ত এলাকার প্রতিটি পুকুরের জল ও রোগীর ব্যবহার করা পুকুর দ্বরায় পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করার যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ ব্যাপারে মালিকগণ, সংস্থা ও সরকারী পুকুর বিভাগ সদা সক্রিয় থাকবেন।

জলক্রীড়া

সুসংরক্ষিত ও জীবাণুমুক্ত বড়-মাঝারি পুকুরে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াগণ সামর্থ অনুযায়ী নানা ধরনের সাঁতার ও জলক্রীড়ার আয়োজন করতে পারেন। এজন্য গ্রামের স্কুল, কলেজ ও ক্লাবগুলির সঙ্গে সরকার ও মালিকগণের সহ-যোগিতায় গড়ে তোলার কাজ সম্পূর্ণ করা চাই। গ্রাম-বাংলার মানুষ অনেক কিছু হতে বঞ্চিত। আমাদের বাংলা আলস্যের জন্য সহজপ্রাপ্য জলক্রীড়ার সুফল লাভেও বঞ্চিত। অথচ এই ক্রীড়ার ব্যবস্থা করে কম খরচে সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলা যায়। দুর্দশাগ্রস্ত বিষণ্ণ পল্লীবাসীর জন্য আনন্দের আয়োজন সহজেই করা যায়।

খাদ্য

খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পুকুরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুচিন্তিত ও প্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছচাষ করে পুকুরের মালিকগণ নিজেদের জন্য পুষ্টিকর মাছ পেতে পারেন। মাছ বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থও রোজগার করতে পারেন পুকুরে প্রজননশীল ও দ্রুত বৃদ্ধিশীল সঙ্কর জাতীয় মৎস্য সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মৎস্য দপ্তরের পরিচালনাধীন মৎস্য গবেষণা সংস্থার ভূমিকার গুরুত্বের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। সরকার পরিচালনায় উন্নত জাতের মৎস্য বীজ ও তার প্রতিপালন পদ্ধতি সহজ উপায়ে ও সুবিধাজনক মূল্যে মালিকের কাছে পৌঁছান চাই।

এ কাজে সাহায্য করার জন্য পূর্বোক্ত পুকুর বিভাগে অন্তত একজন মৎস্য-উৎপাদক বিশেষজ্ঞ থাকবেন। তিনি বিনামূল্যে পুকুরের মালিকগণকে বা মৎস্য-উৎপাদকগণকে পুকুরের মাটি ও জলের প্রকৃতি অনুসারে কোন্ জাতের মৎস্যবীজ, কি ধরনের মৎস্য-খাদ্য ব্যবহার করতে হবে এবং মৎস্য প্রতিপালন ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন। এভাবেই কৃষিক্ষেত্রে সবুজ-বিপ্লবের মত পুকুরে মৎস্য-বিপ্লবের স্বপ্নকে সফল করে তোলা সম্ভব।

উৎপাদন

ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পুকুরের সাহায্য নিতে হয়। সেচহীন এলাকায় উচ্চ ফলনশীল ধান, সব্জী, ফলফুল ইত্যাদি চাষের জন্য পুকুরের জলকেই কাজে লাগান হয়ে থাকে। বাস্তুভিটা হতে দূরে প্রধানত সেচের ও মাছ-চাষের জন্য কাটান পুকুরে বিধিসম্মত-ভাবে পদ্মফুল, পানিফল প্রভৃতি চাষ করে লাভবান হওয়া যায়। এমন কি সেচের জন্য জল বিক্রি করেও কিছু অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে।

উন্নয়ন

বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে পুকুরের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ জাতীয় নীতি রচনা করা উচিত। নীতি স্থির করার সময়ে বিশেষ করে 'খাদ্য' ও 'উৎপাদন' ব্যাপারে পুকুরের ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। পূর্ববর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের চিন্তা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। পুকুরগুলিকে যথাসম্ভব বড় ও গভীর করার জন্য মালিকগণকে উৎসাহিত করতে হবে। উন্নয়ন ও সংরক্ষণ পরিকল্পনার সঙ্গে পুকুরের মলিকানার সম্পর্ক ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত। একটি পুকুরের মালিক যখন একজন তখন সেই মালিককে তাঁর অধীনস্থ পুকুরের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কিন্তু, যেখানে একটি পুকুরের মালিকানা একাধিক ব্যক্তির কুক্ষিগত, সেইখানেই যত সমস্যা। গ্রাম-বাংলার অধিকাংশ বড় পুকুরের ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রকট। এ সমস্যার জটিলতা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে বুঝে ওঠা কষ্টকর। পশ্চিমবঙ্গে চোদ্দটি দলের যুক্তফ্রণ্টের ক্রিয়াকলাপ স্মরণ করলে কিছুটা ধারণা করা যাবে। দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে, দরিদ্র হয়ে পড়ছে, সেদিকে দৃকপাত না করে শরিকী কোন্দলের রক্তঝরা ইতিহাস রচনায় সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অনেকটা এইভাবেই পুকুরের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কথা ভুলে গিয়ে শরিকানা নিয়ে শরিকী কোন্দল ও মন কষাকষি চলে। অবহেলার ফলে পুকুর অস্বাস্থ্যকর ও মৎস্য-বিহীন হয়ে পড়ে। শেষে পানা ও জলজ আগাছায় ভর্তি হয়ে গিয়ে পুকুর ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দূর করার জন্য ব্লকের কৃষি বিশেষজ্ঞ, মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও পুকুর বিভাগের প্রতিনিধি গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা সংস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুকুরের মালিকগণের সহায়তায় গ্রামের প্রতিটি পুকুরের সঙ্গে এই পুকুরগুলিও দেখবেন এবং উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন। উন্নয়নের জন্য টাকার দরকার হ'লে প্রয়োজনবোধে পুকুর বন্ধক রেখে সহজ সর্তে ও সহজ উপায়ে আরও বেশি সরকারী ঋণের ব্যবস্থা করবেন। অর্থ ও পরামর্শের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সমস্ত বহু মালিকানা ও এক মালিকানাবিশিষ্ট পুকুরের কোনও প্রকারের কোন উন্নয়ন হবে না, সেই সমস্ত পুকুর গ্রামসভার পরামর্শক্রমে গ্রামের কৃষি-শ্রমিকগোষ্ঠী বা উৎসাহী ব্যক্তির মধ্যে সহজ সর্তে দীর্ঘমেয়াদী লীজ হিসাবে বিলি করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের দরকার আছে। এই গোষ্ঠী বা ব্যক্তি মালিকের মতই সকল প্রকার সরকারী সাহায্য পাবেন।

সর্বশেষ কথা

পুকুরের প্রতি ঔদাসীন্য ত্যাগের সময় এসেছে। এর উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট চিন্তার সঙ্গে সুপরিকল্পিত কর্ম ও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করা চাই। তা হলেই পল্লী-বাংলা স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পদও লাভ করবে।

উচ্চ ফলনশীল ধানচাষ

একটি সফল প্রচেষ্টা

খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়ার জন্য মাঠে মাঠে কৃষিযজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে। সেচযুক্ত এলাকায় একই জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে উচ্চ ফলনশীল ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে ভাগ্যবান কৃষকগণের অন্তহীন প্রয়াসের কথা আজ কারও অজানা নেই। সেচহীন এলাকার চাষীরাও ভাগ্যের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র বৃষ্টিনির্ভর চাষের উপর ভরসা করে বসে নেই। তাঁরাও তাঁদের চির পুরাতন সাথী পুকুরের জলকেই সেচের একমাত্র উৎস ধরে নিয়ে, আমন ধান উঠে যাওয়ার পর, বোরো মরশুমে উচ্চ ফলনশীল ধানচাষ করে কৃষিযজ্ঞকে সফল করে তোলার সার্থক চেষ্টা করে চলেছেন।

হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২নং ব্লকের সুলতানপুর গ্রামে ১৯জন সদস্য-বিশিষ্ট ছ'ভায়ের একটি একান্নবর্তী পরিবার। প্রথমেই সেচহীন এলাকায় বসবাসকারী এই ছ'ভায়ের পরিচয় দিই। শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক, ম্যাট্রিক, জি-টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅর্ধেন্দু প্রামাণিক দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। শ্রীজগদিন্দু প্রামাণিক

এম-এ (ডবল), বি-টি, শ্রীশরদিন্দু প্রামাণিক বি-এসসি, এম-এ, বি-টি, শ্রীভারতেন্দু প্রামাণিক এম-এ, শ্রীঅমরেন্দু প্রামাণিক বি-এ (অনার্স)। শেষের চার ভাই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। উচ্চ ফলনশীল ধানচাষ প্রচলনের বহু পূর্ব হতেই এঁদের ২২ বিঘা ধানী জমিতে নিজেরাই মজুরের সাহায্যে আমন ধান চাষ করে আসছেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে একই ব্লকের বৈঁচি গ্রামের শ্রীঅখিলচন্দ্র কারকের তাইচুং ধানের চাষ দেখে এঁরা এই ধানচাষ করার জন্য উৎসাহিত হন। প্রথম বৎসরের জন্য কারক মহাশয়ের কাছ হতে ঐ ধানের বীজ সংগ্রহ করে ১৯৬৭-৬৮ হতে প্রতি বৎসর বোরো মরশুমে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ধানের চাষ করে আসছেন। আজ পর্যন্ত তিনবার (১৯৬৭-৬৮, '৬৮-৬৯, '৬৯-৭০) চাষ করেছেন। এঁদের চাষ দেখতে গিয়েছিলাম। দেখেশুনে ধারণা হয়েছে, চাষ-আবাদ সম্পর্কে এঁদের কাছে শেখার অনেক কিছু আছে। এই কারণে এঁদের অভিজ্ঞতা, মন্তব্য ও অনুকরণযোগ্য প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করছি।

ধান নির্বাচন ও জমির পরিমাণ

প্রথম বৎসর তিন বিঘা জমিতে তাইচুং, দ্বিতীয় বৎসর দু'বিঘায় তাইচুং, তিন বিঘায় আই-আর-৮ এবং এ বছর চার বিঘায় আই-আর-৮, দু'বিঘায় তাইচুং, পনের কাঠায় জয়া ও পাঁচ কাঠায় পদ্মা ধানের চাষ করা হয়েছে।

জমি নির্বাচন ও তৈরী

পুকুর হতে সেচের সুবিধাযুক্ত 'বাড়ী কোল'-এর (বাস্তভিটা ও বাগান সংলগ্ন) এঁটেল মাটির 'ডহর' (নিচু) জমিগুলি চাষের জন্য নেওয়া হয়েছে। আমন ধান কাটার পর জমির বড় বড় 'নাড়া' (বিচালির মৃত্তিকা সংলগ্ন অংশ) কাস্তে দিয়ে কেটে তুলে নেওয়া হয়। পরে এগুলিকে শুকিয়ে জ্বালানির কাজে লাগান হয়। 'ডহর' জমির আমন ধান কাটার পর জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস, এমন কি কখন কখন জলও থাকে। এই রসযুক্ত বা জলো অবস্থাতেই অল্প দামে টানা চিরপ্রচলিত লাঙলের সাহায্যে দু'বার কর্ষণ ও একবার মই দিয়ে চাষের জন্য জমি তৈরি করা হয়। কেটে নেওয়ার পরেও নাড়ার মাটির নিচের অংশটুকু মাটিতে রয়ে যায়। এজন্য 'কাদা'কে (রোপণ করার জন্য তৈরি করা মাটির নাম 'কাদা') ইচ্ছামত মোলায়েম করা যায় না। নাড়াগুলিকে হাত দিয়ে বেছে ফেলা বা টেনে টেনে তুলে ফেলা কোনটাই সম্ভব নয়। এগুলি পরিষ্কার করার জন্য কোন যন্ত্র থাকলে খুবই ভাল হোত। এঁদের ধারণা, প্রচলিত হালের বদলে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করলে 'কাদা' খুব ভাল হবে এবং এতে চাষের খরচও অনেক কমে যাবে। টাকা সংগ্রহ করে ভবিষ্যতে এঁরা একটি ছোট ট্র্যাক্টর কেনার আশা রাখেন। তবে সরকারী বা অন্য প্রকার সুদযুক্ত ঋণ নিয়ে এঁরা কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি কিনতে উৎসুক নন।

বীজ সংগ্রহ ও শোধন এবং চারা তৈরী

দ্বিতীয় বৎসর আই-আর-৮ ধানের বীজ স্থানীয় ব্লক অফিস হতে কেনা হয়েছিল। এ বছর পদ্মার বীজ বাজারের সারের দোকান হতে কেনা হয়েছে। জয়ার বীজ শ্যামপুর ১নং ব্লকের হোগলাসী গ্রামের প্রগতিশীল চাষী শ্রীঅরবিন্দ মাইতির কাছ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। লবণমিশ্রিত জলে (মিশ্রণের হার ২০ লিটার জলে আধ কেজি লবণ) সংগৃহীত বীজ ধানগুলিকে ডোবানো হয়। জলের উপর ভেসে ওঠা অপুষ্ট বীজগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। ডুবে থাকা বীজগুলিকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিলেই বীজ শোধনের কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রথম বৎসরে ৭ কাঠা জমিতে ১৭ কেজি, দ্বিতীয় বৎসরে ২২ কাঠা জমিতে তাইচুং ১৪ কেজি, আই-আর-৮ ২৪ কেজি এবং এ বছর ১ বিঘা ১৫ কাঠা জমিতে আই-আর-৮ ১৬ কেজি, তাইচুং ১২ কেজি, জয়া ৮ কেজি ও পদ্মা ধানের ২ কেজি শোধিত বীজ চারা তৈরির জন্য বোনা হয়েছিল। আই-আর-৮ এক বৎসরের বেশী ও তাইচুং ছ'মাসের বেশী পুরনো হলে বীজধান হতে ভাল চারা হয় না। সেহেতু শুধুমাত্র বীজধান সংগ্রহের জন্য আমন মরশুমে তাইচুং অল্প পরিমাণে কিছুটা জায়গায় চাষ করতে হয়।

রোপণ উপযোগী চারা তৈরির জন্য 'পেঁকেতলা' পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। (অঙ্কুরিত বীজধান কর্দমাক্ত জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে চারা তৈরির রীতিই পেঁকেতলা পদ্ধতি।) ধান জলে ভিজিয়ে নিয়ে বস্তায় ভর্তি করে শুষ্ক জায়গায় কয়েকদিন রেখে দিলেই বীজে অঙ্কুর দেখা দেয়। তাইচুং ও জয়া ধানকে সহজে অঙ্কুরিত করার জন্য সাধারণ জলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ জলে ভিজিয়ে বস্তায় ভর্তি করতে হয়। পদ্মা বা আই-আর-৮-এর ক্ষেত্রে জল গরম করার দরকার নেই। সাধারণ জল ব্যবহার করলেই চলে। অঙ্কুরিত বীজগুলিকে পূর্বোক্ত প্রথায় তৈরি করা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে হাত দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ছিটানোর সময় চারা তৈরির জন্য জমির নির্দিষ্ট অংশটুকুতে শুধু 'কাদা'ই থাকবে, জল এতটুকুও রাখা চলবে না। অঙ্কুরিত বীজ জলে ডুবে থাকলে বীজ হতে চারা আসবে না, পচে সব নষ্ট হয়ে যাবে। চারা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিমিত জল সেচন করতে হয়। প্রথম বৎসর চারা ৮।৯ দিনের হয়ে যাওয়ার পর, এমোনিয়াম সালফেট ৪ কেজি এবং ১৬।১৭ দিন পর আরও ৫ কেজি ঐ সার প্রয়োগ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বৎসর চারা ৮।৯ দিনের হয়ে গেলে ৫ কেজি এমোনিয়াম সালফেট ও ১৫ কেজি ইউরিয়া একবারই প্রয়োগ করা হয়েছিল। এ বছরও ৯ দিনের পুরানো চারার উপর ৫ কেজি এমোনিয়াম সালফেট ও ৩০ কেজি ইউরিয়া একবারই প্রয়োগ করে রোপণোপযোগী ভাল চারা পাওয়া গেছে।

রোপণ

২৫ হতে ৩৫ দিনের চারা পূর্বোক্ত প্রথায় 'কাদা' করা জমিতে রোপণ করা হয়। প্রথম বৎসর দড়ি দিয়ে সারি সোজা করে ১০´×১০´ অন্তর চারা রোপণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বৎসর দু'জাতেরই চারা ৮´´×৬´ অন্তর রোপণ করা হয়েছিল। এ বছর তাইচুং ৬´´ বাই ৬´´ আই-আর-৮ ৬´´×৬´´, পদ্মা ও জয়া ৬´´×৪´´ অন্তর রোয়া হয়েছে। শেষ দু'বছর দড়ির সাহায্যে প্রতিটি সারি সোজা করা হয়নি। চোখের দৃষ্টিতে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করা হয়েছে। তবে ৪।৫ হাত অন্তর ১০ ইঞ্চি প্রস্থযুক্ত জায়গা রেখে দেওয়া হয়েছে। জমির এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার মত এই জায়গা দিয়ে যাতায়াত করে সার ও কীটনাশক ঔষধ ছিটানো হয়। প্রথম বৎসর অতিরিক্ত ফাঁক-ফাঁক রোয়ার জন্য ধানগাছের প্রতিটি গোছে আশাতিরিক্ত সংখ্যায় শীষ উৎপাদক্ষম গাছ জন্মেছিল। এই জাতীয় 'বিয়ান' হতে উৎপাদিত শীষের অধিকাংশ ধানই ছিল অপুষ্ট। ফলে আশানুরূপ শস্য পাওয়া যায়নি। শেষ দু'বারে ঘন রোপণ করে এই দোষ দূর করার চেষ্টা হয়েছে। দ্বিতীয়বারে অপুষ্ট ধান নেই বললেই চলে। এবারে এখনও ওঠেনি। সবে 'থোড়' এসেছে। কোন কারণে মরশুমের শেষ দিকে রোপণ করলে কিংবা তাড়াতাড়ি ফলন পেতে হলে একটু ঘন রোপণ করা দরকার।

নিড়ানো

রোপণের ১৫।২০ দিন পরে হাত দিয়ে একবার নিড়ানো হয়। দু'বার নিড়ানোর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ধানগাছের পাতার ধারে হাত-পা কেটে যাওয়ার ভয়ে সম্ভব হয় না।

সার

'কাদা' করার সময় প্রথম বৎসর গোবর ৩৮ কুইন্টাল, পটাশ ৩০ কেজি, সুপার ফসফেট ৩০ কেজি ও ১৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়েছিল। রোপণের ১৫ দিন পরে আর একবার ১৫ কেজি ও ৩০ দিন পরে পুনরায় ১৫ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশি ফসলের আশায় 'থোড়' আসার মুখে আরও ৩০ কেজি ইউরিয়া এক ক্ষেপেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। ফলে রোগপোকার আক্রমণ বেড়ে যায়। প্রামাণিক ভায়েরা মনে করেন, থোড়ের সময় বেশি পরিমাণ সার প্রয়োগের ফলেই খুব বেশি অপুষ্ট ধান হয়েছিল। দ্বিতীয় বৎসর কাদা করার সময় গোবর ৬৫ কুইন্টাল, পটাশ ১০০ কেজি, সুপার ফসফেট ১০০ কেজি ও ৫০ কেজি ইউরিয়া দেওয়া হয়েছিল। রোয়ার ২০ দিন পরে আরও ৫০ কেজি এবং ৪৫ দিন পরে পুনরায় ৫০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী আই-আর-৮ ধানে আরও একবার ৩০ কেজি ইউরিয়া ছিটানো হয়েছিল। এ বছর কাদার সময় ১০৭ কুইন্টাল গোবর, পটাশ ১০৫ কেজি, সুপার ফসফেট ১০৫ কেজি ও ৭০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়। এ ছাড়া এই সময়েই পরীক্ষামূলকভাবে আই-আর-৮ ধানের ৪ বিঘা জমিতে ৮০ কেজি শ্বেতী গুটি খোল গুঁড়া করে নিয়ে এবং তাইচুং, জয়া ও পদ্মা ধানের ৩ বিঘাতে ৬০ কেজি কাঙালী গুঁড়া খোল প্রয়োগ করা হয়েছে। আই-আর-৮ ধানের ৪ বিঘা জমির ১ বিঘাতে বছরে দু'বার—একবার আই-আর-৮-এর আর একবার প্রচলিত আমন ধানের চারা তৈরি করা হয় এবং এই দুই ধানের চাষও করা হয়। জমির উর্বরতা স্বাভাবিক রাখার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এ বছর এই এক বিঘাতে রোপণের সময় অন্যান্য সারের সঙ্গে ৪০ কেজি হাড়ের গুঁড়াও দেওয়া হয়েছে। রোপণের পর আই-আর-৮ ও জয়া ধানে ২০ দিন অন্তর দু'বার বিঘা প্রতি ১০ কেজি ও শেষবারে ৫ কেজি হিসাবে ইউরিয়া প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাইচুং ও পদ্মাতে ২০দিন পরে বিঘা প্রতি ১০ কেজি ও ৪০ দিন পরে বিঘা প্রতি ৭ কেজি ইউরিয়া ছিটানো হচ্ছে।

ব্যবসায়িগণ প্রায়ই সারের সঙ্গে বালি এবং লবণ ভেজাল দিয়ে আশানুরূপ শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন। ভেজাল সার প্রয়োগের ফলে জমির অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। প্রামাণিক ভায়েদের মতে, সারের ব্যবসা বেসরকারী ক্ষেত্রে না রেখে সরাসরি সরকারের অধীনে রাখলে নির্ভেজাল সার পাওয়া যেতে পারে। জমি ও শস্য সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। বোরো মরশুমের উচ্চফলনশীল ধান কেটে নেওয়ার পর জমিতে কোনও ঘ(, জন্মে না। জমি সাদাটে হয়ে পড়ে থাকে। জমির অম্লত্ব বৃদ্ধির জন্যই বোধ হয় এমনি হয়ে থাকে। এ বছর বোরো ধান কাটার পরই জমিতে লাঙল দিয়ে ধঞ্চে বোনার ইচ্ছা আছে। ধঞ্চে গাছ এক ফুট হয়ে গেলে এই গাছকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে। এতে সবুজ সারের কাজ হবে। সেই সঙ্গে জমির অম্লত্ব হয়ত কিছুটা কমতে পারে। আমন ধান বছরে গড়ে বিঘা প্রতি ৮।৯ মণের বেশি হয় না। প্রামাণিক ভায়েরা মনে করেন, আমন মরশুমে জমিতে চাষ না করে কেবলমাত্র বোরো মরশুমে উচ্চফলনশীল ধানের চাষ করলে এই ধান এত বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হবে যে, উক্ত ৮।৯ মণের ঘাটতি সহজেই মিটে যাবে। অর্থাৎ চাষের খরচ-খরচা বাদ দিয়ে আমন ধানে যে লাভ হয়, সেই লাভটুকু বেশি পরিমাণে উৎপাদিত উচ্চফলনশীল ধান হতেই উঠে আসবে। এই ধারণার সত্যতা বিচার করার জন্য ৬ বছর তিন বিঘা জমিতে আমন ধান চাষ করবেন না ঠিক করেছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জ্যৈষ্ঠ মাসের বপন ও রোপন

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সমস্ত ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে, তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হোল। কোন্ মাটিতে এই সব ফসলের চাষ করে ভাল ফল পাওয়া যায়, ফসলের নামের পাশে তার উল্লেখ করা হোল।

ফসলের নাম	ক্ষেতের মাটি
শাক—নটে, পুঁই, ডাঁটা	যে-কোনও মাটিতে
মানকচু	বেলে দোআঁশ
কচু	বেলে, দোআঁশ এঁটেল
ঢেঁড়স	দোআঁশ
কুমড়া (বর্ষার)	দোআঁশ
চিচিঙ্গা	দোআঁশ
শিম	বেলে, দোআঁশ
মূলা (বর্ষার)	বেলে, দোআঁশ
করলা	দোআঁশ
চাল কুমড়া	দোআঁশ
ঝিঙা	বেলে, দোআঁশ
বেগুন	উঁচু দোআঁশ
লাউ	দোআঁশ
মেটে আলু	বেলে, দোআঁশ
ওল	বেলে, দোআঁশ
হলুদ	বেলে, দোআঁশ
চীনা বাদাম	বেলে, দোআঁশ
লঙ্কা	বেলে, দোআঁশ
কলা	উঁচু দোআঁশ
আনারস	বেলে, দোআঁশ, এঁটেল
আদা	বেলে, দোআঁশ
গোলমরিচ	নিচু ধরনের সরস যে-কোনও মাটি
পেঁপে	উঁচু দোআঁশ
শন	এঁটেল, দোআঁশ
মেড়ি	উঁচু দোআঁশ;
পান	দোআঁশ
সয়াবীন	বেলে, দোআঁশ
বরবটি	এঁটেল, দোআঁশ
অড়হর	উঁচু ধরনের যে-কোন মাটি
জোয়ার	উঁচু দোআঁশ
ভুট্টা বা জনার	উঁচু দোআঁশ
আউস (রোয়া)	বেলে, এঁটেল, দোআঁশ
আমন (রোয়া)	দোআঁশ, এঁটেল
বাজরা	বেলে, দোআঁশ
কাপাস	উঁচু উর্বর যে-কোন মাটি

বীজ নির্বাচন

চাষের প্রতিটি প্রক্রিয়া পরস্পর নির্ভরশীল ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনও একটিকে ভাল করলেই ফল ভাল পাওয়া যাবে না। প্রক্রিয়ার ক্রম অনুযায়ী পরপর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া যথাযথ সম্পাদন করলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। সময়োপযোগী শস্য নির্বাচন ও ক্ষেতের মাটি নির্বাচনের মত রোগমুক্ত, পুষ্ট ও উন্নত জাতের বীজ নির্বাচন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। রোগমুক্ত পুষ্ট বীজ সংগ্রহ ও বপনের দিকে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক বিশেষ দৃষ্টি দেন বলে মনে হয় না। যেমন তেমন বীজ হলেই হোল। অজ্ঞাতসারে বা অবহেলায় গাছে পেকে যাওয়া বেগুন, কুমড়া, ঢেঁড়স, ঝিঙা, লাউ, করলা, শিম, পেঁপে প্রভৃতি ফল হতে পরবর্তী ঋতুর জন্য বীজ সংগ্রহ করা হয়। ফলগুলি রোগমুক্ত, অপুষ্ট বা উন্নত জাতের ছিল কিনা বিচার করা হয় না। যে গাছ-গুলিতে ঐ ফলগুলি হয়েছিল, সেগুলিও রোগমুক্ত, সতেজ বা ভাল জাতের ছিল কিনা, বিচার করার উৎসাহ দেখা যায় না। বীজগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বেঁধে মাটির হাঁড়িতে বা শিশিতে ভরে রাখা হয়। এইভাবে সংরক্ষিত অবস্থাতেই অনেক সময় বীজগুলিতে রোগ-পোকার আক্রমণ সুরু হয়ে যায়। ধান, শন, ডাল জাতীয় শস্যের বীজ সংগ্রহের বেলাতেও বীজের অপুষ্টি, রোগাক্রমণ, জাত সম্পর্কেও সচেতনতার অভাব দেখা যায়। সংগ্রহের মত সংরক্ষণ ব্যবস্থাও অত্যন্ত নিম্ন মানের। চাষীরা তাঁদের ক্ষেতে এই সমস্ত নিম্ন মানের বীজ বপন করেন। গাছ হয়। কিন্তু গাছ হয় রোগযুক্ত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, দু'একবার ওষুধ প্রয়োগ করে রোগমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। অধিকাংশ স্থলেই রোগ সারে না। এতে ফল ভাল হতেই পারে না। অদৃষ্টের দোষ দিয়ে চাষী চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

এ জাতীয় বিড়ম্বনার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণভাবে কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। বিশেষ-ভাবে নির্বাচিত ও লালিত, জন্য হতেই সতেজ ও পুষ্ট এবং আলো-হাওয়াযুক্ত পরিবেশে বর্ধিত রোগমুক্ত ভাল জাতের গাছের পুষ্ট ও রোগমুক্ত ভাল শস্য বা ফল হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজগুলিকে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে শিশি, বোতল বা বস্তায় ভর্তি করে শুষ্ক পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে। যথোপযুক্তভাবে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন—এমন নির্ভরযোগ্য চাষীর কাছ হতেও বীজ সংগ্রহ করা যায়। এ ব্যাপারে সুরক্ষিত ও বিশুদ্ধ নার্সারীর সাহায্যও নেওয়া যায়। বপনের আগে সংরক্ষিত বীজের বিভিন্ন স্থান হতে নমুনা নিয়ে অঙ্কুরিত করার ব্যবস্থা করে দেখতে হবে শতকরা কত বীজ অঙ্কুরিত হয়। এতে বীজের গুণাগুণ জানা যায় এবং বপনের সময় কি পরিমাণ বীজ লাগবে বুঝতে পারা যায়। স্থানীয় সরকারী কৃষি কর্মচারিগণ বীজ নির্বাচন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। বিনামূল্যে এঁদের পরামর্শ নিতে কৃষকগণের দ্বিধা করা উচিত নয়।

—শ্রীজয়দেব বৈতালিক

গোলাপ গাথা

(শেষাংশ)

গোলাপ-চারার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ

কয়েকটি ডাল সৃষ্টি হবার পরে যখন গোলাপ-চারার সারি ছাঁটবার প্রশ্ন দেখা দেয় তখন একটা মস্ত প্রতিবন্ধক দেখা দেয়: ঠিক কতটুকু ছাঁটা হবে। সারিতে যদি অসমান চারা থাকে তা'হলে বাগানের শোভা যথেষ্টভাবে দর্শকের চোখে ধরা দেবে না, কাজেই ছাঁটতেই হবে এবং বলাই বাহুল্য, ছোট চারাগুলির উচ্চতার ওপর নজর রেখেই এ কাজ করা হয়।

কিন্তু ডালপালা এবং পাতা জন্মাবার পরেই ভালো করে নজর রাখতে হবে, কোনো চারার পাতায় কোনো পোকা-মাকড় বসবার চিহ্ন আছে কিনা। কখনো যদি এমন কোনো পাতা নজরে আসে, যা কোথায়ও ক্ষত হয়েছে, একটু ফোলা ফোলা ভাব, কিম্বা একটু যেন চুপসে যাবার মতো, তা' হলে সঙ্গে সঙ্গে সে পাতাটি সন্তর্পণে ছেঁটে ফেলবেন। কারণ হয় তাতে কোনো পোকা ঘাঁটি করে আছে কিম্বা কোনো ব্যাধি ঐ পথে চারাটির শরীরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। বিশেষত যেখানে গোলাপের বাগান করা হয়, সেখানে এ-সবের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

নানা জাতের পোকা-মাকড়ের আক্রমণের হাত থেকে গোলাপ-চারাকে রক্ষা করবার সব চাইতে প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে D D T স্প্রে করা। ঠিক 5./• হওয়া চাই। সাধারণত দশদিন অন্তর D D T দিলেই চলে। হয় ঠিক সন্ধ্যা, আর না হয় ত' ভোরবেলায় পোকারা গোলাপ গাছকে আক্রমণ করতে আসে। কাজেই ঐ সময় স্প্রে করলে পোকাগুলোও ধ্বংস হবে। মেঘলা দিনগুলি গোলাপ-চারার সব চাইতে দুঃসময় জানবেন। মেঘলা দিনে দিনের বেলায়ও পোকারা গোলাপ-চারাকে আক্রমণ করতে পারে।

গোলাপের সজ্জা

ফুলের সাহায্যে কিছু সাজাবার প্রশ্ন উঠলেই সবার আগে গোলাপের কথা মনে উঠবে নিশ্চয়ই। কারণ, গোলাপ কেবল চোখের পক্ষেই প্রীতিবর্ধক নয়---মনের ওপরও এই ছোট্ট ফুলটির অদ্ভুত প্রভাব আজও বিদ্যমান। বসবার ঘর বলুন, খাবার ঘর বলুন, পড়বার ঘর বলুন আর ঠাকুর ঘর কিম্বা বাসর ঘর বলুন, গোলাপ প্রায় সব জায়গাতেই সমানভাবে শোভা বাড়িয়ে থাকে। প্রিয়তমার খোপায় গোলাপকে যতোটা সুন্দর দেখায় প্রিয়তমের পকেটের ওপর আলতো করে রাখলে তার চাইতে খারাপ দেখায় কি?

ওষধি হিসেবে গোলাপ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনে ভিটামিন 'সি'-এর অভাবজনিত নানা রোগ দেখা দিতে থাকে। লেবু জাতীয় ফল ব্রিটেনে সাধারণত বাইরে থেকে আমদানী করা হত---যেমন তাদের প্রধান খাদ্য গম বা মাংস বছরের নয় মাসের জন্যই বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। বিজ্ঞানীরা স্বদেশে পাওয়া যায়---এমন নানা ফলমূল পরীক্ষা করতে লাগলেন। গাছপালার শিকড় বা পাতা সব কিছু নিয়েই পরীক্ষা চালানো হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, গোলাপের মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি'। পাপড়িগুলি ডাঁটার যে অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে---তার মধ্যে আছে ঐ ভিটামিন। আরও পরীক্ষা করে দেখা গেল, একটি গোটা গোলাপে একটি মাঝারী আকারের কমলালেবুর সমান ভিটামিন 'সি' থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন ঘুরে ঘুরে গোলাপ সংগ্রহের অভিযান। যুদ্ধের সময়ে গোটা দেশের বিভিন্ন ওষুধের কারখানায় প্রায় ২৫ লক্ষ বড় শিশি রোজ সিরাপ তৈয়ারী হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ নাগরিক, বিশেষ করে শিশু ও বালক-বালিকা এই রোজ সিরাপের জন্যে অনেক রকমের ভিটামিন 'সি'র অভাবঘটিত ব্যাধির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। গোলাপের বোঁটার অগ্রভাগ

গোলাপফুল

ঋতুরাজ

পরিতোষ বসু

ফাল্গুন শিমুল চূড়ার হাত ধরে
গড়ের মাঠে কলকাতা শহরে

আমের মুকুল কচি কচি পাতার গন্ধে
আত্মহারা,

বিজ্ঞাপনের রঙ ঋতুর সর্বাঙ্গের সর্বনাশা মনে,
আমরা কথার ঢেউ-এ নাচছি তো নাচছি!

দুধের শরীর নিয়ে রমণী মথিত আপন চিন্তায়
ভালবাসার আলিঙ্গন কী মুগ্ধ কী স্নিগ্ধ
বোধাতীত—

রাত্রির লজ্জা নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়
অঙ্গারের মদির

পিপাসা নিবারণ পাত্রের গভীর হৃদয়ে।

বসন্তকাল এরই নাম বসন্তকাল
ফাগ হয়ে হাওয়ার বুকে

বেদনা খুশি আকর্ষণ সুতীব্র দহন
অতিমিশ্রকাল ঋতুরাজ।

সংগ্রহ করা হয়েছিল ব্যাপকভাবে। সর্বসমেত তার ওজন হয়েছিল ৫০০ টন। এই পাঁচশত টন গোলাপের বোঁটা থেকে যে ভিটামিন 'সি' সংগৃহীত হয়েছিল, তা কমলা লেবু থেকে সংগ্রহ করতে হলে অন্তত ২ কোটি ৫০ লক্ষ কমলা লেবুর প্রয়োজন হতো।

ভোজনবিলাসীর মনোরঞ্জনে গোলাপ

দারুণ গরমে গলা যখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তখন একটু সরবতের জন্যে প্রাণটা ছটফট করবে বৈকি। সরবতে কতো রকমের সুগন্ধিই তো ব্যবহার করা হয়, কিন্তু রোজ সিরাপ মেশানো সরবতের তুলনা হয় কি?

গোলাপ-গন্ধী কেক আজকাল প্রচুর তৈরি হচ্ছে। বিদেশে তো বটেই, এমন কি ভারতেও। রসগোল্লা থেকে শুরু করে নানা মিষ্টিতেও আজকাল প্রায় সর্বত্রই রোজ ওয়াটার ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রোজ ওয়াটার যে ক্ষুধা উদ্রেক করতে সক্ষম তা প্রায় সকলেই স্বীকার করে থাকেন। যে বস্তু ক্ষুধা উদ্রেক করতে সক্ষম সে বস্তু হজমেও প্রচুর সাহায্য করে থাকে—প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে।

উত্তর ভারতে যেখানে 'ইউনানী' পদ্ধতির চিকিৎসা আজও বেশ জনপ্রিয়—তার একটি বিশিষ্ট হজমের ওষুধ হচ্ছে মিষ্টির দোকানে তৈয়ারী একটি দ্রব্য: 'গুলখন্দ'। গুলখন্দ তৈয়ার করা হয় গোলাপের পাপড়ি, মধু আর মিছরি দিয়ে।

গোলাপে পাওয়া

প্রাচীন রোমের খেয়ালী সম্রাট নিরোকে অনেকেই মনে করতেন গোলাপে পাওয়া বলে। কারণ, উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে তাঁর সর্বদা প্রয়োজন হতো গোলাপের। যেখানে তিনি বসতেন সেখানে বসেই যেন টাটকা গোলাপের গুচ্ছ তাঁর নজরে আসে—প্রাসাদ সজ্জার দায়িত্ব যাদের ওপর থাকতো সেদিকে তারা বিশেষভাবে নজর রাখতো। সম্রাটের আয়োজিত যে-কোনো ভোজসভার চতুর্দিকে গোলাপের একেবারে ছড়াছড়ি চন্দ্রাতপ—ঝুলঝুলি থেকে ভোজনের টেবিল পর্যন্ত যেদিকে তাকান যেত কেবল গোলাপ আর গোলাপ—সাদা, গোলাপী, টকটকে লাল—নানা জাতের গোলাপ।

বিরহী অ্যাণ্টনি যখন মিশরের রাণী ক্লিওপেত্রার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তখন অ্যাণ্টনির বসবার আয়োজন করা হতো এমন একটি কক্ষে—যার মেঝেতে হাঁটু ডুবে যায় এমনভাবে গোলাপ বিছিয়ে রাখা হতো। অ্যাণ্টনি মিনতি জানিয়েছিলেন তাঁর প্রণয়িনীকে তাঁর কবর যেন গোলাপ দিয়ে সর্বদা ঢাকা থাকে।

গ্রীস এবং রোমে পুরাতত্ত্বেও গোলাপের কদর অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। স্বয়ং দেবী ভেনাসের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ছিল গোলাপ।

কথিত আছে, কিউপিড নাকি নৈঃশব্দের অধিষ্ঠাতা দেবতা হার্পোক্রেটাসকে একটি গোলাপ ফুল দিয়েছিল ঘুষ হিসেবে—দেবী ভেনাসের সঙ্গে তাঁর প্রণয়-কাহিনী যেন আর পাঁচজনে না জানতে পারে, সেই জন্যে।

জার্মানীর গ্রামের মেয়েরা আজও গোলাপ ফুল দিয়ে একটি প্রক্রিয়া করে যার-যার মনের মতো পুরুষের প্রেম ও নিষ্ঠাকে চিরস্থায়ী করবার মানসে।

—সুনীলকুমার নাগ

আনন্দময়ী মা

জর্জ এ্যালেন

মাসিক বসুমতীর অগণিত ধর্মপ্রাণ পাঠক-পাঠিকার সামনে এই পর্যায়ে গত প্রায় আড়াই বছর ধরে নিয়মিতভাবে ভারতের অমৃত-অন্বেষী, পরমের বার্তাবহ, শাস্ত্রের সন্ন্যাসী ধর্মনায়ক, মহাসাধকদের দিব্যজীবনের অলোকসামান্য আলোকোজ্জ্বল কাহিনী তুলে ধরা হচ্ছে। এই ধারা এবার তার লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে নির্দিষ্ট ধারা থেকে এক স্বতন্ত্র ধারায় উপনীত হচ্ছে। এই সংখ্যায় যাঁর জীবনকাহিনী আলোচনার উপজীব্য, তিনি আজও সশরীরে আমাদের মধ্যে বর্তমান। তিনি আজও প্রকট। এতাবৎ তাঁদেরই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে—যাঁরা আজ আর আমাদের মধ্যে শরীরধারণ করে বর্তমান নেই, যাঁরা প্রয়াণ হয়েছেন সাধনাচিত ধামে, যাঁদের নশ্বরলীলার হয়েছে অবসান, যাঁরা আজ অবস্থান করছেন পৃথিবীর সাধারণ মানুষের চর্মচক্ষুর অন্তরালে। এই পর্যায়ে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত আজ অবধি যাঁরা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কোন মহিলার সন্ধান মিলবে না। এবার এই প্রথম একজন মহিলাকে কেন্দ্র করে এই পর্যায়ের রচনা রূপ নিতে চলেছে। তিনি নির্মলা দেবী। কিন্তু সে নামের পালা বহুদিন শেষ হয়ে গেছে। সে ছিল একটি বালিকার নাম। একটি লাবণ্যময়ী কিশোরীর নাম। একটি মমতাময়ী কল্যাণী গৃহবধূর নাম। আজ যার মাথার উপর আকাশচুম্বী মুকুটের মত শোভা পাচ্ছে নগাধিরাজ হিমালয়, যার চরণপ্রান্ত ধৌত-বিধৌত করে চলেছে লাস্যময়ী তরঙ্গিণী কন্যাকুমারিকা—সেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তের নরনারীর শ্রদ্ধার, ভক্তির, বন্দনার আরতিতে দিব্যবিভাসিতা আনন্দময়ী মা এই মাতৃনামে তিনি সম্পূজিতা।

অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর নশ্বর লীলার সূত্রপাত। রত্নপ্রসূ উনবিংশ শতক তথা তার শেষ দশকের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একটি সম্পূর্ণ শতকের তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ হয়েছে। পরম ভট্টারক ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তার ঠিক দশ বছর আগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেছেন বছর তিনেক আগে সিকাগোকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সারা পৃথিবীর নতুন ধারণা, নতুন চিন্তার জন্ম দিয়ে আন্তর্জাতিক ভবরাজ্যে এক বিপুল আলোড়ন করেছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যোগীশ্রেষ্ঠ অরবিন্দ তখন চব্বিশ বছরের যুবক মাত্র। তাঁর শক্তির সাধারণে প্রকাশের তখনও কয়েক বছর বাকি। এ হেন সময়ে, ১৮৯৬ সালের ৩০শে এপ্রিল, ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ ভক্তপ্রবর নামসাধক বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের মেয়ে নির্মলাসুন্দরীর শুভ জন্ম পরিগ্রহ হয়। সেদিন বৃহস্পতিবার। কৃষ্ণাচতুর্থী।

আনন্দময়ী মা

বিপিনবিহারীর আদিনিবাস বিদ্যাকূট। সেখান থেকে এলেন খেওড়া গ্রামে। পরনে গেরুয়া, মুখে অবিরাম হরিনাম—সেই বিপিনবিহারীর স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী সেদিন গৃহের কল্যাণকামনায় আর পাঁচটি কুলবধূর মতই তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে মাথাটি সবে তুলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন এক অপার্থিব, স্বর্গীয়, নয়নাভিরাম দৃশ্য। কোথায় তুলসী। সেখানে এক দিব্য শোভাময়ী অপরূপ স্নিগ্ধ সৌন্দর্যশালিনী মহিমময়ী নারীমূর্তি। তারপরই দৃশ্যান্তর। দেখা গেল এক অদ্ভুত জ্যোতি। স্থির নয়, চক্রের মত ঘুরছে। সেই ঘূর্ণায়মান জ্যোতিপুঞ্জ অবশেষে মিলিয়ে গেল মোক্ষদাসুন্দরীর দেহাভ্যন্তরে। জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন মোক্ষদাসুন্দরী। তারপরই নির্মলাসুন্দরীর জন্ম। একদিকে সরলা, মুখচোরা, স্বল্পভাষিণী, অন্যদিকে প্রখর বুদ্ধিশালিনী, অসাধারণ মেধার অধীশ্বরী। শৈশবে পাঠচর্চার সময়েই এই অভূতপূর্ব মেধার প্রমাণ মিলতে থাকে।

বালিকা এগিয়ে যায় কৈশোরের অভিমুখে। বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে তার জীবনে এল দোসর। ঢাকা-বিক্রমপুর জেলার আটপাড়া গ্রামের জগবন্ধু চক্রবর্তী ও ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর ছেলে রমণীমোহন একদিন ছাদনাতলায় টোপর পড়ে দেখা দিলেন তাঁর সামনে, অগ্নি ও নারায়ণকে সাক্ষী রেখে বেদের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা দু'জনে দু'জনকে বরণ করে নিলেন চলার পথের দোসর হিসাবে। সেদিন ১৩১৫ সালের ২৫শে মাঘ। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী।

রমণীমোহন সবদিক দিয়েই

নির্মলাসুন্দরীর জীবনের চলার পথের সার্থক দোসর। জগতের বৃহত্তম চলার পথ যাঁর জন্যে, তাঁকে ক্ষুদ্র গৃহকোণের সঙ্কীর্ণ পথে আটকে রাখার চেষ্টাও করেননি রমণীমোহন। নবপরিণীতার আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ তিনি বিধাতার করুণার নিদর্শন হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। স্ত্রীর সাধনপথে বাধা তো হনই নি, বরং নিজেও স্ত্রীর প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন। রমণীমোহনকে সাধকজীবনে দীক্ষিত করেন নির্মলা। রমণীমোহন স্ত্রীকে শুধু দীক্ষাদাত্রী গুরু হিসাবেই দেখেন নি, মাতৃভাবে পূজাও করেছেন। ভারতবর্ষের সাধক-সমাজে রমণীমোহনও অপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন। বাবা ভোলানাথ বা মনাপাগলা নামে সারা ভারতের ভক্তমণ্ডলে তিনি সুপরিচিত।

ছেলেবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার বিকাশ তাঁর মধ্যে দেখা যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে, এমন কি অন্যত্রও নামগান শ্রবণমাত্রেই ভাবে বিভোর হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলতেন তিনি। বাহ্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হ'ত। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে মনে হ'ত যেন সম্পূর্ণ অজানা এক জগৎ তিনি পরিভ্রমণ করে এলেন।

তরুণী তন্বী গৃহবধূ নির্মলার ভিতরে মাতৃরূপের প্রথম সন্ধান যিনি পেয়েছিলেন তাঁর নাম হরকুমার রায়। হরকুমারই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন এ নারী নিছক একজন ভক্তিমতী বা ভাবে বিভোর রমণী নয়—এ নারী জননী। বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিটি লক্ষণই যে এঁর মধ্যে প্রকট, সেই গভীর সত্য সবার আগে ধরা পড়েছিল সন্ধানী হরকুমারেরই চোখে। তিনিই প্রথম নির্মলাকে সম্বোধন করলেন মাতৃনামে। আজকের দিনে যে 'আনন্দময়ী মা' নামে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য সন্তানের নিকট তিনি পরিচিতা—সেই 'আনন্দময়ী মা' নামে তাঁকে প্রথম অর্ঘ দিলেন ভক্তপ্রবর জ্যোতিষচন্দ্র রায়। 'ভাইজী' নামে আনন্দময়ী-ভক্তমণ্ডলে যাঁর ব্যাপক পরিচিতি।

১৯২৭ সাল। বছর দু'য়েক আগে দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণ হয়েছে। আনন্দময়ীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন দেশবন্ধু-জায়া পরম শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবী ও দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা কীর্তনশিল্পে একটি অগ্রগণ্য নাম শ্রীমতী অপর্ণা দেবী। আনন্দময়ীকে দেখেই চমকে ওঠেন বাসন্তী দেবী। আবেগে বিহ্বল হয়ে ওঠেন। ভাষাহারা হয়ে যান। পরে জানা যায়—তাঁর চরম সর্বনাশের প্রাক্‌কালে স্বপ্নে একটি নারীমূর্তি তাঁর আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তাঁকে সাবধান করে দেন। স্বপ্নে দেখা সেই নারী মূর্তি এবং চোখের সামনে মহীয়সী নারী আনন্দময়ীর মূর্তি নাকি হুবহু মিলে যাচ্ছে। দেশবন্ধুর জীবদ্দশায় দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবীর একটি ছবি চোখে পড়েছিল আনন্দময়ীর। তিনি ছবি দেখেই বলেছিলেন—খুব শীঘ্রই এই মহিলার চরম সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। আশ্চর্যের বিষয়, ছবির দু'জন কে কে আনন্দময়ী তখন তার বিন্দু বিসর্গও জানতেন না।

অধ্যাত্মচেতনার লীলাভূমি ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত ব্যাপকভাবে পর্যটন করেছেন আনন্দময়ী। তাঁর দাক্ষিণ্যে, তাঁর করুণায়, তাঁর মমতায় বহু মানুষ হয়েছেন লাভবান।

দিক্‌পাল ধর্মনেতা দয়ানন্দ সরস্বতী ও দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী থেকে সুরু করে ভারতের বহু কৃতী সন্তানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যসংজাত তাঁর কথোপকথন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থেকে মানুষের চেতনা, ধ্যান, ধারণার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে বরণ করেছেন কন্যারূপে। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র তাঁর সান্নিধ্যলাভ করে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের মহামন্দির প্রাঙ্গণে। এছাড়া উদয়শঙ্কর, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ ভারতের বরেণ্য সন্তানরাও তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন। এই তালিকা থেকে জওহরলাল নেহরু আর বল্লভভাই প্যাটেলের নামটিও বাদ দেওয়ার নয়।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম মানসপুত্র মহাপুরুষ মহারাজ ওরফে স্বামী শিবানন্দের নিকট বেলুড় মঠে দীক্ষাপ্রাপ্তা জওহরলালজীর স্বর্গতা সহধর্মিণী কমলা নেহরু তো এক কথায় বলতে গেলে আনন্দময়ীকে পরিপূর্ণ মাতৃজ্ঞানেই অঞ্জলি প্রদান করেছেন। আনন্দময়ীর ভিতর এক দিব্য বিশ্বজননীর প্রতিরূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যিনি বসন্তলক্ষ্মী, সেই কমলা নেহরু।

বর্তমান এশিয়ার যিনি শেষ বিস্ময় বলা চলে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বরেণ্য কর্ণধার পরম পূজনীয় আচার্য মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের নশ্বর জীবনে আনন্দময়ী মা আজ একটি পরম সান্ত্বনা, পরম স্নিগ্ধতার একটি প্রসন্ন লিপি। মনীষিশ্রেষ্ঠ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে বর্ণনা করছেন ভারতের একমাত্র জীবন্ত সন্ন্যাসিনীরূপে।

"আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি-পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল-পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি-বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

—রবীন্দ্রনাথ

আরোগ্য বিভাগ

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ : আরোগ্য বিভাগের পরামর্শ

ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কেন্দ্রীয় পেট্রোল ও রাসায়নিক মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এবং স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ তৎপর হয়ে উঠেছেন। খুব শীঘ্রই একটি নতুন বিল কেন্দ্রীয় [illegible] উত্থাপন করবেন এবং তা যদি ফলবতী হয়, ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে প্রকৃতই একটি উপকার হবে। ভারতের সমস্ত গরীব জনসাধারণ অকুণ্ঠ হৃদয়ে সরকারকে ধন্যবাদ দেবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এখনও তো ওষুধের দাম বাঁধা আছে। যে-কোন একটি ওষুধের শিশির লেবেল দেখলেই স্পষ্ট দেখা যাবে, তাতে লেখা রয়েছে 'রিটেল প্রাইস নট টু এক্সিড'---অর্থাৎ এত টাকার বেশি দাম নেওয়া চলবে না।

তাহলে দাম বেঁধে দেবার কথা আবার উঠছে কেন? তার মানে কি বর্তমানে যে দাম বাঁধা আছে, তার মধ্যে কোথাও ফাঁক আছে কি? বিচার ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আছে। ভূতপূর্ব উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্ভবত উনিশশো ছেষট্টি সালে ওষুধের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে যা দামে ওষুধ বিক্রী করছেন, তার চেয়ে এক পয়সাও বাড়াতে পারবেন না।

উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল এই ধরনের নিয়ন্ত্রণে। ধরুন 'ক' কোম্পানী একটি ওষুধ 'ন' টাকায় বিক্রী করেন, আবার 'খ' কোম্পানী সেই ওষুধই বিক্রী করেন ছ' টাকায়। 'ক' কোম্পানী হয়ত বিরাট বড় কোম্পানী। তার খরচও সেই অনুপাতে অনেক বেশি। সেই খরচের হিসেব কষে, লাভ রেখে ওষুধের দাম হয় ন' টাকা। 'খ' কোম্পানীর খরচ কম, সেই অনুপাতে 'খ' কোম্পানীর ওষুধের দাম ছ' টাকা ধার্য হয়েছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে একই ওষুধ বাজারে দু' রকমের দামে বিক্রী হচ্ছে। এর উত্তরে অনেকে বলবেন, 'ক' কোম্পানী বড়, তাই তাদের ওষুধ নিশ্চয়ই 'খ' কোম্পানীর চেয়ে ভাল। এ যুক্তি সম্পূর্ণ অসার, কারণ একই ধরনের ওষুধে একই রকমের ফল দেয়, যদি ওষুধের মধ্যে প্রকৃতই ওষুধ থাকে। অনেকে হয়ত বলবেন, 'খ' কোম্পানীর ওষুধের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁকি আছে। এর উত্তরে বলবার আছে, ওষুধের মান ঠিক আছে কি না লক্ষ্য রাখবার জন্য সব সময়ে ড্রাগ ইন্সপেক্টর বাজারে ঘুরে বেড়ান। কোন সন্দেহজনক ওষুধ দেখলেই তাঁরা সেই ওষুধ নিয়ে গিয়ে নিজেদের রসায়নাগারে পরীক্ষা করে মান নির্ণয় করেন। যে পরিমাপ লেবেলের গায়ে মুদ্রিত আছে তার চেয়ে কম পেলে তৎক্ষণাৎ ওষুধ বিক্রী বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর কাছে কৈফিয়ৎ চান। অতএব ফাঁকি দেবার পথ সরকার পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া আছে। আসলে এসব ব্যাপার ঠিক নয়। 'খ' কোম্পানী হয়ত অল্প লাভ রেখে অল্প দামে ওষুধ বিক্রী করছেন। 'ক' কোম্পানী মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে একই ওষুধের দাম অনেক বেশি রেখেছিলেন। স্থিতাবস্থার আদেশ জারি হওয়ার ফলে একই ওষুধ বিক্রী করে এক কোম্পানী বেশি লাভ করছে, অপর একটি কোম্পানী কম লাভ করছে।

ওষুধের দাম বেঁধে দিতে গেলে অনেকগুলি ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে। ওষুধের মূল্য নির্ধারিত হয় র' মেটিরিয়ালের ওপর। বড় বড় কোম্পানী র' মেটিরিয়াল আমদানী করার লাইসেন্স পান, ছোট ছোট কোম্পানী সাধারণত পান না। যাঁরা বিদেশ থেকে র' মেটিরিয়াল আমদানী করতে পারেন, তাঁরা অনেক সস্তাতে মাল পান। যাঁরা দেশের বাজার থেকে কেনেন, তাঁদের অনেক অনেক চড়া দামে কিনতে হয়। দু' রকমের দামে র' মেটিরিয়াল বিক্রী হলে তৈরি ওষুধের দাম এক রকম থাকবে মনে হয় না। যে সব কোম্পানী বাইরে থেকে র' মেটিরিয়াল কিনবেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ওষুধ বিক্রী করতে পারবেন, আর যাঁরা স্থানীয় বাজার থেকে র' মেটিরিয়াল কিনবেন, তাঁদের তৈরী ওষুধের দাম বেড়ে যেতে বাধ্য। এই বিভেদ ঘোচাতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের র' মেটিরিয়ালের দায়িত্ব নিতে হবে। সরকার প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় র' মেটিরিয়াল আমদানী করবেন এবং নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকটি কোম্পানীকে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী র' মেটিরিয়াল একই দামে বিক্রী করবেন। যে [illegible] কোম্পানীর লাইসেন্স নেই বা বাতিল হয়ে গেছে, তাঁরা র' মেটিরিয়াল চাইলেও কিনতে পারবেন না। গত এক বছরের র' মেটিরিয়ালের হিসাব দাখিল করলে পরবর্তী

বছরের র' মেটিরিয়াল পাবার যোগ্যতা পাবেন। যে সব কোম্পানী নতুন, তাদের লাইসেন্স দেবার সময়েই ড্রাগ কণ্ট্রোলার চাহিদার অঙ্ক অনুমোদন করে দেবেন। প্রত্যেক কোম্পানীকেই র' মেটিরিয়াল কিনতে হবে সরকারের কাছ থেকে।

ওষুধ তৈরীর জন্য আনুষঙ্গিক অনেকগুলো জিনিষের প্রয়োজন। যেমন ধরুন সিরাপ। যে-কোন সিরাপ তৈরি করতে গেলে ওষুধের মিক্সি ছাড়াও শিশি, বোতল, ছিপি, লেবেল, কার্টন, প্যাকিং লিটারেচার প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। অনেক কোম্পানী আবার চাহচ সরবরাহ করে থাকেন। শিশি-বোতল যদি দামী কেনা হয়, তা হলে ওষুধের দামও বেড়ে যাবে। ছিপির বেলাতেও তাই। লেবেল, কার্টন যদি দামী কাগজে ছাপা হয়, তা হলেও ওষুধের দাম বাড়বে।

ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল ধরনের ওষুধেও দামের তারতম্য আছে। ট্যাবলেটের দাম অপেক্ষাকৃত কম ক্যাপসুলের চেয়ে (একই ওষুধের হিসেবে)। ধরুন, কোন ভিটামিনের ট্যাবলেটের দাম ক্যাপসুলের চেয়ে কম, অথচ দু' রকমের ওষুধেই এক কাজ হয়।

আরও অনেক রকমের আনুষঙ্গিক খরচ আছে ওষুধ তৈরি করার বিষয়ে, যার ওপর নির্ভর ক'রে ওষুধের দাম নির্ধারিত হয়। যে কোম্পানী আনুষঙ্গিক খরচ যত বাড়ান, তাঁদের ওষুধের দাম তত বৃদ্ধি পায়।

এইসব খরচের তারতম্যের জন্য ওষুধের দাম কমে যায় বা বৃদ্ধি পায়। অতএব ওষুধের দাম নির্ধারিত করার সময়ে এইসব সমস্যাগুলির কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ওষুধের ব্যবসায়ে কোম্পানী এবং ক্রেতার মাঝখানে আর একদল ব্যবসায়ী আছেন, যাঁদের বলা হয় Wholesales dealers. এঁরা একসঙ্গে অনেক টাকার ওষুধ অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে কোম্পানী থেকে নিজেদের কাছে মজুত রাখেন। ছোট ছোট ওষুধের দোকান এইসব ডীলারের কাছ থেকে অল্প অল্প করে ওষুধ কিনে রোগী-রোগিণীর কাছে বিক্রী করেন।

সরকার যে মুহূর্তে ওষুধের দাম কমাবার জন্যে সচেষ্ট হবেন, সেই মুহূর্তেই এইসব ব্যবসায়ীর দল সাবধান হয়ে যাবেন। তাঁরা প্রচুর ওষুধ সংগ্রহ ক'রে নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখবেন এবং বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করবেন। ওষুধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রয়োজনের খাতিরে নিরুপায় রোগী-রোগিণীর দল অনেক বেশি দামে বাধ্য হয়ে সেই ওষুধ কিনবেন। এমন কি ক্যাশ মেমোও পাবেন না। সরকার এই সমস্যার সমাধান কঠোর হস্তে না করতে পারলে ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করার চেষ্টা সফল হবে না।

আমরা আরোগ্য বিভাগের তরফ থেকে এই শুভ প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমাদের দেশের অগণিত দীন-দরিদ্র রোগীর দল যদি সত্যিই অল্প মূল্যে ওষুধ পায়, তা হলে প্রকৃতই দেশের মঙ্গল হবে।

এই বিষয়ে আমাদের একটি Suggestion আছে। সরকার যদি দেশব্যাপী ওষুধের Fair price Shop খুলতে পারেন, তা হলে

আরোগ্য বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেউ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

আরোগ্য বিভাগ

নাম---

ঠিকানা-------------------------------------

মাসিক বসুমতী

দেশের লোক অল্প মূল্যে ওষুধ পাবে এবং যে মুনাফা মধ্যকার ব্যবসায়ীকূল লাভ করছেন, তার কিয়দংশ সরকার পেতে পারেন। তাতে উভয়পক্ষেরই লাভ হবে।

সরকার যদি এ বিষয়ে উৎসাহী হন, আমরা আরোগ্য বিভাগের তরফ থেকে আমাদের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার হয়ে আরও অনেক সুচিন্তিত পরামর্শ দিতে পারি।

[পাঠক-পাঠিকারা এ বিষয়ে মতামত পাঠাতে পারেন। যুক্তিপূর্ণ চিঠি আমরা আরোগ্য বিভাগে প্রকাশিত করব।]

● শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী নারায়ণী মুখোপাধ্যায় (জয়কৃষ্ণ পাল রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩) এঁরা দু'বোন। দু'বোনেরই বয়স ১৮ বছর। মাথায় ভীষণ খুস্কি। চুল উঠে যাচ্ছে।

● খুস্কি হলেই চুল উঠে যায়। খুস্কি না সারলে চুল ঠিক হবে না, অতএব খুস্কি কি করে সারানো যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক্।

খুস্কি সারাতে হলে একদিকে মাথা খুব পরিষ্কার রাখতে হবে আর চুল যাতে বেশীক্ষণ ভিজে না থাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভিজে চুলে খুস্কির কীটাণু জন্মাবার সুযোগ পায়। সেই সঙ্গে শরীরের ভিটামিন পূরণ করতে হয়, কারণ ভিটামিনের অভাবে খুস্কি হয়।

অতএব, সপ্তাহে একদিন করে Loxene অথবা Cidal শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ঘষবেন। রোজ স্নানের পর হিজল হেয়ার অয়েল মাখবেন, তা ছাড়া বহু ভিটামিন (Multivitamin) বড়ি দু'বেলা খাবার পর একটি করে খাবেন। মাথার কোন নোংরা জিনিস বা পরের ব্যবহৃত তোয়ালে, চিরুনী লাগাবেন না।

মধুমিতা ছদ্মনামের আড়ালে বালীগঞ্জ, কলিঃ-১৯ থেকে একটি প্রশ্ন পাঠিয়ে প্রশ্নটি ছাপাতে নিষেধ করে পরামর্শ চেয়েছেন।

● দেখুন মধুমিতা দেবী, আপনি যে সমস্যার কথা লিখেছেন, তার সমাধান চিঠিপত্রের মারফতে হয় না, হওয়া উচিতও না। ওসব রোগে যে ওষুধ ব্যবহার করতে হয়, তার পরিমাপ খুব হিসেব করে করতে হয়। একটু গোলমাল হলেই হিতে বিপরীত হয়। তাই কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরামর্শ নিন।

● শ্রীঅনাবিল ভট্টাচার্য (ছদ্মনাম), ছদ্ম ঠিকানা, সাঁত্রাগাছি—প্রথম প্রশ্নে জানিয়েছেন ওঁর গলায় দোষ আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় যদি লেপ বা কম্বল গা থেকে সরে যায়, তা হলে সকাল বেলায় গলায় খুব ব্যথা হয়।

● আমারও হয়। আমি কি করি জানেন? শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই গলায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে শুই। অনেকের এ-ধরনের গলার দোষ থাকে, ওষুধে সহজে যেতে চায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নে জানিয়েছেন, 'লম্বা হওয়া ভাল---এই তথ্য আমাদের সকলের কাছে স্বীকৃত।'

● কিন্তু আমরা স্বীকার করি না। অপরিমিত বেঁটে-লম্বা হওয়া রোগ। তা ছাড়া মানুষ লম্বা-বেঁটে হয় বংশানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী। এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মোটেই লম্বা ছিলেন না।

● শ্রীঅজয়কুমার দত্ত, মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৩ থেকে চিঠি লিখেছেন, তঁর বক্তব্য হল লজ্জাবশত তিনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না। আমরা বলি, ডাক্তারের কাছে লজ্জা-ঘৃণা-ভয় রাখতে নেই। অকপটে সব কথা ডাক্তারের কাছে বলে উপদেশ নিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। সব ধরনের উপদেশ চিঠিতে দেওয়া সম্ভব নয়।

● শ্রীসত্যেন রায়, বর্ধমান—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম, কিন্তু কোন প্রশ্ন খুঁজে পেলাম না। কেবল মনে হল আপনি স্বাস্থ্যবান হতে চান। ভালভাবে খেয়ে একটু বেশি বিশ্রাম করুন। সৎচিন্তা করুন এবং পড়াশুনা করুন, দেখবেন স্বাস্থ্য আপনা থেকেই ভাল হয়ে উঠছে।

● শ্রীসমরেন্দ্র পাল, নবদ্বীপ, নদীয়া থেকে লিখছেন, সঙ্গে দু'খানি কুপন পাঠিয়েছেন :

প্রশ্ন—(১)একটু মোটা হতে চাই। (২) মুখে ব্রণ আছে। (৩) ব্রণের দাগ বহু চেষ্টা করেও ওঠে নি। (৪) বাবার হাতে বাত হয়েছে।

উত্তর—(১)ভাত বেশি করে খান, আলুর পরিমাণও বাড়িয়ে দেবেন। অন্য পরামর্শ এই সংখ্যাতেই আছে। (২) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। ভিটামিন 'এ' বেশি করে খাবেন অথবা ইঞ্জেকশন নেবেন। (৩) সহজে মিলোবে না। (৪)চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

● শ্রীজয়ন্ত বসু, বড়া, হুগলী—

প্রশ্ন ছাপাতে নিষেধ করেছেন। উত্তরে জানাই—এই সংখ্যাতেই আপনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

● ভবানীপুরের বাপের বেটা—

যে সমস্যার কথা লিখেছেন, তার সমাধান হবে তখনই, যখন আপনি বাপের বেটার মত কুঅভ্যাসটি পরিত্যাগ করবেন, তার আগে নয়।

● শ্রীচণ্ডীচরণ দাস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ—

● দাড়ি কামাবার পর গালে গুটি বেরোয়—

● অনেকের বেরোয়। প্রথমত উল্টোভাবে দাড়ি কামালে হতে পারে, দ্বিতীয়ত ক্ষুর বা ব্লেডে ভালভাবে ধার না থাকলে ওই রকম গুড়ি গুড়ি বেরোয়। প্রথমত খুব ধারালো ব্লেড বা ক্ষুর-এ কামাবেন। দ্বিতীয়ত উল্টো একদম টানবেন না। দাড়ি কামাবার পর আফটার সেভিং লোশন মুখে মাখবেন, তারপর যে-কোন ভাল ক্রীম ঘষে দেবেন।

● শ্রীসুনীলকুমার চন্দ, এল আই সি, জামসেদপুর-

আপনার সমস্যা ওষুধে হবে না।

শ্রীমনীগোপাল দে, ভদ্রপল্লী, কৈলাসহর, ত্রিপুরা—

আপনি অযথা চিন্তা করছেন এবং চিন্তার জন্যই আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি দেখা দিচ্ছে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না; দেখবেন সব উপসর্গ দূর হয়ে গেছে।

● শ্রীরঞ্জনকুমার চ্যাটার্জি, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা---

অতীতে যা করেছেন, তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা করবেন না। যে সব উপসর্গের কথা লিখেছেন, সেগুলো নিয়ে যত চিন্তা করবেন, ততই শরীর খারাপ হবে। ওসব চিন্তা ভুলে গিয়ে নিজের কাজকর্ম করুন, দেখবেন স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠছে। কোন ভয় নেই।

● মুকুল, হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি অহেতুকভাবে চিন্তা করছেন। স্নায়বিক দুর্বলতার সঙ্গে বায়ুর উৎপত্তি ঘটায় দুই রকম উপসর্গ ঘটছে।

● শ্রীঅরুণ সরকার, খড়দহ, ২৪ পরগণা---

আপনি লাল মত জায়গাটিতে Nebasulf জাতীয় মলম দিনে দু'-তিনবার করে লাগাবেন।

● মিস্ বন্দীরা---

প্রশ্ন---(১) মেয়েদের মাসিক কতদিন অন্তর হওয়া উচিত? কত বছর বয়সে আরম্ভ ও শেষ হয়?

উত্তর---সাধারণত ২৫ থেকে ৩২ দিনের মধ্যে। আমাদের দেশে (গ্রীষ্মপ্রধান দেশে) সাধারণত দশ-এগারো বছর বয়সে আরম্ভ হয় এবং পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত হয়।

প্রশ্ন---আমার প্রায় ৪০।৫০ দিন পর পর হয়।

উত্তর---কোষ্ঠকাঠিন্য ও রক্তাল্পতার জন্য দেরি করে মাসিক হতে পারে।

প্রশ্ন---(২) অনেকদিন হল মাথায় খুস্কি।

উত্তর---খুস্কি নিয়ে এ সংখ্যাতেই আলোচনা হয়েছে।

প্রশ্ন---(৩) আমার এক বন্ধুর নতুন বিয়ে হয়েছে। আধুনিকা মেয়ে, তাই খুব শীঘ্রই (অন্ততঃ ৩।৪ বছর) সন্তান চায় না।

উত্তর---যে-কোন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গেলেই তাঁরা এ বিষয়ে সবিস্তার উপদেশ দিয়ে দেবেন।

৪নং প্রশ্ন ছাপতে নিষেধ করেছেন বলে ছাপলাম না। ও নিয়ে ভাবতে নিষেধ করবেন।

প্রশ্ন---(৫) স্কিপিং করলে কি লম্বা হওয়া যায়?

উত্তর---সাধারণত হওয়া যায় না।

● শ্রী এস নরেন্দ্র, শিলিগুড়ি---

আপনি যে উপসর্গের কথা বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। দয়া করে আর একবার পরিষ্কারভাবে লিখে পাঠাবেন।

● শ্রীকুমার ঘোষ, শহরপুরা, ধানবাদ---

প্রশ্ন---(১) মণ্টুদার মাথায় চোট লাগায় আমি বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু চিন্তা প্রায় দূর হয়েছিল, কিন্তু সে ভুলবশত স্নান করে, তাতে কি কোন ক্ষতি হবে?

উত্তর---কিন্তু কাটার ক'দিন পরে স্নান করেছেন ভুলবশত সেটি জানান নি, তাই কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

প্রশ্ন---(২) আমার স্বাস্থ্য বড় দুর্বল, মনও দুর্বল।

উত্তর---স্বাস্থ্য সবল হলেই মন দৃঢ় হবে। আপনি রোজ সকালে বেড়াতে যান এবং পেট ভরে খেয়ে দুপুরে ঘুমোন।

● দে, ব (ছদ্মনাম) কলি---৩২---

আপনি যে-কোন বড় হাসপাতালের সার্জিক্যাল আউটডোরে দেখালেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন নেই।

● শ্রীমতী উ. ভ. আসানসোল---

মাড়ি ক্ষয়ে যাওয়ার প্রতিকার করতে গেলে দন্ত চিকিৎসককে দেখান। তিনি দেখে বুঝতে পারবেন, কি কারণে মাড়ি ক্ষয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়ে যাবার কারণ নির্ধারণ করতে না পারলে রোধ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নে, যা লিখেছেন, তা কোন রোগই নয়। আপনা থেকে যেমন হয়, তেমনি মিশিয়ে যায়।

● শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৌলিক, উত্তরপাড়া---

আপনি নুন কম খাবেন। সহজপাচ্য খাদ্য খাবেন। সকাল-সন্ধ্যা বেড়াতে যাবেন। দেখবেন বাতের যন্ত্রণা কমে যাবে। বেশি বয়সে ওষুধ খাওয়া ভাল নয়।

● শ্রীঅজয় সরকার, সূর্যনগর, আলিপুরদুয়ার---

ভাল খাওয়াদাওয়া করুন এবং পরিশ্রম করুন। দিনে একদম ঘুমোবেন না। রাতে গভীর ঘুম হলেই দেখবেন সমস্যার সমাধান হয়েছে।

● শ্রীমতী মৃদুলা ভট্টাচার্য---

অতীতের কথা একদম ভুলে যান। দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Sharkoferrol খাবেন তিন মাস ধরে।

● শ্রীমতী চিত্রা চ্যাটার্জী, দুর্গাপুর---

যে বড়ির কথা লিখেছেন, তা ব্যবহার করলে অনেক সময়ে অনুরূপ উপসর্গ ঘটে। সদা স্রাবের জন্য ভয় পাবেন না, আপনা থেকেই কমে যাবে। বাকী উপসর্গ যদি না কমে, তাহলে একজন বিচক্ষণ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে পরামর্শ নিন।

● শ্রীদীননাথ সরকার, সি, আই, টি রোড, কলিকাতা-১৪---

প্রশ্ন ছাপাতে নিষেধ করেছেন, ছাপালাম না। আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Aminozyme খাবেন দু'মাস ধরে।

● শ্রীপ্রকাশকুমার গুন, টিপুক টি এষ্টেট, আপার আসাম---

Angina pectoris-এর চিকিৎসা কক্ষণো ডাক্তার না দেখিয়ে করবেন না।

প্রশ্ন---(২) জন্ম-মাস-তারিখ না জেনে বা কোষ্ঠী না দেখে শরীরের কোন বিশেষ গঠন দেখে কি মানুষের বয়স নির্ণয় করা যায়?

উত্তর---আঠারো বছরের বেশি

একবার আরও জ্বলে উঠে

তপতী রায়

যন্ত্রণার নিরন্তর কান্নায়
অবশেষে ভেঙে পড়ে
তবু মানে নি সে হার
দুর্জয় প্রতিজ্ঞা তার
তবুও টলেনি বারবার।

কেন না হৃদয়ে তার
জ্বলে ওঠা বাতির আলোয়
গলিত মোমের মত জেগে আছে ব্যথা।
তাকে তুমি আঙুলের চাপে
গড়ে নিতে পার
যে কোন আকার জেনো
দিতে পার তুমি।

হয়তো তখন তার মন
আলো দিতে পারে
আরো একবার জ্বলে
আগুনের শিখার মতন।

কি কম বলা যায়। অবশ্য তার জন্য এক্সরে প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম প্রয়োজন।

●শ্রীজ্যোতি বসু, বালেশ্বর, উড়িষ্যা—

আপনার পুত্র বিষয়ে কোন চিন্তা নেই।

প্রশ্ন---(২) জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি মেয়েদের কি করে মেদ বৃদ্ধি করে?

উত্তর---জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি নিয়মিতভাবে খেলে ওভারির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে দৈহিক মেদের ভাগ বাড়তে থাকে।

●শ্রীমহেশ্বর দাস, আগরতলা, ত্রিপুরা—

আপনি এবং আপনার ভগ্নী উভয়েই 'ভিটামিন বি কমপ্লেক্স' ইঞ্জেকশন নেবেন। একদিন অন্তর একটি করে দশটি। পরিমাণ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে নেবেন।

●শ্রীঅপূর্ব সেন, অশোকগড়, কলি-৩৫—

আপনার প্রথম প্রশ্ন অনেকবার আলোচিত হয়েছে, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, যাঁরা একেবারেই শুক্রক্ষয় করে না, তাঁদের যৌন সংক্রান্ত গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়।

●রতন দে রায়, কাইজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯—

আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ওটা কোন সমস্যাই নয়।

●শ্রীমতী মৃদুলা দে, বেনিয়াপুকুর রোড, কলিকাতা-১৪—

আপনার চোখের পাতায় সম্ভবত ক্যালাজিয়ান্ হয়েছে। এতদিনের পুরনো হয়েছে, বর্তমানে অপারেশন ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তবে এ ধরনের অপারেশন অতি সামান্য এবং কোন দাগ থাকে না।

●শ্রীঅঞ্জনকুমার রায়, হুগলী,—

রাত্রে যাতে গভীর ঘুম হয়, তার ব্যবস্থা করুন, দেখবেন উপসর্গ সেরে গেছে।

শ্রীমাণিক ভট্ট, হালিসহর, ২৪ পরগনা—

মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে স্নায়বিক দৌর্বল্য আসছে। আপনি Nevrovitamin 4 (adult) বড়ি রাতে শোবার সময় ২টি করে এক মাস খাবেন।

●শ্রীদিবাকর দত্ত, তিনপাহাড়, সাঁওতাল পরগণা—

আপনার ভাইকে 'ভিটামিন বি কমপ্লেক্স' ইঞ্জেকশন নিতে বলবেন, বোনের মনে হয় কৃমি আছে। কৃমির চিকিৎসা করাবার আগে একবার মল পরীক্ষা করিয়ে নিন।

●শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে, শরৎ বসু রোড, কলি-২৮—

আপনার চিঠি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পা[illegible] শুনে এবং তদৈব মুখভাব দেখে [illegible]-হা হাসি শোনা গেল গৈরিকের মুখে। এতদিন শোনে নি পাঞ্চালী।

আচ্ছা। সহোদরার সান্নিধ্যে গাম্ভীর্য-কামী পুরুষ অধুনা বিগলিত গৃহের নির্জনতায় শিথিলসংযম। কত কাছের, কত আপনার লোক হয়ে গেল গৈরিক এক লহমায় হাসির সেতুবন্ধনে।

উচ্ছ্বসিত-উদ্বেলিত পাঞ্চালী হৃদয়। বুঝেছে, সে বুঝেছে, প্রেমের অবিরত আঘাতে দ্বার ভেঙেছে দুর্গের।

ধরা দিয়েছে গৈরিক।

আর ভয় নেই।

[illegible] সম্মিলিত হাসির জোয়ারে উদ্বেলহর্ষ পাঞ্চালীর।

কিন্তু নন্দা গেল কোথায়?

এর উত্তর থামবাদ।

জনারণ্যে এক মুখ

ধারাবাহিক উপন্যাস

শ্রীমতী বাণী রায়

এবার আমার গল্পের স্রোত তীব্র হোক, সংক্ষেপ করে তুলি পরিণতি। বৃহৎ কাঠামোয় অনেক প্রলাপ-আলাপ শুনেছেন আপনারা। শুনুন বিস্তৃত পটভূমিকায় সংক্ষিপ্ত কাহিনীসার।

টেবিলে-রাখা জার্মেনীর একখানা এয়ারো[illegible]টার।

'আজ এত আনন্দের কারণ ওই চিঠি, না?' অতি অনায়াসে প্রশ্ন করল পাঞ্চালী।

'ধরুন, তাই যদি হয়। স্বাভাবিক।' আবার সহজ আলাপচারী নমনীয় গৈরিক।

'তাড়াতাড়ি ফিরবেন কথা দিলে ক্ষীরের সিঙাড়া আদি যত যা জানি খাওয়াব।'

'সর্বনাশ!'

সেই রসবার ঘরটির সৌরভ-উতল-রাত্রি আবার নেমে এসেছে। সন্ধ্যা-বেলায় ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ট্রেণে ছুটে এসেছে নন্দা সেন। এসেছে আবার।

এক হাতে স্যুটকেশ, বিশুষ্ক মূর্তি নন্দা সেন 'মৃন্ময়ীর' দরজায় এসে থামল। ট্রেণের বাথরুমে যথা-সাধ্য প্রসাধনের পরিচর্যা অন্তেও দেহ এখন বল্লরীর পুষ্পসম্ভারে ভূষিতা নয়, দেহ এখন দেহযষ্টি মাত্র। নন্দার কর্ণধসন্ত বৈশাখী রুদ্রতায় অবশিত। উদ্বেগ, মনোকষ্ট, অনিদ্রা শোধ নিয়েছে গত যৌবনে।

[illegible] হলেও স্বভাবজনিত মাধুর্যে আত্মসংবরণ করে সহৃদয় অভ্যর্থনায় সমর্থ হল, "আসুন, নন্দাদি। হঠাৎ এদিকে এসেছেন বুঝি?"

"হুঁ।" সংক্ষেপ উত্তরে নন্দা কারণ প্রদর্শনে বিরত। তৃষিত-বিভ্রান্ত দৃষ্টি ঘরের চারদিকে আঁতিপাঁতি করে কী খুঁজছে। মোটা বুদ্ধি ঘরোয়া 'মৃন্ময়ীর' গৃহিনী মীনাক্ষী সহজভাবে বলল, "উনি মেয়েকে জুতোর দোকানে নিয়ে গেছেন। এক্ষুণি ওরা এসে যাবে। এখানে বসুন, চা দেই। চা খেয়ে স্নান সেরে নিন। ততক্ষণ আমি খাবার যোগাড় দেখি।"

"না, একেবারে ওপর থেকে স্নান করেই আসি।" কোনমতে দায়সারা কথাটির শেষে চলে গেল দোতালার গেষ্ট রুমে নন্দা। ততক্ষণে শিক্ষিত ভৃত্য স্যুটকেশটা নিয়ে গেছে। দরজা খোলাই থাকে ঘরখানির। সর্বদা সুসজ্জিত রাখা হয় সহসাগত অভ্যাগতের উদ্দেশে।

মীনাক্ষী বিস্মিত দৃষ্টি মেলে নন্দাকে দেখল। প্রাণখোলা কথা নেই, গম্ভীর, অন্যমনস্ক। কোনরূপ পানীয় প্রত্যাখানও নন্দার পক্ষে বিচিত্র নয়।

নন্দা প্রথম যখন এসেছিল তখন মোটামুটি এক রকম ছিল। একদা লাবণ্যময়ী তরুণীর প্রৌঢ়ত্বে রূপান্তরের পথে দেখা দিয়েছিল নন্দা। তারপরে, কেন জানে না মীনাক্ষী, সুন্দরী হয়ে উঠলেন নন্দা সেন। আবার আজ কেমন রুক্ষ হতশ্রী চেহারায় হাজির হয়েছেন, দেখ। গতবারেই নন্দা সেনের চেহারার পরিবর্তন দেখেছিল মীনাক্ষী স্বভাবেও দেখেছিল নানা রুচিভরা ভাববিন্যাস।

নন্দাদির বয়স হয়ে গেছে, তাই এতটা পরিবর্তন।

বিষাদভরে মীনাক্ষী ভাবল যৌবন একদিন শেষ হয়ে যায়। তাকে বাঁধা যায় না। কোণের কাশ্মীরী টেবিলে খোদাই-কাজ রুপোর কাস্কেট থেকে

কয়েকটা বাদাম মুখে দিতে যেয়ে থেমে গেল মীনাক্ষী। আজকাল খাওয়া বেশী বেশী হচ্ছে। কোমরে মেদ লেগেছে। বিকাশ এসব কথায় হাসে আর বলে, "ভালো তো, দিব্যি আরামে মোটা হও না। বোঁপাসা বলেছেন যে, স্থূলকায়া প্রণয়িনী তিনি ভালবাসেন।"

যাকগে, এবার থেকে খাওয়া-দাওয়ায় সাবধান হব। মীনাক্ষী বিপদে পড়েছে।

বাবুর্চি ছুটি নিয়েছে একবেলার। শহরতলীর ঘরে যাবে সে। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা সংক্ষেপ রেখেছে মীনাক্ষী আজ রাত্রে অতএব। মাংসরোষ্ট আর পুডিং তৈরি করে রেফ্রিজারেটরে রেখে গেছে বাবুর্চি। একমুঠো পেশোয়ারী চালের ভাতের সব আয়োজন আছে। শুধু গ্যাসে আগুন দেবে মীনাক্ষী। ভাত আপনা থেকে হয়ে যাবে।

বাজারে জুতোর দোকান। ফেরার পথে বিকাশ কালাকন্দ আর মালাই নিয়ে আসবে, কথা আছে।

কিন্তু নন্দাদির মত খাদ্য-রসিকের এতে হবে কি? ভালোমন্দ জিনিস থাকলেও নন্দাদি নানা আইটেম্ ভালবাসেন। তা ছাড়া এতও কি তরকারী খেতে পারেন?

মীনাক্ষীর পিত্রালয়ে বিধবা মহিলা থাকবার হেতু নানাবিধ নিরামিষ রান্না হয়। ধানবাদে বড় অফিসারের ঘরণী হওয়ার পরে মীনাক্ষী খাওয়ার ধারা পাল্টে গৃহস্থপন্থী থেকে অভিজাতপন্থী করে তুলেছে। এক গাদা তরকারী, ভাজা, ঘণ্ট, শাক, শুক্তো, ডালনা, চচ্চড়ি ইত্যাদি আমিষ আহার পর্যাপ্ত পেলে কেউ খায় না—এক ব্লাডপ্রেশার বা ডায়াবিটিসের রোগী ভিন্ন। দুধ, ঘি, মাখন, দই থাকতে সেদ্ধ বা রান্না করা আনাজ খায় না তারা কেউ; যেটুকু খাদ্যে সমতা আনার প্রয়োজন, মাত্র সেটুকু গ্রহণ করে থাকে।

মীনাক্ষীর অধরে সুখের হাসি। মানিক রত্নাকারী [illegible]

এমন একটা কিছু পাত্র হিসাবে বিকাশ ছিল না জমিদার তনয়ার পক্ষে। কিন্তু বিকাশকে দেখে এবং কথা বলে হঠাৎ বাবার মেজাজ পছন্দ হয়ে গেল। মায়ের অমত সত্ত্বেও গৃহস্থ ঘরেই কন্যা সম্প্রদান করলেন তিনি। প্রচুর যৌতুক দিলেন আদরিণী দুহিতার ভবিষ্যৎ হিতার্থে।

এখন বোনেদের মধ্যে সব থেকে অবস্থাপন্ন মীনাক্ষী। ধাপে ধাপে কত প্রমোশনের সোপান বেয়ে বিকাশ উঠেছে শীর্ষে। সুখী মীনাক্ষী। স্বামীর প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয়।

কিন্তু নন্দাদির জন্য আজ রাত্রের মত পাঁচমিশেলী একটা তরকারী ও কিছু সেদ্ধ দেওয়া দরকার। যতই ব্যঞ্জন থাক না কেন, সেদ্ধ ও তরকারী খেতে ভালবাসে নন্দাদি। নিজেই সদ্‌পরামর্শ দেন, "মীনা, তোমার সিমগুলো শুট্‌কে যাচ্ছে যে, ছেঁচকী করাও। ওমা, কত বড় লাউ তোমার বাগানে ফলেছে। মটর ডালে লাউ ফেলে খেতে আমি ভারী ভালবাসি" ইত্যাদি ইত্যাদি। সস্নেহে মীনাক্ষী মনোমত খাদ্যে নন্দাদির তৃপ্তি সাধন করে। আহা, উনি একটু খেতে-দেতে ভালবাসেন। বয়স হয়ে গেছে, তায় উনি অনূঢ়া আছেন। এইজন্যে আহারে ঝোঁক এসেছে চিরকুমারীর প্রথায়। মা নেই গৃহে, চাকর-ঠাকুর ভরসা। চাকুরি ক্ষেত্রে যেতে হয় নিত্য। কে-বা দেখে খাওয়াবে?

আহা, আহা।

বলরামওকে ডেকে ফল আনাতে বলল মীনাক্ষী। দূরে বাড়ী শহর থেকে। তাই ঘরে অতিথিবিনোদনের আয়োজন সর্বদা রাখতে হয়।

আপেলগুলো পচে যাচ্ছে। বেছে দিল মীনাক্ষী। মিষ্টান্ন প্রচুর আছে, চট্ করে দু'খানা গরম নিম্‌কি ভেজে দিতে পারলে ভালো। থাকগে, দেরী হয়ে যাবে। বিস্কুট, ফল, মিষ্টান্ন দিয়ে আগু চা খাইয়ে দেই। ট্রেনে এসেছেন এতটা পথ নন্দাদি। না জানি কতটা ক্ষুধার্ত।

নিশ্বাস ফেলল মীনাক্ষী। নিজেকেই তরকারী রান্না করতে হবে। বললেও পারবে না। আজ দিব্যি-ছিমছাম খাবারটি ছিল। সন্ধ্যাবেলাটা লং-প্লেয়িং রেকর্ড শুনবে তারা কথা ছিল। অনেক রেকর্ড কেনা হয়েছে মালিকার সখে। শোনা হয় নি। আজ বিকাশের কাজ নেই। তাই সন্ধ্যা-বেলায় অন্তরঙ্গ সঙ্গীতমুখর এক মধুর পরিবেশ রচনায় মীনাক্ষীর আশা ছিল আনন্দে ভরা।

হঠাৎ তিনজনের সুখস্বর্গে চতুর্থ প্রাণীর হানা। মনকে অবশ্য তৎক্ষণাৎ শাসনে আনল মীনাক্ষী। ভালই তো, পাণ্ডববর্জিত পাড়ায় অতিথি সর্বতো আদৃত। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করল মীনাক্ষী, ভগবান তাকে দু'হাতের মুঠি খুলে দিয়েছেন। অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া উচিত।

বেচারী নন্দাদি, চিরকুমারী জীবনে আছে কি ওঁর?

মীনাক্ষীর ধারণায় বিবাহ না হওয়ার মত প্রমাদ আর কিছু নয়। তবে হুপ্ করে বিনা নোটিশে ঘন ঘন আসছেন এখন নন্দা সেন। একটা খবর দিলে পারতেন। ভাগ্যিস কাল গেষ্টরুমে চাদর-ওয়াড় ধোয়া পরানো ও পাতা হয়েছে।
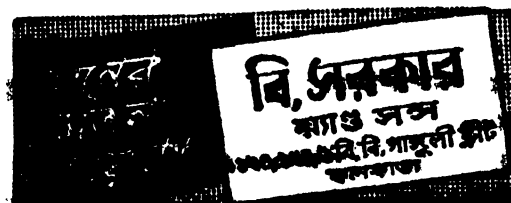
কেমন একটা বিভ্রান্ত ভঙ্গি নন্দাদির।

গতবার থেকে লক্ষণীয়। হয়তো কর্মস্থলে কোনও দুর্যোগের আভাস পেয়েছেন। তাই কলকাতার বাইরে এত ছুটোছুটি। ভালই, এখানে একটু জিরিয়ে যান না।

নিজের প্রশান্ত সুখপূর্ণ চিত্তের কোমল সহৃদয়তার প্রাবল্যে নন্দার প্লেট ভরে মীনাক্ষী বাছা-বাছা মিষ্টান্ন তুলে দিল।

বিকাশ আজ বাজার অঞ্চলে গেছে। সময় পায় না বাজারে বেসাতি ক্রয়ে। অতএব আজ গাড়ীভরে তিনজনের ক্ষেত্রে প্রায় তিরিশ জনের দ্রব্যসম্ভার এসে যাবে। নিশ্চিন্ত মীনাক্ষী।

ভালই হয়েছে, আজ নন্দাদি এসেছেন।

সেই অলস রাত্রি আবার বিকাশের এবার ধরে নেমেছে। পুষ্পসুরভিত উতলা রাত্রি।

মালার ঘরে এয়ার কণ্ডিশনার লাগানো হচ্ছে। মালিকা আজ মা-বাবার ঘরে শোবে।

মালা একটু বিষণ্ণ।

দু'জোড়া জুতো কিনে নানা সওদা নিয়ে ফিরে এসে নন্দা মাসীকে দেখে ভারী খুসী। নন্দা মাসী মালাকে যে প্রশ্রয় দেন অন্য অতিথির কাছে তা পায় না সে। তাছাড়া একা পড়ে থাকা বিদেশের দিনে যে-কোন অভ্যাগত কিশোর মনের হর্ষবর্ধক।

ছুটে দোতলায় গেষ্ট রুমে উঠে গেল। কিন্তু একটু পরেই বিরস মুখে করল প্রত্যাবর্তন। নন্দা মাসী জিনিষপত্র গোছানো নিয়ে ব্যস্ত। মালিকাকে বললেন, "তুমি এখন যাও। আমি এক্ষুণি আসছি।"

অন্যবারের ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। এবারে নন্দা মাসী যেন কেমন—কেমন। অন্যমনস্ক, কি যেন ভাবছেন। কথার উত্তর দিচ্ছেন না। ছটফট্ করছেন।

মীনাক্ষী দেখল এক অস্বস্তিকর দৃষ্টি মেলে—প্রায়ই নন্দা দেখছেন মীনাক্ষীকে। ধরে নিল নিশ্চয় চাকুরির ব্যাপারে মীনাক্ষীর মাধ্যমে বিকাশের সহায়তা চাইবেন নন্দাদি। তাই কখন কেমন করে কথাটা পাড়বেন ভেবে দেখছেন তিনি।

মীনাক্ষী প্রস্তুত। বন্ধু-বান্ধবের এ ধরনের অনুরোধে তারা স্বামী-স্ত্রী অভ্যস্ত। নন্দাদি একলা মহিলা, তাঁর আখের না দেখলে চলবে না।

মীনাক্ষীর এ ধারণা বদ্ধমূল হল যখন নন্দা সেন রেকর্ড শোনার সময়ে মীনাক্ষীর গা ঘেঁষা সোফায় এসে বসলেন। মীনাক্ষীর সঙ্গে এতটা মাখামাখি দৈহিক অর্থে, পূর্বে দেখা যায় নি। মীনাক্ষীর বৃহৎ কবরীর পেছনে হাত ছড়িয়ে সোফায় হেলে বসলেন নন্দা।

উতলা নিদাঘ প্রহরে গান বাজতে লাগল, পাগল করা সঙ্গীত।

মীনাক্ষী হাই তুলতেই নন্দা বলে উঠলেন, "আমারও ঘুম পাচ্ছে। কাল বিকেলের গাড়ীতেই ফিরতে হবে। শুতে যাই।"

নাঃ, নন্দাদি সত্যিই বিব্রত, ক্লান্ত, মীনাক্ষী ধরে নিল। নইলে যিনি গল্পে গল্পে রাত কাবার করতে চান, তিনি আজ কেন শয়ন-পিপাসু সন্ধ্যা রাত্রে? মাত্র ন'টা বাজে এখন।

তবে, কোনও অনুরোধ এল না তো? হয়ত, কাল একান্তে মীনাক্ষীকে বলবেন একা।

"আচ্ছা, চললাম।" নন্দা অদৃশ্য হয়ে গেলেন দোতলার সিঁড়িতে।

এরাও হাঁফ ছেড়ে শয়ন গৃহে ঢুকল।

"এবারে মিস্ নট্ ইন ফর্ম," বিকাশ শয়ন গৃহের আরামকেদারায় বসল।

মীনাক্ষী ততক্ষণ মালিকার দু'বেণী চুল বেঁধে, রাত্রির ঢিলে শেমিজে শুইয়ে দিয়েছে নিজের খাটে। দু'একদিনের জন্য পৃথক শয্যা বিছায় নি।

"মানুষের জীবনে কত দুঃখ থাকে। একলা জীবন নন্দাদির। না জানি কত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়।"

মীনাক্ষী পাশের ঘরের আলনায় গায়ের জামা খুলে রেখে দিল।

"দেখছ তো, ওল্ড মেডের কি পরিণতি। আমাকে ধন্যবাদ দাও তোমাকে রক্ষা করেছি।" সহাস্য বিকাশ। তাড়াতাড়ি নন্দার সঙ্গ থেকে ছুটী পেয়ে প্রফুল্ল সে। কাল সকালে তাড়াতাড়ি কর্মস্থলে যাত্রা করবে। ফিরে আসবে দেরী করে কাজের অজুহাতে। অতিথিকে ষ্টেশনে নিয়ে যাবে মীনাক্ষী।

আগে ভদ্রমহিলার সঙ্গ তবু সহ্য করা যেত। এখন কেমন—কেমন যেন।

মীনাক্ষী ভ্রূভঙ্গি তুলে বলল, "আচ্ছা, মেয়ের সামনে কথার কী ছিরি। মরে যাই।"

সোৎসাহে মালা বলল, "এবার নন্দা মাসী যেন কেমন হয়ে গেছেন। আমাকে—"

"মালা, চুপ কর। বড়দের কথায় কথা কোয়ো না। চোখ বন্ধ করে ঘুমোও দেখি।"

"না, না, আগে তুমি এসো বিছানায়।" মায়ের কথায় মালা প্রতিবাদে মুখর। ষোল বছরের খুকী।

আয়নার সম্মুখে মীনাক্ষী চিরা-চরিত প্রথায় ক্রীম মর্দন করতে লাগল মুখে। শয়ন পূর্বের প্রসাধনী।

"একী?"

হাত দিয়ে সুরচিত খোঁপা থেকে টেনে বার করে চোখের সামনে ধরল মীনাক্ষী—একটা ছোট শিকড়, কৌশলে একটুকরো লোহার বাঁকা তারে গাঁথা। খোঁপায় গোঁজা ছিল।

"কী আশ্চর্য, এটা মাথায় এল কেমন করে?"

বিকাশ বলল, "বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও, কখন বাগানের গাছটাছ থেকে লেগে গেছে, কে জানে?"

"ওটা যে,—দেখি, দেখি, মা," মালা উত্তেজনায় বিছানায় বসে ছিনিয়ে নিল।

॥ আমাদের প্রকাশিত উপন্যাস ॥

সুবোধ ঘোষের

বাসবদত্তা ৪.০০
বন উপবন ৪.০০
জিয়া ভরলি ৬.০০
বসন্ততিলক ৫.০০
শতকিয়া ৮.০০

বনফুল-এর

রৌরব ৪.০০
অসংলগ্না ৩.০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

দিনরাত্রের খেলা ১০.০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

দেহ নয় মন ৪.০০
পিয়ামুখচন্দা ৬.০০
জনম জনম হম ৪.০০

বুদ্ধদেব বসুর

বিপন্ন বিস্ময় ৮.০০
গোলাপ কেন কালো ৫.০০
পাতাল থেকে আলাপ ৫.০০

বিমল করের

একদা কুয়াশায় ৬.০০
কুশীলব ৩.৫০
যদুবংশ ৭.০০
পূর্ণ অপূর্ণ ১০.০০
পরিচয় ৪.০০
বালিকা বধূ ৩.০০
গ্রহণ ৪.০০
খড়কুটো ৪.০০

কালকূট-এর

কোথায় পাবো তারে ২০.০০

বিমল মিত্রের

রাজা বদল ৭.০০
হাতে রইলো তিন ৬.০০
চলো কলকাতা ৫.০০
বেগম মেরী বিশ্বাস ২৫.০০
নিবেদন ইতি ৫.০০
রং বদলায় ৩.৫০

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিশীথ ফেরী ৫.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

আঁধার পেরিয়ে ৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর

গাছের পাতা নীল ৬.০০
দর্শকের ভূমিকায় ৫.০০
সময়ের স্তর ৩.০০
সেই রাত্রি এই দিন ৫.০০
রাতের পাখি ৪.০০
দোলনা ৫.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

ঝড় ৮.০০
প্রেমের চেয়ে বড় ১২.০০

শংকর-এর

বোধোদয় ৫.০০
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৪.৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

নুনের পুতুল সাগরে ১০.০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সূর্যসাক্ষী ১৪.০০
সেতুবন্ধন ৫.০০
তিন দিন তিন রাত্রি ৬.০০

সমরেশ বসুর

যার যা ভূমিকা ৭.০০
সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা ৪.০০
এপার ওপার ৫.০০
প্রজাপতি ৬.০০
স্বীকারোক্তি ৫.০০
বিবর ৫.০০
ফেরাই ৩.০০
দুই অরণ্য ৬.০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সাক্ষী বালুচর ৪.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সরল সত্য ৫.০০
অরণ্যের দিনরাত্রি ৪.০০
আত্মপ্রকাশ ৬.০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

শহর-ইয়ার ৮.০০
প্রেম ৪.০০

মতি নন্দীর

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান ৪.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কুবেরের বিষয় আশয় ১০.০০

মনোজ বসুর

প্রেমিক ৬.০০
সেতুবন্ধ ১২.০০
স্বর্ণসজ্জা ৪.০০
রূপবতী ৩.০০

প্রতিভা বসুর

দ্বিতীয় দর্পণ ৮.০০
রাঙা ভাঙা চাঁদ ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৫৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

মাসিক

বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ. ১৩৭৭

ারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত লিওনার্দো
ভিন্সির পাঁচশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে
রাজিত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধান
বিচারপতি শ্রীপি, বি, মুখোপাধ্যায়

রামরাজাতলায় রামরাজাঠাকুরের

তারাসুন্দরী পার্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
মুখোপাধ্যায়ের নিকট অভিযোগ করছেন ইঁটের
আহত শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ চিত্র সংবাদ ॥

মাসিক
বসুমতী
॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ ॥

হাওড়ায় এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণরত বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

বুলগেরীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল সম্প্রতি কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করেন

বর্ধমানে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে যাদবপুরে গণ-অনশন

নয়াদিল্লীতে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ভাষণরত
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম
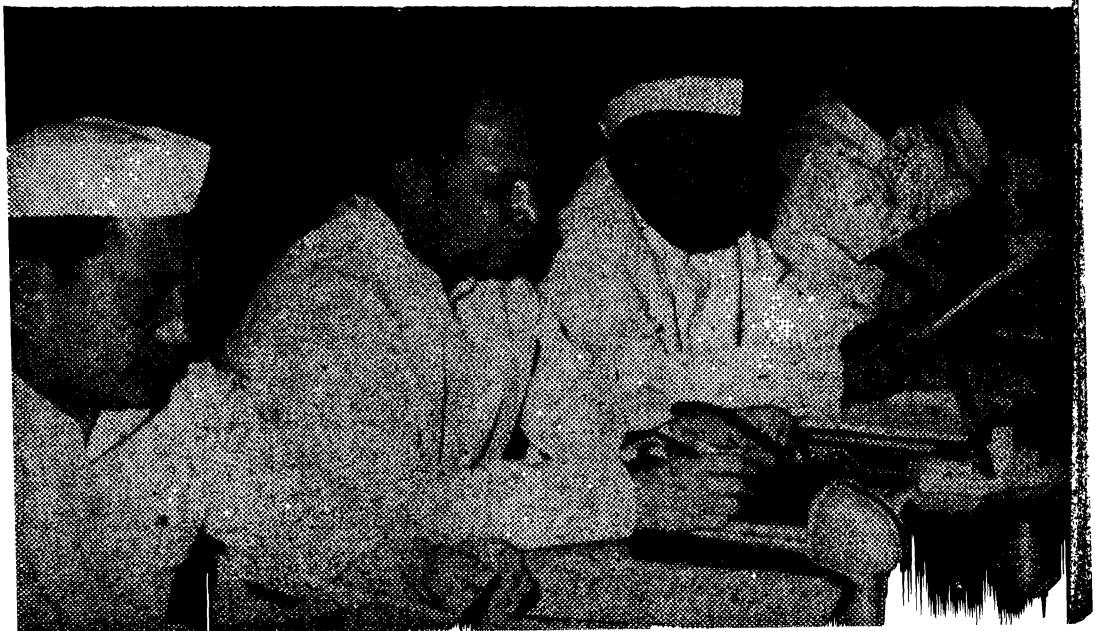
বেলেঘাটার মুন্সিবাজারে বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ

বরাহনগরে কংগ্রেসকর্মীদের প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রাক্কালে ফ্রন্ট শাসনের অরাজকতায় ও বর্ধমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও বর্তমান সংসদ সদস্য শ্রীঅশোককুমার সেন
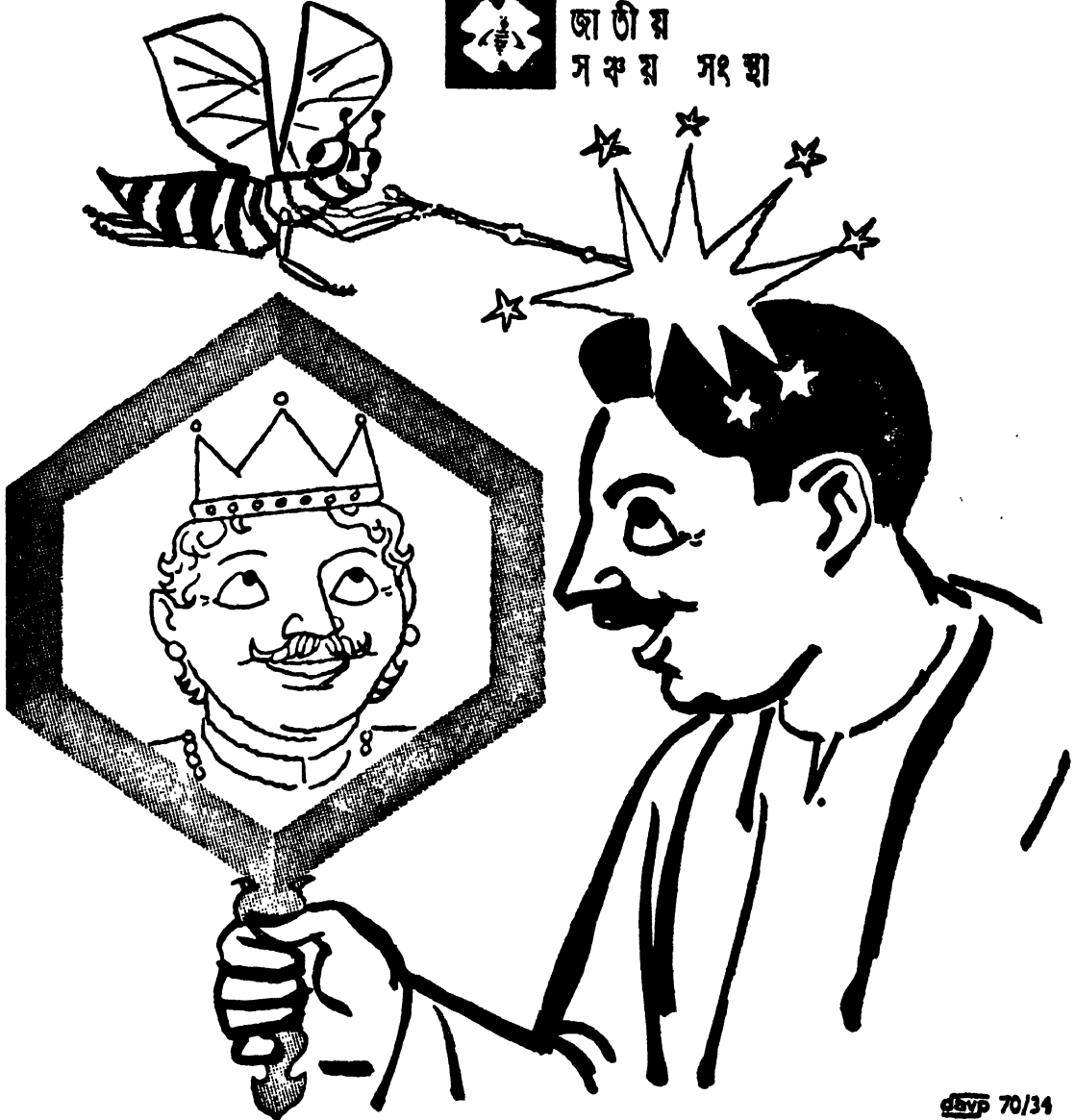
"বনে-জঙ্গলে লোহার তারে এক টুকরো শিকড় গাঁথা থাকে না এমন করে। খোঁপায় কেউ আটকে না দিলে ওভাবে খোঁপায় বসত না।" আরক্ত মুখে মীনাক্ষী উত্তর দিল।

"এটা নন্দা মাসীর ঘরে একটা কাঠের কৌটোয় আমি দেখেছি। নন্দা মাসী এসেছে শুনে দোতলার ঘরে যেয়ে দেখলাম কৌটো খুলে শেকড়টা দেখছেন আর বিড়বিড় করে নিজের মনে কী সব বলছেন, আমাকে দেখে চট্ করে, বন্ধ করলেন কৌটো। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এখন নীচে যাও। ততক্ষণে আমি কিন্তু ঠিক শেকড়টা দেখে নিয়েছি। এটা সেই শেকড়।"

মালা জ্ঞান বিতরণ করতে পেরে গর্বিত হয়ে উঠল।

"কেন? আমার মাথায় শেকড় দেবেন নন্দাদি? তাই বুঝি গা ঘেঁষে বসেছিলেন, চুলে টানও লেগেছিল একবার। কী আশ্চর্য, সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেলেন না কি?"

মীনাক্ষী স্বামীর দিকে চাইল।

উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত হয়ে এক মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে আকস্মিকতায় এক নিদারুণ সত্যের জন্ম দিল। উভয়েই রক্ষণশীল ও সংস্কারপরায়ণ হিন্দু-ঘরের সন্তান। নানা প্রকার তুক্‌তাকের কথা জানা আছে।

মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল মীনাক্ষীর। চোখের কোণায় জলের রেখা।

এত ভালবাসল নন্দা সেনকে। এত আদর যত্ন করল সে। এখনও নখের ডগায় হলুদের দাগ। নিজে তরকারী রান্না করে খাইয়েছে।

নন্দাদি এমন করতে পারলেন! কিন্তু কেন? মালা পুকীপনা করলেও ছেলেমানুষ নয়, পরম চতুর, সে যা দেখেছে ঠিকই দেখেছে।

আর হাতে-পায়ে বল পেল না মীনাক্ষী। শিকড় ছুঁড়ে মেঝেয় ফেলে ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল।

সেই অবসন্ন মূর্তির দিকে চেয়ে বিকাশের মনে পত্নীর প্রতি অপার মমতা ও এতদিনের সুখস্মৃতিভরা ভালবাসা আগ্রাসী হয়ে উঠল।

মীনাক্ষী বিবাহের পরে গরীব স্বামীর ঘরে কত কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। সেই মীনাক্ষী। প্রথম সন্তানের জন্মে সুখবিহ্বল সেই মীনাক্ষী। নিজেকে উজাড় করে দানে অকৃপণ সেই মীনাক্ষী।

মালার উপস্থিতি ভুলে বিকাশ দ্রুত স্ত্রীর পাশে উঠে এল, "মীনা, শরীর খারাপ লাগছে? বল, লক্ষ্মীটি।"

"পাগল নাকি? কিন্তু কেন---কেন? আমি যে বুঝতে পারছি না।"

বিকাশ বুকে নিয়েছে। যে মেধার বলে সে নীচুতলা থেকে ঠেলে উঠেছে, সেই মেধায় ধরা পড়েছে নন্দা সেনের নানা বিচিত্র ব্যবহার। নন্দার কবিতার অর্থ ধরা পড়েছে। কেন এতদিন বোঝেনি বিকাশ?

"তোমার ক্ষতি করার উদ্দেশে।"

"না, না" অনুনয়ভরা আকুল স্বরে বলে উঠল মীনাক্ষী, "নন্দাদি অত নীচ হতে পারবেন না। আমি তো ওঁর ক্ষতি করিনি। কেন এমনটা, করলেন। না কি, আমার ভালোর জন্যে?" "ভালোর জন্যে হলে এত গোপন করতেন না, এ-যুগে এসব কাজ যে এখনও কেউ করে জানতাম না, তায়, বয়স্কা, শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। একটা বাজারে ঝি-এর মনোবৃত্তি।" বিকাশ দাঁতে দাঁতে চেপে বলছে।

"কিন্তু আমার ক্ষতি কেন করতে চাইবেন উনি? আমি তো ওঁর কাছে কোন দোষ করি নি।" মীনাক্ষী এখনও স্তম্ভিত।

"তুমি যে তুমি, সেটাই তোমার দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ইতিমধ্যে মালিকা আর একটি গুরুতর আবিষ্কার করে ফেলল। পিতার সম্মুখে রাত্রি-কামিজের অর্ধ অনাবৃত লজ্জা সে বেডকভারে ঢেকেছিল চিবুক পর্যন্ত। মায়ের শাড়ীর আঁচল তুলে দেখাল, এ কি মা? কেটেছে কে?"

পদ্মরাগ বর্ণের টাঙাইল শাড়ীর কুচকুচে কাল ফিতে পাড় কতিত তির্যকভাবে। ধারালো অস্ত্রে একটি টুক্‌রো কে যেন কেটে নিয়েছে।

আর ভুল করার পথ নেই।

অজস্র অশ্রুপ্লাবনে লুটিয়ে পড়ল মীনাক্ষী।

"এও নন্দামাসী করেছেন। হাতব্যাগ খুলে যখন রুমাল নিচ্ছিলেন, তখনি কাঁচি দেখে ছিলাম। মালিকা আবার জ্ঞানবাহিকা।"

"মীনা, শাড়ীখানা এক্ষুণ খুলে ফেল। কাল আমাকে দিয়ে দিও। কিন্তু করল কখন? ধরা পড়ার ভয়ও কি ছিল না?" বিকাশের কথায় অবরুদ্ধ স্বরে মীনাক্ষী বলল, "ওগো, আমি বুঝেছি। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও আলো জ্বালাতে দেন নি বহুক্ষণ। রেকর্ড শোনার সময়ে বড় আলো নিভিয়ে দিতে বলেছেন। এ সমস্ত আমি মানি না, ভয় পাই না। তুক্‌তাকের ফল যে করে সেই পায়। কিন্তু নন্দা সেনকে আমার ভয় করছে। বিনা কারণে এমন করতে পারলেন। এবার আসা মাত্র ওঁকে একদম অস্বাভাবিক লাগছিল আমার। রাত্রে আমার ঘরে না আগুন দেন।"

"বলদেও, বলদেও"---ডাকতে ডাকতে বিকাশ ঘরের বাইরে গেল।

"দোহাই, কোন কেলেঙ্কারী আর কোর না। লোক জানাজানি হলে আমাদেরি মুখ পুড়বে। বলদেওকে ডাকছ কেন?"

স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়ে বিকাশ বা'র হয়ে গেল শয়নকক্ষ থেকে।

মালিকা কাঁদো কাঁদো। মায়ের হাত ধরে টেনে তুলল, "কাপড় ছাড়বে চল। বাবা:, নন্দা মাসীর সঙ্গে জীবনে আর কথা বলব না আমি। তোমাকে এমন কেন করল, মা? তুমি নন্দা মাসীকে কত ভালবাস।"

"সেটাই তো বুঝছি না। কেমন যেন হয়ে গেছে লোকটা।" পদ্ম-

[illegible] শাড়ী এক কোণ কেটে রেখে নীলা রংয়ের সিল্কলাই শাড়ী [illegible] নিল মীনাক্ষী।

অতিথিকক্ষে নন্দা সেম হাতে মুখ রেখে এলিয়ে বসে আছে শয্যায়।

নৈশ প্রসাধনে আজ মতি নেই। বিছানায় শুয়ে পড়েই বা কি হবে? কিছুদিন হল একদম ঘুম হয় না নন্দার। বিনিদ্র শুয়ে থাকতে থাকতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। তখন উঠে পাইচারি করতে হয়।

নানা উদ্ভট চিন্তা মাথায় বাসা বাঁধে। চিন্তার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কেবল যন্ত্রচালিতের মত যোগেন জ্যোতিষীর নির্দেশ মানা ভিন্ন যেন কিছু করারও নেই নন্দার।

হিপনোটিজমের রোগীর ধরনে দিন যাপন করে চলেছে সে। যোগেন জ্যোতিষীর কণ্ঠস্বর এখন কানে ভেসে আসছে। রাত্রির নির্জন যাম মথিত করে গম্ভীর গম্‌গমে গলা—

"একটা রাত্রি শিকড়টা মাথায় থাকলেই কাজ হবে। না, না ক্ষতি হবে না কিছু স্ত্রীলোকটির। শুধু স্বামীকে চোখে চোখে রাখা ঘুচে যাবে। আর শাড়ীর কাটা কোণটা আমার হাতে পৌঁছনো চাই।"

ক্ষীণস্বরে নন্দা তবু তখনও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, "মীনাক্ষীর কিছু অনিষ্ট হবে না তো?

"না, না। কোন ভয় রাখবেন না, মা। শুধু ওর স্বামী ওকে চেয়েও দেখবে না, আপনার জন্যে পাগল হবে। তখন মা, আমি কিন্তু তামা, রূপো, কাগজের দক্ষিণা নেব না, সোনায় দিতে হবে।"

"বেশ তো, গিনি পাবেন প্রণামী।"

গালে হাত দিয়ে নন্দা ভাবছিল।

কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। না হয়, ভোরেই চলে যাব। স্নানের সময় চুল খুলতে যেয়ে যদি মীনা গোলমাল করে? মালা মেয়েটা ভাগ্যি দেখে নি, সর্বদা ছোঁক ছোঁক করছে। ভূর্জ-পত্রের লেখার সঙ্গে কাঠের কৌটায় শেকড় ছিল।

একদিন দেখা যায় যোগেন জ্যোতিষীর [illegible]। দরজা খোলা ছিল।

সামনে দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়াল বিকাশ।

মন নেচে উঠল নন্দার। এইতো মন্ত্র ফলেছে। কথা বলার মত মন্ত্র ফুটে উঠেছে ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

"তুমি?"

মুখে 'আপনি' এল না নন্দার। আর, আপনি বলে লাভ কি?

তীব্র দৃষ্টিতে নন্দার দিকে চেয়ে ঘরে ঢোকে বিকাশ, নন্দা লক্ষ্য করে দেখবার আগেই সম্মুখ থেকে কালো হাত ব্যাগটি তুলে নিল।

অভ্যন্তরে দন্তবিকশিত করে উঠল ঝকঝকে ধারালো কাঁচি; মীনাক্ষীর গোলাপী টাঙাইল শাড়ীর কর্তিত কোণ।

শাড়ীর টুকরো তুলে নিয়ে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল বিকাশ। কঠিন স্বরে বলল, "বলদেও সাইকেল নিয়ে ড্রাইভারকে ডাকতে গেছে। জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিন। আপনাকে ওরা আজ রাত্রেই কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেবে।"

"সে কী?"

"সে কী, আপনি ভাল করেই জানেন। এক্ষুণি আমার বাড়ী থেকে আপনাকে বা'র হয়ে যেতে হবে। আর কোনদিন এখানে মুখ দেখাবেন না।"

চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল বিকাশ, 'আর হ্যাঁ, শুনে যান—মীনাক্ষী শুধু আমার স্ত্রী নয়, আমি একমাত্র তাকেই ভালবাসি। তার একটি চুলেরও অনিষ্ট যে করতে চায়, তার মুখ দেখতে আমার ঘেন্না হয়।"

পাঞ্চালীর দিনে সুখের বাণ ডেকেছে।

একটু প্রশ্রয়ে তরুণ তরুর সাবলীল আরামে সে যেন সুখের আকাশে ডানা-পালা মেলে দিয়েছে। যে ছিল ধরার অতীত, অধরা, সামান্য মনোযোগ তার কত আশ্বাসের।

[illegible] শেষ হয় না। বহু দিন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সাধনা সে পরিত্যাগ করেছিল। সঙ্গীত-প্রেমী হলেও গানের পশরা সাজানো চলে নি পাঞ্চালীর কর্মজীবনের দিনে। তা ছাড়া, প্রসিদ্ধ গায়িকা যে হবে না, সে কেন অর্থ এবং সামর্থ্য বৃথা ব্যয় করবে?

কিন্তু গান যে মনে মনে গুঞ্জরণ করে ফেরে। মধ্যে একদিন নিরুপমার সঙ্গীত অর্জনে গিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে রুমার গান শোনার উদ্দেশে।

রুমা গানও শুনিয়েছিল, হাতে কার্ডও গুঁজে দিয়েছিল। 'কুঁড়িপল্লব সঙ্ঘের" ফাংশান। কাছাকাছিই হবে, আজব হ্রদে যে অতি বৃহৎ স্টেডিয়াম আছে, ওখানেই। বিরাট ব্যাপার।

নিরুপমা বলল,, "আশেপাশে সমাজবিরোধীর বাস, পুলিশ প্রথমে ওখানে ফাংশান হতে দিচ্ছিল না। কিন্তু শোষণ সরকারেরা ওপরতলার লোক ধরে অনুমতি নিয়েছেন। অবশ্য আসিস চালি, তুই আবার ডুমুরের ফুল এখন। আমাদের পাড়ার সবাই যাচ্ছে। এত বড় বড় নামাই শিল্পী-দের চোখে দেখাও ভাগ্য। আমি সামনের সীটের স্পেশাল কার্ড পেয়েছি, তবু বেলাবেলিই যাব। হিরণ্ময়ীদি পঞ্চাশ টাকার টিকেট কিনেছেন। ওঁর পাশেই সীট চেয়ে নিলাম।"

"সে কি? কম্‌প্লিমেন্টারী ও[illegible] কেনা সীটের কোনও আলাদা ভা[illegible] নেই? পঞ্চাশ টাকার পাশে সীট তুমি যদি পেয়েছ, তবে বেলাবেলি যা[illegible] কেন? পাঞ্চালী বিস্মিত প্রশ্ন করল

"ওরা বলেছে আগে যাওয়া[illegible] দরকার ভাল সীট পেতে হ'লে। এ[illegible] টিকেট বিক্রী হয়েছে আর এত কম্প্লি[illegible] মেণ্টারী দিয়েছে যে ঠিকঠাক হিসে[illegible] রাখা শক্ত। যা বিজ্ঞাপন করেছে দেখেছিস চালি? দেওয়াল, ল্যাম্প পোষ্ট, গাছের গা মুড়ে ফেলেছে পোষ্টারে পোষ্টারে।" নিরুপমা আগ্রহে স্ফীত।

রুমা বেণী দুলিয়ে বলে উঠ[illegible]

মাষ্টারমশাই বলেছেন যে, এবার আমাদের টার্গেট শহরতলী। সেখানে লোক দিয়ে দিয়ে পোষ্টার লাগানো হয়েছে। তারকেশ্বর থেকে এদিকে সমস্ত কলকাতার লোকেরা মধ্যে মধ্যে বোম্বাই শিল্পীদের দেখে কিনা, বাইরের লোকেরাই সুযোগ পায় না। তা আসছেও, পিল পিল করে আসছে। এক বৈদ্যবাটিতেই হাজার টাকার টিকেট বিক্রী হয়েছে।"

"ওরে বাবা, এত ভিড়। যাব কি করে?" বিখ্যাত গায়কের নাম থাকায় পাঞ্চালীর আগ্রহ বৈদ্যবাটিজনের থেকে কম নয়। কিন্তু আসবার সময়ে চতুর্দিকে টিনের বেড়া দিয়ে স্থানটির ঘেরা পরিধি দেখে সচকিত। এখন আয়োজনের গুরুত্বে হতবাক্।

"তবে এখানে আসিস, একসঙ্গে যাওয়া যাবে। হিরণ্ময়ীদিও সব শুনে-টুনে আগেই যাবেন। আমি অবশ্য রুমার সঙ্গে আগে চলে যাব। তুই না হয় আগেই আসবি।"

"না, অত আগে আসা চলবে না। ছ'টার সময়ে সুরু হ'বে, তুমি যাবে তিনটেয়।"

"তাহলে অন্য কাউকে নিয়ে নিস সঙ্গে। ওখানে বাড়তি চেয়ার দিয়ে দেবে।" নিরুপমার নিশ্চিন্ত উত্তর।

"সে কি বলছ তুমি? সীটে নাম্বার নেই?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করল পাঞ্চালী।

"আরে, আছে, আছে। তবে শোষণবাবু বলেছেন, তেমন কেউ যদি যেতে চান, ওঁরা ম্যানেজ করে নেবেন।"

আমি আবার তেমন কাউকে যোটাতে পারব কি করে? বড়জোর অফিসের সর্বাণীকে নিয়ে যেতে পারি। নন্দাদি এখানে নেই।"

"খুব হবে, মাসী। ওরা ওধারের বস্তির মেয়েদের পর্যন্ত এক গাদা পাশ দিয়েছে। যত লোক চাও, নিও। মাষ্টারমশাইকে বলে কয়ে বসিয়ে দেব—রুমা পাঞ্চালীকে আশ্বাস দিল।

হরবাবু পাঞ্জাবী বলল, "না, একজন হ'লেই চলবে। নিরু, তোমার কর্তা যাচ্ছেন না মেয়ের গান শুনতে?"

"না গো, না। উনি ততক্ষণ গোমড়া মুখে বাড়ী বসে বসে ইকনমিক্সের বই পড়বেন। প্রায় পাড়ার সকল কর্তারাই যাচ্ছেন না। এসব নাকি ফচ্‌কেপনা।"

হায়, যদি মেয়েরা না যেত সেদিন। পরে পাঞ্চালী ভেবেছিল।

"হিরণ্ময়ী দত্ত দামী টিকেট কিনলেন?" কথান্তরে এল পাঞ্চালী। "কিনবেন না উনি কি আমি কিনব? লটারীর টাকায় লাল হয়ে গেছে। কি কায়দায় থাকে। পাড়ার মধ্যে নতুন বাড়ী আবার তক্ষুণি বিক্রি হচ্ছিল। নিল কিনে। ভাগ্য সব দিকেই প্রসন্ন। অথচ আমারই হাত দিয়ে পেয়ে গেল। সেই আমি কিনা তেতলায় একখানা ঘর তুলতে পারছি না।" ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে নিরুপমা মুখ ভার করে নূতন করে তোলা ডিভানে বসল হেলে। স্প্রিং নষ্ট হয়ে যাবে বলে সে জোরে চাপ দিয়ে বসে না। অসমর্থ স্বামীকে আখ্যা দেয় নিরুপমা 'কৃপণ' বলে। স্প্রিং নষ্ট হয়ে গেলে কৃপণ স্বামীর কাছ থেকে টাকা বার করা শক্ত কাজ।

"ভালই তো। তুমি একজনের জীবন বদলে দিলে নিরু।"

"বদলানো বলে বদলানো। এখন দেখো তো চেয়ে। সেই ইস্কুলের চাকুরি করে ছেড়ে দিয়েছেন। এক-তলায় প্রেস বসিয়ে মোটা ভাড়া টানছেন দিব্যি। টাঙাইল, সিমলাই ছাড়া আটপৌরে শাড়ী পরেন না, পায়ে সর্বদা ভেলভেটের চটি। বাসে ট্রামে ওঠেন না কখনও। বাড়ী কি সাজিয়েছেন। বাড়ী অবশ্য ছোট, কিন্তু দেওয়ালে রং করে, আবলুস কাঠের আসবাব দিয়ে ইন্দ্রের অমরাপুরী করেছেন। আর আমি।

নিরুপমা পুনর্বার দীর্ঘশ্বাসে মনোভার মোচন করল। বাড়ী ওর একটা কমপ্লেক্স হয়ে গেছে, দেওরের বাড়ী দেখার পরে। —এমনি চিন্তাসহ পাঞ্চালী জলসার কার্ড নিয়ে সেদিন বিদায় হ'ল।

বাড়ীর দিকে যেতে যেতে সেদিন হঠাৎ কার আভাস পেল নাকি পাঞ্চালী? এখানেই একদিন ভুল করেছিল। গৈরিক মনে করে অপাংক্তেয় সঞ্জীবকে দেখে চমক লেগেছিল। আশ্চর্য, কিসে আর কিসে? ধানে আর তুষে?

কিন্তু কি সাদৃশ্য উভয়ের আকৃতির মধ্যে, ভেবে দেখলে ভারী অবাক লাগে। এদিকে সঞ্জীব থাকে। আর থাকবে কোথায়? ওই গলির খোঁ ছোটখাটো একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে না কি। কি বা করে? নিশ্চয় সেই অফিসেই আছে। ভাগ্য ফেরাতে যে পারে নি বোম্বাই যায়। নইলে এহেন এলাকায় থাকত না। যাক, এতদিন পরে সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাড়ীতে বলা হয়নি। কে আর জানতে চাইবে?

রুমার গাওয়া গানখানা গুনগুন করতে করতে বাসে উঠল সে—
"একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনি।"

বিমলাদির বাড়ী ছিল কাছে। গেলেও হত। গৈরিকের সহযাত্রী হচ্ছেন না বিমলাদি জেনেছে সে। কিন্তু আলাপের পরিধি কতদূর বোঝা যায় না। অমন ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলার প্রতি বিমুখ থাকা যায় না কি?

কিন্তু গৈরিক পারে।

অনমনীয় অদ্ভুত গৈরিক। সে নেমে এসেছে কাছে। মন প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাড়ীতে অফিস-ফেরৎ বাবার উগ্র অসন্তোষ। 'যেটা না দেখব হয় না। আজব হ্রদের ধারে টাউন-শিপের কাজটা অন্য কোম্পানী ধরে ফেলল। সে কি এক আধটা টাকার কাজ। লাখ-লাখ। একর একর জমি কিনে পাখার কারখানা আর কারখানার শহর। ওঃ, ভাবলে নিজের হাত-পা চিবোতে ইচ্ছা করে।"

একি স্নেহ একি ভালোবাসা একি হৃদয়ে ভিড়ানো পানসীর
একা আরোহিনী মমতা—নয়নে জটলা করেছে আঁখি নীর।
পিছনে পা ফেলে ফিরে যেতে চাই ফিরাতে পারিনা বাসনাকে—
ও যে চেয়ে ছিল ও যে চেয়ে রয় ও যে চেয়ে বসে থাকে।

দুনিয়ায় ভীরু দেনা-পাওনায় কত আলো গেছে হারিয়ে গো,
দুদিনের ভীরু নজরে তিয়াসা এখনো যে হাত বাড়িয়ে গো!

'বাবু তুম ফির আওগে তো ঠিক?' কচি ঠোঁটে ভাষা ভাষা কাঁপে
মনে শন শন তালপাতা নড়ে ঝাউবন কাঁদে অনুতাপে।
একি স্নেহ একি মমতা গো একি নয়নে গোপনে আঁখি-নীর?
দুদিনের হাসি বুকে তুলে নিই এ'তীর ভিড়ানো পানসীর॥

চায়ের টেবিলে বাবা রাগেই গোগ্রহর আস্ত আস্ত আলুর দমে মুড়ো মুচি ধ্বংসে দ্বিগুণ বেগে রত হয়ে পড়েন। মা কাছে বসে পান চিবো-চ্ছিলেন, "অন্য কে পেল?"

"একটা নূতন কোম্পানী। নাম দিয়েছে 'বিকিকিনি'। আমার অফিসের নাম 'বিকানীর'। আমাকে ডাউন দিচ্ছে"

বাবার বিকানীরে জন্ম হয়েছিল। অতঃপর পিতামহ প্রবাস ছেড়ে বাংলায় আসেন। তাই তাঁরা বাঙালী।

আজ বাবার অযথা অসন্তোষ স্পর্শও করল না পাঞ্চালীকে।

নিজের ঘরে চলে গেল সে।

নন্দাদি তিনদিন অফিস পলাতক। ওর বাড়ী যেয়ে আজ খবর নিতে হবে ফিরছে কবে ফেরেনি নিশ্চয়। তবে তো অফিসে যেত। একটা দিন কামাই করে না নন্দাদি। বাড়ীতে নিঃসঙ্গ, তাই অফিস তার আশ্রয়। সম্প্রতি ধানবাদে যাবার উন্মাদনায় দু' একটা ক্যাসুয়াল লীভ নিলেও অন্য নিত্য হাজিরা রাখে। পাহাড়ের মত অনড় অচল হয়ে সীটে বসে থাকে, কখনও যাবার আগ্রহ দেখায় না।

দণ্ডিস্বামী তাই নন্দার উপর প্রসন্ন। শুকনো চামড়ায় ঘেরা চোখে ঝিলিক হেনে বলেন, "মিস সেন ইজ অ্যান এগজ্যাম্পল টু অল্।"

কাল নন্দার খবর নেবে ভাবতেই মন উল্লসিত। ভাগ্যি নন্দাদি টেলিফোনে নেই। বাড়ী যেয়ে খবর নেবার সুযোগ আছে তাই।

খাটে অসময়ে এলিয়ে সুখচিন্তায় ডুবে গেল পাঞ্চালী। কাল যেয়ে নন্দার খবর নেব। নন্দাদি এলেই নেমতন্ন করে আনব। আসবেন তো বলেছেন। মা-বাবার সঙ্গে আলাপ হবে। ওঁরাও দেখবেন মানুষ কত সুন্দর হতে পারে।

কি কি খাবার করব? চা, না নৈশ ভোজন? আগে চা-ই হোক। জার্মেনি যাবার আগে রাত্রে একদিন খাওয়াবই খাওয়াব। আমাকে মনে রাখবেন তাহলে। কেন যাচ্ছেন? কবে আসবেন? যাবার আগে আমার জায়গা করে নিতে হবে।

শক্ত মন বলেই রক্ষা। বিদেশে কেউ কিছু ওঁর করতে পারবে না। ওর মনে রেখাও পড়বে না

কাল অফিসে নীল শাড়ীখানা পরে যাব। ক্লোকরুমের ব্যবস্থাটা চমৎকার হয়েছে। ওখানে বেশ সেজে নেওয়া যায়। এধারে দণ্ডিস্বামী বেজায় ভালো। সর্বাণী সর্বপ্রথম দাবী জানায়। উনি তৎক্ষণাৎ রাজী। "হ্যাঁ, মেয়েদের একটু বেশভূষার স্থান রাখো বৈকি, কেবলমাত্র ল্যাভেটরীর দ্বারা হয় না।"

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই আনন্দ। এবার দেখা হবে। বিকেলে যাব।

আহ্বান আগেই এসে গেল টেলিফোনে। চিরপ্রার্থিত স্বরে ডাক, "বিকেলবেলায় অফিসের পরে আমা-দের বাড়ী আসবেন?"

অমোঘ আদেশ যেন। সান্নিধ্য-বর্জিত দেহহীন স্বর কী কঠোর, কী নিস্পৃহ।

তবু জীবনে প্রথম গৈরিক নিজে থেকেই ওকে ডাকল। আহা, কী আনন্দ। না জানি কত কথা বলবে আজ। কেন ডাকল? চিরপ্রার্থিত কোন কথা?

আনন্দে উদ্বেল স্বরে সে বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।" 'কেন' জিজ্ঞাসা সে করবে না। নিশ্চয় গৈরিক তাকে কিছু বলতে চায়। নইলে অত সুদূর মহিমার শিখর থেকে তাকে ডাকত না নিজে থেকে।

ভাবতে সাহস হয় না। হৃদয়, তুমি দুরাশায় আত্মহারা হোয়ো না।

শুধু জেনে নিতে হবে তাই প্রশ্ন করল পাঞ্চালী "নন্দাদির খবর কি?"

"সে জন্যই ডেকেছি।"

ক্লিক্। টেলিফোন নামিয়ে রাখা হয়েছে ওধারে।

[ক্রমশ।

প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র

(জনৈক বিপ্লবীর জীবনকাহিনী)

দণ্ডপাণি

দ্বিতীয় অধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জমিদারী প্রথায় জমিদাররাই জমির মালিক ছিলেন। যাহারা জমি চাষ করিত তাহাদের হাতে জমি ছিল না। অথচ জমিদারের সঙ্গে জমিরও সাক্ষাৎ কোন সংস্রব দেখা যায় নাই। তাঁহারা শুধু খাজনা আদায় করিয়াই খালাস। জমির উন্নতির চেষ্টা তাঁহাদের কোন কালেই ছিল না। তাঁহারা সাধারণত শহরেই বাস করিতেন। তাঁহাদের নায়েব, গোমস্তারাই গরীব প্রজার উপর নানারূপ পীড়ন চালাইয়া খাজনা আদায় করিত। ইংরেজী চালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই দেশে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার নানারূপ মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যাও কম ছিল না। একই জমির সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের স্বার্থ জড়িত থাকার ফলে জমির উন্নতি বিধানের কথা কেউ ভাবিতেই পারে নাই।

দেশ স্বাধীন হইবার পর এই জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকাল এই প্রথা বর্তমান থাকার ফলে বাংলার কৃষককুল সর্বনাশের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছিল। এখানে নানা শ্রেণীর কৃষক বর্তমান। মালিক চাষী, বর্গাদাররা ভাগচাষী, কৃষাণ, কৃষি মজুর---সকলেই কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে একমাত্র মালিক চাষী ভিন্ন কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল নহে। একদিকে জমিদারী প্রথায় উত্তরাধিকার সূত্রে জমি ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল, অন্যদিকে দুর্বহ ঋণের দায়ে কৃষকের জোতজমা মহাজনের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হওয়ার ফলে ক্রমেই কৃষির অবনতি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার কাহিনী সে বিষয়ে নয়।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামই সমস্ত উৎসবের মূল উৎস। কৃষির অবনতির ফলে পল্লীর উৎসবগুলি যখন উদ্বাস্তু আকারে শহরে উপস্থিত হইল, তখন তাহার আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। পল্লীর 'বারোয়ারী পূজা' তখন 'সার্বজনীন পূজায়' পরিবর্তিত হইতে দেখা গেল। বিভিন্ন পূজাগুলির মধ্যে দুর্গাপূজাই ছিল দীর্ঘদিনের পূজা। সেইজন্যই ইহার জাঁকজমকও ছিল অন্যান্য পূজার চেয়ে বেশী। ইহাতে ব্যয়ের আধিক্যও ছিল প্রচুর। ফলে জমিদার শ্রেণীর লোক ব্যতীত এই পূজা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সেইজন্যই পল্লীগ্রামে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীতেই এই পূজা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যাইত। গ্রামের অল্পবিত্ত বা গরীব লোকেরা ধনীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই দেবী দর্শনের আনন্দ লাভ করিত। তাহা হইলেও ঐ সব ধনিক শ্রেণীর দাপটে, অনেকেই তাহাদের বাড়ীতে গিয়া আনন্দ লাভকে অমর্যাদাকর বলিয়া মনে করিত।

হরকুমার সিংহ দেও দেবের পিতৃপুরুষরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেন। পলাশীপ্রান্তের কোন এক পল্লীগ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি ছিল। পলাশীর যুদ্ধে তাঁহাদের পরিবারের কয়েকজন হতাহত হয়, হরকুমারের পিতৃদেবও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। ছিন্নমূল হইয়া জননীর হাত ধরিয়া হরকুমাররা পূর্ববঙ্গে চলিয়া যায়। পদ্মার পারে বিক্রমপুরের এক গ্রামে স্থানীয় লোকেরা সাহায্য ও সহায়তায় তাঁহারা ডেরা বাঁধেন। তাও মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের ক্ষুদ্র ডেরা নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। নূতন করিয়া আবার উদ্বাস্তু হওয়ায় কোথায় যাইবেন স্থির করিতে পারেন না। প্রতিবেশী উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহারা পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন। মেঘনা পার হইয়া গোমতীর তীর ধরিয়া মুরাদনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং বাসের উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন ক্রোশ দূরে হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত এক গ্রামে তাঁহারা আস্তানা গাড়িবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

কাসারীখোলা দুইটি বৃহৎ পরগণার সীমান্তবর্তী গ্রাম। পূর্বদিকে গঙ্গামণ্ডল পরগণা ও পশ্চিমে বরদাহাত। মাঝখানে একটি খাল। বর্ষাকালীন এই স্রোতস্বতী খালটাই ত্রিপুরা জেলার এক বিস্তৃত গ্রাম ধামতী ও ক্ষুদ্র পল্লী কাসারী-খোলাকে আজও পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গামণ্ডল প্রবাহিত এই খালটি যেমন বাসস্থল নির্ণয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় তেমনি, বরদাদেবী প্রশান্তিও শ্যামল অঞ্চলও একান্ত আকর্ষণীয়। সেই জন্যই হরকুমারদের স্থান নির্ণয়ে বেশী দেরী হইল না। অবশ্য দুই সতীনের ঝগড়ার কথা সেদিন তাহাদের মনে আসে নাই।

পরগণা দুইটিকে ঘিরিয়া একটি জনশ্রুতি আজও বর্তমান রহিয়াছে। "পাহাড়পুর, পান্তি, রাজামেহের, ধামতি, কুড়াকাল, কুরুণ্ডি, বাপে-পুতে অরণ্ডি।"

পরগণার অন্তর্গত গ্রামগুলি এমন-ভাবে বিন্যস্ত যে, চলার পথে পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। জমিদারদের মধ্যে লাঠালাঠি ও খুনোখুনি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাহা উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার হইলেও সাধারণ গ্রামবাসীরাও তাহা হইতে রেহাই পায় নাই। বিরোধ সীমানা লইয়া। সীমান্ত বিরোধ চিরকালের। কালও ছিল, আজও আছে। এবং থাকিবেও। সাময়িক আপোষে কোনদিন স্থায়ী ফয়সালা হয় না। একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই তাহা করিতে হয়। তাহাও হইয়া থাকে, যখন দুই বিবদমান দল বা গোষ্ঠীই দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

তারপর আবার যেই সেই। একটা বিরতির মুহূর্তে নিবৃত্তিকর পরিস্থিতিতে ঐ সীমান্তবর্তী গ্রামে হরকুমারদের আস্তানা গড়িয়া উঠিল। কোন দিক হইতেই সেইদিন কোন বাধা আসে নাই। কারণ, গ্রামবাসীরা আরও প্রতিবেশী যাচঞা করিতেছিল। কেন না অপর দিকে খালপারের বিরাট গ্রাম অধিক জনসংখ্যাবহুল। যাহা হউক, ইতিমধ্যে গ্রামের মণ্ডলদের দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহায়তায় এবং নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কিছু-দিনের মধ্যেই হরকুমারের মত যুবকদেরও মোড়লি করার সুযোগ আসিয়া গেল। হরকুমার তখন গ্রামের মোড়লদের একজন।

গঙ্গামণ্ডলের জমিদারদের বসতবাটী ধামতী গ্রামেই অবস্থিত ছিল। ইতিপূর্বে তাঁহাদের নগর বাঁটি স্থাপিত হইয়া গিয়াছে ত্রিপুরা জেলার প্রধান শহর কুমিল্লায়। গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ধনিক শ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়রা কিছুকাল পূর্ব হইতেই শহরে বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আদায় উশুলের জন্য জমিদারদের বসতবাটীগুলি নায়েব-গোমস্তাখানায় পরিবর্তিত হইয়া গেলেও, আঙ্গিনাগুলি ছিল পারিবারিক অবসর-বিনোদনের আড্ডাখানা ও উৎসব-অনুষ্ঠানের রেওয়াজখানা। দোল-দুর্গোৎসবে কতই না সমারোহ। বহিরাগত নটনটীদের আগমন, বাঈজী নাচ ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন, উৎসব অন্তের পরবর্তী দিনগুলিকে গ্রামবাসীদের উপর নিপীড়নের আচমন হিসাবে ব্যবহার করা হইত। এই উপলক্ষে একদিকে যেমন হাস্যরসমিশ্রিত ঘটনাবলীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইত, অপর দিকে জমিদারী দাম্ভিকতার বিপদসঙ্কুল পরিণতি সংঘটিত হইতেও বেশী সময় লাগে নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে হরকুমারদের মত ব্যক্তিরাই দুর্দান্ত ও প্রতাপান্বিত জমিদারদের মৃগয়ার শিকার হইতে দেখা যাইত।

হইলও তাহাই। প্রথমত নায়েব-গোমস্তা ও পাইক-পেয়াদাদের জবর-দস্তীর বিরুদ্ধে যখন তাঁহারা জমিদার মহাশয়কে করজোড়ে প্রতিকারের প্রার্থনা জানাইল, তখন একদিকে স্বেচ্ছাচারিতার রক্তচক্ষু ও অপরদিকে উৎপীড়নের বিভীষিকা তাঁহাদের নৈরাশ্য সৃষ্টি করিতে দেরী হইল না। তবে তাঁহারাও দমিলেন না। দিনের পর দিন লাঠিপেটা ও খুন-জখমের বিরুদ্ধে তাঁহারা জমিদারের দরজায় ধর্ণা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আজকালকার মত পিটিশন্, প্রোসেশন্ ও ডেপুটেশনের রেওয়াজ তখন ছিল না বটে, তবে নারীর মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ হইলে লাঠি-সোঁটা সহকারে গ্রামবাসীরা আগাইয়া যাইতে কখনও পিছপা হন নাই। অনেক সময় খুন-খারাবীতে আক্রমণও প্রতিরোধের পরিসমাপ্তি হইতে দেখা গিয়াছে। তার পর চলিয়াছে মামলা-মোকদ্দমা।

হরকুমারদের একটা সুবিধা এই ছিল যে, তাঁহারা সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দা গঙ্গামণ্ডল জমিদারী প্রসারিত ও সমৃদ্ধিশালী হওয়ার বিরুদ্ধে বরদাহাতী জমিদারেরা দূরে অবস্থান করিতে থাকিলেও, পরোক্ষভাবে তাঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকিতেন। এইভাবে আঘাত ও আর্তনাদের মধ্যে গ্রামবাসীদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবার সাহস ও সহায়তা দ্বারা হরকুমার ইতিমধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির দিক হইতে তাঁহার বসতভিটা ব্যতিরেকে তেমন কিছু বিত্ত-বৈভব তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইহাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় অসুবিধা। গ্রাম্য চৌকীদার, থানার অফিসার ও জেলার হেড-কোয়ার্টার সর্বত্রই তিনি সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। ফলে গৃহে বাস ও হাজতবাস তাঁহার কাছে একই প্রকারের ছিল। তবে হ্যাঁ, তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদা ছিল সকলের নিকট উন্মুক্ত। এমন কি উভয় জমিদারদের গৃহে যে কোন আচার-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণে কোনদিন ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায় নাই।

[ক্রমশঃ]

মীরা বর্ষ মল্লার

শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাশ

॥ বাইশ ॥

রতন সিংহ নতুন রাণা। বনবীর আর মলদেও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ছায়ার মতো।

চিতোরগড়ের অন্তঃপুরে রাণী ধনবাঈয়ের এখন অপ্রতিহত ক্ষমতা। সবাই ভয় করে ধনবাঈকে। দু'বেলা হাজিরা দেয় ধনবাঈয়ের জেনানা দরবারে। এমন কি বড়ো রাণী কুম্ভন-বাঈকেও নাকি আসতে হয় মাঝে মাঝে। ধনবাঈকে ঘিরে থাকে তার জোধপুরী রাঠোর সহেলীরা, তাদের দাপটে থমথম করে চিতোরগড়।

শুধু একজন এখনো আসে নি ধনবাঈয়ের জেনানা দরবারে। চিতোর-গড়ের রাজপুতানীরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে আলোচনা করে তার সম্বন্ধে। ওরা বলে মীরাবাঈ মেড়তীয়া রাঠোর। জোধপুরীদের সঙ্গে ওদের বনিবনাও নেই। তাই মীরা আসবে না ধনবাঈয়ের দরবারে।

যারা মীরাকে শ্রদ্ধা করে, ওরা বলে---না, সে জন্যে নয়, মীরা তার পুজোআর্চা নিয়েই আছে, চিতোর-গড়ের রাজনৈতিক দলাদলি থেকে সে একটু তফাতে থাকতে চায়।

কথাটা গেছে ধনবাঈয়ের কানে।

সে বলেছিলো,---বেশ, তাকে থাকতে দাও তার নিজের মতো। যখন তার ভালো লাগে না, তাকে আসতে বলার কি দরকার।

না, তাকে আসতেই হবে,---বলে ধনবাঈয়ের জোধপুরী রাঠোর সহেলীরা। ---আজ ক্ষমতা আমাদের হাতে এসে গেছে বলেই বোধহয় তার ভালো লাগছে না অনেক কিছু। কিন্তু যেদিন ক্ষমতা ছিলো রাণা সাঙ্গার হাতে, যেদিন মীরাজী ছিলেন রাণার প্রিয়পাত্রী, সেদিন তো দলাদলির মধ্যে ভিড়ে যেতে বাধে নি? সেদিন কেন খবর পাঠিয়েছিলেন রাণার কাছে, সেদিন কেন কুমার উদয় সিংহকে চিতোরের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন?

ওদের কথা শুনে ধনবাঈয়ের মনও আবার বিরূপ হোলো মীরার উপর। মনে পড়লো যে, মীরার সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গতা ছিলো কারমেতন বাঈয়ের। কিন্তু ধনবাঈকে সে কোনদিনই আমল দেয় নি।

এখানে আসতেই হবে মীরাকে, ---বললো জোধপুরী রাঠোর মেয়েরা,---আসতেই হবে ধনবতীবাঈয়ের জেনানা দরবারে।

ধনবাঈয়ের কাছ থেকে আমন্ত্রণ নিয়ে থাল-ভর্তি লাড্ডু, শুকনো নারিকোল ও মেওয়া সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে গেল চারজন রাজপুতানী।

মীরা আজকাল মহলেও বেশী থাকে না। বেশীর ভাগ সময় পড়ে থাকে গিরধরজীর মন্দিরে। নিজের মনে গান তৈরী করে, কখনো নিজে একলা বসে গায়। কখনো শোনায় কয়েকজন বৈষ্ণব অতিথিকে।

মিষ্টি ও মেওয়ার থালা মীরা নিবেদন করে দিলো গিরধরজীর সামনে।

---কিন্তু মীরাজী, আজ যে একবার আসতে হবে রাণী ধনবতীবাঈয়ের জেনানা দরবারে। আপনি এলে উনি খুব খুশি হবেন।

মীরা হাসলো, বললো,---আমার প্রভুজী তো আমাকে এখন আর চোখের আড়াল করতে চান না। তার চেয়ে রাণী ধনবতীবাঈই আসুন আমার প্রভুজীর দরবারে। উনি খুশি হবেন।

এত আস্পর্ধা? ---জোধপুরী রাঠোর সহেলীরা জ্বলে উঠলো এ খবর পেয়ে।

গুম হয়ে বসে রইলো ধনবতীবাঈ।

খবর দিন বনবীরকে। জোর করে ধরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে।

আরেকজন বলে উঠলো,---না, না, অতো বাড়াবাড়ি করতে যেও না। রক্তা-রক্তি হয়ে যাবে চিতোরগড়ে। রক্ষীরা সবাই শ্রদ্ধা করে মীরাজীকে। ওঁর উপর কারো হাত পড়লে রাজপুতদের রক্ত গরম হয়ে উঠবে।

কিন্তু কি করে ওকে আনা যায় তাহলে?

আনতে হবে কেন? কী এমন জরুরী, থাক না মীরাজী নিজের মতো। ও যদি গিরধরজীর মন্দিরে নিজের পুজোটুজো নিয়েই পড়ে থাকে, আমাদের এত ভাবনা কিসের?

ভাবনা আছে বই কি। ভিতরের ব্যাপার তো জানো না। তোমাদের কি ধারণা মীরা শুধু নিজের ভজন-পূজন নিয়েই মশগুল। ওসব ঢং, ওসব শুধু লোক-দেখানো। আসলে সে ভালো সময়ের অপেক্ষা করছে।

কেন? ওর কি স্বার্থ?

ভুলে গেছ কারমেতনবাঈয়ের সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতার কথা? মীরা নিজে

হোতো রাজরাণী কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তাতো আর হতে পারলো না। এখন তার ইচ্ছে, এমন কেউ গদীতে বসুক, যার উপর মীরা নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

কে সেই এমন কেউ?

বুঝতেই পারছো। কারমেতন-বাঈয়ের ছেলে বিক্রমজিৎ।

ওরে বাবা। ওর মতো লোককে মীরা সামলাতে পারবে?

ওর মতো লোককেই পারবে। ওর তো চরিত্র বলে কিছু নেই, এ বয়েসেই কি রকম নোংরা বিকৃত রুচির লোক হয়ে উঠেছে, সে খবর নিশ্চয়ই রাখো। ও তো হবে শুধু সাক্ষীগোপাল। আসল ক্ষমতা তাহলে পাবে রাও সুরজমল এবং তাহলেই অন্দরমহলের কর্ত্রী হবেন কারমেতনবাঈ। এদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হলে চাই মেড়তীয়া রাঠোরদের সমর্থন। সেটা সম্ভব হবে মীরাকে খুশি করে রাখতে পারলে।

এই ব্যাপার?

তাই তো শুনেছি।

কে বললে?

বনবীর সেদিন বলছিলো আমাদের ইন্দুবাঈকে।

ইন্দুবাঈয়ের সঙ্গে বনবীরের একটু অন্তরঙ্গতা আছে,---না?

চুপ চুপ, ওসব আলোচনা কোরো না। কেমন করে কানে যাবে, কথাটা গিয়ে পৌঁছবে বনবীরের কাছে, তারপর আমাদের জান-ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না।

না হয় বুঝলাম মেড়তীয়া রাঠোরদের সমর্থন পাওয়ার জন্যে ওরা মীরাকে একটু তোয়াজ করলো। মীরাজীর এতে কী লাভ?

শুনেছি মীরাজী হতে চান জগৎ গোসায়িন্।

মানে?

সবাই মানবে, যেখানে যতো বৈষ্ণব আছে সবাই। ওঁর নামে মন্দির হবে, ওঁর নামে পুজো হবে, ওঁর নামে অতিথি সেবা হবে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধানা বলে স্বীকৃতি পাবেন। সারা হিন্দুস্থান তাঁকে মানবে। তাঁর সম্মান হবে রাণাজীরও উপরে।

তলোয়ার হাতে নিয়ে রাণা সাঙ্গা যে কাজ পেরে ওঠেন নি, শুধু হরিনাম করেই মীরাজী সেটা করতে চান?

হাসির ঝিলিক খেলে গেল সবার মুখে।

ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়;---বললো রাঠোর রাজ-কুমার মলদেব। ---এ তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, মীরার উদ্দেশ্য হোলো মেড়তীয়া রাঠোরেরা শক্তিশালী হয়ে উঠুক। বুঁদী শক্তিশালী হয়ে উঠুক। অম্বরের রাজাও শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

রাণা রতন সিংহের মুখখানি কঠিন হয়ে উঠলো। এরা প্রত্যেকেই রতন সিংহের প্রতিপক্ষ। অম্বরের কছওয়াদের সঙ্গে চিতোরের সিসো-দিয়াদের বৈরিতা অনেক দিনের। বুঁদির সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না।

বনবীর বললো,---হ্যাঁ, এসব হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার নয়। এখন ওদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেছে বলে ওরা চুপ মেরে বসে আছে। কিন্তু সুযোগ পেলেই আমাদের ছোবল দেবে। ওরা আবার শক্তিশালী হওয়ার আগেই ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া দরকার, যাতে ওরা কোনদিন আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

মীরাজীকে মহলের ভিতর আটক করো।

না, না, পাগল হলে না কি রাণাজী? মীরাবাঈকে এখন কিছু বলা চলবে না।

তা হলে?

আগে বাইরে থেকে শুরু করতে হবে।

কি ভাবে?

তোমার বাবা রাণা সাঙ্গা তোমার বিয়ের ঠিক করে গিয়েছিলেন অম্বরের রাজকন্যার সঙ্গে। বাগদান হয়ে গিয়ে-ছিলো। এ বিয়ে ভেঙে দিতে হবে।

বেশ, কালই ঘোষণা করে দাও এ বিয়ে হবে না। অম্বর থেকে যে সব উপহার-উপঢৌকন এসেছিলো, ওগুলো সব ফিরিয়ে দাও।

আমার কাছে খবর আছে যে, আমাদের শত্রুরা আগেই আঁচ করতে পেরেছে যে, অম্বরের রাজকন্যার সঙ্গে মেবারের মহারাণার বিয়ের প্রস্তাব আমরা নাকচ করে দিচ্ছি।

ওরা কি করতে পারবে আমাদের?

রাও সুরজমল অম্বর-রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্যে মনে মনে তৈরী হয়ে আছেন।

রাণা রতন সিংহ হেসে উঠলো বনবীরের কথা শুনে। বললো,---তাতে আমাদের কি আসে-যায়?

বনবীর আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, ---বুঁদীর সঙ্গে অম্বরের একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ওদের কূটনীতি হোলো আস্তে আস্তে চিতোরকে ঘিরে ফেলা।

ওরা যদি বাবর শাহ্‌র সাহায্য নেয়, তা হলে আমি একটুও অবাক হবো না,---বললো মলদেব।
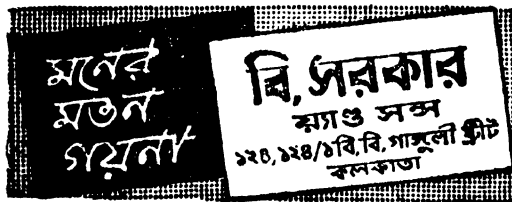
নিচ্ছে কিন্তু সত্যি সত্যি,---বনবীর গম্ভীরভাবে বললো।

মানে ?

কারমেতনবাঈ বাবরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, জানো ?

তাই নাকি ?---রতন সিংহের তলোয়ার ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো,---বাবরের সাহায্য নিয়ে চিতোর জয় করবে ? চিতোরের গদীতে বসাবে বিক্রমজিতকে ?

না, অতো সাহস এখনও হয় নি। বাবর শা'ও এতদূর এগোতে সাহস করবেন না। ওঁর সামনে এখন অনেক ঝঞ্ঝাট। হিন্দুস্থানের নতুন রাজত্বে আগে নিজের অধিকার জমাতে হবে। তারপর তো মন দেবে এদিকে।

তোমার কি ধারণা,---মলদেব বললো,---বাবর শাহ্ চিতোর জয় করবে কারমেতনবাঈয়ের এক অপদার্থ ছেলের হাতে এদের তুলে দেওয়ার জন্যে ?

---না হে, অতো সাধুপুরুষ বাবর শাহ্ নন।

---হ্যাঁ, আমি জানি। বাবর শাহ্‌র চোখ আছে মেবারের উপর।

---অতো সহজ নয়। তার আগে অম্বর, আলওয়ার, বিকানীর, বুঁদী, ভরতপুর---এসব জয় করতে হবে না ?

---এ ব্যাপারে সাধারণ প্রজারা খুব সাহায্য করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

ওরা পারে। সামান্য সুবিধের জন্যে ওরা দেশকে স্বচ্ছন্দে পরের হাতে তুলে দিতে পারে। কিন্তু মেবার সে রকম নয়,---গর্জে উঠলো রতন সিংহ।

বনবীর শান্তভাবে বললো,---ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার আগে আমরা অনেক কিছু অনুমান করে নিচ্ছি। আমি কয়েকদিন আগে একটা খবর পেয়েছিলাম গুপ্তচরের মারফৎ। তখন কথাটাকে আমল দিই নি। এখন মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সত্যি।

কি খবর ?---বললো রাণা রতন সিংহ,---কই আমাদের তো বলো নি।

---রাণী কারমেতনবাঈ রণথমভোর দুর্গ দিয়ে দিতে চান বাবর শাহ্‌কে। তার বদলে চান এতাওয়ায় একটা জায়গীর। তাঁর ধারণা---সেখানে তিনি অনেক নিরাপদে থাকতে পারবেন, দিন কাটাতে পারবেন নিজের খেয়াল-খুশি মতো। বিক্রমজিৎ যতো পথভ্রান্ত হোক, এখনো তার অল্প বয়েস হয়ত নতুন আবহা যার সংস্পর্শে এসে আবার বদলে যেতে পারে।

---মোগল এলাকায় বড়ো হলে রাজপুত আর রাজপুত থাকবে না।

---আমরা তো তাই চাই। বিক্রমজিৎ যতো দূরে সরে যায়, ততোই আমাদের পক্ষে ভালো।

কিন্তু তাতো হবে না,---বললো মলদেব,---বাবর শাহ্ যদি বিক্রমজিতকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে রাখে, তাহলে বুঝতে হবে নিজের কোনো বিশেষ মতলব হাসিল করতে চায় তাকে দিয়ে।

---সে তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। মেবার রাজ্যকে নিজের আওতায় নিয়ে আসা ছাড়া আর কি মতলব থাকতে পারে।

প্রতিপক্ষ খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন খবর নিয়ে আসে বনবীরের গুপ্তচরেরা।

মেড়তার রাও বিরমদেবকে চিঠি পাঠানো হয়েছিলো মেবারের অন্যতম বিশ্বস্ত ও অনুগত সামন্ত হিসেবে নতুন রাণার দরবারে এসে নিজের আনুগত্য জানানোর জন্যে। পরোক্ষে একথাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে, তাঁর মতিগতির উপরই নির্ভর করবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী মীরাবাঈ সম্বন্ধে নতুন রাণার সদিচ্ছা ও ব্যবহার।

বিরমদেব কোনো উত্তর দিলো না। এলোও না।

শোনা গেল, মীরাবাঈ বিরমদেবকে খবর পাঠিয়েছে, তার জন্যে বিরমদেব যেন একটুও চিন্তা না করেন।

এখনই মীরাজীকে নজরবন্দী করো মহলের ভিতর,---উত্তেজিত হয়ে বললো রাণা রতন সিংহ।
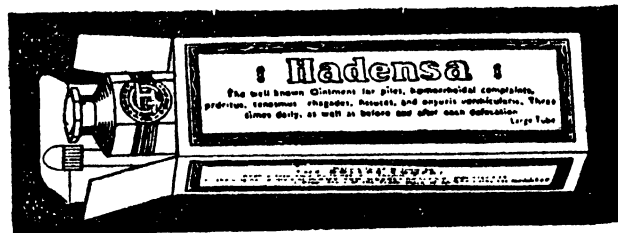
না, না, এখন নয়,---বনবীর বললো শান্তভাবে।

এভাবে আস্কারা দেওয়া হবে তাদের? বুঝতে পারছো না, আমাকে সরিয়ে বিক্রমজিতকে রাণা করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে?

---তুমি চুপচাপ বসে দেখ, আমরা কি করি।

খবর এলো রণথমভোর দুর্গে রাণী কারমেতনবাঈয়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে রওনা হয়েছে বিরমদেবজী।

এবার সৈন্য পাঠানো যাক;---একটু হেসে বললো বনবীর,---সে যেন কিছুতেই কারমেতনবাঈয়ের সঙ্গে যোগ দিতে না পারে। এবং---একটু থামলো বনবীর, তারপর বললো,---সে যেন মেড়তায়ও ফিরে যেতে না পারে।

মেড়তায়ও সৈন্য পাঠানো দরকার, ---বললো রাণা রতন সিংহ।

---আমি তাও ভেবে রেখেছি। একদল সৈন্য গিয়ে চড়াও হবে মেড়তার উপর। কুমার মলদেব বললো,---কিন্তু সিসোদিয়ারা মেড়তা দখল করবে, এটা সহ্য করবে না জোধপুরের রাঠোরেরা।

দখল কে করছে? ---বনবীর হেসে বললো,---শুধু মেড়তা থেকে বেরোনোর পথ আটকে বসে থাকবে আমাদের সৈন্য, যাতে মেড়তা থেকে সাহায্য পাঠাতে না পারে কুমার জয়মল এবং যাতে মেড়তায় ফিরে আসতে না পারে বিরমদেবজী।

বিরমদেবজীকে পথে আটকে ফেললো মেবারের সৈন্যরা। মেড়তায় ফেরার উপায় নেই, রণথমভোরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ নেই। শুধু একটি মাত্র রাস্তা খোলা,---এ দেশ ছেড়ে একেবারে চলে যেতে হবে।

মেড়তার বাইরে এসে ছাউনি গাড়লো আরেক দল সিসোদিয়া সৈন্য। নগর প্রাকারের তোরণ বন্ধ করে ভেতরে আটকে বসে রইলো বিরমদেবজীর ছেলে জয়মল।

মীরাবাঈয়ের কাছে খবর এসে গেল।

কিন্তু কিছু বললো না মীরা। কোনো লোক পাঠানোর চেষ্টা করলো না বিরমদেবের কাছে কিংবা জয়মলের কাছে। নিজের দৈনন্দিন রীতি অনুযায়ী নিজের সাধুসেবা, বৈষ্ণব-সঙ্গ ও গিরিধর-জীর পূজো নিয়েই মেতে রইলো।

রাণা রতন সিংহ বললে,---মীরাজী বোধহয় সংসার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

বনবীর হেসে বললো,---আমার তা মনে হয় না। উনি খুব বুদ্ধিমতী। উনি ঠিক জানেন আমরা এমন ব্যবস্থা নিয়েছি, যাতে কোনো লোক ওঁর কাছ থেকে কোনো খবর নিয়ে মেড়তার দিকে গেলে আমাদের হাতে ধরা পড়ে যাবে।

বিরমদেবের ব্যবস্থা হলো। এবার সুরজমলের পালা। হাডার রাও সুরজমল,---প্রতিপক্ষদলের আসল নেতা। রাণী কারমেতনবাঈয়ের বড়ো ভাই, রাণা সাঙ্গার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী,---এসব কারণে খুব প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

হাডার গদির জন্যে দাবিদার দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাক,---বললো বনবীর,---নিজের গদি বজায় রাখবার জন্যে আভ্যন্তরীণ গোলমালে জড়িয়ে পড়লে আর অন্য দিকে মন দেওয়ার অবসর পাবে না সুরজমল।

গোলমাল বেধে গেল বুঁদী রাজ্যের ভিতরে। গদির দাবিদার হয়ে উঠে দাঁড়ালো আরেকটি পক্ষ। মেবারের সমর্থন পেয়ে তারা রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে উঠলো।

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে রাও সুরজমল হাত মেলালো অম্বর রাজ্যের সঙ্গে। বিয়ে করলো অম্বরের রাজকন্যাকে, যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিলো রাণা রতন সিংহ। মেবারের সঙ্গে অম্বরের শত্রুতা অনেক দিনের। রাও সুরজমল চেষ্টা করলো মেবারের উত্তর দিকে একটি শক্তিশালী জোট সৃষ্টি করার জন্যে।

জোধপুরের রাও গাঙ্গা এতদিন চুপচাপ লক্ষ্য করছিলো চারপাশের পরিস্থিতি। এবার একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো।

রাণা রতন সিংহের মা রাণী ধনবাঈ রাও গাঙ্গার বোন। কুমার মলদেব রাও গাঙ্গার ছেলে। তাই এতদিন জোধপুরের রাও গাঙ্গা কোনো পক্ষে যোগ দেওয়ার কথা প্রয়োজন মনে করে নি---একথা ভেবে যে, রাণা রতন সিংহের উপর জোধপুরেরই প্রভাব বজায় থাকবে।

কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি দেখে আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলো না রাও গাঙ্গা। যখন শুনলো তারই ছেলে মলদেব সিসোদিয়া সৈন্যদের অধিনায়ক হয়ে মেড়তা অবরোধ করেছে, তখনই চঞ্চল হয়ে উঠলো। পরামর্শ করলো দরবারের অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে।

সবাই একমত হোল যে, অবাঞ্ছনীয়ভাবে বেড়ে উঠছে বনবীরের ক্ষমতা। রাণা রতন সিংহের উপর আসল প্রভাব বনবীরের, মলদেবের নয়।

এবং এমনও সন্দেহ করার কারণ হচ্ছে যে, মলদেবের উপরও বনবীরের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। মেড়তার সঙ্গে গণ্ডগোল মিটে গেলে মলদেব আর চিতোরে ফিরে যাবে না বলে শোনা যাচ্ছে, সে জোধপুরে ফিরে এসে ওর বাবা রাও গাঙ্গাকে রাজকার্যে সহায়তা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে।

এটা কিন্তু জোধপুর দরবারের সর্দারদের মনঃপূত নয়। তাদের ধারণা---মলদেবকে দিয়ে জোধপুরেও একটা গণ্ডগোল বাধাবার পরিকল্পনা করেছে বনবীর। সম্ভবত মলদেব রাও গাঙ্গাকে সরিয়ে নিজে জোধপুরের রাজা হওয়ার চক্রান্ত করছে। এ যদি হয়, তাহলে রাজপুতানার রাজনীতিতে বনবীরের প্রভাব খুব বেড়ে যাবে।

এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করছে বাবর শাহ্ও। বনবীর নাকি গোপনে যোগাযোগ করেছে বাবরের সঙ্গে। সে যদি জোধপুর, মেড়তা, মেবার আর বুঁদী নিজের 'আওতায়' আনতে পারে, তাহলে বাবর শাহের সঙ্গে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার

শত বর্ষ পরে

পরিমল ভট্টাচার্য

অন্ধকার ছিল দেশ জাতি যবে ছিল পরাধীন
হে মহাত্মা আলো হাতে এসেছিলে তুমি সেইদিন।
বিশ্বের বিস্ময় তুমি অহিংসার মূর্ত-প্রতীক
তোমার জীবন-বেদ সত্যের সন্ধান দিল ঠিক।
মুমূর্ষু জাতির দেহে ছিল নাক এতটুকু বল
সঞ্জীবন সুধা দিলে পান করে আকণ্ঠ গরল।
সমস্ত যন্ত্রণা গ্লানি মুছে দিতে মানব আত্মার
এসেছিলে হে সারথী লহ প্রাণের নমস্কার।
হে মহাত্মা তুমি নেই তবু আজ শতবর্ষ পরে
দেবতার মত আজো কোটি কোটি মানুষের ঘরে।

সে নামবে না। অম্বর সম্বন্ধে যদি মোগল-বাদশা কোনো রণনৈতিক নীতি অবলম্বন করে, বনবীর কোনো আপত্তি করবে না।

বাবর কোনো অভিমত প্রকাশ করে নি, শুধু চুপচাপ পরিস্থিতি লক্ষ্য করছে। তবে বনবীরের প্রস্তাব যে একেবারে অবহেলা করছে না, সেটা বোঝা যায় রাণী কারমেতনবাঈ সম্বন্ধে তার সাম্প্রতিক নিস্পৃহতা দেখে।

রাও গাঙ্গা আর চুপ করে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। নিজের ছেলে মলদেবকে জানালেন,---মেড়তা রাজ্য অবরোধ করার নীতি তিনি মোটেই পছন্দ করছেন না, কারণ, মেড়তার রাজবংশ জোধপুর রাজবংশেরই একটা শাখা। মেড়তার উপর মেবারের সিসোদিয়াদের কর্তৃত্ব জোধপুরের নিরাপত্তার দিক থেকে অবাঞ্ছনীয় এবং জোধপুরেরই রাজকুমার মলদেব যে এ ব্যাপারে সিসোদিয়া বাহিনীর পরিচালনা করছে, এটা তিনি মোটেও অনুমোদন করতে পারছেন না।

কোনো উত্তরই দিলো না কুমার মলদেব।

তখন রাও গাঙ্গা জানালেন যে, যদি একপক্ষ কালের মধ্যে তুলে নেওয়া না হয় মেড়তার অবরোধ, তাহলে তিনি রাঠোর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবেন সে দেশের সাহায্যে।

এ খবর পেয়ে অবাক হোলো রাণা রতন সিংহ। বললো ---ব্যাপার কি? আমার তো ধারণা ছিলো মেড়তিয়া রাঠোরদের সঙ্গে জোধপুরের রাঠোরদের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। আজ হঠাৎ মেড়তার জন্যে জোধপুরের দরদ উথলে উঠছে কেন?

বনবীর মুখ টিপে হাসলো। বললো, রাজনীতিতে চিরকালের শত্রু বলে কিছু নেই, চিরকালের বন্ধু বলেও কিছু নেই। আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রু হতে পারে। আজ যে শত্রু কাল সে পরম মিত্র বলে গণ্য হতে পারে।

চটে গেল রাণা রতন সিংহ। বললো, ও সব দার্শনিক তত্ত্ব শোনার ধৈর্য আমার নেই। যোধপুরের রাঠোরেরা যদি মেড়তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, আমরা কি করবো? অবরোধ তুলে নিয়ে মান-ইজ্জৎ খুইয়ে চলে আসবো? না কি, রাঠোরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো?

বনবীর হাসতে হাসতে বললো, তোমার কি অভিমত?

--রাঠোরদের সঙ্গে যদি যুদ্ধ আরম্ভ করি, তা হলে কিন্তু আমাদের শত্রুপক্ষের অনেক সুবিধে হয়ে যাবে। যদি যুদ্ধ না করে সরে আসি, আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

---তা হলে?

---কি করা যায়, আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।

বনবীর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বললো,---একটা তৃতীয় পথ আছে, আমি তার ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

---কি ব্যবস্থা?

---রাও গাঙ্গার কাকা কুমার সেখাজী জোধপুরের গদী দখল করার জন্যে আক্রমণ করছে কালই। তাকে সাহায্য করছে নাগপুরের আমীর খাঁ আর বিকানীরের রাও জেটসি।

রাণা রতন সিংহ অবাক হয়ে বনবীরের দিকে তাকালো।

বনবীর হাসিমুখে বলে গেল,--রাও গাঙ্গা তার মেড়তার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ পাবে না, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করার ফুরসতও আর হবে না।

রাণা রতন সিংহ এবার হাসতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু বনবীর গম্ভীর হয়ে গেল। বললো,---কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে।

হাসি বন্ধ করে তাকালো রতন সিংহ।

বনবীর বললো,---বাবর শাহ্ খুব গোপনে মীরার কাছে হীরার হার পাঠিয়েছে। সে হারের অনেক দাম।

রাগে সাদা হয়ে গেল রাণা রতন সিংহের মুখ।

[ক্রমশ।

খেলাধূলা

স্কেটিং-এর রাণী লিডিয়া

গত ৮ই মার্চ দিনটি সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিশ্ব-নারী দিবস হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। লিডিয়া স্কোবলিকোভা, রাশিয়ার সুন্দরী তন্বী এ্যাথলেটের পক্ষেও ঐ দিনটি শুভদিন, কারণ ঐ দিনেই তিনি শিল্পনগরী উখারলস্-এ জন্মগ্রহণ করেন। আকাশের উজ্জ্বল আলো এবং সংসারের হৈ-হৈ আনন্দের মধ্যে লিডিয়া বড় হয়ে ওঠে। ছেলেদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যেই সে খেলাধূলা করতো, আর স্কেটিং-এর শিক্ষাও সেই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে নিত। স্কুলে পড়ার সময় জিমন্যাস্ট করা, ভলিবল এবং এ্যাথলেটের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষাও সে গ্রহণ করতো, তবে ছোট্ট মেয়েটির এসব দিকে বড় একটা মন লাগতো না।

পুরোপুরি যখন যৌবনে পদার্পণ করলো লিডিয়া, সেই সময় উরালস্-এর স্পোর্টস্ ক্লাব থেকে ডাক এল তার। সেইখান থেকেই তাঁর মধ্যে নানাবিধ অত্যাশ্চর্য গুণের লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। পাঁচবার তিনি

চারটি স্বর্ণপদক বিজয়িনী মহিলা এ্যাথলেট শ্রীমতী লিডিয়া

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদান করেছেন এবং ক্রমিক পর্যায়ে এক থেকে পাঁচের মধ্যে তাঁর নাম থাকতোই। কিন্তু দুর্ভাগ্য---বহুদিন বহু পরিশ্রম করেও তিনি রেকর্ড মার্কের ওপরে যেতে সক্ষম হন নি। ১৯৬০ সালে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নের সময়ই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং আপন কৃতকার্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞও ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য সেবারেও তাঁকে ঘিরে রইল। এরই বদলা তিনি নিলেন পরবর্তী অলিম্পিকে। ১৫০০ এবং তিন হাজার মিটারে ক্রশ-কাণ্ট্রি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করতে দেখা গেল লিডিয়াকেই। শুধু তাই নয়, বিশ্ব-রেকর্ডকেও তিনি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।

একমাথা বাদামী চুলের অপরূপ তন্বী লিডিয়া সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ এবং দর্শক—সকলের কাছেই আজ অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর ঘরে আজ বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগৃহীত মেডেলের

ছড়াছড়ি। ১৯৬৩ সাল থেকেই [illegible] সকলের ধারণাকে অতিক্রম করতে থাকলেন। জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কেটিং প্রতিযোগিতায় চারটি বিষয়েই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হয়ে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার লাভ করলেন। ১৯৬৪ সালেও তিনি অলিম্পিকের প্রাঙ্গণ থেকে চারটি স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনে নিজের গলায় ধারণ করলেন। এরপর থেকেই লিডিয়ার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁর নামের পূর্বে "স্কেটিং-এর রাণী"—এই কথাটি লেখা যেন কাগজ-ওয়ালাদের প্রথা হয়ে দাঁড়াল। এছাড়া অলিম্পিক 'সুপার ষ্টার', দি ডেমন অন আইস' ইত্যাদি বিশ্লেষণগুলিও তাঁর নামের আগে শোভা বর্ধন করতে লাগল। সুদূরে আমেরিকানরাও লিডিয়াকে রাশিয়ার গর্ব বলে প্রচার করতে লাগল। আমেরিকার কাগজে লেখা হল স্বল্প দূরত্বে এবং দূরপাল্লাতে সমানভাবে কিভাবে একটি অল্পবয়সী মেয়ে দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়, তা না দেখলে ধারণা করা অসম্ভব। জার্মানীর একটি কাগজে 'কুইন অফ দি স্পোর্টস' এই শিরোনামায় একটি লেখা প্রকাশিত হল এবং তাতে স্থানীয় সাংবাদিকরা লিডিয়ার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেন। অলিম্পিক প্রাঙ্গণে তাঁর মুখখানি যখন হাজার হাজার দর্শকের কাছ দিয়ে ঘুরে যেত, তখন সে কি চীৎকার। লিডিয়ার সুন্দর মুখখানায় শুধু একটুখানি হাসি সে সময়

বিশ্বাস ব্যায়ামাগারের সভ্য মহম্মদ আলাম এই বৎসর দি জিমনাসিয়াম পরিচালিত 'মিঃ জিম '৬৯' আখ্যা লাভ করেছেন

লেগে থাকতো। তারপর প্রতিযোগিতা শেষে লিডিয়া যখন মঞ্চের ওপর প্রথম স্থানটি দখল করে দাঁড়াতেন, তখন দর্শকদের মধ্যে সে কি দারুণ চীৎকার-হুড়োহুড়ি। তারা অপেক্ষা করতো রাস্তার মোড়ে মোড়ে। তারপর লিডিয়ার খাওয়ার সময় তাঁকে কেউবা করমর্দন করতো, কেউ চুম্বন করতো, আবার কেউ কেউ বা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতো।

লিডিয়া বর্তমানে বিবাহিতা এবং এক সন্তানের জননী। ১৯৬৮ সালের অলিম্পিকে যোগদান করতে না পারলেও, পরবর্তী অলিম্পিকে দ্বিগুণ উৎসাহে যোগদানের আশা রাখেন। লিডিয়া এ সব সত্ত্বেও একটি কলেজের শারীর শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষিকার পদে নিযুক্তা।

দি জিমনাসিয়ামে পুরস্কার বিতরণী সভা

রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অবস্থিত 'দি জিমন সিয়াম' (ন্যাশনাল বক্সিং স্টেডিয়াম) কর্তৃক পরিচালিত মিঃ জিম ৬৯—দেহশ্রী ও মিঃ জিম পাওয়ার '৬৯ শক্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান স্মৃতি ন্যাশনাল বক্সিং স্টেডিয়ামে বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে পরিসমাপ্তি হয়। বহু ব্যায়ামবিদ্ তাঁদের নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে দর্শকদের আনন্দ ও উৎসাহ দান করেন। কল্যাণ-কুমার দাসের সভাপতিত্বে শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী পারিতোষিক বিতরণ করেন।

—ক্রীড়ারসিক

ক্রিকেটের শিল্পী হারবার্ট সাটক্লিফ

ইংলণ্ড তথা পৃথিবীর সুন্দরতম ক্রিকেটারদের মধ্যে হারবার্ট সাটক্লিফ্-এর নাম চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনে তাঁর করা '0' থেকে ১২৭ পর্যন্ত প্রতিটি ইনিংসই তিনি এক একটি নজীর সৃষ্টি করেছেন। সোজা কথায় তাঁর দীর্ঘ খেলোয়াড়ী জীবনের যতগুলো ইনিংসের কোনটাতেই তিনি একঘেয়ে নেতিবাচক ক্রিকেট খেলেন নি।

৭৪ বছর বয়স্ক হারবার্ট সাটক্লিফ তাঁর জীবনের ঝুলিতে সংগ্রহ করে রেখেছেন মোট ৫০,১৩৫টি রাণ এবং এই রাণের মধ্যে ৪,৫৫৫টি এসেছে টেস্ট খেলা থেকে এবং প্রায় অর্ধেকই এসেছে (২,৭৪১ রাণ) অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে।

এক সিজিনে হাজার রাণ করেছেন হারবার্ট মোট ২৪ বার এবং তাঁর শত রাণের সংখ্যা ১৪৯টি। তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের বছরগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৩২ সালেই তাঁর ব্যাট সবচেয়ে বেশী সরব ছিল। যে বছরে তিনি আঁকড়ে-ছিলেন মোট ১৪টি শত রাণ এবং সে তুলনায় ১৯২৪ ও ১৯৩১ সালে তাঁর রাণের বন্যায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। যেহেতু ঐ সময়ে তাঁর সেঞ্চুরীর সংখ্যা ছিল ১৩টি।

সাটক্লিফ টেস্ট খেলায় সবচেয়ে বেশী সেঞ্চুরী করেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মোট ৮টি। অপর কীর্তি হিসেবে যা উপস্থিত রয়েছে, তা হল তিনি মোট চারবার একটি খেলার দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেন এবং তার মধ্যে ১৯২৪-২৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এবং ১৯২৯ সাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম উইকেটে সি হোমসের সঙ্গে জোট বেঁধে করা ৫৫৫ রাণ আজও বিশ্ব-ক্রিকেটে অম্লান। ১৯৩২ সালে ইয়র্কশায়ারের হয়ে এসেক্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে তাঁরা ঐ কীর্তি স্থাপন

'গোলাপ : মৃত্যু : এবং প্রেম'

এ, এফ, কামরুদ্দীন আহমদ

গোলাপ সেদিন মারা গেছে পথে
রোগে-শোকে ধুকে ধুকে,
প্রতিদিন আর আসে না ভ্রমর লক্ষ দলে দলে,
বেকার মালীটা ঘুমায় হেথা
নিড়ানো কিংবা জল দেওয়া গেছে উঠে॥

ভস্ম বিলায়ে আকাশের পথে
দিয়ে গেছে অনুরাগীজন,
শুষ্ক গোলাপে কেঁদেছে নীরবে
মরে গেছে সেই প্রজাপতি মন,
আমার পকেট ফাঁকা
প্রেম নাই সেথা আঁকা॥

গোলাপ মরেছে, প্রেমিক মরেছে,
প্রেম সুরভিত সুগন্ধিসার
মায়ক ক্লান্ত মালঞ্চে আর হবে না সে
মালাকার।
মালাবার দ্বীপে মরিছে কাঁদিয়া
সুতীব্র হাহাকার॥

করেন---সেখানে সাটক্লিফ করেছিলেন ৩১৩ রাণ।

ক্রিকেট লিখিয়ে রবার্টসন গ্লাসগো হারবার্টের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন---"আমি এত ব্যাটসম্যান দেখেছি, কিন্তু হারবার্টের মত কেউই নয়। হারবার্ট তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা এবং পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে যখন উইকেটে থাকেন, তখন তাঁর তুলনা হিসাবে কাউকেই আমি খুঁজে পাই না।"

অপর একজন লিখেছেন---"আমার চিন্তাশক্তি এবং দেখা আমাকে এই কথাটাই মনে করিয়ে দেয় সে, হারবার্ট সাটক্লিফের মত অন্য কোন ব্যাটসম্যানই ইংলণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এতটা করেন নি, যতটা কিনা হারবার্ট করেছিলেন।"

এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সেই তিনটি ইনিংস যা কি-না স্বকীয় প্রতিভায় চিরকাল আমার মনের ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে থাকবে, তার প্রথমটি হল সিডনী টেস্টে তাঁর করা ১৯৪টি রাণ। মেলবোর্ণে করা (চ্যাপম্যানের দলের পক্ষে) ১৩৫ রাণ এবং তৃতীয়টি ১৯২৬ সালের ওভাল মাঠের।

ঐ তিনটির মধ্যে সিডনী এবং মেলবোর্ণে তিনি এমন উইকেটে দাঁড়িয়ে খেলেছেন---যেখানকার পীচ ছিল পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্টতম। আসল কথা---যত খারাপ হতে পারে, তারচেয়েও পীচ ছিল এক ডিগ্রী নীচে এবং একথা কে-না জানে যে, মেলবোর্ণের ভিজে পীচ জঘন্যতায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেখানে যিনি না খেলেছেন বা দেখেছেন, তিনি কল্পনা করতে পারবেন না। সেই রকম অবস্থায় হারবার্ট সেদিন হিংস্র হায়নার মত ব্যাট হাতে ওৎ পেতে ছিলেন এবং সাপের জিভের মত লক্লকে বলগুলোকে ঝাঁটার মত ঝাঁট দিয়ে দিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলেন নিখুঁতভাবে। সে দৃশ্য ভোলা যায় না।

এবং ১৯২৬ সালের তৃতীয় ইনিংসটির সূত্রপাত ওভাল মাঠে এবং যত ভয়ানক রকমের বিশ্রী স্নায়বিক চাপের মধ্যে হারবার্ট এবং হবস্ যে খেলা সেদিন দেখিয়েছিলেন---তার দাম দেওয়া যায় না এবং ঘোরতর বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই হারবার্ট-হবস্ জুটী করেছিলেন বলিষ্ঠ শত রাণ। পরম উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁদের সেই খেলা। তাঁদের সেই জুটী। সেই হবস্-সাটক্লিফ জুটী, যা বিশ্ব-ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান জুটী হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকবে।

—পবিত্র মজুমদার

পাপুর ছবি : বড়দের লেখা

চল্লিশটি লেখা, ছোটদের জন্য—এর মধ্যে ছড়াই বেশি, গদ্যও কিছু আছে। লেখা এবং ছড়াতে অন্তত একখানা করে ছবি—এ ছাড়াও দু-চারখানা আলাদা ছবি আছে। দুটি ছবি রঙিন, একটি মলাটে, একটি ভেতরে। সব ছবিগুলিই পাপুর আঁকা, আর সব লেখাগুলোই বাঙলাদেশের চল্লিশজন লেখক-লেখিকার লেখা, কেবল একটি লেখা বাদে। সেটি পাপুর নিজেরই লেখা। বইটির নাম—পাপুর ছবি—সঙ্গে ছড়া।

সমস্ত লেখাগুলোই লেখা হয়েছে পাপুর আঁকা ছবিগুলি থেকে। সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী এমন একটি কাজ করেছেন যা এর আগে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীতে কিছুকাল আগে তিনিই প্রথম বহু শিশু শিল্পীদের আঁকা ছবি ছাপিয়েছিলেন। এই সিরিজে পাপুর, যার অন্য নাম সুব্রত সরকার, তিনখানা ছবি অনেকেরই চোখে পড়েছিল তখন।

হিমানীশ গোস্বামী

এই সিরিজে ছবি ছাপা না হলেও পাপু হয়ত ছবি আঁকা ছেড়ে দিত না। কিন্তু এর ফলে উৎসাহ তার প্রচুর হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর পর থেকে, আমরা জানতে পারি, পাপুর এবং আরো অনেকের ছবি আঁকা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পাপু মারা যায় অতি কম বয়সে। আট বছর ন' মাস মাত্র বেঁচে ছিল সে। বন্ধুপুত্রের মৃত্যুতে আমরা আঘাত পেয়েছিলাম, সেই সংগে আমরা জানতে পেরেছিলাম, সেই প্রথম, যে, পাপু আকস্মিকভাবে মারা যাবার কিছুদিন আগে থাকতেই প্রচুর ছবি এঁকে ফেলেছিল।

পাপুর বই—সংগে ছড়া, বইটির সম্পাদক বাঙলাদেশের বহু লেখকের কাছে পাপুর আঁকা একটি করে ছবি পাঠিয়েছিলেন—তাতে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, ঐ ছবি দেখে যা খুসি লিখে দিতে, ছড়াও হতে পারে, গল্পও হতে পারে, তবে ছোটদের জন্য হওয়া চাই।

চিঠি পাঠানোর প্রায় সংগে সংগেই লেখা আসতে সুরু করল। কোনো লেখা পাওয়া গেল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই। সব লেখাই এল দশ-বারো দিনের মধ্যে। আমরা তখন প্রতিটি লেখা আসে, আর হুমড়ি খেয়ে পড়ি, কে কি লেখেন দেখবার জন্য। সত্যজিৎ রায়ের লেখা আসে নি? অন্নদাশঙ্কর? শরদিন্দু? বনফুল? এসে গেল সব লেখাই। আর বইটা ছাপে দিতে লাগল। আমরা বসে বসে লেখা পড়ি আর

নাট্যকার ব্রেশট

বিশ্বসাহিত্যের গৌরবময় ইতিহাসে খৃস্টীয় ১৮৯৮ অব্দটির অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। সেই কারণেই এই অব্দটি সাংস্কৃতিক জীবনে চিরস্মরণীয়। পৃথিবীর তিন প্রান্ত থেকে এই একই অব্দে যে তিন দিকপালের আবির্ভাব ঘটল, পরবর্তীকালে তাঁরা কালজয়ী সৃষ্টি ও মহৎ

কমলা দাস

সাধনায় সমগ্র সাহিত্যজগতকে নিজেদের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে রাখলেন। একজন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এক-জন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। আর---আর একজন এই রচনার আলোচ্য পুরুষ বার্টল্ট ব্রেশট।

পূর্বোক্ত তিনজনের মধ্যে ব্রেশট বয়সের বিচারে সর্বজ্যেষ্ঠ। অন্য দু'জনের জন্ম জুলাই মাসে। ব্রেশটের জন্ম ফেব্রুয়ারী মাসের দশ তারিখে। সাহিত্যের নবদিগন্তের উন্মোচনে,

কলা কাকলি

বলি এই লেখাটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে—কিন্তু তারপরই হঠাৎ একজন বলে ওঠেন, না—এটা দেখুন, এক অদ্ভুত খেলার কথা। এটাই সবচেয়ে ভাল। একজন বললেন—এই আচার্য চরিটাই আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে, আর একজন বললেন, বাঃ প্রত্যেকটিই সবচেয়ে ভাল। এ থেকে বেছে প্রথম কোনটা বলা সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে তো নয়ই, ছোটরাই বলতে পারবে। সম্পাদক মশাইও তাই লিখলেন ভূমিকায়।

ছোটরাই বলতে পারবে? এই ছোটরা কে? ছোটরা আমরাই—অনেক বছর আগেকার আমরা। এখন ক্ষীণভাবে মনে পড়ে আমাদের সেই সব দিনের কথা। আমরা ছিলাম বড়দের জগতেরই একটা অংশ। শিশুদের আলাদা জগৎ আছে সেটা এখন বুঝতে পারছি আমরা।

পাপু সৃষ্টি করেছিল সেই ছোটদের জগৎ। পাপুর জগৎ। আমাদের সে জানিয়ে দিয়ে গেল যেন, তোমরা যে জগৎকে শিশু-জগৎ ভাব সে জগৎ মোটেই শিশু-জগৎ নয়। সেটা তোমাদের ধারণা। আর আমাদের তোমরা যে বালক মনে করো তাও সত্যি নয়। দেখ যা লিখেছি তা আমারই লেখা—যা এ'কেছি তা একান্ত আমারই আঁকা। এর মধ্যে শিশুত্ব কতখানি আছে? রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবির মধ্যে যতখানি আছে ততখানি? শিল্পী শিশু ছিল বলেই তার শিল্পকে শিশু-শিল্প বলা চলে কি? এ সব প্রশ্নই রয়েছে পাপুর ছবিতে। 'পাপুর ছবি—সঙ্গে ছড়া' এই অসাধারণ বইটিতে ছোটর জগতে বড়রা এই প্রথমে ঢুকলেন। এর আগে বড়রা ছোটদের জন্য জগৎ সৃষ্টি করতেন তাঁদেরই মনের পরিমাপে—খুব কম সময়েই সে জগৎ ছোটদের কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম একটি শিশু যেন বলল, এসো আমার সঙ্গে—এই দেখ, আমি কি দেখি। এ হল আমার জগৎ—আরো অনেক শিশুরও জগৎ। কিংবা, হয়ত বলা যায় অনেক শিশুই অনেক কাল ধরে বলে এলেও এই প্রথম, পাপুর মৃত্যু হয়েছিল বলেই যেন বড়রা পাশ ফিরে তাকালেন, সাহস করে পেছনেও ফিরলেন, একটু নীচু হয়ে দেখলেন সে জগৎ কতখানি বাস্তব, কতখানি রঙিন, কতখানি আশ্চর্য এবং কতখানি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাতে থাকা সম্ভব। এই প্রথম ছোটর কাছে বড়র আত্মসমর্পণ।

বইটির বিবরণঃ পাপুর ছবি—সঙ্গে ছড়া। সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স, দাম পাঁচ টাকা।

বাদিকা
—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যা

—দেবযানী বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ-কাব্য

—শিবু দত্ত

সলজ্জ
—বিশ্বনাথ গোস্বামী (হাওড়া)

আলোকচিত্র

—মধু অধিকারী

মে
য়ে
ম
হ
ল
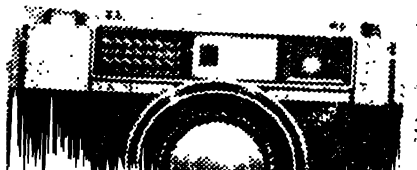
...ষারকান্তি দে

মাসিক

বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ / '৭৭

...নিমেষ রায়

—বিশ্বনাথ গোস্বামী
(পুরুলিয়া)

স্বতন্ত্র রীতি, আঙ্গিকের উদ্ভাবনে, সর্বোপরি এক বিশেষ ধারার প্রবর্তনে যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য— সেই বার্টল্ট ব্রেশটের প্রথম জীবন ছিল সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের এক কর্মীর জীবন। এই জীবন ব্রেশট যখন বেছে নিয়েছিলেন তখন তাঁর কৈশোর সবে সমাপ্ত। কিশোর সেদিন সদ্যযৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

সে ১৯১৬ সালের কথা। ১৯১৮ সালে সে জীবনের সমাপ্তি। সেই বছরই পৃথিবীর আকাশ মুক্ত হ'ল প্রথম মহাযুদ্ধের রাহুচ্ছায়া থেকে। পরের বছর সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কর্মী পরিণত হলেন ছাত্রে। ১৯১৯ থেকে '২২ পর্যন্ত মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করতে থাকেন চিকিৎসাবিদ্যা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে আরও একটি বিষয় তাঁর পঠিতব্য ছিল। তা হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। এরই মধ্যে ১৯২০ থেকে তাঁর পদক্ষেপ শুরু হতে আরম্ভ হল সংস্কৃতির অলিন্দে। নাট্যানুশীলন সুরু হল। প্রযোজকরূপেও তাঁর আবির্ভাব ঘটল। প্রতিভার স্বীকৃতি-স্বরূপ পঁচিশ বছরের তরুণকে দেওয়া হল 'ক্লিস্ট পুরস্কার' (১৯২৩) ১৯২৭ সালে তাঁর কাব্যসংকল 'হাউস পোস্টিল' প্রকাশিত হল। সে বছরই দেখা দিল তাঁর 'মান ইস্ট মান (এ ম্যানস এ ম্যান)। পরের বছ তিনি দিলেন 'ড্রায়ে গ্রোসেনোকার (থ্রি পেনি ওপেরা)। তাঁর 'ডাই হিলি জোহানা ডার শ্লাস থোফ' (সেং জোয়ান অফ দ্য স্টকইয়ার্ডস) আত্ম-

ব্রেশট
(১৯৩১ সালে গৃহীত চিত্র)

১৯৩৩-এ তাঁর জীবনবৃত্ত এক নবতম অধ্যায়ে হল উপনীত।। তাঁকে দেওয়া হল নির্বাসন দণ্ড। নির্বাসিত স্রষ্টা হিসাবে পৃথিবীর নানা দেশ তিনি পরিক্রমা করেছেন। এই তালিকায় পড়ে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই নির্বাসন দণ্ডাদেশ বহাল ছিল। নির্বাসনবাসও তাঁর কর্মহীন কাটেনি, এই চৌদ্দটি বছর তিনি অতিবাহিত করেন নি নিছক অবকাশ-যাপনে। ১৯৩৩ থেকে '৩৮ পর্যন্ত মস্কোতে সাহিত্য সাধনায় রত ছিলেন। ১৯৩৮ থেকে '৪০-এর মধ্যে বেরিয়েছে 'ডার গুতে মেনশ ব সেজুয়ান' (দ্য গুড উওম্যান অব সেজুয়ান)। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের প্রারম্ভ বর্ষে দেখা দিয়েছে তাঁর 'মাটার কারেজ আণ্ড আর কাইণ্ডার (মাদার কারেজ এ্যাণ্ড হার চিলড্রেন) ১৯৪১ সালে বসতি স্থাপন করলো যুক্তরাষ্ট্রে এবং সেই বছর নিবেদন করলেন ডার অকাল্টসেম অফ স্টেগ্‌ ডো অর্টুরো উই (দ্য রেসিস্টিবল্‌ রাইজ অফ আর্টুরো উই)। দু' বছর পর এল গ্রেডিখটে ইম এক্সিল (পোয়েমস ইন এক্সাইল) আর সেই সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করল 'লেবেন ডো গ্যালিলি' (লাইফ অফ গ্যালিলিও)

১৯৪৭ সালে এলেন জুরিখে পরের বছর প্রতিষ্ঠিত হল বার্লিনার এনসেম্বল। বার্লিনে তাঁর অফুরন্ত অবদানময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৫৬ সালের আগস্টে। ব্রেশটের বয়েস সে সময় ঠিক সাড়ে আঠান্ন।

১৯৬৪ সালে গৃহীত কলোন পৌর রঙ্গশালার একটি দৃশ্য

মাধবী নাট্য কোম্পানী

সত্যের জয় এবং পাপের পরাজয়। যুগে যুগে সত্য হয়ে এসেছে আমাদের শাস্ত্রের এই অমর বাণী। মানুষ ইচ্ছে করলেই এই নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। ঘুরে ফিরে তাকে ঐ নিয়মের আওতার মধ্যে আসতেই

যাত্রা সমাচার

হবে। মাধবী নাট্য কোম্পানীর 'আগুন নিয়ে খেলা'য় পালাকার এই সত্যকেই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের মধ্যে সংঘাত আছে, তেমনি আছে চমক। প্রাণবন্ত অভিনয়ের সঙ্গে আছে হাস্যরসাত্মক দৃশ্য। যা দর্শকের মনকে ধরে নাড়া দেয়। অন্তরে দেয় অনাবিল তৃপ্তি। সিংহাসন আর রাজ্যের প্রতি অতিমাত্রায় লোভ থাকার ফলে বীরপুরের রাজা বীরসিংহের মনে যে লালসার আগুন

ঝিকমিক জ্বলে উঠেছিল, পালাকার কানাইলাল নাথ এবং নাট্যপরিচালক মনোরঞ্জন চক্রবর্তী অত্যন্ত ন্যায় এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যাঁদের অনবদ্য অভিনয়ে নাটকটি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে তাঁরা হচ্ছেন, নাট্যকার শ্রীচক্রবর্তী (বীরসিংহ), মনী চক্রবর্তী (লালু মোড়ল), অমর ভট্টাচার্য (শঙ্কর), রমেন ভট্টাচার্য (শূলপাণি), বেলা দেবী (সত্যবতী), অঞ্জলি ভট্টাচার্য (নয়নমণি), সোনালী গোস্বামী (করুণাময়ী) ও বাবলু ভট্টাচার্য, মধু ব্যানার্জী, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সঙ্গীতাংশে যাত্রার মূল সুরটি কৃতিত্বের সঙ্গে বজায় রেখেছেন।

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার সুখ্যাত পালা 'এক টুকরো রুটির এক আবেগময় মুহূর্তে খ্যাতনামা নট মিহির ভট্টাচার্য এবং ছবিরাণী

নট্ট কোম্পানী

কোলকাতার প্রখ্যাত যাত্রা দল নট্ট কোম্পানী সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার গণেশপুরে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ তাঁদের দুটি বিখ্যাত পালা 'বিন্দুর ছেলে' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি' অভিনয় করে এলেন। স্থানীয় জনসাধারণ নাটক দুটির অভিনয় আঙ্গিকগত ক্রিয়াকৌশল ও আলোকসম্পাতের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা

বিশেষ আমন্ত্রণে কোলকাতার সুখ্যাত যাত্রা সম্প্রদায় নিউ রয়েল বীণাপাণি তাঁদের দলবল নিয়ে বোম্বাই সফর করে এলেন। ওখানে 'বোবা কান্না', 'লাল রাজপথ' ও যাত্রা স্কোপে স্বামী বিবেকানন্দ শহরবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। তিনদিনই প্রচুর দর্শক জমায়েৎ হয়। অভিনয় করেছিলেন, মিহির ভট্টাচার্য, বিজন মুখার্জী, তরুণকুমার, দিলীপ চৌধুরী (প্রিন্স), তরুণ ভট্টাচার্য, ছবিরাণী, ফিরোজাবালা, মীনা চক্রবর্তী, বেলা সরকার, প্রমুখ যাত্রা দলের শিরোমণিরা।

ভারতী অপেরা

ভারতী অপেরা 'সূর্য সেন' এবং 'গরীব কেন মরে' সুখ্যাতির সঙ্গে বহুদিন ধরেই অভিনয় করে চলেছেন। একটিতে পরাধীন ভারতের বিপ্লবী বীর সূর্য সেনের জীবন-কাহিনী বিধৃত হয়েছে, অপরটি পুরোপুরি একটি সামাজিক নাটক। বাঙলায় এবং বাইরেও প্রচুর জনসমাদর লাভ করেছে এই নাটক দু'টি। সম্প্রতি ভারতী অপেরা যে দু'টি নাটক উপহার দিতে চলেছেন, সে দু'টি হচ্ছে, উৎপল দত্তের 'নীল রক্ত' এবং ব্রজেন দে'র 'আবুল হাসান'। দুটি নাটকেরই নির্দেশনা এবং আলোকসম্পাতে থাকছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও তাপস সেন। ভারতী অপেরা তাঁদের এ দুটি নাটকেও তাঁদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন আশা করা যায়

[illegible] পালায় দেবকুমার ও অমিয় বন্দ্য

A BOUT DE SOUFFLE

বইটির বাস্তব সত্যই যথেষ্ট নয়,—তবে ব্যক্তিগত অবাস্তবতাই হচ্ছে বইটির আসল সত্য, যার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে স্বপ্ন ও বাসনা। ছবির আকারই হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়া আছে দৃশ্যাদির হঠাৎ পরিবর্তন, আলোক-সম্পাতের কায়দা, সংলাপ, এডিটিং প্রভৃতি। স্টাইলও ছিল দ্রুত বিদ্যুৎপাতক ও রসপূর্ণ। এই স্টাইল দর্শকদের তার দুষ্ট চরিত্র এবং ঘটনাবলী থেকে সরিয়ে রাখে। সংযত এবং সুঠাম যে তার স্টাইল, এই তার প্রমাণ। যাই হোক না কেন, চিত্রটি এক নতুন ধরনের নায়কেরও সন্ধান দিয়েছে। বিশিষ্ট ও সুন্দর রচনাশৈলীর দিক থেকে চিত্রটি গতানুগতিক বাঁধাধরা রীতিনীতি হতে চলে এসে এক স্পষ্ট ও চূড়ান্ত পথে পা দিয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সমাজ-সচেতনতা মিশে চলচ্চিত্রের এক নতুন চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু LE PETIT SOLDAT ছবিতে পরিচালক এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নেমে পড়লেন।

১৯৬০ সালের এপ্রিল-মে মাসে জেনেভায় ছবিটির দৃশ্য গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেহেতু ছবিটির চরিত্র-গুলিতে আলজেরিয়ান সমস্যা জড়িত ছিল, সেহেতু প্রায় তিনটি বছর ধরে ফরাসী সরকার এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে প্রথম মুক্তিলাভ ঘটে প্যারিসে। বইটি ছিল কিছুটা সমস্যামূলক। সমস্যা হচ্ছে ছবিটি কি ধোকা, ভালো লোকেদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অথবা ছবিটি নিম্নস্তরের।

এ্যালবার্ট লিউইনের সময় থেকে কোন বই-ই এই বইটির মত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এত উন্নত ছিল না। নায়ক কোন অভিজ্ঞতাই নিতে রাজী নয়, যদি না তা সাহিত্য চারুশিল্পসম্পন্ন হয়। আর নায়িকা নায়কের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে গিরাডুর চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়ক ককটুরের টমাস না- ইন্সপেক্টারের মত মরতে চায়। ছবির একটি প্রধান দৃশ্য লা কভিশান হিউমেন কে নিয়ে আরম্ভ হয়েছে।

এতে দেখান হয়েছে নায়ক যদিও বুদ্ধিমান তবুও সে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে অসমর্থ, প্রেমে দুর্বলচিত্তের মানুষ, যদিও বিদ্রোহের আগুন বর্তমান।

বিশ্বের বিতর্কিত পরিচালক জঁা লুক গদার

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আসল গল্প সম্বন্ধে যা-কিছুই চিন্তা করি না কেন, ছবিটি সত্যই মনো-মুগ্ধকর, তার কারণ গদার যেন ছবির মধ্যে নিজস্ব সব কিছুই দিয়েছেন এবং যা-কিছু স্পর্শ করেছেন, তা জীবন্ত এবং প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। যদিও চিত্রটি কয়েকটি দৃশ্যের জোড়াতালি দেওয়া, তবুও কিছু অদ্ভুত জিনিস চিত্রের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন ডায়লগ, আকস্মিকতা, নায়কের চলাফেরা ও কথাবার্তা বলার মধ্যে মুহূর্তের যে পরিবর্তন, তা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কোন এক সমালোচক লিখেছেন, বইটির মধ্যে যা-কিছুই থাকুক না কেন, এর শতকরা একশো ভাগই এর চলচ্চিত্রের কারুকার্যমণ্ডিত।

'লে পেটিট সোলডাটের' পর গদার পুনরায় প্রেমবিষয়ক মিলনান্তক নাটকে ফিরে এলেন এবং সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে UNE FEMME EST UNE FEMME দেখান ১৯৬১ সালে। কিভাবে এক তরুণী সন্তানের আশায় তার স্বামীকে বশীভূত করল, তারই সুন্দর সমাবেশ ঘটিয়েছেন পরিচালক বিভিন্ন উপায় ও মতবাদের দ্বারা। একমাত্র গদারের স্টাইলই এই ছোট্ট গল্পটিকে এক উচ্চস্তরে উন্নীত করেছে। ছবিটি যেন আনন্দ ও রসিকতার ভাণ্ডার। একসঙ্গে বসে সকলেই সে রস উপভোগ করতে পারেন। একে একটি অমর চারুশিল্প বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক এটা আনা ক্যারিনার সম্বন্ধে প্রামাণ্য একখানি চিত্র, যা তথ্যমূলক চিত্র। রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ। গদারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সব প্রচলিত প্রথা, নিয়মকানুন তিনি ভেঙে দিলেন। সুপরিকল্পিত এবং ভাল দৃশ্যের

গদার পরিচালিত "লা মেপারস" চিত্রের একটি প্রণয়দৃশ্যে জ্যাক পালানস ও ব্রিজিত বার্দো

বাংলা চিত্রজগতের তিন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী—শ্রীমতী সুচিত্রা সেন, শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী ও শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী).

পরিবর্তে তিনি বহু খারাপ দৃশ্য গ্রহণ করলেন। যদিও এইসব দৃশ্য প্লটের দিক থেকে খুব বেশি নয়, তবু চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়; সবচেয়ে খারাপ দৃশ্যের সাহায্যেও পরিচালক যে-ভাবে নায়িকা সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমাদের জানিয়েছেন, তা অকল্পনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরোপুরি মার খেয়ে গেছে। বইটি গদারের পরবর্তী ছবি VIVRE SA VIE বা ১৯৬২ সালে তোলা হয়েছে জোরালো অথচ সংক্ষিপ্ত এবং রোমান্স-বিরোধী। এতে কয়েকটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে অর্থের জন্য একটি মেয়ের নীচ প্রবৃত্তি গ্রহণের ইতিহাস দেখান হয়েছে। কেমন করে একজন পারসিয়ান গরীব মেয়ে 'নানা' প্রথমে অপ্রত্যাশিত-ভাবে, পরে নিয়মিতভাবে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করল, প্রেমে পড়ল। পুনরায় তার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করল এবং অবশেষে আকস্মিকভাবে গুলীতে বিদ্ধ হল, যখন তার ব্যাভিচারের সঙ্গী লোকেদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। কিন্তু গদার এই গল্পকে অন্য রূপ দিয়েছেন। 'নানা' তার দেহ কলঙ্কে যা বোঝায়, তা সর্বস্বই দিয়েছিল। কিন্তু তার আত্মা সে বিসর্জন দেয় নি, যখন সে এ্যাডভেঞ্চারের পথ এ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিল। বইটির মধ্যে একটা 'অসাধারণ' বিশেষত্ব আছে। চিত্রটি কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক সমালোচনা নয়, যদিও বিষয়বস্তু আমাদের এক বাস্তব পথে নিয়ে যায়। এর মধ্যে গদারের প্রেমিকা নানা ক্যারিনার ভূমিকা চিত্তাকর্ষক এবং অনবদ্য তার অভিনয়। ফ্যালিকাটির 'জোয়ান অফ আর্কের' কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েছে নানা। জীবন-দর্শন বিড়্ বিড়্ করে বলে যাচ্ছে, বলছে বাঁচার জন্য তাকে এই নীচবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে, কিন্তু আত্মাকে সে সর্বোপরি তুলে ধরেছে শত আপদ-বিপদের মধ্যেও।

কিন্তু ছবির প্রধান কথা হচ্ছে, জীবন হচ্ছে এক বড় পরীক্ষা। বাস্তব ঘটনাবলী যদিও সেখানে পুরোদস্তুর বিদ্যমান, তবুও গল্পের ধারাবাহিকতা, আধ্যাত্মিকতা—ঠিক ওডেসি'র আধ্যাত্মিক যাত্রা—যেখানে বাস্তবের মূল্য অল্পই। এছাড়াও এর আর এক গুরুত্ব বর্তমান। চিত্রটি গদারের স্ত্রী আনা ক্যারিনার জীবনালেখ্য। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় যে, ক্যারিনার জীবনকথা এই চিত্রের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে। অনুভূতির দিক থেকে দেখলে এটা স্পষ্ট যে, নানার এ্যাডভেঞ্চার আনা ক্যারিনার জীবনে পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এডগার আলান পোর গল্প অবলম্বনে গদার তাঁর প্রিয়তমার মূর্তি এঁকেছেন। সাধারণ জিনিসকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কোন কিছুকে শিল্পপর্যায়ে একবার তুলে ধরলে তার সাধারণত্ব তখন আর থাকে না। তাই এ ক্ষেত্রে ক্যারিনাকেও মরতে হবে নানার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এখানে তা সম্ভবই নয়।

পরিচালকের ইচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় VIVRE SA VIE শিল্পের দিক থেকে পূর্বের তিনটি চিত্রের চেয়েও অনেক গতানুগতিক এবং নীরব চিত্র। ছবিটি কিন্তু তার প্রাপ্য প্রশংসা থেকে যেমন বঞ্চিত হয় নি, তেমনি আর্থিক সাফল্যও ঘটেছে।

১৯৬২ সালে গদার জানালেন যে, গিরাডুর পোর লিউক্রীম নাটকটিকে চিত্রায়িত করবেন, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তাই তিনি LES CARABINERS নামে একটি চিত্র পরিচালনা করেন, যার গল্প রোবার্টো রোসেলিনির কাছ থেকে নেওয়া। ল্যা ক্যারাবিয়ান এক উদ্দেশ্যপূর্ণ ছোট গল্প, যার পটভূমিকা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। দুই জন চাষী তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে এক পরিত্যক্ত দেশে বাস করতো; কিন্তু একদিন চার জন ক্যারাবিয়ানস সুন্দর পোষাক পরিধান করে সেখানে এল। তারা তাদেরকে বললো যে, যুদ্ধ বেধে গেছে। তারা যুদ্ধের সুবিধা সম্বন্ধেও তার সঙ্গে আলোচনা করল। বলল, যে জিনিস স্বাভাবিক সময়ে করতে পারা যায় না, তা এই যুদ্ধের সময় করা সম্ভব হয়।

তারা বলল, এই সময় ধর্ষণ, লুঠপাট, হত্যা অবাধে করা চলে। এই বলে তারা চাষীদের তাড়িয়ে দিল এবং তাদের স্ত্রীদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করল। তখন চাষীরা ঠিক করল, তারা যুদ্ধে

যাবে লুঠপাট করবে। কারোও তাই। যখন শান্তি এল, তারা লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ চাইল কিন্তু শান্তির চুক্তিতে রাজা ঘোষণা করলেন, যাঁরা তাঁর সৈন্য তারাই তাঁর শত্রু এবং রাজার আদেশে সবাইকে তখন মেরে ফেলা হল। গল্প যাই হোক না কেন, গদারের স্টাইল একে এক উন্নত স্তরে নিয়ে গেছে। ব্রেখটের মত শিল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণ আত্মযোগ না করে গদার সম্পূর্ণ detached ভঙ্গিতে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাদের পশুসুলভ ন্যক্কারজনক মনোভাব যেন এক মানববিদ্বেষী মানুষের হিংস্র ও পশুসুলভ মনোভাব নিঙ্‌ড়ে নিঙ্‌ড়ে উদ্‌ঘাটন করে। তার ফল হল এই যে, তাঁর পরিচালিত এই বইটি খুব স্বল্পকালেই দর্শককুলকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাদের চিত্তবিনোদন করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সত্যিকার রুচিবান দর্শকরা এর মধ্য থেকেই এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। কিন্তু গদার তাঁর পরবর্তী চিত্র LE MEPRIS-এ আরো গতানুগতিক এবং ক্লাসিক ধরনের স্টাইলে অবতরণ করেন। তিনি মোরেভিয়ার উপন্যাসকে কেন্দ্র করে এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রিজিত বার্দো ও জ্যাক পালানস-এর মত চিত্র-পরিচালকদের নিয়োগ করে চিত্রটিকে এক উন্নত স্তরে উন্নীত করিয়েছেন। এই চিত্রের নায়ককে এক জায়গায় বলতে শোনা গেছে---গদারের ইচ্ছা ছিল আমি তাঁর কথাবার্তা মত চলব-ফিরব, এমন কি তাঁর জুতো, টুপি ও টাই পরে অভিনয় করি। নায়িকা পালানস বলেছিলেন, তাঁর স্ত্রী'র অভাব তিনি আমাকে দিয়ে চিত্রে পূরণ করাতে চেষ্টা করতেন। আমি তাঁর বেদনার কথা বুঝতে পারতাম। স্ত্রী যেভাবে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতেন তিনি আমাকে দিয়ে সেইভাবে কথা বলিয়ে নিতেন।

রাজনীতির ব্যাপারেও গদার খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর PIERROT LE FOU এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই ছবিতে আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। LA CHINOISE ছবিতেও তিনি চীনের কমিউনিস্টদের দিকে ফিরে তাকালেন। এবং বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তিনি মাওয়ের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

গদার পরিচালিত প্রতিটি ছবির মধ্যে যে জিনিসটি প্রায়ই দেখা যায়, তা হল মৃত্যু। তাঁর প্রতিটি বইয়ের নায়ক-নায়িকাকেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আর, একটা উপকরণেরও অবধারিত উপস্থিতি থাকবে গদারের প্রায় সমস্ত ছবিতে---তা হচ্ছে পিস্তল।

গদার বলেন, 'তাঁর কাছে অভিনেতারা চিত্রকরের মডেলের মত একটি লোক বসে আছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, কথা বলছে, এর মধ্য দিয়েই রঙে-রেখায় চলচ্চিত্রের অভিব্যক্তি।' গদার-এর ছবি আজকেও ইউরোপীয় চলচ্চিত্রের একটি চমকপ্রদ ধারার বাহক এবং এই ধারাকে চলচ্চিত্ররসের দিক থেকে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গদার নিজেও বলে থাকেন, 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আমি আনন্দ পাই, যা বলি তার উল্টোটাই করে থাকি সব সময়ে।' তাই গদারকে দেখে কেউ বুঝতেও পারতেন না, তিনি কি ভাবছেন এবং পরমুহূর্তে কি করবেন। তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ব্রেথলেশ'র সময়ই উপলব্ধি করা গিয়েছিল তাঁর শিল্পিমনটিকে। মাত্র তিন পাতায় লেখা খসড়া চিত্রনাট্য থেকে এ ছবির জন্ম। ছবি তৈরির সব নিয়মকানুন তিনি ভেঙে চুরমার করে দিলেন এই সময়ে। ব্রেথলেশ প্রেমের গল্প হয়েও গতানুগতিক মিলনাত্মক প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে এর তফাৎ ছিল প্রচুর। গদার কম খরচে ছবি করতে ভালবাসতেন। তাঁরই কথায় 'টাইম ইজ মানি।

আজ একটা কথা সত্য যে, গদার ক্রমশ উন্নত থেকে উন্নততর এবং সুন্দর থেকে সুন্দরতর প্রদেশের অন্তস্তলে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর নিজস্ব স্টাইল, অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি তাঁকে এমন এক স্তরে উন্নীত করেছে যে, আগামীকালের কোন পরিচালক তাঁর স্রষ্টার ভূমিকাকে নষ্ট করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শিশু চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণকারী বসুমতী ছোটদের সংসদের সভ্যদের সঙ্গে -এর সেটটি নির্মাণরত বিজন সেন ও অজয় কর

চিত্র : এস পাল

নাট্যলোক

শেষরক্ষা

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর একঅশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রামরাজাতলার শ্রীপঞ্চম। শিবপুর ননীভূষণ সিংহ মেমোরিয়ালে আয়োজিত এই স্মরণোৎসবে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সভাপতি তাঁর ভাষণে নাট্যাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে সব শেষে অভিনীত হল কবিগুরুর 'শেষরক্ষা'। নাটকের প্রধান চরিত্র বিনোদের ভূমিকায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র চিরকিশোর ভাদুড়ীর অভিনয় এককথায় অনবদ্য। এ-রকম সরস চরিত্রাভিনয় আমাদের সৌখীন নাট্যমঞ্চে দেখা যায় না। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন : অশোক চক্রবর্তী, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর লাহিড়ী, শ্রীগোবিন্দ, অমল লোধ, মদন দাস প্রমুখ শিল্পীরা।

বিল্বমংগল

সম্প্রতি শিবশঙ্কর লেনে বাংলার প্রাচীন নাট্যগোষ্ঠী আর পি বি এস কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংসদে মহাকবি গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনেতাদের ব্যক্তিগত এবং দলগত অভিনয় ছিল প্রশংসার যোগ্য। ছোট্ট মেয়ে মাধবী ব্যানার্জির রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সবার মনে দাগ কাটে। পাগলিনীর ভূমিকায় প্রভাত ঘোষ নিখুঁতভাবে রূপদান করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন : কানাইলাল ঘোষ, হরিপদ দাস, সত্যনারায়ণ ঘোষাল, মালা ঘোষ, কৃষ্ণা ঘোষাল প্রমুখ আরো অনেকে। সঙ্গীত পরিচালনা করেন নলিনীকান্ত কর এবং নাটকের পরিচালনায় ছিলেন প্রভাতকুমার ঘোষ।

বড়ো পিসিমা

সম্প্রতি হাওড়ার মেডিক্যাল ক্লাবের সদস্যরা স্থানীয় পূর্ব রেলওয়ে মঞ্চে অভিনয় করলেন 'বড়ো পিসিমা' (দিল সরকার)। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তাররা এবং তাঁদের স্ত্রীরা; কিন্তু অভিনয়ের মান, টিম ওয়ার্ক এবং ব্যক্তিগত চরিত্রচিত্রণ এত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে, অনেক ক্ষেত্রেই দর্শকরা অবাক হয়েছেন। অভিনন্দনও জানিয়েছেন প্রতিটি শিল্পীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখে, বিশেষ করে 'শম্ভুর' ভূমিকায় ডাঃ বনবিহারী কর, পরিচালকের ভূমিকায় ডাঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্তর ভূমিকায় ডাঃ পঞ্চানন সোম, অনাথের ভূমিকায় ডাঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখান।

এ ছাড়া সত্যেন্দ্র কুণ্ডু, ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

গত ১০ই এপ্রিল টেলিগ্রাম কাউণ্টার রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে একটি নাটকের আয়োজন করা হয় "ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে"। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন শশাঙ্কের ভূমিকায় শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়, বরুণের ভূমিকায় শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় (অমল), সুধাংশু মণ্ডল (বনমালী), মদনমোহন ধাড়া (ললিত), সুশীল দে (বিনয়), কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেবার ভূমিকায় শ্রীমতী ছবি তালুকদারের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য

বাটানগর, ১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল): বাটা এ্যাকাউন্টস এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় বাটা সিনেমা হলে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের চিত্রাঙ্গদা অনুষ্ঠিত হয়। অর্জুনের ভূমিকায় সুতপা দত্ত, কুরূপার ভূমিকায় শুক্লা সেনগুপ্তা, সুরূপার ভূমিকায় রত্নাবলী ঘোষ, মদনের ভূমিকায় স্বর্ণা বাগচী ও অন্যান্য ভূমিকায় মানসী বোস, মিতা হোপ, গীতালী বসু, বনানী চৌধুরী, মিতা পাল, কৃষ্ণা হালদার সুঅভিনয় করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় নির্মলেন্দু বিশ্বাস কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সহকারীরূপে ছিলেন মীরা চৌধুরী, কাজল বসু, স্বপ্না সেনগুপ্তা। মীরা চৌধুরী সঙ্গীতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতে ছিলেন—অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, কালাচাঁদ চ্যাটার্জী ও সুখেন্দুবিকাশ দত্ত। উদ্বোধন সঙ্গীতে ছিলেন শ্রীবিপুল ঘোষ।

কালিন্দী

হাওড়ার ঐকতান নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি স্থানীয় শিশির নাট্যমঞ্চে অভিনয় করলেন তারাশঙ্করের 'কালিন্দী'। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীবিভু ভট্টাচার্য। সুঅভিনীত এই নাটকটির সর্বাঙ্গে নাট্য-নির্দেশকের দক্ষতা এবং যত্নের ছাপ স্পষ্ট। ফলত এই নাটকের কৃতিত্বের ভাগীদার নাট্যনির্দেশকই বলা চলে। অভিনয়ে যাঁদের কৃতিত্ব দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে তাঁরা হলেন—বিভু ভট্টাচার্য, সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত ভট্টাচার্য, অরুণ কর, শক্তি ভট্টাচার্য, বিভাস পাত্র, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা পাল, ব্রতী দত্ত, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। বিভাগীয় কর্মে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অর্ধেন্দু দে, হারাধন বসু ও রবীন আদক।

বাংলা ছায়াছবি

ত্রিনয়নী মা

ভক্তিমূলক কাহিনী "ত্রিনয়নী মা" চিত্রের কাজ শেষ হল। বর্তমানে আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষারত। এই ভক্তিমূলক সঙ্গীতবহুল চিত্রের সুরকার হলেন প্রবীণ সুরকার অনিল বাগচী। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচয়িতা হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন পূর্ণেন্দু রায়-চৌধুরী। চিত্রটির অভিনয়াংশে রয়েছেন বাংলার প্রবীণ ও খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপঋষি চিত্রমের চিত্র "ত্রিনয়নী মা"।

মেঘ কালো

খ্যাতনামা রহস্য কাহিনীকার ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্যঘন কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন প্রবীণ পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির নাম "মেঘকালো"। "মেঘকালো" চিত্রটিতে সুর সংযোজনা করেছেন স্বনামধন্য সুরকার পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। পি এ এস ফিল্মসের 'মেঘকালো' চিত্রের প্রধান ভূমিকা দু'টিতে রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী ও সুচিত্রা সেন এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রয়েছেন গুণী শিল্পিবৃন্দ। 'মেঘকালো' চিত্রটির মুক্তি আসন্ন। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

মুক্তিস্নান

দু'টি নারী ও একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শক্তিপদ রাজগুরুর সংঘাতময় পারিবারিক প্রেমের কাহিনী 'মুক্তিস্নান'। 'মুক্তিস্নান' কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করেছেন পরিচালক অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। কাহিনীর চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সঙ্গীতাংশের ভার গ্রহণ করেছেন রাজেন সরকার। চিত্রটিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, হরিধন ও কালী প্রমুখ। রাধারাণী পিকচার্সের 'মুক্তিস্নান' চিত্রটি বর্তমানে মুক্তির দিন গুণছে। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন কার্তিক বর্মণ। চিত্রটির পরিবেশক হলেন নর্মদা চিত্র।

প্রথম প্রতিশ্রুতি

প্রতিভাময়ী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'কে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত। চিত্রটির প্রযোজনায় রয়েছেন মুকুল মজুমদার। চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী, সমিত ভঞ্জ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, ইন্দ্রনাথ ও নবাগতা শিল্পী সোনালী প্রমুখ। চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন নীহার রায়। চিত্রটির পরিবেশনায় পিয়ালী ফিল্মস।

এই করেছো ভালো

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত কাহিনী 'এই করেছো ভালো' চিত্রের মুক্তি সমাসন্ন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কাহিনীকার স্বয়ং। চিত্রটির পরিচালনায় রয়েছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রটিতে সুর দিয়েছেন অধীর বাগচী। দয়াশংকর সুলতানিয়া নিবেদিত চিত্র 'এই করেছো ভালো'। চিত্রের রূপায়ণে রয়েছেন অনুপকুমার, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায় প্রমুখ। লাইট এ্যাণ্ড সেড-এর চিত্র 'এই করেছো ভাল'। চিত্রটির পরিবেশনায় রয়েছেন ফিল্মল্যাণ্ড কর্পোরেশন।

রাধারাণী পিকচার্সের "মুক্তিস্নান" চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

সাগর পেরিয়ে

জগতের বিরাট সংখ্যক চিত্রামোদীর দল, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশের দর্শকসমাজ তাদের সকৌতুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটি নিবদ্ধ করে রাখেন বছরের এই বিশেষ দিনটির দিকে। সেই দিনের প্রতীক্ষায় তাঁদের ব্যগ্রতার অন্ত থাকে না। আকুল আগ্রহে সেই দিনটির উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রহর গুণে থাকেন। এই দিনটিই ঘোষিত হয় সারা বছরের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার বিজয়ীদের নাম। এ বছরের অস্কার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার বিজয়ী বা বিজয়িনীদের নামও সম্প্রতি মহাসমারোহে ঘোষিত হয়েছে। এই ঘোষণায় জানা গেল, বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর গৌরব অর্জন করেছেন যথাক্রমে জন ওয়েন ও ম্যাগি স্মিথ। 'ডিউক' নামে সমধিক খ্যাত তেষট্টি বছর বয়স্ক জন ওয়েনের অভিনীত ছবির সংখ্যা দুশো অতিক্রম করে গেছে। বহু সম্মান এবং শিরোপা তাঁর শিল্পিজীবনের ইতিহাসকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছে। তাঁর মত কৃতী শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অস্কারপ্রাপ্তি দর্শকসমাজে নিঃসন্দেহে গভীর পরিতৃপ্তির সঞ্চার করবে। ছত্রিশ বছর বয়স্কা ম্যাগি স্মিথের সেবায়ও বিদেশের অভিনয় জগৎ যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ। বিচিত্র এবং জটিল চরিত্রের রূপায়ণে তাঁর দক্ষতা সুপ্রমাণিত। এই কুশলী শিল্পীর এই সম্মানপ্রাপ্তি দর্শকসমাজকে গভীর আনন্দ দিতে সক্ষম হবে বলে মনে করা যায়।

জন ওয়েন

●

শতাব্দীর দুস্তর দুর্লঙ্ঘ্য মহাসমুদ্র অতিক্রম করে, মহাকালের সর্বগ্রাসী বাহুবন্ধনকে জয় করে যে ক'টি নাম সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বসমাজের মানুষের স্মৃতির মন্দিরে চিরন্তনের প্রদীপে বন্দনায় উদ্ভাসিত, সেই নামগুলির মধ্যে উইলিয়াম সেক্সপীয়ার অন্যতম। তাঁর কালজয়ী সৃষ্টির মধ্যে 'হ্যামলেট' একটি অবিস্মরণীয় নাম। সাহিত্য-পিপাসু এবং নাট্যামোদী এই উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীর মানসলোক আলোকিত করে তোলার ক্ষেত্রে 'হ্যামলেট'-এর অবদান অনন্য। অগণিত দিকপাল শিল্পী, স্রষ্টা অমর হয়ে আছেন এই নাটকটিতে কেন্দ্র করে। সেকালের স্যার হেনরি আর্ভিং ও একালের স্যার লরেন্স অলিভিয়ার প্রমুখ বহু বরেণ্য নট তাঁদের অসামান্য অভিনয়ে এই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এবার এই বহুজনসমাদৃত নাটকটিকে কেন্দ্র করে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তা যেমনই বিচিত্র, তেমনই বিস্ময়কর। হ্যামলেটের চরিত্রের রূপায়ণ এবার যিনি করতে চলেছেন তিনি তরুণ নন, এমন কি প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ও তিনি বহুকাল পূর্বে অতিক্রম করে গেছেন। এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ হতে তাঁর আর একেবারেই দেরী নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তিনি পুরুষ নন, তিনি নারী। অস্ট্রেলিয়ান বর্ষীয়সী অভিনেত্রী ডেম জুডিথ ইভান্স এবার হ্যামলেটের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। বর্তমান বর্ষে মার্কিন দেশ পরিক্রমায় তিনি তাঁর এই অমূল্য অভিনয়সম্ভার নিবেদন করবেন। এই পরিক্রমার স্থায়িত্ব হবে ছাব্বিশ সপ্তাহ, অর্থাৎ বছরের অর্ধাংশেরও বেশী। পঁচাত্তর বছর বয়স্কা জুডিথ বর্তমানে এই চরিত্রের প্রয়োজনে তরবারি চালনা সম্বন্ধে নিয়মিত শিক্ষালাভ করছেন অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে।

চিত্র মোহাই

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে গেছেন---কোনো কিছুই কারুর মতো যেন না হয়। আমের মতো না হ'য়ে জাম, জামরুল, আতা হলেও চলবে। কিন্তু চেহারা যদি কারুর অন্য আরেক-জনের সঙ্গে মিলে যায়, তাহ'লে কি হবে? এতে তো মানুষের হাত নেই। চেহারাটা বদলে ফেলাও সম্ভব নয়। হয়তো প্লাস্টিক সার্জারির কল্যাণে আদল পালটে নেয়া যায়, কিন্তু দরকার কি? অবিশ্যি এ ক্ষেত্রে যোগ্য হবার দায়িত্ব বিশেষভাবেই বর্তায়। যেমনটা হয়েছে উদীয়মানা অভিনেত্রী শ্রীজাহিদার ক্ষেত্রে। শ্রীমতীকে দেখতে হুবহু প্রখ্যাতা নার্গিসের মতো। ব্যক্তিগত জীবনে ওঁদের মধ্যে নিকট সম্পর্কও রয়েছে। নার্গিস হ'চ্ছেন শ্রীমতী জাহিদার পিসিমা। সুখের কথা, জাহিদা তাঁর পিতৃশ্বসার প্রতিভার ভাগীদার হ'তে পেরেছেন অতি সহজেই। 'আনোখী রাত' ছবিতে প্রথম যখন দেখি, চমকে উঠেছিলুম। বেশ কিছু বছর আগের কোনো ছবি দেখছি না-কি---তা না হ'লে নার্গিস এতো তন্বীরূপে পর্দায় জেগে উঠলেন কি করে। পরে ভুলটা ধরা পড়লো না ব'লে মোহটা কাটলো, বলাই সমীচীন। তারিফ কিছুটা করেছিলুম। পরে অবিশ্যি জেনেছি ওই সাদৃশ্যের মূলে রক্তের সম্পর্কের কথাটা। ভাগ্নে যদি মামার মতো দেখতে হ'তে পারে, ভাইঝিই বা পিসির মতো দেখতে না হবে কেন?

যাই হোক আখতার হোসেনের কন্যা জাহিদা 'আনোখী রাত'-এ অভিনয় করে অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে বেশ খানিকটা চেনাজানার আলোয় উপস্থিত হ'তে পারলেন। এরপর এলো 'প্রেম পুজারী'। ছবিটা কলকাতায় হাঙ্গামার জন্যে বন্ধ হ'য়ে গেলেও, যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, সকলেই তারিফ করেছেন জাহিদার কৃতিত্ব। জাহিদা প্যারিসে অনেকদিন পড়াশুনো করেছেন। ফরাসী ভাষা লিখতে, পড়তে, বলতে পারেন ভালোই। ইংরিজীও জানেন। কথক নাচের দক্ষতা আছে। প্যারিসে কয়েকটা নাটকে অংশ নিয়েছেন। ওঁর আগামী ছবি 'গ্যাম্বলার'। দেব আনন্দ ওঁর বিপরীতে নায়কের চরিত্রে অবতীর্ণ হ'চ্ছেন। আশা করা যায়, জাহিদার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলবে।

●

দিলীপকুমার ও সায়রা বানু স্বামী-স্ত্রী। অনুরূপ ভূমিকায় প্রথম ওঁদের দেখা পাওয়া যাবে যে ছবিতে, সেটির নাম 'গোপী'। ছবিটি তোলা হচ্ছে অবিশ্যি মাদ্রাজে। প্রসাদ স্টুডিওতে সম্প্রতি একটানা দৃশ্য গ্রহণ করলেন পরিচালক ভীম সিং। এর পরই বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে---সেজন্যে শিল্পী কলা-কুশলীকে যেতে হবে উটিতে। তারপরই মহীশূরে। দু'খানি গান এই দু'জায়গায় চিত্রায়িত হওয়ার কথা। প্রসাদ পিকচার্সের এই নিবেদনের শিল্পী তালিকার অন্যান্য নাম হচ্ছে ওমপ্রকাশ, নিরূপা রায়, দুর্গা খোটে, প্রাণ, ছবি ওয়াকার ও ফরিদা জালাল। কল্যাণজী-আনন্দজী সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন।

●

সঞ্জয় আর ফিরোজ দুই সহোদর---হয়তো অনেকের জানা নেই সেকথা। ওঁরা দু'জনে ছবিতেও ভাই হ'য়েছিলেন 'উপাসনা' ছবিতে। আবার এই শিল্পিদ্বয়কে ভাই হ'তে দেখা যাবে 'মেলা' নামে ছবিটিতে। প্রকাশ মেহেরা-পরিচালিত ছবিতে সুরারোপ করছেন রাহুলদেব বর্মণ। গল্প লিখেছেন কোশল। নায়িকা হচ্ছেন মুমতাজ। সহ ভূমিকায় থাকছেন মেহমুদ, ললিতা পাওয়ার ও ভারতী।

—রমেন চৌধুরী

হেমা মালিনী

অনুরাধা [illegible] ‘বিলম্বিত লয়’

সংগঠন—কাহিনী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। পরিচালনা : অগ্রগামী। সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ। পরিবেশনা : চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

অভিনয়ে : উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, নবাগতা দীপা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, কণিকা, পদ্মা, শোভা, তরুণকুমার, মণ্টু, শ্যামল প্রভৃতি।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী : মৃগাঙ্ক (উত্তমকুমার) ছবি আঁকে আর গান গায়। অদিতি (সুপ্রিয়া দেবী)। ওরা দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসে গভীরভাবে।

মৃগাঙ্কর বাবা প্রাচীনপন্থী, তিনি ভাবতেই পারেন না যে, তাঁর ছেলে খৃশ্চান মেয়ে অদিতিকে বিয়ে করতে পারে, তিনি তাই এ প্রেমের ঘোরতর বিরোধী।

অদিতির দাদা অর্থকৌলীন্যে মৃগাঙ্কদের চেয়ে অনেক উঁচু শ্রেণীর, তিনিও পছন্দ করেন না এদের ভালোবাসা। আদৌ তিনি বিশ্বাস করতে রাজী নন যে মৃগাঙ্কর মতো সামান্য এক পটুয়া কোনদিন তেমন কিছু করতে পেরে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

অভিভাবকদের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও তবু কিন্তু একদিন মৃগাঙ্ক আর অদিতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে নিজেদের। রঙে-রসে ভরে ওঠে ওদের জীবন। হাসি আর গানের মধ্যে দিয়ে কাটতে থাকে ওদের পরবর্তী দিনগুলো।

কিন্তু এ আনন্দ-গান বেশীদিন স্থায়ী হয় না। রোদ-ঝলমল নির্মল আকাশে ধীরে ধীরে জমা হয় গাঢ় কালোমেঘ। বড়লোকের মেয়ে অদিতি ঘর ছাড়ার আগে বেশ মোটা অঙ্কের টাকাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বেহিসেবী শিল্পী মৃগাঙ্কর উড়নচণ্ডে স্বভাবের জন্যে সে টাকা উড়ে যেতে বেশী সময় লাগে না। স্বাচ্ছল্যের সংসারে অভাব-অনটন হানা দেয়।

মৃগাঙ্কর বন্ধু সুব্রত (নির্মলকুমার) এসে সবকিছু শুনে অবাক হয়—সে কি! অত টাকা সব শেষ হয়ে গেল। সে অনুযোগ করে অদিতিকে—তুমি তো জানোই, মৃগাঙ্ক চিরদিনের এক বেহিসেবী, কিন্তু তুমি তো সংসারের গৃহিণী, পারলে না তুমি মৃগাঙ্কর খেয়াল-খুশির রাশ টেনে ধরতে?

অসহায় ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অদিতি বলে, মৃগাঙ্ক আমার জন্যে ছেড়েছে ওর ঘর-সংসার, আত্মীয়-স্বজন সবকিছুই—আর তার বিনিময়ে সামান্য ক'টা টাকার মায়া আমি ছাড়তে পারব না। তবু, তবু আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম মৃগাঙ্ককে বোঝাতে, কিন্তু পাছে ও ভুল কিছু মনে করে, তাই জোর করতে পারি নি, পারি নি বাধা দিতে।

এবার শুরু হয় ওদের কৃচ্ছ্র-সাধনের পালা। কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লেগে যায় অদিতি—না, ভেঙে পড়লে চলবে না কখনই, চলবে না লোক হাসানো।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বাচ্ছল্যের সাজানো প্রাসাদ ছেড়ে ওরা চলে এল এক ছোটখাটো বাড়িতে। বিলাস-ব্যসনের আসবাব-পত্র বিদায় করে দিয়ে যেটুকু না হলেই নয়, তাই নিয়ে শুরু করল নতুনভাবে জীবনযাত্রা।

কিন্তু কলসীর জল তো আর নয়কো অফুরন্ত, তাই যেটুকু তলানী পড়ে আছে, সেটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগেই বুদ্ধিমানের মতো ব্যবস্থা করতে হয় অন্য কোন কিছুর। তা সেই ব্যবস্থাই করল অদিতি—যেটুকু শিক্ষা ছিল তার, সেই শিক্ষাকে সম্বল করে স্কুলে চাকরি নিল সে।

কিন্তু তাতে কতটুকুই বা সুরাহা হবে একটা সংসারের, কতটুকুই বা মিটবে সংসারের দৈনন্দিন হাজারো

অগ্রগামী পরিচালিত ‘বিলম্বিত লয়’ চিত্রের একটি প্রণয়মধুর দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

চাহিদা। কলে, বাধ্য হয়েই আরো কিছু উপরি রোজগারের আশায় অদিতি তার গানকে বেছে নিল উপায়ের অপর মাধ্যম হিসেবে।

ধীরে ধীরে এই যে পরিবর্তন হচ্ছিল ওদের ছোট্ট সাজানো সংসারে, তা ঠিক হাসিমুখে মেনে নিতে পারে নি মৃগাঙ্ক। প্রতিবাদ করেও ছিল সে, কিন্তু তবুও মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কোথায় তার? ছোট্ট একটা কাঁটা যেন জ্বালা ধরায় মৃগাঙ্কর মনে, কেমন যেন এক অস্বস্তিতে ভোগে সে।

মৃগাঙ্কও চাকরির চেষ্টা করে। বন্ধু সুব্রতর দ্বারস্থ হয়ে সে জানায়, যে-কোন রকমের একটা চাকরি খুঁজে দিতে, যাহোক কিছু উপার্জন তাকে করতেই হবে। সুব্রত তাকে পরামর্শ দেয়---চাকরির কি দরকার, ফাইন আর্টস ছেড়ে সে কমার্শিয়াল আর্টস ধরুক না কেন, তাতে তো প্রচুর পয়সা।

খেপে ওঠে মৃগাঙ্ক, উত্তেজিত হয়---শিল্পকে করতে হবে পণ্য? না, কখনই নয়। শিল্পকে কখনই সে নামিয়ে আনবে না জনতার মাঝখানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ছবি আঁকবে না সে কখনই। ফলে, তার শিল্পসৃষ্টি দিনের পর দিন দোকানে পড়ে থাকে অসহায় অবহেলিতভাবে, ধুলোর আস্তরণ জমে।

এদিকে অদিতির মনোভাব কিন্তু ঠিক এর বিপরীত---ধ্রুপদী সঙ্গীতের চাহিদা নেই যখন, নেমে এস তখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উঁচু মিনার থেকে, গাও হালকা চটুল গান, যাতে আসবে আর্থিক সাফল্য। হলই বা তা ক্ষণস্থায়ী, তবু আসুক---নাম-যশ-প্রতিপত্তি যত তাড়াতাড়ি হয়।

যুগের চাহিদার সঙ্গে এই আপোষ-রফার মনোবৃত্তি দ্রুত সাফল্য এনে দেয় অদিতিকে, সাফল্যের সোপান বেয়ে উঁচুতে, আরো অনেক উঁচুতে উঠতে থাকে অদিতি। মৃগাঙ্কর চিত্র প্রদর্শনী যখন চরম ব্যর্থতায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে, ঠিক তখনই অদিতির হাল্কা চটুল গানের রেকর্ড বাজার মাত করে, গগনচুম্বী হয় তার বিক্রীসংখ্যা।

মৃগাঙ্ক পড়ে থাকে সেই নীচুতেই---অদিতির জীবনে যতখানি সাফল্য, ঠিক ততখানিই ব্যর্থতা বুঝি তার জীবনে। ক্ষুব্ধ হয় মৃগাঙ্ক, অদিতির তুলনায় নিজেকে বড় ছোট মনে হয় তার। অলক্ষ্যে যেন এক অদ্ভুত প্রতি-যোগিতা হয় ওদের মধ্যে। নারী ও পুরুষের চিরন্তন আধিপত্যের লড়াই।

প্রথমে ছোটখাটো কথা কাটাকাটি, তারপর সেই কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া। তুমুল ঝগড়া। আগুনের ছোট্ট একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানলের রূপ নিয়ে গ্রাস করে যেন এক বিরাট বনভূমিকে। ওদের সম্পর্কের মধ্যে ছোট্ট যে চিড় খেয়েছিল, সে চিড় এক বিরাট ফাটলের আকার নিয়ে দু'জনকে ঠেলে দেয় দু'দিকে।

প্রথম থেকে ওদের ভাব-ভালোবাসা মিলন, তারপর অবস্থার ক্রমাবনতি এবং পরে অদিতির সাফল্য ও মৃগাঙ্কর ব্যর্থতাজনিত ওদের মধ্যেকার বিরোধ ও বিবাদ ইত্যাকার সবকিছুরই নীরব দর্শক ছিল একজন। সে হল এডিথ। অদিতিদের বাড়িতে ছোটবেলা থেকে মানুষ হওয়া অনাথ আশ্রম থেকে নিয়ে আসা একটি মেয়ে। এডিথ প্রথম থেকেই ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, তাই ওদের সম্পর্ক যখন চূড়ান্ত সঙ্কটের মুখোমুখি, তখন সে এগিয়ে এল ওদের মধ্যে---চেষ্টা করল ওদের মধ্যে সেই আগেকার হাসি-গান ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ব্যর্থ হল---ভেঙে গেল ওদের সম্পর্ক।

আর বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে সে ভাঙন আইনানুগ করবার জন্যে এডিথকে দিতে হল অনেক কিছু---একটি মেয়ের যথাসর্বস্ব---তাঁর সুনাম। নীরবে এডিথ মিথ্যা পাপের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে সুগম করে দিল ওদের বিবাহ বিচ্ছেদের পথ।

তারপর তিনজন ছিটকে পড়ল তিন দিকে।

কিছু টাকার ব্যবস্থা করে মৃগাঙ্ক গেল ইউরোপে।

মুক্ত অদিতি উল্কাবেগে এগিয়ে চলল আপন লক্ষ্যের দিকে। সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যেন তার সবকিছু উজাড় করে সার্থক করে তুলতে থাকল তাকে।

দুঃখ, হতাশা আর বেদনায় ফিরে গেল এডিথ তার আগের জায়গায়---অনাথ আশ্রমে।

অনেক দিন বাদে দেশে ফিরে এল মৃগাঙ্ক কিন্তু কোন অভ্যর্থনারই শঙ্খধ্বনি হল না তার জন্যে---সত্যিই তো, একজন ব্যর্থ-রিক্ত মানুষের জন্যে কারই বা মাথাব্যথা থাকবে।

অপরদিকে সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে উঠেও অদিতি নিঃসহায়, একা। অফুরন্ত সুখ আর ঐশ্বর্যের মধ্যেও যেন রিক্ত, ব্যর্থ।

হঠাৎ একদিন রাস্তার মাঝে মৃগাঙ্কের সঙ্গে দেখা হল এডিথের। মৃগাঙ্ক তখন রীতিমত অসুস্থ। এডিথের মন হাহাকার করে উঠল ওই রিক্ত হৃতসর্বস্ব মানুষটির জন্যে। সে তাকে নিয়ে এল তার নিজের ঘরে। তারপর শুরু হল তার সাধনা, জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন নিরাসক্ত এবং সবকিছুর ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলা একজন মানুষকে তার শিল্পকে জাগিয়ে তোলার সাধনা।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে গেল এডিথের সেবা-শুশ্রূষায়, সহানুভূতি-সহযোগিতায় কৃতজ্ঞ মৃগাঙ্ক এডিথকে দূরে ঠেলে দিতে পারল না, গ্রহণ করল তাকে তার নিজের জীবনে। বিবাহিত জীবনের বন্ধনে ভরে উঠল তাদের সংসার। নাই বা রইল সংসারে স্বাচ্ছল্য, তবু সে সংসারে রইল স্নিগ্ধ প্রেম, মায়া-মমতা অকুণ্ঠ সেবা।

এ খবর না যাওয়ার কথা নয় অদিতির কানে, তাই জানতে পারল সে সবই। জানতে পারল মৃগাঙ্কর নতুন সংসারের সঙ্গে তার সাফল্যের সংবাদও। সারা অন্তর-মন হু-হু করে উঠল অদিতির।

কিন্তু জীবনে কি সবকিছু পাওয়া

...রা পারপূর্ণভাবে—যায় না। পূর্ণতার সাথে অপূর্ণতার সুর বাজায় নিয়তি। মুগ্ধ-এডিথের সুখের জীবনেও নেমে এল সেই নিয়তি—এডিথ চলে গেল তার সান্নিধ্যে সংসারের পূর্ণ উপকূল ছেড়ে সেই অকূলে—যেখানকার খবর নিয়ে আজো ফিরে আসে নি কোন পথিক। সুনাভ আর অদিতির দেখা হল—তখন বেলা শেষের পূরবী বাজছে দিগন্ত বিলীন আকাশপটে।

—চিত্রদূত

বেগম মেরী বিশ্বাস একটি স্মরণীয় নাট্য সৃষ্টি

খ্যাতনামা সাহিত্যিক বিমল মিত্রের বহু পঠিত ও জনপ্রিয় ঐতিহাসিক কাহিনী 'বেগম মেরী বিশ্বাস', বর্তমানে বিশ্বরূপা নাট্য মঞ্চে বিরাট সংখ্যক দর্শকদের সমুখে মুন্সিয়ানার সঙ্গে অভিনীত হয়ে চলেছে। বর্তমান বাংলা চিত্রজগৎ বা মঞ্চ জগতে কোন ঐতিহাসিক নাটক এতখানি সাফল্য অর্জন করেছে বলে মনে হয় না। ঐতিহাসিক নাটককে মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত করা যে এক দুরূহ ব্যাপার, আশা করি তা বিশদভাবে বলার কোন প্রয়োজন নেই। সেই দুরূহ ও কঠিন কর্মটি অত্যন্ত দক্ষতার ও মুন্সিয়ানার সঙ্গে উপস্থাপিত করে নাট্যনির্দেশক রাসবিহারী সরকার অবশ্যই দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করবেন। নাটকটিতে যে দলবদ্ধ অভিনয় দক্ষতা আন্তরিকতার সঙ্গে শিল্পীরা সুসম্পাদন করেছেন, ইতিপূর্বে বহু নাটকেই তা বিরল। নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক দর্শককে বিমোহিত করে রাখতে সক্ষম এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। নাটকটির প্রতিটি দৃশ্যে শ্রীসরকারের নাট্যনির্দেশনার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তা সত্যই প্রশংসনীয়। নাটকটিতে যে সব প্রধান প্রধান শিল্পী অভিনয়ে তাঁদের সমস্ত অভিনয় মাধুর্য ঢেলে দিয়ে নাটকটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁদের স্থান, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মরিয়ম বেগমের ভূমিকায় শ্রীমতী জয়শ্রী সেনের অভিনয় মনোমুগ্ধকর। তাঁর বলিষ্ঠ ও সাবলীল অভিনয় দর্শক-মনে গভীরভাবে দাগ কাটবে। শ্রীমতী সেনের অভিনয় সত্যই অভিনন্দনীয়। সিরাজের চরিত্রে সুন্দর অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে মানিয়েছেও ভাল। ক্লাইভের ভূমিকায় শেখর চট্টোপাধ্যায় দর্শক-মন কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর অভিনয় নাটকটিকে বহুলাংশে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। মুন্সির চরিত্রে অনুপকুমার যে অপূর্ব এক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন। নাটকটিতে যে শিল্পী গানে ও অভিনয়ে ভরিয়ে রেখেছেন, তিনি সবিতাব্রত দত্ত। শ্রীদত্তের সুললিত কণ্ঠের গান দর্শকদের গভীরভাবে মুগ্ধ করবে। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে সুন্দর সহযোগিতা করেছেন কণিকা মজুমদার, তরুণকুমার, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক, করালী, নির্মল ঘোষ, বেলা দেবী, সঙ্গীতা, গীতা প্রমুখ। কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীরাসবিহারী সরকার। আলোকসম্পাতে রয়েছেন তাপস সেন। নাটকটির সঙ্গীত পরিচালকরূপে রয়েছেন প্রবীণ সুরকার অনিল বাগচী। বিশ্বরূপার 'বেগম মেরী বিশ্বাস' নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় নাট্য সৃষ্টি। নাটকটির প্রতিটি শিল্পী ও কলাকুশলীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

—শ্রী, চ
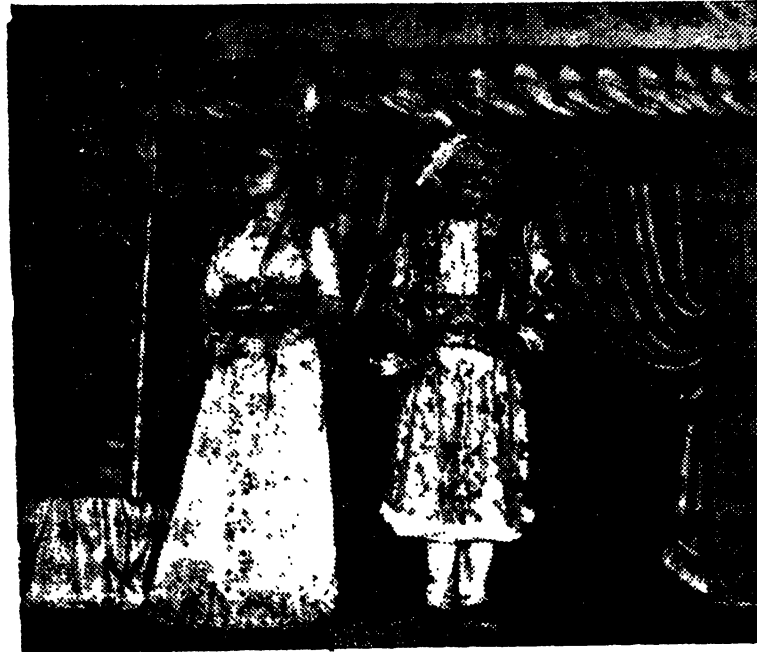
বিশ্বরূপার "বেগম মেরী বিশ্বাস" নাটকের একটি দৃশ্যে মরিয়ম বেগমের ভূমিকায় জয়শ্রী সেন ও সিরাজের চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

মহাকাশে চীন—আমরা কোথায় ?

আজ আট বৎসর যাবৎ ভারতের সহিত চীনের আচরণ এবং ভারত-চীন সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলেই রীতিমত ওয়াকিবহাল আছেন, তাই তাহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেশ করা এখন বাহুল্যমাত্র। সম্প্রতি চীনের একটি সংবাদ আবার নূতন এক আতঙ্কে ভারতবাসীর মনে দুশ্চিন্তার কৃষ্ণমেঘ ঘনায়মান করিয়া তুলিতেছে। দীর্ঘ সময়ের পরিসরে একদা যে চীনকে ভারত-রাষ্ট্র প্রীতির ও মৈত্রীর বন্ধনে সহাবস্থানের আশ্বাসে মিত্রতার ডোরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল---চীনের সহিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ সর্বপ্রকার সহযোগিতার হস্তটি আগাইয়া দিয়াছিল---সেই চীনই নানাভাবে ভারতকে উত্যক্ত এবং বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। এবার ভারতের সর্বনাশ সাধনের প্রচেষ্টায় চীন একটি বড় ধাপ অতিক্রম করিল।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে চীনের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করিতে সুরু করিয়াছে এক শত ছিয়াত্তর কিলোগ্রাম ওজনসম্পন্ন এই কৃত্রিম উপগ্রহটি একশত চোদ্দ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী পরিক্রমার প্রতিশ্রুতি বহন করে। ১৯৬৪ সালে অর্থাৎ ছয় বৎসর পূর্বেই চীন পৃথিবীর পারমাণবিক শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া চীন তাহার পরমাণবিক শক্তি ও প্রাচুর্যের প্রমাণ দিয়াছে এবং পৃথিবীর পঞ্চম পারমাণবিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

সমগ্র ঘটনাটি অবশ্যই এক বিরাট প্রতিভা এবং সমৃদ্ধির পরিচায়ক। প্রধানত এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন বিপুল অঙ্কের অর্থের। সেই অঙ্ক সামান্য নয়। হাজার হাজার কোটি টাকার এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তারপর শুধু অর্থই এখানে শেষ কথা নয়। এই অর্থব্যয়ের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে গুণী, কুশলী, প্রতিভাধর বিজ্ঞানসাধকদের উপর। সামান্য প্রতিভার বা অল্প মেধার বিজ্ঞানীর দল এখানে কদাচ সাফল্যলাভ করিতে পারেন না। অতি উচ্চস্তরের এবং অসাধারণ মেধাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকরাই এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবে পরিণতি দিতে পারেন। অতএব এখানে দেখা যায় যে একমাত্র যে দেশ যথেষ্ট অর্থ এবং দিকপাল বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় আপন অধিকারে রাখে, এ ক্ষেত্রে সেই দেশই জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য আপন কণ্ঠে ধারণ করিতে পারে। এই যুক্তির আলোকেই চীনের অর্থ এবং বৈজ্ঞানিক সম্পদের বিরাটত্ব সূর্যালোকের ন্যায়ই প্রতীয়মান হইতেছে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চীন যেভাবে আপন উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিস্ময়কর নিদর্শন রাখিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সকল দিক দিয়া স্বীয় উন্নতির যে প্রচেষ্টার পরিচয় চীন দিয়াছে, তাহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, এখন প্রশ্ন এই---ইহা যত বড় সাফল্যেরই পরিচায়ক হউক বা চীন যত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই হউক, ভারতের নিকট এই সাফল্য বা এই উন্নতি কোন মূর্তিতে দেখা দিবে ? ভারতের পক্ষে ইহার ফলাফল কি হইতে পারে সে সম্বন্ধে এই বিশেষ মুহূর্তে যথেষ্ট পরিমাণ চিন্তাসাপেক্ষ। পারমাণবিক ক্ষেত্রে চীনের এই ক্রমবর্ধমান সাফল্য চীন ভারতের সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া বলা যায় যে, যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ। ভারতের প্রতি চীনের আর যাহাই থাকুক, মৈত্রীভাবটুকু যে নাই, তাহা আশা করি চোখে আঙুল দিয়া দেখানোর প্রয়োজন হয় না। কারণ এই গভীর সত্যটি সকলেরই মর্মে মর্মে অনুভূত। পারমাণবিক শক্তিতে তাহার এই বিপুল অগ্রগতি ভারতের সর্বনাশসাধনের পক্ষে সে যে কাজে লাগাইবে না, এমন ধারণা কদাচ এই পরিপ্রেক্ষিতে করা চলে কি ? এই মারাত্মক ও শক্তিশালী অস্ত্রটি আপন অধিকারে রাখিয়া সে কি ভারতকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিবে ? ভারতকে যে নানাভাবে উত্যক্ত করিয়া চলিয়াছে এই 'পাশুপত' সে কি শুধু ভারতকে দূর হইতে দেখাইয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিবে, না হোয়াং হোর জলে নিক্ষেপ করিবে ?

অতএব এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের অবিলম্বে সজাগ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। চীন যেমন মারাত্মক শক্তির অধীশ্বর হইয়াছে, ভারতেরও সেই দুর্জয় শক্তিকে প্রতিরোধ করার সাধনায় আত্মনিয়োগ এখনই দরকার। আলাপ আলোচনা শূন্যগর্ভ আস্ফালনে গালভরা বাক্যের প্রয়োগে দীর্ঘ সময়ের অপচয়ই শুধু হইয়াছে, আসল কাজ কিছুই হয় নাই। এখন, এই মুহূর্তে এই শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত শক্তি অর্জন করার সাধনাই ভারত সরকারের একমাত্র জাতীয় কর্ম হওয়া উচিত। দেশের ভবিষ্যত নিরাপত্তা, জাতীয় সম্মান যেখানে প্রশ্ন সেখানে আর যাহাই হউক উদাসীন্য শোভা পায় না। আমাদের লোকসভার বিভিন্ন সদস্য এই দিকটিতে [illegible]

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এবং লোকসভাতেও এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রতি যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

অতএব, আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রকৃত প্রতিরোধের কাজে অগ্রসর হওয়াই ভারতের এখন আশু কর্তব্য। আমরা বিশ্বাস রাখি মহৎ সৃষ্টির জন্মভূমি, মহতের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ এখন শত সহস্র সমস্যা জর্জরিত হইলেও শক্তিশূন্য সে নয় শক্তির অন্তর্ধান এ দেশের আকাশ বাতাস মাটি হইতে আজও ঘটে নাই।

সর্বনাশের ইঙ্গিত

মাথার উপর যাহার ধ্যান মৌন হিমালয় সদাজাগ্রত সতর্ক প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান, লাস্যময়ী কন্যা কুমারিকা যাহার চরণপ্রান্ত অহোরাত্র অবিরাম ধারায় ধৌত বিধৌত করিয়া চলিতেছে, যে দেশ সমগ্র বিশ্বের সুধীসমাজে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি ও সুপ্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমিরূপে সম্পূজিত, সেই ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষের যে বর্তমান আলেখ্য আমাদের নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে তাহা যেমনই ভয়াবহ তেমনই আতঙ্কজনক। অজস্র সমস্যার শিকার এই ভারত ভূমির অন্তর্ভুক্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সমস্যা যেন একেবারে লতায় পাতায় পল্লবিত হইয়া বীজ হইতে বিরাট মহীরুহে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পশ্চিমবাঙলার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা যে কতখানি অনিশ্চিত এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা যে আজ প্রায় অন্তর্হিত এ কথা বলিলে অত্যুক্তির দোষে দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষের অজস্র আভ্যন্তরীণ সমস্যা ছাড়াও অতি নিকটেই যে দুটি বহিঃশত্রু ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের স্বরূপও ভারতবাসীর অজানা নয়। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতি এক ঘোর আবর্তের সম্মুখীন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই আবর্ত হইতে কোন পথ অনুসরণ করিলে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তার উপযুক্ত সময় আজ আর দুয়ার হইতে অদূরে নয়। ভারতের সমগ্র দিকমণ্ডলে আজ যে সর্বনাশের ইঙ্গিত প্রস্ফুটিত হইয়া ভারতের সমগ্র জনজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের সহযোগী 'যুগবাণী' তুলিয়া ধরিয়াছেন,— ভারতের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গবাসীর সেই প্রকৃত চিত্রটি সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য মনে করিয়া এই স্তম্ভে আমরা তাহা পুনরুদ্ধৃত করিতেছি—

বাংলা সম্পর্কে কেন্দ্রের আসল মতলবটি নগ্নভাবে ধরা পড়িয়াছে। বাংলায় অরাজক অবস্থা বজায় থাকুক এই তাঁদের মনের কথা। কারণ এতে তাঁদের লাভ আছে। বাংলা হইতে শিল্প ভারতের নানা রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে তাতে বাংলার ক্ষতি ঘটে, কিন্তু মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের সমূহ লাভ। কারণ বাংলা হইতে মূলধন ও শিল্প কারখানা সরিয়া এই সব রাজ্যে যাইবে। তাই লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন বারবার একই সুরে গীত গাহিতেছেন যে নক্সালপন্থীরা যে উপদ্রব করিতেছেন তাহা কড়া হাতে দমন করা হইবে না, তাহার মোকাবিলা রাজনৈতিক উপায়ে করিতে হইবে। ইহা ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। কারণ নক্সালপন্থীদের রাজনৈতিক বক্তব্যের জবাব দিবার ক্ষমতা কংগ্রেসী শাসকদের নাই। তেইশ বছরের শাসনে ভূমি সমস্যার সমাধান যারা করে নাই, কৃষকদের যারা বঞ্চনা ও শোষণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তারা কৃষক বিদ্রোহের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইবার অধিকার হারাইয়াছে। চ্যবন তা ভালোভাবেই জানেন, তাই আজ তিন বছর যাবৎ তাঁর মুখে রাজনৈতিক উপায়ে মোকাবিলার কথা শোনা সত্ত্বেও কাজের নমুনা কিছু দেখি নাই। নক্সালপন্থীরা ইতিমধ্যে সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাদের কথা ও কাজের কোন অমিল নাই, আর মনের কথা খুলিয়া বলার সৎসাহসও তারা যথেষ্ট দেখাইয়াছে। চ্যবন লোকসভার বিবরে আশ্রয় লইয়া যত লম্বা বুলি বলেন, নক্সালীরা তত সাহসের সঙ্গে নতুন নতুন রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া বসে সবদিক বিবেচনা করিয়া প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাই লাখ কথার এক কথা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন নক্সালীদের দমন করার ক্ষমতা সরকারের নাই, পারিলে জনসাধারণ তাহা করুক। গান্ধীর ছবি, গান্ধীর বই প্রভৃতি পুড়াইয়া নক্সালীরা খোদ রাষ্ট্রকেই চ্যালেঞ্জ করিয়া বসিয়াছে। কারণ গান্ধীকে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতীক রূপে কংগ্রেসীরাই খাড়া করিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও দেখা গেল রাষ্ট্র নড়িয়া বসে না পর্যন্ত। কারণটা কী। যারা চীন ও পাকিস্তানের যৌথ আক্রমণের মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত আছে, বলিয়া প্রত্যহ দুবেলা ঘোষণা করে সেই রাষ্ট্রনায়করা কিছুসংখ্যক নক্সালপন্থীকে কি এত ভয় পান ? ভারতের পুলিশ, মিলিটারী ও রাষ্ট্রযন্ত্র যে এত দুর্বল ও ভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছে তাহা তো আমরা জানিতাম না। সত্যই কি নক্সালপন্থীদের দমনের ক্ষমতা রাষ্ট্র ও সরকারের নেই ?

নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বাংলার বিষয় লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাকা সাজিতে চান বলিয়াই কলিকাতায় নক্সালপন্থীদের উপদ্রব বন্ধ করা হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ সর্বত্র তারা দৌরাত্ম্য চালাইয়াছে,

সিনেমা হল, [illegible] দোকান ও ট্রাম গাড়ি পুড়াইয়াছে, প্রতিদিন বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে। বিশ্বসুদ্ধ লোক ভাবে কলিকাতা চীনাপন্থীদের ঘাঁটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলাম সরকার বলিতেছেন, আসাম ও পশ্চিমবাংলাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার ষড়যন্ত্র মাওবাদীরা করিতেছে। চারু মজুমদার নাকি তাঁর অনুচরদের বলিয়াছেন যে, ১৯৭০ সালের শেষে বা ১৯৭১ সালের গোড়ায় চীন বাংলার উদ্ধারের জন্য মুক্তিফৌজ পাঠাইবে। কমরেডদের তাই তিনি দ্রুত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, দিল্লী, ১৭ই এপ্রিল)।

পাঁচ-ছয় জনের ছোট ছোট স্কোয়াড অতর্কিতে নিঃশব্দ গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করিয়া দশ মিনিটের মধ্যে কার্য হাসিল করিয়া যাতে সরিয়া পড়িতে পারে—এই রকম সামরিক ট্রেনিং কমরেডদের দেওয়া হইতেছে। এতদিন গ্রামের জোতদারদের গলা কাটা ছিল এদের প্রোগ্রাম, এখন কলিকাতার ধনী ও শিল্পপতিদের গলা কাটার প্রোগ্রাম নাকি লওয়া হইয়াছে। ঐ রকম দুচারটি ঘটনা ঘটিলে শিল্পপতিরা রাজ্য ছাড়িয়া পলাইবে। যে ভীতিগ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় তারা ইতিমধ্যেই দিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার সেই সুযোগের অপেক্ষায় চুপচাপ বসিয়া আছেন। নামে অবশ্য তারা পুলিশদের কোথাও কোথাও পাঠান, কিন্তু কার্যত কিছু না করার জন্য একটা আলাদা নির্দেশও হয়তো সেই সঙ্গেই দিয়াছেন। গত ১৮ই এপ্রিল আমাদের কার্যালয়ের সামনে একটি ট্রাম পোড়াইবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ট্রামটি পুড়িবার পর পুলিশ আসিয়াছিল। আসিয়াও বিশেষ কিছু করে নাই।

কলিকাতায় ট্রাম পুড়াইয়া যখন কৃষিবিপ্লব করা হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে বসিয়া স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব সৈয়দ মুস্তাক মুর্শেদ ও তাঁর ভগ্নীপতি শিক্ষা দপ্তরের [illegible] (কর্পোরেশনের [illegible] [illegible] মুর্শেদ) নাকি পাকিস্তানের মিলিটারী গোয়েন্দা দপ্তরের ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতেছেন। এঁরা দুজনই ছিলেন জ্যোতি বসুর প্রশাসনিক কর্মে ডান ও বাম হাত। এবং জ্যোতি বসুকে এঁরা নাকি ভরসা দিয়াছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লব সুরু হইলেই পাকিস্তান ও চীন সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিবে। কাম্বোডিয়ার বেলাও কি চীন আসে নাই? জ্যোতি বসু খুশি হইয়া বেশ কয়েকজন অফিসারকে ডিঙ্গাইয়া আদি ও নব দুই মুর্শেদকেই প্রোমোশন দিয়াছিলেন।

চীন ও পাকিস্তান উভয়ের এজেণ্টরাই ভারতে, বিশেষত বাংলায় কাজ করিতেছে। পাকিস্তান যে কোন মুহূর্তে বাংলার প্রান্ত দিয়াই ভারত আক্রমণ সুরু করিবে। শোনা যাইতেছে তার এই মহতী কাজে চীন ছাড়া রাশিয়াও তাকে প্রচণ্ড সমর্থন করিতেছে। রাশিয়া এখন এশিয়ার মুসলিম দেশগুলিকে চালাও সাহায্য দিবার নীতি লইয়াছে। [illegible] সঙ্গে আয়ুবের [illegible] বিশ্বমুসলিম ব্লক গঠনের [illegible] উস্কানি দিতেছে। এই সব মুসলিম দেশগুলিতে কমিউনিজমের কোন স্থান নাই বরং কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত —পাকিস্তানেও তাই—কিন্তু তাতে রাশিয়ার কিছু যায় আসে না। রাশিয়ার উস্কানিতেই বিশ্বমুসলিম ব্লকের মধ্যে শুধু পাকিস্তান নয়, ভারতেরও অর্ধাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দিল্লীতে ইস্রায়েলের কন্সাল ইয়াকভ সফিল ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে সিরিয়ার স্কুলপাঠ্য ভূগোলের বইগুলির অন্তর্ভুক্ত একটি মানচিত্র উপহার দিয়াছেন। ঐ মানচিত্রে দেখানো হইতেছে যে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশ বিশ্বমুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এলাকা। মানচিত্রটি আমরা দেখিয়াছি। ভারত সরকার এ বিষয়ে এখনো কিছু করেন নাই। রাশিয়ার নিজের প্রস্তুত মানচিত্রে

ভারতের স্বাবস্তৃত এলাকাকে পাকিস্তান ও চীনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখানো হইয়াছে। লোকসভায় আমাদের সরকার কবুল করিয়াছেন যে, ঐ বিষয়ে রাশিয়ার দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। পাকিস্তান যাতে ভারত আক্রমণ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রাশিয়া পাকিস্তানকে দিয়াছে ২০০ ট্যাঙ্ক, মিগ বিমান, সাবমেরিন ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। চীনও পিছাইয়া নাই। চীনের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের মন্ত্রী ফ্যাং-ই এই মাসের গোড়ার দিকে ঢাকায় আসিয়া একটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন---ঐ অস্ত্র কারখানাটি নির্মাণে চীন ৩০ কোটি টাকা দিয়াছে।

পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের অজুহাত ও সুযোগ সৃষ্টি করায় ভারতের মুসলমানদের একাংশের আগ্রহের অভাব নাই। চাইবাসায় হিন্দুদের রামনবমীর মিছিল সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করিয়া তারা দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছে। নানাস্থানেই এই ধরণের কাণ্ড তারা করিতেছে। আমাদের গণতন্ত্রের পুরা সুযোগ লইতেছে কমিউনিষ্টরা আমাদের সেকুলারিজমের পুরা সুযোগ লইতেছে পাকিস্তানপন্থী মুসলমানরা। আশ্চর্য এই যে দুপক্ষের মধ্যে গভীর মিল আছে। চাইবাসার ঘটনায় মুসলমান ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে যোগাযোগ ধরা পড়িয়াছে। ভারত বিরোধিতার ক্ষেত্রে কমিউনিষ্টদের মধ্যে কোন অনৈক্য নাই। ডাঙ্গেপন্থী, মার্কসবাদী ও মাও-বাদীরা ভারতের শত্রুতা করার ক্ষেত্রে হাত মিলাইয়া চলে। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করিলে বাংলার প্রান্তেই এবার করিবে। আর ঠিক সেই সময়ে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য অফিসগুলি ভিতর হইতে অচল করিয়া দেওয়া হয়, কী ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, কী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ উভয় স্থানেই কাজ বন্ধ হইয়া যায়, কলিকাতার দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থা ধর্মঘটের কবলে পড়ে ও ব্যাপক হারে ট্রেণ ও অন্যান্য যানবাহন সাবোটাজ করা হয় তবে বিস্মিত হইব না। রাজ্যপাল ধাওয়ান নক্সালপন্থীদের ও মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক সাজিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার মধ্যে ত্রিশভাগ, মুসলমান, এই যুক্তিতে অবাঙালী মুসলমান কিদোয়াইকে প্রশাসকরূপে নিয়া আসিয়াছেন। এই ব্যক্তি ফকরুদ্দিন আলি আমেদের চেলা, আসামে ছিলেন; আসামের পাকিস্তানপন্থী মুসলিম রাজনীতির সঙ্গে এঁর যোগাযোগ ছিল কি না রাজ্যপাল কি তা জানাইবেন?

ঘটনার যোগাযোগ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ঘোরতর বিপদের সূচনা করিতেছে। যে কোনোদিন বিপদ করাল রূপ লইয়া দেখা দিতে পারে। পাকিস্তানী বোমার ঘায়ে কলিকাতা নগরী ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেলে তারপর হয়তো আমাদের সরকারের ঘুম ভাঙিবে। এমন কি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামকে শত্রুর হাতে সঁপিয়া দিয়াও নিজেদের গা বাঁচাইবার একটা পরিকল্পনা হয়তো কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হইবে না। ইংরেজের বঙ্গ বিজয় ভারত বিজয়ের পথ সুগম করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ গেলে কি ভারত থাকিবে? ইন্দিরা গান্ধীর অবশ্য এত সব কথা ভাবার সময় নাই। নিজেও যদি রাখিতেই তাঁর কালঘাম ছুটিয়া যাইতেছে রাশিয়ার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার শক্তিও তাঁর নাই।

শোক সংবাদ

মহারাজা স্যার জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর

কোচবিহারের মহারাজা স্যার জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর গত ২৮এ চৈত্র ৫৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ইনি কোচবিহারের স্বনামধন্য মহারাজা স্বর্গত স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং পুণ্যশ্লোক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বড় মেয়ে সুকবি মহারাণী সুনীতি দেবীর পৌত্র ছিলেন। মা ইন্দিরা ছিলেন বরোদার গায়কোয়াড়ের কন্যা। হ্যারো-কেম্ব্রিজ ও ট্রিনিটিতে শিক্ষালাভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন ও লেঃ কর্ণেল পদে ইনি উন্নীত হন। ১৯৪৫ সালে কে-সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন। শিকার, খেলাধূলা এবং বিমান চালনার ক্ষেত্রে তিনি এক অভাবনীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় গত ২৭এ চৈত্র ৬২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই উল্লিখিত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৯ সালে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কালে তাঁর অসাধারণ কুশলতা নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে এক অগ্রগণ্য প্রকাশন সংস্থায় পরিণতি দেয়। সাড়া জাগানো আলোড়ন আনা, মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে বাঙলা সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এইভাবে সহায়তা করে গেছেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

শ্রীশ্রী বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসদকুমার

লিউসিপিয়াস কন্যাদের অপহরণ

—পিটার পল রুবেন্স-অঙ্কিত

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

॥ ৪৯ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭৭ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ॥

কথামৃতম্

যোগ
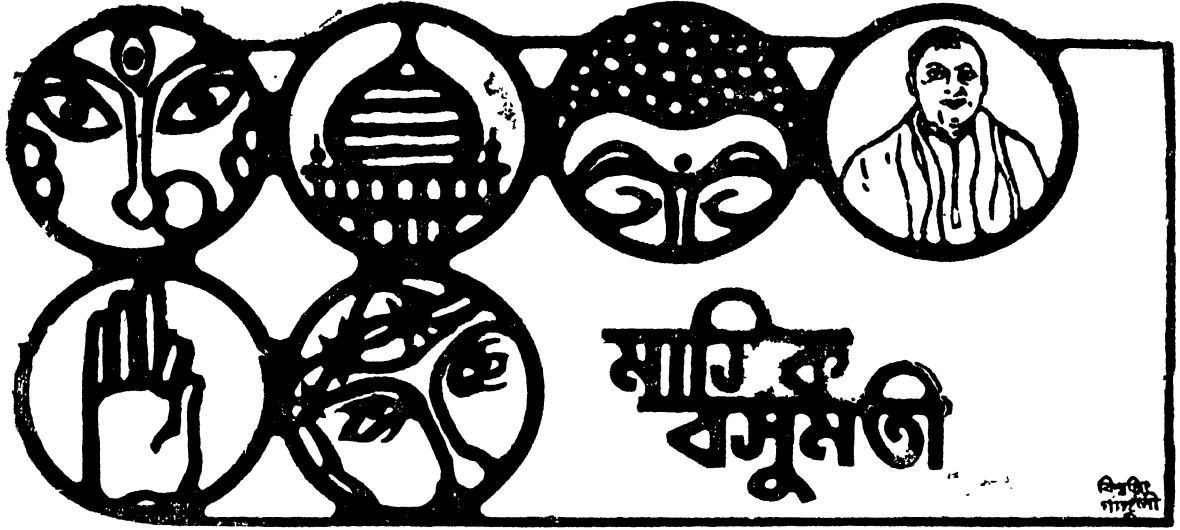
(৩) জ্ঞানবিঘ্ন—ধর্ম বা শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সর্বদা বৃথা আলোচনা করা; বিভিন্ন আসন, নেতিধৌতি, নাড়ী সঞ্চার বিজ্ঞান অর্থাৎ দেহস্থ সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর কোনটার কি নাম, কি কার্য, এসব বিষয়ে অনুসন্ধান নিয়েই ব্যস্ত থাকা, সকল রকম হঠ প্রক্রিয়ার জ্ঞান অর্জন, আত্মপ্রাধান্য বৃদ্ধির জন্য কেবল তর্ক বিতণ্ডা—এ সকল জ্ঞানবিঘ্ন।

(৪) ভোজনবিঘ্ন—রসবৃদ্ধিকর আহার সাধনার বিঘ্ন-স্বরূপ; কারণ তাতে জিহ্বামূলে স্ফীতি ও বেদনা হ'য়ে যোগ-সাধনায় ব্যাঘাত হয়। তাই যে সকল খাদ্যে শরীরে নূতন নূতন রসের সঞ্চার হয়, সে সব খাদ্য যোগীর খাওয়া অনুচিত।

এ সব বিঘ্ন কখন আসে? কেন আসে? গীতায় ভগবান বলেছেন—যে মন বিবেকশূন্য ও বিষয়ান্ধ তার প্রবৃত্তি সতত বিষয়েই আকৃষ্ট হয়; সেই মনই শত্রুর মত কাজ ক'রে তাকে বিপথে নিয়ে যায়—'অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ' (গী—৬।৬)। যোগারূঢ় না হওয়া পর্যন্ত—ইন্দ্রিয় জয় ক'রে প্রশান্ত যতক্ষণ না হওয়া যায়, ততক্ষণ শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মানাপমান ইত্যাদি বোধ থাকে বলে চিত্ত বিচলিত হয়। এই সকল চিত্তচাঞ্চল্য যাতে হয়, সে সকল বিষয়ে সতত বিবেকযুক্ত বিচার দ্বারা নির্লিপ্ততা বা উদাসীন ভাব আনতে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন (গীতা—৬।৯)—সুহৃদ (যিনি প্রত্যুপকারের আশা না রেখে মংগল করেন), মিত্র (যাঁরা স্নেহবশতঃ মঙ্গল করেন, যেমন পিতামাতা), অরি (অপকারী শত্রু), উদাসীন (যিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না), মধ্যস্থ (যিনি উভয় পক্ষের হিতৈষী), দ্বেষ্য (বিরাগ হেতু যাকে অপ্রিয় জ্ঞান হয়), বন্ধু (প্রিয়জন, স্বজন, কুটুম্ব), সাধু এবং পাপী, এ সকলকে সমান জ্ঞান যিনি করতে পারেন তিনিই যোগারূঢ় হ'তে

এই সমান ভাব আনতে না পারলে চিত্তের চাঞ্চল্য কমে না—চিত্ত প্রশান্ত হয় না। যথাক্রমে অভ্যাস দ্বারা চিত্ত পুষ্ট ও প্রশান্ত হ'লে কোন বিষয়ই যোগবিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।

এ বিঘ্নগুলি ছাড়া যোগসাধনার আরও কতকগুলি চিত্ত-বিক্ষেপকারী অন্তরায় আছে। সেগুলি চিত্তের বৃত্তির সঙ্গে উৎপন্ন হ'য়ে যোগীর চিত্তে বিক্ষেপ জন্মিয়ে তাকে যোগভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। যোগীর সেদিকেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

এ অন্তরায় নয়টি। সেগুলি এই :—

(১) ব্যাধি—বাতপিত্তাদি ধাতুত্রয়, রস (আহার্যবস্তুর পরিণাম) এবং করণ (ইন্দ্রিয়গণ)—এ সকলের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম বা বৈষম্য থেকে ব্যাধি জন্মায়।

(২) স্ত্যান—চিত্তের অকর্মণ্যতা।

(৩) সংশয়—'ইহা এরূপ কি এরূপ নয়' এই দ্বিধাগ্রস্ত জ্ঞান।

(৪) প্রমাদ—সমাধির উপায়ের অনুশীলন।

(৫) আলস্য—চিত্তের জড়তা হেতু কার্যনির্বাহে অযত্ন বা অপ্রবৃত্তি।

(৬) অবিরতি—চিত্তের বিষয় প্রাপ্তির জন্য বাসনা বা লোভ।

(৭) ভ্রান্তি দর্শন—বিপর্যয় জ্ঞান অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে জ্ঞান।

(৮) অলব্ধ ভূমিকত্ব—সমাধিভূমির অপ্রাপ্তি। এবং

(৯) অনবস্থিতত্ব—সমাধিভূমি লাভ করেও তাতে স্থিতি বিষয়ে সামর্থ্যহীনতা।

এ সকল অন্তরায়ে লক্ষ্য রেখে যোগসাধনা কর্তব্য।

যোগাঙ্গগুলির নিখুঁত অনুশীলনে যোগীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির লাভের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বিভূতি

তুচ্ছ করেন; কারণ যে ব্যক্তি বিভূতির দিকে মন দেয়, তার মনে একটা মিথ্যা গর্ব এসে পরিণামে কৈবল্য লাভ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

যোগের শেষ সীমায় পৌঁছুলে জগৎ-বিস্মৃতি আসে—সুষুপ্তিতে যেমন জগৎ-বিস্মৃতি হয়, তেমনি বিস্মৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যোগ কাকে বলে? যোগ হচ্ছে মনটিকে কুড়িয়ে এক জায়গায় করা—মনের বিষয়ান্তর-নিবৃত্তি; একটি মাত্র বিষয়ে (ঈশ্বরে) মনের রতি—এক লক্ষ্য, কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি। চাতকের মত; নদ-নদী জলে পরিপূর্ণ, সাত সমুদ্র ভরপুর—চাতক সে জল খাবে না। মেঘের জল পড়বে, তবে খাবে।

"একেই বলে মনকে বৃত্তিশূন্য করা। যোগীরা বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনই যোগ। বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে পরমাত্মাতে স্থির করলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ হয়। নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যানচিন্তাদ্বারা এই যোগ সাধন করতে হয়। আবার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ।

"মন সবটা কুড়িয়ে না আনলে, মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না। ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। সংসার হাওয়া মনরূপ দীপশিখাকে সর্বদাই চঞ্চল করছে; ঐ শিখাটি যদি আদপে না নড়ে তা হ'লে ঠিক যোগের অবস্থা হয়। বাহ্যবিষয় যদি মনরূপ নিক্তির একদিকে ভর করে, তা হ'লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটা মন,—উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ।

"কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে যোগ হয় না। কামিনী-কাঞ্চনরূপে মায়া মন থেকে গেলেই যোগ। একেবারে বিষয়াসক্তি ত্যাগ, কোন কামনা-বাসনা রাখতে নাই। মন শুদ্ধ হলে যোগ হয়। মনের বাস কপালে (আজ্ঞা চক্রে), কিন্তু দৃষ্টি নিচের দিকে। মনের ঊর্ধ্ব দৃষ্টি না হলে যোগ হয় না।

'পরমাত্মা চুম্বক পাথর জীবাত্মা সূঁচকে টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু সূঁচে মাটিমাখা থাকলে চুম্বক টানে না; মাটি সাফ ক'রে দিলে আবার টানে। কামিনীকাঞ্চন মাটি পরিষ্কার করতে হয়। তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে সেই চোখের জলে মাটি ধুয়ে যায়। খুব পরিষ্কার যখন হয়, তখন চুম্বক টেনে নেয়—তবেই যোগ হয়। কাঁদার মত কাঁদতে পারলেই যোগ হয়। যোগে সিদ্ধ হ'লেই কুম্ভক হয়—তার পর সমাধি হয়, দর্শন হয়। যোগ যেন দূরবীন! সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সব বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, যোগ দূরবীন দ্বারা তা প্রত্যক্ষ হয়।

"যোগ প্রধানত তিন রকম; কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ। তা ছাড়া আছে মনোযোগ, হঠযোগ, এই সব। যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের দ্বারা; তীর্থভ্রমণ, দণ্ড-ধারণ, মধুকরী, পূজা, জপ, এ সব কর্মদ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হ'য়ে করতে পারলে যে কর্মই কর, তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

"যাদের সংসারে থেকেও ঈশ্বরে মন থাকে, তাদের ভোগ ও যোগ দুই-ই থাকে। জনক রাজার যোগও ছিল, ভোগও ছিল। তাই জনক রাজর্ষি—রাজা, ঋষি দুই-ই।

"গিরীশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না; যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ। কিন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না গন্ধ একটু থাকবেই। অনেকদিন ধ'রে কামিনীকাঞ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়।

"ওরা থাক আলাদা। যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা, দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে। অসুররা নানা ভোগও কচ্ছে, আবার নারায়ণকেও লাভ কচ্ছে।

"কেশবের যোগ, ভোগ। সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে। নবীন নিয়োগী—তারও যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে; দুর্গাপূজায় সময় বাপ-ব্যাটা দু'জনেই চামর কচ্ছে' আর দেবেন্দ্র ঠাকুর।

"গোস্বামীদের আর ব্রহ্মজ্ঞানীদের (ব্রাহ্ম) যোগ ও ভোগ দুই-ই থাকে। আবার ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়।"

যোগাযোগ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঈশ্বরলাভ তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে। তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়।

"একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ—এগুলো সুযোগ। হয়তো কোন ভাই সংসারের ভার নিলে; হয়তো স্ত্রীটি বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্মিক; কি বিবাহ আদপেই হলো না, সংসারে বদ্ধ হতে হলো না;—এই সব যোগা-যোগ হলে হয়ে যায়।

"একজনার বাড়িতে খুব অসুখ—ছেলেটি যায় যায়; ব্যাকুল হয়ে উপায় খুঁজছে। একজন বললে,—মড়ার খুলিতে স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল পড়বে, আর একটা সাপ একটা ব্যাঙকে তাড়া করে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ ঐ মড়ার খুলিতে পড়বে; সেই বিষজল রোগীকে খাওয়াতে পারলে সারবে। লোকটি সেই
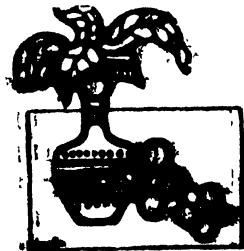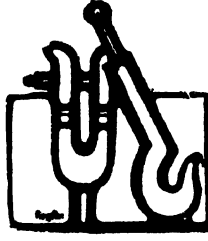
ঔষধ খংজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরংলো, তখন বৃষ্টিও হচ্ছে। সে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বলছে—ঠাকুর, এইবার মড়ার খংলি জংটিয়ে দাও। ব্যাকুল হয়ে খংজে খংজে মড়ার খংলি পেলো—তাতে স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলও পড়েছে। আরো ব্যাকুল হয়ে তখন সে প্রার্থনা করছে—ঠাকুর, এবার ব্যাঙ্ ও সাপ জংটিয়ে দাও। তার ব্যাকুলতায় তেমনি সবই জংটে গেল; দেখতে দেখতে একটি সাপ একটা ব্যাঙকে তাড়া করে এলো, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ ঐ মড়ার খংলিতে পড়ে গেল।

"ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি শংনবেনই শংনবেন—তিনিই সবরকম যোগাযোগ করে দেবেন।

"তবে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। ঘর থেকে বাইরে এসে না দাঁড়ালে আতস কাচে সূর্যের কিরণ পড়ে না। ষোলআনা মন ঈশ্বরকে দিয়ে শরণাগত হতে হবে।"

যোগী

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে নিয়ে পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যানচিন্তা করে; উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না। মন যোগীর বশ; যোগী মনের বশ নয়।

"যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে—সর্বদা আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফ্যালে। দেখলেই বংঝা যায়। যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে; উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে।

"যোগী দংরকম—ব্যক্ত যোগী, আর গংপ্ত যোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে, তারা ব্যক্ত যোগী; সকলে তাদের চিনতে পারে। গংপ্ত যোগী সংসারে থাকে—তাদের মনে ত্যাগ, বাইরে নয়। কেউ তাকে টের পায় না।

"যোগীর লক্ষণ কি? তাতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খংব কাছে দেখে—হৃদয়ের মধ্যে দেখে। যত গাঢ় এই যোগ হবে ততই বাইরের জিনিষ থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমালে বিল্বমঙ্গলের কথা আছে। সে এক বেশ্যালয়ে যেতো। সেদিন তার পিতৃশ্রাদ্ধ; সব কাজ সেরে অনেক রাত্রে সে বেশ্যালয়ে যাচ্ছে। বেশ্যার ভাবনায় বিভোর হয়ে কোনখান দিয়ে যাচ্ছে কোন হংস নাই! এক যোগী চক্ষু বংজে ঈশ্বরের চিন্তা করছিল তার গায়েই বিল্বমঙ্গলের পা লেগে গেল, বিল্বমঙ্গল জানতেও পারলো না। যোগী রাগ করে বলে উঠলো—'তুই কি কানা? আমি ঈশ্বর চিন্তা করছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস!' বিল্বমঙ্গল বললে—'আমায় মাপ করবেন। কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা করি, আমি বেশ্যাকে চিন্তা করে হংস হারিয়ে ফেলেছি, আর আপনি ঈশ্বর চিন্তা করছেন, তবং আপনার বাইরের হংস কি করে আছে?' বিল্বমঙ্গল নিজের মনের লক্ষণ বংঝতে পারলো। বেশ্যাকে গিয়ে বললো—'তুমি আমার গংরং। তুমি আমায় শিখিয়েছো, কি রকম করে ঈশ্বরে অনংরাগ করতে হয়।' তারপর বিল্বমঙ্গল সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল।"

যোনিমংদ্রা

প্রথমে পংরকম্বারা মনকে মংলাধার পদ্মে স্থাপন করে, তন্মধ্যস্থ যোনিমণ্ডল আকুঞ্চিত করে যোগসাধন করতে হয়। ঐ যোনিমণ্ডলের কন্দর্পবায়ংর (এই কন্দর্প বায়ং জীবাত্মরূপিণী কুণ্ডলিনীকে নিজ অঙ্কে ধারণ করে সমস্ত চক্রগংলির সাধন করান; সহস্রারে নিয়ে গিয়ে সমস্ত সাধন করান; আবার জীবাত্মাকে নিজ অঙ্কে ধারণ করে সাধকের ইচ্ছা অনংযায়ী মার্গে নেমে এসে কুণ্ডলিনী না জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত সাধকের জন্মান্তরের সাধনমার্গ অনংযায়ী আধ্যাত্মিক প্রেরণা দান করেন) ঊর্ধ্বভাগে সংক্ষ্মা শিখারূপিণী চৈতন্যস্বরূপা পরমা কলাকুণ্ডলিনীকে সাধক এরূপ ভাবনা করবেন যে আত্মা সেই পরমা কলাদ্বারা পরিব্যাপ্ত ও তার সঙ্গে একীভূত; আর মন, প্রাণ ও আত্মার সঙ্গে একীভূত ঐ দেবী ক্রমে ক্রমে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ (ব্রহ্ম গ্রন্থি), বাণ লিঙ্গ (বিষ্ণু গ্রন্থি), এবং ইতর লিঙ্গ (রুদ্র গ্রন্থি) ভেদ করে সংষংম্নার মধ্যস্থ ব্রহ্মমার্গে ঊর্ধ্বমংখে চলেছেন। এভাবে চলে যখন কুণ্ডলিনী অকুলে (সহস্রারে উপস্থিত হয়ে কুলকুণ্ডলিনী হবেন, তখন তিনি সেই বিসর্গ স্থানে সংধাস্রাবিণী অমাকলা শশাঙ্কের অমৃতধারা পান করতে থাকবেন। এই কুলামৃত অতীব আনন্দময়, শংক্রলোহিত বর্ণ (সত্ত্বরজোময়) ও তেজসম্পন্ন। কুলকুণ্ডলিনী এভাবে দিব্য কুলামৃত পান করে পংনরায় কুলস্থল মংলাধারে ফিরে যাবেন। তার পর আবার পংরকম্বারা আগের মত সহস্রারে গিয়ে অমৃত পান করবেন। এভাবে বার বার করতে হবে। একেই যোনিমংদ্রা সাধন বলে। (শিবসংহিতা, চতুর্থপটল, ১-৮)। মেরংতন্ত্রে এই যোগ একটি শ্লোকে নিম্নলিখিত রূপকভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ—

"পীত্বা পীত্বা পংনঃ পীত্বা পংনঃ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পংনঃ পীত্বা পংনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

যোনিমংদ্রা পরমানন্দদায়িনী।

যোষিৎসঙ্গ

মেয়েরা পংরংষের মন বিভ্রান্ত করে দেয়, তাই তারা পংরংষের সাধনপথের বিঘ্ন। প্রকৃতির কাজ করবার জন্য তারা মায়ার সৃষ্টি করে। এটা তাদের দোষ নয়, স্বভাব। পংরংষেরা মজে অতি সহজেই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মেয়েরা যে সত্যিই হেয় বা খারাপ তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু যে ভগবানকে পেতে চায়, সে নারী থেকে দূরে থাকবে এই বিধান। অন্যালোকে যত খংশি মিশংক—কে বারণ করছে? সাধনার পথের পথিক যারা নয়, তাদের কি বাধা আছে নারীসঙ্গের? নারী প্রেমের সাধিকা হয় অতি সহজে; পংরংষে তা পারে না। নারী পাপের পথেও যেমন নিয়ে যায়, তেমনি কল্যাণের পথেও নিয়ে যায়। মানবের চিত্তনদী দংদিকেই প্রবহমাণ—বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায়। তাই খংব সাবধানে না থাকলে, না চললে, সর্বনাশ আসে ওদের

থেকে। সাপ খেলাতে সবাই জানে না। আনাড়ী সাপুড়ে সাপের হাতে মরে।

যেখানে প্রেম থাকে সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ চিরকালের ; নয়তো কিসের সম্বন্ধ? যেখানে প্রেম আছে প্রেমের দেবী তাদের মিলিয়ে দেন। কিন্তু এ ধরনের প্রেম সাধনালব্ধ বস্তু। দেহের বা রূপের মোহ এ প্রেমের জন্ম দিতে পারে না। রূপজ প্রেম দিয়ে প্রকৃতি তার কাজ করিয়ে নেয় মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"একজন চৈতন্যদেবকে বললে—'আপনি এদের (ভক্তদের) এত উপদেশ দেন, তবু তেমন উন্নতি করতে পারছে না কেন?' তিনি বললেন—'এরা যোষিৎসঙ্গ করে সব অপব্যয় করে ; তাই ধারণা করতে পারে না। ফুটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।'

"বীর্য ধারণ না করলে সাধনসম্বন্ধীয় উপদেশ ধারণা হয় না।"

রজোগুণ

রজোগুণ ক্রিয়াত্মক ; পরিচালনাই ইহার স্বরূপ। যেখানে কোনপ্রকার কার্য, কি কোন পরিবর্তন দেখা যায়, সেখানেই রজোগুণ আছে বুঝতে হয়। রজোগুণের সাহায্য ছাড়া জ্ঞান ও স্বয়ং কোন বিষয় লক্ষ্য করতে পারে না—রজোগুণের চালনাই জ্ঞানের বিষয় লক্ষ্যের হেতু। রজোগুণই প্রবৃত্তিশীল করায় ; তাই যার রজোগুণ যত বেশি সে কর্মে তত বেশি উৎসাহশীল। চলনশীলতাই রজোগুণের ধর্ম।

অপ্রাপ্য এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ, রাগ, দ্বেষ, লোভ, স্নেহ, ঈর্ষা, হিংসা, মত্ততা (রতি), গূঢ়াভিসন্ধি, নিরর্থক চাঞ্চল্য, অগাম্ভীর্য, ব্যগ্রতা, জিগীষা, অর্থোপার্জন, মিত্রানুগ্রহ, গার্হস্থ্যপ্রীতি, ইষ্টে প্রীতি, অনিষ্ট বিষয়ে বিরাগ, কটূক্তি, খ্যাতিলাভার্থে দান—এ সকল রজোগুণের কার্য।

রজো মিশানো সত্ত্বগুণ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যদি কারও শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে ; তার আর কিছুই ভাল লাগে না। রজো মিশানো সত্ত্বগুণ থাকলে তার নানাদিকে মন হয়, তখন 'জগতের উপকার করবো' এই সব অভিমান এসে জোটে। তা থেকে যশ, লোকমান্য ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা এসে পড়ে। তবে যদি কেউ কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করতে পারে, সে খুব ভাল ; কিন্তু সকলে পারে না। কর্ম তো করতেই হবে ; যদি নিষ্কাম কর্ম করা যায়, তাহলে তা করতে করতে রজো মিশানো সত্ত্বগুণও ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়। শুদ্ধসত্ত্ব হলেই ঈশ্বর লাভ হয়—তাঁর কৃপা হয়। সকলে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না। হেম আমায় বলেছিল—'কেমন ভট্টাচার্য মশায়! জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, কেমন'?"

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন—"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায় সে রাজসিক বটে, কিন্তু এ সত্ত্বের রজোগুণ—এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন।"

রমণ

সন্ন্যাসীর ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গেও বসা বা আলাপ করা উচিত নয়। শাস্ত্রে রমণ বা মৈথুনকে অষ্টাঙ্গ বলেছে :

"স্মরণং কীর্তনম্ কেলিঃ প্রেক্ষণং ভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিনঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"—

অর্থাৎ (১) কামবিষয়ক স্মরণ বা চিন্তন (রমণীগণের চিন্তা) ; (২) তদ্বিষয়ে কীর্তন বা আলাপন, কামবিষয়ক আলোচনা ; (৩) স্ত্রী-পুরুষে কামভাবাত্মক ক্রীড়া—চুম্বনাদি ; (৪) স্ত্রী-পুরুষে কামদৃষ্টিতে দর্শন ও রমণীয়তাবোধ ; (৫) গোপনে কামবিষয়ের পরস্পর কথোপকথনে আনন্দ ভোগ ; (৬) মৈথুন উপভোগের সংকল্প ; (৭) মৈথুন বিষয়ক অধ্যবসায় বা অবিশ্রান্ত চেষ্টা এবং (৮) কামক্রিয়া নিবৃত্তিরূপ পরস্পরের সংগমোপভোগ—মৈথুন বা রমণের এই আটটি অঙ্গ, মনীষীরা বলে গেছেন। মুমুক্ষুদের এর বিপরীত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করা উচিত।

সাধক গৃহস্থ হলেও একমাত্র ঋতুরক্ষা কারণ ব্যতীত স্ত্রীর নিম্ন অঙ্গ, এমন কি নাভি পর্যন্ত স্পর্শ করবে না। অপুত্রক গৃহস্থের ঋতুরক্ষা প্রয়োজন ; কারণ 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"রমণ আট প্রকার। মেয়েদের সঙ্গে বসা, কি বেশিক্ষণ আলাপ করা, তাকেও রমণ বলেছে। মেয়েদের কথা শুনছি, শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে—ও একরকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছি (কীর্তনম্), ও একরকম রমণ। মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে চুপিচুপি কথা কইছি, ও একরকম। স্পর্শ করা একরকম। মেয়েদের কোন জিনিষ কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে, ও এক রকম।

"এ সব নিয়ম সন্ন্যাসীদের জন্য। সংসারীদের আলাদা কথা। তাদের অন্য সাতরকম রমণে তত দোষ নাই ; তবে দু'-একটি ছেলে হলে স্বামী-স্ত্রী ভাই বোনের মত থাকবে।

"পারমার্থিক জগতে আত্মার রমণ ভিন্ন ব্যাপার।

"সাধনার অবস্থায় আমার অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল। দেখলাম আমার মত বাইশ তেইশ বছরের ছোকরা সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে জিহ্বা দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সহিত রমণ করছে। প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি—চতুর্দল, ষড়দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ ছিল—ঊর্ধ্বমুখ হল।

"হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করার পর দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হলো, আর প্রস্ফুটিত হলো। তারপর কণ্ঠের ষোড়শ দল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হলো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা!"

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

পরমহংসদেবের

তিরোধানের দু'দিন পূর্বে

১৫ই আগস্ট, শুক্রবার, ১৮৮৬। স্থান--গোপাল ঘোষের বাগানবাড়ী। ঠাকুর বুঝেছেন আর, দেরী নাই। এবারকার মত লীলা শেষ করতে হবে। নরেনকে ডেকে বললেন---ওরে নরেন, আমি ত' চলে যাচ্ছি---তা আমার কাছে অষ্টসিদ্ধি আছে। সাধনা করতে করতে পেয়েছিলাম। কিন্তু কখনও কাজে লাগাই নি। নিবি তুই?

নরেন ঠাকুরের কথায় দুঃখ একটু সামলে নিয়ে বললে, ও দিয়ে কি আমার ঈশ্বর লাভ হবে?

ঠাকুর---না, তা হবে না। তবে অলৌকিক কাণ্ড করতে পারবি।

নরেন---চাইনে তবে আমার অমন অষ্টসিদ্ধি।

ঠাকুর---বোস তবে আমার সামনে।

নরেন বসল।

এরপর নরেনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে হঠাৎ ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

অমনি নরেনের সর্বদেহেও বিপুল শিহরণ জেগে উঠল। মনে হল যেন পরমহংসদেবের শরীর থেকে সূক্ষ্ম তড়িৎ স্পন্দনের মত একটা তেজোরশ্মি বেরিয়ে তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে।

সহসা নরেনও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কতক্ষণ এভাবে গেল সে তা কিছু বুঝতে পারলে না। চেতনা ফিরে দেখল---ঠাকুর কাঁদছেন। তাঁর চোখে জল।

ঠাকুর কাঁদেন কেন? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল নরেন---আপনি কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে?

ঠাকুর আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, আজ আমার সর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলাম। এই শক্তিতে তুই জগতে অনেক কাজ করতে পারবি। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি যেখান থেকে এসেছিস সেখানে।

ঠাকুরের চোখ দু'টি ধীরে ধীরে মুদে আসছে। শয্যার পাশে ভক্ত শিষ্যগণ বুকে প্রচণ্ড শোকভার নিয়ে স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করছে---এক মহামুহূর্তের এক পরম ভাস্বর মহা-জীবনের মহাসমাধির।

নরেন নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সহসা তার মন বলে উঠল, আচ্ছা, অনেকে ত' ঠাকুরকে ভগবানের অবতার বলেছেন। কিন্তু উনি নিজের মুখে ত' সে রকম কিছু স্পষ্ট করে বলেন নি কোনদিন। আজ যদি এই সময় এই অন্তিমে একবার বলতেন---

সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ধর্ম স্থাপনের জন্য তিনি যুগে-যুগে ধরণীতে অবতরণ করেন, তিনিই এসেছেন রামকৃষ্ণ-দেহে। তাহলেই আমার মনের গোপন সন্দেহ মিটতো, তাহলেই বুঝতাম, উনি সত্যই ভগবানের অবতার।

ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই চরম সন্ধিক্ষণে সহসা ঠাকুর চোখ মেলে চাইলেন নরেনের দিকে। নরেন, বলি এখনও তোর মনের সন্দেহ গেল না রে? ওরে সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এবার এক দেহে রামকৃষ্ণ।

নরেনের দেহ কেঁপে উঠল। তার চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। ঠাকুরের অন্তিম বাণীর রেশ তখনও যেন কানে বাজছে। অন্তর্যামী নারায়ণ না হলে কে জানতে পারে এমন করে মানুষের অন্তরের কথা। এদিকে নরেন যেমন নিজের সন্দেহে কুণ্ঠিত হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে যা কামনা করেছিল, তাই পেয়ে তার জীবন ভরে উঠল এক অলৌকিক শক্তিতে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধান

৩১শে শ্রাবণ। পূর্ণিমা তিথি। ছিয়ানব্বই বছর আগে এইদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন। তাঁর শেষ দিনের কথা স্মরণ করে গত ছিয়ানব্বই বছর ধরে তাঁর শ্রীচরণে তাঁর অগণিত ভক্ত তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আসছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ক্যান্সার অসুখ দিন দিন বাড়তে লাগল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ওষুধে আর কোন ফল হ'ল না। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিষ্যগণ ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করাবার জন্য বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটের ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে নিয়ে এলেন। কলকাতার ছোট বাড়ীতে প্রচুর আলো-বাতাস ছিল না। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল স্থির করলেন---কলকাতার রুদ্ধ ও দূষিত বাতাসের জন্যই ওষুধে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্য কলকাতায় চার মাস থেকে কাশীপুরে প্রসিদ্ধ লালাবাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নীর জামাই ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগানবাড়ী মাসিক ৮০ টাকা ভাড়ায় ভাড়া নেওয়া হল।

বাগানবাড়িটি বেশ সুন্দর। আর খুব খোলামেলা। পাঁচিলঘেরা চৌদ্দ বিঘা জমির মধ্যে দোতলা বাড়ী। ওপরে দু'খানা আর নীচে চারখানা ঘর। নীচের ঘরের মধ্যে একখানি হল ঘর। তাছাড়া দারোয়ানদের ঘর,

আর একটা ছোট পুকুর। পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে দু' তিনখানি একতলা ঘর। একটি আস্তাবল ও মালিদের জন্য আরও কয়েকটি ঘর ছিল। আশেপাশে আম, কাঁঠাল, লিচুর বাগান। সামনে লোহার গেট—আর গেট থেকে বাড়ী পর্যন্ত গোল সুরকী দেওয়া সুন্দর রাস্তা।

১৮৮৬ সালের নভেম্বর মাস। অগ্রায়ণ মাসের শেষ দিনের একদিন আগে ঠাকুর এই বাড়ীতে এলেন। এই বাগানবাড়ীতে পুরো আট মাস কেটে গেল। ঠাকুরের অসুখের যথাসম্ভব চিকিৎসা চলতে লাগল। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় গুরুদেবের চিকিৎসার বা সেবার কোনরকম ত্রুটি করলেন না। আর ঠাকুরের শেষ উপদেশে নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, শরৎ, শশী, কালীতারা, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু প্রমুখ বারো জন শিষ্য সাধন-ভজন পথে বহুদূর অগ্রসর হলেন। ঠাকুর নিজেকে রিক্ত করে তাঁর সব ঐশ্বর্য, তাঁর সাধন ভজনের সব ফল শিষ্যদের দান করলেন।

ভক্তেরা একদিন তাঁকে কেঁদে বললে, "আপনি নিজে না আরোগ্য হলে কেউ আপনার অসুখ সারাতে পারবে না।"

তার উত্তরে তিনি বললেন, শরীরটা কাগজের খাঁচা—আর গলায় একটা ফুটো হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। এর জন্য আর করব কি? এই রকম করে তিনি ভক্তদের সব কথা উড়িয়ে দিলেন।

ক্রমে শ্রাবণ মাস অতীত হয়ে গেল। ৩১শে শ্রাবণ, পূর্ণিমা তিথি, রবিবার। সকালে একজন ভক্তকে ডেকে ঠাকুর তাকে পাঁজিটা দেখতে বললেন।

৩১শে শ্রাবণের তিথি-নক্ষত্রের সব কথা শুনে, সেই ভক্ত যেই ১লা ভাদ্রের কথা পড়তে আরম্ভ করলেন, ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাকে চুপ করতে বললেন। সেদিন তিনি কেমন এক-রকম হয়ে গেলেন। দুপুরের একটু পরে নবীন পাল নামে এক ডাক্তার তাঁকে দেখতে এলেন। পরমহংসদেব তাঁকে বললেন, "আজ আমার বড় কষ্ট হচ্ছে—পাশ দুটো যেন জ্বলে যাচ্ছে।" এই বলে তিনি ডাক্তারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নাড়ী দেখে ডাক্তারের ত' চক্ষুস্থির। নাড়ী নেই। ডাক্তার নির্বাক।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, উপায় কি?

ডাক্তার কি উত্তর দেবেন।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রোগ কি দুঃসাধ্য হয়েছে?

ডাক্তার—"তাই তো।" বলে মুখ নীচু করে বসে রইলেনন।

ঠাকুর দেবেন্দ্রকে তুড়ি দিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা এতদিন পরে বলে কি? রোগ আরোগ্য হবে বলে আমাকে চিকিৎসা করাতে এনেছে। যদি রোগই না সারে, তবে কেন বৃথা এই যন্ত্রণা। তিনি রোগের কথা কিম্বা ডাক্তারের কথা আর মুখে আনলেন না।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, আমার হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল-ভাত খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দেবেন্দ্র তাঁকে ভোলাবার জন্য কত কি বলতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে ভোলাবে কে?

সে রাত্রে ঠাকুর সুজি আর দুধ অন্য দিনের চেয়ে গলা দিয়ে গিলতে পারলেন। তিনি রাত্রি একটা পর্যন্ত বেশ আরামে নিদ্রা গেলেন। ঠিক একটার একটু আগে উঠে বসে সুজি খেলেন তিনি। তারপর ১টা ৬ মিনিটে সমাধিস্থ হলেন।

ভক্তদের প্রাণ সেদিন আগে থেকেই অস্থির হয়েছিল। তিনি সমাধিস্থ হওয়ায় তাঁদের প্রাণে একটা আতঙ্ক হল। তাদের প্রাণ হু-হু করতে লাগল। তাঁদের কাছে সেই বাড়ী যেন শূন্য বোধ হ'ল। তাঁরা স্থির করলেন, এই মহাসমাধি। সেই পূর্ণিমা রাত্রে আকাশে নানা রকম পরিবর্তন আর চন্দ্রমণ্ডল দেখা গেল।

সেই রাত্রে সেবকেরা সকলেই এই দুঃসংবাদ পেয়ে উপস্থিত হলেন।

কালরাত্রি প্রভাত হল। ১লা ভাদ্রের প্রভাত সমীরণ পরমহংসদেবের তিরোধানের সংবাদ ঘরে ঘরে বহন করে নিয়ে গেল। এই সংবাদ সকলের প্রাণেই বজ্রাঘাতের মত আঘাত করল। অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁদের প্রাণ বিহ্বল হয়ে উঠল। এতদিন তাঁরা তাঁর সঙ্গে নিত্য আনন্দ অনুভব করেছেন। সাধন-পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তাঁদের প্রাণে শান্তি-বারি সিঞ্চন করেছে। সংকীর্তনে তিনি তাঁদের প্রাণ মাতিয়েছেন। অপূর্ব নৃত্যে তাঁদের মাতিয়ে তুলেছেন। আর আজ সত্যিই কি তিনি নেই। একথা ভাবতেও তাদের প্রাণ ফেটে যেতে লাগল। হায়! এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের কল্লোলে পড়ে পথহারা তাঁরা দিকভ্রান্ত নাবিকের মত হয়ে পড়েছিল, সেই সময় যিনি তাঁদের প্রাণ শীতল করেছেন, পথ দেখিয়েছেন—তিনি আজ কোথায়? সত্যিই কি তিনি আজ নেই। সে রূপ কি এ জন্মে আর দেখতে পাব না?

স্ত্রী-পুরুষ সকলে উন্মত্ত হয়ে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে ছুটতে লাগল। নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রভাতের পূর্বেই এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, ঠাকুরের শরীর কঠিন হয়েছে। চক্ষু স্থির হয়েছে। কিন্তু মেরুদণ্ড তখনও গরম। সুতরাং ডাক্তার ডাকা হ'ল।

ডাক্তার মৃত্যুই স্থির করলেন।

কয়েকজন সন্ন্যাসীও এলেন। তাঁরাও স্থির করলেন, এ মহাসমাধি।

বাগানবাড়ি লোকে লোকারণ্য। বিকাল পাঁচটার সময় মহাসমাধিস্থ মহা-পুরুষের নশ্বর দেহ দোতলার ঘর থেকে নীচেয় এনে একখানি বিরাট পালঙ্কের ওপর স্থাপন করা হ'ল। গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের চূড়া, কটিদেশে ফুলের বেড়া। চরণে ফুলের নূপুরে মনের মত করে ঠাকুরের নশ্বর দেহ

বেদের দেবতা রুদ্র

মন্ত্র সংখ্যার বা সুক্তের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে বেদে ইন্দ্রই প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদে মোট সূক্ত সংখ্যা ১০২৮; ইহার মধ্যে ইন্দ্র সম্পর্কে ২৫০টি সূক্ত নিবেদিত হইয়াছে। তার পরেই অগ্নি। অগ্নি সম্পর্কে সূক্ত সংখ্যা ২০৪টি। তারপর যথাক্রমে সোম, অশ্বিদ্বয় এবং মরুৎগণ। প্রত্যেক দেবতার সম্পর্কেই পূর্ণ সূক্ত ছাড়াও বহুসংখ্যক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্ত্র আছে। ইহাদের সহিত তুলনায় শিব ও বিষ্ণু সম্পর্কে সূক্ত সংখ্যা অত্যন্তই অল্প। শিব সম্পর্কে মাত্র পাঁচটি এবং বিষ্ণু সম্পর্কে মাত্র ছয়টি পূর্ণ সূক্ত আছে। অবশ্য ইহাদের সম্পর্কেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক মন্ত্র আছে। মন্ত্রসংখ্যার স্বল্পতার জন্য ইহাদের কণা মর্যাদা হয় নাই; উভয়েই স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল।

বেদে শিব সাধারণত রুদ্ররূপেই অভিহিত হইয়াছেন। উপনিষদেও শিব মহিমাসূচক বাক্যসমূহে তাঁহাকে রুদ্র বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছে। যথা---

একো হি রুদ্রঃ ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ
য ইমাং লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাং তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥
শ্বেতাশ্বতর, ৩।২

(রুদ্রই হইতেছেন এক এবং অদ্বিতীয়। [পরমার্থদর্শিগণ] সেই রুদ্র ভিন্ন কোন দ্বিতীয়কে দর্শন করেন নাই। তিনি স্বকীয় ঐশী শক্তিসমূহ দ্বারা এই লোকসমূহ শাসন করেন। তিনিই প্রত্যেক জীবের মধ্যে (পরমাত্মারূপে) অবস্থিত। তিনিই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহার রক্ষক হইয়াও অন্তকালে সে সমস্ত সংহার করেন।)।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥
ঐ ৩।৪ ॥

(যিনি দেবগণের উৎপত্তির কারণ এবং ঐশ্বর্যলাভের হেতুভূত, যিনি বিশ্বাধিপ রুদ্র এবং মহর্ষি (সর্ব্বজ্ঞ), যিনি পূর্বে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধিযুক্ত করুন)।

শ্রীভূপেন্দ্র বাচস্পতি

অবশ্য বিভিন্ন বেদে রুদ্র ব্যতীত তাঁহার আরও বহুসংখ্যক নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে তাঁহাকে ত্র্যম্বক (৭।৫৯।১২), পশুপতি (১।৪৩।৬; ১।১১৪।১) কপর্দী (১।১১৪।১) ঈশান (২।৩৩।৯) এবং শম্ভু প্রভৃতি।

যজুর্ব্বেদ রুদ্রদেব সম্পর্কে অন্তত ৭০টি মন্ত্র আছে। সেখানে তাঁহাকে পশুপতি (৬।৩২; ৯।৩৯; ১৮।২৮; ৩৯।৮) মহাদেব (৩৯।৮) শর্ব (১৬।২৮ ৩৯।৮) নীলকণ্ঠ (১৬।১৮) কৃত্তিবাস (৩।৬১) সিতিকণ্ঠ (১৬।২৮) শিব (৩।৬৩) ত্র্যম্বক (৩।৫৮; ৩।৬০) প্রভৃতি বহুবিধ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদেও তাঁহার সম্পর্কে অন্ততঃ ৫০টি মন্ত্র আছে। সেখানেও তাঁহার পশুপতি (২।২৪।১; ১২।৮।৭; ১৫।৫।৬) ভব (১৫।৫।১) শর্ব (১২।৮।৭; ১৫।৫।৭) মহাদেব (১৫।৫।৭) ঈশান (১৫।৫।১৫) প্রভৃতি নাম দেখা যায়।

তাঁহার নীলকণ্ঠ নামটির কারণ রামায়ণে ও মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিলে প্রথমেই অগ্নির ন্যায় তীব্র হলাহল উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে দেব, অসুর ও মনুষ্যাদিসহ জগৎ দগ্ধ হইবার উপক্রম হয়। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৪৪ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে---

অথ দেবা মহাদেবং শঙ্করং শরণার্থিনঃ।
জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহীতি তুষ্টুবুঃ ॥২১॥

(তখন দেবগণ মহাদেব পশুপতি শঙ্করের শরণার্থী হইয়া ত্রাহি ত্রাহি রবে স্তব করিতে থাকেন।)।

এবমুক্তস্ততো দেবৈ দৈবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রাদুরাসীৎ ততোঽত্রৈব শঙ্খ-চক্রধরো হরিঃ ॥২২॥

(দেবগণ কর্তৃক এইরূপে আহুত হইয়া দেবদেবেশ্বর সেইস্থানে আবির্ভূত হইলেন। তার পর শঙ্খচক্রধর হরিও সেইস্থানে আবির্ভূত হইলেন)।

উবাচৈনং স্মিতং কৃত্বা রুদ্রং শূলধরং হরিঃ
দেবতৈর্মথ্যমানে তু যৎ পূর্ব্বং সমুপস্থিতম্ ॥২৩॥
তত্ত্বদীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো স্থিতং।
অগ্রপূজামিহ স্থিত্বা গৃহাণেদং বিষং প্রভো ॥ ২৪ ॥

(হরি স্মিতহাস্যে শূলধর রুদ্রকে বলিলেন--হে সুরশ্রেষ্ঠ ! দেবগণ কর্তৃক মন্থনের ফলে প্রথমেই যাহা উৎপন্ন

ফুলসাজে সাজান হল। পালঙ্কখানি ফুলের মালায় সুশোভিত করা হ'ল।

ভক্তদের পিছনে দাঁড় করিয়ে তাঁর ফটো নেওয়া হল। ঠাকুরের সে দিনের অপূর্ব শোভা যিনি দেখেছেন, তিনি সে দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারেন নি।

বেলা ৬টার সময় মৃদঙ্গ করতালের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন করে তাঁকে কাশীপুরে জাহ্নবী তীরে আনা হল। পথে চারিদিকে হাহাকারে পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার পূর্ব্বে চিতা প্রস্তুত হ'ল। প্রভুর দেহ তার ওপর স্থাপন করে অগ্নি সংযোগ করা হ'ল। সকলে দেখে বিস্মিত হ'লেন যে, এক ঘণ্টার মধ্যে দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নরলীলা শেষ হল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল তাঁর লীলা শত সহস্র ভক্তের প্রাণে ভক্তির উৎস প্রবাহিত করতে লাগল।

হইয়াছে তাহা আপনারই গ্রহণীয়, যেহেতু আপনিই সুরগণের অগ্রগণ্য। সুতরাং হে প্রভো! আপনিই এই স্থানে অগ্রপূজা গ্রহণ করুন)।

মহাভারতের প্রথম পর্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ---

ত্রৈলোক্যং মোহিতং যস্য গন্ধমাঘ্রায় তদ্বিষম্।
প্রাগ্ স লোকরক্ষার্থং ব্রহ্মণো বচনাৎ শিবঃ ॥ ৪৩ ॥
দধাব ভগবান্ কণ্ঠে মন্ত্রমূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ।
তদা প্রভৃতি দেবস্তু নীলকণ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥

(যে বিষের গন্ধমাত্র আঘ্রাণে ত্রিলোক মূর্চ্ছাপন্ন হয়, ব্রহ্মার অনুরোধে মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বর শিব তাহাই কণ্ঠে ধারণ করিয়া তদবধি নীলকণ্ঠ নামে আখ্যাত হইলেন)।

ঋগ্বেদের ৭।৫৯।১২ এবং যজুর্বেদের ৩।৬০ মন্ত্র অভিন্ন। এই মন্ত্রে রুদ্রকে ত্র্যম্বক নামেই সম্বোধন করা হইয়াছে—

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধানাৎ মৃত্যোঃ মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ॥

(সুগন্ধি, পুষ্টিবর্দ্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ করি। উর্ব্বারুক ফলের ন্যায় যেন আমরা মৃত্যুবন্ধন হইতে মুক্ত হই এবং অমৃত হইতে বঞ্চিত না হই)। ভাষ্যে আচার্য সায়ণ ত্র্যম্বক শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ত্রয়াণাং ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাণাং অম্বকং পিতরং" (যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রগণের পিতৃস্বরূপ তিনিই ত্র্যম্বক)। সুগন্ধি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "পুণ্যকীর্তি" এবং পুষ্টিবর্দ্ধনং শব্দের অর্থ করা হইয়াছে অনিমাদি শক্তিবর্ধক।

যজুর্বেদের ৩।৬৩ মন্ত্রে তাঁহাকে কেবল শিব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে -----

শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে
পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসী।
নি বর্ত্তয়ামি আয়ুষে অন্নাদ্যায় প্রজননায় রয়ে:
পোষায় সুপ্রজাস্তায় সুবীর্য্যায়॥

(তোমার নাম শিব। তুমি বজ্রধারী। তুমি পিতা, তোমাকে প্রণাম। আমাকে অকালমৃত্যু দিও না। আয়ুর জন্য, অন্নাদির জন্য, সুসন্তান লাভের জন্য, ধনবৃদ্ধির জন্য, বীর্যলাভের জন্য যেন জীবন ধারণ করি)। শতপথ ব্রাহ্মণে (২।৫।৪।৮-১১) এই মন্ত্রটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। পূর্ব মন্ত্রটিও শতপথ ব্রাহ্মণে (২।৫।৩।১১-১৪) বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ঈশানাৎ অস্য ভুবনস্য ভূরেঃ
ন বৈ উ যোষৎ রুদ্রাৎ
অসূর্য্যম্ ॥ ঋগ্বেদ ২।৩৩।৯

(যে রুদ্র ঈশান সমস্ত ভুবনের ভর্তা তাঁহার বল কখনও তাহা হইতে বিচ্যুত হয় না)।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে তাঁহার দৈহিক রূপের কথা বলা হইয়াছে। তিনি অরুণবর্ণ উজ্জ্বল রূপধারী (১।১১৪।৫) নিত্য তরুণ (২।৩৩।১১) তেজ:পুঞ্জকলেবর (২।৩৩।৮ কল্মলী-কিনং) সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল (১।৪৩।৫)। তিনি সুনাসিক (২।৩৩।৫ সুশিপ্রঃ)। তাঁহার উদরদেশ কোমল (২।৩৩।৫ ঋদূদরঃ) দৃঢ় অঙ্গ বিশিষ্ট (২।৩৩।৯ স্থিরৈরঙ্গৈঃ)। তিনি প্রদীপ্ত হিরণ্ময় অলঙ্কারে শোভিত (শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ ২।৩৩।৯) এবং তিনি কণ্ঠে হার ধারণ করেন (বিভর্ষি নিষ্কম্; (২।৩৩।১০)। যজুর্বেদের ১৬।৮ এবং ১৬।১৯ মন্ত্রে তথা অথর্ববেদের ১২।২।৩ মন্ত্রে তাঁহাকে সহস্রাক্ষ বলা হইয়াছে।

তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে, তিনি বলশালীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলশালী (২।৩৩।৩ তবস্তমঃ তবসাম্)। তাঁহাপেক্ষা বলবান্ কেহ নাই ২।৩৩।১০ ন বৈ ওজীয়ঃ তদস্তি। তিনি উত্তম ধনুর্ধর (সুধন্বা; ৫।৪২।১১)। তিনি অর্চ্চণীয় ধনুর্বাণ ধারণ করেন (২।৩৩।১০ অর্হন বিভর্ষি সায়কানি ধনু)। তিনি রথে আসীন (২।৩৩।১১ গর্ত্তসদং) সিংহের ন্যায় ভীমপরাক্রম (সিংহং ন ভীমং; ২।৩৩।১১) এবং "বজ্রবাহো" (২।৩৩।৩)। তিনি স্থির কার্মুক - ধারী, ক্ষিপ্রগামী - বাণবিশিষ্ট, অপরাজিত, তীক্ষ্ণ আয়ুধধারী (স্থির ধন্বে ক্ষিপ্রেষবে আষাঢ় হায়, তীক্ষ্ণায়ুধেং ৭।৪৬।১)। অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত তাঁহার বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে (যা তে বিদ্যুৎ অবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষয়া চরতি। ৭।৪৬।৩)।

যজুর্বেদে তাঁহাকে বজ্রধারী (স্বধিতিঃ। ৫।৩।৬৩) এবং শতধনুযুক্ত (১৬।২৯) বলা হইয়াছে। অথর্ব বেদের ১২।২।১৯ মন্ত্রে তাঁহার গদা এবং ১১।২।১২ মন্ত্রে তাঁহার শতবিধ অস্ত্রের উল্লেখ আছে। অথর্ব্ব বেদের ৬।৫৭।১ মন্ত্রে তাঁহার এক বিচিত্র শায়কের বর্ণনা আছে।

ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে তিনি সহজে আবহনীয় (সুহবঃ। ২।৩৩।৫) অভীষ্ট-বর্ষণকারী (বৃষভঃ। ২।৩৩।৬, ৭, ৮; ১।৪৩।১; ২।৩।১৫) প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত ও কামনাপূর্ণকারী (মীঢ়ুষে। ১।১২২।১) শোভন সুখদাতা (সুমৃলীকায়। ১।১৩৬।৫) সর্বজ্ঞ (চেকিতান। ২।৩৩।১৫) সেচন সমর্থ (মীঢ়ুঃ। ২।৩।১৪) বহুবিধ ধনদাতা ও সৎলোকের পালক (ভূরেঃ দাতারম্ সৎপতিম্। ২।৩৩।১২) ঐশ্বর্যে সকলের শ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠো শ্রিয়াসি। ২।৩৩।৩) দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (১।৪৩।৫) বিশ্বের ভর্তা (বভ্রবে। ২।৩৩।৮, ১৫)। তিনি বিশ্বরূপ (২।৩৩।১০) অন্নবান্ (স্বধাবে। ৭।৪৬।১)। তিনি সুবিস্তৃত জগৎকে রক্ষা করিতেছেন (ইদম্ দয়সে বিশ্বম্ অভ্বম্। ২।৩৩।১০)।

ঋগ্বেদ বলেন তিনি বহুরূপধারী (পুরুরূপঃ। ২।৩৩।৯)। অথর্ব্ব বেদ বলেন --'উগ্র' রূপে তিনি উত্তরদিকের অধিপতি (১৫।৫।৮); পশুপতি রূপে তিনি পশ্চিমদিকের অধিপতি (১৫।৫।৬ ৭); ভবরূপে তিনি পূর্বদিকের অধিপতি (১৫।৫।১); মহাদেবরূপে দক্ষিণদিকের অধিপতি (১৫।৫।৭); শর্বরূপে উর্ধ্বদিকের অধিপতি (১৫।৫।৭) এবং ঈশানরূপে তিনি সকল দিকের অধিপতি (১৫।৫।১৫)।

পশুপতিরূপে তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের প্রভু (২।২৪।১; ১২।৮।৯)।

রুদ্রদেবের এক নাম মৃগব্যাধ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩।৩৩) তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ (৮।২।১০) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৭।৪।১) একটি অদ্ভুত আখ্যায়িকার কথা আছে। উপাখ্যানটি সংক্ষেপতঃ এইরূপ। প্রজাপতি স্বীয় দুহিতা উষার প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। উষা তখন নিজেকে রোহিণীতে (লোহিতবর্ণ গাভী অথবা হরিণীতে) রূপান্তরিত করেন। প্রজাপতিও ঐরূপ প্রাণীতে রূপান্তরিত হইলেন। মৃগব্যাধ রুদ্রদেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে তীর যোজনা করে প্রজাপতি তখন আত্মরক্ষার জন্য রুদ্রদেবকে পশুগণের আধিপত্যদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। রুদ্রদেবের পশুপতি নামের কারণ বোধ হয় ইহাই।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বিভিন্ন মন্ত্রের ভাষ্যে রুদ্র শব্দের অর্থ বলিয়াছেন-- 'রুদ্‌ দুঃখং দুঃখহেতুর্বা পাপাদিঃ তস্য দ্রাবয়িতা'' (রুদ্‌ শব্দের অর্থ দুঃখ বা দুঃখের হেতু পাপাদি তাহা হইতে মোচন করেন বলিয়া তিনি রুদ্র)। অতঃপর যাস্কের নিরুক্ত (১০।৫) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "যদ্বা রুদ্র রৌতি মাগনিষ্ট্বা মরা-দুঃখে পতিষ্যন্তি ইতি রুদ্রঃ।'' (অথবা রুদ্র যিনি রব করেন --আমার অনভিপ্রেত কার্য করিয়া লোক দুঃখে পতিত হয়---এই কথা উচ্চরবে ঘোষণা করেন)।

ঋগ্বেদে রুদ্রকে আরোগ্যদাতা ও সমস্ত ঔষধের অধিপতি বলা হইয়াছে।

"শুনিয়াছি তুমি ভিষগ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" (ভিষক্‌তমং ত্বা ভিষজাম্‌ শৃণোমি। (২।৩৩।৪)। হে রুদ্র! আমরা যেন তোমার প্রদত্ত অতিসুখকর ঔষধি প্রভাবে শত হেমন্তব্যাপী জীবিত থাকি (ত্বা দত্তেভিঃ রুদ্র শাংতমেভিঃ শতং হিমাঃ অশীয় ভেষজেভিঃ। ২।৩৩।২)। আমাদের রোগসমূহ দেহ হইতে পৃথক করিয়া বিনাশ কর (বি অমীবাঃ চাতয়স্ব বিষূচীঃ। ২।৩৩।২)। হে রুদ্র। যে হস্ত দ্বারা তুমি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সকলকে সুখী কর, তোমার সই সুখপ্রদ হস্ত এখন কোথায়? (ক্ব স্য তে রুদ্র মৃড়য়াকুঃ হস্তঃ যঃ অস্তি ভেষজো জলাষঃ। ২।৩৩।৭)। যজুর্বেদের ৫।৩৯ মন্ত্রে তাঁহার ভেষজের কথা আছে এবং ১৬।৫ মন্ত্রে তাঁহাকে দেববৈদ্য বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৫।১) তাঁহাকে "প্রথমো দৈব্যো ভিষগিতি'' বলা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে (৭।৪৬।৩) দেখা যায়, তাঁহার সহস্র ভেষজ আছে (সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজাঃ)। অথর্ববেদের ২।২৭।৬ মন্ত্রেও তাঁহার ভেষজের উল্লেখ আছে।

পরিশেষে ঋগ্বেদের দুইটি এবং যজুর্বেদের একটি মন্ত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

ভুবনস্য পিতরম্‌ গীর্ভিঃ আভিঃ রুদ্রম্‌
দিবা বর্দ্ধয় রুদ্রম্‌ অক্তৌ।
বৃহন্তম্‌ ঋষ্বম্‌ অজরং সুষুম্নম্‌
ঋধক্‌ হুবেব কবিনা ইষিতাসঃ॥

ঋক্‌ ৬।৪৯।১০

হে স্তোতা! তুমি বৃষভের ন্যায় শ্বেত রুদ্রকে এই সকল স্তুতি বাক্য দিবাভাগে এবং রাত্রিতে সম্বর্ধিত কর। প্রাজ্ঞগণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সেই সুমহান্‌, সুদর্শন, জরারহিত, শোভন সুবর্ণাভ ও সমৃদ্ধ রুদ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি।

প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে
মহো মহীং সুষ্টুতিম্‌ ঈরয়ামি। ঋক্‌
২।৩৩।৮

বিশ্বভর্তা, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেতবর্ণ রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে মহতী ও শোভন স্তুতি উচ্চারণ করিতেছি।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

যজু, ১৬।৪১

ভাষ্যকারগণের মতানুসারে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইতেছে--লৌকিক সুখদাতাকে নমস্কার। মোক্ষ-সুখদাতাকে নমস্কার। বিষয় - সুখ উৎপাদনকারীকে নমস্কার। মোক্ষ-সুখ উৎপাদনকারীকে নমস্কার। শান্ত নির্বিকার কল্যাণকারীকে নমস্কার। নিরতিশয় কল্যাণরূপী এবং নিষ্কলুষকারীকে নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথ কৃত রূপান্তর —
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হতে সব ভালো ----
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা,
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে, তুমিই ভালো,
সকল ভালোর সার ---
তোমারে নমস্কার হে পিতা,
তোমারে নমস্কার।
(রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম পৃষ্ঠা)।

গুরুভ্রাতার দৃষ্টিতে স্বামীজী

"* * * বাঙ্গালার উপর তাঁর (স্বামীজীর) খুব আশাভরসা ছিল। Young Bengal (বাঙ্গলার যুবক) তোরা। তাঁর missin (কার্যের ভার) তোদের trust (ন্যস্ত) করে দিয়ে গেছেন * * * ঠাকুর তাঁর ভিতর দিয়ে জগতে প্রকাশ হয়েছেন। তাঁর কথা ঠাকুরের কথা বলে জানবি। ঠাকুর এত বড় ছিলেন যে সাধারণ মানুষের মন দিয়ে তাঁকে বুঝা শক্ত। স্বামীজী সাধারণ মানুষের উপযোগী করে সর্বসাধারণের সামনে তাঁকে ধরে গেছেন। যে-কেহ ভাগ্যবান তাকে এই পতাকার নীচে আসতেই হবে।"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

চোরবাগানের পুষ্প

কর্ণচঞ্চল কলকাতার একটি নির্জন রাস্তা। পূর্বতন হিন্দু কলেজ থেকে শুরু হয়ে অধুনা হিন্দু হস্টেলের গা পর্যন্ত প্রসারিত। পথচারীদের মধ্যে অধিকাংশই হয় শিক্ষক, না হয় ছাত্র। এই রাস্তাটিই প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট। কলকাতার কোন নামজাদা বা বিশিষ্ট রাস্তার নাম কেন তাঁর নামে রাখা হল না---এ প্রশ্ন নিয়ে কেউ কখনও চিৎকার করেন নি। করার প্রয়োজনও নেই। নির্জন হলেও এই রাস্তাটিই তাঁর নাম বহন করার উপযুক্ত এবং যথার্থ। ছাত্র এবং শিক্ষা নিকেতন ছাড়া যাঁর চিন্তা ছিল না, তাঁর স্মৃতিবহনের উপযুক্ত পথ এইটিই। তা'ছাড়া আরও একটি গুরুত্ব আছে---হিন্দু কলেজের পূর্বতন ছাত্র এবং হিন্দু হস্টেল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তার স্মৃতিবহনের পথ হিসেবেও এটি গুরুত্বপূর্ণ।

আজকাল প্রায় দুষ্প্রাপ্য এবং এককালের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি ফার্স্ট বুকের পাতা ওল্টালে প্রথমেই এক স্থূলোদর খর্বকায় মানুষের ছবি দেখা যায়---কাঁধে যাঁর পাটকরা চাদর, হাতে বই,---ইনিই হলেন ইংরেজী শিক্ষার আদিম তত্ত্বধারক প্যারীচরণ সরকার। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রদান শুরু হয় তাঁরই হাতে।

স্বল্পায়তন একটি ক্ষুদ্র বই---ফার্স্ট বুক, কিন্তু সেকালের এবং একালেরও কোন মনীষী-শিক্ষার্থীই এটিকে অবলম্বন না করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্মৃতিকথা 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে লিখেছেন---"মাস্টারমশায় মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক।"

কালের প্রবাহে এবং রচনা-উৎকর্ষতার গৌরবে সৃষ্টি আজ যেন স্রষ্টাকেও ছাপিয়ে উঠেছে। প্যারীচরণ ও তাঁর অমর গ্রন্থ ফার্স্টবুক আজ তাই অঙ্গাঙ্গী, অনন্যবোধক। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় বলতে গেলে---"ফার্স্ট বুক ও প্যারীচরণ সরকার একখানি বই ও ব্যক্তিমাত্র নয়---একটি প্রতিষ্ঠান।"

কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলে প্যারিচরণ ১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভৈরবচন্দ্র,

শৈলেনকুমার দত্ত

মাতা দ্রবময়ী দেবী। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান তিনি ছাড়া জ্যেষ্ঠ পার্বতীচরণও ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট বুৎপন্ন ছিলেন। প্যারীচরণের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' লিখেছেন---
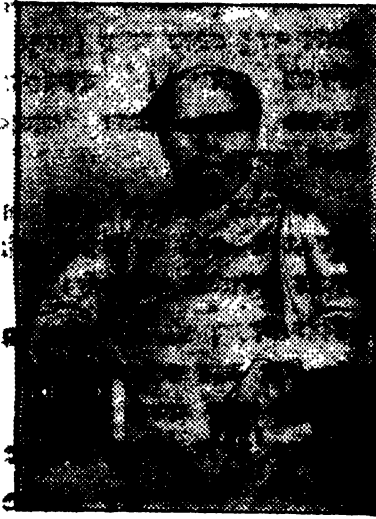
প্যারীচরণ সরকার

চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ
যাহার ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ
করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ
হীনমতি-সুরাপান-বিষম-শমন

প্যারিচরণের শিক্ষাজীবন ছিল খুবই গৌরবের। বাল্যে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন হেয়ার সাহেবকে। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (অধুনা হেয়ার স্কুল) পাঠগ্রহণের [illegible] তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এখানে তিন বছর পড়াশোনা করে তিনি জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক আট টাকা বৃত্তি পান (১৮৩৮)। তারপর তিনি হিন্দু কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তী হন। এখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনকে। হিন্দু কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই আজ স্বনামধন্য---মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ। হিন্দু কলেজে পাঠকালেও প্যারীচরণ উজ্জ্বল তারকারাশির মধ্যে থেকেও নিজ প্রতিভারাশি বিকশিত করে ১৮৪২ সালে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবারেও তিনি মাসিক ৪০৲ টাকা হারে বৃত্তি পান।

পরের বছর সাংসারিক নানা দুর্বিপাকে তাঁকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়। জীবিকার তাগিদ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তিনি ১৮৪৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বেতন ৮০৲ টাকা। দু'বছর সম্মানের সঙ্গে শিক্ষকতা করার পর তাঁর একটি সুবর্ণ সুযোগ আসে। ১৮৪৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর তিনি বারাসাত গভঃ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

বারাসাতে শিক্ষকতাকালে তাঁর সেখানকার মিত্র পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয় এবং এই পরিবারের ডাঃ নবীনকৃষ্ণ মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখের সহযোগিতায় তিনি বারাসাতের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেন। বারাসাতে কৃষি-শ্রমজীবী বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরই। প্রকৃতপক্ষে বারাসাতের উন্নতির মূল সূত্রধর ছিলেন প্যারীচরণই।

এই বারাসাতে শিক্ষকতাকালেই তিনি লক্ষ্য করেন, ছাত্রদের ইংরেজী-শিক্ষার উপযুক্ত গ্রন্থের বড় অভাব। এই অভাবের কথা চিন্তা করেই তিনি তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি ফার্স্ট বুক রচনা করেন (১৮৫০)। জ্ঞানের

গভীরতা এবং অতলস্পর্শী মমতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মিশ্রণ হয়েছিল বলেই এমন একটি যুগান্তকারী সৃষ্টির সম্ভব হয়েছিল। প্যারীচরণের যুগান্তকারী রচনা ফার্স্ট বুক ও সেকেণ্ড বুক প্রকাশ করেন তদানীন্তন বিখ্যাত প্রকাশক 'স্যার রোপার লেথব্রিজ।'

বারাসাতে থাকাকালীন প্যারীচরণের নানা সৎকর্ম পরিচালনা এবং শিক্ষকতার খ্যাতি অচিরেই রাজধানী কলকাতাতে এসে পৌঁছায়। ১৮৫৪ সালে তাঁর কাছে ডাক আসে হেয়ার স্কুলের---প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের আহ্বান। হেয়ার সাহেবের প্রিয় ছাত্র তিনি---তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্কুলে শিক্ষকতার ভার তাঁকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানল। প্যারীচরণ ১লা আগস্ট হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দীর্ঘ ন'বছর তিনি এখানে ছিলেন। এখানে থাকাকালীন ছাত্রদের শুধু শিক্ষাদানই নয়, নিরলস কর্মসাধনায় তিনি হেয়ার স্কুলের প্রভূত উন্নতি সাধন করে গুরুঋণ কিছুটা পরিশোধ করে-ছিলেন। আস্তে আস্তে প্যারীচরণের খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও গিয়ে পৌঁছাল। ইংলণ্ডের রাগবী স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষকের নামে তাঁকেও আখ্যা দেওয়া হল প্রাচ্যের আর্নল্ড বা Arnold of the East। হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় প্রেসিডেন্সী কলেজ কর্তৃপক্ষও তাঁদের প্রাক্তন ছাত্রকে অধ্যাপনার পদে আহ্বান করলেন। ১৮৬৩ সালে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করলেন। বাঙালীর সেই প্রথম ইংরেজী অধ্যাপনার সম্মান লাভ। কিন্তু তবুও হেয়ার স্কুলের সুকুমারমতি ছাত্রদের তিনি স্নেহ-মায়া কাটাতে পারলেন না। অধ্যাপনা করতে করতেও দু-তিন ঘণ্টা তিনি হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের পড়াতেন। ছাত্ররা তাঁর কাছে ছিল সন্তানের মত। স্নেহ-মমতার স্পর্শ পেয়ে ছাত্ররাও তাঁকে কখনও শুধুমাত্র শিক্ষক বলে ভাবতেন না, স্নেহশীল পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন।

হেয়ার স্কুলে থাকাকালীন ছাত্রদের উপযুক্ত ছাত্রাবাসের অভাব দেখে প্যারীচরণ প্রথম ছাত্রাবাস স্থাপনে উদ্যোগী হন। আধুনিক হিন্দু হস্টেলের সূত্রপাত হয় তাঁরই হাতে। তখন হিন্দু হস্টেল ভবন ছিল অধুনা ফায়ার ব্রিগেড অফিসের জায়গায়।

শুধু শিক্ষক হিসেবেই নয়, শিক্ষা বিস্তারের একজন দরদী কর্মী হিসেবেও প্যারীচরণের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিক্ষা বিস্তারের আর একজন নিরলস কর্মী বিদ্যাসাগরও ছিলেন তাঁরই অকৃত্রিম সুহৃদ। মহাকালের কি সুনিপুণ বিচক্ষণতা! ইংরেজী ও বাংলা—দুটি ভাষা শিক্ষার জন্য দুই যুগন্ধর স্রষ্টা তাই একই সঙ্গে, একই সময়ে প্রেরিত হয়েছেন রাস্তা সুগম এবং সহজ করার জন্যে।

বিদ্যাসাগর তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ প্যারীচরণের চোরবাগানের গৃহে প্রায়ই আসতেন। এই বাড়িতেই একদিন প্যারীচরণের দৃষ্টান্তে তিনি বর্ণপরিচয় রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্যারীচরণের জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন —"প্যারীবাবুর দৃষ্টান্তে বা তাঁহার পরামর্শেই তদীয় সোদরোপম সুহৃদ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালী বর্ণপরিচয়াদি চিরস্মরণীয় স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা কার্যে ব্রতী হয়েন।"

শিক্ষা বিস্তার, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে প্যারীচরণ খুব আগ্রহী ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণার মূলেও প্যারীচরণের অনেক অবদান ছিল। তিনি সক্রিয়ভাবে বিদ্যাসাগরকে নানা প্রচেষ্টায় সহায়তা করতেন। তিনি নিজেও চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে তিনি বহু ত্যাগ স্বীকারও করেছেন। বীরসিংহ গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে প্যারিচরণ তাঁর ফার্স্টবুক, সেকেণ্ডবুক পুস্তকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে দান করতেন। এই দুটি বই ছাড়া তাঁর ইংরেজীতে লেখা ভারতবর্ষের ভূগোল বইটিও তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। ইংরেজী ছাড়া ভূগোলেও প্যারীচরণের দক্ষতা সর্বজনবিদিত। স্কুলে ছাত্রদের তিনি ভূগোলও পড়াতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি হেয়ার স্কুলের বার্ষিক ভূগোল পরীক্ষার পরীক্ষকও নিযুক্ত হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন ---"ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকেরা আমাদের পরীক্ষক থাকতেন। প্যারীচরণ সরকার আমাদের ভূগোলের এবং মহেশচন্দ্র ব্যানার্জী ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন।"

শিক্ষকতা ছাড়া প্যারীচরণের কর্মজীবনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল নির্ভীক সাংবাদিকতা। তদানীন্তন সরকারের উদ্যোগে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ৪ঠা জুলাই, ১৮৫৬। প্যারীচরণ এ-পত্রিকাটিরও প্রথম বাঙালী স্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন। গেজেট সম্পাদক Rev. W. O. Brien Smith ১৮৬৬ সালে পদত্যাগ করলে শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর এ্যাটাকিনসন প্যারীচরণকে এ পদের জন্য প্রার্থী হতে অনুরোধ জানান। তিনি প্যারীচরণের নির্ভীকতা এবং ইংরেজী ভাষার দক্ষতার কথা জানতেন। প্যারীচরণ আবেদন করামাত্র এ্যাটা-কিনসন প্যারীচরণকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন (৩রা মার্চ, ১৮৬৬)। নতুন পদে প্যারীচরণ মাসিক বেতন পেতেন তিনশ' টাকা।

নির্ভীকতা এবং ভাষার ওপর সাবলীল দক্ষতার জন্যে প্যারীচরণ অচিরেই সম্পাদক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু বেশিদিন এ পদে তিনি কাজ করতে পারেন নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা সামান্য কারণে মতভেদ হওয়ায় আত্মসম্মান-সচেতন প্যারীচরণ পদত্যাগ করেন।

১২৭৫ সালের ২৬শে বৈশাখ (মে, ১৮৬৮) তারিখে পূর্ববঙ্গের শ্যামনগরের কাছে একটি রেল দুর্ঘটনা হলে অনেক যাত্রী হতাহত হন। প্যারীচরণ

গেজেটে 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে দুর্ঘটনা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি সরকারপক্ষের কিছুটা অসাবধানতার কথা সমালোচনা করে মন্তব্য করেন---'একটি কমিশন নিযুক্ত হওয়া সর্বতোভাবে উচিত।' এ প্রবন্ধ পড়ে তদানীন্তন ছোটলাট গ্রে সাহেব অসন্তুষ্ট হন এবং ২রা জুন, ১৮৬৮ তারিখে সম্পাদক প্যারীচরণকে জানান---

"The article is calculated, from the false account which it gives of the occurences, to mislead and to alarm the Native Public, and the admission of such an article without first taking some steps to enquire into the truth of the statements it contained, seems to Lieutenant Governor to be entirely opposed to the spirit of the conditions on which the Education Gazette is supported by Govt., the chief of those conditions, it may be said being that the paper shall be a vehicle for furnishing the people with the means of forming a sound opinion on passing events by supplying them with accurate information."

১৬ই জুন, ১৮৬৮ তারিখে প্যারীচরণ এ চিঠির জবাব দেন। কিন্তু পূর্ব মন্তব্য প্রত্যাহার করা হয় নি। প্যারীচরণ তাই ৩১শে জুলাই তারিখে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। এডুকেশন গেজেটের পরবর্তী সম্পাদক নিযুক্ত হন ভুদেব মুখোপাধ্যায়।

সামাজিক জীবনে প্যারীচরণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল 'সুরাপান নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠা (১৮৬৪) এবং যুবকদের মধ্যে মদ্যপান নিবারণ করা। তাঁর এ প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীরা। ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাবে তখন দেশের তরুণদের মধ্যে মদ্যপানের রীতি ক্রমশ বেড়েই চলছিল। শিক্ষিত যুবকেরা তখন মদ্যপানকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহক বলে মনে করছিল। সমসাময়িকদের রচনায় এ অবস্থার চিত্রটি অঙ্কিত আছে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন ---"তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।"

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন ---"ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে বঙ্গসমাজে পূর্ণমাত্রায় কাজ করিতেছিল। শিক্ষিতদলের মধ্যে সুরাপানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু কলেজের ষোল-সতের বৎসরের বালকেরা সুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত। যে-যত অসম সাহসিকতা দেখাইতে পারিত, তাহার তত বাহাদুরি হইত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত।"

সামাজিক দুষ্ট ক্ষতের এই প্লাবনকে রোধ করার মত দুর্জয় মনোবল প্যারীচরণের ছিল। কিন্তু তাঁর অবলম্বন ছিল শুধুমাত্র লেখনী। ইংরেজী ও বাংলা---এই দুটি ভাষাতেই লেখনী চালনা করে তিনি এই অভ্যাসের অপকারিতার কথা প্রচার করেন। এ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি wellwisher এবং হিতসাধক (ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৮) নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। হিতসাধকের প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক প্যারীচরণ লিখলেন --"মাদক সেবনের দোষ, সমাজ সংস্কার, সুনীতি, আচার-ব্যবহার সংশোধন, জ্ঞানোপার্জনের সুবিধা, প্রাকৃতিক সামান্য নিয়মাদির ব্যাখ্যা, সদাশয়তার দৃষ্টান্ত, ধার্মিকতার গুণানুবাদ, পাপের তিরস্কার, উপকারজনক আবিষ্ক্রিয়ার সংক্ষেপ বর্ণনা, চিত্তরঞ্জক এবং উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা, উত্তম উত্তম গ্রন্থ ও পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত গদ্য-পদ্যময় প্রবন্ধ এবং সাধারণত হিতসাধারণ বিষয়ের উল্লেখ, এই পত্রিকায় সন্নিবেশিত হইবে।"

ইংরেজী ভাষায় তাঁর দক্ষতার কথা সাগরপার পর্যন্ত প্রচারিত এবং প্রশংসিত কিন্তু তিনি যে সব্যসাচীর মত বাংলা ভাষাতেও সমান দক্ষ ছিলেন, সেটি জানা গেল এই আন্দোলন পরিচালনার প্রবন্ধমালাতে। হিতসাধক পত্রে তিনি সুরাপান নিবারণ সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রবন্ধে লিখলেন---"অপরিমিত পানের অনিষ্টকারিতা এমন স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হয় যে, কেহই তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু পরিমিত পানে অপকারের সম্ভাবনা না থাকিয়া বরং উপকারই হয়---এই বলিয়াই অনেকে সুরাপানের অনুমোদন করেন। বাস্তবিক উহা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম। সুরা প্রভৃতি বিষবৎ বস্তু সম্বন্ধে পরিমিত শব্দই অব্যবহার্য্য এবংপ্রকার বস্তুর বিন্দুমাত্র গ্রহণই অপরিমিতাচারণ, সম্পূর্ণ পরিত্যাগই মিতাচারণ।"

স্নেহশীল আপাতকোমল একজন শিক্ষকের পক্ষে এ আন্দোলন পরিচালনা এবং প্রচার করা যে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, ভাবতে অবাক লাগে। কিন্তু প্যারীচরণের অন্তরে কোমলতা থাকলেও দৃঢ়তাও ছিল। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের শিক্ষক, সমস্ত প্রকার সুশিক্ষা প্রচারের জন্য যতটা বলিষ্ঠতা দরকার, সবই তাঁর ছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী "A Nation in making" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বড় সুন্দরভাবে লিখেছেন---

"No man was better qualified to lead the movement than a teacher of youth so universally respected as Peary Churn Sircar. The outward look and demeanour of the man would, however, produce the impression that he was far more fit to follow than to lead. One so gentle, so quiet, so amiable, seemed to be hopelessly wanting in the sterner qualities of the leader of a great public movement. The result however, showed that there was the mailed fist

concealed under the velvet glove, and that the gentle head master of the Colootola Branch School had been gifted by nature with what are believed to be incompatible qualities, a child-like simplicity and a fascinating amiability, combined with the firmness and strength of a leader of men."

সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা এবং সুরাপান নিবারণ প্রচার পরিচালনার জন্যে তিনি সমাজে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। প্যারীচরণের যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ এবং বলিষ্ঠ মতবাদে তরুণ সমাজও তাঁকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। সে সময় সুরাপায়ী যুবকদের অন্তরেও প্যারীচরণের চরিত্রটি কেমন অঙ্কিত ছিল, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' তার একটি চিত্র রেখেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন --"একদিন কি দুইদিন একটু একটু সুরাপান করিয়াছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য জগদীশ্বরের কৃপা। তৎপরেই মনে মহা নির্বেদ উপস্থিত হইল। প্যারীচরণ সরকারকে, মাতুল মহাশয়কে এবং পিতাঠাকুরকে স্মরণ করিয়া মহা লজ্জিত হইলাম এবং সুরাপান নিবারণের জন্য দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হইলাম। তদবধি আমি সুরাপান নিবারণের পক্ষে রহিয়াছি।" অন্যত্র তিনি আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন --"বলিতে কি তিনিই আমাদিগকে সুরাপানের বিরোধী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।"

সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসে তাই প্যারীচরণ অমর হয়ে আছেন। স্নেহ - মায়া - মমতার আড়ালে যে একটি বজ্র মানব সক্রিয় ছিল, প্যারীচরণের চরিত্রে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক অনেক সৎ প্রচেষ্টায় তিনি মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছেন। দাতা হিসেবেও তিনি অনন্য ছিলেন। ১২৭৩ সালে বাংলা ও উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিলে প্যারীচরণ একটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করে বহুলোকের জীবন বাঁচান। রুদ্রমূর্তির পাশে তাঁর অন্তরে সর্বত্যাগী রিক্ত একটি শিবমূর্তিও লুক্কায়িত ছিল।

১২৮২ সালের ১৫ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫) মহালয়ার দিন এই কর্মী - মহাপুরুষ বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভুবনমোহনকে একটি পত্রে (২৭শে নভেম্বর, ১৮৭৫) লেখেন ---

"To the public the loss cannot be easily replaced. His great ability, high character and singleminded zeal in works of humanity rendered him highly useful to society at large, while his devotedness to the cause of temperance which was manifested in the foundation of the Bengal Temperance Society, in the publication of many valuable tracts in English and Bengali, and in other acts, will doubtless be long cherished in grateful remembrance by all lovers and promoters of temperance in this country."

শাস্ত্রে বলে কীর্তি থাকলে কীর্তিমান বেঁচে থাকেন। কিন্তু বহু কীর্তি থাকা সত্ত্বেও প্যারীচরণ আজ প্রায় বিস্মৃত --এটা আমাদের পক্ষে চরম লজ্জার কথা। এর কারণ বোধহয় প্যারীচরণ নিজে প্রচারবিমুখ পুরুষ ছিলেন। সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভাষায় বলতে গেলে "প্যারীবাবুর চিত্র অন্যরূপ; তিনি সোজা দাঁড়াইয়া কর্তব্যপথে ধীরে গম্ভীরে চলিয়াছিলেন। তাঁহার না ছিল ঢাক, না ছিল জাঁক।"

কিন্তু তবুও তাঁর নাম লুপ্ত হবার নয়। এদেশের সামাজিক অনেক পথেই তিনি বিচরণ করেছেন এবং সেসব পথে তাঁর পদাঙ্ক এত গভীর এবং সুস্পষ্ট হয়ে আছে যে, সেটি মুছে ফেলতে গেলে পথটিও লোপ পাবে। সেটাই আমাদের সবচেয়ে আশার কথা।

হাতির চামড়া

মনে হয় বিশাল বপুটি রীতিমত পুরু চামড়ায় ঢাকা। প্রায় দুর্ভেদ্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা নয়। হাতির চামড়া নরম, অতি মাত্রায় স্পর্শকাতর---মশা-মাছির উৎপাতেই অস্থির পঙ্কু লেগে যায়।

ধুলোবালি, ঘাস বা অন্য কিছু--- যাই পাক্ না কেন, হাতি তা শুঁড়ের সাহায্যে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দেয়। ধুলো বা ঘাসের আস্তরণ পিঠে নেই এমন হাতি দুর্লভ। হাতির সবচেয়ে বড় শত্রু মাছি এবং বা মশার বিরুদ্ধে এটাই তার আত্মরক্ষার পদ্ধতি। এতে বিস্মিত হওয়ার অবকাশ সাধারণের আছে---কারণ, প্রায় সকলেই হাতির চামড়া মোটা বলেই জানি। দেখলে তাই মনে হলেও তা নয়। জলহস্তী এবং গণ্ডারের চামড়াও নরম। ওদের খুব ব্যতিব্যস্ত করার উপায় আলতো ক'রে চামড়ায় কিছু ছোঁয়ান বা হাত বোলান---হাত বোলান যদি আদৌ সম্ভব হয়।

গান্ধীজীর অহিংসা নীতি

"গান্ধীজীর অহিংসা নীতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ১৬ই পৌষের 'রাষ্ট্রবাণী'তে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার কতকগুলি মন্তব্যের আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার সমালোচনা করিতে আমি অনিচ্ছুক। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু বলিতে হইতেছে। 'রাষ্ট্রবাণী'র প্রবন্ধটিতে লেখা হইয়াছে :—

"একজন মহিলা গান্ধীজীর নিকট পরামর্শ চাহেন। তিনি নিজেকে অহিংসায় বিশ্বাসী বলেন এবং নির্যাতন বা অপমান আসিলে অহিংসভাবে তাহার প্রতিকার কিরূপে করা যায় তাহা গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন :

"যে অহিংসা বিকাশের অনুশাসনগুলি মানিয়া চলে, যাহার প্রতিরোধ করার একান্ত ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকল বন্ধন ছিঁড়িতে পারে—তাহাকে অশক্ত করার জন্য যতই বল প্রযুক্ত হউক না কেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাহাকে মরার শক্তি দিবে।

"কিন্তু এই প্রকার বীরত্ব তাহাদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব যাহারা অনুশীলন দ্বারা নিজেদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে। যাহাদের অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস নাই তাহাদের পক্ষে প্রচলিত আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করা উচিত যাহাতে তাহারা অভদ্র যুবকের অশ্লীল ব্যবহার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।" (হরিজন, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮)

'যে নারীর অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস নাই তাহাকে স্পষ্টভাবে প্রচলিত উপায়ে অর্থাৎ হিংসার বা অস্ত্রের বলে আত্মরক্ষা করিতে গান্ধীজী বলিতেছেন। অথচ ঐ প্রবন্ধ সম্পর্কেই রামানন্দবাবু গান্ধীজীর মত এইরূপ বুঝিয়াছেন :—

"তিনি অহিংসাকে এত বড় মনে করেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষাকল্পেও আততায়ীর প্রতি সশস্ত্র বা অন্যবিধ বলপ্রয়োগ তিনি বৈধ মনে করেন না।'

'হরিজন' পত্রিকার ইংরেজী বাক্যগুলির অনুবাদ 'রাষ্ট্রবাণী'র।

"যে নারীর অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস" আছে, গান্ধীজী বলিতেছেন, "অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাহাকে মরার শক্তি দিবে।" পক্ষান্তরে "যে নারীর অহিংসায়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জীবন্ত বিশ্বাস নাই তাহাকে স্পষ্টভাবে প্রচলিত উপায়ে অর্থাৎ হিংসার বা অস্ত্রের বলে আত্মরক্ষা করিতে গান্ধীজী বলিতেছেন।"

"মরার শক্তি" এবং আত্মরক্ষার শক্তি এক বলিয়া আমি মনে করি না। অহিংসায় বিশ্বাসিনী নারী মরিবেন, তথাপি সশস্ত্র বা অস্ত্রবিহীন দৈহিক বলপ্রয়োগ দ্বারা আক্রমণকারীকে কাবু করিবেন না, কেবল তাহার চেষ্টার প্রতিরোধ (resist) করিবেন—
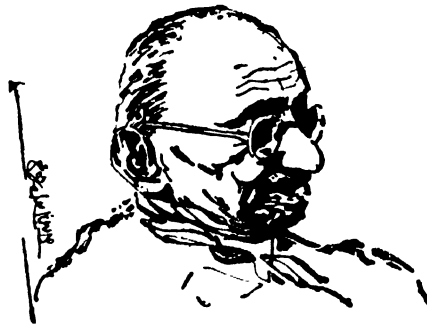
মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর অভিপ্রায় আমি এইরূপ বুঝিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক খুলিয়া আমি কিছু বলিতে চাই না।

আমার এরূপ বুঝিবার কারণ, সর্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-সম্পাদিত Mahatma Gandhi নামক পুস্তক হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে রহিয়াছে।

"He answers that a woman may resist and resist unto death, but not use any other kind of violence."

শেষের "but not use any other kind of violence" কথাগুলির অর্থ আমি এই বুঝিয়াছি যে, আক্রান্তা নারী আক্রমণকারীকে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিবেন না, লাথি কীল চড় চাপড় মারিতে পারিবেন না, কামড়াইতে বা নখাঘাত করিতে পারিবেন না, তাহার সহিত ধস্তাধস্তি করিতে পারিবেন না ; কিন্তু তাঁহার নিজের মৃত্যু পর্যন্ত আক্রমণকারীর ইচ্ছায় বাধা দিতে (resist করিতে) পারিবেন। কি প্রকারে বাধা দিতে পারিবেন তাহা অনুমেয়। আক্রমণকারীকে আক্রমণে অসমর্থ করিতে না পারিলে reistance-এর চেষ্টা সফল হয় না। বলপ্রয়োগ (violence) তাহাকে অসমর্থ করিবার উপায়। উপরে উদ্ধৃত ইংরেজী উপদেশটি অহিংসায় বিশ্বাসিনী বা অবিশ্বাসিনী আক্রান্তা সকল নারীর উদ্দেশেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 'হরিজন' হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে অহিংসায় বিশ্বাসিনীকে এক প্রকার এবং তাহাতে অবিশ্বাসিনী নারীকে অন্য প্রকার ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। আক্রান্তা নারী কোন্ শ্রেণীর, তাহা তিনি নিজে স্থির করিবেন।

আমি এখনও মনে করি, গান্ধীজী সব সময়ে একই বিষয়ে সমান স্পষ্টার্থ কথা বলেন না ; এই জন্য তাঁহার মতামত ঠিক্ বুঝা সব সময়ে সোজা নহে। অবশ্য তিনি জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্বক অস্পষ্টার্থ বাক্য বলেন, আমি এরূপ কিছু বলিতেছি না। গান্ধীজীর মতে বলাৎকার-চেষ্টাও "অশ্লীল ব্যবহার" কথা দুটি দ্বারা বুঝায় কি না জানি না।

কোন নারী কোন দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্তা হইলে যদি কাহারও মৃত্যু আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় হয়, তবে দুর্বৃত্তের মৃত্যুই অধিকতর আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়, আক্রান্তা নারীর নহে।

দুর্বৃত্তের হৃদয় ও আচরণ পরিবর্তন কিংবা তাহার মৃত্যু তাহার ও সমাজের পক্ষে হিতকর। দুর্বৃত্তের মৃত্যু তাহার চরম অনিষ্ট নহে, দুর্বৃত্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকা চরম অনিষ্ট।

তাম্বুল খণ্ড

[শ্রীরাধা বসন্ত—সময়, অপরাহ্ন]

চিরবসন্তের চিরবিরহ অথবা চির-মিলনের নিত্য প্রেমোৎসবের অমিয়-তরঙ্গ বয়ে চলেছে বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমিয় ছন্দে; ----

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন
মেল মলয় সমীরে
মধুকর নিকর করম্বিত
কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।
---(গীতগোবিন্দ)

--- প্রকৃতির চারিদিকে বসন্ত জেগেছে, মলয় সমীরণ সুকোমল লবঙ্গ লতিকাকে সুখস্পর্শ সোহাগ দান করছে, কুঞ্জিত কুঞ্জ কুটীরে ভ্রমরের গুন্-গুন্ গান --- সর্বোপরি বসন্তের কোকিল কুহুকুহু ডেকে উঠেছে!---

এহেন বসন্তে অন্তরের দ্বন্দ্ব, প্রেমমিলনের দ্বন্দ্ব, রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব নিয়ে বৈষ্ণব পদকর্তাকে অনুসরণ করে কীর্তনীয়ার সুললিত সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে --তাঁর নৃত্যের তালে, নূপুরের নিক্কনে, মনে-প্রাণে, জীবনে-যৌবনে, বার্ধক্যে-প্রয়াণে, প্রকৃতির অসীম সত্তায়, সুনীল গগনে, যমুনা-পুলিনে --ঐ একই রূপ, একই মোহ, একই দ্বন্দ্ব;--- আবেশের অন্ত নেই, ভাবাবেশের শেষ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, --স্থির, একাগ্র, অনিমেখ, একান্ত, নিরন্তর, উজ্জ্বল-সোজ্জ্বল, রূপ-রূপের মাধুরী!---

"চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগায়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ।
বৃষভানু নন্দিনী জপয়ে রাতি-দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বাণী
স্বপনে না পাতয়ে কান।'
---(গোবিন্দদাস)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। বৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধার কথা বড়াইয়ের মুখে শুনে অবধি শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল, আকুলকরা সে নাম। তাই বড়াইকে অকপটে বলল,----

"সখি। রাধা নাম কি কহিলে,
শুনি কানমন জুড়াইলে
কত নাম আছয়ে গোকুলে
হেন হিয়া না করে আকুলে।"
---(যদুনন্দন)

সেই নামে তাঁর হিয়া আকুল হয়েছে, ব্যাকুল হয়েছে, না জানি যে নাম এত মধুর, সে রূপ কতই বা সুমধুর। সে রূপে নয়নের চুমুক দিয়ে কত তৃপ্তিই না আসে। বড়াই, শুধু নাম কেন, ---তুমি তার রূপের কথা বল।---

বড়াইয়ের উদ্দেশ্যই তো তাই, সেই রূপের বর্ণনাভঙ্গীতে তাকে পাগল করবে বলেই আজ এই প্রস্তাবনা,---বড়াই সুরু করল, রূপ নয়, স্বরূপ - অরূপ যেন দুয়েরই অন্তলীন সমারোহ। প্রত্যক্ষ হতে, চাক্ষুষ হতে তখনও বাকী,---এতেই এত, বড়াই হাসে!---কি হল?

"তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনি।
ধরিবাক না পারে পরাণী॥
দারুণ কুসুম শর সুদৃঢ় সন্ধানে
অতিশয় মোর মনে হানে।"

সে রূপের বর্ণনায় অন্তরে কুসুমের শর হানে,--মদনও হাসে, কুলশর তার হাতে। অতৃপ্ত যৌবন যেন সেই রূপের বর্ণনায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠে।--কৈ, কোথা সে, কোথায় সেই রূপের প্রতিভাত লাবণ্যের সমারোহ? কৈ সে রাধা---

রাধা - রাধা - রাধা! বড়াই, তুমি সত্যি করে বল, কোথায় গেলে তার সন্ধান পাবো! ---

বিচিত্র সন্ধান! --হ্যাঁ, সন্ধান পাবে বৈকি, আরও এগিয়ে চল তার কাছে।

কিভাবে?

আমি যেমনটি বলব। বড়াই মনে মনে হাসে, মুখে হাসে না, বরং শ্রীকৃষ্ণের এই পাগলপারা দশা দেখে আরও দুঃখ করে, সমবেদনা প্রকাশ করে। অন্যদিকে আবার ভয়ও দেখিয়ে দেয়, বলে, --জানো, সে না রাজার মেয়ে, বৃষভানু-নন্দিনী, তার দেখা পাওয়া বড় সহজ নয়, পথটাও বড় দুর্গম,--তোমাকে সেই পথে যেতে হবে, আমাকে অনুসরণ করতে হবে, তবেই যদি সেই রূপসী তাঁর দেখা পাও, -- চল, এগিয়ে চল।

বৈষ্ণব পদকর্তা গাইলেন এবার---'তাম্বুলখণ্ড', [illegible]!---তখন আর কিছু ঠিক থাকে না। হারিয়ে যায়, সবই হারিয়ে যায়;--- শ্যামলী-ধবলীও তখন মানা মানে না। তারাও সেই বৃন্দাবনের তমালের তরুমূলে চোখ বুজে বিশ্রাম করে না, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলে বনে-বনান্তরে। ঐতো পথ,---ঐ বনে গোপবালারাও প্রাতঃভ্রমণে আসে, দেহলতায় লাবণ্যের ফুটন্ত জ্যোছনা, মনে তাদের তারুণ্যের চপলতা, চোখে তাদের সরলতার কাজল-স্রোতের ঢেউ!---তারি মাঝখানে,---

"নীল জলদসম কুন্তলভারা
চেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা
শিশিত শোভে এ তোর কামসিন্দুরা
প্রভাত সময়ে যেন উড়ি গেল সুরা॥"

---ঐ তো শ্রীরাধা। জান গো বড়াই, ওকি শুধু রূপ? যেন তার বিচ্ছুরিত অঙ্গচ্ছটায় কিংবা তার রূপ দেখে প্রভাত-সূর্যও ডুবে যায়, উদে যায়,---তুমি ঠিকই বলেছ বড়াই,--- ও রূপ শুধুমাত্র রাজনন্দিনীতেই শোভা পায়! --- কিন্তু এবার যে তোমায় পালা বড়াই। চোখে-মুখে তাঁর আকুতি।

বড়াই হাসে, কাতরতা দেখে হাসে, একাগ্রতা দেখে হাসে, শ্রীকৃষ্ণকে উন্মনা দেখে আবার ভয়ও পায়, না-জানি, রূপের আঘাতে, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলিত, পুলকিত,--- পাগলপারা দিশাহারা শ্রীকৃষ্ণ উন্মনা হয়ে পড়ে, হয়তো বা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে---সে রূপ বর্ণনায় একাগ্রচিত্ত

হয়ে বাধা হয়েই তখন বড়াই বলে,—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, মিলন সে করিয়ে দেবে।

দেবে তো?

নিশ্চয়।—এই তো তার কাজ,—কিন্তু।

—শুধু শুধু তো মিলন হয় না বাপু।

তবে?

তার কাছে গিয়ে তোমার ভালবাসার নিদর্শন তো কিছু দেখাতে হবে, বলতে হবে,—তোমার জন্য পাগল, তোমার রূপে পাগল শ্রীকৃষ্ণ,—এই নাও, ধর,---তোমাকে সে উপহার দিয়েছে।

কিন্তু বড়াই, দেওয়ার মত যে আমার কিছু নেই। আছে শুধু এই শিখীচূড়া, বনমালা আর হাতের বাঁশরী।

না, ওসব এখন নয়। এখন তুমি শুধু "তাম্বুল" দিও, সেই হবে তোমার ভালো লাগার,—ভালবাসার চরম নিদর্শন, তোমার অঙ্কুরিত প্রেমের, সেই সঙ্গে প্রথম আলাপের শ্রেষ্ঠ বিনিময় ও চরম প্রস্তাবনা।---বড়াই চলল সেই "তাম্বুল" নিয়ে শ্রীরাধা সকাশে। এইভাবে শুরু হল তাম্বুলখণ্ড।

শ্রীরাধার মন তখন অনেক ভিজেছে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় তার অন্তর দ্রবীভূত হয়েছে। শ্রীরাধার চোখে জল গড়িয়ে পড়ে, মনের কথা তখন বলতে আর বাধে না। জানো গো বড়াই,—তোমার মুখে শুনে আমিও যে আর স্থির থাকতে পারি না,—কোথায় সে কানু?

তাম্বুলখণ্ডে এমনিভাবেই রাধাকৃষ্ণের রাখালের আলাপন শুরু হয়। বৃষভানু-নন্দিনীও তখন কাতরা, সব কথাই তখন আর বড়াইকে না বললে চলে না,—পেটের কথা, মনের কথা, গোপন স্বপ্নবিহারের কথাও তখন বলতে হয়, বলতে ইচ্ছে করে,—এ যে প্রেমের ধর্ম। শ্রীরাধা তখন শুরু করে,—জানো গো বড়াই, আমি শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন দেখেছি,—

"প্রথম প্রহর নিশি সু-স্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে।"—(চণ্ডীদাস)

—শ্রীগঙ্গাধর দাস, সরস্বতী কাব্যশ্রী

দ্রষ্টা বিবেকানন্দ

শূদ্রযুগের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্বামীজী অনেকবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। লণ্ডন থেকে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ১লা নভেম্বর স্বামীজী মেরী হেলকে একটি চিঠিতে লিখেছেন:

"সর্বশেষ শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা হবে এই যে, হয়তো সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে, বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাবে।---প্রত্যুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।"

আবার বলেছিলেন—"Europe is on the edge of a Volcano. Unless the fires are extinguished by a flood of spirituality, it will blow up."

সিস্টার ক্রিস্টিন এ সম্বন্ধে পরে লিখেছিলেন, "This of Europe in 1895, when it was prosperous and at peace. Twenty years later came the explosion."

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজী অনেক কিছু দেখেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি দ্রষ্টার মতই সে সব কথা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ মাদ্রাজ-বাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী লিখেছেন:

"ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে, বিনাশের জয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে,—।

* * *

তাঁরই স্থাপিত বেলুড় মঠ সম্বন্ধে স্বামীজী অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। মহাসমাধির কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, ভক্ত মিস্ জোসেফিন ম্যাক্লাউডকে:

"The spiritual impact that has come to here to Belur will last fifteen hundred years —and this will be a great university. Do not think I imagine it, I see it."

শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীর কাছে একবার বেড়াতে বেড়াতে বলেছিলেন, "এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন জ্ঞান চেষ্টায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তাতে জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবগতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ কর্মের একত্র সমন্বয়ে এইখানে থেকে ideals বেরোবে,---"

* * *

নিজের স্বল্পায়ুর কথা স্বামীজী জেনেছিলেন। অনেকবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন এ সম্বন্ধে। মিস্ ম্যাক্লাউড তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন:

At Belur Math one day... he said to me, "I shall never see forty." I, knowing he was thirty nine, said to him, "But Swami, Budha did not do his great work until between forty and eighty." But he said, "I delivered my message and I must go." I asked "why go?" and he said, "The shadow of a big tree will not let the smaller trees grow up. I must go to make room."

বন্দী-শিবিরে রবীন্দ্রনাথ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

বন্দী-শিবিরে রবীন্দ্রনাথ—শুনিয়া চমক লাগিতে পারে।---

কথাটার সোজা অর্থ এই যে, আমরা শুধু স্থানেই বাস করি না, কালেও বাস করি অর্থাৎ অপরের মনে। যাঁরা জ্ঞানী, গুণী বা কর্মী—তাঁরা তাই তাঁহাদের দেশের সর্বত্রই বাস করেন, যদিও শরীরটা লইয়া বিশেষ স্থানে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদেরও সঙ্গী ছিলেন বন্দিশালাতে। পাশের বন্ধুর কাজকর্ম যেমন আমাদের উপরও ভালোমন্দ ফলাফল আনিত, রবীন্দ্রনাথের কাজ ও কাব্যও তেমনি আমাদের বন্দিশালাতে আন্দোলন তুলিত।---

সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। এক ইংরেজী পত্রিকায় খবর বাহির হইল যে, রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের লইয়া একখানি বই লিখিয়াছেন, বইয়ের নাম "চার অধ্যায়"।---বই পড়িয়া কেহ ভাল বলিল, কেহ মন্দ বলিল—"এই বই রবীন্দ্রনাথের লেখা উচিত হয় নাই, যাদের বিষয় জানেন না তাদের সম্বন্ধে কেন লিখিতে গেলেন? তিনি আমাদের উপর অবিচার করিয়াছেন।"---

এক ভদ্রলোকের কথা সেদিনের চীৎকার ও হট্টগোলের মধ্যে ভালো লাগিয়াছিল। তাঁর সুরও যেমন শান্ত, বক্তব্যের ভঙ্গীও তেমন সংযত ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—এ ভাবে বিচার চলে না। প্রশ্নের যেমন ধর্ম আছে, বিচারেরও তেমনি নীতি আছে। সাহিত্যের দিক দিয়া এর বিচার হইতেছে না, হইতেছে রাজনীতির দিক দিয়া। বিপ্লবীদের এ বইতে উপকার বা অপকার করিয়াছে—এই রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়া বুঝিতেও যে দূরদৃষ্টি দরকার—বর্তমান ক্ষেত্রেও সে দৃষ্টি একেবারে আচ্ছন্ন। প্রয়োজনের পরমায়ু বেশী নয়, আজ যা প্রয়োজন কাল তা-ই ভাঙা মৃৎপাত্রের মত পরিত্যক্ত হয়।---বুদ্ধি শান্ত হইতে সময় লাগে, সে পর্যন্ত অপেক্ষা না করিলে বিচার অসম্ভব। এভাবে আলোচনায় লেখকের যেমন অবিচার হয়, নিজের উপরও তেমনি অবিচার করা হয়। ---আর কিছু না হউক অন্তত এটুকু ভাবা উচিত যে, এঁর মত মনীষী আঘাত করিয়া বিপ্লবীদের ভাবনা ও চিন্তাকে সরল করার সুযোগ দিয়াছেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ ছিল না। দেউলি ক্যাম্পে তিনি আসার পর তাঁকে চিনি। চার অধ্যায়ের আলোচনা আমার মনে রেখাপাত করিয়াছিল। সবাই অল্পবিস্তর উত্তেজিত হইয়াছে, কমবেশী temper সবাই হারাইয়াছে, কিন্তু সে-দলের মধ্যে একা এই লোকটিই মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়াছেন। অনায়াসে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। ঠিক করিলাম, অবসরমত এঁর সঙ্গে ভালো করিয়া আলাপ করিব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথায় কথায় এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠিয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার নিজের মত কি?"

"সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার নিজের মত যে, এত বড় লেখক পৃথিবীতে খুব বেশী আসেন নি। আমার পড়াশুনা বেশী নয়, বিদ্যাও কম, আমার নিজের কথাই বলতে পারি যে, এত বড় প্রতিভাবান মনের সংস্পর্শে আমি আসি নি।"

"আচ্ছা, রাজনীতির দিক দিয়ে যদি বিচার করেন, তবে তাঁর স্থান কোথায় হবে?"

উত্তর করিলেন, "জানেনই তো তিনি রাজনৈতিক নেতা নন্। আন্দোলনের জন্য যে-মানুষ দরকার, তা তিনি নন্। রাজনীতি আজ প্রায় আমাদের পুরা মনের মনোযোগ আবদ্ধ করে রেখেছে—এ সত্য। কিন্তু বাংলার যে মন আজ দেখতে পাচ্ছেন, তা বিশেষ করে দুটি মানুষের মানসরসে পুষ্ট—একজন বিবেকানন্দ, অপরজন রবীন্দ্রনাথ। জাতির স্রষ্টা হিসাবেও তিনি অমর।---

"রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ের গভীরে তাঁর সত্যতর পরিচয় রয়েছে; আমি তাঁকে দার্শনিক বলি না, কারণ দার্শনিক হবার জন্য মনীষাই যথেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু মনীষী নন্, তিনি সত্যদ্রষ্টা। ঋষি। জীবন সম্বন্ধে তাঁর সত্যদৃষ্টি আছে, তাই প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক কালের সত্য-অন্বেষুর কাছে তাঁর মর্যাদা থাকবে। ভারতের যদি কোন বিশেষ mission থাকে, তবে তা জানাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একজন অধিকারী পুরুষ।---

"আমার মনে হয়, ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটিতেই বোধহয় এ-দেশের কথাটি সবচেয়ে পরিষ্কার পাওয়া যায়; এই বহুতে এক ব্যক্ত হয়েছেন, সমস্তুতে তিনিই কর্ম-কর্তা; তিনি ভোগ করেন, তাই তিনি ত্যাগ করেন। ভোগের এর চেয়ে চরম পথ আর নাই, —মা গৃধঃ, লোভ কোরো না, এ কার ধন?"

"গান্ধীজীও বলেন, "Many of us believe, and I am one of them, that through our civilisation we have a message to deliver to the world." কিন্তু তিনি তো ভোগের কথা বলেন না।"

"গান্ধীজী সত্যদ্রষ্টা, বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি। কিন্তু গান্ধীজীর মানসিক গঠন Asctic, তাই Morality-র দিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উপনিষদের উত্তরাধিকারী। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে দু-জনের একটু তফাৎ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো জানেন---বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। গান্ধীজী বর্তমান সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারেন নি, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সত্য আংশিকত্ব-দোষ পেয়েছে। Morality-র সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার কোন মিল করতে না পেরে, গান্ধী এ সভ্যতাকে অস্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি, তাঁর মধ্যে একটা Synthesis আছে। মানুষের বুদ্ধি যে বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে সৃষ্টি করেছে, বুদ্ধির সে দানকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি, পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ সভ্যতা অসম্পূর্ণ, এবং এইখানেই ভারতের বিশেষ mission-এর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। - - -

"রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য একটু খুঁজলেই তাঁর সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে পারবেন। আমি এক সাধককে জানি, 'রামকৃষ্ণকথামৃত' এবং অরবিন্দের 'Lights on Yoga' যত পড়তেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তত পড়তেন। চার অধ্যায়ের তালিকায় এ তিনটিই স্থান পেয়েছিল। গীতা ও গীতাঞ্জলি তিনি পাশাপাশি রাখতেন, প্রয়োজনমত কখনও এটা পড়তেন কখন ওটা পড়তেন। সাধক মানুষ যাঁর লেখায় পাথেয় পেতেন সে লেখার লেখক এদিক দিয়ে নিশ্চয় দীন-দরিদ্র বা আনাড়ী নন---বুঝতেই পারেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন, এ পথের সন্ধানীরা বলেন---ঐ তাঁর First revelation, অরবিন্দের ভাষায় opening, উপনিষদের ভাষায় আত্মদর্শন বা আবরণ-উন্মোচন। এর মানে কি জানেন,---'আমি জেনেছি তাঁহারে, মহান্তপুরুষ, যিনি আঁধারের পারে'।---বলতে পারেন যে, এজন্য রবীন্দ্রনাথ সাধনা করেছেন কিনা? সাধনা আগে হয় না, পরে হয়। সত্যের প্রকাশ যে-কোন কারণে সহসা জীবনে দেখা দেয়, তারপরে সাধনা চলে। এ সত্য-বোধকে স্থায়ী করতে---জীবনকে সে-ছন্দে বেঁধে নিতে। লক্ষ্য নিশ্চয় করেছেন যে, মহাত্মাজী নিজের জীবনকে বলেন Unexpriment with Truth, মহাত্মাজীর যা Truth রবীন্দ্রনাথের নিজের ক্ষেত্রে তাহাই জীবন-দেবতা। জানি না এ আপনার নজরে পড়েছে কিনা।---রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কবির মত বিষয় নিয়ে কবিতা লেখেন না, নিজের অনুভূতির বিচিত্র গান গেয়ে যান, পরে তার একটা নাম দেন। কেন? সমস্ত গান, কবিতাই ঐ একের মধ্যেই বিধৃত ব'লে।"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া সাহিত্যিক বলা হয়, মতবাদ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

শান্ত সুরে জবাব দিলেন, "ওটা গালি। আপনারা কখনও বলেন না, বুর্জোয়া Scientist, অথচ বুর্জোয়া সাহিত্যিক বলতে আপনাদের দ্বিধা হয় না। Science-এর জাত বা শ্রেণী নাই, এ মানতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যের বেলায়ই আপনাদের বুদ্ধি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, গোঁড়ামি দেখা দেয়। রাজনীতি ও সমাজনীতিতে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তা আপনারা অনায়াসে সাহিত্যেও টেনে আনেন। কবিতাটি বোধহয় জানেন---

কমলবনে কে পশিল হীরার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "সাহিত্য অর্থে আপনি কি বোঝেন তবে?"

"এক কথায় বুঝানো কষ্টকর। তা ছাড়া, সংজ্ঞা-নির্দেশ সব ক্ষেত্রেই কঠিন ব্যাপার, এমন কি একপ্রকার অসম্ভবও বলতে পারেন। বিজ্ঞান যদি সত্যসন্ধানী হয়, সাহিত্যকে তবে বলা যায় রসসন্ধানী। মানুষের প্রাণ ধারণ করতে হয়; এদিকের প্রয়োজন নিয়ে সমাজনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি মিলে সভ্যতার একটা দিক গড়ে উঠেছে। মানুষ বাঁচে, প্রাণ ধারণ করে---এতেই কি মানুষ পর্যাপ্ত, না মানুষের আর কিছু আছে?"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "নিজের মধ্যে যে সত্যের সন্ধান পায় নাই কিম্বা করে নাই, তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়---এই আমার ধারণা। - - - 'চার অধ্যায়' নিয়ে সেদিন আপনারা উত্তেজিত হয়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি জন্মদিনে যে 'প্রত্যভিনন্দন' বক্সা ক্যাম্পের বন্দীদের পাঠিয়েছিলেন, তা আর একবার দেখে নেবেন। তখন বুঝতে পারবেন, আপনাদের মধ্যে মানুষের কোন্ পরিচয়কে তিনি দেখ্‌তে পেয়েছেন ও সম্মান দিয়েছেন। - - -

"আপনাদেরই একজনের কথা বলি, যাঁকে সবাই সম্মান করে থাকেন নেতা বলে। জীবনে, ব্যক্তিগত বা রাজনীতি যে কোন ক্ষেত্রেই হউক, যখন ভয়ানক সময় উপস্থিত হয়, বিশ্বাসের জোর কমে যায়, বুদ্ধিতে পথ পরিষ্কার আর ধরা পড়তে চায় না,---তখন তিনি যে ভাবে শক্তি সঞ্চয় করতেন, শুনলে সত্য বলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। শক্তি সংগ্রহ করতেন গান গেয়ে, অথচ তিনি গান জানেন না। এই রকম দিনে কতবার যে আমি নিজেই তাঁকে গুন্ গুন্ করে আবৃত্তি করতে শুনেছি,

তোমার আসনতলের মাটির পরে
লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।

"বিপ্লবের নেতাকে শক্তিরসে যিনি পুষ্ট করতে পারেন তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে আপনাদের আরও একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা নিজেরা সাধক নই, প্রেমিকও নই, আমরা সত্য-অন্বেষুও নই---তাই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্য বুঝতে আমরা স্বভাবতই অক্ষম।" - - -

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিলেন, "এই রাজপুতনায় এসে কার কথা আপনার প্রথম মনে হয়েছিল ?"

"রাণা প্রতাপসিংহের।"

"রাণা প্রতাপের আগে এবং পরে কত লোক রাজপুতনায় জন্মেছে, কিন্তু। ঐ লোকটিই শুধু এ-দেশের মানসিক প্রতিমূর্তি বা প্রতিনিধি হয়ে জীবিত আছেন। বাংলার ও ভারতের আজকের সমস্যার আজ বা কাল একদিন মীমাংসা হবে। তখন এই রবীন্দ্রনাথের নিকট আমাদের সেদিনকার দেশবাসীর আসতে হবে,---দেশের ঐশ্বর্যের ও বাণীর সন্ধান নিতে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ বুঝতে পারে নি, কিন্তু সৌভাগ্যের দিনে জাতির মহৎ ও সত্য প্রয়োজন যখন দেখা দেবে, তখনই রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসী বুঝতে পারবে। এ প্রতিভার পরমায়ু যে কত অমিতায়ু তা বুঝতে একটু দৃষ্টি থাকা চাই।"---

আমার জীবনে লেনিন

"আমার জীবনে লেনিন"---বিষয়ে আমাকে লিখতে বলায় ভিতরে ভিতরে গভীর আলোড়ন অনুভব করছি। এ-বিষয়ে লিখতে বলার অর্থ কি, এ-পর্যন্ত যা কিছু কাজ হয়েছে, তার সারাৎসার বর্ণনা বোঝায় না ? বিপ্লবের অগ্নিময় দিনগুলিতে লোকে জীবন দিয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। কি পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো-শহরের ব্যারিকেডে, কি বুখারার আমিরী শাসনের ধূমায়মান ধ্বংসস্তূপে, সর্বত্রই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আর রক্তের বন্যায় জন্ম নিয়েছে নতুন যুগ, লেনিনের যুগ।

আর আজ ? যে-কোনো সাধারণ একজন সোভিয়েতের মানুষকে, যেমন ধরুন, একজন বাস্তু-শ্রমিক বা এঞ্জিনীয়রকে যদি আপনি এই প্রশ্নটি করেন, তাহলে ? তিনি বলবেন, তাঁর কীর্তি, তাঁর কৃতি লেনিনবাদী বিপ্লবের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। তিনি তৈরি করে চলেছেন ঘরবাড়ি, স্কুল, মহাকাশ-যান। আর এই সব নির্মাণেরই নাম লেনিন।

আমাদের সেরা রাস্তাগুলোর নামকরণ হয়েছে লেনিনের নামে। প্রতিটি সোভিয়েত লেখকের সাহিত্যকর্মে এই রকম আরও একটি করে অবাধ চলাচলের রাস্তা আছে। তা' হল তাঁর রচনার সব-সেরা কয়েকটি পাতা।

আমার লেনিন-সরণিতে আমার কাব্যের নায়কদের বাস। যেমন, তাজিক জনগণের নতুন সুখী জীবন সম্পর্কে লেখা দীর্ঘ-কবিতাটির শীর্ষ নাম যার নামে সেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীনচেতা হাসান আর্‌বাকেশ কিংবা "দিল-এর ফরমায়েশে" নামের চলচ্চিত্রে দৃঢ়চিত্তে সদা-আত্মস্থ করিমভ অথবা আমার "প্রিয়তমা" সেই সাহসিকা, যার উদ্দেশ্যে হৃদয়তাপে তপ্ত আমার বহু কোমল কাব্যপংক্তি

মির্জা তুরসুন জাদা

উৎসর্গীকৃত, আর "হিন্দুস্তানে মুসাফির" কবিতায় বোম্বাইয়ের সেই ছোট্ট ছেলেটি লেনিনবাদী ধ্যানধারণা ক্রমে ক্রমে যার অধিগত হচ্ছে---এরা সবাই আমার লেনিন-সরণির বাসিন্দা।

আমার এই সড়ক থেকে খুবসুরত পামির পর্বতশ্রেণী চোখে পড়ে। তাজ্জব, ভারি তাজ্জব এই পথ।

লেনিন

আবার দেখি, কখন পৌঁছে গেছি ছেলেবেলায়। বালক-আমি হেঁটে চলেছি ওই পথ ধরে। মাথার উপর ঝুলছে বাৎসল্যে পরিপূর্ণ এশিয়ার দোলনার শিয়রে তারাগুলি। ঠিক আমার মাথার উপর একটি প্রকাণ্ড তারাখচিত পথ দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্নের জবাবে মজাদার কোনো কথা শুনতে পাব, এই আশায় বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ওটা কী ?" আমার বাবা ওস্তাদ তুরসুন মস্ত গল্প বলিয়ে। অনেক কাহিনী জানা আছে তাঁর। আর তাঁর গায়ে কাঠের চাঁছির মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।

"ও তো ছায়াপথ, বাচ্ছা। গরীব লোকেরা ওই পথ ধরে খড়ের আঁটি বয়ে নিয়ে যায়, আর যেখানে যেখানে খড়ের টুকরো ঝরে পড়ে সেখানেই চমকে ওঠে এক-একটি তারা---"

আহা, আমিও যে ওই রাস্তা ধরে যেতে চাই---

আবার দেখি, ওই রাস্তা-বরাবর কখন হেঁটে চলেছি আমি। এবার আমি ছাত্র। হাতে একটা বই। বইটা এমন আশ্চর্য নতুন ধরনের যে, মনে হচ্ছে, বই পড়তে পড়তে আমি যেন তারাদের মাড়িয়ে চলেছি। আমার হাতের বইটি লেনিনের লেখা।

আমার এই রাস্তার মোড়গুলো সময়ের বাঁক, পৃথিবীরূপ গ্রহেরই মোড়-ফেরা। এই সব মোড়ে-মোড়ে দেখা মেলে গোর্কি, আর মায়াকোভস্কির, আইনি আর তিখোনভের, পাব্‌লো নেরুদা আর রসুল গামজাতভের—ভবিষ্যতে এর অপর কোনো মোড়ে আমার সদ্যকল্পিত দীর্ঘ কবিতা "লেনিন- সকাশে ভারতীয় প্রতিনিধি—মুহাজিরিনরা" থেকে উঠে-আসা

লেনিন স্মরণে

প্রশান্তকুমার মৌলিক

একশ বছর আগে সভ্যতার সে-কোন এক মহাপুণ্যক্ষণে
[illegible] লাল তারা উত্তরের অন্ধকার হিমেল গগনে।
নিপীড়িত, সর্বহারা, মানবিক অধিকারে বঞ্চিত যারা
সেদিন সে-তারা হতে পেয়েছিল জীবনের
নব-অর্থ ; প্রোজ্জ্বল পথের দিশারা।

জীবন্মৃতের মাঝে নব-উন্মনা নব-মুক্তির প্রেরণা
এনেছিল নব-প্রাণ ; করেছিল নব-সূর্য-উদয় ঘোষণা।
অত্যাচার মুছে গেছে ; টুটে গেছে আজ সেথা
শৃঙ্খল-কারাগার
অযুত প্রাণের মুক্তি ঘোষিতেছে জল-স্থল
অন্তরীক্ষ-পাহাড়।

তবুও এখনো কত দেশ-মহাদেশে
জমাট আঁধার রাত ; অত্যাচারী সমাসীন নিত্য নববেশে।
উত্তরের সে লাল তারা আজিও সেথায়
বঞ্চিত, পীড়িত বুকে জ্বলে যে সদাই।
নৈরাশ্য-ঘোরান্ধকারে আজো অমলিন
সহস্র সংগ্রামী বুকে
সে সহস্র লেনিন।

রাত্রির সঙ্গে কথা

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

আসলে এ সবই হচ্ছে একটি প্রতীকী নাটক
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর মাত্র ঃ
ভূমিকার সামান্য অদলবদলে একটু যা ভিন্ন স্বাদ—
নইলে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি
একই মঞ্চে এক একটি মুখোশে।
তবু নাটকের শেষ দৃশ্যের পর
যবনিকা পড়ে গেলে
যখন একে একে সব চলে যায় ;
তখন শূন্য গৃহে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে
মনে হয় একটানে মুখোশটা খুলে
রাত্রির সঙ্গে কথা বলি নিজের ভাষায়।

শব্দের সমুদ্রের কাছে ভিক্ষাপাত্র ধরি
তৃষ্ণার পানীয় দাও ঃ আমি উপবাসী
হে শৈশব, করজোড়ে ফিরে পেতে চাই
রূপনারাণের কূলে কূলে আমার সেই
সহজিয়া আলোকলতা মন।
আর একবার কাঁদতে চাই
যন্ত্রণা পাপ আর প্রবঞ্চনার মুখোশটা নামিয়ে
আবার সেই ছেলেবয়সের গলায় অনেক অনেকক্ষণ ধরে।

ভালোবাসা...স্বপ্ন...বিশ্বাস...সরলতা
পদ্মপাতায় মোড়া আহা সেই নাগকেশরের বেলা ঃ
এখনো একবার যদি ইসারায় বলে,—
"কাছে আয়...পাশে বস—তুই তো সেই সেদিনের টুটু—"
তাহলেই মুখোশ থেকে মুখটা খুঁজে পাই।

রাত্রির সঙ্গে কথা বলতে দাও নিজের ভাষায়
অন্তত একবার হে আকাশ।

বীরদেরও দেখা মিলবে, আশা রাখি। ভারত-সফরের সময় ওই মুহাজিরিনদের একজন মুহম্মদ আবুদুর রব বার্কির সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর কাছে ভ্লাদিমির ইলিচের কথা বলবার সময় চোখে তাঁর আলোর ঝলকানি দেখতে পাই। আমাদের নেতার জীবন ও বাণী এই চির-অনির্বাণ আলোর ঝরণা। কারণ লেনিনের অমর ধ্যানধারণা ও তার বাস্তব রূপায়ণ, তাঁর জীবনের দুশ্চর অসাধ্যসাধন সোভিয়েতের জনগণ ও সারা বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের কাছে অনুপ্রেরণা ও আশাবাদের অফুরাণ উৎস। আমার নতুন কবিতার কাব্য-বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনার সময় অবশ্য এখনও আসে নি, তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, আমার এই কবিতা দেশকালের সীমা ছাড়ানো এই শাশ্বত "চির-অনির্বাণ আলো"র, লেনিনবাদী মহৎ ভাবনার স্ফুলিঙ্গে দাউ দাউ প্রজ্বলিত মানুষ মশালদের কথাই বলবে।

আমার লেনিন-সরণি বন্ধুতা, স্বাধীনতা আর মমতার রাজপথ ; জীবনে যা-কিছু আমি শিখেছি, কবিতার শ্লোকে যা-কিছু বিবৃত করেছি, তার সারাৎসার এই পথ। অভিযাত্রীর সামনে চির-প্রসারিত এই পথ। এই লেনিন-সরণি।

পশু-পক্ষী-পালন

পক্ষিতত্ত্ব

রমেশ মজুমদার

পক্ষীর পালক আমাদের নিতান্ত পরিচিত। বিলাসীর উপাধান ও গদি গঠনে এই পালক কাজে লাগে। তা ছাড়া সুন্দরীদের শোভাবর্ধন করে ইউরোপে। কিন্তু আমাদের ক'জন এর গঠনবৈচিত্র্যের খোঁজ রাখেন?

পালক পক্ষিজাতির একেবারে নিজস্ব সম্পদ। স্তন্যপায়ী জীবদের ভেতর কারো দেহ লোমে ঢাকা। তিমির মত কারও দেহে শুধু চর্ম, কারো'ব শলাকা আবরণ দেখা যায়। আর্মাডিলোর ন্যায় কারো দেহ সুকঠিন চর্ম-বর্মে সুরক্ষিত। কিন্তু সব পাখীর দেহে পালক আছে। আবার একেবারে পক্ষবিহীন পাখীও আছে। কিন্তু পালক নেই, এমন পাখী কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। দেহরক্ষা ও শারীরিক তাপের সমীকরণের নিমিত্ত মৎস্য এবং সরীসৃপদের দেহে যেমন শল্কের আবরণ, পাখীর দেহেও তেমনি পালকের মনোরম কোমল পোষাক। ডানা সংলগ্ন কতকগুলি পালক বেশ লম্বা হয়ে থাকে। চলতি ভাষায় এদের কুইল পালক বলে। ময়ূর ও হাঁসের কুইল পালক আমাদের সবার কাছেই পরিচিত। এদের গঠন সম্বন্ধে নানা বিষয় খালি চোখে দেখা যেতে পারে।

বার্ব ও বার্বিউল

একটি হাঁসের বা ময়ূরের কুইল পালক হাতে নিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে, মূল কুইল দণ্ড হতে দু'দিকে অসংখ্য কুইল-শাখা বের হয়ে গেছে। এগুলিকে নাড়া দিলে দেখা যাবে যে, এরা পরস্পরের সাথে উপশাখা যোগে সুসংবদ্ধ হয়ে আছে। এই শাখাগুলিকে বার্ব এবং উপশাখাগুলিকে বার্বিউল বলে। প্রত্যেক বার্ব হতে দু'দিকে দুইশ্রেণীর বার্বিউল বের হয়। এই বার্বিউলগুলির বিশেষত্ব এই যে, উপরের বার্ব নিঃসৃত বার্বিউলগুলিকে নীচের বার্বের বার্বিউলগুলিকে চেপে ধরে। সেইজন্য বার্বিউল জাল সহজে ছিন্ন করা যায় না। ডাঃ গেডো ১৫ ইঞ্চি লম্বা একটি সারসের কুইল পাখায় ৬৫০টি বার্ব গণনা করেছিলেন। এর প্রত্যেকটিতে আবার ৬০০ জোড়া বার্বিউল আছে। এই সংখ্যাগুলিকে অতিরঞ্জিত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ পাখীর শরীরতত্ত্বে ডাঃ গেডো অদ্বিতীয় বিজ্ঞ।

মোল্টিং অথবা পালক পরিবর্তন

বংশপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছি যে, সরীসৃপেরা যেমন চর্মের পরিবর্তন
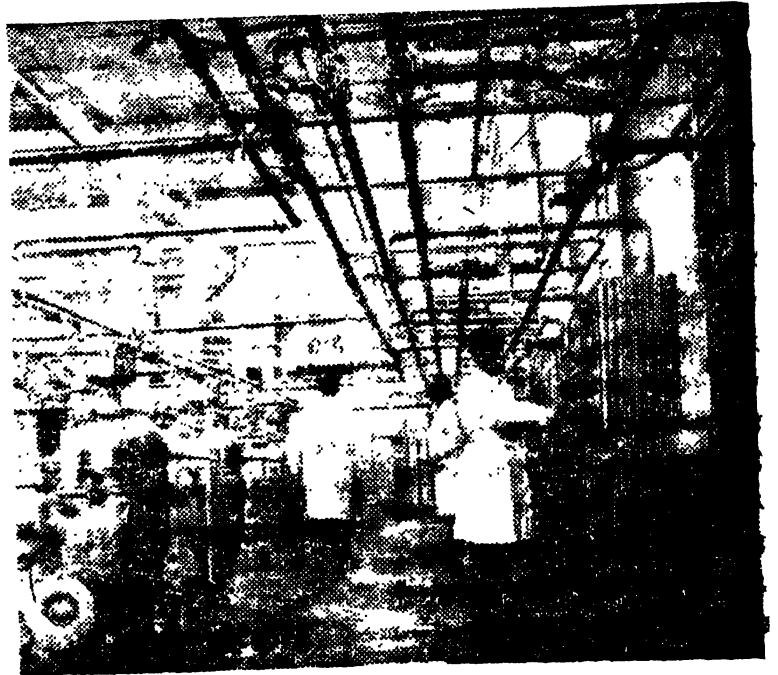
রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত কিরগিজিয়ার উজগেন কারখানাতে গড়ে তোলা দুধের নবনির্মিত নির্বাপ-কেন্দ্র। এখানে ভবিষ্যতে মাখনও উৎপাদিত হবে

করে থাকে, তেমনি পাখীরাও বছরে একবার করে পালক পরিবর্তন করে থাকে। অবশ্য সরীসৃপের চর্ম পরিবর্তনের সাথে পাখীর পালক পরিবর্তনের একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাপ ও টিকটিকি তাদের সমগ্র পুরাণো চর্মটিকে একেবারে ত্যাগ করে। কিন্তু পাখীরা সাধারণত পালকগুলিকে পরিবর্তন করে নেয়। মনে হয় এদের জীবনযাত্রা প্রণালীর পার্থক্যই এর প্রধান কারণ। কিন্তু হাঁসজাতীয় পক্ষীরা তাদের সরীসৃপজাতিদের ন্যায় একেবারে সকল পালক পরিবর্তন করে। এইজন্যই এরা কিছুদিনের জন্য একেবারে উড়তে অক্ষম হয়ে থাকে। এই সময় এদের প্রাণরক্ষার জন্য লুকিয়ে থাকতে হয় এবং স্ত্রীবেশ ধারণ করতে হয়। সাধারণত: পাখীরা সন্তানোৎপাদন শেষ হয়ে গেলে তাদের পালক পরিবর্তন করে থাকে। আবার কোন পাখী এই সময় পায়ের নখ অথবা ঠোঁটও বদলিয়ে নিয়ে থাকে। ইংলণ্ডের পাফিন নামে এক পাখী প্রত্যেক বছরে নতুন ঠোঁট পায়।

পালকের বর্ণ

আশ্চর্যবোধ হলেও অনেকগুলি পালকের যে রঙ দেখি তা প্রকৃত রঙ নয়। পালকের রঙ সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। এর প্রথম শ্রেণী রাসায়নিক রঙ। পালকের উপাদানে মিশ্রিত অথবা অংশবিশেষে সঞ্চিত রঞ্জনদ্রব্য থেকে প্রথম শ্রেণীর বর্ণের উৎপত্তি। এই শ্রেণীর বর্ণ আলোক ও ছায়ার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না। প্রথম শ্রেণীর রঙের ভেতর টুরাকিন নামক রঙের আশ্চর্য প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখ্য। আফ্রিকার টুরাকু নামে এক পাখীর লাল পালকে এই রঞ্জনদ্রব্যটি পাওয়া যায়। এছাড়া টুরাকুর পালকে শতকরা ৫ থেকে ৮ ভাগ তামা থাকে বলে জানা গেছে। বৃষ্টির জলে ভিজলে এই পাখীর রঙ লাল থাকে না। কিন্তু রোদে পালক শুকালে আবার স্বাভাবিক লাল রঙ ফিরে পায়।

রঞ্জনদ্রব্য ও পালকের বহির্ভাগের বিশেষ প্রকারের গঠনের ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর রঙের উদ্ভব হয়ে থাকে। সুতরাং আলো ও ছায়ার পরিবর্তনে এই শ্রেণীর বর্ণেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। তোতা পাখীর গাঢ় নীলরঙ পাখা আলোর ধরলে ধূসর অথবা হলদে দেখায়। এমাজন তোতার সবুজ পাখা ভিজলে বাদামী রঙ হয়ে যয়। এ পর্যন্ত কোন পাখীর দেহেই নীলবর্ণের রঞ্জন পদার্থ পাওয়া যায় নি। পালকের গঠনের ফলে আলোছায়ার প্রভাবে কোন কোন পাখীকে নীলবর্ণ বোধ হয়। ময়ূর এবং বার্ড অব প্যারাডাইজের অতি উজ্জ্বল রঙ তৃতীয় শ্রেণীর রঙের বিশেষ উদাহরণ। অণুবীক্ষণযোগে এই সব পাখীর দেহে অতি সূক্ষ্ম গহ্বর এবং তার ভেতর অতি সূক্ষ্ম মাংসবিন্দু দেখা যায়। এগুলি ত্রিকোণ কাচের মত রঙের উজ্জ্বলতা রক্ষা করে।

রাশিয়ার কিরগিজিয়ার পশুপ্রজনন ও পশু-চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্রের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ চলছে

ঠোঁটের গঠন

সরীসৃপের দাঁতের স্থানে পাখীদের ঠোঁট গড়ে উঠেছে। এই ঠোঁট শিং-এর মত কঠিন পদার্থে গঠিত একটি খোসা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন কোন পাখীর ঠোঁট দুটি খোসায় নির্মিত। কোন কোন পাখীর ঠোঁট অনেকগুলি খোসার সমবায়ে গঠিত হয়ে থাকে।

নখ

বিভিন্ন পাখীর নখও বিভিন্ন প্রকারের হয়। কোন কোন পাখীর মধ্যম আঙুলে একটি ছোট চিরুণীর মত পদার্থ থাকে। এর ব্যবহার আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। কোন কোন পাখীর পায়ে ও পাখায় তীক্ষ্ণ অস্ত্র থাকে। যুদ্ধের সময় এই অস্ত্র কাজে লাগে।

বেশভূষা

পুরুষ ও স্ত্রী পাখীর বর্ণ-বিভেদ এবং তার বিশদ ব্যাখ্যা :—বহু প্রাণীতত্ত্ববিদই বিভিন্ন পাখীর পালকের রঙের পার্থক্যের উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। পরলোকগত বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত চার্লস ডারউইন এঁদের অগ্রণী। সুগায়ক কোকিলের পালক কালো। নিষ্ঠুর শিকরের রঙ পেঁচার রঙের অনুরূপ। আবার টিয়াপাখীর পালকের রঙ সবুজ। এই রঙের বিভেদ নিরর্থক নয়। মানুষের ভেতর স্ত্রী জাতিই সমধিক অলঙ্কারপ্রিয়। পাখীদের স্বভাব অনেকক্ষেত্রেই এর বিপরীত। অবশ্য অনেক পাখীর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্যের কোনও তারতম্য দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে এই তারতম্য ঘটে, সেখানে প্রায়ই দেখা যায় যে, পুরুষ-পাখীই স্ত্রী-পাখী থেকে বেশী সুন্দর। গৃহপালিত পাখীর ভেতর মোরগ এর অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। মোরগের উজ্জ্বল লালবর্ণের চূড়া এবং পেছন দিকের উজ্জ্বল রঙের পালক তার অঙ্গসৌষ্ঠব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করছে। কিন্তু মুরগীর দেহে এই দুটি অলঙ্কারের অভাব। ময়ূর তার সুন্দর পেখমের জন্যই বিখ্যাত। কিন্তু ময়ূরীর কোন পেখম নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, এই ভূষণ পার্থক্যের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যে সকল পাখীর স্ত্রী

ও পুরুষের ভেতর এমন শোভার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়, তাদের ভেতর কেবল-মাত্র স্ত্রী-জাতিই ডিমে তা দিয়ে থাকে। সুতরাং জননঋতুতে আত্মরক্ষার এবং ডিমরক্ষার জন্য তাদের আত্মগোপন করে থাকতে হয়। ময়ূরীর যদি ময়ূরের মত উজ্জ্বল রঙের পেখম পালক থাকতো, তা হলে তার পক্ষে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে থাকা কখনই সম্ভব হতো না। কখনো উজ্জ্বল রঙের পুরুষ পাখীও ডিমে তা দিয়ে থাকে। ভারতবর্ষের কোয়েইল ও স্নাইপ জাতীয় কোন কোন পাখীর পুরুষেরা ডিমে তা দিয়ে থাকে, এদের ভেতর সৌন্দর্যে স্ত্রীজাতি শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দেখা যায়, বংশরক্ষার জন্য এইপ্রকার শোভার তারতম্যের প্রয়োজন। এইজন্য পক্ষীছানারা আত্মরক্ষায় সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে একই রকম পালকসজ্জা ধারণ করে। যাঁরা কোকিল ছানা দেখেছেন তাঁরাই জানেন, বাল্যকালে কেবল-মাত্র পালক দেখে এদের স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায় না। ময়ূরশাবককেও বাল্য-কালে জননীর অপেক্ষাকৃত হীনবেশেই পরিতৃপ্ত থাকতে হয়।

রক্ষক বর্ণ

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পক্ষী ও পক্ষিণীর সজ্জার তারতম্য রয়ে গেছে। এই প্রয়োজন সাময়িক। মরুভূমির কতকগুলি পাখী ঠিক এই কারণেই স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে তাদের বাসভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যানুরূপ রঙ লাভ করে। সেখানে গাছপালা জন্মে না, লুকোবার প্রয়োজন থাকলেও সেখানে লুকোনোর জায়গা মেলে না। সুতরাং সাধারণ পাখীদের মত উজ্জ্বল রঙের পালক থাকলে মরুভূমির পাখীরা কখনই শত্রুর দৃষ্টি এড়াতে পারতো না এবং জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতো না। এইজন্য তাদের পালকের রঙ মরুভূমির সাধারণ দৃশ্যের মত গড়ে উঠেছে। দূর থেকে এই সব ধূসর রঙের পাখীকে পাখী বলেই চেনা যাবে না। এইপ্রকার বর্ণকে ইংরেজীতে বলে প্রোটেক্‌টিভ কলারেশন বা রক্ষক বর্ণ।

রাশিয়ার অন্তর্গত বোরোভস্কে অবস্থিত পশুদের শারীরবিদ্যা ও জৈবরসায়ন সংক্রান্ত গবেষণাগারে কর্মরত দুই বিজ্ঞানী

ঋতু পরিবর্তন ও রঙ পরিবর্তন

শীতপ্রধান দেশের কোন কোন পাখী আবার ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে রঙ পরিবর্তন করে। ঐসব দেশে শীতকালে অবিশ্রাম তুষারপাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের একেবারে পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং এইসব পাখীও চারিদিকের দৃশ্যানুরূপ সাদা বেশ ধারণ করে থাকে।

বিদায় দিয়েছ যারে নয়নের জলে

বক পাখির বাচ্চারা সুখী। কারণ, তাদের পিতামাতারা তাদের যথেষ্ট যত্ন নেয়। সব সময় খাবার খুঁজে এনে দেয়, তাড়াতাড়ি উড়তে শেখায় যাতে শীত পড়লে বাচ্চারা তাদের সঙ্গে উড়তে উড়তে গরমদেশে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে। কিন্তু কি কারণে কে জানে—এহেন স্নেহশীল এক বক-দম্পতী হামবুর্গের কাছে এক গ্রামে তাদের বাসা থেকে একটি বাচ্চাকে হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কপালগুণে বাচ্চাটি জখম হয় নি। গ্রামের বাজকরা বাচ্চাটিকে লালন-পালন করে বড় করার পর শীত পড়তে আশেপাশের অন্যান্য বকরা যখন গরম দেশে যাওয়ার জন্য জড়ো হোল, এটি কিন্তু সে দলে ভিড়ল না। তুষারের মধ্যে সে নিজেই খুঁজে খুঁজে খাবার যোগাড় করে আর খুব শীত পড়লে চুপটি করে পাত্রকর্তার কাপড় শুকোবার গরম ঘরে গিয়ে বসে থাকে।

পুষ্টিকর খাদ্য ও বেকার সমস্যা সমাধানে পোলট্রি শিল্প

হাঁস-মুরগি পালন আজ পশ্চিমবঙ্গে দারুণ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। দুধের জন্য গরু বা মহিষ পালন করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। কারণ ইহাতে প্রচুর জায়গা, অর্থ ও লোকের প্রয়োজন হয়, যাহা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু সহজে পুষ্টিকর খাদ্য কোথায় পাওয়া যাইবে? সকলে তাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনের তাগিদে ৪।৫টি হাঁস বা মুরগি পালন করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তাহাদের টাটকা ডিম হইতে এই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অনেকখানি মেটান সম্ভব। এই প্রয়োজনের তাগিদে, অর্থাৎ ভেজাল খাদ্যের যুগে একমাত্র নির্ভেজাল পুষ্টিকর প্রোটিন খাদ্য হিসাবে ডিমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে মুরগি পালন ও মুরগির মাংস বা ডিম খাওয়া সম্বন্ধে যে কুসংস্কার কিম্বা অস্পৃশ্যতার ভাব ছিল, তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। আর বেশী দেরী নাই---যেদিন সমগ্র ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লবের সাথে মুরগি পালনের বিপ্লবও দেখা দিবে।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমস্যাজর্জরিত, কিন্তু সকলের মধ্যে যে সমস্যা ভয়াবহরূপে দেখা দিতেছে, যাহার সমাধান না হইলে দেশ ও জাতির সম্মুখে এক চরম সঙ্কট দেখা দিবে, সেই বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান যে এই পোলট্রি শিল্পের মাধ্যমে হইতে পারে, সে সম্বন্ধে আজ আর কোন দ্বিমত নাই, বিশেষ করিয়া নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সম্প্রতি নজর পড়িয়াছে এই শিল্পের প্রতি। আমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা দ্বারা বলিতে পারি যে, এই শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহ-উদ্দীপনা তাদের প্রচুর, কিন্তু অর্থ-সঙ্কট ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে তাহারা বিশেষ নিরুৎসাহ বোধ করেন। বাঙালী যুবকেরা আজ আর কোন কর্মের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ নন। শিক্ষা ও উৎসাহ পাইলে অনেক যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও বাড়তি খালি ঘর, বারান্দায় ও বাড়ীর ছাদে ডীপলিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন করিয়া দু'পয়সা অর্জন করিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে গৃহের পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদাও অনেকাংশে মিটাইতে সক্ষম হইবেন, কিন্তু এ-ব্যাপারে প্রয়োজন সরকারী সহযোগিতা। মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে কোন ব্যবসাতেই

সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব নহে। অনেকের ধারণা, অল্প পুঁজিতে পোলট্রি ব্যবসা সুরু করা চলে এবং প্রচুর লাভ করা যায়, কিন্তু এ-ধারণা মোটেই ঠিক নয়। একশত ডিমপাড়া মুরগি পালন করিতে গৃহনির্মাণ সমেত (স্থান আছে ধরিয়া লইয়া) প্রায় তিন হইতে চারি হাজার টাকা পর্যন্ত লাগিয়া যায়। কিন্তু বেকারেরা এই অর্থ কোথা হইতে যোগাড় করিবে? আবার শুধু মূলধন সংগ্রহ করিলেই এই ব্যবসাতে সাফল্য-লাভ সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং-এর যথেষ্ট প্রয়োজন। উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা বা পরামর্শ গ্রহণ না করিলে প্রচুর লোকসানের সম্ভাবনা। সেইজন্য ব্যাপকভাবে গার্হস্থ্য শিল্পরূপে বেকারদের অন্ন-সংস্থানের জন্য আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন পোলট্রি-শিল্প প্রসারে উদ্যোগের ব্যবস্থা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ডেয়ারী এণ্ড পোলট্রি ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে---যাহার উদ্দেশ্য দুগ্ধ-শিল্প, পশুপালন ও পোলট্রি শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা। যে-কোন সংস্থাই গঠন করা হউক না কেন, যদি পরিচালকমণ্ডলীতে সৎ, দক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের স্থানলাভ না হয়, তবে সংস্থার উদ্দেশ্য কতটা সার্থক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্যান্য বহু সরকারী পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে ঐ একই কারণে। সেইজন্য অতীতের বহু পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলাফলের কথা স্মরণ করিয়া সঠিক-ভাবেই যাহাতে উপরিউক্ত সংস্থা পরিচালিত হয় সেইজন্য জনসাধারণকে সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ আমরা অর্থাৎ জনসাধারণ অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি এখন প্রয়োজন প্রকৃত কাজ---যাতে তার সুফল সমাজের সকল স্তরের লোক লাভ করিতে পারে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিদের সন্তানেরা আজ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে নানান রোগে আক্রান্ত হয়। সম্প্রতি আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীশান্তি-স্বরূপ ধাওয়ান শিশু স্বাস্থ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে এক ভাষণে এই বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুতরাং সঠিকভাবে পরিচালিত হইলে পোলট্রি শিল্পের প্রসারলাভদ্বারা এই শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ উপকৃত হইবেন। যাহার প্রয়োজন আজ সর্বাগ্রে।

হাঁস পালনে বিভিন্ন রোগের সমস্যা

[পশু চিকিৎসা অধিকারের প্রচার শাখার সৌজন্যে প্রাপ্ত]

হাঁসের নানা প্রকার রোগ হয়, এর মধ্যে কিছু কিছু রোগ আছে, যা অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং সময় সময় মারাত্মক হতে পারে। এ ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাব হলে অনেক সময় গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি রোগের বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাইরাস রোগ

(ক) ডাক প্লেগ

(ডাক ভাইরাস এণ্টারাইটিস)

সাধারণত বড় হাঁস এই রোগের শিকার হয়। সম্প্রতি আমেরিকায় বাচ্চা হাঁসের মধ্যেও এই রোগ ধরা পড়েছে। পশ্চিম বাংলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। যদিও বৎসরের যে-কোন সময়ে এই রোগ দেখা দিতে পারে, তথাপি বসন্তকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। মুরগীর প্লেগ রোগের সঙ্গে এই রোগের কোন সাদৃশ্য নেই। এই রোগ মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয় না।

লক্ষণ

রোগ-জীবাণু হাঁসের শরীরে প্রবেশ করার ৩।৪ দিন পরে হাঁস ছট্‌ফট্ করতে শুরু করে। বেশির ভাগ সময়ে অন্ধকারে বসে থাকে, ডানা-গুলি ঝুলে পড়ে--হাঁটা-চলার বা জলে সাঁতার কাটার কোন আগ্রহ থাকে না। পালক অবিন্যস্ত হয়ে যায়। খাওয়ার আগ্রহ কমে যায়—কিন্তু জলপিপাসা তীব্র হয়। চোখে পিচুটি পড়ে এবং নাক দিয়ে সর্দি গড়ায়। মাথা ফুলে যায়, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়। পা কাঁপতে থাকে এবং ক্রমশ অসাড় হয়ে পড়ে। সবুজ-তরল পায়খানা হয়—এইভাবে ১—৪ দিনের মধ্যে হাঁস মারা যায়। মৃত্যুর হার ৯৭ o/o —১০০ o/o

গ্লিসারিন ফস্‌ফেটের মধ্যে ঠাণ্ডা অবস্থায় মৃত হাঁসের যকৃত এবং প্লীহার রোগ নির্ণয়ের জন্য পশু-চিকিৎসা অধিকারের বেলগাছিয়াস্থিত কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে পাঠানো যেতে পারে।

প্রতিবিধান

আক্রান্ত হাঁসের চিকিৎসা করে কোন ফল হয় না, কিন্তু সুস্থ হাঁস-গুলিকে যথাসময়ে সরকারী তত্ত্বাবধানে "ডাক্ প্লেগ" টিকা দেওয়ালে এই রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

(খ) ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস

একদিন থেকে তিন সপ্তাহ বয়সের বাচ্চাদের এই রোগ হয়।

লক্ষণ

বাচ্চা হাঁস হঠাৎ আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত হাঁস শুয়ে পড়ে, মাথা পিছন দিকে উল্টে যায় এবং পা ছুঁড়ে ছট্‌ফট্ করে। অসুস্থ হাঁস ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আধ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর হার শতকরা ১০০। পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি এই রোগের প্রদুর্ভাব নির্ণয় করা হয়েছে।

রোগ নির্ণয়ের জন্য মৃত হাঁসের যকৃত গবেষণাগারে পাঠাতে হয়। সম্ভব হলে আক্রান্ত হাঁসের বাচ্চা পাঠালে রোগ নির্ণয় খুবই সহজ হয়।

প্রতিবিধান

এই রোগের 'এ্যাণ্টিসিরাম' দিয়ে আক্রান্ত বাচ্চাদের রক্ষা করা যায়।

(গ) রাণীক্ষেত

সাধারণত হাঁসের এই রোগ হয় না, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই রোগ ধরা পড়েছে।

(ঘ) অরনিথোসিস

আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ হাঁসের শরীর থেকেও এই রোগের জীবাণু পাওয়া গিয়েছে। রোগের লক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

(ঙ) পক্স বা বসন্ত

হাঁসের এই রোগ ভারতবর্ষে দেখা যায়। এই রোগের জীবাণু কেবলমাত্র হাঁসের শরীরেই রোগ ঘটাতে পারে। লক্ষণ তিন ধরণের হয়ে থাকে :—

(১) পক্সের গুটি হাঁসের ঠোঁটে, ঠোঁটের কোণে, চোখের পাতার ওপর এবং পায়ের পাতার ওপর দেখা যায়। শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রে এই ধরনের রোগ হয়।

(২) মুখের ভিতরের নরম অংশে সাদা গুটির মত দেখা দেয় এবং ক্রমশ হলুদ রঙের ঘায়ে রূপান্তরিত হয়। দু' সপ্তাহের মধ্যে এই ঘা সেরে যায়। শতকরা ৩০টি ক্ষেত্রে এই ধরনের পক্স হয়।

(৩) নাক ও মুখ দিয়ে ঘন সর্দি বেরিয়ে আসে, ক্রমশ চোখের নরম অংশ ফুলে ওঠে এবং এইভাবে একটি চোখ অথবা দু'টি চোখই নষ্ট হয়ে যায়। শতকরা ৭টি ক্ষেত্রে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়।

ব্যাকটীরিয়া ঘটিত ব্যাধি

(ক) হাঁসের কলেরা রোগ

আমাদের দেশে হাঁসের এই রোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাসচুরেল্লা নামক জীবাণু দ্বারা এই রোগ হয়।

লক্ষণ

সাধারণত এক মাসের উপর বয়স এই রকম হাঁসই এই রোগের

শিকার হয়। হাঁসের শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়, চামড়ায় জমা রক্তের দাগ দেখা যায় এবং হঠাৎ মৃত্যু হয়।

পায়খানার রং শাদা এবং আম-মিশ্রিত। কখনও কখনও জীবাণুর প্রাচুর্যহেতু গোড়ালির নিকট ফোলা দেখা যায়। শতকরা ৫০টি ক্ষেত্রে হাঁসের মৃত্যু হয়।

প্রতিবিধান

'ফাউল কলেরা ভ্যাক্সিন' দিয়ে সুস্থ হাঁসকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং রোগাক্রান্ত হাঁসকে সাল্‌ফা জাতীয় ঔষধ খাওয়ানো প্রয়োজন।

(খ) প্যারাটাইফয়েড (কিল্‌ ডিসিজ)

সালমোনেল্লা জাতীয় জীবাণু দ্বারা এই অসুখ হয়ে থাকে। সাধারণত বাচ্চারাই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ

ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা এবং ক্রমশ রোগা হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। চোখের পাতা ফুলে ওঠে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানা হতে পারে।

সদ্যজাত বাচ্চাগুলি কোন প্রকার লক্ষণ না দেখিয়েই মারা যায়। জল-পিপাসা বেড়ে যায়। কখনো কখনো ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠোঁট পিঠের ওপর রাখে—ক্রমশ পাশে শুয়ে পড়ে অথবা চিৎ হয়ে পা ছুঁড়তে থাকে।

চিকিৎসা

পানীয় জলের সঙ্গে সাল্‌ফা জাতীয় ঔষধ মিশিয়ে ভাল উপকার পাওয়া যায়।

(গ) পুলোরাম ব্যাধি (সাল্‌মোনেলোসিস)

বাচ্চা মুরগীর মত হাঁসের এই রোগ সাধারণত হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই রোগের প্রকোপের কথা শোনা যায়।

(ঘ) কোলি ব্যাসিলোসিস

বাচ্চা হাঁসেরই সাধারণত এই রোগ হয়, কোন কোন সময় লক্ষণ না দেখিয়েই হাঁস মারা যায়। ক্ষুধামান্দ্য, শরীরের তাপ বৃদ্ধি, দুর্বলতা প্রভৃতি প্রধান লক্ষণ।

(ঙ) বট্যুলিজম্‌

ইহা হাঁসের একটি মারাত্মক ব্যাধি। ক্লস্ট্রিডিয়াম জাতীয় জীবাণু দ্বারা খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়। স্নায়ুঘটিত দুর্বলতা প্রধান লক্ষণ। ডানা, পা এবং চোখের পাতা অসাড় হয়ে যায়। শ্বাসকষ্ট এবং সবুজ রঙের পায়খানা হয়। পালক নরম হয়ে পড়ে যায়। যেহেতু দূষিত খাদ্য থেকেই এই রোগ হয়। সেইজন্য দূষিত খাবারের অংশ, রোগাক্রান্ত হাঁসের রক্ত এবং অন্ত্র রোগ নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগারে পাঠানো উচিত।

সাবধানতা

মৃত হাঁসকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে হাঁসের ঘরগুলি পরিষ্কার করতে হবে। চারিদিকের ময়লা, আবর্জনা পরিষ্কার করাই একমাত্র প্রতিবিধান।

(চ) এরিসিপেলাস্‌

এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বাচ্চা হাঁসের মধ্যে বেশি দেখা যায়, অনেক বাচ্চা প্রাণ হারায়। ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা এবং ছট্‌ফট্‌ করা রোগের বিশেষ লক্ষণ, আক্রান্ত হাঁস মাথা নিচু করে ঝিমতে থাকে। ডানা ঝুলে পড়ে। পায়খানা পাতলা হলুদ বা সবুজ রঙের হয়।

যে অঞ্চলে শূকর প্রতিপালন করা হয়, সেই অঞ্চলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

চিকিৎসা

পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধই সবচেয়ে ভাল কাজ করে।

(ছ) যক্ষ্মা

আক্রান্ত হাঁসের শরীর ক্রমশ ক্ষীণকায় ও খুব হালকা হয়ে পড়ে। বুক ও পেটের মাংসপেশী শুকিয়ে যায়। মরে যাওয়ার পর দেহের ভিতরের নানা অংশে যেমন যকৃত, প্লীহা এবং ফুসফুসে সাদা অথবা হলুদ রংযুক্ত ঘা দেখা যায়।

(জ) তড়কা (অ্যানথ্রাক্স)

যদিও এই রোগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেই বেশি দেখা যায়, তবুও অনেক সময় হাঁসের মধ্যেও এই রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে।

মরে যাওয়ার পর দেখা যায়, মাথা, গলা ও ঘাড়ের ওপরে ফুলে যায়। গায়ের চামড়া নীল হয়ে যায়।

যেখানেই হাঁসের তড়কা রোগ হয়, সেখানেই গরু ও শূকরের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। সেইজন্য কোন জায়গায় যদি অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে তড়কা রোগ হয়, সে জায়গার হাঁসগুলিকে খুব সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে; কারণ রোগসংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই বেশি।

প্রথম পুরস্কার, ২৫৲ টাকা !! দ্বিতীয় পুরস্কার, ১৫৲ টাকা !!

॥ শব্দশৃংখল প্রতিযোগিতা ॥

অমিতাভ চৌধুরী

■	১		২	■	৩	৪		■
৫	■	৬		৭			■	৮
৯	১০	■	১১			■	১২	
১৩		১৪	■		■	১৫		
■	১৬			■	১৭			■
১৮			■	১৯	■	২০		২১
২২		■	২৩		২৪	■		
	■	২৫				২৬	■	
■	২৭			■	২৮			■

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ॥

১। পাশাপাশি এবং উপর নীচে যে সূত্রগুলি দেওয়া আছে নম্বর অনুযায়ী সেইমত শব্দ-শৃংখলের ঘরগুলি পূরণ করতে হবে।

২। প্রতি ঘরে একটি করে অক্ষর অথবা যুক্তাক্ষর বসবে।

৩। কোন শব্দের বানান অশুদ্ধ হলে সেটিকে ভুল বলে ধরা হবে।

৪। অস্পষ্ট লেখা অথবা কাটাকুটির দরুণ বুঝতে অসুবিধা হলে ছকটিকে বাতিল করে দেওয়া হইবে।

৫। অবশ্যই পত্রিকার অন্যত্র প্রকাশিত ছকটি পূরণ করে নীচে স্পষ্টাক্ষরে নাম ঠিকানা লিখে পাঠাতে হবে।

৬। একই নামে একাধিক ছক পাঠানো যেতে পারে কিন্তু প্রেরিত ছকগুলি অবশ্যই পত্রিকার অন্যত্র প্রকাশিত ছক হওয়া চাই নতুবা বাতিল করে দেওয়া হবে।

৭। একটি শব্দের অনেক রকম অর্থ হতে পারে, কিন্তু আমাদের দপ্তরে শব্দ-শৃংখলের ছকটি ঠিক যেভাবে পূরণ করা আছে একমাত্র তার সংগে যেগুলি হুবহু মিলে যাবে সেগুলিকেই সঠিক বলে ধরা হবে।

৮। যে কোন বিষয়ে আমাদের বিচারকের রায়ই চূড়ান্ত বলে ধরতে হবে।

৯। আপনার পূরণ করা ছকটি আমাদের দপ্তরে অবশ্যই প্রতি বাঙলা মাসের ১৮ তারিখের মধ্যে পৌঁছানো চাই। স্থানীয় প্রতিযোগীরা বসুমতীর পোস্টবক্সে এসে সরাসরি জমা দিয়ে যেতে পারেন।

১০। আগামী সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে এই শব্দ-শৃংখলের সমাধান ও সঠিক উত্তরদাতাদের নাম মুদ্রিত করা হবে।

১১। শব্দ-শৃংখলের সমাধান পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক বসুমতী। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাংগুলী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২।

১২। বন্ধ খামের উপরে লিখিত হবে 'শব্দ-শৃংখল প্রতিযোগিতা' : মাসিক বসুমতী।

১৩। শব্দের ছক পূরণের পরে কেটে পাঠানোর জন্য পত্রিকার অন্যত্র একটি ছক মুদ্রিত হয়েছে।

॥ সূত্র ॥

● পাশাপাশি ●

১। সরু ও নরম বংশবিশেষ (উল্টো)
৩। একজাতীয় সরীসৃপ
৬। গুল্মলতা (উল্টোপাল্টা)
৯। কাল্পনিক বৃহৎ পক্ষীবিশেষ
১১। কঠিন নহে যাহা (উল্টো)
১২। ভাবপ্রবণ বিমর্ষতা বা অব্যক্ত ক্রোধ (উল্টো)
১৩। মস্তকের শোভা বর্ধন করে যাহা (উল্টো)
১৫। কৌশল (উল্টো)
১৬। উত্তর ভারতের নদীবিশেষ
১৭। ছেলেটির আর কিছু থাক চাই না থাক—বেশ কেতাদুরস্ত
১৮। বৃক্ষবিশেষের নির্যাস হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক পদার্থবিশেষ (উল্টোপাল্টা)
২০। সন্ধ্যাবেলা দেবতার উদ্দেশে দীপ প্রজ্বালন
২২। লহরী (উল্টো)
২৫। ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (উল্টোপাল্টা)
২৭। ছেলেটির —— শুনে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম
২৮। সদ্বংশে জন্ম হইয়াছে যাহার

● উপরে নীচে ●

২। দুর্দিনে মানুষ যাহা চায় (উল্টো)
৩। পুরাণোক্ত সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল এই চতুর্দশ লোক
৪। সভ্যসমাজে অপরিহার্য যাহা (উল্টো)
৫। বালক বালিকারা স্বভাবতই —— মতি হইয়া থাকে
৭। প্রায় প্রতিটি আসরেই কিছু না কিছু —— শ্রোতা থাকে
৮। দেবীবিশেষ (উল্টো)
১০। বিষ্ণুর অপর এক নাম (উল্টো)
১২। পথিপার্শ্বস্থ অপরিসর জলনালী
১৪। জলজ প্রাণীবিশেষ
১৬। কর্মসম্পাদক
১৮। অসীম জলরাশি যেথা
১৯। যুদ্ধের কারণে যে-দেশের নাম হামেশাই আজকাল সংবাদপত্রে থাকে
২১। অম্ল স্বাদযুক্ত ফল বা তাহার গাছ
২৩। ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতির অর্ধগোলাকার গাঁথনিবিশেষ
২৪। পুষ্প (উল্টো)
২৫। প্রত্যর্পণ শর্তে গৃহীত হয় যাহা
২৬। অকৃত্রিম নহে এরূপ (উল্টো)

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

জনারণ্যে এক মুখ

শ্রীমতী বাণী রায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

অফিস: আজ আনন্দনিকেতন।

সারাদিন পাঞ্চালীর মনে গুঞ্জরণ: দেখা হবে। আজ দেখা হবে। তিনি আমাকে ডেকেছেন। ডেকেছেন নিজে থেকে।

নন্দাদির কথা কি বলবেন?

বলবার আছে কি?

না কি এটা ছুতো মাত্র?

নন্দাদি গেছে কোথায়? আত্মীয়-স্বজনের অভাব নেই, বিয়ে বা শোকাবহ কিছু নয়, পারিবারিক হলেও গৈরিক জানতেন। তবে মামার বাড়ী মধ্যে মধ্যে যেত নন্দা, বৈষয়িক পরামর্শ নিতে অথবা মন খারাপ লাগলে। তবে বলেই তো যায় বাড়ীতে। বরানগরে গঙ্গার ধারে মামা বাড়ী করেছেন। সরকারী চাকরীতে পেনসন নিয়ে আছেন ধর্ম-কর্মে ব্যাপৃত। ভগ্নীর স্মৃতি স্মরণ করে ভাগ্নীর বিপদে আপদে দাঁড়ান এসে। কারণ ভাগ্নেটি অপদার্থ, মামার মতে।

হঠাৎ মনে হল ধানবাদে যায়নি তো? না, অসম্ভব। এই তো সেদিন এল ঘুরে। যতই ক্ষেপে উঠুক, এ জ্ঞানটা থাকবে নিশ্চয় নন্দাদির যে, এত তাড়াতাড়ি আত্মীয়ের বাড়ী যেতে হয় না।

যোগেন জ্যোতিষীর ওখানে গা-ঢাকা দিয়ে যাগযজ্ঞ করাচ্ছে নিশ্চয়। ঠিক, এতক্ষণ মনে হয় নি কেন? সেদিন আড়ালে বহুক্ষণ ব্যাপী গোপনীয় আলোচনার সম্যক্ সিদ্ধি নিশ্চয় যজ্ঞবহ্নিশিখায়।

গৈরিক এখন জানতে পেরেছে, তাই বলবে। নন্দার কথা বলুক বা যা-ই বলুক, পাঞ্চালীকে আহ্বান করেছে গৈরিক এতদিনের নৈঃশব্দের রাজ্য থেকে। এমন কোন কথা নয়, ডেকে বলতে হবে। তুঙ্গশীর্ষে বরফগলা সুরু হয়েছে, সন্ধান মিলেছে শতদিনে। গৈরিক রক্তিম হয়েছে। আরক্ত তাপ সর্ব দেহমনে গ্রহণ করে ধন্য হবে পাঞ্চালী পঞ্চতপা পার্বতীর অগ্নিময় সাধনা সার্থক হ'বার ইঙ্গিত মহেশ্বরের অধরের মৃদুমন্দহাস্যে।

আবার মুগ্ধা মেয়েটির চেতনা পদ্মপরাগবর্ণে এক ছবি এঁকে দেয়।

'আসুন, বসুন।'

'ডেকেছেন কেন?'

'বলুন তো?'

'নন্দাদির কথা কি বলবেন?'

'নন্দাদির কথা না বলে আপনার বা আমার কথা বললে, সেটা সুখকর হবে না?'

হাসির জলতরঙ্গ বেজে উঠবে এখানে। নন্দাদির কথাবলার কথা অসত্য। নন্দাদি তাহলে তো এখানেই অফিসের চেয়ারে বসে থাকত।

তবু এগিয়ে হালিমকে জিজ্ঞাসা করল, "নন্দা সেন মেমসাহেব এসেছেন? মিসেস খাসনবীশের ঘরে আছেন?'

'এঁজ্ঞে না।'

তবে?

নন্দা নেই। তার কথা?

হ্যাঁ, যদি কোনও চিঠি এসে থাকে।

এ সমস্ত কথা ভাবব না, শুধু ভাবব তিনি ডেকেছেন। দণ্ডিস্বামীর সেদিন লাঞ্চে বাইরে নিমন্ত্রণ। অতএব অফিস স্টাফ্ হৃষ্ট। এলোমেলো কাজকর্ম সেদিন।

লাঞ্চে ক্যান্টিনে আজ মাংসের কাট্‌লেট হয়েছিল সস্তা দরে। কয়েক-খানা নিয়ে নিল পাঞ্চালী। যদি অনুকূল পবন বয়, তবেই ওখানে বার করবে। অন্যথায় বাড়ীতে ছোটদের জন্য নিয়ে যাবে।

'ভারি খুশী যে, ব্যাপার কি?' সর্বাণী বলল।

'ব্যাপার আবার কি? একটু ভালমন্দ খেয়ে নি-ই।' পঞ্চালী কাট্‌লেট দাঁত বসায়।

'নন্দা সেন থাকলে হরষিত হয়ে উঠতেন। নন্দার ভোজ্যপ্রীতি সকলেরি অবলোকনে পড়েছিল।

সর্বাণী জিজ্ঞাসা করল অতঃপর, 'নন্দা সেন কবে আসছেন?'

নন্দা সেনের আসা ঠিক থাকলে আজ সর্বাণীকে জলসার কার্ড দিত না হয়তো পাঞ্চালী শেষ পর্যন্ত। সর্বাণী অনেক উৎসবে নিয়ে গেলেও, নন্দা সঙ্গীতপ্রেমী না হলেও নন্দাদি জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ সে গৈরিকের ভগ্নী। নন্দাকেই সঙ্গে নিত।

'কবে ফিরছে নন্দাদি জানি না। খবর নিতে হবে।'

সোজা কথায় এল না পাঙ্কালী যে আজই যাচ্ছে সে খবর নিতে। নন্দার বিষয় থেকে অন্য দিকে মুখ ফেরাতে সে বলে উঠল, 'জলসায় সোজা এখান থেকে যাবে নাকি? তবে আমিও কাপড়চোপড় আনব।'

'সেতো এখনও তিন-চারদিন বাকী। যা হয় করা যাবে।'

নীল শাড়ীর অঙ্গে অঙ্গে জোয়ার সমুদ্রের। ক্লোকরুমে সযত্নপ্রসাধনে মণ্ডিতা পাঙ্কালী বা'র হ'ল রাস্তায় পা ফেলে। যেন একরাশ তুলো হয়ে গেছে পীচের রাস্তা।

ট্রামে-বাসের ভিড়ে ঠেলাঠেলি করতে সে চাইল না। বিলম্ব সহ্য হবে না, প্রসাধনের মালিন্য সহ্য হবে না।

ট্যাক্সি সংগ্রহে মন দিল পাঙ্কালী। রাস্তায় এক সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল সর্বাণী। বাড়ী ফিরে যাবে। 'তবে ঠিক সেদিনের জন্যে ফ্রী থেকো, কেমন? খুব ভালো ভালো গান শুনতে পাবে। বড় বড় ফিল্মস্টারদের দেখতে পাবে।'

হাসিমুখে উপচে পড়া খুশীতে পাঙ্কালী গড়িয়ে পড়ছে। এখনি দেখা হয়ে যাবে। তাই আনন্দে যত আনন্দ অন্যকে বিলিয়ে দিচ্ছে।

সর্বাণী বলল, 'ভালো-ভালো গান শোনার লোভ আছে। কিন্তু ফিল্ম-স্টার দেখার লোভ নেই। নিমাদি বলেন যে অনুকরণ আর্টের উচ্চ পর্যায় নয়।'

'আমি বাবা, উচ্চ পর্যায়ের লোক নই,' স্বচ্ছন্দে বলে দিল পাঙ্কালী "বই পড়া তো বেশ উচ্চ পর্যায়ে, অথচ ফিল্ম স্টার দেখার আশায় ব্যাকুল। পরস্পর-বিরোধী লোক তুমি, পাঙ্কালী।"

সর্বাণী বাইরে কাজ করে, বিশেষত বিমলার মন্ত্রশিষ্যা। অতি সিরীয়াস্ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। সে মনে গেঁথে নিয়েছে। বিমলার আদর্শে : কর্মই একমাত্র ধর্ম।

কর্মপ্রয়াসের শিথিল কোমরে সর্বদা আঁচল তোলা। এখনও ধনেখালির সাদা শাড়ীর চওড়া নানারঙ্ য়ের পাড় সরু কোমরে জড়ানো সর্বাণীর।

বই পড়ার মান উন্নত হয়েছে দাতার রুচি অনুযায়ী পুস্তকসমূহ থেকে মনোনয়নহেতু। সে কথা গোপন কথা।

বই কোথা থেকে আসে ভেবেই মন আবার পুলকপ্লাবিত। হাসতে হাসতে বলল পাঙ্কালী, 'বই পড়লে কি হবে? আসলে আমি একেবারে সাধারণ মানুষ। একদম আটপৌরে।'

'না তো। তুমি কেন একদম সাধারণ হবে? তুমি বেশ একটু অন্য-রকম। তোমার সব সময় একটা আদর্শের রূপ সামনে থাকে। সেটার সঙ্গে না মিললে যা-তা তুলে নেবার মেয়ে তুমি নও।'

সর্বাণীর কথায় মুখে মৃদু হাসি ভেসে এল পাঙ্কালীর। বিকাশ নন্দার সাধনার ধন। কিন্তু আজও সে কাম্য নয় পাঙ্কালীর। no regrets কোথাও ক্ষোভ অথবা ক্ষেদ নেই পাঙ্কালীর। সে যা চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। অবশ্য এখনও না পেলেও পেতে যাচ্ছে নিশ্চয়। দুর্লভের সাধনায় ধন্যা পাঙ্কালী।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। মনে জোর এনে ফেলল সে।

মুখে বলল, নয় তো কি? পথে-ঘাটে রোজ যাদের দেখা যায়, আমি কি ওদের চেয়ে আলাদা? বাসে-ট্রামে ঝুলে ঝুলে অফিসের খাতায় নাম রাখি। সারাদিন যন্ত্রের মত কাজ করি। ওপরওয়ালার মন যোগাই। প্রমোশনে মোক্ষ পাই। বাড়ী ফিরে তারপর মা-বাবার মন যোগাই। আত্মীয়-স্বজনের নিন্দার ভয়ে তটস্থ থাকি। একখানা ভালো শাড়ী পরে সুখ, একটা ভাল মুখের কথায় আনন্দ। আমাদের আনন্দ নতুন বাংলা। সিনেমা দেখায় ধন্য। বিয়েবাড়ী সাজ দেখাবার ক্ষেত্র। আমাদের স্বপ্ন অন্য একটি বিয়েবাড়ী, যেখানে আমরা প্রধান কেন্দ্র। অতঃপর "they lived happy for ever" চিরদিনের স্বস্তি। আমি, সর্বাণী, সেই জনারণ্যের এক মুখ মাত্র।'

পাঙ্কালীর দীর্ঘভাষণের জন্যে সর্বাণী বলল, 'তোমার কথাই কিন্তু প্রমাণ করে তুমি, পাঙ্কালী, জনারণ্যের এক মুখ নও। তাদের দৃষ্টিতে আমাদের জীবনের একঘেয়েমি এমন করে ধরা পড়ে না। কিন্তু, এক-এক সময় আশ্চর্য বোধ করি, তোমার মত মেয়ে নন্দা সেনের মধ্যে এমন কি বস্তু দেখলে যে, অফিসে তোমার সব চেয়ে বড় বন্ধু হলেন উনি? অবশ্য প্রথম থেকেই উনি তোমাকে গ্রাস করেছিলেন, ট্যুরের প্রোগ্রামও পড়ত এক সঙ্গে। অবশ্য নন্দা সেন আগে অন্তঃসারশূন্য হ'লেও ইদানীং কালের মত অস্বাভাবিক ছিলেন না। দিনে দিনে যেন ওঁর ধরণ-ধারণ কেমন কেমন হয়ে চলেছে।"

কাঁধে ঝাঁকুনি দিল সর্বাণী।

সর্বাণী জানে না কি অচ্ছেদ্য আকর্ষণে নন্দার সঙ্গে বাঁধা পড়েছে পাঙ্কালী। মুক্তির পথ কোথায়?

পাঙ্কালীকে নিরুত্তর এবং বিমনা লক্ষ্য করে সর্বাণী চিন্তা করে নিল হয়তো নিকট-বান্ধবীর সত্য-সমালোচনায় বিরাগ ওর। প্রসঙ্গান্তরে এল সে।

'আমার দাদা বলছিলেন যে, ওই আজব হ্রদের জলসায় মেয়েদের না যাওয়াই ভালো। গোলমাল হতে পারে।'

'কেন?' পাঙ্কালী প্রশ্ন করল।

'ফিল্মস্টারেরা আসছেন নামী নামী।'

'তাতে ক্ষতি কি? চিত্রতারকার চারপাশে ভিড় জমেই থাকে। পুলিশের চমৎকার বন্দোবস্ত হয়েছে। পাড়ার ছেলেরা ভলান্টিয়ার হচ্ছে।'

'কিন্তু নিমাদিও ভাল বুঝছেন না। কাছেই উনি থাকেন। পাড়াটা গুণ্ডা, বেকার ভরা। রেফিউজির থানা বসেছে। ভোট পাবার লোভে ওদের জবরদখল থেকে উচ্ছেদ করছেন না সরকার। সারি সারি কুঁড়ে বেঁধে ওরা বসে গেছে। চলে কেমন করে ওদের? খয়রাতি সাহায্যে শুধু নয়। ওদের অসংখ্য ছেলে পিলে হচ্ছে, বড়

হচ্ছে, বেকার হচ্ছে। ওই আজব হদের এলাকায় ছিনতাই, ধাপ্পাবাজী অবাধে চলে। সন্ধ্যার পরে ওসব অঞ্চলে ভদ্রঘরের মেয়ের হাঁটা শক্ত। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ালেও নাকি অকথ্য-কুকথ্য কথা শুনতে হয়। বিমলাদি বলছিলেন, ওই এলাকায় বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থা রাখা দরকার। কিন্তু কিছুই নেই।'

'আমাদের আর ভয়ের কথা ওঠে না। আমাদেরি এলাকা। লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। গোলমাল হবে কেন?'

আশ্বাস দিল পাঞ্চালী।

একটার পর একটা বাস্ চলে যাচ্ছে। ভিড়ে ভর্তি। সর্বাণীও উঠতে পারছে না। উস্খুস্ করছে পাঞ্চালী। ওর সম্মুখে ট্যাক্সি ডাকা সমীচীন নয়। কোথায় যাবে প্রকাশ পেতে পারে।

কাজেই কাট্‌লেট ভরা হাতব্যাগ টিপে ধরে খালি ট্যাক্সি দেখে সতৃষ্ণ হলেও দমন করল নিজেকে পাঞ্চালী।

'আজ বাসে কী দারুণ ভিড়। একটু হেঁটে যেয়ে সামনের মোড় থেকে উঠে যাব। তোমার তো আবার উল্টো মুখ।'

'হ্যাঁ, আমি এখানেই দাঁড়াই। দেখি বাসে উঠতে পারি কিনা।'

নিশ্চিন্ত পাঞ্চালী।

এগিয়ে যেতে যেতে ফিরে বলল সর্বাণী, 'একটা কথা শুনেছি, তোমাকে বলে যাই। ভেবো না আমি ভয় পেয়েছি। আমি যাবো ঠিকই। এমন জায়গায় নিমন্ত্রণ পেলে কেউ ছাড়ে না।'

'কী শুনেছ?'

'শুনেছি, আমার কাকীমার বন্ধুর বাড়ীতে তাদের বন্ধু একজন পুলিশ অফিসার কয়েকখানা কার্ড দিয়েছেন। তাঁরা অনেক করে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই পুলিশ অফিসারটি বলে দিয়েছেন যে, কার্ড দিলাম বটে, কিন্তু মেয়েরা কেউ যেন না যান। গোলমাল হবে।'

চিন্তা করে পাঞ্চালী বলল, 'কুঁড়ি পল্লব সঙ্ঘের' একটু নাম খারাপ আছে। তাই বলে উৎসব পণ্ড হবে না তো। এদের যেমন নাম খারাপ আবার অন্য দিকে তেমনি নামডাক। ব্যবস্থাও তাল হবে। আমাদের ভয় নেই।''

'না, না, আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি ওদিন কাপড় নিয়ে আসব ব্যাগে। ক্লোক্‌রুমে ছেড়ে তৈরি হয়ে যাব। কথা ঠিক থাকল। আর বলতে হবে না।' পা আবার বাড়াল সর্বাণী।

'হ্যাঁ, ঠিক থাকল। আর ভাই, যদি কিছু ঘটে, ক্ষতি নেই। আমরা একঘেয়েমির শাপে অভিশপ্ত। জনারণ্যে এক মুখ হয়ে থাকার চেয়ে না হয় জনারণ্যে হারিয়েই যাব।'

হাসির মধ্যে বিদায় নিয়ে গেল সর্বাণী। এবার হৃদয়, তুমি তৎপর হও।

একখানা ট্যাক্সি সংগৃহীত হল। পাঞ্চালী উড়ে চলল।

অবশেষে সেই বাড়ী।

চিরপ্রার্থিত প্রহর।

সনাতনের চোখ এড়িয়ে চলে এল দোতলায় পাঞ্চালী। পথে চাকর বাকরের সঙ্গে কথা চালানো সময় নষ্ট। সোজা দেবমন্দিরে হাজির হওয়া চাই।

সিঁড়ির মাথায় গৈরিক। রেলিং ধরে নন্দার ঘরের দিকে চেয়ে আছে।

'এখানে কেন? আমি এখন আসব, তাই কি?'

সাহস হয় না এতদূর ভেবে নিতে, নিজেকে সংবরণ করে সে আস্তে কাছে দাঁড়াল।

'আমি এসেছি।'

তন্ময়তার দুর্গ থেকে প্রত্যাবৃত্ত গৈরিক স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কথা বলে উঠল, 'দেখতেই পাচ্ছি।'

সেই মুখে বিন্দুমাত্র কোমলতা নেই। সেই কণ্ঠে একটুও আপ্যায়ন নেই।

নিরাশ হতাশ চিত্তে পাঞ্চালী স্মরণ করল গৈরিকের বিচিত্র চরিত্র। বিগলিত প্রশ্রয়ে সে নিকটবর্তী একদিন হয়েছিল, অন্যদিন আবার স্বীয় বিশিষ্টতায় আবৃত সত্তা। পত্রপাঠ এর পরিবর্তন ভাবাও যায় না।

সরে যেয়ে পথ দেবার প্রয়াস পেল না গৈরিক। স্বাভাবিক ভদ্রতায় বলতে বলাও দরকার নয় যেন তার কাছে।

আরাধ্যের সর্ববিধ ত্রুটি স্বীকারে ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী পাঞ্চালী বিচলিত হ'ল না।

গৈরিক অসামান্য, সে বিচিত্র।

তাকে মূল্য দিতেই হয়।

কথা, খুঁজে পেল না পাঞ্চালী। উদগ্র আশা নিরাশায় অবসিত না হলেও পাঞ্চালীর সুখের পায়ে কে যেন বেড়ি পরিয়ে দিল। পাখীর নাচের ছন্দ কেটে গেছে, এখন পা শৃঙ্খলিত।

'নন্দাদির কথা বললেন, বলেছিলেন?' ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা ভিন্ন বক্তব্য পেল না পাঞ্চালী।

'হুঁ।'

আর উত্তর নেই।

অসহিষ্ণু পাঞ্চালী এবার, 'কোথায় তিনি?'

এবার সোজা হয়ে ফিরে তাকাল গৈরিক। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখল পাঞ্চালীকে। বিদ্রূপজড়িত চাপা গলায় তর্জনী দ্বারা নন্দার ঘরের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে।'

আর সেই চোখের তীব্র বিদ্বেষে শিহরিত পাঞ্চালী। মুহ্যমান মনে কয়েক পা এগিয়ে দরজায় গেল ঘরখানার। দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল পাঞ্চালী।

এ কে?

বাইরে কথাবার্তার শব্দ শুনে বোধহয় বা'র হয়ে আসছে নন্দা সেন।

পায়ের শব্দে যুগান্তের জড়তা।

কিছুদিন হল মোটা হয়েছিল নন্দা, স্থূলকায়া যাকে বলা হয়। কিন্তু বাঁধন-ভাঙ্গা মেদ, এলোমেলো যেখানে সেখানে আলগা থস্‌থসে চর্বির বোঝা।

আজ যেন ভাঙাচোরা এক চূর্ণ সিমেণ্টের মূর্তি থপ্‌থপ্ করে এগিয়ে আসছে। পা ফেলছে টেনে টেনে যেন নড়্‌বড়্ করছে। পাখানায় যেন বল নেই। লম্বা চওড়া মাংসল দেহটা যেন স্ববশে নেই।

অকায় দানবের মত এগিয়ে আসছে নন্দা। গায়ে লেসবসানো সেমিজ, অর্ধ অনাবৃত দেহ। কোমরে

ওড়ানো লাটপাট কুঞ্চিত আধপাতা শান্তিপুরী ডুরে।

পাশা মুখ চুনকাম করা নানাবিধ রং-এ। ভুরু-চোখের রং গালে গড়িয়ে এসেছে। ঠোঁটের রং ছাড়িয়ে রক্তমুখী করে তুলেছে ওকে। পাউডার ছাপ ছাপ।

কিন্তু ভয়াবহ সেই মুখের ভাব-বিকৃতি। লাল ভাঁটার মত চোখ হয়ে উঠেছে, অতি তীব্র চোখের দৃষ্টি। চুল উস্কখুস্ক। দাঁত যেন হায়েনার মত উদঘাটিত।

বিড়বিড় করে বকছে নন্দা নিজের মনে: 'মন্ত্রতন্ত্র খাটে না। ------ শিকড়টা উড়ে এল। মাউ, মাউ, মাউ।'

অব্যক্ত আর্তনাদ পাঞ্চালীর কণ্ঠ ভেদ করে বাইরে এল, রোধ করা গেল না। মুখে হাত চাপা দিতে যেয়ে হাত-ব্যাগ হাত থেকে পড়ে খুলে গেল। কাটলেটসমূহ লুটিয়ে পড়ল।

চাপা আর্তনাদে নন্দা বর্তুলাকার চোখ মেলে দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, 'এসেছিস? তুই সর্বনাশী, আমাকে বুঝিয়েছিলি সে আমাকে ভালবাসে। তুই তাক্‌তুক্‌ শেখালি জ্যোতিষী বাড়ী যেয়ে। তুই ধানবাদে আমাকে পাঠালি বার বার।'

'ওকি, নন্দাদি, আমি তো কিছু করিনি। তুমি নিজে থেকে'—

'নিজে থেকে---দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।' নড়্‌বড়ে মূর্তি হঠাৎ যেন উড়ে এল কাছে মাংসের কাটলেটগুলো পায়ে দলে। শক্ত হাতে গলা টিপে ধরল নির্দয়ভাবে।

অযুত হাতির বল দেহে তার তখন।

গৈরিক তাড়াতাড়ি নন্দার হাত ছাড়াতে চেষ্টা পেল পাঞ্চালীর দলিত কণ্ঠ থেকে। পাঞ্চালীর শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। অভাবিত এই পরিস্থিতি।

গৈরিকের সঙ্গে রীতিমত ঝুটোপুটি বেঁধে গেল। সবল সুস্থ গৈরিকও শক্তিপ্রাবল্যে নন্দাকে পরাভূত করতে কষ্ট পেল। ঘরের মধ্য থেকে একজন সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ এতক্ষণে বা'র হয়ে এলেন। ঘরের মধ্যেই ছিলেন, বোঝা গেল।

তিনি হাত লাগালেন, অন্য প্রণালী।

'ছিঃ মা নন্দা, এমন করে না।' মাথায় হাত বুলুতে সুরু করলেন, পিঠে হাত রাখলেন। ছোট শিশুকে বশ করার যাদুকণ্ঠ তাঁর।

এবার নন্দা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, 'না, না মামাবাবু, জানেন না, কত বড় শয়তান এ। আমাকে ভুলিয়ে ধানবাদে নিয়ে গেছিল। দূর দূর। যাবে কোথায় সে? আজ তাড়িয়ে দিলেও কাল আমার পায়ে লুটোপুটি খাবে। কিন্তু ওর কথা আগে আমাকে শিখে নিতে হবে। জঙ্গলে থাকে জংলী। ওর ভাষা ---হটেনটট্‌, হট্টু, মট্টু, খট্টু।'

এখানে নন্দার হাতনাড়ায় কোণের দেওয়ালের ছবিখানা পড়ে খান্ খান্। কাঁচের টুকরোর সঙ্গে মাংসের কাট্‌লেটের টুকরো বীভৎস পরিস্থিতির বীভৎস পটভূমিকা তুলে ধরল।

ভদ্রলোকের মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গলায় শাদা পাঞ্জাবীর নীচে তুলসীর একছালি মালা দৃশ্যমান।

বিনীতস্বরে তিনি বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মা। নন্দার বংশগত ব্যাধি দেখা দিয়েছে। ছোট বেলায় একবার হয়েছিল। কিন্তু এত-কাল নন্দা ভালই ছিল।'

লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে এবং দলিত গলার যন্ত্রণায় পাঞ্চালীর দু'চোখ জলে ভরে এসেছে। রুমালে চোখ ও গলা মুছে হাতব্যাগ তুলে নিল সে।

নন্দা ততক্ষণে ধুলোমাখা কাটলেটে কামড় দিয়ে বলছে, 'রোজ রোজ খাবার আনে আমাকে ভুলোতে। বেরো বেরো, হতভাগী।'

মামা বললেন, 'এখন চোখের সামনে থেকে আপনার সরে যাওয়াই ভাল।'

গৈরিক মামার সঙ্গে ধরে নন্দাকে ঘরে তুলতে তুলতে বলল, 'আপনি নীচে অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

নীচে চাকরবাকরের আওতায়।

সনাতন বিষণ্ণ মুখে সাবু জাল দিচ্ছে। রান্নাঘরের উনুনে। চটুলা গৌরী মুখ টিপে বাসন গোছাচ্ছে।

মুখ তুলে তাকাল মাত্র সনাতন, অন্যদিনের মত সমাদরে মুখর হয়ে উঠল না।

গৌরী চোখ তুলে দেখে আবার বাসনের গোছায় মুখ নামাল।

থমথমে আবহাওয়ায় দাঁড়াল পাঞ্চালী। যেন অজানা এক অপরাধের ভার স্কন্ধে চেপে শুইয়ে দিল ওকে। কেন সকলে আমাকে তির্যক চক্ষে দেখছে? এদের ঘরে পাগল বলে এরা ভারাক্রান্ত, না আমার প্রতি সন্দিগ্ধ? কেন?

একজন আধাভদ্র স্ত্রীলোক দাঁড়াল ভাঁড়ার ঘর থেকে এসে ওখানে, শাদা জামা-কাপড়, বেশ পরিচ্ছন্ন। আগে দেখেনি একে পাঞ্চালী।

'সাবু হয়েছে?' স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, স্বরে প্রভুত্ব।

'একটু বাকী আছে সেদ্ধ হবার' সনাতনের স্বরে বিনয়।

'ঠাণ্ডা করে তবে খাওয়াতে হবে। গরম কিছু চলবে না। এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল।'

অসন্তোষ প্রকাশ করে স্ত্রীলোকটি পাঞ্চালীকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কে? এনাদের আত্মীয় বুঝি?'

'আমি একই অফিসে কাজ করি।'

'ও, খবর পেয়ে দেখতে এসে-ছেন? আহা, কী কাণ্ড। আমি আজ সকাল থেকে ডিউটিতে এসেছি। ডাক্তারবাবু পাঠিয়ে দিলেন। এসেই দেখি উদ্দোম পাগল।'

স্ত্রীলোকটি আয়া বোঝা গেল, রোগীর দেখাশোনায় এসেছে।

অতিকষ্টে কথা বলছে পাঞ্চালী, 'এমন হ'ল কবে?'

সনাতন এবারে অনিচ্ছার সঙ্গে

খুব খুদল, 'কাল সকালবেলা দিদিমণি এলেন ট্যাক্সি করে। চোখ লাল, আলুথালু চুল নিয়ে ট্রেণে করে ধানবাদ থেকে এসেছেন। আমি শুধোলাম, কোথা থেকে এলেন? কইলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম থেকে। ওখানে আমি ব্যানকা সেজে নাচ দেখাবো। তার পরে খিস্তি শুরু করে দিলেন। সে কি খিস্তি, বাবারে বাবা। কানে আঙুল দিয়ে হয় শুনলি। ভদ্দরনোকের মেয়ে এসনধারা খিস্তিখেউর জানেন, তাতো দেখি নাই আগে।'

স্ত্রীলোকটি গালে হাত দিয়ে শুনছিল, মন্তব্য কাটল, 'এমনি করে সবাই মাথার ব্যারামে। আমাকে এই সব কেসে অনেক পাঠিয়েছেন ডাক্তার-বাবু। এমনিই করে এরা।'

ঘটনার অভূতপূর্ব রূপে বিপর্যস্ত পাঞ্চালী দেহে ও মনে। কত আশা করে এসেছিল। গলায় জ্বলছে নন্দার করাঙ্গুলির পীড়ন। কিন্তু তবু থাকবে সে, গৈরিক তাকে থাকতে বলেছে। হয়তো এক মুহূর্তে সমস্ত কষ্টের নিরসন হ'বে। ভগ্নীর পীড়নে সে লজ্জিত, সান্ত্বনা প্রদানে আসছে হয়তো।

'নন্দাদি ভাল হবেন তো?' স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করল পাঞ্চালী।

'এ বয়সে মনের জিনিষ নিয়ে মাথা খারাপ সারানো শক্ত।'

স্ত্রীলোকটির মুরুব্বি চালে বাধা দিয়ে সনাতন বলল, 'না, না, এমন ধারা উনোম কয়েকদিন পরেই কেটে যায়। তেনার দিদিমাকে দেখেছি না।'

'দাদাবাবু কি বাইরে যেতে পারবেন বোনকে ফেলে?'

যে-কথা মনে তোলপাড়, জানতে চায় পাঞ্চালী।

'দাদাবাবু চলে যাবেন বিলাত। মামাবাবু রয়েছেন, এনারে রাখা হয়েছে। এঁরা সমস্ত হালচাল জানেন। মামাবাবু দিদিমাকে বার মাস দেখেন। দরকার যা করবেন। দাদা-বাবু কইলেন যে, ওনার টিকিট কাটা হয়ে গেছে। এখন না গেলে নয়।'

টিকিট কাটা শেষ? মন চমকে ওঠে পাঞ্চালীর। সে জানল না? হায়রে তার আশা! নন্দা এলে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া গৈরিককে?

ম্রিয়মাণ পাঞ্চালী মোড়ায় বসে পড়ল। আর দাঁড়াতে সে পারছে না।

গৈরিক নীচে এল।

'এ ঘরে আসুন।'

বাইরের ঘরে বসল তারা। বাইরের লোকের বসার ক্ষেত্র, ফরাস একটা, চেয়ার টেবলে সাজানো।

কঠিন-অনমনীয় মুখ গৈরিকের। মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় হ'ল পাঞ্চালীর। উন্মাদিনী সহোদরা ও গৈরিকের এত শঙ্কা এনে দিতে পারেনি।

'আমি দুঃখিত। আশা করি আপনি বেশী ব্যথা পান নি।'

কথার বয়ান মোলায়েম কিন্তু বক্তা নিরাসক্ত। এ কথার উত্তর দেবার প্রবৃত্তি হল না। পাঞ্চালীর গলায় রীতিমত যন্ত্রণা তখন। বাড়ী যেয়ে এককাপ চা খেলে বেঁচে যায়। বিছানায় শুয়ে ঘটনাসংস্থান ধীরচিত্তে ভেবে দেখা ভিন্ন করণীয় কার্য নেই।

কিন্তু গৈরিক যা বলবে, সেটুকু না শুনে যাবে না সে। শেষ কথাটি শুনবার আগে যদি অচেতন দেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়ে তবুও সে থাকবে।

গৈরিক নীরব দেখে বলল পাঞ্চালী, 'এমন অবস্থা হ'ল কেন নন্দাদির?'

'সে তো আপনিই ভাল জানেন সবার চেয়ে।'

'সেকি বলছেন? আমি জানি যা তাতে এমন হ'বার কথা নয়।' বিবর্ণ-মুখে বলল পাঞ্চালী।

নির্মম স্বরে উত্তর এল, 'ধান-বাদের প্রতি নিজেকে সম্প্রসারণ, মিথ্যা আশা নন্দার চাপাপড়া পাগলামিকে মুক্তি দিয়েছে। আপনি মিথ্যা আশা দিয়ে তাকে নাচিয়েছেন, পাঠিয়েছেন সেখানে বারবার। জ্যোতিষীর বাড়ী নিয়ে গেছেন।'

এক হিমবাহ যেন অবস করে ফেলল পাঞ্চালীকে। ডুবে যেতে যেতে শেষ চেষ্টায় সে বলে উঠল। 'আমি বাধা দেবার বহু চেষ্টা করেছি। ধানবাদে বারবার যেতেও নিষেধ করেছিলাম। জ্যোতিষীর বাড়ী আমি ওঁকে নিয়ে যাইনি, উনিই আমাকে নিয়ে গেছেন। আপনি না জেনে অন্যায় কথা বলছেন কেন?'

'অন্যায় কথা আমি বলছি না। আমার কানে সবই আসে। একটা কথা শুনলে গোটা পরিস্থিতি আমি আয়ত্তে পাই। নন্দা চীৎকার করে কথা বলত। অনেক বাজে কথা বলত, যা থেকে ধরা যেত। রকম সকম দেখেও আমি বুঝতে পারতাম। শক্ত হয়ে, কঠোর হয়ে আপনার ওকে নিরস্ত করা কর্তব্য ছিল। আপনি কর্তব্যে অবহেলা করেছেন, বন্ধুর দায়িত্ব পালন করেন নি।' অতিকষ্টে পাঞ্চালী কথা বলছে, যেন নন্দার করমুষ্টির পীড়ন তাকে কণ্ঠরোধ করে ধরছে।

'আপনি কেবল দায়িত্ব আর কর্তব্যই বোঝেন। নন্দাদি যে জীবনে আনন্দ ফিরে পেয়েছিল---''

'চুপ করুন। সে আনন্দ যদি নিরানন্দ হয়, তার জীবনটা ছারখার হয়ে যাবে জানতেন না? শুধু মজা দেখার জন্যে করেছেন না?'

'না, না।'

'তবে? তাকে হাতে রাখতে চেয়েছিলেন কেন? কী আপনার অভিপ্রায়?' তীক্ষ্ণ সর্বভেদী দৃষ্টি মেলে পাঞ্চালীর মর্ম যেন উপড়ে দেখতে চাইল গৈরিক।

যে-কথা শোনাবার আশায় প্রহর খুঁজে ব্যাকুল হয়েছে পাঞ্চালী, আজ যদি সেই কথা ধরা পড়ে, আতঙ্কে সে কণ্টকিত। গোপনীয়তা ভিন্ন, চাইবার বস্তু নেই। যা বলা হয়নি, আর বলতে চায় না পাঞ্চালী।

[ক্রমশঃ

স্থান পরিচিতি

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

দার্জিলিং

কার্শিয়াং

দার্জিলিং জেলার মহকুমা। আয়তন ১৬৪ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২৫,১০৫ (১৯৬১)। এই স্থানকে ইংরেজরা এককালে বলত "The land of the Orchid".এর দূরত্ব কলকাতা থেকে ৩৫০ মাইল এবং শিলিগুড়ি থেকে ৩২ মাইল। দার্জিলিং এখান থেকে ২০ মাইল। এখানে বড় স্টেশন ও জনপদ আছে। এর উচ্চতা ৪,৮৬৪ ফুট।

কার্শিয়াং পূর্বে ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নেপালের গুর্খা রাজা তা কেড়ে নেয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা গুর্খাদের হারিয়ে সিকিমকে ফিরিয়ে দেয়। সিকিমের রাজা ১৮৩৫ সালে এই অঞ্চল ইংরেজদের ছেড়ে দেয়। এখানকার সৌন্দর্য অপরূপ। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার পাকা রাস্তা কার্শিয়াং শহরের মধ্যে দিয়ে গেছে। কার্শিয়াং দার্জিলিং-এর মত বড় না হলেও বেশ সমৃদ্ধশালী শহর।

কার্শিয়াং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু শিখর দেখা যায়। কার্শিয়াং-এর দক্ষিণ দিকে বাংলার বিস্তীর্ণ সমভূমির দৃশ্যও দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের প্রথমে দেখতে পাওয়া যায় তিস্তা নদী। এর ওপর বাঁ দিকে দক্ষিণে পর পর মহানন্দা, বালাসন ও নেপাল সীমান্তের মেচী নদী। বন্য হস্তীর লীলাভূমি মোরুং অঞ্চল। পাঙখাবাড়ী রোড, কার্ট রোড, ডাউ হিল রোড প্রভৃতি কার্শিয়াং-এর রাস্তাগুলি অত্যন্ত সুদৃশ্য। কার্শিয়াং-এর চারধারে পাহাড়ের গায়ে গায়ে অসংখ্য চা-বাগান আছে।

এখানে বৌদ্ধদের মঠ, মন্দির, ডাউ হিল, ঈগল ক্র্যাগ পাহাড় প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান আছে। ঈগল ক্র্যাগ পাহাড়ে চড়লে একদিকে বিস্তৃত সমতলভূমি ও অপরদিকে তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী দেখা যায়।

টুঙ

শিলিগুড়ি থেকে ৩৭ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫৬৫৬ ফুট উঁচু।

সোনাদা

লেপচা ভাষায় সোনাদার অর্থ ভল্লুকের গুহা। এককালে এখানে ভল্লুকের খুব উপদ্রব ছিল। শিলিগুড়ি থেকে ৪২ মাইল। এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫৫২ ফুট।

কালিম্পং

দার্জিলিং জেলার অন্যতম মহকুমা। পূর্বে এটি ভুটানের অংশ ছিল। এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩,৯৩৩ ফুট উঁচু। এর আয়তন ৪০৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৫,১০৫ (১৯৬১)।

উত্তরে সেকেন্দার পর্বতমালার পেছনে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য, পশ্চিমে বড় রঙ্গিতের সবুজ উপত্যকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ সিঞ্চল পাহাড়, দক্ষিণ বাংলার সমতলভূমি, পূর্বে রিনি নদীর উপত্যকা।

এখানে সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলোনিয়াল হোমস, কালিম্পং হোমস, কালিম্পং আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্ট্ গভঃ ডিমন্‌স্ট্রেশন ফার্মস, তিব্বতীয় মঠ, স্কুল ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে। বাজারের ওপরে গীর্জা, তিব্বতীয় রীতিতে তৈরি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-তোরণ। বাজারের কাছে পাহাড়ের গায়ে বৌদ্ধ মঠ।

কালিম্পং একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্র। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে এখানে এক বড় মেলা বসে। নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি থেকে বহু ব্যবসায়ী এই মেলায় কেনা-বেচা করতে আসে। এখানে কৃষিক্ষেত্র ও কারখানাও আছে। এখানের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত ভাল বলে এবং বসন্তকালে রঙ বেরঙের ফুলের বাহার ছড়িয়ে পড়ে বলে বহু টুরিস্ট এই সময় এখানে আসেন। টুরিস্টদের থাকবার জন্য এখানে সুবন্দোবস্ত আছে।

শিলিগুড়ি

এটিও দার্জিলিং জেলার অন্যতম মহকুমা। আয়তন ২৬৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬৫, ৪৭১ (১৯৬১)। কলকাতা থেকে ৩১৮ মাইল। এটি একটি বর্ধিষ্ণু শহর। শিলিগুড়ি নামটি কোচদের দেওয়া। এর মানে পাথুরে জায়গা। এর চারদিকের ভূমি ঢেউয়ের মত উঁচু-নীচু।

শিলিগুড়ি শহরটির চারদিকে বেষ্টিত হয়ে আছে হিমালয়ের তরাই-এর দুর্গম অরণ্য। এইসব জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর বাস।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ দু'ফুট গেজের রেলপথ। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব রেল-পথের তৎকালীন সর্বাধ্যক্ষ ফ্রাঙ্কলিন প্রিসটিজের পরিকল্পনায় দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ স্থাপিত হয়। এই রেলপথের প্রধান লাইন আঁকা-বাঁকা পথে উত্তর-পশ্চিমে কার্শিয়াং হয়ে ৫১ মাইল দূরে দার্জিলিং-এ গেছে। একটি শাখা ৭০ মাইল দূরে পূর্ণিয়ার কিশনগঞ্জে গেছে। অপর একটি শাখা তিস্তা - উপত্যকা দিয়ে কালিম্পং-এ ৩০ মাইল গেলিখোলা পর্যন্ত গেছে।

দার্জিলিং-এর পথে তিস্তা - উপত্যকা শাখা লাইন ফেলে মহানদীর পোল পার হয়ে ৪ মাইল দূরে পঞ্চনই জংশন। এই জংশন থেকে কিশনগঞ্জ শাখা বেরিয়েছে।

এই শহরে হিন্দুদের দেবমন্দির ও

মুসলমানদের কয়েকটি মসজিদ আছে। হোটেল, ধর্মশালা, ডাকবাংলোও আছে।

চাঁদমণি গ্রাম

পঞ্চনই-এর পাশে। এখানে চৈত্র মাসে দোলপূর্ণিমার সময় রাজবংশীদের বসন্তোৎসব ও কামদেবের পুজো হয়। নৃত্যগীতও হয়।

বাগডোগরা

শিলিগুড়ি থেকে ১০ মাইল। এখানে পোতাশ্রয় আছে। এটি তরাই-এর মধ্যে অবস্থিত। এখানে পূর্বে বাঘের উপদ্রব ছিল।

হাতিঘিসা

শিলিগুড়ি থেকে ১৪ মাইল। হাতির অত্যাচারে এই স্থান অধ্যুষিত ছিল বলে এর নাম হয় হাতিঘিসা।

নকশালবাড়ী

শিলিগুড়ি থেকে ১৮ মাইল দূরে তরাই-এর মধ্যে অবস্থিত। তিব্বতীয় ভাষায় 'নকশাল' অর্থে শিকারের উপযোগী স্থান।

রংটং

শিলিগুড়ি থেকে ১২ মাইল দূরে। এখানে রেল চক্রাকারে উঠেছে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, রেলপথ সমতলভূমি ছেড়ে পাহাড়ের গায়ে উঠেছে।

তিনধারিয়া

শিলিগুড়ি থেকে ২০ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ২,৮২২ ফুট।

গয়াবাড়ী স্টেশন

তিনধারিয়া থেকে ৪ মাইল। পাগলাঝোরা-গয়াবাড়ী স্টেশনের কাছে 'পাগলা ঝোরা' জলপ্রপাত আছে। গয়াবাড়ীর আশপাশের পাথরের নাম 'সিকিম নাইস'। পাগলাঝোরা মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাতের জন্য ফুলে-ফেঁপে পাগলের মত ছুটতে থাকে বলে এটি ওই নাম পেয়েছে। পাগলাঝোরার উন্মত্ততার জন্য রেলপথের অনেক ক্ষতি হয়। তাই তাতে বাঁধ দিয়ে উন্মত্ত গতির অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই শৃঙ্খলিত পাগলাঝোরার মর্মবেদনা তার এক কবিতার মধ্যে অমর করে রেখে গেছেন:—

"আমারে কি কেউ জানত এমন বে
পাগলাঝোরার দুঃখগাথা
পাগল বলে করবে হেলা?
করবে হেলা মর্মব্যথা?
জন্ম আমার হিম উরসে,
কুলে আমার তুল্য নাই
সিন্ধু নদের সোদর আমি
গঙ্গাদিদির পাগলা ভাই।
তবুও শিকল পরিয়ে দিলে
রাখলে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প আয়ু,
আমায় কিনা বাঁধলে শেষে।
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে,
পারিনে তায় ছিঁড়তে বনে
শীর্ণ হয়ে যাচ্ছি ক্রমে।
পড়ছি গলে অশ্রুজলে।"
—ইত্যাদি।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য

এই জেলায় সিন্‌কোনা, কফি, কড়াইশুঁটি বার মাসেই জন্মায়। ১৮৫৬ সালে দার্জিলিং-এ চায়ের চাষের আরম্ভ হয়। ১৮৩২ সালে ইংরেজ সরকার এখানে সিন্‌কোনা চাষের পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় সফল হওয়ায় এই চাষ এখন ব্যবসায়ীদের হাতে। সিঙ্কোনার চাষ, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে হয়। কার্শিয়াং-এর চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য চা-বাগান আছে।

শিলিগুড়ি থেকে তিব্বতের পশম, মৃগনাভি, চা, কমলালেবু, শালকাঠ ও অন্যান্য কাঠ রপ্তানি হয়। এখানে বনভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর আছে। কিন্তু কল-কারখানা বিশেষ নেই। বাগডোগরায় কয়লা বেরিয়েছিল কিন্তু তার কিছুই প্রচেষ্টা হয় নি। চা-বাগান ও কমলার চাষে এখানকার অধিবাসী লেপচা, মেচু, কোচ, ভোটাগণ কুলির কাজ করে। এই অঞ্চলের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে বৌদ্ধ মূর্তি, প্রার্থনা চক্র, খেলনা প্রভৃতিও বিক্রি হয়।

মংপুতে সিন্‌কোনা চাষ, কুইনাইনের কারখানা আছে। কালিম্পং তিব্বতীয় পশমের বাণিজ্য কেন্দ্র। শিলিগুড়ি কমলালেবুর বাণিজ্য কেন্দ্র।

দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য উপত্যকায় একটি ছোট খামার উন্নয়ন এজেন্সী স্থাপিত হয়েছে। এই এজেন্সী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পশু-পালন প্রভৃতির উন্নতির জন্য অনুদান ও ঋণ দানের কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। সুকিয়া-পোখরি, মিরিক, রংবি-রংলিয়ট এবং কালিম্পং প্রভৃতি স্থান কেন্দ্র করা হয়েছে।

এই জেলার পাহাড় ও তরাই অঞ্চলের সর্বাঙ্গে ধস। প্রায় প্রতি বছরেই কিছু-না-কিছু ধ্বস নামে। পাথর চাপা পড়ে বহু লোক মারা যায়। ১৯৬৮ সালে তিস্তার বন্যা ও ধসে পাহাড় ভেঙে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়, বহু স্থানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বন্যার কবলে শত শত গ্রাম প্লাবিত হয়। শত শত লোক গৃহহীন ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অধিবাসী

এই জেলায় বাঙালীর সংখ্যা কম নয়। এখানের আদি অধিবাসী বলতে লেপচা, ভুটিয়া, তিব্বতী, নেপালী, মেচু, কোচ প্রভৃতি। শত বছর আগে এখানে রাজবংশীদের যে ভাষায় কথা বলত তার একটু নমুনা দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি

"এক ঝন্‌কার দুইটা বেটা ছিল। তারহে বিচৎ ছোট বেটাটা আপনার বাপক্ কোহেল্, গে বা। ধন দোলৎ যেই মুই পাম্ তা মোক্ দে। তাতে অই উহার দোনো ভাই-এর বিচৎ সম্ সম্পত্তি বাট্ বাখেরা করে দিলে। কিছুদিন বাদে ছোট বেটা গোটে অ্যাখঠে করিয়া দূর দেশের মুখে চলে গেল্, আর উঠে যায়া অনাচার চলন্ চলিয়া সম্ সম্পত্তি উড়ায়া ফঁরায়া দিলে। পাছৎ ঐ দেশৎ বড় আকাল পোল্, অর বড় দুঃখ হবার ধলে, সেলা তার পাছৎ অই যায়া ঐ দেশের অ্যাকঝান নগুরিয়ার তলে শরণ নিলে; ঐ নগুরিয়াটা অক্ আপনার ডাঙ্গাৎ শুয়ার চড়াবার পাঠায়া দিলে।"---"

(প্রেমচন্দ্র বস্তু—১৮৯৭ খ্রীঃ—গ্রীয়ারসনের বই হতে উদ্ধৃত)।

হঠাৎ আলো

তপতী রায়

মাঝরাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল রমা।

এই! এই!! কি হয়েছে? বল, কি হয়েছে?

অনেকক্ষণ পরে ঘুমে-জড়ান চোখ খুলে ওকে ঠেলা দিতে লাগল চিন্ময়।

কিছু না, কিছু না।

কিছু না, তাহলে হঠাৎ কাঁদছ কেন? এটা কি কাঁদবার সময়? একটু ঘুমুতেও দেবে না। কোন দুঃস্বপ্ন দেখলে নাকি?

না—

নাক মুছতে মুছতে বলল রমা।

তবে? সত্যিই জ্বালালে। তোমার নভেলি ব্যাপার আর গেল না সারা-জীবনেও। রাত্রে ভাল করে ঘুমুতেও দেবে না? সন্ধ্যায় অতগুলো খেলাম, চোখের পাতা যে জড়িয়ে আসছে।

তুমি ঘুমোও না, যেমন ঘুমোচ্ছিলে।

বললেই হ'ল না। পাশে একজন গলা ছেড়ে কাঁদতে থাকবে আর আমি ঘুমোব? কালা তো নই। তাহলে তো ইঞ্জিন তৈরীর কারখানাতেও ঘুমোতে পারব।

তাও তো পার।

মনে মনে ভাবল রমা।

নাও, নাও ঘুমিয়ে পড়। জ্বালিও না। বালিশ টেনে পাশ ফিরতে ফিরতে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল চিন্ময়।

একটু পরেই গাঢ় ঘুমে তার নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল।

রমা নাক মুছে আস্তে আস্তে উঠে বসল বিছানার ওপর। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে কতক্ষণ বসে থাকল জানে না। চোখ দুটো আবার জলে ভরে এল। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট, পাথরের মত ভারী হয়ে আছে যেন। অথচ ঠিক দুঃখের সংজ্ঞাও যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না। ঠিক দুঃখটা কি তার? ভাল করে আবার সন্ধ্যাটা ভেবে দেখতে চেষ্টা করল সে। কারণ সে ভালভাবেই জানে। কিন্তু এর কি কোন যুক্তি আছে? আজ সাতবছর তাদের বিয়ে হয়েছে। কোন বাচ্চাকাচ্চা আজ পর্যন্ত হয় নি। সেজন্য তার জীবনে প্রচুর অবসর। চিন্ময় লোকটা মোটামুটি ভাল, কিন্তু একটু স্থূল আর রাগী। সে কথা তো বিয়ের বছর থেকেই বুঝতে পেরেছে রমা। চিন্ময়ের মন রেখে একটু চলতে পারলে তো ভাবনা নেই, অবশ্য সর্বক্ষণ তটস্থ হ'য়ে থাকাও কম কষ্টকর নয়। তবু রমা তো কোন প্রতিবাদ করে না। নীরবে নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে, তার কৈশোর-যৌবনের রঙীন দিন-গুলোকে ও পড়ে-ফেলা বইয়ের মত একপাশে সরিয়ে রেখেছে। অনর্থক মনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

তাছাড়া সর্বক্ষণ কিছু অশান্তি করে না চিন্ময়। ভালবাসার রোমান্টিক কোন অনুভূতি হয়ত তার নেই, কিন্তু অন্যদিকে তো পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই ব্যবহার। বরং একটু সাদামাটাই।

স্বামী তেমন রোমান্টিক নয়, সাদামাটা স্থূল—এই নিয়ে আবার কারও অভিযোগ চলে নাকি? তাকে কম সুখে তো রাখেনি চিন্ময়, তবে? সাধে ওর যে কোন ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাসকে চিন্ময় নভেলি আখ্যা দেয়? সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করে রমারই সুখ-সুবিধের জন্য অর্থ রোজকার করে আনে চিন্ময়। তারপরও যদি রমার অভিযোগ থাকে, মনে তার গভীর দুঃখ আছে, তার স্বামী তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না, তার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো বুঝতে পারে না, তাহলে আর বলার কি আছে?

মশারির ভেতর থেকে সন্তর্পণে বেড়িয়ে এল রমা। চিন্ময়ের নাক বেশ জোরে ডাকছে। এও একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। স্বামীর নাক ডাকা অভ্যাস অথচ সাত বছর ঘর করার পরও স্ত্রী তাতে অভ্যস্ত হ'ল না। গত বছর থেকে 'ইকোয়া-নিল' খেয়ে ঘুমোতে হচ্ছে, তবু কোন-ক্রমে একবার নাক ডাকা কানে গেলে আর রক্ষা নেই। সে রাত্রের মত ঘুম শেষ। অথচ এসব কথা ডাক্তারকেও বলতে পারে না রমা। বিবাহিত জীবনে পরস্পরকে খানিকটা সহ্য করা বলেও একটা কথা আছে। আসলে বোধহয় রমা স্বামীকে ভালই বাসে না।

নিজের মন তলিয়ে দেখতে চায় সে, খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে, যে সত্যের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়, তাতে উল্লসিত হবার মত কিছু নয়। বরং রমার দুশ্চিন্তা বেড়েই যায়। অথচ একথা স্বীকার করতেও সে কুণ্ঠিত

জন যে, স্ত্রীকে সে ভালবাসে না, দিনের পর দিন এমনিই শুধু সাজান অভ্যাস করে যাচ্ছে।

পাশের টেবিলে রাখা জলের জাগ্ থেকে গ্লাসে জল ঢালল রমা, এক চুমুকে প্রায় সবটা শেষ করল। তারপর জানলার কাছে সরে এসে অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি মেলে দিল।

পাশের ঘর থেকে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এই গভীর রাত্রে পাওয়ার কথাও নয়। অথচ কিছুক্ষণ আগেও বোধহয় ছিল। চুড়ির আওয়াজ, মৃদু হাসি, পুরুষ গলায় মাঝে মাঝে অস্ফুত দু'একটা কথা, মেয়ে গলায় ফিসফিসানি, সব শুনতে পেয়েছে রমা। সমস্ত মন দিয়ে একাগ্র হয়ে ও-ঘরের শব্দ শোনবার চেষ্টা করেছে রমা, উচিত নয় জেনেও। আর তার প্রতিদিনের রাতগুলোর সঙ্গে মনে মনে তুলনা করেছে। আজ তার মনের মধ্যে যে ঝড় উঠেছে, তার পূর্বাভাসও সে পায়নি কোনদিন। আসলে সন্ধ্যাবেলাই ঘটনাটার সুরু।

হাজারীবাগের এই "কেনারি হিল্" ফরেস্ট বাংলো রমা আর চিন্ময় গত পাঁচদিন হ'ল এসে পৌঁছেছে, যাবে কাল সকালে। কলকাতার নাগরিক জীবনে হাঁপিয়ে উঠে এখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি রমা। চিন্ময়ের কাছে কোন আবেগ প্রকাশের ইচ্ছা তার করে না। তাই তারা এ-ক'দিন নীরবেই বেড়িয়েছে। কবে যে তাদের মধ্যে সব কথা ফুরিয়ে গেছে, তা তারাও জানে না। এখন শুধু নিয়মমত দাম্পত্যজীবনে বাঁধা থাকা। অথচ অসহ্য নয় কারও কাছে। যেন দু'জনের কাছে দু'জনের প্রত্যাশাও কমে গেছে, তাই স্বাভাবিকভাবে দিন কেটে যাচ্ছে, খাওয়া-শোওয়া-বেড়ান—কোনটাই বা বাদ থাকছে?

অথচ রমা জানে, দু'জন মানুষের মাঝখানের সুরটি যেন ঠিক বাজছে না। চিন্ময় অবশ্য এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না। তার কাছে এ ছাড়া দাম্পত্য-জীবনে আর কি থাকতে পারে? কোন মতানৈক্য নেই, কোন বিরোধ নেই, স্বচ্ছলতা আছে, শান্তিও।

কিন্তু রমার কাছে এ জীবন প্রায়ই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কি যে মুক্তি, তা সে জানে না, অথচ একটা ভারী ব্যথা তাকে অহরহ পীড়িত করছে, রমার নিজের কছেই তা খুব পরিষ্কার নয় বোধহয়। সে নিজেও বুঝতে পারে না, যেন মৃতব্যক্তি বহনের মত এই অদ্ভুত বোঝা সে নীরবে প্রতিনিয়ত বহন করে চলেছে।
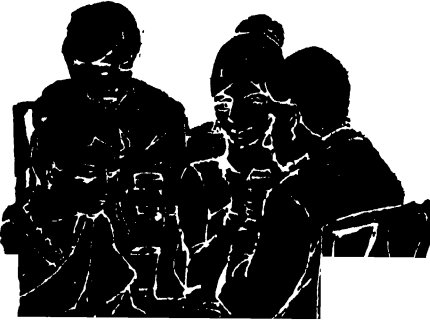
কিন্তু এসব তো গা-সহা হ'য়ে গেছে, সব কিছু সে মেনে নিয়েছিল। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করার ইচ্ছাও তার জাগে নি বা 'নোরার' মত 'পুতুলের সংসার' ফেলে চলে যাবার কথাও তার মাথায় আসে নি। অন্তত আজ অবধি তার ছিল না।

কিন্তু আজকের সন্ধ্যা।

কোথায় ছিল এই সব? সমস্ত প্রকৃতি যেন অনেকদিন অপেক্ষা ক'রে ছিল, আজ সন্ধ্যার বিরাট ঝড়ে তার সব কিছু উড়িয়ে-ভাসিয়ে-ছুটিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিল। অথচ ঝড়ের কোন পূর্বাভাসও সে পায় নি।

●

সন্ধ্যাবেলা প্রত্যহের বেড়ান শেষ করে ওরা দু'জনে সবেমাত্র এসে বসেছে বাইরের ঢাকা বারান্দায়, আর একবার চা-পর্ব শেষ করার জন্য চিন্ময় অনেক কথাই বলে যাচ্ছিল তার স্বভাবমত, আর চা ঢালতে ঢালতে আপন মনে ভেবেই চলেছিল রমা। গাড়ী থামার আওয়াজে দু'জনেই তাকাল নীচের বাবুর্চিখানার দিকে।

সন্ধ্যার ম্লান আলোয় ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবু যে ছায়ামূর্তির মত আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসতে লাগল, তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারল না রমা।

হ্যাঁ, অরুণই বটে।

কিন্তু একা নয়। সঙ্গে সুচিত্রা। বহুদিনের জানা যে নাম অরুণের সঙ্গে জড়িত। অরুণের দীর্ঘ একহারা দেহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন অথচ তার সঙ্গিনীর গতি চাঞ্চল্যে ভরা। চোখের কালো চশমা তখনও সে খোলে নি। মাথায় স্কার্ফও। একহাতে হাণ্ডব্যাগ অন্য কাঁধে লম্বা স্ট্র্যাপে ঝোলান ফ্লাস্ক।

আবার কে এল জ্বালাতে, দিব্যি নিরিবিলি ছিলাম শান্তিতে

চিন্ময় ওদিকে একবার দেখে বলল

হ্যাঁ, কবরের শান্তি'।—মনে মনে ভাবল রমা, তবে কোন উত্তর দিল না।

বাঙ্গালী নাকি? ভদ্রমহিলাকে দেখে তো তাই মনে হয়। যা বড় সিঁদুরের টিপের ঘটা। গেল, নিজেদের মনে থাকাটা মাটী হল। ওর কথার উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল রমা।

একটু পরেই যখন বেরিয়ে এল রমা, তখন লাল কাজকরা শাল তার গায়ে জড়ান। বেরিয়েই একেবারে মুখোমুখি অরুণের।

রমা।

অরুণ।

চেন না-কি তোমরা দু'জনে দু'জনকে?

বিস্মিত চিন্ময় প্রশ্ন করল।

বাঃ চিনি মানে? আমরা—

অরুণের দৃষ্টি তখনও রমার দিকে। রমাও অরুণের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ওর সমস্ত পৃথিবী যেন দুলে উঠল। এখানে এভাবে অরুণের সঙ্গে দেখা, এতদিন পরে?

ব্যাপার কি, হঠাৎ সব পাথর হয়ে গেল যে ?

চিন্ময়ের গলার শ্লেষ অস্পষ্ট থাকল না।—এস আলাপ করিয়ে দিই। অরুণ সেন—আর আমার স্বামী চিন্ময় বোস।

অরুণ হাতজোড় করে নমস্কার করল। চিন্ময় হাতটা কপালে ঠেকাল।

তোমাদেরও আলাপ করিয়ে দিই। রমা, আমার বাল্যকালের বন্ধু আর সুচিত্রা।

তোমার স্ত্রী তো।

বলতে পার।

এ আবার কি ? বলতে পার মানে ?

মানে---যাক্‌গে। চিত্রা, মহেন্দ্রকে বল তাড়াতাড়ি সরঞ্জাম নিয়ে আসুক, এমন সন্ধ্যাটা ফাঁকি দিয়ে চলে না যায়। বলছি, একটু হাত-পা ছড়াও, আমি আসছি।

ঘরের মধ্যে চলে গেল সুচিত্রা। কিসের সরঞ্জাম ?

চিন্ময় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। বা:; প্রথম পরিচয়, সেলিব্রেট করতে হবে না ? আচ্ছা মহেন্দ্র গোছগাছ করুক, আমিও একটু ভদ্রগোছ হ'য়ে আসি।

অরুণও ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আর কিছুক্ষণ পরেই একটা ট্রের ওপর একটা স্কচের বোতল, সোডা, আর চারটে গ্লাস সাজিয়ে মহেন্দ্র বারান্দায় বেরিয়ে এল।

চিন্ময় তো রীতিমত অবাক। ব্যাপার কি ? ভদ্রলোক তো ওভার স্মার্টনেস দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তোমরা তো বেশ চেনা দেখছি পরস্পরকে, অথচ কোনদিন তো বলনি এঁর কথা ? অবশ্য কি-ই বা বল।

ও: বলিনি বুঝি ? আমাদের প্রতি-বেশী ছিল ওরা।

ও একেবারে বাল্য প্রণয় ?

বলতে পার।

বলতে পার আবার কি ? এত ঘনিষ্ঠ দু'জনে অথচ কোনদিন এর নামও তো মুখে আন নি।

---আমার সব পরিচিতদের নাম কি তোমায় বলেছি ?

জানি না, তবে বলা উচিত ছিল।

কেন ?

বা: স্বামীর কাছে কোন কিছু লুকোনর প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

লুকোন ?

ম্লান হাসল রমা। তা নয়তো কি ?

লুকোব কেন ? তোমার অবকাশ কোথায় ?

কিসের অবকাশ ?

আমার কথা শোনবার।

বা: এর জন্য আমার কারখানা ছুটি দিয়ে দিনক্ষণ দেখে বসে অনুরোধ করতে হবে নাকি যে বল এবার তোমার সব প্রণয় কাহিনী।

প্রণয় কাহিনী ? স্ত্রী-পুরুষে প্রণয় ছাড়া বুঝি আর কিছু হ'তে পারে না ? অরুণ আমার বন্ধু।

আর আমি ? বোধহয় তোমার জন্ম-শত্রু।

বা:। আমি একটা মানুষই তো, নানাজনের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়িত আছি। কারও মেয়ে, কারও বোন, কারও স্ত্রী। বিভিন্ন রোল বলতে পার।

হ্যাঁ ওর কাছে ক্রীম রোল, আমার কাছে বীফ্ রোল তাই না ? ফলে আমার কাছে নিষিদ্ধ তুমি।

বাবা, এতও জান তুমি।

হাসল রমা।

হাসির কিছু নয়। আই মীন্ ইট।

পাগলাম ক'র না।---

পাগলাম কিসের ?

আচ্ছা আচ্ছা, ওরা আসছে চুপ কর।

অরুণ আর সুচিত্রা দু'জনেই বেশ যেন ঘষে-মেজে নিয়েছে একটু। সুচিত্রার ফর্সা রং-এ হালকা হলদে রংএর কোটা সাড়ী ভারী সুন্দর মানিয়েছে। খোলা শ্যাম্পু করা চুল কোমর অবধি ছেড়ে দিয়েছে, কানের পাশে মস্ত এক হলদে ফুল। বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা আর সিঁথি ভর্তি সিঁদুর।

রীতিমত মুগ্ধ হল রমা। একটা ঈর্ষার যন্ত্রণাও যেন অনুভব করল। দু'টি পুরুষের সামনে দুই নারী, একটি অতি মনোহারিণী। হঠাৎ রমার মনে হল ও নিজেও একটু সাজগোজ করে প্রসাধন করলে ভাল করত। সে ইচ্ছে তার গত সাত বছরে একবারও হয় নি।

বউ তোমার খুব সুন্দর হয়েছে অরুণ।

তাই নাকি। এতদিন লক্ষ্য করিনি তো।

সুচিত্রার দিকে একবার তাকিয়ে সস্নেহে হাসল অরুণ, হঠাৎ সলজ্জ আনন্দে লাল হয়ে গেল সুচিত্রা আর রমার মনে হ'ল এমনিভাবে প্রেমিকের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেতে ওরও বোধহয় ভাল লাগে।

আসুন, বসা যাক। যদিও আপনার সঙ্গে আগে আলাপ নেই, তবু রমার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর থেকেই আপনাকে চিনি।

কি রকম ?

অর্থাৎ রমাকে জানি তো। ও যাকে নিয়ে সুখী হয়েছে, তাকে খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। এখন মিলিয়ে নিলাম।

এখন খুব হতাশ হলেন তো।

মোটেই নয়, রমাকে সুখী করা সহজ কথা নয়। আপনি সাকসেস-ফুল।

সাকসেস ? মাই ফুট---

খুব আস্তে প্রায় অনুচ্চারিতভাবে কথাগুলো বলল চিন্ময়, তবু রমা শুনতে পেল আর প্রায় বিবর্ণ হ'য়ে গেল ওর মুখ।

ততক্ষণে মহেন্দ্র সোডার বোতল খুলে ফেলেছে। চারটে গ্লাসে মেপে খানিকটা করে হুইস্কি ঢেলে তাতে সোডা মেশাতে মেশাতে বলল চিন্ময় ---আপনাদের না জিজ্ঞেস করেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। তা ছাড়া এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় আর কিভাবে প্রথম পরিচয় সেলিব্রেট করা যায়।

অরুণ গ্লাস এগিয়ে দিল রমার দিকে।

ধন্যবাদ আমি খাই না।

একটু সঙ্গদান কর। সুচিত্রা তোমারটা নাও।

সুচিত্রা হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিল। ও নিজেকে আরও এলিয়ে ছেড়ে দিল চেয়ারে। দাও রমা।

প্লিজ অনুরোধ ক'র না। এটা খাব না।

মহা মুস্কিল তো। আপনি আসুন। আপনার চলে তো ?

ধন্যবাদ। চিন্ময় গ্লাস নিল।

দল ছাড়া হচ্ছেন কবে ?

বারে, ও তো রোজই খায়, আমি তো এই রকম বসে বসেই সঙ্গ দি। আমাকে তুমি কখনও দেখেছ নাকি খেতে ? না, তা দেখিনি। তবে এখন তো আরও ম্যাচিওর হয়েছে।

ও সব ম্যাচিওরিটির পরীক্ষা বুঝি এই তে ? না, না। অদ্ভুত লাগে অন্য সব বিষয়ে এত তোমার রেভেলিউ-শানারি আইডিয়া আর হঠাৎ এ—ব্যাপারে।

যদিও এটা কিছু রেভেলিউশানারি ব্যাপার নয়। তবুও ওসব কিছুই ভাবি না। আমার ভাল লাগে না।

ওর তো কিছুই ভাল লাগে না। চিন্ময় গম্ভীর মুখে বলল। চিত্রার আবার সব কিছু ভাল লাগে, না ? অবশ্য যদি সেটা আমার পছন্দমত হয়, কি বল চিত্রা ?

গভীর দৃষ্টিতে তাকাল অরুণ সুচিত্রার দিকে। কোন কথা না বলে অরুণের চেয়ারের কাছে সরে এসে ওর একটা হাত নিজের হাতে রাখল সুচিত্রা আর রমার ভেতরটা যেন জ্বালা করে উঠল। হিংসা নয়, বেদনায়। ও বোধহয় কোনদিন কারও হাতে হাত রাখার এমন সুখ অনুভব করে নি।

চিন্ময়ের দিকে একবার তাকিয়ে ও দূরের অন্ধকার আকাশে দৃষ্টি মেলে দিল।

ওরা চিয়ার্স করল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

রাশিয়ায় ভারতীয় জাহাজ

ওডেশা বন্দরে একটি ভারতীয় জাহাজ বোঝাই হতে দেখা যাচ্ছে

বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নেই, অথবা তার স্থান সব পিছনে,—সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা ব'লে পদার্থই নেই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বললেই হয়। এমন সময়ে হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বা বা শুনতে পাই, অমনি উন্মত্ত হয়ে বলতে থাকি পৃথিবীতে আর সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ আর সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটিয়ে বেড়ে উঠছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে একমুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে লেশমাত্র বিবর্জিত হ'য়ে ব্যবহারের উপযোগী আকারে বার হ'য়ে এসেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে Special Creation—এ তাই, এতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না; এ ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং একে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; একে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করতে হবে, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করতে হবে না; সংস্কারের আঁধি লেগে একথা আমরা একেবারে ভুলে যাই যে, কোনো একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করে দিয়েছেন, এসব কথা বর্বর কালের কথা। Special Creation-এর কথা আজকের দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে, বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদীই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে Solitary Cell-এ থাকে, সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই Solitary Cell-এ অন্তরায়িত ক'রে রেখেছেন, একথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে ক'রে রেখেছিলাম। দু'রকম ক'রে একঘরে করা যায়—এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এককালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকতেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বললেই হয়। তার ফলে, শোগুন ছিল সত্যকার রাজা, আর মিকাডো ছিলেন নামমাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দিবার সঙ্কল্প হ'ল তখন তাঁর অতিসম্মানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙে তাঁকে সর্বসাধারণের গোচর ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। নিজেকে তা সকল দেশের বিদ্যা হ'তে একান্ত স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছিল, পাছে বিপুল বিশ্ব-সাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশ হ'ল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো; আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা ক'রে নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলচে, সেই শোগুন হ'য়ে আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে শাসন করচে। আমরা অন্যটিকে উদ্দেশে নমস্কার ক'রে এ-কেই প্রত্যক্ষ সেলাম করলুম; এ-কেই খাজনা দিলুম এবং এ-রই কান-মলা খেলুম। ঘরে বসে একে ম্লেচ্ছ ব'লে গাল দিলুম, এর শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হচ্ছে ব'লে আক্ষেপ করলুম; এদিকে স্ত্রীর গহনা বেচে, নিজের বাস্তবাড়ি বন্ধক রেখে এর খাজনার শেষ কড়িটি শোধ করবার জন্যে ছেলেটাকে নিত্য এর কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাতে লাগলুম।

শিশু যে, সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হ'তে তাকে রক্ষা করেই মানুষ করতে হয়। তার [illegible] নিভৃত, [illegible] নিরাপদ। কিন্তু তাকে যদি চিরদিনই ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল ক'রে রাখি তা হ'লে উল্টো ফল হয়। অর্থাৎ যে-শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল ব'লেই পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে তার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য কাণ্ড-জ্ঞানবির্জিত হয়ে ওঠে। খুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হয়েছে, ক্ষেত্রের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন, পারসিক, মৈসর, গ্রীক, রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড় জাতিই ভারতীয়ের মতন ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড় ক'রে তুলেছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হয়েছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করবার দিন আজ আর নেই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ এসেচে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হ'য়ে থাকবে, সে নিষ্ফল হ'য়ে মরবে।

অতএব আমাদের দেশে বিদ্যা-সমবায়ের একটি বড় ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান ও তুলনা হবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে।

তা করতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র ক'রে জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পেলে তার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হ'তে পারে। কাছের জিনিষের বোধ দূরের জিনিষের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারত-চিত্তগঙ্গোত্রীতে এর উদ্ভব। কিন্তু দেশে যে নদী চলছে, কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হ'তেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলেচে। ভারতের বিদ্যার

...ও সেইরূপ মিলন ঘটেছে। যার হ'তে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন ক'বে এনেচে, সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করেচে, তা আমাদের ভাষায় আচারে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভেঙে দেশকে প্লাবিত করেছে, তাকে হেসে উড়োতেও পারিনে, কেঁদে ঠেকানোও সম্ভবপর নয়।

অতএব আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যারা ভারতকে একান্ত ক'রে দেখে, তারা ভারতকে সত্য করে দেখে না। তেমনি যারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হ'তে খণ্ডিত ক'রে দেখে তারাও ভারত-চিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে না। এই কারণবশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে, তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করতে পারি নে। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যা শাশ্বত ভিত্তি তাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড় বলে জান্তে হবে; কারণ এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করতে পারে। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারচি নে। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ, পার্সি, খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজী মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নয়। নেবার জন্যে অঙ্গুলিকে বাঁধ্তে হয়, দেবার জন্যেও;—দশ আঙুল ফাঁক ক'রে দেওয়াও যায় না, নেওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করলে তবে আমরা সত্যভাবে নিতেও পারব দিতেও পারব।

(বিচিত্রা---ফাল্গুন, ১৩৩৫)

—বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

নুতন ভারত বেরুক

আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন-রাতই কর, আর যতই কেন তোমরা "ডম্মম্" বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি।। * * * এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরুমরীচিকা তোমরা---ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা-মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,--তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে,---তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্ত-বীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম।। অতীতের কঙ্কালচয়--- এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন-পেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি,- ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীবমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে"।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আলোকচিত্রের ইতিহাস

আলোকচিত্রের (ফোটোগ্রাফী) ইতিহাস জানতে হলে, প্রথমেই জানতে হবে আলোকচিত্র বলতে কি বোঝায়? 'আলোকচিত্র' বা 'ফোটোগ্রাফী' শব্দের উৎপত্তি দুটো মূল গ্রীক্ শব্দ 'ফোটোস' (photos) অর্থাৎ আলো ও গ্রাফোস (graphos) অর্থাৎ 'লেখা' থেকে। সুতরাং এক কথায় এর অর্থ হলো 'আলোর লেখন'। চিত্রশিল্পী যেমন রং ও তুলি দিয়ে ছবি আঁকেন তেমনি আলোকচিত্রশিল্পীও আলোর সাহায্যে ছবি আঁকেন, আলোর সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করা হয় বলেই একে 'আলোকচিত্র' বলা হয়।

আলোকচিত্রের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় ১৮৩৯ খৃঃ থেকে। প্রথম যুগে আলোকচিত্রের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। সাধারণত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি তুলতেই এর ব্যবহার ছিল। কিন্তু ধাপে ধাপে কতকগুলি অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও আবিষ্কারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে আলোক-চিত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও বিকাশ হয়।

কিভাবে 'আলোকচিত্র' আবিষ্কার হোল, সেকথা জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে 'ক্যামেরা' আবিষ্কারের কথা। 'ক্যামেরা' কথাটিও এসেছে একটা গ্রীক্ শব্দ Kamara থেকে, যার অর্থ হচ্ছে, সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র একটি অন্ধকার ঘর যার একদিকে আছে একটিমাত্র সূক্ষ্মছিদ্র। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে চিত্রশিল্পীরা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘরের একটিমাত্র সূক্ষ্মছিদ্র দিয়ে ঘরের বিপরীত দেওয়ালে বাইরের যে দৃশ্য প্রতিফলিত হোত, তার ওপরে কাঠকয়লা দিয়ে ছবি আঁকতেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী 'লিওনার্দো-দ্যা-ভিঞ্চিই এর আবিষ্কর্তা বলে অনুমান করা হয়। এর থেকেই আবিষ্কার হয়েছে pinhole camara। পরে পিন্-হোল্ ক্যামেরার স্থান দখল করে 'পিন্‌হোলের' (সূক্ষ্মছিদ্র) পরিবর্তে লেন্সযুক্ত ক্যামেরা।

১৫৬৮ খৃঃ ভেনিসবাসী 'ড্যানিয়েল ব্যারবারো' নামে এক ভদ্রলোক প্রথম সূক্ষ্মছিদ্রের pinhole পরিবর্তে ক্যামেরাতে লেন্স ব্যবহার করেন। তিনি যে লেন্স ব্যবহার করেছিলেন, সেটা ছিল এক বৃদ্ধের চশমার একটিমাত্র কাঁচ। এর পর ১৬১১ খৃঃ জন্ কেপলার (John Kepller) নামে এক জ্যোতির্বিদ্ একটিমাত্র লেন্সের পরিবর্তে সম্মিলিত (compound) লেন্স ব্যবহার করেন। সেই সময় পর্যন্ত ক্যামেরা ব্যবহার হোত শুধুমাত্র রেখাঙ্কনের জন্য। কেন না তখন পর্যন্ত 'আলোকগ্রাহী' (light sensitives) ফিল্ম বা কাগজ আবিষ্কার হয়নি।

মৃণাল রায়

১৮৩৯ খৃঃ 'দ্যাগুরে' নামে এক ফরাসী শিল্পী ও 'উইলিয়াম্ হেনরী ফক্স ট্যালবট্' নামে এক ইংরেজ শিল্পী যৌথভাবে কাগজের ওপরে Silver chloride মাখিয়ে তার ওপরে 'নেগেটিভ্' বা প্রতিচ্ছবি তৈরী করেন। এইভাবে কাগজের ওপর 'নেগেটিভ্' তৈরী হওয়ার পর আলোকচিত্রের ব্যবহার শুরু হোল। 'দ্যাগুরে পদ্ধতি' সেই সময় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। এক জাপানী রসায়নবিদ্ এক ডাচ্ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 'দ্যাগুরে পদ্ধতি'র যন্ত্রপাতি আনিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি করতে শুরু করলেন।

১৮৫১ খৃঃ 'ফ্রেডারিক স্কট্ আর্চার' 'ওয়েট কলোডিয়ান' পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কলোডিয়ান পদ্ধতি হচ্ছে, দ্রবীভূত (soluble) আইয়োডাইড (iodide) ও সামান্য পরিমাণ 'পটাসিয়াম ব্রোমাইড (Potassium bromide) একসঙ্গে মিশিয়ে আঠার (gelatine) সাহায্যে কাচের ওপর প্রলেপ মাখানো হোত। তার পরে অন্ধকার ঘরে কাঁচের প্লেট-টাকে সিলভার নাইট্রেটের (silver nitrate) জলে ডুবিয়ে আলোকগ্রাহী বা light sensitive করা হোত। এই পদ্ধতির একটা অসুবিধা ছিল যে, কাঁচের প্লেট ভিজে অবস্থাতে থাকা-কালীনই ছবি তুলতে হোত। কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও ভাল ছবি হোত।

এর পরবর্তী উন্নতি হচ্ছে শুষ্ক (dry) প্লেট আবিষ্কার, যার ফলে ভিজে প্লেটের অসুবিধাগুলো দূরীভূত হলো।

১৮৮৪ খৃঃ 'জর্জ ইস্টম্যান' প্রথম রোল্‌ফিল্ম তৈরী করেন। যার সাহায্যে একসঙ্গে অনেকগুলো ছবি তোলা যায়। ১৮৯১ খৃঃ 'এস্ এন্ টার্ণার' দিনের আলোয় ক্যামেরাতে ভরার উপযুক্ত ফিল্ম্ তৈরী করেন।

ক্রমানুয়ে ফিল্ম্ ও ক্যামেরার নানারকম উন্নতি হয়। দ্রুতগতি (High speed) সাদাকালো ফিল্ম্ ছাড়াও রঙীন ফিল্মের আবিষ্কার হয়। প্রথমযুগে আলোকচিত্রের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত---শুধুমাত্র প্রতিকৃতি portrait তুলতেই এর ব্যবহার হোত। বর্তমানে মানব সভ্যতার প্রতিটি-ক্ষেত্রেই আলোকচিত্রের স্থান উল্লেখযোগ্য। রোগীর দেহের ভেতরের অবস্থাও আমরা আজ আলোকচিত্রের সাহায্যে জানতে পারি। যে সমস্ত জিনিস খালি চোখে দেখা যায় না, সে সমস্ত পদার্থ অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে ক্যামেরা লাগিয়ে বৈজ্ঞানিকরা তার ফোটো তুলে নানা অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এমন কি মানুষ চাঁদের ছবি তুলে নানা তথ্য নিয়ে পৃথিবীতে গবেষণা চালিয়ে চাঁদে পোঁছেছে। কাজেই আলোকচিত্র আজ আমাদের কাছে শুধুমাত্র সৌখীনই নয়, এর পরিধি বহুদূর বিস্তৃত এবং ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

লুপ্ত বিদ্যা উদ্ধার

শ্রীউমাকান্ত মুখোপাধ্যায়

১৩৭৬ সালের পৌষ মাসের মাসিক বসুমতীর ৪১১-১৪ পৃষ্ঠায় 'ত্রয়ী ও উপনিষদসমূহের মূলতত্ত্ব' অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া সাধারণ পাঠকগণের বিশেষ উপকার সাধন করেছেন। তিনি আবার সামবেদের শান্তি মন্ত্রটিকে 'উদ্‌গীথ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহাতে অন্যান্য প্রার্থনার মধ্যে 'আমার অঙ্গসমূহ—বাক্, প্রাণ, চক্ষু, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ আপ্যায়িত হউক,' 'ইহাদের সকলই ব্রহ্মোপনিষদ' বলা হইয়াছে।

তার আগেই তিনি ঋক্, যজু ও সামবেদকে ত্রয়ী বলেছেন, আর এই ত্রয়ী ও উপনিষদসমূহের সারাংশ স্বল্পাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা, "পরমাত্মা পরমেশ্বরই পরমব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম,—সৃষ্টির পূর্বে তিনিই ছিলেন। তাঁহারই ঈক্ষণে বা দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও প্রলয় হয়,—আবার প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টি পূর্বের ন্যায় হয়। প্রলয়কালে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও সকল জীবাত্মা সেই পরব্রহ্মেই অনুস্যূত থাকে। ত্রয়ীতে বলা হইয়াছে, চতুরাশ্রম-ক্রম অনুযায়ী কর্তব্য করিয়া গেলে মানব পরমেশ্বরের সমীপে অবস্থান করেন। তারপর চতুরাশ্রম সংক্ষেপে চমৎকার করে বর্ণনা করিয়াছেন; আরও দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—তখন ঋষিকা বা নারী ঋষিগণও মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন এবং শূদ্রও শিক্ষা ও সৎকর্ম দ্বারা উচ্চতম বর্ণ পর্যন্ত উন্নীত হইতে পারিতেন। ঐ সংখ্যায় ৩৭৮-৮০ পৃষ্ঠায় অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দশাবতার রহস্য' বলিতে যাইয়া এভোলিউসন (evolution) বা বিবর্তবাদের কথা বলিয়াছেন। আকাশের পর বায়ু, বায়ুর পর জল—এটি হইল দৃশ্য পদার্থ,—তাহাতে মৎস্য ও কূর্ম অবতার। তারপর ক্ষিতির উদ্ভব হইলে বরাহ ও নৃসিংহ এই দুইটি পশু দেহে অবতার। তৎপরে হনন করিয়া পিতৃআজ্ঞা পালন করলেন, রামরূপে, গুহকচণ্ডালকে কোল দিলেন এবং বানর লইয়া লঙ্কা জয় আর প্রজারঞ্জনার্থে সীতার বনবাস হইল। পরে বুদ্ধরূপে পঞ্চশীলা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া নির্বাণ লাভের পথ দেখালেন।

তারপর আসিতেছে কল্কি অবতার—তখন হবে একাকার বা সর্বত্র সমদর্শন—জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও আশ্রম প্রভৃতি কোন ভেদই থাকিবে না।

ঐ সংখ্যার ৩৬৮-৭২ পৃষ্ঠায় প্রশান্ত-কুমার সেন মহাশয় তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের ক্রমবিকাশের কথা বলিয়া "চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা" অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে মানুষ পূর্বে অসহায়, দুর্বল ও শক্তিহীন ছিলেন, তিনি যোগসাধন দ্বারা কিরূপে নানাবিধ ঐশী শক্তি লাভ করিতে পারেন তাহা মহর্ষি পাতঞ্জলির যোগদর্শনের 'সাধন' ও 'বিভূতি'পাদ হইতে সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ও সহজ সরল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া 'ঈশ্বর প্রণিধান' পর্যন্ত বুঝাইয়া দিয়াছেন। এরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সচরাচর চোখে পড়ে না। আমাদের ছেলে-মেয়েরা ত বটেই,—যাহাদের বয়স হইয়াছে—কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও একটি ছোট নোটবুকে লিখিয়া রাখিয়া প্রত্যহ একবার পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। ইহাতে যম ও নিয়ম কি, তাহাদের প্রণালী কি এবং কোনটির অনুষ্ঠানে কোন শক্তি বা বিভূতি লাভ হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তার পূর্বে ৩৫৪-৬ পৃষ্ঠায় কথামৃতে যোগেন্দ্র বাবু যোগবাশিষ্ট রামায়ণ হইতে 'মনোনাশের' দুইটি ক্রমের কথা বলিয়া "মনোনাশে ব্যবহার লোপ পায়,—যায়" একথা বলেছেন।

ইতিপূর্বে কার্তিক মাসের কথামৃতে যোগেন্দ্র বাবু বলেছেন, 'এই ঈশ্বর লাভ করতে অনেকের যুগ-যুগান্তর কেটে যায়।' এবার শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে ন্যাংটা সাধুর কথা থেকে দেখিয়ে দিয়াছেন, 'মনের নাশ হলেই অহং-নাশ; মনের নাশের পর যা' থাকে তাই ব্রহ্ম'। ইংরাজ কবি টেনিসন তাঁহার 'In Memorium' নামক কবিতায় যে বলেছেন 'I am I' অর্থাৎ তখন 'আমি হই আত্মস্থ',—ইহা কি তাই, না তাহা হইতে ইহা ভিন্ন কিছু? ইহা সমুদয় কবিতাটাকে পড়িয়া বিশ্লেষণ না করিলে বোঝা যাবে না, কোন পার্থক্য আছে কি না,—থাকিলে কতটা বিভিন্ন। কিন্তু উক্ত কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয় না, উহার ব্যাখ্যা বাজারে পাওয়া যায় না।

তবে ব্রহ্ম হইতে আকাশ ও পরে বায়ু, তারপর জলের সৃষ্টি,—তারপর জীব ও মনুষ্য সৃষ্টি—তারপর মনুষ্য স্তরে-স্তরে ঊর্ধ্বগামী হইয়া ধ্রুবা স্মৃতি লাভ করিলেন, আর তখনই তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলেন—এই কথাই কি ভগবান্ বলেছেন গীতার ১৪শ অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে যথা—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং
যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং
সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৪।১৯ ॥

অনুবাদ,—

গুণের অতীত ব্রহ্ম—দেখেন
যখন লোকে আর ধনঞ্জয়।
গুণত্রয়ই কর্মকর্তা,—তখন
তাদের যেন ব্রহ্মভাব হয়॥
॥ ১৪।১৯ ॥

মনের নাশেও ত এই গুণাতীত অবস্থা হয়। গীতায় এই গুণাতীত অবস্থা লাভের একটি সহজ পন্থা ভগবান বলেছেন, যথা,—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ
ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্
ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪।২৬

অনুবাদ,—
অনন্য ভক্তিতে মোরে
যিনি সদা করেন ভজন
গুণত্রয়াতীত হয়ে ব্রহ্মভাব
পাইবার যোগ্য তিনি হন
॥ ১৪।২৬ ॥

এই গুণাতীত অবস্থার স্বরূপ গীতায় বলা হইয়াছে,—যথা,—
"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরস্তুল্যনিন্দাত্ম-
সংস্তুতিঃ ॥ ১৪।২৪॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো
মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥
১৪।২৫ ॥

অনুবাদ,—সতত উদ্বেগ শূন্য সুখদুঃখ
সম যার, তথা লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয় যার স্তুতি ও
নিন্দনে ধীর সমবুদ্ধি রন্ ॥
২৫ ॥
মান আর অপমানে সম, শত্রু ও
মিত্রকে সদা সম দেখে যেই।
সর্বকাম্য কর্মত্যাগ করেছে যে জন,
পার্থ গুণাতীত সেই ॥২৬॥

এই উচ্চ অবস্থায় উঠিতে গেলে বহু যুগ-যুগান্তর কেটেও ত যায়—এই এভুলোশন বা বিবর্তন উক্ত চারিটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে ভাগে ভাগে; ইহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। পাশ্চাত্যেও ডারউইন ও হার্বাট সেন্সার হইতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত নানরূপ থিওরী বা মতবাদ উদ্ভূত হয়েছে, এবং তাহার উপর নির্ভর করে সামাজিকবাদও গড়ে উঠেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ এখন পর্যন্তও প্রাণ ও মন সৃষ্টির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই—Theory of Chance-এর উপরেই যাবতীয় পরিকল্পনা হইতেছে।

বোধ হইতেছে আমাদেরও বিবর্ত ও সামাজিকবাদের বহু গ্রন্থ অতীতকালে ছিল, তাহা চর্চা-অভাবে ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বা গুরুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের পরে তাঁহাদের বংশে বা অন্যত্র সেই বিদ্যা অধিগম করিবার যোগ্য পুত্র বা শিষ্য না থাকায় সে গ্রন্থের কেহ আদর করে নাই, প্রচারও হয় নাই, অবহেলিত অবস্থায় তাহা নষ্ট বা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

ইংরাজ ও জার্মান পণ্ডিতগণ ধন্য-বাদার্হ, তাঁহারা বহু অর্থব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া আমাদের বহু অমূল্য গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা পড়িয়া জগতের অনুরাগী পণ্ডিতগণ উহার আস্বাদ পাইয়াছেন এবং আমাদের দেশের যাঁহারা ইংরাজী জানেন কিন্তু সংস্কৃত ভাল জানেন না, তাঁহারা উহা পড়িয়া জ্ঞানার্জন করেন। এখনও বহু গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে,—পুরুষ পরম্পরা তাহা কোন কোন পণ্ডিত বংশের স্তিমিতগৃহে এখনও আছে বা থাকিতে পারে। তাহার প্রমাণ মাসিক বসুমতীর ১৭৮ পৃষ্ঠায় কথামৃতে যোগেন্দ্র বাবু 'মনশ্চক্রের' কথা বলিয়াছেন, তাহা ত আমি অন্য কোথায়ও পাই নাই—পড়িও নাই—ইহা ঐরূপ কিছু হইবে—অনুমান করি। তা ছাড়া আমরা হামেশা শুনি যা আসিতেছে 'চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মানব জন্ম হয়। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিবর্তনের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় ছিল বা আছে,—কিন্তু আমরা তো তাহার হদিশ পাই না।'

আমি একজন উকীল পত্নীকে তাঁহার স্বরচিত কবিতায় বিলাপ করিতে শুনিয়াছি যথা,—

"আলমারীতে মোর বাড়ীতে
রহিয়াছে কত বই,—
ধুলায় পোকায় কত নষ্ট হয়,
কিন্তু পড়িবার লোক কই?"

এরূপ বিলাপ ভারতের অনেক পণ্ডিত গৃহে অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহীরা পর্যন্ত করেছেন বলে অনুমান হয়।

স্বদেশ মন্ত্র

"হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারী জাতীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি,মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা; আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সিন্ধুঘোটক

ঈশ্বর যে কটি অপূর্ব বিস্ময় মানুষের জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন অর্থাৎ যারা শুধু সাম্প্রতের সঙ্কীর্ণতায় নয়, শাশ্বতের প্রসারতায়, চিরন্তনের দাবীতে, কালের অবিরাম ধারা পরম্পরায় মানুষের মনের মধ্যে অফুরান বিস্ময়ের দোলা দিয়ে যায়, তাদেরই একটি জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত সমুদ্র। কখনও উত্তাল-উদ্দাম রুদ্রভৈরব, কখনও স্নিগ্ধশোভন শান্ত শিব এই সমুদ্র যেন এক স্বতন্ত্র জগৎ। কত রত্নের সম্মেলন। কত প্রাণের সমারোহ, কত বৈশিষ্ট্যের আকর, কত বৈচিত্র্যের নিদর্শন।

এই বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণিপুঞ্জে সিন্ধুঘোটক একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই নামের সঙ্গেই জড়ানো আছে সমুদ্রের উল্লেখ। সেই বিচারে একে পরিপূর্ণরূপে সামুদ্রিক বলতে বাধা নেই। রূপের দেবতা কিন্তু তার প্রতি প্রসন্ন নন। তার কৃপাদৃষ্টি তিলমাত্রও

বিচিত্র সিন্ধুঘোটক : মুখব্যাদান লক্ষ্য করার মত

তিনি নিক্ষেপ করেন নি তার দিকে, দীর্ঘ, ভীষণাকৃতি এই সিন্ধুঘোটকের বৃহদাকার দন্তগুলি তাকে যেন আরও ভয়াবহ-দর্শন করে তুলেছে।

এর প্রিয় খাদ্য প্রসঙ্গে অনেকে শুক্তির উল্লেখ করে থাকেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য আসে। এই ধরনের একটি বিখ্যাত গল্প পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেটি নিছক রূপকথামাত্রই এবং সেই রূপকথার কাহিনীই এই ধারণার উৎস। বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আসলে সিন্ধুঘোটকের প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য হচ্ছে

সিন্ধুঘোটকের মুখাবয়ব (ডানদিক থেকে)

শম্বুকজাতীয় এক ধরনের প্রাণী, যার দেহের চামড়া অত্যন্ত নরম ও কাঁকড়া বা চিংড়ী মাছজাতীয় জীবগুলি এদের পরেই উল্লেখিত হতে পারে, তারকাকৃতি এক ধরনের সামুদ্রিক মৎস্য এবং সমুদ্রের পোকামাকড়গুলিও। সীল-মাছও এর প্রিয় খাদ্য।

বিশেষজ্ঞরা বহু সিন্ধুঘোটকের দেহ চিরে প্রমাণ পেয়েছেন যে তারা শীলমাছের প্রতি অত্যধিক আসক্ত। তাদের জঠরে সীলমাছের গাত্রচর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তাদের দেহের এই বৃহৎ দন্তগুলি তাদের সকল কাজের প্রধান সহায়ক। আহার্য সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতিটি কাজেই তারা মুখ্যত এই দাঁতের সাহায্যেই করে থাকে।

উল্লেখযোগ্য এই যে, [illegible] প্রাণীদের মধ্যে সিন্ধুঘোটকই একমাত্র প্রাণী, যার মুখের 'হাঁ'র আয়তন দু ইঞ্চি অতিক্রম করে যায়। এ বিশেষত্ব অন্য কোন প্রাণীর নেই। এর ওষ্ঠ

সিন্ধুঘোটকের দীর্ঘায়তন দন্তযুগল

দু'টি অত্যন্ত পুরু ও দৃঢ় এবং সমুন্নত লোমরাজির দ্বারা এই অধরযুগল পরিবেষ্টিত।

শুধু দেখতে ভীষণদর্শনও নয়, অন্যদিকেও যথেষ্ট দৈহিক শক্তির অধিকারী। এই শক্তির প্রকাশ সামান্যই ঘটে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে কিন্তু ব্যাপকভাবে ঘটে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং এই সংগ্রামের মূল কারণই স্ত্রী-জাতি। এদের সমাজের স্ত্রী-জাতি যারা, তাদের অধিকার করতে এরা সর্বদাই ব্যগ্র এবং সেদিকে এদের আসক্তি অত্যধিকমাত্রায় প্রবল। স্বভাবতঃই প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়ে থাকে, তারই পরিণতি ঘোর সংগ্রাম। বলা বাহুল্য যে, যাকে কেন্দ্র করে এই সংগ্রাম, সেই বিশেষ স্ত্রীরত্ন---সেই লাভ করে এইভাবেই এদের সমাজে স্ত্রীরা পুরুষের অধিকারে এসে থাকে।

—অনসূয়া

আদর্শ মহাবীর চরিত্র

দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবন লীলা-ফিলা এখন রেখে দে; গীতা সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা। * * * মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। * * * জীবন-মরণে দৃকপাত নেই---মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান।--- * * * হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না। রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা--- ব্রহ্মত্ব-শিবত্ব-লাভে পর্যন্ত উপেক্ষা। শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবি না। মহাবীরকে স্মরণ করবি--- মহামায়া স্মরণ করবি। দেখবি, সব দুর্বলতা---সব কাপুরুষতা তখনি চলে যাবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ত০ কোথায়? বালিশের দিয়ে প্রায় গোটা শরীরটা ঢেকে থাকা ছেলেটি ধীরে ধীরে দু'চোখ খুলে অস্পষ্ট ভাবে কথা কটি বললো। তা শুনে আমিও একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। পুলিশের লোকটি এই মুহূর্তের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলো। ছেলেটির ভীষণ কাছে এগিয়ে এলো। চোখে-মুখে ফুটে উঠলো অনেক কথা বার করে নেবার ব্যগ্রতা।

কিছুক্ষণ আমার এবং পুলিশ অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো ছেলেটি---তারপর হয়তো হঠাৎ মনে করতে পারলো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা।

লক্ষ্য করলাম---ছেলেটির চোখে ফুটে উঠলো আতঙ্কের চিহ্ন।---

কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম। সেই ত্রাসের ভাব মুহূর্তেই হারিয়ে গেলো ছেলেটির দু'চোখ থেকে। আবার একবার আমাকে দেখলো ছেলেটি।

তার পরমুহূর্তে মুখের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে স্পষ্ট করে বললো একটি অদ্ভুত কথা---

---হ্যাঁ, আমি---মানে---সেই ছোট্ট ছেলেটিকে আমিই মেরে ফেলেছিলাম, আমি ইচ্ছে করেই তার মৃত্যু ঘটিয়েছিলাম---আমি দোষী---সম্পূর্ণ দোষী---। সম্পূর্ণ দোষী---

একসঙ্গে অনেক কথা বলে ভীষণ উত্তেজিত ছেলেটি নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

পুলিশ অফিসারটিকে সরে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম আমি।---

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মরত হাউস সার্জেনটি অবাক হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলো---সার, আপনি কি এই ছেলেটিকে চেনেন?---

অনেকক্ষণ ছেলেটির কাছে ছিলাম বলেই এই প্রশ্ন আমি বুঝতে পারলাম। তাই সংক্ষেপে বলতে হলো বিকেল বেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা।

---নিস্তেজ হয়ে পড়া ছেলেটির দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, তাই একটি সিডেটিভ্ ইঞ্জেকসন্ দেবার কথা বলে আমি বাড়ীমুখো হলাম।---

বন্দনা বড়ুয়া

কেন জানি না, বার বার ছেলেটির কথাই মনে পড়েছিল। "আমি দোষী' ---স্পষ্ট, নির্ভীক স্বীকারোক্তি।। দুর্বল ছেলেটি অসুস্থ অবস্থায়, এ দৃঢ় মনোবল কোথায়, কি ভাবে পেলো!---ভাবছিলম সেই কথাই।

বিকেল চারটের সময় বাড়ী ফিরতে চাওয়া 'আমি' বাড়ী ফিরছি এখন রাত প্রায় দশটা। এত সময় আমি কেন ছেলেটির কাছে ছিলাম! আমি তো তাকে জানি না। বিশাল রাজপথে একটি বাসের চালক, এই ছেলেটিকে দেখেছিলাম মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, হ্যাঁ দেখেছিলম। অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে একটি কথাই মনে মনে ভাবছিলাম---বাসের ষ্টিয়ারিঙে ছেলেটিকে যেন মানাচ্ছিল না। ছেলেটি ভদ্র সন্তান। তাহলে? বাসের ড্রাইভার কেন হলো!---

পরক্ষণেই আমার হাসি পাচ্ছিলো। আমার ডাক্তারী মনটা একটা অজানা ছেলেকে দেখে কেন যে এইসব অবান্তর কথা ভাবছিল। আশ্চর্য!---

---একটি জটিল অপারেশন কেস্ নিয়ে আমি প্রায় সারাদিন হাসপাতালে কাটিয়ে বিকেল বেলা ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে ফিরছিলাম বাড়ী। গাড়ীর পেছনের সিটে শরীরটাকে এলিয়ে মনটাকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করতে চাইছিলাম।

কিন্তু জনারণ্য সেণ্ট্রাল এভিন্যুর বুকে সারি সারি গাড়ীর যান্ত্রিক শব্দ বার বার আমার মনটাকে ফিরিয়ে এনেছিল কোলাহলের মাঝে।

লাল রঙের ট্রেফিক লাইট জ্বলে উঠলো। আমার গাড়ীর বাঁ দিকে এসে দাঁড়ালো একটি বাস। চোখাচোখি হোল বাসটির চালকটির সঙ্গে খাকী ইউনিফর্ম পরা ছেলেটির বয়স হয়তো তেইশ চব্বিশ। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।---

সবুজ লাইট জ্বলে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দ করে তীব্র গতিতে বাসটি চালিয়ে দিলো ছেলেটি। মুহূর্তে হারিয়ে গেলো বাসটি। অজানিতে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম---কেন এই দুরন্ত গতিবেগ। এ যুগের ছেলেরা কেনই বা এতো দুর্দান্ত। যুগের জটিলতাই কি এর কারণ।

আমার সকল চিন্তা অসমাপ্ত অবস্থায় থেমে গেলো। ঘটে গেলো একটি

ঘটনা ঠিক সেই মুহূর্তেই। বিরাট শব্দ করে প্রতিটি গাড়ী থেমে গেলো। নানা কোলাহলে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। আমার গাড়ীর ড্রাইভারটি দৌড়ে গেলো সামনের দিকে। অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললো---একটি ছোট ছেলেকে বাস চাপা দিয়েছে---

খবরটা শুনেই আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। সেই বাসটি নয়তো।।

আমার অনুমান ঠিক ফলে গেলো।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলাম একটি ভয়াবহ দৃশ্য। জানি না, আমার মন কি করে একটি বিপদের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল।

ভীড়। চারদিকে ভীড়। কিন্তু। আমি যে করেই হউক ভীড়ের মাঝে ঢুকে পরলাম। দেখতে পেলাম অমানুষিক একটি দৃশ্য। পাগলের মতো অনেক লোক যার যেভাবে খুসী বাসের চালকটিকে মেরে যাচ্ছিলো---নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিলো ছেলেটির। কাছেই পড়ে থাকা ছোট্ট ছেলেটির মৃতদেহটির দিকে তাকাবার সময় কারো ছিল না। প্রতিটি লোক বিচারক হয়ে দোষীকে শাস্তি দেবার জন্য অধীর উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল।

---পুলিশ এলো একসময়।

কিভাবে যে ক্রুদ্ধ জনতার আসুরিক হাত থেকে ছেলেটিকে ছিনিয়ে আনতে পারলাম সেও এক বিস্ময়কর কাহিনী। মেডিকেল হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি করে আমি অনেকটা ভারমুক্ত হতে পারলাম। কিন্তু বার বার একটি কথাই ভাবলাম আমি।

কিসের জন্য আমার এই কষ্ট-স্বীকার। সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান। না---কিছু কথা জানবার জন্য অহেতুক কৌতূহল।।

---কয়েকটা দিন পার হয়ে গেলো। নানান কেস্ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম যদিও প্রতিদিন সময় করে ছেলেটিকে দেখতে গিয়েছিলাম।

প্রায় ভাবতাম---এই ভদ্র, মার্জিত ছেলেটি কেন এই নিষ্ঠুর কাজ করছিল?

গম্ভীর হয়ে থাকা অরুণ নামের ছেলেটি ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠলো আমার কাছে।

একদিন হঠাৎ অরুণ আমায় জিজ্ঞেস করলো---ডাক্তারবাবু, আমি কি একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

---নিশ্চয়---উত্তর দিলাম আমি।

---আপনি এতবড় একজন ডাক্তার ---কিন্তু---কিন্তু---আমার মতোন অখ্যাত, অচেনা একজন ছেলেকে দেখতে আপনি কেন আসেন? আর---আমি তো এখন ভাল হয়ে গেছি অনেকটা---হয়তো আরো কয়েক দিনের পরেই আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেবে---

একটু ইতস্তত: করে অরুণ।

ও আরো কিছু বলতে চায় আমাকে।

---ডাক্তারবাবু---আমার এই কেস্ চলার সময় আপনাকে নিশ্চয় সাক্ষী দিতে হবে, তাই না? আমি তাই ভাবছি আপনাকে একটি অনুরোধ জানাব---

মুহূর্তে আমার মনের মাঝে উঁকি দেয় একটি কথা। হয়তো---হয়তো এইবার অরুণ আমাকে অনুরোধ করবে সাক্ষী দেবার সময় ওকে যেন আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ বলি। সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সেদিন দোষী বলে স্বীকার করলেও এখন সুস্থ হয়ে অনুতাপে অস্থির হয়ে পড়েছে। অপরিসীম অনুশোচনা জাগছে মনের মাঝে। তাই হয়তো---

কিন্তু আমি এবার হেরে গেলাম।

আমার অনুমান একেবারে মিথ্যে হয়ে গেলো। না---অরুণকে আমি একটুও চিনতে পারিনি।

অরুণ তখন বলছিল---ডাক্তারবাবু আমি তো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমি আবার বলছি---আমি সত্যিই দোষী ডাক্তারবাবু। আমি আমার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পেতে চাই। সাক্ষী দেবার সময় আপনি দয়া করে বলবেন আপনি নিজ চোখে দেখেছিলেন আমার অসাবধানতার ফলেই ছোট্ট ছেলেটির জীবনদীপ চিরদিনের জন্য নিবে গিয়েছিল। আশ্চর্য এক অনুভূতি, আশ্চর্য একটি ইচ্ছে আমার মনের মাঝে জেগে ওঠার ফলেই আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে এ অপরাধ করেছিলাম। আমি ---আমি দোষী ডাক্তারবাবু---

অরুণের কথা শুনে আমি স্তব্ধ নির্বাক হয়ে পড়ি। তার কণ্ঠের দৃঢ়তা আমার মনে জাগায় হাজারো প্রশ্ন। কেন? কেন এ কাজ করলো অরুণ? কি সেই অদ্ভুদ ইচ্ছে---অদ্ভুদ অনুভূতি।

কঠোর শাস্তির কথা জেনেও অরুণ কি করে এ কথা স্বীকার করলো।

আমি অরুণের মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু---কোথায় জন্ম অপরাধীর চোখের ভয়াবহতা? তার পরিবর্তে দেখলাম---অনেক---অনেক হতাশায় ঢেকে রাখা দুটি কালো ক্লান্ত চোখের নিষ্প্রভ আলো। এই মুখে তো অনেক আলো, অনেক আশাভরা দুটি চোখ থাকার কথা। তাহলে?---

হঠাৎ মনে পড়েছিল একদিন পুলিশ অফিসারটির রূঢ় মন্তব্যের কথা ---"এরাই নাকি ভবিষ্যৎ নাগরিক। ভবিষ্যতের দেশের আশা---আলো। কিন্তু সমাজের এই সব আবর্জনা নিজেদের জীবনের মূল্য তো খুঁজে পায় না অন্যহাতে ভালো নাগরিকের জন[illegible] এরা হয়ে উঠেছে মূর্তিমান বিভীষিকা।

আরো অনেক কথাই বলেছিলে[illegible] ভদ্রলোক। আমি লক্ষ্য করলাম---সে[illegible] শোনার সঙ্গে সঙ্গে অরুণের দু'চোখে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠা---কি[illegible] পরমুহূর্তেই তা নিবে গিয়েছিল। একটি[illegible] কথাও না বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে[illegible] দুচোখ বন্ধ করে দিয়েছিল অরুণ।

আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে[illegible] গিয়েছিল।

---এর মাঝে আরো কয়েক[illegible] দিন পার হয়ে গিয়েছিল। আমি জান[illegible] তাম---হাসপাতাল থেকে রিলিজ হলেই অরুণকে জেলে পাঠানো হবে আর তার পরেই হয়তো আরম্ভ হবে[illegible] কেস্টা। কিন্তু---তার আগেই যে আমাকে জানতে হবে অরুণের কথা।।

---অরুণ প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। অরুণের কাছে পাহারা দেওয়া লোকটাকে বাইরে যেতে বলে ওর

বিছানার কাছেই একটি চেয়ার টেনে আমি বসলাম। এর আগে অরুণের খবর নিতে এসে সাধারণতঃ দাঁড়িয়েই চলে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণ পর। কিন্তু আজ আমায় বসা দেখে অরুণ শশব্যস্ত হয়ে হাতে থাকা বইখানা বালিশের কাছে রেখে একটু হাসলো। কিন্তু আমার দু'চোখ তখন আটকে গিয়েছিল বইখানার মলাটের উপর। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ বই! বাস ড্রাইভারের হাতে!

হয়তো আমার মনের কথা অরুণ ঠিক বুঝতে পেরেছিল। কিছুটা লজ্জিত হয়ে আস্তে আস্তে অরুণ বললো---এভাবে শুয়ে বসে আর কত সময় কাটাব? তাই এই বইখানার পাতা উলটিয়ে যাচ্ছিলাম---

অরুণের এই কথা আমাকে কিন্তু খুব সাহায্য করলো। এতক্ষণ ভাবছিলাম কিভাবে আমার কথা আরম্ভ করবো। ---তাই বলাম,

---অরুণ, বইখানার পাতা এমনিতেই তুমি ওলটাচ্ছিলে বল্লেও আমি কিন্তু তা বিশ্বাস করছি না। আচ্ছা অরুণ, তুমি আমার কয়েকটি কথার উত্তর কি দেবে?

উৎসুক হয়ে অরুণ বললো---আমার সাধ্য অনুসারে নিশ্চয় বলবো ডাক্তারবাবু। আমার মতন একজন সাধারণ ছেলের প্রতি প্রথম দিন থেকে আপনি যে দয়া সহানুভূতি দেখিয়েছেন তা কি আমি কখনো ভুলতে পারি? অনেক নির্দয়, হৃদয়হীন লোক দেখার পর পৃথিবীতে ভালো লোক এখনো আছে সে কথা আপনাকে দেখার পর আবার নতুন করে অনুভব করছি। জীবনে তো অনেক কিছুই দেখলাম, অনেক নিরাশা, ব্যর্থতা---ইস্ আমি এ সব কি আবোল তাবোল বকে যাচ্ছি।---আমায় ক্ষমা করবেন ডাক্তারবাবু---আর কিছু করবার নেই তাই হয়তো আজকাল বড়ই স্বার্থকাতর হয়ে যাচ্ছি---

---না-না তুমি চুপ করো না অরুণ। আমি তোমার সব কথা [illegible] তো আজ এসেছি। তোমার মতন একটি ছেলের জীবন ঢেউ না থাকা সাগরের মসৃণ জলের মত সুন্দর হয়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু কেন হল না? আরো তো হাজারো কাজ ছিলো তবে তুমি কেন এ কাজ নিয়েছিলে অরুণ?

---বলবো ডাক্তারবাবু, আপনাকে সব বলবো আমি। আমার সকল কথা বলতে পারলে বিবেকের কাছে আমিও অনেকটা সহজ হতে পারবো। যে দিনের সেই ঘটনার পর থেকে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে আজ আমি সত্যিই বড় ক্লান্ত---

একটু নীরব হয়ে অরুণ আবার বললো---ডাক্তারবাবু, আপনি এইমাত্র বলছিলেন---সংসারে এত কাজ থাকতে আমি কেন এ কাজ বেছে নিলাম। হাজার কাজ থাকার কথা হয়তো সত্যি---কিন্তু আমার ভাগ্যে যে একটাও চাকরি জুটলো না!---কত আশা বুকে বয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। সামান্য মাইনেতে দুটি মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বাড়ীর বড় ছেলেকে পড়িয়ে উপযুক্ত করতে গিয়ে আমার বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন। অভাবের অভিশাপ নামলো সংসারে। বাড়ীর আমি ছোট ছেলে---আমার পরে আরো দুটি বোন ছিল। আমি যেবার বি-এ ফাইনাল দেবো তার আগের বছরে বাবা পেন্সন নিলেন। পরীক্ষার আগে থেকেই অনেক স্বপ্নের জাল বুনেছিলাম মনে মনে। বাবা মা আর ছোট দুই বোনকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলাম, মাত্র কয়েকটি মাস অপেক্ষা করো। তারপর সব ভার আমার।---বাবার কষ্টের টাকা দিয়ে যে দাদা অনায়াসে কর্মজীবনে প্রবেশ করলো, দুদিন যেতে না যেতেই মনের মানুষকে আপন করে নতুন সংসার পেতে বসলো। আশ্চর্যভাবে দাদা ভুলতে পারলো মায়া, মমতা, কর্তব্য দায়িত্বের কথা।। কালেভদ্রে বাড়ীতে একবার আসা ছাড়া দাদার সঙ্গে আমাদের সকল সম্পর্ক হারিয়ে গেলো। দিদিরাও [illegible] আত্মীয়ের মতো বাড়ী আসতো না। [illegible] [illegible] কে [illegible]।

আমি---আমি মাত্র ভাবছিলাম---কখন পরীক্ষাটা হয়ে যাবে, বি-এ ডিগ্রীটা পাবো। তারপর ওদের সবাইকে দেখিয়ে দেবো কিভাবে বাড়ীর মর্যাদা রাখতে হয়।

কি যেন ভাবলো অরুণ। মুখে ফুটে উঠলো একটু বাঁকা হাসি।

---আজ ভাবলে হাসি পায় ডাক্তারবাবু, আমি কি বোকা ছিলাম। কি অদ্ভুদ ছিল আমার আশা, আমার আকাংক্ষা---বি-এ পাস করেও একটা চাকরী পাবো না। এক এক দিন ইচ্ছে হয়েছিল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি সার্টিফিকেটগুলো। কি হবে অর্থহীন, মূল্যহীন কাগজের টুকরোকে বুকে জড়িয়ে মিথ্যে কল্পনার জাল বুনে?

হ্যাঁ---একদিন বি-এ পাস করলাম আমি। বাড়ীতে আনন্দের বান ডাকলো। সবাই জানলো---এবার ভগবান মুখ তুলে চাইবে---অরুণের চাকরি হবে।

দাদা চলে যাবার পর থেকে আমি হয়ে পড়েছিলাম মায়ের চোখের মণি। অভাবের সংসার হলেও আমার পাতে একটু ভালো খাবার দেবার মায়ের কি আপ্রাণ চেষ্টা ছিলো। বাবার পেন্সনের মাত্র একশ টাকায় চলা সংসারে প্রতিজনের মনে জাগলো কত কল্পনা। একদিন মা বললো,---অরুণ, তুই কাজ পাবার দিনেই কিন্তু আমায় নিয়ে যেতে হবে একবার কালীঘাটে। আর একটা কথা---কাজ পেয়েই দুই বোনকে দু'খানা শাড়ী কিনে দিবি আর---আর যদি পারিস বাবাকেও কিনে দিবি একখানা ধূতি---

কেন জানি না, মার কথা শুনে আমার দু'চোখে জল এসে গিয়েছিল। ---কিছু না বলে আড় চোখে মার পরণের ছেঁড়া শাড়ীখানা একবার দেখেছিলাম---সেই মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম অনেক কিছু। আমি আশাবাদী ছিলাম। অনেক সুন্দর স্বপ্ন দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম-----কিন্তু কিন্তু ডাক্তারবাবু সেই আনন্দ, সার্থকতা আমার জীবনে কোনোদিন এলো না।

কিন্তু কেন এলো না। আমি তো

কোনো অপরাধ করিনি ! অনেক আশাও করিনি ! তবে ? মাত্র চেয়েছিলাম ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার জন্য একটি ভদ্র চাকরি ।।

ম্লান হাসি ফুটে ওঠে অরুণের মুখে।

---আপনি হয়তো ভাবছেন, মাত্র বি-এ পাস করে কি করে আমি এতটা আশা করেছিলাম ?

তাই যদি হয় তা'হলে আমি এর উত্তরে বলবো আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকা কর্পোরেশনের বড় অফিসারের মাত্র মেট্রিক পাস ছেলেটি সাহেব কোম্পানীতে কি করে বড় চাকরী পেলো ? আর আমার থেকে পড়াশোনায় অনেক খারাপ, প্রতিবেশী ডাক্তারের গুণ্ডা নামে খ্যাত ছেলেটি কি করে বিলেতে গেলো ?

কিন্তু আমি---আমি তো বিলেতে যেতে চাইনি, বড় চাকরিও খুঁজিনি ! আমার চাহিদা ছিলো তো সামান্য !

ডিগ্রী পাওয়ার পর দু'বছর কেটে গেলো । কাজ খুঁজে পাগল হয়ে গেলাম । এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিলাম অনেক আগেই । কিন্তু কোথায় কাজ ? আমার সর্বক্ষণের চিন্তা হলো মাত্র একটাই । যে কর্মেই হোক আমার একটা কাজ চাই-ই চাই---

প্রথমে আমার চোখেই পড়েনি । লক্ষ্যও করিনি । কিন্তু একদিন চোখে পড়লো, পড়লো বড় নগ্নভাবে। অসম্ভব আঘাত পেলাম মনে । মনে হয়েছিল বুকখানা ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে ।

কেন ?

এবার তাই বলি শুনুন,---আমার উপর থাকা বাড়ীর প্রতিজনের এতদিনের সকল আশা, উৎকণ্ঠা হঠাৎ যেন সব নিঃশেষ হয়ে এলো । সবাই ইতিমধ্যেই জেনে গেছে---অরুণ নামের ছেলেটি আসলে একটি অপদার্থ। জীবনে কোনোদিন তার কিছুই হবে না ।

আমি কি খাবো, আমার জন্য কিছু আছে কি নেই, সে ভাবনাও মা আর ভাবতেন না ।

মনের অনেক বিরক্তি প্রকাশ করে বাবাকেও বলতে শুনলাম---"আমার ভাগ্যই খারাপ । দুই ছেলেই হলো বংশের কলঙ্ক । চাকরি করে একজন বৌয়ের আঁচলের তলায় মুখ লুকোলো আর অন্যজন আজ দু'বছর ধরে চাকরীই খুঁজলো"-----

লজ্জায় দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার । কিন্তু হলো না মরা ।

আরো পরিবর্তন এলো । বোনেদের চোখে দেখলাম অবজ্ঞাভরা চাহনি । অপদার্থ আমি । চূড়ান্ত ভাবে হেরে গেছি জীবনযুদ্ধে ।

বাইরের জগতকে ভালবাসতে সুরু করলাম । বাড়ীতে থাকার সময় শুধুমাত্র পিয়নের অপেক্ষায় কাটিয়ে দিতাম---যদি কোনো দরখাস্তের উত্তর আসে !

পিয়ন আসবার সময় পার হয়ে যায় । হতাশা আমাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তারো বেশি ভয় করতে লাগলাম অন্ধকারকে । সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভয় ঢুকতো মনে, মনের সকল আশা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো । শুনতে পেতাম কে যেন বলতো---তোর আর কিছু হবে না---কিছু হবে না । সম্মুখে দেখতাম রাশি রাশি অন্ধকারের মিছিল ।

---আরো একটি বছর কাটলো । বেকার জীবন অসহ্য হয়ে এলো । মা-বাবা, বোনেদের ব্যবহারে যেটুকু আবরণ ছিল তাও এবার সরে গেলো ।

একদিন বাবা স্পষ্টই বলেদিলেন---"বড় চাকরি না জোটে---কুলী, রিক্সাওয়ালার চাকরী তো আছে । তাই করলেও অন্তত: সবাইকে বলতে পারবো ছেলে চাকরি করে------

আর না । অসহ্য লাগলো । পৃথিবীর উপর বিতৃষ্ণা জন্মালো । সেই মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা করলাম, যা কাজ পাবো তাই নিয়ে নেবো । দরকার যদি হয় কুলী, মিস্ত্রি কিম্বা রিক্সাই টানবো । তবুও সংসারে আর বোঝা হয়ে থাকবো না ।।

------আশ্চর্যভাবে পরের দিন দেখা হয়ে গেলো পরেশের সঙ্গে । পরেশ বাস ড্রাইভার সে কথা জানতাম। অবস্থার জন্যই পড়াশোনা করতে না পারা পরেশ বরাবর আমায় সমীহ করতো, কিন্তু ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিণতি । শেষে কিনা পরেশকেই দিতে হলো আমাকে চাকরির সন্ধান !---

এবার আমি সত্যই কাজ পেলাম। প্রথম দিন খাকী ইউনিফর্ম পরতে গিয়ে অজানিতে চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়েছিলো । আমার সামান্যতম আশা, ক্ষুদ্র কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে নিঃশব্দে আমি অনেকক্ষণ কাঁদলাম । - - -

কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ীর সবাই আমার চাকরির খবর পেলো । যে দাদা একটা চাকরি পাওয়াতে কোনো দিন সাহায্য করেনি, ড্রাইভার হয়েছি শুনে ঘৃণায় লজ্জায় বললো---"অরুণ বাস ড্রাইভারী করলে সমাজে আমি মুখ দেখাবো কি করে ? অফিসের লোকেরাই বা শুনে কি বলবে ? বাস ড্রাইভার হওয়ার চেয়ে ও কেন মরে গেল না ---অন্তত তখন বাড়ীর মান-মর্যাদা এভাবে ধুলায় লুটাতো না---বাড়ীর সঙ্গে দিদিরা সব সম্পর্ক ছেড়েই দিয়েছিল । এ সব দেখেশুনে নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আমার করার আর কিছুই রইল না । ড্রাইভার হবার পর লক্ষ্য করলাম যে, আমি সামাজিক মর্যাদাও হারিয়ে ফেলেছি । মনে হতো, সামনে কিছু না বললেও আড়ালে সবাই যেন আমার অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে হাসাহাসি করছে । ---আর---আর---

হঠাৎ অরুণ স্তব্ধ হয়ে গেলো । একমিনিট, দু'মিনিট করে অনেক ক্ষণ কেটে গেলো । অরুণ হারিয়ে গেছে যেন---নিজস্ব ভাবপ্রবাহে---

আস্তে ডাকলাম---অরুণ---

---ডাক্তারবাবু, অনেক কিছুই তো আপনাকে বললাম, কিন্তু একটি কথা বলতে যে এখনো বাকী । এ কথা না বললে আমার কথা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে ।

চাকরি হবার পর সকল দুঃখ চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কখনো তো

ভাবিনি কাজ পাবার পরের অভিজ্ঞতা বুকে যে এত বাজবে।

---বাড়ীর কাছেই থাকা মালিনীকে মনের একান্তে পেয়েছিলাম সুদীর্ঘ ছ'বছর ধরে। যতদিন কাজ পাইনি একমাত্র মালিনীই আমাকে সাহস দিয়ে উৎসাহ দিয়ে বারবার এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। প্রতিবার ভেঙে পড়ার মুহূর্তে আমি কাছে পেয়েছিলাম মালিনীকে---কিন্তু!

আমি বাস ড্রাইভার হয়েছি শোনার পর মালিনীরও বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল।

ভীষণ আঘাত পেলাম মনে।---কিন্তু নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম ---সত্যিই তো, একটি শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে একজন বাস ড্রাইভারকে কি করে ভালবাসতে পারে!

মালিনী বুদ্ধিমতী। দূরে সরে গিয়ে মালিনী ভালই করেছে।

মালিনীকে হারিয়ে আমার দুঃখ হয়নি। ভালই তো হলো। মালিনী আমাকে মুক্তি দিলো, আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারলাম---

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কেটে গেলো। আমরা দু'জনে চুপচাপ বসে আছি।

নীরবতা ভেঙে অরুণ বললো---

ডাক্তারবাবু, আপনাকে কিন্তু আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। আপনি নিশ্চয় বলবেন আমি সম্পূর্ণ দোষী।

সেদিন সবুজ আলো জ্বলে উঠতেই বাসখানা দ্রুতগতিতে চালিয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ বাসের সম্মুখে দৌড়ে এসেছিল ছোট ছেলেটা। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। ইচ্ছে করলেই আমি ছেলেটাকে বাঁচাতে পারতাম, কিন্তু---কিন্তু আমি তো তা করলাম না---

ওকে দেখার মুহূর্তেই কে যেন আমার মনের মাঝে বিকট চিৎকার করে বলে উঠলো---

"ঐ যে দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ---ঐ যে ছেলেটা সে তো তুই---ছোটবেলাকার তুই---ওর মতন তুইও একদিন ছোট্ট ছিলি, বুকে অনেক আশা-কল্পনা নিয়ে বড় হয়েছিলি---কিন্তু---কিন্তু তোর তো জীবনে কিছুই হলো না---এই ছেলেটাও তোর মতই একদিন বড় হবে, অনেক---অনেক আশা বুকে বয়ে ভবিষ্যতের দিন গুণবে---কিন্তু---কিন্তু যদি তার জীবনেও তোর মতন ব্যর্থতা নেমে আসে। তাহলে? ব্যর্থ হবার আগেই তার জীবন তুই শেষ করে দে---করে দে------"

আমার সারা শরীর কেঁপে উঠলো, আমি চিৎকার করে উঠলাম---"না-না আমি তাকে বড় হতে দেবো না---কিছুতেই দেবো না। আমার মত তার জীবনে অন্ধকার নেমে আসতে কখনো দেবো না---দেবো না---এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে আমি তাকে মুক্তি দেবো---মুক্তি দেবো------"

ডাক্তারবাবু---আমি---আমি তার ছোট্ট শরীরের উপর দিয়ে বাসখানা চালিয়ে দিয়েছিলাম---

দু'চোখে বয়ে আসা অজস্র জলের ধারাকে দু'হাতে মুছে অরুণ বললো---ডাক্তারবাবু, আমি কি তাকে সত্যিই, মুক্তি দিতে পারলাম? না আমার কোথাও কোনোখানে বিরাট ভুল হয়ে গেলো?---ভুল হোক শুদ্ধই হোক তার বিচার করবেন কিন্তু---কিন্তু আমাকে যে শাস্তি পেতেই হবে। সেই শাস্তি আমি যাতে তাড়াতাড়ি পাই আপনি কি সাহায্য করবেন না ডাক্তারবাবু??

●

আমি ভেবে পেলাম না---অরুণকে কি উত্তর দেবো!! *

* অসমীয়া লেখা হইতে অনুদিত।

দুশ্চিন্তাহীন স্যার ম্যাকেনজী

স্যার কম্পটন ম্যাকেনজীর বয়স আশী পেরিয়েছে। ইনি '৮০-তে আসিও না' ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। আটাত্তর বছর বয়সে এই খ্যাতনামা লেখক নিজের সেক্রেটারী ক্রিসীকে বিয়ে করেন। এঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানসিক উৎফুল্লতা, যা থেকে আটাত্তুরে বিয়ে সম্ভব হয়েছিল। নিজেই বলেছেন, 'আমি চিরকাল দারুণ সুখী মানুষ। একবার গ্রীস-এ নিজের গোপনীয় কাজের বর্ণনা লিখে অল্পর জন্য জেল এড়াতে পেরেছিলেন সামান্য জরিমানা দিয়ে। তাঁর নিজের ভাষায়; 'আমি কিন্তু কখনও দুশ্চিন্তা করিনি। কখনও করি না। অন্য লেখকদের থাকলেও আমার মনে কোনদিনই তিল পরিমাণ ঈর্ষা জাগে নি, এর মূলে আমার মতে দুটো জিনিস রয়েছে---ভাল যকৃৎ আর প্রচুর স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয়। আমার উপন্যাস 'প্যাশনেট ইলোপ্‌মেণ্ট' ছাপাতে দু' বছর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল; অসংখ্য অস্বীকৃতিমূলক চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও লেখক হিসেবে নিজের ক্ষমতায় কোনদিন সন্দেহ করি নি।' তাঁর দৈহিক ত্রুটি একটাই: দৃষ্টি-স্বল্পতা। বাঁ চোখটা পুরো অকেজো, ডান চোখে ছানি। তৎসত্ত্বেও তিনি বলেছেন, 'অন্ধ হলে একঘেয়ে লাগবে। তখন বইগুলো মুখে মুখে বলতে হবে। কিন্তু আমি আদৌ দুশ্চিন্তিত নই।'

বিবর্তনবাদের নেপথ্যে

বিবর্তনবাদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় যে নামটি উল্লিখিত সে নাম চার্লস ডারউইন, সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে ডারউইনই একমাত্র নাম—যাঁর কণ্ঠে দুলিয়ে দেওয়া হয় পথিকৃতের বরমাল্য, যাঁর ললাটে এঁকে দেওয়া হয়েছে পথপ্রদর্শকের জয়টিকা, যাঁর দিকে এগিয়ে দেওয়া হয় দিশারীর মহার্ঘ আসন।

মানবজাতির ইতিহাসে ১৮৫৮ একটি অবিস্মরণীয় অব্দ। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য ভারতবাসী সকলেরই সুবিদিত, কিন্তু মানবজাতির ইতিবৃত্তেও সাময়িকভাবে এই অব্দটি অল্প মূল্য বহন করে না। একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সমগ্র মানব সমাজে যে ঘোষণাটি চমক লাগিয়ে দিয়েছিল ডারউইনের সেই বিবর্তনবাদ সংক্রান্ত ঘোষণার জন্য ১৮৫৮ সালে।

ডারউইনের এই মতবাদ সর্বজনবিদিত, কিন্তু এর পশ্চাৎ-ইতিহাস সে পরিমাণ সর্বজনবিদিত নয়। ১৮৩৫ সালের কথা। প্রাণিতত্ত্ববিদ হিসাবে ডারউইন তখন কর্মরত। কর্মসূত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জের বিশেষ ধরণের কয়েকটি প্রাণী তাঁর সমগ্র চিন্তারাজ্যে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন আনে। প্রাণীগুলির দৃষ্টি আকর্ষণকারী গঠন, প্রকৃতি ইত্যাদি দেখে তাদের উদ্ভব তথা সমগ্র প্রাণিসমাজের উদ্ভব বিকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে এক নবতর চেতনা তাঁর চিত্তকে আন্দোলিত করে।

ইংলণ্ডে ফিরে এলেন ১৮৩৭ সালে, ফিরে এসে তাঁর গবেষণার বিষয়টি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। ১৮৩৮ সালে কোন্ ধারায়, কোন্ কোন পন্থায় এই বিবর্তন রূপ পরিগ্রহ করছে এ সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট আলোকপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর ধারণা ও চিন্তাধারাকে লেখনীর মাধ্যমে তিনি প্রথম প্রকাশ ঘটালেন। আরও বছর ছয়েক পর। ১৮৪৪ সালে এই সম্পর্কে তিনি একটি রচনা লিখলেন। তাঁর মতে এটি একটি রচনা, কিন্তু আয়তনের বিচারে এটি একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য গ্রন্থের [illegible] সেটি ছাপার অক্ষরে তিনি প্রকাশ করলেন না। এমন কি তাঁর বৈজ্ঞানিক বন্ধুমহলেও এ সংক্রান্ত কোন প্রকার আলোচনা করলেন না, শুধু দু'একজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যাপারটি জানালেন প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক লিয়েল এবং বিখ্যাত উদ্ভিদবিশেষজ্ঞ হুকার এই অন্তরঙ্গদের পর্যায়ে পড়তেন। তাঁরা বিশেষভাবে ডারউইনকে চাপ দিতে থাকেন। তাঁদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে ডারউইন সম্মত হলেন।

ঠিক এই সময়ে সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে আর এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটল। তিনি এ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। বয়সে ডারউইনের চেয়ে ১৪ বছরের ছোট। অনুরূপ ধারণা তাঁর মনেও দানা বাঁধল। দিবারাত্র এই গবেষণাতেই তিনি মেতে রইলেন। তারপর এই সংক্রান্ত নিজের রচনাটি ডারউইনের কাছেই পাঠিয়ে দিলেন তাঁর অভিমতের জন্য।

ডারউইন হলেন বিব্রত। এখন কি করবেন তিনি। কাজ সুরু করেছেন তিনি অনেক আগে। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেন নি। এখন তিনি পথিকৃতের গৌরব দাবী করেন, কিভাবে লিয়েল এবং হুকারের পরামর্শে অবশেষে তাঁর নিজের এবং ওয়ালেসের রচনা একসঙ্গে পেশ করলেন লিনিয়ান সোসাইটিতে। অবশ্য একটি ভূমিকার মধ্যে আভ্যন্তরীণ সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে দেওয়া হল। ১৮৫৯ সালে অবশেষে প্রকাশিত হল ডারউইনের কালজয়ী গ্রন্থ "দ্য অরিজিন অফ স্পেসেস"—যার আয়তন পাঁচশ' পৃষ্ঠা।

—কৃপাচার্য

গুরুভ্রাতাগণের দৃষ্টিতে স্বামীজী

"কি কার্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা, সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরুর কার্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহান চিত্ত, পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন,—সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ; পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি—আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি, জ্ঞান-আবরণে আবরিত। উভয়ের একই ভাব, কার্যে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন-জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন।"

—মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

মঞ্জুশ্রী সিংহ

(শেষাংশ)

ঈশ্বর গুপ্তের রচিত কবিতার মধ্যে ভগবদ্‌বিষয়ক, ভক্তিরসাত্মক ও নীতিতত্ত্বমূলক কবিতার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যদিও "মহাকালীর স্তব" রচনা করেছেন বা "সারদামঙ্গল" কবিতাগুচ্ছও রয়েছে তাঁর কিন্তু এটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নয়; পূর্ব প্রচলিত রীতিতে মাতৃরূপের আরাধনা তিনি করেন নি। তিনি পিতা-রূপে সম্বোধন করেছেন ঈশ্বরকে। এখানে কবির ভক্তমনের পরিচয়টি বেশ ফুটেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যগুরু সম্পর্কে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন,---"রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।"---একথা হয়তো সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া যায় না। রামপ্রসাদ ঠিক যে অর্থে ভক্ত, সাধক---আন্ত-রিকতার পরিচয় থাকলেও একই অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে সাধকের মর্যাদা হয়তো দেওয়া যায় না। কারণ রাম-প্রসাদের গান স্বতোৎসারিত---তাঁর ধর্মসাধনারই নামান্তর---সচেতনভাবে রচিত নয়।

ঈশ্বরকে পিতারূপে আরাধনা করার রীতি যেমন খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তেমনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী-দের মধ্যেও এই রীতি দেখা যায়। ঈশ্বর গুপ্তও যে অনুরূপভাবে ভক্তি প্রকাশ করেছেন তার কারণ খৃষ্ট-ধর্মের প্রভাব নিশ্চয়ই নয়। কারণ 'হিন্দুয়ানী' রক্ষার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়েছিলেন সর্বদাই।

"যায় যায় হিন্দুয়ানী, আর নাহি থাকে।" (অনাচার)

এ ছাড়া 'ছদ্ম মিশনরি', 'বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্মানুরক্তি' ইত্যাদি অনেক কবিতায় খৃষ্টধর্মের বা মিশনারিদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছেন তিনি,---'মিশনারি ছেলেধরা ছেলে ধরে খায়।' কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন ---সেই প্রভাব হয় তো কিছু পরিমাণে রয়ে গিয়েছে তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কবিতায়।

প্রকৃতিকে নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে---প্রকৃতিই যে সেখানে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে---তা নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা অনেক সময় মানব-জীবনের পটভূমিকা হিসাবে প্রকৃতিকে গৌণস্থান দিয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক তা করেন নি। একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন তিনি প্রকৃতিকে। তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর ঋতু-বিষয়ক ও প্রকৃতিসম্বন্ধীয় অন্যান্য কবিতায়। বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের যে সব সুখ-সুবিধা দেখা যায় তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন কবি। আজকের দিনে আমরা নিছক প্রকৃতির কবিতা বলতে, ঠিক যে জাতীয় কবিতাকে বুঝে থাকি, তার পরিচয় ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে প্রায় নেই বললেই চলে।

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বা রাজ-নৈতিক ঘটনা অবলম্বনে অনেক কবিতা রচনা করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু 'যুগসন্ধিকালের কবি' বলেই বোধ হয় দ্বৈত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় অনেকক্ষেত্রে। সময় সময় মনে হয় তিনি প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন---উদার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সকল কিছু। আবার কোন কোন সময় দেখি, সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন--- তখন মনে হয় তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ব্যক্তি।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সমাজ-সমালোচনার দ্বারায় তিনি বাঙালীর আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, বাঙলার সমাজকে অনুকরণের মোহ থেকে উদ্ধার করতে উৎসুক ছিলেন, জাতীয় চেতনা ও স্বদেশপ্রেমকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, 'হিন্দুয়ানী'কে

প্রাণপণে রক্ষা করে স্বজাতিপ্রীতি ও স্বধর্মনিষ্ঠাকে জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন, কৌলীন্যপ্রথার নিন্দা করেছিলেন, নীলকরের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক চেতনাবোধ ও যুক্তিপ্রধান মনোভাব। তিনি সাহিত্যের উন্নতি চেয়েছিলেন, শিক্ষাবিস্তারেরও সমর্থক ছিলেন। এই সব মনোভাব সেই উনিশ শতকীয় ভাবধারার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ---তাঁর প্রগতিশীল মনেরই পরিচায়ক।

আবার দেখি, নারীশিক্ষা বা নারীপ্রগতিকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কটূক্তি করেছেন, ইংরেজের জয়গান গেয়েছেন, সিপাহী-বিদ্রোহের নায়ক নানা সাহেব ও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকে অসম্মানজনক ভাষায় আক্রমণ করেছেন---তখন আবার অবাক লাগে ভাবতে যে, একই মানুষের মনে রয়েছে যুগপৎ নবীন ও প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী।

উদাহরণস্বরূপ নারীপ্রগতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা তুলে দেওয়া যেতে পারে---

"আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রতধর্ম কোর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।

●

এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।" (দুর্ভিক্ষ)

এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের নারীসমাজকে দেখলে তাঁর যে কী মনোভাব জাগত, ভাবতে কৌতুক বোধ হয়।

কবিতায় যে ভাষা ও ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছেন সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছু দেখা যায় না। ছোটবেলায় তিনি যখন কবিদলে গান বাঁধতেন, তখন থেকেই এই ভাষাগুলি ও রুচি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই যমক, শ্লেষ ও অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি দেখা যায় তাঁর কবিতার প্রায় ছত্রে ছত্রে। এদিক থেকে তিনি সেই কবিওয়ালাদেরই উত্তরসূরী। তবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যে বুদ্ধির দীপ্তি ও ভাবের চমক আছে---কবিওয়ালাদের মধ্যে তা ছিল না।

ভারতচন্দ্র কবিও বটে, পাণ্ডিত্যেরও অভাব ছিল না তাঁর। তাই এক সমস্যায় পড়েছিলেন তিনি---ভেবে আকুল হয়েছিলেন প্রথমে কোন্ ভাষায় কাব্য চর্চা করবেন? তাঁর মনে হল---

"পড়িয়াছি যেই মত, লিখিবারে পারি।"

কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা বুঝবার মতো উপযুক্ত পাঠক বা শ্রোতা তখনকার দিনে বিশেষ ছিল না। তাই আবার মনে হল---

"কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।"

অতএব সমাধান করলেন তিনি এইভাবে যে, সর্বজনবোধ্য ভাষাতেই রচনা করবেন তাঁর কাব্য। সে ভাষার রূপ হবে---

"না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।'

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সামনে এতশত সমস্যা ছিল না। তিনি সে যুগের বাঙ্গালীর মুখের ভাষাকে কাব্যে রূপদান করেছেন---যা সহজ, সরল, সাদাসিধে, আরবী-ফার্সী শব্দবহুল---কিছু কিছু ইংরেজী শব্দও আছে এতে। ঈশ্বর গুপ্ত রোম্যাণ্টিক কবি নন, কাজেই ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না তাঁর। যখন যেভাবে যে কথা তাঁর মনে জেগেছে, বিশেষ ধরনের নৈপুণ্যের পরিচয় না দিয়ে সেই অনুভূতিকে সহজভাবেই প্রকাশ করেছেন তিনি। এইদিক থেকে দেখলে তাঁকে "জনগণ-কবি" নামেই অভিহিত করা যায়।

তাঁর কবিতায় যে সব আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার দেখি, এ যুগে হয়তো ঐ সমস্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কারণ হল এই যে, ইংরেজ শাসনের যুগে ইংরেজী ভাষার যে মর্যাদা ছিল, নবাবী আমলে ছিল তেমনি আরবী-ফার্সী ভাষার কদর। আজকে যেমন বহু ইংরেজী শব্দ আমরা ব্যবহার করে চলেছি আমাদের প্রতিদিনের মুখের ভাষায়, সেদিন তেমনি আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারের চল ছিল। আজ আমরা যখন পড়ি---

"বিবিজান চলে যান লবেজান করে।"

ইত্যাদি ছত্র---তখন হয়তো কানে একটু অন্য রকম লাগে। মনে হয়, 'খাঁটি বাঙালী কবি হয়ে ঈশ্বর গুপ্ত এত বিদেশী শব্দ কেন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, তাঁর আমলে এগুলি ছিল নিতান্ত পরিচিত, সাধারণ নিত্যব্যবহার্য শব্দমাত্র। বহু ব্যবহারের ফলে এগুলি বাংলা ভাষারই অঙ্গীভূত ছিল। এই সঙ্গে আবার অনেক ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও চোখে পড়ে---

'ডিয়ার ম্যাডাম্ ইউ টেক্ দিস্ গ্লাস" (ইংরেজী নববর্ষ)

অথবা---

'কুক্ হয়ে মুখখানি লুক্ করি সুখে।"

মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে কবির কর্মমুখর জীবনের অবসান ঘটে। এখনকার হিসাবে তিনি অত্যন্ত অকালেই বিদায় নিয়েছিলেন ইহলোক থেকে।

ঈশ্বর গুপ্তকে সহানুভূতি নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করার অর্থই হল, তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখা। এই শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি বিশেষ তাৎপর্য বা ব্যাপক অর্থ হল এই যে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদনের ভিতর দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠতে পারি।

★ ভারতীয় নারী ★

সুব্রতা মজুমদার

ভারত-নারীর মহিমা এবং গরিমা বিবর্ধনে ভারতবর্ষের যে প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা এবং অবদান অতুলনীয়—পূজনীয়া মহারাণী অহল্যাবাঈ সেই তালিকায় একটি হিরণ্যোজ্জ্বল নাম। শাশ্বত কাল থেকে, পৌরাণিক যুগ থেকে ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, সেই সনাতনকাল থেকে বিভিন্ন যুগে এক অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় এই মহাদেশের মহীয়সী নারীকুল আপন আপন অভাবনীয় কৃতিত্ব ও দক্ষতায় ইতিহাসে এক একটি বিশেষ অধ্যায়ে গৌরবময় আসন অধিকার করে আছেন। অহল্যাবাঈ সেই পুণ্য-ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ইন্দোরের মহারাণী হিসাবে বিরাট কীর্তির পরিচয় দিয়ে তিনি বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করে গেছেন, সেই অহল্যাবাঈয়ের জন্ম পাথরাদি নামক গ্রামে একটি অতি সাধারণ কৃষিজীবী পরিবারে। বাবার নাম আনন্দরাও সিন্ধে। নিঃসন্তান আনন্দরাও এবং তাঁর স্ত্রী দেবী জগদম্বার কাছে সন্তান কামনায় ধরনা দেওয়ার পর অহল্যাবাঈয়ের জন্ম। ১৭৩৫ সালে অর্থাৎ ঔরংজেবের মৃত্যুর আটাশ বছর পর এবং পলাশী যুদ্ধের বাইশ বছর আগে অহল্যাবাঈয়ের জন্মের পর তাঁর কুষ্ঠী তৈরী হলে দেখা গেল, তাতে লেখা আছে নবজাতিকা একদিন রাজরাণী হবে।

বালিকা অহল্যাবাঈ হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে গেলেন ইন্দোরের হোলকার মালহর রাওয়ের মারুতি মন্দিরে। মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন হোলকার। এ যে সর্বসুলক্ষণা মেয়ে। এই মেয়েই তাঁর চাই। খবরাখবর চলল, সব কিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। অহল্যাবাঈ হোলকারের প্রাসাদে এলেন তাঁর পুত্রবধূর মর্যাদায়। ভাবী হোলকার খাণ্ডে রাও-এর সহধর্মিণী হয়ে।

প্রাসাদ উঠল ঝলমলিয়ে লক্ষ্মীর আবির্ভাবে। কোল জুড়ে এল ছেলে-মেয়ে। নিয়তি বোধহয় অলক্ষ্যে থেকে মুচকি হেসেছিল একটু—১৭৫৪ সালে জাঠেরা উৎপাত সুরু করল। সেই উৎপাত দমন করতে গেলেন খাণ্ডে রাও। তিনি আর ফিরলেন না। এল তাঁর মৃত্যুসংবাদ। তন্বী কিশোরীর জীবনের বিকাশের প্রারম্ভেই নেমে এল অকাল বৈধব্যের যবনিকা। সতী হতে চাইলেন অহল্যা, বৃদ্ধ মালহরের অনুনয়ে ও হাহাকারে শেষ পর্যন্ত সে সঙ্কল্প থেকে তাঁকে বিরত হতে হল।

শ্বশুরের সহকারিত্ব করতে লাগলেন রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে। সমগ্র ভারতে মারাঠা প্রভুত্ব বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছিলেন মালহর, কিন্তু তা চরিতার্থ হওয়ার আগেই তাঁকে যেতে হল পৃথিবী ছেড়ে। সিংহাসনে বসলেন মালী রাও। অহল্যার ছেলে। আসলে সর্বময় কর্তৃত্ব অহল্যার হাতেই রইল। ন' মাস পর মালী রাও-ও চলে গেলেন মায়ের কোল খালি করে। অহল্যার জীবনেতিহাসের প্রাক-কমল পর্বের সমাপ্তি ঘটে গেল। মূল পর্বের সুরু হল। নারীর শাসন একদল সানন্দে বরণ করে নিল, আর একদল লিপ্ত হল গুপ্ত চক্র আর কুমন্ত্রণায়।

প্রাক্তন রাজাদের আমলে প্রবল প্রতিপত্তি ছিল—পুরোহিত গঙ্গাধর যশোবন্তের। তরুণী রাণীর প্রতিও সেই প্রভাব বিস্তার করে নিজে ইন্দোরের সর্বময় কর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন গঙ্গাধর। সুবিধে হল না পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন অহল্যাবাঈ—আপনি পুরোহিত, ধর্মীয় ব্যাপারে আপনার বিধান মেনে নেবো, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে নয়। অপমান মর্মে মর্মে লাগল গঙ্গাধরের। প্ররোচিত করলেন পেশোয়া বংশীয় রাঘোবাকে। রাঘোবা অহল্যাকে জানালেন—রাজপুত এবং ইংরেজরা যে কোন ক্ষতি করতে পারে—আপনি আমার কথা শুনে চলুন, আপনার ভয় নেই। উত্তর পেলেন—আপনার সমস্ত কুৎসিত চক্রান্তের সব খবরই আমার জানা। আপনি সাবধান হোন। তাতেও রাঘোবা দমলেন না। ফলে অহল্যাবাঈয়ের হাতে কারারুদ্ধ হলেন। পরে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেয়েই রাজপুতদের ক্ষেপিয়ে দিলেন অহল্যার বিপক্ষে। অহল্যাবাঈ সব খবরই রাখছেন। একাধিকবার রাঘোবাকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে, তথাপি তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন হয়

নি। টাকা চাইলেন কোষাগার থেকে রাখেবা। অহল্যা জানালেন এ আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এ টাকা জনগণের, আমি এর রক্ষিকা মাত্র। তবে, ব্রাহ্মণ হিসাবে আপনি কিছু দান চাইলে সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। এ কথায় আবার ক্ষিপ্ত হলেন রাঘোবা। যেবার রণক্ষেত্রে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অহল্যা পাঁচশো সৈনিক নিয়ে। বিশেষত্ব এই যে, সৈনিকদের মধ্যে পুরুষ একটিও ছিল না।

রত্নপ্রসূ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আনুমানিক ১৮০৫ সালে এই মহীয়সী মহিলার দেহান্তর ঘটে। মহাতীর্থ বারাণসীর বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দির এবং গয়ার পবিত্র বিষ্ণুপাদ মন্দির তাঁর দু'টি কালজয়ী কীর্তি। স্বীয় রাজ্যের প্রতি গ্রামে পশু-পক্ষীর পরিচর্যা ও সংরক্ষণের জন্য সুব্যবস্থা ও দরিদ্র প্রতিপালনের জন্য সার্থক আয়োজনের কোন ত্রুটি তিনি রাখেন নি।

নীড় হারা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শাশুড়ী বিধবা মানুষ। অনেকক্ষণ ধরে পুজো করে। এছাড়া, বছরে চল্লিশটা ব্রত, পাল-পার্বন, উপবাস লেগেই আছে। সব যোগাড় করে দিতে হয় অন্নকে। এছাড়া বামুন খাওয়ানো, আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ানো, বারো মাসই হয়।

সারাদিন অন্ন রান্নাবান্না করে। পুকুর থেকে জল আনে। জলখাবার করে দেয় দেওরকে। দেওর কাজ-কর্ম কিছু করে না। বেরিয়ে যায় সকাল সকাল। কু-সঙ্গে মেশে। ফেরে দুপুর বেলা, খেয়ে-দেয়ে আবার বেরিয়ে যায়।

শাশুড়ীকে জলখাবার খাইয়ে, ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে। শাশুড়ীর চুল বেঁধে দেয়, পা টিপে দেয়। বড়ি দেয় শীতকালে, আচার তৈরী করে, ধান ভানে, মুড়ি ভাজে, চিঁড়ে ভাজে। কুটনো কোটে, বাটনা বাটে, কাপড়-চোপড় কাচে। ঝি মাত্র একটি। সে না এলে বাসনও মাজে। মুনীষ খাটে ওদের জমিতে। তাদের এক ধামা করে মুড়ি, গুড়, জল দিয়ে আসে দুপুর রোদে। তাছাড়া, আরো কতো রকমের কাজ তার। বিশ্রামের সময় পায় না মোটেও।

প্রায়ই অর্দ্ধেক রাতে একগাদা তাড়ি খেয়ে ফেরে তার দেওর। দরজা খুলে দিতে হয়। কোনদিন সে খায়, কোনদিন খায় না। খেলে অন্ন ভাত বেড়ে দেয়। শাশুড়ী কিছু বলে না। ভয় পায় ছেলেকে। এখন একটিমাত্র ছেলে। খুব আদরের।

রাত্রে ভালো করে কোনও দিন ঘুমোতে পারে না অন্ন। অমানুষিক খাটুনির পরিবর্তে সে কী পায়?

খাওয়া - পরা, বাক্যযন্ত্রণা। মাঝে মাঝে দু-চার ঘা মার।

অর্চনা মিত্র

একদিন এক হাঁড়ি ভাত নামাতে গিয়ে হাঁড়িশুদ্ধ ভাত হাত ফসকে পড়ে গেলো। গরম ফ্যানটা পড়লো তার পায়ের ওপরে। ভাতগুলো ছড়িয়ে গেল মাটিতে। পায়ের পাতা দু'খানাই পুড়ে গেছে। খুব জ্বালা করছে।

তার জন্য অতো কষ্ট অনুভব করছে না - অন্ন। ভাতগুলো যে নষ্ট হল। অতোগুলো চালের ভাত নষ্ট হল। শাশুড়ীর হাতে, আজ অনেক খোয়ার হবে। হলও তাই। নবাবজাদী রাজকন্যে, অলবড়ড়ে প্রভৃতি মিষ্টি মধুর সম্ভাষণে, অন্নর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হল।

ঠিক সময় ভাত না দেওয়ার জন্যে, দেওর তার দুটি গালে চপেটাঘাত করে বসলো। বললো একটা রাঁধুনী বামুন রাখবো এবার। কাজ করতে পারে না, শুধু অকাজ। অন্নর, সারাদিন খাওয়া হল না। পুকুরের ধারে বসে কাঁদলো আর কাঁদলো।

সন্ধ্যেবেলায় অমলা চপলা, ধবলা কমলা প্রভৃতিরা এলে পুত্রবধূর আক্কেল, সংসারের কাজে অপারদর্শিতা সম্বন্ধে অন্নর শাশুড়ী বিশাল বক্তৃতা শুরু করে দিলো। এমন বৌ সংসারের জিনিষ নষ্ট করে, এক কাঁড়ি গিলছে শুধু ইত্যাদি।

বর্ষীয়সী মহিলারাও ছি-ছি করতে লাগলো।

অন্ন ভাবছে - মার সেই আত্মীয়া অথবা আর কেউ যদি একবার তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতো কী মজাই না হতো।

তার মা যদি বেঁচে থাকতো? মা যদি কয়লাকাকার সঙ্গে, গোল না পাকাতো, মার কাছে চলে যেতে পারতো।

অন্ন রাত্রে স্বপ্ন দেখছে — একজন মহিলা এসেছেন। বলছেন চল অন্ন! আমার বাড়ী কলকাতায়। তোকে নিয়ে যাই। আমি তোর পিসী। এখানে তোকে বড় কষ্ট দেয় এরা। আমার কাছে কতো আনন্দে থাকবি।

স্বপ্ন স্বপ্নই। কল্পনা কল্পনাই। কখনও সত্যি হয় না কী?

অন্নর পৈত্রিক বাড়ীটা যে কয়লা কাকা কিনে নিয়েছে — অর্থাৎ বাঁধা দেওয়ার জন্য, তারই হয়ে গেছে।

না হলে, সেখানে গিয়েও থাকতে পারতো। অন্নর দেওর গিয়েছিল-বাড়ী দখলের জন্যে, কিন্তু দখল পায় নি। কয়লাচরণ ভাগিয়ে দিয়েছে। বাঁধা দেওয়ার কাগজপত্র দেখিয়েছে। তামাদি হয়ে গেছে। কথা ছিল - তিন বছরের মধ্যে শোধ না হলে বাড়ী-ঘর, জমী সবই কয়লাচরণের হয়ে যাবে। তাই হয়ে গেছে। অন্নর দেওর নিজে কাগজ দেখে এসেছে।

শাশুড়ীর বাপের বাড়ী থেকে আসে -- শাশুড়ীর তিন ভাইয়ের পরিবারের সকলে। এক-একজন মামা-শ্বশুরের এক ডজন করে ছেলে-মেয়ে তারা এলে অন্নর খুব ধকল যায়। ঘর-দোর কম এ বাড়ীতে। ওরা এলে, বাইরের দাওয়ায় শুয়ে থাকতে হয়। রাবণের গোষ্ঠীর রান্না করতে হয়। পরিবেশন করে চারবেলা খাওয়াতে হয়। শাশুড়ী খুব ভালবাসে বাপের বাড়ীর গোষ্ঠীকে।

রাত্রে শোবার সময় -- কোমর, হাত-পা টন টন করে। যন্ত্রণায় অন্ন ঘুমোতে পারে না। মাথা ঘোরে সব সময়। তবুও খেটে যেতে হয়।

একদিন অন্নর স্বপ্ন - কল্পনা সার্থক হল।

কলকাতা থেকে এলো অন্নর মায়ের মাসী। লাল চওড়া কস্তাপেড়ে গরদের শাড়ী পরা' মোটা-মোটা দপদপে চেহারার এক গিন্নি। সমস্ত সিঁথিটায় লাল টকটকে সিঁদুর জ্বল-জ্বল করছে: গা ভর্তি সোনার গয়না। কপালে বড় গোল সিঁদুরের টিপ। পায়ে আলতা। মাথার চুল সাদা - কালোয় মেশানো। একমুখ পান। ঠোঁট দুটি লাল টকটক করছে। এয়োতির চিহ্ন সর্বাঙ্গে।

তার সঙ্গে একজন চাকর এসেছে। ষ্টেশন থেকে গরুর গাড়ীতে করে এসেছে। সঙ্গে কতো জিনিষ। সবই অন্নর শাশুড়ীর জন্যে এনেছে।

বেলা চারটে নাগাদ তারা এসে পৌঁছলো। অন্নর শাশুড়ী ঘরে শুয়েছিল অন্ন তার পা টিপে দিচ্ছিল। এমন সময় গরুর গাড়ী এসে থামল।

অন্নর শাশুড়ী খুব খুশী হল। প্রচুর জিনিষ এনেছে অন্নর মায়ের মাসী --অর্থাৎ সম্পর্কে অন্নর দিদিমা। গোলাপ-বালা সাহা। অন্নর গোলাপ দিদিমা। মিষ্টি করে কথা বলছে অন্নর শাশুড়ীর সঙ্গে।

অন্ন আগে কখনও দেখেছে কি-না, মনে পড়ছে না। তবে, গোলাপ দিদিমার খুব মনে আছে। অন্নর ছেলেবেলাকার কতো কথাই না বলছে সে। অন্নর বিয়েতে ঐ যে জরি পাড় বেগুনে রংয়ের ঢাকাই শাড়ী, আর লাল রংয়ের কল্কাভাঙার শাড়ী, ঐ দিদিমাই না কী যৌতুক দিয়েছিল। আর সোনার বোতাম,--সেটাও নাতজামাইকে যৌতুক দিয়েছিল গোলাপবালা।

এতোদিন খোঁজ খবর নিতে পারে নি নাতনীর, নাতনীর শাশুড়ীর, সেজন্যও কম আক্ষেপও করছে না দিদিমা। দাদুর খুব অসুখ, তাই নাতনীকে দেখতে চেয়েছে।

অন্নর শাশুড়ীকে খুব ভালো খোলের একজোড়া থানধুতি দিয়েছে দিদিমা। অন্নকে দু'খানা কালাপাড় শাড়ী দিয়েছে। অন্নর দেওরকে একজোড়া ভালো জরিপাড় ধুতি দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, কলকাতার সেরা মিষ্টি, ক্ষীর, রকমারি গ্রামের দুষ্প্রাপ্য ফলও এনেছে। আর এনেছে ফুল-পাতা আঁকা বিছানায় পাতবার চাদর, অন্নর শাশুড়ীর জন্যে পাথরের রেকাব, পাথরের বাটী, পাথরের গেলাস।

বহুদিন পরে অন্নর শাশুড়ী অন্নর প্রতি একটু প্রীতা হল। কী সুন্দর কথা বলে গোলাপ দিদিমা। মুগ্ধ হয় অন্ন।

অন্নকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করছে ---আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি? তোর দাদু, তোর মামারা, তোর মামীরা খুব স্নেহ-যত্ন করবে তোকে। খবর পেলুম তোকে এরা বড় কষ্ট দেয়, তাই নিতে এলুম। তোর দাদুও বলেছে নিয়ে যেতে। অন্ন তো খুব খুশী। তক্ষুণি রাজী হয়ে গেল দিদিমার সঙ্গে যেতে।

গোলাপ দিদিমা অন্নর শাশুড়ীকে বশ করে ফেলেছে।

দিদিমা বলছে অন্নর শাশুড়ীকে --দিন সাতেক পরে অন্নকে আবার দিয়ে যাবো। ক'দিন পরেই তো। সামনে শীতের তত্ত্ব। তত্ত্ব করবো ভাবছি।

দিদিমা অন্নর শাশুড়ীর মন বুঝে ফেলেছে। তাই খুব মন রাখার কথা বলছে। দিদিমার খুব বুদ্ধি। মনে মনে তারিফ করলো অন্ন।

শাশুড়ী সানন্দে অনুমতি দিয়েছে অন্নকে নিয়ে যাবার। গোলাপ দিদিমা বললে -- পুজোর সময় আমাদের কলকাতার বাড়ীতে তোমাদেরও যেতে হবে মা। অন্নর শাশুড়ী তো বিগলিত। মন্দ হয় না, কলকাতায় বেড়িয়ে এলে।

অন্নকে সাতদিনের জন্যে নিয়ে যাবে। খালি হাতে ফেরৎ পাঠাবে না নিশ্চয়ই। অন্নর শাশুড়ী অনুমান করছে। খুব বড়লোক বোধ হয়।

অন্নর মনে হল--সে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছে। কী আনন্দ! এতো আনন্দ আর একবারমাত্র হয়েছিল। বিয়ের জিনিষপত্র যৌতুক দেখে।

দু'দিন পরে ট্রেনগাড়ীতে চড়লো অন্ন। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সে যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে। বহুদিনের পোষা বন্দী পাখী, খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়েছে। যার সঙ্গে সে যাচ্ছে তার ওপর অন্নর অটল বিশ্বাস।

কলকাতা শহর। আজব শহর। অন্নর অনেকদিনের দেখা সেই স্বপ্নের শহর। ষ্টেশনে নামলো ওরা। ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলো ওরা।

কলকাতায় গোলাপ দিদিমার বাড়ী। মস্ত বড় বাড়ী। এ তাদের গ্রামের বাড়ী নয়। এ যেন প্রাসাদ। বাড়ীর সামনে মস্তবড় দরজা। মস্তবড় চারচৌকো উঠোন। উঠোনের কোনে চারচৌকো দালান। দালানের কোনে সার-সার বড়-বড় ঘর। দোতলা বাড়ী। বাড়ীতে অনেক লোক। সবাই মেয়ে। কম বয়সী মেয়ে। সকলকেই মোটামুটি দেখতে ভালো। তাদের গায়ে জামা,

এক গা গয়না, একমুখ পান। রংচং-এ কলকাতার সুন্দর-সুন্দর শাড়ী তাদের পরণে। কথায়-কথায় হেসে তারা গড়িয়ে পড়ে, ঢং করে কথা বলে। এই মেয়েদের সঙ্গে অন্নদের গ্রামের মেয়েদের একটুও মিল নেই। মেয়েগুলো যেন বড় বেহায়া। আর সাজগোজই কী রকম?

এখানে এসে অন্নর যেন কেমন-কেমন মনে হয়। গোলাপ দিদিমা তাকে এ বাড়ীতে রেখে কোথায় গেলো? দাদুকেও দেখতে পাচ্ছে না সে। দাদু অর্থাৎ গোলাপবালার স্বামী। গোলাপবালা তার কথা তো অনেকবারই বলেছে। অথচ দাদুর দেখা নেই। শুধু একপাল চপী মেয়ে। মামারাই বা কোথায়?

অন্নর মনে হচ্ছে--এ বাড়ীর গৃহকর্ত্রী টগরবালা। কী রকম যেন-মহিলা।

সমস্ত রাত একটা খুপরি মতো ঘরে শুয়ে রইলো অন্ন। প্রথম রাতটা। কতকগুলো লোক টলতে টলতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। তাড়ি না কী খেয়েছে--লোকগুলো? দোতলা থেকে গান-বাজনার জোর আওয়াজ আসছে। কারা গান গাইছে? ঐ মেয়েগুলো না কী? এরা কী সারারাত ঘুমোয় না? এখানকার কাণ্ড-কারখানাই আলাদা। বিষণ্ণ হল অন্ন।

পরের দিনও গোলাপদিদিমা এলো না। অন্ন চিন্তিত হল। উৎকণ্ঠিত হয়ে টগরবালাকে প্রশ্ন করলো অন্ন ---গোলাপদিদিমা কোথায়? আমাকে রেখে কোথায় গেলো? আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে।

পালিয়েছে সে। খরখর করে বললো টগর। আর তুমি তো এখানেই থাকবে গো মেয়ে।

পালিয়েছে? পালাতে যাবে কেন দিদিমা? খুব আশ্চর্য হল অন্ন। কী আজে-বাজে বকছে এই গিন্নিটা। যেন একটা পেটমোটা বোতল।

গোলাপ পালাবে না? খনখনে গলায় বললো টগরবালা। তুমি যদি তাকে কিছু বলো। দশ কুড়ি টাকায় কিনেছি যে আমি তার কাছ থেকে তোমাকে। তার ওপর কতো খরচ করেছি। ট্রেনভাড়া, তোমাদের জিনিষ-পত্র কেনার একগাদা খরচ। গোলাপ বল্লে, না দিলে তোমার শাশুড়ীর মন গলবে না। তা, তুমি 'মাল' বেশ ভালোই। খরচ না হয় একটু বেশীই হল। তুলে নোব সব টাকাটাই। অবশ্য, সময় লাগবে। তোমাকে তৈরী করতে সময় যাবে।

শুনেই অন্নর হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কোথায় এনে যে তাকে তোলা হয়েছে--সব বুঝতে পারলো। অন্নর বোঝার মতো বয়স হয়েছে।

উঃ। দিদিমা না ছাই। মেয়েমানুষ হয়েও তার এই সর্বনাশ করলো?

কেন যে সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা লোকের সঙ্গে সে ট্রেনে উঠে পড়লো? কী বোকামীই না সে করেছে।

---ভয় নেই তোর। এতোগুলো মেয়ে যে এখানে আছে, তারা কী সব মরে গেছে? কতো মেয়েকে তোর দিদিমাই তো এনেছে এখানে। সবাই তো ভালোই আছে। রাণীর মতো আছে তারা। তুইও সেরকম থাকবি।

এসব কী কথা? অন্নর মনে হল এক্ষুণি সে পড়ে যাবে মাটিতে মাথা ঘুরে। না। সে পড়ে গেলো না। শরীরটা তার খুব শক্ত।

---একটু ধরন-ধারণ তোকে শিখতে হবে। বোকা-সোকা হয়ে থাকলে তোরই খারাপ হবে। পুরুষ-গুলোকে ভেড়া বানিয়ে রাখবার খুব চেষ্টা করবি। যে তোর ঘরে তোর সঙ্গে একবার শোবে, সে যেন আর ফিরে না যায়। রোজই তাকে নাকে দড়ি দিয়ে, টেনে আনবি। আর যখন আমি বলবো--অমুক লোককে লাথি মেরে তাড়িয়ে দে---তখনই কিন্তু তাড়িয়ে দিবি। না দিলে--তোরই রোজগার হবে না। টগর বকে চলেছে।

টগরের মুখ থেকে আরো কতকগুলো অশ্লীল কথা বেরোলো।

অন্নর মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। শুধু একটা অজানা ভয়াবহ আশঙ্কায় কাঁপতে লাগলো। টগরকে তার শাশুড়ীর চেয়েও ভয়ানক মনে হল।

রূপোগাছির এ বাড়ীতে থাকে সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমুখী, রতনকুমারী, মালতী, চম্পা, কদম, শিউলী, শেফালীবালা, কমলরাণী, পদ্মমুখী, ননীবালা, শিবরাণী সুরবালা, কাজললতা, মনোমোহিনী, নলিনী, চামেলী, পারুলবালা, বকুল আরো কতো মেয়ে। এদের নিয়ে ব্যবসা করে টগরবালা। এদের মধ্যে কেউ অর্থের অভাবে এসেছে, কেউ স্বেচ্ছায়, আবার কাউকে ধরে আনা হয়েছে।

কলকাতা শহরের বুকে তিনখানা বাড়ী করে ফেলেছে---এদের খাটিয়ে। টগরের অনেক আয় যে।

অনেক মেয়েরা বলে--টগরবালার 'পাপাশ্রম'। এ বাড়ীটার গায়ে, কিন্তু লেখা আছে --'কুসুমকুঞ্জ'। কুসুমবালা মরে গেছে অনেকদিন আগে। তারই নামে বাড়ী। কুসুমবালা, এই রূপোগাছি অঞ্চলের বিখ্যাত বারবণিতা ছিল। তারই মেয়ে টগরবালা। তার বয়স হয়ে গেছে। তার ঘরে কেউ আসে না।

শুধু, একটা বুড়ো মতো লোক ---হরিদাস তার নাম, মাঝে-মাঝে আসে। অনেকে বলে--ও হল টগরবালার পাপাশ্রমের দালাল। আরো অনেক দালাল আছে টগরের।

টগরকে মনে হল সাক্ষাৎ যমদূতী। অনেক চিন্তা করে দেখলো অন্ন, পাপাত্মার হাত থেকে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। তবুও শেষ চেষ্টা করলো -- আমাকে ছেড়ে দাও মাসী। আমার অনেক গয়না আছে ---তোমাকে দোব। বাড়ী, জমি সব দোব, আমার যা ভাগে পাবো।

খুব রেগে উঠলো টগর। আমাকে ও লোভ দেখাস নে। আর তুই যদি ভাবিস পালাবি--তোকে ধরে নেবে না। তুই 'পতিত' এখানে এসেই হয়েছিস। তোর নিজের মার কথা মনে নেই? আমি সব শুনেছি গোলাপের কাছে।

উঃ কী নিদারুণ কথা। এবার কেঁদে ফেললো—অন্ন।

'কুসুমকুঞ্জে' ফুলের নামে মেয়েদের নাম অনেকের। এককালে ফুলের মতোই পবিত্র ছিল তারা। তারপর? এখন সকলেই অপবিত্র হয়ে গেছে।

টগরবালা মেয়েদের প্রতিপালন করে। অন্ন-বস্ত্র, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব কিছুই এদের দেয়। পরিবর্তে তারা কী দেয়? সবকিছুই দেয়। কী দেয় তার বিশ্লেষণ না করলেও চলবে। সকলেই তা জানেন।

মনে দুঃখ হলেও, তারা হাসে। শরীর খারাপ হলে, মন খারাপ হলেও নিষ্কৃতি নেই। যাকে চাইছে না, দেখাতে হয় কতো চাইছে তাকে।

দেহে রোগ হলে পরিচর্যার্থে কেউ নেই ওদের।

আজ সোহরাব সাহেব আসবে অন্নর ঘরে। অন্নকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বড়লোকের সমাগম হবে আজ রাত্রে।

অন্ন গিল্টী আর ঝুটো গয়না পরেছে। লাল টকটকে শাড়ী দিয়েছে তাকে টগর। আরো কতো রকমের উপকরণ তার দেহে।

উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণীর দেহে রূপলাবণ্য ধরছে না। সে কি প্রণয়-ভাজন মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে? ভাবছে টগর। প্রথম রাত তো? চিন্তা হচ্ছে খুব।

টগরের মনে ব্যবসার চিন্তা। অন্নর মনের অবস্থা যেন কী একরকম। বলে বোঝানো মুস্কিল। কিছুটা ভয়, কিছুটা অজানা আশঙ্কা মেশানো একটা অবস্থা মনের।

প্রথম রাত্রের অভিজ্ঞতা এখনো ভোলে নি সে।

অনেক রাত্রে শয্যায় আশ্রয় নিলো ওরা দু'জন। বিবিধ বিলাসের সামগ্রীতে সাজানো বড় ঘরখানি। সোহরাব সাহেব পরিতৃপ্ত হল। অনেক টাকা পেল টগর।

সবচেয়ে ভালো ঘর বাড়ীর মধ্যে। রতনকুমারী থাকতো এ ঘরে। অন্ন আসাতে তার রূপ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। রতন নেমে এলো নীচের ছোট ঘরে —সাধারণ ঘরে। আর সেই ঘরখানিতে স্থান হল অন্নপূর্ণার।

তার, শুরু হল বিচিত্র জীবন। অনিয়ম, অসংযম হল তার ধর্ম। সতী-সাধ্বী নারীর ঘর ভাঙায়, তার উপার্জন। অনেকবার তার মনে হতে লাগলো —স্বপ্নের ঘোরে দেখতে লাগলো সোহরাবের স্ত্রী — রামচরণের স্ত্রী, মনোহর দাসের স্ত্রী সকলেই একযোগে আঙুল তুলে তার দিকে দেখাচ্ছে আর বলছে — ওকে চাবুক মারো। ও আমাদের ঘর ভেঙেছে। ও ভ্রষ্টা, ও অসতী — ওকে মারো। ও আমাদের স্বামীদের কেড়ে নিয়েছে, ওকে নরকে ঠেলে ফেলে দাও।

আর এক রাত্রের অনাচার—অসংযমের পর ভোর বেলায় অন্ন ঘুমিয়ে পড়লো। ঠিক ঘুমোল না। মনে হল সে যেন জেগে আছে। সে দেখতে পাচ্ছে, যেন তার শাশুড়ী এসে বলছে — নষ্ট মেয়েমানুষ। আমার কুল ডুবিয়েছ? তোমার নরকেও স্থান হবে না। তুমি না খেতে পেয়ে মরবে। রাস্তায় পড়ে মরবে। শাশুড়ীকে ভয়ঙ্করী মনে হল।

তারপর একদিন নরকের স্বপ্ন দেখলো সে। দেখলো একটা মস্তবড় জায়গা। সাপ আর কেঁচো, রকমারি কীট-পতঙ্গে জায়গাটা ভর্তি। তার ওপর দিয়ে যমদূতেরা অন্নকে টেনে-হিঁচড়ে

বি. ই. কলেজ পুনর্মিলন উৎসবে বি. ই. কলেজের ছাত্রীদের নির্মিত মণ্ডপ বিরাট সংখ্যক দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। চিত্র : ব্যোমকেশ মাইতি

দিয়ে চলেছে। অন্ন যেন চলতে পারছে না, তবুও চলতে হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। বেত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর দেখতে সব মানুষগুলো। তারাচরণের স্ত্রী, বৃন্দাবন দত্তর স্ত্রী, বলছে--মারো---ওকে মারো। আগুনের মধ্যে ফেলে দাও। আমাদের স্বামীদের ওই নষ্ট করেছে। যমদূতেরা তাকে আগুনের মধ্যে জোর করে ফেলে দিল। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলো অন্ন। ভয়ে কাঁপছে সে। গুঙিয়ে চললো দিন -- যেমন করে চবে।

ক্রমশঃ ভয়টা কমে গেলো অন্নর। সবকিছু যেন সয়ে গেলো। টগর নিশ্চিন্ত হল। মনের রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেলো অন্ন।

পুরুষের চোখগুলোকে পাগল করলো সে। সে নিশ্চয় জানতো পুরুষকুল তার রূপরাশিতে বিক্রীত। যে তার কাছে আসে, তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। বেশ লাগে অন্নর।

এও এক ধরনের নেশা। পুরুষ যদি দেখে এসে তার বশীভূত হয়---এতে দোষ কী? একে পাপ বলে না। ওদের স্ত্রীদের ধরে রাখবার ক্ষমতা নেই, তাই আসে।

অন্নর ধারণা ক্রমশঃ পাল্টে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

★ সমাধান ★

সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিবারের সকাল, সদ্য ঘুম ভেঙে প্রশান্ত চ্যাটার্জী এসে বসেছে লনে। পরনে হাউস কোট, বাঁ হাতে ইংরাজী সংবাদপত্র, সামনে টেবিলে চায়ের কাপ।

'আজ ফির আয়ী। নিকালো ইঁহাসে'---রাম সিং-এর হুমকি শুনে প্রশান্তর দৃষ্টি যায় ফটকের বাইরে, ছিন্ন, ময়লা থান পরিহিতা এক বুড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।

'রাম সিং আনে দো।'

সাহেবের হুকুমে ভৃত্য থতমত খেয়ে ফটক খুলে দেয়। না, বুড়ি একা নয়, আড়ালে এক যুবতী।

'এসো বুড়ি-মা, ভেতরে এসো'---গৃহকর্তার ডাকে পায়ে পায়ে দুজনে সামনে এসে দাঁড়ায়। বুড়ির পরনে শতছিন্ন ময়লা থান, এলো গা, খালি পা দু'টো ধুলো মাখা।

'এটি বুঝি তোমার মেয়ে?'

প্রশান্তর প্রশ্নে বুড়ি মেয়েটিকে কাছে টানে, 'মেয়ে নয়গো বাবু। ছেলের বৌ, ছেলে গিয়ে থেকে আমাদের শাশুড়ী-বৌয়ের এ অবস্থা।'

প্রশান্ত সোজাসুজিই মেয়েটিকে দেখে। হ্যাঁ, সুন্দরী বটে। গরীব ঘরে এতো রূপ! দারিদ্র্য এর রং, চেহারা নষ্ট করতে পারেনি। সরু কালো পাড় আধময়লা শাড়ীতে মাথার সামান্য ঘোমটা দেওয়া। কপালের শেষ প্রান্তে শুভ্র সিঁথি রেখা। দৃষ্টি মাটিতে, আশ্চর্য বুড়ির পা ধুলোয় মাখা, খালি পায়ে থাকলেও মেয়েটির ফর্সা পায়ে ধুলো লাগেনি।

'তা তোমার ছেলের কী হয়েছিল?'

'আজ ছ' মাস হ'ল বাবু, আমার ছেলে গেছে ঐ জি টি রোডের ওপরে লরীর তলায়। এ ধানবাদেই কয়লা বোঝাই লরী চালাত আমার ছেলে। ছেলে-বৌ নিয়ে বেশ সুখেই ছিলুম বাবু, তা ভগবানের সহ্য হ'ল নি।'

পুত্রবধূকে জড়িয়ে বুড়ি হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। মেয়েটির দৃষ্টি মাটিতেই। একটু অপ্রস্তুত হয় প্রশান্ত।

'ঘর কোথায় তোমার?

'ঘর আমাদের বাজারের কাছেই, তবে আর কি হোথা থাকতে পারব বাবু। সামান্য পয়সা যা ছিল, সবই ফুরুল। পেটই চলে না বাবু। মাসে এক কুড়ি টাকা ঘর ভাড়া দিই কী ক'রে?'

'কিন্তু এভাবে সাহায্য চেয়েই বা তোমাদের ক'দিন চলবে বুড়ি মা? সকলেরই তো নিজের সংসার আছে। তুমি বরং কোথাও কাজে লেগে যাও। নিজে না পার ছেলের বৌকে। যদি বল আমি না হয় দেখতে পারি। কোল-মাইন-এ তো মাঝে মাঝে মেয়ে লোক চায়।'

'বাঙালী ঘরের খামুন বাবু আমরা, বৌকে তো দেখছ কাঁচা বয়স। বাইরে ছাড়তে ভয় হয়। ওকেই জিজ্ঞেস কর না।'---বলে নিজেই জিজ্ঞাসা করে---'কিরে ছুঁড়ি কয়লা আপিসে কাজ করবি?'

আধ ময়লা কাপড়ে ঢাকা ফর্সা মুখ একবার ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে যায়। 'এ আগুনের টুকরোকে ঘরে রেখে আমি কাজ নিতে পারি না। ওকেও কেউ কাজ দেয় না। আর কাজ যারা দিতে চায় বাবু দোষ নিওনি। ওরা পশু।'

প্রশান্ত ভাবে কিছু বলবে মেয়েটিকে, পারে না, বুড়িকেই বলে, 'আচ্ছা বুড়ি-মা, ওর আবার বিয়ে দাও না কেন? সুন্দরী, বিয়ে দিলেই বোধহয় সব দিকে সুরাহা হয়। তোমাকেও আর পাহারা দিতে হয় না। নিশ্চিন্তে কাজে যেতে পার' বলেই ভাবে। 'এটা কি বলা উচিত হ'ল? শত হলেও---'

'হিঁদু মেয়ের কি দুবার বিয়ে হয়।' যুবতীর কথায় প্রশান্ত চমকে ওঠে। অপ্রস্তুত হয় খুব। কিন্তু কী মিষ্টি কণ্ঠস্বর। ভগবান যাকে দেন সব দিকেই কি ভরিয়ে দেন? কিন্তু এতো যার রূপ সে এভাবে অর্থ কষ্ট পাচ্ছে কেন? নাঃ, ভগবান বোধ হয় নেই।

মেয়েটি পূর্ণদৃষ্টি মেলে চেয়েছিল প্রশান্তর দিকে। কী শান্ত দৃষ্টি। প্রশান্ত বুড়ির হাতে কুড়িটা টাকা দেয়---'এটা ধর বুড়িমা। এ মাসের বাড়ী ভাড়াটা দিয়ে এসে তোমরা শাশুড়ী-বৌয়ে আমার এখানেই থাক। কি আপত্তি

আছে? না, সংকোচ কর না। এমনি থাকতে দিচ্ছি না। আমার রান্না-বান্না ঘর গেরস্থালীর কাজে মেয়ে লোক চাইছিলাম। আমিও বামুন। তোমরা যদি থাক, কত দিতে হবে জানাও—'

'বাবু আপনি—মানে—'

'এখন তবে টাকা কড়িতেই থাক। সাথে কাপড় জামা নিশ্চয়ই পাবে। ভালমন্দ রেঁধে খাওয়ালে পরে না হয় বাড়িয়ে দেব—কী হ'ল? আরে আরে কর কি বুড়ি মা। তুমি আমার বড়' পায়ে হাত ছোঁয়াতে এসে প্রশান্ত বড়িকে বাধা দেয়। 'কিরে ছুঁড়ি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়। বাবুকে পেন্নাম কর'। আধময়লা কালো হাতের পরে ফর্সা নিটোল হাতর ছোঁয়া প্রশান্তর পায়ে ঠেকলে সস্নেহে পিঠে সামান্য চাপ দেয় 'তোমরা তবে কাল সকাল থেকেই কাজে লেগে যাও।'

৬

না, পরদিন আসেনি। তারপর দিনও না। বলেছিল মার্কেটের কাছে থাকে, ড্রাইভারকে নিয়ে প্রশান্ত বেরিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, খুঁজে বের করেছে ঘরটা কিন্তু ওরা নেই। শোনা গেল দুদিন আগে শাশুড়ী বৌয়ে বচসা হয়। সে রাত্রেই নাকি বৌটা গলায় দড়ি দিয়েছে। বুড়ি কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী আজ কাজে যায় নি। কেবল ভাবছে—শত দারিদ্র্যে অটুট থেকেও চাকরী পেয়ে মেয়েটি আত্মহত্যা করল কেন। ওকি প্রশান্তর মনের অভিলাষ বুঝতে পেরেছিল।

★ মৃত্যুমুখে সেই দিন ক'টির ডায়রি ★

(শেষাংশ)

ব্যবসা করতে বসেছেন ওঁরা, দানছত্র তো আর খুলে বসেন নি? এইরকম ভগবানের আশীর্বাদের মতন হঠাৎ-আসা সময়ে দু'পয়সা বেশি না কামিয়ে নিলে কামাবার সময় আর কখন? দরজা- জানলার পর্দা সব খুলে নেওয়া হয়েছে। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, মশারি—কোথাও কোন আবরণের বালাই নেই। যদি চাও তাহলে পয়সা দিয়ে নাও। সাধারণ সময় সবই দেওয়া হয়ে থাকে। ভাল হোটেল। নামী হোটেল। তাদেরও তো একটা নাম-ডাক, নিয়ম-কায়দা আছে? কিন্তু সে তো সবই সাধারণ সময়ের জন্যে। এমন অসাধারণ হঠাৎ-আসা সময়ের জন্যে তো নয়।

বারবার রেগে উঠছে অমু।। বারবার ওকে শান্ত করছি আমরা। বোঝাচ্ছি ওই উত্তেজিত তরুণদেরই মুখের কথা নিয়ে। মগের মুল্লুক নয়। স্বাধীন মুল্লুকে বাস করছি আমরা। অনেক অপেক্ষার পর বিনামূল্যে বিনা যুদ্ধে পাওয়া অহিংস স্বাধীনতা। (অবশ্যই অগ্নিযুগের সেইসব বীর সন্তানদের কথা বাদ দিয়ে 'মৃত্যুহীন প্রাণ' দিয়ে যাঁরা রচনা করে গেছেন নতুন ইতিহাস)।

আগুনজ্বলা ফ্রান্সে সাধারণ মানুষ একদিন 'গিলোটিনে' মহোৎসব করেছিল নীল রক্তের। প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল সেদিন বহু যুগ যুগ ধরে জমে-থাকা পাপ আর লোভের। সেদিন সেই যুগান্তরের পাপস্খলনের মহালগ্নে বুঝি মুক্তিস্নান করেছিল রক্তস্নান শুদ্ধ সাধারণ জীবন। কিন্তু এখনও কি সে মহালগ্ন আসেনি আমাদের? তবে আর কবে আসবে সদিন? আরও কত পরে? শত শত শিশু-মুখের খাদ্য, মানুষের ক্ষুধার অন্ন-লজ্জাবস্ত্র—যারা

শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্তী

রাতের অন্ধকারে আরও গভীর কোন রসাতলের অন্ধকারে পাঠিয়ে দিয়ে সমাজের বুকে ঘুরে বেড়ায় নিশ্চিন্ত আরামে, তাদের শেষ বিচারের দিন কি আসেনি এখনও?

নিশ্চয়ই আসেনি। মানুষের চরম দুর্ভাগ্য নিয়ে আজও তাই ব্যবসায়ী আরও একটু বেশী ব্যবসা করছেন। দাবার চালে মস্ত দান দিয়ে চলেছেন বাজিমাৎ করা মস্ত মস্ত রাজনীতিকের দল, আর সেই পাপের বিষ জমে জমেই নিশ্চয়ই আরও বীভৎস হয়ে উঠছে শত শত মানুষের পচে-ওঠা গলিত শব।

●

আজ দশই অক্টোবর। আমরা আবার বাক্স-বিছানা গোছালাম। মোটরের পথ কিছুটা চলবার মতন নাকি পরিষ্কার হয়েছে উড়ো খবর এল খবরটা সত্যি হতে পারে—নাও পারে। কিন্তু যেতে তো আমাদের হবেই। আর পথের বিপদে ভয় পেতে তো আমরা অনেকদিনই ভুলেছি। তবু অনিল খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল যদি সঙ্গে সঙ্গী হিসেবে আরও কতগুলো গাড়ি পাওয়া যায়। পথে পড়বে লাটাগুড়ি, জলদাপাড়ার জঙ্গল। বনের পশুকে তো ভয় আছেই, কিন্তু তার থেকেও বেশী ভয় যে মানুষকেই। ব্যবসায়ী নয়, রাজনৈতিক নেতা নয়, এরা আসবে সোজাসুজি চেহারাতেই। রাতের অন্ধকারে কোনরকম মুখোস না পরেই।

গাড়ি পাওয়া গেল। ওরাও খুঁজছে সঙ্গী। পাঁচটি গাড়ি যাবে গৌহাটি। সোজা পথ বন্ধ তাই কুচবিহার ঘুরে যেতে হবে তাদের। আমরা নিঃশ্বাস ফেললাম। কিছুটা স্বস্তির।

এবার খাবার আছে সঙ্গে প্রচুর। পথের বিপত্তি সত্ত্বেও তাই ভয় কম। আর একটু একটু এ্যাডভেঞ্চারেরও শিহরণ তাই লাগছে নতুন শীতলাগা একটু একটু মিষ্টি রোদের স্পর্শের মতন।

শহরের কোলাহল ছেড়ে অল্পক্ষণেই গাড়ি বেরিয়ে এল আবার প্রকৃতির বুকে। দু'পাশে জ্বান কচি

[illegible] আঁচলখানি। এখানে পিচ-ঢালা কালো পথ। নিঃশব্দে বসে আছি আমরা ক'টি প্রাণী। খানিকটা খুশী—খানিকটা এই অপরূপ রূপের মহিমায় বিভোর।

বেলা বসন্ত তখন একটা। পার হয়ে এসেছি আমরা অনেকখানি পথ। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে এবার। গাড়ি ছুটে চলেছে একইভাবে শব্দহীন গতিতে। মাথার ওপর জ্বলছে সূর্য। কচি ধানে ছড়ানো রদ্দুর। হঠাৎ রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন বাবা। চিরদিনের ধীর শান্ত মানুষ। সামনে দেখা যাচ্ছে তিস্তার বাঁধ। কিন্তু একি? একি রূপ? অনেক মৃত্যু আর ধ্বংস দেখে আসা আমাদের অভ্যস্ত চোখও বুঝি স্থির নিষ্পলক হয়ে যায় এক মুহূর্ত। বন্ধ হয়ে আসে শ্বাস-প্রশ্বাস। একেই কি বলে ধ্বংস? একেই কি বলে প্রলয়? এই প্রলয়-নাচনই কি নেচেছিলেন নটরাজ সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে উন্মত্ত গতিতে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে?

ভেঙ্গে পড়ে আছে তিস্তা সেতু। ১৯৩২ সালে অনেক বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার আর দেশ বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞদের প্রচুর চেষ্টা আর সাধনায় তৈরী তিন শ' ফুট লম্বা একটা সেতুর প্রকাণ্ড একটা অংশ নিতান্ত অবহেলায় ঝুলে পড়েছে জলের ওপর। তলায় বয়ে চলেছে ভয়ঙ্কর তিস্তা। বড় বড় গাছের গুঁড়ি পচে ওঠা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পশুপাখী আর উলঙ্গ মানুষের শব একাকার হয়ে ছড়িয়ে আছে ধূ ধূ করা খরস্রোতার বুকে। চোখ বন্ধ করলাম আমরা বীভৎস আতঙ্কে। আর দেখতে পারছি না। আর সহ্য করতে পারছি না যে আমরা। হে ঈশ্বর। গলা চিরে বেরিয়ে আসছে প্রাণ ফাটান আর্তনাদ। আর কত দেখব? আর কত মৃত্যুকে পার হয়ে আসব আমরা প্রাণ দিয়ে স্পর্শ ক'রে ক'রে?

অচঞ্চল হাতে শুধু ষ্টিয়ারিং ধরে আছে অনিল। গাড়ির মধ্যে ফোঁপাচ্ছে [illegible]

দিয়ে বার বার খাড়া হয়ে উঠছে শরীরের সমস্ত রোমকূপ। আমরা ছুটে চলেছি। সেবক রোড ধরে। ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ঘুমিয়ে আছে নদী তিস্তা। কে বলবে কদিন আগে এমন সর্বনাশা মরণ-ঘাতী রূপ নিয়ে নেচে উঠেছিল এই রাক্ষুসী মেয়ে? তির তির করে বয়ে চলেছে যেন চন্দন গোলা খানিকটা জলের ধারা। পায়ের পাতাটাও তাতে আর ভেজে না বুঝি। মাঝে মাঝে রোদে ছড়িয়ে থাকা রুপোলি বালির চড়া। কিন্তু খুশী হয়ে উঠছে কই মন-প্রাণ এমন মোহময়ী রূপ দেখেও? সর্বনাশীর কীর্তি যে ছড়িয়ে আছে এখনও দিকে দিকে। মাথার ওপর প্রকাণ্ড বাঁধ। সেদিন পর্যন্ত ছিল মানুষের এপার-ওপারের একটিমাত্র অবলম্বন আজ যেন কোন খেলাঘরের ঘর-বাড়ির মতন টুকরো টুকরো হয়ে বিছিয়ে আছে সেই রোদমাখা বালির চড়ায় চড়ায়। আর অনেকটাই ঢেকে গেছে স্তূপীকৃত হয়ে জমে যাওয়া পলিমাটির তলায়।

আবার নামতে হল গাড়ি থেকে। কাজ করছে সামরিক বাহিনী। আর এতদিনে মানুষের কাজের আর ইচ্ছাশক্তির ঐকান্তিক তৎপরতা দেখে আবার যেন নতুন করে বিশ্বাস ফিরে এল মানুষের পৃথিবীর ওপর।

কাজ চলেছে বাইশ ঘণ্টা ধরে। কিন্তু আমাদের এখানে কতক্ষণ যাত্রা স্থগিত রেখে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে? যতক্ষণ রাস্তা মেরামত না হয়, হয়ত ততক্ষণই। তারপর সামরিক বাহিনীর বেশ কতগুলো ভারী গাড়ি সে পথে আসা-যাওয়া করে পরীক্ষা শেষে চলবে সাধারণ গাড়ি। সে দু'ঘণ্টা হতে পারে আবার দু'দিনও হতে পারে। প্রকাণ্ড একটা আগুনের গোলার মতন ঠিক মাথার ওপর জ্বলছে সূর্য সবটুকু শক্তি ঢেলে। ধূ-ধূ প্রান্তর। কোথাও কোনখানে এতটুকু সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। চোখে জ্বালা ধরে যাচ্ছে সেই অসীম বিস্তার নিয়ে ছড়িয়ে থাকা জ্বলন্ত আগুনের দিকে একটা জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ড। কোস্কা পড়ে যাচ্ছে বুঝি শরীরটা ছোঁওয়ামাত্রই। "এখানেই থাকতে হতে পারে আমাদের গোটা একটা দিন বা দুটো দিন বা আরও কতগুলো দিন-রাত্তির। কিন্তু তাতে আর আমাদের ভয় নেই। এই কদিনেই জীবন থেকে অনেক পাঠ নিয়েছি আমরা। সব কিছু ঘটনার গতিকে আর প্রত্যাশিতকে মেনে নিতে শিখেছি নিঃশব্দে। ভয় ভুলেছি। কাছে-পিঠে কোথাও মানুষের বসতির কোন চিহ্ন নেই। কোন রেস্ট হাউস না। ডাকবাংলো নয়। অপেক্ষা করতে করতে দিন ফুরিয়ে রাত যদি ঘনিয়েই আসে, তাহলে এই গাড়ির মধ্যেই হয়ত বিছানা খুলে কম্বলগুলো শুধু গায়ে জড়িয়ে নেব আমরা। সঙ্গে এবার কিছু খাবার আছে তাই সান্ত্বনা।

কিন্তু সেই আগুনজ্বলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ওরা কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে। শক্ত শরীরগুলো ওঠা-নামা করছে শুধু পাথরের মত ঋজু ভঙ্গিতে। সুকঠিন নিয়মানুবর্তিতায় অভ্যস্ত শরীর—যে নিয়মের শক্ত বাঁধনে প্রতিদিন সূর্য ওঠে। তারা ফোটে আর সেই সূর্যকে স্থির পায়ে নিজের পথে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী।

বেলা দুটো, বেজে গেছে। সেই অক্লান্ত আগুনের নিচে এলিয়ে পড়েছে বাচ্চাগুলো। ক্ষিদেয় জ্বলছে সমস্ত শরীর, কিন্তু খাবার উপায় নেই। যে-কোন মুহূর্তে আমাদের চলতে হতে পারে। সামরিক তৎপরতায় এক মুহূর্তের নির্দেশে। তাই সময় নেই, শুধু কিছু কিছু ফল আর মিষ্টি খাওয়া গেল। পাশ দিয়ে সারি দিয়ে অবিশ্রান্ত চলেছে ওদের ভারি ভারি গাড়িগুলো। ভেঙ্গে পড়া সেতুটার পাশ দিয়ে নতুন একটা পথ তৈরী করল ওরা বড় বড় পাথরের টুকরো, বালি, সিমেণ্ট আর কাঠ দিয়ে। এবার পরীক্ষার পালা। ভীষণ প্রতীক্ষায় নিচে জেগে আছে মৃত্যু। পাহাড়ি নদী একটু আগে নেচে গেয়ে মরণ খেলা শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছে সবে। মনে

যদি আবার ঢল নামে পাহাড়ের বুক শত শত সিংহ গর্জনে, প্রলয় তাণ্ডবে ছুটে আসে আবার বাঁধভাঙা জলস্রোত, তাহলে রাক্ষুসী বুঝি আবার ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে সেই মুহূর্তে। সেই জাগায় ছুটবে মরণ, ছুটবে প্রলয় আর একটি একটি মুহূর্তে লয় হয়ে যাবে মানুষের তিল তিল সাধনার আর পরিশ্রমে গড়ে তোলা অরণ্য-পর্বত-নগর আর বন্দর।

অভ্যস্ত অচঞ্চলতায় ওরা চলেছে তারই ওপর দিয়ে। 'জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' করেছে ওরা, তাই বুঝি 'চিত্ত ভাবনাহীন'।

ছুটে এল ছেলেরা। ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। এই মুহূর্তে যাত্রা করতে হবে। যন্ত্রের থেকেও তাড়াতাড়ি ওরা কাজ করেছে। অবিশ্বাস্য গতিতে তাই তৈরী হয়ে গেছে একটা নতুন সেতু। হোক না তা সে যেমনই।

নিঃশব্দে ছুটে চলেছি এবার আমরা উর্ধ্বশ্বাসে। বিপদের পথ বুঝি এবার শেষ হল। খানিকটা নিশ্চিন্তে শ্বাস নিতে পারি বোধ হয় এবার তাহলে।

পশ্চিম আকাশে সূর্য চলে পড়েছে প্রায়। আমরা এগিয়ে চলেছি সমান গতিতে। বালিরাশি শেষ হয়ে গেছে। সূর্যকরোজ্জ্বল ধু ধু প্রান্তরও শেষ। এবার একটু একটু করে প্রকৃতি পরছে শ্যামল বেশ। সুরু হল চায়ের ক্ষেত। যতদূর চোখ চলে শুধু সীমাহীন সবুজের বিস্তার। নয়নাভিরাম। মনোমুগ্ধকর। সূর্যাস্তের শেষ বেলায় সেই আশ্চর্য শান্তশ্রীতে শুধু চোখ নয়---জুড়িয়ে যায় যেন সমস্ত প্রাণটাই। পাতা তোলা সুরু হয়েছে। কোন শিল্পী যেন অফুরন্ত নিপুণতায় মাঠের পর মাঠ জুড়ে ছোট ছোট গাছের সারিকে বেঁধেছেন এক অপরূপ নৃত্যছন্দে। একটি পাতার এতটুকু বেহিসেবী উচ্ছৃঙ্খলতাও যেন সহ্য হবে না কোনখানে। দুটি পাতা, একটি কুঁড়ি। গুণে গুণে তুলছে ওরা। দুলছে মৃদু ছন্দে সেই সোনার সুরে। আর মাথার সঙ্গে বাঁধা বেতের ঝুড়িগুলোও উঠছে, পড়ছে আর দুলছে সেই গতির ছন্দে।

আমরা ছুটে চলেছি একই গতিতে। বসে আছি নিঃশব্দে বাইরের দিকে চোখ ছড়িয়ে। সুরু হল জঙ্গল। শাল, সেগুন, কদম আর জংলী লতাগুল্ম মিলে তৈরী হয়েছে দুর্ভেদ্য গহন অরণ্য। আরণ্যক জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সংরক্ষিত এলাকা। ঠিক এই সময়---এই সূর্য ডোবা গোধূলিতে আসেন তাঁরা রাতের ভোজন পর্ব সমাধা করে ছোট ছোট ঝরণাগুলোতে জল খেতে। বাঘিনী আসেন কোলের সন্তানদিকে পাশে নিয়ে। আসে খরগোশ, হরিণ, গণ্ডার আর আসেন হাতীর দল। প্রায় সময়ই মোটামুটি গোটা একটি সমাজ নিয়ে। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, পোষ্য পরিবার, প্রতিবেশী সব আসেন এক সঙ্গে অনেক সময়ই স্নানে নামেন হস্তিনীকুল। ভীষণ কেলি---কৌতুকে মত্ত হয়ে শুঁড় তুলে জল ছিটিয়ে দেন একে অপরের গায়। ডেকে ডেকে স্নান করান দুরন্ত শিশুগুলিকে। আর সব চেয়ে বড় রসিকতা করে যখন প্রায়ই সামনে ছড়িয়ে থাকা পিচঢালা পথটির ওপর শুয়ে পড়েন পরম প্রশান্তিতে ক্লান্ত দেহগুলি এলিয়ে দিয়ে তখন সেই সুমহান বিশ্রাম মুহূর্তে দু'দিকে দাঁড়িয়ে যায় গাড়ির সারি। এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, কখনও কখনও তারও বেশী সময় চলে তাঁদের নিশ্চিন্ত

রবীন্দ্র সদন মঞ্চে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের শুভ লগ্নে রবীন্দ্র সদন আয়োজিত
[illegible] রবীন্দ্র প্রণাম জানাচ্ছেন কয়েকজন তরুণী

[illegible]। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসে গোধূলির লাল আলো। তবুও হয়ত ভাঙ্গে না তাঁদের সুখনিদ্রা। নিঃশব্দে কাটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই নিকষ কালো অন্ধকারে। কিন্তু আলো জ্বালাবার তো উপায় নেই কোনো গাড়ির। সেই মুখরতায় যদি হঠাৎ নষ্ট হয় তাঁদের এমন শান্তির আয়োজনটি, তাহলে হয়ত ভীষণ ভ্রূকুটি কুটিল মুখে এগিয়ে এসে একটু অঙ্গ স্পর্শে নিতান্ত অবলীলায় মুহূর্তে পৌঁছে দেবেন তাদের অন্তিমকালে। নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে হয় তাই। আর বিপদ বড় একটা আসে না তাতে। তারপর খুশী মনে বিশ্রাম সেরে এক সময় ওঠেন তাঁরা দলবলশুদ্ধু গোটা সমাজটি নিয়ে। নিশ্চিন্ত মন্থর গতিতে আস্তে আস্তে পা বাড়ান জঙ্গলের কোন শেষ প্রান্তের গৃহকোণটির দিকে। কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছে এ্যাকসিলারেটারে আবার পা দেন চালক। আর মস্ত বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে নড়ে চড়ে বসে এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্থির হয়ে থাকা মানুষগুলো।

আস্তে আস্তে কখন সূচীভেদ্য অন্ধকার নেমে এসেছে। নিঃশব্দে বসে অনিলের কাছে শুনছি আমরা এই গল্প। গাড়ির হেড লাইটে পথের জায়গাটুকু ছেড়ে দু'পাশের অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। ঝিঁঝি ডাকছে অবিশ্রাম। মাঝে মাঝে বিশ্রী কর্কশ স্বরে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে থাকা অন্ধকারকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠছে কোন একটা রাতজাগা পাখী। পেঁচা উড়ছে সশব্দে পাখা ঝাপটিয়ে।

ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত শির শির করে নামছে মেরুদণ্ড বেয়ে। পথের ওপর এমনি একটি হস্তী সমাজ ভয়ানক একটা রসিকতা করে বসে থাকেন না যেন আমাদেরও সামনে হে ভগবান। অতটা সহ্য হবে না এই বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পোড়-খাওয়া শরীরগুলোর ওপর। নতুন কোন অস্বাভাবিককে আর নেবে না অবসন্ন ক্লান্ত মন। আর আশ্চর্য সব নামের বহর এসব দিকের। কালাকাটা, নাগরাকাটা, মাথাভাঙ্গা —শুনলেও যেন শিরশির করে ওঠে শরীর।

কিন্তু না। সংবৎসর এমন রসিকতা করতে আসেন নি কোন ব্যাঘ্র ঘরণী। সেই মুহূর্তে হঠাৎ ভয়ানকরকম পিপাসা পেয়ে যায়নি কোন হস্তী-শিশুর। শুঁড় টেনে টেনে মাকে বিরক্ত করেনি 'জল খেতে চল' বলে। আমরা পার হলাম নিরুপদ্রবেই, কিন্তু রাত অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র। নিজের কাছ থেকে নিজের শরীরটাই বুঝি হারিয়ে গেছে সেই নিকষ কালো অন্ধকারে। চোখের সামনে দু'হাত মেলে ধরেছি আমরা বার বার। কিছু দেখা যায়নি। অনুভূতি হয়েছে শুধু একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টার। মাথার ওপর থেকে থেকেই বুকের মধ্যে চমক তুলে দেওয়া কর্কশ স্বরে ডাক দিয়ে পাখা ঝাপটিয়ে উঠছে এক-একটা কালপেঁচা। ক্লান্তিহীন ঝিঁঝির দল ডেকেই চলেছে একসুরে। অবিশ্রাম।

ঝাপ্প করে গাড়ি থামল। মাঝখানে রাস্তা ভেঙ্গে বিরাট এক খাদ তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে জমেছে বৃষ্টির জল একটা জলার মতন। চারপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র নুড়ি পাথর আর বোধ হয় গোটা একটা মানুষ ডুবে যাওয়া থকথকে কাদা। "সর্বনাশ। এখন উপায় ?" বলল অনিল। "পাশ কাটাও"। বললেন বাবা। পাশ কাটাবার যে জায়গাটুকু, সেদিকে চেয়ে আবার শিউরে উঠলাম সবাই। ডান দিকে জলভরা বিরাট গর্ত। বাঁ দিকে কাঁটা ঝাড় আর আগাছা ছড়ান নিচু খাদ। মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার মতন সরু পথ। তাও এবড়ো-খেবড়ো। চালাতে হবে একটা এ্যামবাসাডার। পরীক্ষা হচ্ছে নাকি অনিলের গাড়ি চালাবার কেরামতির ? নাকি আমাদের স্থৈর্যের ? সমান উৎকণ্ঠায় পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও ছ'খানা গাড়ি।

"তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।" প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম অনিলের ওপর সবাই মিলে, "শুধু শুধু অত জোরে চালিয়ে তখন পেছনে ফেলে এলে সব গাড়িগুলোকে, এখন একেবারে সামনে পড়ে- -।" একেবারে সামনে না পড়লেও এ পথেই যে পার হতে হবে সবাইকেই ঠাণ্ডা মাথায়, সে কথা ভাববার সাধ্য কোথায় তখন ? পাশ কাটাতে গিয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে যদি এখন কোনরকমে গাড়ি খারাপ হয়ে যায় বা টায়ার ফুটো ? চিন্তাতেও হিম প্রবাহ নামল আবার শিরদাঁড়া বেয়ে। কিন্তু তবু চালাতে তো হবে সে পথেই। গাড়ির গতি নামল দশ মাইলে। তার প্রতি মুহূর্তে কাঁপতে কাঁপতে প্রতি মুহূর্তে টলতে টলতে উঁচু পথটার পাশ দিয়ে চাকাগুলো প্রায় ঝুলিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠল এসে গাড়ি এপারে। কিন্তু আমাদের দুর্দশার কি শেষ হবে না ? অন্ধকার রাত্রের অমানিশার পর আছে আলোর আকাশ। মেঘের শেষে রোদ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের শেষ কোথায় ? কবে ? সত্যিই কি আমরা শেষ পর্যন্ত একদিন পাড়ি দেব এই দুর্যোগের শেষ প্রান্তে ? কে জানে ?

একটা বিপদোত্তরণ হল। কিন্তু শুরু হল একই রকম ভাঙ্গা খানা খন্দ আর এবড়োখেবড়ো কাদা আর পাথর ছড়ান পথের। বহু দিন আগে একটা ছবি দেখেছিলাম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পাল ছেঁড়া একটা জাহাজ। বহুদিন আগে দেখা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সে ছবি যেন আবার নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নিজেদেরই উপলব্ধিতে এখন শুধু উত্তাল তরঙ্গের বদলে উত্তাল পথ। আর এ পথের বুঝি শেষ নেই। শেষ নেই এই দুঃখের অমানিশার সীমাহীন উৎকণ্ঠা আর প্রতি মুহূর্তে শ্বাসরুদ্ধ করা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করার। আর বুঝি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না কিছুতেই। ক্লান্ত আমরা বিপর্যস্ত।

পথের দু'পাশে কাঁটা ঝোপ আমাদের গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ছে। বাচ্চাগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে কোলেই। দু'পাশের শাসিগুলো টেনে দিলাম। হয়ত

এক সময় শেষ হবে এ পথের, [illegible] না কিন্তু এখন তো নিশ্চিন্ত [illegible] চোখ বন্ধ করি খানিকক্ষণ [illegible]।

আস্তে আস্তে গায় হাত দিয়ে ডাকছে কে যেন। কে যেন বলছে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। ওঠ। জাগ। অন্ধকারের দ্বীপ থেকে আমরা এসেছি আলোর রাজ্যে। হে বিধাতা আমার হাত ধর। আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে চল—মৃত্যু থেকে অমৃতে। নিশ্ছিদ্র দুঃখের অনন্ত অমানিশা ছেড়ে নিয়ে চল। আলোর দেশে —জীবনের পথে।

'অসতো মা সদগময়:
তমসো মা জ্যোতির্গময়:
মৃত্যোর্মা অমৃতগময়:'

আমরা আলোর দেশে এসেছি। আমরা মরি নি। এইতো আমাদের চার পাশে নতুন ছন্দে সঞ্চারিত হচ্ছে জীবন পরম ব্যস্ততায় আসছে ঐ লোকটি। চলেছে বুঝি আর একটি মানুষ ঘরের দিকে। আমরা দেখেছি মানুষকে। মানুষের [illegible] জীবন [illegible]। মানুষ এত সুন্দর। এত সুন্দর এই পৃথিবী। সুন্দর জীবন। জীবনের পরম উপলব্ধিতে আমরা নতুন করে আবার চোখ মেলছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বড় কঠিনভাবে জীবনের পাঠ নিয়েছি আমরা। জেনেছি, জীবন বড় ছোট। বড় ক্ষণভঙ্গুর। তবে এত অল্প এই সময়টুকুতে কেন এত হিংসা এত দ্বন্দ্ব এত গ্লানি আর কলুষের কালিমা? কেন তবে বারবার পৃথিবীতে এত যুদ্ধের বিভীষিকা? কেন এত সুন্দর একটা মানুষকে একটা গলিত শব তৈরী করে ফেলবার এত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা?

কিন্তু আমরা তো এত কথা বেশী দিন ভাবব না। আমরাও ভুলে যাব। ভুলে যাব দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা পাহাড়ের ঐ চূড়াগুলোকে। ভুলে যাব কাঞ্চনজঙ্ঘার নিষ্কলুষ সাদা হাসিকে। আবার আমরা নীল হব মহাদেবের কণ্ঠে রাখা বিষ আকণ্ঠ পান করে। অমৃত থাকবে দেবতাদের জন্যে। মানুষের অঞ্জলিতে শুধু উঠবে দু'হাত ভরা গরল।

ঘড়িতে এখন রাত্রির মধ্যখান। অনেকখানি মাখন দিয়ে গরম ভাত খেয়ে আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছি। জানলা দিয়ে মিষ্টি এক টুকরো জ্যোৎস্নার আলো আসার মতন ঘরের মধ্যে হালকা নীল আলোটা যেন খুব অল্প করে ছায়া ফেলছে। আরও মৃদু নীল দেওয়ালটার গায়। পাতলা একটা গরম চাদর পায়ের ওপর টেনে নিয়ে এবার আমরা ঘুমিয়ে পড়ব। বহুদিন পর ঘুমব পরম নিশ্চিন্তে— বিশ্রামে— আরামে।

আমরা ঘরে ফিরে এসেছি আবার।

॥ সমাপ্ত ॥

★ প্রসাধন ও সৌন্দর্য ★

বিধাতার অনুপম সৃষ্টি নারী। তার সীমাহীন মাধুর্যে বিমণ্ডিত ললিত-লাবণ্যময়ী বরতনু চিত্তহারী করে তুলে ধরে প্রসাধনের মাধ্যমে। নারীদেহের সৌন্দর্য ও শ্রী বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রসাধনের সহায়তা অপরিহার্য। রমণীর রমণীয়-দেহের সুষমা ও দীপ্তি এই প্রসাধনের দ্বারাই অধিকতর বিকাশ লাভ করে, তার অতুলনীয় ও অনন্যতা সম্বন্ধে পুরুষ-চিত্তে এক গভীর ও ব্যাপক আবেদন জাগাতে সমর্থ হয়।

নারীর এই রূপচর্চা কোন আধুনিক চিন্তাধারা বা ধ্যান-ধারণার ফসল ভাবলে কিন্তু ভুল ভাবা হবে। শুধু একালের নারীদের মধ্যেই প্রসাধনের পূর্ণতা সীমাবদ্ধ নয়, সভ্যতার পুণ্য বোধন লগ্ন থেকেই নারীসমাজে এর প্রবণতা অঙ্কুরিত হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য অনুসরণ করলে এই ধারণার ভূরিভূরি সমর্থন মিলবে। সভ্যতার উন্মেষ লগ্ন থেকেই নারীর এই প্রসাধনপ্রিয়তা সর্বকালে সর্বদিকে-সর্বকোণে ব্যাপ্তি, পরিব্যাপ্তি ও প্রসার লাভ করে আসছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন প্রাচীন মিশরে সে সময়ের রমণীদের ভ্রূ ও পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যে সুচারুভাবে অলঙ্কৃত হোত, তা যথেষ্ট পরিমাণ শিল্প-বোধের স্বাক্ষর হিসাবে গণ্য করা যায়। পুরাকালের গ্রীস এবং রোমের সম্ভ্রান্ত ললনাদের কেশচর্চাও বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করার মত।

ভারতবর্ষও পিছিয়ে ছিল না। মহেঞ্জোদারো সভ্যতাকে এ দেশের প্রাচীনতর সভ্যতার নিদর্শনরূপ গণ্য করা হয়। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে যে সকল বস্তুর সন্ধান মিলেছে, তাদের মধ্যে মহিলাদের যে ড্রেসিং টেবিল পাওয়া গিয়াছে, তার বিন্যাস, কারুকার্য, [illegible]দের তুলনায় কোনমতেই নিরেশ বলা চলে না। তাই, এ দেশের নারী সমাজে তিন হাজার বছর পূর্বেও [illegible] শোভন প্রসাধনের প্রচলন ছিল। [illegible] দাঁতের চিরুনী, ব্রোঞ্জ দিয়ে মোড়া আয়না, ধাতু, মাটি ও পাথরের তৈরী প্রসাধন সামগ্রীর আধার সেকালের মহিলাদের ব্যবহারে আসত। হরাপপায় পাওয়া গেছে নানাপ্রকার প্রসাধন সামগ্রীর নিদর্শন। চানু-দারো থেকে জানা গেল যে, সেদিনকার নারীসমাজেও লিপস্টিকের প্রচলন ছিল। খুঁটিনাটি দ্রব্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রসাধন বা রূপচর্চা সম্বন্ধে তৎকালীন রমণী রত্নের দল কতখানি সজাগ, সচেতন এবং ফ্যাশান-সচেতন ছিলেন।

এখনকার মেয়েদের মত সেকালের মেয়েরাও কেশ, ভ্রূ এবং ওষ্ঠ সম্বন্ধে কিছু কম যত্ন নিতেন না। এজন্য নানা-প্রকার প্রসাধন তাঁরা ব্যবহার করতেন, বহু প্রসাধন দ্রব্য বাড়ীতেও তৈরী হতো। দুধ, মাখন, মধু আবার মাটি, তেল, ময়দা প্রভৃতি সহকারে নানাপ্রকার প্রসাধন দ্রব্য তৈরী হোত এবং সেকালের মহিলারা নানাবিধ দ্রব্যাদির সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের প্রসাধন দ্রব্যকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত থাকতেন।

—তথ্যবন্ধু

জগতের বৃহত্তম লটারীর ফল—আপনি!

ডঃ অসীম বর্ধন

চার লক্ষ কোটি বছর আগে থেকে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের প্রথম সময় হতে আজ পর্যন্ত যত প্রাণ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, আপনি যে-প্রাণটি ধারণ করে আছেন, সেটি হলো সেই অসংখ্য প্রাণ-সৃষ্টির একটি ১৯৭০'' সালের সংস্করণ-মাত্র।

আপনি এবং আপনার মতো প্রত্যেকেরই দু'জন করে মা-বাবা, চারজন পিতামহ-মাতামহ, আটজন প্রপিতামহ ইত্যাদি থাকবেই।

আপনি যদি খুব সহজভাবে অঙ্ক কষে দেখেন, তাহলে দেখবেন, আপনার আগের, খুব বেশি নয় ৩২টি বংশ আগে (প্রায় ১০০০ বছর অতীতে), আপনার পূর্বপুরুষদের নিয়ে এতো মানুষ হিসেবে দাঁড়াচ্ছে যে, একসঙ্গে অতো মানুষ কখনই পৃথিবীতে ছিল না।

একই সৃষ্টির ধারা থেকে আপনার জন্ম এবং এই ধারার প্রত্যেকের সঙ্গেই আপনার একটা পারম্পর্য সম্পর্ক রয়ে গেছে, অথচ আশ্চর্যের বিষয়, আপনাদের মধ্যে কোনো দু'জনকেই সম্পূর্ণ একরকমের বলা যায় না, একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নন আপনারা কেউই।

বংশগতির সূক্ষ্ম কলাকৌশলের মধ্যে দিয়ে প্রায় ৪০,০০০ কিংবা তারও বেশি সূক্ষ্মকণিকা, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'জীনস্'—বংশপরম্পরায় নানাভাবে মিশ্রণ-সংমিশ্রণ হতে হতে প্রত্যেকটি বংশ-পর্যায়ে এমনভাবে রূপ নিতে থাকে যে, মোটামুটিভাবে আপনার মতো একরকমের দুটি মানুষ সৃষ্টি হতে গেলে নারীদেহের মধ্যে একই ডিম ফুটে দুটি প্রাণ সৃষ্টি হওয়া দরকার।

এই জন্যেই আপনি তুলনাহীন। আপনাদের মধ্যে কোনো দু'টি মানুষই সবদিক দিয়ে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অবিকল এক নন এবং ঠিক আপনারই মতো অবিকল কেউ কখনো জন্মায় নি কিংবা জন্মাবেও না।

আপনার মধ্যে যে প্রাণের ধারাটুকু আপনি বহন করে চলেছেন, সে-প্রাণের উদ্ভব যদিও বহু লক্ষ কোটি বছর আগেই হয়েছে, তবু আপনার নিজের যে-প্রাণস্পন্দন, তার উদ্ভব হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তটিতে যখন একটি বিশেষ সর্বাঙ্গপুষ্ট প্রাণবীজ (স্পার্মাটোজুন), যেটি লম্বায় মাত্র এক ইঞ্চির ৫০০ ভাগের এক ভাগ, প্রাণ সৃষ্টির পথ বেয়ে ২০ মিনিটে ১ইঞ্চি গতিতে এগুতে থাকে প্রায় সাড়ে ২২ কোটি একইরকম প্রাণবীজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি পরিণত ডিম (ওভাম)-কে ধরবার জন্যে।

এই ২২ কোটি ৫০ লক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রাণবীজের উদ্ভব হয়েছে পুরুষের অণ্ডকোষের মধ্যে গুটিয়ে রাখা সওয়া এক মাইলের মতো সুদীর্ঘ নালিকাপুঞ্জের ভেতরে।

ডিম অর্থাৎ ওভামটি নেমে আসে নারীদেহের মধ্যে সঞ্চিত প্রায় ৩০,০০০টি কিংবা তারও বেশি ডিমের মধ্যে থেকে—যার মধ্যে একটি নারীর সারা জীবনে প্রায় ৪০০টি ডিম পরিণত হয়ে ওঠার কথা। একটি নারীর দেহে এতোগুলি ডিম থাকা সত্ত্বেও এবং এতগুলি ডিম সারা জীবনে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে থেকে মাত্র ৪০টির বেশি কখনই ফুটে উঠতে পারে না।

তাহলে, দেখুন, আপনার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৩০,০০০ ভাগের ১ভাগ মাত্র; কিংবা বড়জোর বলা যেতে পারে ৪০ ভাগের ১ভাগ। কিন্তু এই হিসেবটা তো কেবল ডিমের দিক থেকেই হলো। একটিমাত্র ডিমকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে যে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ প্রাণবীজ (স্পার্ম) ছুটে আসে, তার মধ্যে তো মাত্র একটি স্পার্মই কাজে লাগে এবং এতগুলি প্রাণবীজের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন ধরনের।

ডিম (ওভাম) এবং প্রাণবীজ (স্পার্ম)—এই দুটি দিক থকে আপনার সৃষ্টির সম্ভাবনা হিসাব করতে হলে ৪০ কে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ দিয়ে গুণ করা উচিত এবং তাহলে স্ট্যাটিসটিক্সের 'ল অভ প্রোব্যাবলিটি' অর্থাৎ সম্ভাবনার সূত্র অনুসারে বুঝতে পারবেন, আপনার মা-বাবা সন্তান-সৃষ্টির যে-ইচ্ছা করেছিলেন, তার মধ্যে আপনার নিজের জন্ম হওয়ার সম্ভাবনাটুকু কতো সুদূরপরাহতই না ছিল। প্রাণবীজ এবং ডিমের মিলন অন্য একটির সঙ্গে হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল এবং তাহলে জন্ম নিতে পারতো অন্য একটি মানুষ—আপনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই যদি বলি, আপনি এই যে আজ এখানে রয়েছেন, সেটা নিতান্ত আকস্মিক—নিতান্তই একটা অটোমেটিক লটারীর ফলে, তাহলে সেটা মেনে নিতে পারবেন তো?

এবার খুব সংক্ষেপে মোটামুটিভাবে দেখা যাক্, একটি প্রাণকণিকা (স্পার্ম) এবং একটি ডিম ঐভাবে লটারীর মাধ্যমে বাছাই হয়ে যাবার পর তা থেকে আপনার সৃষ্টি হওয়ার পথে আরও কি সব ব্যাপার ঘটতে থাকে।

জন্মের পূর্বে ঐ দুটি কোষ কেমনভাবে বদলাতে থাকে তা লক্ষ করলে দেখা যাবে, ছোট্ট ডিমটি যেটির ওজন ছিল মাত্র এক গ্রামের

He is looking for a job yet he reads a NEWSPAPER every day

REGIONAL EMPLOYMENT EXCHANGE

Which other medium fulfils so many needs and requirements of millions like him at so little cost?

The first place to look for a job is in the columns of a Newspaper. Even if he is saving on other purchases, his daily paper for him is a must.

Men and women of the 26-35 age group today form the largest body of newspaper readers in this country*. And 68% of men, 67% of women who are undermatriculates form the highest reading group*.

In their 'growth' years—with rising incomes, whilst raising families—young men and women are busy building a better life for themselves. The goods and services they read about in the Newspapers and Magazines form the substratum of that brighter future. They read their paper—situations vacant columns, cars and homes-for-sale ads—and they hope and plan.

There is a newspaper or magazine to reach every reader in his language at the lowest cost per thousand.

*(A.S.P. Readership Survey.)

Address through the Press —it costs far less

IENS

Inserted in the interest of providing information for better

THE INDIAN & EASTERN NEWSPAPER SOCIETY

everest/758a/I

২লক্ষ ভাগের এক ভাগ, সেটি জন্মের সময়ে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৬ থেকে ৮পাউণ্ড—অর্থাৎ ৮০ কোটি গুণেরও বেশি বেড়ে গেছে ওজনে।

মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত বা মানুষের তৈরী কোনো কিছুর মধ্যে আমরা জীবনে কখনো এমন রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিনি যে, একটি অণুপরমাণুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিম একটি শিশুর আকৃতি লাভ করে—আরও আশ্চর্য মনে হয়, যখন ভাবি আপনিই সেই শিশুটির মধ্যে ছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটিকে একটা ম্যাজিক বলেই মনে হতো—তবে প্রায়ই ঘটছে বলে তা আর মনে হয় না।

এক সময়ে মনে করা হতো, ডিমটাই বুঝি সবকিছু —যেন সেটা ঘড়ির কাঁটার মতো ঠিক সময়ে ফুটে উঠবে বলে একটি প্রাণবীজের অপেক্ষায় থাকে এবং লোকের ধারণা ছিল, ডিমটির মধ্যে জৈবিক শক্তির অনুপাতেই মানুষের দীর্ঘজীবন নির্ভর করে।

এরপরে আবার অনেকে মনে করতেন, তাঁরা প্রাণবীজ অর্থাৎ স্পার্মের মাথায় যেন মানুষের মূর্তি দেখতে পেতেন এবং তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ডিমটা হলো খাবার এবং পুষ্টির একটা ভাণ্ডারমাত্র, আর তারই মধ্যে প্রাণবীজটি ঢুকে পড়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

এ দুটি ধারণার কোনোটাই ঠিক নয়। যেমুহূর্তে একটি ডিমকে একটি প্রাণবীজ স্পর্শ করে, তখনি অন্য সমস্ত প্রাণবীজের স্পর্শ বাতিল হয়ে যায় এবং ডিমটি ঐ বিশেষ প্রাণবীজটির যা কিছু বৈশিষ্ট্য সব নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিতে আরম্ভ করে দেয়। ঠিক ঐ মুহূর্তটির অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে যায় প্রাণীটি পুরুষ না নারী হবে,—সেটা হয়ে যায় প্রাণবীজ ও ডিমের বৈশিষ্ট্যের সম্মেলনেই।

সমস্ত ব্যাপারটা লটারীর মতোই রহস্যময় এবং কার ভাগ্যে কী যে হবে, তা কেউ জানে না। সুপ্রজনন-বিদ্যা অর্থাৎ জেনেটিক্‌সের গবেষকরা জগতের এই বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ লটারীর রহস্য বুঝে ফেলবার খুব চেষ্টা করে চলেছেন।

অবিস্মরণীয় প্রত্যাবর্তন

আবর্তন-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসরণ, যে পৃথিবীর চিরন্তন ধর্ম, সেই পৃথিবীর রোমাঞ্চকর ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় প্রত্যাবর্তন। পরিপূর্ণ বিস্মৃতির অন্ধকার ভেদ করে বিরাট-বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সামরিক যোগাযোগ আবার জোড়া লাগিয়ে যে এক অনবদ্য পুনরাবির্ভাব। এই অভূতপূর্ব ঘটনার বিস্মরণীয় নায়ক হিসাবে এই একক বৈশিষ্ট্যে বিশ্বের ইতিহাসে দেশ-কাল-পাত্রের সীমারেখা অতিক্রম করে যে নাম অমরত্বের দ্যুতিতে সমুদ্ভাসিত, সে নাম আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক।

অংশ জুড়ে তখন তিনি একা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ তাঁর পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। সমগ্র অতীতটা মুছে ফেলে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়ালেন সেলকার্ক। যখন তাঁকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল, তখন তাঁর সঙ্গে

গোপাল মজুমদার

দেওয়া হয়েছিল তাঁর পরিধেয় বস্ত্রাদি, বিছানা, একটি ছোট কুঠার, একটি কেতলী, একখানি বাইবেল ও তাঁর অস্ত্রাদি এবং কিছু আগ্নেয়াস্ত্র। সেই মুহূর্তেই তাঁর অবশ জীবন যাত্রা সুরু।

সেণ্ট জর্জ নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন স্ট্রাডলিং-এর সঙ্গে মতদ্বৈধতা দেখা দিল সেলকার্কের জাহাজকে কেন্দ্র করেই। মনোমালিন্য হয়ে উঠল তীব্র থেকে তীব্রতর। এই মনোমালিন্য ক্রমশ এমন একটা পর্যায়ে এল, যখন দেখা গেল আপোষের তিলমাত্র সম্ভাবনাটিও বিলুপ্ত হয়েছে। অদ্ভুত মেজাজের লোক স্ট্রাডলিং। তিনি আর সেলকার্ককে জাহাজে রাখতে সম্মত হলেন না। তাঁর জাহাজ সেলকার্কের চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই চলে গেল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে, শুধু সেই জনশূন্য অজানা দ্বীপে পড়ে রইলেন একা সেলকার্ক। বিরাট

প্রথম আট মাস কাটল অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগে, একাকিত্বের দুঃসহ জ্বালা ও নির্জনতার ভয়াবহতা সেলকার্ককে রীতিমত সন্ত্রস্ত ও অস্বস্তিপূর্ণ করে তুলেছিল। দু'টি ছোট কুটীর তৈরী করলেন লতাপাতা-বৃক্ষ-শোভিত করে। যতদিন গুলী, বারুদ ইত্যাদি ছিল, ততদিন আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে ছাগল সংহার করে রসনার পরিতৃপ্ত ঘটাতেন, তারপর ছুটোছুটি করে কৌশলে ছাগল ধরে উদ্দেশ্যসাধন করতে হোত। একটি ঘরে রান্না করতেন আর একটি ঘরে শয়ন করতেন, গান গাইতেন এবং প্রার্থনায় সমাহিত হতেন। খুব প্রবল তীব্রভাবে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব না করলে তিনি খেতেন না। কাপড়-চোপড় যখন ক্রমে শতচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন দেহাবরণ করতে থাকলেন ছাগ-চর্ম দিয়ে।

এইভাবে কাটল চার বছর চার মাস। এরমধ্যে কয়েকটি জাহাজ চোখের সামনে দিয়ে চলে গেছে। দু'টি কোন্ দেশীয় জাহাজ নোঙর করেছিল সেই দ্বীপে, সেখান থেকে গুলীবর্ষিত হয়েছিল তাঁকে লক্ষ্য করে। কোনক্রমে সে আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। অবশেষে একদিন জাহাজে এলেন সদলে ডাঃ টমাস ডোভার। ডক্টর কুইক সিলভার নামে যিনি সমধিক খ্যাত। ডোভার উদ্ধার করলেন সেলকার্ককে এই নির্জনতা থেকে। আটশ' পাউণ্ড বেতনের একটি কাজও তাঁকে করে দিলেন জীবিকার জন্য। এই দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস কিন্তু চমৎকারভাবে মানিয়ে গিয়েছিল স্কটিশ নাবিক সেলকার্কের মধ্যে। এই গুপ্তজীবন প্রথমটা তাঁর অসহ্য লাগলেও শেষটায় বেশ মধুরই লাগত, তাই সভ্যতায় প্রত্যাবর্তনের পর ঠিক আগের মত আর মানিয়ে নিতে পারলেন না। সুরটা যেন কোথায় কেটে গেছে।

কিন্তু পৃথিবী লাভবান হল। পৃথিবীর মানুষ জানতে পারল এক পরম বিস্ময়ভরা রূপকথার মত কাহিনী। অবিশ্বাস্য ধরনের এক সত্য ঘটনা। মানুষের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। তাঁকে কেন্দ্র করে বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারও ভরে উঠল। তাঁকে অবলম্বন করে রচিত হল মহান্ সাহিত্যিক রবিনসন ক্রুশো—তাঁকে উদ্দিষ্ট করে লেখা হল সেই অপূর্ব কাব্য যার প্রথম পংক্তি 'I am monarch of all I survey ...'

প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতে শ্রমিক সংঘ

সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করার প্রবৃত্তি প্রাচীনকাল হইতেই মনুষ্য সমাজে প্রচলিত।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই সংঘের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। সমাজের বিস্তার ও অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর সংঘের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদিগকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ক্ষমা-ধর্ম সংঘ, শাসন সংঘ, সামাজিক সংঘ ও অর্থকরী সংঘ।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকগুলি, যেমন বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সংঘবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। এই শ্রেণী সংগঠনকে ধর্ম-সংঘ বলা যাইতে পারে। রাজার ক্ষমতা বিধিবদ্ধ ও সুসংযত করার উদ্দেশ্যে এবং স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংঘ থাকিত। ইহারা অনেকটা বর্তমান যুগের কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যাল, করপোরেশন ও গ্রাম্য ইউনিয়নের ন্যায়, তবে ইহাদের অপেক্ষায় অধিকতর ক্ষমতাশালী ও কার্যকরী। ইহাদিগকে শাসন সংঘরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। বিরাট হিন্দু-সমাজ যে সমুদয় জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রত্যেকেই এক-একটি ক্ষুদ্র সংঘ। এতদ্ব্যতীত সমাজের আরও অনেক প্রকার কার্য সংঘবদ্ধ প্রণালীতে নির্বাহ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষা সংঘ, যেমন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, আমোদ-উৎসবের সংঘ, যেমন বর্তমান ক্লাবের অনুরূপ প্রাচীন 'সমাজ' প্রভৃতি অল্পকালের নাম করা যাইতে পারে। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত যে সমুদয় সংঘের সদস্যগণ নিজেরা কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করেন তাঁহাদিগকে শ্রমিক সংঘ এবং যাহার সদস্যেরা পরের শ্রমলব্ধ অর্থ উপভোগ করেন, তাঁহাদিগকে ধনিক সংঘ বলা যাইতে পারে।

শ্রমিক সংঘের প্রাচীন নাম ছিল শ্রেণী। বৃহস্পতির মতে, দুই কারণে শ্রেণী গঠন আবশ্যক—বাধা দূর করিবার জন্য ও ধর্মকার্য সাধনের জন্য। ধর্মকার্য বলিতে যে শ্রমিক সংঘের যে কার্য তাহার উৎকর্ষ সাধন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, অতিথিশালা নির্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর ও পুণ্যকার্যও বুঝায়। শ্রমজীবীগণ স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পর্যাপ্ত মূল্য পায় না, অনেক সময় পণ্য বিক্রয় করিবার অসুবিধা হয়, পরস্পরের অবৈধ প্রতিযোগিতায় উভয়েরই অনিষ্ট হয়। এই সমুদয় নিবারণ করিয়া যাহাতে সকলের সমবেত শক্তি ও উদ্যমের ফলে সকলেই লাভবান হইতে পারে ইহাই সংঘ গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতীয়েরা এই মূল নীতিটি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, পর্যাপ্ত ধন-উপার্জন করিতে হইলে শ্রমিকদের দলবদ্ধ হওয়া চাই। স্বতন্ত্র থাকিলে চলিবে না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইহার মূল সূত্র আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন 'প্রায়েস সংহতা হি বিত্তো-পার্জন-সমর্থাঃ ধৈকৈকশঃ'।

বৃহস্পতি লিখিয়াছেন—

"কোষেণ লেখক্রিয়য়া মধ্যস্থৈর্বা পরস্পরম। বিশ্বাসং প্রথমং কৃত্বা কুর্যুঃ কার্যানান্তরম ॥"

অর্থাৎ প্রথমে কোষ, লেখক্রিয়া অথবা মধ্যস্থ দ্বারা পরস্পরের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া পরে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কোষ একরকম দৈব প্রক্রিয়া। নিজের ইষ্টদেবমূর্তিকে স্নান করাইয়া ও তাঁহার পূজা করিয়া স্নান ও পূজাবশিষ্ট জল অঞ্জলি করিয়া তিনবার পান করিতে হইত। তৎপর তাহাকে সংঘের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না, সর্বদা ইহার ইষ্টচিন্তা করিব ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ দেবতা সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করার পর যদি কেহ তাহা ভঙ্গ করে, তবে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। সকলে হয়ত এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিত না। এইজন্য অন্যবিধ উপায়ের কথাও লিখিত হইয়াছে। লেখ-ক্রিয়া ও মধ্যস্থ লেখ-ক্রিয়া অনেকটা এগ্রিমেন্টের মতন। ইহাতে সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য ও দায়িত্ব অধিকার ও লাভালাভের কথা লেখা থাকিত। ইহাতে স্বাক্ষর করিলেই সদস্য হওয়া যাইত। অপরিচিত কোন লোক হইলে সম্ভবত একজন তাহার প্রতিভূস্বরূপ হইত: ইহারই নাম মধ্যস্থ।

এইভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্য-প্রণালী লক্ষ্য রাখিয়া বিধিবদ্ধ প্রণালীতে এক একটি শ্রমিক সংঘ অথবা শ্রেণী গঠিত হইত। প্রাচীনকালে প্রত্যেক শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ই এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করিত।

সূত্রধর, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, কাংসাকার, মণিকার, চর্মকার, ভাস্কর, চিত্রকর, বর্ণকার, মালাকার, হস্তিদন্তকার, ক্ষৌরকার, নাবিক, মৎস্যজীবী, তৈলিক, তন্তুবায়, এতদ্ব্যতীত আরও নানা শ্রেণীর শিল্পজীবীরা সংঘ গঠন করিত। যাহারা কোন শিল্পকার্য জানিত না, কেবলমাত্র দেহ খাটিত তাহাদেরও শ্রেণী ছিল।

এই সমুদয় শ্রেণীর একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইতেন; তাঁহাকে জ্যেষ্ঠক শ্রেণী প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত এই জ্যেষ্ঠকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কয়েকজন 'কার্য-চিন্তক' নিযুক্ত হইতেন। সর্বোপরি ছিল সংঘের সাধারণ সদস্যসমূহের সভা। আজকাল যেমন একজন প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি, একটি এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল অথবা কার্য-নির্বাহক সমিতি এবং সাধারণ সমিতি থাকে, প্রাচীন সংঘের গঠনপ্রণালী অনেকটা তদনুরূপ। প্রাচীন সংঘের লোকমতই খুব প্রবল ছিল এবং এইজন্য সাধারণ সভার প্রতিপত্তিও খুব বেশি ছিল। সভাগৃহে প্রায়ই সাধারণ সভার অধিবেশন হইত। সেখানে রীতিমত বক্তৃতা, বিচার বিতর্ক ও আলোচনা হইত। মাঝে মাঝে এই সাধারণ সভার সহিত মুখ্যগণের অর্থাৎ সংঘের প্রধান ব্যক্তিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। তখন রাজা বিবাদের মীমাংসা করিয়া উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনা করিতেন। কিন্তু রাজা যথেচ্ছ-ভাবে এই সমুদয় ব্যাপারের বিচার করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক শ্রেণীরই স্বীয় কার্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি স্বপ্রণীত নিয়মকানুন ও বিধিবদ্ধ আচার-ব্যবহার ছিল। রাজা এই সকল অনুসারেই বিচার করিতেন। যাহাতে এই সমুদয় বিধি-বিধানানুযায়ী কার্য হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও রাজার অবশ্যকর্তব্য ছিল।

প্রত্যেক শ্রেণীরই সভ্যগণের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। সভ্যগণের মধ্যে বিসংবাদ হইলে ইহারাই তাহার বিচার করিত এবং বিচারে দোষী নির্দিষ্ট হইলে শাস্তির ব্যবস্থা করিত। কোন সভ্য শ্রেণীর নিয়মভঙ্গ করিলে অথবা অন্য কোন অনিষ্ট করিলে, এমন কি শ্রেণীর কার্য-চিন্তকগণ তাঁহাদের কার্যে অবহেলা করিলে শ্রেণী হইতেই তাহার শাস্তির ব্যবস্থা হইত। অনেক সময়ে সভ্যগণের পারিবারিক জীবনেও শ্রেণীর প্রভাব বিদ্যমান দেখিতে পাই। বিনয়পিটকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন সভ্য তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিলে শ্রেণীই তাহার মীমাংসা করিত; শ্রেণীর অনুমতি ব্যতীত কোন সভ্যের স্ত্রী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

ন্যায়াধিকরণের কার্য করিত। হত্যা, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য মোকদ্দমা শ্রেণীর নিকট বিচার হইত। অবশ্য শ্রেণীর বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে রাজাকে আপিল করিতে পারিত।

শ্রেণী অথবা শ্রমিক সংঘ আধুনিক ব্যাঙ্কের কার্যও করিত। প্রাচীন ভারতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি এমন বিধিবদ্ধ প্রণালীতে কার্য করিত যে, জনসাধারণে বিশ্বাস করিয়া ইহাদের হস্তে টাকা গচ্ছিত রাখিত। এই টাকার সুদ হইতে দাতার নির্দিষ্ট অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য হইত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১২০ খৃস্টাব্দে শকরাজ নহপানের জামাতা ঋষভদত্ত গোবর্ধনপুরের দুটি তন্তুবায় শ্রেণীতে ৩০০০ কার্ষাপণ জমা রাখেন। প্রথমটিতে ২০০০ কার্ষাপণ শতকরা মাসিক এক কার্ষাপণ হার সুদে, দ্বিতীয়টি ১০০০ কার্ষাপণ শতকরা মাসিক চার অংশের তিন ভাগ কার্ষাপণ হার সুদে। এই সুদের টাকা হইতে প্রতি বৎসর নাসিকের নিকটস্থিত কোন এক গিরিগুহায় যে সকল বৌদ্ধভিক্ষুগণ বর্ষাযাপন করিবেন তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হইবে। ইহাই ছিল দাতার অভিপ্রায়। এই সমুদয় দলিলের শেষে প্রায়ই লিখিত থাকে "যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকিবে ততদিন এই প্রণালীতে কার্য হইবে।" ইহা হইতে এই সমুদয় শ্রেণীর দীর্ঘ অস্তিত্ব, সুবন্দোবস্ত ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেক সময় শ্রেণীগুলি এতদূর প্রভাবশালী হইত যে তাহারা নিজ ব্যয়ে সৈন্যদল গঠন করিত। ইহার দ্বারা আত্মরক্ষা হইত; যুদ্ধকালে এই সমুদয় সৈন্য রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিত। শ্রেণীবল রাজার একটি প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে তাহার ভূয়সী প্রশংসা আছে।

প্রত্যেক জ্যেষ্ঠক অথবা শ্রেষ্ঠী রাজদরবারে সম্মানের আসন পাইতেন। রাজা শোভাযাত্রায় বাহির হইলে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেন। আবশ্যক হইলে রাজবৈদ্য তাঁহাদিগকে চিকিৎসা করিতেন। দুর্যোধন গন্ধর্বদিগের হস্তে পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না; তাঁহার মনে বিষম লজ্জা হইল যে ফিরিয়া গেলে শ্রেণীমুখ্যেরাই বা আমাকে কি বলিবেন, আমিই বা তাঁহাদিগকে কি বলিব। রুদ্রের সহিত কংসের অনুচরগণের মল্লযুদ্ধ উপলক্ষে যে বিরাট সভা-প্রাঙ্গণ সজ্জিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হয়। প্রত্যেক মঞ্চের উপর হইতে যে শ্রেণী যে শিল্পকার্যে নিযুক্ত, তাহার চিহ্নযুক্ত পতাকা উড়িতেছিল।

এই সমুদয় শ্রেণী অথবা শ্রমিক সংঘ যে শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতায় পশ্চাৎপদ ছিল না তাহার বহু প্রমাণ আছে। মন্দাসোর নামক স্থানে একটি শিলালিপিতে এক পট্টবায় শ্রেণীর অদ্ভুত আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহারা প্রথমে লাটদেশে বাস করিত, পরে দশপুর—প্রাচীন মন্দাসোরের রাজার গুণে আকৃষ্ট হইয়া—স্বজনগণ সহ তথায় বসবাস করিয়া থাকে। সেখানে পট্টবস্ত্র বয়ন কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে এবং এক বৃহৎ সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ ধনুর্বিদ্যা, কেহ কথাসাহিত্য, কেহ ধর্মশাস্ত্র এবং কেহ বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিত। প্রশস্তিকারের কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে দশপুরের ঐশ্বর্যের একটু নমুনা দিতেছি।—

"চলৎপতাকান্যবলাসনাথান্যত্যর্থ
শুক্লান্যধিকোন্নতানি
তড়িল্লতা-চিত্র-সিতাভ্রকূট-
তুল্যোপমানানি গৃহাণি যত্র।।
প্রাসাদমালাভিরলঙ্কৃতানি
ধরাং বিদার্য্যেব সমুত্থিতানি
বিমানমালা সদৃশানি যত্র গৃহাণি
পূর্ণেন্দু করামলানি।।"

প্রাচীনকালে শ্রমিক সংঘের মধ্যে কি পরিমাণ জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা ছিল, উক্ত মন্দাসোর প্রশস্তিই তাহার প্রমাণ। তাহাদের দয়া-দাক্ষিণ্য, ধর্মপরায়ণতা ও শিল্পচর্চার পরিচয় ও অন্যান্য অনেক লিপিতে পাওয়া যায়। তাহারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিত, তৃষ্ণার্ত পথিকের জন্য কূপ খনন করিত, বৌদ্ধভিক্ষুর ব্যবহারের জন্য গিরিগাত্রে গুহা খোদিত করিত। এই সমুদয় শ্রেণী যে প্রাচীন ভারতবর্ষের কর্মজীবনে ও ধর্মজীবনে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ইহারা যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বিবেকানন্দ প্রশস্তি

"স্বল্পায়ু এই ভারতীয় সন্ন্যাসী ভারতের সর্বকালের সর্বোত্তম রাষ্ট্রদূত। তিনি এইরূপ ধারনার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, সমগ্র বিশ্ব তাঁহার ভাব ও ভাবনার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত। তিনি অতীতের মানুষ, কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা ও মানসবিকাশ এত গভীর ও ব্যাপক যে, তিনি সেই সময়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলি একালেও প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় মনের অধিকারী, স্বামীজীর মহান ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে অদ্বিতীয়। তিনি সমগ্র জাতির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ইহার গোপন আশা-আকাঙ্খাকে ভাষা দিয়াছিলেন। প্রোজ্জলমনা এই সন্ন্যাসীর মুখের প্রতিটি কথা বা লেখা ছিল অগ্নিশিখার মত। ভারতে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকে বিশ্বের নিকট পরিচিত করাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার চেষ্টা, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার আশা ছিল, সে আশা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

"যদি আমাকে বালক ও যুবকদের নিকট একজন আদর্শ পুরুষের নামোল্লেখ করিতে হয়, আমি প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিব। তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের প্রতীক।"

—জওহরলাল নেহরু

টেলিভিসানের অগ্রদূত

গবেষণার পর গবেষণা চলতে থাকল, বিনা পয়সায় গবেষণা হয় না। গবেষণা চালানোর জন্য চাই বিপুল অর্থ। বেয়ার্ড সরে আসেন না। নিজের খাবারের খরচ কম করে সেই পয়সা গবেষণার কাজে লাগাতে থাকেন।

১৯২৪ সালের আগস্ট মাস। হেস্টিংস থেকে লণ্ডনে আসেন বেয়ার্ড। লণ্ডনের এক বৃহৎ ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর সেলফ্রিজ-এ সাধারণ্যে তাঁর মহৎ কীর্তির প্রথম প্রদর্শন ঘটালেন। অগণিত নরনারী বিজ্ঞানের এক নবীন দিগ্বিজয় সাগ্রহে প্রত্যক্ষ করল। বিজ্ঞানের আর এক ধাপ অগ্রসরণ এর মাধ্যমে প্রমাণিত হল। সংবাদপত্রসমূহ পরম সমাদরে স্বাগত জানালে বিজ্ঞানের এই আর এক ধাপ অপ্রতিহত জয়যাত্রাকে। প্রতিটি পত্র-পত্রিকা মুখর হয়ে উঠল তাঁর প্রশংসায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অল্পকালের মধ্যেই তিনি আবার চলে গেলেন বিস্মৃতির অন্তরালে। যদিও সেটি সাময়িক।

দর্শকসাধারণ বেয়ার্ডের প্রথম প্রদর্শনীতে মানুষের মুখ দেখলেন এক পরিপূর্ণ বৃত্তের আকারে। মানুষের মুখ সম্পূর্ণ গোল আকৃতিতে মানুষেরই সামনে ধরা দিল। টেলিভিসানে প্রতিফলিত মুখ থেকে বুদ্বুদের মত কি যেন নির্গত হচ্ছে।

টাকার প্রয়োজন প্রতি পদক্ষেপে। আত্মীয়স্বজনের কাছে আবেদন জানালেন বেয়ার্ড। আত্মীয়স্বজনরা স্বতঃস্ফূর্তমনেই পাঁচ শ পাউণ্ডের শেয়ার কিনতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে টাকা সংগ্রহ হল। একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুললেন বেয়ার্ড এই টাকা দিয়ে। নাম দিলেন টেলিভিসান লিমিটেড। প্রথম প্রথম বেয়ার্ড মানুষের পরিবর্তে পুতুল, মূর্তি প্রভৃতিকেই টেলিভিসানের বিষয়বস্তুতে পরিণত করলেন। 'বিল' নামক মূর্তিটি টেলিভিসানে বার বার প্রদর্শিত হতে থাকল। ১৯২৫ সালের ২রা অক্টোবর দেখা গেল তাঁর সাধনা অনেকাংশে সফল হয়েছে। প্রতিফলিত মুখের চোখ,

বাসুদেব

নাক, কান স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে লোকের চোখে ধরা দিচ্ছে। 'বিল' ছাড়া আরও যার সহায়তা এ প্রসঙ্গে তাঁর কাছে এক বিরাট মূল্য বহন করে দেখা দিয়েছিল, সে পুতুল নয়, সে মানুষ। তার নাম উইলিয়াম টেনটন। এই কিশোরটি একটি অফিসে 'বয়'-এর কর্মে নিযুক্ত ছিল। পুতুল 'বিল'-এর সঙ্গে মানুষ বিল (উইলিয়ামের ডাক নাম) ও বেয়ার্ডের প্রধান সহায়ক হিসাবে সেদিন দেখা দিয়েছিল।

সময় এগোতে থাকে। বেয়ার্ডের গবেষণাগারের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্বিদিকে। নানা বিজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটতে থাকে সেখানে। এই তরুণ বিজ্ঞান সাধকের দিকে নজর পড়ে দেশের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর। যুক্তরাষ্ট্রেরও নজর পড়ল। এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন অলিভার জর্জ হাচিনসন আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ১৯২৮ সালে আর্থিক প্রতিকূলতা থেকে তাঁর গবেষণা মুক্তি পেল।

তার পরের ইতিহাস গৌরবময়। প্রতি পদক্ষেপে তাঁর জয়মাল্য আর সমাদর স্বকৃতি। ১৯৪৬ সালে এই মহান আবিষ্কর্তার তিরোধান ঘটে।

গবেষণারত বৈজ্ঞানিক বেয়ার্ড

রান্না ঘরে
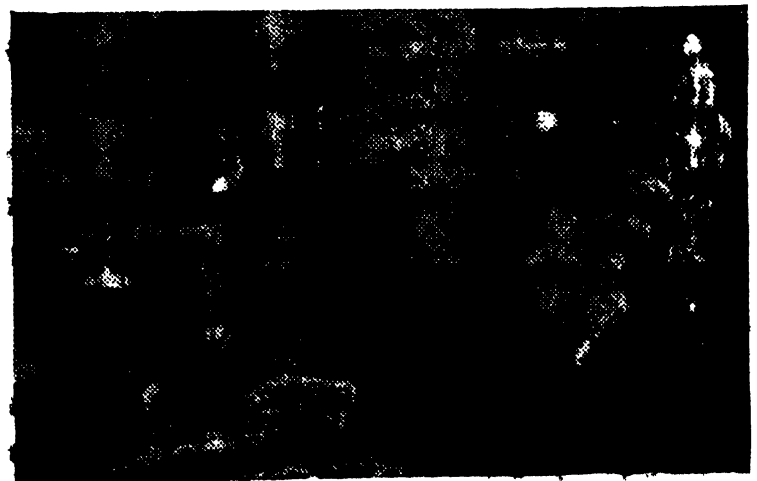
দুনিয়ার মানুষ নানামত দিয়ে চলে, কিন্তু এক ব্যাপারে তারা সকলেই একমত—তা হল রসনার তৃপ্তি, খেয়ে খুসী হয় না এমন আর কে আছে বলুন? এবং সকলেই চায় এই খাওয়া ব্যাপারটিকে এমন করে তুলতে—যার ফলে শুধু উদরই পূর্ণ হয় না, রসনাও লাভ করে ভূমানন্দের আস্বাদ।

রন্ধন পটিয়সী রমণীর জয়গানও তাই আন্তর্জাতিক, এবার গৃহিণীদের সুবিধার্থে মাছ রান্নার কয়েকটি প্রকরণ প্রদত্ত হল।

মাছের স্টু

উপকরণ :—আড়াইশো মাছ (যে-কোন রকমের মাছ হলেই হবে), একটা নারকোল মাঝারি বা ছোট সাইজের, তিনটে কি চারটে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা তিনটে বা চারটে, কিছু ধনেপাতা, চায়ের চামচের একচামচ লঙ্কার গুঁড়ো, কিছু হলুদ গুঁড়ো, সামান্য দারুচিনি, দুটি বড় এলাচ, লবঙ্গ একটা, কিছু তেল বা বনস্পতি জাতীয় স্নেহপদার্থ।

আন্দাজমত নুন ও চিনি।

প্রণালী :—ভাল করে ধুয়ে বেছে মাছটুকুকে পাতলা পাতলা করে কেটে রাখুন।

লঙ্কার গুঁড়ো ও হলুদ গুঁড়ো একসঙ্গে অল্প জলে গুলে রাখুন, সামান্য একটু নুনও মিশিয়ে দিন ঐ গোলায়।

এবার পেঁয়াজ ও লঙ্কা কুচিয়ে নিন। নারকোলটা কুরে নিয়ে বেটে রাখুন। এবার ওই বাটা নারকোলে অল্প জল মিশিয়ে নিয়ে ভাল করে চেপে ওর দুধটা বার করে একটা পাত্রে রেখে দিন।

এবার পাত্রে তেল বা বনস্পতি গরম করে মাছের টুকরোগুলি ভাল করে ভেজে তুলুন। এবার ওই তেলে দারু-চিনির টুকরো, এলাচ ও লবঙ্গ ছেড়ে দিন, ওগুলো বাদামী হয়ে আসার পর ঐ পাত্রেই কুচোনো পেঁয়াজ ও কাঁচা-লঙ্কা ছেড়ে দিন এবং নাড়াচাড়া করে ভাজুন কিছুক্ষণ ধরে।

ভাজা ভাজা হলে নারকোলের দুধটা ঢেলে দিন ওর মধ্যে।

এবার ওতে সামান্য নুন ও মিষ্টি দিয়ে দিন। সমস্তটা ফুটে উঠলে পর ভাজা মাছগুলি ছেড়ে দিন ওতে এবং আরও কিছুক্ষণ ফোটান। তারপর নামিয়ে ফেলে ধনেপাতাগুলি কুচিয়ে ওর ওপর ছড়িয়ে দিন।

ফিশ-কোলাম্বু

উপকরণ :—মাছ কোয়ার্টার কিলো বা আড়াই শো, কিছুটা তেঁতুল, লঙ্কার গুঁড়ো দেড় চামচ, হলুদ গুঁড়ো চায়ের চামচের আধ চামচ, কিছু ধনেপাতা, দু'কোয়া রশুন, দু'টো পেঁয়াজ, কিছু কারিপাতা, কিছু নুন, বড় চামচের একচামচ তেল, আধ চামচ মেথি।

প্রণালী :—মাছটা চাকা চাকা করে কেটে ভাল করে ধুয়ে রাখুন। রশুনের কোয়াদু'টো কেটে লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো ও ধনেপাতার সঙ্গে বেশ মিহি করে বেটে রাখুন।

পেঁয়াজ দু'টো বেশ করে কুচিয়ে নিন। তেঁতুলটা গরম জলে ভিজিয়ে দিন ও কিছু পরে সেটা চটকে চটকে চায়ের কাপের তিন কাপ আন্দাজ তেঁতুলগোলা জল বার করে রাখুন।

এবার একটা পাত্রে তেল গরম করে মেথির ফোড়ন দিন।

ফোড়নের গন্ধ উঠলে ওতেই কুচোনো পেঁয়াজটা তুলে দিন ও সেটা বেশ বাদামী করে ভাজুন, এবার বাটা মশলাটা ওতে দিয়ে সেটাও ভাল করে কষে নিন।

নরম হয়ে গেলে তেঁতুল গোলা জলটা ওতে ঢেলে দিয়ে দশ মিনিট ধরে ফোটান, একটু নুনও দিন ওতে।

এবার ভাজা মাছগুলি ওতে ঢেলে দিয়ে আর একটু ফোটান, তারপর আগুন থেকে নামিয়ে ফেলে একটা পাত্রে ঢেলে রাখুন।

কারিপাতাগুলি কুচিয়ে এবার ঐ পাত্রে ছড়িয়ে দিন!

দইমাছ

উপকরণ—কোয়ার্টার কিলো মাছ—যে-কোন মাছ হলেই চলবে, তবে চিংড়ী ইলিশ বা পোনা মাছ হলেই ভাল, কোয়ার্টার কিলো টক দই, বড় পেঁয়াজ ১টা, দু'টো কি তিনটে কাঁচা-লঙ্কা, অল্প আদা, ১টা বড় এলাচ ও দু'টি লবঙ্গ, একটুকরো দারুচিনি, চায়ের চামচের আধ চামচ রাইসর্ষের গুঁড়ো, সামান্য ঘি ও অল্প নুন।

মাছটা কেটে ভাল করে ধুয়ে একটু নুন মাখিয়ে রাখুন।

পেঁয়াজ আদা ও কাঁচালঙ্কাগুলি ভাল করে কুচিয়ে নিন, দইটা ভাল করে ফেটিয়ে রাখুন।

একটি বড় পাত্রে ঘি গরম করে নিন, তারপর তাতে রাইসর্ষের গুঁড়োটা ছেড়ে দিন, সেইসঙ্গে দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গও ছেড়ে দিন, সবটা একটু ভাজা ভাজা করে নিন, তারপর তাতে কুচনো পেঁয়াজটুকুও ছেড়ে দিন।

পেঁয়াজের রং বাদামী হয়ে এলে মাছের টুকরোগুলি দিয়ে দিন, তারপর আধ গেলাসটাক জল তাতে ঢেলে দিয়ে আদার কুচি লঙ্কার কুচিও ছেড়ে দিন, কিছুক্ষণ ফোটান সবটা।

তারপর নামিয়ে ফেলুন, কিছুক্ষণ রাখার পর ফেটানো দইটা ওতে ঢেলে দিয়ে আস্তে আস্তে নেড়ে মিশিয়ে দিন ভাল করে।

—শ্রীমতী

কফিন ক্লাব

অদ্রীশ বর্ধন

কলকাতায় শুনেছিলাম এক পণ্ডিতের মুখে। মিশরের প্রাচীন রহস্য নিয়ে তাঁর অনেক কেতাব আছে। দেশ-বিদেশে নাম আছে। বয়েসে বৃদ্ধ। পেশায় প্রফেসর।

নাম? এইটুকুই গোপন রাখব। প্রফেসরের ইচ্ছে তাই। যৌবনে প্রফেসরকে ঈজিপ্টে যেতে হয়েছিল। একবার নয়—কয়েকবার। পিরামিড স্ফিংক্স নিয়ে তাঁর গবেষণা—মিশরের মাটিতে তাঁকে না পেলেই নয়। সঙ্গে থাকত পোর্টেবল টাইপরাইটার। সারা দিন টো-টো করতেন। মিউজিয়ামে আর কিউরিও শপে। গলি-ঘুঁজির মধ্যে খুঁজে খুঁজে বার করতেন শ্রীহীন চেহারার দোকান। দোকানদারের সঙ্গে ভাব জমিয়ে সংগ্রহ করতেন হরেকরকম প্রাচীন বস্তু। মিশরীয় খটোমটো নামগুলি প্রফেসর বলেছিলেন—আমি সংগে সংগে ভুলে গেছি।

আগাগোড়া প্রফেসর একটা কথাই বলেছেন। এ কাহিনী অলৌকিক কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জানা মানুষ অতিপ্রাকৃত কাহিনী আর বিশ্বাস করে না। আমিও তাই কাউকে বলি নি। মিথ্যে অপবাদ কুড়িয়ে লাভ কি? তবে তুমি উদ্ভট গল্পের লেখক। তোমার কলমে এ গল্প প্রকাশ পেলে, আর যাই হোক, লোকে আমার টিকিও ছুঁতে পারবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের ছোট্ট গণ্ডীর বাইরে বিরাট অজানার সাগর রয়েছে পড়ে। কতটুকুই বা আমরা জেনেছি? যা জানি না তার সবই কি ধাপ্পাবাজী, আজগুবী, অবিশ্বাস্য? মিশরের পিরামিড আজ সারা পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। পিরামিডের পবিত্রতা যারা নষ্ট করেছে, মমী যারা লুঠ করেছে—তাদের জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটছে না? রহস্যজনকভাবে তাদের অপঘাত মৃত্যু হচ্ছে না? মিশরের প্রেতাত্মার অভিশাপ যে কি সর্বনাশা—তা বারে বারে দেখা যাচ্ছে না?

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন প্রফেসর। চশমা খুলে পাইপে তামাক ঠাসতেন। স্মৃতির রোমন্থনে অকিল হত দুই চক্ষু। খগনাসিকার ঔদ্ধত্য কিন্তু তিলমাত্র কমত না। ভাবখানা যেন, বিশ্ববাসীর বিশ্বাস অবিশ্বাসের তোয়াক্কা রাখি না। আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি, তা মিথ্যে নয়। মৃত্যু যদি একমাত্র সত্য হয়—তবে আমার কাহিনীও নিষ্ঠুর সত্য।

কায়রোতে ঘটনাটা ঘটে তারপর থেকেই মিশরের ছায়া মাড়ান নি প্রফেসর। লোহিত সাগরকে দূর থেকেই নমস্কার করেন।

সেদিন সারাদিন টাইপ করেছিলেন প্রফেসর। লণ্ডন এবং বোম্বাইয়ের দুটি গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশ পাবে তাঁর প্রবন্ধ। তাই ভোর ছ'টা থেকে একনাগাড়ে খটাখট করে গেছেন—[illegible] খাওয়ার সময়টুকু বাদে। মনের দিকে চোখ মেলে আর চলে না, আঙুল যখন পঙ্গু হবার উপক্রম, তখন বাধ্য হয়ে উঠে পড়লেন প্রফেসর। খোলা হাওয়ায় মস্তিষ্কের আবিলতা পরিষ্কার করার মতলব নিয়ে হাঁটতে লাগলেন যে-দিকে খুশী।

হাঁটতে হাঁটতে পথিমধ্যে পেলেন একটা পানাগার। আসব পানের সুসজ্জিত আড্ডা। কি মতিভ্রম হল, ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রফেসর ধোয়া তুলসীপাতাটি নন। বিভিন্ন পাশ্চাত্যের একাধিক শহরে জ্ঞানার্জন করেছেন, সুরায় তাঁর নিরাসক্তি থাকার কথা নয়। তবে নেশাও নেই।

সেদিন কিন্তু মাত্রা চড়ে গিয়েছিল। সারাদিনের খাটুনি আর একলা থাকার যন্ত্রণা ভোলবার জন্যেই বোধ করি পর পর কয়েক পেগ স্কচ গলাধঃকরণ করলেন প্রফেসর। তরল অগ্নি শিরায় শিরায় হল প্রবাহিত। মাথার মধ্যে জাগ্রত হল ঝিমঝিম ঝিমঝিম ভাব।

ভালই লাগছিল, শরীর অসম্ভব হাল্কা। তুলোর মত। মাটিতে পা পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যায় না। মাথার সেই ভার-ভার ভাবটাও নেই। মনের মধ্যে মিষ্টি আবিলতা।

আবার রাস্তায় পা দিলেন প্রফেসর। দীপের আলোয় চেনা রাস্তাগুলোও অদ্ভুত মনে হল। এরপর থেকেই যেন স্বপ্নের ঘোরে চলেছিলেন উনি. কিন্ত চেতনা স্পষ্ট
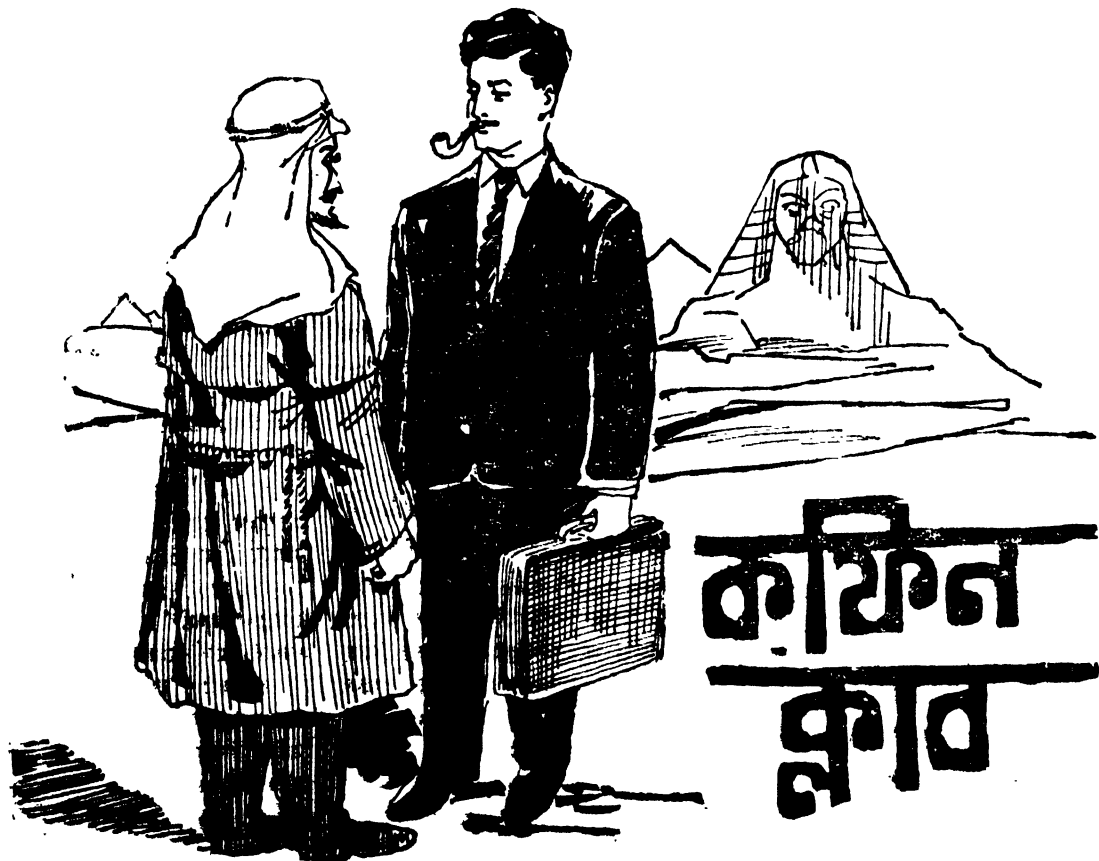
মূল। যা দেখেছেন, যা শুনেছেন—তা আজও মনে আছে।

কায়রোর পথঘাট অচেনা নয় প্রফেসরের। কিন্তু সেদিন, সেই সন্ধ্যায়, সোমরস পানের পর সব কিছুই তাঁর কাছে নতুন রূপে ধরা দিল। সারাদিন তাঁর মাথায় মিশরের প্রাচীন রহস্য আবর্ত সৃষ্টি করেছে। মদের ঘোরে এখন তিনি সেই সবেরই ছায়া দেখলেন আশেপাশে। পা কোথায় চলেছে, সে খেয়াল আর রইল না। মনে হল যেন শূন্যে ভেসে চলেছেন।

পার্থিব চিন্তা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না প্রফেসরের। সেই জন্যই কি অপার্থিব চিন্তার কুহেলিতে আচ্ছন্ন হল তাঁর চেতনা? কে জানে। কিন্তু কোন ফাঁকে যে প্রাচীন ঈজিপ্ট নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তা তিনি নিজেই জানেন না। সহসা যেন হাজার হাজার বছর বিলীন হল তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে। হারানো মিশরের ঐশ্বর্য, প্রহেলিকা আর আতংক বিমূর্ত হল চেতনায়।

বেশ মনে পড়ে, সে সময়ে উনি হাঁটছিলেন জনবিরল একটা রাস্তা দিয়ে। এঁদো গলি। টিমটিমে বাতি। জন-প্রাণী নেই।

মনে মনে কিন্তু উনি কল্পনা করলেন অন্য দৃশ্য। ভাবলেন, একদিকে রয়েছে মিশরীয় মন্দির অন্যদিকে স্ফিংক্স-এর বিস্ফারিত চাহনি।

এঁদো গলি শেষ হল। আলোকিত রাস্তায় এসে পোঁছোলেন প্রফেসর। কল্পনা করলেন, শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত মন্দির-পুরোহিতেরা চলেছে সারি বেঁধে।

বাঁশি বাজছে। কাগজের ভেঁপু। ফেরিওয়ালার ঐকতান।

প্রফেসর ভাবলেন, ভেঁপু নয়—এ হল তারের বাজনার বিলাপ। উপাসনা শুরু হয়েছে। রক্তরাঙা গোলাপের উপচার দিয়ে কুমারী-বলির আয়োজন চলছে দেবতা অসিরিসের সামনে।

যেন স্বপ্ন। পা যে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে প্রফেসরকে, সে খেয়াল নেই। যা দেখছেন, তার ওপরেই মিশর-রহস্যের রঙ চড়িয়ে কল্পনা করছেন অন্য কিছু। কখনো ভাবছেন, সারি সারি ম্যমী সাজানো পথের দু-পাশে। আবার কখনো মনের চোখে দেখছেন, পথিপার্শ্বে ঐ যে বাড়ি—ও তো বাড়ি নয়—নরকরোটি—কংকালের মাথা—আলোকিত জানলাগুলোকে কল্পনা করছেন যেন খুলির অক্ষিকোটর, নাসিকাগহ্বর আর মুখবিবর।

রহস্য প্রহেলিকা, বিভীষিকা—সবই যেন তালগোল পাকিয়ে কিম্ভূতকিমাকার দৃষ্টি-বিভ্রমের সৃষ্টি করল মগজের মধ্যে।

লোকটাকে ঠিক তখনি দেখা গিয়েছিল।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল সাদা আলখাল্লা পরা লোকটা। ঢ্যাঙা। শীর্ণ। তীব্র চাহনি।

প্রফেসর পাশ কাটিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু কাছাকাছি গিয়েও পারলেন না। মনে হল, লোকটা যেন তাঁর জন্যেই দাঁড়িয়ে। অপাঙ্গে তাকালেন প্রফেসর। সঙ্গে সঙ্গে বিষম চমকে উঠলেন। স্বপ্নের ছায়াছবি নিমেষে সত্য হল।

দেখলেন, লোকটার পরনে প্রাচীন মন্দির-পুরোহিতের বেশ। চোখ রগড়ালেন প্রফেসর। না। দৃষ্টিবিভ্রম নয়। মদের নেশা নয়। ঐ সাদা আলখাল্লা, দেবতা অসিরিসের সম্ভ্রম-চিহ্ন আর সর্পরূপ প্রতীক চিহ্ন তো ভুল হবার নয়?

বিপুল বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর। এতক্ষণের বিকট কল্পনা কি শেষে প্রকট হল চোখের সামনে?

আচম্বিতে লোকটা আলখাল্লার মধ্যে থেকে হাত বাড়াল। হাতে একটা সিগারেট। বলল—"মিস্টার, দেশলাই আছে?"

প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতের এ হেন আধুনিক নেশা দেখে মুহূর্তে পরিষ্কার হল বিভ্রম। মনে পড়ল ঈজিপ্টের বহুরূপীদের বৃত্তান্ত। বিদেশী ট্যুরিস্টদের সামনে প্রাচীন মিশরীয় পোষাকে সেজেগুজে এরা দাঁড়ায়। পয়সা লোটবার ফিকির নয়—বিদেশীদের চিত্তবিনোদনই মুখ্য উদ্দেশ্য।

হেসে দেশলাই বার করলেন। প্রফেসর নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন "মুডে" থাকার জন্যেই বোধহয়, ফুটপাথে দাঁড়িয়েই আলাপ জমল দুজনের মধ্যে। ভদ্রলোকের নাম—না থাক। আসল নামে দরকার নেই। ধরা যাক নামটা পাশানবিস। প্রফেসরের নাম শুনে পাশানবিস সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—"বিসমিল্লা! গত কালই তো আপনার প্রবন্ধ পড়লাম কাগজে। মিশরকে আপনি যে-কোনো মিশরীয়র চাইতে বেশি জেনেছেন প্রফেসর।"

প্রফেসর খুশী হলেন তারিফ শুনে। একথা-সেকথার পর পাশানবিস বললেন—"এখন আপনার কাজ কি?"

"কিছু না। স্রেফ হাওয়া খাচ্ছি।"

"তাহলে চলুন আমার গরীবখানায়। খানা-পিনা করবেন। অনেকের সঙ্গে আলাপও হবে।" বলে অদ্ভুত হাসলেন পাশানবিস।

প্রফেসর অরাজী হলেন না। যেতে যেতে শুনলেন, যাঁদের সঙ্গে উনি আলাপ করতে যাচ্ছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাচীন মিশর নিয়ে ভাবেন। ওঁদের একটা ক্লাবও আছে। আজ তাঁদের ক্লাবের বাৎসরিক অধিবেশন এবং সেই উপলক্ষে খানাপিনার আয়োজনও হয়েছে। ক্লাবের সবাই বিচিত্র সাজে সাজবেন। প্রাচীন মিশরকে যেন দেখা যাবে খানাপিনার টেবিলে।

পাশানবিস সেজেছেন মন্দির-পুরোহিতের সাজে। আবার কেউ ধারণ করবে দেবদেবীর ছদ্মবেশ। অথবা আরও উদ্ভট সজ্জা যা এখন মিউজিয়ামে দেখা যায়, পিরামিডের কবরে শোভা পায়। কিউরিও শপেই মানায়।

প্রফেসর কিন্তু-কিন্তু করেছিলেন নিজের আধুনিক বেশবাসের জন্যে। এমন সুন্দর সমাবেশে উনি খাপছাড়া হবেন না কি?

মোটেই না, আশ্বাস দিয়েছেন পাশানবিস। প্রফেসরের কথা, নাকি ক্লাবে এত বেশি আলোচনা হয়েছে যে মুখোশ দিয়ে ঢাকামুখে ওঁকে দেখলে কেউই খুশী হবেন না। চোখের দেখা না দেখলে কি আলাপ জমে।

খোশামুদে কে না ভালবাসে। প্রফেসরও বিলক্ষণ পুলকিত হলেন। তাছাড়া পাশানবিসের সঙ্গে গেলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। দোষের মধ্যে ভদ্রলোক বড্ড বকেন। মুখে যেন তুবড়ি বসানো। নানান কথা। এঁদের এই ক্লাবের নাম নাকি "কফিন ক্লাব"—এঁরা অলৌকিক বিষয় নিয়ে চর্চা করেন। তন্ত্রমন্ত্র, ভূতপ্রেত নিয়ে গবেষণা করেন। আজকের বাৎসরিক অধিবেশন তাই বিলক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এমন একটা অনুষ্ঠান আছে, যা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য কারো হয় না। তবে প্রফেসর হলেন গবেষক। পুরাকালের মিশর তাঁর নখদর্পণে। তাঁর উচিত এই বিষয় অনুষ্ঠানটি স্বচক্ষে দেখা। ক্লাবের সভ্যদের যদিও আজকে চেনা মুস্কিল হবে। প্রত্যেকেই বিদঘুটে মুখোশ ধারণ করবেন কিনা। পিশাচ, আর শরীরী আতংক, জাদুকর, আর অতি-প্রাকৃত বিভীষিকাদের কিম্ভূতকিমাকারদের ছদ্মবেশে জমায়েত হবেন ওঁরা। তারপর? তার পরের ঘটনা প্রফেসর নিজেই দেখবেন।

পাশানবিসের বক্তৃতার তোড়েই পথের নিশানা হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রফেসর। এমন কি যে-বিরাট প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার বাইরেটা কিরকম তাও দেখবার সুযোগ পেলেন না। খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন ভেতরে।

কিছুক্ষণ পরেই বুঝলেন, এ প্রাসাদের নাম হওয়া উচিত—দুঃস্বপ্নের পুরী।

প্রথমেই হলঘর। রক্ত রঙ। লোহিতবর্ণের আস্তরণ ঘরের কড়িকাঠ থেকে কার্পেট পর্যন্ত। কোথাও রঙ চড়া, কোথাও ফিকে, কোথাও গাঢ়, কোথাও উগ্র। দরজায় ভারী পর্দা, ঘাসকোমল গালিচা, আসবাবপত্রের ঢাকনি—সমস্তই লাল রঙের।

কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একাধিক ঝাড়বাতি। ঘরের কোণে কোণে শ্বেতপাথরের ফাঁপা স্ফিংক্সমূর্তির মধ্যে বিদ্যুৎ বাতি টেবিলের ওপর শেডে ঢাকা নরম মোম-প্যাটার্ন বাতি। কিন্তু সব কটি থেকেই

বিচ্ছুরিত হচ্ছে লাল কিরণ। রক্ত আঁধার ভয়াল ঘরের পরিবেশ। লোহিত জ্যোতিতে থমথমে।

বোহেমিয়া কাটগ্লাসের একটি সুরাপাত্র এগিয়ে দিলেন পাশানবিস। কারুকার্যে চোখ মোহিত হয় ঠিকই, কিন্তু ধাঁধা লাগে লালকাঁচের গাঢ়তায়। ষাঁড়ের রুধিরও বুঝি এত গাঢ় নয়। টলমলে কালচে লাল রঙের সুরায় চুমুক দিলেন প্রফেসর। চনমন করে উঠল শিরা-উপশিরা। মদিরার এ হেন বিচিত্র স্বাদ যেন কেমন কেমন। এতক্ষণে যা অস্বাভাবিক অসহজ অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কালচে লাল সুরার প্রসাদে তা অতি স্বাভাবিক, অতি সহজ, অতি সম্ভব মনে হল।

পাশানবিস চেয়েছিলেন প্রফেসরের পানে। বললেন —"চলুন, পাশের ঘরে বন্ধুরা আছে।"

সম্মোহিতের মত চৌকাঠ অতিক্রম করলেন প্রফেসর। সন্ধ্যা থেকেই মদের নেশা চেতনাকে যত না আচ্ছন্ন করেছে, তার চাইতে বেশি সম্মোহন হয়েছে ঐ লোহিত-ঘরে। ঘর তো নয়—যেন নরকের সিংহদ্বার।

পাশের ঘরে সাক্ষাৎ নরকের দর্শনলাভ করলেন প্রফেসর।

কফিন ক্লাবের সব সদস্যই হাজির সেখানে। অমানুষিক বেশবাস। নারকীয় ছদ্মবেশ। হৃৎকম্প জাগানো মুখোশ। রুধির হিমকরা চালচলন। কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয়, মিথ্যা নয়—এরা সত্যি। ছদ্ম নয়, এরা আসল। নকল নয়—খাঁটি। ঐ তো ড্রাকুলার ছদ্মবেশে মানুষটা হাসছে পাশের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে। মিশরীয় চোখে সুর্মার প্রলেপ দিয়ে ডাগর চাহনি নিক্ষেপ করছে যে মেয়েটি, তার উদ্ধত বুকে কংকালের ছবি কেন? মায়াবী নেকড়ের মুখোশপরা একদল শরীরী আতংক পিয়ানোর সামনে রক্ত উত্তাল করা সুরমোহ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। অর্ধ-পশু, অর্ধ-মানবের এই রক্ত ঠাণ্ডাকরা জমায়েতে নিজেকে খাপছাড়া মনে করতে পারলেন না প্রফেসর। সারাদিন যা নিয়ে গবেষণা করেছেন, এ যেন সেই সবেরই রঙ্গমঞ্চ অভিনয়।

বিশাল ডিনার টেবিল ঘিরে গুলতানি করছিল সদস্যরা। মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে হাসি ছাপিয়ে উঠছে ঘরের সমুদ্র নির্ঘোষের মত একঘেয়ে কলরবকে। ওরা হাসছে, গাইছে, ঘুরছে। নরকের কীটরা বুঝি নারকীয় রঙ্গে মেতেছে।

ঘরে ঘরে সবার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিলেন পাশানবিস। প্রফেসর সমাদৃত হলেন সবার কাছেই। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই ঔৎসুক্য সঞ্চার করেছিল কফিন ক্লাবে। দৈবাৎ মানুষটিকে বাৎসরিক অধিবেশনে পেয়ে সবাই অকপট আনন্দ প্রকাশ করলেন।

কিছুক্ষণ পর। একা দাঁড়িয়ে প্রফেসর। খাওয়া শুরুর আর বিলম্ব নেই। পাশানবিস রয়েছেন ঘরের অন্য প্রান্তে। মাথার মধ্যে যেন লক্ষ বোলতার গুঞ্জন শুনেছেন প্রফেসর। বিহ্বল চক্ষু ইতস্তত সঞ্চরমাণ। এমন সময়ে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হল—সেই ভয়ংকর মানুষটি।

লালঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে এল মানুষটা। যেন পিছলে এল মেঝের ওপর দিয়ে। পেছনে আলো থাকায় মনে হল ছায়ায় গড়া তার কায়ামূর্তি। শ্বেতশুভ্র আলখাল্লায় আচ্ছাদিত অংগ। বড় বড় বেঁকানো নখ—ঈগলের নখররাশির মত। আঙুলে বিশাল পাথরের আংটি। শক্ত কলার। তার ওপর মাথা।

উঃ, সে কি মাথা! তাকানো যায় না!

কারণ তা মানুষের মাথা নয়—কুমীরের। ধড় মানুষের—মাথা কুমীরের। লকলকে রক্তজিহ্বা, সবুজ শ্যাওলা ঢাকা হড়হড়ে মুখ, তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত সারি সারি দাঁত আর ক্রূর একজোড়া চক্ষু।

নীলনদের কুমীর-দেবতা সেবেক-এর পুরোহিত। বিধান অনুযায়ী পুরোহিতদেরও কুমীরের মুখোশ ধারণ করতে হয়। এ লোকটির পরনে সেই ছদ্মবেশ।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ছদ্মবেশ এমন নিখুঁত হয়?

প্রফেসরের কেন জানি মনে হল—এ সজ্জা নকল নয়—আসল। এ মুখোশ নিরীহ নয়—নির্মম।

গালিচার ওপরে শব্দহীন দ্রুতগতিতে কুমীর-দেবতার পুরোহিত এগিয়ে এল ঘরের মাঝে। অবরুদ্ধ বিস্ময়ে পাশানবিসের দিকে ফিরেছিলেন প্রফেসর। কে এই মূর্তিমান প্রহেলিকা, তা জানা দরকার।

পাশানবিস ধারে-কাছে নেই। আবার সামনে ফিরলেন প্রফেসর। কুমীরমুখো মানুষটাকে আর দেখতে পেলেন না।

এদিকে-ওদিকে তাকালেন প্রফেসর। কিন্তু লোকটা যেন সত্যিই জাদুকর। নিমেষে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে, উধাও হয়েছে দৃষ্টিপথ থেকে।

খেতে বসে এ প্রসংগ আর মনে ছিল না। খাওয়ার পরেও না। মনে পড়ল অনেকক্ষণ পরে—যখন সর্বনাশের আর দেরি নেই।

কফিন ক্লাবের সদস্যরা আহার সমাপন করে ধূমপানে মন দিয়েছিল। পাশানবিস প্রফেসরকে ডেকে নিয়ে গেলেন লাইব্রেরী ঘরে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত টেবিল।
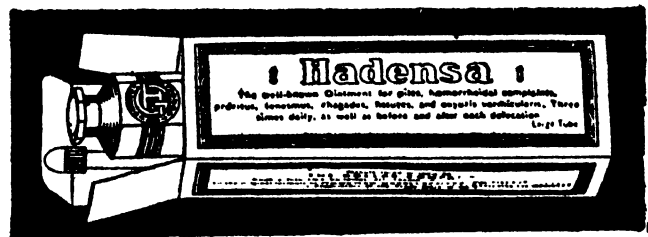
[illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] পত্রের। কফিন ক্লাবের এরা চাই।

অতীন্দ্রিয় [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] পারদর্শী।

পাশানবিস বললেন—"আপনাকে আজ আমন্ত্রণ জানিয়েছি নিছক আলাপ-পরিচয়ের জন্যে নয়। আজ আমাদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। কফিন ক্লাবের পত্তন যে জন্যে—আজ রাত্রে তার সাধনা আমরা করব। এ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে সব সদস্যের প্রবেশাধিকার নেই—কিন্তু সদস্য না হয়েও আপনি থাকবেন। কারণ আমরা চাই আমাদের কৃতিত্ব—আপনার গবেষণা প্রবন্ধে স্থান পাক। আমরা প্রচারবিমুখ নই। তাই আপনাকে আমাদের দরকার। এখন যা ঘটবে—আপনার সামনেই ঘটবে।"

চেয়ে রইলেন প্রফেসর। কি বলবেন, বুঝতে পারলেন না।

ঘর নিস্তব্ধ। পাশানবিস নৈঃশব্দ আর ভঙ্গ করলেন না। নীরবে মস্ত টেবিলটার কিনারায় একটা গোপন বোতাম টিপে ধরলেন।

ঘটাং করে শব্দ হল। এতক্ষণে যা টেবিলের ড্রয়ার মনে হচ্ছিল, আচম্বিতে তা খুলে নেমে এল মেঝেতে। ভেতরের গোপন প্রকোষ্ঠ এবং একটা শবাধার।

পাশানবিস একাই কফিনটাকে টেনে আনল বাইরে। মৃদু আলোয় দেখা গেল একটা ডালাখোলা আধার। ভেতরে শুয়ে ফেটিজড়ানো মামী। মামীর বুকে রক্ষিত জেড-পাথরের ফলক। প্রাচীন মিশরীয় হরফে কি যেন লেখা। আর একটা কুমীরমূর্তি খোদাই করা।

দেখেই যেন লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল মগজের কোষে কোষে।

এ মামী প্রফেসর চেনেন। জানেন ঐ জেডফলকের সাংকেতিক হরফের অর্থ কী। তাই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে শুধু চেয়ে রইলেন হাজার হাজার বছর আগে বিগতপ্রাণ পুরোহিতের মামীমূর্তির পানে।

কুমীরমুখো দেবতা সেবেক-এর চার পুরোহিতের মামী আজ পর্যন্ত পিরামিড লুঠ করে পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি লুঠেরার জীবনাবসান ঘটেছে রহস্যজনকভাবে। কেননা, নীলনদের কুমীরমুখো দেবতা সেবেক রক্ত-লোলুপ ছিলেন। তাঁকে আরাধনা করতে হত কুমারীর রক্ত দিয়ে। বিনিময়ে সেবেক নাকি রক্ষা করতেন পুরোহিতদের। জন্মচক্র পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দেহমুক্ত আত্মা যাতে বারে বারে ফিরে আসতে পারে মামীদেহে—তার ভার নিতেন দেবতা স্বয়ং। তাই মামীলুঠেরারা নিহত হত অস্বাভাবিকভাবে। মামীর বুকে রক্ষিত ঐ যে জেডপাথর—প্রফেসর জানেন ও পাথরে কি [illegible] আছে। হুঁশিয়ার বাণী।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তা সত্ত্বেও যদি বিঘ্নিত হয় মামীর রক্ত-বন্ধনী—সর্বনাশ অনিবার্য। দেবতা স্বয়ং আসবেন তাঁর উপাসকের পবিত্রতা রক্ষা করতে।

সেই মুহূর্তে প্রফেসরের চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল প্রাচীন মিশরের পুরোহিত-তন্ত্র। মিশর অধিপতি ফারাওকে ঠুঁটো করে এই পুরোহিতরাই অন্তরালে থেকে রাজ্য শাসন করেছেন। এঁরা সিংহাসনের পেছনে থাকতেন। অর্ধ-পশু অর্ধ-নরদের উপাসনা করতেন। অতিকায় সর্পদেবতা সেট, নরখাদক বুবাসটিস, প্রচণ্ড অসিরিস এঁদের সাধনার বলে নাকি মূর্তি পরিগ্রহ করতেন জনগণের সামনে। শৃগাল মস্তক নিয়ে অ্যানিউবিস হানা দিতেন, রক্তলোভী মায়াবী নেকড়ের দল ছারখার করত নিরীহ গ্রামবাসীদের।

নীলনদের কুমীর-দেবতা সেবেক বছরে একবার মেমফিস মন্দিরে দেখা দিতেন। তখন তিনি পুরোহিতদের মতই মানুষের দেহ ধারণ করতেন—মাথা বাদে। কুমীরের বিকট মুণ্ড শোভা পেত সেখানে।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতই এতগুলি চিন্তা ঝলসে উঠল মগজের কোষে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল টেবিলে রক্ষিত কয়েকটি পুঁথির দিকে। পাতলা কাঁচের আধারে রক্ষিত প্যাপিরাস পাতার জীর্ণ পুঁথি। দেখেই চিনেছিলেন প্রফেসর। প্রেততত্ত্বে অপরিসীম আস্থা না থাকলে মড়া-জাগানো মন্ত্রে ঠাসা এ পুঁথি কেউ কাছে রাখে না। প্রফেসর জানেন, প্রাচীন মিশরীয়রা জীবন-রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছিলেন। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যেকার চোরাগলির সন্ধান তাঁরা জানতেন। মামীরূপে দেহপিঞ্জরকে রক্ষা করা হত এই কারণেই। যে-কোনো মুহূর্তে সে দেহে জীবনের সঞ্চার যাতে ঘটতে পারে—তার মন্ত্রমালার আয়োজনও থাকত প্যাপিরাসের ঐ পুঁথিতে। যে মন্ত্রের প্রতিটি শব্দোচ্চারণের সংগে সংগে মৃতদেহের পদধ্বনি শোনা যায় শুষ্ক, জীর্ণ, ভঙ্গুর মামীদেহও।

প্রফেসরের ত্রাসবিস্ফারিত চোখের মণিকায় চিন্তার বিদ্যুৎ-চমক বোধহয় দেখা গিয়েছিল। পিস্তলের নলচের মত চাহনি মেলে দেখছিলেন পাশানবিস। প্রফেসর চোখ ফেরাতেই বললেন—"চিনতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ" প্রফেসরের শুকনো গলায়-এর বেশী আর কথা ফোটে নি।

পাশানবিস।

"জেডফলকে যা লেখা আছে তা পুরোহিতদের সাংকেতিক হরফ। খুব সম্ভব "নাকলা।" মানে? সাংঘাতিক। লোম খাড়া হয়ে যায় শুনতে শুনতে।" কাষ্ঠহাসি হাসলেন পাশানবিস।

"এ মামী পেলেন কোথায়?"

"সোজা পথে নয়," নিগূঢ় হাসি হাসলেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভেতর থেকে অজ্ঞাত একটা পিরামিডের অতল অন্ধকারে ছিল এই মামী। সেবেক-এর পুরোহিত। আনতে গিয়ে অবশ্য দুর্ঘটনা ঘটেছে। ক্যারাভান-এর ন'জন লোক মারা যায়। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। তাতেও ঘাবড়াই নি। এখন এ মড়া আমরা জাগাবো, আমার ঘুম পাড়াবো। আপনি সাক্ষী।"

প্রফেসর ঢোক গিলে বললেন—"সেবেক-এর তৃতীয় পুরোহিতের মামী যে বার করেছিল, তার কি হাল হয়েছিল জানেন তো?"

"জানি," আগের মতই বেপরোয়া হাসবার চেষ্টা করলেন পাশানবিস। "লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় সেতুতে দাঁড়িয়ে কুমীর দেখছিলেন। হঠাৎ পড়ে যান নীচে। উদ্ধার করার পর দেহটা চেনারও উপায় ছিল না।"

মনে পড়ল ঠিক তখনি।

খাবার আগে কুমীর-মুখোশ পরা সেই লোকটার কথা এতক্ষণ মনে ছিল না প্রফেসরের। পাশানবিসের শেষ কথাটা শোনবার সংগে সংগে মনে পড়ল সেবেক—পুরোহিত-বেশী সেই বিকটদর্শন লোকটা আচম্বিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল অত ভিড়ের মাঝে।

কথাটা বললেন প্রফেসর। তৎক্ষণাৎ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল পাশানবিস। বাকী চারজন সটান দাঁড়িয়ে উঠল। মুখভাব দেখা না গেলেও বোঝা গেল পাশানবিসের চাইতেও তাদের অবস্থা সঙ্গীন।

ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন পাশানবিস —"ঠিক দেখেছিলেন তো?"

সবেগে ঘাড় নাড়লেন প্রফেসর।

"কিন্তু আজকে কোনো সদস্যই তো এ বেশ পরে নি—এ মুখোশ আনে নি;" বললেন পাশানবিস।

"বাইরের ঠগ নয় তো? ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টাও হতে পারে," দুর্বল কণ্ঠে বলেন প্রফেসর।

চার সংগীকে দ্রুতকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন পাশানবিস। এক্ষুণি তল্লাস করা হোক তন্ন তন্ন করে। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে বহুরূপী জালিয়াত। ঘাড় ধরে যেন এখনি নিয়ে আসা হয় এখানে।

"পুলিশে খবর দিলে হয় না?" চার গবেষক ত্বরিতপদে উধাও হতেই বলেছিলেন প্রফেসর।"

রাজী হন নি পাশানবিস। রক্তহীন মুখের পাণ্ডুরতা বরং আরো বেড়েছে।

মৃদু শব্দটা শোনা গেল অল্পপরেই।

চকিতে চৌকাঠের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রফেসর। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই মূর্তি।

জ্বলন্ত বিভীষিকা। কুমীরমুখোশপরা সেবেক-পুরোহিত। জ্বলন্ত চাহনি নিবদ্ধ পাশা-নবিসের দিকে।

মমীর পাশেই হুমড়ি খেয়ে বসে পড়েছিলেন পাশানবিস। থর থর করে কাঁপছিল আপাদমস্তক। শামুকের মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল দুই চোখ। নিঃসীম আতংকে নীল হয়ে এসেছিল মুখ।

পাশেই শবাধারে জ্বল-জ্বল করছিল জেড পাথর। ফলকে খোদাই কুমীরমূর্তি। সাংকেতিক হুঁশিয়ারি। নীচে সেবেক-পুরোহিতের আত্মাহীন মমী।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জীবন্ত সেবেক-পুরোহিত। সেই লোক। যাকে ছায়ার মত দেখেছিলেন কিছু আগেই—পরক্ষণেই মিলিয়ে গিয়েছিল বাতাসে।

আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর —"এই তো........এইতো সেই........."

কথাটা শেষ হয় নি। মুহূর্ত মধ্যে ঘাড়ের ওপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎরেখা খেয়ে গেল। অদ্ভুত সরীসৃপ ভঙ্গিমায় মূর্তিমান প্রহেলিকা-বেশী আততায়ী ছুটে গেল পাশানবিসের সামনে। দীর্ঘ বক্র নখরযুক্ত কাঁড়াশী আঙুলে চেপে ধরল ঘাড়ের মাংস। আতংকে যেন কৃমিকীটের মত কুঁচকে গিয়েছিলেন পাশানবিস। গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। নিমেষে মুখোশধারীর মুখোশ নেমে এল কণ্ঠনালীর ওপর। দ্বিধাবিভক্ত হল চোয়াল। দেখা গেল সারি সারি ধারালো দাঁত। পরমুহূর্তেই বন্ধ হল চোয়াল, স্তব্ধ হল পাশানবিসের ঘড়ঘড়ানি।

প্রফেসর সেই মুহূর্তে একটা সম্ভাবনাই ভেবেছিলেন। হত্যার আজব হাতিয়ার। মুখোশের আড়ালে ছুরির সারি। কামড়ে কণ্ঠনালী ছিন্ন করার নৃশংসপন্থা।

ভাবনার সংগে সংগে হাত বাড়িয়েছিলেন প্রফেসর। একহাতে লোকটার ঘাড় খামচে ধরে আর একহাতে কুমীর-মুখোশ ধরে টেনে তুলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঝটকান দিল লোকটা। পিচ্ছিল মুখোশের ওপর দিয়ে হাত পিছলে চলে এল নাকের ওপর।

পরের সেকেণ্ডেই পাশানবিসকে ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল হত্যাকারী। ফিরেও তাকালো না প্রফেসরের দিকে। প্রফেসর শুধু দেখলেন, রক্তাক্ত চোয়াল আর রক্তঝরা দাঁতের সারি। নিমেষে সেই আশ্চর্য সরীসৃপ-ক্ষিপ্রতায় দোরগোড়ায় পেঁছোলো লোকটা এবং অন্তর্হিত হল বাইরে।

বোধহয় সেকেণ্ডখানেক থ' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর। অসম্ভব অবিশ্বাস্য সত্যটা উপলব্ধি করতে একটি সেকেণ্ডই যথেষ্ট। মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রফেসর বুঝেছিলেন চরমতম অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল তাঁরই সাক্ষাতে—প্রমাণ তাঁর মুঠোয় ধরা দিয়েই উধাও হল চকিতে।

পরক্ষণেই দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়োলেন প্রফেসর। কারও সংগে দেখা করলেন না, কথা বললেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সাক্ষাৎ নরক থেকে দূরে সরে যাওয়া ছাড়া মাথায় আর কোনো চিন্তাও ছিল না। এ-ঘর সে-ঘর পেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে কোথায় গিয়ে যে হোঁচট খেলেন, সে জ্ঞানও রইল না। তারপর বিদেশী মাতাল ভেবে এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে পেঁছে দিয়ে গেল হোটেলে।

পরের দিন কাউকে কিছু বললেন না প্রফেসর। এমন কি পাছে কাগজ খুলে কাল রাতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পড়তে হয়— তাই কাগজও পড়লেন না। তল্পিতল্পা করে সেই দিনেই কায়রো থেকে পালালেন। এলেন কলকাতায়। আর কুমীর-মুখো হন নি উত্তরজীবনে।

কারণ, প্রফেসর সেদিন মুঠোর মধ্যে ধরেও যা ধরতে পারেন নি—তা আজও ভুলতে পারেন না। আজও নিশার আতংকে চমকে ওঠেন। দুঃস্বপ্নের ঘোরে ককিয়ে ওঠেন। শুধু স্পর্শ পেয়েছিলেন প্রফেসর। ক্ষণিকের ছোঁয়া লেগেছিল কুমীরমুখে। একপলকেই তাঁর যুক্তিবুদ্ধির শক্ত নিগড় চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অবিশ্বাসের আগল ভেঙে গিয়েছিল। অলৌকিক ঘটনার চরমতম প্রমাণ হাত দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রফেসর মুঠোর মকুীরমুখ ধরে ভেবে-ছিলেন মুখোশ ধরেছেন। টান মেরে মুখোশ খোলবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু হাত পিছলে গিয়ে ঠেকেছিল লম্বা নাকে। মুঠোর মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন এমন একটি জিনিস—যা কোনো মুখোশে থাকে না।

থাকে সজীব দেহে। রক্ত-মাংসের মুখে। মুখোশ কি প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়? হয় না।

কিন্তু প্রফেসরের মুঠোয় সেই ভয়ংকর রাতে যা ধরা পড়েছিল, তা রক্ত-মাংসের জীবন্ত নাক! কুমীর নাক।

রশ্মির সাহায্যে গাড়ি চালানো

লাসের রশ্মি অন্যতম চিত্ত-চমৎকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। মানুষ যে চাঁদে যাওয়া নামক অপচয়ের নেশাতেই কেবল মশগুল নয়, মাটির পৃথিবীতে বসবাস আর একটুখানি সহজ করার দিকেও তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থেমে নেই, এই ধরণের আবিষ্কার তার মস্ত বড় প্রমাণ।

ভবিষ্যতে দূর নিয়ন্ত্রণ নীতিতে লাসের রশ্মির সহয়তায় গাড়ি চালানো সম্ভব হবে। এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে, একটা খেলনা গাড়ি এর সাহায্যে চালানর পর। ওতে ছিল একটা 'ফটো-ডিটেক্টর ইনটেন্সীফায়ার'। লাসের রশ্মি সোজা পড়লে গাড়িও চলে সোজাসুজি' এ রশ্মির দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িরও দিক পরিবর্তিত হচ্ছিল। সুতরাং এই রশ্মির সাহায্যে নিরাপদ গাড়ি চালানো যাবে বলেই আশা করা যায়। য়ুরো-আমেরিকায় গাড়ি নিরাপদে চালানো দুর্ঘট। আমাদের শহরগুলোতেও দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কাজেই, জন-নিরাপত্তার খাতিরেই এক্ষেত্রে প্রচুরতর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। লাসের রশ্মি সঠিক পথে পদক্ষেপের অন্যতম উদাহরণ।

মেঘালয়ের দেশে

রবিরতন ভৌমিক

প্রকৃতির কোলে গারো-খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় পরিবেষ্টিত সীমান্ত রাজ্যের নাম মেঘালয়। ২রা এপ্রিল, ১৯৭০ সাল। মেঘালয়ের নবজন্ম হলো আজ। আমাদের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে ঘোষণা করলেন 'মেঘালয়' রাজ্যের জন্ম। সত্যিই মেঘালয়। যত্রতত্র মেঘের নীল্-খোলা বিচরণ নীল নভতলে, আর চলে অবাধ সন্তরণ রাজহংসের মতো অনন্ত-হীন নীল নভতলে। প্রকৃতির সুনিবিড় আঁচল-ছায়ায় এই মেঘালয়। কী অপরূপ মুক্ত-পাখী চিরমুক্ত মন। চারিদিকে শুধু মেঘ আর মেঘ। মেঘের কোথাও নেই শেষ। দিনরাত শুধু মেঘেরই খেলা দু'চোখ ভ'রে দেখতে হয়। পাহাড়-পর্বত, নদী, নালা, তরুলতা, বন-উপবন, পথ-ঘাট, মানুষ, পশু, পাখী, কীট-পতঙ্গ সব কিছুকেই মুক্ত বিচরণশীল মেঘেরা সোহাগভরে কোলাকুলি দিয়ে যায়, চুম দিয়ে যায় মুখে। একদিকে সুদূর বাহু প্রসারিত গারো পাহাড়, অপর দিকে খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়—এরই মাঝখানে মেঘালয় রাজ্য বিরাজিত।

মেঘালয়ের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় অবিস্মরণীয় মহাকবি কালিদাসের অমর মহাকাব্য "মেঘদূতম্"কে। অবিস্মরণীয় মহাকবি কালিদাসকে কেউ ভুলে যায় নি। মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূতম্"-এর ভাবধারা অবলম্বন করে গারো-খাসি ও জয়ন্তিয়া পরিবেষ্টিত পাহাড়ী রাজ্যের নামকরণ করা হ'লো মেঘালয়। সত্যিই যুক্তিযুক্ত নাম "মেঘালয়।"

মেঘালয়ের নবজন্মের [illegible] সঙ্গে নবজাতককে দেখবার বাসনা নিয়ে ছুটে এলাম শহর থেকে বহুদূরে কোলাহল থেকে নির্জনে, একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রকৃতির কোলে বিরাজিত মেঘালয় রাজ্যে। গারো পাহাড়, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের কোলে চিরখ্যাত অপরূপ দৃশ্যেভরা শিলং এবং পৃথিবীখ্যাত অত্যধিক বৃষ্টির দেশ চেরাপুঞ্জী, অদূরে সোবার-পুঞ্জী এবং ভারতের শেষ সীমান্ত শেলা অঞ্চল। সোবারপুঞ্জী ও শেলা থেকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় অদূরে ৬।৭ মাইলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দৃশ্য তথা ছাতক ও সিলেট দেশ। শিলং-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোমুগ্ধকর এবং অতি অপরূপ। সুনিবিড় ঝাউবনে ও পাইনবনে সাড়া জাগিয়ে যায় উন্মুক্ত হাওয়া, ওয়ার্ডলেকের জলে ঢেউ খেলে যায় চঞ্চল হাওয়া। পাহাড় আর পাহাড়। আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু পথঘাট। আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু পথের দুই ধারে সুনিবিড় ঝাউবন, পাইনবন এবং পাহাড়ী নানা গাছপালা, তরুলতা ও নানান রঙের ফুলের গাছপালা। পাহাড়ের কোলে শত শত পাহাড়ী নদী হিংস্র গর্জন ক'রে সমতলের দিকে ছুটে চলেছে। পাহাড়ের বুক চিরে অজস্র ওয়াটার-ফল্স্ অবিরাম গান গেয়ে চলেছে। বর্ষাকালে পাহাড়ের ওয়াটারফল্স্-গুলোর প্রতিধ্বনি বেজে যায় এবং [illegible] যাত্রা [illegible] শোনা যায়

পাহাড়পুরে নিয়ত কর্মমুখর শিলং—মেঘালয়ের রাজধানী। পাহাড়ী আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু পথে-ঘাটে অবিরাম চলছে কতো কতো বাস, মোটরগাড়ী আর টেক্সি। আর চলছে অনবরত সীমান্তরক্ষী মিলিটারী সৈন্যদলের গাড়ী-ঘোড়া। চেরাপুঞ্জীর প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি অপরূপ মনোমুগ্ধকর। নীরব-নিঝুম-নির্বাক পাহাড়গুলো শুধু বোবার মতো চেয়ে চেয়ে দেখে।

আকাশ ও পৃথিবী যেন এখানে এক—যেন এক মহামিলন ক্ষেত্র। অহরহ শুভ্র মেঘের দল পাহাড়গুলোকে ঢেকে ফেলে তার মায়াজালে। পথ-ঘাট চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। ঘন ঘন নেমে আসে মুষলধারায় বৃষ্টি। সকল দিক অন্ধকার। আতঙ্ক জাগায় মনে-প্রাণে বজ্রের নিনাদ। মেঘেরা সোহাগ-ভরে পৃথিবীকে চুম দিয়ে যায়—কোলাকুলি দিয়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবী যেন কতো আপনার জন। হঠাৎ সূর্য ওঠে, ক্ষণিক হাসির ঝিলিক দিয়ে যায়। বর্ষণমুখরিত বিধৌত চেরাপুঞ্জী। এমনি ঝড়-বাদলের মধ্য দিয়ে চলে পাহাড়ীদের জীবনের যাত্রাপথ। ঝড়-বৃষ্টি পাহাড়ীদের চির-কালের সাথী।

পাহাড়ের কোলে কোলে নীল আকাশের নীচে যেন দেবতার নৈবেদ্য সাজানো কাঠের তৈরী কাঁচের তৈরী, টিনের চালের নানান রঙীন ছোট-বড়ো সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী। অপরূপ ছোট—বড়ো ঘর-বাড়ীগুলো। চারি-দিকে শ্যামলিমা ঘেরা সুনিবিড় পাহাড়ের কোলে ঘন বনের মাঝে কাঠের ও খড়ের তৈরী ছোট ছোট ঘরে বাস করে পাহাড়িয়া জাতি, গারো-খাসি ও জয়ন্তিয়ার অধিবাসীরা। পাহাড়িয়া জাতিরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। পাহাড়ের জঙ্গল থেকে নিয়ে আসে পাহাড়ী কলা, পেঁপে, সুপারী, কাঁঠাল, পান, শশা, কমলা লেবু, আনারস, আখ এবং নানাবিধ

ফল-পাকড় বিক্রয়ের জন্যে সপ্তাহের হাটে। পাহাড়ের দেশে সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসে। আবার কেহ নিয়ে আসে পাহাড়ী কাঠ বিক্রয়ের জন্যে। এই হাটে সকলের সাথে হয় মহামিলন, কতো আলাপ-পরিচয়, বন্ধুতা। বিরাট হাট। কতো কী দোকানপাট। মণিহারী দোকান, চা-পান-সিগারেটের দোকান, মুদীখানা, শুখনো মাছের দোকান, মাছ-মাংসের দোকান, আনাজকলির দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, মিষ্টির দোকান। কোনো কিছুরই অভাব নেই এখানে। সবই খাসিয়াদের দোকান। প্রচুর লোকজনের কোলাহলে মেতে ওঠে পাহাড়ীদের হাট। পাহাড়ী মেয়েরা তথা খাসিয়া মেয়েরা রূপ-লাবণ্যেভরা যেন মেঘালোকের অপ্সরী তন্বী যুবতী। সত্যিই মেঘালয়ের মেয়েরা অপরূপ সুন্দরী-যেনো অপ্সরী উর্বশী। সুঠাম কোমলদেহ, ডালিম ফুলের মতো রাঙা পুরু ঠোঁট, গোল-গাল লাল মুখ, উঁচু-উঁচু প্রসারিত বক্ষ-খাসিয়া যুবতী সত্যিই মেঘালয়ের অপ্সরী। অঙ্গসজ্জায় সাজে অহরহ। অপরূপ কেশবিন্যাস। পরনে জড়ানো দুটি রঙীন কাপড় আলখাল্লার মতো—বিলিতি মেম সাহেবদের মতো। গলায় ঝুলানো চামড়ার ব্যাগ—তা'তে ভরা পান-সুপারী। পান-সুপারী সর্বদাই এরা খেতে ভালোবাসে। পাহাড়ী জাতিরা ভাত, মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি খায়। মাংসই হচ্ছে এদের প্রধান খাদ্য। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়েই পাহাড়ী ছেলে-মেয়েরা তথা খাসিয়া-গারো-জয়ন্তিয়ার ছেলে-মেয়েরা কেউ যায় হিন্দু মিশন স্কুলে, আর কেউ যায় খৃষ্টান মিশনারী স্কুলে। পাহাড়িয়া জাতিরা একতাবদ্ধ, শান্তিপ্রিয় এবং ভদ্র। জীবন তাদের শান্তিপূর্ণ। নিঃসঙ্কোচে মুক্ত পাখীর মতো গারো, খাসি-জয়ন্তিয়ার পুরুষ-নারী সবাই শান্তিতে পথে-ঘাটে চলাফেরা করে। মনে-প্রাণে নেই তাদের কোনো আতঙ্ক দেহ-মন-প্রাণ অপরিসীম আনন্দে ভরা।

বিদেশী আগন্তুক পাহাড়িয়া ভাষা কিছু না জানলেও, যদি কোন পাহাড়ী ছেলে-মেয়েকে 'খুবলেই' ব'লে সম্বোধন করে—তক্ষুণি তারা এক গাল হেসে প্রতিউত্তর জানায়—অভিনন্দন জানায় খাসিয়া ভাষায় "খুব্লেই"। খাসিয়া ভাষায় "খুব্লেই" শব্দের অর্থ হ'ল —গুড মর্ণিং অর্থাৎ সুপ্রভাত। "খুব্লেই' বলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন-প্রাণ আনন্দে ভ'রে যায়।

এই রোদ, এই বৃষ্টি, এইভাবে চেরাপুঞ্জীর, সোবারপুঞ্জীর, শেলার এবং বিভিন্ন স্থানের দিনগুলো কেটে যায়। জল-ঝড়-বৃষ্টিকে নিয়ে চলে পাহাড়ীদের জীবনের জয়যাত্রা। এরা হিংস্র, এরা তেজী, এরা সাহসী—ভয়কে পদদলিত ক'রে এরা বাস করে পাহাড়ের পাদদেশে নিভৃত অরণ্যের মাঝখানে। নিশীথ রাতের তারার আলো দেখে তাদের দেহ-মন-প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। পাহাড়ের শত শত গরজগুলোতে আটক-পড়া মেঘেরা নিমেষে ভিজিয়ে দিয়ে যায় পাহাড়তলী। মেঘেরা সৌধ গড়ে নিজেদের খেয়ালখুশী মতো। সন্ধ্যা-সূর্য আবির ঢেলে চলে যায় পশ্চিমাচলে। আঁধারের ছায়ায় ঘুমিয়ে রয় চেরাপুঞ্জী, শিলং, সোবারপুঞ্জী, শেলা এবং পাহাড়-ঘেরা অপরূপ মেঘালয়। মোরগের ডাকে তন্দ্রার ঘোর কেটে যায়—চারি-দিকে নয়ন মেলে দেখি, চিরমুক্ত শ্বেত বলাকার মতো বিচরণশীল পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘের অপরূপ লীলা-খেলা নীল আকাশের নীচে। ধন্য মেঘালয়। অপরূপ তোমার রূপ। শুধু মেঘ আর মেঘ—অপরূপ তুমি মেঘালয়। কবির কবিতার ছন্দে মনকে দোলা দিয়ে যায়।

'শুধু মেঘ আর মেঘ—অনুপম মেঘালয়,
মেঘেরা সোহাগ ভরে কতো করে পরিচয়।
আকাশ পৃথিবী এক, অতি আপনার জন,
মেঘেরা সোহাগভরে সদা করে আলিঙ্গন।
মেঘেরা ঢোলক বাজায় আনন্দে ওই চলে,
ঐ যে ওড়ে বিজয় কেতন আকাশের তলে।
মেঘেরা হাসে ও খেলে, কোলাকুলি দিয়ে যায়,
মন-পাখী উড়ে যায় অনন্তের পানে হায়।

গুরুভ্রাতাগণের দৃষ্টিতে স্বামীজী

"আম্‌রা ও মায়ের (শ্রীশ্রীমায়ের) মুখে শুনে জানতে পারি যে, নোরেন-ভাই ও দশে (আমেরিকা) গেছে। নোরেনভায়ের খবর শুনবার জন্য আমার মন কেমন করতো। ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলেই বলতে লাগলো—'ঠাকুর কি পাগলপনা কোরে গেলেন!' বাকী রাখবে সে কথা মানতে চাইতুম না। সকলকেই বলে দিতুম—'তিনি (ঠাকুর) যখন বলেছেন, তখন একদিন না একদিন নোরেনভাই আমাদের সবাইকে উঁচিয়ে যাবে—তখন দেখবে।' তিনি (ঠাকুর) বলতেন—'ওর দ্বারা বড় বড় কাজ হবে,' আর তোমরা কিনা তাঁর কথায় সংশয় আনছো। তাঁর কথা কি কখনও মিথ্যা হোতে পারে? —শেষে যখন স্বামীজীর কর্মটি ওদেশে প্রকাশ পেলে তখন আমার যে কি আনন্দ হোলো কী বলবো"।

—স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

ছোটদের আসর

ছাত্র নরেন

অধ্যাপক

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

স্বামীজীর নাম তো তোমরা শুনেছ। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল বীরেশ্বর। আদর করে কেউ বলত বিলে। ভাল একটা নামও ছিল। নরেন্দ্রনাথ দত্ত। লোকে বলত নরেন। এই নামেই আমরা তাঁকে ডাকব।

নরেন তো ছ' বছর বয়সে গুরু-মশাইয়ের পাঠশালায় ভর্তি হ'ল। ওদের বাড়ীর মধ্যেই ঠাকুরদালানে পাঠশালা বসে। ওদের বাড়ীর কয়েকটি ছেলে, আর পাড়ার কয়েকজন মিলে এই পাঠশালায় পড়ে।

নরেনের পড়াশোনার কায়দাই আলাদা। গুরুমশাই পড়া বলে যান। ও কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বলে না। ও মাদুরের ওপর চোখ বুজে বসে আছে। অথবা কাত হয়ে শুয়েই আছে।

গুরুমশাই গেলেন ভীষণ চটে। ভাবলেন---ছোঁড়া তো আচ্ছা! পড়াশুনোয় মন নেই একেবারে।

তিনি রেগে কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন---বল্ তো নরেন, কি পড়া দিলাম। ওমা, একি তাজ্জব কাণ্ড। নরেন চট্‌পট্ সব পড়া বলে দিল। গুরু-মশাই যা বলেছিলেন, একটুও বাদ পড়ালোনা।

গুরুমশাইর তো ভুল ভাঙলো। তিনি দেখলেন---ও শ্রুতিধর। মানে কি কথাটার? যে একবার শুনেই সব কিছু মনে রাখতে পারে। আর তাছাড়া, নরেন যখন গুরুমশাইর পড়া শুনছিল, খুব এক মনে শুনছিল। বসে থাকলে কি হবে, মন খুব একাগ্র।

আরেকদিন। নরেন তখন বিদ্যাসাগর মশাইর মেট্রোপলিটান ইস্কুলে পড়ে। ইস্কুলের ক্লাশে একদিন মাস্টার মশাই গেলেন খুব রেগে। নরেনটা পেছনে বসেছে। আর মাঝে মাঝেই পাশের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছে। ভারী অন্যায়। মাস্টার মশাই খুব কড়া শাসনের সুরে অন্য ছেলেগুলোকে পড়া জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ছেলেগুলো তো ছিল অমনোযোগী। পড়া শুনলে তো বলবে। কেউ পড়া বলতে পারলো না। মাস্টার মশাই এবার নরেনকে জিজ্ঞেস করলেন---তুমি বল তো ছোক্‌রা, কি পড়াচ্ছিলুম?

নরেন তো সঙ্গে সঙ্গে সব পড়া চট্ করে বলে দিলে। মাস্টার মশাই ভাবেন, কি অদ্ভুত ছেলে! নরেনটাও তো কথা বলছিল। কিন্তু সব পড়া বলে দিল যে! মাস্টার মশাই ভাবেন---ওর কি দু'টো মন আছে নাকি?

এনট্রান্স পরীক্ষা প্রায় এসে গেল। এখন যেটা স্কুল-ফাইন্যাল, তখন সেটাই ছিল এন্‌ট্রান্স। নরেন তো পড়লো মহা বিপদে। জ্যামিতি যে কিছুই পড়া হয়নি। ইউক্লিডের জ্যামিতি, চারখণ্ড বিরাট বিরাট বই। সব ক'টাই যে বাকী। পরীক্ষার তিন-চার দিন মাত্র দেরী। নরেন তো প্রতিজ্ঞা করে বসলো---জ্যামিতি শেষ না করে আর উঠবে না। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত করবে না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। পড়তে বসে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা একটানা পড়বার পর দেখলো---ইউক্লিডের চারখণ্ড জ্যামিতি বই তার একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে।

পরীক্ষার আগে আরো এক বিপত্তি। দু' বছর নরেন কলকাতায় ছিল না। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামে জায়গায় বাবার সঙ্গে ছিল। সেখানে ইস্কুল নেই। কাজেই দু'বছর ইস্কুলে যাওয়া হয়নি। কলকাতায় ফিরে আসার পর ইস্কুলের মাস্টার মশাইরা তো কিছুতেই ওকে পরীক্ষা দিতে দেবেন না। শেষে অনেক বলা-কওয়ার পর তাঁরা রাজী হলেন। নরেন দু'বছরের পড়া এক বছরের কম সময়ে শেষ করে ফেললো।

পরীক্ষা তো হ'ল। সবাই ভাবলো---নরেন কিছুতেই পাশ করতে পারবে না। ফল বেরোল। দেখা গেল---নরেন একেবারে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ। ওদের

ইস্কুলে ওই একমাত্র ফার্স্ট ডিভিশনে গেল। সবাই তো অবাক।

নরেনের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত খুশী হয়ে ছেলেকে একখানা দামী ঘড়ি উপহার দিলেন।

তারপর নরেন ভর্তি হল কলেজে। কত বই সে পড়ে ফেলে। দর্শনের বই, ইতিহাসের বই, সাহিত্যের বই। কলেজের অধ্যাপকদের এমন নতুন নতুন প্রশ্ন করে যে, তাঁরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাস্টি সাহেব তো একদিন বলেই ফেললেন, নরেনের মত ছেলে তিনি ভূ-ভারতে দেখেন নি। ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

তাহলে কি হবে। নরেন তো শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর করে পড়াই মুখস্থ ক'রে না। ও ভাবতেই পারে না— ছেলেগুলো দিনরাত পড়ছে তো পড়ছেই। কিন্তু মনোযোগ নেই। কিছুই বোঝবার চেষ্টা নেই। কেবল মুখস্থ করবার চেষ্টা। ও তে কি শিক্ষা হয়? নরেন একথা ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে যায়।

ওতো শুধু মুখস্থ করে না। যেটুকু পড়ে খুব একাগ্র মনে পড়ে। আর যেটুকু পড়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে। এমন কি সমস্ত অর্থ বুঝবার জন্যে সে গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। তাই কত সহজেই তার পড়া হয়ে যায়।

বাকী সময়টা কি করে। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ। ও অবশ্য কোন খারাপ আমোদ-প্রমোদ আমল দেয় না। বিশ্রী আলোচনার ধারেকাছেও নেই। ওর আনন্দ হ'ল তর্কে। তর্কে এমন সব যুক্তি দেখায়, বন্ধুরা একেবারে স্তব্ধ। আর গান। এমন গলা। মিষ্টি গলায় একমনে গান গায়। গানের জন্যে বন্ধুরা ওকে ঘিরে থাকে।

ও বি-এ পরীক্ষার আগে বাড়ীর পাশেই দিদিমার বাড়ীতে জায়গা নেয়। ওখানে দোতলায় একটা ছোট্ট কোঠা। একেবারে নির্জন। ওটার পাশে আরেকটা ঘর আরো ছোট্ট। সেখানে মাঝেমাঝে ঢুকে পড়াশোনা করে। ওখানে ঢুকবার একটামাত্র ছোট জানলা-মত। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হ'ত। এই ঘরটার নাম দিয়েছিল নরেন কি জানো? টঙ্। এই টঙেই তার দিনের অনেক সময় কাটে। শুধু খাবার সময় বাড়ী যায়। তাছাড়া এই ঘরে বসে ও অধ্যয়নের তপস্যা করে। ঘরে একটামাত্র তক্তপোশ। উপরে একটা ছেঁড়া মাদুর। ময়লা একখানা বালিশ। আর ঘরের এককোণে পড়ে আছে একখানা তানপুরা। আর একজোড়া বাঁয়া-তবলা। ব্যাস। আর কিছু নেই। শুধু বইপত্তর। নরেনের টঙে মাঝে মাঝে এসে বন্ধুরা হাজির হয়। তখন পড়া বন্ধ। শুরু হয় গান-বাজনা। গান গাইতে গাইতে কোথা দিয়ে সময় চলে যায়, বোঝাই যায় না। বন্ধুরা চলে গেলেই আবার শুরু হয় পড়া।

বি-এ পরীক্ষার আগে। এক বন্ধু নরেনের। নাম হরিদাস। হরিদাস বড় গরীব। সে পরীক্ষার জন্যে শুধু ফি-টা কোনরকমে যোগাড় করেছে। কিন্তু কলেজের মাইনে বাকী একবছরের। তখন ও রকম বাকী রাখা যেত মাইনে। কিন্তু পরীক্ষার আগে সব শোধ করে দিলেই হ'ত। কলেজের কেরাণীর নাম ছিল রাজকুমার। তার হাতে ছিল ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে আদায় করার ভার। কেরাণী হলে কি হবে—ওর বেশ ক্ষমতা। কোন ছেলের যদি মাইনে দেবার ক্ষমতা না থাকতো, তবে তা অনুসন্ধান করে দেখার ভারও ছিল তারই ওপর। খোঁজ নিয়ে দেখে ইচ্ছে করলে ও নিজেই কোন ছেলের মাইনে মাপ করে দিতে পারত। ছেলেরাও ওকে তাই ভালোবাসে। ও নিজেও লোক মন্দ নয়।

হরিদাসকে নরেন বললো—ভয় নেই তোর। রাজকুমারকে বলে আমি তোর মাইনে মাপ করিয়ে দেবো। নরেনকেও রাজকুমার খুব ভালবাসত। কলেজের সেরা ছাত্র নরেন। তাকে সবাই তো ভালবাসে।

তারপর একদিন নরেন গেল রাজকুমারের কাছে। ওর কাছে তখন অনেক ছেলে দাঁড়িয়েছিল। সবাই একটা না-একটা আবেদন নিয়ে এসেছে। কেউ মাইনে দিতে পারছে না, কেউ ফি দিতে পারছে না। নরেন ওকে বললো—মশায়, হরিদাস খুব ভাল ছেলে। ও মাইনে দিতে পারছে না। ওকে মাইনেটা মাপ করে দিতে হবে।

রাজকুমার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জবাব দেয়—তুমি কেন এসেছ ছোকরা মোড়ল-দালালি করতে। মাইনে না দিলে আমি এবার কিছুতেই ওকে পরীক্ষা দিতে পাঠাবো না।

কথা শুনে তো হরিদাসের মুখ মলিন। নরেন বলে—মন খারাপ করিস্ নে। ও বুড়ো ওরকম বলে। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার সময় নরেন হেদোর কাছে এক গলির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। এদিকে হয়েছে কি, রাজকুমারের একটু নেশার অভ্যেস ছিল। এ গলিটার ভেতরে ছিল এক গুলির আড্ডা। সন্ধ্যার পর তো বাবু আস্তে আস্তে এদিক-সেদিক তাকিয়ে গলির ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে ও মা, একি! সামনে দু'হাত ফাঁক করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে নরেন। রাজকুমার তো গেল ভড়কে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ত্যে-ত্তো করে বলে---কি দত্ত, তুমি এখানে।

নরেন বলে—আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। মশায়, হরিদাসের মাইনেটা মকুব করবেন কি না বলুন। নইলে, আপনার এই নেশার কথা আমি সবার কাছে ফাঁস করে দেবো।

রাজকুমার নরেনের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—ওজন্যে ভাবনা নেই। সে হয়ে যাবে'খন, সে হয়ে যাবে'খন।

নরেন বলে---তাহলে তখন আপনি আমাকে ওভাবে অপমান করলেন যে।

রাজকুমার বলে—ওকথা কি অত লোকের সামনে বলতে আছে! তাহলে ছেলেগুলো সব যে চেপে ধরবে! বলবে —মশায়, ওকে মাপ করলেন, আমাদের করবেন না কেন?

নরেন শুধোয়—তাহলে হরিদাসের মাইনে মকুব?

সে জবাব দেয়—হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরীক্ষার ফি-টা দেবে তো? তাহলেই হলো।

রাজকুমার নরেনের হাত থেকে ছাড়া পেলে বাঁচে। নরেনও তখন পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুড় সুড় করে সে গুলির আড্ডায় ঢুকে পড়ে। নরেন আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসে। তারপর মহানন্দে গিয়ে হরিদাসকে জানায় সুখবর। হরিদাসের মুখে ফুটে ওঠে হাসি।

বি-এ পরীক্ষার দিন সকালবেলা। নরেন ভোরবেলাতেই বন্ধু হরিদাস আর দাশরথির বাড়ীতে গিয়ে হাজির। গান গাইতে গাইতে দরজায় টোকা দেয়।

ওরা তখনো ঘুমোচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। সামনে নরেনকে দেখে অবাক। তারপর শুরু হয় গান। ন'টা পর্যন্ত চলে। পরীক্ষার সময় যে হয় হয়। এক বন্ধু বলে—নরেন পরীক্ষা আজ। সকালবেলাটা এ ভাবে মাটি করছ! কোথায় একটু বইপত্তরগুলো শেষবারের মত ঝালিয়ে নেবে।

নরেন বলে---ওজন্যেই ভায়া এ সব করছি। মাথাটা সাফ করে নিচ্ছি। সারা বছর যদি না পড়া হয়ে থাকে, তবে সকালে ক'পাতা বই উল্টোলেই কী পরীক্ষায় পাশ করে যাবো বরং এখন ওসব করলে সব যাবে গুলিয়ে। তাই মাথাটাকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি।

তারপর ঠিক সময়ে নরেন বন্ধুদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে চললো, খুব আনন্দের সঙ্গে চললো। ওর হাবভাবে পরীক্ষার জন্যে কোন ভয় বা আতঙ্কের চিহ্নমাত্র নেই। —আরণি হইতে

★ জন ও' হারা ★

জন ও' হারা আমেরিকার একজন জনপ্রিয় কথাশিল্পী ছিলেন। জন ও'হারার জন্ম পেনসিল-ভেনিয়ার অন্তর্গত পটস্‌ভিলেতে। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার। আট ভাই- বোনের মধ্যে জন ছিলেন সবচেয়ে বড়।

জন ও'হারা যখন ছাত্র, হঠাৎ তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হল। বাবা কিছু রেখে যেতে পারেন নি, জনকে চাকরীর চেষ্টায় বেরোতে হল। তিনি এক জাহাজে চাকরী পেলেন। কিছুদিন চাকরী করার পর তাঁর এ চাকরী ভাল লাগল না। তিনি জাহাজের চাকরী ছেড়ে দিলেন। জন রেল অফিসে এক চাকরী জোগাড় করলেন। কেরাণীর কাজ। রেল মাশুলের হিসেব রাখতে হয়। কিছুদিন পরে এ কাজকে খড় একঘেয়ে মনে হল। তিনি রেলের চাকরী ছেড়ে দিলেন।

জন ও'হারা এবার নিলেন এক গ্যাস কোম্পানীর চাকরী। তাঁর কাজ গ্যাস মিটারের অঙ্ক রেকর্ড করা। কিছুদিন তিনি চুপচাপ এ কাজ করে গেলেন, তারপর এ চাকরী ছেড়ে দিলেন। তিনি হলেন এক ইস্পাত কারখানার শ্রমিক। এ চাকরীও তিনি বেশীদিন করতে পারলেন না।

জন ও'হারা নিউইয়র্ক মর্নিং টেলিগ্রাফ পত্রিকার নাট্য সমালোচক হলেন। এবার তিনি কলম ধরলেন। তিনি তারপর ক'টি নকশা লেখেন। তাঁর লেখা নকশাগুলো পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করল। এর পর তিনি লিখলেন একখানা উপন্যাস। এই উপন্যাসের নাম 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ইন সামাররা'। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। ১৯৩৪ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হল। তাঁর প্রথম উপন্যাস আশাতীত সাফল্যলাভ করল।

এক বছর পরে তাঁর আর একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হল। এই উপন্যাসটির নাম 'বাটারফিল্ড এইট'। এটি তাঁর আর একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। এর পর তিনি একটানা গল্প এবং উপন্যাস লিখে যান। তাঁর প্রতিটি গল্প, প্রতিটি উপন্যাস খুবই জনপ্রিয়। জন ও'হারা ছিলেন মানব-প্রেমিক। তিনি বহু রকমের কাজ করেছেন, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন, তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কথা জেনেছেন, আর তাদের কথাই তিনি সুন্দরভাবে তাঁর গল্প ও উপন্যাসে লিখে গেছেন। তিনি দীন-দুঃখীর, অসহায়, আর্ত, দুর্গতদের কথা সব সময় চিন্তা করতেন, আর তাদেরকে নিয়েই তিনি লিখেছেন এক একটি গল্প, এক একটি উপন্যাস।

জন ও'হারার একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'টেন, নর্থ ফ্রেডারিক।' ১৯৫৬ সালে এই উপন্যাসটির জন্য তিনি 'ন্যাশনাল বুক' পুরস্কার পান। তিনি পঁয়ত্রিশটির বেশী বই লিখেছেন। তিনি হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। জন ও'হারা পঁয়ষট্টি বছর বয়সে নিজের বাড়ীতে মারা গেছেন।

—শ্রীঅরুণকুমার সেনগুপ্ত

অপরাহ্ণে

—অজিত কর্মকার

মাসিক

বসুমতী

আষাঢ়

১৩৭৭

আলোক চিত্র

ভোরের যাত্রা
—উমেশচন্দ্র জানা

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন; ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন
* ছবি পাঠাবেন এই নামে

—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১২

সাঁঝের কলকাতা
—পি সি ধীর
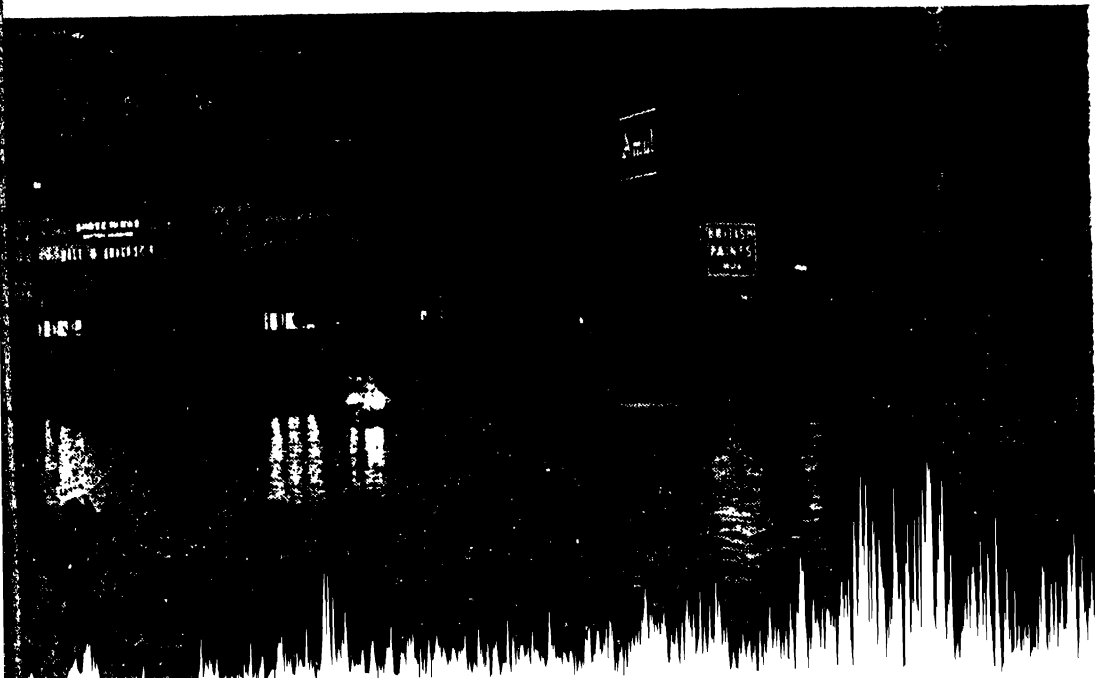
জালবিস্তার
—রামকিংকর সিংহ

মাসিক বসুমতী ।। আষাঢ় / '৭৭

স্নানার্থী
—দেবদত্ত

দেশী ও বিলাতী
—রথীন রায়

মাসিক

বসুমতী

আষাঢ় / '৭৭

★ গল্প হলেও সত্যি ★

ঘরাটিতে রোজই এসে বসেন ভদ্রলোক। তবে সামনের সারিতে নয়। পেছনে যে বেঞ্চি পাতা আছে তাতে। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে হাতে-কাচা মারকিন কাপড়ের পাঞ্জাবি, পায়ে জুতা---তাতে কালি লাগানো হয় নি বোধ হয় বহুদিন। গম্ভীর মুখে ঘরের ভেতর ঢুকে, হাতের লাঠি ও লণ্ঠনটি নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেঞ্চিতে এসে বসেন ভদ্রলোক। তারপর তন্ময় হয়ে শোনেন সাহিত্যের আলোচনা। ভদ্রলোক যেমন লাজুক, তেমনি স্বল্পভাষী। আলোচনার সময় দু-একটা বেফাঁস কথা শুনে মনটা খচ খচ করে বটে, কিন্তু কিছু বলতে ভরসা হয় না। আবার যদিও কিছু বলেন, তা অতি সামান্য। কি জানি, যদি স্বল্পবুদ্ধির কথা সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে---এই ভয়ে।

●

এমনি করে দিন কেটে যায়। ভাগলপুরের বাঙ্গালীটোলার গাঙ্গুলী-বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যায় সাহিত্যের মজলিস বসে, আবার যথাসময়ে ভাঙ্গার পর যে-যার নিজের আস্তানায় ফিরে যায়।

এক মাস নয়, দু' মাস নয়, দেখতে দেখতে ছ' মাস কেটে গেল এইভাবে। সেটা ছিল এক শ্রাবণের সন্ধ্যা। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে মেঘের তোড়জোড় খুব। দুর্যোগের জন্য আড্ডায় সেদিন আর কেউ আসে নি। গাঙ্গুলীবাড়ীর কর্তা অর্থাৎ সাহিত্য-বাসরের মধ্যমণি দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছেন কেউ আসছে কি না?

হঠাৎ রাস্তার বাঁকে দেখতে পেলেন একটা আলো। ক্রমশ যেন সেটা তাঁর বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমটা বিশ্বাস হ'ল না, তারপর নিকটবর্তী হলে তিনি চিনতে পারলেন যে, আগন্তুক তাঁর আড্ডারই লোক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন গৃহস্বামী। তবু কথা কইবার একটা লোক পাওয়া গেল---এই ভেবে।

লাঠি ও লণ্ঠন হাতে আগন্তুক প্রবেশ করলেন ঘরে। দরজা খোলা ছিল। চিরাচরিত অভ্যাসের কোন পরিবর্তন হ'ল না। লাঠিটি দেওয়ালে

স্নেহলতা দেবী

ঠেসিয়ে রেখে, লণ্ঠনটি নামিয়ে, জুতাজোড়াটি খুলে বেঞ্চিতে এসে বসলেন।

গৃহস্বামী কি একটা কাজে ভেতরে গিয়েছিলেন একটু। ঘরে প্রবেশ করে আগন্তুক ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখেই বললেন, ওখানে কেন? সামনে এসে বসুন। আজকে আপনার সঙ্গে গল্প করি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমটা ইতস্তত করছিলেন আগন্তুক ভদ্রলোক। তারপর আস্তে আস্তে এসে বসলেন সামনের চেয়ারে।

গৃহস্বামী বললেন, দেখুন, আমাদের আড্ডায় রোজই আপনাকে আসতে দেখি। অথচ আপনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় হয় নি।

আগন্তুক ভদ্রলোক মুচকে হাসলেন একটু। মুখে কিছু বললেন না।

প্রাথমিক আলাপের পর গৃহস্বামী জিগ্যেস করলেন, এখানে কি করা হয়?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, নরেন-গঞ্জের কাছারিতে একটা চাকরি নিয়ে কোলকাতা থেকে এখানে এসেছি।

সে কি মশাই? কোলকাতা থেকে চাকরি করতে শেষে এখানে এলেন। একটা কিছু ওখানে জুটলো না? গৃহস্বামী বললেন।

ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, চেষ্টা করলে হয়ত একটা কিছু জুটে যেতে পারত। কিন্তু শহর কোলকাতার চেয়ে নির্জন গ্রামই আমার বেশী ভালো লাগে।

সাহিত্য-টাহিত্য কিছু করা হয়? গৃহস্বামী জিগ্যেস করলেন ভদ্রলোককে।

ঝোঁক একটু-আধটু আছে। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন।

গপ্পো-টপ্পো কিছু লিখেছেন নাকি?

না, সে রকম কিছু লিখি নি। তবে উপন্যাস একটা লিখেছি। তাও পড়ে আছে। মনের মত লোক পাইনি বলে দেখান হয় নি। ভদ্রলোক বললেন।

আপনার যে মশাই একেবারে মগডালে ওঠবার ইচ্ছে। গল্প নয়, নক্শা নয়, একেবারে উপন্যাস---বলেই গৃহস্বামী হো-হো করে হাসতে লাগলেন। তারপর ভদ্রলোকের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললেন, কাল এখানে আসবার সময় পাণ্ডুলিপিটা যদি আনেন, তবে ভাল হয়। পড়ে দেখতাম আপনার লেখাটা---।

ভদ্রলোকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ---এদিকে রাত বাড়ছে দেখে ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কে জান এই ভদ্রলোক? বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর গৃহস্বামী হচ্ছেন সুসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ

পাণ্ডুলিপিটি। বিভূতিবাবুর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপিটি পড়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর শিষ্যদেরকে দুই প্রেমে। পরে তাঁর সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারা-বাহিকভাবে এটা প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে এঁদের দু' জনের যে কি দান, তা বড় হয়ে তোমরা জানতে পারবে।

নানা রঙের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মামার বাসায় চারজন করে কবিরাজী ছাত্র থাকতেন; তা ছাড়া আমরা দু'ভাই, আর আমুন-জন, বসুন-জন লেগেই থাকতো। তাদের সবাইকার পাতে দুধ দেয়া সম্ভবপর ছিল না। কাজেই কলকাতার বাসায় দুধ বন্ধ। রাত্তিরের খাবার পর মনে হত, এই সময় একবাটি দুধ পেলে কত মজা হত। মনে হত—দুধের অভাবে পেট যেন ভরল না। কলকাতার জীবনে এই আক্ষেপ আমার বহুকাল পর্যন্ত ছিল।

তবে পালে-পার্বণে আমরা কলকাতার দই খেতাম। তার স্বাদ আবার অন্যরকম। এর নাম নাকি চিনিপাতা দই। কিন্তু কাগমারীর খাসা দই—যা টপুড় করলে পড়ে না—সেটা এখানে কোথায় মিলবে? ছেলেবেলায় শেখা সেই ছড়া মনে পড়ত।

"মোটা মোটা সবরি কলা—
কাগ্‌মাইর‍্যা দই॥"

এখানে সে হল্‌দে রঙের সবরি কলাও নেই— আর খাসা কাগ্‌মাইর‍্যা দইও দেখতে পাওয়া যায় না।

আমাদের রমেশ মামা—দিনাজপুরের ছোট দাদামশাই কেদারনাথ সেন—তাঁরই ভাগ্‌নে। মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মতো রমেশ মামা এসে হাজির হতেন। মিষ্ট স্বভাবের মানুষটি। আমাদের কাছে দেশ-বিদেশের গল্প বলতেন।

রমেশ মামাকে পেলে আমরা সহজে ছাড়তে চাইতাম না। উনি কোন্ কলেজে পড়তেন, তা জানতাম না। তবে সেই মধুর স্বভাবের মানুষটি আমাদের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন।

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙার পর শুনলাম রমেশ মামা অনেক রাত্তিরে এসেছেন। এখনও তাঁর ঘুম ভাঙেনি।

আমরা চুপচাপ রইলাম। রমেশ মামা জাগলেই তাকে গল্প শোনানোর জন্যে ধরতে হবে।

কিন্তু সেদিন সকাল থেকে বাড়ীর আবহাওয়া যেন একটু অন্যরকম দেখলাম।

সব চুপ-চুপ ভাব।

রমেশ মামার কি কোনো অসুখ করেছে?

আমরা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না। এরপর আরো বিস্ময় আমাদের জন্যে জমা হয়ে ছিল।

[illegible]

হঠাৎ জানা গেল বৈঠকখানা ঘরে পুলিশ এসেছে। তারা নাকি রমেশ মামাকে খুঁজছে। শুনে আমরা ভারি অবাক হয়ে গেলাম।

রমেশ মামার মতো নিরীহ মানুষকে কেন পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে? তিনি চোর না ডাকাত?

আমরা যত না অবাক হই, তার চাইতে বেশী চিন্তা মনে জমা হয়ে ওঠে রমেশ মামার জন্যে।

ইচ্ছে ছিল—সরাসরি বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করি, রমেশ মামার পেছনে লাগবার কারণ।

পরে শুনলাম ওরা নাকি টিকটিকি। রমেশ মামা ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াবার কি নাকি ষড়যন্ত্র করেছেন—সেই জন্য টিকটিকিরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমাদের বৈঠকখানা ঘরে যেতে দেয়া হল না। মামার সঙ্গে ওদের কি কথাবার্তা হল জানা নেই। তারপর আমাদের সেই মাটির মানুষ রমেশ মামাকে ঘুম থেকে তুলে সোজা থানায় নিয়ে গেল। আমরা আশা করে রইলাম রমেশ মামা এই আসে—এই আসে—

কিন্তু রমেশ মামা আর ফিরে এলেন না।

সেদিন মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল।

কিছুদিন বাদে আমরা কাশী ঘোষ লেন ছেড়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে আর একটা বড় বাসায় উঠে এলাম। এই বাসাটা স্টার থিয়েটারের উল্টোদিকে ১৪৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। বাড়ীর মালিক অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী। ইনি নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শিষ্যা ছিলেন। এককালে চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন।

ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার চৈতন্য হোক।'

এখন বিনোদিনী দাসীর অনেক বয়েস হয়েছে। রোজ আমাদের এই নতুন বাসার সামনে দিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।

মামার কবরেজি চিকিৎসায় নাম হয়েছে—তাই তিনি বড় বাসা ভাড়া নিলেন। নানা জায়গায় রোগী দেখতে যেতে হয়। তাই একটি ঘোড়ার গাড়ী কেনা হল। সইস ঘোড়াটাকে দলাই মলাই করত—বালতি-ভর্তি ভিজে

ছোলা খাওয়াতো আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। খড়-বিচালিও কেটে কেটে স্তূপ করে রাখা হত। ঘোড়াটার খোরাক নেহাৎ মন্দ ছিল না। আমাদের খুশির খবর এই যে, মাঝে মাঝে এখন ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বেড়াতে পারবো।

এই নতুন বাসায় অনেকগুলি ঘর ছিল। সদর রাস্তায় ট্রাম রাস্তার ওপরে যে দু'খানি কামরা ছিল, তার একটিতে মামা ফরাস করে বৈঠকখানা ঘর তৈরী করলেন। এইখানেই রোগীরা সব আসতো। তা ছাড়া একপাশে চেয়ার-টেবিল ছিল। মাস্টারমশাই আমায় সকালবেলা পড়াতে এলে আমি এই চেয়ার-টেবিলে বসে পড়তাম। দ্বিতীয় ঘরটিতে বড় বড় আলমারীভর্তি ঔষধ সাজানো থাকতো। এই দুটো ঘরে রাত্রে মামার ছাত্ররা ঘুমুতো। একতলায় ভেতরবাড়ীতে কলঘর, পায়খানা, ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি ছিল। পেছনে ছোট্ট এক-ফালি জমি। তাতে একটি বাতাবি নেবু গাছও ছিল।

দোতলায় একটি বিরাট হলঘর ছিল। সেখানে মামা বাড়ীর ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতেন। দোতলাতেও পায়খানা-কল ইত্যাদি ছিল। অন্যান্য ঘরগুলির একটায় মা'র সঙ্গে আমি থাকতাম, আর পড়তাম।

ইতিমধ্যে দিনাজপুর থেকে বড় মামা কৃষ্ণনাথ সেনের ছেলে বড়দা, মদনদা এসেছে কলেজে পড়বে বলে। বড়দা তেতলায় ছোট ঘরটি দখল করে নিয়েছিল। দোতলায় একটি ঘর ছিল মায়ের পূজোর ঘর। সেখানে মা আর মামা দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন। মোটকথা, বাড়ীটিতে অনেকগুলি কামরা থাকায় কারো কোনো অসুবিধে হয়নি। মাঝখানে একটি ছোট উঠোন ছিল। সেখানে কবিরাজী তেল জ্বাল দেয়া হত।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ওপর এত বড় বাড়ীখানির ভাড়া ছিল তখন একশ' টাকা।

কলকাতার গলি থেকে এই সদর রাস্তায় আসার ফলে প্রথম প্রথম আমাদের ভালো ঘুম হত না। সারাদিন ধরে ট্রামের ঘণ্টা আর গাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ, ফেরিওলার চীৎকার, বাসনওলার ঠন্ ঠন্, ভিখিরীদের কান্নাকাটি, শব্দের আর কামাই নেই।

তারপর এক-একদিন গভীর রাত্রে স্টার থিয়েটারের সামনে মাতালদের হল্লা আর চীৎকারে আচমকা ঘুম ভেঙে যেতো। অনেক রাত্রে দুই দলে মারামারি সুরু হয়ে যেতো। সোডার বোতল ছোড়ার শব্দ শোনা যেতো। কখনো কারো কারো কান্না আর সেই সঙ্গে কুকুরের আর্তনাদ ভেসে আসতো।

অনেক রাত্তির পর্যন্ত চোখে আর ঘুম আসতো না। চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে থাকতাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রাত্তিরের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হত।

নতুন বাসায় আসার ফলে এখান থেকে স্কটিশ ইস্কুল একেবারে সোজা সরল রেখায় পড়ে গেছে। দূরত্বও খুব বেশী নয়।

আমাদের নতুন পাড়ায় রক্ষিতদের বাড়ীর নীলমোহন রক্ষিত আমাদের সঙ্গে পড়ত। ওকে আমরা সবাই 'খুড়ো' বলে ডাকতাম। এ পাড়ায় আসার ফলে ওর সঙ্গে নতুন করে ভাব জমল।

আমরা ঠিক করলাম, শেষ রাত্তিরে উঠে হেদোতে প্রাতর্ভ্রমণ করতে যাবো। নীলমোহন এই ব্যাপারে খুব উৎসাহ প্রকাশ করল।

কাশ্মীর যাত্রা চিত্র : গোপাল দত্ত

এইভাবে শুরু হল আমাদের সকালবেলাকার বেড়ানো।

এক এক দিন পথে পা দিয়ে মনে হত—কত রাত্তির কে জানে। রাস্তার গ্যাসের আলোগুলি এই দুটি দুঃসাহসী ছেলের পানে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসতো। পথে জনপ্রাণী পর্যন্ত নেই। মাঝে মাঝে পাহারাওলার নাগরাজুতোর খট্ খট্ আওয়াজ শোনা যেতো। যদি কখনো তাদের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো, প্রশ্ন করলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতাম, "পাহারাওলাজী, ময় ত ঘুমনে বাহার হুয়া।"

পাহারাওলা মৃদু হেসে গোঁফ চুমড়ে চলে যেতো। এইভাবে প্রাতর্ভ্রমণ করতে করতে আমাদের সাহস বেড়ে গেল। শেষকালে একদিন ধরা পড়ল যে, আমরা অসীম উৎসাহে রাত তিনটের সময় বেরিয়ে পড়েছি।

সেই দিন থেকে আমাদের প্রাতর্ভ্রমণ পর্বের ইতি—

আমাদের ক্লাশে যে-সব ছেলে ছিল তাদের অনেকের সঙ্গেই ভাব জমে উঠেছিল। মহীমোহন, অনাদি, ফণী, অরুণ, নীলরতন, সন্তোষ, চৈতন্য, সুবল, সুবোধ, সত্যানন্দ, প্রতুল, চিত্তরঞ্জন অনেকেই পরে জীবন-পথে খুব উন্নতি করেছিল।

মহীমোহন ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজীতে পাকা। বর্তমানে সে স্কটিশ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। অনাদি গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্টে বড় অফিসার হয়েছিল। পরবর্তী যুগে ওর সহযোগিতায় আমি রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের জন্যে চিত্রনাট্য রচনা করে দিয়েছিলাম। সেটি যথাসময়ে সিনেমার রূপদান করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই ছোট্ট সিনেমাটি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

ফণী বড় ডাক্তার হয়েছে। অরুণ প্রবেশিকা পরীক্ষার ৫ম স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অল্পবয়েসেই আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমাদিও অকালমৃত্যু বরণ করে। এ ছাড়া আমাদের দলের মধ্যে বহু ইঞ্জিনীয়ার-অ্যাডভোকেট-ডাক্তার-ব্যবসায়ী হয়ে পরবর্তী-জীবনে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও অর্থ উপার্জন করে প্রচুর খ্যাতিলাভ করে।

আমাদের নতুন বাসার নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন—ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী। তাঁদের বাড়ীর দু'একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।

একবার জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে এই চন্দ্রশেখর কালীর বাড়ী যাত্রা হয়। কলকাতায় এসে এই প্রথম যাত্রা দেখবার সুযোগ হল। ওঁদের বাড়ীর মাঝখানে একটি উঠোন ছিল। সেইখানেই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। খুব বেশী লোক সেখানে ধরে না। তাই শুধু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্যে এই আয়োজন।

কলকাতার যাত্রাদলের পোষাক-পরিচ্ছদ খুব ঝকমকে। গানের সুরগুলিও বেশ সুন্দর। আমাদের দেশের যাত্রা পার্টির যেমন দৈন্যদশা, ঠিক সে রকম নয়। যাত্রা দেখে ক'দিন ধরে সেই বিষয় নিয়েই ছেলেমহলে আলোচনা চললো। যাত্রার যুদ্ধের দৃশ্যগুলি অতি সহজেই ছেলেদের অন্তর জয় করে নেয়। যুদ্ধের বাজনাও মনকে বেশ নাচিয়ে তোলে। যুদ্ধ না থাকলে আর যাত্রা কি?

ডাঃ বটকৃষ্ণ রায় আমাদের আর একজন নিকট প্রতিবেশী ছিলেন।

একবার আমার জ্বর হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই সেই জ্বর ছাড়ে না। তখন মামা ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়কে কল দিয়েছিলেন। তিক্তকষায় ওষুধ সেবনের পর তবে জ্বর পালায়। এই ডাক্তারবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার মামাত-বোন শানুর খুব বন্ধুত্ব হয়। দুই পরিবারে খুব যাতায়াত ছিল। শানু আমাকে রাঙাদা বলে ডাকত বলে ডাক্তারবাবুর মেয়েরও আমি রাঙাদা হয়ে গেলাম। তখনকার দিনে ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়ের চিকিৎসা ব্যাপারে বেশ সুনাম ছিল।

পরবর্তী যুগে আমি যখন সাবালক হয়ে সাহিত্যিক বলে পরিচিত হয়েছি, তখন বাঙলা দেশের সাহিত্যিকরা একবার রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" অভিনয় করেছিলেন। তাতে ডাঃ বটকৃষ্ণ রায় সেজেছিলেন রসিক, আর আমি শ্রীশের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম। অভিনয় হয়েছিল নাট্যনিকেতনে।

সে আর এক যুগের কাহিনী।

মামার পশার যাতে আরো বাড়ে সেজন্যে তিনি মাঝে মাঝে খবরের কাগজের লোকদের আমন্ত্রণ করে প্রীতিভোজের আয়োজন করতেন। তখনকার দিনে 'নায়ক' দৈনিক পত্রিকা বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই রকম একটি প্রীতিভোজে নায়কের সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি প্রথম দেখি। পাঁচকড়িবাবু শ্লেষ বিদ্রূপ মিশিয়ে নরমে-গরমে সম্পাদকীয় রচনা করতেন। বলতেন, ও নইলে কাগজ কাটবে কেন? একদিকে আশু মুখুজ্যেকে গালাগাল দিতেন, গুঁফো সরস্বতী নাম দিয়ে কার্টুন বের করতেন, আবার পরদিন আশুবাবুর কাছে গিয়ে বলতেন, আপনাকে গালাগাল দিলে তবে ত' লোকে কাগজ কিনবে। আপনি কিছু মনে করবেন না।

এই ছিলেন—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবার কাগজের হকারদের শিখিয়ে দিতেন, খুব করে চ্যাঁচাবি আর বলবি, পাঁচকড়ি মাল খেয়ে কসে গালাগাল দিয়েছে। তবে ত' কাগজ বিক্রি হবে।

আরো সব সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে আনা হত—কাগজে লেখালেখি হলে যদি পশার বাড়ে।

আমার পিসতুতো দাদা মিঃ কে এম নিয়োগী নামে বন্ধুমহলে পরিচিত ছিলেন। তিনি 'রয়টার' ও 'এসোসিয়েটেড প্রেসে' উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তাঁর সহায়তায়ও কাগজে লেখালেখি চললো।

[ক্রমশ

ঘড়ির রাজা বিগবেন

ঘড়ি—ঘড়ির রাজা বিগবেন, পৃথিবীর সুপরিচিত ঘড়ির ইতিহাসে বিগবেন একটা নাম। লণ্ডন শহরের মধ্যমণি। পার্লামেণ্ট ভবনের একশো আশী ফুট উঁচু চূড়োয় অবস্থিত এই ঘড়িটা লণ্ডনবাসীর চলার পথের যেন একটা সঙ্গী—ঐখানে আসলে সকলকেই কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে হয়। নিজের হাতের ঘড়ির সঙ্গে একবার মিলিয়ে নেয় সময়।

প্রকৃতপক্ষে বিগবেন তৈরী হয়েছিল আঠারো শো চুয়ান্ন সালে। কিন্তু সে তার কাজ আরম্ভ করে এবং সকলের সঙ্গে মিশে চলার জীবন শুরু করে আঠারো শো উনষাট সালের একত্রিশে মে। বিগবেন এলো—আর ওয়েস্ট মিনিস্টার গির্জার ঘড়ির সুনাম নষ্ট হোয়ে গেল। কারণ, এতোদিন ওয়েস্ট মিনিস্টার গীর্জার ঘড়িই ছিল বিখ্যাত। অবশ্য ওর হিংসার অবকাশ রইলো না। কারণ, অগ্নিকাণ্ডের ফলে ওয়েস্ট মিনিস্টার ঘড়ি নষ্ট হ'য়ে যায়। পার্লামেণ্ট ভবনের উপর বিগবেনকে বসতে সুযোগ দেওয়া হোল। তদানীন্তন বিলাতের চীফ লর্ড অব উডস্ অ্যাণ্ড ফরেস্টস্ (এখন বলা হয় অফিস অব ওয়ার্কস) প্রস্তাব করেন এমন ঘড়ি বসানো হ'বে যা হ'বে ঘড়ির রাজা। দ্বিতীয় আর এমনটি থাকবে না। চীফ লর্ড কথা রেখেছিলেন—তাই আজও বিগবেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই—সে ঘড়ির রাজা। সত্যিই রাজা।

উনিশ শো একচল্লিশ সালের মে মাস। হাউস অব কমন্সের ওপর জার্মান বোমা পড়লো ফেটে। আর তাই প্রয়োজন হোল সেই একশো আশী ফুট উঁচু চূড়োয় বসানো ঘড়িটি মেরামতের। এই একশো আশী ফুটের কথার সঙ্গে সঙ্গে খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে পড়ে, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরেরও উচ্চতা কিন্তু একশো আশী ফুট। যাই হোক, মেরামতের সময় বি বি সি থেকে লণ্ডনের সেণ্ট পিটার্স গীর্জার ঘড়ির সময় সঙ্কেত জানান হচ্ছিল। উনিশ শো ছাপান্ন'র তেরো-চোদ্দ তারিখের ঠিক রাত বারোটায় ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় লণ্ডনবাসীদের—হে লণ্ডনবাসী, তোমরা শোন—তোমাদের প্রিয় ঘড়ি আবার সচল হয়েছে। যুদ্ধের সময় বিগবেনের ঘণ্টা-ধ্বনিতে লণ্ডনবাসী বুঝতে পারতো—না এখনো ব্রিটেন আছে।

বিগবেনের ড্যায়ালের ব্যাসটা হোল অবিশ্বাস্য। সাড়ে বাইশ ফট—হ্যাঁ ভাই! প্রত্যেকটি ঘণ্টার ফিগার লম্বায় দু'ফুট কোরে। আর প্রত্যেকটি মিনিটের মাঝের ফাঁক এক ফুট করে। বিগবেনের পেণ্ডুলামের ওজন ছয়শো পঁচাশী পাউণ্ড। লম্বায় তের ফট। একবার পরো দুলতে ঠিক দু' সেকেণ্ড সময় নেয়।

মাণিকলাল দাশ

একসময়ে অবশ্য চাবি ঘুরিয়েই দম দিতে হোত বিগবেনে। তখন সপ্তাহে তিনদিন কোরে এবং প্রতিবার দু'জন লোক পাঁচ ঘণ্টা কোরে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দম দিতে একেবারে ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পড়তো। এখন আর বিগবেনে চাবি ঘুরিয়ে দম দিতে হয় না। শিকলে বাঁধা একটা ওজন আছে। সেটি নামতে থাকে। নামতে নামতে নীচে মাটি পর্যন্ত নেমে যায়। তখন ওজনটিকে চেন বা শিকল ঘরিয়ে ঘুরিয়ে তুলে দিতে হয়। উনিশশো ষোল থেকে বিগবেনে দম দেওয়া হ'চ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে।

বিগবেনের সময় পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে অনেকবার। তবে বিলাতের রয়্যাল অবজারভেটরি এর সময় পরীক্ষা কোরে বলেছে যে, কোনদিন এক সেকেণ্ডের মত সময়েরও হেরফের হয় না বিগবেনের। উনিশশো চৌত্রিশে একবার পরিষ্কার করার জন্য দু'মাসের মত বি[illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] মাঝে [illegible] দুর্ঘটনার জন্য বিগবেনের পেণ্ডুলাম বন্ধ হয়। শোনা যায়, একদিন একটি পুলিশের কানে হঠাৎ বিগবেনের শব্দ যেন অচেনা মনে হ'ল। ট্রাফিক কণ্ট্রোল করতে করতেই চোখ তুলে দেখতে দেখলো ছোট ছোট বেশ কয়েকটা পাখি ঘড়ির কাঁটার উপর কিচিরমিচির করছে।

আর একবার বিগবেনের কল-কব্জার মধ্যে ইঁদুর তার বাসস্থান করে ফেলে। ফলে বিগড়ে যায় ঘড়ি। আর তৃতীয়বারের কথা হোল—জনৈক মিস্ত্রির মইটা বেকায়দায় আটকে পড়ে, আর বিগবেন মহাশয় অভিমান করে বসেন। বন্ধ হয়ে যায়।

বি বি সি'র অনুষ্ঠানে বিগবেন উনিশশো তেইশ থেকে সময় সংকেত জানিয়ে আসছে। সারা পৃথিবীর অনুষ্ঠানে বিগবেনের ঘণ্টা মোট চল্লিশবার শোনা যায়। বিলাতের একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান আছে, তারা বিগবেনের ছবি প্রথমে দেখিয়ে এবং ঘণ্টা বাজিয়ে তবে তাদের ছবি আরম্ভ করে। এর কারণ, বিগবেন নির্ভুল সময় দেয়। বিগবেনের সময় নির্ভুল রাখার গোপন কথা জানতে চাওয়া হোলে, ইংলণ্ডের অ্যাস্ট্রনমার রয়্যাল অর্থাৎ রাজজ্যোতির্বিদ বলে-ছিলেন, প্রথমত ঘড়ির কলকব্জা সবই অত্যন্ত উঁচু ধরণের। তাছাড়া ওগুলো যেন একটা সুরে বাঁধা রয়েছে। তবুও আমরা পেণ্ডুলামের ডাণ্ডার মাঝ বরাবর একটা ট্রে লাগিয়ে দিয়ে থাকি। যখন ঘড়ি স্লো যায়, তখন ঐ ট্রেতে একটি আধপেনি বা একটি পেনি রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে পেণ্ডুলাম একটু দ্রুতগতিতে চলে, সময়টা পুষিয়ে নেয়। কারেক্ট অর্থাৎ ঠিক ঠিক সময় হলেই ঐ মুদ্রাটি ট্রে থেকে তুলে নেওয়া হয়।

বিগবেন—সে বিগ অর্থাৎ বড়। পৃথিবীর সুপরিচিত নাম বিগবেন ঘড়ির রাজা—শ্রেষ্ঠ আজও রয়েছে, অতীতেও [illegible] [illegible] থাকবেও হয়তো চিরকাল।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

সমীরণ চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

যুগ-সন্ধিক্ষণ—মহান অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতি

'রিভল্যুশন্' --- পূর্ণার্থে সর্বাঙ্গীণ রাষ্ট্রিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন। এ বস্তুটির সঙ্গে রক্তপাত অনিবার্য। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ছবি ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু যত রক্ত ঝরবে, ততই বেশি ক'রে প্রমাণিত হবে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা। ম্লান, মূঢ়, মূক জনতার সুচিরসঞ্চিত অবরুদ্ধ আক্রোশ এবং অজস্র আর সোচ্চার, সুবিধাভোগী শ্রেণীর যুগসঞ্চিত হিংস্র ক্ষমতা ব্যবহারের কৌশল ---এই দুইয়ের ওপর রক্তপাতের মাত্রা নির্ভরশীল। জনগণের দুর্দশা কত বিস্তৃত, কত বেশি গভীরমূল? সেই অনুপাতে তারা ক্ষিপ্ত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শাসক-শোষকের দমন-পীড়ন যন্ত্র কত ব্যাপক, কতখানি শক্তিসম্পন্ন? বিপ্লবকালে এটিও হিংস্রতা-নিয়ামক নিপীড়িত জনগণের নেতৃত্বেরও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক বিপ্লব প্রাকৃতিক বিপ্লবের মতই মানুষের জীবনে অগ্রগতির নতুন পথ উন্মোচিত করে।

এবং এই বিপ্লবের ধাত্রী শ্রেষ্ঠ মানব-মনীষা। শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলের মস্তিষ্কপ্রসূত বিপ্লব-চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। সাধারণ্যে। জন-গণেশের মস্তিষ্কের কোষেকোষে নবীন যাত্রার স্বপ্ন উত্তাল হয়ে ওঠে। যা অবশেষে বাস্তবে রূপ পায়, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সমাজজীবনে আমূল পরিবর্তন আনার সর্বত্যাগী প্রচেষ্টার মধ্যে। দীনতম মানবকও বোঝে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। বিপ্লব সব হারিয়ে সব কিছু নতুন ক'রে পাওয়ার মন্ত্র। অযুত-নিযুতের আত্মদানে ফিরে-পাওয়া নবীন আত্মোপলব্ধি—যা বিসর্জিত পুরণো মূল্যবোধের জায়গায় নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুত বিপ্লব নব-নীতির পাঞ্চজন্য, বন্দুকের নল উপায়মাত্র ---আগ্নেয়াস্ত্র চলে ঐ নীতির অমোঘ শক্তিতে: সুদৃঢ় কোনও দর্শন-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত চিন্তা ব্যতিরেকে যে বিপ্লব আকাশকুসুম তা সর্বকালের বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ লেনিন-ই আমাদের বলে গেছেন। বিপ্লব প্রথমে নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর তার প্রতিফলন ঘটে বাস্তবজীবনে।
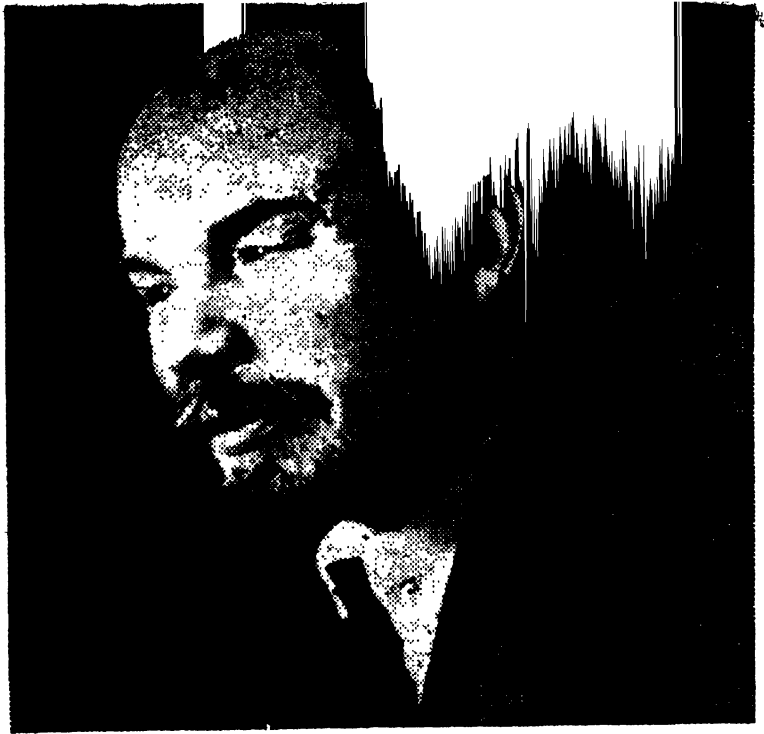
বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কেউ তা ঠেকাতে পারে নি। পারে না। পারবে না। বিপ্লব আসে---তবে তা সঠিক চিন্তা-নিয়ন্ত্রিত না হলে ফরাসী বিপ্লবের মত আংশিক সাফল্যে আত্মহারা হয়ে মিলিয়ে যায় স্ফুলিঙ্গের স্বভাবে।

ফরাসী বিপ্লব কখনও বাস্তবে নিপীড়িত মানবের প্রতিষ্ঠার জন্য সুচিন্তিত দার্শনিক মতবাদ প্রচার না করায় এবং বিপ্লবের ফল সাধারণ্যে বিতত করার সুকঠিন প্রয়াসে ব্রতী না হওয়ায়, সে বিপ্লব পরিণতি লাভ করে রাজতন্ত্রের পুনরভ্যুদয়ের মধ্যে।

বিপ্লবের বীজ অতীতে প্রোথিত। অতীতের গর্ভ থেকে বর্তমানের

লেনিন (১৯২১)

আলোর বিপ্লব-দীপ্তির অনুশীলন কঠিনতম কাজ। এ জন্য আত্মিক যুক্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল চিন্তা এবং চিন্তা অনুযায়ী সর্বত্যাগী সংগঠন।

মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য কার্ল মার্কস্ এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর জীবনব্যাপী সাধনা এবং ভ্লাদিমির ইলিচ্ 'লেনিন'-এর সর্ব-বর্বরতানাশী জীবন-মরণ সংগ্রাম। বস্তুত, চিন্তা এবং কর্মের এমন সমন্বয় মানবেতিহাসে আর হয়নি। সর্ব-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবীর লেনিন অনন্য, একক তুলনারহিত।

'আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের
প্রত্যেক আকাশে
লেনিনের সূর্য-দীপ্তি রক্তের
তরঙ্গে ভেসে আসে:
ইতালী, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড,
আমেরিকা, চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই
কমরেড লেনিন।'
('লেনিন: সুকান্ত ভট্টাচার্য)

কেন? সে উত্তরও কিশোর-কবি দিয়েছেন:

'লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে
অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন
প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে,
আজকেও অযুত লেনিন
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী
প্রতীক্ষিত দিন;
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ,
---আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।'
(তদেব)

জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সফল প্রচার ---যা তাদের তৎকালীন ধনতন্ত্রের বীভৎস উৎপীড়ন থেকে মুক্তির আশ্বাস দিয়ে নবজীবনের স্বর্ণউষা নিয়ে আসার নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল---ছিল লেনিন-এর সব থেকে বড় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সমূলে ধ্বংস করা কঠিন ঠিকই, কিন্তু ধ্বংস-স্তূপের ওপর মহত্তর জীবন গঠন কঠিনতর। সব্যসাচী লেনিন এক হাতে ধ্বংস ক'রে অন্য হাতে গঠন করতে পেরেছিলেন---তাঁর সাফল্যের কারণ মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান, বিশ্বাস, এবং তা রূপায়িত করার জন্য 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে' আজীবন অ-ভূতপূর্ব আত্মহারা সংগ্রাম।

●

জন্যেই লেনিন দেখেছিলেন স্বদেশভূমি ক্ষুব্ধ---পেটে ভাত নেই কারো।

সেই ক্ষুব্ধতা দূর করতে, নিরন্ন, বুভুক্ষু নর-নারায়ণের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে, তাদের আশাহত, সর্বহারা জীবনে আশার আলো ফুটিয়ে ঐশ্বর্যময় করতে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

যে সূর্যোদয়ের ভোর আনার জন্য তিনি রাত্রির তপস্যা-মগ্ন হয়েছিলেন, সেই পরম শুভলগ্ন আসন্ন।

[জীবন-কাহিনী]

'অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্রদিন, জয়োন্মত্ত পাখী---আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।'
('শত্রু এক': সুকান্ত ভট্টাচার্য)

১৯১৭-র ৩রা এপ্রিল ---দিন আগত ঐ; পালাবদলের মুহূর্ত সমাগত; সুদীর্ঘ রাত্রির তপস্যায় গাঢ় অন্ধকার অবসিতপ্রায়; পূর্ব দিগন্ত রক্তবর্ণ, জীবন স্পন্দনে থরোথরো।

এই চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক দিনে লেনিন সদলে সুইডেন ছেড়ে ফিন্‌ল্যাণ্ড-এ এলেন। ক্রুপসকায়া লিখেছেন:

'ধীরে ধীরে গাড়িতে সৈন্যরা এসে ভিড় করল, যতক্ষণ পর্যন্ত না একেবারে ঠেসে ভর্তি হয়ে গেল।'

তারা বসার জায়গায় দাঁড়িয়ে গলা উঁচু ক'রে লেনিন-কে দেখতে এবং তাঁর কথা শুনতে লাগল---কেমন ক'রে

ভাইপোকে ও একজন শ্রমিকের কন্যা ক্রোড়ে লেনিন দম্পতী

যুদ্ধ বন্ধ করা যায় এবং কেন যুদ্ধ অন্যায় ; সারা রাত শুধু এই আলোচনা।

বিলুসত্রভ্ স্টেশন-এ আনন্দাশ্রু-সজল নেত্রে তাঁর বোন মারিয়া উলিয়ানোভা স্নেহালিঙ্গনে জড়ালেন প্রিয় ভাইকে ; এলেন দলে দলে বল্‌শেভিক কমরেডবৃন্দ, সাধারণ শ্রমিক ভাইরা কাতারে কাতারে, আর এলেন মস্কো থেকে 'প্রাভ্‌দা'র সম্পাদকমণ্ডলী। পতাকাবাহী আনন্দোদ্বেল শ্রমিকরা লেনিনকে কাঁধে ক'রে স্টেশন-এর বাইরে প্রতীক্ষাকুল জনতার সামনে নিয়ে গেল।

যুক্তিনিষ্ঠ 'লৌহমানব' লেনিন সেদিন কিন্তু রীতিমত বিচলিত।

পেত্রোগাদ্-এ যেদিন সন্ধ্যায় লেনিন পৌঁছলেন, সেদিন ইস্‌টার্-এর ছুটি। কল-কারখানা এবং খবরের কাগজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তাঁর শুভাগমন সংবাদ বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে গেল সবখানে---সৈন্যদলে, জাহাজে, শ্রমিক-কর্মীর গৃহাভ্যন্তরে। তুষারবৃষ্টি ম্লান পরিবেশে যেন লেগেছে হঠাৎ আলোর ঝলকানি ; হলদে পাতা উড়িয়ে দিয়ে নবীন কিশলয়ের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছে বুঝি দিকে দিকে। উত্তাল বীচিবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে বাত্যাতাড়িত দীনপ্রাণ সহসা পেল কূলের সন্ধান। রৌদ্রস্নিগ্ধ, আলোকস্নাত নতুন বন্দর।

সর্বত্র তখুনি অভ্যর্থনার প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেল অসীম উৎসাহে। মস্‌কোতেও তাঁর প্রত্যাগমন-সন্দেশ পৌঁছল। সেখানে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে স্বাগতবার্তা পাঠান হ'ল টেলিগ্রাম-এর মাধ্যমে।

সেই আলোকসমুজ্জ্বল রাত্রে পেত্রোগ্রাদ্ স্টেশন কোলাহলমুখর---লেনিন ট্রেন থেকে রাশিয়ার মাটিতে পদার্পণ করামাত্র সমবেত সৈন্যদল তাঁকে 'সংগ্রামী সেলাম' জানাল এবং সৈন্যদলের ব্যাণ্ড-এ বেজে উঠল 'মারসে ইয়ে' সংগীতের উদাত্ত গম্ভীর সুর। শ্রমিক কমরেড্‌রা তাঁকে ফুলে ফুলে ঢেকে দিলেন। কমরেড চুগুরিন্ এগিয়ে এসে বলশেভিক দলের ৬০০ সংখ্যক দলীয় কার্ড লেনিন-এর হাতে তুলে দিলেন সোৎসাহে, সমবেত কমরেড্‌দের করতালিধ্বনির মধ্যে।

রুশজাতির ইতিহাসে সে একদিন লক্ষ পরাণ শঙ্কাহীন। ঋণমুক্তির উৎসাহে আন্দোলিত। ধনতন্ত্রের বীভৎস শোষণে শুধু দিনযাপনের গ্লানিপঙ্কে নিমজ্জিত অসংখ্য প্রাণে সেদিন পৌঁছেছিল আসন্ন 'মুক্তির' মুহুর্মুহু ডাক---তাদের উদ্দীপিত মুষ্টি সেই মুক্তি ত্বরান্বিত করার আকুল আগ্রহে উত্তোলিত। 'সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়না' তারা শেষবারের মত ফিরিয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কীভাবে তা বলেছেন লেনিন---গ্রাম-নগরের ভিড়ে বারবার মৃত্যু হানা দিয়ে গেছে, সেখানে জমেছে অন্ধকার, সেই যুগসঞ্চিত পুঞ্জীভূত অন্ধকারে আলোকসন্দেশ বহন ক'রে এসেছেন স্বয়ং দিবাকর বুঝি-বা। বহু শতাব্দীর নিপীড়িত মানবাত্মার আকুল কামনার মূর্ত বিগ্রহ লেনিন।

লেনিন, লেনিন।

স্টেশন-গৃহ আর সংলগ্ন রাস্তাঘাট। জনসমাকীর্ণ---লেনিন-সন্দর্শনে উত্তাল। তারা সবাই এসেছে মহানায়ককে দেখতে ; তাঁর প্রজ্জ্বলিত প্রাণশিখার স্পর্শে নিজেদের প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে।

সার্চলাইট-এর তীব্র আলোয় ঝলসে উঠেছে আকাশপতাকা---তাতে উৎকীর্ণ 'স্বাগত লেনিন'। ব্যাণ্ড-এ বাজছে 'ইণ্টারন্যাশনাল্'। জনতার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-কলরবের মধ্যে কমরেড-রা লেনিনকে সাঁজোয়া গাড়িতে তুলে দিল। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি স্বাগত জানালেন জার-এর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সদর্পে দণ্ডায়মান উন্নতশির অমর যোদ্ধৃবৃন্দকে। গাড়ি চলল, পথে বারবার থেমে থেমে তাঁকে 'পথসভা' করতে হল। প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য, তাঁর মুখের দুটো কথা শোনার জন্য জনতা অস্থির। সবাই বুঝি বলতে চায়, 'রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।

এমন বিপুল, গভীর, সর্বব্যাপী, আন্তরিক গণ-সম্বর্ধনা ইতিহাসে আর কেউ কখনও পেয়েছেন কি? এ-ব্যাপারেও লেনিন অতুলনীয়। রুশ জীবনের অন্ধকারে যে অতলান্ত আশা সঙ্গোপনে মর্মরিত হচ্ছিল, সেই আশা বাণীমূর্তি লাভ করল তাঁর চিন্তায় ও কর্মে ---তাই গোটা জাতটাই তাঁকে বসিয়েছিল হৃদয়ের সিংহাসনে, মনের মণিকোঠায়। তাঁর সে আসন অক্ষয়, অব্যয়। সর্বগ্লানিমুক্ত আনন্দ-শতদলের মত মানবচিত্তে শাশ্বত মহিমায় বিরাজিত।

তিনি এলেন---'রথচক্র ঘর্ঘরিয়া বিজয়ী-রাজসম। গর্বিত নির্ভয়'---এবং বজ্রমন্দ্রে মুক্তি-সংবাদ ছড়িয়ে দিলেন দশ দিকে। রুশ জাতি আসন্ন বন্ধন-নাশের সুগভীর প্রত্যাশায় লক্ষ কণ্ঠে গেয়ে উঠল :

'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের
গ্লানি, শরমের ডালি ;
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভক্ষতি-টানাটানি,
অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ-সংশয়---
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।।'

('বর্ষশেষ' : রবীন্দ্রনাথ)

তারা অনেক সয়েছে ; অনেক ক্লিষ্ট দিন, মুমূর্ষু রাত কেটে গেছে নীরব চোখের জলে। আর নয়। লেনিন তাদের ডাক দিয়েছেন, তিনি ডাকতে জানতেন :

'ক্ষতবিক্ষত নতুন সকাল বেলা,
শেষ করব এ রক্তের হোলিখেলা,
ওঠো সোজা হয়ে, পায়ে পায়ে লাগে ঠেলা,
দেখ, ভিড় দেখ স্বাধীনতালুব্ধের।'

('ডাক' : সুকান্ত ভট্টাচার্য)

৩রা এপ্রিল সারারাত ধরে আলোচনার পর লেনিন-দম্পত্তি গেলেন লেনিন-এর বোনের ফ্ল্যাট-এ---এখানে তাঁরা জুলাই পর্যন্ত ছিলেন।

পাঁচ এপ্রিলে 'প্রাভ্দা' এবং 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর স্বলিখিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী: 'হাউ উই গট্ ব্যাক'—, 'আমরা ফিরলাম কীভাবে।' রাশিয়ার তথা পৃথিবীর ইতিহাসের চরম সন্ধিক্ষণে যুগপুরুষ লেনিন-এর প্রত্যাবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস তখন বাঁক নিচ্ছে—সম্পূর্ণ অজানা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে অজানিত আশা-আশঙ্কায় থরোথরো বিপ্লব-তরণীর হাল নিপুণহাতে ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর অভূতপূর্ব দায়িত্ব বহনে সক্ষম একতম নায়ক লেনিন—তাই ঘটনাস্থলে তাঁর পৌঁছনোর সংবাদ ঐতিহাসিক গুরুত্বমণ্ডিত। রুদ্ধনিশ্বাসে আনন্দ-রোমাঞ্চিত বুকে সবাই পড়ল আধুনিক অডিসিউস্-এর ঘরে ফেরার কাহিনী।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে —অচলায়তন ধ্বংস। উত্তরের জানলা উন্মুক্ত। সামনে তখন সেই ধ্বংসস্তূপকে সবল হাতে অপসারিত ক'রে, নতুন সমাজজীবন গড়ে তোলার দুরূহ কর্তব্য; এবার গড়তে হবে। এ বড় কঠিন কাজ। বিপ্লব অতীতেও বহুবার হয়েছে—রিক্ত অত্যাচারিত সর্বহারার দল বারবার অত্যাচারী শাসক-শোষকদের টেনে নামিয়েছে পথের ধূলোয়। কিন্তু ধ্বংসের পর তারা বিমূঢ়; কোনও শক্ত, সমর্থ নায়কের হাত এগিয়ে আসে নি জনগণকে সুস্থ, সহজ, প্রাণরসপূর্ণ ছন্দোবদ্ধ সমাজজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। রুদ্রের তাণ্ডব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চতুর্মুখের সৃজনী ক্ষমতা আর শিবের মঙ্গলশক্তি সুপ্ত। মানুষ বারংবার ভেঙেছে ভগ্নস্তূপ—কিন্তু, জীর্ণতার অন্তরালে যে আনন্দস্বরূপ উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত, তাকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।

এই দুরূহতম কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রণী লেনিন। সকলের জীবনে 'রসপূর্ণ আকাশের বাণী' ছড়িয়ে দেওয়ার মহত্তম ব্রতে তিনিই নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। প্রথমে ডাক দিয়েছিলেন ধ্বংসের, ভাঙতে বলেছিলেন অত্যাচারীর মসনদ—সে তাঁর রুদ্রমূর্তি, তার পর গড়ার পালায় প্রধান ভূমিকা তাঁর। নবজাতককে মঙ্গল-লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করার দায়িত্বও। একাধারে তিনি রুদ্র-ব্রহ্মা-শিব। ধ্বংস-সৃষ্টি-মঙ্গলশক্তি।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যেই ঘটল ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, কিন্তু তা কি শাসকদের চরিত্র বদলাতে পেরেছিল? একথা ঠিকই যে, জার্ আর নেই, তার স্থানে আরূঢ় অন্তর্বর্তী সরকার; কিন্তু, তার প্রকৃত রূপ কি, কোন্ পথে সে এগোবে? সে কি বাস্তবিক সর্বহারাদের আশা-আকাঙখা সফল করার মারকসীয় পথে এগিয়ে যাবে, না অতীতের রোমন্থন ক'রে বুর্জোয়া প্রথায় গা ভাসাবে? লেনিন এবং দলের সামনে এটি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন।

জার্-এর সমকালীন 'আইনী' দলগুলো তাদের বুর্জোয়া চরিত্র পুরোপুরি বজায় রেখেছিল জার্ সরকারের পূর্ণ সমর্থনে। বলশেভিক দল বে-আইনী; তার পরিচালকরাও নির্বাসনে। কাজেই, বুর্জোয়া দলগুলো আপ্রাণ চেষ্টা সুরু করল বিপ্লবের রাশ টেনে জনগণের অসীম উৎসাহ চিরাচরিত বুর্জোয়া খাতে বইয়ে দিতে।

একমাত্র বলশেভিকরা কখনও লোভবশত সমাজবাদী পথচ্যুত হয় নি, তারা জনগণের সামনে অন্তর্বর্তী সরকারের আসল বুর্জোয়া রূপ খুলে ধরল। নবলব্ধ 'স্বাধীনতা'র সুযোগ নিয়ে তারা আবার 'প্রাভ্দা' প্রকাশ সুরু করল ৫ই মার্চ, রবিবার থেকে। এ দিনটি পৃথিবীর বঞ্চিতদের কাছে স্মরণীয় দিন।

লেনিন-এর নেতৃত্বে বলশেভিক-দল শ্রমিক-প্রোলেতারিয়েতদের বোঝাতে লাগল বিপ্লব তখনও অসম্পূর্ণ—কেবলমাত্র স্বৈরাচারী শাসকদের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা বুর্জোয়া দলের হাতে এসেছে। কিন্তু আসল কাজ—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, জনগণের স্বার্থে শাসন পরিচালনা—তখনও পুরো বাকি। নতুন বুর্জোয়া শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি বিপ্লবকে মন্থর ও শ্লথগতি করায় এবং শ্রমিক-চাষীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনও পন্থা অবলম্বন না করার মধ্যে নিহিত।

সম্মুখে অপেক্ষমাণ সুকঠিন কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে দলীয় কমরেডদেরও ধারণা অস্পষ্ট। লেনিন এসে তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করলেন। এমন কি, 'প্রাভ্দা'র সম্পাদকমণ্ডলী পর্যন্ত শনৈঃ শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনের পক্ষপাতী। তাঁরা ২১শে ও ২২শে মার্চ লেনিন-এর 'লেটার ফ্রম্ আফার' 'দূরের পত্র' প্রকাশ করলেন অনেকখানি ছাঁটকাট করার পর।

তাঁদের মতে সব ক্ষমতা শ্রমিক প্রোলেতারিয়েত-এর সোভিয়েট-এর হাতে দেবার বদলে বুর্জোয়া সরকার বজায় রেখে, তার ওপর জনগণের 'চাপ' সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা যুদ্ধকামনা ও পররাজ্যলোলুপতা ছেড়ে দেয়। লেনিন দেখালেন, যদিও কোনও কোনও পরিস্থিতিতে এ
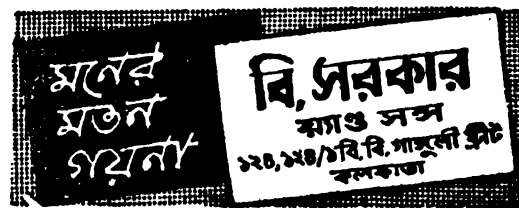
---- চাপ দিয়ে কাজ হওয়া সম্ভব, কিন্তু তৎকালীন বিশেষ অবস্থায়— যখন রুশ সরকার ফরাসী এবং বৃটিশ সরকারের সহযোগিতায় বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদের প্রতিভূস্বরূপ— কেবলমাত্র 'চাপ' দিয়ে ধনী ও জমিদারদের হাত থেকে ক্ষমতা টেনে নেওয়া অসম্ভব।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতিকালে কামেনেভ্ প্রমুখ আধা-মেনশেভিকরা লেনিন-এর বিরোধীতা করেছিলেন। এমন কি, স্তালিন পর্যন্ত কামেনেভ্-এর ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থন করেছিলেন এক সময়। অবশ্য, অল্প দিন পরেই (এপ্রিল মাসে) স্তালিন নিজের ভুল বুঝে লেনিন এবং দলের মত ঠিক বলে গ্রহণ করেছিলেন।

সমস্ত দল তখন লেনিন-এর নির্দেশের জন্য অপেক্ষমাণ—বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সঠিক কর্মপন্থার নির্দেশ দেবেন। ৪ঠা এপ্রিল সারা রাশিয়ার বলশেভিকদের সামনে লেনিন তাঁর যুগান্তকারী 'এপ্রিল থিসিস' পেশ করলেন। তাঁর 'দ্য টাস্কস্ অব্ দ্য প্রোলেতারিয়েত ইন্ দ্য প্রেজেণ্ট রিভল্যুশন'—'বর্তমান বিপ্লবে প্রোলেতারিয়েত-এর কর্তব্য' নামক থিসিস্ পথের ইংগিত দিল।

বহুবার এই রকম ঘটনা ঘটেছে। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকামী রুশনেতারা সঠিক পথ হারিয়েছেন, এবং লেনিন তাঁদের নির্ভুল পথের নিশানা দিয়েছেন অসাধারণ মনীষা বলে। রুশ-বিপ্লব তাঁর ভ্রান্তিহীন মতবাদের অমৃতফল।

এর প্রথম আলোচ্য বিষয় যুদ্ধ; যুদ্ধ ও যুদ্ধবাজরা জনগণের সর্বপ্রধান শত্রু, তাই। বুর্জোয়া সরকার পরিচালিত যে কোনও যুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক, তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তাঁর মতে রাশিয়া সবেমাত্র বিপ্লবের প্রাথমিক স্তর পার হয়েছে; বাকি সবচেয়ে জরুরী অংশ---চাষী ভাইদের সাহায্যে শ্রমিক-প্রোলেতারিয়েত-এর হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা আনয়ন। সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমিত ক্ষমতা এবং উপকারিতা নির্দেশ ক'রে লেনিন দেখালেন সোভিয়েত রিপাবলিক-এর হাতে ক্ষমতা না গেলে কোনও উন্নতি সম্ভব নয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়ার নীতির পক্ষপাতি---সর্বপ্রথম দুর্ভিক্ষ এবং অর্থনীতির আশু বিপদ অতিক্রম করার জন্য কিছু জনসাধারণবোধ্য এবং সহজসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক্ :---

(এক) দেশের সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয়করণের পর তা আঞ্চলিক সোভিয়েত্-এর হাতে অর্পণ।

(দুই) বড় বড় সব জোত হাতে নিয়ে সেগুলো অনতিবিলম্বে চাষীদের সোভিয়েত-এর পরিচালনাধীনে আদর্শ খামারে পরিণত করা।

(তিন) দেশের সব ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং তা শ্রমিক-সোভিয়েত্-এর পরিচালনাধীনে আনা।

(চার) সমগ্র উৎপাদন এবং বিলি-ব্যবস্থার ওপর শ্রমিক-প্রোলেতারিয়েত্এর নিয়ন্ত্রণ কায়েম।

লেনিন-এর মতে উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত। মূক, অসহায় জনতা এই প্রথম শাসন-ক্ষমতার দায়িত্ব পেয়ে দিশেহারা, হতবুদ্ধি, বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে প্রভেদ করতে অক্ষম। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে, প্রয়োজন তাই দৃঢ়চেতা, সৎ কর্ণধার। রাশিয়ার পাতিবুর্জোয়া সমাজ সমাজ-বিপ্লব আর ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যপথে দাঁড়িয়ে হতভম্ব। কোন্ পথে এগোবে তারা? তারা পথ চেনে না। তাই সবার মত তাদের হাত ধরে বিপ্লবের মঙ্গলপথে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিলেন লেনিন এবং তাঁর নেতৃত্বে বলশেভিক দল।

এই অপূর্ব বৈপ্লবিক নেতার সমগ্র প্রচেষ্টার মূলে ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রোলেতারিয়েত্-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। তিনি ঘোষণা করলেন, যতদিন না শ্রমিক ও কৃষক সহ সৈন্যদলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁদের সমর্থন করছেন, ততদিন জোর ক'রে ক্ষমতা অধিকার করার চেষ্টা অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক। শ্রমিক, কৃষক, গৃহস্থ, সৈন্যদল---সকলকে বোঝাতে হবে মধ্যবর্তী সরকারের আসল গণতন্ত্র-বিরোধী রূপ, এবং এইভাবে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা ঘুচিয়ে তারপর শান্তিপূর্ণ উপায়ে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকার করবে বলশেভিক সোভিয়েত্সমূহ।

মহানায়ক লেনিন দেখালেন, শান্তিপূর্ণ উপায়েই প্রোলেতারিয়েত-এর হাতে ক্ষমতা আসা সম্ভব এবং এটিই প্রকৃষ্ট পথ। কম্যুনিস্টরা না কি সর্বদা মারমুখী, রক্তপাত ছাড়া তাদের মুখে নাকি কথা নেই---এই অপবাদ যে সর্বৈব মিথ্যা, তার প্রমাণ কম্যুনিস্ট জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা লেনিন-এর পূর্বে বিধৃত কর্মকৌশল।

এই সময়েই লেনিন প্রস্তাব করলেন, দলের নাম 'কম্যুনিস্ট পার্টি' রাখা হোক্; কারণ, দলীয় অন্তিম লক্ষ্য আদর্শ কম্যুনিস্ট সমাজ প্রবর্তন। লেনিন-এর ভাষায়, 'ময়লা শার্ট্ ছেড়ে এখন এখন পরিষ্কার পোষাক পরা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।'

তৃতীয় কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনের ওপরও তিনি জোর দিলেন।

তাঁর 'এপ্রিল্ থিসিস' এইভাবে বলশেভিক দলের সাংগঠনিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। ৫ই এপ্রিল্ এক অজ্ঞাত খনি মজুর বল্শেভিক্ দলের এক সভায় বলল, 'কমরেড লেনিন যা বলেন, তাই ঠিক।--- খনিটা আমরা নিয়েছি বটে, কিন্তু তার দশ হাজার কর্মী যে কখন কী করবে, তা বলবার কর্তা কেউ নেই।---তাই, কিছু শিক্ষিত কমরেড পাঠিয়ে দেওয়া হোক্, যারা আমাদের বলতে পারবে কি এবং কেমন কোনও কাজ করতে হবে।---

আজ্ঞে হ্যাঁ, কমরেড লেনিন যা-কিছু বলেন, সব ঠিক।'

৭ই এপ্রিল্ লেনিন-এর থিসিস প্রকাশিত হল 'প্রাভ্দায়'। এর পর প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনান্তে মোটামুটি সকলেই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় মেনে নিলেন। কেবল কামেনেভ্ তখনও ভিন্ন মতে বিশ্বাসী। কামেনেভ্-এর জবাবে লেনিন লিখলেন, 'লেটারস্ অন্ টাক্‌টিক্‌স' এবং 'দ্য ড্যুয়াল পাওয়ার্'—এতে তিনি পরিষ্কারভাবে গোঁড়ামির বিপদ সম্পর্কে সাবধান ক'রে দিলেন। তিনি বললেন, গোঁড়ামি মূর্খতা, লিখলেন:

> 'এটা বেশ ভাল ক'রে বোঝার সময় হয়েছে যে, একজন মার্কস্-বাদীকে বাস্তব অবস্থা পুরোপুরি সম্যক উপলব্ধি করতে হবে; অতীতের কোনও থিওরী আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না।---থিওরী (বয়সে) ধূসর, কিন্তু সবুজ অনন্ত চলমান জীবনের প্রতীক।

মেন্‌শেভিক্ দল তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাতে লাগল। অবিরাম মিথ্যা প্রচার ও বিষোদ্‌গারের ফলে একদল লোক দৈহিক আক্রমণের ভয় পর্যন্ত দেখাল তাঁকে। লেনিন এবং বল্‌শেভিক-রা নাকি অ্যানারকী আর গৃহযুদ্ধ ডেকে আনছেন।

কিছু লোকের মনে যে এ ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মেছিল, তা থেকেই বোঝা যায়, বিরামহীন মিথ্যা প্রচার কত শক্তিশালী। মেন্‌শেভিক্ নেতা ড্যান তারস্বরে ঘোষণা করলেন, 'লেনিন সবে রাশিয়ায় এসেছেন, তিনি দেশের অবস্থা জানেন না'।

পট পরিবর্তিত হচ্ছে দ্রুত লয়ে। ১৪ই এপ্রিল্ পেত্রোগ্রাদ্-এ বল্‌শেভিক দলীয় সভ্যরা কন্‌ফারেন্স করলেন—তখনই সৈনিক এবং শ্রমিকদের এক বিশাল মিছিল বেরুলো অন্তর্বর্তী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। এই প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ এবং আশু কারণ সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রীর বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতি 'অকুণ্ঠ' সমর্থন জ্ঞাপন। ২০শে এবং ২১শে রাজধানীতে লক্ষ লক্ষ লোকের সরব প্রতিবাদে মুখর, তাদের শান্তির উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

এই বিরাট প্রতিবাদ পুরো নিষ্ফল হয় নি। অন্তর্বর্তী সরকারের দু'জন সর্বাধিক অপ্রিয় মন্ত্রী—মিলিউকভ্ আর গুচকভ্—পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, এবং ছ'জন মেন্‌শেভিক্ এবং সোশ্যালিস্ট - রিভল্যুশনারী মন্ত্রী নিয়ে একটি নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হল।

লেনিন সর্বদা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কাজেই, দলের কিছু সভ্য যখন বাগ্‌দাতিয়েভ্-এর নেতৃত্বে হঠাৎ 'এখুনি অন্তর্বর্তী সরকারের পতন চাই' বলে শ্লোগান দিলেন, তখন তিনি তাঁদের সাবধান ক'রে বললেন, জনগণের পূর্ণ সমর্থন অর্জন না ক'রে অগ্রসর হওয়া নিরর্থক, অফলপ্রসূ এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

২৪শে এপ্রিল্ রাশিয়ান্ বল্‌শেভিক্ দলের সপ্তম সমাবেশ বসল পেত্রোগ্রাদ্-এ। প্রারম্ভিক ভাষণে লেনিন সমবেত কর্মীদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁদের এই সার্থক আন্দোলন সারা পৃথিবীর প্রোলেতারিয়েত্-এর মুক্তি-আন্দোলনের অংশমাত্র।

লেনিন-এর নেতৃত্বে প্রস্তাব নেওয়া হল এই মর্মে যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির প্রাথমিক অধিকার এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অবশ্য নিন্দনীয়।

জমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার অস্বীকার ক'রে সমস্ত জমি জাতীয়করণ এবং তার সুষ্ঠু বণ্টন চাই-ই। প্রস্তাবের অন্য অংশের বক্তব্য আইনের জন্য অপেক্ষা না ক'রে আন্দোলন চালাতে হবে; অর্থাৎ, আইন আসবে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ।

চতুর্দিকে অশান্তি। মহানায়কেরও তাই শান্তি নেই। অষ্টপ্রহর তিনি কর্মব্যস্ত। শান্তি চাই। তা অর্জন করার সাধনামগ্ন লেনিন। অবিরাম জলস্রোতের মত কর্মীদের যাতায়াত, তাদের সংগে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, 'প্রাভ্‌দা' পরিচালনা, সারা দেশের শ্রমিক - চাষীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা আনয়ন এবং এরই ফাঁকে ফাঁকে লেখনী চালনা। নব্বুই দিনের বিরামহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ১৭০টিরও বেশিসংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এই অস্বাভাবিক কর্মময়তা সত্ত্বেও তাঁকে কোনদিন কেউ ক্লান্ত বা বিরক্ত হতে দেখে নি। সদা-হাস্যময় পুরুষ লেনিন যেন আনন্দঘন-সত্তা। প্রাণশক্তির উচ্ছল প্রাচুর্যে উজ্জ্বল। আশপাশের সকলেই তাঁর আনন্দে উদ্‌বোধিত হত।

বস্তুত সাধারণের সংগে অ-সাধারণ মানুষের একটি মূল পার্থক্য প্রাণশক্তির বিকাশে সংলক্ষ্য। প্রথম জন দুর্বলচেতা, উদ্যমহীন, শেষোক্ত জন দৃঢ়চেতা, উদ্যোগী পুরুষসিংহ; যথোপযুক্ত চিন্তার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছে প্রাপ্তব্য বস্তু লাভে তাঁর মরণপণ সংগ্রামই তাঁকে মহত্ত্বের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেয়। কোন কিছুই তাঁর কাছে অসম্ভব নয়। উঠে, জেগে যিনি শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করতে এগিয়ে আসেন, সংকল্প-কঠিন পদক্ষেপে, তাঁকে শেষ পর্যন্ত প্রতিহত করার ক্ষমতা কারও আছে কি? লেনিন এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাঁর কাম্য নিপীড়িত মানবের মুক্তি, নিষ্পেষিত মানবাত্মার উদ্‌বোধন। এর চেয়ে মহত্তর কামনা এবং সংকল্প সিদ্ধির বৃহত্তর উদ্যোগ লিখিত ইতিহাসে অলভ্য। লেনিন পদদলিত, লাঞ্ছিত, অর্ধ-মৃত মানবতার মুক্তিদূত।

প্রত্যহ তখন শ্রমিক আর সৈনিকদের আলোচনা সভা বসে।

১৯১৭-র 'মে দিবস' অনুষ্ঠিত হল পেত্রোগাদ্-এ মহাসমারোহে—রাশিয়ায় এই প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন।

৪ঠা মে থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত মেন্‌শেভিক্ দল পরিচালিত প্রথম কৃষক প্রতিনিধি সভার অধিবেশন। তাতে বল্‌শেভিক্-রা সক্রিয় অংশ নিলেন। কিন্তু তাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সভা প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে যুদ্ধ 'সফল' করার আহ্বান জানাল।

জুন মাসের প্রথম দিকে বসল প্রথম 'অল রাশিয়া কংগ্রেস অব্ সোভিয়েত্‌স'। এখানে সর্বসমেত ১০৯০ প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ১০৫ জন বল্‌শেভিক্, বাকি সব মেন্‌শেভিক এবং সোস্যালিস্ট রিভল্যুশনারী। লেনিন-এর বক্তৃতার ফলে সভার সময় বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন পরিচালকবর্গ কুখ্যাত কেরেনেস্‌কী লেনিন কি মার্‌কস্-বাদ শেখানোর প্রচেষ্টায় সমবেত প্রতিনিধিবর্গের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ ক'রে তুললেন?

কিন্তু মেন্‌শেভিক্-রা কৌশলে কোয়ালিশন্ সরকারের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল।

ইতিমধ্যে পেত্রোগ্রাদ্-এর শ্রমিক-প্রোলেতারিয়েত্‌দের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের জনবিরোধী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে। জুন মাসের ১০ তারিখে 'প্রাভ্‌দা'র মাধ্যমে বল্‌শেভিক্ দল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ডাক দিলেন। কিন্তু রুশ সোভিয়েত্ কংগ্রেস-এর মেনশেভিক্-রা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে এই সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন; সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব তখন মেনে নেওয়া ছাড়া লেনিন-এর গত্যন্তর ছিল না।

১৮ই জুন প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিক পেত্রোগ্রাদ্-এর রাজপথে মিছিল বের করল বল্‌শেভিক্‌দের নেতৃত্বে। এই উত্তাল জনসমুদ্র বল্‌শেভিক্ দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নজীর। বিশেষত রাজধানীর মানুষ তাদের প্রতি ক্রমেই বেশি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন নিঃসন্দেহে।

জুন-এর শেষ দিকে অক্লান্ত লেনিন ক্লান্ত। অশ্রান্ত কর্মযজ্ঞের হোতা তিনি, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর লৌহ-কঠিন দেহও অসুস্থ হয়ে পড়ল। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অথচ ঘুম নামে মাত্র—কাজেই মাথাধরা আর অনিদ্রা রোগ হল। বিশ্রামের জন্য 'নেই ভোলা' গ্রামে গেলে কি হবে, বিশ্রাম তাঁর কপালে নেই। পেত্রোগ্রাদ্-এ অশান্তির খবর পেয়ে তিনি ছুটে এলেন কর্মক্ষেত্রে।

কেরেন্‌সকীর কাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল ক্রমান্বয়ে। ৩রা জুলাই দলে দলে শ্রমিক এবং সৈন্যরা পেত্রোগ্রাদ্-এর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার দাবি নিয়ে। লেনিন কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন—সশস্ত্র বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ তখনও অনাগত—সৈন্য-বাহিনী এবং সাধারণ জনতা তখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নি; অন্য দিকে বুর্জোয়া সরকার যে-কোনও আন্দোলন রুখতে প্রস্তুত।

৩রা জুলাই স্থির করা হল, প্রস্তাবিত ৪ঠা জুলাইয়ের শ্রমিক-সৈন্য বিক্ষোভ পরিচালনার ভার এবং তা শান্তিপূর্ণ এবং সংঘবদ্ধ ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করবেন।

রাত প্রায় একটা নাগাদ শ্রমিক ং সৈন্যরা জমায়েৎ হতে থাকে রল। তাদের দাবি—সোভিয়েত কুণি অন্তর্বর্তী সরকারকে সরিয়ে মতা অধিকার করুক। মেনশেভিক ং তাদের সমধর্মীরা সরাসরি এই স্তাব নাকচ ক'রে দিল। গোপনে রকারের সংগে যোগসাজসে তারা স্তাবিত বিক্ষোভ দমনের মতলব রে রেখেছিল।

৪ঠা এপ্রিল ভোরে অসুস্থ লেনিন সে স্বয়ং পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ রলেন।

দুপুরবেলা পাঁচলাখেরও বেশি মিক-সৈন্য সম্মিলিত হয়ে শান্তিপূর্ণ-াবে মিছিল সুরু করল। মহানায়ককে খার জন্য জনতার আকুল আগ্রহ খে লেনিন এসে দাঁড়ালেন ক্সে-িনসকায়া প্রাসাদের বারান্দায়, রেলিং-এ র দিয়ে—নাবিক, সৈন্য, শ্রমিকের ন উল্লাসে গগনভেদী আওয়াজ ুলল। স্মিতহাস্যে তাদের স্বাগত ানিয়ে লেনিন শান্ত ও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে াওয়ার উপদেশ দিলেন।

মিছিল চলল। তাদের শ্লোগান: সোভিয়েত্-এর হাতে ক্ষমতা চাই; ধনতান্ত্রিক মন্ত্রীরা নিপাত যাক্; রুটি চাই, শান্তি চাই, চাই স্বাধীনতা'।

ভীত, সন্ত্রস্ত হল বুর্জোয়া সরকার এবং তাদের সংগী মেনশেভিক্ দল, যার ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী অপদেবতা।

বিচিত্র মেনশেভিক্দের কার্য-কলাপ। তাদের ধূর্ত মুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন, তারা ভুঁই ফুঁড়ে উদিত 'দেশপ্রেমিক' কি-না! তাদের অন্ধ বীর-মদে তারা দেশবাসীকে মাতিয়ে ঠকাতে চায় প্রতিপদে। ঘোষণা করল, এসে গেছে দারুণ দুর্দিন। এবং ভেবেছিল, দায়ভাগ বল্শেভিকদের কাঁধে চাপিয়ে তারা স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু লেনিন-অনুগামীদের কাঁধ সমর্থ, দোষের বোঝা বহন ক'রেও, অদমিত অগাধ ক্ষমতার প্রাচুর্যে—সেই শক্তি-উৎস প্রাণপ্রাচুর্যধারী অগণিত মজুর, এবং কৃষক, যারা সেদিন লাঙলের মুখে নির্ভয়ে সংগী বাবা মাটির বুকে রচনা করার নেশায় মেতে উঠেছিল।

মেনশেভিকদের সংগী হিংস্র শত্রু সাম্রাজ্যবাদীর দল। তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপ জরাজীর্ণ শাসন-ব্যবস্থার অন্তিমকাল বুঝি বা ত্বরান্বিত করেছিল।

মিছিলের ওপর চলল নিষ্ঠুরতম আক্রমণ—শোণিতের স্বাদ পেলো পেত্রোগ্রাদ্। পথ ভেসে গেল শান্তিপূর্ণ মানুষের বক্ষশোণিতে। ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত লাল। রক্তের হোরি-খেলা।

তারপর যেন অন্তহীন ধনীর দৈন্যের অত্যাচার! সুরু হল ব্যাপক খানাতল্লাসী, অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত, অবাধ গ্রেপ্তার, অকথ্য অত্যাচার। ওরা জেনেও বোঝে নি, শত-কোটি অত্যাচারেও মানুষ কখনও শেষ পর্যন্ত তলিয়ে যেতে প্রস্তুত নয়। বাতাসে তার নিভৃত প্রতিজ্ঞা গুঞ্জরিত হয়, মর্মরিত হয় অন্তরের নিভৃতে। তাদের চলা ক্লান্তিবিহীন—

'যত ঘিরে আসে পথ-সংকট
চলে তত নব বলে।
চলে পড়ে পথ 'পরে।
নবীন মৃত্যু-যাত্রী আসিয়া
তুলে ধরে বুকে ক'রি।'

বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি বুকাশন্ দাবি জানালেন; অন্তর্বর্তী সরকার এখুনি সব শ্রমিকদের নিরস্ত্র করুন, মৃত্যুদণ্ড আবার চালু ক'রে 'জুলাই বিক্ষোভ'-এ অংশ গ্রহণকারীদের শাস্তি দিন অনতি-বিলম্বে। বল্শেভিক্দের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ সুরু হল; ৪ঠা জুলাই রাত্রেই তাদের দলীয় কার্যালয়ে হানা দিল পুলিশ।

৫ই জুলাই 'প্রাভ্‌দা' অফিস সৈন্য দিয়ে চুরমার ক'রে দেওয়া হল; লেনিন তাদের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন; দলীয় ছাপাখানা 'ত্রদ্'ও তাদের হাত থেকে নিস্তার পেল না।

লেনিন-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা তখন বাধাবন্ধহীন। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম দুষ্কর্মলীলা।

"শবস্রোত - জলে কাদা-গোলা বলে
গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদগব,
গলিত শবের ভাগাড়ের
ওরা, মৃত্যুর করে স্তব।"

মৃত্যু-বন্দনা কোনদিনই জীবনের দুর্বার গতি ঠেকাতে পারে নি; ভোরের পাখি নতুন জীবন-প্রভাতে 'নব পুণ্য-শ্লোক' উচ্চারণে ক্লান্তি জানে না।

আলেক্‌সিন্‌সকী ঘোষণা করলেন, তিনি কাগজপত্র দিয়ে প্রমাণ ক'রে দেবেন, লেনিন জার্মান্ গুপ্তচর।। বল্শেভিক্দের খুন করবার প্ররোচনা পর্যন্ত খোলাখুলি দেওয়া হতে লাগল।

৬ই জুলাই লেনিন বাধ্য হয়ে আবার আত্মগোপন করলেন ভাইবর্‌স অঞ্চলে; সংগে ক্রুপস্‌কায়া: সম্পদে-বিপদে তিনি স্বামীর চিরসহায়।

৭ই জুলাই অন্তর্বর্তী সরকার লেনিন এবং অন্য কয়েকজন বল্শেভিক্-এর গ্রেপ্তারী শমন জারি করলেন। কিন্তু দলীয় সভ্যের মতে লেনিন-এর উচিত আদালতে উপস্থিত হওয়া; কিন্তু স্তালিন এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী—তাঁর মতে, সৈন্যরা লেনিনকে সরাসরি খুন ক'রে ফেলবে।

দলীয় প্রতিনিধি গেলেন সরকারী প্রতিনিধি আনিসিমভ্-এর সঙ্গে কথা বলতে—তাঁরা দাবি জানালেন, সরকার যদি লেনিন-এর প্রাণরক্ষার দায়িত্ব নেন ত' তাঁর আদালতে হাজির হওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আনিসিমভ্ তাতে গররাজি—তিনি বললেন, তিনি 'নিজেই জানেন না আগামীকাল' তিনি নিজে 'কার হাতে থাকবেন'। বল্শেভিক্-রা সুতরাং ফিরে এলেন।

তাঁরা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, আপাতত লেনিন-এর পক্ষে ধরা দেওয়া অসমীচীন। তাঁর গোপন বাসস্থানের খোঁজ সুরু হল।

ক্রমশঃ।

সাহিত্য পরিচয়

সটীক সামগানাং সন্ধ্যা প্রয়োগঃ / বসুমতী সাহিত্য মন্দির

সন্ধ্যা প্রয়োগ সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশে যে রীতি বহুল প্রচারিত তা সর্বাংশে গোভিল প্রণীত সন্ধ্যা সূত্রের অনুযায়ী নয়। এতে সন্ধ্যা সূত্রোক্ত অনেকগুলি মন্ত্র পরিত্যক্ত ও সূত্রাতিরিক্ত কতকগুলি মন্ত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। যথাবিধি শাস্ত্রালোচনান্তে এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে অনুবাদক স্বীয় কর্মে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, বস্তুত তাঁর স্বচ্ছন্দ ভাষারীতির মাধ্যমেই জটিল বিষয়বস্তু সরল টীকার মাধ্যমে সাধারণের বোধগম্য হয়ে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়েছে। তত্ত্বানুসন্ধানী পাঠকমাত্রই যে এই গ্রন্থটিকে সাদরে গ্রহণ করবেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। বঙ্গানুবাদ--হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশনায়--বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রাঃ লিঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য---এক টাকা।

জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ / আনন্দধারা প্রকাশন।

অমর সাহিত্যস্রষ্টা বিভূতিভূষণের শিল্পচেতনা ও সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থারম্ভে সন্নিবেশিত হয়েছে বিভূতিভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা অল্পের মধ্যেও এই সাহিত্যকার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই তার মাধ্যমে স্বপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে অন্যতম পুরোধা স্থানীয় এই লেখকের রচনারীতি একেবারে পৃথক ধরণের [illegible] তাঁ

আছে, কোন ইজমই এই দৃষ্টিকে পারে নি ঘোলাটে বা আবিল করে তুলতে, সেই সঙ্গে সুন্দরেরও পূজারী তিনি। বস্তুত "সত্যম-শিবম-সুন্দরম" মন্ত্রের এমন একনিষ্ঠ অনুসরণ আর কোন সাহিত্যসেবী কখনও করেছেন কি না সন্দেহ। প্রকৃতি প্রেমিক এই সাহিত্যশিল্পীকে নিখুঁতভাবে বিচার করে, তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে, তাঁর এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ শোভন ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক--ডঃ তারকনাথ ঘোষ, প্রচ্ছদ---খালেদ চৌধুরী, প্রকাশক---আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম---১২'০০।

Child Of The Revolution

দীর্ঘকাল সোভিয়েত ইউনিয়ানে বসবাস করার ফলে বিশ্বের এই বৃহত্তম কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সম্বন্ধে লেখক যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তারই স্মৃতিচারণ ঘটেছে এই গ্রন্থে। সোভিয়েত ইউনিয়ানে বাল্যকালেই তিনি যান নাৎসী জার্মানী থেকে উদ্বাস্তু হিসাবে মাতার সঙ্গে। তারপর থেকে দীর্ঘকাল সেই দেশেই অতিবাহিত করেন তিনি এবং এই সময় ষ্ট্যালিনের রাশিয়া তাঁর চোখে যেভাবে প্রতিভাত হয় তাঁরই নিখুঁত আলেখ্যস্বরূপ বলা চলে আলোচ্য গ্রন্থটি। সোভিয়েত রাশিয়ার আদি-পর্বের সমগ্র অবস্থাকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক এই রচনায়, সে সময় রাশিয়া কমিউনিজমের প্রকৃত সংজ্ঞা কিভাবে নিরূপিত হত সে সম্বন্ধেও তথ্যনিষ্ঠ

আলোচনা করেছেন লেখক। বইটি পড়লে ষ্ট্যালিনের আদর্শানুযায়ী চালিত সোভিয়েত ইউনিয়ানের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাবার অবকাশ জন্মায়। লেখকের আন্তরিকতায় তাঁর বক্তব্য হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। মূল রচনার ইংরাজী অনুবাদেও যথেষ্ট শক্তির স্বাক্ষর রয়েছে। প্রচ্ছদ রঙীন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---উল্‌ফগ্যাঙ লিয়নহার্ড, অনুবাদ---সি. এম. উডহাউস, প্রকাশক---হেনরী রেগনেরী কোম্পানী চিকাগো, ইলিনয় গেটওয়ে এডিশন, টাকা---১-৯৫ পয়সা।

সুবোধ ঘোষের গল্প-সংগ্রহ / (প্রথম খণ্ড) প্রতিমা পাবলিকেশন্স

খ্যাতনামা সাহিত্যকারের মোট পঁচিশটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। সুবোধ ঘোষের রচনার আজ আর নতুন করে কোন পরিচয় দেওয়ার নেই, বস্তুত বাংলা গল্প সাহিত্যের ধারাটি আজ যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গল্প-সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে সক্ষম হয়ে উঠেছে তার জন্য যাঁদের নাম সর্বদা স্মরণীয়, সুবোধ ঘোষ তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পও স্থান পেয়েছে আলোচ্য সংগ্রহে, যার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় "শ্মশান চাঁপা" "থির বিজুরী", "বৈদেহী" প্রভৃতির। এই সব গল্পের প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই আমাদের পূর্ব পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটেছে, নানা সাময়িক পত্রের মাধ্যমে। তবু নতুন করে যেন শিহরিত হতে হয় এগুলি পড়তে গিয়ে। সম্পদময়ী শৈলীর সহায়তায় রূপে, রসে, গন্ধে একেকটি গল্প যেন একেকটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদল। এমন মধুগন্ধী ভাষা কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং একই জনা

লেখকের রচনার আয়োজন এত তান্ময় হয়ে দেখা দেয় পাঠকের মনে। গল্পগুলির আঙ্গিক যেমন অনবদ্য তেমনই এদের ভাবসম্পদ, মানবিকতা ও হৃদয়ের স্পর্শে এরা এতই সমৃদ্ধ যে, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে মনে গন্ধেও ভরে ওঠে মন। লেখকের হৃদয়বত্তার ছাপ আঁকা রয়েছে প্রতিটি গল্পেই এবং সত্য বলতে কি, সেটাই এদের প্রাণসত্তা। এমন অনবদ্য একটি গল্প-সংগ্রহ উপহার দেওয়ার জন্য, গ্রন্থটির প্রকাশক সংস্থা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। প্রচ্ছদ রমণীয়, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক---সুবোধ ঘোষ, প্রকাশক---প্রাইমা পাবলিকেশনস্, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। প্রচ্ছদ-শিল্পী---শ্রীসুধীর মৈত্র। দাম---পনের টাকা।

বাঘ ও অজন্তা / সারস্বত লাইব্রেরী

বাঘ ও অজন্তা গুহার চিত্র সম্পর্কে লেখক এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এই গ্রন্থ লিখেছেন। শিল্পী সেইসব দর্শনীয় বিখ্যাত গুহাচিত্র দর্শন করেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন সবিস্তারে। দুটি গুহার অসংখ্য চিত্র নিজে এঁকে এনেছেন এবং উপহার দিয়েছেন এই গ্রন্থে। তাঁর প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এসব উপলব্ধি করেছেন ও সেইসব স্থানের বর্ণনাও সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। দীর্ঘদিন আগে শিল্পী এই বাঘ ও অজন্তাকে কেন্দ্র করেই একখানি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন এবং রত্নসাগর গ্রন্থমালা সিরিজে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া কয়েকটি বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকাতেও বাঘ ও অজন্তা সম্পর্কে কয়েকটি লেখা প্রকাশ করেছিলেন। শিল্পী-লেখকের কুশলী কলমে এটি একটি সুন্দর তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ হতে পেরেছে। লেখক---দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলি: ৬। দাম ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

[illegible] / এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী

লেখক ভারতভ্রমণকারী ও সৌন্দর্য-রসিক, দেশ দেখে বেড়ানোর আনন্দে তিনি সদাই মশগুল, আলোচ্য গ্রন্থটিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই গ্রন্থে তাঁর ভারত-দর্শনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিসমূহ প্রাণ পেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ভারতের উল্লেখ্য দর্শনীয় মোট বাহান্নটি স্থানের কথা এতে আছে। সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও লেখক সেগুলির যে বিবরণ দাখিল করেছেন, তা যেমন তথ্যনিষ্ঠ তেমনি আকর্ষণীয়। লেখার আনন্দই শুধু সব নয়, তার চেয়ে মহত্তর কোন উপলব্ধির চেতনাও ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে। লেখক যে মূলত জীবন-সন্ধানী সে কথাও বুঝতে বাকি থাকে না তাঁর রচনা পাঠ করলে। কয়েকটি সুন্দর ছবি সন্নিবেশিত হওয়ায় এই ভ্রমণ কাহিনীর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে। আমরা এই রম্য ভ্রমণকথার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রঙীন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী, প্রচ্ছদ---সুধীর মৈত্র, প্রকাশক---এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম---৭'৫০।

যার যা ভূমিকা / আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় জীবনের মূল্যবোধ যে কোথায় নেমে গেছে মনে হয় সেটা বোঝাতেই এই কাহিনীর অবতারণা করেছেন লেখক। চারজন যাত্রী গাড়ীতে করে আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়েছে, যার মধ্যে তিনজন পুরুষ ও একজন নারী। পুরুষ তিনজনের মধ্যে অলক ধনী প্রডিউসার, শান্তনু মোটামুটি সফল পরিচালক, উদীয়মান নাট্যকার ও সুদীপ্তা আকর্ষণীয় চেহারার এক সাধারণ অভিনেত্রী। প্রতিটি চরিত্রের আলাদা আলাদা জবানীর মাধ্যমে দানা বেঁধেছে কাহিনী। সকলেই খোলাখুলিভাবে পরস্পরকে বিশ্লেষণ করেছে এবং সেই সূত্রে বিশ্লেষণ করেছে নিজেদেরও। সন্দেহ, অবিশ্বাস ও তিক্ততায় ভরা এইসব জবানবন্দী থেকে একটা বিকৃত জীবনবোধেরই পরিচয় বারে বারে আত্মপ্রকাশ করে। অথচ এটাই এ কাহিনীর চরম বক্তব্য নয়, সব পরিবেশকে ছাপিয়ে মনুষ্যত্বের যে ইঙ্গিত আত্মপ্রকাশ করেছে বারবার, মনে হয় সেটাই মুখ্য আর সবই গৌণ। মনে হয় নিজের হাতে গড়া সহস্র-বিধ কলুষের শেকলে বাঁধা অবরুদ্ধ মানবাত্মারই মুক্তি-কামনার অবিরাম আবেদন ধ্বনিত হচ্ছে এই রচনার ছত্রে ছত্রে। লেখকের অনন্য শৈলী বিষয়বস্তুর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। প্রচ্ছদ ইঙ্গিতময়, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---সমরেশ বসু, প্রচ্ছদ---পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রকাশক---আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। দাম---৭ টাকা।

ব্যাপার বহুতর / বাক্-সাহিত্য

ব্যঙ্গাত্মক রম্যরচনা বললেই যথাযথ পরিচয় দেওয়া যেতে পারে এই গ্রন্থের। ছোট ছোট কয়েকটি সরস রচনার মাধ্যমে, সমাজের নানা স্তরের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে মিষ্ট-মধুর কশাঘাত করেছেন লেখক। আজকাল দুর্নীতির ও অসাধুতার যে ঢেউ এসে লেগেছে সমাজের সব স্তরে, তার স্বরূপ খুলে দেখিয়েছেন লেখক নির্মমভাবেই কিন্তু সে উদ্‌ঘাটন নির্মম হলেও নিষ্ঠুর নয়, কারণ তার অন্তরালে রয়েছে লেখকের সরস প্রাণোচ্ছলতা, যার ফলে রঙ্গ করার উদ্দেশ্যটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। সরস সাহিত্যের ক্ষেত্রে, আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---ওঙ্কার গুপ্ত, প্রচ্ছদ---চণ্ডী লাহিড়ী, প্রকাশক---বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-, দাম - পাঁচ টাকা।

গ্রাম / বাক্-সাহিত্য

বাংলা, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলের সেকালের একটি বিশেষ দিকের ছবি বড় সুন্দরভাবেই ফুটে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসের মাধ্যমে। লেখক মূলত কৌতুক রসের স্রষ্টা, কিন্তু সে কৌতুকও উদ্দেশ্যহীন নয়, বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নানা রূপ নানা বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তোলাতেই তার সার্থকতা। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রাম্য বৃদ্ধ স্বরূপ মণ্ডলের জবানীতে সেকালের জমিদারদের জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপের যে রূপটি বিধৃত, তা যেমন কৌতুকাবহ তেমনই তথ্যনিষ্ঠ। লেখকের অনন্য-শৈলীর মাধ্যমে জমিদার দামোদর চৌধুরী ও তাঁর নফর শিবদাস মণ্ডল, প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার ধনঞ্জয় রায়, নির্লোভ ব্রাহ্মণ অনাদি ন্যায়রত্ন, তেজস্বিনী বিধবা বুড়ঠাকরুণ প্রভৃতির যে রূপটি ধরা দেয়, তা যেমন উজ্জ্বল তেমনই উপভোগ্য। সেই সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে বয়ে চলেছে যে মধুর দাম্পত্য প্রেমের ধারাটি মূল নায়িকা পুরোহিত-কন্যা নৃত্যকালীকে কেন্দ্র করে, তার আকর্ষণও বড় কম নয়। স্নিগ্ধতা ও সরসতার এমন অপূর্ব সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক--বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রচ্ছদপট--অজিত গুপ্ত, প্রকাশক---বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম---৪'৫০

নানা / অগ্রগামী প্রকাশনী

এমিল জোলা রচিত একখানি উপন্যাস। প্যারী শহরের থিয়েটার দ্য ভ্যারাইটির হলঘর কেন্দ্র করে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। নানা হচ্ছে নায়িকা, যাকে তুলে ধরেছে বোর্দেনেভ। প্যারী শহরে দারুণ জল্পনা-কল্পনা এই নায়িকা নানাকে কেন্দ্র করে। কত কল্পনার বন্যা, কত তর্ক-বিতর্ক। নানা হলো সর্বশ্রেষ্ঠা। অভিনয় যত ভাল না করুক---তত ভাল লাগে তার হাসি, তার চাহনী, গালের টোল পড়া, নাচ এবং উপরে লাথি ছুঁড়ে দর্শককে বিমোহিত বা সম্মোহিত করা। তারপর প্যারী শহরে রাতের পর রাত নানার জন্য দর্শকদের প্রতীক্ষা। তারা কাতর প্রতি মুহূর্তে। প্রেমের আকুলি-বিকুলি খা খেয়ে মরে হতাশায়। কত জন পরিচিত হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এমনি একটি আকর্ষণীয় কাহিনী এই নানা গ্রন্থখানি। । দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে এবং এদেশে এই গ্রন্থখানি আদৃত হয়ে আসছে। এমন একটি বইয়ের মূল লেখক এমিল জোলা। অনুবাদ করেছেন গোপালচন্দ্র দাস। সুন্দর অনুবাদ করেছেন তিনি। প্রকাশক : অগ্রগামী প্রকাশনী, বি বি ঘোষ রোড, বর্ধমান। দাম ১৫ টাকা। রেক্সিন বাঁধাই। গ্রন্থখানি আদৃত হবে।

এপার বাংলা ওপার বাংলা /

বাক্-সাহিত্য

সংস্কৃতির প্রসারার্থে অধুনা সাহিত্যিকরা নিমন্ত্রিত হচ্ছেন দেশ-দেশান্তরে, এবং এমনই এক সুযোগে বর্তমান গ্রন্থের লেখকও পাড়ি জমিয়েছিলেন সাগরপারে দু মাসের জন্য প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই রচনা তাঁর সেই আট সপ্তাহব্যাপী অভিজ্ঞতারই স্নিগ্ধ স্মৃতিচারণ। মানবপ্রেমিক লেখক, দেশ দেখতে গিয়েও মানুষই দেখতে চেয়েছেন এবং তাতে তিনি সফলও হয়েছেন। ডলারের দেশ আমেরিকায় জীবন উপভোগ করার সহসুবিধ উপকরণেও তাঁর সত্য দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য আবিল হয়ে ওঠে নি, সবার উপর মানুষই যে সত্য, এই মহত্তম উপলব্ধিকেই যেন তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেছেন প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পলে। এবং তাই সব নয়, দ্বিখণ্ডিত পর্যুদস্ত বাংলা দেশের দুই খণ্ড যে আজও ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে এক সুতোয় গাঁথা রয়েছে সে সত্যকেও চিনতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। এপার বাংলার সঙ্গে ওপার বাংলার রাখিবন্ধন যে অচ্ছেদ্য, জিয়াবুল হক, বরুণ সাহা, আজিজ সাহেব, জালাল আমেদ, জিয়া হায়দার, বেনেডিকট গোমেজ প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে তা সপ্রমাণিত হয়েছে। বাঙালীর একমাত্র পরিচয় যে বাঙালীয়ানাতেই নিহিত, সে সত্য ও সোচ্চার এই রচনার ছত্রে ছত্রে। প্রচ্ছদ নয়নাভিরাম, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক---শংকর, প্রচ্ছদ---কানাই পাল, প্রকাশনায়---বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম - দশ টাকা।

মানুষের মাঝে এভারেস্ট /

সোভিয়েৎ দেশ প্রকাশনী

"লেনিন সম্পর্কে গোড়ার দিকের সাহিত্য বিষয়ক" এই রচনা অনুসন্ধানী পাঠককে বিশেষভাবেই আনন্দ দান করবে। লেনিন সম্পর্কে বিশের দশকের গোড়ায় ভারতে যেসব রচনাদি প্রকাশিত হয়েছিল, আলোচ্য গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত করা হয়েছে। লেখক বিদেশী হয়েও যে কি রকম সুচারুভাবে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত লেনিন সম্পর্কীয় আলোচনাদির নোট সংগ্রহ করে আবদ্ধ কর্ম সমাধা করেছেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। এজন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে, চালাতে হয়েছে আন্তরিক প্রচেষ্টা। যার স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের পাতায় পাতায়। সম্পাদনকার্যেও কৃতিত্বের ছাপ আছে। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---এল ভি মিত্রোখিন, সম্পাদনা---গিরিজাকুমার সিন্‌হা, প্রকাশক---সোভিয়েৎ দেশ প্রকাশনী, দাম---পঁচাত্তর পয়সা।

সুখের লাগিয়া / ডি এম লাইব্রেরী

একটি সংঘাতময় কাহিনী গড়েছেন লেখিকা। কাহিনীটিতে যেমন প্রাণ আছে, তেমনি আছে বলিষ্ঠ ভাষা। গল্পের নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র-গুলিও যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়েছে। তা ছাড়া এই গ্রন্থের আর একটি দিক লক্ষ্য করবার মত, যা হলো---ধারাবাহিকতার [illegible] রয়েছে অটুট। মনে ছাপ রাখার মত কাহিনী মুগ্ধ করে রাখে

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির এক জনসমাবেশের একাংশ। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন সভাপতি বীরেশ্বর রায় ও অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় এম-পি

॥ চিত্র সংবাদ ॥

নারকেলডাঙ্গার নিহত বিপুল রায়ের বাড়িতে তাঁর শোকস্তব্ধ মা শ্রীমতী নির্মলা দেবী, বোন আরতি রায় ও কাকিমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও বর্তমান সংসদ-সদস্য শ্রীঅশোককুমার সেন

ভারত সভা হলে প্রেস কর্মচারী সমিতির ৫১তম বার্ষিক সভায় ভাষণরত শ্রীযতীন চক্রবর্তী

মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৭৭ '৭৭

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছেন তরুণীরা

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ভবনে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণরত বিদায়ী সভাপতি শ্রী এ কে জৈন। পার্শ্বে উপবিষ্ট রয়েছেন নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রী আর পি গোয়েঙ্কা

মাসিক বসুমতী, আষাঢ় / '৭৭

মাধ্যমিক শিক্ষকদের এক বিরাট মিছিল মহাকরণ অভিমুখে চলেছে

লিপ্রা দত্ত এই গ্রন্থের লেখিকা। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে তিনি তাঁর আশ্চর্য যাদুকরী সৃজনীশক্তি ও বলিষ্ঠ রচনাশৈলীর এক অসামান্য নিদর্শন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রকাশ-বর্ণনারীতি চিত্তাকর্ষক। মনোরম ভাষা স্বচ্ছন্দগতি ও প্রাঞ্জলতায় ভরপুর। রচনার মধ্যে একটি বিশেষ সমাজের যে নিখুঁৎ আলেখ্য তিনি তুলে ধরেছেন তা তাঁর বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় বহন করে। প্রকাশক---ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিঃ ৬। দাম : সাত টাকা।

স্বীকৃতি / বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড

কয়েকটি ছোট গল্পকে একত্রিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যকার, তাঁর কলমের প্রসাদগুণে বিভিন্ন রস ও মেজাজাশ্রয়ী গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। কয়েকটি গল্প বিশেষভাবেই মনে রাখার মত, যার মধ্যে "হ্যাংম্যান" "লাভের গুড়" "অভিভাবিকা" "স্পেশাল চিঠি" প্রভৃতির নাম করা যায়। লেখকের কথন-ভঙ্গীর আন্তরিকতাই গল্পগুলির প্রাণসত্তা, তিনি যা বলেন তা মন থেকেই বলেন, যার ফলে তাঁর বক্তব্য সহজেই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে। আমরা এই গল্পগ্রন্থটি হাতে পেয়ে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। লেখক---জরাসন্ধ, প্রচ্ছদপট---শ্রীকানাই পাল, প্রকাশনায় - বাক্ - সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম পাঁচ টাকা।

পূব-পশ্চিম / আনন্দধারা প্রকাশন

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন। শক্তিমান সাহিত্যকার রচিত এই কবিতা-সমষ্টি এক বিশেষ আবেদন নিয়ে বোদ্ধা পাঠকের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। কি দীপ্তিতে কি ভাবব্যঞ্জনায় এরা এক নতুন রসের ধারার সন্ধানবাহী। ভাষারীতি-ঔজ্জ্বল্য তো বিশেষভাবেই মনকে টানে। বস্তুত ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ কবিতাগুলি পাঠ শেষেও বহুক্ষণ ধরে ধ্বনিত হতে থাকে রসজ্ঞ পাঠকের মর্মে। প্রচ্ছদশিল্প সুষম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রকাশক---আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রচ্ছদ---পূর্ণেন্দু পত্রী, দাম : তিন টাকা।

শুকনো জল / ডি লাইট বুক কোঃ

আলোচ্য কাব্য গ্রন্থটিতে মোট পঞ্চান্নটি ছোট ছোট কবিতা সংকলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য আধুনিক কবিতা বলতে যা বোঝায়, গ্রন্থোক্ত কবিতাগুলিও সেই জাতীয়। ছন্দ বা মিলের বালাই না থাকলেও কবিতাগুলির মাঝে কাব্য-রসের ঘাটতি নেই, কবির পরিশীলিত মননের ছাপও আছে, তাই এগুলি সাগ্রহে পাঠ করতে চাইবেন অনেক কাব্যামোদী ব্যক্তিই। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক---কেদার ভাদুড়ী, প্রকাশক---ডি লাইট বুক কোম্পানী, ১৭৩।৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬, দাম : তিন টাকা মাত্র।

লেনিনের জীবন কথা / সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী

কমিউনিজমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা লেনিনের নাম বিশ্ববিদিত হলেও বাংলায় তাঁর জীবনকথার সমধিক অভাব, এই গ্রন্থ সেই অভাব অনেকটাই মেটাবে। সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত লেনিনের এই জীবনীতে তাঁর সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুষ্ঠুভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। এই মহান বিপ্লবী নায়ক সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে বইটি পড়লে। মূল রাশিয়ান থেকে যিনি বঙ্গানুবাদ করেছেন তাঁর কাজেও যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর আঁকা। আমরা এই গ্রন্থটি হাতে পেয়ে সুখী হয়েছি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক---নিকোলাই মিখাইলোভ, প্রকাশক---সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী, ১।১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬, দাম : এক টাকা।

বারান্দা / অব্যয়

গল্পও নয় অথচ প্রবন্ধ বা রম্য রচনাও নয় এমন ধরনের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত রচনার সমন্বয় ঘটেছে এই গ্রন্থে। রচনাগুলিকে বরং বলা যায় লেখকের সলিলকি বা স্বগতোক্তি, যে কোন বস্তু নিয়ে তিনি কিছুক্ষণের জন্য মনে মনে যা ভেবেছেন তাই রূপ পেয়েছে আলোচ্য রচনাগুলির মাধ্যমে। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, লেখকের স্টাইলে অনন্যতার স্বাক্ষর আছে, এবং শুধুমাত্র তার জোরেই এই মিস্টিক ধরনের রচনাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রচ্ছদ রুচিসঙ্গত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---অমল চন্দ, প্রকাশনা---অব্যয়, ৪২ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯, দাম : তিন টাকা।

গল্প বিচিত্রা

আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি ছোট গল্প একত্রিত করা হয়েছে। গল্প-গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর সব কটিরই রচয়িত্রী মহিলা। লেখিকাদের মধ্যে খ্যাতনাম্নী কয়েকজনও আছেন, তবে বেশীরভাগই নবাগতা। বহু রচনাই অপটু লেখনীর স্বাক্ষরবাহী, তবু তারই মধ্যে দু' একজনের রচনায় কিছুটা প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত আছে। বর্ণাশুদ্ধির বাহুল্য রীতিমত চোখে পড়ে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। সম্পাদনা---শ্রীমতী অর্চনা মিত্র, মুদ্রক---প্রেস কর্নার। ২৩, যুগীপাড়া লেন, কলিকাতা। মূল্য : ৩'৫০।

Betrayal of Bengal By Congress

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সূচনায় দেশ ভাগের যে ঘৃণিত ও সর্বনাশা প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" বাংলা দেশ অদ্যাবধি তার প্রায়শ্চিত্ত করে যাচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থে সে সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে। দেশ ভাগের ফলে বাংলার স্বার্থ কিভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন লেখক।

জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেই বইটি পাঠ করে উপকৃত হবেন। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—খগেন কর, প্রাপ্তিস্থান—প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : দু' টাকা।

খোয়াই / (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)

গৌরী বসু সম্পাদিত এই কবিতা মাসিকের প্রথম সংখ্যাটি হাতে পেয়ে আমরা সুখী হয়েছি। খ্যাত অখ্যাত বহু আধুনিক কবির কবিতা এতে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাব্যানুরাগী পাঠকমাত্রেই যে এই নবাগত কাব্য-মাসিককে সাদর স্বাগত জানাবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। প্রকাশনা—খোয়াই প্রকাশনী, ৪।৫, নাকতলা রোড, কলকাতা-৪৭। প্রচ্ছদ—কমল সাহা।

বেদ গ্রন্থমালা / (প্রথম খণ্ড)

গ্রন্থকার চারিবেদের অনুবাদকল্পে উৎসাহী হয়েছেন, এটি বড়ই আনন্দের বিষয়। আলোচ্য গ্রন্থটি এই অনুবাদ সিরিজের প্রথম খণ্ড, এতে ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ করা হয়েছে। এই অনুবাদে প্রথমে ঋক্-মন্ত্র, পরে মন্ত্রের পদ বিভাগ, অন্বয়, অনুবাদ এবং শব্দার্থ-ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অনুবাদ-কর্মে যথেষ্ট আন্তরিকতার স্বাক্ষর বর্তমান। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। সম্পাদনা ও অনুবাদ—পরিতোষ ঠাকুর ও শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম : ৩'০০।

অমর বাণী / ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ফ্র্যাঙ্কলিন, ডি রুজভেল্টের মত ও মন্তব্য প্রথম পরিবেশিত হয় "আমেরিকান রিপোর্টারের" পাতায়। পরে এই সাময়িক পত্রের কয়েকটি সংখ্যা থেকেই এই বিষয়ক ফিচারগুলি উদ্ধার করে তার থেকে স্মরণীয় উদ্ধৃতিগুলি বেছে নিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়। আলোচ্য পুস্তিকাটি এরই সরল বঙ্গানুবাদ। এই উদ্ধৃতিগুলি একাধারে জ্ঞানগর্ভ ও আনন্দদায়ক। আমরা এই পুস্তিকাটি হাতে পেয়ে সত্যই খুসী হয়েছি। অঙ্গসজ্জা পরিচ্ছন্ন। প্রকাশনা—উইলিয়ম ডি, মিলার। ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা।

উনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ /

সারস্বত লাইব্রেরী

বাংলার ঐতিহাসিক গৌরবময় উনবিংশ শতাব্দীকে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে আলোচ্য রচনায়। আবার উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্যের পর বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ক্রমিক অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন লেখক। গবেষণামূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য রচনাটি সাদরেই গৃহীত হবে অঙ্গসজ্জা পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম : দেড় টাকা।

দ্রষ্টা বিবেকানন্দ

স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন সপ্তর্ষির একজনের মত। সপ্তর্ষির মতই তিনি ছিলেন দূরদর্শী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। যা দেখেছিলেন, যা বলেছিলেন, সবই সত্য হয়েছে এবং হচ্ছে। তাঁর জীবনের মহিমময় মুহূর্তের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী এখানে দেওয়া হল।

* * * *

আধুনিক বিশ্বের সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলেছিলেন ১৮৯৪ খৃঃ সে বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ আসে না। সিস্টার ক্রিষ্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"Sometimes he was in a prophetic mood, as on the day when he startled us by saying, "The next great upheaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China." This he said thirty two years ago, when China was still under the autocratic rule of the Manchu Emperors, from which there was no prospect of release for centuries to come, and when Czarist Russia was sending the noblest of her people to the Siberian mines. To the ordinary thinker those two countries seemed the most unlikely nations in the world to usher in a new era."

রূপ রস বর্ণ

'তবে চলুন আমরা একসঙ্গে যাই, আপনার বাড়ি হয়ে কেল্লার মাঠে।'

'আপনিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে যান, চৌধুরী মশাই।' আমন্ত্রণ জানায় রৌশন।

ভ্যাণ্ডারবিল্ট বলেন, 'মাদাম, আমার এক মিনিটও দেরী করবার উপায় নেই, টাকা পেলেই চলে যাব। ওরা দু'দিন না খেয়ে আছে, আমার গলা দিয়ে তো খাবার নামতে চাইবে না। আপনার নিমন্ত্রণের সুযোগ আর একদিন গ্রহণ করবো, আজ নয়। ওদের মুখগুলো এবং কাতরদৃষ্টি আমাকে পাগল করে দিয়েছে।'

বিস্মিত হয় লাবেয়া। দাম্ভিক উদ্ধত লম্পট এই লোকটির চোখ দুটি কী হঠাৎ ছলছল করে উঠলো, না এটা তারই চোখের ভ্রম?

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ পাঁচ ॥

কলকাতা ছেড়ে যারা পালিয়েছিলো তারা প্রায় সবাই ফিরে গেছে। কিন্তু বেশ কিছু ফিরিঙ্গি, আরমানি ও হিন্দু রয়ে গেছে চন্দননগর, চুঁচড়ো ও শ্রীরামপুরে। শ্রীরামপুরে হিন্দু তাঁতিরাই বেশী। তবে কলকাতার দেহের ক্ষতটা শুকোতে সময় লাগবে। নবাব আলিনগর নাম দিলেন, তবুও কলকাতা নামটাই আঠার মত লেগে থাকলো।

কলকাতায় এবার চড়কপুজো নমো নমো করে সারা হবে, জেলেপাড়ার সঙের মিছিল বার হবে না, চন্দননগরে তোড়জোড় সুরু হয়েছে। ধোপাপাড়ার সঙের মিছিলে আরও জৌলুষ হবে।

চরণ ধুপী মাঝখানে হুগলী গিয়েছিলো, শুনে এসেছে লোকমুখে চলতি একটা ছড়া—

নবাব বাহাদুরকা ফৌজ
যেইসি খোলা তলোয়ার,
ঘড়ি ভরমে জিত লিয়া
কেল্লা কলকাত্তা বাজার।

চরণ এসে ভুতো, শিবু, বিশু, ফটিক, দেবু, বংশীকে বললো, এক ঘণ্টার মধ্যে নবাবের ফৌজ কলকাতার শহরটা নিয়েছে, এটা তো মিছে কথা। সে সাদা বাংলায়ই ছড়া কত গাঁথবে, উর্দু-ফুর্দুতে নয়। তালিম ও মহড়া চলে রোজ।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন মিছিল বার হলো।

দিব্যদর্শী

প্রথমে ইংরেজের ফৌজী উর্দী-পরা, খড়ি মেখে ধবধবে সাদা এক গোরাসৈন্য, তার কোমরে দড়ি বেঁধে একটি দাড়ি-পরা ছোকড়া নবাবী ফৌজের উর্দী পরে তরোয়াল উঁচিয়ে চলেছে, পেছনে গানের ধুয়ো।

সাবাস সাবাস ইংরেজ,
কোথায় গেল সেই তেজ?
কোথায় রইল কলকাতা?
পালিয়ে গেলি ফলতা?

খেয়ে মদ, আর গোস্ত,
পালোয়ান হলে মস্ত,
এখন খাবে কাঁচকলা,
খেয়ে গেলে কানমলা।

এর পরে একজন পুরুষ এলো মেম সাহেবের পোষাকে, কিন্তু মুখে ইয়া বড় গোঁপ। ধুয়ো উঠলো—

সাবাস সাবাস প্রেসিডেণ্ট ড্রেক,
একেবারে বদলে ফেললে ভেক,
ছিলে মর্দ সাজলে মেম,
সেম সেম ছি: ছি: সেম।

সঙের বশীর ভাগই ছিল ইংরেজদের কেচ্ছা। সাদা রঙ মুখে-গায়ে মেখে সাজানোও হয়েছিলো চমৎকার। সেদিনকার মাঝরাতে ঘোড়ার পিঠে বার্নার্দকে মনে পড়াতে ভুতো বাগদী ধরে এসেছিলো ঐ শালার কেচ্ছাও নামাতে হবে মিছিলে, চরণ তার কথা ঠেলতে পারেনি।

একটা রাম ছাগলের পিঠে চড়ে চালছে ভুঁড়ি-ওলা বেঁটে মোটা সাহেব-বেশধারী, মুখে চুরুট। ধুয়ো উঠলো:

রাতের বেলা ঘুর ঘুর করে এই শালা
তাঁতিপাড়া মুগীপাড়ায় দাদন ছড়ায় মেলা
আসে যদি ধোপাপাড়ায় ভেঙে দেব ঠ্যাং
মারের চোটে হয়ে যাবে

চ্যাপ্টা একটা ব্যাং,
পালা পালা, ওরে শালা।

বোড়াকমলপুরের রাস্তায় চলেছে মিছিল। হরিধন চৌধুরীর পৌত্র প্রতিবার বাইরে এসে দাঁড়ান, এবার বুড়োকে দেখা গেল না। বাড়িটা ভেঙে পড়ছে, মেরামৎ করবার পয়সা নেই বৃদ্ধ হরিধন চৌধুরীর। ছেলে পাটনায় ভাল চাকরি করছে, ফিরিঙ্গি বিয়ে করেছে সবাই জানে, কিন্তু হরিধনের দু'বেলা অন্ন জোটে না। চরণ হেঁকে বললো, বীরু দেখ তো জানলা দিয়ে বুড়ো মরে আছে কি না? কি, শুয়ে আছে? থামা মিছিল, আমি ভেতরে দেখে আসি।

বৃদ্ধ হরিধন চৌধুরীর পা মচকে গেছে আছাড় খেয়ে। বাড়িতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই দেখবার। চরণকে দেখে মলিন হাসি হাসলেন। দাদু, মিছিল এবার দেখা হলো না, উঠে বসতে পারি, কিন্তু হাঁটতে পারি না।

মিছিল থেমেছে। চরণ আবার হাঁক দিল 'শিবু, মিছিল পেছনে হটিয়ে আন, একেবারে গোড়া থেকে সুরু করতে হবে।'

চরণ হাতজোড় করে বলে 'বাবু, আপনি না দেখলে আমার মিছিল বৃথা হয়ে যাবে। আপনারাই ছিলেন এ তল্লাটের জমিদার, আমরা তো ছিলাম আপনারই প্রজা, এখনও আপনাদের প্রজা বলেই মনে করবেন, আমরাও আপনাকে মনিব বলেই মনে করি। যদি আমি ধোপা বলে ঘেণ্না না করেন তবে আড়কোলে করে আপনাকে সামনের বারান্দায় নিয়ে বসিয়ে দেই।

বৃদ্ধের গলার স্বর ধরে এলো। 'তোরা তো আমার নাতীর মত চরণ, ঘেণ্না করবো কেন? তোরা ছাড়া আর কে আছে আমার?'

দু'চোখ বেয়ে জল নেমেছে হরিধন চৌধুরীর। অসহায়ত্বের পরম দুঃখ, পরম গ্লানি ফুটে উঠেছে চোখেমুখে।

চৌধুরী জমিদারদের ঠাটবাট শুকিয়ে গেছে, বাড়িটা জরাজীর্ণ, হরিধন চৌধুরীর দেহটাও পুষ্টির অভাবে শুকিয়ে কাঠ, পঞ্চাশ বছরেই জরাজীর্ণ। থাকবার মধ্যে আছে গায়ের টকটকে গৌরবর্ণ এবং চৌধুরী বংশের খড়্গ-নাসিকা। একটা ভাঙা চেয়ারে বারান্দায় বসিয়ে দিল বৃদ্ধকে চরণ ধুপী, আগাগোড়া মিছিলটা দেখানো হোল। জমিদার-বাড়ির লক্ষ্মী চলে গেছে, কিন্তু সম্মানটা দেখাতে জানে চরণ ধুপীর দল।

'বাবু, সাহেব ডাক্তারটিকে একবার ডেকে দেখাবো? কেবল মচকানো নয়, পায়ের হাড়ও তো ভেঙে যেতে পারে?'

সম্বিত ফিরে এলো হরিধন চৌধুরীর। এতক্ষণ জমিদারের মতই মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে বসে মিছিল দেখছিলেন, এখন উঁচু মাথাটি হেলে পড়লো। 'বলিস কিরে, সাহেব ডাক্তার? টাকা কোথায়?'

'টাকার কথা আপনার ভাবতে হবে না, বাবু, সঙের তহবিল থেকে দেওয়া হবে।'

'সে হয় না চরণ, ওটা বারোয়ারির টাকা। দশজনের টাকা থেকে বাজে খরচ করবি কেন আমার জন্যে?'

'শেয়াল কুকুরের মত মন নিয়ে আমরা মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবো?'

হরিধন জড়িয়ে ধরলেন চরণের হাত। 'ভদ্রলোকের মুখে এ রকম কথা শোনা যায় না আজকাল, তোর মুখেই একথা শুনলাম। কিন্তু---'

'কিন্তু-কিন্তু নয় বাবু, আজ বিকেলেই বুভিয়ার সাহেবকে নিয়ে আসবো আমরা, আর রামু ভটচাযের মেয়েটা এসে রোজ দু'বেলা মালিস করে দিয়ে যাবে, দুটো ভাত ফুটিয়েও দেবে।'

হরিধনের জবাব দেবার সময় না দিয়েই চরণ বৃদ্ধকে বিছানায় শুইয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

মিছিল চলেছে থিয়েটার দিকে। ওখানকার আরমানিরাও এবার চাঁদা দিয়েছে। ফিরিঙ্গিদের মত ওরা আলসে নয়, বড় জঙ্গলটা কেটে প্রায় সাফ করে ফেঁদেছে, বসিয়েছে কাঠের আড়ৎ, তুলে ফেলেছে ছোট ছোট সব কাঠের বাড়ি নিজেদের থাকবার জন্যে, ভাছাড়াও চেয়ার, টেবিল, খাট, দরজা, জানলা তৈরী করে। ওদের হাতের কাজও ভালো। মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বর্ধমান, কলকাতা, ঢাকায়ও নৌকো বোঝাই চালান দেয়। ফরাসী কোম্পানী জমিটা দিয়েছিলেন ওদের কিস্তিবন্দী হিসেবে, বাসস্থানের জন্য কিছু নগদ টাকাও আগাম দিয়েছিলেন মাথাপিছু হিসেবে, সে টাকাটা কখনো খেলাপ করে না এরা। একার যা সাধ্য হতো না, সকলে মিলে একসঙ্গে খেটেখুটে জুগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ফিরিঙ্গীরা সুবিধে করতে পারে নি। জোয়ান ছেলেরা ঢুকেছে চাকরিতে, বেশীর ভাগই ফরাসী ডাচ ও নবাবের পল্টনে, মেয়েরা মধুচক্রের মৌমাছি হয়ে মধু বিতরণে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

সবদিন সমান যায় না। যে অদৃশ্য শক্তিটি মানুষের সুদিন-দুর্দিনের বরাদ্দ হিসেব করে মেপে দিচ্ছেন, তাঁর নাম বিধাতা। এক এক সময় তিনি সহৃদয়-সকরুণ মুক্তহস্ত, এক এক সময় নির্দয়, নিষ্করুণ কৃপণ। তিনি নির্বিকার, মানুষের বন্যবাদও অভিযোগে সমভাবে ভ্রূক্ষেপহীন।

খিদমৎগার আলি আসগর কোন শুভ বা অশুভ মুহূর্তে বিবিপাড়ার ভাড়াটে ঘরটির চৌকাটে লিখে রেখেছিলো 'এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা' তা ঐ বিধাতাপুরুষই জানেন। তখন সে লাটবাড়ির চাকরিটি পায় নি, ক্রমে চাকরিটা পেলো, অভাবের দিন কেটে গিয়ে স্বচ্ছলতার সুদিন এলো, চিড়িয়ার মত খাপসুরত আর্মানি বিবি জুটে গেল নসীবের ভাগতে। কিন্তু চৌকাটের ঐ লেখাটা যে ভাগ্যের চাকটাকে আবার ঘুরিয়ে দেবে তা ভেবে দেখেনি, হয়তো তা হলে ওটা মুছে ফেলতো। আলি নগরের জন্মলগ্নে কলকাতার যে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বহ্নিবন্যায়, সে বহ্নি একটি স্ফুলিঙ্গ এসে লেগেছে আলি আসগরের বুকে, জ্বালিয়ে ছাই ক

দিয়ে গেছে তার কলিজা। শূন্য হয়ে গেছে তার বিবিপাড়ার সুখের নীড়।

চিড়িয়া সেই যে কলকাতা গিয়েছিল, আর ফিরতে পারে নি। মুর্গীহাটার আরমানি গীর্জায় যখন সেজেগুজে খুড়তুতো বোনের বিয়ের উৎসবে গিয়েছিলো যখন বর-কনে অভ্যাগতরা টের পায় নি যে, নবাবের সেপাইরা দিসিপাড়া লুঠ-লোপাট করে এগিয়ে আসছে। কামানের আওয়াজ তখনো মারাঠা-খালের ওপারে, তাই ভাবা গিয়েছিলো বিবাহের অনুষ্ঠানটি তাড়াতাড়ি সমাধা করে সবাই ফোর্ট উইলিয়মের ঘাট থেকে রওনা দেবে। দুটো পানসি নৌকো ভাড়া করা ছিল, মালপত্তরও উঠেছিলো।

তারপরে কী হলো সেই তাণ্ডবে কেউ বলতে পারে না, তবে আলি শুনেছে চিড়িয়া এখন মুর্শিদাবাদে এক কাজীর বাড়ীতে বাঁদীর কাজ করছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মাথার চুল জট পাকিয়ে গেছে। কি নির্যাতনটাই তার ভোগ করতে হয়েছে হায়!

কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে আলি আপন মনে বিড়বিড় করে, হাসে কাঁদে, আল্লার কাছে নালিশ করে। তার মোম-পালিস গোঁফজোড়ার কোণ দুটি আর উদ্ধত-উদ্যত নাই, অযত্নে নেতিয়ে পড়েছে, পাগড়ীর বন্ধনসৌষ্ঠব আগের মত নেই, শুধু কলের মত কাজ করে যায় অভ্যাসের তাড়নায়।

লাটকুঠির দুপুরের খানাপিনা শেষ। আলির খেয়াল হলো তার তামাক ফুরিয়েছে, চললো সে রামভরোসার দোকানের দিকে। রামভরোসা মিছির মুঙ্গেরের লোক, বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করে বাঙ্গালী ব'নে গেছে। মাছ খায়, পান চিবোয়, বামুন হয়েও টিকিধারী নয়।

'এস আলিভাই, কী দরকারে পায়ের ধুলো পড়েছে?'

'তামাক, খুব কড়া দেশী তামাক।'

'মিঠে তামাক ছেড়ে কড়া ধরছে কেন? মাথায় চল করে লাগবে। খেতে চুরুট, সেটা ছেড়ে দিচ্ছো তামাক, এবার কড়া তামাক?'

'মাথা কী আর আছে মিছির ভাই, চন করে ধরলে বুঝবো খানিকটা যায়গা মতই আছে।

'চিড়িয়া বিবির খোঁজ তো পেয়েছো, নিয়ে এস না গিয়ে?

'থেকেও নেই সে, খোঁজ না পেলেই হয়তো ভালো হতো।

'একটা হারিয়েছো, আর একটা জুটিয়ে নাও না কেন? কত তো এসেছে এখানে কলকাতা থেকে। তুমি তো আর বামুনের ঘরের বিধবা নও?'

মিছিল ফিরতি পথে। গান শোনা যাচ্ছে---

মরি মরি কী বীরত্ব, সাদা মুখে কালি,
তার চাইতে কালীঘাটে দিলে হ'ত বলি,

কেউ কতক [illegible] চোর মত চলে,
আর কতকে গারদখানায় পড়লো
ইন্দুর কলে।

আলির কান দুটো জ্বালা করে উঠলো। ইঁদুরের মতই কলে পড়েছিলো চিড়িয়া শয়তানদের হাতে। একেবারে পিষে মেরে ফেলেছে। এটা বাঁচার মত বেঁচে থাকা নয়, বেঁচে থেকেও মরার মত। তাড়াতাড়ি তামাকের মোড়কটি তুলে নিয়ে সে ছুটে চলে যায়।

চরণ ধুপীর ভাষায় পালিস নেই, কিন্তু সাদা জাতের প্রতি অসন্তোষ ফুটিয়ে তুলতে পারে। কলকাতার ইংরেজদের পরাজয়ে দেশী লোকদের বুকের পাটা যেন ফুলে উঠেছে, ভয় ভেঙ্গে গেছে।

কারখানার কামীনরা কাজে একটু ঢিল দিয়েছে। সঙ দেখতে যাবার হুজুকে চুরুটের কারখানার সবাই দুপুরে ছুটি নিয়েছে। অ্যালবার হিসাব মেলাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু বারে বারে ভুল হচ্ছে। সেদিন চৌধুরীর ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণে রাবেয়ার গলায় অমন সুন্দর মালাটা দেখেই তার সন্দেহ হয়েছিলো ওটা কোনো ভক্তের প্রেমনিবেদন। অত বড় বড় মুক্তো, অত জেল্লাদার মুক্তো সচরাচর দেখা যায় না। রাবেয়া অন্যমনস্ক হয়েই হয়তো বারে বারে মালাটিতে হাত দিচ্ছিল, মনের ভাব ফাঁস করে দিয়েছে তার হাতের আঙ্গুল। কে এই জন সিলভেষ্টার? নামটায় মনে হচ্ছে ইংরেজ। তা হলে রাবেয়ার সঙ্গে পরিচয় হলো কোন সূত্রে?

গতকাল মনে হলো আগের রাত ঘুমোয় নি রাবেয়া। চোখমুখ দেখে মনে হলো খুব কেঁদেছে। জন সিলভেষ্টার নাকি মারা গেছে খবর পেয়েছে। খবরটি এনেছে আলি আসগর। আলি আসগরই বা খবরটি কোথায় পেল? ও কি সিলভেষ্টারকে চেনে?

আলি আসগর যদি চেনে তবে দুবাস ভার্তানেসও নিশ্চয়ই চেনে। গভর্ণরের কুঠির বাইরে কোনো ফরাসীর মুখে তো সিলভেষ্টারের নাম শোনা যায়নি। তবে কি এই ইংরেজ লেফটেন্যান্টটি মাঝে মাঝে চুপিসারে ওখানেই আসা-যাওয়া করতো? রাবেয়া তাকে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসতো, নইলে অমন করে কাঁদবে কেন?

অ্যালবারের মাথা গরম হয়ে যায় ভাবতে ভাবতে। ঈর্ষা নামক রিপুটি সর্পের মত দংশন করে, সে দংশনে হলাহলের মত তীব্র বিষ, সে বিষের জ্বালাও অতি প্রবল।

সঙের মিছিল দেখে ফিরছে ভার্তানেস সামনের পথ দিয়ে, অ্যালবার ডাকলো।

'বোস ভার্তানেস, অনেকদিন পরে দেখা।'

'হ্যাঁ মঁশিয়ে।'

'ছোট বেগম মিছিল দেখতে যান নি?'

'ওঁরা কেউ যান না, তার উপর তাঁর শরীরটা খুব ভাল নয়।'

'কেন? কালও তো দেখেছি বেশ ভাল আছেন?'

'বোধ হয় মনটা ভাল নেই।'

কথায় কথায় অনেক কিছু জেনে নিলো অ্যালবার। লেফটেন্যাণ্ট জন সিলভেষ্টার গভর্ণরের কুঠিতে বহুবার এসেছে, একসঙ্গে খানা খেয়েছে, রাতে থেকেছে, সাহেব ও মাদামসাহেব খুব পছন্দ করতেন তাকে। কলকাতার কেল্লা থেকে বদলী হয়ে পাটনার কুঠিতে যায়, তারপর তার কাছ থেকে আর খবর আসে নি। তিনদিন হলো আলি আসগরের কে যেন এসেছে মাদ্রাজ থেকে, সে ওখানকার কেল্লায় কাজ করে, সিলভেষ্টার নামে এক সাহেবের জন্যে সে কামরা সাফ করে সব প্রস্তুত রেখেছিলো, কিন্তু যে-জাহাজে আসবার কথা ছিল সে জাহাজ এলো, অথচ সাহেবটি এল না, এল তার কয়েকটি মাল। এরপরে লোকটা আরো মাসখানেক মাদ্রাজের কেল্লায় কাজ করেছিলো, সাহেব আসে নি। সাহেবের খুব অসুখ হয়েছিলো বলেই মাদ্রাজে বদলী হচ্ছিল, পথেই নিশ্চয় মারা গেছে। মাদ্রাজ কেল্লার কাজ ছেড়ে দিয়ে লোকটা পণ্ডিচেরী গিয়েছিলো, সেখান থেকে এখানে চলে এসেছে।

অ্যালবার অধীর আগ্রহে শুনছিলো, কিন্তু দেখালো যেন কানই দিচ্ছে না। যাকে সে চেনে না তার সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। সে মাত্র রাবেয়ার সম্বন্ধে কিছুটা আগ্রহশীল।

'এদিকে কদ্দূর গিয়েছিলে, ভার্তানেস?'

'ঘিরেটি পর্যন্ত'

'কেমন দেখলে মিছিল?'

'মন্দ নয়'।

'এখন কুঠিতে ফিরছো?'

'হ্যাঁ মঁশিয়ে'।

লাট-কুঠিতে অ্যালবারের যথেষ্ট যাতায়াত, সেই সূত্রে মঁশিয়ে অ্যালবারকে ভার্তানেস ভাল করেই চেনে, রাবেয়ার কথা জিজ্ঞাসা করবার মধ্যে কিছুমাত্র অসঙ্গতি দেখতে পায় নি সে, যতটুকু জানে সবই বলেছে। জন সিলভেষ্টারের কথাটাও রাবেয়ারই প্রসঙ্গে। অ্যালবার এক বাক্স ভালো চুরুট দিয়ে লোকটিকে বিদায় করলো। চুরুটের মার্কাটা দেখে সে বেজায় খুশি।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আপিস থেকে বেরোলো অ্যালবার। দেলার্দের বাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ, সকাল সকাল যেতে বলেছে। বিস্তর টাকার মালিক হয়ে বসেছে দেলার্দ, খানপিনা-জলসা প্রায়ই হয়, কে কে আসবে সে সম্বন্ধে কোনই কৌতূহল নেই অ্যালবারের, লোকটির নির্লজ্জ ভোগশক্তি অ্যালবারকে ঘৃণায় সঙ্কুচিত করে। খাদ্য ও পানীয় উভয়ই কী বিপুল পরিমাণ উদরস্থ করতে জানে।

অ্যালবার স্নান করে পোষাক পরছে। সারাদিন ঘর্মস্রোতের পরে স্নান করে যে আরামটুকু হয় ঘর্মের বিরামে, সে-বিরামে পুনরায় ছেদ পড়ে যদি আঁটসাট পোষাকে আবার বাইরে যাবার তাড়া থাকে। এদেশের গরীবরা বেশীর ভাগ সময়েই খালি গায়ে থাকে, সেজন্য হাসে বিদেশীরা, কিন্তু ওরাই বুদ্ধিমান, বিদেশীদের সভ্যতার শাস্তি দেখে হাসবার অধিকার ওদেরই আছে।

খানসামা হ্যারি সিধাস্তিন এসে

খবর দিল মলিনারি সাহেব এসেছে। অসময়ে এই আবির্ভাবে বিরক্ত হয় অ্যালবার, কিন্তু হাসিমুখে বলতে হয় 'এসো গিলানো, কী মনে করে?'

'অনেক কিছু মনে করে, পিয়েরে, আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছে দেলার্দের কুঠিতে. সেটা উপলক্ষ , লক্ষ্যটি অন্য, এই পিস্তলটি পকেটে রাখো।'

'পিস্তল দিয়ে কী হবে ভোজনের আসরে ?'

'কাজে লাগতে পারে, না-ও লাগতে পারে। সে কথা পরে হবে, তুমি তো বেশভূষা করে প্রস্তুত, কিন্তু তোমার গাড়ি কই?' আমি যানবাহনহীন জানো, এখানে এসেছি তোমার সঙ্গী হতে।'

'আমার গাড়িটার একটা চাকায় ফাটল ধরেছে, দেলার্দ তার গাড়ি পাঠাবে। আর কে কে আসছে জানো ?'

'তোমার কৌতূহল নাই জানবার, তাই জানো না, আমার কৌতূহলটা একটু বেশী, তাই জেনেছি। বার্ণার্দ আসছে, সেভালিয়ে আসছে, যারা দেলার্দের যতরকম কুকর্মের সঙ্গী। আর আসছে চুঁচড়ো থেকে দুটো ফিরিঙ্গি মেয়ে। ওরা নাচবে। সর্পিণী নৃত্য, মরাল নৃত্য এবং জলকন্যা নৃত্য দর্শন করে একেবারে মোহিত হয়ে যাবে, বন্ধু।'

'তবে আমি যাবো না, গিলানো।'

'উঁহু সেটা হবে না, যেতেই হবে তোমাকে। এখন শুনতে চেও না কেন।'

সে রাতের ঘটনাগুলি অ্যালবারের ভুলবার নয়। বহুদিন পরে ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়িতে যা সে বলেছিলো তার মর্মার্থ এখানে দেওয়া যেতে পারে---

'খাবার আয়োজন ছিল প্রচুর। তার পরে সুরু হলো নৃত্য। শিল্পকলার নামে জৈবিক উন্মাদনা পরিবেশনের নির্লজ্জ অভিনয়। মাঝে মাঝে কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত। আমি পালিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, মলিনারি টেনে বসিয়ে কানে কানে বললো, আরেকটা অভিনয় আসন্ন, সে অভিনয়ের দুটি অভিনেতা, সেও আমি। কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মলিনারি দেলার্দের কানে কানেও কী বললো, সে হো-হো করে হেসে উঠলো, দেখলাম মাথা কাৎ করে সায়ও দিল। দেলার্দের সঙ্গে এত দহরম-মহরম দেখে মলিনারির উপরে বিষম রাগ হলো আমার। আরো চটে গেলাম, যখন সে ফিরিঙ্গি মেয়ে দুটোর গলা জড়িয়ে ধরে পাশের ঘরে ঢুকলো আমাকেও টেনে নিয়ে।

পরিচিত ঘর। আমারই শোবার ঘর ছিলো, যখন প্রথম দিকটায় দেলার্দের সঙ্গে থাকতাম। মলিনারি তবে কী দেলার্দ, বার্ণার্দ সেভালিয়ের সঙ্গে একই পথের পথিক? ঘৃণা হলো লোকটির ওপর। কিন্তু আমাকে টেনে আনলো কেন?

আমার মুখের ভাব দেখে মলিনারি হাসলো। 'অভিনয়ের প্রথম দৃশ্য দেখলে বন্ধু, এখন দ্বিতীয় দৃশ্যে এই মেয়ে দুটিকে ওদের মাতৃভাষা পর্তুগীজে বুঝিয়ে দিচ্ছে, কেমন ভয়ানক ফাঁদে পা দিয়েছে এখানে এসে। এরা দুই সহোদরা, সতী-সাধ্বী যে নয়, তা বুঝতেই পারছো, কিন্তু বিপদটা আসছে সেভালিয়ের দিক থেকে, তার ব্যবসাটা একটু মোড় ঘুরেছে, দাস-ব্যবসা এখন একেবারেই দাসী-ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুন্দরী মেয়েদের দাম খুব বেশী পার্শিয়ান গাল্ফের আরব রাজ্যগুলিতে।'

সুরামত্ত স্খলিতবসনা মেয়ে দুটো খিলখিল হাসি হেসে আমাদের বক্ষলগ্ন হবার চেষ্টা করছিল, মলিনারির ধমকে শান্ত হয়ে বসে তার কথাগুলো শুনলো, তারপরে আমাদের পায়ের উপর উবু হয়ে কাঁদতে লাগলো। মলিনারি নিঃশব্দে তাদের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমাকে ইশারা করলো ওদের বিছানার উপরে শুইয়ে দিতে। দেলার্দ ও সেভালিয়ে ওদের খুব মদ খাইয়েছিল, নেশায় আচ্ছন্ন চোখে ঘুম নেমে এল। শান্ত, সুন্দর দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন পাশাপাশি একবৃন্তে আলো করে আছে। ঘুমের যাদুস্পর্শে উচ্ছৃঙ্খলতা ও মলিনতার রেখা মাত্র নাই।

বহুক্ষণ বসেছিলাম আমরা দু'জনে অর্গলবদ্ধ সেই ঘরটিতে। পাশের ঘরে চাপা হাসি ও সুরাজড়িত নারীকণ্ঠের কলধ্বনি অনেকক্ষণ পরে স্তব্ধ হয়ে এল অবসাদের অতল গহনে। কণ্ঠধ্বনি আমার অপরিচিত নয়, একটি রোজীর, অন্যটি ডেইজীর, ওরাও সহোদরা, দেলার্দের কুঠীতেই কাজ করে। অতিথি সৎকারে দেলার্দ মুক্তহস্ত।

বাইরে অন্ধকারের ঘন যবনিকা। বহুদূরে ডালকুত্তার ঘেউ ঘেউ রব কানে আসতেই মলিনারি লাফিয়ে উঠে মেয়ে দুটোকে জাগিয়ে দিল। পেছনের বাথরুম খুলে আমরা মেয়ে দুটির হাত ধরে ছুটলাম, পাপিষ্ঠ সেভালিয়ের অনুচররা কাজ হাসিল করার জন্য এগিয়ে আসছে।
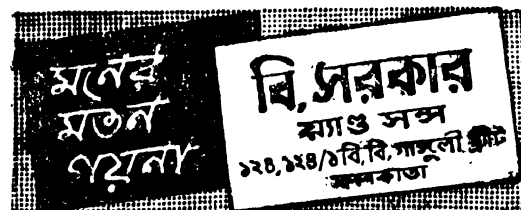
মলিনারি জঙ্গলের পথ ধরলো, খোলা পথ এড়িয়ে। পকেট থেকে কি একটা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিল যাতে ডালকুত্তারা গন্ধ টের না পায়। মেয়ে দুটি চলতে পারছে না, মলিনারি একটা মেয়েকে দু'হাতে তুলে নিল, আমাকেও আর একটিকে তুলে নিতে বললো। আমি হাঁপাচ্ছিলাম ভয়ে ও ভারে।

গঙ্গা খুব দূরে নয় দেলার্দের কুঠী থেকে। একটা ডিঙ্গি নৌকো বাঁধা ছিল (মলিনারি ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখে নি), উঠলাম গিয়ে সেখানে। মেয়ে দুটিকে শুইয়ে দিয়ে কষে দাঁড় বেয়ে চললাম, কিন্তু মাথা ঝিম্‌ঝিম করছিল, শরীর অবশ।

ডিঙ্গির এক কোণ থেকে মলিনারি টেনে বার করলো একটা বোতল। চকচক করে খানিকটা গিলে বোতলটি আমার হাতে দিল। মেয়ে দুটি মূর্চ্ছা গেছে, কিছু ব্যাণ্ডি আমি খেয়ে একটু ওদের মুখের মধ্যে ঢেলে দিলাম। মেয়ে দুটি চোখ মেললো, আমার হাঁপিয়ে পড়া বুক চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

হিন্দুরা শবদেহ কবর দেয় না, আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। ওদের বড্ড ভুতের ভয়, শ্মশানে গভীর রাতে কেউ যায় না। মলিনারি চুঁচড়োর শ্মশান ঘাটে যখন নৌকো বাঁধলো মেয়ে দুটি তখন উঠে বসেছে। ওখানকার জন-দি-ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ নদী থেকে খুব দূর নয়। মলিনারির ডাকাডাকিতে চার্চের বিশপ ফাদার হুড্‌জেস দরজা খুলে আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে অবাক।

মলিনারি আবার পর্তুগীজই বলতে সুরু করলো, ফাদারের সঙ্গে। বুঝিয়ে দিল এরা বিপদে পড়ে এখানে এসেছে আশ্রয়ের জন্য, অন্তত শাকি রাতটুকুর ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তারপর এদের বাড়ি পৌঁছে দেবার ভারও তাঁর, আমাদের যা করবার ছিল, তা শেষ হয়েছে।

ফিরলাম আমরা দু'জনে ঘোড়ার পিঠে খুব তাড়াতাড়ি। মলিনারি সব ব্যবস্থা আগেই ঠিক করে রেখেছিল বোঝা গেল। দেলার্দের কুঠীর কিছু দূরে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়েই আমরা এগুলাম, তারপরে সে মহা সোরগোল সুরু করে দিল।

দেলার্দ-বার্ণার্দ-সেভালিয়ে ছুটে এলে মলিনারি অভিনয়টির শেষ দৃশ্যটিতে বেশ তাক লাগিয়ে ছাড়লো আমাকে। রাগে যেন তার চোখ-মুখ ফেটে যাচ্ছে, বজ্জাৎ মাগী দুটো পালিয়েছে, শয়তানের ধাড়ী, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখে মলিনারি, ওরা বিছানায় নেই। সে চেয়ারে বসেই ঘুমোচ্ছিলো, আমি নাকি বেহুঁস হয়ে মাটিতেই পড়েছিলাম। তারপর থেকেই সারা জঙ্গলটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু ওদের পাওয়া গেল না। পাজী, কুত্তাকা বাচ্চা। আমার হাসি পাচ্ছিল, চেপে রাখা দায়।

দেলার্দ ও বার্ণার্দের চোখ তখনো ঘুমে জড়ানো কিন্তু মনে হলো সেভালিয়ে অনেকক্ষণ হয় জেগেছে। ভোর হয়ে গেছে, দেলার্দ রোজীকে ডাকলো কফি দেবার জন্যে, রোজীর সাড়া নেই। ডেইজীকে ডাকলো, তারও সাড়া নাই। চেঁচিয়ে ওঠে দেলার্দ, রোজী ডেইজী দু'জনেই উধাও। ওরা শুয়েছিলো পাশের একটা ছোট কুঠুরীতে, সেটার দরজা খোলা।

'ভুল করে ওদেরই নিয়ে গেল সেভালিয়ের লোকরা? প্রশ্ন করে মলিনারি।

বোধ হয় চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নিতে পারে নি। খুঁজতে খুঁজতে ওদের পাওয়া গেল দেলার্দের খাটের নীচে অজ্ঞান অবস্থায়। ঘরে নাকি লোক ঢুকেছিলো, ভয়ে ওরা ছুটে আসে মনিবের ঘরে, সে ঘরের ছিটকিনি বন্ধ করে খাটের তলায় ঢুকে একেবারে বেঁহুশ হয়ে যায়।

হা হা করে হেসে ওঠে অ্যালবারের বন্ধু। 'চমৎকার। তাহলে এখানেই যবনিকাপাত? তুমি সেভালিয়েকে চিনতে পারো নি, অথচ মলিনারি অনেক পরে এসেও ওর আসল ব্যবসা কি ধরে ফেললো?'

ফলতা কলকাতার চল্লিশ মাইল দক্ষিণে। গ্রামখানি গঙ্গার ওপরে। ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের রাজত্ব। কলকাতা, কাশিমবাজার, মালদহ, ঢাকা ও হিজলির উদ্বাস্তু ইংরেজরা ওখানেই আশ্রয় নিয়েছে, আর দিন গুণছে, মাদ্রাজ থেকে সাহায্য আসবে কবে। ওরা বেণের জাত, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে জানে।

গ্রামটিতে পুকুর নেই, কূয়ো নেই, যেখানে জঙ্গল নাই সেখানে কাদা, জল টেনে আনতে হয় নদী থেকে, অথচ নবাবের ভয়ে কেউ ওদের কাজ করতে চায় না। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ভেঙ্গে ছাতু ছাতু করে সিরাজ রাজা মাণিকচাঁদকে আলি নগরের ওরফে কলকাতার দেওয়ান নিযুক্ত করে গেছেন। তিনি কড়া নজর রেখেছেন ফলতার ইংরেজদের ওপর, বজবজের ছোট কেল্লাটাও মেরামত করে নতুন কামান বসিয়েছেন।

কাশিমবাজার থেকে ওয়াটস্‌, ঢাকা থেকে কলেট, নবাবের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে হলওয়েল, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতি রুই-কাতলারা সবাই এখানে হয়েছেন জড়ো। প্রেসিডেণ্ট ড্রেক ভাঙ্গেন তবু মচকান না, একটা ভাঙ্গা গুদোম ঘরে নতুন করে কাউন্সিল খুলে বসেছেন। কাউন্সিলে কাজ হয় কচু, কেবল চলে ঝগড়া-ঝাঁটি, মনকষাকষি। লজ্জার মাথা খেয়ে যেভাবে ড্রেক চম্পট দিয়েছিলেন কলকাতা থেকে সেটা কেউ ভুলতে পারছে না।

মশা, মাছি, সাপ, পোকামাকড়, ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ে নাজেহাল ইংরেজরা। রোজই কেউ না কেউ মরছে, ছেলেপিলেদের দুধ নেই, বড়দের ডিম, চিনি, রুটি, মাংস নেই, ওষুধ নেই— মদ মাংস তো দূরের কথা। উমিচাঁদ

তোমার অজস্র তীর

রঞ্জিতকুমার সরকার

এবারে যেমনভাবে যেদিক্ থেকেই তুমি অত্যন্ত উদ্ধত তীর ছোঁড়ো
আমি অনায়াসে হাতের মুঠিতে লুফে নেবো,
আমার ক্লিষ্ট তালু, সহচর যন্ত্রণার কৃষ্ণবর্ণ অংগীকারগুলি
দীর্ঘদীন একাগ্র রেওয়াজে
এখন অনেকখানি সহজ ও সহিষ্ণু হয়েছে,
সরল স্বাচ্ছন্দ্যে আর সমস্ত সৌরভগুলি ঝরে যাবে নাকো—
অন্তত এ সান্ত্বনাটুকু এখনো আমার কাছে ঘোরাফেরা করে।
আগামী বসন্তকালে যে-কোনরকম ব্যর্থতা, রূঢ়তা
অথবা অভিশপ্ত অভিলাষের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে
অট্টহাসি হাসার মহড়া আমি নিয়ে ফেলেছি।

তোমার অজস্র তীর
বন্দী হয়ে গেছে এই অভ্যস্ত দু'হাতের অনায়াস মুঠির ভেতরে॥

চোরাগোপ্তা ভাবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাঠায় কিন্তু টানাটানি ঘোচে না।

ড্রেক চন্দননগরের ফরাসীদের, চুঁচড়োর ডাচদের এবং শ্রীরামপুরের দিনেমারদের কাছেও চিঠির পরে চিঠি লিখছেন; কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না। চন্দননগর থেকে দুটি চালান কফি, চিনি, মদ এবং জামা-কাপড় ফলতায় পৌঁছল, কিন্তু আর দুটি চালান মানিকচাঁদের লোকদের হাতে ধরা পড়তে পড়তে উল্টোমুখে ফেরৎ চলে এল। শ্রীরামপুরের একটি পাদ্রী প্রতি রবিবার বাইবেল পাঠ করতে যাবার সময় আলখাল্লার তলায় লুকিয়ে এটা সেটা নিয়ে যেতেন, একদিন ধরা পড়ে নাস্তানাবুদ হলেন। একটা ডাচ জাহাজ চুঁচড়ো থেকে সাগরের পথে যেতে ফলতায় মাংস ও রুটি কয়েক পিঁপে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু দু'মাস পরে আবার জাহাজ আসবে। ইংরেজদের হেনস্তা গোটা সাদা জাতেরই অপমান, ওরা সাহায্য করতে চায়, অথচ পেরে উঠছে না।

ফলতায় খাদ্য ও বস্ত্র দুই-ই সমস্যা। সাহেব-মেম-কাচ্চাবাচ্চারা যে যে-পোষাকে ছিল জাহাজে উঠে বসেছিল, সেগুলো নোংরা হয়ে গেছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে, জলের অভাবে কাচা হয়ে ওঠে না, সুঁইসুতোর অভাবে রিপু করা যায় না। তবুও আশায় আশায় দিন গুণছে, কবে সৈন্য আসবে।

এলেন মাদ্রাজ থেকে মেজর কিলপ্যাট্রিক কিছু সৈন্য ও রসদ নিয়ে, কিন্তু বাঙলা দেশের জলহাওয়া খেয়ে বেশীর ভাগই অকেজো হয়ে শুধু ভারই বাড়ালো।

ইংরেজদের খবরাখবর মানিকচাঁদ সবই পাঠাচ্ছিলেন নবাবকে, কিন্তু ইংরেজদের কেরামতি কতটুকু চাক্ষুষ দেখেছেন তিনি, অবজ্ঞার হাসি হাসেন, মীরজাফর ও মোহনলাল সায় দিয়ে আরও তাচ্ছিল্যের বক্রহাসি হাসেন, আগে শৌকৎ জঙ্গকে ঠাণ্ডা করতে হবে বলেন নবাব, সে তোড়জোড় চলে। উমীচাঁদের কাছ হতে এ-খবরটাও ইংরেজরাও পেয়ে যান, এবং পাঠিয়ে দেন মাদ্রাজে।

ওদিকে শৌকৎ জঙ্গও চুপ করে বসে নেই। এক কোটি টাকা নজরানা দেবেন লোভ দেখিয়ে দিল্লীর বাদশার উজীরের কাছ থেকে ফরমান আনিয়েছেন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবি দখল করবার জন্যে। চিঠিও লিখেছেন চড়া মেজাজে সিরাজের কাছে সিংহাসন ছেড়ে দিতে। চিঠিতে এটাও জোরদার করে বলেছেন দেশের লোক, আমীর-ওমরাহরা, বিদেশীরা সবাই তাঁকেই চায়। সিরাজ রেগে টং, এটা নিছক ধাপ্পা, আলিবর্দী তাঁকেই মসনদে বসিয়ে গেছেন, সবাই তাঁকেই নবাব বলে মনে নিয়েছে ও মানবে। না, আর দেরী নয়, ওর আস্পর্দ্ধা এখনই গুঁড়িয়ে দিতে হবে, চলো পূর্ণিয়ায়। দিল্লীর বাদশা ফরমান দেন নি, দিয়েছেন তাঁর উজীর, ওর কোনো মূল্য নেই।

শৌকৎও সিরাজের জবাব না পেয়ে হুকুম দিলেন, সাজো সাজো, মুর্শিদাবাদ চলো। দু'পক্ষের দেখা হলো গিরিয়ার মাঠে, যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। নেশাখুরি ও আহম্মকিতেও শৌকৎ সিরাজের মাসতুতো ভাই, কেবল রক্তের সম্পর্কেই নয়। হীরে-জহরৎ পরে, কিংখাবের পাগড়ি মাথায় দিয়ে নবাব সেজে বিস্তর ভাঙ খেয়ে শৌকৎ হাতীর পিঠে চড়ে নামলেন রণে। তাঁর সৈন্যও কম নয়। ভাঙে চুর, চোখ দুটো লাল, কাকে যেন হাতীর পিঠে আসতে দেখে ভুল করলেন সিরাজ নিজেই এগিয়ে আসছে, দল ছেড়ে তেড়ে চললেন সেদিকে। একটি গোলা ছুটে এসে পাগড়ির সঙ্গে মাথাটাও উড়িয়ে নিয়ে গেল, দেহটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, শৌকতের বাহিনী এ দৃশ্য দেখে সোজা পেছনে দৌড়। বিজয়লক্ষ্মী ধরা দিলেন সিরাজের হাতে।

গোলার আঘাতটি যেন রৌশনের বুকে এসেই বিঁধলো চন্দননগরে। সংবাদ শুনে সে লুটিয়ে পড়লো শয্যায়।

[ক্রমশ।

চাষ আবাদ ফসল

উচ্চফলনশীল ধান চাষ

(শেষাংশ)

সেচ

নিজেদের পুকুরের জল দিয়েই সেচের কাজ চালান হয়। জলের বড় টান। এ জন্য জমির মাটিকে শুধু ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জমিতে জল দাঁড় করিয়ে রাখার বিলাসিতা করলে ত' চলবে না। জমিতে জল বেশি রাখলে হয়ত কিছু বেশি ধান পাওয়া যেত, কিন্তু অনটনের বাজারে কম জল দিয়েই কাজ চালাতে হয়। প্রামাণিক ভায়েরা বললেন, ৬৪০০০ ঘন হাত জল দিয়ে টানাটানি করে ৪ বিঘাতে চাষ করা যায়। রস-যুক্ত বা জলো এঁটেল মাটির জমিতে চাষ করলে এবং আশেপাশের জমিতে একই সময়ে চাষ করা হলে জলের খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়। প্রথম বৎসর সিউনি দিয়ে একদিন অন্তর জল সেচ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বৎসর সিউনি ও ভাড়া করা পাম্প কাজে লাগানো হয়েছিল। যথাসময়ে পাম্প ভাড়া না পাওয়ার জন্য নিয়মিত সেচ দেওয়া সম্ভব হয়নি। শেষের দিকে স্থানীয় ব্লক অফিসের মাধ্যমে অর্ধমূল্যে অর্থাৎ ৩৬ টাকায় একটি দশ ফুট লম্বা দ্রোণী কেনা হয়েছিল। মাঝে মাঝে এটিকেও কাজে লাগান হয়েছিল। জল সেচের অসুবিধা দূর করার জন্য এ বছর কোনও প্রকার ঋণ না নিয়েই ৩৫৫০ টাকা খরচ করে পাঁচ অশ্বশক্তিযুক্ত একটি পাম্প কেনা হয়েছে। প্রয়োজন-মত নিজেদের জমিতে সেচের কাজ চলছে। মাঝে মাঝে ভাড়া দিয়ে দু'চার টাকা রোজগারও হচ্ছে। প্রামাণিক ভায়েদের ধারণা, সার ও জল প্রয়োজনের তুলনায় কম দিলে ফসল তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে, কিন্তু পরিমাণে কম হবে।

বিষ প্রয়োগ

প্রথম বৎসর রোগপোকার আক্রমণ হতে ধান গাছকে রক্ষা করার জন্য রোপণের ২৫ দিন পরে হাত দিয়ে একবার গ্যামাকসিন গাছের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৪০ দিনের গাছে পিচকারি দিয়ে চারশ' সি সি ফলিডল জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছিটানো হয়েছিল। ধানে ফুল আসার সময় আরও ১৬ কেজি গ্যামাকসিন হাত দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে রোগ-পোকার আক্রমণ হতে ধানকে মোটা-মুটি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় বৎসর রোপণের এক মাস পর হতে প্রতি ১০ দিন অন্তর স্প্রে মেসিনের সাহায্যে জলমিশ্রিত এণ্ড্রিণ (মিশ্রণের হার ১২ লিটার জলে ৫০ গ্রাম এণ্ড্রিণ) ছিটানো হয়েছিল। এ জন্য ৫ লিটার এণ্ড্রিণ খরচ হয়েছিল। এ ছাড়া ২৫ কেজি গ্যামাকসিনও প্রয়োগ করা হয়েছিল। ব্লক অফিস বা বেসরকারী কোন দোকান হতে সময়মত ওষুধ না পাওয়ার জন্য ওষুধ প্রয়োগে অনিয়ম হয়েছিল। এতে ফসলহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এ বছর দ্বিতীয় বছরের মত এণ্ড্রিণ দেওয়া হচ্ছে। তবে ১০ দিন অন্তরের বদলে ৮ দি ছাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বছর ৯ লিটার এণ্ড্রিণ ও ১০০ কেজি গ্যামাক-সিন লেগে যাবে। খুব সম্ভব খোল প্রয়োগ করার জন্য এবং ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়ার জন্য এ বছর অপেক্ষাকৃত বেশি পোকার উপদ্রব হচ্ছে। এ বছর বারে বেশি, কিন্তু পরিমাণে কম ওষুধ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনামত ব্যবস্থা নিয়ে প্রথম দিকে কিছুতেই পোকার আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে অবশ্য পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে পোকার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা সম্ভব।

হয়েছে। সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পোকার আক্রমণ জোরদার হয়ে ওঠে। এজন্য সার প্রয়োগের তিন দিন পরেই ওষুধ প্রয়োগের ব্যবস্থা না করলে চলে না। দেখা যাচ্ছে, জয়া ও পদ্মার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্য দুটি ধানের চেয়ে বেশি। ওষুধ ছিটানোর জন্য স্প্রে মেসিনটি ১৯৫ টাকায় কেনা হয়েছে। নিজেদের কাজ ছাড়া পাড়ার আরও অনেকের কাজ এতেই চলে। এ জন্য প্রামাণিক ভায়েরা কোনও ভাড়া আদায় করেন না। পরের বছর হতে এই মেসিনটি কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করবেন না ঠিক করেছেন। এমন কি ভাড়া নিয়েও দেবেন না স্থির করেছেন। অপব্যবহার-জনিত ক্ষতির হাত হতে মেসিনটিকে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ন্যায্য মজুরি পেলেও মজুরেরা বিষক্রিয়ার ভয়ে এণ্ড্রিণ ও গ্যামাকসিন প্রয়োগে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এ জন্য কখনও কখনও মজুরির ওপরে কয়েক বোতল মদ উপঢৌকন দিয়ে তাদের রাজী করাতে হয়। ওষুধ প্রয়োগের কাজটি বেশির ভাগ সময়েই নিজেরাই করে থাকেন।

প্রামাণিক ভায়েদের ধারণা, আশেপাশের সমস্ত জমিতে একই সঙ্গে ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ওষুধ প্রয়োগের ফল ভাল পাওয়া যায়।

ধান কাটা

প্রথম বৎসর পৌষের মাঝামাঝি বপন করে বৈশাখের ৮।১০ তারিখে তাইচুং কাটা হয়েছিল। ধান হয়েছিল ২৭ মণ, বিচালি ৯ কাহন। দ্বিতীয় বৎসর আই আর ৮ পৌষের ১ তারিখে বপন করে জ্যৈষ্ঠের ২ তারিখে কাটা হয়েছিল। তাইচুং পৌষের ১৫ তারিখে বপন করে কাটা হয়েছিল ২৪।২৫শে চৈত্র। আই আর ৮ হয়েছিল ৮০ মণ, তাইচুং ৪৪ মণ। বিচালি ৩০ কাহন। এ বছর পৌষের মাঝামাঝি বপন-কাজ শেষ হয়েছে। ফসল এখনও মাঠে। কোন বিপর্যয় না ঘটলে তাইচুং ৪৪ মণ, আই আর ৮ একশ' মণ, জয়া ২০ মণ, পদ্মা ৪ মণ ও বিচালি ৪২ কাহন হবে আশা করা যাচ্ছে।

সরকারী সাহায্য

দ্বিতীয় বৎসর আই আর ৮ ধানের বীজ ও এই ধানের চাষ সম্পর্কে পরামর্শ স্থানীয় ব্লক অফিস হতে পাওয়া গিয়েছিল। স্প্রে মেসিন ও পাম্প কেনার সময় সেলট্যাক্স মকুবের ব্যাপারে স্থানীয় বি ডি ও সাহায্য করেছিলেন। নির্ভেজাল এণ্ড্রিণ ও গ্যামাকসিন ব্লক অফিস হতেই কেনা হয়। দ্রোণীর কথা ত' পূর্বেই বলা হয়েছে। ব্লক অফিস হতে এণ্ড্রিণের ৫ লিটারের টিন কিনতে হয়। আরও ছোট টিন থাকলে বা খুচরা বিক্রির ব্যবস্থা থাকলে সাধারণ চাষীরা বেশী উপকৃত হতেন। সবুজ বিপ্লবের সফলতায় সরকারী সাহায্যের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রামাণিক ভায়েরা বললেন, রাস্তায়, বাজারে স্থানীয় গ্রামসেবকের সঙ্গে দেখা হলেই বলেন---"আপনাদের চাষবাস কেমন চলছে? আপনাদের চাষ দেখতে যাব।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত একবারও চাষ দেখতে আসেননি। এঁরা মনে করেন, চাষ দেখে পরামর্শ দিলে ধান আরও বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্লক অফিস হতে কীটনাশক ওষুধ কেনাও রীতিমত ব্যয়বহুল ব্যাপার; কমপক্ষে তিনদিন অফিসে ছুটতে হবে। অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই ওষুধ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ওষুধের দাম ত' আছেই। মিথ্যা ভাষণের অভ্যাস, অযথা দেরী করার প্রবণতা, পরোক্ষে ঘুষ নেওয়ার মনোবৃত্তি অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। এ ব্যাপারে শাসনযন্ত্রকে কলুষমুক্ত করা চাই। প্রয়োজন হলে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আয়

১৯৬৭-৬৮

ধান---	টা:	১৮০০-০০ *
বিচালি---	টা:	৯০-০০
মোট আয়	টা:	১৮৯০-০০
মোট ব্যয়	টা:	৬৩৫-৭০
লাভ	টা:	১২৫৪-৩০

* ১৯৬৭-৬৮ সালে ধানের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এজন্য মাত্র ২৭ মণ ধান বিক্রি করে আঠার শ' টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছিল।

ব্যয়

১৯৬৭-৬৮

বীজধান---	টা:	৫০-০০
চাষের জন্য জমি তৈরি	"	৩০-০০
গোবর সার---	"	৫০-০০
রাসায়নিক সার---	"	৯১-৫০
সেচ---	"	১৮০-০০
কীটনাশক ওষুধ---	"	১৬-২০
মজুর---	"	১৬৮-০০
গরু, ছাগল, চোর ইত্যাদির হাত হতে সংরক্ষণ বাবদ	"	৫০-০০
	টা:	৬৩৫-৭০

আয়

১৯৬৮-৬৯

ধান---

তাইচুং---	টাঃ	১৪৫২-০০
আই আর ৮---	"	৩২০০-০০
বিচালি---	"	৩০০-০০
মোট আয়	টাঃ	৪৯৫২-০০
মোট ব্যয়	টাঃ	১৪৯৮-০০
লাভ	টাঃ	৩৪৫৪-০০

ব্যয়

১৯৬৮-৬৯

বীজধান---	টাঃ	৩৮-০০
চাষের জন্য জমি তৈরি	"	১১৫-০০
গোবর---	"	৮৫-০০
রাসায়নিক সার---	"	২৬৫-০০
কীটনাশক ওষুধ---		
গ্যামাকসিন---	"	১০-০০
এণ্ড্রিণ---	"	৯০-০০
সেচ---	"	৩০০-০০
মজুর---	"	৫২৫-০০
গরু, ছাগল, চোর ইত্যাদির হাত হতে সংরক্ষণ বাবদ	"	৭০-০০
	টাঃ	১৪৯৮-০০

আয়

১৯৬৯-৭০

ধান---

আই আর ৮---	টাঃ	৪০০০-০০
তাইচুং---	"	১৪৫২-০০
জয়া---	"	৬৬০-০০
পদ্মা---	"	১৩২-০০
বিচালি---	"	৪২০-০০
-।- মোট আয়	টাঃ	৬৬৬৪-০০
মোট ব্যয়	টাঃ	২৫৩০-১২
লাভ	টাঃ	৪১৩৩-৮৮

-।- ধান এখনও গোলাজাত করা হয়নি। ধানে থোড় এসেছে। সমস্ত কিছু ঠিকভাবে চললে এবং বাজার দর ১৯৬৮-৬৯-এর মত থাকলে ধান ও বিচালিতে ৬৬৬৪ টাকা আয় হতে পারে।

ব্যয়

১৯৬৯-৭০

বীজধান---	টাঃ	৩৮-০০
চাষের জন্য জমি তৈরি	"	১৮০-০০
সার---		
গোবর---	"	১৪০-০০
শ্বেতীগুটি খোল	"	৬০-০০
কাজলী গুঁড়া খোল	"	৩৮-০০
হাড়-গুঁড়া---	"	২৫-০০
সুপার ফসফেট	"	৭২-০০
পটাস---	"	৫০-০০
ইউরিয়া---	"	২৬২-০০
এমোনিয়াম সালফেট	"	৩-১২
*সেচ---	"	২২৫-০০
*কীটনাশক ওষুধ		
এণ্ড্রিণ---	"	১৮০-০০
গ্যামাকসিন---	"	৪২-০০
*মজুর---	"	১১১৫-০০
*গরু ছাগল চোর ইত্যাদির হাত হতে ফসল সংরক্ষণ বাবদ---	"	১০০-০০
	টাঃ	২৫৩০-১২

* ৮ই চৈত্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, হিসাব নেওয়া হয়েছে। ব্যয়ের সমস্ত টাকা এখনও খরচ হয়নি। তারকা চিহ্নিত বিভাগগুলির বাকি কাজগুলির জন্য ৬৫০ টাকা মজুত রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ফসল গোলাজাত করতে হলে ২৫৩০-১২ টাকাই খরচ হয়ে যাবে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখে অনেকেই চাষ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। বলবেন---লাভ ও ভালই হয়। ছ' জন শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রম ও তাঁদের নিরলস ও পরীক্ষামূলক প্রয়াসের দাম বোধ-হয় লাভের অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রামাণিক ভায়েদের সঙ্গে ধানের ক্ষেতের আলপথে ঘুরে ঘুরে সবুজ তাইচুং, আই আর ৮, জয়া, পদ্মা ধান দেখছিলাম। আশে-পাশে অন্যান্য কৃষকরাও কিছু কিছু এই ধান চাষ করেছেন দেখলাম। শরদিন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন---'গদির উপর দিয়ে চলবেন?' প্রশ্নটি বুঝতে পারলাম না। তাকিয়ে রইলাম। অর্দ্ধেন্দুবাবু বলে উঠলেন, ধান গাছের সারির মধ্যে পা দিয়ে দেখুন। দ্বিধাগ্রস্তভাবে সারির মধ্যে পা চালিয়ে দিলাম। গদির রহস্য বুঝতে পারলাম। সারির মধ্যে দু' পাশের ধান গাছের শিকড় মাটির উপরে এমনভাবে এবং এত বেশী সংখ্যায় হয়েছে যে সারির মধ্যে পা দিলে মনে হয় যেন গদির উপরে পা দিয়েছি। পোকা-মাকড়ের কোন চিহ্ন দেখলাম না। সতেজ গাছগুলি সত্যিই আশা আনন্দ জাগিয়ে তোলে।

ক্ষেত দেখে ফিরে আসছিলাম। শরদিন্দুবাবুরা কিছুতেই ছাড়লেন না। আলুভাজা সহযোগে মুড়ি খেতে হোল। খেতে খেতে নানা ধরনের কথাবার্তা হোল। বললেন--প্রথম বৎসর পুকুরের জল সম্বল করে আমাদের চাষ করা দেখে পাড়ার লোক হাসাহাসি করেছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন--খরচই সার হবে, কিছু হবে না। যেদিন ১৮৭০ টাকার ফসল ঘরে তোলা হোল সেদিন হতে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাসাহাসি শোনা গেল না। তাঁরাও আশার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। পরামর্শলাভের আশায় আমাদের কাছে এলেন। পাড়ায় আমরা তিন বিঘা জমি দিয়ে সুরু করেছিলাম। এখন শুধুমাত্র পুকুরকেই ভরসা করে পাড়ার প্রায় ৫০ বিঘা জমিতে বোরো মরসুমে

উচ্চফলনশীল ধান চাষ করা হচ্ছে। এ জন্য ছোটবড় প্রায় ৫০টি পুকুরকে কাজে লাগান হচ্ছে। কেউ কেউ পুকুর গভীর করে ফেলেছেন। আমরাও গত বছর আমাদের দু'টি পুকুর গভীর করেছি। অন্যেরা গভীর করার চেষ্টায় আছেন। যাঁদের পুকুর আছে, অথচ কাছাকাছি উচ্চফলনশীল ধান চাষ করার উপযোগী জমি নেই তাঁরা জল বিক্রি করছেন। বোরো মরসুমে উচ্চফলনশীল ধানচাষের জন্য এক বিঘা জমিতে যে জল লাগবে, সেই জল জমির মালিক নিজ খরচে উঠিয়ে নেবেন। পরিবর্তে পুকুরের মালিককে ৫০ টাকা দিতে হবে।

৫০ বিঘা জমিতে আটশ' মণ হতে হাজার মণ ধান উৎপাদিত হবে। আমাদের পাড়া হতে জাতীয় উৎপাদনে অতিরিক্ত হাজার মণ ধান দিতে পেরে সত্যিই গর্বিত। কৃষকদের উৎসাহের অভাব নেই। অভাব আছে সেচের। সেচের ব্যবস্থা করে দিলে আমাদের গ্রাম হতে আমরা বহু হাজার মণ অতিরিক্ত ধান ফলিয়ে দিতে পারি। প্রামাণিক ভায়েদের মত শিক্ষিত আধুনিক কৃষকদের কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা বহুমুখে করলেও বোধহয় সবটা বলা যায় না। আশা করতে ভাল লাগে, আগামী দিনে বাংলার ক্ষেত-খামার এমনি সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিক্ষিত কৃষকের কর্মচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠবে। এঁদের দেখে মনে হয়েছে---সেদিনের আর দেরি নেই।

আষাঢ় মাসের বপন ও রোপন

আষাঢ় মাসে যে সমস্ত ফসলের চাষ হয়ে থাকে তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হোল। কোন্ কোন্ মাটিতে এই সব ফসলের চাষ করে ভাল ফল পাওয়া যায়, ফসলের নামের পাশে তার উল্লেখ করা হোল।

ফসলের নাম	ক্ষেতের মাটি
চিচিঙ্গা	দো-আঁশ
শিম	বেলে দো-আঁশ
শাক---নটে, পুঁই, ডাঁটা,	যে কোন মাটি
ঝিঙ্গা	বেলে-দো-আঁশ
ফুল কপি	দো-আঁশ
টম্যাটো	দো-আঁশ
বেগুন	উঁচু দো-আঁশ
লাউ	দো-আঁশ
মূলা	বেলে, দো-আঁশ
ওল	বেলে, দো-আঁশ
কচু	বেলে, দো-আঁশ, এঁটেল
মানকচু	বেলে, দো-আঁশ
গোলমরিচ	নিচু রসযুক্ত যে কোন মাটি
লঙ্কা	বেলে, দো-আঁশ
আনারস	বেলে, দো-আঁশ, এঁটেল
চীনা বাদাম	বেলে, দো-আঁশ
পেঁপে	উঁচু দো-আঁশ
পান	দো-আঁশ
আমন (রোয়া)	দো-আঁশ, এঁটেল
বরবটী	এঁটেল, দো-আঁশ
ভুট্টা বা জনার	উঁচু দো-আঁশ
অড়হর	উঁচু মাটি
জোয়ার	উঁচু দো-আঁশ
সয়াবীন	বেলে, দো-আঁ

লঙ্কা চাষের পদ্ধতি

রান্নায় লঙ্কা অপরিহার্য। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিস্তীর্ণ জমিতে লঙ্কা চাষ করে লাভবান হওয়া যায়। উঠানে, বাড়ীর সামনে, বাগানে এমন কি টবে ১০।১২টি লঙ্কা গাছ লাগিয়ে একটি ছোট পরিবার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারেন। লঙ্কা চাষের ঝামেলা কম। অভিভাবকের পরামর্শে বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও অবসর সময়ে অতি সহজেই লঙ্কা উৎপাদন করতে সক্ষম।

ধানি, সূর্যমুখী, পাটনাই, জয়পুরী, কামরাঙ্গা, চায়নিজ জায়েন্ট (মিষ্টি লঙ্কা), রুবি কিং, বুল নোজ, সুইট স্প্যানিস, হাতিশুঁড়, এন-পি-৪৬, এন-পি-৪৬-১-৫ প্রভৃতি নানা জাতের লঙ্কা আছে। রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এক বা একাধিক জাতের লঙ্কা চাষের জন্য বেছে নিতে হবে।

বৈশাখ হতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে বীজ বপন করে শীতকালে এবং অগ্রহায়ণ হতে মাঘ মাসের মধ্যে বপন করে গ্রীষ্মকালে লঙ্কা পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ে বীজতলাতে বীজ ফেলে চারা তৈরি করে নিতে হয়। এক কাঠা পরিমাণ ক্ষেতে চাষের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ৬।৭ গ্রাম বীজ হলেই চলবে। ৩৫ হতে ৪০ দিনের মধ্যে চারাগুলি প্রায় ৬ ইঞ্চির মত লম্বা হয়ে যাবে। তখন উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেতে ঐগুলিকে স্থানান্তরিত করতে হবে। নির্ভরযোগ্য নার্শারী বা বিশ্বস্ত চাষীর কাছ হতেও চারা সংগ্রহ করা যায়। চাষের জন্য জল জমে থাকে না এমন উঁচু ধরনের ক্ষেত নির্বাচন করতে হবে। ক্ষেতের মাটি বেলে বা দো-আঁশ হলেই ভাল হয়। লঙ্কার পক্ষে রোদ বিশেষ উপকারী। এজন্য যেখানে সব সময়ে রোদ আসে সেখানে ক্ষেততৈরি করা বাঞ্ছনীয়। কোদাল দিয়ে কোপানো ক্ষেতে ২ ফুট অন্তর লাইন করে প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট বা দেড় ফুট অন্তর 'মাদা' করতে হবে। চারা লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানের নাম 'মাদা'। প্রতিটি 'মাদা'র আয়তন ১´ ১´ ৭´´ হলেই

চলবে। ইহার মাটি ভাল করে কুপিয়ে নিতে হবে। প্রতিটি 'মাদা'র মাটির সঙ্গে এক কে জি পচা গোবর, ৬৫ গ্রাম সুপার ফসফেট ও তিন গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 'মাদা'র মাটি যদি যথেষ্ট পরিমাণে রসযুক্ত না থাকে, তাহলে চারা লাগানোর আগে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে মাটিকে সরস করে তুলতে হবে। সন্ধ্যার আগে রসযুক্ত 'মাদা'র মাঝখানে চারা লাগানোর পর ঝারির সাহায্যে প্রয়োজন মত জল দিয়ে মাটিকে ভিজিয়ে দিতে হবে। চারা বসানোর পর রোজ বা এক-দু'দিন অন্তর 'মাদা'তে জলসেচ দিয়ে গাছকে সজীব করে তুলতে হবে। অতিরিক্ত জলসেচের ফলে কচি গাছের গোড়া পচে না যায় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। অতিরিক্ত বৃষ্টির জল বের করে দেওয়ার জন্য নিকাশী নালাগুলি ক্ষেত প্রস্তুতের সময়েই তৈরি করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। চারা লাগানোর ৩০।৩৫ দিন পরে গাছগুলি বড় হয়ে গেলে, লাইনের মাঝে মাটি অল্প করে তুলে নিয়ে গাছের গোড়াগুলি ভাল-ভাবে বেঁধে দিতে হবে। এইভাবে মাটি তুলে নেওয়ার ফলে লাইনের মাঝে অগভীর নালা সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনের সময় এই নালায় পরিমাণ মত জল সেচন করে ক্ষেতে সেচের কাজ চলতে পারে। সমস্ত ক্ষেত না ভিজিয়ে শুধু গাছের গোড়ায় পরিমাণ মত জল দিয়েও সেচের কাজ হতে পারে। গাছের গোড়ার আশেপাশের মাটি শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে যাওয়ার আগেই জলসেচের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। অভিজ্ঞ চাষীরা বলেন, ৮।১০ কে জি সরিষার খোল, ৩।৪ কেজি চূর্ণ, ২।৩ কেজি বীট লবণ গোবর জলে গুলিয়ে নিয়ে গাছের গোড়ার আশেপাশে 'মাদা'র উপরে অল্প অল্প করে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই তরল পদার্থ দেওয়ার ২।৩ দিন বাদে 'মাদা'র মাটি নিড়ানি দিয়ে আলগা করে দিতে হবে। এর এক-দেড় দিন পরে পূর্বোক্ত প্রথায় গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিড়ানি দেওয়ার সময় গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বর্ষাকালের দিকে দেখা যায়, কোন কোন গাছের পাতা রঙ-বেরঙের হয়ে মুচড়ে গোল হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় গাছের নির্দিষ্ট অংশটি কেটে বাদ দিতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে গাছ উপড়ে ফেলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ফলিডল জাতীয় কীটনাশক ওষুধ নির্দিষ্ট সময় অন্তর গাছের উপর ছিটিয়ে এই রোগ হতে গাছকে রক্ষা করা যেতে পারে। স্যাঁওলা পড়া রোগ দেখা দিলে গাছের মাথার দিক হতে শুকোতে সুরু হয়ে গোটা গাছটিই শেষে শুকিয়ে যায়। প্রতিকার---শুকনো অংশটি কেটে বাদ দিতে হবে। প্রয়োজন হলে গাছটি উপড়ে ফেলে দিতে হবে। ক্ষেতের সমস্ত গাছে কপার ফাঙ্গিসিড ছিটিয়ে দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বীজতলাতেই এই রোগের আক্রমণ শুরু হয়। সেজন্য অ্যাগ্রেসন জি এ বা অন্য কোন বীজ শোধনকারী ওষুধের সাহায্যে বীজগুলিকে শোধন করে নিয়ে বীজতলাতে বপন করা বাঞ্ছনীয়। থ্রীপ্‌স পোকার আক্রমণ হতে গাছকে রক্ষা করতে হলে ডি, ডি, টি এমালসন সময়মত গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

যথোপযুক্তভাবে পরিচর্যা করা হলে, চারা লাগানোর আড়াই তিন মাসের মধ্যে গাছে ফল ধরে। এক কাঠা ক্ষেত হতে ৫৫।৬০ কে জির মত লঙ্কা পাওয়া যায়।

খনার বচনে ঝাল

ছায়ে লাউ, উঠানে ঝাল।
কর বাপু চাষার ছাওয়াল॥
* * *
মাছের জলে লাউ বাড়ে।
যেনো জমিতে ঝাল বাড়ে॥
* * * *
ভাদ্দর আশ্বিনে রুয়ে ঝাল।
সে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কাতিক অঘ্রাণ মাসে।
ধড় গাছ ক্ষেতে পুঁতে আসে॥
সে গাছ মরিবে ধরিয়া ওলা।
পুরিতে না হবে ঝালের গোলা॥
* * * *

[ঝাল = লঙ্কা]

—শ্রীজয়দেব বৈতালিক

পশ্চিমবাংলায় কৃষি উপযোগিতা

সুজলা-সুফলা এই বাংলা দেশ আমাদের মাতৃভূমি। এই দেশের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাই এই দেশকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়। সমগ্র পশ্চিম বাংলায় জমির পরিমাণ মোট ২০,৮৯,৫০,০০০ একর। তার মধ্যে ৯,০০৪৫,০০০ একর জমিতে চাষ-আবাদ হইয়া থাকে এবং ধান চাষ হয় মাত্র প্রায় ১ কোটি একর জমিতে। বাংলা দেশের অধিকাংশ অঞ্চল নদীমাতৃক, এজন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অল্পায়াসে এখানে অধিক ফসল পাওয়া যায়। আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নিকট কৃষির যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান ছিল। তাঁহারা কৃষিকার্যকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন। কৃষিকার্যের দ্বারা ভগবানের সৃষ্টি যথা সংসার, সমাজ, সভ্যতা এক কথায় সব কিছুরই অস্তিত্ব পর্যন্ত রক্ষা পাইতেছে।

পুরাকালে কৃষিকে এদেশে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক বৃত্তি বলা হইত, তাহার

একটি চড়ুই, একজন দেবদূত

[অসমিয়া কবিতা]

নীলমণি ফুকন

অন্ধকার দৃশ্যাবলীর মাঝ থেকে . . .
একটি চড়ুই
দগ্ধ স্মৃতি আর নির্জন আত্মার পালক

দুঃখ আর যৌবনের প্রথম নির্বাসিত সন্তান
একটি চড়ুই
তন্দ্রাতুর মানুষের দুচোখের অনল অনিদ্রা

একজন দেবদূত॥

যথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যা। বৈদিক যুগে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে হল-চালনা করিয়া কৃষিকর্ম করিতেন। কৃষিশাস্ত্র—বেদ, উপনিষদের ন্যায় প্রাচীন ঋষিদের মস্তিষ্কনিঃসৃত-জ্ঞানরাশি। "পরাশর সংহিতা", প্রাচীন কৃষিশাস্ত্র, "কেদার-কল্প", "তরু চিকিৎসা" প্রভৃতি কৃষিশাস্ত্র আয়ুর্বেদেরই অন্তর্গত।

আমরা পুরাণে দেখিতে পাই—রাজা জনক স্বহস্তে হলকর্ষণ করিতে করিতে কর্ষিত ক্ষেত্রের সীতার মধ্যে কন্যা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। সীতা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। রাজর্ষি জনক ভূমিকর্ষণ করিয়া—কৃষিকর্ম করিয়া পুণ্যতমা লক্ষ্মীকে পাইয়াছিলেন। তাই—হে দেশবাসি। কৃষিকর্ম কর,—যুগে যুগে লক্ষ্মী জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাদের গৃহে গৃহে ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবেন।

কৃষির সেবা করিয়া ভারত একদিন ধন-ধান্য, সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু আজ কৃষিকে অবজ্ঞা ও অনাদর করিয়া আমাদের এই দুর্দশা ও হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। আজ ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে খাদ্যের জন্য তাকাইতে হইতেছে।

আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ প্রধানতঃ শিল্পপ্রধান থাকিলেও, বর্তমান যুগে তথাকার অধিবাসীরা কৃষির উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়া নূতন উন্নত প্রণালীর সময় ও শ্রম লাঘবকারী কৃষি যন্ত্রাদির সাহায্যে, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগে ও সাধারণের মধ্যে আধুনিক কালোপযোগী উন্নত প্রণালীর কৃষি-বিষয়ক জ্ঞান বিস্তার করাইয়া কৃষিকর্ম দ্বারা তথাকার কঙ্কর বহুল ভূমিতে আমাদের দেশ অপেক্ষা বহু গুণ বেশী ফসল উৎপাদন করিয়া দিন দিন লক্ষ্মী লাভ করিতেছে। আর আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশ চির কৃষি-প্রধান হওয়া সত্ত্বেও, কৃষিবিষয়ক অজ্ঞানতা ও নিশ্চেষ্টতার জন্য আমরা দিন দিনই দরিদ্র ও খাদ্য বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি এবং খাদ্যের জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছি। আজ দেশের চতুর্দিকে খাদ্যের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ অধিবাসী খাদ্যাভাবে নিদারুণ অপুষ্টির কবলে পড়িতেছে। আর আমরা সাহিত্য ও দর্শন লইয়া পড়িয়া রহিলাম, অন্নাভাবেই মরিয়া গেলাম। দেশের খাদ্যাভাব যাহাতে দূর হয় তাহার জন্য আমাদের সাধনা ও চেষ্টা করিতে হইবে। তাই আবার বলিতেছি, "হে দেশবাসী—ভাইগণ। কৃষিকে জীবনের ব্রত কর, দেখিবে অচিরাৎ তোমাদের বুকের ক্রন্দন মুখের হাসিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, গৃহে গৃহে অন্নপূর্ণা আসিয়া অন্ন বিলাইতেছেন। পেটে অন্ন থাকিলে দর্শন চিন্তা আসিবে। প্রাণপণে নূতন উদ্যমে লাগিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—লাঙ্গলই আমাদের বল, কৃষিই আমাদের উপাস্য, দেশের শস্যই আমাদের ইজ্জৎ, আশা-ভরসা, সম্মান ও প্রাণ !!!

বাঁশের চাষ

গৃহস্থের বাঁশে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। পলি, দো-আঁশ ও দুধে এঁটেল মাটিতে বাঁশ ভাল জন্মে। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ১৪।১৫ হাত অন্তর বাঁশ লাগাইতে হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায়—আগুন লাগাইয়া শুকনা পাতা ইত্যাদি পোড়াইয়া দেওয়া ও পাঁক মাটি দিতে হয়।

—শ্রীমৃণালকান্তি বসু

বাক্‌সিদ্ধ সর্বানন্দ

একেবারে নিরক্ষর। আদৌ পরিচয় নেই স্বরবর্ণের সঙ্গে। ব্যঞ্জনবর্ণও পুরোপুরি অজানা। অথচ জন্ম মহাপণ্ডিতের বংশে। পিতামহ বাসুদেব পণ্ডিত সমাজে এক বিরাট দিক্‌পাল, সাধক হিসাবেও বিপুলকীর্তি। দাদা আগমানন্দও পণ্ডিত মহলে এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন আসনে অধিকার অর্জন করেছেন। বংশের সকলেই সরস্বতীর মানসপুত্র, সাধারণের শ্রদ্ধা ও বন্দনার লক্ষ্য। কিন্তু সর্বানন্দ?---এ কি আশ্চর্য ব্যতিক্রম---একি মূর্তিমন্ত বৈসাদৃশ্য, এ কি বিস্ময়কর বৈপরীত্য। একেবারে ঘোর মূর্খ---দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বংশে একটি মাকাল ফল।

এ নিয়ে কারো মনেই স্বস্তি নেই। রাজা থেকে সুরু করে প্রতিটি মানুষেরই মনে এক তীব্র অস্বস্তি---দাদা আগমানন্দ আর সহধর্মিণী বল্লভার তো কথাই নেই; নিদারুণ বেদনা এবং তীব্র ক্ষোভ প্রতিনিয়ত তাঁদের বুকের মধ্যে চেপে রাখতে হচ্ছে, লোকসমাজে মুখ দেখানো প্রায় দায় হয়ে উঠেছে, সকলের কাছেই সর্বানন্দ এক উপহাসের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র---এ চিন্তা তাঁর অতি প্রিয়জন এবং সবচেয়ে নিকটজনের মনে কখনও প্রগাঢ় আনন্দ তো দূরের কথা, তিলমাত্র আনন্দেরও সঞ্চার ঘটাতে পারে না।

বর্ধমানের অন্তর্গত পূর্বস্থলী গ্রাম। সেখানকার বাসিন্দা বাসুদেব স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সপরিবারে চলে আসেন পূর্ববঙ্গের চাঁদপুরের অন্তর্গত মেহের গ্রামে। সেই থেকে মেহেরই তাঁদের ভদ্রাসন হয়ে উঠল। সাধনোচিত ক্ষেত্র মেহের, আধ্যাত্মিক সাধনার ঐতিহ্যে গরীয়সী মেহের। অধ্যাত্ম সাধনার এক পীঠস্থল-সদৃশ। বাসুদেবের সঙ্গে এসেছিলেন বালক ভৃত্য পূর্ণানন্দ। এই পূর্ণানন্দই যেন সর্বানন্দের জীবনমরুর বুকে একটি পাপড়িভরা তাজা গোলাপ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপেক্ষা-বঞ্চনা-গঞ্জনার সমারোহে স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতির এক নিরন্তর নির্ঝর। প্রতিকূলতার নিবিড় নিশীথ নিশ্ছিদ্র আঁধারপুঞ্জে যেন আনুকূল্যের একটি স্নিগ্ধ আলোর বলিষ্ঠ রেখা।

জর্জ এ্যালেন

বিভিন্ন পণ্ডিত গবেষকরা নানাপ্রকার গবেষণায় এবং কিছু নির্ভরযোগ্য ঘটনা বিবরণ ও পুঁথিপত্র নির্ভর করে মোটামুটিভাবে সর্বানন্দকে পঞ্চদশ শতাব্দীর সৃষ্টি বলে নির্দেশ করেছেন।

এক ধারায় কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। সমস্ত ব্যাপারটা চরম অস্বস্তির মধ্যে দিয়েও যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ-অকস্মাৎ একদিন এ কি করে বসলেন সর্বানন্দ, অর্বাচীন মূর্খের মত প্রকাশ্য রাজসভায় সর্বজনসমক্ষে এ উক্তি কেন তিনি করে বসলেন, যার ফলে সমগ্র পরিবারের উঁচু মাথা অনেকখানি নিচু হয়ে গেল। লজ্জায়, অপমানে, গ্লানিতে মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন আগমানন্দ। এ তিনি কি করে বসলেন ---

জমিদার জটাধর সকলের সামনে সর্বানন্দকে উদ্দেশ করে বললেন --বলতো হে মহাপণ্ডিত, আজ কি তিথি? নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন সর্বানন্দ---কেন, আজতো পূর্ণিমা---

কিন্তু সেদিন অমাবস্যা। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন জটাধর। অবিলম্বে সভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আদেশ দিলেন সর্বানন্দকে। শুধু সর্বানন্দ নয়, এ অপমান সমগ্র পরিবারের। দেশপূজ্য পণ্ডিত বাসুদেবের পবিত্র স্মৃতিরও অমর্যাদা ঘটালেন সর্বানন্দ। এ আর সহ্য করতে পারলেন না বল্লভা। যা মুখে এল বললেন স্বামীকে, সেদিন যেন আর বাঁধ মানল না তাঁর নিরুদ্ধ বেদনা। বহুকালের সঞ্চিত জ্বালা সেদিন ভর্ৎসনার রূপ নিয়ে সকল দুয়ার ভেদ করে প্রলয়ঙ্করী বন্যার বেগে বেরিয়ে এল।

সহ্য করতে পারলেন না সর্বানন্দও। বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। প্রবেশ করলেন গহন গভীর অরণ্যে। এ প্রাণ রেখে লাভ কি---এ প্রাণের কি মূল্য---এ প্রাণ কার কি উপকারে আসছে---বেঁচে থাকা মানেই তো নিরন্তর প্রতি লোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ধিক্কার কুড়োনো, লোকের উপহাস আর বিরক্তির পাত্র হয়ে বেঁচে থাকা, সে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি?

ভাবান্তর ঘটল সর্বানন্দের। কেন কিসের জন্যে এভাবে তিনি অমূল্য প্রাণ নষ্ট করবেন! এই দুর্লভ মানব-জন্ম কি নষ্ট করার জন্যে! এতো পলাতক কাপুরুষের মনোবৃত্তি, পালিয়ে কেন যাবেন সর্বানন্দ? যে কারণে তাঁর এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা, এত ধিক্কার, তারই সমুচিত উত্তর দেবেন সর্বানন্দ। যে বিদ্যার অভাব তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করে তুলেছে---সেই বিদ্যার অফুরন্ত ঐশ্বর্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভরিয়ে তুলবেন---সেই তো হবে তাঁর উপযুক্ত কাজ। জটাধরের অমর্যাদার হবে যোগ্য প্রতিদান।

বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রয়োজন তালপাতার। সামনেই প্রকাণ্ড তালগাছ। সেই গাছে উঠলেন সর্বানন্দ। গাছের সুউচ্চ চূড়ায় তিনি যখন পাতা সংগ্রহ করছেন ঠিক তখনই তাঁর চোখে পড়ল এক প্রকাণ্ড বিষধর ফণাধারী সর্প। প্রথমটা ভয়ে হিমশীতল হয়ে উঠলেন সর্বানন্দ। সমস্ত চেতনা যেন লোপ পেয়ে গেল। এ যে ভয়াল, এ যে ভীষণ, এ যে ভয়ঙ্কর, এর দংশনে নিশ্চিত প্রাণান্ত, কিন্তু পিছিয়ে আসারও পথ নেই। তা হলেও তার তীব্র হলাহল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। সংগ্রামেই লিপ্ত হলেন সর্বানন্দ। প্রচণ্ড শক্তি, অসাধারণ কুশলতার সাহায্যে তীব্র এবং দীর্ঘ সংগ্রামে অবশেষে সর্পকে পরাস্ত করলেন সর্বানন্দ। সর্প প্রাণ দিল সর্বানন্দের হাতে।

বৃক্ষতলে ঠিক সেই সময়েই অপেক্ষা করছিলেন এক অবধূত সন্ন্যাসী। অভূতপূর্ব যোগাযোগ। সন্ন্যাসী বললেন, আজ রজনীর মধ্যযামে তোমার দীক্ষা। শবসাধনায় বসতে হবে তোমাকে। চমকিত সর্বানন্দ। মুখে সংলাপ নেই। বিস্ময়ে ভাষাহারা। তাঁর দীক্ষা। তিনি বসবেন শবসাধনায়?—একি শুনছেন তিনি—এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া, এ কোন্ ইন্দ্রজাল?

সংশয় ভেঙে দিলেন সন্ন্যাসী। বুঝিয়ে দিলেন এর নেপথ্যবর্তী গভীর সত্য। সবই তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত। গাছের একটি পাতাতেও কাঁপন লাগে না তাঁর ইচ্ছা না হলে। প্রতি পদ-ক্ষেপই পূর্বনির্দিষ্ট। প্রতিটি পা ফেলাই আগে থেকে মাপা থাকে। সন্ন্যাসী বোঝালেন তাঁর আগমন মোটেই আকস্মিক নয়, সবই পূর্বপরিকল্পিত। নির্ধারিত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। এখন এসেছে সেই ক্ষণ, এল সেই পবিত্র মুহূর্ত, হৃদয়ের অন্ধকার মরূদ্যানে এবার ফুটে উঠবে আলোর শতদল, ধেয়ানের মনোমন্দিরে এবার শোনা যাবে সেই পরমের নূপুর-নিক্কণ। অন্তরের অন্তঃপুরে ঝঙ্কৃত হবে সেই অপরূপের মোহন মধুর ছন্দ।

পূর্ণানন্দের মনে আনন্দ আর ধরে না। এই দীর্ঘজীবন যে স্বপ্ন, যে চিন্তায় বয়ে বেড়াচ্ছেন, আজ তা সার্থক হতে চলেছে, আজ বুঝি তাঁর বেঁচে থাকার মানে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। একটি বিরাট রহস্য, যে তিনি ছাড়া কেউ জানে না, একটি অতি গূঢ়-গোপন কাহিনী আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাঁরই জানা আছে।

কঠোর তপস্যায় ব্রতী ছিলেন বাসুদেব। বিশ্বজননীর মহিমান্বিতা দশদিক উজ্জ্বল করা অপরূপ মূরতির দর্শনের তপস্যা। দেবী জানালেন—এ জন্মে দর্শন হবে না। সে আশা বাসুদেবের অপূর্ণই থাকবে—কিন্তু দেবী দর্শন তিনি পাবেন পরজন্মে, যখন তিনি নিজের পৌত্ররূপে আবার জন্ম পরিগ্রহ করবেন।

জন্মান্তরের একটি রহস্যদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল সর্বানন্দের সামনে। সব কিছু রহস্য আজ তাঁর কাছে প্রাঞ্জল। যে ঘন পুরু যবনিকা এতদিন সামনে পথরোধ করেছিল, তার অপসারণ তাঁর দৃষ্টিপথে অনেক কিছুর আবির্ভাব ঘটাল।

পূর্ণানন্দ নিজে হলেন শব, শবাসরোধ করে বরণ করলেন মৃত্যু। সর্বানন্দের কোন ওজর-আপত্তি শুনলেন না। শবাসনে বসলেন সর্বানন্দ, রজনী দ্বিতীয় যাম। চারিদিকে নিবিড়-নিশীথ অন্ধকারের অপ্রতিহত লীলা। আসে ভীতি, আসে প্রলোভন। সুরু হয় প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য, রঙ্গিণীর লাস্যনৃত্য, ভৈরবের ঘোর বিকটদর্শন চক্ষুর দৃষ্টি থেকে বজ্র উদ্গীরণ, সুরু হয় পক্ব বিম্বাধরোষ্ঠি তন্বীর বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গকটাক্ষ মদিরা মাখানো মোহময়ী দৃষ্টি থেকে নির্গত হয় মাদকতার ধারা, যক্ষর-ক্ষের ভীমভৈরব আস্ফালন, মনোমোহিনীর নয়ন ভোলানো অঙ্গের লাবণ্য হিল্লোল—সাধক স্থিরলক্ষ্য, শান্ত, সমাহিত, প্রলোভনে মুগ্ধ হন না, ভীতি-প্রদর্শনে হন না কম্পিত। অবশেষে রাত্রির সমাপ্তি যখন হয় হয়, উষার অরুণ-রাগিণী যখন দূরে শ্রুত হতে থাকে তখনই সাধকের সাধনা হয় সার্থক। দেবী কৃপা করেন ভক্তকে। সাধনার অগ্নিপরীক্ষায় ভক্ত সগৌরবে উত্তীর্ণ। দেবীর প্রসন্ন হাসির অমৃত বর্ষিত হয় ভক্তের উদ্দেশে। দেবীর করুণায় প্রাণ ফিরে পান পূর্ণানন্দ।

কিন্তু দেবীর এই শ্রেষ্ঠ ভক্তের মুখ থেকে একবার যা নিঃসৃত হয়েছে তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে? ভক্তের অসম্মান কি দেবীর অসম্মান নয়, সাধকের বেদনা কি জননীর রাতুল চরণে কাঁটার মত বিঁধবে না? ভক্তের মর্যাদা দেবী রক্ষা করলেন। সমগ্র পরিপার্শ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে অমাবস্যার বুক চিরে দেখা দিল পূর্ণিমার আলো।

জীবননাট্যের ঘটে এক পরিপূর্ণ দৃশ্যান্তর। সারা জীবনের ইতিহাস উপনীত হয় এক ভিন্ন অধ্যায়ে। যে অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এক পরিপূর্ণ নতুনের জন্ম। সে নতুন লাবণ্যময় তেজোদ্দীপ্ত, ব্যক্তিত্বসমন্বিত। সর্বানন্দ কাশীর দিকে পা বাড়ালেন।

চলার পথে যশোরে এলেন। চন্দ্রচূড় আগমবাগীশের গৃহে রইলেন ছদ্মপরিচয়ে। কিন্তু ছদ্মপরিচয় রইল না। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছেন যশোরে। তর্কযুদ্ধে আহূত হয়েছেন চন্দ্রচূড়। কিন্তু চন্দ্রচূড় আজ বার্ধক্যের শিকার, স্মৃতিতে ভাঁটা পড়েছে। মনে মনে ভয় ধরে তন্ত্রাচার্যের—সারা জীবন যশের, মানের, খ্যাতির উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠানের পর আজ কি সেই উত্তুঙ্গ শীর্ষ থেকে হবে তাঁর শোচনীয় পতন? সে লজ্জা যে কি বেদনাদায়ক তা ভেবে উৎকণ্ঠার অবধি থাকে না। চন্দ্রচূড়ের অবরুদ্ধ বেদনার ভাষা বুঝতে বাকী থাকে না সর্বানন্দের। সর্বানন্দ আশ্বাস দেন চন্দ্রচূড়কে। চন্দ্রচূড় বুঝতেই পারেন না সর্বানন্দ কি করে সেই দিগ্বিজয়ীর সম্মুখীন হবেন। এদিকে স্বপ্নে আদেশ পান সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। দেবী তাঁকে স্বপ্নে জানালেন—"আমার বলে যে বলীয়ান, আমার প্রসাদে যে শক্তিমান, তার সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা কোর না"। অগত্যা দিগ্বিজয়ীকে তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হল। যশোর থেকে কাশী।

কাশীতে বসবাসের পর কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার এক দুর্ভেদ্য জটিল রহস্যের আড়ালে চলে গেলেন সর্বানন্দ। তারপর তাঁর জীবনের কোন কাহিনী বা পরিণতি কিছুই জানা যায় না। অজানার অন্তহীনতায় মিলিয়ে গেলেন বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ।

তবে, কোন কোন দিকপাল মহাসাধক আজও বলে থাকেন, সর্বানন্দ অনন্তনিদ্রায় এখনও নিমগ্ন হন নি।

দূর দিগন্তে ঝড়

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

নবম পরিচ্ছেদ

মার্শাল শর্টি'র ভোরে উঠা অভ্যাস উষার প্রথম স্পর্শে তাঁর ঘুম ভাঙে বরাবর। আজো ভাঙলো। কিন্তু আজ বোধহয় একটু তাড়াতাড়িই ভাঙলো। আকাশে এখনো অন্ধকার, ভোর হ'তে অনেক দেরি। জেলখানার জানালার বাইরে তাকালেন একবার। চেতন-অবচেতনের আলোর-আঁধারে আকাশ কাঁপছে। সেদিকে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লেন।

ঘরের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমিয়ে আছে অনেকগুলো লোক। মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো ভেসে গেল মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারদের বিচিত্র চেহারাঃ জিম্ লিটন, প্রিস্টলি, পোলটন (না, পোলটন নেই আর), জেনিথ্, স্যাভলট.........। অমনি সমস্ত শরীর চন্‌মনিয়ে উঠল। আবার ঘুমন্ত লোকগুলোকে দেখলেন তিনি। একটা শতচ্ছিন্ন কম্বল পাকিয়ে বালিশ বানিয়ে মেঝের উপর টানটান শুয়ে আছে উলরিক আর কেইট।...... ছিপছিপে বেন আর হোৎকা রোরি, হাত-পা এক করে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে ঘরের এক কোণে। তাছাড়া আছে ব্রেসফোর্ড। টেবিলের উপর হাত, হাতের উপর মাথা রেখে চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছে অষ্টাবক্র ব্রেসফোর্ড। আর দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে-বসে অনর্গল নাক ডাকাচ্ছে মাইক। প্রত্যেকের হাতের কাছে বন্দুক...... পিস্তল...... রাইফেল আর গুলীভর্তি বাক্স।

বাইরে অতর্কিতে পায়ের শব্দ। কে? —অ্যাল্। সমস্ত রাত সতর্কদৃষ্টিতে রাইফেল নিয়ে পাহারা দিয়েছে অ্যাল্। জেলখানা আর লালকুঠির গোটা চৌহদ্দিটা ঘুরে বেড়িয়েছে।

ডাকাতদের কেউ এলো না তো! অথচ রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে তারা ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এরকম একটা ধারণা প্রায়-নিশ্চিত ছিল। আর সেই বীভৎস সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতও ছিল সকলে। কিন্তু এ কি, সবই যে ফুটফাট, ফক্কিকার! যেন দিক-দিগন্ত আচ্ছন্ন করে কালবৈশাখীর ভূমিকা হলো, কিন্তু জল না, ঝড় না, একটু হাওয়া পর্যন্ত না—হঠাৎ আলোর খুশিতে আকাশ উঠল ঝিলকিয়ে। ব্যাপার কি? লিটন ছাড়া পেয়ে ওদের গ্যাংকে কি বলে নি সব কথা? নিশ্চয়ই বলেছে। এতক্ষণে প্রিস্টলিও নির্ঘাত জেনে গেছে যে, তার মৃত্যুবাণ—সেই ছাপানো বিজ্ঞাপনটি—আছে এই চামড়ার ব্যাগে। সুতরাং তার মৃত্যুবাণ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সে যে মরিয়া হয়ে ছুটে আসবে সে তো অবধারিত। কিন্তু কই, কেউ তো এলো না! তবে কি ডাকাতরা তাদের পরবর্তী আক্রমণধারা সম্পর্কে মনস্থির করতে পারে নি? এমনও হচ্ছে পারে যে, জনৈক লিটন বা জনৈক প্রিস্টলির একক স্বার্থের জন্য দলের সকলে এত বড়ো ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কিংবা হয়তো......যাক্ গে, অত ভেবে কি হবে! প্রস্তুত থাকাই ভালো। বর্বরদের বিশ্বাস নেই। মার্শাল শর্টি উঠে দাঁড়ালেন। দু-একবার পায়চারী করলেন। গায়ের ইউনিফরম থেকে পায়ের বুটজোড়াটি পর্যন্ত আপাদমস্তক তিনি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত।

আপাতত কিছু জলযোগ করা দরকার। ব্রেকফাস্ট। কিন্তু তাঁর জেলখানার এই স্বল্পপরিসরে এতগুলো লোকের প্রাতরাশের আয়োজন করা সম্ভব হবে না। মাইকের লালকুঠিতে অবশ্য সে-ব্যবস্থা হ'তে পারে। সুতরাং পায়ের ঠোকর মেরে তিনি রোরিকে তুললেন: 'ওঠো, ওঠো, উঠে

পড়ো এক্ষুণি। লালকুঠিতে গিয়ে ব্রেকফাস্ট বানাও সকলের।'

ঠোক্কর খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠল রোরি, বিড়বিড় ক'রে চোখ ঘসতে-ঘসতে লালকুঠির দিকে পা বাড়ালো। মার্শালের হাঁক-ডাকে সকলেই উঠে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে এসে ভোরের হাওয়ায় আড়মোড়া ভাঙল।

মার্শালের কাঠের বাড়িটা মন্দ নয়। সম্মুখের দিকে গুটি চারেক ছিমছাম ঘর নিয়ে মার্শালের চেম্বার। আসবাবের কোনো বাহুল্য নেই। পেছনের দিকে হাজতঘরের সারি। তার ওপাশে এদিক-ওদিক সরু রাস্তা। রাস্তা বরাবর একসার বাড়ি—সরকারী আপিস বোধহয়। ওধার থেকে সদর রাস্তাটা শহরের প্রান্তে গিয়ে মিশেছে। জেলখানার সম্মুখে এক টুকরো জমি। তারপরেই মাইকের লালকুঠি। মাইক চলল লালকুঠির দিকে। এতগুলো লোকের ব্রেকফাস্ট তৈরির কাজ, রোরিকে একটু সাহায্য করা দরকার।

গুলতানি আর গুঞ্জন। মাইকের রান্নাঘরের গন্ধে মন্থর ভোরের বাতাস খিদে-ছড়ানো। খানিকবাদে লালকুঠিতে সকলেই হাজির হলো একে একে। গরম, ধোঁয়া-ওঠা ব্রেকফাস্ট টেবিলের ওপর। জুলিয়া পরিবেশন করবে। টেবিলের কাছে এগিয়ে এল সে।

খাবারের দিকে লোলুপ দৃষ্টি সকলের। সমস্ত টার্টিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাইক হুমকে উঠল: 'কোনো শালা খেতে পাবে না। যার সংগে বন্দুক বা রাইফেল নেই, ব্রেকফাস্ট দেয়া হবে না। গেট আউট্!'

'আঃ মাইক!' বিরক্তকণ্ঠে আপত্তি করল টুলকি: 'বড্ডো বাড়াবাড়ি করছো। এই সাত-সকালে কেউ আসবে না।'

'এলে কাল রাত্রেই আসতো।' —যোগ করল বেন।

'না. ঠিক বলেছে মাইক।' মার্শালের কণ্ঠস্বর কঠিন শোনালো: 'সশস্ত্র না হয়ে কেউ খেতে পাবে না।'

অগত্যা খাবার-টেবিল ছেড়ে উঠতে হলো। জেলখানায় মার্শালের চেম্বার থেকে যে-যার হাতিয়ার নিয়ে এল। তারপর খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'কিন্তু বাইরে লক্ষ্য রাখবার জন্যে তো কেউ রইল না।' —মাইক সদাসতর্ক। —'গার্ড, একজন গার্ড তো দরকার।'

আবার অস্বস্তি।

'আমি গার্ড দেবো।' —জুলিয়ার সকলের কথায় অস্বস্তি কাটলো। —'লালকুঠির পেছনের দিকটায় আমি আছি।'

'সেই ভালো। সমুখটা তো আমারই দেখার।' —খেতে খেতে বলতে লাগল মাইক।

—'কিন্তু না, এদিকে না, ওদের লক্ষ্য হবে মার্শালের ঐ জেলখানা। অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্য মার্শাল শর্টি।'

'তবে আর কি, লালকুঠিতে আমাদের ভয়টা কিসের!' —পুরো একটা সেদ্ধ ডিম মুখে পুরলো কেইট। —'আরে দূর, সকাল-বেলা ওদের আসতে বয়েই গেছে! হ্যাঁ, যদি আসে তো আজ রাত্রে, এই বলে রাখছি!'.....

কথাটায় সায় দিল সকলেই এবং এই রকম গুলতানি করতে করতে খাওয়া শেষ করল। খাওয়াটা মন্দ হলো না। ঢেকুরও উঠল কারো-কারো। মাইকের মেজাজটা যেমনই হোক, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন তার চমৎকার!

'আচ্ছা, এবার তাহলে মার্শালের জেল-ঘরের দিকে যাওয়া যাক।' মাইক উঠে দাঁড়াল। 'না-কি আরেক দফা চালাবে, বেন?'

শেষের কথাটায় সবাই হেসে উঠল। বেন একটু পেটুকগোছের, সাঁটিয়েছেও দুজনের খাবার। একটু অপ্রতিভ হ'লো সে। সামলে নিয়ে কি একটা বলতে যাবে, এমন সময় মাইক হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলো: 'না, না, আর দেয়া যাবে না তোমাকে।'

আরেক দফা সমবেত অট্টহাস্যে মার্শাল শর্টিও যোগ দিলেন। কিন্তু হঠাৎ যেন বাজ পড়ল! বাইরে কোথায় দুম্ করে রাইফেলের গর্জন উঠল একটা। হাস্যরোল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই শুনল, ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে অসংখ্য ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ: খটাখট্........ খটাখট্........ খটাখট্.........। তরংগের পর তরংগ, মৃত্যুর মতো এগিয়ে আসছে এবং সেই সংগে রাইফেলের দুম্দাম্।

লালকুঠিতে চোখের নিমেষে যে-যার রাইফেলে গুলী ভরে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে-হাতে চেয়ার-টেবিল সরে গেল এক পাশে। পথ পরিষ্কার।

—'কোন্ দিক থেকে আসছে শব্দটা?' —রাইফেল তুললেন মার্শাল।

'ঐ যে, জেলের ওপার থেকে।' রোরি হাত তুলে দেখাল।

ঘরের ভিতরের লোকগুলো সংঘর্ষের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে হুটপাট করে ছুটে বেরোবার জন্য দরজার কাছে ভিড় করল।

'এই শুয়ার-কি বাচ্চা, আভি মৎ নিকালো।' —মার্শালের হুংকারে সবাই থমকে গেল। তারপর তাঁরই আদেশে ঘরের এক কোণে রাইফেল হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

জানালার এক পাশে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন মার্শাল। কই, কারোকে দেখা যায় না তো! অথচ ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলীর আওয়াজে জেলঘরের খিড়কির দিকে কাঠের ফ্রেমগুলো বারংবার কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বারংবার ঝলসে উঠছে আকাশ: তার মানে, সম্মুখের জেলখানার আড়ালে পড়েছে ডাকাতের দল।......... চারদিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে বুঝতে বাকি রইল না জেলঘর আক্রান্ত হয়েছে। জানালার শার্সি, কাঠের দেয়াল ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। ....

'শালারা তোমাকে খুঁজছে মার্শাল' মাইক ফিসফিসিয়ে বলল: 'পোলটনের দলিলপত্র সমেত তোমাকে।'

'হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে।' মার্শাল শর্টি একটু ভেবে বললেন: 'ওখানে তো পাবে না আমাকে, তারপর এই লালকুঠির ওপর চড়াও হবে।.........মাইক, এক কাজ করো। চট্ ক'রে ওপরে চলে যাও। ওদের এগোতে দিয়ো না। যে এগোবে তক্ষুণি ওপরের জানালা থেকে তাকে গুলী করে খতম করবে।.........হ্যাঁ, তোমার দলে যাও কেইট, উলকি আর রোরিকে। আর-সকলে থাকবে আমার সংগে।.........যাও, চলে যাও।'

অনেকগুলো ভারি বুট ছুটে সিঁড়ি থেকে ওপরে উঠে গেল। লালকুঠি থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। নিচে জানালার ফোকরে রাইফেলের নল রেখে মার্শাল সন্তর্পণে দেখতে লাগলেন জেলখানার খিড়কির দিকটা। অন্য জানালায় সদর রাস্তার দিকে রাইফেল তাক করে রইল বেন, ব্রেসফোর্ড আর অ্যাল।......মার্শাল বুঝলেন, মুখোশধারী ডাকাতের দল এখনও জেলখানাটা তন্নতন্ন করে তল্লাসী করছে। অনেকগুলো ছায়া আসছে-যাচ্ছে। একটাকে লক্ষ্য করে রাইফেলের ঘোড়া টিপে দিলেন মার্শাল—গুড়ুম করে প্রচণ্ড শব্দ হলো একটা। নিমেষে জেলখানায় মার্শালের চেম্বারে অনেকগুলো লোকের ছায়া সরে গেল। একটা কলরব শোনা গেল: পরস্পর পরস্পরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, শত্রুপক্ষ সজাগ, লালকুঠিতে তারা ঘাটি বেঁধেছে। সাবধান, সাবধান!

কিছুক্ষণ পর দোতলা থেকে গুলীর শব্দ শুনলেন মার্শাল। একটি বুলেট গিয়ে বিঁধলো জেলের জানালায়। তারপর এক-ঝাঁক গুলী। তার মানে মাইকের দল সক্রিয় হয়ে উঠেছে।.........মাইকদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা যে সুদৃঢ় সে-কথা বুঝতে পারল ডাকাতরা, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিজেদের দল সাজিয়ে ফেললো।

ডাকাতরা গুলী ছুঁড়ল, মাইক জবাব দিল। নিজেদের মাথা বাঁচিয়ে ডাকাতেরা সন্তর্পণে জেলখানার এধার থেকে ওধারে অর্ধ-বৃত্তাকারে সরে সরে গেল। তারপর আবার গুলীর শব্দ। আবার চুপচাপ। আত্মরক্ষা আর আক্রমণ—অন্যের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে নিজেকে আড়াল করা, তারপর লক্ষ্য

স্থির করে রাইফেলের ঘোড়া টেপে দেয়া। এমনি করে চলতে লাগল লুকোচুরি, চলতে লাগল গুলী-বিনিময়। দেখেশুনে মনে হলো, এ-লড়াই সহজে থামবে না।

না, এই খুটখাট লড়াই করে কিছু হবে না। খানিকটা চুপ মেরে গেলে কেমন হয়? ওদের গুলী ফুরিয়ে যাবার পর যদি আমরা শুরু করি? না, তাতেও কোনো লাভ হবে না। শুধু আক্রমণ প্রতিহত করা তো নয়, মুখোশধারী বর্বরদের সমূলে ধ্বংস করতে হবে। কি করা যায়! চিন্তিতমুখে মার্শাল জানালার কাছে একটু মাথা তুলতেই অতর্কিতে একটা বুলেট জানালা ভেদ করে তাঁর মাথার টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। অল্পের জন্যে মাথাটা বেঁচে গেল মার্শালের।

দৃশ্যটা উপভোগ্য। খুকুখুক করে হেসে উঠল লিকলিকে বেন। —'আহা-হা, টুপিটা গেল, টুপিটা—।'

এই ঠাট্টা অসহ্য লাগল মার্শালের। এক ধমকে থামিয়ে দিলেন তাকে।........তক্ষুণি দোতলা থেকে গুলী ছুটল বিদ্যুৎবেগে—জেলখানার ডান দিকে আর্তনাদ উঠলঃ তার মানে, খতম হলো একটা। সাবাস মাইক, সাবাস!

এ কি, জুলিয়া যে! ঘরের মধ্যে ঘুরঘুর করছে। 'বুদ্ধু মেয়ে কোথাকার!' —মার্শাল হুঙ্কার দিলেনঃ 'শিগগীর মাথা নিচু করো। ওরা দেখতে পেলে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেবে।' —জুলিয়া হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। সরে গেল অন্য দিকে। চারদিকে এই অগ্নিবৃষ্টি—অথচ যেন কিছুই হচ্ছে না, এমনি অকুতোভয় জুলিয়া।

মার্শালের ছোট্টো চেম্বারে জানালার পাশে একটা মুখ। সট্ করে সরে গেল আবার। বন্দুকের নল দেখা গেল, তারপর আস্তে আস্তে একটা মাথা নিচে থেকে অর্ধেক ওপরে উঠল। উঠেই সরে গেল। আবার আসুক, আবার।........এবার আর দেরি করলেন না মার্শাল। লক্ষ্য তাঁর অব্যর্থ। ডাকাতদের একটি খসলো। পরক্ষণেই তাঁর কানের পাশ দিয়ে একটি বুলেট শাঁ করে বেরিয়ে গেল। মার্শাল বসে পড়লেন। অমনি এ-পাশ থেকে বেন আর ব্রেসফোর্ডের রাইফেল গর্জে উঠল। —এক হাতে অ্যাল, বেইনও কম যায় না।........

কিন্তু ও কি? রাস্তার ওপাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসছে নিচের দিকে। মাথা তুলবে কার সাধ্য! নিতান্ত মাইক ওপর থেকে গুলী না চালালে নিচে থেকে প্রতিরোধ করা মুশকিল। মুশকিল অবশ্য উভয়-পক্ষেই—কারো পক্ষেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব না।........ মার্শাল সরে গেলেন ব্রেসফোর্ডের পাশে, ও-দিক থেকে তাক করা যায় কিনা দেখা যাক।

'না, এভাবে চলতে পারে না।' মার্শাল বললেনঃ 'আকাশ মেঘলা। এই পরিস্থিতিতে ওদের জব্দ করতে হলে চোখ এড়িয়ে ওদের কাছে যেতে হবে।'

'তা কি করে সম্ভব?' বেন অবাক হলোঃ 'পাগল না কি!' পরমুহূর্তেই তার একটি বুলেট শাঁ করে ছুটে গেল—একটা আর্তনাদ উঠল জেলখানায়।

মার্শাল কি ভাবলেন। তারপর মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে লাগলেন লাল-কুঠির পিছন দিকে। আরে, মেঝের উপর বসে জুলিয়া কি করছে। রাইফেলে টোটা ভর্তি করছে সে—তার মানে, সে-ও চুপ করে বসে থাকবার মেয়ে নয়। কিন্তু মার্শাল তাকে নিরস্ত করলেনঃ 'তোমার কাজ এটা নয়, জুলিয়া। তার চেয়ে তুমি বরং স্যাণ্ডউইচ বানাও গে, সেটাই হবে এখন সবচেয়ে বড়ো কাজ।'........

হামা দিয়ে দিয়ে পিছনের দরজার আড়ালে চলে যেতেই মার্শাল উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে সন্তর্পণে এ-ঘর-ও-ঘর খুঁজতে খুঁজতে মাইককে পাওয়া গেল। জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছে মাইক। আর মিনিটখানেক যেতে-না-যেতেই রাইফেলের নল তাক করে অগ্নিবৃষ্টি করছে।........

'কেমন বুঝছো, মাইক?'

'নাঃ, কিছু না, কিছু এগোচ্ছে না।' —আবার রাইফেলের ঘোড়া টিপলে মাইক। ওপার থেকে একটা তীক্ষ্ন আর্তস্বর শোনা গেল। —'নিচে আপনার কাউবয়রা কেমন চালাচ্ছে?........আমার এখানে উল্‌কি তো মারাত্মক জখম।'........

'আহ্ হা।........না, আমার দল ঠিক আছে।'........মার্শাল বললেনঃ 'এখন কি করবে, মাইক? এভাবে তো চলতে পারে না।........ওদের দলে কত লোক হবে বলতে পারো?'

'না। তবে আন্দাজ করতে পারছিঃ শ' খানেকের কম না।'........

নিচে নেমে এলেন মার্শাল। হামাগুড়ি দিয়ে আবার স্বস্থানে। তাঁর দলের কাউবয়রা যুদ্ধে মেতে উঠেছে, কেউ হটে নি। তারই মধ্যে দেখা গেল একটি নতুন দৃশ্যঃ অ্যাল আর বেনকে পেছন থেকে মাংসের মোটা মোটা স্যাণ্ডউইচ খাওয়াচ্ছে জুলিয়া।........হামা দিয়ে দিয়ে ওদের কাছে পৌঁছলেন মার্শাল। জুলিয়াকে পাঠিয়ে দিলেন ওপরে। আহত উল্‌কির কাছে।

'কেমন বুঝছো তোমরা?'........ মার্শালের কথার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলী এসে থরে থরে সাজানো মাইকের মদের বোতলগুলি ভেঙে চুরমার করে দিল।

'না মার্শাল, ব্যাপার সুবিধের নয়।' অ্যাল বললঃ 'ওরা দলে ভারি। এভাবে চালিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য।'

'তাছাড়া এই খানিক আগে ব্রেসফোর্ডের চোট লেগেছে।' একটা বুলেট ছাড়ল বেনঃ 'তবে মারাত্মক কিছু না, একটু ছড়ে গেছে এই যা।'

'রাস্‌কেলদের জেলঘর থেকে তাড়িয়ে বাইরে আনতে পারলে হতো। দিনের আলোয় তখন—'

'আমিও তাই ভাবছিলাম, মার্শাল।' —মাইক কখন নিচে নেমে এসেছে টের পায় নি কেউ। —'যদি তোমার জেলখানার কুঠিতে আগুন লাগিয়ে দেয়া যায়, তাহলেই হয়। তখন তো শালারা ঘর থেকে না বেরিয়ে পারবে না। কিন্তু—'

'এতে আর কিন্তু কি, মাইক।' মার্শাল স্থিরকণ্ঠে বললেনঃ 'আমার ওখানে মূল্যবান জিনিস বলতে কিছুই নেই। জেলখানার কুঠিটা পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে? —যাক না। তার বদলে গ্যাংটা যদি ধরা পড়ে, সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো লাভ।'

'ঠিক আছে, মার্শাল।' মাইক সংকল্পে কঠোরঃ 'কেইট আর রোরিকে নিয়ে আমি যাচ্ছি জেলের খিড়কির দিকে, ইতিমধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী চালিয়ে ওদের ব্যস্ত রাখো।...... তারপর যদি দ্যাখো গর্ত থেকে ইঁদুরগুলো বেরিয়ে পড়েছে, তখন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর।'

কিন্তু ব্যাপারখানা কি? মাইকের মতলব তো কিছুই ঠাহর হলো না। মার্শাল তবু চুপ করে রইলেন। মাইক একাধারে দুর্ধর্ষ ও তীক্ষ্নবুদ্ধি—তার প্রতি মার্শালের আস্থা অটুট।........

কেইট আর রোরিকে নিয়ে পিছন-দুয়ার দিয়ে চোরের মতো পিছলে গেল মাইক। —'ভারি ভারি রাইফেলগুলো রেখে যাও এখানে।' —সংগীদের বললো মাইকঃ 'তার বদলে পিস্তল নাও সংগে।'........

'রাইফেলের বদলে পিস্তল?' —রোরি অবাক হলোঃ 'পাগল নাকি!'

'ইউ শাট আপ।' মাইক গর্জে উঠলঃ 'যা বলছি তাই করো।......শোনো। জেল-কুঠিতে আগুন লাগাব আমি। তোমরা একটু দূরে থাকবে—কুঠির দুই কর্ণারে। আগুনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলে—'

'বুঝেছি। দম আটকে ইঁদুরগুলো বেরিয়ে আসবে, অমনি গুলী করবো।'

'রাইট।' কেইটের বুদ্ধির তারিফ করল মাইকঃ 'নাও, চলো।'

খিড়কির পথ দিয়ে প্রায় আধ মাইলটাক পিছনে চলে গেল মাইক। বড়ো রাস্তা বরাবর শহরের প্রাচীর। প্রাচীর ঘেঁষে অনেকটা ঘুরলো, কয়েকটা বাড়ির পাঁচিল ডিঙোল, তারপর জেলখানার অদূরে একটা মস্ত থামের আড়ালে এসে থামল।......দুর্জয় সাহস আর

সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে বুকে পায়ে-হেঁটে এগিয়ে গেল মাইক। জেলকুঠির অনেকটা পিছনে হাজতঘরের কাছে এসে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ভিতরে। বারুদের গন্ধে আর রাইফেলের মুহুর্মুহু প্রচণ্ড শব্দে বন্দীরা আতঙ্কে শুয়ে পড়েছে। কেউ কেউ নিচু গলায় ফিসফাস করেছে। এরা মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারদের খবর রাখে না। কিন্তু বাইরে যে একটা প্রলয় কাণ্ড চলছে, তাই নিয়েই তাদের ফিসফিসনি।

জেলখানার সম্মুখে মস্ত একফালি জমি, তার ওপারে লালকুঠি। ও-দিকটাতে প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। শাঁই-শাঁই করে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটছে দু'পক্ষে। রাইফেলের গর্জনে সমস্ত প্রান্তর কম্পমান।......কিন্তু এদিকে, জেলখানার খিড়কির দিকে বিন্দুমাত্র গোলমাল নেই।.........

মাইক তীক্ষ্ন চোখে দেখে নিল চারদিক। জেলের হাজতঘরের জানালার কাছে এসে আদেশের সুরে বলল: 'তোমাদের কেরোসিন ল্যাম্পগুলো দাও তো আমাকে। নাও, জলদি করো।'.......

বন্দীরা এ-ওর দিকে তাকাল, কেউ কোনো কথা কইতে ভরসা পেল না। মাইকের হাতে পর পর গোটা পাঁচেক কেরোসিনল্যাম্প জমা পড়ল।

খিড়কি থেকে সরে এসে বাঁ-দিক ঘুরে জেলখানার মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়াল মাইক। এ কী, এত ঘোড়া এখানে! ও বুঝেছি, মুখোশধারী ডাকাতদের ঘোড়াগুলোকে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে।

মাইকের নির্দেশে রোরি বড়ো বড়ো বাড়ির পাশ দিয়ে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। রাস্তা ঘুরে অনেকটা দূরে ছেড়ে দিয়ে এল। সময় নিল আধ ঘন্টারও বেশি।.... কাজটা অত্যন্ত সন্তর্পণে সারতে হলো। রোরি ফিরে না-আসা পর্যন্ত মাইক আর কেইট রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। আধঘন্টা বাদে ফিরে এল রোরি।

রোরি ফিরে আসতেই মাইক দু'জনকে কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিসিয়ে ভাঙল তার প্ল্যান। জেলের পিছন দিকটা ফাঁকা। সুতরাং এদিকে আগুন দিলে সহজে কেউ টের পাবে না। যখন টের পাবে, আগুন তখন দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়বে ভিতরে। তখন বজ্জাতেরা সম্মুখের দরজা দিয়েই পালাতে চেষ্টা করবে।.........

'রোরি, শোনো। তুমি থাকবে জেলের দক্ষিণের কোণ ঘেঁষে। আর কেইট উত্তরের কোণে। ইঁদুরগুলো এক-এক করে বেরোবে আর ফায়ার করতে করতে জেলের একেবারে সামনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। ওদিকে মার্শালের রাইফেল ওৎ পেতে আছে।'...... যাও, জারি আপ।'........

নিঃশব্দে চলে গেল ওরা। মাইক তবু কিছুটা মিনিট অপেক্ষা করল। তারপর কেরোসিনল্যাম্প খুলে রাশি রাশি চটের টুকরো ভিজিয়ে লংকাকাণ্ডের প্রথম পর্ব শুরু করল। প্রথমে একটা ঘর বেছে নিয়ে পিস্তল হাতে মাথা গলিয়ে ভালো করে দেখে নিল মাইক। কেউ নেই, ফাঁকা।.........একটা ল্যাম্প জেবলে ভিতরে কাঠের মেঝেতে ছুঁড়ে দিল। তেলের সংগে আগুন গড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগল। তারপর জবজবে চটের টুকরোগুলো এখানে-ওখানে এঘরে-সেঘরে ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত হলো।

কাজ শেষ করে সট করে সরে এল মাইক। খানিকটা দূরে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

মুহূর্তের মধ্যে জেলখানার তিন দিক ঘিরে লক্‌লক্‌ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুনের শিখা আর কালো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল চতুর্দিকে।

জেলের ভিতরে ডাকাতদের রাইফেল গর্জন ক্রমশ যেন থিতিয়ে এল।......ভেসে এল অনেক লোকের ভয়ার্ত কোলাহল। তারপর হুড়মুড়, হুটপাট, ব্যস্তসমস্ত পদধ্বনি। ঘরের ভিতরে কারা যেন পিছন দিকের দরজা খুলল। পরক্ষণেই লেলিহান অগ্নিশিখার আক্রমণে সে-দরজা দড়াম্‌ করে বন্ধ হয়ে গেল।.........

আবার। আবার।

জেলখানার অভ্যন্তরে রাইফেলের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। শোনা গেল অনেক লোকের সম্মিলিত উচ্চকিত আর্তস্বর। অনুমান করা কঠিন নয়, লালকুঠি থেকেও আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে আর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসছে ডাকাতদের ওপর।...... যে যার প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করছে। একজন তো উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে জেলকুঠির সম্মুখের দরজা খুলেই লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু মার্শালের বুলেট তাকে আর উঠতে দিলে না। জানালা গলিয়ে আরেকজন, তারও একই দশা।......একটু বাদে আবার এক ঝাঁক বুলেট। মাইক লক্ষ্য করল, তিন-তিনজন মুখোশধারী ডাকাত কোণের দিকের দরজা খুলে সবেগে বেরিয়ে এল। অমনি রোরি আর কেইটের পিস্তল গর্জন করে উঠল। তিন-তিনজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পড়ে রইল। আর উঠল না।

জেলের পিছন দিকটা সাংঘাতিক জ্বলছে। সুতরাং বেরোতে হলে সম্মুখের দরজা। ঐখানে লড়াইটা জমজমাট।.........তাহলে আর পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? তার চেয়ে বরং ঘুরে গিয়ে রোরি আর কেইটের সংগে যোগ দিলে হয়। —মাইক এক পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে পেছনের জানালাটা ভেঙেচুরে সবেগে একটা মাথা বেরিয়ে এল। তার মুখোশটা লাল।

সর্দার, ডাকাতদের সর্দার নিঃসন্দেহে। মরিয়া হয়ে সে পালাচ্ছে: জেলের সম্মুখের দিকে মার্শাল শর্টের দলের বুলেটের ঝাঁক এড়িয়ে সে ঐ ভয়াবহ পিছনের জানালাটিকে বেছে নিয়েছে।

একটুও দেরি করল না মাইক। ক্ষিপ্রহস্তে পকেট থেকে দড়ি বার করে তাতে ফাঁস বানাল। জানালা গলিয়ে সর্দারের মাথাটা বেরোতেই মাইক দড়িটা ছুঁড়ে দিল; পলকের মধ্যে সর্দারের গলায় ফাঁসটা আটকে গেল, হ্যাঁচকা টানে তাকে টেনে নিয়ে এল মাইক। জানালা থেকে বেরিয়ে এসে ধপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ল সর্দার। কঠিন নুড়ি পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে মাইক তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। সর্দার কি করবে সহসা বুঝতে পারল না। গলার মধ্যে ফাঁসটা আটকে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোমরে পিস্তল, কিন্তু হাত দুটো গলার ফাঁস খুলবার জন্য সক্রিয়।...... অবশেষে সর্দারকে নিজের পায়ের কাছে এনে ফেলল মাইক। দড়ির টান ঈষৎ শিথিল হতেই সর্দারের হাত চলে গেল কোমরে। অমনি কব্জির ওপর মাইকের ভারি বুটের প্রচণ্ড আঘাত। কব্জিটা ভেঙে গেল বোধহয়। ঈষৎ আর্তস্বর শোনা গেল। পরমুহূর্তেই দড়ির শক্ত বাঁধন পড়ল সর্দারের আষ্টেপৃষ্ঠে।

সর্দারের পিস্তলটা খুলে নিল মাইক। তারপরে নিচু হয়ে একটানে লাল কাপড়ের মুখোশটা। আরে, এ যে প্রিস্টলি! প্রিস্টলিই তাহলে মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারদের সর্দার। মার্শাল শর্টের অনুমান তো তবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

বিস্মিত ও বিমূঢ় মাইক উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার বিস্ময়ের অসতর্ক মুহূর্তে আরেক প্রচণ্ড বিস্ময় তার সম্মুখে পিস্তল উঁচিয়ে দণ্ডায়মান। মুখোশপরা সাক্ষাৎ যম, ডাকাতদেরই আরেকজন। কি করে এল, কখন এল? মাইক যখন সর্দারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কি জানালা গলিয়ে এই লোকটাও লাফিয়ে পড়েছে? —হ্যাঁ, তাই, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। চকিতে ব্যাপারটি আঁচ করল মাইক। কিন্তু উদ্যত পিস্তলের সম্মুখে সে নিরুপায়।

'ঘোড়াগুলো কোথায়?' —ভয়ংকর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

তার কণ্ঠস্বরে মাইক পরিষ্কার বুঝল, লোকটা আর কেউ নয়, পিচফোর্কের মার্শাল জিম লিটন স্বয়ং।

'ওদিকে হয়তো।' হতাশার হাত ঝুলিয়ে দিল মাইক: 'এই বাড়িগুলোর ওপাশে কোথাও।'

'কোথায়?' লিটনের পিস্তলের নলটি এসে মাইকের বুকে ঠোক্কর মারল: 'চল্‌, নিয়ে চল্‌ আমাকে।'

মাইক পিছনে ফিরল। তার পিছনে

পিস্তল উঁচিয়ে লিটন। অকস্মাৎ মিনতি-কাতর গলায় প্রিস্টলি বলে উঠল: 'লিটন, খুলে দাও আমাকে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

মুহূর্তের জন্য তাকাল লিটন। কিন্তু মাইককে বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না। মাইকের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে লিটন স্থিরকণ্ঠে বলল: 'না প্রিস্টলি, আমার সময় হবে না। এই ঝকমারিটা তুমিই বাঁধিয়েছ, সুতরাং সবকিছু সামলাবার দায় তোমার।...... আমি চললুম আমার পিচফোর্কে। সেখানে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে, এমন ক্ষমতা কারো নেই।......হ্যাঁ, মার্শাল শর্টকে বোলো, মাইককে নিয়ে যাচ্ছি পিচফোর্কে। আমার পেছনে তাড়া করলে প্রথমেই মাইককে গুলী করে খতম করবো, তারপর দেখা যাবে।'.........

'আমাকেও সংগে নাও, লিটন। —প্লীজ!' বারের কাতর অনুনয়।

'অসম্ভব।' —লিটন সংকল্পে অটল। —'তোমাকে ফাঁসিতে লটকাবার আগে শর্টকে বলতে ভুলো না যেন। মাইককে জীবন্ত ফিরে পেতে হলে আমার পেছু নেওয়া চলবে না।.........ইউ রাস্কেল, গো অন।'

পিঠের দিকে পিস্তলের ঠোক্কর খেল মাইক। সম্মুখে দৃষ্টি রেখে চলতে লাগল। নিরুপায়।.........সারি সারি বাড়ির মাঝখানের সরু পথ ধরে চলতে গিয়ে হঠাৎ [illegible] শুনল: 'এই উল্লুক-কা বাচ্চা, উধার কাঁহে। আমাকে কি পেয়েছিস, আমি কি তোদের মতো ঘাস খাই?'

না, পালাবার পথ নেই। একটু চেষ্টা করলেই খতম। নিষ্ঠুর লিটনের পিস্তল যে-কোনো মুহূর্তে—না, তার চেয়ে......... ঘোড়াগুলো কোথায়?.........হ্যাঁ, ওদিকেই হবে হয়তো।.........কিন্তু পিচফোর্কে ফিরে গিয়ে লিটন তো তাকে মুক্তি দেবে না।...... আর যাই হোক, সমস্ত শাসানি উপেক্ষা করে মার্শাল শর্ট নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে।.........ও কি, হঠাৎ মাইক টের পেল পিছন থেকে লিটন আচমকা তার কোমরের পিস্তলটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল কোথায়। মাইক এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। নিরুপায়।.........

একটু পরেই ঘোড়ার সন্ধান মিললো। দুটো ঘোড়া। একটাতে লিটন উঠল, পিস্তলের ডগায় মাইককে ওঠাল অন্যটায়। তারপর পিচফোর্কের দিকে ছুটলো দুটো ঘোড়া। আগে মাইক, নিরস্ত্র। পিছনে পিস্তল উঁচিয়ে মার্শাল জিম লিটন।

বহুক্ষণ ধরে ঘোড়া ছুটল। ছুটতে ছুটতে অবশেষে পিচফোর্কের সীমানায়। হঠাৎ ঘোড়া দুটোকে দাঁড় করালো লিটন, মুখ থেকে নীল কাপড়ের মুখোশ খুলে ফেলল। তার আদেশে মাইককে নামতে হলো ঘোড়া থেকে। তারপর—আশ্চর্য কণ্ঠস্বর মাইক—শুনতে পেল অদ্ভুত এক আদেশ: 'যা শালা, ছেড়ে দিলুম তোকে। পালা।...... না, ঘোড়া পাবি নে, স্রেফ হাঁটন। —হ্যাঁ, তোদের ঐ হোৎকা মার্শালকে বলিস, হিম্মৎ থাকে তো মার্শাল লিটনের পিচফোর্কে পায়ের ধুলো দেয় যেন একবার।'.......

অট্টহাস্য করে ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেল বর্বর লিটন।

অস্ত্রহীন, অশ্বহীন, নিরুপায় মাইকের সম্মুখে আবার অবারিত হলো রুক্ষ শুষ্ক ধু-ধু প্রান্তর।.....টিলাটাউনের পথ অন্তহীন। অনতিক্রম্য।......না, হেঁটে হেঁটে এই সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তর পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। —তার চেয়ে পিচফোর্ক কাছে, পিচফোর্কেই যাওয়া যাক। যদি কোনো ঘোড়া-টোড়া হাতানো যায় তো ভালো, নয়তো অন্য উপায় দেখতে হবে। দাঁতে দাঁত ঘষে মাইক পিচফোর্কের দিকে পা বাড়ালো।

ক্লান্ত, শ্রান্ত, ধুলিধূসরিত মাইক সরাসরি যখন 'পাইন ভিলা'র ভিতরে এসে ঢুকলো, আচমকা তাকে দেখতে পেয়ে বারের এলোমেলো কোলাহল হঠাৎ ঝাঁ করে থেমে গেল। সকলের সমবেত দৃষ্টি এখন মাইকের ওপর।.........

বারের একপাশে গেলাশ হাতে দাঁড়িয়ে মার্শাল লিটন—নিরস্ত্র নিঃসহায় ক্লান্ত অবসন্ন মাইককে দেখে শব্দ করে হেসে উঠল। সেই বিদ্রূপের হাসিতে যোগ দিল সমস্ত খদ্দের। সিটি বাজানো, বিচিত্র ধ্বনি উঠল নানা দিক থেকে, টিটকিরির বন্যা বয়ে গেল। মাইক দাঁতে দাঁত ঘষলো। মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ, গলা শুকিয়ে কাঠ। বারের মালিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে দৃঢ়স্বরে এক গেলাশ হুইস্কি চাইল সে। মালিক তাকাল লিটনের দিকে, লিটন ঘাড় নাড়ল: না।

'না, কিছু পাবে না তুমি। তোমার মতো রাস্কেল পাইন ভিলার যোগ্য নয়। গেট আউট।'.........

সমবেত অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল ঘর।

মাইকের চোখ দপ করে জ্বলে উঠল। নিমেষের মধ্যে সে ছুটে গিয়ে মালিকের ঘাড় ধরে এমন ধাক্কা দিল যে সে-লোকটা টাল সামলাতে না পেরে ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল নিচে।

এ যেন আরেকটা মজা, যেন সার্কাস দেখছে খদ্দেররা। উচ্চকিত হাসির হল্লা থামতেই চায় না।

লোকটা গড়িয়ে পড়ে' যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। তার হাত কোমরে পৌঁছবার আগেই মাইক ছুটে গিয়ে লোকটার হাতে মারল এক প্রচণ্ড লাথি। তারপর পলকের মধ্যে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে লোকটাকে শূন্যে তুলে ধরে ছুঁড়ে মারল লিটনের গায়ে। এই আকস্মিকতার জন্য লিটন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ছিটকে পড়ল একদিকে। তার হাতের গেলাশ মেঝের পড়ে চুরমার। এক লাফে একটা থামের আড়ালে চলে গেল মাইক।

'হ্যান্ডস্ আপ, লিটন।' মাইকের হাতে উদ্যত পিস্তল।

বিস্ময়ে বিমূঢ় লিটন হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল। খদ্দেরদের মধ্যে এবারে ত্রাসের হুটোপুটি। মাইকের জ্বলন্ত হিংস্র চোখ একবার ঘুরে গেল: 'যে শালা এগোবে তাকেই খতম করবো আগে।......বাঁচতে চাও তো পালাও, বেরিয়ে যাও। দশ গুণবো আমি।.........ওয়ান, টু, থ্রি.........'

মাইকের নাম ভুবনবিখ্যাত। হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল সবাই। যে লোকটাকে আছড়ে ফেলেছে মাইক সে ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ অচেতন।

'লিটন, এসো আমার সংগে।......হ্যাঁ, পাইন ভিলার এই খিড়কি দিয়েই চলো। আপাতত এই পথটাই নিরাপদ।'

অনুগত ভৃত্যের মতো লিটন চলতে লাগল, পিছনে পিস্তল উঁচিয়ে মাইক। এক সময় লিটন থামল: 'কোথায় যেতে হবে?'

'আপাতত দোতলায়। মার্শাল শর্টের জন্য অপেক্ষা করা যাক।'

লিটনকে জোর করে নিয়ে গেল দোতলায়। আষ্টেপৃষ্ঠে শক্ত করে নিয়ে গেল দোত-, মুখে গুঁজলো এক গাদা কাপড়। আরেকটি দড়ির ফাঁস মালার মতো গলায় পরিয়ে দড়ির অন্য প্রান্ত দেয়ালের হুকের সংগে বাঁধা হলো। রজ্জুবদ্ধ লিটনের দেহটা তুলে নিয়ে এল গরাদহীন জানালার ওপর। —'বুঝতেই পারছ লিটন, আর মাত্র একটি ধাক্কা......তাহলেই ব্যস, তুমি জানালর বাইরে সটান ঝুলে পড়তে পারবে।......না, এক্ষুণি না, শর্ট আসুক, তখন দেখা যাবে।........ না, না, একটুও নড়বে না, তাহলে এক্ষুণি লটকে দেব।'.......

মাইক দেখল নিচে কিছু লোক জমেছে। তাদের চলাফেরা, কথাবার্তার রকম-সকম দেখে মনে হয় তারা কিছু মনস্থির করতে পারছে না। কেউ সন্ত্রস্ত, কেউ উত্তেজিত। অনেকে আবার এদিক-ওদিক কেটে পড়েছে।

মার্শাল শর্টের কোনো পাত্তা নেই। মেঘলা আকাশে লাল রঙ ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল।......... এখন কি করা যায়! মাইক জানালার বাইরে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখল: সর্বনাশ! ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো উড়িয়ে কারা আসছে এদিকে! এ যে অনেকগুলো ঘোড়সওয়ার! তবে কি প্রিস্টলি ছাড়া পেয়ে তার গ্যাং নিয়ে ফিরে এল?...

মাইকের চোয়াল শক্ত হলো। প্রশস্ত আলমারির কোণ থেকে রাইফেলটা টেনে নিল সে। টোটা ভরে তৈরী হলো।

পিচফোর্কে সন্ধ্যার ছায়া নামল। কাছে, আরো কাছে তীব্র বেগে ছুটে

আসছে দলটা। আরেকটু, আরেকটু আসতে দাও। তারপর—। আরে, এ যে শর্টি! ব্রেসফোর্ড...... অ্যাল...... বেন... বেইট....

শর্টি!' জানলা থেকে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মাইকঃ 'এই যে, আমি ওপরে।'

[illegible] শর্টি উপরে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ঘোড়সওয়ারদের দেখে পিচফোর্কের বাসিন্দারা কে কোথায় গা ঢাকা দিল। ওপর থেকে মাইক আবার চেঁচালঃ 'লিটনকে পাকড়েছি এখানে। জলদি চলে এসো।'

মার্শাল শর্টির আদেশে পাইন ভিলা ঘেরাও করা হলো। শত্রুপক্ষের সশস্ত্র আর কেউ রইল না। পাইন ভিলায় স্তূপীকৃত হলো রাইফেল, বন্দুক আর পিস্তল।

শর্টি দোতলায় উঠবার উদ্‌যোগ করছেন এমন সময় আবার মাইকের ডাক শোনা গেলঃ 'ওপরে এসে আর দরকার নেই। আমি যাচ্ছি নিচে।'

উপর দিকে তাকিয়ে মার্শাল শর্টি [illegible], [illegible] [illegible] নিচে গলায় দড়ির ফাঁস আটকে পিচফোর্কের মার্শাল জিম লিটনের দেহটা ঝুলছে।

মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারের দল নিশ্চিহ্ন। পিচফোর্ক থেকে টিলাটাউনের পথ এখন নিষ্কণ্টক। সন্ধ্যার অন্ধকারে অনেকগুলি ঘোড়া টগবগিয়ে চলেছে। তাদের চলার ছন্দে সমস্ত দিনের ক্লান্তি, না কি সফলতার উল্লাস?.........

মার্শাল শর্টির কাছে এগিয়ে এল মাইকঃ 'প্রিস্টলির কি হলো, শর্টি?'

'ডাকাতদের সর্দার? —খতম!'

'যাক বাঁচা গেল। উৎপাত বন্ধ, অশান্তির আশংকা নেই আর।'

'তা তো হলো, কিন্তু জুলিয়ার কি হবে?' —থেমে থেমে বললেন মার্শালঃ 'কে চালাবে তার সোলোল্যান্ড?......তাছাড়া, মাইক, স্টারল্যান্ড আর সোলোল্যান্ডের মাঝখানে ঐ জলাটা নিয়ে আবার তো একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠতে পারে।'

'না, পারে না।' লাগাম টেনে একটু পেছিয়ে এল অ্যালঃ 'আর কোনো গোলমাল হবে না মার্শাল।'

'হবে না? কি তার গ্যারান্টি?'

'আছে। জুলিয়া আর আমি ঠিক করেছি আমরা বিয়ে করবো।'

ঘোড়ার পেটে গোত্তা মেরে উদ্দাম গতিতে ছুটল অ্যাল। মার্শাল আর মাইক একসঙ্গে হেসে উঠল।

পাথর ছড়ানো রুক্ষ ও বন্ধুর প্রান্তর মাইলের পর মাইল পার হয়ে গেল অশ্বারোহীর দল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগন্ত-জোড়া আকাশের নিচে সমবেত ধ্বনি মিলিয়ে গেল দূরে—বহুদূরে।

আমাদের মন্দিরে ঘণ্টা বাজলো।

॥ সমাপ্ত ॥

বিশ্বের জননায়ক লেনিনের প্রতি নিবেদিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে রুশ দেশে অসংখ্য ডাক টিকিট প্রকাশিত হয়েছে। কেবলমাত্র উক্ত দেশেই নয়, তাঁর আদর্শে শ্রদ্ধাশীল অন্যান্য দেশেও লেনিনের বিভিন্ন ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আমরা তার কয়েকটি মাত্র নিদর্শন দিলাম

আরোগ্য বিভাগ

● শ্রীবীরেন্দ্রনাথ নন্দী, শাঁখারী বাজার, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া—

প্রশ্ন ১: আড়াই বৎসর যাবৎ আমার উভয় পাটির দাঁত হইতে রক্ত, পুঁজ পড়িতেছে।—

উত্তর: আপনি যে সমস্ত চিকিৎসা করিয়েছেন, তা ঠিকই, মনে হয় আপনি নিয়মিতভাবে করেন নি। আপনি অন্তত তিন মাস ধরে নিয়মিতভাবে যে চিকিৎসা করছেন, তাই করুন, দেখবেন সেরে গেছে।

প্রশ্ন ২: প্রায় ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ আমি এক মাথার চুলকানিতে ভুগছি। মাথায় অনেকগুলি ছোট-বড় পোড়া পোড়া রঙের ফুস্কুড়ি হয়।—

উত্তর: আপনি গাবের সোয়াব্ নিয়ে অটোভ্যাকসিন্ তৈরী করে ইনজেকশন নিন, তাছাড়া Multi-vitamin বড়ি অথবা সিরাপ নিয়মিতভাবে মাসতিনেক খেয়ে যান।

● শ্রীএ কে গাঙ্গুলী, জামসেদপুর-৪—

আপনার চিঠির উত্তরে জানাই, ব্যক্তিগত চিঠি দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি Nevrovitamin 4 (adult) সকালে ১টি রাতে শোবার সময় ২টি করে বড়ি একমাস খাবেন। এর মধ্যে নিজের মনকে শক্ত করে তোলবার চেষ্টা করবেন। এ ছাড়া কোন উপায় নেই।

শ্রীসমীরকুমার মুখার্জি, মহারাজা নন্দকুমার রোড, কলি-৩৬।

যে বিষয়ে লিখেছেন, তা নিয়ে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায় না। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। দুবেলা ব্যায়াম করবেন; রাতে সকাল সকাল শুয়ে পড়বেন। দেখবেন, সব উপসর্গ চলে যাবে।

● কুমারী স্বপ্না বসু, টাটানগর—

আপনি রোজ রাতে শোবার সময় ত্রিফলার জল খাবেন। দেখবেন আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

● শ্রীপরেশনাথ চট্টরাজ, গ্রাহক নং ৫৪১১৬—

আপনি মাথায় প্রত্যহ স্নানের পর হিজল হেয়ার অয়েল মাখবেন। দেখবেন উপকার পাচ্ছেন।

● শ্রীরমেশচন্দ্র বিশ্বাস, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি—

কৃমির চিকিৎসা—ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না করে খাবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আপনি

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর মত নিয়ে কৃমির চিকিৎসা করান। বাকী উপসর্গগুলো কৃমি সারলেই সেরে যাবে।

● শ্রীপ্রশান্ত বসু, তেঁতুলতলা, বর্ধমান—

আপনার দুশ্চিন্তার জন্য উপসর্গগুলো হচ্ছে। কোন ভয় করবেন না। আপনা থেকেই সেরে যাবে।

● শ্রীমনোজকুমার সরকার, রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, কলি-২৬।

Scabalcid জাতীয় লোশান যে স্থানে চুলকানি হয়েছে লাগাবেন। এ ছাড়া জায়গাটি Cidal Soap দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।

● পিউ, ধানবাদ —

আপনার চিকিৎসক যে ওষুধ দিয়েছেন, তা অত্যন্ত নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন খান। স্বাস্থ্য তৈরী হতে বেশ সময় লাগে। —

● কুমারী পুষ্প ও কুমারী শুভ্রা মুখার্জি, চন্দননগর, হুগলী—

ব্রণ সারাতে হলে সর্বাগ্রে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে হয়। মুখে কোন প্রসাধনী মাখতে নেই এবং চর্বিজাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া পরিহার করতে হয়।

● শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া —

চুল পড়ে যাচ্ছে। লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেকশন ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন নিয়ে দেখতে পারেন।

● শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি, তমলুক, মেদিনীপুর—

হাঁপানির কোন ভাল অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ আমার জানা নেই। আমার বিশ্বাস, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় এর ফল বেশী পাওয়া যায়। —

● শ্রীশান্তিকুমার সিংহ, রামপুরহাট, বীরভূম —

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি এতগুলি জটিল উপসর্গের কথা লিখেছেন, যার উত্তর এই স্বল্প জায়গার মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে একটা কথা মনে রাখবেন, চিকিৎসককে যদি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস না করেন; আপনার রোগ সারবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তিনি যখন বলছেন আপনার দৈহিক কোন রোগ নেই, তখন মনে স্ফূর্তি এনে স্বাভাবিক কাজকর্ম করছেন না কেন?

● শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-১২

মনে হচ্ছে, আপনার যকৃতের দুর্বলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। তাই রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে ও মুখে দুর্গন্ধ হচ্ছে। আপনি যকৃতের পুষ্টি বৃদ্ধি

করে এমন কোন ওষুধ ব্যবহার করুন এবং প্রত্যহ ত্রিফলার জল খান।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যা বলেছেন, তা আবার আগের মত তৈরী করা সম্ভব নয়। জীবনে অতীতকে কখনও আর ফিরে পাওয়া যায় না। বর্তমানকে স্বীকার করতেই হবে। ওসব ভুলে যান।

আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজা মাড়ির পক্ষে বেশি উপকারী। তবে আঙ্গুল দিয়ে মাজলে পেষ্ট-এর চেয়ে পাউডার-এ বেশি উপকার হয়।

বাকী উপসর্গ আপনা থেকেই কমে যাবে যকৃতের পুষ্টি বাড়লে। —

● শ্রীশ্যামলকুমার সেন, উপর নড়িয়া, পুরুলিয়া —

আপনার উপসর্গ কোন ওষুধে কমবে না ; ধৈর্য ধরে থাকলে আপনা থেকেই কমে যাবে, অধৈর্য হলে অপারেশন করিয়ে নিন।

●শ্রীনির্মাল্যবিকাশ চন্দ, চন্দননগর, হুগলী—

যে ওষুধে উপকার পেতে আরম্ভ করেছেন, সে ওষুধ বন্ধ করবেন না। আরও মাসপাঁচেক খেয়ে যান। এ সব রোগে অনেকদিন ধরে ওষুধ খেতে হয়।—

●শ্রীমঙ্গল সেন, একডালিয়া রোড, কলিকাতা—

আপনি পুরনো আমাশয়ে ভুগছেন। Amicline জাতীয় বড়ি খেলে কমে যাবে। যে কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, Amicline বড়ি দিনে তিনটি করে দশ দিন খাবেন।

●শ্রীএ, এন, দত্ত, কলি-৬

আপনি যেখান থেকে পড়েছেন, তা ভুল। যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা পুরুষ মাত্রেরই কম বেশি হয়। কিছু করতে হবে না, শুধু জায়গাটি রোজ সাবান দিয়ে (কার্বলিক, লাইফবয় প্রভৃতি বীজাণুনাশক সাবান নয়) ধুয়ে ফেলবেন। প্রয়োজন হলে রোজ নিবাসালফ মলম লাগাবেন। কোন ভয় নেই, দেখবেন আপনা থেকেই সেরে গেছে।

স্বাস্থ্য ভাল হবার জন্যে যে কোন টনিক এবং পেটভরে ভাত খেয়ে ঘুমোবেন।

●শ্রীঅবিনাশ বর্ধন, সুভাষগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর—

আপনি Hygina Granule দিয়ে দুবেলা Gargle করবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে দূর করবেন।

●শ্রীদীপ্ত মিত্র, চম্পাহাটি, ২৪পরগণা---

আপনি উপসর্গ নিয়ে যত চিন্তা করবেন, ভয় পাবেন, তত আপনার উপসর্গ বাড়বে। কোন ভয় নেই, আপনা থেকেই সব কমে যাবে। —

●শ্রীসুদীপকুমার মিত্র (ছদ্মনাম), বাগনান, হাওড়া —

আপনার চোখের কোণে কালি পড়ছে এবং কোল বসে যাচ্ছে বলে চিন্তিত হয়েছেন। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নানারকমের দুশ্চিন্তা থাকার জন্য এইরকমের উপসর্গের উপদ্রব ঘটে। আপনি দুবেলা ব্যায়াম করুন, পেটভরে খান এবং গভীর নিদ্রা যান, তাহলেই দেখবেন, উপসর্গগুলি কমে যাচ্ছে।

পুরনো ব্রণর কালো কালো দাগ, সহজে যেতে চায় না। আপনি মুখে অলিভ অয়েল মাখবেন, এছাড়া কিছু মাখবেন না।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না: দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

আরোগ্য বিভাগ

নাম— -

ঠিকানা— -

- -

মাসিক বসুমতী

●শ্রীঅঞ্জনা সেনগুপ্তা, বাগবাজার স্ট্রীট, কলি-৩---

বুকের মাঝখানে যে দু-একটি চুল হয়েছে, তার জন্য চিন্তা নেই। এ বয়েসের চুল সকলেরই হয়। এ ধরনের চুল উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে নেই। আপনি ও নিয়ে একটুও চিন্তা করবেন না।

চুল উঠে যাচ্ছে, তার জন্য সপ্তাহে একবার করে Loxene Sampoo অথবা Cidal Sampoo দিয়ে মাথা ঘষে ফেলবেন, রোজ মাথায় ভাল করে তেল মাখবেন, আর ভিটামিন বি কমপ্লেক্স্ নিয়মিতভাবে খেয়ে যাবেন।

●শ্রীদিলীপ সরকার, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলি-২৮---

আপনি এক কাজ করুন তো? ব্যায়াম করা মাস দুয়েক ছেড়ে দিন। সকাল-বিকেল একটু বেড়ান। দুপুরবেলায় ঘণ্টা কয়েক ঘুমোন। আমার মনে হয়, অতিরিক্ত ব্যায়ামের জন্য অনুরূপ উপসর্গগুলি ঘটছে। উপসর্গগুলি কমে গেলে আবার ব্যায়াম করবেন, তবে অল্প পরিমাণে।

●শ্রীবি, কে, চ্যাটার্জি, বারাসত --

খুব ঠোঁট ফাটছে? ঠোঁটে নিয়মিতভাবে গ্লিসারিণ লাগান, আর ভিটামিন এ ডি মিশ্রিত কোন ওষুধ ব্যবহার করুন। অন্ততপক্ষে ছমাস ব্যবহার করতে হবে।

ব্রণ সারাবার ওষুধ নিয়ে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। ---

●এম, ভট্টাচার্য, ডিগবয় ---

মাসিক নিয়মিত করে তোলার জন্য ওষুধের চেয়ে ব্যায়ামের পক্ষপাতি আমি, বিশেষ করে অবিবাহিতা মহিলাদের জন্য। মাসিক সাধারণত ২৫ দিন থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে হয়; এইদিনের মধ্যে যদি হয়, তাহলে কোন কিছুর দরকার হয় না। যদি আরও গোলমাল হয়, তাহলে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম ও হিপ্ বাথ্ নিলেই উপসর্গগুলি কমে যাবে। ব্যায়াম যে ভাবে বলছি, সেই ভাবে করলে বেশি উপকার হয়।

চিৎ হয়ে মাটিতে বা শক্ত বিছানার ওপর শুয়ে হাত দুটি মাথার ওপর তুলে দেবেন। তারপর হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁবার চেষ্টা করবেন; হাত কানের সামনে আসবে না, হাঁটু ভাঁজ হবে না। প্রথম প্রথম এ ধরণের ব্যায়াম করা যায় না, পরে অভ্যাস হয়ে গেলে খুব সহজেই করা যায়। প্রতিদিন ১৫ থেকে ৩০ মিনিট করলেই যথেষ্ট।

হিপ্ বাথ হল। বড় টবে (যার মধ্যে অনায়াসে বসা যায়) ঈষদুষ্ণ গরম জল নিয়ে কোমর অবধি ডুবিয়ে বসে থাকা। এই ভাবে মিনিট দশেক বসে থাকলে দেখা যাবে, ধীরে ধীরে উপসর্গগুলি কমে যাচ্ছে।

এছাড়া নিয়মিতভাবে ভাতের সঙ্গে বেশি করে শাক খেলে মাসিকের অনিয়মিতভাব কমে যায় এবং স্বাস্থ্য উজ্জ্বল হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নে যা বলেছেন, তা শারীরিক দুর্বলতার জন্য ঘটেছে। কোন রোগ নয়। ---স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেই উপসর্গ কমে যাবে।

●শ্রীউদয় গুহ, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া--

নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করলেই অনুরূপ উপসর্গ (মেদ) কমে যাবে।

●শ্রীমতী দেবযানী গুপ্তা, ভবানীপুর--

আপনার একটি প্রশ্নের উত্তর এই সংখ্যাতেই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ক্রিমির চিকিৎসা ডাক্তার না দেখিয়ে কখনো করবেন না।

শ্রীমতী পু. স্ব. নিউদিল্লী-২৩---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। ফ্রাইব্রয়েড্ অপারেশনের পর সন্তান হয়েছে এ রকম বহু মহিলা আছেন; তবে যদি আবার ফ্রাইব্রয়েড্ সুরু হয়ে থাকে, তাহলে সমস্যার কথা। আপনার সন্তান ধারণের বয়স এখনও আছে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কোন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছে যান। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখবেন আপনার জরায়ুতে আবার টিউমার হচ্ছে কি-না? যদি না হয়ে থাকে, আপনার স্বামীর বীর্য পরীক্ষা করিয়ে দেখে নেবেন সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা আছে কি-না? যদি থাকে, আপনাকে কিউরেট্ ও ইনসাফ্লেশন্ টেস্ট করে দেবেন। কিউরেট এবং ইন্সাফ্লেশন্ টেষ্টে যদি কোন গোলমাল না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের সন্তান হবে।

●জনৈকা পাঠিকা--

আপনাকে হাসপাতাল থেকে যে চিকিৎসাপত্র দিয়েছেন তা যথেষ্ট ভাল; নিয়মিত ব্যবহার করে দেখুন, উপকার পাবেন।

●শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তী, দক্ষিণ-পাড়া, দমদম --

আপনি দু'বেলা পেটভরে ভাত খান। দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোন। বিকেলে ব্যায়াম করুন, দেখবেন স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।

● শ্রীনিখিলসুন্দর চক্রবর্তী, বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর ---

গ্রাহক হবার জন্য সম্পাদককে আলাদাভাবে চিঠি লিখুন।

আপনার চুলের জন্য Cidal sampoo করুন সপ্তাহে একবার করে, তাছাড়া নিয়মিতভাবে ভাল মাথার তেল মাখুন, আর ভিটামিন বি, কমপ্লেক্স খান।

●শ্রীজগন্নাথ, কলিকাতা---

আপনি নিয়মিতভাবে হিজল হেয়ার অয়েল মেখে যান, দেখবেন, উপকার পাবেন। বংশগত কারণেও হতে পারে।

●শ্রীহারাধন ব্যানার্জি, কসবা, কুমারপাড়া লেন, কলি-৪২---

যে উপসর্গের কথা লিখেছেন তা যে কোন লোকের, যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। ও নিয়ে ভাববেন না। সপ্তাহে একবারের বেশি ব্যবহার করবেন না। তাহলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

●শ্রীবলাইচন্দ্র বাঙ্গর, ঠিকানা নেই-

ডাক্তার দেখান। শুধু চিঠিতে উপদেশ দিলে উপসর্গ কমবে না।

●শ্রীবুদ্ধদেব সেনগুপ্ত, বালীগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলি-১৯---

পুরুষ মানুষের গায়ে বেশি লোম হয়ই। এটা কোন রোগ নয় বরং স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

মিস্, এম এস, ভদ্রকালী, হুগলী—

দাদ বা ছুলি সারাতে হলে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। রোজ সাবানকাচা জামা-কাপড়, অন্তর্বাস পরতে হয়। রোজ কার্বলিক সাবান মেখে চান করতে হয়। পরিষ্কার শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছতে হয়। গা শুকিয়ে গেলে Scabalcid Emulsion তেলের মত গায়ে মাখতে হয়, তারপর কিছুক্ষণ হাওয়া লাগাতে হয়। —এ ছাড়া Multivitamin খেতে হয়।

শ্রীবিনয়েন্দু হালদার, বিক্রমগড় কলোনী, মেদিনীপুর --

আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অযথা বাজে চিন্তা করে, শরীর ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন। কে বলেছে ছোট? তারা কতটুকু জানে? ওই ধরণের চিন্তা করে আপনার স্বাভাবিক জীবনের গতি ব্যাহত হচ্ছে। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি বলছি, আপনি জীবনে উন্নতি করবেন। নিয়মিতভাবে নিষ্ঠা সহকারে পড়াশুনা করে যান।

কুমারী সবিতা আচার্য, আলিপুর-দুয়ার---

আপনি অকারণে ভয় পেয়েছেন। Sharkoferrol জাতীয় ঔষধ দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের ২ চামচ করে খাবেন অন্তত তিন মাস; দেখবেন, আপনার উপসর্গ কমে গেছে। আপনার দাদাকে Multivitamin বড়ি খেতে বলবেন সকালে একটি, সন্ধ্যায় একটি, অন্তত পক্ষে দু'মাস।

● শ্রীনীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাথা-ভাঙা, চন্দননগর —

হাঁপানির ভাল ওষুধ আমার জানা নেই। হাল্কা ধরণের খাওয়া-দাওয়া, যা সহজেই হজম হয় এবং অল্প কিছুক্ষণ খোলা হাওয়ায় বেড়ালেই রোগের অনেক উপশম হয়।

● শ্রীশ্যামল দাস, কুচবিহার —

দেখুন, জীবনে সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আপনি যা মনে করবেন, বলিষ্ঠভাবে তা ব্যক্ত করবেন। হয়ত ভুল হতে পারে, বন্ধুরা তা সংশোধন করে দেবেন। আপনি যদি স্বচ্ছভাবে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করার অভ্যাস না করেন, তাহলে ওই বাধো বাধো অনুভূতি কখনো যাবে না।

● শ্রীমলয়কুমার কুণ্ডু, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯---

ঘুম একটি অভ্যাস। আপনি যেমন অভ্যাস করবেন, তেমনি ঘুম পাবে। সকাল-সন্ধ্যা ব্যায়াম অথবা পরিশ্রম করুন। রাত এগারোটায় শোবেন, সকাল ছটায় উঠবেন। কিছুদিন অভ্যাস করলেই দেখবেন, উপসর্গগুলি কমে গেছে।

● শ্রীঅমিতকুমার বসু, নস্করপাড়া লেন, হাওড়া ১--

বেশী ঝাল খাবেন না। কোন খাবার খুব গরম খাবেন না। বেশী করে দুধ খাবেন। দুবেলা খাবার পর এক গ্লাস করে দুধ খাবেন। কোন ওষুধের প্রয়োজন হবে না।

● শ্রীনরেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, জালান খাঁ রোড, কাঁথি ----

যে সব উপসর্গের কথা লিখেছেন, সেগুলো কোন রোগ নয়। পুরুষ মানুষ মাত্রই ও ধরণের উপসর্গ হয়। এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেই উপসর্গ চলে যাবে।

● শ্রীসত্যনারায়ণ দত্ত, ডামরা, বীরভূম---

কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য অগ্নিমান্দ্য উপসর্গ দেখা দেয়। আপনি প্রতিদিন বেশি করে শাক সিদ্ধ খাবেন ভাতের সঙ্গে। কিছুদিন খেলেই দেখবেন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে গেছে এবং ক্ষিধেও বেড়েছে।

● শ্রীস্বপন সেন, কুচবিহার —

পাইওরিয়া সারাতে হলে ডাক্তারের চেয়ে নিজের চেষ্টা বেশি করে করতে হয়। প্রত্যহ দিনে তিনবার করে দাঁত মাজবেন। ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। আঙুল দিয়ে ভাল পাউডার মাজন নিয়ে মাজবেন। নিয়মিতভাবে ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ব্যবহার করলে পাইওরিয়া সেরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। যদি পুঁজ থাকে, তাহলে চিকিৎসকের মত নিয়ে চিকিৎসা করবেন। অনেক চিকিৎসক মাজনের সঙ্গে সালফাডায়াজিন বড়ির পাউডার মিশিয়ে ব্যবহার করতে বলে সুফল পেয়েছেন।

● শ্রীমতী ভারতী গুহরায়, জলপাইগুড়ি---

আপনি ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিতে বলেছেন, তা সত্ত্বেও, বসুমতীতে উত্তর দিলাম, কারণ আপনার প্রশ্নের উত্তরে আরও অনেকের উপকার হতে পারে। অনেকে হয়ত লজ্জার বশবর্তী হ'য়ে প্রশ্ন করতে পারেন না; কিন্তু উত্তরে লাভবান-লাভবতী হতে পারেন।

মুখের চামড়া খসখসে হয়ে যাচ্ছে এবং ঠোঁটের রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে? এক কাজ করুন, রোজ সকাল-সন্ধ্যে দুধের সর আর কমলা লেবুর খোসা ভালভাবে ঘষে ঘষে লাগাবেন। আধ-ঘণ্টা পরে ধুয়ে ফেলবেন। কোন সাবান দেবেন না। দেখবেন, কিছু-দিনের মধ্যেই উপকার পাবেন।

● শ্রীকমলকান্ত আচার্য, লাটাগড়, পার্শ্বপুর, ২৪ পরগণা—

ব্রণ নিয়ে এই সংখ্যাতেই অনেক-বার আলোচনা হয়েছে।

● জনৈকা ছাত্রী, ইছাপুর—

আপনার স্বাস্থ্য ভাল হলেই আপনা থেকে অন্যান্য উপসর্গ চলে যাবে। আপনি নিয়মিতভাবে Liferon জাতীয় ওষুধ দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু চামচ করে দু' মাস খাবেন।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক—

আপনি প্রশ্ন লিখে নাম-ঠিকানা জানাতে চান না যে সংকোচে, ঠিক সেই সংকোচে আমিও প্রশ্নটা সাধারণ, ভদ্র পাঠিকা-পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারছি না। প্রশ্ন পড়ে মনে হচ্ছে, আপনি মহিলা। বিবাহোত্তর জীবনে কীভাবে সুখ পাবেন, কীভাবে 'চুম্বন' করলে সবচেয়ে আনন্দ পাবেন।

এ ধরণের শিক্ষা আগে থেকে নাই বা দিলেন। পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি যবে থেকে হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় নি কীভাবে সবচেয়ে আনন্দ পাওয়া যায় বিবাহোত্তর জীবনে,ভবিষ্যতেও দরকার হবে না। একটা কথা, বিবাহিত জীবনে যত শ্লীল হবেন, নম্র হবেন, ধীর হবেন, তত প্রকৃত আনন্দ পাবেন।

● শ্রীমতী মানসী পাল, হালিসহর, ২৪ পরগণা—

আপনি দু' পায়ে সকাল-সন্ধ্যা ভাল করে Nebasulf Ointment ঘষে ঘষে লাগাবেন; দেখবেন, ওগুলো চলে গেছে।

● শ্রীস্বপন ভট্টাচার্য, বরাহনগর—

আপনি চুলকানিতে Scabalcid Emulsion অথবা Ascabiol জাতীয় ওষুধ লাগাবেন, দেখবেন, কিছুদিনের মধ্যেই চুলকানি সেরে যাবে।

● স্কোয়ার (ছদ্মনাম), ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক—

আপনি যে সম্বন্ধে লিখেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু করবেন না। যেমন আছেন, তেমনি থাকুন। আগে পরীক্ষা ভালয় ভালয় হয়ে যাক, তারপর প্রশ্ন করবেন, কি করতে হবে বলে দেব।

কুমারী দিতি রায়, এণ্টালী, কলি-১৪—

১ নং প্রশ্নের উত্তর—যে ওষুধটির নাম লিখেছেন, তা কক্ষণো খাবেন না; হিতে বিপরীত হতে পারে।

আপনি যেসব জিনিস লাগাবার কথা লিখেছেন, তা একেবারে অবৈজ্ঞানিক উপদেশ। কেন সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবেন। শরীর ভাল হলেই আপনার উপসর্গ নিরাময় হবে। আপনি দুবেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে Sharkoferrol এবং সকাল-সন্ধ্যা চা-চামচের ২ চামচ করে Paladec ওষুধ নয়। তিন মাস পরে জানাবেন কেমন আছেন। যে সমস্যার কথা লিখেছেন, তাতে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়।

●শ্রীমতী উমা আচ্য, আর কে ঘোষাল রোড, কলি-৪২—

আপনি যখন এত রকমের চিকিৎসা করেও ফল পান নি, তখন Placentrex (Albert David) 2ml এবং ভিটামিন বি ১২, ৫০০ মাইক্রোগ্রাম ইণ্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন নিয়ে দেখতে পারেন।

●শ্রীমতী রোহিণী গুপ্তা, কুন্ডীর—

আপনার 'আরোগ্য বিভাগ' ভাল লেগেছে শুনে আমরা আনন্দিত। কুমারী দিতি রায়কে যা করতে বলেছি, আপনিও তাই করবেন, দেখবেন আপনার উপসর্গও কমে গেছে।

●শ্রীআর কে মুখার্জি, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলি-১—

আপনার কন্যার বিষয় যা লিখেছেন, পড়লাম। যদি টনসিলে পুঁজ জমা হয়ে থাকে, তাহলে অপারেশন করিয়ে ফেলাই শ্রেয়ঃ, নইলে টনসিলের পুঁজের মধ্যে যে জীবাণু থাকে, তা রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে শরীরের নানা জায়গায় অর্থাৎ গাঁটে, হৃদপিণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। যদি পুঁজ না হয়ে থাকে, তাহলে স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টনসিলের দোষও চলে যাবে। রোজ দুবেলা গরম জলে নুন ফেলে Gargle করাবেন আর পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দেবেন, বিশেষ করে দুধ।

●কুমারী কণিকা দাস, কাণপুর—

জরায়ুতে যা আছে কি না সে বিষয়ে সঠিক উপদেশ দেবেন চিকিৎসক; অতএব আপনি কোন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞকে দেখান, তিনি পরীক্ষা করে যথাযথ মতামত দেবেন।

আপনার শরীরে ঘাম জমে অনুরূপ চুলকানির সৃষ্টি হয়েছে। আপনি সাবান দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে ফেলবেন, তারপর শুকনো তোয়ালে মুছে। তারপর Anthisan মলম লাগাবেন। দিনে দুবার করে এক মাস লাগাবেন।

আপনার লম্বা হবার আর কোন আশা নেই।

●শ্রীমতী ছবি দত্ত, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা—

আপনি Siobutazone বড়ি দিনে দুবার করে ২টি করে দশদিন খাবেন। তারপর Siosylamide বড়ি দিনে দুবার ২টি করে বড়ি তিন মাস ধরে খাবেন। দেখবেন, আপনার উপসর্গগুলো কমে গেছে।

●কণিকা (ছদ্মনাম), প্রকৃত নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক—

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আমার কথা বিশ্বাস করবেন? আমি যা বলব, তা পরম বিশ্বাসে করতে পারবেন?

ছোটবেলা থেকে রোগে ভুগে ভুগে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন খুবই দুঃখের কথা; কিন্তু একটা কথা কেউ আপনাকে বোঝায় নি, ছোটবেলা থেকে যদি প্রকৃতই কোন রোগ এতদিন ধরে থাকত, তাহলে আপনার বেঁচে থাকাই সমস্যার কথা হয়ে পড়ত।

আমি যা বলি, তাই করুন কেন বলছি, তাতে কি ফল হবে বিচার বা বিশ্লেষণ করতে পারবেন না। পরম বিশ্বাসে আমার কথা পালন করতে হবে।

আপনি রোজ ভোরবেলায় উঠে ভালভাবে মুখ হাত পা ধুয়ে পড়তে বসবেন। সকালে দু ঘণ্টা পড়বেন। সকাল বেলায় লেখার কাজ করবেন। দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে পেটভরে খাবেন। খাওয়ার পর অন্ততঃ পক্ষে দু'ঘণ্টা শোবেন। ঘুম না আসলে বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে থাকবেন। এ সময়ে কোন পড়াশুনা করতে পারবেন না। তিনটের সময় হালকা ধরণের জলখাবার খাবেন। বিকেলবেলা একটু বেড়াতে বেরোবেন। ঘণ্টা দু'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে ভাল ক

বসবেন। ছ'টা থেকে ন'টা পড়বেন। রোজ রাতে পড়ার কাজ করবেন। ন'টার সময় উঠে বইপত্তর ভালভাবে গুছিয়ে রেখে দশটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়বেন। শোবার সময় ঈষদুষ্ণ গরম দুধ এক গ্লাস খেয়ে শোবেন।

রোজ রাতে পড়বেন। পড়ায় মন না বসলে জোরে জোরে পড়বেন। রাতে যা পড়বেন, পরদিন সকালে সেই পড়া বই না দেখে খাতায় লিখবেন। তারপর অন্য কাজ করবেন। তারপরের দিন বই খুলে মিলিয়ে দেখবেন ঠিক লিখেছেন কি-না? যদি কোন ভুল থাকে, কেটে অন্য রঙের কালি দিয়ে প্রকৃত কথাটি বসাবেন।

আপনি যদি পড়াশুনা না করেন, তাহলেও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ নিয়ে একইভাবে বিদ্যাভ্যাস করবেন। কিছুদিন অভ্যাস করলেই দেখবেন, আপনার রোগের যন্ত্রণা অনেকাংশে কমতে সুরু করেছে।

এ ছাড়া প্রতিদিন দুবেলা ভাত খাবার পর-চা-চামচের ২ চামচ করে Aminozyme খাবেন, দু মাস ধরে।

●শ্রীমতী মিতা রায়, হাজারীবাগ—

আপনার সমস্যার সমাধান আগের প্রশ্নেই আলোচিত হয়েছে। ভয় করবেন কেন? পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার। ভুল হোক, ঠিক হোক, আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা কণিকার (ছদ্মনাম) উত্তরে যা বলা হয়েছে, সেইমত করবেন।

●তপন, বি এম রোড, কলি-১০—

যদি সত্যিই হার্ণিয়া হয়ে থাকে, তাহলে অপারেশন করিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা।

●শ্রীমতী রাণী ভৌমিক, ফুলবাগান রোড, কলিকাতা-৫৪—

খুস্কীর জন্য সপ্তাহে একদিন করে শ্যাম্পু করবেন। Multivitamin বড়ি খাবেন। ক্ষিধে বাড়ার জন্য দুবেলা ভাত খাবার আধ ঘণ্টা আগে চা চামচের এক চামচ করে Elixir Neogadine এক মাস খাবেন।

●প্রবণ (ছদ্মনাম), উল্টাডাঙ্গা—

আপনি Nevrovitamin-4 (adult) সকালে ১টি, রাতে শোবার সময় ২টি করে একমাস খাবেন; দেখবেন আপনার উপসর্গ কমে গেছে।

[এবার আরোগ্য বিভাগের পাঠক-পাঠিকারা অধিকাংশই প্রশ্ন ছাপতে নিষেধ করেছেন। সেইজন্য এবারে প্রশ্ন না দিয়ে কেবল উত্তর দেওয়া হল]

মেয়েরা কি বেশী ঘুম কাতুরে ?

রেবা দেবী

রাতে যখন কচি গলার ডাক শোনা যাবে অন্ধকারের বুক চিরে-তখন ভুলেও ঠেলা মেরে জাগাবেন না যেন নিদ্রিত স্বামী-দেবতাটিকে, বলবেন না, 'এবার তোমার ওঠার পালা, দ্যাখ বাচ্চা কি চায়'।

স্ত্রীদের বোঝা উচিত এতদিনে যে, স্বামীরা রাতে ঘুম থেকে এভাবে জাগতে হলে মোটেই খুসী হয় না।

এ কথা মানা না মানা অবশ্য স্ত্রীদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু বাচ্চা কাঁদলে ঘুমন্ত স্বামীকে ঠেলে তুলে দিয়ে কোন স্ত্রীই আখেরে লাভ করে না কিছু, কারণ এভাবে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হলে কর্মক্লান্ত পুরুষের মেজাজ খিঁচড়ে যায় বেশ ভালভাবেই, পরের দিন ধাক্কা সামলাতে হয় স্ত্রীকেই।

সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য দেশে মনঃসমীক্ষামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই তথ্যই আত্মপ্রকাশ করেছে যে, পুরুষের ঘুমের প্রয়োজন মেয়েদের চেয়ে বেশী এবং সে কারণেই রাতে বাচ্চার প্রয়োজনে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত করাটাও অনুচিত স্ত্রীর পক্ষে। অবশ্য সেকালে এ সমস্যার বালাই বড় একটা ছিল না; কারণ সকালের সীমন্তিনীরা রাতে ছেলে উঠলে নিজেরাই সামলাতেন কর্তাদের বিব্রত করতে যেতেন না কখনই।

ওয়াশিংটনের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, ডাঃ পল. স্যাণ্ডেস বলেন, 'পুরুষের পক্ষে ঘুমের প্রয়োজন মেয়েদের চেয়ে সর্বদাই বেশী। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, পর পর ছয়দিন রাতে ঘুম ভাল মতন না হলেও একটি মেয়ে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই তার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু একজন পুরুষ পর পর তিন রাত ঘুমের ব্যাঘাত হলে আর কাজকর্ম করতে পারে না স্বাভাবিকভাবে, অফিসে যাওয়াই তার সার হয় শুধু'।

সম্প্রতি প্রায় শ পাঁচেক মহিলাকে প্রশ্ন করে জানা গিয়েছে যে তাঁদের মধ্যে শতকরা সত্তরজনই রাতে আট ঘণ্টার চেয়ে কম ঘুমোন, এবং শতকরা চল্লিশ জন ঘুমোন সাত ঘণ্টারও কম।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে মেয়েদের যত বয়স বাড়ে, ঘুম ততই কমে যায়, পক্ষান্তরে ছেলেদের বয়স যত বাড়ে ঘুমও ততই বেড়ে যায়।

একদা বিশ্বখ্যাতা অভিনেত্রী মার্লিন ডিট্রিচের উদাহরণটাই নিন না কেন।

চৌষট্টি বছরের এই অভিনেত্রী আজও স্থবির হয়ে পড়েন নি বটে, কিন্তু রাতে তাঁর ঘুম হয় মোট চার ঘণ্টার মত।

বিখ্যাত অভিনেত্রী বেটি ডেভিসের ঘুমের পরিমাণও ওই মাপেরই, তবে বেটির তাতে কোন দুঃখ নেই, তিনি বলেন---'এত দ্যাখবার আছে জীবনে, এত কিছু করবার আছে, তবে ঘুমোতেই বা যাব কেন খামখা বেশী বেশী'?

ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের মা আজও জীবিতা ও তাঁর বয়স আটষট্টি বছর, গত ত্রিশ বছর ধরে ইনি রাতের ঘুমের মাত্রা একই রকম রাখতে সক্ষম হয়েছেন বলে শোনা যায়।

ইনি প্রতি রাত্রে ছ'ঘণ্টা ঘুমোন। রাণীমাতার দিন আরম্ভ হয় ভোর ছটায় আর শয্যার ক্রোড়ে আশ্রয় নেন তিনি মধ্য রাতে কাজেই রাজকীয় বৈভব বিলাসের মধ্যেও ছ' ঘণ্টার বেশী ঘুমোবার তাঁর অবকাশ কোথায়?

অবশ্য সারাদিনে নানাবিধ সামাজিক দায়দায়িত্বে ভরা ঠাসা প্রোগ্রামের মাঝেও রাণীমাতা কিছু কিছু সময় বার করে নিতে পারেন সর্বক্লান্তিহর নিদ্রার আরাধনায়, যেমন ধরুন, গাড়ীতে এক-জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার অবকাশে বেশ টুক্ করে কয়েক মিনিটের জন্য ঘুমিয়ে নিতে পারেন তিনি, আবার গন্তব্যস্থানে পৌঁছেই পরিপূর্ণ-ভাবে সজাগও হয়ে উঠতে পারেন সহজেই।

এইভাবে বাঁধা সময়ের হাত থেকে কিছুটা বিশ্রামক্ষণ কুড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু মেয়েদের বড় একটা দেখা যায় না; পুরুষের বরং এ ক্ষমতা আছে।

তারা খুব সহজেই টুক করে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে সুযোগ ও সুবিধা হ'লেই।

মেয়েরা যে শুধু ছেলেদের চেয়ে কম ঘুমোয় তাই নয়, তাদের ঘুমও ছেলেদের চেয়ে পাতলা।

ছোট বাচ্চার মায়েদের পক্ষে তো এ কথা আরও খাটে, সামান্যতম শব্দে তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে যায় চট করে, কারণ বাচ্চার জন্য সদাই সতর্ক হয়ে থাকতে হয় তাঁদের।

এই জন্যই রাতে বাচ্চা উঠলে পর বাপের আগে মা'ই সর্বদা টের পান।

মনে হয়, মায়ের একটা সত্তা সর্বদাই অতন্দ্র হয়ে প্রতীক্ষায় থাকে শিশুর সাড়া পাওয়ার জন্য। যেটা বাপের মধ্যে খুঁজতে যাওয়াটা নিছকই পাগলামী।

অথচ ইনসমনিয়া বা নিদ্রাহীনতা রোগের শিকার কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় পুরুষেরা।

ডাঃ স্যাণ্ডেসের মতে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের পুরুষরাই সচরাচর অধিক ভোগে এই রোগে।

আবার মেয়েরা সচরাচর বয়সে ভালভাবেই ঘুমোতে পা সেটাও বেচারা পুরুষদের পক্ষে উপভোগ্য ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়।

ইউনিভার্সিটি অফ বন মেডিক স্কুলের পক্ষ থেকে আদ্যন্ত পরী নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে মেয়েরা ঘুম ঠিকমত হচ্ছে বি তা নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামায় না।

চিকিৎসকদের মতেও দু'চার ঘুম না হলে ভয় পাওয়ার কিছু বরং এ নিয়ে কোনরকম চিন্তা কব সমূহ ক্ষতিকারক।

মাঙ্গালোরের খ্যাতনামা চিকি ডাঃ পাই বলেন, 'নির্দিষ্ট কয়েক ঘুম রোজ হওয়াই চাই, নইলে রসাতলে যাবে, এ ধরণের মনো সচরাচর পুরুষেরাই পোষণ করে

যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি যে, মোট পাঁচ-ছয় বা তার চেয়েও কম সময় ঘুমো মানুষ মোটামুটি সুস্থই থাকবে।

মেয়েরা এবং শিশুরা এ বিশেষ মাথা ঘামায় না বলেই নিদ্রাহী বা ইনসমনিয়া রোগে তারা কম'।

কাজেই পুরুষের রাতের ব্যাঘাত যাতে না ঘটে, সে মেয়েদের সচেতন থাকাই নয় কি?

এ যুগের অর্জুন

নাম কনরাড্ ভিবন। পেশা বন্দুক-নির্মাণ। নেশা লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কনরাড্ দু দু'বার বন্দুকের লক্ষ্যভেদে বিশ্ববিজয়ী হয়েছেন। নির্ভুল নিশানা তাঁর। লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না বললেই চলে। কোমরে বন্দুক রেখে ইনি দেওয়ালে বসা মাছি এবং দু'শ মিটার উঁচু দিয়ে উড়ন্ত পাখি গুলিবিদ্ধ করতে পারেন। ক'রে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন বহুবার।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার নিয়মিত অনুশীলন করেন। কোও ফাঁক বা ফাঁকি নেই তাঁর নিষ্ঠায়। ফলে, তাঁর ওজন আট পাউণ্ড পর্যন্ত কমে যায়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রতি-যোগিতায় কনরাড্ দু'শ' পায়রার মধ্যে একশ' নিরানব্বইটি এবং ১৯৬৭তে দু'শর মধ্যে একশ' আটানব্বইটি পায়রা নির্ভুল লক্ষ্য সন্ধানে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

'পাঞ্চালী' ছাড়া আর সব পুরস্কারই এ যুগের অর্জুন কনরাড্

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মীরা বর্ষা মল্লার

॥ একুশ ॥

দিল্লীর নতুন বাদশাহ বাবর শাহ্ মীরার কাছে হীরের হার পাঠিয়েছেন অতি গোপনে। এখান থেকেই মীরার জীবনের ঝড়ঝাপটা শুরু।

আজ আমি বসে ভাবছি সেদিনের কথা। খবরটা রাওলায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাবর শাহ্ হীরের হার পাঠিয়েছেন মীরাবাঈয়ের কাছে। চিতোর শহরের লোকজন পরস্পরকে বলছে এ কথা---বাবর শাহ্ হীরের হার পাঠিয়েছেন মীরাজীর কাছে। কথাটা বনবীরের লোকেরা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করছে চারদিকে। বাবার শাহ্ হীরের হার পাঠিয়েছেন মীরাজীর কাছে।

কেন?---জিজ্ঞেস করছে রাওলার রাজপুতানীরা।

আর জিজ্ঞেস করছে সাধারণ লোকেরা,---কেন? কেন? কেন?

আমি মনে মনে তৈরী করার চেষ্টা করছি সেদিনকার ছবি। গিরিধরজীর মন্দিরে মীরা এল। একেবারে একা। চারদিকে পাহারা, মীরা কোথাও যেতে পারে না। বাইরের কেউ আসতে পারে না। গিরিধরজীর মন্দিরে।

রাণা রতন সিংহের কড়া হুকুম। মীরা নজরবন্দী। মহলের কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। বনবীরের নিযুক্ত দুই পরিচারিকা চম্পা আর চামেলী সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখবে।

মীরার কানে এসেছে তার চরিত্র নিয়ে নানারকম কথা রটাচ্ছে বনবীরের লোকেরা। মীরা বিধবা। মীরা সুন্দরী, মীরা তরুণী, গিরিধরজীর পুজো-ভজন এসব ফাঁকি। ভেতরের ব্যাপার খুব জটিল।

তাকে এসব শোনাচ্ছে চম্পা, আর চামেলী।

আমি ভুলেযাওয়া ইতিহাসের কুয়াশা বার বার দেখবার চেষ্টা করছি, ওড়নার আড়ালে মীরার মুখখানি। কিন্তু বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। বার বার মুছে যাচ্ছে ইতিহাস। মনে পড়ছে, শুধু কিম্বদন্তি।

সেই কিম্বদন্তি বলছে তানসেনের কাছে মীরার গানের প্রশংসা শুনে বাদশাহ আকবর ছদ্মবেশে এসেছেন মীরার সঙ্গে দেখা করতে। মীরার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নিজের গলা থেকে হীরের না, মুক্তোর হার খুলে উপহার দিতে গেলেন মীরাকে।

শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাশ

এরপর কানে ভেসে এলো গ্রামোফোনে শোনা মীরাবাঈ পালার সংলাপ।

মীরা।---

ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। রুক্ষ, গম্ভীর।

কে? ও, মহারাণা, আপনি?

গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে পড়েছে কিম্বদন্তির স্বামী, রাণা কুম্ভ।

---হ্যাঁ মীরা, আমি, আজ তোমার ব্যবহারে লজ্জায়-ঘৃণায় আমার মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে।

---কেন মহারাণা?

---কেন? এখনো বুঝতে পারো নি? সিসোদিয়া রাজবংশের কুলবধূ হয়ে তুমি প্রকাশ্যে গান শুনিয়েছো একজন ম্লেচ্ছকে, আর তার কাছ থেকে হীরের হার উপহার নিতে তুমি একটুও কণ্ঠাবোধ করছো না। মীরা, মীরা, তুমি সিসোদিয়া কুলের কলঙ্ক---

মহারাণা।---মীরার আর্ত কণ্ঠস্বর। ---প্রভু, গিরিধারী গোপাল, তোমার সামনে এমন কথাও শুনতে হোলো আমায়।

মহারাণা,---ছদ্মবেশী বাদশাহ আকবরের কণ্ঠস্বর,---আপনি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছেন। আমার একটা কথা---

না, না, না,---গর্জে উঠলো মহারাণা কুম্ভ,---আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি জানি, আপনি কে। আপনার পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলে এখনই হাজার হাজার রাজপুত উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটে আসবে। আপনি যান, এক্ষুণি ত্যাগ করুন চিতোরগড়। আমি রাজপুত, পরম শত্রুকে একলা পেয়ে তার জীবননাশ করা আমার কাছে অধর্ম। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, এই মুহূর্তে চলে যান,---

খট্ খট্ খট্ খট্,---ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে অপসৃয়মান।

মীরা---!

মহারাণা---!

তুমি স্বৈরিণী!

এ মিথ্যে অপবাদ মহারাণা।

তুমি তোমার স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী।

না মহারাণা, আমার স্বামী গিরিধারী গোপাল; তিনি জানেন, আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে জানি না।

না, না, না, মীরা, তোমার স্বামী আমি, আমি রাণা কুম্ভ----

গ্রামোফোনের পালার সংলাপ ফিরে আসে আমার কানে। কিংবদন্তির কাহিনী মনে পড়ে।

আর আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। কোথায় রাণা কুম্ভ, কোথায় বাদশাহ আকবর, কার সঙ্গে কাকে জুড়ে আমাদের গল্প ফেঁদেছে আমাদের কাহিনীকারেরা।

হ্যাঁ, বাদশাহ আকবরের সঙ্গেও মীরার দেখা হয়েছিলো, কিন্তু সে অনেক বছর পরে। আকবর তখন তরুণ, মীরা প্রায় বৃদ্ধা, তখন মীরা আর চিতোরে নেই, তখন নিজের পরিচয় গোপন করে উত্তর ভারতের প্রধান বৈষ্ণব-তীর্থ স্থানগুলো পরিক্রমার পর এসে আশ্রয় নিয়েছে চন্দোগড়ের বাঘেলা রাজা রামচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে।---সে প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর পরের কথা।

কিন্তু নিজের দেওর রাণা রতন সিংহের আমলে মীরা হীরের হার পেয়েছিলো বাদশাহ বাবরের কাছ থেকে।

কিন্তু এ উপহার গানের জন্যে নয়। এর পেছনে ছিলো এক জটিল রাজনীতি।

বনবীরের কাছে নিয়মিত খবর দিতে আসে হয় চম্পা, নয় চামেলী। আর ওঠা-বসা, গান, চলাফেরা সব কিছুর ওপর ওদের কড়া নজর। রাণার হুকুম---মীরার সঙ্গে যেন কারো দেখা না হয়, কারো সঙ্গে যেন কোনো কথাবার্তা না হয়, কারো সঙ্গে যেন চিঠিপত্রের আদান প্রদান না হয়।

ও শুনেছে যে, সবাই বলাবলি করছে মীরার চরিত্র ভালো নয়, মীরা অন্য কোনো পুরুষের প্রতি গোপনে আসক্ত?---বনবীর হাসিমুখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো চামেলীকে।

হ্যাঁ, শুনেছে।

কি বলছে মীরা?

কিছু না। হাসিমুখে তানপুরো বাজিয়ে একটি গান গাইতে বসলো।

কি গান?

গানের কথাগুলো হোলো---

রাণাজী ম্যয় সাঁওরে রঙ্গ রাতী
জিনকো পিয়া পরদেশ বসত হ্যাঁয়
লিখ লিখে ভেজেঁ পাতী।

রাণাজী, আমি শ্যামলবরণ সেই কৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন হয়ে আছি,---নিজের মনে বিড় বিড় করে বললো বনবীর,---খুব ভালো কথা। জিনকে পিয়া পরদেশ বসত হ্যাঁয়, যার প্রিয় থাকে বিদেশে, লিখ লিখ ভেজেঁ পাতী, সে তাকে চিঠি পাঠায়। মানে? কে কাকে চিঠি পাঠায়? কি বলতে চাইছে মীরাবাঈ।

তাতো জানি না,---চামেলী বললো, ---এর পরের কথাগুলো হোলো---

মেরে পিয়া মেরে হৃদয় বসত হ্যাঁয়
য়হ সুখ কহিও ন যাতী।

আমি প্রিয় থাকেন আমার হৃদয়ে, এ সুখ তো কাউকে বোঝানো যায় না।

বনবীর মাথা নাড়লো। বললো,---না, আমার খটকা লাগছে। গানের কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে কাউকে কিছু জানানোর চেষ্টা করছে মীরাবাঈ। এসব গুপ্ত সঙ্কেত। নিশ্চয়ই অন্য কেউ দূর থেকে শোনে। তোমরা নজর রাখো ভালো করে। কেউ যদি কান পেতে শোনে, আমাকে জানিয়ো।

ওর গান গাওয়া বন্ধ করে দাও,---বললো রাণা রতন সিংহ।

না, সে হয় না,---বনবীর উত্তর দিলো,---বরং ওকে গাইতে দাও যা খুশী, এর মধ্যে যদি কোনো সঙ্কেত থাকে, আমরা ঠিক ধরে ফেলবো।

চলে গেল চামেলী।

যতক্ষণ না ও দূরে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রাণা রতন সিংহ আর বনবীর।

রাণা রতন সিংহ বললো,---শুনছি, কেউ কেউ নাকি বলাবলি করছে আমি শাক্ত, আর মীরা কৃষ্ণভক্ত ব'লে আমি মীরার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছি।

---কারা বলছে?

---ঠিক জানি না। সাধারণ প্রজাদের মধ্যে কয়েকজন।
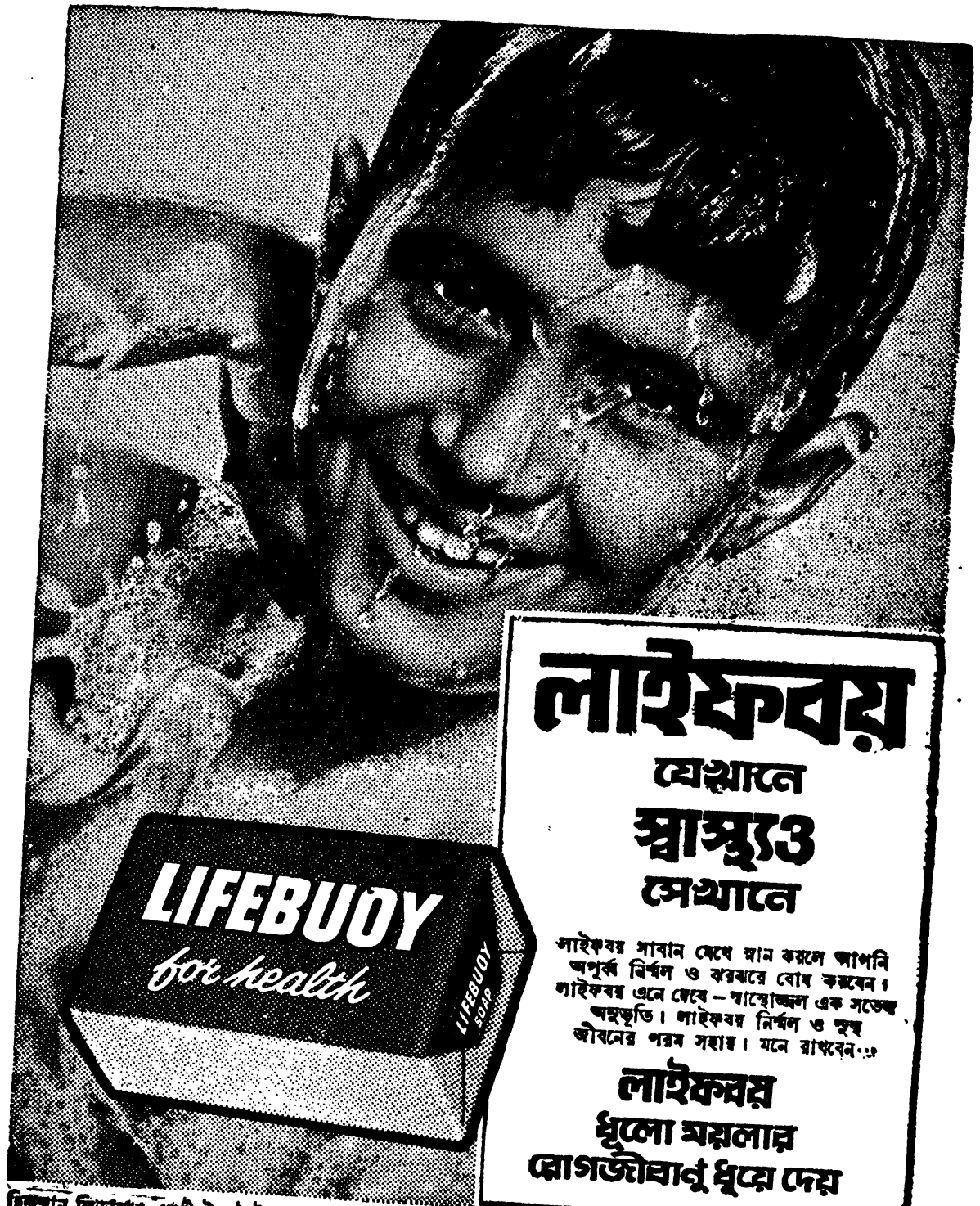
---খোঁজ নাও, দেখবে ওরা সবাই আমাদের প্রতিপক্ষ দলের গুপ্তচর। দেখতে পাবে, এই লোকগুলো বৈষ্ণব সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই লোকের মধ্যে রটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে রাণা বৈষ্ণবদের ওপর উৎপীড়ন করার পরিকল্পনা করেছে। এরা মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ওপর ঘা দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার চেষ্টা করে।

---মীরাবাঈকে নজরবন্দী করে রেখে দিলেই কি আমরা নিরাপদে থাকতে পারবো?

---ওদের যোগাযোগগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। মীরাজী কৃষ্ণের সাধনা করুন, আর শিবেরই সাধনা করুন, আমাদের কিছু আসে-যায় না; কিন্তু আমার ধারণা এ সব ফাঁকি। একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের ওপর এ একটা আবরণ। এভাবে ওদের কাজ হাসিল করতে আমরা দেবো না।

---কিন্তু বাবর শাহ মীরাবাঈয়ের কাছে হীরের হার কেন পাঠিয়েছেন জানা গেছে?

---সবটা জানা যায় নি। কিন্তু খানিকটা অনুমান করতে পারছি। মীরাবাঈয়ের জ্যাঠামশাই বীরমদেবজী বাবর শাহ্‌র কাছে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার মতলব করেছেন। রাণী কারমেতোবাঈও লোক পাঠিয়ে যোগাযোগ করেছেন বাবর শাহ্‌র সঙ্গে। এদিকে মেড়তায় খুব অর্থাভাব ঘটেছে। রাজকোষে কিছুই নেই। বীরমদেবজীর পক্ষে সেখানে কিছু পাঠানো অসম্ভব। তাই তাঁর হয়ে কয়েক লক্ষ টাকার সাহায্য পাঠাচ্ছেন বাবর শাহ্‌। এমনি টাকা পাঠানো অসম্ভব। তাই হীরের হার। সোজাসুজি মেড়তায় পাঠানো অসম্ভব, তাই মীরাবাঈয়ের মারফতে। কারণ, মেড়তায় জয়মলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মীরাবাঈয়ের। আমরা এ পর্যন্ত শুধু মীরাবাঈকেই জয়মলের চিঠিপত্র লিখতে দিয়েছি। এ হার মীরাবাঈয়ের কাছে কিভাবে এলো এবং মীরাবাই কিভাবে সেটা জয়মলের কাছে পাঠাতো, সেটা জানিনা, তবে,

আমার ধারণা, বৈষ্ণব সাধু সেজে যে সব গুপ্তচর মীরার কাছে যাওয়া-আসা করে, তাদের মারফতেই এই লেন-দেন চালানোর পরিকল্পনা ছিলো।

আমরা তো নিশ্চিত নই যে, সে হার জয়মলের কাছে পাঠানো হয় নি,—বললো রতন সিংহ।

আমি জানি যে, পাঠানো হয় নি,—উত্তর দিলো বনবীর,—আমি এটাও জানি যে, হার মীরার কাছেই আছে।

রতন সিংহ বললো,—সিসোদিয়া রাজবংশের কোনো কুলবধূর অলঙ্কার রাণারই সম্পত্তি।

---আমিও সে কথাই ভাবছিলাম।

---তাহলে সেটা আমাদের হাতেই আসা উচিত।

---তা তো বটেই। বহু লক্ষ টাকা দাম।

---আমরা চুপ করে বসে আছি কেন?

---চুপ করে বসে নেই। আমি খোঁজ-খবর করছি। চম্পা আর চামেলীকে বলেছি গোপনে অনুসন্ধান করতে। হীরের হার কোথায় রেখেছে---এটা জানতে পারলে যেন আমাকে খবর দেয়।

---এতে কোন ফল না হতে পারে। তার চেয়ে বরং মীরাবাঈয়ের ওপর চাপ দিলে হারটা পাওয়া যেতে পারে।

এখন নয়,---বললো বনবীর,—আরো কিছুদিন যাক।

কেটে যায় দিনের পর দিন।

মীরা নজরবন্দী। কারো সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। মহলের রাজপুতানীরা আসতে পারে না তার কাছে। হঠাৎ কেউ সামনে পড়ে গেলেও মাথা নিচু করে সরে যায়। মনে মনে সবারই ভয়। রাণা রতন সিংহ বা বনবীরের হুকুম অমান্য করার সাহস কারো নেই।

মীরা একা। একেবারে একা। সঙ্গে থাকে শুধু চম্পা আর চামেলী। কিন্তু ওরা সঙ্গিনী নয়। চুপ করে বসে থাকে। এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে কি যেন খুঁজে বেড়ায় তাদের চোখ।

মীরা নির্বিকার। দেখেও দেখে না। নিজের মনে গান গায়, গিরিধরজীর বিগ্রহের সেবা করে।

মাঝে মাঝে মনে হয় মন্দিরের বাইরে একটি-দুটি ছায়া এসে দাঁড়ায়। একেবারে নিঃশব্দে।

মীরা ফিরেও তাকায় না।

ওরা আড়ালে দাঁড়িয়ে গান শোনে।

এ সব গান রাণাজীকে---রাণা রতন সিংহকে উদ্দেশ করে গাওয়া। সব নিপীড়নের উত্তর এ-সব গানের মধ্যে। রাণা রতন সিংহ বুঝতে পারে। বনবীরও বুঝতে পারে।

রাণাজী, হেঁ তো গোবিন্দকা গুণ গাসিয়াঁ।----

রাণাজী, হ্যাঁনে য়া বদনাম লাগে মোটী।---

রাণাজী, থে ক্যাঁনে রাখো হ্যাঁসু বৈরা ---
রাম তনে রঙ্গ রাচী রাণা, ম্যঁয় তো সাঁওলিয়া রঙ্গ রাচী রে।---

রাণাজী রুঠিয়ো তো হ্যাঁরো বাঁরো দেস রখাসী।---

রাণাজী হ্যারী প্রীত পুরবলী ম্যয় কাঁই করূঁ।----

গানের পর গান, নতুন নতুন গান। প্রত্যেক গান রাণাকে উদ্দেশ করে শোনানো।

মহলে কারো মীরার গান শোনার হুকুম নেই। তবু কি করে যেন কেউ-না-কেউ শুনতে পায়। গানের পংক্তিগুলো গুণ গুণ করে, তারপর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই সতর্ক থাকে রাণা রতন সিংহ যেন শুনতে না পায়, বনবীর যেন জানতে না পারে, ওদের গুপ্তচরেরা যেন টের না পায়।

তবু রাণার কানে যায় গানের পংক্তিগুলো।

একদিন বনবীরের সামনে ফেটে পড়লো রাণা রতন সিংহ।

---রাণাজী, রাণাজী, রাণাজী! আমি আর সহ্য করতে পারছি না, রাণাজীকে উল্লেখ করে এ সমস্ত গান। সবাই গাইছে। সর্বত্র গাইছে। আমি কি শেষ পর্যন্ত সবার হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে উঠবো নাকি।

কি করতে চাও,---বনবীর বললো।

---মীরা মরে যাক। কেউ মেরে ফেলুক ওকে।

বনবীর হাসলো,---বন্ধু, রাজবংশের কোনো নারীকে ঝট করে ওভাবে মেরে ফেলা যায় না।

---তাহ'লে?

---তার আগে আমার চাই ওই হীরের হার।

---তারপর?

---বিদেশী শত্রুর পাঠানো হীরের হার রাণার রাজ্যে কোনো পুরুষ বা স্ত্রীর কাছে থাকা ঘোর অপরাধ এবং দেশদ্রোহিতা, তাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া যায়। তবে শুধু সন্দেহ বা অনুমানের ওপর কিছু করা চলে না, বিশেষ করে মীরাবাঈয়ের ক্ষেত্রে, যিনি মহারাণা সাঙ্গার পুত্রবধূ।

----চম্পা আর চামেলী কি বলছে?

---বলছে সেই একই কথা। কিছুই জানা যাচ্ছে না, কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কারো সঙ্গে মীরাজীর দেখা হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার একটু খটকা লাগছে।

---কেন?

---আমি জানতে পেরেছি যে, মীরাজী জয়মলের কাছে লোক পাঠিয়েছে গিরিধরজীর আশীর্বাদী ফুল দিয়ে।

---হার পাঠিয়ে দেয়নি তো?

---না।

---কি করে জানো?

---আমার লোক তাকে আটক করেছে।

---কোথায় সে?

---কয়েদখানায়।

---কি বলছে?

---কিছুই বলছে না।

---বলানোর চেষ্টা করা হয়েছে?

সব রকম,---একটু হাসলো বনবীর,

---আজ তিনদিন প্রায় বেহুঁশ হয়ে আছে। একটু জ্ঞান হলেই বলছে, আমি জানি না, আমি কিছুই জানি না।

---কে সে?

---পোশাক সন্ন্যাসীর। নাম-ধাম কিছু জানা যায় নি এখনো।

—তার মানে মীরা সবার চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে দেখা করে ওর গুপ্তচরদের সঙ্গে।

—আমারও তাই ধারণা।

—ওকে ধরতে হবে।

পাহারাদারদের কাছে গোপন নির্দেশ চলে গেল, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে বা কানে এলে সঙ্গে সঙ্গে যেন জানানো হয় রাণাকে আর বনবীরকে।

সেদিন অনেক রাত।

বনবীর এসে রাণার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো।

খবর এসেছে পাহারাদারদের কাছ থেকে। —মন্দিরের দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে চাপা গলার কথা কানে আসছে।

রাণা বনবীরকে বললো,—তুমি গিয়ে দেখ, কি ব্যাপার।

—না, আমি নয়। তুমি যাও।

—আমি? কেন?

—তুমি রাণা। তুমি তলোয়ার হাতে যেতে পারো। কোনো পুরুষমানুষকে গভীর রাতে গোপনে কোনো কুলবধূর সঙ্গে মিলিত হতে দেখলে কোনো বিচার না করেই তাকে শাস্তি দিতে পারো। সে অধিকার আমার নেই।

একটু ভাবলো রাণা রতন সিংহ। তারপর বললো,—বেশ, আমিই যাচ্ছি।

গিরিধরজীর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

রাণা কান পেতে শুনলো। মনে হোলো যেন মীরাবাঈয়ের গলা শুনতে পাচ্ছে। নিশ্চয়ই কথা বলছে কারো সঙ্গে, একা একা নিজের মনে কথা বলছে না নিশ্চয়ই।

দরজায় জোরে করাঘাত করলো রাণা। একবার, দুবার, তিনবার।

কে আছো ভেতরে? দরজা খোলো।

কোনো উত্তর নেই।

দরজা খোলো। নয় তো আমি দরজা ভেঙে ফেলবো।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল।

রাণা দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে মীরাবাঈ। বড়ো বড়ো চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

কে? রাণাজী? এসো, ভেতরে এসো। হঠাৎ এত রাত্তিরে?

কে আছে ভেতরে?

আমি, আর—

আর কে?

—গিরিধরজী।

ঠোঁট কামড়ালো রাণা।—ওকথা আমি শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, সত্যি সত্যি কে আছে। কার সঙ্গে কথা বলছিলেন আপনি?

মীরা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

ভেতরে ঢুকলো রাণা রতন সিংহ। হাতে খোলা তলোয়ার। চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলো। কাউকে দেখতে পেলো না। গিরিধরজীর বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ যেন রাণার বুক কেঁপে উঠলো। তার এ কি অশোভন আচরণ? খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে দেবতার বিগ্রহের সামনে?

এক পা এক পা ক'রে পেছন দিকে সরে এলো রাণা রতন সিংহ। তারপর মীরাকে কিছু না বলেই মন্দির থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দূরে মিলিয়ে গেল রাণার পায়ের শব্দ। মীরা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিলো।

তারপর ডাকলো, —চম্পা। চামেলী।

এককোণে ফুলপাতা, আর ভোগের ফলের স্তূপ। তার পেছন থেকে বেরিয়ে এলো চম্পা চামেলী, আর একজন পূজারী ব্রাহ্মণ।

চম্পা বললো,—আমার যা ভয় করছিলো। রাণাজীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কি করে, আমি বুঝতেই পারি নি।

চামেলী বললো—রাণাজীর চোখে ঘুম ছিলো। বোধ হয় সদ্য উঠে এসেছেন বিছানা থেকে। অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই টের পেতেন।

মীরাবাঈ বললো,—আমাদের হাতে বেশী সময় নেই। হয়তো আবার ফিরে আসবে। মিশ্রজী, আপনি এখনই বেরিয়ে পড়ুন। জয়মলকে জানাবেন, এরপর অনেকদিন হয়তো ওর সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ করার সুযোগ হবে না। তবে ওর দিদি ওকে প্রত্যেকদিন মনে করবে। গিরিধরজীর কাছে প্রার্থনা করবে, যাতে ও নিরাপদে থাকে। হীরের হারটা সাবধানে বেঁধে নিয়েছেন তো?

পূজারী ব্রাহ্মণ অনন্ত মিশ্র পেটের কাছে কাপড়ের খাঁজটা একবার অনুভব করলো। তারপর বললো,—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

—খুব সাবধানে যাবেন। আপনার ওপর নির্ভর করছে আমার ভাই জয়মলের ভবিষ্যৎ, মেড়তার ভবিষ্যৎ।

দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল অনন্ত মিশ্র।

মীরা চামেলীকে বললো,—পেছন পেছন তুমিও যাও। যদি কোনোরকম সন্দেহ হয়, মিশ্রজীকে সতর্ক করে দিয়ো। চিতোরগড়ের ভিতরেই শুধু ভাবনা, এখান থেকে একবার বেরোতে পারলে তাকে রক্ষা করার জন্যে অন্য লোক আছে।

দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল চামেলীও।

মীরা তানপুরো তুলে নিয়ে গিরিধরজীর বিগ্রহের সামনে গিয়ে বসলো। তারপর আস্তে আস্তে একটি ভজন আরম্ভ করলো।

কাছে চুপ করে বসেছিলো চম্পা। সে ভাবছিলো, গত কয়েকদিনের মধ্যে কতো পরিবর্তন এসে গেছে তার আর চামেলীর জীবনে। ওদের অতীত খুব পরিষ্কার নয়, ওরা বনবীরের মাইনে-করা পরিচারিকা, মীরার ওপর নজর রাখবার জন্যে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু মীরাবাঈয়ের সান্নিধ্যে এসে দেখতে দেখতে একেবারে বদলে গেছে তাদের মন, তাদের জীবন, তাদের সব কিছু।

পরদিন সকাল বেলা রাণা রতন সিংহের সঙ্গে যখন বনবীরের দেখা হোলো, বনবীর জিজ্ঞেস করলো, —কি খবর? কাউকে দেখতে পেলে গিরিধরজীর মন্দিরে?

[ক্রমশ।

লেনিন ও বুদ্ধিজীবী সমাজ

এন. দানিলভ

বুদ্ধিজীবী সমাজের সমস্যাটি সোভিয়েত আমলের প্রথম যুগে সবচেয়ে জটিল ও জরুরী সমস্যাগুলির মধ্যে এক মুখ্য সমস্যা হয়ে দেখা দেয়।

অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে লেনিন সেই প্রধান প্রধান দিকগুলি বেছে নেন, যাতে সমস্যাটির সার্থক সমাধান সুনিশ্চিত হয়।

এক কথায়, বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাটা ছিল নিম্নরূপ। অতীতের রুশী বুদ্ধিজীবী সমাজের বেশ একটা বড় অংশ অক্টোবর বিপ্লবকে ও তার ফলে যে মৌলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়, তাকে স্বাগত জানায়। এদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ক্লিমেন্ত তিমিরিয়াজেভ, রকেট-বিদ্যার পথিকৃৎ কনস্তান্তিন ৎসিয়োলকোভস্কি, উদ্ভিদবিজ্ঞানী আইভান মিচুরিন, বিমানবিদ্যার অসামান্য তাত্ত্বিক নিকোলাই ঝুকোভস্কি, ইঞ্জিনীয়ার বি ভেদেনিয়েভ, জি গ্রাফতিও এবং আর ক্লাসন, লেখক আলেকজান্দার ব্লক, ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, এ সেরাফিমোভিচ প্রমুখ। ম্যাকসিম গোর্কির নেতৃত্বে প্রগতিশীল রুশী বুদ্ধিজীবী সমাজের এই কেন্দ্রীয় অংশ রুশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য জনগণের সংগ্রাম ও প্রয়াসে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কিন্তু দেশে নতুন ব্যবস্থার প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের একটা বেশ বড় অংশও ছিলেন। এঁরা প্রধানত ছিলেন অতীতে সুবিধাভোগী ধনী বা অভিজাত শ্রেণীর লোকজন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশত্যাগ করেন, অন্যান্যরা দেশে থেকে গেলেও প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্র, অভ্যুত্থান ও সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে নানা ধ্বংসাত্মক কাজের শরিক হন।

ভ্লাদিমির লেনিন ও তাঁর অনুগামী কমিউনিস্টরা, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকেই যারা বিপ্লবের পথে এগোচ্ছিলেন, তাঁরা এইসব বিরোধী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী-দের যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, ওঁদের মনোগত ইচ্ছা-পূরণের কোন ভিত্তিমূলই নেই এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিকাশের চাকাকে আর পিছন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। লেনিনের এই অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন লেখক এ লুনাচারস্কি, কোষ-গ্রন্থকার এন মেশ্চেরিয়াকভ, শিক্ষাবিদ ও গবেষক এন ক্রুপস্কাইয়া, চিকিৎসক এ সেমাস্কো, ইঞ্জিনীয়ার এল ক্রাসিন, ইতিহাসবিদ এম পোক্রোভস্কি, পদার্থ-বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ্যাবিদ পি স্টেনবর্গ প্রমুখ। এঁদের অধ্যবসায়ের ফলে বিপথগামী বহু বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার ও সংস্কৃতি-কর্মী ঠিক পথে ফিরে আসেন। আর যাঁরা প্রতিরোধ করতে থাকেন, দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা অনুযায়ী তাঁদের খুবই কঠিন ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়।

কিন্তু অতীতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে একটা বড় গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন তাঁরা, যাঁদের নীতি ছিল রয়ে-সয়ে দেখা। এঁদের মনোভাব ছিল দেখা যাক, বিপ্লব কিভাবে আরও এগোয়, দেশের সামনে সত্যিই যে বিপুল বাধা-বিঘ্ন দেখা দিয়েছে এবং ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম রুশদেশ যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, নতুন ব্যবস্থা সেসবের মোকাবিলা করতে পারে কিনা।

অতীতের রুশী বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যাটিও বেশ জটিলই ছিল, কিন্তু বিদেশী সোভিয়েত "বিশেষজ্ঞ"রা যতটা দেখাতে চাইতেন, ততটা নয় (সে-কালেও এ রকম "বিশেষজ্ঞে"র সংখ্যা কম ছিল না)। রুশিয়ার ভবিষ্যতের এই সব হরেকরকম ব্যাখ্যাকাররা বলতে চাইতেন যে, নতুন সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষে এই অতীতের বুদ্ধি-জীবীদের সম্পর্কিত সমস্যাটির সমাধান করাই অসম্ভব। এঁদের মধ্যে কারও কারও মত ছিল যে, ঠিক এই সমস্যাটির লেবুর খোসার ওপর পা পিছলে পড়েই বলশেভিকদের ঘাড়গোড়, এমন কি মাথা ভাঙবে।

লেনিন নিজে ছিলেন অতি-সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের একজন—দার্শনিক, আইনবিদ ও সাংবাদিক। তিনি কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত রাষ্ট্রকর্মীদের দের কাছে এই প্রস্তাব দেন যে, বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে খুবই যথাযথ ও সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে এবং এঁদের সম্পর্কে কোন-রকম হঠকারী সিদ্ধান্ত ও কাজ করা চলবে না। লেনিন এটা মনে করতেন আরও এ জন্যই যে, কমিউনিস্টদেরই কতকাংশের কাছে সামগ্রিকভাবে অতীতের বুদ্ধিজীবীরা শত্রু বলে এবং সমাজের বৈপ্লবিক বিকাশের পথে অন্তরায় বলে গণ্য হতেন। এ ধরণের মনোভঙ্গীর নৈরাশ্যবাদী ও কালা-পাহাড়ী অন্তঃসার, অতি-বিপ্লবী বুলি আওড়ানোর মধ্যে আড়াল করা থাকত। লেনিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতা, আর বলিষ্ঠতা নিয়ে বুদ্ধি-জীবীদের সম্পর্কে এ ধরণের হীনতা-প্রবণতামূলক মনোভাবের বিপদ ও অসারতা সর্বসমক্ষে খুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাটি নিয়ে এ ধরণের যা-খুশী-তাই মনোভাব বিপ্লবের স্বার্থের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করে না।

বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে উদ্ধত মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন লেনিন। তিনি লেখেন, "বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একেবারে ধ্বংস করে ফেলা বা দেশছাড়া করা অসম্ভব"

প্রয়োজন হ'ল এদের পরাস্ত করা, নতুন করে গড়ে তোলা, এদের হজম করে নেওয়া ও পুনর্শিক্ষিত করা।" সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সেই আমলে লেনিনের এই বিশ্লেষণ ছিল প্রকৃতই সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে এক বিশদ ও সুস্পষ্ট কর্মসূচী।

অতীতের যে বুদ্ধিজীবীরা গোড়া থেকেই রুশিয়ার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুমোদন জানাত, তারা নতুন ব্যবস্থার প্রতি আরও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠল এবং এই নতুন সমাজ গড়ার বহুবিধ ও কঠিন কাজে আরও উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিল।

যারা দোলাচলের ও সংশয়ের মধ্যে ছিল ও কি হয়, না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখছিল তারা ক্রমশ স্থিরনিশ্চিত হল যে, সোভিয়েত ক্ষমতা প্রকৃতই এক মহান ও শ্রমিক-কৃষকের জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে তা এক সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমন কি, দৃঢ় সংশয়ীরাও শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করল যে, শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র শক্তি অর্জন করে এক প্রবল ক্ষমতা হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়েও দৃঢ়-নিশ্চয় হল যে, লেনিন ও প্রকৃত কমিউনিস্টদের কথায় পূর্ণ আস্থা রাখা যায় এবং ঠিক এর ফলেই এই রাজনৈতিক দলটি জনগণের মধ্যে দৃঢ়-প্রোথিত।

তা ছাড়া, সোভিয়েত ক্ষমতা ও তার কাজের সমর্থনে অতীতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দাঁড়াবার আরও কারণ ছিল। বিশেষভাবে তা প্রকাশ পেল এই ঘটনায় যে, নতুন রাষ্ট্রক্ষমতা বুদ্ধিজীবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ গঠনাত্মক সামাজিক শক্তি হিসেবে গণ্য করছে, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রগতিতে বুদ্ধিজীবীদের কাজের ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে।

এ দিকটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় এ জন্যই যে, অতীতে রুশিয়ায় বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের কাছে বুদ্ধিজীবীরা সেবাদাসের ভূমিকায় গণ্য হত।

অতীতের রুশিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রী অংশটি সেজন্য কোন সময়েই রুশ শাসন-কর্তাদের অনুমোদন পায় নি। অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত ক্ষমতাই সর্বপ্রথম বুদ্ধিজীবীদের কাছে সেই অবাধ সুযোগ উপস্থিত করলো যাতে তারা পুঁজিবাদী, ভূস্বামী ও ধনিকদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থের বদলে বৃহত্তর শ্রমজীবী জনগণ ও রাষ্ট্রের কাজে আসতে পারে। বুর্জোয়ার সংকীর্ণ ব্যবসায়িক

লেনিন

স্বার্থ বুদ্ধিজীবীদের সৃজনশীলতা ও উৎসাহকে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল, আর সোভিয়েত আমলেই সর্বপ্রথম সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, অভিনেতা প্রমুখ তাঁদের সৃজনশীল ও ফলপ্রসূ কাজের উপযোগী পরিবেশ খুঁজে পেলেন।

অধিকন্তু, বর্তমান শতকের ২০-এর যুগের ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিল যে, রুশ বুদ্ধিজীবীদের ভাগ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন তথাকথিত বিদেশী বিশেষজ্ঞরা প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী মহলের ও তাদের গোয়েন্দা বিভাগের স্বার্থেই কাজ করছে।

তা'ছাড়া, অতীতের বুদ্ধিজীবী-দের অধিকাংশের পক্ষে বিপ্লবকে স্বীকার করে নেওয়ার এক বৈষয়ক কারণও ছিল। যদিও সেসময় সোভিয়েত রাষ্ট্র এক অসহনীয় আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছিল, তবু বিজ্ঞানী ও লেখকরা মোটামুটি ও যথেষ্ট খাবার পরবার সংস্থান পেয়েছিলেন। এর ফলে বহু বুদ্ধিজীবী শারীরিকভাবেই নিজে-দের বাঁচাতে পেরেছিলেন।

কিন্তু রুশ বুদ্ধিজীবীদের সব চেয়ে যা আকৃষ্ট করেছিল, তা হল রাষ্ট্র ও সমাজের কাজে তাদের লাগাবার জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের এক সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ। ১৯২০-২১ সালে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সামনে সবচেয়ে যা বড় কাজের প্রকল্প দেওয়া হয়—তা হ'ল রুশিয়ার বৈদ্যুতিকরণের (গোয়েলরো) পরি-কল্পনা। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কমিউনিস্ট গ্লেব করঝিঝানোভস্কির উপর এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে।

সোভিয়েত ক্ষমতা সম্পর্কে তখনও যাঁরা সংশয়বাদী ছিলেন, লেনিনের বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনা সেইসব বুদ্ধিজীবীদেরও (বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার) অনুপ্রাণিত করে। এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য সরকার ২০০ বিশেষজ্ঞের এক কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের সদস্য হলেন আই আলেক-জান্দ্রভ, এম শাতেলেন, এ গোরেভ, এ রামজিন ও অন্যান্যরা লেনিনের ভাবধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এঁরা অনেক কিছু করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েট সরকার রচিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরাট রূপরেখাও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে। এই পরিকল্পনায় ২০ বছরের মধ্যে বিশেষ করে বয়স্ক জনসংখ্যার মধ্য থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভি-যানের উপর জোর দেওয়া হয়।

চিরন্তন

মালতী দত্ত

কখন স্খলিতছন্দ উর্বশীর মত
অভিশাপ শিরে ধরি এ মর্তকায়ায়
জন্ম লভেছিনু একদিন
তুমিও তো শাপভ্রষ্ট গন্ধর্বের মত
চিরতরে নির্বাসিত সুরলোক হতে—
অনন্ত এষণা শুধু লয়ে কালস্রোতে
ভাসিয়া চলিয়াছিনু। তুমিও তখন
অন্যমনে কোন এক চিন্তায় মগন
তবু হল দেখা
দুজনের আঁখিদীপে আলোকের রেখা.

পূর্বজনমের কথা পড়িয়াছে মনে
তোমার চোখেতে মায়া লাগিল গোপনে।
একান্ত সে পরিচিত মূর্তিখানি মোর
যুগান্তের পরে তবু স্বপ্নসম ঘোর।
অশ্রুনদী পার হয়ে বুঝিয়াছি তাই
দুঃখদাহ মিলনের তীব্র চেতনাই
উন্মেষিত করে তোলে শুধু বারবার
পরাণে পদ্মবনে বিরহের সরসীতে
নিত্য তাই আসন তোমার।

ভারত-শ্রী রুশদেশে ৮ বছরের থেকে উর্ধ্ববয়স্কদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ সাক্ষর ছিল। তাই এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্র ও গণসংগঠনগুলির প্রচণ্ড প্রয়াস। একাজে সেজন্য বিদ্যালয় শিক্ষক, চিকিৎসক কৃষি-বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী সকলেরই ডাক পড়ে।

১৯৪০ সালের মধ্যে দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতার সমস্যাটির সম্পূর্ণ দূরীকরণ হয়।

সোভিয়েত ক্ষমতা শুধু ঘোষণাই করে না, রাজনৈতিক ও বাস্তবভাবে শ্রমিক-কৃষকের সন্তানদের মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষালাভের ব্যবস্থাটি সুনিশ্চত করে। এটি শুধু শুভেচ্ছামূলকই ছিল না, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সুদৃঢ়, বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা নেওয়া হয় ও রাষ্ট্র সেজন্য নিয়মিত ও বিরাট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে।

১৯১৯ সালের মধ্যেই সাধারণ শিক্ষা বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রাক-বিপ্লবকালীন ছাত্রসংখ্যার দ্বিগুণ হয়।

একদা লণ্ডন 'টাইমস', 'নিউয়র্ক টাইমস' ও ফরাসী 'ফিগারো' পত্রিকার মত বড় বড় বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি তাদের সংবাদদাতাদের নামে বিপুল কালি ও বুদ্ধি ব্যয় করে প্রচার চালিয়েছিল যে, বলশেভিকরা ও সমগ্র সোভিয়েত জনগণ অতীতের সবকিছু সংস্কৃতি নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে চলেছে, সেই সঙ্গে ভুলভ্রান্তি ও ব্যতিক্রমের ঘটনাগুলিকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে দেখান হতে থাকে।

সোভিয়েত ক্ষমতা অতীতের রুশিয়ার সমস্ত সাংস্কৃতিক সম্পদ ও স্মৃতিস্তম্ভগুলি অতি সযত্নে রক্ষা করে। প্রাসাদগুলি রূপান্তরিত হয় মিউজিয়ম ও স্বাস্থ্যাগারে, বিখ্যাত শিল্পকৃতিগুলি অভিজাতদের জন্য সংরক্ষিত প্রদর্শনশালা থেকে সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। মস্কোর বলশয় থিয়েটার, মালি থিয়েটার, মস্কো আর্ট থিয়েটার, আলেকজান্দ্রিস্কি থিয়েটার (বর্তমান, পুস্কিন থিয়েটার), রুমিয়ানৎসেভস্কাইয়া লাইব্রেরী (বর্তমান লেনিন লাইব্রেরী), ত্রেতিয়াকভ গ্যালারি, বাখরুশিন থিয়েটার মিউজিয়ম প্রভৃতি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নবজীবন পায়।

এগুলি বলতে গেলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ শিক্ষা, যা সমস্ত পক্ষপাতহীন বস্তুনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সুনিশ্চিতভাবে দেখিয়ে ছিল যে, বলশেভিকরা শুধু রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে গণতান্ত্রিক নীতির ঘোষণাই করে না, কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করে।

এবং শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যকর্মী সহ বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকতম অংশকে জনগণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের বহুমুখী কাজে নিযুক্ত করে।

অবশ্যই, এটা ভাবলে সরলীকরণ করা হবে যে, বিরোধিতা ও অনড়তা থেকে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি আনুগত্যে বুদ্ধিজীবীদের ক্রম-উত্তরণের প্রক্রিয়াটি বেশ সহজসাধ্য হয়েছিল। না, এই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা ও সংশয়, তবু তা লেনিনের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির দ্বারা নির্দেশিত পথের দিকে—বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের দিকে প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যায়।

লেনিন যে কথা বলে ছিলেন "সমগ্র অভিজ্ঞতা বুদ্ধিজীবীদের আমাদের সারিতে নিয়ে আসবে", তা সত্যে পরিণত হয়। অতীতের বুদ্ধিজীবী সমাজ সোভিয়েত জনগণের পথে চলে আসে, নতুন সমাজ গড়ার আদর্শ আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নেয় এবং সৎ ও একনিষ্ঠভাবে সোভিয়েত দেশের, কমিউনিজমের স্বার্থের সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

আর সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রেরণাদাতা ও সংগঠক ভ্লাদিমির লেনিনের অবদান এখানেই চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে।

মাসিক রাশিফল
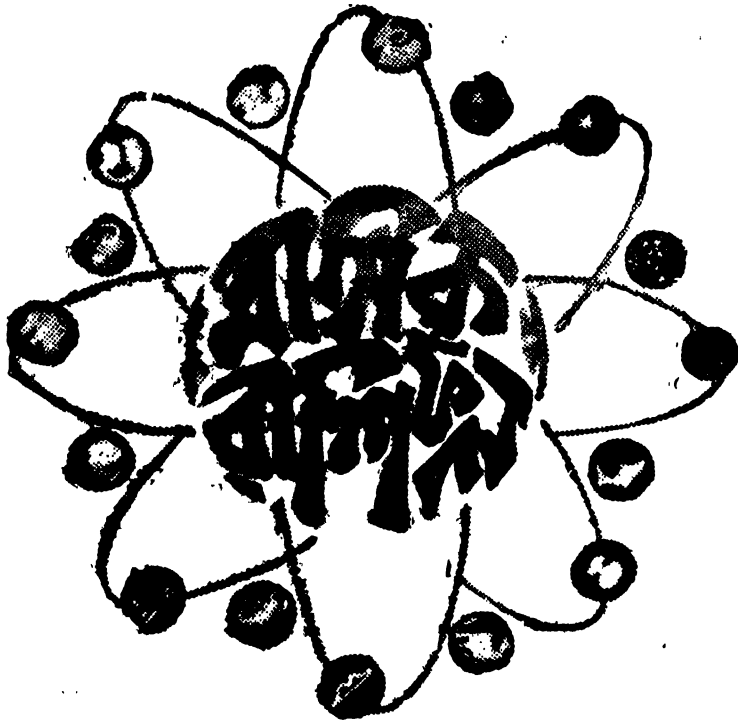
॥ আষাঢ় মাসের ফলাফল ॥

আষাঢ় মাস। নিরয়ণ মতে রবি থাকবেন মিথুন রাশিতে। আকাশ আর পৃথিবীর, পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনলীলার প্রকাশ এই মাসে। এমাসে যাদের জন্ম তাদের পক্ষে তাদের জন্ম বর্ষ হবে যোগাযোগের দিক থেকে শুভ। কিন্তু মিথুন আশ্রিত রাশি কিংবা লগ্নের পক্ষে এই বর্ষ পারিবারিক দিক থেকে বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। বিয়োগ-ব্যথা ও রোগ-যন্ত্রণা এবং রাজনৈতিক কারণে এ বছর চিহ্নিত হয়ে থাকতে পারে। এ মাসের ২৩ তারিখ (৮ই জুলাই) থেকে কর্কট ও মকর আশ্রিত রাশি ও লগ্নের ব্যক্তিদের পক্ষে অনেক দিক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উক্ত সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নূতন কোনো ঘটনা এবং বিদেশী উৎপাত বা হস্তক্ষেপ ব্যাপার ঘোরালো করে তুলতে পারে। আমেরিকার রাষ্ট্রচক্রে দুর্দৈবের আভাস রয়েছে। এই আষাঢ় মাসে পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনাবলী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আসামের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে। আষাঢ় মাসে কিংবা মিথুন লগ্ন অথবা রাশির ব্যক্তিদের পক্ষে মুক্তা ও পীত পোখরাজ রত্ন উপকার দিতে পারে। পৌষের জাতকের পক্ষে চুণী উপকার করতে পারে। সিংহের জাতকের পক্ষে এবং কর্কটের জাতকের পক্ষে নীলা ও গোমেদ বিশেষ বিধি অনুযায়ী

তারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

ধারণ করা এসময়ে উচিত। তুলা কিংবা মেষের জাতক নব-বিবাহিত হলে মেষে শনির প্রবেশ কাল থেকে পাঁচ বছর গুরুত্বপূর্ণ এবং এসময়ে সতর্ক থাকা কর্তব্য। শনি এই পাঁচ বছর আশ্রম, মঠ এবং গুরুবারের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারে। অপর-দিকে মানবতাবাদের নূতন দিকেরও হবে অভিব্যক্তি। যাক্, এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের শুভাশুভ আভাস দিচ্ছি :—

মেষ : এখানে নিজের মৌলিক প্রতিভা অনুযায়ী সৃষ্ট কাজের প্রশংসা পাবেন। সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি হবে অনবদ্য। এই সৃষ্টি আপনাকে বিশেষ সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে পারে। বাইরের ভণ্ডামি এবং অহংসর্বস্ব লোকেদের প্রাধান্য মানসিক উত্তেজনা বাড়াবে এবং এজন্য অপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। মাসের আট তারিখের পর যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। বুদ্ধিজীবীর প্রোফেশনে ভাল হবে। অধ্যাপক ও গবেষকদের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু মাসের শেষের দিক বিজ্ঞানধর্মী প্রোফেশন যাঁদের, তাঁদের পক্ষে প্রতিকূল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য ঘটতে পারে। কিন্তু মন্তব্য প্রকাশ সম্বন্ধে সাবধান। ব্যবসায়ে মূলধনে ঘাটতি পড়তে পারে। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু সন্তানদের কারো জন্য উদ্বেগ যেতে পারে। মহিলাজাতকের আর্থিক উদ্দেশ্যের অনুকূল। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক হোন। মেষ লগ্নের জাতকের শুক্রের দশান্তর্দশা প্রতিকূল হবে। বর্তমানে সকল কাজে সাবধান।

বৃষ : কাজের কোনো প্রচেষ্টা এবার সুখবর আনতে পারে। বেকারদের পক্ষে বিশেষ করে যারা টেকনিক্যাল কোনো কাজ জানে, তাদের কাজের সুযোগ আসবে। কিন্তু সমব্যবসায়ী কিংবা সহকর্মীদের আচরণ সম্পর্কে সাবধান। কেউ আপনার নামে এমন কিছু রটাতে পারে, যা আপনার কর্মক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কিংবা নতুনভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হবারও সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। প্রিয়জনদের কারো সম্পর্কে উৎকণ্ঠা যাবে। নব-বিবাহিতদের পক্ষে এ মাস তাৎপর্য-পূর্ণ। বাবা-মায়ের উপর লক্ষ্য রাখুন। যৌথ পরিবারে ভাঙন দেখা দিতে পারে। ছবি আঁকা কিংবা মূর্তি গড়ার কাজে যাঁরা দক্ষ, তাঁদের কোনো চুক্তির কাজ পাবার সম্ভাবনা। সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজক বিস্মৃত হতে পারেন। মহিলাদেরও অনুরূপ ফল।

বৃষ লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলযোগ ও আর্থিক দুশ্চিন্তার কারণ ঘটবে।

মিথুন : পারিবারিক ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট এবং স্বজনদের কারো সম্পর্কে উৎকণ্ঠা যেতে পারে। কাজকর্মে সুযোগ এবং সৃষ্টিমূলক কাজের চুক্তির দিক্ থেকে ভাল। কিন্তু পরিবেশ এমনই হয়ে উঠতে পারে যে, পরিকল্পনামত কাজ করা কঠিন হয়ে উঠবে। নিজের স্বাস্থ্যে নূতন কোনো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ব্যবসায়ে প্রত্যাশিত ব্যাপারে হতাশ হতে পারেন। জমি-বাড়ি নিয়েও গোলমাল ঘটায়। রাজনৈতিক ব্যাপারে সংযুক্ত থাকলে এখন তিন মাস বিশেষ সাবধান। বাইরে কোথাও গিয়ে অসুবিধায় পড়তে পারেন। চাকুরী ক্ষেত্রে নূতন কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। অবশ্য নূতন প্রার্থীর চাকুরী হতে পারে। মহিলা জাতকের প্রিয়জনচিন্তা এবং শারীরিক অবস্থা উত্যক্ত করবে। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে উদ্যমে ব্যর্থতা ও আর্থিক অপচয়। বৃহস্পতির দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে আশাপ্রদ হবার সম্ভাবনা।

কর্কট : পদমর্যাদার দিক্ থেকে জটিলতা এবং প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। মঙ্গল, রাহু ও শনির দশান্তর্দশা ও জন্মকালীন তাদের অবস্থানের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান। এমাসে যান-বাহনে চলাফেরা এবং জনতার ভিড়ে যাওয়া সম্পর্কে সাবধান। নূতন কোন কাজে হাত দিয়ে গোলমালে পড়তে পারেন। ব্যবসায়ে যোগাযোগের দিক্ থেকে ভাল। সরকারী চুক্তি কিংবা সরকারী ব্যাপারে অশান্তি। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে গোলযোগ হতে পারে। মোটের ওপর এ মাসের কার্য-কারণ আপনার ভবিষ্যৎ কর্মধারা কিংবা জীবনের ওপর বিশেষ ইঙ্গিতের পথনির্দেশ করছে। পরিচিতা সহ-কর্মিণীর সঙ্গে যোগাযোগ ও অন্তরঙ্গতা মিলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মহিলাদের বাগড়াবাটি সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। তরুণী মেয়েদের মনোমত ক্ষেত্রে বিবাহ-মিলন ঘটতে পারে। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা কিন্তু বিরোধী-পক্ষের ষড়যন্ত্র বিচলিত করে তুলতে পারে।

সিংহ : যে প্রেরণা নিয়ে কাজ করছেন, তা আপাতরম্য হলেও আকস্মিক সমস্ত ব্যাপারই ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। জনতার ভিড়, সভা-সমিতি কিংবা আন্দোলনের ব্যাপার এড়িয়ে চলা উচিত। যান-বাহন ও এরোপ্লেনে যাতায়াতও এমাসে এড়িয়ে চলা যুক্তিযুক্ত। ব্যবসায়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে। ওষুধপত্র ও রাসায়নিক উৎপাদনের ব্যাপারে কোনো সুযোগ আসবে। আইনজীবী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে মাসের শেষাংশ অনুকূল। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। দাম্পত্য ক্ষেত্রেও ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি উৎপাত করতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে এখন আশানুরূপ হবে না। বৈজ্ঞানিক অথবা ইঞ্জিনীয়ারিং সূত্রে যাঁরা দেশের বাইরে যেতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের পক্ষে আশাপ্রদ। পূর্বের প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপার নূতন করে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। মহিলা-জাতকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবাঞ্ছিত পরিবেশ হঠাৎ অশান্তি সৃষ্টি করবে। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে শনি কিংবা বুধের দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান।

কন্যা : মানসিক দুর্বলতা কাজ-কর্মের ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। নিজের সম্বন্ধে যতটুকু ভাবেন, অন্যের কাছে ততটুকু পাওয়া কঠিন। এমন কি সংসারের দিক থেকেও এখন নৈরাশ্য-পীড়িত হবার আশঙ্কা। ছেলেমেয়েদের কারো অসুখ-বিসুখ কিংবা তাদের জন্য কোনো কারণে উদ্বেগ যেতে পারে। স্বাধীন প্রোফেশনে আশানুরূপ হবে না। আবার চাকুরী ক্ষেত্রেও নৈরাশ্য কিন্তু হঠাৎ কোনো সুযোগ আসতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে বাইরে কোথাও যাবারও সম্ভাবনা আছে। নূতন কোনো ব্যবসায় করারও সম্ভাবনা। পোলট্রি কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের পক্ষে এমাস অনুকূল। জিনিসপত্র হারানো, চুরি যাওয়া ও ঝগড়া-বিবাদে ক্ষতির আশঙ্কা। বিবাহেচ্ছু তরুণী মেয়েদের মনোনয়নে ভুল হতে পারে। এখন বিবাহ না করাই যুক্তিযুক্ত। উদরঘটিত ব্যাপারে স্বাস্থ্য অশান্তি সৃষ্টি করবে। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে স্বাধীন মতামত ও অপ্রিয় সত্য কথা ব্যক্ত করা সম্পর্কে সাবধান। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

তুলা : এক ধরণের ভয়-ভাবনা ব মানসিক দুর্বলতা আপনাকে পেয়ে বসতে পারে। শরীরের দিকে নজর রাখুন। বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধদের বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। কাজের জন্য বিশেষ মর্যাদা বা স্বীকৃতি আশা করছেন, ততটুকু পাওয়া কঠিন এবং অপ্রত্যাশিত আঘাত পাবার সম্ভাবনা। আর্থিক দিক্ থেকে ভাল বলা চলে না। স্বাধীন প্রোফেশনে আয় হ্রাস পাবে। নূতন কাজে টাকা ঢেলে উদ্বেগ বাড়বে। চাকুরী ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক। কিন্তু চুক্তির কাজে নিয়মিত আয়ের পক্ষে বাধা আসতে পারে। রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। এখন থেকে সাত মাস বিশেষ লক্ষণীয়। প্রেম-প্রণয়ঘটিত ব্যাপার কুৎসা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। গুহ্যবিদ্যা ও তান্ত্রিক কার্যাদির মোহে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। বিবাহেচ্ছু তরুণী মেয়েদের

পাত্রনির্বাচনে সাবধান থাকা উচিত। নিকটস্থ আত্মীয় ও প্রিয়জন সম্বন্ধে উদ্বেগ যাবে। তুলা লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট, দেহকষ্ট এবং আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটতে পারে।

বৃশ্চিক ঃ পরিবেশ এমনই যে মানসিক উত্তেজনা ও অস্থিরতা বাড়বে। ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সাবধান। বাইরে কোথাও যাবার তাগিদ, আমন্ত্রণ ও যোগাযোগ আসতে পারে। ইঞ্জিনীয়ারিং কিংবা উচ্চ বিজ্ঞানে গবেষণার কাজে ইচ্ছুকদের ভারতের বাইরে সুযোগ পাবার সম্ভাবনা। যন্ত্রপাতি ও কল-কারখানার কাজে সুফল হবে। কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্য আঘাত লাগা কিংবা পড়ে গিয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ব্যবসায়ের প্রসারে ও নূতন কোনো কাজে হাত দিতে হলে এ মাসের শেষাংশ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভাল। চাকুরী ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কিছু ঘটতে পারে। স্পষ্টবাদিতা ও রূঢ় আচরণ সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। কোনো আত্মীয়া কিংবা বান্ধবী সম্পর্কে জটিলতা দেখা দেবার আশঙ্কা। মহিলা-জাতকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। চাকুরে মেয়েদের উন্নতির আশা আছে। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে যোগাযোগের দিক্ থেকে ভাল। শুক্র কিংবা বৃহস্পতির দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান।

ধনুঃ নূতন কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং নূতন যোগাযোগ বন্ধুলাভ এবং আর্থিক দিকে শুভ ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু আত্মসচেতনতা এবং মর্যাদাবোধের ওপর কারো আক্রমণ আপনাকে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে বাধ্য করতে পারে। তার ওপর চোখের ও পেটের গোলমালে কষ্ট দিতে পারে। পুরোনো কোনো ব্যাপার আবার নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ব্যবসায়ে আগের চেয়ে ভাল; কিন্তু নূতনভাবে বাড়াতে গিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়তে পারেন। জমি-বাড়ি নিয়েও গোলমাল হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকলে, তা নিয়ে অশান্তি ভোগের আশঙ্কা। চাকুরীপ্রার্থীর চাকুরী হতে পারে। পারিবারিক ব্যাপারে বার বার উদ্বেগ যাবে। মহিলাজাতকের পক্ষে উদ্যমে সাফল্য কিন্তু সন্তানসম্ভবাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। ধনু লগ্নে জন্ম হলে আয় বৃদ্ধির যোগাযোগ; কিন্তু পারিবারিক কারণে অশান্তি ভোগের আশঙ্কা।

মকর ঃ মাসের আট-দশদিনের পর ঈপ্সিত ব্যাপারে অনুকূল ইঙ্গিত পাবার সম্ভাবনা। বিরোধী শত্রুরা নিজেদের জালে নিজেরাই জব্দ হবে। রাজ-নৈতিক নেতা ও কর্মীদের পক্ষে এ মাস লক্ষণীয়। গুরুজনদের কারো পীড়াদি সংকট সৃষ্টি করতে পারে। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে নূতন সমস্যা দেখা দিতে পারে। নূতন ব্যবসায় ও ক্ষুদ্র শিল্প-উৎপাদনের জন্য কলকারখানা স্থাপনের ব্যাপারে যাঁরা উদ্যোগী তাঁদের অনুকূল। চাকুরী ক্ষেত্রে আগের বাধা দূর হতে পারে। গচ্ছিত অর্থাদি সম্পর্কে অশান্তি হবার আশঙ্কা। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের পক্ষে এমাস বিড়ম্বনা-সূচক। পত্রিকার মালিকদের সংকট যেতে পারে। গুপ্ত ব্যাপার প্রকাশ পাবারও আশঙ্কা। মহিলাজাতকের মাসের শেষাংশ অনুকূল নয়। শিরঃপীড়া ও পেটের যন্ত্রণা কষ্ট দিতে পারে। মকর লগ্নে জন্ম হলে প্রীতির প্রসার ও কর্মক্ষেত্রে নূতন সূচনা। কিন্তু তেইশ তারিখের পর পনেরো দিন বিশেষ সাবধান।

কুম্ভ ঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান। অসতর্কতা ক্ষতির কারণ হতে পারে। অন্যদের প্ররোচনায় কোনো কাজ করে অসুবিধায় পড়তে পারেন। দূরে কোথাও গিয়ে সংকটে পড়তে পারেন। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কারো পীড়াদি সংকট সৃষ্টি করতে পারে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকলে, তার ফল অনুকূল হবে না। ব্যবসায়ে নতুন সম্ভাবনা। কারো সহায়তায় নতুন প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর কাজে অগ্রণী হতে পারেন, চাকুরীপ্রার্থীদের পক্ষে অনুকূল। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা। সামাজিক ব্যাপারে জটিলতা ও উত্তরাধিকার-সূত্রতার ব্যাপারে অশান্তি দেখা দিতে পারে। বিবাহেচ্ছুদের এখন যোগাযোগের দিক থেকে অনুকূল। মহিলাজাতকের ভাবপ্রবণতা ও সন্দেহ-প্রবণতা দমন করে চলা উচিত। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে নূতন সুযোগ এলেও নিজের বিভ্রান্তিতে ফ্যাসাদ হতে পারে। বৃহস্পতি কিংবা মঙ্গলের দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান।

মীনঃ গোড়ার দিক উদ্বেগের মধ্যে যেতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। কাজের চাপও বাড়বে। চাকুরীস্থলে অপরের সমস্যা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষা বিভাগের প্রধানদের পক্ষে নূতন সমস্যা দেখা দিতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে অনুকূল বলা চলে না। মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুকূল নয়। নূতন কোনো ব্যবসায় করবারও যোগ আছে। মার্শারী ও পোলট্রির কাজে যাঁরা লিপ্ত, তাঁদের আকস্মিক ক্ষতি নৈরাশ্য আনতে পারে। দূরে কোথাও গিয়ে অসুবিধায় পড়তে পারেন। ব্যয়বাহুল্য ও ঝগড়া-বিবাদ অশান্তি আসতে পারে। জমি-বাড়ি কেনাকাটার ব্যাপারে এখন কোনো কিছু না করাই যুক্তিসঙ্গত। লেখক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের পক্ষে আগের চেয়ে ভাল। বিবাহেচ্ছুদের যোগাযোগের দিক্ থেকে ভাল। পরীক্ষার্থীদের কোনো সুখবর পাবার মতো যোগ। মীন লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

অতি গোপন

CIBA Cosmetics

একমাত্র নতুন **বিনাকা টপ** এমন একটি গোপন সম্প্রসারণশীল উপাদান দিয়ে তৈরী যা টুথপেষ্টকে আপনার মুখের গুপ্ত আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিয়ে লুক্কায়িত জীবাণুর সাথে সংগ্রাম করে। ফলে আপনার মুখের স্বাস্থ্য বজায় থাকে—মুখ সারাদিন পরিস্কার ও তাজা থাকে।

প্রমাণ আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। ল্যাবরেটারীর পরীক্ষা আজ বাড়ীতেই করে দেখুন

কাঁচের পাত্রে জল ঢালুন আর তাতে কাঠ কয়লা বা রঙীন কোন গুঁড়ো জলের উপর ছিটিয়ে দিন।

বিনাকা টপ সামান্য জলে মিশিয়ে, তার এক ফোঁটা কাঁচের পাত্রের জলের মধ্যখানে ফেলুন।

আপনি স্বচক্ষে দেখবেন, বিনাকা টপ কি ভাবে ঝটপট চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ময়লা পরিষ্কার করে এবং পিছনে রেখে যায় স্বচ্ছ পরিশ্রুত অঞ্চল।

Bi Binaca

new

Toothpaste top

বিনাকা টপ... মুখের পূর্ণ পরিচর্যার গোপন কথা।

mcm/ciba/150a/bn
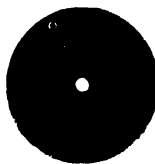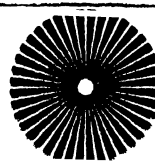
॥ আমাদের প্রকাশিত উপন্যাস ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বেণীসংহার ৪·০০
শজারুর কাঁটা ৪·০০
তুঙ্গভদ্রার তীরে ৬·০০
বহু যুগের ওপার হতে ৩·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
অমাবস্যার গান ৩·০০

রবি গুহ মজুমদারের
মানুষ দেবতা হবে না ৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
রূপসী রাত্রি ৬·০০

বুদ্ধদেব গুহর
নগ্ন নির্জন ৪·০০
হলুদ বসন্ত ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
ঘুণপোকা ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর
পরাজিত সম্রাট ৪·০০
বনপলাশির পদাবলী ৮·৫০

প্রফুল্লকুমার সরকারের
লোকারণ্য ৪·০০
ভ্রষ্টলগ্ন ২·৫০

সন্তোষকুমার ঘোষের
জল দাও ৩·৫০

সুশীল রায়ের
অদ্বিতীয়া ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
লোকটা ৩·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
প্রতিধ্বনি ফেরে ৪·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
সারারাত ৫·০০
মনের মানুষ ৩·০০

॥ আমাদের প্রকাশিত গল্প ও নাটক ॥

বুদ্ধদেব বসুর
পুনর্মিলন (নাটক) ৪·০০
কালসন্ধ্যা (নাটক) ৩·০০
কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যসন্ধ (নাটক) ৫·০০
তুমি কেমন আছো (নাটক ও গল্প ৬·০০
তপস্বী ও তরঙ্গিণী (নাটক) ৩·০০

সুশীল রায়ের
সামান্য-অসামান্য ৫·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সন্ধ্যারাগ ৫·০০
ময়ূরী ৩·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
হুঁহারা ৭·০০

সুবোধ ঘোষের
ভারত প্রেমকথা ৭·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উত্তম মধ্যম ৫·০০
কল্প কুহেলি ৮·০০
ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন ৪·০০
ঘরণী যখন তরুণী ছিল ৪·০০
শঙ্খকঙ্কণ ২·৫০
কহেন কবি কালিদাস ৩·০০

বিমল মিত্রের
নিশিপালন ৬·০০
প্রেম পরিণয় ইত্যাদি ৭·০০

বিমল করের
আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন ৪·৫০

রূপদর্শীর
ব্রজদার গুল্প-সমগ্র ৬·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রেমের গল্প ৪·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
হর্ষবর্ধন নিতানূতন ৪·০০
ভালোবাসার অনেক নাম ৬·০০
ঘরণীর বিকল্প ৩·০০
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
লোকরহস্য ৫·০০
প্রেমের গল্প ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
সাগিনা মাহাতো ৪·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
আগ্রা যখন টলমল ৪·০০
পঞ্চশর ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রেমের গল্প ৪·০০
তিন শূন্য ৩·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯
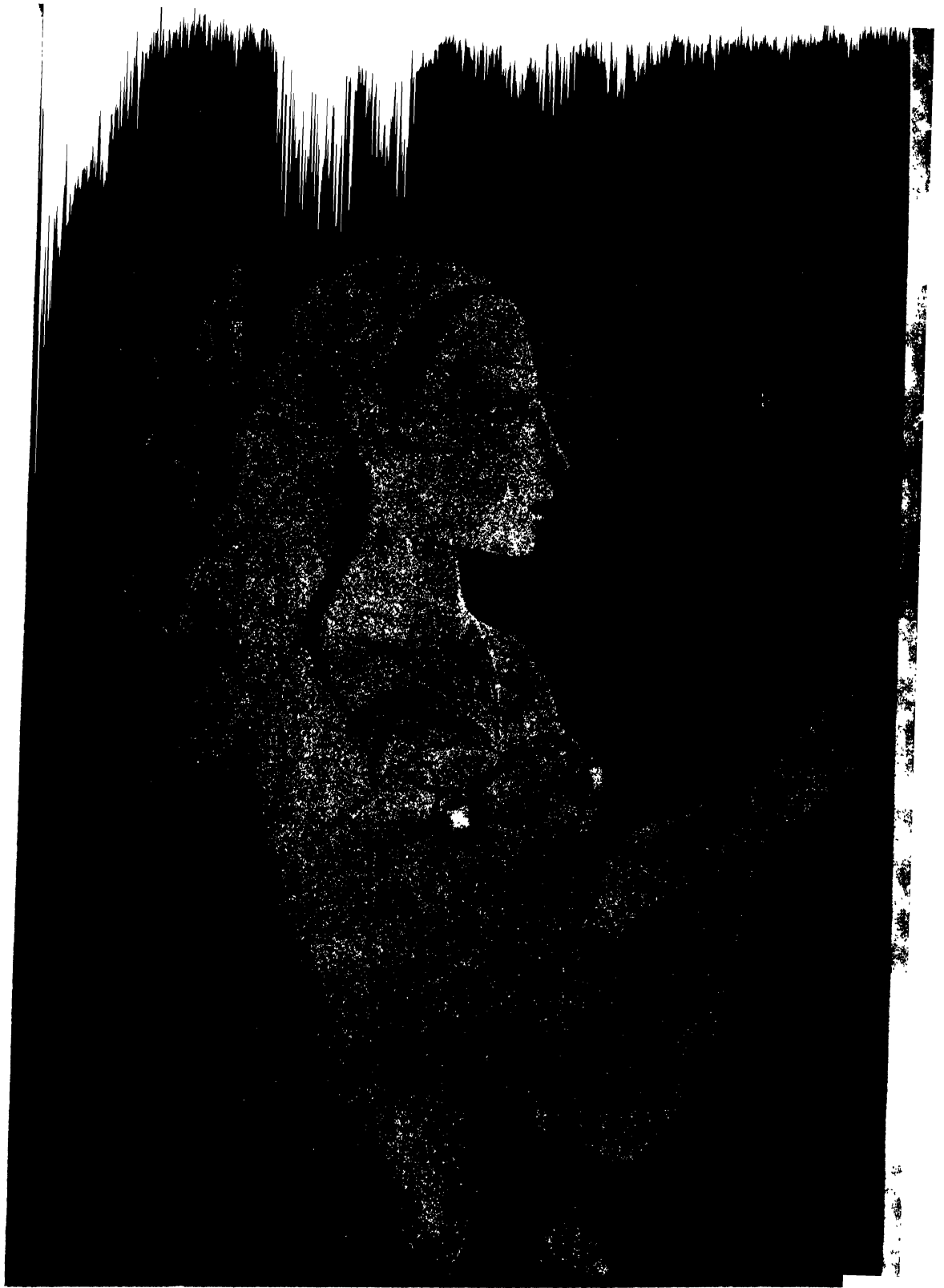
প্রার্থনা

—শ্রীসাধন সেন অঙ্কিত

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীঅমিয়নাথ সেনগুপ্ত (বিলাসপুর), (১) ব্যবসা করুন, (২) উৎকৃষ্ট রক্তমুখী প্রবাল আট রতি রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখুন। ●শ্রীকানাইলাল খাঁ (কনকাবতী), পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না। ●শ্রীনবগ্রহ দাস (শ্রীহট্ট), (১) সরকারী, (২) আট রতি গোমেদ ও তিন-চার রতি কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই ●শ্রীনিমাইচরণ চ্যাটার্জী (বকুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া), (১) পাঁচ বছর পর মোটামুটি অনুকূল অবস্থা, (২) পড়াশোনার চেষ্টা করুন। ●শ্রীহিমাংশুশেখর কুলভি (খড়গপুর, দেড় বছর বিশেষ ভাল নয়। জন্মকালে শনি ও মঙ্গলের অবস্থান বিশেষ ক্ষতিকর। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। ●শ্রীহরিদাস মুখার্জী (মদনপুর, নদীয়া), নাম অনুযায়ী কুম্ভ রাশি হতে পারে। আগামী নবেম্বরের পর বর্তমান অবস্থার কিছু পরিবর্তন হবে। ●শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস (ড্রাইভারটোলা, কাটিহার,) (১) এই বাংলা বছরে সম্ভাবনা কিন্তু এখনো এক বছর নানা বাধা। (২) ব্যবসায়ের যোগ আছে। ●শ্রীমতী যূথিকা চৌধুরী (একডালিয়া রোড, কলিকাতা), (১) শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যাপার মাঝে মাঝে অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। এখনো চার বৎসর বিশেষ সাবধান। (২) আট রতি গোমেদ ও আড়াই থেকে সাড়ে তিন রতি কৃষ্ণাভ ক্যাটস আই রত্ন শাস্ত্রসম্মতভাবে ধারণীয়। ● শ্রীবুদ্ধদেব সিংহবর্মা (মুর এভিনিউ, কলিকাতা), (১) চন্দ্র ও বুধের অবস্থা শুভকর নয়, (২) লটারীতে হবার যোগ দেখি না। ●শ্রীকৃষ্ণ সাহা (ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি), (১) হবার সম্ভাবনা আগস্ট পর্যন্ত, (২) মোটামুটি ভাল হবে। ●শ্রীভাগবতপ্রসাদ রায় (বাকুলিয়া, বাঁকুড়া), (১) বৃশ্চিক লগ্ন, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র, ধনু রাশি, ক্ষত্রিয় বর্ণ ও নরগণ, (২) এখনো চার বছর উৎপাতসূচক। ●শ্রীনীরেন্দ্র পালচৌধুরী (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি), (১) ভাল, (২) বর্ষকাল ধৈর্য ধরতে হবে। ●শ্রীমতী চন্দনা চৌধুরী (অবধায়ক : শ্রীপি, কে, চৌধুরী) রাজা বসন্ত রায় রোড, কলি), (১) আগামী বাংলা নূতন বছরে এবং ভাল জায়গায়, (২) মোটামুটি ভাল কিন্তু কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই রত্ন আড়াই থেকে সাড়ে তিন রতি ধারণীয়। ●কুমারী আশাবরী (ধলভূম রোড, জামসেদপুর), (১) সম্ভাবনা আছে, (২) ভাল। ●কুমারী শিবানী (ধলভূম রোড, জামসেদপুর), (১) হবে, (২) গীটারে যশ ও কাজ হবে।। ●কুমারী লতা (জামসেদপুর) (১) এ ব্যাপারে সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন। চার-পাঁচ রতি পান্না সোনার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) মোটামুটি চলনসই। ●শ্রীঅ-কু-ব (মাধবপুর, ডায়মণ্ডহারবার), (১) মোটামুটি দাম্পত্য জীবন ভাল, (২) নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এখনো সতর্ক হয়ে নিয়ম পালন করা উচিত। ●শ্রীএ, কে, সামন্ত (দাশনগর), (১) নিজের মনকে দৃঢ় করুন; গল্প-কবিতা প্রভৃতি লিখতে চেষ্টা করুন, (২) যদি সম্ভব হয় প্রতি

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম---

ঠিকানা---------------------------------------

—মাসিক বসুমতী—

দিন কচি কলাপাতায় আঠারোবার লাল কালিতে নিজের নাম লিখে দেখুন। শাঁখের আংটি ধারণ করতে পারেন। ●অমলচন্দ্র ব্যানার্জী (ফার্টি-লাইজার কলোনী, পর্বতপুর, আসাম), (১) চাকুরী হবে, (২) তিন বছর পর স্থায়ী পরিবর্তন। ●শ্রীললিতমোহন সিংহ (বি, বরুয়া কলেজ, গৌহাটী), কন্যা রাশি হবে, (২) এক বছর ধৈর্য ধরে চলুন। ●শ্রীহীন সিন্হা (মুখার্জী লজ, মুর্শিদাবাদ), (১) পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না, (২) স্বজাতি নয় এবং বিদেশ যাবার সম্ভাবনা বত্রিশ বর্ষ বয়সের আগে দেখি না। ●শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি (তমলুক), বসুমতীর কুপন ছাড়া উত্তর দেওয়া হয় না। প্রেরিত কুণ্ডলী-গুলোর প্রথমটি শুদ্ধ। বিশুদ্ধ মতে গণনাই গ্রাহ্য। ●শ্রীমৃণালকান্তি ভট্টাচার্য (পানিতোলা, লখীমপুর), (১) শুক্রের দশাকাল শুভ নয়। জন্মকালে চন্দ্র অশুভ, (২) চাকুরীর চেষ্টা করুন। কিন্তু চার বছর সব কাজে সাবধান। সম্ভব হলে তিন রতি মুক্তা ও আট রতি গাঢ় লাল পলা ধারণ। ●শ্রীদীপককুমার পাত্র (শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলি), (১) নানাভাবে পড়াশোনা বা উন্নতির পথে এখন বাধার যোগ। তবু আগামী জুলাই থেকে কিছু ভাল হতে পারে, (২) স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। প্রতিকার জন্য মুক্তা তিন রতি ও লাল চুণী তিন রতি সোনায় ধারণীয়। ●শ্রীমতী খেয়া রায় (পূর্ব পল্লী, শান্তিনিকেতন), (১) চলনসই, (২) উভয়ের কোষ্ঠি বা জন্মকুণ্ডলী না দেখলে বলা সম্ভব নয়। আপনার কোষ্ঠি এদিক দিয়ে দুর্বল। ●শ্রীদেবব্রত মুখার্জী (বিধান সরণি, কলি) (১) আরো এক বছর দেখুন, (২) ছাব্বিশ বর্ষ বয়স থেকে। ●শ্রীনিখিলকুমার বিশ্বাস (ভূপেন রায় রোড, বেহালা) (১) উচ্চশিক্ষার যোগ কিন্তু দেড় বছর অন্য সমস্যা ভিন্ন পথে নিতে পারে, (২) লটারীতে প্রাপ্তি নেই; বাড়ীঘর এখন হবে না। রক্তমুখী নীলা সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ রতি যথাশাস্ত্র ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীতুষারকান্তি দে (ধাড়সা, সাঁত্রাগাছি) (১) অনেক গ্রহই গোলমেলে অবস্থায়। তার উপর এখন শনির দশা চলছে, (২) দ্বাদশস্থ দেহপতি বুধের জন্য তিন-চার রতি পান্না সোনার আংটিতে এবং পাঁচ-ছয় রতি ইন্দ্রনীল রূপার আংটিতে। প্রথমটি সোনায় ডান হাতের অনামিকায় এবং দ্বিতীয়টি ডান হাতের মধ্যমায় যথাবিধি পরীক্ষা ও শোধনাদি করে ধারণীয়। ●শ্রীবিবেক-কুমার সাহা (নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলিকাতা), (১) হবে, (২) চাকুরীতে। কিন্তু সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়সে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে। ●শ্রীআর, কে, ঘোষাল (ফিডার রোড, কলি) (১) বর্তমান ইংরেজী বৎসরের শেষাংশে উন্নতিশীল পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু তিন বছর নানাভাবে শরীর, মন ও অর্থের ওপর চাপ থাকবে। এর উপর কর্মক্ষেত্রে আশাপ্রদ হওয়ায় উপকার পাবেন। ●শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (কালিচরণ শেঠ লেন, কলি), সীসক এবং তামার আংটি। একতোলা পরিমাণ সীসক রুদ্রাক্ষের মত গোলাকারে সুতো দিয়ে ডান বাহুতে এবং তামা এক তোলার আংটি ডান হাতের অনামিকায়। ●শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দে (কেদার ভট্টাচার্য লেন, সাঁত্রাগাছি), (১) শনি ও মঙ্গলের একত্র অবস্থান অত্যন্ত বিরুদ্ধ। এ অবস্থায় শুধু অপরাজিতা নীলায় চলবে না। এর সঙ্গে রক্তমুখী প্রবাল নয়-দশ রতি আবশ্যক, (২) শনির দশায় গোড়ার সাত বছর ভাল যাবে না। রত্ন ধারণ করলেই যে উপকার হবে, তা সব ক্ষেত্রে ঠিক নয়।। ●শ্রীপথিক (গৌহাটী, আসাম), (১) পান্না ধারণে কোনো উপকার হবে না। বরং গোমেদ আট-নয় রতি ধারণ করা চলে, (২) বিশেষজ্ঞ অ্যালোপাথ চিকিৎসক দেখান এবং এক্স-রে করে ভেতরটা পরীক্ষা করান, তারপর চিকিৎসা। রত্ন হিসাবে উৎকৃষ্ট পীত পোখরাজ আট-নয় রতি সোনার আংটিতে ধারণ করা চলে। ●শ্রীমিহির বসু (ওয়ালটেয়ার পার্ক, বিশাখাপত্তনম), (১) আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে, (২) ডিসেম্বর থেকে দেড় বছর মধ্যে হবার সম্ভাবনা। ●শ্রীমৃণাল রায়চৌধুরী (তুলিষা চা বাগান, দরং) (১) ধনু রাশি ও নরগণ এবং বৃহস্পতি তুঙ্গী, (২) শনির কুপ্রভাব পড়ছে। তারজন্য দক্ষিণা কালিকা কবচ কিংবা রক্তমুখী নীলা সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ রতি যথাবিধি শোধনাদি করে ধারণীয়। ● কুমারী স্মৃতি দত্ত (কানাই ধর লেন, কলিকাতা), (১) কুম্ভ লগ্ন, মেষ রাশি, অশ্বিনী নক্ষত্র ও দেবগণ; (২) মঙ্গলের কুপ্রভাব দূর করার জন্য আট-নয় রতি রক্তমুখী অর্থাৎ গাঢ় লাল প্রবাল আট-নয় রতি রূপার আংটিতে ধারণীয়। ●শ্রীসুশীলকুমার দে (বি, এল, গাঙ্গুলী লেন, কলি) (১) সময় এখনো প্রতিকূল তবু আগামী জুলাই থেকে কিছু অনুকূল হবে এবং ছয় মাস মধ্যে হতে পারে, (২) প্রতিকার জন্য প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে ছয়টি করে বেলপাতা জলে ভাসিয়ে দিয়ে দেখুন। ●শ্রীবেণু রায় (ডিগবয়, আসাম) (১) আগামী ইংরেজী বছরের গোড়ার দিকেই কিছু ভাল হবে। কিন্তু এখনো চার বছর মাঝে মাঝে উৎপাতসূচক, (২) পরবর্তী সময় মোটামুটি ভাল। আট রতি গোমেদ ও আড়াই থেকে সাড়ে তিন রতি কর্ণকক্ষেত্র ক্যাটস আই রত্ন উপকার দিতে পারে। ●শ্রীদীননাথ সাহা (জি, টি, রোড, হাওড়া), আগামী মাস পর্যন্ত বিশেষ ভাল নয়। ●শ্রীবিষ্ণু-কুমার আদিত্য (কবি ভরতচন্দ্র রোড, কলিকাতা), (১) সম্ভাবনা নেই. (২) দেড় বছর পর। ●শ্রীদিলীপকুমার দত্ত (মালুগ্রাম, শিলচর) (১) সাড়ে চব্বিশ বর্ষ বয়সের মধ্যে সরকারী কাজ হতে পারে, (২) বিদেশযাত্রার যোগ এখন নেই। আট রতি পীত পোখরাজ সোনার আংটিতে ও আট রতি রক্তপ্রবাল রূপার আংটিতে ধারণীয়।

প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র

(জনৈক বিপ্লবীর জীবনকাহিনী)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

উভয় জমিদারের নিকট হরকুমারের অবারিত দ্বার থাকিলেও তাঁহার সম্বন্ধে তাহাদের ত্রাসেরও অন্ত ছিল না। হরকুমার অকারণে জমিদারদের সঙ্গে বেশী ঘেঁষাঘেঁষি করিতেন না। তাঁহারও ভয় ছিল পাছে বেশী ঘনিষ্ঠতার ফল অন্যরূপ দাঁড়ায়। আর তাহা ছাড়া তিনি যখন শক্তপর্যায়ভুক্ত তখন অতটা মাখামাখিই বা কিসের জন্য। সেইজন্যই তাঁহার চাল-চলন ও গতিবিধি ছিল নানা প্রকারের। বিশ্বনাথ বলিয়া তাঁহার অপর একটি নামও ছিল এবং উক্ত অঞ্চলে তিনি "বহুরূপী" বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

প্রতিবেশীদের আপদ - বিপদে, তাহাদের জন্য নানাভাবে স্বার্থত্যাগ করিয়াও তাঁহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। সেই আঘাত আসিয়াছিল তাঁহার জ্ঞাতিভাইদের নিকট হইতে। তাহাদের সঙ্গে তাঁহার জমি-জমার একটা ভাগ - বাটোয়ারা বা হিসাব - নিকাশ চুকাইয়া লইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার জনপ্রিয়তাই তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার স্বজনরা তাহা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। নানাভাবে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার উপায় খুঁজিতেছিল। এমনকি একদিন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে রাত্রিকালে তাঁহার গোয়ালঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। গৃহস্থালী ও গবাদি সহ তাঁহাদের গৃহস্থ পরিবারটি সেইদিনই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতো যদি না হরকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র তরুণ রামকুমার পূর্বেই টের পাইয়া চীৎকার করিয়া বাটীস্থ সবাইকে জাগাইয়া নিজের দুই অনুজকে সঙ্গে লইয়া অসীম সাহসের সঙ্গে গরুগুলির বাঁধন খুলিয়া দিত, তাহাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি সেইখানেই যবনিকাপতন হইত। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় রহিয়া গেল যে সেই রাত্রি হইতে বিশ্বনাথকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ কখনও দেখে নাই। একটি অভিশপ্ত জীবন।

দণ্ডপাণি

এইরূপ মর্মান্তিক ঘটনা সেইদিন রামকুমারের হৃদয়ে কিরূপ রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারিব না। তবে তাঁহার ধীর, স্থির ও শান্ত স্বভাব সেইদিন সহজভাবেই সে তাই গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেও পিতার ন্যায় জননীর স্নেহচ্ছায়াতলে দিন গুণিতে লাগিল। জননী তাঁহাকে সেদিন তাঁহার পিতৃপুরুষদের শৌর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সাহসে ভর করিয়া জীবন-সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইতে উপদেশ দিলেন। এইটুকুই তাঁহার পক্ষে সেইদিন যথেষ্ট ছিল।

পিতা নিরুদ্দিষ্ট হইবার পূর্বেই রামকুমারকে বিবাহ করাইয়াছিলেন। কথায় বলে 'স্ত্রীভাগ্যে ধন'। হইল ও তাহাই। অল্পসময়ের মধ্যেই রামকুমার বিষয় সম্পর্কে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেন। পিতার পক্ষে যাহা সম্ভব হয় নাই অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করা। তাহাই তিনি সম্পন্ন করিয়া লইতেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ চলার পথেও কর্মপন্থা নির্ধারণের দিক হইতে ইহা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। সমস্ত বিরোধেই যে একটা আপোষ মীমাংসায় পৌঁছাইতে চেষ্টা করে, ইহাই তাঁহার মস্ত গুণ। এই সদগুণ তাঁহাকে তাঁহাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক হইল।

বিবিধ বিরোধ-মীমাংসায় তাঁহার ডাক পড়িত এবং তাঁহার যুক্তি ও পরামর্শ সংগত বলিয়া সবাই মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিত না। প্রতিবেশীদের নিকট সে ভাগ্যবান বলিয়া কথিত ছিল। কেন-না, তাঁহার স্ত্রী ছিল খুবই সুশ্রী ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী। পত্নীর বুদ্ধিমত্তার কাহিনীও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে তাহার সুখ-সমৃদ্ধির পশ্চাতে কোন এক অদৃশ্য হস্ত এমনভাবে কাজ করিয়া চলে যে, সে তাহার কোন কিছু হদিসই করিতে পারে না। সেইজন্যই ঘোরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। হয়ত মানবজীবন মনুষ্যত্ব পরীক্ষার একটা বিরাট ক্ষেত্রস্বরূপ বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

রামকুমার সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান পুরুষ। বিষয়-আসয়ও মধ্যম রকমের। তাঁহারা একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার। পারিবারিক মর্যাদা ও খ্যাতি-সম্পন্ন। ঘরে সতী সাধ্বী স্ত্রী। কনিষ্ঠ দিনমণি ও নবীনকুমার সঙ্গীতজ্ঞ, সন্ন্যাসী ও অকৃতদার, সেতো দশজনের একজন। তাহার অভাব কিসের। অধিকন্তু সে একজন মানী লোক। জমিদারদের প্রতিপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সে প্রতিভাবান। শেষ পর্যন্ত ইহাই তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়াইল।

সেইবার বর্ষায় গোমতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভয়ানক ঢল নামিল। খালের জল হুড়হুড় করিয়া গ্রামের দক্ষিণাংশের বরদাহাতীর চালু জমিতে প্রবেশ করিয়া আইচাই করিতে লাগিল। বাহির হইবার পথ নাই। ধানের ডগাগুলি জলের তলে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ঢেউয়ের পাহাড় খেলিতে লাগিল। সে এক নিদারুণ দৃশ্য। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে প্রবাহিত খালের উভয় তীর উচ্চ বলিয়া ঢলের জল বাধা পাইয়া বরাবর দক্ষিণদিকে স্ফীত হইয়াছে। এখন উপায়? সমস্ত গ্রামব্যাপী হাহাকার লাগিয়া গেল। গঙ্গা মণ্ডলের মনিব জমিদার খবর পাইয়া উল্লসিত হইলেন এবং ভ্রূকুটি করিলেন। এইবার বরদাহাতীর ভরাডুবি। আর যায় কোথা।

অবস্থা দেখিয়া রামকুমার স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাইদের সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে গ্রামবাসীদের সহায়তায় মণ্ডল মনিবদের অধিকৃত খালের দক্ষিণ তীরের উচ্চ ভূমিতে খাদ কাটিয়া বিভিন্ন খাতে ঢলের জল প্রবাহিত করিয়া দিলেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। দেখিতে দেখিতে দিবাশেষে এক-তৃতীয়াংশ জল নামিয়া গেল। ধানের ডগায় তখন অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবং পার্শ্বস্থিত গ্রামবাসীদের মুখে আনন্দের হাসি। জানি না অন্তর্যামী সেইদিন রামকুমারের বিধিলিপিতে কি লিখিয়া রাখিলেন। তবে ঢলের পর যে ঝড় আগতপ্রায় তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

সেইবারের মত গ্রামবাসীদের বিপদ কাটিল বটে, কিন্তু রামকুমার মণ্ডল মনিবদের আপদস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। যদিও বরদা দেবীর কৃপায় দেহাতী মালিকদের খামারে পুরস্কার-স্বরূপ রামকুমারের ভাগ্যে সামান্য কিছু চাষের জমি অল্প খাজনায় সঞ্চিত হইল। তাহা হইলেও, তাঁহার মন একটা অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত রহিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন ইহা না হইলেই ভাল হইত। কিন্তু উপায় ছিল না।

এই ঘটনার পর হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, যে, জমিদার — তালুকদাররা বিত্তবান হইতে পারেন বটে এবং সেই বৈভবে প্রতিপত্তির বড়াই ও দাপট থাকিলেও রায়ত-প্রজা বা গ্রামবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করা আলাদা জিনিষ। একমাত্র জনসেবা-মূলক কাজেই সেই সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। এই ধনে যে ধনী হইতে পারে তাহার মর্যাদা অন্যরূপ। জমিদাররা অনেক ব্যাপারে অপদার্থ হইলেও তারা শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া সেই মর্যাদার কদর বুঝিতেন। আর বুঝিতেন বলিয়াই প্রকাশ্যে রামকুমারের মত লোকদের উপর হামলা করিতে উদ্যোগী হইতেন না। তবে নায়েব-গোমস্তাদের নিষ্ঠুরতার ছিঁটে-ফোঁটা তাঁহাদের পেরেসানী দিত এটা ঠিক। নানারূপ সাজানো বা বানানো কাহিনী দ্বারা চরিত্র হনন করার ব্যবস্থার অভাব ছিল না। আজগুবী ঘটনার কথা প্রচার করিতে যেমন বেশী সময় লাগিত না, তেমনি সাধারণ গ্রামবাসীকে ধোঁকা দিতেও বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না। আর এইসব উদ্ভট ঘটনা বিশেষভাবে নারীঘটিত ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইত। তারপর জনশ্রুতিকে উপলক্ষ করিয়া গৃহস্থের ঘর ভাঙ্গিতে বা পোড়াইতেও যেমন সময় লাগিত না, তেমনি ঘর বসাইতেও সময়ের অপেক্ষা রাখিত না। সেইদিক হইতে রামকুমারের দুর্ভাগ্য না ঘটিলেও দেহাতী সম্পত্তি তিনি কোনদিনই ভোগ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ একদিকে মণ্ডল মালিকদের সংলগ্ন জোতের প্রাধান্য। অপরদিকে তাঁহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ঈর্ষাপরায়ণতার দরুন। অবশ্য এই দিককার নেতিবাচক সমস্যা তাঁহাকে তেমন উদ্বিগ্ন করিতে পারে নাই। কারণ তিনি তাহা পূর্বেই আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন। তবে তাঁহার সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হইয়াছিল তাঁহার স্বজনদের অসৌজন্যমূলক মনোভাব লক্ষ্য করিয়া। তাঁহাকে বে-ইজ্জৎ করিবার জন্য তাঁহার সম্পর্কিত ব্যক্তিরা মণ্ডল-মনিবদের মদৎ দিতে কার্পণ্য করে নাই। বিনিময়ে তাহারা যে অনুগৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না।

রামকুমারদের অনল্প ফলন সম্পত্তি তাহারা নিজেরা কোনদিনই স্বহস্তে চাষবাস করিতেন না। ভূমিহীন গ্রাম্য কৃষকদের দ্বারাই তাঁহারা চাষ-আবাদ করিয়া লইতেন। তবে নিজেদের জমি তদারক বা রক্ষণাবেক্ষণ নিজেরাই করিতেন। লাঙ্গল বা মইয়ে নিজেরা হাত না লাগাইলেও অন্য সব যাবতীয় কার্যে কোনরূপ অবহেলা করিতেন না। চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কের ফলে নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিত। গ্রাম্য গৃহস্থ পরিবারদের সকলেরই প্রায় এই অবস্থা ছিল। বহুকাল হইতেই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল বলিয়া নমঃশূদ্র ও পরবর্তী কালে দরীদ্র মুসলমানরাই চাষের কাজ করিয়া আসিতেছিল। নিজেদের চেষ্টা-চরিত্রে বা ভূস্বামীদের অনুকম্পায় তাহাদেরও উন্নীত হইতে দেখা গিয়াছে। সামাজিক বৈষম্য এই উন্নয়নে তেমন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে নাই।

তবে জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বিক্ষিপ্ত মনোভাব গ্রাম-বাসীদের মধ্যে তুষের আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছিল। বিশেষ

অধিকারপ্রাপ্ত ব্যবস্থায় জমিদারদের আর্থিক প্রাচুর্যহেতু বিলাসব্যসন ও উদ্ধত মনোভাব, কারণে-অকারণে মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার হরণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ ধীরে ধীরে তাহাদের সমাধি রচনা করিতেছিল। বংশগত তিতিক্ষা ও প্রাখর্য রামকুমারের মধ্যে ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল বলিয়াই তাঁহার বলিষ্ঠ মনোভাব কোনরূপ দাম্ভিকতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে দেয় নাই। তাঁহার মর্যাদাই ছিল তাঁহার নিকট সর্বস্ব। আর ইহাই সেদিন তাঁহার কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল। পল্লীবাসীর মনোরাজ্যে তিনি সাম্রাটের আসন অধিকার করিলেও বৈষয়িক ব্যবস্থায় একান্ত নিঃসঙ্গ—ইহাই তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

বঙ্গজ কায়স্থরাও একদিন নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিত। যদিও কায়স্থর আভিধানিক অর্থ রাজকর্মচারী বিশেষ, তাহা হইলেও দিনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আইন, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, দোকানদার, লেখক প্রভৃতি বৃত্তিতে সেইদিন পরিব্যাপ্তি লাভ করিতেছিল। আজও সেইরূপ চলিয়াছে। কৌলীন্য প্রথার ফলে উপজীবিকায় উপাধিক রক্ষণশীলতা খানিকটা রক্ষিত হইলেও, সাধারণ কায়স্থদের মধ্যে নিম্নস্তরের লোকেরা অনায়াসেই প্রবেশলাভ করিতেছিল। গোত্রভেদ গোত্রান্তরকে সেইদিন কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। সামাজিক পরিবর্তন নির্দিষ্ট পথ ধরিয়াই চলে। ভাঙা-গড়ার মধ্যেই সমাজ-জীবন প্রবর্তিত হইয়া থাকে। তাহাতে ব্যক্তি পরিবার বা গোষ্ঠীর ব্যবহারিক জীবনেও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। নামের পদবী পরিবর্তনে যেমন দেরী হয় না, তেমনি তাহার পৌরাণিক আভিজাতিক অংশগুলিরও অপভ্রংশ হইতে সময় লাগে না। তাই ইতিমধ্যে ধূর্জটি শিব হইয়া গিয়াছে। কুমাররা-মোহন—মোহনচন্দ্র হইয়াছে। গোবর্ধন হইয়াছে গোধন। এমনি অনেক কিছু। সিংহ দেওরাও তেমনি দেব-এর আকার গ্রহণ করিয়াছে। এই পরিবর্তনের মুখে শুধু তারাই নয়, জমিদার পরিবাররাও রেহাই পায় নাই।

সেইবার মণ্ডল জমিদারদের বড় হিংসার পূজা। দশ আনি অংশের আবাহন। সুতরাং আয়োজনের অন্ত নাই। দশ গ্রামের প্রতিবেশী মহাজন ব্যক্তিদের কেহই বাদ পড়িবার কথা নয়। দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। নাটমন্দিরে পর্দার আড়ালে দেয়াল ছোঁয়া প্রতিমার অবয়ব অভিনব আকারে অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। দেবীপ্রতিমার চক্ষুদান অন্তে মহাষষ্ঠীর মহালগ্নে বিভাজনদের উপস্থিতির মধ্যে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন হইল। পাঁচদিনব্যাপী সমারোহে নিমন্ত্রিত ও রবাহূতদের মধ্যে প্রাচুর্যের অভাব পরিলক্ষিত হইল না।

নিম্নলিখিত হরকুমার দে'র বংশ তালিকাই তাহার সাক্ষ্য বহন করে।

হরকুমার (বিশ্বনাথ) সিংহ দেও
|
রামকুমার দিনমণিকুমার নবীনকুমার দেব
|
গোবিন্দমোহন প্যারীমোহন রাজমোহন দে
|
বীরেন্দ্রচন্দ্র দে

[ক্রমশ।

মেয়েদের কাজ / কাজের মেয়ে

মেয়েরা কতখানি কেজো? দৈহিক পরিশ্রমে তাঁরা কতটা পটু? খাটতে কি ইচ্ছুক না অনিচ্ছুক?

পুরুষের মতন তাঁরা সুদক্ষ নন ঠিকই, তবে অনেক বেশি সময় ধরে একনাগাড়ে একঘেঁয়ে কাজ করতে ক্ষম। রান্নাবান্না, অন্যান্য দৈনন্দিন পারিবারিক সময় সাপেক্ষ টুকিটাকি কাজ তাঁরা ক'রে থাকেন। পুরুষের তুলনায় শারীরিক পরিশ্রম কম করতে পারেন—ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পুরুষের মতনই পাত্রী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

একনাগাড়ে কাজ করার সময় তাঁরা দিবাস্বপ্ন দেখার সুযোগ পান, এবং দিবাস্বপ্ন মেয়েদের জীবনে প্রয়োজনীয় বলেই সাধারণ্যে বিশ্বাস প্রচলিত।

মেয়েরা পুরুষের তুলনায় বেশি সাবধানী, অধিকতর মিতব্যয়ী (নিজেদের শাড়ি-গয়না-প্রসাধন বাদ দিয়ে?) কিন্তু ঢের বেশি ঈর্ষাপরায়ণ এবং ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে কলহপটু, নিদেন অভিযোগপ্রবণ। শিক্ষার তারতম্য এ ব্যাপারে পার্থক্য ঘটায়। মেয়েদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস তৃপ্তিদায়ক পারিবারিক পরিবেশ; এবং ঠাট্টা-তামাসার মাধ্যমে এঁদের অনেক আপাত দুরূহ কাজে পর্যন্ত নিযুক্ত করানো যায়।

এঁরা স্বজাতির তুলনায় পুরুষের অন্য কাজ করা বেশি পছন্দ করেন।

খেলাধূলা

খ্যাতনামা দুই এ্যাথলেট

আজ বিশ্বের এ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আমেরিকার স্থান সর্বাগ্রে। গত দু'টি অলিম্পিকের কথা যদি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে ১৯৬৪ সালে রাশিয়া সর্বাধিক পয়েণ্টের জোরে শীর্ষস্থান পেলেও আমেরিকা পয়েছিল সর্বাধিক স্বর্ণপদক। মোট ৩৬টি। ১৯৬৮ সালেও পদক জয়ের তালিকায় আমেরিকা শীর্ষস্থান দখল করেছে। আর রাশিয়ার ছিল দ্বিতীয় স্থান। উভয়ে পদক দখলের অধিকারী যথাক্রমে ১০৬ এবং ৯১। আমেরিকার এই সাফল্যের মূলে শুধু সরকারের আর্থিক আনুকূল্য বা সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাই নয়, সেই সঙ্গে প্রতিটি এ্যাথলেটের মনের মধ্যে আছে যেমন নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং সংযমী মনোভাব, তেমনি আছে তাদের দৈহিক পটুতা, কোচের প্রতি অবিচল আস্থা এবং নিয়মানুবর্তিতা। তাই সে সব দেশ আজ খেলাধূলার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উন্নতির পথে। আর ভারত দিনের পর দিন অর্জিত সম্মানকে বিদেশের মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে আসছে। তাকে বর্ধিত করার ক্ষমতা নেই, তাকে ধরে রাখারও শক্তি থেকেও বঞ্চিত। ক্রীড়ামানের দিনের পর দিন অবনতি ঘটছে। যে হকিতে ভারত বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল, আজ সেখানেও সে সিংহাসন-চ্যুত। এ্যাথলেটিক্সের কথা না বলাই ভাল। মেক্সিকো অলিম্পিকের পর অন্যান্য দেশ যখন কোন-না-কোন বিষয় নিয়ে বড়াই করে বেড়াচ্ছে, ভারত তখন নিজস্ব কুকীর্তির মূল্যায়ন করা দূরে যাক, এ্যাথলেট তৈরি করার চিন্তাও তাঁরা করলেন না। যার ফলে ভারত যে তিমিরে ছিল আজো সেখানেই রয়ে গেল। অথচ আমেরিকা আজ খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করলেও লক্ষ্য আরো দূরের দিকে। এখানে আজ ঐ দেশেরই খ্যাতিমান দুই এ্যাথলেটের পরিচয় দিচ্ছি।

রন হুইটনির নাম হার্ডল রেসের ক্ষেত্রে আজ আর কারো অবিদিত নয়। হুইটনির যে জিনিসটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে যে ট্রাক শার্ট তিনি পরিধান করেন, তার ওপর একটি অদ্ভুত কথা লেখা আছে। কথাটা হচ্ছে 'রাণ ফর ফান।' কিন্তু সত্যিই কি তাই? 'ফান'-এর জন্য রাণ করেন তিনি, না, তা নয়। জয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি পদচালনা করেন। স্বর্ণ-পদক লাভই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। তিনি মাঠে নামলে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকেরই আজ বুক কাঁপে। অথচ বছর তিনেক আগেও এই ব্যক্তিটি ছিলেন প্রায়-অপরিচিত। সামান্য একজন পথ-নির্দেশক—হতাশা, দুঃখ এবং দৈন্যের চাপে জর্জ্জরিত। সাধারণের কাছে কোন বিষয়ে খ্যাতিলাভের আশা কল্পনাতি-রিক্ত যেন একটা কিছু। কিন্তু কোথা দিয়ে হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়ী মাইক লারাবির সঙ্গে একরকম হঠাৎই সাক্ষাৎ ঘটে গেল হুইটনির। তারপর হুইটনিরই মতে, 'মাইক আমার

হার্ডেল রেসের ক্ষেত্রে আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য নাম রন হুইটনিকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চারশো মিটারব্যাপী এক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান তিনিই অধিকার করেছেন। গত দু'বছরের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতায় তিনি পরাজিত হয়েছেন কিন্তু জয়লাভ করেছেন আঠারোটি প্রতিযোগিতায়

মনের মধ্যে সব কিছু ওলট-পালট করে দিলেন। দৌড়ান আমার কাছে আনন্দ দায়ক, দুঃসহ কঠিন কোন কাজ নয়। দাদাদির অনুপ্রেরণায় এবং তারি পরামর্শ অনুযায়ী চ'লে দু' বছরের হুইটনি আঠারটি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে জয়লাভ করলেন এবং মাত্র একটিতে হার-স্বীকার করতে হল তাঁকে। অলিম্পিকের ৪০০ মিটার হার্ডলসে রেকর্ড পয়েণ্ট অর্জন করেন কাউলে। ৪৯'১ সেকেণ্ডে। হুইটনির রেকর্ড ৪৯'৩। কিন্তু হুইটনি আশা করেন, তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই ঐ সময়ও অতিক্রম করে যাবেন। হুইটনির যদিও বয়স অল্প কিন্তু তাঁর মধ্যে আছে অঢেল সামর্থ্য, আছে গতি ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক কোন প্রতিযোগিতায় মস্তিষ্ক স্থির রেখে জয়লাভের সামর্থ্য। হার্ডলসে তিনি সাধারণত আধ মাইল দূরত্ব থেকে রাণ দিয়ে থাকেন এবং শেষের আগে তাঁর গতিবেগ অসম্ভব রকম বেড়ে যায়।

গত অলিম্পিকে হুইটনি ৪০০ মিটার হার্ডল রেসে যোগদান করেছিলেন এবং এর জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তা যেমন-ভাবে তিনি পালন করেছিলেন তা চরাচর হুইটনির বয়সী কোন যুবকের পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়। কোচের একদিকে নির্দেশ, অপরদিকে নিজের শরীরের প্রতি অমানুষিক পীড়ন হুইটনিকে যেন বিরাট দরের এ্যাথলেট বলে মনে হত। মেক্সিকোর উচ্চতাকে তিনি ভয় করেন নি। তার মতে, একজন এ্যাথলেটকে যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ঠিকমত বজায় রাখতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত হুইটনি মেক্সিকো অলিম্পিকের কোন খেতাব অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু মনোবল তাঁর অসীম, বয়সও কম। সুতরাং তিনি পুনরায় তৈরি হচ্ছেন আগামী অলিম্পিকের জন্য।

—ক্রীড়ারসিক

স্থান-সমস্যার সমাধান?

যে হারে মানুষ বাড়ছে গোটা পৃথিবীতে বিশেষতঃ এশিয়া-আফ্রিকা-চীন-ল্যাটিন আমেরিকায়, তাতে বুভুক্ষা চরম রূপ নিতে পারে এই শতাব্দীর শেষ দিকে।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে যে কেবল আহার্য খাদ্যে টান পড়বে তাই নয়, থাকার জায়গাও ভয়াবহ-ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। 'একটুকু বাসা' ধরণীর কোনও কোলে আর মিলবে কি না সন্দেহ।

যতদিন অবস্থা চূড়ান্ত রূপ না নিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত, অর্থাৎ বর্তমানের স্থান-সমস্যা মোকাবিলার জন্য য়ুরোপ-এর আসবাব ব্যবসায়ীরা একটা উপায় বাতলেছেন। থাকতে হয় স্বল্প পরিসরে। ফলতঃ, নিজেদেরই হাত-পা ছড়ানোর জায়গা মেলে না, আসবাব-পত্র দরকারী হলেও ঢোকানো দায়।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা 'ফোম' দিয়ে বরছে সোফা-কৌচ, প্লাস্টিক ফয়েল (হাওয়া দিলে ফুলবে) লাগাচ্ছে চেয়ার তৈরির কাজে, শক্ত কার্ড-বোর্ড আর কাগজ দিয়ে বানাচ্ছে নানা রকম আসবাব, এ সবই প্রয়োজন ফুরোলেই মুড়ে রাখা যায়। প্রয়োজন-মাফিক শুধু খুলে নেওয়ার ওয়াস্তা। 'ফোম'-এর ঢেউ এদেশেও পৌঁছেছে।

ডঃ গিরিজা মুখোপাধ্যায়

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় গ্রন্থকার, স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও সাংবাদিক]

দক্ষ সাংবাদিক, একনিষ্ঠ স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সার্থক গ্রন্থকার এবং সর্বোপরি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গবেষক হিসাবে আগামীকালের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠাগুলি যে ক'টি নাম সগৌরবে অধিকার করে থাকবে, ডঃ গিরিজা মুখোপাধ্যায় সেই তালিকায় একটি পরম শ্রদ্ধেয় দীপ্তিমান নাম। উপরোক্ত গুণ বা কৃতিত্বগুলি একাধারে যাঁকে কেন্দ্র করে সার্থকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে---এই রচনার আলোচ্য, বাঙলার সেই মুখোজ্জ্বলকারী প্রতিভাধর সন্তান ডঃ গিরিজা মুখোপাধ্যায় শুধু বাঙলারই নন, সারা ভারতের পরম গর্ব ও গৌরব বললেও বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট হতে হয় না।

মালদার কোতয়ালীতে ১৯০৫ সালে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। সারা ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এই অঞ্চলটির অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব এককথায় তুলনারহিত। সেই বিশেষ অঞ্চলজাত গিরিজা মুখোপাধ্যায়ও ছাত্র-জীবন থেকেই জাতীয় আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। দেশজননীর সোনার অঙ্গে বিদেশী শাসনের লৌহ-শৃঙ্খল কিশোরচিত্তকেও সচেতন করে তোলে জাতীয় মুক্তি সম্পর্কে। পঠদ্দশা শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুক্তি-সংগ্রামে।

১৯২১ ও ১৯২৩---এই সময়ে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত থাকার জন্যে তাঁকে করতে হল কারাবরণ, পরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য স্বীয় কর্মক্ষেত্র হিসাবে তিনি লণ্ডনকে বেছে নিয়েছিলেন। লণ্ডনে বাস করে তিনি দেশের স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন অক্লান্ত উদ্যমে কাজ করে গেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের নিজস্ব বেতারের তিনি ইংরাজী ভাষায় ঘোষকের দায়িত্বও পালন করে গেছেন।

১৯৩৮ সালে তিনি 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর প্যারিসে অবস্থিত সংবাদ-দাতার কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ থেকে '৫০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্সের সার্ভে এবং ডকুমেণ্ট সংক্রান্ত পরিচালক। ১৯৫০ সালে তিনি যোগ দিলেন ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রকে।

পশ্চিম জার্মানীর হাইডবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে তিনি পি-এইচ-ডি উপাধি অর্জন করেন। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক মন্ত্রকের ইতিহাস বিভাগের প্রধান গবেষকের দায়িত্ব তিনি সগৌরবে পালন করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা তিনি তিন বছরকাল করেছেন।

ভারতের এবং বহির্ভারতের বহু রাজনৈতিক সামাজিক এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন।

তাঁর গ্রন্থগুলি তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের এবং গভীর মননশীলতার এক-একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর এবং তাঁর ভাষাসৃষ্টির দক্ষতা ও বিশ্লেষণীশক্তির এক সুস্পষ্ট পরিচায়ক। তাঁর বহুসংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে বুকস অব দিস ইয়োরোপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ইয়োরোপীয়ান ইউনিটি, এ স্টাডি অফ ফ্রেঞ্চ পলিটিক্যাল পার্টিস, দ্য জার্মান মাইণ্ড, জেনেসিস অফ দ্য নাৎসী রেভলিউশান, ফ্লাইট ফ্রম প্রাগ, চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট, রাইজ এ্যাণ্ড গ্রোথ অফ দ্য কংগ্রেস, মহাত্মা গান্ধী অ্যাণ্ড ভুসল্যাণ্ড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিবদুর্গা
—মুক্তিকুমার মুখোপাধ্যায়

ঊর্দ্ধে লক্ষ্য
—চিত্রজিৎ ঘোষ

পম্পেই-এর ধ্বংসাবশেষ
—রথীন রায়

শঙ্করাচার্যের মন্দির (কাশ্মীর)
—এস, পাল

পত্রহীন
—বিশ্বনাথ গোস্বামী

...ের রেখা
অনিলকুমার ভট্টাচার্য
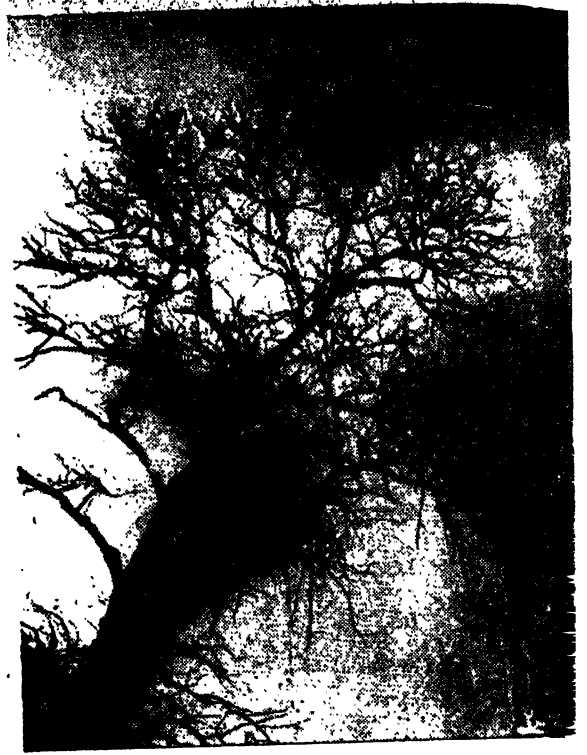
মাসিক বসুমতী । আষাঢ় / '৭৭

...্য
দীপংকর সেন

প্রভাতী
—তপনকান্তি দে

জ
ন
নে

সরোজিনী নাইডু
—স্বদেশ পাল

ইন্দিরা গান্ধী
—রণজিৎ ভট্টাচার্য
(২য় পুরস্কার)

ইন্দিরা গান্ধী
—বিশ্বনাথ গোস্বামী
(১ম পুরস্কার)

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

বিষয়বস্তু

শ্রাবণ — অভিনেতা

ভাদ্র — অভিনেত্রী

১ম পুরস্কার কুড়ি টাকা

২য় „ পনেরো „

৩য় „ দশ „

মনের চোখে
-অজিতকুমার কর্মকার

মাসিক

বসুমতী

আষাঢ় / '৭৭

ডঃ হরেন্দ্রকুমার আচার্য

[দিকপাল বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত]

বাংলায় এমন কোন কোন জীবনের সন্ধান কদাচিৎ মেলে, যে জীবন বৈচিত্র্যের আলোয় সমুজ্জ্বল; প্রচারের ঢক্কানিনাদ থেকে সে-সব জীবন অনেক দূরে, কিন্তু অবদানের গরিমায় ও সার্থকতার স্পর্শসমৃদ্ধ। এই তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম ডক্টর হরেন্দ্রকুমার আচার্য। বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর অবদান অসামান্য, বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য শুধু ভারতেই নয়, ইয়োরোপ-খণ্ডে পরম সমাদরে স্বীকৃত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার বহু স্বতন্ত্র ধারার তিনি পথিকৃতের গৌরবে সমৃদ্ধ—আবার তিনি সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, শাস্ত্র ও সাহিত্যে প্রভূত দক্ষতার অধিকারী, যার প্রমাণস্বরূপ 'বিদ্যা-বিনোদ' ও 'ব্যাকারণতীর্থ' উপাধি-দু'টি তাঁর অধিকারে। ইংরাজী, বাঙলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ছাড়াও রুশ, জার্মান ও ফরাসী ভাষাতেও তাঁর অনন্যসাধারণ দক্ষতা।

অবিভক্ত বঙ্গের এক প্রধান অঞ্চল কুমিল্লায় ১৯০৮ সালের ১লা ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে জৈব রসায়ন বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর উপাধি তিনি লাভ করলেন। এ্যাক্টিভ কার্বোন সংক্রান্ত গবেষণায় ১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্জন করলেন ডি-এস-সি। ইলেকট্রন সংক্রান্ত গবেষণায় ১৯৪৮ সালে তিনি পি-এইচ-ডি লাভ করলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেই বছরেই লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে হলেন ডি-আই-সি।

১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁর হাতে তুলে দিলেন নাগার্জুন পুরস্কার। ১৯৩৮ থেকে '৪১ তিনি ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ ফেলো। বোর্ড অফ সায়েণ্টিফিক এ্যাণ্ড রিসার্চ স্কলার ছিলেন ১৯৪২ থেকে '৪৪ পর্যন্ত। এর পরবর্তী চার বছর তিনি ছিলেন স্যার তারকনাথ পালিত ফরেন ফেলো। ১৯৪৪ থেকে '৪৫ এই এক বছর 'স্যানফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্রিস্টন মেয়ার রিসার্চ ফেলো হিসাবেও দেখা গেছে ডঃ আচার্যকে। ১৯৪৯ সালে তিনি হলেন স্যার জে সি বসু রিসার্চ ফেলো।

কিকির ইনস্টিটিউট অফ আর্মামেণ্ট স্টাডিসের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধানের আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল ১৯৬০ থেকে '৬১। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এ্যাসোসিয়েশানের তিনি সদস্য। দিল্লীর প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান গবেষণাগারের রসায়ন শাখার সহকারী পরিচালকের আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত হতে দেখা গেল ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে।

ভূপৃষ্ঠ, সিলিকন এবং খাদ্যের পদার্থ ও রসায়ন সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত এবং ব্যাপক গবেষণা সমগ্র বিজ্ঞান-সমাজে যথেষ্ট সাধুবাদ এবং অভিনন্দন অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তাঁর বিজ্ঞানের দুশ্চর তপস্যা দেশ-বিদেশের বোদ্ধা-মহলে যথেষ্ট সমাদর অর্জন করেছে এবং বিজ্ঞানবিষয়ক তাঁর মূল্যবান রচনাগুলিও সংশ্লিষ্ট পাঠকমহলে অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীসত্যশরণ মুখোপাধ্যায়

[দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের জেনারেল ম্যানেজার]

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে কোন বাঙালী নিম্নপদের অফিসাররূপে যোগ দিয়ে উত্তরকালে সেই সংস্থার সর্বময় কর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছেন, এমন ঘটনা আগে ঘটেছে বলে জানা যায় না। কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভবপর হয়েছে, ঐ রেলের বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসত্যশরণ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। এটা নিঃসন্দেহে বাঙালীর কাছে অশেষ গৌরবের ব্যাপার।

১৯১৫ সালে ভাগলপুরে শ্রীমুখো-পাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এ্যাকাউণ্টস সারভিসে পাটনায় ছিলেন এবং সেখানেই শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি মেধা এবং প্রতিভার পরিচয় দেন। রাঁচী জেলা-স্কুল থকে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আই-এস-সি'তে চতুর্থ হয়ে পাটনা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯৩৫ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম হয়ে সেই বছরেই স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিলাতে যান। সেখানে সমস্ত পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং পরে কিছু-দিন চাকুরীও করেন।

১৯৩৮ সালে টিসকোতে কাজ নিয়ে দেশে ফেরেন। পরে ১৯৪০ সালে বি-এন-আর-এ (অধুনা সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে) এসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদে যোগ দেন। পরবর্তীকালে সিনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার, পার্সোন্যাল অফিসার, ডেপুটী জেনারেল ম্যানেজার প্রভৃতি বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে কাজ করার পর, ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে তিনি ঐ রেলেই জেনারেল ম্যানেজাররূপে নিযুক্ত হন। মাঝে তিনি ইস্টার্ন রেলওয়েতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কিছুদিনের জন্যে যোগ দেন।

বাঙলার এই কৃতী সন্তান ১৯৫৮ সালে ইণ্টার ন্যাশনাল রেলওয়ে

কনফারেন্সে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন জাপানে এবং ১৯৬৩ সালেও ইউনাইটেড নেশন (কাফে)তে পুনরায় জাপান যান। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, নাগপুর কলেজের ভিজিটিং অধ্যাপক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক পরীক্ষক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইন্স্টিটিউট অফ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রেসিডেণ্ট, বোকারো স্টীল প্ল্যাণ্টের ডাইরেক্টর। এছাড়া প্রগতি ও গঠনশীল নানান সংস্থার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতোভাবে জড়িত।

বর্তমানে বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের সম্বন্ধে শ্রীমুখোপাধ্যায় অত্যন্ত বিচলিত। তিনি বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশের ইঞ্জিনীয়াররা অন্য দেশের তুলনায় কোন অংশে কম প্রতিভাবান নন। তাঁর সংস্থা থেকে আফ্রিকা, মিডল ইস্ট প্রভৃতি দেশে পাঠান বাঙ্গালী নবীন ইঞ্জিনীয়াররা সুখ্যাতির মুকুট মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি তাঁর সংস্থার প্রায় দু'লাখ কর্মীর কাজে অত্যন্ত গর্ববোধ করেন। তাঁর মতে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের যে প্রগতি তার মূলে আছে, তাঁর কর্মীবন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতা।
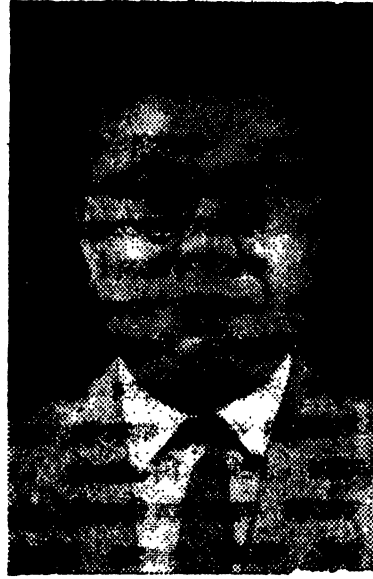
শ্রীমুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী লীনা মুখোপাধ্যায় বাঙলার গৌরব স্বর্গত ডঃ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী ও স্বর্গত প্রভাতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় একজন বিদুষী মহিলা। তিনি অঙ্কন-শিল্পে পটিয়সী। শ্রীমুখোপাধ্যায়কে সমস্ত সৃজনশীল কাজে তিনিই সর্বদা অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় কেবলমাত্র একজন প্রশাসনিক দক্ষ এবং প্রগতিশীল বিচক্ষণবিদ্ই নন। তিনি একজন ভালো সাঁতারুও বটেন। টেনিসও তাঁর প্রিয় খেলা।

শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবী রায়

[কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার]

যাদের দৌরাত্ম্য ও অপকীর্তি শান্তিপ্রিয় ভদ্রসমাজে ক্রমশই আতঙ্কের কালোমেঘ ঘনিয়ে তুলছে, যাদের ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপ ক্রমশই সামগ্রিক আলেখ্যের উত্তরোত্তর শোচনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে, সেই সমাজদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করে, তাদের ঘৃণ্য ও বীভৎস অত্যাচার থেকে শান্তিকামী ভদ্র সমাজকে মুক্তিদান করা, মহানগরীর আরক্ষাবাহিনীর যে শীর্ষস্থানীয় অফিসারদের কর্মজীবনে প্রধান লক্ষ্য ও মুখ্য ব্রত— সেই তালিকায় গোয়েন্দা বিভাগের নবনিযুক্ত ডেপুটি কমিশনার শ্রীদেবী রায় একটি উজ্জ্বল নাম। আজকের দিনে পুলিশবাহিনী যে সুদক্ষ, বিচক্ষণ ও নির্ভীক কর্ণধারদের জন্যে গর্ব ও গৌরব বোধ করতে পারে, শ্রীদেবী রায় নিঃসন্দেহে তাঁদেরই একজন। বর্তমান পদ গ্রহণের বহু দায়িত্বসচেতন পুলিশ অফিসার হিসাবে সাধারণ্যে প্রভূত স্বীকৃতি ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করেছেন।

দেবী রায়ের আদি নিবাস পাবনা। বাবা স্বর্গত কুমুদনাথ রায় ছিলেন একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টার। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মহাতীর্থ বারাণসীতে তাঁর জন্ম। অতি অল্প বয়সে দেবী রায় তাঁর বাবাকে হারান। তার পর সমগ্র সংসার ছেয়ে যায় সমস্যা ও দুশ্চিন্তার কালো মেঘে, সমগ্র পরিবার এক অতি জটিল এবং দুর্বহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ফলে, জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই দেবী রায়ের সংগ্রামী জীবন সুরু হয়েছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতের বিরুদ্ধে কঠিন-কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে জীবনের চলার পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। সে পথ সেদিন তাঁর সামনে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, ছিল কণ্টকাকীর্ণ। অটুট মনোবল, অবিরাম উদ্দীপনা এবং স্থির লক্ষ্য সেই জন্ম-সংগ্রামীকে আজ পৌঁছে দিয়েছে সার্থকতার এবং সাফল্যের নিশ্চিত ও নিরুপদ্রব বন্দরে।

স্কুল-কলেজ জীবন বারাণসীতেই কাটল। বাঙালীটোলা হাইস্কুলের ছাত্র দেবী রায় স্কুলের পড়া শেষে ভর্তি হলেন কুইন্স কলেজে (বর্তমানে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়)। সেখান থেকে আই-এস-সি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে যোগ দিলেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি অর্জন করলেন ১৯৪০ সালে। ক্রীড়াবিদ্ হিসাবেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট খ্যাতিমান। ক্রিকেট এবং ফুটবলে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি।

১৯৪৩ সালে যোগ দিলেন কলকাতা পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টারের কাজ নিয়ে। চারটি থানায় কাজ করার পর এ্যাণ্টি রবারী সেকশানে তাঁকে নিযুক্ত

অর্ধশতকের অভিনয় প্রসঙ্গে

যাত্রা শিল্পী
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ আমি আপনাদের কাছে বিগত অর্ধশতকের অভিনয়ের কথা বলব। তার পূর্বে খুব সংক্ষেপে একটু ভূমিকা করে নিচ্ছি।

বিশ শতকে আমার অভিনয়-জীবনের সূচনা। ১৯০৩ সালে গিরিশ-চন্দ্রের "ধ্রুব চরিত্র" নাটকের ধ্রুব চরিত্র আমার প্রথম অভিনীত ভূমিকা। তখন উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পড়ি। আমার প্রথম নাট্যশিক্ষক রসরাজ অমৃতলাল বসু। পাঠ্যজীবনে সৌখীন থিয়েটারী অভিনয় ও কুস্তির প্রতি আকর্ষণ ছিল অধিক। এ বিষয়ে আমার সঙ্গী ছিলেন অভিনেতা জীবন গাঙ্গুলী। সুধী নাট্যশিক্ষক অমৃতলালের তালিমের গুণে অভিনয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হই। ফলে অভিনয়স্পৃহা সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। কুস্তি-বিদ্যায় কিছু পারদর্শিতা অর্জিত হয়েছিল। দৈহিক গঠনও তদনুরূপ। আমরা কয়েকজন যুদ্ধে যোগদানের জন্য মনোনীত হলাম। খ্যাতিমান অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, ভূমেন রায় ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ায় অবস্থান করি। কুচকাওয়াজ ও নানাপ্রকার শিক্ষার ফলে যুদ্ধে যোগদান পরবর্তী-কালের অভিনয়---জীবনের অনেক উপকার সাধন করেছে। এর অনেক কিছু অভিনয়ে প্রয়োগ করতে পেরেছি।

যুদ্ধের শেষে ভারতে ফিরে চাকরি সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। সুতরাং আবার সৌখীন অভিনয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। এমনিভাবে একদিন যুগপ্রবর্তক নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দৃষ্টিপথে পড়ার সুযোগ অর্জন করি। তখন নাট্যাচার্য সীতা নাটক খোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন। জীবন গাঙ্গুলী এবং আমিও ঐ নাটকে অভিনয় করার জন্য মনোনীত হলাম। মাসিক হাতখরচা ৫৲ টাকা। সে ১৯২৪ সালের কথা। যথারীতি মহলায় উপস্থিত হচ্ছি। চরিত্র বিশ্লেষণ, অভিনয় শিক্ষা ভার্স এ্যাকটিং-এর নূতন পাঠ গ্রহণ করছি। বহু বহু পণ্ডিত ব্যক্তির আগমনে মহলাস্থান তীর্থে পরিণত হয়ে উঠছে। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, সুরকার, গীতিকার প্রমুখ সুধীজনের সমাগমে আমাদের মনে নূতন উন্মাদনা জাগত।

আকর্ষণ এত প্রবল যে, মহলাস্থল পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু পেটের ক্ষুধা বোধ হয় সকলের উপরে। এক শক্তিশালী যুবকের মাত্র ৫৲ টাকায় মাস চালানো শক্ত হল। এমন সময় নাটাগড়ের জমিদারের যাত্রা সংস্থা থেকে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনের ডাক এল। একদিকে নাট্যাচার্যের আকর্ষণ, আর একদিকে অর্থের আকর্ষণ। অনেক মানসিক যুদ্ধের পরে যাত্রা আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। তদবধি ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত একটানা পেশাদার যাত্রায় অভিনয় করে চলেছি। ১৫ বছর থিয়েটারে অভিনয় করার পরে একাদিক্রমে ৫২ বছর যাত্রাভিনয় করি। আমি আশী বছরে পদার্পণ করেছি। ১৮৯০ সালে আমার জন্ম।

জীবনের অধিকাংশ সময় যাত্রা-ভিনয় করা সত্ত্বেও, থিয়েটারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার বিশেষ কারণ আছে। প্রকৃত নাট্যরসিকদের কাছে অভিনয় করে যাঁরা তৎকালে সুনাম অর্জন করেন, তাঁদের প্রায় সকলেই থিয়েটার থেকে যাত্রায় আসেন। বস্তুত যাত্রা ছিল গীতিপ্রধান। থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রায় অভিনয় প্রাধান্য পেতে সুরু করে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে। গান ছাপিয়ে অভিনয় বড় হয়ে ওঠে মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি থেকে। তখন যাত্রা-নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার থেকে ক্ষেত্র মিত্র ও চুনীলাল দেবকে এনে যাত্রায় অভিনয় শিক্ষা দিতেন। অভিনেতারা সাধ্যমত অভিনয়রীতি গ্রহণ করতেন। যাত্রার সু-অভিনয়ের সঙ্গে থিয়েটারি অভিনয়ের পার্থক্য খুব বেশি নয়। থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ স্বাভাবিক। যাত্রা উন্মুক্ত আসরে উপস্থাপিত হয় বলে এর অভিনয় একটু বোল্ড। আমি জানি যাত্রার অভিনয়ের কথা শুনলেই অনেকের মনে পড়ে অকারণ লম্ফ-ঝম্ফ, চেঁচা-মেচি। কিন্তু এটা যাত্রার প্রকৃত অভিনয়-রীতি নয়। অভিনয়-শিক্ষাহীন সাধারণ অভিনেতার অক্ষমতা মাত্র। এদের

করা হল ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৯৪৯ সালে হলেন ইন্সপেক্টার। ক্রিমিন্যাল ইন্টেলিজেন্স সেকশানের ডাকাতি স্কোয়াডের ভার তাঁর হাতে দেওয়া হল। ভয়াবহ এবং নৃশংস অপরাধসমূহ দমনের ভার দিয়ে ১৯৫৯ সালে তাঁকে নিয়োগ করা হল এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পদে। ১৯৬৬ সালে তাঁকে দেখা গেল, গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের আসনে। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর নাম ঘোষণা করা হল গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার হিসাবে।

সাহসিকতা এবং প্রশংসনীয় কর্ম-নৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫২ ও ১৯৫৮ সালে তিনি পুলিশ পদক লাভ করেছেন। রাষ্ট্রপতির পুলিশ এ্যাণ্ড ফায়ার সার্ভিস মেডেল তাঁর অধিকারে এল ১৯৬৫ সালে।

সংখ্যা অধিক বলে যাত্রাভিনয় সম্পর্কে অনেকের ধারণা উচ্চ নয়। কিন্তু থিয়েটারেও কি অপটুর সংখ্যা অধিক নয়? সেই অপটুদের দিয়ে কি থিয়েটারের বিচার হয়? এ প্রশ্নটি সুধী নাট্য-রসিকদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। থিয়েটার ও যাত্রা উভয় স্থলে অভিনয় করার সুযোগ পাওয়ায় আমার দীর্ঘ অভিনয়-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অভিনয় থিয়েটারে হোক আর যাত্রার আসরে হোক এ্যাকটিং-এর রীতি নিয়মকানুন মোটের উপরে একই। এই নিয়মকানুন যিনি উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে শিখেছেন, কঠোর সাধনা করেছেন, তিনিই চরিত্র সৃষ্টি করে প্রকৃত নাট্যরসিকদের আনন্দ দিতে পেরেছেন। যাত্রায় অনেকে এ শিক্ষাকে গ্রাহ্য করেন না, থিয়েটারে একে গ্রাহ্য করতে হয়। তাই বলছিলাম থিয়েটার থেকে যাঁরা যাত্রায় এসেছেন,—অর্থাৎ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ির দেওয়ান ও মোক্তার সুরেশ মাস্টার, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, বর্তমান প্রবন্ধকার সুরেন মুখার্জি প্রমুখরাই সংযত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সহজে সুধী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। থিয়েটারে অভিনয় না করেও সাধনা বলে সু-অভিনেতারূপে খ্যাতি অর্জন করেন ফণিভূষণ মতিলাল।

বিগত অর্ধশতকের অভিনয় প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। আমাদের সময়ের শিক্ষারীতির বিষয় আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি। অভিনয়ের জন্য —(ক) শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া চর্চা করা এবং স্বর-সাধনা করা (ব্রিদিং এণ্ড ভয়েস্) প্রধান কথা। এই সাধনা ছাড়া সু-অভিনয় করা একান্ত অসম্ভব। স্বর কখনও নাভিমূল থেকে, কখনও বক্ষ থেকে, কখনও কণ্ঠ থেকে, কখনো বা শির থেকে তুলতে হয়। তেমনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে নানাভাবে কনট্রোল করে অভিনয়ের সময় কাজে লাগাতে হয়।

(খ) অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বিভিন্ন মঞ্চে বা আসরে চলাফেরা, প্রবেশ প্রস্থানের কায়দা (অর্থাৎ মাইম) অভিনেতার অপরিহার্য শিক্ষার বিষয়।

(গ)—অভিনয়ে আবেগের খেলা দেখাতে না পারলে অনেক সময়ই তা শুষ্ক নীরস হয়ে ওঠে। ৫০ বছর ধরে অধিকাংশ থিয়েটারী নাটকেও দেখেছি আবেগদীপ্ত অভিনয়ে অভিনেতারা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। শিশির-যুগের পূর্বে এদিক থেকে দানীবাবুর জুড়ি ছিল না। এখনো তাঁর আধো আধো ভাষার দরদী কণ্ঠের অভিনয় কানে লেগে আছে। জনা নাটকে প্রবীর 'দাও মাগো সন্তানে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিদায় চলে যাই লোকালয় ত্যজি' আজও তা ভুলি নি। এই প্রসঙ্গে অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, প্রমুখ বিশেষ খ্যাতিমান অভিনেতাদের কথাও বলা যায়। আপনারা হয়ত অনেকেই তাঁদের পূর্ণ যৌবনের শক্তিশালী অভিনয় দেখেন নি, কিন্তু বয়স নিবন্ধন আমার সে সৌভাগ্য হয়েছে। যাত্রায় আবেগের খেলার প্রাধান্য আরো অধিক।

(ঘ) টেম্পো তোলার জন্য যাত্রায় বিবেকের গান বিশেষভাবে ব্যবহার ভাগে পাওয়া হত। সাধারণত নাটকের প্রধান চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব, ভাবাবেগের চূড়ান্ত অবস্থা সৃষ্টি এই গানের লক্ষ্য হত গানের সঙ্গে প্রধান প্রধান অভিনেতাকে নির্বাক অভিনয় করতে হত। অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে। গান এবং এই ভাব-অভিনয় মিলিত হওয়ায় টেম্পো উঠ্তো। এরজন্য বড় অভিনেতার সুর-সাধনার প্রয়োজন হত। সুরজ্ঞান না থাকলে গানের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করা সম্ভব হয় না। থিয়েটারী অভিনয়ের সঙ্গে যাত্রা অভিনয়ের এইখানে পার্থক্য রয়েছে। যাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আগের অভিনেতা যেখানে সংলাপ ছাড়বে, পরের অভিনেতাকে সেই স্কেলে সংলাপ ধরতে হবে। যার সুরজ্ঞান নেই, তার পক্ষে এ কাজ ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। এইজন্য যাত্রাভিনয়ে কিছু সুরসাধনা প্রয়োজন। অভিনয় সাধনা প্রসঙ্গে প্রবীণ অভিনেতাকে গানের সুর তুলতে হত। তৎকালের উন্নত যাত্রার গানের সুর একটু কঠিন হত। এর একটা বিশেষ ধরণও ছিল। শুনলেই বোঝা যেত এটা যাত্রার সুর।

যাত্রায় প্রম্পট্ চলে না। অভিনয়ের অংশ পুরো মুখস্থ করতে হয়। থিয়েটারেও আমাদের সময় এটা মানা হত। আবার অনেক সময় দেখেছি, অনেকে এ রীতি তেমন মানতেন না। কিন্তু যাত্রায় মুখস্থ না করলে কেবল যে দর্শকদের বিদ্রূপ সহ্য করতে হয় তাই নয়, সংস্থায় চাকরীও বজায় রাখা যায় না। চাকরী বলেও নয়, পাঠ মুখস্থ না থাকলে, কি থিয়েটার কি যাত্রা আবেগ প্রয়োগ করা একেবারেই অসম্ভব। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ওখান থেকে শিখে এসেছিলাম, অভিনয়ের জন্য চরিত্র বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এইজন্য চরিত্রের শারীরিক গঠন, সামাজিক দিক অর্থাৎ সমাজের কোন্ স্তরের লোক, কি কাজ করে, শিক্ষাদীক্ষা কি প্রভৃতি ও মনোভাবের দিক বিচার করে অভিনয় করা দরকার।

আমাদের সময়ের কোন কোন সু-অভিনেতা একাজ করতেন। তৎকালে তিন প্রকারের অভিনয় প্রচলিত ছিল। (ক) বিশ্লেষণধর্মী, (খ) ভঙ্গী ও চমক-প্রধান, (গ) ভাবাবেগপ্রধান। প্রখ্যাত অভিনেতারা এর কোন একটি রীতিকে প্রাধান্য দিতেন। তার অর্থ এ নয় যে, অন্য রীতিকে একেবারেই বর্জন করতেন। সুরেশ মুখোপাধ্যায়, ফণী বিদ্যাবিনোদ, প্রবন্ধকার সুরেন মুখোপাধ্যায় বিশ্লেষণধর্মী অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। ফণী মতিলাল, শরৎ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত বসু ভঙ্গী-প্রধান অভিনয়ের পক্ষপাতিত্ব করতেন। অভিনয়ে চমক সৃষ্টির দিক থেকে আমার বয়ঃকনিষ্ঠ ফণী মতিলাল সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। এ বিষয়ে এই সুকণ্ঠ অভিনেতার মৌলিকতা স্বীকার করতে হয়। ভাবাবেগ-প্রধান অভিনয় করা পছন্দ করতেন কালী গুহ, কালীয়দমন গুহঠাকুরতা, চুনী গোস্বামী, ভোলানাথ ভট্টাচার্য। বিশেষ কোন একটি রীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে সমস্ত রীতি মিলিয়ে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন সতীশ মুখোপাধ্যায়, সতীশ বসু ও হরলাল গাঙ্গুলী। তৎকালে থিয়েটারী অভিনয়েরও বিভিন্ন রীতি ছিল। বিভিন্ন অভিনেতারা বিভিন্ন রীতির অভিনয়ধারা অনুসরণ করতেন। যাত্রার অনেক অভিনেতা আবার দানীবাবু ও নির্মলেন্দুবাবুকে অনুসরণ করে, এমন কি নকল করেও অভিনয় করতেন। এ নকল অভিনয় যে আনন্দজনক হত না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নকল করে সু-অভিনয় করা যায় না। গুণী শিল্পীকে ভেংচানোই হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যাত্রায় ভার্স এক্টিং-এর প্রাধান্য ছিল। থিয়েটারেও ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভার্স এক্টিং খুব জনপ্রিয় ছিল। অভিনেতারা একটানা ভার্স্ এক্টিং করতেন। তাতে স্থানে স্থানে স্বর উঁচু-নীচু করতেন, কিছু আবেগ সংযোগ করতেন। ভার্স্ এক্টিং-এ নূতনত্ব আনেন শিশিরকুমার। তারপর মঞ্চেও অনেকেই এই রীতি গ্রহণ করেন।

মঞ্চের বাইরেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই রীতিতে অভিনয় করতেন। সেকালের নূতন ভার্স্ এক্টিং-এ মঞ্চ ও চিত্র পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, প্রফুল্ল রায়, সন্তোষ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দুর মত উচ্চস্তরের অভিনেতার ভার্স্ এক্টিং শুনে কত শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যেত।

নূতন রীতির ভার্স্ এক্টিং-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, একে কেটে ভাব অনুযায়ী ছোট ছোট করে, গদ্যের মত কথা বলার ভঙ্গিতে পরিণত করা। ছন্দের জন্য, ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে একটু-আধটু সুরের রেশ হয়ত থাকত। কিন্তু সব জড়িয়ে তা গদ্যের মতই হয়ে উঠত। যাত্রাভিনয়ে এই রীতির প্রচলন করেন সুরেশ মুখোপাধ্যায়, ফণী বিদ্যাবিনোদ প্রবন্ধকার সুরেন মুখোপাধ্যায় ও ফণী মতিলাল। এই অভিনেতারা থিয়েটারের অনুকরণেই যাত্রায় এর প্রবর্তন করেন। শ্রোতারা নূতনের আস্বাদন পেয়ে এদের জয় ঘোষণা করতে কার্পণ্য করেন নি।

আপনারা জানেন, এক-একটি যাত্রা নাটকে অন্তত পাঁচ-ছটি রসের বিশেষ সমাবেশ করতে হয়। এর ফলেই নাটক বড় হয়ে যায়। যাত্রায় আলোর খেলা নেই, দৃশ্যপট নেই, শুধু বাণী ও কণ্ঠের উপর নির্ভর। কাজেই বিশেষ রসের আবেগদীপ্ত অভিনয় যাত্রার আসরে যে জনপ্রিয় হবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? নাটক এমনভাবে রচিত হত, যাতে প্রধান প্রধান অভিনেতা এক-একটি সংলাপে মিশ্ররস পরিবেশনের সুযোগ পেতেন। এই মিশ্ররস পরিবেশনে উতরে গেলেই তবে অভিনেতার যশ হত।

আমাদের সময় অভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রধান অভিনেতাকে বিভিন্ন রসের অভিনয়ে দর্শকদের আনন্দ দিতে হত। কি থিয়েটার, কি যাত্রা — উভয় স্থানেই সংস্কার নামী অভিনেতাদের বাইট

রোল ও ডাক রোলে সমানভাবে দর্শকদের অভিবাদন করতে হত। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার সেরা সংস্থায় অর্থাৎ ভাণ্ডারী অপেরা, গণেশ অপেরা, আর্য অপেরা, বীণাপাণি অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টী প্রভৃতিতে দীর্ঘকাল মলাটের কার্য করেছি। তাতে যেমন ব্রাইট্‌ সাইড্‌ ছিল, তেমনি ডার্ক সাইড্‌ ছিল।

থিয়েটারে আমাদের সময় দস্তুরমত অভিনয়-শিক্ষা দেওয়া হত। গিরিশচন্দ্র ছিলেন নটগুরু। তিনি নাটক লিখতেন, অভিনয় করতেন, কিছু কিছু অভিনয় শিক্ষা দিতেন মেধাবী অভিনেতাদের। অর্ধেন্দু মুস্তফির এ বিষয়ে সুনাম ছিল। অমৃতলাল বসু ও অপরেশচন্দ্র ছিলেন তৎকালে অন্যতম নাট্য-শিক্ষক, কিন্তু এ বিষয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাংলার বহু কৃতী অভিনেতা---বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, প্রফুল্ল রায়, শৈলেন চৌধুরী, রবীন্দ্র রায়, ললিত লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, জীবন গাঙ্গুলী এবং আরো অনেকেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কাছেই অভিনয়-পাঠ গ্রহণ করেছেন। সুরেশ মাষ্টার (সুরেশ মুখোপাধ্যায়) কলিকাতায় অভিনয় শিক্ষা করেন ক্ষেত্র মিত্র, অমৃতলাল ও শিশিরকুমারের কাছে। যাত্রায় যোগদান করার পূর্বেই তিনি পরিচিতি অর্জন করেন। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়) অভিনয় শিক্ষা করেন গিরিশচন্দ্রের ছাত্র রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এবং কিছু পাঠ নিয়েছেন শিশিরবাবুর কাছে। সতীশ মুখোপাধ্যায় যাত্রার টেক্‌নিক্‌ সুন্দরভাবে শিক্ষা দিতেন। আমি অভিনয় শিক্ষা করেছি অমৃতলাল বসু, শিশিরকুমার ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। ফণী মতিলাল (ফণিভূষণ মতিলাল) যতদূর জানি, কিছু কিছু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিখেছেন এবং আরো কোন কোন কৃতী অভিনেতার কাছে। তথাপি তাঁর অভিনয়ধারা স্বতন্ত্র। তিনি যাত্রার একজন উচ্চ অভিনেতা, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই এবং তাঁর জনপ্রিয়তাও অবিসম্বাদিত।

যাত্রায়ও আমাদের সময় অভিনয় শিক্ষা দেওয়া হত। সুরেশ মাষ্টার ও ফণী বিদ্যাবিনোদ যাত্রার উত্তম শিক্ষক ছিলেন। সতীশ মুখোপাধ্যায়, হরলাল গাঙ্গুলী ও বিভূতি গাঙ্গুলীর শিক্ষা ভাল ছিল। আমরা যখন যে সংস্থায় কাজ করেছি তখন সে সংস্থায় অভিনয় শিক্ষা দিয়েছি। বর্তমানে থিয়েটার-যাত্রায় অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা খুব কম। কোন শিল্পীই অন্যের কথা বিশেষ মানতে চান না। আমাদের সময় ঠিক এ রকম ছিল না। তখন দস্তুরমত অভিনয় শিখতে হত। এই শিক্ষা প্রসঙ্গে মিশ্ররসের অভিনয়ের উপর অধিক জোর দেওয়া হত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই আমাকে যাত্রার অভিনয় সম্পর্কে একটি একস্‌টেন্‌শন্‌ লেক্‌চার দেবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। উপাচার্য ডক্টর রমা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে আমার বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাত্রায় মিশ্ররসের অভিনয়-রীতির কয়েকটি ফলিত উদাহরণ আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ শ্রোতারা সেকালের যাত্রার মিশ্ররসের অভিনয়-রীতির পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করেন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচীন নামী অভিনেতা-রূপে আমার সঙ্গে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের একটি সাক্ষাৎকার হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর রাত ৮-৪৫মি: এই সাক্ষাৎকার কলিকাতা ক থেকে প্রচারিত হয়। এতেও আগেকার মিশ্ররসের অভিনয়-রীতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। বস্তুত তৎকালে যাত্রার আসরে মিশ্ররসের অভিনয় খুবই আকর্ষণীয় ছিল। মিশ্ররসের অভিনয় বহু শিক্ষা সাপেক্ষ, তাই এর কদরও অধিক ছিল। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে এটাই দেখেছি এবং অভিনয়ের জন্য এরই অনুশীলন করেছি অধিক।

প্রচ্ছদপরিচিতি

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রচ্ছদচিত্রটি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কলা কাকলি

সাসপেন্স সম্রাট হিচকক

আশিস দত্ত

আজকের যুগে হিচককের নাম শোনেন নি, এমন লোক পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। মোটা, খাটো শান্ত ধরণের মানুষটি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক। পুরো নাম হচ্ছে আলফ্রেড হিচকক। বিশেষ এক ধরণের ছবিই তিনি পরিচালনা করে থাকেন---সাসপেন্স ফিল্ম। মানুষকে ভয় দেখিয়েই তাঁর আনন্দ। এই কাজেই তিনি তাঁর জীবিকানির্বাহ করেন।

গত ২৫ বছর ধরে হিচকক ছবি করছেন। বিশ্বের সমস্ত অংশেই তিনি জনপ্রিয়। স্টকহোমের এক রেস্তোরাঁয় আগে থেকে না জানিয়ে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এই অভিনব প্রথায় আপ্যায়িত করা হয়েছিল। খাবারগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল পিস্তল, ছুরী, বোমা---যা তাঁর ছবির উপাদান---প্রভৃতির আকারে। তাজমহল, কলোসিয়াম, ভ্যাটিকান, জেরুসালেম, যেখানেই তিনি গেছেন মানুষ তাকে ঘিরে ধরেছে, অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিয়েছে। এতে হিচকক বিরক্ত হন নি, আনন্দই পেয়েছেন। আত্মপ্রচারবিমুখ তিনি মোটেই নন। তাঁর সবক'টি ছবিতেই তিনি কোনো-না কোন সময়ে কোন-না-কোন ভাবে আবির্ভূত হয়েছেন।

Life Boat ছবিতে মাত্র ন'টি চরিত্র ছিল। টালুলা ব্যাঙ্কহেড ও তার সঙ্গে আর আট জন। প্রথমে মনে হয়েছিল এ ছবিতে হিচকক বোধহয় আর দেখা দিচ্ছেন না।---না ছবির একেবারে শেষদিকে জনৈক অভিনেতা একটি খবরের কাগজ মেলে ধরলেন। সেখানে ছিল মোটাদের রোগা হবার এক ওষুধের বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপনের মডেলের ছবিটা ছিল হিচককেরই।

অনেক পরিচালক একটি অসমাপ্ত গল্প নিয়ে ছবি তুলতে আরম্ভ করে না। (বাংলা ছবির জগতে এটা খুব স্বাভাবিক না হলেও বোম্বে ও হলিউডে এ' জাতীয় জিনিষ আকছারই ঘটছে) ছবি তোলা যত এগুতে থাকে গল্পও সেই অনুযায়ী এগুতে থাকে। কিন্তু হিচকক্ ছবি তোলার আগে প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে আগে থেকে মনস্থির করে নেন। হিচকক তাঁর ছবি তোলাকে উলের সোয়েটার বোনার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

সাসপেন্স ছবি তৈরী করতে গেলে ছবিতে গুপ্তচর, ভিলেন, খুন, হত্যা--মামলা-মোকদ্দমা আমদানী করতেই হবে। সোনা, টাকাকড়ি, গুপ্তধনের মানচিত্র কিম্বা কিছু জরুরী দলিল দস্তাবেজ, যার পেছনে কিছু মানুষ পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। হিচকক এই সব জিনিসের নাম দিয়েছেন ম্যাকগফিন (MACGUFFIN)। অনেক বছর আগে পড়া এক গল্পে হিচকক এই শব্দটি পেয়েছিলেন।

নোব্‌ল প্রাইজপ্রাপ্ত খ্যাতনামা পদার্থবিদ ডঃ রবার্ট মিলিকানকে হিচকক জিজ্ঞাসা করেছিলেন---আচ্ছা। ছবিতে এটম বোমা আমদানী করলে তা কত বড় হতে পারে? তারপর কি ঘটল, সে সম্পর্কে হিচকক লিখছেন ---'ডা মিলিকানের মুখ শাদা হয়ে গেল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন---আপনি কি গ্রেপ্তার হতে চান? এরপর আমাকে একঘণ্টা ধরে বোঝালেন ছবিতে এটম বোমা বিস্ফোরণ কি কারণে অসম্ভব।' কিন্তু হিচককের মনে হল এটম বোমকে ম্যাকগাফিনে পরিণত করা সম্ভব। এই একগুঁয়েমীরই সফল পরিণতি হলো Notorious ছবিতে। সে ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকের কথা। মনে রাখতে হবে হিরোসিমায় তখনো বোমা ফেলা হয়নি।

হিচককের জন্ম হয়েছিল লণ্ডনে বাবা ছিলেন পাইকারী পোলট্রী ব্যবসায়ী। হিচককের বয়স যখন পাঁচ তখন একটি চিরকূট দিয়ে তাঁর বাবা তাঁকে স্থানীয় থানায় পাঠিয়ে দেন। ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁকে ফাটকে পুরে বললেন,---'দুষ্টু ছেলেদের কি হয় তাই-ই তোমার বাবা তোমাকে দেখাতে চান।' পাঁচ বছর বয়সের এই দারুণ অভিজ্ঞতা হিচকক ভুলে যাননি। কার্যক্ষেত্রে খুন-খারাপী নিয়ে কারবার করলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কিন্তু আদর্শ নাগরিক ও পুলিশকে এড়িয়েই চলতে চান।

ধর্মত তিনি একজন রোমান ক্যাথলিক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে তিনি পড়াশুনা করেন। কিন্তু আমেরিকান

ফিল্ম-ম্যাগাজিনগুলি তাঁকে প্রভাবিত করতে সুরু করে। প্যারামাউণ্ট স্টুডিও (হলিউড) লণ্ডনে আপিস খুললে সেখানে হিচকক একটা চাকরী জুটিয়ে নেন। ইংলণ্ডে তিনি The thirty nine steps; The lady vanishes প্রভৃতি ছবি নির্মাণ করেন। এগুলি এখনো ক্লাসিক হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। আমেরিকার অর্থ ও ছবি তৈরীর নানান রকম সুযোগ সুবিধা তাঁকে আকর্ষণ করে। ১৯৩৯ সালে মার্কিণ মুলুকে তিনি পাড়ি জমান। তাঁর ছবির গল্পগুলি হিচকক বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন। To catch a thief-এর কল্পনা এসেছিল একটি রহস্যোপন্যাস থেকে। Rear window-র গল্পটিকে কেউই ছবিতে রূপান্তর করতে পারছিলেন না। বছরের পর বছর তা ফেলে রাখা হয়, পরে হিচকক তা চিত্রায়িত করেন। হিচকক যাদুমন্ত্রে যেন খুব সাধারণ গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। রহস্য আর উৎকণ্ঠার মাঝে মাঝে হাসির খোরাকেরও কমতি নেই।

এই সব [illegible] করতে গেলে যে ধৈর্যের দরকার তা সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে। কয়েক বছর আগে তাঁর এক চমকপ্রদ আইডিয়ার কথা তিনি বলেছিলেন: দেখা যাবে একটি জনবহুল রাস্তা দিয়ে একজন 'আরব' প্রাণপণ ছুটছে।

তারপর সে ছবির নায়কের হাতের ওপর এসে পড়বে ও মারা যাবে। তখন দেখা যাবে যে আরবটির পিঠে একটি ছোরা বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার গায়ে হাত দিতেই নায়কের হাতে রক্ত লাগে ও তখন বোঝা যায় যে 'আরবটি' একটি ছদ্মবেশী ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ।

হিচকক ভাবছিলেন কি ভাবে জিনিষটাকে চিত্রায়িত করা যায়। কয়েক বছরের সুগভীর চিন্তার পর 'The man who knew too much' ছবিতে সমস্যাটির সমাধান করেন।

Rebecca, Rope, Stage fright The lady vanishes. প্রভৃতি ছবিতে এক আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তি লক্ষ্য করা যায়। আলো-ছায়ার খেলা, ভাল কাটিং ও এডিটিং, [illegible] হয়েছে, নাটকীয় ফ্ল্যাশব্যাক—প্রভৃতি হচ্ছে হিচককের ছবির অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য।

মার্কিণী বিশিষ্ট চিত্রসমালোচক ওটিস ফার্গুসন হিচককের শব্দ সংযোজনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। গীর্জার ঘণ্টার আওয়াজ, কুকুরের ডাক, ট্রেনের চাকার একটানা ছন্দোবদ্ধ শব্দ, কারখানার তীব্র আওয়াজ প্রভৃতি হিচককের ছবিতে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যা দর্শকদের মনে এক 'আশ্চর্য অবর্ণনীয় অনুভূতি ও শিহরণ' জাগায়।

হিচকক সাসপেন্স ছবির জগতে পায়োনীয়ার। অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিচকক তাঁর ছবির পরিধি বৃদ্ধি করছেন। সামান্য 'অর্থহীন' আইডিয়াকে হিচকক এমন সব ছবিতে রূপান্তরিত করেছেন যা দর্শকদের বিমোহিত করেছে। তাঁরা হাসিতে ফেটে পড়েছেন, আবার উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছেন।

নৃত্য শরীরকে সুস্থ ও ছিমছাম রাখে

আজকাল বহু মেয়ে পুরুষ কারিনের নাচের স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। এদের পেশাদার নাচিয়ে হবার কোন সাধ নেই। নেচে ও ব্যায়াম করে শরীরটাকে সুস্থ ও ছিমছাম রাখাই এদের উদ্দেশ্য। এজন্যে শ্রীমতী কারিন দক্ষিণা নেন মাসে ২০ মার্ক। অবশ্য বুধবার বিকেলের 'জাজ অ্যাণ্ড বীট' ক্লাসে যোগ দিলে ২৫ মার্ক।

প্রথম কদমফুল

সংগঠনে---প্রযোজনা : দীপাংশু-কুমার দেব, কাহিনী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ইন্দর সেন, সঙ্গীত পরিচালনা : সুধীন দাশগুপ্ত, গীত রচনা : সুধীন দাশগুপ্ত ও পুলক ব্যানার্জী, চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চ্যাটার্জী, শিল্প নির্দেশনা : রবি চ্যাটার্জী, সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য, ব্যবস্থাপনায় : বাসু ব্যানার্জী, প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিতকুমার মিত্র। ইকান্স ফিল্মস নিবেদিত এই ছবির বিশ্ব পরিবেশনার দায়িত্ব পড়েছে সীমা ফিল্মসের উপর। অভিনয়ে : সৌমিত্র চ্যাটার্জী---সুকান্ত, তনুজা---কাকলী, ছায়া দেবী---সুকান্তর মা, অজিত ব্যানার্জী---সুকান্তর বাবা, শুভেন্দু চ্যাটার্জী---নরেন, মাষ্টার---ঋত্বিক ঘোষাল, সুকান্তর ভাইপো---মেণ্টু, মিহির ভট্টাচার্য---কাকলীর বাবা, পদ্মা দেবী---কাকলীর মা, এ ছাড়া তরুণকুমার, সুব্রতা, অনুভা, ভানু, শৈলেন মুখার্জী, সাধনা রায়-চৌধুরী, সীমন্তিনী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। নেপথ্য কণ্ঠে, ---আশা ভোঁসলে, মান্না দে।

এখানে পিঞ্জর

কলামন্দিরের 'এখানে পিঞ্জর' ছবির চিত্রগ্রহণ পর্ব সমাপ্তপ্রায়। পরিচালনায় যাত্রিক গোষ্ঠী, সঙ্গীত পরিচালনায় ডঃ ভূপেন হাজারিকা। অভিনয়ে---উত্তমকুমার---লেখক, দিলীপ মুখোপাধ্যায়---দিব্যেন্দু, অপর্ণা সেন---নীলা, অপর্ণা দেবী---মা, গৌর শী---বাবা। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় আছেন, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জী, দোলন-চাঁপা দাশগুপ্ত ও রত্না ঘোষাল।

এখনই

সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী 'এখনই' কে এল কাপুর প্রডাকসন্সের ব্যানারে নির্মিত হতে চলেছে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করছেন বলে জানা গেল তাঁদের মধ্যে আছেন---অপর্ণা সেন, মৃণাল মুখার্জী, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জী, সাগর চৌধুরী ও জয়া ভাদুড়ি।

বাংলা ছায়াছবি

রাজকুমারী

স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে 'রাজকুমারী' ছবিটি পরিচালনা করছেন সলিল সেন। সুর-সংযোজনায় আছেন রাহুল দেববর্মণ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করছেন---লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে ও কিশোর-কুমার। অন্যান্য চরিত্রলিপিতে আছেন, উত্তমকুমার, তনুজা, ছায়া দেবী, দীপ্তি রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, রমেন চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

পরিচালনা---অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালনা---হেমন্ত মুখো-পাধ্যায়, আলোকচিত্র---অজয় মিত্র, অভিনয়ে---অনিল চ্যাটার্জী---চিত্তরঞ্জন,

কয়েকটি বাংলা চিত্রের নবাগতা শিল্পী সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় চিত্র : অমিতেশ বন্দ্যো…

একটি বিশেষ ভঙ্গীমায়—সুচিত্রা সেন   চিত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়

লিলি চক্রবর্তী---বাসন্তী দেবী, ভোলা দত্ত---গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাসের ছোট মেয়ের ভূমিকায়---ঋতা ভট্টাচার্য। ছবির চিত্রগ্রহণ পর্ব প্রায় শেষ!

মহাকবি কৃত্তিবাস

'মহাকবি' কৃত্তিবাস' ছবির পরিচালনায় আছেন অশোক চ্যাটার্জী। সম্পাদনা এবং সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী ও বিজন ঘোষদস্তিদার। ছবির নাম ভূমিকায় আছেন, অসীমকুমার ও লিলি চক্রবর্তী। নেপথ্যে কণ্ঠদান করছেন, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও আরতি মুখার্জী।

মাল্যদান

মাল্যদান—প্রযোজনা —অজয় কর ও চিমন দে। বিশ্বপরিবেশনা---চিত্রলিপি ফিল্মস। কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিনয়ে: সৌমিত্র, নন্দিনী মালিয়া, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, শৈলেন মুখার্জী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অনুভা

অজয় করের পরিচালনায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় ছবিটি দ্রুত সমাপ্তির পথে।

ফাঁকি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ফাঁকি'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন রুণু চক্রবর্তী। শ্রীচক্রবর্তী এর আগে কয়েকটি বইয়ে সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। এবারে নিজস্বভাবে পরিচালনার গুরুদায়িত্ব মাথায় পেতে নিয়েছেন। বিলায়েৎ হুসেন খাঁর সুরে এতে কণ্ঠদান করেছেন, কিশোরকুমার, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও স্বপন গুপ্ত। মুখ্য চরিত্রগুলিতে রূপ দিচ্ছেন---শমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, বিমলেন্দু ঘোষ, বিপ্লব চন্দ, কনক দেবনাথ, ছায়া দেবী, শিবানী বসু, জুঁই ব্যানার্জী, সোমা ও বম্বের অশোককুমার।

সোনা বৌদি

সুখেন দাস রচিত কাহিনী 'সোনা বৌদি'র কাজ শেষ হয়ে উপস্থিত মুক্তি প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। 'সোনা বৌদি' চিত্রটি পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়। চিত্রটিতে সুর সংযোজনা করেছেন অজয় দাস। দীনেশ দাশ প্রযোজিত 'সোনা বৌদি' চিত্রের চরিত্রলিপিতে রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সেন, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, সমিত ভঞ্জ, সুখেন দাস, শিবানী, মাঃ অরিজিৎ প্রমুখ। দীনেশ চিত্রম নিবেদিত ও পরিবেশিত চিত্র 'সোনা বৌদি।'

পরিচালক অ্যালঁ্যা রেনে

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকে ফরাসী চলচ্চিত্রের চেহারা পাল্টে দিয়ে যাঁরা আলোড়ন এনেছিলেন অ্যালঁ্যা রেনে তাঁদের অন্যতম। যুদ্ধোত্তরকাল ইতালির নিউরিয়ালিজম্‌ যেমন চলচ্চিত্র শিল্পে, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের চলচ্চিত্রে নতুন প্রাণশক্তি এনেছিল তেমন 'নিউওয়েভ' বা নবতরঙ্গ এনেছে ফরাসী চলচ্চিত্রে। যুদ্ধোত্তরকালে ফরাসী চলচ্চিত্রে বড় দুঃসময় এসেছিল। দর্শকরা একঘেয়েমির অভিযোগে ফরাসী চলচ্চিত্রের দিকপালদের ছবিতে উৎসাহ হারিয়েছিল। কলোনীগুলি একে একে হাতছাড়া হওয়ার জন্য দেশের বাইরেও তার তেমন বাজার ছিল না, যাতে হলিউডের মত অনেক পচা ছবি বিদেশে দেখিয়ে উৎপাদন ব্যয় পোষানো হত। অথচ দিকপালদের ছবির ব্যয় ছিল বিশেষ মোটা অঙ্কের। এছাড়া যুদ্ধের পরে মানসিক গঠনেও কিছু পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। ফ্রান্সে বছরে যে ৩৭ কোটি দর্শক সিনেমা দেখে তাদের মধ্যে ৮৮ ভাগের বয়স ১৫ থেকে ২১ বছর। সুতরাং কি ধরণের ছবি পছন্দ করবে সেদিকটাও লক্ষণীয়। 'নবতরঙ্গ' ছবির পরিচালক অ্যালঁ্যা রেনে সেইসময় উদয় হয়ে বললেন: 'আমি নতুন চিত্রস্রষ্টাদের অপেক্ষা নব পর্যায়ের দর্শকদের উপর বেশী বিশ্বাসী'। নিউওয়েভ প্রবর্তকদের মধ্যে ফ্রান্সে ট্রাফোঁ, জ্যঁ লুক গদার, ক্লড চাব্রোল প্রমুখ নেতৃস্থানীয়। পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন অ্যালঁ্যা রেনে, ভার্দা প্রমুখ।

অ্যালঁ্যা রেনে ১৯২২ সালের ৩রা জুন বৃটেনের ভ্যানিস-এ জন্মগ্রহণ করেন। ভ্যানিস-এর সেণ্ট ফ্রান্কোস জেভিয়ার কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ছাত্র হিসেবে স্কুল এবং কলেজে তাঁর সুনামই ছিল। ১৯৩৬ সালে অর্থাৎ মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তিনি অনেকগুলি ৮ মিলিমিটার ছবি তৈরি করলেন। ১৯৪০ থেকে ৪২ সাল পর্যন্ত সিমোন-এর তত্ত্বাবধানে তিনি অভিনয় শিক্ষালাভ করলেন। ৪৩ থেকে ৪৫ সাল পর্যন্ত আই ডি এইচ ই সি তে ভর্তি হলেন এবং কয়েক বছর পড়ে পাঠ অসমাপ্ত রেখেই চলে গেলেন। ৪৫ সালেই রেনে মিলিটারীতে চাকুরী নিয়ে জার্মানী এবং অস্ট্রিয়াতে গমন করেন এবং ঐখানেই ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দলের সভ্য হলেন। ঐ সময়েই তিনি Le Sommeil Albertine-এর আলোক চিত্রকর হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে রেনে প্রথম সহকারী ও পরিচালক ও সম্পাদক হিসেবে 'প্যারিস ১৯০০' ছবিতে যোগ দিলেন। এরপর কিছুকাল টেলিভিশনে কাজ করলেন। ছবির সম্পাদনার কাজও করলেন বেশ কয়েক বছর। এরপর ফিচার ফিল্মে হাত দিলেন রেনে। এবং তিনখানি ছবি তোলার পর ১৯৫৯ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ছবি "হিরোসিমা মন আমোর" ছবিটি পরিচালনা করলেন। হিরোসিমা, টোকিও এবং প্যারিসের বিভিন্ন জায়গায় ছবির দৃশ্যগুলি তোলা হল। এর নায়িকা এক ফরাসী অভিনেত্রী। হিরোসিমার উপর একটা ছবিতে অভিনয় করতে জাপানে এসেছিল। তার বিদায় গ্রহণের দুদিন পূর্বে এক জাপানী ভাস্করের প্রেমে পড়ে। একদিন পরেই অভিনেত্রীকে জাপান ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা দুজনেই যুদ্ধের ভয়ঙ্কর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। একজন দেখেছে হিরোসিমাকে, আর একজনের জীবনের উপর দিয়ে গেছে চরম অপমান। অভিনেত্রী নাৎসী অধিকৃত ফ্রান্সের এক গ্রামে এক নাৎসী সৈন্যকে ভালবেসেছিল। সেই সৈন্য পার্টিজানদের হাতে নিহত হয়। গ্রামবাসী চরম অপমান করে মেয়েটিকে তাড়িয়ে দেয়। সে 'প্যারিসে' এসে নতুন করে জীবন গঠন করে। দু'জনেই বিবাহিত, দুজনেরই সন্তান রয়েছে। যুদ্ধের স্মৃতি এক রাত্রির মিলনের পর দু'জনকেই আবার দূরে সরিয়ে নেয়। এই ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে তারা ভুলতে চায়। এই ছবিতে ফরাসী অভিনেত্রীর চরিত্রে এম্যানুয়েল রিভা এবং জাপানী ভাস্করের চরিত্রে ইজি ওকাদা অভিনয় করেছে। ছবির দৃশ্যগ্রহণ ও কয়েকটি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত সৃষ্টি চমকপ্রদ। যৌনতার মুহূর্তগুলি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। অথচ এই ছবির বিরুদ্ধেও ফরাসীতে প্রতিবাদ উঠেছে।

অ্যাল্যাঁ রেনে পরিচালিত একটি চিত্রের এক দৃশ্যে নায়িকা ইমানুয়েল রিভা

বহু মহিলাও এইসঙ্গে তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছে। ছবির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, স্বাধীনতার জন্য প্রতিরোধ-যুদ্ধ আর ফ্যাসিস্ট যুদ্ধকে একাকার করে ফেলা হয়েছে। আর এক অভিযোগ যৌনতার ব্যাপারে বিদ্রোহী চিন্তাধারায়। যাই হোক 'হিরোসিমা মন আমোর' বিশ্বের সকল চিত্ররসিকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। চলচ্চিত্র আঙ্গিকের এ এক সম্পূর্ণ নতুন চেহারা রেনে তাঁর ছবিতে তুলে ধরলেন। এরপর তুললেন 'লে এ্যানে ডেরিনার এ ম্যারিচেনবাদ' এ ছবিও দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এখানেও অতীত, বর্তমান, যা ঘটেছে বা ঘটছে বা ঘটতে পারত সবকিছু নিয়ে রেনে তার চিত্রকল্প তৈরি করলেন। সময়ের মাপ এখানে কোন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলে নি। রেনের অপর একখানি অসাধারণ চিত্র 'দি ওয়ার ইজ ওভার'। ছবির নায়ক ডীগো---এমন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য যারা সবসময় স্পেনে বিদ্রোহ ঘটাতে চাইছে। কর্মস্থল তার স্পেনে এবং সেই উপলক্ষে প্রায়ই তাকে যাতায়াত করতে হয়, যদিও তার বাসস্থান প্যারিসে। কিন্তু এজন্য তার নিজস্ব কোন পাশপোর্ট ছিল না। অপরের পাশপোর্টই সে ব্যবহার করতো। এবং যে ব্যক্তির পাশপোর্ট ব্যবহার করতো তিনি ছিলেন জাতে ফরাসী। একদিন এক অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে গেল। সীমান্ত থেকে ফেরার পথে সীমান্ত-প্রহরীরা তাকে আটক করে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল এবং শেষে তার পাশপোর্ট থেকে ঠিকানা বার করে সেখানে ফোন করলো। পাশপোর্টের আসল অধিকারীর কন্যা প্রথমটা কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও পরে তাকেই তার বাবা বলে কথাবার্তা করে তাকে ধরাপড়ার হাত থেকে রক্ষা করলো।

ডিগো মেয়েটির এ উপকার ভুললো না। এ সেইহেতু কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য তার বাড়ীতে ফিরে হাজির হল একদিন। ডিগোকে পিতৃতুল্য বলে মনে হলেও বিদ্রোহী হিসেবে যে মেয়েটির মনের উপর এমনই প্রভাববিস্তার লাভ করলো যে মেয়েটি স্বেচ্ছায় ডিগোর কাছে নিজের দেহদান করে ধন্য মনে করলো। এদিকে ডিগো তার বহুদিনের সঙ্গিনী মারিয়েনের কথা ভুলতে না পারায় তার কাছে ফিরে আসে। মরিয়েনও তার কাছে প্যারিসে থেকে যাবার জন্য ডিগোকে অনুরোধ করে। এদিকে ডিগো ও তার দলের কাজকর্মের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। এই অবসরে দলের একব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং ডিগোও বাধ্য হয় স্পেন অভিমুখে ছুটে যেতে। সুন্দরী দুই তরুণী নাদিন এবং মারিয়েন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ডিগোর ধরা পড়ার আশঙ্কায় তারা ভীত হয়। কিন্তু ডিগো স্বচ্ছন্দে সীমান্ত অতিক্রম করে স্পেনে প্রবেশ করে।
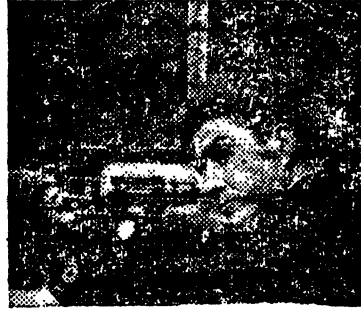
চিত্রকার অ্যাল্যাঁ রেনে

চিত্রটি রাজনৈতিক রোমাঞ্চে ভরা এবং রেনে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়াবার জন্যে ডিগোকে ক্রমাগত তৎপর অবস্থায় দেখিয়েছেন বন্ধুদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন তাকে জর্জর করে তুলেছে। এখানেও রেনে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একসূত্রে গেঁথে ছবিটির আবেগকে বৃদ্ধি করেছেন। রেনে তাঁর এই অসামান্য চিত্রশৈলীর মাধ্যমে যুদ্ধের অসার্থকতা প্রতিপন্ন করে এমন কতকগুলি দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন যা ভোলার নয়।

অ্যার্লঁ্যা রেনে জ্যা তেম জ্যা তেম বা আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ সর্বাধিক জটিল বিষয়বস্তু ও পরিচালন-দক্ষতার পরিচায়ক। ছবিটি গতানুগতিক কাহিনী-চিত্র নয় বা দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যেও এটি নির্মিত হয় নি। এ ছবির নায়ক কুদকে নিয়ে কয়েকজন ডাক্তার একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন। তার অতীতকে তাকে কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়ে দেওয়া যায় কি না, সেই পরীক্ষা একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে ছবিটি ঘটনা বিস্তার করেছে একটা বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য। কিছু এ্যাবসার্ড ধর্মী নাটকের রীতিতে। ভালবাসার জিজ্ঞাসা প্রেম সম্পর্কে মানুষের তৃপ্তি ও অতৃপ্তিকে নিয়ে প্রশ্নগুলির ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। আত্মহত্যা করতে গিয়ে সে হাসপাতালে যায়। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে একজন ডাক্তারের কাছে আসে। ডাক্তাররা তাকে নিয়ে পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় তার অতীতের কথা মনে ভেসে আসে। এবং অতীত দিয়ে সে নিজের মূল্যায়নের চেষ্টা করে। চিত্রটিতে অতীত, অনতি-অতীত, বর্তমান কেবলই একাকার হয়ে যায়। একই দৃশ্য বারবার ফিরে আসে। অস্তিত্ববাদের বিপরীত, অথবা বিকল্প একটি দার্শনিক সূত্রকে সম্ভবতঃ পরিচালক এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। হয়তো তিনি বলতে চান, আমাদের জগতে তথা মনোজগতে সময়ের কোনও সীমা নেই; আমরা বাস করি সময়হীন পৃথিবীতে। রেনের অন্য ছবির মুখ্য চরিত্ররা যেমন বার বার অতীতে ফিরে গেছে অর্থাৎ অতীতকে পুনর্জীবিত করেছে এই ছবির নায়ক কুদও ঠিক সেই আদর্শে ঘুরে বেড়ায়। এখানে রয়েছে অতিরিক্ত হিসেবে সায়েন্স ফিকশানের আমেজ। তবে ঐটুকুই, রেনে তা নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করেন নি। এইখানেই রেনের বৈশিষ্ট্য। রেনে বলেন, ফিল্মে যেটি আমাকে আকর্ষণ করে তা হচ্ছে বিশ্ব-জগতের মধ্যে আর একটি জগৎ আছে এবং তার নাম ফিল্ম-জগৎ। এখানেও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে চরিত্রগুলি আছে তারা সবাই সত্য কথা বলে, সাধারণের মতই তারা যেখানে থাকে, চলাফেরা করে, অনেকের কাছে চলচ্চিত্র অস্পষ্টতা ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু রেনের মতে চলচ্চিত্র স্পষ্টতা এবং সরলতায় পরিপূর্ণ। স্যুটিং-এর পূর্বে

তিনি কিছু কিছু স্কেচ করেন এবং তা নিশ্চলতা বা অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, স্যুটিং এর সময় স্কেচগুলোকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে থাকেন। উত্তরে রেনে বলেন, সে সময়ও আমি চিন্তা করি এবং আলোচনা করি। এছাড়া এর দ্বারা অভিনেতা এবং ক্যামেরাম্যানদের সঙ্গে এক মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে। স্যুটিং-এর আট দশদিন আগে থেকে অভিনেতাদের আতঙ্কিত হয়ে থাকতে হয় না। কারণ স্ক্রিপট এর সঙ্গে স্কেচ থাকার ফলে অভিনেতাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা আগে থেকেই গড়ে ওঠে। এবং স্যুটিং-এর সময় আমি তাদের যেকোন অবস্থার মধ্যেই রাখি না কেন যার সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই তাঁরা ওয়াকিবহাল থাকেন এবং বিশেষ চিন্তা করার কিছু থাকে না। এবং যেহেতু আমি চাই সেটের মধ্যে সকলেই একটু হাত পা ছড়িয়ে নিক, সেইহেতু স্যুটিং সুরু হবার আগেই আমি যা কিছু আলোচনা তা করে নিয়ে থাকি। শুধু তাই নয় স্যুটিং-এর আগে আমি সবকিছুরই মহড়া দিয়ে নিয়ে থাকি। অভিনেতাদের সম্বন্ধে রেনের ধারণা খুব উচ্চে। তাদের কাজেরও তিনি খুব প্রশংসা করেন। আবহাওয়ার জন্য প্রায়ই স্যুটিং-এর দিন পরিবর্তন করতে হয় কিন্তু অভিনেতাদের জন্য কদাচিৎ। ক্যামেরা সম্বন্ধে রেনে বলেন, ক্যামেরার নির্দেশ অনুযায়ীই ফ্লোর সাজানো হবে, ফ্লোরের সাজানো অনুযায়ী ক্যামেরা ঘুরবে ফিরবে না।

নাট্যলোক

পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ ও ক্লান্তি

চীফ মাইনিং অ্যাডভাইসার রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রযোজনা করলেন বাংলা নাটক 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ' ও হিন্দী নাটক 'ক্লান্তি'—এই নাটক দুটি অভিনীত হলো সম্প্রতি ধানবাদ রেলওয়ে ক্লাবে। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাটক দুটি দর্শকরা উপভোগ করেন। দুটি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন শান্তি রাবানী ও কে সি ইন্দর। সমষ্টিগত ভালো অভিনয়ের জন্য দুটি নাটকই সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। নিমাই ঘোষ, মনোরঞ্জন পাল, আলোক দত্ত, সিদ্ধার্থ দাস, সমীর দত্ত, বিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, কার্তিক বৈরাগী, কে সি ইন্দর, বি দুবে, বি রাম, ডি আচার্য, স্নিগ্ধা দত্ত, অনীতা চক্রবর্তী, রত্না চক্রবর্তী প্রমুখের একক অভিনয় প্রশংসিত হয়।

এখানে পিঞ্জর

সম্প্রতি কুলটি অফিসার্স ক্লাবের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মনোরম অর্কেষ্ট্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুরু হয়। পরে ভারতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করেন গীতিকা মুখোপাধ্যায়, শেষে স্থানীয় নাট্য সংস্থা 'প্রবাসী' একাঙ্ক নাটক 'এখানে পিঞ্জর' অভিনয় করেন। নাটকের অব্যবহিত পূর্বে 'প্রবাসীর' বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তরুণ সাংবাদিক সমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বক্তৃতা করেন। শ্রীলাহিড়ী জানান যে, নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ড্রামা ফেষ্টিভ্যালে 'এখানে পিঞ্জর' নাটকটি মঞ্চস্থ করে এই প্রবাসী সংস্থা তিনটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে এসেছেন, একটি আট বছর বয়সের পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণাত্মক এই নাটকটির একক চরিত্রে অভিনয় ক'রে শিশু অভিনেতা শ্রীমান দেবাশিস্ মুখোপাধ্যায় অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় ও নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা অর্জন করে। তপন রায় রচিত ও পরিচালিত এই নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন সমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং যন্ত্র সঙ্গীতে সহযোগিতা করেন প্রবীণ শিল্পী হরিমোহন দাস।

শ্যামলেন্দুর মূকাভিনয়

সম্প্রতি বসিরহাটের অন্তর্গত তারাগুনিয়ার অগ্রদূতের পরিচালনায় একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কলকাতার নামী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করলেও বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল জনপ্রিয় শিল্পী শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর মূকাভিনয়। শিল্পী শ্যামলেন্দু সেদিন মোট তিনটি বিষয়ের উপর দীর্ঘ সময় ধরে মূকাভিনয় করলেন। অভিব্যক্তির প্রকাশ নিখুঁত, সবকটি চরিত্র যেন বাস্তবরূপ নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে মানবজীবনের বিভিন্ন উপলব্ধিকে সার্থকরূপ দেওয়ার জন্য সেদিন তিনি দর্শকদের প্রশংসার দাবী রাখেন।

ক্ষুধা

খেয়ালীর শিল্পিবৃন্দ গত ১০ই মে রাঁচি রোটারী ক্লাব হলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ক্ষুধা নাটকটি মঞ্চস্থ করে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দান করেন।

বর্তমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাটকের বিষয়বস্তু মুন্সিয়ানার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে। একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সফল নাটকে যা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহলো শিল্পীদের টিম ওয়ার্ক। খেয়ালীর শিল্পিবৃন্দ এজন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখেন।

সদা, গজা, গগন গড়াই, মানবী ও মলিনার চরিত্রে যথাক্রমে পরিমল চক্রবর্তী, নিরঞ্জন রায়, ফেলু মুখার্জী, শ্রীমতী অঞ্জু চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী বাসন্তী দাস অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি কবিরাজ, দেবপ্রসাদ বিশ্বাস, হারাধন সমাদ্দার, বিশু চৌধুরী, অমল ভট্টাচার্য, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, ব্রজগোপাল দে, শ্রীমান মাণিক মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান শ্যামল সরকার. শ্রীমান সমীর

সরকার, পূর্ণেন্দু দাস, শ্রীমতী সন্ধ্যা সমাদ্দার এবং আরও অনেকে।

সঙ্গীত পরিচালক শ্রীবিমলকুমার দাস, নাটকটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তাঁর অবদান নিশ্চয় উল্লেখনীয়।

দৃশ্যসজ্জা এবং অলোক সম্পাতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

উৎসবের অন্তরালে

রূপনারায়ণপুর হিন্দুস্থান কেবলস সমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী রচিত ও পরিচালিত নৃত্যগীতি আলেখ্য 'উৎসবের অন্তরালে' পরিবেশন করলেন, মূকাভিনয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত আঙ্গিক ও প্রয়োগ চিন্তার অভিনব এই নাটকটি। অনুরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ালী সেনগুপ্ত, কল্পনা মুখোপাধ্যায় প্রশংসার দাবী রাখেন। গ্রন্থনার কৃতিত্ব কাজল লাহিড়ীর।

ঐ মহামানব আসে

বোসবাগান মাঠে 'ঐ মহামানব আসে' নৃত্যগীতি পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন অতীন চট্টোপাধ্যায়, স্বপনকুমার, সন্ধ্যা রায়, সুরমা মিত্র, পাপনু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আরো অনেকে।

বসন্ত উৎসব

চুঁচুড়া সঙ্গীতকলা মন্দিরের সভ্যবৃন্দ বসন্ত উৎসবের ডালি সাজিয়েছিলেন সম্প্রতি গোম ট্রেনিং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। রবীন্দ্র কবিতা ও গীতি অবলম্বনে রচিত 'বসন্ত উৎসব' সমবেত সুধীজনকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। এদিকে থেকে উদ্যোক্তাদের প্রথম প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত। অনুষ্ঠান পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন সঙ্গীতে দেবু চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যে যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্কলন ও গ্রন্থনায় বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। নাচে আর গানে অংশ নেন সন্ধ্যা, অর্ঘ্য, বন্দনা, অঞ্জু, কাজল, তৃপ্তি, ডালিয়া, অঞ্জনা, কাবেরী, মীরা, পারুল, সমীর, শচীন, অশোক, শিশির ও রবীন। সমীর ভট্টাচার্য এ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির প্রযোজক।

ছবি বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার

রঙ্গসভা আয়োজিত "ছবি বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার" প্রতিযোগিতায় ১৯৬৯ সনের শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে প্রতিবিম্ব নাট্যগোষ্ঠীর "ঝিঁঝিঁ পোকার কান্না", প্রকাশ নন্দী পরিচালিত এই সংস্থার এ নাটকটি একাধিক নাট্য উৎসবে প্রশংসা অর্জন করে।

গত ১২ই মে, মঙ্গলবার ছবি বিশ্বাসের বাসভবনে প্রতিবিম্ব নাট্য গোষ্ঠীকে পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, কাননদেবী, তপন সিংহ, অনুপকুমার ও মন্মথ রায়।

বর্তমান যুগযন্ত্রণার পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। অনুন্নত সমাজের প্রতীক হিসাবে একটি পাগলা গারদকে কল্পনা করে নাটকের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

সঙ্গীতশিল্পী হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সে তরুণ হোলেও ইতিমধ্যে সঙ্গীতজগতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আধুনিক,
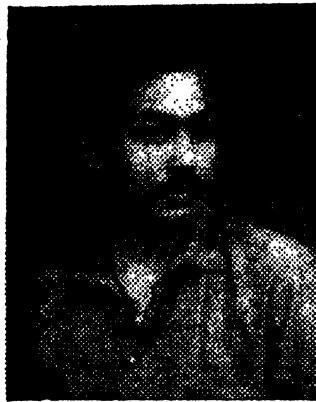
শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভজন ও রাগসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের অবাক করে দিয়েছেন। বর্তমানে উনি শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র।

ব্যঙ্গশিল্পী প্রেমেন দাস

বাংলার তরুণ ব্যঙ্গগীতি শিল্পী প্রেমেন দাস বহু বড় বড় বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গেয়ে বাংলা দেশে এক আলোড়ন
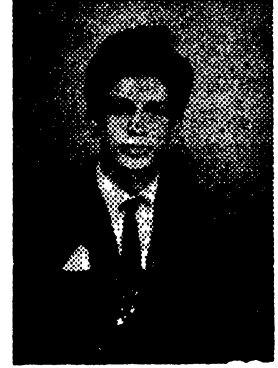
শ্রীপ্রেমেন দাস

সৃষ্টি করেছেন। ইনি হাসির গান নিজেই রচনা করে শ্রোতাদের আনন্দ দান করেন।

তরুণ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক উৎসব ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ৩০শে ও ৩১শে মে উল্টাডাঙ্গার 'তরুণ সম্মিলনী' গোষ্ঠীর সদস্যরা এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাদের প্রথম বার্ষিক উৎসব ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করেন, নিজস্ব সংস্থার প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'কানাগলি', কিরণ মৈত্রের বারোঘণ্টা', এবং সমর সুরাই ও বিশ্বনাথ বিশ্বাসের 'মুন্না' নাটক তিনটি মঞ্চস্থ করেন। তিনটি নাটকই সু-অভিনীত হয় এবং এর সাফল্যের জন্য সংস্থার সদস্য অতীন্দ্রমোহন সাহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুরঞ্জন ঘোষ রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যের উপর আলোচনা করেন। এরপর 'বারো ঘণ্টা' মঞ্চস্থ হয়। "বারো ঘণ্টা' নাটকের নামভূমিকায় নৃপেন্দ্র রায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ আচার্য ও সুনীল দাসের অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে ভূপাল সুরাই, সুবোধ পাল, কানাই সুরাই, গোবিন্দ রায় ও অনিল

নায়কের অভিনয় চরিত্রানুগ। স্ত্রী-চরিত্রে চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ও বেবী দাস-এর অভিনয় সার্থক ও সুন্দর। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ডঃ দিলীপ মালাকার উপস্থিত ছিলেন। এইদিনের প্রথম নাটক 'মুন্নার' চরিত্রে শিশু-শিল্পী উৎসার অভিনয় সার্থক ও সুন্দর। অন্য দু'টি চরিত্রে সমর সুরাই ও বিশ্বনাথ বিশ্বাসের অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় নাটক 'কানাগলি' অপেক্ষাকৃত সু-প্রযোজিত। ভূপাল সুরাই ও ও রবীন্দ্র সাহার অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে নিত্যানন্দ সাহা, অজয় মিশ্র, মৃত্যুঞ্জয় পাল, রণেন্দ্র ঘোষ ও সৌমেন দাস। স্ত্রী-চরিত্রে ছিলেন মন্দিরা দাস, সবিতা রায়, দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেবী দে। নাটক তিনটির সঙ্গীত-পরিচালনায় দিলীপ ঘটকের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

সিলুয়েটের পরিচালনায় নূতন নাটক আবৃত্ত দশমিক

গত ১৭ই মে, রবিবার বিশ্বরূপা নাট্যমঞ্চে সিলুয়েট-এর পরিচালনায় ব্রেশটের অনুপ্রাণিত 'আবৃত্ত দশমিক' অভিনীত হয়। এই নাটকের মধ্যে ফুটে উঠেছে বাস্তব সমাজের পচনশীল অবস্থার কতকগুলো চিত্র। পরিচালক ধীর সেন মহাশয় অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালনা ক'রে নাটকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন। এই নাটকটিকে দলগত হিসাবে প্রত্যেকেই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সফলতার পরিচয় দেন। নাটক রচনা এবং পরিচালনায় ধীর সেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে বাস্তব সমাজের পচনশীল অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন বাস্তববাদী নাট্যকার এবং পরিচালক হিসাবে বিশেষ প্রশংসার পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

আর, আই, সি, রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ চতুর্থ বার্ষিকী উৎসব পালন করলেন গত ৬ই ফেব্রুয়ারী একাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ হলে। এই উপলক্ষে এঁরা এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, তাতে অংশ নেন শ্রীশচী-নাথ মুখোপাধ্যায়, কবি মজুমদার, উৎপলা সেন, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, এবং মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত। শেষে সংস্থার সভ্যগণ পার্থপ্রতিম চৌধুরীর "নাসকাটা ঘর" নাটকটি সাফল্যের সাথে অভিনয় করলেন।

দলগত অভিনয় এদিন নাটকটি সত্যকারের আনন্দ দিতে পেরেছিল দর্শকদের। নাটকে প্রথমেই বলতে হয় "আগন্তুক" রূপী দিলীপকুমার ঘোষ-এঁর নাম, এর অভিনয় বহুদিন মনে রাখার মত। অভয়পদ ঘোষের "মর্জের ডাক্তার" যেন মামুলি ধরণের অভিনয় হয়েছে। এ ছাড়াও এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন বেণুলাল ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ ঘোষ, তপন গুহরায়, সুশীল ভট্টাচার্য, হিমাংশু মুখার্জী। আবহসঙ্গীত এই নাটকের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে কাজে লেগেছে এবং তা খুবই প্রশংসনীয়। এটি পরিচালনা করেন রবীন পাল, পরিবেশ মজুমদার। নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন অভয়পদ ঘোষ।

কলিকাতায় সেন্ট্রাল মিউজিক কলেজ আয়োজিত বড়ে গোলাম আলি খান সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন তাঁর প্রিয় ছাত্রী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্তা সংগীতশিল্পী শ্রীমতী প্রভাতী মুখোপাধ্যায়

গোপালকৃষ্ণ রায় পরিচালিত "নলদময়ন্তী" চিত্রে অসীমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সুন্দরবন মিউজিক্যাল কনফারেন্সের উদ্যোগে বৈদ্যনাথ রায়ের পরিচালনায় কাকদ্বীপ অমর টকীজের পাশের মাঠে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে বিশেষ আনন্দদান করেন সর্বশ্রী উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল সেন, দিলীপ চক্রবর্তী, চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়। হাস্যকৌতুকে কয়েকটি নক্সা পরিবেশন করেন সুশীল চক্রবর্তী। কৌতুকগানে আনন্দদান করেন দুই বেচারা। যন্ত্রসঙ্গীতে ভি বালসারা তাছাড়া মূকাভিনয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন তপন দত্ত।

বারো ঘণ্টা

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ষ্টাফ এসোসিয়েশনের দুর্গাপুর শাখার বার্ষিক আনন্দ সম্মেলনে ব্যাঙ্কের কর্মীরা সম্প্রতি স্থানীয় 'এ' জোন কমিউনিটি সেণ্টারে কিরণ মৈত্রের "বারো ঘণ্টা" নাটকটি অভিনয় করলেন। অভিনয়ে যদিও সকলেই নতুন, তবু শিল্পীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে নাটকটির বলাগাত্র অভিনয় সকলের মনেই রেখাপাত করতে সমর্থ হয়। এটি পরিচালনা করেন সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে ছিলেন চণ্ডী চট্টোপাধ্যায়, অসিত দত্ত, রবীন মুখোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, সুরেশ ধর, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মোহন গড়াই, মদন চক্রবর্তী, মানব দাস, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, গোপা চৌধুরী, দীপ্তি চন্দ্র, শ্রীমান মিঠু এবং পরিচালক স্বয়ং, আবহসঙ্গীতে ছিলেন ভূমেন মৈত্র ও সম্প্রদায়।

জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়—যাযাবির বাইরে
চিত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়

বছরের শ্রেষ্ঠ কলাকুশলীবৃন্দ

দিশারী সংস্থা গত ১৯৬৯ সালে অভিনীত নাটক ও যাত্রাগান এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৃতীদের নাম ঘোষণা করেছেন। বিজয়ী সকলকে দিশারী এওয়ার্ড দ্বারা ভূষিত করা হবে। এওয়ার্ড কমিটি ঘোষিত বছরের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের ফলাফল:

নাট্যাভিনয়

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা: নক্ষত্রের "নয়ন কবীরের পালা"। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার: বসন্ত ভট্টাচার্য "পরাজিত পৃথিবী"। শ্রেষ্ঠ পরিচালক: নিমাই ঘোষ (শৃঙখল), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা: শ্যামল ঘোষ (নয়ন কবীরের পালা)। শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা: অসিত মুখোপাধ্যায় (তারা শোনে না)। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী: মমতা চট্টোপাধ্যায় (অজাতক)। শ্রেষ্ঠা সহ অভিনেত্রী: সিপ্রা সাহা (লালকুঠী)।

যাত্রা

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা: তরুণ অপেরার "লেনিন"। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার: শম্ভু বাগ (লেনিন)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক: জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (মৃত্যুঞ্জয় সূর্য্য সেন)। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক: মহেন্দ্র দত্ত (জ্বলন্ত বারুদ)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা: শান্তিগোপাল (লেনিন)। শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা: জহর রায় (সূর্য্য সেন)।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী: জ্যোৎস্না দত্ত (আন্দোলন)। শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রী: বর্ণালী ব্যানার্জী (রাজা রামমোহন)। শ্রেষ্ঠ কৌতুক শিল্পী: রাধারামণ পাল (জ্বলন্ত বারুদ)।

শাস্ত্রীয় সংগীত

শ্রেষ্ঠ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী আরতি বাগচী ও দিলীপ চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ সেতার শিল্পী: কল্যাণ লাহিড়ী। শ্রেষ্ঠ বেহালা শিল্পী: নিভা দাস। শ্রেষ্ঠ বাঁশীবাদক: প্রণব মুখার্জী। শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক: সন্দীপ দেব। শ্রেষ্ঠ সারেঙ্গী শিল্পী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ ভরত নাট্যম শিল্পী: লিপিকা গুপ্ত। শ্রেষ্ঠ কথক নৃত্যশিল্পী: মায়া চট্টোপাধ্যায়

দেখুন! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে...

টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোয়ার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়—এমন সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে!

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম। টিনোপাল কিনুন—রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা "এক বালতির জন্যে এক প্যাকেট"!

Tinopal

® টিনোপাল—জে.আর.গায়গী.এস.এ.,বাল, সুইজারল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গায়গী লিঃ, পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আ

Shilpi HPMA 13A/70 E

রবতীচরণ ভট্টাচার্য

াথাসপ্তশতী ১২·০০

হাজার বছর আগে সাতবাহন-নরপতি হাল-সংকলিত প্রাকৃত বিতার সরস কাব্যানুবাদ। সপ্তশতী সর্বদা বচনে ব্যঞ্জনায় স্থূল বনের ছবি আঁকে—কোন অনির্বচনীয়ের কল্পলোকে আমাদের য়ে যায় না।·····দেবতা ও স্বর্গের জন্য সপ্তশতীর কবিদের ান শিরঃপীড়া নেই।·····সপ্তশতীর গাথাগুলির তর্জনীসংকেত ই ধরিত্রীর দিকে।···নরনারীর স্নেহ-প্রেম-প্রীতি বিরহ-মিলন ানন্দ-বেদনা ঈর্ষ্যা-অসূয়ার গানে মুখরিত সপ্তশতীর এই দক্ষিণী দীপ।·····যে ভাবের পাঠকই আসবেন খালি হাতে কেউ রে যাবেন না।···কাব্যের পরিচয়সূচক বিস্তৃত ভূমিকা সংবলিত।

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

মেঘদূত ৭·০০

আগে মেঘদূতের অনুবাদ বাংলাদেশে অনেক হয়েছে, কিন্তু ছন্দ রেখে অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন: "যোগীন্দ্রনাথের অনুবাদ একটি য়কর সমুচ্চশিখর হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্ষতবিক্ষত চরণ বিক্ষেপে যোগীন্দ্রনাথ কৃতকার্যতার তুঙ্গশৃঙ্গে যে জয় পতাকা প্রোথিত করলেন বাংলা ছন্দ সাধনার আকাশে তা কাল সগৌরবে উড্ডীন থাকবে।"······

য়দুর্গা লাইব্রেরী ঃ ৮এ কলেজ রো : কলিকাতা ৯

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ! সদ্য প্রকাশিত হইল!!

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

রাজভাষা

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ)

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার অপূর্ব গ্রন্থ। যাঁহারা কিছুমাত্র ইংরেজী জানেন না, তাঁহারাও 'রাজভাষা'র সাহায্যে কোন শিক্ষকের সহায়তা ব্যতিরেকে অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে পারিবেন। ইংরেজী ভাষার শিক্ষকদের পক্ষেও 'রাজভাষা' বিশেষ সাহায্যপ্রদ বলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ স্বীকৃত। ইংরেজী ভাষা যাঁহারা নিয়ত চর্চা করেন তাঁহারাও 'রাজভাষা' ব্যবহারে উপকৃত হইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম নির্মাতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী লিখিয়াছিলেন :—

"আমি রাজভাষাখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে প্রথম ইংরেজী শিক্ষাবিদ্‌দিগের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তক যাঁহারা মনোযোগের সহিত সযত্নে পাঠ করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই যে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

॥ মহাভারত ॥

প্রাচীন যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস ও নীতিকথা—সমস্ত মহাভারতে বিধৃত।

মূল সংস্কৃতের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত

আক্ষরিক অনুবাদ, শব্দার্থ পাদটীকা ও ভূমিকা সম্বলিত

প্রথম খণ্ড—(আদি, সভা ও বনপর্ব)	১৬·০০ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—(বিরাট, উদ্যোগ ও ভীষ্মপর্ব)	১০·০০ "
তৃতীয় খণ্ড—(দ্রোণ ও কর্ণপর্ব)	১০·০০ "
চতুর্থ খণ্ড—(শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী ও শান্তিপর্ব)	৮·০০ "
পঞ্চম খণ্ড—(শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব)	৮·০০ "

বোর্ডে বাঁধা মনোরম সংস্করণ। উৎকৃষ্ট কাগজ, উন্নততর ছাপা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

হায় কলকাতা!

কি সাহিত্যে কি শিল্পকলার নানা শাখায় কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, একটি বিশেষ বিষয়গত প্রবণতা উত্তরোত্তর আধিক্য লাভ করে চলেছে। যেহেতু সাহিত্য বা শিল্পকলা প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম অর্থাৎ প্রকাশই যার ধর্ম, তাই জীবনে যা কিছু ঘটে থাকে তাকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ এবং যথাযথভাবে চিত্রিত করাই একালের প্রকাশরীতির স্বরূপ হওয়া উচিত--এই ধরনের মনোভাব বর্তমানে অনেকের মধ্যেই পোষিত হচ্ছে। জীবনকে এইভাবেই সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় অনেকেই এখন উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের কাছে জীবনের চিত্রায়ন কোন রাখা-ঢাকা বা সীমা-পরিসীমার গণ্ডীর মধ্যে সার্থকতা লাভ করতে পারে না। জীবনে যা কিছু ঘটে ললিতকলা বা সুকুমার শিল্পের মাধ্যমে তার কতটা পর্যন্ত পরিবেশন করা চলে, মাত্রাবোধ বা পরিমিতি সংক্রান্ত সীমারেখার প্রশ্ন এই জীবনবাদীদের কাছে আজ আর প্রশ্রয় পাচ্ছে না। তাই, সাম্প্রতিক বহু সুকুমারকলায় যৌনতার আধিক্য বা ছড়াছড়ি বিশেষভাবে দৃষ্টিপথে পড়ে যাচ্ছে।

গত জুন মাসে নিউইয়র্কে একটি যৌন-আবেদনমূলক বা পরিপূর্ণ যৌনধর্মী নাটক সাড়া জাগিয়েছে। এই নাটকটির নাম শুনে শুধু কলকাতাবাসী কেন, সারা ভারতবাসী প্রথমটায় রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন। নামটিকে কেন্দ্র করেই নাটকটি সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নৃত্যগীতবহুল এই নাটকটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ওহ ক্যালকাটা'। যৌনধর্মী যে ক'টি সাহিত্য ও নাটক সম্প্রতি সারা দুনিয়ায় আলোড়ন এনেছে, এই রচনাটির স্থান তাদের পুরোভাগে বললেও অত্যুক্তি হয় না। বৃটেনের জাতীয় রঙ্গালয়ের পরিচালক ও লণ্ডনের এক প্রাক্তন সমালোচক কেনেথ টিনান এর রূপকারী 'ওহ ক্যালকাটা' সম্পর্কে বলেছেন--এটি সঙ্গীত সহযোগে এক কলাসম্ভার, নৈশ আমোদ-প্রমোদ এবং সময় কাটানোর এক সভ্য মার্জিত উপকরণ হিসাবে গণনীয় হতে পারে। যৌনতার প্রাধান্য সম্পর্কে ইনি বলেছেন, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং প্রখর শিল্পবোধ সমন্বিত ব্যক্তিরা এই নাটকে অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যাদি দেখে জীবনের এক সামগ্রিক পরিচয় পাবেন, যা কিছু দৃষ্টান্তের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে।

সাধারণ্যে সাড়া যে জেগেছে তার মুখ্য নিদর্শন লোকে দু'মাসের অপেক্ষায় দুশো টাকা দিয়েও এর টিকিট কিনেছেন। তবে, এর দর্শকের চেয়ে পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশী। তার কারণ এর নাট্যরূপ দেখার জন্য দু'মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কিন্তু গ্রন্থটি বইয়ের দোকানে গেলেই পাওয়া যাচ্ছে। থিয়েটারের টিকিট যেখানে কিনতে হচ্ছে দুশো টাকা দিয়ে, বইটি সেখানে তেরটি টাকা দিলেই পাওয়া যায়। দর্শকের সুবিধার চেয়ে পাঠকের সুবিধা আরও বেশী। সাধারণ রঙ্গালয়ে দূর থেকে সকলের সঙ্গে যে দৃশ্য দর্শক উপভোগ করছেন, সেই যৌনপ্রধান দৃশ্যগুলির ক্লোজ-আপ চিত্রসমূহ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ায় তার আনন্দ (রুচিগত প্রশ্ন তুললে স্বতন্ত্র কথা) পাঠক আস্বাদ করছেন দর্শকের তুলনায় অনেক বেশী।

এখন স্বভাবতই এই ধরনের যৌনধর্মী নাট্যসম্ভারের নাম এই মহানগরীর নামানুসারে কেন হল--এ সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত হতে পারে। আসলে নাটকের কাহিনী বক্তব্যের সঙ্গে আপনার-আমার কলকাতা শহরের কিন্তু তিলমাত্রও সম্পর্ক নেই। শুধু কথার খেলায় এই নামটি দাঁড়িয়ে গেছে। ফরাসী চিত্রকর ক্লোভিস ত্রুলির একটি বিখ্যাত ছবি এর নামের উৎস। একটি মোহময়ী তরুণীর নিতম্বপ্রদেশ ছবিটির উপজীব্য। এই ছবিটির "Oh! quelle cul t'as" এই কথাটি থেকেই কথান্তরে দাঁড়িয়ে গেছে 'ওহ ক্যালকাটা'। কথাটির অর্থ--'আহা কি সুন্দর নিতম্ব তোমার'।

এতক্ষণ না হোক, নামকরণের ইতিহাস শুনে আমাদের মনে হয় সমগ্র কলকাতাবাসীও এবার নিশ্চয়ই বলবেন --হায়! কলকাতা।

—মধুছন্দা

'আবিরে রাঙানো' চিত্রের নায়িকা সুচন্দ্রা

যাত্রা সমাচার

মাধবী নাট্য কোম্পানী

মাধবী নাট্য কোম্পানীর পরিচয় নতুন করে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বহু সার্থক পালা এরা ইতিমধ্যেই উপহার দিয়েছেন দেশের নাট্য রসপিপাসু ব্যক্তিদের। সম্প্রতি এঁদের দুটি পালা যেভাবে আলোড়ন তুলেছে তা অনেকের কাছেই ঈর্ষার কারণ। একটি কানাইলাল নাথের 'আগুন নিয়ে খেলা' ও অপরটি প্রশান্ত ভট্টাচার্যের 'রক্ত দিয়ে কিনলাম।' নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে যাঁরা নাটকদুটিকে বিপুল সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সেই তালিকার মধ্যে আছেন, সেণ্টু দাস, রমেন ভাদুড়ী, ননী চক্রবর্তী, বাবলু ভট্টাচার্য, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী দাস, সোনালী গোস্বামী, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, গীতশ্রী দাস প্রভৃতি। নাট্যপরিচালনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন মনোরঞ্জন চক্রবর্তী।

নিউ গণেশ অপেরা

যাত্রা জগতের এক বিশেষ সম্পদ নিউ গণেশ অপেরার 'মরেও যারা মরে না'। এর পূর্বে যে ক'খানি পালা এরা দেশের জনসাধারণের কাছে উপহার দিয়েছে তার প্রত্যেকখানিই সার্থক। বর্তমানে যাঁরা এই পালাটিকে অভিনয়সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, ভোলা পাল (বড়), পশুপতি ঘোষ, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, মধুছন্দা, দীপ্তি ঘোষ, (ঝুমটি) সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় (দুলালী), হরিপদ সর্দার, বিজয় মজুমদার, দেবেশ্বর গুপ্ত, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রতুল নস্কর, প্রজাপতি পাত্র, মন্মথ চট্টোপাধ্যায়, দুলাল সিকদার, আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় দে, ভূপেন প্রামাণিক, বরদা সর্দার ও মহাদেব। অমিয় ভট্টাচার্যের সুরসমৃদ্ধ 'মরেও যারা মরে না' পালা গানটির সঙ্গে কণ্ঠদান করেছেন, সুধীর ধাড়া। গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পালা গানটি দিনের পর দিন দর্শকচিত্ত জয় করে চলেছে।

নাট্যভারতী

'বিনয়-বাদল-দিনেশ' এই তিনটি নামের সঙ্গে বাংলা দেশের আপামর জনসাধারণের যেমন পরিচয় তেমন নাট্যভারতী এই নামেরই পালাগানটির প্রচার করে নাট্যরসপিপাসু জনগণের মনে বিশেষ একটি আসন দখল করে নিয়েছেন। অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী রচিত এই পালা গানটির পরিচালনায় আছেন যাত্রাজগতের প্রখ্যাত নট পঞ্চু সেন। যাঁদের অভিনয়নৈপুণ্যে নাটক বিপুল সংখ্যক দর্শককে বিমোহিত করে রাখে তাঁরা হলেন, মোহিত বিশ্বাস, মনোজকুমার, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত সাহা, দিলীপকুমার, অনিল ভট্টাচার্য, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, প্রবীরকুমার, বেণু সিং, জ্যোৎস্না দত্ত। আবহসঙ্গীতে খোকা মল্লিক এবং সঙ্গীত পরিচালনায় সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন কানাই জানা। এই নাটকটির প্রচার ও প্রসারের জন্য নাট্যভারতী আজ সকলের প্রশংসা পাবেন।

দিল্লীতে আয়োজিত যাত্রা উৎসবে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তরুণ অপেরার তিনজন শিল্পী শান্তিগোপাল, বর্ণালী ব্যানার্জী ও শিব ভট্টাচার্য

নিউ ওয়েল বীণাপাণি অপেরা

নিউ ওয়েল বীণাপাণি অপেরার শিল্পীরা 'এক টুকরো রুটি' অভিনয় করে বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন। নাটকটি বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও সুনিপুণ্যানার সঙ্গে অভিনয় হয়ে চলেছে নাটকটির আর একটি সম্পদ সঙ্গীত। সুরের মায়াজাল যেভাবে কালীপদ সেন বিস্তার করেছেন তার জন্য প্রশংসা পাবেন। শিল্পী তালিকায় আছেন---বিজন মুখোপাধ্যায়, তরুণ-কুমার, মিহির ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা ভট্টাচার্য, প্রিন্স চৌধুরী, ছবিরাণী, বেলা সরকার, ফিরোজাবালা, রীণা চক্রবর্তী, তিনকড়ি ভট্টাচার্য, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ দাশগুপ্ত, বিভূতি পাণ্ডে প্রমুখ।

তরুণ অপেরা

চলতি মাসের ছ তারিখে কোল-কাতার নাট্য-রসপিপাসু ব্যক্তিগণ আর একবার 'লেনিন' নাটকটি দেখবার সুযোগ পেলেন। বাংলা দেশের জনসাধারণের কাছে তরুণ অপেরা প্রযোজিত এই নাটকটি সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। কোলকাতার নামকরা মঞ্চ ছাড়াও, বাংলা দেশের বহু জায়গায় নাটকটি যতবারই অভিনয় হয়েছে ততবারই দর্শকেরা অভিভূত হয়েছেন নাটকটির প্রয়োগগত নৈপুণ্যে ও দলবদ্ধ অভিনয় মাধুর্যে। নাটকটির প্রধান ভূমিকায় আছেন যাত্রা-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট শান্তিগোপাল। তরুণ অপেরার পরবর্তী আকর্ষণ শম্ভু বাগ রচিত 'নেপোলিয়ন' এবং অমর ঘোষ রচিত 'রমলা সার্কাস'। পরিচালনায় থাকছেন অ র ঘোষ এবং নাটক দুটির প্রধান ভূমিকায় থাকছেন শান্তিগোপাল।

বিচিত্র বোম্বাই

দু'টি হাত একত্র হওয়ার ব্যাপার যেখানে, তখন কাজ কি অনেক মাথাকে অনাবশ্যক টেনে এনে! মাথার সংখ্যা যতো বাড়বে কৌতূহলী চোখের মাত্রাও সীমা ছাড়িয়ে যাবে। —না কি!---চারিচক্ষের মিলনকে অকারণে বিড়ম্বিত না হ'তে দেওয়াই তো কাঙ্ক্ষণীয়।

এই মতবাদেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে বোধ হয় সেদিন উদীয়মান শিল্পী অজয় সাহনী চুপি চুপি তাঁর ধ্যানের ধনটিকে পরম আপন জনে পরিণত করেছেন। কাকপক্ষী হয়তো টের পেয়েছিলো, খবর জানতে পারে নি উৎসাহী মানুষের দল। একটু অনুমান করতে পারলেই তো চেঁচামেচি হৈ-চৈ-এ কান ঝালাপালা করে ছাড়ত।

দেব আনন্দের ভাগ্নী কুমারী অরুণা কোহলীর সংগে অজয়ের মোহব্বৎ চলছিলো অনেকদিন ধরেই, তারি সফল পরিণতি ঘটলো পরিণয়ে। কিন্তু অত্যন্ত গোপনে। ওদের বিয়েতে উভয়ের বিশিষ্ট আত্মীয়-স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব বাদ পড়ে গেলেন বিলকুল। উভয়ের মা বাবাও হাজির থাকতে পারেন নি অনুষ্ঠানে---সেজন্যে তাঁদের আপশোসের শেষ নেই। ইতর জনের মিষ্টান্নে বঞ্চিত হ'য়ে কিঞ্চিৎ কুপিত হওয়া স্বাভাবিক, তাই বলে জনক-জননীকেও বঞ্চিতের দলে ফেলা হয়তো ঠিক হয় নি। তা না হোক, সুভালাভালির ইচ্ছায় দুটি হৃদয় যে পথ-চাওয়া আর কাল-গোণার অবসান ঘটাতে পেরেছে এই না ক-তো। অরুণা-অজয় অজেয় হোক তাদের মিলিত জীবনের প্রাত্যহিক যুদ্ধ-বিগ্রহে। জীবনটা যেমন অভিনয়-মঞ্চ তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রও বটে। ওরা নিত্যই যেন জয়ী হয়ে বিজয়মালা পায়।

●

ক'লকাতার কালী ব্যানার্জী বোম্বাই পাড়ি দিয়েছেন। বিশ্বরূপা থিয়েটারের 'ঘর' যখন ভেঙে গেল তখনই উনি---অনুমান করি ওঁর নিজের ঘরও বাংলার বাইরে নতুন ক'রে বাঁধবার পরিকল্পনা করলেন। শিল্পীদের এই মহা সুবিধে (অবিশ্যি বরাতও চাই) এ রাজ্য সে রাজ্য ঘুরে বেড়ানো খুবই সহজ। হয়েছেও তাই। কালীবাবু কুলজিৎ পালের নির্মীয়মাণ ছবি 'আনজানা সফর'-এ অভিনয় করছেন বর্তমানে। এ-ছবিটি

অজয়

রাইডার হ্যাগার্ডের প্রখ্যাত রচনা 'কিং সলোমন মাইনস' অবলম্বনে গড়ে উঠছে। শ্রীব্যানার্জী মৃত্যু-প্রতীক্ষিত এক বন্দীর ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন।

কালী ব্যানার্জি বোম্বাইয়ে এরপর ক্রমানুয়ে কাজ করে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। সেক্ষেত্রে বাংলাকে একেবারে ছেড়ে যাওয়াও হয়তো দরকার হবে। শিল্পীর নতুন প্রচেষ্টা সার্থকতায় মণ্ডিত হোক।

কুলু ভ্যালির প্রকৃতির সৌন্দর্যে দর্শকদের চোখ জুড়োবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পরিচালক রামানন্দ সাগরের নতুন ছবি 'গীত'-এ। কিন্তু এই দৃশ্য গ্রহণ করতে গিয়ে সদলবলে শ্রীসাগর প্রাণ হারাতে বসেছিলেন সেদিন। সাবধানী পথিকরা পথ ভুলে ঘুরে ঘুরে মরতে বসেছিলেন বিমানবাহিত অবস্থায়---নাক ঘেঁষে গেছে চরম বিপত্তিটুকু। বিমান-চালক বেচারী কুলু বিমানক্ষেত্রটি খুঁজে না পাওয়ায় বাঁধলো গণ্ডগোল—আর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় নির্দিষ্ট নিশানার উদ্দেশ পাওয়া তো সহজ নয়। প্লেনের আরোহীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন---চিত্র-তারকারা তো কণ্ঠাগত প্রাণ তখন। মালা সিনহা, রাজেন্দ্রকুমার, নাজির হোসেন, নির্দেশক রামানন্দ সাগর, বিভিন্ন কলাকুশলীর মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়; প্লেন তো ঘুরছে ঘুরছে---কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে কোথায় সেই বাঞ্ছিত পথ-রেখা, যেখানে উড়ন্ত ওই যান্ত্রিক ঈগলটিকে নামিয়ে তার বুক চিরে বেরিয়ে আসতে পারবে সবাই। প্রকৃতই পারবে কি? ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে ধক্-ধক্ করে হৃদস্পন্দনের সংগে পাল্লা দিয়ে এক ঘণ্টা ---দু' ঘণ্টা --তিন ঘণ্টা --- আরো আরো ——

প্রযোজক-পরিচালক শ্রীসাগর ধীর পায়ে উঠে গেলেন, ককপিটে বসলেন। তাঁর মাথার হাজারো ভাবনার ধোঁয়া পাক খাচ্ছে, তবু তিনি ভেঙে পড়েন নি। ভগবানে বিশ্বাস হারান নি তিনি, চেয়ে রইলেন পথের নিশানার খোঁজে। এক সময় চোখে পড়লো ক্ষীণ সেই পথ-রেখা, পাইলট সেই পথেই পেয়ে গেলেন অতোগুলি যাত্রীর বিপন্মুক্তির তোরণ-দ্বার। আঃ মাটির (পাথর?) বুকে পা রেখে বুক ভরে প্রাকৃতিক বাতাস দু' নাকে টেনে নেওয়ার কী যে মাদকতা ---তার সম্যক্ উপলব্ধি

ধর্মেন্দ্র

হোলো মানুষগুলির। পথ পেতে যদি আর মিনিট পনেরো দেরি হোতো, তাহলে পেট্রোলের অভাবে প্লেনখানা সেদিন ওই সব আরোহীকে নিয়ে পাহাড়ে মাথা খুঁড়ে মরতো এটা সত্যি কথা।—

যাই হোক, ভ্যালিতে দৃশ্যগ্রহণ করতে গিয়ে পরিচালককে আবার এক সমস্যায় পড়তে হয়েছিলো। হাজার চার-পাঁচ স্থানীয় মানুষ তো হাজির ওই সব জনপ্রিয় শিল্পীকে দেখতে, তারা আর নড়ে ছাড়ে না। তা ছাড়া কুলুতে (সারা সিনে) যে মেলার দৃশ্যটি নেবার জন্যেই ওঁর সদলে সেখানে যাওয়া সেটাই বা কি করে সম্ভব। সবাইকে বেশ জোর ধাপ্পা দিয়ে অতঃপর দৃশ্যটি তোলা হয়েছিলো ঠিকই—'গীত' মুক্তি পেলে তার পরিচয় পাবেন দর্শকবৃন্দ। এখন একটু ধৈর্য না ধরে উপায় নেই।

ভি শান্তারাম সেদিন তাঁর নতুন ছবি 'জল বিন মছলি, নৃত্য বিন বিজলী' ছবির খুব জাঁকজমকপূর্ণ একটি নাচের দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন। এটি তোলা হয়েছে বোম্বাইয়ে তুলসী হ্রদের তীরে, নাচে অংশ নিয়েছিলেন নায়িকা সন্ধ্যা ও নায়ক প্রবীণকুমার। সংগে নৃত্য-শিল্পীদের একটি দল। ইষ্টম্যান কালারে তোলা হচ্ছে ছবিটি। লক্ষ্মী-কান্ত-প্যারেলাল এর সুরকার।

রোম্যাণ্টিক জুটি শশী কাপুর ও শর্মিলা ঠাকুরের একটানা পাঁচ দিন দু'শিফটে দৃশ্য গ্রহণ শেষ করে বেশ কিছুটা কাজ এগিয়ে নিলেন পরি-চালক বিজয়। ছবির নাম 'সুহানা সফর'। সেঞ্চুরী ফিল্মসের পতাকা-তলে তোলা হচ্ছে এটি। আর কে বেদীর গল্পের চিত্রনাট্যকার জালালমুখী। আনন্দ রামানী লিখেছেন সংলাপ। আনন্দ বক্সী রচিত গানে সুর দিচ্ছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, চরিত্রচিত্রণে আর যাঁরা অংশ নিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আছেন কে এন সিং, মনমোহন কৃষ্ণ, উল্লাস, ললিতা পাওয়ার, রেণু তিওয়ারী, আগা, ডেভিড প্রভৃতি।

●

'ফুল অওর পাথর' ছবিটি বক্স অফিসের বদান্যতায় ধন্য হয়েছিলো বিশেষ করে। প্রযোজক-পরিচালক ও পি রালহনের প্রচেষ্টা সেবার সার্থক হয়েছিলো—নাম এবং দাম মিলেছিলো যুগপৎ, খবরে দেখা যাচ্ছে শ্রীরালহনের নবতম প্রয়াস 'তলাশ' সব রেকর্ড

ব্রেক করে দিয়েছে। প্রায় কোটি... টাকার এই ছবিতে দুনো আয় হবে সকলের ধারণা। কোথাও কোথাও বা তারও বেশি। বম্বে সার্কিটে পাঁচ সপ্তাহে 'তালাশ'-এর কালেকশন হয়েছে দশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো তেত্রিশ টাকা, 'ফুল অওর পাত্থর'-এ পাঁচ সপ্তাহে পয়দা হয়েছিলো সাতলক্ষ ছিয়াশি হাজার চৌষট্টি টাকা উননব্বুই পয়সা। দিল্লী ইউ পি-তেও অনুরূপ অর্থাগম হয়েছিলো। পাঞ্জাব কিন্তু সবাইকে টেক্কা মেরেছে, তিন সপ্তাহে 'তালাশ' থেকে আয় হয়েছে সাড়েপাঁচ লাখেরও বেশি, 'ফুল অওর পাত্থর' থেকে ওই সময়ে সংগৃহীত হয়েছিলো তিনলক্ষ সাড়ে চুয়াত্তর হাজারের মতো। ছবি সম্পর্কে দর্শকদের খুব উচ্ছ্বাস শোনা যাচ্ছে। ছবির নায়ক রাজেন্দ্রকুমার। মনে হয় রাজেন্দ্রকুমারের এবার সৌভাগ্য-সূর্য মেঘমুক্ত হবে। কথাই তো আছে 'নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস।'

●

এখানে ছবির নামকরণে এখন একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কোনো হিট গানের লাইন নিয়ে টানাটানি লোকালুফি চলেছে। দস্তুরতো এটা রেওয়াজ হয়েও পড়েছে বলা যায়। 'রঙ্গিলা তেরে রঙ মে'—এ গানটা 'প্রেম পূজারী' ছবির। এটি জনচিত্তে সাড়া জাগিয়েছে। ব্যস, ফিল্ম কোক বাগিয়ে নিলেন এটি, নাম হোলো ছবির 'রঙ্গিলারে'। বি এ পরদেশী ও বি আর নাইডু প্রযোজিত এ ছবির মুখ্য ভূমিকা দুটিতে রূপ দেবেন সঞ্জীবকুমার ও ডিমি। শঙ্কর-জয়কিষণ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সুর সংযোজনার জন্যে। এইচ এ রাহী সংলাপ লিখছেন, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় রয়েছেন বি আর নাইডু।

●

কি করে প্রোডাকশনের খরচ কমানো যায়? প্রযোজকদের এটা এখন শিরঃপীড়ায় দাঁড়িয়েছে। স্যুটিং-এর সময় যদি সংক্ষিপ্ত করা যায়, তাহলে বেশ কিছু টাকা বাঁচতে পারে। অতএব কমাও স্যুটিং ডেট—অন্তত চেষ্টা তো করো। পরিচালক অমিত বসু তাঁর 'জান পহেচান' ছবিটি পঞ্চাশ দিনে শেষ করবেন বলে ঠিক করেছেন। রঙিন ছবিটির নায়ক হচ্ছেন সামীর (ফিরোজ খাঁ ও সঞ্জয়ের অনুজ), নায়িকার রূপসজ্জা নেবেন শ্রীমতী নন্দা। নন্দার চরিত্রটি মজার—অতি আধুনিকা একটি মেয়ে বিরাট এক নারী বাহিনী নিয়ে পুরুষদের জুলুম রুখতে বদ্ধপরিকর। তার প্রয়াসের কি পরিণতি দাঁড়ালো সেটার বিষয়ে কোনো আলোকপাত এখনি করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তবে অনুমান করা চলতে পারে। ছবির কাজ এগুচ্ছে।

●

সমীর গাঙ্গুলীর প্রথম ছবি 'সাগীনা'-এ সায়রাবানু যাকে বলে ক্যাপচার করেছিলেন। অবিশ্যি শহরে আসার আগে পর্যন্ত ওই চরিত্রটিকে আমি বিশেষভাবে উপভোগ করেছি। তারপর কেমন যেন হয়ে গেল। যাই হোক, শ্রীগাঙ্গুলী তাঁর নতুন প্রচেষ্টার কাজে বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন। রাখী এখন নায়িকা হচ্ছেন, তাঁর বিপরীতে থাকছেন শশী কাপুর, আর থাকবেন অনিতা দত্ত, নাজির হোসেন, কৃষ্ণকান্ত ও উমা ধাওয়ান।

ববিতা

সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে
চিত্র : বিশ্বনাথ গোস্বামী

নায়ক মনোজকুমার এখন পুরোদস্তুর পরিচালক বনে গেছেন। ওঁর লেটেস্ট ছবি 'পুরব পচ্ছিম'-এর দৃশ্য-গ্রহণ প্রায় শেষের দিকে। মনোজ তাঁর ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষের মনের গভীরে অনুসন্ধান চালাতে চেয়েছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। এদেশ ওদেশ বলেও কিছু নেই।'

সম্প্রতি মেহবুব স্টুডিওতে এ-ছবির কিছু দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। বিশেষ ভাবে তৈরী করা বার লাউঞ্জের একটি অর্ধবৃত্তাকার বিরাট সেটের মধ্যে চিত্রগ্রহণ সমাধা হয়েছে। দৃশ্যটি খুবই চিত্তাকর্ষক। ওপরের ছাদ থেকে ঝুলবে হরেক রকমের আলোর ঝাড়, মেঝে মোড়া রয়েছে সুদৃশ্য কার্পেটে, মেঝের মাঝামাঝি বসানো হয়েছে তিনটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। তাতে চারটি করে টেবিল রাখা। এই সেটে শিল্পী ছিলেন সায়রাবানু, প্রেম চোপরা, রাজেন্দ্রনাথ এবং মনোজ স্বয়ং। কয়েকজন হিপিও উপস্থিত ছিলো দৃশ্যটিতে।

এইভাবে কাজ চললে জুলাই মাসের মধ্যে ছবির দৃশ্য গ্রহণ শেষ হ'তে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

●

আর একটা সু-খবর দিই। অঞ্জু মহেন্দ্রর কথা মনে আছে তো? রাতারাতি যে চিত্রনায়িকা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্সের কণ্ঠলগ্না হয়ে সারা ভারতে জোর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই বঙ্কিতাকে নিশ্চয় ভুলে যান নি। কলকাতাতেও পড়ন্ত প্রতিভা সোবার্স কতো কি বলেছিলেন তাঁর ভারতীয় প্রিয়া সম্পর্কে। কিন্তু চটকদারি কথার রঙিন বেলুনগুলো ফেঁসে চুপসে একাকার হয়ে গেল ভারতের মাটি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই। পরের ঘটনাগুলো তো সকলেরই জানা। হালফিল সোবার্স শাদা চামড়ার অর্ধাঙ্গিনী সংগ্রহ করে নিয়েছেন সে ছবিও তো নানা পত্রপত্রিকার শোভা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু ক্রিকেট জগতে সোবার্স তাঁর মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছেন অনেকখানি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার যে গদীচ্যুত হয়েছেন, সেটা নাকি অঞ্জুর অভিশাপেই—এমন গুজবও শুনেছি। কিন্তু প্রতারিতার কি এমন সান্ত্বনা এতে?

সত্যিকারের শান্তি এবং সান্ত্বনা বোধ হয় এতোদিনে শ্রীমতী অঞ্জুর অদৃষ্টে ঝাপিয়েছে। এবার আর ভিনদেশী কেউ না, বোম্বাইয়েরই তিনি একজন। পাঁচজনের একজন নয়, একেবারে পঞ্চম। ছবির রাজ্যে রাজেশ খান্না তো এখন যথেষ্ট নাম করে ফেলেছেন। এই রাজেশকেই নাকি অঞ্জু এবার আঁচলে ঘিরে নিয়েছেন। রাজেশ স্বয়ং কথাটা অবশ্য স্বীকার করেন নি। ওঁদের যে বাক-দানপর্বও কিছুদিন হোলো সারা হয়েছে সেটাও মানতে চান নি। তা স্বীকার-অস্বীকারে কিছু যায় আসে না শুধু ভয় হয়। রাঙা মোমের আবির্ভাবে কারা যে আতঙ্কগ্রস্ত হয়—সেটা তো মিথ্যে নয়। তারকার সঙ্গে তারকার অন্তরের আত্মীয়তা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়লেই আমরা খুশি হবো আন্তরিক। বেচারাকে আর যেন হতাশার আগুনে দগ্ধ হতে না হয়!—

●

'নলচে আড়াল' কি একে বলে? না, তাও নয়, প্রায় স্পষ্টাস্পষ্টি হিন্দী ছবিতে আদি রসাত্মক ব্যাপারগুলো দেখানো হ'চ্ছিলো। 'খোসলা কমিটি' তাকে দরাজ করতে অনেক বিধি ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। সেটা আইনের অনুমোদন পাবার আগেই ঝটিতি তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ছবিতে। বাঙলাও ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আসছে পেছনে। তবে হিন্দী রয়েছে একবারে চূড়োতে। দেশের খবর বিদেশের কাগজের মারফৎ চোখে পড়েছে সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের 'লাইফ' ম্যাগাজিনের কল্যাণে জানা গেছে 'আনজানা সফর' ছবিতে বিশ্বজিৎ নায়িকা রেখাকে উত্তপ্ত চুম্বন করেছেন। কেমিস্টো ফিল্মসের হিন্দী এই নিবেদনটিতে একেবারে চুম্বনের সোজাসুজি আমদানি। বোম্বাইয়ের অনেকেই খবরটা জানতেন না, তাই, 'লাইফ'-এর ওই সংবাদ পরিবেশনের পর তাঁরা হন্যে হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেন। জানা গেল সত্যিই তাই। তবে ওই 'দৃশ্যটি' বিদেশে দেখবার জন্যেই গৃহীত হয়েছে এখানে ওটা পরিবেশিত হবে না।

—রূপমন চৌধুরী

শর্মিলা ঠাকুর

প্রথম ইলেকট্রনিক বেহালা

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সুর-সৃষ্টির ভাবনায়ও এসেছে পরিবর্তন। এমন কি বাদ্যযন্ত্রগুলিকেও বর্তমান কারিগরী যুগের উপযোগী করে নেওয়া হচ্ছে। আজ একটিমাত্র ইলেকট্রিক গিটারের আওয়াজেই বিরাট কনসার্ট হল গমগম করতে থাকে। বড় বড় বাদ্যযন্ত্রের সুর তো এখন বাড়িতে বসেই সৃষ্টি করা যায়। প্রায় সব স্বরকম্পনই বর্তমানে তৈরি করা যায় ইলেকট্রনিকের সাহায্যে। কিন্তু এ পর্যন্ত যে যন্ত্রটি তৈরি করা যাচ্ছিল না কিছুতেই, তা হ'ল ইলেকট্রনিক বেহালা। পিয়ানোর মত একটি যন্ত্রে ইলেকট্রনিকের সাহায্যে কয়েক রকম তারের বাজনার সুর সৃষ্টি করা গিয়েছে বটে, কিন্তু এমন কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র এতাবৎ ছিল না যা দেখতে ঠিক বেহালারই মত, বাজাতেও হয় ঠিক একইভাবে। এইরকম যন্ত্র শীঘ্রই বাজারে দেখা যাবে। পশ্চিম জার্মানীর। ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী। টাউনাসের ভেইলবাস নামক স্থানের এক সৌখিন কারিগর এই যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

ইলেকট্রনিক ভারোলিনের সুবিধা হল : বেহালার সমগোত্রীয় চারটি তারের বাজনার সুর এই একটি যন্ত্রেই পাওয়া যাবে। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণকারীদের দুর্ভোগ কিছুটা কমবে, তাঁরা বেশ সন্তুষ্ট হবেন। কারণ উন্নত মানের বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের যেসব মূল্যবান কাঠ বিপুল পরিমাণে আমদানি করতে হয়, তা আর অত বেশি আনতে হবে না। ইদানীং এইসব কাঠ পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেপ রেকর্ডারে যেমন একটা কথা বলার হেড থাকে, ইলেকট্রনিক বেহালায়ও তেমনি একটা হেড থাকবে। ছড় দেখতে কিন্তু আগের মত থাকলেও তা টেপ দিয়ে মোড়া থাকবে। সেই [illegible] হবে। [illegible] ওই [illegible] ফলে শুরু হবে ইলেকট্রনিক কম্পন। সেই কম্পন তখন বিবৃত হবে এব বাজনা শোনা যাবে।

তবে এই ইলেকট্রনিক বেহালা তৈরির সব কাজ এখন শেষ হয় নি। আবিষ্কারকের বক্তব্য, কর্মপ্রয়োগের দিক থেকে বর্তমানকালের বাজনাটিও নিজের আসন করে নেবে। তবে সত্যিকারের স্ট্রাডিভারি জাতীয় বাজনার সঙ্গে এটি কখনও কোনক্রমেই প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না।

৫নং শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার ছক

(কেটে পাঠাতে হবে)

■	১		২	■	৩	৪		■
৫	■	৬		৭			■	৮
৯	১০	■	১১			■	১২	
১৩		১৪	■		■	১৫		
■	১৬			■	১৭			■
১৮			■	১৯	■	২০		২১
২২		■	২৩		২৪	■		
	■	২৫				২৬	■	
■	২৭			■	২৮			■

৪নং শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার সমাধান

সমাধান ॥ সূত্র (পাশাপাশি) : ১। কুরল ৩। বসুমতী ৯। পদার্থ ১০। বক ১১। নহলা ১৪। বায়না ১৬। চরম ১৮। মরক (মকর) ২০। বকপা (পাবক) ২৩। মম ২৫। রবদ (বরদ) ২৬। অতা ২৭। দরিয়া ২৯। য়িচরতা (রচয়িতা) ৩০। কুঞ্জর

সূত্র (উপর নীচে) : ২। রধ (ধর) ৪। সূপ ৫। মদাড়া (দামড়া) ৬। তীর্থঙ্কর ৭। শবর ৮। কহবা (বাহক) ১২। লায়ম (ময়লা) ১৩। নীরব ১৫। নারঙ্গ ১৭। মকর (রকম) ১৯। তামদায় (দময়ন্তী) ২১। পাবদা ২২। সাতাশ ২৪। মরিচ ২৮। গঞ্জ

৪নং শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার সমাধান

মুদ্রণ প্রমাদ হেতু বৈশাখ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে ৪নং শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতায় উপর-নীচের ৭নং সূত্রটি বাদ পড়িয়া যাওয়ায় উপর-নীচে ৭নং এবং পাশাপাশি ১০ নং সূত্রটি প্রেরিত সকল সমাধানেই সঠিক আছে এরূপ ধরিয়াই আমরা বিচার করিয়াছি। এবারকার প্রতিযোগিতায় নির্ভুল সমাধান পাঠাই-বার জন্য প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন ২/১১, যশোর রোড, কলিকাতা-২৮ হইতে শ্রীমতী মিনু দে। ইহার পর একটি ভুল-বিশিষ্ট কোন সমাধান না থাকায় দুইটি ভুলবিশিষ্ট সমাধান প্রেরণকারীদের দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পুরস্কার পাইবেন তরুণ বসু, ৩০/১/বি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪ এবং বারীনকুমার ভদ্র ও ভক্তিরঞ্জন দেব, পোঃ কলাগ্রাম, জেলা মেদিনীপুর। যেহেতু শেষের দুজন একই ছকে সমাধান পাঠাইয়াছেন, এবং দুজনের নামে মণিঅর্ডার করা যায় না সেই হেতু তাঁহাদের ভাগের ৭·৫০ পয়সা কাহার নামে প্রেরণ করা হইবে তাহা জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

অগ্রদূত পরিচালিত 'অজরী অপেরা' ছবিতে উত্তমকুমার

একালের জনপ্রিয় অভিনেতাদের মধ্যে রিচার্ড বার্টন (৪৫) একটি বিশিষ্ট নাম। দীর্ঘকালব্যাপী এঁর অবিরাম সেবায় চলচ্চিত্র জগৎ যথেষ্ট পরিমাণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বহু বিখ্যাত চরিত্রের এঁর সার্থক রূপায়ণ জনসাধারণ্যে এঁর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলেছে। সম্প্রতিকালের পরিসরে নেবেড, নাইট অফ দ্য ইগুয়ানা, ভি-আই-পি, স্যাণ্ড পাইপার প্রভৃতি চিত্রসমূহে তাঁর অভিনয় এক অসামান্য সম্পদস্বরূপ। এই বিদগ্ধ অভিনেতাকে এবার চিত্র পরিচালকরূপে দেখা যাবে। যে ছবিটি তাঁর পরিচালন কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে আত্মপ্রকাশ করবে, সেই ছবির নাম 'ডিযে-ক্টার' আগামী অক্টোবর থেকে এই চলচ্চিত্রায়ণ শুরু হবে। এই ছবির আর একটি প্রধান আকর্ষণ---এতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন বার্টনের বিশ্ববিখ্যাতা সহধর্মিণী উনচল্লিশ বছর বয়স্কা এলিজাবেথ টেলার।

●

গত ২৯শে মে থেকে রুশ চলচ্চিত্রের একটি সমারোহ সুরু হয়েছে ভারতবর্ষে। স্থান নির্বাচিত হয়েছে নৈনিতাল। এই মনোমুগ্ধকর চিত্রগ্রাহী অঞ্চলে অনুষ্ঠেয় এই চিত্র-সমারোহ স্থায়িত্ব লাভ করবে এক সপ্তাহ। বহু খ্যাতনামা রুশ শিল্পী ও কুশলী এতে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শোভা বৃদ্ধি করবেন বলে আশা করা যায়।

●

জাপানের বিশ্বমেলা-৭০ সম্প্রতি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এক আন্তর্জাতিক সংবাদে পরিণতি লাভ করেছে। এই বিশ্বমেলায় প্রদর্শনের জন্য সুইডেনের 'আই এ্যাম কিউরিয়াস' নামক ছবিটি এসেছিল। 'ইয়েলো ফিল্ম' হিসাবে চিহ্নিত এই ছবিটি পাশ্চাত্য দেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সুইডেন যে কতখানি এগিয়ে (?) গেছে আন্তর্জাতিক চিত্র জগতের খবরাখবর যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছে তা অজানা নেই। বিশেষ বিশেষ মহলে এই বিখ্যাত সাড়া জাগানো ছবিটি জাপানের এই মেলায় একবাক্যে ছাড়পত্র পায় নি। সেখানে ছবিটি সেন্সর করা হল এবং ছবিটি অশ্লীল বলেই ঘোষিত হল।

'থ্রী ফেসেস অফ ইভ' এর নায়িকার ভূমিকায় যাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয় দর্শককে বিস্ময়ে হতবাক্ করে দিয়েছিল সেই শক্তিময়ী শিল্পী জোয়ান উডওয়ার্ডের (৪১) আগামী ছবি "মিসেস বেনেকার"। এই ছবিতে এক মনস্তাত্ত্বিক রোগিণীর ভূমিকায় জোয়ান আত্মপ্রকাশ করবেন।

●

গত তিন বছর চলচ্চিত্র জগতে এমন কোন ছবি মুক্তি পায় নি, যার শিল্পী-তালিকায় জেরাণ্ডিল পেজের (৪২) নাম পাওয়া যাবে। বর্তমানে শোনা গেছে 'দ্য বিগুইল্ড' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

* * *

ক্যাথারিন রস তাঁর বর্তমান প্রেমিক আলোকচিত্রী কনরাদ হলকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে নারাজ হলেন, কিন্তু তাই বলে হলের সঙ্গে ক্যাথারিন প্রণয় মধুর সম্পর্কের প্রগাঢ়তা কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে ভাবলে ভুল করা

সাগর পেরিয়ে

হবে। ক্যাথারিন বলেছেন, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কে বিবাহটা নাকি এমন একটা গুরুতর বা অপরিহার্য ব্যাপার নয়।

●

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত লস এ্যাঞ্জেলস শহরের মেয়র শ্রীশ্যাম ইয়র্টি অল্পকাল পূর্বে ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন। মেয়র মহাশয় ব্যক্তি-জীবনে রীতিমত চিত্রামোদী। চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগ ঐকান্তিক। ভারত পরিদর্শনের সময় তিনি বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন ও ঘরোয়াভাবে চিত্রনির্মাতা শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে মিলিত হন। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা শ্রীরামানন্দ সাগরকে—তাঁর প্রতিভায় এবং বন্ধুত্বে অভিভূত হয়ে তারই স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রীইয়র্টি লস এ্যাঞ্জেলস শহরের চাবি উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

●

লণ্ডনে নির্মাতব্য যে ছবিটি আগামীদিনের সারা জগতের দর্শকসমাজে এক অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে বলে অনায়াসে আশা করা যায় তা ছিল 'দ্য পারফিউমড' গার্ডের কামসূত্র অবলম্বনে এই ছবিটি দর্শক সমাজকে যে গভীর ও ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করবে সে সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুমান বা নিরূপণের অপেক্ষা অবশ্যই থাকে না। ধর্ণরঞ্জিত এই ছবিটির দুই প্রধান ভূমিকায় দেখা দিচ্ছেন সইদ জাফরী এবং চিত্রা নিয়োগী। ছবিটির নানা অংশে এই দু'জন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। চিত্তচাঞ্চল্যকারী বহু দৃশ্যের অভিনয়ে এই দুই শিল্পী অংশ নেবেন

●

ভারতের বাইরে যে সকল স্থানে ভারতীয় চিত্র অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সিরিয়া সেই তালিকার অন্যতম নাম। পৃথিবীর নানাস্থানেই ভারতীয় চিত্রের বিপুল সমাদর এই তালিকায় সিরিয়া এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সঙ্গম, ফুল ঔর পত্থর, কাশ্মীর-কা-কলি, দুলহান এক রাত কী' প্রভৃতি সাড়াজাগানো ভারতীয় ছবিগুলি সিরিয়ার রাজধানীতেই গৃহীত হয়েছে। বহু ভারতীয় চিত্রস্রষ্টা চিত্রায়ণের উপযুক্ত স্থান হিসাবে এখন দেখা যাচ্ছে, সিরিয়াকেই নির্বাচিত করছেন।

●

প্রবীণ অভিনেতা জেমস ম্যাসনের (৬২) প্রাক্তন সহধর্মিণী প্যামেলা খুব শীঘ্রই 'লেডী প্যামেলা' নামে চিহ্নিত হতে চলেছেন, পরিণত বয়সে প্যামেলার বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর প্যামেলার অন্তরঙ্গ হিসাবে একাধিক নাম সংশ্লিষ্ট মহলে অনুমিত হয়। অল্পকাল পূর্বে জনৈক বৃদ্ধ চিকিৎসকের সঙ্গে প্যামেলার প্রণয় এক প্রগাঢ় আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু সকলের তুলনায় একদা জেমসের বন্ধু জো লেভির সঙ্গে প্যামেলার প্রেম ব্যাপকভাবে সকলের

[illegible] পড়ে এবং জানা যায় প্যামেলার হৃদয়ে সকলের তুলনায় জো'র আসনই সর্বোচ্চে। এ কাহিনী যাঁরা জানেন বর্তমানে তাঁদের কিন্তু সে ধারণা বদলাতে হবে। প্যামেলার বর্তমান জীবনধারা প্রমাণ করছে যে, তাঁর হৃদয়ের সর্বোচ্চ আসনে এখন আর জো লেস্লি অধিষ্ঠিত নন, সেই শূন্য আসন এখন লর্ড ডেনিস হুইটলির অধিকারে। তাঁদের উদ্দাম প্রেমলীলা বর্তমানে সকলেরই গোচরীভূত, শুধু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটাই সকলের অজানা।

●

বিখ্যাত গায়ক অভিনেতা ডীন মার্টিন (৫৩) তাঁর দ্বিতীয় সহধর্মিণী জিনির (৪৩) সঙ্গে সুদীর্ঘকালব্যাপী বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেছেন এক তরুণীর আকর্ষণে। এই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে জিনির মনের সাড়া তিলমাত্রও ছিল না। জিনি একেবারেই চান নি ডীনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হোক, কিন্তু ভবিতব্য রোধ করা যায় নি। বহু অভিনেত্রীকে প্রমোদ সঙ্গিনী বা অন্তরঙ্গা মুহূর্তের সহচরীরূপে লাভ করার কৃতিত্ব বা সৌভাগ্য যাঁর অন্যের মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করে সেই হাওয়ার্ড হিউস এবং জিনি মার্টিনকে এখন অতি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গভাবে ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। ডীনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের সময় জিনির চেহারায় যে মনোবেদনা নৈরাশ্য ও অশান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল হিউসের সাহচর্য লাভের পর জিনির চেহারা থেকে সে ভাব সম্পূর্ণ অপসারিত হয়---তাঁর চেহারায় সেই আগেকার উজ্জ্বল্য লাবণ্য এবং আবেদন পূর্বের তুলনায় আরও যেন বর্ধিত হয়েছে।

●

রূপলোক হলিউড আজ মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত হতে চলেছে। একের পর এক মৃত্যুর আধিপত্য হলিউডের উপর বিস্তৃত হতে দেখা যাচ্ছে। মরণের জয়যাত্রা ক্রমশই যেন এখানে অব্যাহত ও অপ্রতিহত হয়ে চলেছে। অল্পদিনের ব্যবধানে একাধিক শিল্পীকে মরণের আলিঙ্গন বরণ করে নিতে হয়েছে। স্বভাবতই এ ঘটনা চিত্রামোদী সমাজে নিদারুণ বেদনার কালো মেঘ সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি যে কজন শিল্পী জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন তন্মধ্যে ইঙ্গার স্টিভেন্স, অ্যানিটা লুইসি, জিপসি রোজ লী এবং এড কোলীর নাম বিশেষ উল্লেখ্য। মাত্র এক সপ্তাহের সময়সীমায় চারজন কৃতী শিল্পীর জীবনান্ত হলিউডে ইতঃপূর্বে হয়তো কদাচিৎ ঘটেছে।

ইঙ্গার স্টিভেন্স একালের জনপ্রিয় তারকাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। যে রূপসী অভিনেত্রীরা রূপলাবণ্যে, বঙ্কিম কটাক্ষে, লাস্যসমৃদ্ধ আবেদনে দর্শকচিত্তে এক গভীর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছেন ইঙ্গার তাঁদেরই একজন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে এই সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটল। চলচ্চিত্রের নব্যধারায় অন্যতম পীঠস্থান সুইডেন ইঙ্গারেরও পিতৃভূমি। টেলিভিশনেও তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ম্যান অন ফায়ার, এ ড্রিম অব কিংস প্রভৃতি ছবিতে তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রিচার্ড বার্টন

চুয়াত্তর বছর বয়সে লোকান্তরিতা হলেন অ্যানিটা লুইসি। অভিনেত্রীদের মধ্যে একটি শীর্ষস্থানীয় আসন অধিকারে অ্যানিটা সফল হয়েছিলেন। তাঁর চিত্তাকর্ষক অভিনয় পৃথিবীতে তাঁর অগণিত ভক্ত সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যাও সামান্যো সত্তর পাঁচ বছর বয়স থেকে তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনা। ত্রিশের দশকে দর্শকসমাজ তাঁকেই মেনে নিয়েছিলেন সমগ্র চিত্রলোকের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী হিসাবে। তাঁর রূপের এবং লাবণ্যের খ্যাতির সেদিন অন্ত ছিল না। এ মিড সামারস নাইটস ড্রিমে টিটানিয়া এবং মাদাম দ্যু বারীতে মারী আন্তয়নের ভূমিকায় তাঁর অনবদ্য অভিনয় দর্শকের স্মৃতিতে আজও অম্লান দীপ্তিতে বিরাজ করছে। অ্যানিটা জীবনের শেষ দিনেও যে জনপ্রিয়তা এবং সমাদর পেয়েছেন তা এক কথায় বিস্ময়কর।

জিপসি রোজ লী ছিলেন বয়সে অ্যানিটার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। স্বনামধন্য জাঁ ককতিউ পর্যন্ত তাঁর একজন অনুরাগী। তাঁর সম্পর্কে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কাঁ বলেছেন--হাও ভাইটাল-- গ্রন্থরচনায় তিনি মনোনিবেশ করেছেন এবং সাহিত্যের তাগিদে রঙ্গজগৎ ত্যাগ করলেন বলে ঘোষণাও করলেন তিনি। কার্যক্ষেত্রে রঙ্গজগৎ ত্যাগ তিনি করেন নি, কারণ রঙ্গজগৎই তা করতে দেয় নি।

এড কোলীর দেহান্তর ঘটল সত্তর বছর বয়সে। হলিউড ও ব্রডওয়ে উভয় স্থানেই তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। অনন্যসাধারণ এই অভিনয়ক্ষমতা তাঁকে শ্রেষ্ঠচিত্র ও মঞ্চশিল্পীদের পর্যায়ে আসন গ্রহণে সমর্থ করে। রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্মারক হিসাবে সমগ্রজীবনে তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করেছেন।

—চিত্রদূত

ছবির দুনিয়া

অভিনয় জগতের ইতিহাসে পৃথিবীর যে কয়টি বিরাট দেশের দীর্ঘ-কালীন ঐতিহ্য ও অফুরন্ত অবদানের গৌরবময় কাহিনী সসম্মানে লিপিবদ্ধ আছে ইংল্যাণ্ড তাদের অন্যতম। ইংল্যাণ্ডের নাট্যানুশীলনের গুরুত্ব সমগ্র জগতের অভিনয়রসিক সমাজে অশেষ মর্যাদার সঙ্গেই স্বীকৃত। ইংল্যাণ্ডের এই অভিনয় জগৎ যাঁদের মহান সাধনায় ও ঐকান্তিক সেবায় সমৃদ্ধ হার্বার্ট লোম সেই তালিকায় এক অবিস্মরণীয় নাম।

সার্থক শিল্পী হার্বার্ট লোম। বিশ্বের অগণিত দর্শক তাঁর অসামান্য সৃজনীপ্রতিভায় বিমুগ্ধ। জনতার দরবারে অটুট প্রীতির এক উল্লেখ্য আসন তাঁর অধিকারে। ইংল্যাণ্ডের এই বরণীয় শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে হলিউডের চিত্রজগৎও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। লোমের হলিউড ভ্রমণ নানাদিক দিয়ে তাৎপর্য-পূর্ণ। এক দেশের শিল্পীর অপর দেশে অভিনয় কোন অভাবনীয় ব্যাপারের মধ্যে পড়ে না। এক দেশের শিল্পীর অপর দেশে অভিনয় দু'টি দেশের পারস্পরিক পরিচয় প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর করে তোলে। এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ে দু'টি দেশই লাভবান হয়।

কিন্তু লোমের হলিউড যাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। হলিউড থেকে দেশে ফিরে লোম দুই স্থানের নাট্যচিন্তায় শিল্পীদের জীবনচর্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন যে তুলনামূলক একটি চিত্র তুলে ধরেছেন তা নানাকারণে বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

ইংল্যাণ্ড ও হলিউড উভয়েরই লক্ষ্যটি এক—শিল্পসৃষ্টি, শিল্পের প্রচার। কিন্তু ভিতরের জগতের চেহারাটা সম্পূর্ণ আলাদা। লোম দেখেছেন হলিউডের শিল্পী মহলের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক কথো-পকথনের একটি মুখ্য অংশ অধিকার করে থাকে অর্থকরী আলোচনা। টাকা-পয়সা সম্বন্ধে আলোচনার সময়ের একটি দীর্ঘ অংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য দিকগুলি কথো-পকথনের বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত হতে পারে না। কিন্তু লোমের নিজের দেশে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। সেখানেও শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে রত হন। তবে, তাঁদের কথার বিষয়-বস্তু থাকে প্রধানত নির্মীয়মাণ ছবিটিকেই কেন্দ্র করে। ছবিটির গল্প, তার গুণাগুণ, তার বৈশিষ্ট্য, তার ফাঁক ফাঁকি, তার শিল্পী-নির্বাচন, তার অভিনয় প্রভৃতিকে অবলম্বন করেই তাঁদের কথাবার্তা রূপ নেয়।

হার্বার্ট লোম

টাকার জোর হলিউডের ঢের বেশী। লোম হিসেব করে দেখিয়ে-ছেন হলিউডের একজন প্রবীণ তারকাকে যে টাকা দেওয়া হয়—সেই অঙ্কের টাকায় যুক্তরাজ্যে একটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি তৈরী হয়ে যায়। টাকার প্রাচুর্য লোম হলিউডে দেখেছেন, তিনি দেখেছেন একটি ছবিকে স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম করতে সেট-সেটিংস বাবদ জলের মত কিভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়; কিন্তু বৃটিশ ছবিতে যে মহৎ শিল্পসত্তার বিকাশ তিনি দেখেছেন এক বলিষ্ঠ শাশ্বত শিল্পচেতনার প্রতিচ্ছবি ইংল্যাণ্ডের ছবিতে তাঁর চোখে যেভাবে ধরা পড়েছে—হলিউডের ছবিতে তাঁর ধারণায় সে চিহ্ন অনু-পস্থিত। অথচ একথাও তিনি গুরুত্ব সহকারেই উল্লেখ করেছেন যে, হলিউডও কলা-কৌশলগত উৎকর্ষে অনেকখানি এগিয়ে আছে।

মার্কিণ চিত্রজগতে বৃটিশ পরি-চালক - অভিনেতা - অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে এক গভীর শ্রদ্ধার আসন সংরক্ষিত। ইংল্যাণ্ডের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক গুণী কৃতীদের উদ্দেশ্যে আমেরিকার এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব লোমের চোখ এড়িয়ে যায় নি। আর একটি বিষয় লোম লক্ষ্য করেছেন যে, মার্কিণ চিত্রনির্মাতারা অভিনেত্রীদের নামের প্রচার ব্যবসায়ের সাফল্যের অন্যতম উপায় বলে মনে করেন না। শুধু তিনজন অভিনেত্রীর বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটে। সে তিনজন এলি-জাবেথ টেলার, অড্রে হেবার্ণ ও জিন সিমন্স। লক্ষণীয় এই যে, তিন শিল্পীই জাতে বৃটিশ।

এই দুই স্থানের তুলনামূলক আলোচনায় হার্বার্ট লোম শুধু শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি। দুটি অঞ্চলের প্রকৃতিগত পার্থক্যও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। লণ্ডনের মেঘলা আকাশ দেখা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার বাসিন্দার কাছে ক্যালিফোর্নিয়ার মেঘমুক্ত আকাশ থেকে প্রসন্ন সূর্যের প্রদীপ্ত রশ্মি যে কি পরিমাণ প্রেরণা, শক্তি ও উদ্যমের উৎস সেই গভীর সত্যটিও লোম মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

—চিত্রপ্রিয়

আধে-আধুরে'র নট-লীলা

'আধে-আধুরে' চিত্রের একটি দৃশ্যে সুধা শিবপুরী ও ওম শিবপুরী
চিত্র : ধীরেন অধিকারী

সিনেমা-র বহু নটই মঞ্চ-কেন্দ্রিক মঞ্চের মাধ্যমে অনেক সুখ্যাত অভিনেতা নাট্য-কলায় পারংগম হয়েছেন ফলতঃ ছায়াছবি সমৃদ্ধ হয়েছে উৎকৃষ্টতর অভিনেতার সংযোগে —বেড়ে গেছে তার নাট্য-মূল্য।

এই দলের সাম্প্রতিক উল্লেখ-যোগ্য একটি নাম ওম্ শিবপুরী।

ইনি দিল্লী থিয়েটার-এর সুখ্যাত নট ; অংশুমালী-র গতানুগতিকতা বর্জিত ছায়াছবি 'আধে আধুরে'য় এঁর প্রথম চিত্রাবতরণ ; মোহন রাকেশ রচিত এই নাটকটি মঞ্চসফল।

পুরুষ একটি চরিত্রে তিনি রূপায়িত করছেন পেশাদারী নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতায় ; এর সংগে যুক্ত নতুন পথে পদচারণায় উদ্দীপ্ত উৎসাহ—শিল্পীর নিবেদিত-প্রাণতা।

দিল্লীর মঞ্চপ্রেমিকদের কাছে সুপরিচিত, সম্প্রতি টেলিভিশন দর্শকের প্রশংসাধন্য, ওম্ শিবপুরী খ্যাতি অর্জন করেছেন 'খামোশ আদালত জারি হ্যয়', 'তুঘলক', 'কঞ্জুস', 'কিং লীয়র', 'অন্ধা যুগ' এং মোহন রাকেশ-এর 'আশাদ্ কা এক্ দিন' ও আধে-আধুরে' ইত্যাদির মত নানান জাতের নাটকে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে।

লক্ষণীয় যে, এতগুলো নাটক —যা তিনি পরিচালনা, প্রযোজনা করেছেন, যা তাঁর নাট্যাভিনয়দীপ্ত—কেবল যথেষ্ট গুণসম্পন্নই নয়, সফলও বটে। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য অবতরণের জন্য তিনি আধে-আধুরে'র চেয়ে ভাল নাটক পেতেন কিনা সন্দেহ—এ ছবিতে তিনি পাঁচটি ভিন্ন মেজাজের মুখ্য চরিত্র রূপায়ণে ব্রতী; পারিবারিক দ্বন্দ্বের জীবনমুখী প্রকাশই এর লক্ষ্য। হিন্দী ছবির জগতে ব্যাপারটি অভূতপূর্ব।

তাঁর স্ত্রী সুধা শিবপুরী স্বগুণে অভিনয় জগতে প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চ এবং সুকুমার কলার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ গভীর।

খুবই স্বাভাবিক যে তিনি 'আধে আধুরে'য় স্বামীর সংগে মুখ্য স্ত্রী-চরিত্রটি রূপায়িত করবেন। 'তিসরি কসম' খ্যাত বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

'ন্যাশনাল স্কুল অব্ ড্রামা'র ছাত্র বহু স্বর্ণপদক বিজয়ী স্বামী-স্ত্রী ওম শিবপুরী এবং সুধা শিবপুরী 'আধে-আধুরে'র প্রধান আকর্ষণ—নাট্যকলা এবং অভিনয় সম্পর্কে এ উক্তি প্রযোজ্য।

এঁরা দু'জন মঞ্চখ্যাতি অনুযায়ী চলচ্চিত্রেও শিল্প-সুষমায় অবর্ণনীয় মাধুর্যবিস্তারী হবেন নিঃসন্দেহে।

শিবানী কল্—ছায়াছবির বাইরে
চিত্র : অমিত

সম্পাদকীয়

উজ্জ্বল বটে---তবে সোনা নয়

মহাকবি সেক্সপীয়ারের কালজয়ী রচনাগুলির মধ্যে মার্চেণ্ট অফ ভেনিস অন্যতম। এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত যে ক'টি উক্তি বা বাক্যাংশ শতাব্দীর দুস্তর সেতু অতিক্রম করিয়া বিশ্বের কোটি কোটি নর-নারীর হৃদয়ে চিরন্তনের প্রতিশ্রুতিতে গাঁথা হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত All that glitter is not gold---যাহার মর্মার্থ হইল, যাহা চকচক করে তাহাই সোনা নয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সর্বাধিনায়ক আসনে যিনি আজ সমাসীন, সেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নীতি ও কার্যাবলী দেখিয়া সেক্সপীয়ারের এই অমর উক্তিটিই আজ বারবার আমাদের মনের দুয়ারে ঘা মারিয়া যাইতেছে। শ্রীমতী গান্ধীর কার্যধারার স্বরূপ সম্যকরূপে এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে এই উক্তিটির অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থের সহিত এক অদ্ভুত সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রীর আসনে তিনি অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন আজ সাড়ে চার বৎসর পূর্বে। মন্দাক্রান্তা তালে গতানুগতিক ছন্দে একরকম সব কিছুই চলিতেছিল, কিন্তু ১৯৬৯ সাল হইতে আলাপ যেন হঠাৎ জলদে পরিণত হইয়া গেল। শ্রীমতী গান্ধীর ঐ সময় হইতে যে সকল কার্যাবলীর পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে, তাহাদের পরিণতিগুলিও দেশবাসীর অজানা নয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সময়ের মধ্যে যাহা যাহা করিয়াছেন সকল কিছুই তাঁহাকে প্রচুর হাততালি এবং বাহোবা ধ্বনি পাওয়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার কার্যগুলি এমন কি অসমসাহসিকতা, নির্ভীকতা ও জলন্ত দেশপ্রেমিকতা বলিয়া অনেকের কাছে প্রতিভাত হইয়াছে এবং তাঁহার বংশগত ঐতিহ্য তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া সমগ্র ব্যাপারটি এক বিরাট জমকালো রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

আমাদের দৃষ্টি দুই প্রকার---একটি আপাতদৃষ্টি---আরেকটি গভীর দৃষ্টি। ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে এই বিপুল বাহোবার সৃষ্টি আপাতদৃষ্টি হইতে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহার বিপরীত ঘটনাই ঘটিবে। যেমন ইন্দিরা গান্ধী গত জুলাই মাসে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়ত্তের আইন জারী করিলেন। এখনও এক বছর হয় নাই, ইহারই মধ্যে সংবাদ আসিল লণ্ডনস্থ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার আড়াই কোটি টাকা তছরুপ, চমৎকার। কি আনন্দজনক সংবাদ। অধিকন্তু ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখার এজেণ্ট শ্রীপ্যাটেলের তজ্জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা উৎকণ্ঠিত হইবার কারণও নাই---কেন না, বোধকরি কোন শাস্তিই তাঁহার জন্য নির্ধারিত হইবে না। ধর্মতেজার ন্যায় ইনিও খোস মেজাজেই জীবনটি হয়তো কাটাইয়া দিতে পারিবেন। ধর্মতেজার অধর্মকর্ম লইয়া যে সময় সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই বিপুল আলোড়নের মধ্যেই একটি মুখরোচক কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল। শোনা গিয়াছিল ধর্মনামধারী এই মহা-অধার্মিকটি নাকি এক বহুমূল্যের সিল্ককোট প্রধানমন্ত্রীকে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ উপহার দিয়াছেন। এবারেও হয়তো কোনদিন শোনা যাইতে পারে যে, প্যাটেল মহাশয়ও বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করিয়া এক মহামূল্য উপহার সামগ্রীর দ্বারা পঞ্চাশোর্দ্ধা শ্রীমতী গান্ধীর স্মিতমুখের প্রসন্ন হাসিটি আরও চিত্তাকর্ষক করার চেষ্টা করিতেছেন।

বুদ্ধিমান দেশবাসী, লাঞ্ছিত দেশবাসী, প্রতারিত দেশবাসী---বিচার করিয়া দেখুন যে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়ত্তের সুফলের কতটুকু অংশ লাভ করিলেন।

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক---যাহা ইন্দিরা গান্ধীর বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য তাহার একটি স্পষ্ট প্রমাণ রাখে।

নয়াদিল্লীর যে বাড়ীতে মহাত্মা গান্ধী ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন সে বাড়ীটির মালিক বিড়লাগোষ্ঠী। বিড়লারা নাকি এই ঐতিহাসিক ভবনটি সরকারকে দান করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, এই দানের পরিবর্তে তাঁহারা পাইতেছেন প্রায় চোদ্দ বিঘা জমি। বিড়লা বাড়ীর নামও পরিবর্তিত হইবে না এবং তাহার চেয়েও মজার ব্যাপার, ঐ বাড়ী সংরক্ষণের জন্য খরচের টাকার জন্য বরাদ্দ সরকারী টাকা ব্যয় করার ভার থাকিবে বিড়লাদের গঠিত একটি কমিটির উপর। মজার ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; ঐ পুরাতন বাড়ীটির তুলনায় চোদ্দ বিঘা জমির দাম ঢের বেশী। সুতরাং সরকারী টাকা বিড়লাদের পাদপদ্মে কিভাবে উজাড় করিয়া দেওয়া হইতেছে ইহা তাহার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদ পাকিস্তানে আজও কিছুমাত্র কমিল না। এখনও দলে দলে পাকিস্তান হইতে সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুর দল ভারতে আগমন করিতেছেন। আমাদেরই মা-বোনের সম্মান সম্ভ্রম সেখানে ভূলুণ্ঠিত। তাঁহাদের দুঃখে বেদনায় আমরা ভারতীয় নাগরিকরা এককথায় স্তব্ধ, শিহরিত। কিন্তু এই ব্যাপকহারে উদ্বাস্তু সমাগম যদি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে বা অব্যাহত থাকে, তাহা হইবে তাঁহাদের পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা ভারত সরকার করিবেন তাহা আমাদের

জানা নাই। পাকিস্তান ক্রমশই হিন্দুশূন্য হইতেছে কিন্তু ভারতবর্ষ কি মুসলমানশূন্য হইতেছে? আজ ভারতেরও নানাস্থানে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র হলাহল আকাশ-বাতাস বিষময় করিয়া তুলিতেছে। এই সাম্প্রদায়িকতার তিক্ত অভিজ্ঞতা এ দেশের অধিবাসীদের কাহারও অজানা নয়। এ হেন পরিস্থিতিতে ইন্দিরা-সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী চ্যবন মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই অবস্থা আরও বর্ধিত আকার ধারণ করিলে তিনি কিছু নীতিবাক্যের [illegible] মত প্রচার অভিযান চালাইবেন, তাহার অধিক তাঁহার আর কিছু করার নেই। এই চরম দু:সময়ে এই অশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন যে শুধু নীতিবাক্য প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কিছু করার নাই, তাহা হইলে তাঁহার অপেক্ষা দেশদ্রোহী আর দ্বিতীয়টি নাই। নীতিবাক্যের গঙ্গাজল ছিটাইয়া পালনীয় কর্তব্যের গণ্ডী হইতে পলায়ন করিয়া গায়ে বাতাস দিয়া বেড়ান যায়, কিন্তু ভাবীকালের ইতিহাসের ক্ষমা মেলে না। আগামী-দিনের নর-নারীর বিষদৃষ্টি হইতে নিজেকে বাঁচানোর কোন পথ থাকে না।

কিন্তু এ সত্ত্বেও ইন্দিরাপন্থীরা আনন্দে আত্মহারা। নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা হইতে কয়েকবার মহামান্যা ম্যাডাম রক্ষা পাইয়াছেন এই গর্বেই তাঁহারা কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ভাবিতেছেন—'এমনই করেই যায় যদি দিন যাক না'—কিন্তু এইখানেই ভুল, এইভাবে দিন অতিবাহিত হইবে না, আজ শুধু এক বিশেষ পরিস্থিতির সুযো[illegible] জয়ের একটির পর একটি ধাপ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু যেদিন এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধিত হইবে সেইদিনই সেই সু-উচ্চ সাফল্যের চূড়া হইতে শ্রীমতী গান্ধীর যে সাংঘাতিক পতন ঘটিবে—সেই পতন হইতে উত্থানের মুহূর্ত হয়তো আর কোনদিনই তাঁহার জীবনে আসিবে না। এই সাময়িক জয়গুলি চকচকে দ্রব্যের মতই। চাকচিক্যই আছে, সোনার মত দেখিতে বটে কিন্তু তাহা সোনা নয়। চটকের দ্বারা জনচিত্তে স্থায়ী আসনলাভ করা যায় না, কিন্তু সততার দ্বারা জনচিত্ত অবশ্যই বশীভূত হয়।

কোন্ পথে ?

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতি বর্তমানে ক্রমশই যেভাবে জটিল ও সঙ্কটসঙ্কুল আবর্তের অভিমুখে পরিচালিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ সম্যকরূপে অনুধাবন করিলে দেশপ্রেমী যে-কোন ব্যক্তির চিত্তই বিষাদে এবং দুশ্চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। একদিকে অযোগ্য অপদার্থ শাসকমণ্ডলী, অপরদিকে সেই অযোগ্যতা ও অপদার্থতার সুযোগগ্রহণকারী কয়েকটি মতলববাজ স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ রাজনৈতিক দল ক্ষতবিক্ষত সমস্যাজর্জরিত এই দেশকে যে আরও কতখানি শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাদেরই রোপিত বিষবৃক্ষের ফল সমগ্র জাতীয় জীবনে কি মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল, তাহা চিন্তা করিলে উৎকণ্ঠার অন্ত থাকে না। এ সম্পর্কে আমাদের সহযোগী 'যুগবাণী' যে চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে এই স্তম্ভে উপস্থাপিত করি। তাঁহাদের মতে—

মহাপ্রতাপশালী ভারত সরকার মুষ্টিমেয় নকশালপন্থী যুবকদের দমনে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছেন। রূঢ় বাস্তবসত্য অস্বীকার করিয়া লাভ নেই। পুলিশ নকশালপন্থীদের মুখপত্রটি বন্ধ করিয়াছে, হাজারখানেক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করিয়াছে। সরকারী বড়কর্তারা ঘন ঘন বিবৃতি দিতেছেন, নকশালীরা সাফ হইয়া গেল বলিয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। যদিও কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ও ইস্টার্ন রাইফেলসে ছাইয়া গিয়াছে, যদিও রাজ্যের গোটা পুলিশবাহিনীর এখন একমাত্র কাজ নকশালী বিদ্রোহ দমন, তবু দেখিতেছি কলিকাতা শহর ও সংলগ্ন অঞ্চলেই যখন তখন যত্র তত্র নকশালী যুবকরা তাদের আক্রমণ চালাইতেছে, এমন কি এখন তারা সরাসরি পুলিশকে আক্রমণ করিয়া লড়াইয়ে আহ্বান করিতেছে। তাদের সাহস ও সংগঠন-শক্তি এত বেশি যে শুধু পুলিশ নয়, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের মতো বড় বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তারা লড়াই করিতেছে।

'খুনের বদলা খুন'—এই নীতিতে তারা বিশ্বাসী এবং সে বিশ্বাসকে তারা কার্যে রূপান্তরিত করিতেছে। তারা রেডিও স্টেশন খুলিয়াছে, একটা নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা বড় অংশ তাদের সমর্থন করিতেছে। এখন তারা রাষ্ট্রের ভিতরেই একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে পারিবে। আর কয়েক মাস বর্তমান অবস্থা চলিলে, ভারত সরকারের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে লোকের আস্থা ধুইয়া মুছিয়া যাইবে ও পক্ষান্তরে নকশালী যুবকদের শক্তি সম্পর্কে সমীহ ও সম্ভ্রম জাগিবে। এখনই জাগিতেছে।

নকশালপন্থীদের চৈনিক আনুগত্য যারা ভালো চোখে দেখে না, "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান" জাতীয় শ্লোগানে যারা ক্ষুব্ধ, তারাও অন্যান্য বিষয়ে এদের প্রশংসা করিতেছে। একটা বিষয়ে এরা লোকচিত্তে গভীর ভাবে দাগ কাটিয়াছে, তা এই যে, এরা রাজনৈতিক ভণ্ডামি হইতে মুক্ত, এরা সংবাদপত্রে নাম ছাপার জন্য কাতর নয়, এদের মুখের কথা ও কাজের মধ্যে অমিল নাই, সংসদীয় গণতন্ত্রের

চালাকিকে এরা ধূলিসাৎ করিতে বদ্ধপরিকর। ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন এতদিন ছিল শহরকেন্দ্রিক, দেশের শতকরা আশীজন কৃষকের কোন স্থান সে আন্দোলনে ছিল না। চারু মজুমদারের দল রাজনীতির এত বড় ফাঁকিটাকে সরাসরি ধরাইয়া দিয়াছে। তাদের কৃষক বিপ্লবের আহ্বানে যথেষ্ট যুক্তি আছে। জোতদারদের গলাকাটা অভিযান আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের আমলে সি পি এম, সি পি আই, আর-এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সি দল যেভাবে গ্রামে গ্রামে ধান লুট করিয়াছে, ডাকাতি করিয়াছে, গরীব কৃষককে হত্যা করিয়াছে, দু-পাঁচ বিঘার মালিকের জমিও কাড়িয়া লইয়াছে, এমন কি গৃহস্থের পুকুরের মাছ, ঘরের বাসনপত্র, মেয়েদের গায়ের গয়না---কোথাও কোথাও নারীর সতীত্ব লুট করিয়াছে, সে তুলনায় কানু সান্যাল মহাশয়ের সমর্থকরা সংযম, আদর্শবাদ ও নির্লোভ আচরণের পরিচয় দিয়াছে। তারা ছিনতাই, জুয়াচুরি, লুট প্রভৃতি হীনকর্ম কোথাও করে নাই। জ্যোতি বসু যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন তাঁর দলের লোকেরা যেসব অতি জঘন্য কার্যকলাপ করিয়াছে ও সি পি এম নেতারা প্রকাশ্যে যেসব কাজের প্রশংসা গাহিয়াছেন, সারা দেশের লোক তাতে লজ্জায় শিহরিত হইয়াছে। কিন্তু নকশালপন্থীরা তাদের আদর্শ নৈতিক লাইন হইতে বিচ্যুত হইয়া একটি কাজও করে নাই। পশ্চিমবঙ্গের আর কোনো রাজনৈতিক পার্টির সম্পর্কে এতবড় কথা বলা যায় না। আর সব পার্টিরই ভ্রষ্টাচার অঙ্গের ভূষণ। আর কোনো পার্টির কাছে রাজনৈতিক সৎ আচরণের প্রত্যাশা আমরা করি না।

আমরা চারু মজুমদার, কানু সান্যাল বা তাঁদের অনুগামীদের সমর্থক নই। তারা একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে এবং কোনো স্বাধীন দেশই ইহা বরদাস্ত করিতে পারে না। এমন কি উত্তর কোরিয়া বা উত্তর ভিয়েৎনামেও মাও সে তুঙকে তাদের চেয়ারম্যান বলিতে দিবে না, পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই দেশের ভিতর পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্বকে সমূলে বিনষ্ট করিবে। কিন্তু নকশালপন্থীরা ক্রমশ যে শক্তি ও জনসমর্থন এদেশে সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে তার মূল কারণ এই যে, তারা পঞ্চম বাহিনী নয়, তারা এদেশের বিপ্লবী যুবশক্তি। গত তেইশ বছর যাবৎ যে রাজনৈতিক ভণ্ডামি, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অত্যাচার ভারতবর্ষে চলিয়াছে, তার বিরুদ্ধে এই প্রথম ভারতের যুবকরা জাগিয়াছে।

রাজনীতিকে তারা এম এল এ, এম পি হইবার সোপানরূপে ব্যবহার করিতে চায় না, তারা মন্ত্রী বা মন্ত্রীর পার্ষদ হইতে চায় না, তারা লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতি সুযোগ আদায় করার ধান্ধাও করে না; তারা মুখে গরম বুলির ফুলঝুরি ঝরাইয়া কার্যে জনতার পকেট কাটে না। তাদের বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা সংশয়াতীত। তারা প্রাণ নিতেও জানে, দিতেও জানে।

গত তেইশ বছরে কংগ্রেস কমিউনিস্ট প্রভৃতি সকল দল মিলিয়া রাজনীতিকে মাছের বাজারে পরিণত করিয়াছে; সরকার কোনো নীতি অনুসরণের বালাইটুকুও স্বীকার করে নাই; অন্যায়ের প্রতিকার চাহিয়া কারও কাছেই সমর্থন মেলে নাই। বিড়লাদের সেলস ট্যাক্স ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়ায় সেলস ট্যাক্স বিভাগের সহকারী কমিশনার এন সি রায় চাকরি হারাইয়াছিলেন, বিড়লাদের কিন্তু সাতখুন মাপ হইয়াছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসিয়া কংগ্রেসী আমলে দুর্নীতির কারণে পদচ্যুত কর্মচারীদেরও চাকরিতে পুনর্বহাল করিয়াছেন, কিন্তু এন সি রায়ের মতো সৎ, বিশ্বস্ত, দক্ষ অফিসার পুনর্বহালের আবেদন জানাইয়াও বিচার পান নাই। পাইবেন কেন? যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বড় বড় শরিক দল যে বিড়লাদের স্বার্থসেবার ব্রত লইয়া বসিয়াছেন। বিড়লাদের বা পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরাগ জন্মিতে পারে এমন কোনো কাজ যে তথাকথিত বামপন্থীরা করিবেন না, ইহা তো জানা কথা।

কংগ্রেস করিয়াছে অপশাসন ও তার ফলে জনমনে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, উহাকে মূলধন করিয়া জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতো মতলববাজ নেতারা বৈপ্লবিক লম্ফঝম্পের সাহায্যে কংগ্রেসের পরিত্যক্ত গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছেন। এঁরা প্রতি স্তরে জনগণের সঙ্গে লুকোচুরি ও বিশ্বাসঘাতকতার খেলা খেলিয়া এখন ধ'রে পড়িয়া মজিতেছেন। খাঁটি, নির্ভেজাল নতুন বৈপ্লবিক শক্তির আবির্ভাব তাই এখন অনিবার্য; কারণ ইতিহাস তাই দাবী করিতেছে। তবে বৈদেশিক আনুগত্য ত্যাগ করিয়া বাংলার বিপ্লবী যুবকদের এখন আপোষহীন জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হইয়া বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। স্বদেশের প্রতি আনুগত্য থাকা চাই। সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে স্বদেশকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করিব---ইহাই তো বিপ্লবীদের মুক্তিমন্ত্র হওয়া উচিত।

সেই মন্ত্রেরই উদ্গাতা ছিলেন বাংলার চিরজীবী বিপ্লবিগণ---ক্ষুদিরাম বসু, অরবিন্দ, যতীন মুখার্জী, নেতাজী সুভাষ। তাঁদের ঐতিহ্য ও দায়ভার বাংলার নবযুগের নবীন বিপ্লবীদের বহন করিতে হইবে। মাও সে তুঙের মহিমা প্রচার করিলে আর যাই হোক জাতির চিত্তে ঠাঁই মিলিবে না। জাতীয় ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করিয়াই জাতীয় বিপ্লবকে সফল করা সম্ভব। নকশালপন্থীরা যদি জাতির ঐতিহ্যকে অস্বীকার

ভিন্ন রাষ্ট্রের নেতাদের মতামত অন্ধভাবে অনুসরণ করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী না পালটায়, তবে নতুন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদলের আবির্ভাব হইবে। বাঙালির অন্তর তেমন দলের আবির্ভাবই কামনা করিতেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পতাকা বহন করিতে যারা সক্ষম, বাংলার সেই বিপ্লবী যুবকদের আজ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। ভোটের পলিটিক্স হইতে মুক্ত হইয়া নতুনভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবের পথে চলার সময় তাদের আসিয়াছে।

ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজ্যের হতভাগ্য জেলা

খণ্ডিত - বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অসহায় অবস্থা আজ পশ্চিমবঙ্গের। সহস্র সমস্যার কণ্টকে পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারাক্রান্ত। এই দুর্বহ সমস্যা, হইতে কোন পথে পশ্চিমবঙ্গের অন্তত কথঞ্চিৎ স্বস্তি, তাহার সন্ধান কোনদিক হইতে আসিবে, সেই দিগ্‌নির্ণয়ও এখন রীতিমত এক কঠিন সমস্যার পর্যায়ভুক্ত। যে স্বাধীনতার বেদীমূলে বাঙলার অর্ঘ্যই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান—সমগ্র ভারতের ঘরে ঘরে দিকে দিকে নগরে নগরে জাতীয়ভাবোধের সঞ্চারে যে বাঙলার ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য, সারা ভারতকে এক ব্যাপক মুক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে বাঙলার অবদান অবিস্মরণীয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেই বাঙলাই সর্ববিধ অবিচার উপেক্ষা এবং শোষণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হইল।

হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত জেলাগুলির মধ্যে আবার বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার দুরবস্থাই সর্বাধিক। বিলম্বে বর্ষা সমাগম অথবা অনাবৃষ্টি এই জেলা দুইটির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় করিয়া তোলে। অনাবৃষ্টি তখন এই জেলা দুইটির বিপুলসংখ্যক অধিবাসীদের মধ্যে এক মহাসমস্যার রূপ নেয়। এই দুস্তর সমস্যাসমুদ্র হইতে পরিত্রাণের কোন পথই তাহাদের সম্মুখে তখন আর প্রতীয়মান হয় না। দু'মুঠো অন্নের চিন্তায় তখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তখন অবলুপ্ত হইয়া যায়।

এই শোচনীয় অবস্থা কিন্তু হাল আমলের নয়। প্রশ্ন এই যে, সরকার এতাবৎকাল তাহার প্রতিকারকল্পে কতটুকু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন—বিরাট রাজ্যের শাসন পরিচালন এবং সংরক্ষণভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা কতটুকু দায়িত্ব পালন করিলেন?

অবশ্য সরকারী দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নজীর এখানেই শেষ নয়, তাহার দৃষ্টান্ত এক এক করিয়া উপস্থাপিত করিলে উহা পর্বতপ্রমাণ আকার ধারণ করিবে। দায়িত্ব পালনে অবহেলা সরকারের পক্ষে যেন এক অতি নিত্য-নৈমিত্তিক এবং সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যে সকল তথাকথিত রাজনৈতিক দল ভোটপ্রাপ্তির জন্য অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতির বাক্যবাণ বর্ষণ করেন এবং সরকারী সমালোচনার ঝড় বহাইয়া দেন, তাঁহারাই বা ভোট প্রাপ্তির পর এই অসহায় দুর্গত জনগণের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার কি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, সে প্রশ্নও তো স্বভাবতই জনগণের চিত্তে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে। অভিসন্ধিমূলক স্তোকবাক্য জনগণকে প্রতারিত করিয়া বড় বড় উজ্জ্বল স্বপ্নে সর্বহারাদের বিভ্রান্ত করিয়া গদী লাভের জন্য যাঁহারা ভোট সংগ্রহকে বিবেক-বিরোধী কাজ বলিয়া গণ্য না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অপকীর্তির জন্য কৈফিয়ৎ তলবই বা জনগণের পক্ষে অন্যায় বলিয়া কেন বিবেচিত হইবে? জনগণ প্রকাশ্যে এবার তাঁহাদের চ্যালেঞ্জ করুন যে, গদীলাভের জন্য এই অসংখ্য মানুষের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলার অধিকার কে তাঁহাদের দিল—ভোট চাওয়ার মুহূর্তে যে প্রতিশ্রুতিগুলি তাঁহারা দেন—ভোটপ্রাপ্তির পরই তাহা যখন তাঁহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন, তখন ভবিষ্যতে যেন আর কোনদিন এই কলঙ্কিত মুখ জনগণের সম্মুখে তাঁহারা না দেখান।

শোক সংবাদ

কাজী আবদুল ওদুদ

প্রখ্যাতনামা মনীষী ও সাহিত্যসেবী কাজী আবদুল ওদুদ গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট সমাদর অর্জন করেন। গ্যেটে, রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষার পরিচায়ক।

নিকুঞ্জবিহারী মাইতি

বিশিষ্ট মুক্তিসংগ্রামী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী নিকুঞ্জবিহারী মাইতি গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ৭৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শিক্ষামন্ত্রীর আসন তাঁরই দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিল। ১৯৬২ পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তিনি মন্ত্রিসভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

শ্রীব বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীনন্দকুমার

মাসিক বসুমতী
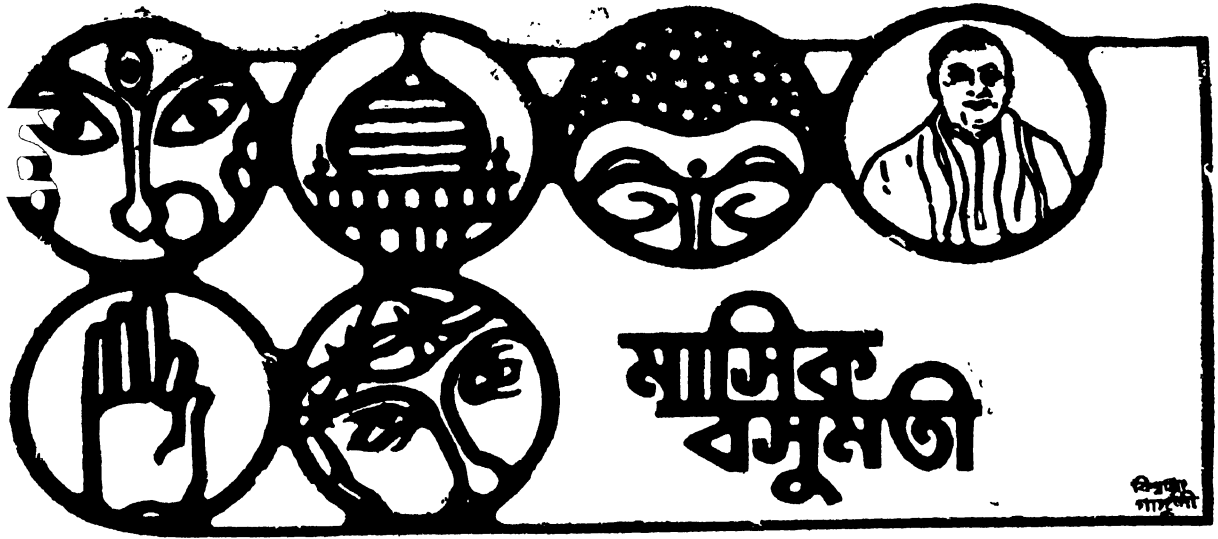
॥ ৪৯ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭৭ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা ॥

কথামৃতম্
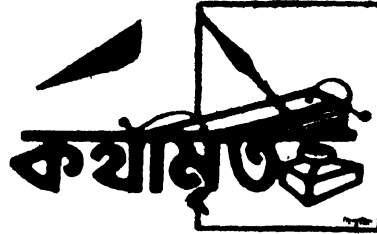
রস

শাস্ত্র বলেন—'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ পরমাত্মা (ব্রহ্ম) রস-রূপ। 'আনন্দং ব্রহ্মেতি বিদ্বান্'—ব্রহ্মজ্ঞান আনন্দস্বরূপ। । আর আনন্দ একই কথা। আনন্দই রস। আনন্দ থেকে খিল বিশ্বের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই লয়। সেই ই চৈতন্য বা জ্ঞান, আর তার অভাবই অজ্ঞানময়ী জড়তা বা য়া। তাই মায়াধীন জীব জ্ঞানময়ের মূলে আনন্দের প্রতিবিম্ব ষয়ানন্দকেই ভ্রান্তিবশে মূলে আনন্দ ভেবে তাতেই লিপ্ত হয়। ন্তু সেই পরম রসের সন্ধান না পেয়ে মনের চঞ্চলতা ক্রমশঃ ড়েই যায়; তাতে নির্ভরতা হারিয়ে রস ও আনন্দের উৎস ক্তির সাধনায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে। 'ভক্তি মীমাংসাসূত্র' বলেন 'রসরূপঃ পরমাত্মা, জড়রূপা মায়া।'

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—'রসোঽহং অপ্সু কৌন্তেয়' ।৮) অর্থাৎ জলের সার যে রস, আমি সেই রসস্বরূপ। আগেই লেছেন (৭।৭)—'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং'—কিনা, রস আমাতেই নুস্যূত।

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—(মধ্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ)

"রতি ভেদে কৃষ্ণ ভক্তি পঞ্চ ভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়॥
পঞ্চ রস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥"

[illegible] ভাব আছে—

(১) স্থায়ী ভাব—যাহা সকল ভাবকে বশীভূত ক'রে কর্তৃত্ব করে। ইহাই রসের মূল।

(২) বিভাব—ইহা রসের হেতু; বংশী স্বরাদি উদ্দীপন এবং কৃষ্ণাদি আলম্বন।

(৩) অনুভাব—ইহা রসের কার্য; চিত্তের একাগ্রতা ও নৃত্যগীতাদি।

(৪) সাত্ত্বিক ভাব—ইহাও রসেরই কার্যবিশেষ।

(৫) সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব—ইহা রসের সহায়।

এই পঞ্চভাবের শেষ চারটি প্রথম ভাবটিকে স্বাদ্য ক'রে রসাবস্থায় পরিণত করে। চতুর্থ (সাত্ত্বিক) ভাবটি আট প্রকার—স্তম্ভ, ঘর্ম, স্বরভেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, বর্ণবিকৃতি, অশ্রু ও প্রলয়; এগুলি তৃতীয় ভাবের (অনুভাব) পরিপোষক। পঞ্চম (সঞ্চারী ভাবগত সাতটি রস মুখ্য রতিকে সাত ভাবে প্রকাশ করে :—

(১) হাস্য—উদ্দীপনা প্রকাশ রতি,
(২) অদ্ভূত—বিস্ময় রতি;
(৩) বীর—উৎসাহ রতি;
(৪) করুণ—শোক রতি;
(৫) রৌদ্র—ক্রোধ রতি;
(৬) বীভৎস—জুগুপ্সা বা নিন্দা রতি;

আর, (৭) ভয়—ভয়ানক রতি। এতগুলি বিভিন্ন ভাবের সহিত স্থায়ী রতির মিশ্রণে ও বিভিন্ন পর্যায়ে মিলনে নানারকম মিশ্ররসের আস্বাদন হয়।

রস আস্বাদ্য, রসের প্রক্রিয়া আস্বাদন, আর সাধক আস্বাদক। কৃষ্ণই রস—নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য ও পরমানন্দস্বরূপ। তর্ক বা যুক্তি দ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হতে পারে না; শাস্ত্র পাঠ দ্বারাও নয়। শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা মানব নিজ ভাবনানুযায়ী রসের উপলব্ধি করে। ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান একীভূত হয়ে সচ্চিদানন্দ রসে ডুবে যায়; তখন সাধকের [illegible]

আমি বিরাট আমিতে একাকার হয়ে সেই পরমের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। কামনাশূন্য কর্মদ্বারা ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয়। সৎসঙ্গ, সচ্চিন্তা, সদনুষ্ঠানে রতি এবং তত্ত্বদর্শী গুরুর জ্ঞানোপদেশ দ্বারা এই রসানুভূতি সম্ভব হয়।

একজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ বলেছেন—

'পুঁথি মেরে পুঁতি, বেদ পড়ে মজুরে,
কর্থানিকে ঘর বহুত মিলে, কর্ণিকে বহু দূরে!'—

অর্থাৎ আমার (জ্ঞানীর) বাক্যই পুঁথি (শাস্ত্র); সাধনহীন পন্ডিতগণ মজুরের মত শাস্ত্রভারবাহী মাত্র—সাধনার রস তারা পায় নাই। রসহীন শাস্ত্রবাক্য-কথক অনেক মিলে; কিন্তু শাস্ত্রানুশাসন-রসিক কর্মী অতি বিরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সামাধ্যায়ী লেকচার দিলে। বললে—ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত, তাঁতে কোন রস নাই; তোমারা প্রেমভক্তি রূপ রস দিয়ে তাঁর ভজনা কর।' দ্যাখো—যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁর কোন রস নেই বলছে! এ লেক্‌চারে কি লোকশিক্ষা হয়?

"একজন বলেছিল, আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে ঘোড়া! তাতে বুঝা যায় ঘোড়া ত' নাই-ই, গরুও নাই।"

রাগভক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ—"প্রেমাভক্তির অন্য নাম রাগভক্তি। এটি অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়। এ ভক্তি এলে আর বৈধীকর্মের প্রয়োজন হয় না,—বিধি-নিয়ম থাকেও না। যেন বন্যা এসে মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো।

"বৈধী ভক্তি অনেক করতে করতে ক্রমে রাগভক্তি আসে। রাগভক্তি যতক্ষণ না হয়, ঈশ্বর লাভ হবে না। তাঁর উপর ষোল-আনা মন হবে, সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, তবে তাঁকে পাবে। কারু কারু রাগভক্তি ছেলেবেলা থেকে আপনা আপনি হয়—যেমন প্রহ্লাদ।

"এ ভালোবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না—দয়া থাকে। এ ভালবাসা এলে সংসার কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়—যেন বিদেশ। এ ভক্তি এলে বিষয়বুদ্ধি—সংসারাসক্তি একেবারে চলে যায়।

"রাগভক্তির পতন নাই; যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে, কিম্বা যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদেরই রাগভক্তি হয়। তারা যেন খানদানি চাষা—ফসল হোক আর না হোক, চাষ তারা করবেই। ঈশ্বর তাদের ভার লন—তাদের ধরে থাকেন; তাই তাদের পড়ার ভয় নাই।

"রাগভক্তি হলে কেবল ঈশ্বরের কথা শুনিতে ভাল লাগে। এই রাগানুগা ভক্তিই মূলকথা। রাগভক্তি স্বয়ম্ভূলিঙ্গের মত। তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর কৃপায় একবার যদি রাগভক্তি আসে, তা হলে পাপ-পুণ্য সব ভুল হয়ে যায়। তখন আইনের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে তফাৎ হয়ে যায়। যেন ধানকাটার পর মাঠের উপর দিয়ে সোজা চলে যাওয়া।

"বৈধীভক্তি হতেও যেমন যেতেও তেমনি; রাগভক্তির পতন নাই। যাদের রাগভক্তি তারা কখনো বলে না—'ভাই, কত জপ তপ, কত হবিষ্যি করলুম, কিন্তু কি হল?' তারা খানদানি চাষির মত; কখনো হাল ছাড়ে না। বাপ তাদের ধরে থাকে—তাই তারা পড়ে না। ঈশ্বর তাদের ভার লন।"

রাধা

মহাবিদ্যা জগৎকর্ত্রী পরমেশ্বরী ত্রিপুরা দেবী (ষোড়শী) ব্রহ্মের পরমকলা থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মান্ড সৃষ্ট, পালিত ও সংহৃত হচ্ছে। এই চিৎশক্তিই বিষ্ণু বল্লভা পদ্মিনী এবং পদ্মিনীই রাধিকা দেবী। পদ্মিনী কৃষ্ণ-কার্য-সাধিকা দূতী এবং কৃষ্ণ ও গোবিন্দ এই নামদ্বয়ের শক্তিরূপিনী। বাসুদেব সর্বদা 'রাধা', এই পরাক্ষরদ্বয় চিন্তা করেন এবং তাঁর মোহন বংশীও 'রাধা' 'রাধা' বলে। কেন? ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ রূপ অপূর্ব সাধনলব্ধ রজোগুণপুষ্ট 'রং' বীজ বা 'রা' (অর্থাৎ জীবনীশক্তি কুন্ডলিনী দেবী) এইবার বহ্ন্যাত্মক নীলধূম্রসম আনন্দরসপ্রদ বিষ্ণুগ্রন্থির আধার সাধকের 'ধা' বা 'ধ্যা' অথবা স্থূলে ধ্যানভূমিতে (অর্থাৎ রাসমন্দিররূপে অনাহত ক্ষেত্রে) রা+ধা= রাধারূপে উপনীতা হয়ে বিষ্ণু মায়া প্রভাবে পরমের সহিত রাসলীলার জন্য প্রস্তুত হন। অনুলোমে যাহা অন্তরের স্বাভাবিক স্পন্দন ধারা, বিলোমে বা বিপরীত রীতিতে তাহাই রাধারূপে রসোন্মুখী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করতে রাধিকার সৃষ্টি করেছেন—সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই আধার—আর নিজেই শ্রীমতীরূপে আধেয়, নিজের রস আস্বাদন করতে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে। তাই বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্ম-গ্রহণ করে চোখ খুলেন নাই; এই ভাব যে, এ চক্ষে আর কাকে দেখবো! রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে করে
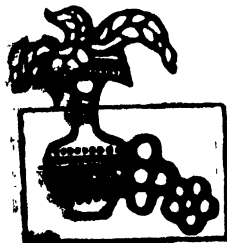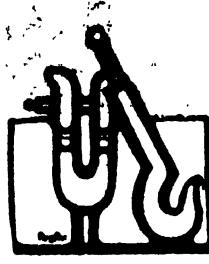
গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ খুললেন—কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চোখে হাত দিচ্ছিলেন।

"রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, কামরাধা, প্রেমরাধা আর নিত্যরাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী; প্রেম-রাধা শ্রীমতী; নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে।

"রাধিকা বিশুদ্ধ সত্ত্ব, প্রেমময়ী। রাধিকা যোগমায়া নয়। যোগমায়ার ভিতর তিনগুণই আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ সত্ত্ব বই আর কিছুই নাই।

"রাধাকৃষ্ণ লীলা কেন? তাঁর মাধুর্য আস্বাদনই সার কথা। তিনি রস, ভক্ত রসিক, সেই রস পান করে। তিনি পদ্ম, ভক্ত অলি। ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না; তখন ভক্ত হন রস, ভগবান রসিক; ভক্ত পদ্ম, ভগবান অলি। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য দু'টি হয়েছেন—তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা।"

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—আদি, (৪।৯৪) :—

মৃগমদ, তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

রামের ইচ্ছা

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো। তা হলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে তিনিই সব করছেন; সবই 'রামের ইচ্ছা'—তাঁতি যেমন বলেছিল। শুন গল্পটা।

"এক গ্রামে একটি তাঁতি ছিল। বড় ধার্মিক, সবাই তাকে বিশ্বাস করে, আর ভালবাসে। তাঁতি হাটে কাপড় বিক্রী করে। খদ্দের দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, রামের ইচ্ছা, সুতোর দাম ১৲; মেহনতের দাম, রামের ইচ্ছা, চার আনা; মুনাফা, রামের ইচ্ছা, দু' আনা; তবেই কাপড়ের দাম, রামের ইচ্ছা, এক টকা ছ' আনা। সবাই তাকে এত বিশ্বাস করতো যে সে দামেই কাপড় নিত। লোকটি ভারী ভক্ত; রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চণ্ডী-মণ্ডপে বসে ঈশ্বর-চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্তন করে। একদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঠাকুরের নাম কচ্ছে এমন সময় এক-দল ডাকাত সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা এসে ওকে জোর করে তাদের সঙ্গে মোট বইবার জন্য নিয়ে গেল। পথে এক গৃহস্থর বাড়ি তারা ডাকাতি করে জিনিষপত্রের একটা মোট ওর মাথায় চাপিয়ে দিল। এমন সময় পুলিশ এসে পড়াতে ডাকাতেরা পালিয়ে গেল, কেবল তাঁতিটি মাথায় মোট সমেত ধরা পড়লো। পুলিশ তাকে নিয়ে হাজতে রাখলো। পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোকেরা জানতে পেরে সবাই এসে গেছে। সবাই বললে, 'হুজুর, এ লোক কখনো ডাকাত নয়, সবাই একে জানে।' সাহেব তখন তাঁতিকে জিজ্ঞাসা করলে—'কি গো, তোমার কি বলার আছে বলো।' তাঁতি বললে—'হুজুর, রামের ইচ্ছা, আমি খাওয়া-দাওয়ার পর চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি; রামের ইচ্ছা, অনেক রাত অবধি ঘুম আসছে না, তাই, রামের ইচ্ছা, ঠাকুরের নাম কচ্ছিলাম; এমন সময় রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত আমায় ধরে টেনে লয়ে গেল; রামের ইচ্ছা, তারা একটা বাড়িতে ডাকাতি করলো; রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় একটা মোট চাপিয়ে দিলে। এমন সময়, রামের ইচ্ছা, পুলিশ এসে আমাকে ধরলো; রামের ইচ্ছা, ডাকাতরা পালালো; রামের ইচ্ছা, পুলিশ আমাকে রাতে হাজতে রাখলো; আজ সকালে, রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে।'

লোকটার হয়ে সবাই বলছে দেখে সাহেব তাঁতিকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। মুক্তি পেয়ে তাঁতি বললে, 'রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।'

"তাই বলি, সংসার করা, সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা; তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ করো।"

এই 'রামের ইচ্ছা' কথাটির তাৎপর্য কি? শ্রী 'ম' বলেছেন—"পাখীর মত শিখানো বুলি হলে হবে না—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, এটি ষোলআনা বোধ চাই। তাঁর দর্শন না হলে—তাঁকে অন্তরে লাভ না করলে এক একবার হয়তো সে বোধ হয়, কিন্তু আবার ভুল হয়ে যায়। তাঁতি যেমন বলেছিল—'আমি খেলুম রামের ইচ্ছায়, চণ্ডীমণ্ডপে বসলুম রামের ইচ্ছায়, ঘুম এলো না রামের ইচ্ছায়, আমায় ডাকাতে ধরে নিয়ে গেল রামের ইচ্ছায়, ডাকাতি হল রামের ইচ্ছায়, আমায় পুলিশ ধরলো রামের ইচ্ছায়, ছাড়ানও হল রামের ইচ্ছায়। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না—Free will নয়, Predestination! তবে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে? কিন্তু কেন? ঠাকুর বলেন—'কেন, কে বলবে? তাঁকে কে বুঝবে? তিনি জানোয়ারের ভিতর চোর, সিংহ, সাপ; গাছের মধ্যে বিষগাছ; মানুষের ভিতর চোর, ডাকাত, খুনে, বদমাস;—এ-সবও ভালর সঙ্গেই পাশাপাশি রেখেছেন। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপপুণ্য বোধ, দায়িত্ববোধ, শুচি-অশুচিবোধ, ভাল-মন্দ বোধ থাকেই; যখন পূর্ণ বিশ্বাস হয় তখন দেখা যায়, বুঝা যায়, রামের ইচ্ছাতেই সব হয়—তিনিই সব করছেন।"

রাসলীলা

যোগশাস্ত্র মতে অনাহত চক্রের সাধনায় মহর্লোকে বিষ্ণু-গ্রন্থি ভেদের পর সাধক সালোক্য মুক্তি লাভ করেন; এই অবস্থাতেই সাধক স্বকীয় ইষ্টমূর্তির দর্শন লাভ করে পরিতৃপ্ত হন। পুরুষ ও প্রকৃতি এখানেই যুগলভাবে শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি রূপে প্রকটভাবে সাধক কর্তৃক দৃষ্ট হন; তাই এই স্থানকে রাসমণ্ডল বলে। সাধকের জীবনীশক্তি বা কুণ্ডলিনীশক্তিও এখানে জীবাত্মার সঙ্গে মিলিত হয় বলে হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ লাভ করে। ইহাই প্রসিদ্ধ রাসলীলা।

পুরাণ মতে রাসলীলার আধ্যাত্মিক অর্থ হচ্ছে, একই সাক্ষী-চৈতন্য অসংখ্য জীববুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে তাদের সঙ্গে বিহার কচ্ছেন; ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তিনি লীলায় ঐ তত্ত্বই দেখিয়েছেন জ্ঞানিগণই এ তত্ত্ব বুঝবার অধিকারী। এ দ্বারা মুমুক্ষু লোকদের তিনি শিখালেন, অধর্ম যেমন লোহ-

শৃঙ্খল, ধর্ম তেমনি স্বর্ণশৃঙ্খল। মুক্তিলাভ করতে হলে অধর্মের ন্যায় ধর্মশৃঙ্খলও পরিত্যাগ করতে হবে। তাই তিনি প্রথমেই গোপীগণের ধর্মবন্ধন আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে নিলেন। পূর্বে বস্ত্রহরণ তাদের লজ্জাবন্ধন প্রমাণিত হয়েছিল, তাই তাদের কাত্যায়নী ব্রতদ্বারা চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দিয়েছিলেন। সেভাবে চিত্ত শুদ্ধ হলে তারা ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে পবিত্র রাসলীলার অধিকারিণী হয়েছিল। রাসলীলার প্রথম ভাগে গোপীগণ মনে করেছিল 'আমরা পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে সৌভাগ্যবান।'

অখণ্ড চৈতন্যের অনুভব করতে গিয়ে যখন সাধকের রসাস্বাদ সম্ভোগের অভিমান আসে, তখন অনুভব চিৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। তাই রাসলীলায় তখন গোপীরা কৃষ্ণকে খুঁজে পায় নি। রসাস্বাদ জন্যই সবিকল্প সমাধিতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না—রসাস্বাদ বিঘ্ন এসে নির্বিকল্প সমাধির পথ রুদ্ধ করে। কারণ রসাস্বাদের লক্ষ্য খণ্ড জীব-চৈতন্যের দিকে, অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্যের দিকে নয়।

পরে যখন গোপীরা নিজেদের ভ্রম বুঝে অনেক বিলাপদ্বারা আরো শুদ্ধচিত্ত হয়ে পুনরায় কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলো, তখন তারা কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেলো এবং রাসলীলায় পূর্ণ অধিকার পেয়ে সকল রসের সার এই রসানন্দ অনুভব করে ধন্য হল। তাদের সঙ্গে কৃষ্ণের আর তিলমাত্র ভেদ রইলো না।

মুমুক্ষু জ্ঞানী ছাড়া অন্যের পক্ষে রাসলীলার অনুকরণ অনধিকার চর্চা। অনধিকার চর্চায় মন্দ ফলই অবধারিত। গরল পান মহাদেবকেই সাজে—অন্যের পক্ষে অবধারিত মৃত্যু।

চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে (৮ম পরিচ্ছেদ)—

"রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাসাধ্য কুঞ্জ সেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥

অন্যান্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম।
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য গোপীভাব বর্য॥
সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম সর্ব ত্যজি সে কৃষ্ণে ভজয়॥"

রাধাকৃষ্ণের এই চিন্ময় কামগন্ধহীন বিহার বা বিলাস প্রকৃতি ও পুরুষের নিত্যরাসলীলার নির্দেশক। চির পরিবর্তনশীল বিশ্বে যা কিছু ছিল, আছে যা হবে—জল-স্থল, অনল, অনিল, তেজ, ব্যোম, দেব, দানব, মানব—তাদের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি—ভাব, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, সাধনা—সব এই রাসলীলারই অভিব্যক্তি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবস্থায় দেখেছিলেন এই রাসলীলা—রাধাকৃষ্ণের, হর-গৌরীর, পুরুষ ও প্রকৃতির। সর্বত্র প্রকৃতি ও পুরুষের এই রাসলীলার অনুভূতিই অদ্বৈতজ্ঞান; রাধাকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত চিন্ময় রাসলীলাই বিশুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হলেন। তাই দেখ, রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হলে প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতিভাব হলে তবে রাস, তবে সম্ভোগ।

"শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূর পাখা। ময়ূর পাখাতে যোনি চিহ্ন আছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন।"

রিপুবিজয়ের একটি সহজ সাধন-সঙ্কেত

ষড়রিপুর বিজয়ের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বনীয় ঃ—

(ক) কামবিজয়ের জন্য—

(১) প্রতীক্ষা প্রধান উপায়। কোন বিষয়ে কাম বা কামনা উপস্থিত হলে, তখনই সে কাজ করতে না গিয়ে কিছু সময় অপেক্ষা করবে; যাতে সেই কাম বা কামনার বেগ আপনা থেকেই কম পড়বে।

(২) ব্যায়াম দ্বিতীয় উপায়। মহাবীর হনুমানের নাম স্মরণ করে যে কোন পরিশ্রমযুক্ত ব্যায়াম করতে থাকলে কাম-বাসনা সরে যায়। ব্রহ্মচারী যুবকদের পক্ষে ইহা বিশেষ অবলম্বনীয়।

(৩) সাধকের পক্ষে প্রাণায়াম ও হঠযোগের মুদ্রাদি অবলম্বনীয়।

(৪) ঠাকুর বলেছেন, "আরোপ করলে ভাব বদলে যায়। প্রকৃতিভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। মেয়ের ভাবে থাকলে কামজয় হয়।"

(খ) ক্রোধ বিজয়ের জন্য

(১) ক্ষমার অভ্যাস প্রধান উপায়। ক্রোধের পাত্রকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অপরাধের ক্ষমা অভ্যাস করলে ক্রমে ক্রোধ বশীভূত হবে।

(২) ক্রোধের সময় সাধারণত পিঙ্গলায় (দক্ষিণ নাসায়) নিঃশ্বাস চলে। কার্পাসতুলা বা ন্যাকড়া গুঁজে ডান নাক বন্ধ করে বাম নাসায় (ইড়া) নিঃশ্বাস চালালে ক্রোধের দমন হয়।

(৩) ক্রোধের সময় দর্পণে নিজের মুখ দেখলেও ক্রোধ দমিত হয়।

(গ) লোভ বিজয়ের জন্য—

প্রারব্ধ চিন্তাই প্রধান উপায়; অদৃষ্টে থাকলে সময়ে নিশ্চয়ই পাব, লোভ করতে হবে না; আর অদৃষ্টে না থাকলে লোভ করেও পাব না—শুধু মনস্তাপ লাভ হবে, এই ভাবনা করতে হয়।

(ঘ) মোহ বিজয়ের জন্য—

নিত্যানিত্য বিচার প্রধান উপায়। বিষয় অনিত্য; তাতে মুগ্ধ হয়ে নিত্যবস্তু ঈশ্বরকে না ভুলি, সতত এই বিবেক জাগ্রত রাখা।

(ঙ) মদ ও মাৎসর্য বিজয়ের জন্য—

সর্বমঙ্গলা মা আমার সকল কর্ম সকল অকর্ম দেখছেন; মদ ও মাৎসর্যের বশীভূত হলে তিনি আমাকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করবেন না, বরং বিরক্ত হয়ে আমাকে ঘৃণা করবেন— এ কথা মনে রেখে সাধনায় তৎপর হতে হবে।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

ভারতীয় অপরা বিদ্যা

শ্রীইন্দুচন্দ্র বেদান্তভূষণ

'পজিটিভ সায়েন্সেস' বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতীয় জীবনের এক বিশাল অপরিহার্য অঙ্গরূপে বর্তমান ছিল ও অদ্যাপিও আছে, কারণ কেবলমাত্র পরা বিদ্যা (আধ্যাত্ম জ্ঞান) কোন মহাজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। ইহাদের ইঙ্গিত অতি সংক্ষিপ্তভাবে প্রসঙ্গক্রমে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত পূর্ব প্রবন্ধসমূহে আছে—এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিশদ করিয়া দেওয়া হইল। বহুপূর্বে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার 'পজিটিভ্ সায়েন্সেস অব দি হিন্দুজ্' গ্রন্থে ইহা পরিবেশন করিয়াছিলেন, তৎপরে অনেক মনস্বী এ-সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন, যথা—ডঃ মজুমদার (প্রাচীন ও পরবর্তী যুগে ভারতীয় নৌবিদ্যা), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (ভারতীয় রাসায়নবিদ্যার ইতিহাস), ডঃ বিজনরাজ ও ডঃ বাগচী (ভারতীয় উপনিবেশ), আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব) প্রভৃতি অনেকে, অনেক বিষয়ে। কিন্তু ভারতীয় অপরা বিদ্যার মূল চতুর্বেদে, ষড় বেদাঙ্গে ও চার উপবেদে (আয়ুর্ধনুর্গন্ধর্ব - অর্থশাস্ত্রে) এবং তন্ত্ররাজিতে, ইহা স্মরণে না রাখিলে পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা, এক অপরের পরিপূরক,—এই অতি প্রয়োজনীয় যোগসূত্রটি বোধগম্য হইবে না।

শেষ তুষার-যুগ শেষ হইয়াছিল প্রায় খৃঃ পূঃ আট হাজার বৎসর পূর্বে। তাহার প্লাবনে সুমেরুপ্রদেশ হইতে আর্যগণ ক্রমাগত দক্ষিণদিকে আসিতে বাধ্য হন (ঋক্ ৭।১৯।৫), শেষ পর্যন্ত এক শাখা ভারতে প্রবেশ করেন ('এরিয়ানিজেশন্ অব ইণ্ডিয়া'—অধ্যাপক দত্ত)। ভারত (ঋক্ ৬।১৬, ৭।৮) অতি প্রাচীন নাম। আদিবাসী ও দ্রাবিড়েরা এ দেশ জুড়িয়া ছিল—সুতরাং আর্যদিগকে সমরনীতি ও অন্যান্য উপায়ে ধীরে ধীরে এবং কখনও ক্ষিপ্রগতিতে, এই সকল উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইয়াছিল—যাহা পরে কুরু, কোশল, কাশী, পাঞ্চাল, কৌশাম্বী, শাক্য, বিদর্ভ, মালব, অন্ধ্র, গান্ধার, কোল প্রভৃতি বহু রাজ্যে পরিণত হয়। ইহা অতি কষ্টেই হইয়াছিল—যাহার উপাদান ছিল প্রধানত তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস ও উদ্যম, দৈবী কৃপায় আস্থা, সমরাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উপনিবেশ ব্যবস্থা এবং "কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্" (ঋক্ ৯।৬৩।৫) অর্থাৎ শুদ্ধিব্যবস্থা। তাঁহাদের সঙ্গে অতি অল্পসংখ্যক আর্যনারী ছিলেন, যাহার ফলে এই শুদ্ধিব্যবস্থা দ্বারা তাঁহাদের সমাজের অভ্যন্তরে বিজিতদিগের মধ্য হইতেই বহু নর-নারী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল সংখ্যালঘু নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনেই। সুতরাং দেখা যাইবে, আর্যগণ সর্বতোমুখী বিদ্যা ও প্রযুক্তি-বিদ্যা, পরা ও অপরা বিদ্যা, অস্তিত্বের প্রয়োজনেই, সমভাবে অনুশীলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; পরে যাহা বিরাট ও বিশাল ভারতীয় আর্যসভ্যতায় পরিণত হইয়াছিল এবং অদ্যাপিও দেদীপ্যমান।

ভারতীয়গণ নিম্নলিখিত বহুমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পথিকৃৎ এবং তত্তৎ যুগে আশ্চর্যরূপে শিখরদেশে অবস্থিত ছিলেন:—পাণিনি শিক্ষা ও ব্যাকরণ (ফনেটিক্স, ফিললজি), পিঙ্গলাচার্য্য ছন্দঃ (প্রসডি), গর্গ জ্যোতিষ; উপবেদীয় চিকিৎসা বা আয়ুর্বেদ, যাহার সম্প্রসারণ চরক ও সুশ্রুতে (৬ষ্ঠ শতাব্দী)—ভেষজ খনিজ ঔষধ, অরিষ্ট, আসব, তৈল, ঘৃত, রসচিকিৎসা (মকরধ্বজ, প্রাসসমূহ, পরবর্তী নাগার্জুনে আরও সম্প্রসারিত), শতাধিক প্রকারের শল্যচিকিৎসায় (মার্কারী, মঃ মঃ গণনাথ সেনের চিত্রসম্বলিত প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ); ধনুর্বেদে (মঃ ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রীর উৎকৃষ্ট সংস্করণ) যাহাতে শব্দভেদী-অগ্নিবাণ, বিমানসমর, নাগপাশ, ব্যূহরচনা, অস্ত্রাদির চিত্রসম্বলিত বর্ণনা এবং যাহার সম্প্রসারণ রামায়ণ-মহাভারতের সমরশাস্ত্রে ও পরবর্তী মৌর্য, রাজপুত এবং ছত্রপতি শিবাজীর রণকৌশলে; গন্ধর্ব উপবেদের সঙ্গীতবিদ্যা ও সুকুমারবিদ্যা (ফাইন আর্টস ও এস্থেটিক্স), যাহার সম্প্রসারণ বাৎস্যায়ণ কামসূত্রে পরবর্তী যুগের সঙ্গীত-চিত্র-কারুকলায়, নাট্য ও কাব্যে অর্থশাস্ত্র-উপবেদের কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্যনীতি, রাষ্ট্রনীতি, যাহার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট পূর্তবিদ্যা এবং যাহার সম্প্রসারণ কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে ও পরবর্তী প্রয়োগে বহুবিধ শিল্পে; স্থাপত্যবিদ্যা (ই-বি-হ্যাভেলের ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্চার); জ্যোতির্বিদ্যা (বহুনক্ষত্র, দ্বাদশ রাশিচক্র, তুরীয় ব্রহ্ম-যন্ত্রনামক দূরবীণ, ঋক্ ৫।৪০।৫, ঋক্ ১।১৬৪।১২-১৮—যাহা পরবর্তী যুগের আর্যভট্ট, বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ত (ষষ্ঠ শতাব্দী), এবং ভাস্করাচার্য (দ্বাদশ শতাব্দীতে) প্রভূতরূপে উন্নত করেন—তাঁহারা কোপার্নিকস্, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতির বহুপূর্বে পৃথিবীর দৈনিক গতি (চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি), পৃথিবী কপিথফলবৎ দক্ষিণোত্তরয়োঃ-

, ভূগোলে, ব্যোমমিতি-ত্রিকোণমিতি, আকৃষ্টি-শক্তিশ্চ (মাধ্যাকর্ষণ) মহী, প্রভৃতি আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন ; গণিত বিদ্যা (পরিমিতি, কল্পসূত্র-বেদাঙ্গে সুলভ-সূত্রে বর্ণিত, আর্যভট্ট ভাস্করাচার্য প্রভৃতি বীজগণিত, লীলাবতী (পাটিগণিত), গোলাধ্যায় (স্ফেরিক্যাল ত্রিকোনোমেট্রি), দশমিক রাশিবিদ্যা (ডেসিমাল) প্রভৃতির পথিকৃত ; পদার্থ-বিদ্যা--কণাদের অণু--পরমাণুবাদে ও গৌতমের পদার্থতত্ত্বে ; রসায়নবিদ্যা (তন্ত্র, আয়ুর্বেদ, নাগার্জুন ও পরবর্তী যুগের সম্প্রসারণে) ; উপনিবেশ স্থাপন ও শুদ্ধিকরণের কথা ও নৌবিদ্যার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এতগুলি ব্যবহারিক বিদ্যার তাঁহারা জনক ছিলেন এবং সমসাময়িককালে ও পরিবেশে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অপরা বিদ্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্মুক্তমনা ছিলেন, ভারতীয় রীতি ও নীতি এই যে বিদেশের জ্ঞান তাঁহার প্রয়োজনমত গ্রহণ করিতেন, অবশ্য নিজস্বরূপে পরিবর্তিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া। তাহার প্রমাণ, এই সকল বিজ্ঞানালোচনায় যবনাচার্যদিগের মত সাদরে উল্লিখিত ও গৃহীত 'যবন' শব্দটি (যবনিকা) সে যুগে 'বিদেশী' বুঝাইত—কোন অপকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইত না ; তাহা হইলে 'আচার্য শব্দটি' ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবহার করিতেন না। ভারতীয় মহাজাতীয় জীবনে এইরূপ আদান প্রদান সর্বসময়ে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে বলিয়া আমরা সুপ্রাচীন জাতি হইলেও দেদীপ্যমান। ব্যাস (ডায়ামেট্রিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন) মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাস্ক প্রভৃতি নিরুক্তকারগণ (লেক্সিকন-প্রণেতা), এবং আচার্য সায়ণ, মাধব, শংকর, বল্লভ, শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি আমাদের যুগপৎ ধর্মান্ধতা ও ধর্মহীনতা (রিলিজিয়াস ভ্যাকুয়াম) হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উচ্চতর সমালোচনাশৈলী (হায়ার ক্রিটিসিজম) ও সমন্বয়ীভাষ্য (কনকর্ড)-সমূহের মাধ্যমে,---এই সূক্ষ্ম কলাকৌশল (টেকনিক্), অপরা বিদ্যা উভয়ধর্মী।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান এই সকল অপরা বিদ্যাসমূহকে সর্বপ্রকারে অতিক্রান্ত করিয়া আনিয়াছে এক অতি বিস্ময়কর যুগে, আমাদের এই সুপ্রাচীন মহাজাতিকও। এই মহাজাতির নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া নূতনকে বরণ ও গ্রহণ করিবার শক্তি অপরিসীম এবং যাহা ইতিমধ্যেই করা সম্ভব হইয়াছে তাহার তাহার অকুণ্ঠ প্রশংসা নিরপেক্ষ বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণও করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা যথেষ্ট থাকিয়া গিয়াছে,--বর্তমান ভারত দ্বিধাগ্রস্ত, (অন দি ক্রস-রোডস্)। এইরূপ সঙ্কট বহুবার আমাদের জাতীয় জীবনে আসিয়াছে, কিন্তু আমরা অন্য সভ্যতার বিদ্যুৎ স্পর্শে বা হুন-শক্-মোংগল প্রভৃতি আঘাতে, অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় গতাসু হই নাই,--আমাদের প্রাণশক্তি (পোটেন্‌সিয়াল এনার্জী) আমাদের সকল সংকট উত্তীর্ণ হইবার ক্ষমতা দিয়াছে ও দিবে। তাহার জন্য প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে প্রযুক্তি-বিজ্ঞান নায়কদিগের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী (এপ্রোচ), চিন্তানায়ক ও কর্মনায়কদিগের যুগোচিত চিন্তাধারা ও কর্ম-প্রবর্তনা। তাহা ইতিমধ্যেই পাইতেছি ও প্রচুর পরিমাণে পাইব আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের ও নবজাগরণের প্রসাদেই,—সন্দেহ নাই।

নকুল দাসের চিত্রপ্রদর্শনী

সম্প্রতি আকাদেমী অব ফাইন আর্টসের পশ্চিম গ্যালারীতে তরুণ শিল্পী নকুল দাসের একক চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে গেল। নকুল দাসের এটি দ্বিতীয় একক চিত্র-প্রদর্শনী। আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পী তাঁর সম্প্রতি আঁকা কুড়িখানি কাজ উপস্থিত করেছেন। কালি আর তুলির ড্রয়িং। শ্রেণী হিসাবে তাঁর রচনা সমকালীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তুলির মোটা টানের মধ্য দিয়ে মানব-জীবনের দুঃখকষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন। রচনাগুলিকে পৃথক নম্বর দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হলেও, সমগ্র রচনার মধ্যে একটাই দৃষ্টিভঙ্গী বা ভাবগত ঐক্য কাজ করছে। সে হলো দুঃস্থ, নিঃস্ব মানবতার জন্যে শিল্পি-মনের অপরিসীম দরদ। নকুল দাস বয়সে তরুণ। শিল্পীর ড্রয়িং সুন্দর ও সাবলীল। সবচেয়ে ভাল লাগে তাঁর বিমূর্ত রচনাগুলো যেমন ৫, ১৪, ২০, ১৮ ও ২ নম্বরের ড্রয়িং। এ সকল স্থানে তিনি বিষয়বস্তুর অবয়বটুকু চতুষ্কোণ জাতীয় ছোট বড় নানা ক্ষেত্রে ভাগ করেছেন দ্রুত তুলির টানে। কম্পোজিশন বা বিষয়বস্তু সংরচনে শিল্পীর পাকা হাত।

মাস্ক শিল্পীঃ নকুল দাস

বধিরতা সম্ভবপর হ'তে পারে। কিন্তু বলেছেন, জার্মান নিজন্‌সের কারণে দুই বধিরতা পরিমাপের রেখাচিত্র হবে—'এ ফ্ল্যাট অডিওমেট্রিক কার্ভ'।

মাতা-পিতার রক্তের আর্‌-এইচ ফ্যাক্টর বধিরতার আর একটি কারণ। 'রেসাস্ ফ্যাক্টর' আবিষ্কৃত হয় ১৯৪০ খৃস্টাব্দে। 'রেসার্স' রক্তের লোহিত-কণিকার মুখভাগে, শ্বেতকণিকার শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ উপস্থিত থাকে তা লোহিতকণিকার মুখভাগে থাকলে বলা হয় 'রেসাস্ পজিটিভ', আর না থাকলে 'রেসাস্ নেগেটিভ'। খিভাইন বলেছেন যে, নবজাতকের ক্ষেত্রে 'হিমোথিটিক্ এ্যানিমিয়া' এবং ন্যাবা (জন্‌ডিস্) রোগের কারণ 'রেসাস্' সঞ্জাত অসঙ্গতি। কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যাবা রোগ মস্তিষ্কের জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে, কারণ 'বেসাল নুক্লি'র হলুদ আভাস। 'বেসাল নুক্লি'র হলুদাভাসের কথা প্রথম উল্লেখ করেন অরথ্ এবং নাম দেন 'নুক্লিয়ার জন্‌ডিস্'। Smchorl এই বিশেষ প্রকার ন্যাবা রোগকে 'কানিক্‌চারাস্' নাম দেন।

কর্কেট্-ই সর্বপ্রথম 'কানিক্-চারাসের' সঙ্গে যুক্ত জটিল বধিরতার একটি ঘটনা উল্লেখ করেন।

১৯৫০ খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ক্রার্বট্রি ও জেরাড্ এবং আমেরিকার গুড্‌হিল 'কার্নিক্‌চারাস্'— গোত্রীয় 'রেসাস্' অসঙ্গতির কারণে নবজাতক-দের মধ্যে আবির্ভূত বধিরতা সম্বন্ধীয় ঘটনা প্রকাশ করেন। ক্যাভানথ্-ও এ-বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯৫০ খৃস্টাব্দে ক্ল্যারিয়ক্স এরূপ ধারণার বশবর্তী হ'য়ে পরীক্ষামূলক কাজ আরম্ভ করেন যে, 'কানিক্‌চারাস্' গোত্রীয় 'রেসাস্' অসঙ্গতির ক্ষেত্রে, কোষের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ 'এ্যানো-ক্সিয়া' দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়, ফলে কঠিন 'এ্যানিমিয়া' রোগের আবির্ভাব হয়। উক্ত রোগে কোষের গা ছিদ্র হ'য়ে 'বিলরুবিন'-এর প্রবেশ-পথ করে দেয় এবং বিশেষ প্রকার হলুদ লক্ষণের বৃদ্ধি ঘটায়।

অয়্‌ডিন্ ২৪টি অকালজন্মা শিশুর পোস্টমর্টেম করেন, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রকারের 'কানিক্-চারাস্' লক্ষ্য করেন। ওদের 'সেরোলজিক্যাল্' পরীক্ষাও করা হয়, কিন্তু সেখানে 'রেসাস'-অসঙ্গতির কোন প্রশ্ন ছিল না। তাঁর মতেও অক্সিজেনের অভাবই মস্তিষ্কের কোষক্ষয়ের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং এর ফলেই এক জাতীয় কোষের গায়ে ছিদ্র হয় ও 'বিলরুবিন্' প্রবেশের সুযোগ ঘটে।

কুস্তেন্ ও ক্রিংগ্‌স্ মনে করেন যে, অকালজন্মা শিশুর ক্ষেত্রে 'কানিক্-চারাস্'-রোগের কারণ লিভারের অপরিণতি। আরো জানা গেছে যে, এ সব শিশুর মধ্যে খুব বেশি পরিমাণ 'বিলরুবিন্' জাতীয় রক্তরস থাকে।

জেরাড্ মনে করেন যে, হাই-পোগ্লিকেমিয়া থেকে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ক্ষয় হয়। জেরাড্ দুটি 'কানিকচারাস রোগীর 'পোস্টমর্টেম' করেন। 'কক্-লিয়া নুক্লি'-তে স্নায়ুকোষের ক্ষয় লক্ষিত হয়। তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য 'ককলিয়া'র্ আবির্ভাব ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল। তিনি বলেন যে, যে সমস্ত 'কানিক্‌চারাস্' ঘটনার ক্ষেত্রে বধিরতার স্পষ্ট প্রমাণ আছে, সে সব ক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম করা হয় নি।

বেভিস্ লক্ষ্য করেছেন যে, 'কানিক্‌চারাসের' ক্ষেত্রে রক্তরসের মধ্যে 'বিলরুবিন্' ও 'অক্সিহিমো-গ্লোবিন্' উভয়ের পরিমাণই বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এ সব ক্ষেত্রে 'বিল-রুবিন্' চুয়াইয়া গিয়া 'বেসাল্ নুক্লির উপরে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্ষতি করতে পারে।

মূল কথা হচ্ছে, যদি মাতার 'Rh' নেগেটিভ্, পিতার পজিটিভ এবং গর্ভস্থ শিশুর 'Rh' পজিটিভ্ হয়, তা'হলে মায়ের পদ্ধতি বিপরীত পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সুরু করে। কখন কখন এর সঙ্গে বিষাক্ত জীবাণুর (ব্যাক্‌টেরিয়াল টক্সিন্ অর্ ভাইরাস্) সংহারক প্রচেষ্টাও যুক্ত থাকে। ফলে বর্ধমান ভ্রূণের অনিষ্ট হয়। 'আর্-এইচ' ঘটিত বিপদের সময় হচ্ছে প্রসবের প্রাক্কালে বা প্রসব সময়ে। তখন মায়ের রক্ত দূষিত হয়ে শিশুর রক্ত দূষিত করতে পারে। নবজাতকের এরূপ বিষাক্ত রক্ত-সঞ্জাত রোগকে ন্যাবা রোগ বলে। যদিও রক্তসঞ্চালন দ্বারা নবজাতকের জীবন রক্ষা একে-বারে অসম্ভব নয়, কিন্তু এরূপ সঞ্চালন প্রচেষ্টায় শিশুর কান, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গের স্থায়ী ক্ষতি হ'তে পারে। সৌভাগ্য যে, মা-বাবার প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে রক্তের 'Rh' সম্ভূত ক্ষতির সংখ্যা খুব সামান্য।

(গ) শ্রবণেন্দ্রিয়ের বহিঃকর্ণ (অর্থাৎ কর্ণপত্র ও বহিঃকর্ণনালী) বা মধ্য কর্ণের কোন গঠনগত অসামঞ্জস্য অভাব বা অস্বাভাবিকতার কারণে আজন্ম বধিরতা ঘটতে পারে। এরূপ শ্রুতি-ক্ষয়ে করোটির হাড়ের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ পাঠান যেতে পারে। কিন্তু অস্থি-মাধ্যমে প্রেরণের ফল বায়ুমাধ্যমে প্রেরণের মত উৎকৃষ্ট হয় না। প্লাস্টিক সার্জারী, সাধারণ অস্ত্রোপচার অথবা অন্য প্রকার চিকিৎসার সাহায্যে বহিঃ-কর্ণ ও মধ্যকর্ণের এরূপ সমস্যাগুলি অতিক্রম করা যেতে পারে।

অধিগত বধিরতা ও শ্রুতিক্ষীণতা

যতদূর জানা গেছে, তাতে অধিগত বধিরতা ও শ্রুতিক্ষীণতার ঘটনা আজন্ম সঞ্চারিত বধিরতার তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি। অধিগত বধিরতা কোন প্রকারেই আজন্ম সঞ্চারিত হ'তে পারে না। অধিগত বধিরতার কারণ অনেক। নীচে বিশিষ্ট কারণগুলি আলোচিত হচ্ছে—

(ক) শিশুদের স্কার্লেট ফিভার, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি, ডিপথিরিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রোগাক্রমণের ফলে বধিরতা সংঘটিত হ'তে পারে। বর্তমানে 'ম্যানেনজাইটিস'

রোগ থেকে সৃষ্ট বধিরতার সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত রোগে মস্তিষ্কের চারিপার্শ্বে আচ্ছাদিত ঝিল্লী (মেম্‌ব্রেন্‌) আক্রান্ত হয়। ফলে, বিষাক্ত 'স্পাইনাল্‌ ফ্লুইড্‌' কখন কখনও অন্তঃকর্ণে এসে সঞ্চিত হয়। যদিও এরূপ রোগাক্রমণ থেকে চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হওয়া সম্ভব, তবুও অন্তঃকর্ণের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রী ও অন্যান্য সংবেদজ (সেন্‌সরি) কিংবা সংজ্ঞাবহ যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। এ-রকম বিনষ্ট একবার কার্যকরী হলে কোন চিকিৎসা বা ঔষধ ফলপ্রসূ হয় না। শৈশবে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাক্রমণের ফলে সংবেদজ-স্নায়বিক (সেন্‌সরি-নিউরাল) বধিরতা বা শ্রুতিক্ষীণতা সঙ্ঘটিত হ'তে পারে। কর্ণপ্রদাহ (মাম্পস্‌) রোগে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হ'য়ে অন্তঃকর্ণের ক্ষতি করতে পারে। তবে কর্ণপ্রদাহ রোগে সাধারণত একটি কানই আক্রান্ত হয়। হাম, স্কারলেট্‌ ফিভার ইত্যাদি রোগে সাধারণত মধ্যকর্ণ আক্রান্ত হয়।

(খ) কর্ণমল (ইয়ার-ওয়ক্স) বহিঃকর্ণ-গহ্বরে সঞ্চিত হলে শব্দ-প্রবাহ কর্ণপটাহ বা মধ্য কর্ণে পৌঁছবার পথে বাধা পায়। ফলে, বধিরতা বা শ্রুতিক্ষীণতা আবির্ভূত হ'তে পারে।

(গ) এক্সটার্নাল ওটাটিস এক-রকম চর্মরোগ বিশেষ। উক্ত রোগে বহিঃকর্ণ আক্রান্ত হয়। বহিঃকর্ণ-গহ্বরে 'ব্যাক্টেরিয়া' বা 'ফাংগি' সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ পেলে, তা' গহ্বর গাত্রের চর্মকে আক্রমণ করে এবং গহ্বরের গঠনগত পরিবর্তন সূচিত করে। উক্ত রোগসঞ্জাত চর্মোপরি অবস্থিত স্ফোটকগুলি শব্দ-তরঙ্গ-প্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ' রোগ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে বেশি হয়। কখন কখন রোগটি মধ্যকর্ণেও সংক্রামিত হ'তে পারে। রোগ-লক্ষণ ---বহিঃকর্ণে বেদনা অনুভব।

(ঘ) মধ্যকর্ণ স্ফীতি (ওটাটিস মিডিয়া) রোগের প্রধান কারণ মাথায় ঠাণ্ডা লাগা, এ রোগে নাসিকা-মধ্যস্থ তরল শ্লেষ্মা পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হয়ে ইউস্‌টেচিয়ান নালীতে প্রবেশ করে; এবং উক্ত নালীবাহিত হয়ে মধ্যকর্ণে প্রবেশ করে। যখন 'ইউস্‌টেচিয়ান টিউব' স্ফীত হয়, তখন কোন কিছু গলাধঃকরণ-কালে তার বায়ুপ্রবেশ পথমুক্ত না হওয়ায় মধ্যকর্ণে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বহিঃ-কর্ণ পটাহের (মেম্‌ব্রেন্‌) উপর বাতাসের চাপের সহিত মধ্যকর্ণস্থ বাতাসের চাপের সাম্য বিপর্যস্ত হয়। ঐ সময়ে আবার মধ্যকর্ণে অবস্থিত বায়ুর অক্সিজেন রক্ত দ্বারা গৃহীত হওয়ায় এবং নতুন বাতাস (ফ্রেস এয়ার) প্রবেশের সুযোগ না থাকায় মধ্যকর্ণে আংশিক বায়ুশূন্যতা ঘটে। ফলে কর্ণপটাহ বহিস্থ বায়ুর চাপে মধ্যকর্ণের দিকে বেঁকে গিয়ে, মধ্য-কর্ণের সঞ্চালক যন্ত্রগুলির ক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণ হ্রাস করে। উক্ত যন্ত্রগুলির অকার্যকারিতার জন্য সাময়িক-ভাবে শ্রবণক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হতে পারে। অতিরিক্ত সর্দি ইত্যাদি হ'লে আমরা অনেক সময় সাময়িক শ্রুতিক্ষীণতা অনুভব করি এবং সাধারণ-ভাবে 'কানে তালা লাগা' বলে উল্লেখ করে থাকি। বস্তুতপক্ষে উক্তরূপ 'কানে তালা লাগা' আমাদের আলোচ্য রোগ থেকে ভিন্ন নয়। এই রোগ দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করলে বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে, মধ্যকর্ণে অবস্থিত 'ইউস্‌-টেচিয়ান্‌ টিউব' বাহিত তরল শ্লেষ্মা ঘনীভূত ও গাঢ় হয় এবং পুঁজ সৃষ্টি করে। এই পুঁজ মধ্যকর্ণে বিষক্রিয়ার সঞ্চার করে। এমতাবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা বিষক্রিয়া নষ্ট না করলে কানে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হয়। এখন মধ্যকর্ণস্থ পুঁজ কর্ণপটাহ ভেদ করে বাইরে আসবার চেষ্টা করে এবং বাইরে আসে। যদি যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হয় এবং অনুরূপ অবস্থা দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করে, তা' হ'লে বধিরতা অবশ্যম্ভাবী। অশিক্ষিত সমাজে, অবহেলা বা গুরুত্ব বোধের অভাবে এরূপ বধিরতার সংখ্যা বেশি দেখা যায়। শিশুবয়সেই উক্তরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশি।

(ঙ) অটোস্‌ক্লেরোসিস্‌ বা অস্থিকরণ একরকম অস্থিরোগ---যা' অন্তঃকর্ণের চতুষ্পার্শ্বের অস্থি-আধারে (বোনি ক্যাপ্‌সুল্‌) সৃষ্ট হয়। এই অস্থি আধারটি শরীরের যে-কোন অস্থির তুলনায় বেশি কঠিন। আধারটির চার-দিকে ছোট ছোট নরম হাড় জন্মাতে থাকে এবং ক্রমশ সেগুলি কঠিন হয়ে যায়। 'ওভাল্‌ উইনডো'-র সামনে ও পিছনেই সাধারণত অস্থিগুলির সৃষ্টি হয়। সময়ে সময়ে 'কক্‌লিয়া' নিজেই এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে স্নায়বিক শ্রুতিক্ষয় লক্ষিত হয়। কিন্তু এই নতুন অস্থি সৃষ্টি ও বৃদ্ধির ফলে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি হয় তখন, যখন মধ্যকর্ণের প্রান্তে অবস্থিত স্ট্যাপিস অস্থির প্রান্তটিকে (ফুট প্লেট) এরা শক্তভাবে 'ওভাল উইন্‌ডো'র সঙ্গে আবদ্ধ করে দেয়---যাতে স্ট্যাপিসের সহজ সঞ্চালন ক্ষমতা নষ্ট হয়। স্ট্যাপিস সঞ্চালিত না হ'লে বহিঃকর্ণ প্রান্তে অবস্থিত পটাহ থেকে ম্যালিয়াস্‌ ও ইন্‌কাস্‌ কর্তৃক গৃহীত ও সঞ্চালিত শব্দ-তরঙ্গ কার্যকরিভাবে অন্তঃকর্ণস্থ তরল পদার্থে সঞ্চারিত হতে পারে না। ফলে শ্রুতিহ্রাস বা বধিরতার আবির্ভাব হয়। অটোস্‌ক্লেরোসিস রোগোদ্ভূত শ্রুতিহ্রাস বা বধিরতা শ্বেত জাতিগুলির মধ্যে বেশি দেখা যায়।

(চ) টিউমার, সিফিলিস, স্কাল্‌-ফ্রাক্‌চার, হিস্টিরিয়া, স্মল পক্স, টিউবারকিউলোসিস প্রভৃতি রোগ থেকেও বহিঃ, মধ্য এবং অন্তঃকর্ণের ক্ষতির ফলে বধিরতা বা শ্রুতিক্ষীণতার সৃষ্টি হতে পারে।

(ছ) শরীরের অষ্টম স্নায়ুর পক্ষাঘাত বা অন্য কোন অকার্যকারিতা বধিরতার কারণ হতে পারে।

(ক) অজ্ঞাত বা বিক্ষিপ্ত কারণ :—

বিক্ষিপ্ত বধিরতার কারণগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে মনে হয় যে, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য জীবনধারণের নিম্নমান, শিক্ষার অভাব, সন্তান পালনে মাতা-পিতার দায়িত্বজ্ঞানের অভাব প্রভৃতি কারণে শিশুর শারীরিক অপুষ্টিজনিত একপ্রকার বধিরতা বা শ্রুতিক্ষীণতার উদ্ভব হয়।

১। অনো নামে একজন জাপানী ডাক্তার লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'ভিটামিন-এ'র অভাবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতির ফলে বধিরতা ইত্যাদির সৃষ্টি হতে পারে।

২। শ্রবণশক্তির অতি প্রয়োগ অনেক সময় শ্রুতিক্ষয়ের কারণ হ'তে পারে। চক্ষুর অতিরিক্ত পরিশ্রমে যেমন দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, কানের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে শ্রুতিশক্তি ক্ষীণ হওয়া সম্ভব। ডাঃ এ্যালবার্ট বলেন: বড় বড় শহরে বিচিত্র শব্দ; অতিরিক্ত মানসিক শ্রম; বায়ুর শীততাপ, উষ্ণতা ও আর্দ্রতা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতিনিয়ত ক্ষতিসাধন করছে। কারখানার শ্রমিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে উক্ত কারণে অধিক সংখ্যক শ্রুতিক্ষীণতা লক্ষ্য করা যায়।

৩। কানের খুব কাছে অত্যধিক জোরে শব্দ হ'লে অনেক সময় সাময়িক বা স্থায়ী বধিরতার সৃষ্টি হ'তে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিকটে 'সেল' বা অন্য কোন বিস্ফোরণের শব্দে অনেক সময় সৈন্যদের মধ্যে অনুরূপ বধিরতা সংঘটিত হয়।

৪। কুইনিন, সিলিসাইকেট্ এবং ক্যানামাইসিন্, স্টেপ্টোমাইসিন, নিও মাইসিন্ প্রভৃতি অ্যান্‌টি-বায়োটিক ঔষধ অতিরিক্ত ব্যবহার করলে বধিরতা, শ্রুতিক্ষীণতা, কর্ণনাদ (টিনিটাস্) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব বলে অনেক ডাক্তার মনে করেন। কুইনিন ব্যবহারের ফলে ককলিয়া'-র কি ক্ষতি হ'তে পারে সে সম্বন্ধে ডাঃ টেলর বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

৫। কখন কখনও দেখা যায়; কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতিরেকে, যে-কোন বয়সে শ্রুতিক্ষীণতা বা বধিরতা দেখা দিল। অনেক সময় বংশানুক্রমিক বধিরতাই এর কারণ। বংশানুক্রমিক বধিরতার আবির্ভাব যে-কোন বয়সে ঘটতে পারে। অন্তঃকর্ণের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্যাহত হওয়ার ফলে এরকম হয়। এ-রোগ পুরুষানুক্রমে বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত হ'তে পারে।

৬। অকালজন্ম। অরুভিন্ বলেছেন, অকালজন্মশিশুর স্নায়ুতন্ত্রী দুর্বল; ফলে এ্যানোক্সিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। উক্ত কারণে স্নায়ুকোষেরও ক্ষতি হয়। এরূপও বিবেচনা করা হয়ে থাকে যে, ককলিয়া'-র অভ্যন্তরস্থ পদার্থের ক্ষতির কারণে বধিরতা সৃষ্টি হয়।

জনসেন্ বলেছেন, স্বাভাবিক-জন্ম শিশু অপেক্ষা অকাল-জন্ম শিশুর ক্ষেত্রে ধারণী-বধিরতার (পার্সেপটিক ডেফ্‌নেস্) সংখ্যা বেশি।

বার্ধক্যজনিত কারণ

অন্তঃকর্ণের অসুখ বা অস্বাভাবিকতার ফলে শ্রুতিক্ষমতার যে ক্ষতি হয় তাকে প্রেস্‌বাইকুসিস্' বলে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় এ রোগ দেখা যায়। ৪০ বছর বয়সের পরে 'অর্গান্ অফ্ কর্টি' এবং 'অডিটরী নার্ভ'-এর ক্ষয় খুবই স্বাভাবিক। 'অর্গান্ অফ্ কর্টি'র ওপরে শব্দ-গ্রাহক স্নায়ুতন্ত্রীগুলি বয়োবৃদ্ধির ফলে এবং ব্যবহারের দ্বারা, ক্রমশ ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একসময় প্রয়োজনানুযায়ী শব্দ গ্রহণে অক্ষম হয়। তখনই বার্ধক্যজনিত বধিরতা বা শ্রুতিক্ষীণতার আবির্ভাব হয়। *

* 1. Carruthers, D. G., 'Med. J. Australia', 31st March 315, 1945.
2. Gregg, W. MCA., 'Trans. Opthal. Soc. Australia', 3 : 35, 1941.
3. Fisch, L. and Osborn, D. A., 'Arch. Dis. Childhood', 29 : 309, 1954.
4. Taylor, A. M., 'Laringoscope', 47 : 692, 1937.
5. Aldin, R., 'Lancet', 1 : 1153, 1950.
6. Johnsen, S., 'Acta Oto-laryng.', 42 : 51, 1952.

রাকেট

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক রবার্ট এইচ্ গডার্ড পৃথিবীর প্রথম তরল জ্বালানী রকেট উড়িয়েছিলেন। এর সঙ্গে গতি ও শক্তিতে তুলনীয় প্রথম জারমান্ রকেট প্রায় চার বছর পরে শূন্যে উড়েছিল। অথচ, ভারনহ্ ব্রোণ-এর আমলে সুবিখ্যাত 'V-2' রকেট প্রচুর সংখ্যক নির্মিত হয়েছিল জার্মানীতে। আরও আমেরিকায় ১৯৪৯-এ; প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঠিক তেইশ বছর পরে নির্মিত হয় অভিকায় 'ভাইকিং' রকেট। এই যে দশ বছর বাড়তি লেগেছিল আমেরিকার, এজন্য অনেকেই গডার্ড-এর ঢাকঢাক গুড়গুড় নীতিকে দায়ী করেন।

[illegible]

মাতাজী গঙ্গাবাঈ

জর্জ এ্যাব্রেন

দূর অতীতে পুণ্য ভারতভূমির এক প্রান্তে এক রাজার প্রাসাদে শতসহস্র ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে বিপুল বৈভবের চোখ ঝলসানো, নয়ন ধাঁধানো জমকালো আলোকপুঞ্জ ভেদ করে একদিন কেমন হঠাৎ বিচ্ছুরিত হল ত্যাগের বৈরাগ্যের করুণার একটি স্নিগ্ধ আলোকরেখা, ঠিক তেমনিই গত শতকে ভারতের আর এক প্রান্তে এক রাজপুরীর অভ্যন্তরে এই ধরণেরই বৈরাগ্য, মৈত্রী ও করুণার পবিত্র আলো আরেকবার জ্বলে উঠে ভারতের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং জনকল্যাণের ইতিহাসে একটি চমক লাগিয়ে চলে গেল।

এই চমক যিনি লাগালেন তিনি গঙ্গাবাঈ। মাতাজী গঙ্গাবাঈ। দক্ষিণ ভারতীয় এক রাজার দুহিতা। কিন্তু কোন রাজার কি এমন সাধারণ কোন ব্যক্তিগত ঘরণীরূপে তাঁকে দেখা গেল না। তবে, জননীরূপে পরবর্তীকালে দেখা গেল অসংখ্য আতুরের, অনাথের, অসহায়ের—যারা তাঁর করুণার পবিত্র আলোকে জীবনের সব অন্ধকার বিদূরিত করতে সক্ষম হয়েছে, যারা তাঁর দাক্ষিণ্যের ধারাস্নানে আপন আপন জীবনের সকল ব্যথার সকল বঞ্চনার প্রলেপ ধৌত-বিধৌত করতে অপারগ হয় নি।

এক অপূর্ব বৈচিত্র্যবিমণ্ডিত তাঁর নশ্বর জীবনের ইতিহাস। এ জন্মের সূচনা রাজপ্রাসাদে রাজনন্দিনীরূপে, তারপর সন্ন্যাস এবং কঠোর তপস্যা, তারপর সিপাহী বিপ্লবে যোগদান। তারপর নানাসাহেবের সঙ্গে নেপাল যাত্রা, নেপাল থেকে ফিরে এসে পুরাপুরি সন্ন্যাসজীবন বরণ করে নিলেন এবং সেই জীবনের মাধ্যমে এই মহানগরী কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠা করলেন শিক্ষায়তন, প্রচার করলেন জাতীয়তার মন্ত্র, স্থাপন করলেন জনসেবায় এক অমলিন আদর্শ।

জাতীয় ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর অবদান অসামান্য। এই শতাব্দীতে আবির্ভূত দিকপাল প্রণম্য ভারত-সন্তানদের দুর্বার সাধনা ভারতের ইতিহাসের সামগ্রিক আলেখ্যে বহুগুণ ঔজ্জ্বল্য দান করেছিল। ঘুমন্ত জাতির নিদ্রাভঙ্গ ঘটেছিল সেই যুগ-বৈতালিকদের ঘুম-ভাঙানিয়া গানে। পরাধীন মানুষের মনোলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল নব নব চেতনায়, ধারণায়, জীবনবোধের অরুণ রক্তরাগে। মাতাজী গঙ্গাবাঈ এই শতাব্দীরই এক উল্লেখযোগ্য ফসল।

গঙ্গাবাঈ রায়বেলুড়ের রাজকন্যা। রায়বেলুড়ের রাণী অর্থাৎ গঙ্গাবাঈয়ের মা ছিলেন ভেলোরের রাজনন্দিনী। গঙ্গাবাঈয়ের নামকরণ সম্বন্ধে কিছু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কেউ বলেন, সস্ত্রীক রায়বেলুড় রাজ স্বপ্নে গঙ্গাদর্শন পাওয়ার পর এই কন্যার জন্ম, আবার কেউ বা বলেন গঙ্গাদেবীর আরাধনার ফলেই এই মহীয়সী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করলেন।

রাজকুমারী গঙ্গাবাঈয়ের জীবন সুরু হল যথাযথ রাজনন্দিনীর মত,
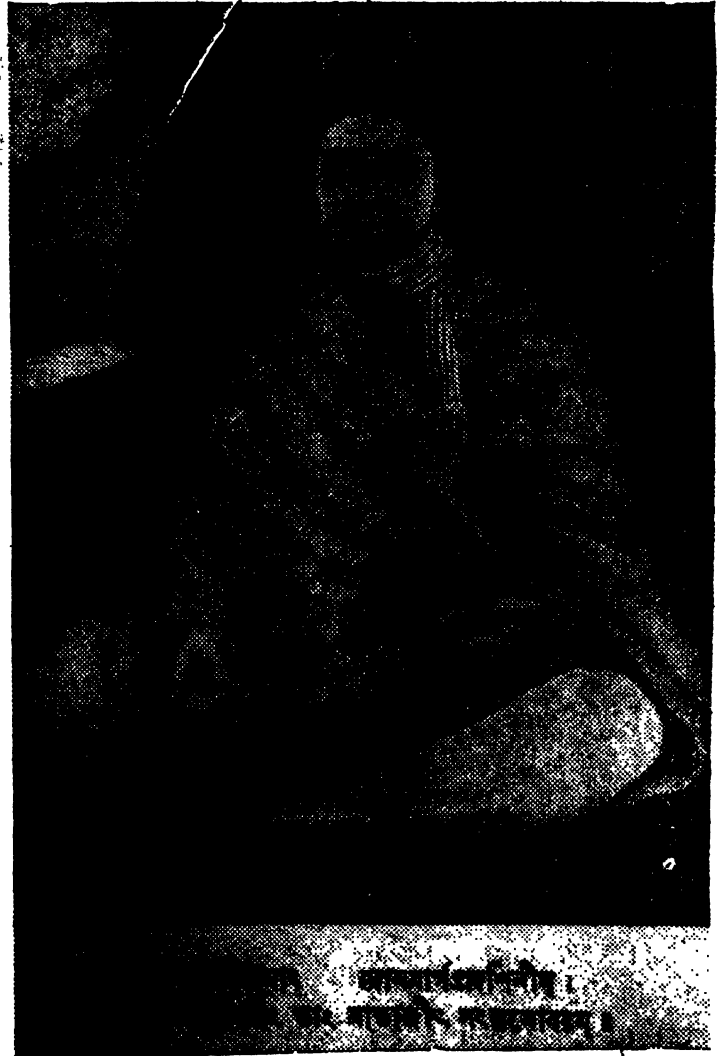
মাতাজী গঙ্গাবাঈ

কিন্তু তার ভিতরেও একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য সেই জীবনকে বিশেষত্ব দিয়েছিল। জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই পরবর্তী জীবনের জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছিলেন গঙ্গাবাঈ।

অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতিতেও তিনি শিক্ষা নিতে থাকেন এবং দেখা যাচ্ছে ক্রমশই পটীয়সী হয়ে উঠতে থাকেন।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে রাণী লক্ষ্মীবাঈ একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। ঝাঁসির এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী রাণী সেদিন যে অতুলনীয় বীরত্ব, দেশপ্রেম এবং মনোবলসহকারে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন—তা যে-কোন দেশের মুক্তিকামী স্বাধীনতা যোদ্ধার যাত্রাপথের পরম অনুপ্রেরণা এবং এক অনির্বাণ আদর্শ।

লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন গঙ্গাবাঈয়ের খাসী এবং প্রায় সমবয়সী। সুতরাং গঙ্গাবাঈয়ের জন্ম ১৮৩৫ বা সন্নিকটবর্তী কোন অব্দ বলে ধরে নেওয়া যায়। কৈশোর থেকেই গঙ্গাবাঈয়ের হৃদয়ের বীণায় ঝঙ্কৃত হতে থাকে সেই অপরূপের সুর। কিশোরী রাজকন্যার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে সেই রসঘন অনুভূতি—যে অনুভূতির উদাত্ত আলোকে ঈশ্বরের মানসপুত্ররা দূর করছেন পৃথিবীর গ্লানি, পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলেছেন দিব্য আলোকে—ধরার মানবকে ভ্রান্তি, সংশয় ও অন্ধকারের রাহুগ্রাস থেকে উপনীত করেছেন সত্যের, শাশ্বতের, সার্থকতার প্রাঙ্গণে।

কিশোরী গঙ্গাবাঈয়ের প্রতিদিনের প্রতি ক্ষণের প্রতি পদক্ষেপের তালে তালে যেন মিলতে থাকে সেই পরমের পদসঞ্চার। কে যেন হাতছানি দেয়—কে যেন অন্তরজোড়া আলোড়ন তুলে বলে—এই ভোগ, এই বিলাস, এই আরাম তোমার জন্যে নয়—রাজার ঐশ্বর্যের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে এস—সকল রাজার রাজা সকল মহারাজার মহারাজা যিনি তাঁর অনন্ত কৃপার সীমাহীন সত্তার গ্রহণ করে ধন্যা হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর।

নৈমিষারণ্যে সাধনায় রত হলেন গঙ্গাবাঈ। কঠোর সাধনা, দুস্তর তপস্যা, পঞ্চাগ্নি ব্রত। পঞ্চতপা গঙ্গাবাঈ রাজপ্রাসাদের মণি-মাণিক্যের আকর্ষণ ছিন্নভিন্ন করতে পেরেছিলেন এই কারণেই যে, তিনি মণির মন—তিনি নীলমণির।

১৮৫৮ সাল। সারা ভারতের মুক্তিসাধনার প্রথম ব্যাপক পদক্ষেপ। ঝাঁসি থেকে শোনা গেল এক তীব্র হুঙ্কার অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী এক তন্বী যুবতীর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠ থেকে—মেরে ঝাঁসি দুঙ্গা নেহি—সেই ডাকে কি মাদকতা ছিল জানি না, কি মোহিনী শক্তিতে ভরা ছিল সেই কণ্ঠ তাও আমাদের জানার বাইরে—তবে, ইতিহাস এইটুকু আমাদের জানাচ্ছে—সেই বীরাঙ্গনার ডাক টলিয়ে দিল সারা ভারতের মাটি—আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ আন্দোলিত হয়ে উঠল সেই মহিমময়ীর আহ্বানে, শতাব্দীর ঘুমঘোরে থেকে যেন সারা ভারতবর্ষ জেগে উঠল, ভারতের ঘরে-ঘরে, নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা জেগে উঠল—সমগ্র জাতির চেতনায়, চিন্তায় এবং স্বপ্নে এল জাতীয় মুক্তিতৃষ্ণা।

সাধনায় অনেকদূর তখন এগিয়ে গেছেন গঙ্গাবাঈ। লক্ষ্মীবাঈয়ের সে আহ্বান সেই সাধনকুঞ্জেও পৌঁছল। সন্ন্যাসিনী এবার দেখা দিলেন যুদ্ধনেত্রীর ভূমিকায়। সাধনমঞ্চ থেকে এসে দাঁড়ালেন রণাঙ্গনে। সাধনায় অর্জিত শক্তির প্রয়োগ ঘটালেন স্বাধীনতার সংগ্রামে। তবে রণাঙ্গন তাঁর জীবনের প্রকাশক্ষেত্র হিসাবে অধিককাল চিহ্নিত নয়।

এর পরেই নানাসাহেবের সঙ্গে গঙ্গাবাঈ চলে গেলেন নেপাল। সেখানে পশুপতিনাথের মন্দিরের কাছে গঙ্গামন্দির নির্মাণ করলেন গঙ্গাবাঈ।

মহানগরী কলকাতা। সেদিন সারা ভারতের রাজধানী। এই কলকাতা হ'ল তাঁর কর্মক্ষেত্র। এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন মহাকালী পাঠশালা। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম এবং খ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত। এই প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়ে তুললেন জনকল্যাণের স্বপ্ন নিয়ে। সহায়করূপে পেলেন কয়েকজন পরম বিদ্যোৎসাহী, দেশোন্নয়নধর্মী স্বনামধন্য পুরুষকে। প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং তাকে চালানোর জন্যে চাই প্রভূত অর্থ। টাকার তোড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন এই স্বনামধন্য পুরুষের দল। এগিয়ে এলেন দেশপূজ্য মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, এলেন দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, এলেন দ্বারভাঙার মহারাজা স্যার রামেশ্বর সিং।

এই বিদ্যায়তনটিকেই কেন্দ্র করে মাতাজী গঙ্গাবাঈয়ের কর্মজীবন প্রবাহিত হতে থাকে। তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তিনি শুধু নিজের মুক্তি খোঁজেন নি, তিনি খুঁজেছেন জাতীয়মুক্তি। শিক্ষার, চিন্তার, কুসংস্কার থেকে মুক্তি, দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রসার প্রভৃতিই প্রকৃত কল্যাণের পথ হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন—সেই সঙ্গে দৈহিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন ও উপাসনাকেও তিনি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূল্য দিয়েছিলেন—সেই আদর্শে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর শিক্ষায়তন—এই বিদ্যালয়ে যারা আসবে তারা এখান থেকে গ্রহণ করবে দেশসেবার মন্ত্র, সেবার মন্ত্র এবং দৈহিক শক্তির অনুশীলনে তারা অর্জন করবে প্রভূত শক্তি—মহাকালী পাঠশালা স্থাপনের নেপথ্যে এই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। গঙ্গাবাঈয়ের সমগ্র জীবনকাহিনী অনুধাবন করলে দেখা যায়, তাঁর জীবন শুধু ধর্মের অনুশীলনেই নিমগ্ন নয়। ধর্মের সঙ্গে কর্মের অপূর্ব সমন্বয় তাঁর ধর্মজীবন বা জীবনধর্মকে আরও বহুগুণ বরণীয়া করে তুলেছিল।

মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শনে একদিন এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মুগ্ধ-অভিভূত হলেন স্বামীজী। আন্তরিক অভিনন্দন এবং সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বিদায় নিলেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই মহীয়সী বীরাঙ্গনা, কর্মসাধিকা এবং অধ্যাত্মমার্গের বরণীয়া জ্যোতিষ্কের পার্থিবজীবনের অবসান হয়।

কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

বিপিনবিহারী মিশ্র

স্বনামধন্য কবি জয়দেব গোস্বামী নিজ প্রতিভা ও মনীষার জন্য জগদ্বিখ্যাত। অনুমানতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব (বর্তমানে কেন্দুলী) গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবি জয়দেব স্বরচিত গীতগোবিন্দে মাতা-পিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত
শ্রীজয়দেব কস্য।
পরাশরাদিপ্রিয় বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ
কবিত্বমস্তু॥

কবি জয়দেব অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগী হন এবং শ্রীপুরুষোত্তমে গমনপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনতিপাত করিতেন। ইনি পরম বৈষ্ণব শ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। পুরুষোত্তমেই ঘটনাক্রমে তাঁহাকে বিবাহ করিতে হয়। কোনো এক ব্রাহ্মণ দম্পতী তাঁহাদের পদ্মাবতী নাম্নী একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে কবির হস্তে সমর্পণ করেন। প্রথমতঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালিকার স্বভাব ও আনুগত্য দেখিয়া কবি তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুকাল পুরুষোত্তমে থাকিবার পর কবি সস্ত্রীক পুনরায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় রাধা-মাধবের বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক বসতি করেন।

কবি জয়দেব বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেন নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, ইহা 'সদুক্তি কর্ণামৃত' হইতে জানা যায়। লক্ষ্মণসেন জয়দেবের কবি-প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে নিজ পঞ্চরত্ন সভার প্রধানরূপে বরণ করেন। জয়দেব একাধারে সুকবি, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ এবং সুগায়ক ছিলেন। গীতের পরিপাট্যের জন্য আবশ্যক—স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য। ইহা পৃথক পৃথক দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। একাধারে এই দুইটি ক্ষমতা সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনি আবার সুগায়ক ইহা অতি বিরল। কিন্তু জয়দেব ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কবির যশ ও খ্যাতি শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের সর্বত্র যথেষ্ট ছিল, এবং আজ ভারতের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি অত্যধিক।

বর্তমানে গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবের অন্যান্য কোন রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় না। অবশ্য জয়দেব রচিত কয়েকটি রচনা পাওয়া যায়, কিন্তু এই জয়দেব গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব কি-না এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' কবি জয়দেবের নামে যে শ্লোকগুলি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পাঁচটি গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত। যাহাই হউক, গীতগোবিন্দ যে কবি জয়দেব রচিত এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনা অত্যন্ত বিরল। গীতগোবিন্দের মত এমন অলঙ্কারপূর্ণ মধুর সুললিত ভাবপূর্ণ গীতিকাব্য অন্য কোন ভাষায় বড় একটা দেখা যায় না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্বন্ধে গীতগোবিন্দ একখানি অপূর্ব গীতিকাব্য। এই গীতিকাব্যে বাক্যের চাতুর্য, রচনার মাধুর্য, পদের লালিত্য এবং ছন্দের সুকোমল পারিপাট্য আদ্যোপান্ত সর্বত্র সমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই কাব্যে কোথাও অলঙ্কার দোষ অথবা গঠন দোষ সুসজ্জ পাঠকদের নয়নগোচর হয় না। কবি জয়দেবের রচনার স্বরূপ মোহিনী শক্তি যে তা পাঠমাত্রেই পাঠকের হৃদয় প্রফুল্ল ও মন মুগ্ধ হয়। বস্তুত কবি জয়দেব তাঁহার কাব্যকে নানা গুণে মণ্ডিত করিয়া, নানালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া পূর্ণ মনোহর করিয়াছেন। এই কাব্য যত অনুশীলন করা যায়, পাঠলালসা ততোধিক বৃদ্ধি পায়।

গীতগোবিন্দের ভাষা---অনেকের মতে গীতগোবিন্দের গানগুলি প্রথমে দেশীয় ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং পরে উহা সংস্কৃতে অনূদিত করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু এই মত অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মনে হয় যে, কবি দেশীয় ও সংস্কৃত উভয় ভাষারই পণ্ডিত ছিলেন, ফলে সংস্কৃত রচনাকালে তাহাতে কিছু দেশীয় প্রভাব পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গীতগোবিন্দের রচনাকাল এক সন্ধিক্ষণে। সেই সময়ে প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃত ভাষার শেষ অবস্থা এবং অপভ্রংশ বা দেশীয় ভাষার উত্থানকাল। এই সন্ধিক্ষণে নবোদিত ভাষাকে বর্জন করিয়া প্রাচীন সংস্কৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রচেষ্টা হয়তো সর্বত্র দেখা দিয়া থাকিবে এবং সম্ভবতঃ এই প্রচেষ্টায় গীতগোবিন্দ একখানি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেশীয় ভাবধারায় রচিত হইলেও, ইহাকে ঠিক দেশীয় গীতিকাব্য বলা যায় না। সে যুগে দেশীয় ভাবভঙ্গী ও গীতিবাহুল্য সংস্কৃত কাব্যে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং গীতগোবিন্দেও তাহারই পরিচয়। সুতরাং গীতগোবিন্দ যে সংস্কৃতে রচিত ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

গীতগোবিন্দের ভাব ও ছন্দ রবীন্দ্রনাথকে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা তিনি 'জীবন স্মৃতিতে' উল্লেখ করিয়াছেন।

"একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি

বাস্তব কাব্য

শ্রীশশাঙ্ক পাণিগ্রাহী

কাব্যবনে বিচরণ করার আমার অবসর নাই।
আমাকে যেতে হবে সেই নোংরা বস্তিটার মাঝে ;—
যেটা দখিনা বাতাসের বদলে
কয়লার চাপ চাপ ধোঁয়ায় ভরে থাকে ;
যেখানে ফুল ফুটে না,
চাঁদ হাসে না ;
যেখানে কাব্য করার এতটুকু অবকাশ নাই।

অস্বাস্থ্যকর শ্বাসরোধী পরিবেশে
যেখানে রুগ্ন-শীর্ণ মানুষেরা
নিজেদের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য
অহরহ প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে
ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধার মত।
যাদের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে
মৃত্যুর বিভীষিকা ;
কোটরগত চোখে হতাশা।

তাদের মাঝে আমি রুটি যোগাড়ের গদ্য প্রচার করতে চাই ;
তাদের সংহতির সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগিয়ে তুলতে চাই ;
শতাব্দীর সঞ্চিত কুর্মের খোলস ছেড়ে
বেরিয়ে আসার বীজমন্ত্র শোনাতে চাই।

কবিরা থাকুন কল্পনার গজদন্ত মিনারে।
সেখানে উঠার আমার কোন সাধ নাই।

পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা, ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না ; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না।---সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃত-নিকুঞ্জ গৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল।—যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণং হরিবিরহদহন বহনেন বহু দূষণং'---এই পদটি ঠিকমতো যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।"

গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত সাহিত্যে কবি জয়দেবের আবির্ভাব এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই সাহিত্যে তাঁহার দান বর্ণনাতীত। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান অনন্যসাধারণ। জয়দেবের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল কাব্যেই নহে, শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যেও যথেষ্ট। যদিও তাঁহার বিষয়ে অধিক কিছু জানা যায় না, অথবা যাহা কিছুই জানা যায়, তাহা আবার অলৌকিকতাপূর্ণ, তথাপি তাঁহার লেখার মধ্যেই তাঁহার চারিত্রিক বলিষ্ঠতার যথেষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে।

বর্তমানে গীতগোবিন্দকে অশ্লীল কাব্য বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মত পরিধেয়।---"এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজরা করেন না।---আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।"

যে যুগে গীতগোবিন্দের রচনা হইয়াছিল, সেই যুগে ইহা সম্পূর্ণ শ্লীল বলিয়াই গণ্য ছিল। সেই যুগের সকল সাহিত্য নিদর্শনেই এইরূপ পরিচয় আছে।

কালিদাসের সাহিত্যে ধর্ম ও দর্শন

ধর্ম কি, ধর্মের প্রয়োজন বা কি জানাইবার জন্য কালিদাস বলেন—

'কর্মবন্ধচ্ছিদং ধর্মং ভবস্যেব মুমুক্ষব: ॥' (কু—২।৫১)।

সংসারে কৃতকর্মের ফলভোগ-রূপ বন্ধন হইতে মোক্ষকামীরা যাহার দ্বারা মুক্তিলাভ করেন তাহা ধর্ম।

মহাকবির ধর্মমত লইয়া আলোচনা করিতে যাইলে বুঝিতে পারা যায় যে, দেবতারা বহু হইলেও ঈশ্বর এক।

বিক্রমোর্বশীয়ের নান্দীতে মহাকবি বলেন---

'বেদান্তেষু যমাহুরেক পুরুষম্ ॥'

যখন বেদান্তে যাঁহাকে বলা হইয়াছে 'এক পুরুষ', মল্লিনাথ তাঁহার টীকায় এক পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'একমেব অদ্বিতীয়ম্'—ঈশ্বর এক, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই।

রঘুবংশের অষ্টম সর্গে মহাকবি বলেন---

'বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।' (রঘু-৮।৪৬)।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিষও অমৃত হয়, আবার অমৃতও বিষ হইয়া যাইতে পারে।

কুমার-সম্ভবে মহাকবি বলেন—

'নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।' (কু-২।৪)।

সৃষ্টির পূর্বে তুমি ছিলে এক, তারপর ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে।

যাঁহার উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হইল, তিনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা। কেবল ব্রহ্মা নয়, মহাকবি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সম্বন্ধে যেখানে যা কিছু বলিয়াছেন, সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইয়া আপন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তবু কিন্তু, যদি তাঁহার সাহিত্য লইয়া সমগ্রভাবে আলোচনা করা যায়, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার ইষ্টদেব ছিলেন শিব, আরাধ্য দেবী ছিলেন পার্বতী।

ঈশ্বরকে তিনি বলিয়াছেন এক এবং ঈশ্বর বলিতে তিনি যে শিবকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হ কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমোর্বশীয়ের নান্দীতে তিনি বলিয়াছেন—

'যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয় শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।'

ঈশ্বর বলিতে যাঁহাকে ছাড়া আর অপরকে বুঝায় না। শিব ঈশ্বর। চতুর্থ অঙ্কেও মহাকবি ঈশ্বর শব্দে শিবকে বুঝাইয়াছেন। সেখানে রাজা পুরূরবা সম্মুখে ভূমির উপর পতিত সঙ্গমনীয় মণিটি হাতে তুলিয়া লইয়া বলিতেছেন---

'ততঃ করিষ্যামি ভবন্তমাত্মনঃ শিখামণিং বালমিবেন্দুমীশ্বরঃ ॥'

শ্রীরাম নাথ মল্লিক

ঈশ্বর যেমন চন্দ্রকে তাঁহার শিরোভূষণ করিয়াছেন, আমিও তোমাকে (মণিকে) আমার শিরোভূষণ করিব।

ঈশ্বর বলিতে এখানে যে শিবকে বুঝান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; রঘুবংশের অষ্টম সর্গে মহাকবি বলেন—

'অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ শ্রিত-গোকর্ণ নিকেতমীশ্বরম্'। (রঘু-৮।৩৩)।

সে সময় দেবর্ষি নারদ দক্ষিণ মহাসাগরের তটে অবস্থিত গোকর্ণ মন্দিরের ঈশ্বরকে বীণা বাজাইয়া শোনাইবার নিমিত্ত আকাশপথে যাইতেছিলেন। ঈশ্বর শব্দের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বলেন, 'গোকর্ণাখ্য স্থানমীশ্বরং শিবং শিবং'—শিব।

কালিদাস যে শৈব বা শিবের উপাসক ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, অথচ অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের ইষ্টদেব তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার আস্পদ ছিলেন।

মহাকবির আবির্ভাবের বহু পূর্বে সত্যদ্রষ্টা মুনি-ঋষিরা তপস্যালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা 'জন্মান্তর', 'কর্মফল', 'পরমাত্মার' অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রভৃতি বেদের মূল তত্ত্বগুলিকে ভিত্তি করিয়া যে সনাতন ধর্মের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যুগেও ধর্ম সেইভাবে প্রচলিত ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচলন, সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব, জনসাধারণের দেব-দেবীদের প্রতি ভক্তি, মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থার বহু বিবরণ তাঁহার সাহিত্যে পাওয়া যায়।

'জন্মান্তর' সম্বন্ধে তাঁহার সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যায় যে, জন্মাইলে মরিতে হয়, আর মরণের পর আবার 'জননী জঠরে শয়ন করিতে হয়', জন্মান্তর তত্ত্বের এই মূল সূত্রটি মহাকবি তাঁহার নাটক ও গল্পগুলির মধ্যে এমন স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, পড়িলে মনে হয়, জন্মান্তর তত্ত্ব ছিল তাঁহার মজ্জাগত বিশ্বাস। যেন তিনি এ তত্ত্ব স্বয়ংসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত মানিয়া লইয়াছিলেন।

পূর্বজন্ম ও পরজন্মের উল্লেখ তিনি তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনাগুলির বহু স্থানে বহুবার করিয়াছেন। এমন কি পূর্বজন্মের সংস্কার যে পরজন্মের মন ও কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, এ কথাও তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন।

রঘুবংশের অষ্টম সর্গে মহাকবি বলেন, বশিষ্ঠদেব যখন শুনিলেন, মহারাজ অজ তাঁহার পত্নী মহারাণী ইন্দুমতীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে এত অধিক বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, যতশীঘ্র পারা যায় এ পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে তাঁহার প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজাকে এ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি এক শিষ্য দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—

"পরলোকজুষাং স্বকর্মভির্গতয়ো ভিন্ন পথা হি দেহিনাম্।।' (রঘু-৮।৮৫)।

দেহীরা (জীবেরা) পরলোকে গিয়া নিজ নিজ কর্মের ফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়েন।

বলার উদ্দেশ্য, রাজার কর্মফল ও তাঁহার পত্নীর কর্মফল একপ্রকারের নয়, সুতরাং মহারাণী---তাঁহার প্রিয়া---স্বকর্মের ফলানুসারে যে লোকে গিয়া বাস করিতেছেন, তিনিও যে ঠিক সেই লোকে গিয়া পত্নীর সহিত মিলিত হইতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

ইহা শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তিসঙ্গত বাণী হইলেও, বুঝিতে পারা যায় যে, মহাকবির ভালবাসা-প্রবণ ইহাতে সায় দিতে পারে নাই, তাঁহার যেন বিশ্বাস ছিল, কর্মফল বিভিন্ন হইলেও স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমের সুদৃঢ় আকর্ষণে একই লোকে গিয়া একত্রে বাস করিতে পান দেখাইবার জন্য অজের মৃত্যুর পর তিনি বলিতেছেন---

'পূর্বাকারাধিকতররুচা সঙ্গতঃ কান্তয়া সৌ'। (রঘু-৮।৯৫)।

দেহত্যাগের পর অজ পরলোকে গিয়া পত্নী ইন্দুমতীর সহিত মিলিত হইলেন। ইন্দুমতীর রূপ তখন পার্থিব দেহের রূপের অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়া মানুষ কি সেখানে অনন্তকাল বাস করে?

ইহার উত্তর মহাকবির সাহিত্যের কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। 'পূর্ব মেঘের' এক শ্লোকাংশে তিনি বলেন---

'স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাম্'। (পূ-মে---৩১)।

যে পুণ্যের ফলে মানুষ স্বর্গে গিয়া বাস করিতে পায়, সে পুণ্যের মেয়াদ যখন শেষ হইয়া আসিতে থাকে, তখন আবার তাহাকে জন্মগ্রহণ করার জন্য পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়।

পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া মানুষ যখন নবজন্ম গ্রহণ করে, তখন কি তাহার পূর্বজন্মের কোনও স্মৃতি মনে থাকে? মহাকবি বলেন, প্রণয়ের স্মৃতি মনে আসে বৈ কি---

'মনো হি জন্মান্তর সঙ্গতিজ্ঞম্।' (রঘু-৭।১৫)।

পূর্বজন্মের প্রণয়ের স্মৃতি পরজন্মেও মনে আসিয়া থাকে। মনের অবচেতনাংশে সংস্কাররূপে থাকে, বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া যায় না।

কেবল প্রণয়ের স্মৃতি নয়, পূর্বজন্মে অধীত বিদ্যারও সংস্কার পরজন্মের মনে ও মস্তিষ্কে যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা জানাইবার জন্য মহাকবি পার্বতীর বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে বলিতেছেন---

'স্থিরোপদেশামুপদেশকালে।
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।।'(কু-১।৩০)

পূর্বজন্মে অধীতবিদ্যা পার্বতীর মনে সংস্কাররূপে ছিল বলিয়া এজন্মে তিনি গুরুর উপদেশ পাওয়ামাত্র সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

এখানে কুমারসম্ভবে মহাকবি বলিলেন, 'গুরুর উপদেশ পাওয়ামাত্র' ---আর রঘুবংশে বলিতেছেন---

'স পূর্বজন্মান্তরপূর্বপারাঃ।
স্মরন্নিবাক্লেশকরো গুরূণাম্।।'
(রঘু---১৮।৫০)।

পূর্বজন্মে বালক সুদর্শন যে-সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, এজন্মে তাহাদের স্মৃতি স্মরণ পথে আসিয়া পড়ায় তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্লেশ গুরুদিগকে ভোগ করিতে হইল না।

মহাকবি যেন বলিতে চাহেন, কেবল যে অসাধারণ মেধার জন্য বালক সুদর্শন গুরুদেবের বিনা উপদেশে সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিতে পারিতেন, তাহা নহে, পূর্বজন্মের বিদ্যার সংস্কার ইহজন্মে মনে আসিয়া পড়িত বলিয়া তিনি অনায়াসে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্বজন্মের কোনও কোনও কর্মের স্মৃতি যাহা মনের অবচেতনাংশে রহিয়া যায়, চেতনাংশে আসিতে পারে না, মনের উপর তাহারা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে বুঝাইবার জন্য মহাকবি রামের 'বামনাশ্রম' দর্শনের ব্যাপারে বলিতেছেন---

'উন্মনাঃ প্রথমজন্মচেষ্টিতা
ন্যস্মরন্নপি বভূব রাঘবঃ।।' (রঘু---১১।১২)

বামনাশ্রমে আসিয়া রামচন্দ্র যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখ হইতে বলিরাজা ও বামনের কাহিনী শুনিতেছিলেন, পূর্বজন্মের কোনও কথা তাঁহার মনে না পড়িলেও তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিলেন।

কেন এ উৎকণ্ঠা, কেন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, বুঝাইবার জন্য মহাকবি যেন বলিতে চাহেন, রামের পূর্বজন্মের ঘটনা রামের মনের অবচেতনাংশে রহিয়া যাওয়ায় আশ্রমটি দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল, এ স্থানটি যেন তাঁহার পরিচিত, বলি-বামনের কাহিনীও যেন তাঁহার জানা, অথচ পূর্বজন্মের কথা মনের চেতনাংশে আসিতেছিল না বলিয়া, এ স্থানটি কেন যে পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছিল, বলি-বামনের কাহিনীর কি যে তিনি জানিতেন, বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিতেছিলেন না, মন তাই উৎকণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছিল।

পূর্বজন্মের পাপের ফলে মানুষকে যে এ জন্মে কত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, যেন তাহা জানাইবার জন্য মহাকবি সীতার বনবাস প্রসঙ্গে সীতার মুখ দিয়া বলাইতেছেন---

'মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ।।'
(রঘু---১৪।৬২)।

আমারই পূর্বজন্মের পাপের ফলে এই অসহ্য দুঃখ বজ্রের মত আমার উপর নিপতিত হইল।

পূর্বজন্মের মত পরজন্মেরও উল্লেখ সীতার বনবাস প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের মুখে রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া সীতা স্বামীর উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন---'পরজন্মে যদি আবার নারী হইয়া জন্মাই, তুমিই আমার স্বামী হও, বিচ্ছেদের দুঃখ আর যেন ভোগ করিতে না হয়। (রঘু-১৪।৬৬)

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

প্রথম পুরস্কার ২০৲ টাকা !! দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫৲ টাকা !!

॥ শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা ॥

অমিতাভ চৌধুরী

১	২	৩		■	৪ ব	সু	৫ ম	৬ তী
৭			■	৮	■	৯		
১০		■	১১		১২	■		
	■	১৩				১৪	■	
■	১৫			■	১৬			■
১৭	■	১৮		১৯			■	২০
২১	২২	■	২৩				২৪	
২৫		২৬	■		■	২৭		
২৮				■	২৯			

॥ প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ॥

১। পাশাপাশি এবং উপর নীচে যে সূত্রগুলি দেওয়া আছে নম্বর অনুযায়ী সেইমত শব্দ-শৃঙ্খলের ঘরগুলি পূরণ করতে হবে।

২। প্রতি ঘরে একটি করে অক্ষর অথবা যুক্তাক্ষর বসবে।

৩। কোন শব্দের বানান অশুদ্ধ হলে সেটিকে ভুল বলে ধরা হবে।

৪। অস্পষ্ট লেখা অথবা কাটাকুটির দরুণ বুঝতে অসুবিধা হলে ছকটিকে বাতিল করে দেওয়া হইবে।

৫। অবশ্যই পত্রিকার অন্যত্র প্রকাশিত ছকটি পূরণ করে নীচে স্পষ্টাক্ষরে নাম ঠিকানা লিখে পাঠাতে হবে।

৬। একই নামে একাধিক ছক পাঠানো যেতে পারে কিন্তু প্রেরিত ছকগুলি অবশ্যই পত্রিকার অন্যত্র প্রকাশিত ছক হওয়া চাই নতুবা বাতিল করে দেওয়া হবে।

৭। একটি শব্দের অনেক রকম অর্থ হতে পারে, কিন্তু আমাদের দপ্তরে শব্দ-শৃঙ্খলের ছকটি ঠিক যেভাবে পূরণ করা আছে একমাত্র তার সংগে যেগুলি হুবহু মিলে যাবে সেগুলিকেই সঠিক বলে ধরা হবে।

৮। যে কোন বিষয়ে আমাদের বিচারকের রায়ই চূড়ান্ত বলে ধরতে হবে।

৯। আপনার পূরণ করা ছকটি আমাদের দপ্তরে অবশ্যই প্রতি বাঙলা মাসের ১৮ তারিখের মধ্যে পৌঁছানো চাই। স্থানীয় প্রতিযোগীরা বসুমতীর পোস্টবক্সে এসে সরাসরি জমা দিয়ে যেতে পারেন।

১০। আগামী সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে এই শব্দ-শৃঙ্খলের সমাধান ও সঠিক উত্তরদাতাদের নাম মুদ্রিত করা হবে।

১১। শব্দ-শৃঙ্খলের সমাধান পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক বসুমতী। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২।

১২। বন্ধ খামের উপরে লিখিত হবে 'শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতা' : মাসিক বসুমতী।

১৩। শব্দের ছক পূরণের পরে কেটে পাঠানোর জন্য পত্রিকার অন্যত্র একটি ছক মুদ্রিত হয়েছে।

॥ সূত্র ॥

● পাশাপাশি ●

১। অমাবস্যা
৪। পাঠক-পাঠিকা মহলে সর্বাধিক জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা
৭। সেই রকম (উল্টো)
৯। অম্লস্বাদযুক্ত ফলবিশেষ (উল্টো)
১০। শ্বেত বর্ণের পুষ্পবিশেষ (উল্টো)
১১। মাতুলালয় সম্পর্কিত
১৩। অলঙ্কারবিশেষ (উল্টোপাল্টা)
১৫। ভোজনাগারের—অপরিষ্কার থাকা আদৌ বিচিত্র নয়
১৬। প্রকৃত মালিকের নাম গোপন করিয়া অন্যের নামে পরিচিত এমন
১৮। মহাভারতে উক্ত যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ নির্মাণকারী (উল্টোপাল্টা)
২১। প্রাকৃত কাব্যে ভ্রমণ বা বিচরণ করা অর্থে ব্যবহৃত শব্দ
২৩। শপথ করিতে প্রযুক্ত শব্দবিশেষ (উল্টোপাল্টা)
২৪। কাব্যে 'দাম' হিসাবে ব্যবহৃত শব্দ (উল্টো)
২৫। কুলকীর্তি গায়ক (উল্টোপাল্টা)
২৭। জ্যামিতিতে ব্যবহৃত মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ
২৮। তরওয়াল
২৯। এক শ্রেণীর মদ্যবিশেষ (উল্টো)

● উপরে নীচে ●

১। একজাতীয় পক্ষীবিশেষ
২। প্রভু (উল্টোপাল্টা)
৩। পরিচর্যা (উল্টো)
৫। সাহায্য
৬। লজ্জা আছে যাহার (উল্টো)
৮। শত্রু ধ্বংসে অপরিহার্য সমরোপকরণ
১১। ধর্মবিশ্বাস আছে যাহার (উল্টোপাল্টা)
১২। আদব কায়দা জানে না এমন (উল্টোপাল্টা)
১৩। লজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত শব্দের বানানভেদ (উল্টোপাল্টা)
১৪। রাষ্ট্রভাষায় বাছাই করা
১৭। গৃহপালিত পক্ষীবিশেষ (উল্টোপাল্টা)
১৯। তিরস্কৃত ছেলেটির দিকে তাকাইয়া দেখি তাহার সারা — কাদা লাগিয়া আছে (উল্টোপাল্টা)
২০। লজ্জা নাই যাহার (উল্টো)
২২। নিরুপায়
২৪। একবার ফল দেয় এরূপ একজাতীয় গাছ
২৬। তান্ত্রিক মারণমন্ত্রবিশেষ (উল্টো)
২৭। পাকিলে রক্তবর্ণ হয় এরূপ ফলবিশেষ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুই প্রান্তবর্তী কবি

শ্রীবিভাস সরকার

চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সাধারণভাবে এই চারশ' বছরকেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলে ধরা হয়। চারশ' বছর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে নেহাৎ কম সময় নয়। অন্য দেশের কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু বাংলা সাহিত্যের কথাই চিন্তা করি তাহলে দেখব, আলোচ্য কালসীমার মধ্যে রচিত সাহিত্য বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধারণ করে আছে। প্রথমত: তুর্কী আক্রমণ, দ্বিতীয়ত: শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং তৃতীয়ত: মোগল শাসন। শুধু স্মৃতিচিহ্ন রাখে নি, বরং বলা যেতে পারে,—এই ঘটনাগুলি কখনও সংহত করে, কখনও অপরূপ ভাব-ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি এনে, কখনও বা একঘেয়েমীর হাত থেকে মুক্তি দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে ধাপে ধাপে একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিষয়বৈচিত্র্যে, ভাবগাম্ভীর্যে [illegible] অনুরঞ্জনে এই দীর্ঘ চারশ' বছরে রচিত সাহিত্য তাই স্বভাবতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু এই বহু ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সৃষ্টির ইতিবৃত্ত আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় —এই স্বল্পপরিসরে তা সম্ভবও নয়। আমাদের আলোচনা মধ্যযুগের দুই প্রান্তের দুই কবিকে নিয়ে। এঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাসুন্দরের প্রধান কবি রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র। একজনের অধিষ্ঠান মধ্যযুগের সূচনাপর্বে, অন্যজন অবস্থান করছেন এই যুগেরই একেবারে শেষভাগে —যুগ-বিবর্তনের [illegible]।

স্বভাবতই এই দুই কবির [illegible]প্রকৃতি এবং পরিবেশের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। একজন কাব্য রচনা করেছেন বাংলা ভাষার গঠনলগ্নের যুগে, অন্যজন রাজনৈতিক ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের তলায়; একজন গ্রাম্য সংস্কার ও রুচি-বোধে আচ্ছন্ন, অন্যজন নাগরিকবোধ ও বুদ্ধিতে দ্যুতিমান; একজনের কাব্য লোকসাধারণের জন্য, অন্যজনের কাব্য সমাজের একটি বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর মুখ চেয়ে রচিত।

কিন্তু এত সব পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সূত্রে বোধ হয় আলোচ্য কবি যুগলকে একত্রে গ্রথিত করা যায়। এই সূত্রটি হল তাঁদের ইহমুখীনতা, তথা জীবন-রস আস্বাদনে একান্ত আগ্রহ। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলা যায়, অপেক্ষাকৃত বাস্তব পটভূমিতে প্রাকৃত মানব-মানবীর প্রেম-প্রণয়ের বিচিত্র চিত্রাঙ্কন প্রয়াস। বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই অবহিত আছেন যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যতখানি দেবতার অনুধ্যানে তন্ময়, মানবতার জয়গানে ততখানি মুখর নয়। কিন্তু এরই মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস ও ভারতচন্দ্র এক বিরল ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। মানবতার প্রতি তাঁদের এই দৃষ্টিক্ষেপ হয়ত একালের মত এত প্রত্যক্ষ নয়, ধর্মীয় অথবা রাজকীয় কাহিনীর একটা সূক্ষ্ম আবরণ হয়ত তাঁদেরও দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হতে দেয় নি, —তবু তাঁদের মূল লক্ষ্য কি, সতর্ক পাঠকের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

অতঃপর আমরা এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই যুগ ও তাঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করব।

বড়ু চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল—এর রুচির প্রশ্ন। বৈষ্ণব কবিতার উচ্চ ভাবাদর্শ এবং হৃদ্‌প্রাধান্য এই কাব্যে অনুপস্থিত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়ে, তা হল এর দেহ-প্রাধান্য। রাধা এবং কৃষ্ণের নামের একখানা নামাবলী গায়ে জড়িয়ে দিয়ে কবি একটি গ্রাম্য কিশোরী এবং একটি গ্রাম্য কিশোরকে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করেছেন। কিশোরীটি অপূর্ব সুন্দরী। কবি তার রূপবর্ণনা করেছেন কৃষ্ণের মুখে,—

> "[illegible] শোভে যেহেন খঞ্জনে।
> ঈষত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে॥
> [illegible] জিণী তোর আধরের কলা।
> মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা॥
> কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
> বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা॥"—
>
> —দানখণ্ড।

আর কিশোরটি দেহ-পিপাসায় পীড়িত। বড়ায়ির মুখে রাধার রূপের কথা শুনে সে বলেছে,—

> "তোর মুখে সুনী রাধিকার রূপ
> আওর নব যৌবনে
> অহোনিশি দহে সকল পরাণ
> আর থীর নহে মনে॥"
>
> —তাম্বুলখণ্ড।

অতঃপর গোটা কাব্যটি আর কিছুই নয়,—কিশোরটির একের পর এক সুযোগ-সন্ধান এবং সুযোগ পেলে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের কাহিনী। কবি কিছুই গোপন করেন নি। রাধাকে দর্শনের সময় কৃষ্ণের হৃদয়ে যে তৃতীয় [illegible] —তার থেকে আরম্ভ করে তাদের [illegible] মুহূর্তটি, এমন কি সেই সময়ে কৃষ্ণের [illegible] কলা-কৌশলও নিখুঁত [illegible] উপহার দিয়েছেন পাঠককে। কোনারকের পাথরের গায়ে শিল্পী যেমন বিচিত্র [illegible] ভঙ্গীতে মিথুন-লীলাকে রূপায়িত করেছেন, কবিও যেন তেমনি করেই একটি মিলন-চিত্রকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা দিক থেকে

[illegible]

চোখের সামনে উপস্থিত করেছেন --মিলন ঘটিয়েছেন, কখনও জলে, কখনও স্থলে, কখনও বনে।

সমালোচকের প্রধান আপত্তি নর-নারীর মিলনের এমন অনাবৃত রূপায়ণের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ আবার গোটা কাব্যের মধ্যে একমাত্র শেষ দুটি খণ্ডতেই যাবতীয় প্রশংসনীয় কাব্যগুণ খুঁজে পান। তাঁদের যুক্তি, --একমাত্র এই পর্যায়েই রাধার আর্তি দেহবন্ধন-মুক্ত হতে পেরেছে।

দেহের থেকে আত্মা, মিলনের থেকে বিরহ, সুখের থেকে দুঃখই যখন কাব্যে প্রধান হয়ে ওঠে--সাধারণভাবে তখন তা ভাবগভীরতায় রসিকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে;--যুগবন্ধন মুক্ত হবার প্রতিশ্রুতি রাখে। সব দেশের সব কালেরই শ্রেষ্ঠ কবি এই পথের পথিক হয়ে যুগের অমৃতলোকে পৌঁছেছেন। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের সাধনা আরও কঠোর। আত্মার নামে দেহের ফাঁকি স্বীকার করেন নি তিনি। দেহে তাঁর সাধনার সুরু, প্রেমে সে সাধনার সিদ্ধি। আর এই দেহ তো বাইরে থেকে আরোপ করা কোন বস্তু নয়--এ তো প্রেমেরই অবলম্বন। নরনারীর যে প্রেম, সে প্রেম তো দেহকে বাদ দিয়ে নয়। মনের আবেগ, অনুরাগ---সব কিছুর প্রকাশ যেখানে এই দেহেরই মাধ্যমে, সেখানে দেহকে বাদ দিলে যে অনেক-খানি বাদ পড়ে যায়। তা হতে দেন নি বড়ু চণ্ডীদাস। শ্যামের নাম মাত্র শুনিয়ে অনুরাগ সৃষ্টি করার মত সূক্ষ্মতার ধার ধারেন নি কবি। তাঁর কৃষ্ণকে জোর করে রাধার অনুরাগ ছিনিয়ে আনতে হয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে মিলন নয়, ---একেবারে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ দিবালোকে দেহের পাত্রে মিলনের রক্তিম মদিরা পরিবেশন করেছেন কবি। এতখানি সাহস ক'জনের থাকে? প্রেমের অমৃত তাঁর কাছে এত সহজ-লভ্য নয়;--বহু তৃষ্ণা, বহু যন্ত্রণার হলাহল পান করে তবেই তিনি সেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। রাধার মুখে আরোপ করতে পেরেছেন প্রেমিক-হৃদয়ের চিরন্তন বিরহাকৃতি----

"কাহ্নাঞি বিহাণে মোর সকল
সংসার ভৈল
দশদিগ লাগে মোর শূন।
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি
লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ।।"
---বংশীখণ্ড।

বড়ু চণ্ডীদাস তাই বাংলা সাহিত্যে তৃষ্ণার, যন্ত্রণার, আনন্দের মহাকবি। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তৃষ্ণার, যন্ত্রণার, আনন্দের---এক কথায় যৌবনের মহাকাব্য।

ভারতচন্দ্র

চৈতন্যদেবের তিরোভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কারণ, যে প্রেম-ভাবনার সূত্রে তিনি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে গেঁথে একটা মহৎ ভাব-পরিমণ্ডলে স্থাপন করেছিলেন--তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে পড়েছে শিথিলমূল। আদর্শের অভাবে সর্বত্র দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা --এর ওপর আবার উদ্ভব হয়েছে মোগলরাজ আগমনজনিত নতুন পরিস্থিতি। এককথায় বাংলার গণ-জীবনে দেখা দিয়েছে যুগান্তরের ইঙ্গিত। যুগের এই পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে ভারতচন্দ্রের পদার্পণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি এ যুগের নাগরিক সমাজের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি কথা প্রথমেই মনে পড়ে। প্রথমত, তিনি একটি বিশেষ যুগের সৃষ্টি; দ্বিতীয়ত, তিনি বিদগ্ধ কবি।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, ভারতচন্দ্র একটি বিশেষ যুগের সৃষ্টি। রাজসভাটা আর কিছুই নয়, সমাজেরই একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। যে বিলাস-ব্যসন, নীতিহীনতা, কুরুচিপ্রবণতা সমাজের সকল স্তরেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল---রাজসভাটা ছিল তারই এক ঘনীভূত রূপ। কাজেই রাজসভার কবি হওয়াটা তাঁর পক্ষে লাভের হলেও আমাদের তা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই, কেন না রাজসভার কবি না হলেও তিনি বিদ্যাসুন্দর জাতীয় কাব্য রচনা করতেন। কারণ, তাঁর মানস-প্রকৃতি যে পরিবেশে গঠিত, তাতে এই ধরণের বিষয় ছা[illegible]ার [illegible]কান বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মু[illegible] [illegible]পত না।

বর্ণনাতেই কবির সুখ। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কোনরকমে একটি নারী-দেহকে খাড়া করতে পারলে কবির যেন আর আনন্দ ধরে না। অলঙ্কার আর ছন্দের বান ডেকে যায়।

নবনাগরি নাগরমোহিনী।
রূপ নিরুপম সোহিনী।।
শারদ পার্বণ, সীধুবরানন,
পঙ্কজকাননমোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী,
লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী।।

আর সে নারীদেহের পাশে যদি আর একটি নরদেহ থাকে তাহলে তো কথাই নেই। অন্নদামঙ্গল-এর কবির যেটুকু সাধ অপূর্ণ ছিল, সেটুকু তাই পূর্ণতা পেয়েছে 'বিদ্যাসুন্দরে' এসে। এখানে কবি একেবারে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ। বেশ বোঝা যায় যখন কবি বিদ্যার দেহ বর্ণনা করছেন বা বিদ্যা-সুন্দরের মিলনের ছবি আঁকছেন, একের পর এক, তখন কেবল রাজার বা তাঁর পারিষদের হাততালি মিলছে না, সেই সঙ্গে তৃপ্ত হচ্ছে কবির প্রাণপুরুষ। একটু করে বর্ণনা করছেন, আবার নিজেই সেটিকে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছেন---

'খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুমশর খর শর জরজর
তর তর থর থর অঙ্গে।।
রতিমদসাগর নাগরী নাগর
সুন্দরী সুন্দর কোলে।---
দুঁহ ভুজ পাশহি দুঁহ জন বন্ধন
সম রস অবশ দুঁহু অঙ্গে।
দুঁহ তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদন তরঙ্গে।।'

ধারাবাহিক উপন্যাস

জনারণ্যে এক মুখ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'সময় কাটাবার এক প্রণালী হিসাবে এটা নিয়েছিলেন বোধহয়। এদেশের মেয়েদের লঘুতা দেখে ঘেন্না হয়।' বিতৃষ্ণায় গৈরিকের মুখ আকুঞ্চিত।

কোথায় থেকে লুপ্ত আত্মমর্যাদা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে দলিতকণ্ঠা পাঞ্চালীর দলিত সত্তায়।

বিদ্রূপের জবাবে সে-ও ব্যঙ্গভরে বলল, 'কতগুলো দেশ দেখেছেন আপনি?'

'দেশ না দেখতে পারি, সে দেশের মেয়ে দেখেছি। আপনাদের মত মহিলার সঙ্গে কথা বলতে আমার অশ্রদ্ধা হয়।' গৈরিক উঠে দাঁড়ান।

কোনমতে জলের তলা থেকে মাথা তুলে প্রাণপণ শক্তিভরে রুখে দাঁড়াল পাঞ্চালী। প্রতিহত সত্তা সংহত করে সে-ও প্রতিঘাত করল, 'শুনুন,

শ্রীমতী বাণী রায়

শুনে যান। আপনার বংশগত উন্মাদ রোগের কথা আমার জানবার নয়। নন্দাদির আগেও মাথা খারাপ হয়েছিল, সে কথা আপনার মামার মুখে আজ প্রথম শুনতে পেলাম। সে সময় নিশ্চয় আমার দোষে ঘটেনি। কারণ আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না। ভালভাবে এ দেশের কোন মহিলাকে অপমান করা আপনার পক্ষে নূতন কিছু নাও হতে পারে। কিন্তু আমি জানি আমার দোষ নেই।'

ঝড়ের বেগে বার হয়ে রাস্তায় ছুটে নামল পাঞ্চালী।

এখন শুধু রইল পথ, আর রইল পথচলা।

প্রকাণ্ড ফটকের সম্মুখে গাড়ীর ভিড় লেগে গেছে। আজব হ্রদের সম্মুখের রাস্তা, পাশের রাস্তা অসংখ্য গাড়ীর আশ্রয় হয়েছে। পথচারিগণ কৌতূহলের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে আনাচ-কানাচ খুঁজে নিয়ে গন্তব্যস্থলে যাচ্ছেন। বাসগুলো লোকবোঝাই হয়ে অতিকায় এবং আজগুবো জাহাজের গতি ধারণ করে হেলে-হেলে দুলে-দুলে হঠাৎ খ্যাচ করে থেমে যাচ্ছে আজব হ্রদের এপাশে। পিলপিল করে লোক নামছে, অতঃপর ফটকের সম্মুখে ঠেসাঠেসি লেগে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আজব হ্রদের অভ্যন্তর জন-সমুদ্রে পরিগণিত।

পৃথিবীর যত লোক কি আজ এই এখানে হানা দিয়েছে? কুঁড়ি-পল্লব সঙ্ঘের যে-কোন আয়োজনে এরূপ লোক-সমুদ্র দেখা দেয়। কিন্তু এবারে ক্ষমতাসীন সরকারী দলের সাহায্যপুষ্ট ও প্রসাদধন্য সকল আয়োজনের আরও বিপুল ও বিরাট বহিঃপ্রকাশে মনোযোগী। এবার তারা দেখিয়ে দেবে ফাংশান করা কাকে বলে।

অবশ্য তারা দেখিয়ে দিতে পেরেছিল। প্রচারমাহাত্ম্যে কলিকাতা,

অন্য কোনদিকে কবির দৃক্‌পাত নেই। তৃষ্ণা নেই, আবেগ নেই, যন্ত্রণা নেই, প্রাণের উত্তাপ নেই—শুধু ভোগ। প্রাণহীন দুটি পুতুলের ভোগের ছবি দেখে আর দেখিয়েই কবির তৃপ্তি।

তবে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে দ্বিতীয় সূত্রটির মধ্যে। ভারতচন্দ্র বিদগ্ধ কবি—ভারতচন্দ্র একটি বিশেষ style-এর কবি। পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল --অলঙ্কারশাস্ত্র আর ছন্দোজ্ঞানও ছিল প্রচুর। সর্বোপরি তিনি জানতেন বক্তব্য বিষয়কে কিভাবে প্রকাশ করতে হয়। এই কারণেই রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্য যেখানে সাহিত্যের আবর্জনা--সেই একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য সেখানে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। আর একটা বিষয়ে রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর বৈসাদৃশ্য। রামপ্রসাদ যুগের দাবি অনুযায়ী বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করলেও সে দাবির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে পারেন নি। সেই না-পারার বেদনা সোনার কমল কলিয়েছে শাক্ত-সঙ্গীত রচনায়। অন্যপক্ষে, ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ওঠে না, কেন না তাঁর যুগের দাবি আর প্রাণের দাবি দুটোই এক। ভারতচন্দ্র তাই এত আন্তরিক, ভারতচন্দ্রের কাব্য তাই যুগের সার্থক রূপায়ণ।

বৃহত্তর কলিকাতা, মহানগরী শহর, সর্বত্র থেকে লোক হাজির। যেন এমন একটা কাণ্ড তারা কেউ জীবনে দেখেনি। সারাজীবন হাঁ করে প্রত্যাশায় ছিল। স্বয়ং বিধাতা উক্ত সুযোগ দিয়েছেন হাতে তুলে। তারা রুদ্ধশ্বাসে ধেয়ে এসেছে। বোম্বাই-তারকাদের চাক্ষুষ দেখে ধন্য হয়ে যাবে। পরবর্তী জেনারেশনের কাছে বলতে পারবে একদা বহু অর্থ ও সামর্থ্যব্যয়ে তারা বোম্বাই-তারকার নাচ দেখেছে, গান শুনেছে। কোনও জনপ্রিয় তারকার নামযুক্ত এই অনুষ্ঠান হুজুকের যুগেও একটি শ্রেষ্ঠ হুজুক।

সর্বাণীর সঙ্গে পাঞ্চালী হাজির হল ফটকের ধারে। সবিস্ময়ে সর্বাণী বলল, 'এতবড় ব্যাপার আগে বোঝা যায় নি তো। বাবা, আদেখলের মত শহরের যত জনতা যেন ভিড় করে এসেছে এখানে। দেখেছ, পাঞ্চালী?'

পাঞ্চালী বিষাদপ্রতিমা। জীবন তার জ্বলে গেছে এক নির্মমের কথার আঘাতে। কথার বাণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল ছুটে বুকে বিঁধেছে। কত স্বপ্ন, কত আশা নিয়ে নন্দার গৃহে হাজির হয়েছিল সে। অফিসকর্মীদের চোখ এড়িয়ে কত সযত্ন প্রসাধনে নিজেকে সুশোভন করেছিল।

ভেবেছিল প্রিয়তম সদয়। কিন্তু যেটুকু সহৃদয়তার মুখ দেখেছিল এতদিন, সেটুকু জ্বলে গেল বাড়বানলে। বেদনায় মুহ্যমান সেই রাত্রে আহার মুখে তোলে নি সে।

বাড়ী ফিরে খাটের বিছানায় নিজেকে মেলে দিয়ে শুধু মনের ক্ষত চেয়ে দেখে বালিশের চিত্রবিচিত্র তোয়ালে-ঢাকনা ভিজিয়েছে। গলায় হাত বুলিয়ে যন্ত্রণার উপশম চেয়েছে। মাতার সন্দেহ উদ্রেক করেছে আর।

'চালি, এমন করে শুয়ে আছিস কেন? ভাত খাবি না? অফিস থেকে বাড়ী ফিরে জলখাবার খেলি না। অফিস থেকেই নন্দার বাড়ী গেলি চলে, নন্দা কেমন আছে?'

বালিশে মুখ গুঁজে রুক্ষ জ্বালাভরা গলায় পাঞ্চালী কোনমতে উত্তর দিয়েছিল, 'ভালো নয়। নন্দাদি খুবই অসুস্থ। অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিতে হয়েছে।'

মাতার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে যেন উষ্ণ লাভাস্রোতে দেহমন শুষ্ক হয়ে গেল। অশ্রু জলে গেল আগুনে।

কী অন্যায়। নন্দা চিরদিনের পাগল। বংশগত পাগলামির প্রকোপে সে ছন্নছাড়া।

বোমের দোষের বা রোগের দায়িত্ব অন্যকে দেওয়া। এই পাঞ্চালীর আদর্শ, পাঞ্চালীর মানসকুমার?

গানবাজনার জলসায় আসবার ইচ্ছা ছিল না আর পাঞ্চালীর। কিন্তু মনকে শক্ত করে চলে এল সে। সর্বাণীকে বলে রাখা হয়েছে। নিরুপমা কত যত্ন করে কার্ড দিয়েছে, কন্যার গান শুনবে বন্ধু।

তা ছাড়া কেন সে বাড়ী বসে একজনের কঠিন কথার বাতাসে শীতার্ত পাতার মত কাঁপবে? ভুলতে হবে।

এখন সর্বাণীর কথায় কাষ্ঠহাসি হেসে বলল পাঞ্চালী, 'আমরাই বা কম আদেখলে নাকি? এসেছি তো।'

এই সময়ে দেখা গেল একখানা ট্যাক্সি থেকে কতকগুলি যুবক নেমে এল। হাতে থলেভরা কী সমস্ত যেন। কারুর হাতে একগাদা সোডার বোতল দেখা যাচ্ছে থলের মধ্য থেকে।

'দেখছ, দেখছ?' থতমত খেয়ে সর্বাণী থমকে দেখাল পাঞ্চালীকে গোপন ইসারায়, 'বোমা কি না কে জানে? শেষে সোডার বোতল খেয়ে প্রাণ যাবে। চল, পালাই।'

'সোডার বোতল কপালে থাকলে, হোক না। লোকচক্ষে পড়ার কাজ কিছুই করতে পারিনি। না হয় মৃত্যুতে 'মার্টার' হব।'

নির্লিপ্ত ঔদাস্যে পাঞ্চালী জবাব দিল। নিরাপত্তার প্রশ্ন উদাস মনে দেখা দেয় না। যা হয় হোক না, আর নিজের কোন ভালমন্দে কিছু আসে যায় না।

একবার খবর নিয়েছিল অন্যকে দিয়ে। নন্দা নেন এখন অনেকটা ভালো। স্নান-খাওয়া করছেন, উগ্রতাও কমে এসেছে। বাবা স্বামী হয়ে দেখা-শোনা করছেন। গৈরিক চলে গেছে জার্মানী।

পৃথিবী শূন্য পাঞ্চালীর। নির্বন্ধক তিরস্কার করে এলেও মনে শান্তি হ'ত। রাগ হোক বা, রাগের পাত্র হাতের কাছে থাকলেও মনে আসে শান্তি। কিন্তু এই নিদারুণ শূন্যতার সারা মন একেবারে উষর বালির চড়া হয়ে আছে।

ভালো করে চারপাশ দেখছে না পাঞ্চালী, পারছে না। যেটুকু যা বলছে সর্বাণী, চোখ মেলে দেখে নিচ্ছে নিরুৎসাহভাবে।

ওরা ঢুকে পড়ল। টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গা। সারি সারি ভেনেস্তার চেয়ার। বহুলোক স্থান পায় নি, দাঁড়িয়ে আছে টিনের বেড়া ঘেঁষে দলবদ্ধভাবে। সম্মুখে প্রকাণ্ড উঁচু বিরাট মঞ্চ। পেছনে একখানি প্রাচীন বাড়ী, আজব হদের ক্লাব। সেই ছাদেও জনতা।

এককোণে জায়গা মিলল এক-জনের। সারি সারি স্বেচ্ছাসেবক বুকে ফুল লাগিয়ে বিনা কারণে চলাফেরায় ব্যস্ত। লোকজনের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে তাদের চলবে না, তারা এক গভীর গোপন ভাবধারায় যেন অনু-প্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছামত চলাফেরা করছে। স্বেচ্ছাসেবক নামটি সার্থক হয়েছে ওদের ওইটুকু অর্থে। তারা সেবক নয়, স্বেচ্ছাচালিত বাহিনী।

সর্বাণীকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল পাঞ্চালী। হঠাৎ জনারণ্যে দেখল নিরুপমার মুখ। এগিয়ে বসে আছে নিরুপমা, জড়োয়া ইয়ারিং দুলছে কানে। পাশেই হিরণ্ময়ী দত্ত। সাদা ফিন্‌ফিনে চান্দেরীর জরি ঝক্‌মক্‌ করছে। কানে কুচি হীরের কানফুল, গলায় মুক্তার একনরী হার, তলায় মুক্তাখচিত পান্নার লকেট দুলছে। টাকা পাবার পরে, বাড়ী কেনার পরে রত্নালঙ্কার কিনে-ছিলেন হিরণ্ময়ী।

কিন্তু হায়, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেছে। ঈশ্বর, যদি সে-ই দিলে, এত বিলম্বিত কেন? টাকায় কোন সুখ এখন পাবেন হিরণ্ময়ী? রং-চঙে জামা-কাপড়, অতিরিক্ত অলঙ্কার পরলে লোক হাসে। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন করলেও অধিক আহার হ'লেই পেটের গোলমাল শুরু হয়। আয়োজন মাঠে মারা যায়। চিরদিন কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে থেকে হিরণ্ময়ী স্বভাবে বড়লোক হ'তে পারেন নি। ঝি-চাকরকে প্রাণে ধরে কিছু দিতে পারেন না। অথচ নিজেও খেতে পারেন না।

আজ সেই উদরাময়ের দিন। পোড়া থেকে ঝুড়িভর্তি ল্যাংড়া আম এসেছে। লোভে পড়ে আনিয়েছিলেন। ছাড়া জীবনে একঝুড়ি আম কেনার বিলাসও উপভোগ করা চাই কিনা।

বেশ কয়েকটা আম খাবার পরে পেটে সইল না। ডাক্তার ডেকে রীতিমত ঔষধ সেবন করে তবেই এসে বসেছেন। মুখখানা মাঝে মাঝে বিকৃত হচ্ছে।

গলা উঁচু করে এদিক-ওদিক চাইতে নিরুপমার চোখে এল দণ্ডায়মানা পাঞ্চালী। হাতছানি দিয়ে ডাকল সে।

লোক ঠেলে যেতে হয়। ইতস্তত করছে দেখে সর্বাণী বলল, 'তুমি ওখানে যেয়েই বসে পড়গে পাঞ্চালী। আমি তো জায়গা পেয়েছি। এমন বিচিত্র বন্দোবস্ত দেখিনি যে, কার্ডের নাম্বার অনুক্রমে সীট্‌ রাখা হয় নি। হয়তো হয়েছিল, কিন্তু যে যাবে পারে পাস্‌ দিয়েছে নিশ্চয়। ওলট-পালট হয়ে গেছে।'

'সে কি সম্ভব?'

'নয় কেন? কতকগুলো বাড়তি ছাপিয়ে নিলেই হয়। দেখো না, খেলার মাঠে হরদম হয়। ওই লোকগুলোর দিকে দেখ চেয়ে, ওরা কি টিকিট কেটে এসেছে।'

একদম রিফিউজী মেয়ে।

'আমার ভালো মনে হচ্ছে না। কেমন-কেমন লাগছে। ওই ভলানটীয়ারদের দিকে দেখ।'

সর্বাণীর কথায় চেয়ে দেখল পাঞ্চালী। মঞ্চের পেছনে ক্লাবের একতলা ছাদ ভরে গেছে। বিশ্রী চেহারার উগ্র চোয়াড়ে যুবক ভলানটীয়ারের ব্যাজসহ দাঁড়িয়ে বিশ্রী দৃষ্টি মেলে মেয়েদের দিকে চেয়ে আছে।

নিরুপমা ভাবল পাঞ্চালী তাকে দেখে নি। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল সে। অনেকটা এগিয়ে বসেছে নিরুপমা। মঞ্চের কাছাকাছি।

ভলানটীয়াররা ছাদ থেকে সবই দেখছে। নিরুপমা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রবলবেগে হাত নাড়ছে দেখে ওরা গা-টেপাটেপি, হাসাহাসি সুরু করে দিল।

সর্বাণী চিন্তিতভাবে বলল, 'এ কী রকম ভলানটীয়ার। এই ধরণের ভলানটীয়ার জীবনে দেখিনি।'

পাঞ্চালী অনুৎসাহভাবে অনিচ্ছুকভাবে কথা বলছে, চলাফেরা করছে। আঘাতে মন মুদ্রিত হয়ে গেছে আঘাতের বস্তুর চারপাশ ঘিরে। অপরিসীম বেদনায় লালন করছে সে ব্যথাটুকু। বাইরের বস্তুনিচয় সে মুদ্রিত মনে প্রবেশ পাচ্ছে না। সজাগ হয়ে সে উঠছে না। চরম নিষ্ক্রিয়তায় মোহাচ্ছন্ন। যা না করলে নয়, তাই করে চলেছে শুধু জড়পদার্থের মত।

অনিচ্ছুক কথায় পাঞ্চালী বলল, 'কুঁড়ি-পল্লবসঙ্গম' সমস্ত অনুষ্ঠান পণ্ড করে ফেলে। এবার রিফিউজি ও গুণ্ডায় ভরা আজব হ্রদের ধারে ফাংশান করতে বাধা দিচ্ছিল সকলে। ওরাও জেদ ধরেছে দেখবে কে কি করে। গাড়ী গাড়ী ভলানটীয়ার এনে ফেলেছে।'

'ভালো করে নি। পাড়ার ছেলেদের দেওয়া উচিত ছিল। তুমি যাও, পাঞ্চালী। যেখানে পার বোস। আরও লোকজন ক্রমাগত আসছে।'

নিরুপমা একখানা চেয়ার আনিয়ে ফেলে, অন্য চেয়ারগুলো ঠেলাঠেলি করে একটা জায়গা বার করে বসাল পাঞ্চালীকে।

'অসুখ করেছে নাকি, চালি? মুখ-চোখ এত শুকনো কেন রে?'

অত উত্তেজনা ও ভিড়ের মধ্যেও পাঞ্চালীর ভাবান্তর চোখে পড়েছিল নিরুপমার।

'কিছু না', প্রসঙ্গান্তরে নিরুপমার ভোঁতা মনকে ফিরিয়ে দিল পাঞ্চালী, 'রুমা কোথায়?'

'ওই ছোট ঘরগুলোর মধ্যে আছে। নাচের মেয়েরা ওখানে ড্রেস করছে। আমার ইচ্ছা ছিল স্টেজেই বসে থাকা গোড়া থেকে। কিন্তু পাহাড়ের মত বিশাল স্টেজ হ'লেও লোক উঠে উঠে ভরিয়ে রেখেছে। কোথায় ফাংশান করবে, কে জানে? তিলধারণের স্থান নেই। ভলানটীয়াররা যে স্টেজে থাকে এমন করে, দেখিনি।

নির্বাক পাঞ্চালী। ছোট ঘর থেকে একজন বিশিষ্ট পেট্রন বেরিয়ে এলেন। চোখ লাল, মুখ গোলাপী, চলাফেরায় উত্তেজনা। দেখেই ধরা যায়। কিছু পানীয়ের প্রভাব। পেছনে সাঙ্গোপাঙ্গ, তাদেরও তথৈবচ অবস্থা। নিরুপমা ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে দেখছিল, ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'বাসব সমাদ্দার। মদ খাচ্ছেন ক্রমাগত দলবল নিয়ে। পাড়ার ছেলেরা চটে আছে, বাইরে থেকে লোক এনে স্বেচ্ছাসেবক বানিয়েছে, ওদের কাউকে নেয় নি। আমি তো অনেক আগে এসেছি। আমাদের পাড়ার রমিত এসে বলল, নানারকম গুণ্ডা-বদমাস ঢুকেছে ভেতরে। মওকা পেলেই ছিনতাই চলবে। এত অব্যবস্থা সবদিকে হবে জানতাম না। রুমার গানটা হয়ে গেলে বাঁচি।'

পাঞ্চালী একটা অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেল, ক্ষীণস্বরে বলল, 'আমি রুমার গান হলে চলে যাব।'

হিরণ্ময়ী এ সমস্ত স্থানে নূতন আসছেন, তারিয়ে-তারিয়ে আস্বাদ উপভোগে ব্যগ্র। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমাদের ঝি বলছিল তারকেশ্বর থেকে গাদা-গাদা গুণ্ডা

এসে ভাসিয়ে নিয়েছে পারলেন। ঘামবা জমাদার বলেছেন, 'দেখে নেব আমার ফাংশন কে পণ্ড করে এবার ? আমি আজব হ্রদের গুণ্ডাদের ভয় রাখি না। কোনও রাজনৈতিক দলেরও পরোয়া করি না।'

পাঞ্চালীর নিরুপমাকে দেখামাত্র বিকাশ ও প্রাণবাবের স্মৃতি মনে উদয় হয়েছিল। তাই কলার কথা ও আগাগোড়া সেই বীভৎস দৃশ্যটি মনে এসেছিল। বীভৎসতার শেষে যা'র একটি রমেশ আবার শান্তি এনে দিতে পারত, তার কঠোর তিরস্কার আজ পাঞ্চালীর দিবারাত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আঘাত আরও তীব্র হয়েছে, কারণ যখন সে আশা করেছিল মাধব এবার সময়ে।

'নহাৎ নিরুপমা এবং হিরণ্ময়ীর এতগুলো কথার উত্তরে একটা কিছু বলা দরকার বলেই সে যান্ত্রিক নির্লিপ্ততায় বলে দিল, 'ভয় নেই আমার, ভরসাও নেই। আমি তাড়াতাড়ি চলে যাব। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন ? সাড়ে ছ'টা কখন বেজে গেছে।'

'কয়েকজন শিল্পী এখনও এসে পৌঁছন নি, তাই দেরী হচ্ছে। দেরী করেই আরম্ভ হবে।'

ইতিমধ্যে একদল শালোয়ার-কামিজপরা মেয়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে পেছনে বসতে গেল। পূর্ণ-যৌবনা তরুণী, অতি আঁটো কামিজ ভেদ করে দেহের পরিপূর্ণতা ডাক দিয়ে দিয়ে বলছে: দেখ, দেখ। হালকা ফেনার মত একটুকরো দোপাট্টা কারুর কারুর বুকে ফেলা, কারুর আবার সেটুকুও নেই। শালোয়ার ঢেকেছে অধোভাগ প্রায় নিতম্বের ওপরে।

হা-হা করে হাসতে হাসতে মেয়ের দল অতি বেপরোয়া দৃষ্টি মেলে চারদিক দেখতে দেখতে চলে গেল। এরা যেন ওদের মুচকিহাসি, চতুর্দিকের মানুষ লোকসমাজের ওপর গ্রাহ্যে আনে না।

'বাঙালী নয়, না ?' হিরণ্ময়ী এমনভাবে চেয়ে চেয়ে বিরক্ত করলেন। তবে আপশোষ। হায়, বয়স গেছে বলে এখানকার অতি প্রচলিত ও আধুনিকার প্রিয় পাঞ্জাবী পোষাকটি ওঁর পরা হল না। সাহসে ভর করে একটা পাজামা স্যুট নিউ মার্কেট থেকে কিনে এনেছেন। রাত্রে, শীতের দিনে কখনও বা পরে থাকেন। বেড-টী ধরেছেন হিরণ্ময়ী। জীবনের অনেক অপূর্ণ সখ মিটিয়ে নিচ্ছেন। যেদিন স্লিপিং পোষাকে শুয়ে থাকেন, সেদিন ঝি চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে হতবাক হয়ে যায়।

—মাগো মা, বুড়ো মানষের সাজ দেখ ? কাঠির মাথায় হাড়ভিসার কালো হাতপাও, তেনার আবার মেমেগোরের মতন পোষাক চাই।—

'বাঙালী, পাঞ্জাবী দুই-ই আছে। কলেজের মেয়েরা সব।' পাঞ্চালী উত্তর দিল। 'ছিঁড়ে কেটে পড়ছে যেন পোষাক, এতই টাইট পরেছে।'

সম্মুখের সারিভর্তি অবাঙালী নরনারী। মেয়েদের সল্‌মা-চুম্‌কী-জরিখচিত জামা-কাপড়। মাড়োয়ারী, সিন্ধী, গুজরাটি, ইউ পি, সকল প্রদেশের লোক যেন আজব হ্রদের জলপ্লাবনে আত্মদান করতে এসেছে।

কারুর বা অঙ্গে হীরকভূষণ, যেন বিবাহবাড়ীর যাত্রী। এপাশে কয়েকটি মেয়ে স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের দিকে চেয়ে চোখ নেমে আসে।

একচিলতে জামা, হাত একটি কিছে। দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে আছে কি না নেই, শিষ্ট পর্বতও মানে নি, কোমর খুলেছে কথা। এদিকে নাভি উদ্‌ঘাটিত করে কোমরের নীচে জানুভাগে শাড়ী। খুলে পড়ে না কেন সে রহস্য অবশ্য ইন্দ্রাইক জানে।

কেউ নাকে মাকড়ি দিয়েছেন, কাকের বাসা চুলের নীচে বেখাপ্পা কানের। কারুর চুকড়ি করে বাঁধা কেশের মধ্যে মুক্তার টানা দেওয়া নথ।

চারপাশে আশপাশের পুরুষের দৃষ্টি এদের কাছে আসে না, আনে যৌবন। দুকপাত নেই কোনদিকে। লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টি যেন পুষ্পবর্ষণ। তাই চেয়েই তারা এমনি স্বৈরিণীর সজ্জায় সেজেছে। শরীরে যতটুকু না রাখলে একদল উলঙ্গ বলা যায়, ততটুকু বস্ত্রখণ্ড। পাঞ্চালী বিরক্ত হল।

পরে অবশ্য সতেজে পাঞ্চালী এদেরই সাফাই গেয়েছিল ভয়াবহ ঘটনাটির পরে বিমলাদির দ্বারা অনু-প্রাণিত হয়ে :—

'মেয়েদের পোষাক অশালীন ছিল বলেই কি তাদের গায়ে হাত উঠবে ? নানারূপ মন্তব্য করে ক্ষান্ত হয়নি, অত্যাচারও করা দরকার ছিল। আমাদের পিতামহীর যুগে ফিন্‌ফিনে পাতলা ভিজে শাড়ী পরে তাঁরা নদী থেকে, পুকুর থেকে স্নান করে ফিরতেন। তাঁদের পথের মধ্যে চেপে ধরত নাকি ? পূজার মণ্ডপে খালি গায়ে গরদ পরে প্রসাদ বাঁটতেন, পায়ে হেঁটে মন্দিরে পুজো দিতে যেতেন। কান্নাতসিয়ে বা পাল্কী চড়ে যাওয়া হত না। তখন কেউ দেখত না প্রকাশ্য পথে ? জামার বালাই ছিল না—সেমিজ তখন। সে দেশে পুরুষ ছিল না ? বদমাইস ছিল না ? তখন তো দেশে শিক্ষার প্রসার এত হয়নি।'

গলায় জোর এনেছিলেন বিমলাদি। প্রচণ্ড আঘাতের পরে মুখ থুবড়ে ঘরের কোণায় পড়েছিল পাঞ্চালী। মরেছিল পাঞ্চালী। বিষস্য বিষমৌষধম্—এই জ্ঞানী বচনের আজ্ঞায় বিমলা বিষের চিকিৎসা বিষ দিয়ে করেছিলেন। একটি অশ্রুত নিদারুণ সত্য শুনিয়ে-ছিলেন।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চিত্রে হাল্লার রাজাকে যাদুকরা ঔষধ খাওয়ানো মাত্র তিনি তেজে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হিংস্র হয়ে ছুটতেন। চক্ষুর পলকে রূপান্তর।

তাই হয়েছিল পাঞ্চালীর। বিছের কামড়ে জ্বলে যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিল সে বিমলার সঙ্গে। লজ্জা, কুণ্ঠা, কিছু কিছুই ছিল না অবশিষ্ট।

কিন্তু সে পরের কথা।

অলৌকিক-জগতীর গুঞ্জন উঠতে সুরু

করছে ততক্ষণ। নির্ধারিত সময় অতীত, অথচ জলসার কোনও সাড়া নেই। নানা ধরণের উগ্রপন্থী যুবকবৃন্দ দর্শক-রূপে এসেছে। তারা অধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত। পাঞ্চালীর ডানদিকে দূরে টিনের ছাউনির ধারে একদল ষণ্ডা চেহারার যুবক দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় বসবার আসন পায় নি। তারা চীৎকার করে করে নিজেদের মতামত ও অধৈর্য ব্যক্ত করছে।

অবশেষে একটি ছোট ছেলেকে হারমোনিয়াম দিয়ে বসানো হল। সারি সারি আলোগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠল। বহু মাইকে বহুবার বিঘোষিত হল, 'আমাদের অনুষ্ঠান সুরু হচ্ছে। আপনারা দয়া করে চুপ করে বসুন।'

বালক কেমন গান করত ঘরোয়া সভায় বলা শক্ত। কিন্তু এত জনতায় গাইবার গায়ক যে সে নয়, গান ধরা মাত্রে বোঝা গেল। অসমপ্রিকায়ারে এক কম্পিত কাঁচাগলার আকূতি শোনা গেল কাছাকাছি। দূরের শ্রোতারা শুধু মুখনাড়া দেখল।

প্রথমে একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে গমগম্ করে অসন্তোষ ধ্বনিত---মশাই, মাইক ফেল করছে যে।

শোনা যাচ্ছে না।

এসব কি ইয়ার্কি হচ্ছে?---ইত্যাদি।

কোনমতে সে গান শেষ হলে স্থানীয় শিশুশিল্পী বিমান বোসের আবৃত্তি চলল কিছুক্ষণ।

'জোরে, জোরে' বলার পরেও গলায় জোর এনেও মাইক দুর্বল। ক্রমেই জনসমুদ্র অশান্ত।

একজন চীৎকার করে বলল, 'প্লাকার্ডের নামগুলোর কাউকে দেখছি না কেন?'

ততক্ষণে একজন চিত্রতারকা সমুপস্থিত হয়েছেন এক প্রযোজক-সহ। তাঁরই নামধন্য উৎসব।

'আপনারা চুপ করুন। শ্রীযুক্ত উপস্থিত হয়েছেন।' ঘোষক বলছে।

ততক্ষণে জনতা বিরক্তি প্রদর্শন করছে, 'কাউকে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি না। মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা নেমে আসুন।'

স্বেচ্ছাসেবকেরা ভ্রূক্ষেপও করল না। বরঞ্চ ক্লাব ঘরের ছাদে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাচতে লাগল। দর্শক যত ক্ষেপে ওঠে তত তারা মজা পায়।

এধারে আরও একটি আনাড়ী গান সুরু হয়েছে বাচ্চা এক মেয়ের। জনতা ক্রমেই ক্ষেপে উঠছে, কিছুই ভাল করে শোনা যাচ্ছে না। বিশিষ্ট গায়কদের, শিল্পীদের দেখা নেই।

একটা হট্টগোল সুরু হল। ক্রমেই বাড়তে লাগল। বেগতিক দেখে চিত্রতারকাকে মাইকের সম্মুখে দাঁড় করানো হল। তিনি সবিনয় অনুরোধ জানালেন নীরবে বসে শোনার জন্য।

একটুক্ষণ নীরবতা এল।

আবার আনাড়ি এবং প্রায় অশ্রুত গান চলার পরে কোলাহল সুরু।

কর্তাব্যক্তিরা এক এক করে করজোড়ে দেখা দিলেন। 'দয়া করে আপনারা শান্ত হোন। নির্ধারিত শিল্পীরা এখনই এসে যাবেন। ততক্ষণে স্থানীয় শিল্পীরা আপনাদের আনন্দ দেবার চেষ্টা করছেন।'

ততক্ষণে দর্শক ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে লেগে গেছে। 'নামুন, ষ্টেজ থেকে নামুন সকলে। ওখানে কোন কাজ আছে আপনাদের?'

একজন কর্তাব্যক্তি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কঠোর বাক্য মাইকের সম্মুখে উচ্চারিত করলেন। একজন স্বেচ্ছাসেবক চোয়াড়েভাবে অঙ্গভঙ্গি করল।

ডানদিকে বেড়ার কাছ থেকে সেই যুবকগুলির দিক হতে ঢিল ছুটে এল মঞ্চে একটা, একাধিক। একজন কর্তাব্যক্তি আহত হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের ওপর থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা দর্শকদের মধ্যে চেয়ার ছুঁড়ে মারল।

লেগে গেল কুরুক্ষেত্র।

অসংখ্য ছেলে দর্শকদের মধ্য দিকে তেড়ে এল। চেয়ার তুলে চেয়ার ভেঙ্গে তারাও সুরু করল হানাহানি। একটা হৈ-হৈ, রৈ-রৈ শব্দে কানে তালা লেগে যায়।

দমাদম সোডার বোতল ছোড়া, বোমার শব্দ ও আগুন। এরই মধ্যে ঢিল এসে লাগতে লাগল আলোর গায়ে।

চোখের পলকে সব অন্ধকার।

আলোর কাঁচ ভাঙার ঝন্ঝন্ শব্দ, চেয়ার ভাঙার মড়মড় শব্দে আর্ত অগণিত কণ্ঠের আর্তনাদ মিশে এক মুহূর্তে প্রচণ্ড তাণ্ডব সৃষ্টি হল।

'পালাও, পালাও,' 'ওরে বাবা', 'বাঁচাও' ডাকের সঙ্গে বিপন্ন নরনারীর আত্মীয়স্বজনের নাম ধরে ব্যাকুল আহ্বান সুরম্য, আলোকোজ্জ্বল সভাস্থলকে যন্ত্রণাদায়ক নরকে আখ্যা দিল। চোখে দেখা যাচ্ছে না, তারই মধ্যে নারী-কণ্ঠের চীৎকার, বর্বর পুরুষকণ্ঠের অট্টহাস্য শোনা যাচ্ছে। ছুটে পালাতে যেয়ে নরনারী চেয়ার বেধে পড়ে, কাঁচে কেটে, ইঁটে ছেঁচে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। লোকের ভিড়ে হাঁপিয়ে জ্ঞান হারাচ্ছে। বন্ধু বা পরিজন এ ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে পালাচ্ছে।

এর মধ্যে চেয়ার-টেবিলে আগুন ধরিয়ে দিল। সেই আগুনের আভায় ঈষৎ আলোকিত বিরাট পরিধির জনসমুদ্র অসহায় অবস্থায় ছোটাছুটি সুরু করে দিল।

'আগুন, আগুন,' 'ফায়ার ব্রিগেড', 'পুলিশ কই'---এম্ববিধ ডাক মাথার ওপরে মুক্ত নীলাম্বর শুধু শুনল।

একজন চীৎকার করে বলল, 'পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নি, বাহাদুরেরা বলেছিলেন পুলিশ লাগবে না।'

আজব হ্রদের চারপাশের রাস্তায় তখন খণ্ডযুদ্ধ। চারদিকে ফটক থাকলেও অন্ধকারে গোলকধাঁধার মত জাঁতাকলে সকলে পিষ্ট। মফস্বলের যে-সমস্ত লোক এসেছে তারা এদিকের পথঘাট চেনে না। মেয়েরা পথ হারিয়ে বিপন্ন, ছোটাছুটি সার হচ্ছে শুধু।

পুলিশ ততক্ষণ বাইরে দু'খানি ভ্যা

নিশ্চেষ্টভাবে বসে আছে। এত যে ভয়াবহ ঘটনা তাতে কিছু আসে যায় না যেন। গাড়ীভর্তি পুলিশ। পেছন দিকটায় অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে ভিতরে। এবার মেয়েলি আর্তনাদ শোনা গেল।

হতবাক হয়ে নিরুপমা চেয়ে ছিল।

মহিলা কণ্ঠের এক বিশেষ আর্তনাদে হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেল। রুমা কোথায়? আমার রুমা?'

ছুটে চলে যেতে পাঞ্চালী হাত ধরল।

'কি করছ, এই অন্ধকারে মারামারি আর ভাঙাচোরার মধ্যে কোথায় যাও? রুমা জানে তুমি এদিকে আছ। ওখান থেকে লোক নিয়ে আসবে। ভাগ্যি, স্টেজে বসাতে পার নি। এতক্ষণে হয়ে যেত।'

'কিন্তু, আমার যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে'—নিরুপমার চিরসংসারী মন মেয়ের জীবনহানির আশঙ্কার পর্বে মেয়ের সম্ভ্রমহানি ও ফলে জাগতিক অসুবিধাটাই ভেবে দেখল।

একজন নিম্ন শ্রেণীর মেয়ে ছেঁড়া কাপড় খোলা ব্লাউজে ছুটতে ছুটতে ওধার থেকে এল, 'পালাও গো, পালাও। ওধারে বাথরুমে মেয়েদের টেনে নিয়ে যেয়ে অত্যাচার করছে।'

নিরুপমা পাগল হয়ে উঠল, 'রুমা, রুমা। কোথায় গেলি? কি সর্বনাশ হল আমার।'

পাঞ্চালীও অন্ধকারে খুঁজছে সর্বাণীকে, সে-ও ডাকছে, 'সর্বাণী, সর্বাণী।'

হিরণ্ময়ী এধার-ওধার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে শুধু প্রতিহত হচ্ছেন।

'উঃ-আঃ', দারুণ চীৎকার করে নিরুপমা মাথা চেপে ধরল। ভিড়ের মধ্যে তখন ছিনতাই চলছে। নিরুপমার কান থেকে রক্ত পড়ছে, শাড়ীর আঁচলে মাখামাখি। এক কানের জড়োয়া এয়ারিং ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

কে কার দিকে তাকায়। যথাসাধ্য সাজসজ্জা করে ও অলঙ্কারে পরিশোভিত হয়ে নারীমণ্ডলী এসেছিলেন চিত্রতারকার সঙ্গীত শ্রবণে। এখন সজ্জা কাল হয়ে দাঁড়াল।

সম্মুখের অবাঙালী দু'চারজন মহিলাকে নানারূপ অশ্লীল কথাবার্তা বলছে কয়েকটি পুরুষ। তাঁরা প্রাণভয়ে পালাতে সুরু করছেন, দৌড়ে দিগ্‌বিদিক-হারা পশুর মত।

ওদিকে রব উঠছে, 'জল, জল, একজন মহিলা মূর্চ্ছা গেছেন। ভলানটীয়ার।'

একজন বৃদ্ধ অথর্ব হওয়ার দরুণ মহিলাব্যূহে দাঁড়িয়েছিলেন। কপালের স্বেদ মুছে সবিদ্রূপে বলে উঠলেন, 'ভলানটীয়ার কোথায় যে আসবে? গুণ্ডা এনে ভরিয়েছে আসানসোল থেকে, তারকেশ্বর থেকে। ওরা মারামারি, ছিনতাই, লুটপাটে ব্যস্ত।'

সমর্থ ভদ্রপুরুষ তখন অদৃশ্যপ্রায়। অবাঙালী মহিলাদের পালাতে দেখে বিকট হাসি হেসে একদল চোয়াড়ে হাত বাড়িয়ে তাঁদের তাড়া দিয়ে পেছু পেছু ছুটল।

হিরণ্ময়ীর গলার মুক্তার একনরী হার হেঁচকা টানে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে পান্নার ধুকধুকি সহ।

মুক্তা টপ্ টপ্ করে ঝরছে মাটিতে।

তিনি মাথা ঢেকে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। ওই তাড়া করার দৃশ্য দেখে এবার জ্ঞান হারালেন।

পাঞ্চালী ততক্ষণ মনের জড়তা ঝেড়ে ফেলেছে। তাঁকে ধরে আধভাঙা চেয়ারের হেলানে বসিয়ে নিরুপমাকে বলল, 'একটু এঁকে দেখ। আমি জল নিয়ে আসি। ওধারে একটা জলের গাড়ী দেখেছিলাম যেন।'

নিরুপমার অবস্থা তখন মর্মান্তিক। মুখে-কানে আঁচল চাপা দিয়ে সে কাঁদছে। কাটা কানের যন্ত্রণা, মেয়ের জন্য আশঙ্কা অথবা দামী গয়নার শোক, কোন্‌টা প্রাধান্য পেয়েছে বলা শক্ত। নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই নিরুপমার।

'নিরু, ভয় পেয়ে ভেঙে পড়লে চলবে না। আমি এগিয়ে যাই। সর্বাণী থাকলে ভাল হত। ও শক্ত মেয়ে। জল না পেলে হিরণদি বুড়ো মানুষ মারা যাবেন। রুমার জন্যে ভেবো না। মেয়েটি মিথ্যা বলেছে। একটা টাকা পেলে যারা রাজী হয়, তারা পালাবে কেন? আমি এক্ষুণি আসছি। তুমি ওঁর মাথায় একটু আঁচল দিয়ে বাতাস দাও। দেখি তোমার কানের জন্য ফার্স্ট এইড্ পাই কি না। নিরু, শান্ত হও।'

নিরুকে উপদেশ দিয়ে এধার ওধার হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চলল পাঞ্চালী।

হঠাৎ পাশ থেকে চীৎকার, 'একি আমার শাড়ীখানা টেনে খুলে নিচ্ছে কে?'

সায়া-ব্লাউজপরা একজন মেয়ে ছুটছে। শাড়ী নেই গায়ে।

পাঞ্চালীর চেনা এলাকা আজব হৃদ। কিন্তু এখন আর সে দিক-নির্ণয় করতে পারছে না। একবার এদিক, একবার ওদিক চলাফেরা করছে হাতিড়ে হাতিড়ে। ভাঙা কাঁচ আর কাঠে ছত্রাকার এলাকায় পা ফেলা দায়।

বাইরে তখন বারম্বার প্রার্থনার পরে পঙ্গু পুলিশ হাত-পা জড়ো করে কোনমতে একটা-দুটো কাঁদানে গ্যাস ছুড়ছে। রাস্তায় অপেক্ষমাণ ছেলেরা ছুটে পালাচ্ছে তখন। একটু পরেই বার হয়ে এসে ইঁটের টুকরো ছুড়ছে পুলিশের গাড়ীর গায়ে।

যেন লীলাখেলা চলছে।

ভেতরে তখন নটরাজের ধ্বংস তাণ্ডব। শিল্পসংস্কৃতির রূপময় নৃত্য এখন শিবতাণ্ডব।

পাঞ্চালী জনারণ্যে মিশে গেল।

[ক্রমশ।

(সাম্প্রতিক আবিষ্কার পর্যালোচনা)

দুরারোগ্য ব্যাধি লিউকেমিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান

রক্তের ক্যান্সার বা লিউকেমিয়া এবং মারাত্মক ক্ষতিকর রক্তাল্পতা ও লিউকোমাইটোসিস এখনো পর্যন্ত দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে বিশ্ববাসীর কাছে বিভীষিকা হয়ে আছে, এদের বিরুদ্ধে কার্যকর সুনির্দিষ্ট হাতিয়ার আজো চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উইলিয়াম মোইসেয়েভিচ হ্যার্গোলৎস বলেছেন, সোভিয়েত দেশে লিউকেমিয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা যে সংগ্রাম শুরু করেছেন, তাতে পুরোপুরি জয়লাভ না হলেও সংগ্রাম বর্তমানে তীব্রতর হয়ে জয়লাভের দিন এগিয়ে আনতে চলেছে। লিউকেমিয়ার সংক্রমণ, বিকাশ ও বিপর্যয় সাধনের পদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাবে জানার জন্য গবেষণা করা হচ্ছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মানুষ ও ইঁদুরের লিউকেমিয়ায় বেশ সাদৃশ্য আছে। সহজলভ্যতার জন্য ইঁদুরকে শহীদ করে গবেষণা করা সুবিধাজনক, তাছাড়া ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি দ্রুত ঘটে এবং তাদের দেহে টিউমার খুব অল্প সময়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় গবেষণাকার্য ত্বরান্বিত হয়। এভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে ম্যালিগন্যান্ট নিওপ্লাজমের বিরুদ্ধে কার্যকর চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে বলে বৈজ্ঞানিকগণ আশা করছেন। টিউমারের ভাইরাস-ঘটিত প্রকৃতিসমূহ পর্যবেক্ষণের দিকে বৈজ্ঞানিকগণের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার খ্যাতনামা ক্যান্সার গবেষক বিজ্ঞানীরা লিউকেমিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের দেহকলা বা টিস্যু থেকে নিষ্কাশিত বস্তু ইঁদুরের দেহে কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ করিয়ে তাদের দেহে প্রথম নিওপ্লাজম ঘটান। এর ফলে ল্যাবরেটরীতে নূতন ধরণের ভাইরাস-ঘটিত লিউকোসিস ব্যাধির সৃষ্টি করা হয়েছে। ইঁদুরের লিউকোসিসে পনেরোটিরও বেশী বিভিন্ন প্রকৃতির ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এর কতকগুলি ভাইরাস সম্পর্কে সোভিয়েত বিজ্ঞানী এম. পি. ম্যাজুরাংকো, ওরাই এন বুগোরোভা, এস. এ. গ্রিবার এবং জেড এ পোস্নানিকোভা বিস্তারিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছেন।

শ্রীজ্যোতির্ময় হুই

সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণের সম্মুখে যে সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে তা হলো লিউকেমিয়ার সঠিক ভাইরাস নির্ণয় করা এবং লিউকেমিয়ার প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুত করা।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

বিশ্বের সাধারণ মানুষ রুদ্ধশ্বাসে দিন গুণছেন কতদিনে এ সংগ্রাম শেষ হবে এবং গবেষক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করবেন—লিউকেমিয়া আর দুরারোগ্য নয়, লিউকেমিয়াকে তাঁরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

বিকলাংগ শিশুর জন্ম

কয়েক বছর আগে ইউরোপের কয়েকজন প্রসূতি শোকাহত দৃষ্টিতে তাঁদের নবজাতক বিকলাঙ্গ শিশুগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এই শিশুগুলির পরিপূর্ণ আকৃতি ছিল না এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ছিল অস্বাভাবিক। ইউরোপের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এ ধরনের বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের কারণ সম্পর্কে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাঁদের মতে, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় 'থ্যালিডোমাইড' নামক শ্রান্তিবিনাশকারী ঔষধ সেবনের ফলে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়।

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম কিন্তু নূতন বা অসাধারণ কোনো ঘটনা নয়। চিকিৎসকদের হিসাবে জানা গেছে, বিশ্বের হাজারটি নবজাতকের মধ্যে কমপক্ষে এক বা একাধিক আঙ্গিক ত্রুটি থাকে। শিশুর আঙ্গিক বৈকল্যের প্রকৃতি সব সময় সমান হয় না। কোনো ক্ষেত্রে নিতান্তই নগণ্য, কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ভয়াবহ। যেমন মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ডে রক্তোৎক্ষেপের [illegible] শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার [illegible] মারা যায়। আবার সুস্থ-সবল শিশু জন্ম নিলো। দেখা গেলো শিশুটির কোনো হাতে বা পায়ে পাঁচটির পরিবর্তে ছয়টি আঙুল অথবা ঠোঁটের উপরিভাগ কাটা হয়েছে ইত্যাদি। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের ঘটনা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বহু প্রাচীন-কালেও পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের ক্যালেন্ডারে লিপিবদ্ধ রয়েছে ২৫০০ খৃস্টপূর্বে ৬০টি বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কাজেই শুধুমাত্র 'থ্যালিডোমাইড' সেবনই বিকলাঙ্গ শিশু জন্মের একমাত্র কারণ বলা যায় না (২০০০ খৃস্টপূর্বে এই ঔষধের অস্তিত্বই ছিল না)। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বিকলাঙ্গ শিশুজন্ম নিয়ন্ত্রণ করাকে একটা সমস্যা বলে মনে করছেন। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম-সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলী নিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি শাখাও গড়ে উঠেছে—যার নাম 'টেরাটোলজি'।

আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম সম্বন্ধে উদ্ভট কতকগুলো যুক্তির কথা প্রচলিত ছিল। গ্রহণের সময় সহবাস করলে নাকি বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। স্পষ্টতঃ ধারণাটির পিছনে কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক সমর্থন নেই।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের কারণ একটি নয়, একাধিক। অবশ্যই বংশানুক্রম বা হেরিডিটি অন্যতম মুখ্য কারণ। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে পরিবেশের বিশেষ প্রভাব এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক কর্তৃক গৃহীত রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে অ্যামব্রোজ পেয়ার বলেন, গর্ভবতী নারীর জরায়ুর সংকীর্ণতার জন্য অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়ে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে উইলিয়াম হার্ভী বলেন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের কোনো এক স্তরে ব্যাঘাতপ্রাপ্তির ফলে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মলাভ করে থাকে

১৯৩৭ সালে প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এফ হেল বললেন যে, গর্ভাবস্থায় কয়েকটি সুপ্রয়োজনীয় ভিটামিনের অভাব বিকলাঙ্গ শিশুজন্মের অন্যতম কারণ। অন্য একটি মতবাদে বলা হয়েছে, গর্ভাবস্থায় মিথাইল ফোলিক অ্যাসিডের ন্যায় পুষ্টি-বিরোধী ঔষধ গ্রহণে গর্ভস্থ ভ্রূণের খাদ্য গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে ভ্রূণের পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভ ঘটে না। একটি সাম্প্রতিক মতবাদ হলো, গর্ভবতী নারীর আয়োডো-অ্যাসিটেট এর ইনসুলিন গ্রহণে গর্ভস্থ ভ্রূণ বিকলাঙ্গ হয়ে গড়ে ওঠে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের আর একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হলো-- গর্ভবতী স্ত্রীলোকের আহারে শর্করা-জাতীয় উপাদানের আধিক্য ভ্রূণের মস্তিষ্ক গঠনে বৈকল্য আনয়ন করে এবং আহারে ফোলিক অ্যাসিডের অভাবও ভ্রূণের দৈহিক গঠন অস্বাভাবিক করে দেয়। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সারা বিশ্বের টেরাটোলজিষ্ট বিজ্ঞানীরা এখনো গবেষণা করছেন।

চা, কফি এবং হৃদ্‌রোগ

আমাদের দেশে চা-পানকে এখন আর বিলাসিতা বলে মনে করা হয় না। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় চা একটি অপরিহার্য স্থান করে নিয়েছে। পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির শেষে এককাপ ধূমায়িত চা অনেককেই স্বর্গসুখ দান করে থাকে। এমন লোকও বিরল নয়, যারা শুধুমাত্র চা পান করে দীর্ঘ সময় ক্ষুধা সহ্য করে থাকতে পারে। অন্যান্য পানীয়ের মতো চায়েরও অনুরাগী ও বিরাগী সমালোচক রয়েছেন। শেষোক্তরা চা-পানকে রক্তচাপ বৃদ্ধি ও অগ্নিমান্দ্যের অন্যতম কারণ বলে দোষারোপ করে থাকেন। পূর্বোক্তরা চায়ের উপাদান ট্যানিক অ্যাসিডের অবসাদ-বিনাশী ও শক্তি-প্রদায়ী ক্ষমতার কথা বলে থাকেন। বর্তমান দিনের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছেন—চা-পান দেহের কোনো ক্ষতি তো করেই না ; উপরন্তু চা-পান স্কেলিরোসিস নামক হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধ করে।

হৃৎপিণ্ডের ধমনীর কাঠিন্য হৃদরোগ আক্রমণের অন্যতম মূল কারণ। হৃদ্‌রোগ আক্রমণের কারণ সম্পর্কে গবেষণা করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ধমনীর ভিতর দিকে কোলেস্টেরোলের পুরু আস্তরণ সৃষ্ট হলে ধমনীর ভিতর রক্ত চলাচলের পথ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে হতে অবশেষে রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হৃদরোগের আক্রমণ ঘটায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, চর্বিজাতীয় আহার্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে রক্তে কোলেস্টেরোলের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বৈজ্ঞানিক ওয়েই ইয়ং, রবার্ট হোটোভেক এবং আর্থার রোমেরো বলেছেন, চা-পান রক্তের কোলেস্টেরোলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে হৃদ্‌রোগ স্কেলিরোসিস প্রতিরোধ করে থাকে। বিশ্বের আরো কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন আলোচনায় চা-পানের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন। ১৯৬৬ সালে জে এ লিটন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, কফি-পানের দ্বারা মানুষের রক্তে কোলেস্টেরোলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং চা-পানে হ্রাস পায়। হৃদ্‌রোগীদের নিয়ে এক গবেষণামূলক সমীক্ষায় জানা গেছে, হৃদ্‌রোগীদের অধিকাংশ চা-পান অপেক্ষা কফি-পানে বেশী আসক্ত ছিল। ১৯৪১ সালে প্রখ্যাত চীনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী আই স্যাপার একবার উল্লেখ করেছিলেন যে, চীনাদের মধ্যে যারা অত্যধিক চা-পানে অভ্যস্ত তাদের স্কেলিরোসিস আক্রমণ একেবারে বিরল। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বৈজ্ঞানিকগণ খরগোস এবং মানুষের উপর কফি-পানের কুফল নিয়ে প্রত্যক্ষ গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁদের মতে চা-পান হৃৎপিণ্ডের ধমনীর আর্থেরোমা গঠনে বাধা দেয়, এই আর্থেরোমা গঠিত হলে অন্যতম হৃদ্‌রোগ অ্যাথারো-স্কেলিরোসিস আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল হয়। এই সব গবেষক বিজ্ঞানীদের মতে চা-পানে অভ্যস্তদের মধ্যে উক্ত হৃদ্‌রোগ হয় না বললেই চলে। তাঁরা একটি মজার সিদ্ধান্তও করেছেন—চর্বিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করার আগে খাদ্যটিকে এককাপ চায়ের সাহায্যে ধৌত করে নিলে হৃদ্‌রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা কম হয়। কিন্তু উক্ত গবেষক বিজ্ঞানীরা চা-নির্যাসের ঠিক কোন্ উপাদান হৃদ্‌রোগ প্রতিহত করে তা সঠিকভাবে এখনো বলতে পারেন নি।

পচনশীল ক্ষতের চিকিৎসায় রক্তচাপ বৃদ্ধির সুফল—একটি বিস্ময়কর গবেষণা

ডেনমার্ক, সুইডেন ও কোপেনহেগেনের একটি চিকিৎসক দল সম্প্রতি দেহের পচনশীল ক্ষতের চিকিৎসার একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা সুস্থ ও নীরোগ ব্যক্তির পায়ে রক্ত চলাচলের গতির সঙ্গে পচনশীল বা 'গ্যাংগ্রীণাস' ক্ষতবিশিষ্ট ব্যক্তির পায়ে রক্ত-চলাচলের গতির তুলনা করে দেখেছেন, শেষোক্ত গতিবেগ প্রথমোক্তের প্রায় অর্ধেক। এর থেকে তাঁদের ধারণা হয়, যদি কৃত্রিম উপায়ে ক্ষতবিশিষ্ট পায়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করানো যায়, তাহলে ক্ষত নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ হবে এবং ক্ষত দ্রুত সারবে। রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য তাঁরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, সামান্য ব্যায়াম, ধূমপান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সুপারিশ করেছেন।

উক্ত রক্তচাপ সৃষ্টির জন্য তাঁরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে ফ্লোরোকর্টিজোন অ্যাসিটেট অথবা ডেসোকসিকর্টিকস্টেরোন অ্যাসিটেট ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করেছেন। উক্ত মিশ্রণ প্রয়োগ করে কয়েক মাসের মধ্যে ধমনীর মধ্যে রক্তচাপ পনেরো মিলিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। যে পাঁচটি রোগীর উপর এই গবেষণা করা হয়েছিল, তারা প্রত্যেকে রোগমুক্ত হয়েছে।

ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

[বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য]

এ কালের ভারতীয় ঐতিহাসিক সমাজে বাঙলার কীর্তিমান সন্তানদের মধ্যে যাঁদের আসন পুরোভাগে সসম্মানে নির্দিষ্ট, আধুনিক যুগে এ দেশে ইতিহাস অনুশীলনের আচার্যসদৃশ মর্যাদায় যাঁরা সমাদৃত, দেশের ইতিহাস-চর্চার স্রোত বেগবান করে তুলছে যাঁদের সাধনা—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁদেরই অন্যতম।

প্রথিতযশা মনীষী ও ব্যবহারজীবী স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্তের পুত্র প্রতুলচন্দ্রের জন্ম ১৯১০ সালে। গুপ্তদের আদিনিবাস ময়মনসিংহ। মা সাবিত্রী দেবী ছিলেন প্রখ্যাত জননায়ক ও পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায়ের বোন। ১৯২৫ সালে সাউথ সাবার্বান হাই স্কুল থেকে সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রতুলচন্দ্র। ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৬ সালে লণ্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ থেকে অর্জন করলেন পি-এইচ-ডি উপাধি। ১৯৩৯ থেকে '৫৩ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৭ থেকে '৫০ তিনি ছিলেন ভারত সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইতিহাস বিভাগের ভাষ্যকার। ১৯৫৭ থেকে '৬১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডাররূপে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬১ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের আসনে তিনি সমাসীন। বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অস্থায়ী উপাচার্য।

লণ্ডন, ক্যালিফোর্নিয়া, শিকাগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন সময়ে তিনি ভ্রাম্যমাণ সদস্য ও অধ্যাপকরূপে
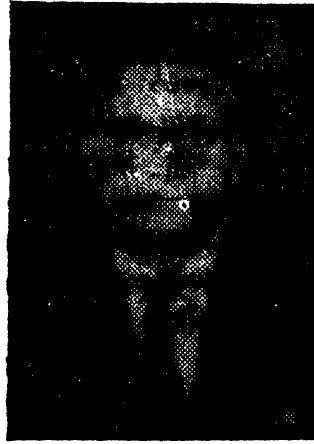
ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অধর মুখার্জী লেকচারার ও লীলা লেকচারাররূপেও আমন্ত্রিত হয়েছেন। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর-সংক্রান্ত মন্ত্রক থেকে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিয়োজিত হয়েছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্মার্টস ভিজিটিং ফেলোরূপে সম্মানিত করেছেন।

এ ছাড়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদ, ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সংক্রান্ত উপদেষ্টা সমিতি, রাজ্য সরকারের ব্যক্তিপরিচিতি কমিটি ও রেজিওন্যাল রেকর্ডস সার্ভে কমিটির সভ্যপদ, যুক্তরাজ্যের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস ও কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সচিবের, ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির সহকারী সভাপতির এবং ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস শাখার সভাপতির মর্যাদাসূচক আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অব দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থটি আচার্য নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি সম্পাদনা করেন।

নানা সাহেব, দ্বিতীয় শাহ আলম, বাজীরাও পেশোয়া, ফোর্ট উইলিয়াম প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কয়েকটি অতীব মূল্যবান গ্রন্থের তিনি প্রণেতা।

শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত

[প্রথিতযশা ভাস্কর ও নয়াদিল্লীর আধুনিক শিল্পের জাতীয় সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ]

ভারতবর্ষের ভাস্কর্য বিদ্যায় এ-কালের ইতিহাসে যাঁদের সাধনা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকার দাবী করতে পারে, প্রদোষ দাশগুপ্ত সেই তালিকায় একটি বরণীয় নাম। একালে ভারতবর্ষের ভাস্কর্য কলার উৎকর্ষসাধনে ও গৌরববর্ধনে তাঁর সাধনার গুরুত্ব বিশেষজ্ঞ সমাজে এককথায় সসম্মানে স্বীকৃত। তাঁর পূর্বসূরি দিকপাল ভাস্করেরা ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ ধারাটিকে আপন আপন অভাবনীয় তপস্যায় বলিষ্ঠ, প্রতিশীল করে তুলেছেন, প্রদোষ দাশগুপ্তের প্রতিভা সেই ধারার গতিশীলতা এবং বলিষ্ঠতা আরও বহু গুণ বিবর্ধিত করে তুলেছে।

১৯১২ সালের ১০ই জানুয়ারী ঢাকায় প্রদোষকুসুম দাশগুপ্তের জন্ম। যে ভাস্কর্য বিদ্যার মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ, সেই ভাস্কর্য বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি দেশের বাইরেও পাঠ লাভ করে অধীতব্য বিষয় সম্বন্ধে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ করেছেন। লণ্ডনের রয়্যাল এ্যাকাডেমী অফ আর্টস এবং সেণ্ট্রাল স্কুল অফ আর্টস এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌টসে তিনি ছাত্র শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ থেকে '৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষা অর্জন করেন প্যারিসে ইকোলে দ্য গ্যুঁ স্যুমাতে।

১৯৫০ সালে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে। ১৯৫১ থেকে '৫৭ পর্যন্ত কলকাতার সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি নয়াদিল্লীর আধুনিক শিল্পের জাতীয় সংগ্রহশালার পরিচালনভার গ্রহণ করলেন। এই সংস্থাটির অগ্রগতি এবং জয়যাত্রার ক্ষেত্রে তাঁর সুচিন্তিত নেতৃত্ব, নৈপুণ্য এবং কুশলতা এক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগীয় মন্দিরসমূহের টেরাকোটা শিল্প তাঁর বিশেষ গবেষণার বিষয়-বস্তু। তাঁর ব্যাপক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গবেষণায় এই সংক্রান্ত বহু তথ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থাকার পর এ-যুগের প্রাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসুজনের বহু জিজ্ঞাসার অবসান ঘটায়। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে মাই স্কালপচার্স এবং টেম্পল টেরাকোটা অফ বেঙ্গল দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯৬০ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ইণ্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশান অফ আর্টসের তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি পৌরোহিত্য করেন। ললিতকলার আকাদামীর কার্য-নির্বাহক এবং সাধারণ পরিষদের ও বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যপদ তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

ভিয়েনা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, শ্যাম প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার পাত্র কানায়-কানায় পরিপূর্ণ।

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

[দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিভাগীয় প্রধান]

অতুলনীয় পাণ্ডিত্য এবং অনন্যসাধারণ অবদানময় প্রতিভা যাঁদের পরিচিতি দেশের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদেশে সুধীসমাজেও পরিব্যাপ্ত করেছে, সেই তালিকায় ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশ-গুপ্ত এক স্মরণীয় নাম। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদান সংশ্লিষ্ট সমাজে একটি বিশেষ মর্যাদা-সূচক আসন আজ তাঁর জন্যে সসম্মানে নির্ধারিত। বাংলা দেশের বাইরে আজ সসম্মানে বহুজনের পিপাসু-চিত্ত জ্ঞানের ও শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে স্বীয় বিপুল পাণ্ডিত্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন ও সেই সঙ্গে এক মহান জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করে যাঁরা চলেছেন তিনি তাঁদেরই অন্যতম।

মহানগরী কলকাতায় ১৯১৫ সালের ১১ই জুলাই রবীন্দ্রকুমারের জন্ম। ১৯৩৭ সালে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন রবীন্দ্রকুমার। ১৯৪১ সালে লাভ করলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে তাঁর দ্বারা অর্জিত হল ডিফিল উপাধি। এই উপাধি পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড থেকেও তিনি অর্জন করেছেন।

রবীন্দ্রকুমারের ছাত্র-জীবন যথেষ্ট কৃতিত্বের আলোয় উদ্ভাসিত—বহু শীর্ষ-স্থানীয় পদক, বৃত্তি, পুরস্কার প্রভৃতি অর্জন করে স্বীয় মেধার সার্থক প্রমাণ তিনি রেখেছেন। ১৯৪৮ সালে সুবিখ্যাত মোয়াট স্বর্ণ পদক তিনি লাভ করেছেন। এছাড়া রেজিনা গোয়া স্বর্ণ পদক, মিত্র গবেষণা বৃত্তিও তাঁর আয়ত্তে এসেছে। ১৯৫৫ সালে তাঁর অধিকারে এল স্যার রাসবিহারী ঘোষ ওভারসিজ রিসার্চ ফেলোশিপ।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঠাকুর অধ্যাপকের এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিভাগীয় প্রধানের আসন তিনি অলঙ্কৃত করলেন ১৯৬২ সালে। ১৯৬৪ থেকে '৬৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঐ বিভাগের কলা অনুষদের অধ্যক্ষ।

লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ লিটারেচার এবং বৃটিশ সোসাইটি অফ এস্থেটিকসের সভ্যপদ তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। বেঙ্গল লিটারারী ইউনিয়নের সভাপতি-রূপেও তাঁকে দেখা গেছে।

পৃথিবীর নানা দেশ তিনি ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেছেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, গ্রীস, হল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, জাপানপ্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহ তিনি বিশেষভাবে পরিদর্শন করেছেন।

তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে ইংলিশ পোয়েটস অন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড আদার এসেস এবং মেকলের হিস্টোরিক্যাল রাইটিংস ইন ইণ্ডিয়া---তাঁর প্রগাঢ় ও বহুমুখী পাণ্ডিত্যের দু'টি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেশ-বিদেশের সুধী-সমাজে এ গ্রন্থ দু'টি যথেষ্ট সমাদর সহকারে স্বীকৃত। হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এ্যাণ্ড সিলোন—গ্রন্থটির সম্পাদনাও তাঁর ঐতিহাসিক কৃতিত্ব এবং সম্পাদন-কুশলতার একটি প্রমাণ।

শ্রীমতী ইলা ঘোষ

[বাঙলার প্রথম মহিলা ইঞ্জিনীয়ার ও উইমেনস পলিটেকনিকের অধ্যক্ষা]

ইতিহাসের অনির্বাণ আলোয় এ তত্ত্ব দৃঢ়ভিত্তিক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সারা ভারতবর্ষের নবজাগরণের পুণ্য মন্ত্র উদ্‌গীত হয়েছিল বাঙলার প্রান্ত থেকে। এ তথ্যও সর্বজনবিদিত যে, বাঙালীর সাধনায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ভূমিকাও কম নয়। এ কালের বঙ্গ-দুহিতাদের মধ্যে রত্নপ্রসূ বঙ্গজননীর গর্ব ও গৌরব বিবর্ধনে যাঁদের ভূমিকা অসামান্য—সেই তালিকায় শ্রীমতী ইলা ঘোষ একটি উজ্জ্বল নাম। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম ইঞ্জিনীয়াররূপে এ দেশের নারী-প্রগতিকে তিনি আর একধাপ এগিয়ে দিলেন।

পূর্ববঙ্গের মাদারীপুরে তাঁর জন্ম। পিতৃদেব যতীন্দ্রকুমার মজুমদার ছিলেন বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র এবং বেঙ্গল সিভিল শ্রেণিভুক্ত। ছেলেবেলা কাটে বাঙলার বিভিন্ন জেলায়। ১৯৪৭ সালে আশুতোষ কলেজ থেকে আই-এস-সি পাশ করে বি-ই কলেজে ভর্তি হলেন। বি-ই কলেজে সেই প্রথম ছাত্রীদের অন্তর্ভুক্তি ঘটল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলেন ১৯৫১ সালে। ১৯৫৬ সালে যুক্তরাজ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন উচ্চতর শিক্ষায় সাফল্য লাভ করে। ডেরাডুনের সুপ্রসিদ্ধ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান হলেন ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৪ থেকে '৫৬ এবং ১৯৫৯ থেকে '৬০ তিনি ছিলেন দিল্লী পলিটেকনিকের যথাক্রমে লেকচারার ও সিনিয়ার লেকচারার। ১৯৬০ থেকে '৬৪ তিনি অধ্যাপনা করেছেন কলকাতার জুট টেকনোলজিতে।

শ্রীমতী ইলা ঘোষ

ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনীয়ার্সের তিনি এ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার। এই সংস্থার গ্রন্থাগারিকাও তিনি ছিলেন। ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জি-নীয়ার্সের সঙ্গেও কোষাধ্যক্ষরূপে তাঁর যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল। ১৯৬৭ সালে কেম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত সোসাইটি অফ ইণ্টারন্যাশনাল উইমেন ইঞ্জিনীয়ার এ্যাণ্ড সায়েণ্টিসে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছেন। বিজনেস এ্যাণ্ড প্রোফেসনাল উইমেনস ক্লাব অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তিনি সচিব। এ্যাসোসিয়েশন অফ প্রিন্সিপাল অফ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনের তিনি সদস্যা।

'ইণ্ডিয়ান ইঞ্জীনিয়ার' পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি একজন সদস্যা।

১৯৬৪ সাল থেকে উইমেনস পলিটেকনিকের অধ্যক্ষার আসনে তিনি অধিষ্ঠিতা।

'এ্যাপ্লায়েড মেকানিক উইথ ওয়ার্কড একজাম্পল' এবং 'হাইড্রোলিক উইথ ওয়ার্কড একজাম্পল' নামক তাঁর রচিত গ্রন্থ দুটি ইঞ্জিনীয়ারিং-এর একটি মূল্যবান পাঠ্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের শ্রীতরুণ ঘোষের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধা।

তাঁর জীবনের আগামী দিনগুলি আরও বিপুল অবদানময় হয়ে উঠুক

প্রচ্ছদপরিচিতি

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রচ্ছদ-চিত্রটি শ্রীদেবু দাস কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

অতিশব্দ

হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পরিচিত জগতের একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্য অংশ হ'ল ধ্বনি-ময়তা অর্থাৎ শব্দকম্পনের উত্থান-পতন। প্রতি মুহূর্তে ছোট-বড় হাজার হাজার ধরনের শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের চারিদিকে। এই সকল ধ্বনি বা শব্দ-কম্পন আমাদের মানসিকতায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোন শব্দ আমাদের অনুভূতিকে আবিষ্ট করে, আবার কোন কোন শব্দ আমাদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আকাশে জেট প্লেনের আওয়াজ, পূজামণ্ডপে মাইকে ভেসে আসা গান আর যাই হোক, আমাদের সুখানুভূতির দ্যোতক নয়। অথচ রেলগাড়ির ছন্দোময় ধ্বনিকে আমরা পছন্দ করি। এর কারণ, ধ্বনিময়-তার তারতম্য।

আমাদের শ্রবণযন্ত্র অত্যন্ত অনুভূতি-সম্পন্ন। তবুও বহিঃপ্রকৃতির অনেক শব্দকেই আমাদের শ্রবণযন্ত্র গ্রহণ করতে পারে না; ফলে তাদের আমরা শুনতে পাই না, তারা চিরকাল আমাদের অজ্ঞা-তেই থেকে যায়। মানুষের শ্রবণযন্ত্র একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উত্থিত শব্দসকল গ্রহণ করতে পারে। এই সীমার বাইরে আমরা বধির। যে সমস্ত শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ থেকে ১৬,০০০ কম্পন সৃষ্টি করতে সক্ষম, তারাই আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে। পাখীর কাকলি, শিল্পীর গান এবং প্রাত্যহিকের কথাবার্তা এই সীমার মধ্যেই ধ্বনিময়। অথচ এই চিরন্তন গণ্ডীর বাইরের জগৎ আরো ব্যাপক, আরোও বিস্তৃত। আর সে জগতের সন্ধানও পাওয়া গেছে অতি সম্প্রতি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, এই সীমার বাইরে উত্থিত শব্দ আমরা না শুনতে পেলেও মনুষ্যেতর প্রাণী, যেমন—কুকুর, বিড়ালেরা তা শুনতে পায়। এমন কি, মানুষের মধ্যেও শ্রবণানুভূতির তারতম্য আছে। বয়স্কদের থেকে শিশুরা, সহরের লোক থেকে গ্রামের এবং কল-কারখানার লোকেদের থেকে অফিসবাবুদের শ্রবণযন্ত্র ভাল ও ব্যাপক অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

যে সকল শব্দ আমাদের [illegible] ধ্বনিময় নয়, বিশেষত ১৬,০০০ হাজারের ওপরে) তাদের নিয়ে বিজ্ঞা-নীরা গবেষণা চালাচ্ছেন প্রচুর। কৃত্রিমভাবে এই সকল শব্দ সৃষ্টি ক'রে তা দিয়ে তাঁরা ব্যবহারিক জগতের উপকার সাধনের চেষ্টা করছেন। গবেষণায় প্রাথমিকভাবে তাঁরা বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছেন। এই গবেষণা থেকে দেখা গেছে, অতি দ্রুত ও সূক্ষ্ম কম্পনসম্পন্ন শব্দসমষ্টি বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে আসতে পারে। সুকঠিন বস্তু বা ধাতুর গায়ে নির্দিষ্ট মাপের ছিদ্র করা, জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অংশাদি পরিষ্কার করা, ফলমূল, মাংস ইত্যাদিকে অনেকদিন পর্যন্ত টাটকা ও সতেজ রাখা, শল্যচিকিৎসা ছাড়া রোগ নিরাময় ইত্যাদির ব্যাপারে শব্দ-কম্পন সমষ্টির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। আমরা এই শব্দকম্পন সমষ্টিকে অতিশব্দ (ultrasonic) আখ্যা দিতে পারি। যদি অতিশব্দের ধারণা বা ব্যাখ্যান ঠিক হয়ে থাকে, তবে তানসেন গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতেন—এ উপকথা অবিশ্বাস করা চলে না। তানসেনও হয়তো তাঁর গানে এত বেশী দ্রুত কম্পন সৃষ্টি করতে পারতেন যে, মেঘবিধৃত জলকণা সেই কম্পনের আঘাতে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তো। অতিশব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগের সফলতা সম্বন্ধে সবচেয়ে আশান্বিত হলেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা আশাতীত। দুরা-রোগ্য রোগ, যা নাকি দামী ওষুধ ও নামী চিকিৎসকের ছুরি-কাঁচিকে উপেক্ষা হানে, সে রোগকেও নাকি নিরাময় করা যায় অতিশব্দের সাহায্যে।

আমেরিকার আইওয়া নামক স্থানে শল্যবিদ ডাঃ রাসেল মেয়ার্স ও অধ্যাপক উইলিয়াম, জে, ফ্রাই অতিশব্দ কম্পন প্রয়োগের সাহায্যে অনেক রোগীর মস্তকের সুস্থ [illegible] লাগিয়ে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ক্ষেত্রে অপারেশন করতে হলে মস্তিষ্কের সুস্থ টিস্যুগুলোর ওপর দিয়ে ছুরি চালিয়ে অযথা ঝুঁকি নিতে হত। সবল ও সুস্থ টিস্যুকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করে তাঁরা মস্তকের ভেতর অতিশব্দের কম্পন প্রয়োগ করে অসুস্থ অংশকে আক্রমণ করেছেন এবং তাদের নিরোগ করে তুলেছেন। একইভাবে কিডনির পাথর নষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে অপারেশন ছাড়াই। কম্পনের আঘাতে কিডনির পাথর টুকরো টুকরো করে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হবে। যুদ্ধের সময় সমুদ্রের তলায় সাবমেরিণ আছে কিনা, তা শব্দের সাহায্যেই নিরূপণ করা হয়। মস্তকের টিউমার, গলব্লাডারের পাথর আছে কিনা, তা নির্ণয় করা হবে অতিশব্দের প্রয়োগ দ্বারা। তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার আরো উন্নত, আরোও অত্যাধুনিক। এর ফলে হয়তো এক্সরের ব্যবহার কমে যাবে এবং সাথে সাথে এক্সরের আনুষঙ্গিক কুফল সীমিত হয়ে পড়বে।

আজকাল আমেরিকায় বিয়ারের বোতলের মুখ আঁটবার আগে তাকে অতিশব্দ কম্পনের সাহায্যে বায়ুশূন্য করা হচ্ছে। দেখা গেছে, আগে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে পরিমাণ বায়ু নিষ্কাশন করা সম্ভব হত, তার থেকে অনেক বেশী বায়ুশূন্যতা এই পদ্ধতির দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব। এর ফলে বিয়ারের টাটকা ভাবটা আরোও বেশীদিন ধরে রাখা যাচ্ছে। একইভাবে মাংস, ফলমূল, দুধ ইত্যাদি পচনশীল জিনিষকে অনেক-দিন পর্যন্ত সতেজ রাখা যাবে।

লস্ এঞ্জেলস সহরটি ধোঁয়াশার জন্য কুখ্যাত। ধোঁয়াশা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল, হাজার হাজার চলমান মোটর গাড়ির নির্গত ধোঁয়া ও কল-কারখানার চিম্নী থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস। এই ধোঁয়াশার জন্য নাগরিক-স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকে, বিশেষ করে

অব্যক্ত

শ্রীমদন চক্রবর্তী

আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক মিতালি
অনেক ব্যথাভরা কথাহারা আকুলি
অনেক দূরত্বের মাঝে ব্যবধানের অসীম ইসারায়
নিকটত্বের স্বপ্ন-ছোঁয়ায় হয় কোলাকুলি ঃ

অজানার কোহিনুর মনের অনেক গোপনে
অনেক রঙের খোঁজে ভোলে সে আপনে
অনেক রাজের ধন পাতালে সঞ্চিত হয়
রূপকথার বেড়াজালে সুন্দরের সোপানেঃ

অনেক ঢেউয়ের সাথে অনেক মুকুতা
অনেক রূপালী মায়ার অনেক বারতা .
অনেক কাব্যের ডালি সাজায়ে ভান্ডারে
নিমেষে সাজায়ে তোলে অনেক কবিতা ঃ

অনেক অনেক মায়া চপল নয়নে
অনেক অনেক চাওয়া ও পুষ্পচয়নে
অনেক চাওয়া আর পাওয়ার মাঝারে
আশা তবু টুটে যায় অলীক স্বপনে ঃ

চলার পদচিহ্ন আর অনেক ভাসমান আকাশ
অনেক অনেক ছন্দহারা জীবন অবকাশ
অনেক ভাংগা গড়ায় ছন্দদোলার সুর
সুরহারা জীবনের অনেক অনেক বিকাশ
শূন্যতার হাতছানিতে জমে অনেক
আরো অনেক ইতিহাস ঃ

বিঘ্নিত হয় যানবাহনের চলাচল ও বিমান উড্ডয়ন। লস্‌এঞ্জেলসের এই ধোঁয়াশা তাড়াবার জন্য অতিশব্দের সাহায্য নিয়ে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়েছে। বিমান বন্দরের রাণওয়ের ওপর জমাটবাঁধা ধোঁয়াশার ভিতর দিয়ে অতিশব্দ কম্পনসৃষ্টিকারী এক প্রকার হুইসেল বাজিয়ে ধোঁয়াশার ঘনত্বকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। ঘনত্ব কেটে যাবার ফলে ধোঁয়াশাও আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সহরের অন্যান্য স্থানেও এইভাবে ধোঁয়াশাকে সত্যিই তাড়ানো যায় কিনা, এ নিয়ে মার্কিন বিজ্ঞানীরা আরো ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অতিশব্দের সর্বাধুনিক ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হল একটি অস্ত্রের মাধ্যমে। অস্ত্রটি যুদ্ধক্ষেত্র ও শান্তি-রক্ষায় সমানভাবে প্রয়োগ করা যাবে। আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার সামরিক বিভাগ। এই অস্ত্রের সাহায্যে দুশো ফিটের মধ্যে যদি শত্রুসৈন্য থাকে, তাহলে তাকে ইচ্ছামত পঙ্গু অথবা হত্যা করা যাবে। দুশো ফিটের ওপরে থাকলেও তাকে আহত করে দেওয়া সম্ভব। তেমনি কোথাও বিক্ষোভ-হাঙ্গামা হ'লে হাঙ্গামাকারীদের ছত্রভঙ্গ করা ব্যাপারে দ্রুত কম্পনসম্পন্ন অতিশব্দ সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করে যথেষ্ট উপকার নাকি পাওয়া যাবে এ্যাটমের সুস্থ প্রয়োগ না করে মানু তার অপকারের দিকটাতে যেমন বে গুরুত্ব আরোপ করেছে, হয়তে অতিশব্দের প্রয়োগের বেলাতে সেটা ঘটতে পারে। আমাদের কা ভ্য় নয়।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। মহেন্দ্র ততক্ষণে ট্রানসিসটার রেকর্ড প্লেয়ারে বিলাতী গানের রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েছে। ক্রমশ বোতল খালি হয়ে এসেছে। আর চিন্ময়, অরুণ মেতে উঠেছে গল্পে। গান ডুবে গেছে ওদের কথাবার্তার কোলাহলে, সুচিত্রা আরও ঘন হয়ে বসেছে অরুণের কাছে, বার বার কাঁধে মাথা রেখেছে। অরুণের একটা হাত সস্নেহে সব সময় সুচিত্রাকে জড়িয়ে রেখেছে আর তাদের কথা-বার্তায় মাঝে মাঝে যোগ দিয়েও রমা যেন দূরের কোন অন্য জগতে থেকে গেছে সব সময়।

রমা একটা গান কর।

কি যে বল !

কেন? আগে তো বেশ ভাল গান করতে।

আর করি না।

একদম না?

না---

সব আগে। বুঝলেন সেন। সবই আগে---বর্তমানে নয়। অন্তত এই সাত বছরে আমি ওকে কোনদিন গান করতে দেখি নি।

চিন্ময় আস্তে আস্তে বলল।

তার গলার স্বর শুধু ভারী নয়, খানিকটা অনুযোগ যেন মেশান।

আশ্চর্য!

অরুণ সুচিত্রার হাতে মৃদু চাপ দিল—কি আশ্চর্য?

চিন্ময় করুণ হেসে জিজ্ঞেস করল। তারপর একবার রমার দিকে তাকিয়ে বলল—

আশ্চর্য কি আর? ও তো একটা পুতুলের মত। আমার তো মনে হয় ওর মধ্যে কোন জীবনী শক্তি নেই। টু-মাচ টিমিড্।

না---

ভারী গলায় বলল অরুণ।

ও টিমিড্ নয়। কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে জাগাতে পারে নি।

কি বললেন?

গল্প

প্রায় অনুচ্চারিত কথাগুলো চিন্ময় শুনতে বা বুঝতে পারে নি।

না, কিছু না, চিত্রা, ভাল লাগছে?

সুচিত্রাকে আরও কাছে টানল অরুণ। আর রমার দু'চোখ হঠাৎ জলে ভরে এল। নবকুমার জাগাতে পারে নি। ঠিকই বলেছে অরুণ। কে জাগাবে? কাকে? ভীড় করে এল অনেক কথা। বিয়ের পর কি জীবন সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল, আর কি হল। অথচ বাইরে থেকে কত লোক তাকে হিংসেই করে। এমন স্বামী, এমন সংসার, এত স্বাচ্ছন্দ্য। নিজের মনের ভেতর পর্যন্ত অনুসন্ধান করল রমা, কোথাও কোন সঙ্গ নেই।

তপতী রায়

একেবারে একা সে। ম্যাথু আর্ণল্ডের কবিতার "উই মরটাল মিলিওনস্ লিভ এলোন"। সারাজীবনই তো তাকে এমনি সহস্র লোকের মাঝেও একা-কিত্বের বোঝা বহন করতে হবে। আজও তাই।

হঠাৎ অরুণের গলা শুনল।

রমা, চিত্রা কিন্তু খুব ভাল গান জান।

তাই নাকি? আপনি গান তাহলে।

বাঃ, ওর যত সব বাড়িয়ে বলা।

বাড়িয়ে না, সত্যি। চিত্রার গান আমার খুব ভাল লাগে।

তোমার ভাল লাগে বলেই তো গাই গো। না হলে আমি বুঝি জানি না যে মোটেই ভাল গাইতে পারি না আমি।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল কিছুক্ষণ।

অরুণ, কিছু মনে কোর না। তোমাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?

পাঁচ বছর। তবে পাঁচ বছর ঠিক বিয়ে নয়। কোর্টশিপ চলছে বলতে পার।

মানে?

চিন্ময় অবাক হ'ল।

চিত্রার স্বামী ওকে এতদিন ডিভোর্স দেয় নি।

তাহলে? তিনি কোথায়?

তিনি আমেরিকায় একজন মার্কিণী মহিলার সঙ্গে আরামে আছেন আজ সাত বছরের ওপর। অথচ কিছুতে ডিভোর্স দেবেন না।

কারণ?

হঠাৎ আলো

কারণ তিনিই জানেন। তবে ওসব কেয়ার করি না। আইন মানতে গিয়ে নিজেদের জীবন তো নষ্ট করতে পারি না। আফ্টার অল ওয়ান লাইফ্ টু লীভ।

তাহলেও।

না, এই গত মাসে ডিভোর্স পাওয়া গেছে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে। বোধ হয় ভদ্রলোকের নিজের দরকার, তাই মাস কয়েক আগে ছুটে এসেছিলেন নিজে। ওকে গত মাসে মুক্তি দিয়েছেন।

তাহলে তো তোমরা এখন বিবাহিত।

না, আইনত এখনও নয়। এক বছর আরও অপেক্ষা করতে হবে।

বাব্বা:। আচ্ছা ব্যাপার তো। কিন্তু এভাবে---যাক্---

চিন্ময় কথাটা যেন শেষ করল না। না না, যাবে কেন? ইম্মর‍্যাল বলছেন এই তো? মি: বোস, আমার চিত্রার সুখ আমার কাছে সব থেকে বড়। ওকে একা ভাসিয়ে দিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারি না। আমি কি নিজেও কম ধাক্কা সহ্য করছি সমাজে? কিন্তু ওর চোখের জল যে মোছাতে পেরেছি, সেই আমার সব থেকে বড় পুরস্কার।

অরুণের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল সুচিত্রা।

গ্লাসটা ঠিক চোখের সামনে ধরে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হঠাৎ মোটা গলায় বলল চিন্ময়—

জানি না, এ এমন কি জিনিষ—যার জন্য আপনারা এত সব রিস্ক নিতে পারেন। আপনার দুর্ভাগ্য বলব মি: বোস। কিন্তু নো রিস্ক, নো গেম।

হাসল অরুণ, আর ওদের দিকে তাকিয়ে রমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অবশ্য একেবারে হতাশ হবার মত নয় মি: বোস। কাশীতে গিয়ে শিব সাক্ষী করে একটা বিবাহ গোছ করে নিয়েছি। সবই চিত্রার ইচ্ছা। ওর খুব গোঁড়ামী আছে।

গোঁড়ামী নয়, এটা প্রয়োজন।

চিন্ময় বলেই চুপ করে মনে মনে বলল: গোঁড়ামীর তো পরাকাষ্ঠা।

চিত্রা। এবার একটা গান শুরু কর।

কি গান গাইব?

যেটা তোমার ইচ্ছা।

একটু গুন্ গুন্ করে চিত্রা আরম্ভ করল।

'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান।'

গানের মধ্যে যোগ দিল অরুণ। তারপর একসময় রমার দিকে তাকিয়ে বলল—

রমা। তুমিও যোগ দাও না।

না—প্রায় কান্নাভরা গলায় বলল রমা। তারপর হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নীচু করল।

একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অরুণ। চিন্ময় ততক্ষণে তার খালি গ্লাসে আরও হুইস্কি ঢেলেছে। রমা বুঝতে পারছে মাত্রা ছাড়াচ্ছে চিন্ময়। অবশ্যই যথারীতি এর পর ও ঘুমিয়ে পড়বে। খাওয়া হবে না এই যা। আর রমার কাছে ওর ঘুমই কাম্য। না হলে বড় বিরক্ত করবে শোয়ার পর। তবু এমব কোন কথা ভাবতে ভাল লাগছে না, ওর দু'চোখ ভরে এসেছে জলে। না, ও কোন বিষপান করে নি, অন্তত এতদিন তাই জানত, কিন্তু আজ এই সন্ধ্যায় এই আলোছায়ার রহস্যময় নেশাধরা বারান্দায় বসে তার হঠাৎ মনে হল, সে বিষপান করতে চায়, সেই চরম অতৃপ্তিতে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে থাকতে চায়। প্রাণ সমর্পণ করতে চায়, কিন্তু কাকে? চিন্ময়কে? আজ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল সে চিন্ময় নয়। তবে অরুণ? তার বহুদিন আগের ফেলে আসা কলেজ জীবনের প্রায় ঘনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া তার মুগ্ধ ভক্ত অরুণ? না, তাও নয়। এরা কেউ নয়, এমনকি যার সঙ্গে তার প্রথম সম্বন্ধ হয়ে দিনস্থির পর্যন্ত হয়েও বিয়ে হয় নি, সে-ও না।

কিন্তু শুধু একজন। যাকে জানে না, চেনে না—যার হয়ত অস্তিত্বই নেই, তেমন কেউ। যাকে ভালবাসলে সে দূরে গিয়েও ভুলতে পারবে না। কাছে থেকেও খুঁজে পাবে না, তেমন কারও জন্য এক মন-কেমন-করা কান্নায় তার হৃদয় ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

* * *

যখন মুখ তুলল, তখন চিন্ময় তার ঘরে চলে গেছে। শুধু অরুণ সুচিত্রার মাথাটা নিজের বুকের পাশে নিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

রমাকে উঠতে দেখে ও সুচিত্রাকে নাড়া দিল—চিত্রা। ওঠ, ঘরে যাও, আমি আসছি।

তুমিও এস, দেরী ক'র না।

মা না, দেরী করব না, যাও। রমা বস, একটু কথা আছে।

কোন কথা না বলে রমা বসে থাকল।

রমা।

কি।

কাঁদছিলে কেন?

দু:খিত।

নিজের নাক-চোখ মুছল রমা।

দু:খিত হবার মত কিছু নেই। তুমি তেমনিই আছ।

না, অনেক—অনেক বদলে গেছি আমি।

কিছুমাত্র না। তেমনি ইমোশনাল, কিন্তু কেন রমা?

চিন্ময় বাবু তো—

খুব ভাল লোক। আমার মন বুঝি এমনি খারাপ হ'তে পারে না।

পারে তবে আজ বোধ হয় কথাটা ঠিক নয়। আমার মনটাও তুমি দুর্বল করে দিলে রমা।

কেন?

কেন জান না?

না। অবশ্য জানতে চাইও না।

শোন রমা, তোমাকে আমি ভুলিনি ভুলতে পারি না। এক সময় তুমি আমার কতটা ছিলে।

কেন বানিয়ে বানিয়ে বলছ অরুণ। তোমাকে তুমি কতটা ভালবাস তা তো জানতে আমার বাকী নেই।

ভালবাসি, হয়ত হবে। হয়ত ভালবাসাই আমার স্বভাব বলে।

ভালই তো।

না। শুধু তাই নয়। যাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে নতুন জীবন দিয়েছি তাকে রক্ষা করাও যে আমার কর্তব্য রমা।

কোন উত্তর দিল না রমা।

আমি তো জানতাম তুমি সুখেই আছ।

আছিই তো।

না, সেটা যে কত বড় মিথ্যে, আজ আমি তা বুঝতে পারলাম।

বাঃ, হঠাৎ ইমোশনাল হয়ে কেঁদেছি বলে ভেবে নিলে সারাজীবন দুঃখেই কাটছে আমার?

না হলেই সুখী হব। কিন্তু, যাক—

অরুণ। একটা কথার জবাব দেবে?

বল।

তুমি সুচিত্রাকে খুব ভালবাস, না।

খুব কাকে বলে জানি না, তবে ভালবাসি। ও আমাকে মস্ত বড় যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

যন্ত্রণা?

হ্যাঁ, অপমানের যন্ত্রণা। তোমার বিয়ে হ'য়ে যাবার পর সকলের চোখে আমি এমনিই অবজ্ঞাত আর উপহাসের পাত্র হলাম, তখন সুচিত্রাই আমাকে সব অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। আমাকে ও আশ্রয় দিয়েছিল। অথচ তখন ও নিজেই অসহ্য অপমানে দিন কাটাচ্ছে। ওর স্বামী ওকে শুধু মারধোর করেই ক্ষান্ত থাকেনি। ওর গয়নাগাটি সর্বস্ব নিয়ে আমেরিকায় পালিয়েছে ওকে একা ফেলে। কি নিরাশ্রয় অবস্থা ওর। অথচ আমাকে ও বুকে টেনে না নিলে আমার কোথায় আশ্রয় ছিল বল?

অরুণ তুমি জান না, তোমাকে ও আশ্রয় দিয়ে নিজেই আশ্রয় পেয়েছিল।

হ'তে পারে, কিন্তু আমার সে সময়ে বড় প্রয়োজন ছিল ভালবাসার, না হলে আমিও বোধ হয় বাঁচতাম না। অথচ তখন আমি একেবারে যাকে বলে কপর্দকশূন্য। সব খরচ ও বহন করেছে। আজ অবশ্য আমি বড় চাকুরে। কিন্তু তখন?

জানি না অরুণ, কিন্তু তোমাদের দেখে আজ মনে হ'ল তোমরা পরস্পরকে ভালবেসে কত সুখী। একে অন্যকে পূরণ করছ। কিন্তু আমি কত একা।

আমারও সেটা মনে হয়েছে রমা। তুমি বোধ হয় খুব একা, না?

ভীষণ একা অরুণ, ভীষণ একা। আমার এ নিঃসঙ্গতা যে কত বড় তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এসব তো ভুলেই ছিলাম। এ জগৎকে তো একেবারে অতীত করে দিয়েছি, শুধু যদি তোমাদের না দেখতাম। কেন তোমরা এলে?

দু'হাতে মুখ ঢাকল রমা।

অনেকক্ষণ পর যেন বহুদূর থেকে ডাকল অরুণ।

রমা।

কি?

তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাস না?

এতদিন জানতাম ভাসবাসি। এটাই সহজ সাধারণ ভালবাসা। কিন্তু আজ বুঝেছি হয়ত আমাদের ভেতর ভালবাসা জিনিষটাই জন্মায়নি। আমার ভাবতে বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে যে, চিন্ময়কে আমি ঠকিয়েছি।

না ঠকাও নি। তা ছাড়া ইট্ ইজ নেভার টু লেট। ওকে সমস্ত আবেগ দিয়ে ভালবাস রমা, দেখবে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। রমা, জগতে ভালবেসে নিজেকে দিয়ে দেওয়ার থেকে বড় আনন্দ, বড় মুক্তি আর নেই।

জানি অরুণ, কিন্তু স মুক্তি তো ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না।

আমার দিকে চেয়ে দেখ রমা। পারবে না আবার চিন্ময়কে নতুন করে ভালবাসতে?

জানি না।

না, জানি না নয়। চিন্ময় খুব ভাল লোক।

আমি তো বলিনি খারাপ। কিন্তু বলা অনুচিত, তবু তোমার কাছে কিছু গোপন রাখব না। ও এত স্থূল, আমরা যেন দু'জনে দু'জগতের লোক। কি ক'রে একাত্ম হব অরুণ? এতদিন তো সহ্যই করেছি, চিরদিনই করব, কিন্তু নিজের কাছে তো নিজের ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে।

কোন ফাঁকি নয়। তোমার নিজের হাতে সব। রমা, সুখ পায়ে হেঁটে আসে না, তাকে কুড়িয়ে নিতে হয়।

কোন কথা না বলে রমা দূরে তাকিয়ে রইল। দূরের অন্ধকার আকাশে তখন মিটমিট করে জ্বলছে অসংখ্য তারা।

তোমরা সব খাবে না? চল, সব প্রস্তুত হয়ে গেছে।

সুচিত্রা খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, হাতে একটুকরো মাছভাজা। অরুণের মুখে একটুকরো ভেঙে দিয়ে রমাকে জিজ্ঞেস করল—আপনাকে দেব?

না—

আমাকেই বা হঠাৎ এখন মাছভাজা দিলে কেন চিত্রা?

বারে, ইঞ্জিনে কয়লা না দিলে ইঞ্জিন চলবে কি করে?

সত্যি চিত্রা, তুমি না থাকলে বাঁচতাম কি করে তাই ভাবি।

ওদের দিকে একবার অপলক দৃষ্টিতে তাকাল রমা। তারপর উঠে নিজের ঘরে দ্রুতপায়ে ঢুকে গেল রমা।

●

তারপর তো যথারীতি ঘুমিয়েই পড়েছিল ওরা। কিন্তু রমার ঘুম বার বার ভেঙে যাচ্ছিল। ওঘর থেকে শব্দমাত্রকে ওদের প্রেমালাপ বলে মনে করে অকারণে যন্ত্রণা পেয়েছে। ঘুমের ভেতর রমার বুকের ভেতর যন্ত্রণার মুচড়ে উঠেছে বার বার।

জানলা দিয়ে দূরের আকাশে তাকাল রমা। একটা তারা তীরবেগে নীচে নেমে চলেছে কোথায় কে জানে। এই বিরাট মহামণ্ডলে তার কোথায়

যে দেশকে হিটলারও সমীহ করতেন

****

সুইজারল্যাণ্ডকে আমরা ইউরোপের সৌন্দর্যের রাণী বলেই জানি। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূট-নীতিতে তার ভূমিকার খবর ক'জনই বা রাখি। তবুও একটা জিনিস হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে সুইজারল্যাণ্ডের শহর জেনেভায় মিলিত হয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। প্রতিনিধিরা কি সুইজারল্যাণ্ডের রূপের আকর্ষণেই সেখানে গিয়েছিলেন। না, এর কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটাই এখানে আলোচ্য।

কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো যখন কোনো কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন, সেই সময় তিনি যদি অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ১০ মিনিট কথা বলেন, সুইস রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে হয়তো কথা বলবেন ১ ঘণ্টা ধরে। কেননা সুইস রাষ্ট্রদূতকে নিজের দেশ ছাড়াও, যেসব দেশের সঙ্গে কিউবার কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেণ্টিনা, গুয়াটেমালা, হাইতি—ইত্যাদি) সে সব দেশেরও প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সুইজারল্যাণ্ডের এই ভূমিকা নতুন নয়। একটি দেশ আর একটি দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে, বন্ধ দূতাবাসের সম্পত্তি রক্ষা থেকে আরম্ভ করে নানারকম কাজকর্ম ও নানা ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব করতে হয় সুইজারল্যাণ্ডকেই। ফলে, ইউরোপের ছোট্ট এই দেশটির ভূমিকা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুইজার-ল্যাণ্ডের বৈদেশিক বিভাগের একটি শাখা—বৈদেশিক স্বার্থ শাখাকেই (Foreign Interests Division) সারা বিশ্ব জুড়ে হাজারখানেক কর্মচারী বহাল করতে হয়েছিল অন্যান্য দেশের পক্ষে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যাদি করে দেবার জন্য।

আশীষ দত্ত

সুইজারল্যাণ্ডকে বিভিন্ন দেশের হয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বহিষ্কৃত ও পলাতক নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। নিরপেক্ষতার প্রমাণ রাখবার জন্য

হিটলার

অনেক চিরাচরিত কূটনৈতিক কাজ সুইজারল্যাণ্ড করে না। যদিও রাষ্ট্র-দূতের অনেক কাজই সুইস কর্মচারীরা করেন, কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রদূতের মতো গোপন রাজনৈতিক ও সামরিক রিপোর্ট তাঁরা তৃতীয় দেশে পাঠান না। এ ছাড়া আরো নানারকম সমস্যা নিয়ে সুইস কর্মচারীদের ভাবতে হয়। কিউবা কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবার আগে জনৈক আর্জেণ্টিনীয় ব্যবসায়ী বহু টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি কিউবায় পাঠান। কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিউবার কর্তৃপক্ষ সেগুলির দাম দিতে অস্বীকার করেন। ব্যবসায়ীটির অনুরোধে সুইস কর্মচারীরা চুক্তির মূল কাগজপত্র দাখিল করে কিউবার কাছ থেকে দাম আদায়ে সমর্থ হন।

কয়েক শতাব্দী ধরে সুইজারল্যাণ্ড অবিচল ও নিষ্ঠাভরে নিরপেক্ষ। তাই হয়তো বিশ্বের যাবতীয় দেশ আন্ত-র্জাতিক ও কূটনৈতিক নানা ব্যাপারে সাহায্যের জন্য সুইজারল্যাণ্ডের কাছে ছুটে যায়। নিরপেক্ষতায় তাঁদের নিষ্ঠা এতদূর যে, তাঁরা রাষ্ট্রসংঘেও যোগ দেন নি। এমন কি, নিরপেক্ষ দেশগুলির বৈঠকেও সুইজারল্যাণ্ড সাধারণত যোগ দেয় না। এ বিষয়ে সুইসদের বক্তব্য: আমরা এদিকে বা সেদিকে ভোট দিলেই তো আর নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না। ফরাসী ও আলজিরীয়দের সংঘর্ষের শেষদিকে দু' পক্ষই একটি শান্তি বৈঠক ডাকার জন্য সুইজারল্যাণ্ডকে অনুরোধ করে। বৈঠকের ব্যবস্থা করা হলো সত্য, কিন্তু বিবদমান দুই পক্ষ দুই গোঁ ধরে বসলেন। ফরাসীরা ফ্রান্সের বাইরে বৈঠক করতে রাজী হল না। আলজিরীয়রাও প্যারিসে তাদের শান্তি মিশন স্থাপন করতে ও আলোচনা-কালে সেখানে গিয়ে থাকতে রাজী হল না। তখন সুইজারল্যাণ্ড আল-জিরীয়দের সুইস হ্রদ লীম্যানের ওপর এক বিলাসবহুল হোটেলে থাকতে অনুরোধ জানাল। প্রতিদিন সকালে তিনটি সুইস হেলিকপ্টার আলজিরীয়

জায়গা আছে কে তা জানে। কিন্তু রমার এ স্থির বিশ্বাস কিছুই নষ্ট হয় না, আবার নতুন করেই সুরু হয় তার ---ক্ষণমাত্র রূপান্তর ঘটে। নিজের মন কি নিজেই জানে রমা? ঘুমন্ত চিন্ময়ের দিকে একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে তার পাশে এসে শুয়ে পড়ল রমা।

একটু দ্বিধা করে চিন্ময়ের বুক থেকে পাশবালিশটা সরিয়ে ওর বিরাট লোমস বুকে নিজের মাথাটা গুঁজে দিল।

॥ সমাপ্ত ॥

প্রতিনিধিদলকে প্যারিসে নিয়ে যেত এবং রাত্রে বৈঠক শেষে তাঁদের আবার হোটেলে ফিরিয়ে আনত। সুইসদের এত মেহনত বৃথা যায় নি। বিবদমান দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সুইজারল্যাণ্ডের ভূমিকা ছিল খুবই স্মরণীয় ও প্রশংসনীয়। সুইস কর্মচারীদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও দ্রুত কাজকর্মের ফলে শত শত লোকের প্রাণ ও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সুইজারল্যাণ্ড মিত্রশক্তির পক্ষে ৮৫টি মিশন ও অক্ষশক্তির পক্ষে ৪১টি মিশন চালিয়েছিল। যুদ্ধের সময় এই কাজ যেমন কঠিন, তেমনি বিপজ্জনক।

যুদ্ধের শেষ দিক। জার্মানীর ড্রেসডেনে তখন মিত্রশক্তি বোমা ফেলছে। হিটলার খবর পেলেন যে, বোমা ফেলার ফলে ড্রেসডেনের ৪০,০০০ অধিবাসী প্রাণ হারিয়েছে। এ কথা শুনে ফুয়ার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ও বদলা হিসাবে ২৫,০০০ আমেরিকান যুদ্ধ-বন্দীর প্রাণনাশের হুকুম দেন। প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস প্রধান বেতার ভাষ্যকার হ্যান্স ফ্রিটস্কিকে অবিলম্বে এই ঘোষণা প্রচার করতে নির্দেশ দেন। ফ্রিটস্কি এই নৃশংস হুকুমে বিচলিত হন এবং গোপনে বার্লিনের সুইস রাষ্ট্রদূত পিটার এইন ফেলডস্কারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।

ফেলডস্কার জানতেন যে, হিটলার মিত্রশক্তির অনুরোধ-উপরোধে কর্ণপাতও করবেন না। তিনি এও জানতেন যে, সেই মুহূর্তে যুদ্ধজয়ের নেশায় আরো সৈন্যের জন্য হিটলার হন্যে হয়ে উঠেছিলেন। তখন বার্ন (সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী) থেকে অনুমতি আনারও সময় নেই। তাই ফেলডস্কার জার্মান কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, আমেরিকার পক্ষ থেকে ২৫,০০০ যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের আলোচনা করতে চান। হিটলার কিছুটা নরম হয়ে আমেরিকান যুদ্ধবন্দীদের প্রাণনাশের হুকুম প্রত্যাহার করেন। অবশ্য সেই আলোচনা আর শুরু হতে পারে নি। তা শুরু হবার আগেই যুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু ফেলডস্কারের জন্যই ৪০,০০০ আমেরিকান যুদ্ধবন্দী নিশ্চিতমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান।

বিভিন্ন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে নানা কৌতুকের সন্ধানও পাওয়া যায়। একজন সুইস কূটনীতিবিদের মুখেই শুনুন: "ধরুন একটি দেশের কর্মচারীদের কাছে তাঁদের শত্রুর পক্ষ থেকে গেলাম, তখন তাঁদের অভ্যর্থনায় আন্তরিকতার লেশমাত্রও থাকে না। ধরুন এর পাঁচমিনিট পরেই আমি আমার নিজের দেশের পক্ষ থেকেই একই কর্মচারীদের কাছে গেলে খুবই খাতির পাই। চা-চুরুট প্রভৃতি দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত করা হয়। এটা কি দ্বৈতব্যক্তিত্বের ব্যাপার? আমি জানি না।"

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যাওয়া একটি ব্যয়বহুল ব্যাপারও বটে। কেউ বা বলবেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। না, তা ঠিক নয়। "প্রতিনিধি" দেশগুলির কাছ থেকে সুইজারল্যাণ্ড যাবতীয় খরচা আদায় করে থাকে। কিন্তু কূটনীতিবিদদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন দেশে মিশন স্থাপন করতে গিয়ে সুইজারল্যাণ্ডকে গাঁটের কড়ি যে খরচ করতে হয়, তা সত্য। যুদ্ধের বছরগুলিতে বৈদেশিক স্বার্থ শাখায় (Foreign Interests Division) সুইজারল্যাণ্ড লক্ষ লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করেছিল।

বিশ্ব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সুইজারল্যাণ্ডের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যুদ্ধ ও সংঘর্ষবিধ্বস্ত পৃথিবীতে সুইসরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে, মানুষের যুদ্ধের পাগলামীকে চূড়ান্ত হতে না দিয়ে একটা যোগসূত্র বজায় রাখবার যে চেষ্টা করেছে, তা অতুলনীয়। এমন একটা দেশ না থাকলে আমাদেরই হয়ত এমন একটি দেশ বা প্রতিষ্ঠান গড়তে হত, কেননা রাষ্ট্রসংঘের ক্ষমতা ও গতিবিধি খুবই সীমাবদ্ধ। সৌভাগ্যক্রমে ঐতিহ্যবাহী এমন একটি দেশ আছে, তাই আমাদের আর গড়তে হয় নি। ইউরোপের ছোট দেশ সুইজারল্যাণ্ড ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র লুক্সেমবার্গ থেকে আরম্ভ করে বিশাল রাশিয়া—কেউই হিটলারের ঝটিকাবাহিনীর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। সেই হিটলারও সুইজারল্যাণ্ডের গায়ে হাত দেন নি। সুইজারল্যাণ্ডের ঐতিহ্যজগৎমান্য নিরপেক্ষতাকে হিটলারের মত বেপরোয়া লোকও সমীহ না করে পারেন নি।

বিবেকানন্দ প্রশস্তি

"বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম, তখন আমার বয়স পনেরোও হবে কি না সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা তখন আমার ছিল না।—কিন্তু কয়েকটা জিনিষ একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অজস্র জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

['ভারত-পথিক' থেকে সঙ্কলিত]

রূপ রস বর্ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পন্দিচেরী এসেছেন আগ্লোয়া জেনারেল বুশীর আহ্বানে। আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে দুর্বল বহুখণ্ডিত ভারতে শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন সর্বপ্রথমে দেখেছিলেন দ্যুপ্লে, পন্দিচেরীর সর্বাধিনায়ক ফরাসী-ভারতের গভর্নর জেনারেল। সুশিক্ষিত শৃঙ্খলাবদ্ধ মুষ্টিমেয় সেনা দ্বারা কি-ভাবে অশিক্ষিত শৃঙ্খলাহীন সংখ্যা-গরিষ্ঠ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা যায়, সে কৌশলটি সর্বপ্রথমে তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর পক্ষপাতিত্বে হায়দরাবাদ ও কর্নাটকের শক্তিপরীক্ষায় জয়ী হলেন ক্লাইভ, হেরে গেলেন দ্যুপ্লে, সমস্ত দক্ষিণ ভারতে প্রথম পর্বে ফরাসী প্রাধান্য বিস্তার করে শেষ পর্বে কিস্তিমাৎ হয়ে গেলেন ইংরেজের হাতে। কারণ উৎকোচ ও ছলনার গোপন অস্ত্রটি জানা ছিল না দ্যুপ্লের, যেমন জানা ছিল ধূর্ত ক্লাইভের।

ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুঝলো না দ্যুপ্লের মর্ম, দিল না কোনো মূল্য, অপমানের গ্লানি বহন করে ফিরে যেতে হলো তাঁকে ফ্রান্সে। দ্যুপ্লের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভাগাভাগি করে কোম্পানী পাঠিয়েছে, সেনাধ্যক্ষের পদে জেনারেল বুশীকে এবং ব্যবসার দায়িত্ব ও শাসনভার দিয়ে কাউণ্ট ললীকে।

বুশীর খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে দাম্ভিক ও রূঢ়ভাষী ব'লে, তাই সারা পথ আগ্লোয়া বেশ কিছু চিন্তার মধ্যে ছিলেন। তিনি নিজেও স্পষ্টভাষী, আত্মসম্মান বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন।

দিব্যদর্শী

ইস্পাতের অস্ত্রে ইস্পাতের আঘাত পড়লে ঝনঝন ক'রে ওঠে, এক্ষেত্রেও তেমনটি হওয়া খুব অসম্ভব হয়তো নয়।

ফোর্ট লুই কেল্লায় প্রথম সাক্ষাতে মনে হলো লোকটি আর দশজনে যে রকম চলে-ফেরে কথা বলে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দেহ বিশাল, বিরাট গোঁফ লাঞ্ছিত বদনমণ্ডলে কামানোর কঠিনতা, কণ্ঠস্বর কর্কশ। প্রাথমিক করমর্দনের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আগ্লোয়া বুঝতে পারলেন না সেটা সহৃদয়তার প্রকাশ কিম্বা বিরূপতার লক্ষণ। তার পরে যখন গরমের কথা উল্লেখ করে কোটটি খুলে বসতে বলা হলো তখনও আগ্লোয়া বুঝতে পারলেন না, ওটা অনুরোধ কিম্বা আদেশ।

দু'গেলাস ডাবের জল টেবিলের 'পরে ছিল, বুশী আগ্লোয়াকে তার একটি দেখিয়ে দিয়ে আরেকটিতে চুমুক দিলেন।

'মদ আমি স্পর্শ করি না কর্নেল, কেউ আমার সামনে খায় তাও পছন্দ করি না, সিগারেটের ধোঁয়াও আমার বরদাস্ত হয় না। ডাবের জলের ব্যবস্থা কেন এবং ছাইদানি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন বোঝা গেল।

বুশী ডুবে গেলেন একটি ম্যাপের ভিতরে। আগ্লোয়া সামনে বসে আছেন সেদিকে যেন খেয়ালই নেই। অনেক-ক্ষণ পরে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ছেলেপুলে ক'টি?'

'দু'টি।'

'ভাল, বেশী ছেলেমেয়ে হওয়া ঠিক নয়। ফ্রান্সেই আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল, এদেশের সমাজটা ভাল নয়।'

ম্যাপটা আবার গ্রাস করে নিল বুশীকে। অথবা তিনিই ম্যাপটাকে গোগ্রাসে গিলে ফেলতে চাচ্ছেন, যেন সময় আর পাবেন না। হাতের কাছে একটা ঘণ্টা ছিল, অনেকক্ষণ পরে ম্যাপ দেখতে দেখতেই তিনি ঘণ্টা বাজালেন। যাকে ডাকবার জন্য ঘণ্টা বাজালেন সে এসে পৌঁছেছে কিনা না দেখেই বলে উঠলেন—'আঁদ্রে, কর্নেল আগ্লোয়াকে দেখিয়ে দাও কোন ঘরে থাকবেন, আমার ডিনার এখানেই দিয়ে যাও।'

লোকটি অভদ্র, ছোটঘরে জন্মেছে ভাবেন আগ্লোয়া। খেতে খেতে আরো ভাবেন তাঁকে কর্নেল বলে সম্বোধন করলেন কেন, মেজর না ব'লে? তিনি তো আসলে মেজর?

সমুদ্রের দিকে কেল্লার একটি ঘর দেখিয়ে স্যালুট করে চলে গেল লোকটি আরেকজন এসে স্যালুট করে দাঁড়ালো। 'আমি জীন দেলতর, যখন যা দরকার আমাকেই হুকুম করবেন কর্নেল।'

ঘরে ঢুকেই আগ্লোয়ার চোখে পড়লো লাল ফিতেয় বাঁধা একটা খুব বড় লেফাফা, উপরে তাঁরই নাম লেখা। লেফাফা ছিঁড়তেই দেখা গেল একটি হুকুমনামা, জেনারেল বুশীর সই, মেজর বারবিয়ে ইউজেন আগ্লোয়া কর্নেলের পদে উন্নীত হয়েছেন।

পরের দিন সমস্ত দিনের মধ্যে বুশীর দেখা পাওয়া গেল না, অথচ তিনি নাকি কেল্লার ভিতরেই আছেন। মেজর মর্তিমার এবং আরো অনেক ক্যাপ্টেন ও লেফটেনেণ্টের সঙ্গে আলাপ হলো আগ্লোয়ার, তাঁদের কাছে শুনলেন জেনারেলের জন্য শহরের মধ্যে একটি সুন্দর বাড়ির বন্দোবস্ত করা হয়েছিলে, কিন্তু তিনি যাননি, কেল্লার ভিতরেই দু'খানা ঘর নিয়ে আছেন, একখানা শোবার ঘর, একখানা আপিসঘর, আপিসঘরের টেবিলে বসেই খান, কখনো ডাইনিং রুমে আসেন না। বুশীর আরো অনেক খামখেয়ালির কথাও জানা গেল।

পরের দিনও বুশী ডেকে পাঠালেন না দেখে আগ্লোয়া বিস্মিত হলেন, মেজর মর্তিমার আশ্বাস দিলেন সেদিন রাত্রে নিশ্চয়ই দেখা হবে, গভর্নর জেনারেল কাউণ্ট ললীর কুঠীতে ভোজের আয়োজন আছে, সবাই সেখানে যাবে, বুশীর শত কাজ থাকলেও যেতে হবে, ভোরেই তিনি বেরিয়ে গেছেন, কখন আসবেন কাউকে বলে যাননি।

বুশী একটিবারও তাঁর সঙ্গে খেতে না বলায় আগ্লোয়া ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, বিকেলবেলায় গভর্নর জেনারেলের একটি চিঠি এল আমন্ত্রণ জানিয়ে। সন্ধ্যের সময় নিয়ে যেতে গাড়িও এলো। কাউণ্ট ললী এবং তাঁর পত্নীর সাদর অভ্যর্থনায় খুশিও হলেন আগ্লোয়া। কাউণ্টপত্নী নিজেই আর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পন্দিচেরী ও কলকাতার প্রসঙ্গে অন্য সবই চাপা পড়ে গেল। সবাই ঘিরে ধরেছে আগ্লোয়াকে; সবার কেন্দ্রস্থলে তিনি। ভারতে ফরাসী উপনিবেশগুলির এটাই রাজধানী, ফরাসীর সংখ্যাও বেশী, মহিলাও অনেক আছেন এখানে, চন্দননগরের মত শ্বেতাঙ্গিনী-বর্জিত নয়। মহিলারা কেউ কেউ লেদোর অশ্বেতাঙ্গিনী জীবনসঙ্গিনীর কথাও জানতে কৌতূহলী। এই দিশি আলাস যে ফরাসীদের প্রকৃত বান্ধব সে সম্বন্ধে পুরুষরাও প্রায় সকলেই অভিন্ন ধারণা পোষণ করেন দেখা গেল। ইংরেজদলের বাঙলা দেশে বিপর্যয়ে সবাই খুশি, ফলতায় তারা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে সবাই। পন্দিচেরীতে এসে অবধি আগ্লোয়ার ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। আজ এই সন্ধ্যার আসরটি সে ভাবটা কাটিয়ে দিল। বেশ আদরযত্নই মিলছে এখানে।

প্রকাণ্ড ব্যাঙ্কোয়েট হল, সারি সারি কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন মাথার উপরে, পুরু গালিচা বিছানো, সারি সারি চকচকে লম্বা টেবিলের দুই পাশে ভেলভেট-আঁটা চেয়ার, বিচিত্র রকমের সুখাদ্যের পরিবেশন ও বিবিধ সুরা।

আগ্লোয়া শুনলেন মর্তিমারের কাছে জেনারেল বুশী পঞ্চাশ মাইল দূরে এক জায়গায় কয়েকটি ঘোড়া কিনতে গিয়েছেন। সে শ্লেষ করে বলে, পল্টনের যা কিছু দরকার তা কেনবার জন্য কোয়ার্তারমাস্তার দনিগল আছে, কিন্তু জেনারেলের কাণ্ডকারখানাই আলাদা, নিজেই কয়েকটি তেলেঙ্গী সেপাই নিয়ে চলে গেছেন।

ভোজ প্রায় শেষ, এমন সময় বুশীর দীর্ঘ দেহটি দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে। গম্ভীর কর্কশগলায় শোনা গেল, 'যে যেমন আছেন চুপ করে বসে থাকুন। মাদামোজেল পিকার্তো, আপনি নিশ্চল হয়ে থাকুন, মোটেই নড়বেন না, মাত্র একমিনিট সময় সবাই আমাকে দয়া করে দিন।'

মাদামোজেল পিকার্তো স্তম্ভিত ভয়ে, বাকি সকলে হতভম্ব। কেউ কারু দিকে তাকাচ্ছেন না, কথার স্রোত সহসা স্তব্ধ। কোনো একটা বিপদ আসন্ন—সে আশঙ্কা উপস্থিত সকলকে যেন প্রস্তরীভূত করে দিয়েছে।

গুড়ুম গুড়ুম, গর্জন করে উঠলো বুশীর পিস্তল। মাদামোজেল অনুভব করলেন একটি আগুনের হল্কা তাঁর স্বর্ণবর্ণ কবরীর নিম্নে সুকোমল কণ্ঠদেশের পশ্চাতে। চৈতন্যলুপ্ত হয়ে গেল তাঁর।

জেনারেল বুশী ত্বরিৎপদে সুন্দরী তরুণীর দেহটি দুই হাতে তুলে নিয়ে চললেন পাশের ঘরে, ইশারায় গৃহপত্নী কাউণ্টেস ললীকে অনুসরণ করতে অনুরোধ জানিয়ে।

অভ্যাগতরা এখন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, বুশী উন্মাদ, বুশী খুন করেছেন, বুশীর কৈফিয়ৎ কী? কিন্তু সাহস পেলেন না বুশীর পেছন নিতে, আবার বুশীর কর্কশ কণ্ঠের আদেশ, 'আপনারা এঘরেই থাকুন, খবরদার ওঘরে যাবেন না।'

অচৈতন্য মাদামোজেলকে শুইয়ে দেওয়া হল বিছানায়। বুশীর অজানা নাই কুঠীর কোথায় কী আছে, কাউকে হুকুম করলেন না, নিজেই একগ্লাস ব্রাণ্ডি নিয়ে এসে চামচে করে অচৈতন্য মেয়েটির মুখে ঢেলে দিতে লাগলেন, কখন যে নিঃশব্দে ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে মশিয়ে ফেলিক্স বুর্জো এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ লক্ষ্য করেন নি।

আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করেন নি অভ্যাগতরা, হঠাৎ চোখে পড়লো আগ্লোয়ার। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন একটা প্রকাণ্ড বিষধর সাপ, মাদামোজেল যে চেয়ারে বসেছিলেন তার তলায় পড়ে আছে, মাথা ভেঙে গেছে গুলির আঘাতে। হৈ-হৈ করে উঠলেন সকলে, ভয়ানক বিষাক্ত এটা, কামড়ালে আর বাঁচবার উপায় থাকে না। জেনারেলের কী অব্যর্থ তাক! আর কারুরই সাধ্য ছিল না এমন জীবন-মরণের ঝুঁকি হাতে নিতে। মাদামোজেলের বরাত ভালো, ঠিক সময়ে ঠিক লোকই এসে হাজির হয়েছিলেন।

বুশী চামচ চামচ ব্রাণ্ডি ঢালছেন মাদামোজেল পিকার্তোর ঠোঁট দুটি

ফাঁক করে, হোৎকা চেহারা হলেও হাত তার নিপুণ, একটি ফোঁটাও এধার ওধার হচ্ছে না। কাউণ্টেস হাওয়া করছেন মাথায়, হঠাৎ নজর পড়লো ফেলিক্স বুর্জোর দিকে, এই অনধিকার প্রবেশে বিরক্ত হলেও তিনি কিছু বললেন না, বরং একটু হাসলেন।

ফেলিক্স বুর্জো অতিমাত্রায় সু-পুরুষ যুবক। তার বংশপরিচয় পন্দিচেরীর কেউ না জানলেও একটা চাপা সন্দেহ পোষণ করে—এ ফ্রান্সের কোনো সর্ব শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশীয়ের জারজ সন্তান, হয়তো বা স্বয়ং সম্রাট লুই'র। সে ব্যবসায়ের নাম করে বছর-খানেক হলো এসেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত সেদিকে কোনো গরজ দেখতে পাওয়া যায় নি, টাকা কোথা হতে পায়, কেউ বুঝতে পারে না, অথচ প্রকাণ্ড একটি কুঠীতে জাঁকজমকের সঙ্গে থাকে। চালচলনে, কথাবার্তায় অসাধারণ মার্জিত ভাব, বেশভূষা, রুচির শ্রেষ্ঠতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথেষ্ট ঈর্ষার পাত্র ফেলিক্স বুর্জো পন্দিচেরীতে, কিন্তু সে ঈর্ষা চাপা পড়ে আছে বিস্ময়-মিশ্রিত ভয়ে। কাউণ্ট ও কাউণ্টেস ললী অত্যধিক খাতির করেন কেন এই ছেলেটিকে, তারা অবাক হয়।

মাদামোজেল পিকার্তোও বছর-খানেক আগে এসেছে পন্দিচেরীতে। কেউ কেউ জানে সে ফ্রান্সের গ্রাণ্ড-মার্শাল পিকার্তোর প্রথম পক্ষের কন্যা, কেউ বলে গ্রাণ্ডমার্শালের নয়, তার ভাই ঔপন্যাসিক পিকার্তোর মেয়ে, যাই হোক আছে ললীর কুঠীতেই। ছ' মাসের জন্যে বেড়াতে এসে বছর-খানেক রয়ে গেছে, বাইরের লোকের সঙ্গে মেশে কম, আশ্চর্য সুন্দরী। ফেলিক্স বুর্জো প্রায়ই আসে ললীর কুঠীতে, ধরতে গেলে রোজই। লোকে চোখ বুজে থাকে না, চোখ মেলেই থাকে, এক কান দিয়ে কথা অন্য কানে যায়, সে কান দিয়ে অন্য কানে। ফরাসী সমাজ এখানে একটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, এককোণে একটু আলোড়ন উঠলে সেটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয় না।

ফরাসীরা দ্বীপবাসী ইংরেজ জাতের মত রসহীন অর্থকেন্দ্রিক জাত নয়, সৌন্দর্যপ্রিয় আনন্দপ্রিয় প্রাণোচ্ছল। ইংরেজরা টাকার মত জীবনটাকেও মেপে মেপে ভোগ করে হিসেব-নিকেশ করে, ফরাসীরা জীবনটাকে উজাড় করে ভোগ করতে জানে। মাদামোজেল পিকার্তো সুস্থ হলে ভোজ আবার সুরু হলো, তারপরে সবাই চললেন আরেকটি প্রকাণ্ড কামরায়, যেটি বলনৃত্যের 'সেলন' নাচের জন্যে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে।

বারাঙ্গনাবর্জিত চন্দননগরের উৎসব-বাসরগুলির তুলনায় পন্দিচেরীর এই আনন্দ-অনুষ্ঠান আগোয়ার শুষ্ক হৃদয়ে এক বিস্মৃত কালের স্মৃতির সরস উৎস জাগিয়ে তুললো, তিনি একটি সুকোমল নৃত্যসঙ্গিনী নির্বাচনে সচেষ্ট, এমন সময়ে তাঁর স্কন্ধদেশে স্পর্শ বোধ হলো একটি দীর্ঘ অঙ্গুলির। মাথা ফিরিয়ে দেখেন জেনারেল বুশী।

'নাচের আসর চলবে রাত দুটো পর্যন্ত, সময় আপনার যথেষ্ট আছে, কিন্তু আমার নাই। তা ছাড়া আমার পা দুটি মার্চ করতেই শিখেছে, নারীবক্ষলগ্ন হয়ে নৃত্য করতে শেখে নি, সামনে আমাদের বিস্তর কাজ, ভাববার বিষয় যথেষ্ট, আসুন কর্নেল পাশের ঘরে।'

বাজপাখীর মত ছোঁ মেরেই বুশী নিয়ে গেলেন আগোয়াকে। মনে হল এটি গভনর জেনারেল কাউণ্ট ললীর আপিস-ঘর; কর্মব্যস্ততার ছাপ চারি-পাশে, নাচের আসর থেকে এটা যেন ভিন্ন জগৎ।

পকেট থেকে ছোট একটা ম্যাপ বার করলেন বুশী, চন্দননগর গোন্দল-পাড়া ঘিরেটি ভাদকেশ্বর হুগলী চুঁচুড়োর নক্সা। এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এত ভাল জানেন দেখে আগোয়া অবাক হলেন, ভদ্রলোক ভারতে এসেছেন মাত্র মাস তিনেক হলো, তাও আবার পন্দিচেরীতে কাটিয়েছেন।

'কর্নেল, চন্দননগরের চারিপাশে যে গড়টি কাটাচ্ছেন তার প্রস্থ মাত্র তিন মিটার, পাঁচ মিটার হলে ভাল হয়। ঐ মাটি দিয়েই পাঁচিল ঘিরতে পারবেন মনে হয়, এই এই জায়গায় বুরুজ তৈরী করে কামান বসাতে হবে।'

গড়টা কত বড় তাও জানেন ইনি? কামানগুলোর মুখ বেশীর ভাগই দক্ষিণমুখো হবে, তবে কী নবাবের চাইতে ইংরেজদের সম্বন্ধে আশঙ্কা এর বেশী? কিন্তু ইংরেজরা তো কলকাতা থেকে ভেগেছে? কিছু মন্তব্য করেন না আগোয়া।

'আপনার কামান খুব কম আছে কর্নেল, আমি জানি, বন্দোবস্ত করছি ফ্রান্স থেকে। গোলাগুলী বারুদ।'

'চুঁচুড়ার ডাচরা গোপনে দিচ্ছে।'

'চমৎকার।'

'সৈন্যও বাড়াতে হবে। শত্রুকে কাছে আসতে দেওয়ার চেয়ে দূরে থাকতে ঝাঁপিয়ে পড়া ভাল। আপনাদের ওখানে ফিরিঙ্গি ও আর-মানি তো অনেক এসেছে, ওদের বিশ্বাস করতে পারেন?'

'কিছু কিছু নিয়েছি। এবং কিছুটা বিশ্বাসও বোধ হয় করতে পারি।'

'অনেক বেশী নিতে হবে। ওরা থাকবে সামনে, আমাদের সৈন্যরা তাদের পেছনে, মানে আগে কালো পেছনে সাদা, সামনে শত্রুর গুলীগোলা, পেছনে আমাদের গুলীগোলা, পালাতে চাইলেও পথ বন্ধ, আপনি কী মনে করেন কর্নেল?'

'আমিও ঐ রকমই ভেবে রেখেছি জেনারেল, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে গড় ও পাঁচিল নিয়ে টাকার অভাবে কাজ ভাল এগোচ্ছে না।'

'মঁশিয়ে রেনোকে ভেবে দেখতে বলবেন, টাকার টানাটানি আমাদের এখানেও। একটা কথা, গভর্নর জেনারেল ললী চান আপনারা নবাব

সিরাজউদ্দৌলাকে খুশি রেখে চলবেন। দ্যুপ্লে এখানকার নবাবদের গৃহবিবাদে যোগ দিয়ে ভুল করেছিলেন, সে রকম ভুল যেন আর করা হয় না, তবে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। কোনো কারণে এদেশের রাজা বা প্রজারা যদি শ্বেতাঙ্গদের উপর চটে যায়, তবে আমাদের সকলেরই ক্ষতির সম্ভাবনা, ফরাসী ইংরেজ ডাচ বলে এরা আলাদা করে দেখবে না। আরেকটা কথা আপনাকে বলা দরকার, ইউরোপে আমাদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে এখন। ওদের জাহাজ বেশী, আমাদের কম, দেশ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারি। এখানকার ঘর তখন আমাদের নিজেদেরই সামলাতে হবে, বাইরে থেকে কোনো সাহায্যই পৌঁছবে না।'

ভোরে জাহাজ ছাড়বার কথা, আগ্নোয়ার আর নাচের মজলিসে যাওয়া হলো না। বুশীর প্রস্তাবে তার সঙ্গেই কেল্লায় ফিরে চললেন এবং জেনারেল নিজেই সঙ্গে করে জাহাজে উঠিয়ে দিলেন। সিঁড়ি দিয়ে ডেকে উঠবার সময় বুশী তাঁর হাতে একটা বড় খাম দিয়ে বললেন, 'মঁশিয়ে-লা-গভর্নরের হাতে দেবেন কাউণ্ট লালীর এই গোপনীয় চিঠিটি, আপনাকেও তিনি শুভযাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বনজুর মঁশিয়ে কর্নেল।'

আগ্নোয়ার অনুপস্থিতিতে চন্দননগরে অর্লেয়াঁ কেল্লায় একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল।

কি একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে, ফিরিঙ্গি প্লেটুনের কর্পোরাল রেবেলোর সঙ্গে ফরাসী প্লেটুনের কর্পোরাল ফেরিয়ারের একপশলা মুখ খিস্তি, তারপরে ঘুষোঘুষি। ফরাসীরা দলে ভারী, তারা ফিরিঙ্গিদের ব্যারাকে ইট-পাথর ছুঁড়ে কয়েকজনকে জখম করে দিল। আরমানি প্লেটুন দু'দলকে ঠেকিয়ে না রাখলে ব্যাপারটা আরো অনেক দূর গড়াতে পারতো।

আগ্নোয়ার অনুপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন রেভিয়ারেরই সব দায়িত্ব, তিনি ক্যাপ্টেন ক্লেমেন্ত ও ক্যাপ্টেন মেনার্দকে নিয়ে তদন্ত ও বিচারের জন্য কোর্টমার্শাল বসালেন।

পাঁচজন করে ফরাসী, আরমানি ও ফিরিঙ্গি সৈন্যের সাক্ষ্য নেওয়া হলো, যারা ঘটনাটি নিজের চোখে দেখেছে। তারপর কেল্লার কয়েদখানা থেকে রেবেলো ও ফেরিয়ারকে এনে হাজির করানো হলো, হাতে হাতকড়া লাগানো।

ক্যাপ্টেন রেভিয়ার তাদের সম্বোধন করে সুরু করলেন, কর্পোরাল রেবেলো ও কর্পোরাল ফেরিয়ার, তোমরা পল্টনে ঢোকার সময় কোম্পানী ও ফরাসী সম্রাটের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলে, স্মরণ আছে?

'হ্যাঁ।'

'ফৌজী আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলবে শপথ করেছিলে?'

'হ্যাঁ'

'সে শপথ ভঙ্গ করেছো, স্বীকার কর?' কর্পোরাল-দ্বয় চুপ করে রইলো লজ্জায়।

'গত তিন বছরের মধ্যে এই কেল্লায় কোনো কোর্টমার্শাল বসে নি, আজ তোমাদের জন্যে সেই গ্লানিকর প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে। তোমরা কি লজ্জিত ও দুঃখিত?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কর্পোরাল ফেরিয়ার আমাকে কুত্তির বাচ্চা বলে অপমান করেছিল, আরো বলেছিলো কালাভূত, অভিযোগ করে রেবেলো।

'কর্পোরাল রেবেলো আমাকে শুয়োরের বাচ্চা ও সাদাভূত বলে গাল দিয়েছিল'---পাল্টা অভিযোগ করে ফেরিয়ার।

'আমরা গায়ের রঙ বা জাতের তফাৎ বিচার করি না এখানে, সমান পারিশ্রমিক, সমান সুযোগ-সুবিধা এবং সমান সম্মান দিয়ে থাক তোমাদের। একই রকমের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি, সেটা অস্বীকার করতে পারো?'

'না।'

'তবে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে না কেন, কোনো যুক্তি দেখাতে পারো?'

উভয়ে চুপ করে রইলো।

'লেফটেনেণ্ট ব্রাঁশ, ওদের হাতকড়া খুলে দিন।'

হাতকড়া খুলে দেওয়া হলো। রেভিয়ার মৃদুস্বরে আলোচনা করলেন কিছুক্ষণ ক্যাপ্টেন ক্লেমেন্ত ও ক্যাপ্টেন মেনার্দের সঙ্গে, তারপরে বললেন, 'পল্টনের শৃঙ্খলার জন্য আমাদের দুঃখের সঙ্গেই শাস্তিবিধান করতে হচ্ছে। পনের দিনের জন্যে কর্পোরাল পদ থেকে সাধারণ সৈনিকের পদে তোমাদের নামিয়ে দেওয়া হলো। এখন চলে যেতে পারো ব্যারাকে।'

জীবনকে স্রোতের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলা হয় জীবন-স্রোত। কখনো সে স্রোত চলে মন্থরগতিতে, কখনো প্লাবনের বেগে তটভূমিতে লাগে ফাটল, ঘুরে যায় অন্যদিকে। ঘিরেটি গ্রামের সৌদামিনীর জীবনেও এসেছিল একটি প্রভাত, রেখে গিয়েছিল একটি প্লাবনের উত্তাল উচ্ছ্বাস, ঘুরে গেল তার জীবনের স্রোতোধারা।

নবীন ঊষার প্রথম আলোক ফুটে উঠেছে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে। গ্রাম ছাড়িয়ে বাগানের মধ্যে সে ফুল ও বেলপাতা সংগ্রহ করে ভরছে তার ছোট বেতের টুকরিতে, গুন্ গুন্ করে গান গাইছে। ভ্রাতার গৃহে কটুভাষিণী গঞ্জনাপ্রিয় ভ্রাতৃবধূর কারাগারে সে বন্দিনী বালবিধবা, একবেলা আহারের জন্য সারাদিনের দাসীবৃত্তি। প্রত্যূষের এই স্বল্পকাল দেহে ও মনে সে স্বাধীনতার আস্বাদ উপভোগ করে। ছ'বৎসর বয়সে সে শিবপূজা আরম্ভ করে, যত বড় দুঃখ লাঞ্ছনা ও অসুস্থতাই হোক না কেন, সে শিবপূজা কখনোই কামাই করে নি, শুধুমাত্র একটি দিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল, যেদিন তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ আসে, তখন বয়স সাতবছর।

[ক্রমশ।

অভিশপ্ত হীরে

ওজনে বেশ বড়োই। সাড়ে চুয়াল্লিশ ক্যারেট। আকারেও নেহাৎ ছোট নয়। ১½ ইঞ্চি। বর্ণ খাঁটি নীল। দেখতে অনেকটা বুদ্ধমূর্তির মত।

ফরাসী ভূপর্যটক ও জুয়েলার জাঁ-ব্যাপটিস্ত ত্যার্ভেনিয়ার প্রথম সংগ্রহ করেছিলেন নীল রঙের এ হীরেটি। প্রাচ্যদেশ থেকে মহামূল্য এ রত্নটি তিনি এনেছিলেন সঙ্গে করে। আর বিক্রয় করেন ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর কাছে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে।

কিন্তু হীরেটি ছিল অভিশপ্ত। পবিত্র বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ করিয়ে এ ধারা অনুজ্ঞা ছিল : ভগবান তথাগতের পবিত্র এ রত্নটি অপবিত্র, কেউ যেন স্পর্শ না করে। যদি কেউ এ অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করে থাকে, তবে মহাদুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে তাকে। এমন কি মৃত্যুরও।

সম্রাট চতুর্দশ লুই বিপুলায়তন রত্নটি লাভ করে তো খুশিতে আটখানা। বহুমূল্যে শুধু কেনা নয়, জুয়েলারকে রাজসম্মানেও ভূষিত করলেন। বিপুল বিত্তের অধিকারী হলেন ত্যার্ভেনিয়ার।

কিন্তু সুখ বেশী দিন তাঁর কপালে সইল না। শীঘ্রই তিনি দৈন্যদশায় পতিত হন এবং একান্ত নিঃস্ব অবস্থায় কয়েক বৎসরের মধ্যে মারা যান মিশরে।

নিখিল সেন

সম্রাট লুই হীরেটি কাটবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন আমস্টার্ডম-এর উইল হেম ফলস্‌কে। কিন্তু আশ্চর্য, উইল হেম যেই হীরেটি কাটবার যোগাড় করলেন, অমনি তাঁর সুন্দর ব্যবসাটি ডুববার উপক্রম। ক্রেতারা কেউ আর তাঁর দোকানে পা দেয় না, কাজ-কর্ম সব বন্ধ। তার উপর ছেলেটি গেল মারা। আত্মহত্যা করলো সে। দু'দিন পর নিজেও তিনি মারা গেলেন ঋণ-জালে জর্জরিত হয়ে।

কিন্তু সম্রাট চতুর্দশ লুই অনেক দিন বেঁচেছিলেন। ১৭১৫ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে হাওয়া/খোলাখুলি ফরাসী দেশকে ছত্রখান করে যান। দীর্ঘকাল ধরে দেশের মধ্যে চলতে থাকে যুদ্ধ,-বিদ্রোহ। পরাজয়ের পর পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। অপমানজনক সন্ধিসর্ত নিতে হয় মেনে। রাজকুমার উত্রেক্ আর জ্যেষ্ঠ পৌত্র দু'জনেরই ঘটে অকালমৃত্যু।

চতুর্দশ লুই-এর পর সম্রাট পঞ্চদশ লুই অভিশপ্ত হীরেটির উত্তরাধিকারী হন। তাঁর রাজত্বকালে ফ্রান্সে দুঃখ-দুর্দশা আর বিপর্যয় চলতে থাকে অব্যাহতগতিতে। অতিরিক্ত মদ্যপান আর যৌন-ব্যভিচারের ফলে তিনি ছিলেন রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। ১৭৭৪ সালে বসন্ত মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান অকালে।

ষোড়শ লুই তারপর উত্তরাধিকারী হলেন হীরেটির। বহুমূল্য এ নীলবর্ণের হীরেটি সম্রাজ্ঞী ম্যারী এণ্টনীর ছিল অতি প্রিয়। তিনি আবার মাঝে মাঝে তা ধার দিতেন তাঁর প্রিয়বান্ধবীদের কাউকে কাউকে। ল্যাগবেলের রাজ-কন্যা একবার হীরেটি ধার নিয়ে যান তাঁর কাছ থেকে। তিনিও ফরাসী বিপ্লবের সময় রাজপরিবারের আরও অনেকের সঙ্গে নিহত হন।

ম্যারী এণ্টনীর পর অভিশপ্ত হীরেটির স্বত্বাধিকারী ফ্রান্সিস বোঁলিউ হন বলে জানা যায়। কিন্তু অচিরে তিনিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং অনাহারে পতিত হন মৃত্যুমুখে।

অনেক দিন তারপর সন্ধান মেলেনি ডায়মণ্ডটির। হঠাৎ একদিন তার হদিশ পাওয়া গেল। নিলামে উঠেছে বিক্রীর জন্য। প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী টমাস হোপ ১৮ হাজার পাউণ্ড মূল্যে নীল হীরেটি কিনে নেন। বৃটেনে তাই ডায়মণ্ডটি 'হোপ-ডায়মণ্ড' নামে পরিচিত হয়। টমাস হোপের পর তাঁর বংশধর লর্ড ফ্রান্সিস হোপ দীর্ঘকাল আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি ভোগ করার পর ১৯০১ সালে তা বিক্রয় করে দেন নিউ ইয়র্ক শহরের বিখ্যাত জুয়েলার স্যামুয়েল ফ্র্যানকেনের কাছে। হোপ পরিবারে যতদিন হীরেটি গচ্ছিত ছিল, ততদিন

তাঁদের তেমন ধড়রকমের কোন বিপদ-আপদ ঘটেনি। কিন্তু আশ্চর্য, স্যামুয়েল ফ্র্যাংকেল কিনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় দেখা দিল। ব্যবসাপত্র উঠে গিয়ে তাঁর দেউলিয়া হবার উপক্রম হলো। ব্যাপার দেখে তিনি অভিশপ্ত হীরেটি বেচে দেবেন ঠিক করলেন। কলিন ব্রোকার নামে অনৈক ব্যবসাদার ওটা কিনে নেন। আর বিক্রী করে দেন প্রিন্স ক্যানিটভস্কিকে।

কলিন ব্রোকার তবু রেহাই পেলেন না। ওটা হাতছাড়া করার আগেই তিনি উন্মাদ হয়ে যান এবং আত্মহত্যা করে নিস্তার পান।

এদিকে প্রিন্স ডায়মণ্ডটি উপহার দেন তাঁর এক সুন্দরী উপপত্নীকে। লাস্যময়ী এ তরুণীটির নাম লোরেনা ল্যাডু। তিনি ছিলেন ফোলিস বার্জারেস থিয়েটারের অভিনেত্রী। বহুমূল্য রত্নটি উপহার পেয়ে তিনি তাঁর নতুন নাটকের প্রথম রজনীতে অবতীর্ণা হন তাই পরে। বহুমূল্য হীরকটির দাম সমগ্র প্রেক্ষাগৃহের আসনপত্রের চাইতে বহুগুণ বেশী। বক্ষবাসের উপর দোদুল্যমান নীল মণিটির প্রতি প্রেক্ষাগৃহের সমুদয় চক্ষু গিয়ে নিবদ্ধ হোল। কিন্তু লোরেনার ওই নীল মণিটিই হোল কাল—তাঁর অভিনেত্রী জীবনের ঘটাল অবসান।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ প্রতিধ্বনিত করে হঠাৎ গর্জে উঠল এক পিস্তল। আর অভিনেত্রী লোরেনা মঞ্চের উপর পড়ে পড়লেন নীলমণিটিকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে। ওপরের বক্স ঘর থেকে প্রিন্স ক্যানিটভস্কি নিজেই গুলী ছুড়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল অবশ্য উজ্জ্বল ওই নীলমণিটি।

নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক, প্রিন্সও নিষ্ঠুর নিয়তির হাত থেকে নিস্তার পান নি। গুলী করার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাঁর বক্স ঘরে বিপুল হটহাসিতে ফেটে পড়লেন। উন্মাদ হয়ে যান পুরোপুরি। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁকে আর গ্রেপ্তার করা হয়নি ঠিক। তবে লোরেনার হত্যার দু'দিন পরেই একদল রুশ সন্ত্রাসবাদী অতর্কিতে তাঁর গৃহ চড়াও করে তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে যায়।

হোপ-ডায়মণ্ডটি তারপর মনথারিডেস নামে অনৈক গ্রীক বিত্তশালীর করায়ত্ত হয়। জহরৎটি কেনার কিছুদিন পরেই মনথারিডেস স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্র সহ একদল দস্যুর কবলে পতিত হন এবং দস্যুরা ডায়মণ্ডটি তাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সবাইকে হত্যা করে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করে।

তারপর বেশ কিছুকাল অভিশপ্ত হীরেটির কোন খবর আর পাওয়া যায় নি। এরপর যখন তার হদিশ মিলল, দেখা গেল মণিটি ভূতপূর্ব সুলতান আবদুল হামিদের ফরাসী রক্ষিতা সালমা যুবেথার অঙ্গশোভা বর্ধন করছে ভূতপূর্ব সুলতান বহুমূল্য ডায়মণ্ডটি কিনে বিদেশিনী রক্ষিতাকে উপহার দিয়েছেন। ভূতপূর্ব সুলতান তারপর এক জহুরী ডেকে হীরেটিকে পালিশ করার জন্য নিয়োগ করেন। জহুরীর নাম আবু সবীর। আবু সবীর যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে বসার আগেই কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে। আর ডায়মণ্ডটি চলে যায় কারা রক্ষীর হেফাজতে।

কারা রক্ষীটিও রেহাই পেল না। কে বা কারা এসে গলা টিপে তাকে হত্যা করে হীরেটি নিয়ে উধাও হয়ে যায়। ওটাকে তারপর পাওয়া যায় পুর রক্ষী এক খোজার কাছে। চুরির অপরাধে খোজাটাকে তখন রাজধানী কনস্টানটিনোপোলের এক ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে মারা হয়।

এ বিপর্যয়ের পর অপয়া হীরেটিকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় আবদুল হামিদকে। সুলতান ওটাকে যুবেথার হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু নিয়তির এমনি পরিহাস, সুলতান নিজহাতে একদিন তাঁর প্রিয়তমাকে গুলী করে হত্যা করেন। বিদ্রোহী একদল তরুণ-তুর্কী যারা তাঁর রাজপ্রাসাদ চড়াও হলে। যুবেথার সম্মান রক্ষার জন্যই হয়তো তিনি যুবেথাকে নিজহাতে গুলী করেছিলেন। যাই হোক, তুর্কী বিদ্রোহী দল যাবার সময় মণিটিকেও নিয়ে যায় সঙ্গে করে। আর বিক্রী করে দেয় হাবিব নামে এক ব্যবসায়ীর নিকট। কিন্তু হাবিব শীঘ্র মারা যায় সিঙ্গাপুরের কাছে এক জাহাজডুবিতে। সুলতানও ইতিমধ্যে গদীচ্যুত হন এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে।

১৯১১ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন পোস্ট সংবাদপত্রের মালিক এডওয়ার্ড ম্যাক্‌কিন হোপ-ডায়মণ্ডটি এক ফরাসী জুয়েলারের কাছ থেকে কিনে নেবার মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ডায়মণ্ডটির নাড়ী-নক্ষত্রের খবর পেয়েছিলেন। তিনি আপত্তির ঝড় তুললেন।

ম্যাকলিন তাই হীরেটি কিনতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফরাসী জুয়েলারটিও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কোর্টে মামলা দায়ের করলেন। শেষ পর্যন্ত ৩৬ হাজার পাউণ্ডে ওটা ক্রয় করতে রাজী হন স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

এদিকে হীরেটি বাড়ীতে আনার সঙ্গে-সঙ্গেই ম্যাকলিনের মা গেলেন মারা। একমাত্র পুত্র ভিন্‌সন মাত্র দু-তিন বছরের শিশু। ভিনসনই তাঁর সব সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। মা ও বাবার বিপুল সম্পত্তির মালিক। 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী শিশু।' পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী শিশুর নিরাপত্তার জন্য সব রকমের সতর্কতার ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু নিয়তির এমনি পরিহাস, রক্ষী ও তত্ত্বাবধায়কদের সতর্ক চক্ষু এড়িয়ে একদিন কোটিপতি ধনকুবের পিতার প্রাসাদের লৌহ-কপাট পার হয়ে ছেলেটি নেমে আসে রাস্তায়। আর সঙ্গে-সঙ্গেই চাপা পড়ে এক মহিলার গাড়ীর নীচে। আর কয়েক

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

সমীরণ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিন যায়, পেত্রোগ্রাদ্-এর পরিস্থিতি ততই শোচনীয় হয়ে ওঠে। সেখানকার বল্‌শেভিক্ মতে বিশ্বাসী সৈন্যদের দলে দলে সুদূর সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বল্‌শেভিক্ পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ; বিচারহীন অত্যাচার বেড়ে চলল ক্রমান্বয়ে।

ওরা ভুলে গিয়েছিল বালির বাঁধ দিয়ে যৌবন-জল-তরংগ রোধ করার প্রচেষ্টাও হাস্যকর। বিপ্লবচন্দ্রের আকর্ষণে জনজীবনে জোয়ারের উচ্ছ্বাস, সেই উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্যার গতিরোধ অসম্ভব:

'যে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ার,
মাঠে ঘাটে বাটে নেমেছে ঢল,
জীর্ণ শাখায় বসিয়া শকুনি
শাপ দিক তারে অনর্গল।'

লেনিন-এর ফ্ল্যাট-এ দিনের পর দিন খানাতল্লাস চলতে লাগল। জিনিস-পত্র তচ্‌নচ্ ক'রে, বিছানাপত্র ছিঁড়ে বেয়োনেট্ চালিয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রেও অসন্তুষ্ট সন্ধানকারীরা শেষ পর্যন্ত ক্রুপসকায়া এবং ইয়েলিজারভ্-কে (যাকে তারা 'লেনিন' মনে করেছিল) ধরে নিয়ে গেল। অবশ্য, রাত্রে তাঁরা মুক্তি পেলেন।

লেনিন-এর পক্ষে পেত্রোগ্রাদ্ সহরে থাকা ক্রমেই বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। ঠিক হল, তাঁকে রাজলিভ স্টেশন-এর কাছে নিকোলাই ইয়েমেল্যিয়ানভ্ নামক একজন পুরনো শ্রমিকদলীয় সভ্যের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে। জায়গাটা ফিন্‌ল্যান্ড-এর প্রান্তসীমার কাছে,—কাজেই প্রয়োজন-বোধে সহজেই ফিন্‌ল্যান্ড-এর ভেতরে লুকনো চলবে।

৯ই জুলাই লেনিন তাঁর বিখ্যাত দাড়ি কামিয়ে ফেলে ফিন্‌ল্যান্ড-এর চাষিসুলভ পোশাক পরে রাত এগারোটার সময় এ-পথ সে-পথ দিয়ে ট্রেন-এ উঠে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন।

তাঁকে রাখা হল খামারবাড়ির দোতলায়, খড়ের গাদার মাঝখানে। শয্যা খড়ের; একপাশে খড় সরিয়ে রাখা হল একটা ছোট টেবিল আর দু'খানা চেয়ার। খামারবাড়ির চারপাশে গাছপালা; বেড়াতেন যদিও মাঝে মাঝে, কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হত।

কিন্তু সরকারের নিমকহালাল গোয়েন্দারা আঁচ পেয়ে গেল। তারা রাজলিভ্ এবং তার চারপাশ চষে বেড়াতে লাগল। অবস্থা সংগীন বুঝে

জীবন-কাহিনী

তাঁকে রাজলিভ্ হ্রদের ওপারে স্থানান্তরিত করা হল অত্যন্ত সংগোপনে। এখানে তিনি শুতেন খড়ের গাদার ভেতর ঢুকে। তাঁকে খাদ্য এবং পোশাক যোগাবার ভার নিলেন তোকারেভা নাম্নী একজন শ্রমিক-মহিলা। যাতায়াত হত নৌকো ক'রে।

এদিকে সরকারী গোয়েন্দারা তাঁর সন্ধানে হন্যে হয়ে চষে বেড়াচ্ছে গোটা রাশিয়া। তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য মোটা পুরস্কার ঘোষিত হল। কিন্তু বৃথাই।

আজ সেই পবিত্র তাঁবু—খড়ের গাদাসমেত—সংরক্ষিত। কাছেই একটা পাথরের থামে উৎকীর্ণ:

'এখানে ১৯১৭-র জুলাই-আগস্ট মাসে গাছের ডালে নির্মিত তাঁবুতে থেকেছেন বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন---এবং 'দ্য স্টেট্ অ্যান্ড রিভল্যুশন্' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই স্মৃতি অক্ষয় রাখার জন্য 'লেনিন' সহরের শ্রমিকরা এখানে গ্র্যানাইট্ পাথরের তাঁবু তৈরি করেছে।—১৯২৭ খৃস্টাব্দে।'

এখানে অবস্থানকালেও তিনি দলীয় কাজ পরিচালনা করতেন দৃঢ়হস্তে। তিনি ঘোষণা করলেন বলশেভিকরা চেয়েছিল শান্তিপূর্ণ পথ, কিন্তু মেন্‌শেভিকরা নিজেদের 'সংগী'দের সহযোগিতায় তা হতে দেয় নি। তাঁর মতে তাই পরিস্থিতির বিবেচনায় ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি অবান্তর হয়ে গেছে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া শান্তি গতিরন্যথা। সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের জয় সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহর বাষ্পটুকুও ছিল না।

ঘণ্টার মধ্যেই ত্যাগ করে শেষ নিঃশ্বাস।

হোপ-ডায়মণ্ডের ইতিকথা এখানেই শেষ।

অভিশপ্ত হীরেটিকে তারপর কেটে ফেলা হয়। হোপ-ডায়মণ্ড-এর নাম হয় তখন 'ব্রুউন্সউইক ব্লু ড্রপ ডায়মণ্ড' তার ইতিহাসও শোকাবহ। ব্রুউন্স-উইক পরিবারের বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের কথা জাস্টিন গ্লাসের লেখা 'স্টোরী অব কুমফিল্ড প্রফেসি'র পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে।

জুলাই মাসের শেষ থেকে ৩রা আগস্ট পেত্রোগ্রাদ্-এ অনুষ্ঠিত হল ষষ্ঠ বল্শেভিক্ কংগ্রেস। সর্বসম্মতিক্রমে লেনিন এই কংগ্রেস-এর অনারারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। প্রস্তাব নেওয়া হল, 'কোন অবস্থাতেই লেনিনকে ধরা দিতে দেওয়া হবে না'। লেনিন-এর 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা' সম্পর্কিত মতবাদও সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত এবং গৃহীত হল। আরও স্থির হল, তাঁকে বল্শেভিক দলের 'প্রথম' প্রতিনিধিরূপে কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী-তে পাঠানো হবে।

এই কংগ্রেসের সব সিদ্ধান্তই শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা-নির্দেশক। প্রচারিত একটি ম্যানিফেস্টোয় বলা হল, আসন্ন প্রোলেতারিয়েত্ সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র সংঘর্ষে সমাজতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী।

খড়কাটার কাল অতিক্রান্ত; কাজেই চাষী সেজে হ্রদের পার্শ্ববর্তী খামারে থাকা লেনিন-এর পক্ষে আর সম্ভব নয়। শিকারীরা আসতে লাগল দলে দলে, গুজবও অসংখ্য ছড়িয়ে পড়ছে। পেত্রোগ্রাদ্-এর চারপাশে গোয়েন্দারা তাঁর খোঁজে মরীয়া, —এমন কি, শিকারী কুকুরের দল পর্যন্ত নিযুক্ত হল তাঁকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে। এক পত্রিকা খবর দিল ৫০জন সৈন্যদলের অফিসার তাঁকে ধরার জন্য 'করেংগে ইয়ে মরেংগে' পণ করেছে।

সুতরাং নিরাপদ আশ্রয় চাই। তৈরি হল নকল পাস্পত্র, সেস্ত্রোরেৎস্ক-এর শ্রমিক 'কন্সতানতিন পেত্রোভিচ ইভানভ্'-এর নামে লেনিনকে ছদ্মবেশ পরিয়ে ছবি তুলে সেটি লাগান হল ছাপমারা পাসপত্রে। ট্রেন-এর ফায়ারম্যান সেজে, হুগো জালাভা নামক পূর্ব-পরিচিত একজন চালকের সহযোগিতায় এন্জিন্-এর ফুট প্লেট্-এ চড়ে গোটা রাশিয়া-র গণনায়ক চললেন ফিন্ল্যান্ড-এ পুনর্নির্বাসনে।

প্রায় দশ কিলোমিটার পথ জলন্ত বনের ভেতর দিয়ে উত্তপ্ত কাষ্ঠখণ্ড মাড়িয়ে তিনি সংগীসহ এসে পৌঁছলেন দিবুনি স্টেশন-এ। সেখানেও সৈন্যরা যথারীতি প্রহরারত। একটা ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রইলেন লেনিন। ট্রেন এলে সংগী রাহ্জা সহ তিনি দ্রুতপদে শেষের কামরায় উঠে নিরাপদে উদেল্নায়া স্টেশন-এ পৌঁছে অবশেষে আশ্রয় নিলেন একজন ফিন্ শ্রমিকের গৃহে।

পরের দিন রাহ্জা আর শট্ম্যানকে নিয়ে স্টেশন-এ গেলেন আবার এবং শট্ম্যান-এর কাছে গচ্ছিত রাখলেন তাঁর 'নীল নোটবই', এতে ছিল তাঁর 'মার্কসিজম্ অব্ দ্য স্টেট্' বইটির পাণ্ডুলিপি।

ট্রেন-চালক হুগো জালাভা লেনিনকে ফায়ারম্যান হিসেবে এন্জিন্-এ তুলে নিলে তিনি মহোৎসাহে এন্জিন্-এ কাঠ ঠেলতে লাগলেন। গোল বাধল সীমান্ত স্টেশন বেলুস্ত্রভ্-এ এসে। প্রতিটি যাত্রী এবং রেলকর্মীদের কাগজপত্র তন্নতন্ন ক'রে দেখা সুরু হল। পাছে কোনও বিপদ ঘটে সেই আশংকায় বুদ্ধিমান জালাভা তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে এন্জিন্ খুলে জল ভরার ছলে সেটি পাম্প-এর কাছে নিয়ে যান এবং ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা দেওয়ার পর দ্রুত এসে এন্জিন্ লাগিয়েই ট্রেন ছেড়ে দেন। কয়েক মিনিট-এর মধ্যে তাঁরা পৌঁছলেন ফিন্ল্যান্ড-এর তেরিজোকি-তে এবং লেনিন অনতি-বিলম্বে ফিরিয়ে নিলেন তাঁর নোটবই।

'মার্কসিজম্ অব দ্য স্টেট্'—রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ — তাঁর বহুপ্রচারিত বইয়ের একটি।

তেরিজোকি থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে একজন ফিন্ শ্রমিকের বাইরের ঘরে স্থিতি করলেন লেনিন। অনন্ত কাজের অবসরে তিনি গৃহের মালিককে তাঁর চাষ-আবাদে সাহায্য করতেন, বনে বনে ঘুরে ফলফুল কুড়োতেন; হ্রদে স্নান এবং নৌকা-বিহারও ছিল। আর ছিল বাড়ির শিশুদের নিয়ে খেলা—তাঁর শিশুপ্রীতি সুবিদিত।

কিন্তু রাশিয়ার সীমান্তের এত কাছে বেশিদিন থাকা নিরাপদ নয়। কাজেই হেল্সিংফর্স্ সহরে আশ্রয় খোঁজা হল এবং তা মিলকুস্তো রোভিওর গৃহে। তিনি তখন সহরের অস্থায়ী কোতোয়াল। নিরাপত্তার দিক থেকে এ ব্যবস্থা

আত্মোচেনাম্প লেনিন

সর্বোত্তম। পেত্রোগ্রাদ্-এর সংগে সংযোগ রাখা হত আমাদের পূর্ব-পরিচিত ট্রেন-চালক জালাভার মাধ্যমে; কেন না, তিনি থাকতেন ক্রুপসকায়ার বাসস্থানের সন্নিকটে। তাঁর আশ্রয়দাতা রোভিওর জবানীতে:

'পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী সন্ধ্যার সময় মেল ট্রেন এলে সমস্ত পত্র-পত্রিকা কিনে লেনিন-এর কাছে নিয়ে যেতাম। সে সব পড়ে তিনি অনেক রাত পর্যন্ত লিখতেন; আমি পরের দিন সেই লেখা (জালাভার হাতে) দিয়ে দিতাম পেত্রোগ্রাদ্-এ পৌঁছে দেবার জন্য। দিনের বেলা লেনিন নিজের জন্য রান্না করতেন।---'

খুব কম দলীয় কমরেড্রাই তাঁর বাসার খবর জানতেন, তবে তাঁর প্রবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হত 'প্রোলেতারী' এবং 'ওয়ার্কার্' পত্রিকাদ্বয়ে-এ দু'টি বল্শেভিক্রা প্রকাশ করেছিলেন 'প্রাভ্দা'র পরিবর্তে।

হেল্সিংফর্স-এ থাকার সময় লেনিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফিন্ল্যান্ড-এর স্বাধীনতা সমর্থন করেছিলেন এবং ওখানকার বামপন্থীদের উপদেশ দিয়েছিলেন রাশিয়ার বামপন্থী সরকারকে অগ্রাহ্য করতে; বল্শেভিকদের পক্ষ থেকে ফিন্দের স্বাধীনতার গ্যারান্টীও তিনি দিলেন। অবশ্য একথাও তিনি বলেছিলেন যে, ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রচুর হওয়ায় তাঁর পক্ষে রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া চলা অসম্ভব।

এখানে ক্রুপ্সকায়া দু'বার গোপনে লেনিন-এর সংগে মিলিত হন--পারপত্র করা হয়েছিল 'আতামানোভা' নাম্নী একজন মহিলার নামে। ছোট্ট একটি বাক্যে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে গেছেন লেনিন-জায়া :

'আমাকে দেখে ইলিচ্ খুব খুসি হয়েছিলেন।'---নিজের আনন্দের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। গৃহসুখবঞ্চিতা ক্রুপসকায়া নিজের ব্যাপারে কোনদিনই সরব নন; স্বামীর ব্রতকে নিজের ব্রতরূপে মনেপ্রাণে গ্রহণ ক'রে আত্মসুখ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। 'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম'---এই মন্ত্রটি তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলেন সারা জীবনভোর।

এই সময় লেনিন পেত্রোগ্রাদ্-এ ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন; কেন না, তাঁর মতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমেই বিপ্লবের অনুকূল হয়ে উঠছিল। বন্ধুরা আশংকিত কণ্ঠে সকাতরে নিষেধ করলেন -- কিন্তু লেনিন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। ছদ্মবেশে ভাইবোর্গ-এ পৌঁছুলেন সেপ্টেম্বর্ মাসের শেষে। কারণ, অতদূর থেকে বিপ্লব পরিচালনা অসম্ভব।

নানা কারণে তখন বিপ্লব আসন্ন, পরিস্থিতিও ক্রমেই বল্শেভিক্দের অনুকূল হচ্ছিল। ১৯১৭-র হেমন্তকাল থেকে --সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধর চতুর্থ বছরে ---রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হতে সুরু করল। কলকারখানায় কাঁচা মাল, কয়লা ইত্যাদির সরবরাহ রীতিমত কমছে, উৎপাদন কমে গেছে বিপজ্জনকভাবে। দুর্ভিক্ষ আসন্ন। প্রথমে জার্-এর স্বৈরতন্ত্র এবং সাম্প্রতিক বুর্জোয়া সরকার দেশকে টেনে সর্বনাশের কিনারায় এনে দাঁড় করাল।

এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দূরে থাক্, বুর্জোয়া সরকার যেন ইচ্ছে ক'রেই অবস্থা আরও খারাপ হতে সাহায্য করেছিল। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল দেশের ক্রমাবনতির দায়টুকু বিপ্লব আর বল্শেভিক্দের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার। কোটিপতি রিয়াবুশিনসকী বললেন, '*দুর্ভিক্ষর করাল হস্ত*' বিপ্লবের টুঁটি টিপে মেরে ফেলবে! বেকারী তখন ভয়াবহ, রুটির দাম আকাশছোঁয়া; পেত্রোগ্রাদ্ এবং মস্কোয় দৈনিক রুটির বরাদ্দ করা হল ২০০ গ্রাম, ময়দার সঞ্চয় ছিল মাত্র দশ দিনের মত। এক লক্ষরও বেশিসংখ্যক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করছিল--দুর্দশা অন্তহীন।

নির্বিকার সরকারের কৃপায় কিন্তু ব্যবসায়ী আর ধনীদের সুযোগ-সুবিধা ক্রমবর্দ্ধমান। ১৯১৭-র আগস্ট মাসে প্রধানত ধনী এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত তথাকথিত 'শাসন পরিষদ' নিয়ে 'ব্যস্ত' রইলেন মেন্শেভিক্ প্লেখানভ্। বিপ্লব বর্জনের আহ্বান জানিয়ে তিনি রিয়াবুশিন্সকী এবং অন্যান্য ধনী ব্যবসায়ীদের সংগে 'সন্ধি'র প্রস্তাব করলেন।

শাসন পরিষদের উদ্বোধন দিবসে বল্শেভিক্দের ডাকে চার লক্ষরও বেশি সাধারণ মানুষ ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ দেখাল।

লেনিন-এর লেখনী থেকে তখন নির্দেশ আসছে মুহুর্মুহু --'দ্য ইম্পেন্ডিং ক্যাটাস্ট্রফী অ্যান্ড হাউ টু কম্ব্যাট ইট্'---সে সময়ের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। এ ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখলেন তিনি। এক প্রবন্ধে ('বল্শেভিক্রা কি শাসনক্ষমতা রাখতে পারে?') তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: 'হুজুররা দয়া ক'রে আমাদের ভয় দেখাবেন না, কোনও লাভ হবে না।'

২৫শে আগস্ট ধনিক শ্রেণীর পদলেহী জেনারেল কোর্নিলভ্ একদল সৈন্য নিয়ে মারচ্ ক'রে পেত্রোগ্রাদ্-এ এলেন 'শান্তিরক্ষা' করার সুমহান উদ্দেশ্যে। তাঁর চাতুরী সহজেই বুঝতে পেরে লেনিন বল্শেভিক্দের আহ্বান জানালেন তাঁকে রুখতে। তাঁর নির্দেশিত পথে জনগণকে সংঘবদ্ধ ক'রে দলীয় কমরেড্রা সহজেই কোরনিলভ্-এর ষড়যন্ত্র বিনাশ করতে পেরেছিলেন।

১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হল তাঁর প্রবন্ধ 'অন্ কম্প্রোমাইজেস্'--এতে তিনি প্রমাণিত করলেন নিজেদের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না ক'রে বল্শেভিক্রা সব সময় মিট্মাট্ করতে প্রস্তুত। তিনি প্রস্তাব করলেন, স্বল্পকালের জন্য পাতি - বুর্জোয়াদের সংগে একটা বোঝাপড়া করা যেতে পারে শান্তিপূর্ণ-ভাবে এই মর্মে যে, বুর্জোয়া সরকার পূর্ণ গণতন্ত্রর ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং বল্শেভিক্রা সরকারের বাইরে থেকে আন্দোলন চালাবার পূর্ণ অধিকার বজায় রাখতে পারবে। ৩রা সেপ্টেম্বর্ তিনি আবার

লিখলেন, 'হয়ত শান্তিপূর্ণ সমাধানের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে'---

বলা বাহুল্য, মেন্‌শেভিক্ এবং তাদের সহযাত্রীরা লেনিন-এর এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করল।

কোর্‌নিলভ্-এর পশ্চাদপসরণের পর ক্রমে ক্রমে বহু সোভিয়েত্-ই বল্‌শেভিক্ দলে যোগ দিচ্ছিল। 'দ্য টাস্‌কস্ অব্ দ্য রিভল্যুশন্' প্রবন্ধে লেনিন প্রস্তাবিত সরকারের জন্য একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করলেন:

১। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব বিবদমান জাতিসমূহের কাছে শান্তির প্রস্তাব;

২। সমস্ত জমিদারী এবং চাষের জমি এখুনি জাতীয়করণ ক'রে তা শ্রমিক-চাষীদের সম্পত্তি করা;

৩। সবক'টি ব্যাংক এবং প্রয়োজনীয় ব্যবসাগুলোর জাতীয়করণ;

৪। সমগ্র দেশের উৎপাদন এবং ভোগের ওপর শ্রমিকদের কর্তৃত্ব;

এবং

৫। 'কোর্‌নিলভ্' জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করা।

প্রস্তাবিত সরকার অনতিবিলম্বে কন্‌স্টিটুয়েন্ট্ অ্যাসেম্‌বলী আহ্বান করবে।

যথারীতি এই প্রস্তাবও মেন্‌শেভিক প্রমুখদের দ্বারা নাকচ হল।

সশস্ত্র বিপ্লব সে ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী এবং লেনিন বললেন, 'সব ক্ষমতা সোভিয়েত্-এর হাতে' বলে তিনি যে ডাক দিয়েছেন, তার বর্তমান তাৎপর্য 'সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে' বুঝতে হবে।

সেপ্‌টেম্‌বর্ মাসের মাঝামাঝি লেনিনদলকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকারের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানালেন।

রাশিয়ার সে এক অত্যন্ত সংকটাপন্ন সময়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে যোগসাজসে রাশিয়ার বুর্জোয়ারা জার্‌মানীকে পেত্রোগ্রাদ্ 'দান' করার উপক্রম করছিল এবং রাশিয়ার অজ্ঞাতসারে ইংরেজ এবং ফরাসীরা জার্‌মানীর সংগে পৃথক শান্তিচুক্তির প্রস্তুতি চালাচ্ছিল।

'মার্‌কস্‌বাদ ও সশস্ত্র বিপ্লব' নামক সেই সময় লেখা একটি প্রবন্ধে লেনিন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব মার্‌কস্ এবং এংগেল্‌স-এর মতে একটা উপায় বা কৌশলমাত্র—লক্ষ্যে পৌঁছুবার পন্থা হিসেবেই তার প্রয়োজনীয়তা। 'বিপ্লবের জন্য বিপ্লব' কথাটা অর্থহীন প্রলাপ বই আর কিছু নয়।

মেন্‌শেভিক্‌রা সেপ্‌টেম্‌বর্-এর মাঝামাঝি আবার কন্‌ফারেন্‌স ডাকল, কিন্তু লেনিন আর 'কথার মালা'য় ভুলতে রাজি হলেন না। তিনি বল্‌শেভিক্‌দের উপদেশ দিলেন গ্রামে, সহরে, গঞ্জে, কারখানায়, খামারে ছড়িয়ে পড়ে সর্বসাধারণের কাছে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করতে এবং আসন্ন বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে।

ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রেই লেনিন ছদ্মবেশে হেল্‌সিংফর্‌স ছেড়ে স্বদেশে ফিরে এলেন এবং ভাইবোর্‌গ-এ ফিরে জুহো লাতুক্কা নামক কর্মীর ঘরে আশ্রয় নিলেন গোপনে।

এখানে এসেই লেনিন বাল্‌টিক নৌবাহিনীর বল্‌শেভিক্ প্রধান স্মিল্‌গা-কে নির্দেশ দিলেন, কেরেন্‌স্কী সরকারের বিরুদ্ধে উত্থানের জন্য প্রস্তুত থাকতে। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁর উদাত্ত আহ্বান গেল সর্বস্তরের প্রতিটি কর্মীর কাছে। ক্রমবর্ধমান কৃষক আন্দোলন, সারা দেশে অসন্তোষ, ফিন্ সৈন্যদল এবং বাল্‌টিক্ নৌবাহিনীর অন্তর্বর্তী সরকারের আদেশ পালনে অসম্মতি, উত্তর সীমান্তে সন্নিবিষ্ট সৈন্যদলের বল্‌শেভিক-দের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সব সীমান্তের সৈন্যদলের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অসম্মতি---সব ক'টি ঘটনা লেনিন-এর মতবাদের সমর্থক: বিপ্লব সমাসন্ন এবং এই-ই হচ্ছে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রকৃষ্ট সময়। লেনিন বললেন, 'রাশিয়ার ভবিষ্যৎ, সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক-প্রোলেতারিয়েত-এর ভবিষ্যৎ' এই সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর ডাক এল, আর তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' পন্থার ওপর নির্ভর ক'রে বসে থাকলে চলবে না, 'লোহা গরম থাকতে থাকতে'ই আঘাত হানতে হবে। ২০শে অক্টোবর সোভিয়েত সম্মেলনের জন্যও তিনি অপেক্ষা করতে গররাজি, কেন না, আসন্ন সুযোগ ত্যাগ করা তাঁর মতে অত্যন্ত অসমীচীন।

ভাইবোর্‌গ-এ লেনিন ছট্‌ফট্ করছিলেন, বিপ্লব প্রস্তুতির কেন্দ্রস্থল পেত্রোগ্রাদ্-এ যাওয়ার জন্য। ঐ

যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণরত লেনিন

উদ্দেশ্যে তিনি বারবার কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠাচ্ছিলেন। অবশেষে, অক্টোবরে তিন তারিখে সেই বহুপ্রার্থিত অনুমতি মেলামাত্র তিনি অনতিবিলম্বে পেত্রোগ্রাদ্-এ ছুটলেন। এলেন ছদ্মবেশে, পুরনো ট্রেন-চালক বন্ধু জালাভা-র ২৯৩ নম্বর এন্জিন্-এ চড়ে---ক্রুপ্সকায়া তাঁর জন্য গোপন আবাস প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন বান্ধবী মার্গারিতা ফোফানোভার বাড়িতে।

আসন্ন বিপ্লবের জন্য লেনিন-উদ্যম বিপুল। ৮ই অক্টোবর প্রকাশিত তাঁর বহু বিখ্যাত 'অ্যাডভাইস্ অব্ অ্যান্ অন্লুকার্' (এক দর্শকের উপদেশ) প্রবন্ধে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবকে 'চারুকলা' রূপে বর্ণনা ক'রে কয়েকটি মূল নীতি প্রণয়ন করলেন:

(এক) সশস্ত্র অভ্যুত্থান নিয়ে খেলা কোর না,---আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত যেতে হবেই;

(দুই) প্রথমেই প্রচুর জনবল আর অস্ত্রাদি জড় করা চাই;

(তিন) মনে রেখো, আত্মরক্ষার প্রশ্ন এলেই অভ্যুত্থানের পরাজয়---সব সময় আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভংগী নিয়ে চলবে এবং সংকল্পে দৃঢ় থাকবে;

(চার) শত্রু যখন ছত্রভংগ, ঠিক তখন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে;

(পাঁচ) প্রাত্যহিক---এমন কি প্রাহরিক---সফলতার দিকে দৃষ্টি রাখবে এবং লক্ষ্যের পবিত্রতা বজায় রাখবে যে-কোনও উপায়ে।

নৌবাহিনী, শ্রমিক কম্রেড্ এবং সৈন্যদলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা টেলিফোন এক্সচেনজ, টেলিগ্রাফ, রেলওয়েগুলি আর সেতুগুলি দখলের ওপর তিনি জোর দিলেন। তাঁর মতে, পেত্রোগ্রাদ্ এই অভ্যুত্থানের সাফল্য নির্ভরশীল---বিলম্বে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

১০ই এবং ১৬ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং হল সুখানোভার ফ্ল্যাট্-এ। শ্মশ্রু-গুম্ফহীন এবং ধূসর পরচুলা পরিহিত লেনিন সভাপতিত্ব করলেন এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে।

লেনিন-এর প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কমিটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করল যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং তার উপযুক্ত সময় এসে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় দলকে অন্য সব কাজ ফেলে সশস্ত্র বিপ্লবকে সফল করার উদ্দেশ্যে উঠেপড়ে লাগতে হবে।

এই প্রস্তাব কেবলমাত্র কামেনেভ্ আর জিনোভিয়েভ্ ছাড়া আর প্রত্যেকের সমর্থন পেল।

আসন্ন অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক দিক পরিচালনার জন্য লেনিন-এর নেতৃত্বে স্থাপিত হল পলিটিক্যাল ব্যুরো।

১৬ তারিখে বসল মিখাইল কালিনিন্-এর সভাপতিত্বে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। এখানেও কামেনেভ্ আর জিনোভিয়েভ্ আপত্তি জানালেন এই বলে যে, বল্শেভিকরা তখনও দুর্বল শত্রুর তুলনায়। প্রস্তাব ভোট-এ দেওয়া হলে ১৯-২ ভোট-এ গৃহীত হল; চারজন ভোট দেন নি।

আর একটি প্রস্তাবে বলা হোল, স্ভার্দলভ্, স্তালিন, বুবনভ্, উরিট্স্কী এবং দ্ঝার্ঝিন্ সকীকে নিয়ে রিভল্যুশনারী মিলিটারী সেণ্টার গঠন করা হোক্।

উপযুক্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকরী করার প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেল সর্বত্র---নগরে - প্রান্তরে, হাটে-মাঠে-বাটে। মহানায়কের 'জীবন-বাণী' ছড়িয়ে গেল কোটি জনতার অন্তরে; সে বাণী তাদের চিত্তকুহরে কুহরিয়া ছুটে চলল সহস্র স্রোতে---দিন বদলের পালা আগত ঐ, স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তির জীবনপণ আগ্রহে রাশিয়া প্রস্তুতিমগ্ন। সেই সুর লেনিন-এর জন্মশতবর্ষেও ধ্বনিতেছে। সেই বিপুল, বৃহৎ, গভীর, মধুর আহ্বানের অনুরণন আজও ভরে রেখেছে তাঁর উত্তরসূরিদের চিত্ত।

১৭ই অক্টোবর রাত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক শাখার নেতা পদ্ভয়স্কী এবং অন্যান্যদের সংগে মিলিত হয়ে আলোচনা প্রসংগে লেনিন নানান উপদেশ দিলেন: বিভিন্ন শাখার নেতাদের সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ, সংগঠনের দিকে আরও সূক্ষ্ম নজর রাখা দরকার। বললেন, 'মনে রেখো, জনগণ তোমাদের সামনে রয়েছে।---তাদের সংগঠিত করার এবং তাদের হাতে উপযুক্ত অস্ত্র তুলে দেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের।'

১৮ই অক্টোবর বিশ্বাসঘাতক কামেনেভ্ 'নিউ লাইফ' নামক আধা-মেন্শেভিক্ পত্রিকায় প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা প্রকাশ ক'রে দিলেন। ওদিকে ট্রট্স্কী দলের ভেতর প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগলেন, অভ্যুত্থান দ্বিতীয় সোভিয়েত্ কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতুবি রাখার জন্য। লেনিন ঘৃণার সংগে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

সব শুনে সংগে সংগে দ্বিতীয় কংগ্রেস পেছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করল মেন্শেভিক্রা। সব জানতে পেরে অন্তর্বর্তী সরকারও ওদিকে প্রস্তুত---পেত্রোগ্রাদ্-এর মিলিটারী-প্রধান সমস্ত সভা-সমিতি এবং রাস্তায় লোক জড়ো হওয়া নিষিদ্ধ করলেন এবং হুকুম এল সমাবেশ হলেই গুলী চলবে।

লেনিনকে গ্রেপ্তার কর---পুনরাদেশ দেওয়া হল ১৯শে অক্টোবর এবং সদ্য বিগত জুলাই মাসের মতই কেরেন্সকীর গোয়েন্দারা তাঁর সন্ধানে তখন মরীয়া।

কামেনেভ্ আর জিনোভিয়েভ্কে দল থেকে বহিষ্কারের দাবি জানালেন লেনিন, কিন্তু স্তালিন কামেনেভ্কে সমর্থন করায় ২০শে অক্টোবর লেনিন-এর অনুপস্থিতিতে কামেনেভ্-এর পদত্যাগপত্র গৃহীত হল।

২৪শে অক্টোবর্ কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেনিন লিখলেন তাঁর ঐতিহাসিক চিঠি:

'এই চিঠি লিখছি ২৪শে সন্ধ্যায়। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল---এখন এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে আর দেরি করার ফল শোচনীয় হবে।

'আমার সব শক্তি নিয়ে আমি কম্‌রেড্‌দের বুঝাতে বলছি যে, সমস্তই এখন ঝুলছে সূক্ষ্ম সুতো --- আমাদের সামনের সমস্যাগুলি আর সভা-সমিতিতে সমাধান হওয়ার নয়, পরন্তু একমাত্র সশস্ত্র এবং প্রস্তুত জনগণই এর সমাধানে সক্ষম --- যে-কোন উপায়েই হোক না কেন, আজ রাত্রেই সরকার পরিচালকদের গ্রেপ্তার করতে হবে --- ইতিহাস বিপ্লবের দেরি কখনও ক্ষমা করবে না, কেন না, আজ সুরু করলে আমরা সফল হব, কিন্তু কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার অর্থ সব কিছু নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া ---'

পত্রবাহিকা নিযুক্তা হলেন ফোফানোভা এবং লেনিন নিজে সেই মুহূর্তে স্মোল্‌নি যাওয়া স্থির করলেন। রাহ্‌জার সাহায্যে পুরনো একটা ওভারকোট আর ছেঁড়া টুপি যোগাড় ক'রে, গলায় ময়লা রুমাল জড়িয়ে তিনি রওনা হলেন। ফোফানোভার জন্য লিখে রেখে গেলেন : 'তুমি যেখানে যেতে চাও নি, সেখানেই গেলাম।' পথে কেরেন্‌সকীর সৈন্যরা আটকেছিল, কিন্তু লেনিন সব বাধা ঠেলে পেরিয়ে গেলেন গন্তব্যস্থানে। তাঁর গোপন বাসের হল অবসান।

অজ্ঞাতবাসের সময় দলীয় সভ্য-বৃন্দ যে অসীম স্বার্থত্যাগ এবং সমূহ বিপদ অবহেলা ক'রে তাঁকে সাহায্য করেছিল, সে জন্য লেনিন আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

মহানায়ক বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছলেন, সব কাজের ভার গ্রহণে তিনি উন্মুখ। প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত--- কর্মযজ্ঞের সূচনা। আর ছদ্মবেশে রুদ্র-তনয়ের মত লুকিয়ে থাকা নয়, আজ আসন্ন আহবে ঝাঁপিয়ে পড়ার শুভ-মুহূর্ত আগত। তিনি ব্যাকুল-চিত্তে প্রতীক্ষা করছেন সেই শুভলগ্নের, যখন তাঁর জীবনের স্বপ্ন নেবে সফল রূপ, খসে পড়বে অত্যাচারিতের হাত থেকে যুগযুগান্তের শৃংখল, অবসান হবে অত্যাচার-অনাচারের অমানিশা।

সেই মহাজন্মের লগ্ন বুঝি এসেছে। বিপ্লবের কূলহারা উচ্ছ্বাসে নাচের মাতন লাগল মানহারা মানব-মানবীর বুকে---পদছন্দে ছন্দায়িত হল রুদ্র-তাণ্ডব; সেই প্রলয় নাচনে কুটোর মত তলিয়ে গেল নির্লজ্জ অমানুষতা, সভ্যের বর্বর লোভ।

মানবজাতির অগ্রগমনের পথে ইতিহাস-চিহ্নিত সেই রাতে স্মোল্‌নির সমুজ্জ্বল প্রাসাদ কর্মচঞ্চল---রেড্‌ গার্ড, সৈন্যদলের এবং কারখানার প্রতিনিধি-বৃন্দ সমাগত সারা দেশ থেকে। সবাই নির্দেশ চান। রিভলুশনারী কমিটির সভা চলেছে তিনতলায়---বিরামহীন অধিবেশন। বিরাট হলঘরে অসংখ্য শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য এবং নাবিকরা সমবেত হয়েছেন দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস-এ যোগদানের উদ্দেশ্যে। জংগী গাড়ি, লরি আর মোটর সাইকেল-শ্রেণী সশব্দে সামনের রাস্তা মুখরিত ক'রে ছুটছে ত' ছুটছেই---চারপাশে বিশালকায় কামান পাতা। আর, জনস্রোত ক্রমবর্ধমান---জোয়ারের পরেই বুঝি ডেকেছে সাঁড়াসাঁড়ি বান। আনু-গত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিনিধিরা আসছেন একের পর এক। প্রাসাদের সামনে অসংখ্য প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের আভায় সব কিছুই যেন অতিপ্রাকৃত।

লেনিন-এর আগমনের সংগে সংগে শৃংখলাবদ্ধভাবে মোটরবাহী দূতবৃন্দ একে একে কারখানায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং সৈন্যদলের কাছে চলে গেল অভ্যুত্থান আরম্ভ করার নির্দেশ বহন করে। পেত্রোগ্রাদ্‌-এর রেড গার্ড দল, সৈন্য এবং নাবিকরা নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে রওনা হল শহরের সমস্ত আগম-নির্গম পথ বন্ধ করতে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দখল করতে।

পরের দিন (২৫শে অক্টোবর) নেভাপদ্‌-এর সব সেতু, টেলিফোন এক্সচেন্‌জ, টেলিগ্রাফ অফিস, বেতার-কেন্দ্র, রেল স্টেশন, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, স্টেট ব্যাংক ইত্যাদি সমস্ত কিছু রেড্‌ গার্ড এবং সৈন্যদলগুলি অধিকার করে নিল। কেবলমাত্র 'উইন্‌টার্‌ প্যালেস্‌' (অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের আশ্রয়স্থল) এবং পেত্রোগ্রাদ্‌-এর সৈন্যদলের হেড্‌ কোয়ার্‌টার্‌ ছাড়া শহরের সবই বিপ্লবীদের কবলে। লেনিন জোর দিলেন 'উইনটার্‌ প্যালেস্‌' দখলের জন্য।

ইতিমধ্যেই বিপ্লব সফল হওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

প্রভাতে সর্বাধিনায়ক লেনিন 'রাশিয়া'র জনগণকে সম্বোধন ক'রে এক আবেদনে বললেন:

'অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে; ক্ষমতা এসেছে পেত্রোগ্রাদ্‌-এর শ্রমিক ও সৈন্যদলের প্রতিনিধি এবং প্রোলেতারিয়েত্‌ ও সৈন্যদলের পুরোধা---বিপ্লবী মিলিটারী কমিটির হাতে।'

রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হল বিজয়বার্তা--- দিকে দিকে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে। সেই বিপ্লবী বারতার মর্মকথা বুঝি :

'আমরা সৃজিব নতুন জগৎ,
আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে নত এই ধরা নেবে
অঞ্জলি পাতি মোদের দান।'

বিপ্লবীদের জীবনপ্রভাত এল সুপ্তিসাগর পেরিয়ে। তিমিরজয়ী বীরকুল আনন্দে উদ্বেল।

বেলা ২-৩০ মিনিট-এ পেত্রোগ্রাদ্‌ সোভিয়েত্‌-এর সভায় মহোল্লাসে সম্বর্ধিত হলেন মহানায়ক; বললেন, 'বিনা রক্তপাতে'ই তাঁরা অভ্যুত্থান সফল করেছেন; রুশ ইতিহাস নতুন বাঁকের মুখে এবং এই তৃতীয় রুশ বিপ্লব নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রবাদের জয়ের সূচনা।

সেই দিনই---২৫শে অক্টোবর--- সন্ধ্যায় বিপ্লব সমর্থক মানোয়ারী জাহাজ 'অরোরা' থেকে ছোঁড়া হল 'উইন্‌টার্‌ প্যালেস্‌'-এর ওপর সেই ঐতিহাসিক গোলা, যা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণ

বিজয় এনে দিল নিপীড়িত জনগণের হাতে।

২৫শে অক্টোবর কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে রইল সমাজতন্ত্র গঠনের পরম লগ্নের স্মৃতি বহন ক'রে, যারা জগতের বঞ্চিত, সর্বহারার দল। ঐদিন প্রথম নবীন জীবন ঊষার রক্তিমচ্ছটা দেখল নয়ন ভরে, শুনল আগামীদিনের আশা-রাগিণীর প্রথম তান।

রাশিয়ার নতুন প্রভাত যে মুক্তির বারতা বয়ে নিয়ে এল, তার সর্বব্যাপী অনুভূতি রুশ জাতির হৃদয়তটে আঘাত দিল অবিরত। আনন্দের সাগর হতে ছুটে এল বান, অমনি সবাই বসে গেল দাঁড় হাতে, সবল পেশী সচল হয়ে উঠল বিপ্লব-তরী লক্ষ্যে পৌঁছনর গহন আকুলতায়। গোটা জাতটাই যেন আর পিছনপানে না ফেরার প্রতিজ্ঞা-মুখর—যে হাওয়ার মুখে তরী ভাসিয়েছে, সেই হাওয়াকেই তারা সাথী ক'রে নিল চিরকালের মতন। তারা পালের রশি ধরল কষি—এ রশি ইতিহাস-দেবতার অক্ষয় বরপূত শত আঘাতেও ছেঁড়ার নয়।

রাশিয়ায় নিষ্ঠুরের হাতে সুন্দরের বন্ধন ঘুচিয়ে দিলেন লেনিন এবং তাঁর অনুগামী কমরেড আর প্রোলে-তারিয়েত্ সৈন্যদের সাহায্যে।

প্রতিবিপ্লবের শেষ শক্ত ঘাঁটি 'উইনটার প্যালেস্'-এর পতন সংবাদ ২৬শে অক্টোবর ভোর তিনটের পর দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েত্ কংগ্রেস'-এর সভায় পৌঁছনোমাত্র গোটা হল যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল অদম্য উল্লাসে—সেই উদ্দাম-উল্লাসই বুঝি নবজাতকের শুভ জন্ম-লগ্নের ঘোষণা। জন্ম নিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার—সারা দুনিয়ার সর্বহারাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক লেনিন-সরকার।

লেনিন সকালে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি—তিনি ব্যস্ত ছিলেন 'উইনটার প্যালেস্'-এর ওপর শেষ আঘাত হানার বন্দোবস্ত নিয়ে এবং প্রথম বল্শেভিক্ সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য নির্ধারণের। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা তাঁর চোখে ঘুম নেই। কোটি জনতার ঘুম কেড়ে নিয়েছে যে বীভৎস পশুশক্তি, তার সংগে চূড়ান্ত মোকাবিলা করতে হবে যে—মহানায়কের চোখে ঘুম থাকে কী ক'রে। 'উইন্টার প্যালেস্'-এর পতন এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীদের গ্রেফ্তার পর্ব অন্তে তিনি বিশ্রাম নিতে গেলেন। কিন্তু ঘুম আসে না যে। কঠিনতম প্রয়াসে-জাত সমাজতন্ত্র-শিশুর ভাবনা তাঁর অন্তর জুড়ে রয়েছে। অত্যাচারের কুহেলিকা ঘুচিয়ে নতুন প্রাণমন্ত্রের যে বাণী ছড়িয়ে দিলেন, তার সার্থকতা সাধনও যে তাঁরই কর্তব্য। পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ ভাষাকে তিনি সার্থকতার বারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধ করেছেন—এখন তাকে বাঁচিয়ে রাখাও যে তাঁরই কাজ। কাউকে বিরক্ত না ক'রে, কাউকে না জানিয়ে তিনি নিঃশব্দে বসে গেলেন ভূমিবিষয়ক নির্দেশাবলী লিখতে।

২৬শে অক্টোবর সারাদিন তিনি ব্যস্ত পেত্রোগ্রাদ্-এর সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে। দ্বিপ্রহরে সেণ্ট্রাল্ কমিটির সভায় স্থির হল, অন্য কোনও দলের সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র বল্শেভিক্-রাই সরকার গঠন করবে।

ঐদিন সন্ধ্যায় হল দ্বিতীয় 'সারা রাশিয়া সোভিয়েত্ কংগ্রেস'-এর অন্তিম অধিবেশন। জন্ রীড্-এর ভাষায়:

'ঠিক ৮-৪০ মিনিট-এর সময় উত্তাল কলরোল জানিয়ে দিল মহানায়কের আগমন-বার্তা।---আধময়লা, বড়সড় ঢোলা ট্রাউজারস্ পরিহিত, খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে,—লেনিন, জনগণের লেনিন, ইতিহাসের জনপ্রিয়তম নায়ক এসে দাঁড়ালেন সম্মুখে।'---

নবজাত সোভিয়েত সরকারের প্রথম ঘোষণা শান্তির আশ্বাসপূর্ণ।

আঁদ্রেইয়েভ্ লিখেছেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত লেনিন কিছু বলতে পারেন নি; কেন না, অগণিত মানুষ তাদের পরম-প্রিয় নেতাকে দেখার এবং তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছিল 'জয়তু লেনিন' ধ্বনিতে। শ্রমিক, সৈন্য এবং নাবিকরা উল্লাসে টুপি ছুঁড়ছিল; শুধুমাত্র লেনিনকে দেখার অধীর আগ্রহে, জনতা জানলা-দরজা বেয়ে, চেয়ার-টেবিলে উঠে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। লেনিন যে তাঁদের জন্য দুঃখের পণে দুর্লভ ধন জয় করে এনেছেন। অত্যাচার-নিপীড়নের সকল কাঁটা ধন্য করে বিপ্লব-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে—তার মনোহরণ সুবাসে জনচিত্ত মাতোয়ারা।

ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ইতিহাস-পুরুষ লেনিন উদাত্ত কণ্ঠে শান্তির জন্য আহ্বান জানালেন—নিঃশর্ত শান্তির জন্য আলোচনার ডাক। তিনি বললেন, রাশিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে চায় যে, দুর্বল জাতির ওপর অত্যাচার, পররাজ্য অধিকার ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় এবং সর্বজাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য শান্তি আনতে হবে দুনিয়ায়—নান্যঃ পন্থাঃ; তা ছাড়া, তক্ষুণি অন্তত তিন মাসের জন্য যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করে শান্তি আলোচনায় বসতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরত জাতিসমূহের সংগে ভূতপূর্ব রুশ সরকারের সমস্ত গোপন চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হল। বৃটেন, ফ্রান্স্ এবং জার্মানী-র প্রোলেতারিয়েত্-দের আকুল আহ্বান জানালেন লেনিন রুশ জনগণের পাশে দাঁড়াতে 'সাফল্যের সংগে শান্তি আনয়ন করার জন্য'।

সমবেত সকলে দাঁড়িয়ে 'ইনটার্ন্যাশ্নাল' সংগীত গাওয়ার পর সভা ভংগ হল।

লেনিন-এর 'ডিক্রী অব্ পীস্' (শান্তির প্রস্তাবনা) সর্বপ্রথম সহাবস্থান নীতির ঘোষণা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং ধনতান্ত্রিক দেশ যাতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে, তাই লেনিন নির্দেশ করলেন তাঁর 'শান্তির প্রস্তাবনা'য়।

'ভূমি সংস্কারের প্রস্তাবনা'য় তিনি

দাবি জানালেন সমস্ত জমিদারী অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করা হোক ক্ষতি-পূরণের কোন প্রশ্ন না তুলে, এবং সব জমি সোভিয়েত্ কমিটি-র হাতে দেওয়া হোক্ সুষ্ঠু বণ্টনের উদ্দেশ্যে। তিনি আরও প্রস্তাব করলেন, জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা চিরতরে তুলে দিতে হবে; জমি ক্রয়-বিক্রয় চলবে না।

কংগ্রেস-এ ১০১ জন সদস্যবিশিষ্ট 'অল্ রাশিয়া সেণ্ট্রাল্ এক্সিক্যুটিভ্ কমিটি' গঠিত হল; নির্দেশ রইল, কৃষক ও সৈন্যদলের প্রতিনিধি নিয়ে ভবিষ্যতে এই কমিটি-র কলেবর বর্ধিত করা হবে।

অন্তর-ন্যাশন্যাল-সঙ্গীত

জাগো---

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ।।

আদি শৃঙখল সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল সর্বনাশেরে এবে ভাঙিব এবার।
ভেদি' দৈত্য-কারা
আয় সর্বহারা।
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত।।

কোরাস

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে
শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী!
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী!
এই সংগ্রাম-মাঝ,
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ,
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ।
এই 'অন্তর - ন্যাশনাল - সংহতি' রে
হবে নিখিল মানব জাতি সমুদ্ধত।
---নজরুলের অনুবাদ।

সফল অক্টোবর বিপ্লব নিঃসংশয়ে প্রমাণ করল তাত্ত্বিক লেনিন বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রেও অনন্য, তুলনারহিত। সর্বকালের এবং সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক এবং বাস্তবে সেই তত্ত্বের প্রয়োগবিদ্-রূপে তাঁর স্থান চিরকালের জন্য মহাকাল-নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তাঁর তুলনাবিহীন পরিচালনায়:

'অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।।'

ইতিহাসে সর্বপ্রথম তিনিই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর 'পবিত্র অধিকার' অস্বীকার ক'রে তা জনসাধারণের সর্বাঙ্গক কল্যাণে নিয়োজিত করিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসানে 'প্রোলেতারিয়েত্-এর শাসন' প্রবর্তন করলেন। স্বর্ণপ্রসূ স্বদেশের সমস্ত ঐশ্বর্যের যারা আসল উত্তরাধিকারী, তাদের হাতে তাই তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ মানুষকে খাঁটি মুক্তি এনে দিলেন যুগযুগান্তসঞ্চিত দুর্বিষহ অবিচার-অনাচার ঘুচিয়ে। সত্যিকার সাম্যবাদ এল দেশে, জনগণেশ পেল প্রাপ্য আসন ---সামনে উন্মুক্ত হল বিশাল আত্ম-বিকাশের অপরূপ সম্ভাবনার স্বর্ণালোকচ্ছটা।

রুশ বিপ্লব ধনতান্ত্রিক সমাজের অচলায়তনের মূল পর্যন্ত নাড়া দেওয়ায় পৃথিবী দু'টো সুস্পষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় বিভক্ত হয়ে গেল। শান্তি, ঐক্য, সাম্য, প্রীতি ও অবাধ প্রগতির উদার সম্ভাবনা খুলে গেল জগতের নিপীড়িত মানুষের সামনে। সারা জগতের সর্বহারার দল উন্মুখ হয়ে চাইল রাশিয়ার দিকে; মেনে নিল তাঁকে নিজেদের অভ্রান্ত দিগ্দর্শকের অপরিসীম মর্যাদা দিয়ে, মহাকালের রথের অন্যতম প্রধান সারথিরূপে। পূর্ব ও পশ্চিমের সংগম-স্থলে অবস্থিত রাশিয়ার নবজাগরণ একসংগে পূর্ব ও পশ্চিমের অত্যাচারিত মানুষের মনে আনল নবীন উষার আগমন-বার্তা।

'বাধা অপসারিত, পথ নির্দেশিত'---অক্টোবর বিপ্লব প্রসংগে মহানায়কের বাণী এই। [ক্রমশ।

একগ্লাস ব্র্যাণ্ডি

খাওয়ার পর একগ্লাস ব্র্যাণ্ডির চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে। তবে, ব্র্যাণ্ডি বেশ ভাল হওয়া চাই। কটা রঙের এই তরল পদার্থটি প্রায়ই ঝাঁঝালো এবং কড়া। 'জিন্জার এল্' সহযোগে এটি আরও বেশি উপভোগ্য; এটি কক্টেল-এর পক্ষে ভাল এবং ক্রিস্মাস্ পুডিং- এর পক্ষে একেবারে নিখুঁত। ওয়াইন-এর মত ব্র্যাণ্ডি নয়। এটি বোতলজাত হওয়ার পর ক্রমেই ভালতর হতে থাকে। পাঁচ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় এই প্রক্রিয়া চালানো যায়, চালানো হয়ও। 'Brandy' শব্দটি জারমান্ শব্দ 'Branntwein' থেকে এসেছে, মানে 'Burnt-wine'---অর্থাৎ দু'বার পরিশোধিত ওয়াইন্। ফ্রান্স-এর কগ্ন্যাক্ অঞ্চলে সেরা ব্র্যাণ্ডী তৈরি হয়।

উত্তম কগ্ন্যাক্ (আইনী) কেবলমাত্র স্থানীয় শ্বেত ওয়াইন্ থেকেই তৈরি করা হয়। বড় বড় ওক কাঠের পিপেয় বছরের পর বছর থাকার ফলে বর্ণহীন তরলটি বাদামী হয়ে ওঠে. ওক কাঠের 'ট্যানিন' থেকে রং ধার ক'রে। বোতলে ভরার সময় পিপেয় রাখার কাল তাতে দেগে দেওয়া হয়। বছর পাঁচেকের পুরনো অল্প দামী ব্র্যাণ্ডির বোতলে সাধারণত তিনটে তারা থাকে। সাত বছর থেকে বারো বছরের পুরনো মাল (VO বা VE মার্কা) ভালতর। প্রথম শ্রেণীর ব্র্যাণ্ডির মার্কা VSOP বা VSEP। তবে সব সেরা ব্র্যাণ্ডির নাম 'Grande champague'। ঐ জেলায় সেরা আঙুর হয় বলে এই নাম।

[গল্প]

আঁধারের স্বাদ

সুমিত ঘোষ

একটা টিকটিকি দেওয়ালে পোকা খাচ্ছে। খপ্ করে ধরছে আর মুখে পুরছে। কত খাচ্ছে। একটার পর একটা বাদলা পোকা আসছে, কেমন অদ্ভুতভাবেই না টিকটিকিটা ধরছে। আলোটা অফ করে দিলেন করুণবাবু। টিকটিকিটা নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হল। হাসি পেল করুণবাবুর। মন বলে টিকটিকির কিছু আছে বলে তাঁর জানা নেই। হয়তো আছে। মন না থাক, অনুরূপ তো কিছু থাকতে পারে। তাহলে কি করে সংসার-ধর্ম করে। রাশি রাশি বাচ্চার জন্ম দেয়। নাকি ওর কেউ নেই। সংসারে একা নাকি। হাসিও পায় করুণ-বাবুর। একে টিকটিকি তায় আবার তার মন আছে কি না গবেষণা করা। সংসারের কোন কাজ না থাকলে এইসব বাজে চিন্তায় মনকে ভাবিয়ে তোলে। মা-বৌদির অভিযোগ মিথ্যে নয়।

আলোটা আবার জ্বেলে দেন। এখন পোকা অনেক কম। আরেকটা টিকটিকি এসে জুটেছে। পুং কি স্ত্রী জানেন না। খাদ্যের ভাগীদার না দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার সাহায্যকারিণী, অত চিন্তা করার দায় পড়েনি। চিন্তা করতেন যদি না হঠাৎ মা-বৌদির কথা মনে পড়তো। মা-বৌদির কথা মনে পড়লেই মনে হয় ওরা ঠিকই বলেচে। সত্যি তো বিয়ে করেছে অথচ বৌকে পোষবার ক্ষমতা নেই। এতে কে না দুষবে। অথচ এই বৌদিই তাঁর বিয়ের আগে এষার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এখন তো বৌদি প্রায় বলেন, লজ্জা করে না, একটা মেয়ের জীবন নিয়ে মিছিমিছি নয়ছয় করলে! ভাগ্যিস এষাকে আনি নি ঘরে। নইলে সারা-জীবন কথা শুনতে শুনতে জীবন যেতো।

করুণবাবুর জীবনটাই কেমন যেন ছন্নছাড়া। একথা তো উনি ভালো করেই জানেন। আর জানেন বলেই জীবনকে যত্ন নিয়ে গড়তে পারেন নি বা চান নি। আজীবন অবিবাহিত থাকবেন বলেই ভেবেছিলেন। অথচ বৌদি দেওরকে সংসারে মন বসাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গেলেন; প্রথমে চেষ্টা করলেন নিজের মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে দিতে। করুণবাবু কখনও বিয়ে করতে চান নি। একটা সামান্য চাকরী, নিজের পেটটা কোন-মতে ভরবে। আর বাকী সময় কাটবে বই পড়ে। কিন্তু বৌদির কথা ঠেলতে পারেন নি। বিয়ে বিয়ে শুনতে শুনতে একজন সঙ্গিনীর অভাব বোধ করে-ছিলেন। নিজের বিছানাটা মাঝে মাঝে বড় ফাঁকা মনে হোত; ছোট খাটটাও যেন বড় বেশি চওড়া মনে হোত। সারাদিন দেশী-বিদেশী বই পড়েও সময় কাটতো না। ফ্যান্টাসির জগতে ডুব দিতে সর্বক্ষণ তাঁর মন চাইত।

বিয়ে তাই হল। কিন্তু যথাসময়ে বৌ ফিরে গেল। কেন ফিরে গেল, কবে আবার আসবে, কেন এতদিন এলো না সবাই জিজ্ঞাসা করে। করুণ মিত্তির কোন উত্তর দিতে পারেন নি। উনি বোধহয় পারবেন না। কেন পারবেন না তা জানেন না। কেউ বলেও দেন নি। তবু পারবেন না।

কি ব্যাপার বল তো ছোড়দা, টাকা আনচো, অথচ খরচ করতে দেখি না, জমাতেও দেখি না। টাকাগুলো কি হয়। শ্রাদ্ধ? কোন বিশেষ বাড়ীতে, না বিশেষ পল্লীতে? বৌদির মুখে কিছু আটকায় না। তাঁর ধারণা বৌ বুঝি অভিমান করে চলে গেছে। নইলে অমন মেয়ে হয়ে চিঠি দেয় কি-না অমন লোকের সঙ্গে ঘর করবো না। ঠিকই বলে। এত বয়স হল, এক পয়সা না পেরেছে জমাতে, না পেরেছে কিছু করতে। নিশ্চয় কোথাও খরচ করে আসে। বৌ ক'দিন এসেই জানতে পেরেছে। নইলে নিজের সংসার ফেলে চলে যায়?

মাঝে মাঝে মনে হয়, করুণ নির্বীর্য পুরুষ। দু'বেলায় ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে বলেন, রক্ষে করেচো বাবা, এষার গলায় যে একজন ইমপোটেণ্ট কুলিশ ঝোলেনি এটাই ওর ভাগ্য। আহা, বড্ড আদুরে মেয়ে। ওরকম

স্বামী পেলে আত্মহত্যা করতো নিশ্চয়।

বৌদি যখন তখন অনেক কথা বলেন। দাদার ভালো চাকরী। একে অফিসার, মেজাজও ঠিক সেইরকম। সাতে-পাঁচে থাকেন না উনি। অফিসেও অফিসের কাজে ব্যস্ত, বাড়ীতেও অফিসের কাজে ব্যস্ত। কি করে যে দাদা সময় কাটায় তাই ভেবে অবাক হন করুণবাবু। অফিসের কাজ ছাড়া আর কোন কাজেই তাঁর সাড়া মিলবে না। বই পড়াটা তাঁর কাছে বাজে সময় নষ্ট করা। বৌদির মুখের ওপর করুণবাবু কোন কথা বলতে পারেন না। তার কারণ তাঁর স্বামী বেশি রোজগারী। এই বিরাট সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছেন। বৌদির কথা নীরবে হজম করা ছাড়া উপায় আর নেই। আর বৌদিকে তাঁর বড় একটা আশ্চর্য লাগে না। আশ্চর্য লাগে ঈপ্সিতাকে। ঈপ্সিতা ওর বৌ। ওর বিয়ে করা বৌ, হ্যাঁ, একটা রাত্রি বউ-বউ খেলা খেলেছিল। খেলা শেষ হয়ে গেল। যে যার ঘরে ফিরে গেল।

অথচ ঈপ্সিতার ওপর কোন অধিকার ছিল না। অবশ্য সে খুব স্পষ্ট-ভাষী। স্পষ্টভাষায় জানিয়েছিল, বাবা-মার কথা ঠেলতে পারেনি বলেই বিয়ে করেছে। এখনও মনটা পড়ে আছে ব্রজেশের কাছে। ওকে ভুলতে পারবে না ঈপ্সিতা। কোনদিনই পারবে না। অথচ এই সামান্য কথাটা মাকে জানালেও বাবাকে জানাতে পারেনি। বাবা যেরকম লোক হয়তো ওকে কেটেই ফেলবে। বাবাকে সে চেনে। খাঁটি যম বললেও চলে।

একগাদা কথা বলে গেল ফুল-সজ্জার রাতে। করুণ জানতে চায়নি। নিজে কতখানি ঠকেছে তার হিসেব পেতে চায়নি। বরং যা সত্যি ঘটেছে তা চাপা পড়ে থাক। কিন্তু ঈপ্সিতা জানাবেই। প্রথমে ভেবেছিল বোধহয় রসিকতা করছে ঈপ্সিতা। না, পরে বুঝলেন, সন্দেহ করার কিছু নেই ওর কথায়।

ঈপ্সিতা কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল করুণের পানে। মনে মনে হেসেছিল বেচারী করুণ মিত্রের করুণ মুখের পানে তাকিয়ে।

বিশ্বাস করুন আপনি, আপনার জীবনকে অভিশপ্ত করে তোলবার কোন কামনা ছিল না। আপনারা পুরুষ। একবার দুর্ঘটনা ঘটলে আপনাদের দরজা খোলা। শিক্ষিত লোকেরা আশী বছরেও ষোল বছরের তন্বীকে ঘরণী করে তুলছে। তাই এই পথটা নিয়েছি। আপনার সঙ্গে বিয়ে হলেও আমার এই ভাঙা হৃদয় আর এই আমার অপবিত্র দেহটা নিয়ে যন্ত্রণা দেবো না আপনাকে।

ঈপ্সিতা চুপ করে রইল। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। এগ্রিকালচার অফিসের ক্লার্ক-কাম-টাইপিষ্ট। প্রৌঢ় সাহেব গোবিন্দ মিত্তিরকে এই 'কথা' দিয়েই বশ করেছে। ঈপ্সিতা বলে চললো, কুয়াশাভরা শীতের সকাল। মা বললে, তোকে কে ডাকছে। ঘুমের রেশ কাটেনি। লেপটা গা থেকে সহজে সরাতে পারছি না। আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলুম। গিয়ে দেখি আমাদের অফিসের সহকর্মী ব্রজেশ। এই সকালে হঠাৎ? ও নাকি এ পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আমাকে মনে পড়ায় দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। সেদিন বুঝতে পারিনি ব্রজেশ আমার জীবনটা নয়ছয় করে দেবে। আমার হাতে নাকি যবের শীষ আছে। এই দেখুন। ঈপ্সিতা ওর ডান হাতটা তুলে ওকে দেখায়। করুণবাবু হাত দেখতে জানেন না। বিশ্বাসও করেন না। তবু হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যবের শীষ থাকলে কি হয়?

কি আশ্চর্য, জানেন না, ছেলেদের হাতে থাকলে লাভ ম্যারেজ করে; মেয়েদের হাতে থাকলে সে মেয়ে জীবনে সুখী হয় না। দেখি আপনার হাতটা---

বাঁ হাতটা তুলতে যায়। করুণবাবু আশ্চর্য হন। বাঁ হাতটা টেনে ডান হাতটা এগিয়ে দেন। পুরুষের ডান হাত নয়, বাঁ হাত।

আমি বাঁ হাত কাউকে দিই না। ডান হাতে যদি হয় তো হবে, নইলে—

ব্রজেশও এত গোঁয়ার গোবিন্দ নয়। ডান হাতটাই তুলে দেখে। সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর তপ্ত হাতটার স্পর্শে অভিভূত হয়। ঈপ্সিতা সুখী হবে না, করুণও হবেন না, ক্ষতি কি। ঈপ্সিতাকে বোঝানো যাবে। সে ঠিক বুঝবে। করুণবাবু এতজনকে বোঝাতে পারেন, নিজের স্ত্রীকে বোঝাতে পারবেন না? তিনি ঠকেছেন। ঈপ্সিতাও তাই বলবে। কিন্তু তিনি নিজেকে ঠকতে দেবেন না। সারা জীবন ঠকেছেন। সারা জীবন। হাতে হাত দিয়েছেন কাজ ভণ্ডুল হয়েছে। জীবনে কোন মেয়ের ভালবাসা পাননি। ভালবাসা আদায় করা একটা আর্ট নাকি। তাছাড়া ভালবাসা এক জিনিস, পাওয়া আরেক জিনিস। করুণবাবু চেয়েছিলেন ভালবাসা। কিন্তু পরে বুঝলেন, ভালবাসা পাওয়া যায়, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে কাউকে পাওয়া যায় না। তা যদি যেতো, তবে চকিতাকে পাওয়া যেতো ঠিকই। চকিতা তো ভালবাসতো করুণবাবুকে। কিন্তু বিয়ে করতে চায়নি। বলেছিল: ঐ ছন্নছাড়া লোকটার সঙ্গে ঘর করা? নৈব নৈব চ। করুণবাবুর কানেও গেছে সে কথা। অবাক হননি তিনি। চকিতা তাঁকে ভালবাসলেও তাঁর জীবনের সঙ্গে ওর জীবনটা মেলাতে চাইবে না। কারণ ওর একটা ভবিষ্যৎ আছে, একটা 'এম' আছে। মেয়েরা যেরকম স্বামী পাবার স্বপ্ন দেখে, সেই সবরকম গুণসম্পন্ন একজন পুরুষের স্বপ্ন দেখেছিল চকিতা। এতে দুঃখ নেই করুণবাবুর। কিন্তু ভালবাসা বাদ দিয়েও তো শুধু দেহটা পাওয়া যায়, তপ্ত দেহ। যে-কোন মেয়ের নয়। তাঁরই স্ত্রীর। এটা একটা অধিকার। ঈপ্সিতার কথা শুনে প্রথমে তাঁর কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল তিনি কতখানি ঠকেছেন। একটি মেয়ে কিভাবে প্রতারিত করেছে তাঁকে। তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করেছে। অথচ বলতে পারেন

নি। সারা শরীর অভিমানে ফুলছিল। অথচ এখন স্ত্রীর তপ্ত হাতের ছোঁয়া পেয়ে সব ভুলে গেলেন। জীবনটা মনে হল একখণ্ড কবিতা।

ঈপ্সিতা হাত নেড়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলো। বললে, একটা আবছা যবের শীষ দেখতে পাচ্ছি। এক বছরের মধ্যে এক্কেবারে পরিষ্কার ফুটে উঠবে।

তার মানে, বলচো আমি লাভ ম্যারেজ করবো?

সিওর। হতেই হবে। জানেন, আমি অনেকের হাতে যবের শীষ দেখেছি, তাদের সকলের জীবনে দেখেছি এই ঘটনাই ঘটেছে। আপনি নিজে কি করতে পারেন!

তাই নাকি? কিন্তু আগে তো আগুনের সামনে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করা বউকে ডাইভোর্স করতে হবে। কিন্তু তা করার আগে কতকগুলো গ্রাউণ্ডস্ খুঁজতে হবে।

ঈপ্সিতা হাসে। আমার প্রতি বিশ্বাস বেশিদিন থাকবে না। দু'দিন পরেই আপনার ঘৃণা হবে। আপনি তাড়িয়ে দেবেন কুকুরের মত।

হাসি পায় করুণবাবুর। করুণকে চেনে না ঈপ্সিতা। তাই একথা বললে। কিংবা নিজে থেকে বিদায় নেবার এ একটা অজুহাত। আজ ফুলশয্যার শুভরাতে এই সব কথাগুলো ঈপ্সিতা না তুললেই পারতো। আরও তো অনেক মেয়ে আছে, কে এমন করে তাদের কুমারী জীবনের ইতিহাস খুলে ধরেছে। সত্য ভাষণের জন্যে ওকে প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু দু'দিন পরে তো বললে হোত। করুণ বোঝেন হয়তো ঈপ্সিতা একটা বড় উদ্দেশ্য রেখে দিয়েছে ওর মনে। এই দেহেই তো শয়তানের বাস। ঈপ্সিতা ওর পোষা শয়তানকে বড় বেশি আস্কারা দিয়েছে, তাই আজ ওরও শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে।

তুমি সব ভুলে যাও। আমিও ভুলে যাবো।

আপনি পারবেন না।

না পারবো যদি জানোই, তবে বলতে গেলে কেন। আমি কি তোমার জীবনের সব ইতিহাস জানতে চেয়েছি?

জানি আপনি চান নি; কিন্তু আমাকে বলতে হোতই। আমি যে ব্রজেশকে ভুলতে পারবো না। ব্রজেশকে ঘিরে আমার সমস্ত সত্তা। আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না।

তবে বিয়ে করলে না কেন?

করতুম। জাত আমি মানি না। ব্রজেশ বেনে। বেনে কেন, সদ্‌গোপ-গয়লা-কইবোত-হাড়ি-বাগদি মায় মোছলমানও যদি হোত আমি ওকে ছেড়ে দিতুম না। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ছ'টা ওর ছেলেমেয়ে। তবু ওকে আমি ভালবাসি। কেন ভালবাসি আমি জানি না।

এরপর আর কি শুনবেন করুণবাবু। তাঁর মনে হল তিনি পৌঁছেছেন নতুন এক দেশে। তবু বোধহয় উপায় আছে। এখনও আশা আছে। মনে হয়, একটি সন্তান হলেই সংসারে ওর মন বসে যাবে। মন পাবার বাসনা যদিও ছিল তাঁর, কিন্তু তা না পেলেও ক্ষতি নেই। একটা সংসার তো পাবেন। শিশুকে ঘিরেই তো সংসার। বয়স তাঁর কম হল না। এতদিন একটা সংসার পাবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। সেই সংসার তো পাবেন!

আমি তলিয়ে গেছি, বিশ্বাস করুন; কিন্তু এও বিশ্বাস করুন, আমি আর ব্রজেশ ছাড়া আর কেউ জানে না যে আমি তলিয়ে গেছি। ভেবেছিলুম আমাদের মধ্যেই রেখে দেবো; কিন্তু বাবা তা হতে দিলেন না। আমার মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। ব্রজেশ মরতে দিলে না, বললে, চাকরী করা মেয়েদের ভয় কি। তারা কি কারুর পরাধীন? তারা মেয়ে হয়েও পুরুষ। ওর কথায় আমি সত্যকার সান্ত্বনা পেয়েছিলুম।

আঁচলটা বুক থেকে নামিয়ে দেয় ঈপ্সিতা। দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝতে পাচ্ছেন কিছু?

চমকালেন করুণবাবু, মেয়েটা কি বলতে চায় তবে—তিনি লক্ষ্য করলেন, হ্যাঁ ওর পেটটা একটু উঁচু। একটু লক্ষ্য না করলে ঠিক বোঝা যায় না পেটটা কতখানি উঁচু। সাধারণ-ভাবে দেখলে মনে হয় পেটে বোধহয় চর্বি জমেছে বলেই এই পরিবর্তন।

নির্লজ্জ! তুমি বেশ্যা—

আমি জানতুম আপনি এই কথা বলবেন। যেদিন আমার বিয়ের সব ব্যবস্থা হচ্ছে সেদিন থেকে রোজ ভেবেছি, এই কথা কেমনভাবে আমি তাকে জানাবো; অথচ লুকোবার তো নয়। লুকোবার হলে কোন চিন্তা ছিল না। নিজের পাপ যে নিজের দেহেই বয়ে বেড়াচ্ছি করুণবাবু। অথচ আমার দিবারাত্রির ভাবনা এই পাপকে ঘিরে। কখনো কখনো ভেবেছি, বাবাকে বলবো, আমি বিয়ে করবো না, আবার ভেবেছি, নিজে পাপ করেছি, কিন্তু যাকে আনছি সে তো কোন পাপ করেনি। পাঁক থেকেও তো পদ্ম ফোটে। ওর তো একটা পরিচয় চাই। আমি স্বীকার করছি করুণবাবু, আমি স্বার্থপর। নিজের জন্যে ভেবে মরে আপনার দিকটা উপেক্ষা করেছি, কিন্তু আপনি পুরুষমানুষ, আপনার চিন্তা কি!

করুণের মনে হল এমন এক চড় মারে যাতে ঈপ্সিতা বুঝতে পারে জীবনটা একটা ছেলেখেলার বস্তু নয়। তার চোখ রাগে জ্বলছিল ঠোঁট কাঁপছিল। একটি কথাও বেরুলো না মুখ দিয়ে। আশ্চর্য, এখনও রজনীগন্ধার গন্ধ আসছে। এখনও ছাদে বসে সবাই গল্প করছে। তার শব্দও আসছে। আজ নাকি উৎসব। আজ মিলনের দিন! তাঁর মা ভাবচেন, যাক ছোট ছেলেকে সংসারে মন বসিয়ে দিলেন। বৌদির মনটা খুবই খারাপ ছিল। যদি এখানে বৌ করে আনতে পারতেন, মামা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। অথচ যেখানে যা লেখা আছে। করুণবাবু অকস্মাৎ একটি গাল দিয়ে উঠলেন। অনেকদিন কো

[illegible] দেখেনি। সেই [illegible] জীবনে সরস্বতী পূজোর রাত্রে জোরে রাত জেগে একটু-আধটু খিস্তি করেছিলেন মনে আছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোন খিস্তি মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

আমি জানি করুণবাবু, ব্রজেশ আমার জীবনের ধূমকেতু। কিন্তু আমি চাই না কাউকে মারতে, কাউকে কষ্ট দিতে। ওর ঘরও তো আমি ভাঙতে পারতুম।

কিন্তু আমার ঘর? খিঁচিয়ে উঠলেন করুণবাবু। সজোরে ঈপ্সিতার হাত দুটো চেপে ধরেন। ওঁর বলিষ্ঠ হাতের চাপে যন্ত্রণাবোধ করলো ঈপ্সিতা। দম যেন আটকিয়ে যাবে। তবু সব সহ্য করলো। ও এই ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।

তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করলে। এই অধিকার তোমায় কে দিলে? করুণ চাইলো, ঈপ্সিতা এবার কাঁদুক। বেশ জোরেই কাঁদুক। চীৎকার করে উঠুক। লোকজন ছুটে আসুক। দেখুক একজন হতভাগ্য পুরুষকে। সঙ্গিনী চেয়েছিল। হাসি পায় ওর। অথচ আশ্চর্য, এত চাপেও কাঁদলো না। একটু মুখে শব্দও করলো না। দমটা বন্ধ করে রইল ঈপ্সিতা।

তোমায় যে কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। বিয়ের আগে আত্মহত্যা করলে না কেন, তুমিও বাঁচতে, আমিও বাঁচতুম। শেষ পর্যন্ত আমার কপালে—

এত যন্ত্রণার মধ্যেও হাসি পেল ওর। বললে, এত সহজে মরতে হলে জগতে লোকের সংখ্যা অনেক কমে যায়। সতী ক'টা পাবেন? আর পুরুষ! সবাই যেন সাধু। যারা পারে না তাদের মধ্যে বেশির ভাগ কানা-খোঁড়া-হাবা-কালার দলে। কিংবা ভূষো কালির রং। আর যারা ইমপোটেন্ট—তারা। সত্যিকারের সাধু কত পার্সেণ্ট?

সত্যিকারের একটা গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে ঈপ্সিতা। করুণের হাতটা মুহূর্তে আলগা হয়ে এল। ঈপ্সিতার বুদ্ধি আছে। কোথায় কি বলতে হয় জানে সে। জানে বলে এই অবস্থায় আগুনে ঝাঁপ দিতে পেরেছে। আর করুণবাবুর কপালে যে রকম করেকটা রেখা ফুটে উঠেছে, সেরকম রেখা ঈপ্সিতার মুখে নেই। ভরাট মুখ ওর। কোন রেখা মুখটাকে কাটাকুটি করেনি। ওর মুখের পেণ্ট এখনও জ্বলজ্বল করছে। ওকে সত্যি দেখতে সুন্দর। অথচ এই মুহূর্তে তিনি আয়নার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে একবার দেখে নিয়েছেন। ভারী কুৎসিত দেখতে লাগছে নিজের কাছেই।

কবে যাবে বাড়ীতে?

আপনি যেদিন ছাড়বেন।

তোমার ওপর আমার কোন দাবী নেই। কোন অধিকার নেই।

সে আমি জানি। কিন্তু একটা ভিক্ষা আছে।

করুণবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন ঈপ্সিতার কথা কানে যায়নি তাঁর। যেন কি গভীর চিন্তার জগতে ডুব দিয়েছেন। তাঁর দিকে চেয়ে বলতে সুরু করলো ঈপ্সিতা, আমাদের একটা কণ্ট্র্যাক্টে আসতে হবে। এছাড়া আর উপায় নেই।

কণ্ট্র্যাক্ট? মানে চুক্তি? কিসের কণ্ট্র্যাক্ট?

কোনরকম ভাবলো না ঈপ্সিতা। একনিশ্বাসে বলে গেল, এই ধরুন আমরা দুজন চিরদিন দূরে দূরে থাকবো, এক বছর আমি অজ্ঞাতবাস করবো। ছুটির দরখাস্ত করেছি। আমার বাড়ীতে জানবে আমি এখানেই আছি। আপনি কোনদিন কোন কথা জানাবেন না। আপনার বাড়ী থেকে আমাকে নিয়ে আসার জন্যে যদি কোন তাড়া দেন, তবে আপনি বলবেন, আমি বিশেষ একটা পরীক্ষা দেবার জন্যে খুবই ব্যস্ত। এই অবস্থায় আমার পক্ষে শ্বশুরবাড়ীতে যাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এক বছর আপনি বিয়ে করতে পারবেন না। এক বছর পর আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন। আর শেষ সর্ত হল, আমার সন্তান আপনার পদবী পাবে, যেমন আমি পেয়েছি।

তার মানে, তোমায় আমায় ঘিরে একটা বিরাট মিথ্যের জগৎ তৈরী হবে?

আদর্শবাদীরা তাই বলবেন। আমি রিয়ালিষ্ট; এই সব ভাববাদীদের ভাবালুতায় আমার গা ঘিন ঘিন করে। আমি একে বলি না মিথ্যের জগৎ। বরং বলি বাঁচবার জগৎ। বাঁচবার তাগিদে মিথ্যেকথা বলা পাপ নয়। বরং ভালোমানুষীর ভণ্ডামীই পাপ।

তুমি অনেক কিছু বলতে পারো। তোমার সব কথাকে মানতে হবে এমন কোন কথা নেই।

হঠাৎ ঈপ্সিতা ওর হাত দুটো নিজের হাতে চেপে ধরে। করুণবাবু এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনি বাঁচান। আমার যে এ ছাড়া পথ নেই।

কিন্তু আমি কি পেলুম। তুমি তো সমস্ত পাওনাগণ্ডা পাই-পয়সার হিসেবে মিলিয়ে নিয়েচো।

আপনি ভুল করছেন করুণবাবু, আমি কেবলমাত্র বাঁচতে চেয়েছি। বাঁচার অতিরিক্ত দাবী কিছু করিনি। যদি করি আপনি তা বাতিল করবেন। আপনি আমায় বাঁচান। ওর চোখে জল এল। ও কাঁদতে লাগলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মায়া-কান্না নাকি? করুণবাবুর মনে হল বলবেন। কিন্তু কিছু মন্তব্য করলেন না। আর যদি বা সত্যিকারের কান্না পায় ওর, তবে কাঁদুক। করুণবাবু সারা জীবন কাঁদবেন, আর ঈপ্সিতা এইটুকু আর কাঁদবে না। বরং হাসি পায় করুণবাবুর। তাঁর ভুবন রিক্ত। কান্না পেলেও কাঁদতে ইচ্ছে আর করবে না। আর সত্যি বলতে কি, ঈপ্সিতাই ওকে শিখিয়েছে বাস্তববাদী হতে। ঐ তো ঈপ্সিতা কাঁদছে ওঁরই অনুগ্রহ লাভের জন্যে। ও কাঁদুক। করুণবাবুর হাসির দিন আজ।

অনেকক্ষণ আর কথা হ'ল না। পায়চারী করতে সুরু করলেন করুণবাবু। রাত চারটে বাজার ঘা পড়লো। আর একটু পরেই আশ্চর্য রাতটা একটু একটু করে সরে যাবে। দিনের আলোয় ঈপ্সিতাকে কত সুন্দর লাগবে, কত

সাধু মনে হবে। ঈপ্সিতা নববধূ। কত যত্ন, কত আদর পাবে। মা ব্যস্ত হবেন, বৌদির তো কথাই নেই। ব্যস্ত হওয়ার চেয়ে তাঁর ব্যস্তভাবটিই লক্ষ্য করার মত। আর করুণ মিত্তির একা-একা। পাঁচজন নানা কথা বলবে। ঠিকই বলবে। কিন্তু উত্তর দিতে তাঁর ইচ্ছে করবে না। বারেবারে মনে পড়ছে রাতের অভিজ্ঞতার কথা। ঈপ্সিতা ওঁর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওঁর শান্তি অপহরণ করেছে। হ্যাঁ, দেওয়ালে এখনও চকচক করছে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে কনভোকেশন গাউন-পরা দীপ্ত চেহারাটা। ছবিটা যেই দেখেছে, বলেছে, হ্যাঁ ছবি হয়েছে বটে। দীপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে কেউ কেউ ভবিষ্যতের সুপ্ত নেতার ব্যক্তিত্বকে দেখেছিল। মন্তব্য করেছিল, করুণদা ঠিক প্রগ্রেসিভ লীডার হবে, ওর চোখমুখ যে প্রমাণ করছে। অদ্ভুত ওর পারসোন্যালিটি! মা বলেছিলেন, অতশত বুঝি না, তবে এইটুকু জানি, ফুলের মত নরম ওর মন। কারুর দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে। ওর ভাগ্যটাই আগাগোড়া ভালো। ও যেদিন জন্মালো, ওঁর সেদিন মাইনা বাড়লো কুড়ি টাকা। ওর অন্নপ্রাশনের দিনে উনি ওঁর সাহেবের সঙ্গে কাশী-বৃন্দাবন বেড়িয়ে এলেন। উনি আজ বেঁচে থাকলে ওর পাশ করার খবরে সবচেয়ে আনন্দিত হতেন। মায়ের দীর্ঘশ্বাস এখনও তাঁর কানে বাজে। মায়ের কত আশা। করুণবাবুর সব কথা মনে আছে। কিছুই ভুলে যাননি। মায়ের কথাগুলো আজ নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, কথাগুলো প্রকাণ্ড এক বিদ্রূপ। মায়ের মনে যে বিরাট বিশ্বাসের প্রাসাদ তৈরী হয়েছে, আজ এক কথাতেই সেই প্রাসাদ ভেঙে দিতে পারে। মা সহ্য করতে পারবেন না। মাও কাঁদবেন।

এখনও রজনীগন্ধাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মিষ্টি গন্ধ আসছে। বাইরে পাখী ডাকতে সুরু করেছে। রাতটা কোথা দিয়ে কেটে গেল নিঃশব্দে। দেওয়ালে ছবিটার পানে তাকান। দীপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেদিনের করুণ মিত্র দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে প্রসারিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর দু'চোখে। আর আজ ধূসর রজনীগন্ধার একপাশে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আশাহত করুণ মিত্র। কত তফাৎ! অথচ জীবনে কিছু করতেও পারতেন। বই পড়েই সময়গুলো কাটিয়ে দিতে পারতেন। অফুরন্ত সময় আর অপরিমিত শান্তি! আজ সব শেষ হয়ে গেছে। দায়ী শুধু একজন। সে কাঁদছে। এখনো কেঁদে চলেছে। তবে ইনিয়ে-বিনিয়ে নয়। কাঁদুক। যত পারে কাঁদুক।

ভালোই হল, নিজের মনেই করুণবাবু বলতে লাগলেন, জীবনে অনেক কিছুই তো শেখার বাকী ছিল। শেখা হল। তুমি আমায় শেখালে, চকচকে জিনিস দেখলেই ধরতে যেও না। দু-তিনবার ভেবে দেখো। এটা আমি বইয়েতেই পড়েছি। বাস্তব জ্ঞান ছিল না। আজ হাতেনাতে ঐ মূল্যবান উপদেশের উদাহরণ পেয়ে গেলুম। আর আরেক জিনিস শিখলুম, জীবনে কাউকে বিশ্বাস করবো না। এর জন্যেও তোমায় ধন্যবাদ।

ঈপ্সিতা কান্না থামিয়েছে। আয়নার সামনে বসে নিজের চোখ মুছছিল।

আরও শেখালে, নিজের দেহ নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে পাপের বীজ দেহে নিয়ে এসে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য আরেকজনের শান্তিও নষ্ট করা যায়।

ঈপ্সিতা এবার কথা বললো, আপনি কি মনে করেন স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করার ইচ্ছে আমার নেই? ছিল। কিন্তু ভাগ্যে আমার নেই। নইলে এইরকম দুর্ঘটনা ঘটবে কেন? একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললে।

হাসি পেল করুণবাবুর। ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত। ওর কথা কইতে কণ্ঠও কাঁপে না। করুণ আর কথা কইবেন না। যা হবার হয়ে গেছে। আবছা আলো ঘরে ঢুকছে আরম্ভ করেছে। টেবিলে দুটো মালার স্তূপ। গোলাপের মিষ্টি গন্ধ। আর রজনীগন্ধাগুলো যেন মধুর মিলনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। রাতের অন্ধকার প্রেমিকের হৃদয়ে শিহরণ জাগায়। অথচ সে অন্ধকারের রূপ কেমন তা জানেন না করুণ মিত্র। আর বোধহয় কোনদিন জানতেও পারবেন না। অথচ ঈপ্সিতা জানে। অন্ধকারের মাদকতার স্বাদ সে জানে। সত্যি ঈপ্সিতার সঙ্গেই তাঁর কত প্রভেদ। ঈর্ষা হল। ঘৃণা হল। এতক্ষণের অবিরাম কান্নাকে ওর ভণ্ডামি বলে মনে হল। সত্যি অনেক কিছু জানতে বাকী ছিল। কিন্তু এই জানতে চাওয়াটাই তো একমাত্র ইচ্ছে ছিল না। আজ তো দিনের আলোর মত ধবধবে সাদা যে, করুণবাবু ঠকেছেন; সম্পূর্ণ ঠকেছেন। একজনের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন।

ঈপ্সিতা ওর মাথাটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর এলিয়ে দিলে। সারারাত জাগার পর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দুটো মুড়ে গেল। করুণবাবু ঘুমুতে পারলেন না, ঈপ্সিতার দিকে চেয়ে মনে হয় পারেও বটে ঘুমুতে। কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। সত্যি তো যে জন্যে সে চিন্তিত ছিল তার তো ফয়সালা হয়ে গেছে। ওর আর চিন্তা কিসের?

জানালার শার্সিটা খুলে দিলে ভালো হয়। চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। দেওয়ালে দৃপ্ত মুখমণ্ডলটা বড় ঝাপসা লাগছে। শার্সিটা খুলে দিলেন। এক-ঝলক টাটকা রোদ ঘরে আছাড় খেয়ে পড়লো।

দরজা খুলে করুণবাবু বেরুলেন। ঈপ্সিতা এখনো ঘুমুচ্ছে। করুণ বাথরুমে গেলেন। সারা গা পাক দিচ্ছে। কপালটা গরমে তেতে গেছে। বাথরুম থেকে দালানে ফিরে এলেন। ওপরের দালান থেকে নীচের উঠোনটা স্পষ্ট দেখা যায়। এত ভোরেও ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় জমে গেছে উঠোনে। বাসি লুচি আর পানতুয়া বোঁদে কাড়াকাড়ি ক

খাচ্ছে। বেলি-ফেলি-ছন্দা-তন্দ্রার দল ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামছে। ওদের মুখে হাসি। আহা বেচারীকে জাগিয়ে দিলি? সারারাত বেচারীর খুবই খাটুনি গেছে। এই চুপ করুণদা আসছে। বেশ চাপাস্বর, অথচ করুণবাবুর কানে সব গেল।

ঘরে ঢুকলেন তিনি। নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে ঈপ্সিতা। চেয়ারে বসেন করুণবাবু। টেবিলে রাখা গরম এককাপ চা পেলেন। শরীরে বল এল। ঈপ্সিতার সঙ্গে আর দুটো কথা কইতে ইচ্ছে হল। কিন্তু হঠাৎ বৌদি ঘরে ঢুকলেন। ঈপ্সিতার বন্দিদশার যেন মুক্তি দিতে এলেন। বাসি কাপড় ছাড়ার সময় এখন। এখন আর করুণবাবুর আওতায় নয়। ঈপ্সিতার মুখে কি লাজুক লাজুক হাসি। সবাই বলছে, বৌ হয়েছে বটে। শিক্ষিত চাকুরে মেয়ে বলে মনেই হয় না। কি সরল মেয়ে দেখ দিকিনি। তা ওদের দোষ কি; ঈপ্সিতার বিরাট ঘোমটা দেখে অনেকে ধারণাই করতে পারে না যে মেয়েটি শিক্ষিতা। ফেলি ওর দিদি বেলিকে বলেই বসলো, দ্যাখ দ্যাখ, দেখে শেখ। তুই তো ঘোমটা মানিসই না। যেন কতই না ফরোয়ার্ড হয়েছিস। তবু যদি বৌদির মত বিদ্যে থাকতো পেটে।

একদিন বৌ চলে গেল। সেই যে গেল, আর এল না। সবাই অবাক হয়েছে, হঠাৎ না আসার কারণটা কি—করুণবাবু কোন জবাব দিতে পারে নি। মা তো একদিন বলেই ফেলেছিলেন, বৌমার নয় একটা অভিমান থাকতে পারে, কিন্তু তোর তো একটা কর্তব্য আছে। করুণবাবু তারও উত্তর দিতে পারেন নি। করুণের অসহযোগিতার মনোভাবে মা শেষ পর্যন্ত ঝিকে পাঠিয়েছিলেন। ঝিয়ের হাতে ছোট্ট একটা কাগজ পাঠিয়েছিল ঈপ্সিতা। এক লাইনে লেখা, অমন পুরুষের সঙ্গে ঘর করা অসম্ভব। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন মা। বড়বৌকে দেখিয়েছিলেন সেই চিঠি। এতদিন ধরে যে সন্দেহ তাঁর মনে পাক খাচ্ছিল আজ যেন সেই সন্দেহ পেকে উঠলো। বললেন, আমি তো জানতুমই মা এই রকমই হবে। বৌদির থেকে নানা গুজব ছড়িয়ে গেল। অসহ্য হল করুণবাবুর। এ বাতাস বিষিয়ে এল তাঁর কাছে। একটা এজেন্সির কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন নানা জায়গায়। কিছুদিন পরে এই যে বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম তাও ভালো লাগলো না। ঘরে চলে এলেন। অথচ ঘরেও মন বসে না। ক্রমে যেন তিনি স্থবির হয়ে পড়ছেন।

হ্যাঁ, ঈপ্সিতার একটা সন্তান হয়েছে। নাম রেখেছে গর্জনকুমার। বেশ হয়েছে দেখতে। মা নিজে একদিন গিয়েছিলেন। নাতিকে কোলে নিয়ে নামাতে চাননি। করুণের রং ময়লা কিন্তু নাতি ফুটফুটে ফর্সা। এমন সুন্দর নাতিকে ফেলে কোথায় যাবেন। কিন্তু বৌ-ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন নি। যাঁর নিজের ছেলের ওপর জোর নেই, পুত্রবধূর ওপর কি জোর থাকবে। ছেলেকে মনে মনে গালি দিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন সেদিন।

মায়ের তাগাদায় অস্থির হয়ে করুণবাবু একদিন ছুটলেন শ্বশুরবাড়ীতে। ক'দিনের জন্যে ঈপ্সিতাকে আনার জন্যে। ঈপ্সিতা আসবে কি না সন্দেহ। হয়তো তাঁকে দেখেই ঈপ্সিতা হাসবে মনে মনে। এত কথা শোনার পরও ওর ওপর লোভ। তা ভাবুক। তাঁর জীবনটাই অভিশপ্ত। সকলের হাসি শুধু তাঁর কপালে জুটেছে। করুণ জানলার বাইরে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিলেন। বাইরের দৃশ্য দেখে যাওয়া তাঁর ছোট থেকেই অভ্যেস। বাইরের দিকে তাকিয়েও ঈপ্সিতার মুখটা মনে পড়ে। ও কি আসবে? না, কিছুতেই আসবে না। করুণবাবুকে দারুণ ঘৃণা করে। কেন তা জানেন না। শুধুমাত্র ব্রজেশের জন্যে? হঠাৎ চোখে পড়লো ঈপ্সিতা, বাইরে ওদেরই সঙ্গে দৌড়োচ্ছে, ট্রেণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেছনে পেছনে ওর ছেলে গর্জনকুমার। সেও ছুটছে মায়ের সঙ্গে। করুণবাবু অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। ওরা ট্রেণকে রেখে এগিয়ে চললো। তবু ছুটছে। ওরা থামবে না। ট্রেণ যেন অনেক পিছিয়ে পড়েছে। অনেক। অনেক। অনেক। ক্রমে ওরা ছোট হয়ে এলো। একসময়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

এক ফোঁটা তপ্ত জলে চোখের মোটা কাঁচটা ঝাপসা হয়ে গেল। করুণবাবু মাথাটা ঢাকলেন।

গুরুভ্রাতার দৃষ্টিতে স্বামীজী

"কী মহাপ্রাণ ছিলেন তিনি। সকলের জন্য কী Feel (সমবেদনা অনুভব) করতেন। সকলের জন্য এত প্রীতি, এত সহানুভূতি আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখি নি, আর দেখবও না। * * তাঁর কথার এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তলে তখনই গিয়ে পৌঁছত, একটুও বিলম্ব হত না। সে সময়ের জন্য সব ভুল হয়ে যেত। লোকে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেত। সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি তুলে দিতে পারতেন।"

"স্বামীজী আর কিছু না হলেও একটা সম্পূর্ণ (perfect) মানব। এইরূপ সম্পূর্ণ মানবের ধারণাই যদি না করা যায়, তবে ভগবানের ধারণা করা কি সম্ভব? তাই স্বামীজী বলতেন, 'আগে আমাকে বোঝো, পরে ঠাকুরকে বুঝবে।"

—স্বামী তুরীয়ানন্দ

অরুণাচলের আশ্রমে

[গল্প]

শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বাংলা দেশের জাতীয় চারণ কবি, নাট্যকার ও দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর চন্দ্রগুপ্ত নাটকে গ্রীকদের মুখেতেই বলেছিলেন, আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি সম্বন্ধে, "কি সুন্দর বিচিত্র এই দেশ"। ভারত সকল বিষয়েই সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের এবং সভ্যতার প্রথম আলোক এই ভারত থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র পৃথিবীতে। খৃষ্ট-জন্মের বহু হাজার বছর আগে এখানকারই ঋষি ও মনীষীরা একমেবাদ্বিতীয়ম পরমসত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছিলেন। আর তা জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেতে অভিব্যক্ত করেছিলেন। অতীতে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন ভারতে আত্মসমাহিত নিষ্কিঞ্চন, সমাজের আদর্শস্থানীয় পুরুষ। বেদ যেমন প্রধানত ব্রাহ্মণদেরই কীর্তি, অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতাও ছিলেন ব্রাহ্মণ। পরমব্রহ্মকে রামরূপে জ্ঞান করে বাল্মীকি অপরূপ রামায়ণ সৃষ্টি করেছিলেন। মহাজ্ঞানী বেদব্যাসও বিরাট গ্রন্থ মহাভারত রচনা করেছিলেন। এই বেদব্যাসের পুত্র ছিলেন সম্পূর্ণ দেহাত্মবোধশূন্য, আজন্ম আত্মসমাহিত শুকদেব গোস্বামী। শুকদেব ছিলেন ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথমেই লেখা আছে : এক সময় পিতা ও পুত্র পথে চলেছেন, শুকদেব পিতার আগে আছেন, পথের পাশে সরোবরে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে স্নান করছেন, গোঁসাইজী তাঁর কাবরের অভ্যাসমত নিস্পৃহ হয়ে চলেছেন, তাঁকে দেখে সুন্দরী নারীরা কোনপ্রকার লজ্জা বা ভ্রূক্ষেপও করলে না, কিন্তু গোঁসাইজীর পিতা পরমজ্ঞানী বেদব্যাস যখন ঐ পথ দিয়ে যান, তাঁকে দেখে যুবতীরা সমস্ত ও অঙ্গের আবরণ দেয়। এটা আধুনিক জগতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যেখানে জীবহিংসা হয় না, হরিদ্বারে

গঙ্গার জলে মাছেরা নির্ভয়ে মানুষের হাতে খাবার খেতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। এটা হরিদ্বারে যাঁরাই গেছেন নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। জীবহিংসার মতই পুণ্যশ্লোক ভগবান শুকদেবের স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ ও দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল। অতীতে এই ভারতে শুকদেব জড়ভরত প্রভৃতির ন্যায় আরও অনেক দেহাত্মবোধশূন্য মহাত্মার কথা শুনতে পাওয়া যায়। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর যুগে, যখন দেশে জড়বাদের প্রাধান্য, যখন সকলেই সমাজের ভেতর সবরকম বৈষম্য দূর করবার জন্য ব্যস্ত, যখন স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত, ঠিক এইরকম সময়ে দক্ষিণ ভারতের এক অল্পপরিচিত স্থানে অতীতের এই সব দেহাত্মবোধরহিত ঋষিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই বুঝি ভগবান রমণ মহর্ষির আবির্ভাব হয়েছিল তিরুভান্নামালাই অরুণাচলে। বাল্যকালেই লক্ষিত হয় এঁর ভেতর গভীর সমাধির অবস্থা। যখন মাত্র ১৬ বছরের বালক, সম্পূর্ণ দেহাত্মবোধশূন্য হয়ে সহজেই তিনি পরমাত্মার সঙ্গে সমাধিতে নিমগ্ন হন। আমরা মহর্ষি পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে ধৃতম্ভরা প্রজ্ঞার কথা পড়েছি এবং এই ধৃতম্ভরা প্রজ্ঞা সর্বাবস্থায় সমভাবে যাতে স্থিরভাবে উজ্জ্বল থাকে ততক্ষণই আমাদের তীব্র সাধনের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয়, এই ধৃতম্ভরা প্রজ্ঞা রমণ মহর্ষি বাল্যে যখন "ব্রাহ্মণ স্বামি"রূপে পরিচিত ছিলেন তখনও যেরকমটি উজ্জ্বল ছিল ঠিক সেইরূপ উজ্জ্বল ছিল তাঁর তিরোধানের সময় পর্যন্ত, যখন তিনি সমস্ত জগতে ভগবান রমণ মহর্ষিরূপে পরিচিত। ভারতে অতীতে অনেক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জন্মেছেন, কিন্তু সহজাত আবাল্য ব্রহ্মজ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী পুরুষ খুব অল্পই হয়েছেন। রমণ মহর্ষির এই ব্রহ্মজ্ঞান পার্থিব, লৌকিক গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেই হয়েছিল। বাল্যাবস্থায় এমন কঠোর তীব্র সাধন করেছিলেন যে আমাদের অতীতের রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বাল্মীকির উইপোকাতে আচ্ছাদিত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিরুভান্নামালাই-এ অরুণাচলের মন্দিরে পাতাল লিঙ্গের অন্ধকার কক্ষে তিনি যে সাধনা করেছিলেন তা সত্যই অদ্ভুত, বিস্ময়কর! রমণ মহর্ষির জীবন পরম বিস্ময়কর ও অপূর্ব। বাল্যকালে অন্যান্য বালকের মত রমণ মহর্ষি যখন অধ্যয়নরত, সেই সময়ে হঠাৎ একবার তিনি নিজের শরীরের মরণের সব অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং এই মরণশীল দেহের অতিরিক্ত যে শাশ্বত নিত্য অবিনশ্বর আত্মা আছে তার সন্ধান পান। আত্মার এই সাক্ষাৎকারের পূর্বেই কিন্তু বালক ভেঙ্কটরমণ তাঁর পরম আরাধ্য অরুণাচল শিবের সন্ধান পান। তেজোলিঙ্গ অরুণাচলের না

শুনে তাঁর এক নিকট-আত্মীয় অরুণাচল থেকে সদ্য প্রত্যাগমন করেছেন, বালক রমণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "অরুণাচল শিব কোথায় আছেন" ? উত্তরে তিনি বলেন, "কেন অরুণাচল শিব তিরুভান্নামালাই-এ আছে, তুমি কি তা জান না ?" সেইদিন থেকেই বালক রমণের তাঁর প্রাক্তন সংস্কারবশত একটা অদম্য ইচ্ছা হয় অরুণাচল শিবের সন্নিকটে তিরুভান্নামালাই-এ যাবার। অরুণাচল শিবের নাম শুনেই তাঁর মন স্বতঃস্ফূর্ত ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তারপর একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্লেষবাক্যের উত্তরস্বরূপ বালক ভেঙ্কটরমণ তাঁর এই অজানা তিরুভান্নামালাই-এর পথে নিঃসম্বল অবস্থায় ২৯শে আগষ্ট, শনিবার, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বৎসর, তাঁর পরমারাধ্য পরম-পিতা অরুণাচল শিবের সন্ধানে যাত্রা করেন এবং ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অরুণাচলে উপস্থিত হন। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নভাবে সুদীর্ঘ ৫৪ বৎসরকাল আত্মজ্ঞ, বুদ্ধস্বরূপে সহজ সমাধি অবস্থায় দিন যাপন করেন। তাঁর পরম ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব অরুণাচল শিবের সঙ্গে একীভূত হন ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে। যে মুহূর্তে মহর্ষির নরদেহ থেকে তাঁর শাশ্বত আত্মা নির্গমন করে, ঠিক তখনই দেখা যায় আকাশে এক ভাস্বর জ্যোতি আলোকচ্ছটা বিকিরণ করে অরুণ গিরির শৃঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে।

এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে মহর্ষির অন্তর্ধানের প্রায় ৫ বা ৬ বৎসর পরে আমি তাঁর সম্বন্ধে সম্যকভাবে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও উপদেশাবলী পাঠ করে অবগত হই। তাঁর বাণী, বাহ্যিক লৌকিক গুরুর সাহায্যে আত্ম-সাক্ষাৎকার এবং সর্বদা সহজ সমাধিতে নিমগ্ন "ব্রাহ্মীস্থিতিঃ" অবস্থা আমাকে সহজেই সম্মোহিতের মতই আকৃষ্ট ও গুণমুগ্ধ করেছিল।

এ রকম অসামান্য গুণসম্পন্ন দুর্লভ পুরুষের পূতস্পর্শে ধন্য এবং স্মৃতিবিজড়িত আশ্রম দর্শনের ইচ্ছা আমার মনের কোণে অনেক দিন ধরে সঞ্চিত হয়েছিল। তিরুভান্নামালাই-এ রমণ মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী টি এন ভেঙ্কটরমণ (Sri T. N. Venkataraman) এখন শ্রীরমণাশ্রমের অধ্যক্ষ, আমার আশ্রমদর্শনের অভিলাষ তাঁকে পত্রে নিবেদন করি। তাতে তিনি আমাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানান। আমাদের চাতরা নন্দলাল বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ ১৯৬২ সালের ১৪ই মে সোমবার থেকে সুরু হয়েছে, এই অবকাশের সুবিধা পেয়ে আমি কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সারনাথকে সঙ্গে করে ১৭ই মে, ১৯৬২, বাংলা ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ সালে বৃহস্পতিবারে মাদ্রাজ মেলে তিরুভান্নামালাই শ্রীরমণাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ট্রেণে কোনও-রূপ অসুবিধা ভোগ না করে আমরা যথারীতি ১৯শে মে ভোরবেলায় মাদ্রাজ পৌঁছাই। মাদ্রাজ থেকে তিরুভান্নামালাই ষ্টেশনে (Tiruvannamalai) যাবার দুটি রেলপথ আছে। প্রথমটি মাদ্রাজ এগমোর (Egmore) ষ্টেশন থেকে মিটার গেজ ট্রেণে ভিল্লু-পুরমে (Villupuram) গাড়ী বদলাতে হয় আর অন্য এক মিটার গেজ ট্রেণে তিরুভান্নামালাই-এ যেতে হয়। আর একটি রেলপথ হচ্ছে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন থেকেই—যেখানে সব বড়গেজ ট্রেণেরই যাতায়াত আছে—ট্রেণে কাটপাডি (Katpadi) ষ্টেশনে নামতে হয়, পরে সেখান থেকে মিটার গেজ ট্রেণে তিরুভান্নামালাই-এ যাওয়া যায়। আমি এবারকার যাত্রায় প্রথম পথটিই বেছে নিই, দ্বিতীয় রেল-পথটি আমি যখন তিরুভান্নামালাই-এ ১৯৬৫ খৃঃ অব্দে সস্ত্রীক এসেছিলুম তখন ব্যবহার করেছিলুম। যাই হোক, আমরা মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন থেকে এগমোর ষ্টেশনে আসি, এখান থেকে শুধু মিটার গেজ ট্রেণ যাতায়াত করে, এখান থেকেই রামেশ্বরম্, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। আমাদের ট্রেণ ধনুষ্কোডি প্যাসেঞ্জার, সকাল ৯।৫০ মিঃ সময় ছাড়বার কথা। কিন্তু ছাড়ল ১০।১০ মিঃ সময়। ২০ মিঃ যদিও বিলম্বে ছাড়ল, কিন্তু কিছুদূর আসবার পর আরও ২ ঘণ্টা লেট চলতে লাগল একটি বিপত্তির জন্যে। মন্থরগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সব ষ্টেশনে থেমে যায়। একটি ষ্টেশনে থামবার পর এঞ্জিন যেমন প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে যাত্রা শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গেই বিকট এক আওয়াজ করে দুটি বগির (Bogie) বা গাড়ীর সংযোজনকারী লৌহদণ্ডটি (ইংরাজীতে বলে Coupling) (কাপলিং) ভেঙ্গে যায় আর আমাদের মত নিরুপায় যাত্রীদের, যতক্ষণ না সেটা মেরামত হয়, প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ট্রেণের কামরার ভেতর বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। ভিল্লুপুরম ষ্টেশনে যখন ট্রেণ আসে তখন বৈকাল ৪।৫০ মিঃ—আমাদের আসবার কথা ৩।১০ মিঃ সময়। আমাদের ট্রেণ বিলম্বে আসার জন্যে, আমাদের তিরুভান্না-মালাই-এর ট্রেণও প্রায় ৮০ মিঃ দেরীতে ছাড়ল। আমরা যখন তিরু-ভান্নামালাই-এ পৌঁছাই তখন রাত্রি সাড়ে আটটা বেজেছে, আবার বিপদের উপর বিপদ, মুষলধারে বৃষ্টিও পড়ছে। একবার মনে করলাম যখন রাত্তির হয়ে গেছে, বৃষ্টিও খুব পড়ছে, ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে কোনক্রমে রাত্রি কাটিয়ে সকালে শ্রীরমণাশ্রম অভিমুখে যাব। পূর্বেই কিন্তু আমি পত্রে জানিয়ে দিয়াছিলাম যে, আমরা যদি দৈব-দুর্বি-পাক না ঘটে, তবে ১৯শে মে, শনিবার নিশ্চয় আশ্রমে উপস্থিত হব। মনে এই আশা আর ভরসা নিয়ে শ্রীভগবান রমণ মহর্ষির নাম স্মরণ করে এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যেই একটা টাঙ্গা ভাড়া করে শ্রীরমণাশ্রমে যাত্রা করি। ষ্টেশন থেকে আশ্রম প্রায় ৩ মাইল দূরে। টাঙ্গাওয়ালা ভাড়া নিল দেড় টাকা (১-৫০)। আশ্রমে যখন আসি তখন রাত প্রায় সাড়ে নয়টা বেজে গেছে। আশ্রমের অফিসঘরে দেখলাম কয়েকজন তখনও কাজ করছেন। তার মধ্যেও অনুসন্ধান করে জানলাম আশ্রমাধ্যক্ষের পুত্র শ্রীমান গণেশনও আছে। শ্রীমানের

[illegible] ২৩ বা ২৪, গৌরকান্তি গেরুয়াধারী এম-এ (M. A.) পাশ [illegible]। বিনম্র যুবক, মহর্ষির ত্রিনি সম্পর্কে পৌত্র। পরিচয় দেওয়াতে আশ্রমের ভেতর অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নির্মিত ৭ নম্বরের ঘরটি বাসের জন্য দিলেন। ঘরেতে সব রকম সুবিধাই আছে—শয়নের জন্য খাট, বিছানা, একটি টেবল ফ্যান, সংলগ্ন স্নানঘর ও শৌচাগারও আছে। আজ তিনদিন হল ক্রমাগত ট্রেণে আসাতে আমাদের বেশ ক্লান্ত হতে হয়েছিল, তারপর আজ সমস্ত দিন আশানুরূপ বিশ্রাম ও আহারাদিও হয়নি, স্বভাবতই আমাদের খুব ক্ষিধেও পেয়েছিল। কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার ফলে আমাদের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য তখনও রাত্রি প্রায় ১০টার সময়ও রক্ষিত ছিল। ঠাণ্ডা ভাত, দক্ষিণ দেশীয় তরকারীর সঙ্গে খুব তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলাম। আশ্রমটি অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে, একটি বড় উদ্যানের মধ্যে, পরিবেশ বড় চমৎকার, অনেকগুলি ময়ূর নির্ভয়ে বেড়াচ্ছে; ময়ূরগুলির মধ্যে সাদা ময়ূরও রয়েছে দেখলাম। বাঁদর ও হনুমানেরও অভাব নাই। আশ্রমে রোজ সকালে ও বৈকালে বেদপাঠ করা হয় মহর্ষির সমাধিমন্দিরের সামনে। মহর্ষির বৃটিশ বংশোদ্ভব শিষ্য অসবর্ন সাহেবকে (Arther Osborne) আমরা যে ক'দিন আশ্রমে ছিলাম, এই বেদপাঠের সময় আসতে দেখতাম। যদিও পুরা ইংরাজ, ইনি মাদ্রাজীদের মতই সরল শুভ্র বেশভূষায় রোজ তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে বসে ধ্যান করতেন। মহর্ষি সম্বন্ধে অসবর্ন সাহেব অনেক পুস্তক রচনা করেছেন; মহর্ষির অতিশয় অনুরাগী ভক্ত, তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে, গুরুর মতন ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থাইল্যাণ্ডে (শ্যামদেশে) অনেক দিন ছিলেন; মহর্ষির জীবিতাবস্থায় তাঁর দুর্লভ সান্নিধ্যেও কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে এঁর বিশেষ জ্ঞান আছে। যদিও অসবর্ন সাহেবের গুরুদেব, মহর্ষি লোকান্তরিত হয়েছেন; কিন্তু এই স্থানকেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান মনে করেন এবং সেই জন্যেই এখানে আশ্রমের খুব কাছেই সপরিবারে একটি গৃহে বাস করেন। তাঁর জীবদ্দশায় মহর্ষি বলেছিলেন, তাঁর দেহ নষ্ট হলেও তাঁর বিদেহী আত্মা এইখানেই, যেখানে তিনি অর্ধ শতাব্দীর উপর বাস করে গেছেন, অদৃশ্যভাবে বাস করবেন। আকুল অন্তরে ভগবান রমণ মহর্ষিকে ডাকলে এখানে অনেকেই মহর্ষির করুণালাভ করেন, কাতর প্রার্থনায় এখনও তিনি সাড়া দেন। মহর্ষির আর একটি গুণমুগ্ধ বৃটিশ বংশোদ্ভব ইংরাজ শিষ্যের বেশ একটু কৌতুককর কাহিনী শোনা গেল। এই শিষ্যটি এখন লোকান্তরিত, নাম ছিল মেজর এ ডবলিউ চ্যাডউইক (Major A. W. Chadwick)। ইনি ছিলেন মহর্ষির অত্যন্ত অনুরাগী সরলপ্রাণ বিশ্বাসী শিষ্য। মহর্ষি তাঁর ভক্তদের উপদেশ-দানকালে বলতেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই ভেতর আছে সেই অবিনশ্বর শাশ্বত আত্মা, কিন্তু মাঝখান থেকে এক অবিদ্যারূপ অনিত্যসত্তা বা অহংকার, যেটা সর্বৈব মিথ্যা ও অসার (false ego) এসে আমাদের সেই সদা নিত্য শুদ্ধসত্ত্ব আনন্দময় আত্মাকে উপলব্ধি করতে বাধা দেয়। সুতরাং আমাদের চিন্তা করতে হবে সব সময় এই যে, আমরা চিন্তা করছি, অনুভব করছি, সেটা আসলে কে করছে।

"একটু গভীরভাবে ভাবলে আমাদের অহংভাবের অসারতা ও অনিত্যতা খুব স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।" মহর্ষি বলতেন, এই অসার অহং সত্তাকে একেবারে ধ্বংস করতে হবে, সম্পূর্ণ মনকে নাশ করতে হবে তবেই আমরা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারব। চ্যাডউইক সাহেব মহর্ষির অনুরাগী ভক্ত, তিনি নিজের অহংভাবকে কল্পনা করে নিজের জীবদ্দশায় তাঁর সমাধি দিয়েছেন এই আশ্রমের ভিতর; তার একটা নিদর্শন-স্তম্ভও আছে। চ্যাডউইক সাহেবের নিজের হাতে গড়া তাঁর মিথ্যা অহং সত্তার সমাধি দেখে মনে বেশ কৌতুক বোধ করলাম। আশ্রমের ভেতর মহর্ষির নিজের সমাধি ছাড়া তাঁর গর্ভধারিণীরও সমাধি রয়েছে দেখলাম। এই সমাধির উপর মন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে মাতৃভূতেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে। মন্দিরে শ্রীচক্রের পূজা প্রত্যেক শুক্রবার ও প্রতি তামিল মাসের ১লা তারিখে হয়। মহর্ষির বিশাল হৃদয়ের ও সর্ব-প্রাণীর প্রতি অসীম করুণায় আর একটি নিদর্শন দেখলাম আশ্রমের সকলের, বিশেষ করে মহর্ষির অতিপ্রিয় গাভী লক্ষ্মীর সমাধি। মূক প্রাণীদের প্রতি করুণা মহর্ষির ছিল অপার্থিব ও তুলনাহীন। তিরুভান্নামালাই-এ শ্রীরমণাশ্রমে এসে মহর্ষি তাঁর সাধন-জীবনের প্রারম্ভে পাতাল লিঙ্গের অন্ধকারময় কক্ষেতে যে কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেটা দেখবার জন্যে খুব আগ্রহ হয়, সেই উদ্দেশ্যে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে, আমি অরুণাচল মন্দিরের বিগ্রহ ও মন্দির প্রাঙ্গণে পাতাল লিঙ্গকে দর্শন করতে যাত্রা করি। এখানে এই পাতাল লিঙ্গ ও মহর্ষির উগ্র তপস্যার বিষয় কিছু বলা সমীচীন বলে মনে করি। মহর্ষি যখন তিরুভান্নামালাই-এ প্রথম আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই অল্প; তাঁকে দেখে গ্রামের বেশীর ভাগ ছেলে-ছোকরার দল তাঁকে পাগল বলে নানাভাবে উত্যক্ত ও বিরক্ত করত, তাঁর উপর ইটপাটকেলও ছুঁড়তো। মহর্ষির নিকট তিরুভান্নামালাই-এ অরুণাচলেশ্বর তাঁর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়, এ স্থান ত্যাগ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। অথচ প্রকাশ্যে কোনও স্থানে সাধন-ভজনাদি করলেও দুষ্ট ছেলের দল তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেবে না, এই সব ভেবে তিনি তাঁর সাধনার স্থান পাতাল লিঙ্গের অন্ধকার ঘরেই স্থির করলেন। এই পাতাল

লিঙ্গ শিব খুব নিচু অন্ধকারময় ঘরে লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল। যদিও এই অন্ধকার ঘরে একটি শিবলিঙ্গ ছিল, কিন্তু সেটা ছিল একরূপ অবহেলিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায়। ঘরে কোনও কালে আলো জ্বলত না, ভয়ানক স্যাঁতসেঁতে, পোকা, মাকড়, ইঁদুর বিছারও সেখানে অভাব ছিল না। ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, এই রকম স্থানে বসে ১৭ বৎসরের বালক "ব্রাহ্মণ স্বামী"---যিনি পরবর্তী কালে ভগবান রমণমহর্ষিরূপে বিখ্যাত ---কি যে এক অপার আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন যে, যার জন্য তাঁর দেহের প্রতি বিন্দুমাত্রও চেতনা ছিল না। ব্রহ্মানন্দে তিনি এতই সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতেন যে, দুই উরু ও পাদদেশে যে কীট পতঙ্গের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ও পুঁজ বেরোচ্ছে, সেদিকে কোনও হুঁশ নেই। সত্যই, ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ, রমণসুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জনিত সুখ থেকে কোটি কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ, "কোটি রমণসুখেও ব্রহ্ম-রমণের এককণা সুখও পাওয়া যায় না।" ইন্দ্রিয়জনিত সুখ আমাদের পরিণামে পশুভাবাপন্ন ও বহির্মুখী করে, আর অশান্তি ও ক্লেশের সৃষ্টি করে। ব্রহ্মানন্দ মহর্ষি বলতেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের প্রকৃত সত্তা; একবার অন্তর্মুখী হয়ে এই আনন্দের আস্বাদ পেলে ইন্দ্রিয়সুখ লাগবে অতীব তুচ্ছ, অসার আর নিকৃষ্ট। এই পাতাল লিঙ্গের কক্ষটি স্মরণীয় করবার জন্যে মহর্ষির একজন পার্শী ভক্ত দেখলাম একটি প্রস্তরফলকে কক্ষের উপরে নির্দেশ করে রেখেছেন। অরুণাচল মন্দির থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে খুব বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয়। এখানকারই স্থানীয় এক ভদ্রলোক দয়া করে ছাতা দিয়ে খুব উপকার করেছিলেন। ইংরাজী ২৩শে মে, বুধবার অরুণাচল পাহাড়ের উপর মহর্ষির যে দুটি সাধন-স্থান আছে, তা দেখবার জন্য পুত্র সারনাথকে সঙ্গে করে বৈকাল প্রায় ৩টার সময় শ্রীরমণাশ্রমের পাশেই পাহাড়ের উপর উঠতে শুরু করি। এই দুই সাধন আশ্রমের নাম স্কন্দাশ্রম ও বিরূপাক্ষ আশ্রম। প্রায় ১ মাইল পার্বত্য পথে ক্রমাগত উঁচুতে উঠে আমরা প্রথমে স্কন্দাশ্রমে আসি। এই স্থানটি সাধু ও সন্তদের সাধন ভজন করবার জন্য নির্জন একটি ক্ষুদ্র আশ্রম। গ্রীষ্মের রৌদ্রে পাহাড়ে উঠতে আমার ও সারনাথের খুবই তৃষ্ণা পেয়েছিল, আশ্রমের মধ্যে স্বচ্ছ, শীতল ঝর্ণার জল পেয়ে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করি। স্কন্দাশ্রমের এই ঝর্ণার একটি ইতিহাস আছে। এই ঝর্ণা ছিল পূর্বে শুষ্ক, কিন্তু ভগবান রমণ মহর্ষির এমনি এক অলৌকিক মাহাত্ম্য যে, তিনি এখানে আসবার পর থেকেই এই ঝর্ণা আবার সজীব হয়ে সব সময়েই জলপূর্ণ থাকে। খানিকটা দূরে আরও নিচের দিকে অগ্রসর হবার পর আমরা বিরূপাক্ষ গুহার আশ্রমে উপস্থিত হই। কতকগুলি বৃক্ষসম্বলিত স্থানে একটি বেদী রয়েছে, আর পাশেই পাহাড়ের ভেতর সাধনের উপযোগী গুহা। স্কন্দাশ্রম থেকেও শান্ত ও চমৎকার পরিবেশের মধ্যে রয়েছে এই বিরূপাক্ষ আশ্রম সামনেই। দেখা যায়, অরুণাচল মন্দিরের চারটি সুবৃহৎ গোপুরম ও অরুণাচল শিবের মন্দির। মহর্ষির পরমপিতা এই অরুণাচল শিবই আকর্ষণ করে বরাবরের জন্যেই তাঁকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। আমার বোধ হয় জীবন্ত অরুণাচলেশ্বর শ্রীভগবানরমণ মহর্ষি এই জন্যেই এই স্থানটি তাঁর তপস্যার উপযোগী মনে করে নির্বাচন করেছিলেন। এইখানে মহর্ষি তাঁর মার সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। এইখানেই প্রৌঢ় কাব্যকণ্ঠ গণপতি মুনি তরুণ যুবক মহর্ষিকে দর্শন করবার জন্যে এসেছিলেন। আর জগতের মাঝে তাঁকে প্রচার করে দিয়েছিলেন শ্রীভগবানরমণ মহর্ষিরূপে। মহর্ষি ছিলেন স্বভাবতই খুব স্বল্পভাষী, শান্তি ও নিস্তব্ধতার পক্ষপাতী। বিরূপাক্ষ গুহাতে মহর্ষি সন্দর্শনে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর-ভাগ লোকই মহর্ষি অপেক্ষা অনেক বয়সে বড়, তাঁরা আসতেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে। মানসচক্ষে মনে পড়ল শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য রচিত দক্ষিণামূর্তির আর্যার একটি বিখ্যাত শ্লোক:

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥"

"বটতরুমূলে বসে আছেন অনেক বৃদ্ধ শিষ্য। এঁদের যিনি গুরু তিনি কিন্তু যুবা, মৌনের দ্বারা, নির্বাকের দ্বারা তাঁদের মনোগত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করছেন, আর তাতেই তারা ছিন্নসংশয় হয়ে যাচ্ছেন"।

এই বিরূপাক্ষ আশ্রম থেকে নিম্নাভিমুখে সোজা পথ অরুণাচল মন্দিরের উত্তরের গোপুরমের দিকে চলে গেছে। আমরা এই পথ ধরে মন্দির অঙ্গনের দরজায় উপস্থিত হলাম, এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল রাস্তা অতিক্রম করে আশ্রমে যখন প্রত্যাবর্তন করি, তখন রাত প্রায় আটটা। শ্রীরমণাশ্রমের খুব কাছেই স্বামীশেষাদ্রি আয়ারের আশ্রম। মহর্ষি অরুণাচলে আসার অনেক আগেই শেষাদ্রিস্বামী এখানে এসেছিলেন। এঁর আগমন আমাদের অনেকটা জন দি ব্যাপটিস্ট-এর (John the Baptist) ভগবান যীশুখৃস্টের পৃথিবীতে জন্মাবার আগে আসার কথা মনে করিয়ে দেয়। জন ছিলেন ভগবান যীশুখৃস্টের অগ্রদূত, যদিও ভগবদ্‌প্রেমে ও সাধন-ভজনে জন অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান যীশুখৃস্ট সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "আমার পরে যিনি এই পৃথিবীতে আসবেন তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর জুতার ফিতা খুলবারও আমি উপযুক্ত নই" [লুক ৩. ১৬। (Luke 3.16)] শেষাদ্রিস্বামীও সাধন ভজনে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন পরম পণ্ডিত ও লোকের মনের অন্তর্বেত্তা। তিনি মহর্ষিকে সাক্ষাৎ ভগবান অরুণাচল শিব বলে জ্ঞান করতেন। শেষাদ্রি তাঁর অনেক শিষ্যকে

জনসহ ভক্তদের অন্যে মহর্ষির কাছে পাঠাতেন। মহর্ষির এই অনুরাগী সাধক ভক্তের আশ্রমে একদিন বেড়াতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি একজন সৌম্যমূর্তি, লাবণ্যময় যুবা স্থিরাসনে বসে ধ্যান করছেন। এঁর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ বসে বুঝতে পারি ইনি মৌনব্রতাবলম্বী। একখণ্ড কাগজে লিখে জানতে চাইলাম ইনি রমণ মহর্ষির শিষ্য কি-না; কিন্তু যুবা সাধুটি কোনওরূপ উত্তর কাগজে লিখে দেন নি। রমণাশ্রমে থাকবার সময় দেখলাম, একজন বাঙালী ভদ্রলোক ওসবর্ণ সাহেবের সঙ্গে এসে বেদপাঠ শ্রবণ করেন। কথাবার্তায় বুঝলাম, ইনি মহর্ষি সম্বন্ধে পুস্তক পড়ে তাঁর অনুরাগী হন, মহর্ষির জীবদ্দশায় কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় নি। প্রথম জীবনে ইনি একজন এঞ্জিনীয়ার ছিলেন, কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে এখানেই সস্ত্রীক বসবাস করছেন। প্রায় ৮ দিন পরম আনন্দের সঙ্গে আশ্রমে কাটিয়ে আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হই, ২৭শে মে, রবিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯৬২ খৃঃ অব্দে।

সূর্য-স্নানের বিপদ

জনৈক ফরাসী চিকিৎসকের মতে সূর্য-স্নানের খ্যাপামো মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

তাঁর মতে, খুব ভদ্রভাবে বললেও বলতে হয় গোটা ব্যাপারটাই ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সব সব চেয়ে বিশ্রীভাবে বলা চলে তখন, যখন তা দুর্বলকে দুর্বলতর এবং সুস্থ মানুষকে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে বাধ্য করে।

সূর্য-স্নানের ব্যাপারে ছেলে-বুড়ো প্রত্যেকের সাবধান হওয়া উচিত।

প্রথমত, বয়সের কথা গভীর-ভাবে চিন্তা করা দরকার। ষাটের পর সূর্যালোকে গাত্রচর্ম মেলে ধরার নির্বুদ্ধিতার অবসান একান্ত কাম্য। যদিচ, নির্দ্ধিধায় বলা চলে, ষাট বছর বয়সে মানুষ নিজেকে ঠিক বৃদ্ধ ভাবতে অনিচ্ছুক- - -

ধমনীতে যদি বালকোচিত নমনীয়তা না থাকে, সে ক্ষেত্রে জমাট বাঁধার বিপদ থাকে তা ছাড়া হাজারো সংক্রমণের আশংকা ত রয়েইছে।

এমন কি ছোকরাদের মধ্যেও সোজাসুজি সূর্যালোক চামড়ায় লাগানোর ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।

চামড়ার কৈশিক সূক্ষ্ম শিরার কাজ অতিরিক্ত আলো লাগলে মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে বাধা-প্রাপ্ত হয়। হৃদরোগী এবং মাত্রাছাড়া শ্রমে কষ্ট পায় এমন লোকের আর একটি বিপদ আছে। হৃৎপিণ্ডর কাজ এর ফলে আরও কষ্টসাধ্য হয় এবং উত্তেজনার প্রবণতা বাড়তে থাকে।

এই মারাত্মক উত্তেজনা রোগী অনেক সময় ঠিক ধরতে পারে না। মধ্যবয়স্ক মানুষের পক্ষে সূর্য-স্নানের আগে চিকিৎসকের সংগে পরামর্শ করা উচিত।

যাদের মূত্রগ্রন্থি নিখুঁত নয়, তাদেরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। চামড়ার পক্ষে স্বাভাবিক বাষ্পত্যাগও সূর্য-স্নানের ফলে বাধাগ্রস্ত হয়।

ফলে, চামড়ার মাধ্যমে যে বিষ বেরিয়ে যেত, তা বের হওয়ার ভিন্ন রাস্তা খুঁজবে। এমনিতেই কর্মব্যস্ত মূত্রগ্রন্থিতে ঐ বিষ যাবে, তখন মূত্র-গ্রন্থির খাটুনি বাড়বে অবাঞ্ছিতভাবে।

অনেক যক্ষ্মারোগী সূর্য-স্নানের সাহায্যে শারীরিক উন্নতির প্রত্যাশী। এ ব্যাপারে তাদের মোহভঙ্গ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভয় পাওয়ার মত অসংখ্য জটিলতা এর ফলে তৈরি হতে পারে। হাঁপানী রোগী সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

চর্মরোগীদেরও সূর্যালোক সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষত: 'একজিমা'-গ্রস্ত রোগীর পক্ষে সূর্যালোক সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বন্ধন

সুমিত্রা সেনগুপ্ত

"আপনি বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, জ্ঞানী, আপনি আমাকে বলুন মন্ত্রের বন্ধন বড়—না মনের বন্ধন বড়?" ফুলশয্যার রাত্রে কাকলীর প্রথম প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। তার অর্থ?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে কিছুক্ষণ পর আবার বলল—"আপনার বাবার কাছে আমার বাবা প্রচুর অর্থ ধার করেছিলেন, শোধ দিতে না পারায় আপনার কাছে আমাকে বলি দিয়েছেন। নিজেকে আপনার কাছে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেবার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আমার বাবার খেয়ালের দরুণ আমাকে আত্মহত্যা করতে হল আপনাকে বিয়ে করে; বাংলা দেশের সাধারণ মেয়ে আমি—বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না, তাও মাকে আমি আমার সব কথাই বলেছিলাম, কিন্তু কিছু ফল হ'ল না। অতএব মুখ বুজে আপনার বলির পাত্র হলাম। কিন্তু আপনি আমায় বলুন মনের বন্ধন বড়—না মন্ত্রের বন্ধন বড়?"

অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী নববধূর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। বুকের ভেতর কে যেন দশন্দে দামামা পিটছে তখন। হায় রে ফুলশয্যার রাত্রি। তুমি এ কি বার্তা বহন করে আনলে?

দীর্ঘশ্বাসটা চেপে বললাম—"তোমার প্রশ্নের উত্তর একদিন তুমি নিজেই পাবে কাকলী, তবু প্রশ্ন যখন করেছ তখন বলি—পুরাতনপন্থীদের কাছে মন্ত্রের বন্ধনই বড়, কিন্তু বিজ্ঞান-যুগের মানুষ আমরা, সে কথা মানি না, আমাদের তাই মনে হয়, মনের বন্ধনই বড়। যাক সে কথা, তোমার কোন ভয় নেই কাকলী, আমার দ্বারা তোমার কোন অসম্মান হবে না, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

তোমার মনের সাড়া যদি না পাই, তোমার ঐ অপূর্ব সুন্দর দেহটা আমি চাই না, যেখানে প্রাণের স্পর্শ নেই। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো।"

আমার আশ্বাসবাণী শুনে সে নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাদেবীর কোলে সুখে স্থান পেল। আর আমি তার হতভাগ্য স্বামী। মাঝরাত্রি পর্যন্ত বাইরে বারান্দায় পায়চারী করলাম, টিনের পর টিন সিগারেট ধ্বংস করেও নিদ্রাদেবীর দেখা পেলাম না। যখন আর দরজা খুলে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল না তখন ঘরে এসে বসলাম। এই আমার প্রথম মিলন রাত্রি, ফুলশয্যা।

পরে একদিন সুবিধামত বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম সত্যি কি শ্বশুর মশাই বাবার কাছে অর্থ ধার করেছিলেন নাকি?

বাবা বললেন—"শশাঙ্ক আমার বাল্যবন্ধু, এই মেয়ের অসুখে সে একবার কিছু টাকা আমার কাছে ধার করে। তার বহুদিন পর সে সেই টাকা শোধ দিতে আসে, আমি তখন সেটা নিতে অস্বীকার করি, টাকার আমার প্রয়োজন কি? কিন্তু শশাঙ্ক নাছোড়বান্দা, তখন আমি ওকে বলেছিলাম, 'বেশ তো, দে না তোর মেয়েকে আমার কাছে, মনে কর পুত্রবধূর অসুখে ও টাকা আমার খরচা হয়ে গেছে। ঐ রকম নিখুঁত সুন্দর একখানা মুখ চোখে পড়ে কই? আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হোক, এই তো কথা। কেন খোকা?" পিতার সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

"না, এই এমনি—মানে এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।" পাশ কাটালাম। পিতারা বন্ধুত্ব গাঢ় করলেন। কিন্তু!!! আমার এই কিন্তুর উত্তর কে দেবে?

●

দিন কেটে যেতে লাগল, বেশ বুঝতাম বাপের বাড়ী যাবার অজুহাতে সে তার প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত। বুঝেও না-বোঝার ভাণ করতাম, অনেক কথা শুনেও না-শোনার ভাণ করতাম। অবশ্য অফিসের কাজ জোর করে নিজের স্কন্ধে নিলাম; যাতে বাড়ী ফিরতে আমার রাত্রি হয়। মা এজে

অত্যন্ত রেগে উঠলেন—নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে বেড়াতেও যাই না, সিনেমায়ও যাই না, এ কেমন মতি তাঁর পুত্রের। তিনি ভর্ৎসনা করতেন, নির্বিকার চিত্তে হজম করতাম। আর সে! মা-বাবার সঙ্গে কত গল্প করত, তাঁদের সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হতে দিত না, তার প্রশংসায় তাঁরা উভয়েই পঞ্চমুখ। আমার ছোট ভাইটির সঙ্গে হেসে দিন কাটাত, হাসি-গল্পের শেষ নেই যেন, কেবল আমার বেলায় তার মূর্তি অন্যরূপ। আমার ঘরের পাশে একখানি ছোট ঘর আছে, সেখানেই সে রাত্রে শুতো, তাকে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সে আমার কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমাদের ভেতর-কার এই অমিলের ব্যাপার যাতে কারুর চোখে না পড়ে সে দিকে তার প্রখর দৃষ্টি ছিল। লোকের সামনে আমার সঙ্গে অভিনয়েরও ত্রুটি ছিল না।

সেদিন তার বাপের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। কাকলী সকালেই চলে গিয়েছিল। আমি অফিস ফেরত সেখানে উপস্থিত হ'লাম। আমাকে দেখে কাকলীর মা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং কেমন যেন অসহায়-ভাবে আমার দিকে তাকালেন। যাই হোক অভ্যর্থনার ত্রুটি হ'ল না—ছোট শালী কাজরী এসে আমাকে হাসি-গল্পে মাতিয়ে রাখল। কিন্তু তার দিদিটির এতক্ষণ পর্যন্ত কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রায় সাতটা নাগাদ তিনি ঘরে পা দিতেই পাশের ঘর হতে জননীর চাপা তিরস্কার কানে প্রবেশ করল—

"কি করছিলি এতক্ষণ? কুণাল সেই কখন থেকে বসে আছে।"

তার উত্তরে কাকলী বলল—"বারে বললাম যে তোমায় নির্মল আর আমি সিনেমায় যাব।"

আবার বকুনী—"আশ্চর্য, নির্মল আর নির্মল, ও যে তোর টাকা শুষে খাচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তোর? যার এমন রত্নের মত স্বামী, তার যে কেন এমন মতি হয় তা তো ছাই বুঝি না। আচ্ছা কলি, সত্যি করে বলতো তুই কি তোর নিজের ভুলটা কোনো-দিন বুঝবি না।"

মায়ের প্রতি ঝাঁজাল উত্তর—"না, না, না বুঝব না, বুঝব না, কিছুতেই বুঝব না, বিয়ে দিয়েছিলে কেন? বার বার বলেছি নির্মলকে ছাড়া আমার চলবে না, বেশী যদি জোর করবে তো আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব, তখন তোমাদের বদনাম হবে।"

আবহাওয়া বেশ তিক্ত হয়ে উঠল। কোনোমতে গলাধঃকরণ করে বাড়ী ফিরলাম। গাড়ীতে কাকলীর সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। লক্ষ্য করলাম তার সমস্ত মুখমণ্ডল রাগে লাল হয়ে গেছে, ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত।

●

এমনি করেই একটি একটি দিন কাটতে লাগল। কখনও বন্ধুর মুখে শুনতাম আমার স্ত্রীকে অপর একটি পুরুষের সঙ্গে 'লেকে' দেখেছে, কেউ বা সিনেমায় দেখেছে, কিম্বা আর কোথাও। আমি মনে মনে বিচলিত হ'লাম, মা-বাবার চোখে যেন কোনোদিন ঐ দৃশ্য না পড়ে। সে কিন্তু নির্বিকার। একদিন এক বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে সিনেমায় গেলাম। ইদানীং সবরকম আমোদ-আহ্লাদ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতাম, কেমন যেন ভাল লাগত না কিছু। যাই হো'ক আমাদের দেরী হওয়াতে অন্ধকারেই প্রবেশ করলাম। কিন্তু অন্ধকারেও আমার ভুল হয় নি। আমাদের এক লাইন আগে সে এবং তার নির্মল, হাতে হাত রেখে বসে আছে। কি যে একটা অস্বস্তির মধ্যে তিন ঘণ্টা বসে-ছিলাম তা বোঝাতে পারব না। কিন্তু সে আমাকে দেখেছে এবং না-দেখার ভাণ করে নির্মলের সঙ্গে অহেতুক অত্যধিক বাড়াবাড়ি করছে। 'শো' ভাঙবার আগেই ভিড়ের অজুহাত দেখিয়ে বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে কোনমতে বাড়ি ফিরলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পর কাকলী ফিরল গুনগুন করে গান করতে করতে। ঘরে ঢুকে নির্লজ্জের মত প্রশ্ন করল—"কেমন দেখলেন? আমাদের তো বেশ লাগল।"

বৃশ্চিক দংশনের মত শরীর জ্বলে উঠল, উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। এই প্রথম তাকে এভাবে উপেক্ষা করলাম।

নানা জায়গা থেকে নানাকথা কানে আসত—কোনদিনই আমল দিতাম না, কিন্তু এবার কাকলীর প্রতি অহেতুক রূঢ় হয়ে উঠলাম। তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, সে আমার স্ত্রী, তাকে স্ত্রীর সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছি। টাকা-পয়সা সে ইচ্ছেমত খরচ করত, যদিও জানতাম আমার কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে তার নির্মল ছিনিমিনি খেলে তবু বাধা দিই নি। মিষ্টি হেসে সর্বদা তার সঙ্গে কথা বলতাম, আমার দীর্ঘশ্বাস সর্বদাই চেপে রেখেছি। কিন্তু সেদিন "সিনেমা হল"-এ নির্মলের সামনে আমাকে উপেক্ষা করাতে আমার অন্তর যেন কেমন কঠিন হয়ে উঠল। ইচ্ছা করেই তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাতে লাগলাম। সে ঘরে প্রবেশ করলে আমি তক্ষুণি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম, সে খাবার পরিবেশন করলে খেতাম না। এমনও দিন গেছে দিনান্তে তার সঙ্গে একটি কথাও বলিনি। আমার এই পরিবর্তনের জন্য কিনা জানিনা হঠাৎ দেখি সেও কেমন বদলে যাচ্ছে। অফিস থেকে যখনই ফিরতাম, দেখি সে বাড়ীতেই আছে। আমি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতাম সে ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুর ঘুর করত। তার সে উগ্র সাজ পরিত্যাগ করে সুন্দরভাবে যত্ন নিয়ে সাজত। যার সিঁথিতে সিঁদুর খুঁজে পাওয়া যেত না, তারই সিঁথি সিঁদুরে লাল হয়ে থাকত, সমস্ত কপাল জুড়ে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরতে শুরু করল। সে যেন আমাকে আকর্ষণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই তাকে উপেক্ষা করতাম। আরও ক'দিন পর হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার শয্যার অপর পাশে সে তার

অতি গোপনীয়!

CIBA Cosmetics

একমাত্র নতুন **বিনাকা টপ** এমন একটি গোপন সম্প্রসারণশীল উপাদান দিয়ে তৈরী যা টুথপেষ্টকে আপনার মুখের গুপ্ত আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিয়ে লুক্কায়িত জীবাণুর সাথে সংগ্রাম করে। ফলে আপনার মুখের স্বাস্থ্য বজায় থাকে—মুখ সারাদিন পরিস্কার ও তাজা থাকে।

প্রমাণ আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। ল্যাবরেটারীর পরীক্ষা আজ বাড়ীতেই করে দেখুন

কাঁচের পাত্রে জল ঢালুন আর তাতে কাঠ কয়লা বা রঙীন কোন গুঁড়ো জলের উপর ছিটিয়ে দিন।

বিনাকা টপ সামান্য জলে মিশিয়ে, তার এক ফোটা কাঁচের পাত্রের জলের মধ্যস্থলে ফেলুন।

আপনি স্বচক্ষে দেখবেন, বিনাকা টপ কি ভাবে ঝটপট চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ময়লা পরিস্কার করে এবং পিছনে রেখে যায় স্বচ্ছ পরিশ্রুত অঞ্চল।

Bi Binaca

new

Toothpaste top

বিনাকা টপ... মুখের পূর্ণ পরিচর্যার গোপন কথা।

mcm/ciba/150a/

শয্যা পেতেছে, ফুলশয্যা রাত্রির পর এই প্রথম তার শয্যাসঙ্গী হ'লাম, কিন্তু একটি কথাও বলি নি ইচ্ছে করেই। তার এই পরিবর্তনে বাড়ীতে সাড়া পড়ে গেল, মা খুব খুসী, তাঁর বহির্মুখী বধূমাতা অন্তর্মুখী হয়েছে বলে। আরও লক্ষ্য করলাম আলমারীতে টাকার অঙ্ক আমি যেমন রাখি, তেমনি থাকে-খরচ হয় না। মাঝের কটা দিন যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম যত টাকাই তুলি অল্প কদিনেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। মন একটু নরম হ'ল, ভাবলাম আজ না হয় তাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব, বেচারী নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, তাছাড়া প্রায় মাসখানেক সে বাড়ীতেই আছে।

বিধাতা বিমুখ হ'লেন, একটু তাড়াতাড়ি ড্রাইভ করছিলাম বাড়ী ফেরবার তাড়ায়, হঠাৎ ভীষণ ঝাঁকুনি লাগল। আমার গাড়ীর সঙ্গে অন্য একটি গাড়ীর ধাক্কা লেগেছে, কারুরই আঘাত গুরুতর নয়, তবু, উভয় পক্ষকেই হাসপাতালে ছুটতে হ'ল। হাসপাতালের ব্যাপার---সুতরাং ফার্ষ্ট-এইড করে বাড়ী ফিরতে প্রায় রাত দশটা বেজে গেল, সঙ্গে কয়েকজন পরিচিত ভদ্রলোক ছিলেন। মা ঐ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন। বাড়ীতে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। কিন্তু কাকলী কোথায় তাকে তো দেখছি না। সে কি তবে আবার আগের মত বের হয়েছে। এদিকে একটু শান্ত হ'লে মা পাশের ঘর থেকে তাকে টেনে আনলেন, দেখি চোখ দু'টো জবাফুলের মত লাল, সমস্ত মুখ ফুলে লাল হয়ে গেছে।

মা বললেন—"দেখ্ তো খোকা, এই পাগলীকে---সেই সন্ধ্যে থেকে কেবল ছটফট করছে আর বলছে, 'কই এত দেরী তো কখনও হয় না।' বিকেলে আজ গা ধোয় নি, চা খায় নি, কেবলই কাঁদছে। ওর মনে ডাক দিয়েছে ঠিক।"

বললাম —"মা, আমাদের দু'জনের খাবারটা আজ ঘরেই পাঠিয়ে দাও।"

মা চলে গেলে বহুদিন পর তার দিকে ভাল করে তাকালাম, মনে হ'ল যেন রোগা হয়ে গেছে। এক হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অপর হাতে তাকে ঈষৎ আকর্ষণ করে বললাম----"কি হয়েছে কলি, পাগলের মত এত কাঁদছ কেন?"

সে হঠাৎ উন্মত্তের মত আমার বুকের পরে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল—"কেন আমায় এমন করে শাস্তি দিলে? বল আর কখনও এমন করবে না? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের আরও কি বাকি আছে।"

যতই তাকে বুঝিয়ে বলি হঠাৎ-ই গাড়ীতে ধাক্কা লেগেছে, সে ততই কেঁদে বলে আমি নাকি ইচ্ছে করে ধাক্কা লাগিয়েছি তাকে শাস্তি দেব বলে। চাকর খাবার দিয়ে গেলে কোনমতে হাতের ব্যথা নিয়ে তাকে খাওয়াতে অনেক অনুনয়-বিনয় করতে হ'ল। সেই শেষে বাসন বের করে রেখে এসে দরজা বন্ধ করে আমার গা ঘেঁসে বসল। এই প্রথম তাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে তার অতি সুন্দর মুখখানি চুম্বন করলাম। হেসে প্রশ্ন করলাম—

"আজ তুমি বল মন্ত্রের বন্ধন বড়—না মনের বন্ধন বড়?" তার লজ্জাবনত মুখখানি আমার বুকে লুকিয়ে সে বলল---"জানিনা, বলব না"---

পেরুর ভয়াবহ ভূমিকম্পের শিকার শিশুসন্তানসহ জনৈকা রমণী

নীড় হারা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পদ্মমুখীর শরীর খারাপ হয়েছে। জর হয়। শরীরের মধ্যে কদর্য রোগ বাসা বেঁধেছে।

টগরবালা হয়তো তাড়িয়ে দেবে ওকে। ভাবছে--অন্নপূর্ণা।

জয়া বলে একটি নতুন মেয়ে এসেছে পাপাশ্রমে। খনিয়ে থাকতে পারছে না। চুঁচুড়ো থেকে এসেছে। ধরণ-ধারণ সে কিছুই জানে না এখানকার।

তার একটি ছেলে হল। টগর বললো--মরা ছেলে হয়েছে।

কেঁদে-কেঁদে জয়া বললো-আমি নিজে শুনেছি ছেলের কান্না। টগর মাসীই মেরে ফেলেছে।

---চুপ কর, চুপ কর। শুনলে টগর মাসী আস্ত রাখবে না। তোকেও মেরে ফেলবে। সূর্যমুখী বললো।

--মেরে ফেললে তো বাঁচি।

---একেবারে তো মেরে ফেলবে না। দগ্ধে মারবে যে। বললো মালতী-লতা।

অন্নকে শিউলী বললো—চলো অন্নদি, আমরা পালাই। ব্যবসা করি আমরা আলাদা গিয়ে। চামেলী, কদম, তিলোত্তমা আর উর্বশীও যাবে বলেছিল। টগর মাসী তো একটি পয়সাও আমাদের হাতে ঠেকায় না। অথচ, আমাদের দৌলতেই এতো রোজকার করছে, বাড়ী করছে, পয়সা করছে।

—চুপ কর। বললো—কমলরাণী।

অন্ন বললো---শুনে ফেললে- হাড়গুলো আলাদা করে দেবে আমাদের।

ভয় পেয়ে গেলো শিউলী।

কদম বললো - আমরা যদি বাড়ী ভাড়া করি একটা। ব্যবসা দু'দিনেই জমে যাবে।

—ভাবা সোজা, করা কঠিন। বললো অন্ন।

পারুলের বয়স হয়েছে। রোগ ধরেছে। পয়সা হাতে জমে নি কিছুই। রোজকার কমে গেছে।

নলীবালারও সেই একই অবস্থা।

ওদের তাড়িয়ে দেবে টগর।

তখন ওরা কী করবে? লোকের বাড়ী কাজ করবে। তারপর? যখন বুড়ি হয়ে যাবে?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করবে।

চিন্তা হচ্ছে অন্নপূর্ণার। ভবিষ্যৎ ভাবছে।

অর্চনা মিত্র

দশটা বছর তো মক্ষিরাণীর মতো কেটে গেলো।

ক্ষণপ্রভা এসেছে অন্নর ঘরে। অন্ন নেমে এসেছে নীচের ঘরে। রতনকুমারী হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। ইদানীং তার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। টগর তাকে এমনিতেই একদিন না-একদিন তাড়িয়ে দিতোই। সে নিজেই চলে গেছে।

চম্পা বললো - অন্নদি আমার কী হবে? ইদানীং তারও খদ্দের জুটছে না। বয়স বেশী হলে কী হবে আমার? না খেয়ে মরতে হবে যে।

--বিয়ে করলে, একটা উপায় হয়, বুঝলি? অন্ন বললো।

--বিয়ে? তুমি হাসালে অন্নদি। বিয়ে আমাদের কে করবে? আমরা যে পতিত। আমরা কী কখনোও ঘরের বৌ হতে পারি?

—আজকাল ভয় নেই রে। নিশ্চিন্ত মনে বললো অন্ন।

—যুগ পাল্টেছে। দিন-কাল পাল্টে গেছে। লোকেরা উদার হয়েছে এখনকার দিনে। বড় ঘরের ছেলেরা বিয়ে করে উদ্ধার করে এখন।

—তুই দেখিস, আমি ঠিক বিয়ে করবোই। বললো অন্ন। একটা ভালো মানুষ দেখে বিয়ে করবোই। আবার বললো অন্ন।

বয়সের ভার নেমেছে শরীরে। তাকে দেখে আর কোন যুবক পুরুষ উন্মাদ হয় না। সে বয়স কেটে গেছে। সে রাঙা অধর আর নেই। রসময় ওষ্ঠাধর শুকিয়ে গেছে। কটাক্ষহীন চোখ দু'টির তলায় কালি পড়েছে স্থায়িভাবে। চোয়ালের কাছটায় এতোটুকুও মাংস নেই। হাড়ই সার।

টগর অসন্তুষ্ট হয়েছে তার ওপর।

তার দোষ কী? স্থির-যৌবনা সে নয়। অনাচারে-অসংযমে তার শরীর ভেঙ্গে এসেছে। দিনে - দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে সে। তার দেহ অনবসন্ন, মন ভারাক্রান্ত।

এইভাবে আরো কেটে গেলো কিছুদিন। ভবিষ্যৎ চিন্তায় সে অস্থির হচ্ছে মনে মনে। মুখে যাই বলুক না কেন।

শ্যামারও বড় সাধ বিয়ে করবার। ওর যে বর জুটবে না, তা সে জানে। তবুও তার বড় সাধ। সমস্ত জীবন ধরে বর চাইছে সে।

উঠোনের একধারে একটা গরবতীলেবুর গাছ। গাছটায় ফল হয় না। একদিন শ্যামা বললো - অন্নদি, ঐ গাছটাকে আমার বড় ভালো লাগে। ওকে আমি বিয়ে করবো। ও আমার বর। তোমরা বিয়ে দাও না আমার ওর সঙ্গে।

একসঙ্গে সব মেয়েরা হেসে উঠলো। শ্যামার চোখ দু'টো জলে ভরে

উঠলো। অন্ন বুঝলো তার মনের কথা, মনের ব্যথা।

'স্বামী' কথাটা বড় মিষ্টি। শুনতেও আনন্দ হয়, বলতেও আনন্দ হয়। কী যে মোহ ঐ কথাটায়, ঐ শব্দটায়। অন্ন বোঝে সেটা।

নীচের তলায় এসে বারো বছর কেটে গেলো। টগর এবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে অন্নকে — তার দিন ফুরিয়েছে।

একদিন টগর একটা শুভ সংবাদ দিলো। ছেনী মিস্ত্রী বিয়ে করতে চাইছে অন্নপূর্ণাকে। অন্ন কয়েকটা রাত কাটিয়েছে ছেনীর সঙ্গে। কালো, রোগা, ঢেঙা, খোঁচা - খোঁচা দাড়ি ছেনী মিস্ত্রীর।

স্বামী হিসেবে কোন মেয়েই তার চেহারাকে প্রার্থনা করে না। তবুও সে যে স্বামী হতে চেয়েছে - অন্নর মতো মেয়ের, এই না কতো অন্নর সৌভাগ্য বলতে হবে।

পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে টগরকে মিস্ত্রী বললো, এর বেশী দিতে পারবো না।

টগর বললো---তুমি বলেছ সত্তরটি টাকা দেবে। তাহলে ছাড়বো না ওকে।

অগত্যা ষাট টাকায় রফা হল।

অন্নকে যে মেয়েরা ভালোবাসতো তারা সুখী হল। অন্নর বরকে নিয়ে তারা ঠাট্টা - তামাসা করলো - ভগিনীপতি হিসাবে।

কালীঘাটে গিয়ে ওদের বিয়ে হল। মালা-বদল হল। মিস্ত্রী অন্নর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলো।

অন্ন ঘর পেলো, স্বামী পেলো। সংসারের মধ্যে প্রবেশ করলো।

অন্ন আনন্দে দিশেহারা হল। এতো দিনের বাসনা পূর্ণ হল।

ছেনীর বৌয়ের সঙ্গে ছেনীর বনে না। সে বাপের বাড়ীতে (গ্রামে) থাকে। তার সঙ্গে ছেনীর কোন সম্পর্ক নেই।

ছেনীর বাড়ী গড়িয়াহাটার কাছে। একটা বস্তির মধ্যে। একখানাই ঘর। সামনে একচিলতে বারান্দা। সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা। চিক দিয়ে আড়াল করে নেওয়া হয়েছে বারান্দাটা। কলঘর অনেক দূরে। বস্তিটার মধ্যে খুব কম করেও একশোজন লোক থাকে। কেউই অন্নকে ভালো চোখে দেখে না।

দিন আনে, দিন খায় ছেনী। অন্নর হাতে সংসার খরচের টাকা দেয়। একছড়া রুপোর হার দিয়েছে বিয়ের পরে। এক জোড়া বালাও গড়তে দিয়েছে। পরের মাসে দেবে বলে।

অন্ন বলে-এতো খরচ করো না। আমরা বুড়ো হলে টাকার দরকার হবে। জমাও টাকাগুলো।

--কেন ? আমাদের ছেলে-মেয়েরা দেখবে আমাদের। মিস্ত্রী বলে।

অন্ন মাথা হেঁট করে। মনে আনন্দ হয়, মুখে কিছু বলে না।

বড় বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছে অন্ন। বড় বেশী আশা করছে সে।

ঠকেছে -- তবুও আশা করছে।

মিস্ত্রী তাকে খুব সুখে রেখেছে বলতে হবে। রোজকার করে ভালোই। বেশ টাকা-কড়ি দেয় অন্নকে। অন্নও পাকা গৃহিণীর মতো বেশী খরচ বাঁচিয়ে, খরচপত্র করে। বাজার করে আনে। একহাতে রান্না-বান্না, ঘর-দোর পরিষ্কার করা, সংসারের যাবতীয় কাজ সবই করে। হাসিমুখে মিস্ত্রীর পা টিপে দেয়, মাথা টিপে দেয়, হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করে।

মিস্ত্রী বলে - আমার যে বৌ ছিল মহা বদমাস (ঢোক গিলে বলে), তাকে আমি এখন নিই না ঘরে, তাকে দূর করে দিয়েছি। মহা বদমাইস। খালি টাকা দাও, গয়না দাও, এটা দাও, সেটা কিনে দাও, শাড়ী দাও। আমি বলেছি - যা বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকগে যা। আমি মাসে মাসে খরচের টাকা পাঠিয়ে দিই অবশ্য। খুব বড়-লোকের মেয়ে তো, তাই আমার ঘরে থাকতে পারলো না। --তোমার মতো এমন লক্ষ্মী বৌ তো সে নয়। এতো ভালো তুমি - বলে মিস্ত্রী।

আনন্দে বিগলিতা হয় অন্নপূর্ণা। সেও তো মনের মতোই স্বামী পেয়েছে, ঘর পেয়েছে। তার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর ভাবতে হবে না। রাস্তায় আর দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হবে না। বেঘোরে প্রাণটা অন্তত যাবে না। সে ধন্য মনে করে নিজেকে।

ছেনী মিস্ত্রী বলে - আমি মরে গেলে তুমি চলে যেও - আমার গাঁয়ে-তাঁতিপুকুরে —আমার ধানজমি আছে, ঘর আছে, শুধু দেখবার কেউ ছিল না, এখন আর আমার ভাবনা কী? তুমি যখন এসে গেছ আমার সংসারে, আমার ঘরে লক্ষ্মীও এসে গেছে।

আরো ইনিয়ে-বিনিয়ে কতো কথা বলে মিস্ত্রী। লোভ দেখায় অনেকরকম।

মনের ভারে—সবই সত্যিকথা।

কাঁচা মেয়ে অন্নপূর্ণা। ভবিষ্যতের জন্য সে পাকা ব্যবস্থা কিছুই করলো না। শুধু মুখের কথাতেই ভুলে গেলো। পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করবার মতো তার বুদ্ধি ছিল না।

মানব-জীবনের কতোটা সে জানতো? মাত্র কয়েকটা দিক দেখেছিল—সবটা তো দেখে নি, অভিজ্ঞতাও তার হয় নি। পুরুষরা মেয়েদের কতো রকমভাবে ঠকাতে পারে, তার জানা ছিল না। তাই সে বোকার মতো, পরের সংসার নিজের মনে করে, পরম উৎসাহে—'সংসার' গোছাতে শুরু করে দিলো। দিনকতক বেশ কেটে গেলো।

কিছুদিন পরে সে লক্ষ্য করলো—ছেনী মিস্ত্রী অনেক রাত্রে ফিরছে। মুখেও তাড়ির গন্ধ পায়-কোথা থেকে সে ফেরে, বুঝতেই পারলো।

অন্নর মনটা খারাপ যদিও হল—তবু ছেনীকে কিছু বললো না। তার যে 'বলা' সাজে না। মিস্ত্রী যদি বলে—'তুমি কী?'

একদিন ছেনী কাজে বেরিয়ে গেছে। অঘটনটা ঘটলো তখনি। ছেনী দুপুরে খেতে আসে। তখনো আসে নি।

রান্না প্রায় শেষ করে ফেলেছে অন্ন। দু'টো বালতি করে জল নিয়ে সবে ঘরদোরটা ধোবে বলে ঝাঁটা নিয়ে একটু জল ফেলেছে মাটিতে—হৈ-চৈ শব্দ হল ঘরের বাইরে।

অন্ন দেখলো-একটি মেয়ে (বৌ)। মড়াকান্নার মতো কাঁদতে কাঁদতে সেই ঘরে ঢুকলো। তার পেছনে পাড়ার দামুখুড়ো, খুড়ি, পানউলী মাসী আর একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা।

এ কি কাণ্ড? ছেনীর কিছু হল না কী? ভয় হল অন্নর।

—এই যে, ইনিই বুঝি তিনি? যে বৌটি কাঁদছিল, বলে উঠলো। রাগে গরগর করে হাত-পা নেড়ে বললো—ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।

—ছেনীর বৌ এসেছে গো। তোমার মিস্ত্রিপনা করা এবার ঘুচলো—বললো পানউলী মাসী।

—এঁ্যা? বটে? আমার ঘরে একটা নষ্ট মেয়ে এসে উঠেছে? সে কররে গিয়েমো? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

অন্নর হাত থেকে ঝাঁটাটা এক-ঝটকায় ছিনিয়ে নিলো-ছেনীর বৌ। তারপর-দমাদম করে পিঠে বসাতে লাগলো অন্নর। প্রতিবেশীরা হাসছে, ফিসফিস করছে।

নাটকটা খুব জমে উঠলো। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলোও খুব মজা পাচ্ছে-কাণ্ডকারখানা দেখে। দাঁত বার করে হাসছে--দামুখুড়ো। পানউলী মাসী ফোড়ন কাটছে। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। সকলেই অন্নর বিপক্ষে।

ছেনী মিস্ত্রী খেতে এলো এমন সময় বৌকে দেখে, বেচারা একেবারে 'হিম'। কেউ বোধ হয় দেশে লিখে দিয়েছে ব্যাপারটা। তাই রণচণ্ডী মূর্তিতে হাজির।

এবার ঝাঁটাগাছটি নিয়ে ছেনীর বৌ ছেনীর বুকের ওপর ক'খা বসিয়ে দিলো। ছেনী ঘরের অপর প্রান্তে দৌড়ে পালালো। কতবার অন্ন বোঝাতে চাইছে যে, তার মিস্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। সিঁদুর দেখাচ্ছে বারবার, মাথার সিঁথির কাছে হাত দিয়ে।

—আহা। মরি-মরি। কী আমার সতী-লক্ষ্মী বৌ এলেন। সাতপাকে বাঁধা বৌ একেবারে। পানউলী মাসী টিপ্পনী কাটলো।

--বিয়ে? তবে রে রাক্ষুসী। এক্ষুণি বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। চিৎকার করে উঠলো-ছেনীর বৌ।

তখন মিন মিন করে বলছে ছেনী—আমি কী বিয়ে করেছি নাকি? ঐ শয়তানীটা আমার বাড়ীতে জোর করে উঠে এসেছে-আমাকে ভাল মানুষ পেয়ে। বিয়ে করেছি-কে বলেছে? অগ্নি সাক্ষী হয়েছে? আর? আর আমার এমন বৌ থাকতে—

—সোনার চাঁদ আমার ছেনী। ওর স্বভাব কখনোও খারাপ? কেউ বলতে পারবে? ঐ মেয়েটাই তো সিঁদুর-টিঁদুর পরে হাজির হয়েছে। আর, ছেনীর দয়ার শরীর। বলেছে—খেতে না পাও, রান্না-টান্না করে দিও, তোমাকে খেতে দোব—বোনের মতো থাকতে পারো। [illegible] বললো।

ঝনঝন করে অন্নর মাথাটা ঘুরে গেলো। এতো মিথ্যেকথা, কী করে বলতে পারে মানুষ। মানুষে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে ক্রমশ।

ছেনীর বাড়ীতে অন্নর স্থান হল না। বিদায় না করতে পারলে ছেনীর বৌয়ের শান্তি নেই। সেটাই স্বাভাবিক।

শুধু সিঁদুর পরে অন্ন প্রমাণ করতে পারলো না যে, ধর্মত তাদের বিয়ে হয়েছিল কখনোও। মন্ত্র না পড়ে বিয়ে না হলে, সে বিয়ে বিয়েই নয়।

অনেক অশান্তির পর অন্ন ছেনীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। বেশ রাত হয়ে যাবে-টগরের বাড়ী পৌঁছতে। কোথায় আর যাবে? সেখানেই যেতে হবে।

কেউ যদি তাকে গান-বাজনা শিখিয়ে ভদ্রঘরের 'পতিতের' মতো তৈরী করতো, তবে পেটে দু'মুঠো অন্ন জুটতো। টগরবালার তো শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ায় রুচি ছিল না। আচ্ছা স্বার্থপর মানুষটা। সবকিছুতেই অন্নর বিতৃষ্ণা জেগেছে।

কোথায় যাবে সে? টগরের বাড়ী আবার ফিরে যাবে? কোথায় চাকরী করবে? কে তাকে চেনে? চাকরী দেবে কেন?

সমস্তটা রাস্তা ভেবে-ভেবে, পুরোন আস্তানায় গিয়ে পৌঁছুলো অন্ন। রাত্রের পরীরা সাজগোজ করে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছে। খদ্দেরদের ভিড়—টগরের পাপাশ্রমে। টলতে-টলতে খদ্দেররা যার-যার নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে পড়েছে।

টগরও ব্যস্ত খুব। কে একজন বড়লোক আসবে রাত্রে। কুসুমণির ঘরে তার থাকবার কথা। নীহারকে দেখতে পেলো না অন্ন। সে বোধ হয় ঘরে ঢুকে পড়েছে। টগরের শরীর ভালো নয়। [illegible] হয়েছে। ছলাকলা করতে পারে না।

সব শুনে টগর বললো—এসেছো যখন, আজকের রাতটা থাকো।

বড় রূঢ় শোনালো কথাটা অন্নর কানে। তবু, থাকতেই হল।

টগরবালার ঘরের মেঝেতে তার স্থান হল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তার নেই। কিছু খেলো না তাই।

—আর যে পারি না মাসী। কাতর কণ্ঠে অন্না বললো। একটু পরে আবার বললো —আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও। না খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরবো যে।

---তোমার ব্যবস্থা তো করে দিয়েছিলাম, বনিয়ে থাকতে পারলে না তুমি। আমি এর চেয়ে আর বেশী কী করতে পারি, বলো! টগর বললো।

---আমাকে তাড়িয়ে দিলো যে ওরা। কান্না ঝরলো অন্নর চোখে।

---তাড়িয়ে দিলো? তুমি জোর করে থাকলে না কেন? বললে না কেন, বিয়ে করা বৌকে তাড়ানো যায় না, কালীঘাটে তো বিয়ে হয়েছিল।

বিয়ে? এতো দুঃখেও হাসি পেলো অন্নর।

---ওকে কি বিয়ে বলে মাসী? মন্ত্রপড়া হয় নি, অগ্নি-সাক্ষী হয় নি, আর---

---থাম এখন। আমি আর বাজে কথা শুনতে চাইনে। রাত হয়ে গেছে। আমি ঘুমোচ্ছি। তুই আমার পা-টা টিপে দে। বলে পাশ ফিরে শুলো টগর।

অন্নকে আর কথা বাড়াতে দিলো না টগর। তার মন ভিজলো না।

প্রায় সমস্ত রাতটা, টগরের সেবা করে কাটিয়ে দিলো। টগর তাতেও খুশী হল না। শুধু বললো---লোকের বাড়ী যদি গতর খাটিয়ে রোজকার করিস, চেষ্টা করবো।

পরের দিনও টগরের আশ্রয়ে থাকতে হল। শিবরাণী খবর দিলো---শালিকবাগানে একটা বাড়ীতে বাসন-মাজার কাজ আছে। অন্ন যদি রাজী থাকে সেখানে কাজটা হয়ে যেতে পারে।

রাজী নয় আবার? অন্ন দেখা করলো---শালিকবাগানের বাবুদের বাড়ীতে। ভাগ্য ভালো কাজটা হয়ে গেলো। চাটুজ্যেবাবুদের বাড়ী। পুরোন পরিচয় গোপন করে বাবুদের বাড়ীতে কাজে লেগে গেলো।

মস্তবড় পরিবারের বাসন মাজতে হয়। সকালে গয়লাবাড়ী থেকে দুধ নিয়ে আসতে হয়। এনে, রান্নাঘর ধুয়ে, বাসন মাজতে মাজতে, বেলা ন'টা বেজে যায়। চায়ের---জলখাবারের বাসনপত্রও যে অনেকগুলো। তারপর কয়লা ভেঙ্গে রাখে। বাসনমাজার ফাঁকে বড় বড় তিনটে উনুন ধরিয়ে দিতে হয়। দেরী হলে—বামুন ঠাকুর চেঁচামেচি করে। বড়া-বড়ির তরকারি হলে, কাপড় ছেড়ে, একরাশ ডাল আর মশলা বাটতে হয়। তারপর বাসি-ছাড়া কাপড়গুলো সাবান দিয়ে কেচে ছাদে শুকুতে দিয়ে আসে। দশটা নাগাদ দু'খানা বাসি রুটি আর একটুখানি চা দেয় গিন্নিমা। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নেয় সবটুকু। মাছগুলো ধুয়ে কুটে দেয়, হলুদ মাখিয়ে রান্নাঘরে দিয়ে আসে।

থাকবার কোন জায়গা নেই অন্নর। মুড়ি-মুড়কি যা হয় দু'টি খেয়ে---চাটুজ্যে-বাবুদের বাড়ীর পেছনে---যেখানে চাকর-বাকরদের ঘর আছে---তারই পাশে শুয়ে সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে দেয়। বেলা তিনটের সময়---আবার কাজ শুরু হয়। রান্নাঘর ধোওয়া, বাসনমাজা, জামা-কাপড় কাচা, গিন্নিমার পা-টেপা ইত্যাদি। রাত্রেরও ব্যবস্থা ঐরকমই। যা হয় কিছু খেয়ে, রাতটুকু চাকরদের ঘরের সামনে কাটিয়ে দেয়।

জীবন পুরোন চাকর। তিরিশের বেশী বয়স নয়। তার মনে দয়া হল। অন্ন তারই ঘরের সামনে পড়ে থাকে। বাবুদের বাড়তি ঘর যদিও আছে, তাঁরা দেন নি ঘর---অন্নকে। শীতের রাত্রে হি-হি করে কাঁপে মানুষটা।

জীবনের কেমন যেন মায়া হয় অন্নর ওপর। অন্য চাকর-বাকররাও তো আছে। তারা দয়া করে না, এতটুকুও ঠাঁই দেয় না তাদের ঘরে।

অন্ন ঠিকে-ঝি। তাকে বাবুরা ঘরই বা দেবেন কেন? অন্ন ভাবে। শীতে জবু-থবু, হয়ে গুঁড়ি-শুঁড়ি মেরে বসে থাকে চাতালটার ওপরে। একটা ঢাকা যদি থাকতো চাতালের ওপর ওর গায়ে হিম পড়তো না রাত্রে। জীবন ভাবে। বাবুদের বাড়ীতে অনেক জায়গা। তবুও জায়গা হয় না অন্নর।

রাত্রে অন্ন ভাবছিল কতো মোহময়ী রাত্রি কেটে গেছে। বড় সাজানো ঘরের মধ্যে। যে মানুষ তাকে উপভোগ করেছে, সেই মানুষই তাকে তাড়িয়েছে যখন, সে শেষ হয়ে গেছে। তবুও ভোগ করেছে তো? তার রূপে পুরুষ মুগ্ধ হয়েছে তো?

কোনদিন অন্নরও কী মোহ জাগে নি? সেও কী আকণ্ঠ ভোগ করে নি? তারও কী কামনা-বাসনা মেটে নি? সে নিজে সুখী হয় নি? মানুষকে সুখী করে নি?

হ্যাঁ। করেছে। সুখী নিশ্চয়ই করেছে। স্বপ্নের মতো কয়েকটা রাত, তার কেটেছে-মোহগ্রস্ত হয়ে। অনেক রাতের অনেক মানুষকে তার ভাল লেগেছে।

আর আজ? তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তারাই। যাদের লালসার আগুনে সে পুড়েছে। তার আর প্রয়োজন নেই। সে ফুরিয়ে গেছে। আজ সে অসহায়। বেড়াল-কুকুরদের মতো তাড়া খেয়ে-খেয়ে জীবনটা তার শেষ হবে।

দারুণ শীতের রাত্রে বড় কষ্ট হচ্ছে অন্নর। পুরোন পাতলা বালাপোষ-খানায় একটুও শীত আটকায় না। দাঁতে দাঁতে লেগে যায়। মাংস-অস্থি-মজ্জা সব কিছু ঠাণ্ডায় জমে যায়। বাবুরা-মায়েরা দেখেও দেখেন না, তার কতো কষ্ট।

বাবুদের বাড়ীর ভেতর বড়-বড় বারান্দাও আছে। খোলা নয়। সবটা ঢাকা। বড়-বড় জানালা-দরজা দিয়ে ঢাকা। অপ্রয়োজনীয় ঘরও অনেক পড়ে আছে বাড়ীতে।

কিন্তু সেখানে অন্নকে কেন জায়গা দিতে যাবেন বাবুরা? চুরি-চামারি করে যদি সে পালায়? যদিও অন্ন বলেছে—গ্রাম থেকে এসেছে, স্বামী মরে গেছে, সম্প্রতি। কেউ, খেতে-পরতে দেবার নেই। তাই পেট চালানোর তাগিদে কলকাতায় এসেছে। গতর খাটিয়ে উপার্জন করে পেট চালালে অনেক সম্মান। মিথ্যেকথা বলেছে সে। সত্যিকথা বললে চাকরি পাওয়া যেতো না।

একদিন জীবন বললে—তুমি আমার ঘরে এসে শোও, রোজ রাত্রে। তোমার কষ্ট দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। শীতে ঘুমোতে পারো না।

অন্ন যেন বেঁচে গেলো। তার বেশ বয়স হয়ে গেছে। জীবন তার ছেলের মতো। জীবনের ঘরে মাটিতে সে শুতে লাগলো—প্রতি রাত্রেই।

বড়দাদাবাবুর আদরের চাকর জীবন। কর্তা মশায়ের বড় ছেলে সাহেবিয়ানায় পোক্ত। জীবনকে বিলিতী কায়দায় সবকিছু শেখানো হয়েছে। বড়দাদাবাবু কোট-প্যাণ্ট-টাই পরেন। রাত্রে পার্টি যান। রাত্রে ডিনার খান টেবিলে। বাড়ীর সকলে তাঁকে অপছন্দ করলেও, মুখে কেউ কিছু বলেন না। কারণ, অনেক টাকা রোজকার করেন তিনি। বাড়ীতেও সাহেব-সুবো এলে জীবন সাদা ধপধপে বেয়ারার পোষাক পরে, তকমা এঁটে ঘুরে বেড়ায়। রান্না-বান্নাও সেই করে রাখে। বাড়ীর বাইরে যে একটা ঘর আছে, রান্না হয় সেখানে। সাহেবী-খানা রান্না করতে পারে। লেখাপড়াও জানে। খাবার সময় টেবিল সাজায়।

সে একা হাতে সবকিছুই করে। অন্ন সাহায্য করে। মশলা পিষে দেয়। পেঁয়াজ কেটে দেয়। ঘরটাও ধুয়ে দেয়। বাসনপত্র মেজে দেয়। জীবনের হাতের কাছে জিনিষপত্র এগিয়ে দেয়। এগুলো যদিও বাড়তি কাজ, তবুও করে দেয়।

সে যে কৃতজ্ঞ জীবনের কাছে। রাতটুকু ঘরের ভেতর তাকে ঠাঁই দিয়েছে—তাই। কিন্তু, তাই নিয়ে এ বাড়ীর ঝি-চাকররা কুৎসা রটাচ্ছে।

—বলি এতো দরদ কিসের? কমবয়সী ঝি—বেণীর বৌ বলে। বেণী মারা যাবার পর সে চাটুজ্যে বাড়ীতে কাজ করছে। বছর দুয়েক আছে এ বাড়ীতে। এ বাড়ীর সেজ বৌয়ের ছেলের কাজ করে। একটু দুর্বলতা আছে জীবনের ওপর।

খাঁদার মা—গিন্নিমার নিজস্ব লোক। মুখ টিপে-টিপে কথা বলে। গিন্নিমার কাছে সাত-পাঁচ করে লাগালো জীবন আর অন্নর নামে। ধীরেন বলে কর্তা-মশায়ের এক পেয়ারের চাকর ছিল, সে পাড়াময় বলে বেড়াতে লাগলো।

গিন্নিমা বিরক্ত হলেন। ছি-ছি। এসব কী কাণ্ড। গেরস্ত-বাড়ীতে এ কী অনাচার। বুড়ি হয়ে মরতে চললো। এখন কি না ছেলের বয়সীর সঙ্গে এই সব।

ক্রমশ, কর্তা শুনলেন, বাড়ীর ছেলেরা শুনলেন, ছেলের বৌয়েরা শুনলেন। সে এক-বিশ্রীকাণ্ড। সকলে শুনে বললেন-ছিঃ-ছিঃ।

অন্নকে জবাব দিলেন গিন্নিমা। এরকম লোক রাখা যায় না।

জীবনও চাকরি ছাড়লো। ও বাড়ীতে সে আর থাকতে পারলো না। একটা টান পড়ে গেছে-অন্নর ওপর। অন্নকে সে ছেড়ে থাকতে পারবে না। তার মনে হল।

জীবন অন্নকে বললো-তোমাকে আমি বিয়ে করবো।

এ কী সম্ভব? অন্ন স্বপ্ন দেখছে না তো? অন্ন হতবাক্।

জীবন সব রকমের কাজ জানে। তার কাজ জোটাতে কষ্ট হল না। তার চাকরি একটা জুটে গেলো-বড়-লোকের বাড়ীতে। অন্নও রইলো জীবনের সঙ্গে। বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া করলো জীবন।

আবার সংসার পাতলো-অন্ন। এবারেও সে অনেক আশা করল। বিয়ে করছে কেন জীবন? কালীঘাটের মালা বদলে আর বিশ্বাস নেই অন্নর। এবারে মন্ত্র পড়ে, অগ্নি-সাক্ষী করে বিয়ে করবে। জীবনও রাজী হয়েছে। জীবনের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বৌ মরে গেছে।

একটা চাকরী জুটলো না অন্নর।

জীবন বলে-কী দরকার তোমার কষ্ট করে? চলে যাচ্ছে তো আমাদের। তোমাকে চাকরি করতে হবে না। তোমার শরীর খারাপ।

দু' জায়গায় কাজ করে-জীবন। অনেক টাকা পায়। অন্নকে টাকাগুলো দেয় জীবন। অন্ন পাকা সংসারীর মতো সাবধানে খরচ করে। দিন চলে যায় জলের স্রোতের মতো। বিয়ের জন্যে তাগাদা দেয় অন্ন। জীবন বলে হাতে কিছু টাকা জমুক, বিয়েতে খরচ আছে তো। লোকজন খাওয়াতে হবে।

৩

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগলো।

অন্নর, বিয়ে করা এখনও হয় নি। অন্ন অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছে—জীবনকে। জীবনের কেমন যেন গা নেই। বার বার বললে সে বিরক্ত হয়। জীবন যেন আগেকার মতো নেই। অন্যরকম হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন জীবনের দেশ থেকে চিঠি এলো। তার বাবা মারা গেছে। জীবন দেশে চলে গেলো। অন্ন খুব খানিকটা কাঁদলো। ধর্মসাক্ষী করা বৌ হলে সে জীবনের সঙ্গেই যেতে পারতো। জীবনের মা নেই, আগেই মারা গেছে। বাড়ীতে কোন মেয়ে নেই। সে যদি যেতো। জীবন আশ্বাস দিলো-খুব তাড়াতাড়িই সে ফিরবে। অন্ন যেন কোন চিন্তা না করে। কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে গেলো।

অনেকদিন হয়ে গেলো, জীবন ফিরছে না কেন? দেশে গিয়ে দু' লাইনের একটিমাত্র চিঠি দিয়েছিল। ভুলে গেলো না কী?

অন্ন চিঠি দিয়েছে ক'খানা। তারও জবাব নেই। এদিকে ঘরভাড়া বাকী পড়েছে। বাড়ীওয়ালা তাগাদা দিচ্ছে।

হাতে একটিও পয়সা নেই। সব খরচ হয়ে গেছে।

দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লো অরু। সে চাকরীর চেষ্টা করে যাচ্ছে সমানে। না, পুরুষকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর এ ভুল সে করবে না।

ভগবান তবু মুখ তুলে চাইলেন। 'ক্যানসার' রোগে ভুগছেন এক আশি বছরের বৃদ্ধা। সেখানে চাকরী জুটলো। মোটা মাইনে দেবে, তবে খাটুনীও খুব। ভদ্রমহিলার জরায়ুতে 'ক্যানসার' হয়েছে। গামলা-গামলা রক্ত বেরোয়। তাছাড়া সবকিছুই পরিষ্কার করতে হয়। খাওয়া-পরার আর চিন্তা নেই।

সেবা করতে গিয়ে, প্রথম দিকটা গা গুলিয়ে উঠতো অরুর। তবুও টিকে থাকতে হবে। না হলে খেতে পাবে না। সবকিছু সহ্য করেছে সে। এটাও সহ্য হল।

সেবার কাজটা পেয়ে অরু ঘর ছেড়ে দিলো। ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করতো--বৃদ্ধা যেন অনেকদিন বেঁচে থাকেন। তা না হলে তার কাজ চলে যাবে। আবার, বৃদ্ধার কষ্ট দেখে মনে হয়, ভগবান তাঁকে টেনে নিন।

ঐ বাড়ীতে কাজ করবার সময় তার বসন্ত হল। একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলো রোগের প্রকোপে। কাজটাও চলে গেল। অসুখের পর তার শরীরটাও ভেঙ্গে গেল। ক্রমশ নুয়ে পড়তে লাগলো বয়সের ভারে। শেষ পরিণতি রাস্তায় বসে ভিক্ষে করা। দু-চার জায়গায় ঝি-এর কাজ করেছিল। তারপর আর পারে নি। শরীরের প্রায় সব শক্তিটুকু ক্ষয় হয়ে গেছে। কাজ করবার সমস্ত শক্তি চলে গেছে। অন্য কোনরকম উপায় নেই--উপার্জন করার। তাই সে আজ ভিখিরী। পৃথিবীতে তার কোন দরকার নেই, তবুও সে অক্ষম হয়ে বেঁচে আছে। ভগবান তাকে দেখতে পান না। তাকে ভুলে বসে আছেন। আর যাদের পৃথিবীতে প্রয়োজন, তারাই মারা যাচ্ছে। ভগবানের এ কী বিচার?

●

গল্প শেষ করলো বুড়ি।

বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার মামার বাড়ীতে জলসা শেষ হয়ে গেলো বোধ হয়।

অন্ধকারের কালো মিশমিশে রংটা আমার চারপাশে। আমার দৃষ্টিতেও গাঢ় কালো রংয়ের প্রলেপ। তাই কাছের মানুষটাকেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। নগরের যা অবস্থা--রাস্তায় আলো নেই। 'বাল্ব'গুলো বোধ হয় চুরি হয়ে গেছে। আলো জ্বলছে না।

পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে জ্বালালাম।

বুড়ি দু'টো হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে কাঁদছে।

মুখ তুলে তাকালো সে। বললো--আজ যাই বাবু।

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিবে গেলো।

--চলো বুড়ি। তোমাকে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি। একা গেলে, অন্ধকারে গাড়ী চাপা পড়বে।

---আর আমার বাড়ী। একখানা ঘরই পেলাম না। কান্না মেশানো গলায় বুড়ি বললো।

॥ সমাপ্ত ॥

জুভেনিল কোর্টে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের বিদায় সম্বর্ধনাসভায় মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ

★ লজ্জাবরণ ঃ দীর্ঘ-হ্রস্ব ★

আবরণের হ্রস্বতা-কেন্দ্রিক সাম্প্রতিক গোরগোল বহু পুরনো সামাজিক বিতর্কের জেরমাত্র—আকাশ থেকে পড়া নিরালম্ব, বায়ুভূত কোনও ব্যাপার নয়।

ভালবাসার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা প্রত্যেক মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পদ। অন্যথায়, সন্তানের সুস্থতা, স্থিতি এবং চরিত্র গড়ে ওঠে না বাঞ্ছিত পথে।

সামাজিক বিধিনিষেধ তাই প্রবল। সময়বিশেষে পীড়াদায়ক। সেজন্যই বিধির বাঁধন আল্‌গা হলে উল্‌টোমুখী প্রবণতাও প্রায়ই চূড়ান্ত পর্যায়ে ছুটে চলে। এই টানাপোড়েনের ফলে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপারটা মানবিক সমৃদ্ধি এবং সংকোচের মাত্রা সংক্রান্ত হলে তা খুবই দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কাজেই, গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা পোষাক থেকে প্রায় উলংগ পোষাকের আভাস পর্যায়ক্রমে যায়, আবার আসে; প্রথানুরক্তি এবং প্রথা ভাঙার উদ্দামতা সংঘর্ষর মধ্য দিয়ে নতুন সাম্য সৃষ্টি করতে থাকে।

উর্ধ্ববিহীন — টপ্‌লেস্‌ থেকে পোষাকের ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা অধুনা উর্ধ্ব-অধঃ আবরণের নতুন 'কেতা' বাজারে ছেড়েছে: পা থেকে মুখ পর্যন্ত চোখে পড়বে না, রাজ্যসুদ্ধ মেয়ে-মদ্দ সব মুসলমানের বিবি। এই পোষাকে ফাঁকা থাকছে কেবল চোখ আর চিবুক। জনৈক য়ুরোপীয় পোষাকী খাঞ্জা খান্‌ খবর দিয়েছিলেন, তাঁর 'মডেল' সুন্দরীরা সব ন্যাড়া হচ্ছেন পরের বছর—কারণ, না কি চুলের বোঝা বড় বিশ্রী বোঝা হয়ে উঠেছে।

বক্ষ এবং কেশ পুরুষের কাছে উত্তেজনা আর উদ্দীপনার দু'টি প্রধান বস্তু। সুতরাং, স্ত্রী-বক্ষ সকলের সামনে উন্মুক্ত করার অর্থ স্ত্রীলোকের নারীত্ব হরণ করা, আর চুল কামিয়ে ফেললে স্ত্রীলোককে পুরুষের মত দেখায়।

যুদ্ধোত্তর কালে সব উন্মুক্ত ক'রে নগ্নতাবাদীরাও সম্ভবত এইটিই চেয়েছিলেন। আশা ছিল, এভাবে ছোকরাদের বিপথগামিতা এবং যৌন অপরাধ যথেষ্ট কমবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান্‌ শ্রমিকরাও নগ্নতার চর্চা করতেন—রাজনৈতিক বিদ্রোহ, সামাজিক বিদ্রোহর সঙ্গে হাত মেলাল পোষাকী বিদ্রোহ।

বাড়ীতে নগ্নতা চর্চার মানে সকালে মুখ ধোয়া, দাড়ি কামানো, পোষাক পরা ইত্যাদির সময় নগ্ন অবস্থায় নিরুত্তেজিত হয়ে চলাফেরা। এর সমর্থকদের মতে, ছোটরা অল্পবয়সে নিজেদের লিংগাদি এবং সমগ্র দেহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পাক, বড়দের পূর্ণাংগ দেহও তাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হোক্‌। ওতে ভালই হয়।

এদের মতে, বেশি ঢাকঢাক গুড়্‌-গুড়্‌ ছোটদের পক্ষে ক্ষতিকর; ফলত তারা যৌন বিষয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়। সহজভাবে প্রকৃতিকে মেনে চললে তা হতে পারে না। আদিম সমাজ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু দেখালেই 'ত হয় না। তারা জানতে চায়, কেন সব কিছু অত বেশি উন্মুক্ত ক'রে রাখা হয়েছে, এটাও কি তাদের কোনও কোনও ব্যাপার জানতে না দেওয়ার ইচ্ছে নয়?

তা ছাড়া, সকলের সামনে নগ্ন থাকলে ছোটদের সংগত কারণেই মনে হতে পারে, তারা বুঝি সাধারণ্যে প্রদর্শনীয়। এটা ঠিক যে, সব শিশুই নিজেকে জাহির করতে উৎসুক, বড়দের গোপন ক্রিয়াকলাপ দেখতেও তারা ইচ্ছুক। কিন্তু উলংগ ক'রে রাখলেই এই সমস্যার সমাধান হয় না।

ওদের যে ঐসব মোটামুটি জানানো দরকার, সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা বিশেষ নেই। প্রশ্ন হল: এই শিক্ষার জন্য কতখানি নগ্নতা প্রয়োজন? একবার বোঝালেও যেমন হয় না, তেমন নগ্নতার অবাধ চর্চাও শিশুর যৌন সজিৎসা এবং যৌনবোধ পর্যন্ত নষ্ট ক'রে দিতে পারে।

যৌন-সম্পর্কর ব্যাপারে প্রতিটি শিশুর সুপ্ত কৌতূহল প্রমাণিত। ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে এই কৌতূহলই তার সব শিক্ষার ভিত্তি তৈরি ক'রে দেয়। কিন্তু সন্তানদের সামনে নগ্ন থাকলে বাবা-মার পক্ষে নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ানো আদৌ বিচিত্র নয়, অন্য ক্ষতির সম্ভাবনাও রয়েছে।

প্রথম ছ' বছর পুরুষ-শিশু মার প্রতি এবং নারী-শিশু বাবার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত থাকে, তাদের অন্তরংগ জীবন সম্পর্কে তার কৌতূহলও প্রবল; এর পর ধীরে ধীরে সে বাবা-মার অন্তরংগতা মানিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে তার ইচ্ছা অবদমিত হয়। সুরু হল তার 'ল্যাটেন্‌সী পিরিয়ড্‌'। ৬ বছর থেকে বয়ঃসন্ধির সূচনা পর্যন্ত এর পরিধি—শিশুর জীবনে এই বছর ক'টি শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক মূল্যবান।

এই সময় শিশুর যৌনচিন্তা এবং যৌন-ক্রিয়াকলাপ ধীরেসুস্থে ধাপে ধাপে গূঢ়, অবচেতনের স্তরমাধ্যমে অংকুরিত হতে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। বাড়িতে বাবা-মার নগ্নতার দ্বারা তা ওস্‌কালে শিশুর সংক্ষোভজ তুফান জীবনের অন্যান্য দিক তছনছ ক'রে দিতে পারে। তা ছাড়া এর ফলে পুরুষ-শিশু মার প্রতি এবং নারী-শিশু বাবার প্রতি দীর্ঘদিন অস্বাভাবিক আসক্ত থাকতে পারে।

নগ্নতা শিশুমনে ব্যর্থতা এবং পরাজয়বোধও সৃষ্টি করে। বাবাই শিশুর আদর্শ পুরুষ—তাঁকে অনুকরণ ক'রেই সে বেড়ে ওঠে। প্রতি পদে তাঁর পরিণত দেহের সংজ্ঞে নিজের অপূর্ণ দেহের তুলনা ক'রে সুরু করার আগেই সে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে পারে।

খুদে মেয়েটিও ভাবে, কখনও সে কী তার মায়ের মত পূর্ণ বক্ষ, সুগোল নিতম্ব, অলকরাশি, বিশেষ স্থানে কেশগুচ্ছ ইত্যাদি লাভ করবে। শৈশবে সে তার ভায়েরই মত। কেবল ভায়ের

জাপানের ওসকায় আয়োজিত শিল্পমেলায় ভারতীয় মণ্ডপের নির্বাচিত গার্লস গাইডদের সংগে আলোচনারতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

একটা বাড়তি অংগ থাকে---সে ভাবে হয় তাকে ওটি দেওয়া হয়নি, নতুবা কেউ তা নিয়ে গেছে।

সারাদিন খেলামেলার পর, রাত্রে যখন আবরণ লাগে, দরজা বন্ধ হয়---তখন তারা ভাববেই এই নৈশ গোপনীয়-তার হেতু কী। এই আকস্মিকতা তাদের মনে ধাক্কা দেবেই। ভাবে—তারা হয় বাদ পড়েছে, নতুবা বিতাড়িত। এমন কি, যৌনসংসর্গ যে 'বদ' ব্যাপার, তাও তারা ভাবতে পারে। কারণ, বাবা-মা ব্যাপারটা গোপনে করেন, ঠিক যেমন তারা কোনও অন্যায় কাজ গোপনে করার জন্য সচেষ্ট হয়।

'এলেম আমি কোথা থেকে?'---শিশুর এই প্রশ্নটির নির্গলিতার্থ-মায়ের জঠরে সে গেল কী ভাবে। তার যৌন-ভাবনার অনেকখানি জুড়ে থাকে বাবা-মার পারস্পরিক আচরণ। নগ্নদেহে ঘুরে বেড়ালে তাকে এ বিষয়ে কিছুই জানানো যায় না।

বাবার লিংগ দেখে প্রথমে তারা ভয়ার্ত হতে পারে। ভয় পাওয়া স্বাভাবিক---আকৃতি শিশুর চোখে ভীতিপ্রদ। তাছাড়া, বাবার আকৃতি, শক্তি আর ক্ষমতা শিশুর পক্ষে ভীতি-জনক---তার যা সামান্য আছে বাবা তা চটে গেলে কেড়ে নিতে পারেন, এ ভয়ও তার অবচেতনে সক্রিয়।

কেউ কেউ বলেন, পূর্ণাংগ দেহ দেখলে শিশু ভাববে ওই তার লক্ষ্য। এ যুক্তি ধোপে টেকে না। যা অনেক দূরে, নাগালের বাইরে, তা কেবল শিশুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে অপেক্ষাজনিত হতাশা বয়ে আনে। সব শিশুই সংগে সংগে ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে সমুৎসুক।

অতিরিক্ত ঢাকচাক গুড়গুড়ের বাতিক এবং নগ্নতা---দুই-ই ক্ষতিকর।

বাড়িতে বাড়ন্ত ভাই বা বোনকে অহরহ নগ্ন দেখলে পারস্পরিক সম্পর্কে যৌনতার বিস্তার ঘটে অবাঞ্ছনীয় মাত্রায় এবং পরে মেয়ের পক্ষে মনোমত স্বামী এবং ছেলের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক স্ত্রী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। মেয়ের মনে বাবা এবং বা ভাইয়ের প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত হয়। ছেলের মনে মা এবং বা বোনের যৌনরূপ ক্ষতিকর মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

সুতরাং, বয়স বুঝে তার মানসিক ও সংক্ষোভজ অবস্থার মূল্যায়ন ক'রে শিশুকে শিক্ষাদান প্রয়োজন। কাজেই বাবা-মার দৈহিক আবরণহীনতা বড়জোর কালেভদ্রে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতি শিশুই কখনও-না-কখনও বাবা-মাকে এ অবস্থায় দেখে। এ ক্ষেত্রে চমকে উঠে হৈ-হৈ করা ক্ষতিকর। বাবা-মা এ ব্যাপারে সহজ হলে ছেলে মেয়েরাও সহজ হবে।

আবরণ যেন আভরণ না হয়ে ওঠে। তা যেন সময় বিশেষে প্রযোজ্য হয়ে শিশুর চিত্তবিক্ষেপ না ঘটায়।

—বিভা চৌধুরী

স্থান পরিচিতি

হাওড়া

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

হাওড়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। হাওড়া জেলা নামে আগে কোন স্বতন্ত্র জেলা ছিল না। কখনও বর্ধমান, কখনও হুগলী বা কখনও ২৪-পরগণা ও নদীয়া জেলার এলাকার মধ্যে ছিল। ১৮৪৩ খৃীস্টাব্দে হাওড়া একটি পৃথক জেলারূপে পরিগণিত হয়।

হাওড়া নামের উৎপত্তি নিয়ে কেউ কেউ বলেন, 'হাওড়' শব্দ থেকে হাওড়া দাঁড়িয়েছে। "হাওড়" কথাটির মানে হচ্ছে কর্দমাক্ত জলাভূমি। হাওড়া জেলায় জলাভূমি বা নিম্নভূমির সংখ্যা খুব বেশী। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেণে করে কিছুদূর গেলেই দেখা যায়, লাইনের দু'দিকেই জলাভূমি। বর্তমানে হাওড়া জেলার পথঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে, অনেক বড় বড় পাকা রাস্তা হয়েছে, ঘন বসতি গড়ে উঠেছে, তবু এখনও অনেক স্থানে নিম্নভূমি দেখা যায়।

হাওড়ার গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য এখনও নয়নানন্দকর। বিস্তৃর্ণ ধানক্ষেত, শাক-সব্জীর বাগান, গৃহ-পালিত পশুপক্ষী এই জেলায় এখনও বেশ দেখা যায়। পাতিহাঁস, রাজহাঁস, মুরগী অনেকের বাড়ীতে পালিত হতে দেখা যায়। এই জেলার বহু স্থানে নারকেল ও সুপারির গাছ অনেক দেখা যায়। যানবাহনের জন্য নদীতে, খালে নৌকো, ডিঙ্গি, শালতি প্রভৃতি চলে।

সীমা—উত্তরে বালি খাল। পুবে ও দক্ষিণ-পুবে হুগলী নদী, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রূপনারায়ণ নদ।

নদ-নদীর গতি অনুসারে এই জেলা তিন ভাগে বিভক্ত।

পূর্ব ভাগে—ভাগীরথী থেকে সরস্বতী নদী পর্যন্ত।

মধ্য ভাগ—এই ভাগের মধ্যে কৌশিকী নদী ও দামোদর প্রবাহিত।

পশ্চিম ভাগ—দামোদর থেকে রূপনারায়ণ পর্যন্ত।

আয়তন—৫৭০ বর্গ মাইল (১৯৬১), লোকসংখ্যা—২,০৩৮৪৭৭ (১৯৬১), মহকুমা—(১) হাওড়া (সদর) ও (২) উলুবেড়িয়া।

নদী—ভাগীরথী বা হুগলী, দামোদর ও রূপনারায়ণ।

খাল—বালি, রাজগঞ্জ, সাঁকরাইল, সিজাবেড়িয়া ও চাঁপা খাল—এগুলি হুগলী নদীতে পড়েছে। সরস্বতীর নিম্ন অংশ সাঁকরাইল খাল ও কৌশিকীর নিম্ন অংশ সিজাবেড়িয়ার খাল নামে পরিচিত।

হাওড়া শহর—এটি এই জেলার সদর মহকুমা। এর আয়তন ১৭৪ বর্গ মাইল।

এই শহরটি গঙ্গার পশ্চিম তীরে কলকাতা শহরের বিপরীত দিকে অবস্থিত ও কলকাতার সঙ্গে একটি সেতুর দ্বারা সংযুক্ত। এই সেতুটির নাম হাওড়া পুল। আগে গঙ্গার ওপরে এটি ভাসমান পুল ছিল। এটি তৈরী হয় ১৮৭৪ খৃীস্টাব্দে। কতকগুলো ভাসমান নৌকোর (পনটুন) ওপর আধ মাইল লম্বা এই পুলটি তৈরি হয়। এর ওপর দিয়ে গাড়ী, মোটর, শেষ দিকে বাস প্রভৃতি চলাচল করত। পায়ে চলারও পথ ছিল। এই পুলের বিশেষত্ব ছিল যে, মাঝের দু'খানি নৌকো ইচ্ছেমত সরিয়ে দিয়ে পুল খুলে দেওয়া হ'ত, তাতে বড় বড় স্টীমার, জাহাজ যাতায়াতের পথ হ'ত। তারপর পুরানো পুল বদলে নতুন পুল তৈরি হয়। এ পুলটি আগের পুলের কাছাকাছি। আর এটা একটা বিরাট পুল। এতে স্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য এই পোল খোলার দরকার হয় না। সব রকম যানবাহন, বাস, মোটর, লরি, ট্রাম প্রভৃতি এই পুলের ওপর দিয়ে যায়।

হাওড়া পুলের পাশেই বিরাট রেলওয়ে স্টেশন। এই হাওড়া স্টেশনটি ভারতের সর্বপ্রথম স্টেশন। ১৮৫৪ খৃীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী নামে এক ব্যবসায়ী সংঘ হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত ২৩ মাইল রেলপথ খোলে। ভারতে রেল-পথের সূত্রপাত ঐদিন থেকেই। তারপর ১৮৫৫ খৃীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই রেলপথ রাণীগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৬৩ খৃীস্টাব্দে কলকাতা থেকে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। ১৮৭৯ খৃীস্টাব্দে ভারত সরকার এই রেলপথ কিনে নেয় ও একটি নবগঠিত কোম্পানীর হাতে এর পরিচালনভার দেয়। এই কোম্পানীর সঙ্গে ১৯২৪ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত চুক্তি থাকে। চুক্তি শেষ হবে ১৯২৫ খৃীঃ ১লা জানুয়ারী সরকার নিজের হাতে এই ভার গ্রহণ করে।

হাওড়া শহরটি একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। বহু কল-কারখানা এই শহরে আছে। সাবানের কারখানা, অ্যালু-মিনিয়ামের কারখানা, রঙের কারখানা, গঙ্গার ধারে ধারে চটকল, চালের আড়ত প্রভৃতি আছে। এই শহরের জজ কোর্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, হাওড়া ময়দান, স্কুল-কলেজ, হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল, বি সি রায় পোলিও ক্লিনিক, পশু চিকিৎসালয়, সিনেমা প্রভৃতি আছে। এই শহরে হাওড়া হাট প্রসিদ্ধ। রাজপথ দিয়ে ট্রাম-বাস প্রভৃতি চলাচল করে। বাস বহুদূর পর্যন্ত নানা অংশে গিয়েছে। ট্রাম

দক্ষিণ দিকে হাওড়া থেকে শিবপুর ও উত্তর দিকে হাওড়া থেকে সালকিয়া বাঁধাঘাট। লোকের বসতিও ঘন ঘন, রাস্তা-ঘাটও জনবহুল। সম্প্রতি বাঁধাঘাটের ট্রাম তুলে দেবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বেতোড়---হাওড়া শহরের দক্ষিণাংশকে আগে বেতোড় বলত। চারশ বছর আগে কবি বিপ্রদাস তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, বাণিজ্য যাত্রাকালে চাঁদ সদাগর এই স্থানে নৌকো বেঁধে বেতাইচণ্ডীর পুজো করেছিলেন। বেতোড় তখন বড় বন্দর ছিল। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে সিজার ফ্রেডরিক নামে এক ইংরেজ পর্যটক বাংলায় আসেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায়, সে সময় পর্তুগীজরা প্রতিবছর বর্ষাকালে এখানে বাণিজ্য করতে আসত। তারা বেতোড়ে খড়ের চালের ঘর তৈরি করে সমস্ত বর্ষাকাল থাকত। বাণিজ্য শেষ করে চলে যাবার সময় খড়ের চালাগুলি পুড়িয়ে দিয়ে যেত। যতদিন বেতোড়ের কাছে সরস্বতী নদীতে বাণিজ্য তরী ভাসত, ততদিন এই স্থান জনমুখর ছিল। সরস্বতী তীরস্থ জনপদগুলি তখন সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু সরস্বতী মজে যেতে সুরু হলে, গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ভাগীরথী খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়। সরস্বতী মজে যাওয়ায় জল অল্প হলে জাহাজ চলাচলের অসুবিধে হতে লাগল। পর্তুগীজরা তাদের বড় জাহাজগুলি বেতোড়ে রেখে ছোট ছোট নৌকো দিয়ে সপ্তগ্রাম বন্দরে যাতায়াত করত। এই সময় হুগলীতে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে, আর বেতোড় পরিত্যক্ত হয়।

শিবপুর---হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে এক পল্লী। এখানে বেতাইতলায় বেতাইচণ্ডীর মন্দির আছে।

শালিমার---এখানে রংয়ের কারখানা আছে।

নিম্বার্ক আশ্রম---কলেজ রোড নামে রাজপথের ওপর এই বাঙালী সন্ন্যাসী মোহন্ত সন্তদাসজী এর প্রতিষ্ঠাতা, এটি বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান। এঁর পূর্বনাম---তারাকিশোর চৌধুরী। ইনি হাই কোর্টে আইনজীবী ছিলেন।

শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ---বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিছু আগেই এই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। এখানে ছাত্রাবাসও আছে।

বোটানিক্যাল---গার্ডেন তৎকালীন বাংলা সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারি কর্ণেল কিড ও তাঁর পরিবারবর্গ শিবপুর, হাওড়া, শালিমার পয়েন্টের কাছে নিজেদের বসতবাড়ীতে বাস করতেন। তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন ৩০০ একর জমি ছিল। তিনি এক বিরাট উদ্যান তৈরির পরিকল্পনা করে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ম্যাকফার্সনকে রাজি করান। ঐ ৩০০ একর জমি ক্রয় করা হয়। তার মধ্যে ৩০ একর জমি বিসপ কলেজের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় ও বাকি ২৭০ একর জমিতে উদ্যান তৈরি হয়। এই বাগানের নাম হয় বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই বাগানটি গঙ্গার ঠিক ওপরেই অবস্থিত। কর্ণেল রবার্ট কিড ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে নানা জাতীয় গাছ সংগ্রহ করেন। ক্রমে সব রকম গাছ ও লতার নমুনা এখানে সংরক্ষিত হয়। গঙ্গাতীর থেকে বাগানের মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার দু' পাশে পাম গাছের সারি। সুন্দর অর্কিড হাউস, ২০০ বছরের পুরানো বটগাছ, যার কাণ্ড থেকে প্রায় ৩০০টি জট বা শিকড় মাটির মধ্যে ঢুকেছে। এই বটগাছটি প্রায় ৯০০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এলাকা নিয়ে আছে। শোনা যায়, এই বাগান তৈরির আগে এখানে এই বটগাছের তলায় এক সন্ন্যাসী থাকতেন। আর্কিড ঘরের বিপরীত দিকে প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট কিডের আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপিত আছে---তাতে লেখা আছে: "ফাদার অফ দি গার্ডেনস।"

সালখিয়া---হাওড়ার একটি পুরাণো পল্লী। শহরের উত্তর দিকে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও এর উল্লেখ আছে---'চিৎপুর-সালিখা এড়াইয়া যায়'। এখানে 'ধঙ্গেশ্বর শিব' নামে এক মন্দির সম্প্রতি গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে হাওড়া ট্রাম লাইন শেষ হয়েছে বাঁধাঘাটে।

লিলুয়া---হাওড়া থেকে তিন মাইল দূরে। লিলুয়া রেলওয়ে কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম, গো-শালা প্রভৃতি আছে।

পুরাতন হাওড়া পুল

বেলুড়---বেলুড় স্টেশন হাওড়া থেকে ৪ মাইল। বেলুড়ের গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় মঠ। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এই মঠে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিমন্দির, স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমাধিমন্দির, শ্রীসারদা দেবীর মন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণের এক সুন্দর বড় পাথরের মন্দির তৈরি হয়েছে। এই মন্দিরের পরিকল্পনা স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে তখন ইহা সম্ভব হয় নি। তাঁরই অনুপ্রেরণায় দু'জন আমেরিকান মহিলার প্রভূত অর্থে এই সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হয়। বাঙলাদেশে এত বড় মন্দির আর নেই। এই মন্দিরে রামকৃষ্ণদেবের চিতাভস্মের ওপর রামকৃষ্ণদেবের সুন্দর পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে এখানে রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সেই উৎসবে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

বালি---হাওড়া থেকে ৬ মাইল। এটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু পল্লী। এর লোকসংখ্যা ২১,১৩২ (১৯৬১)। বালির পশ্চিম দিকে একটা খাল আছে। এই খালই হাওড়া জেলার শেষ সীমা। বালিতে কল্যাণেশ্বর নামে এক শিবমন্দির আছে। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু লোকসমাগম হয়।

আগে এখানে আচার্যেরা গণনা করে এক পঞ্জিকা বের করতেন। তখন সকলেই সেই পঞ্জিকাকে অনুসরণ করতেন। তখন ছাপাখানা হয় নি। এর পরে ছাপাখানার সৃষ্টি হলে অন্যান্য পঞ্জিকা বেরোয় এবং এঁদের প্রাধান্য কমে যায়।

এই বালি গ্রামেই আগে "বালির কাগজ" বলে একরকম কাগজ তৈরি হত। এখন আর বালির কাগজ বিশেষ দেখা যায় না।

বালির গঙ্গার ধারে এক রেলওয়ে ব্রিজ নতুন তৈরি হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের ঠিক পাশেই এই ব্রিজ। এই ব্রিজ তৈরির সূত্রপাত হয় ১৯২৭ সালে আর শেষ হয় ১৯৩১ সালে। সে সময়ের বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন এই ব্রিজের উদ্বোধন করেন। তাঁরই নামানুসারে বালি ব্রিজ 'ওয়েলিংডন ব্রিজ' নামে পরিচিত হয়। এটি একটি প্রকাণ্ড ব্রিজ। গঙ্গাগর্ভে ৭টি স্তম্ভের ওপর এটি তৈরি। এর ওপর দিয়ে রেলপথ ছাড়া গাড়ী, মোটর ও লোক চলাচলের স্বতন্ত্র পথ আছে। অনেকে সন্ধ্যায় এই স্থানে বেড়াতে আসে।

বালির দক্ষিণ দিকে ঘুষুড়িতে ভোটবাগান নামে তিব্বতীয়দের এক মন্দির আছে। এটিও একটি পুরাণো মন্দির। ১৭৭২ সালে ইংরেজদের সঙ্গে ভুটিয়াদের যুদ্ধ হয়, তিব্বতের তাশী লামার মধ্যস্থতায় সন্ধি হয়। তাশী লামার অনুরোধে ভাগীরথীর তীরে বৌদ্ধদের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস এই মন্দির তৈরি করেন। বাঙলা দেশের মন্দিরের মত এর ছাদ ও মন্দিরের গায়ে তিব্বতীয় মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। তাশী লামা এই মন্দিরের জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ ও পূজার উপকরণ পাঠিয়ে দেন ও পুরাণগিরি গোসাঁই নামে এক শৈব সন্ন্যাসীকে মোহন্ত নিযুক্ত করেন। মন্দিরে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আছে।

হাওড়া ময়দান---হাওড়া স্টেশনের গায়ে বাকল্যাণ্ড ব্রিজ ছাড়িয়ে একটু গেলেই এক বিরাট ময়দান। এই ময়দানের গায়েই বিরাট রাজপথ---গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই ময়দানের পশ্চিম অংশে পূর্বে মার্টিন কোম্পানীর ছোট গেজের রেল স্টেশন ছিল। এইখান থেকেই তখন আমতা-শিয়াখালা ও চাঁপাডাঙ্গায় যাওয়া হত। বর্তমানে এই স্টেশনটি এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চাঁদমারিতে প্রধান স্টেশন হয়েছে। এই হাওড়া ময়দানে বহু মেলা, সার্কাস প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

এখান থেকে কদমতলা, ব্যাটরা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। এই অংশও জনবহুল, কল-কারখানাসমন্বিত তো বটেই, বস্তিও আছে।

স্বামীজীর সমাধি

দাসনগর---এখানে আলামোহন দাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানা রকমের শিল্পের কারখানা।

মাকড়দহ---হাওড়া তেলকল ঘাট থেকে ৮ মাইল। এই স্থান সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। সরস্বতী এখন মজে গেছে। এখানকার মাকড়চণ্ডী-দেবী বিখ্যাত। শোনা যায়, এই দেবীকে শ্রীমন্ত সদাগর প্রতিষ্ঠা করেন।

ডোমজুর---হাওড়া থেকে ১০ মাইল। এটিও সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই জায়গা পাটের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এখানে পানের বরজও আছে। আতসবাজি, সোলার টুপি, তালাচাবি এখানে তৈরি হয়।

এরই কাছে জগৎবল্লভপুর, পাঁচলা প্রভৃতি গ্রাম আছে।

বড়গাছিয়া---হাওড়া ঘাট থেকে ১৬ মাইল। মার্টিন রেলের এটি একটি জংশন। এটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। সেকালের বিখ্যাত যাদুকর আত্মারাম সরকারের বাড়ী এর কাছেই, কমলপুর গ্রামে।

মুন্সিরহাট---হাওড়া ঘাট থেকে ১৯ মাইল। এটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার হাট প্রসিদ্ধ। এখান থেকে ৫ মাইল দূরে প্রাচীন ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজধানী ও কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান পেঁড়োরগড় বা পেঁড়ো-বসন্তপুর। পেঁড়োয় শক্তি পাণ্ডুয়ার

অপভ্রংশ। পেঁড়োয় ধ্বংসাবশেষ কানা নদীর ধারে দেখা যায়।

আমতা—হাওড়া ঘাট থেকে ২৮ মাইল। দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। বন্যা থেকে শহরকে রক্ষা করবার জন্য দামোদরে উঁচু বাঁধ দেওয়া আছে। আগে যখন রেলপথ হয় নি, তখন আমতা বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। দামোদর নদ দিয়ে নৌকো করে রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা ও মেদিনীপুর থেকে লবণ আমদানি হত। তখন আমতায় লবণ ও কয়লার প্রচুর গোলা থাকত। আমতা থেকে এই সব মাল নৌকোয় বোঝাই হয়ে দামোদর দিয়ে গঙ্গায় আসত ও নানাদিকে যেত। আগে এখানে কাঁসার ও পিতলের দ্রব্যাদি তৈরি হত।

মেলাইচণ্ডীর মন্দির এখানে প্রসিদ্ধ। কেহ বলেন, এটি পীঠস্থান। এটি হাওড়া জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। এর গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৬৪৯ খ্রীঃ (১০৫৬ বঙ্গ) এটি তৈরি হয়। মেলাইচণ্ডীর বিগ্রহ পাথরে তৈরি। মূর্তি সাড়ে তিন ফুট উঁচু। এই মন্দিরের কাছে এক শিবমন্দির আছে। হাটখোলার মদনমোহন দত্ত এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি আই ই-র জন্মস্থান নারিট গ্রামে আমতার কাছেই। এঁরই চেষ্টায় হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে খোলা হয়। এখানে 'ন্যায়রত্ন ইন্সটিটিউশন' উচ্চ বিদ্যালয়, আমতা কলেজ, মুন্সেফী আদালত প্রভৃতি আছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিবেকানন্দ

অমিতাভ

'যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকতো, তবে বুঝতো এই বিবেকানন্দ কি করে গেলো'—স্বামীজীর নিজের মুখের কথা। কথাটা আরো বেশি করে উপলব্ধি করা যায়, যখন তাঁর বাণী ও রচনার মধ্যে কেউ অবগাহনের চেষ্টা করে। মানুষের সর্বাত্মক মুক্তি চেয়েছিলেন স্বামীজী, আর তাই তাঁর মূলমন্ত্র ছিলো—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। অথচ এরই সাথে সাথে মানুষের বর্তমান সমস্যাগুলি নিয়ে এমন নিখুঁত বিশ্লেষণী সমাধান দিয়েছেন, যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তাই মূলত ধর্মপ্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও জীবনের কোন অঙ্গকেই তিনি বাদ দেন নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাবাদর্শের সঙ্কট ও নেতৃত্বের দেউলেপনায় বিভ্রান্ত মানুষ কি করে আবার আত্মদীপটি জ্বালিয়ে নিতে পারে, তারই সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছি 'বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনীতি' প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী : চৈত্র '৭৬ ও বৈশাখ '৭৭)। বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, যখন দেখি শুধু রাষ্ট্রনীতিই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এক সুস্পষ্ট রূপরেখা তিনি এঁকে দিয়ে গিয়েছেন। অপূর্ব ধী ও প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত এক অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের চোখে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বলতে চেষ্টা করেছেন—ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেমন হওয়া দরকার। স্বামীজীর যখন জন্ম, তখন কার্ল মার্কসের বয়স চুয়াল্লিশ, 'দ্য ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হয়নি, আর স্বামীজীর দেহত্যাগের পঁচিশ বছরের মধ্যে কেইনসের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। অর্থনীতির দুই জগতের দুই দিকপাল মার্কস ও কেইন্‌সের মধ্যে স্বামীজীর তাৎপর্যপূর্ণ জীবন। তাঁর লেখায় তাই দেখা যায় উভয়ের বিশ্লেষণমূলক সমন্বয়। আরো মনে রাখতে হবে, স্বামীজী যখন এসব কথা বলছেন, তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বয়স মাত্র ১০।১২ বছর। তাই

স্বামী বিবেকানন্দ

সে যুগে স্বামীজীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এক সুদূরপ্রসারী স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে আনে, যার প্রয়োজনীয়তা আজও সমানভাবেই রয়েছে।

॥ দুই ॥

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

স্বামীজীর মূল লক্ষ্য ছিলো প্রতিটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ। একথা আগেই দেখেছি। তাই নিছক আর্থিক স্বচ্ছলতাকে তিনি মুক্তির পথ বলে কখনো মনে করেন নি। অর্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শেষত আধ্যাত্মিক জাগরণের উদ্দেশ্যেই তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তাকে মোটামুটি দশ ভাগে ভাগ করা যায়। এখানে আমরা সরাসরি স্বামীজীর কথা তুলে তাঁর পরিকল্পনার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি বুঝতে চেষ্টা করবো।

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের মানোন্নয়ন

'জুনাগড়ে যেমন, এখানেও (ভুজ রাজ্যে) তেমনি দেওয়ানজীর গৃহে স্বামীজীকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনাসভা বসিত; ধর্মপ্রসঙ্গের সহিত শিল্প, কৃষি, অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতির কথাও আসিয়া পড়িত এবং স্বামীজী সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, এইসব দিকেও ভারতের উন্নতির প্রয়োজন আছে এবং উহার উপায়ও ভারতের ক্ষমতাতীত নহে।'' (যুগনায়ক বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড, ৩৩৯ পৃঃ—স্বামী গম্ভীরানন্দ)

'তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরাণীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরাণীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরী—এই তো! এতে তোদেরই বা কি হলো, আর দেশেরই বা কি হলো? একবার চোখ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?'

—(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ।)

খাদ্য ও ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্—চাকরি গুখুরী করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার করে।'

—বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ।

'আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রটা বালসুলভ পরনির্ভরতায় পূর্ণ। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তারা খেতে খুব প্রস্তুত, আবার কারও কারও সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পারলে আরো ভাল হয়।—তোমাদের জাতটা দেখাক যে, তারা কিছু করতে প্রস্তুত।'

—পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৬৪-৫ পৃঃ।

"জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে, তারা সম্পূর্ণ জাগরিত হয়েছে।—এদের দেশলাইয়ের কারখানা এক দেখবার জিনিষ। এদের যে-কোন জিনিষের অভাব, তাই নিজের দেশে

করবার চেষ্টা করছে।---আর তোমরা কি করছো? সারা জীবন কেবল বাজে বকছো।'

ঐ ৯৯-১০০ পৃঃ।

ভারী ও হাল্কা শিল্পে উন্নতি

'একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই---আহম্মক---জীবন সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখ্‌গে।'

---বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১০৬-৭ পৃঃ।

'স্বর্ণপ্রসূ, অর্থাৎ খনিজদ্রব্যে সমৃদ্ধিশালী (লেখকের) ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে।---পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্---নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কার করে।'

---বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ।

'ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই কাঁচা মাল দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ-বিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈরী করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস।'

---বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১০৫ পৃঃ।

আয় ও সম্পদ-বন্টনে সমতা

'আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে। যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,---হায়। তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে।---আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল? হায়। এরা দুনিয়াদারির কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটে ও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে---সকলে মিলে এদের চোখ খুলে।---সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে, দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না---এ নিশ্চয় জানবি।'

---ঐ, ২৩৫-৬ পৃঃ।

কর্মসংস্থানের বহুল সুযোগ

'প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহার ও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।'

---পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ২৮৩ পৃঃ।

'বাপ্! কি পাসের ধূম, আর দু'দিন বাদেই সব ঠাণ্ডা। শিখলেন কি?---না, নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন উচ্চশিক্ষা থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু টেক্‌নিক্যাল্ এডুকেশন পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে। চাকরি চাকরি করে আর চেঁচাবে না।'

---বাণী ও রচনা ৯ম খণ্ড, ৪০২ পৃঃ।

'আমাদের চাই কি জানিস?---স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর সায়েন্স পড়ানো; চাই টেক্‌নিক্যাল্ এডুকেশন, চাই যাতে ইণ্ডাস্ট্রী বাড়ে; লোকে চাকরী না করে দু'পয়সা করে খেতে পারে।'

---ঐ, ৪০৩ পৃঃ।

গ্রামাঞ্চলের উন্নতি

'পল্লীগ্রামের ছেলেরা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে শহরে পালিয়ে আসে, গ্রামে হয়তো অনেক জায়গা-জমি আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না---মনের তৃপ্তি হয় না; শহরে হতে হবে, চাকরি করতে হবে। অন্যান্য জাতের মতো আমাদের হিন্দু জাতটা তাই বেড়ে উঠতে পারছে না।---উৎপাদন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। শহরে বাস করার ঝোঁক বেশি, আর একটু পড়াশুনো করলেই চাষার ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামি করতে দৌড়োয়। পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ তো প্রায় হয় না; ছোটখাটো খরলাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে ওঠে, লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশি হয়---চাষাদের চোখ খুলে যায়; তাদেরও একটু-আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখাপড়া করতে ইচ্ছা হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি আবশ্যক তাও হয়।---এই ছোট জাত আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই-ভাই ভাবে মেশামেশি হয়। যদি তোমাদের মত লোকেরা কিছু লেখাপড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষবাস করে, আর চাষাদের সঙ্গে আপনার মতো ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে; তাহলে দেখবে---তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক---জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, ছোট জাতের মধ্যে ধর্মের উচ্চ উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা, উপকার করতে শেখানো---তাও অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত হবে।'

---যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৩১৫-৬ পৃঃ।

'সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে; সত্যিকার জাতি, যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।---তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব বোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।'

---পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ।

'দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ আপনি শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে পৌঁছিতে হইবে।'

---ঐ, ১৭৫ পৃঃ।

দেশের সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার

'একবার চোখ খুলে দেখ স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে। তোদের ঐ শিক্ষা

সে অভাব পূর্ণ হবে কি ?---কখনো নয়। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্---চাকরী গুখুরী করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার করে।'

---বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ।

'ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই কাঁচামাল দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা, ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল কিনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ-বিদেশের লোক তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈরী করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস।'

---ঐ, ১০৫ পৃঃ।

বিদেশী দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা

"চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া।---ক্রমশ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্মশালার মাল বিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে।'

---পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৬-৭ পৃঃ।

'ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে আগ্রহান্বিত করতে হবে এবং ভারতীয় শিল্প-দ্রব্যাদি যাহাতে বহির্ভারতে বিক্রয় হয় তার জন্য বাজার সৃষ্টি করতে হবে।' ---ঐ, ২৮৮ পৃঃ।

অর্থনৈতিক ও শিল্পবিজ্ঞানাদি-বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার দ্রুত প্রসরণ

'তোমাদিগকে নূতন নূতন মৌলিক-ভাব ভাববার চেষ্টা করতে হবে।'

---ঐ, ২৫৯ পৃঃ।

'নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না।'

---বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ।

'আমাদের চাই কি জানিস ?---স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর সায়েন্স পড়ানো; চাই টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইণ্ডাস্ট্রী বাড়ে; লোকে চাকরী না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।'

---ঐ, ৪০৩ পৃ।

'কতকগুলি গ্র্যাজুয়েট পাই তো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা সেখানে টেক্‌নিকাল্ এডুকেশন পেয়ে আসে।'

---ঐ, ৪০৬ পৃঃ।

'ভদ্রলোকটি বোম্বে থেকে একখানি চিঠি নিয়ে এখানে আমার কাছে এসেছেন। তিনি একজন প্র্যাক্‌টিক্যাল্ মেকানিক এবং তাঁর একমাত্র ইচ্ছা এই যে, তিনি এ দেশের ছুরি, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহনির্মিত দ্রব্যসকলের কারখানা দেখে বেড়ান।---আমার স্বদেশবাসীদের ভেতরে এরূপ বেপরোয়া সাহসের ভাব দেখলে উহাতে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি।'

---পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃঃ।

'আমাদের জাতের পক্ষে এখন আবশ্যক কর্মতৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক (তত্ত্বাবিষ্কারোপযোগী) প্রতিভা।'

---ঐ, ৯৬ পৃঃ।

'স্বামীজীর খেতড়ীতে (রাজস্থানে---লেখক) প্রায় তিন মাস অবস্থানের সুযোগে রাজা তাঁহার নিকট পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা এবং নক্ষত্র বিদ্যা (এ্যাস্ট্রনমি---লেখক) অধ্যয়ন করেন। রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ গৃহে স্বামীজী একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়াছিলেন---উহাতে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য সংগৃহীত ছিলো। একটি দূরবীক্ষণও ঐ উচ্চ গৃহের ছাদে স্থাপিত হইয়াছিল এবং গ্রহ-নক্ষত্রাবলোকনে গুরু-শিষ্য এমনই মাতিয়া যাইতেন যে, সময়ের জ্ঞান থাকিত না।'

যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ।

দেশের অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরশীল ('সেল্‌ফ রিলায়েন্ট') ও স্বয়ংচল ('সেল্‌ফ জেনারেটিং') করা

'আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রটা বালসুলভ পরনির্ভরতায় পূর্ণ। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তারা খেতে খুব প্রস্তুত, আবার কারো কারো সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পারলে আরো ভাল হয়। যদি তোমরা নিজেকে নিজে সাহায্য করতে না পার, তবে তো তোমরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও।'

---পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৩৬৪ পৃঃ।

'লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান না যায়, তবে জগতের যত ঐশ্বর্য আছে সব ঢাললেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না।'

---পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ২৫৭ পৃঃ।

'জনগণের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নর-নারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে।'

---পত্রাবলী, ১ম খণ্ড ১৮২ পৃঃ।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের মানুষকে সুস্থ জীবন অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে---এই হলো স্বামীজীর উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিয়ে অবসর যাপনের সুযোগও দেওয়া দরকার। আর তাতেই উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ দিলে মানুষ তার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলতে পারবে।

॥ তিন ॥

পরিকল্পনার ভিত্তি

উপরে উক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, স্বামীজীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দেশের মানসিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূ[illegible] ব্যবহার। এদেশে পরিকল্পনায় কেবল উৎপাদনের দিকে নজর দিলেই যথা[illegible] হবে না, এর সাথে সাথে কর্মহীনদে[illegible] কর্মের ব্যবস্থাও করতে হবে।

(ক) ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। তা[illegible]

স্বামীজী কৃষির উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এতে দেশের মানবিক সম্পদের এক বিরাট অংশকে কাজে লাগানো যাবে। ভারতের প্রধান খাদ্য চাল ও গম এবং সাধারণ লোকের বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের জন্য তুলার চাষের আধিক্যও দরকার। অতএব অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিতে হবে।

(খ) ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারে প্রয়োজন শিল্পের। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পায়নের সাহায্যে এ দেশকে উঠতে হবে। শিল্পায়নের মধ্যে ভারী ও কুটীর শিল্প এবং খনিজ পদার্থের উত্তোলন শোধন---এই তিনটিকেই স্বামীজী প্রধান বলে মনে করেছিলেন। এর ফলে ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সাথে সাথে পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির মধ্যে স্থান করে নিতে পারবে।

(গ) কৃষি ও শিল্পের সাথে সাথে বাণিজ্যের উপর জোর দিয়েছিলেন স্বামীজী। বাণিজ্যের মধ্যে আবার আমদানীর চেয়ে রপ্তানীর দিকেই নজর দেওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেশেই উৎপন্ন করে নিজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বহির্ভারতে সর্বত্র রপ্তানী করতে হবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি। এতেও মানবিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হবে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হবে।

(ঘ) কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এই তিনটিকে ভিত্তি করেই স্বামীজী দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এরই সাথে সাথে তিনি আরেকটি জিনিষের উপর খুব জোর দিয়েছেন; তা হচ্ছে---গবেষণা। দেশের অর্থনৈতিক গবেষণাই শুধু নয়, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক সন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালাবার জন্য দেশের সর্বত্র গবেষণা সংস্থা থাকার প্রয়োজন।

॥ চার ॥

॥ কৃষি

কৃষিকে কেন গুরুত্ব দিতে হবে, এ বিষয়ে স্বামীজীর মত সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে তাঁর আরো কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল।

২। কৃষির সাহায্যে দেশের মানবিক সম্পদের প্রচুর ব্যবহার করা যায়।

৩। অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা এদেশে গুরুতর বলে ধান-গম ও তুলা চাই।

৪। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পাট, চা, আখ, তৈলবীজ গুরুত্বপূর্ণ।

৫। শিক্ষার প্রসারতার সাথে সাথে কাগজ-শিল্প চাই, যার জন্য বাঁশের প্রয়োজন।

৬। শিল্পায়নের জন্যও কৃষির ব্যবহার দরকার, কারণ কৃষি ও শিল্প অনেক সময়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

৭। গ্রামাঞ্চলগুলিকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে কৃষি।

৮। বিদেশে রপ্তানীর জন্যেও কৃষিজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায়। প্রাচীন যুগে ভারত থেকে কি কি কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হত, তার সম্বন্ধে স্বামীজী বলছেন---'অনাদিকাল হতে উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতি-কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল---ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিলো; তা সমস্তই ভারত হয়ে যেত। আবার লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল, জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান---ভারতবর্ষ।'

---বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০৫ পৃঃ।

কৃষির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তার উন্নতির জন্য তিনটি প্রধান দিককে তুলে ধরেছেন স্বামীজী:

১। কৃষকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ কাজ পাবার জন্য তাদের জমি, সার, উন্নততর বীজ, সেচের সুবিধা প্রভৃতি প্রদান করতে হবে, কারণ স্বামীজী বুঝেছিলেন---'নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না।'

---বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ।

২। সম্পূর্ণ আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা শেখাতে হবে। বলছেন তিনি---'নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষ নয়, বিদ্বান বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। পল্লীগ্রামের ছেলেরা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে শহরে পালিয়ে আসে; গ্রামে হয়তো অনেক জায়গা-জমি আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না---মনের তৃপ্তি হয় না; শহরে হতে হবে, চাকরি করতে হবে। উৎপাদন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। শহরে বাস করার ঝোঁক বেশি, আর একটু পড়াশুনো করলেই চাষার ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামি করতে দৌড়ায়। পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগতো প্রায় হয় না; ছোটখাটো খারাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে ওঠে, লেখাপড়া জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞানের সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশি হয়---চাষাদের চোখ খুলে যায়।'

যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৩১৫-৬ পৃঃ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও জাপান

সূর্যোদয়ের দেশ, চেরিফুলের দেশ হিসাবে পৃথিবীর যে দেশটি এক বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে আছে তার নাম জাপান। ভগবান বুদ্ধের প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর মন্ত্রে সুদূর অতীতে বিশ্বের যে ক'টি দেশ করজোড়ে নত মস্তকে দীক্ষা গ্রহণ করে বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথ ও মত জীবনের পরম সার্থকতায় উপনীত হওয়ার একমাত্র পাথেয় হিসাবে অবলম্বন করল, জাপান তাদেরই অন্যতম। শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাপান একটি শীর্ষ-স্থানীয় দেশ। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও তার প্রসিদ্ধি জগৎজোড়া। এই জাপানী ভাস্কর্যও ভগবান বুদ্ধের কাছে অফুরন্ত ঋণী। বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করেই জাপানী ভাস্কর্যে যাত্রারম্ভ। আজ যে জাপানী ভাস্কর্যের খ্যাতি সুপরিব্যাপ্ত, বুদ্ধমূর্তি থেকেই তার সূচনা।

অবশ্য, ভারতীয় সভ্যতা থেকে জাপ সভ্যতা বয়সে অনেক তরুণ। জাপ সভ্যতার বয়েস এখনও দেড় হাজার বছর পূর্ণ হয়নি---বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। ৫৫২ খৃষ্টাব্দে জাপানে সম্রাট কিমেইর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষ থেকে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তারের মধ্যেই জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়যাত্রা সুরু হল। জাপানে বুদ্ধদেবের প্রথম মূর্তি আসে কোরিয়া থেকে। কোরিয়ার এক রাজা জাপ সম্রাটকে একটি বৌদ্ধমূর্তি উপহার দেন। মূর্তিটি, ব্রোঞ্জ নির্মিত। বর্ণের মাধ্যমে এই মূর্তিটির মধ্যে বুদ্ধের ভগবৎমহিমা আভাসিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সম্রাট ছিলেন শিল্পবোদ্ধা। একদিকে এর মহৎ শিল্পকর্মে মুগ্ধ হলেন, অন্য দিকে বিদেশী মূর্তিকে দেশে প্রাধান্য দেওয়ার দ্বিধা, সংশয় তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করল। পরবর্তী প্রাচীন বৌদ্ধ-মূর্তির ভাস্কর হলেন কুরাত-সুকুরি-নো-তোরি। তোরি এই মূর্তিটি নির্মাণ করেন ৬২৩ সালে। জাপানের বৌদ্ধ ভাস্কর্যের এক প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে তোরির মূর্তিটিকে গণ্য করা যায়।

হোরিয়ু-জী মন্দিরে যে প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তিটি সংরক্ষিত, সেটিও

কিয়োটোর কুরামাদেরা মন্দিরের একটি অপূর্ব বুদ্ধমূর্তি

ব্রোঞ্জের। এতে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধ বসে আছেন পদ্মাসনে। পরিধানে পূজকের পরিচ্ছদ। শুধু মুখটি অনাবৃত, আর কাঁধ থেকে সর্বশরীর পোষাকে ঢাকা। পোষাকটি দেহকে কেন্দ্র [illegible] পাশে আরও অনেকখানি জায়গা জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেদিন ভাস্করেরা যে সকল মূর্তি তৈরী করতেন, সেগুলি আয়তনে যাতে ছোট হয় সেদিকেও যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখা হোত। স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্যই আয়তনের উচ্চতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হোত। প্রাচীন অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

জাপানী ভাস্করেরা তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশ শুধু ব্রোঞ্জের মাধ্যমেই করেন নি। কাঠের সাহায্যও এখানে নিয়েছেন। মাটির সহায়তাও তাঁদের নিতে হয়েছে। অমোঘপাশ, বজ্রপাণি, চন্দ্রপ্রভা, সূর্যপ্রভাস প্রভৃতি মূর্তিগুলি এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুপ্রাচীনকালে জাপানী বুদ্ধমূর্তিগুলির ভাস্করেরা যুক্তকরের কল্পনার পরিচয় দেন নি।

ভাস্কর্যনায়ক জোকোর আমলে দেশের বৌদ্ধভাস্কর্যের গতি এক নতুন ধারায় মোড় নেয়। সমগ্র শিল্পে এক মাধুর্যময় নতুনত্বের আস্বাদ এনে দিলেন জোকো। জোকোর আমলে দেখা গেল, কাষ্ঠমূর্তির অংশবিশেষ পৃথক পৃথকভাবে খোদিত হয়ে পরে সবগুলি একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোত। ফিনিক্স হলের এবং হোকাইজী মঠের আমিডা মূর্তি দুটিই এই পদ্ধতিতে সৃষ্ট করা হয়েছিল।

জাপানের ইতিহাস মন্থন করলে দেখা যায় যে, আসুকো হাকুদো, হেইয়ান, কামাকুরা প্রভৃতি জাপানের বিভিন্ন যুগে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের নব নব রূপ পরিগ্রহ হয়েছে। প্রতি পরিবর্তনের মধ্যেই নতুন যুগের কালোপযোগী চিন্তাধারা ছায়াপাত করেছে।

—কৃপাচার্য

পাশ্চাত্য কাষ্ঠখোদাই শিল্পের পথিকৃৎ

ভিক্টোরীয় যুগের ঔজ্জ্বল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ধনে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য, তাঁদেরই অন্যতম রাস্কিনের ধারণায় অঙ্কনজগতে যিনি টার্ণারের সঙ্গে তুলনীয়, সেই টমাস বিউইক পাশ্চাত্য কাষ্ঠখোদাই শিল্পের ইতিহাসে পথিকৃৎ রূপকার, উদ্ভাবক হিসাবে সসম্মানে চিত্রিত। এই শিল্পের নব-কলেবরে পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা অনায়াসে চলে ভগীরথের সঙ্গে। আজকের জগৎ যাঁকে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দিকপাল পথপ্রদর্শকের সম্মান দিয়েছে, সেই মানুষটি নিজে কিন্তু কোনদিন ভাবতে পারেন নি যে, তাঁর এই মহান সাধনা সময়ের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মানুষের সমাদর ও স্বীকৃতিতে অমর হয়ে থাকবে।

বিউইক আজকের মানুষ। কয়েক বছর আগে তাঁর দ্বি-শতবার্ষিকী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ১৭৫৩ সালের ১২ই আগষ্ট তাঁর জন্ম। নর্দাম্বিয়ার ছেলে টমাস। বাবা ছিলেন একজন কৃষিজীবী ... এলিংহামের কাছে

বিউইকের প্রতিভার এক অসামান্য নিদর্শন

চেরিবার্ন হাউসের একটি কয়লাখনির স্বত্বাধিকারীও ছিলেন। আট ভাই-বোনের মধ্যে টমাস ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতিপুঞ্জ এবং পশুপক্ষী তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। পড়ার বইয়ের দিকে টান ছিল কম, গাছপালা, ফলফুল, আকাশ-নদী প্রভৃতির দিকে অনুরাগ ছিল তত বেশী। এদেরই মাধ্যমে নিজের মাতৃভূমির এক মহিমময় আলেখ্য বালকচিত্তে গাঁথা হয়ে যায়। প্রকৃতিপ্রেমের পরিণতি দেশপ্রেম। তাই দেশের যা কিছু শোভা-সম্পদ, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, শিল্পের মাধ্যমে তাদের প্রকাশ সেই বাল্যবয়সেই জীবনের মূর্ত হয়ে গেল বিউইকের। ড্রেইং শব্দটিই যখন তার জানার বাইরে ছিল তখন থেকেই চিত্রচর্চা সুরু হয়েছে বিউইকের।

চৌদ্দ বছর বয়সে শিক্ষানবীশ হলেন নিউকাশলের খোদাইকার র‍্যালফ্ বেলামির। বাবার ধারা অনুসরণ না করে ... পথ বেছে

বিউইক

নিলেন। অঙ্কন সম্বন্ধে সামান্য পাঠ এখানে গ্রহণ করলেন, কিন্তু বিস্তারিত পাঠ নিলেন খোদাই সম্বন্ধে। স্টোরি টেলার গেজফেবলস এবং সিলেক্ট ফেবলসের কাঠের ব্লক-এর পরিকল্পনার জন্যে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করলেন, যা বেলবিকে মুগ্ধ করে তোলে। বেলবি সেই রীতিগুলি পাঠালেন সোসাইটি ফর দা এথকার জমেন্ট অফ আর্টসে। সোসাইটি একটি সোনার মেডেল অথবা নগদ সাত গিনি পুরস্কারস্বরূপ বেছে নিতে বললেন বিউইককে। নগদ পুরস্কারই নিলেন টমাস এবং সেই গিনিগুলির প্রত্যেকটি তিনি তুলে দিলেন তাঁর মায়ের হাতে।

১৭৭৬ সালে তরুণ টমাস বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। নানাস্থান ভ্রমণ করে এলেন লণ্ডনে। লণ্ডন এতটুকু দাগ কাটল না তাঁর মনে। স্থায়িভাবে বাসা বাঁধলেন নিউকাশলে। শিক্ষাগুরুর আমন্ত্রণে তাঁর অংশীদার হলেন। ১৭৮৬ সাল তাঁর পারিবারিক জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনাবহুল কাল। শোকে-আনন্দে এই অব্দটি তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। বাবা, মা, বড় বোনকে এই বছর হারালেন টমাস, আবার এই বছরই ঘরণী করে আনলেন ইসাবেলা এলিয়টকে।

এনগ্রেভিং ও এচিং-এ এর পর নব নব আঙ্গিকে প্রকাশরীতির এবং শিল্পচর্চার এক বিরাট নজীর সৃষ্টি করতে থাকলেন বিউইক। ব্যাঙ্কের নোট, কয়লাখনির সার্টিফিকেট, নিমন্ত্রণপত্র, সংবাদপত্রের শিরোনাম প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান প্রকাশিত হতে থাকল। তাঁর পূর্বে একাজে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা অন্য শিল্পীকে দিয়ে নক্সা করিয়ে নিতেন, কিন্তু এই নক্সা বা অলংকরণের কাজও টমাস নিজেই সম্পন্ন করতেন।

বিউইকের কীর্তির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন

১৭৯০ সালে প্রকাশিত 'এ জেনারেল হিস্ট্রি অফ কোয়াড্রুপেটস' এবং ১৭৯৭ ও ১৮০৪ সালে প্রকাশিত 'দা হিস্ট্রি অফ বৃটিশ বার্ডস' তাঁর সৃজনীশক্তির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বহন করছে।

১৮২৮ সালে এই ক্ষণজন্মা দিকপালের ৭৫ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়।

—বাসুদেব

হতাশা থেকে অনেক ক্ষতিকর মানসিক প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়, এর উৎস নানান ধরণের নিরাপত্তাবোধের অভাব। দৈহিক বা আর্থিক নিরাপত্তা-হীনতা সহজবোধ্য। জীবনহানি, দৈহিক তৃপ্তি ব্যাহত হওয়ার আশংকা, দীর্ঘকাল আচরিত অভ্যাস উল্টে যাওয়ার আশংকা ইত্যাদি থেকে ভয় জন্মায় এবং ভয় দুশ্চিন্তা বা হতাশার জনক। যাই হোক্, সংক্ষোভজ নিরা-পত্তাহীনতাও সমান তীব্র ভয় এবং তজ্জাত হতাশার কারণ। সুতরাং আর্থিক বিপর্যয়জাত অহংকার খর্ব হওয়া, শক্তিতে আঘাত লাগা, কৃতিত্বে খাটো হওয়া বা পারিবারিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং সেজন্য নিরাপত্তাবোধের হানি যে-কোনও ধরণের মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করতে পারে।

নিজেরা পরিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক স্তরে প্রবেশ করতে অক্ষম। যা কিছু করে সবই কাঁচা পয়সার বিনিময়ে। ঐভাবে মোটামুটি সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে দিন কাটায়। তারপর কোনও কারণে আর্থিক বিপর্যয় ঘটলে তখন তারা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে—মনে মনে। এখন তাদের অনেকেই সংক্ষোভজ এবং আর্থিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত।

হতাশার আর একটি কারণ সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আধ-খেঁচড়া দর্শন প্রাণপণে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা। তাতে না কি শান্তি মেলে, পালিয়ে বাঁচার উপায় হাতে আসে। ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা কষ্টকর হওয়ায় ব্যর্থ হয়ে তারা উপর্যুক্ত গোঁজামিলের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এজন্যই আজকাল কুসংস্কারে বিশ্বাস

হতাশাজনিত মানসিক রোগ

অস্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভংগী খুবই চোখে পড়ে এবং তা বিশেষ ধরণের মানসিক রোগ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এটি সমাজকর্মীরা প্রত্যহ মানিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এর মধ্যে আছে নানা মাত্রার স্থায়ী খিট্‌খিটে মেজাজ, কল্পিত দৃশ্যে উত্তেজনা, পৃথককরণ, বা সমালোচনা, তিক্ততা, বদমেজাজ, ইত্যাদি। সাধারণ মনখারাপ থেকে তীব্র ও স্থায়ী হতাশা প্রায়ই হয়; আবার বিরক্তি, ঔদাসীন্য, ছাড়াছাড়া ভাব, বা আশাহীনতাও কোনও কোনও লোকের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া।

হতাশা-জনিত একটি প্রধান সমস্যা বেধেছে যুদ্ধোত্তর 'হঠাৎ নবাব'দের নিয়ে। এদের মানসিক স্তর শিশুসুলভ। বাড়ছে, তথাকথিত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাদের স্থান হচ্ছে সমাজের শীর্ষে। খুব খাতির তাদের।

সমাজকর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য নিম্নোক্ত উপদেশগুলো পালন করা যেতে পারে:

যখন মনে হবে কোনও নৈতিক সমস্যা গজিয়েছে, তীব্র 'রিলিফ' প্রব্লেম্‌ও বটে, তখন চাকরিহীন যুবক-যুবতীকে মন খুলে বকতে দেওয়া দরকার। ফলে মানসিক দুর্বিষহ চাপ মুক্তি পেয়ে মনকে স্বস্তি দেয়। সমাজ-কর্মীর পক্ষে সহনশীল শ্রোতা হওয়া আবশ্যিক। এজন্য অনুশীলন প্রয়োজন।

খোলাখুলি সদলে আলোচনা এবং বক্তৃতার প্রতি সামাজিক সহনশীলতা থাকা দরকার। অবদমিত মনোভাব সামগ্রিকভাবে সামাজিক নীতির পরিপন্থী।

অপসৃয়মাণ মনোবল এবং আত্ম-সম্মানবোধ আর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় কাজের জন্যই কাজ করাও ভাল। চাকরি পাচ্ছে না এমন কারও পক্ষে স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য কাজ করাটা ধোঁকাবাজি নয়। এর ফলে তার নিজস্ব গুরুত্ববোধ, আত্মসম্মানবোধ এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বজায় থাকে; তাছাড়া, এতে তার ব্যক্তিত্ব সুস্থভাবে গড়ে ওঠে—এবং নিটোল ব্যক্তিত্বের অভাবে মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায় না। এজন্যই কাজের জন্য কাজ—চাকরি না পেলে—এত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও কাজ হলেই চলে, তবে সে কাজ মোটামুটি আয়ত্তাধীন নির্দিষ্ট মাত্রার হওয়া চাই। কাঠ চেরাই, বাগান করা বা অন্য কোনও কাজ নিয়মিত অভ্যাস, আর সৎচিন্তায় মানুষকে প্রেরণা যোগায়। অলসভাবে চুপচাপ থাকা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।

সহজ আনন্দ উপভোগে অভ্যস্ত হওয়াও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম উপায়।

মনের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে ডাক্তারের কাছে ছুটতেই হবে, তার কোনও মানে নেই, যদিও ডাক্তারখানা বহু ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। মনোবল এবং মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য এমন অনেক উৎস আবিষ্কৃত হচ্ছে যা আগে মানুষ ভাবতেই পারত না।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা গোটা সমাজের সামগ্রিক দায়িত্ব। এটা এমন একটা ব্যাপার যা আলাদা আলাদা ক'রে দেখা চলে না। সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে এটি কোনও বিশেষ পৃথক বা সম্পর্কহীন ব্যাপার নয়।

গুরুভ্রাতার দৃষ্টিতে স্বামীজী

"এ শরীরটা তো একটা যন্ত্রমাত্র, তাও আবার অচেতন, আর যন্ত্রীর জন্যই যন্ত্র, যন্ত্রীকে বাদ দিলে তার থাকা না থাকা দুই-ই সমান। মনে কর, একটা কলম যদি বলে, 'আমি শত শত চিঠি লিখেছি' তবে সত্যি কি উহা তাই করেছে? উহা তো কিছু লিখেনি লিখেছে সে ব্যক্তি যে তাকে ধরে আছে।" —স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

নবোয়াকভ প্রসঙ্গে

স্রষ্টার পরিচয় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এ কথা যতখানি সত্য, আবার তেমনি শুধু সৃষ্টিকে অবলম্বন বা নির্ভর করে স্রষ্টার সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ পরিচিতি মেলে না এ ধারণাও ততখানিই অভ্রান্ত। রচনার নেপথ্যে লেখকের যে ব্যক্তিজীবন বর্তমান, সেই ব্যক্তিজীবনের এমন বহু দিক আছে যাদের ছায়া তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এমন কি অসংখ্য লেখকের বেলায় দেখা যায়, জীবনের গতি একই লক্ষ্যাভিমুখী হলেও তার পথ, ধারা ও প্রকাশরীতি ভিন্ন। লেখকমাত্রেই জীবনশিল্পী, কিন্তু তাঁদের আপনাপন জীবনশিল্পের পরিচর্যা, আঙ্গিক, প্রকাশরীতি এক নয়, যেমন মধ্যরাত্রির পূর্বে বায়রনের কলম থেকে একটি অক্ষরও নির্গত হত না। আবার স্কট এবং রাসকিনের যা কিছু লেখার কাজ চলত ভোর সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে।

একালের লেখকদের মধ্যে তিনজন লেখকের জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করলে লেখার অন্তরালে তাঁদের নেপথ্যচারী ব্যক্তিজীবনের একটি স্বতন্ত্র দিক পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হতে পারে। এই তিনজন তিনটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সন্তান। একজন হ্যারল্ড রবিনস, একজন ভ্লাদিমির নবোয়াকভ, আর একজন জর্জে সিমেনন। আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স যথাক্রমে এই তিনজনের মাতৃভূমি।

বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ লেখক হলেন হ্যারল্ড রবিনস। কার্পেট বেগারস, ড্রিম মার্চেন্ট, নেভার লাভ এ স্ট্রেঞ্জার, হোয়্যার লাভ হ্যাস গন প্রভৃতি আলোড়ন আনা সাড়া জাগানো গ্রন্থের গ্রন্থকার তিনি। তাঁর এক-একটি গ্রন্থ তাঁকে এনে দেয় গড়ে দুই মিলিয়ান (কুড়ি লক্ষ) ডলার। রবিনস সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি নিয়ে লিখে থাকেন। কোন মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস, কোন কালজয়ী বক্তব্যের প্রচারের অভিপ্রায়, কোন বিরাট দর্শনের আলোকপাতের কামনা তাঁর মধ্যে তিলমাত্র নেই। অর্থোপার্জনের জন্যেই তাঁর লেখনীধারণ এবং সে কাজে তিনি লব্ধসিদ্ধ। ক্যানে থেকে তিন মাইল দূরে এক পার্বত্য ভিলায় তিনি লেখেন। বাইরের প্রকৃতির অফুরান সৌন্দর্য অবলোকনের সহায়ক বাতায়ন তিনি রুদ্ধ অর্গল আবদ্ধ রাখেন। প্রচুর তথ্য গ্রন্থে এবং অভিধানে ঠাসা তাঁর লেখার ঘর। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত সাধারণত তিনি কাজ করে থাকেন বৈদ্যুতিক টাইপরাইটারে। নিউইয়র্কে তাঁর যে দপ্তর আছে সেখানে চল্লিশজন আইনজ্ঞ এবং হিসাবঅভিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাদির ঠিকমত বিক্রী-ব্যবসা লক্ষ্য রাখতে এবং অর্থকরী দিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে। দশখানি বই তাঁকে এনে দিয়েছে পঁচিশ মিলিয়ান ডলার এবং দশখানি গাড়ী। সমালোচকের আনুকূল্য তিনি পান নি, কিন্তু পাঠকের সমর্থন তিনি লাভ করেছেন।

নবোয়াকভ

'লোলিটা' গ্রন্থটিই নবোয়াকভকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জনে সহায়তা করেছে। এই লেখক তাঁর পাণ্ডিত্য ও গভীরতার জন্যেও বিখ্যাত; যে দিক দিয়ে পূর্বোক্ত লেখকের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য, ভোর ছটায় তিনি ওঠেন। সাতটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি লেখার সময়। মধ্যে সাড়ে আটটায় প্রাতঃরাশের জন্য আধ ঘণ্টার বিরতি। মধ্যাহ্নভোজনের জন্য দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়া হলে আবার লিখতে বসেন। নৈশভোজনের পূর্বপর্যন্ত লেখা অব্যাহত থাকে। তাঁর জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত এক ধরণের কার্ডে তিনি লিখে থাকেন। তিনি দাঁড়িয়ে লেখেন। এক-একটি কার্ড লেখা হয় আর লেখক ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিক্ষেপ করেন। স্ত্রী সেগুলি সংগ্রহ করেন। লেখা শেষ হলে সেগুলি একত্রে টাইপিস্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুধু লোলিটাই তাঁকে কয়েক মিলিয়ান ডলারের মালিক করে তুলেছে।

সিমেনন আঁদ্রে জিদের ভাষায় জীবিত ফরাসী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। লেখা সুরু করায় আঁকা একটি খামের উল্টোদিকে চরিত্রের নামগুলি তিনি লিখে ফেলেন, ঘটনাস্থলগুলির একটি মানচিত্রও তিনি এ সময়ে এঁকে নেন।

সকাল সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত তাঁর লেখার সময়। বাকী সময় একেবারে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁর কাটে। বাইরের পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে নিজেকে তিনি একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নেন। কারো সঙ্গে দেখা করেন না, কোন নেমন্তন্ন রক্ষা করেন না, এমন কি টেলিফোনে পর্যন্ত কথা বলেন না। নিজের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে মিশে থাকেন তিনি। নিজেকেও কোন লেখার একটি চরিত্র হিসাবেই ভাবতে থাকেন তিনি। প্রায় সাড়ে চার শ' উপন্যাসের জনক তিনি।

—অনুসন্ধ

সাহিত্য পরিচয়

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-কথা ও কাহিনী

প্রথম খণ্ড

আলোচ্য গ্রন্থের নাম থেকেই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মানোর অবকাশ ঘটে। বস্তুতঃ পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকাহিনী যেন চির নূতনের স্বাদবাহী। আলোচ্য রচনাতেও এ সত্যের স্বাক্ষর আঁকা। ভক্তিমতী লেখিকা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের লীলাকীর্তন করেছেন এই গ্রন্থে। ঠাকুরের দৈনন্দিন লীলাচিত্রগুলি, তাঁর উপদেশ, তাঁর গাল্পগল্প যথাযথভাবেই রূপায়িত করা হয়েছে। বইটি পড়তে পড়তে এক অলৌকিক ভাবরাজ্যে চলে যায় মন, মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুকী কৃপা যেন সকলের উপরই বর্ষিত হচ্ছে। লেখিকার আন্তরিকতাও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে তিনি যেটুকু ভাববিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন, তা বিশেষভাবেই উপভোগ্য। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ সুশোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখিকা---শ্রীঅর্চনা পুরী, প্রকাশক—স্বামী নির্বেদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, বরানগর, কলিকাতা-৩৬। মূল্য---পাঁচ টাকা মাত্র।

ছোটদের অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম মানসপুত্র স্বামী অভেদানন্দের পুণ্য জীবনী সংক্ষেপে ছোটদের উপযোগী করে রচনা করেছেন লেখিকা। ছোট থেকেই মহাপুরুষদের জীবনকথার সঙ্গে পরিচিত হলে সহজেই বালক---বালিকার নমনীয় মনে মহৎ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হয়, যা নাকি উত্তর জীবনে তাদের প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, এদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ধরনের জীবনী প্রকাশের প্রয়োজন সমধিক। আলোচ্য গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দ বা কালী মহারাজের কর্মময় জীবনের কথা সুন্দরভাবেই প্রকাশিত। ছোটরা তো বটেই, বড়রাও যে এই সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান জীবন-চিত্রখানি হাতে পেয়ে খুশী হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখিকা---শ্রীঅর্চনা পুরী, প্রকাশনায়---শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা---৩৬। মূল্য---১.০০।

ভারতের সাধক চিত্রাবলী / প্রাচী

অধ্যাত্ম-ভারতের বিশিষ্ট নেতাদের একটি মনোরম চিত্রসংগ্রহ বা এ্যালবামরূপে এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে। সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত যশস্বী লেখক শঙ্করনাথ রায়। ভারতীয় সভ্যতার এক বড় বৈশিষ্ট্য এ সভ্যতা কয়েক হাজার বৎসরের প্রাচীন হলেও, এর স্রোতধারা আজো খণ্ডিত হয়নি, বয়ে চলেছে অব্যাহতভাবে। মিশর, গ্রীস, ব্যাবিলন, রোমের প্রাচীন সভ্যতার পতন ঘটেছে বহুকাল আগে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা তার অপূর্ব প্রাণশক্তি নিয়ে আজো বেঁচে আছে। পাশ্চাত্যের মনীষী ও ধর্মসংস্কৃতির গবেষকদের অনেকেই ভারতের অন্তর্জীবনের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আসলে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মসংস্কৃতির কালজয়ী প্রাণপ্রবাহের মূলে রয়েছে এদেশের সাধকগোষ্ঠীর প্রভাব। যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক ও মরমিয়া সাধকরূপে তাঁরা আমাদের জনজীবনে ছড়িয়ে আছেন যুগ যুগ ধরে। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের বিবেকানন্দ, অরবিন্দ অবধি এই সাধকদের বহুমুখী কল্যাণধারাকেই আমরা বিস্তারিত দেখতে পাই। আর্ট পেপারে ছাপা এই চিত্রসংগ্রহের ছবিগুলি অতি মনোরম, অঙ্গসজ্জার সুরুচি ও শিল্পগত সৌষ্ঠব প্রশংসার দাবী রাখে। শঙ্করনাথ রায়ের সুরচিত, জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাটি এবং সাধকদের সংক্ষিপ্ত জীবনপরিচিতি এই এ্যালবামের বড় আকর্ষণ। ভক্ত জনসাধারণ এবং ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির অনুরাগী সুধিবৃন্দ সবাই এই চিত্রসংগ্রহকে স্বাগত জানাবেন। সম্পাদনা : শঙ্করনাথ রায়, প্রাপ্তিস্থান---প্রাচী পাবলিকেশনস্ ৩ এবং ৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, তেতলা, কলিকাতা---১। মূল্য---দশ টাকা।

পালামৌ / বসুমতী সাহিত্য মন্দির

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের নাম বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট সুপরিচিত হলেও, বর্তমানে তাঁর রচিত বহু গ্রন্থই বাজারে মেলে না। এমতাবস্থায় তাঁর বিখ্যাত রচনা "পালামৌ" পুনঃপ্রকাশ করে ও সুলভ মূল্যে পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে এর বর্তমান প্রকাশক সংস্থা পাঠকের গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। "পালামৌ" মূলতঃ ভ্রমণ কাহিনী, কিন্তু উপভোগ্যতায় এই রচনা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের মতই মনোহারী। এই অরণ্যময় প্রদেশে লেখক যৌবনকালে একবার ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি বৃদ্ধ কিন্তু সেজন্য তাঁর রচনার মর্যাদা বা আকর্ষণ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি, অনবদ্য ভঙ্গীতে ছবির পর ছবি এঁকে গিয়েছেন লেখক স্মৃতির ভাণ্ডার মন্থন করে। যেমন তাঁর

শৈলী, তেমনই তাঁর বর্ণন-কৌশল। এতদুভয়ের সংযোগে পাকানো তার সামগ্রিক সৌন্দর্য্য নিয়ে পাঠকের মানসে ভেসে ওঠে। গ্রন্থশেষে লেখকের জীবনী সন্নিবেশিত। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক মোটামুটি। লেখক—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—দুই টাকা।

রঙ্গ-তুরঙ্গ / ডি এম লাইব্রেরী

সম্পূর্ণ উদ্ভট কল্পনা জাতীয় এই রচনাকে ফ্যানটাসি আখ্যা দেওয়া যায় সহজেই। লেখক কল্পনার রাশ ছেড়ে গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলিকে নিয়ে গেছেন কখনও অতীতের রাজ্যে কখনও বা সুন্দর ভাবী যুগের ছায়ায়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের রচনায় কার্যকারণের সন্ধান করাটা নেহাৎই বাতুলতা, এতে পাঠককেও কল্পনাশ্রয়ী হয়ে রঙ্গ-তুরঙ্গের সওয়ার হয়ে পড়তে বাধ্য হতে হয়, কাজেই এই গ্রন্থের পাঠককেও যে তা করতে হয় তাতে বিস্ময়ের কি আছে? প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন, লেখক---বনফুল, প্রচ্ছদপট---রনেন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়---ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য---তিন টাকা।

বাসঃদত্তা / আনন্দ পাবলিশার্স

প্রাচীন সংস্কারের স্বপ্নকুহক জড়ানো যার মনে, এমন একটি অদ্ভুত মানুষের উদার জীবন-দর্শনের কথা শুনিয়েছেন লেখক এই গ্রন্থে। কাহিনীর নায়ক ভুবন মজুমদার পুরানো এক বনেদী বংশের বংশধর। অদ্ভুত চরিত্রের এই মানুষটি আজকের যুগেও আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁর পুরোন বাড়ীর মতই পুরোন কয়েকটি সংস্কার ও বিশ্বাসকে। হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার হরিনাথ মিত্র কেন কে জানে সহ্য করতে পারেন না এই মানুষটিকে, বার খেয়ে খেয়ে এই মানুষটার ভক্তি-বিশ্বাসের বনেদ পর্যন্ত নড়ে গেলেই বুঝি শান্তি পান তিনি। কিন্তু তা হয় না, দুর্ভাগ্যের চরম পর্য্যায়ের ভেতর থেকেও বেরিয়ে আসেন যখন এই বিচিত্র মানুষ তখনও তাঁর মুখের হাসি অম্লান, অন্তরের প্রসন্নতা অটুট। আহত সর্পের মতই মাথা নামান হরিনাথ। সত্যই তাঁর হার হল এই অদ্ভুত মানুষের কাছে যাঁর নাম ভুবন মজুমদার। অনবদ্য ভঙ্গীতে কাহিনীটি পরিবেশন করেছেন লেখক। তাঁর অনুপম শৈলী কাহিনীর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। মনুষ্যত্বের বিজয়ই তাঁর কাহিনীর মূল বক্তব্য এবং এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেও তিনি সক্ষম হয়েছেন সহজেই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সুবোধ ঘোষ, প্রচ্ছদ—পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রকাশনায়—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য—৪'০০।

সেই পথটুকু / ডি এম লাইব্রেরী

প্রখ্যাত লেখকের লেখা অনবদ্য দুটি বড় গল্প সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখকের রচনার প্রধানতম প্রসাদগুণ স্নিগ্ধতা এই গল্পগুলির মাঝেও অনুপস্থিত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে সেটাই এদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। প্রথম গল্প 'সেই পথটুকু'তে প্রেমের এমন এক নতুন রূপ উদ্‌ঘাটিত যার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। সুন্দরী এবং প্রাণচঞ্চল। তরুণী যূথীর রোগশয্যা সুখশয্যায় পর্য্যবসিত হতে পেরেছে যে প্রেমের সান্নিধ্যে সেই অমলিন চিরন্তন প্রেমের রূপটি পাঠকমনে দাগ এঁকে দেয় খুব সহজেই। এমনটি কি সত্যই হয়, না এমনটি হওয়া সম্ভব? একথার বিচার না করে মন কেবলই উজিয়ে ওঠে "এমনটিই হওয়া উচিত" বলে, আর সেটাই যূথী ও দীপেনের প্রেমের সবচেয়ে বড় সার্থকতা এবং সেইজন্যই এই রচনা রসোত্তীর্ণ—এই আখ্যায় ভূষিত হওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয় ও শেষ গল্প "নতুন ভুবন"-এর নায়িকা অঞ্জনা সুখী ও স্বাভাবিক নারী, স্বামীসোহাগিনী সন্তানের জননী, তবু নবীনত্ব ও বৈচিত্র্যের যে পিপাসা নারীমনকে মাঝে মাঝে আকুল করে তোলে, জাগিয়ে তোলে তার রাধা হিয়াকে, তারই প্রভাবে সেও খোঁজে নবীনত্বকে। অঞ্জনাও তাই বন্ধুত্ব কামনা করল পর-পুরুষের, চাইলো প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি নিতে প্রভাসের সান্নিধ্যে। কিন্তু শুধুই ক্ষণিকের তরে নতুন ভুবনের একটু আস্বাদ নেওয়ার সাধ, তার পুরোন ভুবনের কোন ক্ষতি হোক, এমন কথা ভুলেও ভাবে না অঞ্জনা। তাই ক্ষণিকের অতিথিকে সরে যেতে হল জীবনের দাবীর সামনে খুব সহজেই। আত্মস্থা অঞ্জনা আবার ফিরে পেল নিজেকে, নীরের মায়ায় ঘরে ফিরে এল শান্ত বিহঙ্গী। খুব সহজভাবে নারীমনের এই সহজাত বৈচিত্র্যকে রূপ দিয়েছেন লেখক আলোচ্য গল্পটির মাধ্যমে। তাঁর বক্তব্য গোচার ও সুস্পষ্ট হয়ে দাগ কাটে পাঠকমনে। ললিত-মধুর শৈলী গল্প দুটির প্রধানতম আকর্ষণ। প্রচ্ছদ রঙীন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রকাশক---ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—পাঁচটাকা মাত্র।

[illegible]ের খেলা / আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী। সার্কাস বস্তুটির সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় ঘটেছে কোন না কোন সময়ে। আমরা সার্কাসের খেলা দেখেছি প্রত্যেকেই, মুগ্ধ হয়ে অবলোকন করেছি বাঘ-সিংহের খেলা, ট্রাপিজ খেলোয়াড়ের বিস্ময়কর ক্রীড়াদক্ষতা, রঙ-বেরঙের পোষাক পরা তরুণী ও কিশোরীদের নানাবিধ কৌশল, ক্লাউন বা সঙের ভাঁড়ামী, কিন্তু এদের প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি, কতটুকুই বা চিনি আমরা সেই মানুষ-গুলিকে, যারা জীবন তুচ্ছ করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমাদের চিত্ত বিনোদন করে চলেছে সামান্য

কিছু অর্থের বিনিময়ে? আলোচ্য গ্রন্থে এদেরই জীবনায়ন করেছেন লেখক গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। লেখকের মুন্সিয়ানায় সার্কাসের নরনারীর বিচিত্র ও সংঘাতবহুল জীবনযাত্রা সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েই ছাপ রেখে যায় পাঠকের মনে। দি গ্রেট জুয়েল সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার হারকু সায়েব থেকে মাজা-ভাঙ্গা টুনি মাসী পর্যন্ত সকলেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমানভাবে, ট্রংম্যান শিবনাথের হৃদয়দৌর্বল্যে আমরা বিচলিত হই, সার্কাসের মেয়ে হাসির কুলবধূ হয়ে ওঠাতেও আনন্দিত হই। বিস্ময়কর দক্ষতার সঙ্গে কয়েকটি অখ্যাত ও অজ্ঞাত মানুষকে সাহিত্যের উপজীব্য করে তুলেছেন লেখক। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গেও আমরা একাত্ম হয়ে উঠতে পারি খুব সহজেই। পুষ্পরাজ-উষা, যমুনা-শিবনাথ, হাসি-যুগল এদের যৌথ জীবনের সার্থকতা কামনা করি মনে মনে, খুসী হই হারকু সায়েব ও লীলাকে পরস্পরের হাত ধরতে দেখে। লেখকের তথ্যনিষ্ঠা ও একাগ্রতায় বিষয়বস্তু শুধু আকর্ষণীয়ই নয়, প্রামাণ্যও হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা গ্রন্থটি পাঠ করে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ শিল্পরুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রচ্ছদসজ্জা---অজিত গুপ্ত, প্রকাশনায়---আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য---দশ টাকা।

বায়ু বয় পূর্বদিকে / ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখিকার সাম্প্রতিকতম উপন্যাস। বার্ধক্যের ছায়া নেমে-আসা কয়েকটি মানুষের বসতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। কলকাতার কাছেই এক শহরতলীতে বাসা বেঁধেছেন কয়েকটি প্রায়বৃদ্ধ মানুষ, তাঁদের জীবন চলে মন্দাক্রান্তা ছন্দে, গতির বেগ নেই সে জীবনে, সেখানে দখিনা বাতাসের প্রবেশ নিষেধ, পুবালী বাতাস সেখানে নিত্যই হত্যা করে যৌবনকে; তবু কখনো বাসনা উতলা হয়ে ওঠে বার্ধক্য কলোনীর স্তিমিতপ্রায় জীবন প্রেমের স্পর্শে, বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন নতুন করে চঞ্চল হয়ে উঠতে চান সে স্পর্শে। এই কলোনীতে বেকার যুবক রবি এল একদিন বসন্ত বাতাসের মতই, তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে সে বার্ধক্য কলোনীর জীবনকে। গ্রন্থোক্ত কাহিনী সেই বিশ্লেষণেরই ফসল। খ্যাতনাম্নী লেখিকা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন জীবনের একটি বিশেষ দিককে। প্রসঙ্গত এও বলা চলে যে, এই গ্রন্থে তাঁর রচনায় যে ভঙ্গীটি প্রধান তা তাঁর রচনায় ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি; মনে হয় জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আরও গভীর, আরও মানবিক হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা---বাণী রায়, প্রচ্ছদ---বিশ্বনাথ দাস, প্রকাশক---ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম---৪.৭৫।

এক ডজন গপ্পো / আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প সঙ্কলন, মোট বারোটি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। মূলত কিশোরদের জন্য লেখা হলেও, এই গল্পগুলি নিঃসন্দেহে সব বয়সের পাঠকেরই মনোরঞ্জন করবে। বস্তুত এমন অনবদ্য ও নিটোল গল্প কমই চোখে পড়ে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। বিভিন্ন রসের গল্প আছে এবং সব কয়টিই স্বাদে ও গন্ধে বিশেষভাবেই উপভোগ্য। প্রারম্ভিক গল্প "সেপ্টোপাসের খিদে" এক কথায় এক অনবদ্য সৃষ্টি, পাঠকমনের কৌতুহলকে পুরোপুরি জাগিয়ে তোলেন লেখক এই গল্পটির মাধ্যমে। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা যায় যে, উক্ত গল্পটি পড়লে আমাদের আবার নতুন করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পগুলির কথা মনে পড়ে যায়। এটি ছাড়াও বহু উপভোগ্য গল্প আছে বর্তমান সঙ্কলনে যার মধ্যে "অনাথবাবুর ভয়" শীর্ষক গল্পটির নাম করতে হয় প্রথমেই। এই গল্পে ভূতের গল্পের যে মেজাজ খুঁজে পাওয়া যায় তা বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত লব্ধকীর্তি লেখকের প্রতিভার এই নতুন দিকটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিমাত্রই যে আনন্দ লাভ করবেন তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। হাতে আঁকা যে ছবিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে রচনার আকর্ষণকে তা বর্ধিত করে এবং এগুলোও লেখকের প্রতিভার আরও কয়েকটি বিস্ময়কর নিদর্শন। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক--সত্যজিৎ রায়, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ--সত্যজিৎ রায়, প্রকাশক---আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য---৬.০০।

বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ইতিহাস রচনায় বাঙ্গালীর উৎসাহ চিরদিনই কম এবং সেজন্যই বাংলার ও বাঙ্গালীর ইতিহাস আজও রয়ে গেছে খানিকটা অপরিচয়ের অন্ধকারে। এজন্য এক্ষেত্রে যাঁরাই এগিয়ে আসেন তাঁরাই আমাদের ধন্যবাদার্হ, আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এই গ্রন্থে বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসকে তুলে ধরবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বমতে বাংলা দেশ আর্যসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র, গ্রন্থকারও এই মতের পোষকতা করেছেন। এই রচনায় বাঙ্গালীদের বল-বিক্রম, শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার তাম্রলিপ্ত রাজ্যকে প্রাচীন বাংলার গৌরবতম স্থানরূপে বর্ণনা করেছেন। বাংলার বিগত যুগের মহিমাকেও যথাযথরূপে উপস্থিত করেছেন তিনি পাঠকের দরবারে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ও বাঙ্গালীর

ইতিহাসের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় উদ্ঘাটিত। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক---মোটামুটি। লেখক---শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদার, প্রকাশক---সম্বোধি পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, ২২, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। মূল্য---৮ টাকা ৫০ পয়সা।

নদী মাটি মানুষ / অশোক প্রকাশন

আলোচ্য গ্রন্থে মাটির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সুন্দরভাবে চিত্রায়িত; মাটির সঙ্গে যাদের প্রাণের যোগ সেই সব সাধারণ চাষী মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনা অপরূপভাবেই ফুটে উঠেছে লেখকের দরদী কলমের মাধ্যমে। চাষীর ঘরের জোয়ান ছেলে অক্ষয় ছিল দিন-মজুর। একটুকরো জমিও ছিল না তার কোনওখানে নিজের বলতে, অথচ বুকে ছিল অনন্ত তৃষ্ণা জমির জন্য। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একদিন সত্যই কিছু জমির মালিক হতে পারল অক্ষয়, নদীর কূলে তার সেই সোনা-ফলানো জমিতে ফসল ফলালো, ঘর বাঁধলো সে নিজের জমিতেই। ঘর হলেই তো ঘরণীর প্রয়োজন, তা ছাড়া দুরন্ত যৌবনের তাগিদও তো আছে, অতএব এল নির্মলা, ঘর সেজে উঠলো ঘরণীর পদক্ষেপে। তবু জমিই যেন অক্ষয়ের প্রাণসত্তা। নির্মলাকে সে ভালবাসে, খুবই ভালবাসে, তবু বধূর উচ্ছল যৌবনের চেয়ে মাঠের সোনালী ফসলের দিকেই যেন তার পক্ষপাত বেশী। বুঝিবা সেই অভিমানেই নির্মলা চলে গেল একদিন মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মাটির প্রেমে আত্মহারা অক্ষয়ও একদিন বুঝলো যে মাটির চেয়ে মানুষ অনেক বড়, সেদিন সেও ত্যাগ করে গেল তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জমি ও নিজের হাতে বাঁধা ঘর। সাবলীল ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়েছে কাহিনী। লেখকের আন্তরিকতায় তা বিশ্বাস্য ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, প্রকাশক---অশোক প্রকাশন, এ-৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম---চারটাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

সোনা রূপা নয় / রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প সংকলন। দীর্ঘ জীবনে লেখিকা যেভাবে মানুষকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তারই ছাপ পড়েছে বর্তমান রচনাবলীর উপর। গল্পগুলি এককথায় অনবদ্য, কারণ লেখিকার জীবনবোধ ও সহৃদয়তার স্বাক্ষর গভীরভাবেই আঁকা এদের মাঝে। মানবিক আবেদনে ভরা গল্পগুলি পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে যেতে হয়, মনে হয় মানুষকে কি গভীর সহানুভূতির সঙ্গেই না বিচার করেছেন লেখিকা। 'সবার উপর মানুষ সত্য' এ বাণীটি যেন তাঁরই মর্মবাণী। রাজস্থানের অন্তঃপুর নিয়ে বেশ কয়েকটি কাহিনী রচিত হয়েছে, তাদের মাঝে রাজস্থানের অভিজাত ও সাধারণ মানুষ এতদুভয়েরই অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত। রাজস্থানের সঙ্গে লেখিকার ব্যক্তিগত পরিচয় যে ঘনিষ্ঠ তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সামগ্রিক জীবনবোধের ফলে রচনাগুলি সহজেই শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত। শুধু তাই নয়, তাঁর রাজস্থানের কাহিনীগুলি বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানাকেও প্রশস্ততর করে। এই শক্তিমতী লেখিকার সাহিত্যকৃতিত্বের সম্যক্ মূল্যায়ন আজও হয়নি বলেই মনে হয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সংকলন গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। আমরা বর্তমান গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শিল্পশোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা---জ্যোতির্ময়ী দেবী, প্রকাশক---রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা---১২, প্রচ্ছদ---গৌতম রায়। দাম---পনের টাকা।

রবীন্দ্রসঙ্গীত / জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থোক্ত আলোচনাদির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তা ও সঙ্গীত সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে। এবং এর মাধ্যমে রবীন্দ্র-গীতিমানসের মর্মোদ্ধার করাটাও সম্ভব বোদ্ধা পাঠকের পক্ষে। বস্তুত যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই লেখক এই দুরূহ গবেষণাকর্ম সমাধা করেছেন। উনবিংশ-বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত ও শিল্প-জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে তাঁর সঙ্গীতের অবদানই প্রধানতম, কাজেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজনও বর্তমান। আলোচ্য গ্রন্থ লেখক এই প্রয়োজনীয় কর্মে ব্রতী হয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন। আমরা এই গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল, প্রকাশক---জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, প্রচ্ছদ---শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য---বারো টাকা।

নিশীথ ফেরী / আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

আলোচ্য গ্রন্থে সন্ত্রাসবাদী দলের গোপন কার্যকলাপের এক নিখুঁত ছবি আঁকা হয়েছে। বেকার যুবক প্রকাশ, ঘটনাচক্রে জড়িত হয়েছিল এক সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে এবং সেই দলের নির্দেশেই গোপনে রিভলবার দিয়ে আসতে যায় সে এক গণ্ডগ্রামে নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে। এই লেন-দেনের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে যা যা ঘটেছিল তা নিয়েই গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। প্রকাশের মানসিক চাঞ্চল্যকে নিখুঁত ভাবেই রূপায়িত করেছেন লেখক,

বস্তুত সম্রাসবাদীদের এই ধরণের লিপীধ ফেরী ঠিক কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে তা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে পাঠকের মানসে। চরিত্রচিত্রণেও ক্ষমতার স্বাক্ষর আঁকা, বিশেষ করে আংটিদির চরিত্রটি অসাধারণ। পরিবেশ রচনাতেও সিদ্ধহস্ত লেখক। আংটিদির গৃহে প্রকাশের আগমন থেকে নিষ্ক্রমণ পর্যন্ত সময়-টুকু কিভাবে কেটেছিল তা যেন চোখে দেখা যায় স্পষ্ট। বইটি পড়ে আমরা সত্যই খুশী হতে পেরেছি। প্রচ্ছদ শিল্পসুষম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল, লেখক---বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক---আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯, প্রচ্ছদ---পূর্ণেন্দু পত্রী। মূল্য---পাঁচ টাকা।

কাত্যায়নী / বেঙ্গল পাবলিশার্স

উপনিষদে কাত্যায়নীর নামোল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বৃদ্ধ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয়া পত্নী। প্রথমা পত্নী বৃহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মহিমার কাছে কাত্যায়নী স্বভাবতঃই নির্বাপিতা আর সেজন্যই হয়ত তিনি কিছুটা উপেক্ষিতাও; কিন্তু তা বলে কাত্যায়নীর গুরুত্ব কমে না কারণ মৈত্রেয়ী যেমন বৃহ্মবাদিনী, কাত্যায়নী তেমনি স্ত্রীপ্রজ্ঞা। এই নারীকে কেন্দ্র করেই বিরচিত বর্তমান নাটকখানি। উপনিষদ যাঁর সম্বন্ধে প্রায় নীরব, সেই নারীকে আপন মহিমায় উদ্ঘাটিত করে দেখানোর প্রচেষ্টা যে অভিনব তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। নাট্যকারের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক---শশাঙ্কভূষণ, পরিবেশক---বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য---তিন টাকা পঁচিশ পয়সা।

এখানো সেই মুখ / সাহিত্য সদন

আলোচ্য গ্রন্থে ঈশ্বরপুত্র যীশু-খ্রীষ্টের জীবনের কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যীশুর অমৃতবাণী তাঁর দিব্য জীবনের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছিল একদা, কাজেই তাঁকে জানতে হলে, উপলব্ধি করতে হলে এগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। লেখকের ভাষামাধুর্যে কাহিনীগুলি সহজেই পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে। আমরা এই রচনাটিকে স্বাগত জানাই। প্রচ্ছদ, মনোহর, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---সঞ্জীব সরকার, প্রকাশক---সাহিত্য-সদন, ৬৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, প্রচ্ছদপট---মানব বড়ুয়া। দাম---তিন টাকা।

দু'ভ এক খেলায় আম / সিগনেট বুক শপ

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে মোট ৪৮টি ছোট ছোট কবিতা সংকলিত হয়েছে। লেখকের গভীর কবিমানসের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে এদের মাঝে। কয়েকটি কবিতায় সচেতন মানসিকতা-সম্পন্ন মানুষের হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি সোচ্চার। এই প্রসঙ্গে "এখন" শীর্ষক কবিতাটি বিশেষভাবেই স্মরণীয়। ভাব ও ভাষার সৌকুমার্য বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। কাব্যামোদী পাঠক এই কাব্যগ্রন্থটি হাতে পেয়ে নিঃসন্দেহে খুশী হবেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক---শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পরিবেশক---সিগনেট বুক শপ, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ---মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। দাম---তিন টাকা।

বদ্ধ ঘর বদ্ধ কেন

ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ্ স্যার লিওনার্ড হিল-এর মতে তথাকথিত 'ইন্‌ফ্রা-রেড' আলোকরশ্মিতে নাসারন্ধ্র সংকুচিত হওয়ার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস বিঘ্নিত হয়। ঘন লাল বা ম্যাড়্‌মেড়ে লাল উত্তাপই ঐ আলোকরশ্মির উৎস।

তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, অতিরিক্ত গরম ঘরে মানুষ বদ্ধ মনে করে প্রধানত এই কারণে।

তিনি দেখিয়েছেন নাসারন্ধ্রে তাপের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে এ রকম হয় না; চামড়ার 'সেন্‌সরী নার্ভ'গুলো থেকে 'রিফ্লেক্স এফেক্ট' এই অনুভতি। এই অনুভূতি যে বিশেষ তাপ-রশ্মি থেকে হয়, তার নাম তিনি দিয়েছেন 'নোস শাটার্‌স'—'নাসারন্ধ্র বদ্ধকারী'। যাদের শ্বাস-প্রশ্বাস অন্য কারণে আংশিক বিকল, তাদের ওপর এর প্রভাব বেশি। সর্দি-কাশি, হাঁপানী বা 'হে-ফিভার'-গ্রস্ত রোগীরা এই পর্যায়-ভুক্ত।

এই প্রতিক্রিয়া মুখের চামড়ার ওপর বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ার সাহায্যে কমান সম্ভব; কিংবা উজ্জ্বল তাপ-উৎস-জাত রশ্মি—যা তাঁর ভাষায় 'নোস্ ওপেনার্'—'নাসারন্ধ্র উন্মুক্ত-কারী'—দিয়েও এ রকম করা যায়। এগুলো জলীয় বাষ্প দ্বারাও শোষিত হতে পারে, এবং 'হীটার-'এর সামনে পাত্র জল রাখার ব্যাখ্যাও এই। ঘরের বদ্ধতা দূর করার উদ্দেশ্যে এক

পরীক্ষার সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন উপযুক্ত 'নোস্-শাটার্' রশ্মির মধ্যে শতকরা ষাটজন মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ভোগ করেছে, এবং শতকরা পঁচিশ জনেরও বেশি মানুষের ক্ষেত্রে এই কষ্ট এত স্পষ্ট যে, যথোপযুক্ত যন্ত্রর ওপর তাদের শ্বাসকষ্টর ছক দেখানো যায়।

সুতরাং বলা যায়—ঐ বিশেষ রশ্মির উপস্থিতিই বদ্ধঘরের বদ্ধভাব প্রধান কারণ। এ রকম অবস্থায় বদ্ধভাব প্রধান কারণ দূরকরামাত্রই আবার স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগ এবং প্রশ্বাস-গ্রহণ সম্ভব হয়।

ভয়াবহ জলচর

সীমাবদ্ধকালের গণ্ডীতে নয়, অনন্তকালের ইঙ্গিতে জলজ প্রাণী-সমূহের মধ্যে যারা স্থলজ মনুষ্যকুলের অপার বিস্ময় আকর্ষণ করে আসছে, সেই তালিকায় অনেকগুলি নামই এসে পড়ে। এই বহুর মিছিলে একটি নাম বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। সে নাম —অক্টোপাস।

মানুষের জীবনধারণ জল ব্যতীত অসম্ভব, শুধু তাই নয়, জলজ মৎস্য মানুষের এক প্রধান খাদ্য। যে মৎস্য মানুষের পাতা জালে ধরা পড়ে তারা রসনা তৃপ্তি করে থাকে, অক্টোপাস সেই মৎস্যকুলেরই অন্তর্গত, অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই অক্টোপাসই অনেক সময় মৎস্যভোজী মানুষের প্রাণান্তের কারণ হয়ে থাকে।

বিচিত্র দর্শন এই প্রাণী। কি ভীষণ তার আকৃতি। জলচারী মানুষের মনের মধ্যে অক্টোপাসের জন্য ভয় সকল প্রকার সংশয়ের অতীত। মানুষ তো দূরের কথা, পাহাড়-পর্বত টলাবার মত ক্ষমতাও এর মধ্যে বর্তমান। ভগবানও যেন এর সহায়। মনের বাসনা অক্ষরে অক্ষরে চরিতার্থ করার জন্যই যেন এর বিরাট দেহে জুড়ে দিয়েছেন একেবারে চার জোড়া হাত। এতগুলি হাত পেলে মানুষও আরও অনেক কিছুই করতে পারত।

এই ভীষণাকৃতি প্রাণীটির একটি নিদর্শন পাওয়া যাবে বৃটিশ মিউজিয়ামে। সেখানে সংরক্ষিত এই নিদর্শনের মাধ্যমে দেখা গেছে, তার শুঁয়োটিরই আয়তন আঠারো ফিটের কম নয়। এর আহার সংগ্রহের পদ্ধতিটিও বড় বিচিত্র। রীতিমত কৌশল অবলম্বন করে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে। কোন ছোট-খাটো মাছ মেরে সেই মাছটি এরা এমনভাবে সাজিয়ে রাখে, যাতে সহজেই অন্যান্য মৎস্যখাদক প্রাণীর দৃষ্টি সহজেই সেদিকে পড়ে। এইভাবে তাদের দৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট দিকে আবদ্ধ করে প্রলোভন বিস্তার করে তাদের একেবারে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলে। শেষে তাদের একেবারে আর পালাবার পথ থাকে না এবং শেষ পর্যন্ত অক্টোপাসের হাতেই তাদের প্রাণ দিতে হয়। শুঁয়োর একটি ঝাপটাই শিকারকে ধরাশায়ী করার পক্ষে যথেষ্ট। কাঁকড়া এদের অতি প্রিয় খাদ্য।

একটি কদাকৃতি অক্টোপাশের নিষ্প্রাণ দেহ

'স্কুইড' বলতে যে বিশেষ প্রাণীটি বোঝায়, সে আবার অষ্টভুজও নয়। সে রীতিমত দশভুজা। এরা সাধারণত জলের অগভীর অংশে বিহার করে। মৎস্য এদের খাদ্য। এরা স্থির হয়ে থাকতে পারে না। ক্রমানুয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর ফলে এদের দৈহিক গঠন টর্পেডোর মত হয়ে গেছে। এদের অতিরিক্ত হাত দুটি সাধারণত আবরণের মধ্যেই থাকে। উপযুক্ত বা লোভনীয় শিকার সন্ধানে এলে তখন এই অতিরিক্ত হাত দুটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই প্রাণী-দের মধ্যে দৈর্ঘ্যের মাত্রা পঞ্চাশ ফিট দেখা গেছে। একটি মানুষের দেহের প্রস্থের যা পরিমাণ, এদের এক-একটি হাত সেই পরিমাণের।

এদের ভয় আছে। জলের মধ্যে এদের আতঙ্কও অনুপস্থিত নয়। এদের সংহারক সামুদ্রিক ভীষণদর্শন তিমি।

এদের প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর যে তথ্য—সেটি হ'ল, এরা সামনে এগোনোর থেকে পিছনে চলাই বেশী পছন্দ করে। এদের সম্মুখগামী বলার থেকে পশ্চাদগামী বলাই শ্রেয়। জলের মধ্যে যে অতি স্বাভাবিক ও সাবলীল-ভাবে এরা পিছন দিকে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে যায়, তা সত্যই বিস্ময়ের আকর।

—বাসুদেব

একটি কদাকার অক্টোপাশের নিদর্শন

ছোটদের আসর

গল্প হলেও সত্যি

অনেকদিন আগের কথা।

কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এক অনাথা স্ত্রীলোক।

কোলে তার বছর তিনেকের একটি শিশু। তার খুব জ্বর। পয়সার অভাবে ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে না। তাই ব্যারিস্টারবাবুর কাছে এসেছে যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায় এই আশায়।

মস্ত ফটকওয়ালা বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ঘোড়ার গাড়ী। বাবু তখন কোর্টে বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। কোচম্যান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো দরওয়ানের সাথে গল্প করছে।

বাড়ীর ভেতর ঢুকে স্ত্রীলোকটি দরওয়ানকে জিগ্যেস করল, 'বাবু কোথায় বাবা, তাঁর সঙ্গে আমি একবার দেখা করব।'

বুড়ো দরওয়ান ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, 'বাবুর এখন কোর্টে বেরোবার সময়। দেখা তাঁর সঙ্গে এখন হবে না মাইজী।'

উত্তর শুনে স্ত্রীলোকটির মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, 'দেখা আমার যে করতেই হবে বাবা। আমার বড় বিপদ।'

কাছেই দাঁড়িয়েছিল কোচম্যান। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃত করে কড়াস্বরে বলে উঠল, 'তুমি তো ভারী প্যাঁচালে মানুষ দেখছি। এক কথা একশ'বার কইছ। দেখা হবে না---যাও।'

শ্রীগণেশ দত্ত

স্ত্রীলোকটি থতমত খেয়ে গেল তার কথা শুনে। ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকাল একবার। তার পর কোন উপায় না দেখে সে

লেখক

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হল।

এদিকে কখন যে বাড়ীর কর্তা অর্থাৎ ব্যারিস্টারবাবু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন তা' আর কেউ লক্ষ্য করে নি। সঙ্গে তাঁর দুইজন ভদ্রলোক। কয়েকজন চাকরকে একটি স্ত্রীলোককে ঘিরে থাকতে দেখে একটা যে কিছু ঘটেছে তা' বুঝে নিতে তাঁর অসুবিধা হ'ল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার। এত গোলমাল কিসের?'

গলার আওয়াজ শুনে সবাই চমকে উঠল। কোচম্যানের মুখতো একেবারে ভয়ে কালো হয়ে উঠল। তার জন্যেই এই কাণ্ডটি ঘটেছে। বাবুটি এমনিতে গঙ্গার জল, কিন্তু এ সব ব্যাপারে বড় কড়া। যদি শোনেন যে, মেয়েছেলেটিকে অপদস্থ করা হয়েছে, তা হলে আর অপমানের শেষ থাকবে না। মহিলাটি এগিয়ে এসে নমস্কার করে বলল,' 'আপনাকে একটা কথা বলছিলাম বাবু। আমার এই ছেলের খুব জ্বর। ডাক্তারবাবু বলেছেন, সময়মতো চিকিৎসা না করালে অসুখ বেড়ে গিয়ে ফল খারাপ হতে পারে। আপনি যদি কিছু সাহায্য না করেন তবে বাছাকে হয়ত আর---' কথাটি শেষ করবার আগেই স্ত্রীলোকটি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিগ্যেস করলেন, 'ডাক্তার ওষুধের দাম কত বলেছে।"

"স্ত্রীলোকটি বলল, 'আড়াই টাকা।'

---কি যেন ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বার করে মহিলাটির হাতে দিয়ে বললেন, 'এই দশটা টাকা আপনি নিয়ে যান। যদি আরও কিছুর দরকার হয়, তবে পরে আসবেন।' বলেই ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়েই সঙ্গীদের নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

যেতে যেতে একজন সঙ্গী জিগ্যেস করলেন, 'আপনি ওকে দশটাকা দিলেন কেন?'

প্রশ্নকর্তার জবাবে ভদ্রলোক বললেন, "দেখ, যে পয়সার অভাবে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারছে না, সে খুবই অভাবগ্রস্ত। যদি ওষুধের দামটাই শুধু দিতাম, তবে খাবার জন্য আবার ওকে চিন্তা করতে হ'ত। ফলে ছেলেটির প্রতি পুরাপুরি যত্ন নেওয়া হ'ত না। অনেক ভেবে চিন্তেই আমি টাকাটা ওকে দিয়েছি।

সঙ্গীরা ভদ্রলোকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

কে জান এই দরদী ব্যারিস্টার? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইনি ছিলেন প্রথম সারির সৈনিক। দেশকে ইনি যে কিরূপ ভালবাসতেন, বড় হয়ে সে সব কথা জানতে পারবে।

★ গরু ★

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকালকার কথা জানি না, তবে আমাদের সময় ছোটবেলায় স্কুলে প্রায় সব ছেলে-মেয়েকেই অন্তত একটা বিষয়ে বাংলা রচনা লিখতে হয়েছে। বিষয়টি হল, 'গরু'। অপরিষ্কার হাতে-রুলটানা খাতায় অনেক বানান ভুল করে তখন আমাদের গরুর ওপর লিখতেই গলদঘর্ম হত। সবাই প্রায় একই রকম লিখতাম অনেক ভেবে ভেবে, হাতে, মুখে কালি মেখে: গরু গৃহপালিত পশু। গরু দুধ দেয়। গরুর চারিটি পা ও দুইটি শিং আছে। তার পর অনেক ভেবেচিন্তেও গরুর ওপর রচনা এর বেশী বিশেষ এগোতো না।

গরু আমদের ছোটবেলায় ছিল, এখনও রয়েছে। পরে থাকবে। কিন্তু গরুর ওপর রচনা আর আমাদের কখনও লিখতে হয় নি। এম-এ, বি-এ, কি ম্যাট্রিক কোনো পরীক্ষারই প্রশ্নপত্রে আমার অন্তত কখনও চোখে পড়ে নি গরু সম্বন্ধে রচনা এসেছে। গরুর সঙ্গে সম্পর্ক মানুষের সারাজীবন থাকলেও, দুঃখের কথা, স্কুলের ছোট ক্লাশের পরীক্ষা ছাড়া গরু কখনও উঁচু পরীক্ষায় রচনার মর্যাদা পায় নি। দোষ অবশ্য গরুর নয়---দোষ গরুর প্রতি উদাসীন পরীক্ষকদের। যাঁরা নিশ্চয়ই মনে করেন যে, গরুর ওপর রচনা লেখা খুবই সোজা। সোজা কি না জানি না, তবে ছোটবেলায় আমাদের প্রায় সবাইকেই গরু রচনার খাতায় ভাবিয়েছে, কয়েক লাইন লেখার পর গরু এগোতেই দেয় নি। গরুর বর্ণনা দিয়ে তার কাজের মধ্যে দুধ দেয়া, আর ঘাস খাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই লিখতে পারি নি। তবে আমাদের এক সহপাঠী, এখনও মনে আছে, গরু সম্বন্ধে কয়েক লাইন নতুন কিছু লিখেছিল এবং সেজন্যে সে তার কচি বন্ধুমহলে বেশ প্রশংসাও পেয়েছিল। সে লিখেছিল, অন্যান্য জীবজন্তু ও মানুষের মলকে বলা হয় 'গু', কিন্তু গরুর বেলায় তাকে বলা হয় গোবর। অতটুকু বয়েসে ওই ধরণের বর্ণনা সত্যি তার মাথায় এলো কি করে তা ভেবে আমরা অবাক হয়েছি। কিন্তু অত ভাল বাংলা লিখে এবং গরু-শীর্ষক রচনায় সবচেয়ে ক্লাশে বেশী নম্বর পেয়েও, 'এনোয়াল' পরীক্ষায় সে পাশ করতে পারে নি। মাস্টারমশাই রেগেমেগে বলতেন, গরু খুশী হয়ে তার গোবরই তোর মগজে উপহার দিয়ে গেছে।

আজকালকার ছেলে-মেয়েরা একদিক থেকে বেঁচে গেছে। গরু নিয়ে তাদের রচনা লিখতে হয় না---ছোটোবেলায় স্কুলে তো নয়ই, সারা শিক্ষা-জীবনেও হয়ত নয়। মনে হয়, আমাদের ছোট-বেলায় গরুর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, এখনকার ছোটদের তা নেই। আমরা গরুর ওপর যে সব কবিতার লাইন পড়েছি, যেমন, 'গরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে' বা 'রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে', আজকালকার ছোটরা আজও তা পড়ছে কি? মোটেই না। আমাদের সময় গরু ছিল অনেক, তাকালেই গরু দেখা যেতো। প্রায় সব বাড়িতেই গরু দেখা যেতো। বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে চা, কফির জায়গায় এক গেলাশ খাঁটি গরুর দুধ খেতে দিত। এখন এ অবস্থা একরকম অতীতের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি। তখন সব বাড়িতেই আর কিছু না থাক, গোয়ালঘর একটা থাকবেই। এখন গোয়াল কথাটা এক লুপ্তপ্রায় শব্দ হয়ে এসেছে, আর গোয়াল-ঘর সমস্ত বাড়ি থেকে অবলুপ্ত হতে হতে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করেছে।

বাংলায় কখনই ভাল ছিলাম না। গরুর রচনায় কোন সময়েই পাশ নম্বরের বেশী পাই নি। তবু কেন জানি না, গরুর ওপর রচনা এলে খুশীই হতাম। তবে এক একসময় ভাবতাম ছাগল, বেড়াল, কুকুর, টিয়াপাখী ইত্যাদি গৃহপালিত পশু এত থাকতে সবাইকে বাদ দিয়ে গরুর ওপরই এত বেশী রচনা আসে কেন। ছোটবেলার সে প্রশ্নের জবাব এত বড় হয়েও এখনো পাই নি। অবশ্য ভাবতাম, গরুর দুধ খাই বলেই হয়ত গরুর ওপর কৃতজ্ঞতা বোধ আমাদের বেশী। আর ছাগলের

দুধ জানতাম একমাত্র গান্ধীজীই খান।

গরুকে আমরা ভালবাসি। বিশেষ ধবধবে সাদা হৃষ্টপুষ্ট গরু সত্যিই ভালবাসার মতই। আমার মতে গরু পৃথিবীর নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। গরুর ওপর রচনায় আমরা গরুর ভাল দিকটাই লিখে গেছি, খারাপ দিকটা এড়িয়েই গেছি। যেমন গরুর দুটো শিং আছে লিখেছি, কিন্তু গরু শিং দিয়ে যে গুঁতোয় সে কথা কমই উল্লেখ করেছি। গরু ঘাস খায় লিখেছি, কিন্তু ঘাস না পেলে বাড়ির বেড়া ভেঙে ঢোকে, বা ফটক খোলা পেলে বাগান চিবিয়ে সাফ করে, গরুর অপকর্মের এই কাহিনী লিখি নি। আমাদের গরু-প্রীতির এসব বিশিষ্ট উদাহরণ বৈকি।

বড় হয়ে গরুর ওপর আর কখনও রচনা লিখতে হয় নি। আশ্চর্য নয় গরুর ওপরের অনেক রচনা জঞ্জালের স্তূপ থেকেই গরুরাই চিবিয়ে খেয়েছে। আজ যদি গরুর ওপর রচনা লিখতে হয়, অনেক কিছুই লিখতে পারব। লিখব, একদা গৃহপালিত গরু আজ পথে-ঘাটে-হাটে-মাঠে সর্বত্র অনাদরে ও অবহেলায় যথেচ্ছ প্রতিপালিত হচ্ছে। গরুরা বাজারেও বাবুদের থলি থেকে শাকসব্জী একটু অসাবধানী হলেই চুরি করছে। গরুরা আজকাল আদরের চেয়ে লাঠি খেতে ও হেঁই হেঁই তাড়া খেতে অভ্যস্ত। রাখাল আজ আর কোথায়? যারা আছে, তারা গরুর পাল মাঠে নিয়ে যাবার কাজ ছেড়ে কুলিগিরি কি আফিসে চাপরাশির কাজ করছে। গরুর গাড়ির যুগ এক-রকম শেষ হওয়ায়, গরুরা গাড়িটানার কাজ থেকে একরকম রেহাই পেয়েছে। গোয়ালঘরের অবলুপ্তি হয়েছে, এসেছে খাটাল। পৌরসভা সর্বত্র খাটাল স্থানান্তরের কোথাও বা উচ্ছেদের কাজে লেগেছে। লিখব, গরুর সংখ্যা ইদানীং কমে এসেছে। কে জানে গোয়ালের স্বর্গসুখ থেকে খাটালের দেওয়ানি আমে এসে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দ হারিয়ে ওরা ব্যথিত ও মর্মাহত। তাই গরুর স্থান নিচ্ছে মহিষেরা। ঘরে ঘরে তাই আজ মোষের দুধ, গরুর দুধ হয়ে উঠেছে দুষ্প্রাপ্য।

আজ গরুর ওপর রচনা লিখতে পারি অনেক কিছুই। পাতা ভরাতে পারি স্বচ্ছন্দে। লিখব, হায় গরু, ইদানীং তোমাদের শীর্ণকায় অস্থি-চর্মসার চেহারা দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। খেতে কি পাও না? তোমাদের খাবারের জন্যে আয়োজনই বা কি, সামান্য ঘাস। তাও তো এখন দুষ্প্রাপ্য। মাঠে ঘাস কোথায়? শুকনো ফেটে চৌচির মাঠে সবুজের চিহ্ন ক্রমশই নিঃশেষ হয়ে আসছে যে। যাও সবুজ মাঠ আছে, তাও বাড়ি ও রাস্তা তৈরি হয়ে গ্রাস হয়ে যাচ্ছে। দুঃখ হয় গরু, যখন দেখি অভাবে পড়ে বাজারে কি গৃহস্থের বাড়ি থেকে শাক-সব্জী চুরি করছ, আর ধরা পড়ে গালাগাল আর মার খাচ্ছ। বেদনা লাগে, গরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের কলা খাওয়ার সময় লোলুপদৃষ্টিতে তোমাদের তাকিয়ে থাকা দেখে। হায় গরু আজকের সমাজ কি অবস্থায় তোমায় নিয়ে এসেছে।

কিন্তু তাই বলে তোমার ওপর মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধার কোনই কমতি নেই। পারলে বড়লোকেরা এখনও শ্রাদ্ধে গোদান করছে। পিণ্ড খেতে এখনও তোমার খোঁজ পড়ে। ভক্তিমতী মহিলারা এখনও তোমায় ছুঁয়ে হাতজোড় করেন। গোমাতা তুমি ঠিকই আছ এখনও। যত ভক্তি-শ্রদ্ধা, ততই অবজ্ঞা: এই তোমার ট্র্যাজিডি গরু। যারা তোমায় ভক্তি করছে তারাই তোমায় পটাচ্ছে। যে মানুষেরা পুজোআচ্ছায়, ক্রিয়াকর্মে খাওয়াচ্ছে, সেই মানুষই আবার তোমায় না খাইয়ে মারছে। তবু এরই মধ্যে সান্ত্বনার কথা, গভর্ন-মেণ্ট দুধের ব্যবসা হাতে নিয়ে ডেয়ারী ফার্ম খুলে তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু সরকারি আদরে তোমাদের মন ভরছে কি?

সামাজিক চেতনা আর উন্নতির ক্রমবিকাশে গরু তুমি যতই তাড়া খাও, হ্যাংলা হও, আর অস্থি-চর্মসার হও, তোমাকে নিয়ে সবচেয়ে ঐতিহাসিক আলোড়ন হল, তোমার রাজনীতিতে প্রবেশ। হায় গরু জান না তুমি, গোহত্যা নিয়ে কত আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিল, মহান মহান সাধুসন্তদের বিবৃতি: রাজ্যসভা, লোকসভায় তোমাকে নিয়ে হৈ রৈ। গরু তোমার জেনে অপার আনন্দ হওয়া উচিত যে, কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক 'জোড়া বলদ'। তোমার জাতের ওপর এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি চাও?

গরু, তুমি ঘাস খাও। গরু তুমি দুধ দাও। দেশে ঘাস আজ শেষ হয়ে এসেছে। তবু যেমনি ঘাস পাও, যেটুকু পাও, তাই খাও। আর দুধ দাও। ঘাস যেমনি খাও, সারাজীবন তুমি খাঁটি দুধই দিয়ে এসেছো। কিন্তু সে দুধে গয়লা জল মিশিয়ে এসেছে সারাজীবন হায় গরু তুমি জান না। কখনও জানতেই পারবে না, তোমারই দুধ দুয়ে তোমাকেই কিভাবে ঠকানো হচ্ছে। যদি জানতে পারতে তুমি, আমি নিশ্চিত জানি, পৃথিবীর সব গয়লাদের তাড়া করে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে খতম করতে। কিন্তু হায় গরু, তুমি ঘাস খাও। তাই তোমার বুদ্ধি মোটা। তাই গয়লা তোমাদের অনন্তকাল ধরে ঠকিয়ে যাচ্ছে। তুমি শুধু সারাজীবন লেজ নেড়ে, মাছি তাড়িয়ে যাবে, আর জাবর কেটে যাবে।

গরু, সহজে রাগ না তুমি, একান্ত অসহ্য না হলে শিং বাগিয়ে গুঁতোবার জন্যে তাড়া কর না। গরু, সহজে ক্ষতি কর না তুমি। খুব খিদে না পেলে বাজারের শাক-সব্জীতে মুখ দাও না তাড়া খাবার জন্যে- কারুর বাগানে ঢুকতে চাও না মার খাবার জন্যে। প্রাণীদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে সরল, শান্ত, সাদাসিধে, হাসিখুশী। তোমার অখণ্ড উদারতা। তোমার ত্যাগের তুলনা নেই, দানের পরিমাপ নেই। তাই করুণতম পরিহাস এই যে,

এত কিছুর প্রতিদানে তোমার জন্যে পৃথিবীতে রয়েছে শ্রদ্ধা, ভক্তি আদরের মুখোসে অনাদর, অবহেলা আর প্রতারণা। আর সেলাম তোমাকে গরু; কোন গ্লানি গায়ে না মেখে, কোন অকৃতজ্ঞতার অনুশোচনা না করে, আশ্চর্য উদাসীনতায় তুমি শুকনো ভেজাল ঘাস খেয়ে যাচ্ছ, আর বিলিয়ে যাচ্ছ নির্ভেজাল পুষ্টিকর দুধ॥

★ যে শব্দ-তরঙ্গ শোনা যায় না ★

শ্রীসমীরকুমার নিয়োগী

পৃথিবীতে অসংখ্য ধরণের শব্দ আছে। কিন্তু সকল ধরণের শব্দকে আমরা শুনতে পাই না। শব্দ-কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে ১৬বারের কম বা ১৬০০০ বারের বেশী হলে, সেই শব্দ আমাদের কর্ণে শ্রবণ অনুভূতি জাগ্রত করে না। প্রতি সেকেণ্ডে ১৬০০০ বারের অধিক কম্পনযুক্ত শব্দ-তরঙ্গকে বলা হয় 'আলট্রাসনিক তরঙ্গ' (ultrasonic wave)। বাংলায় বলা হয় 'শব্দোত্তর তরঙ্গ'। শব্দোত্তর তরঙ্গকে ভিত্তি করে, বর্তমানে বিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা গড়ে উঠেছে।

সংক্ষিপ্ত পূর্ব ইতিহাস

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল ও পণ্ডিত পিথাগোরাসের সমযকাল থেকে শব্দ-বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুভসূচনা হয়। আমাদের জানা আবশ্যক---অ্যারিস্টটলই শব্দ-তরঙ্গের আবিষ্কারক। বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর সময় হতেই শব্দ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, গবেষণার কাজ দ্রুত চলতে থাকে। এর পর, বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে এই বিষয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করেন। তিনি বলেন, শব্দ-তরঙ্গ একপ্রকারের শক্তি মাত্র। এই তরঙ্গ যে কোন ধরণের কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে গমন করতে পারে। বিজ্ঞানী গ্যালটন ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে শব্দোত্তর তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেন। আধুনিক-কালে, গবেষণাকারীদের মধ্যে রিচার্ড-সন, সকোলভ, পিয়ার্স, বার্গম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীর নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

উৎপত্তি

বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। (১) কোয়ার্টজ জাতীয় পদার্থের কেলাসের (crystal) ভিতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ পাঠালে কেলাসটি ক্রমশ প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়। ইহার ফলে কেলাসটির চতুর্দিকের বায়ুস্তরে শব্দোত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়; (২) ঐ কেলাসের মধ্যে যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করে---কেলাসকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করলে, শব্দোত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি ঘটে। (৩) পরীক্ষা করে দেখা গেছে---কোয়ার্টজ কেলাসের পরিবর্তে বেরিয়াম টাইটানেট পদার্থের সাহায্যে এই তরঙ্গের শক্তি খুব বেশী হয়। (৪) যদি কোন পরিবর্তনশীল চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে লোহা অথবা নিকেল ধাতুর পাত খুব সূক্ষ্মভাবে কম্পিত হয়, তখন শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। (৫) বিভিন্ন আকৃতির কম্পনযুক্ত বস্তু ব্যবহার করে, আলোক তরঙ্গের মতো শব্দোত্তর তরঙ্গকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত করা যায়।

ব্যবহারিক প্রয়োগ

শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহারিক প্রয়োগ সত্যই আশ্চর্যজনক। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, নৌ-বিজ্ঞান, ধাতব-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন শিল্পে এই তরঙ্গকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সমুদ্রের নীচে সাবমেরিনের অবস্থান, সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়, সমুদ্রের নীচে কয়লার স্তর অনুসন্ধান, এবং মাছের ঝাঁকের অবস্থান নির্ণয় প্রভৃতি কাজে এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের আশ্চর্য প্রয়োগ দেখা যায়---ইলেকট্রোপ্লেটিং, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও রং করা, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি কাজে।

আধুনিককালে, বৈজ্ঞানিকগণ টেলিস্কোপ, টেলিভিশন, মাইক্রোস্কোপ, রেডার প্রভৃতি জটিল যন্ত্রপাতিতে এই তরঙ্গের ব্যবহার প্রণালী আবিষ্কার করেছেন।

একথা শুনলে অবাক হতে হয়---সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, ছোট ছোট ঘড়ি প্রভৃতি পরিষ্কার করার কাজে এই শব্দোত্তর তরঙ্গকে ব্যবহার করা হয়।

ধাতব পাত অথবা রবারের টায়ারের ভিতর কোন ফাঁক আছে কি না, তা এই তরঙ্গের সাহায্যে ধরা পড়ে।

কোন স্থানে আগুন লেগেছে কি না তা জানা যায়---শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে। চোর ধরবার যন্ত্রে এই তরঙ্গের সুন্দর প্রয়োগ করার পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করেছেন।

জিনিষপত্র শুষ্ক করবার কাজে, রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাণে, কাচ শিল্পে, এই নতুন আবিষ্কৃত তরঙ্গের সাহায্য লওয়া হয়। ছোট ছোট পোকামাকড় মারা, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সামগ্রী পরিষ্কার করার কাজে, তাছাড়া---ক্যানসার রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের সুন্দর প্রয়োগ আছে।

উপসংহার

শিল্পক্ষেত্রে, কারিগরী ক্ষেত্রে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গ এনে দিয়েছে এক নতুন পরিবর্তন। এই তরঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশেষ অগ্রণী। আমাদের দেশে এই তরঙ্গের কিছু কিছু ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে।

★ বিপদের বন্ধু ★

গোদাবরী নদীর তীরে এক বিশাল গাছ ছিল।

বহু পাখী রাতে আশ্রয় নিত এই গাছের শাখা-প্রশাখায়।

এই সব পাখীর মাঝে 'লঘুপতনক' নামে এক কাক ছিল।

এক রাতের শেষের দিকে, চাঁদ যখন প্রায় অস্তাচলে এবং ভোরের আলোর আভাস ফুটি-ফুটি করছে, ওই কাকটির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ মেলে সে দেখল যে, গাছের নীচে একজন পাখীধরা জাল হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

নিরীহ, অবোধ ছোট ছোট পাখী-গুলিকে ধরাই লোকটার মতলব বুঝে লঘুপতনকের মনে দুঃখ হল, আর সে ঐ লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

সে দেখল যে, লোকটা খোলা মাঠের উপর কিছু চাল ছড়িয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে নিজের হাতের সূক্ষ্ম জালটি তার উপর পেতে দিল।

কিছুক্ষণ পর একঝাঁক পায়রা উড়তে উড়তে সেখানে এল এবং চক্রাকারে ওই জাল বিছানো জায়গা-টির উপর ঘুরতে লাগলো উড়ে উড়ে।

ছড়ানো চালগুলির উপর চোখ পড়তেই, পায়রারা অস্থির হয়ে উঠলো নেমে গিয়ে ওই চাল কটি খাওয়ার জন্য।

কিন্তু ওই পায়রাদের দলপতি বা সর্দার ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে দলের পায়রাদের সাবধান করে দিয়ে বলল—'অত তাড়াহুড়ো করো না তোমরা, আগে দেখতে হবে যে, খোলা মাঠে এমনভাবে চাল ছড়ানো রয়েছে কেন।---এটা কি খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার নয়? হয়ত আমরা সকলেই ঘোর বিপদে পড়ে যাব ওখানে নামলে।'

রেবা দেবী

একটা লোভী পায়রা একথা শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠল---'তাবলে সামনে খাবার দেখেও কি বিপদের ভয়ে পেছিয়ে যেতে হবে নাকি?' এই কথা বলেই সে মাঠের উপর নেমে পড়ল, এবং তার দেখাদেখি অন্য পায়রাগুলিও নেমে এল।

বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে জালে বন্দী হয়ে পড়ল তারা সকলেই।

এভাবে বিপদে পড়ার জন্য ওরা খুবই ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়ল, এবং একযোগে দোষারোপ করতে লাগলো লোভী পায়রাটার ওপর।

ওদের সর্দার এবার বলে উঠল:---'এখন আর ওকে দোষ দিয়ে কি হবে? আমার কথা তো কেউ শুনলে না, সে যাহোক, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দ্যাখ কি করে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।'

'আমি বলি কি, সকলে মিলে জালটা মুখে করে নিয়েই উড়ে পালানো যাক, কি বল তোমরা, রাজী আছ?'

এবার আর সর্দারের কথা অবহেলা করল না পায়রারা, ওর কথামত সকলে মিলে জাল মুখে নিয়ে আকাশে উড়লো।

পাখীধরাটা জালশুদ্ধ পায়রারা আকাশে উড়ছে দেখে, 'হায়' 'হায়' করে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কিছু দূর ছুটে গেল ওদের পিছু পিছু, কিন্তু শীঘ্রই পায়রারা ওর চোখের আড়ালে চলে গেল।

রাগে, দুঃখে গজগজ করতে করতে লোকটা নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল।

পাখীধরাকে ফিরে যেতে দেখে, সর্দার পায়রা নিজের দলকে উদ্দেশ করে বললো--- 'ইঁদুরের রাজা হিরণ্যক আমার খুব পুরোনো বন্ধু, চল তার কাছে যাওয়া যাক, সে আমাদের অবস্থা দেখলে কখনই স্থির থাকতে পারবে না, জাল কেটে আমাদের মুক্ত করে দেবে।'

'বিপদের বন্ধুই তো আসল বন্ধু।'

--হিতোপদেশ থেকে গৃহীত।

পুতুল বিয়ে

গৌর মোদক

মোদের খুকু ব্যস্ত বড়ই আজকে মেয়ের বিয়ে,
খরচ হবে হাজার পাঁচেক গয়না-গাটি নিয়ে।
কাঠের গুঁড়োর পায়েস হবে আর কাগজের লুচি,
হরেক রকম মিষ্টি খাবার নানান ভাজা-ভুজি।
বর আসবে বিকেল বেলায় মাথায় টোপর পরে,
মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি খেলনা-মোটর চড়ে।
হাসির মাঝেই কাঁদে খুকু একা সে অন্তরে,
মেয়ে ছেড়ে কেমনে সে থাকবে একা ঘরে।
পুতুল-ঘরে আজকে খুকুর কাজের নাইকো সীমা,
একটি মাত্র মেয়ে তার নামটি অরুণিমা।
বেলা গেল, বিকেল হল ঐ এল যে বর,
হাল্কা হাসির হুল্লোড়ে আজ মুখর পুতুল ঘর।
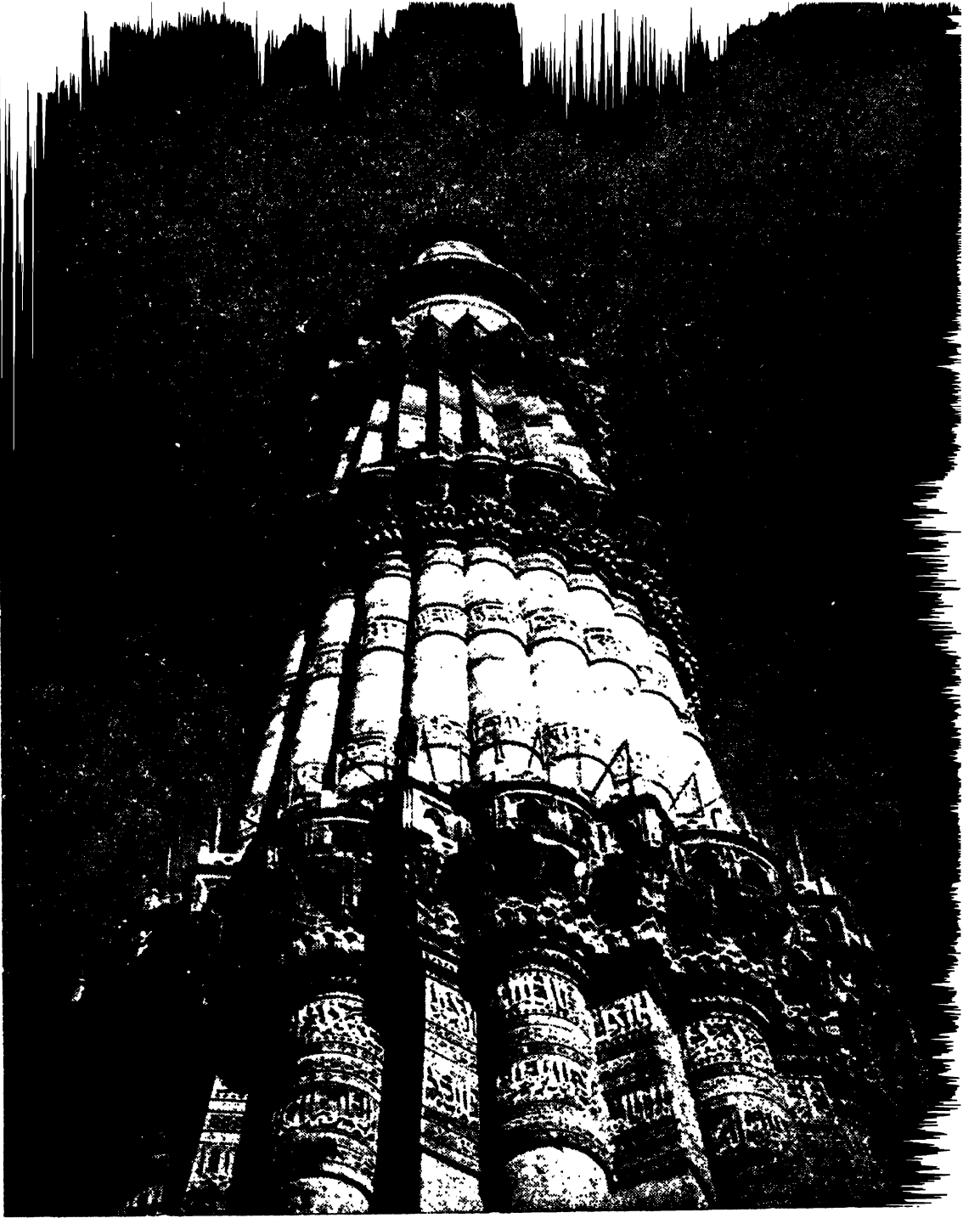
আকাশ

—স্বপনকুমার

মাসিক

বসুমতী

শ্রাবণ

১৩৭৭

॥ আলোকচিত্র ॥
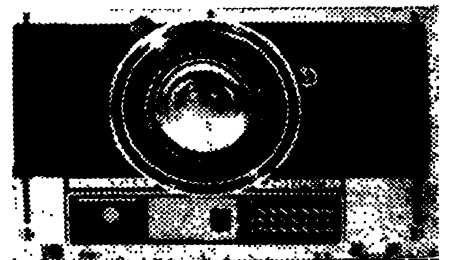
নান্তে —শিবশঙ্কর কাঞ্জিলাল

যাঁরা আলোকচিত্র পাঠাতে চান তাঁদের জন্য

* ছবির পেছনে ছবির বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।
* ছবি গ্লসি কাগজে পাঠাবেন ম্যাট কাগজে পাঠাবেন না।
* ছবি মনোনয়নের জন্য ছবির সংগে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন।
* ছবি বর্ধিত আকারে পাঠাবেন
* ছবি পাঠাবেন এই নামে

—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-১২

খাদক —বিন্দুশেখর বিশ্বাস

প্যারিসের পথে —রথীন রায়

মাসিক বসুমতী শ্রাবণ ১৩৭৭

বাঙলার পথে —মৃণাল রায়

বিশেষ মুহূর্তে —অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক বসুমতী

শ্রাবণ ১৩৭৭

★ স্যামুয়েল যোসেফ আগনন ★

১৯৬৬ সালে দু'জন সাহিত্যিক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। একজন সুইডেনের বিখ্যাত মহিলা কবি নেলী সাকেশ, আর একজন ইস্রায়েলের সাহিত্যিক স্যামুয়েল যোসেফ আগনন। এর আগে ১৯০৪ সালে দু'জন সাহিত্যিক ও ১৯১৭ সালে দু'জন সাহিত্যিক যুগ্মভাবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

স্যামুয়েল যোসেফ আগনন ১৮৮৮ সালে পোল্যাণ্ডের কাছে গ্যালিসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর জন্ম পোল্যাণ্ডে, জীবনের বেশীরভাগ সময়ই কেটে গেছে প্যালেস্টাইনে। স্যামুয়েল যোসেফ আগনন হিব্রু সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ কথাশিল্পী।

যোসেফ আগনন প্রথমে কবিতা লিখতে সুরু করেন। তিনি যখন কবিতা লেখেন তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর। হিব্রু ভাষাতে কবিতাগুলো লেখেন। ১৯০৮ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নাম 'অ্যাগুনট'। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

শ্রীঅরুণকুমার সেনগুপ্ত

১৯০৮ সালে যোসেফ আগনন প্যালেস্টাইনে চলে যান এবং জাফাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি জুইস কোর্টের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই বছরেই তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি অনেকগুলো ছোট গল্প লেখেন। ১৯১২ সালে আগনন প্যালেস্টাইন থেকে চলে যান। তিনি আসেন বার্লিনে। তিনি হিব্রু সাহিত্যের অধ্যাপক হন। এখানে তিনি বারো বছর থাকেন।

১৯২৪ সালে আগনন বার্লিন থেকে আবার চলে আসেন প্যালেস্টাইনে। তিনি জেরুজালেমে [illegible]। তিনি আবার লিখতে সুরু করেন। ১৯৩১ সালে তাঁর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস প্রকাশিত হল। এই উপন্যাসটি 'দি ব্রাইডাল ক্যানপি' নামে ইংরাজীতে অনূদিত হয়। ১৯৩৭ সালে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির নাম 'এ গেস্ট ফর দি নাইট'। ১৯৪৫ সালে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এটির নাম 'ইয়েসটারডে অ্যাণ্ড দি ডে বিফোর অব ডেজ গন বাই'।

যোসেফ আগনন হিব্রু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান বিয়ালিক পুরস্কার পান দু'বার। একবার পান ১৯৩৫ সালে, আর একবার পান ১৯৫১ সালে। এছাড়া তিনি ইস্রায়েল সরকারের কাছ থেকে ১৯৫০ ও ১৯৫৮ সালে পুরস্কার পান।

১৯৭০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী স্যামুয়েল যোসেফ আগনন মারা গেলেন।

সুজাতা কর্তৃক তথাগতকে পরমান্ন প্রদান শিল্পী : শ্রীতপতী বড়ুয়া

সুভাষচন্দ্র ও জাতীয় মুক্তি বাহিনী

প্রণতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেশজননীর সোনার অঙ্গ থেকে বিদেশী শাসনের শৃংখল মোচনের ভূমিকায় যাঁর অবদান শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় সগৌরবে চিত্রিত হয়ে আছে, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। শুধু ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট সীমায় নয়, শুধু একটি বিশেষ কাল বা গণ্ডীর মধ্যে নয়—সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পরিসরে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মহানায়কদের যে মিছিল দেখা গেছে, সুভাষচন্দ্রের আসন তাঁদের সকলের পুরোভাগে।

সুভাষ-জীবনের অনন্য কীর্তি আজাদ হিন্দ ফৌজ। সুদীর্ঘ কালব্যাপী ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে যে জাতীয় মুক্তিচেতনা অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, যে জাতীয়তার উত্তাল তরঙ্গ আসমুদ্রহিমাচল এই ভারতভূমিকে আন্দোলিত করে তুলেছিল, সেই মুক্তি অভিযানের সার্থকময় পরিণতি আজাদ হিন্দ ফৌজ। সুভাষচন্দ্র সেই মুক্তিবাহিনীর অবিস্মরণীয় রূপকার।

একথা অস্বীকার করার আজ উপায় নেই যে, আজাদ হিন্দ শেষ পর্যন্ত নিয়তির পরিহাসে দুর্ভাগ্যবশত নানা প্রকার দুর্যোগ ও বিপদের সম্মুখীন হলেও, বৃটিশ সিংহকে শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে পাততাড়ি গুটোতে সেই বাধ্য করেছিল। পরিণামে দুর্ভাগ্যের মুখ দেখলেও, তার পূর্বে যে কাজ সে করে গেল তার মূল্য অন্তহীন। আজকের স্বাধীনতা তারই সাধনার ফল। বস্তুত জাপানের মালয় বিজয় এক স্মরণীয় ঘটনা। পাশ্চাত্য শক্তি ধরাশায়ীকরণের দিকে রীতিমত উন্নত হলেও, এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নায়কদের ললাটও কুঞ্চিত করে তুলেছিল চিন্তার রেখায়। সে সময় থেকেই একরকম প্রমাণ হয়ে গেল যে, সমরবিদ্যায় ইউরোপের তুলনায় এশিয়াও পিছু পা নয়।

১৯৪১ সালের শেষাশেষি জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ ফুজিহারার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে মোহন সিং একজন। এর পরই তাঁর ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে এবং শেষ

জনগণমন অধিনায়ক

পর্যন্ত তিনি নিজে একটি মুক্তিবাহিনী সংগঠনে উদ্যোগী হন, যে বাহিনীর লক্ষ্য ভারতমাতার মুক্তি। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত বৃটিশ সরকারের সেনানীর অন্তররাজ্যে সেদিন দেশপ্রেম এক মহিমান্বিত মূর্তিতে বিকশিত হয়ে ওঠে। মোহন সিংয়ের সহায়তায় এগিয়ে এলেন মহান বিপ্লবনায়ক রাসবিহারী বসু। পরে জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোহন সিংয়ের মতের অমিল দেখা গেল, যার পরিণতিস্বরূপ ১৯৪২ সালের শেষাশেষি থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত মোহন সিংকে কাটাতে হ'ল ধৃত অবস্থায়।

জাতীয় মুক্তিবাহিনীর প্রথম পর্ব এইখানেই শেষ। দ্বিতীয় বা চরম পর্ব রূপ নিতে থাকল সুভাষচন্দ্র বসুর জাপান আগমনের পর থেকেই। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে জাপানে পৌঁছলেন সুভাষচন্দ্র। জার্মানী থেকে জাপানে সমগ্র পথ তিনি এলেন সাবমেরিনে। সুভাষচন্দ্র এসে সমগ্র বাহিনীর প্রাণসঞ্চার করলেন, একতায় উদ্বুদ্ধ করলেন, সুসংগঠিত করে তুললেন সমগ্র বাহিনীকে।

১৯৪৪ ও ১৯৪৫-এর প্রথমার্ধ আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। যদিচ প্রবল বাধা, প্রচুর প্রতিবন্ধকতার ভিতর তাঁদের এগোতে হয়েছে, প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে, তথাপি যে জ্বলন্ত দেশপ্রেমের এবং মুক্তি সচেতনতার পরিচয় আজাদ হিন্দ বাহিনী দিয়ে গেছেন, তা অভূতপূর্ব এবং তার গরিমা কোনদিনই ম্লান হওয়ার নয়।

আজাদ হিন্দের পরিণতিও কারো অজানা নয়, তথাপি পরবর্তীকালের সত্যানুসন্ধী, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ধর্মী ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাচক্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ চরম জয়গৌরব লাভ না করলেও তার অবদান, তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার কীর্তির মূল্য অপরিসীম এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মত দেশগতপ্রাণ মহান মুক্তিনায়ক বা সংগঠক পৃথিবীর বুকে কদাচিৎ জন্ম-পরিগ্রহ করে থাকেন।

: Salvation :

If you seek **your own salvation** you will **go to hell**. It is the salvation **of others** that you must **seek... and** even if you have to go to hell in working for other **that is worth** more than **to** gain **heaven by seeking your own salvation**... Shri Ramakrishna **same and** gave his life for the **world. I will sacrifice my life**: you also every one of you, **should** do **the same**. All those work and so forth one only a **beginning**. Believe me, from **the** shedding of our life blood **will** arise gigantic heroic **workers and** warriors of God **who will** revolutionise the **world**."

—*Swami Vivekananda*

॥ ছোট গল্প ॥

একতলায় বিরাট একটা হলঘর—সামনে ছোট্ট একটু বাগান। বাগানে ছোট্ট কাঠের দোলনা, স্লিপ, সী-স। এক-কোণে ছোট ছোট টবে পাতাবাহার, মাঝখানে নরম সবুজ ঘাস। হলঘরের মাঝে ছোট ছোট টেবিলে সাজানো হরেক রকমের বিল্ডিং ব্লকস—প্লাষ্টিক ক্লে, রঙীন চক, শ্লেট—খোলা তাকে সাজানো রবার প্লাস্টিক আর কাপড়ের খেলনা। এরই মাঝে ঘুর ঘুর করছে একদঙ্গল ছোট্ট বাচ্চা—তিন থেকে পাঁচ বছরের। এই সব-কিছুই পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখছিলেন রেণুদি। তারপর জয়ার দিকে ফিরে বললেন—'এই আমার স্কুল,—কী কাজটা পারবে বলে মনে হচ্ছে?'

চটকরে উত্তর দিতে পারলো না জয়া। রেণুদি কি জানেন একটা কাজের কী ভীষণ দরকার ওর? আর ম্যাট্রিক পড়া বিদ্যে নিয়ে ঘণ্টা তিনেকের চাকরীতে শ'খানেক টাকা রোজগার করা যে সহজ নয় তাও নিশ্চয় জানেন রেণুদি। কিন্তু জয়া শুনেছিল যে, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অনুভূতির মৌখিক প্রকাশ একদম পছন্দ করেন না রেণুদি। তাই মুখ নামিয়ে শুধু বললে—'পারবো'।

'বেশ,—তাহলে এখন থেকেই কাজে লেগে পড়ো না কেন?'

ওর দিকে খুশীভরা চোখে তাকালেন রেণুদি। 'আচ্ছা, তার আগে এসো আমার অফিস ঘরে—এখানকার শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলে নিই। তোমার ফর্মাল ট্রেণিং নেই আমি জানি,—কিন্তু শুধু মাত্র পুঁথিগত বিদ্যার ওপর আমি তেমন জোর দিই না। বাচ্চাদের মনটাকে গড়ে তুলতে গেলে যে অভিজ্ঞতা চাই, সেটা তো তোমার আছে,—নিজের বাচ্চা যখন মানুষ করেছ—'

জয়ার মুখটা পাংশু দেখাচ্ছিল। রেণুদির নজর এড়ালো না সেটা। চট করে প্রসংগ পাল্টে বললেন—'চলো তার আগে এক কাপ চা খেয়ে তোমার জয়েনিংটা সেলিব্রেট করা যাক—'।

চা খেতে খেতে আরো অনেক কথা বললেন রেণুদি। বাচ্চাদের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন নানা কাগজে। সেগুলির ফাইল বের করে দিয়ে বললেন—'অবসর সময়ে পড়ে দেখো—' অন্য যে দুজন টিচার আছেন, স্নেহ বিশ্বাস আর সুপ্তা ধর—তাঁদের ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু জয়া আর কিছুতেই মন দিতে পারলো না ভালোভাবে। শিশু-শিক্ষাপ্রণালীর আধুনিকতম ধারা—রেণুদির বিলিতী টি-সেটে দামী লপচু

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

চায়ের সুগন্ধ, আর হলঘরে হাসিখুশী বাচ্চাদের কলরব,—সব কিছু ছাপিয়ে বার বার মনে পড়তে লাগলো জানালা ঘেষে বসা পংগু টুটুনের ছবিটা। টুটুন এই ফাল্গুনে পাঁচ পেরিয়ে ছ'য়ে পা দেবে। ছোট্ট টুটুন জন্মের পর যার আধবোজা চোখ আর মুঠিকরা লালচে ছোট্ট হাতের দিকে তাকিয়ে জয়ার মনে হয়েছিল, জীবনে এর চেয়ে বেশী আর কী কাম্য থাকতে পারে। ছোট্ট টুটুন,—ভিজে কাঁথা বদলাতে একটু দেরী হলে কেঁদে, ককিয়ে, পা ছুঁড়ে একাকার করত। সেই টুটুন একটু একটু করে বড়ো হোলো, ঐ স্কুল ঘরের বাচ্চাদের মতোই হাসিখুশী,—ওদের মতোই চঞ্চল পায়ে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াতো। জয়ার ছোট্ট গৃহস্থালীর টুকিটাকি তছনছ করে দিত। কিন্তু তারপর—

রেণুদির কথায় চমক ভাঙলো জয়ার। সুপ্তাকে বললেন—'যাও তো সুপ্তা,—জয়াকে নিয়ে 'এ' গ্রুপের গল্প বলার ক্লাসে দাওগে—'

"চলুন ভাই জয়াদি,—গল্পের বইগুলো বার করে দিচ্ছি—'

জয়া একটু ইতস্তত করে বললে—'একটা কথা বলবো রেণুদি? আজ না হয় একটা ক্লাস করেই বাড়ী যাই। প্রথম দিন, আর আমিও ঠিক তৈরী নই—'

'বেশ তো, তাই যেয়ো—'

গল্পের ক্লাস নিতে বেশী সময় লাগলো না। নতুন মুখ বলেই হয়তো, বাচ্চারা কাছে ঘেঁষলো না বেশী। সুপ্তা ধর বলছিল, শুক্লা নাকি খুব মজার মজার প্রশ্ন করে। কিন্তু আজ সবাই চুপচাপ শুনে গেল শুধু।

যাবার সময় রেণুদি বললেন,—'কাল আটটায় স্কুল সুরু। মিনিট দশেক আগে এলেই ভালো—' বাড়ী ফিরে কড়া নাড়তে দরজা খুললো মোতির মা।

'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে বৌদি?'

'প্রথম দিন কি না, তাই। টুটুন কী করছে?'

'আর কী করবে?' মোতির মার গলায় বিরক্তির ঝাঁজ লাগলো। জানালার ধারে বসে। বলছিলাম চানটা সেরে রাখতে—'

'থাক, আমি চান করাচ্ছি ওকে। বাবুর খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হয়েছে তো?'

'তুমি বাড়ী ছিলে না বলে দাদাবাবুর খাওয়া-দাওয়া দেখবো না—

প্রশ্ন

তুমি কী আমাকে সেরকম লোক পেলে নাকি?' মোতির মাকে আহত মনে শোনালো।

'না না বাপু—আমি তা বলি নি'—এত বাজে কথাও বলতে পারে মোতির মা। ওপরে চলে এলো জয়া।

জানালার পাশে চেয়ারে বসেছিল টুটুন। পায়ের শব্দে এদিকে তাকালো। জয়াকে দেখে ওর ফ্যাকাশে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'মা, তুমি তাড়াতাড়ি এসে গেছ—'

ওর কপালে একটা চুমু খেয়ে জয়া বল্লে—'তুমি আমার সোনামণি কিনা, তাই। এই দেখ, কী এনেছি তোমার জন্যে—'।

রঙীন চকের প্যাকেটটা খুলে ধরল জয়া, টুটুন সেগুলি একটু নাড়াচাড়া করে বলল—'বা রে, আমি তো বলেছিলাম মার্বেল আনতে—'

'বেশ তো, কাল আনবো—'।

'মা, তুমি কী রোজ স্কুলে যাবে?'

'হ্যাঁ বাবা, রোজ না গেলে ওরা টাকা দেবে কেন?'

'বাবা তো টাকা আনে—'

'আমাদের যে আরো বেশী টাকা চাই---তোমাকে এখন ভালো ভালো ওষুধ খাওয়াতে হবে তো। আচ্ছা, এবার চলো, চান করবে।'

'এখন ইচ্ছে করছে না। তুমি আগে চান করো।'

স্নানের ঘর নীচে। যদিও টুটুনের স্নানটা তোলা জলে দোতলার বারান্দাতেই সারতে হয়। আলনা থেকে শাড়ী, তোয়ালে নিয়ে নীচে নামতে যাবে জয়া, তখন টুটুনের ডাক শোনা গেলো—'মা—'

জয়ার বুকটা ধক্ করে উঠলো। মাঝে মাঝে টুটুন এমন অসহায় ভাবে ডেকে ওঠে। ব্যস্ত হয়ে ওর পাশে গিয়ে বলল—'ডাকলে কেন টুটুন—'?

'মা—' টুটুনের দুই চোখে শাণিত জিজ্ঞাসা—'ভালো ভালো ওষুধ খেলে আমার পা ভালো হয়ে যাবে তো? আমি হাঁটতে পারবো—?'

'নিশ্চয়ই, তুমি এবার শীগ্‌গীরই ভালো হয়ে যাবে দেখো—'

কিন্তু জয়ার কণ্ঠে তেমন আশ্বাসের সুর ফুটলো কই? হয় তো ছোট্ট টুটুনও বুঝতে পারলো সেটা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—'তুমি তো কবে থেকে বলছ—'এবার নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে'---'জানো মা বাবা বলেছে, ভালো হয়ে গেলে একদিন মাঠে নিয়ে যাবে---বাবার সংগে রেস লাগাবো। বাবা নিশ্চয়ই হেরে যাবে, না?'

'নিশ্চয়ই,---কিন্তু তুমি এবার চুপটি করে বোসো তো,---চানটা সেরে আসি।'

কিন্তু সারাটা দিন ছোট্ট টুটুনের প্রশ্নটাই জয়ার মনটাকে কুরে কুরে খেল। বাড়াতে একশো টি টাকা। সংসারের সুরাহা হবে নিশ্চয়ই। ওষুধপত্র, টুটুনের ট্রিটমেণ্ট—সবই হয়তো হবে। কিন্তু তবু,—টুটুন কী ভালো হবে? আবার আগেকার মতো হেঁটে-চলে বেড়াতে পারবে?

সুহৃদ যখন অফিস থেকে ফিরলো, জয়া তখন রাতের রান্নার যোগাড়ে ব্যস্ত। মোতির মা এসে খবর দিল—'বাবু এসেছেন বৌদি—'

'বলগে, চা হয়ে যাবে এক্ষুণি।' উনুনে কেটলীটা চাপালো জয়া। 'টুটুন কী করছে?'

একটু পরে সুহৃদ এসে মোড়াটা টেনে নিয়ে রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় বসলো। 'চাকরীটা হয়ে গেল তাহলে---'

'কে বললে তোমায়?'

টুটুন ভালো হয়ে গেলে কী কী করবে তারই একটা লম্বা ফিরিস্তি দিল। মাঠে যাবে---ক্রিকেট খেলবে---'

'থাক, আর বোলো না---শুনতে পারছি না—চায়ের পেয়ালাটা সুহৃদকে দিয়ে উঠে যায় জয়া। কাঁদতে পারলে মনটা একটু হালকা হোতো হয়তো। কিন্তু টুটুনের দৃষ্টি বড়ো তীক্ষ্ণ। জয়ার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝে ফেলবে সব।

'মা তুমি কাঁদছিলে বুঝি?' কেন, এ প্রশ্নটা আজকাল আর করে না, এটুকু ছোট্ট মানুষটাও যেন বুঝে গেছে জয়ার কান্নার সংগে ওর পা ভালো না হওয়ার সম্বন্ধটা। তাই হয়তো পরমুহূর্তেই আচমকা প্রশ্ন করে বসবে—'আমার পা বুঝি আর ভালো হবে না মা?'

জয়া তাই অকারণেই টেবিল-চেয়ার ঝাড়ে, মোছে---ফিরে এসে রান্নায় মন দেয়। একসময় উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসে—'আজ কী খাবিরে টুটুন? রুটির সংগে আলুর দম?'

পরদিন খুব ভোরেই ওঠে জয়া। আটটার একটু আগেই স্কুলে পৌঁছতে হবে বলে দিয়েছেন রেণুদি। যাবার আগে টুটুনের খাবার গুছিয়ে যেতে হবে। সুহৃদের জন্য অন্ততঃ ভাতে-ভাত। সময় যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।

সুহৃদের জন্য চা নিয়ে এসে ডাকে ওকে,—'ওঠো, চা রেডি—'। তারপর টুটুনকে জাগাতে গিয়ে দেখে জেগেই আছে ও।

'তুমি আজ অনেক তাড়াতাড়ি উঠে গেছ টুটুন—'

'তুমি আজ স্কুলে যাবে, মা, মা?'
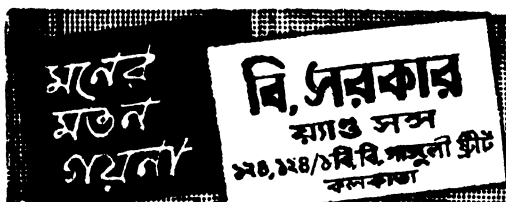
'হ্যাঁ, বাবা—'

'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো কিন্তু। নইলে আমার মন খারাপ করবে—'

'নিশ্চয়ই। আর আজ মার্বেল নিয়ে আসবো তোমার জন্যে—'

'আচ্ছা মা'—হঠাৎ টুটুন জয়ার বুকে মুখ লুকায়—'তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন তোমারও তো এরকম পায়ের অসুখ হয়েছিল, না? তুমি তো তার পর ভালো হয়ে গিয়েছ, না?'

টুটুনের কালো কোঁকড়া চুলগুলির মধ্যে জয়ার আঙুলগুলো স্তব্ধ হয়ে যায়। কী জবাব দেবে সে? ঠোঁট কামড়ে কোনমতে কান্নাটা ঠেকায় ও। কেন এমন দুঃখ পেতে হোল টুটুনকে? নিজের মনকে অবিরত প্রশ্ন করে চলেছে ও। কর্মফল,—ভগবান, এসব কতকগুলি অর্থহীন কথা। কোন মানে হয় কী, তা না হলে খুনী, চোর, দস্যু কালোবাজারীরা নিশ্চিন্ত আরামে হেঁটে চলে বেড়াবে, আর এ ঘরের জানালার মরচেপড়া গরাদগুলো ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে পংগু টুটুন। কোনমতে টুটুনের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসে ও।

কিন্তু জীবনের সব প্রশ্নগুলি সব সময়ই কী এড়ানো যায়? স্কুলের হলঘরটায় যখন সেই আর সুপ্তার সংগে সেদিনের ক্লাশের টুকিটাকি ঠিক করছিল জয়া, ঠিক তখনই বিরাট ভেঁপু বাজিয়ে স্কুলের বাসটা এলো। আর একটু পরেই হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এলো একদঙ্গল বাচ্চা একঝাঁক প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো হলঘরে, বারান্দায়, লনে। কিন্তু জয়ার চোখে পড়লো শুধু ওদের চঞ্চল পাগুলো, কালো, ফর্সা, রোগা, মোটা, সুগঠিত একরাশ পা, আর এই চঞ্চল পাগুলো ছাপিয়ে ওর চোখে ভেসে উঠলো পংগু একজোড়া পা—আর সকালের সেই প্রশ্নটা যেন মনে সহস্র ফণা তুলে উঠলো, কেন—কেন? জয়ার চোখটা কেমন অন্ধকার করে এলো।'

'ও কী জয়াদি—আপনার শরীর খারাপ করেছে নাকি?'

চেয়ারটা ধরে নিজেকে সামলে নিল জয়া। বুকের কাছে কেমন একটা ব্যথা। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে পারছে না জয়া। ঐ চঞ্চল পাগুলোকে সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু সে কথা কাউকে বলা যাবে কী? সুহৃদই বা কী বলবে? এমন চমৎকার চাকরী, ভালো মাইনে। আবার দোরে দোরে উমেদারী করতে হবে। কিন্তু এখানে। প্রতি মুহূর্তে জয়ার হৃদয়কে মাড়িয়ে যাবে ঐ চঞ্চল পাগুলো। না,—পারবে না জয়া। সুপ্তার দিকে ফিরে বলল—'রেণুদি কখন আসবেন বলতে পারো ভাই? ওঁর সংগে দরকারী একটা কথা ছিল—।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

আলোছায়ার অন্তরালে

শিপ্রা দত্ত

পুরীর সমুদ্রসৈকতে একদল কিশোর খেলছিল। গুরুগম্ভীর শব্দে কুটিল ফণা তুলে সমুদ্রের ঢেউগুলি তীরে ভেঙে পড়ছিল। ভাঙা ঢেউ-এর বুদ্বুদমালা বালুরাশিতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে। তার সঙ্গে ভেসে আসছিল, সাগর হতে নানা রং-বেরং-এর নানা আকৃতির ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি সামুদ্রিক সম্পদ।

সমুদ্রের উত্তাল হাওয়ায় কিশোর-দলের চুল অবিন্যস্ত। তাদের পরিধেয় বস্ত্র সবারই এক রকম। দেখে মনে হয়, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বা আশ্রমের বাসিন্দা এরা। যদিও বয়স প্রায় সবারই এক বা ২।১ বছরের এদিক ওদিক, কিন্তু আকৃতিতে, রঙে-চেহারায় সকলেই আপন আপন স্বাতন্ত্র্য যেন বজায় রেখেছে।

কিশোরদের মধ্যে একজন ছেলের চেহারার গঠন ও সৌন্দর্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, কেশদাম কুঞ্চিত কাল, ভাসা ভাসা বড় চোখ, পাতলা রক্তিম ঠোঁট। বাঁশীর মত নাক, টানা সরু ভ্রূ। বড় বড় চোখের পাতা, প্রশস্ত ললাট। মুখে একটা দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। দেখলে কারো অনুমান করতে ভুল হবে না যে, ছেলেটির উচ্চ বংশের কৌলিন্য আছে।

এই কিশোর বালকটির নাম রণবীর রায়। তাকে কিশোর দলের দলপতি বলে মনে হয়। সবাই যেন তার আনুগত্য স্বীকার করেই আছে। রণবীরের হুকুমে তারা যেন সব কিছু করতে সদা প্রস্তুত।

রণবীরকে তার সঙ্গী-সাথীরা ভালবাসে, ভয় করে, বিশ্বাস করে, রণবীরের প্রতি সবারই একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা লাভের জন্য রণবীরের কোন প্রয়াসই নেই। এ যেন তার অনায়াসলভ্য সম্পদ।

কিশোর দল যখন খেলায় ব্যস্ত, তখন হঠাৎ একজন নারীর—বাবুয়া, আমার বাবুয়া—এই আর্তরব তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারা দেখল—সমুদ্রতটে একজন ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা ও স্বাস্থ্যবান একজন বালক। বালকটি খেলতে খেলতে হাসিমুখে উত্তাল ঢেউ-এর বিস্তৃত মুখের দিকে ছুটে যাচ্ছে, তার পিছনে ছুটে চলেছে একজন ভদ্রলোক ও আর্তকণ্ঠে একজন মহিলা।

রণবীর এই দৃশ্য দেখে বিদ্যুৎ-গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগর বুকে। রণবীর ও বাবুয়া মুহূর্তের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। এক বিরাট ঢেউ গর্জে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল তটে। ভদ্রলোক ও মহিলার ভয়ার্ত স্বর দিকে দিকে প্রতিধ্বনি তুলল।

আশ্রমিক বালকেরা মুহূর্তের জন্য যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অবিলম্বে তারা যেন তাদের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ছুটে সেই দম্পতির নিকট যেয়ে বলল—

আপনারা অধীর হবেন না। রণবীর খুবই পটু সাঁতারু। সে নিশ্চয় আপনাদের ছেলেকে উদ্ধার করতে পারবে।

ভয়বিহ্বল চিত্তে ভদ্রলোক কিশোর দলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তোমরা কোন নুলিয়াকে ডাকো। ছেলেটি নিজেই ছোট। সে কি করে আমাদের বাবুয়াকে রক্ষা করবে? না জানি আবার কোন্ মা-বাপের সন্তানকে আমরা বিপদের মুখে ঠেলে দিলাম। যাও তোমরা একজন দক্ষ নুলিয়াকে ডেকে আনো। যত টাকা সে চায়, আমি দেব। এই কিশোর দুটির প্রাণ যেন সে রক্ষা করে।

কিশোর দলের মধ্যে দুটি ছেলে তাদের সহচরকে বলল—

—তোরা এখানে থাক্। দেখ রণবীরকে দেখা যায় কিনা। আমরা গিয়ে নুলিয়াকে ডেকে আনছি—বলেই তারা তীরবেগে ছুটে চলে গেল।

অপেক্ষক কিশোরদলের অন্যতম শেখরদম্পতীকে লক্ষ্য করে বলল—

রণবীর ডুব সাঁতারে ওস্তাদ। বিশেষ করে ঢেউ-এর নীচে সাঁতার দিয়ে সে অনেক দূর চলে যেতে পারে। সাঁতারে সে অনেক প্রাইজ, মেডেল পেয়েছে। হামেশাই তো সে কত ডুবন্ত লোককে উদ্ধার করে। এবারও নিশ্চয় সে আপনাদের ছেলেকে বাঁচাতে পারবে। যে কোন দক্ষ নুলিয়া হতে সে সাঁতারের কৌশল ভাল জানে।

রোরুদ্যমানা মহিলা উত্তর দিলেন—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাছা। তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। আমার বাবুয়া বাঁচলে বাবা জগন্নাথের মন্দিরে আমি পুজো দেব। তোমাদের বন্ধুকেও পুরস্কৃত করবো। বাবা জগন্নাথ, তোমাকে দর্শন করতে এসে এমনভাবে যেন আমাদের সোনার মাণিককে হারাতে না হয়।

ভদ্রলোক উদ্বিগ্নমুখে বললেন—

এমনভাবে ঢেউএর মুখে ছেলেটিও ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরের ছেলে, ভগবান এদের দু'জনকে রক্ষা কর।

এভাবে স্বামী-স্ত্রী যখন সন্তান শোকে নানা বিলাপ করে দেবদেবীর

উদ্দেশে মানত করছে, তখন একটি নুলিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কিশোর দুটি ফিরে এলো।

কিশোর দলের চোখ সাগরের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সাগরের প্রতি জল বুদ্বুদের মধ্যে তাদের চির পরিচিত মুখটিকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দূরে বহু দূরে ছোট্ট একটা মাথা যেন মাঝে মাঝে উঠে আবার ডুবে যাচ্ছে। তারা এতদূর হতে ঠিক বুঝতে পারছে না---ঐ কাল মাথাটি কি রণবীরের অথবা কোন সামুদ্রিক জীবের।

তাদের দামাল সাথীটির উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তারা জানে রণবীর আপ্রাণ চেষ্টা করবে বালকটিকে রক্ষা করতে। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু অঘটনও ঘটে থাকে।

সাঁতারে অপটুজন অনেক সময় জল-ভয়ে ভীত হয়ে এমনভাবে রণবীরকে আঁকড়ে ধরে যে—তাতে রণবীরের জীবনও বিপন্ন হবার উপক্রম হয়। কিন্তু প্রতিবারই রণবীর কৌশলে তাদের বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে—ডুবন্ত লোককে কৌশলে টেনে আনে।

দলের মধ্য হতে গোপাল বলল—

একটা ছোট নৌকার ব্যবস্থা করলে হয়। যদি রণবীর অনেকদূরের চলে যেয়ে থাকে—ক্লান্ত হয়ে যদি এতটা আসতে না পারে, আমরা কয়েকজন ঐ নৌকা হতে তাদের তুলে নিতে পারবো।

গোপালের প্রস্তাব ঐ দম্পতি যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এবং মেছোদের একটা ছোট্ট নৌকাকে এই 'রিলিফ' কাজের জন্য কয়েকজন ছেলেসহ পাঠিয়ে দিলেন। পাঠাবার সময় তাঁরা বললেন---

তোমরা যারা সাঁতার জান, কেবল তেমন দু'তিন জন যাও। এই বিপদের মুখে তোমাদের বন্ধুকে পাঠিয়ে চিন্তান্বিত। তারপর আবার তোমাদেরও অন্য বিপদে ঠেলে দিতে চাই না। তবুও না পাঠিয়েও যে মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না।

নৌকা নিয়ে দুটি তিন ছেলে রণবীরের খোঁজে ছুটল। নুলিয়াও তুফ সাঁতার দিয়ে চলেছে। এমন সময় অন্যান্য কিশোরেরা দেখলো তাদের থেকে কয়েকগজ দূরে যেন সাগর পারে কি একটা উঠেছে।

দূর হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। শেখরের মনে কেমন সন্দেহ হওয়ায় সে ছুটে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল কিরণ, প্রবাল, বিনয়---দম্পতিকে সান্ত্বনা দিতে আরও কয়েকজন রয়ে গেল।

শেখরদের দল ছুটে গিয়ে দেখল তাদের অনুমান সত্য। রণবীর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বালকটিকে পিঠে করে তীরে উঠেছে। ছেলেটি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে। রণবীরও খুবই ক্লান্ত।

শেখরের দল তক্ষুণি ছেলেটিকে নানা প্রক্রিয়ায় সে যে জল খেয়েছে, সেই সব জল বের করে তাকে জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। ওদিকে রণবীর খানিকক্ষণ নির্জীবের মত পড়ে থেকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল---

---ছেলেটি বেঁচে আছে তো?

ততক্ষণে ঐ দম্পতি অন্যান্য কিশোরদের নিয়ে ছুটে আসছে। তাঁরা নিকটে এসে দেখলেন ইতিমধ্যে ছেলেরা বাবুয়া যে জল খেয়েছে---তার অনেকটা বের করেছে। বাবুয়া যেন আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে।

বাবুয়ার মা "আমার---বাবুয়া" বলে তাকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই কিশোর-দল বাধা দিয়ে বলল---

—এখন নয়। একটু অপেক্ষা করুন। আগে ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে দিন। সঙ্গে যদি আপনাদের গরম দুধ বা কফি কিছু থেকে থাকে বরং তাই ওকে দিন।

ভদ্রলোক কিশোর দলের সেবা-পরায়ণতা ধা একনিষ্ঠতায় তুষ্ট হয়ে নিজেদের স্বার্থপর আচরণে লজ্জিত হয়ে বললেন---
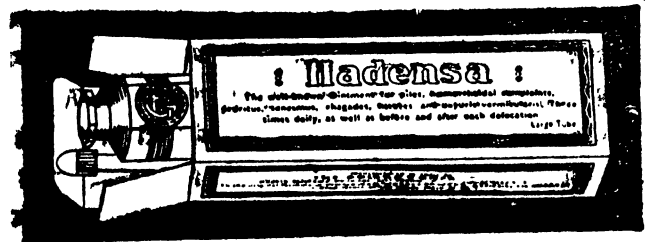
। —তোমাদের বন্ধুটির খবর কি ? ও কেমন আছে ? চল তাকে দেখি।

ততক্ষণে রণবীর নিজেকে অনেকটা সুস্থ করে সবে উঠে বসেছে। কিন্তু তার সমস্ত মুখে তখনও ফুটে রয়েছে ক্লান্তির রেখা। তার সমস্ত চোখ জুড়ে শ্রান্তির চিহ্ন। সে তার ক্লান্তমুখ তুলে জিজ্ঞেস করল—আপনার ছেলে ভাল আছে তো ?

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতার রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন—

—হ্যাঁ। বাবা। তোমার জন্য বাবুয়াকে আজ আমরা ফিরিয়ে পেয়েছি। কিন্তু তোমার এ ঋণ যে জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ করতে পারবো না। তুমি বড় ক্লান্ত। একটু কফি খাও।

ক্লান্তিমাখানো হাসির রেখা রণবীরের রক্তিম ঠোঁটে ফুটিয়ে সে উত্তর দিল—ধন্যবাদ, আমরা আশ্রম বালক। তাই কফি বা অন্য কোন পানীয় আমাদের কাছে নিষিদ্ধ।

—কিন্তু রোগীর জন্য যে অনেক নিষিদ্ধ খাবারও ডাক্তার ব্যবস্থা করে থাকেন। তাই মনে করেই না হয় খাও। এতে শরীরটা গরম হবে। একটু সুস্থ বোধ করবে।

বিনয় বিনয়সহকারে বলল—আপনি বৃথাই এসব বলছেন। রণবীর আশ্রমের আদর্শ সন্তান। জীবন থাকতে সে কখনও আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করবে না। বরং আমি একটু দুধ নিয়ে আসি ওদের দু'জনের জন্য —বলেই বিনয় আশ্রমের উদ্দেশ্যে ছুটে গেল।

ভদ্রলোক রণবীরের সুন্দর সুঠাম দেহ ও সুকুমার কান্তির দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন—ভগবান যাকে দেন, তাকে উজাড় করেই দেন। তাই রূপেই শুধু তুমি অনিন্দ্য নও, গুণেও তুমি অতুলনীয়। এই কচি বয়স হতে নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যকে রক্ষা করছ।

তুমি কার ছেলে? তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে অভিনন্দন জানিয়ে আসবো, এমন অমূল্য রত্নের অধিকারী বলে। তোমাদের ঠিকানা কি? তুমি কোন্ ক্লাসে পড়? তোমাকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই। তুমি কি চাও, বাবা? কি পেলে তুমি খুসী হবে? তুমি আজ আমার যে উপকার করেছো, কোন কিছুর বিনিময়েই তার প্রতিদান দেওয়া যায় না। তবু তোমার রুচি ও পছন্দমত কিছু তোমায় দিতে পারলে আনন্দ পাবো।

করুণ হাসি খেলে গেল রণবীরের ক্লান্ত শ্রান্ত মুখে। সে উত্তর দিল—মা-বাবা হারানো অনাথ আশ্রমের ছেলে আমরা। অন্যের জন্য আমাদের এই ব্যর্থজীবন দানই তো আমাদের কর্তব্য। কোন কিছুর লোভে আমি আপনার ছেলেকে রক্ষা করিনি। আমায় মাপ করবেন। কোন প্রতিদান গ্রহণে আমি অক্ষম।

প্রবাল বলল—রণবীর একাদশ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র। প্রতি বছর পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করে থাকে এবং বোর্ডের পরীক্ষাতেও সে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পাবে—এই আশাই সবাই করছেন।

ঐ যে স্বামীজীরা আসছেন। তাঁদের থেকেই রণবীরের গুণাগুণ সম্বন্ধে আরও জানবেন। খেলাধূলায়ও সে ফার্স্ট বয়। প্রতিবার সে অনেক কাপ ও মেডেল পায়। কিশোর দল স্থানীয় অনাথ মন্দিরের আশ্রমিক। এই আশ্রম পরিচালনা করেন জনৈক স্বামীজীর শিষ্যরা। স্বামীজী কালে ভদ্রে এখানে আসেন। তিনি ভারতের কোন পর্বতচূড়ায় নির্জন সাধনায় কালাতিপাত করেন, তা অনাথ মন্দিরের অন্যতম প্রধান স্বামীজী বীরানন্দ ছাড়া কেউই জানেন না। একমাত্র তাঁর সঙ্গেই সেই সাধক মহাপুরুষের যোগাযোগ আছে।

অনাথ মন্দিরের বাসিন্দারা যদিও প্রায় সবাই অনাথ, কিন্তু স্বামীজীদের অকপট স্নেহের ঝর্ণায় এরা স্নাত। তাই হতভাগ্য সন্তানরা পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত হলেও, তার অভাব অনুভব করে না।

স্বামীজীদের অপত্য স্নেহনীড়ে এরা কে কবে থেকে এসে বাসা বেঁধেছে তা অনেকেই জানে না। স্বামীজীদের স্নেহের সঙ্গে জড়িত আছে তাঁদের আদর্শ। স্বামীজীদের আদর্শই আশ্রম বালকদের উদ্বুদ্ধ করে তাঁদের মতই আদর্শবান হতে।

কিশোর বালকদের মন এখনও ভিজেমাটির মতই নরম। যে ছাঁচে ঢালা যায়—সেই রূপই তারা নেয়। কৈশোরকালটাই জীবনে মধুর সময়। এ যেন মাঠের কচি সবুজ দূর্বা ঘাস—যাঁদের দিকে তাকিয়ে মন আনন্দে ভরে উঠে।

স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগের বয়স এটা। কিছু করবার, কিছু গড়বার জন্য তখন মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এই বয়সে কিশোররা সামাজিক হয়ে উঠতে চায়। এই বয়স হতে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ শিশুদের মধ্যে জাগে। এবং ভবিষ্যৎ আত্মবিকাশের প্রথম সোপান এই কৈশোরকাল।

স্বামী বীরানন্দ তাই এই কিশোর দলকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবার সবরকম সুযোগ দিয়ে থাকেন। তারা আশ্রমের বাগান নিজ হাতে করে। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বয়ঃকনিষ্ঠ আশ্রমিক বালকদের তত্ত্বাবধান করে থাকে। অবশ্য প্রতি ৮।১০টি কিশোর দলের প্রতি থাকে অনুরূপ দলের বালকদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এবং প্রতিটি দলের দলপতি হচ্ছেন এক-একজন ব্রহ্মচারী বা স্বামীজী।

এইভাবে এদের মধ্যে গড়ে ওঠে কেবল দায়িত্ববোধই নয়, এরা পরস্পর পরস্পরকে স্নেহ-প্রীতির ডোরে বেঁধে পরস্পরকে ভালবাসতে শেখে। এরা যেন একটি বড় পরিবারে বাস করছে।

স্নেহের শাসনের মধ্য দিয়েই স্বামীজীরা এইসব হতভাগ্য সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত পত্তন করেন।

অনাড়ম্বর এই অনাথ মন্দির। কিন্তু আন্তরিকতা এবং স্বাদেশিকতা পূর্ণ।

যুগোপযোগী আদর্শে এইসব আশ্রম বালকদের পরিচালনা করা হয় না বলে যেমন আরাম ও ভোগবিলাসের মধ্য দিয়ে এদের আশ্রমিক-জীবন অতিবাহিত করতে দেওয়া হয় না---বলে অনেকেই এই আশ্রমকে সুনজরে দেখে না এবং আশ্রমের জন্য মুষ্টিভিক্ষার চালও দেয় না।

অবশ্য এসব তথাকথিত 'সুব্' গৃহস্থের দানের প্রত্যাশায় অনাথমন্দির বসে থাকে না। কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে তারা এইসব হতভাগ্য সন্তানদের স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেয়।

স্বামী বীরানন্দ বলেন---কার অদৃষ্টে কি লিখন আছে, তা একমাত্র বিধাতা-পুরুষ ছাড়া কেউই জানেন না। আমরা কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে শিখবো। তারপর ভোগবিলাস? যদি ভাগ্যে থাকে---তবে পরবর্তী জীবনে তোমরা তা নিশ্চয় ভোগ করবে।

কারণ তোমরা সবাই আমাদের মত গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী বা স্বামীজী হবে,---তেমন প্রত্যাশা আমরা করি না। তবে গুরুদেবের ইচ্ছাস তোমাদের এমন ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে আমাদের তৈরী করতে হবে---যাতে সুখে-দুঃখে অভাবে-অনটনের মধ্যেও ধৈর্যশীল, প্রসন্নচিত্তের সুগৃহস্থ ও সুনাগরিক হতে পারবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগবিলা-সের মধ্যে ডুবে থেকে তোমরা লোভের পথে এগিয়ে যাও, পাপে তোমাদের আসক্তি আনে, অধর্মকে তোমরা আলিঙ্গন করে---পরবর্তী জীবনে তোমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়---এটা আমাদের অভিপ্রেত নয়। তাই আমরা চাই তোমরা মুকুল হতেই জীবনের যা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তার জন্যই নিজেদের প্রস্তুত কর।

দেশের জন্য দশের জন্য তোমরা ত্যাগ করবে। প্রয়োজন হলে দেশের জন্য জীবনপণ করে নিজেদের এই নশ্বর দেহ সার্থক করবে---এটাই আমরা চাই।

তোমরা যেমন আমাদের স্নেহ, ভালবাসা পাচ্ছো---তেমনি তোমাদের বয়ঃকনিষ্ঠদের আদর্শস্থানীয় হয়ে তোমরাও তাদের স্নেহপ্রীতির বন্ধনে বেঁধে একই পরিবারের মত বড় হবে---এটাই গুরুদেবের অভিপ্রেত।

ভগবানের ও তাঁর আশীর্বাদে কতটুকু সার্থক হবে তাঁর অভিলাষ জানি না। তবে আমাদের আন্তরিকতা ও তোমাদের সহযোগিতা পেলে ঊষর মরু জীবনে আমরা উর্বর বীজ বপন করে আনন্দের মন্দাকিনী ধারা বইয়ে দিতে পারবো আশা করি।

বড় হতে হলে, নাম যশ করতে হলে প্রথম জীবনে কৃচ্ছ্রতা অবশ্যম্ভাবী। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের কাজ নিজে করে নেওয়ায় কোনই লজ্জা নেই।

এখনও পাশ্চাত্যের প্রতি স্বাধীন দেশে ঘরে ঘরে সকলেই যার যার নিজের কাজ নিজে করে থাকে। কোন কাজ ছোট নয়। বা স্বাবলম্বিতা অবজ্ঞার বস্তু নয়।

আমরা গরীব দেশের লোক। ধর্মই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ধর্মপথে থাকতে হলে, সব রকম ভোগ-বিলাসের প্রলোভন হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই সমীচীন।

অতীত ভারত ভোগের দেশ ছিল না। ছিল ত্যাগের আদর্শ। আমরা সনাতন ভারতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই অনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি---পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত, পাশ্চাত্য মেকী সংস্কৃতির উলঙ্গ পরিবেশ হতে অন্তত কিছু ভারতীয় সন্তানকে দূরে সরিয়ে রেখে, দেশের চরম দুর্দিনে দেশকে রক্ষা করবার পণ গ্রহণ করেছি।

সনাতন ভারতের অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান দুই কর-পুটে পশ্চিম গ্রহণ করছে। আজ আমরা রিক্ত। যেহেতু আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ তাদের দান করেছি,---তাই আমরা রিক্ত নই।

পরানুকরণ মোহে আবিষ্ট হয়ে ---আমরা সর্বহারা হয়েছি। তাই আমরা নিজের অতুল সম্পদ অবজ্ঞা ভরে ফেলে---ছুটে চলেছি পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে। এতে লাভবান্ হচ্ছি না। পরন্তু হারাচ্ছি আমাদের গৌরবময় অতীতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান।

দানে কেউ কখনও রিক্ত হয় না। দান ভারতীয় সনাতন শাস্ত্রে পরম ধর্ম। তাই ভারতীয় ঐশ্বর্যশালী রাজা, মহারাজা, জমিদার সর্বদা দান করতেন মুক্তহস্তে। বিশেষ করে জ্ঞান যতই করবে দান---ততই যাবে বেড়ে।

তাই পশ্চিমের দুয়ারে জ্ঞান, কৃষ্টি, সংস্কৃতি দান করে আমরা রিক্ত হই নি। আমরা রিক্ত হয়েছি পরাণকরণের লোভের মোহে। এই লোভের পরি-ণতিতে ভারত আজ পাপে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে রয়েছে।

স্বামীজীর আদর্শের অনুপ্রেরণায় আশ্রমিক বালকেরা অনুপ্রাণিত। তারা নিজেদের দিয়ে ভারতের গৌরবময় অতীতকে ফিরিয়ে আনবার জন্য যেন উদ্গ্রীব। তাই স্বামীজীদের আদর্শ সামনে নিয়ে, অতীত গৌরবময় অতীত দেশবরেণ্যদের জীবনী পাঠের মাধ্যমে তারা এগিয়ে চলেছে।

যে সব ছেলেরা লেখাপড়া, খেলা-ধুলা, সামাজিক কর্তব্যে প্রথম হয়ে থাকে,---তাকেই সেই সেই শ্রেণীর দলপতি করা হয় এই আশ্রমে। এতে শ্রেণীর সবার আগ্রহ ও উৎসাহ হয়, দলপতির মতই সব কিছুতে শ্রেষ্ঠ হয়ে শ্রেণীর সব পুরস্কার লাভ করতে, স্বামী-জীদের ও আশ্রমের সবার স্নেহভাজন হতে।

তাই এরা অপরের বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে। অন্যের উপকার করতে সর্বদা প্রস্তুত। দেশের কখনও কোন কাজে অনাথ আশ্রমের বালকদের ডাক পড়লে সকলেই উদ্গ্রীব হয়ে থাকে---তার নামটা যাতে কর্মসূচী হতে বাদ না যায়---সেই দিকে দৃষ্টি রাখে।

রণবীর যেন তার নামটা সার্থক করবার জন্য সর্বদা তৎপর। তাই কখনও কোন বিপদ দেখলে, সে বীরের মত তা'তে ঝাঁপিয়ে পড়ে---কাজ

শেষ করে প্রসন্ন মুখে ফিরে আসে। অন্যরা হয়ত যেখানে সামান্য দ্বিধা করে প্রাণের ভয়ে—রণবীর বিনা দ্বিধায় বীরদর্পে সেখানে এগিয়ে যায়। ফলাফলের জন্য যেন তার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

রণবীর বলে—মৃত্যু জীবনে একবারই আসে। মৃত্যু ভয়ে সদা-সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকলে, জীবন ধারণের কি সার্থকতা ? তাই আমি কোন বিপদকেই ভয় করি নি এবং করব না।

অনেক সময় প্রজ্বলিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে রণবীর অনেকের সম্পদ, শিশু, গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করেছে। সময় সময় এজন্য হয়ত কয়েকবার সে নিজেও অক্ষত থাকে নি।

নিমজ্জমান শিশু বা লোকদের সে প্রায়ই প্রচণ্ড ঢেউএর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করছে। নিমজ্জমান লোকের অপটুতার জন্য সে কয়েকবারই নিমজ্জিত হতে যেয়েও ভগবানের অপার দয়ায় বেঁচে ফিরেছে এবং অন্যকেও বাঁচিয়েছে।

এসব ক্ষেত্রে স্বামীজীরা রণবীরের জীবন বিপন্ন হবে বলে বাধা দিয়েছেন। কিন্তু রণবীর বীরদর্পে বলেছে—আপনারা বাধা দেবেন না, আপনাদের আশীর্বাদের বর্ম পরেই তো আমি এমন দুর্গম স্থানে যেতে সাহস পাই। আপনাদের অভয়বাণীই আমার একমাত্র রক্ষাকবচ।

—কিন্তু তাই বলে নিজের জীবনকে এমন করে তুচ্ছ করাও তো পাপ। ভগবান প্রত্যেককেই কোন অভিষ্ট সিদ্ধ করবার জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁর সেই অভিষ্ট সিদ্ধ না করে—এমন করে প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়া কি উচিত ? পরোপকার অবশ্যি করবি। কিন্তু নিজের জীবন বিপন্ন করে নয়, বলেন স্বামী বীরানন্দ।

করুণ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে রণবীর উত্তর দেয়—আমাদের মত মা-বাপ খেকো বে-ওয়ারিশ ছেলেরা এসব করবে না তো কারা করবে ? আমাদের জীবনের মূল্য কি ? পরের জন্য যায় যদি জীবন—সেটাই তো এই হতভাগ্যদের জীবনের সার্থকতা।

স্বামীজী ব্যথিত মুখে গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন—আমাদের স্নেহ ভালবাসার কোন মূল্যই কি তোর কাছে নেই রণবীর ? বাবা কি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে ? আমাদের কি মা-বাবা আছেন ?

পরকে যে আপন করতে পারে, সেখানেই তো তার কৃতিত্ব। আপন তো বরাবরই নিকট, প্রিয়জন। কিন্তু এই আশ্রমের স্বামীজীদের স্নেহ, ভালবাসা, সঙ্গীদের প্রীতি, ছোটদের শ্রদ্ধা, বড়দেরই স্নেহ অর্জ্জন করে যে জীবনকে যথার্থ সার্থক করে তুলতে পারে—তার জীবনই শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, গৌরবময়।

আর নিজের জীবনকে ধিক্কৃত মনে করে—যে হেলায় ফেলায় তা ভাসিয়ে দিতে চায়—তার জীবনকে কখনও সার্থক জীবন বলে না, রণবীর। তাই বলছি, এভাবে নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ যদি বাহাদুরীর মোহে জীবন বিপন্ন করে—সে জীবন সার্থক নয়। সেই জীবনদানও আত্মহত্যার মধ্যে প্রভেদ কোথায় ? পরন্তু এইভাবে জীবনদানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে একটা সুপ্ত নামের মোহ।

ছিঃ রণবীর, তোর থেকে এমন উত্তর আমরা আশা করিনি। তোর উপর যে আমাদের অনেক আশা, দেশ যে তোর কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। তুইও যদি আর দশজন সাধারণ ছেলের মতই কাজ করিস্ বা কথা বলিস্—তবে আমাদের আশ্রমের সব প্রচেষ্টা যে নষ্ট হয়ে যাবে বলে ভয় হয়।

আমরা যে তোদের মত ছেলেদের দিয়েই ভারতের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছি। আমি খুবই দুঃখিত হলাম, তোর মনোভাব জেনে। আমাদের এমন অকৃত্রিম ভালবাসার কোন মূল্যই কি তোর কাছে নেই ?

রণবীর নতমুখে স্বামীজীর পদধূলি নিয়ে বলল—আমায় ক্ষমা করবেন, স্বামীজী। আমি বড় কৃতঘ্ন। মাঝে মাঝে আমার কি হয়, আমি নিজেই বুঝতে পারি না। তখন মনে হয়, এ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই।

আমার মত হতভাগা কে ? মা-বাবার কোন স্মৃতি আমার মনে জাগে না। কোন্ পাপে এত অল্প বয়সে মা-বাবাকে হারিয়েছি জানি না। তাই যখন এই মনোভাব আমার মনে জাগে, তখন আমি আপনাদের স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, সহপাঠি ও আশ্রমিক বালকদের স্নেহ, প্রীতির কথা ভুলে যাই। কি এক দুর্বার অভিমানে আমার মনকে তখন মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। তখন আর কোন কিছুই আমার ভাল লাগে না।

আজ আপনাদের স্নেহাশ্রয় না পেলে—আমি হয়ত ভিখারী ছেলেদের মত পথে পথে দুমুঠো অন্নের জন্য ভিক্ষা করে বেড়াতাম। আপনাদের দয়া, স্নেহের ঋণ জন্ম-জন্মান্তরে শোধ করতে পারবো না।

আমার এই অকৃতজ্ঞতার জন্য স্বামীজী আমায় কঠোর শাস্তি দিন—যাতে আর কখনও এমন অকৃতজ্ঞ না হই।

স্বামীজী সস্নেহে তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, —নারে রণবীর, তোদের কি আমরা শাস্তি দিতে পারি। তোদের মনের দুঃখের কথা যে আমিও অনুভব করতে পারি। কারণ আমিও যে তোদের মতই অনাথ। তোদের তবু পরিচয়পত্র আমাদের কাছে আছে, কিন্তু আমার পরিচয়পত্রও নেই। গুরুদেব আমাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছেন।

তাই তোর চেয়েও আমি বেশী অভাগা জানবি রণবীর। মুহূর্তের দুর্বলতাকে কখনও প্রশ্রয় দিস্ না। তুই এটা জানিস্—তুই ভাল পরিবারের সন্তান। উচ্চ বংশে তোর জন্ম। সুতরাং না-ই বা রইল মা-বাবা। তবু তুই কীর্তিমান পুরুষ হবি।

[ক্রমশ।

চাষ আবাদ ফসল

পান বরজ

সুপ্রাচীনকাল হতে আমাদের দেশে পানের ব্যবহার চলে আসছে। ভরপেট আহারের পর মসলা সহযোগে এক খিলি পান কার না ভাল লাগে? পূজা-পার্বণে, অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় পান অপরিহার্য। অধরোষ্ঠ রঞ্জনে পানের ভূমিকার কথা রসিকজনকে নতুন করে বলার দরকার নেই। প্রেম নিবেদনের জন্য আকাঙ্ক্ষিতজনের কাছে পান পাঠানোর রীতি প্রাচীনসাহিত্য পাঠকের অজানা নেই। ঔষধের জগতেও পানের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। মাথায় পানের রস মেখে মাথার উকুন নির্মূল করা যায়। পান পিষে একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়ার সাহায্যে রসটুকু বের করে রাতকানা লোকের চোখে দিলে রাতকানা-রোগ সেরে যায়। এখন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, বহু গুণান্বিত এই পান কিভাবে উৎপাদিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তর কৃতী বরজীর অভিজ্ঞতা হতেই দেওয়া যাক।

ক্ষেত নির্বাচন ও 'গাছ' তৈরী

জল দাঁড়ায় না, এমন উঁচু আলো-হাওয়াযুক্ত দোআঁশ মাটির ক্ষেত পান-চাষের উপযুক্ত। নির্বাচিত ক্ষেতটিকে কোদাল দিয়ে দশ-বার ইঞ্চি গভীর করে কোপাতে হবে। কোদলানোর সাত-আটদিন পরে কোদাল দিয়ে চেঁছে ক্ষেতটিকে সমতল করতে হবে। দেড় হাত অন্তর লম্বালম্বি দড়ি ফেলে লাইন করতে হবে। নির্ভেজাল শ্বেতী গুঁড়ো খোল (কুড়িহাত লম্বা লাইনে সাতশ' পঞ্চাশ গ্রাম খোল) দড়ির ওপর দিয়েই প্রত্যেক লাইনে দিতে হবে। খোল দেওয়ার পর দড়ি তুলে নিয়ে খোলের ওপর ঝুরঝুরে দোআঁশ মাটি দিয়ে প্রত্যেক লাইনকে ক্ষেতের তল হতে চার-পাঁচ ইঞ্চি উঁচু করতে হবে। মাটিযুক্ত লাইনের মাঝের উচ্চতাই কেবল চার-পাঁচ ইঞ্চি হবে। দু'পাশের উচ্চতা ক্রমশ কমতে কমতে ক্ষেতের তলের সঙ্গে মিশে যাবে। তল সংলগ্ন লাইনের প্রস্থ পাঁচ-'ছ'ইঞ্চির বেশি হবে না। লাইনের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য ক্ষেতের আকার-আয়তনের ওপর নির্ভর করে। ক্ষেতের ওপর মাটি ও সার দিয়ে তৈরি করা এই লাইনকে বরজীর ভাষায় 'গাছ' বলে।

'পান-ঘর' তৈরী

বিশেষ রীতিতে তৈরি করা ঘরের মধ্যে পান চাষ করতে হয়। এই ঘরকেই 'পান-ঘর' বলা হয়। 'গাছ' তৈরির পরে ক্ষেতের ওপরে 'পান-ঘর' তৈরি করতে হবে। সমতল করা ক্ষেতের ওপরে 'পান-ঘর' তৈরির পরও 'গাছ' তৈরি করতে দেখা যায়। পূর্বোক্ত বিশেষ রীতির পরিচয় দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি 'পান-ঘর' তৈরির কলাকৌশলের উল্লেখ করছি। ধরা যাক, কুড়ি হাত লম্বা ও কুড়ি হাত চওড়া একটি ঘর তৈরি করা হবে। এতে বারটি 'গাছ' হবে। ঘরের উচ্চতা হবে সাড়ে চার হ'তে পৌনে পাঁচ হাত। ঘরের উচ্চতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক 'গাছ'-এর দু'প্রান্তে দু'টি করে মোট চব্বিশটি শক্ত বাঁশের খুঁটি নড়তে-চড়তে না পারে, এমন করে পুঁতে হবে। এই খুঁটির নাম 'গাছ-খুঁটি'। ক্ষেতের অপর দুই প্রান্তে চারহাত অন্তর একটি করে মোট আটটি পূর্বোক্ত উচ্চতা ও গুণবিশিষ্ট খুঁটি শক্ত করে পুঁততে হবে। এই খুঁটির নাম 'ছুঁচ খুঁটি'। এ ছাড়া ঘরের চার কোণে ঐরূপ চারটি খুঁটি ঐভাবে পুঁততে হবে। মাটির তল হতে সাড়ে চার হাত বা পৌনে পাঁচ হাত ওপরে (ঘরের উচ্চতা) মাটির তলের সঙ্গে সমান্তরাল করে পূর্বোক্ত প্রত্যেক খুঁটির সঙ্গে কাতাদড়ি দিয়ে বাতা বাঁধতে হবে। মোটা বাঁশ হতে

একটি বাঁশে বাঁশের সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট চারটি, অপেক্ষাকৃত কম মোটা হলে একটি বাঁশে বাঁশের সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দু'টি বাতা তৈরি করা যায়। নির্দিষ্ট একটি 'গাছ'-এর প্রান্তস্থিত 'গাছ-খুঁটি'-দ্বয়ের যে স্থানে বাতা বাঁধা হোল, সেখানে সেই 'গাছ'-এরই সমান্তরাল করে অনুরূপ একটি বাতা বাঁধতে হবে। একটি বাতাতে অকুলান হলে দুই বা ততোধিক বাতা কাতাদড়ি দিয়ে বেঁধে জোড়া দিয়ে নিতে হবে। শেষোক্ত একটি বা জোড়া লাগানো একাধিক বাতার নাম 'গাছ-বাতা'। এইভাবে প্রত্যেক 'গাছ'-এর ওপরে 'গাছ-বাতা' বাঁধতে হবে। ক্ষেতের দুই প্রান্তস্থিত দুইটি 'ছুঁচ-খুঁটি'র প্রত্যেকটির যে জায়গায় আগে বাতা বাঁধা হয়েছিল, সেই দুই স্থানে যে কোনও প্রান্তের 'গাছ-খুঁটি'গুলির সমান্তরাল করে একটি বাতা বাঁধতে হবে। দুই প্রান্তস্থিত দুই 'ছুঁচ-খুঁটি'র সংযোগকারী এই বাতার নাম 'ছুঁচ-বাতা'। একটি বাতাতে না হলে একাধিক বাতা কাতাদড়ি দিয়ে বেঁধে একটি 'ছুঁচ-বাতা' তৈরি করতে হবে। আমাদের নির্দিষ্ট ক্ষেতটির জন্য অনুরূপ আরও তিনটি অর্থাৎ মোট চারটি 'ছুঁচ-বাতা' লাগবে। বারটি পরস্পর সমান্তরাল 'গাছ-বাতা'র ওপরেই নব্বই ডিগ্রী কোণ করে চারটি পরস্পর সমান্তরাল 'ছুঁচ-বাতা' দেওয়ার ফলে বাতাগুলি আটচল্লিশ জায়গায় আটচল্লিশটি ক্রুশ চিহ্নের সৃষ্টি করবে। ক্রুশ চিহ্নের নিচ দিক হতে 'ঠেকাঠ' দিয়ে এমনভাবে ঠেকনা দিতে হবে, যাতে ঘরের 'চাল' (ওপরের কাঠামো) ক্ষেতের মাটির সাড়ে চার হাত-পাঁচ হাত ওপরে (ঘরের উচ্চতা) ক্ষেতের তলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এ জন্য আটচল্লিশটি 'ঠেকাঠ'-এর দরকার নেই। একটি অন্তর চব্বিশটি ক্রুশের নিচে চব্বিশটি 'ঠেকাঠ' দিলেই চলে যায়। এখন একটি 'ঠেকাঠ' তৈরির পদ্ধতি ও এর ব্যবহারবিধি সম্পর্কে আলোচনা করছি। মাঝারি ধরনের মোটা একটি বাঁশকে দু'ভাগে চেলা করে দু'টি বাতা তৈরি করতে হবে। এই বাতা হ'তে প্রয়োজনমত দীর্ঘ একজোড়া বাতা কেটে নিতে হবে। সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই দু'টি বাতার একটিকে অপরটির ওপরে রেখে বাতা জোড়ার যে কোন প্রান্তের একফুট ভিতরে কাতাদড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে। অপর প্রান্তের দু'টি বাতার মুখ ছুঁচলো করে দিতে হবে। ছুঁচলো মুখ দু'টিকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফাঁক করলে বাতা দু'টির দড়ি বাঁধা অংশে কোণের সৃষ্টি হবে। ছুঁচলো প্রান্ত দু'টি মাটিতে রেখে অপর প্রান্ত দু'টি ওপরের দিকে সোজাসুজি তুলে ধরতে হবে। দড়ি বাঁধার ওপরের অংশের কোণ দিয়ে ক্রুশ এমনভাবে ঠেলে ওপরের দিকে তুলতে হবে, যাতে ছুঁচলো অংশ মাটিতে পোঁতার পর ক্রুশ মাটি হতে সাড়ে-চার হাত পৌনে-পাঁচ হাত ওপরে (ঘরের উচ্চতা) থাকে। যে 'গাছ'-এর ওপরের ক্রুশে 'ঠেকাঠ' লাগানো হচ্ছে, সেই 'গাছ'-এরই একপাশে (যেখানে 'গাছ' ও ক্ষেতের সমতল মাটি মিশেছে, সেখানে) 'ঠেকাঠ'-এর একটি ছুঁচলো অংশ পুঁততে হবে। অপর ছুঁচলো অংশটি সেই 'গাছ'-এরই অপর পাশে অনুরূপ জায়গায় পুঁততে হবে। 'ঠেকাঠ' লাগানো ক্রুশে চার হাত লম্বা একটি দড়ি বেঁধে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিলে দেখা যাবে স্থিরভাবে ঝুলন্ত দড়ির প্রান্তভাগ হতে 'ঠেকাঠ'-এর একটি বাতার মৃত্তিকা-সংলগ্ন অংশের যে দূরত্ব, বিপরীত দিকে অপর বাতার মৃত্তিকাসংলগ্ন অংশ হতে পূর্বোক্ত দড়ির প্রান্তভাগেরও সেই দূরত্ব। এইভাবে চব্বিশটি 'ঠেকাঠ' যথাস্থানে লাগানোর পর 'ছুঁচ-বাতা'র সমান্তরাল করে পাশাপাশি খড়ি বিছিয়ে গোটা 'চাল'টি ছেয়ে দিতে হবে। খড়ির পাশ দিয়ে বৃষ্টির জল পুরোপুরি ঘরেই পড়বে। সূর্যরশ্মিও অল্প অল্প প্রবেশ করবে। 'গাছ-খুঁটি' ও 'ছুঁচ-খুঁটি' বরাবর ঘরের চারপাশ একইভাবে খড়ি, নারিকেল পাতা, বিচালি বা অন্যপাতা দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। ঝড়-বাতাসে 'পান-ঘর' যাতে পড়ে না যায়, সেজন্য মাঝের দিকে খুঁটি হাত অন্তর পুঁতে ঘরের ভিতর হ'তে প্রত্যেক 'ছুঁচ-খুঁটি'তে 'ঠেস' দিয়ে রাখতে হবে। এ ছাড়া ঘরের বাইরে চারদিকে চার-পাঁচ হাত অন্তর শক্ত কাতাদড়ি বা তার দিয়ে 'টানা' দিয়ে রাখতে হবে। যাতায়াতের জন্য এক বা একাধিক দরজাও রাখতেই হবে।

নালা

'গাছ' তৈরি করার পর ক্ষেতের সমতল অংশ যেটুক পড়ে রইল সেটুকু জল সেচের ও নিকাশের নালারূপে ব্যবহৃত হয়। যাতায়াতের রাস্তা হিসাবেও এগুলির ব্যবহার হয়ে থাকে। 'পান ঘর'-এর ভিতরের চারপাশেও এই নালার মত নালা তৈরি করে রাখতে হবে। 'গাছ'-এর উচ্চতা যতখানি তার চেয়ে একটু বেশি উঁচু করে 'গাছ-খুঁটি' ও 'ছুঁচ-খুঁটি'র গোড়া বরাবর ঘরের চারপাশে আল দিতে হবে। জল নিকাশের দরকার হলে এই আলের এক বা একাধিক স্থানে 'কাটান' দিয়ে দিলেই চলে। চারপাশের এই নালার জন্য 'গাছ'-এর দৈর্ঘ্য দু'হাত আড়াই হাত কমে যাবে ঘরের বাইরের চারপাশেও যাতে জল জমে থাকতে না পারে সেজন্য যথোপযুক্ত নিকাশি নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

রোপণ ও সেচ

'গাছ', ঘর, নালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে গেলে পান রোপণ করতে হবে। পান প্রধানত তিন জাতের। 'বাংলা', 'সাঁচি' ও 'মিঠে'। 'বাংলা' পান দু' জাতের—'সাধারণ বাংলা' ও 'গেঁটে বাংলা'। 'গেঁটে বাংলা' পানের ল' (=লতা)তে ঘন ঘন গাঁট হয় এবং পান পুরু। 'সাধারণ বাংলা' পানের ল'তে ফাঁক ফাঁক গাঁট হয়, পানও অপেক্ষাকৃত পাতলা। তিন জাতের পানের মধ্যে 'মিঠে' পানের দাম সব চেয়ে বেশি, সব চেয়ে কম হোল 'বাংলা' পানের। আবার 'সাধারণ বাংলা'র দাম গেঁটে বাংলা'র চেয়ে

কম। 'সাঁচি' ও 'মিঠে', বিশেষ করে 'মিঠে' পানের চাষ খরচবহুল ও কষ্টসাধ্য। 'বাংলা' পানের চাষ অপেক্ষাকৃত কম খরচে করা যায়। এতে 'মিঠে' পানের মত সূক্ষ্ম পরি-চর্যারও দরকার হয় না। এখানে 'বাংলা' পানের চাষের কথা আলোচনা করছি। রোপণ করা পানের লতে জল সেচ করলে বা বৃষ্টি হলে 'গাছ'-এর মাটি যাতে এলোমেলো হয়ে না যায়, সেজন্য রোপণের আগে 'গাছ' তৈরির জন্য যে ঝুরঝুরে মাটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সে মাটিকে হাত দিয়ে চেপে চেপে একটু শক্ত করে নিতে হবে। ল'-এর কাটিং রোপণ করার সময় 'গাছ'-এ যদি উপযুক্ত রস না থাকে তাহলে ঝারির সাহায্যে অল্প জল সেচ করে 'গাছ'-কে সরস করে নিতে হবে। রোপণের জন্য নীরোগ ও ভাল জাতের পানের ল'-এর কাটিং সংগ্রহ করতে হবে। একটি কাটিং-এ একটি পানসহ একটি গাঁট বা চোখ থাকবে। চোখের নিচে সোয়া এক ইঞ্চি ও ওপরে এক ইঞ্চি ল' রাখতে হবে। শ্রাবণ মাসের আট-দশ তারিখে কাটিং-গুলি 'গাছ'-এর মাথাতে চার-পাঁচ ইঞ্চি অন্তর রোপণ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেও পানের ল'-এর কাটিং রোপণ করতে দেখা যায়। রোপণের সময় দেখতে হবে চোখ সহ নিচের সোয়া এক ইঞ্চি ল' যেন মাটির নিচে চলে যায়। রোপণের পরেই খেজুর পাতা দিয়ে কাটিংগুলি ঢেকে ঝারির সাহায্যে ঐ পাতার ওপর দিয়ে কাটিং-এ জল সেচ করতে হবে। পনের-কুড়ি দিন প্রত্যহ সকালে বা বিকালে, প্রয়োজন হলে দু' বেলাতেই ঝারির সাহায্যে খেজুর পাতার ওপর দিয়ে পরিমাণমত জল সেচ করে কাটিং ও 'গাছ'-এর মাটি সরস করে রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সেচ দেওয়ার ফলে কাটিং পচে না যায়। রোপণের পনের-কুড়ি দিন পরে চোখ হতে নতুন ল' বের হলেই বুঝতে হবে ল' 'ধরে' গেছে। এই সময়ে খেজুর পাতা 'গাছ' হতে তুলে নিতে হবে। এখন হতে প্রত্যহ সেচ দেওয়ার দরকার নেই। রস শুকিয়ে এলেই পুকুর হতে পাম্প বা সিউনির সাহায্যে নালার মধ্যে জল সেচন করে সেচের কাজ চালাতে হবে। কলসী বা বালতির সাহায্যে জল তুলে পানের ল'-এর গোড়া ও 'গাছ' ভিজিয়ে দিয়েও সেচের কাজ চালানো যায়।

খড়ি ধরানো

পানে নতুন ল' ন-দশ ইঞ্চি লম্বা হলে শ্বেতী গুঁড়ো খোল (কুড়ি হাত 'গাছ'-এ তিন'শ পঁচাত্তর গ্রাম) মিশানো দোআঁশ মাটি দিয়ে ল'-এর গোড়া বেঁধে দিতে হবে। খোল মেশানো মাটি 'গাছ'-এ প্রয়োগ করার আগে অন্য জায়গায় দশ-বার দিন ফেলে রাখতে পারলে ভাল হয়। এইভাবে মাটি দেওয়ার সময় প্রতিটি ল'-এর কাছে একটি করে খড়ি দিতে হবে। এ জাতীয় খড়ির নাম 'পাখড়ি' খড়ি। 'পাখড়ি' খড়ির গোড়ার দিকটি ল'-এর গোড়ার কাছে অল্প একটু পুঁতে দিতে হবে। খড়ির আগা দিকটি 'গাছবাতা'র পাশ দিয়ে গিয়ে 'গাছবাতা'র ওপরে অন্তত আট-ন' ইঞ্চি উঠে থাকবে। 'পাখড়ি' খড়ি যাতে কাত হয়ে পড়ে না যায়, সেজন্য প্রতিটি 'গাছ-বাতা'র দু'পাশে এই বাতার সমান্তরাল করে দু'সারি খড়ি দিয়ে রাখতে হবে। শেষোক্ত এই খড়ির নাম 'সামলী' খড়ি। 'পাখড়ি' খড়ি 'গাছ-বাতা' ও 'সামলী' খড়ির সারির মধ্য দিয়ে চলে যায়। এ জন্য 'পাখড়ি' খড়ির কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। 'পাখড়ি' খড়ির সঙ্গে ন-'দশ ইঞ্চি লম্বা উলু দিয়ে ল'-টিকে বেঁধে দিতে হবে। ল' বেড়ে বেড়ে 'পান-ঘর'-এর 'চালের' কাছ পর্যন্ত উঠে যাবে। বেড়ে যাওয়া ল' যাতে মাটিতে পড়ে না যায়, সেজন্য ল'-এর এক ফুট অন্তর পূর্বোক্ত উপায়ে উলু দিয়ে 'পাখড়ি' খড়ির সঙ্গে ল'কে বেঁধে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, বাঁধার সময় উলুর চাপে ল'-এর কোন ক্ষতি না হয়। ল' বাঁধা উলু তৈরির বিশেষ পদ্ধতি আছে। কাঁচা উলু কেটে নিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে। শক্ত উলুগুলিকে দু'দিন রোদে শুকিয়ে নিয়ে তিন দিন তিন রাত জলে পচাতে হবে। পরে দু'দিন রোদে শুকিয়ে নির্দিষ্ট মাপে কেটে নিলেই ল' বাঁধার উলু তৈরি হয়ে যাবে।

পান জমানো

শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে পানের দাম ভাল পাওয়া যায়। এই সময়ে বিক্রির জন্য অনেক বরজী এক বিশেষ পদ্ধতিতে পান জমিয়ে রাখেন। পদ্ধতিটি এইরূপ : ল' 'পান-ঘর'-এর 'চাল' পর্যন্ত বেড়ে গেলে 'পাখড়ি' খড়ির উপরার্ধের ল' বাঁধা উলুগুলি কেটে দিতে হয়। ল'-এর আগার এক বিঘত নিচে দু'আঙুল দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে ল'টিকে নিচের দিকে নামাতে হবে। 'পাখড়ি' খড়ির উপরার্ধের পান-যুক্ত ল' ধীরে ধীরে ঝুলে পড়বে। ল' ধরা আঙুল দু'টি যখন 'পাখড়ি' খড়ির মাঝখানে আসবে তখন উলু দিয়ে সেই স্থানে ল'টিকে বেঁধে দিতে হবে। এখান হতে ল'টি আবার বেড়ে বেড়ে 'চালের' দিকে উঠতে থাকবে। এইভাবে পানযুক্ত ল' বুঝিয়ে 'পান-ঘর-এ ছ' মাস পর্যন্ত পান জমিয়ে রাখা যায়। রোগ পোকায় আক্রান্ত পান জমিয়ে রাখা উচিত নয়।

'নুড়া' ও 'নাছা'

বাজার দর বেড়ে গেলে বা রোগ পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে বরজী ল'-এর নিচ দিক হতে সঞ্চিত পান নুড়তে (ল' হতে পান তোলার নাম পান 'নুড়া') সুরু করেন। আর যাঁরা জমিয়ে রাখেন না, তাঁরা পনের-কুড়ি দিন অন্তর ব্যবহারোপযোগী পান নুড়ে নেন। 'পান-ঘর' বা পান ক্ষতিগ্রস্ত না হলে দশ কাঠা জায়গা হতে বছরে কমপক্ষে চল্লিশ 'মোট' (দশ হাজার পানে এক 'মোট') পান

সংগ্রহ করা যায়। 'মোট' বাঁধার বিশেষ পদ্ধতি আছে। ল' হতে নুড়ে নিয়ে পানকে 'নাছা'তে ('নাছা'—নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গুছানো) হবে। নুড়া পানগুলিকে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিয়ে চাহিদা অনুসারে বত্রিশ, আটচল্লিশ বা পঞ্চাশটি পানকে পর পর সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি 'গোছ' তৈরি করতে হবে। 'গোছ'-এর পানের বোঁটাগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কেটে দিতে হবে। কখনও কখনও বোঁটা না কাটলেও চলে। এইভাবে কয়েকটি 'গোছ' একত্রে সাজিয়ে বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি 'মোট' তৈরি করা হয়।

[আগামী সংখ্যায় শেষ।

—শ্রীজয়দেব বৈতালিক

শ্রাবণ মাসের বপন ও রোপন

শ্রাবণ মাসে যে সমস্ত ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে, তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হোল। কোন্ মাটিতে এই সব ফসলের চাষ করে ভাল ফল পাওয়া যায়, ফসলের নামের পাশে তার উল্লেখ করা হোল।

ফসলের নাম	ক্ষেতের মাটি
বেগুন---	উঁচু দোআঁশ
শিম------	বেলে দোআঁশ
বাঁধাকপি---	দোআঁশ
ফুলকপি	দোআঁশ
টম্যাটো---	দোআঁশ
বীট------	দোআঁশ
মুলা------	বেলে, দোআঁশ
মানকচু----	বেলে, দোআঁশ
শাক—নটে, পুঁই, ডাঁটা	—যে কোন মাটি
লঙ্কা------	বেলে, দোআঁশ
অড়হর---	উঁচু জমি—যে কোন মাটি
মাসকলাই---	বেলে, দোআঁশ
চীনা------	উঁচু বেলে, দোআঁশ
আমন ধান (রোপণ)	—দোআঁশ, এঁটেল
তিল (সাদা)---	বেলে, দোআঁশ
পেঁপে (চারা লাগান)---	উঁচু দোআঁশ
আনারস---	বেলে, দোআঁশ, এঁটেল
মটরশুঁটি---	দোআঁশ
পান------	দোআঁশ
তামাক----	উঁচু বেলে, দোআঁশ

কলম ও চারা

এ মাসে মাটি সরস থাকে; আবহাওয়াও অনুকূল থাকে। এ জন্য স্থায়ী গাছের কলম ও চারা রোপণের উপযুক্ত সময় হিসাবে শ্রাবণ মাসকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে পারলে অন্যান্য মাসেও রোপণ করা যায়। এ মাসে সচরাচর যে সমস্ত গাছের কলম বা চারা রোপণ করা হয়ে থাকে, তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হোল।

এই তালিকা হতে প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী কলম বা চারা নির্বাচন করে নিতে হবে। নির্বাচনের সময় বাগানের মাটি, আয়তন ও অবস্থানের কথা ভুলে গেলে চলবে না।

ফল

আম, লিচু, লেবু, বাতাবী, কমলা লেবু, সপেটা, পেয়ারা, জামরুল, কুল, আঙ্গুর, আতা, আপেল, নাসপাতি, আমড়া, বেল, কয়েৎবেল, চালতা, জলপাই, বেদানা, নোনা, ডুমুর, বাদাম (কাজু), গাব, মহুয়া, করমচা, কামরাঙ্গা, কালজাম, ডালিম, নারিকেল, সুপারি, কাঁঠাল।

ফুল

বেল, জবা, করবী, রঙ্গ, ম্যাগনোলিয়া, কুন্দ, চাঁপা, চামেলী, জেসমিন, যুঁই, অশোক, কদম্ব, কামিনী, কাঞ্চন, কুরচি, গন্ধরাজ, টগর, পলাশ, পয়েনসেটিয়া, বকুল, বক্‌ফুল, শেফালিকা, হাসনুহানা, লজ্জাবতী, স্থলপদ্ম, অপরাজিতা, ঝুমকালতা, মাধবীলতা, মালতী, আইভিলতা, বগেনভেলিয়া, কেতকী, ধুতুরা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল, কলকে।

মশলা

এলাচ, কাবাবচিনি, তেজপত্র, দারুচিনি, হিং, পিপল।

মূল্যবান কাঠের গাছ

অর্জুন, ছাতিম, দেবদারু, মেহগ্নি, শিরীষ, শিশু, সেগুন, নিম।

অন্যান্য

আমলকী, বহেড়া, রবার, হরিতকী, চন্দন, ক্যাকটাস, ইউক্যালিপটাস, পিপারমেণ্ট, ঝাউ, নানা ধরনের পাতাবাহার, বিবিধ বর্ণের কচু।

তাল ও খেজুরের বীজ এ মাসেই বপন করা যায়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখলে কলম বা চারা রোপণ করে হতাশ হতে হয় না। (১) নির্ভরযোগ্য নার্শারী, বিশ্বস্ত চাষী বা সরকারী ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষিত বাগান হতে নীরোগ ও উৎকৃষ্ট জাতের সতেজ কলম ও চারা সংগ্রহ করতে হবে। (২) রোপণের জন্য আলোহাওয়াযুক্ত উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। (৩) রোপণের সময় মাটি সরস থাকবে, কিন্তু লাগানো গাছের গোড়াতে জল দাঁড়িয়ে থাকবে না। গোড়া পচে গিয়ে গাছ মরে যাবে। এ জন্য জল দাঁড়ায় না, এমন স্থানই নির্বাচন করতে হবে। (৪) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গাছের আকারের কথা চিন্তা করে রোপণের দূরত্ব ঠিক করতে হবে। (৫) রোপণের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট আকারের গর্তে রোপণের পূর্বেই প্রয়োজনীয় সার পরিমাণমত প্রয়োগ করতে হবে। (৬) প্রয়োজনবোধে রোপণ করা কলম বা চারাতে জলসেচের ও ছায়া দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

কালিদাসের পুষ্পলতা

১। অরবিন্দ :—পদ্মের সাধারণ নাম। পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম। কোকনদ—রক্তপদ্ম। ইন্দীবর—নীলপদ্ম। সময় সময় নীল শালুককেও ইন্দীবর বলে। কুবলয়—উৎপল—ছোট পদ্ম। 'কুবলয়' শব্দে কোথাও নীলপদ্মকেও বলা হইয়াছে; যেমন—"কবলয়দলনীলৈ রুন্নতৈ স্তোয়নম্রৈঃ"—(ঋতু ২।২২)

কালিদাস বলিতেছেন যে, শরৎকালে শ্বেতপদ্ম প্রচুর ফোটে; যথা—"পার্থিব শ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎ পঙ্কজলক্ষণা।" (রঘু ৪।১৪)

নীলপদ্মও ফোটে :—"নীলোৎপলৈর্মদকালানি বিলোকিতানি"

উৎপলও ফোটে :—"স্বচ্ছপ্রফুল্ল কমলোৎপলভূষিতানি" (ঋতু) ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, পদ্ম ও উৎপল পৃথক; তা'না হইলে একসঙ্গে "কমল" ও "উৎপল"—এই দুই মহাকবি উল্লেখ করিতেন না।

মহাকবি ঋতুসংহারে "বিপত্রপুষ্পাং নলিনীং"—পাতাশূন্য পদ্ম বলিয়া পুনর্বার মেঘদূতে কি করিয়া ফুটন্ত পদ্মের কথা বলিলেন। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার প্রথমমুখে পদ্ম বিপত্র হয়; বৃষ্টি পড়ার পর ক্রমশ পত্র জন্মিতে থাকে, পদ্মও ফুটিতে থাকে। তারপর শরতেই পূর্ণ বিকাশ। অবশেষে শীতে আবার ঝরিতে থাকে। পুনর্বার বসন্তে ফুটিতে আরম্ভ করে।

মৃণাল এবং বিস—ইহারা একার্থবাচক। ইহা পদ্মের গাছের মাটির মধ্যের অংশ। পদ্মের তো আর গাছের মত কিছু হয় না,—হয় নাল। নলিন অর্থে পদ্ম। নলিনী অর্থে পদ্মিনী, পদ্মময় স্থান এবং পদ্মের ঝাড় বুঝায়।

২। অর্জুন :— আপিঞ্জরা বদ্ধরজঃকণত্বাৎ, মঞ্জর্য্যুদারা শুশুভেঽর্জুনস্য দগ্ধাপিদেহং গিরিশেন রোষাৎ, খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য।" ১৬।৫১ রঘু

অর্জুন গাছ ৩০।৩২ হাত উচ্চ হয়; কাণ্ড অতি স্থূল। বাংলার বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে—ইহা আরণ্যবৃক্ষ। পাতার আকার মানুষের জিহ্বার মত।

৩। অশোক :— অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যের সপল্লবানি। পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিত নূপুরেণ।" কু ৩।২৬

ইহা হইতে জানা গেল যে, বসন্তকালে অশোকের ফুল হয়; আর ঐ

স্ব[illegible]তি সরকার

ফুল মূল হইতে ফোটে। কবি-প্রসিদ্ধি আছে যে, সুন্দরী সালঙ্কারা রমণী বাম পদাঘাত না করিলে অশোকের ফুল ফোটে না—প্রাচীন ভারতে এই-প্রকার আমোদজনক প্রথা ছিল।

তরুণ অশোকবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর এবং তাহার পাতাগুলি ঐ সময় যত ভাল থাকে, বড় অশোক বৃক্ষের তেমন থাকে না। ঐ সময় যখন লাল লাল ফুল ফোটে আর বাতাসে ঝাঁকড়া পাতাগুলি একবার সরিয়া যায় আবার ঢাকা পড়ে—এইরূপ চলকিশলয়" হয়, তখন ঐ "রক্তাশোক' স্মরবর্ধকই হয়। মল্লিনাথও বলিয়াছেন যে— রক্তোঽত্র স্মরবর্ধনঃ" (উ, মেঘ টীকা ১৫ শ্লোক)—এই স্মরদীপক বলিয়াই ঋতুসংহারে কালিদাস অশোকের বিশেষণ "সশোক" দিয়াছেন।

৪। আম্র।

৫। ইক্ষু :—"ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যঃ তস্যগোপ্তুর্গুণোদয়ম্।" ৪।২০ রঘু।

ভাষানাম :—বাঃ -- আক্, কুশের।

৬। ইঙ্গুদী :— তা ইঙ্গুদীস্নেহ কৃত প্রদীপম্।"

(১৪।৮১ রঘু)

শাস্ত্রী মহাশয়কে ডেরাডুনের অঞ্চলে "ইঙ্গুদী" বলিতে "মৌগাছ" দেখাইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই "মৌকেই ইঙ্গুদী বলেন। ইঙ্গুদীকে অমরসিংহ কেবল তাপস-তরু বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য পাওয়া যায়—ইঙ্গুদীর তৈল ঋষিরা মাখিতেন, খাইতেন, প্রদীপে জ্বালাইতেন এবং কোন স্থান কাটিয়া গেলে এই তৈল দিয়া বাঁধিতেন, তাহাতেই ঐ ক্ষত আরাম হইত। মৌ-তেলেরও নাকি ঐরূপ ব্যবহার আছে ও ঐরূপ গুণ আছে।

৭। উদুম্বর :—"শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্।" (পূর্বমেঘ ৪২)

ভাষানাম—বাঃ = যজ্ঞডুমুর। এই যজ্ঞডুমুরের গাছ সুপরিচিত। বর্ষায় উদুম্বরের ফল পাকিবার কথা কালিদাস বলিয়াছেন।

৮। এলালতা :—"তাম্বুল বল্লী পরিণদ্ধপুগা স্বেলালতা লিঙ্গিতচন্দনাসু। তমালপত্রাস্তরণাসু রন্তুং, প্রসীদ শশ্বৎ মলয়স্থলীষু।" (৬।৬৪ রঘু)

অমর—"পৃথ্বীকা চন্দ্রবালৈলা নিষ্কুটির্বহুলা।" "এলয়াত নাশয়তি মুখদৌর্গন্ধ্যম্"—এলাইচ লতা। এলাইচ দুই প্রকার—বড় এলাচ ও ছোট এলাচ।

৯। কঙ্কেলি :—"কঙ্কেলি পুষ্পরুচিরা নবমালতী চ।" (ঋতু ৩।১৮)

এই "কঙ্কেলি" লইয়া খুব গোল আছে। কঙ্কেলিকে সকলেই অশোক বলে। "অশোকো হেমপুষ্পশ্চ কঙ্কেলি পিণ্ডপুষ্পকঃ"—ইতি রত্নকোষঃ।— কঙ্কেলিকে অশোক বলা ভুল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, যোধপুরের পুরাতন রাজধানী মণ্ডপপুর—বর্তমান মণ্ডোরে প্রথমে এই কঙ্কেলি বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন।

একটি মাঝামাঝি রকমের গাছ শাদা ফুলে ভরে গেছে। আর ভারি বাহার হয়েছে। গাছের পাতা কতবেলের গাছের পাতার মত। সে সময় সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাস। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, উহার নাম "কক্কেড়"; তখন তিনি বুঝিলেন যে, ইহা কালিদাসের "কঙ্কেলি"---অশোক হইতেছে---"বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তি" অর্থাৎ বসন্ত-পুষ্প। আর ঋতুসংহারে কালিদাস বলিতেছেন যে, "কঙ্কেলিপুষ্প রুচিরা নবমালতী চ দন্তাবভাস-বিশদ স্মিতচন্দ্র-কান্তি হরতি"---কঙ্কেলি পুষ্পের সৌন্দর্য এবং নবমালতী দাঁতের প্রভার দ্বারা নির্মল হাসিরূপ চাঁদের শোভাকে হরণ করছে। ইহাতে প্রকাশ পাইল যে, চাঁদের শোভা শুভ্র, দাঁতের প্রভাও শুভ্র, তখন কঙ্কেলি ফুলের শোভাও শুভ্র; সুতরাং কঙ্কেলি ফুল শাদা। কিন্তু অশোক ফুল লাল; অতএব কঙ্কেলি কি করিয়া অশোক হয়? তারপর অশোক হইতেছে বসন্তপুষ্প। আর কঙ্কেলি হইতেছে শরৎ-পুষ্প কারণ শরৎ-বর্ণনায় কালিদাস কঙ্কেলির বর্ণনা করিয়াছেন।

১০। কদম্ব :---"কদম্ব সর্জার্জুন-কেতকী-বনম্" (ঋতু ২।১৭)---"নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং।" (মেঘ ১।২১)

অভিধান :---নীপ, প্রিয়ক, কদম্ব, হলিপ্রিয়। (অমর)

মল্লিনাথের মতে কদম্ব ও নীপ দুইটি পৃথক বৃক্ষ। "কদম্ব" হইতেছে সাধারণ "কদম গাছ" এবং "নীপ" হইতেছে "স্থল কদম্ব"।---কালিদাস নীপের বর্ণনায় বলিয়াছেন---হরিত কপিশ বর্ণ। হরিত বলিতে সবুজ এবং কপিশ বলিতে লাল্চে কালো (brown) অর্থাৎ সবুজ, লাল ও কালোর মিশ্রণ। এই রং দেখিয়াই মল্লিনাথ নীপকে কদম্ব হইতে আলাহিদা করিয়াছেন। বৈজয়ন্তী তো দুইটি পৃথক করিয়া দিয়াছে। কদম্ব---সাধারণ কদম; আর নীপ--বড় কদম। কদম্ব ও নীপ ---একই হউক বা দুই হউক---বর্ষাকালেই ফুল ফোটে।

১১। কদলী---"ক্রীড়াশৈলঃ কনক কদলী বেষ্টন প্রেক্ষণীয়ঃ।" (উঃমেঘ ২।১৫ বাংলা নাম :---কলা।

১২। কন্দলী :---'কর্তুং যত্র প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং" (পূ: মেঘ---১।১১) "নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈঃ আবির্ভূত প্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্"। (পূ, মেঘ ১।২১)

বাংলা নাম :---কেহ ইহাকে "ভুঁইচাঁপা" বলেন, কেহ বলেন "কলাফুল"; আর কেহ বলেন "বেঙের ছাতা"। ইংরাজীতে ইহাকে Mush-room বলিয়াছে।---এই ছাতা সাদা এবং লাল্চে হয়। শুনিয়াছি লাল রঙের ছাতা লোকে খায়। কালিদাস এই লালবর্ণের ছাতারই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা একমাত্র বর্ষাতেই হয়।

১৩। কর্ণিকার :---"কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারম্।" (ঋতু ৬।৫)

কর্ণিকার হইতেছে আমাদের "সোঁদাল"। কালিদাস ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে সোঁদাল ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না। কালিদাস বলিতেছেন কর্ণিকারের রং হইতেছে---"আকৃষ্ট হেমদ্যুতি কর্ণিকারম্" অর্থাৎ হেমদ্যুতি; আবার বলিতেছেন "হুত হুতাশন দীপ্তি বনশ্রিয়ঃ, প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ" অর্থাৎ হোমে আহুতি প্রদানে অগ্নির যে স্বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তি হয়, সেইরূপ স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট কর্ণিকার ফুল বনলক্ষ্মীর সোনার গহনার প্রতিনিধি হইয়াছিল। আর ইহা যে রমণীদিগের প্রিয় কর্ণভূষণ, তাহাও মহাকবি দেখাইয়াছেন।---আবার মহাকবি এই কর্ণিকারকে মদনের বাণ করিয়াছেন। (ঋতুসংহার ৬।২৭)। ইহা করা ঠিক হইয়াছে। সোঁদাল ফুল লম্বা, শ্রেণীবদ্ধ এবং সোনার রং-এর। লম্বা বলিয়া বাণের সঙ্গে তুলনায় বেশ খাটিয়াছে।

১৪। কল্পদ্রুম :--"কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাত" (রঘু ৬।৬)

মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ এবং হরিচন্দন---এই পাঁচটি দেববৃক্ষ। ইহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না জানা নাই।

১৫। কহ্লার :---"কহ্লার-পদ্ম কুমুদানি মুহু-বিধুন্বং-স্তৎ সঙ্গমাদধিক শীতলতামুপেতঃ।" (ঋতু---৩।১৫)---

কুমুদ ও কহ্লার বিভিন্ন; কিন্তু এক জাতীয়। অনেক সময় অভিধান-কারগণ এক জাতীয় বস্তুকে এক পর্যায়-ভুক্ত করিয়া থাকেন। এখানেও তাই হইয়াছে। নীলপদ্ম পাওয়া যায় না। অনেকে নীল শালুককেই ভ্রমবশতঃ নীলপদ্ম বলিয়া থাকে। নীল শালুক অনেক পাওয়া যায়। শাদা শালুকই কুমুদ; আর গন্ধযুক্ত নীল শালুকই কহ্লার। কহ্লার শরৎকালের ফুল।

১৬। কালাগুরু :---"চকম্পে তীর্ণ লৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বরঃ। তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালা-গুরুদ্রুমৈঃ।" (রঘু ৪।৮২)

কালাগুরু---কাল অগুরু---অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ অগুরু। অতএব অগুরুভেদ।---কালিদাসের বর্ণনা হইতে পাই যে---"কালাগুরু" প্রাগ জ্যোতিষের অর্থাৎ কামরূপের দ্রব্য। বস্তুতঃ কালাগুরু কামরূপেই পাওয়া যায়।

১৭। কালীয়ক :- - - "প্রিয়ঙ্গু কালীয়ক কুঙ্কুমাক্তম্" (ঋতু ৬।১২) ইহাকে সাধারণতঃ 'হরিচন্দন' বা পীত-চন্দন' বলা হয়।

১৮। কালেয় :---"ততং লোধ্র-কল্কেন হৃতাঙ্গতৈলাম্ অশ্যানকালেয়-কৃতাঙ্গরাগাম্। (কু---৭।৯)

ভাষানাম:---বাঃ---দারুহরিদ্রা।

১৯। কাশ:---"প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজ।" (কু---৭।১১) ভাষানাম:---বাঃ---কেশে।

২০। কিংশুক :---"উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুকে।" (রঘু ৯।৩১)

পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, বাতপোথ, ত্রিপর্ণক, আস্ফোত, ব্রহ্মবৃক্ষ, হস্তি-কর্ণদল এবং কৃতী---এইগুলি পলাশের নাম।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মরিশাসের বিমানবন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

॥ চিত্র সংবাদ ॥

সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা আয়োজিত ফ্যাসি বিরোধী চলচ্চিত্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণরত জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি মিঃ রেডার

বর্ধমানে এস. বি. অফিসে মুখার্জী তদন্ত কমিশনের অন্যতম প্রধান সাক্ষী গুণমণি রায়কে হত্যা করার অন্তরালে যে গভীর ষড়যন্ত্রের ইংগিত রয়েছে তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীসুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস. পি. শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে বুঝিয়ে বলছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এম. পি.। শ্রীসেনের সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী ও শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়

মাসিক বসুমতী। শ্রাবণ / '৭৭

পুরুলিয়ার হাটওয়ারায় পুষ্করিণী খননের কাজ পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন পঃ বংগের রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান

মরিশাসে থাকাকালীন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে 'পোর্ট ও লুই নগরীর স্বাধীনতা' আখ্যায় ভূষিত করা হ

মহাকরণে মুখ্যসচিব শ্রীসুকুমার মল্লিক-এর পৌরোহিত্যে নবগঠিত পঃ বঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের বৈঠকের দৃ
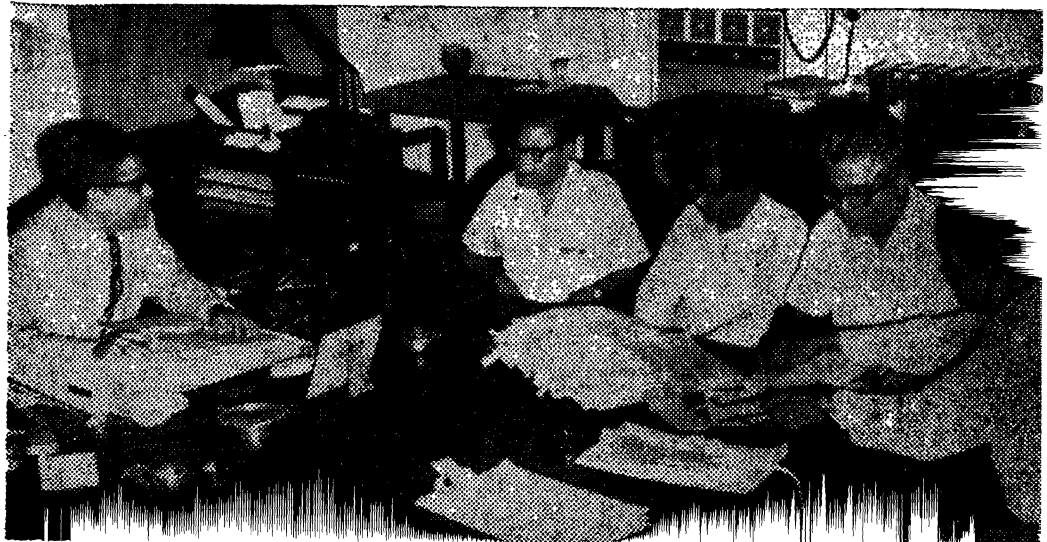
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এ. আই. টি. ইউ. সি. পঃ বঙ্গের ইউনিয়নসমূহের কনভেনশনে ভাষণরত শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এম. পি

রাজভবনের সামনে রাজ্যপালের অপসারণ ও গুণমণি রায়-এর হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র পরিষদের সভ্য ও কংগ্রেস কর্মীরা ২৪ ঘণ্টাব্যাপী অনশন করেন

টম্যাটো

অরুণ চৌধুরী

গাছপালার যন্ত্রণার অনুভূতি আছে। ঠিক মানুষের মতই ওরা দুশ্চিন্তিত হতেও পারে। এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কৃতিত্ব একজন কৃতী আমেরিকান বিজ্ঞানীর, তিনি যদিও ইংলণ্ডের সাসেক্সবাসী।

পরীক্ষার জন্য তিনি মানুষের সংক্ষোভজ প্রতিক্রিয়া নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি 'স্কিন্ গ্যাল্‌ভানোমিটার' কাজে লাগান। এটি দেহের মধ্যেকার জীবনীশক্তির ঘনত্ব এবং গতি মাপে, এবং তা ব্যাখ্যা করে চিন্তার অবস্থাও জানা যায়। সুতরাং এটিকে জীবনের উপস্থিতির অভ্রান্ত পরীক্ষা বলা চলে।

ভয় এবং অপরাধবোধ কীভাবে ফুটে ওঠে উপর্যুক্ত মিটারে তা তিনি দেখান। তারপর, ঐ মিটারের সঙ্গে দু'টি সংযোজকের সাহায্যে একটি টম্যাটো জুড়ে দেওয়া হয়। গাছ সংলগ্ন টম্যাটোর জীবনের লক্ষণ ফুটে না ওঠা পর্যন্ত যন্ত্রটি ঠিকঠাক ক'রে, অবশেষে টম্যাটোর গায়ে একটি পেরেক ফোটান হল। তক্ষুণি গ্যাল্‌ভানোমিটারের ছুঁচ কেঁপে উঠে উর্ধ্বমুখী হল।

এইটিই মানুষের চূড়ান্ত কষ্ট এবং মৃত্যুভয়ের লক্ষণ, এবং এ থেকেই বোঝা যায় যে, কোন না কোন উপায়ে গাছ 'চিন্তা' করতে এবং নিজের টিকে থাকার ব্যাপারে দুশ্চিন্তিত হতে পারে।

পেরেক ফোটানোর পর কিছুক্ষণ গাছটির প্রতিক্রিয়া মিটারে ধরা পড়েছিল---মানুষেরও এক্ষেত্রে একই রকম প্রতিক্রিয়া হয়।

বস্তুত, গাছপালাকে ঠিকমত বুঝি মানুষের মঙ্গলে পুরোপুরি লাগাতে হলে ওদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের আরও কার্যকর এবং সূক্ষ্ম পদ্ধতি বের করতে হবে। মানবিক মনঃসমীক্ষণের ধারা এক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

বদলোকের মত বদ গাছও আছে---যারা সবাইকেই ভালবাসে এবং যাঁরা সকলকেই খুন করতে উৎসুক।

শেষোক্ত দলে পড়ে আমাজনের তীরবর্তী বিষাক্ত লতাগুলো, এরা পথিককে গলায় বেড় দিয়ে মেরে ফেলতে তৎপর। অ্যারিজোনার এক ধরণের ক্যাক্‌টাস্ লাফিয়ে উঠে পাকড়াতে চায়। এই জাতের গাছপালা আক্রমণ এবং মারমুখী আত্মরক্ষায় 'বিশেষজ্ঞ'। সাংঘাতিক এদের হাবভাব। আবার, শান্ত গাছেরও অভাব নেই। এবং এগুলো সংবেদনশীলও বটে।

উপরি-উক্ত বিজ্ঞানীর গবেষণার পূর্ণ ফল যদিও আরও পরীক্ষা-নির্ভর, কিন্তু এর ফলে গাছপালার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিশ্চয়ই বাড়বে। যেমন, হাজার খানেক চারা-গাছ থেকে বেছে নেওয়া সম্ভব হবে সেরা ফলদায়ী গাছটি।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে পালক জানবেন গাছটি বেড়ে ওঠা এবং ফল দেওয়ার সময় ঠিক কতখানি টুকু সন্তুষ্ট ছিল। আরও ভাল এবং

টোম্যাটো সংক্রান্ত গবেষণায় নিরত ডঃ হার্বার্ড

বেশি শক্তপোক্ত ফল এবং শাকসব্জী আগের তুলনায় ঢের আগে ফলানো যাবে—গোড়ার দিকে তার প্রতিক্রিয়া জানলেই হল।

এইভাবেই 'মানসিক অবস্থা' জেনে গাছের ভাবী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। আমাদের বিজ্ঞানীর মতে, মৃত্যু-ভাবনা সুরু হলে গাছ অসুস্থ হতে পারে।

একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীও এর আগে দেখিয়েছেন, গাছের পক্ষে প্রতিদিন বিশুদ্ধ নাচের সুর সর্বোৎকৃষ্ট টনিক। তাঁর পরীক্ষাধীন গাছ ভরতনাট্যম্ নাচের সুরে তড়িঘড়ি বেড়ে উঠেছিল।

দুঃখের কথা, দু'জন আমেরিকান্ বায়োকেমিস্ট দেখিয়েছেন কলা, টম্যাটো এবং শুঁটি শিরায় জট পাকালে 'স্ট্রোক্' এবং 'হারট্ অ্যাটাকের' শিকার হয়।

আধুনিক অসুখ 'নারভাস্ ব্রেক-ডাউন'-এর হাত থেকে গাছপালাও মুক্ত নয়। রুশ কুকুর হয়ত মহাশূন্যে মনের আনন্দে বেড়িয়েছিল, কিন্তু চাঁদে যেতে বিষম গররাজি বাঁধাকপি।

কিছুদিন আগে মহাশূন্যের অভিকর্ষ-হীন অবস্থায় এটি মুষড়ে পড়ে, বাড়-বৃদ্ধিও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

এ রকম উদ্ভট 'ব্যাভার' গাছ-পালার না-পছন্দ। মাটির ওপর চেনা-জানা পরিবেশে, মেজাজমাফিক বেড়ে ওঠাই এদের অভিপ্রেত। অন্তত মস্-এন-জোলেস্-এর 'দ্য রিলিজিয়াস্ রিসার্চ ফাউন্ডেশন' তাই মনে করেন।

ওঁরা নিয়মিত মিটিং ক'রে গাছ-পালাকে খুশ খবর শুনিয়ে যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেন। গাছ-পালা খুশি থাকে ভালবাসা, যত্ন এবং মনোযোগের আন্তরিকতাময় পরিবেশে।

বেশি কড়া ব্যবহারে গাছপালার প্রতিক্রিয়া খারাপ হয়। আহত ফুল এবং গাছ সাংঘাতিক 'কারবন্ মনোক্সাইড্' ছেড়ে বাতাস বিষাক্ত করতে পারে। পাউণ্ড দুয়েক আলফালফা পাতা থেকে একজন মানুষ মারার মতন পর্যাপ্ত কারবন মনোক্সাইড বের হওয়া খুবই সম্ভব। সাধু সাবধান।

পেছিয়ে-পড়া বা হাবোগোবা গাছের ক্ষেত্রে 'শক ট্রিটমেণ্ট' বাড় ঠিকমত করার ব্যাপারে ফলপ্রদ। টম্যাটোর ক্ষেত্রে অন্তত ভাল ফল পাওয়া গেছে। এর সাহায্যে ফলন প্রায় তিনগুণও হয়েছে।

ভবিষ্যতে গাছপালা এত সুখী হতে পারে যে, সারা বছরই ওদের ফল ফলানোর ব্যাপারে হয়ত রাজি করানো সম্ভব হবে।

অছাড়া, নতুন দাবিও ওরা মেনে নেবে। ইতিমধ্যেই অনেক দাবি মানানো গেছে।

এখন 'ঝাঁঝহীন' পেঁয়াজ, গন্ধহীন বাঁধাকপি এবং পোড়ানো বা ভাজার জন্য বিশিষ্ট আলু ফলানোর চেষ্টা চলছে।

চলুক। কেবল সহানুভূতির সঙ্গে চললেই বাঁচোয়া। কে জানে, অন্যথায় ওদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি কতখানি উদ্দীপ্ত হবে, এবং তার কুফল আমাদের কতখানি ভোগ করতে হয়।

সোভিয়েত রাশিয়ার একটি পরীক্ষামূলক পশু খামারের গোসম্পদের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে

শস্য-উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি
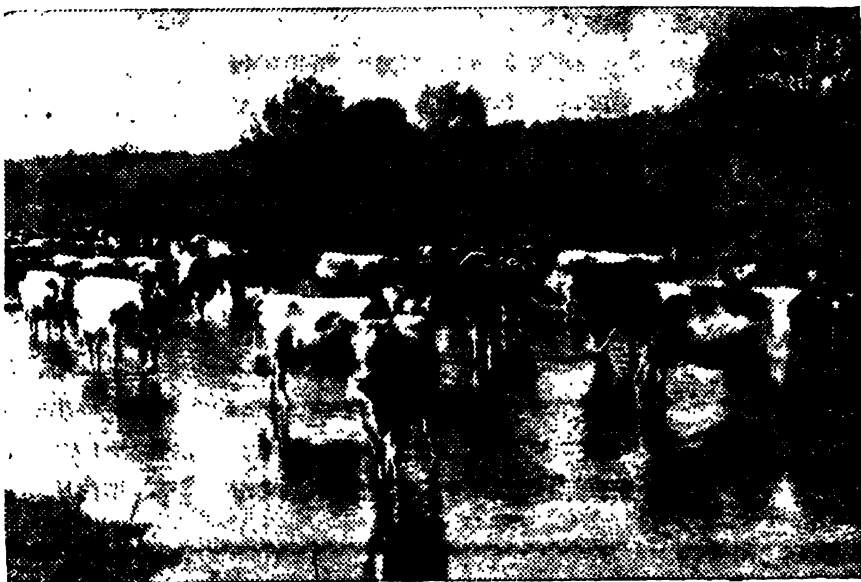
বহুল প্রচারিত 'সবুজ বিপ্লব' প্রচুর ফলনশীল শস্যবীজের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। এই নতুন বীজগুলো উৎপাদিত হয় কিভাবে ?

ইতিহাসের ঊষাকালেই সেরা গাছ বেছে নিয়ে তা থেকে বীজ রক্ষা ক'রে বহুগুণিত করার রেওয়াজ চালু হয় বেশি এবং উন্নততর ফলন পাওয়ার উদ্দেশ্যে। পরে, দু' জাতের বাঞ্ছনীয় গুণগুলি একই বীজে প্রবিষ্ট করার সম্ভাবনা দেখা দিলে, শস্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবীন গতি সঞ্চারিত হল।

সাধারণত দু'টি ঘনিষ্ঠ জাতের বীজের গুণ মেলানর চেষ্টা হয়, কিন্তু সময় বিশেষে ভিন্নজাতের মধ্যেও মেল বন্ধনের প্রয়াস চলে, যাতে বিশেষ পরিবেশে সাধারণ জাতের বীজ বেশি কার্যকর বা উপযোগী হয়।

শস্য-বিজ্ঞানী দূর সম্পর্কের দু'টি জাত মেলানর চেষ্টা করেন—একই 'জেনাস্'-এর অন্তর্গত ভিন্ন 'স্পেসিস্'। কখনও কখনও এই চেষ্টায় কোনও ফল হয় না। বিশেষ রাসায়নিক চিকিৎসায় এই অসুবিধা দূর করা গেলে সংকর বীজ কাজে আসে।

বল্‌গাহরিণ উৎপাদক বোরিস ইকে তেডকে মস্ত প্রান্তরে দেখা যাচ্ছে

কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ কিচিলি সম্বা ধানের সঙ্গে বন্য ধানের মিশ্রণে সংকর বীজ উৎপন্ন হয়। এটি খরানিরোধক, মাঝারি আকারের বীজ, তামিলনাড়ুতে এর চাহিদা খুব।

'ইন্টার-জেনেরিক্' বীজ উৎপাদন অবশ্য তুলনায় বিরল এবং 'জেনেরা'র অন্তর্ভুক্ত দু'টি ভিন্ন 'সাবগ্রুপ'-এর সংকর বীজ এটি। বাঁশ আর আঁখ মিলিয়ে যে মিশ্রণ হয়েছিল, তা এখন সারা ভারতে প্রচলিত জাতের পূর্ব-পুরুষ। কিছুদিন আগে রাই-গম মেলানো গেছে, এবং শুকনো জমিতে গম চাষের ব্যাপারে এই সাফল্য বিশেষ কাজে আসবে বলেই কৃষি-বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

উৎসাহী এবং শিক্ষিত কৃষক নতুন জাতের বীজ উৎপাদনের যে চেষ্টা করেন, তার ফলে মাঝে মাঝে যে উল্লেখযোগ্য ফললাভ হয় না, তা নয়। মহীশূরের একজন কৃষক শুকনো জমিতে উচ্চ ফলনশীল ভুট্টা উৎপাদনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ফলে, ভুট্টার একটা শীষের জায়গায় চারটে পর্যন্ত শীষ উৎপন্ন হচ্ছে। এটি Sorghum CSH-1 এবং ভুট্টার মিশ্রণে উৎপন্ন বীজের ফসল। দু'টি শস্যের সদ্‌গুণ মিলিয়ে তৈরি হওয়ায় এটি ফসল বাড়ানর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। প্রথম শস্যটির চেয়ে এর grain quality ভাল, দ্বিতীয়টির তুলনায় এর উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। এই সংকর বীজজাত শস্য পশুখাদ্য এবং মনুষ্য খাদ্য—দুই-ই উৎপন্ন করে এক-সঙ্গে। পোকার উপদ্রবও এতে অনেক কম।

শস্য-বিজ্ঞানীরা এই সংকর বীজ অনুমোদন করেছেন। ঐ কৃষক আশা করেন, তিনি ভবিষ্যতে আরও বেশি কার্যকর সংকর বীজ তৈরি করতে সক্ষম হবেন। বস্তুত, তিনি বসে নেই।

সর্বত্র চলেছে শস্য-উৎপাদনের ব্যাপারে আরও ভাল পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য গবেষণা। ইতিমধ্যেই অনেকখানি সাফল্য করায়ত্ত হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে অনেক বড় সাফল্য আমরা অর্জন করতে পারবো এবং অন্নাভাবের বিভীষিকা দূর হবে চিরতরে। ভিক্ষাপাত্র হাতে দেশে দেশে ফেরার দুঃখজনক প্রয়োজনও।

—বসুবন্ধু

যে গাছ মাটি উর্বর করে

আধা-উষর ভারতীয় অঞ্চলে নিম খুবই জনপ্রিয় গাছ; কারণ, এর কোন অংশই ফেলনা নয়। জল সেচ ছাড়াই এ গাছ জন্মায় এবং বেড়ে ওঠে, গবাদি পশু এর বিশেষ ক্ষতি করতে অক্ষম। নালচে এবং বালুকাময় মাটির ওপর এর কার্যকর প্রভাব অনস্বীকার্য। ঐ রকম জমিতেই নিম বেশি জন্মায়।

জনৈক বিশেষজ্ঞ উত্তর-পশ্চিম নাইজিরিয়ার সাকোটা অঞ্চলের নিমের মাটির সঙ্গে পার্শ্বস্থ কৃষি জমির মাটি তুলনা ক'রে তিনি দেখতে পান একই মাটি, একই জলবায়ুতে থাকা সত্ত্বেও রাসায়নিক পার্থক্য অনেক। নিমের ওপরকার মাটিতে পাঁচগুণ বেশি কার্বন, চারগুণ বেশি নাইট্রোজেন, তিনগুণ বেশি পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে। তা ছাড়া, এ মাটির জলধারণের ক্ষমতাও বেশি। এইভাবে নিম একই ধরনের কর্ষিত জমির তুলনায় পুষ্টিকর পদার্থ ধরে রেখে বা নিচের থেকে তা এনে জমিকে উর্বর করে তোলে। খনিজ পদার্থের যোগানও নিম অবিরাম করে। নিমের পাতা মাটিতে পচে মাটিকে সার যোগায়। কর্ষিত জমিতে এমনটা হয় না। আবার, খরার সময় কর্ষিত জমি যখন খটখটে শুকনো, তখনও নিমের মাটি সিক্ত থাকে তুলনায়।

সুতরাং চাষের জমিতে নিম লাগালে ভাল হয়। মেহগনি কাঠের কুটুম নিম আসবাবের কাঠ বা জ্বালানী কাঠও সরবরাহ করে, ডাইং-এর কাজে জলে দ্রবণীয় আঠা দেয়; এবং ঔষধ শিল্পে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছালও নিমের কাছ থেকে মেলে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বসন্তকাল থেকে সুরু ক'রে গোটা গ্রীষ্মকাল কচি নিমপাতা অতীব উপকারী খাদ্য। অনেক রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা গড়ে তোলে নিম। বছর পাঁচেক লাগে মাটিকে উর্বর করতে—সুতরাং ঐ সময়টুকু বাড়তে দিয়ে তারপর নিমকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সাধারণতঃ জমি নিষ্ফলা হলে চাষীরা অন্য জমি চষেন। তাঁদের আশা স্বাভাবিকভাবেই ঐ জমি পরে উর্বর হয়ে উঠবে। অথচ আসলে জমি ক্ষয়ে যায়, সমস্যা বাড়ে। নিম এই সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে সক্ষম।

—স্বপনকুমার চৌধুরী

উপকরণ :---আড়াইশো আলু, আড়াইশো মটরশুঁটি ও আড়াইশো গাজর, দু'টি কাঁচালঙ্কা, তিন চাকা বা শ্লাইস পাঁউরুটি, ডিম একটি, চায়ের চামচের এক চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, পেঁয়াজ, কিছু ধনেপাতা, বনস্পতি ঘি বা ভাল ঘি, অল্প নুন।

প্রণালী :---আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে চটকে নিন, মটরশুঁটিগুলো ছাড়িয়ে রাখুন, গাজর চাকা চাকা করে কুটে নিন, এবার এগুলোও সিদ্ধ করে চটকে নিন। পাঁউরুটির শ্লাইসগুলি জলে ভিজিয়ে নরম করে নিন। এবার দু'টি পেঁয়াজ ও দু'টি কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে রাখুন, এবার একটি পাত্রে অল্প ডাল্‌ডা বা ঘি গরম করে ও কুচোনো পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা ভাজতে চড়ান, বাদামী রং না ধরা পর্যন্ত ওটা ভাজুন।

এবার একটি পাত্রে ডিমটা ভাল করে ফেটিয়ে নিন, ধনেপাতাগুলোও কুচিয়ে নিন।

এবার সমস্ত সিদ্ধ তরকারীর সঙ্গে সব জিনিষগুলো ভাল করে চটকে মেখে, জল চেপে ঝরিয়ে ভিজে রুটির চাকাগুলোও ঐ সঙ্গে মেখে নিন, একটু নুন ও লঙ্কার গুঁড়োর সাথে।

এবার ঐ মাখা তালটা থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে ছোট ছোট চপের আকারে গড়ে নিন।

আগুনে তাওয়া বা ফ্রাইপ্যান চড়িয়ে অল্প অল্প করে ঘি বা ডাল্‌ডা দিয়ে চপগুলি উল্টে-পাল্টে ভেজে নিন।

এগুলো শুধুও খাওয়া যায়, আবার হামবার্গার বানরুটীর মধ্যে দিয়েও খাওয়া যায়।

রান্নাঘরে

আরও ভাল হয়।

র‍্যাভিয়োলী

উপকরণ :---আলু ও গাজর আড়াইশো গ্রাম করে, একমুঠো ফ্রেঞ্চবীন, ফুলকপির কিছু অংশ, কয়েকটি কাঁচালঙ্কা, একটুকরো আদা, কিছু ধনেপাতা, চায়ের চামচের আধ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, অল্প নুন।

চায়ের কাপের দু'কাপ ময়দা, কিছু ডাল্‌ডা। বড় বড় টোম্যাটো ও পেঁয়াজ দু'টি করে, গরম মশলা কিছু।

প্রণালী :---আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে সিদ্ধ করে চটকে মেখে নিন।

ফ্রেঞ্চবীন ও অপর সব্জীগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে রাখুন। এবার কয়েকটি কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতাগুলো কুচিয়ে রাখুন। এবার কাটা সব্জীগুলো সিদ্ধ করে নিন, এবার ঐ সিদ্ধ তরকারী, চটকানো আলু, কিছু কাঁচালঙ্কার কুচি, ধনেপাতা, একটু হলুদগুঁড়ো, একটু লঙ্কার গুঁড়ো ও পরিমাণমত নুন একসঙ্গে ভাল করে মেখে নিন।

এবার ময়দাটায় একটু নুন দিয়ে ভাল করে ঠেসে মেখে রাখুন।

এবার গোল গোল করে কয়েকটা নেচি কাটুন ময়দার তাল থেকে এবং ছোট করে লুচির আকারে বেলে নিন। এবার ঐ মাখা তরকারী থেকে কিছু কিছু নিয়ে একটি করে লুচির ওপর রাখুন ও আরেকটি লুচি দিয়ে সেটিকে ঢেকে দিয়ে দুটো লুচির পাশ ভাল করে মুড়ে জুড়ে দিন। এবার ঐ গড়া ময়দার টুকরোগুলোকে ভাল করে ভেজে নিন ডাল্‌ডায়।

এবার গ্রেভী করে নেওয়ার পালা।

পেঁয়াজ দু'টি কুচিয়ে নিয়ে একটুকরো আদা ও কয়েকটি কাঁচালঙ্কা সহযোগে মিহি করে বেটে নিন।

একটা পাত্রে বড় চামচের এক চামচ ডাল্‌ডা তাতিয়ে নিন এবং ওতে ঐ বাটা মশলাটুকু ছেড়ে দিন, বাদামী করে ভেজে নিন ওটা। বেশ ভাজা ভাজা হয়ে এলে টোম্যাটো দুটো ছেড়ে দিন, একটু নুন, অল্প হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়োও দিন। আবার কিছুক্ষণ ভাজুন নেড়ে-চেড়ে। এবার আন্দাজমত জল ঢেলে দিন ওতে।

ফোটান পাঁচ মিনিট ধরে, তারপর পাত্রটা নামিয়ে ফেলুন আগুন থেকে

এবার ভাজা ময়দার টুকরোগুলো একটা পাত্রে সাজিয়ে তার ওপর গ্রেভীটা ঢেলে দিন, সমস্তটার ওপর কিছু ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে ছড়িয়ে দিন।

গরম থাকতে থাকতে পরিবেশন করবেন।

চাইনিজ স্যালাড

উপকরণ :---এক ডজন ছোট পেঁয়াজ, তিনটি লঙ্কা, ছ'টি পাকা লাল টোম্যাটো, বড় চামচের ছ'চামচ স্যালাড অয়েল বা অলিভ অয়েল, বড় চামচের দু' চামচ চিনি, বড় চামচের দু' চামচ ময়দা, বড় চামচের দু' চামচ সয়া সস্ ও চায়ের কাপের এক কাপ জল, অল্প নুন।

প্রণালী :---পেঁয়াজগুলো ছাড়িয়ে চার টুকরো করে রাখুন, লঙ্কাগুলো কুচিয়ে নিন, টোম্যাটোগুলো চাকা চাকা করে কেটে নিন।

একটা ফ্রাই প্যানে গরম করে নিন।

তারপর তাতে টুকরো করা পেঁয়াজগুলো ঢেলে দিয়ে মিনিট পাঁচেক ভাজুন।

এবার ওতে টোম্যাটোর চাকা ও লঙ্কার কুচিগুলো মিশিয়ে দিন।

এবার একটা পাত্রে জলটা ঢেলে ফেলে তাতে চিনিটুকু, ময়দা ও সয়া সস্ মিশিয়ে দিন ভাল করে।

এবার আগুনে চড়ানো ফ্রাই প্যানে ঐ মিশ্রিত গোলাটা ঢেলে দিন, পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত ফোটান সমস্তটা, তারপর নামিয়ে ফেলে গরম থাকতে থাকতে পরিবেশন করুন।

পালং শাক

উপকরণ :---দুই বা তিন বাণ্ডিল পালং শাক, দুটো বড় আলু, দুটো

মাদার ভিক্টোরিয়া ওকামপো

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ঝড় থেমে গেছে, অনেক পাপড়ি খসেছে ফুলের বনে,
প্রাঙ্গণসীমা সাজিয়ে তুলেছে সন্ধ্যার কূলে-কূলে—
কত যে সাক্ষী ওক!
ধারাভিষিক্ত পর্বতমালা মেনেছে হলুদ আলো।
তারই কোল ঘেঁষে দীর্ঘ পাইনবন।
আঙুরলতার ছোঁয়ায় ছন্ন কত না ত্রিযামা রাত!

ওপারের দিকচিহ্নবিলীন বিসারিত নদী 'প্লাতা' ঃ
পিঁপড়ের মতো রূপোচিনিমুখে রৌদ্রের পথে চলে।

আরজেনটিনা শহরের বুকে নিরুপম-নিষ্কাম—
'মিরালরিও' কি বাড়িটার ওই নাম?

তুষারশৈল ভাসমান দেখি প্রকাশ্য জলপথে,
তলদেশটুকু ধরা তো পড়ে না চোখে।
সৃজনশীলতাধর্মী যে মন প্রাণরসে ভরপুর,
বিজয়া নামের সার্থক রূপায়ণ ঃ
বুয়েনোস আইরেসে—
মাদার ভিক্টোরিয়া ওকামপো
তুমি কী বাড়ালে হাত?

পূরবীর কবি শুনেছিল কবে সন্ধ্যাবেলার সুর,
গোষ্ঠে ফিরছে ধেনুরা—অঙ্গে গোধূলি আলোর রেণু।
সন্ধ্যাকুলায় ফিরে আসে কত বনবিহঙ্গদল,
খেয়াপারাপার বন্ধ করেছে মাঝি।
দিনের সূর্য দূরে পশ্চিম দিগন্তে পড়ে হেলে।
সারা সমুদ্র বিদায়বেলার বিষাদ-অশ্রু ধোয়া।

মাদার ভিক্টোরিয়া ওকামপো
তুমি কী বাড়ালে হাত।
বিজয়ার ডাকে পূরবীতে সাড়া
দেবে রবীন্দ্রনাথ?

পেঁয়াজ, চায়ের কাপের এক কাপ মুগের ডাল, লঙ্কা, হলুদগুঁড়ো, ও ধনে-জিরে-গুঁড়ো কিছু, অল্প নুন, সামান্য চিনি।

প্রণালী :—মুগের ডালটুকু ভিজিয়ে দিন রান্নার ঘণ্টাদুয়েক আগে থেকে। পালং শাকটুকু ভাল করে বেছে ধুয়ে রাখুন, তারপর কুচিয়ে কেটে নিন।

পেঁয়াজদুটোও চাকা চাকা করে কেটে রাখুন, এবার আলু দুটোর খোসা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে রাখুন।

একটা পাত্রে কিছু ঘি তাতিয়ে নিন, তারপর তাতে হলুদগুঁড়ো ছেড়ে দিন সামান্য, এবার পেঁয়াজের চাকা-গুলোও ওতে ছেড়ে দিন, দিয়ে নাড়া-চাড়া করে অল্প একটু ভেজে নিন, তারপর কিছু ধনে গুঁড়ো ও জিরা গুঁড়ো এবং পরিমাণমত নুন ও চিনি দিয়ে দিন এবং আরেকটু ভাজা ভাজা করুন সমস্তটা।

এবার জল থেকে ডালগুলো উঠিয়ে নিয়ে ঐ ভাজা মশলা ও পেঁয়াজের মধ্যে ছেড়ে দিন, আলু, শাকও ছেড়ে দিন ওর মধ্যে।

অল্প জল দিন ও সবটা সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলুন।

—রেবা দেবী

পশু-পক্ষী-পালন

চৈনিক সারমেয়

চীনা কুকুর পিকিংগিজ্ প্রাচীনতম কুকুর কি না, তা নিয়ে মতান্তর বর্তমান: কারও কারও মতে সালুকি প্রাচীনতর। বস্তুত, প্রাচীন মিশরীয় প্যাপীরাস কাগজে এবং ফলকে আধুনিক সালুকির মত সারমেয় অংকিত আছে; তা দেখলে মনে হয় আকৃতিতে এরা হাজার হাজার বছর আগে একই রকম ছিল। এ সব তাত্ত্বিক কচকচি তোলা থাক। শ'খানেক বছরের তফাতে কীই বা এসে যায়? একটা কথা কিন্তু ঠিক: শিকারের পর মিশরীয় প্রভুব্যক্তিরা কুকুরগুলোকে শ্যা-খানায় পুরে দিতেন পরবর্তী শিকারের আগে আর তাদের খোঁজ পড়ত না। চীনা কুকুরদের বেলায় ভিন্ন রকম। নিদেনপক্ষে চার হাজার বছর ধরে এরা সম্রাটের বিছানা, খাদ্য এবং আনন্দের ভাগীদার। প্রতিটি অনুষ্ঠানে তারা উপস্থিত থাকত ---সম্রাটের পত্নীবর্গ এবং সভাসদদের আগে এদের স্থান। বহু সম্মানভূষিত পিকিংগিজ্-রা মাইনে পর্যন্ত পেত।

এত খাতিরের কারণ ধর্মীয়। গোড়ায় এদের কেবলমাত্র সম্রাটের পরিবারে পোষার রেওয়াজ ছিল। ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম চীনে পৌঁছনো পর্যন্ত এরা মহামান্য সম্রাটের পোষ্য।

ঐ ধর্ম অনুযায়ী তাঁর সিংহাসনের রক্ষী বুদ্ধদেবের সিংহ, তার গর্জনে দুষ্ট আত্মা পলায়ন করে। তাই, চীনাদের কাছে অপরিচিত সিংহ রহস্য-উৎস।

শীগগিরই দেখা গেল সম্রাটের নিজস্ব পিকিংগিজ্ কুকুর চেহারায় ভারতবর্ষীয় সিংহের মতনই অনেকটা। শুরু হল এর পদোন্নতি। এদের বুদ্ধদেবের রক্ষীর মর্যাদা দেওয়া হল, এবং সতর্ক ব্রিডিং-এর ফলে চেহারা এবং স্বভাবে বনের রাজার মতই বিশেষ একটি পিকিংগিজ্ বংশের জন্ম দেওয়াও সম্ভব হল। এরা সিংহাসনের রক্ষক এবং রাজকীয় পরিবারের রক্ষা-কর্তা হল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে দেবতার মর্যাদা পেয়ে রাজপ্রভুদের পূজা পেল।

এদের বংশবৃদ্ধির দায়িত্ব ছিল রাজকীয় শ্বা-বিশেষজ্ঞদের হাতে; তারা দৃষ্টিনন্দন সারমেয় উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত হতেন এবং সেগুলো সম্রাটের ব্যক্তিগত পোষ্যরূপে গণ্য হত। এরা বিশেষভাবে শিক্ষা পেয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্রাটের আগে আগে গিয়ে ঘেউ ঘেউ রবে তাঁর আগমন ঘোষণা করত, এবং কয়েকটি তাঁর পেছন পেছন এগোত তাঁর পোশাকের প্রান্ত মুখে ক'রে।

এই 'সিংহ কুকুর'দের রাজপুরীর চৌহদ্দীর বাইরে দেখা যেত না বললেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট ছাড়া আর কারোর এদের বাইরে নেওয়ার হুকুম ছিল না।

স্বাভাবিকভাবেই এই দৃষ্টপূর্ব রাজকীয় সমাদরে হাজার হাজার বছর কাটানোর ফলে এদের মধ্যে অনন্য-সুলভ গাম্ভীর্যময় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এদের শিক্ষা ছিল সিংহের মত অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করার। বিশ শতকে ইংলণ্ড-আমেরিকার কোমল ড্রইংরুম-বাসী হওয়া সত্ত্বেও এরা আজও অসম-সাহসী। প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহত্তর এবং হিংস্রতর হলেই এদের আমোদ বাড়তে থাকে, নিজেদের যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ এরা কখনও ছাড়ে না।

চীনদেশে এদের খাদ্যও ছিল রাজকীয়। রাজবাড়ির কুকুরছানাকে দুধ খাওয়াত রক্ষিতাবৃন্দ। হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবে বড় হওয়ার ফলে এদের পক্ষে মানবিক কিছু গুণ লাভ করা কি অসম্ভব? পণ্ডিতরা এ প্রশ্ন শুনে হাসলেও, এদের কৃষ্ণবর্ণ গোল প্রাচ্য চোখে এমন কিছু দেখা যায় যা প্রতীচ্যের সারমেয়কুলে কখনও দৃষ্ট হয়নি। এদের সারমেয়াতিগ সমানু-

ভূতি আর অদ্ভুত মস্তিষ্কর বুদ্ধিমানতাও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিঃসন্দেহে অন্য কোনও কুকুরই মানবিক মেজাজের অংশভাক্ হতে অক্ষম। অতি দীর্ঘকাল ধরে পরিশীলিত প্রভু এবং পারিপার্শ্বিক এদের এই বিশিষ্ট গুণের অধিকারী করেছে। এদের শিক্ষা দেওয়া সহজতম এবং মানুষ-বন্ধুদের খুশি-অখুশি বুঝতে এরা ওস্তাদ। পরিচালনা করা যায় এদের, কিন্তু আদেশ মানতে বাধ্য করা অসম্ভব। এটি কিন্তু একগুঁয়েমী ভাব। য়ুরোপীয়রা যখন ধন্য, মোসেস যখন তাঁর 'দশটি আদেশ' পাথরের ওপর উৎকীর্ণ করেননি, তখন থেকেই এরা প্রাচীনতম এবং অত্যুন্নত সভ্যতার শাঁসটুকুর মধ্যেই লালিতপালিত। পিকিংগিজ্-এর মালিকরা তাই হবু ক্রেতাদের বলেন, ন্যায্য সম্মান যদি একে না দিতে পারেন ত কিনবেন না, চ্যামেলিয়ন কিনুন।

চার হাজার বছরের পুরনো কোরীয় ব্রোঞ্জ মূর্তি থেকে বোঝা যায় এরা তখনও প্রায় একই রকম দেখতে ছিল। কিন্তু এদের উৎস আজও অনুমানের বিষয়।

এর ফলে কয়েকটি সুন্দর উপকথার উদ্ভব হয়েছে। একটি বলে, একবার এক সিংহ এক খুদে বাঁদরের প্রেমে পড়ে সমস্যার সমাধানের জন্য বুদ্ধদেবের কাছে গেলে করুণাময় বুদ্ধদেব তাকে খুদে হওয়ার ক্ষমতা দেন। তখন সেই সিংহ ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে পিকিংগিজ কুকুরে পরিণত হয়। এই উপকথারই ভিন্ন রূপ: সিংহ আর বাঁদরের উদ্দেশ্যমূলক মিলনের ফল পিকিংগিজ্।

সম্রাটরা পছন্দ করতেন রং করা কুকুর। সাদা কুকুরের আদৌ জনপ্রিয়তা ছিল না। কারণ, সাদা মৃত্যুর রং। অবশ্য দু'চোখের মাঝখানে সাদা ঝলক খুব আদৃত হত, বুদ্ধদেবের প্রিয় চিহ্ন হিসেবে। ফ্যাশন পালটাল। খোলা জিভওলা কুকুর খুব প্রিয় হয়ে ওঠায় বাচ্চাগুলোর জিভ টেনে লম্বা করা হত।

সের তিনেক ওজনের ক্ষুদ্রতম কুকুরের কদর খুব—এদের জামার ভেতরে পুরে রাখা যায় বলে। এদের জন্ম আকস্মিক। অবশ্য, বিশেষ উপায়ে এদের জন্মানোর সম্ভাবনা বাড়ানো সম্ভব।

১৮৬০ খৃস্টাব্দে ফ্র্যাংকো-বৃটিশ আক্রমণকালে পিকিং থেকে পিকিংগিজ বহু মূল্যবান সামগ্রীর সঙ্গে লুট করা হয়েছিল। পাঁচটা অপরূপ কুকুর জনৈক রাজকুমারীর দেহরক্ষী ছিল। এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতমটি বিজয়ী জেনারেল-এর টুপিতে ঘুমোত। এটি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হয়। তিনি এর নামকরণ করেন 'লুটী'। লুটের মাল।

প্রাচ্যের প্রাচীনতম রাজপরিবার থেকে প্রতীচ্যের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজপরিবারে আশ্রয় পেল এরা। যোগ্য সমাদরও।

১৮৯৪-তে প্রথম চেস্টার্-এ প্রদর্শিত হওয়ার পর থেকে এদের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ১৮৯৮-তে সারমেয় সঙ্ঘ এদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। আশ্চর্যজনক স্বল্প সময়ের মধ্যে য়ুরো-আমেরিকায় এদের জনপ্রিয়তা শীর্ষস্থান লাভ করল।

বহু পুরস্কারজয়ী পিকিংগিজ্ আজও জনপ্রিয়তায় অদ্বিতীয়। এদের কদর দীর্ঘজীবনক।

—তথ্যাচার্য

প্রোটিন খাদ্যে বিপ্লব

'বিপ্লব' শব্দটি বোধকরি সর্বাধিক প্রচারিত। শোনে নি এমন কাউকে খুঁজে বের করাও মুশকিল।

বক্ষ্যমান আলোচনার বিষয় প্রোটিন খাদ্যে বিপ্লব---অর্থাৎ, মৌলিক পরিবর্তন। 'সবুজ বিপ্লব' কেন্দ্রীয় কর্তাদের জবানীতে আমরা কল্পনা করেছি। কিন্তু, আলোচ্য ব্যাপারটি বাস্তব; আমাদের খাদ্য পশুমাংসর ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা কানাডা এবং অন্যত্র দীর্ঘকাল আগেই সুরু হয়েছিল, বিদেশী সাহায্য ছাড়াই। সেই প্রচেষ্টা অনেকখানি সফল। অধিকতর সাফল্য নিশ্চিত। কারণ, গবেষকদের প্রচেষ্টায় সক্রিয় মস্তিষ্ক আর হাত---জিহ্বার স্থান প্রায় শূন্যের কোঠায়।

কানাডার প্রেইরী প্রদেশগুলোর পরীক্ষামূলক 'ফার্ম'-এ এক ধরনের নতুন প্রাণী চোখে পড়বে---গোহিষ: গরু এবং মোষের মিশ্রণে উৎপন্ন।

আমেরিকার দক্ষিণী জলাভূমিতে দেখা যাবে গরুর মত পাল পাল প্রাণী ---এরা অংশত গরু এবং রেড্ ইণ্ডিয়ানদের কুঁজঅলা ষাঁড়ের সংমিশ্রণ।

এই প্রাণী বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক খেয়াল নয়---এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান, যা আমাদের জীবনের উন্নতির সংগে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত: এ থেকে আরো ভাল খাদ্য, বেশি খাদ্য, এবং পরে অনেক সস্তায় খাদ্য মিলবে সকলের জন্য।

এই শতকের শেষে মানুষের সংখ্যা হবে ভয়াবহ। রব উঠবে: ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। ছোট এ তরী। সেই অনাগত আতংক ছড়িয়ে গেছে সবখানে। আমরা---থাক্। আত্মগ্লানি কিসের লক্ষণ যেন বলেন মনস্তাত্ত্বিকরা। কিন্তু, ওরা বসে নেই। প্রয়োজন---অনাগত হলেও---ওদের ভাবায় এবং কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। ক'রে আসছে বরাবর।

এক্ষেত্রেও তাই। প্রকৃতির দান আপন প্রয়োজনমাফিক উল্টেপাল্টে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওরা খাদ্য সমস্যার যথাসম্ভব সমাধানে কৃতসংকল্প। সেই দৃঢ় প্রচেষ্টারই ফসল উপযুক্ত দু'টি নতুন জাত। খাদ্যে বিপ্লব ওরা সুরু করেছে।
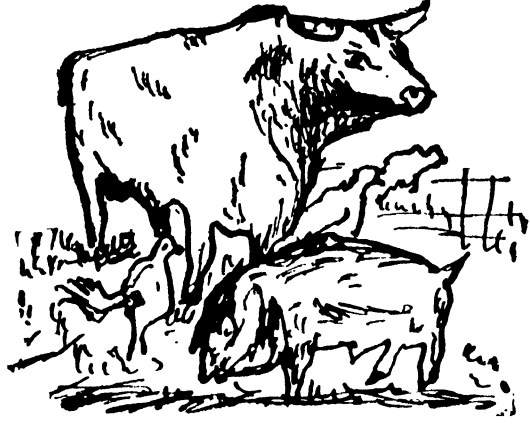
কানাডায় প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝায় গরুর পাল অসহায়। অথচ মোষগুলো টিকে থাকে। তাই ওরা গরু + মোষ = গোহিষ বানালো। চল্লিশ বছরব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল গোহিষ---যা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়াতে পারে এবং এদের মাংস গৃহপালিত গোরুর মতই সুস্বাদু।

আমেরিকার বিশেষ প্রাণীটির এখন ঘাম হয়। কারণ, রেড ইণ্ডিয়ান্ কুঁজঅলা বৃষর এই গুণটি বৈজ্ঞানিক প্রজননের কৌশলে তার আয়ত্তাধীন করানো সম্ভব হয়েছে। আগে গরমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে এগুলোর জ্বর পর্যন্ত হত। নবসৃষ্ট প্রাণীদের দুধ আর মাংস হয় পর্যাপ্ত।

আর একটা সমস্যা হল উৎকৃষ্ট বৃষর বীর্য থেকে বছরে হাজার পাঁচেক ডিম উর্বর করা যায় ঠিকই, কিন্তু অতসংখ্যক উৎকৃষ্ট গরু কোথায়? ঠিক হল: বছরে গরু ১৭টা ভ্রূণকোষ উৎপাদন করে---এগুলো উৎকৃষ্ট গরু থেকে নিকৃষ্ট গরুতে প্রোথিত করতে পারলে সমস্যার সমাধান হয় বটে। বিপুল উদ্যমে গবেষণা চলেছে। সাফল্য করায়ত্ত হবেই। তখন, একটা গরু বছরে ১৭টা বাচ্ছা দেবে---একবারও স্বয়ং না বিইয়ে।

শুয়োরের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন চলেছে। প্রায় দু' দশক আগে একদল বৈজ্ঞানিক এগুলো দেখে বলেন---আকার ঠিক নেই, বড্ড বড়, অতিরিক্ত মেদবহুল।

মাত্র বছর সাতেকের মধ্যে তাঁরা আধুনিক প্রয়োজনমাফিক নতুন শুয়োর তৈরি করে ফেললেন। ১৯৫৩-এ বাজারে-ছাড়া এই শুয়োরের পা ছোট, শরীর দীর্ঘ এবং প্রত্যেকটা থেকে বিক্রয়যোগ্য ১০০ সেরের মত মাংস পাওয়া যায়। এরা বাড়ে চট্‌পট্, মাংস আগের তুলনায় ঢের বেশি মনুষ্যোপযোগী।

মোরগ-মুরগীর পরিবর্তন আরও চমকপ্রদ। এদের প্রায় চেনাই যায় না---নতুন পাখি বুঝি বা। আড়াই দশকেরও আগে নতুন জাতের মোরগ-মুরগীর জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়। নিউ হ্যাম্‌শায়ার জাত নিয়ে গবেষণা সুরু করে জনৈক মুরগীপালক প্রায় নতুন এক জাতের মুরগীর জন্ম দেওয়াতে সক্ষম হন। প্রজনন আর পুনঃ প্রজননের কৌশলে তিনি

এ নতুন জাতটির জন্ম দেয়, যার ওজন আগের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশি। আর, অনেকটুকু সাদা চাকাচাকা মাংস। তা ছাড়া আগেরগুলো বড় ক'রে বাজারে ছাড়তে হলে লাগত প্রায় ১৪ সপ্তাহেরও বেশী। এ ক্ষেত্রে দরকার মাত্র ৮ থেকে ১২ সপ্তাহ।

পুরনো টার্কী খুব বেশি বড়। অকে ছোট করা হল। হাড় মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। আর সবটাই সাদা মাংস।

কেবল মাংসের ক্ষেত্রেই নয়—শাকসব্জির ক্ষেত্রেও এই ঢেউ লেগেছে।

—সংকলক

পক্ষীতত্ত্ব

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের পাখী এবং তাদের চেহারার বৈচিত্র্য বশ লক্ষ্য করা যায়। এদেশের পাখীদের রূপ পরিবর্তন খুব একটা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের পাখীদের ভেতর কিছু পাখীর রূপ পরিবর্তন হয়ে থাকে জানা গেছে। টারমিগান পাখী তাদের অন্যতম। এদের ইংলণ্ডে দেখা যায়। স্ত্রী এবং পুরুষের বিভিন্ন রকম পালক একমাত্র গ্রীষ্মকালে লক্ষ্য করা যায়। আবার শীতের প্রাদুর্ভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পুরনো পালক পরিবর্তন করে। অথবা আবহাওয়ায় তা খসে পড়ে এবং তার বদলে শাদা পালক গজিয়ে ওঠে। বরফের রঙের সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির অদ্ভুত অবদানে বা সহায়তায়, যার জন্য কোন শিকারী চট করে তাকে দেখতে পায় না। এইভাবে নিজেরা লুকিয়ে থেকে চলাফেরা করে ও খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রাকৃতিক অবদানটুকু না পেলে তারা খাদ্যাভাবে মরে যেতো। ভক্ষ্যবস্তুরও তেমনি পরিবর্তন ঘটে থাকে। এদের মত সব পাখীই ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের রূপটাকে পাল্টাতে পারে না। অথচ কোন পাখীর আত্মরক্ষার্থে রূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং তা প্রায় অতি উজ্জ্বল বর্ণের।

দেশের গ্রামে বা গ্রামাঞ্চলে হরিয়াল পাখীকে দেখা যায় বটগাছ বা ঐ জাতীয় গাছে বাস করছে। বটের পাতার সাথে মিশে থাকে হরিয়াল অথবা টিয়াপাখী। হরিয়াল অত্যন্ত ভীতু পাখী। অনেক দূর থেকে বারুদের গন্ধ পেলে বা বন্দুকের শব্দ পেলে সদলবলে পলায়ন করে। তেমনি অন্য কোন গাছের পাতার সাথে মিশে থাকতে পারে। টিয়াপাখীও এই বটের ফল খেয়ে থাকে। আবার সদলে যখন পাকা ধান ক্ষেতে হানা দেয়, তখন তাদের গায়ের রং মিশে যায় ক্ষেতের রঙের সাথে। টিয়ার গায়ের রং গাঢ় সবুজ বর্ণের। বয়স বাড়ার সাথে গলদেশে রামধনুকের আকারপ্রাপ্তি ঘটে। টিয়াপাখী শুধু ধান ক্ষেতেই নয় বা বটগাছেই নয়, ঝাউগাছেও বিচরণ করে। ঝাউপাতার রঙের সাথে মিশে থাকে এবং ঝাউয়ের ফল খেয়ে থাকে। সবুজে সবুজে মিশে বেশ মহানন্দে বাস করে এবং উদরপূর্তি করে।

রমেশ মজুমদার

আর একটি পাখী বুলবুল। লেজ-ঝোলা বুলবুল পাখী। খয়েরী রঙের বুলবুলের লেজ খুব বড় হয় না। কিন্তু সাদা অর্থাৎ সাহেব বুলবুলের লেজ খুব বড় হয়ে থাকে। সাধারণত গ্রীষ্মকালেই এই বুলবুলকে দেখতে পাওয়া যায়। এরা আমবাগানে সুন্দর চেহারা নিয়ে ছুটাছুটি করে এবং আমগাছের ডালে একটু উঁচুতে বাসা বাঁধে। খয়েরী রঙের বুলবুল স্ত্রী জাতীয় এবং পুরুষগুলি সাদা। ওদের বাসাগুলো বড়ই সুদৃশ্য এবং শক্তভাবে গড়া, যাতে ঝড়ে না ভেঙে যায়। উভয়েই এই বাসা বাঁধার কাজে ব্যস্ত থাকে। চোখ জুড়ানো এই রূপ নিয়ে লেজ-ঝোলা বুলবুল নেচে নেচে বেড়ায়। বুলবুল পুরুষগুলো দুধের মত সাদা রঙের এবং লেজ লম্বায় দু' হাত মত হয়। তেমনি পুরুষ পায়রাগুলোকে দেখতে বড় সুন্দর। পুরুষ চড়ুইগুলোও দেখতে চমৎকার।

ভারতবর্ষে একপ্রকার পাখী আছে হুপু জাতীয়। এরা মানুষের আগমন লক্ষ্য করে মাঠের ভেতর সাদা ও কালো মেশানো বিচিত্র বর্ণের পাখা বিস্তার করে মাথা নীচু করে থাকে। এদের মাথায় ঝুঁটি আছে। কিন্তু দূর থেকে এদের এই অবস্থায় দেখলে মনে হবে যেন এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় অথবা কাগজ পড়ে আছে। মানুষ না দেখলে আবার ছুটাছুটি করে খাদ্য অন্বেষণে।

এখানে চাতক পাখীকে তুলে ধরা যেতে পারে। ঝোপে-জঙ্গলে এমনভাবে মিশে থাকে গায়ের রঙের সাথে, যাতে সহসা ধরা যায় না কোথায় তার অবস্থিতি। একমাত্র নড়াচড়া করলেই ধরা পড়ে। প্রকৃতির অদ্ভুত সহায়তা এরা পেয়ে থাকে।

কুরাসো ও বাজপাখী

মধ্য আমেরিকায় একপ্রকার পাখী দেখা যায়। নাম কুরাসো। এই কুরাসো পাখী অত্যন্ত সুখাদ্য। তাই শিকারীরা এদের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং এদের সংহার করে মাংসভক্ষণ করে। এই কুরাসো পাখী আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা ছিল, হয়তো এখনো আছে। ঐ দেশেই কুরাসোর মত একপ্রকার বাজ আছে। দেখতে কুরাসোর মত হওয়ায় শিকারীরা অনেক সময় ভুল করে বাজপাখীকে বধ করে হতাশ হয় পরে। নিতান্ত কাছে থেকে

এই বাজপাখীকে কুরাসো বলে ভ্রম করে। যেমন আমাদের দেশে কাক ভাবে কোকিল। এই অবস্থায় পড়ে মরে কুরাসোপাখীগুলো। বাজপাখীকেও স্বগোত্র ভেবে বিচলিত হয় না বা পালায় না। ফলে প্রাণ হারাতে হয় প্রায় ক্ষেত্রেই।

কোকিল ও পাপিয়া

আমাদের দেশের পাপিয়া বিপরীত শ্রেণীর অনুকরণের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। এই দেশবাসী পাপিয়ার নাম জানেন, কিন্তু পাপিয়াকে চেনেন না। পাপিয়া স্বভাবত পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং সুকণ্ঠে গান গায়। স্ত্রী কোকিলকে অনেকে পাপিয়া মনে করেন। কোকিলের স্ত্রী-পুরুষ সবারই চোখ লাল হয়ে থাকে। কিন্তু পাপিয়ার চোখ অনেকটা পীতবর্ণের। ফ্র্যাঙ্কফীন সাহেব বলেছিলেন যে, য়ুরোপীয়রা গরমকালে পাপিয়ার কণ্ঠস্বরে এমন বিরক্ত হয়ে ওঠে যে, তাকে দেখতে পেলে গুলী করবে, কিন্তু পাতার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে গান গায় বলেই তা পারে না। ইংরাজীতে তাই এদের বলে 'হক্‌কাকু'।

কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে লুকিয়ে। তারপর কাক যদি জানতে পারে, তাহলে তাড়া করে নিয়ে যায় কোকিলকে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। প্রায়ই কোকিল কাকের চোখে ধুলো দিতে সমর্থ হয়। এই সুযোগে স্ত্রী কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। পুরুষটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাকের সাথে লেগে থাকে। কাকও তাকে গ্রামছাড়া করে ছাড়ে। বিলাতের কাককু পরভৃত। অর্থাৎ এমনি পরের বাসায় ডিম পাড়ে। এমনিভাবে ঝগড়া বাধিয়ে মারামারি করে পাস, পিপিট অথবা রোবিন পাখীর সাথে। তাড়া করে নিয়ে যায় পুরুষটিকে। সেই সুযোগে লুকিয়ে থাকা কাকক চুপ করে এসে বাসায় বসে ডিম্ব প্রসব করে দেয় ছুট।

কালোফিঙ্গে-কোকিল-কাক

কাকের বাসায় কোকিলের স্থান হয়, কিন্তু কোকিলের সাথে কাকের সাদৃশ্য খুব বেশী। বায়সী কোকিলকে সহচর ভাবতেই পারে না। স্ত্রী কোকিলের চেহারা কতকটা শিকরের মত। এ ক্ষেত্রে কাকের সন্দিগ্ধ ভাব কোকিলের প্রতারণার কাজে বেশ সাহায্য করে। ডবু., পি, পিক্রেফট বলেছেন যে, কোকিল সাধারণত কালো-ফিঙ্গের বাসাতে ডিম পেড়ে থাকে। পুরুষ কোকিল এবং কালোফিঙ্গের চেহারা এক। একমাত্র পার্থক্য লেজের গঠনে। আবার মজা এই, কখনো ফিঙ্গেও কাকের মত সন্দিগ্ধ স্বভাবের। আবার অনেক সময় স্ত্রী ফিঙ্গে পুরুষ কোকিলকে আপনার সহচর মনে করে থাকে এবং মাতামাতি করে। অনেকে বলেন, ময়নাও কোকিলের প্রতারণায় অন্যের সন্তান প্রতিপালন করে। এটা কতদূর সত্য জানা যায়নি।

পিঠের ও পেটের রং

অনেকেই দেখে থাকবেন যে, বহু পাখীর ও অনেক পশুর পিঠের রং বুকের রং অপেক্ষা বেশ গাঢ়। এর কারণ তাদের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে মিলিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমেরিকার প্রাণীতত্ত্ববিদ থেয়ার সাহেব ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটি প্রমাণ দ্বারা কথাটি বেশ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গায়ের রঙের সাথে এর রং মিলিয়ে বসবাস করতে ভাল-বাসে। প্রকৃতি এদের আকৃষ্ট ক'রে বাঁচায় এদের এমনিভাবে।

একটি পুরোনো ওষুধের জনপ্রিয়তা

আমাদের দিদিমা, ঠাকুমারা অনেক রকম ওষুধপত্তর জানতেন। ফিকব্যথায় তাঁরা দিতেন জলপড়া, সর্দিতে যষ্টিমধু, বদ রক্ত বার করতে জোঁক সেকালে আকচার ব্যবহার করতেন তাঁরা। এরকম একটি ওষুধ পশ্চিম জার্মানীতে আবার খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটি হচ্ছে ইঁদুরের মত জন্তুর চর্বি। প্রাচীনকালে জার্মানীতে বাত সারাতে এই চর্বি ব্যবহার ছিল। ইদানীং পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে, সত্যিই এই চর্বির বাত সারাবার গুণ আছে। অর্থাৎ সেকেলে ওষুধ বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

বৃক্ষ বিপ্লব

আরও, আরও, আরও, আরও— খাদ্য চাই।

জনসংখ্যা যে হারে ক্রমবর্ধমান—গর্ভনিয়ন্ত্রণের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও—ভারতে এই শতকের শেষে পৃথিবীর চেহারা যা দাঁড়াবে তা আদৌ আশাপ্রদ নয়। থাকার জায়গা নিয়ে কামড়া-কামড়ি লাগার সম্ভাবনা।

সুতরাং চালু শ্লোগান—উৎপাদন বাড়াও—অচল হবে। বাড়ানো হবে কোথায়? চাষ করতে জমি লাগে। পশুপালনেই যে জায়গা আবশ্যিক তাই নয়, পশুখাদ্য ফলানোরও জমি চাই। উপায়? বৃক্ষ বিপ্লব।

অর্থাৎ, গাছপালার জগতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে আগের তুলনায় ঢের অল্প খেয়েও অনেক বেশি পুষ্টি সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে।

ধান-গমের ক্ষেত্রে এ চেষ্টা চলেছে বিশ্বময়। ফিলিপাইনস-এর কৃষিখামারে সর্বশেষ যে ধান-গমের বীজ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, তাতে একই পরিমাণ জমিতে আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ফসল ফলানো গেছে। অন্য পরে কা কথা, এই পশ্চাদপদ ভারতেই আই-আর-৮ ইত্যাদির সাহায্যে অনেক বেশি ধান ফলছে। গমের ক্ষেত্রে নাকি পাঞ্জাব-হরিয়ানা বিপ্লব এনেছে। আর, ফিলিপাইনস-এ উৎপন্ন (সম্ভবতঃ আই-আর-২১ কিংবা ২৪) বীজে ফসল হবে আরও অনেক, অনেক বেশি।

কিন্তু কেবল ধান-গমের ফলন বাড়িয়েই তৃপ্ত থাকা চলছে না। শাক-সবজীর উৎপাদন, তার পুষ্টিমূল্য বাড়ানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে অধিক পুষ্টিকর জাত উৎপাদনে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই লক্ষণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'হাই-সি' টম্যাটো-র দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক্। ১৯৩৮-এ শক্তপোক্ত, রোগপ্রতিরোধক এক জাতের টম্যাটো তৈরি করার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিকের হাতে আসে তার মধ্যে ছিল পেরু-র শক্ত, সবুজ, জঘন্য এক জাতের টম্যাটো। বেড় মাত্র ইঞ্চি খানেক। এত ছোট আর এত খেলো—কিন্তু রীতিমত শক্তপোক্ত আর বাতসহ। এটিকে আমেরিকার বড় জাতের স্বাদু টম্যাটোর সঙ্গে মিলিয়ে নতুন ফসল উৎপন্ন করার চেষ্টা চলল। 'ক্রস'-এর বীজ নেই। মনে হল, এ চেষ্টা ছাড়তে হবে। কিন্তু, আরও দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে অবশেষে মাত্র একটা বীজ পাওয়া গেল।

এই বীজের সাহায্যেই শক্তপোক্ত নতুন জাতের টম্যাটো উৎপাদন করা সম্ভব হল। তখনও এটি বাড়তি এক রোগ প্রতিরোধক জাত মাত্র। পরীক্ষার ফলে একটা চমকপ্রদ তথ্য জানা গেল। এই জাতের টম্যাটোয় ভিটামিন সি বা 'গ' খাদ্যপ্রাণ আশ্চর্যজনক পরিমাণে বর্তমান, অন্য যে কোনও জাতের চেয়ে ঢের বেশি। সমান আকৃতির কমলা-লেবুর সমান 'গ' খাদ্যপ্রাণ যুক্ত এই টম্যাটো-র নাম রাখা হল 'হাই-সি'—প্রচুর সি ভিটামিন্ সমৃদ্ধ টম্যাটো।

গুয়াতেমালায় জাত শস্যে 'ক' খাদ্যপ্রাণের খুবই অভাব। ফলতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের শরীরে ভিটামিন-এর অভাব অপ্রতিরোধ্য। সুরু হল গবেষণা: আমেরিকান শস্যের তুল্য খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ শস্য গুয়াতেমালায় উৎপাদন করতেই হবে। অবশেষে গবেষণার ফল মিলল—মিলল আশাতিরিক্তভাবে। আমেরিকান শস্যের তুলনায় সদ্য উৎপন্ন শস্য তিন চারগুণ বেশি খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ।

অবশ্য, এক্ষেত্রে সর্বাধিক চাঞ্চল্য-

পদার্থ থেকে যা প্রকৃতি স্বয়ং গোপন রেখেছে একটা সাধারণ গাছে। এই ওষুধটির নাম 'Colchicine'—কল্‌চিসাইন্। এ থেকে ইতিমধ্যেই এমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটেছে যে, বৈজ্ঞানিকরা হতভম্ব।

তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, এই রাসায়নিক পদার্থটি ক্রোমোসোম্-এর সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে; এই ক্রোমোসোম্-ই প্রতিটি 'জার্ম্ সেল্'-এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক প্রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে এই রূপকথার রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার ক'রে চমক লাগানো ফল হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা কৃত্রিম প্রজননের সাহায্যে প্রমাণ আকারের ইঁদুরের তুলনায় ২ ১/২ গুণ বড় এবং পরিণত ইঁদুরের জন্ম দিইয়েছেন।

কল্‌চিসাইন্ প্রয়োগে পাওয়া গেছে তরমুজাকৃতির টম্যাটো। হাতির আকারের গরুও মিলবে এরই সাহায্যে।

প্রকৃতির ভাণ্ডারের গুপ্ত কুঞ্চিকা আজ বৈজ্ঞানিকদের করতলগত। আর তাঁরা তেমন চিন্তিত নন। মহার্ঘতম প্রাকৃতিক সম্পদ আজ তাঁদের আয়ত্তাধীন।

তাই তাঁরা নির্ভয়ে বলছেন: আবিষ্কার সীমাহীন। সব সমস্যার সমাধান আছে। এবং তা করাও হবে। মা ভৈঃ।

সত্যিই আর চিন্তাক্লিষ্ট হওয়া বোধকরি নিরর্থক। সীসেম খোলার মন্ত্র যখন পাওয়া গেছে, তখন আর ভয় কাহারে।

—স চৌ

সমকামী

নিজ লিংগ থেকে যে সংক্ষোভজ এবং দৈহিক তৃপ্তি লাভ করে, তাকেই বলা হয় সমকামী। সব সমকামীকেই যৌন ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা যায় না। প্রচুর সংখ্যক লোক বয়:-সন্ধিকালে কিংবা বয়সকালেও কৌতূহল বা অবস্থার চাপে সাময়িকভাবে সমকামের আশ্রয় নিলেও, আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন যাপন ক'রে থাকে।

তাছাড়া রয়েছে স্বাভাবিক' সমকামীরা। এরা বিপরীত লিংগ থেকেই যৌনতৃপ্তি পেতে ইচ্ছুক এবং অভ্যস্ত। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থার বেড়াজালে আটকালে (জেল-এ, সৈন্যবাহিনীতে, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে) সাময়িকভাবে সমকামী হয়। মুক্তি পেলে আবার এরাই স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করে।

সুতরাং, প্রকৃত সমকামী সে-ই, যে কেবল দীর্ঘদিন নিজলিংগে আসক্ত নয়, বিপরীত লিংগর প্রতি যার আকর্ষণও তুলনায় কম।

এর কারণ কি? আগে অনেক কারণই দেখানো হয়েছে: হর্মোন্ ক্ষরণের গণ্ডগোল, জন্মগত, গঠনগত ত্রুটি, স্বেচ্ছায় নতুন চমকপ্রদ উত্তেজনা লাভের ইচ্ছা ইত্যাদি। আজ কিন্তু এইসব মন্তব্য পরিত্যক্ত। সর্বাধুনিক দৃষ্টিতে এটি মানসিক জটিলতার ফল। কিন্তু এখনও বলা যাচ্ছে না---সমকামের কারণ---। কারণ, সমকাম কোনও মানসিক রোগ নয়, তার লক্ষণ মাত্র।

ঠিক যেমন মাথা ধরে নানা কারণে, সমকামও ব্যক্তিত্বর একাধিক গণ্ডগোলের প্রকাশ। কাজেই 'ক' বাবু যে কারণে সমকামী, 'খ' বাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে তা-ই।

এর মানসিক কারণ বহুবিধ হওয়া সম্ভব:

(এক) বিপরীত লিংগ সম্পর্কে তীব্র ভীতি।

(দুই) বয়স্ক মানুষের পক্ষে শোভন সামাজিক কর্তৃত্ব উড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

(তিন) সামাজিক কর্তৃত্ব উড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

(চার) সমলিংগর প্রতি ঘৃণা বা প্রতিযোগিতা করার মনোভাব, তার মাধ্যমেই তৃপ্তিলাভের ক্রিয়া-মাধ্যমে তৃপ্ত করা।

(পাঁচ) দৈহিক উত্তেজনার জগতে বাস্তবের মুখোমুখি না হওয়ার ইচ্ছাসঞ্জাত পলায়ন।

(ছয়) নিজেকে বা অন্যদের শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করার ইচ্ছা।

কোন বিশেষ পারিবারিক পরিবেশে যে সমকামী হবেই তা আজও অপ্রমাণিত। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, সুস্থ, পুরুষালী পিতার সুস্থ সাহচর্যর অভাব বালককে এবং স্নেহশীলা, নারীজনোচিত গুণাবলী-সম্পন্না মাতার অভাব বালিকাকে সমকামী হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে।

সমকামী দু' ধরণের: প্রথম ধরণের সমকামীরা প্রকৃতই সমলিংগ উপভোগে অভ্যস্ত। একজনের ভংগী আক্রমণাত্মক---এরা পুরুষালী পুরুষ। অন্যজন অনেকটা অক্রিয়---এরা মেয়েলী পুরুষ।

দ্বিতীয় জাতের সমকামী সমলিংগর সংগে মিলনের আনন্দ কল্পনায় বা স্বপ্নে লাভ করে। এরা এ ব্যাপারে পুরো সচেতন নয়। সচেতন হলে হয় প্রবল সাহসে সামাজিক বেড়া ভাঙতে ছোটে, নতুবা উর্ধ্বায়নের প্রচেষ্টায় নিজেদের উদ্যম নিয়োজিত করে।

একটা কথা প্রসঙ্গত স্মর্তব্য: সমকালীনদের চেহারা দেখে চেনা যায় না। সে চেষ্টা নিরর্থক, ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিকরও বটে।

সমাজ এদের নিয়ে কী করবে? দেখা গেছে, সমকাম দুর্লভ নয়, কিংবা তা বেছে নেওয়ার প্রশ্নও অবান্তর; স্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি লাভে অপারগ নিউরোটিক মানুষই বাধ্য হয় এই পথে যেতে, এরা এর ফলে নিজেদের নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত বোধ করে; ঠিক যেমন, খ্যাপাটে লোক কোনও বিশেষ প্রকরণ যান্ত্রিকভাবে করায় স্বস্তি পায়। এই অর্থে, সমকাম প্রকৃতপক্ষে কোনও যৌন ব্যাপার নয়।

আজকের সমাজ এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত। শিক্ষিত মহলে সহনশীলতা যে নেই তা নয়, কিন্তু যুগযুগ লালিত প্রবল বিমুখতা ঘোচে নি। আইনও সমকামীনদের প্রতি খড়গহস্ত।

কেন এমন হয়? ধুরন্ধর মনঃসমীক্ষকদের ব্যাখ্যা ভিন্নমুখী হয়। অভিন্ন হলেও তা সাধারণের পক্ষে বোঝা খুবই কঠিন। এদিকে বিশেষত যৌন ব্যাপারে সামাজিক কঠোর বিধি-নিষেধের জালে আমাদের মন আবদ্ধ। কাজেই, যৌন সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে অ-সামাজিক কিছু সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্যতিক্রম দেখলেই ক্ষেপে ওঠা মানুষের স্বভাব। ঠিক যেমন, কেউ কেউ ব্যতিক্রম ছাড়া চলতি পথে হাঁটতে অনিচ্ছুক।

এদের সঙ্গে বাঁচা যায় কী ভাবে।

কখনও ভাববেন না যে, এরা আপনাকে দলে টানতে ষড়যন্ত্র করেছে। ধরুন, জনৈক সমকামী আপনার সহকর্মী, কাজের ব্যাপারে সে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। সে যদি আপনাকে এক সঙ্গে খাওয়ার প্রস্তাব দেয়, ত পাছে সে সমকামের প্রস্তাব করে, সেই আশঙ্কায় তাকে এড়িয়ে যাওয়া অনুচিত।

জানবেন, সমকামী সঙ্গীর সংখ্যা বাড়িয়ে ব্যক্তিগত জটিলতা বাড়াতে বিশেষ অনিচ্ছুক। এ ধরণের ঘটনা ঘটেও কালেভদ্রে। সে ক্ষেত্রে দৃঢ়কণ্ঠে 'না' বলাই যথেষ্ট।

যৌন জীবন

শুধু দুটি ঘর

নিখিলরঞ্জন মাইতি

মুখোমুখি দুটি ঘর এপার-ওপার
অনেক প্রাচীন। মুখোমুখি দুটি দরজা।
যৌবনে বসন্ত যেন স্পর্শ খোঁজে কার
দুদিকের দুটি হিয়া উড়ন্ত পসরা।

আত্মীয় স্বজন কিংবা প্রতিবেশী যারা
মাঝে মাঝে টের পায়। হয়তো সহানুভূতি,
কিংবা কোন দুর্নীতির লগ্ন খোঁজে তারা।
অহোরাত্র টানে শুধু জীবনের ইতি।

যে চোখ আমার দিকে তাকাতো ক্ষণিক
দৃষ্টির করুণাটুকু পাওয়া যেতো মনে
সলাজে অনন্ত কথা—উন্দাম পথিক!
নয়নে গোপন যাত্রা কার অন্বেষণে?

অনেক অজানা বেলা, আকারে ইঙ্গিতে
দিয়েছি উত্তর তার। আর এক জগৎ
হয়েছে অংকিত ক্ষণে ক্ষণে—তোমার সংগীতে।
আমার চলার পথ—তোমাকে আমার নামে নিয়েছি শপথ।

সে দিন আরেক দিনে হয়ে গেছে শেষ
পড়ে আছে কল্পনার পুরাতন চর—
দুটি নাম, দুটি হিয়া—কিছু পরিহাস
মুখোমুখি বসবার শুধু দুটি ঘর।

আবারও বলছি, এ ধরণের ঘটনা বিরল। সমকামীরা একা থাকতে চায়; কিংবা স্বাভাবিক যৌণ জীবন-যাপনকারী বন্ধু বা সহকর্মীদের তারা এত শ্রদ্ধার চোখে দেখে যে, এমন কোনও 'প্রস্তাব' তারা করবে না, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে।

কারও প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া মানেই আবশ্যিকভাবে সমকামী হওয়া নয়। 'আবশ্যিকভাবে' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি বন্ধুটি শয়নে-স্বপনে কেবলই অপ্রত্যাশিতভাবে মনের কোণে ঝিলিক মেরে যেতে থাকে ত সমকামের অন্তর্লীন প্রবণতা রয়েছে বলা চলে।

সবরকম সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয় এবং বৃত্তিগত ক্ষেত্রে সমকামীদের দেখা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকাই উচিত। কেবল সুকুমার কলার ক্ষেত্রেই এদের দেখা মেলে না। এরা ছড়িয়ে আছে সবখানে।

এখন প্রশ্ন, এরা কি শিশুদের পক্ষে ক্ষতির আকর? সাধারণভাবে বলা যায়, না। সমকামী বিপর্যস্ত মানসিকতার অধিকারী বলার অর্থ এই নয় যে, সে সর্বদা যে-কোনও বয়সের শিকার খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরছে। শিশু-প্রেমী সমকামী সংখ্যায় অত্যল্প, গণনায় আসে না। যেমন গণনায় আসে না বালিকা-প্রেমী হেটেরোসেক্স্যুয়াল্।

তা ছাড়া, নিজেদের শিশুসন্তান না থাকার বেদনায় সমকামীরা প্রায়ই আত্মীয় বা বন্ধুদের শিশুসন্তানদের প্রকৃতই স্নেহ করে, ভালবাসে।

সমকামী কি বিপরীত লিংগকে ঘৃণা করে। মূলত, নিজেদের গোপন অ-সামাজিক ক্রিয়ার ফলে প্রাপ্ত কঠিন ব্যবহার তাদের স্বাভাবিক বিপরীত লিংগের প্রতি ঘৃণা উদ্দীপ্ত করতে পারে।

পরস্পরের প্রতি সমকামীদের ব্যবহার কেমন? এদের সম্পর্কে গভীরতা থাকে না বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর কারণ, সমকাম কেউ বেছে নেয় না, স্বাভাবিক যৌন জীবনযাপনে অসামর্থ্যই সমকামের প্রকৃত কারণ।

এর প্রতিকার? ব্যক্তিগতভাবে এদের চিকিৎসা সম্ভব। হচ্ছেও। সেরেও উঠছে অনেকে; যদিও এ ক্ষেত্রে কানও চমৎকারী তট তট তোটর বা আশুফলপ্রদ ওষুধ নেই। মনঃ-সমীক্ষক এবং বিশ্লেষকরা যতখানি সফল, ততখানিই ব্যর্থ। সবচেয়ে বড় বাধা: সমকামীরা পাল্টাতে চায় না। (হয়ত ব্যাধির এও একটা লক্ষণ); তা ছাড়া, অপরে বাধ্য করলে বা বিশেষ সঙ্কটে পড়লে তবেই তারা চিকিৎসিত হতে আসে।

এ ব্যাপারে কয়েকটা কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: প্রথমত—সমাজ পরস্পর-বিরোধী চিন্তায় আচ্ছন্ন; পুরুষসমকামী-দের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি; নারী সম-কামীরা সাদরে গৃহীত।

দ্বিতীয়ত—এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। কাজেই, শেষ কথা কে বা বলে?

তা ছাড়া, ক্যান্সার-এর মত সমকামও মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা নির্ভর নয়। কেউই স্বেচ্ছায় সমকামী হয় না। সুতরাং কর্কট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মতই সমকামী মানুষও আমাদের অনুকম্পার পাত্র। নয় কি?

যে মানুষ প্রকৃতির হাতে মার খেয়ে বিপর্যস্ত, তাকে অপ্রয়োজনে আরও ব্যথিত করা নিষ্ঠুরতা।

এ কথা কখনও ভুললে চলে না।

—বাৎস্যায়ন

মাসিক রাশিফল

॥ শ্রাবণ মাসের ফল ॥

তারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

শ্রাবণের প্রবৃত্তিতে রবির কর্কটে প্রবেশকালে বৃশ্চিক লগ্নের উদয় ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়ঝঞ্ঝা আর বন্যা এবং সামুদ্রিক বিক্ষোভে জন-হানির আশঙ্কা। সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দরের পক্ষেও এ মাস ক্ষতিকর। সামুদ্রিক অধিকার নিয়ে অথবা সমুদ্রে বিস্ফোরণে ও বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ বাধার আশঙ্কা। ভারতের পক্ষে আগস্ট মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ নতুন মোড় নিতে পারে। কর্কট ও সিংহ আশ্রিত রাজনৈতিক নেতা, প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের পক্ষে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস বিশেষ লক্ষণীয়। শ্রাবণে যাঁদের জন্ম তাঁদের মধ্যে যাঁদের বয়স ২৪-২৬, ৩৭-৩৯ কিংবা ৪৮-৫৩ বর্ষ তাঁদের পক্ষে বর্তমান শ্রাবণ থেকে এক বৎসর লক্ষণীয় পরিবর্তনসূচক। বর্তমান শ্রাবণে উদর-ঘটিত পীড়াদি, সন্তান কষ্ট ও পত্নী পীড়াদি তাদের উত্ত্যক্ত করতে পারে। শ্রাবণ মাসের লগ্ন কর্কট। ভাবপ্রবণতা কল্পনাপ্রবণতা এবং এক ধরনের অনুভূতি-দৃষ্টির সাহায্যে এঁরা লোক চরিত্রের মর্মের দিক্ উদঘাটন করতে পারেন। কাজেই সাহিত্যিক ও শিল্পী-দের বেশীর ভাগ ব্যক্তিদের শ্রাবণ মাস, কর্কট রাশি কিংবা লগ্নের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। দরদী তাঁদের মন, অত্যন্ত বাৎসল্যপ্রবণতা আছে তাঁদের মধ্যে, আবার তাঁরা ক্ষণক্রোধী। আবার তাঁরা ক্ষমারও অবতার। জীবনে শোক-তাপ তাঁদের পেতেই হয়। শ্রাবণের জাতকের পক্ষে শ্বেতপ্রবাল ও পান্না উপকার দিতে পারে। যাক্ এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের ব্যক্তিগত শুভাশুভের আভাস দিচ্ছি :---

মেষ : গৃহ-পরিবেশ মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। প্রিয়জনের জন্য দুশ্চিন্তা আবার শারীরিক কারণে অস্বস্তিবোধ এবং টাকাকড়ির ব্যাপারে গোলযোগ উত্ত্যক্ত করতে পারে। অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে অথবা অন্যের ব্যাপারে জড়িত হয়ে সময় নষ্ট ও আর্থিক অপচয়ও ঘটতে পারে। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক পদক্ষেপ উচিত। ব্যবসায় বাড়াতে গিয়ে নতুন সমস্যার মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পী-দের যোগাযোগের দিক্ থেকে ভাল। নতুন ভাবে সম্মানলাভেরও সম্ভাবনা। কিন্তু শারীর কষ্ট ও পারিবারিক সমস্যা মাঝে মাঝে বিচলিত করবে। রাজনৈতিক ব্যাপারে অনুকূল নয়। চাকুরীক্ষেত্রে মর্যাদা বাড়বে। কিন্তু তার চেয়ে ঝঞ্ঝাট এবং শত্রুতা বেশী উত্ত্যক্ত করবে। পরিবারে কোনো প্রিয়জনের পীড়াদি বিশেষ উৎকণ্ঠায় ফেলতে পারে। মহিলা জাতকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। মেষ লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলযোগ ও প্রীতির সম্পর্কে হানি ঘটতে পারে।
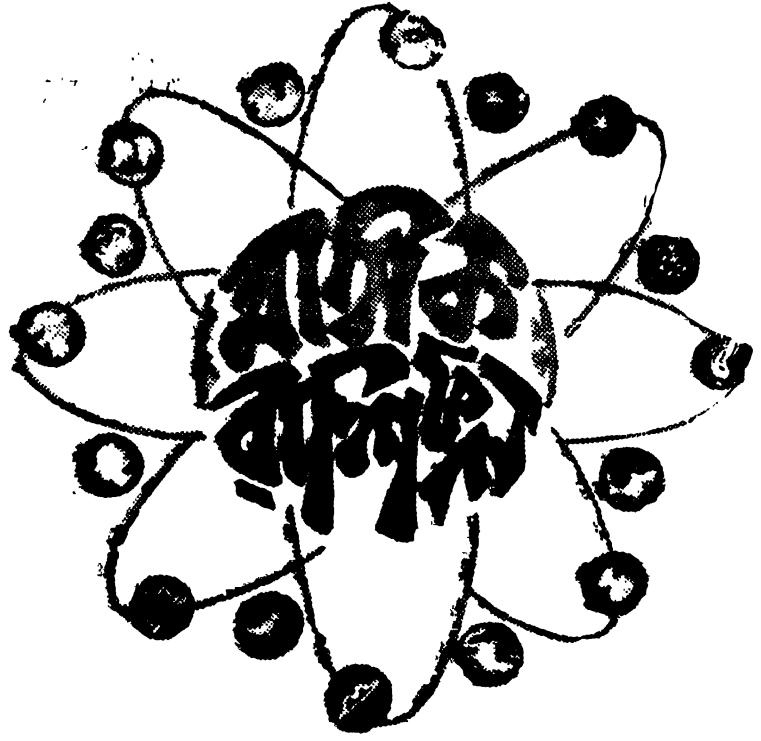
বৃষ : মনের উপর বেশী চাপ পড়বে। গলার অসুখ ও বাতজ পীড়াদি সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। শিশু ও বালকদের মধ্যে যাঁদের বৃষ রাশি কিংবা লগ্ন, তাঁদের জ্বর হলে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। মহিলাদের মধ্যে যাঁরা সন্তানসম্ভবা তাঁদেরও বিশেষ সঙ্কট যেতে পারে। ভিড় বা জনতার মধ্যে যাওয়া, বদ্ধ ঘরে বা হলে সিনেমা কিংবা থিয়েটার দেখাও ক্ষতিকর হতে পারে। বেকারদের মধ্যে যাঁদের টেক্‌নি-ক্যাল কোনো যোগ্যতা আছে, তাঁরা কাজ পেতে পারেন। যান্ত্রিক ইঞ্জিনীয়ার ও দক্ষ কারিগরদের উন্নতির সম্ভাবনা। সাধারণভাবে চাকুরীক্ষেত্রে গতানুগতিক আন্দোলন কিংবা উত্তেজনামূলক কাজ এড়িয়ে চলা উচিত। কৃষির কাজ ও জমি-বাড়ির নতুন কিছু করতে গেলে মাসের তেরো দিনের পর অনেকাংশে অনুকূল। মহিলাজাতকের কোনো সূত্রে লাভ ও প্রীতির প্রসার ঘটবে। কিন্তু গুরুজনদের কারো জন্য উৎকণ্ঠা যাবে। বৃষ লগ্নে যাঁদের জন্ম তাঁদের কর্মক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা। ব্যবসায়ে নতুন ভাবে প্রবৃত্ত হবারও যোগ রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। দূরে কোথাও যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন : আকস্মিক কোনো সমস্যা গোলমাল করতে পারে। শারীরিক

ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। পেটের গোলমাল ও কোনোরূপ ব্যথা-বেদনা কষ্ট দিতে পারে। অম্বল, সর্দি-কাশি ও অর্শ জাতীয় রোগের প্রবণতা থাকলে বিশেষ সাবধান। মহিলাদের জ্বর ও সর্দিজনিত উৎপাত এবং পড়ে গিয়ে কষ্ট পাবার আশঙ্কা। যৌথ কারবার ও যৌথ সংসারে ভাঙন ধরতে পারে। বাইরে কোথাও যাবার প্রস্তুতিতে বাধা পড়তে পারে। মাছের কারবার ও পোলট্রীর ব্যবসায়ীদের পক্ষে অনুকূল। প্রতারণা করে কেউ কোনো দ্রব্য নিয়ে যেতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রে প্রভাব, প্রতিপত্তি বাড়বে। পরিবারে কারো সঙ্কট যেতে পারে। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য ঝঞ্ঝাটভোগের আশঙ্কা। চাকুরী প্রার্থীর চাকুরী হতে পারে। মহিলা জাতকের প্রিয় কাজে আবদ্ধ ও আর্থিক লাভ বুঝায়। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের উৎপাত, ব্যয়বৃদ্ধি ও স্বজন কর্তৃক উত্যক্ত হবার আশঙ্কা। শনি কিংবা মঙ্গলের দশান্তর্দশা চললে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। এখন বাইরে কোথাও যাওয়া ক্ষতিকর হতে পারে।

কর্কট: প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যাপারে যতই ঝঞ্ঝাট ও বিরোধিতা দেখা দিক না কেন, এখন সময় আপনার এগিয়ে যাবার অনুকূল। কিন্ত যাদের নিয়ে চলেছেন বা যাদের উপর নির্ভর করে চলেছেন, তাদের সম্পর্কে সাবধান। রাজনৈতিক ব্যাপারে এখন অনুকূল। নতুন ব্যবসা পত্তনেরও সম্ভাবনা। কিন্তু চাকুরীক্ষেত্রে নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। গোপন কোনো ব্যাপার প্রকাশ পাওয়ায় বিশেষ সঙ্কটও দেখা দিতে পারে। শিরঃপীড়া, অনিদ্রা ও রক্তের চাপজনিত দুর্বলতা সম্পর্কে সাবধান। মহিলাদের উদর-আন্ত্রিক ও জরায়ুঘটিত সমস্যা কষ্ট দিতে পারে। সন্তানের জন্যও উদ্বেগ ভোগের আশঙ্কা। মহিলাজাতকের পারিবারিক ব্যাপারেও মনের উপর চাপ পড়বে। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে শ্লৈষ্মিক কষ্ট, বক্ষ পীড়া ও রক্তের চাপ সম্পর্কে বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। কর্মক্ষেত্রে গতানুগতিক-ভাবেই চলবে।

সিংহ: নিজের ব্যক্তিগত কাজ-কারবার সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। এমাসে এমন কিছু প্রকাশ পেতে পারে, যাতে এ সম্পর্কে বিচলিত হতে পারেন। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পড়ে গিয়ে আঘাত লাগা ও বাতজ উৎপাত সম্পর্কে সাবধান। ছোট শিশু বা বালকদের, যাদের সিংহ রাশি, তাদের জ্বর ও কোনো-রূপ ব্যথা-বেদনা দেখা দিলে অবহেলা করবেন না। মহিলাদের আকস্মিক-ভাবে কষ্ট পাবার আশঙ্কা। সন্তান-সম্ভবাদের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। ব্যবসায়ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়বে। নতুন কাজে হাত দেবারও সম্ভাবনা। আইন-জীবী ও চিকিৎসকদের পক্ষে মাসের শেষাংশ প্রোফেশনের দিক থেকে লক্ষণীয়। কোনো মহিলার চক্রান্ত সম্পর্কে সাবধান। প্রণয়মূলক ব্যাপারে কুৎসা রটনার আশঙ্কা। চাকুরীক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রায়ই মতবিরোধ চলবে। সহকর্মীদের কারো আচরণ মনে আঘাত দিতে পারে। চাকুরে মহিলাদের উন্নতির সম্ভাবনা। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ মনোমত হবে না।

কন্যা: মনের জোর রাখুন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় ভাব-বিলাসী হওয়াটা ক্ষতিকরই হবে। আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী লোক রয়েছে। কোনো জায়গায় লোভের বশবর্তী হয়ে কাজ করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। এভাবে কাজ-কারবারেও সাবধান থাকা উচিত। রক্তের চাপ ও উদর-বায়ু ঘটিত পীড়াদির প্রবণতা থাকবে। মাথাধরা দু'একদিনের বেশী হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। মহিলাদের বমন ও অরুচি অম্বলের কষ্ট হতে পারে। উনিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়সের তরুণদের প্রণয়মূলক দুর্বলতা গোলমালে ফেলতে পারে। আবার পনেরো থেকে উনিশ বছরের তরুণীদেরও এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। গায়িকা ও অভিনেত্রীদের কোনোরূপ সঙ্কটে পড়ার আশঙ্কা। ব্যবসায়ে আশানুরূপ হবে না। চাকুরী-ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চলা উচিত। অবশ্য অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিও ঘটতে পারে। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে নতুন যোগাযোগে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে।

তুলা: স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। বয়স্ক ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। পনেরো থেকে উনিশ বছরের ছেলে-মেয়েদের ঐ রাশি হলে জ্বর ও আমাশয় ঘটিত গোলযোগ দেখা দিলে গোড়ায়ই সাবধান হবেন। মহিলাদের আন্ত্রিক কোনো গোলযোগ দেখা দিলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। লেখক, আইনজীবী এবং অধ্যাপকদের সুনাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্ত সামান্য ভুলে বেফাঁস মন্তব্য প্রকাশ করে ফ্যাসাদে পড়ার আশঙ্কা। অসম-বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে আচরণে বা ঘনিষ্ঠতায় সাবধান থাকা উচিত। কোনো ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ মনে আঘাত দিতে পারে। নতুন কারবারে উদ্যোগী হতে হলে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে আগে চিন্তা করবেন। পুস্তক প্রকাশক ও ছাপাখানার মালিকদের এখন সময় প্রতিকূল। মহিলাজাতকের পক্ষে উদ্যমে সাফল্য কিন্ত শত্রুতার আশঙ্কা। তুলা লগ্নে জন্ম হলে কর্ম-ক্ষেত্রে সাফল্য এবং আর্থিকক্ষেত্রে আশাপ্রদ।

**He has to rush to work by 7.
Yet he reads a
NEWSPAPER
every day**

Which other medium is so indispensable to so many millions without the time for anything?

For quite a few people, the working day starts earlier than for most. A quick gulp for a breakfast and they're off... with the morning paper tucked under their arm.

People can't find an excuse for not reading their newspapers and periodicals. Haste, hurry, work and worry are a part of all lives... but reading the Press despite them all is, too the common element in all lives.

There will be times when friends, books, the radio, T.V. or the cinema will not be able to touch such rushed lives...but the morning paper tucked under the arm or the periodical by the bedside will be there—as inevitable as tomorrow's sunrise. Nobody escapes the influence of the Press, no matter what...

There is a newspaper or magazine to reach every reader in his language at the lowest cost per thousand.

Address through the Press —it costs far less

IENS

Inserted in the interest of providing information for better advertising value by
THE INDIAN & EASTERN NEWSPAPER SOCIETY

everest/709a/IENS

বৃশ্চিক ঃ কোনো ব্যাপারে অত্যধিক উত্তেজনা ও আবেগ গোলমাল করতে পারে। বেফাঁস কথা বলা কিংবা ঝোঁকের বশে কাজ করা সম্পর্কেও সাবধান। রক্তের চাপজনিত গোলযোগ ও উদর-আন্ত্রিক পীড়াদিও কষ্ট দিতে পারে। পুরনো অসুখ-বিসুখ থাকলে সাবধান হবেন। মহিলাজাতকের পুরনো রোগ থাকলে, তা আবার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বাইরে কোথাও যেতে হলে আগে সবদিক বিবেচনা করে দেখুন। ব্যবসায়ে নতুন-ভাবে অর্থ নিয়োগেরও সম্ভাবনা। কারো সহায়তা উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে পারে। চাকুরীক্ষেত্রেও নতুন কোনো খবর পেতে পারেন। মহিলা জাতকের সাংসারিক কারণে মনের উপর চাপ পড়বে। তরুণীদের বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। চাকুরীপ্রার্থীর তৎপর হওয়া উচিত। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যাপারে নতুন সুযোগ আসবে। পরিবারে কারো অসুখ-বিসুখ উৎপাত করবে।

ধনু ঃ গোড়ার পনেরো দিন যোগাযোগের দিক্ থেকে অনুকূল। পরিবারে গুরুজনদের কারো পীড়াদি সঙ্কট এবং ভাই-বোনদের কারো জন্য উদ্বেগ থাকতে পারে। চাকর-বাকর কিংবা অধীনস্থ কর্মচারীদের কারো জন্যও উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাট যেতে পারে। উদরঘটিত পীড়া এবং পায়ের কোনো-রূপ কষ্ট উৎপাত করতে পারে। উঁচু জায়গা থেকে নামার সময় বিশেষ সাবধান। অপ্রত্যাশিত দ্রব্য কিংবা উপহার লাভের সম্ভাবনা। জন্মকালে যাঁদের একাদশে বৃহস্পতি কিংবা রাহু, তাঁদের বিশেষ লাভবান হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ে নতুন সুযোগ আসবে। কোনো হিতৈষী ব্যক্তিকে সন্দেহ করে অশোভন মন্তব্য দ্বারা নিজের ক্ষতি করবেন। বিবাহেচ্ছু তরুণ ও তরুণীদের বিবাহের সম্ভাবনা। চাকুরীপ্রার্থীদের এখন চাকুরীলাভের সম্ভাবনা। ধনু লগ্নে জন্ম হলে আর্থিকক্ষেত্রে আশাপ্রদ ; কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

মকর ঃ বৃহস্পতি দশমে থেকে সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে : তার উপর এখন মঙ্গলও রয়েছে প্রতিকূল। অথচ যোগাযোগের দিক্ থেকে ভাল বলা চলে। পুরনো সহকর্মী ও বিশ্বাসীদের কারো আচরণ অসুবিধায় ফেলতে পারে। নিজের করণীয় কাজ করে চলুন। মাসের শেষাংশ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে। ব্যবসায়ে জটিলতা দেখা দেবে। ধৈর্যহারা না হয়ে দৃঢ়ভাবে চলুন। চাকুরীপ্রার্থীর পক্ষে অনুকূল অবস্থা এসেছে। লেখক ও অধ্যাপক-দের নতুন সুযোগ পাবার সম্ভাবনা। আমাশয় ও জ্বর উৎপাত করতে পারে। ছেলেমেয়েদের কারো জন্য উদ্বেগ যাবে। হিতৈষী কোনো ব্যক্তির জন্যও আকস্মিক উদ্বেগ ভোগের আশঙ্কা। মহিলাজাতকেরও অনুরূপ ফল। মকর লগ্নে জন্ম হলে কর্মে খ্যাতি ও নতুন কর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান।

কুম্ভ ঃ আগের কোনো উদ্যম এবার আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপার কিন্তু ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে শত্রু বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের জন্য কাজকর্মে বাধা আসতে পারে। ভিড় ও জনতার সমাবেশে যাওয়া উচিত হবে না। রক্তের চাপ ঘটিত উৎপাত দেখা দিলে বিশেষ সাবধান। ব্যবসায়ে নতুন উদ্যম ও আটকানো সম্পত্তি বা অর্থ উদ্ধারের পক্ষে অনুকূল। বিদেশ গমনেচ্ছু শিক্ষার্থী ছাত্রদের সুযোগ আসবে। পরীক্ষার্থী মেয়েদের অপ্রত্যাশিত ভাল হতে পারে। চাকুরী-প্রার্থীর কাছে কোনো সুযোগ আসবে। পথে কুড়ানো জিনিস সম্পর্কে সাবধান। কারো কথায় বা প্ররোচনায় ভুল পথে চলে বিপন্ন হতে পারেন। মহিলা-জাতকের প্রিয়জন চিন্তা এবং সংসারের অবস্থা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পারে। বিবাহযোগ্যাদের বিবাহ পিছিয়ে যেতে পারে। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক যোগাযোগ ও পারিবারিক সমস্যা জটিল হয়ে উঠতে পারে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে নতুনভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে।

মীন ঃ স্বাধীন প্রোফেশনে আয় বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী, লেখক ও প্রকাশকদের এখন অনুকূল।

কিন্তু বিভ্রান্তির কবলে পড়ে ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ঠাণ্ডালাগা ও আছাড় খাওয়ায় কষ্ট হতে পারে। দাঁতের যন্ত্রণাও উৎপাত করতে পারে। ছোট ছেলেমেয়েদের ঐ রাশি হলে, পেটের গোলযোগ দেখা দিলে সাবধান। এমাসে ভূমিষ্ঠ শিশুদের সম্পর্কে অতিরিক্ত সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ে এখন নতুনভাবে অর্থ নিয়োগ করা উচিত হবে না। যাঁরা কণ্ট্রাক্ট ও সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করেন, তাঁদের পক্ষে এমাস প্রতিকূল। মাসের একুশ তারিখের পর লক্ষণীয়। মৌলিক প্রতিভা পুরস্কৃত হতে পারে। মহিলা জাতকের পক্ষে নতুন কোনো ব্যাপার উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবে। তরুণীদের বিবাহের ব্যাপারে অগ্রণী হওয়া উচিত হবে না। মীন লগ্নে জন্ম হলে নতুন কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি (তমলুক), আগের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সোনার আংটিতে আড়াই থেকে সাড়ে তিন রতি উৎকৃষ্ট কনকক্ষেত্র বৈদূর্য যথাশাস্ত্র শোধনাদি করে ধারণীয়। ● শ্রীমতী টুলটুল ঘোষ (হাওড়া), (১) হবে, (২) আছে। ● শ্রীমতী ঘোষ (হাওড়া), (১) হতে পারে; (২) মনোমত হবে। ● শ্রীমতী মিনু চ্যাটার্জী (অবধায়ক: মনোমোহন চ্যাটার্জী, শেওড়াফুলি), পূজার আগেই চাকুরী হবে, (২) স্বামীর স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। মার্চের মধ্যে উন্নতির সম্ভাবনা। ● শ্রীমতী পলা ঘোষ (নীলমণি রোড, কলি), (১) উচ্চতর শিক্ষার যোগ, (২) দেড় বছর মধ্যে। ● শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বোস (সুকিয়া স্ট্রী, কলিকাতা), (১) আটত্রিশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকা উচিত; (২) আগামী পৌষ থেকে নয় মাসের মধ্যে যোগ আসবে। ● শ্রীসোমনাথ দত্ত (রায়গঞ্জ, দিনাজপুর), (১) আগামী জানুয়ারী থেকে কয়েক মাসের মধ্যেই শুভ ইঙ্গিত রয়েছে; (২) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। দেড় বছর মধ্যে না হলে হওয়া কঠিন। ● শ্রীমঙ্গল সেন (একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ), (১) মঙ্গল ও শুক্রের একত্র অবস্থান গোলমেলে, (২) প্রতিকার জন্য সাদা মুক্তা তিন রতি সোনায় এবং রক্তমুখী প্রবাল আট রতি রূপায়। ● শ্রীরঞ্জিত-কুমার দে (জলপাড়া), এক বছর ধৈর্য ধরে থাকুন। ● শ্রীনিখিলকুমার বিশ্বাস (ভূপেন রায় রোড, বেহালা), (১) চাকুরী হবে; (২) স্বাভাবে চলার মত উপার্জন হবে।

● শ্রীনির্মাল্য চক্রবর্তী (তিলক রোড, দুর্গাপুর), (১) ধৈর্য ধরে চিকিৎসকের পরামর্শমত চলুন। আগামী বর্ষ থেকে ধীরে ধীরে বেশ ফল পাবার সম্ভাবনা, (২) উৎকৃষ্ট মুক্তা তিন-চার রতি এবং রক্তমুখী প্রবাল আট-নয় রতি যথাবিধি ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীমতী সরকার (হাজিনগর), (১) দেড় বছর পর মনোমত, (২) সাঁইত্রিশের পর। ● শ্রীসরকার (হাজিনগর), (১) স্বাধীন প্রোফেশন উপযোগী, (২) জীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হবে। ● শ্রীবুদ্ধদেব বিউয়াল (হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা), (১) দু'বছর বিশেষ ধৈর্য ধরে চলতে হবে, (২) পীত পোখরাজ ছয়-সাত রতি ও রক্ত প্রবাল সাত-আট রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীশঙ্করী ব্যানার্জী (জয়রামপুর, হুগলী), (১) বর্তমান বাংলা সালে সম্ভাবনা কিন্তু এ সময় না হলে ছাব্বিশ থেকে সাতাইশ বর্ষে, (২) বর্তমান বছরের কার্য-কারণের উপর নির্ভর করছে। ● শ্রীমতী উমা চট্টোপাধ্যায় (কদমতলা, হাওড়া), (১) চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হ'বার সম্ভাবনা, (২) লটারীতে পাবার যোগ এখন নেই। ● শ্রীধূমকেতু (কাপাসডাঙ্গা), (১) অন্য লাইনে যেতে হবে, (২) এসব ঠিক নয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান। ● শ্রীদেবব্রত সরকার (রাণা-প্রতাপ রোড, দুর্গাপুর), (১) দু'বছর কিছু কিছু খারাপ যাবে, (২) অন্য রত্ন ধারণ না করে শুধু আসল মুক্তা সোনার আংটিতে তিন-চার রতি ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীবিশ্বনাথ চ্যাটার্জী (রামপুর কলোনী, জামালপুর), (১) ত্রিশ বর্ষ বয়স থেকে কর্ম ও অর্থ ব্যাপারে শুভফল দেখা দেবে, (২) প্রতিকারে বিশেষ কোনো ফল হবে না। ● শ্রীসোমনাথ দত্ত (রায়গঞ্জ), (১) আগামী ইংরেজী সাল লক্ষণীয়, (২) কিছু গোলমাল আছে। চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। ● শ্রীএম পুরী (নিউদিল্লী), (১) জুলাই মাসের পর পাঁচ মাসের মধ্যে কিছু সুযোগ আসবে, (২) মুক্তা ধারণ করা চলে। ● শ্রীকৃষ্ণ শুক্ল (রাণীগঞ্জ), (১) স্বাধীন প্রোফেশনে। কণ্ট্রাক্ট ও সাপ্লাইয়ের কাজ হতে পারে, (২) উৎকৃষ্ট কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই রত্ন সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার রতি। ● শ্রীমতী অর্পণা মিত্র (সীতানাথ বোস লেন, হাওড়া), (১) মোটামুটি ভাল; কিন্তু ভাল করে বিচার করে ও মন স্থির করে এ ব্যাপারে অগ্রসর হবেন, (২) শিল্প ও ললিতকলার যোগ আছে। ● শ্রীশম্ভুনাথ পাঠক (মানকর, বর্ধমান), (১) সন্তানস্থান দুর্বল। পত্নীর পক্ষে তিন-চার রতি মুক্তা ধারণ ও স্বামীর পক্ষে অন্তত এক রতির তিন ভাগের এক ভাগ হীরক ধারণীয়, (২) এসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎকের পরামর্শ বাঞ্ছনীয়। ● শ্রীমতী দূর্বা ঘোষ (যতীনদাস রোড, কলিকাতা), (১) রূপার আংটিতে আট-নয় রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করুন: জীবন ব্যর্থ হবে না, (২) আগামী অগ্রহায়ণ থেকে এক বছরের মধ্যে সুযোগ আসবে। সম্ভব হলে প্রত্যেক মঙ্গলবারে তিনটি করে বেল-পাতা মা কালীর পায়ে দেবেন। ● শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা), (১) উন্নতি হবে, (২) পাঁচ বছর ধৈর্য ধরতে হবে। আট রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণীয়।

●শ্রীমতী অনিমা দে (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি), (১) বর্তমানে শনি অশুভ, (২) আট রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণীয়। ●শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ সেন (নিশান সরণি, কলিকাতা), (১) ব্যবসায়ে উন্নতি, (২) নিজের মনোমত। ●শ্রীকৌশিক সাহা (খড়্গপুর), লাল পলা, শাঁখের মালা ও তামার মালা এক সঙ্গে লাল সুতোয় ধুনসীর মত ধারণ করুন, (২) এখানে কোষ্ঠী করানো হয় না। ●শ্রীমতী দীপ্তি সাহা (খড়্গপুর), (১) তিন-চার রতি মুক্তা সোনার উপর ধারণ, (২) হবে। ●শ্রীমতী চন্দ্রিদাসী (মতিবাগ, নিউদিল্লী), (১) বাড়ি হবে, (২) আনার হবে। ●শ্রীভাগ্যলক্ষ্মী দত্ত (সুভাষ রোড, বাঁকুড়া), (১) মঙ্গলের বাধা, (২) জন্মস্থান থেকে অনেক দূরে। প্রতিকার জন্য রূপার আংটিতে আট রতি রক্তমুখী প্রবাল। ●শ্রীশান্তিরঞ্জন দে (জাড়িগ্রা), (১) কোনো রত্ন ধারণে হঠাৎ ভাল হবে না, (২) তিন বছর পর। ●শ্রীঅশোক কুমার সিনহা (কালিচরণ ঘোষ রোড, কলি), (১) হবে না, (২) ব্যবসায়ে উন্নতি হবে। ●শ্রীমতী ছবি চ্যাটার্জী (কসবা), (১) বৃশ্চিক রাশি, কর্কট লগ্ন ও দেব গণ, (২) মিথুন রাশি, দেব গণ ও তুলা লগ্ন। ●শ্রীপ্রণবকুমার চ্যাটার্জী (ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, খড়্গপুর), (১) স্থানপরিবর্তন হতে পারে, (২) তিন রতি মুক্তা সোনার আংটি ও তিন রতি চুনী সোনার আংটিতে। পোখরাজ মধ্যাটপূর্ণ। ●শ্রীমৃণালকান্তি ভট্টাচার্য (পানিতলা, আসাম), পড়াশোনা হবে, (২) চিকিৎসকের পরামর্শমত চলুন। ●শ্রীমতী শেফালী দত্ত (সুভাষনগর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট), (১) মীন লগ্ন আর কর্কট রাশি, আগামী অগ্রহায়ণ থেকে বর্ষকাল মধ্যে, (২) নামধাম বলা সম্ভব নয়। কিন্তু দূরে হতে পারে। ●শ্রীঅচিন্ত্যকুমার দাশগুপ্ত (জলপাইগুড়ি), (১) এরূপ কাজে সাফল্য আসবে না। বরং নিজের যোগ্যতা গবেষণামূলক কাজে লাগালে তিন বছর মধ্যে স্বীকৃতি পাবেন, (২) আর্থিক অনটন থাকবে না। ●শ্রীমতী অর্চনা মিত্র (ভবানীপুর), (১) শিক্ষা বিভাগে কাজ, (২) এ-অবস্থায় মন স্থির করে চলুন। উল্লিখিত ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী শুভ হতে পারে না। ●শ্রীশঙ্করনাথ সিংহ (গোবিন্দ খটিক রোড, কলি), (১) বাংলার বাইরে যাওয়া এখন হবে না, (২) আগামী ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে নিজেই কর্তব্য স্থির করতে পারবেন। ●শ্রীমতী মধুমিতা রায় (হুগলী), আট রতি শ্বেত প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীমতী ছন্দা দেবী (নিউ আলিপুর)—(১) বর্তমান বর্ষেই তা হতে পারে, (২) বর্তমান বছরের কার্য-কারণের ওপর নির্ভর করছে। ●শ্রীমতী চামেলী বসু (কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি), আগামী অগ্রহায়ণ থেকে বর্ষকাল মধ্যে, (২) আট রতি রক্তমুখী প্রবাল ও তিন রতি মুক্তা ধারণ করা উচিত। ●শ্রীসত্য সরকার (পাবতলা লেন, কলি), (১) তিন বছর ধৈর্য ধরতে হবে, (২) চাকুরীর চেয়ে ব্যবসায় ভাল হবে। কিন্তু তিন বছর কোনোটাতেই সুবিধা হবে না। ●শ্রীমতী শ্রাবণী মুখোপাধ্যায় (অনন্তরাম মুখার্জী লেন, রামকৃষ্ণপুর), (১) হবে না, (২) দেরী আছে। ●শ্রীকৌতূহলী (হাওড়া), (১) উত্তর দেওয়া হয়। কিন্তু চিঠি এখানে হয়ত পৌঁছায় নি। আপনার ধনু লগ্ন, বৃশ্চিক রাশি ও দেব গণ, (২) আশানুরূপই

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সঙ্গে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সঙ্গে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সঙ্গে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম— . . . .

ঠিকানা— . . . .

. . . .

—মাসিক বসুমতী—

হবে। ● শ্রীপার্থ (উল্টাডাঙ্গা, কলি), (১) গ্রহসন্নিবেশ এমনি যে, বছর দু'য়েক বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রূপায় আট থেকে নয় রতি সিংহলী গোমেদ ও তিন থেকে চার রতি মুক্তা সোনায় ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) ছক ঠিক আছে। ● শ্রীআনন্দশঙ্কর মহাপাত্র (পুরানো বালাসোর উড়িষ্যা), (১) চাকুরী জুলাই থেকে পাঁচ মাস মধ্যে হতে পারে। কিন্তু ব্যবসায় বিশেষ ক'রে পোলট্রি প্রভৃতি করার যোগ, (২) গ্রহসন্নিবেশ এমনি যে, এখন বছর দু'য়েক বিশেষ ভাল যাবে না। ● শ্রীশিব (দেবীপুর), (১) মঙ্গল ও শুক্রের অবস্থান বেশী ক্ষতি করছে, (২) আগামী ইংরেজী সালে হতে পারে, নানা বাধার জন্য রক্তমুখী প্রবাল আট-নয় রতি ধারণ করতে পারেন। কিন্তু ছয় বছর ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। ● শ্রীবুড়ো (প্রতাপাদিত্য রোড, কলি), (১) অগ্রহায়ণ থেকে তিন-চার মাস দেখুন, (২) শ্বেতপ্রবাল আট-নয় রতি ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রী এস এন চ্যাটার্জী (চিরিয়া, বিহার), (১) আগস্ট থেকে চার মাস দেখুন, (২) ধৈর্য ধরে কাজ করুন। আপনি ভাল হবে। ● শ্রীমতী মঞ্জু ভট্টাচার্য (ডিগবয়), (১) বর্তমান ইংরেজী মাসেই চাকুরী হবে, (২) নিজের মতের ওপর জোর দেবেন। ● শ্রীমতী পদ্মজা (দক্ষিণ ভারত), (১) উচ্চ শিক্ষা ও অধ্যাপনার যোগ, (২) উন্নতি হবে। এখন থেকে সাহিত্য-ভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া উচিত। ● শ্রীমতী ললিতা (দক্ষিণ ভারত), (১) বর্তমান দেড় বছরের কার্যকারণের উপর অনেকটা নির্ভর করছে, (২) বিবাহ আগামী দু'বছর মধ্যে হতে পারে। ● শ্রীশ্যামাশান্তি চট্টোপাধ্যায় (রামপুরহাট), (১) সেপ্টেম্বরের মধ্যে, (২) রক্তমুখী প্রবাল সাত থেকে আট রতি পরিমাণ রূপার আংটিতে। ● শ্রীবিশু ঘটক (আসানসোল), (১) স্বাস্থ্যের জন্য বিঘ্ন, নতুবা বেশ ভাল যোগ; (২) সোনার আংটিতে তিন-চার রতি মুক্তা ও রূপায় ছয়-সাত রতি রক্তমুখী প্রবাল। ● শ্রীযদু ঘটক (আসানসোল), যোগ আছে বিজ্ঞানে, (২) চাকুরীর পর ব্যবসা। ● শ্রীবিধু ঘটক (আসানসোল), (১) ডাক্তারী কিংবা রসায়ন বিজ্ঞান, (২) ছয়-থেকে আট রতি রক্তমুখী প্রবাল। ● শ্রীমতী কণিকা ঘটক (আসানসোল), (১) সাহিত্যে ভাল করবে কিন্তু ভাবপ্রবণতা ক্ষতিকর, (২) সর্দি কাশি ও উদর পীড়াদি সম্পর্কে সাবধান। ● শ্রীঅজিত-কুমার চ্যাটার্জী (বৃষিক কলিয়ারী, কালীপাহাড়ী), (১) আগামী বছর থেকে কিছু ভাল হবে, (২) আট-নয় রতি রক্তমুখী প্রবাল রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীললিত-কুমার সুর (বন্দীপুর), (১) বছরের শেষাংশ ভাল, (২) শনি অশুভ। আরো এক বছর ধৈর্য ধরে থাকুন। ● শ্রীনৃপেন্দ্র-নাথ সিংহ (নওয়াপাড়া, সোনারপুর), (১) আগামী অগ্রহায়ণ থেকে বর্ষকল দেখুন, (২) তিন বছর বিশেষ ভাল নয়। ● শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ (নেয়াপাড়া), (১) কন্যা লগ্ন ও বৃশ্চিক রাশি, (২) সাতাশ থেকে। ● শ্রীঅসীমকুমার নন্দী (তেতুলমারী স্টেশন), (১) দেড় বছর ভাল নয়। তবু আগামী ইংরেজী সালে চাকুরীক্ষেত্রে কিছু ভাল হতে পারে, (২) আট রতি শ্বেত প্রবাল রূপার আংটিতে। ● শ্রীউত্তম দত্ত (অবধায়ক ডাঃ সত্যেন দত্ত, বিধান সরণি, কলি), (১) চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সাবধান, (২) তবু বর্ষকাল পরে কিছু ভাল হবে। প্রতিকার জন্য তিন-চার রতি শ্বেত প্রবাল ও তিন-চার রতি রাজপট্ট ধারণ করাতে পারেন। ● শ্রীগৌতম দত্ত (বিধান সরণি, কলি), (১) তিন বছর ভাল নয়। গ্রহযোগ অশুভ। (২) প্রতিকার জন্য তিন-চার রতি মুক্তা এবং মৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণ করানো চলে। ● ডাঃ সত্যেন দত্ত (বিধান সরণি কলি), (১) আগামী ডিসেম্বর থেকে তিন-চার মাসের কার্য-কারণ দেখুন। (২) দু'বছর পর সুযোগ ● শ্রীপার্বতীরাণী দত্ত (আসানসোল), (১) আগামী বছর দেখুন, (২) বাধা দূর করার জন্য কনকক্ষেত্র ক্যাটস আই রত্ন দুই থেকে আড়াই রতি ও রক্তমুখী প্রবাল ছয়-সাত রতি। ● শ্রীপ্রশান্তকুমার দত্ত (আসানসোল), (১) ভাল যোগ আছে, কিন্তু এখন খুব সাবধান, (২) চাকুরী তাড়াতাড়ি পাবেন।

টিনজাত খাদ্য

নতুন কিছুর প্রতি মানুষ স্বভাবত কিছুটা সন্দেহপ্রবণ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা বিরুদ্ধমনোভাবে রূপান্তরিত হতে পারে। টাটকা শাক-সব্জী বা ছাগমাংস নিত্য কিনে খেতে অভ্যস্ত মানুষ তাই টিনজাত খাদ্যের প্রতি বিমুখতা পোষণ করে। আমাদের দেশে প্রায় সদ্যপ্রচলিত টিনজাত খাদ্য সম্পর্কে সাধারণ গৃহস্থকে প্রশ্ন করামাত্র তার বিরূপমনোভাব স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। অথচ, য়ুরো-আমেরিকায় অধুনা টিনজাত খাদ্যের বাজার প্রায় একচেটে।

প্রথম প্রথম কিন্তু ওই মহাদেশ দু'টোতেও এ-ব্যাপারে বেশ সন্দেহ, ক্ষেত্র বিশেষে বিমুখতা ছিল। প্রচুর বিজ্ঞাপন এবং কালের সহায়তায় ব্যবসায়ীরা অবশেষে ক্রেতাদের বোঝাতে পারলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে টিনজাত খাদ্য বাজারে প্রাপ্তব্য। চালাও টাটকা খাদ্যের তুলনায় দূষিত হয় অনেক কম। খদ্দের অবশেষে বুঝলেন, টিনজাত 'স্যাল্‌মন্' মাছ অধিকতর পুষ্টিকর, কারণ টিনে ভরার জন্য যে পরিমাণ উত্তাপ চাপের মাধ্যমে আসে নির্বীজকরণের কালে, তার ফলে ক্যালসিয়াম্ পাওয়া যায়, এবং হাড়গুলো নরম হওয়ায় খাওয়া যায়।

প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র

(জনৈক বিপ্লবীর জীবনকাহিনী)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আত্মচরিত সম্বন্ধে আত্মগোপনের কথা প্রায়ই শুনা যায়। তাহা ইচ্ছাকৃত নয় বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিচরিত্র যেভাবে গঠিত হইয়া থাকে, তাহার ফলে সামাজিক বিধানকে উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সেই কারণেই ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশে দ্বিধা বা সঙ্কোচের অবকাশ থাকিয়া যায়। ইহাতে সত্য অযুক্ত থাকলেও মিথ্যা প্রশ্রিত নহে। সত্যকে যথার্থভাবে প্রকাশ করিতে না পারার কারণ সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া। সমাজের অগ্রগতিতে মানুষের চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রগতিশীল করিয়া তুলিবার জন্য নর ও নারীর সম্পর্ক-জনিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনা নৈমিত্তিকভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক বলিয়াই সাহিত্যিকরা বাস্তবকে কল্পনার সাহায্যে আকর্ষণীয় করিয়া তোলেন ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতেই সত্যিকার সমাজচিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অবশ্য কোথাও যে তাহার ব্যতিক্রম না হয় তাহা নয়। সাধারণত তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে ধার্মিক ও রাজনীতিক ব্যক্তিদের প্রকাশনায়। আমার জীবনকাহিনী রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি নির্দিষ্ট দিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই সামাজিক জীবনকে সামান্যভাবে পাক্ষিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

আজ মহানবমী মহাবলির দিন। নয় প্রকারের বলি। ইক্ষু, চালকুমড়ো, শশা, কলা, মায় পাঁঠা ও মহিষ বলি পর্যন্ত। বৃহদাকারের যূপকাষ্ঠ সজ্জিত রহিয়াছে। পাশেই রক্ষিত একটি বৃহদাকারের শাণিত খাঁড়া। ধূপ-ধুনা, কাঁসর-ঘণ্টা, ঢাক-ঢোল ও নহবতের অনবদ্য বাদ্য ও বাদনে শরতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। চন্দন-চর্চিত পুষ্পের মধুময় গন্ধ, প্রসাদের রসাল ও সুমিষ্ট আঘ্রাণ অতিথি-অভ্যাগতদের সকলকেই তন্ময় করিয়া

দণ্ডপাণি

তুলিয়াছে। সদ্য পরিহিত নানাপ্রকারের নূতন জামা-কাপড়ে বালক-বৃদ্ধ সবাই আচ্ছাদিত। কোথাও এতটুকু মালিন্যের ছাপ নেই। আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও আবেগ-আপ্লুত পরিবেশ শিশুর সরলতা, প্রাণপ্রাচুর্য ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ।

এতক্ষণ সকলেরই দৃষ্টি মন্দিরস্থিত প্রতিমার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। এখন বলির সময় উপস্থিত বলিয়া মন্দিরের সম্মুখের চত্বরে সজ্জিত বধ্যভূমির মার্জিত রঙ্গমঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হইল। যার যার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইবার জন্য সবাই ব্যাকুল।

পুরোহিত ঠাকুরের নির্দেশে যজ্ঞে নিবেদ্য বস্তুর কয়েকটি বধ্যভূমিতে আনিয়া রাখা হইল। দেখিতে দেখিতে ঘাতক মালকোঁচা মারিয়া, কোমরে গামছা বাঁধিয়া, কয়েকটি বৈঠক ভাঁজিয়া, পালোয়ানী ঢঙে পাঁয়তারা কসিয়া ও দেহতালি দিয়া যূপকাষ্ঠের সংলগ্ন হইয়া খাঁড়া হাতে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। বলির ফলগুলি দ্বিখণ্ডিত হইবার পর, পাঁচ-ছয়জন লোক একটি সদ্যস্নাত মহিষকে ধরিয়া লইয়া আসিল। ঘাতকের নির্দেশে লোকগুলি নিষ্ঠুরভাবে বলপূর্বক আছাড় দিয়া পশুর ঘাড়টিকে যূপকাষ্ঠে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার কাঠি আঁটিয়া দিল এবং দেহটিকে অনড় রাখিবার নিমিত্ত বিভিন্ন অংশ আগলাইয়া ধরিল। ততক্ষণে অসহায় মহিষের আর্তনাদ নিঃশেষিতপ্রায়। তারপর গাড়া হাঁটুর উপর রক্ষিত দেহটিকে ঘাতক সামলাইয়া লইয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে খাঁড়াটিকে উদ্যত করিয়া উচ্চৈস্বরে তিনবার মায়ের নাম উচ্চারণপূর্বক এক কোপে মহিষের গর্দানটিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল শত্রুনিধনজনিত উল্লাস ও নৃত্য। সমস্ত বাদ্যযন্ত্র শেষ পর্দায় ঝঙ্কৃত হইয়া আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মথিত মর্দিত মহিষ-অঙ্গটি ততক্ষণে অসাড় হইয়া গিয়াছে। সকলের কপালে রক্তের ফোঁটা। পুরোহিত মশাই এবার যজ্ঞে যজ্ঞাহুতি দিলেন। কিন্তু সেই সময় সবার অলক্ষ্যে শক্তিধর জমিদার যে একটি নরবলিরও ব্যবস্থা করিতেছিলেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

অসংখ্য আগন্তুকরা নাটমন্দিরে সারি সারি উপবিষ্ট। পূজার প্রসাদ বিতরণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ভিতর বাড়ীতে অভ্যাগতদের বলির প্রসাদ সম্বলিত আহার্য গ্রহণ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আসনোপবিষ্ট অতিথিরা অঙ্গুলিলেহনে মনোনিবিষ্ট। অকস্মাৎ নায়েব মহাশয়ের আগমন এবং রামকুমারের প্রতি তাঁহার কপট আপ্যায়নজনিত অনুরোধ যেন সমস্ত প্রাঙ্গণটির উপর বিনা মেঘে একটি বজ্রপাত হইয়া গেল। মাত্র সামান্য একটি বাক্য---কাসারীখোলার রামকুমার দেব মহাশয় যেন আহারান্তে নিজহস্তে উচ্ছিষ্ট উদ্ধারণ করেন। উপবিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কেহ কেহ তখনও ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন নাই কাহার উপর বজ্রাঘাত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। যদিও প্রাণভয়ে নয়, তবু যেন কিসের আশঙ্কায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কি করিবেন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কারণ রামকুমার নিজের মর্যাদা রক্ষায় অনন্যোপায় হইয়া নিজের গলার ভিতর নিজের আঙুল প্রবেশ করাইয়া আহারের শেষ চর্বিত অংশটুকুও পাতের উপর বমন করিয়া দিয়াছেন। এবং সঙ্গে উপবিষ্ট অষ্টম বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঘাড়ে ধরিয়া তাহার গলায়ও অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছেন। সহানুভূতিশীল অভ্যাগতের দুই-একজন অবিলম্বে আগাইয়া আসিয়া নির্দোষ শিশুটিকে পিতার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিলেন। তারপর যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়া গেল।

জমিদার বাড়ীর আনাচে-কানাচে মহানবমীর দ্বিপ্রহরেই বিজয়া দশমীর মর্মবেদনা গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে এই ঘটনা রটনা হইতেও বেশী সময় লাগিল না। ইতিমধ্যে রামকুমার কোন ফাঁকে শিশুটিকে রাখিয়াই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেইদিন প্রত্যূষে রামকুমার গৃহিণী [illegible] নীচের নিজেদের পুকুর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিলেন। পথে একটি বিড়াল তাঁহার সম্মুখ কাটিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। পুনরায় দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে তিনি বাসন-কোসন ধুইয়া যখন রাখিতে যাইবেন সেইসময় অকস্মাৎ তাহার হাত হইতে কয়েকটি বাসন পড়িয়া যাওয়াতে তিনি ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একটা অজানা আশঙ্কায় তাহার মন ভয়ানক ভারাক্রান্ত হইল। স্বামী-পুত্রের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বেলা পড়িয়া আসিতেই গ্রাম্য কৃষকরা গৃহাভিমুখী হইতে আরম্ভ করিল। কুমারদের পুকুরপাড় দিয়ে সদর রাস্তা। এই রাস্তা দিয়াই তাহারা যাতায়াত করিয়া গ্রামের উত্তরভাগের জমি চাষ-আবাদ করিয়া থাকে। ফিরিবার পথে তাহাদের একজন কুমারদের বড় ভাইকে পুকুরের ঠাঁই জলে দাঁড়াইয়া কানে আঙুল দিয়া অনবরত মাছরাঙার ন্যায় অস্বাভাবিকভাবে ডুবাইতেছে দেখিতে পাইল। সাহসে ভর করিয়া দু'-একবার ডাকিয়াও কোন উত্তর বা সাড়া পাইল না। তাহার সন্দেহ হইল। হাতের সরঞ্জাম রাখিয়া সে কুমারদের বাড়ীতে গিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কুমার গৃহিণীর তন্দ্রা টুটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া বড় কুমারের বিষয় শুনিয়া অবিলম্বে পুকুর ঘাটে ছুটিয়া আসিলেন। একই অবস্থায় স্বামীকে ডুবাইতে দেখিয়া উঠিয়া আসিতে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিলেন, তখন নিজেই জলে নামিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া পাড়ে উঠিলেন। স্বামীর রক্তিম চক্ষু ও দেহের দুর্বলতা অবলোকন করিয়া তিনি ভয় পাইয়া গেলেন। বার বার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন জবাব না পাইয়া ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বামীকে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাড়ী লইয়া যাইবার খানিক ক্ষণের মধ্যেই পড়শীরা ছেলেকে বাড়ীতে দিয়া গেল। কিন্তু তাহারা জমিদার বাড়ীর ঘটনা বিষয়ে কিছু জানিতে [illegible] পাইল না। অধিকন্তু রামকুমারের অবস্থা দেখিয়া তাহারাও ভয় পাইয়া গেল। সন্ধ্যা না পড়িতেই পাড়া-প্রতিবেশীরা আসিয়া খোঁজ-খবর লইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রামকুমার তখন জ্বরে অচৈতন্যের ন্যায় শয্যাগত রহিয়াছেন। অবশেষে দশমীর প্রভাতে একটিবার মাত্র স্ত্রী ও পুত্রদের কাছে ডাকিয়া শেষবারের মত তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যার পর যখন মণ্ডলখালের অদূরে শ্মশানবন্ধুরা তাঁহার চিতায় শান্তিবারি ছিটাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন খালের ভাটাজলে জমিদার বাড়ীর প্রতিমা বিসর্জন শেষ হইয়া গিয়াছে। জানি না তখনও এই গ্রামে ভাসিয়া আসা ঢাকের শেষ দুই-একটি বিদায়ের শব্দ রামকুমারের স্ত্রীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না। তবে অর্ধশত শারোদৎসব তাঁহার জীবনে যে শুধু সাদা থান কাপড় পূজার উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং মর্মভেদী হাহাকারের মধ্যে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে রামকুমারের নাবালক ছেলেরা সাবালক হইয়া উঠিল। কিন্তু যাহা যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। জমিজমা যাহা ছিল জমিদারের চক্রান্তের ফলে ও দেনার দায়ে সবই নিঃশেষ হইয়া গেল। গত্যন্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া জ্যেষ্ঠ গোবিন্দমোহন উপার্জনের আশায় বাহির হইয়া পড়িল। তখন আসামে রেলের নূতন লাইন বসিতেছে। উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলে তখন কাজ হইতেছিল। গোবিন্দ সহজেই একটি কাজ জুটাইয়া লইল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিল। ছুটি-ছাটায় সে বাড়ীতে আসিয়া পাড়া-প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত

করিতে কোনদিনই অবহেলা করে নাই। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও দুই-চার-দশজন সমবয়সীদেরও নিজের কর্মস্থলে লইয়া গিয়া জীবিকা উপায়ের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করে নাই। গ্রামে জমিদারের প্রতারণা ও পাইক-পেয়াদার উৎপীড়নে অনেকেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই গ্রাম ছাড়িয়া নগরাভিমুখী হইতে তাহাদের অনেকেরই বেশী সময় লাগিল না। ইহাতে তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নীত হইল বটে, কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। নিজেরা দেখাশুনা করিতে না পারায় বিষয়-আসয় ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে নিজবাসে পর-বাসীর ন্যায় পরিগণিত হইতে লাগিল। কিন্তু মাটির টান এমনই যে, ধীরে ধীরে অপসৃত ও উচ্ছিন্ন হইতে থাকিলেও গোবিন্দের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল। যদিও আংশিকভাবে পরিবার-পরিজনরা গ্রামবাসী হইতে নগরবাসীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহা হইলেও, কর্মক্লান্ত জীবনের ভার লাঘব করিতে ও শক্তি সঞ্চয় করিতে তাহারা পরি-জনদের লইয়া দেশের মাটিতে আনাগোনা অব্যাহত রাখিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দের পারিবারিক অবস্থায় তাহার একলা চলা ভিন্ন উপায় ছিল না। কাজেই সুযোগ পাইলেই সে গৃহাভিমুখী হইয়া উঠিত।

ক্ষত শুকাইয়া গেলেও দাগ থাকিয়া যায়। দেহের উপরিভাগের সেই দাগ লক্ষ্য করিয়া তাহার মূল কারণ বিষয়ে মনের উপর রেখাপাত হইয়া থাকে। বাল্যাবধি গোবিন্দের জীবনে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহা ভুলিবার নয়। তাহার সংগ্রামী জীবনে দিনের পর দিন সেইসব ঘটনাগুলি মনে হইলেই তাহার বংশগত তেজস্বিতায় শিহরণ জাগাইয়া দিত। মায়ের একটি কথা তাহাকে বড়ই ভাবাইয়া তুলিত। তিনি বলিতেন, নিজের চেষ্টায় বড় হওয়া দরকার। বিত্তশালী ব্যক্তিকে প্রতিরোধ করিতে হইলে বিত্তবান হইতে হইবে। কেন না লোকে নির্ধনকে দুর্বল ও ধনবানকে বলবান করিয়া থাকে। তাছাড়া বলবান লোক সমুদয় বস্তু অধিকার করে ও সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়। অর্থ প্রভাবে ধর্ম ও কাম এবং ইহলোক ও পরলোকে সদগতি লাভ হইয়া থাকে। তবে অর্থ লাভ করিতে হইবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। তিনি আরও বলিতেন, কোন কোন সময় শত্রুও মিত্র হয়। আবার কখনও মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। কার্যের গতিও সর্বদা সমান হয় না। কার্যাকার্য নির্ণয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া করা উচিত। শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত শত্রুদিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্খ বিপক্ষদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কখনই অর্থোপার্জন বা সুখভোগ করিতে পারে না। এই জগতে যখন সকল লোকই স্বার্থপরতায় বশীভূত, তখন কেহই কাহারো প্রিয়পাত্র নয়। সহোদর-ভ্রাতা ও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। কখনো কখনো ভার্যা ও সহোদর কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় প্রীতিশৃংখলে আবদ্ধ হয়। কিন্তু যাহার সহিত কোন সম্পর্কই নাই, তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তবে লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য সাধন করিতে পারে, তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতিও কারণসাপেক্ষ।

মায়ের কথা গোবিন্দ অস্বীকার করিতে পারিল না। সে ভাইদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ দিতে লাগিল। সে নিজেও প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা ভাবিয়া জমিদার গোষ্ঠীর সহিত সম্প্রীতি স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইতে লাগিল। কিন্তু হইলে কি হইবে। তাহাদের পোষা বেড়ালগুলি সময় ও সুযোগ মত তাহাকে আঁচড় দিতে ছাড়িল না। সে অবসর সময়ে ফক্‌নার সাহেবের কথা ভাবিত। একসঙ্গে হাতির উপর উপবিষ্ট হইয়া জীবন-বিপন্ন করিয়া বন ও জঙ্গল পরিদর্শন করিয়া যাইত। কোথায় কিভাবে রেলের লাইন বসাইলে একদিন স্থানীয় কাঁচামাল বিদেশে পাড়ি জমাইতে সুবিধা হইবে, তাহার জন্যই তো ফকনার সাহেবের প্রীতির বন্ধনে সে আবদ্ধ। তাহার ও ফক্‌নার সাহেবের মধ্যে কত ব্যবধান। অথচ একই আসনে তাহারা উপবিষ্ট। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাহাদের বিঘ্নসঙ্কুল। তবু তাহারা নিজ নিজ স্বার্থানুযায়ী জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহা হইতে পল্লীর ক্ষুদ্র পরিসরে কূপমণ্ডুকের ন্যায় নিজকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার সার্থকতা কি। এই প্রশ্ন তাহার মনে জাগে। সে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া তাহার পরিবেশকে বিচার করিতে তৎপর হয়। সেইভাবেই সে চলিতে থাকে।

ইতিমধ্যে তাহার ভাইয়েরা দেশোপযোগী ব্যবসায়ে নিজেদের খানিকটা গুছাইয়া লইয়াছে। সুতরাং গৃহের ভাবনা তাহার অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি হইতে নানাভাবে প্রতারিত হইয়া গ্রাম-দেশের প্রতি তাহার একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া উঠিতেছিল। তাহা হইলেও দশজনের আহ্বান বা আকর্ষণ সে অবহেলা করিতে পারে নাই। তাহার একটি মাত্র পুত্র-সন্তানকে কি করিয়া মানুষ করা যায় তাহাই সে বিশেষ করিয়া ভাবিতে লাগিল। পল্লীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অর্থাৎ পাঠশালাতে তখনও ইংরাজী আসিয়া পৌঁছায় নাই। গুরুমহাশয়ের কাছেই বিভিন্ন বয়সী ছেলেরা বিভিন্ন পাঠ্য তালিকায় উত্তীর্ণ হইয়া উঠিত। চার বৎসর এইভাবে পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর ছাত্ররা দুই-দশ গ্রামের অন্তর্ভুক্ত কোথাও একটি ইংরাজী মাধ্যমিক স্কুলে (M. E. School) তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইত। সেখানে চার বৎসর পাঠ অন্তে কোথাও উচ্চ বিদ্যালয়ে (H. E. School) আরও চার বৎসর পড়িয়া তবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Metriculation) উত্তীর্ণ হইত। এই ছিল সেই সময়কার শিক্ষা

ব্যবস্থার মোটামুটি নিয়ম। যদিও ইতিপূর্বে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় অর্থাৎ কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পরীক্ষা এন্ট্রান্সের (Entrance) দিন অতীত হইয়া গিয়াছিল।

ভাইদের সমবেত চেষ্টায় তাহাদের অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হওয়াতে হালের-গরুর পরিবর্তে এখন গৃহে গাই-গরুর আগমন হইয়াছে। দুই-চারটি মেষশাবকও তিড়িং তিড়িং করিয়া গৃহের চৌহদ্দিতে লাফাইতে লাফাইতে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া গৃহস্বামীদের আহ্লাদ জানাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও এই নিষ্পাপ ও নির্বোধ পশুগুলি গোবিন্দের পরিবারে বলবর্ধক ও রসনার তৃপ্তিসাধকরূপে কিছুকাল পূর্ব হইতেই পালিত হইয়া আসিতেছিল। তথাপি সে শখ করিয়া তাহার কর্মস্থল হইতে একটি সুগঠিত মেষ আনিয়াছিল। ভেড়াটি এমন সুউচ্চ ও সুদর্শন ছিল যে, তাহাদের পরগণা অঞ্চলে কদাচিৎ এইরূপ একটি পশু দেখা গিয়াছিল। ডেংড়া নামে তাহাদের একজন বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল। সেই ছিল এই পশুগুলির তত্ত্বাবধায়ক। সেই সময়মত ছ'বছরের শিশু বীরুকে ভেড়ার পিঠে চড়াইয়া পাঠশালায় দিয়া আসিত এবং ছুটি হইলে নিয়া আসিত। সমস্ত পরিবারের একমাত্র আদরের শিশু বীরুকে সেও নিজ সন্তানের ন্যায় বুকে-পিঠে করিয়া মানুষ করিতে কম চেষ্টা করে নাই। ভেড়াটি ছিল তাহাদের দুইজনের একান্ত অন্তরঙ্গের ন্যায়। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, আজ এই হাট, কাল ও বাজার, সর্বত্রই বীরুকে ভেড়ার পৃষ্ঠে চড়াইয়া বেড়াইতে বাহির হইত। হয়ত রামকুমার গৃহিণীর পৌত্রের কাছে বলা 'ঠাকুরমার ঝুলির' কাহিনীগুলি তাহার মনেও রেখাপাত করিয়া থাকিবে। সেইজন্যই নিজেকে রাজপুত্রের চলনদার বলিয়া ভাবিতে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। দেখিতে দেখিতে চারটি বছর যে কিভাবে কাটিয়া গেল, তাহা কেহ টের পাইল না।

গোবিন্দের মাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য, প্রতিবেশীর প্রতি মমতা ও সৌজন্যবোধ তাহাকে সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। পিতা-মাতার অনেকগুলি গুণই সে পাইয়াছিল। কিন্তু সংসারে সৎ লোক যেমন রহিয়াছে তেমনি অসৎ লোকেরও অভাব নাই। বরং বেশীই। তাঁহার গুণপনার জন্য সে অনেকের, বিশেষ-ভাবে তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ঈর্ষার পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পারিবারিক ব্যাপারেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বেশী সময় লাগিল না। ইতিমধ্যে মধ্যম প্যারীমোহনের বিবাহ স্থির হইয়া গেল এবং শুভকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। কিন্তু 'বৌভাতের' দিন সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র পরিবারে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। পরশ্রীকাতর সমবয়স্ক আত্মীয়-স্বজনদের দলে ও তালে পড়িয়া প্যারীমোহনের নির্দেশে দাদার অজ্ঞাতসারে এতদিনের পালিত মেষটিকে হত্যা করা হইল। অতবড় একটি মেষের মাংস অল্প ব্যয়ে বহু অতিথিকে আপ্যায়ন করার বিষয় যুক্তিসঙ্গত হইলেও, দাদার হৃদয়ে যে কতবড় আঘাত লাগিতে পারে তাহা অনুজরা ভাবিয়া দেখিল না। এই ঘটনার পর গোবিন্দ সাতদিন আহার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হইল যে, দুঃখে ও রাগে কিশোর বীরু ডেংড়াকে লইয়া গ্রামের বাহিরে কোথাও চলিয়া গিয়াছিল। এক আত্মীয়বাড়ী হইতে তাহাদের উদ্ধার করিয়া আনা হইল বটে, কিন্তু গৃহ পরিবেশে যেন একটা থমথমে ভাব রহিয়াই গেল। গোবিন্দ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই কর্মস্থলে চলিয়া আসিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই সে ঘোরতর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেইবার তাহার বাঁচিবার কোন আশাই কেহ রাখে নাই। ভগবান যেন হাতে ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া গেল। এমন দিনও তখন তাহার গিয়াছে যে, গ্রাম্য প্রথানুযায়ী তুলসীতলায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগের জন্য ঘর হইতে তাহাকে ধরাধরি করিয়া একাধিকবার বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

দিন যায় কিন্তু কথা থাকে। তাহা না হইলে এমন কি ঘটনা। সে তো অনেকদিন আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কথার দ্বারা তাহাকে জিয়াইয়া রাখিলে লাভ কি। বরং কুফল ফলিতে পারে। কিন্তু কয়জনে তাহা বুঝে। এমনিই হয়। মানুষের স্বভাবই এইরূপ। গোবিন্দের অসুস্থতায় সাময়িকভাবে জল ঘোলানো বন্ধ ছিল। কিন্তু তাহার নিরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহা চাড়া দিয়া উঠিল। পাড়া-প্রতিবেশীরা আবার পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিল। কথাগুলি নানা প্রকারে দোষ-গুণে ভারাক্রান্ত হইয়া গোবিন্দের কানে বার্তার আকারে আসিতে থাকিলেও সে বেশী আমল দিতে চাহিল না। ধৈর্য সহকারে সে শুনিয়া যাইতে লাগিল। সামান্য সুস্থ বোধ করিলে পুনরায় কর্মস্থলে চলিয়া গেল। ঐদিকে ফক্‌নার সাহেব তখন বিশ্রাম লাভের মানসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত হইতেছে। গোবিন্দ তাহাতে খুবই নিরুৎসাহ বোধ করিল। ফক্‌নার সাহেবও এতবড় অসুখের পর আর পার্বত্য অঞ্চলে তাহাকে চাকুরী করিতে নিষেধ করিল।

[ক্রমশ।

মীরা কী মল্লার

—কাউকে না। সেখানে মীরাবাঈ একলা। বোধ হয় নিজের মনেই বক বক করছিলো বিগ্রহের সামনে, তার তো ধারণা, ওই বিগ্রহই তার স্বামী।

বনবীর হাসলো। বললো,---এজন্যেই আমি যাই নি তোমার সঙ্গে। আমি জানতাম তুমি কাউকে দেখতে পাবে না।

---তাহলে আমায় পাঠালে কেন?

---যাতে ওরা তারপর নিশ্চিন্ত হয় যে, আর কেউ আসবে না। কিন্তু ওরা ভুল করেছিলো। তোমার পেছন পেছন আমিও গিয়েছিলাম, তুমি ফিরে যাওয়ার পর অপেক্ষা করেছিলাম কিছুক্ষণ।

---তারপর?---রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো রতন সিংহ।

---তুমি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে একটি লোক বেরিয়ে এলো মন্দির থেকে। হ্যাঁ পুরুষমানুষ।

॥ বাইশ ॥

খবর এসে গেছে চিতোরগড়ে। রাও সেখাজী ফৌজ নিয়ে আক্রমণ করেছে জোধপুর। রাও গাঙ্গা এখন নিজের রাজধানী রক্ষা করতে ব্যস্ত। সে সাহায্য করতে পারবে না মেড়তা রাজ্যকে। মেড়তা ঘিরে ফেলেছে কুমার মলদেব। বীরমদেবের পক্ষে অসম্ভব নিজের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া। মীরার ছোটো ভাই কুমার জয়মল সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। হয়তো আর রক্ষা করতে পারবে না মেড়তা রাজ্য।

---তুমি যা চাইছিলে তাই হোলো তো?--বনবীর জিজ্ঞেস করলো রাণা রতন সিংহকে।

---শুধু আমি চাইলেই কি হোতো? হাসিমুখে উত্তর দিলো রতন সিংহ, সব সাফল্যের পেছনে আপনার কূটবুদ্ধি আর কৌশল।

---কিন্তু এক জায়গায় আমি এখনো ব্যর্থ। সেই হীরের হারটা এখনো আমাদের হাতে এলো না। বাবর শা'র পাঠানো হার। বহু লক্ষ টাকা দাম।

---ওটা মেড়তায় পৌঁছে যায় নি তো?

---বুঝতে পারছি না। জয়মল এখনো যেভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, আমার সন্দেহ হচ্ছে এ শুধু সাহস আর দৃঢ় সংকল্প থেকে নয়। ওর হাতে টাকাও এসে গেছে। কিন্তু কোত্থেকে এলো? মেড়তা ঘিরে আছে মলদেবের সৈন্য। খাজনার টাকা তো যাচ্ছে না। হতে পারে হীরের হার সেখানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তাহলেও বা--। বেচবে কোথায় সেই হার। মেড়তায় যে লোক হীরের হার নিয়ে কয়েক লাখ টাকা দিতে পারে, সে এমনিও দিতে পারে জয়মলকে, ও হার বেচতে হলে জোধপুরে

শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাশ

বেচতে হবে, অম্বরে বেচতে হবে, কিংবা চিতোরে। সে টাকা মেড়তায় নিয়ে যাবে কে?

---আমার মনে হয় না হীরের হার মেড়তায় গিয়ে পৌঁছেছে।

---আমারও তাই ধারণা, সে হার নিশ্চয়ই চিতোরেই আছে।

---তাহলে মীরাবাঈ গোপনে লোক পাঠাচ্ছিলো কেন?

বনবীর বললো,----পরখ করে দেখছিলো আমাদের পাহারা কতো জোরদার। যদি দেখতো যে অন্তত তিন-চারজন আমাদের পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে, তাহলে একফাঁকে আরেক-জনের হাতে পাঠিয়ে দিতো হীরার হার।

রতন সিংহ কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো,---এক কাজ করা যাক। মীরাবাঈ যাকেই বাইরে পাঠায় আমরা তাকেই ধরে খানাতল্লাস করবো। হার পেলে আটকে রাখবো। না পেলে ছেড়ে দেবো।

বনবীর হাসলো,---রাণাজী, মীরাবাঈ তোমার চাইতে অনেক চালাক। হার কোনদিনই হয়তো যাবে না, কিংবা এমনভাবে যাবে যে, আমরা টের পাবো না। কিন্তু যাদের আমরা শুধু খানাতল্লাস করেই ছেড়ে দেবো, তাদের মারফতে অনেক খবর-বার্তার লেনদেন হতে থাকবে।

---তাহলে কি করা?

---কড়া পাহারা মোতায়েন থাকবে মীরাবাঈয়ের মহলের চারদিকে, একটি লোক বেরোতে পারবে না, একটি লোক ঢুকতে পারবে না। মহলের ভিতর মীরাবাঈ চম্পা ও চামেলীর নজরবন্দী হয়ে থাকবে সব সময়। ওরা কেউ তাকে কখনো চোখের আড়াল করবে না। একজন-না-একজন কেউ সঙ্গে থাকবে সব সময়।

---কি লাভ তাতে?

হীরার হার কোনোদিন বেরোতে পারবে না মহলের ভেতর থেকে।

---তারপর?

বনবীর হাসলো, বললো,---মীরাবাঈ নিষ্ঠাবতী বিধবা। সব সময় ব্রতপার্বণ উপবাস নিয়ে আছেন, নিজের শরীরের যত্ন নেন না একটুও। মনে করো, একদিন তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। ওঁর তো ছেলেমেয়ে কেউ নেই। মহলের ভিতরে যা কিছু আসবাবপত্র---গয়না---অলঙ্কার আছে, সব তো তখন মহারাণার সম্পত্তি।

---কদ্দিন অপেক্ষা করতে হবে এর জন্যে। রতন সিংহ জিজ্ঞেস করলো।

---তুমি বলো।

---ওই হীরের হার আমার চাই, আজই, এক্ষুণি।

---সে তো হয় না রাণাজী। দু-তিন মাস তো অপেক্ষা করতে হবেই। তুমি কি চাও লোকে তোমার নিন্দে করে? মীরাজী আর যাই হোক, কুমার ভোজরাজের পত্নী, রাণা সাঙ্গার পুত্রবধূ। সাধারণ লোকে ভালোবাসে মীরাকে।

---আচ্ছা, সেই লোকটা যে সেদিন রাত্তিরে বেরিয়ে যাচ্ছিলো মীরাজীর মন্দির থেকে, তাকে যে ধরে ফেলা হয়েছে, এ খবর তো জেনে গেছে রাজ্যের সবাই।

---হ্যাঁ।

---তার প্রতিক্রিয়া?

---যারা আমাদের পক্ষে ওরা বিশ্বাস করেছে। যারা বিপক্ষে ওরা বলছে, এ আমাদের বানানো। মীরাবাঈয়ের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় পরপুরুষের সঙ্গে গোপনে মন্দিরে মিলিত হওয়া।

---লোকটি স্বীকার করেছে?

---এখনো করে নি। তবে ওর উপর নানারকম,---একটু থামলো বনবীর, একটা নিষ্ঠুর হাসিতে ঠোঁট দুটি বেঁকে গেল,---নানারকমভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। মানুষের শরীর তো। সহ্য করার একটা সীমা আছে। মনে হচ্ছে দু-এক দিনের মধ্যে স্বীকার করবে।

---আমি একটা উপায় ভেবেছি।

---কি?

---রাজপরিবারের কোনো নারীর সম্বন্ধে এরকম অপবাদ শোনা গেলে, মহারাণা পরীক্ষা করতে পারেন, সে দোষ না নির্দোষ। এরকম একটা পুরোনো রীতি আছে, যদিও বহুকাল এর কোনো প্রয়োজন হয় নি।

---কী রীতি?

একটি ঝাঁপিতে করে তার কাছে বিষাক্ত সাপ পাঠাতে পারেন মহারাণা। যদি সাপ তাকে কামড়ায় সে দোষী। যদি কিছু না করে, সে নির্দোষ।

বনবীর ঘাড় চুলকালো। হাসলো একটুখানি। বললো,---এ মতলব তো মন্দ নয়।

---আরো একটি পরীক্ষা আছে। বললো রতন সিংহ। কালীর মূর্তির উপর ঢেলে দেওয়া হবে যে জল সেটা তাকে পান করতে দেওয়া হবে। যদি সে নির্দোষ হয়, তাহলে তার কিছু হবে না। যদি দোষী হয়, তক্ষুণি মারা যাবে।

বনবীর হেসে উঠলো। বললো,---আমাদের পূর্বপুরুষদের মগজে সত্যি কিছু বুদ্ধি ছিলো। বিষাক্ত সাপ, সামনে যাকে পাবে কামড়াবেই, সে দোষীই হোক বা নির্দোষ হোক। কালী মূর্তির উপর ঢেলে দেওয়া জলে যদি বিষ মেশানো থাকে, তাহলেও একই ফল। বিষাক্ত সাপের বেলায় যদি সাধারণ লোকের মনে কোনো সংশয় থাকেও-বা, দেবমূর্তি ধোয়া জল সম্বন্ধে এ সমস্ত বোকা ধার্মিক ভক্তিমান লোকের কোনো কিছু বলার নেই।

ফুর্তিতে ডান হাতে তুড়ি দিলো বনবীর।

---এদিন একথা আমায় জানাও নি কেন রাণাজী! হীরের হার কব্জা করার এ তো খুব সোজা রাস্তা।

---শুধু হীরের হারের জন্যে?

---না রাণাজী। মীরাবাঈকে যদি সরিয়ে ফেলা যায় এই দুনিয়া থেকে, তাহলে আমাদের বিপক্ষের মনোবল নষ্ট হবে। মেড়তিয়া রাঠোরদের সমর্থন তারা আর পাবে না, সাধারণ প্রজারাও তাদের সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে পড়বে।

---কিন্তু আমার চাই হীরের হার।

শুনেছি সে হার নাকি এসেছে ইস্পাহান থেকে।

---তাহলে এক কাজ করা যাক।

---আমরা চেষ্টা করবো কাল-পরশুর মধ্যেই যাতে সেই লোকটি স্বীকার করে যে, সেদিন রাত্তিরে সে মীরাজীর মন্দিরে ছিলো।

---কথাটা দরবারে সবার সামনে বলতে হবে।

---নিশ্চয়ই। তারপর আমরা এ ব্যাপারের আলোচনা করবো, দরবারে আমি প্রস্তাব করবো, যেহেতু মীরাবাঈয়ের সুনামের উপর সিসোদিয়া রাজবংশের মর্যাদা নির্ভর করছে, চিতোরের রাজপরিবারের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তাঁকে পরীক্ষা করা হোক কালী মূর্তিকে স্নান করানো জল দিয়ে। এতেই প্রমাণিত হবে তিনি দোষী, না নির্দোষ।

---না, না---। হঠাৎ যেন একটু কেঁপে উঠলো রতন সিংহ।

বনবীর অবাক হয়ে তাকালো।

---কী হোলো রাণাজী?

---না---।

রতন সিংহের মুখ সাদা হয়ে আছে।

বনবীর বুঝলো,---রাণাজী, তোমার মন বড় দুর্বল।

রতন সিংহ বললো,---না, কালী মূর্তিকে স্নান করানো জল নয়। এসব ব্যাপারের মধ্যে ঠাকুরদেবতাকে জড়ানো ঠিক নয়।

বনবীর খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো রতন সিংহের মুখের দিকে, আস্তে আস্তে তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো। তারপর বললো,---বেশ, তোমার যা ইচ্ছে।

---সাপ।

---হ্যাঁ।

---বিষাক্ত।

---তা তো বটেই।

---এমনি ঝাঁপিতে করে নয়।

---কেন?

---মীরাবাঈ ঝাঁপি খুলতে রাজী নাও হতে পারেন।

---তাহলে।

---ফলের ঝুড়িতে করে পাঠাবো। ওঁকে বলা হবে গিরিধারীর পুজোর জন্যে ফল পাঠানো হয়েছে। উনি নিশ্চয়ই খুলে দেখবেন।

বনবীর কিছুক্ষণ পায়চারি করলো এদিক-ওদিক।

---কি হোলো? জিজ্ঞেস করলো রতন সিংহ।

---ভাবি।

---কেন?

---আমি ভাবছি, দরবারে তাহলে কথাটা তোলার কি দরকার?

---তা নইলে লোকে ভাববে আমরাই মেরে ফেলেছি মীরাবাঈকে।

---হ্যাঁ, তা বটে।

আবার কিছুক্ষণ ভাবলো বনবীর। তারপর বললো,---তুমি খানিকটা ঠিকই ভেবেছো, আমিও খানিকটা ঠিক ভেবেছি, দুটো মেলাতে হবে।

---কি রকম?

---দেখ রাণাজী, ফলের ঝুড়িতে করে বিষাক্ত সাপ পাঠানো হলে আমরা তার জন্যে দরবারে যে কারণই উল্লেখ করি না কেন, লোকে ঠিক ভাববে যে, আমরা পরিকল্পনা করে মীরাবাঈকে মেরে ফেলেছি। সুতরাং সাপ গোপনে পাঠানোই ভালো। জানিয়ে পাঠালে মীরাবাঈ না খুলতে পারে। বলতে পারে, আগে কোনো নির্দোষ লোকের সামনে, এই ধরো যেমন মহারাণা রতন সিংহের সামনে, বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দিয়ে প্রমাণ করা হোক যে, সে নির্দোষ লোককে কামড়ায় না, তাহলেই আমিও রাজী হবো এই পরীক্ষা দিতে।

---হ্যাঁ, তাও তো বটে,---বললো রতন সিংহ।

---একথা বললে লোকে নিশ্চয়ই মীরাবাঈয়ের কথায় সায় দেবে।

---তা দেবে।

---কিন্তু যদি দরবারে তোলা হয় কালীমূর্তিকে স্নান করানো জল খাইয়ে করানোর প্রস্তাব, কারো কিছু থাকবে না। এমন কি, যদি যদি দরকার হয়, তুমি আমি বা অন্য যে কেউ সে জল খেয়ে প্রমাণ করতে পারি। ... দিতাম তোমাকে কিছু ... তাহলে মীরাবাঈ নিজেও রাজী না হয়ে পারবেন না।

---কিন্তু সে জল খেয়ে আমাদের যদি কিছু না হয়, মীরাবাঈয়ের হবে কেন?

---মীরাবাঈকে যখন দেওয়া হবে, সে জলে বিষ মেশানো হবে।

---কে মেশাবে?

---চম্পা কিংবা চামেলী।

কিছুক্ষণ ভাবলো রাণা রতন সিংহ। তারপর মাথা নাড়লো। বললো, না।

---কেন?

---ঠাকুর দেবতার নাম করে এরকম কাজ,---না, আমার সাহস হচ্ছে না।

---তোমার ভয় কিসের। তুমি তো কিছু করছো না। যা করবার আমিই করছি।

---না, আবার মাথা নাড়লো রতন সিংহ, আমার হুকুমেই তো হচ্ছে।

---তোমার হুকুমে? বনবীর রতন সিংহের সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখলো স্থিরদৃষ্টিতে। তারপর ধমকালো গলায় বললো,---তুমি আমাকে হুকুম করবার কে?

ওই দৃষ্টির সামনে ভয় পেয়ে গেল রতন সিংহ। বললো,---আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। আপনি যা বলছেন তাই হবে।

বনবীর একটু হাসলো। বললো,---না রাণাজী, তোমাকে বিব্রত করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আমার পুরো কথাটা তুমি এখনো শোনো নি।

---বলুন।

---দরবারে স্থির হবে যে ওই পবিত্র জল মীরাবাঈয়ের কাছে পাঠিয়ে ওঁর নির্দোষিতা পরীক্ষা করা হবে। সে খবর জানানো হবে মীরাবাঈকে। তার কিছুক্ষণ পরে দরবারে খবর আসবে যে উনি হঠাৎ মারা গেছেন বিষাক্ত সাপের কামড়ে।

---কি করে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো রতন সিংহ।

বনবীর হাসলো,---ওই একই কথা শুধু তুমি নয়, অনেকেই জিজ্ঞেস করবে।

গিরধরজীর পুজোয় ফল লাগে প্রত্যেক দিন। ঝুড়ি ঝুড়ি ফল যায় মন্দিরে। তারই একটিতে ছিলো দুটি বিষাক্ত সাপ। সেই সাপ কামড়েছে মীরাবাঈকে।

---লোকের মনে অন্যরকম কোনো সন্দেহ হবে না?

---হতে পারে। আমরা যাদের ভালোবাসি, সেসব লোকের মুখে একথাই ছড়াবে যে, ফলের ঝুড়ি-টুড়ি বাজে কথা। গোপন কলঙ্কের কথা জানাজানি হয়ে গেছে বলে এবং রাণার নির্দেশে পবিত্র জল পান করে পরীক্ষা দেওয়ার সাহস নেই বলে মীরাবাঈ গোপনে বিষাক্ত সাপ আনিয়ে এভাবে আত্মহত্যা করেছেন।

রতন সিংহের মুখ ঝলমল করে উঠলো। বললো,---হ্যাঁ, এ ব্যবস্থাই ভালো। তাহলে আমার কোনো দায় আর রইলো না।

বনবীরকে জড়িয়ে ধরলো রতন সিংহ,---সত্যি বনবীর, কূটবুদ্ধিতে আপনার তুলনা নেই।

॥ তেইশ ॥

সেদিন সকালবেলা মীরাবাঈ গীতগোবিন্দ পাঠ করছিলো গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে। পাশে বসেছিলো চম্পা আর চামেলী। এমন সময় একজন পাহারাদার এসে জানালো চামেলীকে ডেকে পাঠিয়েছেন বনবীর সিংহ।

চামেলী উঠে চলে গেল। মীরাবাঈ গীতগোবিন্দ পাঠ করতে লাগলো সেদিকে চোখ তুলে না তাকিয়ে। চম্পা উঠে গিয়ে এদিক ওদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। তারপর ফিরে এলো।

তখন গীতগোবিন্দ থেকে মুখ তুললো মীরাবাঈ। বললো,---যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে মিসিরজী এবার রাজ্যে সীমানা পেরিয়ে যেতে পেরেছেন। কিন্তু হরিরামজী যে ধরা পড়েছেন বনবীরের লোকের হাতে তারই জন্যে বড্ড ভাবনা হচ্ছে।

---উপায় ছিলো না বাঈসা, চম্পা বললো, সেদিন রাত্তিরে চামেলী মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে খানিকটা যেতে দেখলো, অন্ধকারের ভিতর একজন আস্তে আস্তে অনুসরণ করছে মিসিরজীর। চলার ধরণ দেখে চিনতে পারলো যে তিনি বনবীর সিংহ। চামেলীকে বনবীরজী দেখতে পান নি। আগের ব্যবস্থামতো অন্যদিকে লুকিয়েছিলো হরিরামজী।

চামেলী সঙ্কেত করতে মিসিরজী অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল আর সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো হরিরামজী।

বনবীর সিংহ ভুল করে ভাবলেন তিনি হরিরামজীকে অনুসরণ করে আসছেন মন্দিরের দরজা থেকে, খানিকটা যাওয়ার পর বনবীরজীর সঙ্কেতে পাহারাদারেরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ফেললো হরিরামজীকে। ওকে নিয়ে চলে গেল সবাই।

চামেলী এদিক ওদিক ঘুরে যখন নিশ্চিন্ত হোলো যে ধারেকাছে কেউ নেই, তখন মিসিরজীকে বেরিয়ে আসার সঙ্কেত জানালো। হরিরামজী বনবীর সিংহকে ওরকম ধোঁকা দিতে না পারলে মিসিরজী সেদিন আর বেরোতে পারতেন না চিতোরগড় থেকে।

---কিন্তু কয়েদখানায় ওরা যে উৎপীড়ন করবে হরিরামজীর উপর।

---বেশী করবে না। সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

মীরা তাকালো চম্পার দিকে।

চম্পা বললো, জোহরী বাজারের সেঠ ওঙ্কারমল হীরের হারটা নিয়ে নয় লাখ টাকার একটা হুণ্ডি দিয়েছে মিসিরজীকে। আর এক লাখ টাকা নগদ দিয়েছে আমাদের তেজ সিংহকে।

---অনেক বেশী দিয়েছে। হারের দাম ছয়-সাত লাখ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়।

আমাদের জন্যে ওঁর খুব সহানুভূতি। এজন্যেই বেশী দিয়েছেন। আপনাকে শ্রদ্ধা করেন খুব। হুণ্ডি নিয়ে মিসিরজী চলে গেল জোধপুর। রাও সেখাজী জোধপুর আক্রমণ করলেও চারদিক থেকে অবরোধ করতে পারেন নি। একটা দিক এখনো খোলা। সেদিকে রাঠোর সেনারা এমনভাবে গেড়ে বসে আছে যে, সেখাজীর ফৌজ এগোতে পারছে না। তাই জোধপুরে ঢুকতে সেখাজীর কোনো অসুবিধে হবে না। সেখানে হুণ্ডি ভাঙিয়ে নেবেন।

এদিকে আমাদের প্রতাপজী গিয়ে দেখা করেছেন কুমার মলদেবের সঙ্গে। উনি পাঁচ লাখ টাকায় রাজী হয়েছেন। এমনভাবে ঘিরে থাকবেন মেড়তা যে এখানে রাণাজী আর বনবীর সিংহ ভাববেন মেড়তা দখলে আসবে কয়েক দিনের মধ্যেই।

অথচ মলদেবজী কিছু করবেন না, একটা পথ একটু খোলা রাখবেন যাতে রসদ যেতে পারে মেড়তার ভিতর। সে পথ দিয়ে মেড়তায় ঢুকবেন মিসিরজী, মলদেবের পাঁচ লাখ উনি যোধপুরে মলদেবের এক বিশ্বাসী লোকের হাতে আগেই দিয়ে আসবেন। বাকী চার লাখ মেড়তায় ঢুকে কুমার জয়মলজীর হাতে দেবেন। কিন্তু বাঈসা', একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। কুমার মলদেবজী তো রাণাজীর আর বনবীরজীর বন্ধু। উনি ঘুষ নিতে রাজী হলেন কেন?

মীরাবাঈ একটু হাসলো। বললো,---বদলোকেরা যখন নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে বন্ধু হয়, তখন আবার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনেই ঘুস নিয়ে একজন আরেকজনকে ফাঁকি দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না।

---মনে হচ্ছে, কুমার মলদেবের হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, ---চম্পা বললো।

---হ্যাঁ, তা হয়েছে,---মীরা উত্তর দিলো একটু হেসে।

---আপনি জানেন?

---একটু একটু আমি যাই কি। শুনতে চাও?

---বাঈসা', আপনি আমাদের এত বিশ্বাস করছেন কেন? আপনি জানেন আমরা বনবীরের মাইনে করা লোক, অথচ একদিনে হয়তো গোপন কথা জানিয়ে দিলে আমাদের।

চম্পা, এক সময় ছিলে বনবীরের লোক, কিন্তু এখন তো তা নও। এখন তোমরা আমার গিরধরজীর পরিচারিকা। তোমাদের দু'জনার চেয়ে আপন এখানে তো আমার আর কেউ নেই।

চম্পার চোখে একটু জল এলো। সে চোখের জল মুছলো ওড়নার প্রান্ত দিয়ে।

মীরা বললো, জানতে চাও মলদেবের কেন এত টাকার দরকার? তার এখন নজর জোধপুরের সিংহাসনের দিকে।

সে কি? কুমার মলদেব তো যোধপুরেরই যুবরাজ, মারওয়াড়ের সিংহাসন তো ওঁর বাবা রাও সাঙ্গার মৃত্যুর পর উনিই পাবেন।

ততোদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য ওর নেই চম্পা। আমার ধারণা ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করে দখল করতে চায় মারওয়াড়ের সিংহাসন। এবং এর জন্যে ওর টাকা দরকার।

কিন্তু বনবীর তো ওঁকে সাহায্য করতে পারতেন।

বনবীর?—মীরা হাসলো,—ঠিক এই মুহূর্তে মলদেব জোধপুরের রাজা হোক এটা বনবীর চায় না।

কেন?

তাহলে মলদেব খুব শক্তিশালী হয়ে পড়বে। রাজপুতানার রাজনৈতিক ভারসাম্য ঝুঁকে পড়বে তার দিকে। তাতে রতন সিংহের অসুবিধে।

মলদেব তাহলে জানেন বনবীরের মনোভাব?

জানে নিশ্চয়ই। ওর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। ও আপাতত বনবীরের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না জেনেই আমাদের কাছ থেকে টাকা নিতে রাজী হয়েছে। মেড়তা দখল করার জন্যে বনবীর যে তাকে ব্যবহার করতে চায়, এটা সে পছন্দ করে নি।

তাহলে মেড়তা অবরোধ করলো কেন?

হাতে একটি সৈন্যদল চাই। সেটা বনবীরের সাহায্যে মেবার রাজা থেকে পেয়ে গেছে বলে।

চম্পা মাথায় হাত দিলো।—ওরে বাবা, রাজনীতিতে কতো প্যাঁচ, কতো জটিলতা, একেবারে মাথায় ঢোকে না।

মীরা একটু হাসলো। বললো, —সত্যি, বড্ড নোংরা। বনবীর মলদেব এদের মতো লোকের জন্যেই এরকম। মহারাণা সাঙ্গা, কুমার ভোজরাজ, এঁরা তো সেরকম ছিলেন না। তাঁদের সামনে একটা আদর্শ ছিলো। ওঁরা আজ নেই, তাই আমাকে নিতে হয়েছে সেই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব। জড়িয়ে পড়তে হয়েছে এদেশের রাজনীতিতে। সেজন্যেই তো বনবীর, রতন সিংহ এরা এত ঘৃণা করে, এত ভয় পায় আমাকে। বনবীর সাংঘাতিক লোক। রতন সিংহ অতো খারাপ নয়। কিন্তু বড্ড দুর্বল। ওর মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই।

বাইসা' আপনাকে যখন ভালো করে জানতাম না, আপনার সম্বন্ধে কতো খারাপ খারাপ কথা শুনেছিলাম বনবীরের কাছে, সেসব বিশ্বাসও করেছিলাম। আজ মনে হয় এ অপরাধ আমাদের কোনোদিন ঘুচবে না।

যেদিন গিরধরজীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছো চম্পা, সেদিন থেকে সব অপরাধ ঘুচে গেছে। আমার সঙ্গে যে এখন সাধারণ মানুষের মুক্তির কাজে নেমে গেছ, এটাই গিরধরজীর আসল সেবা। আমার চোখে দেশের সাধারণ মানুষ আর গিরধরজীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

চম্পার চোখে আবার জল এলো। দু'জনেই চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর মীরা জিজ্ঞেস করলো,—হ্যাঁ, হরিরামজীকে বাঁচানোর কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা তো বললে না।

তেজ সিংহের হাতে এখন টাকা এসে গেছে। ও এক হাজার টাকা দিয়েছে কারারক্ষীদের সর্দারকে। বনবীরকে ওরা জানাবে যে হরিরামজীর উপর খুব উৎপীড়ন করা হচ্ছে, কিন্তু আসলে তেমন কিছু করা হবে না।

আমি শুনেছি যে, ওর উপর খুব চাপ দেওয়া হচ্ছে একথা স্বীকার করার জন্যে যে সেদিন রাত্তিরে সে এখানে মন্দিরের মধ্যে ছিলো আমার সঙ্গে।

চম্পা মাথা নিচু করে রইলো। আস্তে আস্তে বললো,—ছিঃ ছি, বনবীরটা কি নোংরা। আপনার সামনে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

মীরা হেসে বললো,—আমরা ভয় পাবো কেন, আমাদের মাথাই বা হেঁট হবে কেন, আমাদের মনে তো কোনো পাপ নেই। তুমি বরং হরিরামজীকে জানাবার ব্যবস্থা করো, সে যেন কথাটা স্বীকার করে।

বাইসা', হরিরামজী প্রাণ দেবে কিন্তু একথা বলতে পারবে না।

তাকে একথা বলতে হবে চম্পা। তা নইলে তেজ সিংহের টাকাও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। বনবীর নিজেই তার উপর উৎপীড়ন করবে। ওর মাথায় কি মতলব ঘুরছে আমি বেশ আঁচ করতে পারছি।

কিন্তু বাইসা', আপনার সম্বন্ধে লোকে কতোরকম আলোচনা করবে, সেটা আমরা কি করে সইবো।

সইতে হবে চম্পা। জীবনে কতো-রকম পরীক্ষা আসে। এও সেরকমই সেরকমই একটি। আমার মনে গিরধরজী আছেন, আমি তো ভয় পাই না।

চম্পা চুপ করে রইলো। মীরা আবার আরম্ভ করলো গীতগোবিন্দ পাঠ করতে।

চম্পার মনে হচ্ছিলো চামেলী বনবীরের সঙ্গে দেখা করতে গেছে অনেকক্ষণ। এখনো ফিরছে না কেন। তাকে কি বলছে বনবীর সিংহ।

এমন সময় বাইরে শুনলো পায়ের আওয়াজ। তাকিয়ে দেখলো চামেলী ফিরে আসছে। তার পেছন পেছন একটি লোক। লোকটির মাথায় একটি ঝুড়ি।

মীরা মুখ তুলে তাকালো।

গিরধরজীর সেবার জন্যে কিছু ফল—বললো চামেলী।

কে পাঠিয়েছেন?

মহারাণা রতন সিংহ,—বললো অন্য লোকটি। [ক্রমশ।

আত্মচরিতে সমাজচিত্র

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতায় মার্ক টোয়েন

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শুধু নিজের জীবনের পঁচাত্তর বছরের কথা নয়, পিতৃ-পিতামহের কালের অনেক কথাও মার্ক টোয়েন প্রকাশ করেছেন তাঁর আত্মচরিতে, যা থেকে পুরো উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার সমাজচিত্র আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সে চিত্র আমরা পূর্বেকার কয়েকটি আলোচনায় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। সাংবাদিক হিসেবে, সাহিত্যিক হিসেবে এবং বক্তা হিসেবেও মার্ক টোয়েন তাঁর আত্মকথায় আমাদের সামনে মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী আলোচনা কয়টিতে এসব প্রসঙ্গও সময় সময় উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু একজন সাংবাদিকের, সাহিত্যিকের এবং বক্তার দৃষ্টিতে তাঁর কালের সমাজকে মার্ক টোয়েন কিভাবে দেখেছেন সে বিষয়ে একটু বিশদ আলোচনাই প্রয়োজন সে যুগের মার্কিণ সমাজচিত্র যথাযথভাবে আজকের মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে।

সাংবাদিকতাই টোয়েন শুরু করে-ছিলেন আগে, কাজেই তাঁর সেই বৃত্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এবারের আলোচনা আরম্ভ করা যাক। পিতার মৃত্যুর পর বার-তের বছর বয়েস থেকে সংবাদপত্রের সঙ্গে পরিচিত হলেও ১৮৬২'র শেষ কিংবা ৬৩'র শুরুতে টোয়েন সাংবাদিকতার জীবনে পুরোপুরি প্রবেশ করেন। অরোরা থেকে ভার্জিনিয়া সিটিতে এসে 'এণ্টারপ্রাইজ' পত্রিকায় তিনি যোগ দেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে পাঠানো হয় কার্সন সিটিতে বিধান সভার অধিবেশন রিপোর্ট করতে। এই পত্রিকায় টোয়েন একটি সাপ্তাহিক চিঠি লিখতেন। প্রতি রবিবার এই চিঠি প্রকাশিত হতো আর প্রতি সোমবার তা নিয়ে বিধান সভায় ছোটখাটো ঝড় বয়ে যেতো। একের পর এক সদস্য উঠে টোয়েনের সমালোচনার উত্তর দিতেন তীব্র ও তিক্ত ভাষায় এবং সবিস্তারে গালিগালাজ করতেন সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের উদ্দেশ্যে। এতে স্বভাবতই মার্ক টোয়েন উৎসাহ বোধ করতেন এবং তাঁদের বক্তব্যের যথার্থ জবাব দেবার জন্যে এবং তাঁর বিরোধীদের ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে আরো বেশী করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরবর্তী সপ্তাহের চিঠি রচনায় উদ্যোগী হতেন। বিধান সভার সমালোচকদের সুবিধার জন্য অতঃপর টোয়েন তাঁর সাপ্তাহিক চিঠিতে পুরো নাম স্বাক্ষর করে ছাপতে লাগলেন।

এই চিঠির বিষয়বস্তু সঠিকভাবে সংগ্রহ করার জন্য টোয়েন সারাদিন বিধান সভায় বসে থাকতেন এবং অর্ধ-পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর চিঠিতে নিন্দা ও স্তুতি সমানভাবে বণ্টন করতেন। ফলত এই চিঠির যথেষ্ট প্রভাব পড়ল বিধান সভার ওপর এবং এই প্রভাবেই এই মর্মে একটি আইন পাশ হল যে, ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী সংগঠনকে অঞ্চলের সেক্রেটারীর কাছে সংগঠনের সংবাদ পেশ করতে হবে। তার জন্য নির্দিষ্ট দক্ষিণাও দিতে হবে। সেক্রেটারী ছিলেন টোয়েনেরই ভাই,—আর এই আইনের ফলে গড়ে তাঁর মাসিক প্রায় [illegible] ডলার আয় হতে লাগল।

এরপর তাঁর ডাক পড়ল টেরিটোরি-য়্যাল এণ্টারপ্রাইজের উইলিয়াম রাইটের স্থলবর্তী হওয়ার জন্যে। রাইট ছিলেন এই পত্রিকার একমাত্র রিপোর্টার। তিন মাসের জন্য রাইট আইওয়াতে নিজ বাড়ীতে যান, এই সময়কার পুরো দায়িত্ব পড়ে টোয়েনের ওপর।

গোড়াকার সেই দিনগুলিতে নেভাডার নতুন অঞ্চলে মল্লযুদ্ধ হঠাৎ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ১৮৬৪ সাল নাগাদ প্রায় প্রত্যেকেই যেন ভাবতে লাগল এরকম একটা যুদ্ধে গিয়ে কাউকে মারা, অন্ততপক্ষে তাকে নিকেশ করে দেয়া, কিংবা নিজে মরা অথবা কমপক্ষে বিকলাঙ্গ হওয়া ছাড়া আত্ম-সম্মান থাকছে না। টোয়েন তখন ভার্জিনিয়া সিটি এণ্টারপ্রাইজ-এর সিটি এডিটর। বয়স ২৯ বৎসর। উচ্চাশা টোয়েনেরও নানারকম ছিল, কিন্তু মল্লভূমির কোন আকর্ষণ তাঁর ছিল না। কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাবার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। এণ্টার-প্রাইজের ষ্টাফের মধ্যে গুডম্যান ছিলেন জবরদস্ত লেখক। এণ্টারপ্রাইজের প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা ভার্জিনিয়া ইউনিয়ন-এর সম্পাদক টম ফিচ্-কে পর্যন্ত তিনি জব্দ করেছিলেন। ইউনিয়নের সম্পাদকীয়তে ফিচ্ তাঁর অসামান্য বাগ্মিতার শক্তি প্রকাশ করতেন এবং তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল 'সিলভার-টাংগড্ অরেটর অব উইসকনসিন' বলে। উইসকনসিনেই ছিল তাঁর বাড়ী। ফিচ সম্পাদকীয়তে যতটা গরম লিখতেন, গুডম্যান আরো গরম ও কড়া করে তার উত্তর দিতেন, আর ফিচ্ যখন গুডম্যানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেন তখন টোয়েন ও তাঁর সহকর্মীরা রাত ভোর আনন্দে হৈ-হৈ করতেন।

মাত্র এক সময় টোয়েন মল্লযুদ্ধের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই

এ সম্পর্কে তাঁর পূর্বেকার সুস্থ চিন্তা ফিরে আসে। তিনি এর পুরোপুরি বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁর মতে "মল্লযুদ্ধ হচ্ছে অজ্ঞানের কাজ এবং এক বিপজ্জনক কাজ, এবং এটি অপরাধজনক কাজও বটে।"

নেভাদা ছেড়ে যাবার পর টোয়েন ছিলেন স্যানফ্রান্সিস্কোর 'মর্ণিং কল'-এর রিপোর্টার এবং একমাত্র রিপোর্টার। এই পত্রিকার একজনের পর্যাপ্ত কাজ ছিল, কিন্তু দু'জনের মত কাজ ছিল না। তাঁর কাজের ধারা ছিল এইরকম—সকাল ৯টায় পুলিশ আদালতে ছোটা এবং আগেকার রাতের যত গণ্ডগোলের বিবরণ সংগ্রহ করা। আইরিশে-আইরিশে, চীনায়-চীনায় তখন দণ্ডযুদ্ধ রোজ লেগেই থাকত। রোজই এ কাণ্ড হত আর রোজই তার রিপোর্ট করতে হত—অত্যন্ত একঘেয়ে নিরামিষ ব্যাপার। সেখান থেকে উচ্চ-আদালতে: আদালতে আগের দিনে যা বিশেষ বিশেষ রায় দেয়া হয়েছে তার রিপোর্ট সংগ্রহ করা; তৎপর সোজা থিয়েটারগুলোতে।—একের পর এক ৬টি রঙ্গমঞ্চ পরিদর্শন করে, মিনিট পাঁচেক করে প্রতিটি দেখে, তার রিপোর্ট লিখতে হত। শতবার যা বলা হয়ে গেছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার সে কথাই লেখা হত। —নিত্য নতুন কথা আসবে কোত্থেকে। সকাল ৯টা ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত একটানা এই ধামাধরা কাজ করতেন টোয়েন।

একদিন তবু একটা নতুন ঘটনার সন্ধান পেলেন। দেখলেন একদল আইরিশ বাঁদর ছেলে একজন চীনাম্যানকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে। এই ঘটনার রিপোর্ট খুব গুছিয়ে-গাছিয়ে প্রেসে দিলেন টোয়েন। কিন্তু আশ্চর্য, রিপোর্টটি পরদিন বেরুল না, তার পরদিনও নয়। প্রেসে গিয়ে খবর নিতে ফোরম্যান জানালেন—পত্রিকার মালিক বার্নস্ নিষেধ করাতেই রিপোর্টটা ছাপা হয় নি। নিষেধ কেন? বার্নস এইভাবে তার বক্তব্য রেখেছিলেন: 'কল' হচ্ছে 'নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকার মত—ধোবানী-দের অর্থাৎ গরীবদের কাগজ। এটিই হচ্ছে একমাত্র সস্তা কাগজ, গরীবদের পয়সাতেই এই কাগজ চলে; সুতরাং তাঁদের মন-মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে খবর দিতে হবে। আইরিশরা হচ্ছে গরীব, মর্ণিং কলের তারাই হচ্ছে অবলম্বন, তারা ছাড়া 'মর্ণিং কল' একমাসও চলবে না—আর তারা চীনাদের ঘৃণা করে। টোয়েন যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা' ছাপা হলে আইরিশ সমাজ ক্ষেপে যাবে এবং 'মর্ণিং কল'-এরও গুরুতর ক্ষতি হবে।

ব্যবসায়িক দিক থেকে মালিক বার্নস্-এর যুক্তি মার্ক টোয়েন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের সাংবাদিকতা তাঁর কাছে 'লাঞ্ছনা' বলে মনে হয়েছিল। এই ঘটনার পর দ্বিতীয় একজন রিপোর্টার নিয়োগ করা হয় 'মর্ণিং কলে' এবং এক মাস যেতেই টোয়েনকে মালিক পদত্যাগ করতে বলেন, যা বরখাস্ত করারই সামিল। এতে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন টোয়েন এবং তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস এ কথাই বার বার তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর ওপর যে অবিচার করা হয়েছে তার প্রতিবাদে বিধাতার রুদ্র-রোষ নেমে আসবে একদিন 'মর্ণিং কল'-এর ওপর। অনেক বছর পরে হলেও ১৯০৬ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সত্যি সত্যি ঐ সংবাদপত্রের অফিসটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই ভূমিকম্পের ছবি যেদিন তাঁর চোখে পড়ে, তার মাত্র দু'দিন আগে 'নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকায় লণ্ডন সংবাদদাতার একটি রিপোর্ট দেখে এবং আপটন সিনক্লেয়ার আমেরিকানদের অর্থ গৃধ্নুতার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে অসঙ্কোচেই মার্ক টোয়েন তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি একজনও সৎ মানুষ (পুরুষ) নেই আজকের আমেরিকায়।' চল্লিশ বছর আগে 'মর্ণিং কলে' তিনি যখন রিপোর্টার হিসেবে দাসত্ব করছিলেন, এমন কি সে সময়েও উন্নততর আমেরিকাকে তিনি অনুভব করতেন এবং নিজেকেও উন্নততর বলে মনে করতেন। ১৯০৬ সালে তা' আর তিনি মনে করতে পারছেন না। তাই বিগত বারোমাসের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে 'নিউ ইয়র্ক সানে'র লণ্ডন সংবাদদাতা আমেরিকার
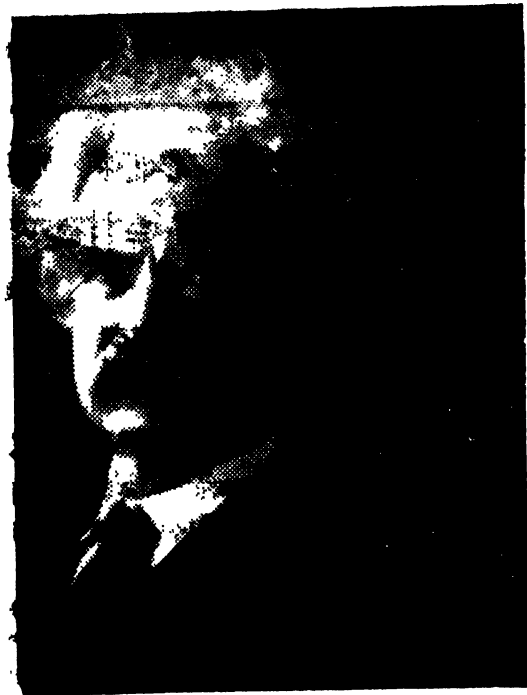
বক্তৃতা দিচ্ছেন লেখক মার্ক টোয়েন

বীমা কোম্পানীতে, পৌরসভায় এবং রেলওয়ে প্রভৃতি সংস্থায় চুরি ও প্রতারণা প্রভৃতির যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, তাতে মার্কিণ সমাজের চরম অধঃপতনের কথা বলতে টোয়েনের একটুও বাধে নি।

মার্ক টোয়েন রিপোর্টার, সহ সম্পাদক ও সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সাংবাদিক হিসেবে সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়েই বার বার তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছে। সাহিত্যিক জীবনেও প্রকাশকদের অসাধুতায় তিনি আহত হয়েছেন অনেকবার। আত্মকথায় তিনি তা অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন।

সাংবাদিক জীবন থেকে বিদায় নেবার আগেই সাহিত্যিক জীবনে প্রবেশ করেছিলেন মার্ক টোয়েন। সাংবাদিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমেরিকার সমাজকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে যা কিছু রোমাঞ্চকর, বিস্ময়কর ও অভিনব বিষয় তাঁর চোখে পড়েছে, সে সব অভিজ্ঞতাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে সাহিত্য রচনায়।

সাহিত্যিক জীবন শুরু কিভাবে হলো সে প্রসঙ্গে আত্মচরিতে মার্ক টোয়েন বলেছেন, গ্রন্থকার হিসাবে আমার অভিজ্ঞতার আরম্ভ হয়েছে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের শুরু থেকে।

কিন্তু সে আরম্ভের স্মৃতি খুব সুখকর নয়, মার্ক টোয়েনের আত্মজীবনী পড়লেই তা' জানা যায়। ১৮৬৭-র জানুয়ারীতে টোয়েন স্যানফ্রান্সিস্কো থেকে নিউ ইয়র্কে চলে আসেন। সে সময়ে স্যানফ্রান্সিস্কোর 'দি বুলেটিন' পত্রিকার রিপোর্টার এবং পরে 'দি ক্যালিফোর্ণিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ চার্লস্ এইচ ওয়েব তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর 'দি জাম্পিং ফ্রগ' প্রভৃতি স্কেচগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে এবং নিউ ইয়র্কের পুস্তক প্রকাশক মিঃ কার্লটনের কাছে সেগুলি প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে দিতে। ওয়েবের কথামতো টোয়েন তা' করেছিলেন, কিন্তু কার্লটন সেগুলি গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ না করে 'দি স্যাটারডে প্রেস'-এর মালিক মিঃ হেনরী ক্লেপের কাছে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ক্লেপ তাঁর 'দি স্যাটারডে প্রেসে'র শেষ সংখ্যায় 'দি জাম্পিং ফ্রগ' স্কেচটি প্রকাশ করে দিলে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তা' পুনর্মুদ্রিত হয় এবং তাতে বেশ একটা বড়ো আলোড়নেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাতে কি হবে, ওয়েব নিজে কার্লটনের সঙ্গে টোয়েনের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিলেও তাতেও কোনো কাজ হয়নি। কার্লটন আরো বড় লেখকের জমা পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে দিয়ে নতুন আরেকখানি পাণ্ডুলিপি গ্রহণের অক্ষমতা জানিয়ে মার্ক টোয়েনকে বিদায় দিয়েছিলেন।

নিউ ইয়র্ক থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এসে সব কথা জানালে বন্ধু ওয়েবই নিজে উদ্যোগী হয়ে আমেরিকান নিউজ কোম্পানীর মাধ্যমে এক ডলার পঁচিশ সেণ্ট মূল্যের একখানি ছোট বই প্রকাশ করেছিলেন মার্ক টোয়েনের স্কেচগুলি নিয়ে এবং তার নাম দিয়েছিলেন The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County and Other Sketches.

ঐ বছরেই জুন মাসে কোয়েকার সিটি অভিযানে বেরিয়ে পড়েন মার্ক টোয়েন এবং নভেম্বরে ওয়াশিংটনে ফিরে এসে হার্টফোর্ডের এক প্রকাশক আমেরিকান পাব্লিশিং কোম্পানীর এলিশা ব্লিস-এর কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন যাতে তাঁকে বলা হয়েছে তাঁর কোয়েকার সিটি অভিযানের ওপর একখানা বই লিখতে, যার জন্যে তাঁকে বিক্রির ওপর শতকরা পাঁচ ডলার করে রয়ালটি দেওয়া হবে। রয়ালটির

সদ্য প্রকাশিত বই

মৃত ও জীবিত ॥ বিমল কর ॥ ৪·০০

পরমার মৃত স্বামীর সঙ্গে অদ্ভুত কায়িক সাদৃশ্য এ উপন্যাসের নায়ক অবীরের। এই চেহারার সাদৃশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। ইতিপূর্বে দৈহিক সাদৃশ্য নিয়ে যে গুটিকয় উপন্যাস বাংলায় লেখা হয়েছে 'মৃত ও জীবিত' তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। ডাবল-এর থীম্-কে বাংলা সাহিত্যে গূঢ় সার্থক নিজস্ব তাৎপর্যে অন্বিত করলেন লেখক তাঁর এই নতুন উপন্যাসে।

আমরা যেখানে ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ ৫·০০

'তলিয়ে যাবার আগে' নামে যে কাহিনীটি 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে সারা দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু করেছিল, সেটিরই পরিবর্তিত গ্রন্থরূপ 'আমরা যেখানে'। এ কাহিনীর নায়িকা : কলকাতা—যে কলকাতায় এখন প্রচণ্ড হিংস্রতা আর অন্ধ আতঙ্ক, এ দুটি প্রবৃত্তিই প্রবল। আর নায়ক : সময় ১৯৬৯-৭০। বাকি সবাই পার্শ্বচরিত্র।

বেলা-অবেলার গান ॥ প্রতিভা বসু ॥ ৬·০০

প্রতিভা বসুর রচনায় প্রথম প্রেমের আনন্দ-বেদনাময় বিষণ্নমধুর রূপটি যেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে, এমনটি আর কারুর নয়। উচ্ছ্বাসে ভরা, আবেগে উত্তাল নতুন যৌবনের স্বপ্নসম্ভব দিনগুলি যেন মুহূর্তে উদ্বেল করে তোলে পাঠকহৃদয়। 'বেলা-অবেলার গান' এক দুঃখিনী মেয়ের এমনই এক হৃদয় উদ্বেল করা প্রথম প্রেমের বিষাদময় কাহিনী।

পুনর্মিলন ॥ বুদ্ধদেব বসু ॥ ৪·০০

ট্র্যাজিক ও কমিকের মিশ্রণে, ভয় কৌতুক রহস্য ও গম্ভীর ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে, ফিরে-ফিরতি সংলাপে ও ঘটনায় এই দ্রুতগামী একটানা নাটকটি সম্পূর্ণ মঞ্চোপযোগী ও সব রকম পাঠক ও দর্শকের পক্ষে উপভোগ্য। তবে এর মর্মোদ্ধার করতে হলে বোধ হয় গভীরতর অভিনিবেশ প্রয়োজন।

বাসরদত্তা ॥ সুবোধ ঘোষ ॥ ৪·০০

বিংশ শতকের জড়বাদী সভ্যতা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না কেমন করে আজও টিকে আছে ভারতের মত মূর্তিমান সেকেলে-পনাটা প্রাচীন সংস্কৃতির নামাবলী গায়ে জড়িয়ে? কিসের জোরে? তার সেই অহংকারী ঈর্ষা শান্তি পায় কেবল সেইদিনই, যেদিন সে বুঝতে পারে ঐ পিছিয়ে-থাকা জীর্ণতাটার অবিনাশী প্রাণশক্তি নিহিত তার হৃদয়বত্তায়।—এমনই একটি মহৎ বিষয় চিরায়ত শিল্পরূপ প্রাপ্ত লেখকের এই নবতম উপন্যাসে।

রাজাবদল ॥ বিমল মিত্র ॥ ৭·০০

রাজাবদলের সঙ্গে সঙ্গে কি রাজ্যেরও আমূলে বদল হয়ে যায়? বদলে যায় কি রাজ্যের মানুষগুলো পর্যন্ত—এমন কি, তাদের ভালো-মন্দ বোধ, শুভ-অশুভ—সব কিছু?—বাংলাদেশের বর্তমান ক্রান্তিকালের একটি বিরাট সমস্যা অত্যন্ত নগ্নভাবে দেশের মানুষদের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর এই সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের মাধ্যমে।

এক ডজন গপ্পো ॥ সত্যজিৎ রায় ॥ ৬·০০

'বাদশাহী আংটি'র গ্রেট ডিটেকটিভ ফেলুদার আরও দুটি রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনী, সঙ্গে আরও দশটি বিভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে সংগ্রথিত এই অপূর্ব সংকলন। এ গল্পগুলির মধ্যে গোটা তিনেক বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী, গুটি চারেক অলৌকিক কাহিনী, দুটি স্রেফ মজার গল্প, এবং একটি মাত্র সিরিয়াস গল্প। প্রকাশের দু সপ্তাহের মধ্যে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯। ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

ছবির মেলা
—বিশ্বনাথ গোস্বামী
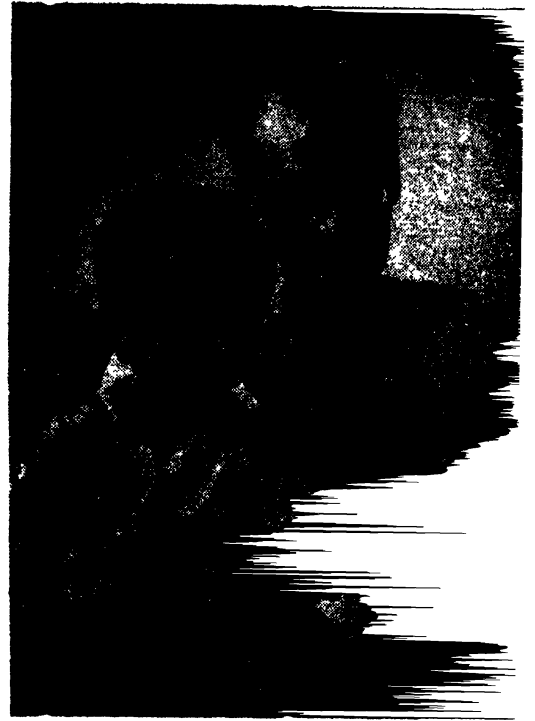
দুই প্রান্ত
—অভিজিৎ পাল

মাসিক

বসুমতী

শ্রাবণ / ’৭৭

দুই বোন
—স্নেহাংশু দে

পুকুরঘাটে
—এস. এম. হালদার

ফসল
—এন. রায়

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ
—অজিতকুমার কর্মকার

অভিনেতা
(রাজকাপুর)
-বিশ্বনাথ গোস্বামী (কলিকাতা)
(১ম পুরস্কার)

অভিনেতা
(বসন্ত চৌধুরী)
—অজিত গোস্বামী
(২য় পুরস্কার)

অভিনেতা
(অনিল চট্টোপাধ্যায়)
—নিবেদিতা চট্টোপাধ্যায়
(৩য় পুরস্কার)

জলবিহার
—হারাধন পাইন

প্রতিযোগিতার

বিষয়বস্তু

ভাদ্র/'৭৭

॥ অভিনেত্রী ॥

পরিবর্তে পাণ্ডুলিপি পেশ করা। সঙ্গে সঙ্গে একবারে দশ হাজার ডলার দিতেও কোম্পানী রাজী ছিল। তবে বন্ধু এ ডি রিচার্ডসনের পরামর্শে টোয়েন রয়ালটির শর্তেই ঐ বই লিখতে ব্লিস-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

মার্ক টোয়েন খুবই আর্থিক অভাবের মধ্যে পড়েছিলেন সে সময়ে। দৈবাৎ তখন তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুইণ্টনের ভাই উইলিয়ম সুইণ্টনের যোগাযোগ ঘটে যায় এবং তাঁরা দু'জনে মিলে অভিনব উপার্জনের উপায় স্থির করে নিলেন। পৃথিবীতে তাঁরা দু'জনেই হলেন প্রথম 'নিউজপেপার সিণ্ডিকেটের' প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকার বারোখানা ছোট সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁরা রাজধানী ওয়াশিংটনের সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। প্রতি চিঠির জন্যে এক ডলার হিসাবে প্রত্যেকটি সাপ্তাহিকের জন্যে তাঁরা সপ্তাহে দু'খানি করে রাজধানীর চিঠি লিখতেন। এভাবে সপ্তাহে চব্বিশ ডলার উপার্জন করে তাঁরা দুই বন্ধু তাঁদের খরচ মোটামুটিভাবে চালিয়ে নিতেন।

এ সময়ে মার্ক টোয়েন আবার দেশময় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতাও দিয়ে চলেছেন এবং সেই সঙ্গে আমেরিকান পাব্লিশিং কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি পূরণে তাঁকে কোয়েকার সিটি অভিযানের ওপর তাঁর 'ইনোসেণ্টস অ্যাব্রড' বইখানাও লিখে যেতে হচ্ছে এবং প্রকৃত পক্ষে এ বইখানাই তাঁর প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ। ১৮৬৮র জুলাই মাসের মধ্যে বইখানার পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করে প্রকাশক অর্থাৎ মিঃ ব্লিস-এর কাছে পেশ করতে হবে এই ছিল কথা। টোয়েন তাঁর কথা রেখেছিলেন। কিন্তু বই প্রকাশের ব্যাপারে আমেরিকান পাব্লিশিং কোম্পানী এমনি টালবাহানা শুরু করে দিয়েছিলেন যার ফলে টোয়েনকে শেষ পর্যন্ত মামলার ভয়ও দেখাতে হয়েছিল কোম্পানীর অংশীদারদের। অথচ বছরখানেক ধরে টানাহ্যাচড়ার পর ১৮৬৯ সালের আগস্ট মাসে বইখানা প্রকাশিত হবার পর মিঃ ব্লিস-এর কাছ থেকেই টোয়েন জানতে পেরেছিলেন যে, মাত্র ন'মাসের মধ্যেই তাঁর বই থেকে প্রকাশক কোম্পানী সব ধার-দেনা শোধ করে সত্তর হাজার ডলার লাভ করতে পেরেছিলেন।

টোয়েনের যে স্কেচ বইখানা বন্ধু ওয়েব আমেরিকান নিউজ কোম্পানীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন সে সম্পর্কেও তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আত্মকথায়। স্কেচ বইখানির ভালো বিক্রি সত্ত্বেও ওয়েব আমেরিকান নিউজ কোম্পানী থেকে কোনো হিসেব আদায় করতে পারেন নি। মার্ক টোয়েন ১৮৭২ সাল নাগাদ আরেকখানি বই লেখেন, বইখানির নাম 'রাফিং ইট'। এর পর অনেক দিন তাঁর আর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৮৭৯ সালে তিনি যখন ইয়োরোপ থেকে দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি একটা বই লিখে আনেন---"এ ট্র্যাম্প অ্যাব্রড"। তাঁর আরও কয়েকটি বই---"দি গিলডেড্ এজ", "স্কেচেস নিউ অ্যাণ্ড ওল্ড", "দি অ্যাডভেঞ্চারস্ অভ টম সয়ার", "ওল্ড্ টাইম্স্ অন দি মিসিসিপি", "দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার" ও "দি স্টোলন্ হোয়াইট এলিফ্যাণ্ট"।

'দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার' বইটি সম্বন্ধে মার্ক টোয়েনের কন্যা সুসি লিখেছে, এটি নিঃসন্দেহে তার পিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বই। বইটির মধ্যে তাঁর দয়ার্দ্র সহানুভূতির পরিচয় রয়েছে। বইটি সুন্দর সুন্দর আইডিয়ায় ভরা, ভাষাও চমৎকার।

সুসি লিখেছে, 'বাবা খুব কদাচিৎ এমন প্যাসেজ লেখেন যার কোথাও কিছুটা অন্তত কৌতুকরস নেই, এবং আমার মনে হয় না এই কৌতুকরস ছাড়া তিনি কখনও কোনো প্যাসেজ লিখবেন।' [আগামী সংখ্যায় শেষ।

হাঁপানি সারাতে চান?

নতুন কোনও ওষুধ নয়, বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সমজাতীয় ওষুধের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও বটিকা বা সিরাপও নয়---হাঁপানির চিকিৎসায় ডাক্তাররা কিছুদিন হল একটি জিনিসের ওপর জোর দিচ্ছেন : রোগীকে পরিচিত 'জীবাণুময় পারিপার্শ্বিক' থেকে সরিয়ে নেওয়া চাই, বাড়ীর আবহাওয়া তার পক্ষে ক্ষতিকর। অন্যত্র সরিয়ে নিলে রোগী যে সেরে ওঠে, এমন কি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, তা সম্প্রতি প্রমাণিত।

কারণ, দেখা গেছে বহু হাঁপানির রোগী 'পারিবারিক জীবাণু'র শিকার। এঁরা পরিবারের অন্যান্যদের দ্বারা আক্রান্ত হন; তাদের হাঁপানী না-ও থাকতে পারে---তাঁদের হয়ত কোনও উল্লেখযোগ্য অসুখই নেই।

একটি ১২ বছরের ছেলের হাঁপানি কিছুতেই সারছিল না---অ্যাণ্টি অ্যালার্জি মেজার, অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রয়োগ, টন্সিল অপারেশন এবং অ্যাডেনইড্ রিমুভ্যাল সত্ত্বেও। নতুন একজন চিকিৎসক এসে দেখলেন ছেলেটির ঠাকুরদা দীর্ঘস্থায়ী সিনসাইটিস্-এ ভুগছেন। তাঁর রোগ আয়ত্তাধীন হওয়ার পর ছেলেটিরও রোগমুক্তি ঘটল।

আর একটি পরিবারের ১২ এবং ১৫ বছরের দু'টি ছেলে বছরের পর বছর হাঁপানীতে ভুগছিল। সব চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের নাক এবং ঠোঁটের 'কালচার' করার পরে ধরা পড়ল ব্যাক্টেরিয়া। পরিবারের অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তিদেরও ঐ একই ব্যাক্টেরিয়া 'কালচার' ক'রে ধরা পড়ায় সকলের চিকিৎসা চলল একযোগে। ফলত, তাদের একজন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত, অন্যজনের অবরে সবরে মৃদু টান ওঠে।

এই ব্যাক্টেরিয়াগুলো কি? এরা অনেক জাতের, এবং যে-কেউ একাধিক ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণে ঘায়েল হতে পারে। হাঁপানী রোগীদের পারিবারিক 'কালচার' থেকে কয়েকটি সাধারণ ব্যাক্টেরিয়া ধরা পড়েছে, স্ট্যাফিলোকক্কাস অ্যারিকাস্, মিট্রেউস্ এবং অ্যাল্বাস্; অ্যালফা স্ট্রেপ্টোকক্কাস্, নানা জাতের ডিপ্থেরইড্।

এগুলো আলাদাভাবে জানার গুরুত্ব কম; কেন না, এদের আয়ত্তে আনার পদ্ধতি প্রায়ই অভিন্ন। গুরুত্ব গোটা পরিবারে এগুলোর অস্তিত্ব আবিষ্কারে---এবং সকলের চিকিৎসায় রোগীর/রোগীদের রোগমুক্তিতে।

তপনকুমার চৌধুরী

আন্তঃপারিবারিক রোগ সংক্রমণের জন্যই কি আপাতদৃষ্টে বহু হাঁপানি রোগী আবহাওয়া পাল্টালে আপাতভাবে উপকৃত হন? অনেক চিকিৎসক আজ তাই মনে করেন। তাঁদের মতে, রমণীয়, শুষ্ক আবহাওয়া নয়, আসলে জীবাণু অধ্যুষিত পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনই রোগমুক্তির আসল কারণ। এঁরা বলেন, হাঁপানি রোগীকে জীবাণু-উৎস পরিবার থেকে সরিয়ে নিলেই সে সহজভাবে শ্বাসত্যাগ এবং প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারবে।

সৌভাগ্যক্রমে যারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, বাড়ির আবহাওয়া তাদের জন্য অনেকক্ষেত্রেই সুফলদভাবে পরিবর্তিত করা সম্ভব।

'স্মল ব্রংকিয়াল টিউব'-এ বাধা সৃষ্টি হলেই হাঁপানি হয়। এই টিউবগুলোর কিনারায় গ্রথিত ঝিল্লী ফুলতে পারে; তার চারপাশের পেশী সঙ্কুচিত হওয়াও সম্ভব; কিংবা টিউবগুলো 'মুক্কাস্' দ্বারা বুজে যেতে পারে।

যাই হোক্ না কেন, রোগীর টান ওঠে, সে বাতাস পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তার বুক কোলে, নাকের পেশীতে টান ধরে, ফুসফুসে কষ্ট হয়।

বহুদিন থেকেই জানা আছে, হাঁপানি হয় অ্যালারজি সংক্ষোভজ চাপ বা সংক্রমণ থেকে।

বিরক্তিকর বস্তুতে কারও কারও অ্যালারজি আছে। সংক্ষোভের সঙ্গে হাঁপানির সম্পর্ক বোঝা সহজ। কোনও বিশেষ সংক্ষুব্ধ মুহূর্তে কারও প্রথম হাঁপানির আক্রমণ হয় এবং আর যে কারণই থাক না কেন, স্নায়বিক উৎকণ্ঠায় হাঁপানি বাড়বেই। সংক্রমণ ব্রংকাইটিস, ফ্লু, নিউমোনিয়া বা হুপিংকাফ্ থেকে হয়।

কিন্তু ঠিক যে কী ভাবে সংক্রমণ হাঁপানি সৃষ্টি করে, তা আজও রহস্যাবৃত।

'মেকানিজম্' যাই হোক না কেন, অধিকাংশ 'অ্যালারজিস্ট'ই স্বীকার করেন যে, হাঁপানির ক্ষেত্রে সংক্রমণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

একজন আমেরিকান চিকিৎসক প্রথমে হাঁপানির ক্ষেত্রে পারিবারিক সংক্রমণের কথা চিন্তা করেন। রোগীর পরিবারভুক্ত অন্যান্যদের থুথু ইত্যাদি 'কালচার' ক'রে তিনি উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন ব্যাক্টেরিয়া আবিষ্কার করেন।

যেমন, জনৈক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের হাঁপানি দীর্ঘদিনের। মাঝেমাঝে তাঁকে হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে হত হাঁপানির জোরালো আক্রমণের জন্য। অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রয়োগে ফল হত সাময়িক। তাঁর স্ত্রী-কন্যা সুস্থ। কিন্তু পরীক্ষায় ধরা পড়ল তাঁরাও হাঁপানির জীবাণুবাহী। এবং এই ভদ্রলোক সুস্থ হতে-না-হতেই স্ত্রী-কন্যার জীবাণুর ঘায়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়ছিলেন।

পাঁচজনের একটি পরিবার---কর্তা, গিন্নী আর তিনটি সন্তান। প্রত্যেকের হাঁপানি। পরীক্ষান্তে বোঝা গেল সকলে মিলে বেশ একটি জীবাণুময় আবহাওয়া তৈরী করেছেন। নতুন জীবাণুমুক্ত ঘরে গেলেন তাঁরা। তাদের যাওয়ার

আরোগ্য বিভাগ

ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আরোগ্য বিভাগে ডাঃ বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের রচিত "ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ" রচনা পড়িয়া যাহা জানিলাম, তাহার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর সঙ্গে আমার পূর্বেকার ধারণা এবং মতামত না জানাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। জানি না আমার মতো ভুল ধারণার বশবর্তী লোক আরও কতজন আছেন। ওষুধের মূল্য ব্যাপারে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল, যে "যত গুড় ঢালবে তত মিষ্টি হবে", অর্থাৎ বেশী মূল্য দিয়ে সাধারণত আমরা ভাল জিনিষ ক্রয় করে থাকি। কিন্তু ওষুধ ক্রয়ের ব্যাপারে সেটা ভিন্ন, সেটা লেখক অতি সুন্দর উদাহরণের সাথে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ট্যাবলেট ও ক্যাপস্যুলের ব্যাপারে এই জানিতাম যে, ক্যাপস্যুলে ট্যাবলেট অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ওষুধ আছে। ঐ পরিমাণ ওষুধ খাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। যাহা হউক, নিজের ধারণা নিয়ে আমার বক্তব্যের কলেবর আর বৃদ্ধি করতে চাই না। ওষুধের "ফেয়ার প্রাইস শপ" খোলার কথা অতি উত্তম। গরীবের এতে উপকার হবে। আমাদের দেশে গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কতজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতে পারেন। বেশী সময় বাধ্য হইয়াই ডাক্তারের শরণাগত হয়। গ্রাম ও মফস্বলবাসীদের এখনও কোন ওষুধের দরকার পড়িলে শহরে ছুটিতে হয়। শুধু ওষুধ কেন, আরও অনেক জিনিষের দাম সরকার তো বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই ন্যায্য দামে তো পাওয়া যায় না, আর পাওয়া গেলেও অনেক মাস অপেক্ষা করিতে হয়, সুতরাং ফেয়ার প্রাইস শপ খোলার পর আমাদের "আফটার ডেথ, কামস্ দি ডক্টর" এ অবস্থার সম্মুখীন হইতে না হয় তার কথা আগেই আমাদের বিচার-বিবেচনা করা দরকার। প্রাইভেট ডিলারগণ তখন বাজারে কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি করিয়া, কালো বাজারের পথ আরও সুগম করিতে পারিবেন। ফেয়ার প্রাইস শপ এ দুষ্প্রাপ্য এবং সাধারণ ওষুধের প্রাচুর্যতা রাখিয়া এবং অন্য দোকানের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে চালাইতে হইবে। তাহাতে জনসাধারণের উপকারে আসিতে পারে। অন্যথা ওষুধের ফেয়ার প্রাইস শপ খোলার যৌক্তিকতা নাই। আমাদের মূল লক্ষ্যের উপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রথম :—ন্যায্যমূল্যে ওষুধ বিক্রয় (ফেয়ার প্রাইস শপ-এর মূল উদ্দেশ্য)

দ্বিতীয় :—সরকারের আংশিক মুনাফা লাভ।

তৃতীয় :—ওষুধের প্রাচুর্যতা (অবশ্যই চাহিদানুযায়ী)

উপরোক্ত এই লক্ষ্যের পূরণ করিয়া সরকার ফেয়ার প্রাইস শপ চালাতে পারলে খুবই উপকৃত হবো।

---রাধাগোবিন্দ বাগ।

পর সে ঘরও জীবাণুময় হয়ে উঠল। কর্তাই জীবাণুবাহক সন্দেহে প্রধানত তাঁর চিকিৎসা করায় গোটা পরিবারই ক্রমে সুস্থ হয়েছিল।

এরকম জাজ্বল্যমান উদাহরণ মেলে খুব কম। বস্তুত, এই কারণেই এতদিন এদিকে তেমন দৃষ্টি পড়ে নি।

যে হাঁপানি রোগীর সংক্রমণের কারণ পারিবারিক, তাঁকে নিরাময় করা যায় কীভাবে?

প্রথমত---রোগীর এবং অন্যান্যদের 'রেস্‌পিরেটরী ট্র্যাক্ট ইনফেকশন'-এর চিকিৎসা আবশ্যিক।

কিন্তু ওখানটা পুনরাক্রান্ত হতে পারে চামড়া, চোখ, কান ইত্যাদি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তারও সুষ্ঠু চিকিৎসা চাই।

তাছাড়া, গামছা বা জামা-কাপড় একে অন্যেরটা ব্যবহার না করা উচিত। রোগীকে যথাসম্ভব আলাদা রাখা দরকার।

হাঁপানির ক্ষেত্রে পারিবারিক অবদান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনেছে।

হাঁপানি উত্তরাধিকার সূত্রে হয় কি? একই পরিবারে পুরুষানুক্রমে হাঁপানি দেখা গেছে, তা থেকেই সাধারণের বিশ্বাস উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ'-বাচক। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে পারিবারিক আবহাওয়া এর একটি কারণ। যক্ষ্মাও আগে পুরুষানুক্রমিক মনে করা হত।

হাঁপানিতে আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের আলাদা ক'রে হাসপাতাল বা নার্সিং হোম-এ রেখে যে সুফল পাওয়া যায়, তার কারণ কি পারিবারিক দূষণমুক্তি হতে পারে না?

এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও মেলে নি। তবে মিলবে একদিন। যাই হোক, হাঁপানি নিরাময়ের ক্ষেত্রে নবীনতম পদ্ধতিটির প্রয়োগ কার্যকর নিঃসন্দেহে।

'ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ' শিরোনামায় শ্রীরাধাগোবিন্দ বাগ মহাশয় বোম্বাই থেকে যে চিঠি লিখেছেন, তা হুবহু ছাপতে দিলাম। এই চিঠি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 'আরোগ্য বিভাগের' পাঠক-পাঠিকারা মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন। আমরা এ সম্বন্ধে আরও মতামত আহ্বান করছি।

'ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে নানাদিক থেকে বিরোধিতা আসবে, বিশেষ করে বিদেশী অর্থে যে কোম্পানীগুলি গড়ে উঠেছে, এ কথা আমরা আগেই বলেছিলাম। সরকার পক্ষ যদি অসহায় বোধ করেন, তাহলে তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই বিরোধিতা সবদেশেরই সরকারকে করতে হয়।

ওষুধ কেনা-বেচার মধ্যে অনেকগুলি রন্ধ্র আছে। প্রথম যে কোম্পানী ওষুধ তৈরী করে, তারা সরকারকে যথাযথ ট্যাক্স দিয়ে বাজারে ছাড়েন। কোম্পানী থেকে ওষুধ হোলসেলস্ মার্কেটে বিক্রীত হয়, অথবা বড় বড় দোকানে একসঙ্গে অনেক টাকার ওষুধ বিক্রী করে দেওয়া হয়। কোম্পানীর পক্ষে সুবিধে তাড়াতাড়ি এককালীন অনেক টাকা পেয়ে যায়। ছোট ছোট দোকান, বড় দোকান থেকে অল্প অল্প করে ওষুধ কিনে রোগীদের কাছে বিক্রী করেন। রোগীর কাছে যখন ওষুধ পৌঁছয়, তখন তিনহাত ঘুরে এসেছে। কোম্পানী, হোলসেলস্ মার্কেট অথবা ছোট ওষুধের দোকান, সকলেই মুনাফা নিয়ে ব্যবসা করেন, তাই তিনবার মুনাফার অঙ্ক চড়তে চড়তে রোগীর কাছে যখন ওষুধ পৌঁছয়, তখন তার মূল্য বেড়ে যায়।

ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হলে, কোম্পানীর কাছ থেকে ওষুধ সরকারকে কিনতে হবে। জাল ওষুধ অথবা গোপনে যে সব ওষুধ বিক্রীত হয়, সেগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। প্রয়োজন হলে ওষুধের কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। সরকার ওষুধ কেনার পর প্রত্যেক দোকানে তা বিক্রী করবেন। প্রত্যেকটি দোকানে সরকার পক্ষ থেকে একজন কি দুজন লোক থাকবেন, যিনি কঠোর নজর রাখতে পারবেন যে অযথা বেশি দামে ওষুধ বিক্রী না হয়। সরকার যদি তেমন মনে করেন, ওষুধের দোকানগুলিকে নিজের পরিচালনাধীনে আনতে পারেন।

অবশ্যই এজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল হেল্থ স্কীম-এর অধীনে যে সমস্ত রোগী বা রোগিণী আছেন, তাঁরা বিনাব্যয়ে ওষুধ এবং চিকিৎসার যাবতীয় সুযোগ পান। কিছুকাল পূর্বে চশমা পর্যন্ত বিনাব্যয়ে পেতেন। আয়ারল্যাণ্ডেও বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ আছে, অথচ অর্থনৈতিক অবস্থায় আয়ারল্যাণ্ড ভারতবর্ষ থেকে দুর্বল।

প্রত্যেক দেশেরই সরকার জানেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রক কোনদিন আয় দেয় না। পুরোটাই খরচের ব্যাপার। তাই তারা স্থায়ী আয়ের পথও সুগম করে রেখেছেন। ইংলণ্ডের 'টোব্যাকো ট্যাক্স' অত্যধিক এবং এই কর স্বাস্থ্যবিষয়ক খরচের জন্য ইয়ারমার্কড (আলাদাকরণ) করে রাখা থাকে। এই অর্থ অন্য কোন খাতে খরচ করবার অধিকার কোন সরকারের নেই। আয়ারল্যাণ্ডে জুয়াখেলা, রেস খেলার ওপর যে কর আছে, তা ব্যবহৃত হয় স্বাস্থ্যখাতে।

আমাদের দেশেও প্রচুর লটারী খেলা, রেস খেলা প্রভৃতি হয়ে থাকে। সরকার এই সমস্ত খেলা থেকে যে কর পান, তা যদি স্বাস্থ্যখাতের জন্য নির্দিষ্ট-ভাবে বরাদ্দ করে রাখেন, তাহলে অর্থ-সংকটের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রকের চিন্তা থাকবে না। ——

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

এ বিষয়ে আমরা পরের সংখ্যায় আরও আলোচনা করব। রাধিকাবাবুর পত্র নিয়ে আমরা পরের সংখ্যায় আলোচনা করব। যদি এর মধ্যে আরও পত্র পাই, সবগুলি একসঙ্গে ছাপাবার চেষ্টা করব।

● **শ্রীসৌম্য চৌধুরী**, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৩—

যে সমস্যার কথা লিখেছেন, তা মাঝে মাঝে হবে, আবার মাঝে মাঝে কমে যাবে। ভয় পাবার কিছু নেই, তবে ভরসার জন্য গৃহ-চিকিৎসককে দেখাতে পারেন।

● **শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার**, কদমা-বাজার, জামসেদপুর-৫—

সাত বছরের মেয়ের কান দিয়ে পুঁজ পড়ে, আপনি কালবিলম্ব না করে হাসপাতালের কান-নাক-গলা বিভাগে দেখিয়ে চিকিৎসা করান। এ রোগের চিকিৎসা পত্রযোগে কখনো করাবেন না।

● **শ্রীবিপুব ব্যানার্জি**, সেণ্ট্রাল জামবাদ কোলিয়ারী, বর্ধমান—

আমরা অনেকবার জানিয়েছি, ইংরিজীতে পত্রযোগ করলে আমাদের খুব অসুবিধে হয়, আশা করি ভবিষ্যতে বাংলাতেই চিঠি লিখবেন। যাই হোক, লম্বা হওয়ার কোন প্রতিবিধান আমার জানা নেই। অনেক পরিবারে দেখা গেছে, ভাই, বোন, মা, বাবা লম্বা হওয়া সত্ত্বেও কোন একটি বিশেষ ভাই কি বোন বেঁটে হয়। অনুসন্ধানে দেখা যায়, পূর্বপুরুষের দু-এক বংশ আগে (পিতামহ, মাতামহ বা তারও আগে) কেউ না কেউ বেঁটে ছিলেন। তাঁদের কারুর ধারা বর্তমান বংশে কোন একটি ভাই কি বোনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করলে বেঁটে হয়।

● **শ্রীমতী সুস্মিতা দত্ত**, মনসাতলা রোড, বজবজ—

আপনি যে সমস্যার কথা বলেছেন, তার উত্তরে জানাই, নিয়মিতভাবে প্রত্যহ দুবার ভাত খাবার পর চা চামচের দু চামচ করে অরোপেক্স ফোর্ট (এ্যালক্রেন) খাবেন দুমাস। কিছু মাখতে হবে না—

● **শ্রীসমীর মুখার্জি**, উত্তরপাড়া, হুগলী—

ওরকম উঁচু মত চিপির জন্য কিছু ভাবতে হবে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে।

●শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসাক, শিকারপুর, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার---

আপনি অযথা ভয় পাবেন না। ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

●শ্রীমতী মধুমিতা রায় (ছদ্মনাম), দেওঘর, এম-পি---

আপনি ঈষদুষ্ণ গরম জলে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকবেন। পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট। প্রত্যহ স্নানের আগে বসবেন। এইভাবে 'কোমর স্নান' (হিপ্ বাথ্) নিয়মিতভাবে করলে মাসিকের যন্ত্রণা কমে যায়। অল্প বয়সে বেশি ওষুধ খাওয়া ভাল নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য আপনি নিয়মিত ভিটামিন বি কমপ্লেক্স্ খাবেন।

অনামিকা দেবী --

প্রশ্ন ১ : আমার মেয়ের বয়স ৫ বৎসর। তার মুখে গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিকার কি?

উত্তর : ব্যায়াম ও পরিশ্রম করান। স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হলে এই ধরণের উপসর্গ কমে যাবে।

প্রশ্ন ২ : আমার ছেলের বয়স ১৬ বৎসর। কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী যতটা লম্বা, সেই তুলনায় ছেলে লম্বা হচ্ছে না। এর কোন প্রতিকার আছে কি না?---

উত্তর : বাপ-মা লম্বা হলেই যে ছেলে-মেয়েরা লম্বা হবে তার কোন অর্থ নেই। অনেক সময় পূর্বপুরুষের ধারা মা-বাবাকে টপকে ছেলে-মেয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাকে মেণ্ডিলিয়ান থিয়োরী বলে। হয়ত আপনার মা, বাবা, ঠাকুমা, ঠাকুরদাদা অথবা আপনার স্বামীর পূর্বপুরুষের কেউ বেঁটে ছিলেন, তাঁদের কারুর ধারা, আপনাদের ছেলের মধ্যে বর্তেছে।

তবে নিরাশ হবার কিছু নেই; উনিশ, কুড়ি বছর পর্যন্ত লম্বা হয় ছেলে-মেয়েরা। কোন চিকিৎসায় কিছু হবে না। করা উচিতও নয়। --

প্রশ্ন ৩ : আমার মাথার চুল হঠাৎ কিছুদিন যাবৎ খুব উঠে যাচ্ছে--

উত্তর : আপনার বয়সের কোন উল্লেখ নেই। চল্লিশোর্ধে আপনা থেকেই চুল পড়তে আরম্ভ করে। চুল পড়া বন্ধ করতে হলে নিয়মিত ভিটামিন বি কমপ্লেকস খেতে পারেন। যকৃতের দুর্বলতাও চুল উঠে যাবার একটি কারণ। মানসিক দুশ্চিন্তা থাকলেও চুল উঠে যায়।

প্রশ্ন ৪ : নারী ও পুরুষের যৌবন কত বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আর যৌবন বলতে কি কি বোঝায় --

উত্তর : যৌবন কথাটির সংজ্ঞা এক এক জন, এক এক রকম করে থাকেন। যৌবন কথাটির অর্থ তারুণ্য। নারী ও পুরুষ যে বয়সে, জীবনের কর্ম, খ্যাতি, উন্নতি প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি প্রকাশ করবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, তাকেই যৌবন বলে।

অনেকে যৌনতার সঙ্গে যৌবনকে মিশিয়ে দেখেন। বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে এই সংজ্ঞা ভুল। মানুষের জীবন শুধু যৌনতা ঘিরে নয়, তাই অন্য গুণগুলির বিকাশ করার কথা না বলে, শুধু যৌনসম্ভোগের কথা বললে যৌবন কথাটিকে বিকৃত করা হয়। আমি যে অর্থে, যৌবন কথার সংজ্ঞা ধরছি, তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে কর্মক্ষমতার ওপর। অনেকে অশীতিপর বয়সেও যুবক থাকেন, আবার অনেকে ত্রিশ বছর বয়সেই বার্ধক্যজনিত ভারে নুয়ে পড়েন, অতএব বয়সের হিসাবে যৌবনের স্থায়িত্ব বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৫ : মানুষের মনের অশান্তি

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

আরোগ্য বিভাগ

নাম- -

ঠিকানা- -

- -

মাসিক বসুমতী

উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা কিভাবে এড়ানো যায়?

উত্তর: বিশ্ববিখ্যাত জনৈক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চিকিৎসকের মতানুযায়ী জীবনকে তিনটি কামরায় ভাগ করে নিতে হয়। কোন কামরার সঙ্গে কোন কামরার যোগাযোগ থাকবে না। প্রথম কামরা - অতীত; দ্বিতীয় কামরা - বর্তমান এবং তৃতীয় কামরা-ভবিষ্যৎ। যখন আমরা বর্তমান কামরায় বাস করবো, তখন অতীত ও ভবিষ্যৎ কামরার সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকবে না। অর্থাৎ অতীতের জন্য দুঃখ বা অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা না করে, বর্তমানের কাজ স্বাভাবিকভাবে করে গেলেই মনের অশান্তি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এড়ানো যায়।

●শ্রীতপনকুমার সেন, ধর্মনগর, ত্রিপুরা---

আপনি ডাক্তার দেখান। চিঠিতে এ চিকিৎসা করা উচিত হবে না।

●শ্রীমতী মায়া সাহা, নীচু বাজার, নদীয়া---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। চুল উঠে যাবার প্রধান কারণ শারীরিক দুর্বলতা এবং খুস্কি। আপনি প্রাগ্‌মাটার মলম, নারিকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মাথায় ও ভ্রূতে ভালভাবে ঘষে ঘষে লাগাবেন। সপ্তাহে একদিন শ্যাম্পু করবেন। এ ছাড়া মাল্‌টিভিটামিন খাবেন।

●শ্রীমোহন চাটার্জি, গৌহাটি ১১---

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, আপনি দিনে তিনবার করে ২ চামচ করে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স খাবেন। দ্বিতীয় প্রশ্নে যা লিখেছেন, তা পরীক্ষা না করে মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

●শ্রীসত্যনারায়ণ কল্যাণশর্মা, রাণীগঞ্জ---

প্রশ্ন ১: আমার পায়ের নখগুলি আঙুলের চামড়ার মধ্যে ঢুকে যায় এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

উত্তর: সমানভাবে নখ কাটবেন। নিয়মিতভাবে বেটনোভেট সি (গ্ল্যাক্সো) মলম নখের ডগায় লাগাবেন।

প্রশ্ন ২: আমার এক বন্ধুর দাঁতে খাঁজ থাকায়, সেই খাঁজগুলির গর্ত পরিপূর্ণ হয় এবং সেই গর্ত হতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

উত্তর: আপনি দাঁতের ডাক্তারকে দেখিয়ে খাঁজগুলি ভরতি করিয়ে নেবার আশু ব্যবস্থা করুন। দাঁতের খাঁজে ময়লা পচে বিষাক্ত হয় বলে যন্ত্রণা হয়। কিলিং এ যদি না কমে, তাহলে দাঁত তুলে ফেলতে হবে। এছাড়া মুখ সব সময় পরিষ্কার রাখতে বলবেন।

●শ্রীবিমলকুমার দাস, উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি---

লম্বা হওয়া নিয়ে এ সংখ্যাতে আলোচনা করা হয়েছে

●শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সদানন্দ রোড, কলি-২৬---

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মোটা হওয়ার জন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন হয় না। আপনি হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে চিকিৎসকরা ওষুধ দেন কেন? দুটি কারণে মোটা হওয়ার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। প্রথম কারণ, ওষুধে স্টিমুলেশন হয়। দ্বিতীয় কারণ, মনের সান্ত্বনা যে, ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন, এবার নিশ্চয়ই মোটা হব। আসলে পেট ভরে খেয়ে পরিমিত বিশ্রাম করলেই শরীর পুষ্ট হয় এবং মেদ বৃদ্ধি হয়।

●শ্রীনিখিল পট্টনায়ক, মধুতটি, পুরুলিয়া---

কৃমিনাশক ভাল ভাল ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারেন।

●শ্রীমতী হাসি ঘোষ, মিস্ত্রী, ধানবাদ---

প্রশ্ন ১: আজ প্রায় তিনমাস যাবৎ আমার শরীর (মুখ, হাত, পা) ফুলে যাচ্ছে। ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। ---

উত্তর: আগে চিকিৎসক দিয়ে নির্ধারণ করে নিন, কেন ফুলছেন। রক্তাল্পতার জন্য ফুলতে পারেন, অ্যালার্জির জন্যও ফুলতে পারেন, ভিটামিন বি ১২ কমে গেলেও ফুলতে পারেন। ফোলার কারণ নির্ণয় করে, চিকিৎসা করুন দেখবেন ফোলা কমে গেছে। অনেক সময় বৃক্কজনিত (নেফ্রাইটিস্) রোগের জন্যও শরীর ফুলতে পারে। অতএব কেন ফুলছেন তার কারণ স্থির না হলে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে এই সংখ্যাতেই অনেকবার আলোচনা হয়েছে।

●শ্রীঅমিতকুমার ঘোষ, বজবজ---

কিছু ভাববেন না। যত চিন্তা করবেন, তত উপসর্গটি বৃদ্ধি পাবে।--

●চারটি এম-এর ছদ্মনাম, নারায়ণপুর, ২৪-পরগণা---

এ বিষয়ে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যায়াম সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর আপনি কোন ব্যায়ামবীরের কাছ থেকে নিন।

●জীবন্মৃত (ছদ্মনাম), শিলচর, কাছাড়---

প্রশ্ন: ডায়বিটিস্ ইন্‌সিপিডিস্-এর চিকিৎসা কি?

উত্তর: খুব ভাল ওষুধ নেই। ভাল ঘুম হলেই অনেকটা কমে যায়।---

●শ্রীসুজন সেন, গোপীনাথপুর, বাঁকুড়া ---

প্রশ্ন: মাঝে মাঝে আমার শরীরের চামড়া দাগড়া দাগড়া হয়ে যায় এবং খুব চুলকোয়। ---

উত্তর: আপনি স্ক্যাবিলসিড ইমালশন মাখবেন।

●শ্রীঅরুণকুমার গুহ, জি, টি, রোড, চন্দননগর---

১নং প্রশ্নের উত্তর: স্ক্যাবালসিড ইমালশন জায়গাগুলিতে মাখবেন।

২নং প্রশ্নের উত্তর: প্রত্যহ দাড়ি কামাবেন---।

৩নং প্রশ্নের উত্তর: সহজে কিছু কমা যাবে না।

রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-শিশির প্রতিভা

১৯৪১ সালের 'পূজা' সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি প্রবন্ধে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার লিখেছিলেন, 'অভিনীত নাটকে দর্শক কাঠগড়ার আসামীর মত নির্বাক হয়ে বসে থাকবেন, আর অভিনেতারা অভিনয় করবেন এর মধ্যে ঘোর অসামঞ্জস্য আছে, এটা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই চেষ্টা করতেন "a barrier thrown down between stage and audience" কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বললেও নাট্যাচার্য শিশিরকুমারই রঙ্গমঞ্চে প্রথম দর্শক ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যে একটা যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। এটা ঠিক যে শিশিরকুমার তরুণ যৌবন থেকেই রবীন্দ্রনাথের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন এবং নাট্যলোকে রবীন্দ্রনাথকে অসম্ভব ভক্তি করতেন এবং সেই জন্যই শিশিরকুমার ঐ প্রবন্ধেই দুঃখ করে লিখেছেন—"ইবসেন, গাউটম্যান নাট্যশালার জন্য যা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তার এক কণাও কিছু করতে পারেন নি। আমি তাঁকে নিজে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আনবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু নাকউঁচো অন্ধ গোঁড়া ভক্তদের বাধায় তাঁকে আনতে পারি নি, যদি পারতাম বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ মধ্যাহ্ন সূর্যের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।" ১৯২১ সালে যখন ওল্ড ক্লাবের হয়ে শিশিরকুমার একটি পরিত্যক্ত সেকেলে নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" অভিনয় করেন তখন অনেক সাহিত্যিক নাট্যবোদ্ধা বিদগ্ধজন এসেছিলেন কৌতূহলী হয়ে। কানাঘুষা চলছিল অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী এতে অভিনয় ও পরিচালনা দুই-ই করছেন। সে রাত্রে শিশিরকুমারের প্রয়োগকৌশল, আধুনিক ধারায় অভিনয় সজ্জা, দৃশ্যপট সমস্ত যেন এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন সকল গুণীই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের এই অভিনয় বার বার রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর ভবনে "ফাল্গুনী ও ডাকঘর" নাটক অভিনীত হয়েছিল ১৩২২ ও ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে। বিদগ্ধ রসিকজনরা সেখানে গিয়ে উচ্চতত্ত্বধ্বনের অভিনয়, দৃশ্যশয্যা, নূতন সুর আর ভাষা, চরিত্র, নূতন ভঙ্গী আর মঞ্চকলার অপূর্ব সমন্বয় দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন। তাঁরা ঠাকুরবাড়ীতে অনুভব করেছিলেন অতীতের নাগপাশমুক্ত নবযুগের হৃদয়-স্পন্দন। রবীন্দ্রনাথ নাট্য সাহিত্যের নূতন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু সেটা যে প্রাধান্য রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধ্যমে এসে রঙ্গজগৎ তোলপাড় করবে, "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" দেখে এটা কেউই অনুভব করতে পারেন নি। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথ দ্বারা কতখানি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন সেটা বলা শক্ত। কিন্তু এটা কেউই অস্বীকার করতে পারেননি যে, তাঁর অভিনয়-ধারাপদ্ধতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগনৈপুণ্যের প্রভাব বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এও সম্ভব যে, দুই সত্যিকার অসাধারণ প্রতিভার দৃষ্টি, অনুভূতি দুইটি সরল রেখার মত সমান্তরালে থেকেও একই দিকে অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

গোড়াতেই বলেছি, শিশিরকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গোঁড়া ভক্ত। কবি সত্যেন দত্তর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে একটি দীর্ঘ শোক-কবিতা রচনা করে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে অপূর্ব কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন রামমোহন লাইব্রেরীর হলে। সেখানে হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে শিশিরকুমারও

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিলেন। শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির পর এতই অভিভূত আর বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তিনি বাইরে এসে ধাবমান একটি মোটর গাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের বললেন, "দেখ, আমি এখনি এই মোটর গাড়ীর তলায় পড়ে আত্মহত্যা করতে পারি"। সকলে বলে উঠেছিলেন—"সে কি, শিশির, তুমি কোন্ দুঃখে আত্মহত্যা করতে যাবে?" শিশিরকুমার বলেছিলেন—"দুঃখে নয় ভাই, আনন্দের আতিশয্যে"—সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন-দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও শিশিরকুমারের ভক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর "সীতা", "শেষরক্ষা", "বিসর্জন", "তপতী" প্রভৃতি দেখে শিশিরকুমারকে "নাট্যাধিনায়ক" উপাধিতে ভূষিত করেন। যে শিশিরকুমার ভারত সরকারের "পদ্মভূষণ" তুচ্ছ জ্ঞান করে ফিরিয়ে দেন, তিনি কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া "নাট্যবিনায়ক" অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। শিশিরকুমার তখনও কলেজের ছাত্র। কলেজের এক অনুষ্ঠানে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয়ে 'কেদারের' ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই অভিনয় দেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এতই মুগ্ধ হ'ন যে, তিনি বলেন, "আমাদের বাড়ীতে অবনরা ছাড়া আর কারো পক্ষে এত সুন্দর অভিনয় করা সম্ভব হয় নি। এক সময়ে আমি এই ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছি। এখন আমি শিশিরকে ঈর্ষা করি।"

পরবর্তীকালে "সীতা" নাটক অভিনয় দেখে তিনি বলেছিলেন---"সীতা নাটকটি কিছুই নয়। শিশির-বাবুর অসাধারণ প্রতিভার জন্য ঐ নাটকটি 'সগৌরবে চলিতেছে'। শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর ঘরোয়া নাটকের স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, 'জোড়া-সাঁকোর হলঘরে ছেলেবেলায় অভিনয় হতে দেখি, তাতে পূজনীয় রবি কাকা ও জ্যোতি কাকারা অভিনয় করে বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের মনোরঞ্জন করতেন। রবি কাকা আপনার নিজেদের লোকজন নিয়ে ঘরোয়াভাবে নাটক লিখে তা অভিনয় করতে খুব ভালবাসতেন। বাইরের থিয়েটারে আমরা খুব কমই যেতুম। তবে রবি কাকার অনুমতি নিয়ে তাঁর কথামত শিশির ভাদুড়ীর অপূর্ব অভিনয় দেখে অজন্তার বেশ-ভূষা, স্থাপত্য এবং বাচনভঙ্গী, প্রয়োগ কৌশল সমস্তই আমাদের ঘরোয়া নাটকে রবি কাকার ধারাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল "রবি কাকার মত কি সুন্দর, স্বাভাবিক অভিনয় করলেন।" এতেই বোঝা যায় যে, ঠাকুরবাড়ীর ভাবধারা তথা নাট্যকলার ধারা শিশিরকুমারের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে।

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" শিশিরকুমার কর্তৃক অভিনীত হয়। এই সম্বন্ধে বেশ একটি যোগা-যোগ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের "গোড়ায় গলদ" স্টার থিয়েটার মঞ্চস্থ করেন, কিন্তু কোন কারণে তা চলে নি বা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি। রবীন্দ্র-নাথ শিশিরকুমারের স্মরণাপন্ন হলেন। শিশিরকুমার হাজির হলেন, সব শুনে বল্লেন, "আপনি গোড়ায় গলদ করে বসে আছেন এখন আমাকে শেষ রক্ষা করতে ডাকছেন।" রবীন্দ্রনাথের ভারী ভাল লাগল এবং শিশিরকুমারের মতামত ও উপদেশ নিয়ে অদলবদল করে "শেষ রক্ষা" নাম দিলেন। শিশিরকুমার বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে "আপনার ঐ নিমাই নাম চলবে না বৈষ্ণবী

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

ভাগবতীয়া নাম শুনে দর্শক সুস্থির হতে পারবে না। আপনি নিমাই-এর জায়গায় গদাই রাখুন।" যাঁরা অভিনয় দেখেছেন তাঁরাই দেখবেন যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের শেষ রক্ষা আর শিশিরকুমারের অভিনীত শেষ রক্ষার পার্থক্য। শেষ রক্ষা নাটকের চরিত্রলিপি এইরূপ ছিল---

চন্দর---শিশিরকুমার
বিনোদ---রবি রায় পরে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
গদাই---শৈলেন চৌধুরী
শিবচরণ---মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পরে অমলেন্দু লাহিড়ী
নিবারণ---যোগেশ চৌধুরী
ললিত---রাধিকানন্দ
ক্ষ্যান্তমণি---চারুশীলা
কমলমুখী---কৃষ্ণভামিনী
ইন্দুমতী---প্রভা পরে শ্রীমতী কঙ্কা

বিজ্ঞাপন এবং প্রচারপত্রেও অভিনবত্ব দেখা যায়।

নাট্যমন্দিরে একত্রে তিনটি বিবাহ—ললিতের সহিত কাদম্বরীর, গদাই-এর সহিত ইন্দুমতী এবং বিনোদের সহিত কমলমুখীর। কন্যা সম্প্রদান করবেন "চন্দ্রদা" কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের পৌরোহিত্যে। পাশের পরি-বর্তে নগদ টিকিট কিনিয়া দর্শন প্রার্থনীয়।

শেষ দৃশ্যে মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে 'থিয়েট্রিক্যাল ইণ্টিমেসীর' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিশিরকুমার এই শেষ রক্ষা নাটকে। বিবাহ বাসরে "পদ্য" ছাপিয়ে শিশির-কুমার নিজে নেমে এসে প্রেক্ষাগৃহে বিলি করতেন। "যাঁর অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভাল।" প্রথম প্রথম সামনের সারির দর্শকদের মিষ্টিমুখ করাতেন।" একসঙ্গে তিন তিনটি বিবাহ, একটু মিষ্টিমুখ করবেন না?" তারপর আবার বলতেন, "আপনারা গান ধরুন, আমার তো গাইবার গলা নেই বলে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রের গলায় যখন গান দেন "যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে"---তখন তো জানতেন না যে, শিশির এই চরিত্রটি অভিনয় করবে" এবং কাদম্বিনী ভূমিকার অভিনেত্রীকে দেখিয়ে বলতেন, "ভাববেন না যেন, এই গায়ের রং ঐ হতভাগা ললিতের জন্য এই ঘোর কাল রং পেণ্ট করতে হয়েছে;" আবার কোন কোন দিন বলতেন, যখন বড়বৌ ক্ষ্যান্তমণি তাঁকে মালা পরিয়ে দিতেন "দেখলেন তো, বুড়ো বয়সে আমারও একবার বিয়ে হয়ে গেল" ধরুন, ধরুন, গান ধরুন। রবীন্দ্রনাথ সামনের সোফায় বসে দাড়ি নেড়ে নেড়ে এবং হাসতে হাসতে অভিনয় উপভোগ করতেন আমরা নিজেরা দেখছি। রবীন্দ্রনাথ বলে-ছিলেন---"বড় অভিনেতা হতে হলে দুটি গুণ থাকা প্রয়োজন "জিনিয়ালিটি এবং ডাবলিং পার্সো-ন্যালিটি"। শিশিরবাবুর 'চন্দ্র'র ভূমিকায় এই দুটি গুণের অদ্ভুত পরিস্ফুটন হোত।

রবীন্দ্রনাথের **বিসর্জন আর এক**খানি সাফল্যমণ্ডিত **নাটক। 'রাজর্ষি'র** নাট্যরূপ। **সুললিত মধুর কণ্ঠে ছন্দ**কবিতায় গদ্যরাগে **আবৃত্তি** শিশিরকুমারের অপূর্ব **দান রঙ্গমঞ্চে। বিসর্জন** নাটকে শিশিরকুমার রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন। এ সম্বন্ধে তখনকার সিনেমাপত্র 'নবশক্তি'র সমালোচনা থেকেই বোঝা যাবে---

> নবশক্তি (১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)---'বিসর্জনে---রঘুপতি যেন একটা দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ, ব্রাহ্মণ্য তেজে গরীয়ান, লুপ্ত ব্রাহ্মণ্য গরিমা উদ্ধারে কুটচক্রী আবার আজন্মপালিত জয়সিংহের প্রতি নারীর মত কোমল স্নেহশীল। শিশিরকুমারের অভিনয়ে এর প্রত্যেকটি রস অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাণার সঙ্গে কথোপকথনকালে কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করে শিশিরকুমার কতখানি শ্লেষ, ঘৃণা, ক্রোধ যুগপৎ অভিব্যক্ত করেছেন ---যাঁরা বলেন অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক নয় তাঁদের প্রণিধান্যযোগ্য।'

কিছুদিন বাদে স্বয়ং শিশিরকুমার 'জয়সিংহের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। নবশক্তির সমালোচনা শিশিরকুমারের অননুকরণীয় কণ্ঠস্বর 'রাজরক্ত এনেচি---নিজে আমি করি নিবেদন' স্বরের বিচিত্র লীলার মধ্যে জয়সিংহের রূপ যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার তুলনা আমার অনতিসামান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজে পাই না।'

কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মুখে শুনেছি যে, শিশিরকুমার অভিনয়ের পূর্বে কখনও রবীন্দ্রনাথের অভিনীত রঘুপতি বা জয়সিংহ দেখেন নি। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত শিশিরকুমার কোন ছায়াছবি বা টকীজ বা অন্য কারো অভিনয় দেখেন নি। নিজে বলেছেন, 'যে দেখি না, এইজন্য পরোক্ষে হয়তো কোন ছাপ এসে যেতে পারে।'

অভিনয় দেখে **রবীন্দ্রনাথ বলে**ছিলেন, **'রঘুপতির ভূমিকায় শিশিরবাবু অন্তর্দ্বন্দ্বের চরম পরিস্ফুটন যা ফুটিয়েছেন, তা দর্শকদের কাছে এত মর্মস্পর্শী হয়েছে।'**

আবার শিশিরকুমার বলেছেন, **'সংলাপ সৃষ্টি** নাটকের ঘাত-**প্রতিঘাতে** এবং ভাব-ভাষার **এমন** সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার, সংযোগ **একমাত্র** রবীন্দ্রনাথেই **সম্ভব**। তাঁর **সংলাপের** এমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে---যা আমাদের দেশের কোন নাট্যকারের নেই, ফলে অভিনয় জমে ওঠে।'

১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে **অভিনীত হয় 'তপতী'**। নাট্যমন্দিরে প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ---

বিক্রমদেব---শিশিরকুমার
নরেশ---জীবন গাঙ্গুলী
রত্নেশ্বর---রবি রায়
দেবদত্ত---যোগেশ চৌধুরী
সুমিত্রা---প্রভা
বিপাশা---কঙ্কাবতী

'তপতী' নাটকে রবীন্দ্র-শিশির যোগাযোগ দেখেছি।

শিশিরকুমারের উপদেশ ও মত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক অদলবদল করলেন। শিশিরকুমার নিজেও লেখনী চালিয়ে পরিবর্জন, **পরিবর্ধন** এবং পরিমার্জন করলেন। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তা মেনে নিলেন। সেই 'তপতী' নাটকটির পাণ্ডুলিপি যা শিশিরকুমার নিজ হস্তে এবং রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অদলবদল করিয়েছেন দেখেছি তাঁর বরানগর বাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথের ও শিশিরকুমারের হস্তলিপি সহ তাঁর আলমারীতে রক্ষিত ছিল। তাঁর কাছে সেই 'তপতী' চেয়েছিলাম।

হেসে বললেন---"আমার মৃত্যুর পর---তার আগে নয়।'

জানি না পুস্তকটি আজ কোথায়। তপতী একটি বিরাট নাটক। রঙ্গমঞ্চে সচরাচর এত বড় নাটক দেখা যায় না। প্রায় একশো-জনের ওপর শিল্পী, সুলিখিত, সুচিন্তিত, দৃশ্যপট রুচিসম্মত সাজ**পোষাক এবং সর্বশেষে শিশিরকুমারের প্রযোজনার শক্তির** পরিচয় পেয়ে বাঙালী **মুগ্ধ হ'ল। শিল্পরসিক দর্শকরা** যথেষ্ট **প্রশংসা** করেছিলেন, এই নাটকটির অসাধারণ অভিনয়ে।

স্টার রঙ্গমঞ্চ যখন 'নব-নাট্যমন্দির' **তখন** 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩৬ **সালের** ডিসেম্বর মাসে। ভূমিকালিপি দেওয়া হল---

মধুসূদন---শিশিরকুমার
বিপ্রদাস---শৈলেন চৌধুরী
নবীন---কানু বন্দ্যোঃ
মতির মা---রাণীবালা
কুমু---কঙ্কাবতী

যখন যোগাযোগ নাটকের মহড়া চলছে, তখন একটা দৃশ্য লেখাবার প্রয়োজন হয় এবং সঙ্গীত তুলে আনবারও দরকার পড়ে। উত্তরপাড়ার রাজার বংশধর বিখ্যাত খেয়াল গায়ক শ্রীসত্যভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শিশিরকুমারের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শিশিরকুমার পাঠান।

শিশিরকুমারের ওপর রবীন্দ্রনাথের এতখানি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল যে তিনি তাঁদের বলেছিলেন---'ও, শিশির নিজে লিখে নিতে পারবে। আমার লেখার কোন প্রয়োজন নেই।'

শিশিরকুমার নিজে একটি দৃশ্য সংযোগ করেন, এতে রবীন্দ্রনাথ এতটুকুও বিরক্ত বোধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। শিশিরকুমার যথারীতি মঞ্চ ও দর্শকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে নট-নটীর পরিচয় করিয়ে দেন এবং ঝি'র ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন---'সত্যিই ঝি নয়। একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

খেলাধুলা

১৯৭০ সালের জুলে রিমে কাপ

শাবিত্র সমাদ্দার

গত ২০শে জুন তারিখের ফাইন্যাল খেলায় রেফারীর শেষ বাঁশীটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার অবসান ঘটল। চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য লড়াই হচ্ছিল ব্রেজিল ও ইতালীর মধ্যে। লড়াই আর একটি বিশেষ কারণে আকর্ষণীয়। আগেকার প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল ও ইতালী দু'দেশই মোট ২ বার করে প্রত্যেকে কাপটি বিজয় করেছিল; সুতরাং এবারের ফলাফলে যে জয়ী হবে সেই চিরকালের জন্য 'জুলে রিমে কাপ'টি পেয়ে যাবে। আলোচ্য প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ব্রেজিল আগুনের ফুলকির মত খেলে ৪-১ গোলে ইতালীকে হারিয়ে দিয়ে ঐ অপূর্ব সম্মানের অধিকারী হয়েছে।

জুলে রিমে কাপের জন্য মেক্সিকোর চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগ প্রতিযোগিতায় ১৬টি বাছাই দেশ ৪টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছে। তারপর প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ন দেশ কোয়ার্টার ফাইন্যাল-সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল এই রকম-ভাবে নক-আউট নিয়মে খেলেছে।

প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া দেশের সংখ্যা কিন্তু ১৬র চেয়ে ছিল অনেক বেশী। সেই হেতু কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও মেক্সিকো ছাড়া সেই সমস্ত দেশগুলোকে ১৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল এবং সেই ১৪টি গ্রুপের সেরা সেরা দলকেই অর্থাৎ লীগ চ্যাম্পিয়ন দলদেরই চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মেক্সিকো ও ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রমের কারণ হিসাবে বলা যায় যে, প্রতিযোগিতার নিয়মে আছে যে, বিগত জুলে রিমে কাপ বিজয়ী (যেমন: ১৯৬৬ সালের) এবং বিশ্ব ফুটবলের উদ্যোক্তা দেশকে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় খেলতে হবে না, সেই হেতু ঐ দুটি দেশ সরাসরি মেক্সিকোর চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

মেক্সিকো এবং ইংলাণ্ড বাদে অন্যান্য যে ১৪টি দল চূড়ান্ত লীগে খেলেছে—প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তাদের মধ্যে ইউরোপেরই ছিল মোট ৯টি দল।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে যা গুঞ্জন উঠেছিল, তার মূলে হিসাবে নাম উঠেছিল পঃ জার্মাণী ও ব্রেজিলের। দু দেশেরই ছিল ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। আর তাছাড়া ছিল ইতালী, তবে পূর্বোক্ত দু'দলের মত তার সম্ভাবনা অত ছিল না। কিন্তু সেমি-ফাইনালে ইতালী অতি নাটকীয়ভাবে পঃ জার্মাণীকে হারিয়ে দেয় এবং চূড়ান্ত পরিণতির অন্যতম অংশীদার হয়ে যায়। কিন্তু চূড়ান্ত খেলায় তারা ব্রেজিলের কাছে হেরে গিয়ে 'জুলে রিমে কাপ'টি চিরতরে পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

বিগত ৯টি প্রতিযোগিতায় 'জুলে রিমে কাপে'র বিজয়ীদের নাম লিখলে এইরকম হয় :—

ইতালী—২ বার

পঃ জার্মাণী—১ বার

ইংলাণ্ড—১ বার। এরা সকলেই ইউরোপের বিভাগে।

অপর দিকে—দঃ আমেরিকার পক্ষে।

উরুগুয়ে—২ বার।

ব্রেজিল—২ বার।

রাণার্স আপ হিসাবে ফলাফল এইরকম দাঁড়ায়।—

ইউরোপ থেকে—পঃ জার্মাণী—২ বার

হাঙ্গেরী —২ বার

সুইডেন —১ বার

চেকোশ্লোভাকিয়া —১ বার

এবং ইতালী —১ বার

অন্যদিকে দঃ আমেরিকার অন্তর্গত দেশগুলো এইরকম :—

আর্জেণ্টিনা—১ বার

ব্রেজিল—১ বার

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় ১৯৩০ সালে। প্রতি ৪র্থ বছরে প্রতিযোগিতার আসর বসে; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ২ বার অর্থাৎ ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। পরপর ২ বার জুলে রিমে কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে ইতালী (১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে) এবং ব্রেজিল (১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে); কিন্তু ব্রেজিল এই ১৯৭০ সালেও বিজয়ী হয়ে 'জুলে রিমে কাপ' চিরকালের জন্য নিয়ে নিয়েছে।

একই বছরে জুলে রিমে কাপ বিজয়ী এবং রাণার্স আপ হয়েছে ইউরোপ ৪ বার (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৫৪ ও ১৯৬৬ সালে) এবং দঃ আমেরিকা ২ বার (১৯৩০ ও ১৯৫০)।

প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে এ-পর্যন্ত দঃ আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত দেশ ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত দেশের বিপক্ষে খেলেছে ৩ বার (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে) এবং এই তিনবারই দঃ আমেরিকার ব্রেজিল ইউরোপের সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইতালীকে পরাজিত করে চিরতরে 'জুলে রিমে কাপ' নিয়েছে।

বিজয়ী ব্রেজিল দলের খেলোয়াড় পেলে 'জুলে রিমে' কাপ হাতে আনন্দে নৃত্য করছেন

'জুলে রিমে'র সমস্ত ফলাফল :—

বছর	স্থান	বিজয়ী	রাণার্স আপ
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেণ্টিনা
১৯৩৪	ইতালী	ইতালী	পঃ জার্মাণী
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালী	হাঙ্গেরী
১৯৫০	ব্রেজিল	উরুগুয়ে	ব্রেজিল
১৯৫৪	বার্ণে	পঃ জার্মাণী	হাঙ্গেরী
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রেজিল	সুইডেন
১৯৬২	চিলি	ব্রেজিল	চেকোশ্লোভাকিয়া
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	ইংল্যাণ্ড	পঃ জার্মাণী
১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রেজিল	ইতালী

বিশ্বকাপ, স্বদেশপ্রেম ও পেরু

আবার মেক্সিকো। দু' বছর আগে এই দেশেই অলিম্পিকের আসর বসেছিলো। সারা বিশ্বের দামী ও নামী খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীদের উপস্থিতি ঘটেছিল। বিভিন্ন দেশের বহুরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল এই শহরেই। আবার মেক্সিকো শহর মেতে উঠেছে। আজটেক ষ্টেডিয়ামের দিকে সবার দৃষ্টি ছিল। বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসেছিল সেখানে গত ৭ই জুন থেকে। রঙ-বেরঙের পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিলো পুরো ষ্টেডিয়ামটা।

ফুটবলের চন্দ্র-সূর্য থেকে শুরু করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলে বর্তমানে যাঁদের খ্যাতি, তাঁরা সকলেই হাজির হয়ে ষ্টেডিয়ামের শোভা বর্ধন করেছেন। আবার অনেক স্বল্পখ্যাত খেলোয়াড় এবারকার সারা বিশ্বের খেলা-পাগল জনসাধারণের চিত্তে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যোগদানকারী প্রতিটি দেশের এমন দু' একজন খেলোয়াড় আছেন, নানাবিধ প্রলোভনও তাঁদের দেখানো হয়েছে অপর টীমে যোগদানের জন্য, কিন্তু নিজস্ব টীম বা দল ছেড়ে যেতে তারা এখনও কেউ চান নি। অতীতের বহু রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন বিশ্ব রেকর্ডও তৈরি হয়েছে এই বিশ্বকাপের খেলায়। বহু খেলোয়াড় পুরস্কৃত হয়েছেন, গাড়ী, বাড়ী ও নগদ অর্থের দ্বারা। তারও চেয়ে বেশী পুরস্কৃত বা সম্মানীত হয়েছেন, ষ্টেডিয়ামে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ক্রীড়া-মোদীদের দ্বারা---দেশ, কাল, পাত্র ভুলে তাঁরা যাঁরা সেই সব হীরের টুকরো ছেলেদের সাদরে বরণ করেন। বিশ্বকাপ অর্জনের জন্য কি প্রাণপণ প্রচেষ্টা বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে এবারকার বিশ্ব-ফুটবলের আসর জমে উঠেছিল তার কারণ ব্রাজিল, ইতালী ও উরুগুয়ে ইতিপূর্বে দুইবার করে বিশ্বকাপ জিতেছে। সুতরাং তৃতীয়বার যে জিতবে রীতি অনুযায়ী জুলে রিমে কাপ সে-ই জিতবে। তাই খেলার প্রারম্ভে ষোলটি দেশের প্রত্যেকেই বলেছিল জুলে রিমে কাপ তারা জিতবে। আমি বর্তমান নিবন্ধে

ক্রীড়ারসিক

জুলে রিমে কাপ বা বিশ্ব-ফুটবলের ধারাবাহিক কোন সমালোচনা লিখতে বসিনি। পরবর্তী সংখ্যায় তা লেখার বাসনা রইল। বর্তমান এ রচনা বিশ্ব-ফুটবলের আসরে ভাগ্যবিড়ম্বিত পেরুকে নিয়ে।

মেক্সিকোর আজটেক ষ্টেডিয়ামের আকাশে লাল, সবুজ, সাদা বেলুনরা যখন ভেসে বেড়াচ্ছে, কয়েক শো খেলোয়াড় ও কোচ একত্রে গভীর আলোচনায় মগ্ন, নিজের দেশকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সকলেই যখন সচেষ্ট সেই আনন্দঘণ মুহূর্তে খবর বেতার যন্ত্রক মারফৎ ভেসে এল। আর ভয়ে কুঁকড়ে গেল কয়েকজন তরুণ। সব আনন্দ চোখের সামনে থেকে যেন ধুয়ে মুছে গেল। ভীতিবিহ্বল দুই চোখের দৃষ্টি চলে গেল সুদূর পেরুতে। যেখানে হঠাৎ অনুষ্ঠিত এক ভীষণতম ভূমিকম্পে হাজার হাজার পেরুভিয়ান প্রাণত্যাগ করেছে। কেউ বলেন পঞ্চাশ হাজার। কারো মতে প্রায় একলক্ষ মানুষের প্রাণ গেছে। আর গৃহহারা বা সর্বহারা হয়েছে আরো কয়েক লক্ষ মানুষ। এই চরম বিপর্যয়ের আগেই পেরুর ফুটবল দল মেক্সিকোতে এসে হাজির হয়েছেন বিশ্ব-ফুটবলের শেষ প্রতিযোগিতায় মোকাবিলা করার জন্য। দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল সেই সময়েই। মুষড়ে পড়লো সবাই। কে কার আপনজন' কোথায় হারাল কে জানে। প্রথমেই খেলা পড়ল বুলগেরিয়ার সঙ্গে। পেরুর কোচ ম্যানেজার সবাই চিন্তিত। খেলার

বিশ্বকাপ ফুটবল-এর ফাইন্যালে ব্রেজিল ও ইতালীর খেলার একটি দৃশ্য

স্বামীজী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

প্রশস্ত ললাটে তব জ্ঞান-সূর্য জ্বলে,
দীঘল নয়ন দুটি চন্দ্র-সুধা ঢালে ;
মাধুরী দীপ্ত তব দৃপ্ত ভঙ্গিমা,
প্রকাশিছে হৃদি মাঝে নব মহিমা।
হে প্রজ্ঞ, হে বীর, হে জ্যোতির্ময়,—
করুণায় ভরা দৃষ্টি তব,
হস্তে রয়েছে অভয়।

তুমি রামকৃষ্ণের দূত হয়ে বলে গেলে,
'বৃথা শিব খুঁজে মর, জীবেরে অবহেলে'।
বজ্র-কণ্ঠে বার বার দিয়েছ যে ডাক,
'দূর কর দুর্বলতা, জড়তা চলে যাক্—
মানব কল্যাণে নিজেরে কর দান,
তবে ত' জীবনে লভিবে ভগবান।'
পুঞ্জীভূত আঁধারে হে প্রজ্বলিত আলোকের শিখা,
দেখায়েছ মানবের শাশ্বত সত্যের পথরেখা।
সব অবসাদ দূর করি হে আচার্য বিবেকানন্দ,—
সবার জীবনে নিয়ে এস আজ বিবেক ও আনন্দ।

উপদেশ দেবেন কি? সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন কার কখন কি টেলিগ্রাম আসে। কল্পনা, পরিকল্পনা সবই যেন ওলট-পালট হয়ে যায়। দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে একসঙ্গে আবার দেখতে পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

তবু খেলার আগের মুহূর্তে খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুমে এলেন পেরুর আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী জেনারেল আর-ম্যাণ্ডো। নিজেদের খেলোয়াড়দের মনে বল দেবার জন্য দুঃখভারাক্রান্ত মনে, অথচ বেশ জোরালো গলায় বললেন, আমাদের দেশবাসী দুঃখ-দুর্দশায় বিপর্যস্ত প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে সর্বহারা, তবু তোমাদের মুখের দিকেই তারা তাকিয়ে আছে। তোমাদের জয়ে তাদের ম্লান মুখেও হাসি ফুটে উঠবে। চরম দুঃখকে কাটিয়ে ওঠার মনোবল তারা ফিরে পাবে। সেই মনে করে সবকিছু ভুলে জেতার মনোভাব নিয়েই খেলে যাও।

ফল ফললো আরম্যাণ্ডোর এই কথায়। খেলোয়াড়েরা এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা লাভ করলো। প্রতিলোম-কূপে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাঠে পা-দেওয়ার আগে, মাটিকে নমস্কার করে নিলে যেন স্বদেশে নিহত ভাই বোনদের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানালো। তার পর শুরু হল খেলা। ভুলে গেল যেন তারা সব কিছু। পেরু দলের শিক্ষক ডি ডির ধারণা পেরু জিতবে। কারণ দু' বছর ধরে ডি ডি যাকে 'কালো গোখরো সাপ' বলা হয়, তিনি দলকে সেইভাবেই তৈরি করেছেন। তিনিই বলেছেন, আমরা জিতবই। সত্যিই সেদিনকার খেলা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হয়। বুলগেরিয়ার প্রথম আক্রমণধারা ছিল খুব তীব্র। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পেরু দলের ম্যানেজার এসে স্মরণ করিয়ে দিলেন, দেশের নামে যে প্রতিজ্ঞা তাঁরা করেছেন তা পূর্ণ করতেই হবে। পেরু যেন নূতন উদ্দীপনা পেল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হল। সকলেরই যখন ধারণা পেরু হেরে যাবে, তখন সবিস্ময়ে মাঠশুদ্ধ সকলে দেখলে পেরুর লম্বা লেফ্‌ট আউট দূর থেকে জোরালো সট করে বুলগেরিয়ার গোলকীপারকে পরাস্ত করেছে। এই গোল হবার পরে সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, পেরু বুলগেরিয়াকে একেবারে পরাস্ত করে দিয়েছে, কোণঠাসা করে ফেলেছে। ৫৬ মিনিটের সময় পেরু দলের অধিনায়ক হেক্টার ৩০ গজ দূর থেকে ফ্রি কিক এত জোরে করেন যে, বুলগেরিয়ার গোলরক্ষক বল গোলে ঢুকে যাবার পর বল দেখতে পান। ২টি গোল শোধ হয়ে যাবার পর, বুলগেরিয়ার সমস্ত শক্তি ভেঙ্গে পড়লে, তারা পেরুর আক্রমণধারা রক্ষা করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এই সুযোগে পেরুর কুচিনাশ দলের তৃতীয় বা বিজয়সূচক গোল করেন। পেরু-দলকে শিখিয়েছেন, ব্রাজিলের ভূতপূর্ব বিশ্বকাপের খেলোয়াড় ডি ডি। পেরুর শেষ সময়ের তীব্র আক্রমণধারা সেদিন সকলকেই চমৎকৃত করেছে।

পেরু এর পরও দুটি খেলাতে জয়লাভ করেছে। বিশ্বকাপের খেলায় পেরু সবচেয়ে শক্তিশালী দল বলে মনে করার এখনই কোন কারণ নেই। তবু বিশ্ব-ফুটবলে ভাগ্যবিড়ম্বিত পেরু যে খেলা খেলেছে, তার প্রেরণা বোধ হয় স্বদেশের বিপর্যয়ে নিজেদের সবটুকু দেবার প্রেরণা। এ প্রেরণারই আর এক নাম স্বদেশপ্রেম।

কলা কাকলি

লুইভিল্ অরকেস্ট্রা

অরকেস্ট্রা---বহু বাদ্যযন্ত্রর সম্মিলিত অনুষ্ঠান---য়ুরোপীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য। আমেরিকায় এটি খুব জনপ্রিয়।

কেন্টাকী-র লুইভিল্ - এর অরকেস্ট্রা বিশ্বখ্যাত। এতে সম্প্রতি নবীন সুর লাগানো হয়েছে। এঁরা নতুন যে শৈলী আবিষ্কার করেছেন, তা কেবল প্রাচীনদেরই নয়, সদ্য-কন্‌সারট-গামী তরুণদেরও মুগ্ধ করেছে।

ত্রিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত লুইভিল্ অরকেস্ট্রা-র এখন (১৯৬৯-৭০) ত্রিত্রিশতম অধিবেশন চলছে। লুইভিল্ স্কুল অব্ ম্যুজিক্-এর ডীন রবার্ট্ হুইট্‌নী-র অনুপ্রাণিত নেতৃত্বে এঁরা স্থানীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছেন।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগীতের পাদপ্রদীপের আলোয় এঁরা আসেন ১৯৫৪-য় রেকরড ক'রে, সাহায্য মিলেছিল রকফেলার ফাউনডেশন্ থেকে, সে সাহায্য বর্ধিত হয় ১৯৫৯ পর্যন্ত। ঐ সময় লুইভিল্ অরকেস্ট্রা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি মিলছিল যখন রেকরড্-এর মাধ্যমে, সে সময় এই অরকেস্ট্রা-র স্থানীয় খ্যাতিও ক্রমবর্ধমান। ১৯৬০-এ কেন্টাকী জেনারেল অ্যাসেম্বলী প্রথম ঐ রাজ্যে অরকেস্ট্রা-র জন্য অর্থ বরাদ্দ করার পর থেকে এঁরা কেন্টাকী-র অন্যান্য শহরগুলোয় নিজেদের গুণপনা দেখিয়ে আসছেন। এঁরা বিদ্যালয়ের ক্ষুদে পড়ুয়া, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্র, এবং স্থানীয় ছোট ছোট দলের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন কন্‌সারট বেঁধেছেন।

তাছাড়া, কেন্টাকী অপেরা অ্যাসোসিয়েশন্ এবং লুইভিল্ সিভিক্ ব্যালে প্রোডাক্‌শন উপস্থিত করার সময় এঁরা পিট্ অরকেস্ট্রা দিয়ে দল দু'টিকে সাহায্য করেন। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের অনেকেই অন্যান্য দলে বাজান। কেবল তাই নয়, এই অরকেস্ট্রা-র অর্ধেকেরও বেশি সভ্য য়ুনিভারসিটি অব্ লুইভিল্ স্কুল অব্ ম্যুজিক্-এর শিক্ষক। তিনটে কাউন্টী আর দু'টো রাজ্যের শহুরে অঞ্চলেও এঁদের নিয়মিত সংগীত শিক্ষা দিতে ডাক পড়ে।

এতে কেবল প্রথম সারির কয়েকজন নিয়মিত মাইনে পান। অন্যান্যদের অনুষ্ঠান এবং রিহার্‌সাল্ হলেই তবে অর্থ লাভ ঘটে। অনেকেই এজন্য চিন্তিত---তাঁরা চান এটি পুরোপুরি প্রফেশ্যনাল্ হয়ে উঠুক। তবুও বলতে হয়, স্থানীয় অধিবাসীরা কয়েকজন মেক্‌সিকান, একজন কোরীয় এবং একজন নিগ্রোসমেত অত গুণী সংগীত-বিদ্ পাওয়ার ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবান। বিশেষজ্ঞদের মতে, এঁদের অন্তত অর্ধেক গুণী পরে বিরাট অরকেস্ট্রা-য় বাজানোর যোগ্যতা অর্জন করবেন।

ম্যুজিক্ ডিরেক্টর জরজ মেস্টার্-এর প্রভাবে এই অরকেস্ট্রা নতুন প্রাণশক্তি লাভ করেছে। মেক্সিকো-য় সম্ভাবনাময় রচয়িতাদের থেকে দেড়শ' রচনা নিয়ে রেকরড্ ক'রে নিজেদের রেকরড্ ক্লাব---ফারস্ট্ এডিশন্ রেকরড্‌স্---থেকে গ্রাহকদের পাঠান।

এরপর এঁরা নতুন, পূর্বে রেকরড্ না করা সংগীত রেকরড্ ক'রে সাম্প্রতিক সংগীতের স্ফূর্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব অবদান রাখেন।

নিজস্ব রেকরডিং কোম্পানী পৃথিবীতে একমাত্র এঁদেরই রয়েছে। এঁরা এখনও প্রতি বছর ছ'টি নতুন রেকরড্ বাজারে ছাড়েন। ১৯৬৯-এর শেষে এঁদের প্রকাশিত লংপ্লেয়িং রেকরড্ সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬-তে। ১১০জন রচয়িতার ২২০টি রচনা এতে স্থান পেয়েছে।

এঁদের গ্রাহক বিশ্বজোড়া---দূর প্রাচ্য থেকে পূর্ব য়ুরোপ পর্যন্ত, স্টক্‌হোম্ থেকে সান্‌তিয়াগো অবধি। এ থেকে মধ্য বিংশ শতকে নানা বৃত্তিজীবী মানুষের সাংগীতিক রুচি সম্পর্কে সুন্দর একটা ছবি মেলে।

লুইভিল

জাত তরুণ কন্ডাক্টর বাৎসরিক অন্যান্য আমেরিকান অর্কেস্ট্রা, টোকিও, ত্রিয়েস্ত এবং মেক্সিকো সিটি-র অর্কেস্ট্রা-ও পরিচালনা করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর অগ্রগমন অপ্রতিরোধ্য, তাঁকে পেয়ে লুইভিল অর্কেস্ট্রা গর্বিত।

মিশিগান-এর ডেট্রইট্ থেকে আনা ক্যালেন্ডার হেলেনা হিল্ডাগেক পেয়ে অনুরূপ প্রেসিডেন্ট বর্ষদিনের প্রথা সপ্তাহের মাঝামাঝি কন্সার্ট করা বন্ধ ক'রে সপ্তাহান্তিক কন্সার্ট করা মাত্র শ্রোতার সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে গেল। এছাড়াও 'দ্য ফিলহারমোনিক ব্রিজ'—আটজন গুণীর সমন্বয়ে নতুন দল খোলায় তা সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সমাদৃত হ'ল।

এঁদের 'নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি' মানুষের সামনে নব-নব সংগীত সম্ভাবনাকে উপস্থিত করেছে এবং করছে। আশা করা যায়, এঁরা ভবিষ্যতে নতুনতর সুরের মায়ায় শ্রোতাকে মুগ্ধ করবেন।

—তপন চৌধুরী

একক সংগীত আসরে শ্রীমতী নীলিমা সেন

সাঁত্রাগাছির সাংস্কৃতিকী আয়োজিত একক সংগীত অনুষ্ঠানে শ্রীমতী নীলিমা সেনের গাওয়া পনেরটির অধিক গানের মধ্যে যে নিবিষ্ট তন্ময়তা-পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল, মনে হয় এ ধরণের ঘরোয়া আসরের সুস্থ পরিবেশে তাঁর মত শিল্পীই একান্ত উপযোগী। হাজার শ্রোতার ভিড়ে শিল্পী নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একাকীত্বে প্রকাশ করার অবসর পান না। এদিক থেকে সাংস্কৃতিকীর প্রচেষ্টা সার্থক। শিল্পী সেদিন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিশেষ ছাঁদে যে ভাবে সংগীত পরিবেশন করলেন, তাতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। কোন আলোকোজ্জ্বল সভানুষ্ঠানে মনে হয় এই শিল্পীই নিজেকে এমন নিবিষ্ট করতে পারতেন না। গাওয়া গানের মধ্যে বিশেষ করে 'নীলাঞ্জন ছায়া', 'বাসন্তী' 'হে ভুবনমোহিনী', 'আজ যেমন কোরে গাইছে আকাশ' গানগুলি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন লেগেছে। মনে হয় শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডল শ্রীমতী সেনের ব্যক্তিত্ব উজ্জীবনের পক্ষে এতখানি সহায়ক হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের ব্যক্তিত্ব—যেটি তাঁর রচিত কথা ও সুরে বর্তমান—সেটি অত্যন্ত অনুরাগের সঙ্গে স্মরণে রেখেও শিল্পী তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পেরেছিলেন। এইখানেই তাঁর স্বকীয়তা।

গত ২০ ও ২১ জুন উল্টাডাঙ্গার 'ইউনাইটেড ক্লাব' তাদের প্রথম বার্ষিক

নাট্যলোক

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সংস্থার নিজস্ব প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষে দুইদিন নৃত্য, সংগীত ও তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ডঃ দিলীপ মালাকার ও অজাতশত্রু। এই দিনের সংগীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে মঞ্জুরী রায়, সুবীর কর, সৌরীন পাল ও সুবল চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডালিয়া সরকার, বন্যা দত্ত, কাজল পাল, মমতা পাল ও শিখা ঘোষের সমবেত নৃত্যও উপভোগ্য হয়েছিল। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' ও 'ডাকঘর' নাটক দুইটি মঞ্চস্থ হয়। 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটকে চন্দন বিশ্বাস ও শঙ্কর ঘোষ এবং 'ডাকঘর' নাটকে শিখা ঘোষ, শম্পা মুখোপাধ্যায়, সুবল পাল ও সুশীল পালের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, অমল পাল ও আরতি ভট্টাচার্য। 'হিমের রাতে ঐ গগনে' সংগীতের সঙ্গে দেবীকা পালের একক নৃত্যটি প্রশংসা লাভ করে। এরপর পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। তাতে অংশ নেন মলয় চক্রবর্তী, পরিমল পাল, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ সাহা, শ্যামাপদ সুর, দত্তা মুখোপাধ্যায় ও শিখা ঘোষ।

ইস্টার্ন রেলওয়ে প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত 'কণ্ঠহার' নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্তে দীপা হালদার ও গৌর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রঃ [illegible] বসাক

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য

বর্ধমান গত ৬ই জুন রাত্রি ৮টায় ফেডারেশন অফ মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার ৭ম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউশনে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির ভূমিকায় কৃষ্ণা রায়, মায়ের ভূমিকায় স্বপ্না সেনগুপ্তা ও অন্যান্য

মিকায় রিঙ্কু ভাদুড়ী, অরুণা দে, ণিমা হালদার, ও বনানী চৌধুরী -অভিনয় করেন। সংগীতাংশে সংগীত রিচালক নির্মলেন্দু বিশ্বাস, মীরা চৌধুরী ও কাজল বোস অকুণ্ঠিত শংসা অর্জন করেন। দক্ষিণ ভারতের তিথিবৃন্দ 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের চ্চ প্রশংসা করেন। শ্রীকাজল রায় মডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ এসো-সিয়েশনের পক্ষ থেকে শিল্পীদের অভিনন্দন জানান। সংস্থার সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী উদ্যোক্তাদের ও উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান।

নূপুর ডান্স একাডেমীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে নর্তকীর ভূমিকায় সীমা ভৌমিক

নূপুর ডান্স একাডেমির অনুষ্ঠান

৬ই জুন প্রখ্যাত নৃত্যশিক্ষায়তন নূপুর ডান্স একাডেমির তৃতীয় বার্ষিক উৎসব শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল। নৃত্যের আঙ্গিকে সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষকগণকে অভ্যর্থনা এক অপরূপ দৃশ্যে পরিণত হয়।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় শ্রীবারীন বসুর রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে। তবলায় সহ-যোগিতা করেন শ্রীসুশান্ত নন্দন। সেদিনকার সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল কত্থক নৃত্যের ক্রমবিকাশ। প্রাচীনকাল থেকে এই কত্থক নৃত্য নানান পৃষ্ঠপোষকতায় চলে আসছে, এর প্রাচীন ইতিহাসই বা কি, কোথা থেকে উৎপত্তি এবং কিভাবে নাটমন্দিরে দেব উৎসর্গীকৃত কন্যাদের আরতির পরিবর্তে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাঝে মানুষের ভোগলালসার সামগ্রীতে পরিণত হয়। কত্থক নৃত্যের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ পরিকল্পনা করে তাঁর ছাত্রীদের ফুটিয়ে তোলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী কুমারী বন্দনা সেন। কুমারী সেন দাবী করেন এই কত্থক নৃত্যের ক্রমবিকাশ ভারতবর্ষে প্রথম তাঁরই পরিকল্পনা।

একাডেমির ছাত্রীরা প্রত্যেকটি চরিত্র সুন্দরভাবে দর্শকদের মাঝে পরিবেশন করে। রাজনর্তকীর ভূমিকায় ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, ইতি ভট্টাচার্য, রত্না বড়ুয়া এবং দেবনর্তকীর ভূমিকায় প্রণতি ভট্টাচার্য ও তনিমা বিশ্বাস সকলের প্রশংসা অর্জন করে। তবলায় সহ-যোগিতা করেন শ্রীনিতাই বসু ও ওস্তাদ জুমাল খান।

৩ বছর ও ৭ বছরের শিশু-শিল্পীদের পরিবেশিত ভারতীয় লোক-নৃত্য দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। বিহারী লোকনৃত্যে চাষীর স্ত্রীর ভূমিকায় চার বছরের শিশুশিল্পী অপর্ণা চৌধুরী ও শর্মিষ্ঠা সাহা দর্শক-দের প্রচুর আনন্দ দেয়। গুজরাটি, ডাণ্ডিয়া, রাজস্থানী, সাঁওতালী নৃত্য-সুন্দর হয়। সেদিনের শেষ অনুষ্ঠান ছিল জটায়ু বধ, পরিচালনা করেন শ্রীকানাই মজুমদার।

জটায়ু বধের প্রত্যেকটি চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে একাডেমির ছাত্রীরা। ধীরা রায় (মন্থরা), স্বপ্না সাঁতরা (কৈকেয়ী), দেবল রায় (দশরথ) সুন্দর অভিনয় করে। সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীঅজিত নন্দী ও ধারাভাষ্যে শ্রীবাদল রায়।

মহানায়ক লেনিন

'মহানায়ক লেনিন' একাডেমি অব ফাইন আর্টস্ ভবনে শুক্রবার ১লা মে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। নাটকটি রচনা করেছেন অশোক সেন। সন্ধানীর প্রযোজিত এই নাটকটি একটি সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং নাটকের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন রাশিয়ার কলকাতাস্থ কনস্যুলেট জেনারেল ঝারকভ। একটি সার্থক নাটক এবং তা পরিচালনা করেছেন লেখক স্বয়ং। দুর্গাপদ সরকার গানগুলি সুন্দরভাবে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন প্রভাত-ভূষণ। বিনতা রায় একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর পারদর্শিতার কথা দর্শকদের মুখে মুখে। তাছাড়া সুখময় সেন, দীপ্তি চক্রবর্তী, শুভেন সরকার, শঙ্কর মিত্র, সোমনাথ জুতসি, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অশ্রুমুকুল সেনগুপ্ত, বিমল সরকার, দিলীপ দে, ব্রজেন মুখো-পাধ্যায়, প্রবোধভূষণ, অশোক সেন, ডঃ বিজয়ভূষণ, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং সবাই সুন্দর অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন। মঞ্চসজ্জায় কুন্তল মজুমদার ও আলোক-সম্পাতে অমিতাভ সেনগুপ্ত বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন।

LIFEBUOY

for health

লাইফবয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও

সেখানে

লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করার মত
অপূর্ব্ব আনন্দ আর কিছুতে পাবেন না।
যেমন সুস্থ সতেজ বোধ করবেন তেমনি
চমৎকার ঝরঝরে তাজা লাগবে। ভাল
সাবানের সব গুণতো লাইফবয়ে আছেই,
তার চেয়েও বেশী কি যেন আছে···

লাইফবয়

ধূলো ময়লার

রোগজীবাণু ধূয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

রাইফেল

সম্প্রতি ত্যাগরাজ হলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্মচারী সমিতি (গড়িয়াহাট শাখা) উৎপল দত্তের 'রাইফেল' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে প্রশংসার দাবী রাখেন কমল দাস, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, দুলাল আঢ্য, কল্যাণ রায়, অজিত নস্কর এবং গোপা মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা গুহ। নির্দেশনায় ছিলেন জ্যোছন দস্তিদার।

সাজাহান

ক্যারিট ম্যোরান রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা ষ্টার মঞ্চে অভিনয় করলেন ডি এল রায়ের 'সাজাহান'। বহু অভিনীত এ নাটকটি শিল্পীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় এবারও দর্শকের মন জয়ে সক্ষম হয়। কি দলগত, কি ব্যক্তিগত অভিনয়ে সর্বত্রই এঁরা সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীদের একক ও দলগত কয়েকটি মুহূর্ত রচনা সুন্দর ও সার্থক। ব্যক্তিগত অভিনয়ে অসিত মুখোপাধ্যায় (ঔরংজীব), মন্মথনাথ দত্ত (সাজাহান), ধনগোপাল ভট্টাচার্য (দারা), ...গাঙ্গুলী (যশোবন্ত সিংহ) দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া সবিতা মুখোপাধ্যায় (জাহানারা), ইন্দিরা দে (পিয়ারা), বারীন মুখোপাধ্যায় (দিলদার), সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সুজা), পরিতোষ বসু (মোরাদ) উল্লেখযোগ্য। নাট্য পরিচালনার কৃতিত্ব ...নাথ মুখোপাধ্যায়ের।

যা হচ্ছে তাই

সুকুমার ঘোষ রচিত 'যা হচ্ছে তাই' নাটকটি সম্প্রতি শিল্পশ্রীর সদস্যরা ...ড়িয়া মিতালী সংঘের ময়দানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন। শিল্পীদের মধ্যে পরিমল চক্রবর্তী, ইন্দ্রনাথ বসু, শিশির বক্সী, গোরা ঘোষ, বীরেন মজুমদার ও পার্থ চক্রবর্তী কৃতিত্বের দাবীদার। নবাগত ও তরুণ শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত এ নাটকে নির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারো ঘণ্টা

গঞ্জরণ সংস্থা সম্প্রতি গড়িয়া বিধান পল্লীতে কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' নাটকটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করলেন। সামগ্রিক অভিনয়-নৈপুণ্য, আলোকসম্পাত ও সুপরিচালনা নাটকটিকে সার্থক করে তোলে। বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ে সেদিন প্রশংসা পেলেন স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন মুখোপাধ্যায়, চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ সেনগুপ্ত, বিপুল গুহরায়, চিত্ত ভট্টাচার্য ও সন্তোষ দেবনাথ। অন্যান্য ভূমিকায় সুবিমল সাহা, দেবু ঘোষ, সমর ঘোষ ও দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় চলনসই। সবচেয়ে হতাশ করেছেন সন্ধ্যা চরিত্রে বীণা সেন। সঙ্গীতের সংযোজন সুষ্ঠু বলা যেতে পারে।

জে, কে. স্টীল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

জে, কে, ষ্টীল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যরা ২৭ ও ২৮ জুন শ্রীরামপুর রবীন্দ্র ভবনে তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রথমদিন রমেশ মেহতার হিন্দী নাটক 'ফয়সালা' ও দ্বিতীয়দিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহু অভিনীত 'সাজাহান' নাটক দুইটি মঞ্চস্থ হয়। 'ফয়সালা' নাটকে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন, বংশীধর দাস, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল সরকার, মালা ঘোষ ও কৃষ্ণা সরকার।

দ্বিতীয় দিনের নাটক 'সাজাহান' অপেক্ষাকৃত সুপ্রযোজিত। এই নাটকে 'সাজাহান' চরিত্রে সত্যগোপাল ঠাকুরতা ও 'দারা' চরিত্রে কার্তিক মান্নার অভিনয় ছিল সহজ ও সাবলীল। 'সুজা' চরিত্রে অজিত রায়চৌধুরী ও 'মোরাদ' চরিত্রে শান্তি দেবনাথের আরো অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল। সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোলেমান,' প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের 'মহম্মদ', অমর দেব-মল্লিকের 'যশোবন্ত সিংহ', দুলাল দের 'শায়েস্তা খাঁ', কনোজ চক্রবর্তীর 'দিলদার' ও কমল দাসের 'জিহন আলী' নিজ নিজ চরিত্রে উজ্জ্বল ছিলেন। অসিত সেনগুপ্ত 'ঔরংজীব' চরিত্রের চিরাচরিত ধারার বিপরীত অভিনয়ে দর্শকমনকে মুগ্ধ করেছেন। শিপ্রা সাহা 'জাহানারা' চরিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া জ্যোৎস্না নিয়োগীর 'পিয়ারা'। কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের 'নাদিরা' ও বেলা মিত্রের 'জহরৎ' প্রশংসা লাভ করে। নাটকটি পরিচালনা করেন শম্ভু চট্টোপাধ্যায়। দুইদিনের অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অজয় চৌধুরীর ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয়।

শিল্পী প্রশান্ত ভট্টাচার্য

বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই সঙ্গীত জগতে এসেছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। একাধারে গায়ক, গীতিকার, সুরকার ---একের ভেতর তিন গুণের সমাবেশ-সমৃদ্ধ একটি শিল্পী-জীবন। যা সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। সৃষ্টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল প্রশান্তর শিল্পী-জীবনের সুরু খুব ছোটবেলা থেকেই। সঙ্গীতানুরাগী পিতার অনুপ্রেরণায় পুরুলিয়ার প্রবীণ গাইয়ে ভোলা মাষ্টারের কাছে হয়েছিল ওঁর সঙ্গীতের হাতেখড়ি। এরপর

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার বিকাশ। যেখানে যে শিল্পীর গান শোনেন, সেই শিল্পীরই গান ভেসে ওঠে ওঁর কণ্ঠে ঠিক সেই শিল্পীর মতই। গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়তে এলেন প্রশান্ত। সুরের রাজ্যে মুক্তমন বইয়ের পাতায় বন্দী হতে চাইল না। পরীক্ষায় প্রথম হলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় নয়, আন্তঃ কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়। এইভাবে যেখানেই প্রতিযোগিতা সেখানেই প্রশান্ত এবং সাফল্য। ১৯৫৪ সালে সঙ্গীত জগতের আরও বৃহত্তর পরিধিকে জানবার জন্য প্রশান্ত অশান্ত সুর অনুসন্ধিৎসু শিল্পী-মন নিয়ে পাড়ি দিলেন বোম্বাই। ওখানে একদিকে হাফিজ আমেদ খাঁ সাহেবের কাছে তালিম লাভের সুযোগ, অপর দিকে বোম্বের আকাশ-বাণীর নিয়মিত শিল্পী-স্বীকৃতি দুইই লাভ হল প্রশান্তর। ক্রমে ফিল্মী দুনিয়ার গানের জগতে ওঁর প্রবেশ ঘটল। বেশ কয়েকটি ছবিতে কোরাস গান গাইলেন। একক কণ্ঠ দিলেন কয়েকটি তথ্যচিত্রে। দ্বৈতকণ্ঠে গান গাইলেন আশা ভোঁসলে, গীতা দত্ত প্রমুখ শিল্পী-দের সঙ্গে 'রাজনীতি', 'দেবদানব,' 'পহচান' প্রভৃতি ছায়াছবিতে। এরই মধ্যে বোম্বের ফাংসান মার্কেটে প্রশান্ত ভট্টাচার্যের বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। তালাত, রফির গান গেয়ে শ্রোতাদের মন তো মিললই, উপরন্তু মিলল তালাত, রফিরও। এইভাবে বেশ কয়েক বছর কাটবার পর ১৯৬০ সাল স্মরণীয় হয়ে এল শিল্পী প্রশান্তর জীবনে। এইচ এম ভি থেকে প্রথম রেকর্ড বেরুল নিজের সুরে। গায়ত্রী বোসেরও রেকর্ড হল প্রশান্ত ভট্টাচার্যের ট্রেণিংয়ে। সেই থেকে আজ অবধি প্রশান্ত গীতিকার রূপে লিখেছে অজস্র গান, সুরকাররূপে সেই গানের মালাকে সাজিয়েছেন নানান্ সুরেও। হিন্দুস্থান রেকর্ড থেকে ওঁর লেখা ও সুর দেওয়া গান 'আমি সোনার পাহাড়ে', 'অনেক কথাই আমার বলতে হবে', 'রাশি রাশি ফুল', 'নীল আকাশের তলে' তরুণ শিল্পী নিতাই গোস্বামীকে এনে দিয়েছে প্রচুর জন-প্রিয়তা। ওঁর কথা সুরের গান 'প্রেম একটি কবিতার নাম' গেয়ে নাম কিনেছেন উৎপলা মুখার্জীও। শুধুমাত্র রেকর্ডের জগতেই নয়, যাত্রা জগতেও প্রশান্তর সুরের জয়যাত্রা ঘোষিত আজ। উৎপল দত্ত পরিচালিত 'জালিয়ান-ওয়ালাবাগে'র অভূতপূর্ব সঙ্গীত-সাফল্যে। এ ছাড়া 'আগুন নিয়ে খেলা', 'শোনরে মালিক', 'রাইফেল', 'রাজাবাবু' তো আছেই। আকাশবাণী কলকাতার নির্বাচিত শিল্পী ও গীতিকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য'র বাংলায় প্রথম কণ্ঠদান 'বনজ্যোৎস্না' ছবিতে।

বাংলা ছায়াছবি

রূপসী

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত রূপসীর চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়ে গেছে। এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। প্রখ্যাত সুরকার অনিল বাগচী বহুদিন পরে এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ, আর সি, প্রডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি 'রূপসী'র বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন : সন্ধ্যা রায়, শমিত ভঞ্জ, কালী ব্যানার্জী, অনুভা ঘোষ, রবি ঘোষ, জহর রায়, সুতপা চক্রবর্তী, তুই ব্যানার্জী, চিন্ময় রায়, মণি শ্রীমানী, চুমকী, হরিধন মুখার্জী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও 'গুপী গায়েন' খ্যাত তপেন চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য, রূপসীর চিত্রগ্রহণ বেশীর ভাগই স্টুডিও চত্বরের বাইরে হয়েছে। বীরভূম জেলার বহু দৃশ্য এই ছবিতে দেখা যাবে। গ্রামের, বিশেষ করে চাষীদের সুখ-দুঃখের কাহিনীই এই চিত্রের প্রধান উপজীব্য বিষয়। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত এই ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এন, এ, ফিল্মস।

দুর্জয়া দেবী—একটি বিশেষ মুহূর্তে
চিত্র : বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

মহাকবি কৃত্তিবাস

মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির তালিকায় যে কটি নাম আছে, মহাকবি কৃত্তিবাস তাদের মধ্যে অন্যতম। কৃত্তিবাসের নাম কারুরই আজ অজানা নয়। আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ রামায়ণের রচয়িতা হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেই মহান কবির জীবনালেখ্য চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার সঙ্কল্প নিয়েছেন রামায়ণ চিত্রম্। অর্ধেন্দু চ্যাটার্জীর সম্পাদনায় ও শ্রীবিজন ঘোষদস্তিদারের সুরসমৃদ্ধ এই ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন : মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আরতি মুখার্জী, চন্দ্রানী মুখার্জী, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, মাধবী বুয় প্রমুখ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন : অসীমকুমার, বিজি চক্রবর্তী, সুব্রত মুখার্জী, পদ্মা দেবী গোপীকিরণ, তরুণকুমার, কল্যাণ মণ্ডল, গীতা প্রধান, রবীন ব্যানার্জী সুমিত্রা মিত্র, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী ভোলানাথ ব্যানার্জী, পশুপতি কুণ্ডু,

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'প্রতিদান' চিত্রে সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার ও সুখেন দাস

মান্না দে, আরতি মুখার্জী, রুবী ব্যানার্জী ও পরিচালক স্বয়ং। জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমারকে ছবিটিতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। নায়িকার ভূমিকায় আছেন নবাগতা সুপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন, অসিতবরণ, ছায়া দেবী, রবীন ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, সুখেন দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, আনন্দ মুখার্জী, এন বিশ্বনাথন ও মিহির ভট্টাচার্য প্রমুখ। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে দিলীপরঞ্জন মুখার্জী, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ও প্রসাদ মিত্র।

ভবরূপ ভট্টাচার্য। পরিচালনায় আছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়।

মর্জিনা-আবদাল্লা

আলিবাবার কাহিনী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই আনন্দ দিয়ে আসছে। তারই কাহিনী অবলম্বনে রচিত মর্জিনা-আবদাল্লার চিত্ররূপ দিচ্ছেন আলোকচিত্র শিল্পী ও পরিচালক দীনেন গুপ্ত। প্রবীণ ও খ্যাতনামা নাট্যকার মন্মথ রায় এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। এ ছবির বিশিষ্ট একটি চরিত্রে রূপদান করছেন : উত্তমকুমার। অপরাপর চরিত্রে আছেন : অপর্ণা সেন, কাজল গুপ্ত, রবি ঘোষ, শমিত ভঞ্জ ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ হবে সঙ্গীত যার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল চৌধুরী।

দুটি মন

'এ' সার্টিফিকেটে চিহ্নিত ও বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত 'দুটি মন' ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করছে। নতুন আঙ্গিকে রচিত এ কাহিনীর পরিচালনায় আছেন পীযূষ বসু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ছবিতে আকর্ষণীয় কয়েকখানি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন

"নব রাগ" চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা সেন চিত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়

এখনই

'এখনই' চিত্রের আর এক প্রস্থ কাজ (আউট ডোরে) সম্পন্ন হয়ে গেল। আশা করা যাচ্ছে, দু' এক মাসের মধ্যেই বইটির কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর প্রধান কয়েকটি চিত্রে রূপ দিয়েছেন, স্বরূপ দত্ত (অরুণ), মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (রুণু), দিলীপ বসু (টিকলু) ও অপর্ণা সেন (উমি),। এ ছাড়া মৃণাল মুখোপাধ্যায় যুঁই বন্দোপাধ্যায়, ভাস্কর চৌধুরী প্রমুখ অভিনেতারাও আছেন। চিত্রটির পরিচালনায় আছেন তপন সিন্‌হা।

তরুণ অপেরা

গত ২০-এ জুন মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরার বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পালা 'হিটলার' বহুসংখ্যক দর্শকের সম্মুখে মুন্সিয়ানার সঙ্গে অভিনীত হয়। "হিটলার" দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে বলেই মনে হয়। এবং পালাটি দর্শকদের বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে। 'হিটলারের' ভূমিকায় অভিনয় করেন, যাত্রাজগতের স্বনামধন্য শিল্পী শান্তিগোপাল। গত কয়েকদিন পূর্বে বিশ্বরূপায় তরুণ অপেরা তাঁদের আর একটি বহু-অভিনন্দিত পালা 'লেনিন'-এর যাত্রাভিনয় মঞ্চস্থ করেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। লেনিন চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেছেন শান্তিগোপাল। 'হিটলার' ও 'লেনিন'। যাত্রা পালাটিতে সহযোগিতা করেছেন তরুণ অপেরার খ্যাতনামা শিল্পীরা।

মাধবী নাট্য কোম্পানী

মাধবী নাট্য কোম্পানী এবার তাঁদের যে দুটি পালা মঞ্চস্থ করতে চলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'হেড মাষ্টার' ও কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মার্ডার'। উক্ত পালা দুটিতে অংশগ্রহণ করবেন মাধবী নাট্য কোম্পানীর প্রখ্যাত শিল্পীরা। পালা দু'টি যে দর্শকদের আনন্দ দেবে তা বলাই বাহুল্য।

আর ডি বনশাল প্রযোজিত 'চৈতালী' চিত্রের নায়ক বিশ্বজিৎ ও নায়িকা তনুজা

যাত্রা সমাচার

শিল্পী-সম্বর্দ্ধনা

গত ৩রা জুন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আয়োজিত নাট্য ভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টির 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' পালার নাট্যকার নরেশ চক্রবর্তী ও বিনয় - বাদল - দীনেশ যাত্রা পার্টির পরিচালক পঞ্চু সেনকে সম্বর্ধিত করা হয়, এবং উক্ত অনুষ্ঠানে বিনয় - বাদল - দীনেশ'-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

ভারতী অপেরা

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে বিখ্যাত পালা, 'মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। নামভূমিকায় অভিনয় করেন সুশিল্পী সুজিত পাঠক। পালাটি পরিচালনা করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

ভূপেন রায় পরিচালিত "শচীমার সংসার" চিত্রে কল্যাণী মন্ডল ও মিতা কর

পরিচালক আকিরা কুরোশওয়া

আকিরা কুরোশওয়া পরিচালিত চিত্রের একটি দৃশ্যে জনৈকা নর্তকী

আকিরা কুরোশওয়া সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে বা তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে এশিয়ার অন্যতম শিল্পসমৃদ্ধ দেশ জাপান সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। জাপানের অন্যান্য পাঁচটি শিল্পের মত চলচ্চিত্র শিল্পও অন্যতম। ১৮৯৯ সাল থেকে বলা চলে জাপান এই শিল্পের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। ঐ বছরই সে তার প্রথম কাহিনী-চিত্র দর্শকদের উপহার দেয়। ১৯০৪ সালে জাপানে প্রথম চিত্র-নির্মাণ কারখানা, অর্থাৎ ষ্টুডিও তৈরি হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র দুনিয়ার সঙ্গে জাপানের যোগসূত্র গঠিত হয়। খুব দ্রুততালে এই শিল্পের প্রসারলাভ ঘটে। '৪৫ থেকে '৫৮ সাল, এই বার বছরের ব্যবধানে জাপানে ছবিঘরের সংখ্যা ৮৪৫ থেকে ৬০০০-এ বৃদ্ধি পায়। এক লক্ষ মার্ক খরচ করেও সে দেশে ছবি তৈরি হয়েছে। বছরে ছবি তৈরির সংখ্যাও সেখানে কম নয়। প্রায় ৭০০-র মত। স্বাধীনভাবেও ছবি যেমন অনেকে প্রযোজনা করেন, কয়েকটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও ছবি নির্মাণ করে থাকেন। কিন্তু সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান পরিচালকরা কোনদিন বাঁধা নিয়ম বা গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের ধরে রাখেন না। তাঁরা সব সময়ই স্বাধীন-ভাবে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে থাকেন তাঁদের সৃষ্ট শিল্পের মাধ্যমে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার আঙ্গিকে চিত্রকে সর্বজনীন করে তোলেন।

জাপানের কুরোশওয়া সেই জাতের পরিচালক। আজকের জাপানী ছবি নিজের দেশের সীমানা ছাড়িয়ে যে প্রতিবেশী দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে, তার কারণ কুরোশওয়া। শুধু পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে নিজের দেশের পরিচয়ই তিনি শুধু ঘটালেন না, বিদেশের মাটিতে নিজের দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করলেন তিনি।

আজকের এই সম্মানীয় মানুষটির ফিল্মে যোগদান খুব আকস্মিক-ভাবেই ঘটেছিল। তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর। ছবি আঁকতেন এবং জীবনে অনেক সংগ্রাম করে অর্থ উপার্জন করতেন। সেটা ছিল ১৯৩৭ সাল। ১৯৬২ সালে 'শো বিজনেস ইলাস্ট্রেটেডের জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই একথা ব্যক্ত করেছেন। একদিন সংবাদ-পত্রের পাতায় তিনি একটি বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলেন, পি সি এল---যা পরে তোজো ষ্টুডিও নামে খ্যাতিলাভ করে, তাঁদের একজন সহকারী পরিচালকের প্রয়োজন। এর জন্যে তাঁরা একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ছিলেন যার বিষয়বস্তু ছিল 'জাপানী ছবির মৌলিক দুর্বলতা ও তা দূরীভূত করার উপর বিশ্লেষণ।'

উত্তরে কুরোশওয়া লিখেছিলেন, দুর্বলতা যদি মৌলিক হয় তা হলে তা দূর করা সম্ভব নয়, এও লিখেছিলেন, দুর্বলতা যদি মৌলিক হয় তাহলে তা দূর করা সম্ভব নয়। তিনি এও লিখেছিলেন, চলচ্চিত্র সব সময়ই উচ্চমানের হওয়া উচিত। তারপর একদিন আশ্চর্যের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, পিয়ন এসে একটা খাম তাঁর হাতে দিয়ে গেল। খুলে দেখেন, কর্তৃপক্ষ এ পদটির জন্য তাঁকেই মনোনীত করেছেন। অতএব কুরোশওয়া যোগ দিলেন ঐ চাকুরীতেই। কিন্তু দুঃখ করতে লাগলেন ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যাবে বলে।

যা হোকই চাকুরীতে যোগ দিলেন কুরোশওয়া এবং দু-তিন মাসের মধ্যে পুনরায় নিজের কাজে ফিরে আসাটাও স্থির করে রাখলেন। কিন্তু ছবির রাজ্যে প্রবেশ করে কুরোশওয়া দেখলেন, ফিল্মেই তাঁর জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছুবার একমাত্র মাধ্যম। ঐ সময়ে জাপানী ফিল্মে কাজিরো ইয়ামামটোর একচ্ছত্র আধিপত্য। কুরোশওয়া তাঁরই সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হলেন এবং অন্যান্য পরিচালকের কর্মপদ্ধতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতে লাগলেন। জাপানে একজন

প্রথম শ্রেণীর পরিচালক হতে গেলে যে সব জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক তা হচ্ছে---এই শিল্প সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, নিজে চিত্রনাট্য তৈরি করা এবং বিভিন্ন ধরনের ছবির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ইয়ামামটোর বিশ্বাস, মোশান পিকচার্স সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে প্রথম চিত্রনাট্যের ওপর বিশেষ দখল থাকা উচিত। সহকারী কুরোশওয়াও সেই আদর্শে বিশ্বাসী হলেন। কুরোশওয়া বললেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন অভিনেতাকে বিশেষ কোন চরিত্রের জন্য স্থির করছি চিত্রনাট্য ততক্ষণ পর্যন্ত লেখা আমার হয় না। পার্শ্ব চরিত্রের জন্য আমি ঠিক করি সেই সব অভিনেতাদের---যারা নিজেরা শুধু যথাযথ অভিনয়ই করবে না, মুখ্য চরিত্রগুলির অভিনয়েও সহায়তা করবে।

অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় জাপানী পরিচালকেরা অল্পবিস্তর একই পন্থা অবলম্বন করলেও আমেরিকা বা পাশ্চাত্য জগতে তাঁরা সফলতা লাভ করতে পারেন নি। কুরোশওয়ার মত দেশকালের উর্ধ্বেও ওঠে নি। আঙ্গিকগত দিক থেকে অন্যান্য খ্যাতিমান পরিচালকদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও জাপানের প্রধান ঐতিহ্যবাহী পরিচালক বলতে যাকে বোঝায় সেই ইয়াসুজিরো ওজু সারারাত্রি বসে লেখক কোগো নোডারের সঙ্গে ছবির জন্যে চিত্রনাট্য তৈরি করতেন। ওজু যদিও দু'বার কিনেমা জুমপো প্রাইজ লাভ করেছিলেন, তবু নিজের দেশের বাইরে ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই সঙ্কীর্ণতাবাদের জন্য তাঁদের শিল্পকর্ম তাই কোন সমাদরই বাইরে লাভ করতে পারে নি। অতি উগ্রতাও আর একটি কারণ। এ ছাড়াও ছিল প্লট-বিহীন চিত্র। যার ফলে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বিদেশীদের জাপানী সভ্যতা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না। জাপানের পারিবারিক জীবনের অন্তস্তলে প্রবেশ করে ওজু বিদেশী বা বিজাতীয় কোন রুচির সঙ্গে গাঁটছড়া বা কোনরকম সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টাকে পরিহার করতেন। তাঁর মত ছিল, 'দ্য এণ্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড অব নো ফারদার দ্যান দ্য আউট সাইড, অব দ্য হাউস।

পরিচালক মেনজি মিজোগুচি এঁদের চেয়ে আরো একধাপ এগিয়েছিলেন এবং আমেরিকায় যিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন 'উগেটসু' চিত্রের জন্য। কাহিনীর মধ্যে ছিল, মধ্যযুগীয় এক কর্মকার তার স্ত্রী ও এক সুন্দরী মায়াবী। মিজোগুচির আর দিন নেই। কুরোশওয়া লক্ষ্য করলেন: এরপর অতি অল্প পরিচালকই রইলেন, যাঁরা বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে অতীতের দিকে ফিরে তাকালেন। আধুনিক পরিচালকদের মধ্যে কুরোশওয়াকে তাই 'লিস্ট জাপানীজ' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

এরপর এল ১৯৫১ সাল। সুরু হল বিশ্বের দরবারে জাপানের জয়যাত্রা। বিশ্ববাসীর মনে প্রথম যে জাপানী ছবিটি বিশেষভাবে নাড়া দেয়, তার নাম 'রসোমন'। পরিচালক আকিরা কুরোশওয়া। ছবিটি ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসবে বিশ্বের বিদগ্ধ জনসমীপে প্রদর্শিত হয়ে 'গ্রাণ্ড প্রিক্স' প্রাইজটি শিরোধার্য করে। একটি চমকপ্রদ খুনের কাহিনী হল 'রসোমন।' রসোমন হচ্ছে একটা গেট। গ্রীষ্মের একটি দিনে কিয়েটো শহরে সেই গেটের ওপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। বৃষ্টির ঝাপটা এড়িয়ে তিনটি মানুষ কার্নিসের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

পরিচালক আকিরা কুরোশওয়া কর্মরত

জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এম, পাল নিবেদিত
এবং এস, এস, ফিল্মস
প্রযোজিত
দুটি মন

(সচিত্র কাহিনী)

****

…: বিজয় চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : পীযূষ বসু। সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পরিবেশনা : অপ্সরা ফিল্মস। অভিনয়াংশে : দ্বৈত ভূমিকায় উত্তমকুমার। সুপর্ণা সেন। কণিকা মজুমদার। অসিতবরণ। ছায়াদেবী। পদ্মাদেবী। নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুখেন দাস। শ্যামল ঘোষাল। এন বিশ্বনাথন। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। মাস্টার পার্থ প্রমুখ।

কাহিনীর সারাংশ : মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন জমিদার চন্দ্রকান্ত সঙ্গে, নিয়েছিলেন তিনি তাঁর পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে। মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় বিঘ্ন ঘটে নি কোন। বিঘ্ন ঘটল পুজো দিয়ে ফেরার পথে। যদি প্রায় এখন-তখন অবস্থা হলেও মন্দির থেকে ফেরার পথেই যে তাঁর প্রসব বেদনা উঠতে পারে, এমন আশা করেন নি চন্দ্রকান্ত স্বপ্নেও; কিন্তু তাই ঘটল সেই আশাতীত ঘটনাই। 'নিয়তি কে ন বাধ্যতে' বলেই বোধ হয় পথিমধ্যে কাতর হয়ে পড়লেন স্ত্রী এবং ফলে বাধ্য হয়েই জমিদার চন্দ্রকান্তকে আশ্রয় নিতে হল নিকটস্থ বাড়িতে। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করতে হল তাঁকে, যাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে কোন বিঘ্ন না হয়।

বাড়ির মালিক রমণীবাবু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং সঙ্গীতজ্ঞ। যত্নের কোন ত্রুটি করলেন না তিনি। যথাসময়েই সন্তান ভূমিষ্ঠ হল নিরাপদে এবং পিতৃমর্যাদা পেলেন চন্দ্রকান্ত; কিন্তু জমিদারী ফেলে এসেছেন তিনি, তাঁর পক্ষে তো সম্ভব নয় বাইরে থাকা। তাছাড়া যে আনন্দ পেয়েছেন তিনি, সে-আনন্দের শরীক হওয়ার অধিকার আছে জমিদার বাড়ির সকলেরই; সুতরাং তড়িঘড়ি তিনি নিজের জমিদারীতে ফিরে যাবার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হলেন। রমণীবাবুও তাঁকে এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন, এমন কি, সস্ত্রীক চন্দ্রকান্ত এবং তাঁদের নবজাত পুত্রকে কিছুদূর এগিয়েও দিয়ে এলেন তিনি। বাড়ি ফিরে এলেন রমণীবাবু এবং বাড়ি ফিরেই চরম এক বিস্ময়ের মুখোমুখি হলেন।---ভিতর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে নবজাত এক শিশুর কান্না। এও কি সম্ভব! তিনি নিজেই তো নবজাতক সমেত সস্ত্রীক জমিদার চন্দ্রকান্তকে এগিয়ে দিয়ে এসেছেন, তবে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে তাকালেন তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে ---কি এক অব্যক্ত আনন্দ-বেদনায় তাঁর স্থির অচঞ্চল দুটি গভীর কালো চোখ রমণীবাবুর মনের গভীরে এক আকুতি জানাচ্ছে যেন। সে-দৃষ্টির সামনে থেকে সরে এলেন রমণীবাবু।

কালের আবর্তনে এর পর কেটে গেল মিনিট-ঘণ্টা-দিন। সপ্তাহ-মাস-বছর। বছরের পর অনেকগুলি বছর। চন্দ্রকান্তর পুত্র রুদ্রকান্ত এখন আর শিশুটি নেই, বড়, অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। গ্রামের লেখাপড়া সাঙ্গ করে চলে এসেছে শহরে, তারপর শহরেই হয়েছে তার শিক্ষা সমাপন। পূর্ণ যুবক এখন রুদ্রকান্ত---রক্তে তার উদ্দাম চঞ্চলতার ঢেউ, মনে অফুরন্ত উদ্যম বড় অনেক বড় হওয়ার, চোখে স্বপ্ন মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশে ডানা মেলবার।---

এগিয়ে চলল রুদ্রকান্ত আপন পথে—বাবা-মায়ের সাহায্য ছাড়াই বড় হবে সে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। বিরাট

'দুটি মন' চিত্রের একটি আবেগঘন দৃশ্যে উত্তমকুমার ও কণিকা মজুমদার

ব্যবসায়ী হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়বে তার দিকে দিকে।

প্রথম দিকে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেল রুদ্রকান্ত, মোটামুটি সাফল্যও এল তার জীবনে, কিন্তু তাতে কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারল না সে। আরো চাই, আরো---।

এবার সে বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে একাই উদ্যোগী হল। কিন্তু টাকা, টাকা তো চাই। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে চাতুরির আশ্রয় নিল রুদ্রকান্ত---বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে বেনামে ওভারড্রাফটে টাকা তুলল সে। টাকা তোলার পিছনে চাতুরি থাকলেও মনে কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু রুদ্রকান্তের। সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল কোন রকমে একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই সে সমস্ত টাকা ফেরত দিয়ে দেবে নিজে থেকেই।

কিন্তু বিধি বাম। রুদ্রকান্ত সাফল্য লাভ করতে পারল না এবং সে-সফলতা আসতে পারল না তারই বন্ধুদের হীন জঘন্য চক্রান্তে। বড় হওয়ার নেশায় বন্ধুদের একপাশে সরিয়ে রেখে বড় এগিয়ে এসেছিল রুদ্রকান্ত, এ-অবহেলা এ-তাচ্ছিল্য সহ্য করা সম্ভব নয় বন্ধুদের পক্ষে। সহ্য করেও নি তারা, গোপনে গোপনে সুলুক সন্ধান করছিল তারা চূড়ান্ত আঘাত হেনে চরম প্রতিশোধ নেওয়ার।

তাদেরই চক্রান্তে এবং তাদেরই হাতের ক্রীড়নক হয়ে নীলিমা এল রুদ্রকান্তের জীবনে। এল রুদ্রকান্তের চোখে মায়া-কাজল বুলিয়ে তার সর্বনাশ করতে। কামনার ইন্ধনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করতে। কথায় আছে 'মুনিনাঞ্চ মতি-ভ্রমঃ'। সুতরাং রুদ্রকান্তও যে শেষ পর্যন্ত মায়াবিনীর মায়াজালে জড়িয়ে পড়বে। এতে আর বিচিত্র কি। কিন্তু কেউটে কালো রাত যতখানি সত্যি, সত্যি তো ততখানি সোনাঝরা দিনও। সুতরাং রুদ্রকান্তের জীবনের কালো রাতও কাটল এল উজ্জ্বল-উচ্ছল দিন। মোহমুক্তির পর চোখ মেলল রুদ্রকান্ত; কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে---চরম সর্বনাশের আর কিছুই
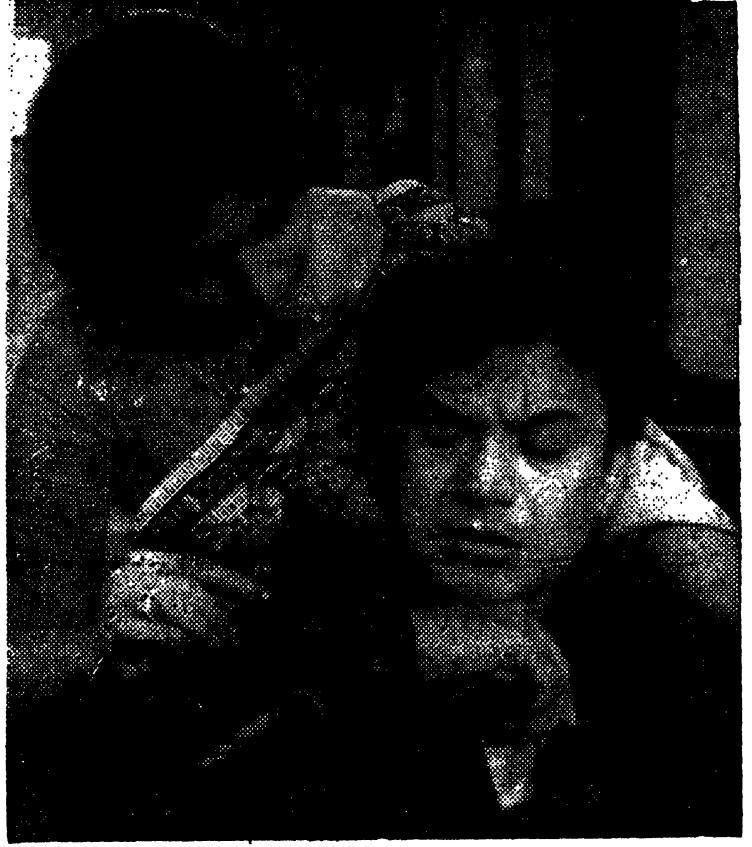
'দু'টি মন' চিত্রের একটি বিশেষ দৃশ্যে নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা সুপর্ণা সেন

বাকি নেই তার। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাল রুদ্রকান্ত এবং শেষ পর্যন্ত এক উত্তেজিত মুহূর্তে নীলিমা এবং তার চার বন্ধুকে নির্মম হত্যা করে ফেরার হল। হারিয়ে গেল আবার সেই কাজল কালো রাতের গভীরেই।

এবার চলুন ফিরে যাই সেই রমণীবাবুর বাড়িতে। রমণীবাবুর বাড়িতে অবশ্যই, কিন্তু আগের সেই সে-গ্রামে নয়, অন্য কোথায়---অন্য কোনখানে। হ্যাঁ, সন্তানের পরিচয় গোপন করার জন্যেই তাকে একদিন রাতের অন্ধকারে ছাড়তে হয়েছে পুরোনো গ্রাম, পরিচিত গ্রাম---চলে আসতে হয়েছে নতুন জায়গায়। এ ছাড়া উপায়ই বা ছিল কি---নিঃসন্তান দম্পতির ঘরে হঠাৎ শিশুর কান্না শুনে চমকে চেয়ে থমকে দাঁড়াবে পাড়ার সকলেই কৌতূহলী হয়ে---টীকা-টিপ্পনী কাটবে---তার চেয়ে এইই ভাল।

নাই বা রইল প্রাচুর্য রমণীবাবুর, কিন্তু ঘাটতি তো নেই তাঁর স্নেহ-প্রেম-ভালবাসায়। তাই সেই কোমল বৃত্তি-গুলোর মধ্যেই মানুষ হয়ে উঠল সেই সেদিনের নবজাত শিশুপুত্র---যে শিশু-পুত্রের অকস্মাৎ ক্রন্দনধ্বনিতে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি এবং বিচলিত হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। পালিত পিতার মতই সত্যনিষ্ঠ এবং সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠল সেই ছেলেটি। যে ছেলেটি আজ যুবক তাপস। মিষ্টি কথাবার্তা আর মধুর ব্যবহারে তাপস প্রিয়পাত্র সকলের।

সেই গ্রামেরই একটি মেয়ে, নাম তার সোমা। পড়াশোনা করে শহরের কলেজে, অথচ চলনে-বলনে, কথায়-বার্তায় লক্ষ্মীশ্রী মাখানো---আজকের আধুনিকতার ছোঁয়া-লাগা সমাজে যার নিতান্তই অভাব। যদিও ভাবতে অবাক লাগে যে সে আধুনিক কেতাদুরস্ত সমাজেরই মেয়ে, কারণ তার বাবা

যদিও রিটায়ার করেছেন তবুও তিনি সমাজের শিরোমণি জজ ছিলেন।

সঙ্গীতে প্রগাঢ় অনুরাগ সোমার এবং সেই সূত্রেই কাছে এসেছিল তাপসের তারপর কবে কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে সঙ্গীতের সুর হয়ে সে তাপসের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করেছিল তা সেও যেমন বুঝতে পারে নি বুঝতে পারে নি তাপসও। বুঝতে যখন ওরা পারল তখন আরো কাছাকাছি আসতে চাইল ওরা হতে চাইল আরো নিবিড়। বিয়ের প্রস্তাব গেল রিটায়ার্ড জজ সাহেবের কাছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধারণত যা ঘটে থাকে, এ ক্ষেত্রেও ঘটল না তার ব্যতিক্রম; নিষ্ঠুর, নির্মম প্রত্যাখ্যান করলেন জজসাহেব, জানালেন, তাপসের মত গরীব, নিস্ব ঘরের ছেলেকে তাঁর মেয়ের উপযুক্ত হতে হলে এখনও কয়েক জন্ম তপস্যা করতে হবে।

ভেঙে পড়ল তাপস আর তার দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়লেন সস্ত্রীক রমণীবাবুও। হোক না পালিত, তবুও তাঁরাই তো তাপসের পিতামাতা। এযাবৎকাল স্ত্রীর সানুনয় প্রার্থনায় তাপসের জন্ম-রহস্য গোপন রেখেছিলেন রমণীবাবু—কিন্তু আর পারলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা জমিদার চন্দ্রকান্তের কাছে গেলেন এবং কোন কিছু গোপন না করে সবিস্তারে জানালেন। এ কথা কিন্তু তাপস অথবা রুদ্রকান্ত কেউই ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না।

এদিকে ব্যর্থ তাপস একদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে বেরিয়ে পড়ল। ঘরকে ভুলতে চাইল পথকে সম্বল করে, সঙ্গীতকে অবলম্বন করে ভুলে যেতে চাইল সোমাকে।

ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় চলে এল তাপস। গানই তার পাথেয়, গানই তার অবলম্বন। গানের মধ্যেই সে হারিয়ে যেতে চাইল; কিন্তু গান তাকে হারিয়ে যেতে দিল না, গান তাকে তুলে আনল আবার সবার মাঝে, সভার মাঝে। তাপসের চূড়ান্ত খ্যাতিতে ভরে উঠল দিগ্বিদিক—ডাক এল রেডিও থেকে—রেডিও ছড়িয়ে দিতে চাইল তার গান দিক-দিগন্তে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রেডিওতেই গ্রেপ্তার হল তাপস, গ্রেপ্তার হল একাধিক নরহত্যা ও জালিয়াতির অপরাধে।

●

ওদিকে সেই পলাতক রুদ্রকান্ত ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পৌঁছাল সেই তাপসদের গ্রামে। রমণীবাবু এবং তাঁর স্ত্রী রুদ্রকান্তকে তাপস ভেবে কাছে টেনে নিলেন এবং এমন কি, সোমাও ছুটে এল তার কাছে। রুদ্রকান্ত বিভ্রান্ত। সে তো তাপস নয়। তবে? বিভ্রান্ত তাপসও। সে তো খুনী নয়। তবে? কিন্তু তারপর? তার পরের ঘটনা কি? পরের ঘটনা দেখতে পাবেন রূপালী পর্দায়।

—আশীষ চট্টোপাধ্যায়

দীপা চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে
চিত্র ঃ ..তেশ ..দ্যোপাধ্যায়

'দু'টি মন' চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে উত্তমকুমার ও কণিকা মজুমদার

মারিয়া কালাস—এক প্রতিভা

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিসরে সমগ্র রসিক-সমাজে কলাজগতের যে দিক্‌পাল তারকাদের নাম এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, মারিয়া কালাস সেই নামমালার একটি উজ্জ্বল নাম। জগতের প্রতিভাময়ী শিল্পি-মার্গে তিনি এক দীপ্তিময়ী নক্ষত্র। ঈশ্বর দত্ত রূপলাবণ্য এবং অনন্য-সাধারণ প্রতিভা—এই দু'য়ের সমন্বয়ে—জনচিত্তের একটি দৃঢ়ভিত্তিক অটল আসন অর্জনে তাঁকে সমর্থ করে তুলেছে। শিল্পক্ষেত্রে উৎকর্ষে এ-কালে যাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে, মারিয়া তাঁদেরই অন্যতমা।

পুরো নাম মারিয়া অ্যানা সোফিয়া সিসিলিয়া কালোগেরো পৌলো। এ যুগের শীর্ষস্থানীয়া সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে 'প্রাইমা ডোনা অ্যাসোলুটা' খ্যাতির তিনি অবিসম্বাদিত অধিকারিণী। শুধু 'মারিয়া কালাস' নামেই তিনি জগৎ-প্রসিদ্ধা। ১৯২৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর মারিয়ার জন্ম নিউ ইয়র্কে। বাল্যজীবন কেটেছে যথেষ্ট প্রতিকূল পরিবেশে। বাল্যজীবনের স্মৃতি আজও তাঁর মনকে বিষাদে সমাচ্ছন্ন করে তোলে কোন কোন সময়ে। স্কুলের পড়া তাঁর কোনদিনই ভাল লাগত না, বরং বিদ্যালয় জীবন তাঁর বালিকাচিত্তকে বরাবরই বিরূপ করে তুলত। নিউ ইয়র্ক তাঁর জন্মস্থান হলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস গ্রীস। তাঁর জন্মের চার মাস পূর্বে তাঁদের পরিবার নিউ ইয়র্কে বসবাস সুরু করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে এই পরিবার এথেন্সে ফিরে আসার পর তাঁর প্রকৃত সঙ্গীত সাধনা সুরু হয়। ন্যাশনাল কনসার্ভেটরির স্কলারশিপ তিনি লাভ করলেন। ১৯৪২ সালে তাঁর সাধারণ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ। এথেন্সের অপেরায় উনিশ বছরের তরুণী সাধারণ্যে তাঁর নৈপুণ্য প্রথম প্রদর্শন করেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর তিনি আবার চলে আসেন নিউ ইয়র্কে এবং গভীরভাবে সঙ্গীত সাধনায় রত হন। ১৯৪৭ সালে আসেন ইতালিতে এবং ভেরোনায় অবশেষে অনেক বাধাবিপত্তির পর গীতশিল্পী হিসাবে আপন দক্ষতা প্রমাণিত করার সুযোগ পান।

১৯৪৮ সালের শেষভাগে তাঁর প্রতিভা সাধারণ্যে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৩ সালে লণ্ডনে

মারিয়া কালাস

তিনি প্রথম সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন বেলিনির 'নর্মা'-য় নাম-ভূমিকায় অবতরণ করে।

জীবনের প্রথম পর্বে যে দু'জনের সহায়তা তাঁর কাছে অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং যাদের সক্রিয় সহযোগিতা তাঁর জীবনেতিহাসকে যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য দান করেছে—সেই দু'জন ভেরোনীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব মেনেগিনি ও ইতালীয় সুরকার টুলিও সেরাফিন। প্রথম জনের সঙ্গে ১৯৪৯ সালে ইনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

তাঁর বর্তমান প্রণয়জীবন এবং প্রেম নানাজনের নানা আলোচনার বিষয়ে আজ পরিণতিলাভ করেছে। বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর গভীর প্রেমে যিনি নিমগ্ন, তিনি সম্প্রতি আর এক বিশ্ববিখ্যাতা অল্পবয়স্কা বিধবার পাণিগ্রহণ করে পৃথিবীব্যাপী সংবাদে পরিণত। মারিয়ার সেই সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছেন, ধূলিসাৎ করেছেন শিল্পীর জীবন-কেন্দ্রিক সমস্ত কল্পনা। তিনি শ্রীমতী জ্যাকলিন কেনেডির বর্তমান স্বামী গ্রীক ধনকুবের এ্যারিস্টটল সক্রেটিস ওনাসিস।

—চিত্রসারথি

বিচিত্র বোম্বাই

ছবিতে তো আগেই হ'য়ে গেছে---এবার বাস্তব জীবনে প্রকৃত রসাস্বাদনের সুযোগ সমাগত। হ্যাঁ, মা হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুরের অচিরে। শর্মিলা ওরফে আয়েষা বেগম এই তো সেদিন পতৌদির নবাবের ঘরণী হ'য়েছেন। দেখতে দেখতে বছরের চাকা ঘুরে গেছে, আর কে না জানে কবির সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি (বিয়ে হ'লেই পুত্রকন্যা আসে যেন প্রবলবন্যা) কতো তাড়াতাড়ি ফলপ্রসূ হয়। কাজেই মা হওয়ার সময় তাঁর হয়ে গেছে অনেক আগেই।

আমার চোখে ভাসছে বছর এগারো আগেকার একটি আলো ঝলমল সন্ধ্যার ছবি। কলকাতার কোন এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত হয়েছে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সম্বর্ধনার আসর। 'অপুর সংসার' ছবিটির মুক্তি উপলক্ষেই ছিলো সে আয়োজন। ওই অতিথি-অভ্যাগতপরিপূর্ণ ডিনার পার্টিতে মা-বাবা, ছোট বোন টিঙ্কু ঠাকুরের ('কাবুলিওয়ালা' ছবির-'মিনি') সংগে আবির্ভূতা হয়েছিলেন রিঙ্কু ওরফে শর্মিলা। ওইটাই তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ। সে আসরে সবাই আমরা টিঙ্কুকে নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত থেকেছি। তারপর যতো দিন গেছে, শর্মিলার বিকশিত হওয়ার পালা চলছে। বাঙলা ছেড়ে বোম্বাই আবার বাঙলা---বছরের পর বছর চলেছে সাধনা এবং সিদ্ধিলাভের বর্ণরঞ্জিত কাহিনী তো সকলেরই নখ-দর্পণে। এবার শর্মিলার ব্যক্তিগত জীবনে চরম সার্থকতার লগ্ন। মা হওয়ার গর্বোদ্ধত দায়িত্ব। মনে অবিশ্যি রাখতে হবে মা হওয়া তো নয় মুখের কথা।

●

যথা বাঙলা তথা বোম্বাই-া-একই ব্যাপার চলে উভয়ত্র। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বাঙলা থাকে এগিয়ে। মনীষী বাক্য 'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস (এ ক্ষেত্রে ডাজ) টু-ডে'---মিথ্যে হবার নয়। ধরুন না কেন, বাঙলা অনেক ছবিরই গানের লাইন ভাঙিয়ে নামকরণ করা হয়েছে ইতিপূর্বে। এখন এ ঢেউ লেগেছে বোম্বাইয়ের মাটিতে। 'রঙ্গিলা রে' নামে ফ্লিম ফোক যে ছবিটি তুলছেন, যার নায়ক সঞ্জীবকুমার এবং নায়িকা হচ্ছেন ভিমি---সে ছবির ওই নাম এসেছে কোথা থেকে জানেন? 'প্রেম পূজারীর' একটি আকর্ষণীয় গান থেকে। 'প্রেম পূজারী' কলকাতার বিক্ষোভের জন্যে অল্প দিন দর্শন দিয়েই বিদায় নিয়েছিলো, তাই গানটা এখানে তেমন শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু ওখানে, মানে বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে নাকি ওটার কদর খুব। তা-ই যদি না হবে তাহ'লে ঝুপ করে কি ছবির নামের মাঝে নাক গলাতে পারে। এ ছবির পরিচালক বি আর নাইডু, সুরের লিখন লিখছেন শঙ্কর-জয়কিষণ জুটি।

সাধনা চিত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়

এদিকে দেখুন 'আরাধনা' ছবিটি বিশেষ একটি চিত্রগৃহে মৌরসীপাট্টা করে ফেলেছে। এক দশক থেকে

সায়রা বানু চিত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়

দু'দশকে উঠেছে প্রদর্শন-সপ্তাহের অঙ্ক। এতে লতা মুংগেশকর আর কিশোরকুমারের গাওয়া 'কোরা কাগজ হ্যায় এ মন মেরা' গানখানি ভাঙিয়ে ডি আর চোপড়া তাঁর আগামী ছবিটির নাম রেখেছেন 'কোরা কাগজ' দীবান মুভিজের পতাকাতলে নির্মীয়মাণ চিত্রটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সৎপাল। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ওঙ্কার সাহেব। বি আর ইশারা সংলাপ রচয়িতা। সুরের জাল বুনবেন এ ছবিতেও শঙ্কর-জয়কিষণ। রাজেশ খান্না নায়ক, নায়িকার রূপসজ্জায় দর্শন দেবেন জাহিদা।

●

একটুখানি ভরসা না নিয়ে ছবি করতে নামার মানেই হয় না। ভরসা হয় সব ফর্‌সা করে দেবে, নয় তো ফলে ফুলে ভরে ভরে যাবে। বাগান বাগিচা। বহু কাল আগেকার তোলা

সুনীল দত্ত চিত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়

সেই 'বাজী' ছবির গানটা মনে আছে 'আপনা পে ভরোসা হ্যায় তো দাঁও লাগা দে'। সত্যিই ভরসা নিজের ওপর থাকলে কখন যে দাঁও লেগে যাবে, কে বলতে পারে। পরিচালক মোহন সায়গলের সাম্প্রতিক উক্তিতেও এ হেন কথাই প্রতিধ্বনিত। শ্রীসায়গল তাঁর অতি আধুনিক ছবির নায়ক নির্বাচিত করেছেন ফিল্ম ইনস্টিট্যুটের স্নাতক নবীন নিশ্চলকে। নায়িকাও দক্ষিণী নবাগত রেখা। প্রধান দু'টি শিল্পীই তাঁর নতুন হওয়ায় তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়। আর তাইতেই তিনি বলেন, ভরসায় সুফলের কথা। ওঁরই নির্দেশে নবীন ফিল্ম ইনস্টিট্যুটের ট্রেনিং নিয়ে সাফল্যের সংগে ফিরে এসেছে (বলা দরকার ও—স্নাতক হ'য়েছে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে)। যাই হোক, শ্রীসায়গলের ছবির নাম : 'শাওন-ভাদো'। আশা করা যায় ছবিটি নতুন ধরনেরও হবে।

—রমেন চৌধুরী

সাগর পেরিয়ে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও মহিলাদের উপাধি ভূষিত করার যে প্রথা সুদীর্ঘকালব্যাপী ইংল্যাণ্ডে অব্যাহত ধারায় প্রচলিত, অভিনয় জগতের দিকপালেরাও সেই তালিকা বহির্ভূত নয়। ইংল্যাণ্ডের দেশবরেণ্য শিল্পিকুলের অনেকেই রাজোপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন। সাম্প্রতিক উপাধি ঘোষণায় শিল্প-জগতকে কেন্দ্র করে এক বিরাট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হ'ল। আজ পর্যন্ত নাইট-হুড পেয়েছেন বহু শিল্পী, কিন্তু পীয়ার শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য এভাবৎ কোন শিল্পীই অর্জন করতে পারেন নি। এবারে সেই নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটল। দেশের এক সেরা রূপস্রষ্টা এবার হাউস অফ লর্ডসে আসন পেলেন। সুদীর্ঘকালীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হাউস অফ লর্ডসের একটি মহামূল্য আসন এই প্রথম গেল একজন অভিনেতার অধিকারে। এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী স্যার লরেন্স অলিভিয়ার (৬৩)। বর্তমানে

এলিজাবেথ টেলর

তাঁকে ব্যারণ হিসাবে পীয়ার শ্রেণীভুক্ত করে করা হ'ল লর্ড অলিভিয়ার।

এই উপাধি বিতরণের তালিকায় শিল্পী-সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও যাঁদের নাম স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে অভিনেত্রী সমাজের অধিনেত্রীস্বরূপা ডেম সিবিল থর্ণডাইক (৮৮) এবং খ্যাতনামা অভিনেতা রিচার্ড বার্টন (৪৫) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেম সিবিল হলেন কম্প্যানিয়ান অফ অনার এবং বার্টন পেলেন সি, বি, ই।

●

পৃথিবীর মানবকল্যাণের ইতিহাসে মনস্বিনী হেলান কেলার (১৮৮০-১৯৬৭) একটি চিরস্মরণীয় নাম। মানবকল্যাণে তাঁর অসামান্য অবদান ইতিহাসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ ও মানবকল্যাণে উৎসর্গিত জীবনের

বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে 'মিরাক্যাল ওয়ার্কার' নামে যে ছায়াচিত্রটি রূপ পরিগ্রহ করেছিল সেই চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন প্যাটি ডিউক অর্থাৎ মহীয়সী কেলারের অবিস্মরণীয় চরিত্রটি রূপ দিয়েছিলেন প্যাটি এই চিত্রে তাঁর সার্থক অভিনয় এক অনন্যসাধারণ আলোড়ন এনেছিল সেদিন। এই চিত্রটিই তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অস্কার অর্জনে সমর্থা করেছিল। চব্বিশ বছর বয়স্কা প্যাটি সম্প্রতি ছাব্বিশ বছর বয়স্ক মাইকেল টেলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য চিত্রজগতে 'সেক্স কুইন' আখ্যাটি যাঁদের প্রতি সর্ববাদীসম্মতভাবে প্রয়োগ করা যায়, 'যৌনতার প্রতীক' হিসাবে যে অভিনেত্রীর দল আজ সারা বিশ্বে আলোড়ন এনেছেন - যাঁদের বিলোল কটাক্ষ ও যৌবনসম্ভার লক্ষ লক্ষ প্রাণে এক হিল্লোল বইয়ে দিয়েছে, জেন ফণ্ডা (৩৪) তাঁদেরই অন্যতমা। দিকপাল অভিনেতা হেনরি ফণ্ডার স্বনামধন্যা এই কন্যা সম্প্রতি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করতে সুরু করেছেন। তিনি দাবী করেছেন ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিণ বাহিনীর অপসারণ এবং আমেরিকাকে তার আদিম অধিবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যাবে জেনের মত একজন প্রতিভাময়ী যশস্বিনী শিল্পীর অস্কার না পাওয়ার নেপথ্যে আছে তাঁর এই রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ।

——চিত্রপ্রিয়

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত ২৩।৩।৭০ তারিখ থেকে আমাদের কার্যালয়ের টেলিফোন নম্বর ৩৪-৭৭৭১-৭৪—এর পরিবর্তে ৩৫-৯৪৬১-৬৪ হয়েছে।

কর্মাধ্যক্ষ
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ

৬নং শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার ছক

(কেটে পাঠাতে হবে)

১	২	৩		■	৪ ব	সু	৫ ম	৬ তী
৭			■	৮	■	৯		
১০		■	১১		১২	■		
	■	১৩			১৪		■	
■	১৫			■	১৬			■
১৭	■	১৮		১৯			■	২০
২১	২২	■	২৩			■	২৪	
২৫		২৬	■			২৭		
২৮				■	২৯			

কুপন

নাম...

ঠিকানা...

মাসিক বসুমতী

৫নং শব্দ-শৃঙ্খল প্রতিযোগিতার সমাধান

সূত্র (পাশাপাশি)—১। তালত (তলতা) ৩। ভুজগ ৬। বদনীবসা (বৎসাদনী) ৯। রক ১২। মরন (নরম) ১৩। লন্তকু (কুন্তল) ১৫। দায়কা (কায়দা) ১৬। কালিন্দী ১৭। চলন ১৮। বারর (রবার) ২০। সেঙ্গীত ২২। রীন (নরী) ২৫। কলায়মল (কমলালয়া) ২৭। তর্জন ২৮। সুজাত

(উপর-নীচে)—২। তদম (মদত) ৩। ভুবন ৪। জসা (সাজ) ৫। সরল ৭। নীরব ৮। ক্ষীমাকা (কানাক্ষী) ১০। কন্তকারন (নবকান্ত) ১২। নয়নজুড়ি ১৪। কুলির ১৮। বারীন্দ্র ১৯। সিরিয়া ২১। তিন্তিড়ী ২৩। খিলান ২৪। নমসু (সুমন) ২৫। কর্জ ২৬। লজা (জাল)

এবার নির্ভুল সমাধান প্রেরণের জন্যে প্রথম পুরস্কার পাবেন শ্রীমতী অঞ্জলি মজুমদার, গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কীম, ওল্ড্ ডগ রেস গ্রাউন্ড, কলিকাতা-৩৮।

অন্যান্য সকল সমাধানই তিন বা ততোধিক ভুল হওয়ার জন্যে দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হল না।

সম্পাদকীয়

বিপ্লবের পদধ্বনি

দীর্ঘ সাধনা, আত্মত্যাগ ও [illegible] বরণের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতবর্ষের সীমাহীন আকাশে যেদিন বহুপ্রতীক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সূর্য পরাধীনতার রাহুগ্রাস ভেদ করিয়া আপন বালার্ক রাগদীপ্ত প্রদীপ্ত রশ্মিতে ভারতের মাটি, ভারতবাসীর মন এক নবীন জীবনস্পন্দনে অনুরঞ্জিত ও অতুলনীয় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপূর করিয়া তুলিল—সেই পরম পবিত্র ঐতিহাসিক পুণ্য লগ্ন হইতে দেখিতে দেখিতে কালের অমোঘ বিধান অনুসারে, একটি শতাব্দীর প্রায় এক চতুর্থাংশকাল কালের গর্ভে বিলীন হইয়া একটি নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করিল। কিঞ্চিৎন্যূন এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কত ঘটনার ঘনঘটা বহিয়া গেল, কত পতন-উত্থানের ঝড় বহিল, কত প্রবেশ-প্রস্থানের পালা চলিল, যাহা জীবন্ত থাকিল শুধু ইতিহাসের নির্বাক ভাষার মাধ্যমে।

এই আলোচ্য সময়ের মধ্যে যাহা ঘটিল, যে সকল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, যে সকল সম্ভাব্য বা অনুমিত পরিণতি রূপ পরিগ্রহ করিল, তাহার ভিত্তিতে এখন আমাদের মনে হয়, এক হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। কি চাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কি পাওয়া গেল, কি স্বপ্ন দেখা হইয়াছিল—অবশেষে তাহার বাস্তবরূপ কেমনতর হইল, সেই হিসাবমেলানোর দিন আমাদের ধারণায় আর দুয়ার হইতে অদূরে নয়।

ভারতের মুক্তিসাধনার ইতিহাস যেমনই গৌরবময়, তেমনই উদ্দীপক। মুক্তিসংগ্রাম তাহার ব্যাপকরূপ ইংরাজ আমলেই পরিগ্রহ করয়াছে ঠিকই, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষে মুক্তিসাধনার বীজ উপ্ত হইয়াছে এ দেশে ইংরেজের পদার্পণের বহু পূর্বে। সুজলা-সুফলা ভারতের মাটিতে বিপ্লবের বীজ যেদিন প্রথম উপ্ত হয়, ভারতে সেদিন মোগলযুগ। ভুবনমনোমোহিনী এই ভারতভূমির আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী পরিসর সেদিন প্রথম বিপ্লবের তূর্যনিনাদে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতের মোগল মহিমা সেদিন মধ্যগগনে। সেদিন সারা দেশকে জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও জাতীয় সচেতনতায় বিদেশ হইতে আগত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন বরেণ্য ভারত সন্তানরা। আকবরের সময়ে প্রতাপাদিত্য, ঔরঙ্গজীবের সময়ে শিবাজী যেভাবে মোগল শাসনের ভিত টলাইয়া দিয়াছিলেন, প্রবল প্রতাপান্বিত দোর্দণ্ড প্রতাপ মোগলসম্রাটদের সিংহনাদ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল যাঁহাদের উদাত্ত বাণীনিনাদে, মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই সম্রাটের ললাটে চিন্তার বলিরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বাঙলায় পাঞ্জাবের, মহারাষ্ট্রের সে ব্যাপক জাগরণ ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। ইংরেজ আমলে দিনে দিনে উত্তরোত্তর মুক্তিসাধনা দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে এবং তাহার পরিণতিও আজ কাহারও অজানা নয়। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও ইহা আজ বাস্তব সত্যেরই নামান্তর মাত্র যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত ইতিহাসকে প্রকৃত মুক্তিসংগ্রাম ও বিপুল ও অনন্য প্রত্যাশার কাল হিসাবে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পরবর্তী ইতিহাসকে এক চরম হতাশা ও আশাভঙ্গের ইতিবৃত্ত অনায়াসে বলা চলে।

যে স্বাধীনতা আজ আমরা অর্জন করিলাম, সে "স্বাধীনতা"র জন্য বাঙলার তথা ভারতের সন্তানরা যুগে যুগে, কালে কালে সাধনার প্রদীপটি স্বীয় ত্যাগে, অবদানে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া পরম্পরার স্রোতে ভাবীকালের হাতে তুলিয়া দেন নাই। দলে দলে অবিরাম ধারায় দেশজননীর মুক্তি পাগল সন্তানরা স্বাদেশিকতার বেদী-মূলে মহামূল্য আপন আপন প্রাণ হাসিমুখে বিসর্জন দিলেন—তাহা এই স্বাধীনতার জন্য নয়, দেশের যে শত-শত দামাল ছেলে, বীরাঙ্গনা মেয়ের দল অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর অমানুষিক নির্যাতন বরণ করিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই—তাহা যে স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সেই স্বাধীনতা যখন আসিল তখন দেখা গেল, যাহা প্রত্যাশিত ছিল এবং যাহা লব্ধ হইয়াছে উভয়ের স্বরূপগত ব্যবধান আকাশ-পাতাল।

তেইশটি বছর আজ বিগত ইংরেজ যাঁহাদের হাতে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া খণ্ডিত দেশটি তুলিয়া দিয়া বিদায় লইল, তাঁহাদের দেশবাসী যথেষ্ট সময় দিয়াছে—কিন্তু এই সুদীর্ঘকালেও দুইটি যুগের সময়সীমাকেও সেই কংগ্রেস সরকার কোথাও কোন ক্ষেত্রেও যোগ্যতা, দক্ষতার পরিচয় দেখাইতে পারিলেন না, কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কি বহির্দেশীয় ব্যাপারে তাঁহাদের কোন কার্যই এতটুকু বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা বা ত্রুটিহীনতার পরিচয় বহন করে কি না—তাহা অভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট নয়।

কিন্তু একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্যায়ের এবং ভুলের মাশুল নিরপরাধ দেশবাসী তাহার সর্ব[illegible] দিয়া—নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করিয়া যোগাইবে কোন যুক্তিতে—

সারা পৃথিবীর চেহারা আজ ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—সমগ্র জগতে স্বতন্ত্র ছন্দ—এই বিক্ষোভের বক্ষ চিরিয়া আজ অভ্যুদয় ঘটিতেছে বিপ্লবের-

...প্লবের ভৈরব হুঙ্কারে দেশের সমগ্র আকাশ-বাতাস মুখরিত। হতাশা, অতৃপ্তি, বেদনার হৃৎপিণ্ড হইতেই স্ফূর্তি হইতেছে, আজ বিপ্লবের পদধ্বনি। যাঁদের মুখের পানে এতদিন দেশবাসী ব্যাকুল আগ্রহে, প্রশান্ত বিশ্বাসে তাকাইয়াছিল, কিন্তু সেই তাকাইয়া থাকা যখন পরিপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া গেল, তখন এই দেশের মাটি হইতেই আবার সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িল নবশক্তির পুণ্যমন্ত্র এই পুণ্যমন্ত্রে সমগ্র দেশকে উদ্বোধিত করিবে জাগ্রত বৈপ্লবিক শক্তির ভাবধারায়। পরিস্থিতি অনুসারে বলা যায় যে, এখন যে অবস্থার আমরা সম্মুখীন, দলাদলি, গদির লড়াই, দলীয় স্বার্থের ধ্বজাধারণ, দেশ ও জাতির প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চেতনাহীন প্রভৃতি এই যন্ত্রণা, এই ..., সেক্ষেত্রে এই কলুষতা, এই গ্লানি, এই আবর্জনার হাত হইতে জাতিকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র জাতীয়তাবাদী প্রকৃত দেশাত্মবোধক বিপ্লব, তবে তাহা প্রকৃত বিপ্লব হইতে হইবে---বিপ্লবের ভান নয়, বিপ্লবের মুখোস নয়---ইতিহাসের আলোতেই আমরা দেখিয়াছি যে আবেদন-নিবেদনে মুক্তি আসে না। সশস্ত্র বিপ্লব আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রত্যাঘাত ছাড়া মুক্তি কখনও আসে না---সেই কারণেই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র প্রাণপুরুষ। সেই কারণেই ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল-কানাই-সত্যেন্দ্র-বাঘা যতীন-মনোরঞ্জন-চিত্তপ্রিয়-বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রদ্যোত-রামকৃষ্ণ-সুশীল-সূর্য সেন প্রমুখ আরও অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশেই বলা যায়---মরণ সাগরপারে তোমরা অমর---তোমাদের স্মরি। শুধু আবেদন-নিবেদন-বৈঠক-চুক্তিই যদি চলিত, তাহা হইলে ইংরেজ কখনও ভারতের মাটি হইতে পাততাড়ি গুটাইত না।

যে বিপ্লব প্রকৃত বিপ্লব--যাহার নীতি জনগণের প্রকৃত কল্যাণসাধন, দেশের শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার, দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষ-সাধন ও দেশবাসীর ভিতর সে সম্বন্ধে সচেতনতা আনিয়া দিল সর্বোপরি যে বিপ্লব সারা দেশকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিবে এবং এক একতার বন্ধনে, সারা জাতিকে আবদ্ধ করিবে--সে ঐক্য ধ্বংসমুখীন নয়---সে ঐক্য গঠনধর্মী---সেই বিপ্লবের পদধ্বনিই আজ প্রত্যাশিত।

বিপর্যয়ের মুখে পশ্চিমবঙ্গ

শত সহস্র সমস্যার হতভাগ্য শিকার, ক্রমবর্ধমান দুর্যোগের নিত্য বলি- ও নৈরাশ্যের এক উল্লেখযোগ্য লীলা-ভূমি পশ্চিমবঙ্গ যে ভাবে তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, সে সম্বন্ধে এই বিভাগে বহুবার ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি অবস্থা দেখিয়া মন্তব্য করা যায় যে, এই বিষয়ক আলোচনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা এখনও শেষ হয় নাই। বরং জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণের প্রশ্ন অনুসারে বলা যায় যে, সারা জাতির স্বার্থ বিবেচনা করিয়া এই আলোচনাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা চলে।

পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের মধ্যে একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। শুধু শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত ঐশ্বর্যের মানদণ্ডেই নয়, রাজনৈতিক বিচারেও পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব আজ সর্বস্বীকার্য। কিন্তু যেভাবে সকল দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গ আজ ঘোরতর সমস্যা-সমূহের সম্মুখীন হইতেছে, তাহার ফলে এই রাজ্য পরিণতির কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ আছে।

একে অন্ন সমস্যা, বেকারী প্রভৃতি তো আছেই, তাহার ফলে অযোগ্য শাসকদের হাতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত জটিল হইয়া ওঠায় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ চিত্র অতীব বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কেবল দলাদলির চাপে দেশের তথা দেশবাসীর আজ নাভিশ্বাস উঠিবার উপক্রম। যাঁহাদের হাতে রাজ্যের শাসনদণ্ড, বলিতে বাধা নাই প্রথমতঃ রাজ্যশাসনে তাঁহারা সম্পূর্ণ অযোগ্য, দ্বিতীয়তঃ দলীয় স্বার্থসিদ্ধিতেই তাঁহারা মাতোয়ারা। এ ক্ষেত্রে কোন্ পথে রাজ্যের তথা জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

দেশের শিল্প-বাণিজ্য ধাপে ধাপে যে ভাবে অচলাবস্থার সম্মুখীন হইতেছে, তাহার ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে আজ প্রায় দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে, কোন 'তথাকথিত' দেশনেতার সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নাই। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারকে সঙ্কোচন বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি জাতীয় সমৃদ্ধির বিকাশকে যে কি পরিমাণ ব্যাহত করিয়া তোলে, সে সম্বন্ধে একটি স্কুলের ছাত্রের কাছেও বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না। দেশের যে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী সম্প্রদায় আপন আপন শ্রমে দেশের উৎপাদনের হার বর্ধিত হইতে বর্ধিততর করিয়া দেশকে গৌরবের পথে আগাইয়া দিতেছেন---তাঁহাদের কি অবস্থার

স্বাধীন হইতে হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখার উপযুক্ত সময় কি আজও আসে নাই। বেকারীত্ব এ রাজ্যে আজ এক বিরাট অভিশাপের আকার ধারণ করিয়া এক নিদারুণ ভয়াবহ সঙ্কটের সৃষ্টি করিতেছে, শিল্পজগতের ক্ষতিসাধন এ দেশের মেহনতী মানুষের সম্প্রদায়ে যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করিবে। তাহার প্রতিকারের ভার কাহার উপর? প্রথাগত-ভাবে সমগ্র রাজ্যের সমাজ শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর, তাঁহারা যোগ্যতার পরিবর্তে পর্বতপ্রমাণ অযোগ্যতার পরিচয়ই দিয়া চলিতেছেন প্রতি পদক্ষেপে। অবশ্য কয়েকটি দল বা গোষ্ঠীর অযোগ্যতার জন্য সারা বাঙলার জনগণ কেন কণ্টকমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিবে, যেখানে গোলাপের মালার সম্ভাবনা অবলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এ সমস্যা আজ কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, এ সমস্যা সারা জাতির—এ রাজ্যের সর্বস্তরের প্রতিটি মানুষের—প্রতিটি মানুষের জীবনের দাম আছে, সেই জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা আর বরদাস্ত করা চলিবে না।

শোক সংবাদ

লীলা রায়

দেশবরেণ্যা বিপ্লবনেত্রী লীলা রায় গত ২৮-এ জ্যৈষ্ঠ ৭০ বছর বয়সে কিঞ্চিদধিক আড়াই বছর সংজ্ঞাহীন থাকার পর গতায়ু হয়েছেন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণা হন। বাংলার বিপ্লবান্দোলনে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য নানা নির্যাতন ভোগ করেন। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও বিপ্লব-সাধনাকে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর রূপ দেন। তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস ও জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির তিনি সদস্যা ছিলেন। কিছুকাল প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনে নেতাজীকে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা করেন। বিপ্লব জীবনে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মিণী ছিলেন। ১৯৩১ সালে ইনি সুপ্রসিদ্ধ 'জয়শ্রী' পত্রিকার পত্তন করেন।

আশা আর্যনায়কম

বিশিষ্ট সমাজসেবিকা আশা আর্যনায়কম গত ১৫ই আষাঢ় ৬৭ বছর বয়সে নাগপুরে লোকান্তরিতা হয়েছেন ইনি ধারাণসীর শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ফণিভূষণ অধিকারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। শান্তিনিকেতনে ইনি শিক্ষা লাভ করেন। কিছুকাল পাঠভবনে অধ্যক্ষা হিসাবে যুক্ত থাকার পর ১৯৩৭ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে সেবাগ্রামের গঠনমূলক কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর বিশিষ্ট শিষ্যা আশা দেবী গান্ধীজীর মৃত্যুর পর বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁর পদযাত্রার সঙ্গিনী হন। ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' খেতাব ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। ভারত সরকার প্রদত্ত উপাধি তাঁর পূর্বে কেউ প্রত্যাখ্যান করেন নি।

মীরা সরকার

শ্রীমতী মীরা সরকার মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে মজঃফরপুরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, তিন পুত্র, তিন কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রদ্যুৎকুমার [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক বসুমতী

॥ ৪৯ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৭৭ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ॥

কথামৃতকথা
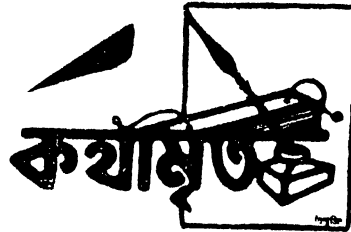
রুচিভেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ—"রুচিভেদ কি রকম জান? কেউ মাছটা ঝোলে খায়, কেউ ভাজা খায়, কেউ অম্বল খায়, কেউ মাছের পোলোয়া খায়—যার যেমন রুচি; আবার যার পেটে যা সয়। মানুষের প্রকৃতি আলাদা, পছন্দও আলাদা। তাই একই জিনিষ নানারূপ করে দিতে হয়। তার উপর আবার অধিকারী ভেদ আছে। তিনি নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন ভিন্ন রুচির এবং অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়; তাই তিনি সাকার পূজারও ব্যবস্থা করেছেন।

"আমি বলি, আগে কলাগাছ বিঁধতে শেখ, তারপর শরগাছ, তারপর সলতে; তারপর—উড়ে যাচ্ছে পাখী।"

রুদ্রগ্রন্থি

বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞাচক্র জন ও তপঃলোক,—এ দুটি রুদ্র বা রুদ্রাণী শক্তির অধিকারভুক্ত। তাই আজ্ঞাচক্রকে রুদ্রগ্রন্থি বলে। এই স্থানে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাত্মবোধক জীবভাবের লয় হয়ে আত্মজ্যোতিঃ বা জীব চৈতন্যের বিকাশ হয়ে থাকে। রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হলে সাধক 'শুদ্ধ তমোগুণ ও শুদ্ধ স্বত্ত্বগুণ প্রধান ধর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে 'শিবতত্ত্ব'জ্ঞান লাভ করে। তার পরই 'ব্রহ্মতত্ত্ব' বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান ও মুক্তি ক্রিয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

মনোময় ও বুদ্ধিময় কোষের বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করতে সাধককে বিপুল আয়াস স্বীকার করতে হয়। অজ্ঞান আবরণ ভেদ করতে হলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ আসক্তি ও বিরক্তির সকল বৃত্তিই লোপ করতে হয়। এভাবে রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হলে সাধক তখন অকুলস্থানে প্রবেশের উপযুক্ত হন।

রুদ্র প্রলয়ের দেবতা। যাবতীয় জগদ্ভাব অর্থাৎ যাবতীয় খণ্ডজ্ঞান এক অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রে বা বিজ্ঞানময় মহেশ্বরে বিলীন হয়। জীবত্বের শেষ গ্রন্থি বা অস্মিতারূপ শুম্ভাসুর অখণ্ড জ্ঞানেই নিঃশেষরূপে বিলয়প্রাপ্ত হয়; প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান-সূর্যের উদয়ে অনাদিকালের অজ্ঞান তিমির দূরীভূত হয়ে বিমলবোধের উদয় হয়।

যতদিন প্রারব্ধ কর্মসমূহ নিঃশেষিত না হয়, ততদিন দেহাত্মবোধও নিঃশেষ হয় না। এই জগৎবোধ—দেহবোধ—অনাত্মে আত্মবোধ—এরই নাম রুদ্রগ্রন্থি। এর নিরসনকে ভেদ হওয়াকেই রুদ্রগ্রন্থিভেদ বলে; প্রারব্ধক্ষয় হয়ে আত্মজ্ঞানের উদয়কেই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ বলে।

রূপ ও রূপদর্শন

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব বলেছেন—"চিৎ ব্যোমক্ষেত্রে যখন কোন বিশিষ্ট মূর্তির আবির্ভাব হয়, তখন সেই মূর্তিটি সাধকের সংস্কার অনুযায়ী গঠিত হয়ে থাকে। তাঁর নিজের কোন বিশিষ্ট মূর্তি নাই; তিনি সকল রূপেই আছেন, অথচ তিনি রূপ-বিবর্জিত। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'—সাধকের হিতের জন্যই 'ব্রহ্ম' বা 'মা' আপনাতে বিশিষ্ট রূপের কল্পনা করেন। সেই কল্পনাই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্র-বর্ণিত দেব-দেবী। সাধক যেরূপ সংস্কারে, যেরূপ বিশেষণে, যেরূপ গুণে আত্মাকে বিশেষিত করেন, ভক্তিপ্রিয় অরূপ পরমাত্মা সেই-রূপ গুণে গুণময় হয়ে সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করেন। ইহাই সাধনা-জগতে বিশিষ্ট মূর্তি দর্শনের রহস্য।

"দুই স্থানে এরূপ বিশিষ্ট মূর্তি দর্শন হয়। এক, মনোময় ক্ষেত্রে; অন্য, বিজ্ঞানময়ী কোষে বা প্রজ্ঞায়। প্রতিদিন

অভ্যাসের ফলে মনে মনে কোন বিশিষ্ট মূর্তির বা রূপের কল্পনা ঘন করে তুললে অনেক সময় ঐরূপ মূর্তি দর্শন হয়। কোন কোন স্থলে ঐরূপ অভ্যাসের সাহায্যে কল্পনা ঘন না করেও কদাচিৎ কোন মূর্তির দর্শন হয়ে থাকে। সেগুলি পূর্বজন্মসঞ্চিত ঘন কল্পনার ফল। এভাবে মনোময় ক্ষেত্রে যে সকল মূর্তির দর্শন হয়, উহা ক্ষণিক আনন্দদায়ক ও ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাসবর্ধক,—ইহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু ঐ সকল মূর্তি সাধককে কৃতার্থ করতে পারে না। কারণ উহাতে প্রাণধর্মের বিকাশ নাই; সর্বজ্ঞতা, সর্বদর্শিতা, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি মহত্ত্বের স্ফুরণ নাই। উহা মনঃকল্পিত একটি ছায়া-বিশেষ মাত্র; সুতরাং সাধককে বরাভয় দানে অমরত্ব প্রদানে সমর্থ হয় না। কিন্তু প্রজ্ঞাক্ষেত্রে যখন কোন বিশিষ্ট মূর্তির দর্শন লাভ ঘটে, তখন সর্ববিধ সংশয় দূর হয়ে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়—সাধক অভীষ্ট বর লাভে ধন্য হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তিনি শুধু নিরাকার নন—তিনি আবার সাকার। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়, ভাব ভক্তি দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায়।

"তিনি নানারূপে দর্শন দেন। কখন নররূপে, কখন চিন্ময় ঈশ্বরীয়রূপে। তুমি রূপে বিশ্বাস করো। রূপ মানতে হয়। ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন, নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়। আমি বেলতলায় স্পষ্ট নানা রূপ দর্শন কর্তাম।

"কামার হাটীর বামুনী (গোপালের মা) কত কি দ্যাখে। একলাটি গংগার ধারে একটি বাগানে নির্জন ঘরে থাকে, আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয়। (বলিতে বলিতে ঠাকুর চমকিত হইলেন)। কল্পনায় নয়, সাক্ষাৎ! দেখলে গোপালের হাত রাঙা! সংগে সংগে বেড়ায়!—মাই খায়! কথা কয়! নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে।"

রোক্

শ্রীরামকৃষ্ণ—"রোক্ কি রকম জান? শেষ পর্যন্ত অনুরাগের সংগে লেগে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—এরি নাম রোক্। মিথ্যে বলে জানছি, রোক্ করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ; যা মনস্থ করেছি, তা করবোই করবো—সেটা শেষ করে তবে অন্য কথা, অন্য কাজ। এই রোক্ বা পুরুষকার জ্ঞানের একটা লক্ষণ। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট করছে তো একেবারে ত্যাগ। কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁধ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।

"বিষয়ী লোকদের রোক্ নাই। হলো হোল; না হলো, না হলো। এই সঙ্কল্প করলো, নির্জলা একাদশী করবো; গিন্নী এসে বললে—'বাড়াবাড়ি করে কি হবে? একাদশী করবে কয়ে; দুখানা লুচি খেলেও একাদশী করা হবে। খাবার সময় আবার দুখানা লুচির জায়গায় দশখানা হয়ে গেল।

"আমার যখন ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বললে—স্বর্ণপর্পটি খেতে হবে, জল খেতে পাবে না; তেষ্টা পেলে দুধ কিম্বা বেদানার রস খেতে পার। সবাই ভাবলে, জল না খেয়ে আমি কেমন করে থাকবো। আমি রোক্ কল্লুম—আমি জল খাব না; আমি পরমহংস দুধ খাব।

"ভিতরে রোক্ না থাকলে তীব্র বৈরাগ্য হতে পারে না—ঈশ্বরের পথে এগুতে পারে না। রোক্ না থাকলে চাষারও মাঠে জল আসে না।"

ললনা চক্র

মানব শরীরস্থ দশটি চক্রের মধ্যে ললনা চক্রই প্রথম অব্যক্ত চক্র। ইহা একটি গুপ্ত চক্র। ইহা রক্তবর্ণ (কেউ বলেন স্বর্ণবর্ণ) দ্বাদশদল কমল (কোন কোন তন্ত্রমতে ৬৪ দল কমল)। বিশুদ্ধ চক্রের উপরে, আজ্ঞা চক্রের নীচে, কণ্ঠের ঊর্ধ্বদেশে আলজিভের পেছনে মস্তানাঙ্গী মধ্যস্থ সুষুম্নাবর্ত্মে এই ললনা চক্র অবস্থিত।

বিশুদ্ধ চক্রে ধ্যানের পর সাধক এই ললনা চক্রে ধ্যান করে তারপর আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করবেন। এই ললনা পদ্মেই অমৃত স্থালী আছে। ইহার ধ্যানে উন্মাদ, পিত্তজনিত দাহ জ্বর শূলবেদনা, শরীরের ও জিহ্বার জড়তা ইত্যাদি বিনষ্ট হয়। সাধনায় সময় ষট্‌চক্র ধ্যানে যোগীর মস্তক উ হওয়া কিম্বা পূর্বোক্ত দৈহিক রোগ বা উদ্বেগ যাতে না হয় তা জন্য এই ললনা চক্রের ধ্যান বিধেয়। তা ছাড়া আরো উপরে চক্রের সাধনার সময়ে যদি কোনরূপ অসুস্থতা বোধ হয়, তখন ললনা চক্রের ধ্যান করলে উপশম হয়।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহ

সম্পাদকীয়
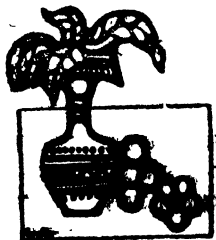
যাহা সত্য—তাহাই সুন্দর আবার যাহা সুন্দরের রূপে প্রতিভাত—তাহারই ভিন্ন নাম সত্য। মূলত সত্য আর সুন্দর অভেদ আর অভিন্ন। ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষণভঙ্গুর এই পৃথিবীর আলোয় উজ্জ্বল, তমসায় আচ্ছন্ন, আনন্দে প্রদীপ্ত, বেদনায় বিদীর্ণ, রৌদ্ররসে প্রাণবন্ত, ছায়ায় ছায়ায় সুনিবিড় ক্ষণকালের এই পান্থশালায় নিত্যকালের অবিরাম ধারায় মানুষের এই আসা-যাওয়ার মেলায় মৃত্যু অপেক্ষা বড় সত্য বাস্তবের বিচারে আর দুটি নাই। এ ধারণা নিছক কবিকল্পনা-প্রসূত নয়, বাস্তবের পটভূমিতে দৃঢ় ও অটলভিত্তিক। যাহা সত্য তাহা স্থির, ধ্রুব, শাশ্বত ; তাই মৃত্যুও স্থির, ধ্রুব শাশ্বত---তাহাই জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি---এ ধারণার সমর্থন আছে গীতায়, উপনিষদে, বিভিন্ন পুরাণে, সত্যদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ পুণ্যকল্প ঋষিদেহ, অমৃতের চিরন্তন পথযাত্রীদের জীবনের বরেণ্য ভাষ্যকারদের ধেয়ানে, চিন্তনে, মননে। কিন্তু তথাপি এই সত্যের সান্ত্বনা, অবধারিতের প্রলেপ মানুষের মন তখনই ভরাইতে পারে না, যখন এই মৃত্যুর আবির্ভাব হয় অত্যন্ত অসময়ে, রীতিমত অতর্কিতে, একটি বলিষ্ঠ জীবন যে সময়ে সুচিন্তিত অবদানের উৎসরূপে প্রতিভাত ; ঠিক সেই জীবনপ্রকাশের প্রকৃষ্ট মধ্যাহ্নে যখন মৃত্যুর জীবনসন্ধ্যার আমন্ত্রণে ধীর পদক্ষেপে সেই সৃষ্টির স্রোতোমুখ অর্গলরুদ্ধ করিয়া দেয়, তখন কিছুতেই এই সত্যকে মন গ্রহণ করিতে চায় না। এই গভীর সত্য তখন নিষ্ঠুর সত্যের আবরণে আত্মপ্রকাশ করে। নিষ্ঠুরতার সহিত হাত মিলাইতে মানুষের মন কখনই সায় দেয় না।

এই উক্তির একটি জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রাণতোষ ঘটকের অকাল এবং আকস্মিক লোকান্তরকে উল্লেখিত করা চলে। ধরণীর এই দু'দিনের খেলাঘরে জীবনের দুই দিবসের হাসি-কান্নার তরঙ্গে মানুষে মানুষে এক অদৃশ্যহস্তের

আত্মিক বন্ধন, অনুভূতিতে যে বন্ধন দৃঢ় এবং হৃদয়ের গভীর উপলব্ধির প্রগাঢ়তায় যাহা অটুট। তাই প্রিয়জনের বিচ্ছেদ মানুষের পক্ষে অসহনীয় আকারে দেখা দেয়। এই আত্মিক বন্ধন সূক্ষ্ম অন্তঃসলিলা অনুভূতি এবং অন্তরের অন্তঃপুরের রসস্নিগ্ধ উপলব্ধি এ ক্ষেত্রে সত্যের অনুশাসনে ও দার্শনিক তত্ত্বকেও অতিক্রম করিয়া যায়। এইখানেই মানবধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ। ইহার উপর, এই দুঃসহ বেদনার উপরেও প্রিয়জন যখন অকালে মরণের সহিত মালাবদল করেন, মহাকালের অমোঘ বিধানে বেদনা তখন হয় আরও মর্মান্তিক।

প্রাণতোষ ঘটকের প্রতিভা যখন স্ফুরণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, সেই প্রতিভাসূর্য যখন মধ্যাহ্নগগনে প্রদীপ্ত ভাস্বর, তাহার উজ্জ্বল রশ্মিতে যে সময়ে জাতীয় জীবনের নানাদিকের নানা তমঘন অংশ অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন হইতে মুক্তিস্নান করিয়া আলোকের পুণ্য-প্রসাদে পূর্ণতার অমল জ্যোতিঃমুগ্ধ রসঘন স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই এই জীবনরসিক

শিল্পীকে নির্মম নিষ্ঠুর নিয়মে মরণের অনতিক্রম্য আলিঙ্গনের নাগপাশে নিজেকে নিবাহিত দিতে হইল। সর্বাপেক্ষা ট্র্যাজেডির বীজ এইখানেই।

প্রাণতোষ ঘটকের ঈশ্বরদত্ত শক্তির স্ফুরণ বা বিকাশের পটভূমি বা ক্ষেত্র হিসাবে দুটি নাম করা চলে—একটি বাঙলা সাহিত্য—অপরটি বাঙলাদেশের সাময়িক পত্রজগৎ। তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রখর রশ্মিতে এ দুটি জগত যে কতখানি সমৃদ্ধ, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। আসলে তিনি ছিলেন এক যুগসন্ধির অগ্রদূত। সম্পূর্ণরূপে বর্জনপন্থী তিনি ছিলেন না। সব কিছু বিসর্জন দিয়া বন্ধনের ইশারাতে তাঁহার স্বপ্নেও স্থান পায় নাই। অতীতের যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া নবীনকালের উপযোগী করিয়া সাধারণ্যে পরিবেশন করিয়াছেন, এমন কি অতীতের যাহা লোকনয়নের অন্তরালে তাহারাও তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির সামনে ধরা পড়িয়া আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ও ঔজ্জ্বল্যে তাঁহারই কল্যাণে আবার নবীন মহিমায় লোকলোচনের সামনে আসিতে সমর্থ হইয়াছে। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ও সে সম্পর্কে তাঁহার পরিপূর্ণ সচেতনতার প্রমাণ এখানেই মেলে।

এক ব্যাপক যুগসন্ধিলগ্নে তাঁহার জন্ম এবং কর্মজগতে আবির্ভাব। একটি অপসৃয়মান ও আর একটি বিকাশোন্মুখ যুগের সন্ধিলগ্নে তাঁহার গৌরবময় অভ্যুদয়। কালের পটভূমি অনুসারে দেখা যায় সাহিত্যের, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের, দেশের অভিনয়-জগতের এক পরিপূর্ণ নবযুগের উন্মেষের অব্যবহিত পরেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার বিকাশকাল জাতীয় ইতিহাসে আরও গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য সমন্বিত। দ্বিতীয় মহাসমরের মরণদামামার রুদ্র নির্ঘোষে সমগ্র জগতের সেদিন এক বিপর্যয়কারী দুঃসময়ে চতুর্দিকে শুধু মৃত্যুর হাতছানি, দিক-দিগন্তে সর্বনাশের

ভুবন সেদিন প্রকম্পিত, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সেদিন মহাপ্রয়াণে লোকান্তরিত, ভুবনমনোমোহিনী, অনন্ত শস্যসম্ভার-শালিনী, নির্মল সুর্যকরোজ্জ্বলা বঙ্গজননীর ঘরে ঘরে সেদিন অন্নহীনতার গগনবিদারী হাহাকার, দুর্ভিক্ষের ভীষণ-করাল পদসঞ্চার, আবার অন্যদিকে দিক্‌দিগন্তের সীমানাবিহীন গগন-ললাট অবারিত মাঠসমূহ প্রলয়ঙ্করী বন্যার লোলুপ শিকারে পরিণত। ভারতের সুদীর্ঘ মুক্তি সাধনাও তখন শেষ পাদে উপনীত। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মরণপণ সংগ্রাম সারা ভারতের রাজনৈতিক চেতনাকে এক অভিনব রূপ এবং সমগ্র তারুণ্যের ভিত্তিভূমিকে এক অভাবনীয় প্রাণ-চেতনায় আন্দোলিত করিয়াছে।

এই পটভূমিতে বাঙলা দেশের সাহিত্য-জগতে যে একদল শক্তিশালী অথচ বয়সে নিতান্ত তরুণ লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইল, প্রাণতোষ ঘটক তাঁহাদেরই একজন। এই লেখক-গোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই বয়স সেদিন পঁচিশের মধ্যে। হৃদয়ে তাঁহাদের প্রাণজয়ী প্রত্যাশা, নয়নে উজ্জ্বল স্বপ্নের সমারোহ, আর লেখনীতে তাঁহাদের যুগস্রষ্টার অত্যুজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। সেই এক সারি বলিষ্ঠ জীবনধর্মী, তীব্র গতিমান লেখনী বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকে এক নবতর অধ্যায়ে উপনীত করিল। আঙ্গিকে, বিন্যাসে, গঠননৈপুণ্যে, উপস্থাপন-কুশলতায় প্রয়োগ-চাতুর্যে বাঙলা সাহিত্যকে তাঁহারা এক নূতন দিগন্তের কক্ষপথভুক্ত করিলেন। এ যেন একটানা দীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন রজনীর অফুরান আলোক-সমৃদ্ধ মালিন্যবিহীন নির্মেঘ প্রভাতে উত্তরণ। সমকালীন যুগমানসের সফল চিত্রকাররূপে নবযুগের ভোরের পাখি এই তরুণ লেখকগোষ্ঠীকে পাঠক-সমাজ সাদরে আবাহন জানাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিলেন না।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, এই লেখকগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই আপন-আপন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, পৌনঃপুনিকতা

বা গতানুগতিকতাই ইঁহাদের একজনকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। সাহিত্য জগতের এক একটি দ্বার তাঁহারা এক একজনে উন্মুক্ত করিলেন, যে দ্বার এক একটি পরিপূর্ণ জগতের অর্গল খুলিয়া দেয়।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পর দীর্ঘ সময়ের অবিরাম ধারায় কোন সাহিত্যকার যে পথে পা দেন নাই, সেই পথেই চরণচিহ্ন রাখিলেন প্রাণতোষ ঘটক। অভিজাত সামন্তজগত বঙ্কিমচন্দ্রের পর এক কথায় বাঙলা সাহিত্য হইতে নির্বাসন গ্রহণ করিয়াছিল। বয়সে নিতান্ত তরুণ প্রাণতোষের প্রসাদে উহা পুনরায় দীর্ঘরজনীর সুপ্তি অতিক্রম করিয়া নূতন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করিয়া একালের পাঠকসমাজকে একটি বিশেষ স্বতন্ত্র আলোকোজ্জ্বল দিকে আকৃষ্ট করিল। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে লেখা 'আকাশপাতাল' সে সময়ে যে কি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা কাহারও স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হওয়ার নয়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'আকাশপাতাল' ও শেষ উপন্যাস 'তিন পুরুষ' উভয়েই প্রাচীন ইতিহাসকেন্দ্রিক ও তথ্যনির্ভর, মধ্যবর্তীকালে রচিত 'মুক্তাভস্ম' ও 'রাজায় রাজায়'ও এই ধারারই দুটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাষার নিপুণতা ও রচনা-চাতুর্য এবং যথাযথ ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃজনই লেখনীর শেষ কথা নয়। রসসৃষ্টিই যে কোন লেখনীর সার কথা। রসই জীবন। রসের স্পর্শ যেখানে, জীবনেরও প্রলেপ সেইখানেই। যে কোন পটভূমিকেন্দ্রিক রসসৃষ্টির সার্থকতার নামান্তর হইল পাঠকের চিত্তে সাম্প্রতের পরিসরে নয়, শাশ্বতের প্রতিশ্রুতিতে শ্রদ্ধা-বন্দনা-ভালবাসায় প্রদীপ্ত সিংহাসনে লেখকের অটল-অনড় প্রতিষ্ঠা। সেই বিচারে আমাদের প্রাণতোষও সার্থক শিল্পী।

তাঁহার বৈশিষ্ট্য সেইখানেই যে তাঁহার প্রতিভা একমুখীন নয়, তিনি নিজে এক বহুচারী প্রতিভার আধার। তাঁহার শিল্পিসত্তায় রসপিপাসু মনে যে প্রতিভার জন্ম, নানা দিগন্তে সে নানা পক্ষ

বিস্তার করিয়াছে, অন্য দিকে তাহা পরিব্যাপ্তি লাভ করিয়া নানা রসের সন্ধানে সে সকলকাম হইয়াছে এবং 'আপন মনে মাধুরী মিশায়ে' সেই রস তাহা অকৃপণ হস্তে দান করিয়া ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে সে নবীন অনুভূতির প্রদীপ্ত আলোক সঞ্চার করিয়াছে। একদিকে প্রাণতোষ ঘটক সেকালের সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সমাজের ঐশ্বর্যপ্রাচুর্য, বিলাসবহুল, শৌর্যবীর্যকল্পনায় জীবনযাত্রার নিখুঁত ও প্রামাণ্য আলেখ্য অঙ্কনে সফলতার হাতে হাত মিলাইতে সমর্থ হইয়াছেন, আবার তেমনই একালের যুগমানসের অতসহ সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনায় ভরা, ঘাতপ্রতিঘাতে সমাকীর্ণ, সুখ-দুঃখে বিচিত্র জীবনচর্যার ভাষামূর্তি নির্মাণেও জয়লক্ষ্মীর স্মিত হাস্যস্ফুরিত প্রসন্ন আশিস সমান দক্ষতার সহিতই প্রশস্ত ললাট রঞ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বাঙলা দেশের সাময়িকপত্র জগৎও তাঁহার অবদানময় জীবনের আর একটি বিশেষ ক্ষেত্র। তাঁহার মননশীল মানস-নয়ন এবং সৃজনশীলতার যে সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন স্বাক্ষর তিনি এখানে রাখিয়াছেন, তাহা ক্ষণকালের সঙ্কীর্ণতায় নয়, নিত্যকালের প্রসারতায়।

আজন্ম তিনি নবীনের পূজারী। সবুজের মন্দির প্রাঙ্গণে তিনি মূর্তিমান বসন্তদূত। নবীনত্বের বন্দনার জয়গানে, প্রশস্তিতে তিনি সর্বদাই মুখর কণ্ঠ। তাঁহার সমগ্র সাংবাদিক জীবন এই গভীরতম সত্যেরই এক রসোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। তাঁহার পঁচিশ বৎসরব্যাপী সাংবাদিক জীবনের উন্মেষলগ্ন হইতে নবীনের সন্ধানে, নবীনের আবাহনে এবং নবীনের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় তিনি তদ্গত চিত্ত। নবীনের মাধ্যমে নবজীবনের ভোরের ভৈরবীর উদাত্ত সুরে জীর্ণ-বিদীর্ণ ক্লান্তবিক্ষত ত্রিযাম রাত্রির আসন্নতার অবসান ঘটাইয়া ভাবীকালের সমাজে এক জলন্ত আদর্শের সৃষ্টি করিতে লব্ধসিদ্ধি হইয়াছিলেন। জীবন পূজারী হিসাবে এখানেই তাঁহার এক বিরাট সার্থকতা।

বাঙলা সাহিত্যে যাযাবর ও রঞ্জনকে এক রকম তাঁহারই আবিষ্কার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দিক্‌পাল সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যেদিন পরম ভট্টারক ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত দিব্যজীবন কাহিনী রচনা করিয়া বাঙলা সাহিত্যের একটি নূতন ধারার চিরঞ্জীব ভগীরথরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন---প্রাণতোষ ঘটকই সেই অপূর্ব রচনা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়া পাঠকসমাজকে সর্বপ্রথম সে সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। অচিন্ত্য-কুমারের ভাষায় তাঁহার যে সাহিত্য-সহযাত্রী নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি---বাঙলা সাহিত্যের এক বরেণ্য পথপ্রদর্শক সেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় চলচ্চিত্র জগতের আহ্বানে যেদিন সাহিত্যের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য, সেদিন প্রাণতোষ ঘটকই এক রকম জোর করিয়া তাঁহাকে পুনরায় লেখনী ধারণে প্রবৃত্ত করান এবং কাহারও অজানা নয় যে, শৈলজানন্দের লেখনীর স্রোতোমুখ সেই সময় হইতেই আজও স্বতোৎসারিত।

নামের পর নামের মিছিল আসে। অগত্যা সে চেষ্টায় বিরত থাকিতে হইতেছে---এ প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু লিপিবদ্ধ করা যাক---একালের বহু প্রথম শ্রেণীর এবং খ্যাতির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে সগৌরবে সমাসীন লেখকের রচনা সাধারণের সামনে সর্বপ্রথম প্রাণতোষ ঘটকই তুলিয়া ধরেন। শুধু লেখকই নয়, বহু চিত্রশিল্পী, বহু আলোকচিত্রী বাঙলাদেশে তাঁহারই উপহার, একথা অনায়াসে নির্দ্বিধায় বলা যায়। অধুনা বিখ্যাত-অখ্যাত প্রায় প্রতিটি পত্রিকারই কিছুটা অংশ অধিকার করিয়া থাকে জ্যোতিষ-সংক্রান্ত আলোচনা---যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহাদের নিকট বলা বাহুল্য; কিন্তু যাঁহাদের জানা নাই তাঁহাদের জানাইয়া রাখি যে, এই বিষয়টির পত্রিকায় স্থানলাভ ঘটে সর্বপ্রথম প্রাণতোষ ঘটকেরই দ্বারা। ইহা ছাড়া কত বিচিত্রধর্মী রচনার প্রবর্তন, কত অভিনব আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন বিচারের সৃষ্টি, এক্ষেত্রে প্রাণতোষ ঘটকের সমতুল আসনের দাবীদাররূপে দেখা দিতে পারেন বাঙলা দেশে এমন একটি নামও বোধকরি আমাদের সম্মুখে বর্তমানে উপস্থাপিত হইবে না। আদর্শ সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক আসলে মনে-প্রাণে ছিলেন সাধক রসসৃষ্টির মন্ত্রসিদ্ধ সাধক। তাঁহার সাধনার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা তাঁহার পথরোধ করিতে পারে নাই। কোন বিশেষ রাজনীতি-দল-মত তাঁহার স্রষ্টাচিত্তকে তিলমাত্র প্রভাবিত করিতে পারে নাই। খ্যাতিমান, প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে তিনি যেমন কদাচ কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই, আবার তেমনই অখ্যাত, অজ্ঞাত, অথচ বিপুল সম্ভাবনাময়, অনন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ যাঁহারা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার পায় নাই সসম্মানে তাঁহাদের হাত ধরিয়া শুধু প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থাই করেন নাই, সেই সঙ্গে সেখানকার এক একটি মূল্যবান আসনও আগাইয়া দিয়াছেন।

একালের কথা আলাদা। কিন্তু সেদিন সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে অর্থাগমের পরিস্থিতিটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেদিন অতীব দক্ষতাসম্পন্ন এবং সাধারণ্যে যথেষ্ট খ্যাতিমান লেখকও রচনার বিনিময়ে যে সম্মান-মূল্য পাইতেন তাহার অঙ্ক নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাহা এত কম যে তাহার উল্লেখ না করাই শ্রেয়। এই ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এই অবস্থার আমূল উন্নয়ন সাধন ঘটাইয়াছিলেন প্রাণতোষ ঘটকই। তাঁহার সাহিত্য প্রেমী ও লেখক সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীল মনে এই অবস্থা ঘা মারিয়াছিল এবং স্রষ্টার সম্মান সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরে জাগ্রত মূল্যবোধ তাঁহাকে এই কার্যে পরিচালিত করিয়াছিল।

তাঁহার কুশলী হস্তে মাসিক বসুমতীর বিরাট ও ব্যাপক রূপান্তর লক্ষ্য করিলে তাঁহার বিপ্লবধর্মী মনোভাব সম্বন্ধে এক

স্পষ্ট ধারণা রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। মাসিক বসুমতীর সেই প্রাচীন সংরক্ষণশীল গতানুগতিক চেহারার তিনি যে যুগোপযোগী কালধর্মী নবরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শুধু প্রতিভারই পরিচায়ক নয়---সেই সঙ্গে তাঁহার বিপ্লবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীও যুগচেতনার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

লেখক চিত্রশিল্পী সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের পরিচয় সর্বজনব্যাপ্ত, কিন্তু এর পরেও আরও একজন প্রাণতোষ ঘটক ছিলেন। সে প্রাণতোষ ঘটক অন্তরঙ্গ বন্ধু সহকর্মী মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে প্রাণতোষ ঘটক---মানুষ প্রাণতোষ ঘটক। দরদে, সহানুভূতিতে, বিনয় নম্র আচরণে, বন্ধু-বাৎসল্যে, দুঃস্থের সহায়তার সকলের সহিত নির্বিশেষে ভ্রাতৃবৎ আচরণে, হাস্যমুখরতায়, মার্জিত রুচিশুভ্র পরিহাস-চপলতায় সে চরিত্র উজ্জ্বল। বাঙলাদেশের রসিকজন, বিদগ্ধজন, বুধমণ্ডলী, গুণী, কৃতী লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাণতোষ ঘটকের অভাব অনুভব করিবেন, কিন্তু আমরা, যাহারা জীবনের বহু স্নিগ্ধ প্রভাত, প্রখর মধ্যাহ্ন, অলস অপরাহ্ন, লাবণ্যময়ী সন্ধ্যা যাঁহার সহিত অতিবাহিত করিলাম, জীবনের পথযাত্রার নানা পর্বে সুখে-দুঃখে, বেদনায়, আনন্দে, চলার পথের সঙ্গী-রূপে পাইলাম, পাইলাম সুখ-দুঃখের ভাগীদাররূপে, পাইলাম অনুভূতি, উপলব্ধির ভাষ্যকাররূপে, পাইলাম ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু ও গুরুপ্রতিম উপদেষ্টা পথ-প্রদর্শকরূপে হারাইলাম সেই মানুষ প্রাণতোষ ঘটককে। আজ দীর্ঘদিনের এই অটুট সংলাপ শুধু স্মৃতিমাত্র। তবে, আমরা বিশ্বাস রাখি যে, সেই স্মৃতির প্রদীপের দিব্যরশ্মিতে আমাদের মনোমন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠান নিত্যকালের ভিত্তিতে, সেখানে তাঁর চিরায়তের আলো অনন্তের আবেদনে বন্দনা ও আরতি।

জীবনের প্রাণচঞ্চল কক্ষপথ হইতে আজ যিনি মৃত্যুর মহামৌনতায় সমুত্তীর্ণ, সেই রূপের পূজারী, প্রাণ-পিয়াসীর অনন্ত নীরবতা পরমা শান্তির আবরণে আবৃত হউক---সেই আত্মা অমৃতের অনির্বাণ আলোয় জ্যোতির্বিমণ্ডিত হউক---অমৃতের অভিসারে এই মহাযাত্রা বেগবান হউক---যে সহস্রদল-শতদলতুলা চরণচ্ছটায় জগতের সব কিছুর পরিণতি, পরম কারুণিকের সেই সকল আলোর জ্যোতি, সেই সকল রাজার রাজা করুণাঘনের পরমা শান্তিবর্ষী শ্রীচরণে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আকুলতা সমন্বিত আমাদের এই পূর্বোক্ত কামনা অঞ্জলি দিলাম।

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মাসিক বসুমতী আজ মর্মাহত এবং শোকবিহ্বল। মাসিক বসুমতীর প্রাণপুরুষ নবকলেবরের রূপকার প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রকর ও স্বনামধন্য সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের তিরোভাব ঘটেছে। মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার কাজ পূর্বেই হয়ে থাকার জন্য সম্পাদকীয় ও শোক সংবাদ ভিন্ন তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কোন নিবন্ধ, আলোক-চিত্রসমূহ ও তাঁর অঙ্কিত চিত্র বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। মাসিক বসুমতীর আগামী সংখ্যায় লোকান্তরিত সম্পাদক সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ রচনা চিত্রসহ প্রকাশ করা হবে। আশ্বিন সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে আমাদের পরলোকগত সম্পাদক সম্পর্কে লিখছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ দাশ, বিশু মুখোপাধ্যায়, ধারেশচন্দ্র শর্মাচার্য অশোক সেন, সুনীল ঘোষ প্রমুখ। এবং যে সমস্ত লেখক, আলোকচিত্রশিল্পী, চিত্রশিল্পীকে মাসিক বসুমতীর মাধ্যমে একদিন তিনি তুলে ধরেছিলেন, সেইসব লেখক, আলোকচিত্রশিল্পী ও চিত্রশিল্পী তাদের প্রিয় লোকান্তরিত সম্পাদকের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনার মাধ্যমে অর্পণ করবেন। বিশেষ রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের লোকান্তরিত সম্পাদকের বিভিন্ন বয়সের ও সময়ের এবং পারিবারিক আলোকচিত্র মুদ্রিত হবে।

নতুন মহাদেশের মুখ্য মহানগরী

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নিউ ইয়র্ক

গগনস্পর্শী শততলা শহরের এক অসংখ্য অনুবর্তিতা নিয়ে গড়ে উঠেছে আমেরিকার বৃহত্তম মহানগরী। কারো মতে এটি নাকি পৃথিবীরও বৃহত্তম; কেউ আবার জাপানের রাজধানী টোকিওকে সেই মর্যাদা দেন। এটি হচ্ছে মার্কিণ দেশের বিকাশ ও উন্নয়নের প্রতিমূর্তি। এখানে অনেক কিছুই বৃহৎ, মহৎ, বিরাট, বিশাল ও বিপুলের সমাবেশ, তেমনি এখানে নৃশংসতা, নোংরামি, গুণ্ডামি, ভণ্ডামি ও নীচতারও এক আমন্ত্রিক নিদর্শন। নিউইয়র্কবাসীরা এটিকে গতির ও সংস্কৃতির অগ্রণী ব'লে মনে করেন। আর আমরা মাথা উঁচু করে উঁচু বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকি আর ভাবি, ওরা পারে আমরা পারি না। কেন?

বোষ্টনের আমার প্রিয়বন্ধু পজার পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে নিউইয়র্কের বিমান ধরার জন্য বোষ্টনের যখন বিমান বন্দরে পৌঁছলাম তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। আর ঝিরঝির ক'রে ইল্‌শেগুঁড়ির মত বৃষ্টি পড়ছে। নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ বাদে বিমান ছাড়লো। শ্রীমান গৌরাঙ্গ আগরওয়ালা ও শ্রীমান অজিত ভুঁইয়া আমার বস্তুলের মাটি ছাড়া দেবার জন্য কষ্ট ক'রে বিমান বন্দর পর্যন্ত এসেছিলেন। বিমানে ব'সে দেখি, আমার পাশে আসীনা এক তরুণী। হাসিখুশী মেয়েটিকে আমার বেশ ভালই লাগলো। সে যেচেই আমার সঙ্গে পরিচয় করল। তার বাবা-মাকে ছেড়ে সে চলেছে ওয়াশিংটনে কার্য-বৃত্তি শিখতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার ভারতীয় কলম-বন্ধুর লেখা চিঠি পড়তে এগিয়ে দিল। পরের চিঠি পড়ার বীতরাগের প্রভাব তাকে বিন্দুমাত্র সংকুচিত করল না। তখন নাম জানলাম তার—'সুশী'।

প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা সুশী, তুমি কি ভারতবর্ষে যেতে চাও? উৎফুল্ল চোখে সুশী বলল—নিশ্চয়ই। তার সুযোগ খুঁজছি। তবে যখন কিছু টাকা জমাতে পারবো, তখন নিশ্চয়ই যাব। আমার ডায়েরীর ভেতর থেকে আমার নাম-ঠিকানা লেখা ভিজিটিং কার্ডটি দিলাম ও বললাম—তোমার এই অল্প সময়ের মধ্যে আপন করার ভাব আমায় মুগ্ধ করেছে। যদি কোনদিন ভারতবর্ষে যাওয়া সম্ভব হয় ও কলকাতায় যাও, তখন তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করবো ও তুমি আমাদের প্রিয় অতিথি হবে। রাজী? আমাদের ওখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

---আপনার আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম। আমি যত্ন ক'রে রেখে দেবো আপনার কার্ড।
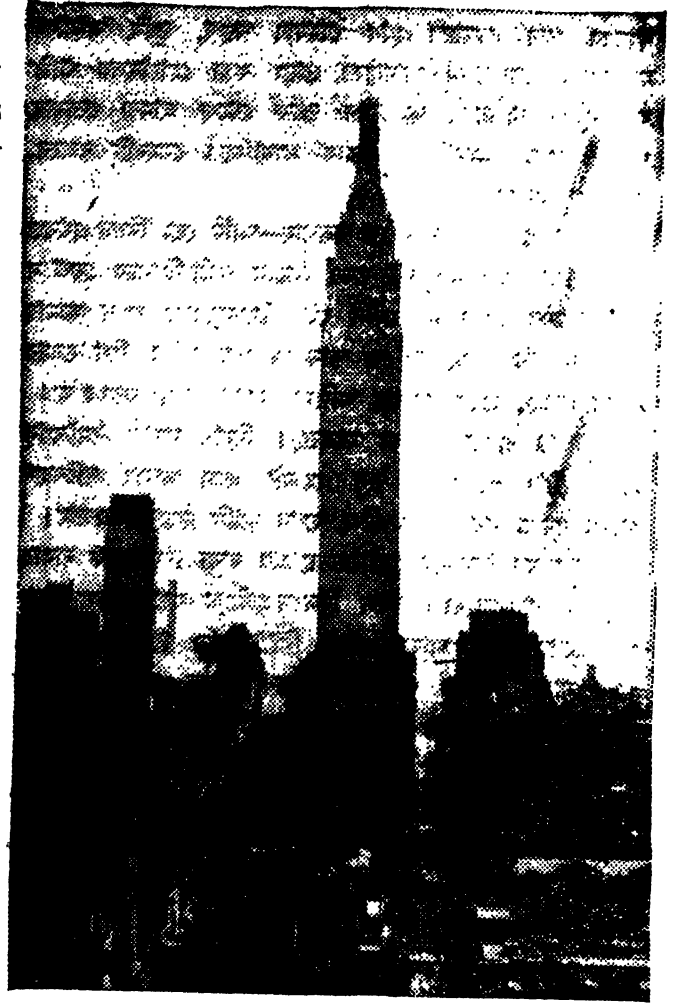
'পজার' হলেন 'মেটকাফে এণ্ড এডী' কোম্পানীর একজন বড় অফিসার। তিনি আমার অর্থনৈতিক অপ্রাচুর্যের কথা স্মরণ রেখে (কেন না তিনি বছর তিনেক বাংলা দেশের ভাত খেয়েছিলেন) কুণ্ঠার সঙ্গে প্রস্তাব করলেন—"তুমি তো যাবে শুক্রবার সন্ধ্যায়, আর নিউইয়র্ক ছাড়বে রবিবার সকালে, তখন আমাদের কোম্পানী থেকে দুজন অফিসার থাকার জন্য 'টিউডর হোটেলে' একখানি পাকাপাকি ঘর ভাড়া করা আছে; আর দুজন অফিসারই শুক্রবার কাজের পর কাজের জায়গা থেকেই নিজেদের গাঁয়ের বাড়ীতে চলে যায়। তার জন্য শুক্রবার বিকেল থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত ঘর খালি পড়ে থাকে। তুমি যদি থাকতে চাও, তা হ'লে আমি টেলিফোনে ব্যবস্থা করছি যে, স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ার এসে তোমায় নিউইয়র্কের বিমান বন্দর থেকে তুলে নিয়ে 'টিউডর হোটেলে' পৌঁছে দেবে। হোটেলটি

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং

শহরের প্রায় কেন্দ্রে। এখন তোমার পছন্দ, তুমি আলাদা ঘর ভাড়া করবে, না আমাদের ভাড়া করা হোটেলের খালি ঘরে দুদিন থাকবে। আমাদের তরফ থেকে আমরা তোমার থাকার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। যেমনটি বলবে, তেমনটি হবে।'

আমি একটু চিন্তা ক'রে বললাম—আমি তো নিজে এখনও কিছুই স্থির করিনি। সব সময় নিষ্কাম কর্মী হিসেবে যেখানে যাই, তাদের উপর নির্ভরশীল হই। তোমাদেরও যখন আমার জন্য অর্থব্যয় হচ্ছে না ও আমারও কম ক'রে বিশ ডলার সাশ্রয় হচ্ছে, তখন তোমার অভিমত মতই ব্যবস্থা করা হ'ক।

থাকার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। বিমান বন্দরে 'মেটকাফ্ এণ্ড এডী'র প্রতিনিধি 'রস্ হোল্ট' এসে আমার পরিবহণ পর্বের সমাধা যখন করে দিল, তখন আমি চিন্তামুক্ত হলাম।

আমাদের বিমানটি দেরীতে ছাড়ার জন্য নিউইয়র্কে নামার অনুমতি পাচ্ছিল না। ফলে বিলম্বে হচ্ছিল সত্য, কিন্তু সময় অপহরণের জন্য আজব শহর নিউইয়র্কের উপর কয়েকবার পাক মারায় আমার একটা নিউইয়র্ক সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ সুবিধা হ'ল। আমার এক বিখ্যাত স্থপতির চিন্তাধারায় বৃহত্তর নিউইয়র্ককে দেখলাম যেন এক সঙ্গে নানা উচ্চতার, নানা আকৃতির—মোটা, চওড়া, পেট মোটা, সরু, লম্বা—যেন বোতল ঘেঁষাঘেঁষি করে বসানো রয়েছে। বোতলগুলো যেন এক-একটা গগনস্পর্শী ভবন। বিমান নামলো, যাত্রী নামলো, মালপত্র নামলো।

আশ্চর্য। কেমন ক'রে অজানা বন্ধুদের তারাও এই অপরিচিতকে এত সহজে চিনে ফেলে ভেবে আমি বিস্মিত হই। 'রসহোল্ট' আমার বড় ব্যাগটা, আর আমি আমার পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষমান তার গাড়ীতে চড়লাম।

উঠে বললাম, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল?

রসহোল্ট—ও কিছু নয়। যেখানে মিনিটে মিনিটে বিমান নামে, সেখানে বিমান ছাড়তে বিলম্বে হ'লে এ ছাড়া গতিও তো নেই।
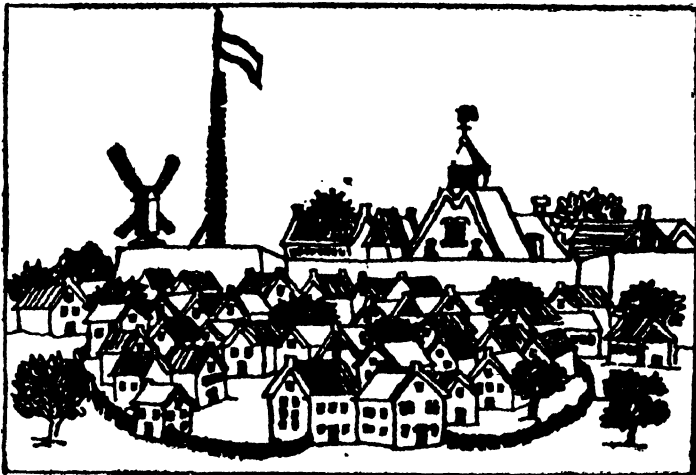
নিউইয়র্ক : আগে

হোল্ট থাকার ব্যবস্থার কথা বললো। পরের দিনের সারাদিনের কর্মসূচী একটা তৈরি করতে বললাম ও রবিবার সকালে বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করার কথাও বললাম।

অভিমন্যু ব্যূহ থেকে বেরুবার পথ জানতো না ব'লে মারা পড়ল। কোথাও এসে আমি ফিরে আসার পথটা আগে থেকে প্রশস্ত করে রাখার পক্ষপাতী। পরে শুনলাম যে, নিউ-ইয়র্কে তখন ট্যাক্সি ধর্মঘট। অতএব রসহোল্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ও নেই।

রসহোল্ট বলে যে, এসব বলার প্রয়োজন নেই। আমার উপরই নির্দেশ আছে এখানে তোমার সমস্ত ভার ও সুখ-সুবিধে দেখার দায়িত্ব আমার। অতএব তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, নির্ভাবনায় ঘুমোও।

বিমান বন্দর থেকে হোটেলের পথে দেখি মাঝে মাঝে বিরাট সাইনবোর্ড—

If you have not Visited Macey
You have not visited Newyork.

'ম্যাসি' একটি বিরাট ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর—যেখানে সব রকমেরই জিনিস একই ছাদের তলায় পাওয়া যায়। লাল-সবুজ আলোর নেভা-জ্বলায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঠোক্কর খেতে খেতে 'টিউডর হোটেলে' পৌঁছলাম 460 ওয়েষ্ট 42nd ষ্ট্রীটে। তিনি আমার ধন-সম্পত্তি দু'দিনের জন্য লিফ্‌টে ক'রে নির্দিষ্ট ঘরে তুলে বিদায় নিলেন।

ঘরে ঘরে এখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র লাগানো। ঘরের ভেতর এত গরম যে, সেখানে টেকা যায় না। কি করি। যন্ত্রটিকে চালিয়ে দিয়ে রাতের আহার পর্ব সমাপনের জন্য রওনা হলাম বাইরে। হোটেলের কাউণ্টারে শহরের মানচিত্র চেয়ে নিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে হোটেলে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে টেলিফোনের ডিরেক্টরী ও নিউইয়র্কের পরিচিত ভদ্রলোকদের ঠিকানা ও নামের তালিকা দেখতে লাগলাম। প্রথমেই নিউ অর্লিনসে হঠাৎ পরিচিত শ্রীপ্রদীপ্ত বাগচীকে আমার মনে পড়লো। সে আমার কাছ থেকে কথা নিয়েছিল যে, নিউইয়র্কে পৌঁছে তাকে যেন খবর দি। এখানে তো প্রায় সবারই টেলিফোন। টেলিফোন ধরলেন শ্রীমতী রুবি বাগচী। পরে এসে বাগচী সাহেব ধরলেন। তাঁকে বললাম আমার নিউইয়র্কে অধিবাস দু'রাত্তির। আজ রাত এমনি কেটে যাবে। কাল সারাদিন নিউইয়র্কে আছি, পরশু দশটার বিমান ধরবো। অতএব একদিন আপনাদের সঙ্গে মিলনের একমাত্র সময় অন্য কথা বলার আগেই তিনি ব'লে নিলেন শনিবার রাত্রে তাঁদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই আসতে হবে। আমি বললাম, "আপনার আদেশ তো মানলাম। এখন আমার ইচ্ছে

আপনি সকাল ন'টায় আমাদের হোটেলে চলে আসুন, আমরা সকলে মিলে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা পরিদর্শনে 'রসহোল্টে'র সঙ্গে যাচ্ছি। তাদের ছেলেমেয়েদেরও আনতে বলেছি। শনিবার তো সবাইয়েরই ছুটি। মার্কিণ মুলুকের শেষ পর্বে কিছু সওদা ক'রে নিতে হবে। তার জন্যও তো একজন পথি-প্রদর্শক ও সহায়কের প্রয়োজন, যিনি আমার প্রয়োজনকে ঠিক অনুভব করতে পারবেন। অন্ততঃ বাংলা কথা বলেও জিবের জড়তা ছাড়ানো যাবে।"

তিনি রাজী হলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের নিউইয়র্ক শাখার সর্বাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দকে টেলিফোন করতে গিয়ে নিরস্ত হলাম। কেন না, আমার একদিনের সীমিত সময়ে ওঁরা কিছু নির্দেশ দিলে তা পালন করতে গিয়ে আমার নিজস্ব কর্মসূচী বিশেষ ক'রে ব্যাহত হবে ও কেনাকাটাও হয়তো সম্ভব হবে না। যাই হোক, ঘুম না আসা পর্যন্ত আমার অসমাপ্ত 'মায়া সভ্যতা'র উপর লেখাটি সমাপ্তির দিকে আনতে চেষ্টা করে কোন এক সময়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে ভোরের নিউইয়র্ক দেখতে ও সকালের প্রাতরাশ সারতে পায়ে হেঁটে চললাম। কাছেই একটা (Automat) অটোম্যাটে ঝোলা গুড় দিয়ে আসকে পিঠে, ব্লুবেরী পাই ও কফি খেয়ে নিলাম। এই আসকে পিঠে হ'ল এখানে যাকে বলে প্যানকেক ও ঝোলা গুড় হল স্থানীয় ঘন 'মেপেল' গাছের রস। যেমন খেজুর ও তালের রস বের করা হয় গাছে খোঁচা গুঁজে দিয়ে। তবে খেজুর ও তালের গাছের ডগায় বিঁধিয়ে দিতে হয়, কিন্তু মেপেল রসের বেলায় গাছের গোড়ার দিকে বিঁধিয়ে দিলেই চলে। তলায় রস ধরার জন্য বালতি ঝুলিয়ে দিতে হয়।

আহারাদি পর্ব সেরে ফিরে এলাম হোটেলের কামরায়। স্নানাদি সেরে নিয়ে জামা-জুতো প'রে ডায়েরী ও চিঠি লেখার পর্ব প্রায় সেরে এনেছি, এমন সময় নীচে থেকে টেলিফোন এল যে 'ভিজিটর' এসেছেন। তাঁদের বসাতে ব'লে আমি দ্রুত নেমে এলাম। দেখি বাগচী সাহেব এসে গেছেন আর এসেছেন হোল্ট সাহেব দুটি ছেলে নিয়ে। আজ মেয়ে দুটিকে আনেন নি। আমরা বিলম্ব না ক'রে বেরিয়ে পড়লাম মোটরে ওয়েষ্ট চেষ্টার কাউণ্টীর দিকে। সেখানের ময়লা পরিশোধনাগার দেখতে। সেটি ঘন বসতির মধ্যে থেকেও স্থানীয় অধিবাসীদের পীড়া দেয় না। প্রথমে যদিও তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল, কিন্তু সুব্যবস্থায় স্থানীয় লোকেরা খুসী। কেন না, এই ময়লাকল তাদেরই নিত্য-প্রয়োজনে লাগছে।

ফেরার পথে মুখে মুখে একটা কর্মসূচী করা গেল। দোকান শনিবার সকাল-সকাল বন্ধ হবার আগে প্রয়োজনীয় সওদা করে নিতে হবে। আর তারপর 'এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং' ও অন্যান্য দর্শনীয় প্রদর্শনশালা দ্রুত দেখে নিতে হবে। তাই চললাম প্রথমেই Maceyতে। সেখানে নানা জিনিষের নীলেম হচ্ছে, অর্থাৎ সস্তায় দিচ্ছে। কতকগুলো টাই, সার্ট, টেপ রেকর্ডারের টেপ প্রভৃতি খরিদ করলাম। ঐ দোকানেই সামান্য খাওয়া-দাওয়া আমরা ছ'জনে সেরে নিলাম ও 'রসহোল্টের' ছেলে দুটিকে দু' বাক্স চকোলেট ও বাড়ীতে দুই কন্যের জন্য আরও দুটি বাক্স দুই ভায়ের হাতে দিলাম তাদের দিতে।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং

'ম্যাসী' থেকে বেরিয়ে আমরা 'এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং'য়ে চ'লে এলাম। পৃথিবীর মানুষে গড়া উচ্চতম বাড়ীতে উঠেই আসা যাক্। বর্তমান পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য যদিও প্রচুর গঠন উপাদানে নির্মিত তবু এতে একটা রুচি ও সৌন্দর্যের পরিচয় আছে। রাতের বেলা এটিকে প্রোজ্জ্বল করতে ১২ কোটি প্রদীপের সমদীপ্ত শিখার আলোক প্লাবনে এর অবয়ব উদ্ভাসিত করা হয়। তার জন্য ১০০০ ওয়াটের আয়োডিন কোয়ার্টজ বাতির ব্যবহার হয়। এই ১৪৭২ ফুট উঁচু ভবনের ১০৫০ ফুট উঁচুতে পর্যবেক্ষণ চাতালে আসতে সময় লাগে আধ মিনিট ও মূল্য লাগে ২৫ সেণ্ট। একদমে এই লিফট্ উঠে যায়, কোথাও থামা নেই। ৮৬তলা থেকে ১২০ তলা পর্যন্ত লাইন দিয়ে লিফ্টে চড়ে উঠে যেতে পারেন ১২৫০ ফুট উঁচুতে। তার উপরে ২২২ ফুট উঁচু ষাট টন ভারী টেলিভিশন সঞ্চারক দণ্ডটি উদ্ধত হ'য়ে দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে টেলিভিশন তরঙ্গ ছড়াচ্ছে। এই ভবনটি তৈরী করতে ৬০,০০০ টন ইস্পাত, ৬০ মাইল জলের পাইপ, ৩৫০০ মাইল টেলিফোনের তার, ৭ মাইল লিফ্টের চোঙ্গা, ৬৫০০টি জানলা, ১৮৬০ ধাপ সিঁড়ি (লিফ্ট খারাপ হলে নামবার বিকল্প ব্যবস্থা)। এর মোট ৩,৭০,০০,০০০ ঘন ফুট আয়তনের ওজন ৩,৬৫,০০০ টন--- যাতে ব্যবহারের জন্য ২০,০০,০০০ বর্গফুট স্থান পাওয়া গেছে। এখানে ২০,০০,০০০ কিলো ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য ২০০জন দাস-দাসী নিযুক্ত। দিনে ৩৫,০০০ লোক দর্শনার্থী হয়ে আসে। এঁরা সাধারণ মান্য-

নিউইয়র্ক ঃ এখন

গণ্যদের মধ্যে নেহরু ও ইন্দিরা, রাণী এলিজাবেথ ও স্বামী ফিলিপস্, শ্যামদেশের রাজা-রাণী, গ্রীসের রাণী, সুইডেনের রাজতনয়া এমনি কত গণ্যমান্য খ্যাতিমানেরা এর নিরীক্ষণ চাতালে দাঁড়িয়ে দূর-দূরান্তের প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখে চলে গেছেন। যখন দাঁড়িয়ে দেখছি, এমন সময় মাথার উপর দিয়ে একটি হেলিকপ্টার চলে গিয়ে PANAM-এর ছাদের উপর আরশোলার মত নামলো ধীরে ধীরে। বিমান থেকে লোক বেরিয়ে এল ও নতুন লোক এসে ঢুকল। একে বলে 'এয়ার ট্যাক্সি'। জনাকীর্ণ নিউইয়র্কের পথ অতিক্রম ক'রে আসার সময় লাঘবের জন্য এই ব্যবস্থা। এর জন্য কিছু অধিক মূল্যও লাগে।

এবার 'রস' পরিবারকে বাড়ী যাবার অনুমতি দিয়ে কাল সকালে আমার অনুরোধ জানালাম যেন তিনি আমায় বিমান বন্দরে সময়ে পৌঁছে দেন। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তিনি আমায় জানিয়ে দিলেন।

এবার আমি বাগচী সাহেবের তত্ত্বাবধানে। তিনি এখানে বেশ কিছুদিন আছেন। 'ফ্র্যাঙ্কলয়েড রাইট' পরিকল্পিত Paul Guggenheim সংগ্রহশালা এক ঘণ্টার মধ্যে সেরে মেট্রোপলিটন মুাসিয়ম্ অব আর্ট দেখতে গেলাম। বিরাট এর সংগ্রহ। কিছু দেখতে না দেখতেই পাঁচটা বেজে যাওয়ায় অভুক্ত হয়ে ফিরে আসতে হ'ল। আকাশে তখন চন্‌চনে রোদ। যাওয়া যাক statue of libcrty দেখতে। সেখানে যাবার জন্য সুড়ঙ্গ পথে দ্রুত বেগে সমুদ্রের ধারে যখন এলাম তখন শেষ খেয়া ছেড়ে গিয়েছে। কাছাকাছি এধার-ওধার ঘুরে বাগচী সাহেবের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে নৈশ ভোজের জন্য সুরঙ্গ পথের ট্রেণে গেলাম। সেখানে কিছুটা বসা যাবে, কথা কওয়া যাবে তাঁদের সঙ্গে।

ষ্টেশন থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে বৃহৎ বহুতল বাড়ীর বাইরের বন্ধ দরজার পাশের দেওয়ালে রাখা কলিং বেল টিপতে শ্রীমতী রুবী সাড়া দিলেন। আমাদের পরিচয় দেয়ালে লাগানো মাইক্রোফোন মারফৎ দিতে তিনি ওপর থেকে সুইচ টিপতেই বাইরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে স্বয়ংক্রিয় লিফটে নিজেরা চালিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট তলায় পৌঁছে কলিং বেল টিপতে শ্রীমতী দরজা খুলে দিলেন। শ্রীমতী রুবী বাগচী কনভেণ্টে পড়া, শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না, সুন্দরী মেয়ে। একটি তাঁদের ছোট্ট মেয়ে। তার সঙ্গে সর্বদা ইংরিজিতেই তিনি কথা কন। তবে আমি বাঙালী পরিবেশে এসে ইংরিজি বলতে নারাজ। মিষ্টি বাংলা কথা শুনব না সব সময়ই ইংরিজি। এ কি আগের শতাব্দের মাইকেল মধুসূদন যে, স্বপ্ন দেখা পর্যন্ত ইংরিজিতে? এঁরা উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী। তাই কলকাতার লোকেদের রুচি ও আভিজাত্যের কাছে নতি স্বীকার করার কোন কারণ না থাকলেও অগোচরে কিছুটা দৈন্য প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। মেয়েদের অন্য যতই কৃতিত্ব থাকুক না কেন, রন্ধন বিষয়ে পারঙ্গমতা অতি বড় শিক্ষিতাও স্বীকার করেন। কলকাতার রান্নার ধরনের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের রান্নাবান্নার হয়তো পার্থক্য

মর্লিন রেনীর প্রতিকৃতি

আছে; কিন্তু আমার কাছে জিহ্বার চেয়ে পরিবেশের মূল্য বেশী। আমার আপন স্নেহ ও প্রীতিপ্রবণতার উদার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছি। কারুর ত্রুটি যে ধরব না, সে কথা তো তাদের জানা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না সংলাপ সুরু হয়। যে জড়তা নিয়ে রুবী দেবী আলাপে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁর রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করতে সে আবরণ সম্পূর্ণ দূর হ'য়ে গেল। তখন তাঁর কৃতিত্বের বিস্তারিত কাহিনী অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। আমি সব সময়ই এক ব্যগ্র শ্রোতা। আমি সবেরই তারিফ করলাম। আমরা পরস্পরে পরস্পরের আচরণে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে গভীর রাত্রে যখন ওঁদের বাসা থেকে বেরিয়ে মধ্যরাত্রের Time Square দেখতে দু'জনে এলাম, শ্রীমতী আমাকে প্রীতির স্মারকস্বরূপ একটি ছোট্ট প্লাষ্টিকের বেহালা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে যে অসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল, তা উদ্‌ঘাটিত হ'ল কলকাতায় এসে। সেটি আকৃতিতে বেহালা বটে, কিন্তু আসলে ওটি একটি ছোট্ট মাপবার ফিতে। Time Square-এ সুড়ঙ্গ পথে এলাম। এই সেই প্রদীপ্ত আলোয় প্রোজ্জ্বল টাইমস্ স্কোয়ার, রঙ্গজগতের চঞ্চল প্রাণকেন্দ্র Time Square! টাটকা সংবাদ চলমান আলোক রেখায় পরিবেশিত Time Square মধ্যরাত্রেও লোকের ভিড়ের অন্ত নেই। পথচারীরা অনেকে বিশেষ তরল হয়েছেন, তাঁদের চলনে-বলনে। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে চলে এলাম Tudor হোটেলে। বাগচী সাহেবকে বললাম, আপনার সঙ্গে দু'দিনের সঙ্গ পেলাম ইংরিজি মতে। কেন না, রাত বারোটা বেজে গেছে। এত যে আমার জন্য করলেন তা অকপটে স্বীকার করে আপনাকে লজ্জিত করব না। শ্রীমতীকে নমস্কার, ছোট্টটিকে চুমু।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅরবিন্দ এবং বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ

সমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশী যুগে যে-সমস্ত বরেণ্য বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের পাশে জড়ো হয়ে দেশমাতৃকার শৃংখলমোচনে সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। শ্রীঅরবিন্দ তখনও ঋষি হন নি, থাকতেন কলকাতার ২৩নং স্কট্‌স্ লেনে। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক হিসাবে তাঁর নাম তখন বিপ্লবী-মহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত। অমরেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম সুহৃদ, প্রখ্যাত লেখক ও স্বদেশপ্রেমিক উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। অমরেন্দ্রনাথ (যিনি ছিলেন প্রায় সকলের 'অমরদা' বা 'গোবিনদা') এমন উচ্চস্তরের মানুষ ছিলেন, যাঁকে শ্রদ্ধা না করে, ভাল না বেসে পারা যায় না। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর চরিত্রমাধুর্যে ও ঐকান্তিক দেশ-প্রেমে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিপ্লববাদে দীক্ষা দেন। শুধু বিপ্লবী জীবনেই নয়, আমৃত্যু তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের একান্ত ভক্ত। শ্রীঅরবিন্দের গভীর স্নেহ-ভালবাসা আর শুভেচ্ছা - আশীর্বাদ ছিল এই মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকের প্রধান সম্পদ। অমরেন্দ্রনাথের সহধর্মিনী কমলবাসিনী দেবীর কাছে শুনেছি, তিনজনের প্রভাব অমরেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল সর্বাধিক। এই তিনজন হলেন তাঁর মা সরলা দেবী, চার্চ কলেজের স্টিফেন সাহেব এবং শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর প্রথম বিপ্লব তাঁর অন্তর্জীবনের বিপ্লব—যাঁর মৌল প্রেরণা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। আর উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এই মনীষীর সঙ্গে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বলে তাঁর প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে, ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম উত্তরপাড়ায় আসেন এবং ধর্মরক্ষিণী সভায় জাতীয়তা ও সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শ্রীঅরবিন্দকে উত্তরপাড়ায় নিয়ে আসবার অনেকগুলি কারণ ছিল। তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মিছরিবাবুকে (রাজেন্দ্রনাথ) বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করা। মিছরিবাবু রাজ-নন্দন হয়েও ছিলেন তেজস্বী, মুক্তহস্ত এবং স্বদেশপ্রেমিক। বিপ্লব-আন্দোলন পরি-চালনার জন্য তখন সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল অর্থের। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে মিছরিবাবু ও বিপ্লব-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করবেন--এই আশা নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেন

ব্যর্থ হয় নি তাঁর পরিকল্পনা। খুশি মনেই বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্যের ভার নিয়েছিলেন মিছরিবাবু। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, কুখ্যাত কিংসফোর্ড সাহেবকে মারবার জন্য যখন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে পাঠান হয়, তখন অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে মিছরিবাবু তিনশো টাকা দান করেন। মিছরিবাবুর মতো বেশ কিছু ধনী যুবক গোপনে বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করতেন। এঁদের মধ্যে খ্যাতনামা ব্যব-সায়ী ৮ভবতোষ ঘটকও ছিলেন অন্যতম। অমরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন--'১৯০৮ সালে যখন মাণিকতলার বোমারু দল গ্রেপ্তার হয় এবং যখন শ্রীঅরবিন্দকে নেতা করিয়া তাঁহাদের বিচার হয় তখন হইতে ভবতোষের সহিত আমার রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সময় প্রয়োজনবোধে ভবতোষের নিকট যাইয়া অর্থ সাহায্য লইয়া আসি গুপ্ত সমিতির জন্য ব্যয় করিতাম। ভবতোষ এ বিষয়ে চিরদিনই মুক্তহস্ত ছিল।' (বিপ্লবীর চোখে জনৈক ব্যবসায়ী - অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬৮)। দেশের মুক্তি-আন্দোলনে এইসব নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।
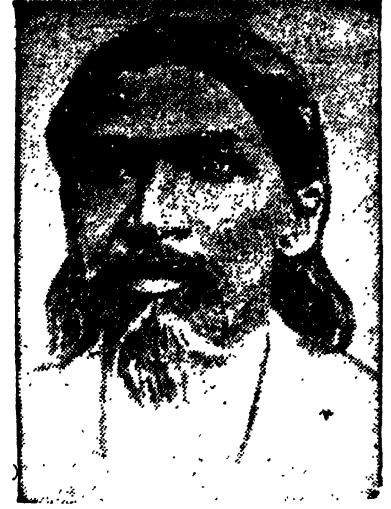
শ্রীঅরবিন্দ

ঐ বছরই (১৯০৮) সংগঠিত হল মজঃফরপুরের ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড। পুলিশ আবিষ্কার করে ফেলল মাণিকতলার বোমার আড্ডা। গ্রেপ্তার বরণ করলেন আটত্রিশজন বিপ্লবী ও কর্মী। রেহাই পেলেন না শ্রীঅরবিন্দও। ১৯০৮ সালের ২রা মে ভোরবেলা তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায় যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগানের নির্দেশে তাঁকে চোরের মতো হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে দ্বিধা করে নি ইংরেজ সরকারের পুলিশ। পরে অবশ্য হাতকড়ি ও দড়ি খুলে নেওয়া হয়। অমরেন্দ্রনাথ সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলেন। বিপ্লবী কর্মী ও শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেরিয়েছেন পথে পথে। সন্ধ্যাবেলা

কাকার বাড়ী যেতেই ব্যাকুল প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর ঠাকুমা --'অরবিন্দকে হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেছে?' উত্তর দিয়েছিলেন ক্রোধান্ধ অমরেন্দ্রনাথ -'শত্রু শত্রুতা করতে সম্মান দেবে কেন? সমস্ত জাতি যখন লাঞ্ছিত তখন অরবিন্দের লাঞ্ছনায় দুঃখ কি?'

উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে অমরেন্দ্রনাথকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে নি। (যদিও তাঁর বাড়ি সার্চ করা হয়েছিল)।

এক বছর পরে, অর্থাৎ ১৯০৯ সালের ৬ই মে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন। দেখা করতে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। ধর্মরক্ষিণী সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে ভাষণ দেবার জন্য জানালেন সাদর আমন্ত্রণ। শ্রীঅরবিন্দ রাজী হলেন।

১৯০৯ সালের ৩০শে মে উত্তরপাড়ার ধর্মরক্ষিণী সভায় শ্রীঅরবিন্দ যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তা তাঁর 'Uttarpara Speech' রূপে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে। কারাগারে তাঁর নবজীবন লাভ, বিরাট মানসিক পরিবর্তন এবং নারায়ণ দর্শনের কথা এখানেই তিনি প্রথম প্রকাশ করেন।

সভায় শ্রীঅরবিন্দকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 'আবাহন' নামে একটি কবিতা (লেখকের নাম অজ্ঞাত) পাঠ করা হয়। কৌতূহলী পাঠকের জন্য কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল।

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হে ধর্ম, হে পুণ্য,
নবীন বেশে এসো হে।
হে মহান, এসো,
শান্তির মত কলহে।
এসো হে সুন্দর,
মিলন সম বিরহে --
হে বিরাট, হে সংযম,
আজি এসো, এসো হে।
বাজুক মঙ্গলশংখ তব আগমনে
মুখরিত সামগান পূত তপ কাননে,
তব পদরজস্পর্শে হোক মুঞ্জরিত,---
তব বাঁশরীর তানে হোক সঞ্জীবিত,
নীরস জীবন কুঞ্জে, নিস্পন্দ চেতন।
এসো ফিরে এ সংসারে হারানো রতন.
ধূপেরই মত পূত সৌরভ বিলাতে,
হে বরেণ্য নবীন আশা ভরসা সাথে,
পূর্ণ সম দৈন্যে, - আলোক সম আঁধারে
"আজি অবনত ভারত চাহে তোমারে"।

[অমরেন্দ্রনাথ প্রকাশিত 'কর্মযোগিন', ভাদ্র ২০, ১৩১৬]

'আমি ঈশ্বরের দেখা পাই না কেন?' ভক্ত অমরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল প্রশ্ন করেছিলেন। স্মিত হেসে যোগীশ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ দিয়েছিলেন--'দেখবার আকুতি হলেই তিনি দেখা দেবেন।' উপদেশ দিয়েছিলেন--'গীতার কথা ভুলো না। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে কাজ করলে সিদ্ধি অনিবার্য।'

মহাগুরুর এই উপদেশামৃত আজীবন পালন করেছিলেন ভক্ত দেশপ্রেমিক। নিষ্কাম কর্মযোগী হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ জনজীবনে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে শ্রীঅরবিন্দ খবর পান যে পুলিশ তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করতে পারে। 'Dupleix' নামে এক ফরাসী স্টীমারে চেপে তিনি পণ্ডিচেরী রওনা হন। শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা ত্যাগে যাঁরা সর্বাধিক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা হলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মতিলাল রায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ বিশ্বাস (অমরেন্দ্রের সহকারী বসন্ত বিশ্বাসের ভাই), কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুকুমার মিত্র, নগেন্দ্র গুহরায় এবং অনেক ডাক্তার। এঁদের সকলেরই দান অসামান্য। বিদায়কালে জাহাজে খরচের জন্য অমরেন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে কিছু অর্থ প্রদান করেন। তা ছাড়া প্রায়ই পণ্ডিচেরীতে তাঁর নামে অমরেন্দ্রনাথ অর্থ এবং বস্ত্রাদি প্রেরণ করতেন।

এর পর আর দীর্ঘকাল দু'জনের সাক্ষাৎ হয় নি। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের অন্যতম পুরোধা ছিলেন বলে অন্যান্য বিপ্লবীদের মতো অমরেন্দ্রনাথকেও ছদ্মবেশে দীর্ঘদিন অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়েছিল। ১৯২১ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে রাজবন্দীরা প্রায় সকলেই মুক্তি পেলেন। ফিরে এলেন অমরেন্দ্রনাথের সুহৃদ উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবিবৃন্দ। অমরেন্দ্রনাথ তখন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে (নাম খুব সম্ভব স্বামী কেবলানন্দ) তাঞ্জোর আশ্রমে বাস করছেন। তিনি স্থির করলেন পণ্ডিচেরী গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নেবেন।

পণ্ডিচেরী আশ্রমে একদিন এসে দাঁড়ালেন এক অনিন্দ্যকান্তি জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী আত্মপরিচয় দিতেই প্রত্যক্ষদর্শী নলিনীকান্ত গুপ্তের ভাষায় 'একটা উৎসাহের, বিস্ময়ের এবং কথঞ্চিৎ আশঙ্কার তরঙ্গ উঠে গেল-- আশঙ্কা এজন্যে যে, কথাটা বাইরে জানাজানি হয়ে গেলে ফরাসী তথা বৃটিশ সরকার কি করে ফেলবেন তার ঠিক নেই' (স্মৃতির পাতা)। জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে ইংরেজ সরকার যাঁর নামে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, সারা ভারত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাঘা বাঘা গোয়েন্দা পুলিশ যাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি--সেই বিখ্যাত অমর চাটুজ্যে স্বশরীরে পণ্ডিচেরী আশ্রমে উপস্থিত।

মতিলাল রায় তখন পণ্ডিচেরীতেই ছিলেন। তিনি অভ্যর্থনা করে অমরেন্দ্রনাথকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। অমরেন্দ্র-

সোভিয়েত রাশিয়ায় সংস্কৃত চর্চা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের চর্চা যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তার কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রুশীদের শ্রদ্ধা মনোভাব। অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত আগে রাশিয়ায় ভারতবিদ্যা (Indology) অনুশীলনের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল—যেখানকার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি। এই কেন্দ্রে যে দু'টি প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, সে দু'টি হল—সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব ও বৌদ্ধ-ধর্ম। অধ্যাপক মিলার ও ফরটুনেটভএর তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য স্থান তাঁদের দ্বারা সুস্থাপিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ ও তিব্বতে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে রাশিয়ার যে সব পণ্ডিত গবেষণা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভি বশিলিয়েভ, আই মিনায়েভ, এফ শেরবাৎস্কি ও এস ওল্ডেনবার্গের নাম প্রথম সারিতে গণনা করা যেতে পারে। উনবিংশ শতকের তৃতীয়ার্ধে রাশিয়ার খারকোভ, কিয়েভ, ওদেশা ও তার্তু প্রভৃতি শহরে ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে লেনিনগ্রাদ ও মস্কোভেও সংস্কৃতচর্চার প্রসার হতে থাকে। লারলিন, শোর, ঝিভের প্রভৃতি গবেষণারত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ সংস্কৃতভাষার মাধ্যমেই যে ভারতের ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের মূলোদ্‌ঘাটন করা যায়, তা দেখাতে গিয়ে বহু তথ্য-মূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ভারতবিদ্যার প্রচার ও প্রসারে সোভিয়েত সরকারেরও উৎসাহ কম ছিল না এবং স্বদেশের ভারততত্ত্ববিদ্‌গণকে তাঁরা সকলপ্রকার সাহায্য দিতে দ্বিধা করতেন না। এই প্রসঙ্গে একজন সোভিয়েত ভারতবিদ্যাবিদ্ জি জি কোতোভ্‌কি বলেছেন—

"Indology became a truly comprehensive discipline only after the October Revolution. The Soviet Government showed great concern for the work being done by Russian Orientalists and provided them with every possible assistance. V. I. Lenin, founder of the Soviet State, attached great importance to the study of the Orient."

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি সোভিয়েতবাসী পণ্ডিতদের অনুরাগ-পূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নোভিৎস্কি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষণীয় মূল্য সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লেখেন এবং দর্শন ও ধর্মের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বিষয়ে স্বাভিমত ব্যক্ত করার সময় সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বহু উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করেন। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে আবার বৌদ্ধ দর্শনের দিকেই সোভিয়েতবাসীদের আগ্রহাতিশয্য দেখা যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভি পি বশিলেভ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে একটি বিরাট গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এস এফ ওল্ডেনবার্গ এবং শের-বাৎস্কি Bibliotheca Buddhica নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমপ্রসূত এই গ্রন্থটি বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যের আকর। গ্রন্থটি পিটার্সবার্গ শহর থেকে প্রকাশিত হয়। শেরবাৎস্কি প্রধানতঃ বৌদ্ধ দর্শন ও প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। কালক্রমে বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক হিসাবে তাঁর নাম সর্বত্র স্বীকৃত হয়। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু শেরবাৎস্কিকে 'a universally recognised authority on

---

নাথের সঙ্গে ছিল পাঁচজন ভক্ত-শিষ্য। তারা ফিরে গেল।

বহুদিন পরে গুরু-শিষ্যে সাক্ষাৎ হল। তাঞ্জোর আশ্রমে অমরেন্দ্রনাথ ধর্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত বক্তৃতা দিতেন, তা 'Speeches of a Sadhu' নামে ছাপা হত। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—'ভাইতো ভাবি Speeches of a Sadhu-র সাধুটি কে।' বিশ্রাম এবং নানা বিষয়ে আলোচনার পর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ খেতে বসলেন। মাছ, মাংস এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হল। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 'দেখি কেমন নির্বিকার হয়েছো।'

চিরকাল নিরামিষভোজী অমরেন্দ্রনাথ সেদিন দ্বিধাহীন মনে তৃপ্তি সহকারে মাছ আর মাংস খেয়েছিলেন। খুশি হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। জানিয়েছিলেন, 'তুমি সংস্কারমুক্ত হয়েছো কিনা দেখেছিলুম।'

শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে চন্দননগরে ফিরে যেতে বললেন। বিদায়কালে জানালেন, 'পণ্ডিচেরী আশ্রমের দ্বার তোমার জন্য খোলা রইল, যখন খুশি এসো।'

অমরেন্দ্রনাথ শ্রীমায়ের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন।

পরবর্তীকালে দেশের রাজনীতির সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরম সাধক শ্রীঅরবিন্দ এবং পরমা সাধিকা শ্রীমা'র তিনি ছিলেন একান্ত অনুগত এবং তাঁদের জ্যোতির্ময় আদর্শই ছিল তাঁর জীবন-পথের পাথেয়।

ndian philosophy বলে অভিহিত করেছেন। শেরবাৎস্কি প্রধানত: যে তিনটি গ্রন্থের জন্য আজ ও বিশ্বৎসমাজে অভিনন্দিত, সে গুলি হল—প্রথমত:—'The central Conception of Buddhism and the meaning of the word Dharma'. গ্রন্থটি লণ্ডন থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত: ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লেনিনগ্রাদ থেকে প্রকাশিত 'The conception of Buddhist Nirvana এবং তৃতীয়ত: ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে লেনিনগ্রাদ থেকে দু' খণ্ডে প্রকাশিত 'The Buddhist logic' গ্রন্থটি।

সাম্প্রতিক কালে Institute of philosophy of the USSR Academy of sciences থেকে ছয় খণ্ডে 'এ হিষ্ট্রি অফ্ ফিলজফি' প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য বহু আলোচনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে জি, এফ, ইলিন ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের উপর 'Hinduism, Buddhism, Jainism, etc.' গ্রন্থগুলি রচনা করেন। গ্রন্থগুলি রুশ ভাষায় রচিত এবং গ্রন্থগুলি বিষয়বস্তুর মধ্যে লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। আরও কয়েক বছর পরে এ, এম, পাটিগোর্‌স্কি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ই, আই, গোস্তেয়েভা-র বৈশেষিক দর্শনের উপর গ্রন্থটি। সোভিয়েতের ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের কাছে ভারতীয় দর্শন যে কত সমাদৃত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এ, ডি, লিট্‌ম্যান এক প্রবন্ধে বলেছেন—

"While Hegel deprived Indian Philosophy of the very right to be called a Philosophy, Russian scholars showed an original philosophical end in the development of social thought in India."

প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য, নাটক ও অন্যান্য কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে সোভিয়েতের ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের জিজ্ঞাসা অনেক দিনের। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকেই প্রাচীন ভারতের অনেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনামূলক রচনাও অনেক প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে অধ্যাপক পি, পেত্রভ লিখিত 'On the Holy literature of Trans-Ganges India এবং On the Holy literature of the Hindus' রচনা দুটি উল্লেখযোগ্য। আই, পি, মিনায়েভ-এর Survey of key Documents of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ রচনাগুলি সংক্ষেপিত আকারে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে আছে বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এবং বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ-গুলি। খারকোভবাসী ভারততত্ত্ব-বিদ্ পি, জি, রিত্তের 'কালিদাস ও মেঘদূত' এবং 'দণ্ডী ও দশকুমার-চরিত' সম্বন্ধীয় মনোজ্ঞ সমালোচনা প্রকাশ করেন। প্রাচীন রাশিয়ার গল্প কাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় গাথা-উপগাথার সম্পর্ক নিরূপণে কয়েকজন পণ্ডিত উদ্যোগী হন। এঁদের মধ্যে এফ, আই, বুলগাকোভের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে যে সমস্ত সোভিয়েত পণ্ডিত ভারতবিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছেন—ও ভলকোভা, পি গ্রিন্‌ৎসের, আই রবিনোভিচ্, আই সেরেব্র্যাকোভ, এ সিরিকিন এবং আই এরম্যান। প্রাচীন ভারতের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে এঁদের ঔৎসুক্য ক্রমাগ্রগতির দিকে প্রসারিত। ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে এঁদের মনোভাব ই পি চেলিশেভ নামক রুশ সমা-লোচকের ভাষায় অতি অল্প কথায় ব্যক্ত হয়েছে।

"....they (Soviet Indologists) regard the ancient Indian heritage of India not as a pertified miracle of bygone times but as a living and growing tradition that exerts a fruitful influence on present-day literature and remains an inexhaustible source of literary and cultural development of contemporary India."

ভারতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক শাখায় সোভিয়েত ভারতবিদ্যাবিদেরা বিচরণ করেছেন এবং ভারতীয় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও অনুবাদ কাজে তাঁদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে অনেক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছেন। অবশ্য একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাশিয়ার প্রথম যুগে যে সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য অনূদিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই পাশ্চাত্য ভাষা থেকে। প্রায় দেড়শ বছর ধরে রাশিয়ায় এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে এই কাজ ক্রমোৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এ, এ, পেত্রভ ভগবদ্‌গীতার রুশ-অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ কাজ করেন রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক এন, এম, করমজিন। ইনি জার্মান ভাষা থেকে এই অনুবাদ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার কবি ভি, এ, জুকোভস্কি মহাভারতের 'নল ও দময়ন্তী' উপাখ্যান কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। রুশ কাব্য জগতে এই কাব্যটির স্থান অতি উচ্চে। সোভিয়েতের আর একজন খ্যাতনামা কবি কে, বলমোন্ত অশ্-ঘোষ ও কালিদাসের অনেক কাব্যাংশ অনুবাদ করেন (১৯১৩-১৯১৬)।

পিটার্সবার্গ শহরে 'এশিয়ান মিউজিয়াম অফ্ দি রাশিয়ান্ একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস্'-এ অনেক দুষ্প্রাপ্য

সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল, আর, কে, লেনৎস্ এবং অন্যান্য ভারতবিদ্যাবিদেরা দীর্ঘদিন ধরে এই পুঁথিগুলির বিস্তৃত বিবরণ ও প্রকাশন ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন (১৮০৮-৩৬)। পি, ওয়াই, পেত্রভ (১৮১৪-৭৫) একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি প্রথমে কাজান নগরে ও পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি 'ঘটকর্পর কাব্য', 'গীতগোবিন্দ' এবং আরও অনেক সংস্কৃত কাব্য ও মহাকাব্যের অনুবাদ ক'রে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে রুশ-অনুবাদের পথ-প্রদর্শক হন। কে, এ, কোসোভিচ্ (১৮১৫-১৮৯৩) ঋগ্বেদ, মহাভারত ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগর-এর সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করেন। বিখ্যাত রুশ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বথলিংক-এর (১৮১৫-১৯০৪)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর Great Petersburg Dictionary of Sanskrit গ্রন্থটির জন্য। এই গ্রন্থের সম্পাদনায় তাঁকে সাহায্য করেন উইলিয়াম রোথ। ১৮৫২ থেকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত— এই দীর্ঘদিন ব্যাপৃত হয়েছিল উক্ত গ্রন্থটির সম্পাদনায়। এছাড়া বথলিংক-এর তত্ত্বাবধানে কালিদাসের শকুন্তলা (১৮৪২), শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক (১৮৭৭), কয়েকটি প্রধান উপনিষদ্ এবং গোপদেব ও পাণিনির ব্যাকরণ (১৮৮৭) রুশ অনুবাদ ও টীকা সহ প্রকাশিত হয়। বথলিংক-এর মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রাশিয়ার গর্বের স্তম্ভ। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সম্পাদনায় ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর প্রকৃত পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক।

বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে লেনিনগ্রাদের কয়েকজন ভারততত্ত্ববিদ্ সম্মিলিতভাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করেন। এই গ্রন্থ সম্পাদনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রার উপাদান সংগ্রহ করা। রাশিয়ার মহিলা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর, ও, শোর (১৮৯৩-১৯৩৯) অনেক সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধান, গ্রন্থপ্রকাশ ও অনুবাদ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঋগ্বেদের ভাষার উপর তাঁর একটি গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ হয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। পঞ্চতন্ত্র ও শিবদাসের বেতাল পঞ্চবিংশতির অনুবাদ ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কৃতি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত আখ্যান, উপাখ্যান ও রূপকথার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন আধুনিককালের রুশ ভারতবিদ্যাবিদ্ বি, এল, ওগিবেনিন, এ ভি গেরাসিমোভ, এ, ওয়াই সিরকিন প্রভৃতি। মহাভারতের উপর গবেষণা করেছেন ভি আই কলিয়ানোভ। তিনি মহাভারতের কয়েকটি খণ্ডের অনুবাদ করেন এবং রামায়ণ-মহাভারতের উপর কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রামায়ণ-মহাভারতের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন পি, এ, গ্রিন্‌ৎসের। এল, ডি, সেরেব্রিয়াকোভ কালিদাসের রঘুবংশের রুশ অনুবাদ ক'রে (১৯৪০) খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

সংস্কৃত নাটক ও গীতি কবিতার উপর রুশ ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের গবেষণা কাজ কম উপেক্ষণীয় নয়। ভি আই কলিয়ানোভ, ভি কে এরমান, আই এস রবিনোভিচ্ কালিদাসের নাটকগুলির অনুবাদ ও আলোচনা করে কালিদাসকে রাশিয়ায় খুব জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এরমান বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটির অনুবাদ করেছেন। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কবি ভর্তৃহরির উপর আলোচনা ও প্রখ্যাত সংস্কৃত কবিদের উল্লেখযোগ্য রচনাংশের অনুবাদ করে যাঁরা খ্যাত হয়েছেন, তাঁরা হলেন ও, এফ, ভলকোভা ও আই, ডি, সেরে, সেরেব্র্যাকোভ। অমরুশতকের মনোজ্ঞ অনুবাদ করেছেন মহিলা সংস্কৃতজ্ঞ কবি ওয়াই. এম, অলিখানোভা। জয়দেবের গীতগোবিন্দের সটীক অনুবাদ ও আলোচনা করেছেন এ, ওয়াই, সিরকিন। ইনি বাৎস্যায়নের কামসূত্রেরও অনুবাদ করেন এবং ভারতীয় সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক কি রকম ছিল সে সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনা করেন।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর রুশ পণ্ডিতদের গবেষণা কাজ অল্প হলেও খুব নগণ্য নয়। ওয়াই, এম, অলিখানোভ আনন্দ বর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' ও অভিনব গুপ্তের 'লোচন'-এর অনুবাদ করেন এবং এঁদের পথানুসারে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ধ্বনিবাদ আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি মাতঙ্গ, নারদ ও শার্ঙ্গ দেবের সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র আলোচনায় পি, এ, গ্রিন্‌ৎসের-এর নামও স্মরণযোগ্য। ভরত, অভিনব গুপ্ত ও অন্যান্য সংস্কৃত আলংকারিকেরা কাব্যের সংজ্ঞা ও রসস্বরূপ বিচার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা-ই সংক্ষেপিত আকারে স্বদেশবাসীর কাছে ইনি মাতৃভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। ভরত, ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথের আলোচিত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রুশ ভাবান্তর করেছেন ভি, জি এরমান। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ছন্দের উপর গবেষণা-ব্যাপারে রুশ ভারতবিদ্যাবিদেরা এখনও খুব একটা অগ্রগতি দেখাতে পারেন নি, তবে এ দুটি বিষয়ে তাঁদের অনুসন্ধান কাজ ক্রমোন্নতি পথে। ভি, এ, কোচারগিনা সোভিয়েতের সংস্কৃত ভাষা জিজ্ঞাসুদের জন্য একটি প্রাথমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছেন (১৯৫৬)। কয়েক বছর ধরে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণগত ও ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করছেন ই এ মকায়েভ। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে ভি, ভি, আইভানোভ ও ভি, এন, তোপোরোভ-এর যুগ্ম সম্পাদনায়। টি, ওয়াই. এলিজারেনোকোভা পালিও

হে ধরিত্রী

বন্দে আলী মিয়া

পথশ্রমে ক্লান্ত আমি হে ধরিত্রী বিছাও আসন
শ্যামল প্রান্তর 'পরে চলে যেথা তৃণের বিলাস
জর্জর সকল তনু—মুদে আসে দুইটি নয়ন
বিশ্রামের দাও আজি সেথা মোর গাঢ় অবকাশ।

ধরিত্রী জননী মোর তব স্নেহ পক্ষপুট তলে
আমারে আবৃত করো—দাও মোরে প্রশান্তি গভীর।
নির্বাণ লভেছি আমি, মুক্তি চাহি আজি অশ্রুজলে
বিস্বাদ জাগিছে মনে লোভাতুর বান্ধবের ভিড়।

সংসার-অনল আর দুঃখের বিষে মোর কায়া
দগ্ধ হয়ে গেছে হায়—চাহে নাকো কেহ তার পানে;
সকলে খুঁজিছে স্বার্থ, করে নাকো এতটুকু মায়া
ভালো কেহ বাসেনা কো—আসে শুধু বিলাস সন্ধানে।

জীবধাত্রী মাতা অয়ি নাহি স্বার্থ তোমায় আমায়
তুমি শুধু দিয়ে গেছ—চাহোনি কো কভু তার ফিরে—
কৃতঘ্ন সন্তান আমি, ক্ষমা করো আজি অবেলায়
স্থান দাও এতটুকু স্নেহাতুর রক্ষ কোণে তব

সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে উভয় ভাষার প্রকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র কোথায় ও কখন ছিল, সে সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানের ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার সম্পর্ক সুললিতভাবে বুঝিয়েছেন বিদুষী রুশ ভারততত্ত্ববিদ্ ভি, ভি, বেত্রোগ্রা-দোভা। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাগুলি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান।

বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থগুলির অধিকাংশই আজ রুশ পণ্ডিতদের দ্বারা অনূদিত এবং সোভিয়েতের ভারতীয় ধর্ম অনুসরণকারীদের কাছে বিশেষ-ভাবে আদৃত। রাশিয়ার অনেক মিউজিয়াম ও লাইব্রেরিতে বহু বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি পুঁথি সুরক্ষিত। আস্তে আস্তে এগুলিরও অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এ কাজে যাঁরা আজ প্রধান উদ্যোগী তাঁরা হলেন ভি এস ভোরোবেয়েভ, জি এম বনগার্ডলেভিন, ও এফ ভোলকোভা এবং ই এন টেমকিন। ভোলকোভা আর্যশূরের 'জাতকমালা'র রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেছেন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এমন কোনও শাখা নেই, যেদিকে রাশিয়ার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় নি। সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সকল দিকেই তাঁদের জিজ্ঞাসু ও সপ্রশংস মন আকৃষ্ট হয়েছে। এই কাজে তাঁদের বহু কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট পথ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হন নি। ভারত সম্বন্ধে জানার কৌতূহল রাশিয়ায় প্রাক্-বিপ্লব যুগেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণতা পেয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের পরে। গেরাসিম লেবেডফ, অধ্যাপক আই মিনায়েভ, পণ্ডিত শেরবাৎস্কি, ওল্ডেনবার্গ প্রমুখ মনীষী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান কাজের সূচনা করেছিলেন, তার অনুসরণ আজও ক্রমবর্ধমান। তাঁদের এই অদম্য উৎসাহের মূলে যে প্রবল মনোভাব বিশেষভাবে কার্যকরী, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিখ্যাত রুশ ইতিহাসাধ্যাপক ভি বালাবুশেভিচ্ 'Soviet studies of India' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন---

"Soviet people have always shown keen interest in the life of the Indian people, their history and present development, their culture and art. They have always sympathised with their struggle for independence and building a happy future. The ties between the two peoples have since long become traditional; they are constantly growing in scope and strength." *

---

* এই রচনায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ-গুলি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে---

(১) G. G. Kotovky—Soviet Indology: Ways and Stages of development.
(২) A. D. Litman—Studies in the Socio-Political and Philosophical thought of India.
(৩) E. P. Chelyshev—On the Translation of Indian literature in the USSR.
(৪) A. Y. Syrkin—Studies of Ancient Indian Texts in the USSR.
(৬) M. S. Andronov—Studies in Indian languages.

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র কি সাপুড়েও ছিলেন?

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

সর্প-বিশারদ নয়, সাপুড়ে কথাটার উপর জোর দিতে চাই। শরৎ জীবনের অনেক কথা আমরা জানি না। প্রশ্ন জাগে, শরৎচন্দ্র কি তাঁর জীবনের কোন সময়ে সাপুড়ে হয়েছিলেন? সাপ-ধরা আদি কাজ দক্ষতার সঙ্গে নিজহস্তে করতে তিনি কি অভ্যস্ত হয়েছিলেন? শরৎসাহিত্যে সাপের যেসব তথ্য আমরা পাই, তা' বই-পড়া বিদ্যে নয়, দূর থেকে দেখা জ্ঞান নয়, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা দিয়ে পুষ্ট নিছক অভিজ্ঞতা। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র যে তাঁর প্রথম জীবনের কিয়দংশ অতি উৎসাহের সঙ্গে সাপুড়ে-পরিবারে মিশে সাপ-ধরা আদি কাজ করতে শিখেছিলেন, প্রকারান্তরে তিনি তা' নিজেই স্বীকার করে গেছেন ব'লে মনে করি। কিন্তু সে কথা আলোচনার আগে শরৎ-জীবনের সাপ সম্পর্কীয় দু-চার কথা কৌতূহলোদ্দীপক হবে ব'লে ব'লে নিতে চাই।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রকে একবার সাপে দংশন করেছিল। বহু কষ্টে সেবার তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। এর পর থেকেই সাপের উপর শরৎচন্দ্রের কেমন একটা রাগ জন্মে। সাপ ধরা ও মারা তাঁর কাছে একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সহজে সাপ ধরার কৌশল একটা বইতে তিনি পড়লেন। বেলগাছের শিকড় সাপের মুখের কাছে ধরলে যতই বিষধর সাপ হ'ক না কেন, শিকড়ের গন্ধে সে মাথা নুইয়ে ঝিমিয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে বালক শরৎচন্দ্র ব্যাপারটা হাতে-নাতে পরীক্ষা করতে উদ্যত হলেন। বেলগাছের শিকড় তো কাছে-পিঠে ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পিছ দিকে ইটের গাদাতে গোখরা সাপের একটি বাচ্চারও দেখা মিলল। সর্প-শিশুটিকে রাখার জন্যে সরাসমেত একটি হাঁড়িরও ব্যবস্থা হ'ল। ত্যক্ত গোখরোর বাচ্চাটি যেই ফণা ধ'রে দাঁড়িয়েছে, অমনি উৎসাহী শরৎচন্দ্র বেলগাছের শিকড়টি একটি লাঠির আগায় লাগিয়ে তার মাথার কাছে ধরলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্য, সর্প-শিশুটি তাতে মোটেই নির্জীব হয়ে পড়ল না। পরন্তু রাগে সে শিকড়ের উপরই ছোবল মারতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লাঠির আঘাতেই সর্প-শিশুটিকে কাবু করতে হ'ল।

সাপের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই রাগ খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। সাপের প্রতি একটা আকর্ষণ একটা দরদই ছিল শরৎচন্দ্রের। কৌতূহল তো ছিলই। শংখচূড়-আদি মাত্র কয়েকটি বড় আকারের বিষধর সাপ ছাড়া সাপ সাধারণতঃ মানুষকে এড়িয়ে চলে। ত্যক্ত বা ভীত হলেই সে মানুষকে দংশন করে। সাপের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিরূপ মনোভাব পরিবর্তনে সাপের এই আচরণ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল কিনা বলতে পারি না।

"শ্রীকান্তে" আমরা দেখি, ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত দুটি তরুণ গভীর রাতে ছোট ডিঙিতে ক'রে চলেছে মাছ চুরি করতে।

চতুর্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। মাঝে মাঝে ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হয়ে ছপাৎ ক'রে শব্দ হচ্ছে। শঙ্কিত শ্রীকান্ত জিজ্ঞেস করে---ও কিসের শব্দ? ইন্দ্রনাথ সহজভাবেই উত্তর দেয়---ও কিছু না, সাপ জড়িয়ে আছে। শব্দ পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওরা কামড়ায় না। অন্নদা দিদির বাড়ির উঠনে শুয়েথাকা বড় অজগর সাপটি সম্পর্কেও ইন্দ্রনাথের অনুরূপ উক্তি: ও কিছু বলে না রে, বড় ভাল মানুষ।

সাপের প্রতি শরৎচন্দ্রের কেবল দরদ ছিল না, সাপের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। পরিণত বয়সেও এ কৌতূহল তাঁর দেখা যায়। কোথাও কেউ সাপ ধরেছে অথবা সাপ খেলাচ্ছে জানতে পারলে শরৎচন্দ্র তাকে ডেকে পাঠাতেন। বেশী বকশিশ দিয়ে তিনি তাঁর কাছ থেকে সাপ সম্বন্ধে নানা কথা জেনে নিতেন।

এখন আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক: সাপ-ধরা আদি কাজ দক্ষতার সঙ্গে নিজহস্তে করতে কোন সময় শরৎচন্দ্র কি অভ্যস্ত হয়েছিলেন?

"বিলাসী" শরৎচন্দ্রের একটি ছোট গল্পের বই। বইটি লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যে, রচনাটি "জনৈক পল্লী-বালকের ডায়েরী হইতে নকল"। পল্লী-বালকটির আসল নাম দেওয়া হয়নি, তার ডাকনাম দেওয়া হয়েছে। নামটি "ন্যাড়া"। ন্যাড়া নামটি কিন্তু আমাদের অপরিচিত নয়। শরৎচন্দ্রের পিতামহী তাঁকে শৈশবে এই নামে ডাকতেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, ন্যাড়ার জীবনের ঘটনাগুলি অন্ততঃ মূলতঃ তরুণ শরৎচন্দ্রেরই জীবনের ঘটনা। সে কথা যদি সত্য হয়---এবং সে কথা সত্যি না হওয়ার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না---তা' হলে বলতে হবে একজন পাকা সাপুড়ের মতই তরুণ শরৎচন্দ্র সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে অভ্যস্ত ছিলেন।

ন্যাড়ার মুখ থেকে আমরা জানতে পারি : "ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখরো-কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।" শরৎচন্দ্রের জীবন-কথা পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই ন্যাড়ার মত তাঁরও এ দুটি শখ ছিল। এ দিক্ দিয়েও আমরা জানি, ন্যাড়া শরৎচন্দ্রই।

সাপুড়ের কাজ শেখার জন্যে ন্যাড়া তথা শরৎচন্দ্র মৃত্যুঞ্জয়ের সাকরেদ হলেন। "সাপ-ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কবজিতে ওষুধ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।---সাপ-ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে।" গুণী অর্থাৎ মন্ত্র-সিদ্ধ ব্যক্তি।

এখানে একটি কথা লক্ষ করার। মৃত্যুঞ্জয় ন্যাড়া তথা শরৎচন্দ্রকে মাত্র "সাপ-ধরার মন্ত্র" শেখায় নি, "হিসাব"ও অর্থাৎ কৌশলও শিখিয়েছিল। মাত্র যদি মন্ত্রই শেখাত, বলতে সংকোচ অনুভব করি, তা হ'লে আজ বোধ হয় আমরা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে দেখতে পেতাম না। ন্যাড়া তথা শরৎচন্দ্র যে একজন গুণী হয়ে উঠলেন তা' 'হিসাবে'র গুণেই---মন্ত্রগুণে নয়, শিকড়-বাকড়েও নয়। গোড়ায় তরুণ শরৎচন্দ্র এ কথা বুঝতে না পারলেও কিছুদিনের মধ্যেই অতি মর্মদায়ক ঘটনায় তিনি তা' ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন, মন্ত্রশক্তি ও শিকড়-বাকড়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে। মৃত্যুঞ্জয় নিজে 'ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিত না'। বিলাসী জাত-সাপুড়ের মেয়ে। এসব ফাঁকির কথা তার জানা। সেজন্যে "বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ংকর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া কর।"

যা' হ'ক, ন্যাড়া তথা শরৎচন্দ্রের মুখ থেকে আমরা জানতে পারি : "বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো আমি এমনই অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।" তা' হলে দেখা যাচ্ছে, পাকা সাপুড়ের মতই তরুণ শরৎচন্দ্র বিষধর সাপের বিষদাঁত ভাঙতে পারতেন---এমন কি তার মুখ থেকে বিষও বের করতে পারতেন। বলা বাহুল্য, এসব কাজ বড় সোজা নয়। সাপ নিয়ে কতদিন নাড়াচাড়া করলে তবে এই দক্ষতা জন্মে। অবশ্য যারা সাপের প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাদের কাছে এসব কাজ তত দুঃসাহসিকতাপূর্ণ মনে নাও হতে পারে। ন্যাড়া তথা শরৎচন্দ্রের মুখেই আমরা জানতে পারি : "আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হ'ক আর নাই হ'ক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায় কিন্তু কামড়ায় না।" পরিণত বয়সেও নিজ হাতে গোখরো সাপ ধরতে শরৎচন্দ্রকে দেখেছেন ব'লে কেউ কেউ লিখেছেন।

শিকড়-বাকড় বিক্রি করা সাপুড়েদের পয়সা রোজগারের একটি বড় উপায়। শিকড় বিশেষ দিয়ে বিষধর সাপকে যে বশীভূত করা যায়, সাপ যে পলায়নে তৎপর হয়, তা' প্রমাণের উদ্দেশে সাপুড়েরা অনেক সময় নানা চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। একটা চালাকির কথা ন্যাড়া তথা শরৎচন্দ্রের মুখ দিয়েই আমরা জানতে পারি : "যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপরে তাহাকে শিকড় দেখান হ'ক আর একটা কাঠিই দেখান হ'ক সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শিকড়-বাকড় বিক্রী করার ব্যাপারে বিলাসীও ভয়ানক আপত্তি জানাত। স্বামী মৃত্যুঞ্জয়কে সে বলত : "দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইও না।"

সাপের মন্ত্রও শিখেছিলেন। তবে "বিলাসী" রচনার সময় ঐ মন্ত্রের শেষ অংশটা কেবল তাঁর মনে ছিল :

"ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন
মনসা দেবী আমার মা
ওলট-পালট পাতাল-ফোঁড়
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
দুধরাজ মণিরাজ !
কার আজ্ঞে---বিষহরির আজ্ঞে।"

কি মন্ত্র, কি শিকড়-বাকড়---সবই যে ফাঁকি, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাই বিলাসীর স্বামী মৃত্যুঞ্জয়কেই যখন আকস্মিকভাবে বিষধর সাপে দংশন করল। যতরকম শিকড়-বাকড় ছিল, মৃত্যুঞ্জয়কে চিবুতে দেওয়া হ'ল, মন্ত্রও আবৃত্তি করা হ'ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মৃত্যুঞ্জয় মারা গেল। এই সম্পর্কে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উক্তি : "সে (বিষহরির) আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নয় এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।"

সাপ সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানা সংস্কার প্রচলিত আছে। "শ্রীকান্ত"র ইন্দ্রনাথের মুখে এর পরিচয় আমরা কিছুটা পাই। শ্রীকান্তকে উদ্দেশ ক'রে ইন্দ্রনাথ বলছে : "কড়ি-চালা কখনও দেখেছিস্ শ্রীকান্ত ? দুটি কড়ি মন্তর পড়ে ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধরে সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির ক'রে দেয়।" ইন্দ্রনাথকে আরও আমরা বলতে শুনি : "শাহজী (অন্নদা দিদির স্বামী) গাঁজা-টাঁজা খান বটে শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসি মড়া আধঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন---এত বড় ওস্তাদ উনি।" শাহজীর কাছ থেকে পাওয়া গাছবিশেষের শিকড় ইন্দ্রনাথ তার কোমরে বেঁধে রেখেছিল, ঐ শিকড়ের বিষধর সাপ বশীভূত করার ক্ষমতা আছে ব'লে শাহজী তাকে বলেছিল। বিষ-পাথর ও সাপের মন্ত্রের জন্যেও ইন্দ্রনাথ শাহজীর কাছে ঘোরাঘুরি করত। কিন্তু এসব সংস্কারের

জাতীয় মুক্তিকামী সাধক তারাক্ষ্যাপা

দেশজননী ও জগজ্জননী অভেদ—কোন ভিন্নতা, কোন পার্থক্যের লেশমাত্র সেখানে নেই—যাঁদের ধ্যান-দৃষ্টিতে এই গভীর, স্থিত, অবিচল সত্যটির মালিন্যবিহীন দীপ্তিতে পরম প্রকাশ ঘটেছিল, সেই পূজ্য সাধকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তারাক্ষ্যাপা এক হিরণ্যবর্ণ নাম। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের এবং বিংশ শতাব্দীতে শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান ও সাধনা এই সত্যেরই সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছে।

অধ্যাত্মিকতার ও রাজনীতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা মন্থন করলে দেখা যাবে—এমন বহু যুগমানবের পবিত্র আবির্ভাব এ দেশের রসে ভরা মাটির বুকে ঘটেছে, যাঁরা আধ্যাত্মিকতা এবং রাজনীতির সেতুবন্ধনে গ্রহণ করে গেছেন এক মহান ভূমিকা। একদিকে রাজনৈতিক নায়করা যেমন দেশজননীর বেদীমূলে অর্ঘ্য দিয়েছেন, জগজ্জননী চেতনায় আবার আর একদিকে বহু আধ্যাত্মিক সাধক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেছেন আপন আপন অবদানে।

ধ্যানমৌন তুষারমৌলী হিমালয়ের অন্তর্গত গাড়োয়াল সাধকশ্রেষ্ঠ তারাক্ষ্যাপার জন্মভূমি। ১২৫৩ সালের ৮ই কার্তিক (১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাস) সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে এই মহাসাধকের জন্ম। সংসার-জীবনের নাম প্রমথেশ। জন্মের নেপথ্যে একটি কাহিনী জড়ানো আছে। প্রমথেশের জনক-জননী বিবাহের পর সুদীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। দীর্ঘ দিবস-রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল, দম্পতির সন্তানমুখ দেখা হল না। মনে বেদনার অন্ত নেই, জননীর মন আর সান্ত্বনা মানে না—কোল তাঁর শূন্য, ঘর আলো করা সন্তান কই? তার অভাবে সব কিছুই তো অসার, অর্থহীন। পুত্রহীনতার জন্যে লোকের কটূক্তি শুনতে হয়—বিচলিতা জননী সুরু

করলে। বটুকভৈরবের তপস্যা। দীর্ঘ তিন বছর পর সাধনার সিদ্ধি মিলল—বটুকভৈরবের অভয়বাণী পাওয়া গেল। "মাভৈঃ, দুঃখের রজনী তোমাদের শেষ যামে এসে পৌঁছেচে,

জর্জ এ্যালেন

আর ভয় নেই, মনে দুঃখ রেখো না। আমি নিজে যাচ্ছি তোমাদের সন্তানরূপে। তার দীর্ঘদিন কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে থাকব না। বৃহত্তর জগৎ এবার হবে আমার কর্মক্ষেত্র। অল্প বয়সেই আমি গৃহত্যাগ করব।"
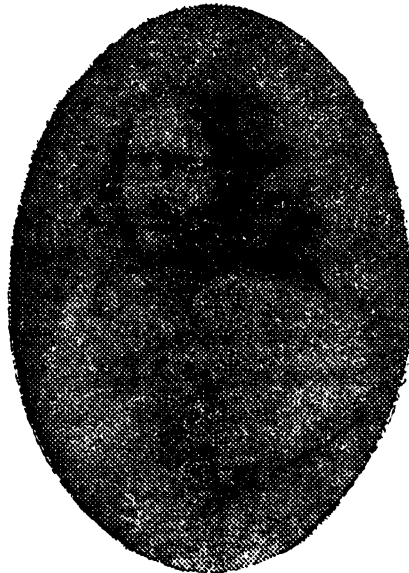
সাধক তারাক্ষ্যাপা

দৈববাণী মিথ্যা হওয়ার নয়। কৈশোরেই একদিন গৃহত্যাগ করলেন প্রমথেশ। জননীর স্নেহবন্ধন, পরিজনদের ভালবাসা, বিত্ত-বৈভব-ঐশ্বর্য কোন কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পরল না, যেমন ধরে রাখতে পারে

নি বুদ্ধ-চৈতন্যকে, শঙ্কর-তৈলঙ্গকে আরও অনেকানেক সাধকশ্রেষ্ঠদের।

আসমুদ্রহিমাচলের যাবতীয় তীর্থ-পরিক্রমা সমাপ্ত করে প্রমথেশ এলো হরিদ্বারে। হঠযোগ অভ্যাস করলেন সুখানন্দ ভারতীর কাছে। বিভিন্ন আসন ও মুদ্রাবন্ধাদিতে ইনি ছিলেন রীতিমত সিদ্ধ এবং বিপুল প্রসিদ্ধির অধিকারী। ১২৯০ সালে (১৮৮৩-৮৪) দর্শন হল অমরনাথ। এখানে এক গুহা তাঁর অলোকসামান্য দিব্য জীবনে জীবনেতিহাসের একটি অসামান্য অধ্যায়। এই গুহার মধ্যে এমন একটি ঘটনা সকলের নয়নগোচর হ'ল, যার দ্বারা প্রমাণ হ'ল—প্রমথেশ বা পরবর্তীকালের ক্ষ্যাপাবাবা তারানাথ নিঃসন্দেহে এক সিদ্ধপুরুষ। সেখানে এ রকম একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, এক নিঃশ্বাসে যদি কেউ বত্রিশটি তুষারবিন্দু পান করতে পারেন তাহলে তিনি সিদ্ধপুরুষ। তারানাথ এক নিঃশ্বাসেই বত্রিশটি তুষারবিন্দু সেদিন পান করেছিলেন।

ফিরে আসছেন তারানাথ। দীর্ঘ পর্যটনে ক্লান্তদেহ। অবসন্নতা ঘিরে ফেলেছে সারা শরীর। মন চাইছে বিশ্রাম—অবসাদ ও ক্লান্তির নিরসন। আশ্রয় নিলেন গীর্ণাহার পর্বতগুহায়, হঠাৎ চোখের সামনে ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। শূন্যে আবির্ভূত হল এক বিরাট পুরুষের দেহ। গলায় দুলছে রুদ্রাক্ষের মালা এবং যজ্ঞোপবীত, চোখ দুটি যেন পৃথিবীর সমস্ত আলো আর জ্যোতি ধরে রেখেছে। মূর্তি নির্বাক নয়। একটি বাক্যও নির্গত হল সেই অসীম তেজঃপুঞ্জ

মূলে যে কোন সত্য নেই, অন্নদা দিদির মুখে তা' আমরা শুনতে পাই: "আমাদের (সাপুড়েদের) আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি।—আমরা মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি নে, মড়াও বাঁচাতে পারি নে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে—।" অন্নদা দিদির মুখ থেকে আমরা এ কথাও জানতে পারি, সাপ ধরাটা শুধু হাতের কৌশল, কোন মন্ত্রের জোরে নয়।

দীপ্তি থেকে---বামা---বীরভূম। ভৌগোলিক অবস্থিতি অনুযায়ী বীরভূমের দিকেই একটি অঙ্গুলি নির্দেশিত করে মূর্তি হল অদৃশ্য।

এ কি অদ্ভুত ঘটনা, এত আলো, এত জ্যোতি, অন্ধকারের বুক চিরে কোথা থেকে এল আবার কোন গভীরে, কোন গহনে মিলিয়ে গেল, কোথা থেকে আবির্ভাব, কোথায় অন্তর্ধান---কিন্তু রেখে গেল এক দিব্য অনুভূতি। কি অপার্থিব চেতনা। শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে, ধমনীতে ধমনীতে কি অপূর্ব শিহরণ, অজানার স্পর্শ যে এমনই রোমাঞ্চকর।

যোগে বসলেন তারানাথ---তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে উন্মোচিত হ'ল এই গূঢ় রহস্য। সাধকের ধ্যানদৃষ্টিতে উন্মীলিত হল এক গভীরতম সত্য। এ দৈব নির্দেশ। ধ্যানের উদাত্ত আলোয় এইভাবে দেখা পেলেন তাঁর প্রকৃত গুরুর---যাঁর স্নেহচ্ছায়া নির্দিষ্ট হয়ে আছে তাঁর জন্যে। ভারতের পূর্ব প্রান্তে দূর বীরভূমে যিনি অপেক্ষা করে আছেন পরমের সন্ধানী তারানাথের জন্যে।

দিঙ্‌নির্দেশও পেয়ে গেছেন তারানাথ, বীরভূমের দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে থাকেন। থামলেন দিল্লীতে। সেটা ১৮৮৭ সাল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যলাভের সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষ মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। বিরাট বিপুল আয়োজন। মহাসমারোহের ব্যাপার। উৎসবে জাঁকজমকের অন্ত নেই। একজন বললেন, দরবারটা দেখে যাও। হঠাৎ কর্ণকুহরে প্রবেশ করল এক দৈববাণী, যার সারমর্ম---এখানে এ কি ছার দরবারের জন্য অপেক্ষা করছ---তোমার জন্যে মহাদরবার অপেক্ষা করে আছে বীরভূমে। সেখানে যে জগজ্জননীর দরবারে তোমার আসন স্থায়ী এবং প্রথম শ্রেণীতে করার প্রস্তুতি চলছে। আর কালবিলম্ব নয়। নয় পৃথিবীর কালের অধীন এক রাণীর জয়ন্তী উৎসব নয়---সকল কালের অধীশ্বরী জগজ্জননীর আহ্বান।

তারাপীঠের বশিষ্ঠের আসনের মহিমা এবং গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। এই আসনে বসে চীনাচায়ের আরাধনা করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মহামুনি বশিষ্ঠ। স্বামীর তারা মা স্বয়, বশিষ্ঠের আরাধিতা দেবী। বশিষ্ঠের পর এই মহা আসনে অযোগ্য ব্যক্তি কখনও বসতে পারেন নি। যিনি বসতে গেছেন আসন তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। অনধিকৃত অবস্থায় সুদীর্ঘকাল ছিল এই আসন। দীর্ঘ দিবস পরে বহু বিস্তৃত সময়ের দুস্তর ব্যবধানে সেই আসন একদিন সাদরে বরণ করে নিল বামাক্ষ্যাপাকে। সাধককুলাগ্রগণ্য বামদেবকে বামদেবের উত্তরসাধক ভারতের অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম পীঠতীর্থ তারাপীঠের বশিষ্ঠের আসনের ভাবী উত্তরাধিকারী হয়ে দেখা দিলেন তারাক্ষ্যাপা সাধক তারানাথ।

কৃষ্ণ চতুর্দশী। নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সে এক নিশীথিনী ঘোর মূরতি। ঘন তমসায় ছেয়ে আছে দিক-দিগন্তর। অন্ধকারের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে সমগ্র চরাচর। সেই বিশেষ পরিবেশে হঠযোগী তারানাথকে কৌলমতে তন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দীক্ষা দিলেন বামদেব।

ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন পুণ্যক্ষেত্রে, মহাতীর্থে সাধনা করেছেন তারাক্ষ্যাপা। সাধনায় লাভ করেছেন---বলা বাহুল্য, পরিপূর্ণ সিদ্ধি। তাঁর সেই সিদ্ধির সৌরভ সুরভিত করেছে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মার্গ।

কিন্তু মহাসাধক তারাক্ষ্যাপা কোনদিনই স্বীয় মুক্তির জন্য সাধনপীঠে বসেন নি। নিজের মুক্তিই শুধু তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর সাধনশক্তি তিনি নিয়োজিত করেছিলেন জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে। পরমায়ু লক্ষ্মীও তাঁকে কৃপা করেছিলেন প্রসন্ন হয়ে। আয়ুলক্ষ্মীর প্রসন্নতা তাঁর উপর ঝরে পড়েছিল অকৃপণ ধারায়। সেই পরিপূর্ণ আয়ুর সুফল লাভ করেছিল দেশের মুক্তি-আন্দোলন।

জাতীয় মুক্তি-সাধনার দুর্জয় সাধনার ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের ব্যাপক ও গভীর পরিচয় আছে, তাঁদের অজানা নয় যে এই সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল অবিচ্ছেদ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় তাঁর বিপুল অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার সর্বশেষ সংগ্রামও তাঁর নশ্বর দেহে বর্তমান থাকাকালীন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাধক তারাক্ষ্যাপা পরিপূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন জগজ্জননীর পাদপদ্মে, তাঁর মতে শুধু সাধন-ভজনের মাধ্যমেই নয়, ভগবান তোমার কাছে ধরা দেবেন তোমার কর্মে। যে কর্মে জনকল্যাণের ইঙ্গিত আছে, যে কর্মে আছে আকুলতার আর্তি ---সেই কর্ম ভগবানের প্রত্যক্ষ কৃপালাভের প্রধান বাহন। ঈশ্বর আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই আসেন না---তবে আন্তরিকতার আবেদনে তাঁর কৃপা সুনিশ্চিত। বিরাট বিশাল বিপুল এই বসুন্ধরা। কত রূপ, কত রঙ্‌, কত রস, কত রেখা, এই সুন্দর পৃথিবীকে সুন্দরতর করে তোলার জন্য ঈশ্বর পৃথিবীতে পাঠালেন তোমায়। তাঁর কর্মে তুমি নিয়োজিত। অতএব তাঁর কাজে সাফল্যে তাঁর আশীর্বাদ তো তুমি পাবেই---কে আটকাবে তোমার সেই প্রাপ্তি? সেই প্রাপ্তির আলোয় তুমি দেখবে পথ---যে পথ তোমাকে নিয়ে যাবে রূপ থেকে রূপান্তরে, সীমা থেকে অসীমে, অরূপ থেকে অপরূপে, যে তোমায় নিশানা দেবে সেই শাশ্বতের, সেই পরমের, সেই দিব্যের অমৃতলোকের তোরণদ্বারের, যে তোমায় সমুত্তীর্ণ করবে ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে।

১৯৪৬ সালে জীবনের একটি শতাব্দীর কক্ষপথ পরিপূর্ণরূপে অতিক্রমণের পর এই মহাসাধকের জীবনদীপ পরিনির্বাপিত হয়।

পশু-পক্ষী-পালন

মুরগী পালন ও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়
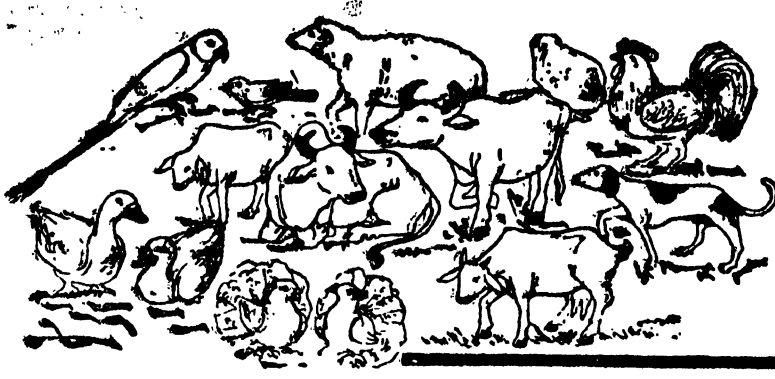
মুরগী পালন আজ শুধু পশ্চিম-মুখক্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতেই অনুন্নত এবং উন্নত দেশগুলিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্যই এর অনেকগুলো কারণ আছে, তার মধ্যে প্রধান হলো অল্প খরচে পুষ্টিকর ভেজালহীন খাদ্য মুরগী থেকেই পাওয়া যায়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তারপর আছে ব্যবসায়ীদের অসাধুতার দরুণ ভেজাল খাদ্যের ব্যাপক প্রচলন। ফলে আজ সাধারণ মানুষ দিশেহারা। তারা ভেবে পায় না—কি করে তারা তাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখবে এই সব পচা খাবার খেয়ে। দামী ওষুধপত্র, ফলমূল ইত্যাদি কিনে খাবার পয়সা আমাদের মত গরীব দেশে কটা লোকেরই বা আছে? তবে কি তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে তাদের স্বাস্থ্য হারাবে। একটা জাতির যদি খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে জাতির চরিত্রও কখনই ভাল থাকতে পারে না—যার প্রমাণ আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি। আর স্বাস্থ্যহীন চরিত্রহীন নির্জীব প্রাণীদের নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হলে, ঐ রাষ্ট্রের আয়ুই বা কতদিন?

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান রয়েছে মুরগীর মধ্যে। হ্যাঁ, মুরগীই পারে আজ আমাদের বাঁচাতে, অন্ধকার ভবিষ্যৎ থেকে।

মুরগী থেকে শুধু পুষ্টিকর ভেজাল-হীন খাদ্যই নয়, তার দ্বারা এই বিরাট বেকার সমস্যার সমাধানও আংশিক-ভাবে হতে পারে। মুরগী প্রতিপালন, মাংস ও ডিম সংরক্ষণ এবং তার বিক্রয়-ব্যবস্থা দ্বারা বহু লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব।

মুরগী পালনে অনেক সুবিধা আছে। জায়গা কম লাগে, মুরগী পিছু খাদ্য ব্যয় সীমা ছাড়ায় না, বাসগৃহ নির্মাণে ব্যয় অল্প। মুরগীর রক্ষণা-বেক্ষণে কর্মীর সংখ্যা অধিক লাগে না। লাভের আন্দাজে মূলধনের পরিমাণ বেশী নয়।

আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মুরগীর মাংস ও ডিমের প্রচুর চাহিদা রয়েছে ফলে ডিম ও মাংস বিক্রি করতে কোন অসুবিধাই হয় না। সুতরাং একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিও অনায়াসে ছোটখাট একটি Poultry করে সংসার প্রতিপালন করতে পারেন।

যদিও মুরগী পালন অনুন্নত দেশ-গুলিতে বেশী প্রচার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অন্যান্য ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও উন্নত দেশগুলিই অনেক অগ্রসর।

আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশ-গুলিতে অবিশ্রান্ত গবেষণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগের ফলে উন্নত মুরগী প্রজাতি, বৃহৎ আকারের ডিম এবং মুরগীপিছু ডিমের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯৫ সালে হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ছিল ২৯২ (X দশ লক্ষ) আর মাত্র ১৫ বছ পর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ (X দশ লক্ষ)।

এই সংখ্যাবৃদ্ধির হার থেকে অনুমাণ করা যায় যে, উন্নত রা গুলিতে Poultry-র উপর কেমন ক রাখা হয়।

মুরগীর ডিম অত্যন্ত সুস্বাদু, পাক এবং বলবৃদ্ধিকারক, এই ডি অনেকগুলি ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ভিটামিন—এ, ভিটামিন-বি ২, ভিটামিন-ডি ইত্যাদি। এই ভিটামি গুলির অভাবে শিশুদের সম্যক বৃদ্ধি হয় না। চর্মরোগ, চক্ষুরোগ সর্দি-কাশি, দুর্বলতা, অবসন্নতা, চুলপড়া রিকেটস ইত্যাদি নানা জাতীয় ব্যা শরীরে আশ্রয় নিতে পারে।

অনেকে মুরগী পালনে উৎসাহ প্রক করলেও অজ্ঞতার অভাবে মুরগী পাল করতে চান না, যাঁরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিরাট আকারে poultry চালান, তাঁরা সাধারণত সকল বিষয়ে পূর্ণভাবে জ্ঞানলাভ করেই এগোন। কিন্তু যাঁরা ১৫।২০টি মুরগী পোষেন বা পুষতে চান, তাঁরা যদি মুরগী প্রতি পালনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নজর দেন তাহলে

াদের অনেক উপকার হবে বলেই আমি মনে করি।

১। মুরগী নির্বাচন :---যে ধরনের মুরগীর ঝুঁটি লাল এবং বৃহৎ আকারের ও তেলচকচকে, উজ্জ্বলচক্ষু এবং যে মুরগীর ডিম নির্গমনের পথ পিচ্ছিল ও বড় সেই ধরনের মুরগী ডিম বেশী দেয় এবং তার আকারও বড় হয়। মুরগীর পেটটিও নরম থাকা চাই। যে সব মুরগী দুর্বল, বিকলাঙ্গ বা ডিম কম দেয়---সে সব মুরগীকে বিক্রি করে ফেলা উচিত। কারণ তা না হলে ব্যয়ের হার বেড়ে যাবে। আয়ও কম হবে। উন্নত জাতের মুরগী যেমন, ব্লক, লেগহর্ন, নিউ হ্যাম্পশায়ার---সব সময়ে পালন করা উচিত এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যেন নিম্নজাতের মোরগের সঙ্গে তাহাদের সংসর্গ না ঘটে।

২। বাসগৃহ :---মুরগী যাতে নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করতে পারে এমনভাবেই মুরগীর গৃহ তৈরী করা উচিত। প্রচণ্ড গরম ও তীব্র শীতের সময় মুরগী যাতে কষ্ট না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। মুরগীর গৃহ নির্মাণ করা সম্বন্ধে নিজের বুদ্ধি না খাটিয়ে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির বা সরকারী poultry-র ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পরামর্শ নিয়ে বাসগৃহ তৈরী করাই সমীচীন।

মুরগীকে সর্বদাই ঘরে আটক রাখা উচিত। বাইরে মোলামেশায় ঘোরাফেরা করলে সহজেই রোগজীবাণুর আক্রমণে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া, ঘরে আবদ্ধ রেখে মুরগী পালন করলে ব্যয় কম হয় এবং শ্রমও অল্প লাগে।

৩। খাদ্য :---মুরগী পালনে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় খাদ্যের পিছনে। মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ যায় খাদ্যের খাতে।

মুরগীকে খাওয়ানো আজ উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও শিল্পের পর্যায়ে উঠেছে। বিভিন্ন গবেষণার ফলে প্রকাশ পেয়েছে সুষম খাদ্য মুরগীকে যত বেশী পরিমাণে খাওয়ানো যাবে ততই সে বৃহৎ আকারের অধিক পরিমাণ ডিম পাড়বে।

অনেকে না জেনে মুরগীকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য দেন না। ফলে তাঁদের মুরগী ডিম উৎপাদন কম করে এবং তাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না।

আমাদের poultry বিশেষজ্ঞগণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন মুরগীর জন্য এমন এক সুষম খাদ্য আবিষ্কার করতে, যার মূল্য কম হবে, আমাদের দেশে আবহাওয়ার উপযোগী হবে এবং মুরগীর পুষ্টি বৃদ্ধি করে অধিক সংখ্যক ডিম উৎপাদনে সাহায্য করবে।

মুরগীকে ভাল সুষম খাদ্য অধিক পরিমাণে দিলে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ যত্ন নিলে উন্নত জাতের মুরগী বছরের অধিকাংশ সময়েই ডিম পাড়ে।

৪। স্বাস্থ্য:---মুরগীর স্বাস্থ্য বজায় রাখাই মুরগী পালকের প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ এবং মুরগী পালনে লাভের বদলে ক্ষতি হতে আরম্ভ করে যখন মুরগীদের মধ্যে ব্যাপক মড়ক দেখা দেয় বা তারা বন্ধ্যা হয়ে পড়ে কিংবা দুর্বল ও নির্জীব হয়ে পড়ে।

মুরগী যদি উপযুক্ত পরিমাণ সুষম খাদ্য না পায় তাহলে সে দুর্বল ও নির্জীব হয়ে পড়ে এবং অপুষ্টিতে ভোগে। স্বাস্থ্যহীন মুরগীর ডিম উৎপাদন অনেক কমে যায় এবং এদের পালনও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

স্বাস্থ্যহীন মুরগীকে প্রায়শই বিভিন্ন প্রকার পরজীবী কীট আক্রমণ করে এবং প্রটোজোয়াজনিত রোগ বা ভাইরাসঘটিত রোগ তার দেহে আশ্রয় নেয়।

স্থানীয় পশুচিকিৎসক কিংবা সরকারী Poultryর চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাঁদের দিয়ে মাঝে মাঝে মুরগীশালা পরিদর্শন করালে সাধারণত এই সব রোগ ও পরজীবী কীটের নিকট থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা থাকে।

৫। মুরগীর ডিম এবং তার সংরক্ষণ—মুরগীর ডিমের খাদ্যগুণ নিম্নরূপ :—মুরগীর ডিম—শতকরা হিসেবে জল — শর্করা — স্নেহ — ধাতব লবণ ৭২'৪, ১৩'৩, ১৩'৩, ১'০।

দুধ যেমন একটি পরিপূর্ণ খাদ্য, ডিমও সেইরূপ। দুধের পরেই ডিমের স্থান, বরং ডিমের আরও বেশী। কারণ দুধে ভেজাল চলে কিন্তু ডিমে চলে না এবং এতে রোগজীবাণু সংক্রামিত হতে পারে না। এ যোগাড় করাও সহজ। সহজপ্রাপ্য ও নানাভাবে রন্ধন-প্রক্রিয়ার জন্য ডিমের স্থান আর কোন খাদ্যই নিতে পারে না। ডিম খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং লঘুপাক।

আমাদের দেশে ডিমের চাহিদা প্রায় বারো মাসই। বাজারে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে এবং লাভ করতে হলে উৎকৃষ্ট ডিম বিক্রি করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, ডিম এমন একটি জিনিস—সাধারণ ক্রেতারাও সহজেই তার ভাল বা মন্দ বুঝতে পারে। ডিমের উৎকর্ষতা বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করলে ফল পাওয়া যাবে :---

ক) সম্ভব হলে ডিম প্রসবের পরই তা বিক্রি করে ফেলা উচিত। কারণ ডিম যত টাটকা থাকে, তার গুণগত মানও তত ভাল থাকে।

খ) বিক্রির জন্য বাজারে না যাওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার, ঠাণ্ডা ও ভিজে জায়গায় ডিম রাখলে তার উৎকর্ষতা বজায় থাকে।

গ) উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ডিম একত্রে না রাখাই ভাল।

ডিম ঠিকমত সংরক্ষণ করতে পারলে ৪০।৪৫ দিন পর্যন্ত তার গুণগত মান বজায় রাখা যায়।

একটি বড় (লম্বায় ৬/৭ ফুট চওড়ায় ২/৩ ফুট) কাঠের বাক্স-র প্রায় অর্ধেক পরিষ্কার বালি দিয়ে ভরে তার ওপর পরিষ্কার জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে—বালির ওপর ডিমগুলি সাজিয়ে রেখে বাক্সের উপরিভাগ ভেজা মোটা ক্যাম্বিস বা চট দিয়ে ঢেকে রাখলে ডিম ভাল থাকে অনেক দিন পর্যন্ত। বালি এবং ক্যাম্বিস বা চট যাতে সব

[illegible] নিয়ুক্ত থাকে সেদিকে বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং লক্ষ্য রাখা উচিত বাড়িটি যেন অত্যন্ত শুকনো জায়গায় না থাকে।

৬। মুরগী শাবক :—মুরগী যখন তার ডিমে তা দিতে বসে সেই সময় সে ডিম উৎপাদন করে না। তা দেবার সময় ২১ দিন। সুতরাং এই সময়ে আয় কম হয়। উন্নত প্রজাতির মুরগী পোষার একটি প্রধান অসুবিধার বিষয় এই যে, উন্নত প্রজাতির মুরগী ডিমে তা দিতে চায় না বা তাদের মধ্যে তা দেওয়ার প্রথাটিরই অবলুপ্তি হয়েছে বা হতে চলেছে।

সম্ভবপর হলে মুরগী পালকের পক্ষে কৃত্রিম ডিম ফোটানোর যন্ত্র ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। কারণ এই যন্ত্র ব্যবহার করলে অল্প সময়ে প্রয়োজনমত ডিম ফোটানো যায় এবং শাবকের জন্মহারও বেশী হয়, নানা প্রকার কীট ও রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভবপর হয়।

বিভিন্ন বয়সের শাবক ও মুরগীকে একত্রে রাখা উচিত নয়। কারণ একসঙ্গে বয়স্ক ও শাবক মুরগী পালন করলে বয়স্ক মুরগীর রোগ শাবককে আক্রমণ করতে পারে ও পরস্পরের ঝগড়াঝাটিতে শাবকের দৈহিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

রোগাক্রান্ত শাবক বা মুরগীকে বিক্রি কিম্বা মেরে ফেলা উচিত। রোগ ধরা পড়বার পর এক মুহূর্তও যেন রুগ্নী মুরগীকে সুস্থ মুরগীদের সঙ্গে একত্রে রাখা না হয়। কারণ রুগ্নী মুরগীর সংস্পর্শে এসে অন্যান্য মুরগীদের মধ্যে মড়ক দেখা দিতে পারে।

৭। বাজার :—ভারতবর্ষে মুরগীর মাংস ও ডিমের প্রচুর চাহিদা ও সেই তুলনায় যোগান কম থাকায় ডিম বা মাংস বিক্রী করা এখনও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশে উন্নত মুরগী প্রজাতির সংখ্যা, মাংস ও ডিমে উৎপাদন এবং জনপিছু মাংস ও ডিমের ব্যবহার নগণ্য। উন্নত দেশগুলি গত ২৫/৩০ বছরে Poultry ও তৎসংক্রান্ত যা কিছুর অগ্রগতি সাধন করেছে—আমাদের দেশে সেই পরিমাণ অগ্রগতি আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সমবায় সমিতিগুলি বাজারে ডিম বিক্রি করবার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি। তবে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে কিছু কিছু চেষ্টার চিহ্ন চোখে পড়ছে। উৎকৃষ্ট ডিমগুলি বর্ণ ও আকার অনুসারে পৃথক পৃথক শ্রেণী করে সাজিয়ে বিক্রি করলে আয় বৃদ্ধি পায়। কারণ সাধারণত দেখা যায়, ক্রেতারা কিছু বেশী মূল্য দিতে হলেও বৃহৎ আকারের উৎকৃষ্ট ডিম ক্রয় করতে পছন্দ করেন।

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ডিম একত্রে মিশিয়ে বিক্রয়ার্থে কখনই বাজারে উপস্থিত করা উচিত নয়। কারণ ক্রেতারা দু'-একবার ঠকলেই ঐ ব্যবসায়ীর ডিম আর কিনতে চাইবে না। বাজারে তার দুর্নাম হবে, ফলে আয়ও হ্রাস পাবে।

ডিম যদি ভালভাবে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে এবং মাংস ছাল ছাড়িয়ে, ধুয়ে পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে প্যাকেজ করে ক্রেতার কাছে আনা হয়, তাহলে ক্রে
খুশী হয়, বিক্রয় বাড়ে। ফলে আ
বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আ
প্রত্যক্ষ জ্ঞানসঞ্চার করে মুরগী পা
ব্যবসায়ে নামা উচিত। কারণ সাধার
দেখা যায়, অসফল মুরগীপালকদে
শতকরা ৭৫-৮০ জন অভিজ্ঞত
অভাবে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ঠিক
বা প্রবন্ধ পড়ে শেখা যায় না। বই
সামান্য সাহায্য করে মাত্র। মু
পালন ব্যবসায়ে উপযুক্ত প্রশি
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসঞ্চয় নিতা
প্রয়োজনীয়।

ভারত সরকার ও রাজ্য সর
ইচ্ছুক মুরগীপালকদের বর্তমানে না
ভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করছে
যদিও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়, ইচ্ছু
ব্যক্তিগণ সরকারের সাহায্য গ্রহণ কর
উপকৃত হবেন বলেই আশা করা যা

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পর ছো
ছোট মুরগীপালকদেরও ব্যাঙ্ক থে
ঋণ পাবার অনেক সুবিধা হয়েছে
সুতরাং মুরগী পালনের ক্ষেত্রে উৎসা
ও আগ্রহশীল ব্যক্তিদের কাছে অ
মূলধন বিরাট একটা সমস্যা নয়।

আমাদের দেশে মুরগী পালন
ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হ

নকুলজাতীয় জন্তুর পশমসহ শিকারী মিখায়েল নিউয়েনহুয়েডকে দেখা যাচ্ছে

রকারের উচিত, উপযুক্ত মুরগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রচুর সংখ্যায় খোলা, মুরগী পালকদের কাছ থেকে ডিম ও মাংস কিনে ন্যায্য মূল্যে বাজারে বিক্রি করা, সস্তাদরে মুরগীর খাবার বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা এবং আরও ঋণদানের ব্যবস্থা করা।

আশা করা যা, অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ মুরগী ও ডিম উৎপাদনে সমৃদ্ধ হয়ে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান এবং পুষ্টিকর খাদ্য-সমস্যার সমাধান করে উন্নত, স্বাস্থ্যবান নাগরিক সৃষ্টি করে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঠিকানা: নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে যোগাযোগ করে মুরগীপালকরা তাঁদের নানারকম জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারেন।

(a) Poultry Research Division, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Uttar Pradesh.
(b) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
(c) American Poultry Association, Inc., Station A, Box 104, Atlanta, Georgia, U.S.A.
(d) American Poultry and Hatchery Federation, Kansas City, Missouri, U.S.A.
(e) West Bengal Poultry Grower's Association, 86/A, Acharya J. C. Bose Rd., Calcutta-14.
(f) State Poultry Firm, 42, Graham Road, Tollygunge, Calcutta-40 Phone No. 46-5314
(g) 'Indian Poultry Gazette', Poultry Research Division, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Uttar Pradesh.
(h) 'ত্রৈমাসিক পোল্ট্রী' ৩০/এ, মুরি লেন, কলিকাতা-১৪, ফোন নং ২৪-৪২০৪ (পোল্ট্রী সম্বন্ধীয় একমাত্র বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

—রমেন সরকার

জেনে রাখা ভাল

শ্রীদেবীপ্রসাদ নাগ

সারা পৃথিবীতে গরুর সংখ্যা ৯৫ কোটি। তার মধ্যে ভারতে আছে ১৮ কোটি, যুক্তরাষ্ট্রে ১০ কোটি, রাশিয়ায় প্রায় ৮ কোটি আর চীনে ৪ ১/২ কোটি। ভারতে প্রতি ৫ জনের জন্য রয়েছে ২টি গরু। গরু বেশী থাকলেও কিন্তু দুধ আমাদের ভাগ্যে সব চেয়ে কম জোটে। গরু এখন প্রায় বোঝা-স্বরূপ। দুধ দেয় কম অথচ তাদের খাদ্যের জন্যে নির্ভর করতে হয় জমির ওপর। আর এ ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে পশুর চিরদিনের লড়াই (জমিন-জনতা আর জানোয়ার-এর মধ্যে লড়াই)। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়ায় জমি অনেক, তাই আমাদের দেশের সীমিত জমিতে মানুষে-পশুতে জমি নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তা সেখানে নেই। এই জন্যে উন্নত প্রজননের মাধ্যমে গো-জাতির উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

ভেড়ার সংখ্যা কিন্তু সবচেয়ে বেশী অষ্ট্রেলিয়ায়---প্রায় ১৫ ১/২ কোটি, রাশিয়ায়---১৩ ১/২ কোটি, চীনে---৬ কোটি, ভারতে---৪ কোটি এবং যুক্তরাষ্ট্রে---৩ ১/২ কোটি। সব চেয়ে বেশী শূয়োর পাওয়া যায় চীনে---১৮ কোটি, যুক্তরাষ্ট্রে ও রাশিয়ায়---৬ কোটি, ভারতে---১/২ কোটি।

কয়েকটি প্রাণীর দেহতত্ত্ব

প্রাণী	গায়ের উত্তাপ	নাড়ীর গতি	শ্বাস-প্রশ্বাস	গর্ভধারণ কাল	কতদিন বাঁচে	এক সাথে কটি বাচ্চা হয়
গরু	১০১-৪' ডিগ্রী	৬০-৭০	১২-২০	২৮০	২০	১
মহিষ	১০১' ডিগ্রী	৪২-৬০	১১-১৮	৩০০	„	১
ছাগল	১০৩-৪' ডিগ্রী	৭০-৯০	১২-৩০	১৫১	১৫	২
কুকুর	১০২' ডিগ্রী	৭০-১০০	১৫-২৫	৬০	১০	৩-৭
বেড়াল	১০১-৪' ডিগ্রী	১০০-১৩০	২০	৬৪	১২	৪
শূয়োর	১০২-৪' „	৭০-৮০	১০-১৬	১০৩	৭	১২
হাতী	৯৭-৪' „	২৮-৩৫	১০-১৫	৭৩০	৬০	১
মুরগী	১০৭-২' „	১২৮-১৪০	১২-২৮	-----	X	X
স্ত্রীলোক	৯৮' „	৬০-৭৮	১৫-২৫	২৮০	----	১

সবচেয়ে কমদিন গর্ভধারণ করে অথচ একসাথে বেশী বাচ্চা হয় শেয়ালের,

পক্ষীতত্ত্ব

পক্ষীশাবকের পালক

আগেই বলেছি পাখীদের স্ত্রী ও পুরুষের সৌন্দর্যের তারতম্য আছে। এদের বাচ্চারাও কিছু স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে একবর্ণ প্রাপ্ত হয়। বেশীকাল পরে পুরুষ বাচ্চাগুলি স্বীয় রূপলাভ করে থাকে। আগেই বলেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ-পাখীগুলি স্ত্রী-পাখী থেকে শ্রীসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, মুরগী, দোয়েল, চড়ুই, হাঁস, পায়রা, ময়ূর প্রভৃতি পাখীদের ভেতর পুরুষ-পাখীগুলি সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। সৌন্দর্য-বিশেষজ্ঞরা বলেন, মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের সৌন্দর্য বেশী। কিন্তু পুরুষমানুষেরা যেহেতু নারীর সৌন্দর্য বেশী প্রত্যাশা করে, তাই নারী পুরুষের চোখে এবং কবি-শিল্পীর চোখে সৌন্দর্যময়ী।

স্ত্রী-পুরুষের কথা

কিন্তু পাখীর কথা বলতে গেলে তাদের স্ত্রী-পুরুষের বেশ একরকম বলা চলে। কেবল উভয়ের পার্থক্য রয়েছে বর্ণের উজ্জ্বলতার তারতম্যে। এদের বাচ্চারা অনেক সময় সম্পূর্ণ পৃথক বেশ লাভ করে থাকে। এদেশের দোয়েল পাখী তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দোয়েল পাখী সাধারণত নারকেলগাছ অথবা অন্য কোন গাছের গর্তের ভেতর বাসা তৈরী করে। তেমনি শালিক পাখীও একই প্রকারে বাসা বাঁধে। টিয়াপাখীও বড় বড় গাছের গর্তে বাসা বেঁধে থাকে।

এদের মত মাছরাঙা পাখীও বহু উঁচুতে গাছের ফোকরে বাসা বাঁধে। পায়রা বাসা বাঁধে চড়ুই পাখীর মত দালানের ফোকরে। এরা সবাই জোড়া বাধে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই একত্রে থাকে এবং বাসা বাঁধে। স্ত্রী ডিম পাড়তে বসলে, পুরুষ বাইরে পাহারা দেয়। আবার ডিমে তা দেবার সময়ও পুরুষ থাকে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। বাচ্চা যতদিন না বড় হয়ে উড়ে যেতে পারছে, ততদিন মা থাকে তাদের কাছে কাছে, এবং বুকের নীচে রেখে দেয়, পাছে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। পুরুষ তখনও বাইরে প্রহরায় রত। সে অন্য কোথায়ও ছুটে যায় না, বা মাতামাতি করে না। মানুষের মত এরাও যেন সভ্যভাবে জীবন-যাপন করে থাকে। এদেরও প্রেম-প্রীতি আছে, রাগ-অনুরাগ আছে। স্বামী-স্ত্রী আছে। বড় হলেই এদের মনের মত একজনকে খুঁজে নেয় এবং তার সাথে ঘর-সংসার করে। যদি তাদের ভেতর একজন মারা যায়, তার জন্য অপরজনকে কান্নাকাটি করতে দেখা যায়। পাখীদের ভেতরে দল আছে। দলবদ্ধ হয়ে তারা বসবাস করে থাকে। একজন মরলে অন্যান্য সবাই এসে সেখানে জটলা করে। একজন অপরাধ করলে দলের অন্যান্য সবাই মিলে তাকে আক্রমণ করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ কাক।

দোয়েল পাখী

রেডব্রেষ্ট রবিন-এর কথা যাঁরা ইংরাজী বই পড়েছেন তাঁরাই জানেন। কালো বুকওয়ালা দোয়েল মনে হয় এই রবিনের স্বগোত্র। মাদাগাস্কার থেকে চীন অবধি প্রায় সব জায়গায় এই দোয়েল পাখীকে দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ-দোয়েল স্ত্রী-দোয়েলের চেয়ে একটু বড় বলে মনে হয়। এবং এই পুরুষ-দোয়েলের সাদা-কালো পালকগুলো স্ত্রী-দোয়েলের চেয়ে বেশী চকচকে। দোয়েলের বাচ্চার ডানায় লালচে দুটি দাগ থাকে। পালক সব গজিয়ে গেলে এই দাগ আর থাকে না। এই দোয়েল পাখীর জ্ঞাতি রবিন পাখীর বাচ্চাদেরও এই পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

হলদে পাখী—মাছরাঙা

হলদে পাখীর শাবক পিতা-মাতার মত রূপ ধারণ করে। কেবল তাদের পালকের বর্ণ বয়স্ক পাখীর মত উজ্জ্বল হয় না। ঠিক তেমনি মাছরাঙা পাখীর বাচ্চাদের অবস্থা। বুলবুল পাখীর বাচ্চাও অনেকটা এইরকম বলা চলে। এদের ভেতরে প্রায় সব পাখীকেই দেখা গেছে দু' সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহের ভেতর পালক লাভ করেছে। কিছু পাখীকে দেখা গেছে, তাদের মা-বাবার মত রূপ লাভ করেছে দু' সপ্তাহের ভেতর। কেবল বড় বড় পাখীদের স্বাভাবিক পালক লাভ করতে দু' তিন বছর সময় লেগে যায়। যেমন, শকুন, হাড়গিলা, সারস, উটপাখী। হলদে পাখীর বাচ্চাদের ঠোঁট লাল থাকে না, পরে লাল হয়।

পাখীর বাসা

পাখীর বাসা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সবচেয়ে সুন্দর বাসা বাঁধতে পারে বাবুই পাখী। তালগাছ অথবা খেজুর গাছের ডালে সেইসব গাছের পাতার সরু আঁশ বের করে সুদক্ষ কারিগরের মত সুনিপুণ হাতে গড়ে এই বাসাগুলি। সরু আঁশগুলি পাটি বুনানোর মত সুন্দরভাবে মোটা করে তৈরী করে, যাতে প্রচণ্ড ঝড়-জলেও এর কোন ক্ষতি করতে না পারে। এই বাসায় ঢুকবার ছোট একটু গর্ত থাকে নীচের দিকে। ভেতরে থাকে আর একটি কুটুরী এবং সেখানে ডিম প্রসব করে এবং বাচ্চা হয়। কোনক্রমেই এ বাসা ভাঙ্গে না। গাছ ভাঙ্গলেও, এর বাসা ভাঙ্গে না। আর একটি পাখী টুনটুনি। ছোটপাখী হলেও, সুন্দর বাসা বাঁধতে পারে। ছোট গাছের চওড়া দুটি পাতার সংযোগ ঘটিয়ে তুলোর আঁশ দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে বাঁধন দেয়। ভিতরে থাকে তুলোর সাথে অন্যান্য কিছু তুলোজাতীয় অংশবিশেষ। ভেতরে চেয়ে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ক্ষুদ্র পাখীর বৃহৎ কারিগরী বিদ্যা যা যে-কোন মানুষকে চমৎকৃত করে। এছাড়া আর একরকমের মধুপাখী সরু ঠোঁটওয়ালা ছোট পাখী দেখা যায়। এরা অনেকটা এই টুনটুনির মত। এরা ফুলের মধুর ভাণ্ডারে সরু চঞ্চু প্রবেশ করিয়ে

স্বভু ঝুরে থাকে। এরাও বাবুয়ের মত বাসা বাঁধে। অন্য তুলোর সংযোগে। ভেতরটা দেখতে ঠিক টুনটুনির বাসার মত। অবশ্য বাসা বাঁধে ছোট গাছের ডালে। এদের বলে মধুচোরা।

পাখীর পালকের বর্ণ

তিনটি উপায়ে পাখীর পালকের রঙ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। প্রথমত পালক পরিবর্তনের জন্য; দ্বিতীয়ত যৌবনপ্রাপ্তির পর কোন অংশ ক্ষয় হয় বা নষ্ট হয়। বর্ণ পরিবর্তনের সময় পালকের স্থানে স্থানে রঞ্জনদ্রব্যের সমাবেশ ঘটে। এছাড়া কৃত্রিম উপায়েও পালকের বর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব। বুলফিঞ্চ নামে এক পাখীকে শনের বীজ খাওয়ালে এর নিজস্ব বর্ণ হারিয়ে ফেলে এবং কালো বর্ণ লাভ করে। ডারউইন বলেন, এমাজন নদীর তীরে যারা বাস করে, তারা তোতাকে একরকম মাছের চর্বি খাওয়ায়। ফলে এরা লাল বা লালাভ রঙ লাভ করে থাকে। দেখতে বড় সুন্দর লাগে। আবার মালয় দ্বীপের জিলোলো দ্বীপের অধিবাসীরাও এইভাবে একজাতীয় তোতার বর্ণ পরিবর্তন করে থাকে। এইভাবে রঙ পরিবর্তন করার ফলে এদের জাতিকে চেনা যায় না।

আলফ্রেড ওয়ালেস বলেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা তোতা ও অন্যান্য পাখীর দু একটি পালক তুলে ফেলে সেই ক্ষতস্থানে একরকম ছোট ব্যাঙের লালা লাগিয়ে দেয়। ফলে এই সকল স্থানে উজ্জ্বল পীতাভ পালক জন্মে। তিনি বলেন যে, এই পালকগুলি তুলে ফেললেও পীতবর্ণের পালক গজিয়ে থাকে।

সৌন্দর্যের ভাণ্ডার

সৌন্দর্যের কথা আগেই কিছু বলা হয়েছে। একবার যে পাখী উজ্জ্বল বেশ লাভ করেছে, সে কখনও অনুজ্জ্বল রূপ ধারণ করে না। বয়ঃসন্ধির পরই এরা তাদের সকল রকম ভূষণ লাভ করে। কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। বুনো পুরুষ হংস পক্ষ পরিবর্তনের সময় শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্য স্ত্রীবেশ ধারণ করে। আবার অষ্ট্রেলিয়ার গুলডিয়ান টুইভিং ফিঞ্চ এবং বিলাতের রুট শাবক অবস্থায় একটি সুন্দর অলঙ্কার হারায়।

আহার্য

জীবন রক্ষা সকল জীবেরই ধর্ম ও কর্ম। জীবন রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন হয়। ঘর-বাড়ী নাই বা থাকলো, আহার চাই। কত আদিম মানুষ ঘর-বাড়ী পায় নি, কিন্তু নগ্নদেহে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিবিড় অরণ্যের মাঝে কাটায় পশু-পাখী মেরে খেয়ে। পাখীরাও মানুষের মত খাদ্য সংগ্রহে সর্বদা ব্যগ্র। আমিষাশী পাখীদের খাদ্য সংগ্রহই কষ্ট-সাধ্য। এই জন্য আমিষভোজী পাখীরা নিজেদের পাশে বেশী আমিষভোজী পাখীদের থাকতে দেয় না। যেমন চিল এবং বাজপাখী। তারা বড় হলে দূরে চলে যায়। বিভিন্ন পাখীর আহার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বাজ, চিল, মাছরাঙা ও কাক মৎস্যাশী। ঘুঘু, চড়ুই ও পায়রা প্রভৃতি পাখী শস্যকণা খেয়ে বাঁচে। দোয়েল, শ্যামা - ফিঙে কীট-পতঙ্গ খেয়ে বাঁচে। হরিয়াল, টিয়া সাধারণত ছোট পাকা ফলেই তুষ্ট হয়। কোন পাখী শুধু মধু খেয়ে জীবনধারণ করে থাকে।

পাখীর দাঁত নেই, তার চঞ্চুই মুখ ও দাঁত। ভোজ্যদ্রব্য ও ভোজ্যপ্রণালীর তারতম্য অনুসারে পাখীর চঞ্চুর গঠনেও একটু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। টিয়া ও কাকাতুয়া পাখীর ঠোঁট তীক্ষ্ণ, কঠিন এবং বাঁকা। বাজজাতীয় পাখীর চঞ্চুও তীক্ষ্ণ, কঠিন এবং বাঁকা। এই ঠোঁটের গঠন এদের জ্ঞাতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু শকুনকে টিয়া বা কাকাতুয়ার জ্ঞাতি বলে ভুল করবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সমভাবাপন্ন দুই জাতি পাখীই প্রায়ই খাদ্যদ্রব্য ছিঁড়ে খায়। বাজপাখী দুটি পায়ে চেপে ধরে মাংস ছিঁড়ে খায়, শকুনও তাই করে। তোতা, কাকাতুয়া পাখীরাও ফল ছিঁড়ে খেয়ে থাকে।

তোতা শ্রেণীর পাখীরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা স্থান কাল বিশেষে মাংস খেয়ে থাকে। নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপের কিয়া একপ্রকার তোতার নাম। এরা নিরামিষ খেতো। এখন তারা মাংস খেতে বাধ্য হয়েছে ইউরোপের মেষপালকদের জন্য। এই পাখী মেষ মাংস খায় এবং দলবদ্ধ হয়ে জীবিত মেষ হত্যা করে।

—রমেশ মজুমদার

মুরগীর মলের সদ্ব্যবহার

যাঁরা অনেক মুরগী একসঙ্গে পোষেন, তাঁদের কাছে মুরগীর মল অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে অনেক সময়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এ সব জড় করে গরু ও ভেড়াকে খাওয়ান যেতে পারে এবং তাতে সুফল পাওয়া যায়।

মুরগীর মলে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে এবং রোমন্থক প্রাণীর পক্ষে নাইট্রোজেন অতি প্রয়োজনীয়। এদের ইউরিয়া না দিয়ে মুরগীর মলাদি খাওয়ালে বেশ উপকার হয়, কেন না এতে নাইট্রোজেন থাকে প্রায়শই ইউরিক অ্যাসিড রূপে।

ইংল্যাণ্ডের কৃষিমন্ত্রক পরীক্ষা-মূলকভাবে শতকরা ১২॥ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত শুকনো মুরগী মল খাইয়ে গবাদিপশুর প্রভূত উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা অবশ্য সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেছেন। এতে মুরগীর রোগ গবাদিপশুতে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা থাকে এবং যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক।

প্রচুর পরিমাণে মুরগীর মল যোগাড় থাকলে আর একভাবেও এর সদ্ব্যবহার করা যায়। যে সব জমি— যেমন, কয়লা খনির আশেপাশে— বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে, সে সব জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা চলে। এ কাজে একর প্রতি অন্তত তিন টন মুরগীর মল প্রয়োজন।

মিসিং স্কোয়াড

(বড় গল্প

নিখিল সেন

ওভার ব্রীজ পার হয়ে প্ল্যাটফরমে নামতে-না-নামতেই ট্রেনখানি ছেড়ে দিল। পরের গাড়ি সেই বিকেল পাঁচটায়। পুল পার হয়ে তাই নেমে আসছিলাম। সিঁড়িটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে তার পাশেই দেয়াল জুড়ে ঝুলান একটা কাচের চৌকোণা বাক্স---মিসিং পার্সোনেলের।

ট্রেনে কাটা বা নিরুদ্দিষ্টদের অনেকগুলি আলোকচিত্র কাচের বাক্সটায় আলপিন দিয়ে গেঁথে রাখা হয়েছে। নীচে নাম, ঠিকানা, আনুমানিক বয়েস, কোথায় কোন তারিখে কাটা পড়েছে বা কবে থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কাচের বাক্সটার পাশ কেটে যেতে যেতে সহসা দাঁড়িয়ে পড়লাম। --একি! মিসেস মিটারের ফটো না? মিসেস মিটার কি তাহলে ট্রেনেই কাটা পড়েছিলেন?

প্রেম করেই ওঁরা বিয়ে করেছিলেন। ভালবেসে। ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ল।

বিপুল ছিল ক্যালচার্যাল সেক্রেটারী কলেজ ইউনিয়নের। পুজা এসে পড়েছিল। তার পূর্বেই ফাংসানটা নামাতে হবে। বেশী সময় নেই। ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করা ঠিক হোল। পুরোদমে তার রিহারসেল চলছিল। এ রিহারসেল মারফৎ ওদের প্রথম পরিচয়। দু'জন দু'জনকে পেয়েছিল ঘনিষ্ঠভাবে। কেন না, সুমিত্রা হোল এডুকেশন বিভাগের ছাত্রী। আর বিপুল ফিজিক্স-এর। আলাদা দু'জগতের। তবু পরস্পর পরস্পরকে আপনার করে নিয়েছিল ওরা নাচ-গান হৈ-হল্লা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে। আপাত-বিরোধী দুটি জীবন-স্রোত কার সম্মোহনী অঙ্গুলি সংকেতে গিয়েছিল বুঝি এক হয়ে।

সুমিত্রা সাড়া দিল। সেও ভালবাসল। সুমিত্রাই তার জীবনের প্রথম শুকতারা। নিজেকে সে বিলিয়ে দিল একান্ত নিবিড় করে। ফিরবার আর পথ রইল না। যেন একটি মৌমাছি দিগ্‌বিদিক না তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রস্ফুটিত কোন এক কুসুমের অন্তস্তলে। ডানাদুটি তার গেল মধুতে জড়িয়ে। আটকে গেল সে তার মধ্যে। বেরুবার পথ আর রইল না।

এর আগে সুমিত্রা ছিল শিক্ষিকা। টিচিং ট্রেনিং-এর ডিগ্রীধারী। অধিকতর উচ্চশিক্ষার জন্য সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল দীর্ঘ স্টাডি লিভ নিয়ে। টাকা-পয়সার ভাবনা তাকে কোন দিন ভাবতে হয় নি। পৈত্রিক স্বচ্ছল অবস্থার কথা ছেড়ে দিলেও নিজের চাকরীর উপার্জিত পুঁজিটা তার নেহাৎ নগণ্য ছিল না।

সিনেমা, থিয়েটার, রেস্তোরাঁ কোনটারই অভাব হোল না। কিংবা ক্লাশ-পালিয়ে গঙ্গার ধার ধরে বরাবর ট্যাক্সী হাঁকিয়ে ছোটার। অধেরও। মধুচ্ছন্দা দিনগুলি তাদের গঙ্গার তীর বা লেকের নির্জন ধারে কখন যে অতিবাহিত হোত, নিজেরাও ঠিক জানতো না।

সিক্সথ্ ইয়ারের শেষাশেষি একদিন ভোরবেলা সুমিত্রা বিপুলদের বোর্ডিং হাউসে এসে হাজির। সুমিত্রাকে অপ্রত্যাশিত দেখে সে খানিকটা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। বলে উঠেছিল: 'এত সকালে?'

'দরকার আছে।' সুমিত্রা জবাব দিলে। 'চল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।'

হ্যাঙ্গার থেকে পাঞ্জাবীটা তুলে নিয়ে বিপুলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার বললে: 'খুব দরকারী কথা কিন্তু।'

'কি ?'

বিপুল জানতে চেয়েছিল। বলেছিল: 'এখানে বলে ফেল না। আমাকে তো আবার টিউশনিতে বেরুতে হবে।'

'না।'

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল সুমিত্রা। 'এখানে বলা যায় না।' তারপর বিপুলের দিকে একটু স্মিত হেসে বললে: 'আচ্ছা তোমাদের মেসের লোকগুলি অমন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কেন বল তো ? যেন গোগ্রাসে গিলছিল।'

'ও: তই বুঝি ?' বিপুলও হেসে উঠেছিল।

ওয়াই-এম-সি-এ থেকে চা আর টোস্ট খেয়ে নিয়ে ওরা তারপর ট্রামে চেপে বসেছিল। ইডেন উদ্যানের ভাঙা বর্মী প্যাগোডার পাশে গাছতলায় বসে পড়ে সুমিত্রা কথাটা পাড়লে। ঘাসের কচি একটা ডগা নখ দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে একসময় জানালে কথাটা।

বিপুল শুনে তো লাফিয়ে উঠেছিল আনন্দে। সুমিত্রার মাথাটা বুঝি বুকে চেপে ধরতে যাচ্ছিল, আশপাশে তাকিয়ে কি ভেবে তারপর ছেড়ে দিলে—বলে উঠলে: 'সত্যি ?'

মুখ তুলে তাকালে সে সুমিত্রার দিকে। মাতৃত্বের অঢেল প্রলেপ লেগেছে তার সর্বাঙ্গে। মুখখানি হয়ে উঠেছে নমনীয়, কমনীয়, সুষমামণ্ডিত। বিপুল তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

সুমিত্রা চোখ দু'টি নামিয়ে শুধালে: 'এখন কি হবে ?'

'যা হবার তাই হবে।'

'না। তা হয় না।' সুমিত্রা মুখ তুললে। 'ও আপদ আমি চাই না। তুমি তার ব্যবস্থা করো। টাকা যা লাগে আমি দিচ্ছি।'

কিন্তু ব্যবস্থা হয়ে উঠল না। মহা ভাবনায় মাসখানেক কেটে গেল। এরই মধ্যে কিছুই হয়ে উঠল না। মুখ ফুটে সবার কাছে বলে বেড়ানও যায় না। কোন পরামর্শও না। একান্ত অন্তরঙ্গ দু'একজন যা দাওয়াই ব্যবস্থা করেছিল মহাভাবনায় পড়ল। সুমিত্রা [illegible] প্রথম থেকেই জিদ করতে লাগল। ক্লিনিকে গিয়ে অপারেশন করিয়ে আসতে। বললে: 'এমন কতই তো হচ্ছে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ?'

বিপুল কিন্তু আপত্তি জানালো। ব্যাপারটা জানাজানি হবার ভয় নয়। আপত্তি করলে সুমিত্রার জীবনের আশংকা করে। হবু ডাক্তার এক ছাত্র-বন্ধুর কাছে শুনেছিল সে, প্রাইভেট হেল্‌থ ক্লিনিকের হাতুড়ে ডাক্তারদের পাল্লায় পড়ে অসহায় এমনি কত কুমারী মাতার জীবন কেবল বিপন্ন হয় নি, হৃতস্বাস্থ্যও আর তারা ফিরে পায় নি।

সে যাই হোক, সহজ সমাধান ওরা একদিন খুঁজে নিল।

বিপুলের মাথাটা আপনার বুকে [illegible]

'আচ্ছা বোকা, এ্যাদ্দিন বলো নি কেন ?'

পরের দিন ওরা কালীঘাটে গিয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলে কিন্তু পুরোহিত মশাই শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের ফ্যাকড়া তুললেন। বললেন: পাত্রী মৈত্র—বারেন্দ্র, আর পাত্র মিত্র—অব্রাহ্মণ অসাম্প্রদায়িক এ বিবাহের জন্য কাজেই ভিন্ন ব্যবস্থা করতে হবে। দক্ষিণাও কিঞ্চিদধিক ব্যয় করতে হবে।

সুমিত্রারা কিন্তু অত ঝামেলার মধ্যে গেল না। পরদিনই তারা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি অফিসের হোল শরণাপন্ন এবং যথারীতি দু'জনে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এল।

সমাধান হোল বটে সমস্যার। কিন্তু ব্যবধানও দেখা দিল অপর দিক থেকে। কলেজের স্টাইফেন আর টিউশনির টাকা থেকে বিপুল এতদিন নিজের খরচ নিজেই বহন করতো। বাবা-মা ছিলেন না। পারিবারিক বন্ধন ছিল না খুব একটা। যা ছিল বিয়ের পর তাও হোল আরও শিথিল। দাদারা ওর সম্পর্ক একরূপ ছিন্ন করলেন বিয়ের পর কেলেঙ্কারীকে কেন্দ্র করে।

সুমিত্রার ক্ষেত্রে এটা আরও গভীর হয়ে বাজল, কথাটা যখন আর গোপন রইল না। বাবা হলেন 'ক্লাশ টু' কেন্দ্রীয় সরকারের আমলা। অপদস্থ, অসামাজিক মেয়ের এ বিয়েতে কাজেই তিনি মারমুখী হয়ে উঠলেন। মেয়ের মাসোহারার মোটা টাকাটা দিলেন বন্ধ করে। শুধু তাই নয়, বাপের বাড়ীর সদর ফটকের দরজাও হোল রুদ্ধ। বিপুলের এক বন্ধু অবশ্য অনেকটা দয়াপরবশ হয়ে একখানি ঘর আর আধখানি বারান্দা তাদের ছেড়ে দিলো। ওরা উঠে গেল।

ছোট ঘর। ভালো বাসা নয়। তবে ভালোবাসার অভাব হোল না। সুমিত্রা ঘর সাজালে মনের মতো করে। সংসার পাতলে প্রথম প্রেমের। কিন্তু তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট উঠল। বিপুলেরও। পড়াশুনায় সে ছিল [illegible] ফিজিক্স-এ ভাল

অনার্সও পেয়েছিল। এম এসসি-তেও ভাল করার কথা। প্রথম না হলেও প্রথম শ্রেণী তার অবধারিত। তারপর অধ্যাপনা। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর গবেষণা--উন্নয়নকামী ভারতের জয়-যাত্রার পথে কলিত পদার্থ শাস্ত্রের নব প্রয়োগ। কিন্তু সব আশা-আকাঙ্ক্ষা গেল ভেস্তে। আসন্ন পরীক্ষার আলো অন্ধকার-ময় জগৎ উঠল তার মাথায়। পড়াশুনার বদলে সকাল, বিকেল আর সন্ধ্যে --তিনবেলায় টিউশনীর মাত্রা গেল বেড়ে। বাড়ল চাকরীর উমেদারী।

এদিকে আবার বোঝার উপর বোঝা। মেটার্নিটি ওয়ার্ডের মোটা বিল। নবজাতিকার প্রাসঙ্গিক নানা খরচা।

ঠিক এ সময় ভগবানের অমোঘ আশীর্বাদের মত একটা কাজ জুটে গেল বিপুলের। খুব মোটা মাইনে নয়। তা হলেও এ বাজারে নেহাৎ মন্দ নয়। রেলের ট্রেভেলিং টিকিট চেকার টি. টি. সি.র কাজ। চলন্ত রেলগাড়ীতে উঠে যাত্রীদের কাছ থেকে খালি টিকিট পরীক্ষা করা আর ডবলিউ. টি. যারা --অর্থাৎ বিনা টিকিটের যাত্রী যারা তাদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে কাঁচা রসিদ কেটে দেওয়া শুধু।

প্রথম প্রথম বিপুলের হাসিও পেত। কান্নাও। তবু কিন্তু সে দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে ভালবেসেছিল রেলপথের রুক্ষ জীবনকে। রেলের এ নতুন চাকরী আনল তার দেহে ও মনে নতুন উদ্দীপনা। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ। চলন্ত ট্রেনের ঝকঝক, ঝকাঝক, ঘরঘর শব্দ ছন্দিত মুখরিত হয়ে ওঠে তার কানে। ইঞ্জিনের বাজখাই তীব্র হুইসল, গাড়ীর সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা দু'পাশের সঞ্চরমাণ গাছপালা, দৃশ্যাবলী, বিস্তীর্ণ মাঠ-প্রান্তর, ধূম্রাভ পাহাড় আর পরিদৃশ্যমান নতুন নতুন মুখমণ্ডলীর মধ্যে খুঁজে পেল সে কাব্যময় এক অভিনব জগতের। দুর্লভ এ মুহূর্তগুলি স যদি ভাষা[illegible] রাখতে পারত ভাষা ও ছন্দের মসিরেখায় তাহলে সুমিত্রা আর তার বন্ধুরা পাঠ করে নিশ্চয় অবাক হয়ে যেত।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ট্রেনে লম্বা জার্নি করতে করতে আশে-পাশে কত বিচিত্র দৃশ্য --ঐতিহাসিক কত স্থান, শিল্পকেন্দ্র; সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থানের পাশ কেটে ছুটে গেছে সে। একদিনকার কথা তার মনে পড়ল: নালন্দা না রাজগীর দেখে এসে সুমিত্রাকে সে লম্বা একখানি পত্র বুঝি লিখেছিল। সুমিত্রার কাছ থেকে সে পত্রের উত্তর সে পায় নি। অবশ্য, তাতে সে দুঃখিত বড় হয় নি। কেন না, ডিউটিতে বেরুলে তাকে দিনকয়েকের জন্য বাইরে বাইরে থাকতে হয়। কোথায় থাকবে বা রাত্রিযাপন করবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ট্রেনের চলমান জীবন। সুমিত্রাই বা তাকে কোন্ ঠিকানায় পত্র লিখবে?

তবু উইক্-এণ্ডে যখন সে বাড়ী ফিরেছিল, ভেবেছিল সুমিত্রা হয়ত তার কাব্যময় উচ্ছ্বসিত পত্রের খুব একটা তারিফ করবে। তাই বাড়ীতে পা দিয়েই কথাটা সে পেড়েছিল। একটু দ্বিধা-সংকোচিত কণ্ঠে শুধিয়েছিল সুমিত্রাকে: 'আচ্ছা, তুমি আমার চিঠিখানাপাও নি?'

'কোন চিঠি?' সুমিত্রা যেন আকাশ থেকে পড়ল।-- 'কোন চিঠি বল তো?'

পুরনো একরাশ শাড়ী প্যাণ্ট আর ছেঁড়া পাঞ্জাবীর বিনিময়ে একটা মেয়ের কাছ থেকে সুমিত্রা স্টেনলেস স্টীলের নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি বাসন কিনছিল। মুখ তুলে জবাব দিলে: 'ও:, হ্যাঁ, চিঠি একটা এসেছিল। ও চিঠি তো নয়, যেন অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত। রেখে দিয়েছি বালিশের নীচে। সবটা পড়া হয়ে ওঠে নি এখনো।'

বেবীকে কোলে নিয়ে সুমিত্রা একসময় উঠে দাঁড়াল। বলল: 'বাব্বা:, রেলে লোকের কাছ থেকে টিকিট চাইতে চাইতে এতখানি কাব্য করতে পারো তুমি?'

খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল বুঝি সে। মহা অপরাধী যেন। একটু কেশে বলেছিল: 'না, কাব্য আর কোথায়? বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রাজগীরে নেমে পড়েছিলাম মহাভারতের সেই বীর যোদ্ধা মহারাজ জরাসন্ধের রাজধানী। এঁরই বিংশ অক্ষৌহিণী সেনার পদভরে আর্যভারত একদা কেঁপে উঠত। শুধু তাই নয়। বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থানও রাজগীর বা রাজগৃহ --গিরিব্রজ। ওখানকার বিস্তীর্ণ মাঠ আর পাহাড়ের সানুদেশে বেড়াতে বেড়াতে তোমার কথা মনে পড়ছিল। তাই লিখেছিলাম। তা তুমি তো একবার পড়েও দেখলে না।'

'আমার অত সময় কোথায়? সংসারের হাঁড়ি ঠেলা, মেয়েকে রাখা তার উপর আবার চাকরীর ঠ্যালা। তোমার মত কাব্য করার আমার সময় কোথায় বলো তো।'

সুমিত্রা বেবীকে ওর কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল: 'তুমি বাড়ী এসেছো ভালই হয়েছে। ওকে একটু দেখো। আমি টিউশনিটা সেরে আসি। আবার হয়তো জল এসে পড়বে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যেতে হবে।'

গজগজ করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে তারপর। নিজের মনে তারপর বলে উঠেছিল: 'বর্ষাতি না হোক, একখানা ছাতাও তো কেনা হয়ে উঠল না একারও।'

একখানি মাত্র ঘর। সেটাই ওদের শোবার বসবার এবং খাবারের, বাকি ঘরখানা এক সহকর্মীকে ভাড়া দিয়েছে গোপনে। চিরজীব একাই থাকে। অবিবাহিত। অডিট সেকসনের জুনিয়র। খোশ মেজাজের বেশ হাসিখুশী মানুষ। আর বৌদি বলতে অজ্ঞান।

একটু অসুবিধা যে হয় না, তা নয়। তবে কিছুটা টাকা তো আসে। আর বাইরের লোকজন এমন কেই বা আসে? আত্মীয়স্বজন কেউ তাদের নাম করে না। আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ হঠাৎ এসে পড়ে সে তাকে

[illegible] মোড়ের চায়ের দোকানে গিয়ে ওঠে। এককাপ চা আর একখানি টোস্ট কিংবা একটা অমলেটের অর্ডার দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দেয়। আর সুমিত্রা তো তার আগেকার বন্ধু-বান্ধবী কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, দেখেও দেখে নি, ভাণ ক'রে এড়িয়ে যায়।

সুতরাং একটু অসুবিধা হলেও দিন তাদের গড়িয়ে যাচ্ছিল —আর পাঁচটা রেলওয়ে কর্মচারীর মত। একঘেয়ে গতানুগতিক।

বিপুল তার রেলওয়ের কালো ইউনিফর্মটি খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল। সাদা ট্রাউজারটি ছেড়ে নিত্য অভ্যাসমত একখানি লুঙ্গি কোমরে জড়িয়ে নিল। এ লুঙ্গি পরা নিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে কতদিন না তার কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। সুমিত্রা আপত্তির ঝড় তুলেছিল। বলেছিল: 'লুঙ্গি পরো কেন? পায়জামা তো পরতে পারো? না হয় আমার একখানা শাড়ী। তোমার ও লুঙ্গি আমার দুচোখের বিষ।'

বিপুল বিয়ের প্রথম প্রথম কিছুকাল তাই অবশ্য পরতো। সুমিত্রার গঞ্জনা এখন অনেকটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। খুব একটা সে গা করে না।

সুমিত্রা শাড়ী পরে বেরিয়ে এসে বেবীকে তার কোলে তুলে দিল।

চোখ তুলে সে তাকাল একবার সুমিত্রার দিকে। মুখখানি তার শুকনো লম্বাটে হয়ে পড়েছে। চোয়ালের হাড় দু'টি গালের ফ্যাকাশে চামড়া ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। বিপুল চোখ দু'টি নামিয়ে বললে: 'একটা ঠিকে লোক রাখলে হয় না? তা হলে তোমার কাজের কিছুটা সাহায্য হোত। খেটে খেটে শরীরটা যে একবারে ভেঙ্গে পড়েছে।'

'হয়েছে, - - - সহানুভূতি আর জানাতে হবে না। ধন্যবাদ।' তারপর দোর খলতে খলতে বললে: 'বেবীকে রয়েছে। আমার হয়তো ফিরতে দেরী হতে পারে।'

বিপুল বেবীকে কোলপাঁজা করে বারান্দার এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগল। কটা রঙের ছোট্ট মেয়ে। তিন বছরে এখনো পড়েনি। হাসি-খুশি মুখ। হাসতে গেলে গালে টোল পড়ে, ভারী সুন্দর। অন্যান্য বারের মত এবারও সে বাবার পকেটে তার কচি হাত দু'খানি গলিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। বাড়ী আসার পথে প্রতিবারই সে বেবীর জন্য চকোলেট কিংবা টফি কিছু একটা নিয়ে আসে। বেবী বুঝি তাই খুঁজছে। আজ কিন্তু তাড়াহুড়োর মুখে বেবীর জন্য কিছু আনতে ভুলে গিয়েছিল সে।

বেবী নাছোড়। 'আব্বা' 'আব্বা' বলে সে আব্দার করতে লাগল।

বিপুল অগত্যা করে কি: বেবীকে নিয়ে সে দোলা দিয়ে নাচাতে লাগল আর নিজে সুর করে ছড়া কেটে চলল:

'বেবীমণি, খুকুমণি, বাপ্পীমণি।
চকো তুমি খাবে নাকি সোনামণি॥'

দুলিয়ে দুলিয়ে সে বেবীকে নাচাতে লাগল। বেবীও খিল খিল করে হাসতে লাগল। কচি কচি হাত বাড়িয়ে গলাটা তার জড়িয়ে ধরল। চোখ দুটি বুজে এল এক সময়। মাথাটা নেতিয়ে পড়ল বাবার কাঁধের উপর। বিপুল আস্তে আস্তে বেবীকে তার বিছানায় শুইয়ে দিল ছোট কাঁথাখানি মুড়ি দিয়ে।

ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে একবার তাকাল বিপুল। মায়ের রঙ পায় নি বটে তবে মুখের আদলখানি পেয়েছে ঠিক। সেই চোখ, সেই নাক, কোঁকড়ান চুল—সবই। যেন সুমিত্রার একখানি প্রতিকৃতি কাঁচি নিয়ে কেটে কে বসিয়ে দিয়েছে মেয়ের মুখে। ঘুমের ঘোরে বেবী এক সময় হেসে উঠল ফিক করে। তারপর ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে কি যেন চুষতে লাগল সে।

এর মানে কি, জানে সে। ফিডিং বোতলটা সে নিয়ে বেবীর মুখে পুরে দিল আলগোছে। সুমিত্রাই অভ্যেসটা থেকে চুষিকাঠি আর ফিডিং বোতল মুখে পুরে দিয়ে ফেলে রাখত মেয়েটাকে ছোট্ট দোলনাটায়। ঘরের নানা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখত বলে নয়, এমনি যেন মেয়েটির প্রতি তার কেমন এক অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য ভাব গড়ে উঠেছিল প্রথম থেকে।

অবশ্য এটা ঠিক, মা হোতে সে চায় নি। দায়িত্বটা এসে পড়েছিল আকস্মিকভাবে। তাই সে এ-দায়িত্ব-ভার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল। বিপুলকে বলেছিল অনেকবার। কিন্তু বিপুল রাজী হয় নি।

ডেলিভারীর সময় সুমিত্রা কিন্তু কষ্ট পেয়েছিল খুব। সিজারিয়ান অপারেশনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তার। জীবন নিয়ে রীতিমত টানা-হ্যাঁচড়া। কেবল প্রসূতি নয়। নব-জাতিকাকেও রাখতে হয়েছিল দিন কয়েক গ্যাস বক্স-এ। খুব বেশী কষ্ট পেয়েছিল বলেই হোক, বা যে-কোন কারণেই হোক, একটা বিজাতীয় আক্রোশ সুমিত্রার গর্জে উঠেছিল মেয়ের প্রতি। যতটুকু না করলে নয়, তার বেশী সে কোনদিন করে নি মেয়ের জন্য।

একদিনের কথা বিপুলের মনে আছে। কি একটা কাজে সে বুঝি কোথাও গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে মেয়েটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে দোলনায় শুয়ে শুয়ে। আর পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাথার দিকে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে। বিপুল ছুটে এসে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। কাঁথাটা ভিজে আছে বুঝি অনেকক্ষণ থেকে। পালটিয়ে দিয়েছিল সে। বলেছিল 'মেয়েটা যে কেঁদে কেঁদে সারা, ওর দিকে একটু নজর দেওয়া [illegible] দোষের?'

খানিকটা ঝাঁজ ছিল [illegible] বিপুলের গলায়। সুমিত্রাও স[illegible] গলায় জবাব দিল।

'আমি তো আর বসে নেই মেয়ে নিয়ে তোমার মত সো[illegible]

'সোহাগ নয়। দেখো, ওর খিদে পেয়েছে।'

সত্যি, বেবীর বুঝি খিদেও পেয়েছিল। বিপুলের বুকে মুখ গুঁজে কি যেন সে পরম আগ্রহে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তারপর ব্যর্থ হয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল। বিপুল কাতর হয়ে তাই বলে উঠেছিল : 'একটু মাই দাও না।'

'না'। মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছিল সুমিত্রা। 'যখন তখন দিলেই হোল না। খাবারের একটা টাইম আছে।'

একটু থেমে তারপর মেয়েকে উদ্দেশ করে বলেছিল : 'অত যদি আহ্লাদ পেয়ে চাস রে হতভাগী, তবে টিকিট বাবুর ঘরে জন্মেছিলি কেন?'

বিপুলের কোল থেকে এক-ঝটকায় মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে দোলনায় আবার শুইয়ে দিয়েছিল সে। আর ফিডিং বোতলটা পুরে দিয়েছিল মুখে।

●

মধুচ্ছন্দা দিনগুলি তাদের ফুরিয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। তুচ্ছ, ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি, শেষে কথা বন্ধ, মনো-মালিন্য লেগেই ছিল হামেশা। এমনও দিন গেছে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে ব্যবধানের অন্তরাল সৃষ্টি হয়েছে অভ্রংলিহ। বিপুল হয়তো কিছু না খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো সুমিত্রাও এসে আলো নিবিয়ে খাটের পাশ ঘেঁষে দেয়ালের দিকে মুখ করে কিংবা মেঝেতে একখানি মাদুর পেতে শুয়ে রইল।

ছোট প্রকোষ্ঠ। কিন্তু তারই চারিটি দেয়ালের বেষ্টনীতে দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছে অতলান্তিক ব্যবধান। মুখর কথাবার্তাও হ্রাস পেতে পেতে শেষে নিত্য প্রয়োজনীয় হ্যাঁ, হুঁ, না-তে পর্যবসিত হোল। কেবল দিনে নয় রাত্রেও। তবে দিনের বেলা একটা সুবিধে, অফিসের দৌলতে সারাদিন দু'জনকেই একরূপ বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে এ-ফাটলের কথা বুঝবার উপায় নেই। সেই ভাড়া-করা হাসি, লোক-দেখানো গোছের দাম্পত্য-জীবনের অভিনয় কোনটারই অভাব নেই। ছুটি-ছাটার দিন মেয়েকে কাঁধে চাপিয়ে সুমিত্রাকে নিয়ে বিপুল হয়তো বেরিয়ে পড়েছে শহরতলীর দিকে। শহরের ঘিঞ্জী পরিবেশ টুঁটিটা তার টিপে ধরে। হাঁপিয়ে ওঠে সে। তাই প্রায় বেরিয়ে পড়ে ওরা। বদ্ধ, রুদ্ধদ্বার, তাপ-নিয়ন্ত্রিত সিনেমাঘরের আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখার চাইতে পল্লীর মুক্তাঙ্গনে ঘুরে বেড়াতে সুমিত্রারও মন্দ লাগে না। ছাত্রী জীবনের কথা তার মনে পড়ে যায়।

দেখে মনে হয় সুখী পরিবার। কিন্তু সুরটা কেটে গেছে কোথায় যেন। সুমিত্রা বুঝে উঠতে পারে না, বিপুলও না। একদিন তো সে মুখের উপর বলে ফেলেছিল সুমিত্রাকে : 'আমার প্রয়োজন যদি তুমি মনে করো ফুরিয়ে গেছে, তা হলে তুমি সহজেই দায়মুক্ত হতে পারো। আমি কোন বাধ সাধবো না। এটুকু উদারতা আমার কাছ থেকে তুমি আশা করতে পারো, মিতা।'

সুমিত্রা তার কোন জবাব দেয় নি। শাড়ী ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠেছিল : 'থিয়েটার-বায়স্কোপে তো আর রোজ রোজ যাওয়া হয় না। চিরঞ্জীব ঠাকুরপো একটা পাশ পেয়েছিল, তাই যাওয়া। টিকিট তো আর কাটতে হয় নি। কিন্তু তাতে যে লোকের অমন চক্ষু টাটাবে জানা ছিল না।'

'চক্ষু টাটাবার কথা তো বলি নি, মিতা। বলছিলাম বেবীকে মায়াদের কোয়ার্টার্স-এ একা রেখে গেলে কি না, তাই। নইলে যেখানে তোমার খুশী যাও না, আমি বলতে আসবো কেন?'

ওঃ, বেবীই তা হোলে তোমার সব। আর কেউ নয়।' সুমিত্রা টিপ্পুনী কেটেছিল। বলেছিল : 'কিন্তু আসছে মাস থেকে কি হবে বলো তো তোমার বেবীর? আমি তো লিলুয়ায় চাকরী নিচ্ছি। তোমার বেবীর ব্যবস্থা তোমাকেই তখন করতে হবে কিন্তু?'

'লিলুয়ায় চাকরী।'

'হ্যাঁ। চিরঞ্জীব ঠাকুরপোর এক দাদা ওখানকার গর্ভর্ণিং বডিতে আছেন। আমাকে নেবেন আশ্বাস দিয়েছেন। ইণ্টারভিউও দিয়ে এলাম।'

'ইণ্টারভিউও দিয়ে এসেছো? কই, আমাকে তো কিছু বলো নি? কবে গিয়েছিলে?'

'এই তো সেদিন, তা অতো বলা-বলির কি আছে?'

সুমিত্রা তারপর রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল।

●

বিপুল মুখ তুলে সুমিত্রার অপস্রিয়মান মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। স্ত্রীর কাছ থেকে এতটা অবশ্য সে আশা করে নি। সুমিত্রা তাকে যতটুকু দিয়েছে তার বেশী কোনদিন সে মুখ ফুটে চায় নি। তাছাড়া তার স্বভাবটা হোল অনেকটা চাঁদির টাকার মত। বাজালে তবে সে বাজে। আপনা থেকে নয়। সুমিত্রার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় কোনদিন সে হস্তক্ষেপ করে নি। প্রতিবন্ধক হয় নি তার স্বাতন্ত্র্যবোধের। বিয়ের এতদিন পরও যদি তার নতুন কর্ম-জীবন সম্পর্কে কোন নতুন সন্দেশ তাকে দিতে নারাজ, এ নিয়ে তার মাথা ঘামান কি শোভা পায়?

সকালের খবরের কাগজখানি সে চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। পাতাও উল্টাচ্ছিল অভ্যাসমত। কিন্তু একবিন্দুও তার বোধগম্য হোল কি না সন্দেহ। কাল সারা রাত ট্রেনে ট্রেনে কেটেছে। দিনের বেলাও খুব একটা ফুরসৎ পায় নি। ক্লান্ত হয়েছিল। তন্দ্রার ঝোঁকে মাথাটা বুঝি বালিশের উপর নেতিয়ে পড়েছিল আপনা থেকে।

সুমিত্রার ডাকে তন্দ্রার ঝোঁক তার কাটল। ছোট আলমারিটা থেকে কি একটা যেন নিতে এসেছিল সুমিত্রা। বললো : 'ঘুমিও না লক্ষ্মীটি। মাংসটা

হয়ে এসেছে। দু'খানা পরোটা ভেজে নিয়ে তোমাকে খেতে দিচ্ছি। চিরঞ্জীব ঠাকুরপোকে দিয়ে একটা চিকিন্ আনিয়েছিলাম নিউ মার্কেট থেকে।'

সুমিত্রা আবার রান্নাঘরে ফিরে গেল। মুখে তার রবিঠাকুরের গানের কলি :

'জীবন যখন শুকায়ে যায়।
করুণা ধারায় এস।'----

তন্দ্রার ঘোরে কি জবাব দিয়েছিল সে মনে নেই। জেগে উঠে দেখল আলোটা জ্বলছে তখনও। রাত কম হয় নি। তার খবারটা টেবিলে চাপা রয়েছে ঢাকা দিয়ে। জলশুদ্ধ গ্লাশও।

কিন্তু ঘরে কেউ নেই। প্রশস্ত খাট-খানার যেদিকটায় সুমিত্রা দেয়াল ঘেঁষে জড়পদার্থের মত পড়ে থাকত, সেদিকটা আজ ফাঁকা। খালি। সুমিত্রা গেল কোথায়? রান্না কি এখনও শেষ হয় নি?

বিপুল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু রান্নাঘরে কেউ নেই। দরজায় শিকল লটকানো। বাথ্রুমও অন্ধকার। সুমিত্রা তবে গেল কোথায়?

গলা ছেড়ে সে ডেকে উঠল : 'মিত্রা---সুমিত্রা।'

কোথাও কোন সাড়া নেই। ভয় পেয়ে কেবল কালো বেড়ালটা পালিয়ে গেল রান্নাঘরের পাশে ছাইগাদা থেকে।

আশ্চর্য, সুমিত্রা এত রাত্রে গেল কোথায়? বিপুল শোবার ঘরে ফিরে এল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল : ছোট্ট যে তিপায়াটার সামনে বসে সুমিত্রা তার দৈনন্দিন প্রসাধনপর্ব সমাধান করত, তার উপর ছোট একটুকরো চিরকুট পড়ে আছে সিঁদুর কৌটো চাপা দিয়ে। চিরকুটটা সে মেলে ধরল চোখের উপর। সুমিত্রার হস্তাক্ষরে ছোট একটি ছত্র :

'চললাম। তোমার দান তোমারই কাছে রেখে গেলাম।' ইতি---সুমিত্রা

ছত্র দুটি বার বার পড়ে গেল বিপুল। নিজের চোখকে নিজে সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সদর দরজার শিকল ছুটে গেল সে। দরজাটা ভেজান। দরজাটা খুলে ছুটাছুটি করতে লাগল সে। কিন্তু কোথাও দেখল না সুমিত্রাকে।

ভোর হয়ে এসেছিল। একটু বেলা হ'লে তাদের রেলওয়ে এস্টেটের কে যেন এসে জানাল : রেলওয়ে ব্রীজটার পাশে একপাটি লেডিজ শ্লিপার ও তার কিছুদূরে মেয়েদের একটি ছোট ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে।

নিদর্শনগুলি যে সুমিত্রার কোন সন্দেহ রইল না। সুমিত্রা কি তবে ট্রেনে কাটা পড়ল? অথবা আত্মহত্যা?

তাই যদি হয় তবে মৃতদেহ গেল কোথায়? রেল লাইনের ধারে পাশে তার কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য, শেষ রাত্রে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কি ট্রেনে কাটা পড়ার সব চিহ্ন লোপাট হয়ে যেতে পারে? পারে কি?

●

সুমিত্রার সন্ধান কিন্তু আর মেলে নি।

যে মাছ ইচ্ছেমত স্ত্রী থেকে পুরুষ হতে পারে

রেড সী'তে পাওয়া যায় ছোট্ট, লাল রঙের মাছ, যার বৈজ্ঞানিক নাম "এ্যান্‌থিয়াস স্কোয়ামিপিনিস।" এদের ঝাঁকে দেখা যায় বেশীর ভাগই স্ত্রীজাতীয় মাছ ; মাত্র কয়েকটি পুরুষ থাকে যারা নির্বিবাদে রাজত্ব করে।

এ মাছের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, এরা ইচ্ছেমত যৌন পরিবর্তন করতে পারে। বেশীর ভাগ স্ত্রীজাতীয় রেখে অবাধ বংশবৃদ্ধি অব্যাহত রাখে।

ইস্রায়েল-এর একজন বৈজ্ঞানিক নাম লেভ ফিশেলসন্, পরীক্ষাগারের চৌবাচ্চায় শুধু স্ত্রীজাতীয় এ্যান্‌থিয়াস মাছ রেখে দেখেছেন যে, দু' সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একটি মাছ ক্রমে পুরুষ যোনিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আবার এই পুরুষ মাছটিকে সরিয়ে নিলে, ঠিক একই সময়ের মধ্যে আর একটি স্ত্রীজাতীয় মাছ পুরুষে পরিণত হয়ে যায়, ক্রমে ক্রমে আপনা হতে।

উপরোক্ত উপায়ে ডঃ ফিশেল্‌সন কুড়িটি স্ত্রীজাতীয় মাছকে পুরুষে রূপান্তরিত করে দেখেছেন।

লক্ষণীয় যে, যত স্ত্রী মাছই থাকুক না কেন, একটিমাত্র পুরুষ মাছ থাকলেই আর কোন যৌন রূপান্তর হয় না ---এমন কি যদি সেই পুরুষটিকে আলাদাভাবে কাচের ঘরে রাখা হয় তা'হলেও । অর্থাৎ দৃষ্টিগোচরে যদি একটি পুরুষ থাকে, তবে সব স্ত্রীজাতীয় মাছই তুষ্ট।

রেড্ সী'তে অসংখ্য স্ত্রীজাতীয় মাছের মধ্যে অল্প কয়েকটি পুরুষ মাত্র থাকে।

কেমন করে এটা হয়, তা' অবশ্য এখনো জানা যায় নি।

[illegible]

রামরাজাতলা

হাওড়া থেকে ৪ মাইল। ষ্টেশনের কাছেই রামরাজার মন্দির; সীতা, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও হনুমানের মূর্তির সঙ্গে রামরাজার বিরাট মূর্তি তৈরী। প্রতি বছর চৈত্র মাসে রামনবমী তিথি থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত মহাসমারোহে রামরাজার পুজো হয়ে থাকে। বিরাট মেলা বসে। মেলায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়। দশহরা, অম্বুবাচী, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীর ভীড় খুব বেশি হয়।

এর কাছেই শঙ্কর মঠ। সুন্দর বাগানের মধ্যে। এর নাটমন্দিরের গায়ে বিষ্ণুর দশাবতারের ছবি ও অন্যান্য পৌরাণিক ছবি আছে। মঠে শঙ্করাচার্যের ও সাবিত্রী দেবীর মূর্তি আছে। প্রতি বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর দিন শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি উৎসব হয়। সাবিত্রী চতুর্দশী-তিথিতে সাবিত্রী দেবীকে দেখবার জন্য বহু মহিলার ভীড় হয়।

মাকসাড়া

রামরাজা তলার কাছে। এখানে 'নবনারী কুঞ্জর' নামে এক বারোয়ারি হয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত। নবনারী কুঞ্জর—আটজন প্রধান সখী সহ শ্রীরাধা একটি হাতীর আকার ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণকে পিঠে করে নিয়ে থাকেন। এই প্রতিমাটি দেখবার জিনিষ। বহু লোকের সমাগম হয়।

ইছাপুর

সাঁতরাগাছির কাছে। এখানে 'সৌম্যচণ্ডী' মূর্তির পুজো হয়। ইছাপুর বারোয়ারি এর উদ্যোক্তা।

শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে মহাসমারোহে রামরাজা, নবনারী কুঞ্জর ও সৌম্যচণ্ডী প্রতিমা শোভাযাত্রা সহ বিসর্জন হয়।

সাঁতরাগাছি

হাওড়া থেকে ৫ মাইল। এটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রেলের প্রধান ইয়ার্ড। এখানকার ওল বিখ্যাত।

স্থান পরিচিতি

মৌরিগ্রাম

হাওড়া থেকে ৭ মাইল। এর আসল নাম মহীয়াড়ি গ্রাম। ষ্টেশন থেকে এই গ্রাম দেড় মাইল। ষ্টেশনের কাছে একটি কাপড়ের কল আছে। সরস্বতী নদীর তীরে এই গ্রামে শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির আছে। এখানকার জমীদার কুণ্ডু বংশীয়। এঁদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দন। রাস উপলক্ষে এখানে বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে ৭ দিনব্যাপী মেলা ও উৎসব হয়।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

মৌড়ি গ্রামের কাছে প্রশস্ত গ্রামে প্রসিদ্ধ মল্লবীর ভীম ভবানীর পৈতৃক বাস।

আন্দুল

হাওড়া হতে ৮ মাইল। আন্দুল একটি প্রাচীন এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আন্দুল রাজবংশ বাঙলাদেশের এক পুরনো কায়স্থ রাজবংশ। মূলত এই বংশের পদবী "কর"। এই বংশের একজন মুসলমান সরকারের কাছ থেকে 'রায়' উপাধি পান। এই বংশের রামলোচন রায় বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে 'রাজ বাহাদুর' উপাধি পান।

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচাঁদ রায় ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। পরে ভ্যান্সিটার্টের দেওয়ান হন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। নবাব সিরাজের পতনের পরে 'মুতাক্ষরীণে'র অনুবাদক মুস্তা খাঁ বলেন—তিনি যখন ক্লাইভের দোভাষীরূপে কাজ করছিলেন, সেই সময় তিনি [illegible] ওয়াজেসের মুখে শুনেছিলেন যে, নবাবের ধনাগার লুণ্ঠনের সময় ওয়াজস, ওয়াটস, লুসিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ (আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) ও মুন্সি নবকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। এই প্রকাশ্য ধনাগারে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দু'সিন্দুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৪ সিন্দুক মণিমুক্তার অলঙ্কার, ২ বাক্স হীরে-জহরৎ ছিল। আর অন্দরে গুপ্ত ধনাগারে ৮ কোটি টাকা ছিল। ইংরেজ এই গুপ্ত ধনাগারের কোনও সন্ধান পায় নি। মীরজাফর ও আমীর বেগ ক্লাইভের দেওয়ান রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণকে এই অর্থের অংশ দিয়ে মুখবন্ধ করেন।

রামচাঁদ পলাশীযুদ্ধের সময় ৬০ টাকা বেতন পেতেন। ১০ বছর পরে মৃত্যুর সময় তিনি নগদে ও হুণ্ডীতে ৭২ লক্ষ টাকা, ৪০০ বড় বড় সোনা ও রূপোর কলস, তার মধ্যে ৮০টি সোনার, এ ছাড়া ১৮ লক্ষ টাকার জমীদারী ও ২০ লক্ষ টাকার জহরৎ। সবশুদ্ধ প্রায় সোয়া কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে যান (বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস)।

রামচাঁদের দুই ছেলে—রাজা রামলোচন ও রাজচন্দ্র। উভয়েই সহৃদয় ও শিক্ষিত ছিলেন। এঁরা উভয়েই তাঁদের অর্থ দাতব্য ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করেন। রাজা রামলোচনের দুই ছেলে—কুমার কাশীনাথ ও কুমার শিবচন্দ্র। তাঁরা দু'জনেই সংস্কৃত, বাংলা ও ফার্সীভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

কুমার কাশীনাথের দুই ছেলে—রাজনারায়ণ ও তারকনাথ। রাজনারায়ণ ইংরেজ সরকার থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান। রাজা রাজনারায়ণ রায়-

হাওড়া
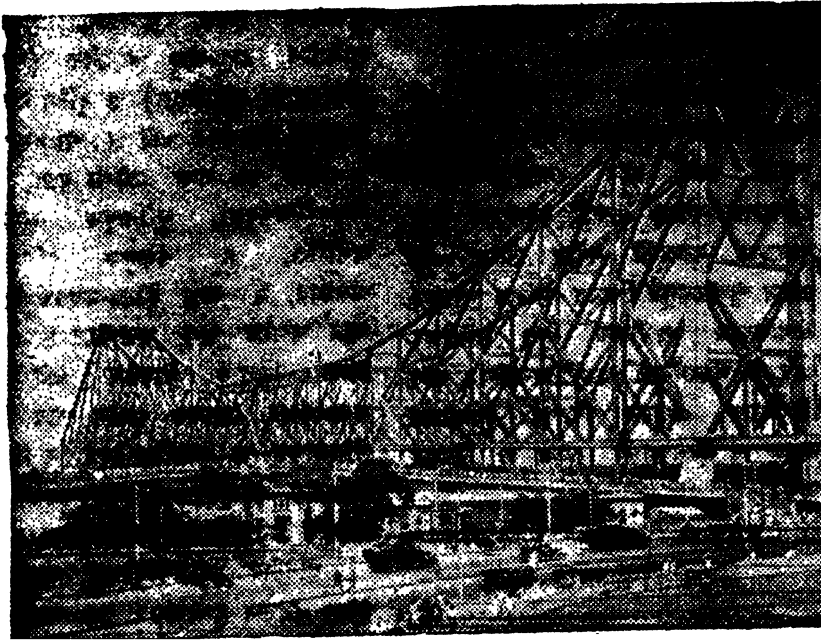
হাওড়ার নতুন পুল

বাহাদুর হিন্দু কলেজে পড়েন ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি সমাজসেবী ছিলেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠায় কায়স্থগণ যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুলনায় হীন নয়, এই সামাজিক আন্দোলনে তিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, তাঁরা যজ্ঞোপবীত ধারণে উপযোগী, নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ করেন। তিনি তাঁর ছেলের বিয়ে ক্ষত্রিয়াচারে দেন---সেই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও তাঁর পৌত্রের বিয়ে ক্ষত্রিয়াচারে দেন।

রাজা রাজনারায়ণ তাঁর একমাত্র পুত্র বিজয়কেশব রায়কে রেখে যান। বিজয়কেশব অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে, তাঁর দৌহিত্র ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। এখনকার জমিদারগণ এই দৌহিত্র বংশীয়।

ক্ষেত্রকৃষ্ণ রাজগঞ্জের রাজপথ, উলুবেড়িয়ার কলেরা হাসপাতাল, ইংরেজি বিদ্যালয় প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আন্দুল জুবিলি হাইস্কুল বহুদিন তিনি পরিচালনা করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর তিন পুত্র---উপেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও নাগেন্দ্রনাথ।

আন্দুল গ্রামে 'সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রাচীন মন্দির আছে।

সাঁকরাইল

হাওড়া থেকে ১০ মাইল। ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থলে এটি সমৃদ্ধ গ্রাম। হেস্টিংসের শাসনকালে রাজা মদন রায় নামে এক জমিদার ছিলেন। যেখানে তাঁর বাসস্থান ছিল তা এখন বেলভেডিয়ার জুট মিল হয়েছে। সাঁকরাইলে উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, চতুষ্পাঠী, পাঠাগার প্রভৃতি আছে।

এখানে বিশালাক্ষী দেবীর প্রাচীন মন্দির আছে।

উলুবেড়িয়া

হাওড়া থেকে ২০ মাইল। এটি হাওড়া জেলার অন্যতম মহকুমা। এর লোকসংখ্যা ৬৬'২৯৯ (১৯৬১) ও আয়তন---৩৮৬ বর্গ মাইল। গঙ্গার তীরে এটি অবস্থিত। এটি একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার ইলিশমাছ ও গাজা বিখ্যাত। ধানও প্রচুর হয়। ধান-চালের আড়ৎও খুব আছে। এখানে কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, কলেজ, নাইট কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতি আছে। গঙ্গার তীরে সুন্দর কালীবাড়ী ও শিবের মন্দির আছে। গঙ্গার তীরে রাসমঞ্চে রাসযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে। বহু লোকসমাগম হয়। এখান থেকে 'মেদিনীপুর ক্যানেল' নামে একটি খাল ও 'ওড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড' নামে একটি রাস্তা আছে। সবরকম যানবাহনাদির সুবিধা আছে।

এর কাছে শ্যামপুর, বাগনান প্রভৃতি স্থান আছে। বাগনান---বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ব্যবসা বাণিজ্যও বেশ চলে।

বীরশিবপুর

হাওড়া থেকে ২৩ মাইল। আগে এই বীরশিবপুরের মাঠে শিকারীরা পাখী শিকার করতে আসতেন। তখন এখানে বহু পাখীর সমাগম হত।

কানাসোনাগ্রাম

বীরশিবপুর থেকে ৪ মাইল দূরে। এখানে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা ও পুকুর। রোগমুক্তির আশায় এখানে হিন্দু-মুসলমানেরা আসে।

দেউলটি

এটি হাওড়া জেলার শেষ গ্রাম। হাওড়া থেকে ৩২ মাইল এর পরেই মেদিনীপুর জেলার আরম্ভ কোলাঘাট থেকে। দেউলটি এককালে গোলাপ চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল এখনও চাষ হয়। এখানে একটি গোশালা ও গোচারণভূমি আছে।

দেউলটিতে নেমে সামতাবেড়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পল্লীভবন আছে। এখানে তিনি বহু সময় বাস করেছিলেন।

মন্দির ও মেলা

রামরাজার মন্দির---রামরাজাতলা রামপুজো উপলক্ষে বিরাট মেলা। কয়েকমাস পুজো ও উৎসব হয়।

নবনারীকুঞ্জর (রাকসাড়া), সৌর চণ্ডী (ইছাপুর)---রামনবমীর পুজো উৎসব হয়---রামপুজোর সঙ্গে।

বেলুড় মঠ

রামকৃষ্ণ মন্দির—বেলুড়। বিরাট মেলা।

রাসযাত্রা উপলক্ষে—উলুবেড়িয়ায় মেলা। সতীমায়ের পূজা—সালখিয়ায় বিরাট মেলা।

ঝুলনের মেলা—সালখিয়া ঘুষুড়িতে।

শিবদুর্গা উপলক্ষে মেলা—কাঁকরাই গ্রামে।

রথের মেলা—রামচন্দ্রপুরে।

রাসমেলা—আন্দুল মৌড়িগ্রামে মেলা ১ মাস ব্যাপী। জন্মাষ্টমী পূজো ও মেলা—দাশনগরে ১ মাসব্যাপী।

বেতাইচণ্ডী—বেতাইতলা, শিবপুর।

মাকড়চণ্ডী—মাকড়দহ।

মেলাইচণ্ডী—আমতা।

পঞ্চাননতলা—হাওড়া।

কল্যাণেশ্বর শিব—বালি।

বঙ্গেশ্বর শিব—শালখিয়া।

তিব্বতী মন্দির—ভোটবাগান, ঘুষুড়ি।

কালীমন্দির—উলুবেড়িয়া।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—আন্দুল।

বিশালাক্ষ্মী দেবীর মন্দির—সাঁকরাইল।

লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির—মৌড়িগ্রাম।

শিল্প ও ব্যবসায়

কৃষি—হাওড়া জেলার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ধান। এ ছাড়া এই অঞ্চলে প্রায় সব রকম শাক-সব্জী, ফল-মূলাদির চাষ হয়। সাঁতরাগাছির ওল বিখ্যাত। রামকৃষ্ণপুরে অনেক চালের গোলা আছে। বাঙলা দেশের নানাস্থান থেকে এখানে চালের আমদানী ও রপ্তানি হয়।

এই জেলার বহু স্থানে পানের বরজ আছে।

এই জেলায় নারিকেল গাছের আধিক্য দেখা যায়। মাকড়দহ, ডোমজুড়, কোড়োলা, আন্দুল, বেগ্‌ড়ি, নিবড় প্রভৃতি স্থানে ও উলুবেড়িয়ার প্রায় সমস্ত স্থান নারিকেল গাছে পূর্ণ। নারিকেল তেলের ব্যবসা হাওড়া জেলায় বেশি দেখা যায়। বিশেষত কোড়োলা গ্রামে। এই জেলায় সুপারির গাছ প্রচুর আছে।

মাছ—অন্যান্য জেলার তুলনায় হাওড়া জেলায় মাছের আধিক্য বেশি। দামোদরের গলদা চিংড়ি, আর ইলিশ মাছ সুস্বাদু। সাধারণত সব মাছই এই জেলায় পাওয়া যায়, বিশেষত ডিমওয়ালা তোপসে মাছ শিবপুরের কাছ থেকে উলুবেড়িয়ার পর্যন্ত হুগলী নদীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উলুবেড়িয়ার নদীর ইলিশ মাছও বেশ সুস্বাদু। দামোদরের বন্যার সময় আমতা, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি জায়গায় জেলেরা পোনার ডিম ধরে বিক্রির জন্যে নানা জায়গায় চালান

রামকৃষ্ণ মঠ

দেয়। এখানকার পোনার ডিম অন্যান্য স্থানের চেয়ে ভাল ও খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। জাওলা মাছ বিক্রির জন্য শালখিয়া হাট বিখ্যাত।

মাদুর, চাটাই—খিলে, বরুইপুর, বসন্তপুর, আমতা, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে অনেক সুন্দর সুন্দর মাদুর তৈরী হয়। অনেক মেয়ে খেজুরপাতা দিয়ে চাটাই তৈরী করে।

মৃৎশিল্প—ডোমজুড়, উলুবেড়িয়ায় নানারকমের মাটির খেলনা, ফুল, মূর্তি প্রভৃতি তৈরী হয়। রাণীগঞ্জের টালির অনুকরণে বালটিকুরী, আন্দুল প্রভৃতি স্থানে একপ্রকার টালি তৈরী হয়।

কাঠের জিনিষ—বাক্স, সিন্দুক, চেয়ার, টেবিল, কড়ি, বরগা, দেরাজ, আলমারি, খাট প্রভৃতি এই জেলায় প্রচুর তৈরী হয়। আগে শিবপুর ও শালিমারের চড়ায় ব্রহ্মদেশ থেকে সেগুন কাঠের আমদানি হত। সেই সব সেগুন কাঠে নানা জিনিষ তৈরী হত।

কাগজ—আগে এ দেশে একরকম হলদে কাগজ তৈরী হত। মুসলমান শিল্পীরা তৈরী করত। আমতা, বাগনানে বেশি তৈরী হত। বিদেশী কাগজের প্রচলন হওয়ায় বালিতে এক কাগজের কল স্থাপিত হয়েছে।

লৌহশিল্প—এই জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কামারশালা আছে, তাতে নিত্যপ্রয়োজিনীয় জিনিষ তৈরী হয়। হাওড়া শহরে গজাল ও পেরেক দেশীয় কর্মকার দ্বারা প্রচুর তৈরী হয়। হাওড়ায় অনেক লোহার কারখানা আছে। এই সব কারখানায় সিন্দুক, ট্রাঙ্ক, কড়া, বাটখারা, বালতি, রেলিং প্রভৃতি তৈরী হয়।

জুট মিল—হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে বহু জুট মিল আছে। আগে এই জেলায় চট বা চটের থলে তাঁতে বুনে তৈরী হত। কিন্তু বহু মিল স্থাপিত হওয়ায়, হাতে বোনা চট, থলে বন্ধ হয়ে গেছে।

কলকারখানা—এই জেলায় বহু কল ও কারখানা আছে—শালখিয়া তেলের কল, বামারলরির লবণচূর্ণ কল, বালিতে হাড়গুঁড়ার কল, শালিমারে রঙের কারখানা, শিবপুর ও শালখিয়ায় বৃহৎ ষ্টিমার ইয়ার্ড আছে।

হাট—হাওড়া শহরের এই হাটটি সুপ্রসিদ্ধ দেশী কাপড়ের হাট। এত বড় দেশী কাপড়ের হাট বাঙলা দেশে আর নেই। এই হাটে যে সকল তাঁতের কাপড় বিক্রি হয়, তার অধিকাংশই হাওড়া ও হুগলী জেলায় প্রস্তুত তাঁতের কাপড়।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—হাওড়া জেলে প্রতাপপুর গ্রামে।

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড

[দানখণ্ড : কাল---গ্রীষ্ম
সময় : সকাল হ'তে সন্ধ্যা]

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমমিলনের অভিসার একান্তভাবেই শুধু প্রেমিকার নয়, মিলন শুধু শ্রীরাধারই নয়---মিলন সখীদেরও, এই মিলনের সুখ বড়াইয়েরও। একের মিলনে অন্যের সুখানুভূতি, যেন মিলনের আনন্দে একে অপরকে অন্তরের পুলকজাগানো মহিমায় মহিমান্বিত করেই ধন্য। শ্রীরাধার অন্তরের সুকুমার প্রেম ভীতির আশঙ্কায় দোদুল্যমান। তবু সে এক অখণ্ড অসীম কৌতূহল,---না, কৌতূহলেই শেষ নয়, অনন্ত এক ভয়, সে ভয় সমাজের, সে ভয় নারীসুলভ চেতনার, সে ভয় কলঙ্কের। কিন্তু এ আনন্দ যে সামগ্রিক সৃষ্টির সত্তায় নিঃসীম প্রকৃতির অন্তরালে স্বর্গীয় আনন্দের বিচিত্র এক অনুরণন, সেই আনন্দের পূর্ণতাই তো মিলন। এ সুখ শুধু প্রেমিকারই নয়, এযে মিলনসৃষ্টিকারী বড়াইয়ের অখণ্ড কর্মযজ্ঞ।--- ভয় কিসের ; চল্ না। মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধের পসরা সাজিয়ে বিকিকিনি করতে। এযে গোপবালাদের নিত্যকর্ম, জাতিধর্ম, এতে তো কারোর কিছু বলার নেই। বলার আছেই বা কি, আর বলবেই বা কে। এযে যোগমায়ার যোগাযোগ ; যারা সৃষ্টিকারিণী যোগমায়া যে নিজেই আহ্বান জানিয়েছে,---তাইতো তারই সঙ্গে সুরু হয়েছে গোপবালাগণের যাত্রা।'

--- কঙ্কণ আর কিঙ্কিণীর মৃদুল-মধুর ছন্দ, গোপবালাদের হাস্যকলরোলে মুখরিত ব্রজের পথ মোহময়, আনন্দময় হয়ে উঠেছে বড়াইয়ের অভিভাবকত্ব ও যেন অনির্বচনীয় মায়াঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে,---যাত্রা-

শ্রীগঙ্গাধর দাস, সরস্বতী

সুরুর এই নিদাঘ প্রাতে। তবু যেন ভয় হয় ; কি জানি, যদি সেই ব্রজের কানাই-এর সাথে আবার দেখা হয়, এই পথে? অন্তরের চিন্তা সহসা প্রকাশ করে ফেলে শ্রীরাধা, বলি,---হ্যাগো বড়াই,---সে তো এ পথে নেই !!

বড়াইয়ের চাতুরী এতক্ষণে ধরা পড়ে। আরে সে যাবে কোথায়, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সঃ কচ্চিদপি গচ্ছতি।" বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে সে কোথাও যায় না। হয়তো দেখা হলেও হতে পারে, চল্, সাবধানে চল্।---অজ্ঞাত আতঙ্কে পা ফেলতে ফেলতে কখন জানি শ্রীরাধা যমুনার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর ঠিক এখানেই সুরু হয়েছে কৃষ্ণকীর্তনের "দানখণ্ড।"

একি। কি এক অশুভ ক্ষণেই না বড়াইয়ের সাথে সে বের হয়েছে। শ্রীরাধার পথরোধ করে যমুনার ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ দানী সেজে বসে আছে। শ্রীরাধার অবস্থা তখন কেমন?

"দানী দেখি কাঁপিছে শরীর
মো যদি জানিতাম পাছে
এ পথে কণ্টক আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির।"
(জ্ঞানদাস)

ভীতির উদ্রেক হয়েছে ; পদকর্তা হাসেন, হাসে মিলনসৃষ্টিকারিণী বড়াই নিজেও। শ্রীরাধার এ ভয় কি অন্তরের? না, এ ভয় অন্তরের নয়, এ ভয় শুধু সমাজের, ভয় শাশুড়ী ননদের আর আয়ানের। তবু যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে ক্ষণিকের, মনে হয়, সে খুব ভুল করেছে, বড়াইয়ের চাতুরী সে বোঝে নি। যমুনার ঘাটে তাই সে তার অন্তরমরকে অথবা সে আতঙ্ক দেখে চমকে উঠেছে ; সাথে সাথে মনে হয়েছে, তার যাত্রা সুরুর অশুভ ক্ষণটির কথা।

"ঘর হইতে বারাইতে
ও চান ঠেকিল মা
হাঁচি জেঠী পড়ি গেল বাধা",---

কবিরাজ কমল কণ্ঠাভরণ---বসারাজেশ্বরপুর।

কবিরাজ বিহারীলাল রায়---সাইকুনি বসা।

সঙ্গীত-রচয়িতা জগন্নাথপ্রসাদ বসু-মল্লিক---আন্দুল।

রায়সাহেব গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরত্ন---শাঁকরাইল।

রামমোহন দত্ত---উত্তর ব্যাটরা। ইনি কোর্ট উইলিয়মে চাকরী করে

ঠাকুরদাস দত্ত---পাঁচালীকার ও সঙ্গীত রচয়িতা---উত্তর ব্যাটরা।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পণ্ডিত---নারীট গ্রাম।

'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ---শাঁকরাইল।

পণ্ডিত হলধর ন্যায়রত্ন---সাঁতরাগাছি।

শেখ আবদুল গফর---চন্দ্রপুর। 'নরবখত মও বাহার' গ্রন্থের রচয়িতা।

বিহারীলাল সরকার---গ্রন্থকার---আন্দুল মৌড়ি।

সাহিত্যিক ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়---মাকড়দহ।

সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়---চন্দ্রভাগ।

বৃন্দমোহন দাস---শালখিয়া।

গীতিনাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়---কল্যাণপুর।

আর সেই অশুভ যাত্রার ফলস্বরূপ হল কি---

"হরিণী পালাঞা যাইতে
ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমত ঠেকিয়া গেল রাধা।"

কিন্তু এখন যে আর কোন উপায় নেই। সামনের পথ দুরতিক্রম্য; পেছনের ফেলে আসা পথও অলঙ্ঘনীয়,---লক্ষ্য শুধু এক, অবিচল স্থির, একাগ্র। আবার ক্ষণে ক্ষণে চমক। সহায় শুধু একমাত্র বড়াই। কিন্তু এযে সবই বড়াইয়ের সৃষ্টি, এই কুহেলিকা তথা আনন্দের ঘনমেঘ বড়াইয়ের অন্তরেই তো সৃষ্টি হয়েছে প্রথম। বড়াইও যে তাই তার কথায় সায় দিয়ে বলল,---নদীর ঘাটে যে দানী সেজে বসে আছে চতুর কানাই, তাতো আগে জানা ছিল না।

তাদের এমনি কথোপকথনের মাঝখানেই হঠাৎ সেই চতুর কানাই হাসতে হাসতে বলে উঠল,---

"সুন্দরী, শুনিয়া না শুন মোর বাণী
না জান কানাই পথে দানী!"---

এত আনমনা কেন, বুঝি জানতে না, পথে কানাই আছে দানী হয়ে। কিগো বড়াই, তুমি বলে দাও,---দধি-দুগ্ধ পসরার দান মিটিয়ে দিক্, তা না হলে---আলিঙ্গন দিক।

---না, না, তার চেয়ে দানই ভাল।

বেশ, তা হলে দানই দাও।

কি দান গো তোমার দানী? কিসে তুমি তুষ্ট হবে?

শ্রীকৃষ্ণ তখন তার দানের হিসাব দিচ্ছে,---কি তার চাই,---

"সীথায় সিন্দুর তোমার নয়নে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচুলী গলে গজমতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিহার॥
করেতে কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥"
(জ্ঞানদাস)

কিন্তু এ কি সম্ভব। শুধু দধি-দুগ্ধের পসরা কেন, নিজেকে বিকিয়ে দিলেও যে এত লক্ষ জোগানো যাবে না।

তাহলে কোন কথাই নেই,---আলিঙ্গন দাও! এই বলেই ব্রজের রাখাল হাত বাড়িয়েছে শ্রীরাধার দিকে।

এই উভয়সঙ্কটে শ্রীরাধা কাতর-কণ্ঠে বলে উঠল,---

"এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে
বৃষভানু সুতা তনু ছুঁইল রাখালে।
একে সে তোমারে ভাল না বাসে
কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর॥"

তাই আবার অনুনয় করে ব্রজের রাখালকে বুঝিয়ে বলল,---

"চাতুরী না কর কানাই চতুর সেয়ান
কংস রাজা শুনিলে লইবে জাতিপ্রাণ।"

ভয়, ভয় দেখিয়ে কি আর তাকে নিরস্ত করা যায়। সমগ্র প্রকৃতির সত্তায় একমাত্র পুরুষ সেই শ্রীকৃষ্ণ কি ছাই কংশরাজকে ভয় করে,---তেমনি ভাবেই সে তখন দৃপ্ত ভঙ্গিমায় উত্তর দেয়,

"কি করিতে পারে তোর সেনা কংশরাঅ
দেবকীনন্দন কাহ্নু কাঁবো না ডরাঅ॥"

অতএব কোন উপায় নেই। বড়াইও তখন নিজেকে অসহায় মনে করে বলল,---ভয় নেই, তোর কোন ক্ষতি হবে না। সৃষ্টির পরম উৎসের কাছে আত্মসমর্পণই প্রকৃতির চিরন্তন আনন্দ। তাই, দানখণ্ডের শেষে পদকর্তা গাইলেন মিলনের পদখানি,---

"মিলল দুঁহুজন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস।"

॥ দুই ॥

[নৌকাখণ্ড, কাল: বর্ষা
সময়: পূর্বাহ্ন থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত]

ইতিমধ্যেই শ্রীরাধাপ্রসঙ্গ, ব্রজের রাখাল কানাইয়ের প্রতি তার গোপন অভিসারের কথা, প্রেমমিলনের কথা প্রায় জানাজানি হতে চলেছে ব্রজের ঘরে ঘরে। এই বেলা যদি বাঁধ না দেয় তবে যে মুখ রাখা দায় হবে। শাশুড়ী-ননদী তাই শ্রীরাধাকে বারণ করেছে, মথুরার হাটে যাওয়া, যমুনার ঘাটে যাওয়া তার নিষিদ্ধ হয়েছে। কুলের কলঙ্ককে এখনো তারা চাপাচাপি দিয়ে রাখতে চায়; কিন্তু তাই কি পারে, এযে যোগমায়া স্বয়ং সৃষ্টি করে চলেছে এই কুহেলিকা, এর আবর্তে শুধু মানুষ কেন, পৃথিবীর অনন্ত শক্তিও যে আবর্তিত, ---সেই যোগমায়া যে বড়াই নিজেই।

---অনন্তের অসীমের মাঝখানেও আজ সীমিত, সীমাহীন পরিব্যাপ্তির মাঝখানেও আজ প্রকটিত, প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে রূপের প্রকাশ, সেই রূপেই আজ লীলাময়ের খেলা।---অনন্ত আকাশের কোনে জলভরা কালো মেঘ---এ যে সেই নবঘনশ্যামের প্রকাশমান মূর্তির অনুচিত্র! বর্ষা প্রকৃতির নবোদ্গমে বিকশিত লতা-কুঞ্জের মৃদুল-শিহরণ যেন বার বার আহ্বান করে মিলনের, কম্পমান ব্রততীর এই অসহনীয় একাকীত্ব যেন আহ্বান জানায় প্রেমিকের তথা অবলম্বনের। ঠিক এই অবসরেই তো প্রকৃতি-শক্তিতে পরম পুরুষের পূর্ণ প্রকাশমান লীলার সময়,---একথা মনে হতেই বড়াই চঞ্চল হয়ে উঠে---রাধাকৃষ্ণের মিলনের আশায়। ---সে যে মিলন করিয়েই ধন্য। তাই আবার ছুটে চলে আয়ানের ঘরে। ব্যগ্র হয়ে কুটিলাকে জানায়,---এই পুণ্যলগ্নের কথা। বলে, কুলবধূরা যদি এই সমাগত পুণ্যতিথিতে পরমেশ্বরের পূজা করে তবে কি হয় জানো?---

স্বামীর শতবর্ষ পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। এহেন শুভক্ষণে রাইকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে পূজায় পাঠিয়ে দাও। ---তোমার আয়ানের শতবর্ষ পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। অবশ্য তোমার কোন ভয় নেই কুটিলা, আমি তোমার বধূমাতাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

পুত্রের পরমায়ু বৃদ্ধি,---কোন্ মা না চায়? বড়াইয়ের কথায় রাজী হয়েছে আয়ানমাতা কুটিলা। অতএব সাজো সাজো!---এমত জটিলার শ্রীরাধাকে ঘরের বাইরে আনতে সমর্থ হয়েছে বড়াই।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃতের পসরা পরমেশ্বরের পূজার উপচার যেন গোপ-বালার একান্ত অন্তরের প্রেমভক্তির অর্ঘ্যের দান। শ্রীরাধা চলল,—চলল যমুনার ঘাটে, কোথায় তাদের পূজা;

"মাথায় পসরা করি
ধায়ে রাধা সুন্দরী,
গোপনারীগণ সঙ্গে।"

কিন্তু একি। বেগবতী যমুনা যে তার উদ্দাম উচ্ছ্বাস নিয়ে আজ দ্বিগুণ উথলে উঠেছে।—"

"যমুনার ঘাটে যাইয়া
প্রবল তরঙ্গ দেখি
ধনি কাঁপায়ে আজি আতঙ্কে।"

বড়াই বলে ভয় নেই। যমুনার ঘাটে আছে এক নেয়ে। —বলতে বলতেই তারা নেয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই কি নেয়ে? এ যে কোন রাজকুমার। বুঝিবা ছলনা করে নেয়ের রূপ ধরে বসে আছে এই ঘাটে,—

হ্যাঁগো ;—"বড়াই এই কি ঘাটের নেয়ে
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ বরণ নেয়ে।—
রজত কাঞ্চনে
না খানি সাজত বাজত কিঙ্কিনী জাল
অপরূপ তাতে শোভে রাঙা হাতে
মণিবাঁধা কেরোয়াল্।"
[কেরোয়াল = হাল্]

এ কি গো। এই নেয়ে কি কোন গুপ্তবিদ্যা জানে। এ যে রাজকীয় পরিবেশ, তার নৌকাই বা কেমন, এ যে একেবারে মণিমুক্তা সাজানো, তার হালেও যে বাঁধা মণিমুক্তা। এ তার কোন্ গুপ্ত বিদ্যা বলে,—

'সিরজিল তরণীখানি
প্রবাল মুকুতা আনি।"

—তুমি জানো নাকি বড়াই, কি ওর গুপ্তবিদ্যা।

জানি বৈকি, ওর অনেক গুপ্তবিদ্যা আছে, আর হঠকারিতাও আছে।

হঠকারিতা!—

হ্যাঁগো হ্যাঁ, ও নেয়ে কম নয়,—

এত ধনরত্ন, দেখছো না,—মণিমুক্তা সুশোভিত "না" আর তার কেরোয়াল।

শ্রীরাধা আতঙ্কে শিউরে উঠে। বড়াই ততই মনের আনন্দে বলে যায়। ও নেয়ে ঐ রকমই, ওর নায়ের যাত্রীদের ডুবিয়ে মেরে তাদের সম্পদ লুঠ করে নেওয়াই ওর একমাত্র কাজ। বড়াই বলেই চলে। এদিকে শ্রীরাধার আতঙ্কের সীমা থাকে না, বার বার মনে হয় "ডুবিয়ে মারে।" পদকর্তাও তাই মনে মনে হাসে,—প্রেমসাগরে ডুবিয়ে মারাই তো ওর কাজ ধনি। প্রেমতরঙ্গের উজান যখন উঠে, তখন জাতি ধর্ম জ্ঞাতি কুল লাজ সবই যে ডুবে যায়, শুধু থাকে চাওয়া পাওয়ার এক অভিনব আনন্দোচ্ছ্বাস, অনাবিল প্রেমের উচ্ছ্বাসময় তরঙ্গ, সেই তরঙ্গেই যে এই নেয়ে ওর নৌকা বেয়ে চলে। তাই আজ সেই পরম নেয়ে প্রকাশমান পূর্ণলীলায় অবতীর্ণ হয়ে যমুনা বক্ষে তরঙ্গের রঙ্গে তার 'না-খানি ভাসিয়েছে, আর এই মুহূর্তে এহেন পরমপুরুষের পুণ্য পরশে যমুনাদেবীও উথলে উঠেছে, যেন উদ্বেলিত যমুনা তার জন্ম-জন্মান্তরের সাধ মেটানোর আশায় আজ মেতে উঠেছে, তাই পদকর্তার সুরে কীর্তনীয়া তান ধরেছে;

"তপন-তনয়া-তীরে
তরণী লইয়া ফিরে
বিদগধ নাগর রাজ।
গোবিন্দ দাস ভনে
কি আনন্দ হৈল মনে
রুণু ঝুনু নূপুর বাজ।।"

নেয়ের রুণু ঝুনু (পায়ের) নূপুরের কাছে যমুনার কলকল-ছলছল উত্তাল তরঙ্গের ধ্বনি একান্ত হয়ে বিলীন হতে চাচ্ছে—এমনিতর শুভক্ষণের আশায় যমুনাদেবী যেন অপেক্ষা করে ছিল যুগ-যুগান্ত ধরে, তাই সে আজ পরম ভাগ্যবতী।

কিন্তু। শ্রীরাধার যে আতঙ্ক কাটে না। চতুর ঐ ডুরুরীকে দেখে যে তার ভয় হয়। তাকে যেন তার 'কেমন-কেমন' লাগে। তার ভ্রূকুটি কুটিল হাসি, রাঙা চোখের চতুর অথচ চঞ্চল চাউনি দেখে শ্রীমতী রাধা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তার ভরা যৌবন আতঙ্কে শিউরে উঠে, যদি বা নায়ে চড়িয়ে কিছু চেয়েই বসে। এ কিছু আর কোন 'কিছুই' নয়, শুধু তার ঐ যুবতী সুলভ সংশয় তাকে বিমূঢ় করে তুলেছে; তার চোখে মুখে ও কথায় ভীতির স্ফুরণ; বড়াইকে সে চুপিসারে বলে,—দেখছো ;—

"হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে
চুলাইছে রাঙা আঁখি
চড়াইয়া নায়, কি জানি কি চায়
বড়ই চঞ্চল দেখি।"—

ও যেন আমাদেরকে দেখে আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

শ্রীরাধাকে এমত অস্থির দেখে বড়াই নূতন প্রস্তাবনা সুরু করেছে। ভয় কিসের? আমরা ঐ একটা সামান্য নেয়েকে ভয় করবো কেন? হোক না তার মণিমুক্তা খচিত 'না', হোক না সে হঠকারী, কিন্তু আমাদের সঙ্গে হঠকারিতা করে এমন কার দুঃসাহস আছে বল তো দেখি।

শ্রীরাধা চমকে উঠে, এ আবার কেমন কথা,—যে হঠকারী সে তো সকলের সাথেই তাঁর স্বভাববশে হঠকারিতা করবে, তদুপরি 'আমরা যুবতী,—না আছে শকতি কোন।"

বড়াই হাসে, বলে,—আমাদের যে শক্তি আছে, সে শক্তি ঐ নেয়ের নেই। একবার যদি সে আমাদের আসল পরিচয় পায়, তবে ঐ চতুর নেয়ে নিশ্চয় ভয় পেয়ে যাবে।

পদকর্তা তাই গোপবালাদে জিজ্ঞেস করে, বলে, —হ্যাঁগো নেয়েকে ভয় পাওয়ানোর সেই পরিচয় তোমাদের কি?—

"আমরা কহিব কংসের জোগানী
বুকে না হেলিব কেহ।"—

তাই বুঝি; তোমরা কংসরাজ দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখন নিত্য, জোগাও সেই রাজার বলে বলীয়ান, কিন্তু আ কি মনে হয় জানো ;—

"জ্ঞানদাস কহে শশী ষোল
পেলে কি ছাড়রে রাহু।।"

গাছ-গাছালির নৈঃশব্দে ভ্রমণ

সাজেদুল হক

গাছ-গাছালির নৈঃশব্দে এক আধবার ভ্রমণ করতে
ইচ্ছে হয়
যখন আধুনিক শব্দের রাজত্বে বাস করে
ঘেমে উঠি—
এই কলকাতায় আর থাকব না ঠিক করে নিই।

লোনা আস্বাদ ঘোলা জলে নাই বা দেখতে পেলুম
নিজের ছবিটা
কলকাতার শোবার ঘরে অনেক ছবি টাঙানো আমার
হরেক ফ্যাসানে
আর নয়; এবার ঘোলা জলে নিজের ছবিটা একটু ধুয়ে নেব।

ভাঙনের তীরে পলাতকা লাল কাঁকড়ার গর্ত খুঁড়ে
একটু দেখব
কেমন করে কথাবার্তা কয় আলিঙ্গনে শুঁড়ে শুঁড়ে
সেই শব্দ
শুনব ; অর সত্যি বলছি কলকাতা ছেড়ে এই শেষবার
গাছ-গাছালির নৈঃশব্দে ভ্রমণ করার ইচ্ছে আমার।

---না, না সেকি। আমরা যে পরের নারী, কুলবধূ। আমরা তাকে বিনীত-ভাবে নিবেদন করবো, হে নেয়ে তুমি আমাদের শালীনতাকে নষ্ট করো না ;

"ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী
পরপুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি।"

ছোয়া তো দূরের কথা, অন্য পুরুষের বাতাসও যদি আমাদের গায়ে লাগে, তবে তৎক্ষণাৎ নারীত্বের শালীনতাকে পরিশুদ্ধ করতে সামাজিক অনুশাসনের নির্দেশে 'সচেলে' অর্থাৎ চেলীসহ, পরিহিত বসন সমেত স্নান করে শুদ্ধ হয়ে আমরা নারীধর্মকে পালন করি। এ হেন কুলবধূর প্রতি নেয়ের ঐ প্রলুব্ধ দৃষ্টি শ্রীরাধার চঞ্চল মানসিকতায় ভীতির উদ্রেক করেছে। ঐ তো---

"রাধা বদন হেরি অস্থির হইলা হরি
মন মাহা করে আশ,
কেরোয়াল্ খসি পড়ে
নৌকা বাহিতে রঙ্গে
উল্লসিত গোবিন্দ দাস।"

এ হেন দুঃসময়ে বেগবতী যমুনার উদ্দাম-উত্তাল তরঙ্গের সাথে তাল না রেখে নেয়ে যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে, শ্রীরাধা বদনের পুলকিত জ্যোৎস্নার শোভায় সে যেন বিমোহিত হয়ে গেছে। পদকর্তার আনন্দের সীমা নেই, আনন্দের সীমা নেই তপন-তনয়ার-যমুনারও।---এমনিভাবেই সে চেয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত লীলায় অংশ গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করতে। আজ তাই উদ্দাম তরঙ্গোচ্ছ্বাসের কল কল-ছুল ছুল ধ্বনিতে আনন্দের স্ফুরণ। আজ তারি তরঙ্গ বক্ষে সেই প্রেমময়ের ---"রজতকাঞ্চনে 'না' খানি সাজত বাজত কিঙ্কিণী জাল।"---এই আনন্দ-ঘন মুহূর্তে পদকর্তার সুরে সেই বেগবতী যমুনার মতই ভাবের উচ্ছ্বাসে পুলকিত হয়ে কীর্তনীয়া তার তালে, তালে 'আখর' দিয়েছে---'কিঙ্কিণী---কিংকিনি।' যমুনার আজ এই অবসরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, শুধু ভাবে 'কি কিনি, কি-কিনি---কিংকিনি।' এখন রাই কিনি না শ্যাম কিনি। শ্যামকে তো কেনা যায় না, সে তো বিক্রিত। শ্যাম তো আর কারোরই নয়, যমুনাও একদিন শ্যামের প্রেমের ভিখারিণী হয়ে বেগবতী হয়ে রয়েছে আজও। আজ সেই তরঙ্গবক্ষেই একমাত্র শ্রীরাধা-মিলনের জন্যই শ্যামের এই রূপ, সে আজ যমুনার ঘাটে নেয়ে। এ শ্যাম যে শ্রীরাধার কাছে বিকিয়ে গেছে, অতএব ---রাই কেনাই ভাল.---"জয় রাধে, জয় রাধে।" তার জন্ম-জন্মান্তরের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে---শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনে ;---তাইতো এখন উচ্ছ্বাসময়ী যমুনা দ্বিগুণ উথলে উঠেছে ;---

"তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে।
হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে ॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরথরি কাঁপে রাই
কোলে করি যায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই
রাই কোলে করি নাগর [illegible] চিতে
এ পার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে ॥'

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

সমীরণ চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

ইতিহাসের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আজ কৃতার্থ—তাঁর আজীবনের স্বপ্ন আর সাধনা আজ সফলতার জয়টিকা পরতে চলেছে। যে জন্য অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে হাসি মুখে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান রচনা ক'রে গেছেন—মানব-ভাগ্য-বিধাতা যে শুভ-মুহূর্তের জন্য যুগ-যুগান্ত অতন্দ্র নয়নে প্রতীক্ষারত, সেই পরম কাঙ্ক্ষণীয় শুভলগ্ন এল তাঁর সমস্ত জীবনের সুখ-সুবিধার বিনিময়ে, দুঃসহ লাঞ্ছনা আর ত্যাগে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-বাদে প্রগাঢ় নিষ্ঠা, আর তা রূপায়ণে তাঁর অভূতপূর্ব পরিশ্রমে।

শ্রমিক কৃষক প্রোলেতারিয়েত্ আজ মুক্ত, শাসন ক্ষমতা তাঁদের করতলগত।

মহাজন্মের লগ্ন আগত ঐ। 'অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত, ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।' নবজীবনের সুনিশ্চিত আশ্বাসে উদয়শিখরে 'মাভৈঃ' মন্ত্র অনুরণিত, মহাকাশে দশদিগবধূর আনন্দ-উদ্বেলকণ্ঠে মন্দ্রিত 'জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়।' মহামানব লেনিন-এর আবির্ভাব, তাঁর তপস্যা, তাঁর কর্মৈষণা মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দিল। সে রোমাঞ্চ মহাকালের প্রসাদধন্য, চিরায়ত তার অনুভূতি। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তবাসী দীনতম প্রাণে তার অনুরণন আজও ধীরোদাত্ত ছন্দে দোলায়িত হচ্ছে, হবেও—যতদিন না তাঁর স্বপ্ন গোটা পৃথিবীকে মুক্তিস্নানের গভীর আনন্দে অভিসিক্ত করে। তারপর, তারও পরে লেনিন, পরিত্রাতা লেনিন কোটি জনতার অন্তরের সিংহাসনে চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন অনুরাগে, প্রেমে। তিনি সেই রাজা যাঁর রাজত্বে সবাই রাজা ; তাঁর সঙ্গে মেলাবার এই একটাই স্বত্ব।

মানহারা মানবিকতাকে তিনি মান দিয়েছেন, তাই সে মান তিনি আপনি ফিরে পান। তাঁর পথে চললে বিফলতার আবর্তে ঘুরে মরার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তিনিই প্রথম ভয়মুক্ত মনে আপন অন্তরে সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন করিয়েছিলেন। দুরূহ কাজে নিজের কঠিন পরিচয় মুদ্রিত করার দৃষ্টান্তও তাঁরই দান। কত বড়, কত মহান লেনিন—তবু এত আপন, এত বড় আত্মীয় মানুষ আর পায় নি।

ক্ষমতা করায়ত্ত। কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? বিপ্লবের পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে হবে, পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ ত সবে সুরু হয়েছে, কোটি কোটি মানুষকে কর্মোদ্যোগী ক'রে জীবন পূর্ণ করতে হবে—এ জন্য চাই বহু প্রস্তুতি, অনেক পরিশ্রম অষ্টপ্রহরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কাজ আর কাজ।

লেনিন প্রস্তুত। চিরলাঞ্ছিত মানবতার বেদনা তাঁকে উত্তীর্ণ করেছে নতুন যুগের ভোরে, তিনি কি বৃথা সময় কাটাতে পারেন। নবীন যুগের নবীন আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছেন তিনি—সেই দীপের শিখা অকম্প্র রাখার দায়িত্ব আর কেই বা বহন করতে সক্ষম। মূক জনতার প্রতিটি হৃৎ-স্পন্দনের পরিচয় তাঁর জানা, তাদের গভীর মর্মস্থলের অনুচ্চারিত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর পরিচিত। তিনি যে তাঁদের আপনজন। দৃঢ় হস্তে রাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরলেন লেনিন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পররাষ্ট্রবিষয়ক—জীবনের প্রত্যেক অংশই তাঁর মমতাপূর্ণ সক্ষম পরিচালনায় মঙ্গলপূর্ণ হয়ে উঠল।

অনন্ত কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিলেন মহানায়ক। গঠনের হোমশিখায় আহুতিদান। তাঁর সেই বিশ্রামের তিলেক অবকাশ, নেই কোনও অলস মুহূর্ত নিজের ক'রে পাওয়ার। সব মুহূর্তই যে তাঁর আপনার—সবার রক্তে রক্ত মিশিয়েছিলেন বলেই আত্মকেন্দ্রিকতার অবসর তাঁর ছিল না। তিনি তা চানও নি।

একটা সমগ্র জাতির জীবন থেকে অতীত-সঞ্চিত ভগ্নস্তূপ সরিয়ে নবজীবনের স্পন্দন আনার পথে বাধা অনেক। রণক্লান্ত রাশিয়া দাঁড়িয়েছিল অর্থনৈতিক ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে, যুগ-যুগান্তের অনগ্রসরতার পিছুটান প্রবল, সদ্য অপসারিত স্বৈরাচারীর দল তখনও নিষ্ফল ক্রোধে ফুঁসছে—যে কোনও মুহূর্তে ছোবল মারার জন্য তারা তৈরী। চতুর্দিকে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বেড়াজাল।

সম্মুখে প্রসারিত অজ্ঞাত সমাজতান্ত্রিক যাত্রাপথ,—সে পথে নেই কোন পদচিহ্ন, সে পথ অনাবিষ্কৃত, অনধীত। মহানায়ক নিঃশঙ্ক তবুও। অপরিচয়ের ভয় তিনি জয় করেছেন। তিনি যে পথিকৃৎ—তাঁর যে নতুন পথ কেটে এগোনর দুরূহতম সাধনা। স্থৈর্যে হিমাচল, প্রতিজ্ঞায় সমুন্নত এভারেস্ট। তিনি নিশ্চিন্ত—তাঁর সঙ্গী অগণিত প্রোলেতারিয়েত্ ; জনগণেশের আশীষধন্য তিনি। সমস্ত দেশবাসীর

মিলিত শুভেচ্ছা আর সমর্থন, ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের প্রাণঢালা সক্রিয় সাহায্য পাথেয় ক'রে এগিয়ে চললেন লেনিন—শান্ত, সমাহিত, জনকল্যাণযজ্ঞে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ইতিহাসপথিক।

যে কোনও বাধাই আসুক না কেন, তিনি বলতেন, 'বেশ ত, মার্ক্স-এর কাছে প্রশ্ন করা যাক্।' অবশ্য সর্বদা তিনি বলেছেন, বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখী না দাঁড়িয়ে সব কিছু থিওরী দিয়ে সমাধান করা যায় না, এবং বৈজ্ঞানিক কম্যুনিজম-এর হোতারা সে চেষ্টা করেন নি। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর ধ্যান-ধারণাকে অনেক রদবদল করলেন। জনসাধারণের প্রকৃত অভিজ্ঞতাপ্রসূত সূত্র ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি। বৈপ্লবিক তত্ত্ব আর তার বাস্তবে প্রয়োগের সুসম সমাহার ঘটিয়েছিলেন লেনিন। ধনতন্ত্রের নিষ্পেষণকাতর পৃথিবী আজ তাই এগোচ্ছে মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ অবলম্বন ক'রে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

বিপ্লব অন্তে লেনিন স্মোল্নীতে পাকাপাকি ডেরা বাঁধলেন। দোতলার একটি ঘর থেকে তিনি দলের এবং সরকারের সব সমস্যার সমাধান করতেন। চারিদিকে শত্রু তখন। এক হাতে শত্রুদমন, আর অন্য হাতে পুনর্গঠন---সব্যসাচী লেনিন যুদ্ধে অক্লান্ত। তখন তাঁর চোখে ঘুম নেই—অত্যল্প ঘুমের মধ্যেও বুঝি বা সমস্যার চিন্তা চলত অবিরাম।

ষড়যন্ত্রও অন্তহীন। প্রতিবিপ্লবীর দল [illegible] ভূমিকায়। ইতিমধ্যে কেরেনেস্কী আমেরিকার সাহায্যে পেত্রোগ্রাদ্ থেকে পালিয়ে পস্কভ্ সীমান্ত রক্ষীদের আশ্রয়ে, সেখান থেকে তিনি কশাক্ বাহিনী পাঠালেন রাজধানী আক্রমণ করতে, জেনারেল ক্রাস্নভ্-এর অধিনায়কত্বে।

বিপ্লবের ওপর প্রথম আক্রমণ এল স্বদেশীয় বুর্জোয়া জোতদারদের কাছ থেকে।

২৭শে অক্টোবর ক্রাস্নভ্ গাত্চিনা অধিকার করলেন---লেনিন স্বয়ং রাজধানী রক্ষার ভার নিলেন। ২৮শে অক্টোবর তিনি নিজে গেলেন পুতিলভ্ কারখানায় বন্দুক, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ করতে।

পরের দিন পুল্কোভা-তে ক্রাস্নভকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা হল; বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ অংকুরেই বিধ্বস্ত হল।

আভ্যন্তরীণ বিপদের শেষ নেই। দলের মধ্যে মেন্শেভিক্-পন্থীরা তখনও বিশ্বাসঘাতক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল বুর্জোয়া ধাঁচের সংসদীয় শাসনতন্ত্র

জীবন-কাহিনী

প্রতিষ্ঠার জন্য। তারা দাবী করেছিল, প্রোলেতারিয়েত্-এর হাত থকে অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে, এবং কেরেনেস্কী-কে বাধা দেওয়া চলবে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অ-ভূতপূর্ব সাফল্য দেখেও তারা বলতে লাগল, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 'অবাস্তব।' কামেনেভ্, জিনোভিয়েভ্, রাইকভ্ প্রমুখের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তারা লেনিনের পরিবর্তে অ্যাভ্কসেন্তিয়েভ্ বা চের্নেভ্কে রাষ্ট্রপ্রধান করার প্রস্তাব রাখল।

২রা নভেম্বর দলের কেন্দ্রীয় কমিটি উপর্যুক্ত প্রস্তাবগুলো ঘৃণার

লেনিনের প্রতিকৃতিসম্বলিত কয়েকটি ডাকটিকিট

সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। কমিটি-র অধিকাংশ সদস্যের মতামত অগ্রাহ্য ক'রেও মেন্‌শেভিক্‌-পন্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন কেন্দ্রীয় কমিটি-র সদস্যবৃন্দ। কিন্তু হঠাৎ কামেনেভ্‌, জিনোভিয়েভ, রাইকভ্‌, মিলুতিন্‌ এবং নোগিন্‌ পদত্যাগ করলেন কমিটি থেকে—শেষ তিনজন 'পিপল্‌'স কমিসার' হিসেবেও কার্যভার ত্যাগ করলেন।

এই ক'জনের বিশ্বাসঘাতকতায় লেনিন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাঁর সে সময়কার কথায় এবং লেখায় এই ক্ষোভ স্পষ্ট। এঁদের সরিয়ে অনতিবিলম্বে আদর্শে বিশ্বাসী কমরেড্‌-দের দিয়ে স্থান পূরণ করা হল—দোদুল্যচিত্ত কামেনেভ্‌-এর জায়গায় এলেন ইয়াকভ্‌ সভার্দলভ্‌ সেন্ট্রাল এক্‌জিকিউটিভ্‌ কমিটি-র চেয়ারম্যান হিসেবে। পিপল'স কমিসার কাউন্সিলএ চারজন নতুন এলেন।

এত দ্বন্দ্ব এবং পরোক্ষ বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা সত্ত্বেও বলশেভিকরা সর্তাপেক্ষে মেন্‌শেভিক্‌ প্রমুখদের আহ্বান জানালেন দেশ পুনর্গঠনের উত্তেজনাময় কর্তব্যে অংশগ্রহণ করতে এবং বেস্ট্‌ লিটোভস্‌ক সন্ধির পরে তারা স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ায়—বল্‌শেভিক-রা তাদের যেতে বলে নি। এরাই পরে বল্‌শেভিক্‌ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ছুতোয় সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়েছিল।

অন্যান্য দলের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যকলাপের ফলে দেশে রইল একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি জনগণের স্বার্থের একতম খাঁটি ধারক ও বাহকরূপে। বুর্জোয়াদের মিথ্যা প্রচার যে, অন্য দলকে অস্ত্র সাহায্যে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হয়েছিল। একদলীয় সরকারের সমর্থন করেননি লেনিন, কেবল বলেছিলেন জনগণের মঙ্গলসাধনায় সর্বপ্রধান ভূমিকা নেবে কম্যুনিস্ট পার্টি। জনমঙ্গলব্রত পূর্ণ করার পুণ্য কাজে সকলকেই তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন—একমাত্র সর্ত ছিল প্রোলেতারিয়েত্‌ ডিক্‌টেটর্‌শিপ্‌-এর প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

বিপ্লবের পর এল নবীন সমাজ আর রাষ্ট্রগঠনের গুরুদায়িত্ব। অক্লান্ত মহানায়ক সবারে বারবার আহ্বান জানিয়েছেন এই পবিত্র কর্তব্যে অংশ গ্রহণ করতে। তিনি বারংবার বলেছেন, সমাজতন্ত্রবাদ ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিত নয়—তা আসতে পারে কেবলমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

বড় কঠিন কাজ—নতুন ক'রে দেশগড়ার কাজের উপযুক্ত কর্মী প্রোলেতারিয়েত্‌-দের মধ্যে কোথায়! তারা সবে যুগান্তর অত্যাচারী শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেলে দিগন্তপ্লাবী স্বর্ণালোকচ্ছটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ, অত বড় দেশের সরকার পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা তাঁদের নেই। এর ওপর সক্রিয় বুর্জোয়া প্রধান সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যক্ষএবং পরোক্ষ অসহযোগ। প্রতি-বিপ্লবীরা প্রধানত এই সব অন্তর্ঘাতকদের ওপর নির্ভর করেছিল বিপ্লব বন্ধ করার কুৎসিত চক্রান্তে; কিন্তু তাদের আশা আকাশকুসুমই থেকে গেল।

সামগ্রিক প্রচেষ্টা এবং শুভ ইচ্ছা যে কী অসাধ্যসাধন করতে পারে, লেনিন-এর নেতৃত্বে সোভিয়েট প্রোলেতারিয়েত্‌ তা প্রমাণ ক'রে গেছে অবিসংবাদীরূপে। তারা দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দিল 'সন্ধানী' মৃত্যুর পরোয়ানা।' ব্যর্থ করল 'কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা।'

কেউ কেউ তাঁর কাছে আসতেন হতাশ হয়ে—অভিজ্ঞতার অভাবে; ভীত হয়ে—অসফলতার আশংকায়—

লেনিন বলতেন, 'আমিও আগে কোনদিন কোনও দেশ শাসন করি নি, কিন্তু জনগণ এবং দল আমার ওপর বিশ্বাস ক'রে যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে আমি বাধ্য। আপনাদেরও আমি ঠিক তাই করতে বলি।'

লেনিন-এর—কমরেড্‌ লেনিন-এর আহ্বান এল পেত্রোগ্রাদ্‌ থেকে, ভল্‌গা তীর থেকে; সে ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া দিলেন শ্রমিক-কৃষক প্রোলেতারিয়েত্‌। দলে দলে তারা সকলে এগিয়ে এলেন দেশমাতৃকার সেবায়, যার যা ছিল তাই দিয়ে তাই দেশজননীর ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন—কেউ বাদ পড়তে রাজি নন।

সুবিশাল যজ্ঞপ্রাঙ্গণে সাড়া পড়ে গেল। আবালবৃদ্ধ নরনারী সবাই উন্মুখ, সবাই কাজ করতে উৎসুক। লেনিন বললেন, 'আমাদের কথা হচ্ছে, রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন দেশের প্রতিটি মানুষ রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করে এবং সজ্ঞানে, অর্থাৎ অন্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, সকল কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে সানন্দে।'

জমির ওপর মালিকানা তুলে দেওয়া হল পুরোপুরি; নারীর সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল: জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেককে সমাজে সমান স্থান দেওয়া হল; ধর্ম ও রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পূর্ণ করা হল; ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষিত হল; এবং শিক্ষাব্যবস্থা হল ধর্মনিরপেক্ষ।

ভূমিসংস্কারের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হল। 'রিপ্লাই টু এন্‌ কোয়ারিস্‌ ফ্রম্‌ পিস্যান্টস্‌' (চাষীদের প্রশ্নের জবাব') লিখে লেনিন স্ব হস্তে বিলি করলেন কৃষকদের, দূর দূরান্ত থেকে আগত কৃষককুলকে একজন শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ চাষী সার দেশের কৃষক সমাজের অন্তরের কথা বললেন: 'কমরেড লেনিন কি, স্বচক্ষে না দর্শন ক'রে আমার ফেরবার উপা নেই—তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে। এবং ফিরে গিয়ে দেশে লোককে বলতে হবে, আমি তাঁকে দেখেছি। এইজন্যেই তারা আমা

পাঠিয়েছে—তারা আমাকে বলেছে, 'খোদ লেনিন-কে প্রশ্ন ক'রে তাঁর মুখ থেকে শুনে নিও কী করতে হবে, এবং কেমন ক'রে।' স্বপ্ন তাঁর সফল হয়েছিল, যেমন হল অন্য অসংখ্য আজীবন বঞ্চিত চাষীদের আকাঙ্ক্ষা—লেনিন-এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনা অন্তে তাঁরা পূর্ণ হৃদয়ে ফিরে গিয়েছিলেন আপন ঘরে।

শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীকে সবচেয়ে জরুরী বলতেন লেনিন; তাঁর মতে এই মৈত্রী সুদৃঢ় হলে কেউ-ই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি রুখতে পারবে না। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্রে এককভাবে কোনও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

সোভিয়েট রাশিয়া-য় বহু ভাষা-ভাষী বহু জাতির বাস। কাজেই, জাতি-গত নানান কূট প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানের ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার সাফল্য বহু বহুলাংশে নির্ভরশীল। ১৯১৭-র ৩রা নভেম্বর প্রকাশিত হল 'কাউন্সিল অব পিপল্‌স্ কমিসার্‌স্' এর পুস্তিকা 'দ্য ডিক্লারেশন অফ রাইটস্ অব্ দ্য পিপলস অব রাশিয়া।' এই ঘোষণায় রাশিয়া-র প্রতিটি জাতির সমান অধিকার এবং সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রে তুলে দেওয়া হল। জাতিগত সমস্ত বাধানিষেধ, খুলে দেওয়া হল সর্ব জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং অবাধ উন্নয়নের সিংহ-দ্বার। যে-কোন জাতি স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার লাভ করল। এই সিদ্ধান্তের বাস্তব ফলস্বরূপ লেনিন স্বহস্তে ফিনল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা স্বীকারপত্র দিলেন।

পারস্য, তুরস্ক এবং চীনের সঙ্গে যে অন্যায় চুক্তিপত্র করেছিল জার্ সরকার, নবগঠিত বল্‌শেভিক্ সরকার সে সব নাকচ ক'রে দিলেন।

ধ্বংস বিপ্লবের একদিক মাত্র—এবং সে ধ্বংস করা হয় নবীন সৃষ্টির সুতীব্র প্রেরণায়। সন্ত্রাসবাদ বা নিহিলিজম্-এর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রথম দৃষ্টিতে ধ্বংসেই সব ক্রিয়ার পরিণতি। শেষেরটি রবি-কিরণ-হেন, তা জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে মানবতাকে ঘিরে রাখে। বিপ্লবের পর মানুষ দাসত্ব বন্ধনমুক্ত হয়ে আপনি আপনার ভাগ্য রচনার অধিকার লাভ করে। যা কিছু পুরাতন, বর্জনীয় তা টেনে সবলে উপড়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে তার জায়গায় নবীন হর্ম্যরাজি নির্মাণ করে বিপ্লব, অভ্রংলেহী মিনার স্তম্ভগুলি মুক্ত মানুষের কীর্তি বুকে নিয়ে অমর। এই উদ্দেশ্য বিপ্লবের। লেনিন তাঁর প্রবন্ধাদিতে বিপ্লবের এই কল্যাণময়, সৃজনধর্মী এবং গঠনধর্মী রূপের দিকে বারবার ইঙ্গিত করেছেন।

অক্টোবর-এর শেষে লেনিন শ্রমিক-পরিচালকদের জ্ঞাতার্থে কিছু নিয়ম প্রণয়ন করলেন—কেমন ক'রে শিল্প-কারখানা, ব্যাঙ্ক, চাষ ইত্যাদি সুষ্ঠু পরিচালনা ক'রে ঠিকমত উৎপাদন করা হবে, তারই জন্য এই সব উপদেশ। কেউ কেউ বলল, রাষ্ট্র বিশেষ বিভাগ খুলে এ সবের ভার নিক, কিন্তু লেনিন এ মতের বিরুদ্ধবাদী। তাঁর মতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু শ্রমিক জনগণকে পরিচালনার পুরো ভার দিয়ে তাঁদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ক'রে দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। 'শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালনা' সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রকাশিত হল ১৯১৭ খৃস্টাব্দর ১৪ই নভেম্বর। অত বড় দেশের কলকারখানার নতুন পরি-চালকরা স্বভাবতই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতেন প্রাথমিক স্তরে; তাঁরা দৌড়ে আসতেন পরম প্রিয় নেতার কাছে। লেনিন সাদরে শুনতেন সব বক্তব্য—গভীর মনোযোগ দিয়ে, পার-স্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করতেন এবং শ্রমিক কর্মী-দের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন তাঁদের গুরুদায়িত্বের কথা। নিশ্চিন্ত মনে ফিরতেন কর্মীরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে, নবীন উৎসাহ নিয়ে।

গোড়া থেকেই লেনিন পরি-কল্পনার ওপর জোর দিয়েছেন। কাজেই কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার আবশ্যকতা অবধারিত—প্রতিষ্ঠিত হল 'সুপ্রীম ইকনমিক্ কাউন্সিল', তার শীর্ষে রইলেন লেনিন স্বয়ং। বায়ুর মত সর্বগ মহানায়ক; সমুদ্রের মত অশ্রান্তকর্মা।

সমস্ত ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হল; রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শ্রমিকরা গ্রহণ করলেন পরিচালনার গুরুদায়িত্ব।

উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর প্রোলে-তারিয়েত্-এর পরিচালনা চালু হওয়ার পরই প্রশ্ন উঠল বণ্টন-ব্যবস্থা নিয়ে। বিশাল সব ব্যবসা সংস্থাগুলোর হাতে ছিল এ কাজ—১৯১৮-র বসন্তকালের আগেই এ সব বণ্টন-ব্যবসা ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে এল শ্রমিক প্রোলে-তারিয়েত্-এর হাতে। কয়লা খনি-গুলো, রেলওয়ে, বিদেশী বাণিজ্য এবং মালবাহী জাহাজী সংস্থাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল একের পর এক। ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃত সব চুক্তি নাকচ করা হল।

এর জন্য এক কাণাকড়িও ক্ষতি-পূরণ দেননি সোভিয়েট সরকার; কেন না, চিরকালের শোষকদের ক্ষতি পূরণ দেওয়া অন্যায়।

ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রকৃত যুগ বদলের পালা এল—লেনিন-এর সুদৃঢ় হস্তধৃত হাল রাষ্ট্রতরণীকে সুবাতাসের সাহায্যে নিরাপদে বন্দরের দিকে নিয়ে চলল। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের বিকৃত কোলাহলেও তাঁর হাত কাঁপেনি—স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে গেছেন তিনি।

বাধা রীতিমত প্রবল। ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া শাসকবৃন্দ। সম্পদচ্যুত জমি-দাররা এবং ঘরের শত্রু বিভীষণ মেন্‌শেভিক্‌গোষ্ঠী,—সবাই একজোট হয়ে নতুন সোভিয়েট সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল—এমন কি, তারা সশস্ত্র আন্দোলনেও পেছু-পা হয়নি। প্রোলেতারিয়েত্‌রা বাধ্য হয়ে এদের দমনকার্যে হাত দিল। অন্তর্দ্বন্দ্ব মোটেও পছন্দ করতেন না লেনিন, কিন্তু উপরি উক্ত পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য

করেছিল দেশবাসীর এক অংশের বিরুদ্ধে যেতে। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের অনেক মন্ত্রীকে পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন, এমন কি চরম শত্রু ক্রাস্নভ্-কে পর্যন্ত।

যে সব পত্র-পত্রিকা (বুর্জোয়া পত্রিকাগুলো তিনি প্রথমে বন্ধ ক'রে দেন নি) সোভিয়েট সরকারের খোলাখুলি বিরোধিতা সুরু করল, সেগুলো বন্ধ করা ছাড়া উপায়ই বা কি। ডন নদীর উপত্যকায় এবং উরাল অঞ্চলের কশাক্‌দের 'বিদ্রোহ' কঠোরহস্তে দমন করা হল।

ইতিমধ্যে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে লেনিন-এর নির্দেশাবলী প্রকাশিত হয়ে গেছে। ১৯১৮-র ১৫ই জানুয়ারী স্থিরীকৃত হল 'রেড্ আর্মী', 'লাল ফৌজ' সংগঠনের নিয়মকানুন।

বিপ্লবের পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মধ্য রাশিয়ায়, উরাল অঞ্চলে প্রায় সমগ্র সাইবেরিয়ায়, ট্রান্‌সবৈকাল অঞ্চলে এবং রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে সোভিয়েট ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল বিদ্যুদ্‌গতিতে। ১৯১৮-র মার্চ মাসের মধ্যে সোভিয়েট আয়ত্তাধীন হল য়ুক্রেন্, বাইলোরুশিয়া, বাল্‌টিক্ প্রদেশগুলি, তুর্কীস্থান এবং বাকু।

বিরামহীন কাজের ফলে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন মহানায়ক। ক্রুপ্‌সকায়া অনবরত তাঁকে অন্তত কিছুদিনের জন্য গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেনিন শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন এই ভেবে যে, ঐ অবসরে তিনি অনেক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখতে পারবেন। কর্মব্যস্ততার জন্য প্রবন্ধ লেখা প্রায় বন্ধ ছিল বললেই হয়। ২৩শে ডিসেম্বর পিপল্‌স কমিসার্ লেনিনকে কয়েক দিনের 'ছুটি মঞ্জুর' করলেন। স্ত্রী ক্রুপ্‌সকায়া এবং ভগ্নী মারিয়া সমভিব্যাহারে তিনি গেলেন ফিন্‌ল্যাণ্ড-এর এক স্বাস্থ্যনিবাসে অবকাশ যাপনের জন্য। বিশ্রাম তাঁর ছিল না---একটা জাতিকে যুগসঞ্চিত পাপপঙ্ক থেকে টেনে তোলার দায়িত্ব যাঁর স্কন্ধে অর্পণ করেছেন বিধাতা, তাঁর কপালে আরাম কোথায়? 'আরাম' তাঁর জীবনে আক্ষরিক অর্থে 'হারাম'। ওখানে গিয়েও তিনি লিখতে লাগলেন অবিরাম।

২৮শে ডিসেম্বর লেনিন ফিরে এলেন পেত্রোগ্রাদ্-এ; অর্থাৎ বিশ্রাম নিলেন ছ'দিন মাত্র!

প্রথম সোভিয়েট নববর্ষ যাপন করলেন লেনিন দম্পতি ভাইবোর্‌গ-এর শ্রমিক কমরেড-দের সাহচর্যে।

পয়লা জানুয়ারী মিখাইলভ্ রাইডিং স্কুল-এ প্রথম সোভিয়েট সৈন্যদলকে সীমান্তে রওনা ক'রে দিয়ে যখন তিনি গাড়িতে ফিরছিলেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ছোড়ে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীর দল। সুইস্ কমরেড্ ফ্রিট্‌জ প্লাটেন ক্ষিপ্রতার সংগে লেনিন-এর মাথা টেনে নিচু ক'রে দেওয়ায় তিনি আহত হন নি, কিন্তু প্লাটেন্ নিজে আহত হলেন। সারা দেশে ধিক্কার পড়ে গেল এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কন্‌সটিট্যুয়েন্‌ট্ অ্যাসেমবলী নির্বাচিত হয়েছিল প্রাক্‌বিপ্লব যুগের তালিকা অনুযায়ী। স্বভাবতই বিপ্লবোত্তর যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এই পরিষদ। তৎসত্ত্বেও লেনিন এই পরিষদ আহ্বান করালেন এবং বল্‌শেভিক দল সমর্থিত 'ডিক্লারেশন্ অব্ রাইট্‌স অব্ দ্য ওয়ারকিং অ্যান্ড এক্‌সপ্লয়েটেড্ পিপ্‌ল' নামক প্রস্তাব উত্থাপন করল ১৯১৮-র ৫ই জানুয়ারী, আসেম্বলী-র প্রথম দিনেই। অ্যাসেম্বলী কিন্তু বল্‌শেভিক্-দের আনীত প্রস্তাব আলোচনা করতে গররাজি। এইভাবেই প্রমাণিত হল প্রাক্‌বিপ্লব যুগের বুর্জোয়াতন্ত্র প্রোলেতারিয়েত্ স্বার্থর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

পরের দিনই সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় এগ্‌জিক্যুটিভ্ কমিটি এবং কাউন্‌সিল্ অব্ পিপল্‌স্ কমিসারস্ একযোগে আদেশ জারি ক'রে কন্‌সটিট্যুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী ভেঙে দিলেন। এর পরিবর্তে বল্‌শেভিক দল দাঁড় করাল তৃতীয় নিখিল রাশিয়া সোভিয়েত্ কংগ্রেসকে। এই কংগ্রেস-এর অধিবেশন সুরু হল ১৯১৮-র ১০ই জানুয়ারী। লেনিন তাঁর বক্তৃতায় বল্‌শেভিক মতবাদের ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, কেবল রাশিয়ায় নয়, এই মতবাদ সারা বিশ্বে পরিবর্তন আনবে। আনবে নতুন আশার বাণী সর্বহারাদের জীবনে, সহজ করবে শোষণের অবসান ক'রে সমাজতন্ত্রবাদের আগমন।

লেনিন উপলব্ধি করেন, তৎকালীন পরিস্থিতিতে সর্বপ্রধান প্রয়োজন শান্তির। শান্তিময় পরিবেশ ছাড়া জাতি গঠনের মহান দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা অসম্ভব। কাজেই নতুন সোভিয়েট সরকারের মাধ্যমে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে লাগলেন শান্তির জন্য। ঘোষণা করলেন: 'শান্তিই সর্বপ্রধান প্রয়োজন---' বারংবার সোভিয়েত্ সরকার সংযুক্ত জাতিপুঞ্জের কাছে আবেদন জানালেন জার্মানী-র সংগে শান্তি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য, কিন্তু এ প্রস্তাব বারবারই অগ্রাহ্য হল।

বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা সরকারের উপর্যুপরি প্রত্যাখ্যানে হতাশ সোভিয়েট সরকার ঠিক করলেন, তাঁরাই জার্মানী-র সংগে শান্তি আলোচনা সুরু করবেন। ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া সরকার, ধনিকশ্রেণী, জমিদারবর্গ এবং মেন্‌শেভিক বিশ্বাসঘাতকরা শান্তি আলোচনায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং এমন কি, সদ্যোজাত দুর্বল বল্‌শেভিক সরকারের বিরুদ্ধে জার্মানীকে আক্রমণে উত্তেজিত পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু সফল হয় নি।

৮ই নভেম্বর রাত্রে লেনিন স্বয়ং প্রধান সেনাপতি দুখোনিন্‌কে টেলিফোন-এ জানালেন শান্তি আলোচনা আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত। দুখোনিন্ এ আদেশ মানতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। সে এক মহা সঙ্কটময় পরিস্থিতি; অনেক সৈন্যদল মেন্‌শেভিক্ পরিচালিত এবং পুরোপুরি বল্‌শেভিক্-দের বিরুদ্ধবাদী।

সঙ্কটত্রাতা লেনিন এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মোকাবিলা করলেন দুখোনিন্‌কে পদচ্যুত ক'রে তাঁর জায়গায় ক্রাইলেংকোকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে বেতারের মাধ্যমে লেনিন সমগ্র সৈন্যদলের কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন, আশু শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব তাঁদের সকলের এবং তাঁরা যেন নিজেরাই শান্তি-আলোচনা সুরু করেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী লেনিন-এর দূরদর্শিতার পরিচয়বাহী। সাধারণ সৈন্যরা নিজেরাই অগ্রণী হয়ে সোভিয়েট সরকারের নির্দেশ কার্যকরী ক'রে শান্তি-চুক্তির প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে 'যুদ্ধ-বিরতি' চুক্তি করেছিলেন।

রাশিয়া এবং অস্ট্রো-জার্মান শক্তি-পুঞ্জের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শান্তি আলোচনা সুরু হল ১৯১৭-র ২০শে নভেম্বর। ব্রেস্ট-লিটোভস্ক-এ এই আলোচনার পর যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করা হয়। ৯ই ডিসেম্বর শান্তি-আলাপ সুরু হল একই জায়গায়। নতুন সোভিয়েট সরকারের দুর্বলতা এবং তাদের শান্তির জন্য আগ্রহ দেখে জার্মানী নির্লজ্জের মত দাবী জানাল যে, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়ার অংশ, এস্তোনিয়া এবং বাইলোরুশিয়া তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে হবে, এবং য়ুক্রেন হবে জার্মানীর অধীন রাষ্ট্র।

দল এবং সোভিয়েট সরকার গভীর সমস্যার সম্মুখীন —এই অপমানজনক শান্তিচুক্তি তাঁরা সই করবেন কি?

বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হতে লেনিন কোনদিনই পরাঙ্মুখ নন; সমস্যা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিটিয়ে দেওয়া তাঁর চিরকালের স্বভাব। এ ক্ষেত্রেও তিনি তাই করলেন। পরিস্থিতি তাঁর চাইতে কেউ ভাল ক'রে জানতো না। সত্যি বলতে কি, সোভিয়েট সরকারের কোনও সৈন্যদল ছিল না তখন; পুরনো সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ, 'রেড্‌ আর্মী' বা 'লাল ফৌজ' সবে-মাত্র গড়ে উঠছে। সৈন্যদলের অধিকাংশ এবং জনসাধারণ রণক্লান্ত এবং শান্তির জন্য উন্মুখ। তিনি খুব ভাল ক'রেই জানতেন, যুদ্ধ চলতে থাকলে সোভিয়েট সরকারের সর্বনাশ ঘটবে—তাঁদের কাছে এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন।

কাজেই পরিস্থিতির বাস্তবিক মূল্যায়ন ক'রে লেনিন সিদ্ধান্ত করলেন, সারা জগতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতিভূস্বরূপ সোভিয়েট গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্যই সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অত্যাবশ্যক—তা সে যে মূল্যই দিতে হোক্‌ না কেন।

লেনিন-এর মতের বিরোধিতা করলেন ট্রট্‌স্কী এবং বাম কম্যুনিস্ট-বৃন্দ (বুখারিন, বুবনভ্‌, লোমভ্‌, ও সিন্‌স্কী প্রমুখ) শান্তি আলোচনা ভেঙে দিয়ে তাঁরা জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তাঁদের ধারণা, শান্তি-চুক্তি করলে পশ্চিমাঞ্চলে বিপ্লব-আন্দোলন ব্যাহত হবে এবং রাশিয়ায় আবার বুর্জোয়া শাসন ফিরে আসবে। ট্রট্‌স্কীর মতে জার্মানীর আর যুদ্ধ চালানোর মত ক্ষমতা নেই; কাজেই রাশিয়া যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ক'রে সৈন্যদল ভেঙে দিক কোনও শান্তি চুক্তিতে সই না ক'রে।

১৯১৮-র ৮ই জানুয়ারী লেনিন এই প্রশ্ন তুললেন পার্টিতে। সেখানে 'বৈপ্লবিক যুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে ৩২ ভোট, ট্রট্‌স্কীর 'না যুদ্ধ, না শান্তি' মতের পক্ষে ১৬ ভোট, এবং জার্মানীর সর্ত অনুযায়ী শান্তিচুক্তির সমর্থনে ১৫টি ভোট পড়ল। সেণ্ট্রাল কমিটির সভায় (১১ই জানুয়ারী) বেশির ভাগ সভ্যই ট্রট্‌স্কীর মত সমর্থন করলেন। সাধারণ সভ্যরাও জার্মানীর কঠোর সর্তাবলী মেনে নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত।

লেনিন মহা সমস্যায় পড়লেন। নিজস্ব মতের নির্ভুলতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত এবং প্রবল বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

বহু আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত পার্টি তাঁর মতই সমর্থন করল।

লেনিন এবং দলের সুদৃঢ় নির্দেশ সত্ত্বেও ট্রট্‌স্কী বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে শান্তিচুক্তি সই করলেন না, পরন্তু ২৮শে জানুয়ারী নিজের দায়িত্বে যুদ্ধ-বিরতির ভিত্তিতে সমস্ত রুশ সৈন্যদল ভেঙে দিলেন। সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে অনতিবিলম্বে পুনরাক্রমণ সুরু করল। এই দিনই (১৮ই ফেব্রুয়ারী) সেণ্ট্রাল কমিটির জরুরী সভায় ৭-৫ ভোটে লেনিন-এর প্রস্তাব অনুসারে স্থির করা হল, সোভিয়েট সরকারের তরফ থেকে তারবার্তা পাঠাতে হবে জার্মান সরকারকে এই মর্মে যে, সোভিয়েট সরকার শান্তি চুক্তি অনুমোদন করেছেন এবং তা সই করতেও প্রস্তুত। তারবার্তা তক্ষুণি পাঠানো হলেও সাম্রাজ্যবাদী জার্মান সরকার ইচ্ছে ক'রে জবাব দিতে দেরি করতে লাগল। ইতিমধ্যে জার্মান সৈন্য এগিয়ে আসছিল।

সোভিয়েট গণতন্ত্রর সেদিন ঘোর বিপদ। আভ্যন্তরীণ 'জ্ঞাতিশত্রু' ও রয়েইছে, উপরন্তু বহিঃশত্রুর হাত থেকে স্বদেশ রক্ষা করাও বিষম জরুরী। সদ্যগঠিত 'রেড্‌ আর্মী'-র প্রথম দল ক'টি পাঠান হল সীমান্তে—পুস্কভ্‌, রেভেল, (তালিনিন্‌) এবং পার্‌ভা-তে বড় রকমের লড়াই বাধল; এবং এই সব রণক্ষেত্রেই বাস্তবিকপক্ষে লাল ফৌজ নবজন্ম লাভ করেছিল।

এরই সঙ্গে সঙ্গে লেনিন ট্রট্‌স্কী এবং তথাকথিত 'বাম' কম্যুনিস্টদের সঙ্গেও তুমুল মসীযুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক এই সব মৌখিক বিপ্লববাগীশদের মুখোস খুলে দিয়ে লেনিন দেখালেন—এরা স্বেচ্ছায় বা ভুলবশত—ইংরেজ ও ফরাসী বুর্জোয়াদের ফাঁদে পা দিচ্ছিলেন; সাম্রাজ্যবাদীদের মনোগত অভিপ্রায় জার্মানীর হাতেই নবজাত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সরকার ধ্বংস হোক।

২৩শে ফেব্রুয়ারী জার্মানী শান্তি চুক্তির জন্য কঠোরতম সর্ত আরোপ করল। ওদের দাবি সমগ্র লাত্‌ভিয়া

ও এস্তোনিয়া তাদের দিতে হবে এবং য়ুক্রেন-এর বুর্জোয়াদের দাবি অনুসারে ওই প্রদেশটি প্রকৃতপক্ষে জার্মানী নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এ ছাড়া সোভিয়েট সৈন্যদল ভেঙে জার্মানীর পক্ষে সুবিধাজনক সর্তে অর্থনৈতিক চুক্তি করা চাই।

ট্রট্‌সকী আর অন্যান্য 'বাম' কম্যুনিস্টদের মারাত্মক ভুলের ফসল এই চূড়ান্ত অপমানজনক এবং ক্ষতিকর দাবিপত্র। লেনিন দুঃখ ক'রে লিখলেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করেছেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী উত্তেজিত লেনিন তাঁর শেষকথা জানিয়ে দিলেন—সেণ্ট্রাল কমিটির সভায় 'হয় জার্মানীর সর্ত মেনে নিয়ে শান্তিচুক্তি সম্পাদন কর, না হয় আমাকে ছেড়ে দাও।' আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে তিনি গররাজি—পিতৃভূমির চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনও 'কথামালা' রচনা করতে মহানায়ক চান না। আবেগে, উত্তেজনায় থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিলেন তিনি। তাঁর আজীবনের স্বপ্ন ও সাধনা মুষ্টিমেয় ভ্রান্ত মতবাদীর একগুঁয়েমির বেদীমূলে বলি দিতে তিনি প্রস্তুত নন।

ইতিপূর্বে বরাবর লেনিনকে সমর্থন জানালেও এই চরম সঙ্কট-মুহূর্তে স্তালিন ইতস্তত করতে আরম্ভ করলেন। লেনিন বারংবার দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, সেই মুহূর্তে শান্তি চুক্তিতে সই না করলে 'তিন সপ্তাহের মধ্যে' সোভিয়েট সরকারের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ফলত, স্তালিন তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

ট্রট্‌সকী, বুখারিন্, উরিট্‌সকী এবং লোমভ্ তখনও লেনিন-এর ঘোর বিরোধী।

অবশেষে স্বপক্ষে সাত ভোট এবং বিপক্ষে চার ভোট পড়ায় লেনিন-এর প্রস্তাব অনুমোদিত হল। স্থির হয়ে গেল যে, শান্তিচুক্তিতে সই করা হবে।

তথাকথিত 'বাম' কম্যুনিস্টরা কিন্তু ভোলবার পাত্র নয়। দলীয় শৃঙখলা তাদের গোঁয়ার্তুমিকে নিরস্ত করতে পারল না। তাঁরা এবার আলাদাভাবে নিজেদের পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করলেন এবং ট্রটসকী ও অন্যান্যরা পদত্যাগ করলেন। এঁদের সুচিন্তিত মত এই যে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে রাশিয়ার ক্ষমতা কিছু হ্রাস পেলেও কোনও ক্ষতি নেই। এই মনোবৃত্তিকে 'অদ্ভুত ও দানবীয়' বলে লেনিন জানালেন, আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক হতে পারে কেবলমাত্র দৃঢ়, সবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট রিপাবলিক।

১৯১৮-র ৩রা মার্চ জার্মানীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ব্রেস্টলিটোভ্স্ক-এর এই কঠোর এবং অসঙ্গত সর্তসম্বলিত চুক্তিপত্রে সই করা যে কত মর্মান্তিক এবং দায়িত্বপূর্ণ, তা লেনিন মনে প্রাণে অনুভব করেছিলেন।

মার্চ মাসের ছয় থেকে আট তারিখ পর্যন্ত পেত্রোগ্রাদ্-এ অনুষ্টিত হল সপ্তম বলশেভিক পার্টি কংগ্রেস। চতুর্দিকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত রাশিয়াকে যে কত সাবধানে শনৈঃ শনৈঃ এগোতে হবে, তা বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন লেনিন। এইসব শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলি যাতে রাশিয়া আক্রমণের কোনও অজুহাত না পায়, সে জন্য সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকে প্রয়োজনবোধে হতে হবে নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল। জার্মানী-র সঙ্গে চুক্তি যে হাঁফ ছাড়ার অবসর নেওয়া, সে কথাও লেনিন বুঝিয়ে বললেন।

সপ্তম কংগ্রেস লেনিন-এর 'যুদ্ধ ও শান্তি' সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থন ক'রে ব্রেস্ট্-লিটোভ্স্ক চুক্তিও অনুমোদন করল।

অন্য এক প্রস্তাবে লেনিন চাইলেন দলের নাম পরিবর্তন ক'রে কম্যুনিস্ট পার্টি নাম রাখতে। তাঁর মতে, বিপ্লব অন্তে বলশেভিক দলের কাজ ফুরিয়েছে, এবার সংগঠনের কাল—'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী; এই মহান বাক্যটি বাস্তবে পরিণত করতে অর্থাৎ, খাঁটি 'কম্যুনিজম' আনতে—দলকে উঠেপড়ে লাগতে হবে।

এই প্রস্তাবও অনুমোদিত হল; দলের নতুন নাম হল 'রুশ কম্যুনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)'। নতুন কর্মসূচী প্রণয়নে লেনিন-এর নেতৃত্বে কমিশন নিযুক্ত হল।

ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে লেনিন-এর প্রস্তাব অনুসারে পেত্রোগ্রাদ্ থেকে মস্কোয় রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ১৯১৮-র ১১ই মার্চ লেনিন-এর নেতৃত্বে দলের সেণ্ট্রাল কমিটি এবং কাউন্সিল অফ পিপ্‌লস কমিসার্স মস্কোয় উপনীত হলেন—মস্কো হল সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজধানী।

ব্রেস্ট-এর শান্তি চুক্তি প্রমাণ করল লেনিন-এর পররাষ্ট্র নীতির নমনীয়তা; প্রয়োজনবোধে কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসরণ ক'রে সংগঠন ও শক্তিবৃদ্ধির অবসর পেলে সম্ভাব্য ভাবী সঙ্ঘর্ষর জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা যায়। রাজনৈতিক সমঝোতা যে পরম শত্রুর সঙ্গে কতখানি প্রয়োজন—অবশ্যম্ভাবী হলে—তা তিনি প্রমাণ করলেন। কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি পিতৃভূমির প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন।

লেনিন সর্বদাই বলতেন, রুশ নীতি এমন হওয়া চাই যা শেষে সারা জগতের শোষিত প্রোলেতারিয়েত-এর অনুকূল হবে: এ জন্যই তিনি রাশিয়ার একাংশ ছেড়েও অত্যাবশ্যক শান্তি স্থাপনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কথা হল: সময় চাই সংগঠনের, সময় দরকার ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত সদ্য ভূমিষ্ঠ রুশ গণতন্ত্রর বাঁচার প্রস্তুতির জন্য, সময় প্রয়োজন উপযুক্ত শক্তি বৃদ্ধি ক'রে সময়মতন শ্রেণীশত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

আজ আমরা জানি মহানায়কের দূরদৃষ্টি কত নির্ভুল। সোভিয়েট শক্তি

ক্রমবর্ধমান ; পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোয় তেমেই বিপ্লব আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল, কয়েকটি দেশে খণ্ড বিপ্লব হল।

১৯১৮-র নভেম্বর মাসে জার্মানীতে খণ্ড বিপ্লব হওয়ায় রাশিয়া ব্রেস্ট-এর ঘৃণ্য চুক্তি নাকচ করতে সক্ষম হল। মার্চ থেকে নভেম্বর—এক বছরও লাগল না লেনিন-এর পররাষ্ট্র নীতির নির্ভুলত্ব প্রমাণের জন্য।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে লেনিন গোড়াতেই এই স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক সঙ্গে সব দেশে সফল হতে পারে না এবং 'ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহাবস্থান' কিছু দিনের জন্য ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসেবেই মান্য। লেনিন বুঝেছিলেন, ধীরে ধীরে সব দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় পতাকা ওড়ার কাল পর্যন্ত এই সহাবস্থান থাকবে। তাঁর মতে, এ জন্য দুই নীতির দেশগুলোকে স্থির করতে হবে ও দ্বন্দ্ব দ্বারা কোনও সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলবে না এবং শান্তিপূর্ণ অবাধ বাণিজ্য চলতে থাকবে দুই মতবাদী দেশসমূহের মধ্যে। লেনিন অনবরত বলতেন, সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সমাজতন্ত্রবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ; সমাজতন্ত্রবাদ পররাজ্য লোলুপতার নীতি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। একদা বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, একই গ্রহে অবস্থিত ভিন্ন মতাবলম্বী রাষ্ট্রসমূহর সঙ্গে একযোগে বাস করতে যখন হবেই, তখন তাদের সঙ্গে ব্যবসা এবং অন্যান্য চুক্তি ক'রে শান্তিতে বসবাস করাই বিধেয়। অন্যথায় 'চাঁদে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া' অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব।

অবশ্য, সহাবস্থানের অর্থ কখনও এ নয় যে, ধনতান্ত্রিক মতবাদ মেনে নেওয়া হচ্ছে; লেনিন-এর মতে, এর অর্থ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে অবিরাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের সর্বহারা বিপ্লবকে সাহায্য করা, বিশেষতঃ উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা। লেনিন বলেছেন :

> 'গোটা পৃথিবীর বিপ্লব আন্দোলনের দাবি স্বদেশের বুর্জোয়া সরকারকে উচ্ছেদের পর সোভিয়েট সরকার স্বদেশের আন্দোলনকে সাহায্য করবে, তবে সে এমন সাহায্য দেবে যা তার আয়ত্তের বাইরে নয়---'

কম্যুনিস্টরা একথা কখনও বলেনি যে, বিপ্লব যুদ্ধের রক্তাক্ত পথেই অগ্রসর হতে বাধ্য। তথাকথিত 'বাম' কম্যুনিস্টদের উগ্র ও হিংস্র মতবাদ খণ্ডন করার জন্য তিনি 'স্টেনজ অ্যাণ্ড মনস্ট্রাস্' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন,

> '---যুদ্ধ ও রক্তপাত যে অবশ্যম্ভাবী, এ ধরণের অদ্ভুত মতবাদ মার্কস-ইজম্-এর একেবারেই পরিপন্থী---এই মত সত্য হলে বুঝতে হবে সশস্ত্র এবং রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান বাধ্যতামূলক হতে হবে সর্বক্ষেত্রে এবং সব পরিস্থিতিতে।'

'বিপ্লব রপ্তানী' করার মতবাদকে লেনিন চিরকাল দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়েছেন। তিনি বলতেন, কেবলমাত্র 'উন্মাদ' ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরাই ভাবতে পারে ফরমায়েস মতন বা চুক্তি ক'রে বিপ্লব করা যায়। তিনি বলতেন, বাইরে থেকে কারও ওপর বিপ্লব চাপিয়ে দেওয়া যায় না---তখনই বিপ্লব আসে, যখন 'কোটি কোটি মানুষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, পুরণো সমাজ-ব্যবস্থায় থাকা আর সম্ভব নয়।' আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক অধিকার লেনিন সবক্ষেত্রেই স্বীকার করতেন; তাঁর মতে, প্রত্যেক জাতির নিজের জীবন-যাত্রা প্রণালী, আত্মোন্নয়ন পন্থা এবং যে কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে পছন্দ ক'রে নেওয়ার পুরো অধিকার আছে। তিনি বারংবার বলেছেন, যুদ্ধের পথে নয়, পরন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের জলন্ত উদাহরণ দেখেই পৃথিবীর বিপ্লব আন্দোলন পরিপুষ্ট হবে।

লেনিন বলতেন, 'বিপ্লব রপ্তানী' ক'রে নয়, সোভিয়েট রাষ্ট্র দৃঢ়সংবদ্ধ ক'রে তুলে সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ ক'রেই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র পুষ্ট হবে। এর সঙ্গে চাই সব রকম যুদ্ধ বিষবৎ বর্জন করা—মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে হবে যুদ্ধ অন্যায়, এবং সমগ্র বিশ্বের বাস্তব স্বার্থের পরিপন্থী।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেই পররাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব নিলেন লেনিন। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা হল; আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি অনুসারে ঠিক হল আমেরিকার মালের বিনিময়ে রাশিয়া কাঁচা মাল ও কৃষিজ পদার্থ দেবে।

এই সময় নতুন সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকারী সীলমোহরের কথা উঠল। পিপলস কমিসারদের কাছে যে নক্শা উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তাতে 'তরবারি' অঙ্কিত ছিল দার্চ্য ও শক্তির প্রতীক হিসেবে। লেনিন এই প্রতীকের ঘোর বিরোধী। তিনি বললেন :

> 'তরবারি কেন? রণজয়ে আমাদের দরকার নেই---আমরা পররাজ্য লোলুপতার ঘোর বিরোধী; আমরা আক্রমণ করব না, আক্রমণ প্রতিহত করব মাত্র---'

আলোচনার পর স্থির হল যে, তরবারি নয়, শান্তিপূর্ণ উৎপাদনের চিরন্তন প্রতীক হিসেবে 'কাস্তে ও হাতুড়ি' যুক্তভাবে হবে সোভিয়েট রাষ্ট্র সরকারী প্রতীক চিহ্ন।

আজ মহানায়ক পূর্ণ সফল। আজ জার সম্রাটদের ক্রেমলিন প্রাসাদে সগর্বে উড়ছে লাল নিশান। লেনিন-দম্পতি এলেন ক্রেমলিন্-এ বাস করতে।

[ক্রমশ।

রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-শিশির প্রতিভা

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(শেষাংশ)

অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, শিশিরকুমারকে পত্র লেখেন---'নবনাট্যমন্দিরে শিশিরবাবু কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলাম যোগাযোগ নাটক দেখতে। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসম্পন্নপ্রায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতাদের মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে, তবে সে জন্য নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না।'

'চিরকুমার সভায়' শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটারের হয়ে 'চন্দ্র'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শিশিরকুমার এই ভূমিকাতে নিজস্ব নূতন রূপ দেন—যা রবীন্দ্র-নাথকে মুগ্ধ করে।

আনন্দবাজার পত্রিকা সমালোচনা করেছিলেন---'চন্দ্রর ভূমিকায় শিশিরকুমার যে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, তা দর্শকবৃন্দের করতালিতেই প্রেক্ষাগৃহে প্রমাণিত হ'ল।'

রবীন্দ্রনাথের লেখনীর ওপর যদি সাহসের সঙ্গে কেউ কলম চালাতে পেরেছেন তিনি হচ্ছেন শিশিরকুমার। রবীন্দ্রনাথের 'আশা' কবিতায় আছে 'গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া' শিশিরকুমার রেকর্ডে আবৃত্তি করেছেন---'তরুটির স্নিগ্ধ ছায়া।' রেকর্ড অনেকেই শুনে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রশংসাই করেন নি, বিস্মিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে বলেছিলেন---'তুমি 'তরু' কথাটি দিয়ে আরও শ্রুতিমধুর করেছ।' গাছটিতে অত মধুর শোনায় না।'

সমসাময়িক কত পত্রে রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের সৃজনী প্রতিভার প্রশংসা করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে অনেক উচ্চ ধারণা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন শিশিরকুমার সম্বন্ধে, 'বাংলায় প্রায় সব নাটকই গঠনে এবং সংলাপে দুর্বল। সেইজন্য শিশিরবাবুকে গঠন বদল করতে হয় অভিনয়ের জন্য এবং প্রয়োজনানুযায়ী সংলাপও যোগ করতে হয়, না হয় বদলাতে হয়। অবশ্য এই পরিবর্তন করতে শিশিরবাবু যে আদৌ ভুল করেন না এমন কথা বলি না। কিন্তু নাটকের অবয়ব সাধারণত এত শিথিল থাকে যে, জগতের যে-কোন বড় নাট্যাচার্যের মতো তাঁকেও নাট্যরূপ বদলাতেই হয়। এখানে যে-কোন নাট্যকারকে শিশিরবাবুর নাট্য-নির্দেশনা-প্রযোজনা-সংগঠন মানতেই হবে।'

তাই তো নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলেছেন, 'আমাদের নাট্যকাররা অভিনয়ের উপযোগী নাটক অদলবদল করতে গেলেই রেগে যান, বিরক্ত হ'ন---যেন আমি অযাচিতভাবে তাঁদের নাটকে কলম চালিয়ে নষ্ট করছি, অথচ রবীন্দ্রনাথ যখন যা বদলেছি তাই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন, এতটুকুও আপত্তি করেন নি।'

আগেই বলেছি যে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। শিশিরকুমার কিন্তু নিজে তাঁর উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপূর্ব ভঙ্গিমায় আবৃত্তি করতে পারতেন। তখনকার দিনে শিশিরকুমারের আবৃত্তি রঙ্গালয়ের একটি বিশিষ্ট সম্পদ ছিল। তা শুনতেই অনেকে যেতেন। একবার প্রেসিডেন্সি কলেজে এক উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়। শিশিরকুমারও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ সভায় ছাত্রদের কোলাহল আর গোলমাল আরম্ভ হয়, শেষপর্যন্ত কিছুতেই থামাতে পারা যায় না। কর্তৃপক্ষ যখন দেখলেন কিছুতেই গোলমাল বন্ধ করা যাচ্ছে না, তখন তাঁরা শিশিরকুমারকে আবৃত্তি করতে অনুরোধ করলেন। শিশিরকুমার মঞ্চে উঠে রবীন্দ্রনাথের 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গেই সভা হ'ল নিস্তব্ধ। ছাত্রদের গোলমাল একদম চলে গেল, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে যেন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশিরকুমারের আবৃত্তি শুনতে বড় ভালবাসতেন। শিশিরকুমার যখনই যেতেন তাঁর কাছে, কিছু-না-কিছু আবৃত্তি না শুনে ছাড়তেন না। কিন্তু সব সময়ে তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গ পেতেন না, তার জন্য তাঁর অনুযোগের অন্ত ছিল না। দুঃখ করতেন অভিমান করে বলতেন, ---"তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে আস না কেন? যাদের চাই না তারা আসে---আর যাদের পেতে চাই তারা আসে না।" শিশিরকুমার বলেছিলেন---"আজ্ঞে, দীনুর বন্ধু কিনা, তাই সব সময় আসা হয়ে ওঠে না।" রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দীনু ঠাকুর ছিলেন সুরায় আসক্ত এবং শিশিরকুমার নিজেও তাই। সেইজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে এই ইঙ্গিত দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেই মুচকে হেসে বললেন---?"ও, তুমি দীনুর বন্ধু বটে। ঠিক। তাই সময় পাও না।" কি সূক্ষ্ম মার্জিত সংলাপের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান। বিস্মিত হতে হয়।

১৯৪৩ সালে ডিসেম্বর মাসে দেওঘরে যখন শিশিরকুমার তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান করছিলেন, তখন এক সন্ধ্যায় শিশিরকুমার নিজের মনে একের পর এক রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন, তাঁর সেই সুললিত মধুর কণ্ঠস্বরে। মণিবাবুর মধ্যম পুত্র শিশিরকুমারের অত্যন্ত স্নেহভাজন কিশণ শিশিরকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন,---আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ কি ভাল নট ছিলেন? তাঁর কণ্ঠ কিন্তু মেয়েলি, শিশিরকুমার বিস্মিত হলেন। বললেন---বল কি? রবীন্দ্রনাথ 'বর্ণ এ্যাক্টর' মস্ত বড় নট---তাঁর

চালচলন ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা, চাউনি পর্যন্ত নটের। আর কণ্ঠ তাঁর অপূর্ব। তাঁর আবৃত্তির তুলনা নেই। সেই জন্যই তো তাঁকে আনতে চেয়েছিলাম পাবলিক স্টেজে-এ। তিনি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যদি আসতেন, দেখতে বঙ্গ-রঙ্গশালা এক নতুন যুগের সৃষ্টি করত। কিন্তু রামানন্দবাবু হেরম্ব মৈত্র প্রমুখ গোঁড়া অন্ধদের প্রবল বাধায় আসতে সাহস করলেন না। তিনি একটি গল্প বললেন—"একবার এক সন্ধ্যায় সুনীতিকুমারকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম। উত্তরায়নে আমরা অপেক্ষা করচি, এমন সময় কিছু দূরে যে ছোট্ট ঘরে তিনি বাস করতেন সেখানথেকে আসচেন। তাঁর চাকর বনমালী একটি সুদৃশ্য আধারে রক্ষিত আলো হাতে করে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসচে। তার পেছনে রবীন্দ্রনাথ। কোমর সামনের দিকে বাঁকানো, হাত দুটি পিছনে রাখা। প্রতিটি পা ফেলে ফেলে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে আসচেন। তাঁর আসা আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল যে তিনি কত বড় নট্।"

রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে কতখানি স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন, তারও একটি গল্প বললেন। যখন 'রীতিমত নাটক' অভিনয় করি, তখন চারিদিকে খুব হৈ হৈ পড়ে গেল। দর্শক ও মঞ্চ এর যোগাযোগ নিয়ে। বিজ্ঞাপনেও দিয়েছিলাম—বেরীয়ার থ্রোন ডাউন বিটুইন দি স্টেজ দি অডিয়েন্স কথাটা রবীন্দ্রনাথের কানে গেল। তিনি একদিন ফোনে আমায় বললেন—"শুনচি, তুমি না কি কি একটা নাটক লিখেচ। "তাই নিয়ে মেয়েরা খুব হৈ চৈ করচে। তুমি নাকি প্রেক্ষাগৃহে থেকে অভিনয় করচ এবং রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকরা একত্র হয়ে যায়।" "আমি বাধা দিয়ে বললাম,—না, না, ও আপনার দেখবার মত নাটক নয়। তিনি শুনলেন না বললেন—"আমি একদিন যাব তোমার লেখা নাটকটি দেখব।" "কি আর করি, একদিন তাঁর জন্য বিশেষ আসন এবং প্রেক্ষাগৃহকে নতুন করে সেট্ করে দুপুরে গেলাম তাঁকে আনতে।" গিয়ে বসতেই তিনি মুখখানি ভার করে বললেন—"আমার যাওয়া হবে না। শিশির। সকলে বার করচেন। নিজের লেখা নাটক নয়, পরের লেখা নাটক দেখতে যাবেন কেন?

মনে ভারী দুঃখ হ'ল। আবেগভরা-কণ্ঠে বললাম,—আপনি আগ্রহ ভরে দেখতে চাইলেন। বিশেষ 'শো'র আজ ব্যবস্থা করেচি। অনেক সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনি যদি না যান্ তো আমি ভারী অপদস্থ হ'ব।"

"ব্যস, আর বলতে হ'ল না।" সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"তুমি অপদস্থ হবে। ওরে বনমালী, আমার পোষাক, জামা-কাপড় ঠিক কর। এখুনি আমাকে শিশিরবাবুর থিয়েটার দেখতে যেতে হবে।"

'রীতিমত' নাটক এবং প্রোফেসার 'দিগম্বর' চরিত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচালনাকে পীরাণ্দোল্লার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন,—"শিশিরবাবু যে-কোন জাতির ও দেশের গৌরব। তিনি আধুনিক রঙ্গালয়ের জনক। তিনি স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করলে তাঁর প্রতিভা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হ'ত। আমি শিশিরবাবুর প্রতিভা জানতাম, কিন্তু তিনি যে রঙ্গমঞ্চের এত বড় যাদুকর আমি তা চিন্তাও করতে পারি নি।"

এই জন্যই এর পর যখন রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" অভিনীত হয়, তখন অদলবদল নূতন দৃশ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ও, শিশিরই নিজেই লিখে নিতে পারবে।"

—দেওঘরে মণিবাবুর গৃহে শিশিরকুমার সান্ধ্য বৈঠকে একদিন রসিকতা করে বলেছিলেন। সেখানে বিখ্যাত সাহিত্যিক উপেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বললেন—"দেখুন মণিবাবু, যুগাবতাররা যখন মর্ত্তে লীলা করতে আসেন, তখন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসেন। রামকৃষ্ণদেব এলেন সঙ্গে আনলেন বিবেকানন্দ, মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ প্রমুখ। তবে লীলা জমল। ভগবান শ্রীচৈতন্য এলেন—লীলা কীর্তনের জন্য—প্রয়োজন হ'ল সাঙ্গোপাঙ্গদের। তেমনি রবীন্দ্রনাথই সব নন, তাঁর লীলার জন্য আমাদেরও প্রয়োজন ছিল, যেমন সত্যেন দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার, শরৎ আর এই শিশির। শকুন্তলা সম্পূর্ণ। হতে পারে না, অনুসূয়া প্রিয়ম্বদা ছাড়া, বুঝলেন, বলে হাসতে লাগলেন। সকলেই হেসে উঠলেন।

অনেকে বলেছেন দাম্ভিক। এটা কি দাম্ভিকতার কথা, না যে মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে যা-কিছু সৃষ্টি করেছে এবং সেই সৃষ্টির ফল যাঁর জীবদ্দশাতেই জাতীয় উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে, সেই সার্থকশ্রম মানুষের নিজের ওপর সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের কথা এটা।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ছিলেন শিশিরকুমারের নিজের হাতে গড়া। শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় শিশিরকুমারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন; আবার মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে তীব্র মতভেদও দেখা যেতো। তবে নাট্যাচার্য শচীনবাবুর ওপর বিশ্বাস রাখতেন। শচীনবাবু রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার সম্বন্ধে বলেছেন যে, শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে প্রেরণা পেয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের কিছু কিছু রীতি নিয়ে ফিরে এলেন, তাকে জনসাধারণের উপযোগী করার জন্য। অবশ্য সাধারণ রঙ্গালয়ে আর্ট থিয়েটারই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-রীতিকে এবং প্রয়োগকৌশলকে যে-ভাবে রূপ দিলেন, তাকে রবীন্দ্রনাথ সার্থক বলে মনে করলেন। "সীতা" নাটক থেকেই শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদভাজন হয়েছিলেন।

কারণ সীতা নাটক দেখেই তিনি বোঝেন যে, শিশিরকুমারের সামর্থ্য আছে তাঁর নাটককে রূপ দেবার।

সীতার বৈশিষ্ট্য যা ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভিনয়ের রীতিকে প্রচার করবার চেষ্টা তাঁর সকল নাটকে করেছেন, যাকে বলা হয় 'ensemble' (এ্যাংশ্যাংম্বেল) জার্মাণী প্রথমে আবিষ্কার করে, পরে স্ট্যানিস্‌লাভস্কি সেটাকে সার্থক করে তোলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ যখন বুঝলেন যে, সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর নাটক অভিনয় করার ক্ষমতা অর্জন করেছে, তখন তিনি সাধারণ রঙ্গালয়কে শুধু নাটক দিতে লাগলেন না—নাটক তো দিলেনই, উপরন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের উপযুক্ত করে তাঁর নাটককে তিনি রূপান্তরিত করলেন। শিশিরকুমারের "সীতা" নাটকে সর্বপ্রথম ensemble acting দেখে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য শিশিরকুমারের অনুপ্রেরণায় প্রায় বারখানি নাটক অভিনয়-উপযোগী করেছেন। এইটাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শিশিরকুমারের সব চেয়ে বড় দান বলে মনে হয়েছে। শিশিরকুমার এইটি না করলে, রবীন্দ্রনাথের নাটক স্বল্প-সংখ্যক বিদগ্ধের কাছেই শুধু আদৃত হ'ত।

শিশিরকুমার নিজে বলেছেন, "আমাদের বাংলা দেশে এযাবৎ যতো নাটক হয়েছে, অভিনীত হয়েছে তা প্রায়ই দুর্বল নাটক। মাইকেলের দু'-খানি প্রহসন ও দীনবন্ধুর একখানি নাটক ছাড়া। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন নাট্যকার আসেন নি। বাংলার অসামান্য প্রতিভা, বাংলা সাহিত্যের রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথই যথার্থ নাট্যকার, তাও তিনি জীবনধর্মী নাটক লিখে যেতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "শেষ রক্ষার" মত আলগা নাটক লিখলেও, 'ফাল্গুনীর মত মিস্টিক্ নাটক, "রক্তকরবী"র মত সাঙ্কেতিক সমস্যামূলক নাটক, আবার তপতীর মত যখন নাটক লিখেছেন, তখন জীবনধর্মী নাটকও তিনি লিখতে পারতেন।"

একদিন সন্ধ্যায় দেওঘরের মণিবাবুর চাকাবারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে তামাক খেতে খেতে বললেন,—জানেন মণিবাবু, আমাদের জন্যও চিন্তা করবার লোক ছিলেন যেমন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন,—

এই কথা স্মরি' বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে
অজানা জনের পরম মূল্য নাই
কি গো কোনখানে?

আবার দেখুন অন্তরতর সুরটি—

দুঃখ সুখে নানা বর্ণে রাঙ্গি—
যাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ
পড়িল কবে ভাঙ্গি'—
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে।
আকার হারাল তারা,
আবাস তাদের নাহি—
রাগে অনুরাগে যারা
বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস
আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে॥

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথকে হারিয়ে শিশিরকুমার যখন ১৯৪৩ সালে এই উক্তি করছেন, তখন তার তাৎপর্য বুঝতে খুব কষ্ট হয় না।

শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের নূতন নাটক 'ঘরে-বাইরে' মঞ্চস্থ করবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীরপত্র-ও পড়েছিল। শ্রীরঙ্গমে তাঁর পিছনের ঘরে অনেকবার মহড়াও হয়েছে। "ঘরে-বাইরে" নাটকটি বোঝাবার জন্য যখন শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, তখন মনে হ'ল না যে, মহড়া বসেছে, মনে হ'ল কত বড় নাট্যপ্রতিভা পণ্ডিত, শিক্ষিত অসাধারণ প্রতিভাধরের নিকট বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেন ক্লাস-এ লেকচার শুনছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরে-বাইরে মঞ্চস্থ হয় নি। তাঁর কিছুতেই মনঃপূত হয় নি। বলতেন—"রবীন্দ্রনাথ ইহলোকে নেই। আমি তাঁর অবর্তমানে তাঁর নাটক নিয়ে ভূতের শ্রাদ্ধ করব, এর চেয়ে বড় অসম্মান, অশ্রদ্ধার কথা আর হতেই পারে না।"

এ যে কত বড় গভীর শ্রদ্ধার কথা, আর এমন যে কেউ বলতে পারেন আমার জানা নেই।

শিশিরকুমারের মুখে শুনেছি যে, নিউইয়র্কে যখন ইলিয়ট সাহেব চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং শিশিরকুমার অত্যন্ত অসহায়ের অবস্থার মধ্যে পড়েছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ এই কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার যখন কাণ্ডারী পেয়ে সেখানকার 'ভাণ্ডারভোল্ট থিয়েটারে' সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন এবং প্রাচ্যের অভিনয়-কলার সুখ্যাতি হয় পাশ্চাত্যের কাছে, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

রিপন কলেজ অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুশীলচন্দ্র মিত্র, এম, এ, ডি, লিট (প্যারিস), রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং সঙ্গীতের ওপর থিসিস লিখে ডক্টরেট উপাধি পান। সুশীলচন্দ্র অধুনালুপ্ত বিচিত্রার পরিচালক ছিলেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন—"কি অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা শিশিরবাবুর। একই নাটকে নিত্যনূতন রূপ দেওয়া এবং situation বুঝে সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ তৈরী এবং মঞ্চে উপস্থিত-বুদ্ধি দিয়ে দৃশ্যসৃষ্টি, এ শিশিরবাবুর দ্বারাই সম্ভব।"

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই হ'ক, বা জন্মশিল্পী হিসাবেই হ'ক, শিশিরকুমার ছিলেন কাব্যিক এবং ভাবপ্রবণ। কবিতা আবৃত্তির সুযোগ পেলে তিনি কখনই তা ছাড়তেন না। খালি কাব্য নয়, গোটা সাহিত্য এবং অধিকাংশ চারুকলা নিয়ে অশ্রান্তভাবে তিনি যে বাগবৈদগ্ধ্য প্রকাশ করতে পারতেন আমাদের নাট্যজগতে তার তুলনা খুঁজে পাই না। এমন কি সাহিত্য জগতেও তা দুর্লভ। "তাঁর কথা শুনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত জাগিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি,' বলেছেন অচিন্ত্যকুমা

(শেষাংশ)

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিবেকানন্দ

৩। কৃষির প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা জন্মাতে হবে এবং চাষীর ছেলেকে কৃষিবিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 'জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন? 'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'---এইভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে আরো ভাল করে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে।'

(বাণী ও রচনা. ৯ম খণ্ড, ১০৯ পৃঃ)

॥ পাঁচ ॥

শিল্প

আগেই দেখেছি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ভারতে শিল্পায়নের কথা স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন। তিনি শিল্পায়নকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন---(১) খনিজ দ্রব্যাদি, (২) ভারী শিল্প ও (৩) কুটির শিল্প।

স্বামীজী দেখেছিলেন যে, ভারত খনিজ দ্রব্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। ভারতকে তাই তিনি 'স্বর্ণপ্রসূ' বলে অভিহিত করেছিলেন। আরো বলেছিলেন---"পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা" (ঐ, ১৬৪ পৃঃ) লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, সোনা, তামা, বক্সাইট, অভ্র, সীসা, কয়লা, জিপসাম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ভারতে সুপ্রচুর। তাই এগুলি যত বেশি কাজে লাগানো যাবে, দেশের অর্থনীতি তত বেশি উন্নতির পথে যাবে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, এই খনিজ দ্রব্যাদির উত্তোলন ও নিষ্কাশন সম্পূর্ণরূপে এদেশেই হোক এবং কাঁচামাল

অমিতাভ

রপ্তানী বন্ধ হোক। এর ফলে দেশে যেমন শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার হবে, তেমনি কর্মহীনদের কর্মসংস্থানেরও প্রচুর সুযোগ হবে। তাঁর নিজের ভাষায়---"ভারতে যত জিনিষ জন্মায়; বিদেশী লোক সেই কাঁচামাল নিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ-বিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈরী করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস।" (ঐ, ১০৫ পৃঃ)।

১৮৯৩ সনে আমেরিকায় যাবার পথে জাহাজে শিল্পপতি জামসেদজী টাটার সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। টাটা তখন সামান্য ব্যবসায়ীমাত্র। সেই জাহাজে টাটাকে স্বামীজী বলেছিলেন---"জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রি করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তরী পাওমাত্র। এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।" দেশকে শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বামীজীর ছিলো তীব্র বাসনা। দেশীয় রাজাদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করার চেষ্টাও তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন। মহীশূরের রাজাকে ১৮৯৪ সনের ২৩শে জুন তারিখে শিকাগো থেকে এক চিঠিতে আমেরিকা সম্বন্ধে লেখেন---"এ এক আশ্চর্য দেশ ও এক অদ্ভুত জাতি। প্রথমত জগতের মধ্যে কলকারখানার উন্নতি বিষয়ে এ জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ। এদেশের লোক নানাপ্রকার শক্তিকে যেমন কাজে লাগায়, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে---এখানে কেবল কল আর কল। আবার দেখুন, ইহাদের

সেনগুপ্ত। তাঁর চারিপাশে গিয়ে বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন'র সভার মত হাজির হতেন শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার সত্যেন দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন দেব, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ বহু প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক। রঙ্গালয়ের অন্দরমহল প্রায়ই পরিণত হত উচ্চস্তরের সাহিত্য বৈঠকে। এমন কি তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন দৃষ্টিও আকৃষ্ট করেছিলেন।

একটি আলোচনায় শিশিরকুমার বললেন,---"রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যদি কোনটা পারফেক্ট হয়ে থাকে, তবে তা 'চতুরঙ্গ।' একজন প্রশ্ন করলেন---চতুরঙ্গকে টেকনিক্যালি পারফেক্ট বলবেন কোন হিসাবে? দামিনী যেভাবে বেড়ে যায়, তাতে উপন্যাসের স্ট্রাকচার ধসে পড়ে। শিশিরকুমার উত্তরে বললেন,---লাইফ এ অমন হয়। অপর জন বললেন---লাইফ-এ অনেক কিছুই হয়, কিন্তু নভেলের একটা স্ট্রাকচার আছে। তাতে সব কিছু হতে পারে না। তার ফর্ম আছে। আর একজন বললেন---অর্থাৎ তার 'জিওমেট্রি'। শিশিরকুমার জবাব দিলেন---'যদি তাই হয়, তবে আর্টকে ছেড়ে লাইফকে নেব। তাকেই বড় বলে মেনে নেব"

জীবনশিল্পী শিশিরকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বোঝবার জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

এই রচনা লেখবার সময় বাংলা দেশের সমসাময়িক সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা, 'কিশনের' ডাইরি থেকে রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমারের আলোচনা প্রভৃতি সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সংখ্যা সমুদয় জগতের লোকসংখ্যার বিশ ভাগের একভাগ হইবে। কিন্তু ইহারা জগতের ধনরাশির পুরা এক-ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, ইহাদের ঐশ্বর্যবিলাসের সীমা নাই।" (পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃঃ)

ভারী শিল্পের সাথে সাথে কুটির শিল্পের দিকটার প্রতিও স্বামীজী জোর দিয়েছেন। এই ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প সম্বন্ধে তাঁর মত হচ্ছে:

(১) বহু যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে কুটির শিল্পের ব্যবহার হওয়ায় এদেশে কতকগুলি শিল্প খুবই উন্নত। বলেছেন তিনি ---"একটা মান্ধাতা আমলের এক টাকা দামের তাঁত ও একটা গর্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে কুড়ি টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব" (পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ৪৪৯ পৃঃ)

(২) অল্প পুঁজিতে মানুষকে আত্মনির্ভর করানো যায়।

(৩) কুটির শিল্পে অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জাতীয় আয়ের বণ্টনগত বৈষম্য দূর করে।

(৪) ভারী শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যাদি (যেমন লোহা, দস্তা, তামা ইত্যাদি) বহির্ভারতে রপ্তানী করতে হলে বিদেশী-দের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কুটির শিল্প-জাত স্বদেশী দ্রব্যাদি বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করে বিদেশে রপ্তানী করা যায়। ক্ষুদ্র শিল্পজাত কাপড, গামছা, বেনারসী শাড়ী, এমন কি প্রয়োজন বুঝে আমসত্ত্ব, আমের মোরব্বা, বড়ি, মসলা, বিভিন্ন রকম ডাল প্রভৃতি রপ্তানী করতেও স্বামীজীর আগ্রহ ছিলো।

(৫) কুটির শিল্পে বিদেশী যন্ত্রাদির চেয়ে স্বদেশী যন্ত্র ব্যবহার করেই কাজ চালানো যায় বলে নিজ দেশের যন্ত্রাদি উৎপাদনের দিকে ঝোঁক বাড়বে তাঁর কথায়---"কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরাণো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এস গে'। কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না। দোর কি আগড় বোঝবার জো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা!! এই অবস্থা সর্ববিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের যা ছিল, তা তো সব যাচ্ছেই; অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাক্যি-যন্ত্রণা মাত্র!!" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১৪ পৃঃ)

(৬) কুটির শিল্পের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সহজেই ঘটানো যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

॥ ছয় ॥

বাণিজ্য

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বামীজী যে সব চিন্তাধারা রাখেন, তা হচ্ছে---

(১) আমদানী যথাসম্ভব কমিয়ে রপ্তানীর ওপর জোর দিতে হবে।

(২) কাঁচা মাল রপ্তানী না করে এদেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করা দরকার।

(৩) প্রথমাবস্থায় ভারী শিল্পজাত দ্রব্যের বহির্ভারতে রপ্তানী প্রতিযোগি-তায় না পেরে উঠলে, স্বদেশী দ্রব্যাদিই বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করে রপ্তানী করতে হবে। স্বামীজীর নিজের ভাষায়---"যদি অর্থ উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা--- আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেবো। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।---কাপ না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড় গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা ইউরোপে পথে পথে ফেরি-কর গে। দেখবি---ভারত-জাত জিনিষের এখনো কত কদর। আমে-রিকায় দেখলুম, হুগলী জেলার কতক-গুলি মুসলমান ঐরূপে ফেরি করে করে ধনবান হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ না---এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈরী করে বিক্রি করতে লেগে যা, দেখবি, কত টাকা আসে।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১০৪-৫ পৃঃ)

(৪) সৌন্দর্য ও ব্যবহারযোগ্যতার (আর্ট এ্যাণ্ড ইউটিলিটি) সংযোগে ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে রপ্তানী-যোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদন সম্ভব। ১৯০২ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মিসেস ওলি বুলকে এক পত্রে স্বামীজী লিখছেন --"আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলার

চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন।

ছোটখাট একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন--আগ্রা, গোয়ালিয়র অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে। ওকাকুরা এখানে ভৃত্যদের ব্যবহারের একটি সাধারণ টেরাকোটার জলের পাত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেটির আকৃতি ও খোদিত কারুকার্য দেখে তিনি একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু এটি একটি সাধারণ মৃৎপাত্র এবং পথের ধাক্কা সহ্য করার অনুপযোগী। তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করে গেছেন, পিতল দিয়ে অবিকল সেইরূপ আরেকটি তৈরী করতে। কি করি ভেবে হতবুদ্ধি ---একেক ঘণ্টা পরে আমার যুবক বন্ধুটি (বারাণসীর এক ধনী শিল্পোৎসাহী যুবক, যিনি লুপ্ত ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন) আসে। সেটা করে দিতে রাজী তো হয়েছে, আবার বলছে, ওকাকুরার পছন্দ ওই জিনিষটির চেয়ে বহুগুণ ভাল খোদিত কারুকার্যবিশিষ্ট কয়েকশো টেরাকোটার পাত্র সে দেখাতে পারে।" (বিশ্ববিবেক, ৩৭৮ পৃঃ --সম্পাদনায়: অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর)।

(৫) বিদেশী রাষ্ট্রে ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও এদেশে প্রস্তুত করতে হবে এবং পরে তা রপ্তানী করা দরকার। এতে শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থানেরও সুবিধা হবে।

(৬) রপ্তানী বাড়াবার জন্য বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সংস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

(৭) সরকার থেকে রপ্তানী করার সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হবে।

(৮) দেশীয় লোকদের সর্বপ্রকার চাহিদা মেটাবার জন্য দেশের মধ্যেই পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে, যাতে বিদেশী জিনিষ এসে এদেশের লোকদের মন জয় করতে না পারে। বলছেন স্বামীজী--"ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে আগ্রহান্বিত করতে হবে" (পত্রাবলী, ২য় খণ্ড ২৮৮ পৃঃ)। বিদেশী দ্রব্যাদির প্রতি মোহ দূর করার জন্য, প্রয়োজন হলে, আমদানীকৃত বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্কের বোঝা চাপাতে হবে বলে স্বামীজী ইঙ্গিত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলি বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক চাপিয়ে জনগণকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে ---"বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহা মাগগি, সে দামে পাঁচগুণো সেই জিনিষ কলকাতায় মেলে, অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আসতে দেবে না। মহা কর বসিয়ে দেয়---কাজেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়" (পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)।

॥ সাত ॥

গবেষণা

অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য স্বামীজী গবেষণা সংস্থার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই গবেষণা সংস্থাগুলি তিন ধরনের হওয়া উচিত।

(১) দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করে ছাত্রেরা বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে কৃষি ও শিল্প ব্যাপারে নানারকম শিক্ষা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে তাঁর কতগুলি উক্তি স্মরণ করা যাক।

"আমার যদি টাকা থাকত, তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী পর্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আসে না।" (পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ৩৫ পৃঃ)

"ভদ্রলোকটি বোম্বে হতে একখানি চিঠি নিয়ে এখানে আমার কাছে এসেছেন। তিনি একজন প্র্যাক্‌টিক্যাল মেকানিক্ এবং তাঁর একমাত্র ইচ্ছা এই যে, তিনি এদেশের ছুরি, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহ-নির্মিত দ্রব্যসকলের কারখানা দেখে বেড়ান। আমার স্বদেশবাসীদের ভেতর এরূপ বেপরোয়া সাহসের ভাব দেখলে উহাতে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি।" (পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃঃ)

"নরই হউক আর নারীই হউক --তাহারা দেখুক অপরে একণে কি করিতেছে। তারপর তাহারা কি করিবে স্থির করুক।" (পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃঃ)

"কতকগুলি---গ্র্যাজুয়েট পাই তো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা সেখানে টেক্‌নিক্যাল্ এডুকেশন্ পেয়ে আসে। যদি এরূপ চেষ্টা করা যায়, তাহলে বেশ হয়। আমি বলি এদেশের সমস্ত বড় লোক আর শিক্ষিত লোক যদি একবার করে জাপান বেড়িয়ে আসে তো লোকগুলোর চোখ ফোটে।--- সেখানে এখানকার মতো বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয় নি। তোদের দেশে সাহেব হওয়া যে একটা বিষম রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ)

গবেষণার সাহায্যে নানান মৌলিক চিন্তাধারা গড়ে তুলতে হবে এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কিভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দ্রুত অগ্রসর করিয়ে দেওয়া যায়, তাই ভাবতে হবে ---"মৌলিকতা একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জার্মাণ শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীদের বহু শতাব্দীপ্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে? কেবল শিক্ষা, শিক্ষা আর শিক্ষা। (পত্রাবলী, ১৯৪ পৃঃ)

(২) ভারতের সর্বত্র বহু গবেষণা সংস্থা থাকা দরকার, যেখানে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ও জনসংখ্যা নিয়ে ব্যাপক সন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চলবে। এরা স্থানীয় কৃষক ও শিল্পকারদের নিয়মিত তথ্যাদি সরবরাহ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

"চাই প্রথমত: এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। ক্রমশ ঐসকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান

যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।" (পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৬ পৃ:)

(৩) বিদেশেও বিভিন্ন স্থানে বহু গবেষণা সংস্থা স্থাপন করতে হবে, যারা বিশ্বের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে নিয়মিত গবেষণা চালিয়ে স্বদেশে খবর পাঠাবে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

"(এদেশের) কর্মশালার মাল বিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে।" (ঐ, ১৯৬-৭পৃ:)

"ভারতীয় শিল্পদ্রব্যাদি যাহাতে বহির্ভারতে বিক্রয় হয় তার জন্য বাজার সৃষ্টি করতে হবে।" (ঐ, ২৮৮ পৃ:)

॥ আট ॥

অর্থনীতির পথ

পৃথিবীর দেশগুলির দিকে তাকালে মোটামুটি দুই ধরনের অর্থনৈতিক প্রয়াস চোখে পড়ে। প্রথম দলের মতে, নিরঙ্কুশ বাধা-নিষেধহীন ব্যক্তিগত উদ্যোগই দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলবে। দ্বিতীয় দলের মতে, ব্যক্তিগত মালিকানা সমূলে উচ্ছেদ করে একমাত্র রাষ্ট্রের উদ্যোগেই অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে।

প্রথম মতটি উনবিংশ শতাব্দীতে 'ল্যাসা-ফেয়ার' নামে অভিহিত ছিলো। এই মতের বক্তব্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতাই অযোগ্যদের দূর করে দিয়ে যোগ্য লোকেদের হাতে অর্থনীতির হাল তুলে দেবে। স্বামীজী এই মতকে কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, এধরনের মত কেবল মুষ্টিমেয় লোকের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যই (বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তা : অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা---উদ্বোধন, ৩৫৬ পৃ:, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা)। এদের মনোভাব হচ্ছে, স্বামীজীর ভাষায়---এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানা---সকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?--আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩৯ পৃ:)

"একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈরী করতে লাগলো--হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেইসব বিনিময় করতে লাগলো আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ জায়গার জিনিষটা ও জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিষের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে।" (ঐ, ২০৩-৪ পৃ:)

দ্বিতীয় মতটিকেও (অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বসানো) স্বামীজী সমালোচনা করে বলছেন যে, এতে মানুষের সৃজনী শক্তি ও উৎসাহ নষ্ট হয়ে কর্মী একটি মেশিনে পরিণত হয়। সমাজের বা রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির দাসত্বের পরিণামে উৎসাহ---উদ্যম, মননশীলতা, তীব্র অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়; এইসব হতভাগ্য লোক কখনো বুঝতেও পারে না--স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় দ্যুতি কি বস্তু।

'ল্যাসা - ফেয়ার' প্রণালীতে যেমন একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা সমস্ত অর্থ কুক্ষিগত করে, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তেমনি ব্যক্তির ক্রয় - বিক্রয় - সঞ্চয় সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র--'রক্ত-করবী'র রাজা।

তাই স্বামীজী একটি মধ্যপন্থা অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতির পথ গ্রহণ করতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের একটি সুস্থ সামঞ্জস্য। ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে আগ্রহান্বিত করতে হবে এবং ভারতীয় শিল্প দ্রব্যাদি যাহাতে বহির্ভারতে বিক্রয় হয়, তার জন্য বাজার সৃষ্টি করতে হবে। যারা নিজেরা দালাল নয়, পরন্তু এই শাখার সমস্ত লভ্যাংশ শিল্পীদের উপকারের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত, কেবল তাদেরই দ্বারা একাজ করানো উচিত।" (পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ২৮৮ পৃ:)। এই যারা নিজেরা দালাল নয়' স্পষ্টতই রাষ্ট্রের সরকার। আবার--"টেক্‌নিক্যাল্ এডুকেশন পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে; চাকরী চাকরী করে আর চেঁচাবে না" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৪০২ পৃ:) অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগেরও প্রয়োজন।

স্বামীজী সমর্থিত মিশ্র অর্থনীতির গ্রহণ নিম্নোক্ত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

(১) একচেটিয়া ব্যক্তিগত উদ্যমে জনগণের দাসত্ব ব্যবসায়ীদের কাছে এবং কেবল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দাসত্ব রাষ্ট্রের কাছে।

(২) নিজের লাভের আশা থাকলে মানুষ প্রচুর খাটে, কিন্তু বৃহৎ শিল্প চালানোর পুঁজি বা ক্ষমতাতে রাষ্ট্রই সমর্থ।

(৩) ভারী শিল্পাদি রাষ্ট্রের পরিচালনায় গড়ে উঠলে সমগ্র দেশে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এর প্রসারণ হবে এবং কুটির শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যমে হলে প্রাদেশিক শিল্পের উন্নতি ও বহুল প্রয়োগে সুবিধা।

(৪) বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল রাষ্ট্র থেকে সস্তায় পাওয়া গেলে অতি অল্প পুঁজিতেই কুটির শিল্প ক্রমবর্ধমান রূপ নেবে।

(৫) শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী পরি-কল্পনা কেবল রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

(৬) উৎপন্ন পণ্যের সমগ্র দেশে সমবণ্টনের ভার নিতে একমাত্র রাষ্ট্রই পারে।

(৭) বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য কেবল রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব; মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রেই শুধু ব্যক্তিগত শিল্প পরিচালনা এতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

কুটিরশিল্পের গুরুত্ব আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। এতে দেখা যায় যে, কৃষি - শিল্প - বাণিজ্যের কতকগুলি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরই সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার ব্যক্তিগত মালিকানায় গড়ে ওঠা কুটির শিল্পও দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কুটিরশিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে, অর্থের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জাতীয় আয়ের

বণ্টনগত বৈষম্য দূর করে এবং দেশের মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আত্মনির্ভর হতে উৎসাহিত করে।

উৎপাদন চালিয়ে যেতে হবে চাহিদা ও যোগানের দিকে লক্ষ্য রেখে --এই হচ্ছে স্বামীজীর মত। আত্মতুষ্টির ভাব নিয়ে যা উৎপাদন হচ্ছে, তাকেই চূড়ান্ত ধরে নিয়ে কণ্ট্রোলের সাহায্যে মানুষের চাহিদা সঙ্কোচ করে কন্‌ট্রোলড্ মেকানিজম্ নয়, বরং ঠিক এর উল্টো অর্থাৎ লোকের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে মার্কেট মেকানিজম্ প্রবর্তনের কথাই বলেছেন স্বামীজী। দেশ-বিদেশের লোকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের দিকেও জোর দিয়েছেন স্বামীজী। দেশের মানবিক ও প্রাকৃতিক--উভয় সম্পদই যেন পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়, এই ছিলো তাঁর লক্ষ্য।

শ্রমিকেরা তাদের মূল প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে হয়ে একদিন জেগে উঠে বিদ্রোহ করবে--একথা স্বামীজী স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য রেখেছেন যে, এর ফলে শ্রমিকদের অতিরিক্ত মজুরী দিতে গিয়ে ক্রেতাদের উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় মজুরী ও তাদের উন্নততর জীবনযাত্রার কথা ঘোষণা করার সাথে সাথে স্বামীজী এও বলছেন যে, এর চাপ যদি ক্রেতাদের বহন করতে হয় সম্পূর্ণরূপে, তবে ধীরে ধীরে পণ্য বিক্রয় কমে এসে শিল্পের অগ্রগমনে বাধা দেবে।

"একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগা ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো॥" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৪ পৃঃ)। তাই রাষ্ট্রের উচিত, শ্রমিক-কল্যাণের সাথে সাথে সাধারণ ক্রেতাদের প্রতিও যেন সুবিচার করা হয়। অনেকটা একই ধরনের কথা বলেছেন বহুযুগ পরে শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ তাঁর 'যুগবাণী' পত্রিকায় (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭১ : সোসাল মার্কেট অর্থনীতি)--- "মালিক কর্তৃক শ্রমিক-শোষণ স্থলে মালিক-শ্রমিক যৌথ-লুণ্ঠন প্রবর্তিত হইয়াছে। এরা দুইজনে মিলিত হইয়া জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে এবং সেই শোষণলব্ধ অর্থ মালিক অতিলাভ এবং শ্রমিক বোনাসরূপে ভোগ করিতেছে। শ্রমিক-কল্যাণের শ্লোগানে মুগ্ধ সেই জনসাধারণ ঐ যৌথ লুণ্ঠনের হাড়িকাঠে সানন্দে মাথা পাতিয়া দিতেছে।"

এইভাবে স্বামীজী বিক্রেতার বা সেলার্স মার্কেটের বদলে ক্রেতা বা বায়ার্স মার্কেটের প্রবর্তন চেয়েছিলেন। এ প্রথার সুষ্ঠু প্রচলন বর্তমানে জাপানে দেখা যায়।

অর্থনীতির ব্যাপারে আরেকটি বৈপ্লবিক মতের সন্ধান দিয়েছেন স্বামীজী। তিনি বলছেন--"এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরো গরীব এবং ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে।" ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, "আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হতে নারাজ। রূপার দরে সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবন-সংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে।" (পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ১৬৪-৫ পৃঃ)। বর্তমানে প্রচলিত স্বর্ণ মানদণ্ডের বিরুদ্ধেই স্বামীজীর বিদ্রোহ। আগে আমেরিকায় সোনা ও রূপা উভয় ধাতুর মুদ্রা (বাইমেটালিক্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড) প্রচলিত ছিলো। ১৮৭৩ সনে কংগ্রেস রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন বাতিল করলে দেশে মুদ্রাস্বল্পতা দেখা দেয়। তখন দেশের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী দুঃখ-দুর্দশার চাপে অবাধ রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন দাবী করে। এ বিষয়ে তাদের প্রতি স্বামীজীর সমর্থন দেখা যায়।

উপসংহার

আগেই দেখেছি। মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিই হবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য--এই ছিলো স্বামীজীর মত। এইদিকে লক্ষ্য না রেখে কেবল আয় বৃদ্ধি মানুষের মূল সত্তাকে ধ্বংস করে। তাই নিছক শিল্পায়ন ও কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানুষের মুক্তির পথ--এ কথা স্বামীজী কখনোই মনে করতেন না। আধ্যাত্মিক আদর্শভ্রষ্ট ক্ষমতা ও শুধুমাত্র জাগতিক জ্ঞানের প্রসার মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সম্পদ বৃদ্ধিকে মূল্যহীন করে তুলেছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তাই তিনি উদাহরণ সহ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন--"নানা কল-কারখানা করিয়া ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যে জাতি বিশেষ সভ্য হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে।" তাই স্বামীজী সাবধান করে দিয়েছিলেন, মানুষ যেন অর্থের দাস না হয়ে পড়ে। আর এ জন্যই তিনি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে সাথে মানবাত্মার শাশ্বত-বাণীতে সকল মলিনতা দূর করার প্রয়াসী ছিলেন।

গুরুভ্রাতার দৃষ্টিতে স্বামীজী

"নরেন নর-ঋষির অবতার। মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের একসঙ্গে রয়েছে।"

—স্বামী যোগানন্দ

ফুলের ভাষা

দেবব্রত ঘোষ

ইউরোপ ও আমেরিকায় "ফুলের ভাষায় কথা বলা" (say it with flowers) পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মৌনমুখর মাধ্যম বা সামাজিক প্রথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্কুল-কলেজের প্রণয়মুগ্ধ তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পূর্বরাগ, অনুরাগ, কোর্টশিপ ডেটিং চলার প্রাক্কালে ফুলের ভাষায় কথা বলার ব্যাপক প্রবণতা ওদেশে হামেশাই দেখা যায়। লাজুক ও ভীরু প্রেমিক-প্রেমিকা কোন কথা না বলে, এমন কি চিঠিপত্র মারফৎ অনুরাগ না জানিয়ে শুধুমাত্র ফুলের মাধ্যমেই নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারেন। আবার ভালোবাসার খেলায় ক্লান্ত হয়ে উঠলে ফুলের মাধ্যমেই এই প্রণয়-লীলার অবসান ঘটাতে পারেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুষ্প ভাষাবিদ্ ও ফ্লোরিস্ট ট্রান্সওয়ার্ল্ড ডেলিভারী এসোসিয়েশনের ভাইস---প্রেসিডেন্ট মিঃ জন গোদেৎ বলেছেন---এক গোছা ফুল হাজার কথার চেয়েও বেশী কথা বলে। এই কারণেই বোধহয়, ইউ-রোপ ও আমেরিকায় কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ফুল উপহার দেবার সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। কারণ ফুল নির্বাচনে সামান্যতম ত্রুটি হলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা--এমন কি চিরতরে বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন ধরুন, পাশ্চাত্য দেশে বন্ধুর উপস্থিতিতে বন্ধুপত্নীকে লাল-গোলাপ উপহার দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। যেহেতু লালগোলাপ প্রেম ও কামনার বার্তাবহ ও প্রতীক। সুতরাং---

প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, পারস্য দেশেই সর্বপ্রথম ফুলের ভাষায় কথা বলার প্রচলন শুরু হয়। ১৭০৯ খৃঃ সুইডেনের রাজা পোলটোভার যুদ্ধে রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট-এর নিকট পরাজিত হয়ে তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই সময় তিনি ফুলের ভাষায় কথা বলার কলা-কৌশলের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। তারপর সুইডেনে ফিরে এসে তিনি এই অভিনব উপায়ে মনোভাব প্রকাশের পদ্ধতি পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত করে তোলেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ আমেরিকার প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেম নিবেদন ও অনুরাগ প্রকাশের জন্য কবিতা ও ফুল উপহারস্বরূপ পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতেন। অবশ্য ফুলের মাধ্যমে শুধুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ করা ছাড়া মান-অভিমান, আশা-হতাশা, সুখ-দুঃখ, ক্ষোভ-উল্লাস, কামনা-উচ্ছ্বাস, কৃতজ্ঞতা-প্রশস্তি, বিরক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মনোভাব ব্যক্ত করা যায়। কারণ প্রতিটি ফুলেরই একটি বিশেষ অর্থ ও ভাষা আছে।

ড্যাফোডিল্‌স্ অচরিতার্থ প্রেমের প্রতীক। চন্দ্রমল্লিকা প্রফুল্লতার এবং সাদা গোলাপকুঁড়ি কুমারীত্বের প্রতীক। আপনি যদি প্রেমের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চান তো আপনার মানসীকে হলদে গোলাপফুল পাঠালেই হল। কিন্তু পীচফুল পাঠালে তিনি জানবেন আপনি তার প্রেমের জালে বন্দী। পিওনি প্রণয়মুগ্ধ প্রেমিকের লক্ষণ। হায়াসিন্থ-এর অর্থ ক্ষমাপ্রার্থনা। প্রত্যুত্তরে তরুণীটি ওয়াইল্ড ডেইজী পাঠালে বুঝতে হবে তিনি এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছেন।

"জাইক্‌ফেল্ড্ ফোলিজ" খ্যাত ফ্লোরেন্‌ৎস্ জাইক্‌ফেল্ট্ বিখ্যাত অপেরা গায়িকা মিস বিলি বার্ক'কে একদা এক ট্রাকভর্তি অর্কিড ফুল উপহার পাঠিয়ে তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন। অর্কিড ফুলের অর্থ কবির ভাষায়---

"আমি পার্থ, দেবি---
তব দ্বারে প্রেমার্ত অতিথি।"

মিস বার্ক সঙ্গে সঙ্গে একটি মাত্র জেরানিয়াম ফুল পাঠিয়ে তার উত্তর দিয়েছিলেন---তুমি একেবারেই ছেলে মানুষ। কিছুদিন পূর্বে টিউলিপ ফুলের দেশ হল্যাণ্ড-এর কোন এক সহরের জনৈক কল্পনাবিলাসী ও ভাবপ্রবণ নাবিক তার নবলব্ধ বান্ধবীকে এক বিচিত্র পদ্ধতিতে প্রেম নিবেদন করেছিল। ফুলের ভাষায় কথা বলার ইতিহাসে এ ধরনের মুন্সীয়ানা ও মৌলিকত্ব কদাচিৎ দেখা যায়। নাবিকটি এক সপ্তাহ ধরে অর্থাৎ সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে তার বান্ধবীকে একটি করে ফুল পাঠাতো। এইভাবে সে যে ফুলগুলি পাঠিয়েছিল। তার নাম ও অর্থ এখানে উল্লেখ করা হল---

সোমবার। টিউলিপ---তোমাকে আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম নিবেদন করলাম।

মঙ্গলবার। সান ফ্লাওয়ার---কারণ আমার চোখে তুমি অনন্যা।

বুধবার। ডগরোজ---তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ।

বৃহস্পতিবার। হোলি---কিন্তু আমি ভীরু, তাই অনুরাগ প্রকাশের মত পর্যাপ্ত সাহস আমার নেই।

শুক্রবার। জনকুইল---সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্না হও।

শনিবার। পার্মা ভায়োলেট্---আমি আর কিছুই চাই না---শুধু তোমাকে ভালবাসতে চাই।

রবিবার। অর্কিড---আশা করি, আমার প্রেমে সাড়া দেবে।

অবশ্য এ ব্যাপারে তরুণীটিও পিছিয়ে পড়ার পাত্রী নন। তিনিও সেই নাবিক বন্ধুটিকে প্রতিদিন ফুলের

মাধ্যমে তার যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে-ছিলেন—

সোমবার। গাঁদা ফুল—তোমার অভিপ্রায় কী?

মঙ্গলবার। জেরানিয়াম— তুমি কী একেবারেই ছেলেমানুষ?

বুধবার। পিটুনিয়া— দোহাই তোমার—খুব হয়েছে।

বৃহস্পতিবার। বিগোনিয়া — সাবধান। আমিও বড্ড কল্পনা-বিলাসী।

শুক্রবার। গোলাপকুঁড়ি— তোমার প্রেমের অকপট অজ্ঞতা কী যে মধুর।

শনিবার। স্নো ড্রপ—কিন্তু সেই শুভদিনের জন্য আমাদের আরো কিছু-দিন ধৈর্য ধরতে হবে।

রবিবার। ওয়াইল্ড রু—কারণ এত তাড়াতাড়ি আমি আমার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চাই না।

পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে এখানে কয়েকটি সুপরিচিত ফুলের নাম, অর্থ ও ভাষা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হল।

রক্তগোলাপ: কামনা ও অনুরাগ: আমি তোমাকে ভালবাসি।

কমলা ফুল: শাশ্বত প্রেম ও পরিণয়: "তুমি যে আমারই ওগো।"

লাল কারনেশন: প্রশস্তি: তুমি কী সুন্দর।

হলদে কারনেশন: ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান: আমি পুনরায় তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

ভায়োলেট্: নম্রতা ও অকপট সারল্য: আমিও তোমাকে ভালবাসি।

গাঁদা ফুল: প্রেমে হতাশা বা সংশয়: তোমার অভিপ্রায় কী?

হনিসাকল্: প্রেমের নিগড়:

'আমরা দু'জনা ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।'

স্ন্যাপ্ ড্রাগন: প্রভুত্ব: একচেটিয়া অধিকার: তোমার হাবভাব দেখে মনে হয় যেন আমি তোমার কেনা গোলাম বা বাঁদী।

অ্যাস্টর: মার্জিত রুচি ও পরিচ্ছন্নতা: আপনার পরিশীলিত ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ডেইজী: অকপট প্রেম ও পবিত্র চিন্তা:

'তুমি যে তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।'

গন্ধরাজ: ভীরুপ্রেম:

"হয়ত কাছে নাহি পাবো
তবু, তোমায় আমি দূর থেকে
ভালবেসে যাবো।"

জবা: সৌন্দর্য ও কমনীয়তা: তুমি কী সুন্দর।

ডালিয়া: প্রেমে প্রবঞ্চনা: অসম্ভব —আমি কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

লিলি অব দি ভ্যালি: বশ্যতা, নতি স্বীকার: ক্ষমা কোরো লক্ষ্মীটি।

ম্যাগনোলিয়া: আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব: সত্যই কী তুমি আমাকে ভালবাস?

রেড কলম্বাইন্: গভীর উৎকণ্ঠা, তোমার মতামত জানার জন্য অধীর হয়ে আছি।

ক্যারাণ্ট: সম্মতি: তথাস্তু।

অ্যাঁজেলিয়া: আত্মসংযম, প্রশান্তি: তোমার লাজরক্তিম হাসি আমার হৃদয় হরণ করেছে।

সিডার: আমায় স্মরণে কভু আনিও।

ডগ উড:

'তোমারে ভালবেসে তোমারি লাগিয়া
সয়েছি কত ব্যথা বেদনা অপমান।'

রজনীগন্ধা: মাদকতাময়ী সুন্দরী।

চীনা গোলাপ:

'তোমায় নতুন করে পাবো বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণে।'

জাপানী গোলাপ: সৌন্দর্যই তোমার একমাত্র আকর্ষণ।

সুইট উইলিয়াম:

"গুণ্ঠনখানি খোল একবার যাচি
দেখিয়া ও রূপ চিত্ত সাগর
পুলকে উঠুক নাচি।"

আধফোটা গোলাপ: "আমার এ প্রেম ধূপের সুরভি সম জ্বলিতেই জানে—"

মুন ফ্লাওয়ার: প্রেমের বাউল।

সাইপ্রেস্: হতাশা, শোক।

স্প্যানিশ জেস্‌মিন: আসঙ্গ লিপ্সা, রিরংসা।

দোপাটি: অস্থিরতা।

ক্যাক্টাস: জাঁকজমক, উষ্ণতা।

ক্যান্টারবেরী বেলস্: কৃতজ্ঞতা।

ফরগেট-মি-নট্: নিখাদ প্রেম।

হ থোর্ন: আশা।

হ্যাজেল: মিলন।

লাইলাক্: প্রথম প্রেম।

পদ্ম: প্রেমবঞ্চিতা, খণ্ডিতা।

মিণ্ট: আপোষ-মীমাংসা।

লাল পপি: সান্ত্বনা।

জলপাই: শান্তি।

করবী: সাবধান।

মর্নিং গ্লোরি: বাৎসল্য।

ল্যাভেণ্ডার: অবিশ্বাস, স্বীকৃতি।

ন্যাস্টারশ্যাম্: দেশপ্রেম।

হলি হক্: উচ্চাশা।

নার্সিশাস্: অহং, আত্মপ্রেম।

যুঁই: আকর্ষণ, অনুরাগ।

লেবু: অভিরুচি।

অ্যানিমোন্: বিলীয়মান আশা।

অ্যাস্পেন্: ভাবাবেগ, আকুলতা।

ডাণ্ডেলিয়ন: প্রগলভতা।

হেলিওট্রোপ: আনন্দে উদ্বেল হওয়া।

প্যাশন্ ফ্লাওয়ার: কামনাহীন পবিত্র প্রেম।

গোলাপপাতা: আশা।

টিক: চিরন্তন সৌন্দর্য।

পিটুনিয়া: শান্তির প্রলেপ।

ফ্লক্স: মতৈক্য।

লবঙ্গ: মহিমা।

অ্যামারান্থ: অমরত্ব।

জিনিয়া:

"মন বলে তুমি রয়েছো যে কাছে
আঁখি বলে কত দূরে।"

ডেইজী মাইকেলমাস্: হে বন্ধু বিদায়।

রূপ রস বর্ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সৌদামিনী গান গাইছে গুন্‌গুন্ ক'রে। গানের বিষয়বস্তু শিব-পার্বতীর প্রথম সাক্ষাৎ। দেবাদিদেব মহেশ্বরকে পতিরূপে লাভ-কামনায় কঠোর ও দীর্ঘ তপস্যান্তে পার্বতী মুদিত নয়নে আঁখিজলের সঙ্গে শেষ অর্ঘ্য প্রদান করলেন, নয়ন মেলে দেখেন তাঁর প্রাণারাধ্য শিব মহেশ্বর স্বয়ং আবির্ভূত, প্রসন্ন বদনে হস্ত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন অভীষ্ট বরদানের অপেক্ষায়। রজত-গিরি সম দেহকান্তি, অঙ্গে চিতা-ভস্ম, পরিধানে ব্যাঘ্রাম্বর, ললাটে চন্দ্রমৌলী, শিরে জটাজাল, এক হস্তে ডমরু, অন্য হস্তে ভিক্ষাপাত্র চির-যৌবনের লাবণ্যে ভাস্বর।

দৃশ্যটি কল্পনা করে সৌদামিনির দু'চোখ ভরে আসে জলে। সাজিটিও প্রায় ভরে এসেছে, সে ফিরে দাঁড়ালো বাড়ি যাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু একী! তার সামনেও এক শ্বেতমূর্তি, সুস্মিত বদন, সুঠাম নবীন যুবক। বিদেশী পোষাক, হাতে একটি তালপাতার পুঁথি।

এই নির্জন বনপ্রান্তে সহসা এই বিদেশী বিধর্মী অপরিচিতের আবির্ভাবে সৌদামিনীর ভয় হলো।

'টোমার গলা খুব মিট্টি।' কণ্ঠস্বরে কোমলতার আভাস, সরলতার সুর, ভয় কেটে গেল, খিল খিল করে হেসে ওঠে সৌদামিনী সকৌতুকে।

'টোমার নয়, তোমার, মিট্টি নয় মিষ্টি।'

দিব্যদর্শী

সাহেবটি তিন-চারবার চেষ্টা করে, তারপর উচ্চারণ ঠিক হয়, রুমালটি বার ক'রে সৌদামিনীর হাতে দিতে যায় চোখ মুছতে।

'ছুঁসনি ছুঁসনি মুখপোড়া মেলেচ্ছ।' পিছিয়ে যায় সৌদামিনী, তারপরে ছুটে চলে যায় বাড়ির দিকে।

বনের পথে ছুটে পালানো যায়, কিন্তু নিজের মনের কাছ থেকে ছুটে পালানো যায় না। আরো রাত্রি থাকতে ওঠে সৌদামিনী, বাসি বাসন মেজে, উনুন নিকিয়ে আরো সকাল সকাল আসে ফুল তুলতে। যত আগেই পৌঁছাক না কেন, দেখে এণ্টনী সাহেব আগে এসেই অপেক্ষা করছে। সৌদামিনী গুন গুন করে গান গায়, গানের মানে বুঝিয়ে দেয়, সাহেবের বাঙলা উচ্চারণ শুধরে দেয়, কিন্তু যদি দৈবাৎ গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় গালমন্দ দেয়। 'জানো সাহেব, আমি বিধবা, পুরুষের ছোঁয়া লাগতে নেই।'

এণ্টনী তাকিয়ে থাকে সেই বেদনা-ভরা মুখের দিকে, আর কী যেন ভেবে গম্ভীর হয়ে যায়।

একে একে সব কথা জানতে পারে এণ্টনী। স্বামীকে বিয়ের রাতে একবার মাত্র দেখেছিল সৌদামিনী, বাসর-রাতে সাত বছরের বালিকা ঘুমিয়েই ছিল, একটি কথাও হয় নি, পরেও আর দেখা হয় নি, স্বামীকে মনেই করতে পারে না। তারপরে বারো বছর কেটে গেছে। বাবা ছিলেন পণ্ডিত, বালবিধবা কন্যাকে তিনি ভুলিয়ে রাখলেন সংস্কৃত চর্চার মধ্যে—উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য কোনটাই বাদ রইলো না ; কিন্তু হঠাৎ বাদ সাধলেন বিধাতা, পনের বছর বয়েসে অভাগিনী তাকেও হারালো। ভ্রাতৃবধূর হাতে নির্যাতনের কাহিনীও শুনলো এণ্টনী, শুনে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। পাড়াপড়শীরাও নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করে, 'ওরে হতভাগী শিবপূজা করে শিবের মতই তো স্বামী পেয়েছিলি, তবে সেটাকেও তো খেয়ে বসে আছিস, এখন ও চংটা রেখে দে।' এই হৃদয়-হীনতার নগ্ন ইঙ্গিত এণ্টনীকে যেন উন্মত্ত করে তোলে, এমন রূপ, এমন গুণ, এমন বিদ্যার কদর কেউ বোঝে না এদেশে।

একদিন সৌদামিনী একটা কাণ্ড করে বসলো। এণ্টনী জিজ্ঞেস করেছিল, 'দামিনী, এদেশের বিধবারা আবার বিয়ে করতে পারে না?'

'না সাহেব, হিন্দু বিধবারা পারে না।'

'যাকে মাত্র দুয়েকবার দেখেছে, তার জন্যে সারা জীবন শোক করে কাটাতে হয়?'

'হাঁ, সাহেব।'

'যদি কেউ তাকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়? যদি সর্বস্ব দিয়ে সুখী করতে চায়?'

'তাহলেও না।'

'ব্যভিচারিণী হবার পথ খোলা আছে, অথচ ধর্মসাক্ষী করে আবার বিয়ে করার পথ বন্ধ! এ শাস্ত্র আমি মানি না।'

'তুমি পর্তুগীজ, বিধর্মী, আমাদের শাস্ত্র মানো না, এটাই তো স্বাভাবিক।'

'মানুষের ধর্ম এক, পৃথক পৃথক করেছে মানুষেরা, তোমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা, আমাদের দেশের পাদ্রীরা। যা মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেটা ধর্ম নয়, আইনের নামে বে-আইনী, ভগবানের চোখে সেটা ধর্ম নয়, অধর্ম। বল দামিনী, আমার কথার জবাব দাও?'

সৌদামিনী নিঃশব্দে কাঁদে।

'দামিনী, আমাদের শাস্ত্রে বলে ভালবাসাই ভগবান, ভগবানই ভালবাসা। ভালবাসাকে যদি তোমাদের সমাজ অপমান করে, তাহলে ভগবানকেই অপমান করা হয়। যারা বঞ্চিত করে, তারাই শেষে বঞ্চিত হয়, দেখছো তো দলে দলে হিন্দুরা মুসলমান অথবা খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে।'

সৌদামিনী কথা বলে না, কথাগুলি তার কানে যাচ্ছে কি না বোঝা যায় না। শুধু কাঁদে।

'দামিনী, সমাজের বিধান কারু কারুর পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। বিধাতার বিধানের চাইতেও সমাজের বিধানকে বড় করে দেখবার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই, ভালবাসাই ভগবান, ভগবানই ভালবাসা, এটা মহামানবের বাণী। আমি তোমাকে—'

হু-হু করে ফুঁপিয়ে ওঠে সৌদামিনী। কথাটা শেষ করতে দেয় না, সাজিশুদ্ধ ফুল এণ্টনীর পায়ে ঢেলে দিয়ে ছুটে পালায়।

পাড়ার ক্ষ্যান্তপিসি একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁরে সদু, তুই আজকাল শিবপুজা করিস না শুনতে পাই?'

'শেষ হয়েছে বলেই বন্ধ করেছি, আর দরকার নেই। মাটি দিয়ে শিব গড়ে পুজো করতাম, মাটির শিব কথা বলে না।'

'তবে কি তুই জ্যান্ত শিব দেখতে চাস? দেবতারা তো দেখা দেন না, কথা বলেন না।'

ক্ষ্যান্তপিসি সৌদামিনীর চিবুকে হাত ঠেকিয়ে বলেন, 'আহা এমন সোনার চাঁদ মেয়ে তুই, মাটির শিবের যদি চোখ থাকতো, তবে তোর সব দুঃখু শেষ হয়ে যেতো।'

তর্কালঙ্কার ঠাকুরের মৃত্যুর পর তার দুঃখিনী কন্যা যা একটু স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে এসেছে তা এই ক্ষ্যান্তপিসির কাছে। ক্ষ্যান্তমণি তার দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী, কিন্তু তাঁর নিজের সহোদরা অন্নদাকালী ভাইঝিকে দু'চোখে দেখতে পারেন না, বলেন ওটা সোয়ামীখাকী বাপখাকী মিটমিটে ডাইনী।

এণ্টনী রোজ আসে, রোজ ফিরে যায়, সৌদামিনী ফুল তুলতে আসে না। যে-ফুলগুলি সে ঢেলে দিয়েছিল সেদিন এণ্টনীর পায়ে, তারই একটা সে রুমালে বেঁধে নিয়ে আসে। দেখা হলো একদিন পুকুরপাড়ে। তখনো দিনের আলো ফুটে ওঠে নি, সৌদামিনী শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাসন মাজছে।

'দামিনী?'

চমকে উঠে ফিরে তাকায় সৌদামিনী। ঘিরেটি গ্রামটি তখনো ঘুমচ্ছে, চন্দননগরের কেল্লা থেকে ঘণ্টার শব্দ এল, পাঁচটা বেজেছে।

'মিনি?'

'কী টনি? এখানে এ সময়ে?' গলা কেঁপে যায় সৌদামিনীর, শীতেও ঘেমে ওঠে।

'সারা রাত ঘুমোতে পারি না আজ ক'দিন ধরে।'

'দেশে ফিরে যাও।' কে যেন মুখ চেপে ধরে সৌদামিনীর।

'দেশে, এটাই তো আমার দেশ, মিনি? তুমি যেখানে সেটাই আমার দেশ, বিশ্বাস কর।'

হাত বাড়িয়ে এণ্টনী সৌদামিনীর ছাইমাখা হাত ধরে। আজ আর ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বলতে পারে না সৌদামিনী, বলিষ্ঠ হাতের ভেতর তার কোমল হস্তপল্লবটি কাঁপতে থাকে। সে স্পর্শ বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ে তার সারা দেহে, সে স্পর্শ তার অন্তরের মর্মস্থলে জাগায় শিহরণ, যেন হরণ করে নেয় চেতনা।

'মিনি?'

সৌদামিনীর ওষ্ঠযুগল কেঁপে ওঠে, কথা ফোটে না।

'মিনি, তুমি বিবাহিতা হলেও প্রকৃতপক্ষে কুমারী, এরকম ক্ষেত্রে তোমাদের শাস্ত্রে পুনর্বিবাহের বিধান আছে, আমি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমি তোমাকে শাস্ত্রসম্মত প্রথায় সাদরে পত্নীত্বে বরণ করতে চাই, 'না' বললে এখনি ঐ জলে ঝাঁপ দিয়ে তোমার সামনে ডুবে মরবো।'

সৌদামিনী ঘাড় নাড়ে।

'ঠিক বুঝলাম না, মিনি। বিয়ের প্রস্তাবে 'না' বলছো, না জলে ঝাঁপ দিতে 'না' করছো।'

সৌদামিনী এণ্টনীর পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না বাঙালীর ঘরের অন্দরের মেয়েদের।

ছি-ছি রব উঠলো ঘিরেটিতে। বিধবার বিয়ে? তার উপর খেস্টানের সঙ্গে বিয়ে? তাও আবার ফিরিঙ্গির সঙ্গে? এটা তো ঠিক বিয়ে নয়, মুসলমানের নিকে বললেই হয়? এমন সর্বনেশে মেয়ে জন্মেছিল দেবতার মত লোক তর্কালঙ্কার ঠাকুরের? কুলে কালি দিল? কোন্ শালা বামুন বিয়ে দেবে দেখে নেবো আমরা। এটা যে হবে শাস্ত্রের অপমান, তার চেয়ে বরং আর পাঁচজন ভ্রষ্টা মেয়েমানুষ যা করছে আজকাল, সেরকম বেরিয়ে গিয়ে ঐ ফিরিঙ্গিটার সঙ্গে থাকুক না কেন?

হান্সমান এণ্টনীর ঠাকুর্দা ফার্ণাণ্ডো হান্সমান এসেছিলেন এদেশে পর্তুগাল থেকে। প্রকাণ্ড ব্যবসা, লবণের কারবার, ব্যাণ্ডেল ও সুতোনুটিতে বড় বড় গোলা ছিল। সাবর্ণি চৌধুরীদের

[illegible] নিয়ে তিনি প্রথম ইংরেজ টুটিয়ার অব চার্ণকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। তার বংশে দিশি রক্তের ছাঁট লাগে নি। এই সুরূপ যুবক হান্সমান এণ্টনী এদেশে আগেও একবার এসেছিল বেড়াতে, এবার এসেছে বড় ভাই কার্ল এণ্টনীর কারবারের অংশীদার হয়ে। এদেশ খুব ভাল লেগেছে তার। বলে, বাঙালী জাতটাই চমৎকার।

চন্দননগরের উর্দীবাজার ঘাটে বজরা বাঁধবার আগেই হান্সমান লাফিয়ে উঠেছিল ঘিরেটির ঘাটে, গ্রামের লোকেরা এদেশে কিভাবে থাকে দেখবার কৌতূহল। বজরা ছেড়েছে সুতোনুটির ঘাট থেকে, সঙ্গে তিনটে বড় সাম্পানে লবণ ভর্তি। মাল ছাড়াও সঙ্গে আরো কিছু আছে—একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কিছু বাঙলা বই, হান্সমান প্রবল উৎসাহে বাঙলা ভাষা শিখে নিচ্ছে, সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণটির কাছে সংস্কৃত।

পৃথিবীটা কার বশ? পৃথিবী টাকার বশ। একশো টাকা দিয়ে হান্সমান রাজী করালো হুগলীর এক পুরোহিতকে, শালগ্রাম শিলা ও যজ্ঞাগ্নির সামনে হিন্দুমতে বিয়ে দিতে। সৌদামিনীর দাদা কন্যা সম্প্রদানে রাজী নয়, এমন অনাচারে পিতৃ-পুরুষরা রুষ্ট হবেন, শেষমেশ দুশো টাকার লোভ সামলাতে পারলো না। লোভের চেয়েও ভয়টা বেশী, স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'যে ভাতকাপড় ভাল করে যোগাতে পারে না তার আবার দেমাক, দুশো টাকা একসঙ্গে হতভাগা মিন্সে জীবনে কখনো দেখেছে?' গ্রামশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ করলো হান্সমান এণ্টনী, সবাই বেঁকে বসলো ম্লেচ্ছোর অন্ন খেলে জাত যাবে। কিন্তু যখন কানাকানি জানাজানি হলো সাহেব লুচি-মাংস খাইয়ে সবাইকে ধুতি বা শাড়ি প্রণামী দেবে, তখন জাত যাবার কথাটা হঠাৎ চাপা পড়ে গেল।

'ছেলেরা ধুতি চাদরে খাসা দেখাচ্ছে সাহেবকে' সবাই বলাবলি করে বিয়ের আসরে। মেয়েরা বলে, 'আমাদের সদুকে দেখাচ্ছে রাজরাণীর মত, অমন রূপ এদ্দিন যেন ছাই চাপা পড়েছিল।'

'গান করে বাইজী বেবুশ্যেরা, ভদ্দরলোকের মেয়েরা নয়', 'একা একা অত ভোরে ভিনগাঁয়ে ফুল তুলতে যাওয়া কেন রে ছুঁড়িটার, কি মতলব কে জানে?' 'চলাচলি করলো একটা ম্লেচ্ছোর সঙ্গে?'—জগো ঠাকরুণের বকবকানির বিরাম ছিল না এই সব নিন্দা রটনায়। বিয়ের আসরে কিন্তু দেখা গেল এই সত্তর বছরের বৃদ্ধা লাঠিভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে সৌদামিনীর মাথায় আশীর্বাদ করছেন, 'শিবের মত পতি পেয়েছিস দিদিমণি, এবার তোর সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হোক।' সৌদামিনীর পরে যখন দেখাদেখি এণ্টনীও তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো তখন তিনি একেবারে গলে গেলেন, 'দিদি আমাদের অন্নপূর্ণা, সাহেব তোমার ঘর ভরে উঠবে ধনেজনে—গরীবদের অন্ন বিলিয়ো।'

সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল নেমন্তন্নের আসরে। এণ্টনীর লোকজনরা বিরাট সামিয়ানা টানিয়ে দিয়েছিল সৌদামিনীর বাড়ির সামনে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রের জন্য পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিধবাদের জন্যেও আলাদা বন্দোবস্ত, সবাই যার যার জায়গায় সার দিয়ে বসে খাচ্ছে, এণ্টনী ইতস্তত করে শেষে চলে এল সামিয়ানার তলায়, ঘুরে ঘুরে যাচাই করে খাওয়াতে লাগলো।

গ্রামের মাতব্বররা দেখে এসেছিলেন যেখানে রান্না হচ্ছে, ভিয়েন বসেছে। ভূরিভোজনের কি ব্যবস্থা সাহেব করেছে সে কৌতূহল সামলাতে পারেন নি। রাশি রাশি লুচি, বেগুনভাজা, মাছ, মাংস, চাটনী, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরপুরিয়া, দই, পায়েস দেখে ওদের রসসিক্ত জিহ্বা ও জঠরস্থ অগ্নির তাড়না ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শের অশুচিতাকে অগ্রাহ্য করে দিল আপাতত, তাঁরা টুঁ-শব্দটিও করলেন না দেখে আর সকলে সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভোজ্যবস্তুতে মনঃসংযোগ করলেন। উদরপূর্তির পরে সাহেবের হাত থেকে একখানি ধুতি বা শাড়ি এবং মাথাপিছু নগদ দু' টাকা পেয়ে সকলে ধন্য ধন্য করে চলে গেল। সৌদামিনীর হাত ধরে এণ্টনী তার বজরায় গিয়ে উঠলো। চন্দননগরের উর্দীবাজার থেকে বজরাটি আগেই নিয়ে আসা হয়েছিল ঘিরেটির নিমাইতীর্থ ঘাটে।

এণ্টনী নববধূকে বলে, 'তোমরা বল পার্বতী বহু তপস্যাপুণ্যে শিবকে স্বামিরূপে পেয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় পার্বতীকে পাবার জন্যে শিব তপস্যা করেছিলেন আরো বেশী।'

'না, শিব তপস্যা করেন নি, তুমি জানো না টনি'। এণ্টনীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে সৌদামিনী আঁচলটি গলায় জড়িয়ে দু' হাত জোড় করে।

'শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াতেন মহেশ্বর, কুটির বাঁধলেন পার্বতীকে বিয়ে করে।'

'পার্বতী ছিলেন রাজার মেয়ে, উদাসী যোগিরাজকে গৃহী করলেন তিনি।'

'আমিও কুটির বাঁধছি মিনি, কাল দেখবে চলো। তুমি হবে আমার পার্বতী, আলো করবে আমার সেই কুটির, ঘুরে ঘুরে বেড়ানো আর ভাল লাগছে না।'

'তুমি আমার জীবন্ত শিব, মাটির শিব পূজো করে সাক্ষাৎ শিব লাভ করেছি বহু পুণ্যে।'

বজরার জানলা দিয়ে দেখা যায় নদীর জল রাঙা হয়ে উঠেছে অস্তমান সূর্যের রক্তিমাভা বক্ষে ধারণ করে সে রঙের ছাপ লেগেছে সৌদামিনীর বুকেও। পিছনে যে জীবনটা ফেলে এসেছে সেটা ছিল হিমেলি কুয়াশায় ধোঁয়াটে ছিল না আলোকের স্পর্শ, বাতাস ছিল থমথমে; হঠাৎ এখন চারিদিক আলো রঙীন হয়ে উঠেছে, দক্ষিণ সমীরণে উঠেছে হিল্লোল, মিলেছে পরম আশ্র

মিলেছে প্রাণের দোসর। উঃ এত আনন্দ ও চেপে রাখবে কী করে।

ছোট কাঠের বাড়ি। জার্মানী কারিগরের তৈরী। ছোটর ভেতর আরামের সব ব্যবস্থাই আছে। মালপত্র গরুর গাড়িতে আসছে, এণ্টনীর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায় সৌদামিনী। তার বাড়ি? নিজের বাড়ি এটা? এখানে তার ইচ্ছামত সব চলবে? এখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন? এমনটি সে কোনোদিনই যে আশা করতে পারে নি। বিশ্বাস হতে চায় না যে পরাধীনতার শৃঙ্খল তার খুলে পড়ে গেছে।

'মিনি এই তোমার কুটির।'

'তোমার কুটির টনি।'

'তবে আমাদের দু'জনেরই, এবার হলো।'

এণ্টনী একটি ফুলের মালা পরিয়ে দেয় সৌদামিনীর গলায়। 'রাণীকে রাণীর মত স্বাগত জানাতে হয়।'

সৌদামিনী মালাটি খুলে নিয়ে এণ্টনীর গলায় দিয়ে বলে, 'রাজাকে রাজার মত।'

পর্তুগীজ হান্সমান এণ্টনী সাহেবী পোশাক ছেড়ে ধুতি, পিরান, চাদর ধরেছে, নির্ভুল বাঙলায় কথা বলে, পান খায়, হুঁকো টানে, পুরোদস্তর বাঙালী বনেছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণের গল্পগুলি অনেকের চাইতেই বেশী জানে, হিন্দুর আচার-বিচার-নিয়ম এমন জানে যে, কেউ ঠকাতে পারে না। সাহেব থেকে মুরুব্বিয়ানা করতে চায় না সে, দিশি লোকদের সঙ্গে খাঁটি দিশি হয়ে চলতে চায়।

খাওয়া-দাওয়াও বাঙালী ধরনের। চাকর মাত্র একটি রেখেছে, ঠাটের কোনো দরকার নেই। সে সব কাজ করে, কিন্তু রান্না করে সৌদামিনী। সৌদামিনীর হাতের রান্না তার খুব ভাল লাগে, সৌদামিনীর খুব ভাল লাগে তাকে রান্না করে খাওয়াতে। সৌদামিনী শাক চচ্চড়ি, মুড়িঘণ্ট, লাউঘণ্ট, মাছের ব্যাঞ্জন রাঁধে, এণ্টনী জলচৌকী টেনে এনে কাছে বসে যতক্ষণ রান্না হয়। সৌদামিনী এণ্টনীকে গান শেখায়, দু'জনে ছড়া কেটে সুর দিয়ে প্রশ্ন ও জবাব চালায়, এণ্টনীর গলা ভাল, নতুন নতুন সুর দিতেও পারে। সৌদামিনীকে চমক লাগিয়ে দেয় এণ্টনী রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের গল্পগুলির নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার ক'রে, হর-গৌরী, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণের যুগলতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করে, তাও আবার ছড়া কেটে সুর দিয়ে। তাকিয়ে থাকে সৌদামিনী, একি ম্লেচ্ছ বিদেশী, না ভেতরে ভেতরে খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দার্শনিক? পিতার কাছে উপনিষদ পুরাণ শিখেছে ও, কিন্তু এই বিদেশী স্বামী তো বাঁধা পথ ছেড়ে একেবারে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে। শ্রদ্ধা ও গর্বে ভরে ওঠে তার বুক।

'টনি, তুমি বিদেশী হয়ে এখন জঙ্গলে কী করো?'

'বিদেশী নই আমি, আগে ছিলাম কিন্তু তোমার যেটা দেশ সেটা আমারও দেশ, মিনি! আমার মনে হয় আগের জন্মে আমি এদেশেরই হিন্দু ছিলাম।'

'তোমরা খৃস্টানরা তো জন্মান্তর বিশ্বাস কর না শুনেছি?'

'তাহলে তোমার সঙ্গে আমার এই যোগাযোগ হলো কেমন করে, যদি আগের জন্মের কোনো যোগসূত্র না থাকতো? তোমার সঙ্গে সেই জঙ্গলের পাশে প্রথম যেদিন দেখা হলো সেদিন আমার কী মনে হলো জানো?'

'আমি কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম, টনি?'

'মনে হলো তোমাকে আমি জন্মে জন্মে দেখে এসেছি, পেয়ে এসেছি, পেয়েছি হারিয়েছি, হারিয়েছি পেয়েছি।'

গায়ে কাঁটা দেয় সৌদামিনীর, কড়াতে তেল ঢেলেছে সে কথা ভুলে যায়, ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে গরম তেল জ্বলে ওঠে দপ্ করে, এণ্টনী সৌদামিনীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পেছনে সরিয়ে নেয়।

একটা কথা কিছুতেই শোনে না সৌদামিনী। এণ্টনী বেড়িয়ে আসে রোজ একবার, বাড়ি ফিরলে সে নিজের হাতে জল ঢেলে স্বামীর পা দু'খানি ধুয়ে চুল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। ভ্রমরকৃষ্ণ রেশমের মত চুলের গোছা, এণ্টনী মানা করে, সে-মানা শোনে না সৌদামিনী, বলে, 'তুমি আমার দেবতা, আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী, এ-সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।'

একদিন বড়ি ভাজতে ভাজতে সৌদামিনী সুর তুললো---

'ওগো আমার টনি সাহেব
শুনবো এবার বলো,
কার শাপেতে লক্ষ্মীদেবী
পাতালেতে গেলো,
উদ্ধার করিতে তারে
যাইলো কি যাইনা?
যদি জানো টনি সাহেব
বলেই ফ্যালো না?
কোন্ দেবতা পুরুষ হয়ে
সাজলো মেয়ে বলো,
বিষকুম্ভ পান করে
কে নীলকণ্ঠ হলো?'

এণ্টনী চটপট জবাব দেয়---

'শোনো শোনো বেদ-পুরাণ
আমার জানা আছে
মামাবাড়ির গল্প কেন
কর মায়ের কাছে?
শোনো শোনো তবে তোমার
শুনে রাখা ভাল,
দুর্বাসার অভিশাপে
লক্ষ্মী পাতাল গেল।
সেখান থেকে লক্ষ্মী করেন
সাগরে গমন,
দেবাসুরে আরম্ভিলা সমুদ্র মন্থন।
মোহিনী সাজিয়া বিষ্ণু অমৃত বিলান,
নীলকণ্ঠ হলেন শিব বিষ করি পান।'

'টনি?'

'কী মিনি?'

'তুমি মস্তবড় কবিয়াল হতে পারবে, দল খোল না কেন ভোলা ময়রা, ঠাকুর সিংহ, রামু বেনের মত?'

এণ্টনী ফিরিঙ্গির কবি-প্রতিভা জানাজানি হয়ে পড়েছে। সাহেব বাঙালী সেজেছে, মুখে মুখে ছড়া কেটে গান গায়। চন্দননগরে চরণ ধুপীর কানেও খবরটা এসে পৌঁছেছে। চরণ ধোপাগিরি করলেও গুণী গুণের কদর বোঝে, সাহেব কবিয়াল দল গড়ছে শুনে ছুটে গেল। ধোপার কাজ ছেড়ে দিয়ে সে সাহেবের দলে যোগ দিতে রাজী, শুধু সে নয়, তার দলের অনেকেই। বাজনা ছাড়া কবিগান হয় না, সে-ভার নেবে চরণ, মাইনে সাহেব যা দেবে তাই হাসিমুখে নেবে।

এণ্টনী সাহেবের বজরা আবার পাল তোলে। চুঁচড়ো, চন্দননগর, ভাদরেশ্বর, গোন্দলপাড়া, শ্রীরামপুর, বাঁকিপুর, বরাহনগর, সুতোনুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুরের ঘাটে দেখা যায় নোঙর ফেলতে নোঙর তুলতে। পাল্লা দেয় কবিয়াল এণ্টনী ফিরিঙ্গি ঠাকুর সিংহ, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর, রামু বেনে প্রমুখ নাম-করা কবিয়ালদের সঙ্গে। সাহেবের মুখে কবিগান শুনতে লোক ভেঙ্গে পড়ে।

কোথাও ঠাকুর সিংহ খেউড় ধরেছে---

'বল হে এণ্টনী আমি
একটি কথা জানতে চাই,
এসে এদেশে এবেশে,
গায়ে কেন কুর্তা নাই?'

ধুতি চাদর পরা টকটকে সাহেব তুড়ুক জবাব দেয়---

'বন্ধুগণ শুনুন শুনুন
দয়া করে দিন মন,
ঠাকুর সিং যে চাপান দিল
তার করি খণ্ডন,
এই বাঙালায় বাঙালী সেজে
ভারী মজায় আছি,
সিংহীর বাপের জামাই হয়ে
কুর্তা টুপী ছেড়েছি।'

শ্রোতারা উল্লাসে ফেটে পড়ে, সাহেব ঠাকুর সিংহকে শালা বানিয়েছে।

কোথাও এণ্টনী গান ধরে---

ভজন পূজন জানি নে মা,
জাতেতে ফিরিঙ্গি,
যদি দয়া কর,
তরাও মোরে এ-ভবে মাতঙ্গী।

ভোলা-ময়রা সাহেব কবিয়ালকে নাকাল করতে যায়---

'তুই জাত ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী,
পারবো না কো তরাতে
শোন রে ভ্রষ্ট, বলি স্পষ্ট
তুই যে নষ্ট, মহা দুষ্ট
তোর কি ইষ্ট কালী কেষ্ট
পারবে না কো তরাতে।'

জব্বর খোঁচা মেরেছে সাহেবকে, বলাবলি করে শ্রোতারা। মেয়েদের সারিতে সৌদামিনীর মুখ শুকিয়ে গেছে দেখতে পায় এণ্টনী। সৌদামিনী আসরে না থাকলে তার ছড়া এলোমেলো, সুর বেতাল হয়ে যায়, তাই সে সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এণ্টনী সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুরু করলো---

'সত্যি বটে আমি জাতেতে ফিরিঙ্গি
ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন,
অন্তিমে একাঙ্গী,
খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু
প্রভেদ নাই রে ভাই,
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে,
কোথাও শুনি নাই।'

শ্রোতারা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। গোঁচার বদলে রাম-খোঁচা। সৌদামিনীর মুখে গর্বের হাসি।

ভোলা ময়রা দমে না, লড়াই চলে---
ফিরিঙ্গি এণ্টনী তোর পর্তুগালে বাড়ি,
ধাঙ্গানী সেজেছিস তো কুর্তা টুপী ছাড়ি,
(ফিরিঙ্গি তোর রঙ্গ দেখে বাঁচিনে)
তুই পঙ্গু হয়ে পার হতে চাস গিরি?
বামন হয়ে চাঁদে হাত, নিতে চাস খরি?
তাই তো তোর কথার এমন ছিরি।'

এণ্টনী আবার উঠে দাঁড়ায়---
ও তুই ময়রা ভোলা মিষ্টি বিলো,
কবির আসর ভিয়েন নয়
কীজে বেদশাস্ত্র পড়ে রে তোর
এমন ধারা দশা হয়?
কৃষ্ণ যদি করেন কৃপা
টপকে হব গিরি পার,
ত্রিভুবনের প্রভু নিজেই হলেন বামন অবতার
(ভোলা তুই সব ভুলেছিস বলবো কী আর)।

এণ্টনী তার কবিয়ালি লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে কেবল অপদস্থ করার চেষ্টাই করতো না, দিশি কবিয়ালদের মতো সম্মানও যথেষ্ট দিত। কলকাতার হালসীবাগানের বারোয়ারীতে রামু বেনের সঙ্গে লড়াই, এণ্টনীর নাম তখন সারা বাঙলা দেশে, সভা-বন্দনার ভার তার ওপরেই পড়লো। সে হাতজোড় করে সুরু করলো---

'হালসীবাগান ওঠে মেতে,
জমাট কবির আসর,
কত আছেন জ্ঞানী গুণী
সভার শোভাকর,
এণ্টনী আর রাম পণ্ডিত,
লড়াই হবে ভালো,
মস্ত আসর, দেখা যায়
শুধুই মাথা কালো,
রামু ভায়া তোমায়
আমি করি নমস্কার
দেশটি জোড়া নামটি তোমার,
আমি তো কোন্ ছার?
চরণ চুলি বাজায় ঢোল
বহুৎ মজাদারী
এবার তবে কাব্যকথা
শুনুন দুয়েক চারি।'

এণ্টনী লক্ষ্য করেছিল যে, শ্লেষ বিদ্রূপে প্রতিপক্ষকে যেবকম চটিয়ে দিয়ে তার কথার মিল ও সুর গুলিয়ে দেওয়া যায়, প্রশংসা ও খাখনাইতেও দাম্ভিক প্রতিপক্ষ এলোমেলো হয়ে পড়ে। সাহেবের স্তুতিবাক্যে রামু বেনে সেদিন পদে পদে হোঁচট খেতে লাগলো, এণ্টনীর জয়জয়কার।

এণ্টনীর নামের সঙ্গে সৌদামিনীর নামও ছড়িয়ে পড়লো। সাহেবকে

জলাধারে বিলীন জাহাজ

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমারে কে ডেকে নেবে দৃশ্যমান প্রলাপী-নির্ঝরে,
যেমন সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায় আরোহী-জাহাজ—
অনিবার্য অন্ধকার টেনে নেয় হিম-বক্ষোপরে,
সহজ স্বচ্ছন্দে যেন বন্ধ হয় জলের দেরাজ।

কী তীব্র চীৎকার ওঠে কোলাহল খিলানে গম্বুজে
আসন্ন যাত্রীর চোখে ভেসে ওঠে গড়ু অজগর
ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ফোঁসে, ভয়ে চোখ বুজে—
দেখিবে সমুদ্র শান্ত, মিলায়েছে রাক্ষসী গহবর।

জীবন সংসার মৃত্যু লবেজান ধ্বংসের উল্লাসে
ইচ্ছাগুলি চূর্ণ হয়, সর্বনাশী সুবর্ণ-সমাজ।
বিবেক বিনষ্ট করে নির্ঝরের স্ফটিক বিলাসে
সাদরে ডাকিয়া নিও জলাধারে বিলীন জাহাজ।

তেমনি ডুবিতে চাই অলৌকিক জলের কোটরে—
অযুত যাত্রীর ভয় সংশয়ের দহে ডুবে মরে॥

শিখিয়েছে কে? ঐ সৌদামিনী। সাহেব ভুললো কিসে? ওর রূপে না বিদ্যায়? ভোলা ময়রা একটি আসরে সবার সামনে সৌদামিনী সম্বন্ধে বললো---

'তোর রূপবতী গুণবতী ঘরের শ্রীমতী
রামের পাশে সীতা যেমন কৃষ্ণের রাধাসতী
ওরে সাহেব এণ্টনী তুই বড়ই ভাগ্যবান
তোর প্রাণেশ্বরীর গুণের কথা কর রে ব্যাখ্যান।'

এ প্রশ্নেই কিস্তিমাৎ করলো সেদিন ভোলা ময়রা। এণ্টনীর মুখে আর ছড়া ফুটলো না, সুর উঠলো না। সে সত্যিই ভাগ্যবান, সৌদামিনী সত্যিই তার শক্তির উৎস, সব প্রেরণার মূল, সে চুপ করে রইলো, অন্তরের গোপন ছবিটি আসরে সবার সামনে নামানো সত্যিই যায় না।

কপোত-কপোতীর মত সুখের নীড় বেঁধেছিল ঘিরেটির কুটিরে পর্তুগীজ এণ্টনী ও তার বাঙালী বধূ সৌদামিনী, কিন্তু ফুলের মাঝে কীটের মত দেখা দিল সৌদামিনীর দাদা বংশীবদন। মুখরা গৃহিণী প্রখর বাণ মাঝে মাঝে নিক্ষেপ করে, 'কেন দুশো টাকায় যে রাজী হলো, সাহেবের বিস্তর টাকা, পাঁচশো চাইলেও পাওয়া যেত, আহাম্মক আর কাকে বলে. এমন লোকের হাতেও বাপ দিয়েছিলেন, তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলেন না কেন?'

তাই অভাবে পড়লেই বংশী ছুটে আসে এণ্টনীর কাছে, অভাবে না থাকলেও আসে, দশটাকা বিশ টাকা যা পায় নিয়ে যায়। এণ্টনী ক্রমেই চটে যায়, সে ঠকাতেও চায় না কাউকে, ঠকতেও চায় না। তাকে কী বংশী বোকা পেয়েছে? অবশেষে একদিন 'না' বলে দিল। বাঙালী সাজলেও সাহেবী জেদ, সে 'না'কে আর 'হ্যাঁ' করাতে পারলো না বংশী, খোসামোদ বা ভয় দেখানো কোনোটাতেই ফল হলো না।

একদিন দুপুরবেলা সৌদামিনী ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এণ্টনী এক মুহূর্তও কাছ-ছাড়া হয় না, গানের লড়াই কয়েক মাসের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে, দলের লোকদের পুরো মাইনে আগাম দেওয়া হয়েছে। ঘুমোন্ত মিনিকে তালপাখার বাতাস করতে করতে এণ্টনী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ দেখলো আগুন, মেঝের পাটাতনের একপাশ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। কাঠের বাক্সটিতে অনেক টাকা ছিল, আলমারিতে অনেক পুঁথিপত্র ছিল, এণ্টনী কোনোটার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না, সৌদামিনীকে দু'হাতে তুলে নিয়ে বাইরে ছুটে এলো। পুড়ে ছাই হয়ে গেল চোখের সামনে বহু স্মৃতি-বিজড়িত সুখের নীড়।

কেঁদে উঠেছিলো সৌদামিনী, কিন্তু এতটুকু নিশ্বাস ফেলে নি এণ্টনী। 'তোমার জীবনের দাম লক্ষ টাকা মিনি, এখন আরো বেশী, একজনকে দিয়ে দু'জনকে পেতে যাচ্ছি, তোমাদের দু'টো প্রাণের তুলনায় ক্ষতিটা আমি গ্রাহ্যই করি না। চল গৌরহাটির কুঠিতে, কিন্তু এই ছোট্ট বাড়িতে আমরা দু'জনে সর্বদা ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে থাকতাম, ভয় হয় সেই প্রকাণ্ড কুঠিতে হয়তো আমরা একটু দূরে সরে যাবো দু'জনের কাছ থেকে। তবে তোমাকে আমি মনের মধ্যে খাঁচায় বন্ধ করে রেখেছি, সরে যেতে তো পারবে না?'

সৌদামিনীর হাত ধরে এণ্টনী বজরার দিকে এগোতে থাকে। 'মিনি, ঘোমটা টেনে দাও, লোকে তোমার মুখ দেখতে পাবে।'

বংশীবদন পাঠক ফিরিঙ্গি ভগ্নীপতিকে গ্রাম-ছাড়া করে ছাড়লো, কিন্তু কলকাতার ফিরিঙ্গি কালী এণ্টনী ফিরিঙ্গির স্মৃতি বহন করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। [ক্রমশ।

গ্রামের মেয়ে

—বাদল ভট্টাচার্য অঙ্কিত

মাসিক

বসুমতী

॥ ভাদ্র ১৩৭৭ ॥

সূর্যম

—নকুল

॥ আলোকচিত্র ॥

ভূমিকর্ষণ
—সমর সাহা

মাসিক বসুমতী। ভাদ্র / '৭৭

দুর্গম পথে
—শান্তি বসু
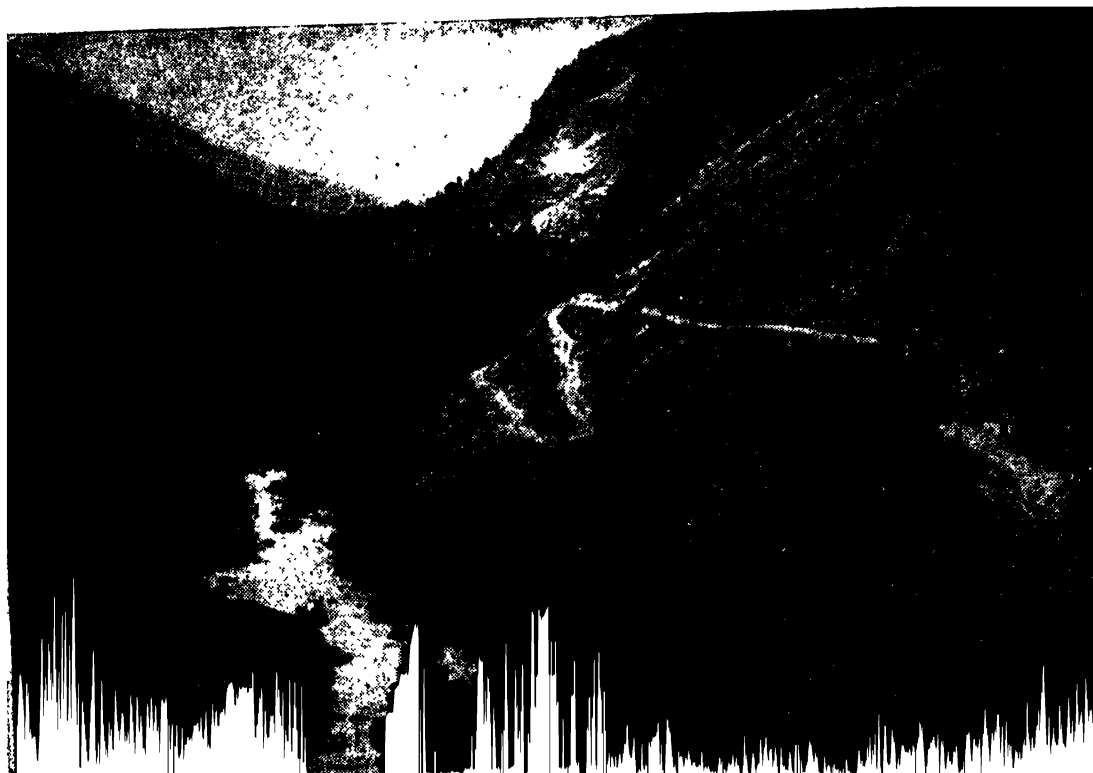
মাসিক
বসুমতী
ভাদ্র / '৭৭

অভিনেত্রী
মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী)
—বিশ্বনাথ গোস্বামী
(১ম পুরস্কার)

অভিনেত্রী

(অপর্ণা সেন)

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

(৩য় পুরস্কার)

মা
সি
ক

॥ ভাদ্র ১৩৭৭ ॥

অভিনেত্রী
(তনুজা)
—শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়
(২য় পুরস্কার)

স্বামী বিবেকানন্দ

চরিত্রলিপি

শ্রীরামকৃষ্ণ।	মিঃ স্টার্ডি।
নরেন্দ্রনাথ: স্বামী বিবেকানন্দ।	পাদরী সাহেব।
সুরেন্দ্র মিত্র।	অজিত সিং। খেতড়ীর রাজা।
রাম দত্ত।	জগমোহন: ঐ মুন্সী।
লাটু।	মাড়োয়ারী ভদ্রলোক।
যোগীন।	ব্রহ্মচারী।
রাখাল।	কেলো।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।	হরিবাবু।
মিঃ ম্যাক্সমুলার।	মিস্ মার্গারেট।

ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[কলকাতার সুরেন মিত্র মহাশয়ের বাটী, একটি উচ্চ আসনে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সম্মুখে ভক্তবৃন্দ সুরেন, রাম দত্ত প্রমুখ নরেন্দ্র নাথ তানপুরা বাজিয়ে গান গাইছেন]

॥ বাহার ঝাঁপতাল ॥

অচল ঘন গহন গুণ, গাও তাঁহারি
গাও আনন্দে সবে, রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি, ফুলেফলে গাও রে,
বিহঙ্গকুল গাও আজি, মধুর তর তানে।
গাও জীবজন্তু আজি, যে আছ যেখানে।
জগৎ পুরবাসী সনে, গাও অনুরাগে।
মম অন্তর গাও আজি, মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি, প্রাণ আমারি।

[গান শেষ হলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সমাধি হল। সকলে ব্যস্ত হলেন। কানের কাছে ঠাকুরের নাম করতে লাগলেন। রামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হল]

শ্রীরাম। বাঃ বাঃ (নরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হলেন, কি যেন মনে করতে চেষ্টা করলেন---)

শ্রীরাম। সেই ঋষি! সেই ঋষি!

নরেন্দ্র। ঋষি।

শ্রীরাম। হ্যাঁ গো ঋষি (নেপথ্যে শোনা গেল)

[মন সমাধি পথে জ্যোতির্ময় লোকে উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। চন্দ্র সূর্য তারা সব অতিক্রম করে সূক্ষ্ম ভাব জগতে এলাম। যতই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে যাই দেব-দেবীর মূর্তি দেখতে পাই পাশে পড়ে থাকে। ক্রমে ভাবরাজ্যের চরম সীমায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে এসে দেখি এক জ্যোতির্ময় বেড়ার খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্য পৃথক করা। খণ্ডরাজ্য অতিক্রম করে অখণ্ড রাজ্যে মন প্রবেশ করলে। সেখানে কোন মূর্তি নেই, দেব-দেবীরাও প্রবেশ করতে পারেন না। কিছুক্ষণ পরে দেখি দিব্য দেহধারী সাতজন প্রাচীন ঋষি সমাধিস্থ। বুঝলাম, জ্ঞান, পুণ্য, ত্যাগ ও প্রেমে এঁরা দেব-দেবীকেও অতিক্রম করে গেছেন। এমন সময় দেখি সেই জ্যোতির্মণ্ডং ঘনীভূত হয়ে দিব্য শিশুর আকার ধারণ করলে। শিশু তার সুকোমল বাহুযুগল দিয়ে একজন ঋষির কণ্ঠ সপ্রেমে আবেষ্টন করে বললে আমি যাচ্ছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। ঋষি শুধু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে শিশুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে সমাধিস্থ হলেন]

শ্রীরাম। ও সুরেন---একে কোথায় পেলে?

সুরেন্দ্র। আজ্ঞে ও নরেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমাদের পাড়ার এটর্ণি বিশ্বনাথ দত্তর ছেলে। খুব ভাল গান গায়। কলেজে পড়ে, এবার এফ-এ পরীক্ষা দেবে।

শ্রীরাম। নরেন। বাঃ বাঃ দেখি, দেখি হাতখানা দেখি---

[নরেন্দ্রর কাছে এসে ডান হাতখানা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতের ওপর রেখে দেখতে লাগলেন এবং নরেন্দ্রর সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন]

শ্রীরাম। নরেন---নরেন্দ্রই বটে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এস। ও সুরেনবাবু রামবাবু, একদিন এই ছেলেটিকে নিয়ে এসো-না-গো দক্ষিণেশ্বরে। আজ তা হলে উঠি কেমন গো, চল চল রাত যে গড়িয়ে গেল। এস কেমন, নিশ্চয় এস।

[শ্রীরামকৃষ্ণ যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, কাপড় সামলে দিলেন রাম, নরেন্দ্র ব্যতীত সকলে তাঁকে অনুসরণ করলেন]

নরেন্দ্র। ঋষি। ঋষি। আস্ত পাগল, বদ্ধ পাগল---হাঃ---হাঃ---হাঃ---।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

বিশ্বনাথ দত্তর বাড়ী

(রাম দত্ত ও নরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করলেন।)

রাম। (কাছে এসে) এ তুই কি ক্ষ্যাপামো করলি বলতো। কাকাবাবুকে এভাবে আঘাত দেওয়া কি ভাল হল।

সুরেন্দ্র। দেখ রাম দাদা, আমাকেও একদিন তাঁকে পেতে হতই। স্নেহশীল বাবা মার মন। আমাদের কোন কিছুতে কষ্ট হবে মনে করলেই তাঁরা কষ্ট পান। আর গতানুগতিক জীবন যদি না চলে তাহলেই তাঁরা আঘাত পান। আমি বিবাহ না করে সংসারী হব না যে কোনদিন তিনি শুনলেই আঘাত পেতেন। কাজেই কথাটা রূঢ় হলেও সত্য, আর আমার কাছে সব চেয়ে এই সত্য।

রাম। সংসারী হব না সংসারী হব না তো প্রায় বলিস। কিন্তু ও পথে তোর গুরু হবেন কে শুনি, তাঁর তো প্রাণান্ত হবে তোর জ্বালায়। যা গোঁয়ার তুই, হয়তো মতে না মিললে কোনদিন তাঁকে মেরেই বসবি।

সুরেন্দ্র। না রাম দাদা, গুরু যাঁকে করব তাঁকে খুব করে যাচাই করে নেব। যখন বুঝব তিনি সকল বিষয়ে আমার চেয়ে বড়, তখনই তো গুরু করব। তাইতো গুরু পাচ্ছি না।

রাম। গুরু পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা সেদিন তো সুরেনদার বাড়ী গিয়েছিলি। আমাদের গুরুদেবকে গান শোনালি, কেমন লাগল।

নরেন্দ্র। (উচ্চ হাস্যে)। তোমাদের গুরুদেব। বেশ লাগল, কি কি নাম, রামকৃষ্ণ---

রাম। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (উদ্দেশ্যে প্রণাম)।

নরেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস না শ্রীরামকৃষ্ণ পরম পাগল। আচ্ছা গুরু জুটিয়েছ রামদাদা। আস্ত পাগল। ও ক্ষ্যাপাটাকে কি করে গুরু করলে আমি তো ভেবে পাই না।

রাম। ক্ষ্যাপা। পাগল। হ্যাঁ পাগলই বটে। ঈশ্বরপ্রেমে উনি পাগল, উন্মাদ; সাধনার সিদ্ধিলাভ করে উনি পাগল। বেশ তো উনি বার বার বলেছেন তোকে আর একবার নিয়ে যেতে দক্ষিণেশ্বরে। চল্ না আর একবার, দেখবি তাঁর জ্ঞান কত।

নরেন্দ্র। বল কি রামদাদা, ঐ পাগলটার জ্ঞান। কি পড়েছে, শুনেছি তো কোন শাস্ত্রই পড়েনি। ইংরিজী তো দূরের কথা, কোনরকমে নাকি নাম সই করতে পারে। মাঝে মাঝে আমাদের সমাজে ওর কথা হয়।

রাম। ব্রাহ্ম সমাজ। হবেই তো তোদের কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী এখন তো ওঁর চেলা।

নরেন্দ্র। আচ্ছা রামদাদা উনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন।

রাম। নিশ্চয়ই দর্শন করেছেন। ঈশ্বর কি উনিই বলতে পারেন।

নরেন। ঈশ্বর কি উনি বলতে পারেন। উনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঈশ্বর দর্শন করেছেন কি না। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন---

রাম। কি বলেছিলেন---

নরেন। আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে তিনি বলেছিলেন---তোমার চক্ষুযুগল কি সুন্দর, জ্যোতির্ময়, প্রকৃত যোগীচক্ষুর মতো। তা হলেই বোঝ, ঈশ্বর কি তিনিও দেখেন নি---আর তোমাদের গুরু ঈশ্বর দর্শন করেছেন।

রাম। বেশ তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করবি।

নরেন্দ্র। আচ্ছা চল আজই যাবো। দেখব কেমন অবতার এসেছেন।

রাম। অবতার নয় মিলে যুগাবতার। কিছুদিন তাঁর কাছে গেলে তুইও চেলা হয়ে যাবি।

নরেন্দ্র। আমি যদি তাঁর চেলা হই তুমি জেনো রামদাদা, আমিই হব তাঁর সেরা চেলা। চল দেখি একবার তোমাদের কেমন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস---হাঃ---হাঃ।

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

(দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ)

শ্রীরাম। ওরে আয়, আয়, আর যে থাকতে পারছি না। তোকে ছাড়া যে সব অন্ধকার। মা---মাগো তাকে এনে দে। বিষয়ী লোকের কথা শুনে শুনে কান যে পুড়ে গেল। শুদ্ধ ভক্ত না হলে দিন যায় কি করে। ওরে আয়, ওরে আয়। তুই এসেছিস আমি জানি, আমি তোকে দেখেছি। ওরে আয়, ওরে আয় ---

(সুরেন্দ্রনাথ, রাম দত্তর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। রাম দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন)

শ্রীরাম। (উৎফুল্ল হয়ে) ওরে নরেন, নরেন এসেছে, নরেন এসেছে। আয় আয় কাছে আয়। এত দেরী করতে আছে। তোকে বহুদিন থেকে খুঁজছি, কাছে আয়, সোজা কাছে আয়।

(নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে গেলেন আশ্চর্য হয়ে)।

নরেন্দ্র। আমাকে খুঁজছেন? কেন আমাকে খুঁজছেন কেন?

শ্রীরাম। হাঁ গো হাঁ তোমাকেই। মা যে তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন চিনিয়ে দিয়েছেন, তাই তো রামবাবুকে কতদিন বলেছি, ও আর একবার তাকে নিয়ে আয় সুরেনবাবুকেও বলেছি।

রাম। তাই তো নিয়ে এলাম। আসা কি চায় জোর করে আনতে হ

শ্রীরাম। আসতে চায় নি, না, আস আসবে, নিজে থেকেই আস প্রথম বিয়ের পর কনেকে ে করে বয়ের ঘরে ঢোকাতে হ কিন্তু দু-চারবার বয়ের সঙ্গে ে হলে বরকে চিনতে পারে। ে কনেই যাবার জন্যে উসখুস ব ---বুঝেছ না, এও তাই। তো একই [illegible] বাপু, আমার ে

আহত গর্জন

রাকা দাস

পরিকল্পিত সংলাপে ভুল হয়ে যায়
কথকতা ঠিক কথা বলে না কখনো।
কর্দমাক্ত হৃদয়ের বুকে তবু
ইট পেতে রেখে ভাবা—'আসিবে উহারা'।
জীবনের ধাপে ধাপে পুরাতন নাটকের
এই সব ভুল অভিনয়ে, জমায়েত চাপ চাপ
প্রতিজ্ঞার স্তর—কিংবা অপচয়ে।
প্রতিজ্ঞার অসহিষ্ণু বোঝা বোঝা ইটে
হবে তৈরি বয়সের অবাঞ্ছিত দীর্ঘ ইমারত।
আছড়াবে দেয়ালে দেয়ালে যার
হৃদয়ের আহত গর্জন।

মনের কথা বলি, প্রাণ খুলে দুটো কথা বলি।

[সকলেই প্রস্থান করলেন নরেন্দ্রও যাইতে উদ্যত)]

শ্রীরাম। তুই নস্, তুই নস্, তোর সঙ্গেই যে মনের কথা।

(নরেন্দ্র দাঁড়ালেন)

(শ্রীরামকৃষ্ণ দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে নরেন্দ্রের সম্মুখে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন)

শ্রীরাম। (আকুল কণ্ঠে) এতদিন পরে আসতে হয়, আমি যে তোর জন্যে অপেক্ষা করছি, একবার আমার কথা ভাবতে নেই। বিষয়ী লোকের কথা শুনে শুনে আমার কান যে ঝলসে গেল। জানি প্রভু। তুমি, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণের জন্যে এসেছ।

নরেন্দ্র। একি বলছেন আপনি। আমি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

শ্রীরাম। হাঁ হাঁ তুমি নরেন অ আমি জানি। তুমি নিজে জান না তুমি কে।

(দক্ষিণ হাত দ্বারা নরেন্দ্রকে স্পর্শ করলেন)

নরেন্দ্র। (উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়) একি, এ যে সব ঘুরছে---দেওয়াল, বাড়ী, ঘর, গাছপালা সব ঘুরছে। আমাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আমি হারিয়ে গেলাম সমগ্র বিশ্বে। ওগো তুমি আমায় একি করলে, আমার বাপ-মা আছেন---

শ্রীরাম। (অট্টহাসা করলেন) তবে এখন থাক, একবারে কাজ নেই, কালে হবে।

(হস্তদ্বারা বক্ষ স্পর্শ করলেন, নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হলেন)

শ্রীরাম। ভাবনা কিরে, কিছু খাবি—

(মাখন, মিছরী, সন্দেশ ও জল নিয়ে নরেন্দ্রনাথের কাছে এসে নিজে হাতে করে খাওয়াতে লাগলেন)

নরেন্দ্র। আমাকে খাবারগুলো দেন, আমার বাবা আছেন, আমরা একসঙ্গে খাবো।

শ্রীরাম। ওরা খাবে এখন তুই খা তো।

(নরেন্দ্রনাথের মুখে গুঁজে দিলেন)

খাওয়া শেষ হলে বল্ তুই আবার এখানে আসবি, একা আসবি—

(নরেন্দ্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন)

শ্রীরাম। তুই আসবি আমি জানি রে; মা আমাকে জানিয়েছেন।

নরেন্দ্র। মা কই, আপনার মাকে তো আমি বলিনি। তিনি কি করে জানলেন।

শ্রীরাম। মা রে। মন্দিরের মা ভবতারিণী। তিনি সব জানতে পারেন, ওঁকে বলতে হয় না।

নরেন্দ্র। (হাস্য) আবার পাগলামি। আচ্ছা আপনি ঈশ্বর দেখেছেন।

শ্রীরাম। দেখেছি কিরে, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, খেয়েছি, একসঙ্গে শুয়েছি। যেমন তোকে দেখছি ঠিক তেমনি দেখেছি।

নরেন্দ্র। আপনি ঈশ্বর দেখেছেন, আমাকে দেখাতে পারেন?

শ্রীরাম। নিশ্চয়ই পারি। তোকে দেখাতে হবে না রে তুই-ই কত লোককে দেখাবি। নে নে একখানা গান কর। খাসা গলা, নে গান কর।

(নরেন্দ্রনাথ তানপুরা নিয়ে বসলেন, একে একে ভক্তবৃন্দ এসে উপস্থিত হলেন।)

(নরেন্দ্রের গান)—

'মন চল নিজ নিকেতনে
মন চল নিজ নিকেতনে।'

[ক্রমশঃ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

সমাজ সংস্কারক দেশবন্ধু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ রাজনীতিক নেতা ছিলেন। দিকপাল ব্যারিষ্টার ছিলেন, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। এছাড়া ভোগী ও ত্যাগী এবং আরও নানা বিশেষণে বিভূষিত তাঁর জীবনের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায়—জনসমাজে এই সকল পরিচয়ের মাধ্যমেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জনমানসে চিরভাস্বর হয়ে আছেন। কিন্তু কেউ কি জানেন যে, তিনি একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। আমাদের সমাজের অনেক পাপ অনেক অনাচারকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন এবং কিছু কিছু সমর্থও হয়েছিলেন।

পিতৃ-পিতামহের পৈতৃক সম্পত্তির মত মানুষ ধর্মকে আঁকড়ে থাকে, তারমধ্যে ভাল বা মন্দ কতটুকু আছে তা মানুষ ভেবে দেখে না এবং ভেবে দেখবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, দেশবন্ধুর জীবন এই গতানুগতিকতার একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর বাবা ভুবনমোহন ছিলেন ব্রাহ্ম---অবশ্য তিনি হিন্দুর ছেলেই ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু সন্তানদের মনে তিনি ধর্ম সম্পর্কে একটি মুক্ত বাতায়ন সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন---তিনি বলতেন যে, ধর্ম কখনও পৈতৃক সম্পত্তির মত পিতা থেকে পুত্রে বর্তায় একথা আমি বিশ্বাস করি না---তাই ব্রাহ্ম পিতার সন্তান হলেও চিত্তরঞ্জন ছিলেন মনে-প্রাণে হিন্দু। ব্রাহ্মধর্ম যে তাঁর খারাপ লাগত তা নয়, কিন্তু এর মধ্যে যে ভণ্ডামি আছে তা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। আর তাঁর অন্তরের এই অভিব্যক্তি অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মালঞ্চ কাব্যগ্রন্থে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য

হেনা চৌধুরী

হয়ত তিনি কিছুদিন ছিলেন, কিন্তু সমাজে যাতায়াত করতেন না বা চক্ষু মুদে ধ্যানও তিনি করতেন না। তার কারণ আমার মনে হয়, হিন্দুধর্মের মধ্যে যে শক্তির সাধনা তা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অন্তরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাই কাব্যজীবনের প্রথম উষালগ্নে কিশোর চিত্তরঞ্জন লিখলেন---ভক্তি পুষ্প দিয়ে মাগো গাঁথিয়াছি হৃদিহার বড় সাধ দিব তুলে, ওই চরণে তোমার।

তিনি অবশ্য বিয়ে করেছিলেন ব্রাহ্মমতে---কিন্তু ছেলে-মেয়েদের বিয়ে তিনি শালগ্রামশিলা সাক্ষী করে হিন্দুমতেই দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, তৎকালীন আমাদের সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল জাতের বাধা--- ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কিংবা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য এ-ধরনের বিয়ের প্রচলনই একেবারে ছিল না বললেই হয়, কিন্তু দেশবন্ধুই প্রথম সমাজে অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্তক। তিনি নিজে বৈদ্যের সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণ-তনয়াকে বিবাহ করেছিলেন। নিজের দুই মেয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কায়স্থের সঙ্গে এবং কনিষ্ঠাকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী বাংলা দেশে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ। সুতরাং হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজের কর্তাব্যক্তিগণই চরম ক্ষেপে গেলেন। সংবাদপত্রসমূহ আলোচনায় মুখর হলো, কিন্তু চিত্তরঞ্জন বদ্ধপরিকর। শুধু এটুকু করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আরও স্থির করলেন যে, ভাল পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ-বিবাহ-কার্য সমাধা করবেন---এর জন্য যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই প্রয়োজন তার কোন মানে নেই। পরে অবশ্য স্ত্রী বাসন্তী দেবীর পরামর্শে তিনি তাঁর এই মত পরিত্যাগ করেছিলেন। ছোট ভাই বসন্তরঞ্জনের বিয়ে দিয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মেয়ের সঙ্গে। এ-ব্যাপারে প্রথমটা চিত্তরঞ্জনের মা আপত্তি তুললে, তিনি তাঁকে বোঝালেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রকৃত ব্রাহ্মণ কারণ তাঁর মত জ্ঞানী ব্যক্তি আর নেই।

পুত্রের এই যুক্তির কাছে মা পরাস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মত দেন।

সত্যই তো জাত-গোত্রের মাপ-কাঠিতে মানুষের মনুষ্যত্বের বিচার নয়---তার মাপকাঠি হচ্ছে জ্ঞান বুদ্ধি। কিন্তু সেভাবে আজও আমরা কি মানুষের বিচার করি? ব্রাহ্মণ আজও বর্ণশ্রেষ্ঠের দাবী করে সমাজের চূড়ায় বসে আছেন, কিন্তু প্রাচীনকালের সে গুণ তাঁদের আছে কি।

তিনি মানুষকে ভালবাসতেন---গরীব দুঃখীর মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করতেন---তাই ঘৃণা দিয়ে নয়, ভালবাসা দিয়ে তিনি সবাইকে আপন বক্ষে স্থান দিতেন---সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের জন্যই তাঁর বক্ষে স্থান ছিল। তখনকার দিনে নারীজাতি শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রগতিতে অনেক পিছিয়ে ছিল, তাদের স্থান ছিল বলতে গেলে কেবল অন্তঃপুরে এবং কোনরকমভাবে যেমন তেমন একটা বিয়ে দিতে পারলেই নারী জীবনের চরম মোক্ষলাভ হয়ে যেত। দেশবন্ধু এদের জন্য অন্তরে বেদনা অনুভব করতেন, কারণ এরাও তো সমাজে পুরুষেরই সমান মর্যাদা প্রাপ্ত মানুষ, কিন্তু সমাজ এদের কোণঠাসা করে রেখেছে। কিন্তু পুরুষের পাশে নারী যদি তাদের কল্যাণ হস্ত নিয়ে এগিয়ে আসে তবে দেশ ও সমাজের মঙ্গল সন্দেহ নেই। তাই সে যুগের আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি নিজের পরিবারের মেয়েদের আধুনিকতার সংস্কার মুক্ততার মধ্যে মানুষ করেছিলেন এবং স্ত্রী, ভগ্নী সকলেই তাঁর দেশব্রতের সহায় হয়ে তাঁর পাশে এসে কেবলমাত্র দাঁড়ান নি, কারাবরণও করেছেন।

তৎকালীন সমাজে পণপ্রথার এক ভয়াবহ রূপ ছিল। এর জন্য কত মেয়েকে যে আত্মহত্যা করতে হত তার ইয়ত্তা নেই। তিনি এদের জন্য প্রাণে গভীর বেদনা অনুভব করতেন এবং বলতেন এর চেয়ে বিয়ে না দিয়ে এদের সমাজ-সেবামূলক কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে শেখালে লোকের মঙ্গল হবে। নারীর ধর্মই সেবা করা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

আর তাঁর এই কথার প্রতিরূপ ছিল তাঁর মেজ বোন অমলা দাশের জীবন। বিয়ে করেন নি---পুরুলিয়ায় একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সারাজীবন অনাথ আতুরদের সেবা করে মাত্র ৪২ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। আর তাঁর এই কর্মের উৎসাহদাতা এবং সাহায্যকারী ছিলেন তাঁর দাদা চিত্তরঞ্জন। বিধবাদের জীবনের এই যে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন, এর মধ্যেও প্রকৃত অর্থ তিনি খুঁজে পেতেন না। নারীদের জীবনের সর্ববিধ উন্নতি সাধন তাঁর অন্তরের স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সময় তিনি পান নি---কিন্তু তার পরিপূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর শেষ দানের মধ্যে। রসা রোডের বাড়ীটি তিনি দান করে তা নারীজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করে যান। সমাজে কেউ পতিত নয়---সবাই সমান। যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে সারা-জীবন আন্দোলন করে গেছেন গান্ধীজী তার জন্যও দেশবন্ধু প্রাণপাত করে গেছেন। সব মানুষের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান---তাই তো নিজের মায়ের শ্রাদ্ধের দিনে গরীব দুঃখী সকলের সংগে একাসনে খেতে বসেছিলেন তিনি। ভারতের দিক্‌পাল ব্যারিস্টার এতটুকু কুণ্ঠিত হন নি। বেলুড়মঠের উৎসবের সময় যখন দেখেছেন সবাই একাসনে খেতে বসেছে তখন তাঁর অন্তর পরিতৃপ্ত হয়েছে। ভগবানের মন্দিরে এই জাতিভেদ প্রথায় তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠত। তিনি বলতেন, এ মানুষেরই সৃষ্ট পাপ। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি। তাঁর বাড়ীতে ভেগাই নামক একটি নীচু জাতের লোক এলো। রান্নাবাড়ীর বারান্দার এককোণে তার খাবার ব্যবস্থা হল। কিন্তু জায়গাটি বড় অপরিষ্কার। বেচারা চিত্তরঞ্জনকে

অভিযোগ জানালো। চিত্তরঞ্জন তাঁর স্ত্রীকে এ ব্যাপার জানালেন। তিনি বললেন, আমি নিজে জাত মানি না তা তুমি জান, কিন্তু আমার তো পাঁচজনের মন রেখে চলতে হয়, তাই ওকে আর অন্য কোথাও খেতে দিই কি করে। চিত্তরঞ্জন বললেন, ঠিক আছে ওবেলা থেকে ও আমাদের সংগে টেবিলেই খাবে। সেদিন ওর প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গন করলেন। তিনি বলতেন, আমরাই এদের ছোট করে রেখেছি তাই ওদের এই অবস্থা।"

তিনি বুঝেছিলেন আমাদের সমাজের প্রাণকেন্দ্র পল্লী, তাই সমাজকে বাঁচাতে গেলে পল্লীগ্রামকে তার অভাব, ব্যাধি প্রভৃতির কবল থেকে মুক্ত করে তার বুকে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে হবে---এ স্বপ্নও ছিল তাঁর জীবনভোর--যার সূচনা দেখি ভবানীপুর প্রাথমিক সম্মিলনীতে এবং পরিসমাপ্তি দেখি জীবনের শেষ অভিভাষণে। পল্লী সংগঠনের জন্য অর্থও সংগ্রহ করেছিলেন তিনি, কিন্তু মহাকালের নিষ্ঠুর বিধানে নিভে গেল জীবনদীপ, তাই আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করতে পারলেন না তিনি। তাঁর সমাজ সংস্কারকের বিমূর্ত রূপ ফুটে উঠেছে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে। দেশবন্ধুকে যাঁরা ব্রাহ্ম বলে তৃপ্তি পান তাঁরা অন্তত এ ব্যাপারের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারবেন যে, দেশবন্ধু মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন---তাই হিন্দুর তীর্থ মোহান্তের অত্যাচার এবং অনাচারে কলুষিত হচ্ছে তা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এর জন্য তিনি যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজের পুত্রকেও তিনি এই আন্দোলনে পাঠিয়েছিলেন এবং বহু সহকর্মীর সংগে তাঁর পুত্রও কারাবরণ করেছিলেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে মোহান্তের অত্যাচার এবং অনাচার বন্ধ হয়ে তীর্থের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছিল। তাই বলি, দেশবন্ধুর জীবনের আর স দিকের মত এই অধ্যায়টিও কি তাঁ জীবনকে গৌরবোজ্জ্বল করে তো নি। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের বাঙা জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং সে উন্নতির পথে পরিচালিত ক তাদের জীবনে যে বাধাগুলো সেগুে অপসারণে বদ্ধপরিকর হয়েছিলে কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের সুবৃ তরঙ্গের এই ছোট ছোট তরঙ্গগুে শেষ পর্যন্ত হয়তো তীরে এসে পৌছ পারে নি।

এক্সপো-৭০ মেলায় অনুষ্ঠিত বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত মালয়েশিয়ার সুন্দরী শ্রীমতী জোসেফিন উংজ জেনকে বিশ্বসুন্দরীর মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন শ্রীমতী গ্লোরিয়া ডায়ার্স (১৯৬৯ সালের বিশ্বসুন্দরী)

বিকেল

সোনালী গঙ্গোপাধ্যায়

রোদ্দুর সরে গেছে দেয়ালের পারে।
ছায়াটা আমার পথ খোঁজে ফকিরের মতো,
একরাশ বাতি ফুটপাথের ওপরে
চেয়ে থাকে, ছায়াটা বিব্রত।
আকাশেতে চাঁদ নেই,
গলির কোণায় তার বাসা
বাই লেন, লেকপার ঘিরে
জ্বালে ফেলে ফুলের নির্যাস।
নীল লাল বাতি
চক্রবালে জ্বলে আর নেভে।
দু-একটা ট্যাক্সির সাথে কটি ছায়া
ছুটে যায় কি জানি কি ভেবে।
এপথে ওপথে বৈতালিক তান।
আপিস ফেরৎ ক'টি প্রাণী গল্প জোড়ে।
দিনান্তের স্বস্তি চলমান
ছায়াঘন অন্ধকার মোড়ে।

।

॥ তিন ॥

স্বামী বীরানন্দ গভীর চিন্তায় মগ্ন। সমস্ত উত্তরবঙ্গ বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেছে। মানুষ, গৃহপালিত পশু-পক্ষী, বন্য পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেরই একই অবস্থা। সবাই ভেসে চলেছে।

দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ জানে না, কোথায় গেলে একখণ্ড শুক্‌নো জায়গা পাওয়া যাবে। এই বন্যাকে মহাপ্লাবনরূপে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না। চোখের পলকে কোথা হতে তীরবেগে পথ ঘাট মাঠ জঙ্গল বাড়ী ঘর সব ডুবিয়ে---সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে---প্লাবনের জল ছুটে এসেছে।

দেশকে দেশ প্লাবিত করে যাচ্ছে---তা ক্ষুদ্র মানবশক্তির বোধগম্যের বাইরে। মহাপ্লাবনের এই রুদ্রমূর্তির মুখে যা পড়েছে---সবই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কুল্ কুল্ রবে সর্বনাশা স্রোতের জল ছুটে এসেছে কোন অচিন্ দেশান্তর হতে। যে পথে বন্যার জল ছুটেছে---সে পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে মহানদী গর্ভে। কোন্ পথে কোথা দিয়ে যে মহাপ্লাবন তার মরণের শিঙা হাতে নিয়ে মহাকালের নৃত্য করতে করতে আসছে, কোনও জ্যোতিষী বা বিজ্ঞানী পূর্বাহ্নে তা ঘোষণা করতে পারে নি।

দেখতে দেখতে গ্রামকে গ্রাম---তারপর শহরকে শহর সবই বিধাতার রুদ্র রোষে পড়ছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে কারও প্রতি বিধাতা পুরুষ তাঁর এই অসীম রুদ্র রোষ ফেল্‌তে কার্পণ্য করেন নি।

রাতদিন শোনা যাচ্ছে স্রোতের গুরুগম্ভীর গর্জন। প্লাবনের প্রথমার্ধে আকাশ, বাতাস ছিল স্তব্ধ। মূক সাক্ষীর মত চারিদিকের বৃক্ষাদি অবাক্ বিস্ময়ে দেখছিল প্রকৃতির এই সংহারলীলা।

হাজার হাজার গৃহ স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে গেছে। একদিকে বর্ষার অবিরাম ধারায় জল, অন্যদিকে ড্যামগুলি খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে জল বাড়তে সুরু করে দেয়।

গৃহপালিত জন্তু ও গরু বাছুরের লেজ ধরে অনেকে চেষ্টা করেছে কূলে উঠে যেতে। কিন্তু কোথায় কূল? স্রোতের মুখে তাল রেখে যখন তার চল্‌তে পারে নি,---তখন স্রোতের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে মানুষ তার সর্বস্ব নিয়ে।

কোথায় গোয়াল, কোথায় আস্তাবল, কোথায় গৃহীর গৃহ, হাট, বাজার, সাজানো বিপণি, অফিস, আদালত---স্রোতের কোলে চলে পড়েছে---তার কোন সঠিক হিসাব নেই। বাড়ীর ছাদও ডুবে গেছে অনেক জায়গায়। দরিদ্র মানুষ প্রকৃতির কবলে পড়ে যেন আবার সর্বস্বহারা হয়েছে।

ঘরের চালে অথবা গাছের ডালে জীর্ণ দেহে অভুক্ত অবস্থায় মানুষ দিন কাটিয়েছে। কিন্তু নিয়তির লেখন এত নির্মম যে, কোথাও তারা শান্তি বা সোয়াস্তিতে থাকতে পারে নি।

"মহত্ত্বের ভ্রূকুটির নীচে"---ক্ষুদ্রপ্রাণ হাতে নিয়ে মানুষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ ও ভয়ঙ্কর জীব, জন্তু ও প্রাণীর সাথে সংগ্রাম করে চলেছিল। গ্রাম ও কোন কোন শহরকে দেখে মনে হয়েছে সীমাহীন সাগর।

সর্বত্র জল আর জল। হয়ত দূর প্রান্তে কোথাও কোথাও কোন বাড়ির চালের অগ্রভাগটুকু এখনও সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ ভেঙ্গে শ্রাবণের ঢল্ নামছে। কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা আজও রোধ করতে পারে নি ভগবানের এই রুদ্র অভিশাপ।

গ্রাম হতে গ্রামান্তর, দেশ হতে দেশান্তরের টেলিফোন, টেলিগ্রাফের সব যোগাযোগ ছিন্ন। বড় ছোট সেতু---সব দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে জলের স্রোতের ধাক্কায়---যেন দুষ্টু ছেলে খেলা শেষে তার খেল্‌না ভেঙ্গে ফেলে গেছে। এই বাঁধগুলির ভয়াবহ পরিণতি দেখে বিধাতার অদ্ভুত শক্তির কথা স্মরণ না করে পারা যায় না। মানুষের সব বুদ্ধি, সব শক্তিকে বিভ্রান্ত করে তিনি তাঁর বিজয়-ভেরী বাজিয়ে যাচ্ছেন।

শিপ্রা দত্ত

সবই সর্বনাশী বন্যার বিরাট জঠরে বিলীন হয়েছে। স্থানাভাবে বন-জঙ্গলের যত বন্য পশু একটু শুকভূমির আশায় ছুটে এসেছে শহরের বুকে দিবালোকে। তাদের দেখে ভীত ত্রাসজড়িত চিত্তে মানুষ ছুটেছে।

এরই মধ্যে বিষধর সাপে সমস্ত দেশের গাছপালা ছেয়ে গেছে। তারাও মানুষেরই মত খুঁজছে কুটীরের সামান্যতম শুষ্ক স্থান। মানুষ, সাপ, পাখী একই সাথে কোন উচ্চ বৃক্ষ-শাখায় আশ্রয় নিয়েছে।

সন্তানের জন্ম হয়েছে বৃক্ষশাখায়। জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য সন্তান স্রোতের জলে কোথায় ভেসে গেছে কেউ তা জানে না। মানুষ কলাগাছের ভেলায় আশ্রয় নিয়েছে। কোথায় পথ, কোথায় মাঠ, ক্ষেত, কোথায় নদী তার কোন নিশানা নেই। চারিদিকে কেবল অথৈ জল, আর জল।

কত পশু, পক্ষী, মানুষ মহাপ্লাবনের

আলোছায়ার অন্তরালে

ঠক্তিক বৈজ্ঞানিক আজ তাঁর বিরাট দীর্ঘের কাছে নতমস্তকে বসে রয়েছে। নিষ্ফল হয়েছে বৈজ্ঞানিকের সব গবেষণার ফল। সবাই বুঝেছে, প্রকৃতির হাতে মানুষ ক্ষুদ্র ক্রীড়নকমাত্র।

এই মহাপ্লাবনের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে বাইবেলের সেই নোহ্‌র প্লাবনের ছবি। মুসলিমরা হেঁকে বলেছে—কেয়ামতের দিন এসেছে।

হিন্দুরা বলছে—এই বুঝি কলির শেষ।

বীরানন্দ স্বামীজীকে চিন্তান্বিত দেখে অন্যান্য মহারাজরা প্রশ্ন করলেন—স্বামীজী, আপনি কেন এত গভীর চিন্তায় মগ্ন?

—ভাবছি বন্যাত্রাণের জন্য আমাদের যেতে হবে। বন্যাত্রাণের জন্য সাহায্য ভিক্ষা আপনারা আজ হতেই বাড়ী বাড়ী গিয়ে তুলতে চেষ্টা করুন।

আপনারা মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন আছেন। অন্য সবাই বিদেশে নানা কাজে ব্যাপৃত—এই অবস্থায় কিছু ছাত্রকেও আপনাদের সঙ্গে পাঠাতে চাই। এর দ্বারা আমাদেরও কাজে সহায়তা হবে। ছাত্ররাও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ পাবে। ভাবছি কাকে কাকে আপনাদের সঙ্গে দেওয়া যায়। আপনাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই এই ত্রাণকাজে যেতে পারবেন। কারণ, এখানকার প্রতিষ্ঠান চালু রাখবার জন্য আপনাদের আমি ছাড়তে পারি না। পরন্তু আপনাদের ২।১ জনের সঙ্গে কয়েকজন উপযুক্ত ছাত্রকে পাঠাতে চাই। তাই ভাবছিলাম কাকে কাকে পাঠানো উচিত হবে।

শম্ভু মহারাজ উত্তরে বললেন—'আশ্রমে যারা সিনিয়ার ছেলে তাদের পাঠান।

—না, তা হয় না। সিনিয়রিটির দ্বারা এদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অনেক ছাত্র আছে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও কর্তব্যভ্রষ্ট, স্বার্থপর। বা দায়িত্ব পালনে অপারগ। আবার অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ আছে—যারা বুদ্ধিমান, কর্তব্যপরায়ণ, সহানুভূতিশীল। সুতরাং গুণের মাপকাঠিতেই বিচার করতে হবে তাদের যোগ্যতা। তবে বেশী ছোটদের পাঠান সমীচীন হবে না।

বৈকুণ্ঠ মহারাজ উত্তরে বললেন—তেমন ছেলেরও আমাদের কিছু অভাব নেই। রণবীরের সঙ্গী কয়জন, যেমন শেখর, গোপাল, বিনয়, প্রবাল, দুলাল, শংকর—এদের কয়েকজনকে অনায়াসে পাঠাতে পারেন। এরা প্রত্যেকেই রণবীরের কিছু কিছু গুণ পেয়েছে। তাছাড়া এদের প্রতি রণবীরের প্রভাবও অসামান্য নয়। এককথায় রণবীর এদের দলপতি। সুতরাং আমাদের যে কোন একজনের সঙ্গে এদের কয়েকজনকে পাঠালে দেখবেন স্বামীজী, এরা ভারী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ত্রাণকার্য সম্পন্ন করে আসতে পারবে।

স্বামী বীরানন্দ উত্তর দিলেন—রণবীরের প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস ও আস্থা আছে। রণবীরের নাম আমি সর্বাগ্রেই স্থির করে রেখেছি। ছেলেটির গুণের শেষ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মন যেন কেমন বিদ্রোহ করতে চায়। তার ধারণা, সে জারজ সন্তান। তাই আশ্রমে প্রতিপালিত হচ্ছে। অথচ তা সত্য নয়। তার বংশপরিচয় যা আমার কাছে আছে, তা এখন প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেই এই অভিমানী দামাল ছেলেটিকে আমি তুষ্ট করতে পারছি না। তার মনে শান্তিও এনে দিতে পারছি না। আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে, আপনারা সব সময়ই এই সব আশ্রমিকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন, যা'তে তারা কখনও স্নেহবঞ্চিত, অবাঞ্ছিত এসব কথা যেন মনে স্থান দিতে না পারে। অবাঞ্ছিত সন্তান যদিও এদের মধ্যে কয়েকটি আছে, তবু যার জন্মের জন্য সে নিজে দায়ী নয়—কেন তাকে সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? আমাদের আশ্রমের আদর্শে সবাইকে মানুষের সম্মান দিয়েই গড়ে তুলতে হবে। বংশপরিচয়ের বিচারে নয়। এই সব হতভাগ্যদের মধ্যে কারো কারো পঙ্কে জন্ম হলেও এরা যে পদ্ম হয়ে ফুটে উঠতে পারে—সেটাই তো আমাদের দেখাতে হবে। সেই যোগ্যতাই তো আমাদের প্রয়োজন। এদের দেশের ভবিষ্যৎ সুস্থ বিবেচক নাগরিকরূপেই আমাদের গড়তে হবে। যতটা সম্ভব আধুনিক সমাজের পঙ্কিলতা হতে এদের দূরে রাখবার চেষ্টা করবেন। ভাল কাজে এদের উদ্বুদ্ধ করবেন। এই কারণেই আমি এদের ত্রাণকাজে পাঠাতে চাই।

শম্ভু মহারাজ বললেন—স্বামীজী, আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম। আমরা রণবীরদের প্রস্তুত হতে বলব। আমাদের মধ্যে কাকে কাকে আপনি এদের সঙ্গে যেতে নির্দেশ দেন—সেটাও যদি আজ জানতে পারি, তবে আমরাও প্রস্তুত হব।

পত্রিকায় ও রেডিওতে উত্তরবঙ্গের যে ভয়াবহ খবরাখবর শুনছি—মনে হয় আমাদের আর বেশী দেরী করা উচিত নয়।

স্বামী বীরানন্দ উত্তর দিলেন—না, আর অধিক বিলম্বের প্রয়োজন নেই। আপনি ও কানাই মহারাজ এই কয়টি আশ্রমিককে নিয়ে আগামীকালই রওনা হবেন।

আজ সন্ধ্যায় রণবীরদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেব। আপনারা দু'জনও ওদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আসবেন।

আমাদের কাছে বর্তমানে যে সামান্য অর্থ, চাল ও কাপড়-জামা আছে—তাই নিয়েই আপনারা কাল যাত্রা সুরু করুন। পরে আমি আরও সাহায্য সংগ্রহ করে অন্য কোন মহারাজকে দিয়ে যথাসময়ে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

প্রকৃতির হাতে মানুষ ক্রীড়নকস্বরূপ। তবু মানুষের ধৃষ্টতার সীমা নেই। তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ছুটেছে চাঁদে, মঙ্গল গ্রহে। মানুষের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বা জ্ঞানপিপাসা

চরিতার্থ করার প্রয়োজন আছে আমি স্বীকার করি। কিন্তু যেখানে প্রতি ধছর প্রকৃতির এই বিদ্রোহ বা রুদ্র লীলাকে রোধ করতে বৈজ্ঞানিকরা পারছে না—যার ফলে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হচ্ছে, শত শত লোক প্রাণ হারাচ্ছে, সেখানে সুদূর গ্রহরাজ্যের রহস্যভেদের এই অপব্যয়কে আমি সমর্থন করতে পারি না। হয়ত মানুষের কৌতূহল নিবারণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন নয় কি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিকে রোধ করার প্রচেষ্টা করা।

দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘূর্ণিবাত্যা, ধস ইত্যাদি নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কেন এরা রোধ করবার চেষ্টা করছে না? প্রতি বছর সরকারের কোটি কোটি টাকা এর জন্য নষ্ট হচ্ছে এবং অগণিত প্রাণ ও ধনসম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে।

॥ চার ॥

শুভ্রাকে শৈশবাবস্থায় রেখে তার মা মারা যান। শুভ্রাদের প্রতিবেশী শুভ্রার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাহুল রায়ের স্ত্রী স্মৃতির কোন কন্যা সন্তান ছিল না। তাই তিনিই তাকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করেন।

যদিও শুভ্রার পিসীমা শুভ্রাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বৌদির মৃত্যুর পর---কিন্তু একমাত্র সন্তানকে অত দূর দেশে চোখের আড়াল করতে শুভ্রার বাবা হৃদয়-রঞ্জন সোম সম্মত হন নি।

রাহুলবাবুর স্ত্রী স্মৃতিদেবীর মনে সুখ ছিল না। রাহুলবাবুর বিরাট ব্যবসা। অর্থের ও প্রাচুর্যের অভাব নেই। কিন্তু তাঁর চারটি পুত্র --সবই বিকলাঙ্গ। একটি পুত্র শুভ্রার থেকে বছর কয়েকের বড়। যদিও সে সচল, কিন্তু তার মস্তিষ্কের যন্ত্রগুলি তেমন সচল নয়। সুতরাং বুদ্ধির স্ফূরণ তার তেমন হয় নি।

তাই স্মৃতিদেবীর মনে সুখ বা শান্তি নেই। বিকলাঙ্গ ছেলেদের মধ্যেও একজন ছাড়া অন্যরা সবাই জড়বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে। সুতরাং ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে তারা তেমন সজাগ নয়। পরন্তু নিজেদের সম্বন্ধে তাদের তেমন কোন ধ্যান-ধারণাই নেই।

কিন্তু এসব হতভাগ্য সন্তানদের দিকে যখন স্মৃতিদেবী তাকান, তখন দুঃখে তাঁর মন ভরে উঠে। কি পাপে --কার পাপে তাঁর প্রতিটি সন্তান এমন হল। কেউ-ই সুস্থ দেহ মন নিয়ে জন্মাতে পারে নি।

তাঁদের চতুর্থ ছেলে বিশ্বনাথকে শৈশবে মনে হয়েছিল --সে সুস্থই হবে। সুন্দর বিশ্বনাথকে তাই রাহুলবাবু ছোটবেলা হতে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশ্বনাথও বেশ কিছুদিন মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করেছে।

কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের উপরাংশের ভার ক্ষীণ পা দুটো যেন বইতে পারে না। তাই শৈশবের হাল্কা শরীরের ভারে যে পা দুটো সক্ষম মনে হত, সেই পা দুটো বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের ভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়ল। হেঁটে চলা আর বিশ্বনাথের পক্ষে সম্ভব হল না।

প্রথম সন্তান অমরনাথ ও দ্বিতীয় সন্তান শৈলনাথের জন্য অনেক অর্থ রাহুলবাবু ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু এদের জড়তা ও বিকলাঙ্গতা তিনি কোন চিকিৎসার মাধ্যমেই দূর করতে পারেন নি।

তৃতীয় সন্তান কৈলাস সুস্থ দেহে জন্মাল। রাহুল ও স্মৃতিদেবীর মধ্যে দেখা দিল আনন্দ। এতদিনে বুঝি ভগবানের দয়া হয়েছে। তাই তাঁরা মন্দিরে মন্দিরে পূজার ডালি পাঠাতে লাগলেন। স্মৃতিদেবী নানা ব্রত-পার্বণ সমারোহভরে করতে লাগলেন। এত দিনে বংশের দীপ জ্বালাবার জন্য ভগবান একজনকে পাঠালেন।

ধনী গৃহে কৈলাসের এই জন্ম উপলক্ষে প্রায়ই নানা পূজা, অর্চনা, পার্টি লেগেই রইল। শিশু বড় হল। হাঁটতে শিখল, কথা বলতেও শিখল।

বাবার আনন্দ যেন উপ্‌ছে পড়ছে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মা যেন ছেলের বুদ্ধিমত্তার তেমন শাণ নেই উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁর মনে যে আনন্দের বান এসেছিল, তা যেন কে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিল।

অমরনাথ ও শৈলনাথের জন্য তাঁর যত না দুঃখ হয়েছিল, কৈলাস যেন ততোধিক দুঃখের কারণ হল।

সুন্দর সুকান্তি সন্তান কৈলাস। কিন্তু নেই কোন বুদ্ধির দীপ্তি তার চোখে মুখে। পরন্তু যতই বয়োবৃদ্ধি হচ্ছে, তার বুদ্ধিহীনতার নানা প্রমাণ যেন প্রকাশ হয়ে পড়ছিল।

না— না— না —তা হয় না শুভঙ্কর, তা হয় না— ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে ওঠেন ইন্দোর যশোবন্ত রাও হসপিটালের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সার্জন ডাক্তার সুরঞ্জন রায়।

উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকেন, তুমি ভাবছ, তোমার বন্ধ্যা স্ত্রীর কোলে অনাথ আশ্রম বা কোথাও থেকে কোন শিশুসন্তান এনে তুলে দিলেই তার সব হাহাকার দূর হয়ে যাবে—আর তোমাদের সন্তানহীন সংসারে শান্তি নেমে আসবে। কিন্তু এমনি করে জীবনের সমস্যার সমাধান হয় না শুভঙ্কর, এমনি করে হয় না। তোমার এ ভুল আমি কিছুতেই করতে দেব না----

আমিও একদিন এমনি করেই---মাঝপথে অকস্মাৎ যেন প্রবল ধাক্কা খেয়ে থেমে যান ডাক্তার সুরঞ্জন----এ কি ভুল করতে যাচ্ছিলেন তিনি। উত্তেজনার বশে নিজের প্রাক্তন ছাত্রের কাছে অতীতের কোন বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের পৃষ্ঠা খুলে ধরতে যাচ্ছিলেন তিনি----না না—তিনি কোনমতেই পারবেন না, কোন বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের পাতা উল্টাতে শুভঙ্করের কাছে---অতীত মন্দ অতীতই হয়ে থাক।

একটানা কথা বলার জন্য মিনিট কয়েক হাঁপাতে থাকেন ডাক্তার সুরঞ্জন। বয়েস হয়েছে, সামান্য উত্তেজনা সহ্য হয় না। অস্থির হৃদয়কে শান্ত করতে কয়েক মুহূর্ত বিরতি দেন কথায়, তারপর ধীরপদে এগিয়ে আসেন শুভঙ্করের পাশে---আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত রেখে সস্নেহ কণ্ঠে বলেন— মাই বয়, ডোণ্ট মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি। তোমার চেয়ে আমার বয়েস অনেক— এবং জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও অনেক, আর সেই অভিজ্ঞতার দাবীতে বলছি যে, এমনি করে জীবনের সমস্যার সমাধান করা যায় না। তুমি জান না, অনেক সময় অনেক আশীর্বাদের পেছনে লুকানো থাকে অভিশাপ—অনেক লাভের পেছনে থাকে বৃহত্তর লোকসান, যাকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই না---যখন দেখতে পাই---তখন আর ফিরে আসবার উপায় থাকে না। তার চেয়ে তোমার স্ত্রী অনীতাকে বোঝাবার চেষ্টা কর যে, ভগবান যখন তাঁর আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত করেন, তখন মানুষ কি নিজের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সে রিক্তস্থান কোন উপায়ে পূর্ণ করতে পারে----- দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কথা শেষ করেন ডাক্তার সুরঞ্জন।

শুভঙ্কর ধীরে ধীরে নতমস্তক তুলে ডাক্তার সুরঞ্জনের পানে তাকায়—তারপর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, স্যার আজ সাত বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে---

চিঠি

[illegible]

আমি বারবার ওকে তাই বোঝাবার চেষ্টা করেই বিফল হয়েছি---এখন তো একরূপ পাগলপ্রায়---বলে যেখান থেকে হোক কোন শিশু এনে দিতে, তা না হলে যে বাঁচবে না---তাই বাধ্য হয়ে আজ এই কনকু খন-এতে এসেছি---শুভঙ্কর নীরব হয়।

ডাক্তার সুরঞ্জনের কণ্ঠ আবার কক্ষের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, নিরাশ হয়ো না, তুমি ডাক্তার —অনীতা আজ এক ধরণের পেসেণ্ট, ওকে রোগমুক্ত করাই তোমার কাজ। আবার ওকে বোঝাও---আজ হয়ত বুঝছে না—কিন্তু একদিন না-একদিন বুঝবে---তুমি সেই আশা নিয়ে থাক।

ডাক্তার সুরঞ্জন ক্ষণেক থামেন—একটা নিঃশ্বাস নেন---তারপর যেন সমস্ত প্রসঙ্গটায় অকস্মাৎ বিরতি দেবার উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন নিজের হাতঘড়ির পানে তাকিয়ে, কাল তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা কর— আজ আমার এক্ষুণি একটা এ্যাপয়েণ্ট-মেণ্ট আছে----

শুভঙ্কর আগামীকাল দেখা করবার স্বীকৃতি জানিয়ে বিদায় নেয়।

অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকেন ডাক্তার সুরঞ্জন শুভঙ্করের গমনপথের পানে। মিথ্যা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-এর ছল করে শুভঙ্করকে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কি করবেন তিনি, ভাল লাগছিল না ঐ প্রসঙ্গ---এ যেন বহুপূর্বে ঘটিত এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি----- মনে পড়াচ্ছিল কেবলই পেছনের দিনগুলোকে----সেই দিনগুলো নাকি মুছেও মোছে না—তাই মন চাইছিল এর থেকে মুক্তি—বাধ্য হলেন তাই মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিতে।

আজ বহুদিন পরে হঠাৎ যেন নূতন করে মনে পড়ে যায় ডাক্তার সুরঞ্জনের নিজের কথা। অজান্তে চোখ পড়ে সামনের দেয়ালে, যেখানে টাঙ্গান রয়েছে সুমনার ফটো----বিয়ের ছবি—পাশে দাঁড়িয়ে সেদিনকার সদ্য পাশকরা তরুণ ডাক্তার সুরঞ্জন। আজকের মত কেশে পাক ধরে নি—দেহের বর্ণ তামাটে হয় নি, চোখের দীপ্তি জ্যোতিহীন হয় নি। বয়েসের ছাপ আজ সারা শরীরে বিদ্যমান। আজ বহুদিন পরে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন ছবির পানে—বাসি বিয়ের দিনের ছবি---মনে হয় এই তো সেদিন। অথচ চৌত্রিশ বৎসর কবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে জানতেও পারেন নি তিনি। বারবার মনের সঙ্গে তর্ক করেছেন---ভেবেছেন অতীত মরা অতীত---যে অতীত কেবল দুঃখ দেয় তাকে মনে রেখে কি লাভ, বিস্মৃতির অতল তলে তাকে বিলীন করে দেওয়াই শ্রেয়---অথচ হেরে গেছেন সম্পূর্ণভাবে তিনি, পারেন নি তা আজও। মনের খাঁজে খাঁজে সেদিনের সব কথাগুলো নিপুণভাবে আজও সাজানো আছে। কিছু ভোলেন নি ডাক্তার সুরঞ্জন, সব মনে আছে। স্মরণের মণিকোঠায় আজও সেদিনগুলো অক্ষয় অম্লান হয়ে জেগে আছে। বয়েস তাঁর স্মৃতিশক্তিকে বিলুপ্ত করতে পারে নি। দিনগুলোই কেবল এগিয়ে গেছে---মনে হয় আজও তিনি পেছনেই রয়ে গেছেন।

সুমনাকে বিয়ের সাজে দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় কোন একদিনের

ঘটনা। সুমনার কোন এক আত্মীয়ার বিয়ে ছিল। রাত্রে সুমনাকে বিয়েবাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়ারা আসতে দেন নি---একরূপ জোর করেই আট্‌কে নিয়েছিলেন। ডিনার শেষে রাত্রে ডাক্তার সুরঞ্জন ফিরে এসেছিলেন। রাত্রি প্রায় একটা ডাক্তার সুরঞ্জন পড়ছিলেন সদ্য-কেনা একটা ডাক্তারী বই। হঠাৎ সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দে সাশ্চর্যে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন---দেখেন সুমনা। বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলেন এ কি তুমি চলে এলে যে? ওঁরা কি মনে করলেন বল তো?

কাছে এসে সুমনা আদুরে মেয়ের মত তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল তা মনে করলে আর কি করব বল ---তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও থাকতে পারব না।

সেই সুমনা কত সহজেই মিথ্যা জনশ্রুতিকে মেনে নিল---লোকের কথাকে গুরুত্ব দিল। তাঁকে কোন কথা জানাল না---তাঁর কোন কথা জানল না। কত সহজেই তাঁকে ছেড়ে চলে গেল স্লিপিং ট্যাবলেটগুলো খেয়ে।

ধীরে ধীরে চোখ এসে পড়ে পাশে টাঙান খোকনের ছবির ওপর। সুমনার আদরের খোকন---বড় আদর-যত্নে মানুষ করেছেন খোকনকে ডাক্তার সুরঞ্জন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় গেল---আর ফিরল না। বিদেশিনীকে জীবনসঙ্গিনী বেছে নিয়ে সেখানেই স্থায়িভাবে বাসা বাঁধল। চিঠি দিয়েছিল বৈকি বিয়ের পর---সব খবর জানাবার পর লিখেছিল উপসংহারে, ডাক্তার সুরঞ্জন যেন তাকে ক্ষমা করেন---আর আশীর্বাদ ভিক্ষা চেয়েছিল।

ডাক্তার সুরঞ্জন আশীর্বাদ জানাতে কার্পণ্য করেন নি। আর ক্ষমা। কথাটা ভাবলে আজও হাসি পায় ডাক্তার সুরঞ্জনের। খোকন জানে না তাঁর একটুও দুঃখ হয় নি। দুঃখ করতে ডাক্তার সুরঞ্জন ভুলে গেছেন, তিনি জানেন দুঃখ করতে পারাটাও একটা বিলাস---সেটা সবার জন্য নয়। তিনি কত আরাম পেয়েছেন, খোকন তাঁকে সব দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে, নিশ্চিন্ত করে গেছে---তার জন্যে মনে মনে তার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। সুমনা নেই, খোকন নেই---আজ আর নূতন করে কারো জন্য ভাববার নেই, ভাবতে গেলে শুধু পেছনের কথা মনে পড়ে যায়। আগে কাজের মাঝে ডুবেছিলেন দু'বছর ধরে তাও নেই---অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন কাজ থেকে অতএব কাজের মাঝে ভুলে থাকবার সুযোগটুকুও হারিয়েছেন, আজ খালি নিরবচ্ছিন্ন অবসর।

মাকে কোনদিনই মনে পড়ে না---বাবাকে আবছা মনে পড়ে---সেও-না পড়ার মত---ভাই-বোন ছিল না। দিদিমা-দাদু বর্জিত মামার বাড়ীতে অনাদরে, অবহেলায় মানুষ। বিরাট বাড়ী---অসংখ্য লোকজন। আশ্রিতের সংখ্যাও কিছু কম ছিল না। তার মাঝে সেদিনের বালক সুরঞ্জন নিজের স্থান খুঁজে নিয়েছিলেন। লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন, তাই স্কলারশিপ পেয়ে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র, আর বুঝেছিলেন যে, বড়লোকেরা আশ্রিতদের দয়া দেখাতে পারে, কিন্তু স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ সেখানে আশা করা দুরাশা মাত্র। তাই কোনমতে মানুষ হয়ে দাঁড়াবার পর তাঁরা তাঁকে চাকরী স্থলে বিদায়

[illegible]নের এক্সপো মেলায় ১৯৭০ সালের বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারিণীরা

দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন---তিনিও সরে এসেছিলেন চিরদিনের মত। আজ তাই সবদিক দিয়ে মুক্ত। কর্মব্যস্ত জীবনের ছুটি। কিন্তু স্মৃতির কাজল আজও মুছতে পারেন নি ডাক্তার সুরঞ্জন, তাই কেবল মনে পড়ে যায় হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলোকে বারবার। যেন জট পাকিয়ে যায় বারবার---ডাক্তার সুরঞ্জন, খোলেন একের পর এক---সে এক বিচিত্র কাজ। এই স্মৃতির জট খোলার মাঝেই দিনগুলো একের পর এক কেবল এগিয়ে যায়।

জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ান ডাক্তার সুরঞ্জন---শূন্য দৃষ্টিতে দূরের পানে চেয়ে থাকেন---শুভঙ্করের কথা মনে জাগে। বন্ধ্যা স্ত্রীর মনোবেদনা দূর করতে চান। সন্তানহীন সংসারে আছে কেবল নিরানন্দ আর অশান্তি। শান্তি আনবার জন্য আনতে চায় অনাথ আশ্রম বা কোথাও থেকে কোন শিশু---যার পদধ্বনিতে বেজে উঠবে সংসারে নূতন সাড়া---কলাকলিতে ধ্বনিত হবে বিশ্বের চিরন্তন সুর।

এমনিভাবে সন্তানহীনতার সমস্যা দূর করতে চায় শুভঙ্কর। ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে ডাক্তার সুরঞ্জনের ঠোঁটের কোণে বড় বেদনার হাসি ব্যর্থতার চিহ্ন প্রতিফলিত হয় সারা মুখে। বহুদিন আগে তিনিও এমনি করেই চেয়েছিলেন নিজের সংসারে শান্তি আনতে—তাই বন্ধ্যা নারী সুমনার কোলে তুলে দিয়েছিলেন হাসপাতাল থেকে আনা অনাথ শিশু। শিশুটি ছিল হয়ত তার জননীর কলঙ্কের জ্বলন্ত স্বাক্ষর—তাই তার জন্মের মাত্র কদিন পর সদ্যোজাত শিশুর জননীকে মেটারনিটি ওয়ার্ডে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আজও সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে—হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে সাড়া পড়ে গিয়েছিল শিশুটিকে কেন্দ্র করে। তারপর ওপর-ওয়ালা থেকে হুকুম আসে শিশুটিকে পুলিশের তত্ত্বাবধানে দেবার। ডাক্তার সুরঞ্জন জানতে পারেন, মনে পড়ে যায় সুমনার কথা---সন্তানের জন্য পাগল---কতবার কেঁদে বলেছে, তুমি অনাথ আশ্রম থেকে কোন শিশুকে এনে দাও—তা না হলে আমি বাঁচব না।

ছুটে আসেন মেটারনিটি ওয়ার্ডে—৷-কর্তাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন শিশুটিকে নেবার জন্য, অতি সহজেই অনুমতি পেয়ে যান। তারপর সুমনার কোলে এনে তুলে দেন শিশুটিকে। সেদিনকার সুমনার আনন্দ ডাক্তার সুরঞ্জন আজও ভোলেন নি। সুমনার বিষাদ, সুমনার বিরক্তি—সব মুছে গিয়েছিল খোকনকে পেয়ে। সুমনার দিনগুলো নূতন সুরে লয়ে ছন্দে ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল। সংসারে পরম শান্তি এসেছিল। ডাক্তার সুরঞ্জন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। মনে পড়ে কতবার তিনি সুমনাকে দুষ্টুমি করে বলেছেন—দেখ, খোকনকে পেয়ে তুমি আমার কথা একেবারেই ভুলে গেলে—

সুমনা খোকনকে নিয়ে আদরের সঙ্গে নাচাতে নাচাতে উত্তর দিয়েছে, ইস্‌ হিংসে হচ্ছে বুঝি খোকন সোনার ওপর?

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

জাপানের ওসাকায় এক্সপো-৭০-এ বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারিণী ভারতের শ্রীমতী বীণা সজনানি

নাইজিরিয়ার সজল সতেজ সবুজের পরিবেশ থেকে এসে পড়লাম একেবারে যন্ত্রশাসিত আমেরিকার কলরবের মাঝখানে। নাইজিরিয়া থাকাকালীন আলাপ হয়েছিল এক মার্কিন নৃত্য-শিল্পীর সঙ্গে। মডার্ন ব্যালে করত। আমার নাইজিরিয় নৃত্য-শিল্পী বন্ধু আসাকিয়ে আমেরিকায় মডার্ন ব্যালে শিখেছিল। ওদের কাছে এই নূতন নৃত্যধারার কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছিলাম। এর আগে ছাত্রীজীবনে কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে মডার্ন ব্যালের জন্মদাত্রী মার্থা গ্রাহামের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম বিখ্যাত জাপানী শিল্পী নগুচির মঞ্চসজ্জা ও শ্রীমতী গ্রাহামের নৃত্যে ফণিমনসার বনের মত মানুষের কণ্টকাকীর্ণ মনকে বিষয়-বস্তু করা, গ্রীক ট্র্যাজেডির নৃত্যরূপ দেওয়া দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। নৃত্যের এ ভাষা আগে গোচর ছিল না। আমেরিকা আসবার কথাতেই মনে হয়েছিল ওদেশে নিত্য নাচের নতুন ভাষা খুঁজছে। নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

যাবার পথে পঃ জার্মানীতে আমার অনুষ্ঠান ছিল। সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যখন জানলাম মিউনিকের যেখানে (কুনট্সলার হাউসে) আমার অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল, সেই এক সময় বিখ্যাত মার্কিন নৃত্য-শিল্পী ইসাডোরা ডানকান নৃত্যানুষ্ঠান করেছিলেন। এই শিল্পীকে আমাদের দেশে অনেকেই জানেন তাঁর আত্মজীবনীর মাধ্যমে। পাশ্চাত্যের নৃত্যজগতে ওঁর স্থান কিন্তু সৃষ্টিধর্মী নৃত্যের প্রেরণারূপিণী রূপে। উচ্চাঙ্গ ব্যালে নৃত্যের জটিল আঙ্গিকে যখন মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তখন ইসাডোরা এনেছিলেন নৃত্যে সহজ সৌন্দর্যের বন্যা। গ্রীক ভাস্কর্যের ঢিলা পোষাক, চাদরের ব্যবহার ও নৃত্য-ভঙ্গীর সরলতা ওঁকে আকর্ষণ করেছিল। নদীর জলের মত ওঁর সমগ্র দেহ নাকি তরঙ্গায়িত হত নৃত্যের সাবলীল ছন্দে। মার্কিণ দেশের আধুনিক নৃত্যের জন্ম-ইতিহাসের গোড়ায় ইসাডোরার দান অসামান্য।

বর্তমান আমেরিকার আধুনিক নৃত্যের জগতে মার্থা গ্রাহামের সঙ্গে আরো দু'জনের নাম পুরোধায় উল্লেখ করতে হয়। এঁরা হচ্ছেন রুথ সেণ্ট ডেনিস ও টেড শ্যান। শ্রীমতী ডেনিস এক সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে নৃত্য করেছেন। নব্বুই-এর কোঠায় বয়স হয়েছিল। মাত্র দু'বছর গত হয়েছেন। শোনা যায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি নৃত্য রচনা করে গেছেন। ওঁর শেষ বয়সের নৃত্য গভীর অধ্যাত্মধর্মী হয়ে উঠেছিল। টেড শ্যানের গল্প নাইজিরিয়ায় আসাকিয়ের কাছে

শ্রীমঞ্জুশ্রী চাকী-সরকার

শুনেছিলাম। সবাই এঁকে ডাকে PaPa Shawn। বয়স আশীর কোঠায়। এক সময় শ্রীমতী ডেনিস ও টেড শ্যান 'ডেনিশ্যান' নাম দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া একটি আধুনিক নৃত্যের কেন্দ্র করেছিলেন। ওদেশের বহু নামকরা নাচিয়েরা এই কেন্দ্রতেই প্রথম শিক্ষানবিশী করেছেন। মার্থা গ্রাহাম, এরিক হকিন্স, হোসে লিমন ও তাঁদের উত্তরসূরি পলটেলর, মার্কস কানিংহাম, ইভরিকো, ইথেল উনইটার প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা সব ঐ একটি ধারা থেকেই প্রেরণা পেয়েছেন। পরিণত জীবনে এঁরা সবাই একটি নিজস্ব 'স্টাইল' সৃষ্টি করেছেন।

ম্যাসাচুসেট্স-এর 'লী'তে বিরাট একটি অংশ জুড়ে টেড শ্যানের নৃত্য প্রতিষ্ঠান 'Jacob's pillow" অনাড়ম্বর পরিবেশ। শ্যান ঐ অঞ্চলের Firmborn কিছুই নষ্ট করেন নি। গ্রীষ্মকালে অজস্র ফুল ফোটে ঐ অঞ্চলে। জঙ্গলে ভেড়া, গরু চরে বেড়ায়। ওদেশে এ ব্যাপারটি দুর্লভ। শান্ত আশ্রমের পরিবেশ। গ্রীষ্মকালে ৩।৪ মাস ওখানে নাচিয়েদের মেলা বসে। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পীরা Jacob's pillow মঞ্চে, মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠান করে যান। আধুনিক নৃত্যে শ্যান পুরুষ শিল্পীদের বিরাট উপকার করে গেছেন। পাশ্চাত্য নৃত্যে আমাদের দেশের মত সুগভীর নটরাজের ভাবনা নেই। নৃত্যে পুরুষের যতটাই অংশ হোক না কেন, সে সব-সময়েই যেন ব্যালেরিনাকেই সামনে রেখে চলে। অবশ্য বিখ্যাত নিজিনস্কি সে যুগের প্রায় সব ব্যালেরিনাকেই ম্লান করে দিয়েছিলেন। পুরুষের দেহ থাকত আবৃত। শোনা যায় একবার স্বল্পবাস পরবার জন্য নিজিনস্কিকে বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল, অথচ ব্যালেরিনার পোষাকটিতে দু'টি পা থাকত সম্পূর্ণ অনাবৃত। শ্যান ওদেশে প্রথম 'All male dance Company' করেছিলেন। এ যেন অনেকদিনের পোষা ক্ষোভের ঝাল মেটানর মত। এবার নৃত্যজগতে একটি বিপ্লব এল। আজকালকার আধুনিক নৃত্যে স্ত্রী-পুরুষ সম-অধিকারে নৃত্য করে। পুরুষ শিল্পীদের দীর্ঘ পেশীবহুল দেহ প্রায় অনাবৃত থাকে। শীর্ণ লতার মত চেহারা নারী শিল্পীদের। আমাদের দেশের রুচিতে ঠিক পূর্ণাঙ্গিনী নন। এরা বেশীর ভাগ সময়ই পরে আঁটো লিওটার্ড।

এখন ওদেশে আধুনিক নৃত্যে নিত্যনূতন চিন্তা, স্টাইল দেখা যাচ্ছে। অনেকের মতে মার্থা গ্রাহাম সেকেলে

আমি পরবাসী

হয়ে গেছেন। গত বছর নিউ ইয়র্কে মার্থা গ্রাহামের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ওঁর আগেকার তৈরী গ্রীক ট্রাজেডি 'ক্লাইমেনস্ট্রা' দেখলাম তৃতীয়বার। ওঁর নিজের বার্ধক্য (শোনা যায় সত্তরের কোঠায় এখন উনি) ওঁর চরিত্রের দেহভঙ্গীর উদ্দাম বলিষ্ঠতাকে সংকুচিত করলেও, ওঁর অভিনয়ে একটি আশ্চর্য দীপ্তি ও একটি অন্তঃশক্তি দেখা দিয়েছে। আর একটি নূতন নৃত্য দেখলাম "The time of snow" অনুষ্ঠানের শেষে গ্রাহাম এসে দাঁড়ালেন ওঁর পেছনে ওদেশের ১২ জন ডাকসাইটে নাচিয়ে। দেখে শ্রদ্ধা হল। উনি তো আর বেশীদিন নাচবেন না, কিন্তু পিছনে রেখে যাচ্ছেন একটি বলিষ্ঠ জীবন্ত নৃত্যধারা।

ওদেশে আধুনিক নৃত্যের নূতন অনুষ্ঠানগুলি দেখে আবার একটি আশঙ্কা জাগল মনে। ওরা ব্যালের জটিলতা থেকে মুক্ত হবার প্রয়াসেই সৃষ্টিধর্মী নৃত্যের চর্চা সুরু করে। এখনকার নৃত্য যেন ব্যালের জটিল আঙ্গিককে অনেক অতিক্রম করে যাচ্ছে। শরীর গঠনের পদ্ধতি ব্যালের চেয়ে কিছু কম আয়াসের নয়। দিনে ৭।৮ ঘণ্টা একটানা ব্যায়াম চলে শরীরকে স্বচ্ছন্দ গতি দেবার জন্য। আঙ্গিক ও ভাবনা দুটো দিক দিয়েই এই নৃত্যকে তুলনা করা যায় আধুনিক সাহিত্য, চিত্রকলার সঙ্গে। প্রাচীন রীতিতে কেবল সুন্দর, মধুর-ই নৃত্যের উপজীব্য। ব্যালে যেন গীতি-কবিতার মত স্বপ্ন-মধুর। আধুনিক নৃত্যের ঘাত-প্রতিঘাত একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে টেনে আনে। ওরা বলে 'ড্যান্স ইজ এ মিডিয়াম অব এক্সপ্রেসান অব লাইফ'। জীবনকে ওরা প্রকাশ করতে চায়—তার কোন অংশই শিল্পের দৃষ্টিতে অসুন্দর নয়। সেখানে রোমাঞ্চের দৃশ্যে সব সময় পাখীর গান শোনা যায় না, আকাশে চাঁদও ওঠে না। মার্কস কানিংহাম একবার নিউ পালতসে নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিরাট দল এনেছিলেন। এত বড় দল বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে ধরল না। জিমনাসিয়ামের মধ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হল। প্রায় ৫ হাজার দর্শক বসল জিমনাসিয়ামের চারপাশের গ্যালারীতে। যন্ত্রপাতি, আলোর সরঞ্জাম সব চারদিকে ছড়ান। কেবল একটি আলোর মায়া সৃষ্টি করে নৃত্যশিল্পী আর দর্শকের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি নৃত্য দেখে মনে হল যেন একটি ঘড়ির পেছনের ডালা খুলে ভিতরটা দেখছি। প্রত্যেক ভঙ্গী, প্রত্যেকটি চলা অসংখ্য বিপরীতের মাঝখানে একটি অলক্ষ্য নিয়মে একতান সৃষ্টি করছে। কম্পিউটারের আওয়াজ, বাস, সাবওয়ের ঘর্ঘর কর্কশ শব্দ, টেলিভিসনের বিজ্ঞাপনে deodorant-এর বর্ণনা—এই হল আবহসঙ্গীত। তারই মধ্যে একটি মধুর প্রেমের দৃশ্য। প্রেয়সী পরমনির্ভরে প্রেমিকের কণ্ঠলগ্না। একটি নৃত্যে ছিল নানা রঙের জিন্ আর সার্ট পরা ছেলেমেয়েদের ছন্দ। মাঝে মাঝে আধুনিক চিত্রপটের মত ওরা থমকে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছিল যেন চলমান আব্‌সট্রাক্‌ট চিত্রাবলী দেখছি। এই নৃত্যটি দেখে চঞ্চল হয়ে উঠেছি এমন সময় পাশের মার্কিন শিল্পী প্যাট জেকবসন বলল,

নৃত্যরতা মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার

"এদের ভিতরে বড় নাচ নাচ ভাব। আমার তেমন ভাল লাগছে না"।

সংশয় হয় ওরা না আধুনিক নৃত্যে নৃত্যকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে। ওদেশের এক-একটা নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখে দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মনে হত, কিন্তু নৃত্যের মুক্তির স্বাদ যেন পাই নি। এ যেন আঙ্গিকের কবল থেকে ছাড়া পেতে গিয়ে আরেক জালে জড়িয়ে পড়া। ওদের যন্ত্রপিষ্ট মনস্তত্ত্বের জগতে নৃত্য-শিল্পীরা হারিয়ে যাচ্ছেন। ওদের ব্যক্তিগত জীবনে কথায় কথায় বলে---Tension---'Nervousness'-এ ভাবটা নাচেও এসে গিয়েছে। ওদের এই জটিল চিত্রগুলি মাঝে মাঝে বেশ উপভোগ করার মত। এক বন্ধু বেড়াতে গিয়ে হোটেলে রিজার্ভেশন করতে পারে নি ছটফট করে সেই গল্প শোনাতে গিয়ে বলে "Tranmatic Experience" দুই প্রতিবেশীর বনিবনা হল না তার নাম হল 'পারসোনালিটি কনফ্লিক্ট, এ ছাড়া কথায় কথায় সেই "Lack of Communication"---এসব শব্দের ব্যূহে আমার সত্যিই সংশয় হচ্ছিল কমিউনিকেশন-এ নিশ্চয় কোথাও গণ্ডগোল হচ্ছে। ভাল লাগলে চালু ভাষা 'ডিভাইন স্পিরিচুয়াল'---নয়ত হিপি ভাষায় 'Groovy' Psyciatrist-এর কাছে যাওয়া গুরুবাড়ী যাবার মত। অন্য দিকে যতই খরচ সংকোচ হোক Psyciatrist-এর দর্শনী দিতে কারো কার্পণ্য দেখি না। আধুনিক নৃত্য অই খাঁটি আমেরিকান। ওদের মনোজগতের স্বাভাবিক সৃষ্টি এমন ধারারই হবার কথা।

মাঝে মাঝে দু'একজন শিল্পী খোলা হাওয়ার সন্ধান দেন।

প্রবীণ শিল্পী হোসে লিমনের একটি নৃত্যের নাম ছিল The winged, আবহসঙ্গীত নানা পাখীর কলরব সকাল- দ্বিপ্রহর-সন্ধ্যায় রেকর্ড করা। এ যেন একঝাঁক পাখীর একদিনের জীবনের মধ্যে মানুষের জীবনকেই সন্ধান করা। শিল্পীরা তাই কখনো মানুষ কখনো বা পাখী।
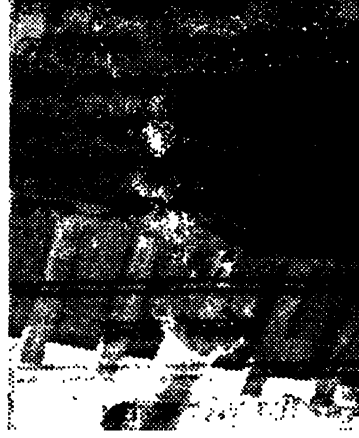
ওদেশের নৃত্যজগতে একটি বড় বিস্ময় লক্ষ্য করেছিলাম যে নৃত্যজগৎ যেন কেবল নৃত্য-শিল্পীদের মধ্যে আবদ্ধ ও নয়। কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর সকলের ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্র এই নৃত্যজগৎ। একএকটি স্মরণীয় নৃত্যানুষ্ঠানের পেছনে এঁদের দান অসামান্য। নৃত্যের অভিব্যক্তি এঁদের আকর্ষণ করে। মার্থাম গ্রাহামের কোন অনুষ্ঠান কল্পনাই করা যায় না। যদি বিখ্যাত জাপানী আমেরিকান শিল্পী নগুচিকে বাদ দেওয়া হয়। নৃত্যশিল্পী হিসাবে শ্রীমতী গ্রাহামই সর্বপ্রথম ডিরাচরিত ক্যানভাসের ওপর আঁকা চিত্রাবলী বর্জন করে এক-একটি ভাস্কর্যকে মঞ্চসজ্জার অঙ্গ করে তোলেন। ওঁর '3-dimensional' মঞ্চসজ্জা পশ্চিমের কেবল নৃত্যেই নয় নাট্যমঞ্চেও একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। এরপর বহু শিল্পী ও ভাস্কর মঞ্চসজ্জায় ক্রমশ সক্রিয় অংশ নিতে সুরু করেন।

মার্থা গ্রাহামের নৃত্যের প্রত্যেক চরিত্রের উপযোগী করে শিল্পী নগুচি এক-একটি ভাস্কর্যের কবিতা রচনা করেন।

"The forms are not literal representation but rather the artists transposed symbols of the scene of action."

একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চসজ্জায় রঙ ও নক্সা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়।

মার্থা গ্রাহামের একটি নৃত্যানুষ্ঠান সঙ্গীত জগতেও একটি অভিনব সৃষ্টি। সঙ্গীত রচিত হয় কেবল শ্রীমতী গ্রাহামের নৃত্যের উপযোগী করে। মেনোত্তি, এ্যারন কোপল্যাণ্ড, পল হিণ্ডস্মিথ, স্যামুয়েল বার্বর, উইলিয়ম শুম্যান প্রমুখ প্রখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতারা শ্রীমতী গ্রাহামের সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন।

[ক্রমশ।

জাপানের এক্সপো-৭০ মেলায় রাষ্ট্রসংঘ মণ্ডপে ভারত-সুন্দরী শ্রীমতী সজনানি শান্তিঘণ্টা বাজাচ্ছেন

[বড় গল্প]

অভিশপ্ত

অনিল জানা

[এ গল্প কোন কবি-জীবনের সত্য কাহিনী নয়। তবে অনেকের সঙ্গে এ গল্পের মিল ঘটবে---একথা জোর দিয়ে বলা যায়]

কবি কাজারিয়ার লেখা উপন্যাসের মাত্র এক অধ্যায় পড়লাম। প্যাঁচার রব শুনে বুঝলাম---রাত্রি এক প্রহর হ'ল।

শহরতলী কলকাতায় কাঠের পুল-সংলগ্ন বাঁশদ্রোণী খালের তীরে কবির আবাসস্থল ঘরখানির সর্বত্র সর্বস্বান্ত জীবনের সুস্পষ্ট আভাস। কঙ্কালসার কাটাল ধর ঘর। ভূতের মতো হাওয়ায় যেন হুঁ হুঁ করতে চয় যেন য-কোন সময়ে ধ্বসে পড়বে। মেঝেতে অসংখ্য ক্ষতের চিহ্ন। ভাঙা চেয়ার, ভাঙা টেবিল, ভাঙা খাট, পুরনো আলমারি ---অপর আসবাবের মধ্যে যা কিছু প্রায় সকলই ভাঙাচোরা, সকলই ছিন্ন-ভিন্ন। উইকাটা পুঁথিপত্র যেখানে যেগুলি, সেও অনেককাল আগের। সেগুলোর কোনটা ছন দিয়ে বাঁধা, কোনটা বা পাকান দড়ি অথবা শাড়ীর পাড় দিয়ে।

ভেতর থেকে দরজা খুললেই কবির বসবার চেয়ার থেকে লক্ষ্যে পড়ে---পাশের ঘরের রান্নাশাল, সাধারণ হাঁড়িকুড়ি ---একখানি কুলুঙ্গি বোঝাই শিশি-বোতল---আর কিছু মশলার ডিবে। ভাঙা কাতান, শিল-নোড়া, একখানা কয়লার উনান।

এই ছিল কবির সংসার।

শ্রাবণ মাস। ঝিল্লীমুখর রাত। একটি সোনা ব্যাঙ্ কোথায় যেন কোঁ-কোঁ ক'রে একটানা ডেকে চলল। ঝড় নেই, আকাশে মেঘ ছিল। বেশ ভরা মেঘ। পথের বাঁকে বাঁকে তাল, খেজুর, নারিকেল হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল। নিম, অশ্বত্থ, বটের পাতারা পথের বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছিল।

জানালার উত্তরে খালের জলরেখা কুমারী-যৌবনের মোহ বিস্তার ক'রে যেন কোন্ অদৃশ্যালোকে মিশে গেছে। স্থল-কলমীর অশক্ত গুঁড়িতে বাঁধা ছিল মালবাহী একখানি ছোট ডিঙি। হাওয়ায় দোল খাচ্ছে ডিঙি। হাল ধরার মাঝি নেই সেখানে।

আমি ঘরের কোণে বিষণ্ণ কেরোসিন শিখার আলোয় সেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসে রয়েছি।

সহসা একরাশ বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগল। আমার তপ্ত দেহকে হিম ক'রে দিয়ে গেল। কবির দীর্ঘশ্বাস নয় তো। তার অতৃপ্ত আত্মার হা-হুতাশ নয় তো! ভয়ে শিউরে উঠলাম।

কবির কাহিনী অনেকটা শুনেছি কি না। দুঃখের জীবন ছিল কবির। বড় জ্বালা-যন্ত্রণার হাতে লাঞ্ছিত হ'য়েছিল কবি।

তার কথা ভাবতে গিয়ে, চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেও কোন্ অন্তর্লোকে হারিয়ে গেলাম। কীট-পতঙ্গের একটানা গুঞ্জন ক্ষণিকের মধ্যে অন্তর্হিত হল। বর্ষা-সুন্দরী বসুন্ধরা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল আমার দু-চোখের সামনে থেকে। বাতাসেরও আলোড়ন অনুভূত হ'ল না।

সেই জীর্ণ ইঁটের কঙ্কালের মধ্যে আমি যেন এক অমৃতপাত্রের সন্ধান পেলাম।

কবিতা ডাক ছাড়ল---সতুদা।

আমার পুরো নাম হ'ল সত্য সেন। তা সে শৈশবকাল থেকে আমাকে সতুদা, সতুদা ব'লেই ডাকত, শুনেও যখন শুনলাম না, কবিতা ডাক দিতে দিতে দিতে এগিয়ে এল---সতুদা, এ কি! ঘরের আলো নিভিয়ে একা অন্ধকারে ব'সে আছ।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললাম---না কবিতা, আলো আমি তো নেভাই নি। প্রতিকূল সংঘাতে যখন টিকতে পারল না, যখন দুর্বল হয়ে গেল---আমিও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি।

কবিতা বলল---জানো, এমনিভাবে আমিও পারি নি একটি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে। কত সংগ্রাম করেছি ওর জন্য---কত দুঃখ-কষ্ট সয়েছি---কত লাঞ্ছনা পেয়েছি। কত রাত আমি ওর জন্য ঘুমোই নি। তবু মা গো---আমার হার হ'য়েছে। যে ফুল ঈশ্বর ফুটিয়েছিলেন, সকলের অজ্ঞাতে, দিনের প্রখর রোদে তা অকালেই শুকনো হ'য়ে ঝরে গেছে, আমার আত্মত্যাগ মিথ্যে হ'য়ে গেছে। থাক সে কথা, রাত হ'ল চল সতুদা---এখন খাবে চল!

বুঝলাম কবি কাজারিয়ার কথা বলতে চেয়েছিল কবিতা। বলতে গিয়ে থেমে গেল।

আমিও বিলম্ব করলাম না। উঠলাম। উঠতে গিয়ে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কবিতার কথায় বললাম---বেশ, তাই চল।

আলোতে গিয়ে দেখলাম, কবিতার চোখে জল চিক্ চিক্ করছে। মরুভূমির বালুকণা তপ্ত রোদে যেমন জ্বলে। সে আমাকে করুণ সুরে প্রশ্ন করল---উপন্যাস পড়া হ'ল?

বললাম---হ্যাঁ, মাত্র প্রথম অধ্যায় শেষ করেছি।

কবিতা বলল---আসনে ব'স। রুটি আনছি।

রুটি-তরকারি দিয়ে গেলে নীরবেই খেয়ে যেতে লাগলাম।

কবিতা আবার প্রশ্ন করল---কী ভাবছিলে পড়া বন্ধ ক'রে?

উঁ---ব'লে আর কোন জবাব এল না আমার মুখে, আনমনা হ'য়ে পড়লাম।

মনে পড়ল অনেককাল আগের কথা। যখন কবিতা আর আমি খেলা-ধুলার আশৈশব সঙ্গী ছিলাম, দু'জনের বাড়ী একই গ্রামের দু'টো প্রান্তে। গ্রামের নাম নিশ্চিন্তিপুর। প্রতুল গুরু-মহাশয়ের পাঠশালা ছেড়ে সতীর্থ হ'য়ে পড়াশুনা করছিলাম একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পড়ার তাগিদে হারিয়ে গেলাম দু'জন দীর্ঘ ছ-বছর। মধ্যে মধ্যে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি এমন নয়। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিল ঘটল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়াকালে। অবাক হলাম---যাকে অনেককাল হারিয়েছিলাম, তার দেখা পেলাম।

কবিতা হাতে হাত মিলিয়ে বলেছিল সেদিন---তোমাকে এখানে পাব, একথা ভাবি নি সতুদা। ইস্, কত কষ্টই না হচ্ছিল---মনের মত একজন সঙ্গী না পেয়ে।

সেই থেকে দীর্ঘ চার বছর ছিলাম আমরা একটি আত্মার মত। কেবল মনের মিল নয়, কতবার যে দেহের মিল ঘটেছিল---সে আজ আর আমার মনে নেই। এ আমারই নাম দেওয়া কবিতা---এ আমারই ভাবলক্ষ্মী কল্পনালতা।

পড়াকালে পল্লী-শহরের ভাড়াটে বাসায় যখন থাকত, কতবারই যে ওর হাতে খেয়েছি---সে কথা কে বলতে পারে।

কবিতা বলল---আর একটু চাটনি দেব?

ততক্ষণে যে আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল, সে কথা আমি বুঝতেই পারি নি। তার কথা শুনে বললাম---না, নেব না।

আমার চোখ থেকে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে এল। কেন এমন মর্মদাহ! কেন এমন অন্তর্বেদনা! সে ভাব বুঝেও নীরব ছিলাম। কাউকে বোঝাতে চাই নি।

সে ভাব বুঝল কবিতা, কিন্তু সসঙ্কোচে লজ্জায় মুখ ফুটিয়ে কিছু বলল না, কেবল আমার বিচ্ছেদকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বাহুতে মৃদু করস্পর্শ দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলল, বলল, ---বিশ্বাস কর
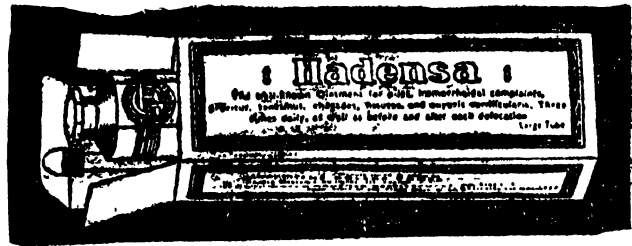
সতুদা, আমি ইচ্ছে ক'রে তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। আমার জীবন কেন যে এমন হ'ল—তুমি আজও জান না।

অভিমান ক'রে বললাম---অধিক সুখ পাওয়ার আশায় হয়ত।

কাঁদতে কাঁদতে সে উত্তর দিল---না না, অমন কথা তুমি ব'লো না সতুদা। এই রিক্ত, শূন্য, সর্বস্বান্ত জীবনকে দেখে, তোমার তাই কি মনে হয়।

ততক্ষণে আমার হাত-মুখ ধোওয়া হ'য়ে গেছিল। ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে বললাম, ---তবে কেন আমাকে একদিন বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপরকে বিয়ে করে বসলে কবিতা। কেন আমাকে অপমান করতে চেয়েছিলে তুমি। কী প্রয়োজন ছিল---আমাকে সেদিন এত চঞ্চল ক'রে তোলার।

তারপর আমার কত বড় ক্ষতি হ'য়ে গেছে---সে সব কি ক'রে বুঝবে কবিতা। আজ আমি তোমার জন্যই নিরুদ্দেশ, ছন্নছাড়া, পাগল।

কবিতা বোঝাতে চাইল---বিশ্বাস ক'রো সতুদা, তোমার সঙ্গে ইচ্ছে ক'রে আমি প্রতারণা করি নি।

প্রশ্ন করলাম---তবে করেছটা কী?

কবিতা তখন বলে গেল---শোন তাহ'লে, তুমি জানতে গত বছর প্যারাটাইফয়েডে ভুগে আমাকে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। একটা হাস-পাতালে থেকে সুস্থও হলাম। তারপর বাড়ী ফেরার পালা। বাবা বললেন, উল্টোডাঙ্গায় কাকাবাবুদের ঘরে যেন দিনকয়েক থেকে যাই। বিরাট পাঁচতলা পুরনো বাড়ীতে তখন সকল ভাড়াটে ভর্তি, কেবল একখানি ঘর খালি। সে ঘরেই আমরা থাকলাম। মাত্র দিন দুই থাকার পর, পাশের বন্ধ ঘরে এক ভাড়াটে এসে থাকলো। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। দাড়ি খোঁচা-খোঁচা, রুক্ষ চুল। জামাকাপড় আধময়লা, উজ্জ্বল ফর্সা সুদর্শন পুরুষ। তবু কেন যে মানুষটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল বুঝলাম না, চোখ ব'সে গেছিল। কপালে দুঃশ্চিন্তা ও রোগের রেখা পড়েছিল। দেহ কঙ্কালসার হয়েছিল। লাঠি ঠুকে ঠুকে সামনের মেঝেতে কয়েকবার পায়চারি করল, মনে হয়, ক্লান্ত হ'তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিড়বিড় ক'রে কি যেন সব আবৃত্তি করতে লাগল। আমি শুনলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছুই।

সেদিন বিকেলের দিকে হঠাৎ বাবাকে যেতে হ'ল সুন্দরবনে, সেখানে পুরনো আমলের বাবার সামান্য জমিদারী ছিল, চাষীরা বাবার জমি জোর ক'রে দখল ক'রে বসেছে। সেটুকু বেদখল হ'লে আর আমাদের বেশী কিছুই থাকবে না। এককথায় ওপরতলা থেকে নীচেরতলায় নেমে আসতে হবে। আমাকে ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখে বাবা চলে গেলেন। কারণ, নদী-নালা, খাল-বিল পেরিয়ে বাবার সঙ্গে যাওয়ার মত স্বাভাবিক শরীরের অবস্থা তখন ছিল না আমার। কলকাতার বাসায় একা একাই থাকতে হ'ল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আলোরা চোখ জ্বলল। পাশের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া এসে ঘরখানাকে ঝাপসা করে গেল। আমি পাশের দোকানে চা-টোস্ট খেয়ে এসে তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম। শেষ চিঠি যা লিখেছিলাম, আজও মনে আছে:

পূজনীয়,

সতুদা---আশা ছিল না বাঁচব বলে, বেঁচে গেছি, জীবনের আকাঙক্ষা এখনও মেটে নি---তাই আমার ঠিকানা দিলাম, লক্ষ্মীটি একবার এস। তোমাকে অনেক দিন দেখি নি। বাড়ী ফিরতে পারছি না, বড় দুর্বল। ইতি---

কবিতা,
উল্টোডাঙা

চিঠি লেখা শেষ হ'ল। কলকাতায় বাবা গ্রামোফন কিনে দিয়েছিলেন। একা একা। তাই ব'সে ব'সে রেকর্ড বাজাতে লাগলাম। ঘড়িতে যখন ন'টা বাজল, তখন নিয়মমত খেয়ে আমাকে বিশ্রাম নিতে হ'ল। তারপর কখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ গভীর রাতের দিকে যখন ঘুম ভাঙল, তখন শুনলাম পাশের ঘর থেকে একপ্রকার কাতর স্বর ভেসে আসছে। প্রদাহমূলক কোন জটিল রোগে আক্রান্ত হ'লে যে যন্ত্রণা-কাতর স্বর বেরোয় তা-ই। ক্রমশ রব বেড়ে চলল---আঃ আঃ। উঃ উঃ। মা গোঃ, বাবা গো; স্থির থাকা গেল না। বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে তার দরজার সামনে দাঁড়ালাম। কান পেতে শুনলাম পাশে কেউ আছে কি না। কিন্তু না---অপর কারোর কোন শব্দ নেই। কপাটে ঠোক্কর দিলাম। মনে হ'ল লোকটা উঠতে চেষ্টা ক'রেও পারল না। কারণ খাট-খানা ঝাঁকুনি খেয়ে কটমট শব্দ ক'রে থেমে গেল। তার অস্থির যন্ত্রণা শুনে দরজায় জোর ঝাঁকুনি দিলাম। সম্ভবত ছিটকিনি ভেতর থেকে ভালভাবে লাগান ছিল না। দরজা খুলে গেল। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালা ছিল। লোকটা আমাকে এত রাতে দেখে অবাক হ'য়ে গেল।

আমি প্রশ্ন করলাম---কী ব্যাপার বলুন তো, আপনার কি কোন অসুখ করেছে।

পেটে হাত দিয়ে বিছানায় ব'সে রয়েছিল লোকটা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, অসুখ বলতে অসুখ। এখনও যে কথা বলছি, সে আমার ভাগ্য ভাল।

প্রশ্ন করলাম---কি এমন অসুখ?

বলল---আঃ ভয়ানক পেটের যন্ত্রণা।

আমি ব্যস্ত হ'য়ে বললাম---ব'সে রইলেন কেন? শুয়ে থেকে আরাম লাগে তো শুয়ে পড়ুন না। পেটে গরম ফোমেণ্ট দেব?

উত্তরে বলল---আগুন কোথায়। উনান ধরাতে যে অনেক সময় লাগবে। তা ছাড়া আপনি কি কয়লার উনান ধরাতে পারবেন?

দেখে ভেবেছিল, আমি বোধ হয় খু-ব বড় বাড়ীর মেয়ে।

আমি বললাম---পারব না কেন! মেয়েমানুষ হ'য়ে এই কাজটা যদি না পারি, তবে পারবটা কী? আমি আগুন করছি।

কয়লার উনান ধরালাম না, অনেক সময় লাগবে ব'লে। স্টোভ লাইট এনে জ্বালালাম। তাওয়া বসাতে উত্তাপের সৃষ্টি হ'ল। তারই ছেঁড়া ধুতি থেকে দু-খানা ন্যাকড়া বের করলাম এবং সে দু'টোকে গুছিয়ে একের পর এক গরম ক'রে কম হ'লেও আধঘণ্টা ধরে ফোমেণ্ট দিয়ে যেতে লাগলাম।

তারপর মনে হ'ল ক্রমাগত তার যেন উপশম হচ্ছে। প্রশ্ন করলাম---এ পেটের ব্যথা আজকেই হ'ল---না আগে থেকে হ'ত।

বলল---প্রায় এক বছর এ রোগে ভুগছি। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে দেখেছিল ---আলসার। বলেছিল পেট অপারেশন করতে হবে। একটা কোম্পানীর চাকরি ক'রে টাকা কিছু সঞ্চয় করেছিলাম। পি জি হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হলাম। অপারেশন ডেট থেকে সুরু ক'রে আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত পাঁচ মাস পনের দিন হাস-পাতালের একটি সিটেই আশ্রয় নিয়ে থাকলাম। আজ বিকেলে এসে বন্ধ ঘরের তালা খুললাম। কিন্তু বাসায় এসে কি ব্যতিক্রম হ'য়ে গেছে জানি না---এখন রাত্রি কত, একটা তো---প্রায় এগারটা থেকে পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। আপনার বলতে কেউ নেই যে সেবা-শুশ্রূষা করে। নার্স অথবা ঝি-চাকরানী রাখব---সে সঙ্গতিও ফুরিয়ে গেছে। পথ্য দূরের কথা, কাল থেকে একখানা পাঁউরুটিও কিনতে পয়সা পাব না। সঞ্চয় যা ছিল, তাও গেছে। অনেক দেনা করেছি। যে দু-একজন বন্ধুর কাছে টাকা ধার পাওয়ার সম্ভাবনা, তাদের কাছ থেকে আজ অবধি কোন ক'রেও পাই নি। এখন নিরুপায়, ছ-মাসের মত হ'ল চাকরি গেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় কাজে যেতে পারছি না। লজ্জা ছেড়ে সত্যি বলতে কী---

I am now quitely helpless,
I may alive or not.

অবাক হ'য়ে গেলাম। এত অসহায় মানুষ হয়। মানুষটির প্রকৃত দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিয়ে বললাম---কেন বাঁচবেন না। না খেয়ে সংসারে খুব, কম লোকই মরেছে।

লোকটা বলল---না, জীবনের ওপর বড় তিক্ততা এসে গেছে। আমি এ জগতে সম্ভবত বেশী কাল বাঁচতে আসি নি।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলল, ---আর আমি বাঁচতেও চাই না। একটা কবিতা আবৃত্তি ক'রে চলল:

কঙ্কাল দিয়েছ মোরে
হে জীবন
আজ আমি দীন বড় ক্ষীণ।
কপোত কপোতী বাসা।
যতো সুখ ছিলো
যতো সম্ভাবনা
---সেও চিহ্নহীন।
তাই দিক্ প্রান্ত খুঁজে মন
'কোথা শান্তি, কোথা তৃপ্তি
বলো, আছে কোথা অমৃত ইন্ধন।
ক্লান্ত আমি।
আয়ু চলে শেষ অস্তাচলে
এ রথ চলেছে
হায়! এ যে বিরামবিহীন।

বুঝলাম, জীবনে পরাজিত মানুষটির অন্তর্নিহিত ভাবসত্তা থেকে একটা গভীর হা-হুতাশ, একটা পাষাণ-চাপা হাহাকার। একটা দুঃসহ কারুণ্যের আর্তনাদ যেন সেই মুহূর্তে ফুটে বেরিয়ে আসতে চায়। অভিশপ্ত জীবনের জ্বালারা যেন তাকে John Keats-এর পলাতক জীবনের নিকটতম সঙ্গী ক'রে তোলে।

প্রশ্ন করলাম---আপনার কে আছেন?

উত্তরে বলল---কেউ নেই।

ভাল ক'রে জানতে চাইলাম---মা, বাবা, ভাই, বোন কিম্বা নিকটতম কোন আত্মীয়?

বলল---নাঃ।

প্রশ্ন করলাম---স্ত্রী?

সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার থেকে ছাড়পত্র বার ক'রে আমাকে দেখাল। আমার যতটুকু মনে পড়ে, তাতে লেখা ছিল, 'আমরা একে অপরের চরিত্রকে সন্দেহ করিয়া ছাড়পত্রে সহি করিলাম।" ওতে দু'জনেরই স্বাক্ষর দেখলাম। স্বামী ---শ্রীকবি কাজারিয়া; স্ত্রী---শ্রীমতী বুলবুল বেগম।

নাম শুনে অবাক হ'য়ে প্রশ্ন কর-করলাম---আপনি কবি কাজারিয়া, যাঁর লেখা 'মৃত্যু' নামক কাব্য ও 'অমৃতের পুত্র' নামক উপন্যাস বাজারে খুব হিট্ করেছে।

অসচ্ছ ম্লানভাবে হাসতে হাসতে জবাব দিল---Yes, I am that Kabi Kazaria.

টেবিলের ওপরেই তাঁর কীর্তিগুলো প'ড়ে ছিল। হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন আমাকে। উঠে গিয়ে ঐগুলো আমি সবিস্ময়ে দেখতে লাগলাম। তোমার হাতের ওই অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডু-লিপি দেখে সেদিন আমি প্রশ্ন করে-ছিলাম, ---এটা কি এই অসুস্থ অবস্থায় লিখছেন?

বলল---শান্তি কোথায়। মনে হয়, যতক্ষণ লিখি---ততক্ষণ শান্তি পাই। কিন্তু জানো, এখন যাদের নিয়ে লিখতে চলেছি---

'(And) They are gone: ay,
ages long ago
These lovers fled away,
into the storm.

জন কীট্স এর এমন কবিতা যাতে রয়ে গেছে সর্বস্বান্ত জীবনের কঠিন মর্মবেদনার কথা।

পরে জানলাম কবি কাজারিয়া রাজস্থানের হিন্দু। পিতামাতা হারিয়ে অতি শৈশবে একজন ব্যবসায়ীর প্রলোভনে পড়ে কলকাতায় চলে এসে-ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে বাংলা দেশে থাকায়, তখন তাঁকে বাঙালী ভিন্ন অপর কোন প্রদেশের ব'লে চেনার উপায় নেই, বুলবুল বেগমের পিতা মক্কার জনৈক

সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তার পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধ'রে বসবাস করছিল। বেগম খুব ভাল গান গাইতে পারত। গজল, টপ্পা, ঠুংরি, কাওয়ালীতে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কোনও এক সূত্রে কবির সঙ্গে বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ের পর ওরা ঘর করেছিল মাত্র দু'টো বছর। কিন্তু টিকল না সে বিয়ে। হয়ে গেল ডাইভোর্স।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম কবির মুখের দিকে। যখন বলল---তারপর বড় দুঃখ, বড় আঘাত পেয়ে তিলে তিলে কখন আমার অজ্ঞাতেই নিজেকে ধ্বংসের হাতে তুলে দিয়েছি সে আমি জানি না। কত রাত আমার চক্ষু কষা হয় নি। পথে-পথে দেশে-দেশান্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে কত ঘুরে বেড়িয়েছি। উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে মদের দোকানে মাত্রা ছাড়িয়ে মদ গিলেছি। শান্তি পাব ব'লে বেশ্যা ঘরে গিয়ে কত রাত কাটিয়েছি। তবু না, কোথাও শান্তি নেই।

আজ বড় ক্লান্ত---বড় শ্রান্ত।
আসবে কখন পরম লগন
তাই তো শুয়েই ভাবি।
মৃত্যু আজকে করছে আমায়
বারেক আলিঙ্গন;
আত্মীয় দূর---
আত্মার কাছে নেই কো বুঝি
আমার বাঁচার দাবী।

চোখ বন্ধ করল কবি। টস-টস ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল দু' চোখের কোণ দিয়ে।

বিবেক ব'লে উঠল---না কবি, আমি আপনাকে মরতে দেব না। এমনি অভিশপ্ত জীবন-কাহিনীগুলো কথায় লিখে রাখার জন্য আপনাকে এ সংসারে বেঁচে থাকতে হবে। আপনি ইতিহাস সৃষ্টি করবেন। আপনি কবি। আপনি জাতির সম্পদ। এ উদাসীন এ দুর্বল জাতি আপনাকে সাহায্য না করলেও সকল সুঃখ-দুঃখে আমি কি আপনাকে কোনও প্রকার সাহায্য করতে পারি না। বলুন কবি---যদি আমার দ্বারা কোনও সাহায্য সহানুভূতি করা সম্ভব হয়; তবে আমি এই মুহূর্ত থেকে প্রস্তুত।

কবি সেই মুহূর্তে প্রশ্ন করল---পারবেন আপনি। কি নাম আপনার?

বললাম---কবিতা সিংহ।

বলল---কবিতা। বা: চমৎকার নাম তো। কে কে আছে আপনার?

উত্তর দিলাম---মা, বাবা আর আমি।

প্রশ্ন করল---বিয়ে করেন নি?

বললাম---বিয়ে। না, বিয়ে করি নি।

প্রশ্ন করল---কি করেন? কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

বললাম---কিছু করি নি যদিও, বি-এ'তে অনার্স নিয়ে পাশ করেছি।

প্রশ্ন করল---কিসে অনার্স?

উত্তর দিলাম---ইংরেজিতে।

বলল---ভাল সাবজেক্ট নিয়ে পাশ করেছেন তো।

একটুখানি উল্লসিত হ'য়ে বললাম---জানেন, একটা স্কুলে আমার চাকরি হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

জানতে চাইল---কোথায়?

জবাব দিলাম---এই কলকাতায়। তবে যতক্ষণ না হয়; আমার কাছে যা টাকা-পয়সা রয়েছে, আপাতত দু'টো মাস কলকাতায় দু'জনের থাকা-খাওয়া চলবে---এ ভরসা রাখতে পারি। এরই মধ্যে যে-কোন একটা চাকরি আমি সংগ্রহ ক'রে নিতে পারব। কি, চলবে তো?

বলল কবি---হ্যাঁ চলবে, কিন্তু আপনার বাবা শুনলে কিছু মনে করবেন না?

আমি বললাম---নিজের ওপর নিজের স্বাধীনতা রয়েছ। আমি এখন আর ছোট নয়। নিজের রথের সারথি হওয়ার ক্ষমতা নিজেই অর্জন করেছি

চাকরি পেয়ে পরে বাবাকে চিঠি লিখলাম---এখন ফিরব না। কিছুকাল পরে বাবা শুনলেন, আমি কবি কাজারিয়াকে বিয়ে করেছি। বাবা যখন জানলেন, প্রথম পক্ষের স্ত্রী মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ ঘটেছিল; আর কি না এমন জাতি-দ্রোহী, ধর্মদ্রোহী কবি কাজারিয়াকে আমি স্বামিত্বে বরণ করেছি; তখন বাবা আমার ওপর রেগে খুন হয়ে গেলেন। আর লিখে পাঠালেন---বেঁচে থাকতে যেন তোমার মুখ কোনকালেই না দেখতে হয়। এমন মেয়ে যার, আঁতুড়ঘরেই কেন সেমরে যায় নি---তাই আজ ভাবি। ছেলের মতোই কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছিলাম---তুমি এমনিভাবে আমাকে ফাঁকি দেবে বলে। বুড়োকালে আমাদের দেখবে কে শুনি? জমিদারীর যা আছে, তোমাকে কিচ্ছু দেব না---সব ভিখিরীদের বিলিয়ে দেব। কেমন শাস্তিটা এবার নিজেই বোঝ।

●

শাস্তি আমার হয়েছে। ফল আমি পেয়েছি। কবিকে বাঁচাতে পারলাম না। বাবার কাছে মুখ দেখানোর কোন ক্ষমতা নেই। তোমার সঙ্গে সতুদা প্রতারণাই করেছি। হেসে কথা বলার সাহস আজ আমার নেই। সব থেকেও কিছু আমার থাকল না। আজ আমি সর্বস্বান্ত। আজ আমি রিক্তা।

কপালে হাত চাপড়িয়ে কবিতা কাঁদতে লাগল। আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। এতক্ষণ যে বিভোর হ'য়ে কথা শুনছিলাম সরে এসে দু'হাত দিয়ে কবিতাকে তুললাম। তার চোখে যে হাত দিয়ে আঁচল চাপা ছিল, কিছুতেই খুলতে চাইল না। জোর ক'রে খুললাম। দু' চোখের জল অশ্রান্ত-ভাবেই গড়িয়ে পড়ল, নিজের কোঁচার কাপড় দিয়ে তাই আমি মুছিয়ে দিলাম। যে বিছানাটা সে আমার জন্যই সন্ধ্যা থেকে খাটে বিছিয়ে রেখেছিল---তারই একপ্রান্তে এনে আমি কবিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে চললাম।

ধারাবাহিক উপন্যাস

জনারণ্যে এক মুখ

শ্রীমতী বাণী রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পাঞ্চালী জয়লর আশায় ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে করতে বহু দৃশ্য দেখল।

প্রায় দাঙ্গের নরকদর্শন হয়ে গেল। একপাশে ছাউনী থেকে বার হয়ে কতকগুলি অল্পবয়সী মেয়ে হ্রদের বাঁধা রেলিং টপকে বাইরে পড়বার চেষ্টা পাচ্ছে। একখানা বেঞ্চও ওরা সরিয়ে এনেছে। উঠে কোনমতে হার্ডল্-রেস্ পেরোবে।

কিন্তু এখানেও জনতা।

'যেন জীবনে কোনও নারী দেখে নি, এমন কয়েকজন পুরুষ জমায়েৎ সেখানে।

নানা কদর্য মন্তব্যে বাতাস কলুষিত হয়ে উঠেছে। পাঞ্চালী এগিয়ে গেল, বলল, 'আপনারা এমন সমস্ত কথা কেন বলছেন?'

এক তরুণ মুখের সিগারেট হাতে ধরে হাত নেড়ে নেড়ে উত্তর দিল, 'কেন বলব না? এরা যদি এমন সাজ ক'রে আমাদের সম্মুখে বার হয়, তবে আমরা চুপ করে থাকব নাকি?'

'আপনাদের লজ্জা করে না? ছিঃ।'

'লজ্জা ওদের না করলে আমাদেরই বা করবে কেন, শুনি? আমাদের লোভ হয় না? সমস্ত শরীর যারা বের করে পাবলিকে দেখায়, তারা এসব চায়। সেইজন্যে এমন করে বের হয়।' তরুণ উদ্ধতভাবে উত্তর দিল।

চোয়াড়ে চেহারার অন্য একজন, এগিয়ে এল।

'ওরে, এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিস কেন? এও কি ওদের দলে নয়? দেখ না, মেয়েটা কেমন জামা পরেছে। হাঃ হাঃ।'

পাঞ্চালীর চেয়ে বক্তা দশ বছরের ছোট। অঙ্গ উন্মোচনে পরাঙমুখ পাঞ্চালী। গরমের জন্য আজ একটা সাদা হাত কাটা জামা পরেছিল বৈ কি।

ততক্ষণে কয়েকজন যুবক সোৎসাহে রেলিং টপকে অন্ধকার নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়েছে অপেক্ষায়।

'আসুন, আসুন, লাফিয়ে পড়ুন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আমরা ধরে পার করে নিচ্ছি।'

ভীত সন্ত্রস্ত মেয়ের দল অন্ধকারে দেখতে পারছে না চোখে। সঙ্গে যদি অভিভাবক থেকে থাকেন, তাঁরা হারিয়ে গেছেন। এধারে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। চেয়ার-টেবল ভেঙ্গে ভেঙ্গে তাতে ইন্ধন দেওয়া হচ্ছে।

আলো ভাঙা হয়েছে ঢিল ছুঁড়ে বা ডাণ্ডার ঘায়ে। ভাঙা কাঁচে বিপজ্জনক মাঠ, অন্ধকার। 'মার মার,' ধর-ধর' শব্দ চতুর্দিকে। স্ত্রীলোকের ক্রন্দন, শিশুর আর্তস্বর, হৈ-হৈ শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

মেয়েরা নিরুপায় অবস্থায় যে-যা বলছে শুনবার চেষ্টা করছে, বুঝে দেখার শক্তি নেই।

ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা ওপাশে। ধরে নিচ্ছে ঠিকই ছেলেরা, কিন্তু নামাবার পূর্বে মাশুল আদায় করে ছাড়ছে।

এধারে আঁটো সালোয়ার-কামিজ পরা একটি মেয়ের পেছনের কামিজ ঝাঁঝালো ব্লেড দিয়ে চিরে ফেলল কে যেন। জামা খুলে নীচে পড়ে গেল টুক্রো হয়ে। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, দু'হাতে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা পেল নগ্নিকা। বিবস্ত্রা ভেনাস্।

অন্যদিকে আর একটি মেয়ের সামনের দিক ছিন্ন করায় ত্বক ও মাংস ব্লেডের ঘায়ে বিভিন্ন। অস্ফুট আর্তনাদে রক্তাক্ত দেহে শুধু সালোয়ারপরা মেয়ে ছুটে পালাল ওধারে লজ্জায়। ওর ব্রেসিয়ারও বিভক্ত হয়ে মাটিতে পড়েছে।

ওদিকে হয়তো সাপ, কিন্তু এদিকে যে বাঘ। কোথায় যাচ্ছে ভেবে দেখল না মেয়েটি। কেবলমাত্র সে পালাতে চায়। কোথায় যাবে জানে না।

পাঞ্চালী উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, ব্যর্থ প্রেমের শিথিল-শরীরে শীতল শোণিততপ্ত,--'আমাকেও খারাপ কথা বলছেন? বলুন। ধরে নিচ্ছি, জগতের সমস্ত মেয়েরা খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু তাই বলে আপনারা ভাল থাকবেন না কেন?'

চোয়াড় টিট্কারি দিয়ে বলল, 'লেকচার দিচ্ছেন? আহা মরি, মরি। শুনেছিলাম এপাড়ার মেয়েরা সর্ববিষয়ে একেবারে আউট। তাইতো, পাড়ার ছেলেদের ল্যাং মেরে সরিয়ে আমরা হাজির। তা দিদিমণি, এখানে লেকচার

দিয়ে লাভ নেই। আমরা মাল টেনেছি। এ সমস্ত কথা কানে ঢুকছে না, মাইরি বলছি। এ সমস্ত কথা বরঞ্চ ওই চিৎপুরে সোনাগাছি, রূপোগাছিতে যেয়ে আদুল-গায়ে বলুন গে। মাইরি বলছি, সব্বাই ভাল হয়ে যাবে।'

নিজের রসিকতায় বক্তা ও চতুর্দিকের শ্রোতারা অট্টহাস্যে পরিস্থিতি কাঁপিয়ে তুলল।

হতবাক্ পাঞ্চালী বলে উঠল, 'ভদ্রলোকের ছেলের যদি ওই সমস্ত অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবনা চিন্তা করা হয়, তাহলে আর কিছু বলার নেই।'

দু'একজন এগিয়ে এল। দৃষ্টি ক্রূর, মুখে ধূর্ততা।

'কি? আমরা ভদ্রলোকের ছেলে নই? কে বলছে? একদম বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব।'

পাঞ্চালীর মনে হল, সমগ্র পরিমণ্ডলে এক বিপজ্জনক রশ্মি কাঁপছে থর-থর্ করে। নিত্যকার দেখা জগৎ নিত্যকারের নেই। বিপদ, চারদিকে বিপদ। কথা বলার ক্ষেত্র এখানে নেই। এখানে পুরুষ সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত। আদিম অরণ্যের আদিম প্রাণী। যারা নারীকে কমোডিটি বা বস্তুর পর্যায়ে ফেলত, নারীর আত্মাকে প্রেমে উজ্জীবিত করে দেহমিলনের ভূমিকা রচনা জানত না।

তাই নারী যে শক্তিমান, তারি কবলগত হত। কখনও বা স্বেচ্ছায় তারাশঙ্করের 'বেদেনীর' মত। সেখানে শঙ্খবলয়ধারিণী সীমন্তিনী সতী অজ্ঞাত ছিলেন। যেমন দিয়েছ, তেমনি নাও।

পায়ে পায়ে পাঞ্চালী সরে যেতে উদ্যত। হয়তো এত সহজে ছাড়া পেত না সে। কিন্তু আর একটি ঘটনায় ছেলেরা লিপ্ত হয়ে পড়ল।

একটি পেলবদেহা মেয়ে রেলিং ডিঙোতে সাহস পাচ্ছিল না। 'ভয় কি, আসুনব---লে একজন তাকে পাঁজাকোলায় লুফে নিল। কিন্তু নামাল না।

ছাড়ুন, ছাড়ুন,' মেয়েটি হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করায়, তখন পায়ের চটী অদৃশ্য, হাতব্যাগ হৃত, হাত একখানা মচকে অস্থির। চুল খুলে আলুলায়িতা। আঁচড়েকামড়ে, চীৎকার করে কিছুতেই সে আততায়ীর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না।

অন্যেরা মজা দেখতে এগিয়ে গেল।

পাঞ্চালী অস্থির হয়ে মেয়েটির উদ্ধারে অগ্রসর হতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একটু পূর্বে সেই কবলিত হচ্ছিল। অতএব একা এগিয়ে যাওয়া মূর্খতা হবে। কোন পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা, এই চিন্তায় পাঞ্চালী ইতস্তত তাকাতে লাগল ওখান থেকে সরে যেয়ে।

'বলতে পারেন পুলিশ কোনদিকে?'

নিরাপদ বিবেচনায় এক বর্ষিয়সী মহিলাকে পাশে দেখে পাঞ্চালী ব্যাকুল প্রশ্ন পাঠাল।

মহিলা হাঁফাতে হাঁফাতে খালি পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। গায়ের ব্লাউজের হাতা ছেঁড়া। কপালের একদিক ফাটা, রক্তাভ ছালওঠা দাগ।

'পুলিশ বাইরে ভ্যানভর্তি বসে আছে। আমার এমন বিপদেও গ্রাহ্য করল না; বলল তাদের ওপর হুকুম নেই ভেতরে ঢোকবার।'

মহিলা জানালেন।

'কী বিপদ আপনার? আমরা সবাই তো বিপন্ন।'

'মাগো, একটি মেয়ের ওপর কয়েকজন পুরুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেখে আমার ছেলে ওদের নিরস্ত করতে যায়। কিন্তু ওরা আমার ছেলেকেই বেদম মারতে লাগল। আমি তখন সামনের গেট দিয়ে ছুটে গেলাম বাইরে ধাক্কাধাক্কি করে। কিন্তু মা, পুলিশ এল না। তখন আবার ছুটে এলাম ভেতরে। দেখি কেউ নেই মা, কেউ নেই। আমার ছেলেটাকে মেরে লেকের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে কিনা কে জানে? মা, আমি কি করব? সমীর, সমীর, বাবা, কোথায় গেলি? মাগো, একটু আমার ছেলেকে খুঁজে দাও মা, পায়ে ধরছি তোমার।' বৃদ্ধা মহিলা অঝোরে কাঁদছেন, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

'মা, আপনি কাঁদবেন না। এর মধ্যে ভাল লোক তো আছেই। কেউ-না-কেউ আপনার ছেলেকে বাঁচিয়েছে নিশ্চয়। গুণ্ডারা ভয় পেয়ে পালিয়েছে।'

'তাহলে সমীর কোথায়?'

এ কথার উত্তর দিতে পারল না পাঞ্চালী। শুধু বলল, 'ফার্স্ট-এইড্ সেণ্টারে খোঁজ নিন। আমি আবার একটি মেয়ের ভারি বিপদ দেখে এসেছি। কাউকে যদি পাই।'

এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে পালাচ্ছিলেন। পাঞ্চালী তাঁর পথ-রোধ করে দাঁড়াল, 'একটু এধারে আসুন আমার সঙ্গে।' 'কেন? এটা এধারে-ওধারে আসবার সময় নয়, একধারেই পালাবার সময়। আপনিই বা এখানে বোকার মত এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'ওদিকে একটা মেয়েকে জোর করে ধরেছে। আসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'---পাঞ্চালী মরীয়া হয়ে অপরিচিতের হাত ধরে টানল।

'মাপ করুন, একা ক'জনের সঙ্গে পারব? দেখেও কি বুঝছেন না, জঙ্গলের রাজত্ব চলেছে। যে মেয়েটি ধরা পড়েছে, যে এতক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। চোখের সামনে কত মেয়েকে টেনে নিয়ে যেতে দেখলাম। আমার ঘড়ি, মানিব্যাগ গেছে, এর পরে প্রাণটিও যাবে। এমন জলসা জীবনে দেখিনি।'

ভদ্রলোক ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালেন। পাঞ্চালী কি করবে ভেবে পেল না। চারদিকে লোকজন ছুটে পালাচ্ছে, নাম ধরে তারা সকাতরে আহ্বান করছে হারিয়েযাওয়া আত্মীয়ের। শিশুরা কাঁদছে।

পায়ে একটা-দুটো কি বাধল? পা ছাড়িয়ে দেখল পাঞ্চালী ফ্রক একটা, ব্লাউজ।

পায়ে পায়ে সে এগিয়ে চলেছে, আন্দাজে, যেদিকে জলের গাড়ী দেখেছে।

ধূম্রকবলিত নারীকে একা নারী হয়ে উদ্ধার করতে সে পারে না, কিন্তু জল দিয়ে হিরণ্ময়ী দত্তকে বাঁচাতে পারে।

পাশ দিয়ে দু'হাতে বুকের কাপড় চেপে একজন অবাঙালী মহিলা পায়ে আবর্জনা মেখে পড়তে পড়তে পালাচ্ছেন।

গলার ছিন্ন মুক্তাহার থেকে টপ্ টপ্ করে মুক্তা ঝরছে। পাঞ্চালী এত বিপদেও অলঙ্কার পরার সখ যেখানে দেখে বিরক্ত হল।

বাঙালী কয়েকটি মেয়ে সালোয়ার-কামিজ পরেছে। দরকার ছিল কি উদ্ধত যৌবনশ্রী পথে-ঘাটে মেলে দেওয়ার? অবাঙালী যারা পরেছে তারাই বা অত দেহ প্রকট করে তুলেছে কেন?

এ সমস্ত জায়গা কি তার উপযুক্ত?

বিপদে পড়লে প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে কিন্তু পাঞ্চালীর মনে ভেসে এল বিমলার মুখখানি।

বুদ্ধি-প্রদীপ্ত প্রশান্ত মুখ, সুবিশাল দু'টি চোখ। এখানে বিমলাদি এলে কি করতেন?

বিমলাদি এখানে আসবার লোক নন। তাঁরি পাড়ার উৎসব, নিমন্ত্রণ-লিপি তিনি পেয়েছিলেন যথাকালে কিন্তু এই ধরনের আয়োজনে আসার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

সর্বাণীর মুখে এ কথা শুনেছিল পাঞ্চালী। ধোঁয়ায় আবছা আকাশে সুদূর নক্ষত্রের মত যেন সেই মুখ ফুটে উঠল।

কাজ করো পাঞ্চালী, সামনে যে কাজ আছে।

পাঞ্চালী আধো অন্ধকারে এগিয়ে গেল। হঠাৎ পেছনে দ্রুত পায়ের শব্দ। এক হাতে শাড়ী ধরে ছুটছে সায়া-ব্লাউজপরা একটি মেয়ে।

আরও একটি নারী, ঝি-শ্রেণীর। ছুটছে আর মুখে বলছে 'পালাও, পালাও। এ গানবাজনা নয়, মেয়েদের ওপার অত্যাচারের ছল।'

একার আরও একটি মেয়ে— পেছনে রাক্ষস পুরুষ। শাড়ীর আঁচল ধরে টানছে, মেয়েটি প্রাণপণে তা নিবারণের প্রয়াস পাচ্ছে।

হঠাৎ বহু বহু করে শাড়ী-খানার প্যাঁচ খুলে লোকটির হাতে এল। মেয়েটি ভয়ার্ত চীৎকারে বেড়ার ওপাশে ছুটে পালাল।

কিন্তু ওধারে যে আজব হ্রদের অথৈ জল অন্ধকারে আবর্তিত হচ্ছে। বুকে তার মৃত্যু। এই অন্ধকারে যদি বেপাড়ার মেয়ে হয়, বুঝতেও পারবে না কোথায় জল, কোথায় বেরোবার পথ।

জায়গাটি ঘিরে ফেলায় অন্যরূপ নিয়েছে অন্ধকারে। পাঞ্চালী এই অঞ্চলের মেয়ে হয়ে নিজেই চিনতে পারছে না।

কিন্তু এ সব কোন্ দৃশ্য দেখছে সে?

জনতার সমাবেশে ব্যবস্থার অবনতি অনেক সময় ঘটে। পূজা প্যাণ্ডেলে আগুন লাগা, রাজনৈতিক সভায় গণ্ডগোলের চেষ্টা সে দেখেছে।

কিন্তু এমনটি দেখে নি।

পৃথিবীর ইতিহাসে যা ঘটেনি কোথাও, বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের জন্য সেটুকু বোধ হয় সঞ্চিত ছিল দেশের ভাগ্যে।

বিবস্ত্রা নারীর অসহায় অবস্থা দুষ্টজনের হাতে পরিধেয় বসন।

কেন পরিস্থিতি এত পরিচিত মনে হচ্ছে পাঞ্চালীর? কোথায় যেন দেখেছে সে, জানা আছে ঘটনা। আর পরিণতিও জানা আছে।

আকাশ-বাতাস যেন আবছা আলোয় এক মুহূর্তে অন্য এক কাহিনীর পটভূমিকা রচনা করে দিল।

অনেক দূরে সরে গেল পটভূমিকা।

"ততো দুঃশাসনো রাজন্। দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ।
সভামধ্যে সমাক্ষিপ্য ব্যাপাক্রষ্টুং ॥
প্রচক্রমে ॥ (মহাভারত)
—সভাপর্ব

সেই কৌরবসভা।

চিত্রার্পিত গুরুজন। দুঃশাসন

'রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশ ধারণপূর্বক সভায় আনয়ন করেছে। দুর্যোধনের আদেশ।

অতঃপর দুঃশাসন দুর্যোধনের ইঙ্গিতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যোগী।

ইতিপূর্বে দুর্যোধনের মাতুল শকুনির অক্ষক্রীড়ায় সর্বস্ব হেরে যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীকে পণ রেখেছিলেন: "নৈব হ্রস্বা ন মহতী নাতিকৃষ্ণা ন রোহিণী। নীলকুঞ্চিতকেশী চ তয়া দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥"

সভামধ্যে বৃদ্ধ সভ্যগণের মুখে 'ধিক্ ধিক্' বাক্য, বিদুর প্রাণহীন প্রায়; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ঘর্মাক্তকলেবর। সানন্দে শকুনি "জিতমিত্যেব" বাক্যে অক্ষের দানে সেই সহস্রবন্দিতা, পঞ্চপাণ্ডবমহিষী, পাঞ্চাল-দুহিতা দ্রৌপদীকে জয় করে নিল। দুর্যোধনের বেনামদার শকুনি।

কিন্তু কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ, কোথায় হস্তিনা?

মহাভারতের যুগ কবে হয়ে গেছে। স্বর্ণমণ্ডিত রত্নখচিত সুখাসনে বিচিত্র উগ্র লবেশধারী রাজন্যবর্গের সম্মুখে কোন্ যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আজকের পাঞ্চালীকে পণ রেখেছে। এখানে আজব হ্রদের মাঠে তারই পুনরাবৃত্তি নাকি?

ইতিহাসের স্খলিত পথে কোন্ দুঃশাসন দ্রুপ-নন্দিনীর দীর্ঘ, নীল ও কুঞ্চিত কেশকলাপ ধারণ করে হস্তিনার প্রকাশ্য সভামধ্যে আনে? কোন্ দুঃশাসন তার বস্ত্র হরণ করতে আজ উদ্যোগী?

কুরুসভার সেই মহাপাপে কুরুক্ষেত্র রচনা হয়েছিল। রক্তে পরিসিক্ত সেই কুরুক্ষেত্র তো বহুদিন বিগত। কিন্তু এই নব কুরুক্ষেত্র কেন জন্ম নিল।

কোথায় কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি? যাজ্ঞসেনীর কাতর আহ্বানে তুমি সে দিনের কুরুসভায় নানা রাগ-বিরাগযুক্ত শত শত বস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছিলে।

আজ এই সমস্ত বিবস্ত্রা নারীর লজ্জা নিবারণে তুমি কোথায়? সুপ্তিমগ্ন?

হে পুরুষোত্তম, আমি জানি, তোমার অতন্দ্র নির্নিমেষ নয়নে সমস্ত দৃশ্যমান। তুমি অপেক্ষা করছ। এক মুহূর্তে যারা ক্ষমতার দম্ভে নারীর মর্যাদাকে মূল্য দেয়নি, তারা ক্ষমতাচ্যুত শৃগালের জীবনে নির্বীর্য হয়ে থাকবে। সমগ্র দেশের শহরে শহরে ধ্বংস তাণ্ডবনর্তনে ভেঙেচুরে ফেলবে জনজীবন। মানুষের আহার্য রক্তে ধোয়া হবে। সর্বত্র রক্তস্রোত বয়ে যাবে। খণ্ড খণ্ড কুরুক্ষেত্র সর্বত্র দেখা দেবে। কারণ:---

"কৃষ্ণঞ্চ, বিষ্ণুঞ্চ হরিং। দ্রোণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী।" তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ। তোমার শাস্তি, আজ যারা নিশ্চিন্ত আরামে বিদ্রূপের হাসি হাসছে তাদের উপরে খড়গের মত পতিত হবে।

আর বেশী দেরী নেই।

কৌরবসভায় মুহ্যমানা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা পাঞ্চালী মিলিয়ে গেল চোখের সম্মুখ থেকে।

দেখা গেল বর্তমানের পাঞ্চালী হাঁটছে।

এগিয়ে যাচ্ছে সে। চার পাশে ধ্বংসের তাণ্ডব, আগুন জ্বলছে। অগ্নিস্নানে শুচি হবে কে আজ?

পাঞ্চালী হঠাৎ দেখল প্যাণ্ডেলের বেড়ার কাছে এসে পড়েছে সে অন্যমনস্ক দ্রুততায়। সীমানা শেষের বেড়া। নির্জন, বড় নির্জন।

এদিকে গোলমাল কম, কিন্তু অন্ধকার জমাট বাঁধা। মহাভারতের স্বপ্নে বিহ্বল পাঞ্চালী কখন চলে এসেছে, লক্ষ্য না করে।

জল? এখানে কোথায়? কিছু নেই, লোকজনও কম। ভিড়ে বিপদ থাকলেও আবার ভরসা থাকে। এখানে কোনও ভরসা নেই।

কেন এলাম? ফিরে যাই।

পাঞ্চালী তখন পথ হারিয়ে ফেলেছে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে না পেয়ে।

কোনমতে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে পা বাড়াল পাঞ্চালী।

সহস্র ক্রোশ নরকপরিক্রমা শেষে ফিরে চলেছে, সে পরাভূত। কিছু করবার নেই পাঞ্চালীর।

অন্ধকারে এক সারি প্রেতের মত হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে কয়েকটি ছায়া সম্মুখে।

পথরোধ করে দাঁড়াল তারা।

'বলতে পারেন যদুরাম বাই লেনটা কোন্ দিকে গেলে পাব? আমরা পথ হারিয়েছি।'

যদুরাম বাই লেন? নামও শোনে নি পাঞ্চালী কোনদিন। কেমন গা ছম্ ছম্ করে উঠল অজানিত আশঙ্কায়। কোনমতে কথা এড়িয়ে যাবার আশায় পা বাড়িয়ে পাঞ্চালী বলল, আমি বলতে পারব না। আমি চিনি না।

'একটু আমাদেরকে সাহায্য করুন না। আমরা এ পাড়ায় নূতন এলাম।'

'আমি না চিনলে কেমন করে সাহায্য করব? আমি যাই, আমার বন্ধুরা ওধারে।' পাঞ্চালী পা আবার বাড়াল।

'আমাদের সঙ্গে এসে দেখিয়ে দিন না।' একজন এবার গায়ের অতি কাছে এগিয়ে এসে বলল। এবার গলায় আদেশ।

'না, না।' অতিশয় ভয়ে পাঞ্চালী দৌড়ে পালাবার উপক্রম করল।

'আসতেই হবে আমাদের সঙ্গে।' সজোরে পাঞ্চালীর দুই হাত চেপে ধরে তারা টেনে নিল।

[ক্রমশ।

আত্মচরিতে সমাজচিত্র

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতায় মার্ক টোয়েন

দক্ষিণারঞ্জন বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৯০৬ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখে মার্ক টোয়েন লিখেছেন যে, বিগত ৩৫ বছরে এমন একটি সময়ও যায় নি, যখন তাঁর হাতে অর্ধেক শেষ করা দু-তিনখানা বই চরম অবহেলায় পড়ে থাকে নি। কখনও কখনও তিন-চারখানাও থেকেছে, পাঁচখানাও। তিনি একসঙ্গে গল্পের সবটা শেষ করতে পারতেন না। কিছুটা লিখে দু' বছর, তিন বছর ফেলে রাখতেন, তারপর ইচ্ছে হলে শেষ করতেন, নইলে করতেন না।

'দি প্রিন্স অ্যাণ্ড দি পপার' মাঝামাঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দু' বছর বন্ধ ছিল। তারপর শেষ হয়। 'হুইচ ওয়াজ ইট' মাঝপথে দু'বার বন্ধ হয়ে যায়। তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি ছিলেন জন্ম-কুঁড়ে। তাছাড়া অন্যকে ডিকটেশন দিয়ে লেখাতে গিয়ে তিনি নিজেকে পঙ্গু করে ফেলেছিলেন।

'দি রেফিউজ অভ দি ভেরিলিক্‌স্‌' তাঁর আর একখানা অসম্পূর্ণ বই। 'দি অ্যাডভেঞ্চারস্‌ অভ এ মাইক্রোব ডিউরিং থ্রি থাউজ্যাণ্ড ইয়ার্স—বাই এ মাইক্রোব' আর একখানা। আর একখানা অসম্পূর্ণ বই হচ্ছে 'দি মিস্টিরিয়াস স্ট্রেঞ্জার'।

পাছে শেষ করতে হয়, এই ভয়ে তিনি তাঁর বহু পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলেছেন। ১৮৯৩ সালে বুয়েনে তিনি ১৫,০০০ ডলার দামের পাণ্ডুলিপি নষ্ট করেছেন। ১৮৯৪ সালে প্যারিসে করেছেন ১০,০০০ ডলার দামের পাণ্ডুলিপি।

মার্ক টোয়েন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন এমন অনেক বই আছে, যা এগুতে চায় না। বছরের পর বছর পড়ে থাকে। কারণ, কাহিনী ঠিক ফর্মে আরম্ভ হয় নি। একটা কাহিনীর একটি মাত্রই ঠিক ফর্ম থাকে এবং সেই ফর্মটি ধরতে না পারলে গল্প কখনও নিজেকে প্রকাশ করে না। মার্ক টোয়েন তাঁর 'জোন অব আর্ক' গল্পটি ছ'বার ভুল ফর্মে আরম্ভ করেছিলেন। শেষবারে ঠিক ফর্মটা পেয়েছিলেন।

তিনি ১২ বছরে ছ'বার চেষ্টা করে একটা ছোট্ট গল্প বলতে চেয়েছেন, যে গল্পটি ঠিক ফর্মে আরম্ভ হলে ৪ ঘণ্টায় শেষ হত—বলে তিনি লিখেছেন। কিন্তু তিনি ছ'বারই ব্যর্থ হয়েছেন। তারপর একদিন লণ্ডনে রবার্ট ম্যাকক্লিওরকে গল্পের বিষয়বস্তু দিয়ে তাঁর পত্রিকায় তা এই বলে ছাপাতে বলেছিলেন যে, গল্পটি যিনি সবচেয়ে ভালভাবে লিখতে পারবেন, তাঁকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। মার্ক টোয়েন এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং আধ ঘণ্টা ধরে গল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলে গিয়েছিলেন। ম্যাকক্লিওর তখন বলেছিলেন, 'আপনি নিজেই গল্পটি বলেছেন। যেভাবে আপনি গল্পটি বলেছেন, ঠিক সেইভাবে কাগজে লিখে ফেলা ছাড়া আর কিছু আপনার করার নেই।'

মার্ক টোয়েন সেটা উপলব্ধি করেছিলেন এবং ৪ ঘণ্টা পরে গল্পটি শেষ করে তিনি পরম সন্তোষ লাভ করেছিলেন। এইভাবে একটা ছোট্ট গল্প লিখতে তাঁর ১২ বছর ৪ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। তিনি গল্পটার নাম দিয়েছিলেন "দি ডেথ ওয়েফার'।

ঠিকভাবে আরম্ভ করাটাই খুব দরকারী। পরে বহুবার এই সত্যটা তিনি প্রমাণ করেছেন।

সাহিত্য-জগতেও সততার অভাব দেখে এবং প্রকাশকদের ব্যবহারে টোয়েন অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তবে এই তৃপ্তি তিনি প্রকাশ করেছেন আত্মজীবনীতে যে, গ্রন্থকার হিসেবে বা জীবনের অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো দিন তিনি সজ্ঞানে আর্থিক প্রশ্নে অসাধুতার প্রশ্রয় দেন নি। অবশ্য জীবনের অনেক অন্যায়, অনেক অপরাধের কথা তিনি স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠভাবেই। আত্মকথার একস্থানে তিনি বলেছেন, I have thought of fifteen hundred or two thousand incidents in my life which I am ashamed of—নিজের এই সমস্ত দোষ-ত্রুটির চিন্তা মার্ক টোয়েনকে তাঁর শেষ জীবনে যেমন যন্ত্রণা দিয়েছে, স্বদেশবাসীর দুর্নীতি এবং অন্যায়ও তেমনি তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে। বিশেষ করে আমেরিকান পাবলিশিং কোম্পানী প্রভৃতি প্রকাশকেরা তাঁকে এমনিভাবে প্রতারণা করেছে যে, শেষপর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়েই তাঁর এক আত্মীয় ওয়েবস্টারকে নিয়ে 'ওয়েবস্টার এ্যাণ্ড কোম্পানী, পাবলিশার্স' নামে নিজেই এক প্রকাশক সংস্থা খুলে বসলেন। নিজের চেষ্টায় প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্টের আত্মচরিত প্রকাশ করে প্রচুর অর্থ এলো তাঁর কোম্পানীর। কোম্পানীর তাঁর নিজেরও বিখ্যাত বই 'হাকলবেরি ফিন' প্রকাশ করে ওয়েবস্টার সাড়ে চুয়ান্ন হাজার ডলারের একখানি

ঠিক মার্ক টোয়েনের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলেন রয়্যালটি হিসেবে। আর ওয়েবস্টার নিজের জন্যে বার্ষিক আড়াই হাজারের স্থলে সাড়ে তিন হাজার ডলার এবং গ্রান্টের আত্ম-চরিতের ওপর শতকরা দশ ডলার হিসেবে কমিশনেরও ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। বিরাট প্রকাশক সংস্থা গড়ে উঠলো। কিন্তু ওয়েবস্টারের অকর্মণ্যতা ও অব্যবস্থায় এবং মার্ক টোয়েন নিজে ব্যবসা না জানায় প্রচুর অর্থ লোকসান হয়ে গেল। বিয়ের পর ১৮৭০ সাল থেকে সম্পাদকতা করে বই লিখে এবং বক্তৃতা দিয়ে যিনি অভাবনীয় পরিমাণে ডলার উপার্জন করে ছিলেন, ব্যবসা ফেল পড়ায় সেই মার্ক টোয়েনকে যে একেবারে পথে এসে দাঁড়াতে হবে, এ কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে ঋণে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। টোয়েন এক সময়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, নিজের জন্যে তিনি আর বক্তৃতালব্ধ অর্থ গ্রহণ করবেন না, যা পাবেন চ্যারিটেবল ফাণ্ডে তা জমা দেবেন। বক্তৃতা দিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠানকে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। টোয়েনের আত্মকথা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, তিনি একজন পেশাদার বক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রতি রাত্রির বক্তৃতায় গড়ে তিনি প্রায় একশ' ডলার করে রোজগার করতেন। কানাডায় একটানা তিনি একশ' দশ রাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

শুধু স্বদেশেই বা আশপাশেই নয়, বিশ্ব-পরিক্রমায় তিনি বেরিয়েছিলেন বক্তৃতা-সফরে এবং মার্ক টোয়েনের মতো অতুলনীয় প্রতিভাধর লেখক, যাঁকে মার্কিন সাহিত্য-জগতের লিংকন বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে তাঁকে বক্তৃতার উপার্জনে শেষ জীবনে ঋণমুক্ত হতে হবে, একে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া কিই-বা বলা যায়?

আজীবন কৌতুক-প্রিয় মার্ক টোয়েনকে গভীর হতাশা ও বেদনার মধ্যে শেষের কয়েকটি বছর কাটাতে হয়েছে, এ ভাবতে মন বিষিয়ে ওঠে। চারদিকের দুর্নীতি ও অমানবিকতায় একদিকে যেমন হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি, তেমনি পর পর বড়ো মেয়ে সুসি, দাদা ওরিয়ন, স্ত্রী এবং সবশেষে কনিষ্ঠা কন্যা জীনের মৃত্যুর বেদনায় একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন মার্ক টোয়েন। জীনকে হারিয়ে তিনিও পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন পঁচাত্তর বছর বয়েসে। জীবনের শেষ বছরটি ছাড়া তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথাকেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর আত্ম-চরিতে। তাতে তাঁর স্বদেশে ও স্বজাতির চরিত্র-চিত্রণ তো ঘটেছেই, অনেক ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন পৃথিবীর চিত্রও সেখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আত্মকথার একস্থানে টোয়েন লিখেছেন---'আমার জীবনের শেষ পঁচিশ বছর আমি মানব জাতিকেই অধ্যয়ন করেছি প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং বিশ্বস্তরূপে। অর্থাৎ এ অধ্যয়ন ছিল আমার নিজেকেই অধ্যয়ন, কেন-না, আমার ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে আসলে তো বিশ্বেরই রূপ সংহত হয়ে আছে। আমি দেখেছি, মানব জাতির এমন কোনো উপকরণ বা উপাদান নেই, যা কম-বেশী আমার মধ্যে নেই। অন্যের মধ্যে তা কিছু বেশী থাকতে পারে, কিন্তু আমার মধ্যে যেটুকু আছে, আত্মপরীক্ষার যাবতীয় উদ্দেশ্যের জন্যে তাই যথেষ্ট। মনুষ্য ও জীবজগতের সংস্পর্শে এসে দেখেছি, অন্য কারুর মধ্যে এমন কোনো গুণ নেই, যা আমার মধ্যে একেবারে নেই। অন্যান্যের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য, তাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, একঘেয়েমী বন্ধ হয়---এই পর্যন্ত। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আমরা সবাই সদৃশ; সুতরাং যত্নে নিজেকে অধ্যয়ন করে, অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনামূলক বিচার করে, বৈচিত্র্যকে লক্ষ্য করে আমি মানব-জাতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি, তা' অন্য যে-কোনো লোকের জ্ঞানের তুলনায় অধিক নির্ভুল ও অধিক ব্যাপক। ফলে, আমার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ও প্রচ্ছন্ন ধারণাটা নিছক আত্মতুষ্টি নয়। এ থেকেই এ কথাও আসছে, মানবজাতি সম্বন্ধে আমার যে মূল্যায়ন তা' আমার নিজের মূল্যায়নেরই একটি প্রতিলিপি।'

এমনিভাবে যিনি মানব জাতির প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারেন, তাঁর আত্মকথায় পারিপার্শ্বিক সমকালীন সমাজচিত্র যে যথার্থভাবে চিত্রিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। বাস্তবিকই মার্ক টোয়েনের আত্মজীবনীর মাধ্যমে বিগত শতাব্দীর মার্কিন সমাজকে আমরা নিখুঁতভাবেই দেখতে পাই।

শেষ নির্জন বোধ

ইন্দ্রাণী
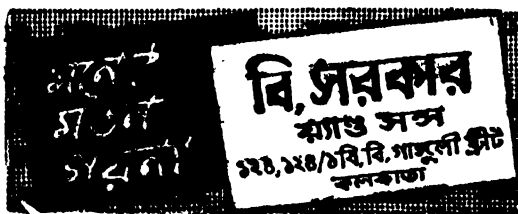
ছোটবেলায় সেই গাছটার তলা দিয়ে বহুদিন যেতে পারি নি। ভয় করত। আমি, স্বাতী আর মীরা সেই গাছটার ভয়ে লাইনের পাশ দিয়ে প্রায় আধ মাইল পথ ঘুরে স্কুলে যেতাম।

ঐ গাছে গলায় দড়ি দিয়ে অভাবী মাখন দরজী বহুদিন ঘুমিয়ে পড়েছে। জানি না, সেই বাবলাগাছটা আজো আছে কি না---তার তলায় রহস্যময়-ভাবে পড়ে-থাকা কয়েকটা বড় বড় কালো পাথর, গা থেকে যাদের তেল আর সিঁদুর সব সময় চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ত। ওখানে মাসে একবার করে কীর্তন হ'ত।---অনেক রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই ধার্মিক সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি এবং মাখন দরজীর মৃত্যুর পর ক'টা মাস সেই উৎসব বন্ধ থাকলেও আবার নিয়মিত শুরু হয়েছিল।

সেই বাবলাগাছটা যদি আজো বেঁচে থাকে তবে তার তলার পড়ে-থাকা সিঁদুর-মাখা কালো পাথরগুলো আজো আছে কি না---সেখানে আজো প্রতি মাসে ধর্মভীরু অভাবী মানুষের গভীর রাত পর্যন্ত উৎসব আজো নিয়মিত বসে কি না---জানি না।

জানি না---জানতে চাই না। যেমন জানতে চাই না মাখন দরজীর অতৃপ্ত আত্মার সাথে সুবিমলের দেখা হয়েছে কি না।---না, আর অন্বেষণ নয়। খোঁজার পালা শেষ এবং তার নির্দেশ সুবিমলই দিয়ে গেছে।

সনৎ রায়

কিন্তু কি করব এখন?---

কেন---যেমন চাকরী করতে তেমনি ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করবে। সংসার দেখবে। ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে প্রমোশন পাবার চেষ্টা করবে। আর কি করার আছে।

আর কিচ্ছু নেই?

আয়নার কাছে আবার প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম।

কি চাও করতে? বিয়ে করবে? তা করতে পার---বয়স অল্প---শিক্ষিতা---সুন্দরী---চাকরী কর।

তা যে সম্ভব নয়। না না সংসার আমায় সে বাধা দেয় নি। বরঞ্চ এতদিন তারা আমায় ঐ কথা বলে যথেষ্ট উত্যক্ত করেছে---।

তবে আর কি। ঘুমোও। রাত তো অনেক হ'ল।

ঘুমোব?---হ্যাঁ সেই ভাল, ঘুমিয়েই পড়ি। চোখটা জ্বলছে ভীষণ। কেমন একটা অন্ধকার ঘরের মত মশারীটা। সুবিমলও বুঝি এই রকম একটা অন্ধকার ঘরে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে থাকবে বুঝি বহুকাল।

প্রদীপ

চিঠিটা পেয়ে একটু অবাক হয়েছিলাম। একশ' গজ দূরেও যার বাসা নয়---সে হঠাৎ পোষ্ট অপিসে চিঠি পোষ্ট করে আমার কাছে পাঠাল কেন---। আর কি-ই বা এমন কথা। অবশ্য সারপ্রাইজও অনেক দেয়---কিন্তু এরকম---

দীপ

আজ নয়---না না আজ একেবারেই নয়। মনে করবি আজ আমার বাসাটা পাকিস্তান। কাল---কাল সকালে আবার

দুই বাংলা মিলে যাবে, আমার বাড়ী হবে হিন্দুস্থান। তুই আসবি। হ্যাঁ শোন্---আমার টেবিলের নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবি---আলতো করে আঠা দিয়ে একটা খামের মত কি ঝুলছে। নিবি---পড়বি---তারপর---সে যা-ইচ্ছে ভাবিস। কিন্তু ঐ কথা---আজ নয়---দিনে নয়---রাতে নয়---কাল ভোরে আবার দুই বাংলা মিলে যাবে। আমার বাড়ী হবে হিন্দুস্থান---তুই আসবি। আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, বুঝলি ওর মধ্যেই তার ঠিকানা থাকবে। বাড়ীতে তো বলা যাবে না বুঝিসই তো সব। বাড়ীর যা অবস্থা ---বেরিয়ে না পড়লে কিচ্ছু হবে না। অবশ্য এ কথাটা তোকে মুখেও বলা যেত---দূর---মুখে-মুখে তো এতদিন কথা বললাম---আর ভাল লাগে না। তাই এরকম---। আসলে এটাকে জোক হিসাবে নিস্---। হ্যাঁ মনে থাকে যেন---আজ নয়---রাতে নয়---দিনে নয়---কাল, আগামীকাল---দুই বাংলা আবার মিলে যাবে---তুই আসবি।

পরশু পোষ্ট করা হয়েছে। আজ এসেছে চিঠি এবং ও সেটা জানে বলেই 'আজ-আজ' করে লিখেছে---।

অফিস থেকে ফিরতে প্রায় ন'টা বেজে গিয়েছিল। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠতে না যখন হাতে চিঠি দিল তখন দশটা বাজে। সকালে পাইনি কারণ আটটার ট্রেন ধরি। পিওন পোষ্ট অফিস থেকে বেরোয় সাড়ে আটটায়।

শরীরটা ভাল ছিল না। ক'দিন থেকেই খারাপ। তার ওপর ওভার টাইম্ চলছে। স্বভাবতই চিঠি পেয়ে বিরক্ত হয়েছিলাম। এসব ছেলেমানুষী সব সময় ভাল লাগে না। যাবি---যেখানেই ইচ্ছে যা, তা এসব ভনিতা করার কি দরকার?---

জানি ও একটু অন্য ধরনের। এবং তার মূলে ওর সংসার---ওর বাবা ---ওর অশান্তি ঘিরে ধরে আছে। তবু সব সময় অন্যের ব্যক্তিগত সমস্যা বা সেই সমস্যার কৌতুক বেশী কিছু উত্তাপ ভাল লাগে না।

বিশেষ করে মানুষের এখন এমন একটা নির্মম সময়ে---অন্যকে নিয়ে মাতামাতি বা তার দুঃখে তার বেদনায় কিছু আশ্বাস বা সমবেদনা ছুঁড়ে দেওয়াও অতিরিক্ত বলে মনে হয়।

সুবিমল আমার বন্ধু। চাকরী নেই। বাড়িতে প্রায় জনাদশেক লোক। ওর বাবা একা সংসার চালান। বয়স হয়েছে---পারেন না। ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ঝগড়ার রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে ওদের সংসারে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করে। মায়া আর শীলারও বিয়ের বয়স হয়েছে। শীলার ওপর অনেকদিন আগে আমার একটা ছোট্ট দুর্বলতা বা ভালবাসা ছিল। এখন নেই। কারণটা ঠিক জানি না। মাঝে মাঝে সে সব দিনের কথা মনে পড়ে---ভাল করে ঘুম হয় না সে সব রাতে---।

একটা ক্লান্ত চিন্তার স্রোত নিজের মস্তিষ্কের কাছে আহত সাপের মত প্রশ্ন করে---কেন শীলাকে ভালবাসা গেল না---কেন তুমি আর শীলা দুটো মানুষ মানুষী ছাড়া কিছু নও, ও বাড়ীতে গেলে শীলা যখন তোমার কাছে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে দাঁড়ায়, তাকায় ---তখন আগের মত তার চোখের অন্ধকার দেখ না কেন তুমি? কেন বল না---শীলা যাবি সেই কুয়োটার কাছে---যেখানে আমরা স্কুল থেকে ফেরার সময় প্রতিদিন 'আ---আ' শব্দ করে প্রতিধ্বনি শুনতাম। ---কেন বল না তুমি। আর ভাল লাগে না তোমার শীলাকে---।

সেই চিন্তাটা আবার অনেক ভাঁটা পেরিয়ে উত্তর দিয়ে যায়---ভাল লাগে না, তা নয়। তবে---অনেক দিনের আগের রঙটা আজ ধোয়া-মোছার অভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে---! নিজের কাছেই তো রয়েছে অনেক বিষণ্ণতা। কি করে পারব---বিবর্ণ বিশ্বাসকে নতুন

করে ভালবাসতে।—কেউই পারে না। একটা জীর্ণ দোকানের সাইন বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ভালবাসতে পারা যায় না—অনেক দূরে চলে গেলে—কিম্বা ঘুম না-আসা-রাতে সেই দোকানটার উজ্জ্বল স্মৃতিকে নতুন করে হয়ত ভালবাসা যায়। তার জন্য ব্যথা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই জীর্ণ বিবর্ণ ছবিকে কখনই ভালবাসা যায় না।

এবং সেই উত্তর আমাকে আর একটা ধাক্কা মেরে বলে যায়, ভালবেসে ফুরিয়ে যাওয়া যায়—কিন্তু অভাবকে ভালবাসব কি করে ?

সেদিন তো আর নেই—সেই পাতকুয়োটার ওপর দিয়ে চলে গেছে পীচ্‌ঢালা রাস্তা—। শীলা আমার ঘন কালো চুলে দূর থেকে কাঁটামাখা খাগড়ার ফল ছুঁড়ে আর বিরক্ত করে না। তার বদলে টাকা চায়। প্রতিমাসে দশ—পাঁচ—যা হোক ওর হাতে দিয়ে আসতে হয়। যে হাতের প্রতিটি আঙুলের কড়ে সাদা-সাদা ঘা লুকিয়ে আছে। —তাই শীলার ভালবাসাকে এখন আমি পুরানো দুর্বলতা বলেই মনে করি।

সুবিমল কেন চাকরী পায় নি এবং আমি ওর সমান বিদ্যে নিয়ে কেন চাকরী করছি—সে প্রশ্ন নিজেকে আমি কোনদিনও করি নি। করতে ভয় করেছে। কারণ সুবিমল আমার গেজেটেড্ বাবার কাছে দু'বছর আগে পর্যন্ত একটা চাকরীর প্রত্যাশায় আসত।—এখন আসে না।

সুবিমলের চাকরী হয় নি, আমার হয়েছে এবং তা আমার বাবার আর একটা স্নেহের খরচার মতন। তবু আমরা আগের মতই আছি। আছি কি—? সেই আগের মত আর সত্যই আছি কি ?

আমি সকালে আপিসে যাই—সুবিমল তখন চায়ের দোকানে ঢোকে। খবরের কাগজ পড়ে—চা খায়—এককাপ দু'কাপ—তিন কাপ—এমনি করে বাড়তে বাড়তে বেলা বেড়ে যায়। খালি পেটের খিদেটাকে বৈজ্ঞানিকের মত দিয়ে ওর ময়লা বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে—সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে সিলিং-এর টিক্‌টিকিটার উদ্দেশ্যে। মনে মনে কথা বলে তার সাথে—স্নান করার তাড়া দেয় শীলা। তবুও ওঠে না সুবিমল। সিলিং-এর টিকটিকিটার সাথে নিজেকে মেলায়—বারবার তন্ন তন্ন করে মেলায়। এক সময় উঠে বসে কাগজ-কলম নিয়ে বালিশে বুক গুঁজে—কলমটা দু' ভুরুর মাঝে ঠেকিয়ে চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর লিখতে শুরু করে—কপাল থেকে বিন্দু-বিন্দু ঘাম নেমে আসে গাল বেয়ে। তখন খোঁচা খোঁচা দাড়ির ভেতর দিয়ে ওর গালভাঙা মুখটার দিকে তাকাতে ভয় করে যেন। মনে হয় ওর মুখের দিকে তাকালে—আমাকে—আমার বাবাকে—এমনি আরো অনেক মানুষকে কিসের একটা জবাব দিতে হবে—। সে জবাব উঠে আসে মানুষের নিভৃত বিবর থেকে—অথচ তা দেওয়া যায় না—দিতে ইচ্ছে করে না—ও জায়গার খবর বাইরে আনতে মানুষের লজ্জা করে—ভয় করে। হয়ত তাই এখন পৃথিবীর সময়টা গ্রীষ্মের আকাশের মত নির্মম উত্তাপ নিয়ে কুঁজো হয়ে বসে আছে।

এখন আর সুবিমল কবিতা লেখে না। ইন্দ্রাণী এ নিয়ে অনেক অভিযোগ করেছিল। কারণ পত্রিকাগুলো থেকে মাঝে মাঝেই ওর নামে চিঠি আসত।

ইন্দ্রাণী বলেছিল—এ সব গোঁয়ার্তুমির কোন মানে হয় না। অন্তত নিজের হাত খরচের জন্য তোমার কিছু লেখা উচিত। তারপর চাকরী-বাকরী পেলে গোঁয়ার্তুমি কোর। যা হোক কিছু তো এখন হাতে আসছে—তাই বা দেয় কে ?—

সেদিন আমি ছিলাম ওদের সাথে। সুবিমল চিৎ হয়ে শুয়েছিল ঘাসের ওপর। হঠাৎ উঠে বসে সাঁড়াশীর মত করে দু'হাতের তর্জনী ইন্দ্রাণীর গালে আলতো করে চেপে বলল—ওগো ভাল-বাসার মেয়ে—সংসার করবে, পিছনে আর ঘুরো না—আর উপদেশও দিও না—ন্যাকামী কোর না।

—তোমার কাছে সবই তো ন্যাকামী। কেন লিখবে না শুনি—?

—ও বাবা, ভালবেসেছি বলে সব কথা তোমায় বলতে হবে না কি—? তুমি পারবে ?

চকিতে আমরা ওর কথায় এমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম যে বহুক্ষণ আমরা পরস্পরের দিকে কেউ তাকাতে পারি নি। আড়চোখে ইন্দ্রাণীকে একবার দেখেছিলাম—দেখলাম ওর মাথাটা অনেকটা ঝুলে পড়েছে ঘাসের কাছে—গাল দু'টো লাল। অথচ সুবিমল ঠিক আগের মত চিৎ হয়ে শুয়ে চোরকাঁটার ডাঁটা চিবোচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর কথা বলল ইন্দ্রাণী—তুমি আজকাল এমন বিশ্রী হয়ে পড়ছ যে, মানুষের সাথে মেশার উপযুক্ত নও।

—মিশো না—মিশো না—কেটে পড়—ঠিক—ঠিক পথ দেখে কেটে পড়—জীবন বদলেছে টেষ্ট বদলেছে, এখন এসব উপদেশের খুঁত্-খুঁতে প্রেম ভাল লাগে না। সুবিমল শুয়ে শুয়েই বলল।

—সে জানি। তবে সেটা ভদ্রভাবে বললেই হ'ত। এ ভাবে—এমন বিশ্রী করে—চলি প্রদীপদা।

এবার আমি কি করি—। মহা মুস্কিল। সুবিমলটা আজকাল এমন হচ্ছে যে, কারো সাথে মানিয়ে চলছে না। কি সংসার—কি বন্ধু-বান্ধব—সবার সাথে ঝগড়া করছে। সেদিন পাড়ার ছেলেদের সাথে পূজোর চাঁদা নিয়ে অকারণ তর্ক করে শেষে আট আনা পয়সা ওদের হাতে না দিয়ে ছুঁড়ে দিল। এবং এসব ক্ষেত্রে যা হয় তাই বলতে বলতে তারা শাসিয়ে গেল ওকে।

ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াতে আমি বল-লাম—ওর সাথে সাথে তুমিও কি ক্ষেপে গেলে নাকি। বোস। ওর সাথে কথা

—ও যা বলেছে তার পর আর আপনার সাথে কথা বলা যায় না প্রদীপদা। সম্মান সবারই আছে—ওর একারই শুধু নেই—। ইন্দ্রাণী মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলে আর দাঁড়ালো না চলে গেল।

সুবিমল বেশ কিছু পরে বলল—খুব রেগেছে না রে—?

—সবাই তো আর বুদ্ধদেব না। এমন সব বাচ্ছেতাই কথা বলিস আজকাল, যার কোন মানে হয় না।

—ওই বা ওসব বলবে কেন? কত বড় ইডিয়ট্—ফট্ করে বলে বসল হাত খরচের জন্য কবিতা লিখতে! ও মেয়ে; ওর দৌড় মিষ্টিকথা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত—হালে চাকরী করছে—সংসার করলে ছেলে মানুষ করা পর্যন্ত। —ও আমার কবিতা নিয়ে কথা বলবে কেন—? ওকে যতটা ভালবাসি—ও আমার লেখা নিয়ে কোন কথা বললে ঠিক ততটা ঘেন্না হয়। এতদিন সহ্য করেছি—আজ পারলাম না। আচ্ছা তুই বল—আমি কেন লেখা ছেড়ে দিয়েছি এ কথা ওকে কি বোঝাব? ও আমার কে?—খুব বেশী হ'লে একটা ছায়া—তার বেশী তো নয়। তবে ওর কাছে আমার যন্ত্রণাকে ব্যাখ্যা করতে যাব কেন? আসলে কি জানিস, ওরা এত অহংকারী যে, সব সময় ভাবে সবাই ওদের কাছে উত্তর আর স্তুতি গেয়ে যাবে। ও সব ন্যাকামী ওর অপিস-কলিগদের দেখাক গে। আমার কাছে নয়—

—কিন্তু ওকে না বললি আমাকে অন্তত বল—কেন তুই লেখা ছেড়ে দিচ্ছিস? পত্রিকাগুলো যখন অফার করছে—লেগে থাক না কেন—?

—দীপ্—তুইও তো এককালে এসব নিয়ে মেতেছিলি—এখন শুধু অপিস অ্যাণ্ড হোম্ কেন—? খুব নিস্তেজ গলায় কথা বলল সুবিমল।

—আমার দ্বারা ওসব হবে না বলে—বহুদিন ছেড়ে দিয়েছি—

—ঠিক। ঐ হবে না বোধটাই বলতে চাই—সেটা ঠিক বলা হচ্ছে না। যে যন্ত্রণাটা রোজ আমার মাথার রক্ত খায় সেটার সঠিক অনুবাদ হচ্ছে না—তাই ছেড়ে দিয়েছি। আসলে মনে হয় কবিতা কেউ লেখে না—সবাই কবিতা লেখার চেষ্টা করে। পারা যায় না দীপ্। যে কষ্টটা খোবলাচ্ছে সারাক্ষণ লেখার পর তাকিয়ে দেখি তার আকৃতি এঁকেছি—গতি দিয়েছি—কিন্তু ঠিক যে ব্যথাটা পেয়েছিলাম সেটাই বাদ পড়ে গেছে। তাই এখন কিছু লিখি না—ভাবি না—কেবল দেখি—জানিস সব কিছু দেখতে এখন খুব ভাল লাগে। আর যন্ত্রণা বিক্রি করেই বা কি হবে? আমার যন্ত্রণা বেচে অন্য একজন বড়-লোক হবে—স্বনামধন্য পাঠকরা রেষ্টুরেন্টে চায়ের মজলিসে টেবিল চাপড়ে সেই যন্ত্রণা নিয়ে শিল্প-শিল্প করে খানিকটা কুকুরের মত নিষ্ফল তর্ক করবে—অথচ আমি জানি ওরা কবিতার কয়েকটা শব্দকে নিয়েই ব্যস্ত হয়—তার পিছনে শব্দের নিভৃত ব্যথাটা ওরা দেখে না—বোঝেও না, যেখানে আমি আছি, আমার ক্লান্ত মনটা শুয়ে আছে—তাই আর এসব মানতে পারছি না—মিছিলে তো যেতে পারব না কোন দিন—নিজেকে বন্ধ করে দূর থেকে একটা প্রতিবাদের চেষ্টা করছি—।

ঘুম এসেছিল—ভীষণ ঘুম এসেছিল সে রাতে। সুবিমলের কথাগুলো আবছা হয়ে কানে ভাসতে ভাসতে ওর প্রতি বিরক্তিটা অনেক কমে গিয়েছিল—তার বদলে সুবিমলের নিষেধ অমান্য করে ওর ক্লান্ত মুখটা আমায় বারবার ডাকছিল। তবু যেতে পারি নি। এত ঘুম এসেছিল সে রাতে—সে অন্ধকার ঘরে ময়লা তক্তপোষের ওপর বাস্তব সুবি-মলের থেকে স্বপ্নের ক্লান্ত সুবিমলকেই অনেক বেশী সুন্দর লেগেছিল আমার।

সুবিমলের চিঠি

দীপ, বেশী দেরী নেই আর। চাইম্‌পীসটা ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে। এখন রাত এগারোটা বেজে কুড়িতে এলে সাথে তর্ক করেছি। কিন্তু এবারের তর্কে বাবাকেই জিতিয়ে দিলাম। মনে হ'ল শেষবারের মত জীবনের এই জায়গাটা —উনিশে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সাড়ে দশটার কাছাকাছি রাতে বুড়োটা একটু জিতুক। বুঝুক তার ধর্মের ষাঁড়ের মত ছেলেটা তার বাণীকে নীরবে গ্রহণ করেছে। এখন হয়ত বুড়োটা মশারীর অন্ধকারে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে—বহুদিন পর ছেলে তার কথার প্রতিবাদ করে নি —উত্তর দিতে গিয়ে আমতা-আমতা করেছে। হয়ত কপালের পাশে দু'টো মশা বসে ওর ব্যথাতুর রক্ত চুষছে। তবু নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে মানুষটা। স্বপ্ন দেখছে তার সুবিমল প্রথম মাসের মাইনে বাবার হাতে তুলে দিয়ে মাথানীচু করে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে। আর সে হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিচ্ছে। ঘুমোচ্ছে বুড়োটা—উনিশে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার সাড়ে দশটার কাছাকাছি রাতে জীবনে প্রথম জয়ের তৃপ্তিতে ঘুমোচ্ছে বুড়োটা—। ঘুমোক।

যাক্ গে—বেশী দেরী নেই আর। ঐ নিমগাছের তলা দিয়ে সরু পথটা দিয়ে বহুদূর অন্ধকারে চলে যেতে হবে আমায়—। বেশ বাতাস বইছে এখন। শীত-শীত করছে একটু। হাঁ জানিস একটা মজার কথা বলি। বহুদিন পর আজ আমার জ্বর এসেছে রে—থার্মমিটারে দেখলাম তিন্। ঠিক বুঝলাম না হঠাৎ আজই ওর আমাকে কি প্রয়োজন পড়ল? না কি আমায় যেতে দেবে না হাসি পাচ্ছে—ভীষণ হাসি পাচ্ছে মনে হচ্ছে জ্বর বিষ্ণুপ্রিয়া অভিনয় করবে বুঝি। তা অবশ্য মন্দ লাগবে না—জোড় না থাকলে ছিঁড়তে মজা লাগে না।

শোন, ইন্দ্রাণীকে বলে দি ইকনমিক্স এইটা আমার বইয়ে তাকে আছে। যেন নিয়ে যায় এ বাড়ীতে ওসব পাট তো বহুদিন চুকে গেছে—। ওর ছোট বোনের জন্য বইটা ও চেয়েছিল। দেব-দেব করে দেওয়া হয়ে ওঠে নি। প্রায় চার ব

রাগ করে যে ও চলে গেল, তারপর আর আসেনি। আসবে না কোনদিন। —জানিস—এখন, ঠিক এই এগারোটা বেজে পঁচিশে ওকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে রে---। ইচ্ছে করছে ওকে ডেকে আজ খুব আদর করে—ওর ঠোঁট-চুল-শরীরের সব কিছুতে আমার আদর—আমার বহুদিনের পুরোন সোহাগ রেখে যাই। দীপ্ সবার প্রতি ঠিক-ঠিক ব্যবহার কেন করা যায় না বলত? যে যেমন চায়। আমি জানি আমার ইন্দ্রাণী অনেক ব্যথা বুকে নিয়ে জীবনকে অন্যভাবে ভালবাসতে চলে গেছে। ভুলটা কোথায় জানিস? --আজ ধরেছি।---ও আমায় ভালবাসার নিবিড়তা দিয়েছিল---কিন্তু আমি ওকে বহুদিন থেকে কেবল ভালবাসবার চেষ্টাই করে এসেছি---পারি নি।

আসলে সময়টা অসুস্থ বলে এমন হচ্ছে সব। আমরা কেউ ঠিক্-ঠিক্ বোধ নিয়ে বেঁচে নেই। এখন সবাই ব্যস্ত—অথচ সেই ব্যস্ততার মত কাজ নেই---। ঠিক কুকুরের মত সব সময় দৌড়চ্ছি—বুকের ভিতর অখণ্ড অবসর নিয়ে---।

আমি জানি এটা অবসর নয়---একটা গোপন অসুখ। এই অসুখের জন্য ঠিকমত কিছু বলা যায় না---ঠিক কিছু চাওয়া যায় না---আবার চাইলেও তাকে চিরদিনের মত গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে না।

তাই সবাই রাগছে, ভীষণ রাগছে—ভীষণভাবে চীৎকার করে, তা'র—বারবার মত বদলানোর খবর ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে। অভাবটাকে উল্টেপাল্টে নেড়ে-চেড়ে গন্ধ বের করে বলছে—মিছিলে চল। অবশ্য সেটা সমাধান না পেয়েই।

জানি না মানুষের এই বিমর্ষ অসুখটা সূর্য থেকে এসেছে কি না---। মনে মনে আমি 'এর একটা ওষুধ তৈরী করেছিলাম। যদি ডাক্তার হতাম, তবে হয়ত এখন সেই ওষুধ পরীক্ষা করতে গিয়ে জেলে বসে অনেক অপরাধ নিয়ে (যদিও জানি না অপরাধ বলে সত্যিই কিছু আছে কি না।) অন্ধকার ঘরে পাথর ভাঙতে হ'ত। কিন্তু এটা ঠিক ---আমার ওষুধের উপকরণগুলো সব ঠিক ছিল। শুধু 'ডোজ্'টা ঠিক করতে পারি নি। কাকে ক'টা দিতে হবে এইটুকুই বুঝিনি।

অথচ ওষুধের উপাদানগুলো সবই আমাদের শরীরের প্রয়োজনেই দরকার। দুটো ভ্যাক্সীন্ তৈরী করতে হবে। তার মধ্যে একটা থাকবে অ্যান্টি-ডোট্। অন্যটা হবে অ্যান্টিপ্যাথি থেকে। পরে দুটো মিলিয়ে (অবশ্য ডোজ্টা জানি না) শরীরে টিকের মত দিতে হবে।

এ্যান্টিপ্যাথি ভ্যাক্সীন্টাতে থাকবে —মৃত বেশ্যার দুঃখিত রক্ত—সাপের পেটের চর্বি—হাইড্র্যাণ্টের জল—গলিত পশু বা মানুষের কিছু শরীরের অংশ—প্রধানমন্ত্রীর বুড়ো আঙুলের রক্ত—কোন এক ধনীর বাড়ীর ভিতের তলার জলা মাটি—বন্যা এবং খরার

জ্বলে পড়া একটা মানুষের পাকস্থলীর ভেতর---রকেটের যান্ত্রিক কিছু আগুন---অহংকারী কুমারীর ঋতুর রক্ত---সব শেষে সিরিঞ্জে নিবি একটা মুমূর্ষু কুকুরের চোখের জল। এর পর অ্যাণ্টিডোট্ ভ্যাক্সীনে নিবি---সকালের আকাশ ভোলানো রোদ---শিশুর চোখের জল এবং নিশ্বাস---নীল শাড়ীতে মোড়া কোন সুন্দরীর মুখের গন্ধ---প্রজাপতির লালা---মৃত রাজনৈতিক নেতার কবরের বাতাস---সাদা কোন ফুলের (সন্ধ্যায় ফোটে না এমন ফুল কিছু) গন্ধ---কিছুটা আকাশ---ওটা দিতেই হবে---ওটুকু শূন্যতা না দিলে মানুষের সুস্থতা পরিপূর্ণ হবে না---এ ছাড়া দিবি সন্ন্যাসীর হাসি (খবরদার সাধুর নয় কিন্তু, ওটা অভাবের ভণ্ডামী) বাউলের একটুকরো গান এবং সব শেষে দিবি কোন নির্জন কবির শেষ ব্যথা।---

দীপ্ আমার মনে হয়, এইগুলো একসাথে মিশিয়ে মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট ওজনে ঢুকিয়ে দিতে পারলে---সুসময় আসতেও পারে পৃথিবীতে।

এ সব গোপন অসুখের চিকিৎসা ঐভাবে না করলে মানুষ সুস্থ হবে না রে---। এখন আমার সেই কবির কথা মনে পড়ছে। নাম মনে নেই---কবিতার লাইনও মনে পড়ছে না। কবিতাটা দেশ-পত্রিকা কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু সে লিখেছিল---হাতে এত অল্প সময় নিয়ে ষ্টেশনে এসেছিল যে, টিকিটওয়ালার কাছে ফেরৎ পয়সা নেবার সময় ছিল না তার। কিন্তু সে ষ্টেশনে এসে জানল গাড়ী লেট্---আসতে অনেক দেরী। ভীষণ রেগে গেল সে। ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়ে বলল---দাও, তোমার নালিশ বই দাও। নালিশ বইয়ের পাতা খুলে গ্যালারীর মত লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মাথার ভিতর তার হাজার প্রতিবাদ---অদ্ভুত নালিশ ঘুরছে মন্ত্রী থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত সবার বিরুদ্ধে। অথচ সে সব নালিশের একটা অক্ষরও সে লিখতে পারল না। বিশাল গ্যালারীমত লাইন-টানা নালিশ বুকের ছোট্ট এককোণে সে শুধু ক্লান্তভাবে লিখে রাখল---ক্ষতি হয়।

দীপ্---এই আমাদের অসুখ। যা বলতে চাই---প্রকাশে তা বলা হয় না। শুধু ঐ 'ক্ষতি হয়' ছাড়া কিছু লেখা যায় না রে---। আসলে কার বিরুদ্ধে যে নালিশ সেটাই যে সঠিক-ভাবে জানে না মানুষ। তেমনি জানে না তার যন্ত্রণার কেন্দ্রটা কোথায়?

মিছিলের মানুষগুলো জোট বেঁধে যায়---জোট বেঁধে শ্লোগান দেয়। কিন্তু হাজারো নালিশের একটা নালিশও সুস্থভাবে জানানো হয় না। একটা নিয়ম আর অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে তারা কথা বলে। অথচ এটা তো সত্যি নিয়মের মধ্যে দিয়ে কখনো নালিশ করা যায় না। তাই সঠিক প্রতিবাদ কার বিরুদ্ধে---সেটা মনে করতে গিয়ে শুধু ক্ষতি হয়। এর মতন একটা বিকীর্ণ রব তারা রেখে আসে---। যে ভাষা পরিষ্কার নয়---অভিযোগের নির্দিষ্ট আকার বলে দেয় না। শুধু তাই ক্ষতি হয়---ক্ষতি হয়। ঠিক তখনই আসে ক্ষোভ। নিজের বন্ধ্যা প্রকৃতির উপর রাগ ছড়িয়ে পড়ে---আগুন আর সন্ত্রাসের ভিতর দিয়ে তারা মরে গিয়ে---আহত হয়ে---আবার তারা প্রতিবাদের জন্য নালিশ বইয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়।

দীপ্ বেশী দেরী নেই আর---। এরকম বোধ ঠিক-ঠিক বোঝা হয়ে গেলে সবারই চলে যেতে ইচ্ছে করে। আমিও যাচ্ছি। এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি, আমার চারদিকে একটা ছোট্ট বেড়া উঠেছিল এতদিন। আমার ক্ষোভ এবং বিদ্বেষ থেকে তার জন্ম---সেই বেড়াটাই আমার আড্ডাতে আমাকে কষ্ট দিয়েছে বেশী।---সুস্থতার যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু নষ্ট হয়ে গেছে তাড়া-তাড়ি। নিজের এই বিলাসী স্বাতন্ত্র্যের নাম কি আমি জানি না---তবে মনে হয় মানুষের নিরাশ্রয় মুহূর্তের চাপে-চাপে সে নির্জনতা বুকের ভিতর সৃষ্টি হয়---তারই গোপন নির্দেশে সত্তার চারপাশে জুটে যায় এমনি এক স্বাতন্ত্র্যের আড়াল।

এটা যদি না থাকত, তবে হয়ত যন্ত্রণাটা এতটা নির্মম নিঃসঙ্গ হ'ত না। বাবা-ইন্দ্রাণী-শীলা-মণ্টু সবাইকে নিয়ে আর কতগুলো বছর পুরোন আমি'টার মত মানিয়ে চলতে পারতাম। তা তো হ'ল না---। সীমানার বাইরে যেতে হ'লে এখন শরীর শুদ্ধই পালাতে হবে। মাথায় অজস্র নালিশের চীৎকার---অথচ কথা বলতে গেলে মনে হয়---শুধু ক্ষতি হয়---।

আর বেশী দেরী নেই---। এবার উঠতে হবে। বারটা বত্রিশে মেলটা পাস করে এখান দিয়ে। একটা কথা দীপ্---শীলাকে আর তুই ভালবাসিস না---না রে---? আমি জানি রে সব---। শীলা তো আর তেমন ভালবাসার মত মেয়ে হয়ে নেই---। এই ঠিক রে---ভালবাসার মেয়ে আলাদা---অন্য রকম---তুই আর কি করবি---।

যাক্ গে---। আর বেশী দেরী নেই---। জ্বরটা বাড়ছে---খুব ধীরে, সন্তর্পণে। ও আমায় জড়াতে চাইছে। পারছে না---পারবে না। ঐ নিম গাছের তলা দিয়ে, সরু মাটির পথ দিয়ে, বহুদূর অন্ধকারে এখন আমায় যেতে হবে-----দেয়ালে মা'র ফটোটার উপর টিক্-টিকিটা ঘুমিয়ে---। কার কাছে বিদায় নেব? মা---না টিক্‌টিকি---? জানি না। ---এখানেই শেষ করছি। চলি রে---।

এবার
মন-রাঙাবে
নতুন রূপে !
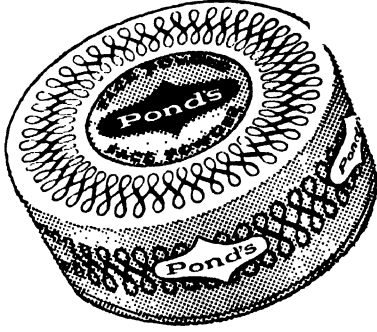
পণ্ড্‌স
ফেস্ পাউডার

আগের চেয়েও মিহি, গন্ধে মনোরম,
একবার লাগালে থাকে বহুক্ষণ—
কৌটোটিও সুন্দর—নতুন ধরণ

উজ্জ্বল রূপের গরিমায় ভরিয়ে তুলুন মুখখানি।
এখন নতুন রূপে পাবেন আপনার প্রিয়
ফেস্ পাউডার—পণ্ড্‌স ফেস পাউডার।
মেখে দেখুন, মায়াবী লাবণ্যে
ঘিরে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে।
নানান রঙে পাবেন, তা থেকে আপনার
নিজের পছন্দসই রঙটি বেছে নিন।

নতুন কৌটো কিনে দেখুন,
কতো চমৎকার নিখুঁত এখন।

পণ্ড্‌স ফেস্ পাউডার—
আর সব ফেস্ পাউডারের চেয়ে
এর ওপরই রূপবতী রমণীদের নজর

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইনকরপোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

॥ এক বিচিত্র পাখী ॥

দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
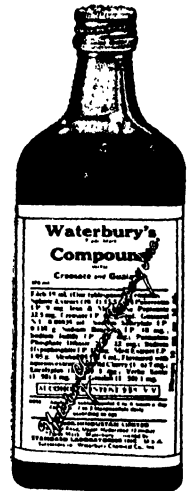
একই প্রজাতির একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীপাখির মধ্যে রঙের সাদৃশ্য কিংবা বৈষম্য দেখে প্রেম-প্রার্থনা ও প্রজনন সম্পর্কে ঐ প্রজাতির পাখিদের আচরণ সাধারণত বুঝতে পারা যায়। কোন প্রজাতিতে পুরুষ-পাখি স্ত্রী-পাখির থেকে বেশী বর্ণাঢ্য হলে, পুরুষ-পাখি স্ত্রী-পাখির কাছে প্রণয় প্রার্থনায় প্রধান ভূমিকা নেয় আর শাবককে লালনপালনের বেলা তাদের ভূমিকা হয় গৌণ। কিন্তু কোন কোন প্রজাতিতে স্ত্রী-পাখিটি পুরুষ-পাখির থেকে বেশী রঙ-বাহারী হয়, আর এরাই পুরুষের কাছে প্রণয় প্রার্থনায় অগ্রণীর ভূমিকা নেয়, আর শাবককে লালন-পালনের ভার পড়ে একা পুরুষ-পাখির ওপর। ফ্যালারোপ এই জাতীয় একটি বিদেশী পাখি।

ফ্যালারোপ (Phalarope) উপকূলবাসী এবং জলচর পাখি। ওদের তিনটি প্রজাপতির মধ্যে সব চেয়ে পরিচিত উইলসনস ফ্যালারোপ (উইলসন সাহেবের নামানুসারে)। প্রজননের সময় ছাড়া অন্য সময় এদের পুরুষ ও স্ত্রী---দুই পাখিরই পালকের রঙ দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রজননকালে পালকগুলো অন্য রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। তখন স্ত্রী-পাখির রঙ পুরুষ-পাখির থেকে অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্ত্রী-পাখি এই উজ্জ্বল রঙের সাহায্যে সহজেই পুরুষ-পাখিকে আকর্ষণ করতে পারে। স্ত্রী-পাখির আকার পুরুষ পাখি থেকে কিছুটা বড়। প্রজননকালে এদের যৌন-আচরণ সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। সঙ্গী নির্বাচনে স্ত্রী-পাখি পুরুষ-পাখির থেকে অনেক বেশী উদ্যোগী হয়। যথাসময়ে স্ত্রীপাখিটি তার মনের মতন একটি পুরুষ সঙ্গী পছন্দ করে নেয় এবং পুরুষ-পাখী যে দিকেই যাক্ স্ত্রী-পাখিটি তাকে অনুসরণ করতে থাকে। ঐ সময় যদি অন্য কোন স্ত্রী-পাখি এই পক্ষিযুগলের সামনে এসে পড়ে, তাহলে এই স্ত্রী-পাখিটি অবনত মস্তকে খানিকক্ষণ থাকে। এই ভঙ্গিটি হচ্ছে আগন্তুককে ভয় দেখানোর ভঙ্গি, মাথা নিচু করে, এরপর এই স্ত্রী-পাখিটি আগন্তুক স্ত্রীপাখির দিকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে সাঁতার কেটে এগিয়ে যায়। আগন্তুকের খুব কাছে এসে হঠাৎ ডানা তুলে গলা বাড়িয়ে পা-নাচিয়ে আগন্তুক স্ত্রী-পাখিটিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। সাধারণত আগন্তুক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পশ্চাদাপসরণ করে এবং প্রথমোক্ত স্ত্রী-পাখিটি তাকে খানিকটা পিছু ধাওয়া করার পর আবার তার প্রিয়ের কাছে ফিরে আসে। আগন্তুকের সঙ্গে আসল দ্বন্দ্বযুদ্ধ কিন্তু কদাচিৎ দেখা যায়। কাজেই এইভাবে স্ত্রী-পাখি অন্য সব আগন্তুক স্ত্রী-পাখিদের ভয় দেখিয়ে কিংবা প্রয়োজনবোধে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়, আর এইভাবে পুরুষ-পাখিটিও তার সঙ্গিনীর সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

মিলনের প্রাক্কালে পুরুষ ও স্ত্রী-পাখি কখনো কখনো মাথা উঁচু করে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে থাকে। দু'টি পাখিরই একটির ঠোঁট অন্যটির মাথার ওপরের দিকে ঘোরানো থাকে। এই ভঙ্গিমায় কয়েক সেকেণ্ড অতি-বাহিত হয়। এই ভঙ্গিটিকে নির্ভয়তা-জ্ঞাপন ভঙ্গি বলা যেতে পারে। এরপর স্ত্রী-পাখিটি মিলনোৎসুক হলে ওদের মধ্যে যৌনমিলন ঘটে। পূর্বোক্ত ভঙ্গিটি সম্ভবত প্রথম মিলনের সময়ই ব্যবহৃত হয়। পাখি দু'টি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে তখন এই ভঙ্গিরও অবলুপ্তি ঘটে।

ডিম পাড়া হয়ে গেলে স্ত্রীপাখি প্রজনন ক্ষেত্র (Breeding ground) ছেড়ে চলে যায়---তারপর একুশ দিন ধরে বেচারা পুরুষ-পাখি ডিমে তা দেয় এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোলে আরও দশ দিন ধরে সদ্য ডিমফোটা বাচ্চাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। ডিমে তা দেওয়ার কিছু আগে পুরুষ-পাখির পেটের কাছ থেকে পালক ঝরে পড়ে যায়। তারপর উন্মুক্ত দেহত্বক আরো পুরু হয়ে ওঠে
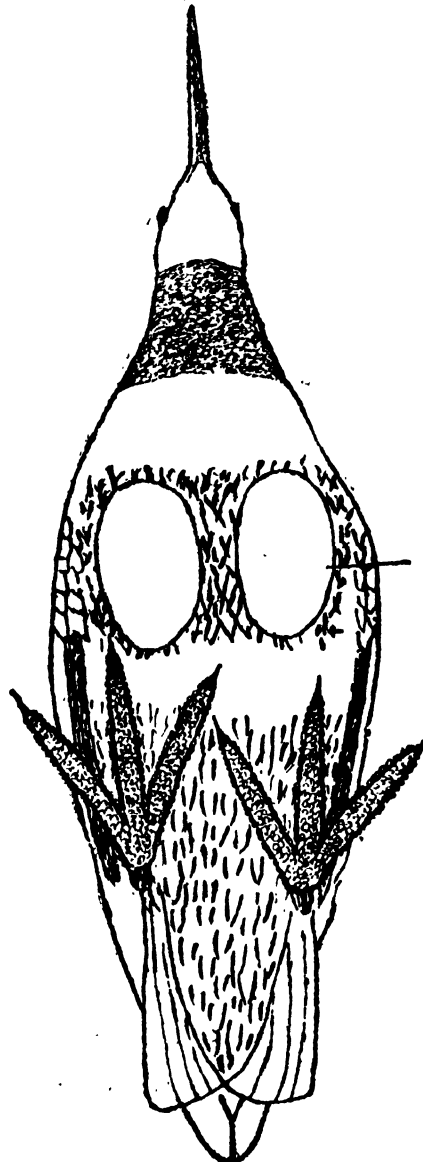
ডিমে তা দেওয়ার দাগ

পুরুষ ফ্যালারপ পাখি

এবং দু'টি জায়গা রক্তপূর্ণ হয়ে ওঠে। এগুলোই ডিমে তা দেওয়ার দাগ (Blood patch)। এই ডিমে তা দেওয়া দাগগুলোর সাহায্যেই পুরুষ-পাখি তা দেওয়ার সময় ডিমগুলো উষ্ণ করতে পারে।

প্রজননের সময়ে ঐ রকম অস্বাভাবিক আচরণ ছাড়াও ফ্যালারোপ পাখিদের আরও কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন অগভীর জলে, উপকূলবাসী অন্য পাখিরা যেখানে কষ্ট করে হাঁটে, এরা সেখানে সাঁতার কাটে। এরা খুব ভাল সাঁতারু। এদের পায়ের গঠন সাঁতার দেবার খুব অনুকূল। সাঁতার দিতে দিতে এরা জলের ওপর থেকে কিংবা মাথা ডুবিয়ে নিচে থেকে হাঁসের মত খাবার তুলে নেয়। খাওয়ার সময় কখনো কখনো এক অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করা যায়, এরা লাটিমের মত জলের ওপর ঘুরপাক খেতে থাকে। সাধারণত অগভীর জলে, জল ঘুলিয়ে নিচ থেকে খাদ্যবস্তু ওপরে তোলার জন্য এ রকম ঘুরপাক ওরা খায় বিশেষ কারণে। জলে বেশী খাদ্যকণিকা থাকলে ওরা এই রকম করে ঘুরে ঘুরে খেয়ে থাকে।

প্রজননের সময়ে ফ্যালারোপ পাখির ঐ অদ্ভুত আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? দেখা গেছে — প্রাণীদের ক্ষেত্রে যৌন হর্মোন এনড্রোজেনের (Androgen) প্রভাবেই প্রেম-প্রার্থনায় পুরুষ অগ্রণীর ভূমিকা নেয়।

প্রজনন চক্রের (Breeding cycle) প্রথম দিক স্ত্রী ফ্যালারোপের দেহে পুরুষের থেকে বেশী পরিমাণ এনড্রোজেন তৈরী হয়। এই হর্মোন স্ত্রী-পাখিতে বেশী তৈরী হওয়ার ফলেই স্ত্রী-পাখিরা ওরা বেশী উদ্যমশীল হয় এবং এই হর্মোনের প্রভাবেই পুরুষ-পাখির থেকে ওদের দেহ বেশী রঙ-বাহারী হয়। স্ত্রী-পাখিতে না হয়ে কেন পুরুষ-পাখির দেহে ডিমে তা দেওয়ার দাগ দেখা দেয় এবং পুরুষ-পাখি ডিমে তা দেয়, তারও একটা হর্মোন বিষয়ক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। দেখা গেছে, ফ্যালারোপের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এনড্রোজেন ও অন্য একটি পিটুইটারী হর্মোন প্রোল্যাকটিনের (prolactin) সংযোগে এবং তাদের প্রভাবেই ঐ দাগ দেখা দেয়। স্ত্রী-পাখিতে ডিমে তা দেওয়ার দাগ তৈরী না হওয়ার কারণ প্রোল্যাকটিনের স্বল্পতা যা পুরুষ-পাখিতে বেশী পরিমাণে তৈরী হয় এবং এই হর্মোনের স্বল্পতাই ডিমে তা দেওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী-পাখির উদাসীন থাকার মূল কারণ।

"গন্ড্ওয়ানাল্যাণ্ড"—প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশ

দেওয়ান্ চমনলাল দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাচীন মায়া ও আজ্টেক্ সভ্যতার সঙ্গে হিন্দু কৃষ্টির অনেক মিল লক্ষ্য করে লিখেছেন যে, এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব নয় যে, আমাদের ভারতীয় আদি পুরুষগণই এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে হিন্দু সভ্যতার প্রচার করেছিলেন। হবেও বা!

আধুনিক পণ্ডিতেরাও নানা লক্ষণ বিচারে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এ্যান্টার্কটিকা (দক্ষিণ মেরুস্থ বিশাল ভূখণ্ড) একসঙ্গে সংযোজিত ছিল এবং পরে তারা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে প্রাকৃতিক কারণে।

সম্প্রতি দু'জন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক অন্তত চারশো মিলিয়ান বছরের পুরাতন 'দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট এক প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন এ্যান্টার্কটিকা-এ প্রাণী আধুনিক জলহস্তীর পূর্ব পুরুষ এবং আফ্রিকায় প্রাপ্ত ঐ যুগের জীবাশ্মের সঙ্গে এর অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

এঁরা এই আবিষ্কারকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করছেন এবং আজ পর্যন্ত যত প্রমাণ পাওয়া গেছে 'গন্ডওয়ানাল্যাণ্ড'-এর আদি অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তার মধ্যে এটাকে সবচাইতে প্রামাণিক বলে মনে করছেন।

এঁদের মতে প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশ গন্ডওয়ানার অস্তিত্ব অদূর ভবিষ্যতে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হতে চলেছে।

রজনীগন্ধার দিন

সুধাময় মুখোপাধ্যায়

বোধ হয় সেটা আষাঢ় মাসই হবে। ঘনঘোর বর্ষা কাজল-কালো মেঘের কুন্তল ছড়িয়েছে সারা আকাশে, 'দাদুরী ডাকিছে সঘনে।' অফিস ছুটি হয়ে গেল সকাল-সকালই। কারণ আগের দিন জোর বর্ষণে কলকাতার পথ-ঘাট ডুবে গিয়ে সমুদ্র হয়েছিল। ফিরছিলাম তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে। মেঘের শাসন ভয় জাগাচ্ছিল মনে। বাড়িতে ছোট ছেলে পিণ্টুর ক'দিন জ্বর। ওর মায়ের শরীরও ভাল নয়। তার ওপর এক নাগাড়ে বর্ষায় মেজাজ এমনি সপ্তমে চড়ে আছে। ওর দোষও নেই। ঘরে চাল বাড়ন্ত হলেও ষষ্ঠীর কৃপা অন্তহীন। অনেক আশা—অনেক কামনার ঝরে-যাওয়া দীর্ঘশ্বাসে ভরে গেছে জীবনের সব কটি মুহূর্ত। আছে শুধু শূন্যতার হাহাকার। নানা চিন্তার জাল কাটতে কাটতে চলেছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন কণ্ঠ কঁকিয়ে উঠল, 'বাবু, একটা কথা শুনবেন'। মুখ ফিরিয়ে দেখি একটি বছর দশেকের ছেলে। হাতে একরাশ সদ্য-ফোটা রজনীগন্ধা। আমায় ডাকে কেন? প্রশ্ন করি---'কী ব্যাপার? কিছু বলবে?' ওর কণ্ঠে বিনীত মিনতি যেন কেঁদেই উঠল---'ফুল নেবেন বাবু, ফুল?' আমি পোড় খাওয়া কনিষ্ঠ কেরানী। অভাবের গর্তে সংসারের সুখ-শান্তি কবেই ডুবে গেছে। ফুল নিয়ে আমি কি করব? আমার হাতে ঐ রজনীগন্ধা আজ আর মানায় না। ওকে বলি, 'দেখ তোমার ঐ রজনী-গন্ধা কিনে সখ করার মত সময় আমার নেই, বরং কিছু চাল পেলে কিনতাম।' ছেলেটির চোখে ভরা আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে এল, বৃষ্টি নামে বুঝি। ও বলল, 'বাবু, চাল আমারও দরকার। মা আজ সাত দিন জ্বরের পর ভাত খাবে। ফুল বেচে যা হয়, তাই দিয়ে কিছু চাল কিনব।' আমার পাঁচটা কুড়ির লালগোলা ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে এক ডজন রজনীগন্ধার তাজা ঝাড় কিনে ফেললাম। মনে হল, আমার জীবনে ফুলের দিন হয়তো কবেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ যে ফুলের মত টাটকা ছেলেটি, ওর মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি, এটাই কি কম লাভ?

ট্রেনে যাহোক করে একটু দাঁড়াবার জায়গা পেলাম। বেজায় ভিড়। ভিড়ের চাপে আমার রজনীগন্ধা তার স্নিগ্ধতা হারালো। মনটা টন টন করে উঠল ব্যথায়। পাশ থেকে হঠাৎ এক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে উঠলেন, 'দাদার শখ আছে দেখি। চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে প্রাণ যায়, উনি আবার রজনীগন্ধার ঝাড় ধরে চলেছেন।' বিরক্ত হলাম, কিন্তু উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ভেবেই নীরব রইলাম। নামলাম নৈহাটিতে। নেমেই বিপত্তি। পাড়ার মুদীখানার মালিক ঘটকৃষ্ণ'র সঙ্গে দেখা। ওর জিভে যেন ব্যঙ্গ চলকে উঠলো, 'টাকাটা তাঁবাদি হতে চলল, এদিকে আবার ফুল কেনা হয়েছে দেখছি। তা ভালো। বিয়ের বার্ষিকী নাকি মশাই?' গা-টা রি-রি করে উঠল, কিন্তু কী বা উত্তর দেবো ওই স্থূল গদ্যময় মানুষটিকে? ওর মাস পাওনার হিসেবই ও জানে, তার বাইরেও যে মনের একটা ছিমছাম চেহারা থাকতে পারে, সে-খবর ও জানে না। ফুলগুলো লুকোবই বা কোথা? সৌন্দর্য চাপা থাকলেও গন্ধ তো চাপা থাকবে না। হন হন করে পা চালিয়ে দিলাম।

মিত্তির পাড়ার মোড়েই দেখা হয়ে গেল সুরেশের সঙ্গে। সুরেশ আমার বাল্যবন্ধু। দূর থেকে মনে হল তারও চোখে চকচক করছে রসিকতা করার লোভে। কাছে আসতেই ও বলল, 'কি হে, চুলে তো পাক ধরেছে। আজ আর রজনীগন্ধা কেন? হাতে কপি দেখলে আশ্চর্য হতুম না। কিন্তু রজনীগন্ধা।' ওকে হেসেই উত্তর দি---'আর বোলো না ভাই, ধরে বেঁধে গছিয়ে দিল।' ও একটু রোম্যান্সের গন্ধ পেলো বোধ হয়। বলল, 'কে কোনও মায়াবিনী হরিণী নাকি?' ওকে আর কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে চলি। বাড়ির কাছাকাছি পৌছে মনে হল। বড় ছেলে সন্তুর মত কে যেন প্রায় পিছনে সরে গেল। ওকে দেখে সারা দেহে কেমন একটা শিরশিরে শীতলতা অনুভব করলাম। পরক্ষণে ভাবলাম, ওকি আর অত স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে? যাই হোক, সাহসে বুক বেঁধে বাড়ি ঢুকতে যাবো, দেখি, আমার ছোট শ্যালিকা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে। পড়বি তো পড় নজর অন্য কিছুতে, তা নয় ঠিক পড়লো আমার হাতের দিকে। 'ও মা, জামাইবাবু যে দেখি রজনীগন্ধা কিনে আনছেন? ওদিকে

সিন্দুর থেয়ে খুব জয়। যাক, দিদি যা খেপে আছে।' ওর সংগে দু' চার কথা বলতে বলতে খানিকটা সময় কেটে গেল। একটু যেন হাল্কা বোধ করি। ও চলে গেছে। বাড়ির চৌকাঠে পা দিয়েই হাড়ে হাড়ে টের পেলাম যে, ঘরণী খবর পেয়ে গেছেন। গলা শুনতে পেলাম তাঁর, 'কী বললি? ফুল কিনেছে। ঠিক দেখেছিস তো? ঘরে চাল নেই, ছেলেটা ধুঁকছে। ওঁর এখন কি না ভীমরতি হল? ফুল কিনে কোন্ মুখে বাড়ী আসছে শুনি?' আর শুনতে পারি না। কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। রজনীগন্ধার ঝাড়টি মরিয়া হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই বাড়ীর পাশে এঁদো ডোবাটা লক্ষ্য করে। ঝুপ করে একটি শব্দ। ব্যস্। আমার রজনীগন্ধা নীরব অন্ধকারে ক্ষমাহীন উপেক্ষায় ভেসে গেল ঐ ডোবাটার জলে।

অত্যন্ত বেদনায় স্পষ্ট করে বুঝলাম আমার রজনীগন্ধার দিন ফুরিয়েছে। জটিল জীবন-যন্ত্রণার পাকে পিষ্ট হতে হতে আমরা মনকে দেউলিয়া করে ফেলেছি, তাই রজনীগন্ধার বিলাস এ-জীবনে শোভা পায় না। হরিপদ কেরানীর পক্ষে তাই আকবর বাদশা হতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই। এখন রজনীগন্ধা দেখলে আর আমার কিনতে ইচ্ছে হয় না, হয়তো আর কোনদিনই হবে না।

সর্বাধুনিক লাইফবোট

ঠিক বুদ্বুদ্-এর মত দেখতে নয় কি, পাশের ছবিটা? এটা হচ্ছে লাইফ-বোটের সর্বাধুনিক সংস্করণ।

খোলা নৌকোয় করে ঝড়-বাদলের মধ্যে সমুদ্রে ত্রাণকার্যের জন্য পাড়ি দেওয়া কোনকালেও নিরাপদ ছিল না, বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও নয়। তাই কারিগরী বিশারদেরা এই নৌকা তৈরি করেছেন। এ নৌকা কিছুতেই ডুববে না। এর ব্যবহারও সুরু হয়ে গিয়েছে।

অত্যন্ত ঘাতসহ এই নৌকা তার মাত্র বারো ফুট ব্যাসের মধ্যে অন্তত ২৮ জন লোককে বইতে পারে অনায়াসে। পূর্ণ শীততাপনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরে পাঁচ দিনের উপযুক্ত খাদ্য-পানীয়, প্রসাধন সামগ্রী, রেডিও, ইত্যাদি বহন করে থাকে। ভেতরে ২৮ জনের বসবার জায়গা ছাড়াও, দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে আরও ২৫ জন।
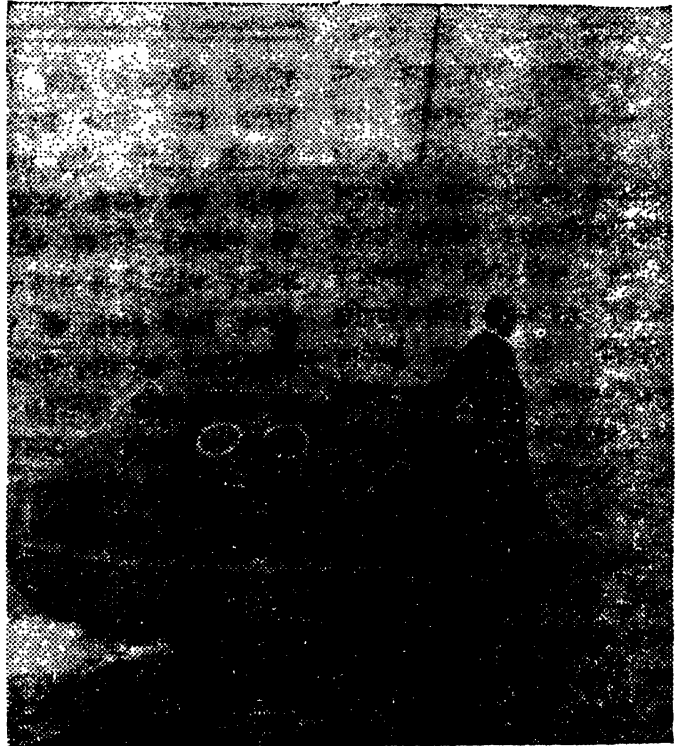
আগেকারের খোলা নৌকাকে জাহাজ থেকে সমুদ্রে নামাতে সময় লাগত অন্তত দশ মিনিট—সে তুলনায় এই অত্যাধুনিক নৌকাকে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলতে লাগে মাত্র ষাট সেকেণ্ড, অর্থাৎ এক মিনিট। এটা বড় কম কথা নয়, যখন প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে মূল্যবান এবং এক মিনিটের দেরীতে অনেক প্রাণহানি হয়ে যেতে পারে।

আপাদমস্তক ঘেরা এই নৌকার ওপরের ঢাকনার মাথায় থাকে একটা সুদৃঢ় আংটা, যা দিয়ে খুব সহজে একে উদ্ধারকারী জাহাজে তুলে নেওয়া যেতে পারে।

সাহিত্য পরিচয়

যুগে যুগে যার আসা / শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন

যুগে যুগে যিনি মর্ত্যের মানুষের সামনে এনে ধরেছেন স্বর্গের পুণ্য পরশ, অমৃতের বিপুল সম্ভার সেই কালজয়ী দিব্যপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথাই নতুন করে নতুনভাবে শুনিয়েছেন লেখক বর্তমান রচনার মাধ্যমে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের জগতে নেমে এসেছিল অজ্ঞানতা ও অধর্মের পুঞ্জীভূত অন্ধকার, জড়বাদের অজ্ঞেয়বাদের দুরপনেয় মোহ। সারা দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত তথা বাঙ্গলারও সে এক সঙ্কটময় সন্ধিকাল। এমনি যুগসঙ্কটে আবির্ভাব ঘটলো পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের, পথহারা মানুষ খুঁজে পেল পথ দেখানো আলোকবর্তিকাটিকে। এই নরদেবতার লীলা-কাহিনী বহুবার বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও যেন পুরোনো হতে চায় না কিছুতেই, আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু তাই চিরপুরাতন হয়েও চির নূতন। অবশ্য এ জন্য গ্রন্থকারের অনবদ্য শৈলীও বহুলাংশে দায়ী, সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গীতে তিনি লীলাকীর্তন করেছেন পরমহংসদেবের। তাঁর বর্ণন-কৌশলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত ও পবিত্র দিব্যজীবন যেন এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ভেসে ওঠে পাঠকের মানসে। ভক্ত পাঠকমাত্রই যে গ্রন্থটিকে সাদর স্বাগত জানাবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রচ্ছদ-শিল্প শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সত্যানন্দ; প্রকাশক—স্বামী নির্বেদানন্দ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬; দাম—পাঁচ টাকা।

স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে / বাক-সাহিত্য

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন, মোট উনিশটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। আধুনিক ঢং-এ লেখা কবিতাগুলি ভাব-মাধুর্যে সমৃদ্ধ। কবির দৃষ্টিভঙ্গী মূলত রোমান্টিক, তাঁর ছন্দের অমিলও তাই ছন্দোময় হয়েই রেখাপাত করে মননে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—আশিস সান্যাল, প্রচ্ছদ—অজয় গুপ্ত, প্রকাশনায়—বাক্-সাহিত্য; ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

পুষ্প-বাসর / ডি, লাইট বুক কোং

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন। মোট ছাব্বিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে এতে। কবিতাগুলি একটু পুরোনো-হলেও ভাব-মাধুর্যে সমৃদ্ধ, পড়তে ভালই লাগে। মনে হয় কবিপত্নীই কবির কাব্যের মূল প্রেরণা, 'চিঠির জবাব' শীর্ষক কবিতাটিতে যেন এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। সে যাই হোক, ছেলেমানুষী একটা ভালো লাগার আমেজ জাগে কবিতাগুলি পড়লে এবং সেটাই এদের একমাত্র সম্পদ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশক—ডি লাইট বুক কোং; ১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সজনীকান্ত দাস / বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সজনীকান্ত দাস এক সুপরিচিত নাম। মূলত সমালোচক হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকলেও, সাহিত্য রচনাতেও যে তাঁর কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান একথা সাহিত্য বো[illegible]তে আ[illegible]ন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও সাহিত্য-কর্মের প্রসঙ্গ প্রদত্ত। সাহিত্যসেবী হিসাবে সজনীকান্ত যে কত বড় ছিলেন এ রচনা পাঠ করলে সে সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ধারণা জন্মাবার অবকাশ ঘটে। সজনীকান্তের সাহিত্য সংজ্ঞা ছিল দ্বিধাভঙ্গিত, একদিকে তিনি ছিলেন নির্মম সমালোচক, অপরদিকে ছিলেন কবি, বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা সজনীকান্তের এই দ্বিবিধ সত্তার উপরই যথোপযুক্ত আলোকপাত করেছেন। বাংলা জীবনী সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই রচনা উল্লেখ্য বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দেবজ্যোতি দাশ; প্রকাশনায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, দাম—দুই টাকা।

ভাববাণী / শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বমুখ প্রদত্ত উপদেশামৃত পরিবেশিত হয়েছে এই কণিকায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতনিস্যন্দী ভাববাণী ভক্তমাত্রেরই পরম ঈপ্সিত কাম্য ধন, এত সুলভে ও সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলিকে চয়ন করে প্রকাশক বোদ্ধা পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। আমরা এই ক্ষুদ্র কণিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রকাশনা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম; সিউড়ী, বীরভূম। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে / সারস্বত লাইব্রেরী

আলোচ্য গ্রন্থটি বিখ্যাত কবি বিষ্ণু দের এক কাব্যসংগ্রহ। মননশীল কবি হিসাবেই শ্রীদের সমধিক প্রসিদ্ধি। বলা বাহুল্য, আলোচ্য কবিতাগুলিতেও সে সত্যের স্বাক্ষর উজ্জ্বল

ভাবেই বর্তমান। তীক্ষ্ণ মনীষার ছাপ এঁদের মাঝে সুস্পষ্টভাবেই অঙ্কিত, তবে ভাবমাধুর্যের দিকটা যে সেজন্যই কিছুটা অবহেলিত তাতেও কোন সন্দেহ নেই। জীবনবাদী কবির গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সুরটি কিন্তু কোথাও অপ্রচ্ছন্ন নয়, বস্তুত সেটাই এই কবিতাগুচ্ছের প্রধানতম সম্পদ, আরও বলা চলে প্রাণসত্তা। কবি যা বলতে চান তা বলেছেন পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে, রেখে-ঢেকে কিছু বলাতে তিনি আদৌ বিশ্বাসী নন, তাই তাঁর বক্তব্যও সোজাসুজি আবেদন জানায় পাঠকের মননে। মননসাপেক্ষ হলেও কোন কোন কবিতার মাঝে মিষ্টিসিজিম্ বা রোমাণ্টি-সিজম্‌ও অনুপস্থিত নয়, বরং বেশ ভালভাবেই সোচ্চার। প্রসঙ্গত "চেনা মুখের আদল" শীর্ষক কবিতাটি দ্রষ্টব্য। এই কবিতাটি বিশেষভাবে কবির রোমাণ্টিক মানসকেই উদ্ঘাটিত করে। আমরা এই মূল্যবান কাব্য-গ্রন্থটির সাফল্যকামী। প্রচ্ছদশিল্প-রুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---বিষ্ণু দে, প্রচ্ছদ---প্রাণকৃষ্ণ পাল; প্রকাশক---সারস্বত লাইব্রেরী; ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। দাম---পাঁচ টাকা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ / বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থন বিভাগ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সার্ধশত-বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন। এতে বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে মহর্ষিদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনা-বলী সংকলিত করা হয়েছে। এক মহা-মানবের পুত্র আর এক মহান মানব, পিতার জীবন ও চরিত্রের সর্বকালীনতা কিভাবে উপলব্ধি করেছেন, আলোচ্য রচনাবলীর মাধ্যমে তাই স্বপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের চোখে দেবেন্দ্রনাথ কিভাবে প্রতিভাত হয়েছেন বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করলে তা বোঝা যায়। বৃহত্তর প্রতিভার যে বৃহৎ মানসেই কেবল সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা দিয়ে প্রতি-ফলিত হতে পারে, এ সত্য সম্পর্কেও অবহিত হতে পারেন পাঠক বর্তমান সংকলনটির মাধ্যমে। মহর্ষিদেবকে বুঝতে হলে এই রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় ঘটাটা একান্ত প্রয়োজনীয়। কয়েকটি সুন্দর আলোকচিত্র সন্নি-বেশিত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ক্রটিহীন। রচনা---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রকাশনা---বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, সংকলয়িতা---শ্রীপুলিনবিহারী সেন। দাম---ছ' টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ গীতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতময় উপদেশাবলী ছন্দে গেঁথে পরিবেশন করেছেন লেখিকা বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে। শ্রীঠাকুর সর্বধর্ম মন্থন করে নিজের উপলব্ধি মিশিয়ে যে পুণ্যবাণী দিয়ে গিয়েছেন অমৃতময় বলেই তাকে "কথামৃত" এই আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, ভক্তজনের কাছে এই কথামৃতের নতুন করে কোন পরিচয় দেওয়াটা নিষ্প্রয়োজনীয়, তবে ছন্দের মাধ্যমে কথামৃতের প্রচার করার কল্পনাটা অবশ্যই নতুনত্বের দাবী রাখে। আমরা আলোচ্য গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা---ব্রহ্মবাদিনী; প্রকাশনায়---শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬। দাম---দেড় টাকা।

ভক্ত চরিতামৃত

আলোচ্য গ্রন্থে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ভক্তজনের চরিতাখ্যান করা হয়েছে। কোন্ ভক্ত কোন্ সময়ে কিভাবে ভগবান শ্রীহরির দর্শনলাভে সফলকাম হয়েছেন, কেবলমাত্র সেই সব বিষয়ই সরল পয়ার ছন্দে বিবৃত হয়েছে, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশ করা হয় নি। ভক্ত ও ভগবানের মাঝে এই সমন্বোত্তর চিত্রগুলি ভক্তজনের কাছে আদরণীয় হবে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। রচনা---শ্রীমৎ ভগবন্ধু ব্রহ্মচারী; প্রকাশনা---দি বান্ধব লাইব্রেরী। দাম---দেড় টাকা।

সেদিন আলো আমার

আলোচ্য গ্রন্থটি এক ক্ষুদ্রায়তন কাব্যসংকলন, তবে শুধু কাব্যসংকলন বললেই এর প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া হল না, তার সঙ্গে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই বিশেষণটিও যোগ হতে পারে স্বচ্ছন্দে। মোট আঠাশটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে এতে---যার সবগুলিই কোন-না-কোন সাম্যবাদী জননায়কের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ বা সাম্যবাদের জয়গান। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হলেও লেখকের আন্তরিকতা সহজেই মর্ম স্পর্শ করে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক---নিমাই মান্না; প্রকাশনা---শ্রীমদন কোলে (সংস্কৃতি), চাকপোতা, আমতা, হাওড়া। দাম---দু' টাকা।

বেদান্তের মণি-মুক্তা-মালা

রামকৃষ্ণ-শিষ্য মহান বৈদান্তিক স্বামী শ্রীঅভেদানন্দ মহারাজের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বেদান্তের ভাষ্যের সঙ্গে পাঠক সাধারণের পরিচয় ঘটাবার প্রয়াস করা হয়েছে। বোদ্ধা পাঠকমাত্রই যে গ্রন্থটিকে সাদরে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। প্রকাশনায়---সপ্তর্ষী; মেদিনীপুর, বিবেকভজন মিশন। দাম---দুই টাকা।

সুরাঞ্জলি ঃ শ্রীদিলীপকুমার রায়: প্রকাশক: শ্রীমিলন সেন, সুরকাব্য সংসদ, ১৯, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা---১৩, পরিবেশক---রূপা এণ্ড কোং, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২০ টাকা।

এক একজন মানুষ সহজাত প্রতিভার বলে যে সব কাজ অনায়াসেই করে ফেলেন, অপরেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও তা পারেন না। দিলীপকুমারের

প্রতিভাও এই শ্রেণীর। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার যুগে অধিকাংশ শিক্ষকই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন না। তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে স্বয়ং পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছিলেন, 'দিলীপকুমারের আর শেখার দরকার নেই, উনি জন্মেছেন সুরের বর্ণা ঝরাতে।' স্বভাবতই ভাতখণ্ডে বলতে চেয়েছিলেন যে, দিলীপকুমার কেবলমাত্র গায়ক হবার জন্যই আবির্ভূত হন নি, তিনি এসেছেন সার্থক সুরকার হিসাবে বিকশিত হতে।

দিলীপকুমারের রচনার ভিতর দিয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের নানা ধারা এসে মিশেছে তাঁর গানে। হিন্দি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঐশ্বর্য, কীর্তনের রসঘন, প্রেমঘন ভঙ্গিমা, ভজনের প্রাণমাতানো মাধুর্য এবং নানাবিধ লোকায়ত সঙ্গীতের লালিত্য এ সবই আমরা তাঁর রচনার মাঝে খুঁজে পাই। তবে দিলীপকুমার কাউকে অনুকরণ করেন নি। তাঁর অসামান্য স্বী-করণের শক্তির বলে সব কিছুই আপনার করে নিতে পেরেছেন।

যে সব শিল্পীর সৃজনীশক্তি বা কর্মক্ষমতা বয়সের সঙ্গে বেড়ে যায়, দিলীপকুমার তাঁদের দলে। সুরাঞ্জলির গানগুলিই এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই গ্রন্থে চার শ্রেণীর গান বিন্যস্ত হয়েছে :

১। যেসব মীরাভজন দিলীপকুমারের কন্যাশিষ্যা ইন্দিরা দেবীর ধ্যানশ্রুত কিন্তু শুধু কথা, সুর নয়। সুরযোজনা দিলীপকুমারের।

২। যেসব গানের সুরও ইন্দিরা দেবী গেয়ে শুনিয়েছেন এবং দিলীপকুমার তার স্বরলিপি করে নিয়েছেন।

৩। দিলীপকুমারের মূল বাংলা গান।

৪। ইন্দিরা দেবীর বাঁধা তিনটি স্বদেশী গান।

এই গানগুলির ভিতর দিয়ে দিলীপকুমারের শিল্পী সত্তাটি সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তাই এগুলি বড় হৃদয়গ্রাহী, অনাবশ্যক আড়ম্বরহীন এবং ভক্তিরসে আপ্লুত। ভোরের পাখী গান গেয়ে সূর্যের প্রথম আলোকে ডেকে আনার সময় যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, তেমনই এক নিরলঙ্কার সৌন্দর্যে তাঁর রচনাগুলি পরিপূর্ণ।

দীর্ঘতম সেতুতে আমি একা / বাণী মন্দির

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্যসংগ্রহ। আধুনিক রীতি-আশ্রয়ী কবিতাগুলির মাঝে একটা স্নিগ্ধতার আভাস ছড়িয়ে আছে। লেখিকার রোমান্টিক মানসের ছায়াও স্বপ্রকাশ এদের মাঝে। জীবনের বাস্তব চেহারাকে অস্বীকার করেন নি কবি, কিন্তু সেটাই যে সব নয় সে চেতনাও তাঁর আছে। তাই তো তিনি বলেন—"নিজেকে চিনেছ কি? চেনো তাকে আগে, চেনো সেই গুপ্তধন, নির্জন আঁধারের আলোর আলোয়।" প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ।। লেখিকা—অরুন্ধতী সেনগুপ্ত; প্রকাশনা—বাণী মন্দির; এ ১২৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

হোমিও জ্যোতি

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির এক বিশিষ্ট অবদান আছে, যদিও এই বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে এখনও সাধারণের বিশেষ কিছুই জানা নেই। আলোচ্য সাময়িক পত্রটি এই হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধীয়। বাংলায় এ ধরনের পত্র-পত্রিকার আত্মপ্রকাশকে শুভ লক্ষণ বলেই মানতে হবে, কেননা এর মাধ্যমে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্যতম বিশেষ এক ধারার সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটার অবকাশ আছে। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। সম্পাদনা—ডাঃ মহিম ভট্টাচার্য।

চিদম্বরা সঞ্চয়ন / ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন

সুমিত্রানন্দন পন্ত হিন্দী সাহিত্যের একজন সুপরিচিত কবি, তিনি ভারতীয় কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর 'চিদম্বরা সঞ্চয়ন' নামক কাব্য সংগ্রহের বঙ্গানুবাদ। মোট পঞ্চাশটি কবিতা স্থান পেয়েছে এই সংগ্রহে এবং ভাববৈচিত্র্য ও সাহিত্যরসের প্রাচুর্যে সবগুলি কবিতাই স্বাদু ও উপভোগ্য। কবির কাব্যমানসেরও যথার্থ প্রতিফলন হয়েছে এদের মাঝে। বাংলায় এই অনবদ্য কাব্য সংকলনটির অনুবাদ হওয়ায় বাঙ্গালী কাব্যরসিক আনন্দিত হবেন। অনুবাদকদ্বয়ও প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করে তাঁদের উপর ন্যস্ত এই গুরুদায়িত্বের কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন। আমরা এই অনুবাদকর্মের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। মূল লেখক—সুমিত্রানন্দন পন্ত, অনুবাদকদ্বয়—ডঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন। দাম—সাত টাকা।

আমি নবাবের বেগম /

হৈমেশ্বর প্রকাশ মন্দির

আলোচ্য উপন্যাসটি ইতিহাসাশ্রয়ী। বর্তমানে ইতিহাসকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনার ঝোঁক খুব বেশী এবং এই প্রবণতা মোটের উপর সুফলপ্রসূ, কিন্তু তা বলে সকলেই যে এ ব্যাপারে পারংগম তা নয়, বরং বহু প্রয়াসই ব্যর্থতার স্বাক্ষরবাহী। বর্তমান রচনাটিরও সাহিত্যরস খুব উঁচু দরের নয়, তবে এতে ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বের অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাবলীই এই উপন্যাসের উপজীব্য। লেখক ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ বজায় রেখেই বাংলার তৎকালীন ইতিহাসের একটা অধ্যায়কে পাঠকের চোখের

সামনে তুলে ধরেছেন। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক—শ্রীদর্শন, প্রকাশনা—হৈমেশ্বর প্রকাশ মন্দির, ২৩, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা।

লেনিনের জীবনকথা/

সোভিয়েৎ দেশ প্রকাশনী

বিপ্লবের জনক ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের (লেনিন) সম্পূর্ণ জীবনকথা সংক্ষিপ্ত আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে এই পুস্তিকায়। লেনিনের পিতৃমাতৃ পরিচয় ও তাঁর পারিবারিক পরিবেশ থেকে তাঁর কর্মবহুল জীবনের সব অধ্যায়ই সযত্নে উদ্‌ঘাটিত। এই সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ জীবনীর মাধ্যমে এই মহাবিপ্লবীকে চেনা যায়, জানা যায় পরিষ্কারভাবে। মূল রচনাটি রাশিয়ান ভাষায় লেখা, আলোচ্য গ্রন্থটি তার সার্থক বঙ্গানুবাদ। আজকের যুগসচেতন বাঙ্গালী এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটিকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নিকোলাই মিখাইলোভ, প্রকাশনা—সোভিয়েৎ দেশ প্রকাশনী ১৯৬৯। দাম—এক টাকা।

একক—শততম সংখ্যা

আলোচ্য পত্রিকাটি এক কাব্য পত্রিকা এবং এটি তার শততম সংখ্যা। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক, কাজেই এর শততম সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বহু বিখ্যাত কবির কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছে এই সংখ্যায়, যার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। গ্রন্থটির সম্পাদন কৌশল, চোখে পড়বার মত। প্রচ্ছদ রুচিস্মিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। সম্পাদনা—শুদ্ধসত্ত্ব বসু, প্রচ্ছদ—গণেশ বসু, প্রকাশনা—শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ৪৪৬।১ কালীঘাট রোড, কলিকাতা—২৬। দাম—তিন টাকা।

নীল স্বপ্ন, লাল ফুল

আলোচ্য কাব্য সংগ্রহটির মূল আকর্ষণ সরলতা। কবি বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগতা, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকর্ম বেশ ছাপ এঁকে দেয় পাঠকমানসে। এক আশ্চর্য সংবেদনশীল মনের পরশ ধরা পড়ে কবিতাগুলির মাঝে, আর সেটাই এদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই এককথায় পরিচ্ছন্ন। লেখিকা—আরাধনা গুপ্ত, প্রকাশক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৩, বারুইপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৫। দাম—এক টাকা।

মিনিস্টার ও প্রতিবিম্ব

বর্তমানে মিনি স্কার্ট, মিনি শাড়ীর মত মিনি সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিরও আবির্ভাব ঘটছে উল্লেখ্য সংখ্যায়, আলোচ্য সাময়িক পত্র দু'টিও সেই জাতীয়। এতে গল্পও কবিতা ও প্রবন্ধেরও অভাব নেই এবং এদের লেখক-লেখিকারাও বড় সামান্য নন, বস্তুত প্রতিবিম্বে 'আশাপূর্ণা দেবী', 'প্রেমেন্দ্র মিত্র' প্রমুখ অপরাজেয় সাহিত্যকারের পদার্পণ ঘটেছে এবং তাঁরা লিখেছেনও মন দিয়ে, মিনি বলে অকরুণ হন নি। মিনিস্টারের লেখকগোষ্ঠী বিখ্যাত না হলেও রচনাশক্তিতে যে তাঁরা বড় কম যান না তারও পরিচয় স্পষ্ট। আমরা এই মিনি পত্রিকাদ্বয়কে সাদর স্বাগত জানাই। পত্রিকাদ্বয়ের আঙ্গিকও পরিচ্ছন্ন। মিনিস্টার সম্পাদনা—চন্দন ভট্টাচার্য ও মলয় পাহাড়ী; দাম—দশ পয়সা। প্রতিবিম্ব সম্পাদনা—গিরিধারী কুণ্ডু; দাম—পঁচিশ পয়সা।

উড়তে অক্ষম পাখী

শুনতে কেমন লাগে বটে, কিন্তু এ-ধরনের পাখী আছে তো নিশ্চয়ই। উটপাখীর কথা ধরুন।

পৃথিবীর মধ্যে এজাতের পাখী সবচাইতে বেশী আছে (বা ছিল) নিউজিল্যাণ্ড-এ। পণ্ডিতদের মত হচ্ছে যে, এককালে এরা সবাই উড়তে পারতো, কিন্তু স্বাভাবিক শত্রুর 'অভাবে' ক্রমে এরা ওড়বার শক্তি হারিয়ে বসেছে—অর্থাৎ, উড়ে পালাবার প্রয়োজন না থাকাতে ওড়বার শক্তি প্রকৃতি দেবী হরণ করেছেন।

এ-জাতের পাখীর মধ্যে আছে নাদুস্-নুদুস রঙীন "নোটরুনিস্"; প্রায় ৫০ বছর ধরে যাকে লুপ্ত বলে মনে করা হত এবং যাদের নাটকীয়ভাবে পুনরাবিষ্কার করেছেন ১৯৪৮ সালে ডঃ ওরবেল নামক বৈজ্ঞানিক। তারপর আছে "ওয়েকা" এবং "কাকাপো" নামক এক জাতের জংলী টিয়া।

অনেক বিশালাকার এ জাতের পাখীকে মাওরীরা মেরে শেষ করেছে। যেমন ধরুন, "মোয়া" নামক বেশ বৃহদাকৃতি পাখী। এরা সময় সময় দশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হত। দেখতে ছিল এরা অনেকটা আধুনিক উটপাখীর মত। প্রায় ২০ ধরনের মোয়া ছিল এককালে নিউজিল্যাণ্ড-এ।

মানুষের লোভাতুর হাত থেকে বেঁচে আছে এখনও "কিউই" নামক ছোট্ট মুরগী ধরণের পাখী। এরা উড়তে পারে না, এদের লেজ নেই এবং লম্বা ঠোঁটের একেবারে ডগায় নাকের ফুটো। থাকে। এদের ডিম কিন্তু মুরগীর ডিমের চাইতে আট গুণ বড়। রেগে গেলে এরা বেড়ালের মত ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ শব্দ করে। সারাদিন এরা ঘুমোয়; সূর্যালোকে এরা প্রায় অন্ধ, এবং রাত্রিতেই আহার অন্বেষণে বেরোয়। ঠোঁটের ওপরে আছে একগুচ্ছ লোম—প্রায় বেড়ালের গোঁফের মত।

বাকখাই

এউরিপিদেস্

পাত্র-পাত্রী

দিওন্যুসস্ (অন্যনাম বাক্খস্, ব্রোমিয়স্)
কোরাস্-দল (এশিয়ার অধিবাসিনী সবাই, দিওন্যুসসের উপাসিকা এবং সহযাত্রিণী)
তেইরেসিয়াস্ (থেবেসের প্রাজ্ঞ জ্যোতিষী, বৃদ্ধ ও অন্ধ)
কাদ্মস্ (ভূতপূর্ব নৃপতি, থেবেস নগরের প্রতিষ্ঠাতা)
পেন্থেয়ুস্ (বর্তমান নৃপতি, কাদ্মসের দৌহিত্র)
পশুপালক
দূত
রক্ষী
পেন্থেয়ুসের অনুচর ও শবাধার বাহকগণ
আগাভে (পেন্থেয়ুসের মাতা)

সকালবেলা, থেবেস নগরে পেন্থেয়ুসের প্রাসাদের সামনে। মঞ্চের একদিকে ভগ্নপ্রায় সেমেলের স্মৃতিসৌধ, উপরে তার অল্প-অল্প আগুনের শিখা আর চারদিকে ছড়ান কালচে পুরনো ভাঙাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

মঞ্চের ডানদিক থেকে দিওন্যুসসের প্রবেশ। মাথায় তাঁর কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়া কোঁকড়া চুলের উপর আইভিলতার মুকুট, গায়ে জড়ান শিশু হরিণের চামড়া, হাতে থ্যুরস্। তরুণ এই দেবতাটির রূপে একটু মেয়েলী ধরনের।

দিওন্যুসস্। জেয়ুসের পুত্র আমি দিওন্যুসস্,
কাদ্মস্-কন্যা সেমেলে জননী আমার;
বিদ্যুদ্বহ্নির ঝলকে জন্ম আমার মাতৃ-গর্ভ হতে।
দেবরূপ সংগোপন করে
মানুষের ছদ্মবেশে এসেছি এ থেবেস্ নগরে,
দিরকে আর ইস্মেনস্ দুই নদী বয়ে যায় যার পাশে।
প্রাসাদ সম্মুখে ঐ দেখা যায়—
বিদ্যুৎ দহনে মৃতা আমার জননীর স্মৃতিসৌধ;
ওখানে জ্বলছে তার বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসস্তূপে
জেয়ুসের অনির্বাণ বহ্নি,—চিরস্থায়ী সাক্ষ্য
আমার মায়ের প্রতি হেরার নৃশংসতার।
কন্যার স্মৃতি-পূত এ সমাধি সযত্নে রক্ষা করে
ভালই করছে কাদ্মস্; সাজিয়ে দিয়েছি আমিও
গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ দ্রাক্ষালতা দিয়ে।
দূরে বহু দূরে
লুদিয়া ও ফ্রুগিয়ার স্বর্ণপ্রসূ নদীতীর হতে
আমার যাত্রা হয়েছে সুরু। পেরিয়ে এসেছি আমি
রৌদ্র-দগ্ধ পারস্য-প্রান্তর,
বাক্ত্রিয়ার প্রাকারবেষ্টিত নগরী নিচয়,
মেদিয়ার ঊষর মরু আর সমৃদ্ধ আরব দেশ।
পেছনে এসেছি ফেলে ঐশ্বর্যের লীলাভূমি
সমুদ্রের উপকূলে এশিয়ার জনাকীর্ণ
সমৃদ্ধ নগর যত, গ্রীক আর প্রাচ্যদেশবাসী
যেখানে পাশা-পাশি করে বাস। সেই সব দেশে
করেছি প্রতিষ্ঠিত আমার রহস্য ও অনুষ্ঠান,
আমার নৃত্য এসেছি শিখায়ে মর্তের মানুষকে
যাতে হয় ধরণীতে আমার দেবত্ব প্রকট।
তারপর থেবেস্।—
বাক্খসের তীক্ষ্ম উপাসনা-ধ্বনি নারীরা তুলেছে আজ;
অঙ্গে করেছে ধারণ তারা মৃগশিশুর চর্ম,
আমার অস্ত্র আইভি-মণ্ডিত থ্যুরসস্-দণ্ড
নিয়েছে তারা হাতে। কারণ,—
হেন কথা বলেছিল মায়ের বোনেরা আমার
মুখে আনা পাপ যা তাদের। বলেছিল,—
আমি দিওন্যুসস্ নই জেয়ুস্-সন্তান,
নরজাত-গর্ভ ধারণ করে পিতার মন্ত্রণায়
সেমেলে চাপিয়েছিল জেয়ুসের উপর
কৌমার্যনাশের আপন কলঙ্ক।
সোচ্চারে ঘোষণা করেছে তারা আরও,—
মিথ্যা পিতৃত্ব আরোপের এই মহাপাপে
জেয়ুস্ করেছেন হত্যা সেমেলেকে বজ্রের আঘাতে।
আমি তাই,—
উন্মত্ততায় করেছি রিষ্ট সেই বোনেদের,
প্রমত্ত করে তাদের এনেছি গৃহের বাহিরে;
গৃহ তাদের এখন পাহাড়-পর্বত, বুদ্ধি লুপ্ত;
বহন করাচ্ছি তাদের আমার রহস্যের পতাকা।
থেবেসের প্রতি গৃহে যত নারী ছিল
সবাইকে করেছি প্রমত্ত গৃহ-ছাড়া করেছি তাদের।
মিলেছে সকলে তারা কাদ্মসের কন্যাদের সাথে,
রয়েছে সেখানে বসে অনাবৃত শিলাসনে
শুভ্র ফার-বৃক্ষতলে। আমার প্রমত্ত উৎসব
জ্ঞান ও বুদ্ধির অগম্যতার, শিখে নিতে হবে
থেবেস্-কে এ-কথা,—যদিও নিতান্ত অনিচ্ছায়।
জেয়ুসের সন্তান,—যাকে গর্ভে ধরেছিলেন সেমেলে,
সেই নিজেকে প্রকট করে দেবরূপে মানুষের কাছে,
আমাকে রক্ষা করতে হবে মায়ের সম্মান।
আজ দৌহিত্র পেন্থেয়ুসকে
কাদ্মস্ দিয়েছেন আপন সিংহাসন
ও রাজ-মর্যাদা। দেবদ্বেষী এই পেন্থেয়ুস্,—
মানে না আমাকে সে, প্রার্থনায় আমার নাম
করে না সে উচ্চারণ, অর্ঘ্য-ধারা নিবেদন
করে না আমাকে।
দেবতা আমি। প্রমাণ করব সে কথা আমি
তারই কাছে সমস্ত থেবেসের কাছে।

প্রকট করব স্বরূপ আমার। এর মাঝে যদি
ক্রোধবশে থেবেসের অধিবাসী পর্বতকন্দর হতে
জোর করে ধরে আনতে চায় সেই নারীদের
মত্ত যারা বাক্‌খসের উপাসনায়, আমি নিজে
যোগ দেব আবিষ্ট সেই নারী-বাহিনীতে,
করব পরিচালিত তাকে। এরই জন্য নরবেশে
দেবরূপ সংগোপন করে এসেছি এখানে।
(ঘুরে দাঁড়িয়ে যে দিক থেকে এসেছিলেন সেইদিকে)
চলে এস, চলে এস এখানে
পবিত্র প্রমত্ত নারীর দল ; পর্যটনে সাথী করে
এনেছি যাদের আমি দূর প্রাচ্যদেশ,
ত্মোলসের সানু আর লুদিয়ার দুর্গ হতে।
সুরু কর তোমাদের স্বদেশের ফ্রুগিয়ার গান,
পেনথেয়ুসের প্রাসাদ ঘিরে তোল ঘোর উচ্চরোল
মহা-জনন্য রেয়া ও আমার উদ্ভাবিত খঞ্জনিতে,
সমস্ত থেবেস্ যাতে হয় সচকিত। যাই আমি
কিথাইরোনের উপত্যকায়, যেখানে রয়েছে
আমার উপাসিকা দল, যোগ দেব নৃত্যে তাদের।
(দিওনুসসের প্রস্থান। যে দিক থেকে তিনি এসে-
ছিলেন সেই পথে নাচতে নাচতে কোরাস-দলের প্রবেশ।
তাদের সবারই গায়ে হরিণ-শিশুর চামড়া, মাথায়
আইভি মুকুট এবং হাতে থুরসস্ ও বাঁশি খঞ্জনি
প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।)

কোরাস। পার হয়ে—
এশিয়ার দূরদেশ আর পবিত্র পর্বত ত্মোলস্
আমরা চলেছি ছুটে হাসির দেবতা সাথে ;
আনন্দ হয়েছে শ্রম আর ক্লান্তি মধুর,
আমাদের গান প্রতিধ্বনি তার যা গেয়েছেন বাক্‌খস্।
ঘরে না বাইরে শুনছ কে?
সাবধানে থেক তাদের থেকে
যারা অন্যের কাজে গলায় মাথা।
হোক পবিত্র সবার অধর,
চুপ কর সব, দাঁড়াও না সরে সরে
আমরা সবাই গাইব যখন
নির্দিষ্ট স্তব বাক্‌খসের।
ধন্য সে সুখী নর
দেবরহস্য যে-জন জেনে
নিজের জীবন করেছে শুদ্ধ,
আত্মা যার হয়েছে শুচি বৈধ অনুষ্ঠানে,
রয়েছে মগ্ন পুণ্য অপার আনন্দে,
আশ্রয় যার পরম-প্রহর্ষ
শান্ত পাহাড়-পর্বতে,
মুকুট পরে আইভি-লতার
পালন করে যে গুহ্য আচার
মহাজননী কুবেলের অনুশাসনে,
উচ্চে নাচায় থুরসস
দেবতা তার দিওনুসস্।
ভ্রান্তচিত্ত আবিষ্ট যারা
নেচে নেচে এস ধেয়ে এস তারা,
স্বদেশে ফিরেছেন দিওনুসস্।
দূর পর্বত হতে ফ্রুগিয়ার
হেল্লাসের রাজপথে
আজ নিয়ে এস তাঁকে,
দেবতা স্বয়ং সন্তান দেবতার। দিওনুসস্—।

মাতৃজঠরে একদা যখন
ছিল দেবতার গর্ভ-শয়ন,
জেয়ুস্ হানলেন তীব্র অশনি,
প্রসব-বেদনা-ক্লিষ্টা জননী
তড়িৎ দহনে জীবন হারায়,
অকালে দেবতা আসেন ধরায়।
ক্রোনোস্-পুত্র জেয়ুস অমনি
গোপন গর্ভে লুকিয়ে তখনি
নিজের উরুতে সোনার সূচিতে
রাখেন তাঁকে রুদ্ধ করে
হেরার দৃষ্টি থেকে।

তারপর,
ভাগ্যদেবীরা যখন তাঁকে পুষ্ট করে তুললেন
জন্মলাভের উপযুক্ত করে,—
জন্ম দিলেন জেয়ুস্ বৃষ-শৃঙ্গ দেবতাকে ;
মাথায় তাঁর পরিয়ে দিলেন কুণ্ডলীপাকান
সাপের মুকুট।
বনের সাপ ধরে, তাই ত' মায়নাদ্‌গণ
লালন করে তাকে, চুলের উপর জড়িয়ে রাখে
মাথায়।

সেমেলের প্রাচীনা ধাত্রী হে থেবেস্!
সাজাও নিজেকে আইভি-লতায়,
আজ পুষ্পিত কর দেহ আপনার
লাল ফলে ভরা ম্রায়োনি মালায়।
আন নতুন পাতা ফারে-র,
ভেঙে ওকের সবুজ শাখা,
ভরে তোল দেহ মন
গুহ্য আবেশে বাক্‌খসের।
চিত্র-মৃগ-শিশু-চর্মের
বসন ও প্রান্ত তার
মণ্ডিত কর বুটি ও গুচ্ছে
অতি শুভ্র ঊর্ণার।
দুর্মদ এই ফেনেল-যষ্টি
বন্য স্বভাব অতি
তাকে জানাও শ্রদ্ধা-নতি।

এখন দেবতা হর্ষের ধ্বনি দিয়ে
সাথীদের তাঁর যাবেন সঙ্গে নিয়ে,
তকলী ও তাঁত ফেলে
থেবেসের মত্ত নারী
ঐ পাহাড়ের উচ্চ সানু ঘেরে
মত্তের দল ছড়িয়ে যাবে ঘেরে,
তখন উঠবে নেচে সবাই দেশের
হয়ে বিহ্বল মত্ত আবেশে
দিওনুসসের।

স্মরণ করি কুরেতেদের পরিচিত সেই গুপ্ত গৃহ,
পবিত্র গহ্বরে ক্রেতের গহনমার্গে, যেখানে
কেটেছে কাল শিশু জেয়ুসের ; আমাদের আনন্দে
যেখানে ত্রিশীর্ষ-মুকুটধারী কোরুবান্তেগণ
এমন উঁচু সুরে বেঁধেছিলেন দুন্দুভি,
যে তার মধুর নিনাদ ফ্রুগিয়ার মধুর বাঁশির সুরে
এনে দিয়েছিল মোহন তাল। বুঝেছিলেন
লোকমাতা দেবী রেয়া, পূর্ণতা দেবে এই দুন্দুভি
তাঁর বাক্‌খসের উৎসব-পরিবেশকে

প্রমত্ত সাত্যুরগণ তাঁর কাছ থেকে পেয়ে
নূতন বছরের প্রথম নৃত্যোৎসবে
এই দুন্দুভি-ধ্বনিকেই করে আসছে প্রধান বাদ্য
প্রাণমাতান তাদের দিওনুসসের উৎসবে।

কী আনন্দ পাহাড়ে-পর্বতে
আছড়ে পড়েন
মাটির উপর
ভক্ত সেখানে
আত্মসমর্পণে ;
বসন তাঁর
পূত মৃগচর্ম,
সাথীরা তাঁর
লঘু পায়ে
চলছে ধেয়ে।
চান স্বাদ রক্তের
আনন্দে খান কাঁচা মাংস
বলি দেওয়া ছাগের ;
ফেরেন ধেয়ে
ফ্রুগিয়া ও লুদিয়ার
পাহাড়ে-পর্বতে.
আবিষ্ট হর্ষোন্মত্ত
আনন্দধ্বনির
নেতা সকলের।

দুধের ধারায় পূর্ণ ধরণী
স্রোত বয়ে যায় সুরা ও মধুর
সুরিয়ার ধূপ-গন্ধে বাতাস উঠেছে ভরে।
ধেয়ে চলেছেন উৎসব-সমাহিত
হাতের থুরসস্ যষ্টিতে বাঁধা
টকটকে লাল মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।
বাতাসে নাচিয়ে কোমল কেশদাম
চীৎকার করে জাগিয়ে তোলেন
দল ছাড়াদের মাতিয়ে তোলেন নৃত্যে

তুমুল গানের সুরকে ছাপিয়ে ওঠে
তাঁর বজ্রমন্দ্র স্বর।—
ছুটে চল, নাচ, নাচ, চল ছুটে
স্বর্ণভূমি ত্মোলসের শ্রী ও শোভা
হে আবিষ্ট মত্তের দল,—গাও গান
দুন্দুভির গুরু গুরু ধ্বনির তালে তালে.
গাও আনন্দের গান, কর স্তুতি
হর্ষের দেবতা দিওনুসসের।
গলা ছেড়ে গাও ফ্রুগিয়ার জানা সুরে তোমাদের
পবিত্র আনন্দে ভরে উঠুক বাতাস
পূত শুদ্ধ বাঁশির সুরে, পাহাড়ে-পর্বতে
সমবেত যারা তাদের পা ফেলার তালে তালে।
অমনি—নাচে যেমন ছাগল ছানা
ঘাসের মাঠে মায়ের পাশে
তেমনি করে লঘু পায়ে
আনন্দেতে লাফিয়ে ছোটে
প্রতি কন্যা বাক্খসের।
(দুদল হয়ে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকবে কোরাস্-দল)

(অন্ধ তেইরেসিয়াস একা একা ধীরে ধীরে এসে দরজার
পাশে দাঁড়িয়ে দরজায় শব্দ করলেন।
বাক্খসের উপাসিকাদের অনুরূপ বেশ তাঁর, হাতে থুরসস্)
তেইরেসিয়াস্। দ্বাররক্ষী!
দ্বাররক্ষী কে আছ এখানে? (ভেতর থেকে ভৃত্যের
সাড়া শোনা যায়)
কাদ্মস্কে ডেকে দাও!
কাদ্মস্, আগেনোরের পুত্র, সিদোনিয়া থেকে এসে
গড়ে তুলেছে যে থেবেসের এই প্রাকার নিচয়।
যাও, বলুক কেউ তাকে, অপেক্ষা করছে তেইরেসিয়াস্।
জানে সে কেন এসেছি আমি, বৃদ্ধ আমি অতি বৃদ্ধ সে
চুক্তি করেছিলাম তার সাথে একদিন হরিণশিশুর চামড়ার
পোষাক গায়ে, হাতে নিয়ে বাক্খসের উৎসব-যষ্টি
পরব গলায় আইভি কিশলয়ের মালা।
(কাদ্মসের প্রবেশ। অতি বৃদ্ধ, বেশ তেইরেসিয়াসের
মত।)
কাদ্মস্। প্রিয়বন্ধু!
ভেতর থেকেও চিনতে পেরেছি তোমার স্বর,
যখনই শুনেছি বিদগ্ধ পুরুষের ধীর কণ্ঠ।
হ্যাঁ, প্রস্তুত আমি ;
সব কিছু আছে সেই দেবতার নির্দেশ মত।
দিওনুসস্ দৌহিত্র আমার ; প্রকট করেছে জগতে
আপন দেবত্ব এখন, সাধ্যমত
মহিমা বাড়ান তার কর্তব্য আমার।
বলত, সবার সাথে মিশে, সাদা দাড়ি দুলিয়ে
কোথায় নাচতে যেতে হবে আমাদের দুই বৃদ্ধের?
এ ব্যাপারে আজ তুমিই কিন্তু পরিচালক আমার,
তেইরেসিয়াস্, বয়স ত' তোমার প্রায় আমারই মত,
আর এ সব কিছু তুমিই ভাল জান।
না-না না,—অসাধ্য হবে না আমার,
সারা দিন রাত আমি তাল দিয়ে যেতে পারি
আমার এই থুরসস্ দিয়ে। সত্যিই আনন্দ আছে
বয়স ভুলে যাওয়ার মাঝে।
তেইরেসিয়াস্। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আমারই মত ভাবছ দেখি!
আমিও ত' যুবক ; চেষ্টা করব নাচতে।
কাদ্মস্। আচ্ছা,—রথে চড়ে যাব কি আমরা পাহাড়ে?
তুমি কি বল?
তেইরেসিয়াস্। না না না,—দেবতার প্রতি
উপযুক্ত সম্মান দেখান হবে না তাতে।
কাদ্মস্। ভাল। আমি তবে হই তোমার পথপ্রদর্শক,
দুই বৃদ্ধ চলি একসাথে।
তেইরেসিয়াস। দেবতাই দেখিয়ে দেবেন পথ এবং বিনা আয়াসে।
কাদ্মস্। আচ্ছা,—বাক্খসের সম্মানে তাহলে কি
সমস্ত থেবেসে নাচব শুধু আমরা দুজনেই?
তেইরেসিয়াস্। শুদ্ধচিত্ত আমরাই শুধু, আর সবাই বিপথগামী!
কাদ্মস্। সময় নষ্ট করছি আমরা। ধর আমার হাত।
তেইরেসিয়াস্। হ্যাঁ, শক্ত করে দৃঢ় মুষ্টিতে।
কাদ্মস্। মানুষের উচিত নয় দেবতাকে লঘু জ্ঞান করা
আমি যা করি না কোনদিন।
তেইরেসিয়াস্। দৈব ব্যাপারে কোন বিচার বিতর্কের
স্থান দিই না আমরা মনে।
সনাতন যে সব প্রত্যয় আমরা পেয়েছি
পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, তাকে ভেঙে দিতে পারবে না
কোন বিতর্ক, মানব-মনে উদ্ভাবিত কোন যুক্তিজাল।
আইভির মালা পরে নৃত্যে যোগ দিতে চলেছি বলে

লোকে অবশ্য সমালোচনা করবে আমাকে,
বলবে তারা, এ বয়সে কী মানায় সে বোধ আমার নেই।
ভুল করবে তারা, নৃত্যে কে দেবে যোগ বা কে দেবে না,
এ ব্যাপারে যৌবন ও বার্ধক্যের কোন ভেদরেখা
দেবতা দেন নি টেনে। সকলের কাছ থেকে
সমান সম্মান প্রত্যাশা করেন তিনি
দেবতার কাম্য নয় পূজা তাঁর হয়ে উঠুক
সূক্ষ্ম গণনার বিষয়।

কাদ্‌মস্‌। তেইরেসিয়াস্‌! অন্ধ তুমি,
আমি বলছি তুমি যা পাচ্ছ না দেখতে।
আমি দেখছি,—
প্রাসাদের দিকে দ্রুত পায়ে আসছে পেন্‌থেয়ুস্‌,
একিয়োনের পুত্র, যাকে আমি দিয়েছি থেবেসের প্রভুত্ব।
দেখে মনে হয় অত্যন্ত বিচলিত সে।
জানি না কী তার বক্তব্য।
(পেন্‌থেয়ুস্‌ প্রবেশ করে দর্শকদের সম্বোধন করে বলবে প্রথমে, মঞ্চের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে কাদ্‌মস্‌ ও তেইরেসিয়াস্‌; তাদের সে দেখতে পাবে না)

পেন্‌থেয়ুস্‌। ঘটনাচক্রে যদিও থেবেস্‌ থেকে
দূরে থাকতে হয়েছিল আমাকে, তবুও
নগরের এই উৎপাতের খবর পৌঁছেছে আমার কাছে।
দেখছি এখানে, নগরের সমস্ত নারী ঘর ছেড়ে
বেড়াচ্ছে ঘুরে পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে
বাক্‌খসের পূজা-অছিলায়, নাচছে আনন্দে
কোন এক ভুঁইফোড় দেবতার সম্মানে,—দিওনুসস্‌
যার নাম।
শুনলাম, উৎসবে মত্ত প্রত্যেক দলের মাঝে নাকি
রাখা হয়েছে মদ্যভান্ড, এ-পথে সে-পথে ঘুরে
লুকিয়ে নির্জন স্থানে আত্মদান করছে নাকি নারীরা
দুশ্চরিত্র পুরুষের কাছে; মায়ানাদ পূজারিণী সবাই
এই হল অছিলা তাদের, যদিও উৎসবে দেখছি
বাক্‌খসের চেয়ে বেশি সম্মান আফ্রোদিতের।
ভাল! যে কটাকে ধরেছি আমি,
রক্ষীরা রেখেছে তাদের অতি সাবধানে হাতকড়া দিয়ে
রাষ্ট্রের কারাগারে। খুঁজে ধরে আনতে যাচ্ছি তাদের
এখনও ঘুরছে যারা পাহাড়ে-জঙ্গলে। আমার
মাতৃদেবী আগাভে
আছেন তাদের মাঝে, সাথে তাঁর দুই সহোদরা,—
ইনো আর আউতোনোপ। একবার বাঁধতে পারলে
সবকটাকে লোহার শিকল দিয়ে অচিরে থামান যাবে
অশ্লীল এই বাক্‌খসের উৎসব।
শুনেছি আরও, লুদিয়া থেকে এসেছে এখানে
প্রাচ্যবাসী কোন এক ঐন্দ্রজালিক অথবা মায়াবী,
শিরে তার কুঞ্চিত সুগন্ধ কেশদাম, গণ্ডে
মদ্যের রক্তিম আভা, চোখে তার আফ্রোদিতের মায়া
প্রলুব্ধ করেছে সে তরুণীদের বাক্‌খসের রহস্যে;
তাদের সংগে দিবারাত্র রয়েছে সে মত্ত।
আচ্ছা!—আনি তাকে একবার আমার পুরীর মাঝে,
তারপর স্কন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব তার মস্তক,
চিরদিনের মত ঘুচে যাবে কেশদাম নাচিয়ে বেড়ান
আর থুরসস্‌ ঘোরান তার।
এই ব্যক্তি, এই বিদেশীটাই প্রচার করছে
দিওনুসস্‌ সম্পর্কে যত অলীক কাহিনী।
সে নাকি দেবতা একজন, জেয়ুস্‌ নাকি রেখেছিলেন
তাকে
উরুর মাঝে। সত্য কথা হল,—দিওনুসস্‌ মৃত;
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সে নিজের মায়ের সাথে,
মিথ্যাকথা সে বলেছিল জেয়ুসের নামে;—
বলেছিল জেয়ুস্‌ নাকি তাকে করেছিলেন
শয্যাসঙ্গিনী।
যেই হোক এই ব্যক্তি জঘন্য আচরণ তার
উপযুক্ত নয় কি ফাঁসির মত কঠোর শাস্তির?
(বিপরীত দিকে যেতে কাদমস্‌ তেইরেসিয়াস্‌কে দেখে)
একি? বা-বা-বাঃ, আর এক অভিনব দৃশ্য!
সিদ্ধপুরুষ তেইরেসিয়াস্‌ ইনি, ইনি আমার মাতামহ,
চিতল-হরিণের চামড়া গায়ে, ফেনেল-যষ্টি হাতে
দাঁড়িয়ে আছেন বাক্‌খসের উপাসক সেজে।
হাসি পায় দেখে!
(পেন্‌থেয়ুস্‌ কিন্তু না হেসে ক্রমেই রেগে উঠতে থাকে।)
দেখ! লজ্জা হয় আমার,
এ বয়সে তোমাদের শালীনতা বোধের নিতান্ত অভাব
দেখে।
শোন, আমার মাতামহ তুমি, দূর করে ফেলে দাও ঐ
মালা,
ছুঁড়ে ফেলে দাও ঐ থুরসস্‌। তেইরেসিয়াস্‌,
তুমিই করেছ
এ-ব্যাপারে এঁকে প্রোৎসাহিত। নিশ্চয়ই বাসনা
তোমার,—
নূতন এই দেবতাটিকে জনসমাজে করে সুপ্রতিষ্ঠিত
নিজে তুমি হবে তার বিজ্ঞ পুরোহিত; আহরণ করবে
যাগ-যজ্ঞের দক্ষিণা। শুভ্রকেশ রক্ষক তোমার;—
অন্যথায়,— গর্হিত এই আচরণকে প্রশ্রয় দিয়েছ বলে
স্থান হত তোমার কারাগারে ঐ সব উন্মত্ত
নারীদের সংগে।
আর নারীদের সম্পর্কে শুনে রাখ আমার মত,—
উৎকৃষ্ট সুরার চমক রয়েছে যেখানে সে অনুষ্ঠান থেকে
কোন মঙ্গলের প্রত্যাশা করা যায় না তাদের।

কোরাস্‌। একি অপবিত্র বাণী! হে ভদ্র!
শ্রদ্ধা কি নাই তোমার দেবতার প্রতি,
যে বংশে জাত তোমার পিতা একিয়োন্‌
সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাদ্‌মসের প্রতি?
অসম্মান করছ তুমি আপন কুলের?

তেইরেসিয়াস্‌। চতুর যদি পায় সত্যের আভাষ আছে যাতে
এমন কোন তর্কের বিষয়, বাঙ্‌নৈপুণ্য দেখান
কিছুই আশ্চর্য নয় তার পক্ষে। বাক্‌-পটুত্ব দেখে
মনে হয়
বুঝি বুদ্ধিমান তুমি; ভাষণ তোমার কিন্তু
মূর্খতারই পরিচায়ক। অবিবেক যে, ক্ষমতা ও
বাক্‌-পটুত্ব
এগিয়ে নিয়ে যায় তাকে মূঢ়তার দিকে,
আপদ সে রাষ্ট্রের।

ক্রমশঃ।

অনুবাদক—সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের আসর

বিচিত্র এক প্রাণী

পৃথিবীর প্রাণিপুঞ্জে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বিচিত্র রূপ, বিচিত্র গঠন, বিচিত্র জীবনযাত্রা, বিভিন্ন প্রকৃতির অভাবনীয় সমাবেশ মনুষ্যেতর প্রাণিকুলকে সামগ্রিকভাবে এক বিশেষ বৈচিত্র্যের স্পর্শে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এই বিচিত্র প্রাণীদের তালিকায় 'লীমার' একটি বিশেষ নাম। লীমার পরিচয়ে পশু। গোত্রে বানর। এক ধরনের বিশেষ জাতের বামনাসের দল লীমার নামে পশুসমাজে পরিচিত।
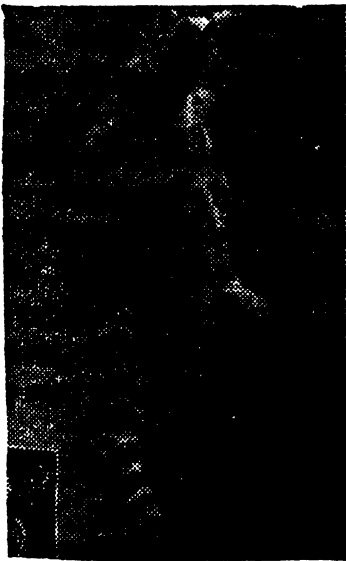
মাদাগাস্কারের একটি বিচিত্রপুচ্ছ লীমার

এই বিশেষ জীবটির ইতিহাসও বড় বিচিত্র। পৃথিবীর নানা দেশে এর প্রাচীনতার নানা নিদর্শন মিলেছে। বিশেষজ্ঞের দল ঘোষণা করছেন—পূর্বে বিশ্বের নানা প্রান্ত জুড়ে এদের বসতি বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ ফ্রান্স, এ্যামেরিকা এবং আরও অন্যান্য স্থানে এদের প্রাচীনতার নানা নিদর্শন মিলেছে। এখনকার দিনে মাদাগাস্কারকেই এদের প্রধান কেন্দ্র বলা যায়।

নানা বর্ণের যেন মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে এক-একটি লীমারের মধ্যে। আকৃতি এবং বর্ণগত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য লীমার সম্প্রদায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষণীয়। পরিবর্তনশীল জগতের ধর্ম, নিয়মিত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সামগ্রিকভাবে জগৎ এগিয়ে চলে। লীমারেরও নানা পরিবর্তন এসেছে। তার চেহারায়, তার জীবনযাত্রায়, তার খাদ্যে। এক ধরণের বিচিত্রপুচ্ছ লীমার—'মাদাগাস্কার ক্যাট' নামেও প্রসিদ্ধ। যদিও মার্জার সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। এরা সকল সময়ে এক গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করে, সূর্যাস্তের পর থেকেই এদের কার্যকলাপ শুরু হয়, এ-দিক দিয়ে দিনের [illegible]..... এরা পেচকের সমগোত্রীয়। এদের খাদ্য-তালিকাও উল্লেখ করার মত। এরা শুধু ফলই খায় না, ডিমও খায়। এমন কি ছোট ছোট পাখিও এদের খাদ্য-তালিকার বহির্ভুত নয়। এরা সাধারণতঃ পার্বত্য স্তূপে বিচরণ করে। এদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হল—এদের পুচ্ছ। কালোতে-সাদাতে ডোরাকাটা হয়ে এক অপূর্বত্ব লাভ করেছে। শোওয়ার সময় উষ্ণতার আশায় এরা লেজটি জড়িয়ে যেভাবে বৃত্তাকার হয়ে শুয়ে থাকে তা দেখার মত।

এক ধরণের ক্ষুদ্রাকৃতি লীমারের সন্ধান মেলে। তাদের নাম মাউস লীমার। মাদাগাস্কারেই এদের বাস। যুগ যুগ পূর্বে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি 'গালাগো মাহোলী'

থেকে এখানে এদের সমাগম ঘটেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার গালাগো মাহোলীও এক ধরণের লীমার। এদের সৌন্দর্যের খ্যাতি জগৎ জোড়া। অন্যান্য ধরণের লীমারগুলি থেকে আকৃতি-প্রকৃতি সকল দিক দিয়েই এরা স্বতন্ত্র ও বহুল পরিমাণে তুলনামূলকভাবে উন্নত। এই বিশেষ লীমারটির মধ্যে নানা ধরণের বুদ্ধির প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়।

এশিয়া মহাদেশেও লীমারের অভাব নেই। মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলসমূহে নানা জাতির লীমারের সন্ধান মিলেছে। এশিয়ার লীমারগুলি সারাদিন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। আর রাত্রিভাগে তারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে অতুলনীয় প্রাণপ্রাচুর্য আর জীবনীশক্তিতে।

—সন্ধানী

★ সাপ ★

সাপ! কথাটা শুনে ভয় পেলে নাকি! ভয় পেও না। ভয়তো এক তরফ থেকে নয়? ওরা আমাদের শত্রু বটে, তবুও তো ওরা আমাদের ভয় করে। ভয়ে বাগানের কোন গর্তে, ক্ষেতের আলের গর্তে, ভাঙা প্রাঙ্গণে বাস করে। এই সাপজগতের কথা শুনতে ইচ্ছে জাগে না কি? হ্যাঁ, যখন জাগে, তখন শোন ওদের সম্বন্ধে সামান্য কিছু কথা।

মনসা-মঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগরের কাহিনী পড়লে মনসার মর্ত্যে মাহাত্ম্য প্রচারের অলৌকিক কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর ছিলেন শৈব। কিন্তু মনসার চক্রান্তে পড়ে শিবকে ছেড়ে মনসা পুজো করতে বাধ্য হন। তারপর থেকে মনসা পুজো আজও চলে আসছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ছোট জাতের লোকরাই মনসা পুজো করে থাকে। ভদ্র সমাজে এ পুজোর রেওয়াজ কম। কিন্তু কেন? কারণ আছে নিশ্চয়ই। ভদ্রলোকেরা ক্ষেতে-বনবাদাড়ে বড় একটা ঘোরেন না। কিন্তু নীচু জাতের লোকরা বন-বাদাড়ে ঘোরে, ক্ষেতে তো তাদের কাজ করতেই হবে। চুপ করে বসে থাকলে তো এদের পেট ভরবে না?

মণিমোহন তেওয়ারী

তাই এদের ধারণা, দেবী মনসাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সাপের বিষ-দন্তের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। কারণ মনসাদেবীকে সন্তুষ্ট করতে করতে পারলে বাহনরা কি অনিষ্ট করতে পারে?

সাপ মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের পা নেই, বুকে হাঁটে। এরা ডিম দেয় কারো আস্তানায়। ডিম থেকে বাচ্চা হয়। (এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে বোড়া সাপ ডিম দেয় না। এরা পশুদের মত বাচ্চা প্রসব করে।) সাপ ডিমে তা দিয়ে বসে থাকে না। এরা ডিম দিয়ে পালিয়ে যায়। বাচ্চা নির্দিষ্ট সময়ে ডিম থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। কারণ বাচ্চারা থাকলে মা যে ওদের আত্মসাৎ করে বসে।

সাপ আকারে গোল। মাথা থেকে সমান থাকে। তারপর একটু একটু করে সরু হতে হতে লেজ সরু আকার ধারণ করে। জিভ চেরা। মহাভারতে আছে অমৃতলোভী তক্ষকের অমৃতভাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাম ধরে নিয়ে চলে গেলে যেখানে কুশের ওপর বসান ছিল, অমৃতভাণ্ড তা চাটতে গিয়ে কুশে জিভ কাটা গিয়েছিল। তাই এদের জিভ চেরা।

শ্রেণী ভাগ করলে, প্রথমত দু-শ্রেণীতে এদের ভাগ করা যায়। বিষধর ও বিষহীন। সব সাপের ফণা বা চক্র থাকে না। যেমন, কালী, খরিশ, শঙ্খচূড়, গোখরো, সেঁকো চিতির ফণা আছে। কালী, খরিশ, শঙ্খচূড়, গোখরোর মাথায় দুটো বাঁকা অর্থাৎ গরুর ক্ষুরের মত দাগ আছে। ভাগবতের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের পায়ের খড়মের দাগ। দুষ্ট কালিয়াকে দমন করতে ভগবান কৃষ্ণ অবতারে কালিয়াদহে প্রবেশ করে দুষ্টকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তারপর থেকে কালিয়ের বংশধররা কৃষ্ণের সেই খড়মের ছাপ বহন করে আসছে।

বিষধর সাপ হল কালী, খরিশ, শঙ্খচূড়, লাউডগা, ও উদয়নাগ ইত্যাদি সাপ। আর বিষহীন সাপ হল মজা, জল-ঢোঁড়া, মেটালী, হেলে, ঢেমনা। পাহাড়ে চিতি (আকারে বিরাট বড়) ইত্যাদি।
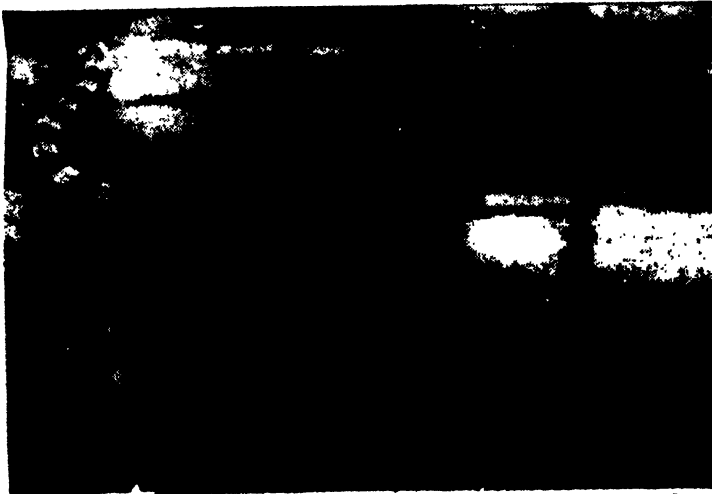
বোড়া সাপ দু-রকমের। গোঁদা বোড়া ও চিরকে বোড়া। গোদা বোড়া কামড়ায়। কিন্তু চিরকে বোড়া কামড়ায় না। লাফিয়ে গায়ে পড়ে। ওদের দেহত্বকে থাকে বিষাক্ত রস, সে রস গায়ে লাগলে গুটি বেরোয়। তারপর গুটি পেকে রস কাটতে থাকে। এ বিষগুটি সহজে সারতে চায় না আবার।

খরিশ তিন রকমের।

দুধে খরিশ, কেঁথো ও জল খরিশ।

কেঁথো খরিশ দেখতে মাটির মত। দুধে খরিশ শাদা, জল খরিশ বেনো জলের মত দেখতে। এরা ভিন্ন জাতের হলেও বিষধর।

কালি দু-রকমের আছে। কালি ও শামুক ভাঙা কালি। কালি হল কালো দেখতে। শামুক ভাঙা কালি একটু সাদা আর গায়ে ডোরাকাটা সাদা দাগ আছে। বিষ উভয়ের সমান।

চিতিও দু-জাতের। সেঁকো চিতি ও বারুনে চিতি। বিষের পার্থক্য নেই।

সাপের বাঁকা দাঁতের নীচে বিষের থলি আছে। দংশনের সাথে থলি থেকে বিষ নেমে আসে। এবং দংশনবিষ প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে সারা শরীরে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে দংশন-কারীকে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যায়।

সাপ চিবিয়ে আহার করে না। গিলে খায়। এবং মরা জিনিষ খায় না। এরা ইঁদুর, ব্যাঙ, পাখীর বাচ্চা ইত্যাদি প্রাণী ধরে আহার করে। বসবাস সম্বন্ধে এরা পরনির্ভরশীল। স্থায়িভাবে কোথায় বাস করে না। ইঁদুরের গর্তে, মাটির ফাটলে, গাছের কোটরে সাধারণত এরা বাস করে।

সাপ শুনতে পায় না। বুকের সাহায্যে অনুভব করে—এরা সঙ্গীত-প্রিয়।

শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেই সাপের সংখ্যা অধিক। তাই ভারতবর্ষে সাপের প্রকোপ বেশী। তবে শীতপ্রধান দেশে যে সাপ নেই তা নয়। যেমন আমেরিকা প্রদেশে "(বোয়াকন্‌স্ট্রিক্টর" (BOACONS-TRICTOR) নামে একপ্রকারের সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের আকার শালগাছের কাণ্ডের মত দেখতে। আফ্রিকার জঙ্গলেও ভীষণাকৃতি সাপ দেখতে পাওয়া যায়।

সাপ দেহের যে স্থানে কামড়াবে সেই স্থানের ওপরটা প্রথমত শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে। যাতে বিষ না ওপরে উঠে ছড়াতে পারে দেহে। তারপর দংশনস্থান চুন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে দাঁত ফুটে আছে কি না। অনেক সময় সাপের দাঁত ভেঙে যায় জোরে দংশনের ফলে। কার্বলিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে সেই স্থানটা পুড়িয়ে দিলে কিছুটা উপকার হয়। আজকাল সর্পবিষ প্রতিষেধক ইন্‌জেকশন যেমন, "এন্টি ভেনাম" বেরিয়েছে। এই ইন্‌জেকশন যথাসময়ে দিলে রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে না।

সাপের বিষে আজকাল ওষুধ-ইন্‌জেকশন হচ্ছে। ঝিনুকে করে সাপের দাঁতের বিষ নেওয়া হয়। গ্রামের বেদেরা সাপ ধরে। তারপর সাপ নিয়ে (নির্বিষ সাপ নয়) যায় যেখানে বিষ নেবার ব্যবস্থা আছে। এতে বেদেদের পয়সা হয়। বেদেরা সাপের খেলা দেখায় গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরে। জাতব্যবসাই এই ওদের। বৈজ্ঞানিকরা বেদেদের মন্ত্র-তন্ত্রের ওপর বিশ্বাস করেন না। ওদের সর্পচিকিৎসা নিয়ে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। বৈজ্ঞানিকদের যেমন বেদেদের মন্ত্র-তন্ত্রের ওপর আস্থা নেই, তেমনি গ্রামের লোকরা বিজ্ঞানকে বিশ্বাস না করে পুরুষানুক্রমে আজও বেদেদের ওপর সর্পচিকিৎসায় আস্থা বজায় রেখে চলেছে।

নারদের ছড়া

[illegible]

আমরা না-হয়
আদিম যুগের
তা বলে কি ভাই
মূল্য কিছু নাই
এই আমাদের?
তোমরা না-হয়
এই-ই যুগের
আধুনিক ভাই
পর নেকটাই
রেঙ-বে-রঙের।

তাই হল পুরান
তোমাদের যুগে
আমরা আদিম
অসভ্য লোক
বলেন হাসি মুখে।
কিন্তু তোমাদের
সু-সভ্য সমাজে
কেন উচ্ছৃঙ্খল
আর বিশৃঙ্খল
সন্ত্রাস বিরাজে।

তোমাদের কাছে
মানীর নাই মান
নাই গুণীর প্রশংসা
সবেতে অপ্রশংসা
সদাশংকিত প্রাণ।
তারপর যদি
হয় কেউ গরীব
বোমা পটকায়
অথবা ছোরায়
অক্কা নিবার্দী।

বল ভাই বল
সত্যি কি-তা নাই
আদিম সে যুগ
আর এই যুগ
বড়ো বিবাদময়।

তাই বলে যাই
হে প্রিয় বন্ধুরা
জেনে রেখ মনে
সুধীশ্বরে নীরবে
নারদের ছড়া।

★ গল্প হলেও সত্যি ★

অনেক দিন আগেকার কথা। কলকাতার একটি বাড়ির একখানি ঘরে সন্ধ্যাবেলায় বসে আছেন একজন ভদ্রলোক আর তাঁর সহকারী।

তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে, তবে ঘরে বাতি জ্বালা হয় নি। বিজলী বাতি নেই এ বাড়িতে।

এই সময় ঘরটিতে এসে প্রবেশ করলেন ভদ্রলোকটির একজন বন্ধু। ইনি পুরনো জিনিসপত্রের সংগ্রাহক। ঐতিহাসিক মূল্যবিশিষ্ট দ্রব্যাদির সন্ধান পেলেই তিনি তা কেনেন। এইরকম বহু জিনিস সংগ্রহ করে তিনি রেখে দিয়েছেন তাঁর বাড়িতে। সেখানে তাঁর সাজানো দ্রব্যাদি দেখলে মনে হয় যে, প্রাচীন শিল্প-সামগ্রীর যেন একটি মিউজিয়ম।

আগন্তুক ঘরে ঢুকে একখানি কেদারায় আসন গ্রহণ করলেন। তারপর আচার আর পাঁপড় বার করে তুলে দিলেন বন্ধুর হাতে।

যতীন্দ্রনাথ পাল

এরপর আগন্তুক পকেট থেকে বের করলেন তিনটি পুরাতন মুদ্রা। এগুলি বন্ধুর হাতে দিয়ে বললেন, 'এই তিনটে কয়েন (মুদ্রা) এনেছি, এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য কি, আর কত দামে কিনতে পারা যায় এগুলো, তা জানতে এলাম তোমার কাছে।'

বন্ধু বললেন, 'এই অন্ধকারে এখনই তা বলি কি করে, আর আমার চোখের-অবস্থাও তো তেমন ভাল নয়। কয়েন-গুলো আজ রেখে যাও আমার কাছে, কাল এর বিষয় বলবো।

এর পর প্রস্থান করলেন আগন্তুক।

ভদ্রলোক তখন সেই অন্ধকারেই আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলেন মুদ্রাগুলি একটি একটি করে।

একটি করে আঙুলে পরীক্ষা করেন আর সহকারীর হাতে দিয়ে বলেন, 'কলম দিয়ে ওর ওপর সালটা লিখে নাও, তারপর কালি শুকিয়ে গেলে কাগজে জড়িয়ে রেখে দাও, কাল ভাল করে দেখবো।'

এরপর যা ঘটলো, তা একেবারে তাজ্জব।

পরদিন দিনের আলোয় মুদ্রাগুলি তন্নতন্ন করে দেখলেন ভদ্রলোক। দেখা গেল যে, গতকাল সন্ধ্যার আঁধারে সেগুলি হাত দিয়ে পরখ করে যে মুদ্রায় যে সাল তিনি লিখিয়েছিলেন, তা প্রায় ঠিক।

এই ভদ্রলোকটি হলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও 'মহেন-জো-দড়ো'র আবিষ্কারক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

ফটো—জেবু খাতুন

ফসফরাস

এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ

কথায় ফুলঝুরি
হৃদয়ে ফসফরাস।
নিত্য জপি, হরি হরি
বুকের ভেতর ধড়াস॥
মুখেতে মুখোস
দেখতে ভদ্রলোক।
আসলে খোলস
ঘৃণিত ভয়ানক॥

★ শঙ্ক শামুক ★

কত বিচিত্র রকমের প্রাণীই না ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর বুকে। তবে কোন বিশেষ জাতের প্রাণী হয়তো পৃথিবীর কোন বিশেষ অঞ্চলে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়; এটা অবশ্য আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা প্রভৃতি কতগুলো পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। কিন্তু শঙ্ক শামুকরা কমবেশী পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। আফ্রিকার দক্ষিণে নাটাল থেকে মোজাম্বিক এবং উত্তরে সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলে এদের প্রচুর দেখা যায়। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলেও এরা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানেও এদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

আফ্রিকায় এরা আফ্রিকান জায়েন্ট নামেই পরিচিত বাংলা দেশে এদের বলা হয় শঙ্ক শামুক। শঙ্ক শামুক নিশাচর প্রাণী। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে এদের দেখা গেলেও গ্রীষ্মকালেই এদের উৎপাত সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। এই সময় এরা সবচেয়ে বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সাধারণ শাঁখের মতনই এদের চেহারা, তবে গায়ের রং সাদা নয়। শিশু অবস্থায় এদের গায়ের রং হয় ফিকে সাদা ও ধূসর বাদামী, আর তার উপর থাকে গাঢ় বাদামী রং-এর লম্বা লম্বা দাগ। প্রথম অবস্থায় গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল থাকে, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রং-এর এই উজ্জ্বলতা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গিয়ে ধূসর কালো রং-এ পরিণত হয়। এদের দেহের উচ্চতা হয় বাইশ থেকে সাতাশ সেন্টিমিটার, আর লম্বা হয় প্রায় চল্লিশ সেন্টিমিটারের মত।

শঙ্ক শামুক গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রাণী। আমাদের দেশে বর্ষার সুরু থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত এরা খাদ্যশস্যের উপর যথেষ্ট উৎপাত করে। এরা নিশাচর প্রাণী বলে দিনের বেলা তেমন কোন উৎপাত করতে পারে না। রাতের অন্ধকারেই এদের অত্যাচারের প্রশস্ত সময়। ছোট ছোট চারা গাছ ও শাক-সব্জী উদরসাৎ করে জীবন ধারণ করে। অবশ্য মেঘাচ্ছন্ন দিনেও এরা চাষের ক্ষতি করতে ছাড়ে না।

শামুকের ব্যাপক আক্রমণের মূল কারণ হল এদের ব্যাপক বংশবৃদ্ধি। তিন বছর বয়সের একটি পূর্ণবয়স্ক

গৌর আদক

শামুক ৬ দফায় ডিম পাড়ে। প্রথম দফায় ১০০টি এবং দ্বিতীয় দফা থেকে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে পূর্ণবয়স্ক একজোড়া শামুক প্রায় ১,২০,০০০ ডিম প্রসব করে থাকে। এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০টি ডিম থেকেই বাচ্চা ফুটে বের হয়। শামুকের অগণিত বংশবৃদ্ধির জন্য শামুক গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলের এক ভয়াবহ শত্রু বলে বিবেচিত হয়েছে। এরা সাধারণত মাটির নিচেই ডিম পাড়ে। তবে কোন জায়গা যদি সম্পূর্ণ আর্দ্র ও ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা থাকে তাহলে এরা সেই মাটির উপরেও ডিম পেড়ে থাকে। ডিমগুলো একেবারে গোল নয়। একটু লম্বাটে ধরণের এবং গায়ের রং হয় সাদা ও হরিদ্রাভ। ডিমগুলো ফুটতে প্রায় দিনদশেক সময় লাগে। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হবার পরও বাচ্চাগুলো প্রায় এক সপ্তাহের মতন মাটির নিচেই থাকে। কিছুদিন বাদে আস্তে আস্তে মাটির উপর উঠে এসে উপযোগী আহার সংগ্রহ করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তোলে।

শীতকালে এদের বড় একটা দেখা যায় না। সারা শীতটাই এরা ঘুমিয়ে কাটায়। এই সময় এদের কোন আহারের প্রয়োজন হয় না; বিনা আহারেই এরা পাঁচ থেকে ছয় মাস বেঁচে থাকতে পারে।

শঙ্ক শামুকের এই ব্যাপক আক্রমণের হাত থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রক্ষা করার জন্য বিভিন্নভাবে এদের ধ্বংস করা হয়। ১৯৪৬ ও ১৯৪৮ সালে উড়িষ্যার বালেশ্বরে প্রায় ৬ হাজার টিনভর্তি কেরোসিন তেল ছড়িয়ে প্রায় বত্রিশ লক্ষর মতন শামুক ধ্বংস করা হয়েছে। আবার ঠিক অনুরূপভাবেই ১৯৫৯-৬০ সালে আন্দামানেও প্রায় দুই কোটিরও উপর শামুকের এক বিরাট অংশকে ধ্বংস করা হয়। কেরোসিন তেল ছাড়া আরো কয়েকটি উপায়েও এদের ধ্বংস করা যেতে পারে। শতকরা চার ভাগ তুঁতে গোলা জল অথবা পরিমাণ মতন লবণ গায়ে ছিটিয়ে দিয়েও এদের ধ্বংস করা যায়। শামুকের গায়ের খোলা ভেঙে গুঁড়িয়েও এদের ধ্বংস করা সম্ভব। এ কাজটি অবশ্য ভোরে বা বিকালের দিকেই করতে হয়।

শঙ্ক শামুক ধ্বংস করার জন্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত টোপ ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে। এই সমস্ত বিষাক্ত টোপ তৈরি করার জন্যে ধান বা গমের খুদ ব্যবহার করা হয়। ৫ ভাগ খুদে ১ ভাগ অ্যালভিহাইড এবং ২৮ ভাগ খুদের সঙ্গে ১ ভাগ প্যারিস গ্রীন মিশিয়ে তাতে প্রয়োজনমত জল ঢেলে দিয়ে জমিতে ছড়িয়ে দিলেও শঙ্ক শামুক ধ্বংস হয়। সাড়ে ৩১ কিলো বিষের টোপ এক একর জমির পক্ষে যথেষ্ট। বৃষ্টি না হলে সাড়ে ৩১ কিলো টোপের সঙ্গে ১'৭ কিলো মাতগুড় মিশিয়ে দিতে হয়।

এইভাবে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যকে শঙ্ক শামুকের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

★ হাজার বছর ধরে ★

চার বোন। তাদের কপালে কি সুন্দর জ্বল জ্বল করে চারটি টিপ। একদিন রাত্রিতে চার বোন বিছানায় পাশাপাশি ঘুমিয়ে। এমনি সময় বড় বোনের কপালের প্রথম টিপটি মহাবিরক্তিতে বলে উঠল---উঃ, এবারে আমার সোয়াস্তি, কী একটা মেয়ের কপালেই না আমার ঠাঁই হয়েছে। দিনরাত শুধু পেটভরা হিংসে, কারোর ভাল দেখতে পারে না, কারোর সুখ সইতে পারে না, সুন্দর একটা কথা বলেছ কি---

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেজো বোনের কপালের দ্বিতীয় টিপটি বলে উঠল---আর আমার কথা বুঝি বলতে নেই, এমন রাগ বাপু কখনো কারোর দেখেছ? এমন একটি মেয়ের কপালে এসে আমি জুটেছি, সে দুঃখের কথা কি আর বলব। দুটি ভালমন্দ কথা শুনেছে কি রুখে ফুঁসে ভ্রুকুটি ছুটে আসবে। কত মেয়ে তো দিন রাত্রি ধরে আমি দেখছি, অমন খিটকুটে স্বভাবের দ্বিতীয়টি চোখে আর কখনো আমার পড়ে নি।

সেজো বোনের কপালের তৃতীয় টিপটি এবার বলল---আর আমার এই লোভী মেয়েটা, লজ্জায় তো আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে। কারোর গায়ে ভাল জামা দেখলে, কারোর খাওয়া দেখলে তো আর কথাই নেই, এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে যতক্ষণ না চোখের দৃষ্টি ভোঁতা হয়ে আসে ততক্ষণ চোখ ফেরাবার নাম নেই।

ছোট বোনের কপালের চতুর্থ টিপটি শুধু ঘুমিয়ে থাকা মেয়ে চারটির দিকে পরম স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন কি ভাবছিল।

---কী ভাবছ অত---দ্বিতীয় টিপটি বলে উঠল---তুমি খুব কম কথা বললেও তোমার ব্যথা আমরা বুঝতে পারি ভাই। তোমার ঐ মেয়েটিও তো খুব সহজ সরল নয়।

প্রথম টিপটি বলে উঠল---এমন যাচ্ছেতাই স্বভাব মেয়েটার কী বলব। একজনের সঙ্গে আরেকজনের কী রকম মিথ্যেকথা বলে ঝগড়া বাধিয়ে দেয় বল তো? একটিও সত্যিকথা কখনো কী ও বলে?

তবু চতুর্থ টিপ কোন কথা না বলে চুপ করে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

মেয়ে চারটি ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। এদিকে আকাশ থমথমে হয়ে উঠেছে। মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছড়িয়ে দু-একটি তারা।

অরুণাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত

তৃতীয় টিপটি এবারে বলে উঠল---যদি কোনোদিন এ মেয়েটিকে ছেড়ে চলে যেতে পারি, সেদিনই তবে আমার শান্তি। হায় ভগবান, এমন দিন কী কখনো আমার আসবে?

দ্বিতীয় টিপটি বলল---শুধু নিজের কথা ভেব না ভাই, আমাকেও তবে নিয়ে যেও, এই নীচ নোংরা পরিবেশ হতে আমায় উদ্ধার কর।

প্রথম টিপটি বলল---আর আমি বুঝি একা এখানে পড়ে থাকব, আমিও নিশ্চয় যাব।

তৃতীয় টিপটি বলল---এ যেন এক স্বপ্ন---বিশ্বাস হতে চায় না, এই ক্রোধ ঘৃণা লোভ মিথ্যেতে ভরা এ স্থান হতে একদিন আমরা সত্যিই মুক্ত হয়ে চলে যাব।

প্রথম টিপটি বলল---এখানে প্রতিটি নিঃশ্বাস নিতেও আমাদের কত কষ্ট ভার বলে মনে হয়। যে করেই হোক আমাদের চলে যেতে হবে---আমরা যেমন ভাল, তেমনি সুন্দর এক দেশে আমরা চার বন্ধু চলে যাব।

ঠিক এমনি সময় বাইরে ঝড়ো হাওয়া উঠল। গাছগুলো দুলে উঠল। পাতা নড়ার শব্দ ভেজা আকাশে শুরু হল। আর তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল এক ঝড়ো হাওয়া। ঘরে ঢুকেই টিপ চারটির দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল---এত রাত হয়ে গেছে, এখনো যে তোমরা ঘুমোও নি?

---হায় কপাল, ঘুম কী আমাদের আর আছে।

চতুর্থ টিপটি ছাড়া বাকী তিনটি টিপ একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

---সে কী, তোমাদের আবার কী হল?---বেশ যেন উদ্বিগ্নতায় ঝড়ো হাওয়া ফের তাদের জিগ্যেস করল।

খুব তাড়াতাড়ি প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় টিপটি তাদের দুঃখের কথা বলে গেল, শেষে বলল---তবে কষ্ট যে আমাদের সইতেই হবে, আমাদের হাড়-মাস এই নোংরা পৃথিবীটা যত ইচ্ছে শুষে খাক।

চতুর্থ টিপটির দিকে তাকিয়ে ঝড়ো হাওয়া জিগ্যেস করল---কই তুমি তো কিছু বললে না?

চতুর্থ টিপটি বলল---আমার ভীষ ঘুম পাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া, এতক আমি জেগে ছিলুম, এইমাত্র তোমা ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরামে দু'চোখ আমা বুজে আসছে।

---তা বেশ, তা বেশ---আম ছোঁয়ায় কারোর যদি ঘুম পায়, আ তবে খুশীই হই। ঠিক আছে, তু ঘুমোও, তুমি ঘুমোও।

---না না, তুমি ওকে ভুল বুঝো ঝড়ো হাওয়া---দ্বিতীয় টিপটি ব উঠল---চতুর্থ টিপও খুব বিরক্ত মেয়েটার ওপর, সে আমরা খুব ভ করেই জানি। তুমি ভাই দয়া ক আমাদের এখান থেকে অনেক---অ দূরে নিয়ে যাও, যেখানে লোভ হিংসে মিথ্যে কিছুই আমাদের ছুঁ না। তুমি ছাড়া যে আমাদের গতি নেই।

ঝড়ো হাওয়া বলল---তা আপত্তি নেই, তবে চল, আমি

পিঠে চাপিয়ে চোখের পলকে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।

কথা শুনেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল টিপগুলো, মনের আনন্দ যেন আর তাদের ধরে না। ঝড়ো হাওয়ার পিঠে টিপগুলো সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল। আর উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের বেগে ছুটে চলল তারা।

---এ কী এ কী!---অনেকটা ওপরে উঠে এলে প্রথম টিপটি চেঁচিয়ে উঠল---আরে চতুর্থ টিপ তো আমাদের সঙ্গে আসে নি।

ঝড়ো হাওয়া খুব রাগ করে বলে উঠল---সে জন্য তুমি আর কী করবে। ওর কালঘুম ওর কাল করেছে, ওকে ঘুমোতে দাও, যত ইচ্ছে সাধ মিটিয়ে ও ঘুমিয়ে নিক।

দ্বিতীয় টিপটি বলল---ঝড়ো হাওয়া ঠিক বলেছে, ওর চলে আসার ইচ্ছে থাকলে অমন করে সে কী আর কখনো ঘুমতো। ও ঐ নরকেই থাকতে চায়, ওকে ওখানেই তবে থাকতে দাও।

প্রথম আর তৃতীয় টিপ সায় দিয়ে বলে উঠল---ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।

ঝড়ো হাওয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়ে তালগাছের মাথা পার হয়ে, পাহাড়ের চূড়োর পাশ দিয়ে আরো অনেক ওপরে উঠে এল। শেষে একটা মেঘের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। মেঘের ওপর টিপ তিনটিকে নামিয়ে বলে উঠল---এই এখানে তোমরা থাক, এত উঁচুতে তোমাদের রেখে যাচ্ছি, মনে হয় তোমাদের আর কোন কষ্ট হবে না।

---বেশ বেশ বেশ---চীৎকার করে উঠল টিপগুলো---আহা এমন সুন্দর জায়গাই তো আমরা চাচ্ছিলাম, ধন্যবাদ---তোমায় অনেক ধন্যবাদ ঝড়ো হাওয়া।

ঐ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে মেঘের আড়ালে আরামে দু'চোখ বুজে শুয়ে রইল টিপগুলো।

●

এমনি করে সুখে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর---কত বছর পার হয়ে গেল কে জানে। একদিন হঠাৎ টিপগুলো চমকে উঠে কাছে ঝড়ো হাওয়াকে দেখতে পেল।

---আরে আরে কী খবর ঝড়ো হাওয়া---এতদিন পর আমাদের বুঝি তোমার মনে পড়ল?

---না ভাই, না ভাই, তোমাদের কথা বরাবরই আমার মনে আছে। যাচ্ছিলুম এক অন্য দেশে, ভাবলুম একবার দেখে যাই, তা তোমাদের খবর সব ভাল তো।

---ভাল মানে, এর মাঝে কত বছর যে পার হয়ে গেছে, শিমুলতুলোর মত হাল্কা সে বছরগুলোর অঙ্ক আমাদের কী আর মনে আছে নাকি?

---খুশী, খুশী হলুম শুনে, তবে এখন যাই ---

এগোবার জন্যে পা বাড়ালে চেঁচিয়ে ডাকল টিপগুলো---আরে শোন শোন, একটা কথা জিগ্যেস করতে ভুলে যাচ্ছি, হ্যাঁ ভাই, আমাদের সেই চতুর্থ টিপের কথা তোমার কী মনে আছে?

---মনে আছে মানে!---যেন চমকে উঠল ঝড়ো হাওয়া ---তাকে তো আমি রোজ দেখি, তোমরা বুঝি তাকে দেখ না?

---এত উঁচু থেকে নীচে ঐ টিপটিকে দেখা কি কোনমতেই সম্ভব ঝড়ো হাওয়া?

ঝড়ো হাওয়া আবার অবাক হয়ে বলে উঠল---সে কী কথা, নীচে কেন, হ্যাঁ হ্যাঁ নীচে তাকে দেখবে কে?

খুব অধীর হয়ে টিপ তিনটি এবার বলে উঠল---আরেকটু বুঝিয়ে আমাদের বলে দাও ঝড়ো হাওয়া, সত্যিই আমাদের সব কিছু যেন গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে।

ঝড়ো হাওয়ার মুখে মিষ্টি এক হাসি ফুটে উঠল। বলল---তোমাদের ঐ চতুর্থ টিপ তোমাদের মত পৃথিবীকে যে ছেড়ে আসে নি সে তো তোমরাও ভাল করে জান। কী করেছিল জান, সে পৃথিবীতে থেকে, ঐ রাগী হিংসুটে লোভী আর মিথ্যেবাদিনী মেয়েগুলোকে ঘৃণা না করে ভালবেসেছিল---খুব, খুব ভালবাসা যাকে বলে---তাতে একদিন সে মেয়েগুলোও তাদের রাগ হিংসে লোভ আর মিথ্যে কথা ভুলে গিয়ে তার মতন ভাল হয়ে তাকেও ভালবাসল। আর তাই তো সে একদিন পৃথিবী ছেড়ে, ভালবাসার ওপর ভর করে অনেক---অনেক উঁচুতে উঠে এল। ঐ যে দেখছ, ছোট একটি আকাশের তারা---ঐ তো তোমাদের সেই ফেলে আসা চতুর্থ টিপ---আজ হাজার বছর পার হয়ে গেছে---তবুও সে ওখানে আছে, আরো হাজার বছর পার হয়ে যাবে---তবু সে ওখানে থাকবে---আকাশে ঐ তারা হয়ে সে জ্বলবে---অনন্তকাল ধরে জ্বলবে।

ইতি, তোমার ছোট্ট রাজু

চিন্ময় রায়

ছোট্ট রাজুর নেইকো ঘুম
কেঁদে-কেঁদে সে বালিশ ভাসায়,
হিজি-বিজি এঁকে লিখছে সে চিঠি
দিদার কাছে আর্জি জানায়।

"ঠানদি তুমি আমায় ছেড়ে
পিসিকে কাঁদিয়ে গেলে যে কোথায়?
ঘুম পাড়ানি গানে মিষ্টি গপ্পো
তোমার মতো কে বলবে আমায়?

দাদুর মতো তুমিও গেলে
আমায়-ও সেথায় যাওনা নিয়ে,
বহুদিন হোলো শুনিনি গপ্পো
শুনবো তোমার কাছে গিয়ে।

জমিয়েছি ঠানদি তোমার জন্যে
হরেক রকম কিস্‌-মিস্ কাজু;
নিয়ে যাও বুকে সেগুলির সাথে
ইতি, তোমার ছোট্টো রাজু।

★ গল্প হলেও সত্যি ★

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগেকার কথা। কলকাতার অদূরে চুঁচুড়া। সেখানে একদিন এক মনোরম সন্ধ্যায় ওস্তাদি গানের মজলিস বসেছে। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত ওস্তাদ গাইয়ে সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর গান শুনবার জন্য আসরে লোক ভেঙ্গে পড়েছে। দূর দূর থেকে অনেক উৎসাহী শ্রোতাও হাজির হয়েছেন।

এঁদের মধ্যে হাজির হয়েছেন এক নামকরা বাঙালী সাহিত্যিক। তিনি আসরের প্রথম সারিতে আসন গ্রহণ করে অপেক্ষা করছেন।

শ্রোতাদের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সেই ওস্তাদ আসরে উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তারা উল্লাসিত হয়ে করতালির দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করলেন।

ওস্তাদজী স্মিতহাস্যে তানপুরা হাতে তুলে নিয়ে সুর বাঁধতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে।

এক মিনিট—দু'মিনিট করে অনেক সময় পার হয়ে গেল। ওস্তাদজীর আর তানপুরা বাঁধা হয় না। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে উস্‌খুস করতে লাগলেন অধৈর্য হয়ে। কিন্তু ওস্তাদজীর তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি আপন মনে সুর বেঁধে চললেন।

আসরের প্রথম সারিতে উপবিষ্ট সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোক আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন, 'লাউ-কুমড়ো বাঁধা কখন শেষ হবে?'

বস্, আর যায় কোথা? অমনি ওস্তাদজী ক্রুদ্ধস্বরে গর্জে উঠলেন, 'এমন গোয়াল ঘরে আমি গাইব না।' শুধু তাই নয়, তিনি এক আছাড়ে তাঁর হাতের তানপুরার দফা রফা করে দিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ পাল

আসরে গোলমাল সুরু হল। চারদিকে হৈ চৈ। সাহিত্যিক ভদ্রলোক অপমানে লাল হয়ে গেলেন। তিনি আসর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আসরের কর্মকর্তারা সব ছুটে এলেন। তাঁরা হাত জোড় করে সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোককে বোঝাতে লাগলেন। তাঁরা অনুরোধ করলেন আসর ত্যাগ না করে যাবার জন্য।

ওদিকে আরেক দল লোক ওস্তাদজীকে গিয়ে সাহিত্যিক ভদ্রলোকের পরিচয় দিলেন এবং তাঁরা সবিনয়ে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন এই ঘটনাটি মনে না রাখেন।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর আসর শান্ত হল। ওস্তাদজী গাইতে রাজী হলেন।

নতুন তানপুরা আনা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওস্তাদজী তাঁর গান সুরু করলেন। তাঁর উদাত্তকণ্ঠের সুরে আসর মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ করে গেল। সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোকও গান শুনতে শুনতে নিমেষে তন্ময় হয়ে গেলেন।

গান শেষ হলে করতালির দ্বারা ওস্তাদজীকে সবাই অভিনন্দিত করলেন।

আসর শেষে সেই ওস্তাদজী এবং সাহিত্যিক ভদ্রলোকের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। আর সেই প্রথম পরিচয় পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হল অটুট বন্ধুত্বে।

এই সাহিত্যিক ভদ্রলোক কে? আর ওস্তাদজীরই বা পরিচয় কি?

এই সাহিত্যিক ভদ্রলোক হচ্ছেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ওস্তাদজী হলেন বাংলার তৎকালীন বিখ্যাত ধ্রুপদগায়ক যদুভট্ট। ইনি রবীন্দ্রনাথেরও সঙ্গীতগুরু ছিলেন।

★ আধুনিক রসায়নের জনক ঃ শীলি ★

অবতরণিকা

হাজার হাজার বছর আগের কথা। দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে দেখা গেলো জেলীর মত প্রাণী—প্রোটোপ্লাজম্। নিস্পন্দ, নির্বাক পৃথিবীর বুকে হলো নবীন প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। তারপর বিবর্তনের শেষ ধাপে আবির্ভূত হলো মানুষ। কেটে গেলো আরও বহু বছর, মানুষ শিখলো আগুন জ্বালাতে। সেদিন থেকেই শুরু হলো রসায়নের জয়যাত্রা। রসায়ন এগিয়ে চললো—ভারতের "তান্ত্রিক" রসায়নীর হাত ধরে, ইউরোপের আলকেমিবিদদের প্রচেষ্টায়। প্রায় হজার বছর এভাবে

শ্রীঅলোককুমার সেন

চলার পর এলো নবজাগরণের যুগ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রসায়নের সুপ্তি ভঙ্গ করলেন আইরিশ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল। তারপর শুরু হলো নব রসায়নের চর্চা। আধুনিক রসায়নের জয়যাত্রার নায়ক চারজন। যথাক্রমে—বৃটিশ বিজ্ঞানী প্রিস্টলী ক্যাভেনডিস, ফরাসী রসায়নী ল্যাভরসিয়ার এবং সুইডিস বিজ্ঞানী শীলি। আজ তোমাদের কাছে শীলির কথা বলব।

●

১৭৭৮ সাল। সুইডেনের কো[illegible] এক অখ্যাত শহরের বুকে নে[illegible] এসেছে গভীর রাতের অন্ধকার। রাতে

নিদারুণ নৈঃশব্দ মধ্যে শোনা যাচ্ছে নিশাচর পাখীদের কর্কশ ধ্বনি। সমস্ত শহরবাসী গভীর ঘুমে মগ্ন, কিন্তু ঘুম নেই এক কম্পাউণ্ডারের চোখে। সারাদিন ডাক্তারখানার হাড়ভাঙা খাটুনির পর আসে রাত্রি, তাই তিনি রাত্রিকেই বেছে নিয়েছেন গবেষণার সময় হিসেবে। সারা রাত ধরে চলে তাঁর গবেষণা। এমনি করেই কেটে যায় একটির পর একটি দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর। কিন্তু তবুও ক্লান্তি নেই দরিদ্র কম্পাউণ্ডার শীলির দেহে, নিদ্রা নেই তাঁর আশাভরা চোখে। কারণ রসায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজে তিনি ব্যস্ত আছেন।

অবশেষে এলো সেই শুভ দিনটি, যেদিন শীলি প্রমাণ করলেন যে, বাতাস মৌলিক পদার্থ নয়, এ হলো একরকমের মিশ্র পদার্থ। এর উপাদান হলো অগ্নিবায়ু ও অপ-বায়ু। সীসাভস্ম পারদভস্ম পুড়িয়ে তিনি অগ্নিবায়ু বা এখনকার অক্সিজেন তৈরী করেন। শীলি বলেন যে, এ বায়ুতে জীবজন্তু ভালোভাবে শ্বাস নিতে পারে, তার মোমবাতি বেশ প্রদীপ্তভাবে জ্বলে ওঠে। আবার অপ বায়ু বা নাইট্রোজেনের উপস্থিতি আবিষ্কার করার জন্যে তিনি বোতলের মধ্যে টিন ও ফসফরাস পোড়ান। তারপর বোতলের মুখটি উপুড় করে জলের মধ্যে রেখে দেন ও কদিন পরে লক্ষ্য করেন যে, বোতলের পাঁচভাগের এক ভাগ বায়ু কমে গেছে, আর বোতলের এক ভাগ জায়গা জলে ভরে গেছে। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে বোতলের মধ্যে যে বায়ু পড়ে থাকে, যার মধ্যে মোমবাতি জ্বলে না বা পোকামাকড় বাঁচে না, সেটা হলো অপ বায়ু।

শীলির এই যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রথমে সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। তাঁর গবেষণার কথা শুনে ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা বললেন, "বাতাস কখনও দু'রকম হতে পারে না।" এই তত্ত্বে ব্যথিত হলেও তিনি নিরুৎসাহিত হন নি। আরও কয়েক বছরের গবেষণার মাধ্যমে অগ্নিবায়ু প্রভৃতির উপায় আবিষ্কার করেন। তখন তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি লাভ করে। শুধু অগ্নি বা অপ বায়ু আবিষ্কার করেই তাঁর গবেষণা থেমে থাকে নি, তিনি অগ্নিবায়ুর মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রদীপ জ্বালান, ক্লোরিন, ফসফরাস, নানা প্রকার অ্যাসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করেন।

তবে জার্মান বিজ্ঞানী স্ট্যাহলের "ফ্লোজিস্টন তত্ত্বে"র বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলেন নি। স্ট্যাহল ঘোষণা করেন যে, ফ্লোজিস্টন হলো এমন পদার্থ যাকে ধরা বা ছোঁয়া যায় না। কিন্তু এই অদৃশ্য ভূতুড়ে পদার্থটি তামা, টিন, লোহা প্রভৃতি ধাতুর মধ্যে রয়েছে। এই পদার্থটির উপস্থিতির ফলেই আগুন জ্বলে তা ধাতু রূপান্তরিত হয় ভস্মে। শীলিও বলেন যে, অগ্নিবায়ু হলো ফ্লোজিস্টনবিহীন বায়ু। আর মোমবাতির ফ্লোজিস্টন সংগ্রহ করে বলেই অগ্নিবায়ুর মধ্যে মোমবাতি জ্বলে।

স্বল্পভাষী, লাজুক প্রকৃতির মহাবিজ্ঞানী শীলি বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের নীরব সাধক, খ্যাতি অর্জনের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো না। তাই মাত্র তিরিশ বছর বয়সে অগ্নিবায়ু আবিষ্কার করে তিনি সেই সংবাদ জানান আবিষ্কারের সাত বছর পরে।

চরম দারিদ্র্য, হতাশা আর সহকর্মীদের বিদ্রূপ ও অবহেলার সঙ্গে সংগ্রাম করে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে শীলির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যর্থ শীলি মৃত্যুর পর সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। বিশ্বের মানুষ তাঁকে আধুনিক রসায়নের নায়করূপে চিহ্নিত করে, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান দেয়।

বর্ষারাতে

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টি! বৃষ্টি॥
ঝরে পড়ে টুপটাপ
টুপটাপ, ঝুপঝাপ,
ভেঙে পড়ে বুড়ো গাছ
ভেসে যায় সৃষ্টি॥

সাথে হাওয়া শন্-শন্,
কাঁপে ওই তালবন,
ঝলকায় বিদ্যুৎ,
ঝাপসায় দৃষ্টি॥

টুটু সোনা চুপচাপ
মা'র কোলে শুয়ে
ঘুম-ঘুম আয় ঘুম
আঁখিপাতা নুয়ে॥

শীতের দুপুরে

গৌর মোদক

রোদ্দুরে ঝিলমিল শীতের দুপুরে,
কে যেন সুরে তোলে পায়ের নূপুরে।
রোদ-ধোয়া আকাশটা করে ধুধু,
ক্লান্তির সুরে ডাকে দূরে এক ঘুঘু।
উড়িয়ে ধুলোর রাশি গাঁয়ের গরুর গাড়ি
ধান-কাটা মাঠ পেরিয়ে চলে সারি সারি।
এক জোড়া চিল ওড়ে দূরে আকাশে,
নতুন ধানের গন্ধ বাতাসে ভাসে।
খেজুরের রস যায় টুপিয়ে ঝরে,
মৌমাছি ভোমরার মৌরগোল পড়ে।
দুপুরের নির্জনে শিস দেয় বুলবুল,
ফাগুনের স্বপনে হয় বুঝি মশগুল।
ধানের খামারে চড়ুই আর পায়রায়,
লাফিয়ে লাফিয়ে ধান খুঁটে খায়।
রোদ্দুরে শুকিয়ে হাঁটুজল বিলে,
মাছ খায় ধরে বকে আর চিলে।
নীরব নির্জন আজ শীতের দুপুরে,
মন যেন ভেসে যায় স্বপ্নের সুদূরে।

ছড়া

দেবব্রত রায়

হাতীমপুরে নেইকো হাতী
এ কথাটি কার না জানা!
থাকেই শুধু মুচকি মুসি
বন্ধু তাকে কেউ করে না!

মুচকি মুসি রোজ রাতে
ঘুরে ফিরে বনের পাশে,
বুনো হাতী বললো তাকে
টুটুল সোনা মুচকি হাসে।

রান্নাঘরে

রসনা তৃপ্তির জন্য, দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় কিছু বৈচিত্র্যের আমদানী হওয়াটা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। তাই এবার কিছু দক্ষিণ ভারতীয় রান্নার প্রকরণ পেশ করা হচ্ছে।

[illegible]

উপকরণ :---আধ পাউণ্ড পাঁউরুটি, দুটি পেঁয়াজ, দুটি কাঁচা লঙ্কা, চায়ের চামচের দু'চামচ নুন, চায়ের চামচের আধ চামচ রাইসর্ষের গুঁড়ো, চায়ের চামচের এক চামচ অড়হর ডাল, বড় চামচের দু'চামচ ঘি বা ডালডা।

প্রণালী :---রুটিটা খুব পাতলা করে শ্লাইস করে নিন, এবং সেগুলির উপর নুন ছিটিয়ে দিন। তারপর ওগুলির উপর হালকাভাবে জল ছিটিয়ে রেখে দিন ঐ ভাবে সাত থেকে আট মিনিটের মত।

এবার আগুনের উপর পাত্র বসিয়ে তাতে ঘি বা ডালডাটুকু ঢেলে দিন, ঘিটুকু গরম হয়ে গলে গেলে পর, তার ওপর রাইসর্ষের গুঁড়ো বা মাষ্টার্ড টুকু ঢেলে দিন।

চড়বড় করে ফুটে উঠলেই ওতে অড়হর ডালটা দিয়ে দিন, ডালটা একটু বাদামী হয়ে এলে পর কুচি করে কাটা পেঁয়াজ ওতে ছেড়ে দিন। সেই সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা দুটোও ছেড়ে দেবেন। সমস্তটা ভাজা ভাজা হয়ে এলে পর, রুটির টুকরোগুলি ছেড়ে দিন। উল্টে পাল্টে ওগুলো ভাজতে থাকুন। রুটির টুকরোগুলি বাদামী হয়ে যাওয়ার পর, পাত্র নামিয়ে ফেলে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখুন। তারপর কোন একটা শুকনো পাত্রে ওগুলো ঢেলে রাখুন। এই রান্নাটির নাম "ব্রেড উপমা।"

ভেজিটেবল উপমা

উপকরণ :---রাভা আড়াইশো গ্রাম, দুটি গাজর, দুটি আলু, একশো গ্রাম বীনস, দুটি পেঁয়াজ, পাঁচ-ছয়টি কাঁচা লঙ্কা, একটুকরো আদা, কিছুটা ধনেপাতা, চায়ের চামচের এক চামচ মাষ্টার্ড বা রাইসর্ষের গুঁড়ো, চায়ের চামচের দু'চামচ অড়হর ডাল, চায়ের চামচের দু'চামচ ছোলার ডাল, পঁচিশ গ্রাম ক্যাসিওনাট্‌স, নুন তিন থেকে চার চামচ, ঘি বড় চামচের ছয় চামচ।

প্রণালী :---সমস্ত আনাজ ও ধনে পাতাটুকু টুকরো টুকরো করে কেটে জলে বেশ করে ধুয়ে তুলে রাখুন।

একটা পাত্রে একটু ঘি গরম করে আগে ক্যাসিওনাট্‌সগুলি বেশ করে ভেজে তুলুন, তারপর একটি ফ্রাই-প্যান আগুনে চড়িয়ে তাতে বড় চামচের এক চামচ ঘি ঢেলে দিন, ঘি গরম হয়ে গেলে পর রাভাটা ওতে দিয়ে বাদামী করে ভেজে তুলে রাখুন একটি প্লেটে। এবার বাকি ঘিটুকু ঐ ফ্রাই-প্যানে ঢেলে দিন, ঘি তেতে উঠলে পর, ওতে ছোলার ডাল, অড়হর ডাল ও রাইসর্ষের গুঁড়োটুকু ঢেলে দিন ও বেশ করে নেড়ে-চেড়ে ভাজুন সবটা, বাদামী রং না ধরা পর্যন্ত।

এবার ওতে কাটা আনাজের টুকরো ও কুচি করে কাটা ধনেপাতা ও কাঁচা লঙ্কা ঢেলে দিন। ভাল করে ভাজতে থাকুন, সমস্ত আনাজগুলো বেশ ভাজা ভাজা ও নরম হয়ে এলে পর, নুনটা দু' গ্লাস জলে গুলে ওর উপর ঢেলে দিন। সবটা টগবগ করে ফুটতে সুরু হওয়ার পর, রাভাটা ঢেলে দিন পাত্রে। তারপর ছয় থেকে আট মিনিট, সমস্তটা নাড়তে থাকুন ভাল করে।

তারপর ভাজা ক্যাসিওনাট্‌স-গুলিও ওতে দিয়ে আর একটু নেড়ে চেড়ে আগুন থেকে নামিয়ে ফেলে একটা পাত্রে ঢেলে রাখুন ঢাকা দিয়ে। গরম থাকতে থাকতে খেতে দেবেন। পাওয়া গেলে ওই আনাজের মধ্যে কড়াইশুঁটিও দিতে পারেন, তাতে স্বাদ আরও বাড়বে।

ভার্মিসেলী উপমা

উপকরণ :---ভার্মিসেলী বা গম বা যবের পিটুলি চারশো গ্রাম, নুন চায়ের চামচের তিন চামচ, অড়হর ডাল চায়ের চামচের দু'চামচ, রাই সর্ষের গুঁড়ো বা মাষ্টার্ড চায়ের চামচের এক চামচ, চারটে কাঁচা লঙ্কা, বড় চামচের চার চামচ ঘি বা ডালডা, ক্যাসিওনাট্‌স পঁচিশ গ্রাম।

প্রণালী :---একটা চ্যাপটা ফ্রাইং-প্যান আগুনে চড়িয়ে তাতে চায়ের চামচের দেড় চামচ ঘি ঢেলে দিন, ঘিটুকু তেতে উঠলে পর যব বা গমের পিটুলিটা তাতে ঢেলে দিন, বাদামী রং না ধরা পর্যন্ত ওটা ভাজুন, তারপর নামিয়ে ফেলে একটা প্লেটে তুলে রাখুন। এবার আর একটু ঘিয়ে ক্যাসিওনাট্‌সগুলিও ভেজে তুলে রাখুন।

এবার ফ্রাইং-প্যানটা আবার আগুনে চড়িয়ে, বাঁকি ঘিটুকু ওতে ঢেলে দিন, ঘিটা তেতে উঠলে পর, রাই সর্ষে বা মাষ্টার্ডের গুঁড়ো ও অড়হর ডাল ওতে ঢেলে দিয়ে নেড়ে চেড়ে বাদামী রং না ধরা পর্যন্ত ভাজুন। ওতে কাঁচা লঙ্কা চারটে দিয়ে দিন কুচি কুচি করে কেটে।

এবার ওতে তিন গ্লাস জল ও নুন দিয়ে দিন, ভাল করে নাড়তে থাকুন কিছুক্ষণ, তারপর পিটুলিটা ঢেলে দিন, দিয়ে আরও মিনিট বারো ধরে নাড়তে থাকুন সমস্তটা। এসময় আগুনের আঁচটা যেন নরম থাকে। মিনিট বারো পরে ভাজা ক্যাসিও-নাট্‌সগুলি ওতে ঢেলে দিয়ে ভাল করে দু'একবার নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেলুন। শুকনো পরিষ্কার পাত্রে ওটা ঢেলে রাখুন।

—শ্রীমতী

চাষ আবাদ ফসল

(শেষাংশ)

ল' নামানো

পান যদি জমিয়ে রাখা না হয়, তাহলে ল' 'চালের' কাছাকাছি চলে গেলে ব্যবহারোপযোগী পান নুড়ে নিয়ে ল'-এর নিচের অংশকে পান-শূন্য করে ফেলতে হবে। পরে ল' ধাধার সমস্ত উলু কেটে দিয়ে ল'কে পূর্বোক্ত উপায়ে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামাতে হবে। ল'-এর নিচের পানটি যখন 'গাছ' হতে পাঁচ-ছ' ইঞ্চি ওপরে আসবে, তখন পানযুক্ত ল'টির অন্তত দু'জায়গায় উলু দিয়ে 'পাখড়ি' খড়ির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। পানশূন্য ল'-এর অংশটি মুড়ে (কাটা, ভাঙা বা মচকানো চলবে না) 'গাছ'-এর মাটির সংলগ্ন করে রাখতে হবে। এভাবে বছরে প্রয়োজন অনুসারে তিন-চার বার ল' নামাতে হয়। পান জমিয়ে রাখলে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে এতবার ল' নামানোর দরকার হয় না। জমিয়ে রাখার সময়ের ওপর নামানোর সংখ্যা নির্ভর করে।

সার ও মাটি দেওয়া

আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপায়ে 'গাছ'-এর ওপর মুড়ে রাখা ল'গুলিকে শেতী গুঁড়ো খোল (কুড়ি হাত 'গাছ'-এ তিনশ' পঁচাত্তর গ্রাম খোল)-মেশানো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বরুজীর ভাষায় মাটি দিয়ে ল' ঢাকার নাম 'ল'-পোঁতা'। 'গাছ'-এর ওপরে ল'-এর গোড়ায় বছরে অন্তত তেরবার—সাতবার শেতী গুঁড়ো খোল (কুড়ি হাত 'গাছ'-এ তিনশ' পঁচাত্তর গ্রাম খোল)-মেশানো মাটি ও ছ'বার শুধু মাটি দিতে হয়। 'ল'-পোঁতা'র জন্যই বেশি মাটির দরকার হয়। অন্য সময় 'চাটি' করে (অল্প পরিমাণে) মাটি দিলেই চলে। পান জমিয়ে রাখলে খোলের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। যত বেশি দিন জমিয়ে রাখা হবে, তত বেশি পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। আগে সারের যে পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, পনের-কুড়ি দিন অন্তর পান নুড়ার ক্ষেত্রেই সেটি প্রয়োজ্য।

খোল ছাড়া অন্য এক ধরনের সার প্রয়োগের রীতি আছে। ভাত ও খোল মিশিয়ে দিন আটেক পচাতে হবে। কুড়ি হাত 'গাছ'-এর জন্য একশ' গ্রাম চালের ভাত হলেই চলবে। খোল পূর্ববৎ। পচান পদার্থটিকে বছরে তিনবার (আষাঢ়, কার্তিক, ভাদ্র) ল'-এর গোড়াতে 'গাছ'-এর ওপরে প্রয়োগ করতে হবে। এ জিনিষটি গ্রীষ্মকালে প্রয়োগ করতে নেই। এই সারটি প্রধানত পানকে পুরু করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

রোগ পোকা

রোগ পোকার আক্রমণ হতে পানকে রক্ষা করার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পানের রোগ অনেকগুলি।

পচা রোগ

পচা রোগ।। ল'তে পান যখন থাকে তখন বোঝা যায় না, এই রোগ হয়েছে। নুড়া পান দু' একদিনের মধ্যেই পচে গেলে বুঝতে হবে পচা রোগ হয়েছে। এই রোগ হ'তে পানকে রক্ষা করতে হলে সকালের দিকে আতপ চালের ভাত রান্না করে বিকালের দিকে জলের সঙ্গে ঐ ভাত চটকে নিয়ে ল'-এর গোড়াতে 'গাছ'-এর ওপর প্রয়োগ করতে হবে। ল' ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বেশিদিন পান জমিয়ে রাখার জন্যও এইভাবে আতপ চালের ভাত প্রয়োগ করতে হয়। কুড়ি হাত

****

পান বরজ

ক্রমশ

'গাছ'-এর জন্য একশ' গ্রাম আতপ চাল হলেই চলবে।

চিতলে আঙারে।। এ রোগ দেখা দিলে প্রথমে পান হলুদ হয়ে যায়, পরে পচে যায়। প্রতিকারের জন্য সম-পরিমাণ গুঁড়ো শ্বেতী খোল ও গুঁড়ো হলুদ মিশিয়ে নিয়ে 'ল'-এর গোড়াতে 'গাছ'-এর ওপরে প্রয়োগ করতে হয়। কুড়ি হাত করে আটটি 'গাছ'-এর জন্য আড়াইশ' গ্রাম গুঁড়ো হলুদ ও আড়াইশ' গ্রাম গুঁড়ো শ্বেতী খোল মিশিয়ে নিলেই চলবে। এই ঔষধ প্রয়োগের দু'সপ্তাহের মধ্যেই এই রোগ সেরে যায়। যে সকল পান রোগাক্রান্ত হয়েছিল, সেগুলি সেরে উঠবে না। যেগুলি রোগাক্রান্ত হয় নি বা ঔষধ প্রয়োগের এক সপ্তাহের পর যেগুলি নতুন, এভাবে সেগুলিতে এই রোগ হবে না।

গেঁদে।। 'গাছ'-এ কখনও কখনও ধুলো চুনের মত সাদাটে জিনিস দেখা যায়। যে জায়গায় এই সাদাটে জিনিস দেখা যায়, সেখানকার ল'গুলি ক্রমশ শুকিয়ে যায়। এগুলি গেঁদে রোগের চিহ্ন। যে জায়গায় গেঁদে রোগ হবে, সেই জায়গার 'গাছ'-এর মাটি ও ল' টেনে ফেলে দিয়ে সারমেশানো নতুন মাটি ও নিরোগ নতুন ল' দিয়ে 'গাছ' ও 'ল' পূরণ করে দিতে হবে। এরপর পিঁয়াজ পিষে নিয়ে গোবরজলের সঙ্গে মিশিয়ে সমস্ত ল'-এর গোড়াতে 'গাছ'-এর ওপরে প্রয়োগ করতে হয়। এই-ভাবে এই রোগের প্রতিকার সম্ভব।

ঝলসা।। এ-রোগ হলে পান লালচে, বিকৃত ও ছোট হয়ে যায়। নিমপাতা ও রেড়ির খোল জলের সঙ্গে মিশিয়ে আট দিন পচাতে হবে। পচান পদার্থটিকে চটকে নিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ঝারির সাহায্যে ল'-এর গোড়াতে 'গাছ'-এর ওপরে প্রয়োগ করতে হবে। এতে ঝলসা রোগ সেরে যায়।

কালী পোকা ও হাউল পোকা

এদের আক্রমণে পানের স্বাভাবিক রঙ্ [illegible] ক্রমশ ছোট হয়ে যায়। পিচকারির সাহায্যে ফলিডল স্প্রে করে এদের আক্রমণ হতে পানকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য শত্রু

শিয়াল।। নিরাপদ মনে করে পান-ঘরের ভিতরে শিয়াল আশ্রয় নেয়। এদের ছুটাছুটির ফলে ল' ও 'পাখড়ি' খড়ির যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকে। বরজী পানঘরের বাইরে ফাঁদ পেতে শিয়াল মারার ব্যবস্থা করেন।

ঝড়।। ঝড়ে পানঘর যাতে ভূমিসাৎ না হয়ে যায় সেজন্য সদা সতর্ক থাকতে হয়। যথাসময়ে অকেজো খুঁটি ও কাঠামোর অংশ মেরামত করতে হবে। 'টানা', 'ঠেল' সর্বদা মজবুত রাখতে হবে।

হাওড়া জেলার শ্যামপুর দু'নম্বর ব্লকের সুলতানপুর গ্রামের বরজী শ্রীবলাইচন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীঅতুলচন্দ্র পুরকাইত মহাশয়দ্বয়ের পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পানচাষের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হোল। পানচাষের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পুরকাইত মহাশয় বললেন, নতুন 'সাজা'র পর তিন-চার বছর 'মা লক্ষ্মী' ভালই দেন। অর্থাৎ কাটিং রোপণের পর তিন-চার বছর পান ভালই হয়। এই সময়ে রোগ পোকার আক্রমণ বড় একটা দেখা যায় না। এরপর হতেই রোগ-পোকার উপদ্রব শুরু হয়। ঝলসা রোগ, কালী ও হাউলে পোকা ধরলে ভাল পান পাওয়ার আশা কমে যায়। পূর্ববর্ণিত উপায়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু একেবারে নির্মূল করা খুবই কষ্টসাধ্য। এ-ব্যাপারে স্থানীয় ব্লক অফিসে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যায় নি। রোগ পোকা দূর করার যথোপযুক্ত ঔষধাদি পাওয়া গেলে পান চাষে ভালই লাভ করা যেত। পানের উৎকৃষ্ট জাত নির্বাচন, যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও রোগ মুক্তির ব্যাপীভাবে জাতীয় ভিত্তিতে গবেষণার প্রয়োজন আছে। স্থানীয় হাটে একশ' পান দশ পয়সা হ'তে সত্তর পয়সায় বিক্রি হয়। হাওড়া জেলার পানের অন্যতম পাইকারী হাট বাগনান। এখানে প্রতি 'মোট' পান পাঁচ টাকা হতে একশ' পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হয়। নীরোগ, পুরু, আকারে বড়, সুন্দর রঙ যুক্ত পানই বেশি দামে বিক্রি হয়। শতকরা মাত্র ত্রিশ হতে চল্লিশটি বরজে এ-জাতীয় সর্বগুণান্বিত পান পাওয়া যায়। বাকি ষাট হতে সত্তরটির পান এক বা একাধিক দোষে দুষ্ট। এজন্য বেশির ভাগ বরজী মনোমত দাম পান না। দশ কাঠার একটি বরজ 'সাজ'তে (তৈরী করতে) কম-পক্ষে আটশ টাকা (জমির দাম বাদ দিয়ে) খরচ হয়। এছাড়া সেচ, সার, ঔষধ, নুড়া, নাছা, খড়ি ধরানো, ল' নামানো, ল' পোঁতা, ঘর সারানো, পান বাজারজাত করা প্রভৃতি কাজের জন্যও কম খরচ হয় না। বরজের পরিচর্যা অলপক্ষণের জন্য হলেও রোজই করতে হয়। নিজ হাতে কোন কাজ না করে লোক রেখে বা অভিজ্ঞ মজুর দিয়ে পান চাষ করা যায়। কিন্তু এতে লাভের আশা না করাই ভাল। লাভ করতে হ'লে প্রতিটি কাজ নিজ-হাতে বরজীকেই করতে হবে। নিজ-হাতে সমস্ত কাজ করে প্রতি 'মোট' পান পঞ্চাশ টাকাতেও বিক্রি হ'লে কিছু লাভ থাকে। এর কমে হ'লে পরিশ্রমই সার। 'বাংলা' পানের চেয়ে 'সাঁচি' ও 'মিঠে' পানের দাম বেশি। পুরকাইত মহাশয়ের 'মিঠে' পানের চাষ করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এ-জাতীয় পান চাষের প্রারম্ভিক খরচ অনেক বেশি। মূলধনের অভাবে 'মিঠে' পানের বরজ 'সাজ'তে পারছেন না। পানচাষের জন্য সহজ সর্তে সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা থাকলে পুরকাইত মহাশয়ের মত গরীব চাষীরা উপকৃত হতেন। গ্রামে এমন অনেক অভিজ্ঞ চাষী আছেন, যাঁদের পানচাষের জন্য জমি আছে, কিন্তু 'সাধারণ বাংলা' পানের বরজ

'সাজ'থারও মূলধন নেই। সরকার বরজের জমি বন্ধক রেখে অল্প সুদে টাকা ঋণ দিলে পান বরজ করে এই সব চাষী স্বচ্ছন্দে দু'পয়সা রোজগার করতে পারতেন।

জুতো ও ছাতা বরজের মধ্যে নিয়ে যাওয়া চলে না। মণ্ডল মহাশয়ের অনুরোধে এইগুলি বাইরে রেখে তাঁর বরজ দেখতে গেলাম। আলো-হাওয়া-যুক্ত শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পানের ল'গুলি প্রায় 'চাল' স্পর্শ করেছে। ল'-এর বড় বড় সবুজ পান থরে থরে সাজান রয়েছে। মণ্ডল মহাশয় দুঃখ করে বললেন, কত সুন্দর, পুরু ও বড় পান। কিন্তু কালী পোকা পানগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলিডল দিচ্ছি। পোকা একটু কমেছে, কিন্তু একেবারে নির্মূল করা যাচ্ছে না। চোখের সামনে পানের দাম কমে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করবার নেই। পুরকাইত মহাশয়ের নির্দোষ পরিচ্ছন্ন বরজ দেখলাম। বরজের এক কোণে দু'টি মাটির কলসী বসানো ছিল। কলসীর প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, এই কলসীর সাহায্যে পুকুর হ'তে জল তুলে ল'-এর গোড়াতে যথাসময়ে জলসেচ করা হয়। সেচের কথা আলোচনা করার সময় পুরকাইত মহাশয় একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করলেন। এ-জাতীয় অবস্থায় পড়ে কত গরীব চাষী সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে ও যাচ্ছে, কে তার খবর রাখে। দিশাহারা চাষী নিষ্ফল আবেদন করবার জায়গাও খুঁজে পান না। সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েৎ এঁদের ত্রাণের জন্য সার্থকভাবে এগিয়ে আসেন না। পুরকাইত মহাশয়ের নিজের পুকুর নেই। স্নানাদিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য 'ভাগারী'র (জ্ঞাতির) একটি পুকুরকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা আছে। এই পুকুরের জল দিয়েই বরজে সেচের কাজ চালাতেন। কিন্তু গত বছর গ্রীষ্মে 'ভাগারি'গণের সঙ্গে মনকষাকষি হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা ঐ পুকুরের জল দিয়ে বরজে সেচ দিতে দেন নি। ফলে যথাসময়ে সেচ দেওয়া সম্ভব হয় নি, বরজের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। কিছুদিন আগে 'ভাগারি'দের সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেছে। এখন সেচের জন্য জল ব্যবহারের কোন বাধা নেই। ল'-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, গত বছর জল অভাবে যে ক্ষতি হয়েছিল, এখন সেটা কেটে গেছে। পানে হাত দিয়ে দেখতে বললেন, হাত দিয়ে দেখলাম, পান বেশ পুরু। রোগপোকার কোন চিহ্ন নেই।

পানচাষ করে কিছু সংখ্যক দক্ষ বরজী নিজেদের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন। কোঠা-বাড়ীও তৈরী করেছেন। বেশির ভাগ চাষীর পরিচর্যার সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এজন্য এঁরা পরিশ্রমের ফল পান-না। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পানচাষ বন্ধ করে দেন। সুলতানপুর গ্রামে এক সময়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি পান-বরজ গড়ে উঠেছিল। এখন সেখানে মাত্র পাঁচটি আছে। পানচাষের পদ্ধতি বড়ই জটিল। পানচাষ শেখার জন্য কোন বিদ্যালয় নেই। যাঁরা চাষ করে লাভবান হতে চান, তাঁরা কৃতী বরজীর অধীনে এক-দেড় বছর শিক্ষানবিশ থেকে চাষের প্রতিটি প্রক্রিয়া ভাল করে বুঝে নেবেন। তার পরে বরজ 'সাজ'বেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে বরজ 'সাজ'লে মূলধন ও পরিশ্রম--সবই মাঠে মারা যাবে।

—শ্রীজয়দেব বৈতালিক

পূর্ণ ফলন প্রয়াস

যীশু কথিত কাহিনী, 'প্যারাবল্ অফ দি সোয়ার্' পড়েছেন অনেকেই।' চাষী বীজ ছড়ান--তার কিছু যায় পাখীর পেটে, কিছু পুষ্টির অভাবে মরে যায়, কিছু রোগ ও আগাছার আক্রমণে নষ্ট হয়; মাত্র অল্প সংখ্যক বীজ থেকেই চারা হয়।

এ কথাটা প্রত্যেক চাষীই জানেন। যদি সবকটা বীজ থেকেই চারা বেরোত তা'হলে চাষের ক্ষেত্রে বিপ্লব হয়ে যেত।

এবং এই বিপ্লবের চেষ্টাই বর্তমানে চালাচ্ছেন বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁরা চেষ্টায় আছেন যাতে প্রত্যেক রোপিত বীজই ফলনশীল হয়, প্রত্যেকটি বীজকে এমনভাবে রক্ষা করা যায়, যে, কোন রোগবীজাণু তাকে আক্রমণ না করতে পারে।

আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা দাবী করেছেন যে, তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে রোপিত বীজের শতকরা ৯০ ভাগকেই ফলনশীল করেছেন।

এঁদের আর এক লক্ষ্য হল, প্রত্যেকটি বীজের জন্য আলাদা সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। তাঁরা প্রত্যেকটি বীজের জন্য আবরণ আবিষ্কার করতে চান, যা একাধারে প্রয়োজনীয় সার যোগাবে এবং বীজকে রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। প্রত্যেকটি বীজের জন্য আলাদা এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্ভব হ'লে খাদ্যসমস্যা বলে আপাতত আর কিছুই থাকবে না।

কল্পনা করুন, যত বীজ ছড়াবেন প্রত্যেকটিই বেড়ে উঠবে এবং শস্য-সম্ভারে ভরিয়ে দেবে পৃথিবীকে।

ভাবতেও আনন্দ লাগে।

ভাদ্র মাসের বপন ও রোপন

ভাদ্র মাসে যে সমস্ত ফসলের চাষ হয়ে থাকে তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হোল। কোন্ কোন্ মাটিতে এই সব ফসলের চাষ করে ভাল ফল পাওয়া যায়, ফসলের নামের পাশে তার উল্লেখ করা হোল।

ফসলের নাম	ক্ষেতের মাটি
শালগম	দোআঁশ
ওলকপি	দোআঁশ
গাজর	দোআঁশ
বেগুন	উঁচু দোআঁশ
পটল	বেলে, দোআঁশ
পালংশাক	দোআঁশ
বাঁধাকপি	দোআঁশ
ফুলকপি	দোআঁশ
টম্যাটো	দোআঁশ
বীট	দোআঁশ
আমন ধান (রোপণ)	দোআঁশ, এঁটেল
পিঁপুল	বেলে, দোআঁশ
তিল (সাদা)	বেলে, দোআঁশ
আনারস	বেলে, দোআঁশ, এঁটেল
বরবটী	বেলে, দোআঁশ, এঁটেল
মাসকলাই	বেলে, দোআঁশ
মুগ	উঁচু হালকা জমি
বিরি কলাই	বেলে, দোআঁশ
মিষ্ট আলু	বেলে দোআঁশ
মটর শুঁটি	দোআঁশ
মূলা	দোআঁশ
মৌরী	বেলে, দোআঁশ
তামাক	উঁচু, বেলে, দোআঁশ।

॥ আবহবার্তা ॥

কৃষিকর্ম আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত আবহাওয়া অফিসে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার পর, পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত রেডিও ও খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রতিদিন 'আবহাওয়ার পূর্বাভাষ'-রূপে ঘোষিত হয়। কৃষকদের জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ বুলেটিনও প্রচারিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত পূর্বাভাষ পল্লী অঞ্চলের বৃষ্টিনির্ভর কৃষিকর্মে প্রকৃতপক্ষে কতখানি সাহায্য করে, তার বিচার না করে গ্রামের কৃষক যে সমস্ত প্রথা ও ধারণার সাহায্যে 'আবহাওয়ার পূর্বাভাষ' জানার চেষ্টা করে থাকেন, তারই কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করছি।

বৃষ্টি

জল সেচের জন্য খাল, নালা, ছোট-বড় জলাধারের অস্তিত্ব থাকলেও, প্রাচীনকাল হতেই আমাদের দেশের চাষবাস প্রধানত বৃষ্টিনির্ভর। বছরের কোন্ সময়ে কতদিন ধরে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে, বা আদৌ হবে কিনা জানা থাকলে বৃষ্টিনির্ভর কৃষিকাজের পরিকল্পনা করতে কৃষকগণের খুবই সুবিধা হয়। এ-সম্পর্কে প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের বিশ্লেষণজাত কয়েকটি প্রচলিত ধারণার উল্লেখ করছি।

খনার বচন পল্লীর মানুষের কাছে অতি পরিচিত। খনার নামে প্রচলিত কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে।

চৈত্রেতে থর থর। বৈশাখে ঝড় পাথর ॥
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে। তবে জানিহ বর্ষা বটে ॥

(চৈত্র মাসে খুব শীত, বৈশাখ মাসে ঝড়, জ্যৈষ্ঠ মাসে তারাময় আকাশ হলে বৃষ্টিপাত ভালই হবে।)

পুবেতে উঠিলে কাড়। ডাঙ্গা ডোবা একাকার ॥

(বর্ষাকালে পূর্বদিকে রামধনু উঠলে বৃষ্টিতে খানা ডোবা ভরে যাবে।)

চাঁদের সভার মধ্যে তারা। বর্ষে পানি মুষলধারা ॥

(চাঁদের সভার মধ্যে তারা দেখা গেলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়।)

দূর সভা নিকট জল। নিকট সভা রসাতল॥

(চাঁদের সভা চাঁদ হতে বেশ দূরে দেখা গেলে শীঘ্রই বৃষ্টি হবে, চাঁদের কাছেই সভা হলে বৃষ্টি হবে না।)

পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা। পুবেতে ধনু বর্ষে ধারা ॥

(পশ্চিম দিকে রামধনু দেখা গেলে খরা হবে, পূর্বদিকে উঠলে খুব বৃষ্টি হবে।)

বেঙ ডাকে ঘন ঘন। শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো।

(ব্যাঙ ঘন ঘন ডাকতে থাকলে শীঘ্রই বৃষ্টি হবে।)

বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়। হবেই বৃষ্টি খনা কয় ॥

(বৎসরের প্রথমে ঈশান কোণ হতে বাতাস বইলে বর্ষা হয়।)

পৌষে কুয়া বৈশাখে ফল। যদিন কুয়া তদিন জল ॥

(পৌষ মাসে যতদিন কুয়াশা হয়, বৈশাখ মাসে ততদিন বৃষ্টি হয়।)

পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥

(পৌষ মাসে গরম আর বৈশাখ মাসে ঠাণ্ডা পড়লে আষাঢ়ের প্রথমেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।)

ভাদুরে মেঘ বিপরীত হয়। সেদিন বৃষ্টি কে ঘোচায় ॥

(ভাদ্র মাসে যেদিন বিপরীত দিকে মেঘ ভেসে যায় সেদিন বৃষ্টি হয়।)

পাঁচ রবি মাসে পায়। খরা কিংবা খরায় যায় ॥

(পাঁচটি রবিবারযুক্ত মাসে বৃষ্টি হয় অথবা খরা হয়।)

কি কর শ্বশুর লেখা জোখা। মেঘেই বুঝবে জলের লেখা ॥

কোদালকুড়ুলে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা ॥

কৃষকে বলগে বাঁধতে আল। আজ না হয় হবে কাল ॥

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে খনার
ছাড়াও, পল্লী অঞ্চলে আরও
ধারণা প্রচলিত আছে। সেগুলির
কটি এখানে উল্লেখ করছি। সূর্য
ের সময় দক্ষিণ দিকে লাল রঙের
উঠলে কিছুদিনের মধ্যেই বৃষ্টি
। সকালের দিকে কালো রঙের
কাক পশ্চিমদিকে বসে ডাকতে
লে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে।
ডোবার সময় উত্তর দিক লাল রঙের
র ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
কালে শামুক জল ছেড়ে গাছের
রের দিকে উঠতে থাকলে বৃষ্টিপাত
ন বুঝতে হবে। মাঠে বিচরণরত
-ছাগল একত্রিত ও ভীত সন্ত্রস্ত
চারদিকে দেখতে থাকলে, বজ্রসহ
পাত আসন্ন মনে করতে হবে।
ত্যাগ করে জলচর পাখীরা
লের উপরে উড়তে থাকলে, ঝড়-
র দেরি নেই বুঝতে হবে। পিঁপড়ে
দের ডিম মুখে নিয়ে নীচু
গার গর্ত হতে অপেক্ষাকৃত উঁচু
গার দিকে বা গাছের উপরের
কে সারিবদ্ধভাবে উঠতে থাকলে
ষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে বুঝতে হবে।

বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব

শুধু বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ দিয়েই
মীণ আবহ বিভাগের কাজ শেষ
য় নি। খনার বচন ও প্রচলিত অন্যান্য
রণার মধ্যে বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব সম্পর্কে
মবাসীকে সজাগ করার প্রয়াস দেখা
য়। প্রথমে খনার বচন শোনা যাক।
দ দিয়ে বর্ষা। খনার বচন ফরসা॥
নি সাত মঙ্গল তিন। আর সব দিন দিন॥
(বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে শনিবার
বৃষ্টি সুরু হলে সাত দিন ও মঙ্গলবার
সুরু হলে তিন দিন চলে। অন্যান্য বারে
আরম্ভ হলে একদিন মাত্র স্থায়ী হয়।)
বামুন বাদল বান। দক্ষিণা পেলেই বান॥
(ব্রাহ্মণ যেমন দক্ষিণা পেলেই
বিদায় হন, তেমনি বৃষ্টি-বাদলা ও বন্যা
দক্ষিণ দিকের হাওয়া পেলেই চলে যায়।)
বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব সম্পর্কে খনার
বচন ছাড়া অন্যান্য ধারণাও প্রচলিত
আছে। যেমন, চাতক ঘরের উপরে
ঘুরে ঘুরে ডাকতে থাকলে শীগ্রই বৃষ্টি
বন্ধ হয়ে যায়। পাখাযুক্ত পিঁপড়ে পল্লী-
গ্রামে 'বাদলা পোকা' নামে পরিচিত।
বর্ষাকালে এই পোকা আকাশে উড়তে
সুরু করলে বুঝতে হবে বৃষ্টি-বাদলা
কেটে গেল।

বৃষ্টিপাতের ফল

সময়োপযোগী বৃষ্টি হলে ফসল
ভাল হয়, অসময়ে বৃষ্টি হলে শস্যের
ক্ষতি হয়। কোন্ সময়ের বৃষ্টির কেমন
ফল, সে সম্পর্কে খনার নামে প্রচলিত
কয়েকটি ধারণার উল্লেখ করা যাক।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার
পুণ্য দেশ।
(মাঘ মাসের শেষ দিকে বৃষ্টি হলে
প্রচুর শস্য জন্মে।)
মাঘ মাসে বর্ষে দেবা। রাজা ছাড়ে
প্রজার সেবা॥
(মাঘ মাসে বৃষ্টি হলে প্রচুর শস্য
জন্মে। ফলে প্রজাগণ সুখী হয়।)
যদি বর্ষে মকরে। ধান হবে টোকরে॥
(মাঘ মাসে বৃষ্টি হলে প্রচুর ধান
উৎপন্ন হয়।)
যদি বর্ষে ফাল্গুনে। চিনা
কাউন দ্বিগুণে॥
ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হলে চিনা ও কাউন
দ্বিগুণ পরিমাণে উৎপন্ন হয়।)
জ্যৈষ্ঠে শুকা আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার
না সহে ধরা॥
(জ্যৈষ্ঠ মাসে শুকনো আর আষাঢ়
মাসে বৃষ্টি হলে প্রচুর শস্য জন্মে)।
জ্যৈষ্ঠে মারে আষাঢ়ে ভরে। কাটিয়া
মাড়িয়া ঘর করে॥
(জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি না হয়ে আষাঢ়
মাসে হলে অধিক ধান হয়।)
যদি চৈত্রে হয় বৃষ্টি। তবে হয়
ধানের সৃষ্টি॥
(চৈত্র মাসে বৃষ্টি হলে প্রচুর ধান হয়)।
যদি বর্ষে অঘ্রাণে। রাজা যায় মাগনে॥
(অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হলে শস্যহানি
হয়, ফলে রাজাকেও ভিক্ষা করতে
হয়।)
খনা বলে শুনহ স্বামী। শ্রাবণে নাইকো
পানি॥
দিনে জল রাতে তারা। এই দেখবে
দুঃখের ধারা॥
(শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হয় না, দিনে
বৃষ্টিপাত, আর রাত্রে তারাময় পরিষ্কার
আকাশ—এরূপ হলে শস্য উৎপাদনের
ব্যাঘাত ঘটে। ফলে কষ্টের সীমা থাকে
না।)

বন্যা

জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত
বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবে
রূপায়ণ করেও, সার্থকভাবে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ
করা সম্ভব হয় নি। প্রাচীন ও মধ্য
যুগেও এব্যাপারে সামগ্রিক কোন
পরিকল্পনাই রচনা করা হয় নি।
বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা
রচনা করা হোক বা না হোক,
লোকমুখে প্রচলিত শ্লোকের মধ্যে
বন্যার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়। সেই বৎসর
বন্যা হয়॥
(সারা আষাঢ় মাস ধরে দক্ষিণা
বাতাস বইলে সে বছর বন্যা হয়।)
আমে ধান। তেঁতুলে বান॥
(আমের ফসল বেশি হলো ধান,
আর তেঁতুলের ফসল বেশি হলে বন্যা
হয়।)

দুঃসময়

দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক, লোকক্ষয়
নিবারণ করার জন্য মানুষ সর্বযুগেই
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কখনও এ-
ব্যাপারে আংশিক সফল হওয়া গেছে।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলতা আসে নি।
এ-জাতীয় দুর্দৈব কখন মনুষ্য সমাজের
উপর এসে পড়বে, সে সম্পর্কেও
ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা হয়েছে।
চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড
গড়াগড়ি যান॥
(চৈত্র মাসে কুয়াশা ভাদ্র মাসে
বন্যা হলে প্রচুর লোকক্ষয় হয়।)
হেসে চাকি বসে পাটে। শস্য সেবার
না হয় মোটে॥
(অস্তকালে সূর্য হেসে পাটে গেলে,
সেবার শস্য মোটেই হয় না।)

[illegible] পিবে বনে [illegible] স্ত্রী, তন
গন্তিব পিতা।
[illegible] মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা ॥
রাজ্যনাশ, গোনাশ, হয় অগাধ বান।
[illegible] কাটা গৃহী কেরে কিনিতে না
পায় ধান ॥

(ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে ভূমিকম্প হলে রাজ্যনাশ, গোনাশ, ও বন্যার ফলে এমন অজন্মা হয়, দ্বারে দ্বারে গিয়েও মানুষ ক্রয় করবার মত ধান পায় না।)

মধু মাসে ত্রয়োদশ দিনে রয় শনি।
খনা বলে সে বৎসর হবে শস্যহানি ॥

(চৈত্র মাসের তের তারিখে শনি অবস্থান করলে, সে বৎসর শস্যহানি হয়।)

পাঁচ শনি পায় মীনে।
শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে ॥

(যে বৎসর এক মাসে পাঁচটি শনিবার থাকে, সে বৎসর দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হয়।)

ভোগ : মাস ভজনী

আবহাওয়া নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পৌষ মাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পৌষ মাসের আবহাওয়া বিচার করে পরবর্তী সারা বছরের আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়। পৌষ মাসের প্রথম দেড়দিন পৌষ মাসের ভোগ। অর্থাৎ কোন্ বছর পৌষ মাসের প্রথম দেড়দিনের আবহাওয়া যেমন থাকবে, পরের বছর সারা পৌষ মাসের আবহাওয়া তেমনি থাকবে। পৌষ মাসের ভোগের জন্য নির্দিষ্ট দেড়দিনের পরের আড়াই দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের ভোগ। অর্থাৎ এই আড়াই দিনের আবহাওয়া পরবর্তী বছরের সারা জ্যৈষ্ঠ মাসের আবহাওয়ার নির্দেশ দেয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের ভোগের পরের আড়াই দিনের আবহাওয়া পরবর্তী বছরের সারা কার্তিক মাসের আবহাওয়ার সংকেত দেয়। এমনিভাবে পৌষ মাসের তৃতীয় আড়াইদিন পরবর্তী বছরের চৈত্র মাসের, চতুর্থ আড়াই-দিন ভাদ্র, পঞ্চম আড়াইদিন মাঘ, ষষ্ঠ আড়াইদিন আষাঢ়, সপ্তম আড়াই-দিন অগ্রহায়ণ, অষ্টম আড়াইদিন বৈশাখ, নবম আড়াইদিন শ্রাবণ মাসের ভোগ হিসাবে গণ্য করা হয়। কোন বৎসরের পৌষ মাস ত্রিশ দিনে হলে, শেষের একদিন পরবর্তী বৎসরের পৌষ মাসের ভোগ হিসাবেই ধরা হয়। পৌষ মাসের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী সারা বছরের আবহাওয়া নির্ণয় করার পদ্ধতিকে 'মাস ভজনী' বলা হয়ে থাকে।

উরি

কার্তিক মাসের শেষ সাতদিন ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম আটদিন—এই পনেরদিন হোল 'উরি'। 'উরি'র সময়ে আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে, বৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এই সময়ে একবার বৃষ্টি-বাদলা সুরু হলে কিছুতেই আকাশ পরিষ্কার হতে চায় না। পেকে যাওয়া আমন ধানের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কথিত আছে—

উরি যদি রসে, পাকা ধান খসে।

শ্রবণা

নক্ষত্র বিচার করেও আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানার চেষ্টা হয়ে থাকে। 'শ্রবণা' পড়লে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এই সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, আবহাওয়া সরস হয়ে উঠে। 'শ্রবণার' স্থায়িত্ব শ্রবণা নক্ষত্র হতে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র পর্যন্ত।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে সারা বৎসরের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, বন্যা ও দুঃসময় সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি ধারণার কথা উল্লেখ করা হোল। গ্রামাঞ্চলে আবহাওয়া সম্পর্কে আরও যে সমস্ত ধারণা প্রচলিত আছে, সেগুলিকে সংগ্রহ করে সংকলিত করার প্রয়োজন আছে। এতে একদিকে যেমন দেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করার উপাদান সংগৃহীত হবে, অপরদিকে তেমনি এগুলির সত্যতা বিচার করে আধুনিক যুগে এদের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বৃহৎ সংহিতায় মেঘের গর্ভসঞ্চার নির্ণয় করে, বৃষ্টিপাতের সময় নির্ণয় করার প্রণালীর উল্লেখ রয়েছে। যামল বনমালা, কৃষি পরাশর গ্রন্থে গ্রহের অবস্থান বিচার করে বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেওয়ার সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে এই সব গ্রন্থে সন্নিবেশিত সূত্রাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করারও প্রয়োজন রয়েছে।

—শ্রীজয়দেব বৈতালিক

বিদেশে ভারতীয় কলা

এদেশে কলার উৎপাদন বৃদ্ধিএবং আরও সরেস কলা উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এতে যে কেবল আভ্যন্তরীণ চাহিদা পরিপূর্ণ-ভাবে মেটানো যাবে তাই নয়, বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণও অনেক বাড়বে। তার ফলং ফলে ফলানি--বহু আকাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য ভাঁড়ার পূরণ আংশিকভাবে। বস্তুত ইতিমধ্যেই জাপানে দশ হাজার টন কলা রপ্তানী করা হয়েছে। রাশিয়াও আমাদের কলা কেনে। বাইরের বাজারে আমাদের সুপুষ্ট ও সুস্বাদু কলার চাহিদা যথেষ্ট। রাশিয়ায় প্রথম ভারতীয় কলা প্রত্যেকটি ৮০ পয়সা দরে বিকিয়েছিল।

হিসেব বলছে, এক হাজার একরে উৎপ। কাবুলী কলা জাপানে বা রাশিয়ার রপ্তানী করলে এক কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। চাঁপা, অমৃতসাগর বা মর্তমান কলার মত উৎকৃষ্ট জাতের কলাও নিশ্চয় ভাল দামে বিকোবে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহীশূরে কলার চাষ হয়। উপযুক্ত জমি
মহীশূরে কলার চাষ হয়। উপযুক্ত

পরিকল্পনা এবং সহযোগিতা থাকলে কলা চাষের জমি যথেষ্ট বাড়ানো সম্ভব, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা, আসাম আর অন্ধ্রপ্রদেশ।

ভারি তুষারপাতযুক্ত এলাকা বিহার এবং উত্তরপ্রদেশেও কলার চাষ বাড়ানো যায়। চাষের জমি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও ভালজাতের কলা চাষ এবং কলা সংরক্ষণের ব্যাপারেও যথেষ্ট উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। সংরক্ষণ, বাজারে চালান দেওয়া ইত্যাদি সময় ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব কমানো চাই-ই।

অধুনা বৈদেশিক বাণিজ্যে কলার স্থান স্বীকৃত। ভারতেই কলার সর্বাধিক প্রাচীন বৃত্তান্ত লভ্য। খৃষ্টজন্মের ৫০০ বছর আগেকার খবর পাচ্ছি আমরা, কিন্তু সহজেই অনুমান করা চলে, তারও ঢের ঢের আগে থেকে লোকায়ত এই সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর ফলের অস্তিত্ব ছিল।

'ন্যু ওয়ার্লড'-এ প্রথম এটি আসে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে। পর্তুগীজরা ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কলা নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে তা এল আমেরিকায়।

কলা লোকায়ত ফল। এটি পুষ্টিকর, সহজে হজম হয়, এতে কার্বোহাইড্রেট এবং খনিজ পদার্থ যথেষ্ট এবং এর ক্যালোরী মূল্য আলুর চেয়ে বেশি। এক আউন্স কলায় আছে ১০-৩ গ্রাম কারবোহাইড্রেট্, সমপরিমাণ আপেলে আছে মাত্র ৩-৮ গ্রাম। অন্ত্রের ওপর কলার পচননিরোধক প্রভাব আছে, আর ছাড়া আর্থ্রাইটিস্-এর ক্ষেত্রেও কলা কাজে লাগে।

ভারতে কলা অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল; কেবল আমের ফলন আর চাষের জমিই কলার তুলনায় বেশি। ভারত সরকারের ডিরেক্টরেট্ অব্ মারকেটিং অ্যাণ্ড ইন্সপেক্শন-এর হিসেব অনুযায়ী কয়েক বছর আগে কলাচাষের জমি ছিল ১, ৯৩, ৬৫৫ হেক্টর এবং মোট কলা উৎপাদন মোটামুটি ২৬, ৬৭, ৫৯৬ টন।

সারা বছর কলা মেলে। অন্য ফলের তুলনায় কলার দামও কম। কিন্তু বর্তমানে উৎপন্ন কলার পরিমাণ আদৌ পর্যাপ্ত নয়, ভাল জাতের কলাও মেলে কম। পাড়তে-খুতে দিতে যা নষ্ট হয়, তা না ধরলে এ দেশে কলার গড়পড়তা প্রতিজন খায় মাত্র ০-০৩৪ পাউণ্ড-জামাইকা, পূর্ব আফ্রিকা, কেনিয়া এবং উগাণ্ডার মত কলা উৎপাদনকারী দেশে মাথাপিছু কলা ভক্ষণের পরিমাণ অনেক বেশি। এমন কি, কলা হয় না এমন অনেক দেশেও যেমন, ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন--এই গ্রহণের পরিমাণ আমাদের তুলনায় দ্বিগুণ।

টাটকা কলা আদর্শ খাদ্য। কাঁচকলা উত্তম তরকারী। গুঁড়ো করে নিলে চাল-গমের বদলে খাওয়া যায়।

কলা জমিয়ে রাখা যায়। রোদ্দুরে শুকিয়ে।

কলার খোসা নিয়ে গবেষণা চলছে শোনা যায়, দশ পাউণ্ডটাক্ খোলা থেকে এক পাউণ্ডটাক মোম পাওয়া যায়।

সে যাক। কলা যে বিদেশে জনপ্রিয় এবং ভারতীয় কলার যে রপ্তানীর বরাত ভাল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কাজেই উৎপাদন বাড়িয়ে কলা রপ্তানী বৃদ্ধি আমাদের জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। অনেক কিছুই আমরা বিদেশের কাছ থেকে মেগে খাই। মওকা এতদিনে পাওয়া গেছে। আসুন, বি[illegible]শী র এ[illegible] আমরা কলা খাওয়াই।

—তপন চৌধুরী

উন্নত প্রথায় ফুলকপির চাষ

সব্জীর সেরা ফুলকপি। ফুলকপির চাহিদা খুবই বেশী। খেতেও বেশ মুখরোচক। অনেক আবার দামেও বেশ চড়া। ফুলকপির মরশুম শীতকাল। পশ্চিম বাংলার হাটে-বাজারে অসময়েও কিছু কিছু ফুলকপি দেখা যায়। আসলে কিন্তু এরা মোটেই বাংলার ফসল নয়। এই অসময়েরটা আমদানি করা হয় বিহারের পাটনা, ভা[illegible]পুর, রাঁচী আর বারাণসী ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। কার্শিয়াং, দার্জিলিং থেকেও সামান্য কিছু কিছু আসে। কিন্তু দূর থেকে নিয়ে আসার জন্য ফুলগুলি টাটকা তো থাকেই না, আর স্বাদে আর গন্ধেও অনেক তারতম্য ঘটে।

কপির চাষ এমন কিছু কঠিন নয়। বীজ থেকে চারা তৈরী করে কপির চাষ করতে হয়। বীজ বপন ও চারা রোপণ করার পর গাছ বড় হয়ে ফুল আসা পর্যন্ত আড়াই থেকে চার মাস সময় লাগে। যদিও বর্ষার পরে বাগান ফসল বেশী ভাল হয়, কিন্তু আগুতে টাটকা ফসলের [illegible] সকলকেই আকৃষ্ট করে।

পশ্চিম বাংলায় জলদি, মাঝারি ও

মাঘি--এ তিন জাতের ফুলকপি দেখা যায়। চাষী ভাইদের চিনবার সুবিধের জন্য এদের কাতকে, অঘ্রানী, পৌষে, মাঘী ইত্যাদি উৎপাদিত ফসল হিসেবে জাত দেখান হয়। যেসব অঞ্চলে মৌসুমীর প্রকোপ বেশী দিন থাকে না অথবা বৃষ্টিপাত আগেই বন্ধ হয়ে যায়, যেমন--পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, নদীয়া এবং উত্তর ২৪-পরগণার উঁচু জায়গায় একটু চেষ্টা করলেই জলদি জাতের কপির চাষ সম্ভব করা যায়। কিছুদিন যাবৎ কৃষি বিভাগ দার্জিলিং, পুরুলিয়া ও রাঁচিতে সব্জীর আগুতি ফসল সফল করার জন্যে আলু ও ফুলকপি চাষের গবেষণা চালাচ্ছেন।

আজকাল বেশীর ভাগ শস্য ফসল ও সব্জীর চাষ করা হয় উন্নত প্রথায়। যেহেতু না, অধিক ফলনশীল দেশী ও বিদেশী উন্নত জাতের বীজ পাওয়া এমন কিছু কষ্টকর নয়। উন্নত প্রথায় চাষ করার সাধারণ নিয়ম হলো--উন্নত জাতের বীজের উপযোগী জমি বাছাই, জমি তৈরী ও বীজতলা তৈরী করতে হবে। আরও চাই দরকারমত জলসেচ, পরিমাণমত জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ আর সময়মত রোগ ও পোকা-দমনের ওষুধ ইত্যাদি।

জমি বাছাই

সবসময় আলো-বাতাস পায়, বর্ষার জল কোনরকম দাঁড়ায় না, এ রকমের উঁচু ও মাঝামাঝি জায়গার সমতল জমি কপি চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। পলিপড়া ও বেশী জৈব পদার্থ আছে, এরকম দোঁয়াশ মাটিতে ফুলকপি ভাল জন্মে। এছাড়া কাছাকাছি সেচের ব্যবস্থা আছে দেখেই কপির জমি বাছাই করতে হয়।

জমি তৈরী

চারা বসানোর কম করেও একমাস আগে জমির আয়তন বুঝে কোদাল বা লাঙ্গল চালিয়ে জমির মাটি দশ থেকে পনের ইঞ্চি গভীর করে খোঁড়া দরকার। কয়েকদিন পর পর মাটি ওলট-পালট করে চষে আলো-বাতাস লাগাতে হবে। আর মাটি খোঁড়ার সাথে সাথে জমি থেকে সবরকম আবর্জনা, গাছের শিকড় বিশেষ করে মুথাঘাসের মূল ইত্যাদি আগাছা ভালভাবে বেছে ফেলতে হবে। এভাবে জমির সবরকম আবর্জনা বাছা হলে, কাঠাপিছু এক গাড়ী পচান আবর্জনা সার বা গোবর সার, তিন কেজি হাড়ের গুঁড়া, পাঁচ কেজি খোল, দুই কেজি সুপার ফস্‌ফেট্ ও এক কেজি মিউরেট্ অব পটাশ ছড়িয়ে আরও দুই থেকে তিনবার মাটি খুঁড়ে মই চালান হলে চারা বসানোর উপযোগী হবে।

বীজ বাছাই

সবসময় মনে রাখবেন, বীজ বাছাই-এর ওপর আপনার ভাবী ফলন নির্ভর করছে। আগেই বলেছি ফুলকপি শীতের সব্জী হলেও এরা সাধারণভাবে তিন জাতের। আর আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত এদের বীজ বপন ও চারা রোপণ করা চলবে। পশ্চিম বাংলায় ফুল ও বাঁধাকপি ভাল জন্মালেও এখানে এদের বীজ জন্মায় না বললেই চলে। বিহার, বেনারস, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি স্থান থেকে ফি-বছর এখানে বীজ আমদানি করতে হয়। এছাড়া প্রদর্শনীর জন্য বা বীজ ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় বিদেশ থেকেও উন্নত জাতের কিছুকিছু বীজ এখানে আনা হয়। আর বীজ থেকে চারা তৈরী করেই সব জাতের কপির চাষ করা হয়।

(ক) জলদি ফুলকপি

পাটনাই, বেনারসী, পুষা-কার্তিকী ইত্যাদি জলদি জাতের জনপ্রিয় ফুলকপি। আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বীজ বপন ও চারা রোপণের সময়।

ফুলকপি

রোপণের পর থেকে হ'তে ৮০কে
মধ্যে ফুল পাওয়া যায়। সারি
র দূরত্ব দেড় ফুট হিসেবে রাখা
। বর্ষাকালে জলদি ফুলকপির চাষ
 হয় বলে জমিতে জল-নিকাশের
ব্যবস্থা থাকা চাই। ছোট ছোট
জমি ভাগ করে নিলে জলদি
কপি চাষে খুব সুবিধে হয়।

(খ) মাঝারি জাতের ফুলকপি

টনাই, ঢাকাই; বেনারসী
, ইণ্ডিয়ান স্নোবল ইত্যাদি এবং
ও পৌষে ফুলকপি মাঝারি
। ভাদ্র থেকে আশ্বিন পর্যন্ত
বপন ও চারা রোপণের সেরা
মাঝারি জাতের চারার দূরত্ব
 দেড় ফুট এবং সারির দূরত্ব
ট থাকা চাই। ফসল তোলার সময়
থেকে ৯০ দিনের মধ্যে। অঘ্রাণ
ষ মাস মাঝারি জাতের ফুলকপিতে
 সরগরম থাকে।

(গ) নাবি জাতের

কপি-জগতের সেরা স্নোবল্ ও
জাতের ফুলকপি। আশ্বিন-
কের মধ্যে বীজ বপন
চারা রোপণ শেষ করতে হবে।
র দূরত্ব আড়াই ফুট এবং চারার
দুই ফুট রাখতেই হবে। ১২০
র আগে ফুল খুব কম সময়েই
য়া যায়। ওজন খুব ভারী ও ফলনে
ই বড় হয়। কচি পাতায় ফল ঢেকে
 বলে রোদের তাপে সহজে নষ্ট
না। নাবি জাতেরটা শীতের পুরো
নো আবহাওয়াতে জন্মায় এবং
 সার ও সেচের দরকার হয়।

এ ছাড়াও আজকাল দেশী-বিদেশী
 অধিক ফলনশীল উন্নত ও সংকর
তের অনেক রকমের ফুলকপির
 পাওয়া যায়। নিরোগ, নিখুঁত ও
 বীজ পেতে হলে চেনা ও বিশ্বাসী
য়গা থেকে কিনতে হয়। ঠিকমত
জ বাছাই করে, বীজের জাত ও
াব অনুযায়ী সময়মত বীজ বপন
চারা রোপণের ওপরই ফুলকপি
ষের সাফল্য নির্ভর করে। এক
সময়ের বীজ অসময়ে ভাল জন্মায় না।
আবার বীজতলায় বেশী বয়সের চারা
থেকেও ভাল ফুল হয় না।

বীজতলা

সহজে ভাল ফুলকপি পেতে
হলে উন্নত প্রথায় চারা তৈরী
করতে হবে। ফুলকপি শীতের
ফসল হলেও বর্ষার মধ্যেই তার চারা
তৈরী করতে হয়। সেজন্য ঝামেলাও
সামলাতে হয় অনেক বেশী। সহজে
আলো-বাতাস পায় এবং বেলে-দোআঁশ-
যুক্ত উঁচু জায়গা বীজতলার পক্ষে
খুবই ভাল। অলটি কলম করতে
হলে মাটির টবে বা কাঠের বাক্সে
বীজ ছড়ানো দরকার। বিশেষ করে
কোন পাত্রে বীজ ছড়াতে হলে ২
ভাগ মাটির সঙ্গে ১ ভাগ আবর্জনা
সার বা গোবরসার ও কিছুটা কাঠের
ছাই মেশান দরকার। এর সঙ্গে
বীজ ছড়ানো দরকার। এক চামচ
সুপার ফস্‌ফেটও দিতে হবে। আর
জমিতে চারা তৈরী করতে হলে
ত্রিশ বর্গফুট (১০´×৩´×৮˝) এক
ফালি বীজতলায় ২।৩ ঝুড়ি
আবর্জনা বা গোবরসার কিছুটা
কাঠের ছাই, ১৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট
এবং ৫০।৬০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ
মিশিয়ে মাটি তৈরী করা দরকার।

কি করে বীজতলায় বীজ ছড়াতে হয়

বীজ ছড়াম অনেকভাবেই করা
যায়। বীজতলার মাটি সমতল করে,
তার ওপর বীজগুলি হাত দিয়ে
ছড়িয়ে দিতে হয়। তারপর বীজগুলি
আরও কিছুটা সারমেশান মাটি দিয়ে
ঢেকে দিয়ে আলতোভাবে চেপে
দেওয়া দরকার। এবার সরু
ঝাঁজরি দিয়ে ধীরে ধীরে জল দিয়ে
ভিজিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে
হবে, যাতে জল বেশী প'ড়ে বীজে
মাটিচাপা না লাগে। বীজ অঙ্কুরিত
না-হওয়া পর্যন্ত ঢাকা দিতে হবে।
৩০ বর্গফুট মাপের বীজতলায় মাত্র
১০।১২ গ্রাম বীজ লাগে। আর
১৫০০ থেকে ১৮০০ চারা পাওয়া
যায়।

বীজতলায় চারা রক্ষা

বীজ বপনের ৩।৪ দিনের ভেতর
চারা বের হলে, প্রথমে কয়েকদিন
২।৩ ঘণ্টা করে এবং ক্রমশ বেশী
সময় ধরে রোদে রাখতে হবে। এভাবে
রোদ লাগান হলে চারার সহ্যগুণ
বেড়ে যাবে। ছোট ছোট চারাগুলিকে
বাঁচাতে হলে অনেক সময় সেচের
দরকার হতে পারে। আবার বৃষ্টির
জল থেকেও রক্ষা করতে হবে বৈ-কি।
হোগলার ছাউনি বা এ্যালকাথিনের
পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকার কাজ বেশ
ভাল হয়।

রোগ ও পোকা দমন

রোগ ও পোকার হাত থেকে
চারাগুলিকেও বাঁচান দরকার। আজকাল
অনেক রকমের প্রতিষেধক ওষুধ
কিনতে পাওয়া যায়। ৫০ ./° শক্তির
ডি ডি টি ১৫ গ্রাম এবং ব্লাইটক্স
৩০ গ্রাম একসঙ্গে এক গ্যালন জলে
গুলে ছিটিয়ে দিলে উপকার পাওয়া
যায়। চারার বয়স ১০।১৫ দিন হলে
একবার এবং ২০।২৫ দিন হলে আর
একবার ওষুধ ছিটান দরকার। ফুল-
কপির প্রধান শত্রু যে ক্ষয়রোগ তাহলো
পাতা বাদামী হয়ে যাওয়া বা পাতার
মাঝে মাঝে ফোস্কার মত দাগ পড়া
এবং কাণ্ড ও ফুলের ভেতর দিক ফাঁপা
হওয়া। পরীক্ষা করে দেখা গেছে,
বোরণের অভাবই এর প্রধান কারণ।
বীজতলা থেকে চারা তোলার ৪।৫ দিন
আগে এবং চারা রোপণের ১০।১৫
দিন পরে আরও ২।১ বার সোহাগা-
মেশান জল (Borax) ছিটান হলে
গাছ কিছুটা রক্ষা পায়। সোহাগার
অভাবে বোরিক এসিডও দিতে পারেন।
চার গ্যালন জলে দুই আউন্স হিসেবে
সোহাগার দরকার হয়। সোহাগা বা
বোরিক এসিড জলের সঙ্গে গাছে
ছিটান খুবই ঝামেলার কাজ। তাছাড়া
বর্ষার জলেও সব ধুয়ে বেড়িয়ে যায়।
সেজন্য অনেকেই সোহাগামিশান
জলের সঙ্গে দুই আউন্স 'টেনাক' ও
৮।১০ কৌটা 'টিপল' মিশিয়ে দিয়ে

থাকেন। তাহলে পাতা ও কাণ্ডে সোহাগা বেশীদিন লেগে থাকে ও ভাল কাজ করে।

জাব পোকা ও কাটুই পোকার মুখ থেকে কপির চারা ও গাছ রক্ষা করতে হলে ১ সি-সি এনড্রেক্স ২০ ই-সি আধ কে-জি জলের সঙ্গে মিশিয়ে তিন সপ্তাহ পর পর ছেটাতে ভুলবেন না।

চারা রোপণ

বীজতলা থেকে ৩০।৪০ দিন বয়সের চারা বা ৪।৫ পাতাযুক্ত চারা জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়। তবে ২।৩ সপ্তাহের বয়সের চারা বীজতলা থেকে তুলে সারযুক্ত হাপরের মাটিতে আরও ১০।১৫ দিন রাখা হলে গাছ বেশ শক্ত, সবল ও কিছুটা বেঁটে হয়। ঝাঁকড়া মূলে গুচ্ছাকারে শিকড় বের হয়। হাপিকরা চারা জমিতে সহজে মরে না এবং সকল গাছে বেশ পুষ্ট ফুল হয়।

বীজতলা বা হাপর থেকে চারা তোলার আগে গোড়ার মাটি জল দিয়ে নরম করে নেওয়া দরকার। আর চারা তুলে অযথা বেশীক্ষণ ফেলে না রাখাই ভাল। মাটির 'জো' দেখে চারা বসানো দরকার। চারার গোড়ায় ৩।৪ দিন সাধারণ জল দিয়ে মাটি রসালো রাখতে হবে। চারা ১/২ থেকে ৩/৪ ইঞ্চির বেশী গভীরে যেন বসান না হয়। রোদের তাপ বেশী থাকলে শালপাতা, কলাগাছের খোল বা কাগজের ঠোঙা দিয়ে ৩।৪ দিন ঢেকে দিতে ভুলবেন না।

যত্ন-পরিচর্যা

ফুলকপির চারা জমিতে বসানোর ১০।১২ দিন পরে চারা-পিছু ৮ গ্রাম এমোনিয়াম সালফেট বা ৪ গ্রাম ইউরিয়া চারার গোড়া থেকে ২।৩ ইঞ্চি দূরে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মেশান দরকার। সার মিশানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে জলসেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়ানী দিয়ে আগাছা তুলে দেবেন, আর দু'পাশের মাটি দিয়ে আল বেঁধে দেবেন। ফুল আসার মুখে আর একবার চাপানসার দিতে হবে এবং দরকারমত জলসেচ চালাতে হবে। এভাবে তদারকি করলে সময়মত গাছ সবল হয়ে উঠবে এবং পুষ্ট ফুল দেবে। কাজেই পরিকল্পনা করে উন্নত প্রথায় ফুলকপির চাষ করতে পারলে আপনিও লাভবান হতে পারেন।

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

কালিদাসের বৃক্ষলতা

(শেষাংশ)

দেশভেদে নাম :---হিন্দুস্থানে---ধারা, কেসু, ঢাক, টেসু, কাংকোখিরা, পলাশ। মহারাষ্ট্রে-পঠ্‌ঠস বা পল্লস। কর্ণাটে---মুত্তুলু। তৈঃ---মোটুগ, মাত্তু- কাচেটু। উৎকলে---পরাশু। বোম্বাইয়ে--- খাকরো। গুঃ---খাখরো। তাঃ---পরশন্। ইং---Downy brach Butea লাটিন বা বোটানিক নাম---Butea frodoza ডাক্তারী নাম---Butea Gum বুটিয়া গাম। সিং---কেল। বাংলায়---পলাশ।

'বনৌষধিদর্পণে' পলাশের বর্ণনা---"পলাশবৃক্ষ উচ্চ হয়। কোচবিহারে যেখানে সেখানে পলাশ গাছ দেখা যায়। রাঢ়ে তেমন দেখা যায় না। দু'চার পল্লীর পর হয়ত একটা পলাশ দেখা গেল। পলাশের একবৃন্তে তিনটি পাতা থাকে বলিয়া ইহার ত্রিপত্রক নাম। সাধারণ বৃন্ত অতি দীর্ঘ।---পলাশ ফুল লাল ও বক্র বলিয়া নখক্ষতের সহিত তুলিত হইয়া থাকে। ইহা বসন্ত পুষ্প।

গণপতি সরকার

২১। কীচক :---"স কীচকৈর্মারুতপূর্ণ রন্ধ্রৈঃ কূজদ্ভিরাপাদিতবংশকৃত্যম্।" (রঘু ২।১২)

অভিধান :---ছিদ্রের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিলে যে বাঁশে শব্দ হয়, সেই বাঁশকে কীচক বা বেণু বলে। (অমর)

কীচক বলিতে "রন্ধ্রবংশ।" ইহা এক প্রকার বাঁশ---সাধারণতঃ পার্বত্য প্রদেশে জন্মে। কালিদাস হিমালয় প্রদেশে ইহার উৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন।

২২। কুঙ্কুম :---"প্রিয়ঙ্গু-কালীয়ক-কুঙ্কুমাক্তম্ স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ" (ঋতু ৬।১২) ---

বৈদ্যকে "কুঙ্কুম" "ঘুসৃণ" এবং "রুধির" নামে বহুল প্রচার। বাং---কুন্‌কুম্, হিঃ---কেসর। সিং---কোকুম্। গুঃ---কেসর। কঃ ---কুঙ্কুম। তৈঃ---কুঙ্কুমপুবু। ফাঃ---লরকীমাস ; অঃ---জাফ্‌রান্। ইং---স্যাফ্‌রণ্ Saffron। বোটানিক :---Crocus Sativus। উৎপত্তিবোধক নাম---"কাশ্মীর" এবং "বাহ্লীক"।---

এখন কাশ্মীর, পারস্য, স্পেন,

“কোন মানুষ
বা কোন দেশ
অপরকে ঘৃণা করে
বাঁচতে পারেনা”

স্বামী বিবেকানন্দ

ফ্রান্স ও সিসিলিতে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া থাকে। অবশ্য অতি প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীরে কুঙ্কুমের চাষ হইয়া আসিতেছে।---কার্তিক মাসে কুঙ্কুমের গাছে ফুল হয়। উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবু রঙের। পুরাতন ও নিকৃষ্ট কুঙ্কুম গাছে পুরাতন ও নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকে পীত বা কাল। বিলাতি কুঙ্কুমে প্রাণীর মেদ ও মাখন মিশ্রিত থাকে। চর্বিমিশ্রিত কুঙ্কুম তৈলাক্ত দেখায়। এই বিলাতি কুঙ্কুম ঔষধার্থে বা দেবোদ্দেশে ব্যবহৃত হয় না। কুঙ্কুম বা জাফরাণ শীতপ্রধান দেশে ভালরূপ জন্মে। মূল আশ্বিন মাসে রোপণ করিতে হয়। ইহার ফুল অতিশয় সুন্দর।

২৩। কুটজ :---"স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার।" (পূ, মেঘ ১।৪)

'বনৌষধিদর্পণ-কার দুই প্রকার কুটজের নাম করিয়াছেন। একটি সিত কুটজ, অন্যটি অসিত কুটজ। সিত অর্থাৎ শুভ্র কুটজই পুং-কুটজ। আর অসিত অর্থাৎ শ্যামবর্ণ কুটজই স্ত্রী-কুটজ বৃক্ষ।---সিত কুটজ বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে, কিন্তু অসিত কুটজ বঙ্গে দুর্লভ; ইহা মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, গোদাবরী-তীর এবং ব্রহ্মদেশে জন্মে। উৎপত্তি স্থান দেখিয়া মনে হয়, কালিদাসের যক্ষ সম্ভবত এই সুরভি অসিত কুটজ দিয়াই মেঘকে অর্ঘ্য দিয়াছিলেন।

বাংলা---কুড়চি বা কুরচি গাছ।

২৪। কুন্দ :---"কুন্দক্ষেপানুগ-মধুকর শ্রীমুষামাত্মবিম্বং।---হস্তে লীলা-কমল-মলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্।"

(মেঘ ১।৪৭, ২।২)

কুন্দ শীতকালের ফুল, কিন্তু ইহাকে বালকুন্দ বলায় বুঝিতে হইবে যে, হেমন্তে যখন প্রথম ফোটে, তখন বাল্যকাল; শীতকালে প্রৌঢ়াবস্থা। বালকুন্দ বলায় অর্থাৎ কুন্দের বাল (নবীন) বিশেষণ থাকায় ইহা হেমন্ত পুষ্প হইতেছে। এখন বোধ হইতেছে যে, হেমন্তে কুন্দ প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে, শীতে মধ্যাবস্থা এবং বসন্তে পরিণত হয়।

২৫। কুমুদ :---"শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং।" (মেঘ ১।৫৮)

২৬। কুরুবক (কুরুবক) :---"চূড়াপাশে নবকুরবকং চারুকর্ণে শিরীষং" (মেঘ ২।২)---ইহার বোটানিক নাম Barleria.

২৭। কুশ :---"কুশাঙ্কুরাদান-পরিক্ষতাঙ্গুলিঃ কৃতোঽক্ষসূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ।" (কু ৫।১১)

কুশ অতি অনুর্বর ভূমিতেও বেশ জন্মায়।

২৮। কুসুম্ভ :---"বিকচ নব কুসুম্ভ স্বচ্ছবিন্দুর ভাসা প্রবল পবনবেগোদ্ভূতবেগেন তূর্ণম্।" (ঋতু ১।২৪)

বাং---কুসুম ফুল।---

রবিশস্যের ন্যায় কুসুম ফুলের বীজ শরতে বপন করিতে হয়, শীতে পুষ্পিত হয়। ইহার পাতা সরু, লম্বা ও কণ্টক-ব্যাপ্ত। ফুল প্রায় কুঙ্কুমের বর্ণ; এইজন্য ইহাকে গ্রাম্য কুঙ্কুমও বলে।

২৯। কেতকী :---"পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সুচিভিন্নৈঃ নীড়ারম্ভৈ র্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রাম চৈত্যাঃ (মেঘ ১।২৩)

বাং---কেয়াফুলের গাছ।

৩০। কেশর :---"মালাঃ কদম্বনব-কেশর কেতকীভিঃ" (ঋতু ২।২০)

দেশভেদে নাম :---হিন্দুস্থানে, কর্ণাটে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে---নাগকেশর।

৩১। কোবিদার :---"চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ।" (ঋতু ৩।৬)

বাঃ---কাঞ্চন ফুলের গাছ।

কোবিদারের নাম যুগ্মপত্র। কারণ ইহার পত্রাগ্র ভাগ এমন ভাবে চেরা যেন দুইটি পত্র মিলিত হইয়াছে। ফুলের পাঁচটি দল বিষমাকৃতি। রক্ত কোবিদার ফাল্গুন-চৈত্রে ফোটে। শ্বেত-কোবিদার শীতে, কৃচিৎ শরতে ফোটে। পীত-কোবিদার বড় গাছ। প্রায় পর্বতে জন্মায় বলিয়া ইহাকে "গিরিজ" বলে।

৩২। খর্জুর---"খর্জুরী স্কন্ধনদ্ধানাং মদোদ্গারসুগন্ধিষু।" (রঘু ৪।৫৭)

তাল, নারিকেল, গুবাক, হিন্তাল, খর্জুর, কেতকী, তালী---এই সাতটি তৃণদ্রুম; অর্থাৎ তৃণদ্রুম বলিলে ইহার প্রত্যেককেই বুঝায়। (অমর)।---খেজুর প্রসিদ্ধ গাছ। বাংলা দেশে সর্বত্রই এরূপ পাওয়া যায়। দেশভেদে নাম বাঃ---খেজুর। হিঃ---খেজুর। সিং---ইন্দি। মঃ---শিন্দী। গুঃ---খর্জুরী। কর---ইচ্ছিলু। তৈঃ---ইণ্টাচেটু। ফারসিতে---তমররুতব। আরবীতে---খর্মাতর। ইং---Date-palm.

৩৩। চন্দন :---"মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনম্ শুচৌ প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাম্।" (ঋ ১।২)

ঋতুসংহারে "প্রকাম-কালাগুরু-ধূপ-বাসিতম্" এই অগুরু কালাগুরু বলিয়া এক প্রকার চন্দনের কথা আছে। কালাগুরু ও অগুরু এক পদার্থ।

৩৪। জবা :---"সান্ধ্যং তেজঃ প্রতি নবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ" (মে ১।৩৬)

অন্য নাম :---রক্তপুষ্প, অর্কপ্রিয়া, হরিবল্লভা, সূর্যারাধনসাধনী জপা, রাগপুষ্পী, প্রতিকা (পিচ্ছিলপুষ্প)।

জবা প্রসিদ্ধ ফুল গাছ। মহামায়ার পূজায় জবার বড় আদর। "জবাকুসুম সঙ্কাশং" বলিয়া সূর্যের বর্ণনা করি ও পূজা করি। লাল জবাই খুব প্রসিদ্ধ। ঝুমকো জবাও চলে। পঞ্চমুখী জবা বড় সুন্দর। শাদা, পীত ও লাল প্রভৃতি রঙের জবাফুল হয়।---কালিদাস বর্ষা-বর্ণনার মধ্যে জবাফুলের কথা বলিলেও ইহা বর্ষাফুল কিনা, তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। তিনি সন্ধ্যারাগে মেঘকে জবা-ফুলের লালবর্ণ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। মহাকবি স্পষ্ট না বলিলেও তিনি যে ইহাকে বর্ষাপুষ্প বলিয়াছেন, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

৩৫। জম্বু :---"ত্বয্যাসন্নে পরিণত-ফল শ্যামজম্বুবনান্তাঃ সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।" (মে ১।২৩)

জম্বু আমাদের প্রসিদ্ধ জাম। অমরসিংহ জামের প্রভেদ বলেন নাই। কিন্তু বৈজয়ন্তী-রচয়িতা যাদবপ্রকাশ তিন প্রকার জামের কথা বলিয়াছেন। একটি মহাজম্বু, তাহা মহাফল অর্থাৎ

আরোগ্য বিভাগ

●শ্রীঅসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া--

আপনি এলোমেলোভাবে কোন কিছু করবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হবে। আপনি দু'বেলা মাথায় প্রাগমাটার মলম সমান পরিমাণে নারিকেল তেল মিশিয়ে ঘষে ঘষে লাগাবেন। এ ছাড়া মালটিভিটামিন খাবেন; এ ছাড়া একটু বেশি করে ঘুমোবেন। অস্থির হলে কোন ফল হবে না।---

শ্রীসুবিমল দাস, জহর কলোনী, পলতা ----

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, সকলেরই ও উপসর্গ ঘটে। কোন ভয় নেই। ---

বার বার ফোঁড়া হচ্ছে যখন, চিকিৎসককে দেখিয়ে পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন অথবা বড়ি খাবেন।

●মধুকর, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪।

আপনাদের ঘরের দু-তিনজন আরোগ্য বিভাগের পরামর্শে সুস্থ হয়েছেন জেনে আমরা আনন্দিত। আপনি চিঠিতে যা লিখেছেন, তা নিরাময় করতে হলে ওষুধের চেয়ে ব্যায়ামের প্রয়োজন বেশি। আপনি রোজ দু'বেলা ব্যায়াম করবেন, অথবা বেড়াবেন, দেখবেন মাসখানেকের মধ্যেই উপসর্গগুলি কমে গেছে।

● শ্রীমতী মালতী---

আপনার দীর্ঘচিঠি পড়লাম। আপনি ছদ্মনাম দিতে বলেছেন, কিন্তু কোন ছদ্মনাম না লেখাতে আপনার নামটুকু শুধু দিলাম। আপনার বান্ধবী জীবনে একটা মস্তবড় ভুল করেছেন। তিনি যখন ক্লাস নাইনে পড়েন, এক ভদ্রলোককে ভালবাসেন, পরে ভদ্রলোক প্রত্যাখ্যান করাতে মানসিক আঘাত পান এবং উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়।

আপনার বান্ধবীকে বোঝাবেন। এভাবে জীবনে কোন ভালবাসা পাওয়া যায় না। জীবনে ভালবাসা চেয়ে পাওয়া যায় না, ভালবাসা আপনা থেকেই আসে, আর সেই ভালবাসার আগমন-প্রত্যাশায় নিজেকে শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, ভদ্রতা, চারিত্রিক সবলতায় গড়ে তুলতে হয়। নিজেকে সম্পূর্ণ করে না তুলতে পারলে, আর একজনকে কাছে ডাকবার অধিকার কোন মানুষের নেই। না নারীর, না পুরুষের।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

আপনার বান্ধবীকে বলবেন, পড়াশুনা করে, নিজেকে নিজের মত (অন্যের অনুকরণ না করে) গড়ে তোলে যেন। অতীত আপনা থেকেই মন থেকে মুছে যাবে; নতুন জীবনে, সুস্থ জীবনে, নতুন মানুষ শুভ ইঙ্গিত নিয়ে আবির্ভাব হবেই।

●শ্রীমতী সুরভি সেনগুপ্তা, জয়নগর, বাদখোর---

এক নম্বর প্রশ্নে যে সব উপসর্গের কথা লিখেছেন, আমার মনে হয়, আপনার মাসিক বন্ধ হয়ে আসছে। আপনি Triredisol H 1000 mcg, ইনজেকশন ১ সিসি করে ইণ্টারমাসকুলার একদিন অন্তর একমাস নেবেন। এ ছাড়া Hepatoglobin দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের ২-চামচ করে দু'মাস খাবেন। তাতেও যদি না সারেন, চিকিৎসক দেখিয়ে Mixogen জাতীয় বড়ি খাবেন। অতি অবশ্য স্থানীয় চিকিৎসক দেখিয়ে ব্লাডপ্রেসার দেখিয়ে নেবেন এবং বেশি থাকলে তার চিকিৎসা করাবেন।

দু'নম্বর প্রশ্নে আপনার মেয়ের বিষয় যে লিখেছেন, তা অল্পবয়সী মেয়েদের রক্তাল্পতার জন্য হয়। ওকেও Hepatoglobin চা-চামচের দু-চামচ করে দু'বেলা ভাতখাবার পর দু'মাস খেতে দেবেন। তাতেও যদি না কমে, চিকিৎসক দেখাবেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাবেন।

●শ্রীমতী, জয়ন্তী সেনগুপ্তা, পাহাড়পুর রোড, কলকাতা---২৪

প্রশ্ন: আমার মেয়ের বয়স ৫।৬ বৎসর। এখনও বিছানায় প্রস্রাব করে।

উত্তর: রাতে শোবার আগে প্রস্রাব ত্যাগের অভ্যাস করাবেন নিয়মিত। রাতে শোবার সময় ১টি করে Tofranil বড়ি একমাস খেতে দেবেন, এ ছাড়া দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দুচামচ করে Paladec খেতে দেবেন একমাস ধরে। এর মধ্যে মল পরীক্ষা করে জেনে নেবেন ক্রিমি আছে কি না। থাকলে তারও চিকিৎসা করাবেন।

শ্রীতরুণকুমার দত্ত, সাঁইথিয়া, বীরভূম---

কোন ভয় নেই। আপনা থেকেই কমে যাবে।

শ্রীসমীর চক্রবর্তী, গ্রীনপার্ক, নতুন দিল্লী---১৩---

প্রশ্ন: আমি ষোলবছর বয়সে খুব পাতলা, লম্বা ছয় ফুট তিন ইঞ্চি---দিন দিন দ্রুতগতিতে লম্বা হয়ে যাচ্ছি, এই রোগমুক্তির উপায়, আর ওষুধের নাম বলুন।

উত্তর : এটা কোন রোগ নয়, সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই বয়সে সকলেই লম্বা হয়। এ নিয়ে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। ভাল খাওয়া-দাওয়া করে একটু মোটা হলেই সুন্দর মানিয়ে যাবে।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মেদিনীপুর---চৌবাচ্চার জল নল দিয়ে বেরিয়ে যাবেই, তাকে বন্ধ করা উচিত নয়। ও নিয়ে কিচ্ছু ভাবতে নেই। পড়াশুনা করে, নিজের কাজকর্ম করে, অন্যমনস্ক থাকলেই উপসর্গ কমে যায়, একদম বন্ধ হবে না।

●শ্রীসুশীল ভৌমিক, মুনিদপুর, বীরভূম---

প্রশ্ন : প্রায় রাতে কাশি হয়, গলা খুসখুস করে।

উত্তর : রোজ রাতে শোবার আগে গরম জলে কুলকুচি করবেন, আর শোবার সময় গলায় একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে শোবেন।

●শ্রীমতী অজিতা সোম, রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম---

আপনি এতদিন চিকিৎসা করান নি? আর দেরি না করে কান-গলা-নাক বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে অতিঅবশ্য চিকিৎসা করাবেন। আর দেরি হলে সারানো সম্ভব হবে না।

●শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া---১

মনে হয় আপনার ব্লাডপ্রেসারের গোলমাল আছে। হয় বেশি, আর নইলে কম। স্থানীয় চিকিৎসক দেখিয়ে প্রেসারের চিকিৎসা করে দেখুন উপকার হবে মনে হয়।

●০০৭ (ছদ্মনাম), ঘাটকাপোর, বোম্বাই---

শ্লেষ্মা এবং কৃমি যখন আছে জানেন, তখন চিকিৎসককে দেখিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নেবেন।

শ্রীঅমুক সেন, উত্তরপাড়া---

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে একমাস Aminozyme খাবেন।

●শ্রীমতী মালিকা দাস, মালদহ---

(১) আপনার শ্বশুর মহাশয়ের যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তা আমার মনে হয়, আপনি যা বলছেন তা নয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিন্ত হোন। আপনি যা লিখেছেন, তা সঠিক হলেও স্পর্শ না করলে অন্য কারুর ছ'বার সম্ভাবনা কম থাকে।

(২) আপনার ছেলেকে এক ফোঁটা Abdec Drops করে খেতে দেবেন একমাস, তারপর ২ ফোঁটা করে একমাস, তারপর ৩ ফোঁটা করে একমাস। এইভাবে ছয় মাস চলবে।

●শ্রীস্বপন দাস, সাউথ রায়নগর, বারুইপুর---

কোন ভয় নেই। আপনা থেকেই কমে যাবে।

●এ, সি, পি, (ছদ্মনাম), নৈহাটি---রাতে যাতে সুনিদ্রা হয়, তার ব্যবস্থা করুন, দেখবেন উপসর্গ কমে গেছে।

●শ্রীমুক্তিকিঙ্কর বসু, আরামবাগ, হুগলী---

আপনি ক্যান্থারাইডিন্ তেল ব্যবহার করতে পারেন।

●শ্রীউৎপল চক্রবর্তী, কুমারডুবি---

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Neogadine খেতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

আরোগ্য বিভাগ

নাম- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ঠিকানা- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

মাসিক বসুমতী

●শ্রীএন. সি. বিশ্বাস, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা---

আপনি রোজ রাতে শোবার সময় Nevrovitamin 4 (adult) বড়ি ১টি করে একমাস খাবেন।

●শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায়, আলিপুর-দুয়ার---

প্রশ্ন : ১-এর উত্তর---ভিটামিন সি খাবেন এবং আঙুল দিয়ে দাঁত মাজবেন।

প্রশ্ন : ২---হস্তমৈথুনের উপকার ওর অপকার কি কি জানাবেন।

উত্তর : উপকার কিছু নেই। অপকার অনেক। হস্তমৈথুন করলে মানসিক একাগ্রতা ওই কার্যের প্রতি ঘনীভূত হয়, ফলে মানসিক কাজ করবার ক্ষমতা মস্তিষ্ক হারিয়ে ফেলে। হস্তমৈথুন পাশবিক প্রবৃত্তির ব্যায়াম। ফলে পাশবিক প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এমনিতেই পাশবিক প্রবৃত্তি, মানবিক প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী। যদি তার পরও অভ্যাসের বশে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়, তাহলে মানবিক গুণগুলি আর বিকশিত হতে পারে না। সেইজন্য স্মৃতিশক্তি, পড়াশুনার অধ্যাবসায়, একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়, আর অনুশোচনায় মন ভেঙে পড়ে, ফলে স্বাস্থ্য ও মন দুর্বল হয়ে যায়।

● নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সুরসুরা রোড, দেরাদুন---

আপনি আমাশয়ের চিকিৎসা করান এবং দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Aminozyme দু'মাস খাবেন।

●শ্রীজয়চাঁদ মণ্ডল, লালগোলা, লস্করপুর---

প্রশ্ন : রোগটি হচ্ছে মন ঘরে রইছে না কেন? সদা মনে হয়, কোন বিদেশে চলে যাই, কিন্তু যাওয়ার সামর্থ্য নেই। কি ভাবে এর প্রতিকার হবে জানাবেন।

উত্তর : ঘরকে বিদেশের মত সুন্দর বলে ভাববেন। তাহলেই ঘরে মন বসবে।

●শ্রীবি এন বিশ্বাস, খেজুয়াবাজার রোড, বহরমপুর---

প্রশ্ন : Cidal Sampoo ও Hijol hair oil এখানে কোন দোকানে পাচ্ছি না।

উত্তর : এ ধরণের প্রশ্ন আমরা বহু পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে পাচ্ছি। ঔষধপ্রণেতাদের কাছে সবিনয় নিবেদন, তাঁরা যেন যথাযথভাবে সর্বত্র ওষুধ পাঠিয়ে জনসাধারণকে অযথা হয়রানি থেকে বাঁচান।

●শ্রীঅসীম গুহ, শোভাবাজার---

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবেন। Multivitamin বড়ি খাবেন।

● শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২৪ পরগণা---

আপনি দু'বেলা একটি করে Enteroquinol বড়ি দশদিন খাবেন, তাছাড়া Diapepsin দু'চামচ করে দু'বেলা ভাত খাবার পর একমাস খাবেন।

●শ্রীমতী মিতা রায়, এ ভি পি কলোনী দুর্গাপুর---৪---

আপনি যে উপসর্গের কথা লিখেছেন, তাঁর জন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। ওগুলো রোগের লক্ষণ নয়। আপনার মনে এখনও লজ্জা ও সংকোচ আছে, তাই অনুরূপ উপসর্গের উদয় হচ্ছে। স্বামীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে থাকতে থাকতে দেখবেন অসুবিধাগুলি আপনা থেকেই দূর হয়ে গেছে।

●শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী, দক্ষিণ পেহড়দা, ২৪ পরগণা---

এত দীর্ঘ চিঠি না লিখে সংক্ষেপে উপসর্গগুলো লিখলে আরও সঠিকভাবে পরামর্শ দেওয়া যায়। আপনি দু'বেলা ভাতখাবার পর চা-চামচের দু'চামচ করে Colipil-s খাবেন একমাস।

●শ্রীসোমনাথ দত্ত, রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর---

আপনার রিপোর্টে তেমন কোন দোষ নেই। আপনার স্ত্রীর অন্য সমস্ত ওষুধ বন্ধ করে, Ephynal 100mg বড়ি রাতে শোবার সময় ১টি করে তিনমাস খাবেন। তিনমাস পরে ফলাফল জানাবেন।

● শ্রীমিঠু ঘোষ, বদরতলা, কলিকাতা---৪৪---

আপনি দু'বেলা ভাতখাবার পর চা-চামচের ২ চামচ করে Sioplex Lysine খাবেন দুমাস।

●শ্রীঅরুণকুমার আদক, পার্ক ষ্ট্রীট, কলি---১৭---

প্রথম প্রশ্নের উত্তর---না---

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর---নিয়মিত Cidal soap মাখবেন।

●শ্রীএস কে মুখার্জী, টেলকো, জামসেদপুর---৪---

স্থানীয় ডাক্তার যে চিকিৎসা করছেন, খুবই ন্যায়সঙ্গত। আপনি তাঁর চিকিৎসাধীন থাকুন।

●শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্তী, রহড়া, ২৪ পরগণা---

আপনি রবিবার অথবা ছুটির দিন বাদ দিয়ে যে-কোন দিন সকাল বেলায় ট্রপিকাল স্কুলের আউটডোরে গিয়ে টিকিট করলেই অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁরা পরীক্ষা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন।

●শ্রীপ্রণব চ্যাটার্জী, খড়গপুর---

দেখুন প্রণববাবু---আমাশয় এমন একটি রোগ যা একবার হলে একেবারে নির্মূল হতে চায় না, একবার হবে, আবার সারবে, তাই যে চিকিৎসা স্থানীয় চিকিৎসক দিয়েছেন, তাই মাঝে মাঝে করবেন।---মনে কোন ভয় রাখবেন না।

●শ্রীকে কে ভট্টাচার্য, প্রসন্ন দত্ত লেন, শিবপুর, হাওড়া---২---

পড়াশুনা কি করে মনে রাখতে হয় এ নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে, তবু আর একবার সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

সকালে দু-ঘণ্টা এবং সন্ধ্যেয় তিনঘণ্টা পড়তেই হবে। কোন কারণেই এর অন্যথা হবে না।

ভোরবেলায় উঠে মুখ, হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসবেন। বিকেলবেলায় খেলাধুলা, ব্যায়াম অথবা বেড়িয়ে এসে ভাল করে হাত-পা, মুখ ধুয়ে পড়তে বসবেন। রাতে পড়ার কাজ করবেন, সকালে লেখার কাজ করবেন। রাতে যা পড়বেন (প্রয়োজন হলে চেঁচিয়ে পড়বেন), শোবার সময় তা মনে রাখবার চেষ্টা করে। শোবেন এবং শুয়ে পড়ার

মীরা কী মল্লার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পূজোর জন্যে ফল আর ফুল আজকাল প্রত্যেকদিন সকালেই আসে। বাইরে থেকে ভক্তেরা পাঠায়, মহলের ভিতর থেকে মেয়েরাও পাঠায়। মীরার সঙ্গে আজকাল কারো দেখা করার হুকুম নেই। কেউ আসতে পারে না মীরাবাঈয়ের কাছে, তাই যারা ওঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, ফুল ও ফল পাঠায় প্রত্যেকদিন।

মীরাও আর নিজের মহলে ফিরে যায় নি। তার থাকা, খাওয়া, শোয়া সব গিরিধারীর মন্দিরে। ভিতরে শুধু দু'জন সঙ্গিনী, চম্পা ও চামেলী।

মন্দিরের দরজা খোলা। কিন্তু কেউ ধারে কাছে আসে না। সবাই জানে আড়াল থেকে সতর্কদৃষ্টি রেখেছে চার-পাঁচ জন সশস্ত্র প্রহরী।

যারা ফল আর ফুল নিয়ে আসে তাদের উপর কড়া নজর। মন্দিরের সামনেই ওদের ফল আর ফুল নামিয়ে রাখতে হয়। কোনো কথা বলার হুকুম নেই। চম্পা কিংবা চামেলী এসে সেগুলো তুলে নিয়ে যায়।

শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাশ

প্রশস্ত মন্দিরের এককোণে জড়ো করে রাখা হয় সেই ফুল আর ফল।

ফলের ঝুড়ি নিয়ে মহারাণার কাছ থেকে যে লোকটি এসেছে তাকে মীরা বললো,---ওখানে নিয়ে রেখে দাও।

আপনি একবার [illegible] সে জিজ্ঞেস করলো।

মীরা তাকিয়ে দেখলো চামেলীর মুখের দিকে।

তার মুখ গম্ভীর। কোনোরকম অভিব্যক্তি নেই।

দেখবো?---বললো মীরা,---আচ্ছা, এখানেই নামিয়ে রাখো।

লোকটি ফলের ঝুড়ি নামিয়ে রাখলো।

চম্পা একবার তাকালো চামেলীর দিকে, একবার সেই লোকটির দিকে। তার একটু সন্দেহ হোলো, সে নিজেই খুলতে গেল ফলের ঝুড়ির ঢাকনা।

না, ---বললো মীরা, আমিই খুলবো। তুমি সরো।

চম্পা লোকটির মুখের দিকে তাকালো। তার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চোখে ফুটে উঠেছে ভয়ের দৃষ্টি

চম্পার মনে একটা আতঙ্ক দেখা দিলো।

তাকিয়ে দেখলো চামেলীর দিকে। চামেলীর মুখে কোনোরকম অভি-ব্যক্তি নেই।

চম্পা তাকালো মীরার দিকে। খুব নিশ্চিন্ত মনে, খুব সহজভাবে ফলের ঝুড়ির ঢাকনা তুলছে মীরাবাঈ।

আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দু'-পা পেছনে সরে দাঁড়ালো। কারণ ঝুড়ির ভেতর থেকে দুটি বিরাট কেউটে সাপ ফণা উঁচু করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কথাই চিন্তা করবেন। একদিন পরে সকালবেলায় বই না দেখে সমস্ত বিষয় খাতায় লিখবেন। পরের দিন বই খুলে মিলিয়ে দেখবেন ঠিক আছে কি না, যদি কোন ভুল থাকে অন্য রঙের কালি দিয়ে কেটে সংশোধন করে নেবেন এমনি ভাবে অভ্যাস করলে দেখবেন যা পড়ছেন মনে থাকছে। তারপর ঘড়ি দেখে অভ্যাস করবেন তাড়াতাড়ি লেখার। ঘড়ি ধরে দশমিনিটের মধ্যে এক একটি প্রশ্নের উত্তর লিখে শেষ করে ফেলবেন। তা'হলে দেখবেন পরীক্ষায় লিখতে আর অসুবিধা হচ্ছে না।

● শ্রীনিমাই বর, বৈকুণ্ঠপুর, হাওড়া---

আপনি Calcileronet Syrup রাতে শোবার সময় ২ চামচ করে পনেরো দিন খাবেন, তা'ছাড়া Siopep-naline tab দু'বেলা ভাতখাবার পর ২টি করে খাবেন।

● শ্রীমতী মিতালী রায় (ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক)---

প্রথম যে প্রশ্ন করেছেন তা কোন রোগ নয়। স্বাভাবিকভাবে সকলেরই হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : Colpomin বড়ি রাতে শোবার সময় প্রসবদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। সকালে বাথরুমে গেলে দেখবেন ময়লা বেরোচ্ছে। কোন ভয় পাবেন না। কুড়ি দিন থেকে ত্রিশ দিন (মাসিকের দিনগুলি বাদে) এই রকম বড়ি ব্যবহার করবেন, দেখবেন চুলকানি সেরে গেছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর : কৃমির জন্য Antipar খাবেন আর দু'বেলা ভাত-খাবার পর চা-চামচের দু-চামচ করে Oroplex Forte খাবেন।

চতুর্থ প্রশ্নে যা জানতে চেয়েছেন, তা বলা নিয়মবিরুদ্ধ।

এক মুহূর্তের ... জন্যে ... মীরার চোখে দেখা দিলো একটা আতঙ্ক। সে চোখ বুজলো, তবে শুধু এক-মুহূর্ত মাত্র। আবার যখন চোখ খুললো, তখন চোখের দৃষ্টি কিছুক্ষণ আগে গীতগোবিন্দ পড়ার সময়ের মতো স্নিগ্ধ।

সাপদুটো আস্তে আস্তে ফণা গুটিয়ে মুখ নামিয়ে নিলো। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ফলের ঝুড়ির ভেতর থেকে। মন্থরগতিতে মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল, তারপর হারিয়ে গেল আতাবনের ভিতর।

মীরা ঝুড়ির ভেতর থেকে ফলগুলি বার করে গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে নিয়ে রাখলো। তারপর আবার ফিরে এসে গীতগোবিন্দ খুলে বসলো।

চামেলীর চোখদুটো জলে টলমল করছে।

লোকটি এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিলো। এবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল মন্দির থেকে।

নিজের মনে গীতগোবিন্দ পড়ছে মীরা।

চামেলী চম্পার কাছে এসে দাঁড়ালো।

কি ব্যাপার? —চম্পা জিজ্ঞেস করলো খুব নিচু গলায়।

অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করো?

চোখের সামনে তো দেখলাম।

না, না, ওটা একটুও অলৌকিক নয়। আসল অলৌকিক যা-কিছু তা মানুষের মনে।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তুমি দেখলে বিষাক্ত কেউটে সাপ, ভাবলে মীরাজীকে মারবার জন্যে রাণাজীর ষড়যন্ত্র। ঠিকই ভাবলে। নিজের চোখে দেখলে বিষাক্ত সাপ, কিন্তু মীরাজীকে কিছুই করলো না, চুপচাপ ফণা গুটিয়ে মুখ নামিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। তুমি ভাবলে অলৌকিক, কিন্তু তাতো নয়। সাপদুটোর বিষদাঁত ছিলো না। আগেই ভেঙে দেওয়া হয়েছিলো।

... ও রকম সাপ কেন পাঠাবেন বনবীর?

চামেলী একটু হাসলো।

বললো, বনবীর বিষাক্ত সাপই পাঠিয়েছিলেন। ফলের ঝুড়িতে ভরে দেওয়ার আগে আমাদের সবার চোখের সামনেই দুটি কুকুরছানাকে প্রাণ দিতে হয়েছে, দুটি সাপের বিষাক্ত কামড়ে। যে লোকটি ফলের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এলো সে বনবীরের খুব বিশ্বস্ত লোক। আমাকে যখন নির্দেশ দেওয়া হোলো, আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো মীরাজীর কাছে, আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চামেলী একটু থেমে ফিরে তাকালো মীরাবাঈয়ের দিকে। ওদিকে গিরধরজীর মূর্তির সামনে বসে সে নিজের মনে গীতগোবিন্দ পড়ছে। অন্য কোনদিকে মন নেই।

তারপর? —চাপা গলায় চম্পা জিজ্ঞেস করলো।

রাণার মহল থেকে বেরিয়ে তো আমরা দু'জনে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আগে আগে ওই লোকটি। পেছন পেছন আমি, আমার পা চলছে না কিছুতেই। কখন আতঙ্কন আরম্ভ হোলো, আমরা ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছি ঘাসের উপর দিয়ে, হঠাৎ দেখি এক জায়গায় সামনে একটি গাছের ডাল বেশ নিচু হয়ে আছে। ও পথে আমি অনেকবার যাওয়া-আসা করেছি, কিন্তু কখনো তো ওই ডাল অতো নিচু মনে হয় নি। আমার সন্দেহ হোলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হোলো যেন ঘন পাতার আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে।

ফলের ঝুড়ি মাথায় লোকটি যতো এগিয়ে যাচ্ছে, ডালটি আস্তে আস্তে অতো নিচু হয়ে আসছে।

সে বোধ হয় খেয়াল করে নি। ওখানে সূর্যের আলোও নেই। এগিয়ে যেতে যেতে ঝুড়িটা গাছের ডালে লেগে তার মাথা থেকে পড়ে গেল নিচে ঘাসের উপর এবং তারপর গড়িয়ে ঝোপের ভিতর।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটি সেই আবছা অন্ধকারে ঝোপের ভিতর হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলো ফলের ঝুড়ি।

আমার মনে হোলো, একজন কেউ

যেন ছায়ার মতো নিঃশব্দে ওদিক থেকে ফলের ঝুড়ি সরিয়ে নিলো। তারপরই দেখতে পেলাম, আমারই কাছে ঝোপের আড়ালে আরেকটি ফলের ঝুড়ি, ঠিক একই রকম দেখতে।

আমি ওকে ডেকে বললাম,---ওদিকে কোথায় খুঁজছো। ঝুড়ি তো এখানে।

সে এসে ফলের ঝুড়িটা নেড়ে-চেড়ে দেখলো। না, ঠিকই আছে ঝুড়ির ঢাকনা। ভালো করে এঁটে দেওয়া আছে। খুলে যায় নি। ঝুড়ির গায়ে কান পেতে শুনলো। বোধ হয় শুনতে পেলো ফলগুলোর উপর সাপ-দু'টোর নড়াচড়া করার আওয়াজ। সন্তুষ্ট হয়ে ঝুড়িটা মাথায় তুলে আবার চলতে শুরু করলো।

আর সেই মুহূর্তে আমি বুঝে নিলাম। ওই ঝুড়িতে যে দুটো সাপ আছে, ও-দুটো বিষাক্ত নয়, ও দুটো নিরাপদ, মীরাজীর কোনো ক্ষতি আর হবে না। আমি তখন নিশ্চিন্ত। মনে হোলো, জীবনের অলৌকিক ব্যাপারগুলো এভাবেই হয়, ---ইন্দ্র-জালের মতো নয়, ভোজবাজীর মতো নয়, সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবেই হয়, যা যুক্তির বাইরে মোটেও নয়।

কিন্তু ঝুড়ি বদলে দিলো কারা? জিজ্ঞেস করলো চম্পা।

জানি না। জানবার চেষ্টাও কোনো-দিন করবো না। তবে মীরাজীকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন এমন অনেকেই তো আছেন রাণাজীর মহলেও, নিশ্চয়ই তাঁদেরই কেউ হবেন, যাঁরা আগের থেকে ষড়যন্ত্রটা জানতে পেরে মীরাজীকে বাঁচাবার জন্যে এত সব ব্যবস্থা করেছেন।

চম্পা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, ভালোই হোলো।

হ্যাঁ, কথাটা রটে যাবে,---হাসি-মুখে উত্তর দিলো চামেলী,---বনবীরের পরামর্শে রাণাজী বিষাক্ত সাপ ফলের ঝুড়িতে করে পাঠিয়েছিলেন মীরা-বাঈয়ের কাছে। কিন্তু গিরিধরজীর কৃপা আছে মীরাজীর উপর। সাপ-দুটো কিছু করে নি। ফণা গুটিয়ে বেরিয়ে গেছে মন্দির থেকে।

বনবীর আর সাহস করবে না। জানি না ভাই। বনবীর ঠিক সেই ধরণের লোক, যারা এভাবে ব্যর্থ হলে ভগবানের উপরও ক্ষেপে গিয়ে মরিয়া হয়ে ওঠে।

॥ চব্বিশ ॥

তুমি তো এমন কিছু বিচলিত হয়েছো বলে মনে হচ্ছে না,---বনবীর সিংহ বললো রাণাকে।

বিচলিত হয়ে তো কোনো লাভ নেই,---উত্তর দিলো রাণা রতন সিংহ---ভগবান যদি তাঁকে রক্ষা করেন আমরা কে কি করতে পারি?

দাঁতে দাঁত চাপলো বনবীর। দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা আওয়াজ বেরোলো।

রতন সিংহের মনে হোলো যেন একটি বিষাক্ত কেউটে সাপ চাপা রাগে ফোঁস করে উঠলো।

না, না, ওসব অলৌকিক-ফলৌকিক আমি বিশ্বাস করি না,---বনবীর বললো, ---লোকে যে যাই বলুক, আমার মনে হয়, এর ভেতরে অন্য কোনো কারচুপি আছে। যে লোকটা ঝুড়ি নিয়ে গিয়েছিলো তাকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে একটু চাপ দিলেই আসল কথাটা বেরিয়ে পড়বে। তবে এখন নয়,---পরে। আপাতত আমাদের হাতে অন্য যে অস্ত্র আছে সেটাই প্রয়োগ করতে হবে।

কি?

কালীজীর মূর্তিকে স্নান করানো জলে বিষ মিশিয়ে পাঠাতে হবে মীরাজীর কাছে। সে বিষ তুমি নিজের হাতে মেশাবে।

কয়েক মুহূর্ত বিষণ্ণ হয়ে রইলো রতন সিংহ। তারপর বললো,----আপনি আমার নিন্দে করিয়ে ছাড়বেন দেখছি।

হোক তোমার নিন্দে। হাতে ক্ষমতা থাকলে নিন্দে কোনো ক্ষতি করে না। লোকে দু'দিন পরে সব ভুলে যাবে।

রতন সিংহ কোনো উত্তর দিলো না।

বনবীর আধবোজা চোখে একটু তাকিয়ে দেখলো। তারপর খুব নরম গলায় বললো,---রাণাজী স্ত্রীলোকের প্রাণ নিতে আমারও কি খুব ভালো লাগছে? আমিও তো রাজপুত।

রতন সিংহ চুপ করে রইলো।

বনবীর বলে গেল,---মীরাজীকে আমিও খুব শ্রদ্ধা করি। তিনি শিসোদিয়া কুলের জ্যেষ্ঠা কুলবধূ। কুমার ভোজরাজ বেঁচে থাকলে মীরাজীই হতেন আমাদের মহারাণী। মীরাজী আমাদের কুলের গৌরব। তাঁর মতো এ রকম সুশিক্ষিতা বিদুষী রাজকন্যা আমাদের কুলে এ পর্যন্ত আর আসে নি। তিনি উচ্চকোটীর সাধিকা, তিনি অনন্যসাধারণ কবি। তাঁকে তো আমাদের মাথায় তুলে রাখা উচিত।

কিন্তু রতন সিংহ,---দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো বনবীর;---আমার উপায় নেই। রাজনীতি বড়ো নির্মম। এখানে সব কিছুর উপরে কর্তব্য, মীরাজী নিজের সাধনা নিয়ে পড়ে থাকেন নি। তা যদি হোতো, আমাদের কিছু বলার ছিলো না। কিন্তু তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। বাদশাহ বাবর চান না মেবার শক্তিশালী হোক। তিনি আড়াল থেকে সাহায্য করছেন আমাদের প্রতিপক্ষকে। এবং মীরাজী নানাভাবে সমর্থন করছেন তাঁদের। আমার কাছে খবর আছে যে, মীরাজীর মারফতে বাবর মেবারের অনেক সর্দারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তুমি বলো রতন সিংহ, আমরা কি করে চোখ বুজে বসে থাকতে পারি।

রতন সিংহ অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো।

বেশ, তা'লে তুমি একাই রাজ্য চালাও, আমি চলে যাই অন্য কোথাও। বললো বনবীর।

বাংগালোর শহরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উপনীত হলে জনসাধারণ
তাঁকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

॥ চিত্র সংবাদ ॥

মাসিক বসুমতী । ভাদ্র / '৭৭

পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসাররা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে প্রাপ্ত
নকসালদের বোমা, লাঠি, পাইপগান ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করে দেখছেন

নয়াদিল্লীতে অর্থমন্ত্রী শ্রীওয়াই, বি, চ্যবনের সঙ্গে আলাপরত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির তত্ত্বাবধায়কবৃন্দ

জাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিক্ষোভ ও পুলিশের লাঠিচালনার একটি দৃশ্য

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লীতে বিজ্ঞান ও শিল্পসম্পর্কীয় গবেষণা পরিষদের পরিচালক সমিতির বৈঠকে সভানেত্রীত্ব করেন

উত্তর কলিকাতার একটি বিদ্যালয়ের সম্মুখ থেকে পুলিশ প্রচুর তাজা বোমা উদ্ধার করে তা পরীক্ষা করে দেখছেন

মা
সি
ক
বসুমতী
ভাদ্র / '৭৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রহরারত সশস্ত্র প্রহরী

হাকরণের সামনে বিরোধী কংগ্রেসের পরিচালনায় এক কৃষক সমাবেশে ভাষণরত শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

না, না, আমি কি সে কথা লছি ?

বনবীর চুপ করে রইলো। তারপর লো, আমি জানি কোথায় তোমার গছে। তুমি নিজের হাতে বিষ শিয়ে দিতে পারবে না। এই তো ?

সে কি করে হয় ? একটু আর্ত ানালো রাণা রতন সিংহের কণ্ঠস্বর, ামি চিরকাল ওঁকে শ্রদ্ধা করে সেছি, ওঁকে ভক্তি করে এসেছি, ঁর কোলে-পিঠে চড়েছি। আমার মা াণী ধনবতীবাঈ আমাকে বেশী যেতে িতেন না তাঁর কাছে। তাই বলে কি ামি তাঁর পর ? কুমার ভোজরাজ াণা হতে পারলেন না। রাণা হ'লাম ামিই। তাই বলে কি আমি তাঁর পর ? াজ তিনি চান আমি রাণা না হয়ে মন বিক্রমজিৎ রাণা হয়। কেন ? ামি কি তাঁর এতই পর ?

সে জন্যেই তো বলছিলাম---। বলে কথা শেষ না করেই থামলো বনবীর।

রতন সিংহ বলে গেল, উনি যদি আমাকে এতই পর মনে করেন, আমি তা হ'লে তাঁর কাছে না যেতে পারি, তাঁকে নির্বাসিত করতে পারি, তাঁকে বন্দী করে রাখতে পারি, তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারি, তাঁর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আমি শুধু আমার তলোয়ারের জোরে এ রাজ্য আমার দখলে রাখতে পারি। কিন্তু বিষের পেয়ালা পাঠাবো তাঁর কাছে ? তাতে কি কোনোদিন উপভোগ করতে পারবো শক্তির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিতে যাওয়ার আনন্দ ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাও তো বটে, তাও তো বটে। মাথা নেড়ে বললো বনবীর, সত্যিই তো, তুমি নিজের হাতে কি করে পেয়ালায় বিষ মেশাবে ? তোমার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ। তোমার মায়ের মতো। তুমি তাঁর কোলে-পিঠে চড়েছো। হোলোই বা তোমার প্রতিপক্ষ। যাই হোক, তুমি ভেবো না। এ তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও।

বিষের পেয়ালা যাবে ?

হ্যাঁ যাবে।

কে পাঠাবে ?

কেন, আমি। অবশ্যি তোমারই নামে।

আমি।

আপনি ?

অবাক চোখে বনবীরের দিকে তাকালো রতন সিংহ। তারপর চোখ দুটো ফিরিয়ে নিলো। উঠে পড়লো নিজের আসন থেকে। কিছুক্ষণ পায়চারি করলো কক্ষের এদিক থেকে ওদিকে। তারপর বনবীর সিংহের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বনবীর সিংহ !

বলো। কিংবা হুকুম করো। তোমার যা ইচ্ছে। তুমি মহারাণা।

বনবীর সিংহ। পেয়ালায় বিষ আমিই মেশাবো।

বেশ।

দিন আমায় সেই বিষ।

এখন নয়।

তাহলে !

কাল সকাল। দরবারে সবার সামনে মন্দির থেকে আসবে পবিত্র বারি। তুমি সর্দারদের সামনে সে জল নিজে খানিকটা পান করবে। তারপর সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে মীরাজীর কাছে।

বিষ ?

হ্যাঁ তখন। তুমি নিজে খানিকটা পান করার পর আমি একটু ঝুঁকে পড়বো তোমার দিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তোমাকে আমি সবার নজর থেকে আড়াল করে রাখবো। ঠিক সে সময় তোমার হাতে দেবো বিষের পুরিয়া আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালায় ঢেলে দেবে।

কারো মনে কোনো সন্দেহ হবে না। বনবীর বলে গেল, বিষের পেয়ালা সোজা যাবে দরবার থেকে। একজন সর্দার যাবে সঙ্গে। কারো সন্দেহ করার কোনো অবকাশ থাকবে না যে, পথে কোথাও জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কখন কেটে গেল একটা রাত রতন সিংহ বুঝতেই পারলো না। মনে হোলো যেন বনবীরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখটা বুজেছিলো রতন সিংহ, আবার চোখটা খুলতেই সামনে বনবীর আর বেশ খানিকটা দূরে প্রশস্ত দরবারে

এদিক-ওদিক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চিতোরের পদস্থ সর্দারেরা।

পেয়ালায় ঢেলে দেওয়া হয়েছে কালীমন্দির থেকে পাঠানো পবিত্র স্নানের জল। রাণা সেটি মাথায় ঠেকিয়ে তারপর পেয়ালায় চুমুক দিলো।

ব্যস ব্যস, আর নয়। সামনে ঝুঁকে পড়লো বনবীর।

সর্দারদের দেখা যাচ্ছে না। সামনে শুধু বনবীরের অতি প্রশস্ত দেহ।

সবার অলক্ষ্যে বনবীরের হাত নেমে এলো রতন সিংহের হাতের উপর। টুক করে একটি পুরিয়া পড়লো রাণার হাতে।

মেশাও,। ফিস ফিস করে বললো বনবীর, তারপর উঁচু গলায় বললো, সবটুকু খেতে হবে না, একটু চুমুক দিয়েছো, তাই যথেষ্ট।

সর্দার বলভদ্র সিংহ! নিচু গলায় বললো রতন সিংহ।

বনবীর ফিরে তাকালো। এগিয়ে আসার উপক্রম করছিলো বলভদ্র সিংহ, বনবীরের তীব্র দৃষ্টি তার উপর পড়তে সে পেছিয়ে গেল।

বনবীর আবার ফিরে তাকালো রতন সিংহের দিকে।

রতন সিংহ পেয়ালা তুলে দিলো বনবীরের হাতে।

বনবীর ভুরুর ইশারায় প্রশ্ন করলো, হয়ে গেছে। শুধু মাথা নাড়লো রতন সিংহ।

বনবীর ধারালো চাউনিতে তাকিয়ে দেখলো। রতন সিংহের মুখের উপর একটা রুক্ষ কাঠিন্য।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে চম্পা। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে।

সর্দার বলভদ্র সিংহ এগিয়ে এলো। তার হাতে একটি সোনার থালা। থালার উপর পেয়ালা রাখলো বনবীর সিংহ। রাণা রতন সিংহ নিজের রেশমী রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলো সেই পেয়ালা।

তারপর বললো, মীরাবাঈ।

সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো বলভদ্র সিংহ। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল দরবার থেকে। তার পেছন পেছন গেল চম্পা।

সারা দরবার স্তব্ধ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই এক এক টুকরো পাথর।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

পরিষ্কার শোনা গেল পায়ের শব্দ। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে বলভদ্র সিংহ। এখন একা। চম্পা আর ফেরে নি তার সঙ্গে।

বনবীরের মুখখানি খুশিখুশি। নিজের হাতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে রাণা। এবার তো আর অলৌকিক কিছু ঘ'টবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

রাণা রতন সিংহ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। সামনে এসে দাঁড়ালো বলভদ্র সিংহ।

রাণার মুখে কোনো কথা নেই।

অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো বনবীর। প্রশ্ন করার অধিকার রাণার। কিন্তু দরবারের আদব-কায়দা তুচ্ছ করে বনবীরই জিজ্ঞেস করলো।

কি খবর বলভদ্র সিংহ!

মীরাজী খুব শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গেই পান করেছেন পেয়ালার পবিত্র জল।

তারপর?

পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ---

কি? ---প্রায় গর্জে উঠলো বনবীর।

পায়ে ঘুঙুর পরে গিরিধরজীর বিগ্রহের সামনে নাচতে নাচতে গান গাইতে লাগলেন।

গান?

বনবীরের চোখ-মুখ থেকে আগুন বেরোতে লাগলো। সারা দরবারে একটা গুঞ্জরণ উঠলো। কি গান!--- কি গান গাইছে মীরা? সবারই মনে একটা সন্দেহ ছিলো কোনো-না-কোনো-রকমভাবে বনবীর হয়তো পেয়ালার জলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। মুখে কিছু বলার সাহস কারো ছিলো না, কিন্তু মনে মনে সবাই ক্ষেপে উঠেছিলো বনবীরের উপর। মীরাজীর মৃত্যু হলে হয়তো আজ চিতোরগড়ে একটা রক্তারক্তি হবে।

কিন্তু কি বলছে বলভদ্র সিংহ। পেয়ালার জল পান করে মীরাজীর কিছু হয় নি? তা'হলে জলে বিষ ছিলো না? তাতো হতে পারে না। এমনি জল পাঠানোর লোক তো বনবীর নয়। তাহলে কি মীরা সম্বন্ধে যা শোনা যাচ্ছে সেটা সত্যি? ভক্ত সাধিকাকে বার বার রক্ষা করছেন গিরিধরজী? তা নইলে বিষের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার পর পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে নাচতে কি গান গাইতে পারেন মীরাবাঈ!

কি গান?

মীরাজী কি গান গাইছেন?

সবার মনে ওই একই প্রশ্ন। একজন একজন করে অনেকেই বেরিয়ে গেল দরবার থেকে। ভালো করে খোঁজ-খবর নিতে চলে গেল বনবীরও। তারপর আর ফিরলো না। এক লোকের মারফৎ রাণাকে খবর পাঠালো যে, আজ সে আর নিজের শয়নকক্ষ থেকে বেরোবে না।

রাণা রতন সিংহ একা। দরবারেও ছিলো অনেকক্ষণ একা। তারপর নিজের মহলে গিয়েও সারাদিন একা। একেবারে একা। আর কেউ আসে নি রাণার কাছে।

ঝরোকায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো রতন সিংহ। মনে হোলো কেউ যেন নিচে গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে। রাণা কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো।

শুধু একটি কলি কানে ভেসে এলো, ---মীরা নাচী রে!

আর কোনো কথা কানে এলো না—গানের সুর দূরে চলে গেল।

নিজের ঘরে পায়চারি করছিলো রাণা। বাইরে কে যেন গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে। রতন সিংহ আবার কান পেতে শুনলো।

পগ বাঁধ ঘুঁঘরুয়া নাচী রী—।

আবার গানের সুর দূরে সরে গেল। রাণার মনে হোলো সারা চিতোরগড়েই যেন ছড়িয়ে পড়েছে মীরার গান। তার খুব ইচ্ছে হোলো বেরিয়ে গিয়ে শোনে, কারো না-কারো

থেকে শোনে, সরাসরি হয়তো মীরার থেকেই শোনে। কিন্তু পারবো না। বন্দী, সে রাণা। তার বেরোবার ওয়ার উপায় নেই।

আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। একটা মৃদু পায়ের শব্দ ঘরে ঢুকলো।

কে?

মহারাণাজী, আমি--। চম্পা---।

চম্পা? তুমি? হঠাৎ?

আপনার সঙ্গে খুব জরুরী দরকার রাণাজী।

রতন সিংহ চুপ করে রইলো কতুক্ষণ। তারপর বললো, ---এসো। এখানে এসো। এখানে ঝরোকার পাশে এসে দাঁড়াও। দেখছো, কি অন্ধকার আকাশ? শোনো চম্পা, অন্য কথা পরে হবে আগে গানটি আমায় শোনাও। সারাদিন আমার মন ছটফট করছে। কিন্তু সবাই শুনেছে ওই গান, শুধু আমি শুনতে পারি নি। তুমি আমায় শোনাবে?

চম্পা বুঝলো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বাইরের আকাশের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে গান ধরলো---

মীরা নাচী রী,

পগ ঘুঁঘরু বাঁধ মীরা নাচী রী।

---পায়ে ঘুঙুর বেঁধে মীরা আজ নাচে রে।

ম্যাঁ তো ম্যারা নারাণ কী আপহি হো গয়ী দাসী রী।

আমি তো নিজের থেকেই দাসী হয়ে গেছি আমার নারায়ণের।

লোগ কহে মীরা ভঈ বাবরী

---লোকে বলছে পাগল হয়ে গেছে মীরা, সাসু কহে কুলনাশী রী

---শাশুড়ী বলছে ওরে সে যে কুলনাশিনী, বিষরো পিয়ালো রাণা ভেজিয়ো

---রাণা পাঠিয়েছে বিষের পেয়ালা

পীবত মীরা হাঁসী রী

---মীরা পান করলো হেসে হেসে---

রাণা রতন সিংহের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো আর সুরে উঁচু পর্দায় চড়ে গেল চম্পার গলা ---

মীরাঁ কে প্রভু গিরিধর নাগর

থারী শরণাঁ আসিয়াঁ রী।

রাণা রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছলো। তারপর বললো, চম্পা, কেউ কোনোদিন জানবে না, আমি পেয়ালার ভেতর বিষ মিশাই নি।

চম্পা কোনো উত্তর দিলো না।

আমার একটা অনুরোধ চম্পা, মীরাজীকে কোনোদিন একথা জানতে দিয়ো না। বনবীর আমায় হাতে বিষ দিয়েছিলো, কিন্তু ও যেই মুখ ফিরিয়ে বলভ্র সিংহের দিকে তাকালো, আমি অমনি নিজের জামার ভাঁজের মধ্যে ফেলে দিলাম সেই বিষ।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর চম্পা বললো, মীরাজী আমায় পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। একটা কথা খুব গোপনে আপনাকে জানাবো। চলো।

আপনার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

আমি জানি। বনবীর আছে তার মধ্যে।

কিন্তু যে-কথা আপনি জানেন না, এর মধ্যে আছে বুঁদীর রাও সুরজমলও।

এবং সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই রাণী কারবেতবল্লাই। হাসতে হাসতে বললো রতন সিংহ, এর মধ্যে মীরাজী নেই কেন?

সে অনেক কথা। আপাতত এটুকু বলতে পারি, বনবীরের হাতে কোনো রকম ক্ষমতা আসুক, এটা মীরাজী চান না, কারণ তাতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো উপকার হবে না। বরং ক্ষতি হবে। কে রাণা, তাতে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই, দেশের জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে থাকলেই তিনি খুশী।

হ্যাঁ, এখন আমি বুঝতে পারছি একটু একটু। রতন সিংহ বললো, এবার আহেরিয়ার উৎসবে আমি যাচ্ছি বুঁদী। রাও সুরজমলের আমন্ত্রণ। যেতে তো হবেই। সাবধানেই থাকবো। ফিরে আসি। তারপর একবার দেখে নেবো বনবীরকে।

রতন সিংহ চলে গেল বুঁদী। খবর শুনে মীরা বিষণ্ণ হয়ে রইলো। চম্পা চামেলীকে বললো, না গেলেই পারতো। আমি সব খবর বহুত দেরিতে পেলাম। যাই হোক, ও ফিরে আসার পর একবার চেষ্টা করে দেখবো বনবীরের হাত থেকে ওকে রক্ষা করতে পারি কি না।

কিন্তু রতন সিংহ আর ফিরে এলো না।

আহেরিয়ার উৎসবে শিকারের সময় রাও সুরজমল হঠাৎ ছোরা বসিয়ে দিলো রতন সিংহের বুকে। রতন সিংহও সঙ্গে সঙ্গে সুরজমলের পেটে বসিয়ে দিলো নিজের ছোরা।

দু'জনেই মারা গেল। --বৈশাখ, পনেরো শ' একত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ।

[ক্রমশঃ।

॥ ভেবে দেখা দরকার ॥

নিখিলানন্দ সেনগুপ্ত

সত্যি কথা বলতে কি, শুভ পরিণয়ের আমন্ত্রণপত্র দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারে আনন্দের পরিবর্তে বহন করে আনে আসন্ন বিপদের এক অশুভ বার্তা। যদিও অবশ্য নিমন্ত্রণলিপিতে উল্লিখিত থাকে, "লৌকিকতার পরিবর্তে আন্তরিক আশীর্বাদ প্রার্থনীয়", তথাপি সংসারাভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত যে, উক্ত আবেদনের ভেতরে আন্তরিকতার লেশমাত্র স্পর্শও নেই। উপঢৌকন ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি ধান-দূর্বো দিয়ে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে উদ্যত হন, তাহলে উৎসবগৃহের নর-নারীর চোখের কোণে, ঠোঁটের ডগায় যে ভাষা ঝিলিক মেরে ওঠে, তাকে কোনক্রমেই সম্মানজনক আখ্যা দেওয়া চলে না।

সেহেতু দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান ভদ্রলোক সাধারণত তাঁর চেয়ে অবস্থাপন্ন গৃহের বিবাহসভায় যোগদানে বিরত থাকেন। কিন্তু, সর্বদা এরূপ এড়িয়ে যাবার কৌশল সফল হয় না। আর, তখনই সৃষ্টি হয় নানারূপ জটিল সমস্যার।--সংসারের শীর্ণ বাজেটকে শীর্ণতর করে, গিন্নীর মাথায় অধিকতর দুর্ভাবনার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, অথবা, হাতের আংটি বাঁধা দিয়ে তিনি সামাজিকতা বজায় রাখতে তৎপর হন।

কিন্তু হায়! তাতেও নিস্তার মেলে না। বিবাহ-বাসরের কিংবা প্রীতি-ভোজের আসরের মহার্ঘ দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে তাঁর অকিঞ্চিৎকর উপহারটুকু মুখব্যাদান করে যেন তাঁকেই ব্যঙ্গ করতে থাকে। উৎসবভবনের সমস্ত আলো এক নিমেষে ম্লান হয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে। প্রাণের সহজ আবেগ ও আনন্দের উৎসমুখে হীনমন্যতার পাষাণচাপা পড়ে অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির ভেতরে নিঃসঙ্গভাবে কাল যাপন করতে বাধ্য হন তিনি। তারপর, সুযোগ বুঝে কোনক্রমে দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া সম্পন্ন করে চোরের মতো সে স্থান ত্যাগ করেন।

এই কি উৎসবের সার্থকতা? আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষে বিশ্বকবি গেয়েছিলেন, "মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব।" যে বিবাহ দুটি নর-নারীর মিলনের উৎসব, ভালোবাসার উৎসব, সে উৎসবে কাঞ্চন-কৌলীন্যের যাঁতাকলে পড়ে কারও প্রাণ যদি কাঁদতে থাকে নীরবে, তবে শুভপরিণয়ের 'শুভত্বটুকু' কতখানি বজায় থাকে, তা পাঠক-পাঠিকারাই বিচার করবেন।

আমাদের সমাজের এ ধরনের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে চিন্তাশীল মনীষীদের অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। বিবাহে উপহার-দানের রেওয়াজ যদি একান্তই রক্ষা করতে হয়, তবে তা সংগোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাধা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেমন ধরুন, একটি "প্রেজেন্টেশন কাউণ্টার" খোলা হলো বিয়ে বাড়ীর এক নিরালা কোণে। সেখানে কার আগমন হলো, তিনি কি উপহার প্রদান করলেন, তা পরখ করবার জন্যে কোন গোয়েন্দা উপস্থিত থাকবে না। অতিথি-অভ্যাগতরা যার খুশী, যেমন খুশী ভেট নিয়ে, মাথা হেঁট না করেই, সেখানে জমা রেখে যাবেন।

অবশ্য, কাউণ্টারটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখা সঙ্গত নয়। চোর-জুয়াচোর নিকটেই আছে। সেইহেতু দুই বৃদ্ধ অথবা প্রৌঢ়কে কিছুদূর ব্যবধানে দরজার মুখে রক্ষী দুটি চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া যাক। আমার বিশ্বাস, তাঁরা সানন্দেই এরূপ নির্ঝঞ্ঝাট দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হবেন। এবং, বিয়েবাড়ীর দামী সিগারেট টানতে টানতেই হয়তো এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবেন। কিন্তু, তাতে কারোর কোন ক্ষতি নেই। মানুষের মর্যাদা রক্ষিত হবে। শুভবিবাহের উৎসব নর-নারীর প্রাণের সহজ আনন্দে, উচ্ছ্বাসে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

এ প্রসঙ্গে নিমন্ত্রণকর্তার পক্ষ থেকেও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথমত, বিবাহ উপলক্ষে বিশিষ্ট আমন্ত্রিতবর্গ উপঢৌকন হিসেবে যে সকল দ্রব্য তুলে দেন পাত্র-পাত্রীর হাতে, বহু ক্ষেত্রে সেগুলি অত্যন্ত খেলো ধরণের হয়। যেমন, রেশমী পাটের শাড়ী।--ঝলমলে-নয়নাভিরাম। পরিধান করলে নববধূকে পাটরাণীর মতো দেখায়ও বটে। কিন্তু, তা ফাটতে থাকে দ্বিরাগমনের পূর্বেই। (এরূপ দ্রব্য প্রদানের হেতু অত্যন্ত স্পষ্ট।--স্থুলভে সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার হাস্যকর প্রয়াস।)

দ্বিতীয়ত, অনেক সময়ে একই ধরনের উপহারদ্রব্যে ঘর ভরে যায়। হয়তো, যে বাড়ীতে কোনদিনই টেবিল ল্যাম্প জ্বলবে না, সেখানে তিন-তিনটে 'বাতি' জড়ো হয়। যে সংসারে বারো মাসে বারো দিনও সরবৎ খাবার কল্পনা কারোর মস্তিষ্কে উদিত হয় না, সে সংসারে চার-চারটি সরবৎ সেট সংকীর্ণ বাসস্থানকে সংকীর্ণতর করে তোলে।

তাই বলছি, জিনিষপত্রের বদলে বিবাহ উপলক্ষে যদি নগদ অর্থ প্রদানের রেওয়াজ চালু করা যায় গোপন পদ্ধতিতে, অর্থাৎ, দাতার পরিচয় অজ্ঞাত রেখে, তাহলে সেই টাকায় [illegible] নিজেদের পছন্দ মাফিক, প্রয়োজন মাফিক জিনিস কিনতে পারে, কিংবা বিয়ের ধার-দেনা পরিশোধে কিছুটা সক্ষম হয়।

প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র

(জনৈক বিপ্লবীর জীবনকাহিনী)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গ্রামের পূর্ব প্রান্তের ছাড়া-বাড়ীর জায়গা ও সংলগ্ন জমি লইয়া বিরোধ লাগিয়াই ছিল। তাহা হইলেও ওখানকার উৎপন্ন ফসল ও শাক-সবজি কুমারদের বাড়ীতেই আসিত। কিন্তু গোবিন্দের অধিক সময় মফস্বলে থাকার পর হইতেই ফল-মূল কোথা দিয়া যে কোথায় চলিয়া যাইত তাহার কোন পাত্তাই পাওয়া যাইত না। গতবার নায়েব গোমস্তার সঙ্গে ইহা লইয়া তাহার বেশ কথা কাটাকাটি হইয়া গিয়াছিল। যদিও জমিদারের সঙ্গে এ বিষয়ে তাহার সামনাসামনি কোন কথাবার্তা হয় নাই, তাহা হইলেও জল অধিকদূর গড়াইয়া গিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাইদের কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য ছিল বলিয়াই তাহারা এই বিষয়ে বিশেষ মাথা গলাইত না। কিন্তু রামকুমার গৃহিণী বর্তমান থাকিতে অতটা ছাড়িয়া দেওয়া সহজ নয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল এই যে, পশ্চিম-বাড়ীর জ্ঞাতিভাই গগন দেব ক্রমাগত বিরোধিতা করিয়া চলিয়াছিলেন। এক-দিকে তিনি জমিদারের লোক, অন্যদিকে ঐ সম্পত্তিটার তাঁহার লোলুপতা। এই উভয়বিধ কারণেই তিনি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর পূর্বে গোবিন্দ বাড়ী আসিল। একদিন সকালে ছেলের হাত ধরিয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার মানসে পশ্চিমমুখী হইল। গৃহের সীমা অতিক্রম করিয়া সবে গগন দেবের বাড়ীর সংলগ্ন রাস্তায় উপস্থিত হইতেই দেবমহাশয় তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। কেন না তাঁহার জমির উপর দিয়াই ঐ রাস্তা পড়িয়াছে। জ্ঞাতিভাইয়ের নিষেধ গোবিন্দ হাসিচ্ছলে উড়াইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু যে বিষয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাহা অত সহজে চাপা পড়ে না। গোবিন্দ পা উঠাইতেই তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার পথ আগলাইলেন। বিনা কারণে গায়ে পড়িয়া ঝগড়ার ব্যাপারকে সে পাশ কাটাইয়া এড়াইবার চেষ্টা করিল আর যায়

দণ্ডপাণি

কোথা, গগন দেব মশাই অবিলম্বে পায়ের খড়ম (কাঠের পাদুকা) উঠাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ ছেলের হাত ছাড়িয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া নিজের পথ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেই খানিকক্ষণের জন্য লোকজন জড় হইবার অবসরে একটা ছোট খাট ধস্তা-ধস্তি হইয়া গেল। তারপর যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইতে লাগিল। কথা কাটাকাটি, গালিগালাজ, প্রতিবেশীর বাধাদান সত্ত্বেও পরস্পর রোখারুখি ও অগ্রবর্তী হওয়া—কোন কিছুই বাকী রহিল না। ঘটনার শেষ যে এইখানেই নয় তাহা সহজেই অনুমান করা গিয়াছিল। বেতার-বার্তার ন্যায় এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কারণে অকারণে ভিন্ন গ্রামের লোকেরাও উহাদের পাড়ার পথে আনাগোনা করিতে লাগিল এবং শুনা কথার সত্যতা যাচাই করিতে দেখা গেল।

সন্ধ্যার পর জমিদার বাড়ীর পেয়াদা আসিয়া গোবিন্দকে সকালে উপস্থিত হইতে সমন দিল। বিচারের রায় হইল সেইদিন হইতেই তাহাদের বাড়ীতে গ্রামের নাপিত, ধোপা ও পুরোহিত বন্ধ এবং অবিলম্বে তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সাক্ষী-প্রমাণের কথা উঠাইয়া সে জানিতে পারিল আগের দিনই সেইসব শুনানী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সওয়ালের আর কোন অবকাশ নাই। ইহাতে গোবিন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িত, যদি না পূর্ব হইতেই তাহার মন তৈরী থাকিত। সপরিবারে দেশ-ত্যাগের কথা সে অনেক আগে হইতেই চিন্তা করিতেছিল। কেন না কচি ছেলেটা গ্রাম্য বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পাঠ সমাপ্তির পর আড়াই মাইল দূরে একটি মধ্য ইংরাজী স্কুলে মাত্র সেই বৎসরই ভর্তি হইয়াছে। প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ যাওয়া-আসায় বালকের প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উপায়ও ছিল না। এবার সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। একটা সিদ্ধান্ত তাহাকে লইতেই হইবে। পরের দিন শ্রীপঞ্চমী। সারা বাড়ীতে একটি মাত্র কিশোর সন্তান। সকলেরই আদুরে। অতি ভোরে গোবিন্দ শয্যা

পরিত্যাগ করিয়া ছেলেকে লইয়া স্নান সারিয়া আসিল। বাড়ীর সকলকেই অঞ্জলির জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। অঞ্জলি দেওয়ার ব্যাপারে বয়স্কদের তেমন তাগিদ নাই। ছেলেটাকে নিয়াই ছিল যত বিপদ। তাহা হইলেও প্রতি-বেশীর যে কোন এক বাড়ীতেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। বিদ্যালয় দূরে বলিয়া,---নতুবা কোন কথাই ছিল না। এ ব্যাপারে মা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে কি কথা হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই, তবে মা ও ছেলে উভয়েই খুব যত্নসহকারে পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। মা ইতিপূর্বে পাঁজি দেখাইয়া লইয়াছিলেন। সময়মত বাটীস্থ সকলকে ডাকিয়া গোবিন্দ পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অঞ্জলির মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল এবং এইভাবে নিজের পূজা নিজেই সম্পন্ন করিয়া সবাইকে অঞ্জলি দেওয়াইল। সব কিছুই হইল, তবু যেন কিসের একটা অভাব রহিয়া গেল। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের মনোভাব সবাইকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। আহারান্তে সামান্য বিশ্রা-মের পর মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, স্ত্রী ও ভাইদের নিকট বিদায় লইয়া ভাটা বেলায় সে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। প্রায় তিন ক্রোশ পায়ে হাঁটিয়া সন্ধ্যায় মুরাদনগরে নারায়ণগঞ্জের গহনার নৌকা ধরিল। পরের দিন ঢাকা পৌঁছাইয়া একটা ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। খারাপ সময়ের মধ্যেও সামান্য একটু ভাল সময়ের প্রাথর্যে শীঘ্রই তাহার একটা কারবারের সুযোগ ঘটিল। সে একটি মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার 'ইংলিস ম্যান' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের একটি সাব-এজেন্সিও জুটিয়া গেল। ভগবানের আশীর্বাদ-স্বরূপ তাহা মাথায় লইয়া সে অল্প-দিনের মধ্যেই তাহার কারবার জমাইয়া লইতে সক্ষম হইল। ইংরাজী বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেকে তাহার নিকট লইয়া আসিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলের সন্নিকটেই কায়েৎটুলী নামক ভদ্রপল্লী অবস্থিত। তাহারই এক প্রান্তে ঢাকা রেল ষ্টেশনের সমীপবর্তী স্থানে গোবি-ন্দের ক্ষুদ্র দোকান। যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া তাহাকে চলিতে হইত। ছেলেকে লইয়াও তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না। তাহার পড়াশুনা ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া কোন কূল-কিনারা করিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীভবানীচরণ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে গোবিন্দের যথেষ্ট হৃদ্যতা ঘটিয়াছিল। তাঁহারই নির্দেশে গোবিন্দ তাহার ছেলেকে ঢাকা হল সোস্যাল্ সার্ভিস্ লীগ্ পরিচালিত অবৈতনিক নৈশ-বিদ্যালয়ে অবিলম্বে ভর্তি করিয়া দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন মিঃ ল্যাংলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনটি আবাসস্থলের অন্তর্গত ঐরূপ তিনটি নৈশ বিদ্যালয় অধিষ্ঠিত ছিল। শ্রীমতী ল্যাংলি ঐ বিদ্যালয়গুলি দেখাশুনা করিতেন। উপাচার্য হওয়ার পূর্বে মিঃ ল্যাংলি ঢাকা হল নামক ছাত্রাবাসের প্রভোষ্ট বা পরিদর্শক ছিলেন বলিয়া ইহার অন্তর্গত নৈশ বিদ্যালয়টির প্রতি শ্রীমতী। বহুদিনের সম্পর্কহেতু অনুকম্পা ও সাহায্য ছিল অত্যধিক। ছেলেটার লেখাপড়ার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া নৈশ বিদ্যালয়ের পরি-চালক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও প্রখ্যাত বিপ্লবী সর্বশ্রী অবনী ঘোষ, শৈলেশ রায় ও জ্যোতিষ জোয়ারদারের পরামর্শে তাহাকে ঢাকার পশ্চিমপ্রান্তে বক্সীবাজারে অবস্থিত নবকুমার ইনষ্টি-টিউশন নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন শ্রীমতী ল্যাংলি নিজেই। ছেলেটির একটা হিল্লা হইল এবং গোবিন্দও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। ইহা ইংরাজী ১৯২৪ সালের কথা।

ইংরেজের সান্নিধ্য লাভ করিয়া বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যেমন শিক্ষা-দীক্ষায় আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরেজীভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি ভবিষ্যৎ বংশধরদের পিতৃপ্রদত্ত নামকরণও সংক্ষিপ্ত ও ইংরেজী অনুকৃত হইয়া উঠিতেছিল। ততদিনে শশাঙ্ক 'কসেট' হইয়া গিয়াছে, যতীন্দ্রচন্দ্র 'জ্যাকী'। লক্ষ্মী 'লাকী' হইয়াছে, সুভাষিণী 'টিকী'। এমনি আরও কত কিছু। স্বভাবতঃই এই জীবন-কাহিনীর জীবনধারা পরিচিত মহলে ধীরেন্দ্র চন্দ্র'র স্থলে 'ধীরেন' নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। সে ইতিমধ্যে সোস্যাল সার্ভিস লীগ্ কর্তৃক আয়োজিত ও অনুষ্ঠিত নানা প্রকারের খেলাধূলা ও বিভিন্ন সেবামূলক কার্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে জনপ্রিয়তা ও স্নেহাধিকার অর্জন করিয়াছিল। সেই বৎসর ১৯২৫ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্র-নাথ সেইবারই প্রথম ঢাকায় আগমন করেন। কবির উপস্থিতি ঢাকাবাসীকে সেদিন কতই না গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। নির্দিষ্ট দিনে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অন্তর্গত কার্জন হলে অভিনন্দনের আয়োজন করা হয়। সেই উপলক্ষে কবিকে দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত নৈশ বিদ্যালয়গুলির যোগ্য প্রতিযোগী ও বিশিষ্ট ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে সভার প্রারম্ভে কবিকে কেন যেন বিমর্ষ দেখাইতেছিল। শুনা গিয়াছিল যে, কবির এই আগমন উপলক্ষে সম্বর্ধনা বিষয়ে কয়েকটি নাগরিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশেষ অপ্রীতিকর বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। যা যাহাই হউক, একের পর এক সম্পাদক কর্তৃক নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর বালকেরা কবির হস্ত হইতে নানা প্রকারের পুরস্কার গ্রহণ করিল। শেষ পুরস্কারের পূর্বে সম্পাদকের উক্তি সভাকক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের করতালি ও উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পুরস্কারটি ছিল "Capacity for Organisation" অর্থাৎ সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য। কবিও খুশী হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে ভরিয়া উঠিল—একটি ছোট্ট বছরের ছেলের সাংগঠনিক দক্ষতা বিষয়ে

প্রস্তব্যে। বীরেনের নাম করিতেই কম্পিত পদে সে মঞ্চে উপস্থিত হইয়া কবির হস্ত হইতে পুরস্কারস্বরূপ সামান্য একটি দোয়াত গ্রহণ করিয়া কেমন যেন আনমনা হইয়া গেল। স্নেহভরে কবি তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া যথাস্থানে যাইবার নির্দেশ দিলে সে দুই হাত একত্র করিয়া কবির আশীর্বাদ কপালে ছোঁয়াইয়া যথাস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইল। কবির সেই স্পর্শের মোহে তাহার হৃদয় কিরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিব না। তবে দেশ বিভাগের পর দেশত্যাগী হইবার দিন অবধি ঐ মহামূল্য সম্পদ তাহার নিকট সঞ্চিত ছিল। তাহার পর সে অনেক কিছু হারাইয়াছে বটে, কিন্তু সেইদিন যাহা লাভ করিয়াছিল—কবির সেই আপ্তবাণী "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন"---একমাত্র তাহার সাহায্যেই সে আট বৎসর পরে তাহার বৈপ্লবিক জীবনে পুলিশের অকথ্য দৈহিক অত্যাচার ও উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিয়া 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গাহিয়া যাইতে উৎসাহিত হইয়াছিল। হয়ত অলক্ষ্যে কবির আশীর্বাদেই ইংরেজের বিচারে সে সেইদিন নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু কেন, তাহা ভবিষ্যতের কোন উদ্দেশ্যে, তাহা মানুষের পক্ষে বলা সাধ্য নয়। ভগবান কাহাকে দিয়া কখন কি কাজ করাইয়া লন, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

ঢাকায় রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে বীরেনের সংশ্লিষ্ট হওয়ার কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তাহার জীবন একান্ত ঘটনাবহুল। ত্রিশের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে সে গ্রেপ্তার হয়। মার্চ মাসেই তাহার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। একমাসও তখন হাতে নাই। এই অবস্থায় বিচারের অপেক্ষায় সে ঢাকার জেল হাজতে আবদ্ধ রহিয়াছে। "শ্রীসংঘের" প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর অনিল রায় তাহার জামিনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া পরীক্ষা দেওয়ার অজুহাতে মুচলেকা দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। পরীক্ষার তখন মাত্র দিন দুই বাকী। ঐ অবস্থায় পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার মত মনোবল অনেকেরই থাকে না। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনরা পরীক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেও সে কিন্তু আশা ছাড়ে নাই। পরীক্ষায় ভালভাবেই সে উত্তীর্ণ হইল। ইতিমধ্যে পুলিশ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে সক্ষম না হওয়ায়, তাহারা মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু তাহা হইলেও প্রতি সপ্তাহে তাহাকে থানায় গিয়া হাজিরা দিতে হইত। ঢাকায় তখন সি, আই, ডি'র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রাসবি। গ্রাসবি সাহেব তাহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে আরম্ভ করিল। ভবিষ্যতে তাহার উন্নতির আশ্বাস দিতেও কার্পণ্য করে নাই। ইংরাজের এইসব কৌশলের কথা তাহার অজানা ছিল না। গ্রাসবি সাহেবকে নিরাশ করিয়া সে নিজেই 'ঢাকা প্রকাশ' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রেসে ছাপাখানার কাজ শিখিতে আরম্ভ করিল। পুলিশ কিছুদিন তাহার পিছু থাকিলেও নিয়োজিত কর্মের প্রতি তাহার আসক্তি দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার ও পরবর্তী সময়ে কয়েকটি ভয়াবহ ঘটনার পর দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছিলেন। কেহ কেহ অবশ্য গা ঢাকা দিয়া রহিলেন। বীরেন প্রেসের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া অতি সংগোপনে দলের গভীরে প্রবেশ করিয়া নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহার গতানুগতিক জীবন লক্ষ্য করিয়া পুলিশ তাহার সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ দেখায় নাই। ব্যাপক গ্রেপ্তারের ফলে দলের কর্মিসংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। পুনরায় তাঁহাদের দ্বিধাবিভক্ত দল ও স্বতন্ত্র কর্মীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার জন্য তাঁহারা চিন্তা-পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। তখন দলের নেতা অনিল রায়, ভবেশ নন্দী ও আরও অনেকে আলিপুরনুমার জেলে। ভবেশ নন্দী মহাশয়কে তাঁহার দাদার নামে নিম্নলিখিত তার পাঠান হইল। "Wire decision sinking family defferences" সময় মত উত্তর না পাওয়াতে পারিবারিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। ভবেশচন্দ্রের দাদা দ্বিজেশচন্দ্র ও বীরেন সাক্ষাৎ করিয়া নেতাদের মনোভাব জানিয়া আসার পর অনিল দাসের নেতৃত্বে নূতন উদ্যমে বৈপ্লবিক কার্যের আয়োজন চলিতে লাগিল। দলের প্রায় দুই ডজন পলাতক কর্মী তখনও ঢাকা - কলিকাতা - মেদিনীপুরে ছড়াইয়া রহিয়াছে। অর্থাভাবে তাহাদের পলাতক জীবন তখন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য স্থির হইল যে অবিলম্বে ডাকাতি বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে। অচিরেই একটি সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কয়েকজন কর্মী ভয়ানক তৎপর হইয়া উঠিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইল। প্রচুর অর্থও পাওয়া গেল। এই ঘটনায় বীরেনের অংশ গ্রহণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঘটনার দিন রাত্রিবেলায় বীরেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ঢাকা যাদুঘরের অধ্যক্ষ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু পল্লীর অন্যান্য অনেকের গৃহে তল্লাসী ও গ্রেপ্তার হইলেও বীরেনের গৃহে কোনরূপ অনুসন্ধান হয় নাই বলিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে পরের দিন হইতে বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিল। কোন এক সূত্রে বীরেনের নাম পাইয়া পুলিশ তাহাকে গৃহ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। তারপর তাহার উপর চলে একটানা অকথ্য দৈহিক অত্যাচার, যাহার ফলে তাহার 'মৃত্যুকালীন জবানবন্দী' পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল।

বীরেনের পিতামহ ও পিতৃদেব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জমিদারী প্রথা ও জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। পরিণামে তাঁহাদের অর্থ-সম্পত্তি, বিত্ত - বৈভব, এমন কি

স্বজনদেরও পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেবের সংগ্রামী মন পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের সাথী হইবার অপরাধে গৃহত্যাগী হইলেও শহরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজ বণিকদের পুষ্ট রেল কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারীদের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তৎকালীন বিপ্লবী দলের পুরোধা অনুশীলন সমিতি ঢাকাতে পূর্ববঙ্গের ঘাঁটি আগলাইয়া সংগঠন প্রসারিত করিতেছিল। পূর্ববঙ্গে সেই সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন মজুমদার, শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়দের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি প্রকাশ্য শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ঢাকা ওয়ার্কসপের শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা সাজাইতে না পারায় তিনি মুক্তি পান। ১৯২৪ সালে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে আসেন। ঢাকা ও ত্রিপুরার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার নাম আজও অবিস্মরণীয়। তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার কথা আজও অনেকের মুখে শুনা যায়। সে সময়ে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন মাঝারী রকমের ডাক ও তার ঘরগুলির সংলগ্ন ষ্টেশনারী ষ্টলের লীজ্ বা ইজারা দেওয়া হইত। যেহেতু তাঁহার মনোহারী দোকানটি ঢাকা রমনা পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে ছিল, সেই হেতু, তিনি ডাক বিভাগের সঙ্গে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত করেন। ঢাকার অবস্থিত ইংরাজদের যাবতীয় ডাক ও তার সম্পর্কীয় কাজ ঐ ডাকঘর হইতেই সম্পন্ন হইত। সেইজনাই তাহাদের আনাগোনও সেখানে অবারিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে সেখান হইতে তাঁহাকে অপসারণের কম চেষ্টা হয় নাই। জবরদস্তিমূলক দখলের এক অভিযোগে তাঁহাকে আটক রাখা হয় এবং পুলিশ মামলা চালায়। জামিনের আবেদন তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। সহকর্মী আইন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ লাভের পর তিনি তাঁহার জবানবন্দী স্থির করিয়া লন। মামলা উঠিলে তিনি আদালতকে বলেন 'মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরই যখন আমরা ইংরাজের অধিকৃত অঞ্চলে জীবনধারণ করি, তখন বলপূর্বক কোন স্থান দখল করা নিশ্চয়ই অবান্তর। জীবিকা নির্বাহের জন্য সরকারী ভূমি সংস্কার নীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া পরিত্যক্ত ভূমিকে ফলপ্রসূ করিয়া তোলায় দেশের উন্নয়নের সহায়তাই হইয়া থাকে। যদি তাহা অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি দোষী। সেজন্য যে-কোন দণ্ড নিতে আমি প্রস্তুত।" বিচারে তিনি মুক্তি পাইলেম বটে, কিন্তু পুলিশের রোষ ও শ্যেনদৃষ্টি তাঁহার উপর অনির্বাণ রহিল। আজ ভাবি রাজনৈতিক কারণে দেশ বিভাগের পর অসংখ্য উদ্বাস্তু প: বঙ্গে আসিয়া বহু পরিত্যক্ত জমি জবরদখল করিয়া ফলদায়ক করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের জবরদখল আজ স্বীকৃত। তাহারা 'অর্পণপত্র' লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সরকারী সাহায্যে তাহারা বাড়ীঘরও নির্মাণ করিয়া লইয়াছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত 'মুকুবপত্র' লাভ করিয়া দেনার দায় হইতেও মুক্তিলাভ করিতে সময় লাগে নাই। তাই ভাবি সেই একদিন, আর এই একদিন। তবে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন।

ঢাকার বিপ্লবী দলের তৎপরতায় স্থানীয় পুলিশ বড়ই অসহায় বোধ করিতেছিল। একের পর এক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড এমন সুষ্ঠু ও সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল যে পুলিশ তার কোন খেই বা সন্ধান পায় নাই। ফলে একটা পরাজয়ের মনোভাব লইয়া তাহারা পরিস্থিতিকে নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সংগঠিত ঘটনার বিন্যাস ও ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি আচরণ এমন পর্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, পুলিশের হিংস্র মনোভাবেরই নগ্নত্ম প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঢাকার জেলাশাসক মিঃ ডুর্নোর উপর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারের উপর যে অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, ঢাকাবাসী আজও তাহা ভুলিতে পারে নাই। শ্রীসংঘের বিশিষ্ট কর্মী শরৎ ও দক্ষিণা দাস ভ্রাতৃদ্বয়ের বাড়ীতে মেয়েদের উপর পুলিশী হামলা নগরবাসীদের ভয়ানকভাবে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ৺অনিল দাসের গৃহে শুধু উৎপীড়নই নয় বহু মূল্যবান অলংকার ও আসবাবপত্র পর্যন্ত অপহরণ করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখিত ছিল। অনুশীলনের শ্রদ্ধেয় নেতা ৺কেদারেশ্বর সেন মহাশয়ের গৃহেও অনুরূপ আচরণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কায়েৎটুলী ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মী দেবেন ভৌমিকের (বুকু) বাড়ীতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা-মাতাও দৈহিক উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পান নাই। এইসব অত্যাচার ও দস্যুবৃত্তির কাহিনী বিপ্লবীদের ডায়্যারি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। এইজন্যই ঢাকা দলের মতানৈক্য দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনিল দাসের নেতৃত্বে যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের তালিকা গৃহীত হয়, তাহার প্রথম পঙ্ক্তিতেই ছিল যে, ঢাকায় অবস্থিত পুলিশের ইন্‌টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চের চারজন সাব-ইন্‌সপেক্টরের দেহ হইতে একই রাত্রে তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া বুড়ীগঙ্গার তীরে একান্ত জনবহুল ব্যাক্‌লেণ্ড ব্যাণ্ডের (সদরঘাট) উদ্যানে কাষ্ঠদণ্ডে ঝুলাইয়া দিতে হইবে। এই উপলক্ষে অচিরেই উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের গতিবিধি, রাত্রিকালে কোন্ কুখ্যাত অঞ্চলে তাহাদের নৈশ-বিনোদন উপলক্ষে আনাগোনা, গৃহে প্রত্যাবর্তন, সবকিছু সংবাদেরই চুলচেরা বিবরণী সংগৃহীত হইল। এইজন্য একটি দিনও নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে দলের কাজকর্ম ভয়ানকভাবে ব্যাহত হইতেছিল বলিয়া কলিকাতা কেন্দ্রের নির্দেশে উক্ত প্ল্যান সাময়িক

'সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—

কি পড়াশুনোয়,
কি খেলাধুলোয়!'

কিছুদিন আগেও ওর কিছুই যেন ভাল লাগত না। সব সময় কেমন মনমরা, আর খিটখিটে। ইস্কুলের পড়াশুনো বা খেলাধুলো কিছুতেই গা নেই। অগত্যা বাড়ীর ডাক্তারকে দেখালাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, "ভাববেন না, আপনার মেয়ের কোন অসুখ হয় নি। শুধু এই বাড়ন্ত বয়সে ওর কিছুটা বাড়তি পুষ্টি চাই। ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দিন।"

হরলিক্স খেয়ে মেয়ের আশ্চর্য উন্নতি হ'ল। ওর ফুর্তি আর উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে। ইস্কুলের রিপোর্টও এখন খুব ভালো।
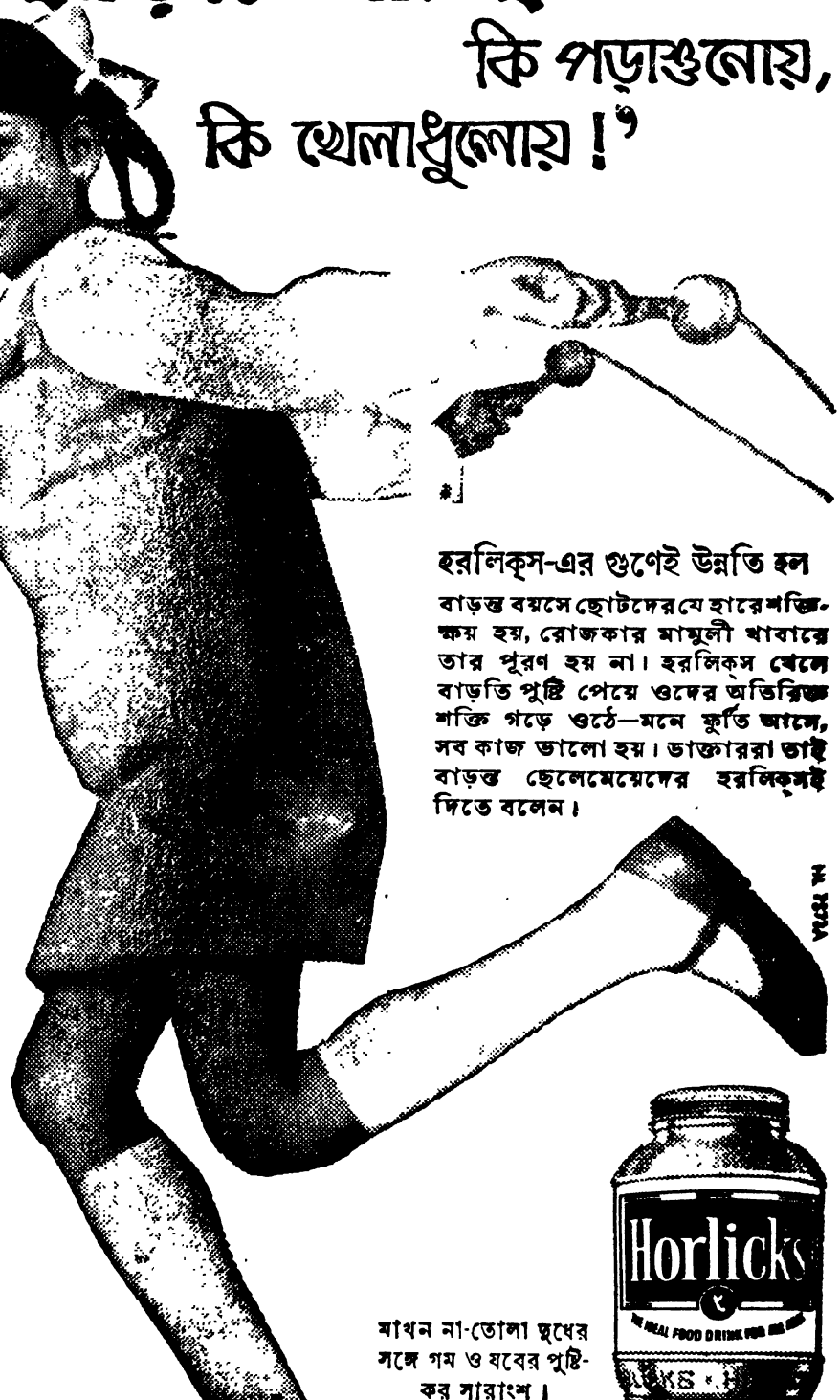
হরলিক্স-এর গুণেই উন্নতি হল

বাড়ন্ত বয়সে ছোটদের যে হারে শক্তি-ক্ষয় হয়, রোজকার মামুলী খাবারে তার পূরণ হয় না। হরলিক্স খেলে বাড়তি পুষ্টি পেয়ে ওদের অতিরিক্ত শক্তি গড়ে ওঠে—মনে ফুর্তি আসে, সব কাজ ভালো হয়। ডাক্তাররা তাই বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের হরলিক্সই দিতে বলেন।

Horlicks

মাখন না-তোলা দুধের সঙ্গে গম ও যবের পুষ্টি-কর সারাংশ।

হরলিক্স বাড়তি শক্তি যোগায়!

ভাবে পরিত্যাগ করা হয় এবং অর্থ সংগ্রহের দিকে সক্রিয়ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইল। ফলে উল্লেখিত 'ট্রেন ডাকাতি'ই প্রায়রিটি বা পূর্ববর্তিতা লাভ করে। ইহার ফলে বীরেনের গ্রেপ্তার, তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার, তাহার পিতা-মাতার উপর অশেষ লাঞ্ছনা, পরিশেষে তাহাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ ক্ষুদ্র দোকানের উপর হামলা ও সমুদয় জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা কোন কিছুই ইংরেজের পদলেহনকারী গোষ্ঠী কর্তৃক অবলম্বিত হইতে বাকী রহিল না। ইংরেজের বদান্য শাসনতন্ত্রের কৃপায় এদেশে তাহাদেরই পুষ্ট মোসাহেব-দের নৃশংস অত্যাচারে সামান্য নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা ছোট্ট পরিবারও আজ রেহাই পাইল না। রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। ইংরেজ শাসনে এইরূপ কত মানুষ ও পরিবার যে বিশেষ করিয়া এই বাংলাদেশে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে তাহার রেকর্ড হয়ত একমাত্র ভগবানের রাজ্যেই রক্ষিত আছে। ভারতে ইংরেজ শাসন একটা ঘোরতর অভিশাপ। তার চেয়েও বড় অভিশম্পাত হইল একদিকে তাহাদের কৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাহার ফলে জমিদারী প্রথার উচ্ছৃংখল আচরণ ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং অপর দিকে তাহাদের প্রচণ্ড দমন নীতি সমগ্র দেশটাকে নরককুণ্ডের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, যেখান হইতে মুক্তি-লাভ আজও ভয়ানক দুরূহ। একমাত্র কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারাই ভবিষ্যতে তাহা সম্ভব।

স্পেশ্যল্ কমিশনে অর্থাৎ বিশেষ আদালতে "ঢাকা ট্রেন্ ডাকাতি" মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। পরবর্তী-কালের প্রখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টার স্বর্গত হেমেন গুপ্ত যাঁহার দুইখানা ফিল্ম --"ভুলি নাই" ও "৪২"--ছায়াচিত্রের জগতে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে তাঁহার বিরুদ্ধে; ইংরেজ আমলের একজন প্রথম শ্রেণীর বাঙালী জাজ বা বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর সারদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের দৌহিত্র ও বিশিষ্ট আইনজীবী বৃজেন সেন মহাশয়ের পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র জ্যোতির্ময় সেন ও বীরেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ঢাকার পাব্লিক প্রসি-কিউটর বা সরকারী উকিল রায়বাহাদুর সত্যপ্রসন্ন ঘোষ। ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের দুইটি প্রথিতযশা বিশিষ্ট পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় দুইটি যুবকের বিরুদ্ধে এই মামলা বাংলার আভিজাত্য মহলে এক বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী এই মামলায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দেশপ্রাণ শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মামলায় আইনের কয়েকটি বিতর্ক-মূলক বিষয়ে সিদ্ধান্ত, ভবিষ্যতের রাজনৈতিক মোকর্দমার নজীর হইয়া থাকে। হেমেন গুপ্ত পলাতক থাকায় কমিশনের মতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উহ্য থাকে। জ্যোতির্ময়ের বিরুদ্ধে তিনটি বিশিষ্ট ধারার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কমিশনের সিদ্ধান্তে জামিন মঞ্জুর হয়। বীরেনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ ছিল বলিয়া তাহাকে জামিন দেওয়া হয় নাই। ঘটনার পূর্বে হাতে যথেষ্ট সময় পাইয়াও বীরেনকে গ্রেপ্তার না করায় উপরের মহল কর্তৃক স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার ঘোরতর অভিযোগ আরোপিত হয়। ইহাতে বীরেনের বিরুদ্ধে স্থানীয় অফিসাররা ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে এবং নিজেদের ঠোঁট নিজেরাই কামড়াইয়া ঝাল ঝাড়িতে থাকে। তাহারা তাহাকে হাতে পাইয়া যতটুকু বিষ ঢালিবার ঢালিয়াছিল। কিন্তু কমিশনের কাছে শ্রীশবাবুর বীরেনের উপর অত্যাচারের বিষয়ে কয়েকজন পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি প্রার্থনা করার সময় নিম্নলিখিত মন্তব্যে তাঁহার উপরও তাহারা হামলা করিতে ছাড়ে নাই। এমন কি তাঁহার গৃহ তল্লাস করিয়া মামলার অনেক জরুরী কাজগপত্র লইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,

"Police battons were used for battering his bones. One important thing for the Police was to take every care so that there were no marks of injury on the body of the tortured person. This was in view of the disgrace already inflicted upon the Police under judicial enquiry in case of death of a tortured political undertrial. So they used all instruments of torture to save their nose and to serve this purpose. The battery was charged on him. Wooden plank was used for molestation. Some other methods such as pin pricking of fingers and smearing of testis adopted resulting his probable death when his 'dying declaration' was taken. At dead of night when he regained his consciousness he found himself near the desk-chair of Mr. Grasby, Addtl. S. P. of Dacca who was heavily drunken was lobbing his revolver, threatening him to kill, if he had not confessed. Before his exit he ordered for him standing-handcuff for the whole night. It is tragic that not even a drop of water was supplied to this poor and helpless boy.

Subsequently the second front operation was started in the following morning. The district in-charge of I. B. Deptt. Mr. J. N. Dhar appeared with a Holy Gita in his hand. He read few 'slokas' and tried to enlighten this innocent fellow to get their nefarious activities done. He was asked to clean his heart from the sin of impurity and impoverished thoughts. But the inoffensive youngster was quite mum.

There was no end of it. The third and the last front was operated which was pertaining to emotion. He being the only son, his parents were brought to influence him but

কালিদাস সাহিত্যে ধর্ম ও দর্শন

(শেষাংশ)

'প্রাক্তন' শব্দটির কয়েক স্থানে প্রয়োগ করিয়া মহাকবি যেন জানাইতে চাহেন, মানুষের জীবন এক জন্মে সীমিত নয়।

'সপ্তর্ষি' মণ্ডলের ঋষিদের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলেন---

'প্রাক্তনানাং বিশুদ্ধানাং পরিপাক-মুপেয়ুষাম্ ॥' (কু—৬-১০)।

পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের ফলভোগ করিতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা তপস্যাতেই রত রহিয়াছেন।

মহারাজ দিলীপের জীবনী বর্ণনায় মহাকবি প্রাক্তনকে উপমান করিয়াছেন—

'ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারা
প্রাক্তনা ইব। ---রঘু--১।২০।

মানুষের এ জন্মের কর্ম দেখিয়া যেমন তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার জানিতে পারা যায়।

পূর্বজন্মে কৃতকর্মের ফল ইহজন্মে ও ইহজন্মে কৃতকর্মের ফল ইহজন্মে ও পরজন্মে ভোগ করিতে হয়, এ 'জন্মান্তর' তত্ত্ব মহাকবি যেমন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তেমনি পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ ও কৃতকর্মের ফল ভোগরূপ বন্ধন হইতে যে চিরতরে মুক্ত হইতে পারা যায়, সে কথাও তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ধর্মপথে চলিয়া মানুষ সাধনার বলে 'মোক্ষ' লাভ করিতে পারিলে আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, ও পূর্বজন্মে কৃতকর্মের ফলও ভোগ করিতে হয় না। মোক্ষলাভ কি উপায়ে করা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

যায় জানাইবার জন্য মহাকবি এক 'জন্মভীরু' রাজার জীবন কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে বলেন---

"তস্মাদ স যোগাদধিগম্যযোগং
অজন্মনেহকল্পত জন্মভীরুঃ।
(রঘু---১৮।৩৩)।

যোগবিদ্যাবিশারদ মুনির নিকট যোগশিক্ষা করিয়া পাছে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় সেই ভয়ে রাজা যোগাভ্যাসে প্রাণত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিলেন।

যোগাভ্যাসের দ্বারা যে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়, মহাকবি সে কথা রঘুর সন্ন্যাস জীবনের বিবরণ দেওয়ার সময়ও বলিয়াছেন—

"তমসঃ পরমপাদব্যয়ং
পুরুষং যোগ-সমাধিনা রঘুঃ।।
(রঘুঃ---৮।২৪)।

যোগ ও সমাধি দ্বারা রঘু পরমপুরুষকে লাভ করিলেন, অজ্ঞান যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

মোক্ষলাভ করিতে হইলে কেবল যে যোগ ও সমাধি সাধনা করিতে হয়, তাহা নহে, মহাকবি বলেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভেরও প্রয়োজন নাই, অন্য উপায় দ্বারাও মোক্ষলাভ হয়---

"তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়
স্তনুত্যজাং নাস্তি শরীর বন্ধঃ ॥"
(রঘুঃ---১৩।৫৮)

গঙ্গা ও যমুনার পবিত্র সঙ্গম সলিলে যে ভাগ্যবানেরা অবগাহন স্নান করেন, দেহাবসানের পর---তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিলেও---আর তাঁহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন।

'পূর্ব-মেঘে'---মহাকবি বলেন, হিমালয়ের একস্থানে চন্দ্রশেখরের চরণচিহ্ন আছে, যাহা দর্শন করিলে ও ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, ও মৃত্যুর পর

---

to no effect. This is the picture how things were being done and prepared by the Police."

সহজ কথায় নৈমিত্তিক ঘটনার আকস্মিকতায় পুলিশী প্রতিরোধের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য অপরাধের ক্ষেত্রে নিরপরাধ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি কিভাবে সংযোজিত হইত তাহারই একটি পরিপূর্ণ চিত্র তিনি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কমিশনের সম্মুখে তাঁহার আরও একটি মন্তব্য একান্ত প্রণিধানযোগ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন---

Prosecution and Defence in these days in the name of Democratic laws are deemed to be ridiculous when the former makes room for the preservation of truth in the cold storage and the later to disolve into interpretations of Justice as if truth has had many sides.

অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিধানে অভিযোগ ও রক্ষণ বা পক্ষ সমর্থন উপহাসের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেন না ন্যায় বিচারের জন্য সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া সাজানো, তারপর আইনের যুক্তিতে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা, সংযোজিত তথ্যের যথার্থতায়, সত্যতার একাধিক্যতা অনুমিত হইয়া থাকে মাত্র।*

* [ঘটনা পরম্পরায় "প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র" জীবনকাহিনীর বিষয়বস্তু বর্ণিত হইল। জীবনধারার পরবর্তী অধ্যায় এখন হইতে "অবরুদ্ধ" নামে প্রকাশিত হইবে --লেখক]

চিরকালের জন্য মহাদেবের প্রমথ পদ লাভ হয়।

আর তাহাকে জন্মধারণের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।

মৃত্যুর পর যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে না হয়, তাহা হইলে ইহার অপেক্ষা মানুষের মহত্তর কামনা আর কি থাকিতে পারে।

মহাকবি তাই তাঁহার শেষ জীবনের রচনা অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের শেষে 'ভরত-বাক্যে' প্রার্থনা করিয়াছেন—

"মমাপি ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।।"

(শকু:—৭ম অঙ্ক)।

সর্বশক্তিমান স্বয়ম্ভূ নীললোহিত শঙ্কর আমায় পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি দিন আর যেন জন্মগ্রহণ করিয়া কৃতকর্মের ফলভোগ করিতে না হয়।

'কর্মফল' তত্ত্ব প্রসঙ্গে মহাকবির মত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি বিশ্বাস করিতেন, মানুষ যে যাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে, কেবল ইহজন্মের নয়, পূর্বজন্মে কৃত কর্মের ফলও এজন্মে ভোগ করিতে হয়। এমন কি, এ জন্মের যে সমস্ত কর্মের ফল জীবিতকালে ভোগ করা হয় না, পরজন্মে তাহাদের ফল ভোগ করিতেই হয়। অবশ্য, ইহা যে কালিদাসের নিজস্ব মত তাহা নহে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তিনি কর্মফলতত্ত্বের বাস্তব রূপ তাঁহার কাব্য নাটকগুলির মাধ্যমে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, 'ভবিতব্যতা' মানব জীবনে এক 'নির্ণায়ক শক্তি', অদৃশ্যভাবে কাজ করিয়া যায়। যখন যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার থাকে, তাহা ঘটিবেই, সে সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঘটনার অনুকূলে না থাকা সত্ত্বেও ঘটিবে। তাহার কারণ—

"ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।

(শকু—১ম অঙ্ক)।

ভবিতব্যতায় প্রবেশদ্বার সর্বত্র উন্মুক্ত।

ভবিতব্যতার মত 'পূর্বাভাষের' প্রতিও মহাকবির আন্তরিক বিশ্বাসের প্রমাণ তাঁহার সাহিত্যের কয়েক স্থানে বিশেষত 'বিক্রমোর্বশীয়ের' দ্বিতীয় অঙ্কে, ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' সপ্তম অঙ্কে পাওয়া যায়।

অদূর ভবিষ্যতে জীবনে যে একটা বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিবে, অনেক সময় মানুষের মনে সে সম্বন্ধে পূর্ব হইতে একটা আভাসের উদয় হয়—যাহাকে বলা হয় 'পূর্বাভাষ'—ইংরাজীতে Premonition মহাকবি তাঁহার নাটক দুইটিতে যে সুন্দরভাবে 'পূর্বাভাষের' বিবরণগুলি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এত স্বাভাবিক যে পড়িবার সময় মনে হয় না যে এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে। ইহাই মহাকবির 'মায়া-লেখনীর' বৈশিষ্ট্য।

কালিদাসের দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, পূর্ব মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান সামান্য ছিল না, বিশেষত ভগবদ্গীতা যে তিনি অতি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এ উপনিষদে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্য-নাটকগুলির স্থানে স্থানে গীতার আদর্শ, উপমা ও বর্ণনা প্রমাণ করিয়া দেয়।

সাংখ্য দর্শনের মূল তত্ত্বটিকে রঘুবংশের এক শ্লোকে উপমান করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন, সাংখ্য শাস্ত্রও তাঁহার অধীত বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। তিনি বলেন—

"বুদ্ধেঃ সরঃ কারণমাপ্তবাচো
বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি।।"

(রঘু—১৩।৬০)।

আপ্তবাক্ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, মহতত্ত্বের উৎপত্তি যেমন অব্যক্ত, প্রকৃতি তেমনি সরযূ নদীর উৎপত্তিস্থল মানস সরোবর।

সাংখ্য দর্শনের 'প্রকৃতি পুরুষ'-তত্ত্বও মহাকবি কুমারসম্ভবের এক শ্লোকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দেবতারা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—

"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ প্রবর্তিনীম্।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ।।"

(কু—২।১৩)

তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকেই পুরুষার্থ প্রবর্তিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, এবং তোমাকেই প্রকৃতির দ্রষ্টা উদাসীন পুরুষ বলিয়া জানে।

সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি সগুণ ও সক্রিয়, পুরুষ নির্গুণ ও উদাসীন।

মহাকবি দেবতাদের মুখ দিয়া ব্রহ্মাকে 'তুমিই প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ' বলাইয়াছেন বলিয়া এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

"প্রমাণাভাবাদ"—প্রমাণের অভাব।

মহাকবি ছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী, তাই মহর্ষি কপিলের এ বাণী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই; সুতরাং সৃষ্টিকর্তাকে তুমিই প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করাইয়া সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিলেন।

এই শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, কালিদাস সাংখ্যের দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, আর নিরীশ্বর তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

যোগদর্শনে মহাকবির প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'ধ্যান-যোগের' বর্ণনার সহিত কুমারসম্ভবের যোগীশ্বর শিবের তপস্যা বর্ণনা ও রঘুবংশের রাজা ও সংসারত্যাগী বৃদ্ধ রঘুর যোগ ও সন্ন্যাস বর্ণনা মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, মহাকবির সাহিত্য গীতার প্রভাবে কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

যোগদর্শনের প্রথম সূত্র—

"যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ।।"

চিত্ত অর্থাৎ মনকে সকল প্রকার বহির্বিষয়ক বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমাত্মার চিন্তায় নিবিষ্ট করিয়া রাখা—যোগ।

পাতঞ্জল দর্শনের এই সূত্রটির অনুসরণ করিয়া মহাকবি রঘুবংশের দশম সর্গে বলিতেছেন---

"অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্।
জ্যোতির্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং
বিমুক্তয়ে।।" (রঘু---১০।২৩)

যোগীরা মোক্ষ লাভের জন্য অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে নিগৃহীত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত জ্যোতির্ময় তোমার (পরমাত্মার) চিন্তায় নিবিষ্ট করিয়া রাখেন।

যোগ ও যোগী সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের আরও পরিচয় পাওয়া যায় কুমারসম্ভবের এক শ্লোকে যেখানে তিনি বলিতেছেন---

"যোগীব যোগবিধি শুদ্ধমনা যমাদ্যৈঃ।
সাংসারিকং বিষয়-সঙ্গমমোঘবীর্য্যম্।।"
(কু---১৭।৪৭)

যোগী যেমন যম নিয়ম প্রভৃতি উপায় দ্বারা মনকে শুদ্ধ করিয়া সুখ, বাসনা প্রভৃতি সংসারের দুর্জয় আকর্ষণ বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

গীতার বর্ণনার সহিত দুই একটি সামঞ্জস্য এখানে দেখান গেল।

গীতায় যোগী পুরুষের বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন---

"সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং
স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।"
(গী---৬।১৩)

যোগীরা অন্য কোনও দিকে না চাহিয়া আপনার নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রহিবেন।

কুমারসম্ভবে মহেশ্বরের তপস্যা বর্ণনায় কালিদাস বলেন---

"লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণম্।।" (কু---৩।৪৭)

নাসিকার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মহেশ্বর তপস্যা করিতেন।

যোগাভ্যাসে যাঁহারা নিবিষ্ট থাকেন চিত্তকে কি ভাবে তাঁহাদিগকে স্থির রাখিতে হয় বুঝাইবার জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপমা দিয়া বুঝাইতেছেন---

"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে
সোপমা স্মৃতা।।"
(গী---৬।১৯)

বায়ু-বিহীন স্থানের দীপ যেমন বিচলিত হয় না, যোগীর চিত্তও তেমনি স্থির অচঞ্চল হইয়া থাকে।

যোগীশ্বর শিবের যোগ বর্ণনায় মহাকবি বলেন---

"নিবাত-নিষ্কম্প ইব প্রদীপম্।।"
(কু---৩।৪৮)

মহেশ্বরকে দেখাইতেছিল যেন বায়ু-বিহীন স্থানের নিষ্কম্প প্রদীপ।

বায়ু-বিহীন স্থানের প্রদীপের সহিত গীতায় যোগীর চিত্তের ও কুমারসম্ভবে যোগীর দেহের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

'বেদান্ত' দর্শনে মহাকবির জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইলে প্রথমে বেদান্তের---

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"---সূত্রটির আলোচনা করিতে হয়।

'অথ' শব্দ মঙ্গলার্থে, 'অত':--- অত:পর, যাহার পর? সাংসারিক বিষয় প্রভৃতি ভোগ করার পর 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'---পরমাত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হওয়া। মনে হয় মহাকবি বেদান্তের এ নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া রঘুবংশে দিলীপ, রঘু প্রভৃতি বহু রাজার জীবন কাহিনীতে দেখাইয়াছেন যে, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাদের অনেকেই রাজ্যসুখ ভোগ করার পর উপযুক্ত পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বনে গিয়া ধর্মচর্চায় ও ভগবদারাধনায় শেষ জীবন যাপন করিতেন।

বেদান্তে তাঁহার জ্ঞান ছিল বলিয়া বিক্রমোর্বশীয়ের নান্দীতে তিনি লিখিতে পারিলেন---

"বেদান্তেষু যমাহুরেক পুরুষম্।"

মহামুনি জৈমিনির 'পূর্ব মীমাংসার' বিষয়-বস্তুতেও যে তাঁহার জ্ঞান ছিল, তাহার প্রমাণ রঘু বংশের পুষ্য নামক এক রাজার জীবনী বর্ণনায় পাওয়া যায়।

মহাকবি পুষ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন---

"মহীং মহেচ্ছ: পরিকীর্য সুনৌ।
মহীষিণে জৈমিনয়েহর্পিতাত্মা।।"
(রঘু---১৮।৩৩)।

পুষ্য মহাশয় ব্যক্তি, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মনীষী জৈমিনির পদে নিজেকে সমর্পন করিলেন---তাঁহার শিষ্য হইলেন।

কেন শিষ্য হইলেন, তাহার কারণ জানাইবার জন্য মহাকবি বলেন---

মোক্ষলাভ করার জন্য মহর্ষির নিকট হইতে যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাকবির সাহিত্যের স্থানে স্থানে ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ও বহু দেব ও দেবীর নানা বিবরণ ছাড়াও 'পরমাত্মার' উল্লেখ পাওয়া যায়।

পরমাত্মা কি বুঝাইবার জন্য মহাকবি বলেন, পরমাত্মা---পরম জ্যোতিঃ---যোগীদের হৃদয়ে পরম জ্যোতিঃ রূপে দেখা দেন।

রঘুবংশের দশম সর্গে রাবণের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণ নারায়ণের নিকট যাইয়া স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, "যোগীরা মোক্ষলাভ করার জন্য তোমার জ্যোতির্ময় রূপের ধ্যান করিয়া থাকেন।

যোগীশ্বর শিবের যোগ বর্ণনায় মহাকবি বলেন---

"যোগা স চান্ত: পরমাত্মসংজ্ঞম্।
দৃষ্ট্বা পরমজ্যোতিরুপাররাম।।"
(কু- ৩।৫৮)

শঙ্কর যে সময় হৃদয়ের মধ্যে পরম জ্যোতি: যাঁহাকে বলা হয় পরমাত্মা দর্শন করিয়া যোগ হইতে বিরত হইলেন।

মহাকবি যেন বলিতে চাহেন, শঙ্কর স্বয়ং পরমাত্মা হইলেও যোগাভ্যাসের সময় তিনিও সাধারণ বা অসাধারণ যোগীপুরুষের মত হৃদয়ের মধ্যে পরম জ্যোতি: দর্শন করিতেন।

পরমাত্মার স্বরূপ যে পরম জ্যোতি: ইহা কালিদাসের কবি কল্পনা নয়, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন -

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমস:
পরমুচ্যতে।।" (গী---১৩।১৪)

"ভারতোজ্জ্বল তিলক"

শ্রীমতী রেণুশ্রী মৈত্র

যে বংশে জন্ম লভিল ভগবান
শঙ্করাচার্য কঙ্কন—
সে বংশে জন্ম লভিল নির্লোভ ত্যাগী
মহা এক যোগী
মারাঠী ব্রাহ্মণ
উজ্জ্বল তিলক
বিজয় গর্বে গর্বিত হ'লো ভারত ভূ-লোক॥

সচ্চরিত্র সাধুতায় আদর্শ পুরুষ
বেদ ; বেদান্ত ; গণিত ; বেদাঙ্গ
অপূর্ব জৌলুষ॥

জ্ঞানের পরিধি অসীম অতল।
বিদেশী মনীষী দল
সিলভ্যান ; লেভি ; ম্যাক্সমূলার
ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলি
একবাক্যে করেছে স্বীকার॥

এলো সে এক শুভ দিন
নিজের সত্তা ভারত আত্মায়
করিল বিলীন॥

যবে শিক্ষার বাহন ইংরাজী
শিক্ষক ইংরাজ
মহাভারতের একি অপমান
মহাপাপ মহালাজ॥

কাহাদের তরে হীনমন্যতা ;
কিসের তরে মোদের অশোক ;
লোকমান্য তিলকের রেগে ওঠে দুই চোখ॥

হেরি দশ দিক্
তারুণ্যের পূর্ণ প্রতীক
যেন ভিসুভিয়াস
রুষিয়া ফুঁসিয়া ফেলে শ্বাস
কখন কিভাবে করিবে উদ্গীরণ
দেশ ও জাতির তরে আন্তরিক
ছিল যে আকর্ষণ॥

জাতীয় ভাবধারা বংশানুক্রমিক
ধর্মীয় সংস্কার
হারালো শিক্ষার্থী দল
হ'লো কিম্ভূতকিমাকার
এমন করে অপমানের তলে
দুঃখ দহন বহন করা কি চলে?
স্বদেশে জাতীয় ঐতিহ্য করিতে সঞ্চারিত
বীরপূজা ; শিবাজী উৎসব
করেছিল প্রচলিত॥

পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক করিয়া অনুসরণ
গড়িয়া উঠুক নতুন উদ্দীপনায়
জাতীয় আন্দোলন॥

হে ভারতবীর উজ্জ্বল তিলক
তোমার স্মরণ বাসরে
শ্রদ্ধাসহকারে
প্রণাম জানায় ভারত ভূ-লোক॥

তিনিই সেই জ্যোতি: যে জ্যোতি: সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থকে জ্যোতি: প্রদান করেন, অজ্ঞতার অন্ধকার যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে মহাকবি এই কথাই বলিয়াছেন---

"স হি দেব: পরং জ্যোতিস্তম:---
পারে ব্যবস্থিতম্" (কু---২।৫৮)

তিনি (শিব) সেই দেব, যিনি পরম জ্যোতি:, অজ্ঞতা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মল্লিনাথ বলেন, 'পরমজ্যোতি:---পরমাত্মা'।

তখনকার দিনে এখনকার মত মন্দিরে মন্দিরে এবং ধনবান ও গৃহস্থ পরিবারের বাসগৃহে গৃহদেবতা রূপে নানা দেব-দেবীর পূজার ব্যবস্থা ছিল, এক অযোধ্যা নগরে বহু বৃহৎ বৃহৎ প্রতিমাপূর্ণ গৃহ ছিল (রঘু---১৬।৩৯)

পশুবলিও যে ধর্মের অঙ্গরূপে গণ্য হইত, তাহা মহাকবির কোনও কোনও কাব্য-নাটকের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

মহারাজ কুশ যখন তাঁহার রাজধানী কুশাবতী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া দিয়া তাঁহাদের পরিত্যক্ত কুল-রাজধানী অযোধ্যায় বাস করিতে আসিলেন, প্রবেশের পূর্বে, পুরোহিতেরা উপবাস করিয়া ও পশুবলি দিয়া বাস্তুদেবতার পূজা করিয়াছিলেন।
(রঘু---১৬।৩৯)

অভিজ্ঞান---শকুন্তলের ষষ্ঠ অঙ্কেও পশু বলির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

এক জেলেকে পুলিসেরা তাহার 'মাছ-মারা' জীবিকাকে উপহাস করায় জেলে বলিয়াছিল---

"পশু মারণকর্মদারুণো
অনুকম্পামৃদুকোহপি শ্রোত্রিয়: ॥

ব্রাহ্মণেরা স্বভাবত দয়ালু হইলেও পশুবলি দেওয়া কি তাঁহাদের নির্দয়তা প্রমাণ করে না?

মহাকবির সময়েও নারীরা যে বার, ব্রত, উপবাস ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ বলিয়া পালন করিতেন, সে বিবরণও তাঁহার সাহিত্যে পাওয়া যায়।

॥ সমাপ্ত ॥

মাসিক রাশিফল
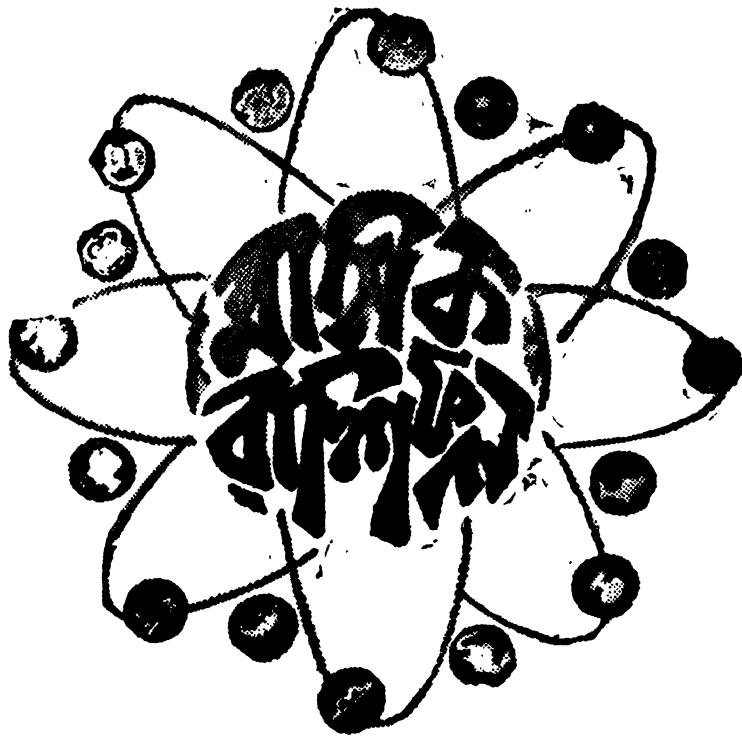
॥ ভাদ্র মাসের ফলাফল ॥

বর্তমান ভাদ্র মাস রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জটিল হয়ে উঠবে। বৃষ লগ্নের উদয়ে রবি সিংহে প্রবেশ করেছে। নীচস্থ মঙ্গলের সঙ্গে মকরস্থ চন্দ্র হয়েছে মুখোমুখি। অপর দিকে চন্দ্র রাশির অধিপতি শনি এখন মঙ্গলের ক্ষেত্রে নীচস্থ। বৃষের দ্বাদশে শনি। মকরাশ্রিত ভারতকে আরো জটিলতার দিকে টেনে নিচ্ছে শনি। ভারতের পক্ষে তথা ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে এ মাস অশুভ ইঙ্গিতবহ। ২৩শে আগষ্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, আবার ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই জানুয়ারী অত্যন্ত অশুভ। সংঘর্ষ, দলাদলি ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা এবং বিশ্বজোড়া যুদ্ধাশঙ্কা এ সময়ে প্রবল হয়ে উঠতে পারে। আমেরিকার পক্ষে এখন অত্যন্ত ঘোরালো। ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই জানুয়ারীর মধ্যে বিশেষ সঙ্কট উপস্থিত হতে পারে। বাঙলায় শিক্ষা-সঙ্কট আরো গোলমেলে হয়ে উঠবে এবং অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। মেষ, মীন, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও মকর রাশির আশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে এ সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অনেকে গ্রহের প্রতিকারের জন্য আমাদের নির্দেশ চান। আমরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুযায়ীই নির্দেশ দিয়ে থাকি। কিন্তু রত্নাদি ক্রয়কালে তা ক্রিয়াশীল কি না, তা আগে দেখতে হবে। শুধু বহুমূল্য রত্নে ফল না হতে পারে। কারো বা অন্য প্রক্রিয়ায়ও উপকার হতে পারে। আবার কোন কোন

হারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

ক্ষেত্রে কোনো প্রতিকারেই লাগে না। একথা জানা উচিত। যাক এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের শুভাশুভ আভাস দিচ্ছি :—

মেষ : মন্তব্য প্রকাশকালে সাবধান। আপনার পক্ষে মিষ্টি কথা ও ধৈর্যের সঙ্গে নিজের কাজ করে যাওয়াই উচিত। টাকাকড়ির বেশ টান থাকবে। খরচ সামলে ওঠা কঠিন হবে। কারো অসুখ-বিসুখের জন্য বিব্রত থাকতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সাবধান। ব্যবসায় ক্ষেত্রে মাসের মধ্যভাগ শুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। পণ্য-দ্রব্যাদি মজুত রাখা কিংবা আগামী দিনে অধিক লাভের জন্য কেনা-কাটার ব্যাপারেও হতাশ হতে পারেন। চাকুরী ক্ষেত্রে চাপ পড়বে। সামাজিক ক্ষেত্রে মর্যাদা বাড়বে। বুদ্ধিজীবী ও আইনজীবীদের পক্ষে মন্দা যাবে। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্যের গোলযোগ ও অযথা শত্রুতা উত্ত্যক্ত করবে। মেষ লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও পারিবারিক পরিবেশ মাঝে মাঝে উত্ত্যক্ত করবে। ব্যবসায়ের প্রসারের ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা করে চলা উচিত। শুক্র কিংবা বুধের দশান্তর্দশা চললে সকল বিষয়ে সতর্ক হবেন।

বৃষ : এ-মাসে যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। মিষ্টি ব্যবহার ও ধৈর্যের সঙ্গে বিরোধিতার মুখোমুখি হোন্। বাক্-বিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়ে শুভ ইঙ্গিত রয়েছে। এক-এক সময় প্রবল বাধা এবং নৈরাশ্য মুষড়ে দিতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা। একগুঁয়েমি ও আত্মসচেতনতা বিপদের ঝুঁকি আনতে পারে। মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতায় সাবধান। উদর ও গলায় কোনো উৎপাত সৃষ্টি হতে পারে। বাতজপীড়া সম্পর্কে সাবধান। পত্নীর স্বাস্থ্য হঠাৎ উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। পড়ে গিয়ে আঘাত লাগা কিংবা ধাক্কা লাগা প্রভৃতি সম্বন্ধে সাবধান। মহিলাদের বিশেষ কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। বৃষ লগ্নে জন্ম হলে ব্যবসায়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে কিন্তু পারিবারিক অসুখ-বিসুখ উৎপাত করবে। পড়ে গিয়ে আঘাত লেগে কষ্ট পাবার আশঙ্কা।

মিথুন : আপনার যদি মিথুন রাশি হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব এবং কোনো কোনো ব্যাপারে সম্মোহিতের মত বিশ্বাস ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আপনার মৌলিক কাজে যশোবৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা বাড়বে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। ব্যবসায়ে শেষাংশ জটিলতাসূচক। আইনঘটিত ব্যাপার ও রাজনৈতিক ব্যাপার অনুকূল

হবে না। কার্যকারণে ব্যয় বৃদ্ধি ও নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ক্ষেত্রেও বিরোধ দেখা দিতে পারে। কোনো ব্যাপারে অতিরিক্ত বিশ্বাসে ক্ষতিরও আশঙ্কা রয়েছে। তরুণদের প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে গোলমাল এবং বিবাহেচ্ছু তরুণীদের নির্দিষ্ট সম্বন্ধ ভেঙে যেতে পারে। মহিলাদের সাংসারিক ব্যাপারে প্রায়ই উৎকণ্ঠা যাবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি হলেও স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে।

কর্কট: কাজকর্মের দিক থেকে একটু বুদ্ধি করে চললে বেশ ভালই করবেন। কিন্তু লোভের বশে কোনো ফাঁদে পা দেওয়া সম্বন্ধে সাবধান। মাসের আঠারো তারিখ থেকে সব কাজে সতর্ক হবেন। নিতান্ত বিশ্বাসী জনও বিরূপ হয়ে ক্ষতি করতে পারে। এখন থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত বিশেষ জটিল। ব্যবসায়ে সতর্ক হয়ে কাজ করুন। চাকুরী ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দরকার। গাফিলতির জন্য ক্ষতি হতে পারে। নিতান্ত উপকারী বা হিতৈষী কারো সঙ্কট বিচলিত করতে পারে। বিদেশ গমনেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা এখন চেষ্টায় অনুকূল পরিবেশ পেতে পারে। কোনোরূপ স্ফীতি, ব্যথা-বেদনা ও জ্বর দেখা দিলে আগেই সতর্ক হবেন। গুরুজনদের ব্যাপারে উদ্বেগ থাকবে। মহিলা জাতকেরও অনুরূপ ফল। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাবধান।

সিংহ: সমস্যাসঙ্কুল এ মাস। বাইরের কাজে ঘরের কথা ভুলে ঝঞ্ঝাটে পড়তে পারেন। যাদের উপর নির্ভর করে চলছেন, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য আপনার কাজ-কারবারে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করছে। আর চাকুরী ক্ষেত্রেও শেষে অসুবিধা সৃষ্টি করছে, একথা মনে রাখুন। সবচেয়ে বড় কথা স্বাস্থ্য। সামান্য খুটিনাটিও অবহেলা করবেন না। ব্যবসায়ীদের পক্ষে ক্রয় বিক্রয় মজুত করার ব্যাপারেও ঝঞ্ঝাট হতে পারে। জমি-বাড়ির ব্যাপারও ঘোরাল হয়ে উঠতে পারে। ছেলেমেয়েদের কারো কার্যকলাপ বিচলিত করতে পারে। সভা-সমিতি কিংবা জনতার ভিড় এড়িয়ে চলা উচিত। রাজনৈতিক কার্যকলাপে অনুকূল ফল হবে না। মহিলা জাতকের মনের ওপর প্রায়ই চাপ পড়বে। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, কিন্তু শত্রুতা ও কর্মক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা উত্ত্যক্ত করবে।

কন্যা: সহজ ও সরল মনে কোনো কাজ করে প্রবঞ্চিত হবার আশঙ্কা। সুতরাং কাজ-কারবারে সংশ্লিষ্টদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার। আত্মম্ভরিতাও বিরূপতা সৃষ্টি করবে। টাকাকড়ির ব্যাপারে আশানুরূপ নয়। অবশ্য কোনো সূত্রে প্রাপ্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। সামান্য কিছুও পরে উৎকট হয়ে উঠতে পারে। সন্তান-চিন্তা ও পারিবারিক সমস্যাও উত্ত্যক্ত করবে। ব্যবসায়ে নূতন পদক্ষেপের সম্ভাবনা। চাকুরী ক্ষেত্রে কারো আনুকূল্য পেতে পারেন। ট্যাক্স, লাইসেন্স ও সম্পত্তিঘটিত ব্যাপারেও উত্ত্যক্ত হবার আশঙ্কা। মহিলা জাতকের ভ্রমণের সম্ভাবনা। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বুদ্ধিজীবীদের প্রোফেশনে আয় বাড়বে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান।

তুলা: অধিক বয়স্ক যাঁরা তাঁদের পক্ষে এখন শরীর সম্বন্ধে সাবধান থাকা বেশী দরকার। খুঁটিনাটি স্বাস্থ্যের উৎপাত প্রায়ই উত্ত্যক্ত করবে। প্রিয়জনদের কারো সম্পর্কে উৎকণ্ঠা যাবে। আকস্মিক কোনো কারণে অর্থক্ষতি কিংবা একসঙ্গে মোটা রকমের ব্যয় হতে পারে। রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রতিকূল যেতে পারে। ব্যবসায়ে নূতন সম্ভাবনা। কিন্তু কোনো ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। মাসের আঠারো তারিখ থেকে সাতদিন লক্ষণীয়। জমি-বাড়ির সম্পর্কে সতর্ক পদক্ষেপ দরকার। চাষবাসের ব্যাপারে নূতন উদ্যম আশাপ্রদ। চাকুরী ক্ষেত্রে দু'একবার অশান্তিকর পরিবেশ দেখা দিতে পারে।

স্নায়বিক দুর্বলতা ক্ষতি করতে পারে। বিবাহেচ্ছুদের পক্ষে এখন বাধাসূচক। মহিলা জাতকের পক্ষেও অনুরূপ। তুলা লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে নূতন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বৃশ্চিক : এগিয়ে যাবার পথে দ্বিধা আর সংকোচ ত্যাগ করুন। হয়ত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ জনের আচরণও আপনাকে আঘাত দেবে। কাপড় ও ফ্যান্সি দ্রব্যের ব্যবসাদাররা মাল কেনাকাটায় বিশেষ সতর্ক হবেন। চাহিদা আশানুরূপ হবে না। মাসের উনিশ তারিখের পর লক্ষণীয়। পোলট্রী কিংবা নূতন ধরনের ফার্মিং-এর কাজে যাঁরা উদ্যোগী হতে চান, তাঁদের পক্ষে এখন যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। চাকুরী ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পক্ষে এখন বাধা। রাজনৈতিক কার্যকলাপ অনুকূল হলেও শত্রু সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে কোনো খবর উৎসাহিত করতে পারে। মহিলা জাতকের উদ্যমে সাফল্য, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা প্রয়োজন। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

ধনু : মাঝে মাঝে এক ধরনের শূন্যতা মানসিক অবসাদ ঘটাতে পারে। বাইরের কোনো ঝুঁকি না নিয়ে এখন হাতের কাজগুলো শেষ করতে চেষ্টা করুন। লেখক ও গবেষকদের পক্ষে এখন অনুকূল সময়। দেহের কোনো অংশে স্ফীতি কিংবা ব্যথা-বেদনা দেখা দিলে সতর্ক হবেন। চিকিৎসা-বিভ্রাটে গোলমাল হতে পারে। ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। চুরি, খোয়া যাওয়া কিংবা অসতর্ক থাকার জন্য ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমার পক্ষে এখন অনুকূল নয়। সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অশান্তি ঘটতে পারে। এককালে সম্পর্ক ছিল—এমন কোনো মহিলার ব্যাপারেও অশান্তি হবার সম্ভাবনা। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্যের গোলমাল ও উদ্যমে ব্যর্থতা নিরাশ করবে। ধনু লগ্নে জন্ম হলে পারিবারিক পরিবেশ বিচলিত করতে পারে।

মকর : কোনো কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে নিজের সামর্থ্য ও সময় সম্বন্ধে অবহিত হবেন। ঝোঁকের মাথায় বেশী কাজ নিতে গোলমালে পড়তে পারেন। ব্যবসায়ের আঁটঘাট ভাল করে বেঁধে নিন। সামান্য গলদে বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। টাকাকড়ির ব্যাপারেও টানাটানি যাবে। আগের কোনো কাজের জের আকস্মিকভাবে ফ্যাসাদে ফেলতে পারে। চলাফেরায় সতর্ক থাকা উচিত। রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রতিকূল হতে পারে। উদর ও মূত্রাশয়ঘটিত পীড়াদি সম্পর্কে সাবধান। দাম্পত্যক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে গতানুগতিকভাবেই চলবে। চাকুরীপ্রার্থী চাকুরী পেতে পারে। মহিলা জাতকের উদ্যমে সাফল্য বুঝায়। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে মাসের শেষাংশে দুশ্চিন্তাসূচক। মকর লগ্নে জন্ম হলে নূতন যোগাযোগ এবং আর্থিক সমস্যার ব্যাপারে আশাপ্রদ কোনো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। বৈষয়িক ব্যাপারে উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাট থাকবে।

কুম্ভ : কাজ-কারবারে উৎসাহিত হবার মতো অবস্থা দেখা যায়। কিন্তু নিজের খেয়াল ও জিদ বজায় রাখার জন্য যোগাযোগের দিক থেকে ক্ষতি হতে পারে। মিল-মালিক ও সংবাদ-পত্রের মালিকদের পক্ষে এ সময় বিশেষ জটিলতাসূচক। পারিবারিক ব্যাপারে উদ্বেগ থাকবে। রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকলে বিশেষ সতর্কভাবে কাজ করা উচিত। নূতন কোনো কারবারে উদ্যোগীদের কিংবা কোনো শিল্প-উৎপাদনে আগ্রহীদের পক্ষে এ মাস অনুকূল। চাকুরী ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এ মাস আশাপ্রদ। প্রেম-প্রণয়ঘটিত বিবাহের পক্ষে এখন বাধা। গুরুজনদের কারো সম্বন্ধে উদ্বেগ যাবে। মহিলা জাতকের কোনো সূত্রে প্রাপ্তিযোগ এবং তরুণী মেয়েদের প্রিয়সঙ্গের সম্ভাবনা। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ও পারিবারিক ব্যাপারে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটবে। বৃহস্পতি কিংবা রবির দশা কিংবা অন্তর্দশা চললে বেশ কষ্ট দেবে।

মীন : উদ্যমে নৈরাশ্য বাড়বে। কেমন যেন এক ধরনের অস্বস্তি আপনাকে বিব্রত করবে। কাজকর্মে তেমন উৎসাহ পাবেন না। অবশ্য চাকুরী ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল বলা চলে। মাসের শেষাংশে কোনো খবর উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কারো পীড়াদি সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। সন্তানদের কারো সম্পর্কে সুখবর পেতে পারেন। ব্যবসায়ে আয় বাড়বে। বাড়িঘর ও ভূসম্পত্তি নিয়ে চিন্তার কারণও ঘটতে পারে। দূরে কোথাও যাবার মতো যোগাযোগ ঘটতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। ঠাণ্ডা লেগে কিংবা কোনোরূপ স্ফীতির জন্য ব্যথা-যন্ত্রণা কষ্ট দেবে। আর্থিক ব্যাপারে আগের চেয়ে ভাল। লেখক ও গবেষকদের পক্ষে সাফল্যসূচক। মহিলা জাতকের স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। মীন লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক উন্নতি হলেও নানা ঝঞ্ঝাট উত্যক্ত করবে। কর্মক্ষেত্রে নূতন সুযোগ উৎসাহিত করতে পারে। শেষাংশে স্বাস্থ্য উৎপাত করবে।

● পত্রোত্তর ●

● শ্রীমলয়কুমার দত্ত (নবাবগঞ্জ, পূর্ণিয়া)---(১) আগামী বছরে মেমাসের পর বর্তমান অবস্থার অনেক পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা; বর্তমানে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনে সুযোগ আসতে পরে। (২) বিব হের ব্যাপারে অগ্রহায়ণ থেকে বর্ষফল দেখুন। ● শ্রীবিষ্ণুকুমার আদিত্য (কবি ভরতচন্দ্র রোড, কলিঃ)---(১) হুগলী জেলার কোনো স্থানে; (২) আয়ু এখনো দীর্ঘকাল। ● হিমাদ্রিশেখর আদিত্য (কবি ভরতচন্দ্র রোড, কলিঃ)---তুলা

লগ্ন ও বৃশ্চিক রাশি। ●শ্রীমতী শুভা আদিত্য (কবি ভরতচন্দ্র রোড, কলিঃ)---সিংহ রাশি ও মেষ লগ্ন। ● শ্রীমনুজেন্দ্রনাথ ঘোষ (গুসকরা, বর্ধমান)---(১)বর্তমানে শনি অত্যন্ত অশুভ এবং এরূপ অশুভ প্রভাব বত্রিশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত চলবে; (২) চাকুরী ক্ষেত্রে জুলাই থেকে আগামী মার্চের মধ্যে কোনো সুপরিবর্তন হতে পারে। ধারণীয় রত্ন, আড়াই থেকে সাড়ে তিন রতি চুনী সোনার আংটিতে। ● শ্রীমৃণাল রায় (গোপালবাড়ী, জয়পুর)---(১) তেত্রিশ বর্ষ বয়স থেকেই প্রকৃত উন্নতির কাল, তবু ইংরেজী বাহাত্তর সাল সুযোগপ্রদ। (২) সোনার আংটিতে চার-পাঁচ রতি পান্না ও পাঁচ-ছয় রতি অ্যাকুয়াম্যারিন ধারণ করতে পারেন। ● শ্রীপ্রমথ ঘোষ (গোপালবাড়ী, জয়পুর)---(১) বত্রিশ পর্যন্ত শরীর ও মনের ওপর ঝামেলা যাবে, কিন্তু এরই মধ্যে অপ্রত্যাশিত কোনো-রূপ মর্যাদা বাড়তে পারে; (২) আয়ু বলা এরূপ প্রশ্নোত্তরে সম্ভব নয়। ●কুমারী শুক্লা রায়চৌধুরী (পাহাড়ী পাড়া, জলপাইগুড়ি)---(১) বর্তমানে নানা জটিলতা, কিন্তু নভেম্বরের মধ্যে চাকুরী হতে পারে; (২) বিবাহ আগামী জুনের মধ্যে হবার সম্ভাবনা। ●শ্রীনন্ত্য সান্যাল (বীরপাড়া মাবিগাঁও), (১) জন্মের তারিখ নেই, শুধু বার দেখে রাশি ঠিক করা যায় না; (২) আগামী বছর জুনের পর মোটামুটি ভাল। ● শ্রী এ সরকার (দুর্গাপুর-৪)---(১) চাকুরী আট মাসের মধ্যে; (২) আধা সরকারী। ● শ্রীমতী সুনীতা চক্রবর্তী (মহানির্বাণ রোড, কলিঃ)---সিংহ রাশি ও মেষ লগ্ন। ● শ্রী জি আর এস (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিঃ)---(১) মোটামুটি নিজের পছন্দ-মতই বুঝায়; (২) রবির অবস্থান ও শুক্রের অবস্থান মোটামুটি ভালভাবে তেত্রিশ বর্ষ বয়সের পর। ●শ্রীবাসুদেব নন্দী (ফরিদাবাদ হরিয়ানা) ---(১) সিংহ রাশি; (২) ইংরেজী বাহাত্তর সাল পর্যন্ত সাবধান থাকা উচিত, অবশ্য এরই মধ্যে পরিবর্তন আসবে। ● অধ্যাপক চৌধুরী (করিম-গঞ্জ ষ্টেশন রোড)---(১) পত্নীকে প্রবাল ধারণ করানো ঠিকই হয়েছে। আপনার পক্ষে তিন-চার রতি উৎকৃষ্ট মুক্তা ধারণই শ্রেয়; মুক্তা সোনার আংটিতে ধারণীয়। শ্বেতচন্দনে বেলপাতায় প্রতি বৃহস্পতিবারে আঠারো বার দুর্গানাম লিখে দেখুন, উপকার পাবেন। ● শ্রীশিবশঙ্কর সুর (তারাগুণিয়া) ---(১) এ বছরেই পাবেন; (২) কিন্তু আড়াই বছর ধৈর্য ধরে থাকুন। ● শ্রীসোমনাথ ব্যানার্জী (মৌড়ী, আন্দুল)---(১) আগামী বছর; (২) লেখাপড়ার চেষ্টা করুন। ●শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র (সার্কুলার রোড, হাওড়া)---আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে কিছু হতে পারে, কিন্তু আড়াই বছর বিশেষ ভাল নয়। কলাপাতায় নীল কালিতে প্রত্যেক শনিবারে দুর্গানাম লিখে দেখুন। ●শ্রী এস এন আচার্য (রাউরকেল্লা)---(১) জুলাই থেকে বর্ষকাল দেখুন এবং এর মধ্যে না হলে উভয়ের জন্মকুণ্ডলী বিচার করে প্রতিকার করুন; (২) আগামী বছর। ●শ্রীসুধানন্দ দাশ (মাষ্টারপাড়া, বালুর-ঘাট)---(১) কন্যা রাশি ও মিথুন লগ্ন; (২) বর্তমান বছরের কার্যকারণ দেখুন। ● শ্রীশোভনকুমার চক্রবর্তী

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সংগে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সংগে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সংগে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম- ....

ঠিকানা- ....

....

—মাসিক বসুমতী—

(আসাদপুর)---কন্যা লগ্ন, তুলা রাশি ও বিশাখা নক্ষত্র। বর্তমানে শনি অত্যন্ত অশুভ। ●শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (সদানন্দ রোড, কলিঃ)--(১) বর্তমানে আগামী মাঘ পর্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত; (২) কিছু ভাল হবে। ●শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত (চাকপাড়া, বালিকুরী)---(১) ধৈর্য ধারণ ছাড়া উপায় নেই; (২) দেড় বছর পর আর্থিক যোগাযোগের দিক থেকে সুযোগপ্রদ। ●শ্রীগোপীনাথ মিশ্র (ব্যাণ্ডেল)---(১) লটারীর যোগ নেই; (২) আড়াই থেকে তিন রতির মধ্যে উৎকৃষ্ট কনকক্ষেত্র ক্যাটস্ আই শাস্ত্রানুযায়ী পরীক্ষা ও শোধনাদি করে ধারণীয়। ●শ্রী জি এম মিশ্র (ব্যাণ্ডেল, হুগলী)---(১) দেড় বছর সকল কাজে সাবধান; (২) হবে, কিন্তু মনোনয়নে সতর্ক হওয়া উচিত। শ্রীমতী মীরা দেবী (অধ্যাপক, এস বি কাপ, হালিশহর)---(১) দেড় বছরের মধ্যে হতে পারে; আগামী বছরটা দেখুন। সময়টা গোলমেলে, সুতরাং প্রত্যেক কাজেই সতর্ক থাকা উচিত। ●শ্রী কার্তিকচন্দ্র নিয়োগী (পোলবা, হুগলী)---(১) স্ত্রী ও সন্তানাদি ভোগ করতে পারবে; (২) মালিকানা নিয়ে গোলযোগ হলেও ওদের ন্যায্য অংশ ঠিক থাকবে। ●শ্রীএ কে দত্ত (লামডিং) (১) চেষ্টা করুন; (২) উভয়ের জন্মতারিখ সময়াদি প্রয়োজন। ●শ্রীকাঞ্চন মিত্র (বিপিন পাল রোড, কলিঃ)--(১) সম্ভাবনা আছে; (২) বিয়াল্লিশ বর্ষ বয়সের পর। ●শ্রীমতী চম্পা চৌধুরী (রাজাপুর)---(১) বাধা রয়েছে, তবু জুন থেকে পাঁচ মাস চেষ্টায় সাফল্য আসতে পারে: (২) মোটামুটি ভাল। ●শ্রীপ্রদীপ সিং (পাঞ্জাব হিন্দু হোটেল, পানিহাটি) —(১) সম্ভাবনা আছে, (২) উভয়ের রাশিচক্র প্রয়োজন। ●শ্রীফণিভূষণ চ্যাটার্জী (ফুলবেড়িয়া)---(১) যে-কোন ব্যবসায়েই চলনসই হবে; (২) তিন বছর আর্থিক বিশেষ ভাল হবে না। ●শ্রীমতী মীনা ভৌমিক (সিদ্রি)---(১) কিছু ভাল হবে, কিন্তু তিন বছর সকল কাজে সাবধান; (২) ছেলেমেয়েদের মোটামুটি ভাল হবে। ●শ্রীপি বি চক্রবর্তী (সিন্ধ্রি)---(১) দেড় বছর লক্ষণীয়; (২) পরে ভালই হবে। ●শ্রীহীরেন ব্যানার্জী (বাঁকুড়া, মাচানতলা বাজার)---(১) বত্রিশ থেকে; (২) এখন বিশেষ ভাল নয়। ●শ্রীকমলেশ অধিকারী (মেমারী)---(১) সম্ভাবনা আছে; (২) মঙ্গল ও চন্দ্রের প্রতিকার আবশ্যক। ●শ্রীতরুণকুমার গুপ্ত (জগাছা, মহেন্দ্রকুটীর)---(১) জুন থেকে নয় মাস চাকুরীর ক্ষেত্রে সুযোগপ্রদ; (২) কোনো অ্যাপ্রেন্টিসশিপের চেষ্টা করুন। ●শ্রীমহুয়া (ধাধাসাত)---(১) দেড় বর্ষ মধ্যে নিজের মনোমত; (২) একই বছরে। ●শ্রীনাম ঘোষ (ভবানীপুর)---(১) আগামী মাসের মধ্যে নিশ্চিত কোনো খবর পাবার সম্ভাবনা; (২) পরিবর্তন আছে। ●কুমারী চুমকী (ভবানীপুর)---(১) শিক্ষিত ও মনোমত; (২) যোগ আছে। ●শ্রীমতী পূরবী (কলিকাতা)---(১) একটু দেরী; (২) সঠিক তারিখ দরকার। ●শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (সদানন্দ রোড, কলি)---(১) এখন থেকে নয় মাস দেখুন, (২) এখন বিশেষ অনুকূল নয়। ●শ্রীপ্রবীর কুমার চ্যাটার্জী (খড়গপুর)---(১) চাকুরীক্ষেত্রে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পরিবর্তনের সম্ভাবনা; (২) এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠা থাকবে। অষ্টমস্থ রবি এবং সপ্তমস্থ শুক্র-চন্দ্র স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল। ●শ্রীশৈলেশচন্দ্র মুখার্জী (সাউথ পার্ক, সন্তোষপুর)---(১) ভাল হবে; (২) তিন-চার রতি মুক্তা সোনার আংটিতে ধারণীয়। ●শ্রীতর্করাগীশ (বনহাটি)---(১) বর্ষকাল ধৈর্য ধরতে হবে। পরে ভাল। ●শ্রীমতী অরুণা ব্যানার্জী (সরখেলপাড়া, বালী)---(১) কুম্ভ রাশি ও কর্কট লগ্ন; (২) দেড় বছর মধ্যে হতে পারে। ●শ্রীমতী (লাকুড়িয়া)---(১) এখন থেকে উনিশ মাস মধ্যে; (২) মনোমত। ●শ্রীবিবেককুমার মান্না (নেপাল ভট্টাচার্য ষ্ট্রীট, কলিঃ)---(১) পালোন্নতির যোগ, কিন্তু প্রত্যেক কাজে সাবধান, (২) সাঁইত্রিশ বর্ষ বয়সের পরে। ●শ্রীব্যোমকেশ (বরুয়া, বেলডাঙ্গা)---(১) তিন বছর ধৈর্য ধরে কাজ করুন; (২) উন্নতি হবে। ●শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু (কুলপুকুর লেন, চুঁচুড়া)---আগামী মার্চ থেকে ভাল; (২) আগামী এপ্রিলের মধ্যে। ●শ্রীনলিনবিহারী দত্ত (রামমোহন মুখার্জী লেন, শিবপুর)---(১) চিন্তা নেই; (২) সাহায্য পাবেন। শ্রীফণিভূষণ সাহা (কে এম শা ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর)---চিত্রানক্ষত্র, তুলা রাশি ও তুলা লগ্ন। ●শ্রীএ কে রায় (গরচা ফার্স্ট লেন, কলি)---(১) আগামী বছর উন্নতি হতে পারে; (২) মুক্তা তিন-চার রতি সোনার আংটিতে। ●শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল (শম্ভুনগর)---(১) বৃশ্চিক রাশি, অনুরাধা নক্ষত্র ও বৃশ্চিক লগ্ন, (২) আগামী পৌষ থেকে চেষ্টা করুন। ●শ্রীসুনীলকুমার প্রামাণিক (শান্তিপুর)---কন্যা রাশি, নরগণ ও কুম্ভ লগ্ন। ●শ্রীভাগ্য দর্শী (রাজা বসন্ত রায় রোড, কলি)---(১) বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষার মান জানতে পারলে প্রোফেশন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া চলে; (২) সুপরিবর্তন হবে। ●শ্রীমতী ইন্দুবালা পাল (সোদপুর)---(১) পরে ভাল হবে। শাঁখের আংটি ও ছয়রতি রক্তমুখী প্রবাল ধারণ করিয়ে দেখুন, (২) মেষরাশি। ●শ্রীইন্দ্রনাথ সামন্ত (ভঁড়ি পুষ্করিণী, ইন্দাস)---(১) মেষ রাশি, (২) সময় গোলমেলে, একটু ধৈর্য ধরে চলুন, পরে চাকুরী হবে। ●শ্রীলীলাপ্রকাশ ভট্টাচার্য (মদন মিত্র লেন, কলি)---(১) ব্যবসায় হবে, (২) দু'বছর কোনো কাজেই বিশেষ অনুকূল হবে না। ●শ্রীএকক (কলিকাতা)---(১) হবে; (২) নয়মাস দেখুন। ●শ্রীবিবেককুমার মান্না (নেপাল ভট্টাচার্য ষ্ট্রীট, কলি)---(১) আট রতি রক্তমুখী প্রবাল, (২) এখন দু'বছর যা সহজ হয়, তাই করুন। অনুকূল সময় আসেনি।

খেলাধুলা

ফুটবলের দৈন্যদশা

বাঙলা দেশে ফুটবল যে ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা সে বিষয়ে বর্তমানে নিশ্চিত করে বলা চলতে পারে। তা না হলে যে কোন চ্যারিটি ম্যাচই হোক না কেন দলে দলে যুবা-বৃদ্ধ ছুটে যায় সেহ খেলা দেখার জন্য। খেলা প্রাণহীন কি প্রাণবন্ত হবে সে বিষয়ে কোন চিন্তা না করেই দু'দিন আগে থেকেই মাঠের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। এর ওপর বাইরে থেকে বিদেশী কোন টীম এলে তো কথাই নেই। সমস্ত শহরটা যেন সেখানে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু গাঁটের কড়ির বিনিময়ে তারা পায় কি ? পায় কিছুটা ধস্তাধস্তি আর ইঁটপাটকেলের সঙ্গে নৈরাশ্যময় অভিজ্ঞতা। খেলোোয়াড়দের এ চিত্র শুধু ঘরের মধ্যেই নয়, ঘরের চৌহদ্দি পেরিয়ে মার্ডেকা প্রতিযোগিতাতেও আমরা সেই একই ছবি দেখতে পাই। বছর বছর খুব জাঁকজমক করে টীম যায় আর প্রথম খেলা থেকেই হারতে শুরু করে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এতবড়ো দেশের ফুটবলের সামগ্রিক মান আজ হঠাৎ এক এমনই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে থমকে দাঁড়াবার কারণ কি ? সেখান থেকে এগোবার শক্তি যেন আর নেই। ফুটবলের এই কঙ্কালসার চেহারা কেউ কোনদিন দেখেছে বলে মনে হয় না। অথচ আগে এই ফুটবলকে

কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার একটি দৃশ্য

নিয়ে কত না গর্ব আমরা করেছি! যদিও তখন ফুটবলে শরীরই ছিল প্রধান পক্ষ, মন কাজ করতো অলক্ষ্যে। আজ বিশ্বের চতুর্দিকে তার চেহারা পাল্টেছে। আজ মন চলছে সবার আগে 'স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে।' পূর্বেকার খোলস ছেড়ে নতুন আঙ্গিকে সেজেছে। খেলা হয়েছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। কিন্তু তবু আমাদের দেশের মান সম্পূর্ণ অধোগামী। উপযুক্ত হয়ে ওঠার কোন চেষ্টা নেই। বিদেশী-দের সঙ্গে খেলার মোহ আছে, কিন্তু তাদের আন্তরিকতার প্রতি আমাদের লক্ষ্য নেই। তাদের উন্নত ধরনের প্রথা-প্রকরণ শেখারও আমাদের আগ্রহ নেই। আজ আমাদের ফুটবলের দৈন্যদশা দেখে তাই সুস্থ সৎক্রীড়া-মোদী জনসাধারণের দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কি বা থাকতে পারে। এই তো গত কয়েক বছরের মধ্যে কতগুলি বিদেশী টীম খেলে গেল। বিরাট নামডাকওয়ালা তারা কেউই নয়। টীমের দিক থেকে তাদের 'নাবালক' বলা যেতে পারে। কিন্তু কি নয়নভোলানো খেলা। চমৎকারিত্বে যেন মন কেড়ে নেয়। অনুশীলনে ও অভ্যাসে তাদের কত একাগ্রতা। খেলোয়াড়দের পায়ে বলটি যেন আত্মসমর্পণ করতেই ব্যস্ত। বোঝাবুঝিতে এতটুকু ভুল নেই। খেলা চলে কখনও দ্রুত লয়ে, কখনও মন্থর-গতিতে। জোরে শট্ মেরে বা অনর্থক দৌড়াদৌড়ি করে তারা শরীরকে অহেতুক কষ্ট দেয় না। আধুনিক ফুটবলের ব্যাকরণ যেন তাদের অধীগত। সব মিলিয়ে ওদের ভূমিকা সৃজনধর্মী। সক্রিয় চিন্তার আশীর্বাদে ছোট বড় পায়ের ও শরীরের কাজ শিল্পের পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা? বড় বড় দল আছে কিন্তু বড় খেলোয়াড় তারা তৈরি করে না। তৈরি খেলোয়াড়দের হাতাতেই তারা ব্যস্ত। নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্র চালু রেখে খেলোয়াড় গড়ে তোলার সঙ্গতি এদের আছে কিন্তু যা আসল জিনিষ সেই উদ্যম বা নিষ্ঠা এদের নেই। যা আছে তা হল দুর্নীতি। তারই চাপে মাঠের চরিত্র আজ যেতে বসেছে। সেই সঙ্গে জাতীয় চরিত্রও যেতে বসেছে। কিন্তু ফুটবলের কর্মকর্তাদের সে চরিত্র সংশোধনের কোন চেষ্টাই নেই যেন। কাজেই স্বখাত সলিলে তলিয়ে যাওয়ার রাস্তা যে ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ কি। আজ তরুণদের মধ্যে সামর্থ্যের এমন যে ঘাটতি তারও জন্যে দায়ী তাঁরাই। কারণ ঘাটতি পূরণে সহজ ও স্বাভাবিক যে পথ সে পথ মাড়াতে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আগ্রহ নেই। ট্রেনিং, কোচিং, প্রশিক্ষণের যতো হাঁক-ডাক আছে সেই অনুপাতে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। আসল কাজে ভেজাল মিশে রয়েছে। জনসাধারণের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা দিয়ে অনেকে বিদেশ থেকে কোচ হয়ে দেশে ফিরছেন। বিভিন্ন শিক্ষণ শিবির চালু করার কাহিনীও শোনা যায়। কিন্তু সব মিলিয়েও নতুন খেলোয়াড়দের আবির্ভাবের পথ, নতুন সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রকে সুগম করে তোলা আজো সম্ভবপর হল না। তাই আবার জিজ্ঞাস্য আমাদের এ দৈন্যদশা কবে ঘুচবে, কবে আমরা ফুটবলের সহজ স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারবো? কবে বলতে পারবো বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত টীমের পাশাপাশি দাঁড়াবার মত মূলধন আমরাও আজ সংগ্রহ করতে পেরেছি?

—ক্রীড়ারসিক

কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার একটি দৃশ্য

আপ্পারাও

ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘ চুয়াত্তর বছরের ইতিহাসে যিনি সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার'-এর মর্যাদা লাভ করেছেন, যাঁর মতন কীর্তিমান খেলোয়াড় আজো ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নি—তিনি হলেন আপ্পারাও। তাঁর নয়নাভিরাম মনোমুগ্ধকর খেলা যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই তাঁর প্রেমে মুগ্ধ হয়েছেন। দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা মাদ্রাজ যখন যেখানে খেলতে গেছেন, সেখানেই অগণিত দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ইউরোপেও খেলতে গিয়ে বিদেশীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। স্বয়ং ডেনিস কম্পটন কলকাতায় খেলতে এসে আপ্পারাওয়ের খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। তাঁর মতে, আপ্পারাও এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার তো বটেই, ইউরোপে জন্মালে তিনি পেশাদারী ফুটবলে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারতেন।

উনিশশো এগারো সাল ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছরেই প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে মোহনবাগান প্রথম আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে। এই বছরেই এক কিশোর প্রথম পৃথিবীর আলোর স্পর্শ লাভ করে, যিনি ভারতীয় ফুটবলের সমস্ত রেকর্ড একে-একে ভেঙ্গে তছনছ করে দেন, বৃদ্ধি করেন ভারতীয় ফুটবলের মর্যাদা। সেদিনের সেই কিশোরই হলেন মদিনীপল্লী আপ্পারাও। দক্ষিণ ভারতের কাকীনাদে ১৯১১ সালের ১১ই মার্চ শনিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বুলাকু। শিক্ষা লাভ করেন পিতাপুর স্কুল থেকে এবং ফুটবল খেলার শুরুও সেখান থেকেই। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের আই এস এফ সি ক্লাবের নিয়মিতভাবে খেলে সাউথ ইণ্ডিয়ার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ট্রফির সঙ্গেই ফটো তোলার সৌভাগ্য লাভ করেন অর্থাৎ জয় করেন। প্রথম তিনি কলকাতায় আসেন ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চার বছর কালীঘাট ক্লাবের পক্ষে খেলেন এবং প্রথম আবির্ভাবেই 'এলাহাবাদ কাপ' জয় করেন। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত একটানা পনেরো বছর খেলেন ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে।

নিজেই নিজের শিক্ষাগুরু। 'ইস্টবেঙ্গল দলের এ-যুগের মহাগৌরব, স্তম্ভের প্রধান স্থপতি আপ্পারাও'।--- বলেছেন আরবি। ধীর, শান্ত, নম্র, চমক নেই; কিন্তু এমন কার্যকরী খেলা, আক্রমণকে এমন হু হু করে এগিয়ে দেবার ক্ষমতা আর কারো মধ্যে দেখা যায় নি এ-যুগে। নিজে গোল করার চেষ্টা নেই, কিন্তু অন্যকে গোল করবার সদর রাস্তা খুলে দেবেই সে বার বার। আর এমন ক্লাব-প্রীতি যে, বার বার অবসর নিয়েও এই পক্বকেশ প্রবীণ ক্লাব থেকে আহ্বান গেলেই সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতেন।

আপ্পারাও-এর যোগদান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একটা বিশিষ্ট সম্পদ লাভ বলা চলে। আপ্পারাও-এর যোগদানের পরই টিম-ওয়ার্ক অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে টিমটি সুষ্ঠু পরিচালনার ফলে দলের জয়ের পথ সুগম হয়ে ওঠে। প্রথম বছরেই লীগে 'রানার্স আপ' লাভ হয়। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ্ হমেডান স্পোর্টিং ক্লাব পেলেও লীগের শেষ খেলায় মহমেডান দলকে ৩-২ গোলে ইস্টবেঙ্গল টিমের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। আপ্পারাও ও সোমানা বিপক্ষের রক্ষণব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। আপ্পারাও - ফটিক সিং, আপ্পারাও - চিট্টুকর, আপ্পারাও ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও - সোমানা, আপ্পারাও - নায়ার বা আপ্পারাও-পাগসলী সব জুটিই বিস্ময় ও ভীতি সৃষ্টি করেছে প্রতিপক্ষ দলের। দারুণ জল-কাদার মধ্যেও তাঁর প্যান্টে ছিটেটুকুও লাগে নি কোনদিন। সারা মাঠেই বলের সঙ্গে সঙ্গে আপ্পারাও অথচ কোন হাঁকপাঁক নেই। বল পেয়েই সবাইকে কাটিয়ে একেবারে

গোলকীপারের মুখোমুখি। কিন্তু গোলকীপার যখন তাঁর শট রুখতে তৈরী ঠিক সেই সময়ই টুক্ করে হয়তো বল ঠেলে দিয়েছেন পাশের কোন খেলোয়াড়কে। ১৯৪২ সালেই তিনি তাঁর গৌরবময় অধ্যায় শুরু করেন। এই বছরেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আপ্পারাও-সোমানা-সুনীল ঘোষ এই ত্রয়ীর জোরে আই, এফ এ-র প্রথম বিভাগীয় লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ্ ও আই, এফ, এ শীল্ডের 'রানার্স - আপ' লাভ করে। 'কুচবিহার কাপ' এবং কাঁচরাপাড়ার 'গিরিশ - শীল্ড'ও লাভ করে। ১৯৪৩ সালেও লীগে 'রানার্স - আপ' এবং 'শীল্ড বিজয়ীর' গৌরব লাভ করে ইস্টবেঙ্গল দল। ফাইনালে পুলিশ দলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়। আপ্পারাও-ই প্রথম গোলটি করেন।

১৯৪৪ সালে কোন কারণে তিনি ও সোমানা ছাড়পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে ভবানীপুর ক্লাবে যান বটে, তবে ভবানীপুরের হয়ে কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নি। লীগের শেষে ক্লাবের আহ্বানে আবার ফিরে আসেন এবং শীল্ডে দুর্ভাগ্যক্রমে বি এণ্ড এ রেল দলের কাছেই ১-০ গোলে হেরে 'রানার্স -আপ' লাভ করে দলের মান রাখেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৩ সালে এই দলই শীল্ডের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে ৭-১ গোলে পরাস্ত হয়েছিল।

১৯৪৫ সালে একসঙ্গে আই-এফ-এ লীগ ও শীল্ড উপরন্তু 'কুচবিহার কাপ' ক্লাব তাঁবুতে আসে। পর পর চার বছর শীল্ড ফাইনাল খেলার যোগ্যতা লাভ করার পুরস্কার স্বরূপ ১৯৪৬ সালে তিনি দলের অধিনায়ক পদে মনোনীত হন। পনেরোই আগষ্ট ফাইনালে মহমেডান দলকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল 'গ্রীফিথ শীল্ড' লাভ করে এবং লীগেও কৃতিত্বের সঙ্গেই চ্যাম্পিয়ানশিপ্ লাভ করে। ১৯৪৭ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে শীল্ডের খেলা পরিত্যক্ত হয়। ইস্টবেঙ্গল দল 'অল ইণ্ডিয়া ফুটবল টুর্ণামেণ্টে' যোগ দেবার জন্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে যায়। সেখানেও আপ্পারাওয়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় ইস্টবেঙ্গল দল ফাইনালে দিল্লী ইউনিয়ন টিমকে ৩-০ গোলে হারিয়ে 'ট্রফি' জয় করে। ১৯৪৭ সালে তিনিই শীল্ডে সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলে দলকে ফাইনালে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফাইনালে খেলার সুযোগ পান নি। ফলে দলও ১-০ গোলে হেরে যায় মোহনবাগানের কাছে। 'রানার্স - আপ' পায় ইস্টবেঙ্গল দল।

সাধারণত প্রত্যেক খেলোয়াড়ই জোয়ান বয়সে ভালো খেলেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খেলা অবনতির দিকে যায়। কিন্তু আপ্পারাও-এর বেলা ঠিক তার উল্টো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য আরো যেন ফুটে উঠেছে। ১৯৪৯ সালে যখন ইস্টবেঙ্গল দল একসঙ্গে আই এফ এ লীগ, আই এফ এ শীল্ড ও রোভার্স কাপ জয় করে ত্রি-মুকুট লাভের গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে, তখন আটত্রিশ বছর বয়স্ক আপ্পারাওই ছিলেন দলের স্তম্ভ-স্বরূপ। আবার পঞ্চাশ সালেও তাঁরই নৈপুণ্যে ইষ্টবেঙ্গল দল একসঙ্গে আই এফ এ লীগ, আই এফ এ শীল্ড ও দিল্লী ক্লথ মিল তিনটি ট্রফি জয় করে।

পাঁচবার আই এফ এ শীল্ড জয়, আটবার শীল্ড ফাইনাল খেলার যোগ্যতা লাভ ও তিনবার লীগ বিজয়। তাছাড়া ডুরাণ্ড কাপ, রোভার্স কাপ, কুচবিহার কাপ, দিল্লী ক্লথ মিল ট্রফি বিজয় প্রভৃতি মিলিয়ে তিনি যত পুরস্কার লাভ করেছেন, সম্ভবত ভারতীয় অন্য কোন ফুটবলারের পক্ষেই তা' সম্ভব হয় নি। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনেও এমন কীর্তিমান ফুটবলারের সংখ্যা খুব বেশী নেই।

১৯৫৩ সালে ইউরোপের রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্টে 'বিশ্ব যুব - উৎসব' উপলক্ষে যে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন হয় তাতে ভারত থেকে ইস্টবেঙ্গল দল আমন্ত্রিত হয়। সেই দলের সঙ্গে দলের বয়োজ্যেষ্ঠ বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক আপ্পারাও বুখারেষ্ট, মস্কো, জর্জিয়া, কিয়েভ ও পুনরায় মস্কো ভ্রমণ করেন। সেখানেও তিনি তাঁর অনুপম খেলায় দর্শকচিত্ত জয় করতে পেরেছিলেন।

আপ্পারাও-এর স্মরণীয় খেলাগুলির মধ্যে ১৯৪৮ সালে চীনা অলিম্পিক একাদশ বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলাটিও উল্লেখযোগ্য। এই খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল ২-০ গোলে জয়ী হয়। গোলদাতা ছিলেন আপ্পারাও ও সালে। পাগসলীর অধিনায়কত্বে যে বার্মা একদশ ভারত সফরে এসেছিল, আপ্পারাও সে দলের বিরুদ্ধেও খেলার যোগ্যতা লাভ করেন। শেষোক্ত দুটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল জয়ী হতে না পারলেও সেদিন আপ্পারাও-এর নৈপুণ্যেই দল বেশী গোলে পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পায়।

১৯৫৫ সালে ৪৪ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। একটানা উনত্রিশ বছর প্রথম ডিভিসনে খেলে তিনি গোষ্ঠবাবুর পঁচিশ বছরের ভারতীয় রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।

—শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোর

শ্রীমোহনানন্দ গুপ্ত

আলো ফোটে,
আকাশের রঙ
অপরাজিতার মত নীল।
মাঠে মাঠে ঘাসে ঘাসে
কণা কণা শিশিরের ঢেউ।
সূর্যের রাঙা আভা
রেণু রেণু ছড়িয়ে পড়েছে
ঘুমভাঙা পৃথিবীর বুকে।
পাখি ডাকা মেঠো পথ বেয়ে
চলেছি এগিয়ে—
দু'চোখে কুয়াশা।
ভয়াবহ শূন্যতা ছড়িয়ে পড়েছে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।
সময়ের নাড়ি কেটে
এলোমেলো পায়
একফালি হাওয়া বয়ে যায়।
ভোর হয়।

মহাকবি শেক্সপীয়র বলেছিলেন "সারা পৃথিবীটাই একটা রঙ্গমঞ্চ।" কথাটা যে খুবই ঠিক, আজকের যুগে একথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে। নাট্য-চেতনা আজকের জনমানসে যে খুব প্রবল হয়ে উঠেছে, একথা বোধ করি কাউকে নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। বিশেষ করে বাঙ্গালীদের সম্পর্কে একথা বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রযোজ্য। নবনাট্য আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলা দেশে। কত অপেশাদার নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছে ও উঠছে। কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে নাটক নিয়ে। বিষয়বস্তু, প্রয়োগকৌশল, অভিনয়ধারা, মঞ্চস্থাপনা কোনক্ষেত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘাটতি নেই। অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীসমূহের প্রযোজিত নাটক দেখবার জন্য বাংলার নাট্যরসিক দর্শককুল প্রেক্ষাগৃহের দরজায় দরজায় ধরনা দিচ্ছেন। তাঁরা দলে দলে ভিড় করছেন মুক্তাঙ্গনে বা সেইসব প্রেক্ষাগৃহে, যেখানে এসব নাটকের অভিনয় চলছে।

তবে এজন্য কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, পেশাদার মঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এর ফলে। আসল কথা হচ্ছে, পেশাদার রঙ্গালয়গুলিতেও দর্শকদের ভিড় আদৌ কম নয়। এর কতকগুলি কারণ তো সহজেই উপলব্ধি করা যায়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে একদিকে যেমন রয়েছে নামী-দামী তারকাদের আকর্ষণ, তেমনি রয়েছে মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতের কৌশলে দর্শক-মনে তাৎক্ষণিক তৃপ্তিদানের ব্যবস্থা। পেশাদার রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের আর্থিক স্বচ্ছলতা অপেক্ষাকৃত অধিক বলে এসব দিকে তাঁরা দৃষ্টি দিতে পারেন। ফলে, দর্শক আকর্ষণ করাও তাঁদের পক্ষে অনেক সহজ হয়।

অন্যদিকে দর্শকেরা অপেশাদার নাটক দেখতে ছোটেন নতুন কিছু পাওয়ার আশায়। সেখানে মঞ্চকৌশল নেই, যান্ত্রিক কলাকৌশলের কেরামতিও নেই, বিপুল ব্যয়ে চোখধাঁধানো মঞ্চসজ্জা নেই, সবার ওপরে নামকরা পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দর্শন পাওয়ার আকর্ষণও নেই। কিন্তু যা আছে তার মূল্য বুদ্ধিজীবী শিল্প-রসিকের কাছে অনেকখানি। সেখানে অভিনয়ের ধারা পৃথক, নাটকের বিষয়-

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বস্তু ও আঙ্গিক পৃথক, সমগ্র নাটকের উপস্থাপনার মধ্যেই রয়েছে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

'রশোমন' নাটকে [illegible] শিল্পী

অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী ও নবনাট্য-আন্দোলন যে বাংলার নাট্যক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে তাতে কোন ভুল নেই। এই আন্দোলনে বাংলার যুবজনের দান প্রভূত।

এদেশে যেমন, তেমনি আজকের আমেরিকার তরুণ-জগৎ সম্পর্কেও একথা সমান সত্য। আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায় পেশাদার অভিনেতৃদের নাটক দেখবার জন্য তো ভিড় করছেই, নাটক

নাট্য আন্দোলনে ঃ তরুণ ও যুবা

সুতরাং বলা যেতে পারে, বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে দু'টি পৃথক ধারা আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। তবে ও অভিনয়ের দিকে তাদের আগ্রহও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, তারা নিজেরাই এখন নাটক অভিনয়ে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে।
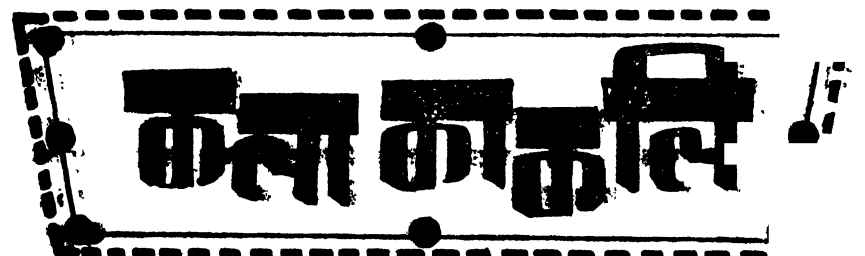
'দি ক্রিমিনাল্‌স' নাটকের একটি দৃশ্য

তারা নাট্যসংস্থা গড়ে তুলেছে। নাটক অভিনয় করছে পল্লীতে-পল্লীতে।

নাটক ও অভিনয়ের প্রতি তরুণদের এই আগ্রহ লক্ষ্য করে আমেরিকায় এখানে-ওখানে এখন অসংখ্য নাট্য-শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কিশোর ও তরুণদের মধ্যে যে শিল্পক্ষমতা সুপ্ত রয়েছে, এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে তাকে উদ্দীপিত করবার চেষ্টা করা হয়। সুপ্ত প্রতিভাকে বিকাশের পথ করে দেওয়া হয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তরুণদের সুযোগ অল্পই। তাই এই শিক্ষাকেন্দ্র-গুলি তাঁদের সামনে সে সুযোগ তুলে ধরবার চেষ্টা করছে।

ওয়াশিংটন শহরে একটি নাট্য-সংস্থা তরুণদের নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যকলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বেশ অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে। সংস্থাটির নাম ওয়াশিংটন থিয়েটার ক্লাব। এখানে কিশোর ও তরুণদের অভিনয়, নাট্যকলা, মঞ্চ-স্থাপনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

নাটক পরিচালনা ও প্রযোজনাও শিক্ষা দিয়ে থাকেন এই ক্লাব। এ ছাড়া আরও বহু সংস্থায় এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ক্লীভল্যাণ্ড প্লে হাউসে একটি যুব নাট্যমঞ্চ রয়েছে। এখানে শুধু যে অভিনয়কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় তা নয়, এখানে মঞ্চসজ্জা, মঞ্চে চলাফেরাকালে শরীর নিয়ন্ত্রণ, অভিনেতার শব্দ প্রক্ষেপণ কৌশল, সাজসজ্জা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নাট্যকলা ও নাট্যরস উপলব্ধির উপযোগী করে যুবমনকে প্রস্তুত করে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী বিদ্যালয় এবং শহরের সরকারী লোকরঞ্জন বিভাগ-গুলিও তরুণদের দ্বারা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। এই সূত্রে এই বিভাগগুলি তরুণ শিল্পীদের নাট্যশিক্ষাও দিয়ে থাকে।

এসব শিক্ষার সুফল দেখা গেছে সম্প্রতি কিছুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত ব্রড-ওয়ের সবচেয়ে স্মরণীয় 'টোনি পুরস্কার' বিতরণী উৎসবে। বিভিন্ন বিষয়ে যখন পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছিল, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ সন্ধ্যাটা বুঝি ছিল তরুণদেরই। তরুণ শিল্প-প্রতিভাদের খুঁজে বার করাই এই পুরস্কার বিতরণী ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। সে দিক থেকে এর সাফল্যও অনস্বীকার্য।

ওরেন বেকাল, কেন হাওয়ার্ড, ব্লিথ ড্যানার এমনি কয়েকটি অভিনয়-সফল নাম।

কলেজ নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনীত নাটকগুলি সত্যিই এখন যুক্তরাষ্ট্রের মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে এক বিশেষ শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

গত বছর এমনি সময়ে ওয়াশিংটনে প্রথম কলেজ নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন কলেজ থেকে ১০টি নাটুকে দল এই উৎসবে প্রতিযোগিতা করেছিল। প্রবীণা অভিনেত্রী পেগী উড এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন।

তবে জাতীয় কলেজ নাট্যোৎসব পরিকল্পনাটি কিন্তু মিস উডের মস্তিষ্ক-প্রসূত নয়। ১৯৬৩ সালে এই ধরনের একটি পরিকল্পনা জন কেনেডি শিল্প-কেন্দ্রের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রবার্ট ডাউলিং-এর মাথায় আসে। পরের বছরই তিনি মার্কিণ জাতীয় নাট্যমঞ্চ ও আকাদমীর কাছে এই উৎসবের প্রস্তাব দেন। মিস উড তখন আকাদমীর প্রেসিডেণ্ট। আমেরিকার সকল অঞ্চলে নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিণ কংগ্রেস ১৯৩৫ সালে এই আকাদমীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উৎসবের প্রস্তাবটি আকাদমী সোৎসাহে গ্রহণ করল।

প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল মোট ১৭৬টি কলেজ নাট্যসম্প্রদায়। আঞ্চলিকভাবে বিচার করে প্রাথমিক দফাতেই অবশ্য এদের অধিকাংশকেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক বিচারে যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছিল মাত্র ৩২টি দল। এদের মধ্যে আবার মাত্র ১০টি দল বিজয়ী বলে ঘোষিত হল।

কলেজ নাট্যমঞ্চ এখন অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এখন ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে অসংখ্য আধুনিক, সুন্দর নাট্যমঞ্চ ও নাট্যালয়।

প্রথম কলেজ নাট্যোৎসবে যে সকল নাটক দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল 'রশোমন' তাদের অন্যতম। নাটকটি উপস্থাপন করেছিল নিউ ইয়র্কের হফস্

মেঘ ও

—দেহ
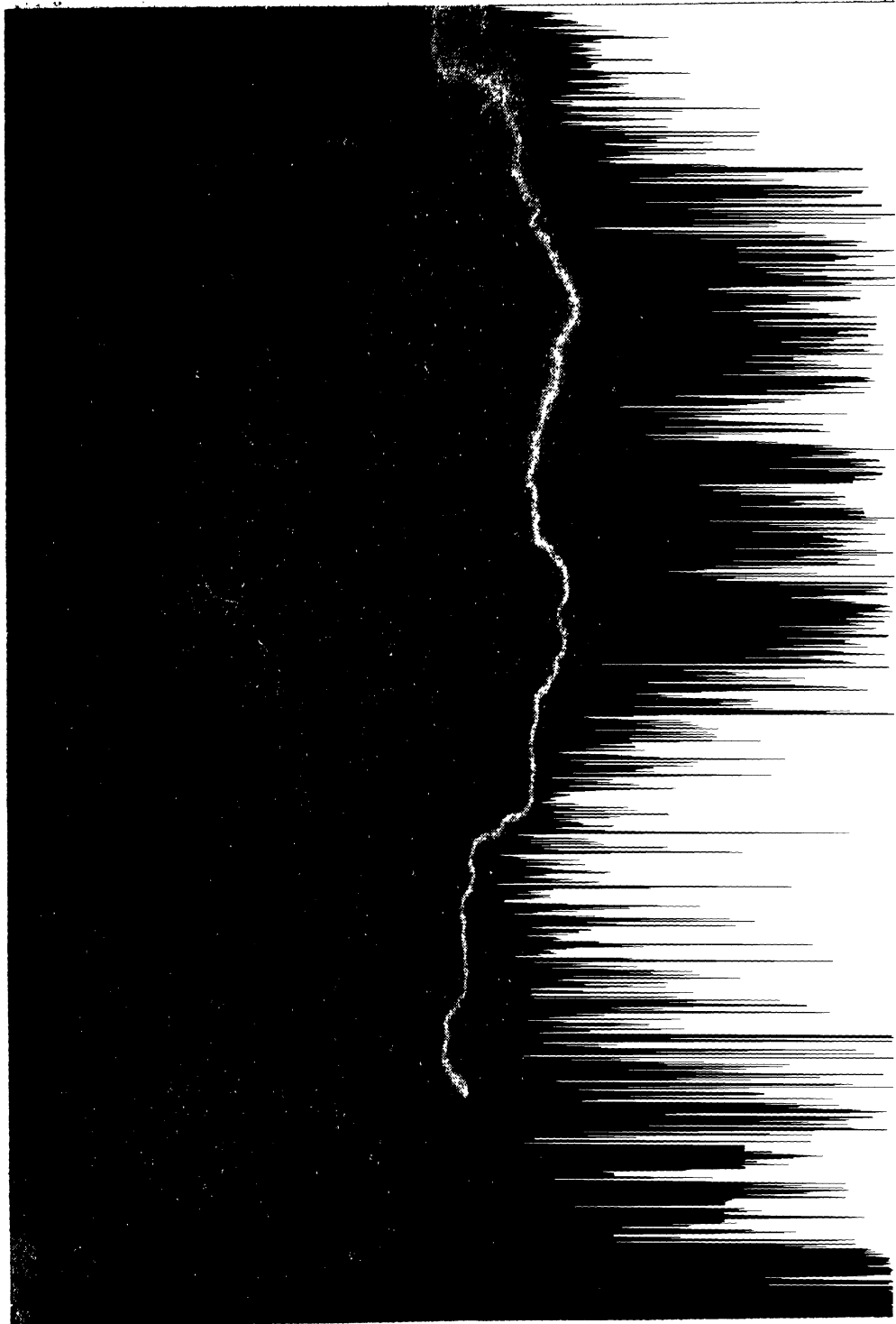
আলোকচিত্র

মাসিক
বসুমতী
ভাদ্র ১৩৭৭ ॥

শিকারের সন্ধানে
—বিশ্বরূপ সিংহ

মাসিক বসুমতী ভাদ্র ॥ ১৩৭৭ ॥

অরণ্য শিকার
—হিমাংশু মৌলিক

মাসিক

বসুমতী

॥ ভাদ্র ১৩৭৭ ॥

স্নেহ
—প্রদীপ সেন
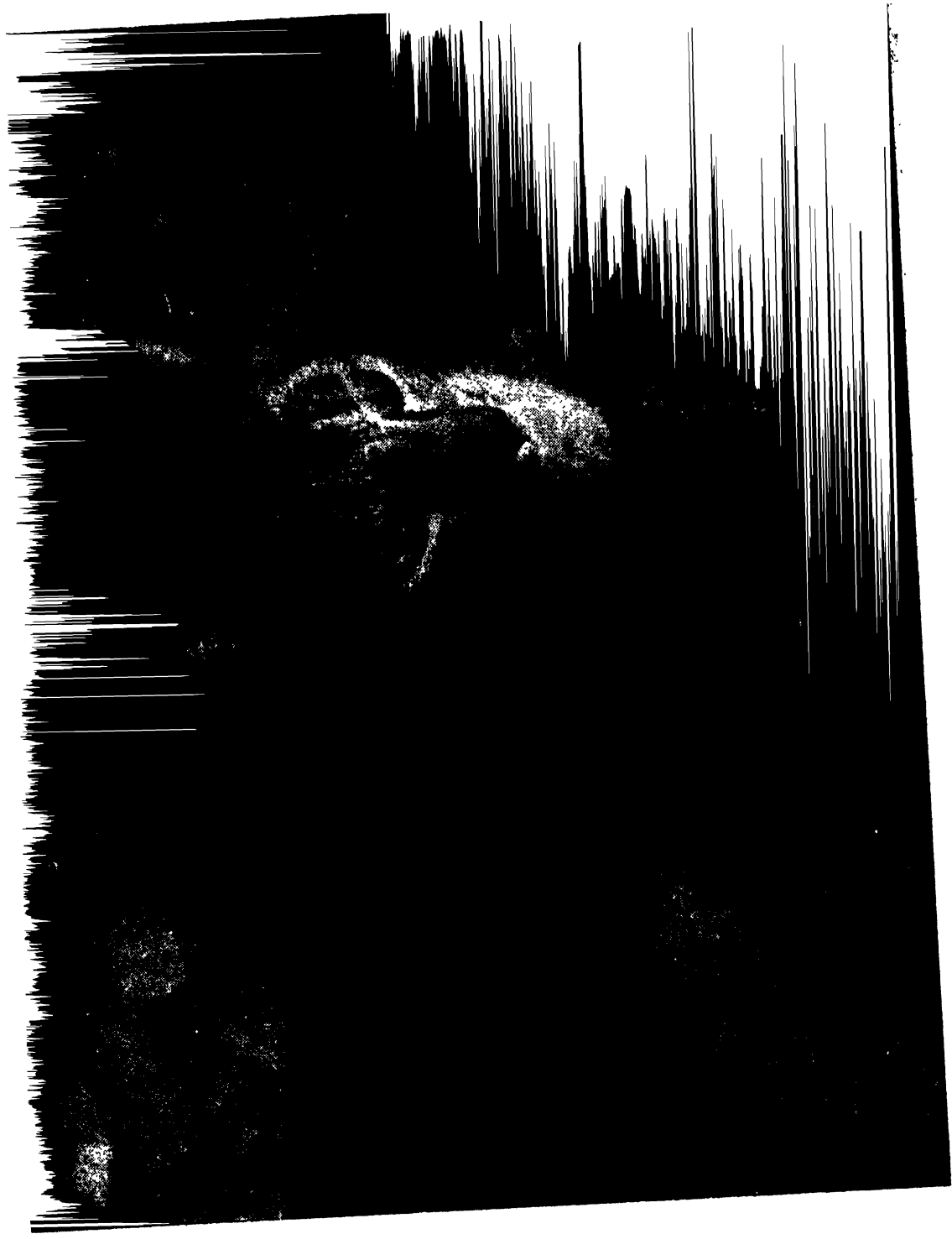
বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা ও নাট্য বিভাগ। সেই বিখ্যাত জাপানী গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ফে ও মাইকেল কানিন। জাপানী গল্পটির উপজীব্য হল সত্যের সন্ধান। এই নাটকের অভিনয়ে কলেজের ছাত্র-অভিনেতৃবর্গ প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যাণ্ডিটের ভূমিকায় কার্ল পিলো যে চমকপ্রদ অভিনয়চাতুর্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তা পেশাদার অভিনয়কেও ম্লান করে দিয়েছিল।

লস এঞ্জেলেস সিটি কলেজের নাট্যদল 'দি ওয়ে অব দি ওয়ার্ল্ড' মঞ্চস্থ করে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দান করেছেন। পেনসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল অভিনয় করেছিলেন মলিয়েরের 'দি মাইজার', আর উত্তর ক্যারোলিনা স্কুল অব দি আর্টস উপস্থাপন করেছিলেন গোল্ডস্মিথের অমর কমেডি 'শী স্টুপ্স টু কনকার।' এই শেষোক্ত নাটকটিতে অভিনেতাদের মধ্যে একটি পরিচিত নাম ছিল কার্ট ইয়াগজিয়ান। মাত্র ২০ বছর এর বয়স। আট বছর আগে সে একটি টেলিভিশন অপেরার নাম-ভূমিকায় গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর।

এ ছাড়া আরও কত নাটকই নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। নাটকগুলি অবশ্য প্রখ্যাত নাট্যকারদেরই লেখা। ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দি পিপ্‌ল,' এলমার রাইসের 'দি অ্যাডিং মেসিন,' কিউবার নাট্যকার জোস ট্রায়ানেনর 'দি ক্রিমিনালস্' প্রভৃতি নাটকের নাম বিশেষভাবে করতে হয়।

এক কথায় বলা যায়, আমেরিকার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নাট্য উৎসবের এই প্রথম অনুষ্ঠানটিই বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং নাট্যক্ষেত্রে তরুণদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

এমনিভাবে যুবজন এগিয়ে চলেছে নাট্যাভিনয়ের জগতে। তারা নাটক রচনা শিখছে, অভিনয়কলা শিখছে, নাটক মঞ্চস্থ করার অন্যান্য আঙ্গিকেও তারা শিক্ষাগ্রহণ করছে। পেশাদার কৃতী অভিনেতৃ ও নাট্যবিদদের পাশাপাশি তরুণ ও যুবকদের অবদানও নাট্যজগৎকে সমৃদ্ধ করে তুলছে।

জ্যোৎস্না বিশ্বাস—একটি বিশেষ ভঙ্গিমায়
চিত্র : বিশ্বনাথ গোস্বামী

আমাদের দেশেও উদ্যোগটা এত জোরদার না হলেও তরুণেরা নাট্যক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য নিঃসন্দেহে এগিয়ে এসেছেন। অপেশাদার নাট্য সম্মেলন ও নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নাট্য প্রতিযোগিতাও মাঝে মাঝে চলছে। তবে কলেজ পর্যায়ে নাট্যোৎসব এখনও হয় নি। আন্তঃকলেজ আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার প্রচলন রয়েছে বহুকাল থেকে। এবার আমেরিকার ধরনে আন্তঃকলেজ নাট্য প্রতিযোগিতা ও নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

'টাইগার এ্যাট দি গেটস' নাটকের একটি দৃশ্যে কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদল

(শেষাংশ)

এই তিনজনের একজন কাঠুরে, একজন ভৃত্য ও অপরজন বৌদ্ধ শ্রমণ। একটু আগে বনের মধ্যে যে খুন হয়ে গেছে কাঠুরের মন সেই ঘটনায় চঞ্চল, চারিদিকে বন-জঙ্গলে ঘেরা পথের মধ্যে দিয়ে চলেছে শ্রেষ্ঠী ও তার স্ত্রী। হঠাৎ তারা উভয়ে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়। স্ত্রীর ওপর ব্যভিচার করে ডাকাতেরা। তারপর শ্রেষ্ঠীকে একটি তরবারি দিয়ে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বধ করে। এদিকে শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী সেই সুযোগে পলায়ন করে। পরে ডাকাতরা থানায় গিয়ে তাদের দোষ স্বীকার করে. কাঠুরে কিন্তু শুনেছিল অন্যরকম। লাঞ্ছিতা স্ত্রী চেষ্টা করেছিল স্বামীকে মুক্ত করার। কিন্তু স্বামীর তার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে ওভাবে না তাকাবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করে। এমন কি স্বামীকে মুক্ত করে দিয়ে সে তারই হাতে মৃত্যু বরণ করে নিতেও রাজী থাকে। কিন্তু স্বামীর সেই একইভাবে ঘৃণার দৃষ্টি-নিক্ষেপ সহ্য করতে পারে না স্ত্রী। সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরে এলে লক্ষ্য করে যে, তারই সে ছুরি স্বামীর বুকে বসালো।

এদিকে 'মিডিয়ম' মারফৎ জানা যায়, লাঞ্ছিতা হবার পর ডাকাতটি শ্রেষ্ঠীর স্ত্রীর কাছে প্রণয় নিবেদন করলে মহিলা ঐ ডাকাতকে বলে, তার স্বামীকে মেরে ফেলে দিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য। ডাকাতটি সঙ্গে সঙ্গে তাকে লাথি মারে এবং বধ করবে কি না অর্থাৎ এমন স্ত্রীকে মেরে ফেলাই উচিত কি না তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে। স্ত্রী সেই দেখে ভয়ে পালায় এবং স্বামী বেচারী লজ্জায় নিজেই ছুরি দিয়ে নিজের প্রাণনাশ করে।

কাঠুরের বক্তব্য কিন্তু আলাদা। সে নাকি নিজের চোখেই সব কিছু প্রত্যক্ষ করেছে। ডাকাতটি প্রথম স্বামীকে বাঁধে এবং পরে তার স্ত্রীর কাছে প্রেম নিবেদন করে বিয়ে করতে চায়। মহিলাটি ইতস্তত করতে থাকলে ডাকাতটি তার স্বামীকে মুক্ত করে ডুয়েল ফাইটে চ্যালেঞ্জ জানায়। কিন্তু শ্রেষ্ঠী জানায়, তার স্ত্রী অসৎ চরিত্রের এবং এ হেন একজন স্ত্রীর জন্য সে ও পথে পা দেবে না। কিন্তু স্ত্রী সে কথা শুনে দুজনকেই উত্তেজিত করতে থাকে। অবশেষে স্বামী বেচারী রাজী হয় এবং মারা পড়ে। এমন সময়, একটি শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে ভৃত্যটি তাকে খোঁজ করে গিয়ে কুড়িয়ে আনে এবং গায়ের জামা-কাপড় খুলে নিতে থাকে। কাঠুরে এতে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, মহিলার মুক্তা বসানো ছুরিটি অপহরণ করলো কে? কাঠুরে সেই শুনে লজ্জায় চুপ করে যায় এবং ছেলেটিকে কোলে তুলে নিতে যায়। বৌদ্ধ শ্রমণটি মনে করে কাঠুরে বাকী পোষাকগুলি বোধ হয় হস্তগত করতে চায়। এই ভেবে কিছু বলতে উঠলেই কাঠুরেটি জানায়, শিশু তার বাড়ীতে রয়েছে। তার সঙ্গে আরো একটি ক্ষতি কি? শ্রমণটি মুগ্ধ হয় কাঠুরেটির কথায়। এই হচ্ছে রশোমনের কাহিনী। রসোমন চিত্রের মাধ্যমে কুরোশওয়া বলতে চেয়েছেন, মানুষের নীতিবোধ আজ এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সব মানুষই নিজেকে বাঁচাতে চাইছে। সকলেই ভাবছে, সেই একমাত্র সত্যকথা বলছে। এই চিত্রের মাধ্যমে কুরোশওয়া যে বলিষ্ঠ মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তা জাপানে তৎকালে কল্পনাই করা যায় নি। এর প্রতিটি ক্যামেরা ফ্রেমই যেন তুলি দিয়ে আঁকা ছবি। কয়েকটি দৃশ্য যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনি আছে শিল্পগত উৎকর্ষতা। সঙ্গীত পরিচালনাও এ ছবির আর একটি সম্পদ। দেশী-বিদেশী সুরের সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে বরং বলা চলে সস্তা মনোরঞ্জনের পথ না ধরে পরিচালক এ ছবিতে প্রাচ্যসঙ্গীতের Contropuntal ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া সবার উপরে এ ছবিতে আছে নম্র মানবিকতাবোধ। যা ছবিটিকে উন্নত পরিচ্ছন্ন ও সংহত করে তুলে ধরেছে বিশ্ববাসীর সামনে।

পরিচালক আকিরা কুরোশওয়া

কুরোশওয়ার 'ইকিরু' মহৎ চলচিত্রের লক্ষণযুক্ত। সমাজ-সত্য, জীবনের বাস্তবতা এই দুই বস্তুই চিত্রটির অঙ্গীকৃত। আবার উভয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই কুরোশওয়ার ওই দুই বস্তুকে অতিক্রম করে তৃতীয় সত্য দৃষ্টিতে এনেছেন। তা হল শিল্পের সত্য, জীবনই যার উৎস---যা দর্শকের চিত্তে উত্তরণের স্পর্শ এনে দেয়।

'ইকিরুর' নায়ক ওয়াতনাবে শহর পৌরসভার নাগরিক বিভাগের প্রধান। ত্রিশ বছরের চাকুরী জীবনের পর তিনি জানতে পারলেন তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত এবং বুঝতে পারলেন তাঁর পরমায়ু নির্দিষ্ট কয়েক মাসের। এই ধারণা থেকে তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হল কুরোশওয়া তা পর্দায় তুলে ধরেছেন অসাধারণ ধৈর্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। প্রথমে তিনি গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন, কিন্তু অফিসের এক তরুণ কর্মীর সারল্য ও উদ্দীপনা তাঁর জীবনের গতি ফিরিয়ে দিল। ওয়াতানাবে বুঝতে পারল মরতে যখন হবে তখন সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু করে মরাই ভাল। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটি কিভাবে একটা শিশু উদ্যান করার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল এবং তাঁর মৃত্যুর পর সহকর্মীদের আলোচনার মাধ্যমে কুরোশওয়া সাহিত্যিকের বর্ণনা ভঙ্গীতে বলেছেন, মানুষের প্রতি ভালবাসা থেকে জাগে

কর্তব্য বোধ এবং মানবিকতা থেকে কর্মের প্রেরণা। কুরোশওয়া কোথাও বক্তৃতার আশ্রয় নেন নি। সাধারণ মানুষের সাধারণ কথায় তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঐ ছবিতেও 'রশোমন'-এর দার্শনিকতা ও আঙ্গিক প্রতিফলিত। এ ছাড়াও লিভিং, সেভেন সামুরাই, লোয়ার ডেপথ্‌স, থ্রোন অফ ব্লাড, দি ব্যাড স্লীপ ওয়েল, ইয়োজিনকো, সানঝুরো, দি হাই এ্যাণ্ড লো, জোকোম্যান এ্যাণ্ড টেম্প্‌ল এবং রেডবিয়াড প্রভৃতি প্রতিটি চিত্রেই কুরোশওয়া সামাজিক সমস্যা অত্যন্ত অভিনবভাবে উত্থাপন করেছেন। গর্কীর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত ও নির্মিত দি লোয়ার ডেপথস্‌ জাপানের বাইরে প্রচুর জনসমাদর লাভ করে। ভেনিসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'দি সেভেন সামুরাই' সিলভার লায়ন অর্জন করে। বার্লিন উৎসবে 'দি হিডন্‌ ফোর্ট্রেস এ্যাণ্ড ইকিরা' চিত্রের জন্য দুটি সিলভার বেয়ার লাভ করে। কুরোশওয়া সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি বড় বেশী সমাজসচেতন, সামাজিক পরিবর্তন ও তার সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের রীতি-নীতির বদল তাকে ভাবায় বেশী। কুরোশওয়ার নায়ক প্রায়ই দেখা যায় আদর্শবান। কুরোশওয়ার ছবিতে ইমেজই প্রধান। কুরোশওয়ার দৃশ্যমান বস্তুর মধ্য দিয়ে চরিত্রের গভীরে ঢোকেন। দেশের গভীরে নয়, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ভেতর ঢোকেন শুধুমাত্র ব্যক্তিক চেতনা বা সমস্যার স্তরেই থাকেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরোশওয়া বলেন, চিত্র-সাংবাদিকরা বলেই চলেছেন, আমি নাকি পাশ্চাত্ত্য-প্রেমিক হয়ে গেছি, কারণ যেহেতু আমার সার্বজনীন একটা ভাব ব্যক্ত হয়ে থাকে। তাঁদের ইচ্ছেটা হচ্ছে আমার ছবি যেন Terribly Japanese Quality হয়, কিন্তু কুরোশওয়া জোরের সঙ্গে বলেন That Certainly is not way of my working. তবে তিনি একথাও বলেন, শুধু বিদেশী দর্শকদের তৃপ্তিদান করার জন্য আমি কোন ছবি তৈরী করতে চাই না। জাপানী দর্শকদের কাছে যদি আমার ছবির কোন অর্থ না থাকে তবে একজন শিল্পী হিসেবে বা পরিচালক হিসেবে তেমন ছবি আমি করতে অনিচ্ছুক। অপর কোন দেশের ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে সেখানকার জনগণের পছন্দ, অপছন্দ সম্বন্ধে কোন সম্যক জ্ঞান অর্জন না করে তাদের চিন্তাধারার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হয়ে আমি কি করে তাদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার উপর চিত্র নির্মাণ করতে পারি। যদি কোন পরিচালক অপর কোন দেশে পরিপূর্ণ-দু-তিন বছর কাটিয়ে সেখানকার রীতিনীতি, সেখানকার সাহিত্য, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারেন তবে তিনি হয়তো সে ধরণের চিত্রনির্মাণে কৃতকার্য হতে পারেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, কুরোশওয়া বাইরে কয়েক মাস কাটিয়েও আমেরিকান পরিচালকদের প্রশংসায় অভিভূত হয়ে পড়েন নি।

আমেরিকার চিত্র-সাংবাদিকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে চিত্রটি সম্বন্ধে তাঁরা সমালোচনা লিখতে চলেছেন সে সম্বন্ধে তারা গভীরভাবে চিন্তা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের দেশের সম্বন্ধে বলেন, তাঁরা সবসময়ে সমা-

আকিরা কুরোশওয়া পরিচালিত অন্য একটি নাটকের দৃশ্য

লোচনা করার জন্য কিছু না কিছু খুঁজে বার করবেন, তা না হলে তাঁদের যেন চাকরী চলে যাবে। কুরোশওয়া অবশ্য চান না তিনি যাই কিছু করবেন তাই তাঁরা হজম করবেন।

কুরোশওয়া আমেরিকান পরিচালক জন কোর্ডের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

সম্মানের উচ্চতম শিখরে উঠে যে মানুষটি আজ অধিষ্ঠিত, সে মানুষটির দেহের আকৃতি ছিল লম্বা ও রোগা, মাথায় পাতলা চুল, চোখের দৃষ্টি ধীর ও শান্ত, একটু বেশী কথা বলেন। ৬০ বৎসর বয়স্ক এই মানুষটি টোকিওর টোঙ্গো ষ্টুডিওর কাছে আপন কুটিরেই স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান সহ থাকতে ভালবাসেন। কুরোশওয়া দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, জাপানে চিত্র-পরিচালকদের সূক্ষ্ম কাজ দেখান বা ভাল চিত্র নির্মাণ করা বর্তমানে একরূপ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। নবীন পরিচালকদের মধ্যে অর্থপ্রবণতা খুবই প্রকট। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কোন ছবি করার দিকে তাদের ঝোঁক কম। কুরোশওয়া বলেন, আমি কি ভাবে কাজ করি তা শুনুন Talk, Talk, Talk That's All I do. লেখকদের ডাকতুম, একসঙ্গে বসে চিত্রনাট্য সম্বন্ধে কথা বলতাম, অভিনেতাদের ডেকে একসঙ্গে বসে অভিনয় সম্বন্ধে কথা বলাবলি করতাম, ক্যামেরা যাঁরা চালনা করেন তাদের সঙ্গে প্রোডাকসন সম্বন্ধে কথা বলতাম। কথা বলেই আমি জীবনটাকে কাটিয়ে দিলাম।

শুধু মহৎ নয় মহত্তম শিল্পীর আসনে আজ কুরোশওয়া আসীন। তাঁর প্রতিটি ছবি আজ শিল্পসৃষ্টির যা অন্যতম উদ্দেশ্য সেইখানেই উৎসর্গীকৃত। অর্থাৎ তাঁর ছবি মানুষকে বাঁচার প্রেরণা দেয়, এগিয়ে যাবার উৎসাহ জোগায়, তাই কুরোশওয়াকে আজ শুধু জাপানের নয় সারা এশিয়ার সারা পৃথিবীর মহত্তম শিল্পী বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের টুকিটাকি

এন, টি, দু' নম্বরে স্যুটিং চলছিল। ছবির নাম 'প্রতিবাদ'। পরিচালনায় আছেন তপেশ্বরপ্রসাদ। বিশ্বজিৎ এসেছেন তারই স্যুটিং-এ। লাঞ্চ টাইমে রামশর্মা তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির। বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সে সময় বিশ্বজিৎ। দেখেই বলে উঠলেন, কি খবর? পূজা সংখ্যা বেরুচ্ছে কবে।

রামশর্মা---আপনার লেখা কোথায়।

বিশ্বজিৎ---দু'চারদিনের মধ্যেই পাবেন।

রামশর্মা---আপনি যে 'রক্ততিলক' নামে ছবিখানি তুলতে মনস্থ করেছিলেন, কি হল তার।

বিশ্বজিৎ --- বইখানি হিন্দীতে হবে। অজয় বিশ্বাস থাকবেন তার পরিচালনায়।

উভয়ের কথাবার্তার মধ্যে হাজির হলেন এক বৃদ্ধ। বেশভূষা মলিন। ক্ষীণতর দু' চোখের দৃষ্টি।

বিশ্বজিৎ---কি চাই।

বৃদ্ধ আমতা আমতা করে বললেন, সেই যে---

'ও' বিশ্বজিৎ বৃদ্ধেরকথার রেশ টেনে বললেন, 'আপনার চশমা দরকার, তাই না।'

বৃদ্ধ হাসলেন। কৃতজ্ঞতার হাসি।

'ঠিক আছে, বিকেলে এসে টাকা নিয়ে যাবেন।'

বিশ্বজিতের এ কথায় বৃদ্ধ আশ্বস্ত হয়ে প্রস্থান করলেন। রামশর্মা বাইরে থেকেই বিশ্বজিতের দানের কথা শুনেছেন, কিন্তু সামনাসামনি দেখলেন এই প্রথম। না, না, ভুল বলে ফেলেছেন, রামশর্মা এর আগে যে দেখেছেন প্রতি বছর পূজোর আগে স্টুডিওর প্রতিটি কর্মীকে বস্ত্র দিতে। তাই প্রতিটি স্টুডিওর কর্মীর কাছে তিনি বিশ্বজিৎবাবু নন। তিনি দেবতা। এ কথা যে ট্রলি ঠেলে সে থেকে লাইটম্যান পর্যন্ত সকলের মুখেই শুনতে পাবেন।

আসল কথা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন রামশর্মা। বিশ্বজিৎ সেদিন যা জানালেন

চৈতালীর একটি দৃশ্যে নৃত্যরতা তনুজা
চিত্র : অজিত গোস্বামী

তার নাম হচ্ছে, হিন্দীতে বইখানি তুলতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। তা না হলে অনেক অসুবিধা আছে, তবে ছবিখানি রঙীন হবে। আর যা জানালেন তা হচ্ছে, বাংলায় বেশ কয়েকখানি বইয়ে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য—কিন্তু তাঁর পক্ষে বর্তমানে সকলের অনুরোধ মেনে চলা সম্ভব হয়নি। কারণ, বম্বে এবং মাদ্রাজে তিনি এখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত। অর্থাৎ বাংলায় যদি সকালে থাকেন, বিকেলে এবং সন্ধ্যে কাটান বম্বেতে। আবার ভোর না হতেই পাড়ি দেন মাদ্রাজে। ফেরার পথে রামশর্মার দেখা হয়ে গেল অজয় বিশ্বাসের সঙ্গে—যাঁর প্রথম চিত্র পরিচালনা সুরু হয় 'প্রথম প্রেম' দিয়ে। এখন তিনিও বম্বেতে খুবই ব্যস্ত।

শর্মার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানালেন, 'রক্ত তিলক' বইখানি তাঁরই রচনা এবং বিশ্বজিতের পরিচালনার প্রযোজনা করছেন তিনিই। বাংলাতেও তিনি একখানি বই করবেন এবং মনোমত তাই গল্প খুঁজছেন।

'যাত্রিক' গোষ্ঠীর নাম কারো অজানা নয়। 'কাঁচের স্বর্গ' তাঁদের দিয়ে গেছে অর্থ এবং সম্মান দুই-ই। এই গোষ্ঠীরই পরিচালনায় এবার চিত্রায়িত হচ্ছে 'এখানে পিঞ্জর'। চিত্ররসিকদের অনেক আশা-ভরসা এই গোষ্ঠীর উপর। তাই তাঁরা তাঁদের সে সম্মান এ ছবিতেও যে বজায় রাখবেন এ বিশ্বাস রামশর্মার আছে।

সেদিন সেই কথাই রামশর্মার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল ঐ গোষ্ঠীরই অন্যতম পরিচালক শচীন মুখার্জীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, সেইদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেই বইটি তোলা হয়েছে। বইটি কবে মুক্তি পাবে তা তিনি এখুনিই বলতে পারলেন না।

শচীনবাবু নিজেও এককভাবে 'কাল তুমি আলেয়া' বইটি পরিচালনা করেছিলেন। বইটি সাফল্যলাভও করেছিল। পুনরায় তিনি নাকি একখানি বই পরিচালনার কথা ভাবছেন বলে শর্মা খবর পেয়েছেন।

—রামশর্মা

"নল-দময়ন্তী" চিত্রের একটি দৃশ্যে ইন্দিরা দে

ছায়াছবির বাইরে—দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়
চিত্র : সমরজিৎ

বাংলা ছায়াছবি

খুঁজে বেড়াই

পরিচিতা ও কলঙ্কিত নায়কের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর পরিচালক সলিল দত্ত এবার তাঁর নিজেরই লেখা একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন। গত পাঁচই জুলাই এর শুভসূচনা সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে। কাহিনীটির নাম 'খুঁজে বেড়াই' গীতালি পিকচার্সের পতাকাতলে নির্মিত ছবিটির সুরোরোপের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার রবীন চ্যাটার্জী। অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সৌমিত্র চ্যাটার্জী, অপর্ণা সেন, অনিল চ্যাটার্জী ও বিকাশ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা আছেন। নিয়মিতভাবে ছবিটির স্যুটিং শীঘ্রই সুরু হবে।

নিমন্ত্রণ

খ্যাতিমান পরিচালক তরুণ মজুমদারের নবতম চিত্রার্ঘ্য 'নিমন্ত্রণ'-এর শুভ মহরৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 'বালিকা বধূ'র পর তনুবাবুর (চিত্রজগতে ইনি এই নামেই খ্যাত) এই প্রথম ছবি। ভারতচিত্র-এর পতাকাতলে নির্মিত ও স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা 'নিমন্ত্রণ'-এর প্রথম দৃশ্যগ্রহণ সুরু হয় শ্রীমতী কানন দেবী ও শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে। ছবিটির প্রধান চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন সন্ধ্যা রায় (মজুমদার) ও অনুপকুমার।

বিবর

সমরেশ বসু রচিত ও বহুপঠিত উপন্যাস 'বিবর'-এর শুভ মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১৩ই জুলাই নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে। উল্লেখযোগ্য এই বইটির চিত্রস্বত্ব কয়েক বছর আগে ক্রয় করেছিলেন শ্রীশ্যামল মিত্র। কিন্তু এতদিন নানা কারণে তার চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায়, প্রখ্যাত অভিনেতা উত্তমকুমার তার ভার নিলেন। প্রযোজনার ভার নিলেন অসিত চৌধুরী ও সঙ্গীত পরিচালনার দুরূহ দায়িত্ব নিলেন শ্যামল মিত্র। নায়িকা চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন সুপ্রিয়া দেবী।

চিঠি

গত রথযাত্রা উৎসবে 'চিঠি' নামে অপর একখানি চিত্রের মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হল। মনীষ আর্ট ইণ্টারন্যাশনাল নিবেদিত ও নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত, অসীম চক্রবর্তী, কণিকা মজুমদার ও সুব্রতা চ্যাটার্জী।

সংসার

নর্মদা পিকচার্সের প্রথম ছবি 'সংসার'-এর শুভ মহরৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল টেকনিসিয়ানস ষ্টুডিওতে। মঞ্চসফল এ নাটকটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন সলিল সেন নিজেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে এ ছবির ক্ল্যাপষ্টিক দিলেন সন্ধ্যারাণী। মহরৎ দৃশ্যের শিল্পী ছিলেন সাবিত্রী চ্যাটার্জী। এ ছাড়া এ ছবির জন্য যাঁরা চিত্ররূপ দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, সন্ধ্যারাণী, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া, নির্মলকুমার, সুব্রতা, জহর রায়, শেখর চ্যাটার্জী, হরিধন, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, মৃণাল মুখার্জী ও অমরনাথ মুখার্জী।

'নবরাগ' চিত্রের সেটে নায়িকা সুচিত্রা সেন, তত্ত্বাবধানে গিরীন্দ্র সিংহ ও পরিচালক বিজয় বসু
চিত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়

জয়দেব

আর পি বি এস সাংস্কৃতিক শাখার সদস্যরা সম্প্রতি 'জয়দেব' নাটক পুনরভিনয় করলেন. ছকু খানসামা লেনে। নাটকের রচয়িতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, যাত্রার রূপান্তর বিধায়ক ভট্টাচার্যের। শশাঙ্ক ভট্টাচার্য নির্দেশিত এ-নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে এদিন অংশ নিয়েছিলেন শমিত্র ঘোষ, আশীষ ভট্টাচার্য, প্রভাত ঘোষ, সুনীতি দাস, শিবরঞ্জন ভট্টাচার্য, কানাই ঘোষ, শিবসুন্দর সিংহ, দুলাল ঘোষ, মণ্টু দাশগুপ্ত, বীরেন ঘোষ, কৃষ্ণা দাস, তারক ঘোষ, শিবনাথ ভট্টাচার্য, পরেশ নন্দন, সুষমা দাঁ, ঝুমা ঘোষাল প্রমুখ আরও অনেকে। নৃত্য ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত করণ।

রাইফেল

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কর্মচারীরা বিশ্বরূপা মঞ্চে 'রাইফেল' অভিনয় করলেন। নাটকের পরিচালনায় ছিলেন পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। সামগ্রিক নির্দেশনা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের। পেশাদার দলের পটুত্ব তাঁদের কাছে আশা করা সঙ্গত নয়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কি অভিনয়ের দিক থেকে, কি ব্যবস্থাপনার দিক থেকে তাঁদের আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের কোন ঘাটতি ছিল না। যুগল চৌধুরী, রহমৎ ইনগ্রাম, অবিনাশ, মাণিক সেন, ভবানীপ্রসাদের ভূমিকায় যথাক্রমে অরুণ চৌধুরী, দীপক বসু, আশু চক্রবর্তী রাজকুমার ঘোষ, অনুব্রত চক্রবর্তী ও বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। কল্যাণের ভূমিকায় বাবলু দাশগুপ্ত অনবদ্য। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরাও তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কিরণবালা' গীতশ্রী নাগের 'সৌদামিনী', মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'মানসী' ও মায়া ঘোষের

নাট্যলোক

'নসিবন' ছিল নিপুণ অভিনয়ের নিদর্শন।

আর এক তরুণ

ইছাপুর জি ই (এম ই এস) ক্লাবের সদস্যরা সম্প্রতি বারাকপুরে রবীন্দ্র ভট্টাচার্য বিরচিত 'আর এক তরুণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। যাঁদের সুঅভিনয়ে নাটকটি সার্থক হয়ে ওঠে তাঁরা হলেন সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হালদার, পরেশ ঘোষ, কমল চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর ঘোষাল ও অলক মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া পূজারিণীর ভূমিকায় কুমারী অনুসূয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় সুন্দর হয়।

ইংল্যাণ্ডের অপেরা প্রসঙ্গে

যে শিল্প-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য ইংল্যাণ্ডকে আন্তর্জাতিক বুধমণ্ডলীতে এক বিশেষ গৌরবের আসনে অভিষিক্ত করে রেখেছে, অপেরা সেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী শিল্প সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ। এই দেশের যে মহান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্ভার বিশ্বজনের সমাদর ও স্বীকৃতি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে, তার মূলে অপেরার অবদান অনেকখানি। সুদীর্ঘকাল যাবৎ রস-পিপাসুর তৃষ্ণা এর দ্বারা যে কি পরিমাণ নিবারিত হয়ে আসছে তার তুলনা মেলা ভার।

ইংল্যাণ্ডের কভেণ্ট গার্ডেনের বিশ্ববিখ্যাত রয়্যাল অপেরা তার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করল মহাসমারোহে—আজ থেকে ঠিক এক যুগ আগে—১৯৫৮ সালে। যে সংস্থার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল আজ থেকে বারো বছর আগে তাকে যে কি পরিমাণ প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে —সে ইতিহাসও কম আকর্ষণীয় নয়। আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন যে বছর জন্মান সেই বছর অর্থাৎ ১৭৩২ সালে এর ঐতিহাসিক পদক্ষেপ সুরু। ইংল্যাণ্ডে তখন রাজা দ্বিতীয় জর্জের আমল। রাজা দ্বিতীয় জর্জ ইংরাজী ভাষা না জানা ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জর্জের ছেলে এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা। একবার নয় দু-দু'বার অগ্নির সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখা এঁকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নানাবিধ সমস্যাকে কেন্দ্র করে এর অস্তিত্বই প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছিল।

১৯৪৬ সালে দ্বারোদ্‌ঘাটন হল এর তৃতীয় ভবনটির। তারিখ ১৫ই মে। বাড়ীঘর দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এর ইতিহাস সমান উজ্জ্বল্যে চিরদিনই আলোকিত আছে। ১৮৩৪ সালে এই সংস্থার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন সেকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী গিউলিয়া গ্রিসি। হে মার্কেটের হার ম্যাজেস্টিস থিয়েটার থেকে ১৮৪৭ সালে কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে বেরিয়ে এসে গ্রিসি গঠন করলেন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা এই কভেণ্ট গার্ডেনই। সেই সময় থেকেই রসিকসমাজে গ্রিসির অপ্রতিহত প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তার চরম উৎকর্ষে উত্তরণ বলা চলে, যা স্থায়িত্ব লাভ করেছিল একটি শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল। ১৮৬১ সালে দেখা দিলেন গ্রিসির সার্থক উত্তরসুরী আদেলিনা প্যাটি। উনিশ বছরের পরমাসুন্দরী তন্বী তরুণী। 'লা সোনামবুলা'য় আমিনা চরিত্রটির সার্থক রূপদান করে তিনি জনপ্রিয়তার চরম শিখরে অধিরোহণ করলেন। মহড়াতে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা মকুব করা হয়েছিল এবং তাঁকে যে বিপুল অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল সেই থেকেই 'স্টার-মানি' কথাটির সৃষ্টি। ১৮৬১ থেকে ১৮৮৬ —এই পঁচিশ বছর তিনিও মহিমান্বিত সম্রাজ্ঞীর ন্যায় অপেরা জগতে রাজত্ব করে গেছেন। ১৮৭২ সালে কভেণ্ট গার্ডেনে দেখা দিলেন ক্যানাডার এমা আলবানি। 'লুসিয়া দা ল্যামেরমুর'-এ লুসিয়া এবং 'লা এ্যাভিটা'য় ভায়োলেটের চরিত্রে তাঁর রূপায়ণ এক-কথায় অবিস্মরণীয়। ১৮৮৮ সালে দেখা দিলেন অস্ট্রেলিয়ার নেলি মেলবা। 'রিগোলেটো'য় গিলডার ভূমিকাটি তিনি চাইলেন, কিন্তু সেই ভূমিকাটি তখন এমার জন্য নির্দিষ্ট। অভিমানে আহত নেলি দেশে ফিরে যাওয়া শ্রেয় বোধ করলেন। অবশেষে জানা যায় যুক্তরাজ্যের যুবরাণী (পরবর্তীকালের রাণী ও ভারত-সম্রাজ্ঞী) আলেকজাণ্ড্রার হস্তক্ষেপ এবং সনির্বন্ধ পীড়াপীড়িতে নেলি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

অপেরার ক্ষেত্রে কভেণ্ট গার্ডেনের গৌরব এবং ঐতিহ্য সীমাহীন। এখানেই অভিনীত হয়েছে বোহেমিয়ান গার্ল, মারিটানা এবং লিলি অফ কিলারনি প্রমুখ কালজয়ী রচনাগুলি।

ইংল্যাণ্ডের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যার দান অপরিসীম সেই অপেরাজগৎ আজ কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে অর্থসমস্যায় বিব্রত। আর্ট কাউন্সিলের বার্ষিক তিন লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দও এই সমস্যার সমাধান করতে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হতে পারছে না। ভাড়া এবং মেরামত বাবদ যায় একান্ন হাজার পাউণ্ড, আলোকসম্পাত এবং তাপ সংরক্ষণের ব্যাপারে খরচ হয় বারো হাজার পাউণ্ড, কর্মীদের বেতন এবং দৃশ্যাবলী রাখার জায়গা বাবদ ব্যয় হয় চুয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ড। সরকারী সাহায্য বাবদ যে পরিমাণ অর্থ কভেণ্ট গার্ডেন পেয়ে থাকে, মিউনিখের অপেরাকেন্দ্রগুলি সরকারী সাহায্য বাবদ তার তিনগুণ বেশী অর্থ পেয়ে থাকে। —অনসূয়া

বিচিত্র বোম্বাই

আপাতত নাম : প্রোডাকসন নম্বর ছয়। যতো দিন যাবে মনস্থির করা সম্ভব হবে ততোই। তখনই জলজল করে উঠবে প্রকৃত অভিধা। সুবোধ মুখার্জী প্রোডাকসন্সের এই অনামী প্রচেষ্টাটির সম্প্রতি সপ্তাহব্যাপী দৃশ্য গ্রহণপর্ব সমাধা হয়েছে সাফল্যের সংগে। শশী কাপুরের বিপরীতে বাঙলার রাখীকে দেখা যাবে এ ছবিতে। সহ-শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন নাজির হোসেন, অনিতা দত্ত, দুলারী, কৃষ্ণকান্ত ও উমা ধাওয়ান। সমীর গাঙ্গুলী পরিচালনায় এবং সুর সংযোজনায় আছেন শচীন দেববর্মণ।

●

জয়সলমীরে (রাজস্থান) আগুনঝরা গ্রীষ্মের দু'টি মাস ধরে স্যুটিংয়ের প্রোগ্রাম নিয়ে হাজির হ'য়েছিলেন প্রযোজক-পরিচালক কে আসিফ। ছবিটি তাঁর বিগ ক্যানভাসের। নাম তো সবারই জানা—'লাভ এণ্ড গড' বা 'মহব্বৎ আউর খুদা'। জয়সলমীরের এক দুর্গম মরুভূমিতেই দৃশ্য গ্রহণের কর্মকাণ্ড। সংগে ছিলেন আসিফ সাহের দুশো জনের মতো সংগী। এঁরা শিল্পী, কলাকুশলী—সে তো বলাই বাহুল্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন সঞ্জীবকুমার (নায়ক), নিম্মি (নায়িকা), নাজিমা, নাজির হোসেন, শাস্ত্রী, আগা, প্রাণ ইত্যাদি। আরব বেদুইনের মতো শিল্পীরা পায়ে হেঁটে, উটে সওয়ার হয়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ছবির কাজে লেগেছেন। সত্যি ছবিকে বাস্তবানুগ করতে কতো ঝড়-ঝঞ্ঝাই না মাথা পেতে নিয়ে হয়। তবু দর্শক আমরা, পান থেকে চুন খসলেই অঙ্গে শাপ দিতে থাকে। এ ব্যাপার কিন্তু বরাবরই থাকবে, থাকা ভালো। মাথার ওপর খড়গ ঝুলে থাকে বলেই না মাথা বাঁচাবার আগ্রহ চিরকাল থেকে যায়। ওটা না থাকলে মাথার দাম থাকত কি?

●

ইন্দো-ইরানিয়ান যৌথ প্রয়াসে যে টেকনিকালার ছবিটি তোলা হচ্ছে তার নাম রাখা হয়েছে 'সালাম-ই-ইরাণ'। পরে এটা পরিবর্তিত হ'তে পারে। দু' দেশের শিল্পীদের নিয়ে এটি চিত্রায়িত হচ্ছে। নায়িকারূপে আছেন

ডিম্পি চিত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়

ওয়াহিদা রেহমান; তাঁর বিপরীতে ইরাণের জনপ্রিয় তারকা ফরদীনকে দেখা যাবে। অন্য আরেকটি রোমাণ্টিক চরিত্রের শিল্পী হ'চ্ছেন সঞ্জীবকুমার। ছবির আগাগোড়াই ইরাণের মাটিতে দৃশ্যায়িত হবে। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিছুদিন আগে পরিচালক চাণক্য ওয়াহিদাকে নিয়ে বোম্বাই ফিরে এসেছেন। সংগে করে এনেছেন সাড়ে তিন রীল গৃহীত ছবির নেগেটিভ।

●

রামানন্দ সাগরের 'গীত' ছবির দৃশ্যগ্রহণে সেদিন বেশ মজার ব্যাপার ঘটেছিল। জিনিসটা জমেছিল এক ভালুক পুঙ্গবকে নিয়ে। বিশাল বপু টুনটুনকে এক ছেলে-ভালুক তাড়া করে নিয়ে যাবে এমন মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আবির্ভাব ঘটবে নায়ক রাজকুমারের। তিনি বীরবিক্রমে ভালুকের সংগে লড়াই করে তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন। টুনটুন পাবে পরিত্রাণ।—এই ছিলো দৃশ্যটি।—

রিহার্স্যালের সময়ে কোনো ঝামেলা হয় নি—নির্বিবাদেই সব চুকে-ছিলো। বাধলো বিপত্তি স্যুটিংয়ের মুহূর্তে। ভালুক তো ক্রমেই বদমেজাজী হ'য়ে উঠতে লাগলো। এমন রুদ্রমূর্তি ধরলো সে যে, কর্তৃপক্ষ নাচার হ'য়ে তাকে বদলে নিয়ে এলেন একটি মেয়ে-ভালুক।—তবেই রক্ষে হোলো সব দিক।

●

আমি যাকে পছন্দ করি তাকে দিনান্তে একবার দেখার সাধ হওয়া বিচিত্র নয়। কাছাকাছি থাকলেই ঘন ঘন এটা সাধ্যের আওতায় আসতে পায়। নইলে দু'চারদিন, হপ্তাখানেক কিম্বা মাসে একবার সাক্ষাৎ সম্ভব হ'তে পারে। তখন শরণ নিতে হয় পত্র-দূতের। চিঠি যে-কোনো মুহূর্তে যোগ-সূত্র স্থাপনে সহায়ক। অগত্যা দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েই পরিতৃপ্তি।

—রমেন চৌধুরী

সাগর পেরিয়ে

হিন্দী ছায়াছবি যাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এক অনতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে, সেই প্রভাব তাঁদের মধ্যে আরও বহুগুণ বর্ধিত আকার ধারণ করবে, যখন তাঁরা জানতে পারবেন যে, এবার খাস লণ্ডনে হিন্দী ছবির রূপায়ণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। লণ্ডন ফিল্মস কর্পোরেশান একটি হিন্দী চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। বিদেশে এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই প্রথম একটি হিন্দী ছবি রূপ নিতে চলেছে। উক্ত সংস্থা এ-ব্যাপারে শ্রীজ কাট্যালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পরিকল্পিত ছবিটি পরিচালনা করার। শ্রীকাট্যালের রচিত একটি কাহিনী এখানে নির্বাচিত হয়েছে। লণ্ডনে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায় এবং তাঁদের জীবনযাত্রাই কাহিনীর বিষয়বস্তু।

●

বিগত যুগে চলচ্চিত্রলোকের নায়িকাদের মধ্যে মে ওয়েস্ট একটি অবিস্মরণীয় নাম। সেদিনকার দর্শক-সমাজে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার যাঁরা করে তুলেছিলেন, মে ওয়েস্ট তাঁদেরই একজন। সুদীর্ঘকাল পরে সম্প্রতি অভিনয়-জগতে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। সাতাত্তর বছর বয়স্কা এই শিল্পীর পুনরাগমন প্রমাণ করল যে, অনেকক্ষেত্রে হিল্লোল জাগানোর ক্ষেত্রে এ-কালের যৌবনরাজ্যের অধীশ্বরী যাঁরা, তাঁরাও মে ওয়েস্টের কাছে ম্লান হয়ে যান। সম্প্রতি এই অশীতি সমীপবর্তিনী শিল্পীকে কেন্দ্র করে এক চমকপ্রদ সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। গ্লাইডে নামক তাঁর সুদীর্ঘকালের অনুচর নাকি বর্তমানে তাঁর স্বামী হতে চলেছেন।

●

পৃথিবীর চলচ্চিত্রামোদীদের কাছে বব হোপ একটি অতি প্রিয় নাম। দর্শকমহলে তাঁর সমাদর যেমনই তুলনাবিরল, প্রতিষ্ঠাও তেমনিই দৃঢ়ভিত্তিক। একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বর্তমানে বব হোপ সম্বন্ধে একটি নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। জানা গেছে, শো-বিজনেস-এ যাঁরা লিপ্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে বব হোপই সেই ব্যক্তি, যাঁর প্রতি ধনলক্ষ্মীর কৃপা সর্বাধিক। বব হোপই ধনিকোত্তম শিল্পীরূপে ঘোষিত হয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি যেখানে প্রথম স্থানটি অধিকার করে আছেন, সেখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানটির অধিকারিদ্বয় হলেন যথাক্রমে বিং ক্রসবি ও ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা।

●

বৃটেনের চলচ্চিত্রামোদীরা চিত্র-নির্মাণের গত এক বছরের হিসাব খতিয়ে দেখার পর যথেষ্ট পরিমাণে নৈরাশ্যের শিকার হচ্ছেন। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এক বছরে ছবি তৈরীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। ১৯৬৯ সালের মে মাসে যেখানে বত্রিশটি ছবি নির্মিত হয়েছে, ১৯৭০ সালের মে মাসে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সতেরোয়।

●

'লোলিটা' এবং 'নাইট অব দি ইগুয়ানা' ছবি দু'টির মাধ্যমে যে শিল্পী সিউ লায়ন প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, সেই সুন্দরীকে এবার দেখা যাবে নাট্য প্রযোজিকার ভূমিকায়। তিনি এবং তাঁর অভিনয় শিক্ষক এরিক মরিস যুগ্মভাবে একটি নাটক প্রযোজনা করতে চলেছেন। বিজ্ঞাপনের মারফত অর্থ তাঁরা কোন অনুকরণীয় প্রচেষ্টায় লাভ করবেন বলে জানা গেছে।

—চিত্রদূত
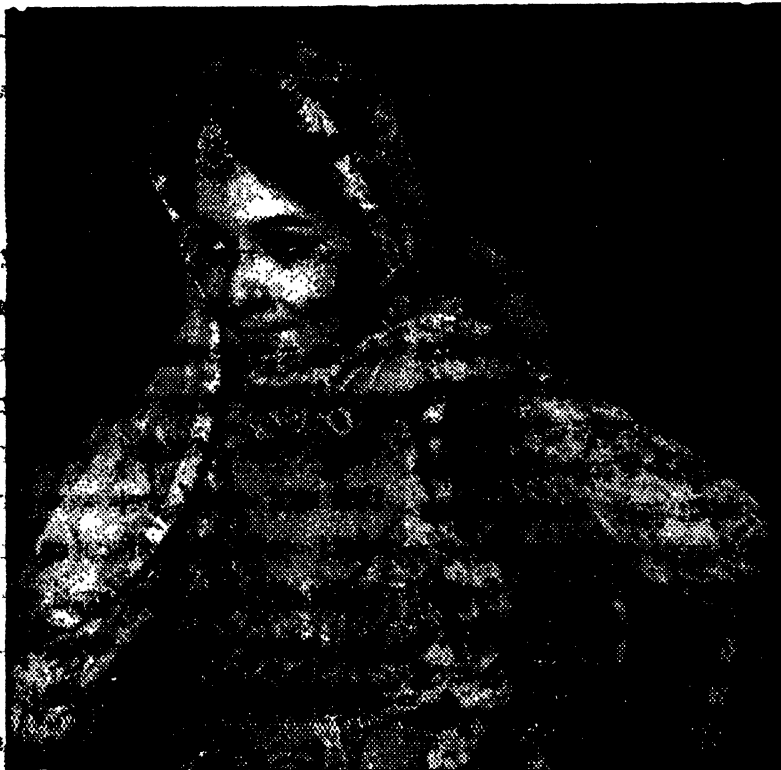
দীপক গুপ্ত পরিচালিত 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবির একটি দৃশ্যে শমিতা বিশ্বাস

পরিতোষ গঙ্গোপাধ্যায়

[অলিম্পিকের অন্যতম প্রথম এশীয় বিচারক ও বিশ্বের ক্রীড়াজগতে বাঙলার এক মহামূল্য উপহার]

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগ-যুগান্তের পরিসরে মহাকালের যে প্রথচঞ্চল অগ্রসরমাণ তার অভিধানে যে একেবারে অনুপস্থিত তার নাম স্তব্ধতা। এগিয়ে চলাই তার ধর্ম, এগিয়ে চলাই তার নিয়ম। সুখ-দুঃখে, ঘাত-প্রতিঘাতে, আনন্দ-বেদনায় সমাকীর্ণ এই পৃথিবীর সকল কিছুর পরিণতিই মহাকালের সর্বগ্রাসী বাহুবন্ধনে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও অনুপস্থিত নয়। সংখ্যাও তার নয় নিতান্ত নগণ্য। মহাকালের আরক্ত নয়নের ভয়াল-ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সময়ের দুরন্ত তর্জনী-সঙ্কেতকে বিন্দুমাত্র মূল্য না দিয়েও শুধু ক্ষণকালের সঙ্কীর্ণতায় নয়, নিত্যকালের প্রসারতায় অনেক কিছুই তার অস্তিত্ব বজায় রাখে, ইতিহাসে তারাই চিত্রিত থাকে সভ্যতার শাশ্বত নিদর্শনরূপে। যারা সর্বগ্রাসী মহাকালের ভয়াল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সময়ের দুস্তর সাগর অতিক্রম করে যুগের পরম্পরায় ভাবীকালের দরবারে বর্তমান থেকে যায়, তাদেরই বলা চলে শাশ্বত সভ্যতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের বার্তাবহ।

সারা পৃথিবীর পরিসরে প্রাচীন ঐতিহ্যের যতকিছু নিদর্শন আজ আমাদের সামনে বিদ্যমান, অলিম্পিক খেলা তাঁর অন্যতম। বহু শতকের বিপুল গরিমায় সমৃদ্ধ এই অলিম্পিকের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পরই একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় যুক্ত হল। এতাবৎ সুদীর্ঘকাল ধরে যে নিয়মে চলে আসছিল এই সময়ে হল তার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। চিরকাল ধরে বিচারকের আসন প্রতীচ্যের যা একচেটিয়া ছিল---আর প্রাচ্য যেখানে ছিল দূরে অনাদৃত-উপেক্ষিত---সেই ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ধুলোয় মিশে গেল এই সময়ে। বহু শতাব্দীর এ পার
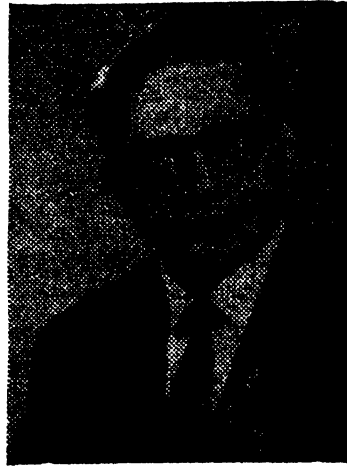
শ্রীপরিতোষ গঙ্গোপাধ্যায়

থেকে সেই দুর্ভেদ্য অচলায়তনের অর্গলমুক্ত করল এশিয়ার যে দুটি রাষ্ট্র, তার একটি লাবণ্যময়ী জাপান আর একটি হল ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষ। এ ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষ একমাত্র যে ভারতীয়ের কাছে ঋণী---তিনি এক বঙ্গসন্তান। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশের দরবারে বাঙলার জাতীয় গর্ব ও গৌরব বিবর্ধনের কারণস্বরূপ যে বঙ্গসন্তানেরা সসম্মানে চিহ্নিত তিনি তাঁদেরই একজন। তাঁর নাম পরিতোষ গঙ্গোপাধ্যায়।

এক ঐতিহ্য আশ্রিত পরিবারের স্বনামধন্য সন্তান তিনি। কিঞ্চিদধিক দু'শো বছর আগে এই পরিবারেরই একটি মেয়ে এসেছিলেন ঠাকুর পরিবারের বধূরূপে। একদা অখণ্ড ও বৃটিশ ভারতের রাজধানী ভারতের বৃহত্তম ও নবীনতম মহানগরী কলকাতার বুকের উপর সৈন্যবাহিনীর আজও যে কেল্লাটি বর্তমান ---যার পোষাকী নাম ফোর্ট উইলিয়াম, তার নির্মাণ কার্য তত্ত্বাবধানের ভার যাঁর উপর পড়েছিল, সেই গোবিন্দরাম ঠাকুর ছিলেন সেই মেয়েটির স্বামী। শতবর্ষ পরে এই বংশের আর একটি মেয়ে এলেন ঠাকুরবাড়ীর বধূরূপে---ইতিহাসে এবং বাঙলা কাব্যে নিসর্গ-চেতনার অগ্রদূত কবি বিহারীলালের কবিতায় তিনি আজও বিরাজিতা। অম্লান মহিমায় রৌদ্ররুক্ষ, হৃদয়হীন জগতের সীমার ওপারে যে অনন্ত স্নেহ-মায়া-মমতা-সহানুভূতি-লাবণ্যের জগৎ বিদ্যমান---সেই জগতের সম্ভার বহন করে যিনি এলেন রবীন্দ্রনাথের জীবনের বোধন-লগ্নে---তিনি সেই কাদম্বরী দেবী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান। কাদম্বরীর খুড়তুতো ভাই বিনোদলাল ছিলেন সৌখীন নট হিসাবে এক অগ্রগণ্য শিল্পী। বিনোদলালের পুত্র পুণ্যলাল এক কীর্তিমান পুরুষ। বহু

ক্রীড়ামোদীদের চোখের সামনে পুঞ্জীভূত নিরাশার মধ্যে অনুপ্রেরণার এক অনির্বাণ উৎসরূপে যার তুলনা অনায়াসে চলে। অতি সামান্য পরিসরে জীবন সুরু করে পরবর্তীকালে অস্টিন ডিস্ট্রিবিউটার্সের শীর্ষস্থানীয় কর্ণধারের আসনটি আপন অধিকারে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন।

প্রণয়লালের বড় ছেলে এই রচনার লক্ষ্য পরিতোষের জন্ম ১৯১৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলের ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৩ সালে। কলা-বিদ্যায় প্রাক-স্নাতক ও স্নাতক পরীক্ষায় সফলতার সম্মুখীন হলেন যথাক্রমে আশুতোষ ও স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। স্নাতক হওয়ার পর তাঁর কর্মজীবন সুরু হল এ্যালেন বেরি থেকে। ১৯৫০ সালে অস্টিন ডিস্ট্রিবিউশানের অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত হলেন পরিতোষ। ১৯৬৫ সালে পিতৃ-বিয়োগের পর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দায়িত্বভার এল তাঁরই হাতে।

কিন্তু পরিতোষের বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মশক্তি এইটুকু পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জাতীয় জীবনের নানা দিক আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং নতুন প্রাণস্পন্দন লাভ করেছে তাঁর নৈপুণ্যের প্রদীপ্ত রশ্মিতে। ক্রীড়া-জগতে তাঁর অবদান অন্তবিহীন। দুঃসাহসী শিকারী ও দক্ষ বৈমানিক ও কুশলী পর্বতারোহী হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব আজ সর্বজনবিদিত। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-জগতের বহুক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে তাঁরই কল্যাণে। পৃথিবীর ক্রীড়ামহলের বহু রুদ্ধ দুয়ার ভারতবর্ষের সামনে সর্বপ্রথম খুলে গেছে তাঁরই কুশলতায়। অলিম্পিকের বিচারক ছাড়াও একাধিক উল্লেখযোগ্য খেলায় ভারতীয় দলকে তিনি পৃথিবীর নানা দেশে নিয়ে গেছেন ম্যানেজার হিসাবে। ১৯৪৭ সালে তিনি প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন। তাঁর দেখা দেশগুলির তালিকায় এখনও পর্যন্ত কেবল এ্যামেরিকা নামটিই অলিখিত আছে

এ ছাড়া বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের ওয়াইল্ড-লাইফ বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট ডেভেলপ-মেণ্ট বোর্ড, ইণ্ডিয়ান রোড্‌স এ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেণ্ট এ্যাসোসিয়ে-শনের কার্য নির্বাহক সমিতি অটো-মোবাইল এ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার সভাপতি, মোটর ইণ্ডা এ্যাসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান এবং বেঙ্গল ট্যাক্সি এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির আসন বাঙলার এই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানের দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে কয়েক বছর তিনি আলীপুর চিড়িয়াখানার সচিবের আসনেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির অন্যতম সভ্যরূপে তিনি যুক্ত।

'র‍্যাণ্ডম থটস অন ওয়াইল্ড লাইফ এ্যাণ্ড গেম প্রিজারভেশান' নামক সংশ্লিষ্ট বিষয়ক একটি অতি প্রামাণ্য এবং অত্যন্ত মূল্যবান নানা তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকার তিনি রচয়িতা।

ব্যক্তিজীবনে তিনি সঙ্গীতনায়ক রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বড় ছেলে বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ্ এবং রবীন্দ্র-অবনীন্দ্রের ভাষায় এক ক্ষণজন্মা সঙ্গীত প্রতিভা---প্রমোদকুমার ঠাকুরের বড় ছেলে একাধিক দেশের প্রাক্তন কনসাল জেনারেল অবনীমোহন ঠাকুরের অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী প্রণতি দেবীর সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

রমাপদ চোধুরী

[বাঙলা সাহিত্যের বহু মহার্ঘ সৃষ্টির স্রষ্টা এবং বহু সার্থক স্রষ্টার আবিষ্কর্তা]

ভয়ঙ্করের বিষাণ বেজে উঠল। আকাশে-বাতাসে শুধু মৃত্যুর ইশারা। দিক-দিগন্তরে কেবল অসুন্দরের হাতছানি। সমগ্র পৃথিবীর বুক জুড়ে সেদিন সুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা।

ত্রিশের দশকের সেটি সমাপ্তি বর্ষ। বিপুল ঐতিহ্যে ভাস্বর এবং জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান প্রেসিডেন্সী কলেজে ঠিক সেই বছরই এসে মিলিত হল তিনটি কিশোর। অত্যল্পকালের মধ্যেই কৈশোরের সীমানা অতিক্রম করে তারুণ্যের পরিমণ্ডলে পদার্পণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই দুটি বন্ধুর সারস্বত সাধনার সত্রপাত হল। তৃতীয় বন্ধু রয়ে গেলেন নীরব শ্রোতা, দুই বন্ধুর লেখা শোনেন,

শ্রীরমাপদ চৌধুরী

মন্তব্য করেন, পরিমার্জন করে দেন। একদিন এক বন্ধু বলে উঠলেন---তোর সাজেশানে আমাদের লেখা এত ইমপ্রুভ করে---তা তুই নিজে লি না কেন? তুই লেখ, ভাল লেখাই হবে তোর হাত থেকে। লেখক-বন্ধু সমালোচক-বন্ধুকে কলেজ পালিয়ে একদিন সোজা নিয়ে গেলেন কলেজ ষ্ট্রীটের ওয়াই, এম, সি-এর ভোজনা-গারে। সেইখানে বসে সমালোচক-বন্ধু একটি গল্প লিখলেন---পরবর্তী-কালে বাঙলা দেশের গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে উৎকর্ষ ও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে যিনি এক অভাবনীয় বিস্ময়ের স্রষ্টা। ও জীবনে তাঁর সেই

প্রথম কলম ধরেন। লেখক-বন্ধু সেই কলম প্রকাশ করে দিলেন 'আজকাল' নামক একটি সাপ্তাহিকে। সাহিত্যের দুর্গম যাত্রাপথে বাঙলা দেশের সেই অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যুগসন্ধির কালে যে তিনজন দুঃসাহসী তরুণ সেদিন অভিযান শুরু করেছিলেন---সময়ের প্রবহমান ধারা একদিন তাঁদের পৌঁছে দিল সার্থকতার বা পরম-প্রাপ্তির কেন্দ্রবিন্দুতে। বাঙলা সাহিত্যের একালের ইতিহাসে তিনটি নাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেল সম্প্রীতির আশ্বাসে নয়, শাশ্বতের বিশ্বাসে। যে লেখক-বন্ধু সমালোচক-বন্ধুকে প্রবৃত্ত করেছিলেন স্বয়ং লেখনী ধারণে তিনি প্রাণতোষ ঘটক, দ্বিতীয় লেখক-বন্ধু---মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সেদিনের সেই সমালোচক-বন্ধু এই রচনার আলোচ্য চরিত্র---রমাপদ চৌধুরী। বাঙলা সাহিত্যের তিন কালজয়ী শিল্পী।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তথা দেশজননীর দিব্য অঙ্গ থেকে বিদেশী শাসনের লৌহ-নিগড় অপসারণের মহান সাধনার গৌরবময় ইতিবৃত্তে মেদিনীপুরের অবদান এবং ভূমিকা এককথায় অবিস্মরণীয়। খড়্গপুরে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের লেবার ইউনিয়ানের পত্তন যেদিন হল, সেদিন তাঁর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেই এই সদ্যোজাত সংস্থার প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সচিব নির্বাচিত করা হল। সভাপতির আসন যাঁর দিকে এগিয়ে দেওয়া হল তাঁর নাম ভি ভি গিরি---এইখানেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। তারপর সময়ের নিরন্তর ধারায় সেই ঘটনাবহুল কর্মজীবন তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানজনক মর্যাদায়---রাষ্ট্রপতির আসনে---যে-আসনে আজও তিনি স্বমহিমায় সমাসীন। সাধারণ সচিবের আসন গ্রহণ করলেন তারাপ্রসন্ন চৌধুরী। ঐ রেলওয়ের চীফ এ্যাকাউণ্টস অফিসার। রমাপদ চৌধুরী তাঁরই পুত্র।

এই সংস্থা যে বছরে রূপ পরিগ্রহ করল সেই ১৯২২ খৃস্টাব্দের ২৬-এ ডিসেম্বর খড়্গপুর রেল কলোনীতে রমাপদ চৌধুরীর জন্ম। আদিবাড়ী বর্ধমান। রেলওয়ে স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার গণ্ডীও অতিক্রম করলেন। ছাত্র-জীবনে রেখে গেলেন যথেষ্ট নৈপুণ্যের ও দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কলেজ-জীবনেই সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত ---সেই কাহিনী থেকেই এই রচনার যাত্রারম্ভ। প্রথম গল্প প্রকাশের পর আনন্দবাজার ও যুগান্তরে পাঠালেন গল্প। একই সঙ্গে ছাপা হল। পূর্বাশায় শুরু করলেন নতুন স্বাদের গল্প লিখতে। গোটা বাঙলা দেশে সাড়া জাগল। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। গল্প-সাহিত্যের আঙ্গিক বিন্যাস ও ভাবধারার নতুন দিগন্তের উন্মোচনে তাঁর যে অসামান্য কৃতিত্ব আজ সর্বজনবিদিত, সেই সময়ে তার সূচনা।

১৯৪৮ সালে 'লাইফ অফ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনভার গ্রহণ করলেন। তারপর প্রকাশ করলেন মাসিক 'ইদানীং'। বাঙলা পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে এই পত্রিকাটির অবদান এককথায় অমূল্য। এর বৈশিষ্ট্য সমমর্যাদায় স্মর্তব্য। ব্যক্তিজীবন এবং ফিচারধর্মী রচনাকে আশ্রয় করে যে পত্রিকাগুলি রূপ নিয়ে থাকে এই পত্রিকা তাদের পথিকৃৎ। কোন খ্যাতনামা লেখকের লেখা এ কাগজে সেদিন ছাপা হোত না, কিন্তু যে অখ্যাত অজ্ঞাত লেখক-কুল এখানে রচনা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের বাঙলা দেশের সাহিত্যিক সমাজে আজ প্রথম শ্রেণীর নাম।

১৯৫৩ সালে যোগ দিলেন আনন্দ-বাজার পত্রিকার উন্নয়ন বিভাগে একশো তেত্রিশ টাকা বেতনে (মাগ্‌গী ভাতা সহ)। রবিবাসরীয় বিভাগে যুক্ত হলেন ১৯৫৮ সালে। তিন বছর পরে হলেন সহযোগী সম্পাদক। একশো তেত্রিশ থেকে দেড় হাজারেরও ঊর্ধ্বে এক সার্থক উত্তরণ, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সাময়িকী বিভাগের সম্পাদক হিসাবে ঐ পত্রিকায় পূজা সংখ্যাও তাঁরই সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হল তাঁর গল্পগ্রন্থ দরবারী। সেদিন প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীদের গল্পগ্রন্থ ব্যবসায়িক সাফল্যের মুখোমুখি হত না। তরুণ সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী এখানে এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য হলেন। উপন্যাস বের হল প্রথম প্রহর। এটি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস তিন তারা। তৃতীয়টি মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত লালবাঈ। পনের দিনে সংস্করণ শেষ হয়ে গেল। সারা দেশের পাঠক-সমাজে এক অভিনব স্পন্দন এনে দিল এই উপন্যাস। ১৯৬৪ সালে লাভ করলেন আনন্দ পুরস্কার।

তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে অরণ্য আদিম, দ্বীপের নাম টিয়া রং, এই পৃথিবী, পান্থনিবাস, বনপলাশীর পদাবলী, পরাজিত সম্রাট, জনৈক নায়কের জন্মান্তর, এখনই, গল্প-গ্রন্থগুলির মধ্যে স্বর্ণমারীচ, অভিসার, বঙ্গনটী, আপন প্রিয়, পিয়াপসন্দ, কথাকলি, দেহলি দিগন্ত, গল্পসমগ্র এবং প্রবন্ধ গ্রন্থাদির মধ্যে লেখালেখি, একসঙ্গে, পত্রনবীশের শুভদৃষ্টি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আন্তঃরাজ্য ও বিদেশী ভাষায় তাঁর গ্রন্থের অনুবাদের রেকর্ডও সমকালীন ক'জন সাহিত্যিকের দ্বারা অতিক্রান্ত হয়েছে তা আমাদের জানা নেই।

জীবনের প্রতিটি পর্বে কত বৈচিত্র্য। জীবনের তুলনায় বৈচিত্র্যের বড় দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি নেই। সেই বৈচিত্র্যদীপ্ত জীবনকে বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন ভঙ্গী থেকে

প্রত্যক্ষ করে, তার মর্মোদ্ধার করে, তার ভাষ্য স্পষ্ট করে সেই সামগ্রিক জীবন-চিত্র যিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠায় তুলে ধরেন, তিনিই সার্থক প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন মননশীল রস-পিপাসু সাহিত্যস্রষ্টা। বলা বাহুল্য, এই তালিকায় রমাপদ চৌধুরী একটি বিশিষ্ট নাম। এই অনুসারে তাঁর সাহিত্য রচনার রীতিপ্রকৃতিও আলোচ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। তাঁর সৃষ্টির মত স্রষ্টা জীবনও বৈশিষ্ট্য বিমণ্ডিত। নিয়মিতভাবে একটানা সাহিত্য-চর্চা কোনদিনই তিনি করেন নি। মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁর লেখনী নীরব থাকে। তারপর নতুন দীপ্তিতে, নতুন আলোয়, নতুন ঔজ্জ্বল্যে ঘটে তার আত্মপ্রকাশ --- সেই কারণেই তাঁর সৃষ্টি এত বৈচিত্র্য-ধর্মী, যুগোপযোগী এবং মহৎ জীবন-দর্শনসমৃদ্ধ বিরাট ভাবনা-সম্বলিত। আপাতদৃষ্টিতে তিনি বজ্রগম্ভীর, কিন্তু অন্তরে তিনি কুসুম-কোমল। বহিরঙ্গে তাঁর গাম্ভীর্যের দুর্ভেদ্য আবরণ, কিন্তু অন্তরঙ্গে তাঁর দরদ, সহানুভূতি এবং স্বতোৎসারিত বাৎসল্য ও ভালবাসার নিরন্তর-নির্ঝর ফল্গুধারা---যে মন তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরে দুর্গত অসহায়ের পাশে সাহায্যের পূর্ণ পাত্র হাতে। যে মনের এক মহৎ প্রকাশ সেদিনও ঘটেছে এক সাহিত্য-সতীর্থকে কেন্দ্র করে, সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধুর জীবনের প্রতিক-পর্বে (এবং তৎপরবর্তীকালেও) রমাপদ চৌধুরীকেই দেখা গেছে এক মূর্তিমন্ত সহায়করূপে।

ঈশ্বর তাঁকে শুধু দুর্বার লেখনী-শক্তি দিয়েই পৃথিবীতে পাঠান নি, সেই সঙ্গে তাঁকে পরিপূর্ণ করেছেন অফুরন্ত হৃদয়সম্পদে---যে সম্পদের আলোয় বহু বিপন্ন মানুষ জীবনের নানা অন্ধকার অতিক্রম করে আলোর অমৃত আস্বাদ নিতে সমর্থ হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এখানে কোন দল, মত বা গোষ্ঠীর প্রশ্ন নেই।

১৯৫৬ সালে শ্রীমতী সুষমা দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের দুই কন্যা মহুয়া এবং মঞ্জরী।

অনিল মিত্র

[রাজ্যের প্রাক্তন স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল— প্রখ্যাত আইনবিদ]

একদিকে তীক্ষ্ণতীব্র যুক্তিজালের বিস্তার, চুলচেরা বিশ্লেষণ, অকাট্য সওয়াল---এখানে হৃদয়াবেগের স্থান নেই, কবিকল্পনার কণামাত্রও অনুপস্থিত, স্বপ্নবিলাস চিরনির্বাসিত---আইনের রৌদ্ররুক্ষ জগতে হৃদয়ের সহজাত কুসুম-কোমল প্রবৃত্তির প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু আর একদিকে অফুরন্ত হৃদয়া-বেগের অমল আত্মপ্রকাশ, অন্তরের অন্তঃ-পুরের গভীর অনুভূতির রসসিক্ত স্ফুরণ, স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার স্বতোৎসারিত ফল্গু---এই হল সহজ সুন্দর ব্যক্তি-মানসের কক্ষপথভুক্ত অমূল্য সম্ভার জীবনের এই দুটি ভিন্নমুখীন ধারা, স্বতন্ত্র প্রকাশরীতির সার্থক সঙ্গমস্থল-রূপে আমাদের হাসি-কান্না ভরা জীবনের চলার পথের বিভিন্ন প্রান্তে যে ক'টি নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে---বাঙলার আইন জগতের অন্যতম স্তম্ভ রাজ্যের প্রাক্তন স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল শ্রীঅনিল মিত্র তাঁদেরই একজন।

পিতৃপরিচয়ও বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার-এর সেই দিকপাল ইঞ্জিনীয়ার রাজ্যেশ্বর মিত্র---এই রচনার আলোচ্য অনিল মিত্রের পিতৃদেব। সেদিন অসংখ্য বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার এই ভারতীয়ের অধীনে কাজ করেছেন। কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জেরুসালেম থেকে তিনি গেলেন অর্ডার অফ সেণ্ট জন এবং বৃটিশ সরকার তাঁকে দিলেন অর্ডার অব বৃটিশ এম্পায়ার।

জব্বলপুর ১৯০৮ সালের ১৮ই মার্চ অনিল মিত্রের জন্ম। বাল্যশিক্ষা সুরু হল কনভেণ্টে এবং সেণ্ট এ্যালুলিয়াস স্কুলে। কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন সেণ্ট মেরীস স্কুলে, কলেজী পাঠ নিলেন স্কটিশ চার্চ এবং সেণ্ট জেভিয়ার্সে। শেষোক্ত কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ প্রসঙ্গে সফলকাম ছাত্রতালিকায় তাঁর নামের উপর মাত্র একটি নাম শোভা পেল। তারপর পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ড। ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সফলতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ১৯৩২ সালে ফিরে এলেন মাতৃভূমি ভারতবর্ষে। সুরু হল আইন-জীবীর জীবন---যে জীবন আজ পরিপূর্ণ সার্থকতার এক অমলিন স্বাক্ষর, যশের এক প্রদীপ্ত শিখা---সুরু হল সেই জীবনের গৌরবময় সূচনা। স্বর্গত প্রমোদচন্দ্র ঘোষের চেম্বারে যোগ দিয়ে আইনজ্ঞের কাজ আরম্ভ করলেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা তদন্ত কমিশনে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হন।

১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হলেন অনিল মিত্র। দশ বছর পর ১৯৬৭ সালে উক্ত পদ থেকে অবসর নিলেন শরীরগত কারণে। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন রত্না সরকারের মামলা, আদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের মামলা প্রভৃতি সমকালীন সাড়া জাগানো, আলোড়ন আনা মোকদ্দমাগুলি তিনিই পরিচালনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁকে সিনিয়ার কাউন্সেলরূপে নিয়োগ করে তাঁর প্রতিভাকে সম্মান দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। ভারত সরকারের বহু মামলা পরিচালনায় ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর আইনবিষয়ক গভীর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন সগৌরবে।

প্রবোধলাল সোম

[রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্মসচিব, দক্ষ প্রশাসক ও বিচক্ষণ আইনবিদ]

অসামান্য কর্মশক্তি এবং দক্ষতার প্রাচুর্য যাঁদের জীবনেতিহাসে অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যের সঞ্চার করেছে, প্রবোধলাল সোম সেই তালিকায় আজকের দিনে একটি বিশিষ্ট নাম। বিচক্ষণ আইনজ্ঞ, বাণিজ্যতত্ত্ববিদ্ এবং প্রখর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশাসনিক হিসাবে যে দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

শ্রীহট্টের এক বিশিষ্ট জমিদার পরিবারের সন্তান স্বর্গত প্যারীলাল সোম সেদিন এক ধুরন্ধর আইনবিদ্ হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী। স্বদেশী-যুগে বক্তা হিসাবেও উদ্দীপনা সঞ্চারে তাঁর ভূমিকা অল্প মূল্যের নয়। প্যারীলালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে চারজনই আইনজ্ঞ। এই পাঁচ জনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এই রচনার আলোচ্য পুরুষ প্রবোধলালের জন্ম ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ, এবং আইন পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীর কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন পাঁচ বছর। পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। কলকাতা মহানগরী যে-কোন মুহূর্তে বোমায় বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বহু পরিবারের মত এই পরিবারও সাময়িকভাবে কলকাতা ত্যাগ করেন। পরিবারের মহিলাদের নিয়ে প্রবোধলাল চলে গেলেন শ্রীহট্টে। সেখানে থাকাকালীন আসাম স্টেট সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন প্রবোধলাল, প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন, কিন্তু সেদিন সে রাজ্যে কোন প্রতিযোগিতায় বাঙালীর স্থান ছিল না বললেই চলে। তাই এক্ষেত্রে এ ঘটনা তাঁর অসামান্য সাফল্যেরই পরিচায়ক।

আইন ও প্রশাসন জগতে অতঃপর নানা ভূমিকায় তাঁর আত্ম-প্রকাশ দেখা গেছে। ভিন্নধর্মী প্রতিটি কর্মেই তিনি দেখাতে পেরেছেন অসামান্য নৈপুণ্য। জুডিসিয়াল অফিসাররূপে সরকারী কর্মজীবন সূচনা করার পর তিনি হলেন সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার। তারপরই রাজ্য সরকারের মুদ্রণাগারের ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হল। এই মুদ্রণাগারের নবপ্রাণ সঞ্চার করার পর তাঁকে তিন বছরের জন্য নিযুক্ত করা হল অর্থ-বিভাগের আণ্ডার সচিব। পরবর্তী এক বছর ঐ বিভাগের ডেপুটি-সেক্রেটারীর কার্যভার পালন করার পর তাঁকে ঐ পদেই শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত করা হল।
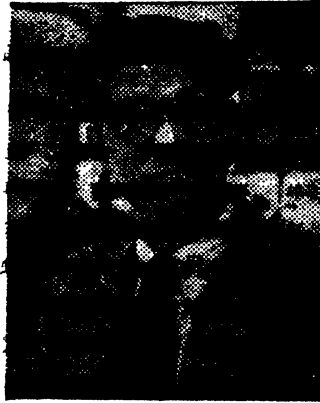
এর পর একটি বিশেষ জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কমিশনার হিসাবে তাঁকে দেখা গেল। ১৯৬০ সালে আবার শিক্ষা-বিভাগে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হল যুগ্ম-সচিবের সম্মানে। ১৯৬১ সালে কলকাতা হল তাঁর কর্মক্ষেত্র। সমগ্র পূর্বাঞ্চলের খাদ্য সংক্রান্ত পরিচালকের আসনে তাঁকে বসান হল---সেই সঙ্গে তাঁর নাম ভিজিল্যান্স অফিসাররূপে ঘোষণা করা হল। এর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়্যার-হাউস কর্পোরেশনের ভার তাঁর হাতে অর্পণ করা হল, তাঁকে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মর্যাদা দিয়ে (১৯৬৪)। যে সংস্থা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত---শ্রীসোম তাকে নিয়ে গেলেন লাভের ঘরে। ১৯৬৮ সালে কৃষি-বিভাগের যুগ্ম-সচিব নিযুক্ত হলেন। বর্তমানে তিনি স্বাস্থ্যদপ্তরের যুগ্ম-সচিব।

শ্রীপ্রবোধলাল সোম

খাদ্য, কৃষি, আইন, অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিভাগেই তাঁর গভীর দক্ষতার পরিচয় মিলেছে এবং ভবিষ্যতে আরও মিলবে এ আশা রাখা যায়। ১৯৪১ সালে শ্রীমতী মাধুরী দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

গুরুভ্রাতার দৃষ্টিতে স্বামীজী

"সমগ্র জগৎ এক্ষণে বুঝিতে সুরু করিয়াছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ কি অদ্ভুত কর্মই না সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যে কেহই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন, তিনিই মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত হইবেন এবং তাঁহার জন্মভূমির প্রকৃত সেবা করিতে তিনি সক্ষম হইবেন। কারণ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শক্তিই তাঁহার মাধ্যমে কার্যকরী হইয়াছিল।" —স্বামী অভেদানন্দ

পরলোকে প্রাণতোষ ঘটক

প্রথিতযশা সাহিত্যকার এবং দিক্‌পাল সাময়িকপত্রসেবী প্রাণতোষ ঘটক গত ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি একটা পাঁচ মিনিট সময়ে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে প্রায় পাঁচ সপ্তাহব্যাপী রোগ ভোগের পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ ঘটক (চট্টোপাধ্যায়) পরিবারের স্বনামধন্য সন্তান, বাঙলার ব্যবসায়-জগতের স্তম্ভস্বরূপ এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সহায়ক স্বর্গত ভবতোষ ঘটকের পুত্র প্রাণতোষ ঘটকের জন্ম চন্দননগরে ১৯২৩ সালের ২৪শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)।

কলকাতার টাউন স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯৪৫ সালে বাঙলায় এম-এ এবং আইন অধ্যয়ন করার সময়ে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও মাসিক বসুমতীর স্থাপয়িতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী আরতি দেবীর সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন ও মাসিক বসুমতী এবং দৈনিক বসুমতীর রবিবাসরীয় সাময়িকী বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী ইতিহাস কারোরই অজানা নয়। বাঙলাদেশের সারস্বত সমাজে এ তথ্য কারোরই অবিদিত নয় যে, প্রাণতোষ ঘটকের যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সৃজনধর্মী চিন্তাধারায়, সর্বোপরি যাদুকরী প্রতিভার কুশলতায় বাঙলার সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকাজগৎ কতখানি সমৃদ্ধ, বিকশিত ও লাবণ্যময় হয়ে উঠেছিল। নব নব শক্তিমান লেখকের আবিষ্কার,

ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের, সুরের, আঙ্গিকের রচনার পরিবেশনে এবং বাঙলার ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাতময় আভ্যন্তরীণ আলেখ্যের সার্থক চিত্রণে তিনি যে নতুন ইতিহাস, নতুন ধারা এবং নতুন আদর্শের সৃষ্টি করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে স্মরণযোগ্য। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ পঙ্গপাল। তারপর বাঙলা সাহিত্যে তাঁর যুগান্তকারী উপহার আকাশ-পাতাল। মাত্র সাতাশ [illegible] লেখা এই অপূর্ব উপন্যাস [illegible] এক আলোড়ন আনে [illegible] শ্রেণীর এক অগ্রগণ্য [illegible] প্রতিষ্ঠা দেয়। তাঁর [illegible] প্রায় কুড়ি। তাঁর [illegible] রাজায়, মুক্তাভস্ম, [illegible] মুঠো মুঠো কুয়াশা, [illegible] প্রেম, রাণীশৌ, মিলন মধু, [illegible], বাসর বাসনা, রূপালী তারার [illegible] স্বপ্নাভিসার, খেলাঘর [illegible] একটুকু বাসা প্র[illegible] তাঁর [illegible] উপন্যাস---তিন পুরুষ (মহারাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত)। এ [illegible] বত্নমালা নামক একটি সমার্থাভিধান ও কলকাতার পথঘাট নামে মহানগরীর বিভিন্ন রাজপথের একটি ইতিহাস তিনি প্রণয়ন করে গেছেন। বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন এবং কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টাররূপেও তিনি সংযুক্ত ছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসাবেও তিনি ছিলেন এক সহজাত প্রতিভার অধিকারী। প্রাণতোষ ঘটকের এই অকালপ্রয়াণ তাঁর অনুরাগী, বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ মহল ছাড়াও সমগ্র সাহিত্য ও সাময়িকপত্র জগতে যে বিরাট একটি আসন শূন্য হয়ে গেল তা এক কথায় অপূরণীয় বললে অত্যুক্তি হয় না।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিপূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত মহান বিপ্লবী নায়ক সর্বজনবরেণ্য বিপ্লবী 'মহারাজ' ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী গত ২৩শে শ্রাবণ---জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় আগষ্ট বিপ্লবের স্মরণীয় দিনে নয়াদিল্লীতে ৮২ বছর বয়সে মহানিদ্রায় অভিভূত হয়েছেন। দেশের মুক্তিযজ্ঞের অন্যতম বরেণ্য যাজ্ঞিক ত্রৈলোক্যনাথের ত্যাগবহুল, সংগ্রামময় রোমাঞ্চকর বিচিত্র জীবনযাত্রা পৃথিবীর যে কোন দেশের স্বাধীনতাপ্রেমীদের চোখের সামনে এক অফুরন্ত উদ্দীপনার উৎস হিসাবে গণ্য হতে পারে। জীবনের তিরিশটি বছর তাঁর অতিবাহিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে---আন্দামান ও মান্দালয়ের বন্দিশালায়। পাকিস্তানের জেলে কেটেছে জীবনের আরও বারোটি বছর। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানেই তিনি বসবাস করেন এবং সেখানে সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠন করে সেই পার্টির চেয়ারম্যান হন। পাকিস্তান সরকার পরে ঐ দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান বিধানসভার সদস্য ছিলেন। 'জেলে ত্রিশ বছর' নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বজনসমাদৃত প্রামাণ্য গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। ভারত ও পাকিস্তান এই উভয় দেশের একটি জীবন্ত মিলনসেতুর অপসারণ ঘটলো তাঁর এই মহাপ্রয়াণে। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের এবং সাধারণ্যের মুক্তি-সচেতনতার [illegible] সাধনের ইতিহাসে তাঁর [illegible] নাম চিরন্তনের দাবীতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

অস্থায়ী সম্পাদক—বিজনকুমার সেন

শ্রীশ্রীদুর্গা (নে

চিত্র :— কল্যাণ স

মাসিক

বসুমতী

॥ আশ্বিন ১৩৭৭ ॥

মাসিক বসুমতী
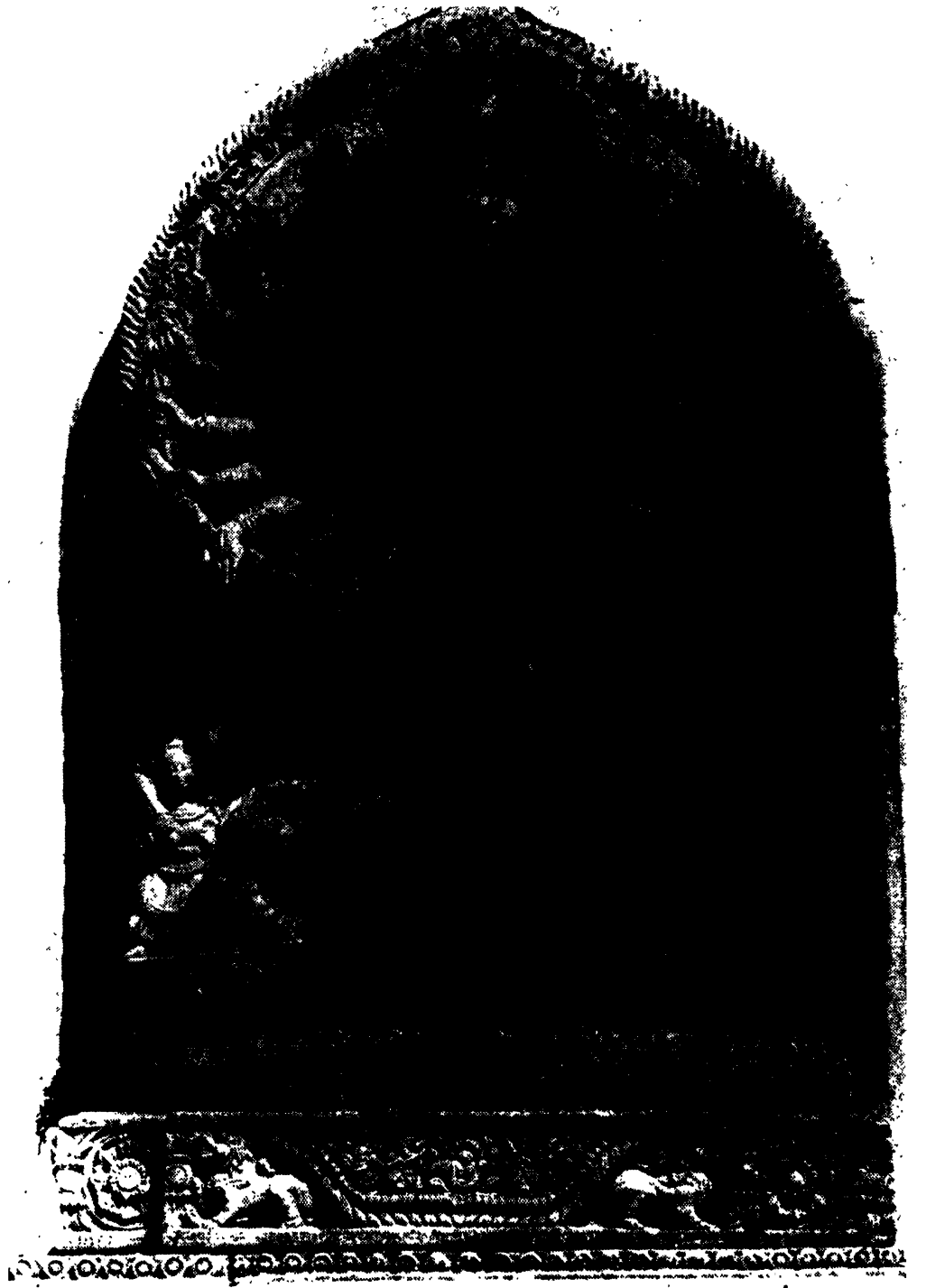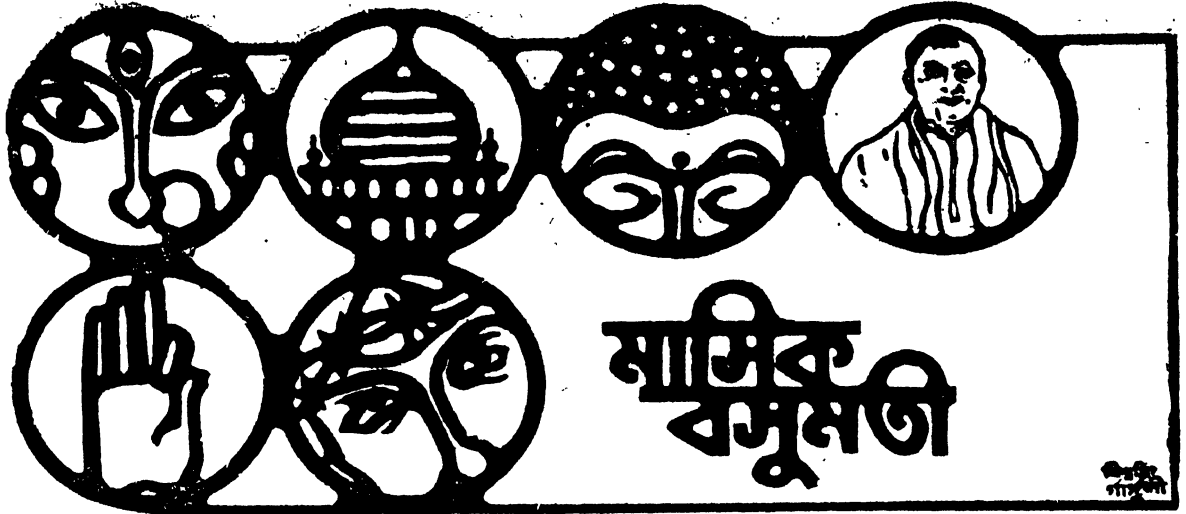
॥ ৪৯ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৭৭ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥

কথামৃত

লিংগশরীর

করণ সকলের শক্তিরূপ অবস্থা অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণরূপ ইন্দ্রিয়শক্তিসকল এবং পঞ্চপ্রাণ—যাহা দেহান্তর গ্রহণ করে সংসৃত হয় তাদের নাম লিংগশরীর বা সূক্ষ্মশরীর। সহজ কথায় প্রাণ স্থূল দেহ থেকে নিষ্ক্রমণের সময় স্থূল দেহের করণসকলের (অন্তঃকরণ, পঞ্চপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির) শক্তিরূপ অবস্থাগুলি নিয়ে নিঃসৃত হয় ; এই সকল সূক্ষ্ম শক্তিসমষ্টিই লিংগশরীর। এই লিংগশরীর বা সূক্ষ্মশরীর সতেরটি অবয়ববিশিষ্ট ; মন (চিত্ত সহিত), বুদ্ধি (অহংকার সহিত), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ—এই সতেরটি অবয়ব। তাই সূক্ষ্মশরীরও অবয়বী।

লিংগশরীরই সুখ-দুঃখ ভোগ করে—জাগ্রত অবস্থায় স্থূল শরীরের সংগে এবং স্বপ্নাবস্থায় সংগীহীন হয়ে—কারণ তখন স্থূল শরীর অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকে।

সূক্ষ্ম বা লিংগশরীরের সতেরটি অবয়বের মধ্যে যে ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ৫টি কর্মেন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি স্থূলদেহের স্থূল ইন্দ্রিয় নয়—এগুলি সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত উপাদানে গঠিত। স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি সেইসকল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের পঞ্চীকৃত। বহিঃপ্রকাশক চিহ্ন। এই সকল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সুখদুঃখাদি ভোগ হয় ; জাগ্রত অবস্থায় সে ভোগ ভোগায়তনরূপ স্থূলদেহে সঞ্চারিত হয় মাত্র। অই আমরা সুখদুঃখ স্থূল চর্মচক্ষে দেখতে পাই না—কেবল উপলব্ধি করি। স্বপ্নাবস্থায় সেটা স্থূলদেহে সঞ্চারিতও হয় না।

সূক্ষ্মশরীর অপঞ্চীকৃত ; পঞ্চীকরণ হয় নি বলেই সূক্ষ্মশরীরকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা হয়।

সমষ্টির লিংগশরীরের সমষ্টিতে বর্তমান ঈশ্বরকে হিরণ্যগর্ভ বলে। আর ব্যষ্টি লিংগদেহে (সূক্ষ্মশরীরে) উপহিত চৈতন্যকে তৈজস বলে।

যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন, তাঁরা লোকান্তরগমন করেন না—এখানেই লয় হন। জীবন্মুক্ত পুরুষের ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হলে আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে তাঁর লিংগশরীর লয় হয়ে যায়। লোকান্তরগমন লিংগশরীর থাকলে তবে সম্ভব হয়। যার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় নি, তার লিংগশরীর লোকন্তরগমন করে। কিন্তু যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর লিংগশরীর উৎক্রান্ত হয় না—প্রারব্ধ ক্ষয়ের সংগে সংগে তাঁর লিংগশরীরও ক্ষয় হয়ে যায়। আনন্দৈকরস অখণ্ড ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তাঁর প্রাণত্যাগ হয় না—ব্রহ্মে লীন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এই চারিটি জড়িয়ে লিংগশরীর—যাকে বলে জীবাত্মা বা অষ্টপাশ জড়িত আত্মা।"

লীলা

ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে করতে ইষ্টের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়ার ইচ্ছা সাধকের মনে জাগে। তার ফলে সাধক লীলা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও মনন করে আনন্দ লাভ করে। ইষ্টের কার্যাবলী বা লীলাসমূহ ধ্যান করে সাধকের ক্রমে ক্রমে ইষ্টের গুণের দিকে দৃষ্টি পড়ে। গুণগুলি অন্তরের স্থায়ী ভাব। এই সূক্ষ্ম গুণগুলিই স্থূল লীলা বা কর্মরূপে অভিব্যক্ত হয়।

কৃষ্ণাবতারের লীলা গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি ; রামাবতারের বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, তুলসীদাসের রামায়ণ ইত্যাদি ; দুর্গাবতারে শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবী ভাগবত ইত্যাদি। এই সকল লীলা গ্রন্থ পাঠে, লীলার আলোচনার ফলে সাধক ইষ্টের [illegible]

তিনিই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়কর্তা ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম—বিশ্বের সর্বত্রই তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়; যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠা। নিত্য দর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়,—ভক্তি-ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত।

"তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা; ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে, যুগে যুগে আসেন, প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না, চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্তলীলা,—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।

"তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর যত বিচিত্রতা; ভাল-মন্দ, সাধু-অসাধু, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, ভক্ত-অভক্ত—আরো কত রকম। আবার অবতাররূপে তিনি ভাব আশ্রয় করে লীলা করেন—যখন যে ভাব। তাঁর অনন্তলীলা আস্বাদনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের পরও তিনি কখন কখন একটু 'আমি' রেখে দেন—'ভক্তের আমি', 'বিদ্যার আমি'। তা হতে লোকশিক্ষা হয়, তাঁর অনন্তলীলা আস্বাদন হয়।

বিচার পথে লীলা স্বপ্নবৎ মিথ্যা হ'য়ে যায়—আমিটাও উড়ে যায়। কিন্তু অহংবুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। নেতি নেতি করে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পৌঁছান যেতে পারে। কিন্তু কিছু ছাড়বার যো নাই। তা হলে ওজনে কম পড়ে।

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না; লীলা আছে বলেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌঁছান যায়। তাই আমি নিত্য লীলা দুইই লই। বগলে হাত দিয়ে টিপ না—দুহাতই ছেড়ে দিয়েছি।

"তাঁকে চিন্তা করে অখণ্ডে—মন লয় হলেও আনন্দ—আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ। তাই হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করে, তার পরে দাস-ভাবে—ভক্তের ভাবে ছিলেন।

"যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁরা জানেন যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয়, 'ঈশ্বর-মায়া-জীবজগৎ'—কি না জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম, সব জড়িয়ে একটি। তিনিই সব হয়েছেন এটা রামানুজের মত; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

"রামানুজের মতে লীলাও সত্য। যতক্ষণ—'আমি' আছে, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য—ততক্ষণ তিনিই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। লীলারূপ ভেঙে গেলে নিত্য ত' আছেই। জল স্থির থাকলেও জল—হেললে দুললেও জল।

"দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয়, তাঁর লীলা কি দেখি। বুড়ী নিকষা রামকে বলেছিল—'রাম, বেঁচে আছি বলে তোমার কত লীলা দেখলাম। তোমার আরো কত লীলা দেখবো বলে আরো বাঁচবার সাধ আছে।'

শক্তি

'কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতা কার্যং'—কারণের যাহা আত্মভূত, তাহাই শক্তি; আর শক্তির যাহা আত্মভূত, তাহাই কার্য। অর্থাৎ যা দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয় বা যা কার্যরূপে পরিণত হবার যোগ্য, তা-ই শক্তি। আর শক্তি দ্বারা যা সম্পন্ন হয়, তা-ই কার্য। শক্তি পরমাত্মারই মধ্যে গূঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত। কাজেই পরমাত্মা চৈতন্যরূপে নিমিত্ত কারণ এবং শক্তিরূপে উপাদান কারণ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই শক্তি—পরমেশ্বরে অবস্থিত, পরমেশ্বর থেকে অপৃথক, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী। শক্তি কারণের স্বরূপ এবং কার্য শক্তির স্বরূপ। কার্য ও কারণ অনন্যভাবে গ্রথিত।

ব্রহ্মের শক্তি ত্রিবিধা—ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী। এই শক্তিকেই শাস্ত্রে প্রকৃতি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, তমঃ, অবিদ্যা ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদ শক্তিকেই বিশ্ব-কারণ অদিতি বলেছেন।

যা কিছু পদার্থ আমরা দেখতে পাই, সবই ব্রহ্মের শক্তি থেকে উৎপন্ন। যা কিছু হবে, তাও তাঁর শক্তি থেকেই হবে। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। দেবী উপনিষদে দেবী (শক্তি) বলছেন—'আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী; পরমার্থতঃ আমি অজা অর্থাৎ জন্মহীনা; ব্যবহারতঃ নানা দেবদেবীরূপে আবির্ভূতা। ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দুই পার্শ্বে, আমি সর্বত্র পূর্ণা। দেশ, কাল, বস্তুতে আমি অপরিচ্ছিন্না।'

শক্তি যখন শান্ত অবস্থায় থাকে, আমরা তাকে জানতে পারি না; যখন উদিত বা প্রকাশিত হয়, তখন জানতে পারি। কাষ্ঠে অগ্নি আছে প্রসুপ্ত অবস্থায়, কিন্তু প্রকাশের পূর্বে আমরা তা দেখতে পাই না। এই শক্তি ব্রহ্মেরই।

মানুষের শক্তি যেমন নিদ্রাবস্থায় প্রসুপ্ত থাকে, জাগরণে প্রকাশ পায়, তেমনি ঈশ্বরের অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তির ক্রিয়া সদাশিব ও কালীমূর্তিতে প্রকটিত—শবরূপে (শিবরূপে) অব্যক্ত বা প্রসুপ্ত (Kinetic) শক্তি,—আর কালীরূপে ব্যক্ত (Potential) শক্তি। তাই বলা হয় পরব্রহ্ম সর্বশক্তির আধার—শক্তি ও শক্তিমান অভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যা কিছু দেখছো, সবই তাঁর শক্তি। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার যো নাই।

"বেদান্ত বলে,—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জীব-জগৎ এসব শক্তির খেলা; বিচার করলে দেখা যায়, এ সব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ—অবস্তু।

"কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি'—এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একটিকে মানলেই আরেকটিকে মানতে হয়। অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়; অগ্নি ছাড়া দাহিকাশক্তি, আবার দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। সূর্যকে ছেড়ে সূর্যরশ্মি, আর সূর্যরশ্মি ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আর শক্তি ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না।
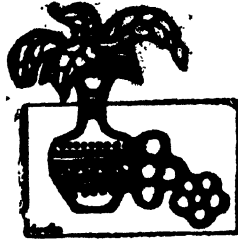
"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী—একই বস্তু; যখন তিনি নিষ্ক্রিয়,—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজই কচ্ছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, আর যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নামরূপ ভেদ, যেমন একই পুকুরের বিভিন্ন ঘাট।

"কিন্তু যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি' এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি প্রার্থনা শুনছো এ জ্ঞানও আছে, আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধও আছে। 'তুমি প্রভু, আমি দাস', 'তুমি মা, আমি ছেলে', 'তুমি পূর্ণ, আমি অংশ'—এরই নাম ভেদবোধ। তুমি একটি আমি একটি, পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার,—এ সব ভেদবোধ। যতক্ষণ এই ভেদবোধ আছে, ততক্ষণ শক্তি (Personal GOD) মানতে হবে।

"শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতর বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই-ই আছে। অবিদ্যা মুগ্ধ করে—কামিনী ও কাঞ্চনে আসক্ত করে। বিদ্যা থেকে দয়া, ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম জন্মায়—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। এই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করবার জন্যই শক্তির পূজাপদ্ধতি।

"যিনি জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, যিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন, সেই মহামায়া দ্বার ছাড়লে তবে অন্দরে যাওয়া যায়—তবে দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। বাইরে পড়ে থাকলে কেবল বাইরের জিনিষই দেখা যায় —সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানা যায় না।

"তাঁর কৃপা পেতে হলে আদ্যাশক্তিরূপিণী মহামায়াকে প্রসন্ন করতে হয়। তাই চণ্ডীতে মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করেছেন। সেই মহামায়াকে প্রসন্ন করবার জন্যই শক্তির সাধনা—তাঁর নানাভাবে পূজা।"

শব্দ

শব্দ একটা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ—চলতি কথায় যাকে বলে ধ্বনি বা আওয়াজ। শব্দ আকাশের গুণ। শব্দ বা বাক্ থেকেই সমস্ত ভুবন উৎপন্ন। কি অমৃত কি মর্ত্য, সবই বাক্ বা শব্দ-সম্ভূত। বেদান্ত দর্শন ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন—'দেবতা প্রভৃতি যা কিছু সমস্তই বৈদিক শব্দ থেকে উৎপন্ন। শব্দের দ্বারাই শব্দ ব্যবহারের যোগ্য পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। যে কিছু সৃষ্ট বস্তু সমস্তই শব্দপূর্বক। অনাদি স্ফোট শব্দই বাঙ্ময় জগতের উৎপত্তিস্থান। এ থেকেই বাঙ্ময় জগৎ ব্যবহারযোগ্য হয়েছে।' শ্রুতি বলেন— 'তিনি ঈক্ষণ-কামনা-ইচ্ছা করলেন'। সঙ্কল্প বা ইচ্ছা থেকেই বিশ্ব উৎপন্ন। সঙ্কল্প জগতের ক্রিয়া; যেখানে ক্রিয়া আছে, সেখানেই চলন আছে। শব্দ ছাড়া চলন বা স্পন্দন হয় না। তাই শাস্ত্র বলেছেন—প্রাণ-স্পন্দন। তা হলে স্পন্দনই বিশ্বের মূল—স্পন্দনই ব্রহ্মের সঙ্কল্প বা জ্ঞান ক্রিয়া। এতেই বুঝা যায় শব্দই সৃষ্টির মূল। ইহাই ব্রহ্ম। শব্দ থেকেই জগৎ সৃষ্ট; শব্দ ঘনীভূত হ'য়ে জগদাকারে পরিণত। শব্দই আধিভৌতিক পদার্থসমূহ। শব্দেই আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বস্তুসমূহ বিধৃত।

ওঁকার প্রথম শব্দ। ওঁকার অ-উ-ম: 'অ'কারটি স্পন্দন, 'উ'কারটি প্রাণ, 'ম'কারটি শব্দ—সাত্ত্বিক, রাজস, তামস। শব্দময় 'ম'কার পদার্থটিই প্রকৃতি।

'কাল' নামক ভগবচ্ছক্তি যখন পরমাণু অবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরমাণু শব্দে এবং যখন অবিশেষ (সাকল্য) অবস্থা ভোগ করেন তখন তিনি পরম মহান শব্দে বর্ণিত হন। তাই একই শব্দের প্রকৃতি, পরমাণু, কাল ইত্যাদি নানা আখ্যা।

খণ্ডকালগুলি যেমন কালের অন্তর্গত, দশটি দিক্‌ও তেমনি আকাশের অন্তর্গত। প্রত্যেকটি দিকের যেমন অভিমানিনী দেবতা আছেন (কল্পিত?) তেমনি সমষ্টি আকাশের অভিমানিনী দেবতাই কালিকা। তাই, রামপ্রসাদ গেয়েছেন—"আমি নগর ফিরি, মনে করি, প্রদক্ষিণ দিই শ্যামা মাকে।"

বর্ণ শব্দেরই সাঙ্কেতিক চিহ্ন। একটি বর্ণ (Alphabet) দেব-দেবীরূপে পূজিত হন। কালীর গলে পঞ্চাশৎবর্ণময়ী মুণ্ডমালা। বর্ণগুলি মন্ত্র-মাতৃকা। "যত শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে, কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে বিরাজ করে"—গেয়েছেন সাধক রামপ্রসাদ।

পরমহংস শ্রীমৎ চৈতন্য ভারতী বলেছেন—(সংক্ষিপ্ত)—

"শব্দ ৪ প্রকার—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী।

'পরা বাঙ্ মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভি সংস্থিতা।
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠ দেশগা ॥'

—পরা বাক্ মূলাধার থেকে প্রথমে উদিত হয়; যখন সেই বাক্য নাভিমূলে আসে তখন পশ্যন্তী; যখন হৃদয়গত হয়, তখন মধ্যমা; যখন কণ্ঠগত হয় তখন বৈখরী। সৃষ্টিক্রমে শব্দের গতি পরা বাক্ থেকে বৈখরী বাকের দিকে, কিন্তু সাধনক্রমে সংহার বা প্রত্যাহারের ধারা অবলম্বিত হয়। তখন শব্দের গতি হয় ক্রমশঃ বৈখরী থেকে মধ্যমা ও পশ্যন্তীর মধ্য দিয়ে 'পরা' বাকের দিকে। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দের উচ্চারণ হয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা শ্রুত হয় তা হলো শব্দের বৈখরী অবস্থা। ইহাই শব্দের স্থূলরূপ। জপ তপ কীর্তনাদিতে বৈখরী বাক্‌কে আশ্রয় করেই সাধনকার্য আরম্ভ হয়। ইহা সঙ্কল্পমূলক।

"সৃষ্টির মূলে হল শব্দ। শব্দ হতেই সব কিছু প্রকাশ। কাজেই সেই একত্র যেতে হলে, শান্ত হতে হলে, শান্তির রাজ্যে—আলোকের রাজ্যে যেতে হলে, শব্দে ফিরে যেতে হবে, নাদক লাভ করতে হবে মনকে অন্তর্মুখী করে ক্রমশঃ নাদলাভ হলে সেই শান্ত রাজ্যে যাওয়া যায়। মহাজন বলেছেন—"জলে মনস্থির কর"। জলে মনস্থির করতে গিয়ে প্রথমে নাদের প্রকাশ হয়।"
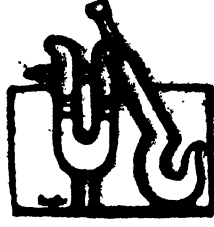
শব্দ ব্রহ্ম

ওঁকার প্রথম শব্দ। ওঁকারই শব্দব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম থেকেই শব্দ তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে। এই শব্দ ব্রহ্মের পূজা প্রতি দেবালয়েই হয়। সকল পূজার পূর্বে পূজকের বামভাগে যে শঙ্খ রাখা হয় তাহাই শব্দব্রহ্মের প্রতীক। সেই শঙ্খে শব্দব্রহ্মের এক এক মাত্রার পূজা করে ইষ্টের জন্য অর্ঘ্য স্থাপন করা হয়। পূজা পদ্ধতির ভিতরে এভাবে শব্দব্রহ্মতত্ত্ব অনুস্যূত।

মৈত্র্যুপনিষদ্ (৬।২২) বলেন—ব্রহ্মের দুই রূপ—শব্দ ও অশব্দ। এই দুই-এর মধ্যে ওঁকার (যিনি ওঁ এই অক্ষর) শব্দব্রহ্ম; আর অশব্দ হচ্ছে পরব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্মের দ্বারা ঊর্ধ্বে উঠে অশব্দে (পরব্রহ্মে) লয়প্রাপ্ত হয়; ইহাই পরমগতি—ইহাই মোক্ষ,—ইহাই ব্রহ্মত্ব,—ইহাই পরমানন্দ। কোন কোন শব্দব্রহ্মবাদী বলেন যে, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করে অন্তর্হৃদয়াকাশে যে শব্দ শ্রুতিগোচরে আসে, তাহাই শব্দব্রহ্ম; এর উপমা সাত প্রকার—নদীর শব্দ, ঘণ্টার শব্দ, কাঁসরের শব্দ রথচক্রের শব্দ, ভেকের চীৎকার রব, বৃষ্টির শব্দ, আর গুহা বা কূপে মুখ স্থাপন করে কথা বললে যে শব্দ হয় তেমনি—এ সব অন্তরাকাশের শব্দের ন্যায়। এই নানাবিধত্ব অতিক্রম করে অশব্দ অব্যক্ত পরব্রহ্মে লয় হতে হয়। তাই শব্দ ব্রহ্ম ও পর-ব্রহ্ম উভয়কেই জানতে হবে। শব্দ ব্রহ্মের জ্ঞান ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলেই পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

বিষ্ণু পুরাণ বলেন—শব্দ ব্রহ্ম এবং পর ব্রহ্ম, এই দুই ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য। শব্দ ব্রহ্মে কুশলী হয়ে পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হতে হয়।

শব্দ ব্রহ্মের মূর্তিই বেদ। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা আর বাণী (বৈখরী) রূপে শব্দব্রহ্মই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ময়। ব্রহ্ম সগুণ রূপ পরিগ্রহ করলেই শব্দ ব্রহ্ম নামে উক্ত হন। ইহাই অবিনাশী পরমনাদ ওঁকার।

শব্দ ব্রহ্ম থেকে শব্দতত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে। জীবকণ্ঠ হতে যে স্বর বা বৈখরী নাদ 'অ'কার থেকে 'ক্ষ'কার পর্যন্ত পঞ্চাশটি মাতৃকাবর্ণাত্মক অক্ষর বলে বর্ণিত; তাদের সংযোগে পদ বা বাক্যের বিকাশ হয়। সকল লৌকিকী ভাষা, গাথা, সঙ্গীতাদি সবই এই বৈখরীনাদ-সম্ভূত।

সমস্ত প্রাণীর হৃদয়দেশে (অনাহত চক্রে) জ্যোতির্ময় সদাশিব গুণত্রয়সমন্বিত শব্দ ব্রহ্ম ওঁকারাত্মা অবস্থান করেন—অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, মকার শিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শব্দই ব্রহ্ম;—অনাহত শব্দ, প্রণবের ধ্বনি—পরব্রহ্ম থেকে আসছে। মুনি-ঋষিরা ঐ শব্দ লাভের জন্য তপস্যা করতেন। সিদ্ধ হলে শুনতে পায়, নাভি থেকে ঐ শব্দ আপনি উঠছে—এই অনাহত শব্দ।

"একমতে, শুধু শব্দ শুনলে কি হবে? দূর থেকে শব্দ কল্লোল শুনা যায়। সেই শব্দকল্লোল ধরে গেলে সমুদ্রে পৌঁছানো যায়। যে কালে কল্লোল আছে, সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধরে ধরে গেলে তার প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। তাঁকেই পরমপদ বলেছেন।" (মহাপ্রলয়ের সময় জগৎ শব্দে এবং শব্দ চিদাকাশে লয় হয়। সমস্ত শব্দ, সমস্ত ভাষা তখন এক অখণ্ডভাবে মিলিত হয়—তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ।)

শম

শম হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের নিগ্রহ। ইহা এক প্রকার সাধন। 'সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতঃ'—সর্বদা সকল বাসনাত্যাগ শম শব্দের অর্থ। মন এবং তার প্রবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির সংযম দ্বারা চিত্তের স্থিরতা আনয়নকেই শম বলে। শম সাধনা মানে যাবতীয় চিন্তা সহ মনোময় কোষকে বা মনকে সংযত ও বশীভূত করা।

সকল রকম বিকার পরিত্যাগ করে মনকে নিস্তরঙ্গ স্থির জলাশয়রূপে পরিণত করতে পারলে চিত্ত পবিত্র হয়, বিশুদ্ধ হয়; তখন তাতে আত্মসূর্য প্রতিফলিত হয়—আত্ম-দর্শন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ (অবিবেক), অভিমান (গর্ব) এবং পৈশুন্য (খলতা) ইত্যাদিকে বৈরাগ্য, অসঙ্গ ও অভ্যাস দ্বারা যে জয় করে নাই, তার 'শম' সিদ্ধ হয় না।

মনের তিনটি প্রধান দোষ আছে—মলিনতা, বিক্ষেপ ও আবরণ। (১) সঙ্গত্যাগ করে নিষ্কামভাবে পুণ্যকর্মাদি করতে করতে মনের মলিনতা নষ্ট হয়। (২) বিক্ষেপ হচ্ছে রাজসিক ও তামসিক ভাব থেকে মনের চাঞ্চল্য। ভক্তির সহিত জপ, ধ্যান, ধারণা ও উপাসনা দ্বারা এ চাঞ্চল্য নষ্ট হয়। তাই ভক্তির উপর বেশী জোর দিতে হবে। (৩) আবরণ হচ্ছে অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা। এ থেকে অহংবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি মনে আসে।

এই আবরণ ও বিক্ষেপের মূলে আছে চিন্তা—যা মনকে বহুমুখী করে স্থির হতে দেয় না। সাধনায় একাগ্রতাই চিন্তা দূর করার উপায়।

শম লাভের ছয়টি প্রধান উপায় আছে—

(১) দম ও প্রত্যাহার অভ্যাস;

(২) রোক ও পুরুষকার;

(৩) সৎসঙ্গ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য,

(৪) মন দ্বারাই মনের উপর পাহারা রাখা (Vigilant watch)—'মনসালোক্য স্বয়ং সিদ্ধ্যন্তি যোগিনঃ'।

(৫) কালহরণ বা প্রতীক্ষা; এবং

(৬) শরণাগত ভক্তি সহ উপাসনা।

—শ্রীযোগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

বাঙালীর দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা বাঙালীর সব থেকে বড় পূজো।

দুর্গাপূজা ভারতে অন্য কোনো কোনো প্রদেশেও হয়। কিন্তু দুর্গাপূজা যে তীব্র জাগরণ বাঙালীর মানসলোকে সৃষ্টি করে তার তুলনা মেলা কঠিন। গুজরাটীরা নবরাত্রি দুর্গাপূজা প্রতিপদ থেকে নবমীর দিন পর্যন্ত পালন করেন কিন্তু তা ধর্মীয় শুষ্ক অনুষ্ঠানে যত গম্ভীর লৌকিক আনন্দে তত উজ্জ্বল নয়। দিনের দৈর্ঘ্যে সে পূজা যত বড়, আনন্দের আবেগে তার হয়ত এক শতাংশও নয়।

বাঙালীর দুর্গাপূজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, যে দুর্গা মূর্তির পূজা হওয়া উচিত সেই মূর্তির পূজা হয় না। পূজা হওয়া উচিত মহিষমর্দিনীর—দক্ষিণপদ সিংহপৃষ্ঠে বামপদ অসুরের স্কন্ধে স্থাপিত, দশহাতে সর্প, শঙ্খ, খড়্গ প্রভৃতি আয়ুধধৃতা; কর্তিতমুণ্ড মহিষের ধড় থেকে খড়্গধৃত অসুরের সংগে বক্ষে বিদীর্ণ ত্রিশূলধৃতা মূর্তি। কিন্তু বাংলায় প্রচলিত মূর্তির সংগে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ ও সপরিবারে বাহনাদি যুক্ত থাকা এক বৈপরীত্য এবং অসুরদলনী রণরঙ্গিণী ভয়ঙ্করমূর্তির [illegible]। বাংলা দেশের পুরাণাদিতে অবশ্য দেবীর পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে আগমন এবং শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ আছে, কিন্তু এ বর্ণনার সংগে মহিষাসুরমর্দিনীভাবের মিল নাই। তবুও এই বিপরীত মূর্তিই বাংলায় পূজিতা এবং এই পূজা বাংলার শ্রেষ্ঠ পূজা। ধর্মগ্রন্থাদির দিক থেকে এই বৈপরীত্য লক্ষণীয় হলেও, এই পূজায় বা মূর্তিতে বাঙালীর সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য "ভাবুকতা"বিধৃত। স্বর্গের দেবতাকে ঘরের মানুষ করে কল্পনা করে পূজা করায় বাঙালীর পারলৌকিক পূজার থেকে ইহলৌকিক পূজাই বড় হয়ে ফুটে ওঠে। মহান্ ধার্মিক ব্যক্তির সংখ্যা বাংলা দেশে নগণ্য নয়। ভারতের হিন্দু তো পরমহংসদেবকে "অবতার" বলায় অকুণ্ঠতাও দেখিয়েছে। কিন্তু তবু সামগ্রিকভাবে বাঙালী মূলতঃ মানববাদী এবং সেই জন্যই বোধকরি পাশ্চাত্যের মানবমুখীন শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞান (কুসংস্কারবাদী ধার্মিকতা থেকে মুক্ত হয়ে) বাঙালী যত শীঘ্র আত্মসাৎ করেছে তত অন্য কোনো প্রদেশ পারে নি। বাঙালী ধর্মগুরু—রাজা রামমোহন, পরমহংস বিবেকানন্দ—ধর্মকে যত প্রাণময় ও মানবমুখীন করে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁদের বিরল। এত বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রসংগ। এই মানবমুখীনতার বৈশিষ্ট্যের যে মাত্রা দেখা যায় তা বোধহয় অন্যান্য প্রদেশে বিরল। এত বিভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রসংগ। এমনি সাধারণ সমাজজীবনেও বাঙালীর ধর্মচর্চায় যেখানে কমবেশী মাত্রায় যুক্তিনিষ্ঠা দেখা যায়, সেখানে অবাঙালীর ধর্মচর্চায় অন্ধ বিশ্বাসের প্রাবল্য দেখা যায়। সেই যুক্তি নিষ্ঠাই বাঙালীকে ধর্মপ্রাণতা সত্ত্বেও মানবমুখীনতায় প্রেরিত করে। বাঙালীর পাশ্চাত্যের মানবমুখীনতা পরিপাক করার ব্যাপারে; অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে

[illegible]

বিবৃত করা অযোগ্য হবে না। অনেকেরই মনে আছে ইংরেজ বাংলায় সব থেকে বেশি ও প্রথম থেকে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই বাঙালীর পক্ষে তাদের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা পরিপাক করা সহজ হয়েছিল; এ ব্যাখ্যা পূর্ণ সত্য নয়, আংশিক মাত্র। সত্যের অন্যাংশ হল—বাংলাদেশ ছাড়াও অন্য স্থানে বহুকাল আগে ইংরেজ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবু সেখানে ব্যতিক্রম কেন দেখা যায়? কারণ—বাঙালীর মানসধর্মের সংগে ঐ সকল মানবমুখী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার সাম্য ছিল; তাই বাঙালী তা অতি সহজে অতি গভীরভাবে আত্মসাৎ করেছিল—রাজা রামমোহনের যুগেই। ইংরেজ ত দিল্লীতেও পরে রাজধানী করেছিল, সুদীর্ঘকাল সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছে তবু সেখানে বাংলা দেশের মত ঘটনা ঘটে নি কেন? আমরা সংক্ষেপে বলা যাক—মূর্তির এই বৈপরীত্য প্রমাণ করে বাঙালীর মানবতাবাদী দার্শনিক চেতনা। ভাবুকতা ত বটেই।

বাঙালী সংস্কৃতির যে কোন দিক থেকেই বোধহয় আমরা এই সত্যকে আবিষ্কার করে নেবার, কোনো-না-কোনো সূত্র খুঁজে নিতে পারি।

বাংলায় প্রচলিত দুর্গামূর্তিতে সম্ভবতঃ লৌকিক জীবনের আরো কয়েকটি ভাবনা বিধৃত। দুর্গা—দুর্গতিনাশিনী; লক্ষ্মী—ধনৈশ্বর্য; সরস্বতী—বিদ্যা; কার্তিক—যুদ্ধ জয়; গণেশ—সিদ্ধি—এই সব ঐহিক জীবনধারায় অনুকূলতায় পূজা বা সাধনার ভাবনা এতে পরিস্ফুট।

মা পিতৃ-আলয়ে আসেন। দেবী হিসাবে তিনি মা আবার পিতৃ-আলয়ে আসায় অর্থে কন্যা। মাতাকে কন্যা, কন্যাকে মাতা পূজা করা বিস্ময়কর ঐহিক-পারত্রিক তত্ত্বের সমন্বয়,—ধর্মের সঙ্গে মানবতার, দেবত্বের সংগে মানবত্বের সমন্বয়—এক উল্লেখযোগ্য বিকাশ। বাঙালীর দুর্গাপূজায় স্বর্গমর্ত্য একাকার, ভগবান ওতপ্রোত জড়িত। ধর্ম, পাপ, পুণ্যের গভীর তর্কের মধ্যে না গিয়েও, এই পূজার মধ্য থেকে বাঙালীকে অনেকখানি চিনে নেওয়া যায়। শাক্ত বাঙালীর শক্তিপূজাও কত কাব্যময়তা মণ্ডিত তা এই পূজা থেকে অনুভব করে নেওয়া যায়। বাঙালীর দুর্গাপূজাকে বিশ্লেষণ করলে সকল দিক থেকে শ্রেষ্ঠের ভাবনার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যিনি এ পূজাকে ধর্মের দিক থেকে বিচার করবেন তাঁর কাছে এ পূজা ত অর্থবহই। যিনি একে সামাজিকতার দিক থেকে দেখবেন তিনি নববস্ত্র, নানান রকম সাজ সাজাই, গরীবকে দান, কাঙালী ভোজনাদি সমাজমুখীতা দেখতে পাবেন। এই পূজার সংগে জড়িত অনেক প্রকার কর্মের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অর্থোপার্জনের—আর্থিক দিক দেখতে পাবেন। কাব্যময়তা ত আছেই, এই পূজার সংগে জড়িত স্ত্রীআচারে আবার এক মনোরম পারিবারিক দিক। পনের বিশ বৎসর আগেও পারিবারিক পূজার বিসর্জনের দিন বিসর্জনপূর্বে দেবী-বরণে ঠিক মেয়ের বিবাহকালীন বিদায় উৎসবের সাদৃশ্য—কুলবধূদের অশ্রুসজল হয়ে ওঠা, সকলে প্রতিমাকে মিষ্টমুখ করান—এ সব অনুষ্ঠান অতুলনীয় পারিবারিক আনন্দবেদনার প্রতীক হয়ে স্বর্গকে মর্ত্যে, ধর্মকে বাস্তবে নামিয়ে আনে। এ অনুষ্ঠান যিনি শান্ত মনে দেখেন, তিনি নাস্তিক হন বা আস্তিক হন, তাঁর হৃদয় আনন্দবেদনায় অভিভূত হয়ে ওঠে।

প্রতিমার গঠনে যেমন এই পূজা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, তেমনি এর অন্য মাসে পূজার সময় মাস ইত্যাদিতেও এ পূজা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এ পূজার ঠিক সময় বসন্তকাল এবং এর নাম বাসন্তীপূজা। [illegible] পুরাণে উল্লেখ আছে:—

পরমহংসদেবের সাধনা

সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রাণী রাসমণি ৩১শে মে, ১৮৫৫ সালে বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী স্থাপন করলেন।

শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট অন্যান্য প্রশস্ত দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা না করে, স্নানযাত্রার দিন বিষ্ণুপর্বের দিনে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই কারণে যে, দেবীমূর্তির নির্মাণ আরম্ভের দিন থেকে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করেছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন, ও যথাশক্তি জপ, পূজা ইত্যাদি করেছিলেন। মন্দির ও দেবীমূর্তি নির্মিত হলে, প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে-সুস্থে শুভদিন নির্ধারিত হচ্ছিল। পাছে মূর্তিটি ভেঙ্গে যায়, এই ভয়ে মূর্তিটিকে বাক্সবন্দী করে রাখা হয়েছিল। এমন সময় ঐ মূর্তিটি ঘেমে ওঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—"আমাকে আর কতদিন এইভাবে বন্ধ করে রাখবি? আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে। যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।"

এই প্রত্যাদেশ পেয়েই রাণী দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে দিন দেখাতে লাগলেন। স্নানযাত্রার পূর্ণিমার আগে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পেয়ে ঐ দিন দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করতে সঙ্কল্প করলেন। তাছাড়া দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারবেন বলে নিজ গুরুর নামে রাণীর এই ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠা করা হল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

.কুমারের ব্যবস্থাদানের ফলে, রামকুমারকেই দক্ষিণেশ্বরে কালী-মন্দিরে পুজারীর পদ গ্রহণ করতে হল। কিন্তু চিরকালের জন্য রাম-কুমারের এই পদ গ্রহণের ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদানের বিধান দিয়ে এবং প্রতিষ্ঠার দিনে নিজে ঐ কাজ শেষ করে, তিনি আবার ঝামাপুকুরে ফিরবেন। রামকৃষ্ণদেব সেদিন দক্ষিণেশ্বরে অন্ন গ্রহণ করেন নি। নিকটস্থ এক দোকান থেকে এক পয়সার মুড়কি খেয়ে সেদিন কাটিয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠার পরদিন প্রত্যুষে রামকৃষ্ণদেব দাদার খবর নেবার জন্য এবং প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যেসব কাজ বাকি ছিল, তা দেখতে এসে কিছুক্ষণ এখানে থেকে বুঝলেন, দাদার সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরবার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সেদিন দাদা তাঁকে সেখানে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেও, দাদার কথা না শুনে তিনি খাবার সময় ঝামাপুকুরে ফিরে গেলেন।

এর পর রামকৃষ্ণদেব পাঁচ-সাতদিন আর দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না। দাদা

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাদি
দিনত্রয়ে।
পূজয়েদ্ বিধিনা দুর্গাং দশম্যাং চ
বিসর্জয়েৎ।

চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে সপ্তমী থেকে তিন দিন এই পূজার বিধান। বোধনের উল্লেখ না থাকায় আরো নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই পূজা বিধিবদ্ধ এবং "বোধন" অনুষ্ঠানপূর্বক (বাংলা দেশে "অকাল বোধনও" বলা হয়) শরৎকালের দুর্গাপূজা বিধিসম্মত নয়। বাংলা রামায়ণে উল্লেখ আছে সীতা উদ্ধারের জন্য রাবণ বধ সফল করার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র সাগর পারের পূর্বে অকাল বোধন পূর্বক দেবীর আরাধনা করে আশী-র্বাদ লাভ করেছিলেন। শরতের পূজা অকালপূজা।

বসন্তকালের শ্রেষ্ঠত্বের কথা গদ্যে কবি-তায় চিরকাল ব্যাখ্যা করা হলেও, বাংলা দেশে বস্তুতঃপক্ষে বসন্তের থেকে শরৎ তার নানান সৌন্দর্যসম্ভার নিয়ে অনেক বেশি মনোহারী। হাওয়ার স্নিগ্ধতা; রোদের বর্ষণোত্তর ঔজ্জ্বল্য। স্থলে স্থলপদ্ম, জলে জলপদ্ম, দীঘিতে কুমুদ, শিশিরভেজা শিউলি। ধানের শ্যামল বায়ু-হিল্লোলিত-ক্ষেত। অসময়ে অকালবোধন পূর্বক পূজা হলেও—শ্রেষ্ঠ ঋতুতে শ্রেষ্ঠপূজা বাংলার দুর্গাপূজা।

বৃষ্টিবিধৌত ঘন সবুজ বৃক্ষপত্র, ধূলিমুক্ত আকাশের মনোরম জ্যোৎস্না। স্বপ্নিল ঋতুতে বাংলার শ্রেষ্ঠ শক্তিপূজা—দুর্গাপূজা শ্রেষ্ঠ ভাবসমতার সমন্বে।

তবে আজ আর সেই পরিপূর্ণ গৌরব এ পূজার বোধ করা যায় না। পূজা সার্বজনীন হয়েও শুধু খ্যাতি পেয়েছে। চাঁদার পয়সা গায়েব করা, উৎকট বিদেশী প্রভাবযুক্ত অনুষ্ঠানাদি, দিনরাত ধ্বনিবর্ধক যন্ত্রে অশোভন হিন্দী গান, মারপিট—পূজাকে ধর্মের বদলে অধর্মে পর্যবসিত করে। সব থেকে বেশি বেদনাদায়ক—অসহনীয় দ্রব্যমূল্য; সীমিত আয়ের মধ্য ও নিম্নবিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আজ আর সেদিনের মত এই পূজার আনন্দে বিভোর হওয়া সম্ভব হয় না। অবশ্য যাঁরা "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" মানে তাদের কথা ভিন্ন। দেশে আজকাল ১০০ টাকার চাপরাসীও ৪০।৫০ টাকার একখানা সার্ট পরে। সে প্রগতি নয়, বিকৃতি।

তবু বাঙালী আশা করুক একবার সেদিন আসবে, যেদিন এ পূজার সত্য সত্যই "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে শিহরিছে দেশ-জননী" বলা সম্ভব হবে।

দক্ষিণেশ্বরের কাজ ছেড়ে যথাসময়ে কামারপুকুরে ফিরবেন ভেবে কামারপুকুরেই রইলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হয়ে গেল। তবুও দাদা কামারপুকুরে ফিরলেন না দেখে, রামকৃষ্ণদেব আবার দাদার খবর নিতে দক্ষিণেশ্বর এসে শুনলেন যে, রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধ, তিনি চিরকালের জন্য সেখানেই শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজারীর পদে ব্রতী হতে সম্মত হয়েছেন। শুনেই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হল। তিনি ছিলেন অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বংশের সন্তান। এই কথা দাদাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রামকুমার ধর্মপত্র অনুষ্ঠানের সরল উপায় অবলম্বন করে, ভাইকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন। শোনা যায় এই ধর্মপত্রে উঠেছিল, "রামকুমার পূজারীর পদ গ্রহণ করতে স্বীকার করে নিন্দিত কাজ করেন নি। এতে সকলের মঙ্গল হবে।"

এই ঘটনার পর রামকুমার ভাইকে ঠাকুরবাড়ী প্রসাদ পেতে বললেও তিনি তাতে সম্মত হলেন না। রামকুমার ভাইকে বোঝালেন, দেবালয়, গঙ্গাজলে রান্না, তার ওপর প্রসাদ শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হয়েছে। এ প্রসাদ খেতে কোন দোষ নেই। ঠাকুরের কিন্তু এসব কথা মনে লাগল না। রামকুমার তখন ভাইকে বললেন, তবে সিধে নিয়ে পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে স্বহস্তে রেঁধে খাও। গঙ্গাজলে ধোয়া সব জিনিষই পবিত্র একথা [illegible] মান [illegible] ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা গঙ্গাভক্তির কাছে হার মানল। ঠাকুর দাদার কথায় সম্মত হলেন। ঐরকমে গঙ্গাজলে স্বপাক খেয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করতে লাগলেন।

মনোরম ভাগীরথীর তীরে, বিহগ-কূজিত, পঞ্চবটী শোভিত উদ্যান, সুবিশাল দেবালয়ে, ভক্তিমান সাধক অনুষ্ঠিত দেবসেবা, ধার্মিক, সদাচারী, পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ, দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তাঁর জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীকে নিজের বাড়ীর মত আপনার করে নিলেন। এখানে ঠাকুর কয়েক সপ্তাহ নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস করলেন।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু ঠাকুরকে দেবীর বেশকারীর পদ গ্রহণে নিযুক্ত করবার ক। মনে মনে স্থির করে, রামকুমারের কাছে সেই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ঠাকুরের চাকরি গ্রহণে অনিচ্ছার কথা রামকুমার মথুরবাবুর কাছে নিবেদন করলেন। কিন্তু মথুরবাবু কোন বিষয়ে নিরুৎসাহ হবার লোক ছিলেন না। এই সময় ঠাকুরের পিসতুত বোনের ছেলে হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্মের সন্ধানে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাতে হৃদয় প্রায় সমবয়স্ক মাতুলের সঙ্গে মিলে-মিশে বেশ আনন্দে দিনকাটাতে লাগলেন।

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময় ঠাকুরের বয়স কুড়ি বৎসর। ঠাকুর তখন মধ্যাহ্নে খাবার সময় সিধা নিয়ে পঞ্চবটীতে স্বপাক খেতেন।

আর রাত্রে তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খেতেন। খেতে বসে তাঁর চোখে জল আসত। তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, "মা আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি।"

কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে মথুরের সঙ্গে একত্র সহবাসে এই স্থান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠল।

এই সময় একদিন মথুরবাবুর ভৃত্য এসে বলল, বাবু আপনাকে ডাকছেন। ঠাকুর যেতে ইতস্তত করছেন দেখে, হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করল। ঠাকুর বললেন, গেলে এখনি আমাকে চাকরি স্বীকার করতে বলবেন।

হৃদয় বললে, তাতে দোষ কি? ঠাকুর বললেন, আমার চিরকাল চাকরিতে থাকতে ইচ্ছা নেই। বিশেষত এখানে পূজা করতে স্বীকার করলে; ঠাকুরের গায়ে যে সব অলঙ্কার আছে, তার জন্য দায়ী হতে হবে। আমা-দ্বারা তা সম্ভব নয়। তবে তুমি যদি ঐ কাজের ভার নাও, তাহলে আমার পূজা করতে আপত্তি নাই।

হৃদয় চাকরি করতে তৎক্ষণাৎ রাজী হল।

মথুরবাবু যখন ঠাকুরকে বেশকারীর পদ নিতে অনুরোধ করলেন, তখন ঠাকুর বললেন, চাকরি করতে আমার চিরকাল আপত্তি আছে।

মথুরবাবু বললেন, এ চাকরি নয়। এ দেব সেবা।

তখন ঠাকুর তাতে স্বীকৃত হলেন। আর হৃদয়কে অলঙ্কারের ভার নিতে অনুরোধ করলেন। মথুরবাবু তাতে স্বীকৃত হলেন।

দিন চলতে লাগল। রামকৃষ্ণদেব প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজারীর পদে ব্রতী হলেন। আর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। রামকুমার এইবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রামকৃষ্ণদেবকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালিকা-মাতা এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা প্রভৃতি শেখাতে লাগলেন। এই রকমে রামকৃষ্ণদেব দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণের যা যা শেখা উচিত সব শিখে নিলেন। শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা না নিলে দেবী পূজা প্রশস্ত নয় শুনে তিনি শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা নেবার সংকল্প করলেন।

কেনারাম ভট্টাচার্য নামে একজন শক্তিসাধক তখন বৈঠকখানা বাজারে বাস করতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে তাঁর যাতায়াত ছিল। ঠাকুরের দাদা রামকুমারের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। মথুরবাবুও তাঁকে চিনতেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করা-মাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হলেন। কেনারাম ভট্টাচার্যও তাঁর অসাধারণ ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইষ্টলাভ বিষয়ে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করলেন

রামকুমার রামকৃষ্ণদেবের অপেক্ষা ৩১ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর শরীরও অপটু হয়ে পড়েছিল। রামকুমার সেইজন্য মথুরবাবুকে বলে রামকৃষ্ণদেবকে কালীমাতার পূজার কাজে নিযুক্ত করতে বললেন। মথুরবাবু তখন শুনলেন যে,

রামকৃষ্ণদেব দেবীপূজায় পারদর্শী হয়েছেন, তখন তাঁকেই কালীঘরে পূজারীরূপে নিযুক্ত করলেন। আর বৃদ্ধ রামকুমার রাধাগোবিন্দজীর সেবা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে রামকুমার শ্যামনগর মূলাজোড়ে গিয়ে সহসা সেখানে মৃত্যু-মুখে পতিত হলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি মাত্র এক বৎসর জীবিত ছিলেন।

এখন থেকে রামকৃষ্ণদেব কারও সঙ্গে বৃথা বাক্যালাপ করতেন না। রাত্রে মন্দির দ্বার বন্ধ হলে, পঞ্চবটীর পাশের জঙ্গলমধ্যে ঢুকে জগণ্মাতার ধ্যানে নিমগ্ন হতেন। রাত্রে নিদ্রা না গিয়ে তিনি পঞ্চবটীতে চলে যেতেন। হৃদয় জানতে পেরে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। একে কালীমন্দিরের পরিশ্রম, তার ওপর তাঁর আগের মত আহার ছিল না। এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না গেলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়বে।

পঞ্চবটীর পাশের স্থান ছিল তখন নীচু জমি, আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জঙ্গলের মধ্যে একটা আমলকী গাছ ছিল। একে কবরডাঙ্গা, তাতে জঙ্গল, সেই জন্য দিনেও জায়গাটা দেখা যেত না। আর রাতে ভূতের ভয়ে কেউ ওদিকে যেত না আমলকী গাছের তলায় কেউ বসে থাকলে তাকে কেউ দেখতে পেত না। রামকৃষ্ণদেব ঐ আমলকী গাছের তলায় বসে রাতে ধ্যানধারণা করতেন।

একদিন রামকৃষ্ণদেব ঐ জঙ্গলে গেলে, হৃদয় তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য ইট ছুড়তে লাগল। তিনি গ্রাহ্যও করলেন না।

পরে একদিন রামকৃষ্ণদেবের ঐ জঙ্গলে প্রবেশের কিছুক্ষণ পরে হৃদয় সেখানে গিয়ে দেখেন, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করে ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছেন। দেখে হৃদয় ভাবল, মামা কি পাগল হল নাকি? সহসা তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে হৃদয় বলল, "এ কি হচ্ছে? পৈতে, কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?

বিদ্রূপ ডাকাডাকির পর রামকৃষ্ণদেবের চৈতন্য হল। তিনি হৃদয়কে ঐ রকম প্রশ্ন করতে দেখে বললেন, তুই কি জানিস? এই রকমে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান -- এই অষ্ট পাশে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। পৈতেগাছটা "আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়" --এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ। মাকে ডাকতে হলে, ঐসব পাশ ফেলে দিয়ে, একমনে ডাকতে হয়। তাই ওসব খুলে রেখেছি। ধ্যানধারণা শেষ হলে ফিরবার সময় ওসব আবার পরব।

হৃদয় এরকম কথা কখনও শোনেনি। সে অবাক হয়ে রইল।

পর জীবনে অভিমান নাশ করে, মনে যথার্থ দীনতা আনবার জন্য, যেসব স্থানকে লোকে অশুদ্ধ ভেবে সর্বদা পরিত্যাগ করে, সে স্থান তিনি খুব যত্ন করে নিজের হাতে পরিষ্কার করেছেন।

ইতর সাধারণের কাছে যেটা বহু-মূল্য, সেই সোনা বা পাথরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে না পারলে, মানুষের মন শারীরিক ভোগসুখের ইচ্ছা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ঈশ্বরের দিকে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না।

লোকের যে পর্যন্ত 'আমি'জ্ঞান থাকে, সে পর্যন্ত তার কোন কাজ করবার অধিকার হয় না। রামকৃষ্ণদেব সে অভিমান দূর করে লজ্জা, ঘৃণা এবং ভয় প্রভৃতি নানা বন্ধন হতে বিমুক্তি লাভ করে মনঃসংযম সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি মনে মনে বুঝতে পারলেন যে, জড় জগতে যেসব জিনিষ আছে তাদের বিশ্লেষণ করে দেখলে কামিনী ও কাঞ্চন এই দু-রকম ভাব পাওয়া যায়। কামিনী-কাঞ্চন থেকে সব পদার্থের সম্বন্ধ আসে। কামিনী থেকে সন্তানাদি জন্মে নানারকম সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যেমন স্ত্রী থেকে পুত্র কন্যার জন্ম হয়। তাদের বিবাহ হলে কুটুম্ব বাড়ে। কাজেই তারা সন্তানাদি প্রসব করে বংশের পুষ্টিসাধন করে। এই অবস্থায় পড়লে মানুষের মনের আর সমতা রক্ষা করা যায় না।

কাঞ্চন সম্বন্ধেও সেই রকম। অর্থ উপার্জনের জন্য বিদ্যালাভ করতে হয়। অর্থের জন্য পরের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে অপমান বোধ হয় না। অর্থের জন্য সর্বদা সশঙ্কিত ও চিন্তিত থাকতে হয়। সুতরাং মনের আর বিরাম-কাল থাকল না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে লাভ করতে চায়, তার পার্থিব আসক্তি অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চন ভাব ত্যাগ করা সর্বতোভাবে উচিত। একথা রামকৃষ্ণের হৃদয়ে আপনি আপনি উদয় হল যে, সর্ব-সারাৎসার ঈশ্বরই ইহ জগতের একমাত্র অবলম্বন। কামিনী-কাঞ্চন অসার ও ত্যাজ্য পদার্থ। তিনি তখন এক হাতে একটা রূপোর টাকা, আর আর এক হাতে একখণ্ড মাটি নিয়ে মনকে সম্বোধন করে বললেন, মন, একে বলে টাকা। আর একে বলে মাটি। এখন এদের বিচার করে দেখ। টাকা রূপোর চাকতি বা গোলাকার। তাতে বিবির মুখ আঁকা আছে। এটা জড় পদার্থ। টাকায় চাল, কাপড়, বাড়ী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি হয়। দশজনকে ডাল-ভাত খাওয়ান যায়। আর তীর্থযাত্রা, দেবতা ও সাধুসেবাও হয়। কিন্তু এর দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ হবার উপায় নেই। কারণ টাকায় মনের অহংকার নিয়ে আসে। এর দ্বারা অহংভাব একেবারে বিনষ্ট হতে পারে না। অর্থে কখনও মন আসক্তিবিহীন হয় না। সুতরাং দেবতা বা সাধুর উদ্দেশ্যে কাজ হলেও, তাতে রজঃ তমোভাবের প্রাধান্য হয়ে ওঠে। রজঃ কিম্বা তমোগুণে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না।

তারপর রামকৃষ্ণদেব কামিনী নিয়ে বিচার করেছিলেন। মনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মন, কামিনী সম্ভোগ করবে? কামিনী কাকে বলে আগে বুঝে দেখ। এ হল একটা হাড়ের খাঁচা, মাংস তা

বাংলাকাব্যে যতীন্দ্রনাথ সেন

অবিমিশ্র আনন্দই কাব্য নয়, দুঃখের অমৃত মন্থনেই কাব্যের সৃষ্টি। শুধু আলোর গানে নয়, আনন্দমুখর লীলা-বিলাসে নয়, দুঃখের শাশ্বত আবেদনেও কাব্যের স্বীকৃতি অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রোত্তর যুগে আনন্দের বিজয়রাগিণী যখন সমগ্র দেশের প্রাণ-বীণাকে করেছে সিঞ্চিত, তখন বজ্র-বহ্নির দীপ্ত জ্বালা নিয়ে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

বাংলা সাহিত্যে কবি যতীন্দ্রনাথ আপন ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল। একদিকে রাজনৈতিক দুর্যোগের ঘন-ঘটায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ভাঙন-মুখী অবক্ষয়, অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মমুখী কল্পনাবিলাসের অক্ষম অনুসরণ--- এরই মধ্যে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। আনন্দের লীলা নিঃস্বনে কবি শুনতে পেলেন দুঃখের মর্মছেঁড়া হাহাকার, তাই তাঁর জীবনচেতনা হল দুঃখ-বাদের। যে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যা বাস্তব, রবীন্দ্রনাথ তার একটা মহৎ অর্থ দিতে চেয়েছেন; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বাস্তবকে বাস্তবরূপেই দেখেছেন---

ছবি ও ছন্দে তোমার দালালি
করিছে স্বভাব-কবি
সমস্তুন্দর দেখে তারা
গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে
'ভবি' ভুলবার নয়?
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু
ওঠে দুঃখেরি জয়।

শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম-বিধান, শোভা-সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি দেখেছেন তিনি অনিয়ম, অবিচার, রুক্ষতা, নির্মমতা, ক্রূরতা, ভীষণতা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবির মতে, এ দুনিয়ার মালিক তাঁর জমা-খরচের ঘাটতি পূরণে বিজ্ঞাপনস্বরূপ প্রকৃতিকে নানা সাজে সাজিয়েছে, তাই সমগ্র বহির্বিশ্বে চলেছে আসল সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা---

মেঘে মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন---
বনে বনে শিখী নাচে,
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখিজল
তৃষিত চাতক বাঁচে।

সৃষ্টির মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে, সভ্যতার মধ্যে যে বিরাট নিষ্ঠুরতা আছে, যাকে অন্যান্য কবিরা ঢেকে রাখতে চাহিছে, দুঃখের ব্যথায় ব্যথিত যতীন্দ্রনাথ সেই তথাকথিত রোমান্টিক কবিদের ভূয়োদর্শনজাত জীবন-চেতনাকে করলেন বিদ্রূপ---

খাদ্যখাদকে বাদ্যবাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য
ষড়ঋতু ছলে ষড় রিপু খেলে
কাম হতে মাৎসর্য।
ছলে বলে কলে দুর্বলে
হেথা প্রবল অত্যাচার
এ যদি বন্ধু হয় ছায়া তব কায়া তো
চমৎকার।

সৃষ্টি তথা প্রকৃতির এ ছলনা থেকে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে কবির জেগেছে অভিযোগ। এ সৃষ্টির পেছনে যদি চরম সত্যরূপে কেউ থাকেন, কবির ভাষায় তিনি কর্মকার মাত্র। কবি তাই শ্লেষের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন---

ও ভাই কর্মকার---

ওপর চামড়া দিয়ে ঢাকা। চামড়া আলাদা করলে কি বেরোবে? মাংস, রক্ত, আর চর্বি। এই রকম যে কামিনী তাকে নিয়ে লোক উন্মত্ত রয়েছে। কামিনী দিয়ে ইহকাল, পরকাল একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এইরকমে মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনীশক্তিতে বিমোহিত, আর একদিকে বাৎসল্য মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন তার দ্বারা ঈশ্বরের চিন্তা কখনও হতে পারে না। সুতরাং কামিনী ঈশ্বরলাভের প্রতিবন্ধক জন্য দেয়।

রামকৃষ্ণের মন কামিনী ত্যাগ করল। তাঁর মনে হল যে, ঈশ্বরের শক্তিকে মায়া বলে। এই মায়া-শক্তি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। মায়াকে তিনি মাতা বলতেন এবং মাতারূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মায়া থেকে মেয়ে। এই জন্যে প্রত্যেক মেয়ের প্রতি তাঁর তখন থেকে মাতৃভাব জন্মে গেল।

আখরে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি
নাস্তিক কর্ম আর ?

ঈশ্বর সম্পর্কে কবির ধারণা---

শোয়া বসা যার সকলি সমান
তারে নিয়ে রাসলীলা।

বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে মানুষকেই বড় করে দেখার প্রবৃত্তি থেকে কবির মধ্যে আর একটি প্রতিবাদ ও সমবেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা হল সর্বপ্রকার অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে। দুনিয়া জুড়ে চলেছে এই স্বেচ্ছাচারের লীলা---

দেখিনু তন্দ্রা ভরে---
তাঁতীর টাকার বড় দরকার,
মাকু ছুটাছুটি করে।

একদল লোক যন্ত্রচালিতের মত পরিশ্রমই করে যায়, বিনিময়ে কিছুই পায় না। ঈশ্বর তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার চরম রূপ দেখান, যখন জননীর কোল থেকে তার সন্তান ছিনিয়ে নেন।

যতীন্দ্রনাথ দুঃখীর কবি। এই দুঃখের জ্বালাতেই তিনি যেন প্রেমকে দেখেছেন তৃতীয় নয়ন দিয়ে। প্রথম যুগে প্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণা---

প্রেম ও ধর্ম বাঁচিতে পারে না---
বারোটার বেশী রাত্রি---

কিন্তু কবির এই নির্লিপ্ত প্রেমের পেছনে আছে প্রেমের প্রতি তীব্র আসক্তি, প্রেম নাই---একথা কবির স্বীকার করেন না। কিন্তু বাস্তব প্রেম স্বার্থবুদ্ধির আঘাতে প্রতিহত, একথা তিনি বার বার স্বীকার করেছেন। যুদ্ধোত্তর যুগে এ ধরনের জীবনকে অনেক কবির কাব্যেই শোনা যায়।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথের এ [illegible] ভঙ্গি সম্পূর্ণ মৌলিক। কবি বাস্তববাদী। কবির এ দুঃখবোধের পেছনে তাই কোন ব্যক্তিগত হৃদয়ের জ্বালা নেই, আছে চিরসুন্দর সাধকের ব্যর্থতার জ্বালাময় খ্যাতি।

কবির প্রথম জীবনের এই দীপ্ত জ্বালা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এসেছে বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে। জীবনের অশ্রান্ত অতৃপ্তির মধ্যে যেন আত্মসমাহিতির সুর ধ্বনিত হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতই কাব্যধর্মে শৈব অর্থাৎ তাঁদের উপাস্য দেবতা শিব। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যৌবনে শিবের দক্ষিণ মূর্তিটি দেখতে পান নি; তাঁর শিব যোগারূঢ় যতীন্দ্র নন, অসহায় আর্তের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু জীবনসন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে কবি শিবের দক্ষিণ মূর্তিটি আবিষ্কার করলেন। রূপ-রস-গন্ধ কবিকে যেন একটু একটু করে স্পর্শ করেছে। কবি জীবনসায়াহ্নে তাই তাঁর বলিষ্ঠ ঔদ্ধত্য কিছুটা পরিশীলিত করে নিলেন, প্রেম ও সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দিলেন। কবির তাই আক্ষেপ---

যে দাবদহনে দাহন করিয়া
এ জীবন পোড়ালেম
আজ মনে হয় এ দগ্ধভালে
সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিনু নাই
চেতনার কূলে বসি চিতামূলে
গায়ে মাখি তারি ছাই।

প্রকৃতির মধ্যেও কবি দেখলেন সৌন্দর্য-কমনীয়তা, আবিষ্কার করলেন হৈমন্তী স্নিগ্ধতা। কবি আজ জীবনের নীলে, মরণের পীতবাসে নূতন সাজে সৌন্দর্যের অভিসারে চলেছেন। কবি জেনেছেন মৃত্যুর শূন্যতাই শুধু সত্য নয়, স্বর্ণদীপ্ত জীবনই মৃত্যুকে সুন্দর করে। তাই কবির প্রশান্ত জীবনদর্শন---

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যু মদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

শুধু কবিতার অন্তরধর্মে নয়, বহিঃধর্মেও যতীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে মূর্তিমান ব্যতিক্রম। কবির বলিষ্ঠ বিদ্রূপ আঘাতে মধুর ললিত রাগিণীতে ঝরে পড়েনি; প্রথম যুগের কাব্যে বলিষ্ঠ শব্দ, বাক্য, ব্যঙ্গ, নূতন শব্দ ও কলোকালিজম প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে কাব্যধর্মের সুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। উপমা, চিত্রকল্প সঙ্গীতধর্মিতা কল্পনা শেষ জীবনে কাব্যে অনেকটা স্থান পেয়েছে।

বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ আপন ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে তাই বিশিষ্ট। বিশিষ্টতা তাঁর রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সৌন্দর্যপিয়াসীদের মুগ্ধতার প্রতিবাদে গণচেতনার উদ্বোধনে, কাব্যের আঙ্গিক রচনার স্বাতন্ত্র্যে। রবীন্দ্রনাথের মত একটি স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী হওয়ার স্পর্ধা তাঁর না থাকলেও আপন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠ ঘোষণায় তিনি বাংলা সাহিত্যে দীপ্তমান তারকা।

রাসায়নিক কীট-পতঙ্গ

এক জাতের গুবরে পোকা আক্রান্ত হলে এক ধরণের বিস্ফোরক তরল পদার্থ মুখ দিয়ে ছিটিয়ে দেয়। এদের তলপেটে দু'টো থলি থাকে যাতে তাদের গ্ল্যাণ্ড থেকে ক্ষরিত রস সঞ্চিত হয় ধীরে ধীরে---এই রস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এটা হচ্ছে শতকরা ২৩ ভাগ। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডে মিশ্রিত হাইড্রোকুইনোন অথবা টলিউহাইড্রোকুইনোন।

এই বিস্ফোরক তরল পদার্থ ছোঁড়ার আগে একে গুবরে মহাশয় তার পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত আর এক কুঠরীতে পাঠিয়ে দেন, যেখানে পারঅক্সাইড্‌কে ভেঙ্গে অক্সিজেন এবং জলে পরিণত করা হয় এবং হাইড্রোকুইনোনগুলি অক্সিজেনের সাথে মিশে শুধু কুইনোন-এ পরিণত করা হয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাতেই এটা তীব্র বেগে বেরিয়ে পড়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে।

যে ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া গুবরে পোকার শরীরের অভ্যন্তরে হয় প্রকৃতি দেবীর গবেষণাগারে---তা মনুষ্য পরিচালিত ল্যাবরেটরীতে করা সম্ভব হয় নি আজও পর্যন্ত। কীরূপে যে প্রকৃতি দেবী এটা সম্পন্ন করে থাকেন অবলীলাক্রমে তাঁর দীনতম সন্তানের দেহাভ্যন্তরে, সেটা আজও রহস্যাবৃত রয়েছে। মানুষ তার বহু প্রশংসনীয় প্রচেষ্টালব্ধ "জ্ঞানের" দ্বারাও এখনো ঐ ব্যাপারটার ব্যাখ্যানে [illegible] পারেনি।

উপেক্ষিত বনৌষধি-'পাঠা'

কবিরাজ শ্রীবিশ্বনাথ অধিকারী
আয়ুর্বেদতীর্থ

আয়ুর্বেদ আমাদের দেশের তথা বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসাশাস্ত্র, এতে কোন সন্দেহ নেই। আয়ুর্বেদ সর্বপ্রকার ভেষজ বিজ্ঞানের প্রসূতি। খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব থেকেই আয়ুর্বেদে অগণিত বনৌষধি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মহর্ষি চরকের সময় ভেষজদ্রব্যের ব্যবহারই বেশী হোত। কালের বিবর্তনে আয়ুর্বেদকে আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত অনেক লতা-গুল্মকে আমরা ভুলতে বসেছি। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মানুষ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। দিনের পর দিন নতুন নতুন তথ্য মানুষের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আর এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ সমগ্র বিশ্ব-জগতে আধিপত্য বিস্তার করছে। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয়---আয়ুর্বেদ তার সেই প্রাচীন গতানুগতিক পন্থায় মন্থর গতিতে চলে আসছে। মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হোল? অতীতের দিকে না তাকিয়ে অতীতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চর্চা না করে---আমরা এগিয়ে চলেছি। তারই অনিবার্য পরিণতিই আজ আয়ুর্বেদের বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এখনও যদি অনুসন্ধান ও গবেষণা করা যায়, তবে বর্তমান সমস্যাবিজড়িত ভারতবর্ষ তথা, বিশ্বের আপামর জন-সাধারণের হিতার্থে উপেক্ষিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক কিছুই দেওয়ার আছে।

'পাঠা' একটি উপেক্ষিত বনৌষধি। সংস্কৃতে পাঠা বা আকমাদি বলা হয়। বাংলা নাম নিমুখা। ইংরাজীতে Parera Root ডাক্তারী নাম---Stephania Harnandifolia.

বর্ণনা :---

ইহা একটি লতানে গাছ। পাতা সাধারণত ২ ইঞ্চি থেকে ৪ ইঞ্চি-পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়। তবে উর্বর জমি হলে ৬ ইঞ্চি পর্যন্তও লম্বা হয়। পাতা খুব বেশী পুরু হয় না, ত্রিকোণাকৃতি, অভিন্ন, প্রায় গোলাকার---তবে অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হওয়ায় হৃৎপিণ্ডাকার দেখা যায়। বোঁটা সাধারণত ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। বোঁটা ও লতার রং সাদা। পাতার নিচের পিঠ সাদা, কিন্তু উপরের পিঠ ঘন সবুজ রং। উপরের পিঠ বেশ মসৃণ ও তৈলাক্ত ভাব। কিন্তু নিচের পিঠ বেশ খসখসে। পাতার কোন পিঠেই শুঁয়া হয় না। এই লতা ২৫ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়। ফুলের রং সাদা, সামান্য সবুজের আভাযুক্ত, ছোট ছোট গুচ্ছ-বদ্ধভাবে বোঁটার পাশেই লেগে থাকে।

ফল---শেয়াকুলের ফলের মত ছোট লাল রং-এর ও এক-একটি হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফল হয়।

জন্মস্থান :---

এই লতা গাছ---পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, লাক্ষাদ্বীপ, নেপাল, পশ্চিম বাংলায়---বিশেষ করে---২৪-পরগণা, হাওড়া, নদীয়া জেলায় বেশী পরিমাণে জন্মায়। পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহেও এ গাছ হতে দেখেছি। তবে মালদহের মাটী উর্বর না হওয়ায়, এই গাছ বেশী পুষ্ট হয় না। যে সব জায়গায় জল বসে না এবং খুব বেশী জঙ্গল বা খোলা না এরূপ স্থানে বেশী পরিমাণে জন্মে। ২৪-পরগণায় সাধারণত ---রাস্তার ধারের ঝোপে-ঝাড়ে, কৃষি জমির আলের বেড়ায় হতে দেখা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ :---

আয়ুর্বেদ মতে ইহা উষ্ণবীর্য, কটুরস, তীক্ষ্ণ ও লঘু। বায়ু, কফ, শূল, জ্বর-কুষ্ঠ, বমি, অতিসার, হৃদরোগ, কণ্ডু, বিষ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম, ব্রণ---ইত্যাদি নষ্ট করে। কথিত আছে যে---এই লতার অঙ্গুরী করে বিজয়া-দশমীর দিন ধারণ করলে কোন অমঙ্গল হয় না। এজন্য এখনও পল্লী অঞ্চলের অনেকেই ইহা পালন করেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অলৌকিক কোন কিছু মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না বটে, কিন্তু চিকিৎসা জগতে এখনও এমন অনেক সাফল্যজনক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, যা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। যাই হোক, ঔষধ-রূপে ইহার পাতা, ডাঁটা, শিকড় সবই ব্যবহার করা যায়।

ফোড়া হ'লে এর পাতায় ঘৃত মাখিয়ে লাগিয়ে রাখলে ফোড়া পক্ব অবস্থায় আসে এবং আপনা হতেই ফেটে যায়। আঙ্গুল হাড়া (whitlow) হলে বা ফেটে গেলে---এই লতার অঙ্গুরী ধারণে উপকার হয়। 'পাঠার' শিকড় তিক্ত ও ধারক। অতিসার-যুক্ত জ্বরে---'পাঠা', ইন্দ্রযব (কুঁড়চি বীজ), চিরতা, মুথা, ক্ষেত পাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য একত্রিত করে পাচন করে খাওয়ালে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। প্রবল শ্লেষ্মাতি-সারে 'পাঠা,' বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ও কুঁড় একত্রে চূর্ণ করে প্রয়োগ করা যায় (এর নাম 'পাঠাদি' চূর্ণ)। পীনস রোগে 'পাঠাদি' তৈল একটি আশু কার্যকরী ঔষধরূপে অদ্যাবধি ব্যবহার হয়ে আসছে। এর মূল অপেক্ষা ডাঁটা, ডাঁটা অপেক্ষা পাতা হীনবীর্য। 'পাঠার' শিকড় প্রস্রাবের পীড়া, উদরাময় এবং অম্লরোগে বিশেষ উপকারী। 'পাঠার' মূল পেষণ করে যোনিতে প্রলেপ দিলে, প্রসূতি শীঘ্র সন্তান প্রসব করে। মহীষ তক্রের (ঘোল) সঙ্গে এর পাতা ৩ গ্রাম পরিমাণে বেড়ে সেবন করলে অতিসার নিবারণ হয়। 'পাঠার' মূল ও অগুরুর ক্বাথ পানে লবণ মেহ আরাম হয়। অর্শ রোগেও এর মূল ব্যবহার করা যায়।

ঋতু স্নানান্তে 'পাঠার পাতা

আজো বর্জন করে চলেছেন কাজেই রমণীদের গর্ভ সঞ্চারের ভয় থাকে না। অবশ্য এ বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে ব্যবহার করা উচিত নয়।)

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না করতে পারলে, আমাদের দেশের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে ও হবে। এমন কি অনাহারে, অশিক্ষায়, অচিকিৎসায় ও বেকারত্বের জ্বালায় সাধারণ মানুষ দগ্ধ হতে চলেছে। বর্তমান আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা আছে, যে-কোন উপায়-পদ্ধতির মাধ্যমে বা আয়োপায়ের দ্বারা জন্ম-নিরোধ করা মহাপাপ। এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা।

কিন্তু বর্তমান আমাদের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা বর্জন না করলে উপায় নেই। তবে এদিকে সংযমী হওয়াই সবচাইতে ভাল পন্থা।

সুদূর অতীতকালেও আমাদের দেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এবং গ্রামাঞ্চলে এখনও বনৌষধির সাহায্যে জন্ম নিরোধ করা হয় এবং তাতে শরীরের কোন প্রকার কুফল দেখা যায় না। -আয়ুর্বেদে এই ধরণের অনেক ভেষজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখনও চর্চা করলে এই ধরণের অনেক অনাবিষ্কৃত ভেষজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সরকারী প্রচেষ্টায় উপেক্ষিত আয়ুর্বেদীয় বনৌষধিগুলির সত্বর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুব্যবস্থা হলে, আয়ুর্বেদসেবিগণ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আরও অনেক সমস্যাপূর্ণ রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস এবং সাধারণ মানুষ স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারবেন।

গোঁফ-দাড়ি প্রসঙ্গে

শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় কোন একখানা বইয়েই পড়ে থাকব: প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষরা যতখানি বিদ্রোহ করে, সে তুলনায় নারীরা অনেক বেশী প্রকৃতি অনুরাগিণী। কারণ স্বরূপ সেখানে উল্লেখ ছিল, প্রকৃতি প্রদত্ত গোঁফ-দাড়ি পুরুষরা বর্জন করেই নাকি এই বিদ্রোহকে রূপ দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গটা আজ হঠাৎ মনে আসার একটা কারণ আছে। সে কারণের জন্যে আমি নিজেই দায়ী ছিলাম কিনা তা' অবশ্য ঠিক বলতে পারব না। তবে, পুরুষরা গোঁফ-দাড়ি বর্জন করে যদি প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করে থাকে, সেটা যে তার খুব বড়রকমের একটা অপরাধ নয়, তখন কিন্তু আমার তাই মনে হয়েছিল।

কিছুটা ঔদাসীন্যের জন্যেই এই প্রকৃতির দানকে একদা আমি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিলাম। আর সেই ফল আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল একটা অতি হীন অপবাদকে মেনে নিয়ে। আমাকে দেখে পকেটমার মনে করে সোজা থানায় নিয়ে গিয়েছিলেন এক মহামান্য কনস্টেবল। আমার নাম-ধাম এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফটো দেখেও তাঁরা আমার সততার উপর বিশ্বাস আনতে পারেন নি। অবশেষে প্রকৃতির সেই অকৃপণ দানকে বর্জন করে তবে আমি রেহাই পাই। সুতরাং এর পর যদি আমি মনে করে থাকি যে, প্রকৃতির ওই দানটিকে বর্জন করে পুরুষরা নিজের প্রতিই সুবিচার করে, তাহলে আমার অনুমানকে কি খুব দোষ দেয়া যায়?

কিন্তু বর্তমানে আমার কিছুটা মতের পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ, এখন বলতে পারি: পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্রোহ করে নি, বরং প্রকৃতির দানটিকে খুব বেশী রকমের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে এসেছে।

আজ এই মতের পরিবর্তন ঘটারও একটা কারণ আছে। সম্প্রতি এই গোঁফ-দাড়ি নিয়ে আমার এক বন্ধু ভীষণ গবেষণা সুরু করেছেন। তাঁরই সংগৃহীত একটি প্রবন্ধ পড়ে বুঝেছি, দাড়ি সব মুখে মানায় না। দাড়ি হচ্ছে একটা ঐতিহ্য, এ ঐতিহ্যকে যত্র-তত্র বিলিয়েদিলে ঐতিহ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা আছে। সব মানুষই যেমন মানুষ নয়, সব মেয়েই যেমন মেয়ে নয়, তেমনি, সব পুরুষকেও পুরুষ বলে স্বীকার করা যায় কি? যাঁদের আমরা প্রকৃত পুরুষ বলে জানি, বলা বাহুল্য, তাঁরা কখনোই প্রকৃতির দানকে অবহেলা করেন নি।

অর্থাৎ, সেই আদিকালের পুরুষগুলোর কথাই চিন্তা করুন। ঋষি বলতে আমরা আজো গোঁফ-দাড়ি বিশিষ্ট একটি সৌম্য পুরুষকেই কল্পনা করি। যাত্রাদলের গ্রীণরুমে ঢুকে ছদ্ম গোঁফ-দাড়ি দেখেই বলে দিতে পারি: যে পালা এখানে অভিনীত হবে, সেটি নিশ্চয় কোন পৌরাণিক কাহিনী। কোন সামাজিক কাহিনীতে ছদ্ম-গোঁফ-দাড়ির ব্যবহার বড় একটা থাকে না। কারণ আধুনিক সমাজ পুরুষ প্রধান নয়, নারী প্রধান। তাই এ যুগে গোঁফ-দাড়ির কদর নেই। যতদিন পর্যন্ত এই গোঁফ-দাড়ির কদর ছিল, ততদিন সমাজে ছিল পুরুষের প্রতাপ।

উনবিংশ, এমন কি বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক পর্যন্তও বিশেষ কদর ছিল এই গোঁফ-দাড়ির। শিক্ষা এবং সাহিত্যে দুটি ক্ষেত্রেই। ভাগলপুর কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল রসিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যতদিন পর্যন্ত

দাড়িকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু দাড়ি বর্জনের দুর্বুদ্ধি যখনই তাঁর মাথায় চাপল, তখনই তিনি হয়ে গিয়েছিলেন অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর বৈশিষ্ট্যটুকু নষ্ট হয়েছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগনে ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এককালে দাড়ির অনুরাগী ছিলেন। এই অনুরাগের বশবর্তী হয়ে তিনি একদা মাসিক বসুমতীর পাতায় (কার্তিক, ১৩৩৩, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ: ৩২ হইতে ৩৫) তার প্রশস্তিও গেয়েছিলেন। সেই নিবন্ধে বাঙালীর দাড়ির যে ইতিহাস তিনি সংকলিত করেছেন, তা খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এবং তিনি একটি সত্য কথাও বলেছেন যে, দাড়ি শুধু পুরুষের বৈশিষ্ট্য নয় ---দাড়ি পৌরুষের বিত্ত। বাস্তবিক, আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি, যে-যে ধর্মগুলো পুরুষ চরিত্রে থাকা প্রয়োজন, তা' শুধু তাঁদেরই আছে, যাঁরা মুখমণ্ডলে দাড়িকে অবাধে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমি একে - একে সেই সব পুরুষদের নাম উল্লেখ করে নিবন্ধের কলেবর বাড়াতে চাই না বলেই আজ ও প্রসঙ্গ কিছুটা এড়িয়ে যেতে চাই।

যে-পুরুষ গোঁফ - দাড়ি একেবারে বর্জন করে, সমাজের বুকে একেবারে খোকা - খোকা হয়ে থাকতে চান, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণই করেন না, তাঁদেরকে বলা চলে ঘরের শত্রু বিভীষণ। তাঁরা পুরুষ হয়েও পুরুষের সঙ্গেই শত্রুতা করেন। দাড়ি-এমন কি মুখে যদি কার্তিক ঠাকুরের মতো একটু গোঁফই না থাকল, তবে তিনি আবার পুরুষ কিসের? পুরুষদের প্রথম সিম্বলই ত গোঁফ-দাড়ি।

মনে আছে, আমাদের বাড়ির কাছেই কয়েক ঘর কুমোরের বসবাস ছিল। তারা চাকা ঘুরিয়ে ঘট তৈরী করত। তৈরী করত হাড়ি -কলসী। আবার প্রতিমাও বানাত তারা। ছোটবেলায় এই প্রতিমা তৈরীর কাজটির মতো প্রিয় কাজ আমার আর ছিল না। তাই, স্কুল ফাঁকি দিয়ে আমি সেই কুমোর-বাড়ি গিয়ে প্রতিমা তৈরী দেখতাম। দেখতাম। দেখতাম সরস্বতীর মুখের ছাঁচ থেকে ওরা শিবের মুখ তৈরী করত। আবার জগদ্ধাত্রীর মুখ থেকেই করত বৃন্দার মুখ। আমি বলতাম, মেয়ের মুখ আর পুরুষের মুখ কি এক?

বৃদ্ধ কুমোর হাসত। বলত: তাই কখনো হয়?

---তবে তোমরা ত তাই হওয়াও।

মিটি মিটি হাসত বৃদ্ধ কুমোর। হাসত আর হুঁকোয় টান দিত।

আমি বলতাম: আলাদা আলাদা ঠাকুরের আলাদা মুখের ছাঁচ করতে পার না?

---পারি।

---পার, তবে একই মুখের ছাঁচ থেকে সব ঠাকুরের মুখ তৈরী কর কেন?

আমার একথার উত্তরে সেদিন বৃদ্ধ কুমোর যা বলেছিল, আজো সে-কথাটা আমার মনে আছে। এবং, এখন বুঝি, যারা জীবন মাটি দিয়ে ঠাকুর তৈরী করে লক্ষ্মী দেবীকে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও, ওদের মনে মনে একটা অতি সত্য কথাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, যে কথাটা আজ অনেকেই জানে না।

সেদিন বৃদ্ধ কুমোর বলেছিল: মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষের মধ্যে যেটুকু প্রভেদ, সেটা খুব সামান্য জিনিষ। আমাদের কাছে সামান্য। আমরা মেয়েদের মুখেই গোঁফ এঁকে-তাকে পুরুষ বলে চালিয়ে দিতে পারি।

কথাটা সেদিন বিশ্বাস হয় নি। বিশ্বাস হয় নি এই জন্যে যে, সামান্য ওই একটু গোঁফের রেখা এঁকে মেয়ের মুখকে পুরুষের মুখ বলে চালিয়ে দেওয়াটাকে আমি অত সহজে মেনে নিতে পারি নি। সেদিন মেয়ে আর পুরুষের মধ্যে একটা বিরাট রকমের প্রভেদকেই মনে-মনে স্বীকার করতাম। লজিকের দিক নিয়ে নয়---দৈহিক দিকটাই বুঝতাম তখন।

কিন্তু আজ অনেক লজিক ঘাঁটার পরও, ওই বৃদ্ধ কুমোরের কথাটাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। সত্যি, নারী আর পুরুষের ওই ব্যবধান মুখের ওই গোঁফের রেখাতেই প্রকট হয়ে ওঠে। কাঠিন্যে অনেক মেয়ের অন্তরই পুরুষকে হার মানতে পারে, আবার অনেক পুরুষ-মন নারীদের চেয়ে কোমল হয় --- এমন নিদর্শনও দেখেছি।

এই প্রসঙ্গে এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন একই বাসায় ভাড়া ছিলাম। তাঁর সঙ্গে একটা আত্মীয়তার মতো সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। খুবই অমায়িক ছিলেন ভদ্রলোক। নিজের রান্নাঘরের ভাল জিনিষটা আমায় রান্না ঘরে সাপ্লাই করতেন। দশটা-পাঁচটা অফিস করে রাত্রি বেলা উনিই রান্নাঘরে ঢুকতেন। এবং রান্নায় অনেক মেয়েই ওঁর সঙ্গে হাত মেলাতে পারতেন না। সেই ভদ্রলোককে আমি দেখেছি। পুরুষ হলেও, মেয়ের মতোই ছিল ওঁর অন্তরটা। শুধু রান্নার জন্যে বলছি না; আমার এ ধারণার অন্য কারণ আছে।

পুরুষের চেয়ে নারীরা একটু বেশীই সমবেদনাশীল হয়ে থাকে। নারী - প্রকৃতির এটা একটা বড় গুণ। কিন্তু সেই ভদ্রলোককে দেখেছি, নারীদের চেয়েও অনেক বেশী সমবেদনা ছিল তাঁর মনে। কারণে-অকারণে চোখে অশ্রু পড়ত। শ্রাবণের ধারার মতো। এবং শুধু চোখের জলেই তিনি সমবেদনা জানাতেন না---এই সমবেদনার বশবর্তী হয়ে তিনি নিজের সাধ্যমতো যা করার করতেন। ওঁর কাছ থেকে আমিও গভীর সমবেদনা লাভে ধন্য হয়েছি। তাই মনে হত, তাঁর কাছ থেকে আমরা যে ব্যবহার পেতাম, সেটা কোন মেয়ের কাছেই পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁর অতি বড় শত্রুও তাঁকে 'মেয়ে' বলতে পারবে না। কারণ, তাঁর মুখমণ্ডলে আশু মুখুজ্যের মতো মোটা গোঁফ ছিল। ওঁর সেই গোঁফজোড়াটা দেখে আমার বার বার মনে পড়ত সেই যাত্রাদলের রাবণের কথা। অথচ, রাবণের চরিত্রের সঙ্গে

তাঁর চরিত্রের এতটুকু মিল ছিল না। বাস্তবিক ভদ্রলোককে দেখলে খুব কঠোর বলেই ভ্রম হত। যেমন নারীদের দেখলেই এক মধুর কমনীয়তার ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

সেই যে আমাদের দেশের কবি বলেছেন :-----

সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল কুল।

এতে যেমন একটি সুন্দর নারী-মূর্তি চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে, তেমনি গোঁফ-দাড়ি দেখলেই একটি প্রকৃত পুরুষ মূর্তিই আমরা কল্পনা করে ফেলি। সুতরাং, এখন বুঝছি, আর কোন বিত্ত থাক আর নাই থাক, ওই গোঁফ-দাড়ির বিত্ততেই পুরুষের বৈশিষ্ট্য। সেই বৃদ্ধ কুমোর যা বলেছিল তার সত্যতা এখন উপলব্ধি করি।

গোঁফ-দাড়ি পুরুষদের পক্ষে বিরাট এক ঐতিহ্যের বিত্ত ত বটেই, আমার মনে হয়, এই গোঁফ-দাড়ির মধ্যে কিছুটা সাত্ত্বিকতাও প্রকাশ পায়। কোন দুষ্ট চরিত্রের পুরুষও কিন্তু গোঁফ-দাড়ির দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত। গোঁফ যদিও তাদের ভাগ্যে জোটে, দাড়ি-লাভের অধিকার তাদের থাকে না। দুর্গা প্রতিমার সেই অসুরটির কথাই মনে করুন। আজ পর্যন্ত কোন শিল্পীও ভুলে অসুরের মুখে দাড়ি-সম্বলিত করেন নি। কিম্বা হিরণ্যকশিপুকেও আমি দাড়িযুক্ত দেখি না। এ থেকে মনে হয় না কি যে, গোঁফ-দাড়ি জিনিষটা খুব সামান্য জিনিষ নয়।

আপনার মুখমণ্ডলে নিশ্চয় দীর্ঘ শ্মশ্রু নেই। কিন্তু কয়েকদিনের বাসি দাড়ি যদি আপনার ব্যস্ততায় প্রশ্রয় পেয়ে থাকে মুখমণ্ডলে, তা' হলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হয়ত আপনার লজ্জা আসতে পারে। তখন শত কাজ ফেলে রেখেও; আপনি হয় নাপিতের সাহায্য নেবেন, কিম্বা ব্লেড নিয়ে আপনিই বসে যাবেন মুখখানাকে সদ্যোজাত শিশুর মত্রে পরিষ্কার করে তুলতে। কিন্তু আপনি যদি রোমান্টিক ভাবাশ্রয়ী হন, তা হলে নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, মুখমণ্ডলে বাসি দাড়ি যখনই উঁকি দেয়, বর্ষার জল পেয়ে দূর্বাঘাস গজানোর মতো, তখন আপনার গিন্নির মুখখানাও আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে কুমোর বাড়ির মেটে হাঁড়ির মতো। অর্থাৎ তিনিও গম্ভীর হচ্ছেন। এ গাম্ভীর্যটুকু উপলব্ধি যাঁরা না করেন, তাঁদের মতো নিরস মানুষ পৃথিবীতে না থাকাই ভাল।

যদি আপনার গিন্নি একটু মুখরা হন (মাপ করবেন, আমার অনুমান সত্য —এমন কথা আমি বলতে চাইছি না), তা'হলে হয়ত স্পষ্টই তিনি বলে বসবেন, দাড়ি কামিয়ে তবে তুমি আমার সামনে এসো। কারণ, আপনার স্বভাবের সঙ্গে আপনার স্ত্রীর স্বভাবের যত গরমিলই থাক, সেটাকে তিনি সহ্য করতে যদিও পারেন, আপনার ওই দাড়িকে তিনি কখনোই সহ্য করবেন না। সহ্য করবেন না এই জন্যে যে, ও বস্তুটি থেকে ওঁরা যুগপৎ বঞ্চিত। এবং তখনই আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, সংসার সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান যত সীমিতই হোক, এরজন্যে আপনি স্ত্রীর কাছে নিজেকে যত ছোটই মনে করুন না কেন, তবু আপনি এমন একটি সম্পদের অধিকারী যা' শত সাধনাতেও আপনার স্ত্রী সে অধিকার কোনদিন পাবেন না। আর এই অধিকার থেকে বঞ্চিত বলেই, আপনার অমূল্য সম্পদটিকে ওই নারীটির এত বিদ্বেষ। সুতরাং সাত-সকালে উঠে দাড়িকে নির্মূল করার সংকল্প না করে দেখুন না, আপনার জীবনে কোন রোমান্সের হাওয়া বয় কিনা।

দাড়ি বাস্তবিকই একটা রোমান্স। আপনি যদি কোন দাড়িধারী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন, মশাই আপনি দাড়ি রেখেছেন কী জন্যে?

দেখবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনি এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। যাঁকে প্রশ্ন করবেন, তিনি প্রথমে আপনার আপাদ মস্তকে একবার তাঁর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নেবেন। তার পর একটুখানি হেসে তিনি উত্তর দেবেন, এটা আমার সখ।

বাস্তবিক, দাড়ি রাখা পুরুষের একটি বনেদী সখ। প্রাচীন সখ। আমরা বহু প্রাচীনতাকে বর্জন করেছি, কিন্তু আজো এই দাড়ি রাখার সখটা একেবারে শিকেয় ওঠে নি। আর সখটা মানুষের মনের একটা বাহ্যিক রোমান্স। তাই বলছি, আপনিও দাড়ি রেখে দেখুন, আপনার মনে অনেকখানি রোমান্সের রঙ লাগবে।

নেপোলিয়ান অতবড় সৈনিক হয়েও কেন তার পতন ঘটল, তার প্রকৃত কারণ কিন্তু ইতিহাসে লেখা নেই। লেখা নেই এই জন্যে যে, যেহেতু নেপোলিয়ান অত বড় এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও, নিজের পতন নিজেই ঘটালেন--একথা লিখতে ঐতিহাসিকদের বিবেকে বেধেছিল। কারণ, যোদ্ধা হিসেবে নেপোলিয়ানের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে ঐতিহাসিকগণের। তাই তাঁরা বেমালুম চেপে গেলেন, দাড়ি ফেলে নেপোলিয়ান নিজের পতনের পথটাকে রুদ্ধ করেন নি। এই সামান্য বুদ্ধিটুকু তাঁর যে ছিল না ---এ সত্যটা অত বড় যোদ্ধার মাথায় আসে নি।

ঠিক এই একই কারণে একই পরিণতি ঘটেছে আলেকজাণ্ডারেরও। দিগ্বিজয়ের অসীম প্রতিভা থাকা সত্বেও, তিনি সারা পৃথিবী বিজয় সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এর প্রধান কারণই হচ্ছে, দাড়ির প্রতি তাঁর বিরাগ।

ইতিহাসের পাতায় এই দাড়ির কল্যাণে অমর হয়ে থাকার নিদর্শন অনেক মেলে। ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ রাজা হাম্বুরাবির দাড়ি ছিল বলেই তিনি দিগ্বিজয়ী হতে পেরেছিলেন। শুধু দিগ্বিজয়ই তাঁর কীর্তি নয়, বোধ হয় তিনিই প্রথম রাজা -- যিনি সাম্রাজ্যের শৃংখলা রক্ষার জন্যে বিজ্ঞানসম্মত আইন প্রবর্তন করেন। পাথরের ওপর খোদাই করে তিনি যে আইনগুলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সে পাথরটি এখনও হাম্বুরাবির স্মৃতিকে অমর করে রেখেছে। নিশ্চয় এখানে একথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর অমন সোনালী

হুম্ভর দাড়ি যদি না থাকত, তা'হলে ইতিহাসের পাতায় সোনালী হরফে তাঁর নামটি কখনোই লেখা থাকত না।

হাম্বুরাবির মৃত্যুর প্রায় দেড় হাজার বছর পরে নেবুকাড্নেজারও ওই দাড়ি রেখেই প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। এবং আর কেউ জানুক আর নাই জানুক, আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে পারি যে, তিনি "শূন্য উদ্যান" নামক যে উদ্যানটি তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে সৃষ্টি করে জগতে বিস্ময়ের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলেন, সেই বাগানটির সৃষ্টির উৎস মূল ছিল তাঁর প্রিয় দাড়ি।

একদিন অসময়ে নেবুকাড্নেজারের স্ত্রী স্বামীর কাছে এসে অভিযোগ করলেন: তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না।

নেবুকাড্নেজার বিস্মিত হলেন। রাণীর মুখে আজ একি কথা। তাঁর ভালবাসার প্রতি রাণীর আজ এই সন্দেহ কেন? স্ত্রীর প্রতি তিনি কোন দুর্ব্যবহার করেছেন বলেও মনে পড়ে না। তবে?

জিজ্ঞাসার দৃষ্টি মেলে স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে থাকলেন রাজা। মুখে কোন কথা সরে না।

রাণী চোখ ছল্ ছল্ করে রাজার মুখের দিকে তাকালেন।

আরো বিস্মিত হলেন রাজা। ব্যাবিলনের রাজমহিষীর চোখে জল? এটা বিস্ময়ের ব্যাপার বই কি।

রাজা জানতে চাইলেন রাণীর দুঃখের কারণ।

এবং রাজার জিজ্ঞাসায় রাণী যা' বললেন, তা' শুনে আপনি আমি হয়ত হাসতে পারি, কিন্তু রাজা নেবুকাড্নেজার হাসলেন না। তিনি ভীষণ এক সমস্যায় পড়লেন। রাণীকে তিনি যথার্থই ভালবাসেন। অথচ, রাণীর বাসনা পূরণ করতে গেলে নিজের পৌরুষত্বকে বিসর্জন দিতে হয়।

রাণী বলেছিলেন, রাজা নেবুকাড্নেজার যেন তাঁর মুখমণ্ডলের শ্মশ্রুগুলোকে বর্জন করেন। রাজার শ্মশ্রুবিহীন মুখই তিনি দেখতে চান।

ভীষণ বিপদে পড়লেন রাজা। ললাট ভূমিতে জাগল চিন্তার বলি রেখা। ঘন-ঘন দাড়িতে হাত বুলালেন নেবুকাড্নেজার।

---তুমি অন্য যে কোন প্রার্থনা করতে পার রাণী। আমি তা পূরণ করব। --রাজা বললেন। কিন্তু তোমার এ-প্রার্থনা পূরণ করতে আমি অক্ষম।

রাণীর প্রতি নেবুকাড্নেজারের ভালবাসার কথা রাণীরও অজানা ছিল না। তাই, রাজার কথায় রাণী আরো আহত হলেন। এবং রাজাকে কিছুটা জব্দ করার বাসনা নিয়েই তিনি দ্বিতীয় প্রার্থনা পেশ করলেন। বললেন, বেশ, তা'হলে আপনি আমাকে এমন একটি উদ্যান তৈরী করে দিন মহারাজ, যে উদ্যানের সঙ্গে পৃথিবীর মাটির কোন সংযোগ থাকবে না। সেটি হবে 'শূন্য উদ্যান'।

রাজা বললেন: তথাস্তু।

কিন্তু সে উদ্যান তৈরী হবে কী করে? --রাজা ভাবতে লাগলেন। পৃথিবীর মাটির বুকেই ত সঞ্চিত আছে প্রাণশক্তি। জগতের এই অপার সৌন্দর্য এ ত পৃথিবীরই দান। সেই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে শূন্য উদ্যান তিনি তৈরী করবেন কী করে।

ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলালেন নেবুকাড্নেজার। এবং এই দাড়িতে হাত বুলিয়েই তিনি এই অসাধ্য সাধন করার উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন, শূন্য উদ্যান তৈরী করে জগতের বুকে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন নেবুকাড্নেজার, তার পেছনে শুধু দাড়িরই অবদান ছিল।

দাড়ির মাহাত্ম্য বুঝেছিল আসিরীয়রাও। তারা যে সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল, ইতিহাসে সেটাকেই জগতের আদি সভ্যতা বলে। আসিরীয় সভ্যতার পেছনেও ছিল দাড়ির অবদান। তারা প্রত্যেকেই দাড়ি রাখত---একথা ইতিহাসেই লেখা আছে। আমাদের ভারতের সিন্ধু সভ্যতাও বিকাশ লাভ করেছিল এই দাড়ির ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস অনুস[...] করার প্রয়োজন নেই। সেখানে দা[...] যথেষ্টই কদর ছিল--একথার প্র[...] আমরা বহুভাবেই পেতে পারি। [...] বড় সিন্ধু-সভ্যতাটা যে কারণেই [...] ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু সেই সভ্য[...] ঐতিহ্যটা কালের কবলে একেব[...] হারিয়ে যায় নি। তাই পুরুষের মু[...] দাড়ি দেখে আজো আমরা আ[...] হওয়ার অবকাশ পাই এই ভেবে [...] পুরুষ মানেই গোঁফ-দাড়ি, গোঁফ-দাড়ি অর্থই পুরুষ।

তাই কিশোর রবীন্দ্রনাথকে [...] অবাঙালী রূপসী ও বিদুষী যুব[...] যখন অনুরোধ করেছিল, দাড়ি [...] রাখার জন্যে, তখন রবীন্দ্রনাথ [...] বা ঐ যুবতীর কথাটাকে আজীব[...] রক্ষা করার সংকল্পই করেছিলে[...] নতুন আবেগের বশবর্তী হয়ে। বি[...] সেই যুবতীই যাঁকে স্বামীত্বে ব[...] করলেন, তিনি ছিলেন দাড়িধারী এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সম্যকভা[...] বুঝলেন দাড়ি না রাখলে তাঁর বংশে[...] মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, তখনই তিনি দাড়ি[...] প্রতি অনুরাগ দেখাতে আরম্ভ করেন অবাঙালী সেই সুন্দরীর অনুরোধে[...] চেয়ে নিজের বংশের ঐতিহ্যটাই তাঁ[...] কাছে বড় হয়েছিল বলেই না তিনি জগদ্বিখ্যাত হলেন। রবীন্দ্রনাথ [...] বাঙলা কাব্যকে আমরা যেমন কল্পনা করতে পারি না, তেমনি দাড়িহী[...] রবীন্দ্রনাথকেও কল্পনা করা যায় না।

যদি অবনীন্দ্রনাথও দাড়ি রাখতে তা'হলে কেমন হত? নিশ্চয় খারা[...] দেখাত না তাঁকে। ওমা। আমিই [...] ভুল করছি, দাড়ি রেখে মনের [...] প্রকাশ করবেন কেন তিনি? অবনীন্দ্রনাথ যে রঙ আর তুলিতেই অমর হ[...] আছেন।

কিন্তু আমি অবনীন্দ্রনাথের দাড়ি[...] কথা ভেবেছিলাম তাঁর সাহিত্য জীবনে[...] কথা ভেবে। কিন্তু ওখানেও হয়েছে আমার ভুল। তিনি ছোটদের প্রি[...] কথাশিল্পী। ছোটরা প্রায় হয় দাড়ি পছন্দ করে না।

তবে যুগান্তরের পাততাড়ির স্বপন বুড়োর মুখে দাড়ি দেখি কেন? তিনিও ত শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান লেখক। ছোটদের মন জয় করার শক্তি ত তাঁরও কম দেখি না। ছোটরা যদি দাড়িকে অপছন্দই করবে; তবে পাততাড়িতে প্রতি সপ্তাহে কেন ছোটরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে সবিনয় অনুরোধ রাখে? হায় রে! এখানেও হয়েছে আমার ভুল। স্বপন বুড়োর কাছে গিয়ে যখন ছোটরা দাঁড়ায়। তখন বুড়োর মুখে আর কোন দাড়িই তারা দেখতে পায় না। এই মজাটা দেখার জন্যেই বুঝি তাদের এত ভিড়।

শিশু সাহিত্যের কথা তা হলে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। কারণ বুঝতে পারছি, ছেলেরা তাদের প্রিয় লেখকদের মুখে দীর্ঘ দাড়ি পছন্দ করে না। দাড়ি বয়স্কদের জিনিষ, ওর মধ্যে সৌন্দর্য উপলব্ধি করার শক্তি নেই কিশোরদের মনে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ল। 'সন্দেশের' উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ত দাড়ি ছিল। এবং শিশুদের অন্তরে ওঁর আসনটি ত আজো অক্ষয় হয়ে আছে। তবে? কী করে এটা সম্ভব? কী করে মেনে নেব যে, শিশুরা দাড়ি পছন্দ করে না?

দাদুর দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেওয়ার একটা অদম্য উৎসাহ থাকে শিশুদের মনে। এতে ওরা বেশ মজাও পেয়ে থাকে। সুতরাং দাড়ির প্রতি যদি শিশুদের বিরাগই থাকবে, তবে ওরা বৃদ্ধ দাদুর দাড়ি দেখে আনন্দে আটখানা হয় কেন?

না। শিশুরা দাড়িকে অপছন্দ করে না।

বরং কিছু বেশীই পছন্দ করে।

তাই কবিদাদু ওদের কাছে এত আপনজন। অক্ষর জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যে রবীন্দ্রনাথকে চিনে ফেলে, সেটা শুধু দাড়ির বৈশিষ্ট্যের জন্যে।

জ্ঞান ও কর্মের চক্রাবর্ত

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

পরাস্য শক্তির্বিবিধা চ মায়া
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ---
শ্বেতাশ্বতর ৬।৮

এর (আত্মার) পরাশক্তি, বিবিধ মায়া; জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি---এ তিনটি স্বভাবসিদ্ধ। শক্তির প্রকাশ ক্রিয়াতে। এই যে তিনশক্তি এর মধ্যে জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া হচ্ছে ভাবনা বা চিন্তা করার ক্ষমতা, দিচ্ছে চেতনা। ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ায় মনের মধ্যে তারপর বাসনা ও পরিকল্পনা বা তত্ত্বপ্রয়োগের আবেগ আসে। আর ক্রিয়াশক্তি হচ্ছে চেষ্টা বা কর্মপ্রয়োগ।

বৈয়াকরণরা বলবেন কৃ ধাতু হচ্ছে কর্মের ভিত্তি। কৃ মানে করা। প্রাচ্যদর্শনে জ্ঞানলাভকেই কর্ম বলা হয়েছে। এই কর্ম চিন্তা থেকে প্রসূত। মনের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবনার ফলে যে বাসনা তারই শারীরিক চেষ্টা অর্থাৎ অনুষ্ঠানের নামই কার্য। সুতরাং চিন্তা ব্যতীত কার্য কখনও হয় না।

"যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান যুক্ত: সমাচরণ।"

বিদ্বান অর্থাৎ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ব্যক্তি স্বয়ং যুক্ত থেকে সকলকে নিয়োগ করবেন।

চিন্তা এবং বস্তু, আত্মা এবং প্রকৃতি--এদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরেই দার্শনিকরা তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণ চালিয়েছেন। যাঁরা আত্মাকে প্রকৃতির উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন তাঁরা ভাববাদী শিবিরের মতের বাহক, আর বস্তুবাদীরা বহিঃপ্রকৃতিকে প্রাথমিক বলে গণ্য করেন। বস্তুবাদীদের মধ্যেও বিভিন্ন মত ও ধারা আছে। যে বস্তুবাদ মানুষের চেতনার সক্রিয় ভূমিকার বদলে বলেন যে, পরিবর্তিত জগতই পারে চেতনার জন্মদিতে সেটা হল যান্ত্রিক বস্তুবাদ। চিন্তা ও বস্তুর সম্পর্কের এই যান্ত্রিক ধারণার ফলে জগতের পরিবর্তন এক অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে হচ্ছে বলে উপসংহার টানতে হয়।

চরাচর বা স্থাবর-জঙ্গমের দুনিয়াতে জঙ্গম বা গতিশীলরাই স্থাবরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। জঙ্গমের দুইভাগ---জীব ও উদ্ভিদ। সেখানেও জীবরা উদ্ভিদকে ভোগ করে থাকেন। জগতে আদি ও অনন্ত এক প্রবাহ রয়েছে। একটি পরম্পরায় বিচিত্র ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সমূহের এক যৌগিক ব্যাপার, এতে স্থাবর-জঙ্গমেরও প্রতিনিয়ত কিছু লুপ্ত হচ্ছে, আবার কিছু নব সত্তা লাভ করছে। সাময়িকতা বাদ দিলে একটা প্রগতিশীল বিকাশ নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর অভিমুখী ধারাকে প্রমাণিত করছে। এর মধ্যে সমগ্র জীবকুলের ধর্ম যেখানে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখা মানুষ সেখানে পরিবেশকে নিরন্তর স্বীয় অনুকূলে পরিবর্তন করে নেয়।

ভাববাদীরা মনে করেন যে, পরমভাবের নিজ ভাবরাশিকে প্রকাশের মধ্যেই চরাচরের বিকাশ প্রক্রিয়া অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর বস্তুগত জগতের বিকাশ ধরে নিয়েই অগ্রসর হয় বস্তুবাদী মতবাদ। যান্ত্রিক ধারণা কেবলমাত্র ঘটনার ওপর তথ্যাতেই দৃষ্টি রাখে। নিজের বিপরীতে পরিণত হওয়ার এবং পুরাতনের বিলীনে নতুনের আবির্ভাবের জটিলতম প্রশ্নের সমাধানে (গতির সারবস্তুকে বৈপরীত্যের ঐক্য এবং পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে) বৈজ্ঞানিক দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন যে, অন্তস্থ অবস্থার ঐক্য আপেক্ষিক, কিন্তু সংঘাত নির্বিশেষ। এই সংঘাতই গতির উৎস এবং বিকাশের উপায়।

শুধুমাত্র বাহ্যিক কারণ যান্ত্রিক গতি সৃষ্টি করতে পারে, অর্থাৎ রূপ ও পরিমাণের পরিবর্তন সাধন করতে পারে, কিন্তু কেন বস্তুর গুণাবলীর সহস্ররূপে বিভিন্নতা, কেন বস্তুর রূপান্তরণ ঘটে; তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জ্ঞানশক্তির দ্বারা জানা গেছে যে, সামাজিক বিকাশও প্রধানত ঘটে আভ্যন্তরীণ কারণে, বাহ্যিক কারণে নয়। এই জ্ঞান সঞ্চয় হলে সমাজের বিকাশে ইচ্ছাশক্তি---বাসনা বা প্রেরণা যোগাবে---সমাজের বদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটাতে সঙ্কটের সময় তার বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা সাধনের।

আধিবিদ্যক কোনও মতই এই দ্বন্দ্বতত্ত্বের কথা বলে না। "অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্ প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। কঠোপ-৫মী বল্লী ৯। যেমন একই আগুন ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে দাহ্য বস্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনই এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধারণ করেছেন এবং সমুদয়ের বাইরেও আছেন। সেই অন্তরাত্মাই পরিবর্তন ঘটাবারও একমাত্র অধিকারী। কাজেই বিকাশের জন্য সংঘাতের কোনও আবশ্যকতা নেই। সঙ্কট ইহ সংসারে কারও শোষণের জন্য নিপীড়নের জন্য সৃষ্ট হয় বলে তাঁরা মনে করেন না। তারা বলেন যে, সবই স্ব স্ব কৃতকর্মের ফলভোগমাত্র---অপর কেহ অনুষ্ঠাতা বা দায়ী নয়।

বস্তুবাদী বলছেন যে, শ্রেণী সমাজে প্রত্যেকের চিন্তাপদ্ধতিতেও শ্রেণীর ছাপ পড়ে। আধ্যাত্মিক মতবাদ পক্ষপাতদুষ্ট এবং জ্ঞানের বিকৃতিসাধন ঘটিয়েছে। মনের অনুভূতি দিয়ে জ্ঞানের সত্যতা কিম্বা তত্ত্বের সঠিকতার নিরীক্ষণ হয় না।

সামাজিক কর্মকাণ্ডের অনুশীলনে মানুষের মনে ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রত্যক্ষণও ছাপ ফেলে বারবার---তখন জানার প্রক্রিয়া ঘটে এবং ধারণার সৃষ্টি হয়। মগজে নাড়াচাড়ার পর বিচার বিশ্লেষণে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময়টাকে যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানেরই স্তর বলা যায়। এই সময় বস্তুর সমগ্রতা, তার মর্ম ও আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করে তার আভ্যন্তরিক বৈপরীত্যের সম্পর্কে চেতনা আসে। এই জ্ঞানোপলব্ধির দুটি অংশ। একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত, অপরটি অন্যের এককের বা বহুর অভিজ্ঞতা-লব্ধ। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষের মধ্যে মর্মবিষয়ের সমাধান করে দেয় তত্ত্বাতত্ত্ব গঠনের ভিত্তি হল বাস্তবের সঙ্গে সংযোগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যানুভূতির স্তর, এগুলির বিন্যাসের পর সংশ্লেষণ। বাস্তবানুগ ও সংলগ্ন তথ্যই ধারণা ও তত্ত্ব গঠনের ভিত্তি।

তত্ত্ব শব্দের আক্ষরিক অর্থ বস্তুর স্বরূপ বা স্বত্ব বা স্বভাব। তত্ত্বের দুটি দিক---একটি বিশিষ্ট অপরটি সাধারণ। তত্ত্বের ব্যাপ্তি সার্বিকতা থেকে স্বাতন্ত্র্য পর্যন্ত। তত্ত্বের সার্বিকতা তার স্বতন্ত্র্যের সত্তার মধ্যে নিহিত থাকে। তত্ত্ব ইউনিভার্সাল বা সার্বিক অবস্থা থেকে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে সঠিক প্রমাণিত হলে, তখন এ্যাবসোলিউটনেস বা স্বয়ম্ভুতা প্রাপ্ত হয়।

মানুষের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে তার বুদ্ধি বা মনন ধর্ম। এরই প্রয়োগে মানুষ বুঝতে চেয়েছে ভ্রান্তি কোনটা এবং সত্যই বা কি।

যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে বিকাশ করতে হয় যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানে। জ্ঞান শক্তি ও ইচ্ছাশক্তির থেকে বেরিয়ে আসে তত্ত্ব। সেই তত্ত্বই হল ক্রিয়াশক্তির পরিচালক। তাত্ত্বিক জ্ঞান কর্মপ্রয়োগে লব্ধ এবং সে জ্ঞানকে আবার কর্মপ্রয়োগে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। বহির্বাস্তব জগতের নিয়মবিধি উপলব্ধি করা এবং ব্যাখ্যা করতে পারার মধ্যেই সমস্যার গুরুত্ব নিবদ্ধ বলে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব মনে করে না। এই সব বিধি নিয়ম সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা সক্রিয়ভাবে জগতের পরিবর্তন সাধনেরও "ক্রিয়া" রাখে।

প্রাচ্য তত্ত্বে বলেছে যে, কর্মবিধান জগতে রাজত্ব করছে। যে কোনও কাজ, যে কোনও চিন্তা---কোনওরূপ ফলোৎপাদন করে তাকে কর্ম বলা হয়। তবে "যথাকারী, যথাচারী তথা ভবতি।" (বৃহদারণ্যক-৪।৪।৫) যেমন কর্ম, যেমন আচরণ--তেমনই ফল লাভ। তাঁরা আরও বলেছেন যে, বহুকার্য পূর্বকর্মের ফল হিসেবে করে যেতে হয়, আবার তারাই অন্য ফল উৎপাদনের ক্ষেত্র তৈরী করতে থাকে। ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্তনের প্রবণতার সূত্রকে তাঁরা নিয়ম বা বিধি বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

কর্মের প্রতি আগ্রহ থাকলে তার বিকাশের ক্ষেত্র তৎ তৎ কর্মের অভ্যন্তরেই হয়ে থাকে। "কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ; স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।" (মুণ্ডক-৩।২।২) সকাম ব্যক্তি যাই কামনা করে, বাসনার দ্বারা সে সেখানেই জন্মগ্রহণ করে। স্বীয় বাসনা, রাগ ও দ্বেষের আকার ধারণ করে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে।

কর্মের ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব, তার ভিত্তিতেই বিদ্বেষ। কর্মের ফললাভে যারা অংশভাগী তাদের সঙ্গে মৈত্রী এবং ঐক্য এটাই আনে শ্রেণীচেতনা। যারা কর্মের ফল ভোগে বঞ্চনা করে তাদের প্রতিবেদ বিদ্বেষ, ক্রোধ তাই হল শ্রেণীবৈরীতা।

বিশ্বের অনাপেক্ষিক ও সাধারণ বিকাশের প্রক্রিয়া ধারার বিশেষ বিকাশের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া আপেক্ষিক এবং সেই কারণে অনাপেক্ষিক সত্যের অন্তহীন প্রবাহে কোনও নির্দিষ্ট পর্যায়ের বিশেষ প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান আপেক্ষিকভাবে সত্য। অসংখ্য আপেক্ষিক সত্যের সার্বিক ফলই হল অনাপেক্ষিক সত্য।

"নমস্তৎ কর্মভ্যঃ বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" কর্মই বলবান। কর্মদ্বারা বিধির ওপরও প্রভাব বিস্তার সম্ভব। বিধি হচ্ছে নিয়ম। তাহলে জগৎ বা সমকালীন সমাজের নিয়মসৌধকে পরিবর্তন করতে কর্মপ্রয়োগ আবশ্যক। প্রাচ্যতত্ত্বের মতে জগৎ হচ্ছে দেশ-কাল-নিমিত্তের সমবায়।

দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে ঢালা যে অস্তিত্ব তাকে জগৎ বলেছেন। নিমিত্তই কিন্তু সর্ববিধ সঙ্কটের উৎপত্তিস্থল।

এইখানে আধিধিদ্যক, দৈববাদী, অদৃষ্টবাদী, অধ্যাত্মবাদী, জন্মান্তরবাদীরা ---কর্মের প্রয়োগে নিমিত্তের রূপান্তরের ক্ষমতার অনুকূল মতের ধারে কাছেও আসেন নি।

মানবজীবন ভাবনাত্মক। ভাবনা অনুসারে কর্ম ও ফললাভ তার স্বভাবের চাহিদা এবং কর্মপ্রচেষ্টা তার ভাবনা দ্বারাই চালিত হয়।

তবে প্রাচ্য তত্ত্বে একটা জিনিষ পাওয়া যায়। জাগতিক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বিষয়ে বলেছেন যে, মুক্তি থেকেই এর উৎপত্তি, বন্ধনে এর বিশ্রাম বা স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতে এর পুনর্গতি। আরও একটা অন্তর্নিহিত সূত্র এর থেকে পাওয়া যায় যে, বন্ধনের মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হতেই স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই সংগ্রাম করে চলেছে। সেই বিকাশই স্বাভাবিকতা। প্রতিবন্ধক বলের বিদূরণের জন্য অস্ত্রের প্রয়োগের কর্মের বিরুদ্ধতা সেখানে নেই। তবে একটা অলৌকিক এবং বিশু আত্মশক্তির জগাখিচুড়ি বহু স্থানে এসে পড়ায় বৈজ্ঞানিক সার্বিকতা লাভ সম্ভব হয় নি।

ইন্দ্রিয়গোচর যে জগৎ, তাকে দেখা যায়, অনুভব করা যায়; স্পর্শ করা যায়, দর্শন করা যায়, চিন্তা করা যায়, কল্পনা করা যায়। এ জগতকে নিয়মাধীন দেখা যাচ্ছে। সে নিয়মের নিয়ন্ত্রণে পরমভাবের প্রকাশ দেখলে জাগতিক মানুষের কর্মযোগের কোনও ভূমিকা বা তার ফলকে অস্বীকার করা হয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যানুভূতির ওপরই যুক্তি-ভিত্তিক জ্ঞান নির্ভরশীল। যুক্তি-ভিত্তিক জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রিয়ানুভূতি। সেই জ্ঞানে প্রতীয়মান হয় যে, সব কিছুর বিকাশের পক্রিয়ার মধ্য বৈপরীত্য বিদ্যমান এবং সূত্রপাত থেকে বিলয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্থাবর-জঙ্গমের বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিপরীতের ক্রিয়া চলে। এ ছাড়া কোনও কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বিপরীতের ক্রমিক প্রক্রিয়া স্বতঃ

ভাবে অবিরাম উদ্ভূত হচ্ছে এবং বিশিষ্ট করে দিচ্ছে নিজেকে। যে সময় ক্রিয়ার অবসান ঘটে, জীবনও যায় স্তব্ধ হয়ে, নেমে আসে মৃত্যু। এই বিপরীত উপাদানের অস্তিত্ব পারস্পরিক নির্ভরশীল। বাস্তবের এই বিরোধের প্রতিফলন দেখা যায় চিন্তায়। চেতনার বিপরীত দিকগুলোরও বিকাশের ফলে চিন্তাজগতের সমস্যাগুলোর সমাধান ঘটায় বিরামহীন ভাবে। স্বতন্ত্র এক একটি সমাধান থেকেই সার্বজনীনতায় টেনে নিয়ে গিয়ে সর্বিক তত্ত্ব পাওয়া যায়।

সার্বিকতার পথে অগ্রসর হতে গেলে ধারণা ও পদ্ধতিকে মূল মর্ম উদ্‌ঘাটনের দিকে টেনে নিতে হয়, তার বিধিনিয়মের প্রতিফলন ঘটাতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন বহির্দেশ থেকে অন্তর্দেশে প্রবেশ করার, চিন্তার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যানুভূত মূল্যবান 'তথ্যসমূহ' পুনর্গঠন করে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাতিল করে দিয়ে মূল মর্মকে বেছে নিতে হয়। অন্যথায় তত্ত্ব একদেশদর্শী হবে---সার্বিক নয়। দু' একটি সাফল্য প্রাপ্তিতে ও সত্যের টুকরো দর্শনে আত্মতুষ্ট হয়ে তাত্ত্বিকের গতিমুখ চোরাগলির বদ্ধ পথে ধাক্কা খাবে।

কর্মই সত্যের কষ্টি পাথর। কর্মপ্রয়োগ না হলে তত্ত্ব ও তথ্যের অর্থাৎ বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য আসে না। সফলতাও পাওয়া যায় না। কর্মের মধ্য দিয়ে তথ্যের সংগ্রহে তত্ত্বের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের, পরিকল্পনার ও কার্যসূচীর ত্রুটী জানা ও তা বিদূরণের পথের সন্ধান হয়।

সক্রিয়ভাবে কর্মপ্রয়োগের মাধ্যমেই কোন সমাজের বন্ধনাবস্থার সঙ্কট মুক্তির পথ---সন্ধান সম্ভব। কর্মপ্রয়োগে যে তত্ত্ব পূর্বসূরীরা উদ্ভাবন করেছেন, দেশ, কাল, পাত্র ও নিমিত্ত অনুসারে সমাজের মূলসৌধগত প্রশাসন, সাহিত্য, সমাজদর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি উপসৌধের ওপর তার কর্মপ্রয়োগেই তৎকালীন সঠিক কর্মধারা নিরূপণ সম্ভব। কর্ম হতে সৃষ্টি, আবার সৃষ্টির

জন্যই কর্ম। কর্মের এই বাস্তব ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে যে তাত্ত্বিক শুধু সূত্র দিয়ে দুনিয়া পাল্টাতে বসে থাকেন, তাঁরা দুনিয়ার রূপান্তরে সক্ষম হবেন না। কর্মপ্রয়োগকারীই নির্ভুল সূত্র দিতে পারবে। এই ভাবে দেখা যায় যে, তত্ত্ব ও তথ্য পরস্পর নির্ভরশীল। তথ্য বাস্তবানুগ না হলে তা তথ্যই নয়। তথ্য থেকে জ্ঞান এবং কর্মের মধ্য দিয়ে যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান---তার থেকে চিন্তা ও বাস্তব দুনিয়া পরিবর্তনের কর্মপ্রয়োগ পদ্ধতিকে পরিচালনা করতে হয়। জানা ও করার, তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ঐক্য রয়েছে। তত্ত্বের এই কর্মপ্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে বৈষয়িক কর্মপ্রয়োগের অভিজ্ঞতাহীন সর্বপ্রকার মন্তব্য, রচনা ও তত্ত্ব হয় একেবারে আত্মমুখীন। তাই তাও ফলপ্রসূ হয় না।

সামাজিক প্রয়োগপদ্ধতির মত মানুষের জ্ঞানরাজ্যেও উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলয়ের প্রক্রিয়া অন্তহীন। প্রত্যেক প্রক্রিয়াতেই আভ্যন্তরিক বিরোধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটে থাকে এবং মানুষের জ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশ সেই সঙ্গে হওয়া বিধেয়। কর্মপ্রয়োগ ব্যতিরেকে সেই অগ্রগতি ও বিকাশ অসম্ভব। সুতরাং কর্মপ্রয়োগ থেকে জ্ঞান ও তত্ত্ব লাভ এবং তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কর্মপ্রয়োগ ও আবার জ্ঞান। এই চক্রাবর্তের সঙ্গে কর্মপ্রয়োগের ও জ্ঞানের বিষয়বস্তু উন্নীত হয় উচ্চ মার্গে। জানার সঙ্গে বাসনা এবং বাসনার সঙ্গে কর্মপ্রয়োগই হল তিন শক্তির ঐক্য। এই ঐক্য সাধন না হলে সব সাধনা [illegible] বিফলতা [illegible]। কর্মপ্রয়োগই সার্থকজ্ঞান দেয় ও তাকে সম্পূর্ণ করে।

যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও তাঁর রচনাবলী

ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের বিদ্বজ্জন সভায় যাঁহারা স্মরণীয়, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় অন্যতম। ভারতবর্ষের জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি একজন। ১৮৫৯ সালের ২০শে অক্টোবর হুগলী জেলায় তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিত সভা তাঁকে বিদ্যানিধি উপাধি দেন। তিনি শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি নামে বিখ্যাত। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ব্যতীত তাঁর আরও সম্মানসূচক উপাধি আছে। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে, রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় এম. এ. বিদ্যানিধি, বিদ্যাভূষণ, এফ. আর. এ. এস, এফ. আর. এম. এস, ডি. লিট। ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী মেডাল, ১৯৪৭ সালে সরোজিনী মেডাল দিয়া সম্মানিত করেন ১৯৫৫ সালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর উপাধি প্রদান করেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। যোগেশচন্দ্র রায় লণ্ডনের রয়াল এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, রয়াল মাইক্রোস্কোপিক্যাল সোসাইটি এবং লিডন নগরে অবস্থিত ইণ্টার ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন অব বোটানিষ্টস সভার সদস্য ছিলেন। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন ১৯৫৬ সালের ১৭ই এপ্রিল। ঐদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে চ্যান্সেলার ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ বাঁকুড়া যাইয়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অনুষ্ঠিত বিশেষ সমাবর্তন সভায়, তাঁহাকে ডক্টর উপাধি প্রদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এজাতীয় সম্মান আজ পর্যন্ত কেহ পান নাই। ইহা আচার্য যোগেশচন্দ্রের মনীষার শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হয়।

এই প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী ও রচনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব। তাঁহার অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত, অন্য পুস্তক এখন সহজ লভ্য নয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী ও আলোচনা

শ্রীসত্যশংকর সুর

১। আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ। প্রথম ভাগ। সান্যাল এণ্ড কাম্পানী। শক ১৮২৫। ১৯০৩ গ্রন্থের। পৃষ্ঠা সংখ্যা --৫১৪।

গ্রন্থের সূচী :---প্রথম খণ্ড :---আমাদের জ্যোতিষী ; বেদ মধ্যস্থ জ্যোতিষ ; জ্যোতিষ সংহিতা ; জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত ; জ্যোতিষ করণ ; জ্যোতিষ শাস্ত্রের বেদাঙ্গত্ব ; বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ; ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব ; প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল ও অপরাপর সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড :---আমাদের জ্যোতিষ, পৌরাণিক জ্যোতিষ---ব্রহ্মাণ্ড, জম্বুদ্বীপ, গ্রহ, নক্ষত্র ; প্রাকৃত জ্যোতিষ-পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহণ, তারাগ্রহ, ধূমকেতু উল্কা, নক্ষত্র জগতের উৎপত্তি ও লয় ; ফলিত জ্যোতিষ---সংহিতা স্কন্ধ, জাতক স্কন্ধ

এই পুস্তকটি সম্পর্কে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের উক্তি প্রণিধানযোগ্য---

"You (Yogesh Chandra Ray) have done an invaluable service ... I appreciate your lucid and exhaustive account of our astronomical systems, —our Samhitas and Siddhantas and our later astronomical works done to the present time ... the value of a compilation such as yours cannot be exaggerated and I wish once more to express my high sense of the obligation you have conferred on all of us —on all Indians—by your patriotic labour."

২। রত্ন পরীক্ষা। কেদারনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। শক ১৮২৫। ১৯০৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬।

সূচী :---রত্নশাস্ত্রের ইতিহাস ; রত্নগণনা ও রত্নের সামান্য লক্ষণ ; মহারত্ন :---হীরক, মাণিক্য, সৌগন্ধিক, নীলমণি, মরকত :---বৈদূর্য, পুষ্পরাগ, গোমেদ, বৈক্রান্ত প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা।

গ্রন্থটিতে রত্নসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন--- 'যোগেশবাবু আর্যশাস্ত্রের লুপ্ত রত্ন উদ্ধারের যে চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার গ্রন্থখানি যে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।---রত্ন পরীক্ষা আমাদের বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে।'

৩। শঙ্কু নির্মাণ। (অর্থাৎ নানাবিধ সূর্যঘড়ি নির্মাণবিষয়ক উপদেশ) দাশগুপ্ত কোম্পানী। শক ১৮৩০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০।

সূচী---উপক্রম ; পরিভাষা ; সূর্যঘড়ির মূলতত্ত্ব ও নাম ; মধ্যরেখা নির্ণয় :---শঙ্কু দ্বারা, বিলাতী ঘড়ি দ্বারা, চুম্বক শলাকা দ্বারা, ধ্রুবতারা দ্বারা, সূর্যঘড়ি, নির্মাণ ও স্থাপন প্রভৃতি।

লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন---"বিলাতী ঘড়ি নির্মাণের পূর্বে বিলাতেও সূর্যঘড়ি কাল বিভাগের একমাত্র উপায় ছিল। সাবধানে নির্মাণ ও স্থাপন করিতে পারিলে সূর্য ঘড়ির সাহায্যে এক মিনিটের এদিক ওদিক সময় জানিতে পারা যায়। অধ্যাপক অপূর্বচন্দ্র দত্তের মতে শঙ্কু নির্মাণ সূর্যঘড়ি নির্মাণের প্রয়োজন ও প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে ইহার উদ্দেশ্য।

৪। বাঙ্গালা ভাষা। প্রথম ভাগ। প্রথম অধ্যায়। রাঢ়ে ভাষা। ১৩১৫। পৃষ্ঠা---৩৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়। বাঙ্গালা শব্দ শিক্ষা। ১৩১৭। পৃষ্ঠা---৩৫-১০৬।

তৃতীয় অধ্যায়। ব্যাকরণ। ১৩১৭। পৃষ্ঠা---১০৭-২৯৬।

বাঙ্গালা ভাষা। দ্বিতীয় ভাগ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। চারি খণ্ডে প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড। ১৩২০। পৃষ্ঠা ২৬৪।

দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩২০। পৃষ্ঠা ২৬৫-৫২৮।

তৃতীয় খণ্ড। ১৩২১। পৃষ্ঠা ৫২৯-৮০০।

চতুর্থ খণ্ড। ১৩২২। পৃষ্ঠা ৮০১-৯৬৯।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যোগেশচন্দ্র রায়ের বাংলা ভাষা পুস্তকটি একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হইল---

অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে---"যোগেশবাবু মাটি খুঁড়িয়া আকর হইতে লৌহ উত্তোলন করিয়া স্বরচিত শাস্ত্রে বাংলা ভাষা ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি যে ভবিষ্যৎ কর্মীদিগের নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবেই।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে---"ইহার সমকক্ষ বাংলা অভিধান শীঘ্র দেখিবার সম্ভাবনা নাই।"

রাজশেখর বসু মনে করেন,---'বাংলা শব্দকোষ বিদ্যানিধি মহাশয়ের একটা কীর্তি। এতে কেবল অর্থই নেই ---এটি আসলে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া।'

লেখকের মতে এই গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য হইতেছে---"বাংলা ভাষার প্রচলিত যাবতীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি---অর্থপ্রয়োগ প্রদর্শন এই শব্দকোষের উদ্দেশ্য।"

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার। অনাথগোপাল সেন স্মৃতি সমিতি। ১৯৫০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০।

সূচী---বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা, বিদ্যালয়ের ভাবী মানসচিত্র: বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাপরিপাটি।

৬। শিক্ষা প্রকল্প। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। বৈশাখ ১৩৫৫। পৃষ্ঠা ৭২। সূচী---পাঠশালার শিক্ষা; শিক্ষার বীজ; মধ্য ও অন্ত্য শিক্ষা; দেশে জ্ঞান প্রচার।

৭। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড---সেন ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং। ১৯১৯। পৃষ্ঠা ১১৬।

সূচী---ক্ষুদ্র ও বৃহৎ; কলাগাছ; কবি কঙ্কণচণ্ডী; তোলেণ্ড দেশ; ফুলের বাগান; কুয়াণ্ড; নুলা; খণ্ডগিরি; দধিবীজ অগ্নিমন্থন।

দ্বিতীয় খণ্ড:---সান্যাল এণ্ড কোং। ১৩ ৩। পৃ ৪ ।

সূচী---বাণী বিশ্বেশ্বরী; দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা; বর্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য; সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ। প্রভৃতি।

৮। পূজা পার্বণ -- বিশ্বভারতী। আশ্বিন ১৩৫৮। পৃষ্ঠা ১৭৮।

সূচী -- দোলযাত্রা; শারদোৎসব; রাসযাত্রা; সরস্বতীপূজা; বারমাসে তের পার্বণ; দুর্গোৎসব প্রশ্ন; শ্রীশ্রীদুর্গা। মহিষমর্দিনী; দুর্গার প্রতিমা; দুর্গাপূজা; শরৎকালীন যজ্ঞ; দুর্গোৎসব নববর্ষোৎসব; দুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল; পরিশিষ্ট।

এই গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ।

৯। কোন পথে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৩৫৯। পৃষ্ঠা ১৯৬।

সূচী -- কোন পথে; ছোট ও বড়; নরনারীর কর্মভেদ; কন্যাদের বিবাহ হবে না? প্রভৃতি।

১০। পৌরাণিক উপাখ্যান। এস সি সরকার এণ্ড সন্স। পৃষ্ঠা ১৩২।

সূচী -- মুখবন্ধ; পুরাণে দেশ; বিষ্ণুর বরাহ ও কূর্ম অবতার; বিষ্ণুর বামনাবতার; ভারত যুদ্ধ কাল। প্রভৃতি।

১১। ধনুর্বেদ। বিশ্বভারতী। ১৩৬১।

সূচী -- প্রস্তাবনা, অগ্নি পুরাণোক্ত ধনুর্বেদ; সমর নীতি; বিশিষ্ট ধনুর্বেদ; কয়েকটি প্রাচীন অস্ত্র।

১২। বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩৬১। পৃষ্ঠা --১৫২।

সূচী -- প্রস্তাবনা; সরস্বতী; উষা ও উর্বশী; ধ্রুবতারা, যজুর্বেদের কাল; ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গ রচনা কাল; সোম অগ্নি ও বিশ্বদেব; ফাল্গুনী পূর্ণিমা; রুদ্র; ইন্দ্র; প্রভৃতি।

১৩। কি লিখি? -- ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ১৩৬৩। পৃষ্ঠা ২০০।

সূচী -- কি লিখি; বাংলা ভাষার লিখন ও পঠন; বাংলা শব্দ ও বানান; ইংরেজীর বাংলা; প্রাচীন পুঁথির সংস্করণ; কবি শশাঙ্ক; বাংলা বিরামাদি চিহ্ন; গল্প; পুরানো গল্প; বাংলা ভাষার প্রকাশ চিন্তা; বাঙ্গলা নবলিপি।

ইংরাজী গ্রন্থ ---

1. The first point of Aswini (the Indian first of Aries) Prabasi Press. 1934, P. 16.

Contents :—Introduction; The Initial Point etc. etc.

2. Ancient Indian Life: Published by P. R. Sen. Sen Roy & Co. 1948 Pg—218.

Contents : — Life in Ancient India; Food and Drink in Ancient India; Sugar Industries in Ancient India; Textile Industries in Ancient India; Fire-Armsin Ancient India; The days of Hindu Calendar; The Eugenics of Hindu Marriage.

এই গ্রন্থটি ১৯৫১ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পায়।

সম্পাদিত গ্রন্থ:---

১। সিদ্ধান্ত দর্পণ। মহামহোপাধ্যায় সামন্ত শ্রীমৎ চন্দ্রশেখর সিংহের বিরচিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় লিখিত ইংরাজী ভূমিকা। পৃষ্ঠা ৯-৬৬। সংস্কৃত ভূমিকা পৃ ৬৭-৬৮।

২। পত্রালী : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। [illegible] বসু কর্তৃক প্রকাশিত। ইন্ডিয়ান [illegible]। ১৮২৫ শক। ১৯০৩। পৃষ্ঠা —২৯৮।

এই গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখক লিখিয়াছেন —'কয়েক বৎসর পূর্বে আমার কোন বন্ধুর সহিত এদেশে সাধারণ জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। তাহারই ফলস্বরূপ তিনি পত্রচ্ছলে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ ছিল। তন্মধ্যে ২০খানি পত্র যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া পত্রালী নামে প্রকাশিত হইল।' বিজ্ঞাপন।

৩। কৃষ্ণপ্রসাদ সেন - বিরচিত চণ্ডীদাস চরিত। চণ্ডীদাস চরিত সংস্কর্তা। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রবাসী কার্যালয়। ১৩৪৪। পৃঃ ২৩৬।

বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ :—

১। সরল বিজ্ঞান। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

২। বাঙ্গলা প্রাকৃত ভূগোল। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।

৩। সরল রসায়ন। ১৮৯৮।

৪। A Primer of Physiography of Indian Depository. 1889. Pp. 118.

Contents—The air, the waters of the ocean ; the Land of this globe ; the Sculpture of the Land ; the Earth of the Planet.

যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে কিছু উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। এর মধ্যে অবশ্য সকল বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকের বিবরণ দেওয়া হয় নাই। পুস্তকাকারে প্রকাশিত রচনার বিবরণ এখানে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার বিভিন্ন রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জীর সূচী হইতে তাঁহার জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ সুনীল রায় মনে করেন, 'যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাংলা দেশের তথা একটি শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন।' সর্বশেষে রাজশেখর বসুর কথায় প্রবন্ধ শেষ করি— "বিদ্যানিধি তো নয়, বিদ্যা বারিধি। এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলা দেশে কেন, ভারতবর্ষেও দুইটি আছেন কিনা সন্দেহ। তিনি বিবিধ বিদ্যায় পারগম।" *

---

* দ্রঃ রাজশেখর বসু — যোগেশচন্দ্র বাগল।

বসুধারা —১৩৬৯। পৃ ৩২৩, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

এ্যালুমিনিয়াম-এর পোষাক ?

এ্যালুমিনিয়াম ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র বলছেন যে, অনতিকাল-মধ্যে বিলাসিনীরা এ্যালুমিনিয়াম-এর সুতোয় বোনা পোষাকে তাদের বরবপু ঢাকতে পারবেন। বলা হচ্ছে যে, এটা সম্ভব হবে "লুরেক্স্" নামক নবউদ্ভাবিত এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর থেকে তৈরী সূক্ষ্ম 'সুতোর' দ্বারা। এটার উদ্ভাবক হচ্ছে মার্কিণ দেশের ডোবেক্ম্যান্, ইস্টম্যান্ কোডাক কোম্পানী এবং এ্যালুমিনিয়াম কোং অব আমেরিকা।

এ্যালুমিনিয়াম এবং এ্যাসিটেট্ থেকে উদ্ভূত "লুরেক্স্" যদিও নতুন আবিষ্কার, তথাপি এ্যালুমিনিয়ামের সুতো কিন্তু নতুন কিছু নয়। রেনল্ডস্ মেটাল কোম্পানী বেশ কয়েক বছর ধরে এ ধরনের একটা সুতো বাজারে চালু রেখেছেন, যার চাহিদা রয়েছে বেশ, বিশেষ করে সান্ধ্য পোষাকের [illegible] কাছে। খুব পাতলা এ্যালুমিনিয়াম পাতকে যন্ত্রের সাহায্যে সরু সুতোয় পরিণত করা হয় এবং সরাসরি তাঁতে চড়ান হয়।

"লুরেক্স্" অবশ্য এ সুতোর ওপরে এ্যাসিটেট্-এর প্রলেপ দিয়ে গড়া। এতে কোন দাগ লাগতে পারে না, অন্যান্য ধাতব সুতোর চাইতে অনেক হালকা এবং একে পশম, রেয়ন, রেশম, সাধারণ তুলোর সুতো ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে বোনা যায় সহজেই। এ পর্যন্ত এর ব্যবহার হচ্ছে প্রধানত সান্ধ্য পোষাক, স্নানের পোষাক, জুতো, পর্দা এবং চেয়ার বা সোফার আবরণী হিসাবে।

সমুদ্রের জল, হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড্, জিন ও রাম্ জাতীয় মদ্য ইত্যাদি এর কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

অনুঃ কিংশুক

যোগীবর পওহারীবাবা

কতই বা বয়েস? ---বছর দশেক। দুধের বাছাই বলা চলে। মায়ের কোলের ছেলে, একেবারে যাকে বলে জননীর অঞ্চলের নিধি, নয়নের মণি, সাত রাজার ধন এক মাণিক। সেই দশ বছরের বাচ্চা হরভজনের কাছে যেদিন সন্ন্যাসাশ্রমের ডাক এল, সেদিন যেন সারা আকাশ ভেঙে পড়ল হরভজনের মায়ের মাথায়, পৃথিবীর সব আলো এক পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকারের রূপ নিয়ে তাঁর দৃষ্টিপথ রোধ করে দাঁড়াল, জীবনের সমস্ত আনন্দ কে যেন এক ফুৎকারে মিলিয়ে দিয়ে গেল। হরভজনকে সন্ন্যাসাশ্রমে দেওয়া--এ যে তাঁর এক অঙ্গহানিসদৃশ, তার চেয়েও নিদারুণ যন্ত্রণা। তবু সেই যন্ত্রণাকেই স্বীকার করে নিতে হয়। অন্তরের আকুলতা এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও, বুকফাটা হাহাকার ভবিতব্যকে রোধ করা যায় না।

কোথা থেকে এল এ আহ্বান, কোন্ সন্ন্যাসী, কোন্ সংসারত্যাগী, কোন্ সেই পরমপথের অমৃত পথিক আকর্ষণ করলেন এই বালককে, স্থির করলেন তার মায়ের বাৎসল্য থেকে দূরে সরিয়ে আনার? তিনি অন্য কেউ নন্, তিনি হরভজনের জ্যাঠামশায় লছমীনারায়ণ। সেবা করার লোকের অভাব তাঁর ছিল না, তাঁর একটি আহ্বানে শত-সহস্র সেবকের উপস্থিতি কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়, তাঁর চরণে একবার সেবার স্পর্শ রাখার সুযোগে যে-কোন ভক্ত নিজেদের জন্ম সার্থক মনে করতেন, তথাপি বেছে বেছে বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল কেন?

দিব্যপথের লক্ষ্যস্থির পথিক লছমীনারায়ণ। এই অমৃতসঙ্গমী পথে যার চরণচিহ্ন পড়ে সেই তো ক্ষণকালের সীমায় নিত্যকালের অবস্থিতি ঘটাতে পারে, সেইতো সীমার বীণায় ঝঙ্কৃত করতে পারে অসীমের সুর। সেই তো ভূমির পটভূমিতে পায় ভূমার স্পর্শ। সেইজন্যেই অন্যের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টির ব্যবধান-টাও আকাশ-পাতাল। তারই দৃষ্টি বহু দূরের প্রান্তসীমাও ভেদ করে যায়। সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধকপ্রবরের ধ্যানদৃষ্টিতেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই বালকের স্বরূপ। সেই সিদ্ধ সাধকের দিব্য নয়নেই ধরা দিয়েছিল বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের সুপ্ত সাধকসত্তা। লছমীনারায়ণ জেনেছিলেন সেই আধার দিব্য, দীপ্ত, প্রদীপ্তের, মহাসাধকের বীজ সেখানে লুকিয়ে আছে। তাই, হরভজনকেই তিনি চেয়েছিলেন। সারা

জর্জ এ্যালেন

ভারতের সাধক সমাজে 'পওহারীবাবা' নামে যিনি বিপুল শ্রদ্ধা-ভক্তি-বন্দনা আকর্ষণ করলেন, সেই হরভজনের জন্ম ১৮৪০ সালে। জৌনপুর জেলার অন্তর্গত ছোট্ট একটি গ্রাম প্রেমাপুরের ঈশ্বরানুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য সুপ্রসিদ্ধ তেওয়ারী পরিবারের অযোধ্যা তিওয়ারীর ছোট ছেলে হরভজন। দশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের বিরাট একটি ঘটনার সূত্র ধরেই এই রচনার আরম্ভ। ষোল বছর বয়সে আর একটি প্রধান ঘটনা তাঁর জীবনে স্বাক্ষর রেখে চলে গেল। এই সময়ে লছমীনারায়ণ করলেন দেহরক্ষা। বাবার কাছ থেকে এসে-ছিলেন জ্যাঠামশায়ের কাছে। ধর্ম-জীবনের হাতেখড়ি তিনিই দিয়ে গেলেন। বালকের অন্তরে ধর্মের বীজ বপন করে গেলেন তিনিই। এই ছ'বছর তাঁর জীবননদী দু'টি ধারার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। একদিকে কঠোর ব্রহ্মচর্য, একনিষ্ঠ সাধনার সমারোহ, অন্যদিকে স্নেহ, মমতা ও বাৎসল্যের অফুরান নির্ঝরিণী।

আশ্রমে মন টিকল না। ষোল বছরের কিশোর বেরিয়ে পড়ল পথে। নিঃস্ব, রিক্ত অথচ কি অদম্য মনোবল, যা কোন বাধায় প্রতিহত হয় না, যা কোন বিপদের রক্তচক্ষু ধমকির কাছে মাথা নত করে নয়, যা সাময়িক ব্যর্থতায় টলে না।

এলেন দ্বারকায়। লোকমুখে শুনলেন কীর্ণাহার পাহাড়ে আছেন এক বৃদ্ধ যোগী। একদিন লুটিয়ে পড়লেন যোগীর পায়ে---আমি পথহারা, প্রকৃত পথের জন্য তোমার চরণে আমায় স্থান দাও।

পূর্ণসিদ্ধ সান্ত্বনা দেন তরুণ অন্বেষীকে --তোমার গুরু অন্যত্র আছেন, তবে তুমি যখন এত আকুল, কিছু যোগসাধনা তোমায় দিচ্ছি।

রামানুজপন্থী বৈষ্ণব হরভজনের সাধনার স্রোতে মিলিত হল যোগসাধনার বলিষ্ঠ ধারা। একদিন খেতে বসেছেন। বাহুল্যবর্জিত অতি সাধারণ খাদ্য। শুধু ডাল আর রুটি। মুখের কাছে খাদ্য উঠছে, হঠাৎ এক অভিনব ভাবান্তর এল, খাদ্য দিয়ে দিলেন অপরকে। ডাল-রুটির পরিবর্তে খেলেন বেলপাতা বাটা এবং আধ-পো দুধ। এই তাঁর নিয়মিত খাদ্যে পরিণত হল। তারপর একদিন দুধও বর্জন করলেন। শুধু বেলপাতা বাটা -- অদ্ভুত, বিচিত্র খাদ্য। এই থেকেই তাঁর নাম হল পওহারীবাবা। পওহারী শব্দের আক্ষরিক অর্থে দাঁড়ায় বায়ুভোজী। শুধু বেলপাতা বাটা খেয়ে থাকা, আর হাওয়া খেয়ে থাকায় প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য আছে কি? খাদ্যতালিকা একদিন বদলালো, কিন্তু বদলে যা দাঁড়াল সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। পঞ্চাশটি মরিচ জল দিয়ে বেটে কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে সেই সরবৎ -আর তার পরই একপোয়া দুধ।

সাধনার দুর্গম পথে ভক্তি ও একাগ্রতার আলোয় বহুদূর এগিয়ে গেছেন সাধক। যোগী হিসাবে পূর্ণ-সিদ্ধির স্পর্শে যেন ভরপুর, কিন্তু তথাপি প্রবীণ সিদ্ধের সন্ধান পেলেই ছুটে যান, চরণের ধূলি মাথায় নেন পরম শ্রদ্ধায়, গভীর ভক্তিতে। যখনই কোন দিব্য-শক্তিমানের সংবাদ পেয়েছেন, তখনই ছুটে গেছেন তাঁর কাছে তিলমাত্র দ্বিধা না করে।

কিন্তু এখনও সেই অভীষ্ট কোথায়, লক্ষ্য যে এখনও বহু দূরবর্তী, সেই পরমের স্পর্শ তো এখনও পরিপূর্ণ আত্মাকে রোমাঞ্চিত করছে না। কিসের জন্যে এ কৃচ্ছ্রসাধন—কিসের জন্যে এ যোগ-শক্তিটুকু দিয়ে তুমি নাগালের বাইরে থেকে যাবে? শক্তি পেয়ে আমি ভুলে থাকব? আমি কি শক্তির কাঙাল—কি হবে আমার এই প্রচণ্ড শক্তি, যদি তুমিই দূরে থাক। আমি শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখি নি, আমার লক্ষ্য তুমি।

অযোধ্যায় সেই গুরুর সন্ধান অবশেষে একদিন মিলল—তার আভাস দিয়েছিলেন কীর্ণাহারের সিদ্ধ যোগী। গুরুর চরণে প্রণত হল শিষ্য। গুরু বুকে তুলে নিলেন শিষ্যকে। দিলেন মন্ত্রদীক্ষা। পওহারীবাবা অবশ্য চিরদিন দীক্ষাদাতার নাম গোপনই রেখে গেলেন।

গুহার মধ্যে চলে কঠোর সাধনা। কখনও সপ্তাহও অতিক্রান্ত হয়ে যায় নিরবচ্ছিন্ন সাধনায়। কিন্তু যখনই গুহার বাইরে থাকেন, তখন আশ্রমবাসীদের প্রতিটি সুখ-সুবিধার দিকে থাকে তীব্র প্রখর দৃষ্টি। দল বেঁধে যখনই কোথাও চলেছেন, হঠাৎ দল থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন---শিষ্যেরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখতেন, গুরু কোন্ প্রাক্কালে সেখানে পৌঁছে তাঁদের পথশ্রান্তি দূর করার প্রতিটি ব্যবস্থা করে রেখেছেন। নিজে মরিচের সমবৎ, বেলপাতা বাটা খেয়ে থাকলেও, চিরদিন স্বহস্তে নানাবিধ সুস্বাদু, মুখরোচক ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করে শিষ্যদের খাইয়েছেন।

সাপে কামড়াল পওহারীবাবাকে, ভক্তরা দিশাহারা চিন্তার আকুল পাথারে, দু'দিন পর দেখা গেল, বাবাজীর অচৈতন্যতা, নির্জীবতা কোথায়? সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক। জোড়া জোড়া বিস্ময়াবিষ্ট কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল অমৃতনির্ঝর এক স্নিগ্ধ হাসি। বললেন, সাপবাবা যে অতিথি—দু'দিন কৃপা করে আতিথ্য নিলেন, নিলেন আমার দেহের ভোগ, তারপর বিদায় নিলেন।

আশ্রমে বসে আছেন বাবাজী। হঠাৎ কোথা থকে আবির্ভূত হল এক উন্মাদ সন্ন্যাসী। হিংস্র ক্রূরতার দৃষ্টি, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তার ভয়ঙ্করের ছাপ। পুঞ্জীভূত রোষের দৃষ্টি। তার লক্ষ্য হচ্ছেন বাবাজী নিজে। সোজা এগিয়ে গেল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পওহারী-বাবার দিকে। তাঁকে মেরেই ফেলবে এই তার অভিপ্রায়। কিছু বললেন না বাবাজী। এতটুকু বিচলিত হলেন না, তিলমাত্র বাধা দিলেন না সেই উন্মত্তকে বরং যারা বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল, তাদের করলেন নিরস্ত। উন্মাদের দিকে স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে রইলেন বাবাজী। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল, উন্মাদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

বাঙলা দেশের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড় এবং অবিচ্ছেদ্য বললেও চলে। বাঙলাভাষা তিনি রীতিমত আয়ত্তে এনেছিলেন। বাঙলায় চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তিনি পাঠ করেছেন। বাঙলার বহু দিক্পাল তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এই তালিকায় তৎকালীন ধর্মনায়কদের ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ তিনটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর যে একটিমাত্র প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ বর্তমান, যেটি তাঁর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য---সেই গ্রন্থের রচয়িতাও এক বঙ্গসন্তান। তিনি ঠাকুর পরিবারের আত্মীয়কুলভুক্ত স্বর্গত রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল যেমনই গভীর, তেমনই মধুর। ভগ্নী নিবেদিতার উক্তি থেকেই জানা যায় যে, বিবেকানন্দের জীবনে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরই যাঁর প্রভাব সর্বাধিক---তিনি পওহারীবাবা।

১৮৯৮ সালে তাঁর পার্থিব লীলার অবসান ঘটল। জ্বলন্ত অগ্নিপুঞ্জে আত্মদান করে নশ্বর দেহের সমাপ্তি ঘটালেন যোগীকুল-গৌরব পওহারীবাবা।

চক্ষু ব্যাংক!

বর্তমানে চক্ষু ব্যাংক পৃথিবীর সকল দেশে সমাদৃত। এর দ্বারা অনেক দৃষ্টিহীন আবার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

সদ্য মৃতের 'চক্ষু সঞ্চিত করে রেখে দৃষ্টিহীনের দৃষ্টিদানের এই অভিনব পদ্ধতি অবশ্য খুব বেশী দিন মানুষ আবিষ্কার করে নি। ১৯৪৪ সালে কয়েকজন ডাক্তার মিলে নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটান-এ 'আই, ইয়ার এ্যাণ্ড থোট' [illegible] করেন। এঁরাই এ কাজের পুরোধা—সর্বপ্রথম 'চক্ষু ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার গৌরব এঁদেরই প্রাপ্য।

বর্তমানে এটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বৃহৎ 'চক্ষু ব্যাংক'। সারা মার্কিণ দেশে এর অন্তত ষোলটি শাখা আছে। অসংখ্য দৃষ্টিহীনকে এঁরা দৃষ্টিদান করে থাকেন প্রতিনিয়ত। এখানে উচ্চ মানের একটি গবেষণাগারও আছে, যেখানে নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল প্রচেষ্টা চলছে। ১৯৪৮ সালে প্যারিস শহরে ফরাসী চক্ষু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমে এ মহৎ কাজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। আইনগত বাধা যা ছিল, তা ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক দেশেই। আজ আর অন্ধ বলেই সকলকে সারা জীবন ভুগতে হয় না---বিজ্ঞান তার কল্যাণ-হস্তের স্পর্শে তাদের অনেককেই আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে।

পক্ষী ওও ব

আমাদের দেশে কতরকম পাখী আছে। প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে তারা নিন্দে নৃত্য করছে। কত বিচিত্র দের আকার-আকৃতি, কত সুন্দর দের দেহগঠন, কত বিচিত্র তাদের লক এবং কণ্ঠস্বর।

শিকারীরা একবার যার স্বাদ পেয়েছে তাদের নিধন করে চলেছে ৎ পেতে সদলবলে। ভোরবেলা য পাখীর কলকাকলীতে প্রভাত ধ্বনিত হয়, যে পাখীর কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে যায়, যে পাখীর ডাকে মনে আনন্দের সাড়া বয়ে যায়, সে পাখীকে আমরা ক'জন চিনি?---গ্রামে বাস করে শৈশবেলা থেকে যে পাখীদের সঙ্গে আমার সখ্য স্থাপন হয়েছে, যে পাখীরা আনন্দের দোলা দিয়েছে প্রকৃতির বুকে---এই প্রকৃতি এবং যাদের জন্য কবিতা, উপন্যাস, গল্প এসেছে আনন্দের নির্ঝর হিসাবে, সেই পাখীর কথা লিখতে পেরেছি---এই গর্ব আমার। প্রথমেই হামিং বার্ডের কথা লিখেছিলাম। আমার সংগ্রহের প্রণালীর তারতম্যের জন্যই যে এই পাখীর ঠোঁটেরগঠনে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, তা'র বহু প্রমাণ আছে। এই পাখীর ঠোঁট বাচ্চা অবস্থায় ত্রিকোণ ও ছোট থাকে। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যখন ফুলের ভেতর থেকে পোকা খেতে ও মধুপান করতে থাকে, তখন এদের চঞ্চুও শরীরানুপাতে বেশ দীর্ঘ এবং বাঁকা হয়। কোন কোন হামিং বার্ডের ঠোঁট তাদের শরীরের চেয়ে লম্বা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের মধুচোরা নামে যে পাখী আছে, তার কথা একবার আগেই উল্লেখ করেছি সামান্য একটু।

মধুচোরা পাখী

আমাদের দেশের পাখীদের ভেতর এরাই বোধ হয় আয়তনে সর্বাপেক্ষা ছোট। তাদের মত আরও দু'একটি পাখী আছে, যেমন---টুনটুনি। মধুচোরার শরীরের রঙ রেশমের মত চক্চকে। পিঠের সবুজ পালক সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লিচু, আম,

রমেশ মজুমদার

কল্কে, টগর বা জামরুল গাছে যখন ফুল ফোটে, ঠিক সকালে লক্ষ্য করা যায়, দলে দলে মধুচোরা পাখী ফুলের ভেতর থেকে চঞ্চু অনুপ্রবেশ ক'রে মধু খাচ্ছে মনের আনন্দে। এদের আবার কখনো গাছের গর্তে বা মাকড়সার জালের ভেতর থেকে কীট সংগ্রহ করতেও দেখা গেছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, হামিং বার্ডের মত শরীরের চেয়ে এদের ঠোঁট বেশী লম্বা এবং হামিং বার্ডের মত এদের ঠোঁটের অগ্রভাগ একটুবাঁকা। এদের খাবার সংগ্রহ একইরকমে হয়ে থাকে। এই পাখীর মধু খাবার নেশা অত্যন্ত প্রবল। যে ফুলের মধু থাকবে, সেখানেই সে নৃত্য করবে এবং মধু খাবে।

পায়রা

এবারে পায়রার কথায় আসা যাক। যাঁরা পায়রা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, পায়রার বাচ্চার চঞ্চু বড় হয়। পরিণত বয়স হ'লেই দেহের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য এসে যায়। পায়রাদের সাধারণত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ভাল পায়রাগুলোর পায়ের চারিপাশে ছোটছোট পশম বা পালক দেখা যায় অসংখ্য। তাতে ওদের সৌন্দর্য আরো বেশী লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য পক্ষীশাবকের মত এরাও হাঁ করে কোটরে বসে মায়ের ঠোঁট থেকে খাবার খেয়ে থাকে। পায়রাদের পুরুষ ও স্ত্রীর প্রীতি-প্রেম সহজেই চোখে পড়ে খোলা ছাদে অথবা কোন ভাল জায়গায়। এই প্রীতিতে পুরুষ প্রথমে সাড়া দিয়ে নাচিয়ে তোলে স্ত্রীকে এবং তা দীর্ঘসময় ধরে। স্ত্রী পায়রা সাড়া দেয় না। ফলে গলা ফুলিয়ে পুরুষ পায়রা নৃত্য করতে থাকে তাকে ঘিরে। অনেক সময় অভিবাহিত হওয়ার পর প্রেয়সীর স্বীকৃতি পায়। এক্ষেত্রে বাঘ-বাঘিনীর প্রীতির কথা বলা যেতে পারে। বাঘ প্রেম-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বাঘিনীর পিছু পিছু চলে। মাঝে মাঝে মৃদু থাবা দেয় এবং স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করে এবং বাঘিনীও রেগে থাবা দেয় কয়েকবার। সেই থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হয় বাঘের মুখ। রক্ত ঝরে, তবু সহজে রাজী নয় প্রেমে ক্ষান্ত হতে। প্রায় এক ঘণ্টা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শেষে বাঘিনী আত্মসমর্পণ করে। এরাও মানুষের সমগোত্র কিনা জানা নেই।
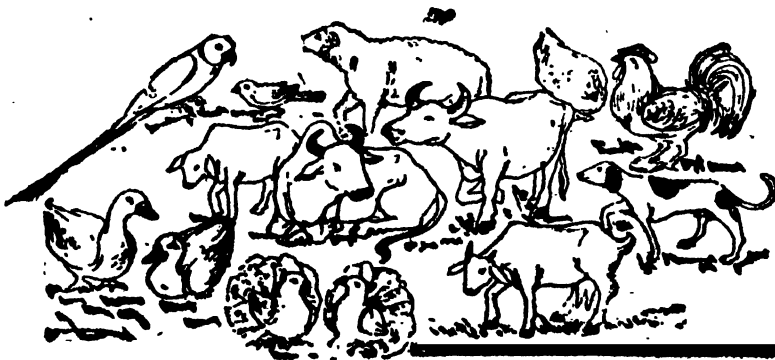
পশু—পক্ষী-পালন

হুইয়া পাখীর কথা

নিউজীল্যাণ্ডের পাখী হুইয়া। খাদ্য সংগ্রহের প্রণালী প্রভেদেই এক-জাতীয় পাখীর স্ত্রী ও পুরুষের ঠোঁট যে বিভিন্ন রকমের হতে পারে, তার একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাকের মত দেখতে এই পাখী নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপে দেখা যায়। পুরুষ হুইয়ার ঠোঁট সোজা এবং শক্ত। স্ত্রী হুইয়ার ঠোঁট শূকরের দাঁতের মত বাঁকা। ঠোঁটের গঠন বিষয়ে বৈষম্য থাকায় অনেকেই সহসা এদের স্ত্রী-পুরুষ চিনতে পারে না। পরে জানা গেছে, খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনেই তাদের এই বৈষম্য ঘটেছে। এটাও প্রাকৃতিক অবদান। এরা গাছের দীর্ঘ শাখার ভেতর থেকে পোকা ধরে খেয়ে থাকে। পুরুষ হুইয়া তার শক্ত এবং সোজা ঠোঁটের দ্বারা গাছের ডালের সকল জায়গা খুঁড়ে ফেলে। যারা পুরুষের সোজা ঠোঁট থেকে নিস্তার পায়, স্ত্রী হুইয়া তাদের ধরে ফেলে বাঁকা ঠোঁট দিয়ে।

হাঁস

আমাদের দেশের পোষা হাঁস সবাই দেখেছেন। এদের ঠোঁট বিশেষত্ব-বর্জিত নয়। এদের খাদ্য জলজ কীট এবং ছোট ছোট মাছ। তা ছাড়া এরা গুগলী, শামুক প্রভৃতি খায়। কাদার ভেতর ঠোঁট ঢুকিয়ে কীট, মাছ ও গুগ্‌লীও খেয়ে থাকে। এরা একে একে অনেকগুলি ডিম প্রসব করে। কোন কোন হাঁস আঠারোটি ডিম প্রসব করে একে একে। কোন কোনটি আবার চব্বিশটি পর্যন্ত। আকারে কারো ছোট, কারো ডিম বড় হয়ে থাকে। হাঁসের মাংস অনেকেই খেয়ে থাকে, কিন্তু খুব সুস্বাদু নয়। হাঁসের আকার বহু রকম হয়ে থাকে। পুরুষ হাঁসগুলি স্ত্রী হাঁস থেকে একটু সুশ্রী হয়ে থাকে।

কাঠঠোক্‌রা

কাঠঠোকরা অনেকেই দেখেছেন। যাঁরা গাঁয়ের ছেলে, তাঁদের চোখে অবশ্য পড়েছে এই পাখী। এই পাখীর প্রধান খাদ্য পিঁপড়ের বাসা খুঁজে বের করা। সন্ত্রস্ত কীটগুলো যখন ভীতভাবে ইতস্তত পালাতে যায়, তখন কাঠঠোকরা তাদের দীর্ঘ ঠোঁটের ভেতরের দীর্ঘ জিভ দ্বারা ধরে খায়। এ জিভে আঠার মতন একপ্রকার পদার্থ থাকে। এই জিভের সংস্পর্শে এলে আর পালাবার উপায় থাকে না কোন কীটের। এদের কাঠঠোকানোর শব্দ সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা গাছের গুঁড়িও গর্ত করে ফেলে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে।

মোরগ, কবুতর ও হাঁস

খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন পাখীদের ঠোঁট ও জিভের বিভিন্ন গঠন আছে, তেমন তাদের পাকযন্ত্র-গুলিও বিশেষত্বপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভোজ্য-দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে পাকস্থলী ও বিভিন্ন অন্ত্রের আকারে তারতম্য হলেও পাকযন্ত্রের গঠনে তাদৃশ বৈচিত্র্য দেখা যায় না। চড়ুই ও টিয়ার ঠোঁটের গঠনে যতই পার্থক্য থাক না কেন, পাকস্থলীর গঠন সর্ব্বপ্রকারে ভিন্ন নয়। কিন্তু চড়ুই ও বাজের পাকযন্ত্র এক নয়।

মোরগ, হাঁস ও কবুতর প্রভৃতির খাদ্য কিন্তু মুখ থেকে গলনালীর পথে একবারে পাকস্থলীতে পৌঁছায় না। এদের গলনালীর সাথে সংলগ্ন একটি থলে আছে। এখানে খাদ্যগুলি কিছু সময় থেকে লালার দ্বারা নরম হয়ে পরে পাকস্থলীতে যায়। এইসব পাখীর গলনালীর নিকটে খাদ্য-সঞ্চয়ের থলির সংস্থানের কারণও তাড়াতাড়ি ভোজনের প্রয়োজনেই মনে হয়। লক্ষ্য করে দেখা যায়, গৃহ-পালিত পায়রার দ্রুত ভোজন হেতু এই থলের ভেতর খাদ্য জমা হয়ে থাকে হাঁসগুলিরও এই এক অবস্থা হয়। গলায় হাত দিলেই তা বুঝতে পারা যায়। হাঁস বা মোরগের মাংস তৈরী করবার সময় লক্ষ্য করা যায় এইসব থলিরা খাদ্যপূর্ণ হয়ে আছে। পাকস্থলীতে যেতে পারে নি।

মাছরাঙা ও বক

চিল, বক, মাছরাঙা প্রভৃতি পাখীরা সকলেই মাছ খায়। মাছরাঙা লম্বা ঠোঁটে মাছটা ধরেই টপ্ করে গিলে খায়। তবে মাছের পিঠে কাঁটা থাকলে কিম্বা মাছ খুব বড় হলে গাছের ডালে তাকে আছড়ে মেরে ফেলে, পরে উদরস্থ করে। বকের খাওয়াও এইরকমে হয়ে থাকে। বক এবং মাছরাঙা সাধু সেজে চুপ করে বসে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য থাকে জলের দিকে। যেই মাছের দেখা পেয়েছে অমনি মুহূর্তে ছোঁ মাছ ধরেছে কি উদর-পূর্তি করেছে। কিন্তু এর বৈপরীত্য দেখা যায় চিলের বেলায়। চিলের ঠোঁটের মত পায়ের নখও বেশ শক্ত। তাই তারা মাছরাঙার মত ঠোঁট দিয়ে মাছ ধরে না। পা দিয়ে শক্ত করে ধরে। তারপরে উড়ে যায় গাছের ডালে এবং ডালে চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। যে মাছ একটি মাছ-রাঙা গিলে ফেলতে দেরী করে না, চিল সেই মাছটাও পায়ে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। আবার কীট-পতঙ্গ খেতে দোয়েল ও ফিঙের প্রণালীরও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

কাক জলা জমিতে শামুক পেলে গাছে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয় মাটিতে। ফলে শামুক ভেঙ্গে গেলে তার ভেতরের অংশ খেয়ে ফেলে। বিলাতের নাটহ্যাচ পাখী কঠিন ফল গাছের গর্তে ঢুকিয়ে ভেঙ্গে নিয়ে খেয়ে থাকে। মানুষের মত পরের সামগ্রী লুঠ করে খেতে পাখীরা বেশ ওস্তাদ। কাক এবং চিল তার দৃষ্টান্তস্বরূপ। একটি পাখী একটি খাদ্য সংগ্রহ করলে অপরজন প্রায়শই ছুটে গিয়ে তা গ্রাস করে থাকে।

মুরগী পালন

মুরগীর বাচ্চা পালনের জন্য খুব বেশী পরিশ্রম দরকার হয় না। এই ব্যবসায়ীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এর উৎপাদনে নয়, এর বিক্রয়ে। নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক বিক্রয় করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। কোন হোটেল বা রেস্টুরেন্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। মুরগীর বাচ্চা যাঁরা পালন করবেন, তাঁদের প্রতি সপ্তাহে চারটি দলে কিম্বা কম-সে কম দু'সপ্তাহ করে দু'টি দলে বাচ্চা পালন করতে হবে। চারটি দল করলে প্রত্যেকটি দলে এমন সংখ্যা রাখবেন—যা এক সপ্তাহের ভেতর বিক্রী করা যায়। দু'টি দলে পালন করলে দেখতে হবে যে, একটি দলের সংখ্যা দু'সপ্তাহের ভেতর সম্পূর্ণ বিক্রী হয়ে গেছে।

হোটেল বা রেস্টুরেন্টের কথা বলেছি আগেই। সেই বন্দোবস্ত করতে পারলে ভালই হয়। কিন্তু তা সকলের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। তা হলেই মুরগীর বাচ্চা পালনকারীর সঙ্কটজনক অবস্থা হতে পারে। বাজারে যাঁরা খুচরা বিক্রয় করেন, তাঁদের কাছে পাইকারী দরে বিক্রী করতে পারেন। যাঁরা জাহাজে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করে থাকেন, তাঁদের কাছেও বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু মুরগীর বাচ্চা বিক্রী করার ব্যাপারে ছোট ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করার কথা যেন চিন্তা করবেন না। ছোট ব্যবসায়ী, মানে যাঁরা উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে এনে বাজারের খুচরা বিক্রেতাদের কাছে দিয়ে থাকেন। মুরগীর বাচ্চা পালনে খুব বেশী লাভ থাকে না। দেখা যায়, ছোট ব্যবসায়ী বা খুচরা বিক্রেতা কেউই তাঁদের লাভের হারের অঙ্ক থেকে এক তিল পিছোতে পারে না। জিনিষের দাম সহসা পড়ে গেলে শতকরা লাভের হার কিছু কমিয়ে উৎপাদনকারীদের একটু সাহায্য করা বা জিনিষ বেশী বিক্রী হলে লাভের হার কিছু কমিয়ে খরিদ্দারদের কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া। এর কোনটাতেই তাঁরা আগ্রহী নন। সুতরাং যাঁরা বেশী পরিশ্রম করেন, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা এবং রোগ ইত্যাদিতে উৎপন্ন দ্রব্যের এককালীন বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে যাঁরা উৎপাদন করেন, সমস্ত ক্ষতি এবং অল্প লাভের ব্যাপারটা তাঁদের ঘাড়ে পড়ে। উপরোক্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে ব্যতিক্রম দেখা যায় না তা নয়। ছোট ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝে চাপ দিয়ে দাম কমিয়ে ডিম উৎপাদনকারীদের ক্ষতি করতে পারেন এমনি নানারকম সমস্যায় সম্মুখীন তাঁদের হতে হয়। সবচেয়ে বিপদ মুরগীর বাচ্চা পালনকারীদের। তার কারণ, সস্তায় দিয়েও বেশী মাল বিক্রী করা যায় না। উপরন্তু যত দিন যায় ততই মুরগীর বাচ্চার পেছনে খাবার খরচ বাবদ লোকসানের হার বাড়তে থাকে।

তাহলে কি মুরগী পালনে কারও যাওয়া উচিত নয়। ভুলে যাবেন না যে, ডিম বা মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনে যাঁরা ব্রতী, তাঁরা একপ্রকার সমাজসেবী। তাঁরা মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য উৎপাদন করে সমাজের সেবা করছেন। প্রতিদানে সমাজেরও দেখা উচিত, তাঁরা যাতে তাঁদের এবং তাঁদের পরিজনদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। তা আজও সম্ভব নয়, দেখা যাচ্ছে। তাই নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই মিটাতে হবে। সমাজকে মুরগীর মাংস যে শ্রেষ্ঠ মাংস তার ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে।

খুব কম লোকেই জানেন যে,

মধুমিতার ভাস্কর

দিলীপ দাশগুপ্ত
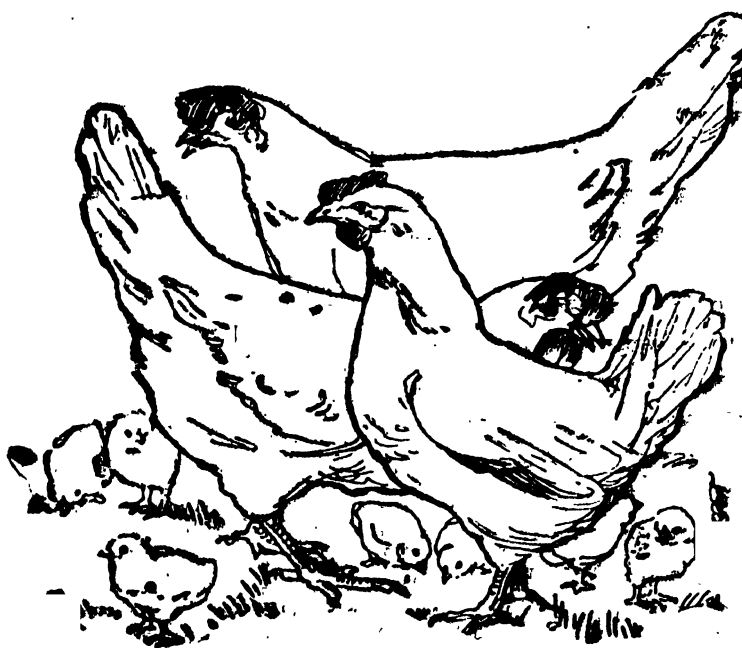
শুধু প্রেমিকই নয়। আশ্চর্য ভাস্করও আমি।
সামাজিক অনুশাসনের বাধার প্রকাণ্ড প্রাচীরকে ভেদ করে
আমার স্বচ্ছ দৃষ্টি ঠিক ওপাড়ের তোমাতেই।
কী ভয়, কী কান্নায়, কী ভয়ানক যন্ত্রণায়
চারপাশের সেই সব ধার-দেয়া ইস্পাত,
আর আগুন শুধুই আগুন,
তাইতো তুমি ধীরে ধীরে যাচ্ছো গলে।
আমি কিন্তু হাত দিয়ে তুলে ধরতে পারি
সেই গলানো-ছড়ানো মোমের তুমিকে।

আমি কিন্তু পারি সেই গড়িয়ে পড়া মোমকে তুলে
আবার অপরূপ সেই মূর্তি গড়তে।
ইচ্ছে করে—একবারটির জন্য শুধু ইচ্ছে করে
সব বাধা নিষেধের প্রাচীরটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে
ওপাড়ের সব স্বজন-আত্মীয়কে ঠেলে ফেলে
নতুন করে তোমাকে গড়ি।

ঈশ্বর জানেন। আর জানে তোমার-আমার হৃদয়
আমি কতো বড়ো ভাস্কর আর তুমি
কত মধুর মহাকাব্যের ভেঙে-পড়া মূর্তি!
মধুমিতার ভাস্কর অমর।

৬'৫০ টাকায় এক কিলোগ্রাম পাঁঠার মাংস। সেখানে ৭'৫০ টাকায় এক কিলোগ্রাম মুরগীর মাংস। পাঁঠার হাড় মোটা এবং ভারী। কিন্তু মুরগীর হাড় ফাঁকা নলের মত এবং হাল্কা।

প্রোটিন

৮ গ্রাম প্রোটিন থাকে ৬০ গ্রাম একটি ডিমে। ১৮০ গ্রাম দুধে থাকে ৫'৪ গ্রাম প্রোটিন। ৩০ গ্রাম ভেড়ার মাংসে ৫'৩ গ্রাম প্রোটিন এবং একটি রুইমাছে থাকে ৪'৯ গ্রাম। সেখানে মুরগীর মাংসে প্রোটিন থাকে ৬ গ্রাম। মুরগীর মাংসে ফ্যাট নেই বললেই চলে। মুরগীর ডিম বা মাংস সস্তায় প্রোটিন খাদ্য।

শ্বাস-প্রশ্বাস

একটি ঘোড়া চব্বিশ ঘণ্টায় ৩,৪০১ ঘটফুট বায়ু নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিয়ে থাকে। সেখানে একটি গরু নেয় ২৮০৪ ঘনফুট। মুরগী নিয়ে থাকে ৮২৭৮ ঘনফুট বায়ু। একজন মানুষের গায়ের উত্তাপ ৯৭'৪০ ডিগ্রী। মুরগীর গায়ের উত্তাপ ১০৬—১০৭ ডিগ্রী। মানুষের নাড়ীর গতি মিনিটে ৭৬, মুরগীর ১২০ থেকে ১৬০। একজন মানুষ মিনিটে ১৯ বার শ্বাস গ্রহণ করে। সেখানে মুরগী নেয় ২৫ থেকে ৪৮ বার।

ভোজ্য ডিম

একজন ভারতবাসী বছরে ৬টি ডিম খেয়ে থাকেন গড়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে হিসাব শেষে দেখা গেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বেড়ে দাঁড়ায় এগারোটা ডিম একজন ভারতবাসীর ভাগ্যে। ইউ-এস-এ, কানাডা বা বৃটেনের জনসাধারণের ভাগ্যে ৩৫০ থেকে ৪৫০টা ডিম জোটে।

পোলট্রির শত্রু

বাইরের কোন লোককে পোলট্রি ফার্মে ঢুকতে দেবেন না। যদি প্রবেশ করে ডেটল বা পটাশ দিয়ে ধুয়ে প্রবেশ করাবেন। বাইরের থেকে এসেই পোলট্রিতে ঢুকবেন না। হাট-বাজার থেকে কেনা মুরগী বা হাঁস ফার্মে রাখবেন না। পাখীদের খাবার জল পরিষ্কার রাখবেন। পানীয় জল ও খাবারের পাত্র দৈনিক পরিষ্কার রাখবেন। ভেজা লিটার ফেলে দেবেন। সুস্থ পাখীদের কাছ থেকে অসুস্থ পাখীদের সরিয়ে রাখুন। বাচ্চা ক্রয় করবার সময় অভিজ্ঞ ভেটেরনারি ডাক্তার বা ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়মিতভাবে নেবেন। ঠিক সময়মত রাণীক্ষেত ইনজেকশন ও বসন্তের টীকা হাঁস-মুরগীদের দিন। প্রতি মাসে অন্তত একবার মুরগীদের ওয়ার্মিং করাবেন। রুগ্ন মুরগী-হাঁস বা ডিম দেয় না এরূপ মুরগীদের বা হাঁসদের বিক্রী করে দিন। মুরগী-হাঁস বাছাই ফার্মের একটা বিশেষ কাজ। এতে খাদ্যের অপচয় হবে না।

—অভিজিৎ

[ছোট গল্প]

কেন্দ্রবিন্দু

সন্মিত্র ঘোষ

জয়তী কল্পনাও করতে পারে নি যে এমন পাড়াগাঁয়ে এত ভীড় হতে পারে। কতদিন পরে শ্রীশার সঙ্গে দেখা হল। পাখি বড় রোগা হয়ে গেছে। সুলি আরও উগ্র হয়ে উঠেছে। ওকে বছর পাঁচ আগে সে দেখেছিল। ওর ছোট জামা, অন্তত এই পাড়াগাঁয়ে কেমন কেমন লাগছিল। শ্রীশাও কম যায় না।

হাঁ, অনক এসেছে। অনক আগেও লিখেছিল আসানসোল থেকে ও এখানে আসবেই। আসব না আসব না করেও না এসে পারেনি জয়তী। ওর, বড়দি'র ছেলে অনক। অনক যখনই কোলকাতায় আসে তখনই একবার জয়তীদের বাড়ীতে আসবেই।

পাখি বড় মনমরা হয়ে বসে আছে। অথচ বছর দুই আগেও কিই না ছেলেমানুষ ছিল। পাখির মত লাফালাফি করত বলে ওর মাসী নাম লিখেছিল পাখি। অথচ এখন পাখিকে দেখে কে বলবে, এই পাখি হল সেই---সেই পাখি।

নিরুপমদার বিয়ে হল বলেই না অনেকদিন পরে সবাই এক হতে পেরেছে। নিরুপমদা এক অদ্ভুত লোক। অত শিক্ষিত, তবু দেশের বাড়ী ছাড়বে না কিছুতেই। এইজন্য কারুর কারুর কাছে নিরুপমদা যেমন গোঁয়ার গোবিন্দ লোক, তেমনই কারুর কারুর কাছে নিরুপমদা আদর্শবাদী লোক এবং তাঁরা নিরুপমকে খুব ভালবাসেন।

নিরুপমদার নতুন বৌ ফুলঢাকা চেয়ারে বসে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা উপহার দিয়ে যাচ্ছেন, আর সমস্ত হিসেব লেখার ভার পড়েছে জয়তীর ওপর। জ্যাঠাইমা জয়তীকে খুব ভালবাসেন। সমস্ত ভারী কাজের দায়িত্ব যেন জয়তীর ওপর। ওর ওপর তাঁর বিশ্বাস অনেক।

লোকজনের শেষ নেই। এই পাড়াগাঁয়েও সব এসে ভীড় করেছে। ভীড় কমল রাত দশটার পর। যারা বিদায় নেবার তারা চলে গেছে। বাড়ীর লোকেদের খাওয়া একে একে হয়ে গেছে। নববধূ চেয়ারে বসে রজনীগন্ধার ডাঁটি দিয়ে নিজের মুখটাকে আপ্রাণ ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে গান শুরু করলে সকলের অনুরোধে। এই যুগে দু' একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত না গাইলে যেন মান থাকে না কোন। জয়তী গান জানে না। কিন্তু মুখে মুখে বেশ তুলতে পারে। লতার কিংবা সন্ধ্যার যখন গান হয়, তখন বেশ অনুকরণ করতে পারে। স্বপ্ন মুখার্জীর স্প্যানিয়াল কুকুরের গানটা কি চমৎকার নাই তুলেছে। এমন কি যদি কেউ এখন অনুরোধ করে তো জয়তী বসে যেতে পারে। কোথায় লাগে ঐ কাঁদুনে সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত। জয়তী নববধূকে জিজ্ঞাসা করলে, আধুনিক গান জানেন না আপনি?

নববধূ ঘাড় নেড়ে জানায়, না, সে জানে না।'

ওর ইচ্ছে হল স্প্যানিয়াল কুকুরের গানটা কিংবা পুরী ভ্রমণের গানটা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু হঠাৎ ডাক পড়ল ওর। রামা ডাকতে এল। পাখিদির বার্তা নিয়ে রাকা হাজির।

[illegible]সময়। তবু যায়। ঐতো গাইছিলি--- [illegible]ম মোর এসেছিল নীরবে----

তা সত্যি - জয়তী বললে, প্রেম যে কি করে আগে, কি নীরবেই না আসে তা ভাবা যায় না। আমি আমার কয় বন্ধু দিয়ে দেখলুম তা। আমি তাই একা একা গাই ঐ গানটা ----

সোলি ওর মাথাটা জয়তীর বুকের ওপর রাখে। আস্তে আস্তে বলতে লাগল, জানিস তো বাবার একমাত্র সন্তান আমি। আমার কিসের অভাব বল। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। এমন কি বারো বছর থেকে উপলব্ধি করতুম একজন পুরুষ প্রয়োজন আর পেয়েও গিয়েছিলুম একটি ছেলেকে। ধনেশদা। পয়সাওয়ালার ছেলে। বাবা তাই মিশতে দিতে আপত্তি করেন নি। ধনেশদা সুপুরুষ। ধনেশদার সব ছিল তবুও যেন কি ছিল না। কেমন যেন হাবলা হাবলা মনে হত। কিংবা মাকাল ফল টাইপের মনে হত। ধনেশদা যখন আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে, তখন আমি মুক্তির স্বপ্ন দেখছি। বিশ্বাস কর। ধনেশদা আমায় সিনেমা দেখায়, থিয়েটার দেখায়; আমি যাই, ও সবসময় নিজের কথা বলে, ও কবে দিল্লী যাবে, কবে বম্বে যাবে. সেসব কথা শোনায়, আমার ভাল লাগে না। সন্ধ্যের আধা-অন্ধকার আর গাঢ় নির্জনে পার্কের ঘাসে বসিয়ে ধনেশদা যখন আমার ঠোঁট দুটো ওর নিজের ঠোঁট দিয়ে চেপে [illegible], তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর মত, যার মুখে সন্দেশও তখন অরুচি। ধনেশদা[illegible]ক [illegible] ফেললুম, ন্যাকামি ছাড়ো। বাড়ী চল, সন্ধ্যে হল, আবার আমার পড়া আচে। এমনি করেই অনার্স দেবো। বড় বেরসিকের মত বলে ফেললুম। ধনেশদা আমায় ছেড়ে দিলে। ওর মুখ পানসে হয়ে গেল। আমি দাঁড়ালুম। ও একটা ট্যাক্সি ডাকলে। এমনি জীবনে অনেককে আঘাত দিয়েছি। পারি নি একজনকে। আমারই সঙ্গে পড়ত। হৃষীকেশকে। সোলি উঠে পড়ে। বেলফুলের মালাটা। খোঁপা থেকে খসে খসে পড়ছে। মালাটা টান মেরে খুলে পাশের জঙ্গলে ফেলে দেয়। ও আবার শুয়ে পড়ল। আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে ওর কত কথাই মনে পড়ে। ওর ক্ষুদ্র জীবনেও যে সব কাহিনী ঘটে গেছে তা খুঁজে আনতে বেগ পেতে হয়। সোলি তবু হৃষীকেশের কথা বলবে। হৃষীকেশ সাহাকে ভালবাসি যে।

হৃষীকেশ সাহা --- জয়তী আর পাখি বলে উঠল।

হ্যাঁ জাতের কথা প্লিজ জিজ্ঞেস করিস নে। আর কিসের কথাই বা জিজ্ঞেস করবি। দেখতে উড়ো কাক। কলেজের ছেলেরা বলত, হৃষীকেশ সাহা। এ কি রূপ - সাহা। আশ্চর্য হৃষীকেশ কিছুই গ্রাহ্য করে না। ও লেখাপড়া করতে এসেছে, সেই লেখা-পড়াই হল ওর সাধনা। হৃষীকেশ সাহার কাছে পড়া বুঝতে যেতুম। লাইব্রেরীতে ও আমায় বোঝাত। কি সুন্দর না বোঝাত। ধনেশদা আমায় শুধু বোঝাত উত্তম-সুচিত্রা কিরকম খায়, কোথায় যায়, রাজকাপুর-নার্গিস কেন আর দুজনে একসঙ্গে নামবে না ফিল্মে, প্রাণের চোখটা দেখবার মত, সোফিয়া লরেনের চেহারা বটে। কোথায় বৈজয়ন্তীমালা থাকে। তবে ব্রিজিত বার্দোর ছবি বার বার দেখার মত। আর হৃষীকেশের মুখে অন্য কথা। ও অন্য জগতের বাসিন্দা। ওর সঙ্গে কদিন মিশে দেখলুম, পড়াটা আর কঠিন লাগচে না। আরও দেখলুম আমি না গেলে হৃষীকেশ যেন উতলা হয়ে পড়ে। পরেরদিন জিজ্ঞেস করে কি হল, কাল যে দেখা পেলুম না। এমনই সহজ প্রশ্ন, আর আমিও ওকে নানাভাবে জব্দ করার চেষ্টা করতুম। দেখতুম হৃষীকেশের পড়াশুনার ব্যাঘাত কেউ ঘটাতে পারে নি, কেবল আমি ছাড়া। এরপর মাঝে মাঝে সিনেমায় গিয়েচি আমরা। দুজনেই মনে মনে অনেক কথা বলতে চেয়েচি, কিন্তু পারি নি। তারপর আমি ফেটে পড়েছিলুম। বলেই সোলি জয়তীকে জড়িয়ে ধরলে। জয়তী বিরক্ত হল। বললে, আমর, আমাকে জড়িয়ে কি আনন্দ পাবি, আমি কি হৃষীকেশ নাকি?

সোলির চোখে জল। হৃষীকেশের সঙ্গে বিয়ে হবার উপায় নেই। ও বিয়ে করবে না।

কেন? পাখি লাফিয়ে ওঠে।

হৃষীকেশ বলে, আগে দাঁড়াই তারপর বিয়ে। আমি বারবার বলেছিলুম, তুমি যা চাকরী করচো তা কর। তারপর আমি তো আচি। আমার নিজের পয়সা তো আচে। ও বলে, পরের পয়সা নিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে মৃত্যু ভাল। আদর্শের দিক দিয়ে ও একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ। আর আমি এও জানি, ও কোনদিন দাঁড়াবে না। ওর ওপর ওর একগাদা ভাইবোন মানুষ হবার ভার। অথচ সবাইকে মানুষ করিয়ে তারপর দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমি অক্কা পেয়ে যাবো। তা মেখে মেচে দিন তো আমার বেশ কাটল।

তা হৃষীকেশকে ভালবাসতে গেলি কেন? তোর রুচিও বটে। একটা গরীবের ছেলেকে অতখানি আস্কারা দেওয়া খুবই খারাপ জয়তী বললে।

এরজন্যে দায়ী ধনেশদা। পয়সা আমাদের আরাম দেয় বটে, কিন্তু ধনেশদার মত লালটু ছেলেরা মদ আর মেয়ে ছাড়া কিছু বোঝে না এটা আমি ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করলুম। মেয়ে ওদের কাছে সৌখিন বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। এটাই আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য লাগে। আর ওর ন্যাকা ন্যাকা কথা আমার কাছে ভয়ানক অসহ্য।

আসলে ধনেশদা দায়ী নয়, দায়ী তোর বাবা। অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়ার ফল সব সময়ে ভাল হয় না। জয়তী বললে। আমি দেখেচি, যেসব মেয়েরা অতিরিক্ত স্বাধীনতা পেয়েচে কুমারী জীবনে, তারা প্রায় সকলেই ঠিকমত নতুন পরিবেশের সঙ্গে অ্যাডজ্যাস্ট করতে পাচ্চে না। ছেলেদের রূপ বিয়ের আগে এক, বিয়ের পরে আলাদা। বিয়ের আগে যেন কতই না

[১০২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সমাজ ব্যবস্থা ও শাস্ত্রকার

ডঃ বাণী চক্রবর্তী

বাংলাদেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাস্ত্রকার আবির্ভূত হয়েছেন। এই শাস্ত্রকারগণ তাঁদের গ্রন্থ রচনায় স্বকীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও সমাজব্যবস্থার দায়িত্ব স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণের ওপরই ন্যস্ত হয়েছিল। এই স্মৃতিকারগণ দেশের তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে শাস্ত্র আলোচনা করেছেন। অবশ্য সকলেই যে এ বিষয়ে সফলতা লাভ করেছেন তা' নয়, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে।

বঙ্গীয় স্মৃতি-নিবন্ধকারগণের সময়ে দেশের ধর্মীয় আন্দোলন ও একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ, দেশের শান্তি ও শৃংখলা একেবারে বিনষ্ট করেছিল। খৃস্টিয় একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা দেখি পাল সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের পর মুসলমানদের আক্রমণে ও অত্যাচারে বঙ্গদেশ তথা হিন্দুধর্ম শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল। অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তখন আবার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-কৃত তান্ত্রিক-ধর্মের প্রবর্তনেও দেশে নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়েছিল। তন্ত্রের সত্যধর্ম ত্যাগ ক'রে লোকে মৎস্য, মদ্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা--এই পঞ্চ 'ম'-কারের বশবর্তী হয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল। জনগণের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণগণ খাদ্যাখাদ্য বিচার না করে মদ্যপান করতে আরম্ভ করেছিল। সমাজ ও ধর্মের এই প্রকার শোচনীয় পরিণতিতেও ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ সেদিকে না তাকিয়ে 'পাত্রাধার তৈল' কিংবা 'তৈলাধার পাত্র'---এইরূপ কূট তর্কে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অতএব, তখন সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল এমন একজন শাস্ত্রকারের, যাঁর সমাজব্যবস্থা জনগণকে এই অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্গগৌরব স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন। সেই সময়েই বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবোক্ত প্রেমধর্মের প্লাবনে বঙ্গদেশকে প্রভাবিত করেছিলেন। পূর্বোক্ত তন্ত্র ও মুসলিম-ধর্মের প্রভাবে বিপর্যস্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রক্ষা করার ভারও রঘুনন্দনের ওপর আরোপিত হয়েছিল।

রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের মধ্যে ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহন সমাজে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যেমন আমরা দেখি ভবদেব নির্দেশিত রীতি অনুসারে এখনও সামবেদী গণের দশ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই বৃটিশযুগে হিন্দু ল'-এর অনেকখানি অংশ প্রণীত হয়েছে এবং বাংলাদেশে এই মত এখনও প্রচলিত আছে। পরবর্তীকালে বল্লাল সেন সমাজের শৃংখলারক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান হয়েছিলেন। বল্লাল সেনই সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করে জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করে গিয়েছিলেন। পরবর্তী নিবন্ধকার হলায়ুধ বেদ-অধ্যয়ন ও বেদের সম্যক্ অর্থবোধ করে বেদরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁর এ প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নি। কারণ, পরবর্তী যুগে বেদপাঠ অনেক কমে গিয়েছিল।

বৈদেশিক অত্যাচারে বিধ্বস্ত সমাজে কোন্‌টি ব্রাহ্মণ্য আচার ও কোন্‌টি বিরুদ্ধ আচার--তা' নির্ণয় করতেও জনগণ অপারগ হয়েছিল। অতএব, এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য আচারকে জনসমাজে প্রকাশিত করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন শূলপাণি, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন। এই নিবন্ধকারগণ গ্রন্থরচনায় নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ অপেক্ষা সমাজরক্ষার প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন। শূলপাণি স্পষ্টত গ্রন্থরচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করেছেন যে, শাস্ত্রজগতে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হওয়ায় প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল, তা' নিরসনের জন্যই তিনি তাঁর নিবন্ধগুলি রচনা করেছেন।

তারপর আবির্ভূত হন স্মার্ত রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথাচার্য চূড়ামণি। শ্রীনাথের স্বকীয় উক্তিতেই পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রজগতের সন্দেহ, জড়তা ইত্যাদি নিরসনকল্পে এবং শিষ্যকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করে তুলতেই তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীনাথের এ প্রচেষ্টা বিফল হয় নি। তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে স্বীয় অতুলনীয় প্রতিভার গুণে রঘুনন্দন শাস্ত্রজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছেন এবং সমাজের সকল সংস্কার সাধন করেছেন। তাঁর সমাজব্যবস্থার মধ্যে উদারতার সঙ্গে কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মহান্ ধর্মরক্ষকের নামে যদি কেউ সংকীর্ণ মনোভাবের দোষ দিয়ে থাকেন, তা সম্পূর্ণ অদূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে। কারণ, তখনকার সামাজিক অবস্থায় রঘুনন্দ নর মতই একজন উদার অথচ কঠোর সমাজ ব্যবস্থাপকের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

যেমন আমরা দেখি, রঘুনন্দনের পূর্বে সমাজে সেদ্ধ চাল ও মশুর ডাল খাওয়া বিগর্হিত বলে গণ্য হত। কিন্তু রঘুনন্দন দেশে এগুলোর প্রভূত প্রচলন দেখে এগুলো খাওয়া যে শাস্ত্রসম্মত তা' প্রমাণ করেছেন। এছাড়া তিনি বঙ্গদেশে প্রচুর মৎস্যের উৎপত্তি ও ব্যবহার দেখে নির্দেশ দিয়েছেন যে, হবিষ্যান্ন ব্যতীত অন্যত্র সর্ব প্রকার মৎস্য ভক্ষণেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে।

তা ছাড়া তখন মুসলমানরা জোর করে বহু স্ত্রীলোককে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল এবং কয়েকদিন পর সেই স্ত্রীলোকদের পাওয়া গেলেও হিন্দু সমাজ তাদের গ্রহণ করে নি,

রবীন্দ্রনাথের

✻ শিক্ষাচিন্তা

বিশ্ববিখ্যাত কবি হিসাবে যাঁকে আমরা জানি, অনেক গান লিখেছেন, গল্প, নাটক, উপন্যাস লিখেছেন, এই পরিচয়েই যাঁকে আমরা বেশি করেই চিনি; তাঁকে আমরা কল্পনারাজ্যের গুণীজন বলেই স্বীকার করে থাকি। কবিতা, গান, গল্প, নাটক—এ সবই কল্পনার সৃষ্টি। এগুলি বাস্তবের ছায়া। কবি- মানুষ যাঁরা, তাঁদের আমরা এই কারণেই বিশেষ চোখে দেখে থাকি। তাঁদের ভাবুক প্রকৃতিকে আমরা যেন সমীহ করে চলি। বাস্তব জগতের সমস্যার পথে তাঁদের চলাফেরা আমরা সাধারণত সতর্ক দৃষ্টিতেই লক্ষ্য করি। ভাবুক-কবিকে বাস্তব জগতের বাইরের মানুষ বলেই গণ্য করতে আমরা অভ্যস্ত।

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেষ্টা করলে বোধ হয় ঠিক হবে না। কারণ, ভাবজগতের গভীরতম রাজ্যে তিনি বিচরণ করেছিলেন, একথা সত্যি, তবু দেখেছি, বাস্তব জগতের সমাজ-সমস্যা নিয়ে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ কতো যুক্তি-সংগত, কতো সারগর্ভ হতো। এদেশের শিক্ষাদীক্ষা, সমাজব্যবস্থা নিয়ে যেসব কথা তিনি বলেছিলেন, লিখেছিলেন, সেগুলির মধ্যে কবিসুলভ আকাশকুসুম কল্পনা নেই, আছে সুস্পষ্ট শাস্ত্রসম্মত পথনির্দেশ এবং বাস্তবসম্মত পরামর্শ।

ডঃ অসীম বর্ধন

কবি রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম এক হয়ে গেছে। সেখানে শিক্ষাচর্চা সম্পর্কে তিনি যেসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন, সেগুলি স্মরণ করলেই

[illegible] পুরুষ [illegible], [illegible] হলেও তিনি এ [illegible] [illegible] সুস্পষ্ট বাস্তবধর্মী মানুষ ছিলেন।

আজ আমাদের দেশে শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হয়েছে তাই এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তাকে যদি আমরা স্মরণ করি, কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করি, তাহলে বোধ হয় তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

শিক্ষা-ব্যবস্থা যাতে ভাল হয়, তার জন্য দেশের গভর্নমেণ্টের দায়িত্বটাই বেশি--এই ধারণাই সাধারণ মানুষের। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই রকমের ধারণা সম্পর্কে ৬০ বছর আগে বলেছিলেন, 'গবর্নমেণ্টের সম্মতির অধীনে যখন আমরা একটা কিছু লাভ করি, তখনই আমাদের বিপদ সবচেয়ে বেশি।' তিনি বলতেন, 'দেশের লোককে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করবার সদুপায় যদি নিজেরা উদ্ভাবন এবং তার উদ্যোগ না করি, তবে আমরা সব দিক দিয়ে নষ্ট হবো -- অন্নে মরবো, স্বাস্থ্যে মরবো, বুদ্ধিতে মরবো, চরিত্রে মরবো---এটা নিশ্চিত।

এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে টলস্টয়ের মতো মনীষীর কথাও তুলেছেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে। টলস্টয় সেই সময়কার রাশিয়ার শিক্ষানীতি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, 'মর্ম হলো এই যে, শিক্ষা ব্যাপারে যা সবার পক্ষে দরকার, তার জন্যে গবর্নমেণ্টের আদেশ, অনুমতি, নির্দেশের

বরং সেই সমস্ত স্ত্রীলোক পতিত বলে গণ্য হত। এই অবস্থায় একমাত্র রঘুনন্দনই সেই স্ত্রীলোকদের উদ্ধার করে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দু সমাজে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবার তিনি সমাজে তন্ত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার দেখে তন্ত্রকে ধর্মের প্রমাণরূপে স্বীকার করে নিয়ে তান্ত্রিকী দীক্ষাকে ব্রাহ্মণবর্গে গ্রহণ করেছেন।

স্মার্ত রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে আরও দেখিয়েছেন যে, পূর্বে সমাজে যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তা' অনুসৃত না হলেও দোষ হয় না। তাঁর শাস্ত্রালোচনায় সহমরণ অপেক্ষা বিধবাদের ব্রহ্মচর্যই মুখ্যকল্পরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তবে ব্রহ্মচর্য অনুমোদন করলেও সমাজে যাতে কোন ব্যভিচার প্রকাশ না পায়, তার জন্য তিনি বিধবা-দের আহার-বিহার, চলা-ফেরা, বসন-ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কঠোরতা প্রবর্তন করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, তখনকার সমাজে যবনদের অনাচারে ও দেশের অন্যান্য ধর্মীয় প্রভাবে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল, তাতে আবার তাঁরই অনুমোদিত সহমরণ-প্রথা বন্ধ করার বিধবাদের সম্পর্কে নতুন বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তা' প্রতিরোধ করতেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রঘুনন্দন এই কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতএব, দেখা যায়, উদার অথচ কঠোর নীতি অবলম্বন করে ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন সমাজ সংস্কারকরূপে খ্যাত হয়েছেন।

বর্তমানে বিংশ শতাব্দীতেও ধর্মের নানা বিশৃঙ্খলায় সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য রঘুনন্দনের মতই একজন উদার অথচ কঠোর ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যাশায় না-থেকে নীরবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে যার যা করণীয়, করে যাওয়াই যে ভালো, সেকথা ভাববার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের এই মতবাদ সমর্থন করে লিখেছিলেন, তিনি যেন অরণ্যে রোদন করেই মরেছেন। প্রকৃত-পক্ষে, রবীন্দ্রনাথেরও অরণ্যে রোদন হয়েছে, কারণ ৬০ বছরেরও বেশি হলো তিনি শিক্ষা-ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হতে বারণ করেছিলেন, কেউ সেকথা কানেও নেয় নি।

ফল যা হবার, তাই হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই আজ আমাদের সবদিক দিয়ে মরতে হচ্ছে। শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কি চায়, তা ভালভাবে বোধ হয় জানে না এবং জানলেও ঠিকভাবে চাইতে জানে না। যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়া হয়—সে-ও বছর ষাটেক আগের কথা—তখন রবীন্দ্রনাথ ওভারটুন হলে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মধ্যে দিয়ে কি ধরনের শিক্ষা আমরা চাই, সেটা আগে ভাবতে বসতে হবে। কেমন শিক্ষাদীক্ষা চাই, সেই সিদ্ধান্ত করা সহজ কথা নয়।

তিনি বলেছিলেন, জাতীয় শিক্ষার নামে বিলিতী ধাঁচের স্কুলের অবিকল নকল করলে আমাদের বোঝা বাড়বে। এই নকলের মধ্যে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেই রুটিন, সেই বড় বড় দালানবাড়ী-সব ঠিক হয়তো মিলে যায়, কিন্তু সেই আয়োজনটাই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, এই সতর্কবাণী রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগেই উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষাতেই বলে-ছিলেন, ঐ ধরনের স্কুল হবে শিক্ষা দেবার একটা কলমাত্র। মাস্টার ঐ কল-কারখানার একটা অংশ হয়ে থাকবেন। ঘণ্টা বাজিয়ে কারখানা খোলে। কল চলতে সুরু করে, মাস্টারেরও মুখ চলতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন;. ছাত্রেরা দু-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা নিয়ে বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময়ে ঐ বিদ্যার যাচাই হয়ে তার ওপরে মার্কা পড়ে যায়। ঐ কলে ফরমাশমতো ঠিক মাপে বিদ্যা তৈরী হয়, এইটাই সুবিধা। কিন্তু মানুষ তো সব এক মাপের, এক ধরনের নয়। সুতরাং ঐ কলে-ছাঁটা বিদ্যা কোনো কাজের বিদ্যা হয় না।

রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী সত্যি হয়েছে কিনা, তা বুঝতে পারা যায় বর্তমান শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার দিকে চোখ ফেরালে কবির কল্পনা মনে করে সেদিন তাঁর কথায় কেউই আমল দেয় নি, আজও আমল দিতে পারছে না মোহগ্রস্ত মন নিয়ে। চোখের সামনে আমরা সকলেই দেখছি শিক্ষার আয়োজন-আড়ম্বরটাই বড় হয়ে উঠেছে, আরও দিন দিন আড়ম্বর বাড়ছে, পাশ-করা বিদ্যে নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ স্কুল-কলেজের কারখানা থেকে বেরুচ্ছে, কিন্তু তার ক'টাদিন পরেই হা-হুতাশ করতে হচ্ছে—ও বিদ্যে কাজের নয়, ও দিয়ে বাঁচা যাচ্ছে না, আসল জিনিষটাই বোধ হয় শেখা হয় নি। সেই আসল জিনিষটা কি?

রবীন্দ্রনাথ সেই আসল জিনিসটাকে বলতেন, কালের উপযোগী শিক্ষা। তিনি মনে করতেন, দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত স্কুলে যা মুখস্থ করানো হয়, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তার মিল দেখতে পাওয়া যায় না।

সুতরাং আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন ঠিকমতো বুঝে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে পাঠ্য বিষয়ে সজীবতা আসে, যাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়ে তোলার দুটো কাজই হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউঈ প্র্যাগম্যাটিক অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক বা প্রয়োগমূলক শিক্ষা-নীতির যে চিন্তাধারা প্রবর্তন করে-ছিলেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির আশ্চর্য মিল আছে।

মূল কথা, মানুষের দেহ-মন-প্রকৃতি, সমাজ না পেলে সুস্থ-সজীব হবে বিকাশলাভ করতে পারবে, শিক্ষার মাধ্যমে ঠিক সেই জিনিসই দিতে হবে—একথা রবীন্দ্রনাথ বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এর জন্য চাই মানুষ। কোনো শিক্ষা-কলের দ্বারা এমন মানুষ গড়া যায় বলে মনে হয় না। মানুষের কাছ থেকেই মানুষ শেখে, শিখা থেকেই শিখা জ্বলে ওঠে। স্কুল-কলেজে কলের মতো বিদ্যাচর্চা হতে থাকলে মাস্টার মশাইরা রুটিনের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেলে, মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক হারিয়ে যায়, শিক্ষাও ঠিক হয় না।

এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাধারাকে কোনো বাঁধা ছকের মধ্যে ফেলতে চাইতেন না। নদী এগিয়ে চলার সময়ে বলে না, 'আমার দু'ধারে দু'টি পাড় তুলে পথ বেঁধে দাও, তার মাঝখান দিয়ে আমি যাবো'। নদী নিজের পথ নিজেই করে নেয় বলেই কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে। তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাও ছিল শিক্ষা বিষয়ে ঐ ধরনের -- তিনি মানুষের শিক্ষাকে স্বচ্ছন্দ-সহজ গতিতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এগুতে দিতে চাইতেন।

তার মানে এই নয় যে, কেবল বস্তুগত প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অর্থকরী বিদ্যাকে প্রাধান্য দিতে হবে। মনের শিক্ষা, আত্মার শিক্ষাও দরকার, মানুষের ধর্ম সম্পর্কেও শিক্ষাচর্চার দরকার। কেবল কয়েক পাতা ইংরেজী শিখে, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং ডিগ্রী ধারণ করলেই মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন না। তিনি চাইতেন, আধুনিক ধারায় মানুষ যা কিছুই শিখতে চায় শিখুক, কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির মিলন ঘটানোর শিক্ষাটাও আয়ত্ত করতে হবে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে প্রশান্তি, যে মহত্ত্ব, উদারতা, সংযম এবং সনাতন ধর্মগুলি যুগ যুগ ধরে কোন্ এক রহস্যের ভিত্তিতে অক্ষয় হয়ে ফুটে রয়েছে, সেগুলিকে দেখতে

হবে, বুঝতে হবে, মনের মধ্যে তার স্বরূপটুকু ধরে নিতে হবে।

দুঃখের বিষয়, স্কুলের কল-কারখানায় এই ধরনের শিক্ষা হয় না বললেই চলে। সেখানে মানুষকে কেবল পুঁথির দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে, চারি পাশের সমাজের দিকে তাকিয়ে তার মধ্যে থেকে শিক্ষালাভের জন্যে স্কুল-কলেজের প্রচেষ্টা খুবই কম।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা অনুসরণ করেই এক্ষেত্রে আমাদের ভাবা দরকার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির এই যে অসম্পূর্ণতা, এর প্রতিকারের জন্যে যুগ যুগ ধরে নির্বোধের মতো সাধারণ মানুষ কেবল গবর্ণমেণ্ট আর স্কুল-কলেজের আশ্বাসের ভরসায় না থেকে নিজেদেরই কিছু করতে নামা উচিত। প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সম্পর্ক গভীর করে তোলার মতো মন গড়ে দেওয়ার ভার গবর্ণমেণ্ট আর স্কুল-কলেজের ওপর ছেড়ে রেখে লাভবান হওয়া যায় না। একথা কতদিন আগেই তো রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন। আজও যদি সেকথা কাজে লাগাবার জন্যে সাধারণ মানুষ উদ্যোগী না হতে পারেন, তাহলে কোনো গবর্ণমেণ্ট, কোনো স্কুল-কলেজ সমাজকে বাঁচাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

এই উদ্যোগ জিনিসটারই অভাব হয়েছে আমাদের, সেদিকে রবীন্দ্রনাথের নজর ঠিকই পড়েছিল। তিনি বহুবার এ বিষয়ে এদেশের মানুষকে সজাগ হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্রেও সত্যিকারের উদ্যোগের অভাব দেখে তিনি বলেছিলেন, 'জীবনের ক্ষেত্রকে বড় করে দেখতে পাই না বলেই জীবনকে বড় করে তোলা এবং বড় করে উৎসর্গ করবার কথা আমাদের স্বভাবত মনেই আসে না। পাখির ছানা তো বি-এ পাশ করে উড়তে শেখে না, উড়তে পায় বলেই উড়তে শেখে।' খুবই সত্যি কথা যে, মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে যাবার সুযোগ-সুবিধা না দিলে সঙ্কীর্ণ পরিবেশে আবদ্ধ করে রাখলে তার নিজের ওপর ভরসা কমে যায়, নিজের শক্তি সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলে। অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং সামান্য সফলতা লাভ করেই মনে করে, অনেক কিছু করা হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন, 'মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল। সেইখানেই তার বিদ্যা, তার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে।' ময়রার দোকানে খাবারটাই তৈরী হয়, হজম করবার শক্তিটা তো সেখানে তৈরী হয় না। কি পেয়েছি, সেটা মানুষের পক্ষে তত বড় কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবো, কাজে লাগাবো, সেটাই বেশি বড়। যা শিখেছি, যা পড়ছি, যা জানছি, তাকে যাচাই করে দেখতে হবে, কাজে লাগে কিনা --তবেই সেটা প্রকৃত শিক্ষা। এই যাচাই করার জন্যে চাই উদ্যম। কেবল অন্ধ বিশ্বাসে বিদ্যার ছাপ নিয়ে আনন্দে মশগুল হয়ে থাকলেই ঠকতে হবে। এই কথা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে অনেকবার অনেক বক্তৃতায় প্রবন্ধে বলেছেন, দুঃখ করেছেন উদ্যোগ-উদ্যমের অভাব দেখে। প্রতিকার হলো না আজও।

তখন সকলে আফশোস করতো, আমরা বিদেশীর পরাধীন, তাই উদ্যম হারিয়েছি। আজ বিদেশীর পরাধীন নই, আজ উদ্যমহীন সাধারণ মানুষ অন্য দোহাই দেয়--দারিদ্র্যের কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করে বলতে হয়, 'নিজের অবস্থাকে, নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল গণ্য করবার মতো দীনতা আর কিছু নেই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে জাগিয়ে তুলতে পারলে এমন কোনো অবস্থাই নেই, যার মধ্যে থেকে সে বেড়ে উঠতে পারে না। এমন কি, দারিদ্র্যই তাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন, 'কাঁঠাল গাছকে দ্রুতবেগে বাড়িয়ে তোলবার জন্যে চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরে বেঁধে রাখা হয়। চারাটি বাধা পেয়ে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে বলেই স্থির হয়ে আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে বেড়ে' ওঠে।'

আমাকে উঠতেই হবে, আমাকে বাড়াতেই হবে আলো যদি পাশে না পাই, তবে তাকে ওপরে খুঁজে নিতে হবে---এই মনোভাব সবার মনে জাগিয়ে তোলার জন্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথাই অনেকভাবে বলে গিয়েছেন। কারণ, এই ধরনের উদ্যোগী মনোভাবই সমাজকে, সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঙ্কট থেকে মুক্তি দিতে পারবে। এই উদ্যোগের অভাব হয়েছে বলেই গবর্ণমেণ্ট বা স্কুল-কলেজ কিছুই করতে পারছে না, উদ্যোগ চাই সর্বজনের মধ্যে।

মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুবই উৎসাহী ছিলেন, একথা আমরা জানি। তিনি বলতেন, মানুষ জানতে চায়, সেটা তার ধর্ম, এইজন্যেই জগতের আবশ্যক-অনাবশ্যক সব কিছুই তার কাছে বিদ্যা হয়ে উঠেছে। সেই তার জানতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জুগিয়ে দুর্বল করে রাখা হয়, তাহলে মানব-প্রকৃতিই দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাই বলে শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-পুরুষ কোন ভেদ থাকবে না, একথা বললে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। মেয়েদের মেয়ে হতে শেখার জন্যে কতকগুলি ব্যবহারিক শিক্ষার বিশেষত্ব আছে, সেকথা মানতে দোষ নেই। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে অনেকে বলেন, মেয়েদের ব্যবহারিক ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। পুরুষরা আপন কর্মের পথ ধরে জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করেছে, কিন্তু মেয়েদের অধিকাংশ বিষয়ে দায়ে পড়ে পুরুষদের অনুগত হয়ে থাকতে হয়েছে, এই ধরনের ক্ষোভ যাঁরা পোষণ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই অপবাদ (বাধ্যতামূলক আনুগত্যের অপবাদ) ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন, এটা সম্পূর্ণ

ভুবন-ভবন

গৃহিণী ঘরের জানলা দিয়ে সামনের বাড়িটা দেখিয়ে বললেন, বাড়ি, ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে হলে লোক রাখা ছাড়া উপায় নেই। ঐ দেখো, ওদের বাড়ির ঐ ছেলেটা রোজ দরজা-জানলা পরিষ্কার করে। তা ছাড়া আরো একটি লোক আছে বাজার-হাট করবার জন্যে। তা ছাড়া ঠিকে ঝি আছে, রাঁধুনী আছে।

অথচ জানি, ও বাড়িতে লোক আছে মাত্র দু'জন। স্বামী আর স্ত্রী। মিস্টার ও মিসেস চ্যাটার্জী। বাংলা দেশের বাইরে কী একটা বড় কাজ

কুমারেশ ঘোষ

করতেন মিষ্টার বি চ্যাটার্জী, এবং বা ভুবন চ্যাটার্জী এবং রিটায়ার্ড করে সম্প্রতি বাড়ি করেছেন তিনি এখানে। সি-আই-টি'র নতুন পল্লী গড়ে উঠেছে, মিস্টার চ্যাটার্জী জমি কিনে রেখেছিলেন আগেই।

---কিন্তু অত লোকের খবর জানলে কী করে?---একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করলাম গৃহিণীকে।

তিনি সংক্ষেপে বললেন শুধু: জানতে হয়।

এবং চলে গেলেন নিজের কাজে।

কিন্তু আমার ভাবনার শেষ হলো না। এঁরা এত সব জানেন কী করে? যে কাজ গোয়েন্দার বা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের---সে কাজ এঁরা ঘরে বসে পান কী করে?

তা ছাড়া, গৃহিনী হঠাৎ এভাবে আমাকে ডেকে এনে অন্যের বাড়ির দরজা-জানলা পরিষ্কার করাটা দেখাবারই বা কী এমন দরকার ছিল? হয়তো একটি মাত্র ঠিকে ঝি নিয়ে তিনি বাচ্চা-কাচ্চা সহ পাঁচজনের সংসার একাই ম্যানেজ করছেন---সেই কথাটাই প্রকা- রান্তরে বুঝিয়ে দিলেন পাঁচজনের সংসারে তিনি যে দশভূজা, সেই সার্টি- ফিকেটটাই তিনি আদায় করে নিলেন জোর করেই।

মিথ্যা। আসল কথা এই যে, দাসী হওয়া মেয়েদের স্বভাব নয়--স্ত্রী হওয়া, মা হওয়াই মেয়েদের স্বভাব।' রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে, তা না হলে সন্তান মানুষ হতো না, সংসার টিঁকতো না। স্নেহ আছে বলেই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে অনুগত হয়ে থাকার দায় নেই। ভালবাসা আছে বলেই স্ত্রী পুরুষের সেবা করে, তার মধ্যেও দাসীত্বের দায় নেই। কিন্তু ভালোবাসা, স্নেহ না থাকলেই স্বাভাবিক সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যায়।'

সমাজ মেনে নিয়েছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই রবীন্দ্র- নাথ বিশ্বাস করতেন, সমাজে যদি এমন অবস্থা কখনো ঘটে, যাতে ভালোবাসার আদর্শ থেকে মানুষ ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেটা মেয়েদের পক্ষেই বেশি অবমাননাকর। মেয়েদের ব্যবহারিক ক্ষেত্র ভালোবাসা স্নেহের ক্ষেত্র। সেখানে দাসীত্বের গ্লানি ভুল শিক্ষার ফলেই আসছে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নয় বরং বেশি। পুরুষরা সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করেছে, যার মধ্যে প্রীতি নেই, সৌন্দর্য নেই। পুরুষের শক্তির ওপরেই সমাজ ঝোঁক বেশি দিয়েছে বলে পুরুষের দাসত্বের দায় বারো আনা। মেয়েদের ভালোবাসার ওপরেই সমাজ ঝোঁক দিয়েছে বলে, মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। এই কারণে শিক্ষা প্রণালীও এমন হওয়া দরকার, যাতে পুরুষ পুরুষই থাকবে, মেয়েরা মেয়েই থেকে যাবে--রবীন্দ্রনাথ এই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সত্যিই তো, 'ভুবন-ভবন'-এ দু'জন লোকের জন্যে চারজন লোক, আর আমাদের বাড়িতে পাঁচজনের জন্যে (অবশ্য আমরা কর্তা-গিন্নী দু'জন সাবালক-সাবালিকা এবং আর কাচ্চা-বাচ্চা তিনজন নাবালক-নাবালিকা হওয়ায় দেড়জন ধরা যেতে পারে —ঠিক কথায় সাড়ে তিনজনের জন্যে মাত্র একটি ঝিয়ের আংশিক সাহায্য। ঠিকে ঝিয়ের ঠেলামারা কাজ।

হ্যাঁ, আমাদের ঠিকে ঝিটার কথা মনে হতেই এতক্ষণে রহস্য ভেদ করা গেল। আমাদের বাড়ির ঠিকে ঝি ঐ ভুবন-ভবনেও কাজ করে। এবং তারই মারফৎ গৃহিণী ওঁদের বাড়ির মাথাগুন্তি লোকের হিসেব পেয়েছেন। তা ছাড়া ওঁরা কী খান, কখন খান, কলতলায় ক'খানা বাসন পড়ে, অথবা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন ঝগড়া করেন---সব কিছুই হয়তো গৃহিণী জানেন ঐ ঠিকে ঝির তৎপরতায়। এই ঠিকে ঝিরাই সঠিক রিপোর্টার বা গোয়েন্দা।

এই শ্রীযুত ভুবন চ্যাটার্জীর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়ে গেল তাঁর বাড়ির সামনেই। তাঁর সঙ্গে এমন দেখা-সাক্ষাৎ আগেও হয়েচে। তিনি হেসেছেন, আমিও। নমস্কার জানিয়েছেন তিনিও, আমিও।

কিন্তু সেদিন শুধু দেখা নয়, আমন্ত্রণও জানালেন, বললেন, আসুন না, একটু গল্প করি। সময় আছে আপনার?

আজকের দিনে গল্প করবার জন্যে সময় তো হাতড়ে পাওয়া যায় না সহজে, তবু ভদ্রতার খাতিরেই বললাম, চলুন।

উপরে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চমৎকার সাজানো ঘর। দামী সোফা-সেট, নানারকমের পুতুল, একটি বুককেসে নতুন অনেক বই সাজানো। অবশ্য বেশির ভাগই ইংরেজী। ঘরের কোণে ফুলদানীতে টাটকা ফুল।

শুধু ড্রইংরুমটা কেন, সারা বাড়িটাই ঝকঝকে, তকতকে। মেঝে মোজাইক করা। দেওয়ালে নানা রঙের ডিসটেম্পার। সিড়িগুলো পিছল-পালিশ।

বুঝলাম, বাড়ি একটা করলেই হয় না, তার তাল সামলানো সহজ নয়।

ভদ্রলোক ভেতরে গেলেন, হয় তো চায়ের কথা বলতে। আর ততক্ষণে আমি চোখভরে সব দেখতে লাগলাম। প্রত্যেকটি জিনিষ কত সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত পরিপাটি করে ভাঁজ করা। সোফার কভার, টি-পয়ের কভার—কোথাও একটু কুঁচকে নেই---সব টানটান করা। জিনিস-পত্রে কোথাও একটু ধুলো নেই, দরজা-জানলার পর্দাগুলোও বে-আবরু নয়। দেখলেও চোখ জুড়োয়।

আর আমাদের বাড়ি? সব তছনছ। দু'টি পকেট সংস্করণ গুণ্ডা ও একটি গুণ্ডি সারাক্ষণ বাড়িটাকে লণ্ডভণ্ড করছে, আর তাদের মা সারাক্ষণ লাঠি হাতে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

মিস্টার চ্যাটার্জী ঘরে ঢুকে একটি সোফায় এসে বসলেন। ভদ্রলোকের চেহারায় একটি আভিজাত্যের ছাপ। পরনে ইস্ত্রিকরা পায়জামা, পাঞ্জাবি। পায়ে পুরীর হরিণ-চামড়ার স্লিপার। সোফায় বসলেন এবং মনে হলো, ঐ সোফা ছাড়া অন্য কোথাও বসলে বোধ হয় মানাতো না।

ভদ্রলোক বললেন, আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম, আপনি নাকি লেখক।

বটেই তো। কিন্তু এ রিপোর্ট পেলেন কী ক'রে ভদ্রমহিলা? বোধ হয় ঐ ঠিকে ঝি। সে আমার বই পড়েনি বটে, তবে আমাকে লিখতে দেখেছে এবং সে লেখা যে কোর্টের এফিডেভিট বা কোন মামলার দরখাস্ত নয়—সে খবরও জেনেছে কোন রকমে।

সলজ্জ হাসি হেসে বললাম, এই একটু-আধটু, মানে সাহিত্য চর্চা।

মিস্টার চ্যাটার্জী হেসে বললেন, বিনয় করছেন আপনি। আপনার অনেক বই আমার স্ত্রী পড়েছেন এবং এখন মনে হচ্ছে, রেডিয়োতে আপনার 'টক'-ও শুনেছি। উনি তো আপনার লেখার একজন রীতিমত ভক্ত পাঠিকা।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা বা মিসেস চ্যাটার্জী ঢুকলেন, নমস্কার জানালেন এবং বসলেন আর একটি সোফায়। তার পেছনে ট্রেতে কফি, কাজুবাদাম আর কেক নিয়ে একটি ছোকরা।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, খান। আপনার সঙ্গে অনেকদিন থেকেই আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। জানেন, যাঁর লেখা বই পড়া যায়, তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, না দেখাই ভাল। তাতে হতাশ হতে হয়।---ঘুরিয়ে দিলাম প্রসঙ্গ : আপনার বুঝি বই পড়ায় খুব ঝোঁক?

হ্যাঁ।---ভদ্রমহিলা বললেন, কী করবো? সময় কাটে না। তাই বই মুখে দিয়ে পড়ে থাকি। পাটনার বেঙ্গলী ক্লাবের লাইব্রেরির সব বই পড়ে ফেলেছি।

মিস্টার চ্যাটার্জী বললেন, অবশ্য আমি কাজ নিয়ে থাকতাম। ছিলাম বিহার গভর্নমেন্টের কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীর ডেভেলপমেন্ট অফিসার। ট্যুরে যেতে হতো মাঝে মাঝে। আর বাড়িতে এসে

ফুলদানীর জীবন আজ সার্থক হলো

আলোটা জ্বালিয়ে রাখ

জয়তী রায়

আলোটা জ্বালিয়ে রাখ ঃ
জীবনের অনেক বছর আমরা একান্তে বসে
অনেক নদীর ঢেউ গুণেছি দু'জনে।
সোনালী ধানের শীষ একই সাথে
অনেক স্বপ্নের সাধ জাগিয়েছে মনে,
পাতা-ঝরা বনে আবার বাসন্তী ফুল।
আমি ঠিক জানি ঃ
দু'জনে এতটা পথ হেঁটেছি যখন,
অরণ্যে আলোর খুশি খেলা ক'রে গেছে সারাক্ষণ।

ঝুমকোলতার সুরে আকাশের অনাবিল নীল
আমাদের পথের শরিক।
এসব জেনেও তুমি খুব জোরে ছুটে গিয়ে
মুঠো ভরে কী তুলবে এখন?
সব কিছু জানা হ'য়ে গেলে
নিজেকে কোথাও আর সহজে মেলে না!

খবরের কাগজ মুখে দিয়েই থাকতাম, আর কখনো বা রেডিও।

ভদ্রমহিলা বললেন, এখানেও সময় কাটতে চায় না। লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়ি বটে, তবু যেন সময় আর শেষ হয় না। একেবারে বেকার।

---সত্যিকারের বেকার কিন্তু আমিই।---মিস্টার চ্যাটার্জী বললেন। রিটায়ার্ড জীবন যে এমন ভয়াবহ, আগে বুঝতে পারিনি। লোকজনের সঙ্গে মেশবার অভ্যেস নেই---তাই আমরা যেন একঘরে হয়ে গেছি। আমাদের অবস্থা হয়েচে কী জানেন?---কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে।

বলে নিজেই হো-হো করে হেসে উঠলেন নিজের রসিকতায়। মিসেস চ্যাটার্জী সলজ্জ হাসি হাসলেন। আমি বললাম, বেশ বলেছেন।

কিন্তু ভদ্রলোক যেন নিজেই অবাক হলেন:

কিন্তু এমন চমৎকার কথাটা বললাম কী করে বলুন তো? বোধ-হয় সাহিত্যিকের হাওয়া লেগে---

এমন সময় সিঁড়িতে দুমদুম করে আওয়াজ আর কলরব।

ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন। এবাড়িতে তো এমন আওয়াজ হবার কথা নয়। বাড়ির দেওয়ালগুলোও বোধহয় চমকে উঠলো। ব্যথা পেলো বোধ-হয় সিঁড়িগুলোও।

অবাক হলাম আমিও।

এ কলরব তো আমার অজানা নয়। গলার আওয়াজ যেন চেনা-চেনা। হ্যাঁ, বড় ছেলে ঝণ্টু ছোট নিণ্টু ঝড়ের মত করে এসে ঢুকলো:

---বাবা, বাবা, তোমার সেই পাবলিশার ভদ্রলোক এসেছেন। বলেই ঝণ্টু ধপ করে সোফায় এসে বসলো: কী সুন্দর সোফা---না বাবা?

সে কথার উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, চল্ যাচ্চি।

মিণ্টু এগিয়ে গেল একটা পুতুলের কাছে। দেখিয়ে বললো, এটা কী পুতুল বাবা?

ভদ্রমহিলা জিগ্যেস করলেন, এরা আপনার ছেলে-মেয়ে বুঝি? দেখেছি ওদের। বাড়ি সরগরম করে রাখে।

হেসে বললাম, এত সরগরম করে রাখে যে, বাড়িতে কাক-চিল পড়তে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে শব্দ।

চিনেমাটির দামী ফুলদানীটা মেঝের পড়ে ভেঙে চুরমার। ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো। জলে ভিজে গেল মোটা কার্পেট।

মিণ্টু ফুল শুঁকতে গিয়ে ঠেলে দিয়েচে ফুলদানীর উঁচু টুলটা।

এগিয়ে গিয়ে তার কোঁকড়ানো চুলের মুঠি ধরলাম, মুখপুড়ি কী করলি?

এবং একখানা চড় তুলেছিলাম, কিন্তু ভদ্রমহিলা থামিয়ে দিলেন, আহা-হা মারবেন না। ওরা ছেলে-মানুষ, ওরা কি বুঝে করেছে? তারপর মিসেস চ্যাটার্জী গম্ভীর হয়ে বললেন---এই যে দেখচেন বাড়িতে সব কিছুই শিশুস্পর্শ বঞ্চিত। শিশু-স্পর্শে ফুলদানীটার জীবন সার্থক হলো। আর মিষ্টার চ্যাটার্জী ম্লান হেসে বললেন, আর জিনিসপত্র না ভাঙলে দেশের ইনডাস্ট্রি বাড়বে কী করে?

আমি এর কী উত্তর দেবো?

অপরাধীর মত দু'জনের হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম, আচ্ছা আসি, নমস্কার।

জীবন-কাহিনী

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

সমীরণ চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এখানে তাঁর ছিল ছোট্ট একখানি বসবার ঘর। লেখার প্যাড থাকত চেয়ার-এর সামনে টেবিলের ওপর— এতে তিনি নির্দেশাদি লিপিবদ্ধ করতেন দর্শনার্থীদের নামও। কখনও কখনও ক্যালেণ্ডারের-এর ওপরও নোট করতেন প্রয়োজনীয় টুকিটাকি। দু' পাশে ঘূর্ণায়মান বই রাখার তাক—লেনিন ঠাট্টা ক'রে বলতেন 'নাগর-দোলা'। বইয়ের তাকের পাশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকত পত্র-পত্রিকার স্তূপ দেওয়াল ভর্তি ছিল বই রাখার তাক —অন্তত ২,০০০ বই ছিল সেই সব তাকে। অন্য একটা ঘরে তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে ১০,০০০-এরও বেশি বই ছিল। তার মধ্যে হাজারেরও বেশি ইংরেজি, ফরাসী, জার্মানী, ইত্যাদি বিদেশী ভাষার বই। রেমার্ক্স এংগেলস প্লেখানভ্, বেবেল, লাফার্গ, মেহরিং, রোজা লুক্সেমবার্গ, হেগেল, ফ্যুয়েরবাখ্, সাঁ-সিমন্ প্রমুখ লেখকের বই ছিল তাঁর সংগ্রহে, ইতিহাস, রাজনৈতিক, অর্থনীতি, এঞ্জিনীয়ারিং, বিজ্ঞান, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য বই থাকত সেখানে। রম্য রচনা ছিল নানা ভাষার।

পড়ার ঘরে ছিল মার্ক্স্-এর একখানি ছবি এবং অনেক মানচিত্র। আর ছিল টবে একটা পামগাছ—লেনিন খুব পছন্দ করতেন এটি, স্বহস্তে পরিচর্যা করতেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ঘরের দরজা বা জানলায় কোনও পর্দা লাগান হয়নি—তিনি পর্দা ব্যবহার বা খড়খড়ি নামানো পছন্দ করতেন না। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর পাঠগৃহ অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল।

এই ঘরের একটা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যেত; সেখান থেকে একটা সুইচ বোর্ড-এর সাহায্যে পেত্রোগ্রাদ্ এবং অন্যান্য শহরের সঙ্গে, সৈন্যদলের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে, সেণ্ট্রাল কমিটি-র সভ্যবৃন্দ ও পিপলস কমিসার্স-দের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যেত।

আবাসিক ফ্ল্যাট-এ তিনি সহধর্মিণী ক্রুপসকায়া এবং ভগ্নী মারিয়া উলিয়ানোভাকে নিয়ে থাকেন। চারখানি ঘর ছিল ফ্ল্যাট-এ। তাঁর নিজের ঘরে লোহার খাটিয়ার বিছানার ওপর বিছানো থাকত তাঁর মায়ের হাতে তৈরি একখানি পশমের চাদর,—শেষ দেখা হওয়ার সময় ১৯১০ খৃস্টাব্দে সুইডেন্-এ তাঁর মা তাঁকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। লেনিন-এর বড় আদরের বস্তু ছিল মায়ের স্বহস্তে বোনা এই শেষ উপহার।

১৯১৮ খৃস্টাব্দ জুড়ে তাঁর পড়ার ঘর এবং বাসগৃহ-সংলগ্ন বারান্দা ভর্তি থাকত টেলিগ্রাফ-কর্মীতে; তাঁরা দিন-রাত তারবার্তা পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে ব্যস্ত থাকতেন। বছরের শেষ দিকে এ সব অন্যত্র সরিয়ে তাঁর ফ্ল্যাট-এ সামরিক অফিসার পাহারায় বসান হল। এঁদের সঙ্গে লেনিন-এর অত্যন্ত দ্যহৃতা জন্মেছিল।

১৯২৩ খৃস্টাব্দে অসুস্থতার জন্য লেনিনকে গোর্কী সহরে গিয়ে বাস করতে হলেও তাঁর ক্রেমলিনস্থিত বাসগৃহ এবং পাঠাগার আজও সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। এখনও হাজার দেশী-বিদেশী অনুরাগী সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে আসেন।

দেশের সর্বত্র এবং সর্ববিষয়ে তাঁর ছিল কল্যাণদৃষ্টি। মস্কো সহরের উন্নয়নে তাঁর দান অসীম। প্রথম দিকে বাসগৃহের খুবই অভাব—লেনিন বাড়ি বিলি করার ভার দিলেন শ্রমিক-সংস্থার ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে সহর পুনর্গঠনের পরিকল্পনাও চলতে লাগল। কোন্ দিকে সহর বাড়বে, কোথায় কোথায় এবং কতগুলো বৃক্ষ রোপণ করা হবে; ভূগর্ভস্থ রেল, পরিবহন ব্যবস্থা, পৌর পরিকল্পনা, ইত্যাদির কীহবে, সব দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

প্রাচীন কীর্তি সযত্নে রক্ষা করার জন্য তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল।

লেনিনকে মস্কো পার্টির সভ্য এবং মস্কো সোভিয়েট-এর সভ্য করে নেওয়া হল। রাষ্ট্র পরিচালনায় দিনরাত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও লেনিন এইসব সভার সময়ে যোগ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন।

লেনিন-এর নির্দেশে মস্কোর সেণ্ট্রাল কমিটির সভ্যদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে একটা রীতি গড়ে উঠেছিল —তাঁরা প্রতি শুক্রবার জনসভায় ভাষণ দিতেন এবং সাধারণভাবে আলোচনায় ব্যাপকভাবে যোগদান করতেন। অবশ্য লেনিন এ ছাড়াও প্রত্যহ —এমন কি দিনে ২/৩ বারও —শ্রমিক-কর্মীদের সাধারণ সভা এবং আলোচনা সভায় যোগ দিতেন। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন তাঁর বক্তৃতা শুনত, তাঁকে দেখত, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করত, এবং নতুন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে যেত, প্ল্যাটফর্ম-এর ওপর থেকে না বললে তিনি

সাধারণত নেমে আসতেন শ্রোতাদের কাছাকাছি; তাদের অন্তরের রাজা তিনি—কেমন ক'রে দূর থেকে বাণী দান করবেন? সহজ, সরল ভাষায় রুশী গ্রাম্য উপকথা এবং প্রবচন ব্যবহার ক'রে কথা বলতেন তিনি—তাঁর বক্তৃতা ছিল অনেকটা সরস আলোচনার মত, শ্রোতারা তা গ্রহণ করত অন্তর দিয়ে। তিনি বলতেন, শ্রোতাদের কথা মনে রেখে তবেই বক্তৃতা করা উচিত।

প্রত্যেকটি শ্রোতা যেন অনুভব করত, লেনিন তার কথাই ভাবছেন এবং তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। এখানেই তাঁর অনন্যসুলভ কৃতিত্ব —তাঁর শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ তাঁকে করেছিল 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক।'

অনলস কর্মযজ্ঞের মধ্যে তাঁর একমাত্র বিলাস ছিল স্ত্রী ও ভগ্নীকে সঙ্গে নিয়ে মস্কোর আশপাশে গাড়ি করে বেড়ানো। ক্রুপস্কায়া লিখেছেন

> '---সময় সময়, যখন আমরা কোনও গ্রামের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতাম, তখন হয়ত একদল ফুলের মতন চাষীদের ছেলে এসে গাড়ি চড়তে চাইত। ভ্লাদিমির শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন, এবং যেই তারা আসত, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিল-কে (লেনিন-এর গাড়িচালক) তাদের তুলে নিতে বলতেন। গাড়ি ভরে উঠত কলকোলাহলে। দু'-এক মাইল গিয়ে তাদের নামিয়ে দিলে তারা আনন্দ-কোলাহলে দিক মুখরিত ক'রে দৌড়ে ফিরে যেত।---'

মস্কোভা নদীর তীরে বারভিকার কাছাকাছি একটি জায়গা ছিল লেনিন-এর বড় প্রিয় বেড়ানোর জায়গা।

যুদ্ধের পেছুটান না থাকায়, নতুন সোভিয়েট সরকার গঠনমূলক কাজে পুরো মনোযোগ দিতে পারল। লেনিন-এর দূরদর্শিতা এবং বাস্তববুদ্ধি সদ্য-ভূমিষ্ঠ রুশ-গণতন্ত্রকে এই সুযোগ এনে দিয়েছিল।

পরিকল্পনার দিকে লেনিন বরাবরই জোর দিতেন। এবার তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯১৮-র মার্চ মাসের শেষার্ধে নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকে মূর্ত করার কাজে হাত দিয়ে এপ্রিল মাসে প্রকাশ করলেন 'সোভিয়েট সরকারের আশু কর্তব্য' নামক প্রবন্ধ। মার্ক্সবাদের পীযূষধারাপুষ্ট এই কর্মসূচীর প্রথমেই ছিল---দেশকে একটি সৎ ও স্থায়ী প্রশাসন-ব্যবস্থা উপহার দেওয়ার প্রাথমিক কর্তব্য এবং দায়িত্বের কথা। তিনি উপলব্ধি করেন, সুস্থ ও সবল প্রশাসনিক যন্ত্র না থাকলে কোন কাজই ঠিকমত করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, তিনি দেখালেন নতুন সরকারের প্রধান অসুবিধা অর্থনৈতিক সাফল্য করায়ত্ত করা। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এবং প্রোলেতারিয়েৎ-এর পরিকল্পনায় সব দিকে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক রূপ এমন হওয়া চাই যে, বুর্জোয়ারা আবার ফিরতে চাইলেও যেন না পারে। সমাজতন্ত্রবাদের পূর্ণ বিজয়ের মাপকাঠি এই।

লেনিন-এর মতে, সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীই সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা। নান্যঃ পন্থাঃ। উৎপাদন বাড়াতে হবে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ওপরও তিনি জোর দিলেন, আর জোর দিলেন হিসাব-পদ্ধতির আধুনিকীকরণের ওপর।

মোটের ওপর, তাঁর মতে, সব দিকে ধনতন্ত্রবাদের থেকে সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার কাজে লেগে পড়তে হবে সবাইকে, যার ফলে কোন রন্ধ্রপথেই বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার শনি সমাজদেহে প্রবেশ করবার সুযোগ না পায়।

সমস্ত খুঁটিনাটির ওপর তাঁর নজর ছিল। উৎপাদন বাড়াবার জন্য তিনি শিক্ষাবিস্তারের ওপর জোর দিলেন; ভারী শিল্পোৎপাদনের সহায়তার জন্য জ্বালানী এবং লোহা উৎপাদন বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা ঘোষণা করলেন। উৎপাদন এবং বণ্টনের ব্যাপারে শ্রমিক-স্বার্থ জড়িত থাকার গুরুত্ব তিনিই দেখিয়ে দেন। লভ্যাংশের ওপর যথোপযুক্ত বোনাস্ শ্রমিকদের দেওয়ার ব্যবস্থাও তাঁরই নির্দেশে ঘোষিত হল।

যারা সমাজকে কিছু দিতে পরাঙমুখ, অথচ নিতে তৎপর, তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রাখার প্রয়ো-

মার্কিন অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টেনসেনসহ মস্কোতে লেনিন (২৮শে নভেম্বর, ১৯২১)

জনীয়তাও ঘোষিত হল। তিনি বললেন :

'টাকার সুষ্ঠু হিসেব রাখ, খরচ কমাও, অলস হয়ো না, চুরি করো না, নিয়মানুবর্তিতা কঠোরভাবে পালন কর।'---

বুর্জোয়ারা প্রচার করছিল, সমাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনও প্রতিযোগিতা থাকে না। এই মিথ্যার তীব্র প্রতিবাদ ক'রে লেনিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, বাস্তবিক প্রতিযোগিতা থাকে সমাজতন্ত্রবাদে---ধনতন্ত্রবাদে নয়। শোষণ ও নিপীড়ন দূর ক'রে জনসাধারণের অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তির উৎস খুলে দিয়ে গোটা সমাজকে আনন্দের ফুলে এবং সমৃদ্ধির ফলে সুশোভিত করতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদ; অন্য কোনও সামাজিক ব্যবস্থা গণদেবতাকে এমনভাবে শৃংখলমুক্ত করতে সক্ষম নয়। বিগত শোষণভিত্তিক সমাজের অন্নদাস সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সগর্বে তার বন্ধন-মুক্তির কথা জানায় এবং তার নিজস্ব উৎপাদন-যন্ত্রকে যথাসাধ্য উন্নত করার মহান কার্যে নিজেকে উৎসর্গ করে নিজেরাই স্বার্থে।

'সর্বকার্যেষু মাধব'---বল্‌শেভিক্ শাস্ত্রে 'মাধব' হচ্ছেন জনগণেশ। লেনিন উৎপাদনক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা প্রবর্তন ক'রে প্রত্যেকটি ছোটখাটো বিষয়ও সর্বদা জনসাধারণের কাছে খুলে ধরার নীতি গ্রহণ করলেন। কোথায় কত উৎপাদন হচ্ছে, কে করছে, কী উপায়ে---এর সবকিছু দেশবাসী জানুক এবং সমষ্টিগত বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে নিক্। তাঁর নীতি এই। আজীবন তিনি এই নীতি অনুসরণ ক'রে গেছেন।

পরিচালনা এবং পরিকল্পনা কেন্দ্রীভূত করার পক্ষপাতী ছিলেন লেনিন। অবশ্য স্থানীয় পরিচালকদের পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজনের প্রতিও তাঁর কড়া নজর ছিল। এই মতবাদ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গঠিত হল অনেক 'ইকনমিক কাউন্‌সিল্'। নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ ক'রে, তার কাছ থেকে কাজ বুঝে নেবেন কেন্দ্রীয় পরিচালকবৃন্দ এবং সেই ব্যক্তি কাজের ব্যাপারে শ্রমিক-কর্মীদের মতামতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেবে---এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী লেনিন। বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন, তবে তাদের আসতে হবে জনগণের ভেতর থেকে, বিশেষ কোনও শ্রেণী থেকে নয়। অবশ্য, পুরনো বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদেরও কাজে লাগাতে হবে।

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের পুরোপুরি কাজে লাগাবার কথা তিনি বারবার বলেছেন,---সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ইত্যাদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে প্রোলেতারিয়েত্ সমাজের ইচ্ছুক প্রেয়সীতে পরিণত করার মহান কাজে এদের যুগসঞ্চিত জ্ঞানসম্পদকে কাজে লাগানো চাই। বুর্জোয়া সমাজের এন্‌জিনীয়ার্, কারিগর, কৃষিবিদ্, শিক্ষক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের আলোচনার মাধ্যমে নতুন বল্‌শেভিক মতবাদে শিক্ষিত ক'রে তাদের নবীন সমাজ গঠনের কাজে লাগাতে হবেই। এ কাজে বলপ্রয়োগ অবিধেয়, বোঝাপড়ার ভেতর দিয়েই তাদের নতুন আলো দিতে হবে; কেন না, তাদের আয়াসলব্ধ বিদ্যা নিষ্ফল হলে ক্ষতি সমাজের।

লেনিন দেখালেন সেকালে রাশিয়ায় পাঁচরকমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত :---(১) পিতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রাচীন চাষ ব্যবস্থা; (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প; (৩) ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপাদন ও ব্যবসা; (৪) তথাকথিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা; (৫) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে কারখানা, ভূমি, ব্যাঙ্ক ও রেলপথগুলো---এগুলো সোভিয়েট সরকারের পূর্ণ আয়ত্তাধীন। এইসব নানারকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে-ক্রমে এক সমাজতান্ত্রিক পরিচালনাধীনে আনার পবিত্র কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানালেন তিনি।

সে-সময় রাশিয়ায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রাধান্য ছিল, প্রধানত পাতি-বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণে। কিছুটা আপোষে এবং প্রয়োজনবোধে কিছুটা বাধ্যবাধকতার দ্বারা এই সব ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ শিল্পে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর লেনিন জোর দিলেন। এমন কি, শ্রমিকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দাম দিয়ে বুর্জোয়া শিল্প কিনে নেওয়ার সম্ভাবনাও তিনি উড়িয়ে দেন নি।

সোভিয়েট রাশিয়ায় 'রাষ্ট্রীয় মালিকানা' কোন দিনই ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় নি; কেন-না, বুর্জোয়ারা সরকারী পরিচালনায় কাজ করতে অতিমাত্রায় অনিচ্ছুক। তাদের আশা, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে হয়ত আবার 'পুরনো গৌরব' ফিরে পাওয়া যাবে।

কম্যুনিস্ট্ দর্শনের শেষ কথা 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তি' স্বীকার ক'রে নিয়েও লেনিন তাড়াহুড়োর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জোর দিতেন কম্যুনিস্ট্ সমাজ-ব্যবস্থার ধীর ক্রমবিকাশের ওপর, জোর করে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনেরও তিনি ঘোর বিরোধী। নবলব্ধ স্বাধীনতার উল্লাসে এ কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে গররাজি যে, এখনও বহুদিন অনভিজ্ঞ প্রোলেতারিয়েত্‌কে উপদেশ-নির্দেশ দানের প্রয়োজন থাকবে। অন্যথায়, তাদের অপটু হাত থেকে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা সহজেই পুনর্দখল করতে পারবে।

১৯১৮ খৃস্টাব্দের ২৮শে জুন সমস্ত ভারী ও বৃহদায়তন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-পরিচালন-ব্যবস্থার আলোচনা প্রসংগে লেনিন সব উৎপাদন শিল্পের বৈদ্যুতিকরণের ওপর প্রাধান্য দিয়ে অনতিবিলম্বে বিদ্যুৎশক্তি কাজে লাগাতে

বললেন। ক্ষেত-খামারের কাজেও বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের নির্দেশ এল। প্রত্যেকটি উৎপাদন শিল্প কাঁচা মালের উৎসের যথাসম্ভব কাছাকাছি স্থাপন ক'রে উৎপাদন সাধ্যমত কেন্দ্রীভূত করতে হবে---এও তাঁরই নির্দেশ।

শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি যে অতি-মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ, লেনিন তা অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি শক্তি-বিশেষজ্ঞ উইণ্টার-এর সংগে আলোচনা করেন, এবং ১৯১৮-র বসন্তকালে তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ 'শাতুরা পাওয়ার স্টেশন' স্থাপিত হয়।

১৯১৮-র জানুয়ারী মাসে লেনিন গ্রাফ্তিও নামক বিশেষজ্ঞকে ভল্খভ্ জলশক্তি-কেন্দ্র স্থাপনের কাজে নিয়োগ করলেন।

য়ুরাল্ অঞ্চলে কয়লাখনি খোঁড়া হল; ব্যাপকভাবে রেল-পথের প্রসারের কাজ সুরু হল; ভল্গা-ডন্ খালের কাজে হাত দেওয়া হল; তুর্কিস্থানে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি করা হল; জীবন সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গোটা দেশ জুড়ে সে এক বিরাট কর্মচাঞ্চল্য। কাঁচা মাল এবং শক্তি উৎপাদনের অসীম গুরুত্ব লেনিন প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন; বিশেষত পূর্বাঞ্চলের জন্য। কৃষিভিত্তিক যন্ত্রপাতি এবং ভোগ্যপণ্য দ্রুত উৎপাদনের ওপরও তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রামাঞ্চল ও সহরাঞ্চলের মধ্যে অবাধ ব্যবসা এবং সমবায়ভিত্তিক লেন-দেনের প্রসারের জন্য নানা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হল। মুদ্রার দৃঢ়তা আনয়নেও যত্নবান হলেন সোভিয়েট সরকার।

কৃষির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা যে সব পরিকল্পনার প্রাণস্বরূপ, তা লেনিন বুঝেছিলেন এবং দল ও সরকার আপ্রাণ চেষ্টারত হলেন কৃষির উন্নতি-সাধনে।

১৯১৮-র গ্রীষ্মকালে রাশিয়ায় খাদ্য-সমস্যা উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করল ক্ষমতাচ্যুত কুলাক-রা (জোত-দাররা) খাদ্যশস্য লুকিয়ে রেখে সরকারের কাছে বেচতে অস্বীকার করায়। এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চেষ্টায় ছিল, যাতে উপোস করিয়ে বল্‌শেভিক্ সরকারের পতন ঘটাতে পারে। মস্কো, পেত্রোগ্রাদ্ ও অন্যান্য সহরের শ্রমিকরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ রুটি পায় নি।

বিপ্লবের স্থিতি তখন খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভরশীল।

১৯১৮-র মে মাসে লেনিন ঘোষণা করলেন, দেশের সমস্ত উৎপন্ন খাদ্যশস্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে বিলি করতেই হবে---এর কোনও বিকল্প নেই বা থাকতে পারে না। খাদ্যশস্য নিয়ে মুনাফাবাজি, জনগণের 'পেট কেড়ে' ফাটকাবাজি দমন করার জন্য কঠোর-তম উপায় অবলম্বনে কোনও দ্বিধা চলবে না। খাদ্যশস্য মজুতদারদের জাতির চরম শত্রু ঘোষণা ক'রে বিপ্লবী পরিষদের কাছে তারা বিচার-যোগ্য বলে ঘোষণা করা হল।

এ সম্বন্ধে লেনিন-এর আবেদন 'অন্ দ্য সেমিন্' প্রকাশিত হল সব পত্র-পত্রিকায়। কুলাকদের 'প্রতিবিপ্লবের স্তম্ভ' বলে তিনি সমগ্র প্রোলেতারিয়েত্‌কে শস্য-মুনাফাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, লুব্ধ কুলাকদের জমানো খাদ্যশস্য উদ্‌গীরণ করতে বাধ্য না করতে পারলে, বুর্জোয়িদের সংগে তারা সোভিয়েট ক্ষমতা ধ্বংস ক'রে দেবে। এ লড়াই কেবল খাদ্যের জন্য নয়, এ লড়াই বাঁচার লড়াই---বহু আয়াসলব্ধ প্রোলেতারিয়েত্-এর ডিক্টে-টর্‌শিপ্-এর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে এই যুদ্ধে।

লেনিন-এর মতে, এই গণ-যুদ্ধের নীতি গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর সংগে মিলন, মধ্যবিত্ত চাষীর সংগে আপোষ-মীমাংসা এবং রক্তলোভী কুলাক বা বড় জোতদারদের কঠোরহস্তে দমন।

এই যুদ্ধে জয়ী হল প্রোলে-তারিয়েত্। নেতা স্বয়ং লেনিন। মধ্যবিত্ত চাষীদের কাছে টেনে নিয়ে

মস্কোতে সুভার্দলভ্‌সহ মার্ক্‌স্-এঙ্গেলস-এর স্মারকস্তম্ভ নিরীক্ষণরত লেনিন (৭ই নভেম্বর, ১৯১৮)

অপ্রতিরোধ্য বেগে এগিয়ে তারা কুলাকদের হাত থেকে পঞ্চাশ মিলিয়ন (পাঁচ কোটি) হেক্টার্ জমি কেড়ে নিয়ে দরিদ্র ও মাঝারি চাষীদের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে কুলাকরা স্মৃতিতে পর্যবসিত হল—বহু পুরুষব্যাপী বীভৎস অত্যাচার আর বঞ্চনার হাত থেকে রুশ চাষী মুক্তি পেল চিরকালের মত। শ্রমিক-কৃষকের মিলনগ্রন্থী দৃঢ়তর হয়ে গেল, সে গ্রন্থী বন্ধনহীনতা অমোঘ শক্তিতে উজ্জীবিত।

ভূমি সংস্কার সম্পর্কে সে সময় লেনিন সমবায় প্রথার ওপর জোর দিয়েছিলেন। ছোট ছোট চাষীরা মিলে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে লাভজনক যৌথ খামার গড়ে তুলবে—এই তাঁর পরিকল্পনার মূল কথা। গৃহপালিত পশু-পক্ষীর উন্নতির দিকেও তাঁর সর্বত্র দৃষ্টি পড়েছিল এবং এর জন্যও তিনি খুঁটিনাটি তথ্যসম্বলিত পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।

মহামানব যীশু বলেছিলেন, 'ম্যান শ্যাল্ নট্ লিভ্ বাই ব্রেড অ্যালোন্'-মানুষ শুধু পেট ভরাতে পারলেই বাঁচে না, মনের খাদ্যও তার পক্ষে সমান প্রয়োজন। এই মহাবাক্য লেনিন সমর্থন করতেন। সোভিয়েট ক্ষমতা-দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগে সংগে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি। ১৯১৮-র জুন মাসে লেনিন-এর স্বাক্ষরযুক্ত নির্দেশ প্রকাশিত হল সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষার আমূল সংস্কার বিষয়ে। শিক্ষকদের সোভিয়েট-এর পক্ষে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে লেনিন স্বয়ং তাঁদের সংগে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলেন। সুষ্ঠু শিক্ষার প্রসার যে শিক্ষকদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়, তা তিনি জানতেন।

এর সংগে সংগে শুরু হল বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের মহৎ কাজ।

আপামর জনসাধারণের কাছে সর্বোচ্চ শিক্ষায়তনের দ্বার অবাধে খুলে দেওয়া হল।

তাঁর মন্ত্র ছিল শিক্ষার বাধা-বন্ধনহীন প্রচার ও প্রসার; সবাইকে জ্ঞানের আলোকতীর্থে নিয়ে আসতে হবে। এক প্রান্তীয় গ্রামের মানুষদের বিদ্যালয় স্থাপনের আকুল আবেদনের উত্তরে তাঁর নির্দেশ : 'পোক্‌রোভস্কী, একটা স্কুল খোল। ইতি লেনিন'।

পুতিলভ্-এর শ্রমিকরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য অঙ্কন শিক্ষালয় স্থাপনে উৎসাহ প্রকাশ করলে শিক্ষা-বিভাগ তাদের অন্তত এক বছর অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। একথা লেনিন-এর কানে গেলে তিনি বললেন, 'শুনেছ কথা? এরা চায় সন্তানদের সাংস্কৃতিক উন্নতি, আর এদের বলা হচ্ছে 'বছর খানেক সবুর কর'।—কোন দেরি চলবে না, এখুনি অঙ্কন বিদ্যালয় খুলতে হবে।'

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা উপলব্ধি ক'রে লেনিন আহ্বান জানালেন, যত শীগগির সম্ভব বিজ্ঞান আকাদেমী স্থাপনের জন্য। সোভিয়েট ক্ষমতার প্রথম বছরেই তাই বিজ্ঞান আকাদেমী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হল। লেনিন প্রস্তাব দিলেন এই সংগে সমাজ-বিজ্ঞান আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করার। এখানে মার্ক্সীয়মতে নানান সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণ করা হবে এবং সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রসার ও প্রচারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাতির সাংস্কৃতিক সম্পত্তি সংরক্ষণের দিকেও নজর দিলেন লেনিন। যুগ যুগ সঞ্চিত শিল্প ও চারুকলার নিদর্শনসমূহ সমগ্র দেশবাসীর উপভোগের সামগ্রী করার উদ্দেশ্যে সরকারী আওতায় এনে যাদুঘরে রাখার ব্যবস্থা হল এবং প্রাচীন কীর্তিগুলি সুষ্ঠু সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করার কাজে সোভিয়েট সরকার নজর দিলেন।

বললেন মহানায়ক—'আগের দিনে মানুষের মস্তিষ্ক সৃষ্টি করত কেবল মুষ্টিমেয় কয়েক-জনকে ভোগী করার জন্য,—বিশাল জনসমাজকে প্রযুক্তি বিদ্যা, শিক্ষা ও জীবনধারণের নিম্নতম প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত ক'রে। এখন থেকে বিজ্ঞানের অপার বিস্ময়জনক অবদান, হৃদয়নন্দক শিল্পসৃষ্টি ইত্যাদি সবই সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত হবে, এবং আর কখনও মানুষী বুদ্ধি অত্যাচার আর শোষণের জন্য ব্যবহার করা হবে না।'

নবলব্ধ সোভিয়েট শক্তিকে দৃঢ়ভিত্তিক করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন লেনিন। দেশের সর্বত্র স্থানীয় সোভিয়েটগুলোর কার্যপ্রণালীর ওপর ছিল তাঁর জাগ্রত কল্যাণদৃষ্টি। অঞ্চলভিত্তিক এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র নিন্দা করা সত্ত্বেও তিনি আঞ্চলিক শাসকদের ক্ষমতা খর্ব ক'রে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধিরও বিরুদ্ধবাদী। কেন্দ্রের নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা লেনিন বারবার সবাইকে মনে করিয়ে দিতেন। একজন আঞ্চলিক শাসনকর্তা সোভিয়েট কেন্দ্রীয় সরকারী নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলে, লেনিন তাঁকে সাবধান ক'রে লিখেছিলেন :

'যদি আমরা শ্রমিক-চাষী জনগণকে সত্যি-সত্যিই নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে চাই, তা হলে প্রথমে আমাদের শুরু করতে হবে নিজেদের নিয়ে।'

১৯১৮-র মে মাসে পিপল্‌স কমিসার্ সংস্থা লেনিন-এর মাইনে বাড়িয়ে দিল। তিনি এই 'বে-আইনী' বাড়তি মাইনে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

সর্বব্যাপী মুনাফাবাজী, সরকারী অর্থের অপব্যবহার এবং অপহরণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করলেন লেনিন। 'পিপল্‌স কোর্ট' প্রতিষ্ঠা করলেন। ঘুষ নেওয়া এবং সমজাতীয় অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন

দশ বছর কাটানো আইন চাইলেন, তার সংগে আরও দশ বছর বাধ্যতা-মূলকভাবে 'জনগণের জন্য' পরিশ্রম। লেনিন-এর দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় তাঁরা পাবেন অত্যন্ত অল্প। সুতরাং দেশরক্ষার কাজ দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সবাইকে করলেন আহ্বান। ব্রেস্ট্‌ চুক্তির স্বীকৃতিমূলক লেনিন লিখিত এক বয়ানে বলা হয়েছিল:

'সমস্ত আক্রমণাত্মক যুদ্ধের নিন্দা ক'রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করছে যে, সাম্রাজ্যবাদীদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তাদের আছে।'

বল্‌শেভিকদের অন্যতম প্রধান দাবি তৎকালীন মাইনে করা ভাড়াটে সৈন্যদলের বদলে খাঁটি 'জনগণের সৈন্যদল' সংগঠিত করা, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। ১৯১৮-র মার্চ মাসে লেনিন সৈন্যদলের নবীন সংগঠন নিয়ে প্রথম আলোচনা করলেন বিশেষজ্ঞদের সংগে। প্রথম প্রথম ঐচ্ছিক ভিত্তিতে যোগদানকারীদের নিয়ে 'রেড্‌ আর্‌মী' তৈরি হয়েছিল, কিন্তু ঐ বছরের বসন্তকালে আভ্যন্তরীণ শত্রু আর 'হোয়াইট গার্ডস্‌' মিলে চাপ দেওয়ার ফলে বাধ্যতামূলক সামরিক সার্‌ভিস্‌ সুরু করতে বাধ্য হলেন কর্তৃপক্ষ।

১৯১৮-র ৪ঠা জুলাই পঞ্চম নিখিল রাশিয়া সোভিয়েট কংগ্রেস-এর অধিবেশন আরম্ভ হল। তথাকথিত 'বাম' কম্যুনিস্টদল এবং মেন্‌সেভিক্‌ দক্ষিণ-পন্থীরা তুমুল আন্দোলন তুলল এই বলে যে, কুলাক-দের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সব ব্যবস্থা তুলে নিতে হবে, খাদ্য-শস্যের অবাধ মুনাফাভিত্তিক ব্যক্তিগত ব্যবসা চলতে দিতে হবে, এবং ব্রেস্ট চুক্তি বাতিল করতে হবে। লেনিন এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাবের পূর্ণ বিরোধিতা করে ঘরভেদী বিভীষণদের স্বরূপ উন্মোচিত করলেন। বিপুল ভোটাধিক্যে ওরা হেরে গেল, সোভিয়েট সরকারের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সমর্থিত হল।

এর ঠিক দু'দিন পরে পরাজিত 'বাম' কম্যুনিস্টরা মস্কো-য় জার্মান্‌ রাষ্ট্রদূত মীর্‌বাখ্‌-কে হত্যা করল—উদ্দেশ্য, রুশ-জার্মান্‌ যুদ্ধ আবার সুরু করা। সঙ্গে সঙ্গে তারা সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করল। ব্যর্থ বিদ্রোহ।

মুষ্টিমেয় বিপথচালিত বিক্ষুব্ধ 'বাম'-দের এ বিদ্রোহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দমন করলেন সোভিয়েট সরকার।

এই পঞ্চম কংগ্রেস—এই লেনিনকৃত 'সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাব্‌লিক'গুলোর সংবিধান অনুমোদন করা হয়েছিল। মুখবন্ধে লেনিন লিপিবদ্ধ করলেন 'নিপীড়িত শ্রমিকদের অধিকারাবলী', সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সব দেশ ও জাতির চিরন্তন সমানাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা ইত্যাদি।

অনভিজ্ঞ প্রোলেতারিয়েত্‌-দের শাসন প্রবর্তনের পর প্রথম কয়েকটি সংকটময় মাস লেনিন-এর সক্ষম ও সবল নেতৃত্বে নিরাপদে কেটে গেল।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীক পরীক্ষা বেশ কিছুদূর এগিয়ে এল দৃঢ় পদক্ষেপে।

অক্টোবর বিপ্লবের অল্পদিন আগে 'নিউ টাইম্‌স' নামক বুর্জোয়া পত্রিকা এক প্রবন্ধে লিখেছিল:

'তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বল্‌শেভিক্‌রা জিতেছে—সে ক্ষেত্রে আমাদের শাসন করবে কারা? রন্ধনশিল্পীরা? আস্তাবলের ঘেসেড়া আর গাড়োয়ানবৃন্দ? কুলিরা? অথবা, ছেলেদের কাপড় পাল্টাবার অবসরে ধাইরের দল দৌড়ে গিয়ে বিধান পরিষদের কাজ পরিচালনা ক'রে আসবে?—কারা থাকবে সেখানে, কোন্‌ রাজনীতিবিদ্‌রা?—বোধ হয় মিস্ত্রীরা যন্ত্র ফেলে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাবে, ছুতোররা ডাকঘরে বসবে এবং জলকলের কারিগরগুলো কূটনীতির কাজ করবে!!—এই কি ভবিষ্যৎ কর্মসূচী?—এ প্রশ্নের উত্তর বলশেভিক্‌রা ইতিহাসের কাছ থেকেই পাবে।'

ইতিহাস সত্যিই জবাব দিয়েছে—মুখের মত জবাব। পণ্ডিতের চরম মূঢ়তায় ইতিহাস-দেবতা হেসেছেন!

'মানুষের দেবতারে।
ব্যংগ করে যে অপদেবতা বর্বর
মুখবিকারে'
তাকে সংগ্রামী রুশ জনগণ বুঝিয়ে
দিয়েছে—
'এ প্রহসনের।
মধ্য-অংকে অকস্মাৎ হবে লোপ
দুষ্ট স্বপনের।
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু
রবে ভস্মরাশি।
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের
অট্টহাসি।'

ধনতান্ত্রিক দানবের মূঢ় অপব্যয় ইতিহাসে শাশ্বত অধ্যায় রচনার গৌরব কখনও লাভ করে নি—করতে পারে না। [ক্রমশ।

গুরুভ্রাতার দৃষ্টিতে স্বামীজী

"অনেকে বলে, দেশের ও দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এভাব ইংরেজি শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরি না হলে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে, তাদের কখন বেচাল হয় না—তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, চাল-চলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়।" —স্বামী ব্রহ্মানন্দ

নতুন মহাদেশের মুখ্য মহানগরী

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(শেষাংশ)

রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। সারাদিন শীতাতপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র চালিয়েও ঘর ঠাণ্ডা যথেষ্ট হয়নি। আর একবার স্নান করে নিলাম। ভাবতে লাগলাম, এই সেই নিউইয়র্ক—যার সেবার ও শক্তির উপকরণ মানুষের চোখের আড়ালে থেকে অবিরত নিভৃতে কাজ করে চলেছে। এইখানেই দেড় কোটি মাইল টেলিফোনের কেব্‌ল্ পোঁতা আছে—যা সারা পৃথিবীকে বিষুব রেখা ধ'রে সাতশো পাক বেড় দিতে পারে। এইখানেই তো পোঁতা আছে ৭000 মাইল গ্যাস পাইপ, ৫,৫০০ মাইল জলের নল, ৫000 মাইল ময়লা নিকাশনের নল, ১৭,000 মাইল বৈদ্যুতিক কেব্‌ল্, ২,২00 মাইল T. V. কেব্‌ল, ৮00 মাইল সুড়ঙ্গ পথ, ৭0 মাইল গরম জলের নল। এর আটশো মাইল সুড়ঙ্গ পথে চলে প্রায় ন' হাজার ট্রেণ। তার জন্য কোথাও তিনতলা-চারতলা সুড়ঙ্গ পথ বিশেষ কর্মব্যস্ত কেন্দ্রের তলা দিয়ে চলে গেছে।

নিউইয়র্কের শিক্ষা-ব্যবস্থা

প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বাদ দিলে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সর্বাধিনায়কত্বের পদ হ'তে অবকাশ নিয়ে জেনারেল আইসেনহাওয়ার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হ'ন ও পরে সারা মার্কিণ মুলুকের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ১৭৩৭৭ ও অধ্যাপকের সংখ্যা প্রায় ৪000। লাইব্রেরিতে বই আছে ৩৬·৭৬ লক্ষ। কলম্বিয়া ছাড়া আছে ফোর্ডহাম, লং আইল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক, সেণ্ট জেমস্ ও ইসিভা বিশ্ববিদ্যালয়। কত যে কলেজ আছে কত বিষয়ে জ্ঞান বিস্তারের তার ইয়ত্তা নেই। এক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Endowment হ'ল ১৩·১ কোটি ডলার।

নিউইয়র্কের সেতু
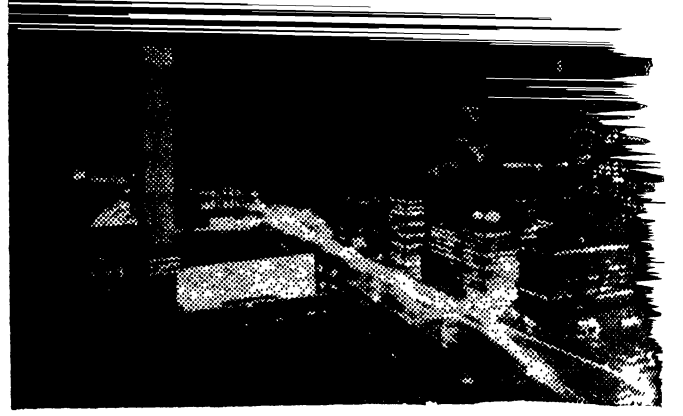
আমরা কলকাতায় পৃথিবীর এক বিখ্যাত সেতু হাওড়ার সেতুই দেখি ও একটি নতুন সেতু তৈরি হবে ভাগীরথীর ওপর বলি। হাওড়া সেতুর উত্তার হ'ল ১৫00 ফুট। কিন্তু নিউইয়র্কে কত বড় বড় নানা আকৃতির সেতু। যেমন ওয়াশিংটন সেতু এর উত্তার হ'ল ৩৫00 ফুট ৬ ইঞ্চি, উইলিয়ামস্ বার্গ সেতু—যার উত্তার হ'ল ১৬00 ফীট, হেলগেট সেতু—১৩৮0, ফুট ব্রুকলীন সেতু—১৫৯৫ ১২ ফীট, ভেরাজানো নেরোস্ সেতু—৪২৬০ ফীট, ম্যানহাটান সেতু—১৪৭০ ফীট। এরকম ছোট বড় তিরিশটি সেতু আছে। আর ডজনখানেক সুড়ঙ্গ পথ আছে গাড়ী ও ট্রেণ চলাচলের জন্য।

রাতের নিউইয়র্ক

বড় শহর, বড় বাড়ী, বড় বিশ্ববিদ্যালয়, বড় হোটেল, বড় সেতু আছে, তো ব'লে এ জায়গা গুণ্ডামি, বদমায়েশী ও নোংরামিতে কিছু কম নয়। এখানে শয়তানদের দল নানা নামে গড়ে উঠেছিল। গুণ্ডার দলেরা বস্তি অঞ্চলে ছিনতাই, চুরি, খুন, ডাকাতি, রাহাজানির প্রসারে বিস্তার লাভ করে। এরা প্রাধান্য লাভ করে তখনই, যখন পৌরপ্রতিষ্ঠানের শাসন ব্যবস্থা এ রকম দলের হাতে পড়ে। এরা সারা মহানগরীকে আতঙ্কিত অবস্থায় রেখেছিল। সেই কুখ্যাত দলগুলির কয়েকটির নাম দিলাম। ঐ দলগুলি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কাজ করে যায়। দলগুলির নাম হ'ল

Patsy Conroys, O' Connell Guards, Bowery B'hoys, Chischesters, Roach Guards, Plug Uglies, Shirt Tails, Dead Rabbits, Atlantic Guards, Daybreak Boys, Buckoos, Hookers, Swamp Angels, Slaughter Housers, and Big S–

নিউইয়র্ক পৌর প্রতিষ্ঠান

ফ্রেঙ্কলিন রুজভেল্ট যখন নিউইয়র্কের গভর্ণর, সেই সময় নিউইয়র্কের শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন আসে। টামানী দলের মেয়র যখন 'জিমিওয়াকার', তখন তিনি মোটা উৎকোচ নিয়ে পৌর সংস্থার লোক নিয়োগ করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে পনেরো দফা নালিশ 'সীবেরী' সাহেব রাজ্যপাল রুজভেল্টের কাছে করেন ও তাঁকে পদচ্যুত করার দাবী জানান।

আমেরিকার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের উপর প্রাদেশিক সরকারের এখানকার মত জুলুম চলে না। এটি বড় শক্ত ঠাঁই। কিন্তু 'রুজভেল্টে'র হাত শক্ত করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক 'ফেলিক্স ফ্র্যাঙ্কফুর্টার'। তিনি আইনের কূট প্রশ্নের অবতারণা করেন। সেই আইনের কূটতত্ত্বটি হ'ল যে, কোন পাবলিক সার্ভেন্টের তাঁর কার্যকালে যদি রোজগারের চেয়ে বেশী অর্থ ও সম্পত্তি তাঁর নামে বা বেনামে জমা থাকে ও গচ্ছিত অর্থপ্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য সূত্রের সন্ধান দিতে না পারেন, তা হ'লে তাঁর আচরণে দুর্নীতির বদনাম থেকে যায়। রুজভেল্ট তাঁকে ডেকে তাঁর নামে ব্যাঙ্কে বিভিন্ন সময়ে জমা অর্থের হিসাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আইনের ধারাটির উপর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেয়র ওয়াকার তাঁর ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে নিউইয়র্ক ষ্টেটের রাজধানী আলবানী থেকে নিউইয়র্কে আসেন ও দলের নেতাদের পরামর্শে কাজে ইস্তফা দিয়ে রুজভেল্টের নামে বহু বিষোদ্গারণ করে জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইংলণ্ডে চলে যান। এরপর মেয়র হলেন 'লা গার্ডিয়া'—যাঁর নামে নিউইয়র্কের একটি বিমান বন্দর। এখানে পৌর শাসন 'মেয়র কাউন্সিল' পদ্ধতিতে চলে। তিনি হলেন, মহানগরীর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। মাইনে পান বছরে ৫০,০০০ ডলার। বার্ষিক আয়-ব্যয় ছ' হাজার কোটি টাকারও বেশী। আয়ের শতকরা ২১ ভাগ শিক্ষা খাতে, ১৭ ভাগ দেনা শোধে, পরিচালনা খাতে ৪ ভাগ মাত্র।

নিউইয়র্কের বস্তি—হার্লেম

পৃথিবীর বৃহত্তম মহানগরীতে বস্তি? যেমন পুণ্যের পাশে পাপ, আলোর পাশে অন্ধকার, তেমনি অট্টালিকার পাশে বস্তি অঞ্চল। এখানে বস্তির সংজ্ঞাটি ভারতবর্ষের বস্তির সংজ্ঞা হ'তে বিভিন্ন। আমরা 'বস্তি' বলতে বুঝি দশ বা ততোধিক কাঠা জমির উপর চালা বাড়ীর সমন্বয়। মনে পড়ে, হাওড়ার গুণ্ডা-বদমাইসে ভরা সরু গলি, খাটা পায়খানা, ভট্‌ভটে নর্দমা, খট্‌খটে চাপাকল Tubewell, দুর্গন্ধময় জঞ্জালভরা অঞ্চল, যেখানে মানুষ নানা প্রয়োজনে থাকে। কেউ থাকে আর্থিক অনটনে, কেউ থাকে কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে দেশে টাকা পাঠাবার জন্য, কেউ থাকে নিজেকে গোপন রাখার জন্য, কেউ থাকে রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের বলি হিসেবে। হার্লেমের বস্তি ম্যানহাটন দ্বীপের বহুতল গগন-ছোঁয়া বাড়ীর আওতায় উদ্বাস্তু জনগণ সুলভে থাকার জায়গা পেতে উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে
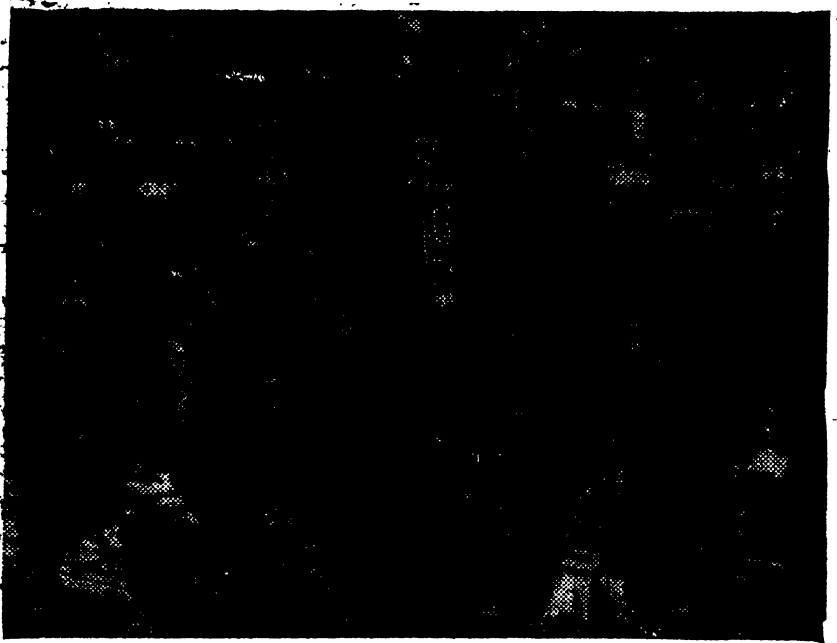
নিউইয়র্কের নগরকেন্দ্র: রকফেলার সেণ্টার

অভিযান সুরু করে। সেগুলি অনেক জায়গায় দোতলা-তিন-তলা বাড়ী, যা মেরামতের অভাবে ভগ্নদশায়, বাড়ীওলার সম্পত্তির প্রতি যত্নের অভাব ও বাসিন্দাদের নোংরাভাবে থাকার স্বভাবে একে বস্তি বলা হয়। তবে ভারতবর্ষের বস্তির মত মারামারি, খুনোখুনি, বেআইনী মদ চোলাই, নারীহরণ, চোরাই মালের কারবার প্রভৃতি বহু অ-নাগরিক কাজ হয়, যা বর্তমানে বিশেষ সমাজবৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও গুরুতর আরক্ষ সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। বাড়ীর চেহারা চুনকামের অভাবে মলিন, কোথাও বালি খসে পড়ছে। বর্তমানে নিউইয়র্কের নবতম বস্তি হ'ল 'স্পেনিশ হার্লেম', চেরী সেণ্ট্রাল পার্কের পূর্বে 96th ও 125th রাস্তার মধ্যের অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। আমেরিকার স্লাম্ (বস্তি) হ'ল এখানকার গতযৌবন, ভগ্নদশাপ্রাপ্ত জমিদারদের বাড়ীর মত। গাঁয়ের জমিদার সহরে এসেছেন, চাকর, গোমস্তা সেগুলি বাস্তু ভিটেতে প্রদীপ দেখাতে মার্কিণী বস্তি করে রেখেছে। তবে ঐ ধনী প্রাসাদের পেছনে ধনিক সম্প্রদায়ের নির্যাতন ও মহৎ কাজের ইতিহাস জড়ানো আছে। কেউ কেউ মনে করেন, বস্তি গড়ে ওঠে আবার সামাজিক প্রয়োজনে। বস্তি থেকেই তো আসে ধনীর বাড়ীতে কাজ করতে ঝি-চাকর, মেথর, মুদ্দোফরাস্ প্রভৃতি।

লোকের আর্থিক মানদণ্ড

কার ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে, সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অধিকাংশ মানুষই সুখের পরিবেশে থাকতে রোজগারের আগেই ভারী রোজগার করে দিয়ে, আধুনিক আবহাওয়ায় আরামে থাকে। বিপদ হ'ল হঠাৎ মারা গেলে। T. V. মারা ধারে দিয়েছিল, গাড়ী মারা কিস্তিতে দিয়েছিল, বাড়ী মারা ধীরে ধীরে দেনা শোধ

ম্যানহাটান
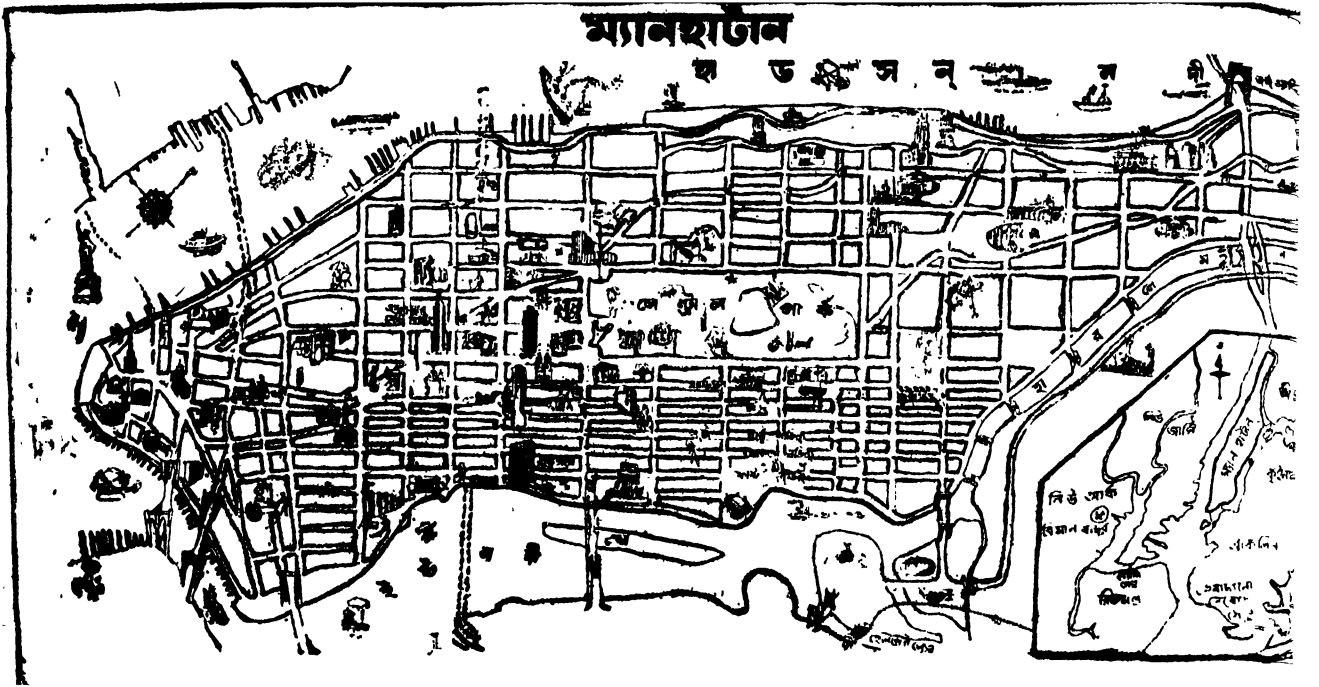
করার অবকাশ দিয়ে বিক্রি করেছিল, তারা একসঙ্গে এসে ছেড়ে-আসা প্রিয়জনদের কাছ থেকে সেগুলি ফিরিয়ে নিয়ে তবে মুক্তি দেয়। তবে বর্তমানে ভদ্রলোকের মান পরিমিতির মানদণ্ড হ'ল Credit Card যার যতগুলো কোম্পানীর ক্রেডিট কার্ড আছে, সে ততই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। পেট্রোল কোম্পানীর যেমন Shell Oil, Esso, Standard Oil, Gulf Oil প্রভৃতি তাদের খদ্দেরদের Credit Card দেয়। সেই ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে সারা আমেরিকার সেই কোম্পানীর যে কোন পেট্রোলের দোকানে ধারে পেট্রোল দেবে। তা'ছাড়া সাধারণ কাজের জন্য, যেমন---হোটেলে খানাপিনা, দোকানে সাজপোষাক কেনা, এরোপ্লেন ও জাহাজের টিকিট কাটা এই Credit Card দিয়েও চলে। Credit Card হ'ল প্ল্যাস্টিকের প্লেটে উঁচু উঁচু হরফে নম্বর ও নাম ও সেই সঙ্গে কোন কোম্পানীর Credit Card তার নাম-ঠিকানা লেখা থাকে। সেই কার্ড নিয়ে গিয়ে জিনিষের দাম লিখে ও তলায় Credit Card ঢুকিয়ে রবারের বেলুনা দিয়ে চালিয়ে দেয় তাতে কয়েক খণ্ড বিলে কারবনের ছাপ উঠে যায়। দোকানদার Credit Card ফেরৎ দিয়ে বিলের উপর Credit Card এর মালিকের সই করিয়ে নেন।

আমেরিকার দৈনিক সংবাদপত্র

রবিবার সকালে বিমানে অতলান্তিক পাড়ি দেবো। বিমানে উঠে সামনের সিটের পেছনের ব্যাগে একদলা কাগজ---রবিবারের New York Times। এটা দশটি অংশে বিভক্ত। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা। তার মধ্যে বিচিত্র বিজ্ঞাপনের জৌলুষই বেশী। এখানে খেলাধুলা বিষয়ে, নাচগান, থিয়েটার, সিনেমা, দাবা খেলা, তাস খেলা, ছবি তোলা, গ্রামোফোন রেকর্ড, রেডিও, টেলিভিশন বিষয়ক রচনা, চিত্র ও বিজ্ঞাপন---ছিয়াত্তর পাতা ধরে। ডাক টিকিট বিষয়েই ২৪ পাতা লেখা ও বিজ্ঞাপন। সবই বিস্তারিতভাবে সচিত্র। পুস্তকের সমালোচনা ও বইয়ের বিজ্ঞাপন, সংবাদ, সম্পাদকীয়, পাঠকদের চিঠিপত্র, মতামত প্রভৃতি বহু বিষয়ের খবর সম্বলিত ক'রে ৩৩২ পাতা ভরিয়ে প্রতি রবিবার বার করে। পাতার ওজন যত এখানে, একটাকা কিলো দরে বিক্রী করলে কাগজের মূল্য উশুল হয়ে আসবে। তবে অনেক পাঠক যে-যে বিষয়ের উপর আগ্রহশীল, সেইটুকু অংশ নিয়ে বাকী অংশ পথের ধারে ফেলে দিয়ে যায়। কে অকারণ এই দাহ্য পদার্থ মিছিমিছি বাড়ীর জঞ্জাল বাড়াতে নিয়ে যাবে ? গৃহিণীরা (অবশ্য সেখানের) অকারণ মালপত্র সংগ্রহ করতে চান না। ওঁরা পুরোনো চেয়ার-টেবিল, পর্দা, সোফা-শেট, রেডিও ও T. V. সেট আধুনিকতার মাপকাঠিতে পুরোনো হ'লে তাদের দেশের 'ধাপা'য় পাঠিয়ে দেয়---মৃত্তিকার ধন মৃত্তিকায় ফিরিয়ে দিতে।

বিস্তৃতি ও জনসংখ্যা

ম্যানহাটন দ্বীপকেন্দ্রিক মহানগর নিউইয়র্ক (যার নাম আদিমকালে 'নিউ অমস্টার্ডম' ও পরে 'নিউ অরেঞ্জ' ও পরে ডিউক অব ইয়র্কের নামানুসারে 'নিউইয়র্ক) প্রায় ৩২০ বর্গ মাইল জুড়ে বিস্তৃত। যেখানে কলকাতার আয়তন দশভাগেরও এক ভাগের কম। লম্বায় ৩৬ মাইল ও চওড়ায় সবচেয়ে বেশী যেখানে, সেখানে ১৬ ১/২ মাইল। নিউইয়র্ক পাঁচটি বরোতে বিভক্ত (১) ব্রংক্স, (২) ব্রুকলীন, (৩) ম্যানহাটন, (৪) কুইনস্ ও (৫) রিচমণ্ড। প্রতি বরোতে একটি ক'রে

সভাপতি আছেন, তিনি বছরে ৩৫,০০০ ডলার মাইনে পান। নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে, কোন্ বরো কত জায়গা নিয়ে কত লোককে থাকার স্থান দিয়েছে।

	বিস্তৃতি (বর্গ মাইল)	দৈর্ঘ্য (মাইলে)	প্রস্থ (মাইলে)	লোক সংখ্যা (১৯৬০)
ব্রংক্স	৪৩'১	৮'৩	৮	১৪,২৪,৮১৫
ব্রুকলীন	৭৮'৫	১১'৬	১০'৯	২৬,২৭,৩৯৯
ম্যানহাটন	২২'৬	১৩'৪	২'৩	১৬,৯৮,২৮১
কুইন্স্	১১৪'৭	১৬'৮	১৩'৪	১৮,০৯,৫৭৮
রিচমণ্ড	৬০'৯	১৩'৯	৭'৩	২,২১,৯১১

মোট : ৩১৯'৮

কিন্তু আশ্চর্য! এই নিউইয়র্ক এত বেড়েছে যে, তাকে মেট্রোপলিটন নিউইয়র্ক করতে হয়েছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের লোকসংখ্যা ৩,৪৩৭,২০২ থেকে ১৯৫০ সালে ৭,৮৯১,৯৫৭-এ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ১৯৬০ সালে না বেড়ে কিছু কমেছে যেমন—৭,৭৮১,৯৮৪ অর্থাৎ শতকরা ১'৪:/: কম।

বিখ্যাত সমাজ বৈজ্ঞানিক স্যার পেট্রিক গিডিস্ নগরীর বিবর্তনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন নিউইয়র্ক এখন মেগালোপলিসের স্তরে। তাঁর বিশ্লেষণে প্রথমে নগরী হ'ল Polis; দ্বিতীয় পর্যায়ে হ'ল Metropolis অর্থাৎ বৃহৎ ও শক্তিমান মহানগরী; তৃতীয় পর্যায়ে Megalopolis অর্থাৎ মহানগরীর উন্মত্ততার বিকারযুক্ত বিরাট আয়তনের দানবীয় নগরী; চতুর্থ পর্যায়ে Pathopolis অর্থাৎ রোগগ্রস্ত সংকোচনশীল ক্ষয়িষ্ণু মহানগরী।

এখানের মহানগরীর মধ্যে নগরী রয়েছে রকফেলার সেণ্টার— The fabulous city within city। এখানে নগরীর সবকিছু সুখ-সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু দাম দিতে হয় প্রচুর। মেয়র ওয়াগ্নার একবার বলেছিলেন: এটি হ'ল Centre of the Universe—যদিও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এর হয়তো সামান্য মূল্য।

বাষ্পচালিত মোটর গাড়ি

বাষ্পচালিত মোটর গাড়ি কি ফিরে আসছে আবার? লক্ষণদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে বটে যে, ৪০।৪৫ বছর আগে যাকে উধাও হতে হয়েছিল, পেট্রোল-চালিত মোটর গাড়িকে স্থান দিয়ে, সেই প্রাচীন বাষ্প পরিচালিত মোটর বোধ হয় আবার দেখতে পাওয়া যাবে পৃথিবীর রাস্তায়।

কারণ হচ্ছে, আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত পেট্রোল পোড়ার ধোঁয়ায়। কয়েকদিন আগেই যে নিউ ইয়র্ক এবং টোকিয়োর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা কাগজে পড়া গেছে, সেই মারাত্মক স্মগ্-এর জন্য শতকরা ষাটভাগ দায়ী পেট্রোল ইঞ্জিন। সময় সময় নাকি আমেরিকান শহরের দূষিত প্রাণঘাতী আবহাওয়ার জন্য এরা শতকরা ৯০ ভাগ দায়ী।

ভয়ের কথা তো বটেই। চিন্তাশীল লোকেরা এ রকম অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার পন্থা উদ্ভাবন করতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

এরই উপায় হিসাবে পেট্রোলের পরিবর্তে বাষ্প দিয়ে মোটর গাড়ি চালাবার কথা উঠেছে—বিশেষ করে মোটর গাড়ি অধ্যুষিত আমেরিকায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

একজন ব্যবসায়ী (নাম উইলিয়াম লিয়ার) ঠিক করেছেন যে, যে দশ-পনেরো হাজার ইঞ্জিন ছাড়া মোটর কিনে তাতে ষ্টীম ইঞ্জিন বসিয়ে বাজারে ছাড়বেন। এই লিয়ার হচ্ছেন একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী। এঁর জেট ইঞ্জিন-এর ব্যবসা আছে। তিনি বলছেন যে, এ রকম গাড়ির জন্য তিনি ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার অর্ডার পেয়েছেন। তিনি আশা করেন যে, ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে বাষ্পচালিত মোটর বাজারে ছাড়তে পারবেন এবং তার কিছু পর থেকে দিনে এক হাজার ইঞ্জিন তৈরী করতে পারবেন। তাঁর মতে পেট্রোল ইঞ্জিন আগামী বিশ বছরের মধ্যেই অপ্রচলিত হয়ে যাবে।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন-এর সমর্থকদের মতে এ ইঞ্জিন চালান অনেক বেশী সহজ—ষ্টারটিং মোটর লাগে না, কারবুরেটারের হাঙ্গামা নেই, ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করবার দরকার হয় না, ইত্যাদি। এবং সব চাইতে বড় কথা, এ ইঞ্জিন শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসকে বিষাক্ত করে মানুষকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবে না তিলে তিলে। মাত্র ২০ সেকেণ্ড নাকি লাগে এ ইঞ্জিনকে চালু করতে, এবং সামান্য কেরোসিন পোড়ার গন্ধ ছাড়া আর কোন গন্ধ নেই।

বর্তমানে জ্বালানী হিসাবে কেরোসিন এবং প্রপেন্ গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমরা কি ক্রমে ক্রমে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছি? প্রকৃতি দেবী কি এতদিনে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন? কে জানে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

তখন ভোর।---

ভ্লাদিমির কুদুনোভ্ সদ্য-পতিত তুষারাচ্ছন্ন তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে, অন্য একজন অফিসার-এর প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে দীর্ঘদেহী, লাবণ্যময় তরুণ; বয়স বাইশ, প্রায় ছেলেমানুষী চেহারা; কমনীয় মুখ, চুল ঘন এবং সুন্দর কোঁকড়ানো; পরনে অফিসার-এর পোষাক, পায়ে অশ্বারোহণের লম্বা জুতো, গায়ে ওভারকোট বা মাথায় টুপি নেই। অফিসারটিও ঢ্যাঙা, মুখ লাল, গোঁফ আছে। ত্রিশ পা মতন দূরে কুদুনোভ্-এর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সে রিভল্বার সমেত হাত তুলছিল ধীরে ধীরে, লক্ষ্য ভ্লাদিমির্ কুদুনোভ।

কুদুনোভ্-এরও হাতে রিভল্বার, হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা, সে বিপক্ষর গুলীর অপেক্ষায় স্থির, যেন উদাসীন, তার কমনীয় তারুণ্য-মণ্ডিত মুখ অন্যান্য সময়ের তুলনায় কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে হলেও তা সাহস-দীপ্ত, মুখে বিদ্রূপাত্মক হাসি। তার বিপজ্জনক অবস্থান, তার শত্রুর নির্মম স্থিরমনস্কতা, পাশে দণ্ডায়মান নির্বাক সহকারী ক'জনের কষ্টকর মনোযোগ এবং মৃত্যুর অনাগত আসন্ন চরণ-ধ্বনি মুহূর্তটিকে ভয়াবহ তীব্রতাপূর্ণ ক'রে তুলেছিল---রহস্যময়, প্রায় ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত গাম্ভীর্যপূর্ণ বলা চলে। সম্মানের প্রশ্ন মীমাংসা হওয়ার কথা। প্রত্যেকের মনে প্রশ্নটির গুরুত্ব স্বীকৃত; কী করছে তা বোঝে যত কম, তত তাদের কাছে মুহূর্তটার গাম্ভীর্য গভীরতর হয়ে ওঠে।

একটা গুলী ছোড়া হল; সকলের দেহে শিহরণ। ভ্লাদিমির হাত ছড়িয়ে দিল, হাঁটু পাড়ল এবং পড়ে গেল। সে তুষার-শয্যায় শায়িত, গুলী তার খুলি ভেদ ক'রে গেছে, হাত দু'টি ছাড়াও তার চুল, মুখ এবং এমন কি মাথার চারপাশের তুষার পর্যন্ত রক্তাক্ত। সহকারীরা ছুটে এসে তাকে তুলল; ডাক্তার তার মৃত্যু ঘোষণা করলেন তখন সম্মানের প্রশ্নটিও মীমাংসিত। বাকি শুধু খবরটা রেজিমেণ্টকে জানানো, আর যথাসম্ভব সাবধানে আর কোমলভাবে মাকে বলা। তিনি তখন একা, নিহত ছেলেটিই তাঁর একমাত্র সন্তান।

নিকোলাই দমিত্রি এভিচ্ তেলেশোভ

দ্বন্দ্বযুদ্ধের আগে কেউ একবারও তার কথা ভাবেনি; কিন্তু এখন সকলেই খুব চিন্তান্বিত। তিনি সকলের পরিচিত, এবং প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসত; ওরা বুঝল এই মর্মান্তিক খবর তাঁকে ধীরে ধীরে শোনাতে হবে। অবশেষে মাকে বলার জন্য আইভান্ গোলুবেংকো সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিরূপে মনোনীত হল, সে অবস্থা সম্ভবমত সহনীয় ক'রে তুলবে।

* * *

পেলাজেইয়া পেত্রোভ্না সবে উঠে নিজের জন্য প্রাতঃকালীন চা তৈরী করছিলেন, এমন সময় ঘরে ঢুকল গোলুবেংকো---বিষাদময় আর অপ্রতিভ।

বৃদ্ধা অতিথিকে স্বাগত জানানর জন্য উঠতে উঠতে অমায়িক কিন্নরে বলে উঠলেন, 'ঠিক চায়ের সময় এসে গেছো আইভান্ আইভানোভিচ্।

শিশুটাই ভ্লাদিমির্-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছো।'

'না, আমি---যেতে যেতে---' গোলুবেংকো তোতলাতে লাগল, তার মুখ লজ্জায় লাল।

'ওকে ক্ষমা করতেই হবে, ও এখনও ঘুমুচ্ছে। কাল সমস্ত রাত নিজের ঘরে পায়চারী করেছে, তাই চাকরকে বলেছিলাম ওকে যেন না ডাকে, আজ দিনটাও পবিত্র কি না। কিন্তু তুমি সম্ভবত জরুরী কাজে এসেছ?'

'না, যেতে যেতে এই একটা ঢুঁ দিলাম---'

'দেখা করতে চাও ত ওকে তোলার হুকুম দিই।'

'না, না, ব্যস্ত হবেন না।'

কিন্তু, যেহেতু পেলাজেইয়া পেত্রোভ্না-র মনে হল সে এসেছে কোন না কোন কাজে তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে, তিনি আপন মনে বিড়্বিড়্ করতে করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

গোলুবেংকো উত্তেজিত, সে ঘরের মধ্যে ইতি-উতি পায়চারী করতে লাগল হাত মোচড়াতে মোচড়াতে, বেচারা ঠিক করতে পারছে না কীভাবে মর্মান্তিক খবরটা জানাবে। সেই মুহূর্ত এল বলে, কিন্তু সে আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারল না, ভয় পেল, আর বরাতকে অভিশাপ দিল এই বলে, সে কেন মরতে এই ব্যাপারটার মধ্যে নিজেকে এভাবে জড়াতে গিয়েছিল।

'কাণ্ড! ছোকরাদের কী ক'রে বিশ্বাস করি বল ত।'---ঘরে ঢুকলেন পেলাজেইয়া, তাঁর কণ্ঠে প্রসন্ন বিস্ময়। 'আমি এখানে কাপ আর সসার্-এ যাতে একটুও শব্দ না হয় সে জন্য কত সাবধান; তোমাকে বলছি বাছাকে জাগিও না, ওদিকে সে না কি অনেক আগেই কোন চিহ্ন না রেখে চলে গেছে। কিন্তু আইভান্ আইভানোভিচ্, তুমি বসে এক কাপ চা খাচ্ছ না কেন? সম্প্রতি তুমি আমাদের ভীষণ অবহেলা করছো।'

যেন এক গোপন আনন্দে তিনি মৃদু হেসে নিম্ন কণ্ঠে বললেন:

'ঐ সময় আমাদের কত খবর!---ভ্লাদিমির্ নির্ঘাৎ তা চেপে রাখতে পারত না। সে নিশ্চয় ইতিমধ্যে তোমায় এ ব্যাপারে সব বলেছে; কারণ, বাছা আমার সাদাসিধে, খোলা মনের। কাল রাত্রে পাপচিন্তা মাথায় এল: 'হ্যাঁ, আমার ভ্লাদিমির যখন সারা রাত ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে---তখন সে নিশ্চয় স্বপ্নে দেখছে লেনোক্কা-কে। ওই-রকম ও, বরাবর: সারা রাত ঘরে পায়চারী করলে নির্ঘাৎ পরের দিন চলে যাবে---আহা, আইভান্ আইভানো-ভিচ্, ঈশ্বরের কাছে বুড়ো বয়সে আমার এই আনন্দটুকুর জন্যই কেবল প্রার্থনা। একজন বৃদ্ধার আর কীই বা প্রয়োজন থাকতে পারে? আমার মাত্র একটাই কামনা, একতম আনন্দ---আমার মনে হয় ভ্লাদিমির আর লেনোক্কা-র বিয়ের পর আর কিছু প্রার্থনা করার থাকবে না। তা হলে কী ভীষণ আনন্দিত আর সুখীই না হব!---ভ্লাদিমির ছাড়া আমার আর কিচ্ছু চাই না; ওর সুখের চেয়ে প্রিয়তর আর কিছুই নয়।'

বৃদ্ধা মহিলা এত ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে উদ্গত অশ্রু মুছে ফেলতে হল।

তিনি বলে চললেন, 'মনে আছে গোড়ার দিকে ব্যাপার ঠিক সুবিধের হয় নি---হয় দু'জনের মধ্যে একটা কিছু, নয়ত টাকা-পয়সার জন্য---তোমরা তরুণ অফিসার-রা ত বন্ড ছাড়া বিয়ে পর্যন্ত করার অনুমতি পাও না---সে যাক, এখন সব ঠিকঠাক; ভ্লাদিমির্-এর জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচ হাজার রুবল আমি যোগাড় করেছি, ওরা ইচ্ছে করলে কালই বিবাহ-বেদীতে বসতে পারে। হ্যাঁ, আর লেনোক্কা আমাকে কী সুন্দর একটা চিঠিই না লিখেছে---আমার হৃদয় আনন্দ-বিভোর।'

কথা বলতে বলতে তিনি পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে গোলু-বেংকোকে দেখিয়ে আবার রেখে দিলেন।

'কী চমৎকার মেয়ে! আর কত ভাল।'

তার কথা শুনতে শুনতে গোলু-বেংকোর মনে হচ্ছিল, সে যেন কয়লার গনগনে আঁচের ওপর বসে আছে। ইচ্ছে হচ্ছিল বন্ধু-মাতার বাক্যস্রোতে বাধা দিতে, বলতে যে সব শেষ, ভ্লাদিমির মৃত, এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে

তার উজ্জ্বল আশার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ; কিন্তু সে নিঃশব্দে সব শুনল। মায়ের সুন্দর, কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে তার গলা যেন বুঁজে গেল।

অবশেষে বৃদ্ধা বললেন, 'কিন্তু তোমাকে আজ এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? তোমার মুখ যেন নিশার অন্ধকার।

আইভান্-এর বলতে ইচ্ছা হল, 'হ্যাঁ। আপনাকে বলার পর আপনারও একই দশা হবে।' কিন্তু তাঁকে কিছু না বলে সে মাথা ঘুরিয়ে গোঁফে মোচড় দিতে সুরু করল।

এদিকে লক্ষ্য না ক'রে পেলাজেইয়া পেত্রোভ্না আপনি চিন্তামগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন :

'তোমার জন্য সুখবর আছে। লেনোচ্কা তোমাকে তার শ্রদ্ধা আমার মারফৎ জানাতে বলে লিখেছে আমি যেন তোমাকে---ভ্লাদিমির্-এর সংগে তোমাকে---তার ওখানে যেতে বাধ্য করি---তুমি ত নিজেই জান সে তোমাকে কত পছন্দ করে!---না, মনে হচ্ছে নিজের কাছে তা চেপে রাখতে পারছি না। তোমাকে চিঠিটা দেখাতেই হল। নিজেই দেখ একবার কত প্রীতিপূর্ণ আর মিষ্ট এই চিঠি।

এবং তিনি আবার পকেট থেকে চিঠির তাড়া বের ক'রে তা থেকে একটা ঠাসবুনোনো লেখা পাত্লা চিঠি টেনে নিয়ে গোলুবেংকো-র সামনে খুলে ধরলেন। তার মুখ তখন আরও বেশি বিষাদময়, এবং সে বাড়ানো চিঠিটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু পেলাজেইয়া পেত্রোভ্না ইতিমধ্যে তা পড়তে আরম্ভ করেছেন :

'প্রিয় পেলাজেইয়া পেত্রোভ্না ---কবে আসবে সেই সময় যখন আপনাকে উপযুক্তভাবে সম্বোধন না ক'রে প্রিয়, মিষ্ট মা আমার বলে সম্বোধন করতে পারব! সে সময়ের জন্য আমি চিন্তিত মনে অপেক্ষমাণ, এবং এত আশা যে শীগ্গীর আসবে ভেবে এখনই আপনাকে মা ছাড়া আর কিছু বলে ডাকতে চাই না---'

পেলাজেইয়া পেত্রোভনা মাথা তুললেন, এবং পড়া বন্ধ ক'রে তাকালেন গোলুবেংকোর দিকে---তাঁর চোখে অশ্রুবন্যা।

'দেখ আইভান্ আইভানোভিচ্', বলেই তিনি দেখলেন গোলুবেংকো গোঁফ চিবোচ্ছে এবং তার চোখও ঝাপাচ্ছে ; তখন উঠে তিনি কম্পিত হাত রাখলেন তার চুলের ওপর এবং কপালে শান্তভাবে চুম্বন করলেন। 'ধন্যবাদ আইভান্ আইভানোভিচ্', তিনি ফিসফিস ক'রে বললেন, স্পষ্টতই তিনি অতিমাত্রায় বিচলিত। 'সর্বদাই আমার মনে হয়, তুমি আর ভ্লাদিমির্ কেবল বন্ধুই নও, আরও বেশি কিছু ---দুই ভায়ের মত---আমাকে ক্ষমা ক'রো---আমি কী ভীষণ সুখী, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

তার ঘাড় বেয়ে অশ্রুধারা নামল, আর আইভান্ গোলুবেংকো এত বেশি বিব্রত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল যে, সে কেবল বৃদ্ধার ঠাণ্ডা, অস্থিবহুল হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তা চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে পারল ; কান্নায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, একটাও শব্দ সে উচ্চারণ করতে পারল না ; কিন্তু মাতৃস্নেহের এই উচ্ছ্বসিত বহিপ্রকাশ দেখে সে নিজেকে এত নিন্দিত মনে করল যে, মনে হল ভ্লাদিমির্-এর বদলে তার পক্ষেই মাঠে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে থাকা ভাল ছিল---গুলী চলে গেছে খুলি ভেদ ক'রে,---যে মহিলা আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু জানতে পারবেন, তাঁর মুখে বন্ধুত্বের জন্য নিজের প্রশংসা শোনার চেয়ে তা প্রিয়তর। তখন তিনি তাঁর সম্বন্ধে কী ভাববেন? সে ভ্লাদিমির্-এর বন্ধু, ভাইয়ের মত---অথচ তার দিকে রিভল্বার উদ্যত দেখেও কি সে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে নি? এই ভ্রাতা নিজেই কি প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জনের ফারাক মেপে রিভল্বার-গুলো গুলী ভর্তি করে দেয় নি? এইসব সে নিজেই করেছে, সচেতনভাবে ; আর এখন এই বন্ধু এবং ভাই সেখানে রয়েছে নিঃশব্দে, নিজের কর্তব্যসাধনের সাহসটুকুও তার নেই।

সে ভীত ; এই মুহূর্তে সে নিজেকে ঘৃণা করছে, কিন্তু একটাও শব্দ উচ্চারণ করার মত আত্ম-কর্তৃত্ব তার নেই। তার আত্মা তখন এক অদ্ভুত সংগতিহীনতায় পীড়িত ; মর্মপীড়িত সে ; শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল। ইতিমধ্যে সময় চলে গেছে---সে তা জানত, এবং যত বেশি তা অনুভব করছিল, ততই পেলাজেইয়া পেত্রোভ্নাকে শেষ ক'টি সুখমগ্ন মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত করার সাহস তার কমে আসছিল। তাঁকে সে কী বলবে? কীভাবে তাঁকে প্রস্তুত করবে? আইভান্ গোলুবেংকোর মাথা একেবারে গুলিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মনে মনে সব দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সমস্ত কলহ, সবরকম বীরত্ব, এবং তথাকথিত সব জাতের সম্মানের প্রশ্নকে অভিশপ্ত করার মত পর্যাপ্ত সময় সে পেয়েছিল, এবং অবশেষে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল---হয় স্বীকার করবে সব, না হলে পালিয়ে যাবে। নিঃশব্দে চট্ করে সে পেলাজাইয়া পেত্রোভ্না-র হাত ধরে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ল ঠোঁট দিয়ে ছোঁওয়ার উদ্দেশ্যে এভাবে সে নিজের মুখ ঢাকল, তার ওপর হঠাৎ নেমে এল অশ্রুর বন্যা ; প্রবলভাবে, দ্বিতীয়বার না ভেবেই, সে করিডোর্-এ ছুটে গেল বিরাট কোট-টা হেঁচকে নিয়ে, তারপর একটিও কথা না বলে বাড়ির বাইরে।

তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত পেলাজেইয়া পেত্রোভ্না ভাবলেন :

'বেচারা, ও নির্ঘাৎ প্রেমে পড়েছে ---আহা, এই ত তারুণ্যের দুঃখ---সুখের পূর্বগামী।'

এবং তিনি শীগ্গীরই তাকে ভুলে গেলেন। তিনি তখন নিজের স্বপ্ন-সুখ-মগ্ন, অনতিক্রমণীয় এবং সম্পূর্ণ সেই স্বপ্ন-সুখ।

বঙ্গানুবাদ—বিভা চৌধুরী

স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন তক্তার উপর—উপস্থিত আছেন লাটু, রাম দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ]

শ্রীরাম। হ্যাঁ গা রামবাবু নরেনের খবর কি, তাকে না দেখতে পেয়ে আমার বুকের ভেতরটা মোচড়াচ্ছে গো, সে কেন আসে না।

রাম দত্ত। তার বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর বড় কষ্টে পড়েছে। বি-এ পাস করেছে, অথচ কোথাও একটা চাকরী যোগাড় করতে পাচ্ছে না, আর তার উপর আত্মীয়রা বাড়ী ভাগ নিয়ে মামলা জুড়ে দিয়েছে। বেচারী বড় মুস্কিলে পড়েছে।

শ্রীরাম। না না ওর আবার চাকরী হবে কি গো, ওর চাকরী হবে কি। ওর চাকরী হবে নি, খুব কষ্ট পাচ্ছে না? এখানে আসতে বোলো তাহলেই সব হবে।

লাটু। হামার সাথে সেদিন দেখা হোলো ঠাকুরজী। হামি বোললাম ও লরেনবাবু কেমন আছ, কুথা যাচ্ছ, উয়ো হামাকে পুছলো তোদের খবর কি।

শ্রীরাম। লরেন জিজ্ঞেস করলে, আমার খবর জিজ্ঞেস করলে, তুই কি বললি, তুই তাকে ডাকলি না ছোঁড়া এখানে, শালা কোন কর্মের নয়—

লাটু। না হামি তো বোললে চোলেন ঠাকুরজীর কাছে। চোলো, তা হামাকে উ বোললে—

শ্রীরাম। কি বললে, কি বললে লরেন?

লাটু। সে হামি মুখে বোলতে পারবে না। সে খুব খারাপ বাত আছে।

শ্রীরাম। ওরে শালা বল না। খারাপ বাত আছে তো তোর কিরে। বল, কি বললে লরেন।

লাটু। হাপনাকে গালাগাল দিলে, পাগলা বোললে, ক্ষেপা বোললে, মুখ বেজার করলে।

শ্রীরাম। [উচ্চহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ লরেন আমাকে পাগলা বলেছে—ক্ষ্যাপা বলেছে, বেশ করেছে, ওতো বলবেই। ও বলবে না তো কি তুই বলবি, শুনছো রামবাবু শুনেছো লরেন আমাকে ঠিক চিনেছে। ওরে লেটো তুই কি চিনবি, ও যা খুসী বলবে। লরেনকে তোমরা চেন না, আমি চিনি। রামবাবু একবার বোলো লরেনকে আসতে।

ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়

রাম দত্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ—বলবো, আজ তাহলে আসি।

[ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সকলের প্রস্থান, সঙ্গে গেলেন লাটু]

—সঙ্গীত—

শ্রীরাম। গিরি। প্রাণ গৌরী আন আমার।
উমা বিধু মুখ না দেখি বারেক।
এসব লাগে আঁধার।
আজি কালি করে দিবস যাবে।
প্রাণের উমারে আনিবে কবে?
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে,
এ কি তব অবিচার।
সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে,
সে শোকে রয়েছি পরান ধরে,
ধিক্ হে আমারে ধিক্ হে তোমারে
জীবনে কি সাধ আর।
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত,
কেঁদো নাকো রাণি হওগো শান্ত,
কে পাইবে তব উমার অন্ত,
তুমি কি ভাব অসার।

[হাততালি দিতে দিতে ছুটে এলেন লাটু]

লাটু। [হাঁপাতে হাঁপাতে] ঠাকুরজী ঠাকুরজী হাপনার লরেনবাবু আসছে—হাপনার লরেনবাবু আসছে।

শ্রীরাম। তাই নাকি, তাই নাকি, না না তুই শুনেছিস মা, তুই শুনেছিস। কইরে লেটো কই লরেন?

লাটু। [দূরে হাত বাড়িয়ে] ওই ফোটকের কাছে আসছে। হামি দেখেই দৌড়ে আসছি হাপনাকে খোবর দিতে। হাপনি তো খুব ভাবছো।

শ্রীরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাবছি। যা লরেনের জন্যে মাখন, মিছরী, সন্দেশ যা আছে নিয়ে আয়। আজ সারাদিন ও কিছু খায় নি, যা শিগ্‌গীর যা।

[লাটুর প্রস্থান।

শ্রীরাম। মা মা লরেনকে তুই রাখিস মা, লরেনকে তুই রাখিস। লরেন, লরেন আয় আয়, কেমন আছিস, কতদিন আসিস নি—

[নরেন্দ্র প্রবেশ করলেন, মলিন বসন, মলিন চাদর, রুক্ষ চুল, মুখে অল্প দাড়ি, অনাহারে, অনিদ্রায়শ রীর শীর্ণ, ধীরভাবে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে দাড়ালেন]

শ্রীরাম। কি রে, মুখ শুকিয়ে গেছে একবারে। কিছু খাসনি বুঝি সকাল থেকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

নরেন্দ্র। বি-এ পাস করে আমার হল কি? মা, ভাই, বোন সবাই উপোস করে মরছে, আর আমি বি-এ পাস করে কিছু করতে পারছি না।

শ্রীরাম। তুই আবার করবি কিরে তোর চাকরি হবে নি।

নরেন্দ্র। চাকরী হবে নাতো খাব কি, মাকে মুখ দেখাব কি করে? তোমার আর কি, তোমাকে তো কিছু ভাবতে হয় না।

শ্রীরাম। হ্যাঁ তোকেই সব ভাবতে হয়। নে কিছু খা দিকি। [লাটু একটা ডিসে করে খাবার নিয়ে এলেন—

[শ্রীরামকৃষ্ণ আগ্রহভরে খাবারের ডিস নিয়ে নরেন্দ্রকে দিলেন]

নরেন্দ্র। আমার নিজের খাবার জন্যেই যেন আমি ভাবছি, যে লেখাপড়া শিখে ভাই-বোনদের খেতে দিতে পারে না, তার আবার সংসারে থাকা কি জন্যে। আমি ও সব এখন খাবো না।

শ্রীরাম। ওরে লেটো। ও নরেন এক নম্বর গোঁয়ার। রাখ রাখ এখন খাবার রাখ, যা তুই যা, আমি দেখি --

[লাটু দুঃখিত হয়ে খাবারের ডিস ফেরৎ নিয়ে গেলেন]

শ্রীরাম। হ্যাঁরে তোর আবার খাবার ভাবনা, তুই কত লোককে খেতে দিবি। কত জনের অন্ন সংস্থান করবি, তোর আবার খাবার ভাবনা।

নরেন্দ্র। ও সব কথা ছাড়ো, আচ্ছা তুমি যে বল, ঐ মন্দিরে তোমার মা আছেন। তুমি যা বলো তাই মা শোনেন, এ কথা সত্য।

শ্রীরাম। হ্যাঁরে, মাকে যা বলবো তাই মা শুনবে নি? তবে আর মা কিরে? তবে বলার মতন বলতে হবে, তবে তো?

নরেন্দ্র। তোমার মাকে বলে আমাদের সংসারের কষ্টটা দূর করে দাও না। আমি আর আমার মায়ের কষ্ট দেখতে পাচ্ছিনে। তুমি তোমার মাকে বলে আমাদের জন্য কিছু করে দাও---

শ্রীরাম। [সহাস্যে] হাঃ-হাঃ-হাঃ এই কথা। তা আমার মা তোরও মা, সবার মা। আমাকে কেন বলতে হবে, তুই নিজেই বল না।

নরেন্দ্র। আমারও মা। আমি ব্রাহ্ম।

শ্রীরাম। ওরে মা বিশ্বমাতা, সবার মা। মায়ের কাছে কি সাদা ছেলে, কালো ছেলে আছে। যা যা তুই নিজে মাকে বলগে যা---

নরেন্দ্র। আমি যাবো মন্দিরে। মূর্তির কাছে। কিন্তু---

শ্রীরাম। যারে, যা। কিন্তু করতে হবে নি। ভাল করে গিয়ে মাকে বলবি মা নিশ্চয়ই শুনবেন। যা যা---

[শ্রীরামকৃষ্ণ জোর করে নরেন্দ্রকে মন্দিরের দিকে বার বার করে ঠেলে দিলেন]

শ্রীরাম। হাততালি দিয়ে---দেখিস মা, জয় মা, জয় মা, দেখিস মা, দেখসি মা।

[ফিরে এলেন নরেন্দ্রনাথ]

শ্রীরাম। কিরে বললি মাকে?

নরেন্দ্র। না বলা হলো না, মন্দিরে গিয়ে কিছু চাইতে পারলাম না।

শ্রীরাম। কি চাইলি তবে?

নরেন্দ্র। কে যেন আমার মুখ বন্ধ করে দিলে। আমার মন শুধু জ্ঞান, বিবেক, আর বৈরাগ্য চাইলে - - - কেন আমার এমন হল?

শ্রীরাম। দূর পাগল। যা, যা, মন স্থির করে যা, বেশ শক্ত হয়ে যা।

নরেন্দ্র। যাবো---

শ্রীরাম। হ্যাঁরে যা যা।

[নরেন্দ্রর প্রস্থান।

শ্রীরাম। জয় মা, জয়মা, দেখিস মা, নরেনকে দেখিস মা।

[নরেন্দ্র ফিরে এলেন]

শ্রীরাম। কি রে বললি, মাকে বললি?

নরেন্দ্র। না বলা হল না এবারেও বলা হল না। সেই একই কথা মুখ দিয়ে বার হয়ে এল। কিছুই চাওয়া হল না।

শ্রীরাম। দূর ছোঁড়া, তুই কোন কর্মের নোস্। আমি ভাবতাম তুই একটা মরদ।

শ্রীরাম। তুই কেশবের চেলা যা, যা, যা---

[ধার করে দিলেন---]

শ্রীরাম। মা, মা, দেখিস মা, জয় মা, জয় মা।

[নরেন্দ্র ফিরে এলেন]

শ্রীরাম। কি হলরে---বললি?

নরেন্দ্র। না, না, বলা হল না। এ তোমারই কারসাজি।

শ্রীরাম। আমি কি করব। তোকে তো বললাম, যা বলগে যা মাকে, তা তুই নিজে মুখে যদি মায়ের কাছে জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য চাস, মা তোকে তাই দেবে।

নরেন্দ্র। না, না, আমি তো তা চাইতে যাই নি। আমি মায়ের কাছে ঐশ্বর্য চাইতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এ আমার কি হল?

শ্রীরাম। ঠিকই হয়েছে। মা তোর খেতে পাচ্ছে না, এসব তোর বাজে কথা। তোর আসল যা চাই, তাই তুই মাকে বলেছিস---মা তোকে তাই দেবে।

নরেন্দ্র। না না ওসব তোমার কথা আমি শুনতে চাইনে, আমার মা-ভাইয়ের কষ্টের কথা তোমাকেই মাকে বলতে হবে। তুমি বলে দাও, তুমি বলে দাও---

শ্রীরাম। ওরে---আমি যে মাকে ঐশ্বর্যের কথা বলতে পারিনে। কারও জন্যে আমি যে কিছু ভিক্ষে চাইতে পারি নে।

নরেন্দ্র। মাকে বলতে হবে না। তুমি বললেই হবে। তুমি বল আমার মা, ভাইদের কোন কষ্ট হবে না, তাহলেই হবে, তুমি বললেই হবে।

শ্রীরাম। আমি বললেই হবে। বেশ তাই বললাম যা---আজ থেকে আর তোদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কোন অভাব থাকবে নি। কেমন হয়েছে তো? [নরেন্দ্র বার বার শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে মাথা ঠেকালেন।]

নরেন্দ্র। আমি তোমাকে এতদিন ঠিক চিনতে পারি নি, তোমার মাকেও বিশ্বাস করিনি। এখন বুঝেছি তুমিও সত্য, তোমার মাও সত্য। আমি মন্দিরে প্রবেশ করে তোমার মাকে প্রত্যক্ষ করেছি। তুমি আমাকে তোমার অভয় চরণে আশ্রয় দাও, আমাকে বৈরাগ্য দাও, আমি আর সংসারে বাস করতে ইচ্ছা করি না। আমি জ্ঞান চাই, বিবেক চাই, বৈরাগ্য চাই, ভক্তি চাই।

[শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করলেন।]

নরেন্দ্র। [ভীতভাবে] আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, সব অন্ধকার হয়ে এল।

শ্রীরাম। ভাল করে দেখ। কি দেখছিস্!

নরেন্দ্র ।। কেউ কোথাও নেই, তবু তুমি আর আমি; তোমাকেও আর দেখতে পাচ্ছিনে; তুমি আমি এক হয়ে গেছি ।।

শ্রীরাম। তুই আর আমি এক। আমি প্রকৃতি, তুই পুরুষ। তোর কোথাও যাওয়া চলবে না, তুই থাকবি, আমি যাবো। তোকেই নিতে হবে আমার কাজের ভার। নতুন ভাবে, নতুন চেতনায় মানুষের মুক্তির জন্য তোর আসা, তুই থাকবি, আমি যাবো ।।

নরেন্দ্র। [অভিভূত হয়ে]
বেশ তাই হবে; তোমার কথাই থাকবে। তোমার কর্মের ভার আমি গ্রহণ করলাম। তুমি আমার দীক্ষা দাও। বুঝেছি এতদিনে, ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। বুঝেছি বিশ্বজগতে সর্বত্রই তাঁর প্রকাশ; বুঝেছি তুমি যেখানে সেখানেই তিনি। আমার সকল সংশয় দূর করে আমাকে অমৃতের সন্ধান দাও---

[শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন---দূর থেকে ভেসে এল]

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় ।।

।। বিরাম ।।

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[বরানগরে একটি পুরাতন বাড়ীর সম্মুখের পথ—প্রবেশ করলে হরিদাস ও তার ভৃত্য কেলো]

হরি। ঠিক জানিস তো এই পথ দিয়ে গেছে ।

কেলো। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু এই পথ দিয়েই গেল।

হরি। সাধুই বটে তো ?

কেলো। আজ্ঞে হ্যাঁ খাঁটি সাধু।

হরি। খাঁটি সাধু। ব্যাটা বল সাধুর মতন দেখতে।

কেলো। আজ্ঞে হ্যাঁ তাইতো।

হরি। দেখতে কেমন ? লম্বা না বেঁটে?

কেলো। আজ্ঞে লম্বাও নয় বেঁটেও নয়, মনোমত আপনার মতন।

হরি। মুখে দাড়ি আছে নিশ্চয়ই।

কেলো। (একটু ভেবে) আজ্ঞে তা আছে বোধ হয়।

হরি। মাথায় চুল।

কেলো। আজ্ঞে তা তো মনে পড়ছে না। চুল---কি জানি ঠিক মনে পড়ছে না, তবে দাড়ি বোধ হয় নিশ্চয়ই ছিল।

হরি। মাথায় চুল ছিল না অথচ দাড়ি ছিল ?

কেলো। আজ্ঞে সেইজন্যই বোধ হয় বলেছি। তবে মনে হয় বাবু দাড়ি যদি থাকে তাহলে চুলও ছিল।

হরি। সেই কথাই ত জিজ্ঞেস করছি। ব্যাটা কোন কর্মের নয়। একটা লোক বাড়ীতে ঢুকে সাধু সেজে ধাপ্পা দিয়ে বাসন চুরি করে নিয়ে পালাল আর তুই তাকে ধরতে পারলি না।

কেলো। আজ্ঞে ধরতে আমি তাকে পারতাম। কিন্তু আমি তো ছিলাম না, মা আমাকে বাজার পাঠালেন সেই তক্কে।

হরি। সেই তক্কে সে সট্‌কালো।

কেলো। আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরি। তুই যখন দেখলি একটা অজানা লোক বাড়ীতে ঢুকেছে তুই গেলি কেন ?

কেলো। আমি কি করবো, মা যদি আমাকে বাজার পাঠায় যাবো না ?

হরি। তুই লোকটাকে ঠিক দেখেছিলি তো, দেখলে নিশ্চয় চিনতে পারবি।

কেলো। আজ্ঞে হ্যাঁ, বোধ হয় তা পারবো। সাধু আর চিনতে পারবো না খুব পারবো।

হরি। দেখ এক কাজ কর, এই বাড়ীতে তো শুনেছি কজন সাধু থাকে এদের কেউ নন তো ?

কেলো। আজ্ঞে আমারও তাই মনে হয়।

হরি। তুই যা দেখি এই বাড়ীর ভিতর দেখ দেখি তাকে চিনতে পারিস কি না।

কেলো। এই বাড়ীর ভেতর। না বাবু এ বাড়ীর ভিতর যেতে আমি পারবো না। এটা বরানগরের বিখ্যাত ভূতের বাড়ী। এর মধ্যে কোন মানুষ যেতে পারে না, থাকতেও পারে না। এ পোড়ো বাড়ী মস্ত ভূতের আড্ডা।

হরি। ভূতো বাড়ী। ভূতো বাড়ী তো এত লোকজন আছে কি করে?

কেলো। আজ্ঞে আপনি জানেন না আপনি তো বেশী দিন এতদঞ্চলে আসেন নি, এটা বিখ্যাত ভূতের বাড়ী। এখানে যারা থাকে তারা হয় নিজে ভূত না হয় ভূতসিদ্ধ পুরুষ। যারা আছে তারা সব ভূতসিদ্ধ। [নিজ নাক কান মলে কার উদ্দেশ্যে নমস্কার করলে] আমি কি এ-বাড়ীর ভেতর যেতে পারি?

হরি। যারা আছে তারা সবাই ভূতসিদ্ধ পুরুষ? বলিস কি? আচ্ছা আমি নিজেই একবার দেখি তবে। তুই আমার পিছনে আয়। দরজার দিতে গমনোদ্যত।

কেলো। (দু পা পিছিয়ে এল)। না বাবু এমন কাজও করবেন না এ-বাড়ীর ভেতর ঢুকবেন না আপনার যতই জিনিস চুরি যাক যদি এরা নিয়ে থাকে কিছুতেই এদের বাড়ীতে ঢোকা হবে না। আমি তো ঢুকতেই পারবো না আপনাকেও যেতে দোব না।

হরি। আমার তোর মতন ভূতের ভয় নেই, আমি যাবোই।

কেলো। (কোমড় জড়িয়ে ধরলে)। না বাবু কিছুতেই এই বাড়ীতে ঢুকতে দোব না। মা আমাকে কি বলবে, না বাবু নিষেধ করছি কথা শুনুন।

হরি। আচ্ছা মুস্কিল তো। কি বিপদেই পড়া গেল। আরে বলি জিনিস-গুলো উদ্ধার করতে হবে তো? ছাড় ছাড়।

[গোলমাল শুনে লাটু বার হয়ে এল। গেরুয়া কাপড় কোমরে জরান, মুখে দাড়ি, মাথায় চুল। লাটুকে দেখেই কেলো একপাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হরিও ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল।

লাটু। কি হোল এত গোলমাল কেন? কাকে দোরকার?

হরি। [লাটুকে ভাল করে দেখে সাহস করে এগিয়ে গেল] কাকে আবার আপনাকে। তোমাকে।

লাটু। হামাকে? কেন? হামাকে আপনার দোরকার, কি দোরকার?

হরি। কেলো এইতো সাধু এইতো।

কেলো। [দুবার ঢোক গিলে হাত-জোড় করে] আজ্ঞে বোধ হয়। কি দরকার? বাবু চলে আসুন চলে আসুন অত কাছে যাবেন না ওঁরা ভূতসিদ্ধ এখুনি।

লাটু। (সহাস্যে) কি দোরকার বলুন তো? কি হোল কি?

হরি। ওঃ কিছু জানেন না যেন? তুমি আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে খাবারের নামে ডিস গেলাস চুরি করে ফিরে এসেছ আবার সাধু হয়েছ।

লাটু। হামি, কখন, আপনি ঠিক বলছেন না। কার কোথা বলছেন হামাকে বলছেন?

হরি। [একবার কেলোর দিকে তাকিয়ে] তোমার কথা বলছি? এখন বোকা সাজলে তো চলবে না আমি সব সাধুদেরই জানি। ভালয় ভালয় বাসন তিনটি দিয়ে দাও চলে যাবো নইলে পুলিশ ডাকবো, লোক জড়ো করবো, এপাড়া থেকে উচ্ছেদ করবো। দাও দাও জিনিষগুলো দাও।

লাটু। আরে আপনি ভুল করছেন বাবু, হামরা কেও দোর থেকে কোথাও বার হায় না আর হাপনার বাড়ী যাবো চোরি করতে।

হরি। আমার চাকর তোমাকে দেখেছে আর তুমি না বলছ, এখনও বলছি কথামত কাজ কর নইলে মজা দেখবে। কিরে কেলো এই সাধুই তো। না।

কেলো। [এতক্ষণে তার সাহস হয়েছে] আজ্ঞে এইই তো, ঠক এই সাধু। দেখুন দাড়ি আছে, আপনার মতন দেখতে, সব মিলে যাচ্ছে।

হরি। হ্যাঁ হ্যাঁ এই, এ না হয়ে যায় না। [কেলোর কানে কানে কি বলছে কেলো আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে লাটুর পিছন দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল তাকে ধরবার জন্যে]। কোন কথা শুনতে চাই না, তুমি জিনিষগুলো বার কর। আমি থানা পুলিশ করবো না---তা না হলে [কেলো পিছন দিক দিয়ে লাটুকে ধরে ফেলেছে, হরি নিজের চাদর দিয়ে বাঁধতে উদ্যত] বেঁধে নিয়ে যাবো থানায় একেবারে]

লাটু। আরে কি সর্বনাশ এতো বড় মুস্কিল, আরে ছাড়রে বাবা ছাড় কি জ্বালাতন [প্রবেশ করলেন সুরেন্দ্রনাথ এদের অবস্থা দেখে]

সুরেন্দ্র। আরে ব্যাপার কি ব্যাপার কি? লাটু কি হোল, আরে হরিবাবু যে কি ব্যাপার লাটুকে ধরেছেন কেন?

হরি। সুরেনবাবু এখানে, এই দেখুন না ব্যাটা সাধু, একের নম্বরের চোর।

সুরেন। চোর, লাটু চোর, ছাড় ছাড় আরে ছাড়ো না।

[কেলো লাটুকে ছেড়ে দিলো]

কেলো। হ্যাঁ বাবু নম্বরি চোর, আমাদের ঘর থেকে থালা, বাটি চুরি করেছে।

[লাটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো]

সুরেন। কে চুরি করেছে---এই লাটু, কি বলছ তোমরা, কিরে লাটু?

লাটু। [হাসতে হাসতে] কি বলবো সুরেনবাবু, কোন সাধু হয়তো এঁদের বাড়ীতে চুরি করেছে এখন হামি তো সাধু কাজেই হামাকে লিয়ে টানাটানি, কি মুস্কিল।

হরি। টানাটানি মানে---তোমাকে দেখেছে আমার চাকর। আর তুমি না বলছ, কি রে কেলো এই তো?

লাটু। কি হামাকে দেখেছ, তোমাদের বাড়ীতে, কবে, ঠিক করে বলতো!

সুরেন। [ধমক দিয়ে] ঠিক করে বল, একে দেখেছ তোমাদের বাড়ীতে এই সাধু 'তুমি ঠিক দেখেছ'

কেলো। [সভয়ে] আজ্ঞে আজ্ঞে, আমি তো ঠিক দেখি নি---মা বলছিল একজন সাধু---তাই। আমি তো তোমাকে দেখি নাই, আমি নিজে দেখি নাই।

হরি। তবে যে তুই বললি এই সাধু---তুই দেখেছিস।

কেলো। [মুখ কাচু মাচু করে] আমি, না তো? আমি তো অ বলি নি। আপনি বললেন এই সাধু---আমি বললাম বোধ হয়; আপনি ধরতে বললেন, আমি ধরলাম; আমি তো সাধু দেখি-ই নাই।

হরি। ব্যাটা, এখন মিছে কথা হচ্ছে, তুই বললি এই সাধু, আর এখন ব্যাটা এ তোরই কাজ, তুই চুরি করেছিস, চ ব্যাটা, তোকেই আমি থানায় দোব, তুই-ই চোর।

কেলো। [ক্রন্দনরত] বাবু আমি কি করবো। আমি তো বললাম উনারা ভূতসিদ্ধ সাধু, ওদের ধরো না---তা আপনি তো---

সুরেন। কি ব্যাপার কি বলতো হরি-বাবু, কি ঘটনাটা কি?

হরি। ঘটনাটা হচ্ছে, আমি বাড়ীতে ছিলাম না। এক সাধু এসে আমার বাড়ীতে ঢুকে স্ত্রীর কাছে এক গেলাস খাবার জল চায় আমার স্ত্রীর কাছে। স্ত্রীলোক---সাধু জল চেয়েছে, অ শুধু জল না দিয়ে একটি কাঁসার ডিসে কিছু খাবার, গেলাসে জল, পা-ধোবার গাড়ু---সব দিয়ে একটু ভেতরে গেছে; আরও খাবার আনতে আর এই ব্যাটা তখন দাঁড়িয়ে।

কেলো। আজ্ঞে না, আমি তখন বাজারে, মা আমাকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন, আমি ছিলাম না।

লাটু। তুমি সাধুকে একদম দেখলে না তো হামাকে চিনলে কি করে?

কেলো। আজ্ঞে বাবু বললেন, তাইতো চিনলাম।

সুরেন। আচ্ছা, আচ্ছা, তারপর।

হরি। আমার স্ত্রী এসে দেখে সাধু সব নিয়ে পালিয়েছে. চোর এসেছিল।

সুরেন। তাই এই সাধুকে ধরেছ? তোমরা কাণ্ড বটে।

হরি। আজ্ঞে ভাবলাম, এই বরানগরের এই বাড়ীটা চিরকালের পোড়ো বাড়ী, এখানে কখনো মানুষ থাকতে পারে না। আমি তো এই কিছুদিন এ-পাড়ায় ভাড়া এসেছি---এসে শুনলাম, এই পোড়ো বাড়ীতে কতকগুলো সাধু এসেছে, বুঝলাম সাধু না ছাই, কতকগুলো চোর এসেছে। সেইজন্যেই একে ধরেছিলাম।

লাটু। ধরেছিলেন, বেশ করেছিলেন, কিন্তু সুরেনবাবু না এলে মরে যেতাম যে।

হরি। আপনি এদের জানেন না কি, এরা চোর নয়?

সুরেন। আজ্ঞে না, এরা চোর নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনেছেন, তাঁরই শিষ্য ক'জন এ-বাড়ীতে থাকেন, সাধন-ভজন করেন, ঠাকুরের তিরোধানের পর, কাশীপুর ছেড়ে বরানগরের এই বাড়ীতেই এঁরা মঠস্থাপন করে আছেন। আর আপনার চোর সাধু ওখানে ধরা পড়েছে দেখুন গা? তার থলি থেকে অনেক মাল বেরিয়েছে, আপনার জিনিষও আছে, যান ওখানে ছোকরারা তাকে ধরেছে।

হরি। তাই নাকি, তাই নাকি, এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য। কি অন্যায়, কি অন্যায়---খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন সাধু বাবা, ক্ষমা করুন, ওরে কেলো ব্যাটা, পায়ের ধুলো নে।

[পদতলে প্রণাম করলে দু'জনেই, লাটু পিছিয়ে গেল]।

লাটু। আরে বাবা, হামাকে পরনাম করতে নেই, হামি সাধু নই বাবা, ঠাকুরের সন্তান আছি।

হরি। তা বললে কি হয় বাবা, অপরাধ নেবেন না, যত নষ্টের মূল এই কেলো।

কেলো। আমি কি করবো। আপনি বলার পর তো আমি বলেছি। দেখো বাবা, আমার যেন কোন অপরাধ নিয়ো না, আমি ভূতকেও ভয় করি, ভূতসিদ্ধ মানুষকেও ভয় করি।

সুরেন। যাও, যাও, তাড়াতাড়ি যাও, ওখানে আবার সাধু পালাবে।

হরি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল, চল, কেলো। আচ্ছা নমস্কার সুরেনবাবু, নমস্কার সাধু বাবা। [দ্রুত প্রস্থান উভয়ের]।

লাটু। [সহাস্যে]। হাপনি না এলে কি মুস্কিল।

সুরেন। শ্রীধর যেতিস---বেশ হোতো। তোদের কোথাও রেখে নিশ্চিন্ত নেই দেখি। চ, চ ভেতরে চ।

[বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান]।

[ক্রমশ।

ওপার বাংলার স্বাধীনোত্তর বাংলা উপন্যাস

অজয় নন্দী

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা উপন্যাসে মুসলমান সমাজের চিত্র অত্যল্প। প্রকৃতপক্ষে 'আনোয়ারা' আর 'আবদুল্লা'ই ছিল প্রতিনিধি স্থানীয়। এই দুই উপন্যাসে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের ছবি অতি বিশ্বস্ততার সাথে অঙ্কিত হলেও ওপার বাংলার সে সমাজ আজ দ্রুত অপসৃয়মান এবং মাত্র অল্প কিছুসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানবাসীর কাছেই এই উপন্যাস দু'টির আজ সমাদর। নাতিদূর ভবিষ্যতে তা শুধু-মাত্র একটি অতীত সমাজের দলিল হিসেবেই হয়তো বিবেচিত হবে।

স্বাধীনতার পর ঢাকা হল ওপার বাংলার রাজধানী। একটা জেলা শহর থেকে অকস্মাৎ রাজধানীর গৌরব অর্জন করলেও অতি আধুনিক নগর জীবনের সব বৈশিষ্ট্য আজও সেখানে অনুপস্থিত। তাই প্রচুর লেখক তাঁদের উপন্যাসের উপাদানের জন্যে এই নগরজীবনের কাছেই ভীড় করলেও অন্যরা কিন্তু আজো নজিবুর রহমান আর ইমদাদুল হকেরই অনুসারী। তার মধ্যেও অবশ্য বেশ কিছু ক্রমরূপান্তরের চিহ্ন অনুপস্থিত নয়, গ্রাম্য উপজাতীয় ও আঞ্চলিক মানুষদের বিশেষ আনা-গোনাও এ সাহিত্যে বিশেষ লক্ষণীয়। তাদের অনেক ক'টিই উন্নত শ্রেণীর উপন্যাস হিসাবে আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর "লাল সালু" (১৯৪৮), সামসুদ্দীন আবুল কালামের "কাশ বনের কন্যা" (১৯৫৪), আবু ইশাকের "সূর্য দীঘল বাড়ী" (১৯৫৫), শওকত ওসমানের "জননী" (১৯৬১) শহীদুল্লা কাইসারের "সারেঙ বৌ" (১৯৬২), আলাউদ্দীন আল আজাদের "কর্ণফুলী" (১৯৬২), জহীর রায়হানের "হাজার বছর ধরে" (১৯৬৪) জহীর-উদ্দীনের "পেচা কাহিনী" (১৯৬৪) এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলোই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এসবের মধ্যে "লাল সালু"র খ্যাতিই বোধহয় সর্বাধিক। এক বাতলবাজ মৌলবী কিভাবে একটা অজ্ঞাত কবরকে লাল সালুতে ঢেকে এক পীরের সমাধি বলে প্রচার করে জনতার সরল মানসিকতাকে আপন স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছিল তাই অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চরিত্র চিত্রণে ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে এই উপন্যাসটি আজ প্রভূত সমাদর লাভ করেছে।

"সূর্য দীঘল বাড়ী"ও প্রকাশের সাথে সাথেই ভীষণ সাড়া জাগায়। এই উপন্যাসের কাঠামো সম্বন্ধে বেশ কিছু বিরূপ সমালোচনা হলেও গ্রাম্য সমাজের সমস্যা ও তার সমাধানে গ্রামীণ মানুষের সংগ্রাম লেখক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর প্রত্যেকটি চরিত্রই বাস্তব পৃথিবীর রক্তমাংসের গন্ধমাখা ও বিশ্বাসযোগ্য। এই ধরণের উপন্যাসে যে কল্পনা-প্রবণতার লক্ষণ দেখা যায় তাও এখানে অনুপস্থিত।

আরেকটি সার্থক উপন্যাস "জননীতে" সস্তা সেন্টিমেন্টের স্বাভাবিক বিস্ফোরণের পরিবর্তে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে জননীদের কঠিনতর সংগ্রাম সাফল্যের সাথে চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে জননী দরিয়া আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেও তা তার মহত্বকেই দৃঢ়ীভূত করেছে। নূর ও সাবরীর সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্রায়ণ।

"সারেঙ বৌ" সাধারণ গ্রাম্য-জীবনের কাহিনী নয়, একটি বিশেষ শ্রেণীর জীবন কথা। আলম মাঝির বউ নমিতুন এই উপন্যাসের নায়িকা। তাকেও প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেই জিততে হয়েছে। জইগোন, দরিয়া আর নমিতুন ওপার বাংলার স্বাধীনোত্তর উপন্যাসের তিনটি মহান নারী চরিত্র।

কিন্তু তথাপি, রোমাণ্টিক অতি-প্রবণতাই বোধ হয় এসব উপন্যাসের প্রধানতম ত্রুটি। ওপার বাংলার গ্রামীণ জীবনও দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে, গ্রাম্য-জীবন উৎপাটিত হচ্ছে নগর জীবনের উৎকেন্দ্রিকতায়, কিন্তু এই রূপান্তরের কোন ছকবাঁধা পথ নেই। ধনতন্ত্র দেশের মাটিতে দৃঢ়মূল হচ্ছে কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের মানসিকতা সমাজবাদেরই দিকে। তাই আধুনিক লেখককুল ধনী বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে মুখর। এম, আর, শেখের "পাতাল শর্বরী"তে এই বুর্জোয়া সমাজেরই অসুন্দর ও লোভী চিত্র চিত্রায়িত।

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা—মধ্যবিত্ত সমাজ আর নারী জাতিই তার সবচেয়ে বড় বলি। মধ্যবিত্ত জীবন এক শ্বাসরোধী পরিস্থিতিতে দিশেহারা। স্ত্রী জাতির অবস্থা আরো শঙ্কাজনক। নারী স্বাধীনতার শ্লোগান তাদের শুধু বঞ্চনাই করেছে। আরোপিত স্বার্থের লোকেরা তাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই শুধু নিয়োগ করে চলেছে। তার মধুকণ্ঠ, তার অর্ধ উলঙ্গ মূর্তি ও ছবি এখানে-ওখানে ব্যবহৃত হচ্ছে খরিদ্দার আকর্ষণের উদ্দেশ্যে চরম নির্লজ্জ-ভাবে। সভ্যতার ইতিহাসে নারীত্বের এমন অবমাননা বোধ হয় আর হয় নি। ওপার বাংলার অনেক উপন্যাসিকের লেখনীই আজ এই [illegible] [illegible] সোচ্চার।

নীলিমা ইব্রাহিমের "বিশ শতকের "মেয়ে" আবদুর রজ্জাকের কন্যা কুমারী" রশীদ করিমের "প্রসন্ন পাষাণ", হুমায়ুন কাদিরের "নির্জন মেঘ", এবং দিলীরা হাসেমের "ঘর-মন-জানালা" এই চেতনারই বলিষ্ঠ উপন্যাস রূপ।

আধুনিক নগর-জীবন, নিজ দোষে নিজেই বিস্বাদ। ধন বণ্টনের অসাম্যজনিত মানসিক প্রতিক্রিয়া মনস্তাত্ত্বিক অবসাদ আর সব পেয়েছিদের সমাজের অসীম স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ সর্বহারাদের শোষণের বিনিময়ে অনেক ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু এই। রজিয়া খানের "বটতলার উপন্যাস" ও "অনুকল্প" শওকত আলির "পিঙ্গল আকাশ" এবং সৈয়দ সামসুল হকের "সীমানা ছাড়িয়ে" প্রভৃতি উপন্যাস তারই লেখনীচিত্র। কিন্তু পাশ্চাত্য উপন্যাসের অতি উগ্র প্রভাব সাধারণ পাঠকের সেণ্টিমেণ্ট থেকে এদের উপন্যাস রচয়িতাদের ততটা পাঠক ঘনিষ্ঠ করে তুলতে পারছে না। প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেরই প্রতিবেশ কৃত্রিম তাই অস্বাভাবিক।

আলাউদ্দীন আল আজাদের "খুদা ও আশা" (১৯৬৪) উপন্যাস প্রকাশের পর থেকে ওপার বাংলার উপন্যাসে নূতন আরেকটি ধারার সূচনা হচ্ছে। তারই অনুবর্তী সর্দার জয়েনুদ্দীনের "অনেক সূর্যের আশা" (১৯৬৭) এবং শহীদুল্লাহ কাইজারের "সংশপ্তক" (১৯৬৫)। ঔপন্যাসিক এখানে একটি সমগ্র এবং সম্পূর্ণ জীবনকেই অঙ্কিত করেন। সে জীবন ভালোও না মন্দও না। এই জীবনে ভালো-মন্দের মিশ্রণ, এ-জীবন বর্তমান জীবন নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের প্রান্তে এ-জীবন বিধৃত।

এছাড়াও আছে আরো বিচিত্র ভঙ্গীর উপন্যাস। তাদেরকে বিশেষ কোন শ্রেণীতে আবদ্ধ করা যায় না। তবুও কিছু কিছু উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজলের "রাঙা প্রভাত" (১৯৫৭), শওকত ওসমানের "ক্রীতদাসের হাসি" (১৯৬২) এবং ওয়ালিউল্লাহর "চাঁদের অমাবস্যা" (১৯৬৪) এই ধরণের উপন্যাস।

"ক্রীতদাসের হাসি" কি বিষয়বস্তু কি উপন্যাসের গঠন উভয়বিধ দিক থেকেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠককে বাগদাদের হারুণ অল্ রশীদের রাজত্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর তার সামনে নাটকীয়ভাবে উদ্‌ঘাটিত করে ধরা হয়েছে শাশ্বত সত্যকে। "ক্রীতদাসের আন্তরিক হাসি শুধুমাত্র টাকা দিয়েই কেনা যায় না।"

"চাঁদের অমাবস্যায়" অস্তিবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। স্বল্প ঘটনায় এই উপন্যাসে চেতনাকেই ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

রাবণবধ পালা গান

রাবণবধ পালা গান' পুঁথিটি মালদহ অঞ্চলে সংগৃহীত। পুঁথির নামকরণ বিষয়বস্তু তথা আঙ্গিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়। এতে ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষণীয়। অধ্যাত্ম-চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে প্রায় পদেই। এখানে শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বররূপে পাই যা কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর 'রামায়ণে' অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু বাল্মীকির লেখনীতে শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ মানুষ যিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত'। রাম ও রাবণের কথোপকথন ও মাঝে মাঝে এই পালা গান রচয়িতার অধ্যাত্ম-চিন্তার মূর্ত প্রকাশ হিসেবে আত্মকথন পুঁথিটিকে সুন্দর করে তুলেছে কিন্তু সেই সঙ্গে রচয়িতার লৌকিক সংস্কার ও চিন্তাধারা তাঁর স্বচ্ছ ও স্বাধীন চিন্তাধারাকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে তুলেছে ও তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাবণের সীতাহরণে যে পাপের বীজ রোপিত হয়েছে তাই তাকে সবংশে নিধন করেছে।

পুঁথিটির মোট পদের সংখ্যা ত্রিশ, এর ভাষা প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার নিদর্শন নয়, আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। বাক্‌বাদিনীর বন্দনা করে পালা গান সুরু হয়েছে। পালা গানটি বিভিন্ন পদের সমন্বয়ে গঠিত। যে ত্রিশটি পদের উল্লেখ পাওয়া গেছে তার সবগুলোর অস্তিত্ব পুঁথিটিতে বজায় থাকে নি। পদগুলি নিম্নে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হোল :---

(অবিকল ভাবে)

নম নম বাক্‌বাদিনী শ্বেতাম্বর শ্বেতবরণী
এ অধমে দয়া কর বলি গো শঙ্করনন্দিনী
বড় আশা আছে মনে স্থান নিব শ্রীচরণে
কৃপা কর এ অধীনে, কাতরে ডাকি জননী॥
॥১॥

জিজ্ঞাসিহে ওহে মন্ত্রী সুমন্ত্রণা বলো বলো
কনক লঙ্কাপুরী আমার বীরশূন্য হইলো।

●

॥২॥

এত কেন চিন্তা কর শুন ওহে মহারাজ
রামলক্ষ্মণেরে বান্ধিয়া আনিবে রাজ সমাজ।
হেন যোদ্ধা মহীরাবণ মায়ায় জিনে ত্রিভুবন
করবে বৈরী নির্যাতন রক্ষা না পাইবে আজ॥
॥৩॥

কালীশংকর ঠাকুর

ওহে মন্ত্রী শুন মন্ত্রী বলি তোমারে
এমন যোদ্ধা কে আছে যে মায়া রণে রামে মারে।
ছিল বীর কুম্ভকর্ণ সে যখন হয়েছে নিধন
কি করিবে মহীরাবণ কেন প্রবোধ দেও আমারে॥
॥৪॥

ওরে ও দূত কি কথা শুনালি
হৃদয়ের ধন মহীরাবণ কোথায় রাখিয়া এলি।
বড় আশা ছিলো মনে মহী জিনিবে রণে
না মারিয়া রামলক্ষ্মণে হনুর হাতে প্রাণ ত্যজিলী॥
॥৫॥

কোথায় গেলি রে আমার প্রাণের মহীরাবণ
তব শোকানলে রে বাপ দহিছে মম জীবন।
নিকষা মাতার না শুনি বাণী মলি বীর চূড়ামণি
সূর্পনখা চণ্ডালিনী মজালে আজ লঙ্কাভুবন॥
॥৬॥

আজ সাজরণে বীরগণে যুঝিতে সমর
এ জীবনে কিবা আশ শুন মন্ত্রীবর।
এ দশাননেরে বাণে কম্পমান দেবগণে
মারি রাম লক্ষ্মণে আর ঘরপোড়া বানর।
॥৭॥

কহি হে রাবণ, ওহে প্রাণধন, কর না হে রণ শ্রীরামের সনে।
গৌতমের পত্নী অহল্যা জননী
পাষাণ রমণী চরণ গুণে।

●

যে পদেতে গঙ্গা হলেন উপাদান
বামন হয়ে নিলো ত্রিপাদভূমি দান।
পঞ্চমুখে যে নাম জপে পঞ্চানন
নাহি প্রয়োজন সে রামের রণে।
॥৮॥

রণে বাধা দিও না হে শুন ওহে মন্দোদরী
দেখবো একবার করে যুদ্ধ মারি কিংবা প্রাণে মরি।
শোনো ভাই কুম্ভকর্ণ নিকুম্ভ কুম্ভ দমন
শোনো পুত্র মহীরাবণ বৃথা এ জীবন ধির॥
॥৯॥

চিনলে নাহে তাড়কারে রাম কি সাধারণ
নয় মনুষ্য শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ দেবনারায়ণ
বহুকাল লঙ্কাপুরে রাজ্য করিলে
বানরেতে কোনকালে করেছে সাগর লঙ্ঘন॥
॥১০॥

আর কি বুঝাব প্রিয়ে তুমি হে আমায়
ধ্যানযোগে মুনী ঋষি যারে না দেখিতে পায়।
তপ করি কত জনম দেখা পায় না সে চরণ
হে সাক্ষাৎ নারায়ণ
কৃপা করি সে রামচন্দ্র হয়েছে আমায় সদয়।
॥১১॥

ওহে প্রাণপতি করিহে মিনতি, স্থির করি মতি শুনহে চন।
শুনহে রাজন করি নিবেদন, রামের সীতা লক্ষ্মণ করহ অর্পণ॥
বঞ্চিলাম আমি ভাগ্যবলে হীন
বল বুদ্ধি সব পাশরে প্রবীণ
লক্ষ্মীরূপে সীতে ভুবনে পূজিতে
রেখেছো সে সীতে আশোক কাননে॥
॥১২॥

মোর প্রাণ থাকিতে কি রামকে সীতা করে। অর্পণ
বরঞ্চ রামের হাতে ত্যজিবে জীবন

তা ফিরে দিলে এখন হাসবে বঙ্ক বিভীষণ
রিয়া দেখিবো রণ এই আমার পণ। ॥১৩॥

হে প্রাণনাথ শুনহ কিঞ্চিৎ নাহি তোমার মত অভাগ্য এমন
ব রূপধরি আইলেন হরি রণপরিহরি লওগো স্মরণ।

সংসারের কর্ত্তা রাম পতিতপাবন
ত্রিভুবনে সবাকে করেন পালন
ভবে দেখ মনে যিনি সত্ত্ব গুণে, তোমায়
বধবে প্রাণে হইয়া শমন॥ ॥১৪॥

সামান্যত বুদ্ধি তব ও মন্দোদরী
রামতুল্য ভাগ্যবান আর কে আছে হে লঙ্কাপুরী
জপ-যজ্ঞ পূজা করে, কেহ না রাখিতে পারে
শন স্বয়ং বিষ্ণুরে
বিনা অর্চনাতে পরে হয়েছে রে দুয়ারের দ্বারী॥ ॥১৫॥

অদ্য রণে বধবো তোরে শুনরে ভণ্ড জটাধারী
সীতার আশা ত্যাগ করিয়া পাঠাইব শমনপুরী।
তোর যদি ক্ষমতা থাকত্তো ভ ত কি রাজ্য নিত
বিধাতা ত বরে দিত সঙ্গে সে ধন দিয়ে নারী॥ ॥১৬॥

ওহে নারায়ণ কৌশল্যা নন্দন তব বাণে জীবন ওষ্ঠাগত প্রায়
করি কর জুড়ি তব শুভ ক্ষমা দেও হে হরি অধম জনায়।
বিশ্বের আরাধ্য অগতির গতি নিদানে স্থজিত তুমি প্রজাপতি
তুমি দিবাকর যমপুরন্দর করহ উদ্ধার এই পাপ আত্মার॥ ॥১৭॥

ওরে ভাই লক্ষ্মণ জানিলাম এক্ষণ লও গো পুরে একজন ভক্ত দশানন
সীতার উদ্ধারে আর কার্য নাই কিরে
বনে যাই তুমি বাওরে ভাই অযুধ্যে ভুবন।
অযোধ্যার রাজা কর বিভীষণে কিরে না যাইব অযোধ্যা-ভুবনে
যেমন জটাবল্কল পড়ি হলেন বনচারি
ঐ বেশেতে একাল করবো সমাপন॥
॥১৮॥

এখে সমাপ্ত সিন্ধু মম শুনরে ভণ্ড রামতপস্বী।
যমের ভবন পাঠাইবো দেখরে মম তীক্ষ্ণ অসি।
ইন্দ্র আদি দেবগণে পরাজয় করিছে রণে
কাটি মুণ্ড তীক্ষ্ণ বাণে মনে কর তোর সে রূপসী।
॥১৯॥

শ্রীরামের বাণে কভু না মা প্রাণে
হেরো নয়নে কালী রসময়ী
পতিতপাবনী দীনজন জননী
ডাকি মা তারিণী দেখা দেও আমায়।
কেহ নাকি মোর ভরসা সংসারে
সকলি ত্যজিয়া তাই ডাকি মা তোরে
শুনেছি পুরাণে ব্যক্ত ত্রিভুবনে
ভক্তেরি স্মরণে হওগো সদয়॥
॥২০॥

আহা কার সাধ্য ওহে মৈত্র বধিবে রাবণ
জগদম্বা যারি কোলে বসে আছে দশানন।
॥২১॥

চিন্তা কর না চিন্তা ও চিন্তামণি
তুমি জগতেরি চিন্তা কেন চিন্তা কর তুমি
ষষ্ঠীকল্পে কর বোধন, চণ্ডি কর আরাধন
বিনাশ হইবে রাবণ শুনহে র ম রঘুমণি॥
॥২২॥

হের গো পার্বতী আমি দীন অতি
ও পদেতে স্থিতি চায় রঘুমণি
আমি দুঃখের ভাজন কর নিবারণ এবা
সব বলে তোমায় দুঃখ নিবারিণী।
সুখভাণ্ড অল্প দুঃখ তাহে ভারি
তথাপি রেখেছ পূর্ণ না বিচারি
নিঃশেষ করি অয় যদি ভেঙ্গে যায়
তবে এ দুঃখ রাখিতে স্থান কে আছিনী॥
॥২৩॥

শুনগো তারিণী গণেশজননী
প্রতি রঘুমণি হওগো সদয়
রাজ্য ত্যজ্য করে কাননে আনিলে
রাবণ যারায় সে যে জানকী হরিলে
ঠেকিছে গো দায়ে সীতার উদ্ধারে
রাবণ সংহরে দওগো অভয়॥
॥২৪॥

ওহে রঘুপতি আপনি স্মৃতি নাহিত
বসতি মানব ব্যবহারে
করো না চাতুরী, ওহে জটাধারী,
রাবণ---তোমার দ্বারী বৈকুণ্ঠ নগরে।
ব্রহ্মশাপে ধরা পাইলে রাবণ সিন্ধুজলে
সেতু করিলা বদ্ধ
তোমার জানকী পরমা প্রকৃতি
রাবণের সাধ্য কি হরিতে সীতারে॥
॥২৫॥

আহা হোলো না হোলো না মৈত্র, জানকী উদ্ধার।
কার সাধ্য ওহে মৈত্র আন গিয়ে ব্রহ্মশর।
আনে এমন কোন জন সে স্থান হইতে বাণ
হায় না বহে পবন
অতি ভয়ঙ্কর স্থান॥ ॥২৬॥

মন্দ কেন মন্দোদরী আমি দ্বিজ ব্রহ্মচারী
বাস করি না বাসে আমি বনে বনে ভ্রমণ করি
শুন আমি বলি মুণি খাই কেবল ফলমূল
রাবণ কিঙ্কর আমি রামদাস কেবল নামটি ধরি॥ ॥২৭॥

যাহ যথা দশানন, ওরে ভ ই লক্ষ্মণ
রাক্ষস স্বভাবে অধর্ম করেছে,
উদ্ধার হইবে পাবে দরশন।
রাজ্য পাবো গিয়া অযোধ্যা নগরী
কে শিখায়
রাজনীতি কোথা শিক্ষা করি
হায় বানর সঙ্গে ফিরি, রাজবংশে
না জানি ধর্মাধর্ম
কে শিখাবে রাজকর্ম অযোধ্যা ভুবন॥
॥২৮॥

কি নিতি শিখিবা ওহে রঘুবর
দয়া করে চরণ ওহে নরায়ণ করহ অর্পণ
মস্তকে আমার।
মায়ার মানব বিশ্বময় তুমি; তোমার মহিমা
কি জানিবো আমি
হে রঘুমণি তুমি গো লোকেরি পতি,
কি শিখিবো নিতি
সংসারে নিতি তোমার গোচর॥ ॥২৯॥

ও ভাই দশানন আমাকে ছাড়িলী
সীতারে করিয়া চুরি সবংশে শেষে মজিলী
মরণ করিলি, যার সীতা ফিরে দিলে না তার
পায়ে ধরে সাধলাম তোমায়, মম কথা
না শুনিলি॥ ॥৩০॥

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীমঞ্জুশ্রী চাকী-সরকার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আসলে শ্রীমতী গ্রাহামের অভিনব চিন্তাধারা ওদেশের সমগ্র শিল্পের মনোজগৎকেই আন্দোলিত করেছিল। শ্রীমতী গ্রাহাম বলেন,

"I am a dancer ... Dance ... has been the symbol of the performances of living. .. The instrument through which the dance speaks is also the instrument through which life is lived ; the human body."

গ্রীক কাহিনীগুলি তাঁর নৃত্যে পুরাতন গল্পের পুনরানুবৃত্তি নয়। ইনি সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গড়েছেন, দুঃসাহসিকভাবে তাকে ঢেলে সাজিয়ে নূতন নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন। শ্রীমতী গ্রাহামের 'কেভ অব দ্য হার্ট' নৃত্যে প্রতিহিংসাপরায়ণা ডাইনী মিডিয়া মানুষের সর্বগ্রাসী প্রেম, হিংসা যা শেষে মানুষকেই ক্ষতবিক্ষত করে দলিত করে তারই প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'সেরাফিক ডায়লোগ "-এ কুমারী, যোদ্ধা, শহীদ---তিনের অন্তরালে জোন অফ্ আর্কের গভীর অধ্যাত্ম-শক্তিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সমাপ্তিতে জোন স্বর্গের দ্বারে উপনীত। হাল্কা রসে তারুণ্যের চাঞ্চল্য ফুটে উঠেছে ওঁর "ডাইভারসন অব এ্যাঞ্জেলস"এ।

শ্রীমতী গ্রাহামের আঙ্গিকের বিশ্লেষণ করে "Dance to the Piper গ্রন্থে কুমারী দ্যামিল লিখেছেন,

"In ballet movement, the arms and legs are used as separate revolving members of a steady spine. Ballet is largely a series of poses, linked with the lightest and most flowing movement . . . Graham's novel approach was in thinking of dancing as a movement. Graham thought that effort was important since, in fact, effort is life, and that the use of the ground was vital rather than escape from it. And because effort starts with the nerve-centres, it follows that a technique developed from percussive impulses and flowed through the body and the length of the arms and legs, as motion is sent through a whip, would have enormous nerveous vitality."

গ্রাহাম এই শক্তিকে প্রকাশ করেছেন ওঁর নৃত্যে কনট্রাকশন-এর মধ্যে---দেহকে নানাভাবে সঙ্কোচন করার ভঙ্গী ওঁর নৃত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। সংকোচন থেকে আবার উন্মোচন এবং বিশেষ করে হাঁটু ও উরুর উপর নির্ভর করে নানা-ভাবের পতন ভঙ্গী, দেহের নিম্নাংশ শূন্যে তুলে ধরা---সমতলের নানাভাবে ব্যবহার নৃত্যভঙ্গীতে যুগান্তর এনেছে।

গ্রাহামের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ শিল্পীই প্রবীণ। নৃত্যের উপযোগী ভাবনা, দেহ তৈরী করতেই এঁদের দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে। অধিকাংশ পঞ্চাশোর্দ্ধ। নারী ও পুরুষ শিল্পী পরিণত শিল্পচেতনা প্রকাশ করেন। আশ্চর্য শারীরিক সামর্থ্য শিল্পীর প্রতিভাকে পরিণত হবার সুযোগ দিয়েছে। নবীন শিল্পীরা শিক্ষা-নবিশী করে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, কিন্তু গ্রাহামের সম্প্রদায়ের শিল্পীদের সমকক্ষ হতে প্রয়োজন দীর্ঘদিনের নিয়মানুবর্তিতা ও দেহ-নির্মাণের বিশেষ সাধনা। ওঁর নৃত্যের

আমি পরবাসী

আঙ্গিক এই কঠোর সাধনাই দাবী করে।

ওদেশে পৌঁছেই বুঝলাম, ভারতীয় শিল্পিরূপে আমি সর্বদাই ওদের চোখে 'একজটিক'। জাপানের কাবুকী, গিনির ব্যালে, আফ্রিকান-এর পাশাপাশি ভারতীয় নৃত্য। নিউ-ইয়র্কের দর্শক দীর্ঘদিন ধরে এসব শিল্পের সঙ্গে পরিচিত। ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে পরিচয় ত্রিশ দশকে উদয়শঙ্কর রামগোপালের মধ্য দিয়ে। অনেক প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাঁরা ত্রিশ দশকে উদয়শঙ্করের নৃত্য নিয়মিত দেখেছেন।

এক চিত্রশিল্পী বলছিলেন, "আমি ৩৫ বার উদে'কে (উদয়কে) দেখেছি, আরো দেখতে চাই।"

৬৩ বছর বয়সের নৃত্যশিল্পী অ্যালেন ওয়েন উদয়শঙ্করের অনুষ্ঠানের প্রোগ্রামগুলি 'সুভেনিয়র' করে রেখেছেন। অ্যালেন এক সময় সারা পৃথিবী ব্যালে নেচেছেন। এখন শিশুদের জন্য নানা রকম ছড়ার উপরে নাচ বেঁধে অনুষ্ঠান করেন। ওঁর কাছে উদয়শঙ্করের ও সিমকীর তরুণ বয়সের কতকগুলি অপূর্ব ছবি দেখলাম।

এত পরিচয় সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নৃত্য ওদের কাছে খুব দূরের জিনিষ, আমার এই শাড়ী-টিপ পরা অস্তিত্বটিও এই দূরত্ববোধ আরও বাগিয়ে তোলে। আমাদের নৃত্য ওদের মুগ্ধ করে, আকর্ষণ করে, কিন্তু কখন যেন নিজের হয় না। এর ব্যতিক্রম দেখেছি দু-একটি নৃত্যশিল্পীর মধ্যে। এঁরা ভারতীয় নৃত্যকে সম্পূর্ণ স্বীকরণ করে নতুন রূপ দিয়েছেন। সোনালী চুল কালো করে, বাদামী রং করে ভারতীয়-করণের প্রয়াস নয়, সেটা ভারতীয় নৃত্যের ভঙ্গী, ভাবনাকে ওদের নিজেদের মত করে দেখান। এই দূরত্ববোধ কিন্তু আফ্রিকায় অনুভব করিনি। নাইজিরিয়ার ব-দ্বীপ অঞ্চলে গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছি ওখানকার বাদ্য শিল্পীদের আমাদের মত [illegible] [illegible] [illegible]

ওরা আমাদের নৃত্য শিখেছে অনেক সময় অনায়াস পরিশ্রমে। অথচ ভারতীয় নৃত্য সচেতন আগ্রহে শিক্ষা করা। শ্রদ্ধা সহকারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখান ভারতবর্ষের দর্শন, সাহিত্য, নৃত্যের ইতিহাস, শাস্ত্রপাঠে আমেরিকানদের জুড়ি কোথাও দেখি নি।

যে-কোন শিল্পেই বোধ হয় শিল্পী স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে এসে পড়লে একবার নূতন ভাবে আত্মপরিচয় পান। তার সে শিল্পের আবেদন যতই সর্বজনীন হোক না কেন, দেশের মানুষ, ভাষা, তার প্রকাশের ঢং, ধারণা সব কিছুর মধ্যে সে যেন অনেকটা মিশে থাকে। এমন সময় সেই পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে হঠাৎ যেন নিজেকে বিদেশী মনে হয়। ইদানীং ওদেশে ঘর-সংসার করে পরিবেশটায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে অনেক সময় খেয়ালই থাকে না যে, আমি বিদেশিনী। কিন্তু বারেবারেই টের পেয়েছি বিদেশীর চোখে আমার অস্তিত্ব সব সময়ই ভারতীয় মেয়ে রূপে। দেশে এই অস্তিত্ব-বোধটি সুপ্ত ছিল। আর ওদেশে মেলামেশা করে নিজের এই আত্ম-আবিষ্কারটি মজার লেগেছে। এ যেন বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে নূতন করে প্রেমে পড়া। দেশকে বেশী অনুভব করলাম দেশ থেকে দূরে গিয়ে।

ওদেশে আমার শিল্পী-জীবনের প্রথম সূচনা হল উড্স্টকে। নিউইয়র্ক ষ্টেটের সবুজ পাহাড়-ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে শিল্পীদের গ্রীষ্ম-কালীন আবাস এই উড্স্টক। সারা শীতকাল প্রায় নিঝুম-পুরী। বসন্তের সমাগমে প্রথমে ফোটে বরফের বুক চিরে। সবুজ ঘাস আর হলুদ, বেগুনী, নীল রং-এর ছোট্ট ছোট্ট ক্রোকাস ফুল। এরপর ফোটে অজস্র টিউলিপ, ড্যাফোডিল, আইরিস। এ তো গেল বাগানের ফুল। বনে-জঙ্গলে ফোটে অজস্র লাইলাক, ডাগউট আর সাদা-কমলা রঙের অগণিত ডে-লিলি। গ্রীষ্মের শুরুতেই বনে-জঙ্গলে পথের দু'ধারে বনফুলের ছড়াছড়ি। হাল্কা নীল রঙের কর্ণ-ফ্লাওয়ার, কালো ভেলভেটের মত বুকে, গাঢ় বাসন্তী রঙের ব্ল্যাক-আইড সুসন, ডেইসী, গোলাপী আর গাঢ় রক্তবর্ণ রিবেল উইড, বনগোলাপ—প্রতি সপ্তাহে এক এক ফুলের সমারোহ। এছাড়া আছে আপেল ক্ষেতের হাল্কা সুগন্ধি আপেল ফুল, আর নাসপাতি ফুল। চেরি ফুলের তো তুলনাই নাই। বছরের ছ'মাস বরফের চাদর-মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে এই অঞ্চলটি। গ্রীষ্মের শুরুতেই তামাম আমেরিকার ভাস্কর, লেখক, গাইয়ে, বাজিয়ে, নাট্যকার, চিত্রকর, স্বর্ণকার, জহুরী, তাঁতী, কুমোর, পটুয়া সহ বহু শিল্পীর

সমাবেশ হয় উড্‌ষ্টকে। অনাড়ম্বর পরিবেশে দেশ-বিদেশের নৃত্য-গীত-নাটকে, নানা ধরণের সৃষ্টিধর্মী শিল্পে জায়গাটি মুখর হয়ে ওঠে। আশ্চর্য প্রাণময় এই পরিবেশ।

'উড্‌স্টক পারফরমিং আর্টস'-এর উদ্যোগে আমার দু'দিন অনুষ্ঠানের পর ওঁরা "ইণ্ডিয়ান ড্যান্স ওয়ার্কসপ" খুললেন। ক্লাসের ভিড় দেখে ভয় হল আমাকে আবার মহেশযোগীর মত 'একজটিক' যোগিনী-টোগিনী ভাবে নি তো। ধারণাটি একেবারে অমূলক নয়। দু' চার জন ক্লাসের শেষে জিজ্ঞাসা করল, "এমন মেজাজ তোমার এ কি 'পট' (গঞ্জিকা, মারিযুয়ানা) ধূমপান করেই এসেছ?" "আচ্ছা দিনে কতক্ষণ মেডিটেসান করব বলতে পার?' কত বছর যোগাভ্যাস করেছ," "হঠযোগ সম্বন্ধে কিছু বিশ্লেষণ করে বল।" "ইড়া-পিঙ্গলা, মূলাধার, ব্যাপারটি একটু ছবি এঁকে দেখাবে" ইত্যাদি।

যাই হোক হুজুগের ভিড় কিছুদিন বাদে কমে এল। যথার্থ নৃত্যরসিক ও আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা রয়ে গেলেন। এঁদের অনেকেই নিয়মিত ব্যালে, আধুনিক নৃত্য আগে শিখেছেন। আধুনিক নৃত্যশিল্পী মেলানি বলছিল, "তোমাদের নৃত্যে আমরা একটি সহজ মুক্তি খুঁজে পাই। এর ভিতর একটি অধ্যাত্মশক্তি লুকিয়ে আছে—যা নৃত্যকে অনেক উপরে তুলে নিয়ে যায়।

অভিনেত্রী জেন বলল "অথচ নৃত্যকে তোমরা কত "আর্থ বাউণ্ড" করে দেখাও। ঐ যে নবরসের 'শৃঙ্গার।' আমাদের মেয়েরা পারবে ওকে অমন নারীত্বময় করে ফোটাতে। আসলে ভক্তি ব্যাপারটা আমরা চার্চ ও সিনাগগের মধ্যে ফেলে এসেছি।"

[ক্রমশঃ]

★ রামেশ্বর ধাম ★

আরতি ভৌমিক

এবারের ছুটি কাটিয়েছি দাক্ষিণাত্যে। সমস্ত দক্ষিণ ভারতই মন্দিরপ্রধান। এখানকার আকাশে-বাতাসে মিশিয়ে আছে ধূপ-ধূনো ফুলের গন্ধ ও ধর্মীয় সঙ্গীত। তবু সমগ্র দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রামেশ্বর ধামের মত প্রাচীন ও পবিত্র মন্দির আমি আর কোথাও দেখি নি।

রামেশ্বর ধাম হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থস্থান। রামেশ্বর মূল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা কোয়েম্বাটুর থেকে রামেশ্বর এক্সপ্রেসে চড়লাম। সমুদ্র পার হয়ে রামেশ্বরে যেতে হয়। সমুদ্রের ওপর ট্রেন চলাচলের জন্য সুন্দর সেতু আছে। এই যাত্রাটা অতি সুন্দর। নীল সমুদ্রে সাদা ফেনা, নীল আকাশে সাদা মেঘ আর দূরে জেলেদের ছোট নৌকা --সব মিলিয়ে যেন কোন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি।

আমাদের রামেশ্বরে পৌঁছতে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল। ষ্টেশন খুবই ছোট ও পুরনো। যাতায়াতের ব্যবস্থা শুধু এক্কা গাড়ী ও সাইকেল রিকশা।

শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি মেখে রামেশ্বর ধাম দাঁড়িয়ে আছে। লঙ্কার যুদ্ধে রাবণ বধ করে শ্রীরাম ব্রহ্মহত্যার পাপে পাতকী হন। এই পাপ থেকে মুক্তি-লাভের জন্য শ্রীরাম এখানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পুজো করেন। এ সম্বন্ধে এখানে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশমত কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ আনতে শ্রীহনুমান দেরী করে ফেলায় সীতাদেবী স্থানীয় বালু দিয়ে লিঙ্গ গঠন করেন এবং আজ পর্যন্ত সেই লিঙ্গেরই অর্চনা হচ্ছে। রামেশ্বরের বালু দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরী হয়েছিল, তাই এখানকার মাটিতে হল কর্ষণ করা নিষিদ্ধ। তাই রামেশ্বরে চাষ-আবাদের কোন ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র পৌরোহিত্য ও তীর্থযাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের ওপর জনসাধারণের জীবিকা নির্ভর করে।

রামেশ্বরের মন্দিরকে কেন্দ্র করেই রামেশ্বর শহর। মন্দিরের চারপাশে ও স্টেশনের কাছে কতকগুলি যাত্রীনিবাস আছে। তবে বেশীর ভাগ যাত্রী-শালাতে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা বিবেকানন্দ লজ নামে এইরকম একটি যাত্রীশালায় ছিলাম। আমাদেরও খাওয়ার ব্যবস্থাটা বাইরে সারতে হোত। রামেশ্বর ধামের প্রাচীনত্বের কাছে আধুনিক জীবনের অনেক সুখ-সুবিধাই হয়ত মিলবে না কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে অতীতের সাক্ষী এই মন্দিরের সুউচ্চ চূড়ার দিকে তাকালে মনে যে মহান্ ভাবের সৃষ্টি হয়, তার কাছে বোধ হয় লাভ-ক্ষতির কোন হিসাব থাকে না।

রামেশ্বর মন্দিরের প্রধান উপাস্য দেব ও দেবী হলেন যথাক্রমে শিব ও পার্বতী। মন্দির সমুদ্রের একেবারে কাছে। তাই সমুদ্র-স্নান করে অর্চনা করাই রীতি। মন্দির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে খুবই বড়। প্রাচুর্যতা ও পবিত্রতার চিহ্ন-স্বরূপ লাল ও সাদা দাগ দেওয়া উঁচু দেওয়াল দিয়ে মন্দিরটি ঘেরা। যে-কোন দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের মত রামেশ্বর মন্দিরেও চারটি সুন্দর ও উঁচু গোপুরম আছে। স্টেশন থেকে কয়েক পা হাঁটলেই গোপুরমের সৌন্দর্য ও বিরাটত্ব যাত্রীদের মন হরণ করে। তবে এখন চারটি গোপুরমের মধ্যে শুধু পূর্ব ও পশ্চিমেরটি অক্ষত অবস্থায় আছে। বাকী দু'টির একেবারেই ভগ্নাবস্থা, তারা শুধু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দিরদ্বারে পসারিণী ফুলের ও দেবার্চনার যাবতীয় সামগ্রী সাজিয়ে বসে আছে। প্রধান প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের হাতী। তাকে এড়িয়ে ভিতরে যাওয়ার কোন উপায়

অনন্তলোকের অভিসার

চিত্র—চিত্ত নন্দী

মাসিক

॥ আশ্বিন ১৩৭৭

নেই। তাকে খুশী করে ভিতরে গেলেই ধূপ-ধুনোর আর ঘৃতের সৌরভে মন ভরে উঠবে। মন্দির অত্যন্ত পরিষ্কার। দেব-দর্শন করার আগে দর্শন মিলবে বিরাট পাথরের তৈরী শিববাহন নন্দীর বা ষাঁড়ের। মন্দিরের প্রবেশ পথের দুই ধারে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উৎকীর্ণ আছে। ভাবতেও ভাল লাগে, এই একই জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দ এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

অন্য সকল দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের মত রামেশ্বর মন্দিরেও সুদীর্ঘ অলিন্দ আছে। সব অলিন্দগুলিই সুন্দর কিন্তু তৃতীয় অলিন্দের সৌন্দর্যের সঙ্গে বোধ হয় কারও তুলনা হয় না। এই অলিন্দটি ২১০০ ফুট লম্বা। অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত বহু স্তম্ভ অলিন্দের শোভা বর্ধন করছে। এমন একটা স্তম্ভের দেখা আমার মেলে নি যেখানে শিল্পীর কুশলী হাতের ছাপ পড়ে নি। কোন কোনটি হয়ত কালের প্রভাবে কিছু নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু যেটুকু এখনও আছে, সেটুকু দেখেও তখনকার দিনের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

মন্দিরের শিবলিঙ্গ সর্বদাই আবরণ-মণ্ডিত থাকে, শুধুমাত্র ব্রাহ্ম মুহূর্তে লিঙ্গের আবরণ মোচন করে অর্চনা করা হয়। সেই সময়ে দেব-দর্শন মহাপুণ্য বলেই প্রচলিত বিশ্বাস।

রামেশ্বর মন্দির যেমন শৈবদের তেমনি বৈষ্ণবদেরও উপাসনার স্থান। কেন না প্রচলিত লোকগাথা প্রচার করে যে এই মন্দিরে লক্ষ্মী ও নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছিল। রামেশ্বর দক্ষিণ ভারতের কাশী। উত্তর ভারত বারাণসী ধামে শিবলিঙ্গকে রামেশ্বরের পুণ্য বারি দিয়ে ও রামেশ্বর ধামের শিবলিঙ্গকে বারাণসী ধামের গঙ্গাধারা দিয়ে পূজা হয়।

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই মন্দিরের কোন অস্তিত্বই ছিল না। শিবলিঙ্গটি একটি খড়ের চালার নীচে কয়েক জন সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারা পূজিত হোত। তখনও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অগণিত নর-নারী পদব্রজে এখানে আসত তীর্থ দর্শনে, যেমন এখনও আসে। বর্তমান মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন বহু যুগ আগে সিংহলের রাজা। তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা বিভিন্নভাবে মন্দির গঠনে সাহায্য করেছিলেন।

মন্দির ছাড়া রামেশ্বরের আর একটা দর্শনীয় স্থান হচ্ছে গন্ধমাদন পর্বত। এটি এখানকার সব থেকে উঁচু জায়গা। এই জায়গা থেকে সমস্ত রামেশ্বর ধামের দৃশ্য দেখা যায়। এখানে একটি ছোট কিন্তু সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরের বালুস্তূপের ওপর শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণের ছাপ আছে।

রামেশ্বর থেকে ধনুষ্কোটি খুবই কাছে। কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা ধনুষ্কোটিকে সভ্য জগৎ থেকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। ধনুষ্কোটি এখন পরিত্যক্ত নগরী। ওখানে যাওয়ার কোন পথই নেই, শুধু আছে ভয়াবহ বালির বিরাট স্তূপ। এই ধনুষ্কোটিতেই শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা যুদ্ধের পর ধনুর্বাণ ত্যাগ করেছিলেন। ধনুষ্কোটি যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু এক রামেশ্বর ধামেই আমি যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তা আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

ম্যানিলার 'বে-ভিউ' হোটেলে এশিয়া-সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারিণীরা

★ ছোটদের চিত্ত গঠনে মায়ের দায়িত্ব ★

একই পাড়ায় পাশাপাশি দু'টি পরিবার, গৃহিণী দুটির বয়স প্রায় চল্লিশ। ওঁদের একজন তিনটি, অপর জন দুটি সন্তানের জননী। একটি পরিবারে দেখা যায়—ভোরে পাখীর কূজনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাই ও দুটি বোন মাঝে মাঝে কোন না কোন সূত্র ধরে চাপা-ঝগড়ার মৃদু গুঞ্জন তোলে, কিন্তু পাশের বাড়ীর দুটি-ভাই বোন কোনদিনই তা করে না।

'চাপ গুঞ্জন' বলা হল এজন্য যে, ওদের বাপ দেরীতে ঘুম থেকে ওঠেন, ঝগড়া-ঝাটির শব্দ তাঁর কানে গেলে, লাফ দিয়ে উঠেই তিনি দোষী নির্দোষ নির্বিশেষে সব ক'টিকেই বেদম মার লাগান, আর ওরা তিনটি তখন পিঠে হাত দিয়ে হাঁউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। তখন একটু দূরে অবস্থিত রান্না-ঘরে কাজে ব্যস্ত মা ছুটে এসে ছোট দুটির পক্ষ নিয়ে বড়টিকে মারতে ছোটেন, এবং সেও তখন মাকে পক্ষপাতিত্বের জন্য বিদ্রূপ করতে করতে ছুটে পালায়।

কেরাণী বাপের মন-মেজাজ দুটো কারণে তেমন ভাল থাকবার কথা নয়; এবং সে-দুটো হল—অফিসে ভীষণ বেয়াড়া কাজের চাপ পূরণে ওঁর অক্ষমতা, আর সংসারের স্থায়ী অভাব-প্রতিযোগের নিত্য তাড়না। স্বামীর নির্বিচার নিষ্ঠুর ঐ মারের জন্য কঠোর কণ্ঠে স্ত্রী ওঁকেই দোষারোপ করে জালাতন শুরু করলে, উনিও অযথা কালবিলম্ব না করে চেঁচিয়ে ওঠেন: অন্যায় করেছে, তাই মেরেছি, ওরা একটু বাদে নিজেরাই থেমে যেত; কিন্তু তুমি রান্না ফেলে রণচণ্ডী মূর্তি ধরে এসে জটকে আরো জটিল করে তুলছ কেন?

গিন্নীও অমনি গর্জে ওঠেন: থ্যাবো, ওসব [illegible] না। দোষ গুণ কার কি—তার খোঁজ না নিয়েই দমাদম মারতে তুমি সব কটাকে পিটলে কেন? জানো না বুঝি আসল দোষ তো ঐ বুড়ো ধাড়ীটার, সে আমি আসতেই ছুটে পালিয়েছে।

কর্তার ক্লান্তিহরা ভোরের ঘুমটুকু ওরা ভেঙে দিয়েছে; বাচ্চাদের ঝগড়ায় প্রথম প্রহারে ওরা স্তব্ধ না হলে, তখন আবার মারের ভয়যুক্ত প্রচণ্ড এক ধমকে নির্ঘাত কাজ হবেই ভেবে ফের একটু ঘুমিয়ে নেবার মতলবে ছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ ওঁর স্ত্রী এসে বাধা সৃষ্টি করায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই লেগে গেল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া—কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতে একেবারেই প্রস্তুত নন।

শ্রীমতী পরীরাণী সেন

গতিক দেখে ছোট দুটি তখন কান্না থামিয়ে একটু আড়ালে সরে যায়, এবং বাপ-মায়ের তাণ্ডব ঝগড়া দেখে নিজেদের দুঃখ ভুলে গিয়ে ছোটটি বুচি পটলাকে বলে: এ-ই দিদি, দেখিস আজ ঠিক মা-ই জিতবে। পটলা তখন অভিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বলে: না রে বোকাটা, তা নয়—হঠাৎ অবশ্য তা-ই হয়; কিন্তু রকম-সকম যা, তাতে আমি নিশ্চয় করে বলে দিতে পারি যে—শেষ পর্যন্ত ঠিক বাবাই জিতবে।

পাড়া-কাঁপানো প্রবল ঝগড়া শুনে, পাশের বাড়ীর গিন্নী এ সময় হেসে তাঁর স্বামীকে বলেন: ওগো শুনছ, ওদিকে ঐ যে শুরু হয়ে গেছে।

তিনি হয়তো তখন একটা আরাম কেদারায় বসে কাগজ পড়ছিলেন; মাথা না তুলেই তিনি উত্তর দেন: কান যখন ঠিক আছে, ওঁদের কণ্ঠও যেহেতু গর্জনমুখী—তখন আর না শুনব কেন? তবে ওজন্য কান খাড়া করে থাকতে আমি প্রস্তুত নই—ওসব তো ওদের দৈনিক বা রোজ, অন্তত সাপ্তাহিক দাম্পত্য মূর্ছনা। গিন্নী হেসে নিজের কাজে চলে যান

এ স্বামীটি অধ্যাপক, গৃহিণী মাত্র ম্যাট্রিকুলেট। ওঁদের এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়েটি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, ছেলেটি দশম শ্রেণীতে। ওবাড়ীর কর্তা-গিন্নী উভয়েই গ্রাজুয়েট; ওঁদের হয়েছিল প্রেমের বিয়ে।

ঘণ্টা তিন-চার পরে দু-বাড়ীর জানালা দিয়ে দুই প্রতিবেশিনীর দেখা হলে, এ বাড়ীর গিন্নী হয়তো বলেন: কি দিদি, আজ সকাল বেলাই দেখি বাড়ী সরগরম। আজ তো শুধু বাচ্চারা নয়, আজ যে স্বয়ং দেব-দেবীতেই 'রণং দেহি'—মূর্তি।

ওবাড়ীর গিন্নী ব্যাপারটার তাঁর মনোমত ব্যাখ্যা দিয়ে শেষে দুঃখ করে বলেন: দিদি, ঝুমুরের বাবা আর তুমি কি যাদু জানো? তোমার ভাগ্যে একদিকে দেখতে পাই, সোনার টুকরো ছেলে-মেয়ে—নিলয় আর ঝুমুর; আর অন্য দিকে তোমরা দুটি কর্তা আর গিন্নী, যেন মনে-প্রাণে দুজনা এক মত, এক পথ। এদিকে দেখ না, মণ্টু গাধা কলেজে ঢুকেছে, অথচ বুঁচি আর পটলার সাথে কথায় কথায় কোন্দল করে; আর ও-দুটোও প্রায়-দিনই কিছু না কিছু নিয়ে দু-চার দফা খোঁচা-খুঁচি লাগাবেই।

এবাড়ীর গিন্নী: হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পাই—খুবই দুঃখের কথা। আচ্ছা দিদি, এখন যাই—চুলোয় দ্বিতীয় দফায় ভাত চাপিয়ে দিয়ে এসেছি----

দু-বাড়ীর দুটি কর্তা, এককালে কিছুদিন সহপাঠিও ছিলেন। ওঁরা এ-পাড়ায় এসেছেন মাত্র দু-বছর আগে। সহপাঠি ছিলেন বলে ওঁদের মধ্যে আগে থেকেই হৃদ্যতা ছিল। এ পাড়ায় ওঁরা আসবার ক-মাস পর অধ্যাপক বন্ধু কথায় কথায় হেসে একদিন ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: তোমাদের তো [illegible] প্রেমের বিয়ে, অথচ কর্তা-গিন্নীতে মাঝে মাঝে চুলোচুলিটা না হলেই কি ভাল ছিল না? সাবেক তোমাদের সে লীলাচঞ্চল দিনগুলোর

কথা কি ঝগড়ার সময় একটুও মনে পড়ে না ?

কেরাণী বন্ধু বক্র হাসিতে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছেন : আরে ভাই, বিয়ের আগের সে ভেজাল-প্রেমের কপালে ঝাঁটা মারি ! তখন দু'জনাকে দুজনা শুধু মিষ্টি মধুর কথা বলে বলে হিপ্‌নোটাইজ করেছি ; তাই তখন কি আর স্বাভাবিক মানুষ ছিলাম, সে মানুষ এ মানুষ যাচাই-বাছাই করব ? বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই দেখতে পাচ্ছি--- ওর দেহে যেমন প্রাণ-মাতানো রূপ, মুখে তেমন তীব্র হলাহল, হাতেও তেমনি সদা উদ্যত খড়্‌গ-। এ-হেন প্রেমময়ী মূর্তিতেই উনি মাঝে মাঝে উদ্দাম নৃত্য শুরু করেন। হেসো না ভাই, ভাবতে আতঙ্ক হয়, সারাটা জীবনই তো ওর এ প্রলয় নাচন দেখতে হবে--- একেই বলে বিধিলিপি।

হেসে : তা তুমিও তো বাপু ওসব সময়ে নিজে একটু রয়ে সয়ে যেতে পারো ; তাহলে একা একা তো আর উনি ঝগড়া-দ্বন্দ্ব চালাতে পারবেন না।

মলিন হেসে : এই যাঃ, মরেছে ! আরে ভাই, দাম্পত্য-জীবনের শুভ প্রথম পর্বে সে সব পরীক্ষা কিছুকাল কি করে দেখিনি ভাবো ? সব নিষ্ফল, সব জিরো। আমি একটানা দু-ঘণ্টা চুপ করে থাকলেও, একনাগাড়ে উনি একা একাই ততক্ষণ পূর্ণ তেজে কথার রেস্ চালিয়ে যেতেন। শেষে এমন চোখা চোখা কথার তীর ছুঁড়তে থাকতেন যে, আগে অতক্ষণ করে চুপটি করে থাকার জন্যই মনস্তাপ হত। সুতরাং ব্যবস্থা বদল করে ফেললাম। তাতে দেখলাম, আমিও রুদ্র মূর্তি ধরবার পর থেকে ওঁর সে অফুরন্ত দমটাও ধীরে ধীরে দিব্যি খাঁটার দিকেই টান ধরতে থাকে।

* * *

এ অধ্যাপকটি দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত —শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও পড়াশুনো ওঁর চমৎকার। তিনি এ সব নিয়ে ওঁর নিজ গৃহিণীকে মাঝে মাঝে যা বলেন, তা কতকটা এরূপ দাঁড়ায় :

দেখ, শিশুদের মোটামুটি দুটো ভাগ করে বিচার করলে জিনিসটা বোঝা সহজ হবে। যেমন---পাঁচ থেকে দশ বছর, আর এগার থেকে ষোল বছর। আর কোলের শিশুর একেবারে অজ্ঞান শৈশবের কথা ছেড়ে দিতে হবে। কারণ, তখন তো ওরা অজ্ঞানের আবরণে ঢাকা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ফুলের মত। জানো ? ওদেরই লক্ষ করে প্রভু যীশু বলেছিলেন : ' 'Suffer little children to come unto me, forbid them not: for of such is the kingdom of God' আর ওদেরি সম্পর্কে এ যুগের আমাদের মহাকবি বলেছেন :

'সে না হলে সকাল বেলায়
এত কুসুম ফুটবে কি ?
সে না হলে সন্ধ্যেবেলায়
সন্ধে তারা উঠবে কি ?'

যাক। ঐ দুটো ভাগের প্রথম ভাগটায় শিশু-জীবন প্রধানত মাতৃ-কেন্দ্রিক। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাল-মন্দ, হাসি-অশ্রু—এ সবের উৎপত্তি-প্রকাশ যাচাই-বাছাইয়ের কেন্দ্রটুকু খুঁজলে, সেখানে একমাত্র তার মাতৃ-মূর্তিটিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে ; অর্থাৎ বাড়িখানির মধ্যে মা-ই হলেন যেন খোঁটা (Pivot), যাঁর সদা-জাজ্জ্বল্যমান অবস্থিতির চতুর্দিকে ক্ষুদ্র শিশুর সদা-ঘূর্ণমান জীবনটুকু।

এ জন্য মাকে এ বয়সে তাঁর সন্তান সম্পর্কে বড় সাবধান হতে হবে। বেশী আবদার, বেশী বকাবকি, বেশ মারধর--- এর কোনটাই সঙ্গত ব্যবস্থা নয়—তা 'কারণগুলো' যতই প্রবল বলে মনে হোক না কেন। পরিবর্তে কখনো সরল স্নেহের ধারা, কখনো বা ভুলিয়ে বুঝিয়ে মিষ্টি কথার সাহায্যে তাকে ঠিক পথে আনতে হবে। ভুল, অন্যায়, বাড়াবাড়ি তো ওরাই করবে ; কারণ, সেটা ওদের চপল বয়সের অবুঝ মনের স্বতঃউৎসারিত একটা প্রকাশ বই, কিছু নয়।

গৃহ-পরিবেশে ওদের খেলাধুলায়, দৌড়-ঝাঁপে পারতপক্ষে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। মোমের পুতুল করে সেল্‌ফে তুলে রাখার মত অতি সমাদরে রেখে রেখে ওদের দেহের চালনা বন্ধ করে দিলে মহাভুল করা হবে। অবস্থাপন্ন গৃহিণীরা বহু সময় এ ভুল করে থাকেন। ছোট্ট বাড়ীখানার মধ্যেই ওদের ক্ষুদ্র দুনিয়া-টুকু ; সেই গণ্ডীর মধ্যে ওরা মনের ইচ্ছা, দেহের ক্ষমতা তো জাহির করবেই। ঐ সঙ্গে এতেই হবে ওদের শরীরের পুষ্টিসাধন।

সারা দিনমানে ওদের দায়িত্বের কাজ বা রুটিন মাফিক্ কোন কাজ থাকে না ; এজন্য দেখা যায়, কিছুটা অকাজও যেন হয়ে দাঁড়ায় ওদের দৈনন্দিন কাজ। ওরই মধ্যে ভুল করে বা অন্যায় করে কিছু করে বা বলে বসলে, তখুনি উদ্যত দণ্ড নিয়ে ওদের দমাতে গেলে তাতে মোট ফল কখনো ভাল হবে না। সব সময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, প্রথমতঃ সর্বাঙ্গীণ চেষ্টায় প্রিয়তা দ্বারা ওদের ঐসব অপ্রিয়তাকে জয় করা চাই। এমন কি, পড়াশুনোতে ওদের অমনোযোগ বা অনিচ্ছা দেখলেও প্রথমত ঐ একই পন্থায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের বেলায় দেখা যায় যে, তাদের ঘরের বাঁধনের চেয়ে বাইরের আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। বাইরের আকর্ষণ মানে : পাড়া, স্কুল, বাইরের খেলাধূলা, বাইরে সমবয়সের বা সহপাঠিদের বন্ধুত্বের আকর্ষণ। সবাই জানে, পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে ওরা ঘরে এ যাবত শিক্ষা, রুচি-অরুচি, মন-মেজাজ প্রভৃতির যে ধরণের ভিত্তিটুকু অন্তরে তৈরী করে নিয়ে বহির্বিশ্বে গিয়ে দাঁড়ালো, সাধারণত তারই ধাঁচে তথায় গিয়ে ওরা বন্ধু যাচাই-বাছাই করতে ব্রতী হবে।

কিন্তু বাইরের দুনিয়া বড় প্রলোভন ময়, নানা ভুলের ফাঁদ সেখানে চিরদিনই

দাঁড়া হয়েছে। এজন্য মায়ের সঙ্গে বাপেরও এ সময়টায় ছেলে-মেয়ের দিকে নজর রাখা অতীব প্রয়োজন; এর কারণ, বাইরেকার ব্যাপারটা বাপেরা অপেক্ষাকৃত ভাল বোঝেন।

দেখা যায়, দশ-বারো বছর বয়স থেকে বন্ধুপ্রীতি ওদের হয়ে ওঠে বেশ প্রবল---তা কি নিজ নিজ পাড়ায়, কি খেলার মাঠে, কি স্কুলে। এ বয়সে বন্ধু-নির্বাচন সত্যি একটা কঠিন কাজ। সাধারণত আমরা দেখি যে, বাইরে বেরিয়ে ছেলে-মেয়েরা তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় যার যার রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী বন্ধু নির্বাচন করতে লেগে যায়। আবার স্কুলের অন্য ছেলে-মেয়েদের প্রবল আকর্ষণেও কখনো কখনো তাদের প্রভাবাধীন হতে তারা বাধ্য হয়। ঘর থেকে দিকে দিকে ভালকে পাথেয় করে বাইরের দুনিয়ায় যাদের যাত্রা শুরু, স্কুল পরিবেশে সুবন্ধু লাভ হলে তারা উত্তরোত্তর আরো ভাল বনে যেতে পারে; আবার মন্দ বন্ধুর প্রভাবাধীন হয়ে, তার সাহচর্যে তার ক্রমাবনতিও প্রায় অবশ্যম্ভাবী। তখন ওদের পড়াশুনোয় মনোযোগ যায় কমে; ফলে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তিও যেমন বেড়ে যায়, পেচনকার বেঞ্চের নিরাপদ আশ্রয়ও তেমনি তাদের কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠতে থাকে।

এজন্য স্কুলের পরিবেশ সম্পর্কে এবং বন্ধু-নির্বাচনের ব্যাপারে বাপ-মায়ের আন্তরিকতার সঙ্গে এবং কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবে ওদেরি কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে নিয়ে ওদের সুবুদ্ধি দেওয়া খুব প্রয়োজন। সাধারণত তাঁরা ঐমত করে থাকেন, নিকট প্রতিবেশী ভাল বা মন্দ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা সম্পর্কে। স্কুলকেও ঐ গণ্ডির মধ্যে টেনে আনা বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে। এই বন্ধুরাই বহির্বিশ্বে শ্রীমান-শ্রীমতীদের ভাল-মন্দ হওয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে চলতে থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনে শুভকে [illegible] আরো [illegible] পরিণত করায় [illegible] ভাল বন্ধুর অবদান নিঃসন্দেহে অপরিসীম। ইংরিজী এ কথাটা বেশ তাৎপর্যবাহী: Love is only chatter, Friends are all that matter.

এসব ছাড়া স্বয়ং বাপ-মায়ের সব সময় মনে রাখতে হবে যে---'কারণ' যত বড়ই হোক, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনে তাঁদের নিজেদের মাঝে মধ্যেই সরব সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়; কারণ, সন্তানেরা প্রায়ই স্বয়ং তাদেরি ঐ ধৈর্যহীন উদ্দামতার সাক্ষী হতে থাকলে, তাঁদের ঐ রাগের, তাঁদের ঐ ধৈর্যহীনতার, তাঁদের ঐ নোংরামির সুস্পষ্ট কুপ্রভাব কচি কচি ছেলে-মেয়েদের কোমল মনে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হতে বাধ্য। এর অনিবার্য ফল এই হবে যে, ওরাও তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে বাপ-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া-দ্বন্দ্বে উৎসাহিত হয়ে উঠতে থাকবে।

কেরাণী বন্ধুর বাড়ীর ছেলে-মেয়ের নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে কলহের গভীর মূলে এভাবেই রয়েছেন স্বয়ং তাঁরাই অর্থাৎ, কর্তা এবং গিন্নী! ছেলে-মেয়েদের মনে বাপ-মা সম্পর্কে ভাবাদর্শ এভাবেই হয়ে যায় মলিন, আর বাপ-মায়ের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও বিনম্রতাও এভাবেই হতে থাকে বিলীন। শেষে এই-ই দেখা যাবে যে, এ শ্রেণীর বাপ-মায়ের সন্তান শাসনের এবং তাদের প্রতি আদেশ ও উপদেশের কোন মূল্যই থাকবে না।

দৈহিক শাসন বিষয়ে দুটো বিভাগ মিলিয়ে সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়---ছোট বয়সে বার বার এবং গুরুতর শ্রেণীর অপরাধ না করলে, দৈহিক শাস্তি ওদের ক্ষেত্রে বর্জন করে চলতে হবে। কৌশলী নানা ব্যবস্থা, মারের ভয় দেখানো---এসব পন্থা বরং গ্রহণীয়। তবে একান্ত অনিবার্য ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তিরও অবশ্য প্রয়োজন আছে; কিন্তু সেটা ঘন ঘন হওয়া কখনোই উচিত হবে না। ইংরেজী একটা কথায় তাই বলা হয়েছে---সার্জনের ছুরি একেবারে গভীর প্রয়োজনে ছাড়া যেমন বর্জনীয়, তেমনি হতে হবে শিশুদের নানা সংস্কার ও সংশোধনের বেলায় দণ্ডের (rod-এর) ব্যবহার।

আরো মনে রাখতে হবে----কঠোর শাসন, কথায় কথায় শাসন--- প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ওদের মন থেকে বাপ-মা, অভিভাবকদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি কমিয়ে আনবে; তারপর আরো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মায়ের প্রতি ওদের মনে সৃষ্টি হবে চাপা ঘৃণা, বিরূপতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি কু-মনোবৃত্তি। তাছাড়াও ওদের মনের এ অপ্রিয় পটপরিবর্তন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওদেরও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

আরো একটা কথা। ছোট বয়সে প্রতিবেশী বন্ধুদের মধ্যে কখনো কখনো ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকে এবং লাগবেই। এ সময় মায়ের কাছে দুটি বাড়ীর দুটি ছেলের দোষ-গুণ নিরূপণের সময়, অথবা সংশ্লিষ্ট দুটি মায়ের মধ্যেও ঘটনাক্রমে ঐ ঝগড়ার ঢেউ এসে পৌঁছালে---এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, যে-কোন প্রকারে নিজ সন্তানটির দোষ ঢাকা দেবই, বা সেটা কমিয়ে প্রমাণ করবই ---এ হীন মনোভাবটি সর্বথা পরিত্যাজ্য। তা না হলে পরোক্ষ-ভাবে নিজের সন্তানের প্রতিই তো শত্রুতা করা হবে।

ঐ কেরাণী-কর্তার গৃহিণী গ্রাজুয়েট, আর অধ্যাপক-পত্নী মাত্র ম্যাট্রিকুলেট। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শেষোক্ত মহিলা চিত্তগঠন, চিন্তাপ্রণালী, বিচারজ্ঞান প্রভৃতিতে (অর্থাৎ, cultural sides-এ) উন্নততর মানসিকতার অধিকারী। সুতরাং বলা যায় যে, শিশু-চিত্তগঠনে একমাত্র বিদ্যাই সব কিছু নয়।

(শেষাংশ)

এমনিভাবে প্রায় একটা বছর হাসি, গানে, আনন্দে কখন কেটে গেছে জানতেও পারেন নি ডাক্তার সুরঞ্জন। ভেবেছিলেন তিনি কত সহজেই জীবনের কত বড় সমস্যার সমাধান করেছিলেন, কিন্তু পরে বুঝেছিলেন যে, তিনি যখন ভেবেছিলেন জীবনের সমস্যার সমাধান করেছেন, তখন সে সমাধান হয় নি বরং আরও জটিল হয়ে গিয়েছিল। বুঝলেন অনেক পরে, যখন সুমনা অতি সহজেই স্লীপিং ট্যাবলেটগুলো খেয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। বুঝলেন চরম ভুল হয়ে গেছে। তাঁর জীবনের হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখলেন, তিনি সম্পূর্ণ বেহিসেবীর মত কাজ করেছেন। দূরের দিকে চেয়ে তাই সেই কথাই বার বার ভাবছিলেন। সমস্যার সমাধান তো তিনি করতে পারেন নি বরং সেটা তাঁর জীবনে চিরদিন ধিক্কার হয়ে রয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ডাক্তার সুরঞ্জন এসে ড্রয়ারের পাশে দাঁড়ান, কি মনে করে আস্তে আস্তে খোলেন ড্রয়ার। তারপর কাগজ-পত্রের মাঝ থেকে বার করেন একটি বহু পুরাতন ভাঁজ করা কাগজ। সময়ের প্রভাবে কাগজের শুভ্রতা নষ্ট হয়েছে, সুমনার প্রথম ও শেষ চিঠি। বহুদিন আগেকার চিঠি, তবু তার মাঝে বিজড়িত আছে জীবনের স্মৃতি। ধীরে ধীরে চিঠি হাতে নিয়ে জানলার পাশের চেয়ারে এসে ক্লান্তভাবে বসে পড়েন ডাক্তার সুরঞ্জন। চশমাটা মুছে ধীরে ধীরে চিঠির ভাঁজটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরেন। বহুবার পড়া চিঠি, কিন্তু তবুও এর মাঝে বিচিত্র অনুভূতি জড়ান আছে যা বোঝান যায় না। সংক্ষিপ্ত চিঠি---কোন সাহিত্য নয়---কাব্য নয়---কোন সুন্দর রচনা নয়, কেবল কতকগুলো শব্দ সমষ্টি দিয়ে সাজান হয়েছে বন্ধ্যানারীর সকরুণ অভিব্যক্তি। প্রতিটি ছত্রে জড়ান রয়েছে না পাওয়ার বেদনা। এই চিঠিই তো তাঁর জীবনের ইতিহাস। তাই বার বার পড়া চিঠিও বার বার পড়তে মন চায়।

সুমনা লিখেছে---সম্বোধনহীন চিঠি

'তোমায় চিঠি লিখছি কি বলে সম্বোধন করব কিছুতেই ভেবে পেলাম না---কারণ কোনদিন তোমায় চিঠি লেখার অবকাশ আসে নি। কিন্তু যাবার আগে তোমায় সব কথা না জানিয়ে আমি কিছুতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারব না --- তাই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি সম্বোধনহীন রয়ে গেল।

আমি চলে যাচ্ছি তোমাকে ছেড়ে, খোকনকে ছেড়ে একথা ভাবলেই আমার বুক ভরে উঠছে অসহ্য যন্ত্রণায়। কিন্তু তবুও আমায় যেতে হবে---

চিঠি

কুমারী দেবরাণী চট্টোপাধ্যায়

দিনের পর দিন এত অসহ্য বেদনা বুকে নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারব না। তোমাকে খারাপ জেনে রাখবার পর আমি কি করে বেঁচে থাকব বল? কিন্তু ওগো---তুমি কেন আমায় সঙ্গে ছলনা করলে? আমি বন্ধ্যা বলে দুঃখ করলে, তুমিই তো আমাকে আদর করে কতদিন বলতে "নাই বা রইল আমাদের কোন সন্তান---তাতে দুঃখ করবার কি আছে, আমাদের ভালবাসাই কি পরস্পরকে সুখী করবার জন্য পর্যাপ্ত নয় সুমনা।' তবে কি করে ভুলে গেলে সে সব কথা? কেবল কি তুমি আমার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে গেলে? বন্ধ্যানারী কি স্বামীর ভালবাসা পাবার যোগ্য নয়?

আজ যাবার বেলায় মনে পড়ছে সেদিনের কথা---যেদিন তুমি খোকনকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে আমার কোলে তুলে দিলে। সেদিন আমার বুক আনন্দে ভরে গিয়েছিল, কত খুশী হয়েছিলাম সেদিন। খোকনকে নিয়ে দিনের পর দিন ডুবে গিয়েছিলাম আনন্দের সাগরে। তোমাকেও পেয়েছিলাম পরম নিশ্চিন্তে। সত্যি আর আমাদের মাঝে কোন কারণেই কোন অশান্তি আসত না। খোকন এনেছিল পরম শান্তি আমাদের জীবনে। কিন্তু আমি ভাবিনি খোকনকে আনার মাঝে আছে প্রবল যন্ত্রণা। এমনিভাবে যখন খোকনকে নিয়ে আমি ব্যস্ত---তুমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তখন ধীরে ধীরে আমার কানে আসতে লাগল নানান দিক দিয়ে নানা কথা। খোকন হাসপাতাল হতে পাওয়া শিশু নয়---সে তোমার ও কোন নার্সের অবৈধ প্রণয়ের ফল। পুরুষ শুধু নারীকে পেয়েই তৃপ্ত হয় না---সে সন্তান চায়---সে সন্তানের মাঝে পরিপূর্ণতা পেতে চায়, আমি ব্যর্থ হয়েছি সেখানে। তাই তোমার মন বাইরের পানে ছুটেছিল, যার ফলে খোকনের জন্ম। আর তাই তুমি আমাকে ছলনা করে তোমার সন্তান খোকনকে আমার কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলে। এমনিভাবে নানা কথা দিনের পর দিন আমার কানে আসতে লাগল, আর আমি ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলাম। রোজই ভাবতাম তোমাকে সবকথা খোলাখুলি-ভাবে জিজ্ঞাসা করি, তোমার সাথে ঝগড়া করি। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। তুমি যেই হাসপাতাল হতে ফিরতে তোমার স্নেহসিক্ত কণ্ঠ শুনে মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেত, বলতে পারতাম না কোন কথাই - ভাবতে চেষ্টা করতাম কোনটা সত্য, আর কোনটা অভিনয়। এইরকম মানসিক দ্বন্দ্বের মাঝে দিনের পর দিন কাটিয়েছি।

রোজ রাত্রে তোমরা ঘুমালে উঠে বসতাম। নিঃশব্দে। তোমার ও খোকনের মুখের পানে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে খোকনের মুখে তোমার সাদৃশ্য খোঁজবার চেষ্টা করতাম। অনেক সময় মনে হত, বাইরে হতে যা-যা শুনি সব ঠিক -- খোকনের মুখে তোমারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম - একটু মিথ্যা বলছি না ওদের বিশ্বাস কর - আমার

যেন শয়তান তাণ্ডব নৃত্য করে উঠত— মাথা ঝন্ ঝন্ করে উঠত - হাত দু'টো কখন ধীরে ধীরে এগিয়ে যেত খোকনের নরম গলার দু'পাশে নিষ্পেষণ করবার জন্য - সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে— পর মুহূর্তে সচেতন হতাম, একি করছি, অসহায় শিশুকে হত্যা করবার বাসনা জাগছে কেন? ওকি দোষ করেছে। তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে দেখতাম, বুকের মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হত ----- রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে চোখের জলে ভেসে যেতাম। তুমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতে আমায় "কি হয়েছে বলত, আজকাল তুমি গম্ভীর থাক কেন? শরীর ভাল নেই? খোকনকে পেয়ে এক বছরের মধ্যে আমাকে একেবারেই ভুলে গেলে দেখছি," ইত্যাদি কত প্রশ্নই করেছ— এড়িয়ে গিয়েছি কেবল।

নানা কথা শুনে শুনে তোমার উপর আমার সন্দেহ এসে গেল প্রবল। তোমার সব কথাবার্তা আদর সবের মাঝে কেবল আমার মনে হয় সবটাই অভিনয়। বিশ্বাসই ভালবাসার ভিত্তি, সেই বিশ্বাসই যখন তোমার প্রতি আমার রইল না, তখন তোমাকে অবিশ্বাস করে আমি কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারব না। তোমার ভালবাসা না পেয়ে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। জীবনে কোন বস্তু পাওয়া আনন্দের, না পাওয়ার মাঝে থাকে না আনন্দ—না বিষাদ, কিন্তু পেয়ে হারানোর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ বোধকরি আর কিছু নেই। তাই তোমাকে পাবার পর কেবল আমার বন্ধ্যা হওয়ার জন্য তোমাকে হারাতে আমি পারব না, সে বেঁচে থাকার কোন মূল্য নেই, তার চেয়ে বরং আমি মুছে যাব পৃথিবী হতে। তাই যেতে হল আমার - তোমাকে ছেড়ে - খোকনকে ছেড়ে। যাবার আগে আমার মনের ধারণাই বল, ব বিকারই বল, সব স্বীকার করে গেলাম। জীবনে তোমাকে কিছুই লুকোই নি, তাই অকপটে হৃদয় মেলে রেখে গেলাম - এই চিঠির প্রতিটি ছত্রে যাবার বেলায়।

আবার বলছি তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, তবু যেতে হবে --নইলে আমি পাগল হয়ে যাব। বহুদিন আগে পড়েছিলাম, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মানুষ যা কামনা করে পরজন্মে তাই পায়। তাই যাবার আগে এই কামনা নিয়েই যাব, যেন পরজন্মে আবার তোমাকে পাই -- আর আশীর্বাদ কর যেন বন্ধ্যানারী না হই -- তাহলে তোমার আমার ভালবাসার মধ্যে আজ যে ফাঁকটুকু রয়ে গেছে -- সেদিন আর তা থাকবে না।' —অভাগিনী সুমনা

- - - চিঠি শেষ হয়; ডাক্তার সুরঞ্জন জানলা দিয়ে দূরের আকাশের অস্তমিত সূর্যের পানে তাকান---আকাশে বিচিত্র রঙের ছটা, নিজের জীবনটা বর্ণহীন বলেই বোধ হয় আকাশটা দেখতে এত ভাল লাগে।

সুমনা অভাগিনীই বটে—যে নারী নিরর্থক সন্দেহের বশে নিজের সাজানো সংসার ফেলে রেখে অক্লেশে স্লীপিং ট্যাবলেটগুলো খেয়ে মৃত্যুবরণ করে নেয়—তাকে অভাগিনী ছাড়া আর কি বলা যেতে পা র।

ডাক্তার সুরঞ্জন আকাশ হতে দৃষ্টি সরিয়ে সুমনার ফটোর পানে তাকান— এই সেই সুমনা, যে বলেছিল তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পারব না'। সে কত সহজেই বিদায় নিয়ে চলে গেল। বহুদিন পরে ডাক্তার সুরঞ্জনের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

★ শিষ্টাচারের টুকিটাকি ★

বিভা চৌধুরী

সব কালে, সব সমাজে শিষ্টাচার নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা অন্তহীন যদিচ, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য কমবেশি রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত। প্রাগৈতিহাসিক সমাজে ---এমন কি মানুষ সমাজবদ্ধ হওয়ার আগেও---বাঁচার তাগিদে গড়ে উঠেছিল টুকিটাকি নিয়ম কানুন।

তবে, শিষ্টাচার আভিধানিক অর্থে বা বাচ্যার্থে শিষ্টজন পালিত এবং নির্দিষ্ট আচার। অর্থাৎ, সমাজ বিকাশের ধারাপথে মানুষ শিষ্ট-অশিষ্ট সম্পর্কিত বোধ লাভ করার পরই প্রথমোক্তরা পালনীয় কর্তব্য বা মোটের ওপর বেঁধে দেন, তাই শিষ্টাচার, নান্যঃ।

কাল ভেদে এবং দেশ ভেদে এবং সমাজ ভেদে এর রূপ ভিন্ন হলেও, বলা চলে তৎকালীন তৎসমাজে প্রচলিত আচারই শিষ্টাচার এবং তা কিছু পরিমাপে অবশ্য পাল্য। সময়ের সংগে তাল রেখে, পরিবর্তিত জীবন-ধারার সংগে সংগতি স্থাপনের প্রয়াসে এর পরিবর্তন সমাজে ঘটতে থাকে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে; কখনও বা কোনও প্রাতঃস্মরণীয় সংস্কারক—স্মার্ত রঘুনন্দন, বা রামমোহন, কিংবা বিদ্যাসাগর---সমাজ হিতার্থেই আচারের ধারা পাল্টে দিয়ে যান। আমরা মানি। কারণ, প্রথমত তা সমাজের দীর্ঘস্থায়ী ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল, তা ছাড়া পরিবর্তকরা অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও মেধা-বলে মংগলমুখী দিক্-পরিবর্তন করতে সচেষ্ট, তাই।

সামাজিক আচারের কিন্তু সার্বিক পরিবর্তন অসম্ভব। কারণ, সে ক্ষেত্রে সমাজের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। কোনও সমাজই তা আজ পর্যন্ত মেনে নেয় নি। সামাজিক সংস্কারের আয়ু অতি দীর্ঘ। তবে, কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে আমূল পরিবর্তন সম্ভব। অবশ্য এর শেকড় সমাজমানসে গভীর মূল হতে যথেষ্ট সময় নেয়। উদাহরণ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

আমাদের শিষ্ট আচার বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। আমরা ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগে আদর্শ শিষ্টাচার সম্পর্কে টমাস্ ই. হিল্ সংকলিত 'ম্যানুয়াল্ অব্ সোস্যাল অ্যাণ্ড বিজ্‌নেস্ ফর্মস্'

থেকে স্নান-খাওয়া – প্রসাধন – চুম্বন ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট মন্তব্য উল্লেখ করব। বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা বইটি নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন।

প্রথমেই স্নান: 'ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই স্নান করা শুধুমাত্র চোখ ধোওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রত্যহ একবার পূর্ণ স্নান অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ (প্রসংগত, ইংলণ্ড-এ, য়ুরোপ-এর অন্যত্রও, প্রত্যহ স্নান কেউ করেন না বললেও চলে)। এক কোয়ার্ট-এর বেশি জল অপ্রয়োজনীয়, বৃষ্টির জল হলেই ভাল।'

চুল এরপর: 'মাঝে মাঝে জল এবং সাবান দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলতে হবে। চুল খসখসে এবং শুক্নো হলে 'বেয়ার'স গ্রীস্' বা অন্য কিছু ব্যবহার করতে হবে সাবধানে।'

তৃতীয় স্থান চর্মর: 'বহিরংগে প্রসাধনী ব্যবহারের ব্যাপারে সাবধান। তার বদলে, প্রত্যেক দুই বা তিন রাতে একবার গুঁড়ো কাঠকয়লা মিষ্ট জল বা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নাও। গাত্রচর্ম পরিচ্ছন্ন এবং শুভ্র রাখতে এটি কার্যকর।'

'বো' করা, ঈষৎ মাথা নোয়ানোর স্থান চতুর্থ।

'কোনও শিষ্ট ব্যক্তি জানলা থেকে পথোপরি দণ্ডায়মান ভদ্র মহিলাকে মাথা ঈষৎ নুইয়ে অভিবাদন জানাবেন না, যদিও জানলা থেকে কোনও ভদ্রমহিলা পরিচিতি জ্ঞাপন করলে, রাস্তা থেকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে প্রত্যুত্তর দেওয়া চলে। সে যাই হোক, এই ধরণের ব্যবহার পরিহার করাই সাধারণভাবে বাঞ্ছনীয়; কেন না, অপরে দেখলে গুজব এ ব্যাপারে অযথা গুরুত্ব আরোপ করতে পারে।'

এবার মর্যাদা বা সম্ভ্রম: 'কাউকে হ্যালো, ওল্ড ফেলো', বা 'হ্যালো, বব্' বলে সম্ভাষণ করা অশিষ্টতাসূচক। এভাবে কেউ ডাকলে ভদ্রভাবে ... দিয়ে ব্যক্তিটিকে সসম্মানে সম্বোধন করা কর্তব্য। তাহলে, খুব সম্ভবত সেই ব্যক্তি স্বকীয় আচরণে লজ্জিত হবে।'

চুম্বন: নিজের বাড়িতে বান্ধবী এলে সম্বর্ধনা জানানর রীতি হিসেবে চুম্বনদান এখনও প্রচলিত; কিন্তু এটি এমন একটি রীতি যা শারীরতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য কারণে তুলে দেওয়া উচিত।

'বল'-এর আসরে পালনীয় আচার এই: 'কোনও ভদ্রলোক বল-এ মহিলাদের ড্রেসিং রুম-এ প্রবেশ করবেন না।'

তাসখেলা: 'সম্ভব হলে খেলার নিয়ম ভাঙবে না এবং ঠকাবে না। কাউকে ঠকাতে দেখলে সবিনয়ে ব্যাপারটি তাকে জানাও, কিন্তু সাবধান তোমার যেন ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে। খেলতে বসে তিক্ত মনোভাব সৃষ্টি হয় যাদের, তাদের উচিত না খেলা।'

বিবাহ সম্পর্কিত আচারও আকর্ষণীয়। 'যার চুল লাল এবং গাত্রবর্ণ উজ্জ্বলতার উচিত ঘন কালো চুলঅলা কাউকে বিয়ে করা। অতিস্থূল বিয়ে করবে রোগাকে এবং শক্তপোক্ত, ঠাণ্ডা মাথার লোক বিয়ে করবে নাদুস-নুদুস, সংরাগময় কাউকে।'

এইবার পতিদেবতার পালা। 'বাড়ি থেকে বেরুতে হলেই নম্র বিদায় জ্ঞাপন এবং প্রেমময় বাক্য উচ্চারণ করবে। এগুলো শেষ কথা হতে পারে।'

ট্রেণ পথে ভ্রমণ: 'চোখ ভাল না হলে ট্রেণ-এ বসে বইপড়া এড়ানো ভাল, ফুস্ফুস্ কমজোরি যাদের তারা কথা এড়িয়ে যাবে।'

হোটেল: 'ভদ্রমহিলার উচিত হোটেল-এর হল-এ একাকী উদ্দেশ্যহীনভাবে না বেড়ান বা একাকী হোটেল-এর জানলায় না দাঁড়ান।'

পথের শিষ্টাচার: 'পেভ্‌মেন্ট পেরোনর সময় ভদ্রমহিলার উচিত গোড়ালীর একটু ওপরে পোশাক ডান হাত দিয়ে তুলে ধরা। দু'হাতে পোশাক তোলা ইতরজনোচিত এবং কেবলমাত্র কাদা খুব গভীর হলেই তা মাপ করা যেতে পারে।'

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এর অনেকখানি সাময়িক হলেও, মূলে নিহিত শালীনতাবোধ। পরে সেই বোধের প্রকাশ পাল্টেছে। আজও বহুল পরিমাণে। কিন্তু মূল বোধ অপরিবর্তিত।
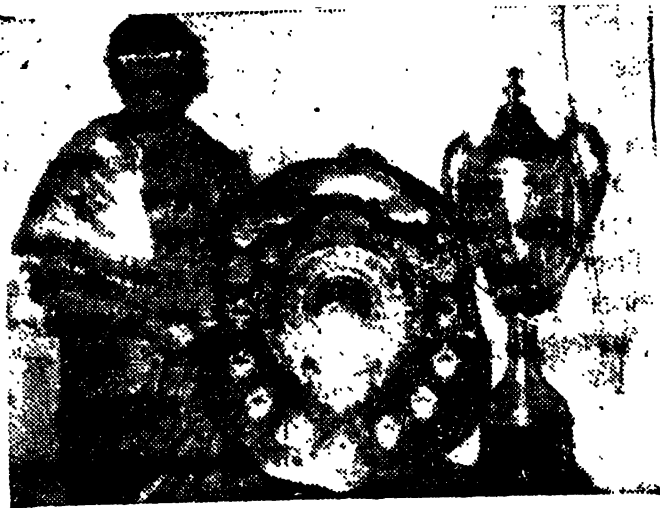
ট্রিপল বিজয়িনী শ্রীমতী শান্তি ঘোষ দার্জিলিং টেনিস টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস্ ও মিক্সড-ডাবল্সে তিনি বিজয়িনী হন

বঙ্গের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গীর্জা

পৃথিবীর নানা দেশের ন্যায় ভারতবর্ষ ও খৃস্টধর্মের সম্প্রসারণ এবং ব্যাপক প্রতিষ্ঠার একটি বিরাট ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত। প্রেম, মৈত্রী ও করুণার মূর্তিমন্ত বিগ্রহ ভগবান যীশুর সুমহান সর্বধর্মের অনুশীলনে ও অবলম্বনে ধর্মের সমন্বয়ে বৃহত্তর মানবধর্মের বিকাশভূমি, অগণিত ধর্মাচার্যদের লীলাক্ষেত্র এই ভারতভূমিও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে নি। ভারতের নানা-স্থানে, নগরে নগরে জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, গীর্জা উপাসনাগৃহজাতীয় খৃস্টধর্মের বিভিন্ন স্মারকচিহ্ন ও নিদর্শনই আমাদের উপরোক্ত ধারণার প্রমাণ।

কলকাতার অনতিদূরে অবস্থিত ব্যাণ্ডেল একাধিক কারণে ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী হয়ে আছে। এ দেশের প্রাচীনতম গীর্জাটি ব্যাণ্ডেলেই অবস্থিত। যে অসংখ্য গীর্জায় সারা দেশ ছেয়ে আছে, তাদের মধ্যে যেটি প্রবীণতম, প্রাচীনতম তাকে বক্ষে ধারণ করার গৌরব আজও এই ব্যাণ্ডেলেরই অধিকারগত।

যোড়শ শতাব্দীর সর্বশেষ অর্ধটিতে এই গীর্জাটির পত্তন হয়। কিন্তু এই গীর্জার যা মুখ্য আকর্ষণ বা সম্পদ, সেই 'আওয়ার লেডী অফ হ্যাপি ভয়েজ' মূর্তিটি আরও প্রাচীন। মূলত এই মূর্তিটি হুগলীতে পর্তুগীজ ফ্যাক্টরির মধ্যে সামরিক উপাসনালয়ে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে যে মর্মর বেদীটির উপর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত সেই বেদীটির নির্মাণ ১৯১০ সালে। ১৮৯৭ সালের ভয়ঙ্কর ভূকম্পনে সাধারণ্যে 'গুরুমার মূর্তি নামে অভিহিত মেরী মাতার এই মূর্তিটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে এখানে যে উপাসনালয়টি পরিদৃশ্যমান, সেই ভবনটির নির্মাণ ১৬৬০ সালে। এর নির্মাণশিল্পের কৃতিত্ব ও গৌরব যাঁর প্রাপ্য তাঁর নাম গোমেজ দ্য সোটা। কিছুকাল এই গৃহটি 'নোসা সেনহোরা দ্য রোজারিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

গীর্জার প্রধান ঘণ্টাটির দৈর্ঘ্য একশো সাড়ে সাঁইত্রিশ ফুট এবং প্রস্থ তেষট্টি ফুট। ক্রুশ থেকে যীশুর অবতরণের যে চিত্রটি এখানে দেখতে পাওয়া যাবে, চিত্রগত চমৎকারিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যে তা ভরপুর।

ব্যাণ্ডেলের এই প্রাচীনতম গীর্জাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আরও বাষট্টি বছর আগে এখানে খৃস্টান মিশনারীদের আনাগোনা, কার্যকলাপ সুরু হোয়ে গেছে। ভারতে তখন মোগল যুগ সবে সুরু হয়েছে। সম্রাট হুমায়ুন তখন শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে রীতিমত বিব্রত। এই সময়ে শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে সম্রাটকে সহায়তা করার সঙ্কল্প নিয়ে মাত্র ন'জন পর্তুগীজকে সঙ্গে নিয়ে যে ইয়োরোপীয় সর্বপ্রথম হুগলী নদীতে প্রবেশ করেন, তাঁর নাম এ্যাড-মিরাল সাম্পায়ের। হুগলী 'ব্যাণ্ডেল' প্রভৃতি সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে খৃস্টানদের অনুপ্রবেশের ধারায় প্রথম পুরুষ এই এ্যাডমিরাল। আকবর-জাহাঙ্গীরের সময়েও বাঙলার এই বিভিন্ন অঞ্চলে নানা বিদেশীদের আগমন ঘটতে থাকে। শাহজাহান যে সময়ে ভারতের সম্রাট, সেই সময় ১৬৩৩ সালে পর্তুগীজরা এই গীর্জাকে বেষ্টন করে আরও সাড়ে শ' সাতাত্তর বিঘে জমি সম্রাটের ফার্মাণ অনুযায়ী লাভ করে। ১৬৪৬ সালে এই ফার্মাণ চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইংরেজদের ইতিবৃত্তে ব্যাণ্ডেলের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে সর্ব-প্রথম ১৬১৬ সালে। 'এমব্যাসী টু দ্য কোর্ট অফ দ্য গ্রেট মিগল'এ স্যার টমাস রো ব্যাণ্ডেলের বিষয় ইংরেজ-দের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যগত গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বেও ব্যাণ্ডেল সেদিন বিভূষিত ছিল। ১৭৯৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর-এর ক্যালকাটা গেজেটে দেখা যাচ্ছে যে, ফোর্ট উই-লিয়ামে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার রবার্ট টমাস অবসর যাপনার্থে ব্যাণ্ডেলে দিনাতিপাত করছেন। সেই সময় ব্যাণ্ডেলকে অতীব মনোরম, চিত্তাকর্ষক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রভূত উপকারী অঞ্চল হিসাবে বর্ণিত করা হয়েছে।

আজও বছরের কোন কোন সময়ে ধর্মীয় উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে ব্যাণ্ডেলের গীর্জা। উৎসবের আলোকমালায় এবং শোভাযাত্রায় উজ্জ্বল্যে বাঙলার এই প্রাচীনতম গীর্জাটি (আজও যেখানে ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বছরে দেড় লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে) নতুন প্রাণের, অনন্ত জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের প্রত্যূষে এই গীর্জাটি বর্তমান ছিল, আবার তার অস্তগমনের সন্ধ্যায়ও এই গীর্জাটি বর্তমানই আছে ভাবীকালকে স্বাগত জানিয়ে কত অসংখ্য পতন-উত্থানের বিচিত্র রোমাঞ্চকর ঘটনা ও ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে।

—গোপাল মজুমদার

শাশ্বত

সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবনের বহুদীর্ঘ যাত্রাপথ বহি'
আসে বাধা, আসে ক্লান্তি অবসাদ নিয়ে।

ক্ষণিকের ভুলে, মাঝে মাঝে থেমে যায় গতি।
তবু তাহা সত্য নয়, নহে পূর্ণচ্ছেদ তাহে;
সম্মুখে চলিতে হবে, এই সত্য, চিরন্তন অতি।

ক্যাপ্টেন কুক দ্বিশত বার্ষিকী

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাপ্টেন কুকের অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের দু'শো বছর এপ্রিল মাসে পূর্ণ হওয়ার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ডাকবিভাগ কয়েকখানি স্মারক ডাক-টিকিট বের করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে ক্যাপ্টেন কুক্-এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই খ্যাতনামা ব্রিটিশ নাবিক মাত্র অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারকই নন, তিনিই অস্ট্রেলিয়াকে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপে মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটি ১৭৬৯ সালে একখানি জাহাজে করে একদল বৈজ্ঞানিককে পাঠিয়েছিলেন। রয়েল সোসাইটি চেয়েছিলেন কোনও বৈজ্ঞানিককে এই অভিযানের নেতা করতে। কিন্তু ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগের মন্ত্রী তাতে রাজি না হয়ে ক্যাপ্টেন কুকের নেতৃত্বে জাহাজ পাঠিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন কুকের এই জাহাজের নাম ছিল,---'এন্ডেভার'। তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল, তাহিতির কাজ সেরে তিনি জাহাজ নিয়ে নিউজীল্যাণ্ড যাবেন এবং সেখান থেকে তাঁর খুশিমত যে-কোনও পথ ধরে ইংলণ্ডে ফিরে আসবেন।

তাহিতি দ্বীপে বৈজ্ঞানিকদের কাজ শেষ হওয়ার পর ক্যাপ্টেন কুক্ অপরিচিত দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে জাহাজ চালিয়ে যান এবং ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের ৭ই অক্টোবর নিউজীল্যাণ্ডে পৌঁছান। সেকালে লোকের ধারণা ছিল নিউজীল্যাণ্ড কোন একটা বড় মহাদেশের অংশবিশেষ। কিন্তু ছ'মাস ধরে নিউজীল্যাণ্ডের চারিদিকের সমুদ্রে ঘুরে ক্যাপ্টেন কুক্ এই দ্বীপের মানচিত্র তৈরী করেছিলেন এবং এই দেশের বিবরণ সকলকে দিয়ে গিয়েছিলেন। নিউজীল্যাণ্ডের সমুদ্রের চার্টিং শেষ করে ক্যাপ্টেন কুক্ সোজা পশ্চিম দিকে জাহাজ চালিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আগে সে পথ ধরে কোনও নাবিক জাহাজ চালিয়ে যান নি।

অস্ট্রেলিয়ার কিছুটা অংশ অনেক আগেই পর্তুগীজ ও ডাচ্ নাবিকেরা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা সেই অংশের নাম দিয়েছিলেন নিউ হল্যাণ্ড। কিন্তু নিউ হল্যাণ্ডের বিস্তৃত ভৌগোলিক বিবরণ নিয়ে কেউ মাথা ঘামান নি বলে এর ভৌগোলিক বিবরণও কারও জানা ছিল না। ক্যাপ্টেন কুক্ তাঁর 'এনডেভর' নিউজীল্যাণ্ড থেকে সোজা পশ্চিম মুখে চালিয়ে ১৭৭০ খৃঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে এসে জাহাজ ভেড়ালেন। অস্ট্রেলিয়ার যত বড় বড় শহর বর্তমান এই উপকূল-ভাগেই গড়ে উঠেছে। হাউ অন্তরীপের কাছে জাহাজ থেকে সদলে নেমে ক্যাপ্টেন কুক্ নতুন আবিষ্কৃত এই ভূভাগ দখল করে ব্রিটিশ পতাকা উড়িয়েছিলেন। তারপর জাহাজের মুখ উত্তরদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে প্রায় ২০০০ মাইল ধরে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলভাগের তিনি মানচিত্র করেন, সমুদ্রের জলের গভীরতার পরিমাপ নেন এবং অন্যান্য ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করে যান। অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারক হিসাবে তাই ক্যাপ্টেন কুকের নাম আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

অস্ট্রেলিয়ার উপকূলভাগ জরীপ করার সময় বহুবার তাঁর ছোট্ট জাহাজখানি নানা বিপর্যয়ে ভেঙে পড়ার মত অবস্থায় পড়ে। 'এন্ডেভার' ছিল মাত্র ৩২০ টনের ছোট্ট পালতোলা জাহাজ। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের জোরালো সমুদ্র স্রোতের মুখে পড়ে জাহাজ যখন আর এগিয়ে যেতে পারতো না, ক্যাপ্টেন কুক্ তখন নাবিকদের দিয়ে দাঁড় টানাতেন। জাহাজ নিয়ে কখনও তিনি পিছিয়ে পড়তে চাইতেন না। এইভাবেই তিনি তাঁর জাহাজ টরেস্ প্রণালী দিয়ে বাটাভিয়া পর্যন্ত নিয়ে যান। অস্ট্রেলিয়া যে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম দ্বীপ, ক্যাপ্টেন কুকের আবিষ্কারের কাহিনী থেকেই তা পৃথিবীর লোকে প্রথমে জানতে পারে। এই দ্বীপে জনবসতির সূত্রপাত

ক্যাপ্টেন কুক দ্বিশতবার্ষিকীর ডাকটিকিট

হিসাব-নিকাশ

[illegible]

জীবনের লেন-দেন কিছুই মেটে না
যত খুশি ফেরি-ফিরি করি বেচা-কেনা
অথবা বসেই থাকি হাত পা গুটিয়ে,
কেটে যায় দিনগুলি আনন্দে চুটিয়ে,

জরাজীর্ণে নুয়ে-পড়া দেহটিকে ঘিরে
আশা-ভরা কামনার ছেঁড়া জামাটিরে
ফেলে দিতে কিছুতেই পারি না সহজে
লড়াই লেগেই থাকে হৃদয়ে মগজে।

সুরু থেকে শেষ করে শেষ থেকে সুরু
করি আর মালা জপি—জয় জয়গুরু।
পাবার খুশিতে আর না পাবার শোকে
ভোলাবে কে হাতে নিয়ে বীতশোক লোকে?

কবরখানার পাশে হিসাব নিকাশ
যে করে সে আমি নই, সেতো ক্রীতদাস।

হয় ১৭৮৮ সালে, যখন কয়েকখানি জাহাজভরতি লোক নিয়ে ইংলণ্ড থেকে ক্যাপ্টেন ফিলিপ্ বোটানী উপসাগরে প্রথম এসে নেমেছিলেন।

ক্যাপ্টেন কুক্ মোট তিনবার দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালিয়েছিলেন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তিনি 'রেজলিউসন' এবং 'এড্ভেনচার' নামে দু'খানি জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ মেরু থেকে বিষুব-রেখা পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগ ঘুরে বেড়ান। এই অভিযানে তিনি নিউ ক্যালিডোনিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। তিন বছর ধরে ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ দু'টি যেভাবে সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছিল, মাইলের হিসাব করলে এত বেশী পথ তাঁর আগে আর কোনও নাবিক সমুদ্রপথে অতিক্রম করেন নি। ১৭৭৫ সালে ইংলণ্ডে ফিরে এসে পরের বছরই আবার তিনি তাঁর তৃতীয় এবং শেষ সমুদ্র অভিযানে বেরিয়েছিলেন এবং এই অভিযানের সময়েই ক্যাপ্টেন কুকের মৃত্যু হয়।

১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ক্যাপ্টেন কুক্ তাঁর "রেজলিউসন" জাহাজে এবং তাঁর সঙ্গী ক্যাপ্টেন ক্লার্ক 'ডিস্কভারী' জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিয়ে আটলাণ্টিক মহাসাগরে যাওয়ার নৌ-পথ খুঁজে বের করা। ১৭৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন কুক্ সদলে হাওয়াই দ্বীপে পৌঁছিয়ে প্রথমে সেখানে খুব সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে জাহাজের মাস্তুল সারানোর জন্যে হাওয়াই দ্বীপের কারাকাকোয়া উপসাগরে তাঁরা নামলে প্রায় তিন হাজার হাওয়াই দ্বীপের আদিবাসী ক্যাপ্টেন কুক্কে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স মাত্র একান্ন বছর। কিন্তু এই বয়সেই নাবিক ও সমুদ্র অভিযানের নেতা হিসাবে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

ক্যাপ্টেন কুকের অস্ট্রেলিয়া আগমনের দু'শো বছর পূর্ণ হওয়ার যে স্মারক টিকিট বেরিয়েছে, তা'ও নতুন ধরণের। পাঁচ সেণ্ট দামের পাঁচটি টিকিট পৃথক পৃথক ছবি দিয়ে একসঙ্গে ছাপানো হয়েছে। বাম দিক থেকে পাঁচটা ডাকটিকিটে আছে ক্যাপ্টেন কুক ও তাঁর জাহাজের ছবি, তাঁর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, জাহাজ থেকে মাটিতে অবতরণের ছবি, তাঁর সঙ্গীদের ছবি এবং সবশেষে জাহাজ ও দেশ আবিষ্কারের দৃশ্য। পাঁচটি প্যানেলে ক্যাপ্টেন কুকের কাহিনীর সবই বলা হয়েছে। এই স্মারক ডাকটিকিটগুলি পৃথকভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তা ছাড়া আরও একখানি ত্রিশ সেণ্ট দামের ডাকটিকিটে ক্যাপ্টেন কুক্ ও তাঁর জাহাজের ছবি দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ডাক বিভাগ কুকের দ্বিশত-বার্ষিকীর যে স্মারক ডাকটিকিট বের করেছেন তা দেখলে এই বিখ্যাত আবিষ্কারকের জীবনী সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।

মুহূর্তে মানবজীবনে অহিংসা ধর্মের সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে, সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যখনই আমরা এই মহান আদর্শের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করি, তখনই আসে বহু অসুবিধা। মনে হয়, অহিংসার আদর্শের কথা চিন্তা করা যত সোজা, জীবনে যথাযথভাবে তার প্রয়োগ করা ততই কঠিন। তাছাড়া মনে এই প্রশ্নই জাগে, অহিংসার আদর্শ কি কেবল মানুষের কল্পনার বস্তু, না, এই আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ ধারণা নেই।

অহিংসার প্রকৃত অর্থ কি? মনে অহিংসা ভাব অথচ তাঁর প্রকাশ নেই, একে প্রকৃত অহিংসা বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'ক' 'খ'-কে আঘাত করল, কিন্তু 'খ' 'ক'-কে কোন আঘাত না করে মনে মনে তাকে অভিশাপ দিতে লাগল। এক্ষেত্রে 'খ'-কে প্রকৃত অহিংস বলা চলে না। যেমন বাহ্যিক ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নয়, যেমন বাহ্যিক নিষ্ক্রিয়তা প্রকৃত নিবৃত্তি নয়, তেমনি বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ না করাটাই অহিংসা নয়। আবার, যে আমাকে আঘাত করল, তাকে আঘাত করার শক্তি আমি রাখি অথচ তাকে আঘাত করলাম না---প্রকৃত অহিংস হতে হলে এর সব সময় প্রয়োজন হয় না। যে ব্যক্তি তাঁর মহাশত্রুর প্রতি মনে মনে একেবারেই বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করেন না, যিনি তাঁর মহাশত্রুকে নিজের মত করে ভালবাসতে পারেন, তিনিই প্রকৃত অহিংস। জগাই-মাধাইকে উদ্দেশ্য করে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলেছিলেন, 'মেরেছিস্ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দোব না।' এইরূপ সৌজন্য, এইরূপ বীরত্বের মধ্যেই অহিংসা ধর্মের প্রকৃত অর্থ নিহিত। সত্য কথা বলতে কি, প্রেমশক্তি দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করার মধ্যে যেরূপ আনন্দ আছে আর কিছুতে সেরূপ আনন্দ নেই। কিন্তু মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সময় এই মহান্ আদর্শের হুবহু প্রয়োগ করা একপ্রকার অপর কর্তৃক আহত হয়েছেন বা তাঁর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তখন তাঁর পক্ষে নিজে অহিংস থাকা অপেক্ষাকৃত সোজা ব্যাপার। কিন্তু যখন কাহারও অধিকার বা নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, তখন অক্ষরে অক্ষরে এই আদর্শের অনুসরণ করার পথে আসে অনেক বাধা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যখন কোন প্রতিবেশীর গৃহ দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সেই দস্যুদলকে বাধা না দিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় কি? যদি কোন ব্যক্তির নিজের গৃহ দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত

শ্রীমঙ্গলময় দত্ত

হয় বা নিজের সম্পত্তি দস্যুগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজের ক্ষতিতে কিছু না মনে করে দস্যুদলের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারেন। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে প্রতিবেশীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছেন, তখন সেই প্রতিবেশীর পক্ষে নীরব থাকা ন্যায়সঙ্গত হবে কি? যখন কোন নারী দুরাত্মা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য অপরের সাহায্য ভিক্ষা করছে, তখন কি কেহ দুরাত্মার হাত থেকে অসহায়া নারীকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করবে না?

উপরোক্ত ক্ষেত্রে দস্যুদলকে কর্ম থেকে বিরত করা যাবে কি? ---আর সে প্রেমশক্তি ক'জনেরই বা আছে? আবার, যখন কেহ অন্যায় কর্মে লিপ্ত আছে, তখন তাকে অন্যায় কর্ম থেকে বিরত না করে সেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়াকে অহিংসা বলা চলে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।' অবশ্য অহিংসা ধর্মের সম্পূর্ণভাবে বাস্তব জগতে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে এই মহান্ ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, একথা বলার পেছনে কোন বিশেষ যুক্তি নেই।

মানব সভ্যতার আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন আদর্শ মানব জাতি অনুসরণ করে আসছে, কিন্তু জানি-না, আজও পর্যন্ত কোন আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হয়েছে কি-না। আদর্শে পৌঁছাতে না পারলেও আদর্শ অনুসরণ করতে দোষ কি? ইংরাজীতে একটি কথা আছে---'Ideal always falls short of the actual.' আদর্শ না থাকলে মানব জাতির অস্তিত্ব থাকে না বা অন্য কথায় বলতে গেলে, আদর্শ পালনের মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা। প্রসঙ্গত মনীষী টলস্টয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য :---

"If a man lives, he believes in something; If he did not

অহিংসা কাপুরুষতা নয়

believe that there is something to live for, he would not live."

মনীষী টলস্টয় যা বলেছেন তার বঙ্গানুবাদ করলে এই অর্থ হয় যে, মানুষকে বাঁচতে হলে কোন কিছুতে বা কোন আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রেখে বাঁচতে হবে। যদি মানুষ বিশ্বাস না করে যে, তার বাঁচবার এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তাহলে সে বাঁচবার মত বাঁচবে না অর্থাৎ তার বাঁচবার কোন সার্থকতা নেই।

অহিংসা মানব জীবনের এক মহান্ আদর্শ, কিন্তু এই আদর্শকে বাস্তবে প্রয়োগ করা কতদূর সম্ভব, তার সন্ধান পাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে। অহিংসা ধর্মের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত (Classical example) নিম্নে উল্লেখ করলাম:

'Ravana, you have fought like a hero, but your fight is useless, this very instant I can put and end to your life If I choose, But, I shall not choose. I have given you a number of opportunities and shall yet one more. Consider if it will not be good for you to deliver over poor Sita to me. Consider well and act. If you heed my advice you will be prosperous. Otherwise, I shall be obliged to put an end to your life."

উপরোক্ত ইংরাজী উক্তির বঙ্গানুবাদ করলে এইরূপ অর্থ হয়:---'রাবণ, তুমি বীরের মত যুদ্ধ করেছ, কিন্তু তোমার যুদ্ধ করাটা বৃথা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি তোমার প্রাণ সংহার করতে পারি, যদি আমি ইচ্ছা করি। কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা নেই। আমি বহু সুযোগ দিয়েছি এবং আরও একবার সুযোগ দোব। তুমি বিবেচনা করে দেখ যে, হতভাগিনী সীতাকে আমার নিকট অর্পণ না করাটা তোমার পক্ষে ভাল হবে কি না। ভালরূপে বিবেচনা কর এবং সেই অনুসারে কার্য কর। যদি তুমি আমার কথা শোন, তাহলে তুমি শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হবে। নচেৎ, আমি তোমার প্রাণ সংহার করতে বাধ্য।' এইরূপ প্রশান্ত ভাব, শত্রুর প্রতি এইরূপ ভালবাসাই হচ্ছে অহিংসার প্রধান লক্ষণ। যেখানে রামচন্দ্রের প্রিয়তমা সীতা জড়িত, সেখানেও তিনি নিঃস্বার্থপর, সেখানেও শত্রুর প্রতি তাঁর ক্রোধ বা অবজ্ঞার ভাব নেই। শুধু কর্তব্যের খাতিরে, শুধু ধর্মরক্ষার জন্যই রামচন্দ্র যুদ্ধ করেছিলেন। মহাভারতে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, প্রথমে অহিংস উপায়ে এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে এবং এই উপায়ে তা যদি সম্ভব না হয়, শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদে দুই প্রকার শক্তির উল্লেখ আছে:--(১) আধ্যাত্মিক শক্তি এবং (২) সামরিক শক্তি। 'মহাভারতে'র ভিতর দার্শনিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা, যিনি মানবমনকে শিক্ষা দিচ্ছেন, মানবমনকে ঠিক পথে চালিত করছেন এবং অর্জুন হচ্ছেন এই মানবমনের প্রতিরূপ, নিদর্শনস্বরূপ। দুর্যোধন ও তার দলবল হচ্ছে অসৎবৃত্তির, দুর্বৃত্ততার প্রতিমূর্তি এবং পাণ্ডবেরা ও তাঁদের মিত্র রাজন্যবর্গ সুমতির, পবিত্র ও মহান চিন্তার প্রতিরূপ। সংক্ষেপে বলতে গেলে রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের জয়, মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে পাণ্ডবের জয়, অধর্মের উপর ধর্মের, মিথ্যার উপর সত্যের, দানবীয় শক্তির উপর নৈতিক শক্তির জয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দুই মহাকাব্যের সার কথা এই যে, পরিণামে ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। লোভ, লালসা, ঈর্ষা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, মনের যা কিছু কুবৃত্তি, যা কিছু অন্যায়, অধর্ম তা বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

এখন কথা হচ্ছে, কি উপায়ে, কোন্ পথে একটি জাতি মহান্ ও শক্তিশালী হতে পারে এবং বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারে? একদল মানুষ আছেন, যাঁরা এই মত পোষণ করেন যে, জাগতিক ব্যাপারে উদ্দেশ্য বা কার্যসিদ্ধির জন্য যে-কোন উপায়, সৎ-ই হোক আর অসৎ-ই হোক্ অবলম্বন করতে হবে। উদ্দেশ্যই মুখ্য, উপায় গৌণ (End Justifies the means)। মিথ্যা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, লুণ্ঠন---এসব কিছুই অন্যায় বলে পরিগণিত হবে না, যদিও এসব জাতির স্বার্থের জন্য, উন্নতির জন্য প্রয়োজন হয়। আর একদল লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, সত্যের পথ ধর্মের পথ, ন্যায়পরায়ণতার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। সত্য কথা বলতে কি, অধর্মের পথে সময় সময় আপাতঃদৃষ্টিতে কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে, কিন্তু পরিণামে তার সমুচিত প্রতিফল পেতেই হবে। হিটলার ও মুসোলিনীর লোমহর্ষক, ভয়ঙ্কর শক্তি ও অত্যাচারের কথা আমরা জানি কিন্তু পরিণামে ইহাদের বিষাদময় হৃদয়বিদারক দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় অধর্মের ও অন্যায়ের পরিণাম কি হতে পারে।

এখন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, শক্তি প্রয়োগ করা অহিংসা নীতির বিরোধী নয়। অহিংসানীতি অনুযায়ী সদিচ্ছা ও প্রীতির মনোভাব নিয়ে শত্রুর সাথে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু অহিংসা ধর্মের মধ্যে এমন কিছু নির্দেশ নেই যে, শত্রুর বা আক্রমণকারীর অন্যায় কর্মের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। যদি সম্ভব হয়, শান্তিপূর্ণভাবে অন্যায় কর্ম থেকে শত্রুকে বিরত করতে হবে। কিন্তু, তা যদি সম্ভব না হয়, শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে। ইহার অন্যতর (alternative) উপায় এই নয় যে, শত্রুর অন্যায়ের নিকট করজোড়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী---যিনি বর্তমান জগতে অহিংসা ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন বলেছিলেন, "Between violences and cowardice, I choose violence because cowardice is a sin.' হিংসা ও "কাপুরুষতার মধ্যে আমি হিংসাকে বেছে নেব, কারণ, কাপুরুষতা পাপ।

এক ঝলক আলো

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

পুলিস গাড়িতে এসে হাজির হবার পর শকুন্তলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ঐ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডটা যেখানে ঘটে, তার চার পাশে এমনি ভীড় জমে গিয়েছিল যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় নি তার পক্ষে। কনষ্টেবল তাকে সঙ্গে করে দু'চার পা এগিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু কৌতূহলী জনতার প্রচণ্ড চাপে আবার তাকে পিছু হটতে হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা শকুন্তলাকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে। সেই শীতের সকালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল তার কপালে। পুলিস-ভ্যান আসার পর একটু পাতলা হয়ে আসে ভীড়টা। পুলিসের লোকেরা ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপর শকুন্তলাকে দু'চারটে প্রশ্ন করে তুলে নেয় ভ্যানের মধ্যে।

শকুন্তলা ভেবেছিল পুলিস ফাঁড়ি থেকে মুক্তি পেতে দেরী হবে না তার। পুলিসের লোকেরা একটা হলঘরে তাকে বসিয়ে রেখে ঘণ্টা খানেক আগে সেই যে চলে গিয়েছে, এখনও

তাদের পাত্তা নেই। কাঠের বেঞ্চির উপর এতক্ষণ বসে থাকতে কষ্টও কম হয় না। সামনের দেয়াল ঘড়িতে বারোটা বাজে। শকুন্তলা অস্থির হয়ে পড়ে। কেন যে তাকে এতক্ষণ এখানে আটকে রাখা হয়েছে, তা সে বুঝতে পারে না। সে তো ইতিপূর্বেই তার পরিচয় ও ঠিকানা পুলিসকে দিয়েছে। পুলিসের লোকেরা যা-কিছু জানতে চেয়েছিল, সবই তো বলেছে তাদের। বিরক্ত হয়ে শকুন্তলা মনে মনে স্থির করে, আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরও যদি তার ডাক না আসে, তবে সে বেরিয়ে পড়বে ওখান থেকে। হয়তো এর জন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হবে তার কাছে। তা হোক, তবু এই-ভাবে অনন্তকাল এখানে বসে থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

শকুন্তলা উঠি-উঠি করছে, এমন সময় উর্দি-পরা একজন চাপরাশি এসে তাকে জানাল, দারোগা সাহেব তলব করেছেন তাকে। চাপরাশির সঙ্গে সে একটা ছোট কামরায় এসে ঢুকল। তাকে ওখানে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল চাপরাশি। কামরার মাঝখানে একটা বড় টেবিল। দু'পাশে দু'খানা চেয়ার। ওপাশের চেয়ারটাতে বসে স্থূলকায় এক ভদ্রলোক টেবিলের উপর রাখা প্রকাণ্ড একটা খাতায় কি সব লিখছেন। তাঁর শরীরের উপরের অংশটা টেবিলের ওপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছে যে, তাঁর মুখখানা শকুন্তলা দেখতে পায় না। তার নজরে পড়ে শুধু তাঁর প্রকাণ্ড চকচকে টাকটা। শরীরের উচ্চতাও ঠিকমত আন্দাজ করতে পারে না সে। তবে তার মনে হয়, ভদ্রলোকটি তেমন লম্বা নন।

ইনিই যে দারোগা সাহেব সেটা বুঝতে দেরী হয় না শকুন্তলার। শকুন্তলা চেয়ারে বসবার কিছুক্ষণ পরেই দারোগা সাহেবের আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা ভারী ও কর্কশ। খাতার উপর থেকে চোখ না তুলেই দারোগা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম?'

'শকুন্তলা।'

'শ-কু-ন্ত-লা। মস্ত বড় নাম যে!'

শকুন্তলা চুপ করে থাকে।

'আপনার আসল নাম?'

দারোগা সাহেব এবার মুখ তুললেন। ভাবলেশহীন কদাকার মুখ, গোঁফ-দাড়ি কামানো। পুরু ভুরুর নীচে ছোট ছোট গোল চোখে এক অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা।

'ঐটেই আমার আসল নাম।'

'বেশ। আপনার পুরো নামটা বলুন তাহলে।'

'শকুন্তলা দেশাই।'

এক মুহূর্তে নিস্পৃহভাবে শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে দারোগা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'আপনার বয়স?'

'ওসব প্রশ্নের জবাব তো আগেই দিয়েছি।'

'আবা একবার দিতে হবে আপনাকে।'' দারোগা সাহেবের কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অশোভন রুক্ষতা ফুটে ওঠে।

'ছাব্বিশ।' শকুন্তলা একটু ঘাবড়ে যায় যেন।

'কুমারী, না বিবাহিতা?'

'বিধবা।' ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে জবাব দেয় শকুন্তলা।

দারোগা সাহেব এবার যেন একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠেন, যদিও বাইরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না।

'আপনি তো এর আগে আমা-দের একজন অফিসারকে বলেছেন, প্যারেলে থাকেন আপনি। সেখান থেকে এতদূরে এসে কী করছিলেন?'

প্রশ্নটা নিতান্ত অবান্তর মনে হয় শকুন্তলার। মনে মনে ভীষণ চটে যায় সে, কিন্তু রাগটা প্রকাশ করার মত ভাষা খুঁজে পায় না।

'বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও বেরুতে পারবো না, এমন কোন কানুন আছে বলে আমি তো জানি না।'

দারোগা সাহেব কোন মন্তব্য না করে মাথা নীচু করে থাকেন। এক মুহূর্ত কি ভেবে শকুন্তলা জবাব দেয় তাঁর প্রশ্নের। 'মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম আমি।'

'আপনি কোনো কাজকর্ম করেন?'

'হাঁ।'

'কী কাজ?'

পেন্সিলটা টেবিলের উপর ঠুকে দারোগা সাহেব আড়চোখে তাকান শকুন্তলার দিকে।

শকুন্তলা অপমানিত বোধ করে। সোজা হয়ে বসে পরিষ্কার কণ্ঠে সে জবাব দেয়, 'গান শেখাই মিউজিক স্কুলে।'

'গায়িকা! সিনেমায় প্লে-ব্যাক করেন তো?'

চোখ দু'টো কুঁচকে মুচকি হাসেন দারোগা সাহেব।

শকুন্তলার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যায়। ওখানে আর একদণ্ডও বসে থাকা অসহ্য হয় তার। ক্রোধের আতিশয্যে তার ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ু-গুলো সতেজ হয়ে ওঠে। পিছনের দরজাটা ঠেলে কে একজন ভিতরে এল, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল না। চেয়ার ছেড়ে উত্তেজিতভাবে সে উঠে দাঁড়ায়, তারপর স্থির অকম্পিত কণ্ঠে বলে, 'কী কাজ করি আমি—তা জানবার কোনো অধিকার নেই আপনার। পুলিস অফিসারদের কর্তব্য মেয়েদের সম্মান রক্ষা করা, অপমান করা নয়। আমারই আপনাকে প্রশ্ন করবার কথা, কিন্তু আপনি প্রশ্ন করছেন আমাকে। রাস্তায় যে লোকটি খুন হল—সে কে? তার পরিচয় আপনারা জানতে পেরে-ছেন কি?''

এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বলতে থাকে, 'আপনারা নানা অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন আমাকে, কিন্তু দরকারী প্রশ্ন একটাও জিজ্ঞাসা করেন নি কেন? ঐ হত্যাকাণ্ডের সময় আমি কী প্রত্যক্ষ করেছি, যে লোকটা খুন করল তাকে আমি দেখেছি কি না, দেখে থাকলে তাকে আমি সনাক্ত করতে

সাম্বন্ধে।ক না—এসব সম্পর্কে আপনারা তো একটাও প্রশ্ন করেননি আমাকে।'

'যথেষ্ট হয়েছে। এখন ওঁকে ছেড়ে দাও, সায়গল।' পিছন থেকে আওয়াজ এল গম্ভীরকণ্ঠে।

শকুন্তলা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় পিছন দিকে। স্যুটপরা সৌম্যদর্শন দীর্ঘাকৃতি এক ভদ্রলোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। দরজার একটা কবাট ডান হাতে ঈষৎ উন্মুক্ত করে দারোগা সাহেবকে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন। দারোগা সাহেব একবার তাকালেন তাঁর দিকে, তারপর রুষ্টমুখে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। যাবার সময়ে শকুন্তলার গা ঘেঁষে এমনিভাবে চলে গেলেন যে, শকুন্তলার শাড়ির আঁচলটা খসে পড়ল কাঁধ থেকে। এটা যে স্বেচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকী রইল না শকুন্তলার, কিন্তু প্রতিবাদ না করে চুপ করে রইল সে।

শকুন্তলা নবাগত ভদ্রলোকটির দিকে একবার তাকায় নিস্পৃহভাবে। তারপর রুক্ষকণ্ঠে বলে, 'আমার কাজ আছে, এখনই যেতে হবে। আমার পথ ছেড়ে দিন।'

'আপনি বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পারছি। এজন্য দুঃখিত আমি।'

'আপনি দুঃখিত হোন আর নাই হোন, আমার কিছু যায় আসে না। যথেষ্ট লাঞ্ছনা হয়েছে আমার, আর এক মুহূর্তও এখানে অপেক্ষা করবো না আমি।'

'মাত্র এক মিনিট সময় আমি নেবো। আপনাকে বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়।'

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে এমন একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ছিল যে, শকুন্তলা তাঁর অনুরোধটাকে উপেক্ষা করতে পারল না। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল চেয়ারের পিঠে হাত রেখে।

'আপনার কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনাকে এতক্ষণ এখানে বসিয়ে রাখাটা অন্যায় হয়েছে আমাদের। কিন্তু—আমাদের অসুবিধাটাও ভেবে দেখবেন একবার। মৃত ব্যক্তিটির পরিচয় সংগ্রহ করতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে আমাদের। তা ছাড়া আমাদের দপ্তরের যে সব নিয়মকানুন আছে তার ঝামেলাও বড় কম নয়। আপনি যদি সংক্ষেপে ঐ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন তবে আমাদের কাজের যথেষ্ট সুবিধে হয়। এ সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানতে পেরেছি তা অবশ্য আপনাকে জানাবো।'

'বেশ, শুনুন তবে।'

শকুন্তলা মনে মনে ভাবে, মানুষের জীবন কী বিচিত্র। ধরাবাঁধা ছকে জীবনটা তার চলেছিল মৃদু-মন্থর গতিতে; হয়তো বা একটু একঘেয়েমি ছিল তাতে; হঠাৎ এল চমক-লাগানো এক নাটকীয় মুহূর্ত, তারপর সেই বৈচিত্র্যের রেশ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই সুরু হল এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দুঃসহ বিড়ম্বনা।

চেয়ারের পিঠে হাতটা রেখে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই শকুন্তলা তার সেদিনের সকালের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে সুরু করল। বর্ণনা করার সময় মাঝে মাঝে আতঙ্কে সে অভিভূত হয়ে পড়ছিল যেন ঘটনাটা আবার সে প্রত্যক্ষ করছে পূর্বের মতই।

সে যা বললে তার মর্ম এই—

মাঝে মাঝে লালবাগে সে আসে মাকে দেখবার জন্য। সেদিন সকালে কোন কাজ না থাকায় সে হেঁটেই চলেছিল লালবাগের দিকে। চারিধারে ঝলমলে রোদ; হাঁটতে ভালই লাগছিল। তার মা লালবাগের যে অঞ্চলে থাকেন সেখানে লোকের বসতি অপেক্ষাকৃত কম। বেলা দশটা বেজে গেছে, ক[illegible] কারখানা বা অফিসে কাজ [illegible] যায়, অনেক আগেই তারা বেরি[illegible] গেছে ঘর থেকে। রাস্তায় লোক[illegible] কম। রাস্তার বাঁকটা ঘুরে শকু[illegible] যেই তার মায়ের ফ্ল্যাটের সামনে এ[illegible] পড়েছে, অমনি একটা প্রচ[illegible] আওয়[illegible] শোনা গেল। কী একটা শোঁ ক[illegible] তার বাঁ কানের পাশ দিয়ে ছুটে গে[illegible] তারপর, কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে স[illegible] সঙ্গেই ফিরে এসে তীব্রগতিতে চ[illegible] গেল তার মুখের উপর দিয়ে। চম[illegible] গিয়ে বাঁ দিকে ঘাড়টা ঝাৎ করতে[illegible] তার নজরে পড়ল ফ্ল্যাট বাড়ির গা[illegible] বারান্দার একটা পাথরের থামে শা[illegible] একটা দাগ ফুটে উঠেছে। কী ক[illegible] কর্ত্তব্য ঠিক করতে না পেরে সে এক-এগিয়ে গেল ফটকের দিকে। সামনে[illegible] দিকে তাকাতেই সে দেখতে পে[illegible] আধাবয়সী একজন খর্ব্বকায় লো[illegible] এগিয়ে আসছে তারই দিকে। লোক[illegible] যে এইমাত্র ফ্ল্যাট বাড়িটা থেকে বেরিয়েছে, এ অনুমান করতে দে[illegible] হল না তার। লোকটি কেমন যে[illegible] আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পা-দু[illegible] তার ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে মুখখা[illegible] ভয়ে বিবর্ণ। একবার সে একদৃ[illegible] তাকাল তার দিকে, তারপরই হুম[illegible] খেয়ে পড়ে গেল তারই সামনে। অ[illegible] পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আরও তিনবা[illegible] প্রচণ্ড শব্দ হল।

ভয়ে এক পা পিছিয়ে গে[illegible] শকুন্তলা। পিছিয়ে যেতেই ধাক্কা লাগ[illegible] থামের গায়ে। এক মুহূর্ত পরে থামে[illegible] আড়াল থেকে আস্তে আস্তে মুখ বা[illegible] করে সে তাকাল। রাস্তার ওপা[illegible]

রাস্তিও মেরাবত্তের একটা দোকান-রের বন্ধ-দরজার সামনে স্যুটপরা একজন লোক দাঁড়িয়ে। তার বাঁ-হাতটা বাঁ-পায়ের উপর আর ডান হাতে একটা রিভলবার। আর দোকান ঘরের স্বল্পান্ধকার বারান্দা থেকে খানিকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তার আলোর মাঝে। লোকটি দাঁড়িয়ে আছে ডান পাটি সামনের দিকে বাড়িয়ে। মাথায় একটা টুপী, টুপীটা ঈষৎ হেলানো, সূর্যের আলোটা পড়ছে টুপীর একপাশে, মুখের খানিকটা ছায়ায় ঢাকা।

টুপীর নীচে তার ছায়ায় ঘেরা মুখখানা শকুন্তলা অবশ্য দেখেছিল মুহূর্ত মাত্র, তবু এটা সে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে যে, ঐ অপরিচিত লোকটি তাকেই লক্ষ্য করছিল একদৃষ্টে। ক্ষণিকের জন্য ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে ছিল সম্মোহিতের মত। তারপরই অনেকের পায়ের শব্দ শোনা গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি রিভলবারটা পুরে ফেলল পকেটে।

হঠাৎ কি মনে করে হাত ঘড়িটার পানে তাকাল শকুন্তলা। দশটা বেজে আটত্রিশ মিনিট। মুখ তুলে আবার যখন সে দৃষ্টিপাত করল দোকানঘরের দিকে, তখন সেই লোকটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সেই জনবিরল রাস্তাটা লোকে ভরে গেছে আর তাদের কলরবে সরগরম হয়ে উঠেছে চারিদিক।

চোখ বুজে শকুন্তলা দাঁড়িয়েছিল আচ্ছন্নের মত। এইমাত্র যে কাণ্ডটা তার চোখের সামনে ঘটে গেল, হয়তো সেটা বোঝবার চেষ্টা করছিল মনে মনে। চোখ যখন খুলল তখন দেখল, তার চার পাশে জমে গেছে বিস্তর লোক আর সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি তারই মুখের উপর নিবদ্ধ। নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু ভীড় বাড়তে থাকে ক্রমশ এবং তার মুক্তির আশা ক্ষীণ হয়ে আসে। সেই জনতার মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল শকুন্তলার। সে হয়তো কিছু বলবারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন অনুভব করে নি। তারা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং পরস্পরকে প্রশ্ন করছিল উত্তেজিতভাবে। শেষে যখন পুলিসের লোক এসে হাজির হল, তখন একটু আশ্বস্ত বোধ করল সে।

শকুন্তলা হত্যাকাণ্ডের যে বর্ণনা দিল, নবাগত ভদ্রলোকটি তা শুনলেন সহানুভূতির সঙ্গে। শকুন্তলা বলতে লাগল, 'তারপর ওরা আমাকে নিয়ে এল এখানে আর ঐ হলঘরটায় বেঞ্চির উপর চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। এক ঘণ্টা কেটে গেল, কেউ আর ডাকতে আসে না। মানুষের ধৈর্যের যে একটা সীমা আছে, এটা আপনারা ভুলে যান একেবারে। সত্যি বলছি আপনাকে, এখানে আমাকে যে কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল, তা জীবনে ভোলবার নয়।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে শকুন্তলা।

শকুন্তলাকে উত্তেজিত হতে দেখে ভদ্রলোক একটু বিব্রত বোধ করেন। শান্তস্বরে বলেন, 'যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আপনি অধীর হবেন না। কাজের কথায় এবার আসা যাক। ঘটনার যে বিবরণ আপনি দিলেন, তা খুবই পরিষ্কার। এখন ঐ সম্পর্কে একটু আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার আছে। রিভলবারের প্রথম গুলীটা পাথরের থামে লেগে ফিরে আসে আপনার দিকে। কানের পাশে আপনি যে তীক্ষ্ণ আওয়াজটা শুনেছিলেন, সেটা ঐ গুলীরই শব্দ। শবে তিনটি গুলী যাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল, তাকেই আঘাত করে। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। যে লোকটি গুলী ছুঁড়েছিল তাকে আপনি যখন দেখে-ছেন, তখন তার চেহারাটা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই?'

একমুহূর্ত থেমে শকুন্তলা বলে, 'হ্যাঁ।'

'লোকটি সুদর্শন, বয়সও বেশী নয়। তিরিশের কাছাকাছি। কী মনে হয় আপনার?'

শকুন্তলা একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, 'হ্যাঁ, ঐ রকমই।'

'পরনের স্যুটটা ধূসর রঙের, টুপীটাও ঐ রঙেরই। চেহারা সাধারণ গোছের, চিহ্নিত করার মত কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। পায়ে ব্রাউন রঙের জুতো। উচ্চতা মাঝারি গোছের। আমি যে বর্ণনা দিলাম, তার সঙ্গে আপনার দেখা লোকটির মিল রয়েছে কি?'

'তার জুতো যে ব্রাউন রঙের তা আমি বলতে পারি, কারণ, তার পায়ের জুতোটা আমার নজরে পড়ে যখন সে দাঁড়িয়েছিল রিভলবার হাতে। কিন্তু তার উচ্চতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কিন্তু তার চোখ আপনি দেখতে পান নি দূর থেকে, তার টাই-এর রঙটা লক্ষ্য করেন নি এবং কী ধরণের রিভল-বার যে তার হাতে ছিল তাও আপনি জানেন না।'

'দেখুন, এখানে কাউকে আমি চিনি না। আপনি কে, জানতে পারলে খুশি হবো।'

'আমি বোম্বাই পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার। আমার নাম দয়ারাম মিশ্র।'

'মিশ্রজী, এর আগে রিভলবার কোনদিনই দেখি নি আমি। কাজেই কী ধরণের রিভলবার তার হাতে ছিল তা আমি বলবো কি করে?'

মিশ্রজীকে হাসতে দেখে শকুন্তলা একটু ঘাবড়ে যায়। কিন্তু তাঁর হাসিটা যে নিছক কৌতুকের, তা বুঝতে দেরী হয় না শকুন্তলার। সেও হেসে ফেলে মিশ্রজীর হাসির কারণটা না জেনেই।

'আমরা যাদের নিয়ে কারবার করি, তাদের বেশীর ভাগই রিভলবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। কাজেই আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে, শহরের অধিকাংশ লোকই রিভলবার কোনদিন দেখে নি কাছে থেকে।

আচ্ছা শকুন্তলা দেবী, আপনি কি লোকটিকে সনাক্ত করতে পারেন?'

শকুন্তলা ইতস্তত করে। তারপর বলে, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। তাকে আমি দেখেছি রিভলবার হাতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে। সেই ছবিটা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু সেই লোকটি যদি রাস্তায় আমার পাশ দিয়ে চলে যায়, আমি তাকে চিনতে পারবো কি না, বলতে পারি না। কারণ, তার চেহারাটা নিতান্ত সাধারণ গোছের।'

'ঠিক বলেছেন আপনি।'

দরজার পাশ থেকে এসে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দয়ারাম বলেন, 'এক মিনিট বসতে হবে আপনাকে। একটা কথা আপনকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।'

শকুন্তলা চেয়ারে বসবাস পর চেয়ারে বসেন দয়ারাম। চেয়ারে স্বচ্ছন্দভাবে বসে নিজের বলিষ্ঠ হাত দু'খানার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে তাকান শকুন্তলার দিকে। দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ ও কোমল।

'মৃত ব্যক্তির ইতিহাস যেটুকু আমরা সংগ্রহ করেছি, তা থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে---যে লোকটি ওকে খুন করেছে তাকে আমর জানি। খুনীর যে বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, তাতে আমাদের ধারণাটা আরও দৃঢ় হয়েছে। টুপীটা অবশ্য সব সময় সে পরে না। তবে মাঝে মাঝে টুপী পরে ঘুরে বেড়াতে তাকে দেখা গেছে।' এক মুহূর্ত থেমে তিনি বললেন, 'আমরা যদি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি, আশা করি আপনি তাকে সনাক্ত করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি তা না পারেন, তাহলে তার অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও আমরা গ্রেপ্তার করতে পারবো না তাকে। সে যদি প্রমাণ নাও করতে পারে, দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে অর্থাৎ ঘটনার সময় সে অন্যত্র ছিল তাহলেও কিছু সুবিধা হবে না আমাদের। আদালত বলবে এবং বলাটা অন্যায় নয় যে, ঐদিন দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে কোথায় সে ছিল---এটা যদি কাউকে প্রমাণ করতে বলা হয়, তবে শতকরা নব্বুই জনই তা প্রমাণ করতে পারবে না সন্তোষজনকভাবে। কাজেই বুঝতে পারছেন---

দয়ারাম কী বলতে চাইছেন, শকুন্তলা তা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে তার মনে হয়, উনি হয়তো তার কাছে আশ্বাস চান---অপরাধীকে সনাক্ত করতে ভয় পাবে না সে।

'আমি যদি তাকে সনাক্ত করতে পারি,' উৎসাহের সঙ্গে সে বলে, 'আমি তা করবো নিশ্চয়ই। আপনি যদি মনে করে থাকেন, অপরাধীকে সনাক্ত করতে ভয় পাবো আমি---'

'না, তা মনে করি না আমি। আমার বক্তব্য ওটা নয়। আমি বলতে চাই, আপনি যেমন খুনীকে দেখেছেন, সেও দেখেছে আপনাকে। সে লোকটি নির্বোধ নয়। আপনি যে ঐ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী, এটা সে ভুলবে না হয়তো।'

শকুন্তলার মুখটা শুকিয়ে যায়। এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তার বুক। 'আপনি কি বলতে চান লোকটি আমাকে খুন করবার চেষ্টা করবে?'

'সে চেষ্টা না করারই সম্ভাবনা বেশী,' ব্যস্তভাবে বলেন দয়ারাম, 'সে চেষ্টা করতে যাওয়া তার পক্ষে বিপজ্জনক। তার চেয়ে তার পক্ষে সহজ হবে শহরের বাইরে কোথাও চলে যাওয়া। যাই হোক্, সে আপনার আস্তানা কোথায় তা জানে না। আপনি বলেছেন, ঘটনাস্থলে যারা ভীড় করেছিল, তাদের কেউই আপনার পরিচিত নয়। এটা একটা মস্তবড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে আপনার মনে রাখা দরকার, কোনো কারণেই আর মায়ের ফ্ল্যাটে আনাগোনা করবেন না, তাহলেই আপনি নিরাপদ। নিজের নিরাপত্তার জন্য মায়ের সঙ্গে বা অন্য কারও সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করবেন না। অবশ্য তার জন্য যথেষ্ট সংযম চাই।'

শকুন্তলাকে স্থির দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করেন দয়ারাম, তারপর বলেন, 'আমার মনে হয়, আপনার মধ্যে সে সংযমের অভাব হবে না।'

'আপনার যে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে, এ আমি সত্যিই মনে করি না,' এক মিনিট চুপ করে থেকে দয়ারাম বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির সকল দিক আপনার ভালভাবে জানা উচিত বলেই এসব কথা বললাম। এবার আপনি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দয়ারাম। শকুন্তলাও উঠে দাঁড়াল। শকুন্তলার আগে আগে চলেন দয়ারাম। দরজার দিকে দু'-চার পা এগিয়ে হঠাৎ শকুন্তলা প্রশ্ন করে, 'যে লোকটি খুন হয়েছে, সে কে?'

দয়ারাম ঘুরে দাঁড়ান। মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'অমৃতলাল ব্যাস। এক সময় উনি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন।'

'আর কে ওঁকে খুন করেছে বলে আপনাদের ধারণা?'

একটু ইতস্তত: করেন দয়ারাম। তারপর বলেন, 'আমাদের মনে হয়, খুন করেছে সায়গল---রাজেশ সায়গল।'

শকুন্তলা আবার দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু দরজার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়। দয়ারামের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটু আগে ঐ চেয়ারে যিনি বসে ছিলেন, তিনিই বুঝি?'

দয়ারাম একটু হাসেন। ''না, উনি নন। ওঁর নাম দীনেশ সায়গল। তবে ওঁরই ছোট ভাই রাজেশ।'

দরজা খুলে দয়ারাম শকুন্তলাকে বললেন, 'ঐ হলঘরটার ডানদিকে একটা কামরায় জন কয়েক খবরের কাগজের রিপোর্টার বসে আছেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলবো আমি, আপনি চুপ করে থাকবেন। ভয় পাবেন না, অল্প কয়েকজন বসে আছেন ওখানে।'

দয়ারাম যখন শকুন্তলাকে সঙ্গে করে হলঘরের ভিতর দিয়ে চলেছেন তখন ডানদিকের একটা ঘর থেকে বে

একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'গুড আফটারনুন, মিঃ মিশ্র। উনি বুঝি ঐ হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী?''

ঘরের মধ্যে মাত্র তিনজনকে দেখা গেল। একজন বৃদ্ধ, বয়স ষাটের কাছাকাছি; চেহারায় বা পোষাকে পারিপাট্য নেই।। দ্বিতীয় ব্যক্তি আধা-বয়সী; চেহারায় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। ভদ্রলোককে একটু গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হল। তৃতীয় ব্যক্তিকে সাংবাদিক বলে চিনে নিতে দেরী হয় না। কারও। বয়সে তরুণ, পরিপাটি বেশ; প্রিয় দর্শন; চোখে-মুখে একটা সপ্রতিভ ভাব।

মুখ ফেরালেন দয়ারাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ঐ ঘরটার সামনে। শকুন্তলা পাশেই ছিল, তবে দরজায় ফাঁকটা দয়ারামের বিরাট শরীরে ঢাকা পড়ায় ভিতরের লোকেরা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না ভালো করে।

আধা-বয়সী ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে দয়ারাম বললেন; 'হ্যাঁ মিঃ ভার্গব! এই ভদ্রমহিলা হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী।'

'ওঁর নামটি কী? ভেতরে এসে বসুন না একবার।''

'না, আমার এখন বসবার সময় নেই।'

শকুন্তলা লক্ষ্য করল; দয়ারামের কণ্ঠস্বর যেন বদলে গেছে। আগে তাঁর কথা বলার মধ্যে কোমলতার যে স্পর্শ ছিল, এখন সেটা অন্তর্হিত।

একটু থেমে দয়ারাম বল্লেন, ''এসব ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করা পছন্দ করি না আমি। এর ফলে অপরের ক্ষতি হতে পারে। আপনি নিজেই একবার ভেবে দেখুন না মিঃ ভার্গব! একমাত্র এই ভদ্রমহিলা খুনীকে সনাক্ত করতে পারেন। এঁর নাম আর ঠিকানা যদি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়; তবে খুনী নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। দুটো খুনের শাস্তি যে একটা খুনের শাস্তির চাইতে বেশী নয়, এটা কে না জানে? কাজেই সাক্ষীর নাম প্রকাশ করা এক্ষেত্রে সঙ্গত নয়। আপনারা ও-বিষয়ে পীড়াপীড়ি করবেন না।'

দয়ারাম এক পাশে সরে যেতে ওঁরা তিনজনই শকুন্তলাকে দেখতে পেলেন পরিষ্কারভাবে। আধা-বয়সী ভদ্রলোক শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'আপনার কোন বিপদ হয়---এ আমরা চাই না। আমরা আপনার শুভ কামনা করি।''

বৃদ্ধ সাংবাদিকের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। সারাদিনের ঝামেলায় তাঁকে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তরুণ সাংবাদিকটি উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে শকুন্তলার দিকে।

দয়ারাম শকুন্তলাকে সঙ্গে করে এগিয়ে যান ফটকের দিকে। রাস্তায় নেমে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁকে একটু চিন্তিত মনে হয়। নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত জোড় করে শকুন্তলা বললে, 'মিশ্রজী, আমি তবে এখন আসি।''

'আপনাকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দেবার ইচ্ছা ছিল আমার; কিন্তু---'

'বাড়ি পৌঁছুতে কতক্ষণ আর লাগবে। ট্যাক্সি করে একাই যেতে পারবো আমি।'

'বেশ। ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড বেশী দূরে নয়। সাবধানে যাবেন।'

এর পর [illegible] শকুন্তলা থমকে দাঁড়ায়। 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন তো?'

'নিশ্চয়ই। সেটা আমার কর্তব্য।'

শীতের সূর্য নিস্তেজ হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। রাস্তার একধারে ছায়া পড়েছে। লোক চলাচলের বিরাম নেই। ফুটপাথের ধারে দু-চারজন নিষ্কর্মা ছোকরা সিগারেট টানছে নিশ্চিন্ত মনে। হোটেল-রেস্তোরাঁয় খরিদ্দারের আনা-গোনা। পানের দোকানে পানওয়ালা পান সাজতে ব্যস্ত। ফিরিওয়ালা রাস্তায় চলেছে হাঁক দিয়ে। দুনিয়ার চাকা যেমন চলছিল, তেমনি চলছে। কিছুক্ষণ আগে এ অঞ্চলে যে এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, তা মনেই হয় না। পথ চলতে চলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে শকুন্তলা।

হঠাৎ এক চলন্ত মোটর থামিয়ে কে একজন তড়াক করে ফুটপাথের উপর লাফিয়ে পড়ল -- শকুন্তলার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে। তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে শকুন্তলাকে লক্ষ্য করতে লাগল এক দৃষ্টিতে। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু একটা আওয়াজ হল 'ক্লিক'। ভয়ে শকুন্তলার সারা দেহ অবশ হয়ে গেল। লোকটা যে তাকে খুন করতে এসেছে; এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। পাছে টলে পড়ে যায়---এই ভয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ব্যাকুলভাবে সে যেন কিছু ধরবার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, ঠিক সেই সময় কার একখানা হাত এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল তাকে।

[ক্রমশ

কৈফিয়ৎ

আরতি চন্দ

কি ভাবছিস কাঁদছি আমি? কি হোলে তোর
হঠাৎ। কেন অমন শুকনো মুখে ঘুরিস রে আজকাল।
লক্ষ্মীটি ভাই; কাঁদিনি শোন, মাথায় পোয়া গোবর
হবো জেলে,—দেখছিলাম না রাঁধছি সারা সকাল।

বড়ো মেয়ে কাঁদবো কেন? কক্ষণো না অনিন্দ্য,
কদিন থেকে বৃষ্টি হোল, জল পড়ে ছাদ চুঁয়ে।
সমস্ত কাঠ ভিজে ঢাউস; কাঁদবো কেন, ইস!
ধোঁয়ার চোখে জল ঝরে রোজ ভিজে কাঠের ফুঁ-এ।

এবার [illegible] রোদ উঠবে সারা উঠোনময়
শুকিয়ে নেব কাঠগুলো সময় এবং এ [illegible]

চাষ আবাদ ফসল

ধানের চারা তৈরীর পদ্ধতি

ধান চাষের দুই পদ্ধতি—'বুনন' ও 'রোপণ'। তাড়াতাড়ি প্রচুর জল দাঁড়িয়ে যায় এমন সব 'ডহর' (নিচু) জমিতে 'বুনন' আর অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে, যেখানে ধীরে ধীরে জল জমতে থাকে সেখানে 'রোপণ' পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 'বুনন' পদ্ধতিতে ধান উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে তিন-চারবার লাঙল ও দু'বার মই দিয়ে বীজধান বোনার উপযোগী মাটি তৈরি করে নিতে হয়। জমিতে লাঙল চালিয়ে নালা করে নালাতে কিংবা কোদাল দিয়ে মাদা করে মাদাতে বীজধান বুনতে হয়। বুননের পর মই, কোদাল বা হাত দিয়ে ধানগুলিকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। বীজ হতে চারা হয়। চারাগুলি বড় হয়ে যথাসময়ে ধান উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠে। এই পদ্ধতিতে চারাগুলিকে উপড়ে নিয়ে অন্য স্থানে রোপণ করার দরকার হয় না। যেখানে বীজ বোনা হয়েছিল সেখানেই থাকে। 'রোপণ' পদ্ধতিতে চারা স্থানান্তর করার উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বীজতলাতে বীজধান ছিটিয়ে ধানচারা তৈরি করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ লম্বা হয়ে গেলে বীজতলা হতে ধানচারাগুলিকে তুলে নিয়ে ধান উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে রোয়া হয়। এই প্রবন্ধে রোপণোপযোগী চারা তৈরির পুরনো ও নতুন কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করছি। প্রথমে পুরনো পদ্ধতির কথা বলি।

ধুলো কাঁকরি

অধিকাংশ চাষীর টুকরো টুকরো জমি নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। জমিও নানা জাতের—'ডহর', 'ডাঙ্গা' (উঁচু), ও 'মাঝারি কাট' (খুব উঁচুও নয় আবার খুব নিচুও নয়)। 'ডহর' জমির জন্য এক ধরনের ধান, 'মাঝারি কাট' জমির জন্য অন্য ধরনের ধান ও 'ডাঙ্গা' জমির জন্য ভিন্ন জাতের ধান নির্বাচন করতে হয়। এক জায়গায় বীজতলা করে অনেক দূরে ধানচারা বয়ে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা আছে। এজন্য কোন চাষীর পক্ষে তাঁর সমস্ত জমির জন্য বীজতলা কোন একটি জমিতে সাজা সম্ভব নয়। প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় বীজতলা সাজা হয়। জমির উর্বর অংশ তলা তৈরির জন্য বেছে নেওয়া হয়। বৃষ্টি পড়ে জমি সরস হয়ে উঠলে তলার জন্য নির্দিষ্ট অংশে লাঙল দেওয়া হয়। 'আচটতলা' (জমির যে অংশে আগের বছর তলা সাজা হয় নি, সে অংশে তলা সাজা হলে তাকে 'আচটতলা' বলা হয়) হলে পর পর দু'বার লাঙল দিয়ে কমপক্ষে সাত আটদিন ফেলে রাখতে হয়। 'আচট' জায়গাতে ঘাস থাকে। সাত আটদিনে রোদের তাপে এই ঘাস মরে যায়। তাছাড়া তলার মাটি ভালভাবে শুকিয়ে যায়। 'মারাতলা'তে (জমির যে অংশে আগের বছর তলা সাজা হয়েছিল সে অংশে তলা সাজা হলে তাকে 'মারাতলা' বলা হয়) ঘাস বা আগাছা থাকে না বললেই চলে। এ কারণে এ জাতীয় তলার জন্য জমিতে লাঙল দিয়ে বেশিদিন ফেলে রাখার দরকার হয় না। তিন চারদিনই যথেষ্ট। পরে দু' জাতের তলাতে তিনবার লাঙল ও দু'বার মই দিয়ে

জমির মাটিকে গুঁড়িয়ে ধুলোর মত করে ফেলতে হয়। ঘাস বা আগাছা থাকলে তুলে ফেলে দেওয়া হয়। তলা সাজার সময় কোন কোন চাষী পচা গোবর, ছাই, খোল ইত্যাদি সার দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ স্থলেই কোন সার প্রয়োগ করা হয় না।

বীজতলার মাটি সরস থাকলে মই দিয়ে সমতল করা জমির ওপরে বীজধান ছিটানো হয়। সরস জমিতে বোনার জন্য ধানগুলি রসযুক্ত হয়ে যায়। কখনও কখনও এই রস পেয়েই বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে যায়। এইভাবে সাজা তলাতে ধান ছিটানোর এক সপ্তাহের মধ্যে বৃষ্টি না হলে বা অন্য কোন উপায়ে জল সেচ না দিলে অঙ্কুরিত বীজগুলি নষ্ট হয়ে যায়। রোদের তাপে জমির রস শুকিয়ে গেলে যে ধানগুলি হতে অঙ্কুর বের হয় নি সেগুলি 'গুমে' যায়। সপ্তাহ পরে সেচ দিলেও গুমে যাওয়া ধান হতে অঙ্কুর হয় না। যথাসময়ে বৃষ্টি হলে বা সেচ দিলে অঙ্কুরিত বীজধান হতে চারা বের হয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তলার মাটি শুকনো খটখটে হলে লাঙ্গল দেওয়া মাটিতে বীজধান ছিটিয়ে দেওয়ার পর মই দিয়ে মাটি সমতল করে দেওয়া হয়। এতে বীজধান মাটির নীচে চলে যায়। এইভাবে শুকনো খটখটে মাটির নিচে বীজধান পনের দিন পড়ে থাকলেও ধানের কোন ক্ষতি হয় না। একপক্ষকাল পরে বৃষ্টি হলে বা অন্য কোন উপায়ে জল সেচ দিলে বীজধানগুলি অঙ্কুরিত হয়ে ধানচারা সৃষ্টি করে। ক্রমাগত রস ও তাপ পেয়ে চারাগুলি বাড়তে থাকে। মই দিয়ে সমতল করা শুকনো খটখটে মাটির ওপরেও বীজধান ছিটানো চলে। এইভাবে ছিটানো ধান এক সপ্তাহ পর্যন্ত শুকনো মাটির ওপরে পড়ে থাকলেও ধানের কোন ক্ষতি হয় না। এর পরেও বৃষ্টি না হলে বা অন্য কোন উপায়ে জলসেচ দেওয়া না হলে বীজধানগুলি খারাপ হয়ে যায়। পরে রস পেয়ে যে কয়টি চারা হয়, সেগুলিতে 'ভাড়াগোছ'-এর সৃষ্টি হয়। 'ভাড়াগোছ' হতে ধান হয় ঠিকই, কিন্তু ধানগুলি অসময়ে ঝড়ে পড়ে। শিষে আটকে থাকে না।

এক একর জমি চাষ করতে হলে ১৪।১৫ কাঠা জমিতে বীজতলা সাজা দরকার। এতে বীজধান লাগে ২৪।২৫ কেজি। অভিজ্ঞ চাষী বীজধান সংগ্রহের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। জমির যে অংশে সবচেয়ে ভাল, নীরোগ ও পুষ্ট ধান হয়, সেই অংশ হতে বিচালি সহ ধান কেটে জমিতেই এক সপ্তাহ ফেলে রাখা হয়। এক সপ্তাহ পরে ধানযুক্ত বিচালিগুলিকে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে বাড়ীর কাছে পরিচ্ছন্ন খামারে আনা হয়। বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি ধান ঝাড়া পাটাতে ধানের আঁটিগুলিকে একবার মাত্র মাঝারি ধরনের আছাড় দেওয়া হয়। এতে যে ধানগুলি শিষ হতে ঝড়ে পড়ে সেগুলিকেই পরিষ্কার করে বীজধানরূপে ব্যবহার করা হয়। পাটাতে আছাড় দেওয়ার আগে ধানের আঁটিতে নির্দিষ্ট ধানের শিষ ছাড়া অন্য কোন ধানের শিষ দেখা গেলে সেগুলি কেটে নিয়ে আলাদা করে রাখা হয়।

বীজতলাতে বীজ বোনার আগে সাধারণ চাষী বীজ শোধনের কোন ব্যবস্থাই করেন না। অতি অল্পসংখ্যক চাষী লবণ মিশ্রিত জলে বীজধানগুলিকে ডুবিয়ে অপুষ্ট ধানগুলিকে বাদ দেবার চেষ্টা করেন। লবণ জলে ডুবে যাওয়া ধানগুলিকে পরে পরিষ্কার জলে ভালভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে বীজতলাতে ছিটিয়ে দেন। রোগমুক্ত করার জন্য পারাঘটিত ওষুধ মিশ্রিত জলে বীজধানগুলিকে ডুবিয়ে শোধন করার রীতি খুব কম সংখ্যক চাষীর জানা আছে। বীজধান শোধন করে নিলে পরবর্তীকালে চারাগুলিতে রোগ-পোকার অত্যাচার অপেক্ষাকৃত কম হবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রয়োজন অনুসারে জলসেচ ও নিকাশী ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে চারা তৈরি করতে খুব সুবিধা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থলে [illegible]। এজন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করেই চাষবাস করতে হয়। এতে অসুবিধার শেষ নেই। বীজতলাতে বীজধান বোনা হোল, অথচ সময় মত বৃষ্টি হোল না। ফলে বীজতলা নষ্ট হয়ে গেল। নতুন করে তলা সাজতে হবে। অল্পসল্প জল পেয়ে চারা বেড়ে [illegible] হয়ে গেল। অথচ মাঠে রোপণোপযোগী জল দাঁড়াচ্ছে না। চারাগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। শুকনো মাটিতে বীজধান ফেলে দেওয়া হোল। হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টি হয়ে মাঠে এক-দেড় ফুট জল দাঁড়িয়ে গেল। তলার চারদিকে আল দিয়ে তলার সমস্ত জল সিউনী, পাম্প বা অন্য কিছু দিয়ে তুলে ফেলে দিতে হবে। চারা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল কাটিয়ে একটু একটু করে জল তলাতে ছাড়তে হবে। সময় মত ঠিক পরিমাণে বৃষ্টি না হলে কখনও কখনও দেখা যায়, বীজতলাতে ধানচারার সঙ্গে নানা ধরনের ঘাস ও আগাছা জন্মেছে। এতে চারা তুলে নিয়ে রোপণ করার খুবই অসুবিধা হয়। অধিকাংশ স্থলেই বীজতলা হতে চারাগুলিকে অতি সহজেই টেনে উপড়ানো যায়। চারার শিকড়ের কোন ক্ষতি হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে খুব টান ধরে, জোরে টান দেওয়ার ফলে চারার শিকড় ছিঁড়ে যায়। এ অবস্থায় সারা তলাটিকে বাদ দেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

চারাগুলি ২৪।২৫ দিনের মধ্যে রোপণোপযোগী হয়ে ওঠে। নিয়মিত জল পেলে ২৪।২৫ দিনে চারা ১৭।১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়ে যায়। জলের চাপ থাকলে অর্থাৎ তলাতে বেশী পরিমাণ জল জমে থাকলে এক মাসের মধ্যে চারাগুলি দু'ফুট পর্যন্ত বেড়ে যায়। রোপণ করার আগে চারাগুলিকে কতখানি বাড়তে দেওয়া হবে তার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। শুধু লক্ষ্য রাখা হয়, রোপণ করা চারাগুলি যেন মাঠের জলের ওপরে অন্তত ৬।৭ ইঞ্চি জেগে থাকে। রোপণ করার সময় প্রতি

'গোছ'-এ ৪।৫টি চারা দেওয়া হয়। মাঠে জলের চাপ কম থাকলে ও জলদি রোপণ করলে 'গোছ'-এ কম চারা দিলেও চলে। জলের চাপ বেশী থাকলে ও নাবী রোপণ করা হলে 'গোছ'-এ বেশী চারা দেওয়ার রীতি আছে। দেড় মাসের মধ্যে চারাগুলিকে বীজতলা হতে তুলে নিয়ে ধান উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেতে স্থানান্তরিত করতে হয়। দেড় মাসের বেশীদিন তলাতে চারাগুলি থাকলে চারার গোড়াতে গাঁট হয়ে যায়। গাঁটযুক্ত চারা রোপণ করে শিষ উৎপাদনক্ষম ভাল ধানগাছ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মাঠে জল হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি রোপণ করা দরকার, অথচ ধানচারা প্রয়োজন মত বেড়ে উঠছে না। তখন কোন কোন চাষী বীজতলাতে নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগ করে চারাগুলিকে তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

বীজতলাতেই কখনও কখনও চারাগুলি রোগ-পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। অধিকাংশ চাষী মনে করেন, সময় মত জল, ঝড় ও রোদ পেলে পোকার আক্রমণ হতে চারাগুলি বেঁচে যাবে। চাষীর এই ধারণা কখনও কখনও সত্যে পরিণত হতে দেখা গেছে। বর্তমানে জল, ঝড় ও রোদের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে না পেরে কোন কোন চাষী বি-এইচ-সি, এনড্রিন প্রভৃতি ওষুধ স্প্রে করে রোগ-পোকার আক্রমণ থেকে চারাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করছেন।

ডুবো কাঁকরি

হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টি হয়ে মাঠে জল দাড়িয়ে গেলে 'ধুলো কাঁকরি' পদ্ধতিতে বীজতলা সাজা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় দু'প্রকারে তলা সাজা হয়। (১) 'ডুবো কাঁকরি' ও (২) 'পেঁকে'। প্রথমে 'ডুবো কাঁকরি'র কথা আলোচনা করা যাক। জমির উর্বর অংশে পরিমাণ মত জমিতে ৩।৪ বার লাঙল ও দু'বার মই দিয়ে কাদা করে নিতে হয়। বীজতলা সাজার জন্য কাদা করা অংশের চারদিকে আল দিয়ে দিতে হয়। আলের ভিতরের অংশে এক ইঞ্চি পরিমাণ জল রেখে বাকি জল সিউনী, পাম্প বা অন্য কিছু দিয়ে তুলে ফেলে দিতে হয়। তলাতে দাঁড়িয়ে থাকা জলের মধ্যে পরিমাণ মত বীজধান ছিটিয়ে দিতে হয়। বীজগুলি এক-দেড়দিন জলের মধ্যেই পড়ে থাকে। পরে তলা হতে সমস্ত জল তুলে ফেলে দিতে হয়। ঠিকমত রোদ পেলে চারদিনের মধ্যে ধান হতে অঙ্কুর বের হয়। চারাগুলি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল কাটিয়ে একটু একটু করে জল সেচ দিতে হয়। বৃষ্টি হয়ে গেলে অতিরিক্ত জল তুলে ফেলে দিতে হয়। ২২।২৪ দিনের মধ্যে রোপণোপযোগী চারা পাওয়া যায়। জমির পরিমাণ, সার, বীজশোধন, বীজধান, কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ সমস্তই 'ধুলো কাঁকরি' পদ্ধতির মত।

পেঁকে

'ডুবো কাকরি' পদ্ধতিতে বীজতলা যেভাবে প্রস্তুত করতে হয় 'পেঁকে' পদ্ধতিতেও সেইভাবে তলা সাজাতে হয়। এখানে বীজধান ছিটানোর সময় তলাতে একটুও জল রাখা চলবে না। তলাতে ছিটানোর আগে ধানগুলিকে অঙ্কুরিত করে নিতে হয়। বীজধানগুলিকে অঙ্কুরিত করার বিশেষ পদ্ধতি আছে। বীজধানগুলিকে ভিজিয়ে নিয়ে বস্তায় পুরে বস্তার মুখ বেঁধে শুকনো জায়গায় কয়েকদিন রেখে দিলেই ধানগুলি অঙ্কুরিত হয়ে যায়। অঙ্কুরিত করার জন্য অন্য পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বৃষ্টি পড়ে না এমন জায়গাতে (শুকনো জায়গা হলে ভাল হয়) বিচালি বিছিয়ে দেওয়া হয়। বিচালির ওপরে চট বিছানো হয়। চটের ওপরে অল্প পরিমাণ তুঁষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বীজধানগুলিকে ভিজিয়ে নিয়ে ঐ তুষের ওপরে স্তূপাকার করে রাখা হয়। এইভাবে রাখা ধানের ওপরে অল্প পরিমাণ তুষ ছড়িয়ে দিয়ে বিচালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বিচালির বদলে চট বা খালি থলে দিয়ে ধানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখা হয়। ২।৩ দিনেই অঙ্কুর এসে যায়। তলাতে ছিটানো অঙ্কুরিত ধান হতে চারা বের হয়ে বাড়তে থাকে। চারা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল কেটে পরিমাণ মত জল সেচ দিতে হয়। ২০ দিনের মধ্যেই রোপণোপযোগী চারা পাওয়া যায়। জমির পরিমাণ, সার, বীজশোধন, বীজধান, কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ—সমস্তই 'ধুলো কাঁকরির মত।

'ডুবো কাঁকরি' বা 'পেঁকে' তলা জল অভাবে শুকিয়ে গেলে তলা হতে রোপণোপযোগী চারা পাওয়ার আশা ত্যাগ করাই ভাল। আমন ধানের চাষী 'ধুলো কাঁকরি' পদ্ধতিতে তৈরি করা চারা পছন্দ করেন। এই পদ্ধতিতে তৈরি করা চারা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও রোগ-পোকার অত্যাচার যতখানি সহ্য করতে পারে 'ডুবো কাঁকরি' বা 'পেঁকে' পদ্ধতিতে তৈরি করা চারা ততখানি পারে না। 'ধুলো কাঁকরি' পদ্ধতিতে তৈরি করা চারা ২।৩ দিন জলে ডুবে থাকলেও চারাগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। 'পেঁকে' পদ্ধতিতে তৈরি করা চারা একদিন জলে ডুবে থাকলে পচে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।

আধুনিক পদ্ধতি

আমন ধানের চাষী বৃষ্টিনির্ভর চাষের জমিতে উপর্যুক্ত তিন প্রকার পদ্ধতিতে আবহমানকাল ধরে ধানের চারা তৈরি করে আসছেন। এই পদ্ধতিগুলিকে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত করে আজকাল সেচের সুবিধাযুক্ত জমিতে উচ্চফলনশীল ধানের চারা তৈরি করা হচ্ছে। এখন এই সমস্ত রূপান্তরিত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

বীজতলার প্রস্থ হবে ৪ ফুট। দৈর্ঘ্য প্রয়োজন মত রাখা চলে। তবে ২৫ ফুট রাখলে সেচের ও অন্যান্য পরিচর্যার সুবিধা হয়। প্রতিটি বীজতলার পাশে ৪ ইঞ্চি গভীর ও ১ ফুট

চওড়া নালা রাখতে হয়। একটি ৬ কাঠা মাপের বীজতলা তৈরির জন্য ৬০০ কেজি কম্পোষ্ট বা আবর্জনা পচা সার, ৭॥ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট, ৯ কেজি সুপার ফসফেট এবং ৩ কেজি মিউরিয়েট পটাশ লাগে। বীজতলায় ফসফেট ও পটাশঘটিত সার প্রয়োগ করলে চারার শিকড় শক্ত এবং চারা সতেজ ও সবল হয়। এই রকম চারার রোগ-আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশী। সার বীজতলার ওপরের এক ইঞ্চি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। মাটির বেশী নিচে পর্যন্ত সার মেশালে শিকড় বেশী নিচে যায় এবং তোলার সময় ছিঁড়ে যায়। প্রতি বীজতলায় ৫০০ গ্রাম বীজ বুনতে হয়। এক একর জমি চাষ করতে হলে বীজতলার জন্য প্রায় ৬ কাঠা জমি দরকার। এতে প্রায় ৩০।৩৫টি ২৫ ফুট লম্বা এবং ৪ ফুট চওড়া বীজতলা হবে।

ভাল ফসল পেতে গেলে নীরোগ বীজ ব্যবহার করা দরকার। তাই বীজতলায় বীজ বোনার আগে বীজগুলিকে ভাল করে শোধন করে নিতে হয়। প্রতি কেজি বীজের জন্য এক লিটার জলে ১ গ্রাম ৬% পারাঘটিত ওষুধ মিশিয়ে সেই ওষধগোলা জলে বীজধানগুলি ৮।১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হয়। যে হালকা বীজগুলি ওপরে ভেসে উঠবে সেগুলি ফেলে দিয়ে বাকী বীজ ছায়ায় শুকিয়ে নিলেই শোধিত বীজ পাওয়া যায়। শতকরা ১ ভাগ পারাঘটিত গুঁড়ো মুধ দিয়ে শোধন করা বীজও বোনা চলে।

ভিজে বীজতলা

বীজতলাকে ৩।৪ ইঞ্চি গভীর করে কাদা করা হয়। কাদা করা তলাতে শোধিত বীজ বোনা হয়। বীজ বোনার ২।৩ ঘণ্টা পরে পূর্বোক্ত নালা দিয়ে বীজতলার ওপরে ১ ইঞ্চি পরিমাণ জল দাঁড় করিয়ে দিতে হয়। এই জল ২৪ ঘণ্টা রাখার পর শুধু নালাতে জল রেখে বাকী জল বের করে দিতে হয়।

শুকনো বীজতলা

বীজতলার মাটিকে ৩।৪ ইঞ্চি গভীর করে কুপিয়ে নিলেই চলে। তলাতে শোধিত বীজধান বুনে ওপরে আলগা করে ঝুরঝুরে মাটি ছড়িয়ে দিতে হয়। নালায় জল রেখে তলার মাটি সরস রাখতে হয়।

এ ছাড়া শুকনো ও ভিজে উভয় বীজতলা হতে আশানুরূপ চারা পেতে গেলে নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা দরকার। পাখির হাত হতে সব সময় বীজতলা রক্ষা করতে হয়। চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় অল্প অল্প করে জলের পরিমাণ বাড়াতে হয়। বীজধান বোনার ১০।১৫ দিন পরে তলার সমস্ত জল বের করে দিয়ে কীটনাশক ওষুধ স্প্রে দিতে হয়। ২৫ লিটার জলে ৫০ মিলিলিটার এনড্রিন ২০% ই-সি বা ১৫০ গ্রাম শতকরা ৫০ ভাগ জলেগোলা বি-এইচ-সি এবং ১৫০ গ্রাম শতকরা ৫০ ভাগ জলেগোলা কপার অক্সিক্লোরাইড বা ১০০ গ্রাম ক্যাপটান ৮৩% ভাল করে মিশিয়ে ৬ কাঠা জমিতে ছিটাতে হয়। তার পর ভিজে বীজতলার ওপর ১২ ইঞ্চি জল ঢুকিয়ে সেই জল বীজতলা হতে চারা তুলে নেওয়া পর্যন্ত রেখে দিতে হয়। শুকনো তলায় নালায় জল রেখে দিতে হয়। চারা তোলার আগে বীজতলা ভিজিয়ে নিতে হয়। চারা ১৫ হতে ২৮ দিনের হলে রোপণ করা চলে।

ডেপগ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে মাটির সাহায্য ছাড়াই ধানের চারা তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতিতে চারা তৈরির জন্য আলো-হাওয়াযুক্ত সমতল জায়গা বেছে নিতে হয়। নির্দিষ্ট জায়গাটি সমতল না থাকলে কোদাল দিয়ে সমতল করে নিতে হয়। সমতল জায়গাটি মাটি বা ইট দিয়ে ১৬ সেন্টিমিটার উঁচু করা হয়। উঁচু করা জায়গার প্রস্থ হবে এক মিটার। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এর দৈর্ঘ্য ঠিক করা হয়। এক একর জমি চাষ করার জন্য এক শতক জমিতে এই পদ্ধতিতে ধানের চারা করলেই চলে। উঁচু করা জায়গার চারদিকে ইট বা মাটি দিয়ে অল্প উঁচু করে আল দিতে হয়। শেষে উঁচু করা জায়গার ওপরে পলিথিনের চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়। পলিথিনের চাদরের বদলে কলাপাতাও ব্যবহার করা যায়। চারা তৈরির জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, ক্ষেতটির উপরিভাগ যেন এবড়োখেবড়ো না হয়---সমতল হওয়া চাই

পলিথিনের চাদরের ওপরে বীজধান ছড়ানোর আগে ৬% পারাঘটিত ওষুধ মিশ্রিত জলে বীজগুলিকে ডুবিয়ে শোধন করে নেওয়া দরকার। 'পেঁকে' পদ্ধতিতে বীজতলাতে বীজ ছড়ানোর আগে যেভাবে বীজগুলিকে অঙ্কুরিত করে নিতে হয় তেমনিভাবে এ ক্ষেত্রেও চাদরের ওপরে বীজ ছড়ানোর আগে বীজগুলিকে অঙ্কুরিত করে নেওয়া হয়। 'ধুলো কাঁকরি' রীতির মত বীজ অঙ্কুরিত না করেও ছড়ানো চলে। এক বর্গমিটার চাদরে এক হতে দেড় কেজি বীজ ছড়ানো চলে। এই পদ্ধতির একটি বিশেষ সুবিধা হোল এই যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ চাদরের ওপরে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ ছড়ানোর পর সেই বীজছড়ানো চাদরের ওপরে অপর একটি চাদর বিছিয়ে শেষোক্ত চাদরের ওপরে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বীজ ছিটিয়ে চারা তৈরি করার ব্যবস্থা করা যায়।

দিনে ৩।৪ বার জল ছিটিয়ে বীজক্ষেতকে সব সময়ে সরস রাখা দরকার। জল ছিটানোর সময় বীজগুলি স্থানচ্যুত হয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রথম ৩।৪ দিন সকালে ও বিকালে অঙ্কুরিত বীজগুলিকে আস্তে করে চেপে চারার শিকড়কে রসের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হয়। প্রথম সাতদিন বীজগুলিকে সরস রাখতে হবে, কিন্তু চাদরের ওপরে জল দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে না। এক সপ্তাহ পরে চাদরের ওপরে এক সেন্টি-

মিটার জল সব সময়ে রাখা হয়। যতদিন না অঙ্কুরিত বীজ হতে পাতা বের হয় ততদিন বীজক্ষেতটিকে কড়া রোদ হতে রক্ষা করার জন্য বেলা ১১টা হতে তিনটে পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়। আছাড়া বর্ষার সময় ও শীতের রাতেও যথোপযুক্তভাবে ক্ষেতটিকে ঢেকে রাখার প্রয়োজন আছে।

১২।১৪ দিনের চারাকে রোপণের কাজে লাগানো চলে। রোপণের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেতটিতে শুধু সুচারুরূপে কাদা করলেই চলবে না, ক্ষেতটিকে ভালভাবে সমতল করা চাই। রোপণের পর দু' সপ্তাহ ক্ষেতে ১২ সেন্টিমিটার জল দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। ক্ষেতটিকে ভালভাবে সমতল করে নিলে রোপণ করা চারার মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। ক্ষেতে চারাগুলিকে ২০ সেমি X ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপণ করা হয়। প্রত্যেক 'গোছ'-এ ৪ হতে ৬টি চারা থাকে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে চললে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। (১) বীজক্ষেতটিকে ভালভাবে সমতল করা চাই। (২) চাদরের উপরিভাগ সব সময়ে সরস রাখা দরকার। (৩) যথোপযুক্তভাবে বীজক্ষেতটিকে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। (৪) চারা ১২।১৪ দিনের হয়ে গেলেই রোপণ করা চাই। (৫) রোপণের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেতটিকে ভালভাবে সমতল করা দরকার। (৬) রোপণ করা ক্ষেতে ১২ সেন্টিমিটার জল ঠিকভাবে রাখা চাই। অন্যান্য পরিচর্যা উচ্চফলনশীল অন্যান্য ধানের মতই।

সাফল্য

চারা ১২।১৪ দিনের মধ্যেই রোপণোপযোগী হয়ে যায়। অন্যান্য পদ্ধতিতে যে সময়ের মধ্যে রোপণোপযোগী চারা পাওয়া যায়, এ পদ্ধতিতে চারা তৈরি করলে অন্তত ১০ দিন আগেই উপযুক্ত চারা পাওয়া যায়। এতে চারার গুণের কোন অবনতি ঘটে না। রোপণ-ঋতুতে হঠাৎ জলবৃদ্ধি বা বন্যা হলে এই পদ্ধতিতে তৈরি করা চারার বিশেষ ক্ষতি হয় না। বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের কৃষকগণ এই প্রথায় চারা তৈরি করে ক্ষতির হাত হতে শস্যকে রক্ষা করতে পারেন। চিরাচরিত প্রথায় বীজক্ষেতের জন্য যে পরিমাণ জমি লাগে, এই প্রণালীতে চারা তৈরি করলে তার অন্তত ১০ ভাগ কম লাগে। ফলে জমি, মজুরি, সার ও সেচ বাবদ খরচ অনেক কম হয়। পাখী, আগাছা ও মৃত্তিকাজাত রোগের অত্যাচারের কোন সম্ভাবনা নেই। চিরাচরিত প্রথায় চারাগুলিকে বীজক্ষেত হতে উপড়ানো, গোছা করে বাঁধা ও রোপণের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট খরচ হয়। এ পদ্ধতিতে চারা তৈরি করলে উপড়ানোর খরচ নেই। শুধু বীজক্ষেত হতে চারাগুলি উঠিয়ে নিয়ে রোপণের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে নিয়ে গেলেই হোল। খরচ খুবই কম। এতে অন্তত প্রতিদিন একর পিছু ৮।১০ জন মজুরের খরচ বেঁচে যায়। চিরাচরিত প্রথায় তৈরি করা চারাগুলি উপড়ানোর সময় চারাগুলির শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্য এ জাতীয় চারা রোপণ করার পর সতেজ ও সবুজ হতে বেশ সময় লাগে। কিন্তু এই পদ্ধ[illegible] তৈরি করা চারার শিকড় ছিঁড়ে যা[illegible] কোন সম্ভাবনা নেই। এ জন্য [illegible] পদ্ধতিতে তৈরি করা চারা [illegible] করলে খুব তাড়াতাড়ি চারাগুলি স[illegible] ও সবুজ হয়ে উঠে। অন্যান্য পদ্ধ[illegible] তৈরি করা চারা হতে যে উৎ[illegible] হয়, এই পদ্ধতিতে তৈরি করা [illegible] হতে উৎপাদিত শস্য তার চেয়ে [illegible] অংশে কম হয় না।

এই প্রবন্ধে যে সমস্ত [illegible] সন্নিবেশিত হয়েছে তার মধ্যে কয়ে[illegible] তথ্য হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২ ব্লকের বরদাবাড় গ্রামের কৃতী [illegible] শ্রীআশুতোষ শাসমল সরবরাহ করেছে[illegible] ইনি কয়েকবছর আগে নিজের [illegible] শ্রীপরিতোষ শাসমলের সঙ্গে চিরাচ[illegible] প্রথায় আমনধান ফলিয়ে পশ্চিম[illegible] সরকার কর্তৃক আয়োজিত বেশী [illegible] প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার [illegible] নির্দিষ্ট একটি পুরস্কার পেয়েছিলে[illegible] আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনাক[illegible] যে সব তথ্যের উল্লেখ করেছি [illegible] কয়েকটি সরবরাহ করেছেন ফার্টিলাই[illegible] করপোরেশন অভ্ ইণ্ডিয়া (সি[illegible] ডিভিশন) কর্তৃক নিযুক্ত হুগলী জে[illegible] ফিল্ড ডেমন্‌স্ট্রেটর শ্রীদেবীদাস মু[illegible]পাধ্যায়। ইনি হুগলী জেলার ধনে[illegible] ও আদিসপ্তগ্রাম ব্লকে হাতেক[illegible] ডেপগ পদ্ধতিতে ধানের চারা তৈ[illegible] করে উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন।

—শ্রীজয়দেব বৈতা[illegible]

আশ্বিন মাসের বপন ও রোপন

আশ্বিন মাসে যে সমস্ত ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে, তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হোল। কোন মাটিতে এইসব ফসলের চাষ করে ভাল ফল পাওয়া যায়, ফসলের নামের পাশে তার উল্লেখ করা হোল।

ফসলের নাম	ক্ষেতের মাটি
বেগুন	উঁচু দোআঁশ
লাউ	দোআঁশ
কুমড়া	দোআঁশ
মূলা	বেলে, দোআঁশ
রাঙ্গাআলু	বেলে, দোআঁশ
পটল	বেলে, দোআঁশ
পালংশাক	দোআঁশ
গোলআলু	উঁচু বেলে দোআঁশ
বাঁধাকপি	দোআঁশ
ফুলকপি	দোআঁশ
টম্যাটো	দোআঁশ
বীট	দোআঁশ
গাজর	দোআঁশ
ওলকপি	দোআঁশ
শালগম	দোআঁশ
মাসকলাই	বেলে দোআঁশ
আনারস	বেলে, দোআঁশ, এঁটেল
বরবটী	বেলে, দোআঁশ, এঁটেল
বোরোধান	পলিমাটি
মুগ	উঁচু হালকা জমি
সয়াবীন	বেলে, দোআঁশ
বিরিকলাই	বেলে, দোআঁশ
মটরশুঁটি	দোআঁশ
জোয়ান	বেলে, দোআঁশ
ধনে	দোআঁশ, পলিমাটি
মৌরী	বেলে, দোআঁশ
মেথি	বেলে, দোআঁশ
জিরা	বেলে, দোআঁশ
সরিষা	দোআঁশ
তরমুজ	বেলে
শশা	বেলে, দোআঁশ
ফুটি	বেলে,
খরমুজা	বেলে
তামাক	উঁচু বেলে দোআঁশ
শন	এঁটেল, দোআঁশ
পান	দোআঁশ
রেড়ি	উঁচু দোআঁশ

শ্রীজয়দেব বৈতালিক

বিষবৃক্ষ

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই বৃক্ষলতাদি জীবজন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিষাক্ত রস সংরক্ষণে ব্যস্ত।

একমাত্র আমেরিকাতেই পাঁচশ'রও বেশি জাতের গাছপালা অব্যর্থ বিষ তৈরি করে। প্রতি বছর এদের দৌরাত্ম্যে শতকরা চারভাগ গবাদি পশু মারা যায়, অনেক মানুষও। এ সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার পরিধি বেশ কম। এবং বিশেষ জ্ঞানবিশিষ্ট পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমিত। বিষাক্ত আইভীলতা যন্ত্রণাদায়ক হলেও প্রাণে মারতে পারে না, কিন্তু মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর বস্তুটির নাম ছত্রাক। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞই বলতে পারেন---কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য ব্যাঙের ছাতা, আর কোন্‌টিই বা বিষময় ছত্রাক।

অবশ্য বিষময় ছত্রাকের সংখ্যা কম। তৎসত্ত্বেও খেলেই মৃত্যু হয় বলেই এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বস্তুত, সঠিক পরিচয় জানা কাউকে দিয়ে যাচাই না করিয়ে এ বস্তু খাওয়া বিপদজ্জনক।

একটি প্রচলিত ভুল বিশ্বাস এই যে, উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত সব ছত্রাক বিষাক্ত, ম্যাড়মেড়ে ব্যাঙের ছাতা নিরাপদ। আসলে, বহু ম্যাড়মেড়ে ছত্রাক জীবননাশা ; আবার, গাঢ় কমলা রঙের উজ্জ্বল ব্যাঙের ছাতা স্বাদু এবং নিরাপদ। এ জন্যই বাজারে লভ্য খাওয়ার উপযোগী বলে প্রমাণিত ব্যাঙের ছাতা খাওয়াই উচিত।

সর্পহার মানে

পূর্ব আমেরিকা এবং কানাডায় 'স্নেক্‌-প্রুফ্‌'---সর্প যার কাছে হার মানে ---নামক চিরস্থায়ী, চমৎকারী সিত পুষ্পসমন্বিত লতা ছড়িয়ে রয়েছে।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগ থেকে এই আপাতনিরীহ খুদে লতা 'মৃদু রোগ' ছড়িয়ে আসছে চারপাশে।

কিছু পরিমাণ এর পাতা খেলেই গরু অসুস্থ হয় এবং ঐ গো-দুগ্ধ মানুষের পক্ষে বিষ হয়ে ওঠে। আজও জানা যায় নি---এই বিষ ঠিক কিভাবে কাজ করে। এগুলো বিনাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এখানে ওখানে হঠাৎ দেখা যায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় বিষাক্ত গাছ, ঝোপ এবং লতা আছে। আর্জেন্টাইন্-এর ভ্যাম্পায়ার্ গাছ প্রাণীর রক্ত শোষণ করার আগে তাকে ঘুমপাড়ানী গন্ধ ছড়িয়ে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। ভেনেজুয়েলা-র তথাকথিত ব্যাঘ্র-বৃক্ষ শিকারের ওপর যন্ত্রণাদায়ক অ্যাসিড্ নিক্ষেপ করে। জাভার উপাস্ গাছ তীব্র বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। জানা থাকলে কেউ এ গাছের ত্রি-সীমানায় ঘেঁসে না। এর ওপর দিয়ে ওড়ার সময় পাখিরা নাকি মরে যায়। আশ-পাশের জলাশয়ের মাছ এর গ্যাস-এ টিকতে পারে না। এই গাছের আঠায় জাভার শিকারীরা তীর এবং বর্শার ডগা বিষাক্ত ক'রে নেয়।

বিষাক্ত রেণু

ব্রেজিল্-এর ম্যান্চিনীল্ গাছের বিষ নাকি এত তীব্র যে, ফুল ফোটার কালে এর তলায় কেউ বিশ্রাম করলে মারা যায়। পুং-কেশর থেকে ঝরে-পড়া রেণু বিষাক্ত।

মেক্সিকোর মায়া-রাই সম্ভবত প্রথম অ্যানাস্থেটিক্স ব্যবহার করে; এই উদ্দেশ্যে ওরা স্থানীয় গাছ কাজে লাগিয়েছিল। আজও ওদেশে অনেক চাইনী-ডাক্তার দাঁততোলা এবং সার্জারীর কাজে এই গাছের পাতা কাজে লাগায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নাকি এমন বিষাক্ত গাছ আছে, যার বিষ আর্সেনিক্ বা ষ্ট্রিক্নিন-এর থেকে সহস্রগুণ বেশি জোরালো। এর নাম আডেনা। এর প্রভাব তাৎক্ষণিক। শিকারের দেহে কোন চিহ্নও থাকে না।

বিষাক্ত ছত্রাক

বারচ্ আর ফার্ গাছের ওপর জন্মায় অত্যন্ত বিষাক্ত ছত্রাক---ফ্লাই অ্যাগারিক্ টোড্‌ষ্টুল। ছড়ানো মাথার বেড় সাত ইঞ্চি পর্যন্ত হয়; রং উজ্জ্বল লাল, মাঝে মাঝে সাদা ছিটে।

আরও অনেক বিষপূর্ণ গাছ আছে। তবে, এদের মধ্যে কায়দায় বোধকরি ষ্টিংগিং নেট্‌ল-ই সব চাইতে সেরা। এটির সর্বাংগ খুদে খুদে সবুজ চুলে বোঝাই; এর প্রত্যেকটি হাইপোডারমিক্ সীরিন্‌জ। ছুঁলেই ওপরকার গোল মাথা ভেঙে সুঁচলো মুখ বেরোয় আর সেই ফাঁপা মুখে বিষ এগিয়ে আসে।

লোকো আগাছার ফুল সুন্দর, বীজ বিষাক্ত। জিম্‌সন্ আগাছা দেখতে ভালই---এর আছে অন্ধ-করা অ্যাল্কালইড্ বিষ।

হলুদ অলিয়্যান্ডার্ আগাগোড়া বিষাক্ত। তবে, এর বীজ থেকে প্রয়োজনীয় তেল নিষ্কাষণ করা হয়।

দেখা যাচ্ছে, অনেক গাছপালাই বিষাক্ত। বৃক্ষ-জগতে বিষ-বৃক্ষ আদৌ অমিল নয়। সে জন্যই অচেনা কোনও পাতা খাওয়ার, এমন কি তার গন্ধ শোঁকার আগেও পাঁচবার ভাবা দরকার। কে বলতে পারে, ঐ বিশেষ পাতাটিই আপনার জীবনে মৃত্যুদূত হয়ে উঠবে কি না।

—বসুবন্ধু

সাগর ফেরা মাঝি

কলিমদ্দির দু' পাটি দাঁত ঠাণ্ডায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। হাসানকে বলে, ওরে ও হাসেন, কি হাড়-কন্‌কনে জাড় (শীত) রে। মোর হাতের পায়ের গাড় লেই যে রে, মোকে এট্টু টিপে দে না বাবা। শরীলটা এট্টু তেতিয়ে (গরম) লিই।'

হাসান দাঁড় বাওয়া ছেড়ে নারিকেল ছোবড়া চিরতে লেগে যায়। কলিমদ্দি দাঁড় বাইতে থাকে। হাসান ছোবড়া চিরতে চিরতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ও চাচা, ঐ দেখো গো, পুব কাণে কি ম্যাগ উট্‌তেচে। এক্ষুণি বুঝিন ঝড় এসবে।'

'তুই থাম্‌তো। তোর শুধু ভয়।' কলিমদ্দি দু'পাটি দাঁত বের করে খিঁচিয়ে ওঠে, 'ম্যাগ করলেই তো ঝাচ পড়বে। নে নে, তুই টেপ দিনি তাড়াতাড়ি।

কলিমদ্দি জাল ঠিক করে নিতে নিতে দখিনের দিকে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। হাসানের দেরী দেখে কলিমদ্দি বিরক্তভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কই রে, হোল? নে না, তাড়া-তাড়ি কর না, দু' চারটে টান মারি, ইদিকে যে শালা নেশাও ছুটে যেচ্চে আবার জাড়েও শরীল কুঁকড়ী পেকৃকে যেচ্চে।

হাসান গাঁজার সাজা কল্‌কেটা কলিমদ্দির দিকে এগিয়ে দেয়।

কলিমদ্দি দু' তালুর মাঝে কলকে পুরে আগুন দেওয়ার অপেক্ষা না করে জোরেজোরে টানতে থাকে।

দেওয়াশলাইটা নৌকোর খোলে পড়ে থেকে থেকে নিউরে (স্যাৎসেতে) গেছে। তাই সহজে আর জ্বলতে চায় না। হাসান দু' তিনটে কাঠি দেওয়াশলাই-এর গায়ের বারুদে ঘষতে ঘষতে কাঠির বারুদ খসিয়ে ফেলেও জ্বালাতে পারে নি। কলিমদ্দির আর তর সয় নি। অধৈর্য হয়ে বলে, 'তুই শালা শুদু দেশেলাই খচ্-খচ্ কর আর মুই হিঁদুর 'মদেপ' (মহাদেব) হয়ে মুকে কল্‌কে লেগে বোস্ থাকি।'

জয়দেব বাগ

হাসান বলে, 'ও চাচা, দেক্‌চোনি, দেশোলাইটা যে 'নিউরে' (স্যাঁত-সেঁতে) হয়ে গ্যাচে। মুই তো জ্বালাতে চাইচি, উ শালা জ্বলচেনে যে।'

কলিমদ্দি রেগে উঠে বলে, 'দে দিনি, মোকে দে।'

'এই হয়েচে গো চাচা। নাও নাও, এট্টু ইদিক এগ্‌গে এসো। না হালে শালা আবার নিবে যাবে।'

কলিমদ্দি একটু তাড়াতাড়ি সরে আসে। হাসান বাতাসের প্রতিকূলে হাত দু'টোকে আড়াল করে দেওয়াশলাই কাঠিটা কল্‌কের মুখে ছোবড়ার গোল্লায় ছেঁকে ধরে।

গোটা আষ্টেক সজোরে টান দিয়ে হাসানের দিকে এগিয়ে ধরে কল্কেটা। বলে 'হ্যা রা, লিবি?'

হাসানের গাঁজা টিপতে টিপতেই দু'টান মারার জন্য উদগ্র বাসনা জেগেছিল। কিন্তু লজ্জায় আগে কিছু বলতে পারে না। হাজার হোক সে পাড়া সুবাদে কলিমদ্দি তার চাচা। তাই হাসান কোনদিন আগে খাবার কথা বলে না, বা টানেও না। কলিমদ্দি অবশ্য হাসানকে শেষ টান না দিয়ে কল্‌কে ঝাড়ে না। হাসান ভাবে --নাঃ, চাচার ইদিক ঠিক চোকের চামড়া আচে। তাই কলিমদ্দি যখন কল্‌কে এগিয়ে দেয় তখন আর হাসান লজ্জা করে না। কল্কেটা নিয়ে হাসান বলে, 'মোর-ও বড্ড জাড় (শীত) লেগেছ্যাল গো চাচা।'

কলিমদ্দি হাসানের মুখে জাড় লেগেছে শুনে বলে, 'হ্যা, র‍্যা, তোর আবার জাড় কি র‍্যা? তোর ঐ বয়েস মোর য্যাখন ছ্যালো, মোর ত্যাখন শরীলের লৌ (রক্ত) কত গরম ছ্যালো জানিস?'

হাসান অবাক দৃষ্টিতে কলিমদ্দির মুখের দিকে তাকায়। কলিমদ্দি তার যৌবন বয়সের গল্প আরম্ভ করে---পোষ মেসের কন্‌কনে জাড়ে এলো (আলগা) গা খালি) গায়ে ঘুরিচি। ঐ কনকনে জাড়ে ডুব দিয়ে খাচের (জালের) জট্ ছেইড়িচি। আর ত্যাখন মোর শরীলে কতো তাগত্ (শক্তি) ছ্যালো জানিস?

হাসান অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আর বোবা শ্রোতার মতো শোনে।

একবার হোল কি জানিস? কাঁঠাখালির কাচে লৌকো বেঁদিচি। ত্যাখন মুক আঁদারে (সন্ধ্যার ঠিক আগে) মতন। দেকি শালা একটা মেচো কুমীর মোর লৌকোয় ন্যাজ (লেজ) তুলে দিচ্চে। উ শালার ইচ্চা ছ্যালো মোকে ন্যাজ্ দে' টেনে লেবে। মুই-ও শালা তেম্‌নি। আস্তে আস্তে ন্যাজ্‌টা ধরে মারনু এক টান। শালা একাবারে বিশ-তিরিশ হাত দূরে গিয়ে ঝপাঙ করে পড়ল। পারবি এ্যাখন মোর মতন ত্যাগদ ধরতে?

হাসান সেই গল্প শুনে অবাক। তবে তার বিশ্বাস হয় নি। সে জানে কলিমদ্দি মিথ্যে বলতে ওস্তাদ। আর সকলেও তাই বলে।

কলিমদ্দি আর গল্প বাড়াতে চায় না। গল্প থামিয়ে হাসানকে বলে--নে নে, বাচ্ ঠিক কর। এক্ষুণি বুঝিন

ইলশে গুঁড়ি পড়বে। বেংতি বাচে যদি দু' একটা জইড়ে অ্যাসে। আজ শালা মাচ্ পড়বে বুঝিন রে হাসেন!

হাসান আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না গো চাচা, উ ম্যাগ ইলশে গুঁড়ির ম্যাগ্ নয়। এক্ষুণি সাপ্টে পানি এসবে।'

'লে লে, যা থাকে বরাতে, বদরগাজী যা দেবে তাই লোব।'

কথা বলতে বলতে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে চলে বার গাঙের দিকে। কলিমদ্দি জাল ছেড়ে ছেড়ে চলে।

একে একে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। গাঙের জল দুমড়িয়ে পাকিয়ে উঠছে। গাঙের ভীষণ গর্জন শোনা যাচ্ছে। কলিমদ্দি বুঝতে পারে এবার ঝড় আসবে। তাই হাসানকে বলে, 'দেবে রে, বুঝিন এবের (এবার) বাচকে (জাল) এ জায়গায় জড়ো করে। যদি দু'টোখানি মাচ পড়তো তাও শালা ঝড়ের জালায় আর হবে নে।'

ওদের একটু দূরে মল্লার পো'র নৌকো। আরও দূরে কয়েকখানা নৌকো। সকলেই জাল ফেলে ঘুরচে। বেশি মাছ পড়লে বুঝতে পারবে। জালের ভাসমান চোঙায় টানাটানি লাগাবে জালে আবদ্ধ মাছগুলো।

কালো ঘুটঘুটে মেঘটা আকাশ ছেয়ে গেল। দুরন্ত সূর্যটাকে মুড়ে ফেললো। সন্ধ্যা হ'তে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি, তবুও যেন গাঙের বুকে সন্ধ্যার কাল্চে আভা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে গেল কারা।

কলিমদ্দি হাসানকে বলে, 'ওরে ও হাসেন, আঁদার তো হয়ে এলো রে, লণ্ঠনটা জ্বালা না। জীনের মতন বসে থাকবি? এক্ষুণি আবার কোন্ শালা চোকরে-কানা নৌকোয় নৌকোয় দেবেখন ধাক্কা।'

হাসান কলিমদ্দির কথা মতো লণ্ঠনটা জ্বেলে নৌকোর মাঝখানে বসিয়ে দেয়।

ক্রমে সন্ধ্যা যতো বাড়ছে ঝড়ের বেগও বাড়ছে। গাঙের জল উথালি-পাতালি করছে। কোথাও বা গেরুয়া মাটি গোলা জলগুলো চালুনীর মত ফোট্ উঠছে। মাছগুলো আনন্দে তড়াৎ তড়াৎ করে লাফালাফি করছে। কলিমদ্দির আর আনন্দ ধরে না। জালে তার মাছ পড়বে হাল্সী গেঁথে। মনে পড়ে, সে যখন তার বাবার সঙ্গে গঙ্গায় আসতো মাছ ধরতে। জাল মাছের ভারে টেনে তোলাই যেতো না। কাঁটাখালি, গদখালি, রাইপুর, হীরেপুরেতেই তখন মাছ পড়তো মণ-মণ। এখন আর সেখানে মাছ নেই। এদিকে না এলে মাছই হবে না।

হাসানের ভয় হয়। ঘরে তার সামত্ত বউ। সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে। তার কাছে কাছে আর সে ক'দিন থাকতে পেরেছে। ইলিশের সময় বিয়ে হল। রোজই ইলিশ ধরতে বের হতে হোত। অবশ্য আসত বড়োজোর ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত। আবার প্রত্যেক দিনই ঘরে ফিরে যেত। আবার তার মধ্যে তিনবার বউ বাপের বাড়ি গেছে, আবার ফিরেছে। রোজ বের হত বটে, কিন্তু সময়ের হের-ফের ছিল। যেদিন যখন জোয়ার থাকতো সেদিন তখন বার হত। জোয়ার শেষ হ'লে আবার ভাঁটার জন্যও অপেক্ষা করতো। মাছ বেশি ধরতে পারলে তারই বেশি পাওনা হবে। বারোটা মাছ পড়লে মহাজনই তো নেবে সাড়ে সাতটা। বাকি মাছ ওর আর কলিমদ্দির।

ইলিশ মাছের যখন মন্দা (খারাপ) ভাব লাগল তখন আবার তারা বেংতি জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এই বার দরিয়ার বুকে। আসবার সময় হাসান পীরবানুকে বলেছিলো, 'হ্যা গা বউ, মুই তো বার-গাঙে যেচ্চি, আমলীর (তেঁতুল) ভাঁড়টা এনে। জানিস তো বার-গাঙে লোনা হাওয়ায় কতো নোক (লোক) ভেদবমি হয়ে মরে যায়। মোরও কি মরণ দেখতে চাস?'

পীরবানু আঁৎকে উঠেছিলো। ধরা গলায় বলেছিল, 'মুই কি উ সব
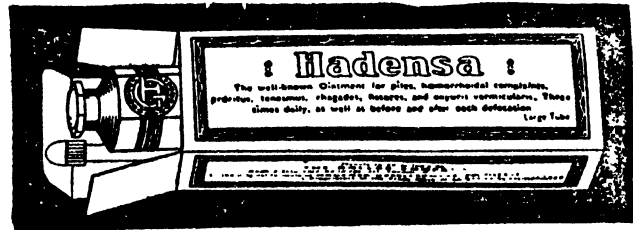
নি।' সে অবাক হয়ে বলেছিল, ...
কি রে বউ। জেলের ঘরের বউ হয়ে
উ সব জানিস নি? তারপর পীরবানু
রান্নাঘর থেকে একটা মাটির ভাঁড়ে করে
আমনী ভাত করে দিয়ে দিল হাতে।
হাসান তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকিয়ে
নিয়ে আমনীর ভাঁড়টা নামিয়ে রেখেই
পীরবানুকে সজোরে নিজের বুকে চেপে
ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। বলে,
'মুই মিচে মিচে বন্নু, তুই উ সব কি
করে জানবি। মুই চলে যেচ্চি। যাবার
সময় তোকে এট্টু আদর করে যাবো
নি? তুই না আমনী নিয়ে এলে মা-ই
আনতো। মুই যেদি না বলতুম, তুই
কি মোর কাচে আসতিস?'

পীরবানু তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত
করে নেয়। লজ্জানম্রভাবে বলে, 'তুমি
কি নোক, মা এক্ষুণি ইদিক এসে
পড়লে---।'

হাসান বলে, 'তুই থামতো।
আচ্ছা তবে মুই যাইরে বউ।'

পীরবানু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আবার
ফরে এসবে গো?'

'যেদিন ফিরবো বলেছিনু, সেদিন
তো পেরিয়েই গেল। তারপর আরও
চারটে দিন পার হয়ে গেল। শুদু ঐ
হাপনাসে চাচার জন্যে। খালি বলে--
ধাম না। আর গোটা কতক হোগ না।
আর ইদিক যে খোরাকী ফুইরে যেচ্চে
সেদিকে চাচার লজর নেই।'

ঝড়ের ভীষণ বেগ। মোচার
খোলার মত নৌকোগুলো দুলছে।
ওদের নৌকোটা মাছের ভারে মাত্র
দু' ইঞ্চি জেগে আছে। দু' জনেরই
ভয়-ভয় করছে। কলিমদ্দি বলে, 'ওরে
ও হাসেন, শালা ডোবাবে নাকি রে?'

কলিমদ্দির কথা শেষ না হতেই
সচকিত হয়ে উঠে বলে, 'হাসান বেপদ
ঘটেচে, পুবু দিকে তাড়াতাড়ি নৌকো
ঠেলিয়ে চ'। বুঝিন মল্লার পো'র নৌকো
ডুবে গেল।'

হাসানের বুকের রক্ত ছলাৎ করে
ওঠে। হাত-পা থর-থর করতে থাকে।
হাল ধরা হাত যেন শিথিল হয়ে যায়।
বলে, 'মুই পারবুনি, তুমি চালাও।'

কলিমদ্দি দু'পাটি দাঁতই মেলে ধরে
খিঁচিয়ে ওঠে বলে, 'শালা চ' না,
দেকচিস নি, ওদের তো তুলতে
হ'বে।'

হাসানের হাত থেকে হাল কেড়ে
নিয়ে কলিমদ্দি গায়ের জোরে হাল
টেনে আগিয়ে যায়। কিন্তু কোথাও
কেউ নেই। শুধু একবারই শুনেছিল;
ওগো মোদের বাঁচাও কে কোথায়
আচো।' তারপর আর কেউ কোথাও
নেই। গাঙের গর্জন ছাড়া আর কারও
কলরব বা আর্তনাদ নেই।

হাসান কলিমদ্দির ফ্যাকাশে মুখের
দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ চাচা, কার
নৌকো গা।'

মোদের এগ্‌গে এগ্‌গে তো মল্লার
পোই ছ্যালো।'

লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় কলিমদ্দির
মুখটা ঠিকমতো দেখতে না পেলেও
হাসান বুঝতে পারে চাচার গলার র'টা
(স্বর) ভারী মতন।

কলিমদ্দি বলে চলে, 'জানিস র‍্যা
হাসেন, কাকেও যেদি ফিরতি দেকিস,
তো হালে মল্লার পো'র খপরটা দিয়ে
দিস। মল্লের ঝিটা কি খাবেখন বলদিনি,
উ শাদীটার জন্যে 'জান'টা যেন ক্যামন
ক্যামন করচে রে।'

হাসান ওসব কথা কিছুই চিন্তা
করে না। তার বউ-এর চিন্তা করতে
থাকে। বলে, 'এইছিনু, তাড়াতাড়ি
ফিরবো, কিন্তুক কি ভাবতেচে তা কে
জানে।' তই হাসান বলে, 'ও চাচা,
চলো, মোরা ঘরে যাই। দরিয়ার যা
ভাব, তাতে মোর ভালো ঠেকতেছে
নে। কবে কহন (কখন)---

হাসানের মুখের কথা কেড়ে নেয়
কলিমদ্দি, 'তোর শুদু ঘরে যাই-যাই,
এহনই তো মাচ পড়বে, বুজি বুজি
(বুঝি বুঝি) সব। ঘরে মোগর (বউ)
জন্যে জান (প্রাণ) আই-ঢাই করতেচে।
হ্যা রা শালা, মোরও তো মাগ ছ্যালো,
মুই কি উপায় করতে এসে ফিরে গেচি?
উপায় কার জন্যে র‍্যা? পয়সা না
নিয়ে গেলে ঐ মাগই তোকে ঝাঁটা-
পেটা করবে।'

ওদের নৌকোর একটু দূর দিয়ে
একটা নৌকোকে যেতে দেখে
কলিমদ্দি হাল ছেড়ে দিয়ে দুটো
হাতকে চোঙা মতন করে হাঁক পাড়ে,
'কে যায় গো, ও কত্তা?'

ও-নৌকো থেকে প্রত্যুত্তর আসে,
'মোরা গো চাচা, শাদী আর জাল্লাদ।'

কলিমদ্দি ডাকে ওদের, 'তোরা
এট্টু ইদিক আয় রে।'

টিমটিমে লণ্ঠনটা কাঁধে নিয়ে
নৌকোটা এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে।
কাছে এলে জাল্লাদ বলে, 'তোমাদের
মাচ হোল গা চাচা?'

কলিমদ্দি চতুর। বলে, 'না,
তাই তো মোরা আরও দু'দিন পরে
যাবো।'

কলিমদ্দি মাছগুলোকে চট্
চাপা দেয়। ভাবে, শালারা বেশি
মাচ দেখে গেলে মহাজনকে বলে
দেবে। দু'পয়সা তা হলে আর উপায়
করতে হবে নে।

জাল্লাদ বলে, 'কি জন্যে ডাকলে
গো চাচা?'

কলিমদ্দির গলা ভারী। হাসানের
বাকশক্তি ফুরিয়ে যায়। কলিমদ্দি
মনে জোর এনে বলে, 'কি আর বলবো
বল। মল্লার পো আর নেই, একটা
খপর দিস মল্লের ঝিটাকে।'

জাল্লাদ আর শাদী দু'জনেই এক
সঙ্গে বলে ওঠে, 'কি কি গো চাচা, মল্লার
পো আর তাহালে নেই?'

'হ্যাঁ রে। তবে তোরা বলতে
যেন ভুলিস নি।'

জাল্লাদ বলে, 'বড়ো ভালো নোক
ছ্যালো গো মোল্লার পো'টা। কি
বোলবোখন। শ্যাষে এই খপরটা
মোকেই দিতে হল। নোকে বলে,
'যে এগ্‌গে খপর দেয়, সে হোল গিয়ে
'কাগ' (কাক)। মুই তো হালে কাগা
হনু র‍্যা।'

শাদী বলে, 'উ সব কথা রাখো
এহন। তাড়াতাড়ি চলো এহন।'

জাল্লাদ নৌকোর মুখটা ঘুরিয়ে
নিতে নিতে বলে, 'তা হালে মোরা
যাই গো চাচা। তা, তোমরা কবে

ফিরচো কেন? খবি জাটী মেয়েদের কাচে জানতে আয়সো?'

'কাল-পরশু নাগাত। আরও দু'দিন থাকতে হবে। কিন্তুক উ শালার জন্যে এগ্‌গেই যেতে হবে। উর নাকি বোয়ের জন্যে 'জান' কেমন করতেচে।'

জাল্লাদ আর শাদী হাসাহাসি করে।

জাল্লাদ আর শাদী রায়পুরে এসে নৌকো বাঁধে। বেলা তখন দু'পৌ-আড়াইটে। সূর্যটা মাথার উপর খাড়া-খাড়িভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। জাল্লাদ বলে, 'ওরে ও শাদী, অনেক দিন শালপানি পেটে পড়েনে, চ' এগ্‌গে এট্টু পেটে ঢোকাই।'

শাদী বলে, 'মোল্লার পো'র খপরটা দিবি নি?'

'দেবে-খন। এগ্‌গে চ' না। এট্টু খেয়ে এসি।'

শাদী নৌকোর খোলের মাছ-গুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যা র‍্যা জাল্লাদ, মাচগুনো খোলা থাকবে র‍্যা? ইদিকে যা ডঙ চিলের আমদানি?'

'যা তুই চট্ চাপা দি-আয়।'

দু'জনে তাড়িওয়ালা পারসীর কুঁড়েতে গিয়ে ওঠে। সে ঘুম দিচ্ছিল। জাল্লাদ ডেকে তুলে বলে, 'এই, তাড়ি হ্যায়?'

সে ঘুম জড়ানো চোখেই বলে, 'জরুর হ্যায়।'

শাদী বলে,' 'এ' কেলাশ হ্যায় তো?'

'আগে খাকে দেখো। তারপর বোলো কোন্ কেলাশ কা মাল আচে।'

দু'জনে চক্ চক্ করে পেট পুরে তাড়ি ঢোকায়। খাওয়া শেষ হ'লে শাদী বলে, 'কেতনা করকে গেলাস ভায়া?'

---'তিন আনা।'

জাল্লাদ তার ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখে তার ট্যাঁকে মাত্র দু' টাকা আছে। বুঝতে পারে ঝগড়া না বাধালে ঐ দামেহ মের হতে দেবেনে শালা পারসী। দাম হয়েছে তিন টাকা বারো আনা। দু'জনে খেয়েছে কুড়ি গ্লাশ। তাই জাল্লাদ বলে---'ধুত্তেরি, এই পানী কা মাপি মাল তিন আনা গেলাশ। উ সব হবেনে শালা। এই লাও।' বলে দু' টাকা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

পারসী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ওরা দু'জনে টলতে টলতে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে। পারসী ভাবে ---যাক না শালা আবার এসবে শালারা। ত্যাখন শালাদের দেখাবো মজা।

তারপর ওরা নৌকোর কাছে আসে।

কলিমদ্দির বউ আর হাসানের মা-ও রোজ আসে। ফিরলো দেখতে ওরা যদি না ফেরে খবর নেবে বলে।

হাসানের বুড়ী মা ওদের দেখে বলে 'হ্যাঁ বাবা, মের ছায়ালকে দেখলি র‍্যা?'

জাল্লাদ নেশার খেয়ালে শাদীর দিকে তাকিয়ে বলেন 'হ্যা রা, কে যে, বলতে বলল ওদের লৌকো ডুবে গ্যাচে।'

শাদী বলে---'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেইচি, মল্লার পো বলল তো তাদের নৌকো ডুবে গ্যাচে।

জল্লাদ আড়ষ্ট ভাষায় বলে, 'ধুর শাল্লা, কলিম চাচা বললো তো, তাদের লৌকো ডুবে গ্যাচে।'

শাদীও মদের খেয়ালে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো।'

কলিমদ্দির বউও বুক চাপড়ে বসে পড়ে। হাসানের মা তখন মাটিতে মাথা কুটছে।

শাদী বলে কলিমদ্দির বউকে, 'ও চাচী, তুই কেন কান্‌চিস? চাচা তো উটেচে । মরেচে হাসেন।'

কলিমদ্দির বউ স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। হাসানের মা কিন্তু তখনও কেঁদে চলেছে ডাক ছেড়ে। বুড়ীর কান্নায় রাস্তার যতো লোক থরে থরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বুড়ী কেঁদে চলেছে, 'মোর ই কি হোল গো, ও বাপ সকলরা তোরা মোর বাপজী গো---তোরা মোর হাসেনকে এনে দেগো।'

কলিমদ্দির বউ অনেক কষ্ট করেও থামাতে পারে না। ঘাটেই শুয়ে শুয়ে আছাড় কাছাড় খাচ্ছে। কার সাধ্য ওকে একা চুপ করায়। শেষে কলিমদ্দির বউ রাস্তার দু' চারজন লোকের সাহায্যে ধরে আনে বাড়ীতে।

বাড়ীতে এতো লোক আর শাশুড়ীকে কাঁদতে দেখে বউ পীরবানু এগিয়ে আসে। বুড়ী পীরবানুকে দেখেই অকথ্য ভাষায় গালাগাল আরম্ভ করে দেয় 'ওলো ও হারামী, ই কি হোলো লো মোর। মোর হাসেন গাঙে ডুবে মরেচে।'

পীরবানু ওকথা শুনেই আছাড় খেয়ে পড়ে। শেষে তার ভাগ্যে এই ছিল। হে আল্লা, মোর নসীবে শেষে তুমি এই লিকেছিলে।

বুড়ী গালাগালি দিয়েই চলেছে, 'ওলো ও বউ, তুই ই কি মোর সব্বনাশ করলি লো, তুই এতদিন এসিস নি, ঠিক ছ্যালো মোর ছাবাল। তুই এসেই কি কাল ঘটালী লো।

বাড়িতে প্রচুর লোক জমে যায়। কলিমদ্দিন বউও আসে। কলিমদ্দির বউ যেন নিজের স্বামীকে অপরাধী ভাবে---যদি না তার স্বামী নিয়ে যেত, তা'হলে হয়ত হাসেন মোরতুকনি।

বাড়ির উঠানে প্রচুর লোক আসছে দেখে পীরবানু তার সরম সামলাতে ঘরের মধ্যে যায়।

বুড়ী সেখানে গিয়েও আরম্ভ করে, 'তুই এখনও মোর ই চোকের সামনে আচিস্। যা না, তুইও মরগে যা। কেন তুই মোর ছাবালের মাতা খেতে গেলি লো। তোর বাপের মাতা খেতে পারলিনি কেন? তুই ঘর থিকে বেইরে যা। তোর মুক লুকুকে থাক। তোর মরণ দেকে মোর চোক জুড়ুক।'

পীরবানুর ভীষণ শোক লাগে। আবার তার উপর শাশুড়ীর অত জ্বালা। তার আর সহ্য হয় না। তার আর বাঁচতেই ইচ্ছা নেই। বেঁচে থেকে কি লাভ তার। তার স্বামী যখন চলে গেলো তখন আর তার কে আছে।

এমনিই জানে এ পোড়া দেহ নিয়ে বেঁচে থাকলে পাড়ার নোচ্চার ছেলে-গুলো শ্মশানের মড়ার মত ছিঁড়ে কুটে খেতে চাইবে শিয়াল-কুকুরের মত। তাই সেভাবে তার মরাই ভাল। বেঁচে থেকে কি ঐ শাশুড়ীর গালাগাল খাবে ?

ঘর থেকে পীরবানু ধীর পদক্ষেপে শাশুড়ীর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। শাশুড়ী তার কান্নাভেজা চোখে পীর-বানুকে লক্ষ্য করে আবার পূর্বের ন্যায় গালাগাল আরম্ভ করে। শাশুড়ী এমন তার উপর দোষারোপ করছে, যেন এ মৃত্যু তারই জন্য ঘটেছে এ মৃত্যুর জন্য সেই যেন দায়ী। কিন্তু বোকা শাশুড়ী জানে না যে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ---এ তিনটির জন্য কেউ দায়ী থাকে না বা এ তিনটি কারও দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষ ঐ তিনটির কাছে যতই শক্তিশালী হোক, পরাজিত হবেই।

শাশুড়ীর গালাগাল থামে না। বলে চলে, 'হ্যালা, আবার কোতা যাচ্চিস লা ? তোর বাপ-ভেয়েদের ডাক না। মোর ছাবালের এট্টু শান্তি করুক।'

পীরবানু আর তার শাশুড়ীর কথা কানে নেয় না। সে যা ভেবেছে তাই করবে। তাই পীরবানু আর থামে না।

বুড়ী দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'তা কোতা চললি লো হারামী ?'

পীরবানু রাগে আর দুঃখে বুড়ী শাশুড়ীর মুখের উপর বলে দেয়, 'মুই যেখেনেই যাই না, তোর জমা-খরচ কি ? এই তো বললি, মোর মরণ দেখে তোর চোক জুড়ুক।'

'বুজিচিলো বুজিচি। য, তোর বাপের বাড়ি। বাপ আবার একটা বুড়োকে ধরে নিকেয় চুককে দিগ্।'

পীরবানু তার স্বামীর ঘর ফেলে রেখে পা বাড়ায়। নিজের অজান্তেই তার নিজের হাতে সাজানো ছ'মাস ধরে সংসারটা কান্নাভেজা চোখে তাকায়। যেন তার ঐ সংসারটা একটা অদৃশ্য টান তাকে টানছে। পা যেন আর চলে না। তবু তাকে চলতে হয়।

কলিমদ্দি আর হাসান দু'জনে বেংতি জাল পেতে মাছের আশায় বসে থাকে। ঘণ্টা চারেক পরে তুলবে। কলিমদ্দি গলা ছেড়ে গান ধরে আনন্দে। তাদের অনেক মাছ পড়েছে। গত দশ-বারো বছরে এত মাছ হয় না।

ক্রমে সন্ধ্যা নেমে আসে। কলিমদ্দি জালের চোঙার দিকে তাকিয়ে দেখে ---জাল অল্প অল্প টানাটানি করছে মাছের ভারে। কলিমদ্দি ভাবে, আর দেরী করলে চলবে না। আবার আজই বাড়ি ফিরতে হবে। খোরাকী আর নেই। তাই কলিমদ্দি হাসানকে বলে, 'ওরে ও হাসেন, বাচ (জাল) তোল না রে!'

হাসান জাল তুলতে তুলতে এগিয়ে যায়। একে একে নৌকোয় তুলে জড়ো করে। কিছুটা তোলার পর জালটা যেন খুব ভারী ঠেকে। হাসান কলিমদ্দিকে বলে, 'ও চাচা, বাচ (জাল) যে বড্ড ভারী ঠেকতেছে। পড়েচে বুঝিন খোড়ো ভেক্‌টি (ভেকুট)।'

কলিমদ্দি বলে, 'জোরে টান না। শালা গাঁতলো কি করে বলদিনি ? ফাঁদ তো মোটে এক বেগোদ্।'

'জইড়ে গ্যাচে বুঝিন।'

জাল টেনে তুলতে দেখে একটা পচা গন্ধ মড়া। জালে হাত-পা জড়িয়ে গেছে। হাসান কলিমদ্দিকে বলে, 'ও চাচা, পেইচি, শালা মল্লার পো'কে। পচে একাবারে গু-গেল্লা।'

কলিমদ্দি হুমড়ি খেয়ে দেখে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না। আর কলিমদ্দির চোখও খারাপ হয়ে গেছে। সবই অল্প দেখে।

কলিমদ্দিকে হুমড়ি খেয়ে দেখা হতে দেখে হাসান বলে---'হ্যাঁ চাচা লণ্ঠনটা জ্বালবো ?'

কলিমদ্দি বলে, 'খপরদার খপরদার, শালা শুকূনী (শকুন) জল পুলুশেরা খুজতে পারলে রক্ষে নেই। মল্লার পো'টা মোদের ইয়ার-বন্ধু ছ্যালো, একবার শ্যাষ দেকা দেকে নিই।

কলিমদ্দি ভালো করে আপাদ মস্তক দেখে হাসানকে বলে 'দে দে, তাড়াতাড়ি ফেলে দে।'

হাসান মড়াটাকে ফেলতে গিয়ে যেন একটা ঘৃণা-ঘৃণা ভাব আনে। তাই মড়াটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কি করে তার গায়ে হাত বা পা লাগাবে। তারপর হাসান বুঝতে পারে মড়াটা আসলে মেয়ে-মানুষ। তাই কলিমদ্দিকে বলে, 'ও চাচা উ যে মেয়েছেলে।'

কলিমদ্দি আবার হুমড়ি খেয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে। বলে 'হ্যা তো রে। দে দে, ঠেলে ফেলে দে গাঙে। কোন্ শালার কম্মো তা কে জানে! ছুঁড়িটার সববনাশ করে মেরে ফেলে গাঙে ফেলে দিয়েচে।'

হাসান ফেলতে গিয়ে দেখে হাতে গলায় কোমরে রূপার গহনা। হাসানের চোখ চক্‌চকে হয়ে ওঠে, ভাবে চাচাকে বলবে, না, বলবে না কিন্তু খুলে নেবেই বা কেমন করে। তার চাচা যদি বুঝতে পারে। তাই বলেই ফ্যালে, 'ও চাচা, ওর গায়ে যে গয়না।'

'নে নে, সব খুলে নে।'

হাসান সব এক এক করে খুলে নেয়।

কলিমদ্দি বলে, 'এখেনেই ভাগ-যোগ করে নিই। আড়ায় উঠে করতে গেলে কুনো শালা দেখলে বেপদ ঘটাবে। আর চ', ঘর যাই।'

কলিমদ্দি আর হাসান সেই রাত্রেই রায়পুরের ঘাটে এসে পৌছাল। অনেক মাছ। দু'জনে বইতে পারবে না। তাই আর তিনজন লোক ধরল। মাছ গুলো পাঁচজনে পড়ে দেড় মণে বস্তায় ঠেসে ঠেসে পুরে মুখ বেঁধে ফেললো। কলিমদ্দি এক এক করে সকলের মাথায় তুলে দেয়। শেষে ছোটটা নিজে একলাই মাথায় তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলো।

মেঘালয়ের দেশে

শিবরতন ভৌমিক

নীল আকাশটা অতি কাছে যেনো মাথায় ঠেকে
সাদা-কালো মেঘগুলো ওই হেসে -খেলে যায়,
রং-বেরঙের ছোটো ছোটো ঘর-বাড়িগুলো
পটে আঁকা ছবির মতো অপরূপ শোভায়।

অপরূপ নানা তরুলতা—নানা ফুল সম্ভার,
সাজায়ে রেখেছে যেনো বিধাতার পূজা-উপচার।
কী অপরূপ অনন্ত মধুর চির শ্যামলিমা,
অনন্ত উদার আকাশের নেই কোনো সীমা।

কতো গিরিমালা ঘেরা অপরূপ মেঘালয়,
মেঘালোকের প্রসাদমাঝে শিলং জেগে রয়।
এই রোদ—এই বৃষ্টি শীতের পরশ লাগে,
মোরগের ডাকে প্রভাত ঐ ঘুম থেকে জাগে।

চারিদিকে সুনিবিড় ঝাউবন—পাইন বন,
অপরূপ শোভা তার—হাওয়া বয় শনশন্।
অপরূপ মেঘের লীলা—অনুপম মেঘালয়,
সবারে করিছে আপন—হৃদয় করেছি জয়।

সূর্য্য ওঠে মেঘের কোলে মধুর হাসি হেসে,
স্বপনের জাল বুনে মন চলে যায় ভেসে।
আকাশ পৃথিবী এক, অতি আপনার জন,
মেঘেরা সোহাগ ভরে সদা করে আলিঙ্গন।

মেঘেরা ঢোলক বাজায় আনন্দে ওই চলে,
ঐযে ওড়ে বিজয় কেতন আকাশের তলে।
চারিদিকে শ্যামলিমা—অনুপম তব ছবি,
কুয়াসার ঘোমটা ফেলি' ওঠে ভোরের রবি।

মেঘেরা হাসে ও খেলে কোলাকুলি দিয়ে যায়,
মন-পাখী উড়ে যায় অনন্তের পানে হায়।
মেঘালয়ের দেশে তুমি অপরূপ যে শিলং,
কে দিলো গো তোমার মুখে নানান রূপের রং।

হাসান-কলিমদ্দি আগড়ে ধাক্কা দিতে আগড়টায় হুড়কো লাগানো ছিল না বলে খুলে গেল, ওরা সবাই পর পর ঝপাস -ঝপাস করে বস্তা ফেললো।

বস্তা ফেলার শব্দে কলিমদ্দির বউ-এর ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি ল্যাম্পটা জেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, "কি গো, কি করে ঢুকলে গো?'

কলিমদ্দি রেগে ওঠে, "তুই শালী আগড়ে হুড়কো দিয়ে রেখেছিলি। দুই গাঙে গেচি তুই তো জানিস। নাকি কে আবার পিরীত করতে এসে---'

'তুমি থামো তো।' বউ মুখ ঝামটা দেয়, 'তোমার নয় আজকাল—এর মধ্যে এসবার কতা ছ্যালো।'

ও:, তাই। ভালো ভালো।'

কলিমদ্দি মুটে তিনজনকে তাদের পাওনা মেটাতে তারা চলে গেলো।

কলিমদ্দির বউ বলে, 'হ্যাঁ গা, হাসেন ভাই এয়েচে?'

'কেন এসবেনে। তুই কি এখনও বোঝালিলি?'

তবে যে শালী আর জাহাদ খপর দিলো তোমাদের নৌকে ডুবে গ্যাচে। তুমি নাকি বেঁচে আচো। আর হাসেন ভাই নাকি তুইলে গ্যাচে।'

কলিমদ্দি বউ-এর সঙ্গে মস্করা করে। 'হ্যাঁ, তুইলে গ্যাচে তোর উটুনে।'

হাসান অবাক। খল খল করে হেসেও ওঠে।

কলিমদ্দির বউ কান্না-কান্না গলায় বলে, 'ও হাসেন ভাই, তুমি এগুগে তোমার ঘরে যাও। তোমার মা বুঝি পাগল হয়ে গ্যাচে।'

নতুন পথের সন্ধানে

উত্তর মেরুর এই দুর্গম পথের কোনরূপে তথ্যমূলক ভালো মানচিত্র নেই বলে জাহাজের কমান্ডার এইভাবে সর্বদা এর গতিপথের উপর লক্ষ্য রাখেন

বিগত পাঁচশত বছর ধরে বণিক সম্প্রদায় উত্তর মেরুর বরফাচ্ছন্ন সাগরের বুক চিরে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার কথা ভেবে আসছেন। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে, দুর্গমের সকল দর্প, সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে যারা এগিয়ে চলে, রবার্ট ম্যাক্লুরের নাম তাদের মধ্যে অন্যতম। এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী আজ থেকে প্রায় ২১৬ বছর পূর্বে এই বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি শেষ পর্যন্ত সফলকাম হতে না পেরে অবশিষ্ট দুইশত মাইল তুষারাচ্ছন্ন পথ চক্রহীন গাড়ীর মাধ্যমে অতিক্রম করেন।

সম্প্রতি গত বছর আমেরিকার বিশাল বাণিজ্য-পোত এস্ এস্ ম্যানহাটন প্রথম উত্তর মেরুর এই বরফাচ্ছন্ন সাগর-পথ অতিক্রম করে ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত রাখে। ইতিপূর্বে বরফে ঢাকা এই দুর্গম পথ শুধু ছোট ছোট বরফ-ভাঙ্গা ক্ষমতাশালী জাহাজই পার হতে পেরেছে। কিন্তু আমেরিকার এই বৃহত্তম ১৫০,০০০ টন মালবাহী জাহাজটি, যা লম্বায় ১০০৫ ফুট এবং ৪৩,০০০, ঘোড়াবিশিষ্ট ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত, তা এই পথ অতিক্রম করে নতুন আশার আলোর সঞ্চার করে।

ম্যানহাটনের এই বিস্ময়কর পরীক্ষা-মূলক অভিযানের ফলস্বরূপ আলাস্কা থেকে আমেরিকার পূর্ব উপকূলে তেল শোধনাগারে কাঁচা তেল (ক্রুড্ অয়েল) সরবরাহের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়।

আশীষ মুখোপাধ্যায়

ইতিপূর্বে একমাত্র পাইপ লাইনের মাধ্যমেই এই তেল আনার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। হিসেব করে দেখা যায় যে, জাহাজে করে এই ক্রুড্ অয়েল আনতে পারলে প্রতি পিপে তেলে ৬০ সেণ্ট করে খরচা কমানো যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আলাস্কার উত্তর মেরুতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রিজার্ভ তেলের খনি বর্তমান। এই খনিতে দুইশত কোটি থেকে চারশত কোটি পিপে তেল আছে বলে তাঁরা মনে করেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানহাটনের এই অভিনব যুগান্তকারী অভিযান বিশেষ-ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমেরিকার এই তৈলবাহী জাহাজটি গত বছর ২৪শে আগস্ট ৯৫ জন নাবিক, বিজ্ঞানী ও সাংবাদিক সহযোগে পেন্সেলভেনিয়ার অন্তর্গত চেস্টার থেকে যাত্রা শুরু করে এই দুর্গমের পথে। সাথে ছিল বরফ ভেঙ্গে যাওয়ার ছোট্ট আইস্-ব্রেকার ও কিছু সংখ্যক হেলি-কপ্টার যা উড়ে গিয়ে দূর প্রান্তের খবর আনতে পারবে।

জাহাজটি গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে ল্যাঙ্কেস্টার সাউণ্ড নামক স্থানে এলে বরফের ওপর দিয়ে পার হবার জন্য এর প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হয়। কখনো বা জাহাজটি এক-একটি বাসের সমান বিশাল বরফের স্তূপ ভেঙ্গে বা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে পথ করে এগিয়ে যেতে থাকে। এই অনন্ত বরফরাশি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে জাহাজটিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যাত্রার পূর্বে এই পর্বতপ্রমাণ জাহাজটির কাঠামোর চতুস্পার্শে ইস্পাতের বেষ্টনী দেওয়া হয় এবং তদুপরি কঠিন বরফ ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এতে বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

এই সুবিশাল মার্কিণ জাহাজটি এরপর ম্যাক্লুর প্রণালীতে এসে পৌঁছলে মেরুপ্রদেশ থেকে স্রোত ও ঝঞ্ঝায় বয়ে আনা স্তূপীকৃত কঠিন জমাট বরফের মাঝে এর অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সামুদ্রিক বরফের মধ্যে লবণাক্ত ভাব যখন হ্রাস পায়, তখন তা আরও কঠিন ও শক্ত আকার ধারণ করে। প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল ধরে দুরন্ত সংগ্রাম করেও যখন ম্যানহাটন এই বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলো না, তখন সে তার গতি বিপরীতমুখী করে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ প্রণালী ধরে তার সুনির্দিষ্ট পথ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে সে প্রকৃতির সকল বাধা-বিপদ উপেক্ষা করে আলাস্কার অন্তর্গত 'প্রদহো' উপসাগরে অবস্থিত তেলের খনিতে এসে উপস্থিত হয়। জাহাজটি আবার এইরূপ দুর্গম পথ পেরিয়ে নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমেরিকাতে ফিরে আসে।
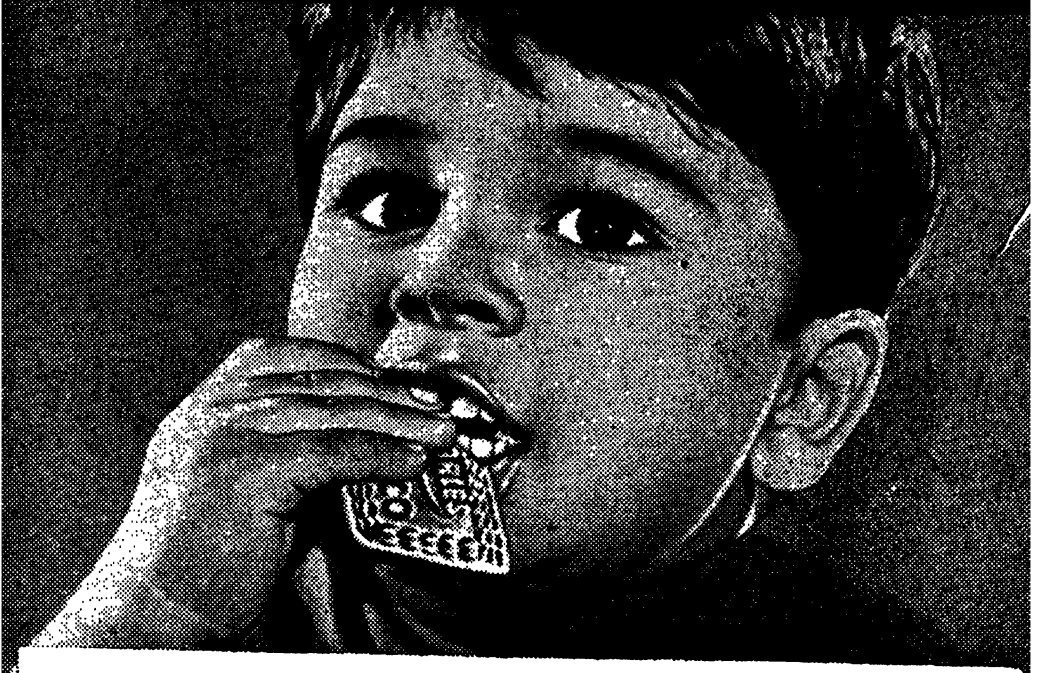
He has to read some 45 lengthy reports every day yet he reads a NEWSPAPER every day
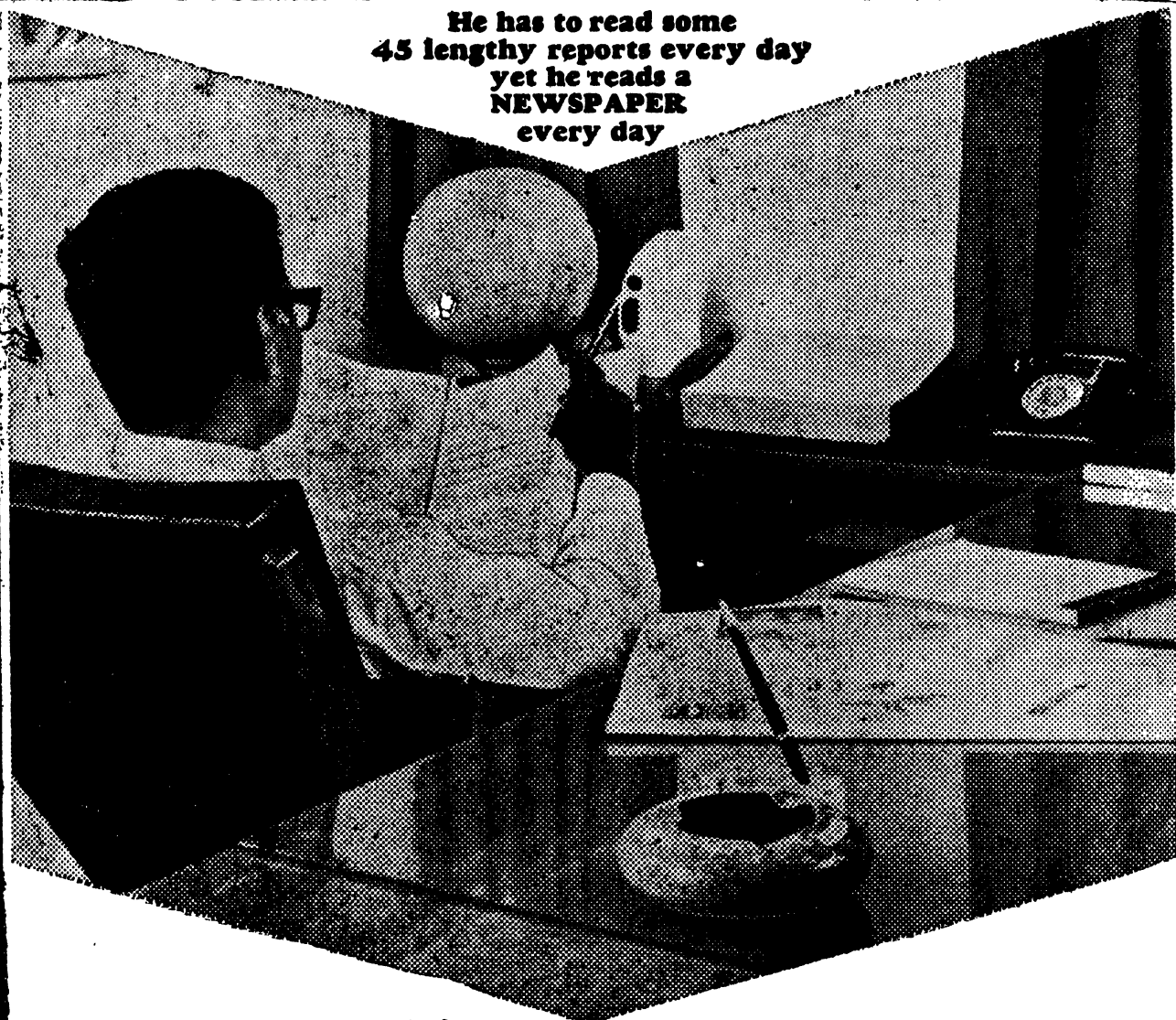
Which other medium has a standing appointment with highly-paid executives like him, day after day?

Up to his eyebrows in work? No time? Perhaps not for many things. But every important man makes time to read his morning paper. Readership of dailies reaches an optimum 100% for busy men with incomes of Rs. 1000 to Rs. 1500*.

They are all businessmen and professionals who by training have learnt to give their closest and fullest attention to what they read.

So, if it is your advertisement which has come under their scrutiny, you know it is getting their full attention. Your whole sales story is being absorbed. For reading necessarily means seeing with attention!

If your message is in the papers, dailies or periodicals, you know that men who matter to you have read it—in depth.

There is a newspaper or magazine to reach every reader in his language, at the lowest cost per thousand.

* *(A.S.P. Readership Survey.)*

Address through the Press: —it costs far less

IENS

Inserted in the interest of providing information for better advertising value by
THE INDIAN & EASTERN NEWSPAPER SOCIETY
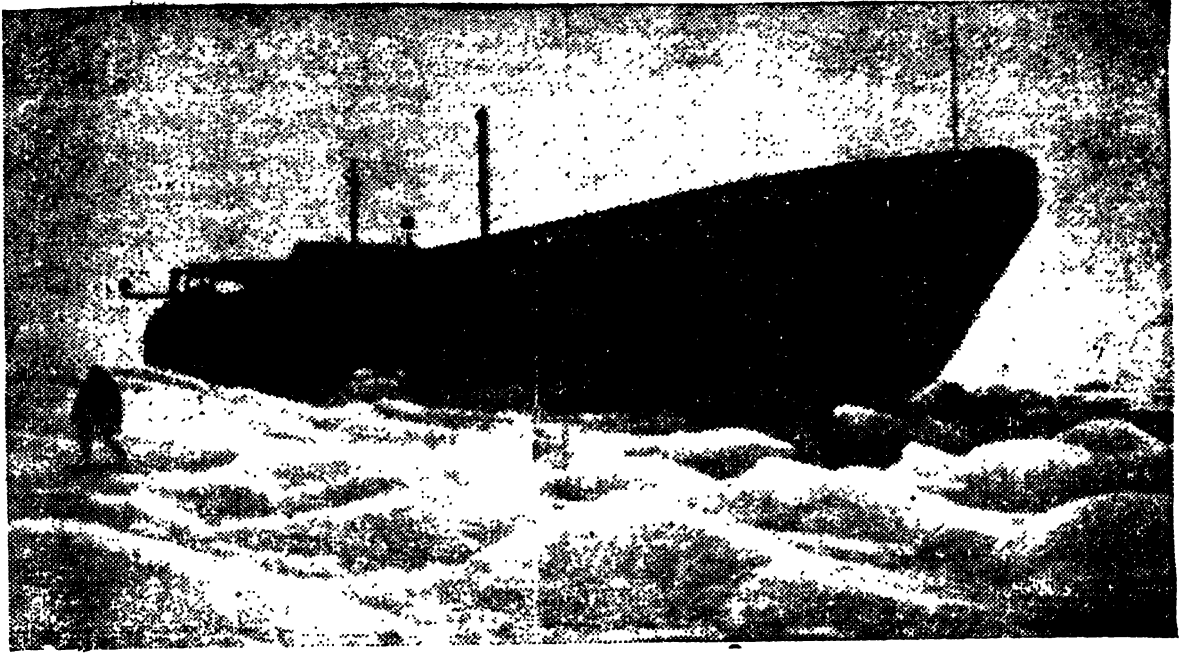
আমেরিকার বৃহত্তম তৈলবাহী জাহাজ এম, এস, ম্যানহাটন উত্তর মেরুর বরফাচ্ছন্ন সাগরের বুক চিরে এগিয়ে যাবার জন্য সংগ্রাম করছে

এই অভিযান চলাকালীন সময়ে বিজ্ঞানীরা প্রতিদিন সকালে জাহাজ থেকে নেমে এসে বরফের বিভিন্ন প্রকার নমুনা সংগ্রহ করে নানা-প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতেন। তাঁরা বরফের কাঠিন্য বিচারের অভি-প্রায়ে এই প্রকার গবেষণায় এর উত্তাপ, লবণাক্ত ভাব ও ঘনত্ব প্রভৃতি বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। বিজ্ঞানীরা হেলিকপ্টারে করে আগে থেকেই জাহাজের গতিপথের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সেই সকল স্থানের বরফের নমুনা সংগ্রহ করে স্থির করতেন যে, এরূপ বরফের ওপর দিয়ে জাহাজ চলাচল সম্ভবপর কিনা, আজও বিজ্ঞানীরা এই সকল দুরূহ প্রশ্নের সমাধানের আশায় অবিশ্রান্তভাবে তাঁদের সুদূরপ্রসারী গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

যদিও উত্তর মেরুর এই জমাট তুষারাচ্ছন্ন সাগরের বুক চিরে ম্যান-হাটনের সফল অভিযান বিজ্ঞানীদের মনে কিছুটা আশার আলোর সঞ্চার করেছে, তবুও ভবিষ্যতে তৈলবাহী জাহাজগুলি এই দুর্গম-পথ পারাপারে কতটা সফলতা অর্জন করবে, সেই সম্বন্ধে এখনই কোন নিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয় বলে তাঁরা মনে করেন। এইপ্রকার জাহাজের নকশা তৈরী করা, তার কারিগরী ব্যবস্থা ও ব্যয় প্রভৃতি নানাদিকের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনার প্রতিও তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

কিন্তু এরূপ পরিপন্থী অবস্থার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ম্যানহাটনের এই বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ সফল অভিযানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে সুয়েজ খালটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হচ্ছে। তাই উত্তরমেরুর এই বরফাচ্ছন্ন পথ যদি জাহাজ চলাচলের পক্ষে উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়, তবে লণ্ডন থেকে টোকিওর বর্তমান দূরত্ব ১৪,৬৭০ মাইলকে কমিয়ে প্রায় ৮,০০০ মাইলে নিয়ে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ভবিষ্যতে বর্তমান বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি-সাধন করা হয়তো সম্ভবপর হবে।
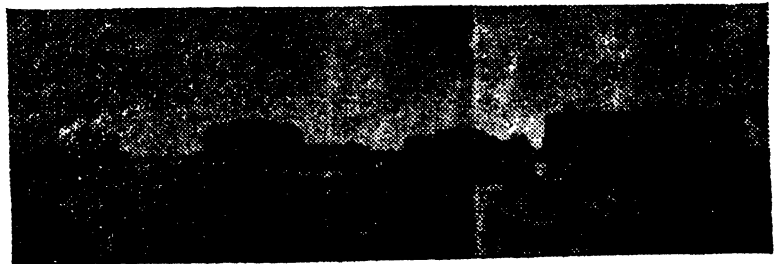
ট্রাক্টার দ্বারা পরিচালিত তৈলবাহী সব গাড়ীতে বা পাইপলাইনের মাধ্যমে এইভাবে তেল নিয়ে যাওয়া হয় আলাস্কার রাজধানীতে

রূপ রস বর্ণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এদের দু'জনকেই দেখেছিলেন গভর্ণর রেণো সিগনর মলিনারির কারখানায় যাবার পথে। কারখানায় আর দু'টো বয়লার বসেছে, তাঁতের সংখ্যা বেড়েছে, মাল অনেক বেশী তৈরী হচ্ছে, নতুন একটা কিছু গড়ে তোলার মধ্যে সাফল্য ও আত্মপ্রসাদের আনন্দ আছে, সে আনন্দ আরো উপভোগ্য হয় অপরের প্রশংসা ও স্বীকৃতিলাভে। মলিনারি তাই আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্ণরকে আমন্ত্রণ করেছে, অনুরোধ জানিয়েছে রৌশন ও রাবেয়াকেও।

খালি গায়ে খালি পায়ে ধুতিপরা শ্বেতাঙ্গ যুবকটিকে দেখে রেণো বিস্মিত হলেন, তার সঙ্গে আবার একটি ঘোমটা-পরা দিশি জেনানা, দু'জনেই হেঁটে চলেছে হাত ধরাধরি করে। এ দৃশ্যটি যেমন লজ্জাকর, তেমনি হাস্যকর, কিন্তু স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের বশে রেণো কিছু প্রকাশ করলেন না। কিন্তু রাবেয়া কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না, চৌধুরী মশাইও এদের সঙ্গে যাচ্ছেন, তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ওরা কে?'

'সেই পর্তুগীজ সাহেবটি, যে 'খাল খেয়ে বেড়ায়, মেয়েটিকেও হিন্দুমতে বিয়ে করেছে, এণ্টনী ও সৌদামিনী।'

রাবেয়া শুনতে চায় আরো, চৌধুরী বলে যান। বলা হয়ে গেলে থেমে যান।

সকলেই চুপ, শুধু দু'টি শব্দ 'বিয়ে করেছে' বার বার এসে ধাক্কা দেয় রৌশনের মনে, রাবেয়ার মনে। গাড়ির ঘর্ঘর চাকার শব্দও যেন ঐ দুটো কথারই প্রতিধ্বনি করছে---বিয়ে করেছে, বিয়ে করেছে।

দিব্যদর্শী

রৌশন ভাবছে কতখানি ভালবাসে সে তার জুলিওকে, জুলিওর ভালবাসার গভীরতাও জানে, কিন্তু বিয়ে হয় নি, স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া যায় না, সমাজের চোখে এ ভালবাসা অবৈধ, এ ভালবাসার কোনই মূল্য দেবে না কেউ, বরং ঘৃণার চোখে দেখবে। ছোট একটি কথা 'বিয়ে', কিন্তু কী যাদুমন্ত্র আছে ঐ কথাটির ভিতরে।

রাবেয়া ভাবছে ছোট ঐ কথাটি যেন মায়াপুরীর দরজা। সেই মায়াপুরীতে সোনার সিংহাসনে ভালবাসার হয় পট্ট অভিষেক, চরম সার্থকতা। সেই স্বর্ণ সিংহাসনে বসে পুরুষ ও নারী সগর্বে ঘোষণা করতে পারে আমরা স্বামী-স্ত্রী, দুই হয়েও আমরা এক, কোনো ব্যবধান, কোনো বাধানিষেধ আমাদের দু'জনের মধ্যে বাধা তুলতে পারে না, আমরা একাত্মা, অভিন্ন হৃদয়, আমাদের ভালবাসা ধর্মের গ্রন্থিতে শুচিশুদ্ধ। উঁকি দেয় তার মনে রবার্ট সিনভেষ্টারের মুখ, দীর্ঘশ্বাস পড়ে, সে তো আর বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে হয়তো --- । মনে আসে অ্যালবার্টের মুখ, চঞ্চল হয় হৃৎস্পন্দন, 'কিন্তু সে কী -- ?

'বনজুর সঁশিয়ে গভর্ণর, বনজুর মাদাম, বনজুর মাদামোয়াজেল, বনজুর মঁশিয়ে চৌধুরী'। কখন যে গাড়ি এসে থেমেছে মলিনারির কারখানার ফটকে, রাবেয়া ও রৌশন—দু'জনের কারুরই খেয়াল হয় নি।

রাবেয়ার সঙ্গে দেখা হবার এই সুযোগ প্রায় জোর করেই আদায় করে নিয়েছে অ্যালবার্ট বন্ধু মলিনারির কাছ থেকে। সে হাসিমুখে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনায় অংশগ্রহণ করলো। মলিনারি রাবেয়ার সঙ্গে আগে পরিচয়লাভ করেছেন, সেটা প্রকাশ করলেন না।

খুশি হলেন রেণো। কারখানার কোথাও এক টুকরো সুতোও পড়ে নাই, বয়লারগুলি তাঁতগুলি সব ঝকঝক করছে, কার্মীরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কলের মত কাজ করে যাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন রেণো, মলিনারি সব বুঝিয়ে দেয়, চৌধুরীরও হাসিমুখ, তার জন্যেই এখানে রেশমের কারখানা দাঁড়াতে পেরেছে, কলকাতা আপত্তি করেছিলো না দুমেলের উৎসাহিতে? স্রেফ হিংসুটে।

রেণোর এক পাশে রৌশন, অন্য পাশে রাবেয়া। মলিনারি ওদের মেয়েলি প্রশ্নগুলির খুব ধৈর্য সহকারে উত্তর দিচ্ছে, ওদের হাতে থোকা শাড়ি ও ছিটগুলো তুলে দেখতে দিচ্ছে। আঁচলা পাড় জমিনের এমন সুন্দর সুন্দর নক্সা সুতোনুটির বাজারেও দেখে নি ওরা, প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে। চৌধুরীর

বুক ফুলে ওঠে, বলেন, 'মঁশিয়ে গভর্ণর, ফরাসডাঙ্গী সুতোর শাড়ির খুব নাম আছে বাংলাদেশে, কিন্তু ফরাসডাঙ্গী এই সিল্কের নাম আরো ঢের বেশী ছড়াবে মনে হয়, ইংরেজদের সিল্কের কারবার আমরা ভোঁতা করে দেব।'

রেণো মৃদু মৃদু হাসেন, ফরাসী এলাকায় নানারকম শিল্প গড়ে উঠুক—তাইতো তিনি চান?

পরিদর্শন শেষ হলে মলিনারি গভর্ণরকে তিনরকম কামিজের কাপড় এবং মেয়েদের তিনখানা করে সুন্দর শাড়ি উপহার দিলেন। 'আমার কুটিরটি, পাশেই, একটু কফির বন্দোবস্ত করেছি, যদি আপনাদের অনুগ্রহ হয়।

বাইরে দেখে বোঝা যায় না, ভিতরে ঢুকে গভর্ণর এবং রৌশন অবাক হয়। রাবেয়ার অবশ্য দেখা আছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে চায় না।

'এটা আপনার থাকবার ঘর?'

'থাকা - শোয়া-লেখাপড়া-খাওয়া---সবই মাদাম। একা মানুষ,-দু'টো তিনটে ঘরে দরকার নেই।'

'খুব বড় ঘরটি তো? যথেষ্ট জায়গা পড়ে আছে এখনো, কী সুন্দর পর্দা-ঝালর দিয়ে সাজিয়েছেন, ঠিক ছবির মত। আচ্ছা, চেয়ারগুলোর গদী ও ঢাকনীর এই মোটা সিল্কও আপনার কারখানায় তৈরী?'

হ্যাঁ মাদাম। এর চাইতেও পুরু তৈরী করা যায়। যে-ফলের নক্সা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা এদেশের নয়, কিন্তু মঁশিয়ে গভর্ণর নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন।'

কফি শুরু হলে কথায় কথায় কৌলধাবার কথা উঠলো, তার কুটির খুব নিকটেই, বললো রৌশন।

অ্যালবার মলিনারিকে জায়গাটা বুঝিয়ে দিতেই সে বলে উঠলো, 'ওঃ, সেই পাগলটি?'

'বলছো পাগল?' রাগ হলো রৌশনের, 'পাগল নয় সিগনর, শক্তিধর সাধক।'

'বেশীর ভাগ ঘরের মধ্যেই বসে থাকে, নানারকম আবোল-তাবোল বকে শুনতে পাওয়া যায়, কদাচিৎ বার হয়, একবার মাত্র একপলক দেখেছিলাম, দেখতে জবরজঙ্গ, চোখ দু'টো পাগলের মত।'

'বেশীর ভাগই রাতদিন সমাধিতে থাকেন, সিগনর।'

মলিনারি 'সমাধি' কথাটা বুঝাতে পারে না, রৌশনের অনুরোধে রেণো বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু লোকটির সম্বন্ধে তাঁরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিষয়টি একটু শক্ত সিগনর। আপনার কাছে অবশ্য নয়। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই, বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্বীকার করবেন। চক্ষু দ্বারা আমরা দেখি, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করি, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করি, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শবোধ জন্মে কিন্তু ঐ পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই প্রথম ক্রিয়া হয় মনে, মনের সেই অনুভূতি সেই-সেই ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে আমাদের দর্শন করায়, শ্রবণ করায় আঘ্রাণ করায়।

'ঠিক বুঝলাম না, মঁশিয়ে গভর্ণর।' প্রশ্ন করে অ্যালবার।

'বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ প্রথমেই মনের উপর ক্রিয়া করে, মনই সেই সংযোগ অবিলম্বে গ্রহণ করে, তারপরে যেই চেতনার প্রতিক্রিয়া হয় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির উপরে, তখনই আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই, আস্বাদ পাই। মনের স্বাভাবিক অবস্থা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে কী দেখছি, কী শুনছি, কী স্পর্শ করছি, তা আমরা বুঝতে পারবো না, যেমন উন্মাদ, মৃগী রোগী অথবা যে অজ্ঞান হয়ে গেছে, সে দেখেও দেখতে পাবে না, শুনেও বুঝতে পারবে না, খাইয়ে দিলেও আস্বাদ বোধ করতে পারবে না। আবার ঠিক এই অবস্থাই হবে—যদি মনের বাহ্যিক ক্রিয়া রুদ্ধ করে কোনো একটি বিষয়ে গভীর নিবিষ্ট থাকা যায়। তখন মন ও সেই বিষয় এমন একত্ব লাভ করে যে, অন্য কিছুরই চেতনা থাকে না, বাইরের কোনো বস্তুই তার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। সাধন জগতে সেই অবস্থার নাম এদেশের হিন্দুরা বলে সমাধি, অর্থাৎ আরাধনার বস্তুতে সম্পূর্ণভাবে তন্ময় হয়ে যাওয়া, বাহ্য জ্ঞান তখন লোপ হয়ে যায়। মন তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ পরিত্যাগ করে অধ্যাত্ম জগতের অতীন্দ্রিয় ভূমিতে অবস্থান করে। সাধারণের চোখে মনে হবে এটা একটা সম্মোহিত অবস্থা।

মলিনারি খুব মনযোগ দিয়ে শুনছিল। 'মঁশিয়ে, আফ্রিকায় কিছুকাল ছিলাম, বুনোজাতরা গায়ে রঙচঙ মেখে, বাঘ-ভাল্লুকের দাঁত গলায় পরে, পালকের টুপী মাথায় বেঁধে ওদের উদ্ভট সব দেবতার খুশি করতে দল বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচতো, মুখে ফেনা উঠে যেতো, শেষে বেহুঁস হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতো, বাহ্যজ্ঞান অনেকক্ষণ থাকতো না। সেটাও সমাধি?'

'ওটা হলো নিকৃষ্ট পশুভাব, শারীরিক অবসাদের ফলে চৈতন্য লোপ,

ও-সময়টার কোনো স্মৃতি থাকে না; জ্ঞান ফিরে এলেই জঘন্য প্রবৃত্তিগুলি জেগে ওঠে। মাদাম রৌশন যে সমাধির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম শক্তির পূর্ণ সঞ্চার, তার স্মৃতি থাকে, সে-স্মৃতি পরম আনন্দময়। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের মোজেস, এলিজা ও ইসায়া প্রভৃতি সন্তদের সমাধিলব্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে, নিউ টেষ্টামেণ্টে সেণ্ট জন ও সেণ্টপলের অলৌকিক উপলব্ধির উল্লেখ আছে, কোরাণে আছে—মহম্মদ এরূপ একটি অতি মানসিক অবস্থায় দেবদূত গেব্রিয়েল কর্তৃক সপ্তম স্বর্গে নীত হন এবং আল্লার বাণী লিপিবদ্ধ করেন কোরাণে—যদিও তিনি একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন। বুদ্ধ সমাধি অবস্থায় সমস্ত অধ্যাত্মমণ্ডল ভ্রমণ করে এসেছিলেন বুদ্ধত্বলাভের সময়ে, জোরোষ্টারও সমাধিমগ্নকালে মহান ঈশ্বর আহুর মাজদার মুখ নিঃসৃত বাণী জেন্দাবেস্তায় লিপিবদ্ধ করে যান। এর কোনটিই হয়তো আপনার কাছে নতুন কথা নয়, কিন্তু অ্যালবার, তোমার কি ভাল লাগছে ?'

'এর কিছুই জানতাম না মঁশিয়ে গভর্ণর !' স্বীকার করে অ্যালবার।

'পিয়েরে জাহাজ চালাতে জানে, মিনার তৈরী করতে জানে, এসব হয়তো জানবার চেষ্টা করে নি কোনদিন।' রাবেয়ার বিদ্রূপে সবাই হেসে ওঠে, সে হাসিতে অ্যালবারও যোগ দেয়।

'যে বললো সে নিশ্চয়ই এসব আগেই জেনে বসে আছে।' উল্টে বিদ্রূপ করে অ্যালবার।

মলিনারি আবার প্রশ্ন করে, 'মঁশিয়ে গভর্ণর, ধর্মপ্রচারক মহামানবদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী রচনা হয়েছে সাধারণ লোকদের বিশ্বাস সৃষ্টি করবার জন্যে, এটা কী সত্য নয় ?'

'খুবই সত্য সিগনর, তবে যা তাঁদের নিজেদের মুখে শোনা গেছে তা অবিশ্বাস করবার কারণ দেখি না, যা অন্যলোকে অর্থাৎ ভক্তরা রটিয়েছে, তার মধ্যে অবশ্যই অনেক অতিরঞ্জন আছে। তেবে দেখুন, সক্রেটিস, প্লেটো, প্লটিনাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক, শাদী, হাফিজ জালালুদ্দীন প্রভৃতি ইরাণের ঋষি-কবিরা, আমাদের খৃষ্টানদের সেণ্ট টেরেসা, সেণ্ট জেভিয়ার, সেণ্ট ফ্রান্সিসের কথাও তো এই ভাবাবিষ্ট অবস্থা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।'

মলিনারি পুনরায় প্রশ্ন করে, 'এমনো তো হতে পারে যে, মস্তিষ্কের সাময়িক দুর্বলতায় অনেক অবাস্তব দর্শন ও শ্রবণ সম্ভব হতে পারে। হয়তো পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করবে যে, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং একই বিষয় সর্বদা চিন্তন ও মনন শরীরের রক্তধারা ও গ্রন্থিকোষগুলিতে এমন কোনো পরিবর্তন আনে, যাতে সেই সময়ে স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থায় বাধা পড়ে। ধরুন, ছোট একটি বদ্ধ স্থানে দীর্ঘকাল অনশন বা অর্ধাহারে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনার অভাবে, একটিমাত্র বস্তুর ধ্যানে মস্তিষ্কের কি রক্তাল্পতা ঘটবে না ? চোখের কি দৃষ্টিবিভ্রম হবে না ? অবচেতন মনের ভাবই কি সামনে বাস্তবের ছদ্মবেশে প্রতিভাত হবে না ? সাধনা ছাড়াও যে অপার্থিব দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি হতে পারে, তা আমি দেখেছি আফ্রিকার ম্যাসাজাইদের ভিতরে যখন ছিলাম। ওদের একরকম গাছ আছে, ফুল হয় না অথচ ফুলগাছের মত, শিকড় বেটে জলে গুলে খেয়ে হাত-পা গুটিয়ে জনকয়েক বসে, আমিও বসেছি কয়েকবার। জ্ঞান পুরোপুরিই থাকতো, কিন্তু নানা রঙের অনেক দৃশ্য ও মূর্তি দেখতে পেতাম, নানারকম সুর ও কথা শুনতে পেতাম, মনে হতো যে, আনন্দের ঢেউয়ে ভেসে চলেছি। ওদের ধারণা, ঐ ওষুধের গুণে আত্মা দেহ ছেড়ে স্বর্গরাজ্য দেখে আসে, দেবদেবীরা এসে দেখা দেন, অপ্সরারা গান গায়। গাছটার নাম 'খুয়া', মঁশিয়ে।'

'বিজ্ঞানীরা বলেন, মেসকালীন টিউবারোসা ফ্যাণ্টাসিয়া। সোজা কথায়, মেসকালীন। এদেশেও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী গাঁজা খেয়ে ধ্যান করে, কিন্তু গাঁজা ঐ মেসকালীনের কাছে দাঁড়াতেই পারে না।'

'গাঁজা ? মানে আপনি কি ক্যানাবিস ইণ্ডিকার কথা বলছেন,—যার ধূমপান করা হয় ?'

'হ্যাঁ সিগনর, এটা কেবল এদেশেই জন্মে, কিন্তু মেসকালীন আফ্রিকা ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও ব্রেজিলেও পাওয়া গেছে, আজটেক্ ও ইঙ্কা—এ-দু'টো বহু পুরোনো জাত, লুপ্ত হয়ে গেছে, ওরা খুব ভক্তি করে খেতো এটা। নরবলির পরে, ওদের বিশ্বাস ছিল, স্বর্গের দেবতারা ওদের পূর্বপুরুষদের পুজোয় খুশি হয়ে এটা উপহার পাঠিয়েছিলেন। রঙ-বেরঙের মূর্তিগুলি সেই দেবতাদের মূর্তি।'

চৌধুরী বলে ওঠেন, 'আমাদের স্বর্গের দেব-দেবীরাও কেউ কেউ শুভ্রবর্ণ কেউ কেউ স্বর্ণবর্ণ, কেউ কেউ শ্যামবর্ণ। সেখানে নানা রঙের ফুল, বিচিত্র দৃশ্য, মন্দাকিনীর জল স্ফটিকেরমত স্বচ্ছ।'

রেণো বলেন, 'এ ধারণা শুধু হিন্দুদের নয়, সব জাতের মানুষের কল্পনাতেই তাদের স্বর্গ বিচিত্র রঙে রঙীন। এই জগৎটার চেয়ে ঐ অচেনা-অজানা জগৎটা যে অনেক সুন্দর, অনেক সুখের, অনেক শান্তির—এই আশ্বাসেরও একটা প্রয়োজন ছিল মনস্তত্ত্বের দিক থেকে। মানুষকে সৎপথে থেকে পুণ্যার্জনে প্রেরণা দেবার জন্যে এটার উদ্ভব হয়েছিলো মনে হয়। কেল্টিক জাতির রূপকথায়, বাইবেলে, ইডেন উদ্যানের বর্ণনায়, মুসলমানদের বেহেস্তের বর্ণনায় সেই চিরবসন্তলোকের সুখবিলাসের আহ্বান রয়েছে। সদা সুমিষ্ট সঙ্গীত, সুরভিত বায়ু, সুগন্ধ পুষ্পিত উদ্যান, সুমিষ্ট নদী প্রস্রবণ, নৃত্যগীত, পান-ভোজনের বর্ণনা ইটালী, গ্রীস, মিশর, আরব, ভারত, চীন, ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত প্রাক-সভ্য জগতের

পৌরাণিক কাহিনীতেই আমরা দেখতে পাই। গথিক চার্চ, চীনের প্যাগোডা, রোম, গ্রীসের ও ভারতের মন্দিরে শ্বেত পাথর, রঙীন কাঁচ, সোনা-রূপা-মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়িও জনচিত্তে স্বর্গ রাজ্যের আকর্ষণীয়তার আভাস দেবার জন্যেই উদ্ভাবিত হয়েছিলো মনে হয়। ঈশ্বর যেখানে বাস করেন, সে রাজ্য অতি সুন্দর। সেহেতু তার মর্ত্যলোকের আবাসস্থলটিও সুন্দরভাবে তৈরী করতে হবে, এটাই ছিল প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা। অথচ মূর্তিগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁরা এই চঞ্চল মনুষ্য লোকের বিপরীত ধর্মী প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভাব। দর্শকরা বাইরে কারুকার্য দেখে এলো পরম বিস্ময়ে, মূর্তির কাছে এসে হল শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অভিভূত। আমাদের ম্যাডোনা, ইজিপ্টের অমন ও আইসিস, রোমের জুপিটার, বাইজেণ্টিয়ার প্যান্টোক্রেটর, ভারতের চক্রপাণি, পূর্ব এশিয়ার বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ, চীনের লোহান, কোপানের ষ্টেলস্ ঐ শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্যের কয়েকটি মাত্র নিদর্শন। আপনি তো ইজিপ্টেও গিয়েছিলেন সিগনর, সে-দেশই বা কিরকম লাগলো? এদেশই বা কিরকম লাগছে বলুন?'

'ইজিপ্ট ভালোই লেগেছিলো, এদেশ আরো ভালো লাগছে, কোথায় যেন একটা যোগসূত্র ছিল প্রাচীনকালে, এ-দু'টি প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মনে হয়, কারণ অনেক বিষয়ে মিল আছে দেখছি।

'বোধ হয় এ মিলের যোগসূত্র ছিল মুসলমানরা, আরব থেকে তারা পূব দেশগুলিতে যেমন ছড়িয়ে পড়েছিলো তেমনি পশ্চিমে। ইজিপ্ট তো এখন পুরোপুরিই মুসলমান। মন্তব্য করে রৌশন।

'এটা তোমার ভুল', বলেন রেণো, 'বুদ্ধের জাতক কাহিনীর মধ্যে 'বভেরু' নামে একটি দেশের উল্লেখ আছে, সেটা সম্ভবত হিব্রুদের দেশ, শুধু উচ্চারণের তফাৎ। বুদ্ধজন্মের পাঁচশো বছর পরে আমাদের খৃষ্টের জন্ম, খৃষ্টের জন্মের আরো পাঁচশো বছর পরে তোমাদের মহম্মদের জন্ম, অর্থাৎ মুসলমান ধর্মের সূচনা। ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের যে-সব জাতের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বেশী ছিল, তাদের সর্বপ্রধান ছিল হিব্রু অর্থাৎ ইহুদীরা। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে বিখ্যাত রাজা সলোমনের সম্বন্ধে লেখা আছে, তাঁর দরবারের শোভা করতো বহু ভারতীয় সামগ্রী, তার জন্য কপি, ময়ূর, চন্দনকাঠ, হাতির দাঁত, পশম, রেশম, মণিমাণিক্য যেতো এদেশ থেকে। আরেকজন রাজার কথাও লেখা আছে, হিরাম, তাঁর জন্য হরেকরকম দ্রব্য যেতো এদেশ থেকে। গ্রীক মহাকবি হোমার-এর কাব্যে আছে স্পার্টার অধিপতি মেনেলিয়াসের শয়নকক্ষে ভারতে তৈরী হাতির দাঁতের কারুকার্যখচিত পালঙ্ক ছিল। ভারত থেকে জাহাজ যেত পারস্য উপসাগর হয়ে, লোহিতসাগর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে, সেখান থেকে ফিনিসিয়ানরা তাদের জাহাজে মাল চালান করতো গ্রীস, রোম, ইজিপ্টে। বৈদিক যুগে হিন্দুরা যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়, সমুদ্রের পুজো করে জাহাজ ছাড়তো, সমুদ্র পথের উপর শুল্কের কথাও পাওয়া যায়। পাঠান, তুর্কী প্রভৃতি মুসলমানদের আসবার প্রায় বারো - তেরশো বছর আগে গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এদেশে এসেছিলেন ভারতের ধনরত্নের ও সভ্যতার প্রসিদ্ধির কাহিনী শুনে এবং হিন্দু ও হিন্দুধর্মকে ভাল করে জানবার জন্যে সঙ্গে এনেছিলেন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গ্রীক পণ্ডিতকে। আপনি কি কি বিষয়ে মিল দেখতে পেয়েছেন ভারত ও ইজিপ্টের মধ্যে, সিগনর?'

'ইজিপ্টের নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে এই বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীদের চেহারার মিল গায়ের রঙ, দৈর্ঘ্য, মুখের ছাঁচ, মাথার চুল। আমার কামীনদের কারু কারুর নাম এবং তাদের ছেলে-মেয়ের নাম—যেমন, বন্য, বেজা, নাড়ু, হাবু, ভুতো, নন্দু, বেচা, কালা, টেপী, ক্ষেন্তী, পানু, টুটু, বুচী —ইজিপ্টেও শুনেছি। মাস দু'য়েক হলো এণ্টনী নামে একটা পর্তুগীজ ছোকরার সঙ্গে আমার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে, অনেক মন্দিরও ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখিয়েছে সে, ধর্ম বিষয়েও আশ্চর্য মিল দেখতে পাচ্ছি। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আশ্চর্য জ্ঞান আছে তার, আমিও বেশ ভালই পর্তুগীজ ভাষা বলতে পারি, তাই বেশ জমে উঠেছিলো, হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে খিরেটিতে ঘর বেঁধেছিলো, আজ দুপুরে কে বা কারা যেন সে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়েছে।'

রেণোর মনে পড়লো, পথে দেখা সেই খালি পায়ে খালি গায়ে ধুতিপরা শ্বেতাঙ্গ যুবক ও অবগুণ্ঠনবতী বাঙ্গালী মেয়েটিকে। খিরেটি ফরাসী এলাকা, তাঁর অধীনে, ক্রুদ্ধ হলেন। শ্বেতাঙ্গটি অভিযোগ না জানিয়েই হয়তো চলে গেল, কিন্তু অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার আইনের কর্তব্য, তদন্ত করাতে হবে।

'মঁশিয়ে গভর্ণর, জানবার কৌতূহল আমার বরাবরই একটু বেশী, একা একাই ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছি থীব্স, মেমফিস্, কার্ণাক, হেলিওপলি, লাক্সরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন মিশরীয়দের দেব-দেবী ও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাংলার হিন্দুদের দেব-দেবী ও ধর্মবিশ্বাসের আশ্চর্য সাদৃশ্য।'

'দু-একটা উদাহরণ দেখাতে পারেন?'

'ওদের সূর্য্যদেবতা সৃষ্টি করেছেন জীবন, এদের ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন জীব দু'জনেই প্রকাশিত হয়েছিলেন পদ্ম থেকে। দু'দেশেরই মন্দিরগুলির মুখ পূব দিকে, যেদিক দিয়ে সূর্য্য উদয় হয়। এখানে বিষ্ণুর হাতে চক্র ওখানে 'রা' নামক দেবতার হাতেও চক্র জীবনের প্রতীক ওখানের দেবী 'সেট' এবং এখানকার কালী মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী আর কোনো দেশেই মৃত্যুর কোনো দেবতা বা দেবী নেই। এদেশের দে দেবীর বাহন হিসেবে অনেকরক পশুও পূজা পায়, ওদেশেও তাই, তবে সেখানে সর্পের সম্মান খুব বেশী প্রত্যেক মন্দিরে সাপের মূর্তি খোদা

আছে দেখেছি, প্রাচীন 'ফ্যারাও' নৃপতিরা দেবতার অংশে জন্ম নিয়েছেন এই বিশ্বাসে মাথার মুকুটে সর্পমূর্তি ধারণ করতেন। এখানে হিন্দুরা গঙ্গাকে দেবী হিসেবে ভক্তি করে, ঠিক সেই রকম ভক্তি করতো প্রাচীন মিশরীয়রা নাইল নদীকে, নাইল নদীর দেবী 'হাপি'কে। এখানকার শিবের বাহন ষাঁড়, নন্দীকে এবং রামের অনুচর হনুমানকে শ্রদ্ধা করা হয়, ওখানে 'আইসিস' ও 'অসিরিসের' কিঙ্কর 'অপিস্' ও 'সিনোফেলাস'কে প্রাচীন মিশরীয়রা ফলমূল উৎসর্গ করতো, অপিস্ একটি প্রকাণ্ড ষাঁড়, সিনোফেলাস বানর জাতীয়। এখানকার ব্রাহ্মণরা তিনবার স্নান করে দিনে, মুসলমানধর্মের প্লাবন আসবার আগে ওখানেও 'হায়ারোফ্যাণ্টরা' তিনবার চান করতো, হায়ারোফ্যাণ্টরা ছিল পুরোহিত জাতীয়, ওরা বোধ হয় এদেশের যোগ বা তন্ত্র মতের মত কোনো একরকম সাধনা করতো এবং বাইরের লোকের সংস্পর্শে অশুচি হবার প্রতিকারে নদীর জলে স্নানে পবিত্র হবার চেষ্টা করতো সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়। শুনেছি মোজেস ছিলেন আধা-মিশরীয় আধা-ইহুদী, আগে নাম ছিল সারিপ্‌স্ হিলিওপলির মন্দিরে হায়ারোফ্যাণ্টদের সঙ্গে বহু বছর গূঢ় সাধনা করে সত্ত্ব লাভ করলে ইহুদীদের ঈশ্বর জিহোভা দ্বারা আদিষ্ট হয়ে ইহুদীধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। ওল্ড টেষ্টামেন্টে মোজেস যা-যা লিখে গিয়েছেন তার অধিকাংশই প্রাচীন ইজিপ্টের ধর্মশাস্ত্র থেকে নেওয়া, কিন্তু তার পরবর্তী পণ্ডিতেরা তার অনেক অর্থই ঠিক ধরতে পারেন নি। বাংলা দেশেও অনেক আচার-নিয়ম, খাবার জিনিষের বাছ-বাছাই দেখা যায় ইহুদীদের মতন, কিন্তু মূল সূত্রটি খুঁজতে গেলে দেখা যাবে ইজিপ্টে। এণ্টনীর কাছে শুনেছি এ অঞ্চলে আর্যদের বৈদিক রীতিনীতির ছাপ বেশী লাগে নি। আমার কামীনদের মধ্যে একরকম চিকিৎসা আছে 'টোটকা', শুধু গাছড়ার মূল, পাতা বা লতা দিয়ে। প্রাচীন ইজিপ্টেও রোগ আরাম করে দেবার জন্যে 'টোট' নামে এক দেবতার কাছে প্রার্থনা বা মানত করা হতো। আবার তারাও জ্যামিতি, বীজগণিত, গ্রহবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র শিখেছিল ভারতের কাছ থেকে। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় এই আদান-প্রদান হয়েছিল কেমন করে।'

একটা কিছু নতুন বিষয় পেলে গভর্ণর রেণোর খেয়াল থাকে না অন্য কোনো দিকে, রৌশনের মনে করিয়ে দিতে হলো কফিপর্ব বহুক্ষণ শেষ হয়েছে, দিনের আলো পড়ে আসছে।

'আজুন না কাল দুপুরে আমার ওখানে, সিগনর, খেতে খেতে আরো কথা হবে, প্রাচীন ইজিপ্টের হায়ারো-গ্লিফিক্‌স্ ও হায়ারোফ্যাণ্টদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে?'

'আপনার নিমন্ত্রণ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম, মঁশিয়ে গভর্ণর। পিরামিডের মধ্যে গোপনে এক রাত্রি কাটিয়েছিলাম, অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়লো, কাল তাও বলবো।'

গাড়ি কারখানার ফটকে ছিল। খেতে খেতে রৌশন প্রশ্ন করলো মলিনারিকে, 'কৌলবাবাকে সাধারণ লোক মনে করবেন না, কোনো দিন খুব কাছ থেকে দেখেছেন?'

'না মাদাম, বলেছি তো মাত্র একদিনই এক পলক দেখেছিলেম, উনি একটি আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দিলেন ঘরে ঢুকবার আগে। কেন বুঝলাম না।'

'আকাশে মেঘ ছিল?

'না, ফুটফুটে নীল আকাশ।'

'তারপরে কোনো ঘটনা ঘটেছে?'

'না।'

'ভেবে দেখুন খুব ভাল করে, কাল বলবেন।'

[ক্রমশঃ।

জৈব রসায়নের একটি নাম

এল-এস-ডি

১৯৪৩ সাল। সুইজারল্যাণ্ডে ভোর হচ্ছে। প্রতিদিনের মত লোকজন জেগে উঠছে, যে যার কাজে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক হফম্যানও চলেছেন তাঁর ল্যাবোরেটরীর দিকে। তিনি লাইসারজিক অ্যাসিডের উপর গবেষণা করছেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। গম্ভীর চিন্তা মিশ্রিত মুখে ল্যাবোরেটরীতে এসে প্রবেশ করেন তিনি। সহ-বৈজ্ঞানিকেরা আগেই ল্যাবোরেটরীতে পৌঁছে গেছেন। তাঁরা হফম্যানকে স্বাগত জানালেন। আজ বৈজ্ঞানিক হফম্যান এক সদ্য প্রস্তুত বস্তুর উপর পরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাঁর নবাবিষ্কৃত বস্তুটির কোন স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, বর্ণ নেই, এটি এক প্রকার তরল পদার্থ। কি করে বস্তুটির সঙ্গে পরিচিত হবেন, তাই নিয়ে হফম্যান ভাবছেন। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন, নিজের উপরেই পরীক্ষা করবেন। বৈজ্ঞানিকের মন হঠাৎ অবিমৃষ্যকারী হয়ে উঠল। অজানা বস্তু গ্রহণের ফলে, ফল কি হতে পারে, তা নিয়ে হফম্যান একটুও চিন্তা করলেন না। সহ-বৈজ্ঞানিকদের সামনে রেখে, হফম্যান বস্তুটি মুখে দিলেন। কয়েক মিনিট মাত্র---অজানা বস্তুটি হফম্যানের মধ্যে ক্রিয়া শুরু করে দিল। হফম্যান যেন কেমন হয়ে গেলেন। নিজেকে যেন কোথায় হারিয়ে ফেললেন তিনি। সহ-বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে ডাকছেন, কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছেন না, অথচ তিনি নিজে যে কথাগুলো বলছেন বা বলতে চাইছেন সে কথাগুলো কি রকম অস্বাভাবিক ধরণের। বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়েন হফম্যানের সঙ্গীরা। একি জিনিষ আবিষ্কার করেছেন হফম্যান। একি মনুষ্যসমাজের কাছে অভিশাপ না আশীর্বাদ? যাই হোক, হফম্যানকে তাঁরা গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। বাড়ি গিয়েও ঐ একই অবস্থা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা তো ভয়ে বিহ্বল। ডাক্তার এলেন, কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না হফম্যান নিজেই ভেবে পান না, ঐ অজানা বস্তু গ্রহণের ফলে তাঁর এরকম অবস্থা হল কেন? অনেকক্ষণ পরে তিনি নিজেকে যেন সুস্থ বোধ করলেন।

পরের দিন আবার ল্যাবোরেটরীতে বৈজ্ঞানিকের মন, আগের দিনের সেই অজানা বস্তুটিকে পুনর্বার গ্রহণ করলেন। আশ্চর্য! আবার তাঁর পূর্বের মতো অবস্থা হলো। যেন কোনো এক অজ্ঞাত লোকে বিচরণ করছেন তিনি, একটা ছোট পেন্সিলকে তাঁর মাইল খানেক লম্বা মনে হচ্ছে। সবই আশ্চর্য ঠেকে তাঁর কাছে। তারপর, সুস্থ অবস্থায় ঐ বস্তুটির ধর্ম অনুধাবন করে হফম্যান

সঞ্জিতকুমার সরকার

বুঝতে পারলেন যে, তিনি জৈব রসায়নে এক নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছেন। তিনি ঐ আশ্চর্য সম্মোহিনী শক্তির অধিকারী বস্তুটির নাম দিলেন লাই-সারজিক অ্যাসিড ডাইথাইলামাইড, সংক্ষেপে বলা হয় এল-এস-ডি। এল-এস ডি, লাইসারজিক অ্যাসিড থেকে তৈরী হয়েছিল। লাইসারজিক অ্যাসিডের সহিত দুটো ইথাইল গ্রুপ (C_2H_5) জড়িত থাকার জন্য, ওটাকে লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইথাইলামাইড বলে। এল-এস-ডি জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এল-এস-ডির কার্যকারিতা বহুবিচিত্র।

এল-এস-ডি গ্রহণের ফলে দেহে ও মনে এক বিচিত্র অনুভূতি পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা নানাবিধ গাঁজা-গাছড়া থেকে তাঁদের নেশার জিনিস প্রস্তুত করতেন। ঐ সমস্ত নেশার জিনিষ থেকে তাঁরা এক অপূর্ব ধর্মীয় অনুভূতি লাভ করতেন। প্রাচীনকালে আর্যরা সোমরস পান করতেন। শুধু আর্যরা কেন, পৃথিবীর আরও নানা দেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষ নানাবিধ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করত। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে চায়, তাই সে একটা নতুন অনুভূতি, একটা নতুন শক্তি চায়। আর সেই জন্যই মানু মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষ তার মনের শান্তি ও শক্তি ফিরে পেলেও শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এল-এস-ডি এই মাদকদ্রব্যের পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু এল-এস-ডির মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ বর্তমান আছে, যা সহজেই বুদ্ধিমান মানুষকে আকৃষ্ট করে।

বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, এল-এস-ডি গ্রহণের ফলে মানুষের সৃজনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এল-এস-ডি ব্যবহারে মানুষের মন বহু বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হয়। শুধু তাই নয়, এল-এস-ডি মানুষের মনে সুপ্ত স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করে তোলে। মানসিক রোগীদের কাছে এটি একটি ফলপ্রদ ওষুধ। অন্তত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে তাই দেখা গেছে। মানুষের অবচেতন মনের বিকাশ সাধনের জন্য এল-এস-ডি'কে কাজে লাগানো হয়। তাই এল-এস-ডি মানুষের কাছে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ। কিন্তু একটি জৈব রাসায়নিক [illegible] কি [illegible] এত আশ্চর্যজনক কাজ

করে, তা চিন্তার বিষয়। বিশ্বের রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এল-এস-ডি সম্পর্কে আশান্বিত। কেন-না এল-এস-ডি'র ওপর আরও গবেষণা করলে, মানুষের কাছে হয়ত এক নতুন দুয়ার খুলে যাবে।

এল-এস-ডি'র কয়েকটি অশুভ দিকও রয়েছে। এল-এস-ডি গ্রহণের ফলে, মানুষের জনিতৃ কোষের (Germ cell) ক্রোমোসোমের ক্ষতি হয়। এল-এস-ডি ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত জিন (gene) গুলি ধর্ম পাল্টে দেয়। তার ফলে অনেক সময় দেখা যায়, সদ্যোজাত মানবসন্তানের দেহে আশ্চর্যজনক আঙ্গিক অস্বাভাবিকত্ব। তা'ছাড়া বারংবার এল-এস-ডি গ্রহণের ফলে মানুষের মন বাস্তব জগত থেকে অনেক দূরে চলে যায়। তাই সেই মন নিয়ে মানুষ বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। তাই এল-এস-ডি'র অপকারিতা বৈজ্ঞানিক সমাজ বহু আলোচ্য বিষয়ের একটি।

এল-এস-ডি নামটি আমাদের দেশে এখনও অনেকের কাছে অপরিচিত। কারণ, এটি আমাদের দেশে এখনও আসে নি। এল-এস-ডি আমাদের দেশে এলে, আমাদের দেশের জনসাধারণ একে কিভাবে নেবেন, তা চিন্তার বিষয়। তবে এল-এস-ডি আমেরিকাতে একটি আলোড়ন তুলেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আমেরিকায় যে সমস্ত হিপিদের কথা শোনা যায়, তারা যে এল-এস-ডি'র-ই ফলশ্রুতি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রমাগত এল-এস-ডি ব্যবহারের ফলে মানুষ তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং শারীরিক দিক দিয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আমেরিকাতে এল-এস-ডি একটি বহু-বিতর্কিত নাম। সমগ্র মানবসমাজের কাছে এল-এস-ডি'র আবেদন অনেকখানি। সেই আবেদনকে যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে কাজে নিয়োগ করতে পারি, তবেই এল-এস-ডি আমাদের কাছে মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে।

হাসান আঁতকে ওঠে। বুকের মধ্যে যেন কেউ হাতুড়ী পিটতে থাকে। আর এক বিন্দুও দাঁড়ায় না। সামান্য পাঁচ মিনিটের পথ পার হবার জন্য পায়ের জোরেই দৌড় দেয়। অন্ধকার রাত। একবার একটা গাছের শিকড়ে হোঁচট খেল। পড়তে পড়তে সামলে নিল। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা কট্ কট্ করতে থাকে। তবুও হাসান থামে না। একেবারে বাড়ির সদরে এসে থামে। ঠেকানো আগড়টা ঠেলে ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে।

হাসানের মায়ের চোখে ঘুম ছিল না। বাড়িতে সে একা। বউও বুঝি বাপের বাড়ি গেছে। সাত-পাঁচ ভেবে হাসানের ধারালো গাছ-কাটারীটা বুড়ী বালিসের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছিল। আগড় ঠেলার শব্দে চট্ করে কাটারীটার বাঁটে হাত রাখে। ভাবে হয়ত ছ্যাঁচড়া চোর। তারপরই হাসান ডাক দেয়, 'ও মা, মা গো!' বুড়ী মা অবাক। ভাবে, সে কি স্বপ্ন দেখছে, না কি সত্যি! হাসান একেবারে মায়ের কাছে এসে বলে, 'কে নাকি বলেচে, মুই মরে গেচি?'

'আয়, আয় বাবা, মোর কোলে আয়। ঐ ওলাউঠো শাদী আর জাল্লাদ

[৯৭৫ পৃষ্ঠার পর]

তো বলে গ্যালো।' বুড়ী যেন হাসানকে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বুড়ী কাঁদবে, না হাসবে ভেবেই উঠতে পারে না। কেবলি হাসানের মাথায়, পিটে, বুকে হাত বুলাতে থাকে।

হাসান তার আনন্দ সংবাদ জানায়। বলে, 'জানিস মা, ই বচরে অনেক মাচ পড়েচে। আর এই দেকো আমি একটা মড়ার গা থিকে গয়না পেইচি।'

বুড়ী মা আনন্দে হাত বাড়িয়ে দেয়, 'কই র‍্যা বাবা?'

হাসান তার ভাগে পাওয়া ছ' গাছা চুড়ি, আর কোমরের গোট্-হারটা মায়ের হাতে তুলে দেয়।

মায়ের চোখ দুটো যেন চক্চক করতে থাকে। হাসান মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে—মায়ের চোখ দু'টো যেন জ্বল-জ্বল করছে। বুঝতে পারে আনন্দে মা কেঁদে ফেলেছে।

বুড়ী গোট্-হারটা নাড়তে নাড়তে আবার ডাক ছেড়ে কেঁদে ফেলে—'ওলো ও মুকপুড়ী, তা হালে তুই তোর বাপের বাড়ি যাসনি। মোর ছাবালের এ কি সব্বনাশ করলি লো।' হাসান অবাক। মাকে বলে, 'ও মা, পীরবানু বুঝি নেই এখেনে?' 'না রে না। মুখপুড়ী যে বলল বাপের বাড়ি যেচি মুই।' বলতে বলতে মাটির দিকে তাকিয়ে আরও মাটিতে ঝুঁকে পড়ে কাঁদতে থাকে। হাসানও কেঁদে ফেলে। মায়ের মুখটা ধরে বলে, 'কি হয়েচে ভালো করে বল না হারামী!'

'ই সব গয়না পীরবানুরই।'

পীরবানুর শুনে বুড়ী মা'র হাত থেকে গোটটা কেড়ে নিয়ে টেনে ফেলে দেয় উঠানে। জোরে কেঁদে ওঠে, 'ওগো, আমার ই কি সব্বনাশ হোল গো। শ্যাষে এই মোর নসিবে ছ্যালো?' গভীর রাতেও হাসানের চিৎকার পাড়ায় ঘুমিয়ে থাকা ছেলে-বুড়োর কানে পৌছায়। অনেকেই আসে ছুটে। কারও হাতে লণ্ঠন, আবার কারও হাতে ল্যাম্প।

হাসানকে শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসান শান্ত হয় না। সে যেন ছেলে-মানুষের মতো ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে।

বুড়ীও থামে না। সে তার আল্লার কাছে জানায়—মুই যেদি না গাল দিতুম বউ হয়ত বাড়িতেই থাকতো। আল্লা তুমি কিগো! মোর সোনার সংসার এমন করে ভেঙে দিলে!

বাকখাই

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এউরিপিদেস্

এই নূতন দেবতা,---যাঁকে তুমি করছ উপহাস,
সমস্ত হেল্লাসে এমন প্রাধান্য তাঁর বিধির বিধান
পূর্ণ প্রকাশে যার অসমর্থ আমার ভাষা। শোন হে যুবক!
দুটি শক্তি আছে, মানব-ব্যাপারে যারা পরম-নিয়ন্তা;
প্রথম হলেন পৃথ্বী-দেবী দেমেতের্, যে নামেই খুসি
ডাক তুমি তাঁকে;---অন্নদাত্রী তিনি মানবের।
দ্বিতীয় হলেন সেমেলের পুত্র এই দিওনুসস্;
অন্নেরই প্রতিরূপ অনুগ্রহ যাঁর,
প্রবর্তিত করেছেন তিনি পান-অনুষ্ঠান মানবসমাজে।
দ্রাক্ষাগুচ্ছ হতে নিষ্কাশিত রসধারা;
মানবকে শুধু আকণ্ঠ পান করতে হয় সেই সুধা,
সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায় অতৃপ্ত মানব জাতির;
প্রতিটি দিনের গ্লানি নিদ্রা ডুবিয়ে দেয় বিস্মৃতির তলে;
ক্লান্ত জীবনের এই হল একমাত্র রসায়ন।
নিজে দেবতা দিওনুসস্; পাত্রে ঢেলে
তাঁকেই আবার নিবেদন করা হয় দেবতার কাছে;
তাঁরই মাধ্যমে যেন মানব-জাতি পায় দেব-অনুগ্রহ।

নিবদ্ধ ছিলেন তিনি জেয়ুসের উরুদেশে;---
তুমি পরিহাস করছ এই পুরাণ-কাহিনী নিয়ে।
শোন তুমি,---আমি বলছি সত্য যেটুকু কাহিনীর মাঝে।
বজ্রের আগুন থেকে সরিয়ে শিশু দিওনুসস্‌কে
দেবতার মতই ওলুম্পোসে নিয়ে আসেন জেয়ুস্।
হেরা চেয়েছিলেন ফেলে দিতে তাঁকে স্বর্গ থেকে,---
বুঝতেই পারছ,---তাঁকে বাধা দিতে জেয়ুস্ বার করলেন
এক উপায়।

পৃথিবীর আবরণ ঐ আকাশের একটুকরো ভেঙে নিয়ে
গড়লেন এক শিশুর প্রতিমা, দিলেন তাকে ন্যাস-রূপে
হেরার কাছে ঈর্ষা তাঁর যাতে হয় প্রশমিত।
আর সত্য দিওনুসস্-কে দিলেন অন্যের কাছে লালন-
পালনের জন্য।

প্রাচীন ভাষার 'ন্যাস' শব্দটির সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে
আমাদের ভাষার 'উরু' শব্দের। কালক্রমে
প্রাচীন শব্দটি ভুলে গেল লোকে; জেয়ুসের
'ন্যাসে'র বদলে জেয়ুসের 'উরু' রক্ষা করেছিল
দিওনুসস্-কে-এই কাহিনী প্রচলিত হয়ে গেল লোকমুখে।

কারণ, দিওনুসসের প্রতিমাই যে দিয়েছিলেন জেয়ুস্
হেরাকে ন্যাস-রূপে।
অপ্রতিহত-প্রজ্ঞ এই দেবতা;
বাক্‌খস্-সম্পর্কিত এই আনন্দ ও উন্মাদনার মাঝে
বিশেষভাবে রয়েছে অনাগত বিষয় দর্শনের তত্ত্ব।
মানুষের দেহে যদি হয় দিওনুসসের আবেশ
তাহলে তাকে তিনি দেন ভবিষ্যদ্-ভাষণ-ক্ষমতা।
যুদ্ধের দেবতা আরেস, তাঁর কৃত্যেরও কিছু অংশ
এই দেবতার। এমন ঘটনাও ঘটেছে কখনো কখনো
যে একটা বর্শাও হয়নি উদ্যত, অথচ রণসাজে সজ্জিত
ব্যূহবদ্ধ বাহিনী ভয়ে করেছে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।
দিওনুসসের দেওয়া এও এক ধরনের মত্ততা।
হ্যাঁ,---এমন দিনও আসবে
যখন দেখবে তুমি তাঁকে হেল্লাসে সর্বজন-পূজিত দেবতা-
রূপে,

দেখবে তুমি তাঁকে জ্বলন্ত মশালে ঘেরা
দ্বি-শৃঙ্গ পর্বতের উৎসঙ্গে ঐ দেল্‌ফির বেদিতে দাঁড়িয়ে
সঞ্চালন করছেন, আস্ফালন করছেন
তিনি তাঁর বাক্‌খসের উৎসব-যষ্টি।
শোন তুমি পেন্‌থেয়ুস্,---
বাহুবলে বিশ্বাস তোমার; কিন্তু বাহুবল নয়
মানব-ব্যাপারের নিয়ন্তা। এই ছাড়া অন্যরূপ চিন্তা
যদি করে থাক তুমি,---সাবধান, নিজের বিপরীত বুদ্ধিকে
প্রজ্ঞা বলে ভুল করো না। স্বাগত জানাও দিওনুসস্-কে
খেবেসে,
অর্ঘ্যধারা কর নিবেদন, মাল্যবেষ্টিত কর আপন মস্তক,
তাঁর ক্রিয়া-কলাপের কর অনুষ্ঠান।
বাধ্য করেন না দিওনুসস্ নারীদের বাসনা দমন করতে।
আত্মসংযম নির্ভর করে সমস্ত ব্যাপারেই
আমাদের নিজ প্রকৃতির উপর।
অন্তরে পবিত্রা যে নারী, বাক্‌খসের অনুষ্ঠানে
কোন আশঙ্কা নাই তার;---এ কথা তোমারও ভেবে
দেখা উচিত।

আরও ভেবে দেখ,---নগরের সিংহদ্বারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে
জনতা যখন দেয় পেন্‌থেয়ুসের জয়ধ্বনি,
আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে অন্তর তোমার;

আমার বিশ্বাস দিওনুসস্-ও সানন্দেই
গ্রহণ করেন শ্রদ্ধা-নিবেদন।
তাই, দুই বৃদ্ধ আমি ও কাদ্‌মস্, যাদের
তুমি করছ উপহাস; আইভির মালা পরে
আমরা চলেছি নৃত্যে যোগ দিতে, এ কর্তব্য আমাদের,
তোমার কোন কথা পারবে না আমাকে দেবদ্বেষী করতে।
অত্যন্ত করুণা হয়,---ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর তোমার,
কোন ঔষধ নাই তার আরোগ্যের।
তবুও,---তোমার এই বাতুলতার আছে কি প্রতিকার।

কোরাস্। তেইরেসিয়াস্!---ভাষণে তোমার প্রদর্শিত হয় নাই
কোন অসম্মান ফোয়বসের প্রতি,---পূজক তুমি যাঁর।
মহান দেবতা-রূপে দিওনুসস্-কে সম্মান করাতে
প্রকাশিতই হয়েছে বরং তোমার প্রজ্ঞা।

কাদ্‌মস্। বৎস! ভাল উপদেশই দিয়েছেন তোমাকে তেইরেসিয়াস্।
লংঘন করতে সাহস করো না তুমি চিরাচরিত পুণ্যাচার;---
থাক আমাদের সাথে। বিপর্যস্ত এখন তোমার বুদ্ধি।
ভাবছঃ তুমি বুঝি বেশ যুক্তিপূর্ণ কথাই বলছ,---কিন্তু না,
একেবারে অযৌক্তিক।---ধর না হয় তোমার কথাই সত্য;
নাও যদি হন ইনি প্রকৃত দেবতা, দেবতা বলে তাঁকে
অন্ততঃ তুমি স্বীকার কর;---সৎ উদ্দেশ্যে বল না হয়
একটা মিথ্যা কথা,---সেমেলে হবে তাহলে সম্মানিত
দেব-জননী বলে, বাড়বে গৌরব আমার নিজের;---
আমাদের বংশের সকলের।
আর স্মরণ রেখ বৎস সেই করুণ পরিণতি আক্‌তায়োনের;
দম্ভ করে যে বলে বেড়াত,---এ দেশে আর্‌তেমিসের চেয়েও
মৃগয়াদক্ষ আমি; আর ছিঁড়ে খেয়েছিল যাকে
তার নিজেরই লালিত কুকুরের দল। নিজে এনো না ডেকে
তেমনি কোন পরিণতি। চলে এস, এই আইভির মালা
নিজে আমি পরিয়ে দিচ্ছি তোমার মাথায়।
দিওনুসসের পূজায় সঙ্গী হও আমাদের।

পেন্‌থেয়ুস্। সরিয়ে নাও তোমার হাত। যাও, পালন কর গিয়ে নিজে
বাক্‌খসের অনুষ্ঠান;---আমার মাথায় চাপিয়ো না
তোমার ঐ বাতুলতার চিহ্ন।---তবে একে আমি শাস্তি দেব
যে তোমাকে শিখিয়েছে এই উন্মাদের আচরণ।
(নেপথ্যে অনুচরের দিকে ফিরে)
এখনই চলে যাও একজন
ব্যবসা করে যেখানে বসে এই দৈবজ্ঞ তেইরেসিয়াস্
চূর্ণ করে ফেলবে সবদণ্ডের আঘাতে, ভেঙে ফেলবে দেওয়াল,
ওলট্-পালট্ করে দেবে সব,---বাতাসে উড়িয়ে দেবে
এর যত সব ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুক্‌রো। বেশি আঘাত পাবে
এতেই ও সব চেয়ে।

অন্য সবাই তোমাদের,---
[illegible] বের করে নিয়ে আসুক
মেয়েমানুষের মত দেখতে সেই বিদেশীটাকে,
অদ্ভুত-ব্যাধিগ্রস্ত করে যে আমাদের নারীদের
সব ভ্রষ্ট করে তুলেছে। ধরতে পারলে
শেকল দিয়ে বেঁধে আনবে তাকে এখানে;---তারপর,---
ঢিল মেরে তাকে যাতে মেরে ফেলা হয়
সে ব্যবস্থা আমিই করব। অনুতপ্ত হতে হবে তাকে
থেবেসে প্রকট হতে এসেছে বলে।
(পেন্‌থেয়ুসের প্রস্থান)

তেইরেসিয়াস্। অবিমৃষ্যকারী মূর্খ।
জান না কি বলছ তুমি। ছিলে বিকৃতবুদ্ধি
হয়েছ ঘোর উন্মাদ।---এস কাদমস্,---আমরা যাই,---
প্রার্থনা করি গিয়ে এই মানুষপশুটা ও থেবেসের জন্য;
অনুনয় করব দিওনুসস্-কে ক্ষমাশীল হন যাতে তিনি।
এস,---তোমার থরসস্ গাও,---চলে এস।
ধরে রেখ আমাকে,---পরস্পরকে সাহায্য করব আমরা।
পড়ে যাওয়া দু'জনেরই দুঃখের কারণ হবে।
চিন্তা করো না কিছু। অর্চনা করবই আমরা
জেয়ুস্-পুত্র দিওনুসস্-কে।
কাদমস্,---পেন্‌থেয়ুস্---শব্দের অর্থ হল দুঃখ।
ডেকে যেন দুঃখ না আনে সে তোমার পরিবারের।
না---না, দৈবজ্ঞান থেকে বলছি না, বলছি তার আচরণ দেখে।
সে যা বলেছে তাতেই প্রকাশ পেয়েছে তার
অজ্ঞতার গভীরতা।
(উভয়ের প্রস্থান)

কোরাস্। পবিত্রতা, ওগো স্বর্গের রাণী।
সোনার পাখায় ভর করে
বেড়াও ঘুরে ধরার পরে
শুনেছ কি তুমি দেব-নিন্দা বাণী?
শুনেছ কি তুমি?
সেমেলের পুত্র যিনি দেবতা আনন্দের,
দেবশ্রেষ্ঠ বলে যাঁর পরিচয় উল্লাসপ্রধান উৎসবে;
বর যাঁর আনন্দ ও নৃত্যে আত্ম-মিলন,
আনন্দ বাঁশির সুরে।
আনন্দ তখন,---
দেবের উৎসবে সফেন মদিরা
যখন মুছে দেয় ক্লান্ত তাপ,---
সব দুঃখ করে দূর---
আইভি কিশলয়ের নিবিড় ছায়ায় যখন
মদির নিদ্রার কোমল উপাধানে
বিশ্রাম করে আবিষ্ট ভক্ত।
পেন্‌থেয়ুসের সাহস কুৎসা করে তাঁর?
ঐ জঞ্জাল, ঐ অসংযত জিহ্বা,
মূর্খের ঐ গর্হিত আচরণ,---
দুঃখের মাঝে হবে এর শেষ।

কিন্তু,---পরিতুষ্ট জ্ঞানীর জীবন,
শান্তির আশিসে ধন্য, ঝঞ্ঝা এড়িয়ে
নিজ গৃহ রাখে নিরাপদ।
দূর আকাশে থেকেও মহান্ দেবতাবৃন্দ
লক্ষ্য করেন মানুষের আচরণ।
বেশি জানার অর্থই জ্ঞানী হওয়া নয়।
অতি-মানবোচিত দম্ভ জীবনের অবসান করে ত্বরান্বিত।
দম্ভে যারা অভিমান করে মানুষের সীমা ছাড়ানর,
নিশ্চিত করায়ত্ত যা তাও হারায় তারা।
উন্মত্ততা বলি একে, জানি না এমন কোন প্রতিবিধান
বদলে দেয় যাতে দুর্জনের দুষ্ট আচরণ।

নিয়ে চল আমাকে হে ব্রোমিয়স্
পৌঁছে দাও কুপরিসে;---
যেখানে প্রেমের দেবতাগণ
করেন মধুময় ক্ষুদ্র জীবন
সেই আফ্রোদিতের দ্বীপে;
অথবা---সেই অজানা দেশে,
সুজলা যার নদী
হাজার ধারায় বয়ে
করে উর্বর মরু-প্রান্তর বৃষ্টিহীন।
অথবা যেখানে,---
শ্যামল সানু ওলুম্পোসের
আবাস ভূমি মিয়ুসগণের
পিয়েরিয়ায় এসে মিশেছে।
নিয়ে চল সেই দেশে,---
শান্ত গ্রেস্‌দের বসতি যেখানে
মধুর দিসায়ার থাকেন সেখানে,
কর প্রবুদ্ধ আমাকে
হাসি ও অর্চনায় হে ব্রোমিয়স্।

জেয়ুসের পুত্র দিওনুসস্,---
উৎসবে আনন্দ যাঁর
প্রিয়া যাঁর দেবী পীস্
ধনদাত্রী, মহিমময়ী,
রক্ষাকর্ত্রী যৌবনের;
দান তাঁর সুরা
ভুলিয়ে দেয় যে সকল দুঃখ,
ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে করে ভোগ।

দম্ভ যার যায় ছেড়ে মানুষের সীমা
মনে-প্রাণে তার সঙ্গ পরিহার করে
শান্তিতে যারা কাটায় দিন, আনন্দে রাত্রি;
অনিচ্ছুক সে তাদের মত সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে কাল
সেই শত্রু তাঁর।
দরিদ্র নেয় বেছে শান্তির জীবন,
মেনে চলি আমি
তার বিশ্বাস তারই আচরণ।

(পেন্‌থেয়ুসের প্রবেশ, সঙ্গে শৃংখলিত দিওনুসস্‌কে নিয়ে কয়েকজন রক্ষী)

রক্ষী। এই সেই সিংহ প্রভু, ধরে এনেছি আমরা
যাকে ধরে আনতে আদেশ করেছিলেন।
কিন্তু নিতান্ত পোষ-মানা সিংহ এটি।
পালানর কোন চেষ্টা করে নাই,---বাঁধতে
স্বেচ্ছায় এগিয়ে দিয়েছে হাত। ভয়ও পায়নি,
মুখের ঔজ্জ্বল্য এখনও যেমন দেখছেন, তখনও তেমনি ছিল।
হাসিমুখে বলেছে বেঁধে নিয়ে যেতে,
অপেক্ষা করছিল যেন আমার জন্য; সত্যিই এ
কোন কষ্ট দেয় নাই আমাদের। স্বভাবতই তাই
লজ্জায় পড়ে বলতে হয়েছিল আমাকে;
'ক্ষমা করবেন মশায়, আমি চাইছি না
আপনাকে বন্দী করতে, কিন্তু এ রাজার আদেশ।'
আরও একটি ব্যাপার ঘটেছে প্রভু।
সেই যে নারীবৃন্দ,---ঐ ধর্মীয় বাতুলতা যাদের,
যাদের কারাগারে রেখেছিলেন শেকল দিয়ে বেঁধে,---
তারা সব সোজা চলে গেছে পাহাড়ের উপত্যকায়,
সেখানে তারা সবাই নাচছে আর আহ্বান করছে বাক্‌খস্‌কে।
পা থেকে তাদের অমনিই খুলে গেল শেকলগুলো,
ছিটকে পড়ে গেল খিল, ছোঁয়াও লাগল না মানুষের হাতের।
দরজা গেল খুলে। প্রভু, থেবেসে এসেছে এ
সঙ্গে নিয়ে অনেক অলৌকিক ব্যাপার। যা কিছু
ঘটবে এরপর, আপনার বিষয় সে সব, আমার নয়।

পেন্‌থেয়ুস্। হাতের বাঁধন খুলে দাও এর।
(রক্ষী দিওনুসসের হাতের শেকল খুলে দিল)
জালে বদ্ধ, এত ক্ষিপ্র গতি নাই এর
যে পালিয়ে যাবে এখন আমার হাত থেকে।
শোন, অসুন্দর নয় আকৃতি তোমার
নারীচিত্ত আকর্ষণের পক্ষে; আর থেবেসে আসার
তাই ত' উদ্দেশ্য তোমার। মন-ভোলান ভাবে
কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ তোমার দুলছে গণ্ডের উপর;
এতে মনে হয় মল্ল নও তুমি।
গাত্রবর্ণেও দেখছি তোমার সযত্নলালিত শুভ্রতা;
আফ্রোদিতের ভজনার জন্যই তোমার ঐ সুন্দর মুখ
রৌদ্র থেকে বাঁচিয়ে চল তুমি ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে।
ভাল, বল দেখি প্রথমে, কোন্ দেশে জন্ম তোমার?

দিওনুসস্। অনায়াসে বলা চলে বিনা বিকত্থনায়।
নিশ্চয়ই শুনেছ তুমি ফুলে ফুলে ছাওয়া
ত্মোলস্ পর্বতের কথা?

পেন্‌থেয়ুস্। হাঁ। সার্‌দিস্ নগর ঘিরে রয়েছে যে পর্বতমালা।

দিওনুসস্। সেই আমার স্বদেশ, লুদিয়াবাসী আমি।

পেন্‌থেয়ুস্। হেল্লাসে কেন এনেছ এই আচার অনুষ্ঠান?

দিওনুসস্। জেয়ুসের পুত্র দিওনুসস্ বলেছেন বলে।

পেন্‌থেয়ুস্। তাহলে কি লুদিয়ায় জেয়ুস্ আছেন একজন,
জন্ম দেন যিনি সব নতুন দেবতার?

দিওনুসস্। না, বলছি আমি তোমাদেরই জেয়ুসের কথা;
বিবাহ করেছিলেন যিনি সেমেলেকে এই খেবেসে।

পেন্‌থেয়ুস্। ভর করেন যখন দিওনুসস্ তোমার উপর,
আসেন কি তিনি রাত্রে স্বপ্নে,
না দৃশ্য হন তোমার চোখের সামনে?

দিওনুসস্। সামনা-সামনি দেখেছি তাঁকে আমি,
তিনিই দিয়েছেন আমাকে এই তান্ত্রিক আচারের ভার।

পেন্‌থেয়ুস্। কি তোমার সে আচারের রূপ?

দিওনুসস্। দীক্ষিত যে নয় তাকে বলা যায় না সে কথা।

পেন্‌থেয়ুস্। কি ফল পায় এতে উপাসকেরা?

দিওনুসস্। বিধিসম্মত নয় তোমার সে সব শোনা,
যদিও শোনার উপযুক্ত।

পেন্‌থেয়ুস্। চতুর উত্তর আমার কৌতূহল জাগানর পক্ষে।

দিওনুসস্। নিরর্থক কৌতূহল।
ঘৃণা করে অবিশ্বাসীকে দেবাচার।

পেন্‌থেয়ুস্। তুমি বলছ স্পষ্ট দেখেছ তুমি দিওনুসস্‌কে,
কেমন আকৃতি তাঁর?

দিওনুসস্। যেমন ইচ্ছা তাঁর। আমার হাত নাই কিছু তাতে।

পেন্‌থেয়ুস্। কিছুই না বলে চতুরভাবে এড়িয়ে যাবার
আরও একটা ছল এটা।

দিওনুসস্। মূর্খের কানে যায় না কখনো সারগর্ভ কথা।

পেন্‌থেয়ুস্। এই দেশই কি প্রথম
যেখানে পরিচিত করছ তুমি দিওনুসস্‌কে?

দিওনুসস্। না, এই তান্ত্রিক নৃত্যে মত্ত সমস্ত প্রাচ্যদেশ।

পেন্‌থেয়ুস্। বিশ্বাস করি সে কথা।
প্রাচ্য সংস্কৃতিহীন আমাদের চেয়ে।

দিওনুসস্। এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ তারা; অবশ্য ভিন্ন তাদের রীতি-নীতি।

পেনুথেয়ুস্। দিনে, না রাত্রে
করে থাক তুমি এই তান্ত্রিক অনুষ্ঠান?

দিওনুসস্। রাত্রেই প্রধানত।
অন্ধকারই উদ্বুদ্ধ করে ধর্মীয় সম্ভ্রম।

পেন্‌থেয়ুস্। অপবিত্র, ছলনাময়,---
অন্ধকার নারীদের পক্ষে।

দিওনুসস্। দিনের আলোকেও চলতে পারে অপবিত্র আচরণ।

পেন্‌থেয়ুস্। শাস্তি পাওয়া উচিত তোমার এই ঘৃণ্য বাচালতার জন্য।

দিওনুসস্। আর তোমার এই ঘোর পাপাচারের জন্য?

পেন্‌থেয়ুস্। কি নির্ভীক করেছে একে বাক্‌খসের মত্ততা।
তর্ক করতেও বেশ জানে এ।

দিওনুসস্। জানিয়ে দাও আদেশ তোমার।
কি শাস্তি দিতে চাও তুমি আমাকে?

পেন্‌থেয়ুস্। আগে কেটে ফেলব তোমার ঐ সুগন্ধি চিকন চুল।

দিওনুসস্। দেবতার নামে রেখেছি, পবিত্র এ কেশ তাঁর নামে।

পেন্‌থেয়ুস্। তারপর, দিয়ে দাও তোমার ঐ থুরসস্ যষ্টি।

দিওনুসস্। নিজে কেড়ে নাও আমার হাত থেকে;
দিওনুসসের এটা, তাঁর হয়ে আমি হাতে রাখি।

পেন্‌থেয়ুস্। রুদ্ধ করে রাখব তোমাকে কারাগারে।

দিওনুসস্। যখনই আমার ইচ্ছা হবে।
দেবতা নিজে মুক্ত করে দেবেন আমাকে।

পেন্‌থেয়ুস্। কি? মুক্ত করে দেবেন তোমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই,
যখন প্রার্থনা করবে তুমি ঐ বাতুল নারীদের মাঝে দাঁড়িয়ে।

দিওনুসস্। এখানেই আছেন তিনি, আমারই পাশে;
দেখছেন তিনি আমার প্রতি তোমার আচরণ।

পেন্‌থেয়ুস্। তাই নাকি? কোথায়?
আমার চোখে ত' তিনি অদৃশ্য।

দিওনুসস্। এখানে আমার পাশে।
দেব-নিন্দুক তুমি, দেখতে পাবে না তাঁকে।

পেন্‌থেয়ুস্। (রক্ষীদের প্রতি)---ধর একে।
উপহাস করছে সে আমাকে, সমস্ত নগরকে।

দিওনুসস্। (রক্ষীদের প্রতি) সাবধান, বাঁধবে না আমাকে।
(পেনথেয়ুস্‌কে) মত্ত আমি নই,---তুমি।

পেন্‌থেয়ুস্। (দিওনুসস্‌কে) আমার আদেশের ক্ষমতা বেশী এখানে।
(রক্ষীদের) আমি বলছি, বাঁধ একে।

দিওনুসস্। বুঝছ না তুমি কী জীবন তুমি যাপন করছ,
কে তুমি তাও ভুলে গেছ।

পেন্‌থেয়ুস্। কে আমি? আমি পেন্‌থেয়ুস্,
পুত্র একিয়োন ও আগাভের।

দিওনুসস্। পেন্‌থেয়ুস্ শব্দের অর্থ হল দুঃখ,
সার্থক তোমার নাম।

পেন্‌থেয়ুস্। নিয়ে যাও একে, রাখ অশ্বশালায় বেঁধে,
যত অন্ধকার চায় ও তা পাবে।
হ্যাঁ, নাচতেও পার তুমি সেখানে।
কিন্তু এই নারীদের, যাদের এনেছ তুমি
সাহায্য করতে আর উৎসাহ বাড়াতে তোমার,
পাঠিয়ে দেব আমি তাদের দাস-দাসী কেনা-বেচার হাটে,
আর না হয় আমারই গৃহে রেখে দেব তাদের
তাঁত-বোনার কাজ দিয়ে, হাতগুলো তাতে তাদের
খঞ্জনি বাজান থেকে দূরে থাকবে।

দিওনুসস্। বেশ, যাব আমি। ভাগ্যে যদি না থাকে
কিছুই হবে না আমার। কিন্তু দিওনুসস্,---
মৃত যাঁকে বলছ তুমি, খুঁজে নেবেন তোমাকে,
প্রতিশোধ নেবেন এই পাপাচারের। আমার গায়ে হাত তুলে
কারারুদ্ধ করতে চলেছ তুমি তাঁকেই।

(রক্ষীরা দিওনুসস্‌কে বন্দী করে অশ্বশালার দিকে নিয়ে যায়, পেন্‌থেয়ুস্‌ও তাদের অনুসরণ করে)

কোরাস্। ওগো দিবুকৃ,
শুভ্রা মধুর কুমারী কন্যা
থেবেসে তুমি আখেলুসের,—
তোমার উথলে ওঠা জলের ধারা
জানিয়েছিল স্বাগত সেদিন
সন্তানকে যে জেয়ুসের।
স্বর্গ-মর্ত্যের দেবতা যেদিন
তাকে নিলেন তুলে শিখা থেকে
সেই চির অনির্বাণ;
রাখলেন তাকে সুরক্ষিত
আপন উরুর মাঝে,
বললেন ডেকে উচ্চস্বরে
নবজাতকের নাম,—
'দ্বিজ তুমি হে দিথুরাম্বস্
এস, পিতার গর্ভে কর প্রবেশ।
উল্লাসের পুত্র যে তুমি
তাই ঘোষণা আমার
হবে থেবেসে তোমার নাম বাক্খস্।
আজকে যখন দিব্য হে দিরকে
পরেছি আমার মাথায় মুকুট,
নাচছে আমার পা
মহাউল্লাসে বাক্খসের;
আমাকে যে তুমি ফিরিয়ে দিলে
তোমার পবিত্র ওই তীর থেকে।
আমাকে কেন করবে তুমি ভয়?
দিওনুসসের গাছে
থুমল যে ফল খ্যাতিতে বলকে
শপথ তারি নামে;
তোমার স্মৃতিকে এখনো
করবে পীড়িত ভয়ানক তার নাম।
উঃ, কী সে রোষ
পেন্থেয়ুসের স্বরে,
রুক্ষ তার ওই মুখে;
সন্তান সে ড্রাগন দাঁতের
এখিয়োনের পৃথ্বী-জাত কুলে,
রক্ত-লোলুপ-হাঁ-করা-মুখপাত,
দেবদ্বেষী ঘৃণ্য ও নীচ
অপবাদ তার মানুষ-রূপের।
আমরা যারা সেবক সবাই বাক্খসের
আষ্টেপৃষ্ঠে শেকল দিয়ে
এখনই সে বাঁধবে তাদের।
আরও দেখ,—
পড়ে আছেন মেঝের 'পরে
সাথী আমাদের এখনো
আঁধার তার কারাগারে।

হে দিওনুসস্!
পার হয়ে অসংখ্য শ্বাপদ-আবাস,
পর্বতের নিতম্বে অথবা শিলাময় শৃঙ্গে
কোথায় তুমি করছ পরিচালিত
থুরসস্‌ধারী তোমার নর্তকবৃন্দকে?
হয়ত বা ওলুম্পোসের কানন-প্রচ্ছন্ন দেশে,
ওরেফেয়ুস্ যেখানে একদিন তাঁর বীণার ঝঙ্কারে
সমাহৃত করেছিলেন পার্বত্য জন্তু ও বৃক্ষরাজি;
গেয়েছিলেন প্রাণমাতান গান।

আনন্দময় ওগো পিয়েরিয়ার উপত্যকা!
হৃষ্ট সেখানে বাক্খস্।
পার হয়ে আক্সিয়ুস্ নদীর ফেনিল প্রবাহ
নৃত্য ও উৎসবের সাথে আনবেন সেখানে তিনি
তাঁর ঘূর্ণী-মাতাল মায়নাদ্‌দের।
শোনা যায়, ভাগ্য ও ঐশ্বর্যের অকৃপণ দাতা,
লুদিয়া ও জলধারাসমূহের উৎসের ওপারে
সেই দেশে পরিক্রমা তাঁর, যে দেশের প্রসিদ্ধ
অশ্বকুল করে বিচরণ সুন্দর সমৃদ্ধ নদীতীরে।
(সহসা প্রাসাদের মাঝে কোলাহল শোনা যায়; নেপথ্য থেকে দিওনুসসের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে)

দিওনুসস্। (নেপথ্যে) শোন, শোন, শোন তোমরা সবাই,—
চিনেছ ত' আমার স্বর? শুনছ ত' সবাই?
হে বাক্খসের উপাসিকাবৃন্দ,—শোন, শোন, শোন—

কোরাস্। কে ওই? কোথায় তিনি?
দিওনুসসের কণ্ঠস্বর আহ্বান করছে আমাদের।

দিওনুসস্। (নেপথ্যে) শোন, শোন, শোন তোমরা আবার,—
সেমেলের পুত্র আমি, পুত্র আমি জেয়ুসের।

কোরাস্। ওই, ওই, ওই আমাদের দেবতা—
এস তবে আনন্দের দেবতা, এস আমাদের মাঝে।

দিওনুসস্। (নেপথ্যে) হে ভীষণ ভূমিকম্প।
পৃথিবী-পৃষ্ঠ কর প্রকম্পিত।

কোরাস্। (ভীতির চীৎকার)
পেন্থেয়ুসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে,
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।
(একে একে বলবে)
দাঁড়িয়ে আছেন দিওনুসস্ ঐ প্রাসাদে,
প্রণাম কর তাঁকে।
প্রণতি জানাই আমরা তাঁকে।
দেখ, দেখ প্রাসাদের স্তম্ভ আর ছাদ কেমন করে
ঝাঁপিয়ে পড়ছে মাটির উপর।
ভেতরের কারাগার থেকে দেবতা করবেন বিজয়-ধ্বনি।
(সেমেলের সমাপ্তির আগুন বেড়ে উঠে উজ্জ্বল হতে থাকে)

দিওনুসস্। (নেপথ্যে) সন্ধুক্ষিত কর সেই শিখা বিদ্যুৎ
জ্বালিয়েছে যাকে; প্রদীপ্ত কর পেন্‌থেয়ুসের প্রাসাদের
তীব্র বহ্নিকে।

কোরাস্। দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ---
দেখছ কি, দেখছ কি তোমরা সমাধির শিখা সেমেলের;
সেই শিখা সেদিনও ছিল যা
মৃত্যু যেদিন হয় তাঁর বিদ্যুৎ-দহনে?
(নেপথ্যে ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ)
শুয়ে পড়, শুয়ে পড় ভয়ার্ত মায়নাদ্‌-দল;
পড়ে যাও সবাই মাটির উপর।
ছাদ-মেঝে, সমস্ত প্রাসাদ চূর্ণ করছেন তোমাদের দেবতা
শুনেছেন তিনি আমাদের আকুতি;
জেয়ুস্‌-নন্দন,---ঐ আসছেন তিনি।
(দরজা খুলে যায়, দিওনুসসের প্রবেশ)

দিওনুসস্। এশিয়ার নারীবৃন্দ।
ভয়ে সন্ত্রস্ত কেন তোমরা, পড়ে আছ মাটিতে?
শুনলে ত' তোমরা সবাই;
নিজে বাক্‌খস্‌ চূর্ণ করলেন পেন্‌থেয়ুসের প্রাসাদ।
ওঠ, ওঠ সবাই; কাঁপুনি থামাও, সাহস সাহস চাই।

কোরাস। কী আনন্দ, তোমার ঐ বাক্‌খসের ধ্বনি শুনে।
তুমিই রক্ষা করেছ আমাদের।
ছিলাম আমরা সহায়হীন পরিত্যক্ত;
কি খুসি যে হলাম তোমায় দেখে।

দিওনুসস্। নৈরাশ্যে কি ডুবে ছিলে তোমরা,---
যখন পেন্‌থেয়ুসের অন্ধকার কারাগারে রাখবে বলে
পাঠান হল আমাকে ভেতরে?

কোরাস। কি উপায় ছিল?
নিয়ে গেল যখন তোমাকেই
কে রক্ষা করত আমাদের?
কিন্তু বল তুমি,---
এই দুর্বৃত্তের কবল থেকে কিভাবে মুক্ত হলে তুমি?

দিওনুসস্। কেন? অতি অনায়াসে;
নিজেই নিজেকে করেছি মুক্ত।

কোরাস। কিন্তু, বাঁধে নাই কি সে তোমার দুই হাত
শক্ত দড়ি দিয়ে?

দিওনুসস্। হা-হা-হা, হ্যাঁ, রহস্য করেছি তার সাথে ও ব্যাপারে
ভেবেছিল ও আমায় বাঁধছে, মতিভ্রম তার,---
ধরেনি ত' সে আমাকে, স্পর্শও করেনি।
ঐ পশুশালার কাছে, যেখানে ও নিয়ে গেল আমাকে
আটকে রাখবে বলে,---দেখতে পেল ও সেখানে একটা ষাঁড়
তারপর সেই ষাঁড়টার হাঁটু আর পায়ে
শক্ত করে দড়ি জড়াতে জড়াতে ও যখন
কাঁপছিল রাগে, ঘেমে উঠছিল আর ওষ্ঠ কামড়াচ্ছিল,
পাশেই আমি তখন চুপ করে বসে দেখছিলাম সব।
এমনি সময় এলেন বাক্‌খস্‌,
ভেঙে ফেল্‌লেন ঐ প্রাসাদ, প্রদীপ্ত করে তুললেন
তাঁর মাতৃসমাধির অগ্নি-শিখা।
পেন্‌থেয়ুস তাই দেখে ভেবে বসল মনে মনে
প্রাসাদে আগুন লেগেছে,
শুরু করে দিল এধার-ওধার ছোটাছুটি,
হাঁকডাক করে ভৃত্যদের বলতে লাগল জল আনতে,
সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সমস্ত পরিবার
নিতান্ত অকারণে।
তারপর ভাবল ও, বুঝি আমি গেছি পালিয়ে।
বন্ধ করে দিল জল ঢালা, টেনে নিল ভয়ঙ্কর তার তরবারি,
ধেয়ে এল প্রাসাদের মাঝে। তারপর দিওনুসস্‌;---
তাই মনে হয়েছিল আমার, আর যা মনে হয়েছিল
তাই বলছি,---এক ছায়ামূর্তিকে
করালেন আবির্ভূত প্রাসাদ চত্বরে।
ছুটে গেল পেন্‌থেয়ুস তার দিকে,---
আর আমাকে হত্যা করছে মনে করে
আঘাত করতে লাগল সে রৌদ্রদগ্ধ বাতাসের গায়ে।
দেবতার ভাণ্ডারে ছিল তার জন্য আরও অপমান;
আমার কারার অবস্থা দেখে বুক তার যাতে ভেঙে যায়,
তাই চূর্ণ, ধূলিসাৎ করে ফেললেন তিনি ঐ পশুশালা;
ঐ তো পড়ে আছে ওখানে ঐ ধ্বংসস্তূপ।
শ্রান্তিতে অসহায় সে এখন; ফেলে দিয়েছে তরবারি।
মর্ত্যের মানুষ হয়ে স্পর্দ্ধা হয়েছিল তার
অস্ত্র ধরতে দেবতার বিরুদ্ধে। আমি নিঃশব্দে হেঁটে চলে এলাম
প্রাসাদের বাইরে; আর এই ত' এখানে আমি এখন।
পেন্‌থেয়ুস্‌ কোন অসুবিধা করছে না আমার।
কিন্তু তার ভারী পায়ের শব্দ শুনছি প্রাসাদের মাঝে;
মনে হয় এখনি আসবে সে এখানে।
কি সে বলবে এরপর?
যতই হোক না কেন তার কোপ, আমাকে পারবে না টলাতে
ধীরস্থির হয়ে জ্ঞানীরা রক্ষা করে থাকেন আত্মসংযম।
(পেন্‌থেয়ুসের প্রবেশ)

পেন্‌থেয়ুস্‌। একি ধিক্কার। ক্ষণকাল পূর্বে
শৃংখলিত কারারুদ্ধ ছিল ঐ বিদেশী;
আর, মুক্ত সে এখন আমার হাত থেকে।
(দিওনুসস্‌কে দেখে রেগে গর্জন করে ওঠে)
ঐ ত সে। কি ব্যাপার? বাইরে এলে কিভাবে?
কি করে সাহস হল তোমার
নিজেকে দেখাতে আমারই গৃহের দ্বারে?

দিওনুসস্। থাম যেখানে আছ। ক্রুদ্ধ তুমি, আত্মসংযম কর আগে।

পেনথেয়ুস। শৃংখলিত, কারারুদ্ধ ছিলে তুমি, পালালে কি করে?

দিওনুসস্। শোন নাই, বলেছিলাম আমাকে মুক্ত করবেন---

পেন্‌থেয়ুস। কে? অদ্ভুত তোমার সব কথা।

[ক্রমশ

অনুবাদক—সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

আরোগ্য বিভাগ

●মিঃ আর পাল, সালকিয়া, হাওড়া--

আপনার উপসর্গের কথা পড়লাম। এ বিষয়ে যত শীঘ্র পারেন চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করে, তাঁর পরামর্শ নিন। যত দেরী করবেন ততই উপসর্গ বেড়ে যাবে।---

শ্রীমতী সুরভি সেনগুপ্তা, জয়ানগর বাঙ্গালোর---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। লৌহঘটিত কোন ইনজেকশন নিলে বা ওষুধ খেলে শতকরা দশজনের পেটে ব্যথা, বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, গা ঝিমঝিম করা, সারা গায়ে চুলকানি ও বিজগুড়ি বার হওয়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য অথবা কোষ্ঠতারল্য ঘটতে পারে এবং পাকস্থলীর ঘা (পেপটিক্ আলসার) বৃদ্ধি পেতে পারে। Chelated Iron খেলে বা ইনজেকশন নিলে শতকরা চারজনের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আপনি শতকরা দশজনের মধ্যে পড়ে গেছেন এবং তাই এই প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

আপনি ভিটামিন-বি-১২ ব্যবহার করতে পারেন রক্তাল্পতার জন্য এবং ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স্ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য। লাইগেশন থেকে এই ধরনের উপসর্গ সাধারণত দেখা দেয় না। ---আলাদাভাবে ক্যাপ্তি খাবার কোন দরকার নেই।

● নীলপদ্ম (ঠিকানা নেই)---

দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু'চামচ করে Sioplex Lysine (Albert Devid) দু'মাস খাবেন।

●নামহীন, কলিকাতা-৪---

এ সমস্যার সমাধান কোন ওষুধে হয় না। ব্যায়াম নিয়মিত ... যাবে; আরও তাড়াতাড়ি হলে ভাল হয়।---

●শ্রীসুধীর কর্মকার, কলিকাতা-২৮

আপনার পুত্রকে Siovite Lysine Drops (Albert Devid) দিনে দু'বার ১০ ফোটা করে দু'মাস খেতে দিয়ে দেখুন উপকার পান কি না---।

●শ্রীমতী মালতী দেবী (ছদ্মনাম) বারাণসী---

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। আপনি মাসিকের পঞ্চম দিন থেকে প্রত্যহ একটি করে Gynovular-২১ বড়ি একুশ দিন খাবেন; এইভাবে প্রত্যেক মাসে খাবেন, তাহলে গর্ভ-সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এই সঙ্গে রক্তাল্পতার জন্য দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু'চামচ করে Livogen (BDH) তিন মাস খাবেন।

●শ্রীঅজিতকুমার সাহা, বর্ধমান---

কোন ওষুধে এ উপসর্গ নিরাময় হবে না। অভ্যাস করলেই আপনা থেকে কমে যাবে।---

●শ্রীকাশীনাথ শীল, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯---

রোদে না ঘুরে, নিয়মিতভাবে খাওয়া এবং বিশ্রাম করলে উপসর্গ কমে যাবে।---

●শ্রীপ্রলয় ব্যানার্জি, চন্দননগর---

ভাল করে গায়ে তেল মেখে নিয়মিত স্নান করলে সর্দির ধাত ভাল

●গুলমোহর (ছদ্মনাম) কলি-৩১

আপনি আপনার বোনঝিকে দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু'চামচ করে Aminozyme (Stadmed) অথবা Dia-Com United Laboratories খেতে বলবেন দু'মাস।

●শ্রীমতী ছবি চাট্যার্জি, ক্রীক লেন---

আপনি নিয়মিত দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু'চামচ করে Limic Forte (Luxmi Pharmacituicals) দু'মাস খাবেন।

●জিজ্ঞাসু (ছদ্মনাম) ২৪-পরগণা---

অধিকাংশ যৌনদুর্বলতা মানসিক ভীতি থেকে উদ্ভূত, বিশেষত যাঁরা অবিবাহিত, তাঁরা আরও বেশি অনুভব করেন। একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। পরীক্ষার আগে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই ভয় করে---বোধ হয় ফেল করবো, এমন কি যে প্রথম হয়, সেও ভাবে। পরীক্ষায় পাস করে যাবার পর একবারও আগের ভয়ের কথা ভাবে না।

আপনি বিবাহ নামক পরীক্ষায় পাস করার পর দেখবেন, মন থেকে সব দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে।

● শ্রীতাপস সেন, ভাটপাড়া, ঘটকপাড়া ----

প্রশ্ন : ভীষণ অম্বল হইতেছে---

উত্তর : দু'বেলা ভাত খাবার পরে চা-চামচের দু' চামচ করে (Diacom) (United Laboratories) খাবে

● শ্রীনরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, হিন্দ মোটর, হুগলী ---

আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। কোন ভয় নেই। একটু বয়স বাড়লেই উপসর্গ কমে যাবে।

● শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দাস, কাছাড়ঘাট, ত্রিপুরা ---

আপনার চিঠি পড়লাম। অনেকদিন রোগে ভুগে হতাশ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু ভালভাবে নিয়মিত চিকিৎসা করলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।

● শ্রীমানস মণ্ডল, তমলুক, মেদিনীপুর

আপনার অনুরোধ মতই প্রশ্ন ছাপালাম না, কিন্তু এ ধরনের চিকিৎসা পত্রযোগে করা সম্ভব নয়। আপনি স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করুন।

● শ্রীঅমল (ছদ্মনাম), কলিকাতা-৭

নিশ্চয়ই আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অনুযায়ী চিকিৎসা করলে সুস্থ হয়ে উঠবেন। কোন ভয় নেই, চিকিৎসা করান।

● শ্রীসনাতন সরকার, বালুরঘাট, দিনাজপুর ----

আপনি দু'বেলা ভাত খাবার পর চা-চামচের দু' চামচ করে Palymin Syrup দু'মাস ধরে খাওয়াবেন।

● শ্রীবিশ্বনাথ নিয়োগী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪

আপনার স্ত্রীকে নিয়মিত প্রতি রাতে ইসফগুলের ভুঁষির সরবৎ খাওয়াবেন। মাসখানেক খাওয়ানোর পর দেখবেন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে গেছে।

● শ্রীমৃণালকান্তি শীট, বাঁকুড়া---

আপনি রোজ ভোরবেলায় উঠে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলবেন। দাদাকে রাতে শোবার সময় দুটি করে Tofanil বড়ি খেতে বলবেন একমাস।

● শ্রীমতী বন্দনা চট্টোপাধ্যায়, বাণীপুর, হাওড়া ---

চুলের জন্য, (Whole liver Extract (T. C. F) Injection 1ml. Intramuscularly) একদিন অন্তর নেবেন, দশটি ইনজেকশন। এ ছাড়া Sioplex Lysine (Albert David) চা-চামচের দু' চামচ করে দু'বেলা ভাত খাবার পর দু'মাস খাবেন।

● শ্রীঅসীম দাস, বি বি চ্যাটার্জি রোড, কলি-৪২---

আপনি Siovite Tablet (Albert David) সকালে দু'টি, সন্ধ্যায় দুটি বড়ি খাবেন, এ ছাড়া দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু' চামচ করে (Aminozyme) (Stadmed) খাবেন দু'মাস। গায়ে (Scabalcid) মাখবেন এবং মাথায় নারকোল তেলের সঙ্গে সমপরিমাণ (Fragmatar) মলম মিশিয়ে মাখবেন। সপ্তাহে একদিন করে Cidal Shampoo মাথায় ঘষবেন।

● শ্রীমতী ছন্দা সেন (ছদ্মনাম) কলকাতা ---

দুপুরে একটি (Tofranil) এবং রাতে শোবার সময় দু'টি (Nevro-vitamin-4) (Adult) বড়ি খাবেন একমাস।

● শ্রীঅসীম বন্দ্যোপাধ্যায় (ছদ্মনাম) উলুবেড়িয়া---

● অসীম দাস, বি বি চ্যাটার্জি রোড, কলি-৪২-এর উত্তরে আপনার উত্তর দেওয়া আছে। ----

● শ্রীশমিত ব্যানার্জি, রিসড়া, হুগলী

নিয়মিত দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু' চামচ করে (Colibils) (Calcutta Chemical) খাবেন একমাস।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

[মাসিক বসুমতীর নতুনতম নিয়মিত বিভাগ 'আরোগ্য বিভাগে' আপনার এবং আপনার আত্মজনবর্গের শারীরিক উপসর্গ সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা হবে। যদি কেহ নিজ নাম প্রকাশ করতে না চান, তিনি সাঙ্কেতিক বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারবেন। চিঠির খামের উপরে "আরোগ্য বিভাগ, মাসিক বসুমতী" কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না; দু'টির বেশী প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। নীচের কুপনের সঙ্গে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।]

এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে

আরোগ্য বিভাগ

নাম---

ঠিকানা-------------------------------------

—মাসিক বসুমতী—

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পার্ক স্ট্রীটে শাসক কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণরত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিং নাহার। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন ডঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

॥ চিত্র সংবাদ ॥

ষ্মৃতি সদনে আগস্ট বিপ্লব দিবস
ক্ষে এক অনুষ্ঠানে বিপ্লবীদের
চিত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রে প্রাক্তন
মন্ত্রী ও বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

মা

সি

ক

বসুমতী

আশ্বিন / '৭৭

কলকাতায় পূর্বভারতীয় রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের বৈঠকে ভাষণরত শিক্ষা ও যুবকল্যাণমন্ত্রী ডঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও।

মা
সি
ক
বসুমতী
আশ্বিন / '৭৭

কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে সংযুক্ত মহিলা পরিষদের হস্তশিল্প প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রাও

রুশ মানচিত্রে প্রদর্শিত ভারতভূমির ভুল তথ্য প্রত্যাহারের দাবীতে ভারতীয় জনসংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতীর নেতৃত্বে রুশ কন্সাল জেনারেলের অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

নিমতলা শ্মশানঘাটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবস উপলক্ষে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

রাজভবনের সম্মুখে বি-পি-এস-এফ ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে তাদের বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

●শ্রীমতী অঞ্জনা রায়, হুগলী ---
আপনার দীর্ঘ চিঠি পড়লাম। লিখুন, যে বিষয়ে লিখেছেন, অপারেশন ছাড়া আর কোন ভাল চিকিৎসা নেই। তবে ঘরেতেও যা ব্যবহার করছেন, নিয়মিত করলে উপকার পেতে পারেন।

●নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-৫৪—
শারীরিক দুর্বলতার জন্যই আপনার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি দেখা দিয়েছে। আপনি নিয়মিতভাবে দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু' চামচ করে Sharkoferrol (Alembic) খান, অন্তত তিনমাস। চুলকোনির জন্য Colpomin Tablet (Fair-deal Corporation) একটি করে রোজ রাতে শোবার সময় যোনিপথের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। মাসিকের দিনগুলি বাদ দেবেন। প্রথম কয়েকদিন খুব ময়লা বেরিয়ে আসবে, তারপর দেখবেন ধীরে ধীরে কমে গেছে। ২০ থেকে ২৫ দিন লাগাবেন।

●শ্রীমতী সুব্রতা মুখার্জি, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলি-৯—
কেউ যদি বলে আপনার কান কাকে নিয়ে গেল, আর আপনি যদি কান আছে কি নেই---না দেখে, কাকের পেছনে ছোটেন, তাহলে দোষ কার বলুন? কে আপনাকে বলেছে—আপনি মোটা হয়ে যাবেন, আর আপনিও মোটা হয়ে যাবার আশঙ্কা করে খাওয়া ছেড়ে দিলেন?

আপনি যা লিখেছেন, তাতে বলতে পারি আপনি একটুও মোটা হন নি। আপনি নিয়মিতভাবে খাওয়া-দাওয়া করুন, বেড়ান এবং বিশ্রাম করুন।

●শ্রীসত্যরঞ্জন পাঠক, শিক্ষক, সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়, খড়গপুর—
আপনার নির্দেশ অনুযায়ী প্রশ্ন ছাপালাম না ---আপনার পিতার জন্য B-G-phos দু'চামচ দু'বেলা। আপনার স্ত্রীর জন্য Sioplex Engymes দু' চামচ দু'বেলা খাবার আগে।

●শ্রীঅনিল সরকার, মালদহ --
আপনি যা লিখেছেন, তা কোন রোগ নয়।

●শ্রীবি কুমার, কলিকাতা-১৪---
পেটের ডানদিকে যে ব্যথার বর্ণনা দিয়েছেন, আমার মনে হয় ডানদিকের কিডনীতে স্টোন হওয়ার দরুন হচ্ছে। এ অবস্থায় দু'ধরনের X-Ray করিয়ে নিন। একটিতে পাকস্থলী ও অন্ত্রের অবস্থা দেখে নিন; দ্বিতীয়টিতে কিডনীতে স্টোন্ আছে কি না জেনে নিন। অনুসন্ধানে আগে জানুন, কিসের জন্য ব্যথা হচ্ছে, তারপর চিকিৎসা করান। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে কোন লাভ নেই।

●শ্রীবি এন ধর, ডাক্তার লেন, কলি-১৪
আপনি অহেতুক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিয়ের বিষয়ে কোন বাধা নেই। আপনি রোজ রাতে শোবার সময় দু'টি করে Nevrovitamine-4 (adult) বড়ি খাবেন। এছাড়া দু'বেলা ভাত খাবার পর চা চামচের দু' চামচ করে Sioplex Lysine খাবেন দু'মাস।

●শ্রীকুমার (ছদ্মনাম) ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক—
আপনার কনুইতে যা হয়েছে, আমার মনে হয় দাদ নয়, একজিমা ---আপনি দিনে দু'বার করে Betnovatec (Glaxo) মলম লাগিয়ে দেখুন তো একমাস।

●শ্রীনিশীথ বিশ্বাস, কৈলাসহর, ত্রিপুরা---
ছ' থেকে আট ঘণ্টা ঘুমোলেই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট। ব্যায়াম করতে পারেন, কোন ক্ষতি হবে না।

●শ্রীএস কে পাল, আরারিয়া, পুর্ণিয়া বিহার---
কোন ইনজেকশন নিতে হবে না। একমাস দু'বেলা খাওয়ার পর পর চা চামচের দু' চামচ করে BG-Phos খাবেন। চাকরির Medical Examination দিতে পারেন, কোন ভয় নেই। পাস করে যাবেন।

●শ্রীসাধুচরণ মাইতি, সুভাষ কলোনী, রাণাঘাট---
ওয়ুনামাইসিন্ ইনজেকশন সাধারণত জরায়ু ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইনফেকশন থাকলে দেওয়া হয়। Lyndiol ২'৫ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও মাসিকের গোলমাল থাকলে বা মাসিকের সময় যন্ত্রণা থাকলে দেওয়া হয়।—

●নিশিপদ্ম (ছদ্মনাম) নদীয়া---
বিয়ের পরই ঐ ধরনের উপসর্গ সব পুরুষের হয়, ক্রমে ক্রমে তা ঠিকও হয়ে যায়।

●বি বি, হাওড়া-৪---
আপনি দিনে তিনবার ভাত খাবেন আর দু'বেলা ভাত খাবার পর Sharko-Ferrol খাবেন দু'চামচ করে দু'মাস।

গুরুভ্রাতার দৃষ্টিতে স্বামীজী

"যতদিন তিনি গৃহে রহিয়াছেন পর্যন্ত তোমার অবলম্বনীয়, ইহাতে আর গর্ভধারিণীর সেবা কর, তাঁহাকেই সন্দেহ নাই। তোমার কর্তব্য, আমার অবলম্বনীয় মুক্তি হোক তাঁহাতেপ্রাপ্তি কর্তব্য; সকলের কার্য্য হচ্ছে প্রভুর করতে পারে সকল কল্যাণ লাভ হইয়া পথে বিচরণ করা। অন্য কর্তব্য নাই।"

—স্বামী তুরীয়ানন্দ

ছোটদের আসর

★ যুগপ্রবর্তক বিদ্যা

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

বিদ্যাসাগর মানব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ পূজারী। তিনি মানব-প্রেমিক, মানব-হিতৈষী। বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারক। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী।

মধুসূদন বিদেশে গিয়ে অর্থকষ্টে পড়েন এবং বিদ্যাসাগরের কাছে নিজের অভাবের কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। দয়ার সাগর, দানবীর বিদ্যাসাগর কবি মাইকেল মধুসূদনের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে দফায় দফায় টাকা পাঠিয়েছেন। মধুসূদন একটি চিঠিতে লিখেছেন, স্নেহ ও মমতায় ভরা যে হৃদয় বাঙ্গালী মায়ের থাকে, বিদ্যাসাগর সেই হৃদয়ের অধিকারী, প্রাচীন মুনি-ঋষিদের মত তিনি মহাজ্ঞানী।

রামমোহন রায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথিকৃৎ। বিদ্যাসাগরের গদ্য সুমার্জিত, কলাসম্মত, সুসংস্কৃত, ছন্দসুন্দর ও শিল্পসুষমামণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলা ভাষাকে পূর্ব প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনীর সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।"

মনীষী রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারক। তিনি আলোকের দূত। বিদ্যাসাগর বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, "১৮৩১ খৃঃ অব্দে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি কোম্পানী সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম করিয়াছিলেন; সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দু, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী, ফরাসী এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদেশীয় লোক-দিগকে, দেব-দেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া, বেদান্ত প্রতিপালিত পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাঁহারাও তদীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। রামমোহন রায় এ দেশের একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন, সন্দেহ নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যুগমানব, যুগপ্রবর্তক ও সমাজসংস্কারক। তিনি ছিলেন বাল্য-বিবাহ ও বহু বিবাহের ঘোরতর বিরোধী। বিদ্যাসাগর 'বাল্য-বিবাহের দোষ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে বিবৃত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমত বিবাহঘটিত আমোদ-প্রমোদে ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জন ক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্য প্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্য

...্যাকুল হইতে হয়।--- অতএব যে বাল্য-বিবাহের দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে ?"

বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়ে যায়। তিনি নিজে পয়সা খরচ করে বহু বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। দেশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখুক, সুশিক্ষিত হয়ে উঠুক, এটা ছিল তাঁর এক মহান স্বপ্ন আর এর জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণ পরিচয়' বইটি দেশের নিরক্ষরতা অনেকখানি দূর করেছে।

আজ থেকে দেড়শ' বছর আগে ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ভারতে এক দরিদ্র পরিবারে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাণীর বরপুত্র, বাণীর বীরপুত্র, বিস্ময়কর তাঁর প্রতিভা, অসাধারণ তাঁর মনীষা, তিনি স্মরণীয়, বরণীয়, তিনি যুগমানব ও যুগপ্রবর্তক।

★ প্রথম বোম্বাই ও বোম্বাইবাসী ★

আজ আমি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আমাদেরই একটি প্রদেশের এবং সেই প্রদেশবাসীর কথা কিছু শোনাব। অবশ্য জানি না আমি তোমাদের মনের মধ্যে কোন বিশেষ রেখাপাত করতে পারব কি না? আমি বোম্বাই ও বোম্বাইবাসীদের কথা কিছু শোনাব। বোম্বাই প্রদেশ এখন দ্বিধাবিভক্ত। অর্ধেক গুজরাট এবং অর্ধেক মহারাষ্ট্র। এই মহারাষ্ট্রের রাজধানীর নাম 'বোম্বাই'।

এই শহরের পত্তন হয় ১৬৬১ খৃঃ। ১৬৯০ সালে ২৪শে আগষ্ট দ্বিতীয় চার্লস্ ওলন্দাজ (হল্যাণ্ড-এর) রাজার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য বোম্বাই যৌতুক হিসাবে পায়। এই দেশে গ্রীভস্ কটন কোম্পানীর 'ফস্টার' সাহেব প্রথম ১৮৯৭ খৃঃ মোটর গাড়ী আনেন। ১৯০১ সালে প্রথম ভারতীয় 'জামসেদজী টাটা' প্রথম বোম্বাইতে তাঁর মোটর গাড়ী আনেন। প্রথম ট্যাক্সি (Taxi) চালু হয় ১৯১১ সালে। বোম্বাইয়ে প্রথম 'পৌরসভা' স্থাপিত হয় ১৮৬৫ সালে। সভা নির্বাচন আরম্ভ হয় ১৮৭৩ খৃঃ। ভারতে প্রথম বেতার (Broad Casting) এই বোম্বাই শহর থেকেই আরম্ভ হয়। ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন "লর্ড আরউইন'। 'লেসলী উইলসন' তখন বোম্বাই-এর গভর্ণর (বর্তমানে রাজ্যপাল)। ১৮৫১ সালে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ১৮৫০ সালে প্রথম থিয়েটার "নভেলটি"। ১৯০৮ সালে প্রথম চলচ্চিত্র এই থিয়েটারেই দেখান হয়। ১৮৫৩ সালে কেরোসিনের বাতি জ্বালান হয়। ভারতে প্রথম রেল চলে এই বোম্বাই শহর হতে। ১৮৫৩ সালে ১৬ই এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানা ২২ মাইল পথ চলে। প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলছিল ১৯২৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী। দূরত্ব 'বোম্বাই' থেকে 'কুরলা' সাড়ে নয় মাইল পথ। গভর্ণর স্যার 'লেসলী উইলসন'এর উদ্বোধন করেন। ট্রাম গাড়ী চালু হয় ১৮৭৪ সালে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম চলে ১৯০৭ সালে। ছোট ভাই-বোনেরা, তোমরা আর একটু ধৈর্য ধর। আর ২।৪টি কথা বলেই বিদায় নেই। জাতীয় আন্দোলনে 'মারাঠারা' গুপ্ত সমিতির বীজ নিহিত করেন ১৮৯৩ সালে এই বোম্বাই শহরে। ভারতে প্রথম জাতীয় আন্দোলনে ফাঁসীর মঞ্চেও আরোহণ করেছিলেন দুই মারাঠা বীর "দামোদর চাপেকার" ও "বালকৃষ্ণ চাপেকার" ১৮৯৭ সালে। রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী দিনে 'র‍্যাণ্ড' ও "আয়ার্স্ট"কে হত্যা করার ফলে এই দণ্ড হয়। ১৯১৪ সালে মহামান্য 'তিলক' (ও এ্যানি বেসাণ্ট) হোমরুল বা আত্মকর্তৃত্বের আন্দোলন শুরু করেন এই বোম্বাই শহরে। ভারতীয় মহান জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৫ খৃঃ প্রথম অধিবেশন এই বোম্বাই শহরেই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হয়েছিল। বৃটিশভারতে 'লেজিসলেটিভ এসেমব্লি'র প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন মিঃ ভি, জে, প্যাটেল (১৯২০-২৫)। ইনিও এই প্রদেশেরই লোক ছিলেন। লণ্ডনের বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে প্রথম ভারতীয় সভ্য স্যার মুনচারজীর পর দাদাভাই নৌরোজী হয়েছিলেন। ইনিও বোম্বাই-এর এক সম্ভ্রান্ত পার্শি ভদ্রলোক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র ভারতে প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে এই বোম্বাই প্রদেশেই তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। আর প্রথম ভারতীয় "ফেলো অফ্ রয়েল সোসাইটী"র (F. R. S.) সদস্য হয়েছিলেন বোম্বাই-এর এক পার্শি ইঞ্জিনীয়ার, নাম এ, আর, কারসেটজী ১৮৪১ সালে।

শ্রীসুনীলকুমার নিয়োগী

চখা-চখির ছড়া

সেখ সামসুল হক

বিলের ধারে ব্যাঙ,
করে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
উড়ে এসে চখী
নেড়ে দু'টি পাখা।
ইয়া বড় লম্বা ঠোঁটে
ঠোকর দিল ব্যাঙের মাথে
ছটফটিয়ে ব্যাঙ
ছড়িয়ে চার ঠ্যাঙ
চখার ঠোঁটে আটকে গিয়ে
করে ক্যাঙর ক্যাঙ ॥

★ শ্বশুরবাড়ীর খাবার ★

নদের চাঁদ চক্রবর্তী ছিল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। টুকটুকে রং, বেশ সুন্দর চেহারা। কিন্তু দেখতে সুপুরুষ হ'লে কি হবে, তার মনটা ছিল বড় ভুলো। কোন কথাটাই তার মনে থাকত না। ছেলেবেলায় পণ্ডিত মশায়ের কাছে এর জন্য যে কত মার খেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আসলে নদেরচাঁদ লোক হিসেবে খুব খারাপ একটা ছিল না; তবে মাঝে মাঝে ভুলের বশে এমন সব কাণ্ড করে বসত, যার জন্য লোকে তাকে ছি-ছি করত।

সেবার নদেরচাঁদ গিয়েছিল শ্বশুর-বাড়ী। পরনে কালো পাড় ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, গলায় সোনার হার। বুকে ঝুলছে ঘড়ির সোনার চেন।

খাওয়া-দাওয়া ভালোই হয়েছিল। আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি কিছু ছিল না। চপ, কাট্‌লেট, সবই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সব চাইতে নদেরচাঁদ খুশী হয়েছিল গ্রামের খাবার গুড়পিঠে খেয়ে। মনে মনে ভাবে আর বলে, আহা-হা, মুখে যেন এখনও লেগে রয়েছে। বেড়ে চিজ বানিয়েছেন শাশুড়ী ঠাকরুণ। বাড়ী গিয়ে জিনিষটি আর একবার না খেলেই নয়। পাছে ভুল হয়ে যায়, তাই বস্তুটির নাম একখণ্ড কাগজে লিখে নিল সে। তারপর সেটা বেশ শক্ত করে ট্যাঁকে গুঁজে রাখল।

বাড়ীর পথে চলেছে নদেরচাঁদ, কোন দিকে তার খেয়াল নেই। চেনা কোন লোক দেখলে সেদিকে ফিরে চাইছে না নদেরচাঁদ;—পাছে কথা বলতে হয় এই ভয়ে।

কিছু দূর পথ যায়, আর 'গুড়পিঠে' বলে সে চেঁচিয়ে ওঠে। যদিও কাগজে বস্তুটির নাম লিখে রেখেছে, তবুও যেন সন্তুষ্ট নয়। তাই মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিচ্ছে নদেরচাঁদ একবার করে চেঁচিয়ে উঠে।

পথে দেখা হ'ল একটা লোকের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ীর চাকর। নমস্কার করে বলল, 'পেন্নাম হই জামাইবাবু, ভাল আছেন?'

কথা বলার ইচ্ছা ছিল না নদেরচাঁদের। কিন্তু পুরনো লোক, কথা না বললে কি ভাববে হয়ত, তাই সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

চাকরটি আবার জিগ্যেস করল, 'দিদিমণি, খোকাবাবু সব ভাল আছে?'

আবার ছোট্ট উত্তর, 'হ্যাঁ'।

চাকরটি আবার প্রশ্ন করল, "দেশে চাষ-আবাদ কেমন চলছে বাবু?"

স্নেহলতা দেবী

বার বার লোকটি প্রশ্ন করায় রীতিমত বিরক্তি বোধ করছিল নদের-চাঁদ। মনে মনে ভাবে আর বলে, 'সাত সকালে ব্যাটা বড় ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি।' তাই অন্যমনস্কতার ভান করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নদেরচাঁদ। লোকটি কোন উত্তর না পেয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

লোকটি চলে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল নদেরচাঁদ। কিন্তু এ কি? যে জিনিষটির নাম মুখস্ত করতে করতে এতটা রাস্তা এল, সেটা বেমালুম স্মৃতি থেকে উবে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবল নদেরচাঁদ। নিকটে একটা গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল, তারপর জল খেল, মাথায় টোক্‌কা মারল, কিন্তু গুড়পিঠে নামটা কিছুতেই মনে এল না।

মনটা রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল নদেরচাঁদের। ধড়ফড় করতে লাগল বুকের ভেতরটা। তাই চোখটা বুজে খানিকক্ষণ গাছে ঠেস দিয়ে বসে রইল।

তারপর রোদ একটু পড়লে বাড়ীর পথে রওনা হল সে। ট্যাঁক থেকে কাগজটা খুলে পড়ল কয়েকবার। তারপর নামটা ঠিক করে মুখস্থ করে নিয়ে আবার ট্যাঁকে শক্ত করে গুঁজে রাখল।

নদেরচাঁদ বলতে বলতে চলেছে গুড়পিঠে, গুড় পিঠে---

গাঁয়ের ভেতর ঢুকতে গেলে একটা নদী পার হতে হয়। নদীর ওপরে আছে বাঁশের পুল। সন্ধ্যে হয় হয়। অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি নদীর জলে পড়ে ভারি একটা সুন্দর দৃশ্য ফুটে উঠেছে। নদেরচাঁদ তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য।

হঠাৎ কোমরটা একটু চুলকে উঠতেই কাপড়ের বাঁধনটা একটু আলগা করল সে। সেই সময় বাঁশের ফাঁক দিয়ে তার ট্যাঁকের কাগজটা নদীর জলে পড়ে গেল।

তখনও নদেরচাঁদের খেয়াল নেই। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রস আহরণ করছে সে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার চমক ভাঙল। খেয়াল পড়ল তার কাগজটার ওপর। কিন্তু ততক্ষণে কাগজটি নদীর ক্ষীণ স্রোতে কোথায় তলিয়ে গেছে।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল নদেরচাঁদের। দু'চারবার বস্তুটির নাম মনে আনবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু হায়, নামটি কিছুতেই মনে এল না।

মুখ গোমড়া করে ঢুকলো বাড়ীতে। মা ছেলের মূর্তি দেখে ভয় পেলেন। আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলেন, 'কিরে, ভাল আছিস খোকা?'

রুক্ষস্বরে নদেরচাঁদ জবাব দিল, 'ভালো না থাকলে এখানে এলুম কি করে?'

জবাব শুনে মা আর কিছু বললেন না। মুখ নীচু করে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

কিন্তু গোল বাধল ঘরে ঢুকে। যখন নদেরচাঁদ দেখল তার সাধের ফুলদানিটা ভাঙা অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে, তখন তার

মাথাটা গরম হয়ে উঠল। ছেলে ভেজেছে শুনে দেওয়ালে ঠেসান ছড়িটা দিয়ে দমাদম পিটিয়ে দিল তাকে।

গোলমাল শুনে বাড়ীশুদ্ধ লোক ছুটে এল। নদেরচাঁদ তখন রাগে কাঁপছে। বউ এসে বেশ করে দু' কথা শুনিয়ে দিল। পাশের বাড়ী থেকে বর্ষীয়সী কয়েকজন মহিলাও এসেছিল চীৎকার শুনে। ছেলেটা তখন ভয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। পাড়ার ইন্দু পিসি তিরস্কারের সুরে বলল, 'তোর কি রকম রাগ র'ল। এমন মেরেছিস যে, বাছার আমার পিঠটা গুড়পিঠের মত ফুলে উঠেছে।'

—'কি বললে পিসি কথাটা। কিসের মত ফুলে উঠেছে?'

—'গুড়পিঠের মত, দেখ না, যদি না বিশ্বাস হয়।'

ওই একটা কথার জন্য এতবড় একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটেগেল পিসি। শ্বশুরবাড়ীতে থেকে এসেছিলুম মুখরোচক এই খাদ্যটা। কিন্তু মনে না পড়ার জন্য মেজাজটা আমার ভাল ছিল না। সামান্য একটা কথার জন্য বাছা আমার শুধু শুধু মার খেয়ে মরল,—বলেই নদেরচাঁদ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

★ সেরা মানুষের শেষ কথা ★

বিপুলা পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্ম হয়। প্রাত্যহিক জীবনের খেলা সাঙ্গ করে গতায়ু হয় তারা। তাদের মৃত্যু ঘটে রোগে, দুর্ঘটনায়, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের গোলাগুলীতে। ও-সব শ্রেণীর মানুষেরা শেষ সময়ে এমন কিছু লিখে বা বলে যায় না---যা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে। সেরা মানুষদের বেলায় তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অন্তিম সময়ে যে-সব কথা ও বাণী তাঁরা রেখে যান, তা ইতিহাসের পাতায় সোনার ফ্রেমে বাঁধা ছবির মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকে চিরকাল। দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্দারকে যখন তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা প্রশ্ন করে-ছিলেন: আপনার পরে কাকে সিংহাসনের অধিকারী করে যাবেন? উত্তরে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন: শক্তিমানকে। ওই মন্তব্যটুকু কী প্রমাণ করে না যে, 'আলেজান্দার দি গ্রেট' ছিলেন সত্যিই তিনি। একটা জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে এতদূর ব্যস্ত ছিলেন আর্কিমিডিস যে, অন্যদিকে মন দেবার সময় ছিল না তাঁর। সে সময় একজন উন্মত্ত রোম্যান সৈন্য এসে তাঁকে জিগ্যেস করলো, তুমি কী আর্কি-মিডিস? গভীর বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এত মগ্ন ছিলেন যে, ঘাড় না তুলেই বল্লেন: সমস্যার সমাধান আগে করি। পরে উত্তর দেবো। মূর্খ সৈনিক ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁকে হত্যা করে চলে গেলো। আবার অনেক---অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষদের বীণা অন্য সুরে বাজে শেষ সময়ে। তাঁরা বলে থাকেন: জীবনের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো। নিজেদের সৃষ্ট জিনিস যদিও গুণে শ্রেষ্ঠ, তবু ও-সবকে অকিঞ্চিৎকর মনে করতেন তাঁরা। টেলি-ফোন যন্ত্রের আবিষ্কারক আলেকজান্দার গ্রেহাম শেষ সময়ে বলেছিলেন: অতি অল্পই কাজ করতে পেরেছি---আরো অনেক কিছু করার ছিল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির স্রষ্টা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী

সুধাংশু গুপ্ত

আইজাক নিউটন, যিনি অচঞ্চল শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন, অন্তিমকালে নিজেকে একটি শিশুর সঙ্গে তুলনা করে বলে গেছলেন, আমি সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করেছি, বিশাল জ্ঞান-সমুদ্র আমার সম্মুখে অনাবিষ্কৃত পড়ে রয়েছে।

সর্বতোমুখী প্রতিভাবান শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি নিজেকে দোষী মনে করতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, ঈশ্বর ও মানব জাতিকে আমি আঘাত দিয়েছি। কেন না আমার শিল্প সৃষ্টি উঁচু মানের হয় নি---আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। এ-ধরনের উচ্চ আদর্শ শিল্পী ও মেধাবী মানুষের বেলায়ই খাটে।

সময় সময় দেখা যায়, মৃত্যুর কালো ছায়া গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জীবনে পূর্বেই রেখাপাত করে। আগেই জানতে পারেন, মৃত্যুর পদধ্বনি তাঁরা যেন।

প্রসিদ্ধ বৃটিশ প্রবন্ধকার কার্লাইল মৃত্যুর ছায়া পূর্বেই দেখতে পেয়ে-ছিলেন। তাই শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন: হ্যাঁ। তা' মৃত্যু। ভাল।

বিংশ শতকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষী বার্ণার্ড শ' ঠিক সেইভাবে তাঁর শুশ্রূষাকারিণীকে বলেছিলেন: তোমরা আমাকে দুর্লভ বস্তু করে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছো। আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষিত। মৃত্যুর প্রান্তে এসে পৌঁচেছি। এই কথা কয়টি বলেই জগৎ সংসার থেকে অপসৃত হয়েছিলেন তিনি।

খ্যাতিমান গ্রন্থকার এইচ জি ওয়েলস ধাত্রীকে শয্যার পাশে ডেকে বলেছিলেন: আমি তো ভালই আছি। তুমি একবার ঘুরে আসতে পার বাইরে থেকে। আশ্চর্য সে চলে যাওয়ার পরমুহূর্তেই জীবনাবসান হয় ওয়েলসের।

ধর্মান্ধ মোগল সম্রাট আওরংজেব কিন্তু অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিলেন। তনি বলেছিলেন: মানুষ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে কি কিছু জানতে পারে বা দেখতে পায়? আমি কিন্তু স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি আসন্ন মৃত্যুর আওয়াজ। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন।

মৃত্যুশয্যায় যশস্বী ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট তাঁর জামাতাকে মৃদুস্বরে বলেছিলেন: ও-অবস্থায় উপনীত হলে পবিত্র জীবনের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুতেই সান্ত্বনা পাবে না।

মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে অনেক সেরা

মনীষী চৈতন্যপ্রভুর মতো পড়তেন। হয়তো তাঁরা দেখতে পান তাঁদের পরবর্তী বাসস্থান। স্বর্গ, নরক ও পুনর্জন্মের ছবি। বিখ্যাত উদ্ভাবক টমাস আলভা এডিসনের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিলো : মৃত্যুর ওপার অতি মনোরম। এক সুষমাময় নন্দন কাননের ছবি হয়তো মনের পটে আগেই গাঁথা হয়েছিলো তাঁর।

সত্যদ্রষ্টা, ভগবতবিশ্বাসী মহামানবেরা মানুষের ভেতর কিছু মন্দ খুঁজে পান না। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর অলৌকিক অবস্থায় ক্ষীণকণ্ঠে ঝংকৃত হয়েছিলো : হে রাম, হে রাম।

ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় নিজের শরীরের নিদারুণ ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে মহাপুরুষ যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন : প্রভো। আমি তোমাকেই দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করেছি। তোমাকে আদর্শ ধ্রুবতারা করে জীবনপথে অগ্রসর হচ্ছিলাম। ওরকম কথা তাঁর মুখেই সম্ভব। কেন না, একদল লোক তাঁর অনুসৃত ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ হোতা লোকমান্য তিলক মৃত্যুর কিছু পূর্বে বলেছিলেন : স্বরাজই আমার একমাত্র কাম্য। স্বরাজ না পেলে ভারতের ভাগ্যাকাশ মেঘাবৃত থাকবে। এর ভেতরই লুকিয়ে আছে সেই সৌভাগ্যের চন্দ্রিমা।

এই সব বরেণ্য মনীষীর স্মরণীয় জীবনের শেষ কথা সমগ্র মানব জাতিকে এক অজানা আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে নেয়।

★ ম্যাজিকের গল্প ★

জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)

অনেক চালাক লোক দেখেছি, কিন্তু সুধীরের মতো এমন ধুরন্ধর চালাক আগে দেখেছি কিনা সন্দেহ আছে। প্রথমে কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে আমায় ভুলোচ্ছিল, কিন্তু পরে যখন দেখলাম ওর মতলব অন্যরকম—তখনই ঠিক করেছি—আর ওর মিষ্টি কথায় ভুলবো না, বরঞ্চ ওর কথা দিয়েই ওকে ঠকাব।

গত বছর ২৫শে সেপ্টেম্বর আমি বঙ্গোপসাগরে বাক্সবন্দী হয়ে সাগরে ঝাঁপ দেবার যে খেলাটা দেখিয়েছিলাম, সেই খেলাটার কলাকৌশল সুধীর জানতে চায়। ওর ধারণা ছিল বার কয়েক আমার সঙ্গে মিশে অথবা কিছু মিষ্টি কথা বলে আমায় জপিয়ে কৌশলটা শিখে নেবে। কিন্তু মশাই, শিক্ষা আমার অনেক হয়েছে। কাউকে বন্ধু ভেবে কৌশল শিখিয়ে দিলে—তার পরের মুহূর্তে সে 'আমিও পারি'—বলে আবার আমাকেই যে অপদস্থ করবার চেষ্টা করে—সেটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা ; সুতরাং ঠিক করেছি 'স্পিকটি নট্'। ক্ষমতা থাকে তো করে নাও বা ক'রে দেখাও। আমি আর শেখাচ্ছি না বাবা।

সাগরে ঝাঁপ দেবার আগে—যখন সবেমাত্র আমি খেলাটা দেখাবো ব'লে ঘোষণা করে এফ. বি. আই, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে চ্যালেঞ্জ করলাম, ঠিক সেই সময়েই সুধীর একবার আবির্ভূত হয়েছিল। এক ধরনের মানুষ আছে—যাদের বছরের কোনও সময়েই দেখা যায় না। কিন্তু অন্যের কাজে ব্যাগড়া দেবার জন্য হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে নিজের অস্তিত্ব জানায়, আমাদের সুধীর হচ্ছে ঐ শ্রেণীর লোকদের একজন। সুতরাং তার আবির্ভাব দেখে মোটেই অবাক হইনি। প্রথমে ঘরে এসেই সে বলেছিল—"প্রদীপদা একটা ছোট্ট খেলা দিয়ে বেশ ষ্টাণ্ট দিলেন। আপনার চালাকির তারিফ করতে হয়।" চমকে উঠলাম। আমি বললাম—'ছোট্ট খেলা মানে?' একটু মিনি হেসে সুধীর বললো—"কেন। খেলাটা তো পুরোন খেলা, এটা তো ইলিউশন বক্স নামে পরিচিত" আমার মনে খুব দুঃখ হলো। কি অদ্ভুত প্রাণী লোকটা ভেবে। বললাম—'খেলাটা দেখবার আগেই দেখছি

পি সি সরকার (জুনিয়র)

খেলাটার কৌশল বুঝে গেলে—ম্যাজিক ছেড়ে জ্যোতিষ হ'তে চ'লেছ নাকি?' সুধীরের মুখে ক্ষণিকের তরে একটু চিন্তা দেখা দিল, আর তার পরেই কি যেন একটা ব'লতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে আমি বলি---'ইলিউশন বক্সের সমস্ত দর্শকই কি খেলার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ক'রতে পারেন? খেলা হ'য়ে যাবার পর আবার কি সব কিছু দর্শকদের পরীক্ষা ক'রতে দেওয়া হয়? বাক্সটাকে কি লোহার পাত দিয়ে মুড়িয়ে ওয়েল্ডিং ক'রতে দেওয়া হয়? ইলিউসন বক্স খেলাতে কি মৃত্যুভয় আছে? একটা বাক্সের ভেতর জাদুকরকে বন্দী ক'রে রাখা হ'লো আর সেই বন্দী অবস্থাতেই জাদুকর বাক্সের বাইরে রাখা বাঁয়া তবলা বাজালেন অথবা বাক্সের মধ্যে রাখা জাদুকর একজন সহকারীর সাহায্যে বাইরে বেরিয়ে এলেন—সে খেলার সঙ্গে এই খেলার কি কোনও যোগ-সাজস আছে ব'লে মনে হয়? একটু বিদ্যেবুদ্ধি খাটাও, দেখতে পাবে গান্ধীপোকা আর গান্ধীজী এক নয়।'

কথার মোড় ঘুরিয়ে নিল সুধীর। হঠাৎ গদগদ হয়ে উঠে আমায় প্রণাম ক'রে বললে---'মাপ করো প্রদীপদা, আমি ঠাট্টা করছিলাম।' হ্যাঁ, একটা কথা ব'লে রাখি। সুধীর কিন্তু আমার চেয়ে বয়েসে বড়ো---কিন্তু তবুও আমায় দাদা ব'লে ডাকে এবং মাঝে মাঝে হঠাৎ এমনভাবে চমকে দিয়ে প্রণামও ক'রে ফেলে। এর কারণটা আমার এই মোটা মাথায় আগে ঢুকতো না। ভাবতাম এটা বোধ হয় পুনর্যৌবন লাভের সহজতম পদ্ধতি। কিন্তু পরে বুঝেছি, ওটা আর কিছু নয়—আমায় একটু 'ইয়ে' দিল আর কি।

এই হচ্ছে আমাদের জাদুকর সুধীরের এক মোটামুটি পরিচয়। আর এই সুধীরবাবুই এখন ঘুর ঘুর ক'রছে ম্যাজিকটার আসল কলাকৌশল জানার জন্য।

ওকে জব্দ করবার জন্য একটা ছোট্ট ফন্দি মাথায় এলো। ওকে বললাম---আমার পরবর্তী 'চ্যালেঞ্জ শো' কি জানো? সে কিছু না ব'লে ব্লটিং পেপারের মতো অভিব্যক্তি প্রকাশ ক'রে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। আমি বললাম---'আমার পরবর্তী খেলা হচ্ছে---আমায় আপাদমস্তক লোহার চেন দিয়ে বেঁধে হ্যাণ্ডকাফ, তালা ইত্যাদি দিয়ে লক্ ক'রে জ্বলন্ত চিতার মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে—আর আমি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে মুক্ত ক'রে---সেই আগুন থেকে সুস্থ শরীরে বেরিয়ে আসবো। খেলাটা খুব কঠিন, তবে আমি নিয়মিত অভ্যাস ক'রে যাচ্ছি।'

সুধীরের মুখ থেকে গোঙানির মতো কয়েকটা কথা বেরুলো। 'আগুনে---নিয়মিত অভ্যাস?' আমি নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললাম---'হ্যাঁ, রোজই অভ্যাস করছি আমি। আমি প্রতিদিন আমার দেহে পেট্রোল ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে উত্তাপটাকে গা সওয়া ক'রে নিচ্ছি। দেখতে চাও তো এখনই দেখাতে পারি।' সুধীর একটু ঢোঁক গিললো। বুঝলাম, বেশ চমকেছে সে। আমি একটু পেট্রোল যোগাড় ক'রে এনে আমার বাঁ হাতের তালুতে ঢাললাম। আর তারপর সুধীরকেই বললাম একটা দেশলাই জ্বালিয়ে ঐ পেট্রোলে ধরিয়ে দিতে। সে তার কাঁপা কাঁপা হাতের বেশ তৎপরতা দেখালো। দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো আগুন আমার বাঁ হাতের তালুতে। বিস্ফারিত নেত্র সুধীরবাবুর ঐ হতভম্ব মুখ আমার এখনও চোখে ভাসছে। মনে আছে, আমার হাতটাকে পরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে সে বাড়ীতে জরুরী কাজ আছে জানিয়ে চ'লে গেছিল।

সুধীর সেদিন যা দেখে অবাক হ'য়েছিল---সেটা আর কিছুই নয়, একটা ছোট্ট কেমিক্যাল ম্যাজিক। ঐ আগুনটা ছিল এক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের আগুন। কার্বন-ডাইসালফাইড আর কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড মিশিয়ে আমি ঐ বিশেষ জ্বালানী তৈরী করেছিলাম। ঐ বিশেষ জ্বালানীকেই আমি পেট্রোল ব'লে চালিয়েছিলাম। ঐ মিশ্রণে আগুন জ্বালালে হাত পোড়া তো দূরের কথা, হাতে মোটেই গরম লাগে না। এটা যে-কেউই অনায়াসে ক'রতে পারে।

সুধীরের বিদ্যা-বুদ্ধির বহর আমার জানা আছে। আমি জানি, রসায়নের ও কিছুই জানে না। সুতরাং ম্যাজিকটা ধরা তো দূরের কথা---এ নিয়ে বেশী সাড়াশব্দ ও ক'রবে না। যাই হোক, সুধীরের খবর এই দু-একদিন আগে পেয়েছি। শুনলাম, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ও হাত পুড়িয়ে বাড়ীতে পড়ে আছে---আজ বেশ কদিন হ'লো। হাজার হোক বন্ধু তো, তাই ভাবছি একদিন ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে আসবো। ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে আমার একবার যাওয়া উচিত। তাই নয় কি?

পরবাস

গৌর মোদক

নদীর বালুচরে ওড়ে গাঙচিল—
লঘু মেঘ গায়ে মাখে আকাশের নীল
আদিগন্ত ধানখেত—সবুজ সমুদ্র।
নিভে আসে ক্রমশ দিনান্ত রৌদ্র।

আকাশের বুকে ফোটে দু-একটি তারা,
চেয়ে দেখি দূরে নভে পাখিদের ফেরা।
ভাবি, অলক্ষ্য নিয়মে কেমন পাকে কাঁচা ধান,
বাতাসে বিহ্বলতা আনে তারই সুঘ্রাণ।

শ্রাবণের এক পশলা বৃষ্টির শেষে,
স্নাতস্নিগ্ধ প্রকৃতির এই পরিবেশে।
তবু পড়ে গোপনে রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস।
মনে হয় এ জীবন দীর্ঘ পরবাস।

★ ভূমিকম্পের কথা ★

অলোককুমার সেন

মাত্র কয়েক মাস আগে (১৯৭০ সালের জুন মাসে) দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যে হলো এক ভয়াবহ ভূমিকম্প---যার কবলে প্রায় এক লক্ষ মানুষ হলেন নিহত বা আহত, আর কত লক্ষ মানুষ হলো গৃহহারা, তা সহজেই অনুমেয়। ভূমিকম্প ভেঙ্গে দিলো মানুষের শান্তির নীড়, আশার সৌধ; পেরুর বিখ্যাত সমৃদ্ধ জনপদ পরিণত হলো জনমানবহীন মহাশ্মশানে। নির্মম ভূমিকম্পের নিষ্ঠুর আঘাতে কত মাতা হলেন পুত্রহারা, বধূ হলেন স্বামীহীনা, তার সন্তানরা হারালো পিতাকে। পুত্রহারা স্নেহময়ী জননীর করুণ আর্তনাদ, স্বামীহীনা বিধবার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ও পিতাহারা সন্তানের কাতর ক্রন্দন ভরিয়ে তুললো আকাশ---বাতাস, ভূকম্পনকে দিলো চরম অভিশাপ।

প্রথম পর্যায়

কিন্তু সত্যি কি ভূমিকম্প শুধু অমঙ্গলের প্রতীক? অশুভের বার্তাবাহক? ধ্বংসের দূত, না কি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে নবীন জীবনের বীজ? তাই তো পেরুর মানুষ নতুন উদ্যমে শুরু করলো নবজীবনের জয়যাত্রা, ঘর বাঁধলো পরিত্যক্ত গ্রামে, ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে। প্রকৃতির সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামে পেরুবাসী হয়েছে মত্ত। এইভাবে প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘোষণা করে অনাদি অনন্ত প্রাণপ্রবাহের জয়ধ্বনি। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হলো মৃত্যু ও জীবনের দূত ভূমিকম্পের রহস্য উন্মোচন করে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা।

ভূমিকম্পের কারণঃ পুরাণের অলৌকিক কাহিনী

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভূমিকম্প তার ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে অসহায় মানুষের রাজ্যে দিয়েছে বার বার হানা। তার নির্মম প্রলয় লীলার শিকার হয়েছে অসংখ্য মানুষ। তাই আমাদের পূর্বপুরুষরা ভূমিকম্পের উৎপত্তির অন্তরালে করেছে অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা, অতিপ্রাকৃত ঘটনার অন্বেষণ।

ভারতীয় পুরাণ অনুসারে বলা হয় যে, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কুপিতা হলে জলপ্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে থাকে। আবার অনেকে বলেন যে, বাসুকি নাগের সহস্র ফণার ওপর ধরিত্রী অবস্থিত।

কোন কারণে বাসুকি তাঁর ফণা আন্দোলিত করলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। ইহুদীরা বলেন যে, ভূগর্ভে বাস করে এক বিশালকায় দৈত্য। তার চলাফেরাতেই ভূমিকম্প হয়ে থাকে। কিন্তু উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের ধারণা, বিরাট কচ্ছপের পিঠে রয়েছেন বসুমতী। আবার দক্ষিণ আমেরিকাবাসীদের বিশ্বাস, মস্ত বড়ো তিমির পিঠে বসুন্ধরার অবস্থান। এই কচ্ছপ বা তিমিরের ঘোরাফেরাতেই ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। জাপানীরা মনে করে যে, মাকড়সার মত দেখতে এক দৈত্য রেগে গিয়ে ভূমিকম্প বাধান। চীনাদের মতানুসারে বলা হয় যে, বিরাট এক মাছের লেজের তাড়নায় কম্পন দেখা দেয়। মঙ্গোলিয়ানরা ভাবে যে, ব্যাঙের গায়ে বসুন্ধরা উপবেশন করে আছেন। এই ব্যাঙের নড়াচড়াতেই ভূমিকম্প দেখা দেয়।

শুধু প্রাচীনকালেই নয়, আধুনিককালেও ভূমিকম্প সম্বন্ধে শোনা গেছে অবাস্তব তত্ত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগালের লিসবনে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। এই কম্পনের হাত থেকে রক্ষা পাবার পর কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ মনে করে যে, লিসবনে প্রোটেস্ট্যানদের উপস্থিতি এই ভূমিকম্পের কারণ। আবার ইংলণ্ডের ধর্মযাজকরা ঘোষণা করেন যে, লিসবন রোমান ক্যাথলিকদের দেশ হওয়ায় ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করেছেন।

ভূমিকম্পনের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাচীন মানুষদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অসহায়তা, অশিক্ষা আর কুসংস্কার হলো অতিপ্রাকৃত কাহিনীর উৎস। সভ্যতার আলোকে মানবমনের কুসংস্কার হয়েছে দূরীভূত। সে যুক্তির সাহায্যে জানতে চেয়েছে ভূমিকম্পের কারণ, অনুসন্ধান করেছে তার ভয়াবহতার ইতিহাস।

ভূমিকম্পের কারণঃ বিজ্ঞানীদের মতবাদ

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হিন্দু জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির ভূমিকম্পের কারণ নির্দেশ করেন।

তাঁর মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে, বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপের অসমতা ঘটলে, গ্রহাবলীর মাধ্যাকর্ষণের অসামঞ্জস্য দেখা দিলে বা ভূগর্ভের মৌলিক পদার্থের তাপ বিকিরণের ফলে কম্পনের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য ভারতীয়
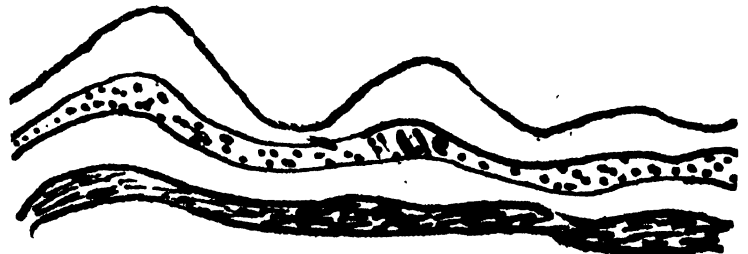
দ্বিতীয় পর্যায়

বিজ্ঞানিগণ বলেন যে, অত্যাধিক বৃষ্টিপাত অথবা ভূগর্ভস্থ তরলের অবস্থার পরিবর্তন (Change of state) ভূকম্পের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মতবাদ তাঁদের বৈজ্ঞানিক মননশীলতা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। আজ নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে তাঁদের কয়েকটি সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়
১নং চিত্র (ভাঁজযুক্ত পর্বতের গঠন)

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে পৃথিবীর নানা দেশের ভূতত্ত্ববিদগণ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের সম্মিলিত গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, ভূ-ত্বকের প্রথম চল্লিশ মাইল গ্রানাইট শিলায় গঠিত আর তার নীচে রয়েছে ধাতব শিলার স্তর। এই কঠিন আবরণের মধ্যে অপরিসীম তাপ রয়েছে বন্দী হয়ে। তবে অনেকে মনে করেন যে, ভূগর্ভের প্রচণ্ড উত্তাপে কোন পদার্থ কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না, তারা থাকে গলিত তরল বা দ্রবীভূত গ্যাসীয় অবস্থায়। এই গলিত তরলের ওপর উপরের স্তরগুলির প্রদত্ত চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই ভূমিকম্পনের উদ্ভব হয়।

কেউ কেউ বলেন যে, ভূত্বকের উপরিস্তলের স্তরবিন্যাস সমান বেধযুক্ত নয়। তাই যেখানে স্তর কিছুটা পাতলা, সেখান দিয়ে অভ্যন্তরস্থ বস্তুরাশি অগ্ন্যুৎপাতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমন অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে আগ্নেয়গিরি না থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই ভূমিকম্প হয়ে থাকে। এই জাতীয় ভূমিকম্পনের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রচণ্ড উত্তাপের কারণ হলো রেডিয়াম ধাতুর উপস্থিতি আর এই রেডিয়ামই ভূমিকম্পের গৌণ কারণ। "উত্তাপের অপচয়ের ফলে ভূপৃষ্ঠের সঙ্কোচনের জন্য কম্পন সৃষ্টি হয়।"—একথা জানিয়েছেন রুশ-বিজ্ঞানীরা। আবার কয়েকজন বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ বলের তারতম্যের জন্য ভূমিকম্প হতে পারে। পৃথিবীর আকার পুরো গোল না হওয়ায় তার ভূপৃষ্ঠ সব জায়গায় সমান নয় বলে এই বলের তারতম্য দেখা যায়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণেই ভূমিকম্প ঘটে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্পর্কে দুই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর মতবাদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা হলেন ওয়েজেনার (Wegener) আর সি ই ডাটন। ওয়েজেনার বলেন, 'গ্রানাইট পাথর আর অন্যান্য শিলায় গঠিত মহাদেশগুলি বেশী ঘনত্বযুক্ত তরল ধাতব পদার্থের ওপর ভাসমান অবস্থায় আছে। বহু বছর আগে থেকেই পৃথিবীর ভূগর্ভে সঞ্চিত গলিত পদার্থ ভূস্তরের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। তাই কোন কারণে এই ভারসাম্যের ব্যতিক্রম ঘটলে ভূস্তরে কম্পন শুরু হয়। ভূস্তর বেঁকেচুরে, উঁচু-নীচু হয়ে সমতা রক্ষা করে।'

আবার ডাটন বলেন, 'পৃথিবী শৈশব অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাপ সঞ্চয় করে শীতল ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। মেঘরাশি জমে গিয়ে পরিণত হয় বৃষ্টিতে। বহু বছর ধরে অবিরাম বর্ষণের ফলে জল জমতে জমতে পৃথিবীর ভূত্বক যায় ডুবে। তারপর শ্রেণী আবার সঙ্কুচিত হওয়ায় জলের মধ্যে থেকে স্থলভাগের সৃষ্টি হয়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে জলস্রোতের ফলে ভূত্বক ক্রমশ ক্ষয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় পলি পড়ে পড়ে স্তর তৈরী হতে থাকে। পলি জমা হয়ে কোন কোন স্তর এত ভারী হয়ে পড়ে যে, ভূমিকম্প সৃষ্টি করে, ভূপৃষ্ঠ ভারসাম্য রক্ষা করে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভূবিজ্ঞানী-দের মতবাদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁদের মতে ভূমিকম্প হয় প্রথমত ভূপাতের (Land-Slip) ফলে, দ্বিতীয়ত ভূগর্ভের তাপ বিকিরণের জন্যে আর তৃতীয়ত ভূগর্ভে সঞ্চিত বাষ্পের আধিক্য ঘটলে।

সম্প্রতি ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে এক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাহাড়ের ভাঁজ আর ফাটল দেখে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পৃথিবী সর্বদাই প্রসারিত আর সঙ্কোচিত হচ্ছে। এই প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে দেখা যায় আলোড়ন। একটা সম্পূর্ণ প্রসারণ ও সঙ্কোচনকে পূর্ণ স্পন্দন (Total Vibration) বলা হয়। পৃথিবীর একটা স্পন্দন শেষ হয় এক ছায়াপথ বছরে, অর্থাৎ সূর্য তার ছায়াপথে একবার পরিভ্রমণ করতে যে সময় নেয়। এক ছায়াপথ বছর হলো আমাদের আঠারো

২নং চিত্র *A*—গ্রস্ত উপত্যকা, *B*—স্তূপ পর্বত
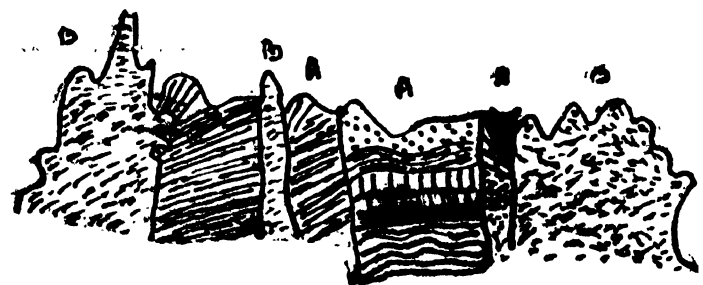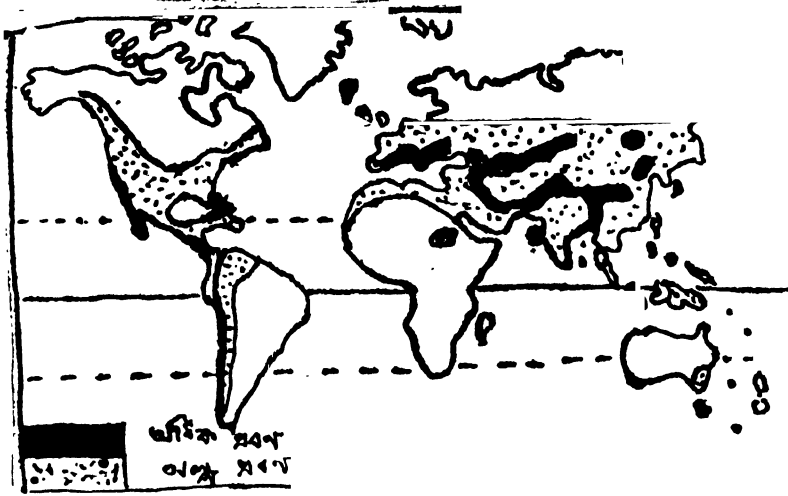
৩নং চিত্র ভূমিকম্পপ্রবণ স্থানসমূহ

কোটি বছরের সমান। প্রতি স্পন্দনের শুরুতে আর শেষে ভূপৃষ্ঠে দেখা দেয় প্রচণ্ড কম্পন---যার ফলে স্তরবিন্যাসে ঘটে এক বিরাট পরিবর্তন। আঠারো কোটি বছর অন্তর ভূমিকম্পের আধিক্য হয় কি না, তা অবশ্য এখনো পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রমাণিত হয় নি। তবে বিশ্বের নানা দেশে চলেছে গবেষণা আর অনুসন্ধান। আশা করা যায় যে, সপ্তম দশকেই ভূমিকম্পের রহস্য আবরণ হবে উন্মোচিত, আমরা শুনতে পাবো তার বহু অশ্রুত কাহিনী।

ভূমিকম্পের প্রভাব

শুধু ধ্বংস আর প্রলয়ের উন্মাদনায় মেতে থাকাই ভূকম্পনের কাজ নয়, ভূত্বকের গঠন ও স্তরবিন্যাসে, আগ্নেয়গিরি আর পর্বতের জন্মদানে, নদীর গতিপথের পরিবর্তন সাধনে ও প্রাকৃতিক জল-হাওয়ার বৈচিত্র্য-বিন্যাসে রয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

ভূতাত্ত্বিকরা বলেন যে, হিমালয় সৃষ্টি ও সাহারা মরুর উৎপত্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে ভূমিকম্পের আবির্ভাব। একদিন যে বিস্তৃত অঞ্চল ছিল হিম-নিমজ্জিত দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির তলায়, তার মধ্যেও যেন কোন মায়াবীর মন্ত্রবলে উঠলো জেগে বিশাল পাহাড়---নাম হিমালয়। সাগর থেকে মেরু সৃষ্টির এই অভিনব কাহিনী শুনিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান। সে জানাচ্ছে যে, নগাধিরাজ হিমালয় হলো ভঙ্গিল পর্বত---যার উৎপত্তি হয়েছে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপের ক্রিয়ার ফলে অনুভূত আলোড়ন বা কম্পনে। কিভাবে ভূকম্প থেকে পাহাড় সৃষ্টি হয় তা দেখানো হয়েছে ১নং চিত্রে। প্রথম পর্যায়ে হলো সাধারণ শিলাস্তরের ছবি। ভূমিকম্পের প্রভাবে এই স্তর কিভাবে বেঁকেচুরে যায় তাই দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। ক্রমশ ভাঁজগুলো পরস্পরের কাছাকাছি এসে পাহাড়ের আকার ধারণ করে।

আবার অনেক সময় কম্পনের ফলে ভূত্বক খাড়াভাবে কেটে যায় ও এক অংশ স্থানচ্যুত হয়ে নীচে যায় নেমে। এই অবস্থাকে চ্যুতি বলা হয়। দুই চ্যুতির মধ্যবর্তী স্থান পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে ওঠে। এই জাতীয় পাহাড়ের নাম স্তূপপর্বত। দ্বিতীয় চিত্রে স্তূপপর্বত দেখানো হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি ও আন্নামালাই পাহাড় এই ধরনের।

যে আফ্রিকার বুকে দাঁড়িয়েছিলো বিশাল সমভূমি, শস্যশ্যামলা উর্বর প্রান্তর, নদীবিধৌত সমতলভূমি, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তা যেন কেমন করে উত্তপ্ত মরু সাহারায় হলো রূপান্তরিত। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা নিয়ে গঠিত "গণ্ডোয়ানা" মহাদেশে ধরলো ভাঙন, সে বিভক্ত হলো তিনটি মহাদেশে। এসব ঘটনার আড়ালে রয়েছে ভূকম্পনের কারসাজি।

সাম্প্রতিককালে সংঘটিত ভূমিকম্পও ভূত্বকের গঠনপ্রকৃতির ওপর প্রভাব ফেলেছে। আসামের ভূকম্পে লখিমপুর জেলার উত্তর-পূর্বাংশে উদ্ভব ঘটে এক ভাস্বর লাল পাহাড়ের। গুজরাটের কম্পনে পঞ্চাশ ফুট চওড়া ফাটলের সৃষ্টি হয়, কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ করে আত্মপ্রকাশ, তার নদীগর্ভে দেখা দেয় শীতল জলপ্রবাহ।

গভীর সমুদ্রের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির সুপ্তিভঙ্গ ঘটলে সে তার রুদ্ধ আক্রোশে লাভা উৎক্ষিপ্ত করে জন্ম দেয় নতুন নতুন দ্বীপের। প্রশান্ত মহাসাগরের একাধিক দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির

ভূমিকম্পের আত্ম-লিপি
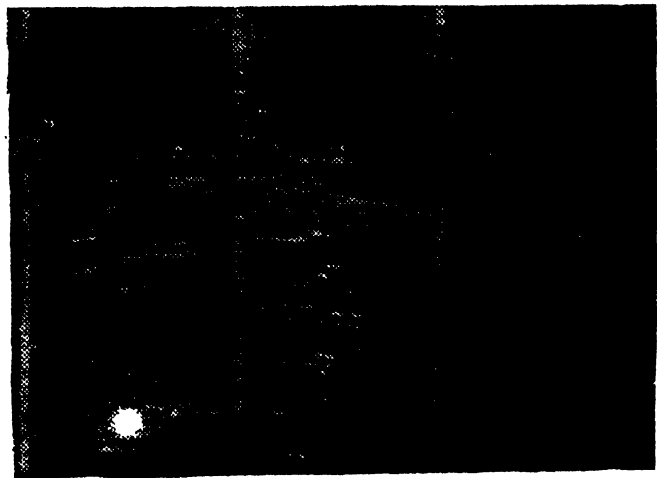
অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। এছাড়া ধাতব পদার্থের খনি অঞ্চলেও ভূকম্পের দান অবশ্য স্বীকার্য।

ধরিত্রী সৃষ্টির পর প্রথম কয়েক লক্ষ বছর ধরে চলতে থাকে অবিরাম ভূকম্পন, তার ফলে ভূপ্রকৃতির তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হতে থাকে ও স্থায়ী আকার লাভ করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, পৃথিবীর বর্তমান আকারের ওপর ভূকম্পের দান অপরিসীম। আবার বসুমতীর বয়স যতই বাড়বে ভূমিকম্পের প্রাবল্য ততই কমতে থাকবে। এইভাবে হয়ত কোন একদিন আমাদের চিরচঞ্চলা অনন্ত-যৌবনা বসুন্ধরা রূপান্তরিত হবে শান্তশিষ্ট কোমলস্বভাবা ধরণীতে। তবে সেদিন আসবে আজ থেকে অনেক অনেক বছর পরে।

ভূকম্প পরিজ্ঞাপক যন্ত্র।

ভূকম্পের গতিপ্রকৃতির অন্বেষণ করার জন্যে আর তার আগমনবার্তা ঘোষিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন উন্নত ধরনের ভূকম্প পরিজ্ঞাপক যন্ত্র। এই যন্ত্রের নাম সিস্মোগ্রাফ। এটি আবিষ্কার করেন ডেভিড মিস্নে সিস্মোমিটার -১৮৪১ সালে। সেই বছরেই জে ডি ফরবেস আরও উন্নত ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৮৫ সালে ভিসুভিয়াস মানমন্দিরে "সিসমোগ্রাফ" যন্ত্র স্থাপিত হয়। তারপর বহু বিজ্ঞান-সেবকের
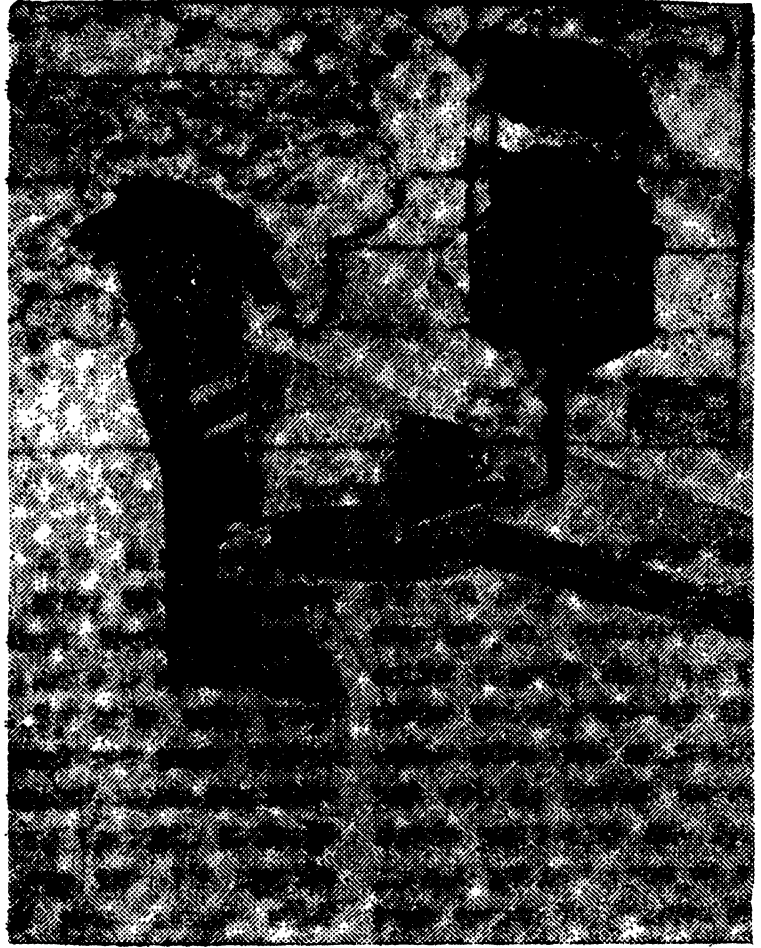
ভূকম্প রেখা-লিপি যন্ত্র—ম্যাক্কম-রোমবার্গ সিস্মোমিটার

অক্লান্ত প্রচেষ্টায় যন্ত্রটির প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে।

এখন সিসমোগ্রাফের গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলছি। প্রাথমিক অবস্থায় যন্ত্রটিতে দোলক ও শলাকা ব্যবহৃত হয়েছিল। খুব উঁচু থেকে লম্বা তারের সঙ্গে একটা ভারী দোলক ঝোলানো হতো। দোলকসংলগ্ন একটা শলাকা বালির ওপর করত কম্পনের রেখাঙ্কন। অনেকে আবার ভুযো-মাখান সিলিণ্ডারের ওপর দু'টো সূক্ষ্মাগ্র কলম লাগিয়ে ভূকম্পন নির্ণয় করেন। সিলিণ্ডারটি ভূমিকম্পের বেগে ধীরে ধীরে আবর্তিত হয়, তার কলমের দ্বারা ঢেউয়ের মত সাদা দাগ পড়ে। বর্তমানকালে দোলক ও সিলিণ্ডারের নিজস্ব কম্পন দূর করার জন্যে 'ড্যাম্পিং' পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, আর তড়িৎশক্তির সাহায্যে যন্ত্রের পরিবর্ধন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা
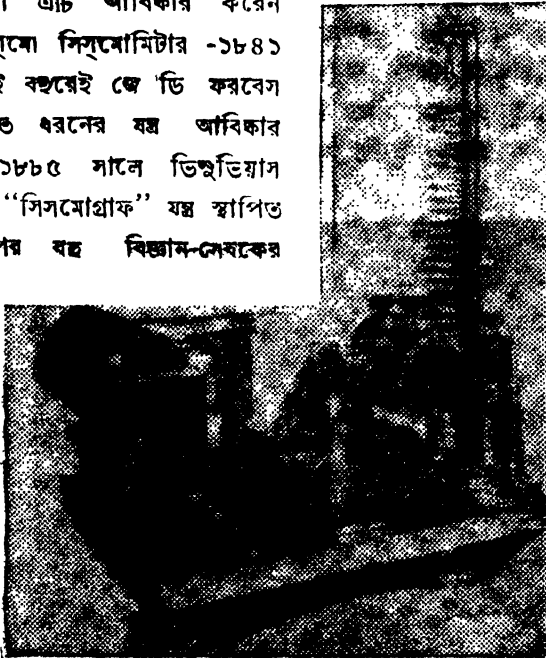
ভূগর্ভ থেকে উপকেন্দ্র পর্যন্ত লম্বালম্বি কম্পন অঙ্কিত করবার যন্ত্র। বাঁ-দিকে চোঙের গায়ে ভুষামাখানো কাগজে 'সিলিণ্ডারের' সাহায্যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। ডানদিকে ভারী দোলক উপরে নীচে কম্পিত হয়।

প্রভু, তোমাকে—

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

অথচ,
প্রতিনিয়ত সকালে
কিংবা স্বর্ণ গোধূলিতে
প্রভু, তোমার আশীর্বাদ নিয়ে
আমাদের আকাঙ্ক্ষা-আকাশ
নগরে—বন্দরে—
ক্রমে ব্যাপ্ত হয় চেতনার প্রগলভ মীড়ে,
স্বপ্নিল রামধনু ভাসে
দিগন্তের স্মিত চক্রবালেঃ শ্বেত শঙ্খচিল
উড়ে আসে
সুরভিত হৃদয়ের
ভালবাসা কুসুমের ঘরে বারোমাস।

শুধু ভাবি
কি আশ্চর্য তুমি।
এই পৃথিবীর ভাঙ্গা-গড়া স্নেহ খেলাঘর
অপরূপা আত্মিক রূপালী
হাসি-কান্না আলো-অন্ধকার
এই নিয়ে
ষড়রিপু সংসারের আরণ্যক প্রশ্ন নির্ঝরে
আনন্দ, বেদনা আর
উৎসবের নক্ষত্র ধূসরে
গোলাপের প্রস্ফুটিত প্রাণবৃন্তে
তুমি
সব কামনার
মগ্ননীল তপোনিষ্ঠ ডালি।

হয়েছে। 'সিসমোগ্রাফের' গঠনবৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন বিজ্ঞানী প্যালিটজন। তাঁর যন্ত্রে একটি দণ্ড ওপরে ও নীচে কম্পিত হয়ে গ্যালভ্যানো মিটারের সাহায্যে বহুগুণ বর্ধিত আকারে ফটোগ্রাফির কাগজে রেখাচিত্র অঙ্কন করে। এই যন্ত্রে গোলাকার একটা খুব ভারী পদার্থ ফ্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, আর ফ্রেমটি স্প্রিং দিয়ে প্রধান কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। ফ্রেমের বাইরে থাকে কয়েকটি তড়িৎ-কুণ্ডলী। ওপর থেকে কম্পন হলে কাঠামোটা হয় আলোড়িত আর চৌম্বক ক্ষেত্রের স্পন্দনের ফলে তড়িৎশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তা উপস্থিত হয় গালভ্যানো মিটারে। গালভ্যানো মিটারের আয়না থেকে আলোক-রশ্মি ফটোগ্রাফির কাগজে বর্ধিতাকার রেখাচিত্র অঙ্কন করে।

ম্যাক্কম রোমবার্গ যন্ত্রে দণ্ডটি শোয়ানো থাকে। এ যন্ত্রে পাশাপাশি কম্পনের রেখাচিত্র পাওয়া যায়। "সিসমোগ্রাফ" যন্ত্রের সাহায্যে ভূ-বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, পৃথিবীর কোথায় কোথায় বেশী ভূকম্প হয়ে থাকে। এই জায়গাগুলোকে বলা হয় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। সাধারণত জাপান, দক্ষিণ আমেরিকা, ভূমধ্যসাগরের চতুর্দিক, হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চল আর মধ্য চীনে ভূকম্পের প্রকোপ বেশী। আবার দেখা গেছে যে, ব্রাজিল, কানাডা, রাশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় কম্পনের প্রাবল্য কম।

"অ্যাপোলো---১২"র নভোচারীরা চাঁদের বুকে রেখে এসেছেন ক'টি অতি উন্নত "সিসমোগ্রাফ"---যারা পাঠাচ্ছে ভূকম্পনের বার্তা আর স্পন্দনের সাড়া-লিপি। এভাবে "সিসমোগ্রাফ" মানুষের জ্ঞানবিস্তারে রেখে যাচ্ছে স্মরণযোগ্য অবদান।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ হয়েছে অবতীর্ণ। প্রথম যুগে সে হয়েছে বার বার পরাস্ত। তারপর মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি আবিষ্কার করলো বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞান দিলো নতুন নতুন হাতিয়ার। আমরা আবার প্রবল বিক্রমে শুরু করলুম লড়াই। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীকে বন্দী করলুম বাঁধ বেঁধে, ধ্বংসকারী প্রচণ্ড বাত্যাপ্রবাহকে হারালুম বাতাসে সিলভার আইয়োডাইড পুড়িয়ে। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির হাত থেকেও রক্ষা পাবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু বিংশ শতকের সপ্তম দশকেও ভূকম্প তার হিংস্র মুখব্যাদান করে সভ্যতাকে গ্রাস করতে হয় উদ্যত, মরণ খেলায় চন্দ্রলোকজয়ী মানুষকে করে লাঞ্ছিত, বিজ্ঞানকে করে শোচনীয়-ভাবে পরাস্ত। তবে আমাদের সংগ্রামের শেষ নেই। তাই এমন দিন আসছে যেদিন ভূকম্পের বহিঃপ্রকাশ হবে নিয়ন্ত্রিত, তার প্রলয়লীলার ঘটবে অবসান, সে তখন বন্দী হবে বিশালের কারাগারে।

কিংবদন্তীর আলোয়

(বড় গল্প)

সঙ্কর্ষণ রায়
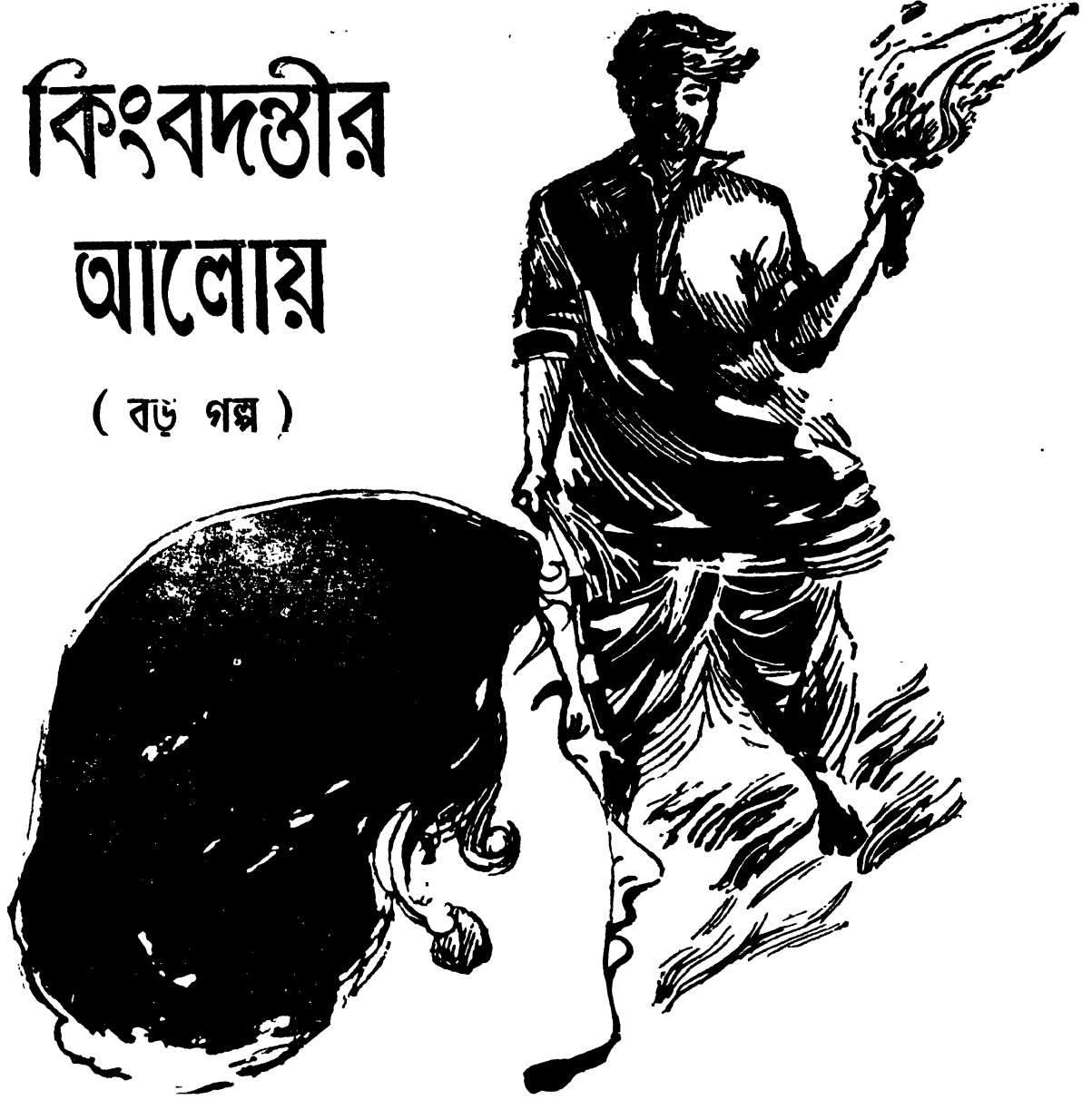
ইতিহাস রচনায় কিংবদন্তীকে উপেক্ষা করা চলে না।--বলছিলেন ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায়।---কিংবদন্তী বা প্রবচন দিয়ে ইতিহাসের ভিত্তি গাঁথা না চললেও ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে তারা গ্রহণযোগ্য।

যতীন্দ্রমোহনের ঢাকার ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখলাম যে, সত্যিই কিংবদন্তীর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ইতিহাসের অন্ধ - তমসাচ্ছন্ন পথ। অন্য উপকরণের অভাব, কাজেই কিংবদন্তীর মশাল জ্বালিয়ে অগ্রসর হতে হয় পদে পদে।

কিংবদন্তীগুলির মধ্যে বীজাকারে প্রচ্ছন্ন আছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, জীবনযাত্রা ও ধ্যান-ধারণার অসংখ্য কাহিনী, রাজ্যের ভাঙাগড়া, রাজশক্তির উত্থান-পতনকে উপেক্ষা করে যা কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকার দাবী রাখে।

এইসব কাহিনীর মধ্য থেকে আমি উদ্ধার করেছি একটি অসামান্য নারী-চরিত্রকে। কিংবদন্তীর নায়িকা, কাজেই ঐতিহাসিক চরিত্র বলা চলে না। কিন্তু ইতিহাসের সম্ভাবনাসঞ্জাত, জনগণ-মানস-সম্ভূত কল্পনার মধ্যে সত্যরূপিণী।

মেয়েটির নাম জয়দুর্গা। শৈশবেই মাতৃহারা। একমাত্র সন্তান, কাজেই বাপের চোখের মণি। নিমেষের জন্য চোখের আড়াল হলে বাপ চোখে আঁধার দেখেন। টোলে অধ্যাপনার সময়েও মেয়েকে চোখের সামনে বসিয়ে রাখেন। টোলে বসে থাকতে থাকতে জয়দুর্গার লেখাপড়া শেখার আগ্রহ হল। আদরিণী মেয়ের কোন আবদারই ঠেলতে পারেন না বাপ, কাজেই তৎকালীন

প্রথাকে অগ্রাহ্য করে তাকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করলেন তিনি।

সময়টা হল ১৩০০ বঙ্গাব্দ। তখনকার দিনে স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় থাকাকেও বাহুল্য জ্ঞান করত সকলে।

কাজেই পণ্ডিতবাড়ির পণ্ডিত মশাইয়ের মেয়ের লেখাপড়া শেখার আগ্রহকে চরম দুঃসাহসিকতা বলে গণ্য করল সকলে এবং সমালোচনার ঝড় উঠল চারদিকে।

জয়দুর্গা যে পণ্ডিত মশাইয়ের ছাত্রদের সঙ্গে একই ঘরে বসে পড়াশুনা করছে, তার জন্যও কটূক্তি বর্ষণের বিরাম রইল না। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত মশাই অবশ্য তা কানেও তুললেন না। জয়দুর্গাও নির্বিকারভাবে পড়াশুনা করে যেতে লাগল।

পণ্ডিত মশাইয়ের বংশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির জন্য গ্রামের নাম হয়েছিল পণ্ডিতবাড়ি। বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি নগণ্য গ্রাম, কিন্তু ছাত্ররা দূর-দূরান্তর থেকে আসে পণ্ডিত মশাইয়ের টোলে পড়াশুনা করতে। যারা আসে, তাদের সকলকেই টোলে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কেবলমাত্র মেধাবী ছাত্রদেরই গ্রহণ করেন পণ্ডিত মশাই।

টোলের মোট ছাত্রসংখ্যা দশ। টোলের লাগোয়া একটি বড় চালাঘরে বাস করে তারা। আহার পণ্ডিত মশাইয়ের ঘরে।

সেদিন সকালে সকলে মিলে পড়াশুনা করছে, এমন সময় একজন অপরিচিত যুবক এসে দাঁড়াল টোলের সামনে একটি আধময়লা কাপড়ে জড়ানো পুঁটলি বগলে করে। তার পরনে ময়লা ধূলিধূসর খাটো কাপড়, কাঁধে শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়। চেহারা অবশ্য ভাল। গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেলেও বেশ ফর্সা, মুখে-চোখে আভিজাত্যের ছাপ আছে।

---কী চাই তোমার বাবা? ---টোলের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করলেন পণ্ডিত মশাই। ---কী নাম তোমার?

পণ্ডিত মশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে টোলের মধ্যে ঢুকে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল যুবকটি, তারপর বললে, আজ্ঞে আমার নাম রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য, নিবাস মিতারা। আপনার টোলে ভর্তি হবার জন্য এসেছি এখানে।

---আমার টোলে তো জায়গা নেই বাবা। একসঙ্গে দশজনের বেশি ছাত্র আমি নিই নে।

---তাহলে আমার কী হবে।---কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে রাঘবেন্দ্র। ---বাবা যে আমাকে আপনার টোলেই ভর্তি হতে বলেছেন।

---আমার টোল ছাড়া আরও টোল আছে। ---স্নিগ্ধ স্বরে বললেন পণ্ডিত মশাই। ---চাও তো তোমাকে ঠিকানা দিয়ে দিতে পারি।

---না, না পণ্ডিতমশাই, বাবা আপনার টোলেই ভর্তি হতে বলেছেন।

---আমার টোলেই ভর্তি হতে বলেছেন। আমার টোলের ওপর তোমার বাবার পক্ষপাতের কারণ?

---আমার বাবার ধারণা একমাত্র আপনিই পারবেন আমাকে মানুষ করে তুলতে ---এ তল্লাটে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার ক্ষমতা নাকি একমাত্র আপনারই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে উঠল পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, তোমার বাবা বোধ হয় জানেন না যে, একমাত্র মেধাবী ছাত্ররাই স্থান পায় আমার টোলে। এখন যারা আছে এখানে, তারা সকলেই কাব্য ও ব্যাকরণের গণ্ডী পেরিয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করছে। আমার কন্যাটিও কাব্য-ব্যাকরণ শেষ করে দর্শন শাস্ত্রের পাঠ নিচ্ছে। এদের মধ্যে তুমি--মানে তোমার কথাবার্তা শুনে তুমি বেশিদূর পড়াশুনা করেছ বলে তো বোধ হচ্ছে না--

---ঠিকই বলেছেন পণ্ডিত মশাই। ---নিঃসঙ্কোচে বললে রাঘবেন্দ্র। ---আমার পড়াশুনা সত্যিই বেশিদূর পর্যন্ত হয় নি। শব্দরূপ, ধাতুরূপ শেষ করে সবে কারক-বিভক্তি-সমাসের পাঠ নিতে শুরু করেছি। সত্যিকথা বলতে কী পড়াশুনায় একেবারেই মন দিতে পারি নি আমি কখনো। শৈশবে মাকে হারিয়েছি, বাবাকেও পাই নি কাছে। ঢাকার নবাব সরকারের চাকরির জোয়ালে তিনি এমনি বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন যে, পুজোর সময়েও দেশে আসতে পারতেন না। কাজেই খুব ছোটবেলা থেকেই যাকে বলে অবাধ স্বাধীনতা, তাই ভোগ করেছি আমি। বিনা বাধায় যথেচ্ছ যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি, মাছ ধরেছি, খেলাধুলা করেছি। অভিভাবিকা ছিলেন বিধবা পিসি---শাসন করার ক্ষমতা ছিল না তাঁর একেবারে, সব ব্যাপারে শুধু প্রশ্রয়ই দিয়েছেন আমাকে। ভেবেছিলাম চিরকালই বুঝি এমনিভাবে কেটে যাবে আমার, কিন্তু হঠাৎ অশনিপাতের মত বাবা গ্রামে ফিরে এলেন। দেশে ফিরে এসেই আমার শোধনে লাগলেন। বিস্তর শাসন ও তাড়না করেও যখন পড়াশুনায় মন বসাতে পারলেন না আমার, তখন পাঠিয়ে দিলেন আমাকে আপনার কাছে।

---পাঠিয়ে দিয়েছেন বলেই যে তোমাকে নিয়ে নেব তার তো কোন কথা নেই বাপু---বিরক্তির সঙ্গে বললেন পণ্ডিত মশাই। ---নিম্নমানের ছাত্র আমি পড়াই না ---অমনোযোগী ছাত্রকে তাড়না করে পড়াবার অভ্যাসও আমার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মশাইয়ের পাদু'টি জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল রাঘবেন্দ্র। কাঁদতে কাঁদতে বললে, আপনি যদি আমাকে জায়গা না দেন, বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবেন বলে শাসিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হয় তুই পণ্ডিতবাড়ির পণ্ডিত মশাইয়ের টোলে ভর্তি হবি, নয় তো যেখানে খুশি চলে যাস। দোহাই পণ্ডিত মশাই, আপনার টোলের ছাত্র হিসেবে আমাকে নিতে না পারেন তো চাকর হিসেবে রাখুন। আপনার টোলের ও [illegible] সব কাজ আমি [illegible] দেব।

রাঘবেন্দ্রর কান্নায় বিচলিত বোধ করেন পণ্ডিত মশাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত প্রথমে তিনি ছাত্রদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তারপর তাকালেন জয়দুর্গার মুখের পানে।

বাপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই জয়দুর্গা বললে, ওকে নিয়ে নাও বাবা। ওর জন্য আলাদা করে পড়াবার ব্যবস্থা কোরো। তুমি নিজে পড়াতে না পার, তোমার ছাত্রদের মধ্যে কেউ না হয় পড়াবে ওকে তার অবসর সময়ে।

মেয়ের কথা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ছিল না পণ্ডিত মশাইয়ের। রাঘবেন্দ্রকে টোলে ভর্তি করে নিয়ে তাকে পড়াবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করলেন তিনি।

পণ্ডিত মশাইয়ের টোলে স্থান পেয়ে রাঘবেন্দ্র নিজেকে ধন্য মনে করলেও, পড়াশুনায় মন দিতে পারল না আপ্রাণ চেষ্টা করেও। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সে পণ্ডিত মশাইয়ের চাষের জমিতে হাল দিতে শুরু করে দিল। চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে মাটি কর্ষণ ও বীজবপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করে সে। ফসল ছাড়া তরিতরকারি ফলানোতে মন দেয়। তা ছাড়া মাছও ধরে সে নদীতে জাল ফেলে। পণ্ডিত মশাইয়ের গরুবাছুরগুলোর পরিচর্যার কাজও ক্রমশ নিজের হাতে তুলে নেয় সে জয়দুর্গার হাত থকে। ব্যঞ্জনে মশলার মত নিজেকে ক্রমশ অপরিহার্য করে তোলে পণ্ডিত মশাইয়ের সংসারে।

●

সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত। আকাশের তারাগুলি সব মেঘে আচ্ছন্ন। দুর্ভেদ্য নিবিড় আঁধার আকাশ ও মাটিকে একাকার করেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে শুয়ে পড়েছে। জয়দুর্গা তার বিছানায় বসে রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোয় পণ্ডিত মশাইয়ের লেখা উত্তরমীমাংসার ব্যাখ্যা পড়ছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝড় এল পণ্ডিত মশাইয়ের চালাঘরগুলিকে কাঁপিয়ে তুলে। ঝড়ের ফুৎকারে জয়দুর্গার ঘরের প্রদীপ নিভে গেল। চমকে উঠে জয়দুর্গা পাশের পণ্ডিত মশাইয়ের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে যে, ও ঘরের প্রদীপটিও নিভে গিয়েছে। পাশের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করে সে। বাইরে ঝড়ের মাতামাতি গাছপালাগুলিকে প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত ক'রে অন্ধকারের মধ্যে একটা অদৃশ্য আবর্তের সঞ্চার করেছে। ছাত্রদের চালাঘরের দিকে তাকিয়ে কোন আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল না সে। বুঝল যে ছাত্রদের ঘরের প্রদীপগুলোও নিভে গেছে।

---বাবা!---আর্তস্বরে ডেকে উঠল জয়দুর্গা।

---কী মা!---ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসলেন পণ্ডিত মশাই। ---ভয় পেলি নাকি?

---হ্যাঁ বাবা। প্রদীপগুলো যে সব ঝড়ে নিভে গিয়েছে। ছাত্রদের ঘরও অন্ধকার।

---রান্নাঘর থেকে আগুন নিয়ে এসে আলো জ্বেলে দে মা।

---রান্নাঘরে আগুন নেই। আমার রান্না শেষ হতেই উনুন নিভে গিয়েছিল।

---তা হলে চকমকি পাথরটা বের কর্ মা। আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জয়দুর্গা বললে, চকমকি পাথরটা আমি হারিয়ে ফেলেছি বাবা।

---হারিয়ে ফেলেছ যখন, তখন আর কী করা যাবে।---নির্বিকারভাবে বললেন পণ্ডিত মশাই।---এখন শুয়ে পড়, সকাল হলে না হয় রাঘবকে বলব আগুন সংগ্রহ করে আনতে।

---এই অন্ধকারে যে আমার ভীষণ ভয় করবে বাবা ---কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে জয়দুর্গা।

এমন সময় বাইরের থেকে রাঘবেন্দ্র ডেকে উঠল, পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত মশাই উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, এই অন্ধকারের মধ্যে বাইরে বেরিয়েছ কেন রাঘব?

রাঘবেন্দ্র বললে, আগুনের জন্য বেরিয়ে আসতে হল পণ্ডিত মশাই। প্রদীপ নিভে গিয়েছে---ওদিকে উনুনে আগুন নেই। আপনার চকমকি পাথরটা দিন পণ্ডিত মশাই।

---চকমকি পাথরটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রাঘব।

---খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি আগুন সংগ্রহ করে আনতে।

---এই দুর্যোগের রাতে কোথায় যাবে বাবা আগুন সংগ্রহ করতে। অন্ধকারে নিজের হাত-পা ঠাহর হয় না, পথ চলবে কী করে।

---অন্ধকারে পথ চলার অভ্যেস আছে আমার পণ্ডিত মশাই। আপনি চিন্তা করবেন না।

---কিন্তু আগুন আনবে কোথা থেকে? এত রাত্রে কোন গৃহস্থবাড়িতে আগুনের জন্য গেলে রেগে আগুন হয়ে উঠবে যে সবাই।

---কোন গৃহস্থবাড়িতে আমি যাব না পণ্ডিত মশাই। শ্মশান থেকে আগুন নিয়ে আসব।

---শ্মশান থেকে আগুন আনবে!---চমকে উঠল জয়দুর্গা।---এই দুর্যোগভরা অমাবস্যার রাতে শ্মশানে যাবে তুমি। এর চেয়ে আঁধারই ভাল। কোন দরকার নেই তোমার আগুন আনতে যাবার।

স্থির গম্ভীর গলায় রাঘবেন্দ্র বললে, দরকার আছে বই কি। অমাবস্যার রাত্তিরে আলো না জ্বেলে রাখলে ঘরের ওপরে ভূতপ্রেতের নজর পড়ে।

বলে সে হন হন করে হাঁটতে শুরু করে দিল---কয়েক পা এগিয়ে যেতেই অদৃশ্য হল অন্ধকারের মধ্যে।

---ওকে ফিরিয়ে আনো বাবা!---ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল জয়দুর্গা।

ও কী আর আমার কথা শুনবে মা---একে মূর্খ, তার ওপরে গোঁয়ার-গোবিন্দ!---গজর গজর করতে থাকেন পণ্ডিত মশাই।

তারপর বিছানার ওপরে টান হয়ে শুয়ে পড়ে তিনি বললেন, যা, শুয়ে পড়্ গে এখন। গর্দভটাই কী আর ও শ্মশানে যাবে ভেবেছিস। হয়তো কোনও গৃহস্থবাড়ি থেকেই নিয়ে আসবে আগুন।

---না বাবা!---মাথা নেড়ে বললে

বোম্বাই ও কলকাতায় ২রা অক্টোবর থেকে দেখান হবে

জেমিনীর

সমাজ কো বদল ডালো

ইস্টম্যানকলার

গতকাল, আজ এবং আগামীকালের ভাবনা সম্বলিত কাহিনী

পরিচালনা • বি. মধুসূদন রাও সংগীত • রবি গীতরচনা • সাহির সংলাপ • প. মুখরাম শর্মা

শ্রীশ্রীদুর্গা (তামিলনা
—এন. রাম

মাসিক
বসুমতী

আলোকচিত্র

মরসুমী ফুল
—রামকিংকর সিংহ

মাসিক

বসুমতী

আশ্বিন ১৩৭৭ ॥

মাসিক

বসুমতী

আশ্বিন

॥ ১৩৭৭ ॥

সমুদ্র-সৈকতে

—বিশ্বরূপ সিংহ

আকাশ-মাটির আহ্বান
—আশুতোষ সিংহ

আমাদের শারদীয়া অভিনন্দন গ্রহণ করুন

গড়ে তোল ছোট পরিবার

জয়দুর্গা।---যখন বলেছে, তখন শ্মশানেই যাবে ও---কেউ পারবে না ওকে ঠেকাতে। কিন্তু এই অমাবস্যার রাতে শ্মশানে গিয়ে কী আর পারবে সে ফিরে আসতে!

কান্নায় কেঁপে ওঠে জয়দুর্গার গলার স্বর।

পণ্ডিত মশাই বললেন, চিন্তা করে আর কী করবি মা। মা দশভুজা ওকে রক্ষা করবেন।

বলে তিনি পাশ ফিরে ঘুমোবার উদ্যোগ করলেন।

নিজের ঘরে এসে শুতে পারল না জয়দুর্গা। জানালা খুলে বাইরের অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সে। তখন ঝড় থেমে গিয়েছে। যে অদৃশ্য গতিস্পন্দন অন্ধকারের মধ্যে বেগের আবেগ সঞ্চার করেছিল, চরম নৈঃশব্দের মধ্যে তা সংহত হয়ে পড়েছে। অন্ধকার যেন একটা কালো রঙের নিরেট দেয়ালের মত আকাশের সঙ্গে মাটিকে যুক্ত করেছে। জয়দুর্গা শুনেছে, তাদের বাড়ি থেকে শ্মশানের দূরত্ব অন্ততঃ পক্ষে দুই ক্রোশ। এতখানি পথ এই আঁধার রাতে পেরোবে কী করে রাঘবেন্দ্র। তারপর সেই বিভীষিকাময় শ্মশান। সেই শ্মশান থেকে আগুনই বা সে আনবে কী করে!

শ্মশান থেকে আগুন নিয়ে যখন ফিরল রাঘবেন্দ্র, তখন মধ্যরাত। প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি জয়দুর্গা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে ভাবল, বুঝি আলেয়ার আলো। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সেই আলোর বৃত্ত, বাড়ির কাছে ছাইতান গাছের নীচে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রাঘবেন্দ্রর মুখখানা দেখতে পেল সে। এক হাতে তার জলন্ত মশাল, অন্য হাতে কয়েকটা লম্বা কাঠের টুকরো---একটানা দু' ক্রোশ ধরে মশালটাকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য একসঙ্গে কতগুলো কাঠের টুকরো তাকে বহন করতে হয়েছে, তা ভাবতে চেষ্টা করে জয়দুর্গা। মশালের আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছিল রাঘবেন্দ্রর ঘামেভেজা কর্মা বলিষ্ঠ মুখখানা। যেন মূর্তিমান অগ্নিদেবতা। আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেন সোনার আভার মত তার মুখখানাকে বেষ্টন করেছে। যেন দিব্য আলোয় গড়া একটি মূর্তি। দেখে চোখে পলক পড়ে না জয়দুর্গার।

দিন দুই বাদে অপরাহ্নে যখন সকলে পড়াশুনা শেষ করে টোল থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে রাঘবেন্দ্র বললে, সর্বনাশ হয়েছে পণ্ডিত মশাই---গ্রামে ওলাউঠা লেগেছে।

ওলাউঠা লেগেছে।---চমকে উঠলেন পণ্ডিত মশাই। তাঁর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ওলাউঠা মানে মড়ক---গ্রামশুদ্ধ সকলেরই প্রাণসংশয়। এই সঙ্কটলগ্নে কী কর্তব্য আমাদের, বল তোমরা।

ওলাউঠার কথা শুনে ছাত্ররা সকলেই ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। একজন কোনমতে বললে, ওলাদেবীর আরাধনা করুন গুরুদেব। ওলাদেবীর কৃপা না হলে---

স্মৃতি ও শ্রুতির ছাত্র হয়ে ওলাদেবীর আরাধনা করতে বলছ।---পণ্ডিত মশাইয়ের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

আর একজন চিঁ চিঁ করে বললে, ওলাদেবীর আরাধনার কোন প্রয়োজন নেই গুরুদেব, আপাতত টোল বন্ধ করে দিন। আর অনুমতি দিন, আমাদের নিজেদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের। মড়কের অবসান হলেই ফিরে আসব আমরা।

পালিয়ে যেতে চাও তোমরা।---আগুনের মত ঝলসে উঠল রাঘবেন্দ্রর চোখ দুটি।---গুরুদেবকে এই মড়কের মধ্যে ফেলে রেখে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চাও তোমরা। প্রাণ থাকতেও সে আমি হতে দেব না। তোমাদের সকলকেই থাকতে হবে এখানে---মরলে সবাই মিলে একসঙ্গে মরব আমরা।

রাঘবেন্দ্রর কথা শুনে শিউরে উঠল সকলে। অসহায়ের মত আর্ত দৃষ্টিতে তাকাল তাঁরা তার মুখের পানে।

ও রকম জল্ জল্ করে চেয়ে আছ কেন?---অবজ্ঞামাখানো স্বরে বললে রাঘবেন্দ্র।---এত তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞান, এই মড়ক থেকে আত্মরক্ষার জন্য কী করা উচিত সে জ্ঞান নেই!

একজন মাথা চুলকে বললে, সে তো আমাদের শ্রুতি বা স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা নেই---গুরুদেবও সে সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেননি আমাদের।

---গুরুদেব না দিয়ে থাকেন, আমি দেব। চলো আমার সঙ্গে তোমরা সবাই। এখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে তুরাগ নদীর ধারে একটা সুন্দর জায়গা আছে। সেখানে রাতারাতি দুটো চালাঘর বানিয়ে ফেলে গুরুদেব ও গুরুকন্যাকে নিয়ে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেব আমরা।

সকলে বিনা প্রতিবাদে অনুসরণ করল রাঘবেন্দ্রকে। তুরাগ নদীর ধারে রাঘবেন্দ্রর সঙ্গে দিনরাত খেটে দু'দিনের মধ্যেই দাঁড় করাল তারা দুটো চালাঘর। চালাঘর তৈরি হতে পণ্ডিত মশাই জয়দুর্গাকে নিয়ে চলে এলেন সেখানে।

মড়কে পণ্ডিত বাড়ি গ্রামের অর্ধেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। অনেকদিন বাদে গ্রাম রোগমুক্ত হওয়ার পর পণ্ডিত মশাই যখন জয়দুর্গা ও ছাত্রদের নিয়ে ফিরে এলেন, তখন শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে সমস্ত পণ্ডিত বাড়ি গ্রাম।

পণ্ডিত মশাই গ্রামে ফিরতেই গ্রামের শিরোমণি মশাই এলেন পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন পণ্ডিত মশাই। পণ্ডিত মশাইয়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে রুক্ষকণ্ঠে শিরোমণি মশাই বললেন, বসতে আমি আসিনি পণ্ডিত মশাই, শুধু দেখতে এসেছিলাম, তোমরা ফিরেছ কি না?

ফিরে যে এসেছি, সে তো লোকমুখেই শুনেছেন।---মৃদু হেসে বললেন, পণ্ডিত মশাই।---তা দেখতে আসার কী ছিল।

---দেখতে আসার কী ছিল। গ্রামের

সন্তানরা সবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিলে, সংকটের অবসান হতেই ফিরেছ, তোমাদের মত বর্জনযোগ্য এ অঞ্চলে আর কে আছে বল।

---এ তো আর যুদ্ধবিগ্রহ নয়, নিতান্তই একটা মড়ক। তা থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার মধ্যে কাপুরুষতা তো কিছু নেই।

কাপুরুষতা থাকবে কেন, রীতিমত বীরত্ব আছে তাতে।---প্রায় মুখ ভেঙচে বলে উঠলেন, শিরোমণি মশাই।---শোন বাপু, মস্ত পণ্ডিত তুমি, গ্রামের সমাজের সঙ্গে তোমার পাণ্ডিত্য ঠিক খাপ খায় না। এই যে তুমি গ্রামের সঙ্কটমুহূর্তে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছ, তাতে গ্রামের সঙ্গে তোমার প্রাণের যে কোন যোগ নেই, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানকার গ্রাম ও সমাজকে যখন আপন বলে মনে করতে পারছ না, তখন এখানকার গ্রাম ও সমাজের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা কোরো না।

সবিস্ময়ে শিরোমণি মশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিত মশাই বললেন, এখানকার গ্রাম বা সমাজের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করব আমি, এ কথা আপনি ভাবলেন কী করে।

মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে না।---ঝাঁজালো স্বরে বললেন শিরোমণি মশাই।

মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ।---হেসে ফেললেন পণ্ডিত মশাই।---ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু আপনারা তো আগেই আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, আমার লেখাপড়া জানা বিদুষী মেয়েকে ঘরে নেবেন না আপনারা কেউই---আমি যেন আমাদের গ্রাম ও সমাজের মধ্যে মেয়ের বিয়ের জন্য চেষ্টা না করি।

---তা বলেছিলাম। কিন্তু যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করলে তোমার মেয়েকে আমাদের ঘরে নেওয়ার অনুকূলে বিবেচনা করতাম,---বিশেষ করে তোমার মেয়ে যখন পরম রূপবতী। এখন অবশ্য তাও সম্ভব হবে না। আমাদের মড়কের মধ্যে ফেলে রেখে গ্রামই শুধু ছাড় নি তুমি, আমাদের মরণমুখেও ফেলেছ। আমাদের এবং সমাজের প্রতি তোমার অবজ্ঞাকে ক্ষমা করা যায় না।

আপনাদের বা আপনাদের সমাজের ক্ষমা আমি চাই না শিরোমণি মশাই।---অবজ্ঞামাখানো স্বরে বললেন পণ্ডিত মশাই।---আমার মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান আমি আপনাদের সমাজের মধ্যে কখনোই করতাম না। আমার ছাত্রদের মধ্য থেকে জয়দুর্গার জন্য যোগ্য পাত্র নির্বাচন করতে একটুও অসুবিধে হবে না আমার।

এর পর আর কোন কথা বলতে পারলেন না শিরোমণি মশাই।

শিরোমণি মশাই বিদায় নিতেই জয়দুর্গা পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে এসে চাপা উত্তেজিত স্বরে বললেন, তুমি কী তোমার ছাত্রদের মধ্যে কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাও বাবা?

জয়দুর্গার মাথায় হাত রেখে স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে পণ্ডিত মশাই বললেন, হ্যাঁ মা। আমি জয়গোপাল মিশ্রের কথা ভাবছিলাম। স্মৃতিশাস্ত্রে রীতিমত পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে সে। তা ছাড়া স্বাস্থ্য এবং রূপেও অতুলনীয়---

আমি রাঘবেন্দ্র ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না বাবা।---চাপা অথচ দৃঢ় স্বরে বললে জয়দুর্গা।

বজ্রাহতের মত জয়দুর্গার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন পণ্ডিত মশাই। বেশ কিছুক্ষণ কোন কথাই বেরোলো না তাঁর মুখ থেকে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন, ঐ আকাট মুখ্যুটাকে বিয়ে করতে চাস তুই!

আকাট মুখ্যু কাকে বলছ বাবা।---ফুঁসে উঠল জয়দুর্গা।---মনুষ্যত্বের বিচারে তোমার ছাত্ররা কী কেউ ওর পায়ের নখের যোগ্য। মানুষের মত মানুষ শুধু নয়, সত্যিকারের পুরুষমানুষ।

বলে সে দ্রুত পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

মেয়ের জেদের কাছে চিরকাল নতিস্বীকার করে এসেছেন পণ্ডিত মশাই, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হল না।

কথা বাড়ল। বিয়েও হল আসরে। পণ্ডিত বাড়ি গ্রামের কেউই উপস্থিত ছিল না। পণ্ডিত মশাইয়ের ছাত্ররাও যোগ দেয়নি এ বিয়েতে। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হতেই তারা পণ্ডিত মশাইয়ের টোল ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

বিয়ের পর জয়দুর্গা রাঘবেন্দ্রকে বললে, ঘরজামাই হয়ে এখানে থাকবে, সেটি হচ্ছে না। মিতারা চল।

মিতারা যাব।---আঁৎকে উঠল রাঘবেন্দ্র।---বাবা কী বাড়িতে ঢুকতে দেবেন আমাকে। বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ফিরতে বলেছিলেন, কিন্তু তা তো আর---

রাঘবেন্দ্রর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জয়দুর্গা বললে, লেখাপড়া না শিখেই যে তুমি মানুষ হয়ে উঠেছ, তা বোধহয় বুঝতে পারেন নি তোমার বাবা। সে যাই হোক, বাড়িতে ঢুকতে যাতে দেন তিনি, সে ব্যবস্থা আমিই করব। তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

জয়দুর্গার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সঙ্কল্পের কথা শুনে পণ্ডিত মশাই ভেঙে পড়লেন। ব্যাকুল হয়ে বললেন, তোরা চলে যাবি, এদিকে ছাত্ররাও চলে গিয়েছে---একা একা আমি এখানে থাকব কী করে বল্‌?

জয়দুর্গা শান্ত স্বরে বললে, এখানে আর থাকতে হবে না তোমাকে বাবা। আমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে গিয়ে তুমি নতুন টোল বসাবে। সব ব্যবস্থা করে তোমাকে আমি খবর দেব।

মিতারাতে বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল রাঘবেন্দ্র। কুণ্ঠিত স্বরে সে জয়দুর্গাকে বললে, তুমি এগিয়ে যাবে তো দুর্গা? বাবার মুখোমুখি হবার সাহস আমার নেই।

মুখ টিপে হেসে জয়দুর্গা বললে, তা জানি।

বলে সে এগিয়ে গেল।

রাঘবেন্দ্রর বাবা বিজয়েন্দ্র বাড়ির সামনের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন, জয়দুর্গাকে দেখে চমকে উঠলেন রীতিমত। এ যেন অসামান্য রূপ, সচরাচর

অর্পিত হৃদয়

[illegible] চক্রবর্তী

আমার হৃদয় আজ অর্পিত হয়েছে
অন্ধকার তোমার চিন্তায়;
কতো স্বপ্ন চেতনার গোপনে রয়েছে
শতাব্দীর শ্রমের ব্যথায়!

পদাবলী মুছে গেছে; হারানো অতীত
কুহু আর কেকারব নিয়ে
আর তো আসে না। তবু যৌবনের রীতি
রক্ষা করি আবেগ রাঙিয়ে।

লক্ষ যুগ-যুগান্তের কামনা বাসনা
আমার হৃদয়ে একাকার
হয়ে বাঁচে; আর সেই মধুর যন্ত্রণা
অনুভবে অদ্ভুত, অপার।......

চোখে পড়ে না---যেন সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমা।

জয়দুর্গাকে দেখে বিস্ময়ে এতখানি অভিভূত হয়ে পড়েন বিজয়েন্দ্র যে, তার পেছনে রাঘবেন্দ্রকে তিনি দেখতেই পান না।

কোনমতে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে বিজয়েন্দ্র বললেন, কে তুমি মা, দেখে বোধ হচ্ছে সাক্ষাৎ মা দশভুজা যেন ধরাধামে অবতীর্ণা হয়েছেন?

গলবস্ত্র হয়ে বিজয়েন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল জয়দুর্গা। তারপর বললে, আমি আপনার পুত্রবধূ বাবা।

আমার পুত্রবধূ!---চমকে উঠে জয়দুর্গার পশ্চাদ্বর্তী রাঘবেন্দ্রকে এবার দেখতে পেলেন বিজয়েন্দ্র।

আমার বাবা পণ্ডিতবাড়ির টোলের অধ্যক্ষ।---বলে চলে জয়দুর্গা।---আপনার ছেলে তাঁর কাছে সব শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে বিশেষ করে ষড়দর্শনে পারদর্শী হয়েছেন। অধ্যয়ন শেষ করার পর গুরুদক্ষিণা দেওয়ার প্রশ্ন উঠতে আমার বাবার অনুরোধে তিনি---

বুঝেছি মা, বুঝেছি, আর বলতে হবে না তোমাকে।---আনন্দের আতিশয্যে বিজয়েন্দ্রর দু'চোখ অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

জয়দুর্গার কথা শুনে রাঘবেন্দ্রর চক্ষুস্থির। এমন অম্লানবদনে এতখানি অতিশয়োক্তি সে করল কী করে, ভেবে পায় না সে। সে কী এর পরিণামের কথা বিবেচনা করে নি! মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের গণ্ডীও যে পেরোয় নি, তার পক্ষে ষড়্‌দর্শন স্বপ্নেরও অগোচর নয় কী! সামান্যতম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধাপেও যে সে টিকতে পারবে না! অসহায়ের মত আর্তদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে জয়দুর্গার মুখের পানে।

নববধূকে বরণ করে নেবার জন্য অন্তঃপুর থেকে তাঁর ভগ্নীকে ডেকে আনতে গেলেন বিজয়েন্দ্র। এই অবসরে চাপা উত্তেজিত স্বরে রাঘবেন্দ্র বললে, এ কী করলে তুমি দুর্গা! আমার সঙ্গে সামান্য একটু আলাপ করলেই তো বাবা আমার বিদ্যাবুদ্ধি টের পেয়ে যাবেন।

আমার বিদ্যাবুদ্ধি তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির অভাবকে পরিপূরণ করবে।---ফিসফিসিয়ে বললে জয়দুর্গা।---কাজেই টের তিনি পাবেন না। তথাপি যতটা পার সতর্ক থেকো।

যথাসম্ভব সতর্কই থাকে রাঘবেন্দ্র। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিজয়েন্দ্রর সঙ্গে কোনও রকম আলাপ সে করে না।

জয়দুর্গা একদিন বিজয়েন্দ্রকে বললে, বাবার ইচ্ছে তাঁর টোলটাকে মিতারা গ্রামে স্থানান্তর করেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, আমাকে ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর।

এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য মা!---বিজয়েন্দ্র সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন।---তোমার বাবার মত পণ্ডিত আমাদের গ্রামে এলে আমাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হবে। বেয়াই মশাইয়ের কাছে আজই লোক পাঠাচ্ছি আমি।

মাসখানেকের মধ্যে পণ্ডিত মশাই তাঁর যাবতীয় পুঁথিপত্র নিয়ে মিতারা গ্রামে এসে পৌঁছলেন। বসতবাড়ির সংলগ্ন একটি দালানে পণ্ডিত মশাইকে থাকতে দিলেন বিজয়েন্দ্র। কালক্রমে সেখানেই টোল বসালেন পণ্ডিত মশাই।

বিজয়েন্দ্রর ইচ্ছে রাঘবেন্দ্রও টোলে অধ্যাপনা করুক। কিন্তু জয়দুর্গা তাঁকে বললে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের ওপরে একটা বিস্তারিত টীকা রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন আপনার ছেলে। টোলে অধ্যাপনা করলে তাঁর রচনায় ব্যাঘাত ঘটবে।

পুত্র গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে জেনে গর্বে ভরে ওঠে বিজয়েন্দ্রর বুক। টোলে পড়াবার জন্য আর তাকে পীড়াপীড়ি করেন না তিনি।

বছরখানেকের মধ্যে সম্পূর্ণ হল রাঘবেন্দ্রর গ্রন্থরচনা। পণ্ডিতমহলে তা বিশেষ সমাদর পেল। সকলেই বললে যে, এই গ্রন্থপাঠ করলে ন্যায় ও বৈশেষিকের অর্থ বিশেষভাবে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

গভীর রাতে শোবার ঘরে জয়-দুর্গাকে একান্তে পেয়ে রাঘবেন্দ্র বললে, তোমার নিজের কীর্তিকে আমার বলে চালাচ্ছ দুর্গা।

আমার নিজের বলতে আর কী আছে কিছু!---রাঘবেন্দ্রর বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে দিতে বললে জয়দুর্গা।---আমার যা কিছু আছে, সবই তো তোমারি গো!

বলতে বলতে আবেগে জড়িয়ে আসে জয়দুর্গার গলার স্বর।

পটভূমি গৌড় / ক্যালকাটা পাবলিশার্স

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের এটি সদ্য-প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ। ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীকে লেখক এমন অদ্ভুতভাবে ঘটনার পর ঘটনা দিয়ে সাজিয়েছেন যাতে পাঠকেরা পড়তে পড়তে চমৎকৃত হবেন। গল্পের সূত্রপাত প্রধানত: গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহ, বিজয়মাধব ও নর্তকী লোটনকে নিয়ে। শেষোক্ত দু'জনের অনুচ্চারিত প্রেম ও ভালবাসা যেমন বইখানির অমূল্য সম্পদস্বরূপ, তেমনি লোটনের প্রতি অনুরক্ত সুলতানের কাহিনীও পাঠকদের শেষ পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন করে রাখবে। এ ছাড়া শাহজাদা জালালুদ্দিন, নাজমা, চন্দ্রহাস চণ্ডীদাস, রামতারা ও আরো অমূল্য চরিত্রের আমদানী করেছেন এই গ্রন্থে। প্রত্যেকটি চরিত্রই সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। বইটির ভাষা ঝরঝরে। বইটি পাঠকদের কাছে যে সমাদর লাভ করবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক---শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাশ। প্রকাশক---শ্রীমলয়েন্দ্রকুমার সেন, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম: ছয় টাকা মাত্র।

ওই ছায়া / আনন্দধারা

একখানি নতুন উপন্যাস। লেখক এই গ্রন্থের গতিপথ এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যা হৃদয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। রেবতী এই গ্রন্থের নায়ক এবং তাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলেছে এর গতি। তারপর বহু ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে বহু চরিত্রচিত্রণ। চরিত্রগুলিও লেখকের কলমে বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে ভাল লাগলো লেখকের কাহিনী-বিন্যাসের রীতি---যা পাকা শিল্পীর কথা মনে করিয়ে দেয়। শেষ দিকে আরো বেশী মনকে আকর্ষণ করে। লেখকের হাতে একটি চমৎকার উপন্যাস গড়ে উঠেছে। পাঠকমহলে আদৃত হবে। লেখক: বিমল কর। প্রকাশক: আনন্দধারা প্রকাশন, ৭৯।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি: ৯। দাম পাঁচটাকা।

সাক্ষী বালুচর / আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:

মানসী ও তার যৌবনের সঙ্গী অর্থাৎ প্রেমিকাকে নিয়ে লেখক এক নিটোল গল্প গড়ে তুলেছেন। মানসীর যৌবনের প্রাণচঞ্চল রূপ যেমন লেখক অপূর্ব ক্ষমতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে নায়কের জীবন-যন্ত্রণার ছবিও পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষদিকে পাঠকের মধ্যে কিছুটা সংশয় দেখা দিলেও পরে তা দূর হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে লেখক বেশ কিছুটা সাসপেন্স তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। অমিয়-চরিত্রটিও ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক। বইটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। লেখক---শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক---শ্রীফণিভূষণ দেব। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯। প্রচ্ছদপটটি মনোরম। দাম: চার টাকা মাত্র।

রস-সিদ্ধান্ত / ভারতীভবন

'রস-সিদ্ধান্ত' দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নগেন্দ্র রচিত সিদ্ধান্তবিদ্যার একটি বিখ্যাত বই। পণ্ডিত সমালোচক মোট ছ'টি অধ্যায়ে যথাক্রমে রস শব্দটির অর্থ, রস-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত, রসের নিষ্পত্তি, রসের অবস্থান, সাধারণীকরণ, ভাবের বিবেচনা, রস-সংখ্যা, রসের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিচার, অংগী রস, রস-বিঘ্ন, রসাভাস, রস-সিদ্ধান্ত: শক্তি ও সীমা সম্পর্কে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রানুরূপ আলোচনা অন্তে মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সচেষ্ট। রস-মীমাংসার দুরূহ পথচারী লেখক নবদিগন্তের নির্দেশ দানের কৃতিত্বে কৃতী। গবেষণা গ্রন্থটি সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা বোধ করি এই যে, অতি দুরূহ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও লেখকের গভীর পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির কল্যাণে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনাও কোন ক্ষেত্রেই সাবধানী পাঠকের কাছে অনাবশ্যকভাবে জটিল হয়ে ওঠে নি। বস্তুত, তত্ত্বের গহন অরণ্যে লেখক সন্ধানী বিচার-রশ্মিপাত করেছেন পরম আগ্রহে এবং সেই আলোকসম্পাতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে অলংকার-অরণ্য। এ কাজ অসাধারণ মনীষার---সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠকের অশেষ তৃপ্তি তাতে। হিন্দীভাষী শিক্ষিত জনের সম্পদ 'রস-সিদ্ধান্ত' বাংলা ভাষায় অনুবাদ ক'রে ডঃ ইন্দ্রনাথ চৌধুরী যে কেবল আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লিখিত বিদগ্ধ পণ্ডিতের আলংকারিক চিন্তা-ভাবনা-সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য এনে দিয়েছেন তাই নয়, তাঁর নিষ্ঠায় বঙ্গভাষাও নিঃসন্দেহে লাভবান। বাংলায় দুরূহ তাত্ত্বিক আলোচনা স্বল্প। এ কাজ সুকঠিন নিঃসন্দেহে। তাই, মৌলিক বা অনূদিত এই ধরণের বই হাতে পেলে স্বভাবতই খুব ভাল লাগে। তা ছাড়া, অনুবাদক হিসেবে ডঃ চৌধুরী কৃতী। তাঁর ভাষা স্বচ্ছন্দ, ভাবনার পরিস্ফুটন কোথাও ব্যাহত হয় নি। লেখক: ডঃ নগেন্দ্র, অনুবাদক: ডঃ ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রথম বাংলা সংস্করণ: ১৯৭০, দাম: পঁচিশ টাকা।

সবার প্রিয় সুভাষ / তুলি-কলম

সুভ ষচন্দ্রের নামের সঙ্গে পরিচিত নেই এমন মানুষ বাঙলা দেশ কেন সারা ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু তাঁর কার্যক্ষমতা, তাঁর জীবনের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি তাঁর জীবনের বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাবলীর সঙ্গে হয়তো অনেকেরই পরিচয় নেই। লেখক এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে সেই অভাব মোচন করেছেন। সুভাষচন্দ্রের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর পড়াশুনা, সমাজসেবা, বিদেশযাত্রা, রাজনীতিতে প্রবেশ এবং ভারতত্যাগ থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন পর্যন্ত প্রতিটি কাহিনী ও ঘটনা লেখক আন্তরিকতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে। নেতাজীর দুষ্প্রাপ্য কয়েকখানি ছবিও এই গ্রন্থখানির অপর এক সম্পদ। যে-কোন বয়সী পাঠকের কাছেই বইটি যে আদরণীয় হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বৃহৎ আকারের এই গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। প্রচ্ছদপট খুবই আকর্ষণীয়। লেখক---শ্রীসুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, প্রকাশক---কল্যাণব্রত দত্ত। কলেজ রো, কলিকাতা। দাম: দশ টাকা মাত্র।

ভুবনমঙ্গলবিগ্রহ শ্রীশ্রীসীতারাম

গ্রন্থকার---শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, প্রকাশক---শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ, দেবযান কার্যালয়, মগরা, জেলা--হুগলী, দাম---৩,।

সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎবিগ্রহ অনন্ত শ্রীমণ্ডিত শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের দিব্যজীবনী অবলম্বনে শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। যেরূপ আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত ও সুগভীর ভক্তিভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। মানুষের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা এবং অধ্যাত্ম পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য এরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। চরিতামৃত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃতি সহযোগে তাঁহার বক্তব্যকে স্পষ্টীকৃত করার প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহাতে এ গ্রন্থে ধর্মভাবের সহিত সাহিত্যের স্বাদ যুক্ত হইয়াছে। বর্ণ দিয়া বোঝান যায় না অবর্ণনীয়কে, যিনি স্বরূপত মানববুদ্ধির অগম্য, তাঁহাকে রেখায় বা লেখায় ফুটাইয়া তোলা দুঃসাধ্য। তাই লেখক শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের অলৌকিক জীবনলীলা রসের আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। নিবিড় ভক্তি সহযোগে লেখক তাঁহার আরতি প্রদীপটি জ্বালাইয়াছেন। গ্রন্থখানি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসার ও প্রচার লাভ করুক ইহা কাম্য। সর্ব-সাধারণের দ্বারা গ্রন্থখানি পঠিত হইলে---ঘন অমৃত---উৎসাভিমুখী হইবে। গ্রন্থখানি দিব্যালোকের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে ভগবৎ উপলব্ধির গভীরতায় আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

চব্বিশ পরগণার মন্দির / আনন্দধারা

প্রাচীন হিন্দুযুগে যে এদেশে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রায় নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলা দেশেও মন্দিরশিল্প খুবই উন্নতিলাভ করেছিল। বাংলার মন্দিরশিল্পের বিবরণ যদিও প্রধানত মুসলমান যুগের নিদর্শন নিয়েই আরম্ভ করা হয়, তবু এ কথাটি বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে যে, হিন্দুযুগের মন্দিরশিল্পের অভাব নয়, তার নিদর্শনের বিলোপই তার একমাত্র কারণ। হিন্দুর শিল্পপ্রতিভা মধ্যযুগেও যে খুব ম্লান হয় নাই, এখনও যে ক'টি নিদর্শন আছে তা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চব্বিশ পরগণার মন্দির পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে এমন কোন বই প্রকাশ পায় নি। এই মূল্যবান গ্রন্থে রয়েছে বহু মূল্যবান চিত্র। যেসব চিত্র চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রের চিত্রও তুলে ধরেছে লেখক---যা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হ[য়ে] উঠেছে। এই মূল্যবান গ্রন্থটির পেছনে লেখকের সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন বিখ্যা[ত] ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখক: অসীম মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ [দে] স্ট্রীট, কলি-১২। দাম ছয় টাকা মাত্র

ওমর খৈয়াম

পারস্যের জ্যোতির্বিদ কবি ওম[র] খৈয়ামের নাম সর্বজনবিদিত। বিশ্বে[র] সকল ভাষাগুলি যেমন ওমরের অনুপ[ম] 'রোবাইয়াৎ' কাব্যের অনুবাদ হয়েছে তেমনি একাধিক অনুবাদ প্রকাশি[ত] হয়েছে বাঙলা ভাষাতেও। কিন্তু ওম[র] খৈয়ামের সঠিক জীবনেতিহাস অথবা পরিচয়মূলক কোন গ্রন্থ ছিল না। প্রা[য়] একচল্লিশ বছর আগে 'কবি শেখ সাদী'[র] জীবনীকার পারস্য ভাষা ও সাহিত্যে[র] সুপণ্ডিত স্বর্গত সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করে ওমর খৈয়ামের একখানি জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সম্প্রতি স্বর্গত নন্দী মহাশয়ের সেই বহু বিখ্যাত 'ওমর খৈয়াম' জীবনী গ্রন্থের বহুকাল পরে সৎসাহিত্যের প্রচারক বসুমতী সাহিত্যমন্দির পুনর্মুদ্রণ করে বাঙালী পাঠক সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। ইতিহাসাচার্য স্যা[র] যদুনাথ সরকারের মূল্যবান ভূমিকাটি গ্রন্থখানির সম্পদ। বিশ্ববিশ্রুত ওমর খৈয়াম শুধুই কবি ছিলেন না, তিনি একাধারে কবি, জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ। এককথায়, পারস্যের জাগ্রত প্রজ্ঞার জীবন্ত বিগ্রহ। সুপণ্ডিত লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস আলোচনা করে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে ওমর খৈয়ামের যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন তা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গবেষণামূলক---তেমনি বঙ্গসাহিত্যে অভিনব। ওমর খৈয়ামের

লেখক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের আলোচনা যেমন সরস, কবিত্বপূর্ণ তেমনি মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য। কৃতী লেখক শুধুই ওমর খৈয়ামের জীবন ও প্রতিভার পরিচয় দেননি, তিনি এই গ্রন্থে প্রাক্-ওমরযুগ থেকে ওমরের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ যে সময়টি ইতিহাসে 'মধ্যযুগ'-রূপে চিহ্নিত সেই সময়ের পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার ইতিহাস সঙ্কলন করেছেন। এই সভ্যতার ইতিহাসে ওমর প্রতিভার কি বিরাট অবদান তার তথ্য-মূলক ঐতিহাসিক আলোচনা এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওমর খৈয়ামের যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা যা এতদিন সহস্র বছরের ধূলায় ধূসরিত হয়েছিল, কৃতী জহুরী লেখক সেই মলিনতা মুছে---লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করে ওমর খৈয়ামের সঠিক পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিদগ্ধ বাঙালী পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও কবিত্ব-পূর্ণ। প্রচ্ছদ, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি পুস্তকের অপরাপর আঙ্গিক রুচিসম্মত। আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটির বহুলপ্রচার কামনা করি। লেখক---স্বর্গত সুরেশচন্দ্র নন্দী, প্রকাশনায়---বসুমতী প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা। দাম: সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

উদ্বাস্তু / সাহিত্য সংসদ

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এই কথা নতুন নয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশকে অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছে। ছিন্নমূল এই মানুষের নাম উদ্বাস্তু। বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, আর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর স্রোত পশ্চিমবাংলাকে সমস্যা-সঙ্কুল করে তোলে। আর সেই হতভাগ্য সর্বহারাদের আজ পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু সমাধান হলো না। এই উদ্বাস্তুদের দুর্দশার ইতিহাস সম্যকভাবে লেখা হয় নি আজো। লেখক সেই কর্তব্যকর্মটি সম্পূর্ণ করেছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। লেখক প্রশাসনিক কর্মচারী হিসাবে পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে লেখক দীর্ঘকাল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের সচিব এবং মহা-ধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তাই এই মর্মস্পর্শী ইতিহাস লেখক সৃষ্টি করতে পেরেছেন। লেখক: শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ আচার্য প্রফুল্ল রোড, কলি-৯। দাম: দশ টাকা।

কত অজানা মানুষ / জ্ঞানালোক

লেখক স্বয়ং সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সেদিনের বৈপ্লবিক চিন্তার সংগঠনে ও প্রচারে নায়কত্ব করেছেন। লেখক সেদিনের সেইসব অজানা সেবক ও সেবিকার যে পরিচয় এই গ্রন্থে বিধৃত করেছেন, তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মহত্ত্বময় প্রাণের বিচিত্র কীর্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এবং অজানাদের এই সব কাহিনীর বিশেষ একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কারণ, এই সব কাহিনী বাস্তব তথ্যের এক একটি সুভাষিত আখ্যায়িকা। বইখানি বৈপ্লবিক সাহিত্যের ভেতর একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বাংলার বৈপ্লবিক চিন্তা, সংগঠন ও সংগ্রামের একটি সম্যক ও সুসংবদ্ধ পরিচয় প্রথম বিবৃত হয়েছিল। লেখক: শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। প্রকাশক: জ্ঞানালোক প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলি-১। দাম---তিন টাকা পঞ্চাশ।

সপ্তপর্ণী / সিগনেট প্রেস

ছদ্মনামের আড়ালে থাকলেও লেখক বাঙলা সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি তাঁর সদ্য-প্রকাশিত এই গ্রন্থে যেমন অজস্র চরিত্রের আমদানী করেছেন, তেমনি তার সুন্দর পরি-সমাপ্তিও ঘটিয়েছেন। গাঙ্গুলী মশাই, বিপিনকাকা, মলয়া, কেতকী বৌদি, মিসেস নওরোজ, কুন্দনলাল, মতি প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে নায়ক রঞ্জন, ইরলি এবং বুলবুল চরিত্র লেখক যেভাবে অঙ্কিত করেছেন তা অনবদ্য। চরিত্রগুলি ভীষণভাবে মনে দাগ কাটে। এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাও লেখক সুন্দরভাবে চিত্রিত করছেন। বইটির প্রচ্ছদপট সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দিব্যদর্শী, প্রকাশক—শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত, কলিকাতা। দাম: সাত টাকা।

বিধাতার অভূতপূর্ব সৃষ্টি

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ আলোচনামূলক। এই গ্রন্থখানির প্রথমে প্রস্তাবনা এবং ভূমিকা রয়েছে। এর পর আলোচিত হয়েছে যদি আর বাঁশী না বাজে, মধুরম, রাজবন্দীর জবানবন্দী, নজরুল চরিত্রের রূপরেখা, স্বধর্মে নিধন শ্রেয়: পরধর্ম ভয়াবহ, শ্যাম ও শ্যামাসঙ্গীত, বিদ্রোহী নজরুল, নজরুল সাহিত্য ও গীতি, শেষ তর্পণ প্রভৃতি। প্রথমে আছে নজরুলের একটি ছবি। নজরুল সম্পর্কে অনেক কথা এবং অনেক কাহিনী ও আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। লেখক: জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীনয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১ নং রমানাথ পাল লেন, কলি-২৩। দাম: পাঠকের আশীর্বাদমাত্র।

বাংলা সাহিত্যপত্র

এই বিশেষ বর্ষা সঙ্কলনটি বেশ সার্থক পত্রিকা। তৃতীয় সঙ্কলন এখানি। এই সংখ্যায় আছে মনুজেশ মিত্র, উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী, মদনমোহন বিশ্বাস, প্রতাপচন্দ্র সরকার, প্রাণেশ আচার্য, সমীর চক্রবর্তী, অজিতকুমার দত্ত, তড়িৎ চৌধুরী, অমিতাভ দাশ, সীমা মিত্র, অভিরাম হালদার, তরুণকুমার ঘোষ, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিতা লিখেছেন। প্রবন্ধ লিখেছেন: হেনা হালদার, উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনায়: উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬, বাবুপাড়া, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। দাম: ত্রিশ পয়সা।

শরৎ সাহিত্যে শকুন্তলা

ভোলানাথ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কালিদাসের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট হলেও শরৎ সাহিত্যের সঙ্গে কালিদাসের কাব্যের সাদৃশ্য প্রায় অচিন্ত্য। কালিদাস ক্লাসিক কবি। এই ক্লাসিক ধর্ম তাঁর বর্ণনায়, তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গিতে, তাঁর মানসিকতায়। ক্লাসিক কাব্য বিগ্রহের অন্তরে রোমাণ্টিকতার ভাবও যে কোথাও কোথাও পরিস্ফুট, সেকথাও কাব্য পাঠকদের অজানা নয়। এ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে যদিও শরৎচন্দ্রের পরিচিতি মূলত সামাজিক ঔপন্যাসিক তথা বাস্তববাদী কথা-সাহিত্যিকরূপে এবং এই বিষয়ে তিনি কালিদাসের বিপরীত মেরুর অধিবাসী তবুও একটি ক্ষেত্রে অন্তত তাঁর সঙ্গে কালিদাসের সাদৃশ্য চোঁখে পড়ার মত। আপাত বিচারে শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের সঙ্গে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের কোন সাদৃশ্য থাকার কথা নয়, তবুও সন্ধানী দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই মিল বর্ণে বর্ণে যে নয় এবং হতে পারে না তা সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হবে না বোধ করি। কারণ, উভয়ের ব্যবধান যে শুধু কয়েকশত যুগের তাই নয় ব্যবধান যুগাবসানের। স্মরণীয় কালিদাসের কাব্য নিছক সাহিত্য সৃষ্টি তথা কলাচর্চা। কালিদাস-বর্ণিত রামগিরি পর্বত, অলকা অথবা মালিনী তীর শুধু কয়েকটি ভৌগোলিক অবস্থিতিই নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিও বটে। কালিদাসীয় যুগে নর-নারীর দুঃখের কারণ প্রিয়জনের বিরহ অথবা স্তূপীকৃত স্বর্ণরেণুর মধ্যে মুক্তাখণ্ডের অপ্রাপ্তি। অন্য পক্ষে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে আছে বিশ শতকের সমস্যাজড়িত বাংলাদেশ, পাত্র-পাত্রী সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস সাহিত্য-কর্ম হয়েও উদ্দেশ্যমূলক তথা সমাজ-সংস্কার। এ ছাড়াও উভয় গ্রন্থের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা হল শ্রেণীগত। 'চন্দ্রনাথ' সামাজিক উপন্যাস এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ক্লাসিক নাটক, যার মধ্যে রোমাণ্টিকতা একেবারে অনুপস্থিত নয়। এতদ্ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দেখা যায় যে, রাজা দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণরত হয়ে কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করেন এবং সেখানে শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হন। ক্রমে তাঁরা গোপনে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। চন্দ্রনাথও বারাণসী-ভ্রমণে এসে হরিদয়াল ঘোষালের আশ্রমে সরযূকে দেখে মুগ্ধ হন এবং পরে সরযূর পাণিগ্রহণ করেন। কেউই প্রণয়িনীর কুল-শীলের পরিচয় জানবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এরপর উভয়ের পতিগৃহে গমন। শকুন্তলা দুর্বাসার শাপের ফলে পতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেন। সরযূ মাতার প্রণয়ী তথা রাখাল ভট্টাচার্যের দুষ্মন্তস্থলও অশুভ উপস্থিতি এবং এককালের গুপ্ত বৃত্তান্ত পরিবেশনের ফলে চন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেন। চন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যে কারণ সামাজিক ছিল, দুষ্মন্তের ক্ষেত্রে তা ছিল দৈব। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কেউই আর পূর্ব আশ্রয়ে ঠাঁই পান নি। শকুন্তলা স্বর্গে মারীচের আশ্রমে নীতা হয়েছেন, সরযূও হরিদয়াল পাণ্ডার আশ্রম-বিচ্যুতা হয়েছেন। তাঁর সেই দুর্দিনে কৈলাস খুড়ো দেখা দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছে। মারীচের আশ্রমে যেমন ভরতের জন্ম হয়েছে—কৈলাস খুড়োর গৃহে তেমনি জন্ম হয়েছে বিশুর। এই তৃতীয়জনকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর পুর্ণমিলন সম্ভব হয়েছে। ভোগবদ্ধ প্রেম বৃহত্তর কর্তব্যে ও প্রেমে অভিষিক্ত হয়ে দীপ্যমান হয়েছে। দুঃখের দারদাহে, বিরহের দহনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা যেমন পরস্পরের যোগ্য হয়েছে, চন্দ্রনাথ-সরযূও তেমনি কাছে আসতে পেরেছে। দুষ্মন্ত, শকুন্তলা এবং চন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল এবং এদের স্রষ্টারা তা দেখিয়েছেন কেবল সরযূর প্রায়শ্চিত্তই অকারণ। তাকে কঠোর সামাজিক বিধানের বলি [illegible]।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাসিক রাশিফল

॥ আশ্বিন মাসের ফলাফল ॥

১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে **আশ্বিন** মাস সুরু হয়েছে। রবির **কন্যায়** সংক্রমণ বা আশ্বিন মাস **প্রবৃত্তি** সময়ে মিথুন লগ্নের উদয় ছিল। **শুক্র** ও বৃহস্পতির শুভ প্রভাব এ মাসে **সাধারণের** উপর অনেকাংশে শুভ **প্রভাব** বিস্তার করবে। নীচাভিমুখী **রবির** সঙ্গে মাসের শেষাংশে ১০ই **অক্টোবর** মঙ্গলের মিলন আকস্মিক-**ভাবে** দেশের অবস্থা ঘোরালো করে **তুলতে** পারে। ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও **নানা** দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি **পাবে**। আশ্বিন ও কার্তিকে কোনো **রোগবিশেষ** মহামারি হয়ে দেখা **দিতে** পারে। এই আশ্বিন মাস **যুদ্ধাতঙ্কও** সৃষ্টি করতে পারে। এ মাসে **শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা**। বিশুদ্ধ মতে ৭ই **অক্টোবর**। ২০শে আশ্বিন বুধবার **রাত্র** ১০টা ৫৩ মিনিট পর্যন্ত সপ্তমী **সকাল** ৯টা ২৮ মিনিট মধ্যে দেবী **দুর্গার** নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন ও **সপ্তম্যাদি** কল্পারম্ভ এবং সপ্তমীবিহিত **পূজা**। **২৩শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর শনিবার বিজয়া দশমী**। আশ্বিন মাসে **যাদের জন্ম, তাদের আশ্বিন ও কার্তিক** এই দুই মাস স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। বক্রী শনি বিশেষ অনিষ্ট করতে পারে। কন্যা লগ্ন ও কন্যা রাশি সম্পর্কেও একথা খাটে। এবার রাশি ও লগ্ন অনুযায়ী এ মাসের শুভাশুভ আভাষ দিচ্ছি:---

মেষ : এ মাস একদিকে নূতন যোগাযোগ ও সম্মানবৃদ্ধির অনুকূল।

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

আবার আর্থিক ব্যাপারে চিন্তাকুল করে তুলতে পারে। স্বজনপীড়া ও নানাকারণে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটবে। প্রিয়জনের জন্য উদ্বেগ যাবে। যে-সব লোকের কার্যকলাপ আপনি দেখতে পারেন না, অনেক সময় তাদেরও সহ্য করতে হবে। স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। ব্যবসায়ে আয় বাড়বে কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে তেমন আশাপ্রদ হবে না। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত রয়েছে। বন্ধুরূপী শত্রুদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া উচিত। পারিবারিক ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যাপারে **অশান্তি** - হতে পারে। মহিলাজাতকের **প্রিয়জনের জন্য উদ্বেগ যেতে পারে। মাসের শেষাংশে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা।** মেষ লগ্নে জন্ম হলে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে আগের চেয়ে শুভ হতে পারে।

বৃষ : আর্থিক ব্যাপারে দারুণ চাপ যেতে পারে। ব্যবসায়ে আশানুরূপ হবে না। পারিবারিক ব্যাপারে অশান্তি এবং নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সুযোগ আসার সম্ভাবনা। বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে দুর্ভাবনার কারণ ঘটতে পারে। অবশ্য জন্মকালে যাদের শনি শুভ, তাদের অপ্রত্যাশিত লাভের যোগও রয়েছে। নূতন কোনো ব্যবসা, কলকারখানা স্থাপনের পক্ষে এ মাস অনুকূল নয়। নূতন প্রার্থীদের চাকুরী হতে পারে। রাজনৈতিক চক্রান্ত ও দলাদলি থেকে দূরে থাকা মঙ্গলজনক। শেষাংশ দাম্পত্য ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তাসূচক। মহিলা জাতকের নিজের বুদ্ধির দোষে ক্ষতি কিন্তু কোনো সূত্রে লাভবান হবার সম্ভাবনা। বৃষলগ্নে জন্ম হলে কোনো কাজে প্রশংসা লাভ, কিন্তু দূর ভ্রমণে বিপত্তি হতে পারে। পরিকল্পনা ওলটপালট করে দিতে পারে।

মিথুন : শরীর সম্পর্কে বিশেষ সাবধান। পারিবারিক ক্ষেত্রেও ঝঞ্ঝাট, কারো অসুখ-বিসুখের জন্য সঙ্কট ও আর্থিক অপচয় ঘটতে পারে। বাইরে কোথাও গিয়ে বিপত্তি ঘটাও অসম্ভব নয়। মাসের শেষাংশ লক্ষণীয়। ব্যবসায়ে আশানুরূপ নয়। বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীদের যশ ও মর্যাদা বাড়বে। বিষয় সম্পত্তি ঘটিত ব্যাপার ও ভ্রাতৃজনিত সুখে বিঘ্ন ঘটতে পারে। নূতন কাজে প্রবৃত্ত হবার পক্ষে এ মাস প্রতিকূল। শেষাংশে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। চাকুরীপ্রার্থীদের যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। রাজনৈতিক ব্যাপারে যারা লিপ্ত তাদের পক্ষে এ মাস অনুকূল হবে না। কোনো ব্যাপারে সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত

হতে পারে। মহিলা জাতকের বিশেষ সূত্রে লাভের সম্ভাবনা। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দিতে পারে।

কর্কট : মাসের গোড়ার দিক্ প্রীতির প্রসার ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির দিক থেকে অনুকূল। নূতন পরিকল্পনায় কোনো অর্থকরী ব্যাপারে এগিয়ে যাবার মত যোগও রয়েছে। সংগঠনের দিক থেকে মাসের শেষাংশ বেশ অনুকূল। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। পরিবারে কারো সঙ্কট কিংবা পীড়াদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে। ব্যবসায়ে অবশ্য আশানুরূপ আয় বাড়বে না। চাকুরী ক্ষেত্রে নূতন ইঙ্গিত রয়েছে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। চুরি যাওয়া কিম্বা কোনোভাবে ক্ষতিরও আশঙ্কা আছে। পথ চলতে সাবধান। মহিলা জাতকের অভীষ্ট কোনো কাজে আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। চাকুরীপ্রার্থীদের অনুকূল। কর্কট লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের উৎপাত এবং কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝট বিশেষভাবে উত্যক্ত করতে পারে। বাইরে কোথাও গিয়ে সংকটে পড়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

সিংহ : মাসটা মাঝে মাঝে বেশ সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে উঠবে। মাসের শেষাংশে প্রত্যেক কাজে সতর্ক হবেন, বিষয়-সম্পত্তি ঘটিত ঝঞ্ঝাট ও দেনা-পাওনার ব্যাপার এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে সেই প্রতিষ্ঠান নিয়ে গোলযোগ বিচলিত করতে পারে, শরীরও বিশেষ ভাল যাবে না। কোনো রূপ স্ফীতি ও ব্যথা-বেদনা দেখা দিলে গোড়ায়ই সাবধান হবেন। অবশ্য ব্যবসায় কিছু আয় বাড়বে। পরিবারে কাউকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চলা উচিত। রাহু, মঙ্গল ও শনির অবস্থান বিরুদ্ধ। নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করতে হলে নিজের সামর্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে আগে অবহিত হোন। মহিলা জাতকের পক্ষে প্রিয়জনের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে বুধ কিম্বা শনির দশান্তর্দশা চললে সকল বিষয়েই সাবধান হয়ে চলা উচিত।

কন্যা : মানসিক চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে কাজকর্মের ক্ষতি করবে। গোড়ার দিকে বিশেষ কোনো সাফল্য ও কারো সহায়তা লাভের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। শেষাংশে শরীর ভাল যাবে না, উদর ও স্নায়ুঘটিত কোনো উৎপাত দেখা দিলে গোড়ায়ই সাবধান হবেন। ব্যবসায়ে আশানুরূপ হবে না। এমন কি অর্থার্জনের জন্য নূতন কোনো ব্যবসার চিন্তাও দেখা যায়। চাকুরী ক্ষেত্রে এক ধরণের অনিশ্চিত অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। কন্ট্রাক্ট কিংবা চুক্তির কাজে সরবরাহকারীদের পক্ষে নৈরাশ্যসূচক। মহিলা জাতকের পক্ষে নূতন যোগাযোগে উৎসাহ বৃদ্ধি এবং অপ্রত্যাশিত আনন্দদায়ক কিছু ঘটতে পারে। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি বাড়বে। কিন্তু প্রত্যাশিত ক্ষেত্রে শুভফল পেতে বাধা রয়েছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ। কিন্তু প্রিয়জনের জন্য উদ্বেগ দেখা যেতে পারে।

তুলা : ব্যবসায়ের দিক থেকে লক্ষণীয়। নূতন কোনো কাজ সুরু করতে হলে এখন থেকে তার প্রস্তুতির প্রয়োজন। পুরনো প্রাপ্য কিছু আদায় হতে পারে। মাসের শেষাংশ অনুকূল, স্বাস্থ্য কিছু কিছু উৎপাত করবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনুকূল হবে। কিন্তু কারো অসুখ-বিসুখ সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা রয়েছে। বৈষয়িক ব্যাপারে শত্রুবৃদ্ধি ও ঝগড়াবিবাদ হতে পারে। দূরে কোথাও যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশায় সতর্ক থাকা উচিত। মহিলা জাতকের দ্রব্যলাভ ও ঈপ্সিত ব্যাপারে শুভ হতে পারে। তুলা লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক ব্যাপারে আগের চেয়ে আশাপ্রদ, কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে।

বৃশ্চিক : স্বাধীন প্রোফেশনের মধ্যে আইন বিভাগ, হিসাব পরীক্ষাদি বিভাগ ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারীদের পক্ষে এ মাস লক্ষণীয়। আয় বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। সন্তান চিন্তা ও গাফিলতি কিংবা ভুলের জন্য ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। চাকুরী ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী সহযোগীদের সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করা সম্পর্কে সাবধান। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদিতে ভাল হতে পারে। নূতন ব্যবসায় সুরু করার পক্ষে এ মাসের শেষাংশ অনুকূল হবে। তরুণ-তরুণীদের প্রেম-প্রণয়মূলক বিবাহাদির পক্ষে এ মাস প্রতিকূল। সঙ্গী নির্বাচনে ও ভ্রমণাদিতে বিশেষ সাবধান। মহিলা জাতকের প্রীতির প্রসার ও নূতন কোনো ব্যাপারে আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। গলার অসুখ কষ্ট দিতে পারে। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে ব্যয়বাহুল্য ও পারিবারিক ব্যাপারে অশান্তি ভোগের আশঙ্কা।

ধনু : চাকুরী ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যেও অভাবনীয় শুভ ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু মন্তব্য প্রকাশ ও অতিরিক্ত ঝোঁকের মাথায় কোনো কিছু করা সম্পর্কে সাবধান। লেখক, বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের পক্ষে শুভসূচক। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। উদরসংক্রান্ত গোলযোগ সম্বন্ধে বিশেষ

সাবধান। সন্তানের জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ ঘটতে পারে। দূরে কোথাও যাবার ব্যবস্থায় বাধা ও আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা। নূতন কোনো কাজ আরম্ভ করতে হলে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ অনুকূল। মহিলা জাতকের পক্ষে মনোমত কাজে সুযোগ ও বন্ধুজনের উপকার পাবার সম্ভাবনা। ধনুলগ্নে জন্ম হলে আর্থিক যোগাযোগের দিক থেকে ভাল, কিন্তু স্বার্থের জন্য যা করবেন, সে-সব কাজ কুৎসাভাগী করতে পারে।

মকর : যা-ই করুন না কেন বেশ ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করে করুন, সহকারী বা উপদেষ্টাদের মতে মত দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিড়ম্বিত হবার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ে নূতন কিছু করারও সম্ভাবনা বা প্রচেষ্টা দেখা যায়। গবেষক ও সংগঠকদের পক্ষে অনুকূল। চাকুরী ক্ষেত্রে আকস্মিক কোনো ব্যাপারে অশান্তি ঘটতে পারে। বিষয়-সম্পত্তি বা জমিবাড়ি নিয়েও নূতন কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরীক্ষার্থীর পক্ষে এ সময় সুযোগপ্রদ। বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ হলে সতর্ক হবেন। মহিলা জাতকের প্রীতির প্রসার ও আত্মজনের জন্য সুখ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকুরে মহিলাদের শুভ ইঙ্গিত রয়েছে। মকর লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে উদ্দীপনা ও আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যের গোলযোগ অশান্তি বাড়াবে।

কুম্ভ : কোনো ব্যাপারে আলেয়ার পেছনে ঘুরে বেড়ানোর মত অবস্থা শনি বক্রী থাকাকালে হতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান। চাকুরী ক্ষেত্রে যোগাযোগের দিক থেকে ভাল হলেও আর্থিক সমস্যা বিব্রত করবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু ভাল হতে পারে, গুরুজনকষ্ট ও ভ্রাতৃসুখে হানিরও আশঙ্কা আছে। চলাফেরায় বিশেষ সাবধান। দূরে কোথাও গিয়ে অসু-বিধায় পড়তে পারেন। পরীক্ষার্থীর পক্ষে এ সময় অনুকূল। চাকুরে মহিলাদের উন্নতির সম্ভাবনা। নব-বিবাহিতাদের পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো কোনো কারণে অশান্তি ঘটতে পারে। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত, কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে। স্বাস্থ্যও উৎপাত করতে পারে। দূর ভ্রমণে বিপত্তি ঘটার আশঙ্কা।

মীন : এ মাসে বিশেষ কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু মাসের শেষাংশ উদ্বেগ, ঝঞ্ঝাট ও নানাভাবে দুশ্চিন্তা ভোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ব্যবসায়ে মোটামুটি ভাল। বাইরে কোথাও যাবার ব্যাপারে অসুবিধা এবং স্বজনপীড়ায় কষ্ট ভোগ হতে পারে। চাকুরী ক্ষেত্রে নূতন সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা। বাড়ির ও প্রতিবেশীর ব্যাপারও আশানুরূপ হবে না। অবশ্য কোনো সন্তান সম্পর্কে সুখবর পেতে পারেন। নূতন কোনো কাজ করতে হলে মাসের গোড়ার দিক অনুকূল। মহিলা জাতকের শরীর ও মনের ওপর বারবার চাপ যেতে পারে। মীন লগ্নে জন্ম হলে কোনো কাজে তৃপ্তি ও সম্মান লাভ হতে পারে। আর্থিক দিক দিয়েও এ মাস আশাপ্রদ। কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সংগে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সংগে জন্মের সাল, তারিখ ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সংগে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কারণে নাম গোপন রেখে প্রশ্ন জানতে চান, তিনি অনায়াসে কোন একটি সাংকেতিক নাম বা ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেন।

(এই কুপন কেটে পাঠাতে হবে)

মাসিক রাশিফল

নাম- ....

ঠিকানা- ....

....

মাসিক বসুমতী

● পত্রোত্তর ●

●শ্রী বি এন দে (রামকৃষ্ণ সেন কলিঃ)---(১) অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে অনুকূল অবস্থা, (২) পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো উত্তর দেওয়া হয় না। ●গহর আলী মোল্লা (চকপাড়া, ভট্টনগর), আগামী বছর জ্যৈষ্ঠের পর আরো ভাল হবার সম্ভাবনা। ●শ্রীশ্যামাপদ রায় (আসানসোল), (১) লটারীতে পাবার সম্ভাবনা নেই, (২) বেশী বয়সে অবস্থার উন্নতি হবে। ●শ্রীবিবেককুমার নাগ (নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলিঃ), (১) আগামী ইংরেজী সালে, (২) অন্য চাকুরীও হতে পারে। ●শ্রীনির্মল মিশ্র (রামচালা), (১) ভাদ্র থেকে দেড় বছর পর, (২) এর পর ভাল দিকে যাবে। ●শ্রীমতী পার্বতী রানী দত্ত (আসানসোল), (১) ইংরেজী বছর, (২) মনোমত হবে। ●শ্রীপ্রশান্ত-কুমার দত্ত (আসানসোল), (১) কাল, (২) চাকুরী আগামী বছরই হতে পারে। ●শ্রীঅসিতবরণ সাহা (তিনসুকিয়া), (১) আগামী বছর মাঘের পর এর চেয়ে ভাল, (২) সাত তিন বছর কিছু কিছু উৎপাত থাকে; কোন কিছু ধারণে বিশেষ ফল হবে না। ●শ্রী সিকো (বিডন স্ট্রীট), (১) ভাল চিকিৎসক দেখান। জ্যোতিষ মতে তিনরতি উৎকৃষ্ট মুক্তা ও আটরতি উৎকৃষ্ট প্রবাল ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) বাধা রয়েছে। তবু দেড় বছর সুযোগপ্রদ। ●শ্রী এম কে (বিডন স্ট্রীট,), (১) সিংহরাশি, (২) আটরতি অ্যাকুয়ামেরিন ধারণ করে দেখুন। ●শ্রী ডি কে (বিডন স্ট্রীট), (১) নবগ্রহ কবচ ধারণ করিয়ে দেখুন, (২) বৃশ্চিক রাশি। ●শ্রীগৌরী দত্ত (রায়গঞ্জ), (১) এখন হবে না (২) মীন লগ্ন ও ধনু রাশি। ●শ্রীশ্যামসুন্দর প্রামাণিক (ডেকানল) (১) আগামী জানুয়ারী পর্যন্ত সাবধান, (২) আগামী বছর উন্নতি। প্রতিকার জন্য---শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা কবচ। ●শ্রীমনোজকুমার দে (রামকমল সেন লেন, কলি), আরো মনোযোগ দাও। ●শ্রীমতী গীতা মিত্র (সার্কুলার রোড, হাওড়া), (১) আগামী অগ্রহায়ণ থেকে দেড় বছর দেখুন, (২) স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। ●শ্রীমতী মিনতি চৌধুরী (সার্কুলার রোড, হাওড়া), (১) সময় এখনো আসেনি; তিন বছর মধ্যে হতে পারে; (২) বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্য রক্তমুখী প্রবাল সাত-আট রতি এবং পাঁচ-ছয় রতি অ্যাকুয়ামেরিন যথাবিধি ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীঅরুণচন্দ্র বসু (বি ই কলেজ, শিবপুর), আপনার পরিকল্পনা সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা। ●শ্রীহারাধন চ্যাটার্জী (শিশির বাগান রোড, বেহালা), ইংরেজী বাহাত্তর সালে হবার সম্ভাবনা। তার কিছু প্রতিকার জন্য রূপার আংটিতে রক্তমুখী প্রবাল আটরতি ধারণ করে দেখতে পারেন। শুধু মেয়েটির স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখুন। ●শ্রীনির্মলকুমার দাস (মহামায়া কটন মিল) (১) সঠিক জন্ম তারিখ ও সময় দরকার, (২) চাকুরীতে পরিবর্তন আছে। শ্রীঅসিতবরণ রায় (চামশা, জলপাইগুড়ি), (১) এখন থেকে সাড়ে তিন বছর পর অনেকাংশে ভাল, (২) প্রতিকার জন্য নয়-দশ রতি রক্তমুখী প্রবাল, রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন। ●শ্রীদীপ ও প্রদীপ (বহরমপুর), (১) এখন থেকে দেড় বছর দেখুন, (২) বৃশ্চিক রাশির পক্ষে এখন মোটামুটি ভাল। ●শ্রীরূপদর্শী (রমেশ মিত্র রোড, কলি), (১) আগামী বছর অনেকাংশে ভাল, (২) পরে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ●শ্রীটাবলু ব্যানার্জী (মুখার্জী-পাড়া লেন, হাওড়া), (১) মিথুন রাশি, (২) তেইশ-চব্বিশ বর্ষ বয়সে হতে পারে। ●শ্রীবিশ্ব সিন্‌হা (মুখার্জী লন, বহরমপুর) (১) পারিবারিক পীড়াদি, নিজেরও দেহকষ্ট ও অনেকবার উদ্যমে বাধা পড়তে পারে, (২) উচ্চশিক্ষার যোগ থাকলেও আগামী আড়াই বৎসরের কার্যকারণ তা নিয়ন্ত্রিত করবে। ●শ্রীদেব সিন্‌হা (বেলডাঙ্গা), (১) আগষ্ট থেকে মার্চের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত, (২) পরীক্ষাদির ব্যাপারে ভাল হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করবে। ● শ্রীমতী কৃষ্ণা দাশগুপ্তা (তিলজলা, কলিকাতা), (১) ভাল চাকুরী আগামী ইংরাজী সালে পেতে পারেন। শনি বিরুদ্ধ। তার প্রতিকার প্রয়োজন, (২) ছেলের স্বাস্থ্যাদি উৎপাত করতে পারে। ● শ্রীমতী শিপ্রা দাশশর্মা (বেলেঘাটা সি আই টি বিল্ডিং), (১) কর্কট রাশি। আগামী বছর থেকে মোটামুটি ভাল, (২) অল্পে বিচলিত হওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করো। পড়াশোনায় ভাল হবে। ●শ্রীস্বপন দাশশর্মা (সি, আই, টি, বিল্ডিং, বেলেঘাটা), (১) মিথুন রাশি, আর্দ্রা নক্ষত্র, নরগণ, (২) পড়াশোনায় আরো মনোযোগ দাও। ● শ্রীচিত্তরঞ্জন গাঙ্গুলী (বালুরঘাট), (১) জন্মকালে রবি ও শনির এবং মঙ্গলের অবস্থান অত্যন্ত বিরুদ্ধ, (২) প্রত্যহ সূর্যোদয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে সূর্যকবচ পাঠ এবং কপালে শঙখ ঠেকিয়ে সূর্যের প্রণাম। এ ছাড়া নয় থেকে দশ রতি রক্তমুখী প্রবাল যথাবিধি শোধন করে ধারণ করে দেখুন। ● শ্রীউৎপল পৈত (রেলওয়ে কলোনী, তিনসুকিয়া) (১) তুলা রাশি, (২) আগামী মার্চের মধ্যে হতে পারে। ●শ্রীকানাই কাহালী (শহীদনগর, কাঁচরাপাড়া), (১) বৃষ লগ্ন, ধনু রাশি ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র, নরগণ, (২) প্রতিকার না করে ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য করুন। ●শ্রীমহাদেব মিত্র (বিপিন পাল রোড, কলি), (১) শ্রীসূর্যকবচ ও আট-নয় রতি পীত পোখরাজ ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) বিবাহে বাধা ও দেরী আছে। ●শ্রীমতী গীতা ঘোষ (অবধায়ক শ্রীএম, কে, দে, সিঙ্গুর) (১) আগামী বছর হতে পারে, (২) মেয়েটার ভবিষৎ ভাল হবে এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষায় উন্নতি করবে। ●শ্রী এ কে সি (কর্ণেল বিশ্বাস রোড, কলি), (১) আগামী মার্চের মধ্যে না

হলে ইংরেজী বাহাত্তর সালে চাকুরী, (২) সম্ভাবনা আছে। ● শ্রীদিলীপকুমার চ্যাটার্জী (ফরিদপুর, ভায়া ডোমকল), (১) হোমিওপ্যাথি শিখুন। প্রতিকার জন্য শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা কবচ ধারণ করতে পারেন, (২) বছর তিনেক পর মোটামুটি শুভ। পত্নীকে ছয়-সাত রতি রক্তমুখী প্রবাল ও তিন-চার রতি মুক্তা ধারণ করানো উচিত। ● শ্রীছদ্মনাম (তারাশুনিয়া), (১) চেষ্টা করতে পারেন, (২) লেখা প্রকাশ করলে মোটামুটি প্রফিট পাবার সম্ভাবনা। ● শ্রীমানসকমল চৌধুরী (জামির লেন, কলি), (১) সম্ভাবনা আছে, (২) তিন বছর দেখুন। ● শ্রীমতী কাকলি চৌধুরী (জামির লেন, কলি), (১) রিসার্চ করুন, (২) শরীরের উপর বিশেষ নজর দিন। প্রতিকার জন্য ছয়-সাত রতি রক্তমুখী প্রবাল, ছয়-সাত রতি গোমেদ ও তিন-চার রতি মুক্তা ধারণ করে দেখতে পারেন। ● শ্রীমতী অপরিচিতা (গরিফা), (১) মীন রাশি ও নরগণ, (২) আগামী ইংরেজী সালে। ●শ্রীপ্রভাতকুমার পাল (রাধাবাজার মোড়, নবদ্বীপ), (১) ছয়-সাত রতি মুন স্টোন রূপার আংটিতে ধারণ করে দেখতে পারেন, (২) আর্থিক দিক দু' বছর ধৈর্য ধরে চলতে হবে। ●শ্রীএম ঘোষ (বর্ধমান), আমাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্ন না করলে কোন উত্তর দেওয়া হয় না। ● শ্রীমৃণালকুমার নাগ (শিবপুর রোড, হাওড়া), (১)শনি অত্যন্ত অশুভ, এবং রবিও অশুভ, (২) প্রতিকারে বিশেষ ফল হবে না। ধৈর্য ধরে তিন বছর চালিয়ে যান। ● শ্রীমতী চৈতালী ঘোষ (বিধান সরণী, কলি), (১) চাকুরীর চেষ্টা করুন, (২) আগামী অগ্রহায়ণ থেকে বর্ষকাল মধ্যে হতে পারে এবং সুখেরই হবে। ●শ্রীসুনীলকৃষ্ণ রায় (বিধান সরণী, কলি), (১) দেরী হবে, (২) অর্থপ্রাপ্তি যোগ এখন নেই। ● শ্রীবিশ্বরঞ্জন দাস (নেতাজী পল্লী, বেলঘরিয়া), (১) সময় প্রতিকূল; তবু আগামী অক্টোবরের মধ্যে কোন কাজ হতে পারে, (২) পড়াশোনার দিক্ কুমার পাল (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি) (১) কর্কট রাশি, পুনর্বাসু নক্ষত্র ও তুলা লগ্ন, (২) দেড় বছর মধ্যে হতে পারে। ●শ্রীএম আর সি (কপাটী, আসাম), (১) বর্তমান ইংরেজী বছরে, (২) শনির কুপ্রভাবে বাধা আছে। ●শ্রীকালিকারঞ্জন রায়সরকার (দিল্লী), (১) বাড়ী এবার শেষের দিকে আরম্ভ করতে পারেন, কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাট চলতে পারে, (২) পত্নীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গোলমাল হতে পারে। ●শ্রীমৃণাল চক্রবর্তী (আনন্দমোহন বোস রোড দমদম), (১) এখন শনির দশা চলছে। রত্নাদি ধারণে বিশেষ ফল হবে না, (২) আগামী ইংরেজী বছর অনেকাংশে অনুকূল। অনেকগুলো গ্রহ-বিরুদ্ধ। ●শ্রীজয়ন্তকুমার চক্রবর্তী (খড়গপুর), (১) সম্ভাবনা আছে, (২) কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। ●শ্রীতর্কতীর্থ (নৈহাটী) (১) বুধ বিশেষ ভাল ফল দেবে না, (২) আগামী বাংলা বছরে কিছু ভাল হতে পারে। ●শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল (শম্ভুনগর, নদীয়া), (১) উদ্যমে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এবং কাজ হবার যোগ, (২) পড়াশোনার চেষ্টা করুন। ●শ্রীপ্রভাসকমল রায় (নীলমণি রো, কলি), (১) দেড় বছর এখনো বিশেষ অনুকূল নয়, (২) তবু চেষ্টা করুন কোনো কাজ হতে পারে। ● শ্রীশ্যামাশান্তি চ্যাটার্জি (রামপুরহাট), (১) ব্যবসায় হতে পারে, (২) কন্যা কিংবা মিথুন হলে ভাল হয়। ●শ্রীতাপসকুমার চক্রবর্তী (রামপুরহাট), (১) চাকুরীর চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু ব্যবসায় পরে, (২) প্রত্যেক শনিবারে বিল্বপত্রে প্রতি পাতায় দু'বার ক'রে লাল কালিতে দুর্গানাম লিখুন। ●শ্রীবিমলকুমার ঘোষ (কলিকাতা), (১) শনি অশুভ আগামী বছর জুন পর্যন্ত অশুভ ফল দেবে। ইংরেজী নূতন বছরে কাজের দিক দিয়ে কিছু ভাল হতে পারে, (২) প্রতিকার ব্যয়-সাধ্য এবং না করাই ভাল। ●শ্রীশঙ্কর-প্রসাদ (নলহাটী), আমাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্ন না করলে উত্তর দেওয়া জামসেদপুর), (১) চাকুরী এখন হতে পারে, (২) বাধা আছে। ●শ্রীমান ভাস্কর (গুপ্ত রোড, জামসেদপুর), (১) অগ্রহায়ণ থেকে যোগ পড়বে, (২) মোটামুটি ভাল। ●শ্রীউমাকান্ত দত্ত (বেলগাছিয়া রোড, কলি) (১) বিশেষ কোনো উপকার হবে না, (২) স্বামী-স্ত্রীর জন্মকুণ্ডলী দেখা প্রয়োজন। ●শ্রীশক্তিকুমার পাল (তারাচাঁদ রোড, হাওড়া), (১) ইংরেজী নূতন সালে দেখুন, (২) আগামী বার হতে পারে। ●শ্রীবিনয় দে (দুর্গাপুর-৪), (১) উচ্চশিক্ষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত, (২) কিন্তু স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখুন। গবেষণা, অধ্যাপনাদি অনুকূল। ●শ্রীটাবলু ব্যানার্জি (হাওড়া-৬), (১) হবে না, (২) ভদ্রভাবে চলার মতন। ● শ্রীএস, ব্যানার্জি (নিরসা, ধানবাদ), (১) এ ধরণের বিশেষ কোনো যোগ নেই, (২) পরীক্ষার বিষয় বলা হয় না। শ্রীতপন বোস (হরিপদ দত্ত লেন, টালিগঞ্জ), (১) আগামী মার্চের মধ্যে দেখুন, (২) উভয়ের জন্মকুণ্ডলী দরকার। ●শ্রীমতী মালতী (কলিকাতা), (১) পনেরো মাস দেখুন, (২) ভাল চিকিৎসক দেখান, উপকার পাবার সময় এসেছে। ●শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (হাদিপুর), (১) সাড়ে তিন বৎসর পর এর চেয়ে ভাল, (২) রত্ন ধারণে বিশেষ উপকার হবে না। ●শ্রীরঞ্জিতকুমার দাস (উত্তর-পশ্চিম দিনাজপুর), (১) বর্তমানে ছেড় বছর বিশেষ ভাল নয়, (২) জন্মের তারিখ আছে, কিন্তু মাসের উল্লেখ নেই। সুতরাং রাশি-লগ্নাদি জানানো গেল না। ●শ্রীপ্রণব সেন (শিলিগুড়ি), বহুমূল্য রত্নাদি ধারণ করেও শুভ ফল হয় না। নিজের মনের দৃঢ়তা রাখো। আর প্রতি সপ্তাহে জন্মবারে কচি কলাপাতায় লাল কালিতে আঠারোবার করে নিজের নাম লেখো, তাতে উপকার হতে

কিরাত বংশের পরিচয় ও কাছাড়িদের বিস্মৃত ইতিহাস

শীতাংশু পাল

পৃথিবীতে মানব জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে ২ লক্ষ বৎসর পূর্বে, কারো মতে ৫০ হাজার বৎসর পূর্বে বা ২৫ হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে মানব জাতির আবির্ভাব হয়েছিল। সে যাই হোক, প্রাচীনতম জাতির অস্তিত্ব যে হিমালয়ের পাদদেশে পাওয়া গেছে এবং পরবর্তী জাতিগুলি চীন দেশ (Pekin-man) ও যবদ্বীপে (Java-man) আবির্ভূত হয়েছিল। অতি প্রাচীনকালে অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ একত্র সংযুক্ত ছিল ও গণ্ডোনিয়া দেশ নামে অভিহিত ছিল। ভারতের 'গণ্ড' জাতির নাম এই গণ্ডোনিয়া থেকেই। জাতিতত্ত্ববিদরা তাঁদেরকে অষ্ট্রো এশিয়াটিক বা অষ্ট্রিক বলে অভিহিত করেছেন ও চীন-তিব্বতীয় Sino-Tibetian জাতিকে মঙ্গলয়েড বিভাগে নির্ধারিত করা হয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে বসবাসকারী 'কিরাত' বা 'বড়ো' জাতিরা আনুমানিক ৪ হাজার বৎসর পূর্ব থেকে বসবাস করে আসছে।

মহাভারতে আমরা রাজা ভগদত্তের বর্ণনা পাই। তিনি প্রাগজ্যোতিষপুরে কিরাতরাজ নামে বিখ্যাত ছিলেন। সে সময়ের পার্শ্ববর্তী প্রমীলা রাজ্য নাগরাজ্য ও ঘটোৎকচের রাজ্য প্রভৃতির উল্লেখ পাই। এ সব ছোট ছোট রাজ্যে নানা জাতের কিরাত বংশীয়েরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে ভারতের পূর্বপ্রান্তে কিরাতভূমি ---'পূর্বে কিরাতা: যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতা:।" কল্পদ্রুমে আছে কিরাতভূমি---"পূর্বে কিরাতা: যস্যান্তে মণিপুরস্থত: পরং।"

অষ্ট্রিক জাতিদের অধ:পতনের যুগে কিরাত বা বড়ো জাতিরা ভারতের উত্তরাঞ্চল জুড়ে আক্রমণ করে। তাঁদের আদিভূমি 'বদ', 'বোদ বা 'বোড' চীন দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ছিল। কিরাত ও বড়ো জাতির মূলত: একই এ' সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। বাজসেনী সংহিতা, মহাভারতে ও ও অথর্ববেদের উক্তিমতে এরা গহ্বরবাসী। হিমালয়ের সমুদয় পাদদেশ জুড়ে ছিল এঁদের খণ্ড খণ্ড রাজ্য। Periplus-এর 'Khirrhadia, Ptolemy-র 'Kirrhadia, Plinyর "Chirioto-sagi এবং 'Skiratai' নাগার্জুন কুণ্ডের উৎকীর্ণ লিপির "কিলাত্" প্রভৃতি এই কিরাত জাতিকেই বুঝায়। আর এঁদের রাজ্যের বিস্তৃত ছিল পূর্ব ভারতবর্ষের আসাম, কাছাড় ও ত্রিপুরা জুড়ে। আসামে এ 'কিরাত' জাতিদের প্রভাব খুব বেশী। আর আসাম ও পূর্ব বাঙলার বসবাসকারী কিরাতরা মঙ্গোলীয়ান জাতির অন্তর্গত।

গ্রীক লেখকগণ প্রাচীনকালে আসামের নাম "Serica" ছিল বলে অভিহিত করেছেন। 'Silk' শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে মঙ্গোলীয় 'সিরকেক্', কোরিয়ার 'সির', চীনের 'সী', গ্রীকের 'সির' ও ল্যাটিনের 'সিরিকাম' প্রভৃতি শব্দের আগম সম্ভাব্য মনে করি। সিল্ক বা রেশম ব্যবসায়ীদিগকে 'সিরে' ও 'কাইরাইট' প্রভৃতি বলা হয়েছে। 'Sericulture' শব্দের মূল কোথায় এ' থেকে তা' অনুমান করা যায়। আর কিরাত জাতির এই বড়ো শাখারা আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ে রেশমের চাষ ও শিল্পের প্রসার করেছে। বিষ্ণুপুরাণ ও কালিকাপুরাণে এ' জাতিকে প্রধানত: পশু-শিকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। ব্যাধ নামেই তারা পরিচিত। বলা বাহুল্য, শিবের বাসস্থান তিব্বত থেকে এই কিরাত জাতিরা শিবলিঙ্গ আনয়ন করেন ও উত্তরভারত ও আসামে শৈব উপাসনার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন, পরে তা' ত্রিপুরা মণিপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে প্রচলিত হয়। তখন রাজ্যগুলিতে ছিল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ, মহা-অরণ্যসঙ্কুল, মহাপুণ্যবান ও মহিমাযুক্ত। এই রাজ্যগুলিতে অরণ্যাশ্রিত শৈবধর্ম প্রচারের কথা ও ইতিহাস আমরা 'ধরণী সংহিতায়' পাই। শিবোপাসক কিরাত জাতিরা 'সির' বা রেশমের ব্যবসা করত, তাঁরা ছিল নৃত্যগীতে পারদর্শী, ঢাক করতাল ও অন্যান্য বহু বাদ্যযন্ত্র তারা ব্যবহার করত।

প্রাচীন কাল থেকেই 'বড়োরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তর ভারত, নেপাল, ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যে এক শক্তিশালী জাতি হিসাব পরিগণিত ছিল। কাছাড়ীরা ভোটব্রহ্ম শাখার 'বড়ো' জাতির অন্তর্গত। আসাম অঞ্চলের জাতিসমূহকে পর্যালোচনা করলে 'বড়ো' দু'টি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা---(১) মূল বড়ো

বিভাগ, (২) নাগা বড়ো ও নাগা কুকী উপবিভাগ, কিন্তু নগা বড়ো বিভাগকেই মূল নাগা জাতি ধরে নিলে ভুল করা হবে। কারণ নাগারা মূলত: আসাম বৃহ্ম বিভাগের ভাষার তারতম্য ও দৈহিক গঠনের ব্যতিক্রমের জন্য নাগাদিগকে ভৌগোলিক পরিবেশে আরও তিন বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা যথা (১) পশ্চিমাঞ্চলীয় নাগা: আঙ্গামী, সেমা, রেংমা, কেজমা ও কন্ (২) মধ্যাঞ্চলীয় নাগা:—আও, লোটা, ফেংসা, খুকুমী, খাংকুল, মাও, (৩) পূর্বাঞ্চলীয় নাগা:—আংওয়াংকু, বাংপারা, চিংমেগনু, মুতনিয়া, চাং, মেমিঙ, আসিংপীয়া, মসাং, সাংহি, মৈরাও মারিচং, নামা-সাংগিয়া, ইত্যাদি এ'সব নাগা ও বড়ো বিভাগের নাগা-দের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। কন্যাক নাগারা ও অন্য বিভাগে বিভক্ত, তাঁরা বিভিন্ন গোষ্ঠ গোষ্ঠীতে পরিবার নিয়ে বসবাস করে নাগা বড়ো বিভাগে প্রধানত: কাচা, কাবুই ও মৈরাও, জাতিরা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া মরাং, খাংকুল, মৈরাং, কাদং ও সপুভমা প্রভৃতি নাগারাও বড়ো বিভাগের অন্তর্গত। নাগা পাহাড় কোন কোন সময় কাছাড়ী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাগা এবং কাছাড়ীদের মধ্যে বন্ধুত্বের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এমন কি কোন কোন সময় তাঁদের মধ্যে বিবাহ ক্রিয়াদিও সম্পন্ন হত। কাছাড়ীরা প্রাচীন কাল থেকেই নাগাদিগকে বলত 'নাঙ্গা' কাছাড়ী 'নাঙ্গা' শব্দের অর্থ যুদ্ধপ্রিয় জাতি।

মূল বড়ো বিভাগকে 'বড়ো কাছাড়ী' ও 'ভোট তিব্বতীয়' প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এ'গুলির মধ্যে ও বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সমাজ-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। যথা:—

বর্তমান আসামের জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব উভয়ই সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন রক্তের সমন্বয় রয়েছে। ভৌগোলিক পরিবেশে ও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এ' সব বিভক্ত জাতিরা স্থায়ী বসবাস করবার জন্য ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত-ভাবে এক জাতি অন্য জাতির প্রতি বিবাহসূত্রে সৌহার্দ্যস্থাপন করেছে ও বহু আবর্তনে-বিবর্তনে ভিন্ন এক জাতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই, আসাম অঞ্চলের বিশাল এই বড়ো বিভাগের মানুষদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রণ উল্লেখযোগ্য।
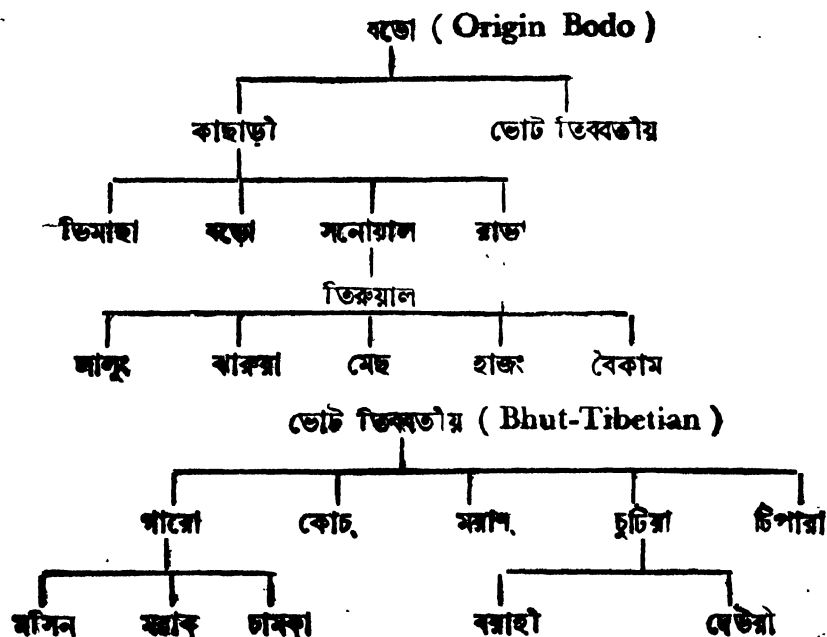
তাই দেখুন সিণ্টেং খাসীয়াদের মধ্যে মোঙ্গলো, অষ্ট্রিক, আলপাইন, ও ভোট বৃহ্ম জাতির সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। কোথার জাতিদের মধ্যে অষ্ট্রিক, নাগা ও বড়ো লুসাইদেরমধ্যে ইন্দো-নেশীয়া, সেমা ও আঙ্গামী নাগাদের মধ্যে মঙ্গোলীয়ান ও বড়োদের সংমিশ্রণ অত্যাশ্চর্য।

"It was as a result of this fusion that intermediate group of tribes (Naga-Bodo) originated. The use of forked posts either of stone or of wood may be taken as an important element of Bodo culture, and with a few exceptions, and element of Bodo origin can be traced in all the Naga and other tribes using this kind of Post (Civilization of Assam, P. 91, P. C. Chaudhury).

এ'সব সংমিশ্রিত বড়ো জাতিরা বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে মঙ্গো-লীয়ান গোষ্ঠীর মানুষ চীন, বৃহ্মদেশ ও তিব্বত থেকে এসে বৃহ্মপুত্র নদীর তীরে তীরে রাজ্য স্থাপন করে। তাই বৃহ্মপুত্র নদীর শাখা নদী সমূহের নাম অনেকাংশই 'বড়ো' ভাষায় রাখা। "বড়ো" ভাষায় বুর্লুং বুথুর এই বুর্লুং বুথুর শব্দ থেকে "বৃহ্মপুত্তর" বা বৃহ্মপুত্র হতে পারে অনুমান করা যায় কিন্তু বৃহ্মপুত্র মূলত: সংস্কৃত শব্দ।

আসাম, নেফা, নাগাভূমি, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয়, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে বিশাল ভূভাগের উপর পর্বতে সমতলে নদী তীরে বসবাসকারী মূল বড়ো জাতি থেকে উদ্ভূত পূর্ব ভারতে এ সব মানুষের সংখ্যা বিশ লক্ষেরও অধিক। তাই উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ ভূটানের উপজাতি ও ত্রিপুরার টিপারা রিয়াংদের ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে বড়োদের অপূর্ব মিল রয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রমাণসূত্রে দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর মানুষরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভারতে প্রবেশ করে ও মঙ্গোল জায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের পবত অতিক্রম

উপজাতি ও সমাজ গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। যথা:—

বড়ো (Origin Bodo)
- কাছাড়ী
  - ডিমাছা
  - বড়ো
  - সনোয়াল
    - তিরুয়াল
      - লালুং
      - খারুয়া
      - মেছ
      - হাজং
      - বৈকাম
  - রাভা
- ভোট তিব্বতীয়

ভোট তিব্বতীয় (Bhut-Tibetian)
- গারো
  - মসিন
  - মন্নাক
  - চামফা
- কোচ
- মরাণ
- চুটিয়া
  - বরাহী
  - দেউরী
- টিপারা

করে সীমাতে বসবাস করত। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সংস্কৃত কাব্যে এই মঙ্গলয়েড-দের ও তাঁদের পূর্বসূরীদের 'কিরাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। খৃষ্টীয় ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে এই কিরাত বংশীয়েরা উত্তরবঙ্গ, আসাম, বিহার নেপাল ও পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাবতী, খিতলা, গোমতী, তাপ্তী, ডিহং,. ডিবং , তিস্তা ও মঙ্গলদৈ প্রভৃতি—তি, তী, তি, দৈ ও ডিব্রু শব্দে মঙ্গোলীয় জাতির সংস্কৃতির আভাষ পাওয়া যায়। আসামের আদিম অধিবাসীদের মূলতঃ চারটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—(১) অষ্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠী, (২) তিব্বতীয় ব্রহ্ম, (৩) দ্রাবিড় ও (৪) মিশ্রিত আর্য। অষ্ট্রো এশীয়ান গোষ্ঠী আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম। ঐতিহাসিকদের মতে বড়ো, ডিমাছা, সনোয়াল, রাভা, লালুং, মিকির, গারো ও মেছ প্রভৃতি গোষ্ঠীরা বড়ো কাছাড়ী জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের আচার ব্যবহার ভাষা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি দৈহিক গঠনে ভোট তিব্বতীয় মানুষদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। আসামের ইতিহাস মতে তাঁরা ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক পরাক্রম জাতিরূপে বহু বৎসর রাজত্ব করেছে। ক্রমে ক্রমে তাঁরা ব্রহ্মপুর, সোনাপুর, ডিমাপুর, মাইবং বা কীর্তিপুর, খাসপুর ও হরিটিকর প্রভৃতিতে তাঁদের রাজধানী বহু উত্থান পতনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করেছে এবং অহোম জাতিদের আক্রমণে এক শাখা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়,—তারাই বড়ো কাছাড়ী, আর মাইবং নদীর উপত্যকার দিকে যে শাখা চলে আসে তারা ডিমাছা কাছাড়ী। বর্তমানে বড়ো কাছাড়ীরা কাছাড় জেলা, উত্তর কাছাড় জেলা, ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গ, নেপাল ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী স্থান-সমূহে বসবাস করছে।

অহোমদের আক্রমণের ফলে কাছাড়ীরা কিন্তু সহজেই তাঁদের রাজত্ব ছাড়েনি। তাঁরা তাঁদের রাজত্ব ও রাজধানী রক্ষার জন্য অনেক যুদ্ধ করেছে। অতীব সাহস ও বিক্রম দেখিয়ে দুর্ধর্ষ অহোম আক্রমণের ফলে কাছাড়ীরা ধানসিরি উপত্যকা ছাড়তে বাধ্য হয়।

কাছাড় নামের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রাচীন যুগের কিছু তথ্য (mythology) উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কামাখ্যাতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, ও পুরাণ প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, পাতাল নামে এক সাম্রাজ্য ছিল এবং তা' কোচবিহার, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পাতালেই দেবতারা দৈত্যরাজ বলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে না পেরে ছলনায় প্রেরণ করেছিলেন। মূলতঃ পাতাল রাজ্যের অংশ ও কাছাড় জেলা এখানেই রাজা বলিকে বন্দী রাখা হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবত মতে ভারতের 'প্রাগুদীচ্যাং' অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে পাতালবাসী সগর বংশ ধ্বংসকারী অগ্নি অবতার কপিল মুনির বাসস্থান। কাছাড়ের বদরপুরঘাট রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে সিদ্ধেশ্বরে এখনও কপিলাশ্রম অবস্থিত। তাহার উত্তরে বড়াইল পাহাড়ে অবস্থিত কপিল নদী। পাতাল গঙ্গা ভোগবতী বরাক নদী কাছাড় জেলার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত। অসমীয়ারা এ' নদীকে এখনও ভোগলিয়া নদী বলে। বরাকের শাখা নদী সুরমা। সুরমা সুরের মাতা গঙ্গারই নামান্তর। কাছাড়ের পূর্ব রাজ্য মণিপুর। মণিপুর উপত্যকা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৬০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। সেখান থেকে বহু নিম্নে অবস্থিত মূল পাতাল (নিম্নভূমি অর্থে) কাছাড়ের ভুবন পাহাড়ের সুরঙ্গের সহিত মণি-পুরের কাংলা সুড়ঙ্গ সংযুক্ত। উহার মধ্য দিয়েই বভ্রুবাহন কিংবা পুণ্ডরীক পাতাল থেকে সঞ্জীবনী মণি নিয়ে যান। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বরাহী দ্বীপের বর্ণনা আছে। বরাহ দ্বীপ কি বর্তমান সুরমা উপত্যকা ? বরাহী দ্বীপের সীমানা পূর্বে স্বর্ণবতী নদী ও চুলুইন নদী দক্ষিণে 'কুয়াই' নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দ্বীপেই বরাহী পর্বত ও বরাহী নদী অবস্থিত। এক সময় আসামের সমস্ত পর্বতমালার নাম ছিল বরাহ পর্বত। বর্তমান কাছাড়ের উত্তরস্থ বড়াইল (বরাহের আইল) পর্বত ও পশ্চিমের ওয়াংচিক পর্বত (ওয়াক-বরাহ, চিক্-পর্বত) প্রাচীন বরাহ পর্বতের প্রতীক স্বরূপ। আর বরাহী নদী বরাকে রূপান্তরিত। বরাহ দ্বীপের দক্ষিণ ভাগের নদীর নাম 'কুয়াই।' 'কুইয়াড়া'র তীরবর্তী স্থান-সমূহের বাসিন্দারা 'কয়াড়' নামে পরিচিত। 'কয়াড়' থেকে হয়ত বা কাছাড় শব্দের উৎপত্তি হতে পারে।

গণ্ডনিয়া যুগে উত্তর ভারত, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, মণিপুর, কাছাড়, খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়, ময়মনসিং ও তৎ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ জলের নীচে ছিল। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি-ক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াকৃত জরীপ কার্য থেকে জানা যায় যে দশ কোটি বৎসর পূর্বে শিলং বড়াইল পাহাড়ও তৎপার্শ্ববর্তী মালভূমি সাগর পৃষ্ঠের সমতলে ছিল ও পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্বে উক্ত অঞ্চলগুলি ছিল সাগর গর্ভে বিলীন। হাণ্টার সাহেবের মতে কাছাড় জেলার পূর্ব ও উত্তর ভাগের পাহাড় শ্রেণীতে প্রাচীন কলের সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতের চিহ্ন আছে। অধুনা শিলঙ-শিলচর যে বাসরুট খোলা হয়েছে সে রাস্তার পাহাড় কাটার সময় বিশাল সামুদ্রিক ফসিল দেখা গেছে। কাছাড়ে সহাবস্থান সম্পর্কে এতো গেল প্রাচীন মতামতের কথা। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে কাছাড়ীরা সর্বদাই তাঁদের বাসস্থান তৈরী করত পাহাড় ও নদীর কাছাকাছি। নদীর কাছে বা পর্বতের কাছে—"কক্ষরাট" বা "কক্ষাত" তারা বসবাস করে তাই মনে হয় 'কক্ষাত' সংস্কৃত শব্দ থেকে 'কচ্ছভ' ও কাছাড় হয়েছে। কাছাড়ী জাতিদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী আছে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারীতে কাছাড়ীদের যে উপকথার উল্লেখ আছে তা' থেকে জানা যায় বহুপূর্বে কাছাড়ীরা বসবাস করতো অত্যন্ত সুন্দর এক শৈল শিখরে। তার নাম ছিল ইলাস কাক-রাসি। সে শৈলবাসীদের বাড়ী ঘর সব

[illegible] পাথর দিয়ে তৈরী। গ্রামের পার্শ্বে ছিল প্রবহমান চঞ্চলা খরস্রোতা নদী। সেই সুদূর দূরাধিগম্য গ্রাম কিন্তু এক বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হল। তারা ভীতত্রস্ত হয়ে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে নদীর অপর পারে নীচু অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিল। এই নীচু অঞ্চলই 'কক্ষাত্' বা কাছাড়। ইতিহাসে আছে কাছাড়ীরা খাসীয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। তাঁদের মনোমালিন্য ছিল বহুদিন পর্যন্ত। তাই খস্ বা খাসীয়াদের সঙ্গে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্যেরা বলত খসারি। খসারী থেকে হলো 'কাছাড়ী।' কাছাড়ীদের রাজ্য ছিল তাই হয়ত দেশের নাম হলো কাছাড়। ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সূত্রে এসব কথা বিশ্বাস নাও হতে পারে কিন্তু 'খসারি' থেকে অপভ্রংশ হয়ে শব্দটি কাছাড়ী হতে পারে তা' অনুমান করা যায়।

বর্তমান কাছাড় জেলা করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচর মহকুমা নিয়ে বিস্তৃত। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাক নদী প্রবাহিত। বরাক ও মধুরা নদীর তীরে কাছাড়ীদের রাজধানী খাসপুর ও হরিটিকর, উত্তর কাছাড় জেলায় মাহুর নদীর তীরে রাজধানী মাইবং ও ধানশ্রী নদীর তীরে রাজধানী ডিমাপুরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। কাছাড় জেলা থেকে উত্তর কাছাড় জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থাও বর্তমানে পৃথক। কাছাড় রাজ্যের ইতিহাস এখন কালের গর্ভে বিলীন।

প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃত শাস্ত্র ও কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় রাজা নরকাসুর কিরাত সমাজ নিয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। অমরকোষ অভিধানে আছে,---

"লোকহয়ং ভারতং বর্ষং শরাবত্যাস্ত যোঽবধেঃ।
দেশঃ প্রাগ্ দক্ষিণঃ প্রাচ্যো উদীচ্যঃ পশ্চিমোত্তর।
প্রত্যন্তো ম্লেচ্ছদেশঃ সাৎ মধ্যদেশস্থ মধ্যমঃ।"

প্রাগ্ দক্ষিণ দেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দক্ষিণ দেশ। ঐ সময় পূর্ব দিকে হিড়িম্বার রাজ্য ছিল। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবরা ভারতের পূর্ব প্রান্তে বনবাসের জন্য এসেছিলেন। হিড়িম্বার রাজা হিড়িম্ব রাক্ষস বংশীয়। তিনি ভগ্নী হিড়িম্বাকে পাঠালেন পাণ্ডবদিগকে বধ করবার জন্য। হিড়িম্বা দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের রূপ দেখে প্রণয়াসক্ত হলেন ও ভীমকে পতিত্বে বরণ করলেন। এ' কথা শুনে রাজা হিড়িম্ব ক্রোধান্বিত হলেন ও স্বয়ং চললেন পাণ্ডবদিগকে বধ করবার জন্য। হিড়িম্ব রাজা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মে। পাণ্ডবরা ঘটোৎকচকে হৈড়ম্ব রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন। ঐতিহাসিকরা বলেন হৈড়ম্ব রাজারা ছিলেন কিরাত বংশীয়---আর অধুনা কাছাড়ীরা ঘটোৎকচের বংশধর।

মহাভারত ছাড়া 'কালিকাপুরাণ' ও 'কামাখ্যাতন্ত্রে' কাছাড়ী বা হৈড়ম্ব রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে। যথা---

"ত্রিপুরা কৈকিকাচৈব জয়ন্তী মণি. চন্দ্রিকা।
কাছাড়ী মাগধী অশ্বানি সপ্তপর্ব্বতাঃ॥

সপ্তপাতাল বরাহী দ্বীপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাস ও বাস্তবের ভিত্তিতে বহু প্রমাণও আছে যে শ্রীহট্ট কাছাড় ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি সাগর গর্ভে ছিল। উলুপীর আদেশে পাতালে থেকে সঞ্জীবনী মণি আনয়নকারী নাগরাজ পুণ্ডরীক ও পুত্র মৌনী শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মগধ রাজ্য থেকে মণিপুরের মধ্য দিয়ে নাগলোক যান। বর্তমান করিমগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ ও লুসাই পাহাড়ের কিছু অংশ ছিল মাগধী রাজ্য। তাই দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়ের নাম মগধী পাহাড়। কাছাড়, মণিপুর, মগধ, নাগরাজ্য প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য। তাই আছে---'

'পূর্বেতে মণিপুরএক দেশ ছিল।
মৌনী নিয়াপুণ্ডরীকনাগপুরে গেল।"
(মণিপুর চক্রম্--লাংখইলুখই রচিত)।

প্রাচীন কাব্যগাথায় ও আরও বিভিন্ন শ্লোক ও উদাহরণ প্রভৃতিতে আছে হৈড়ম্বদের উপাস্য দেবী ছিলেন "রণচণ্ডী"। ব্রহ্মখণ্ডের একটি শ্লোকে আছে---

"হেড়ম্ব দেশ মধ্যে রণচণ্ডী বিরাজতে।
বরবক্রা সরিৎপার্শ্বে হিড়িম্বা লোকদুর্জয়া"।

এখানে পাওয়া যায় যে বরবক্ বা বরাক নদীর তীরে হৈড়ম্ব রাজ্য ছিল। খাসপুর রাজধানীতে রণচণ্ডীর মন্দির এখনও বিদ্যমান।

এ কথা নিঃসন্দেহ যে আসামের বড়োভাষী অধিবাসীদের মধ্যে কাছাড়ীরাই ব্রহ্মপুত্র পর্যঙ্কের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। অহোমদের আগমনের পূর্বে ও উত্তর পূর্ব আসামে কাছাড়ীদের রাজ্য ও রাজধানী ছিল। কাছাড়ীদের প্রথম রাজধানী নওগাঁ জেলার ব্রহ্মপুর। এ' ব্রহ্মপুর নিয়ে বহু পণ্ডিতদের বহু মতামত আছে। তথাপি আমরা লৈখিক ও নানা-প্রামাণ্য সূত্রে আলোচনা করে জানি যে দরং জেলার বরাহী রাজ্যের রাজমন্ত্রী ছিলেন বিরোচন ফা---তিনি জাতিতে বড়ো বা কাছাড়ী। তিনি বরাহী রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রাজার সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি স্বীয় অনুচরদের নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে চলে যান ও বর্তমান নওগাঁ জেলাতে রাজ্য বিস্তার করেন। রাজধানী স্থাপন করেন ব্রহ্মপুরে। ব্রহ্মপুর নওগাঁ শহরের ৫ মাইল পূর্বে কলং নদীর তীরে অবস্থিত। ব্রহ্মপুর গ্রামে এখনও প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাছাড়ী রাজ্য ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীর ধরে ধানশ্রী নদীর উপত্যকায়ও বর্তমান উত্তর কাছাড়ের মাহুর নদী; কাছাড়ের বরাক নদী---দিক্রং নদীর পূর্বাংশ থেকে কলঙ নদী পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। কোন কোন সময় দিক্রং ও ধানশ্রী নদী কাছাড় ও কামতা রাজ্যের সীমারেখা ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে কাছাড় রাজ্যের সঠিক ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রামাণ্য কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ইতিহাস দিয়ে অনুমান করে নেওয়া হয়।

কাছাড়ী রাজ্যের রাজধানী ব্রহ্মপুর

মিষ্টি হাসি
—দেবদত্ত

আলোকচিত্র

মাসিক বসুমতী

॥ আশ্বিন ১৩৭১ ॥

ফুল ও আধার
—কল্যাণ সরকার

মাসিক

বসুমতী

॥ আশ্বিন ১৩৭৭ ॥

মাসিক বসুমতী আশ্বিন ॥ ১৩৭৭ ॥

বরুণ রায়

—বিভূতিভূষণ রায়

—অনিল দাস

ছোটদের মেলা

—প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়

—শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

রম্নী
—রামকিংকর সিংহ

মাসিক

বসুমতী

॥ আশ্বিন ১৩৭৭ ॥

বন্ধুত্বের সমীক্ষা

ভারত-জার্মান আর্থনীতিক সহযোগিতা

১৯৭০ সাল পর্যন্ত "মাঝারি মেয়াদের আথিক যোজনা"র কাঠামোর ভিতর ফেডারেল সরকার ব্যয় হ্রাসের যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা সত্ত্বেও উন্নতিকামী দেশগুলিকে আর্থনীতিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশী অর্থ পাওয়া যাবে। একমাত্র ১৯৬৭ সালেই ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী ৮৫৫ কোটি টাকার মত, অর্থাৎ জার্মানীর নীট জাতীয় আয়ের ১˙২৬%. সরকারী ও বেসরকারী আথিক সাহায্য দিয়েছেন। ১৯৬৮ সালে জার্মানীর সাহায্য প্রতিশ্রুতি ১৯৬৭ সালের রেকর্ডও ৪৬%. ছাড়িয়ে যায় এবং এর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১˙২৭৩ কোটি টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইউ-এন-সি-টি-এ-ডি সম্মেলন যে লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছিলেন, ফেডারেল রিপাবলিক তা পূরণ করে সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। তুলনামূলকভাবে প্রাচ্যগোষ্ঠীর দেশগুলি উন্নয়ন সাহায্য খাতে এই একই বছরে তাঁদের জাতীয় আয়ের মাত্র ০˙১%. (কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতির কথা হিসাবের মধ্যে না ধরে যদি প্রকৃত অর্থদানকেই হিসাবে ধরা হয়) ব্যয় করেছেন। পশ্চিম জার্মানী ও ভারতের মধ্যকার আর্থনীতিক সহযোগিতা তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: সাহায্য, শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং ব্যবসাবাণিজ্য।

মূলধনী সাহায্য ঃ

উন্নতিকামী দেশগুলিকে জার্মানী মোট যে বৈদেশিক সাহায্য দিয়েছে, তার মধ্যে ভারত পেয়েছে একটা মোটা অংশ। ১৯৭০ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ভারতকে প্রতিশ্রুত জার্মানীর মূলধনী সাহায্যের পরিমাণ হচ্ছে ৯৩২ কোটি টাকা; ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখ পর্যন্ত যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তার পরিমাণ ৭২১ কোটি টাকা। এই অর্থের সঙ্গে যোগ দিতে হবে ভারতকে প্রদত্ত বহুমুখী সাহায্যের একটি মোটা অংশ--এই অর্থ এসেছে জার্মানীর অনুদানপুষ্ট বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আই-ডি-এ) এবং অন্যান্য সম্প্রসার সংস্থাগুলির কাছ থেকে।

পশ্চিম জার্মানীর ঋণে সাহায্যপুষ্ট কয়েকটি প্রধান প্রকল্প:

রৌরকেলা স্টীল অ্যাণ্ড ফার্টিলাইজার প্ল্যাণ্ট;
মাইশোর আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং, ভদ্রাবতী;
নেভেলী লিগনাইট কোং;
পেট্রো-কেমিক্যাল কম্প্লেক্স, গুজরাট;
ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ;
শিপবিল্ডিং প্রোগ্রামস্।

রৌরকেলা, নেভেলী এবং গুজরাটে সারের প্ল্যাণ্ট স্থাপনে অংশ গ্রহণ করে এবং সার আমদানীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থার মারফৎ সাহায্য প্রচেষ্টাকে ভারতীয় যোজনায় অগ্রবর্তিতার ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করেই জার্মানী ভারতীয় ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

এ ছাড়া অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ভারতকে একটা মোটা অঙ্কের ঋণ (প্রকল্প বহির্ভূত সাহায্য) দেওয়া হয়েছে; যার একটা মোটা অংশ দেওয়া হয়েছে যুক্ত ঋণ হিসেবে। ভারতকে প্রদত্ত দ্বিপাক্ষিক মূলধনী সাহায্যের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই পশ্চিম জার্মানীর স্থান। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ভারতকে ৩˙৪ কোটি টাকার মূল্যের খাদ্য-বাবদ সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল।

প্রধান প্রধান দাতার মূলধনী সাহায্য ঃ

(কোটি টাকার হিসাবে

	প্রদান	প্রতিশ্রুতি
	১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত	
ইউ এস এ--মূলধনী	---২,৪০২˙৯	২,৫৫৮˙(
সাহায্য--পি এল ৪৮০	১,২২৯˙৬	১,৪২৩˙
পশ্চিম জার্মানী (ফেডারেল রিপাবলিক)	--- ৭২১˙৩	৮৯৭˙(
বিশ্বব্যাঙ্ক	------ ৬৫৮˙৩	৭৫৫˙
আই ডি এ	------ ৬৪৫˙১	৬৬৩˙
ইউ কে	------ ৫৮৭˙১	৬৮১˙
সোভিয়েট ইউনিয়ন	--- ৫৭০˙০	১,০২১˙

কারিগরী সাহায্য ঃ

কারিগরী সাহায্য বাবদ মঞ্জুরী : আনু : ২১ কোটি টাকা

ভারত-জার্মান কারিগরী সাহায্য
প্রকল্পের সংখ্যা : ৩৫

তাদের মধ্যে আছে

আই আই টি	: মাদ্রাজ
প্রোটোটাইপ প্রোডাকশন-কাম ট্রেনিং সেণ্টার	: ওখলা, দিল্লী
সেণ্ট্রাল স্টাফ ট্রেনিং অ্যাণ্ড ভোকেশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট	: হাওড়া / কলিকাতা
ফোরম্যান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	: ব্যাঙ্গালোর
টি ভি স্টুডিও	: দিল্লী ও বোম্বাই
এগ্রিকালচার প্রোজেক্ট	: মাণ্ডি (হিঃ প্রঃ)
	কাংড়া (হিঃ প্রঃ)
	নীলগিরি (তামিলনাড়ু)
	আলমোড়া (উঃ প্রঃ)

পশ্চিম জার্মানীতে ভারতীয় ছাত্র এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা আনুমানিক ৪,০০০

শিল্পক্ষেত্রে ভারত-জার্মান সহযোগিতা ঃ

সহযোগিতা চুক্তির (মার্চ, ১৯৬৯) সংখ্যা : ৪৪৬। যৌথ প্রচেষ্টার সংখ্যার ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানীর স্থান তৃতীয়, গ্রেট বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। সহযোগিতার চুক্তি তালিকায় জার্মানীর অধিকাংশ প্রধান ফার্মের নাম দেখতে পাওয়া যাবে : সিমেন্স, এ ই জি-টেলিফাঙ্কেন মার্সিডিস-বেঞ্জ, এম এ এন অ্যাণ্ড বশ্‌, হেকস্ট, ফারবেরকে-বেয়ার অ্যাণ্ড বি এ এস এফ, ক্রুপ, ডি ই এম এ জি, গুটে-হফনাংস-হুয়েট, রাইনস্ট্যাল-হ্যানোমাগ এবং আরও অনেক।

সহযোগিতার অনুমোদিত চুক্তি ঃ

দেশ	অনুমোদিত	
	১৯৫৭ থেকে	১৯৬৭ থেকে
	৩১শে মার্চ, ১৯৬৯ পর্যন্ত	
গ্রেট ব্রিটেন	৭৬৬	৬৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫২১	৬৬
পশ্চিম জার্মানী	৪৪৬	৫৬
	৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ পর্যন্ত	
পূর্ব জার্মানী	৬০	২

ভারত-জার্মান বাণিজ্য ঃ

ভারতে সরবরাহকারী হিসাবে ফেডারেল রিপাবলিক অব্‌ জার্মানীর স্থান তৃতীয়, কিন্তু ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা হিসাবে মাত্র নবম। এই ভারসাম্যহীনতার পরিণতি হলো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফারাক। তবে ১৯৬৮-৬৯ সালে ফেডারেল রিপাবলিক অব্‌ জার্মানীতে ভারতের রপ্তানি অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

১৯৬৮ সালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের সাধারণ উর্দ্ধমুখী গতি জার্মানীতে ভারতীয় পণ্যের বর্দ্ধিত হারে রপ্তানির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়----১৯৬৭ সালের মানের চেয়ে প্রায় ১৭% বেড়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে জার্মানীর আমদানী বাড়ে প্রায় ১৬%। সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জার্মানীতে যে ভারতীয় পণ্য আসে, তার শতকরা ৩৫ ভাগ আসে তৃতীয় কোন দেশের মাধ্যমে। ভারত-জার্মান বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যে এ ধরনের রপ্তানিকে ধরা হয় নি।

জার্মানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের যে ঘাটতি রয়ে গেছে, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। কাজেই এই সমস্যাটি উপলব্ধি করে জার্মান সরকার ফেডারেল রিপাবলিকে ভারতীয় রপ্তানি উন্নতি সাধনে সক্রিয় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এরজন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ফেডারেল রিপাবলিকে ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানি উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প--বিশ্ববাণিজ্যের ইতিহাসে এই প্রকল্প সম্ভবত অনন্য। কারণ এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ কেবলমাত্র নিজেদের রপ্তানির উন্নতিসাধনের জন্যই শক্তি ও অর্থের ব্যয় করতো। এই প্রকল্পের সাফল্যের একটি আশাব্যঞ্জক লক্ষণ এই যে, গত ১৯৬৮--৬৯ আর্থিক বছরে জার্মানীতে ভারতের রপ্তানি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেছে।

ভারত এবং জার্মানী—অগ্রগতির অংশীদার

ফেডারেল রিপাবলিক অব্‌ জার্মানীর কনস্যুলেট জেনারেল, কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত।

ধারাকালীন কামতা রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের সীমানা নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা দেয়। বিরোচন ফার মৃত্যুর পর তার পুত্র বিক্রমাদিত্য ফা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মিকির পাহাড়ের পাদদেশে এসে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজধানী নাম দেন সোনাপুর। তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। রাজধানীতে স্থাপন করলেন সোনার দুর্গামূর্তি। পূর্বাঞ্চলের বহু বড়ো ও নাগা সর্দাররা ঐ নূতন রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াল কিন্তু বিক্রমাদিত্যের রণকৌশলে সবাই পরাস্ত হলেন। রাজ্যের সীমানা বেড়ে গেল উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ধানশ্রী নদীর তীর পর্যন্ত। রাজ্যের রাজধানী সোনাপুর থেকে স্থানান্তরিত হলো ডিমাপুর। ডিমাপুরে রাজত্ব করার সময় কাছাড়ীদের গৌরবগাথা ছিল উচ্চ শিখরে। কারুকার্যশোভিত বিজয় তোরণ, জয়স্তম্ভ অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণ করা হলো। ঐ সময় রাজানাও, ডেলোদাও ও হালোদাও প্রভৃতি বীরপুরুষ---ওয়াইবাংমা ও ওয়াইথীংমা প্রভৃতি বীর রমণীরা জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে বীর ডেমালিক সুদূর বৃহ্মদেশ পর্যন্ত রাজ্য জয়ের অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁদের বিজয়স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আজো রাজধানী ডিমাপুরে অবস্থিত আছে। ডিমাপুর রাজত্বের সময় কাছাড়ীদের স্থাপত্য ও শিল্পকলা ছিল অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্য থেকে উন্নত। সেখানকার রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এ কথাই প্রমাণ করে। ডিমাপুরের ভগ্নাবশেষে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন আজো বিদ্যমান। তোরণ, স্তম্ভ ও রাজপ্রাসাদের স্থাপত্যগাথা আজো ঐতিহাসিকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই ইতিহাসবিদ Johnstone মন্তব্য করেছেন----

"It is a strange sight to see the relics of a forgotten civilization in the midst of a pathless forest."

কাছাড়ীদের ডিমাপুরে রাজত্ব করার সময় অহোমরা বারবার তাঁদের রাজ্য আক্রমণ করে। বারবার আক্রমণের ফলে কাছাড়ীরা পর্যুদস্ত হয়ে অহোমদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য কাছাড়ীরা ক্রমে ক্রমে ডিমাপুর থেকে উত্তর কাছাড় জেলার মাইবং-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মাইবং মাহুর নদীর উপত্যকায়। এখান থেকেই কাছাড়ী রাজারা 'হিড়িম্বার অধীশ্বর' নামে খ্যাত। মাইবং রাজসভার যুগ কাছাড়ীদের রেনেসাঁর যুগ। ১৫৬৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৩৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৩জন রাজা পৌনে দুইশত বৎসর মাইবং-এ রাজত্ব করেন। কাছাড়ীদের বহু উত্থান-পতন শৌর্য-বীর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় মাইবং-এর রাজত্বকালে। কাছাড়ীরা কয়েক পুরুষ ধরে মাইবং-এ রাজত্ব করে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। এবং সময় রাজধানীর সৌন্দর্য মহিমা বর্ধনে রাজাদের দৃষ্টি পড়ে। মহাভারতে বর্ণিত 'কিরাত'---মঙ্গোলীয়ানদের এক শাখা কাছাড়রা প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ধারা অবলম্বন করে স্বীয় রাজত্বকে স্মরণীয় করবার জন্য মাইবং-এর রাজ্য শাসনে, ক্ষমতায়, শিল্পে, সাহিত্যে, জীবনযাত্রায়, প্রস্তরখণ্ডে, মুদ্রায়, মন্দিরগাত্রে, অনুশাসনে ও লিপিতে নাম ও শক উৎকীর্ণ করেছেন। পূর্ব ভারতের অরণ্যাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব।

মাইবং-এর কাছাড়ী রাজা তাম্রধ্বজের সময় জৈন্তাবু রাজারা বিদ্রোহ করে। জৈন্তারাজের বিশ্বাসঘাতকতায় তাম্রধ্বজ বন্দী হন। রাণী চন্দ্রপ্রভা স্বামীকে মুক্ত করবার জন্য অহোম রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অহোম রাজ রুদ্র সিংহ জৈন্তা ও কাছাড়কে সামন্ত রাজ্য হিসাবে বশীভূত করেন। কিন্তু যাযাবর রাজবংশীয় এই কাছাড়ীরা অদৃষ্টের পরিহাসে তাম্রধ্বজ অহোম রাজ রুদ্র সিংহের সন্ধির সূত্র অমান্য করলেন। স্বাধীন ঘোষণা করলেন কাছাড় রাজ্য। ১৭০৬ খৃস্টাব্দে আবার যুদ্ধ বাধল অহোম ও কাছাড়ীদের মধ্যে। তাম্রধ্বজ পরাজিত হলেন। অহোম সৈন্যরা মাইবং শহর লুণ্ঠন করল, রাজধানীর ক্ষতি সাধন হলো খুব বেশী। কিন্তু রাজা তাম্রধ্বজের মনে প্রবল বাসনা স্বাধীন সার্বভৌম রাজত্ব গঠনের। তাই পরবর্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ মাইবং থেকে সমতল অঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইট, চুণ ও সুর্কী দ্বারা বরাক উপত্যকার খাসপুরে রাজধানী সুরক্ষিতভাবে নির্মাণ করলেন। খাসপুর ছিল বড়াইল পাহাড় দ্বারা প্রতিরুদ্ধ তাই অহোম রাজারা আর কোনদিন কাছাড়ী রাজ্য আক্রমণ করেন নি। খাসপুরের তোরণ দ্বারে নির্মিত হলো "রণচণ্ডী মন্দির" "স্নান ঘর" (Royal Bath), "বারদুয়ারী ও "শিবাশ্রম" ইত্যাদি। নির্মিত হলো রাজপ্রাসাদ, কূপ, পুষ্করিণী ও সেতু। কাছাড়ী রাজাদের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যের নিদর্শন কাছাড়ে আজো আছে। কাছাড়ী শেষ নরপতি গোবিন্দ চন্দ্রের সময় কাছাড়ে দেখা দেয় বার্মিজ ও মণিপুর বিদ্রোহ। গোবিন্দ চন্দ্র এ বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বৃটিশদের শরণাপন্ন হন ও ১৮২৮ খৃস্টাব্দে খাসপুর থেকে রাজধানী বদরপুরের রাজটীলা বা হরিটিকরে স্থানান্তরিত করেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র ১৯৩০ খৃস্টাব্দে আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে স্বাধীন কাছাড় বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সেনাপতি তুলারাম বৃটিশ সরকারকে বার্ষিক কর দিয়ে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলে রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তর কাছাড় ও বৃটিশদের শাসনাধীনে আসে। শ্রীসূর্যকুমার ভূঞার মতে---

"In 1832 Lord William Bentick appointed Captain Jenkins and Lt. Pemberton to survey the North-East Frontier including Cachar."

প্রায় ১০।১২ বৎসর কাছাড় জেলা জেনারেল জেঙ্কিন্স-এর শাসনাধীনে থাকে ও ক্রমশ উত্তর কাছাড় জেলা সেনাপতি তুলারামের কাছ থেকে বৃটিশ সরকারের অধিকারভুক্ত হয়। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজত্বের চির অবসান ঘটে।

[কেন্দ্রাবন্দু গল্পের শেষাংশ---৯১২ পৃষ্ঠার পর]

উদারপন্থী, তোমাকে ভালবেসেও যে কোন ছেলের সঙ্গে মিশতে দেবে। ওর উদারতায় তুমি মুগ্ধ। বিয়ের পর দেখবে তোমায় সন্দেহের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবে। আমি তাই অনেক দেখলুম। আসলে এরজন্যে দায়ী, অতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ —

আমিও জয়ীদির কথা স্বীকার করি। শ্রীশা জানাল। অতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যেই আমাদের এই দুর্গতি। তাছাড়া আমাদের এই বয়সটা ভীষণ খারাপ।

তুমি কি এটা তোমার নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করলে? জয়ন্তীর জিজ্ঞাসা।

ঠিক তাই। আমি আমার চোখ দিয়ে নয়, জীবন দিয়ে একথা যে কতখানি সত্যি তা উপলব্ধি করতে পেরেচি। সোলি ধনেশদাকে চিনতে পেরেছিল, আমি আমার শ্যামকে চিনতে পারি নি। তাই জন্যে তার পুরস্কার-স্বরূপ নতুন একজনকে পেটে বইচি।

শ্রীশার কথা শোনামাত্র জয়ন্তী, পাখি আর সোলি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। যেন ওদের তিনজনকে সাপে কামড়িয়েছে।

কি বললি?

কথাটা কি জোরে জোরে বলার।

কিন্তু এমন দুর্গতি কেন হল রে?

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি--ও সুর করে বলতে লাগল --কিন্তু নিবৃত্তিকে কজন নিতে পারে। আমি পারি নি। তার কারণ আমি অনেক স্বাধীনতার পেয়েচি, সেই স্বাধীনতার ঐশ্বর্য আমি অপব্যয় করেচি। এমন একদিন গেচে, যেদিন ভেবেচি দেহের আনন্দই প্রকৃত আনন্দ। দেহ যে আনন্দের মধ্যে নিঃশেষ করা যায়, তা আমি হেমলাকে দেখিয়ে দিয়েচি। হেমলা নিজেও অবাক হয়েচে। আমি লজ্জা কাকে বলে তাও ভুলে ছিলুম। সেবারে দার্জিলিং গিয়েছিলুম হেমলা আর আমি। দুজনে এত মদ গিলেছিলুম এত পার্ভার্স হয়ে পড়েছিলুম যে, আজ নিজেরই কাচে নিজেকে ঘেন্না করে। অথচ কোনদিনই নিজেকে দমন করতে পারি নি।

এরপর কি করবি বলে ভেবেচিস?

হেমলাকে বিয়ে করবো। আগামী মাসেই। বাবা-মার আপত্তিতে। আর নিজেরও অমতে---

হঠাৎ ওদের লক্ষ্য পড়ল রাকার দিকে। অত ছোট মেয়ের সামনে সব গল্প করে ফেলেছে, এটা উচিত হয় নি ওদের। জয়তী বললে, হ্যাঁ রে রাকা, তুইতো কাউকে বলে দিবি না এসব কথা? সকলেই উঠে বসেছে।

রাকা বললে, তাই কি পারি নাকি? আমায় কি ভেবেচো বলতো? প্রাণ থাকতেও আমি কাউকে বলবো না। এই যে সকালে সাঁতারের সময় কত কি ঘটে গেল, আমি কি কিছুই বুঝতে পারি নি মনে করচো। এই যে অনকদার সঙ্গে তোমার কত রাগারাগি হয়ে গেল তার কারণ আমি বুঝি। জানো জয়ীদি, অনকদার মনটা খুব খারাপ দেখলুম। এককোণে বসেছিল। পরিবেশন কিছুই করে নি। জ্যেঠু পরিবেশন করতে বললে, অনকদা বললে, আমার শরীরটা ভাল নেই।

ওকে বুকের কাছে টেনে এনে জয়তী বললে, তুই সব বুঝতে পেরেচিস। আশ্চর্য! সত্যিরে আমি ওর ওপর ঠিক রাগি নি। অথচ বাইরের এই রাগ দেখানোটাও আমাদের প্রয়োজন। এই ছলনাটুকুর আশ্রয় না নিলে নিজের ব্যক্তিত্ব থাকে না। এই ধর ভীড়ের মধ্যে আমি অনককে দেখলুম। কিন্তু কে আগে কথা কইবে এ নিয়ে মনে মনে প্রতিযোগিতা চলল। আমি চাইবো অনকই আগে ডাকুক। আমি এমনভাব দেখাবো যেন ওকে দেখতেই পাই নি। তুই যদি কাউকে ভালবাসিস, তবে তুই দেখবি এই ছলনাটুকু প্রয়োজন। আগে তুই বড় হ। প্রেমের কিছু বোঝ। তখন আপনি এগুলো তোর মধ্যে আসবে।

যারে, আমি নাকি বড় হই নি মাষ্টারমশাই ন্যাড়াদা আমায় এমন সব গল্প বলে, যা শুনলে তোমাদেরই লজ্জা করবে। আর প্রায় বলবে, তোমার চোখদুটো কি চমৎকার, তোমার মুখটা কি মিষ্টি, হাতটা কি নরম। বাবা যদি আসে পড়ার ঘরে, তখন এমন করে বোঝাবে, বাবা মনে করে ন্যাড়াদা খুব খেটে আমায় পড়ায়। যেই বাবা চলে যাবে, অমনি আমার হাতটা ওর হাতের মধ্যে নিয়ে বলবে, বাব্বা, বাঁচলুম। আর কতবার যে চুমু খেয়েচ অ কি বলবো।

চুপ কর, অসভ্য কোথাকার---- থামিয়ে দেয় জয়তী।

এইটুকু মেয়ে, এরমধ্যে পেকে বরানগরে গেচে ----

পাখি বললে, পরকে বকতে আর সমালোচনা করতে খুবই সহজ। ওকে তোরা বকচিস, কিন্তু নিজেদের পানে তাকিয়ে দেখ দিকিনি। এইতো ওরই সামনে নিজেদের কথাই মুক্তকণ্ঠে বলে গেলুম। সোলি, তুই বারো বছর থেকে মজেচিস, আর আমিও তাই, শ্রীশার কথাই বাদ দে। আজ ঐ বয়সটাকে ডিঙ্গিয়ে এসে যদি ঐ বয়সের কীর্তিকলাপকে ভুলে যাই সেটা ঠিক হবে?

জয়তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তা সত্যি।

শ্রীশা বললে, ভগবানের কি সৃষ্টি ---পুরুষ আর প্রকৃতি---

পাখিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ভাবতে গেলে কূল পাই না রে---

ওরা পাঁচজনে গোল হয়ে শুয়ে পড়লো। একদৃষ্টে আকাশের পানে তাকিয়ে রইল। কালো মেঘের পর্দা ক্রমশ ছিঁড়ে যেতে লাগল। আকাশে রং খেলে গেল। আকাশ ঝলমল করে উঠল তারায় তারায়। ওরা এখন নীরব। এমন করে আকাশের পানে তাকিয়ে রইল, মনে হল ওরা বুঝি এর আগে এমন আবেগভরে আকাশ দেখে নি। ক্রমশ মনে হল, আকাশ অনেক কাছে এসে পড়েছে।

প্রাণতোষ-স্মরণে

শ্রীমান প্রাণতোষ পরিপূর্ণ যৌবনে, যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশও হয় নি, যখন কর্মশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি জীবনে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে ও নবতর স্ফুরণের প্রত্যাশায় উন্মুখ থাকে, সেই সময়ে পরলোকগমন করলেন। বাংলা সাহিত্য সরস্বতীর অঙ্গনের দীপমালা থেকে একটি দীপশিখা নির্বাপিত হল। সেই নির্বাপিত দীপগন্ধে বঙ্গসংস্কৃতির বর্তমান পরিবেশ আজ পূর্ণ হয়ে রয়েছে এবং বার বার সেই শিখাটির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আমরা, যারা শ্রীমান প্রাণতোষকে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম, তাঁরা তাঁর অন্তর্ধানে শোকাহত। তাঁর ভদ্র ও পরিশীলিত চরিত্র, মধুর ও মিষ্ট ব্যবহার, তাঁর স্নিগ্ধ ও মার্জিত সৌজন্যের কথা বার বার মনে হচ্ছে ও মন ভারাক্রান্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে, অর্থহীন আক্ষেপের মত ---আমরা কত বর্ষীয়ান জ্যেষ্ঠ, বয়োবৃদ্ধ মানুষ থেকে গেলাম, আর পরিপূর্ণ যৌবনে, পূর্ণকর্মোদ্যমের মাঝখান থেকে সে অপসৃত হোল। আর আমরা তাঁর শোকে আক্ষেপ করছি। জটিল, অনধিগম্য সৃষ্টি-বিন্যাসের এ এক বিচিত্র, নিষ্ঠুর পরিহাস।

আজ থেকে ত্রিশ বৎসর, কি তারও এক-আধ বৎসর পূর্বের কথা। আমি বাগবাজারে অমৃতবাজার পত্রিকার কাছে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে বাসা করে থাকি। সেই সময় দু'টি ছেলে, দু'টি প্রিয়দর্শন, শ্রদ্ধাবান মিষ্টস্বভাবের তরুণ আমার কাছে আসত মধ্যে মধ্যে। দু'জনেই বোধহয় সদ্য কলেজে ঢুকেছে তখন। জানলাম, দু'জনেই কাছাকাছি থাকে শ্যামপুকুর এলাকায়। তাদের একজন একটু লম্বা, অপরজন মাথায় একটু খাটো। একজনের নাম স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন প্রাণতোষ ঘটক। 'ঘটক' পদবী শুনেই প্রথমদিন বোধহয় তাকে তার পরিবার সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। কারণ তখন শ্যামপুকুরের এক ঘটক-পরিবারের নাম শুনেছি। এঁদের নাম পূর্বেও আমার জানা ছিল। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, তিনি সেই ঘটক-পরিবারেরই সন্তান। তাঁর পিতার নাম ভবতোষ ঘটক। ঘটক-পরিবারের মধ্যে ভবতোষবাবুর নামই শুনেছিলাম। সে সময় ভবতোষবাবুর নাম কলকাতায় বিশেষ পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ভবতোষবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে এবং তাঁর দ্বারা একাধিকবার উপকৃত হয়েছি; এবং সে উপকার তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রাণতোষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর পিতৃদেব ভবতোষবাবুর স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতার জন্য সে পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যরচনার কথা আমি ভাল করেই জানতাম। তাঁকে দেখে আমার একটু বিস্ময়ই লাগত। কারণ চন্দননগরের একটি সুবিখ্যাত পরিবার, যাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে বিষয়-আশয়ের চর্চা করেছেন এবং সে চর্চায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। (লোহার কারবারে তাঁদের পরিবারের খ্যাতি তখন সকলেরই সুবিদিত)। তাঁদের পরিবারের একটি সন্তান এমন একটি অবৈষয়িক কর্মে আসক্ত ও যুক্ত হবে তা খানিকটা আশ্চর্যের
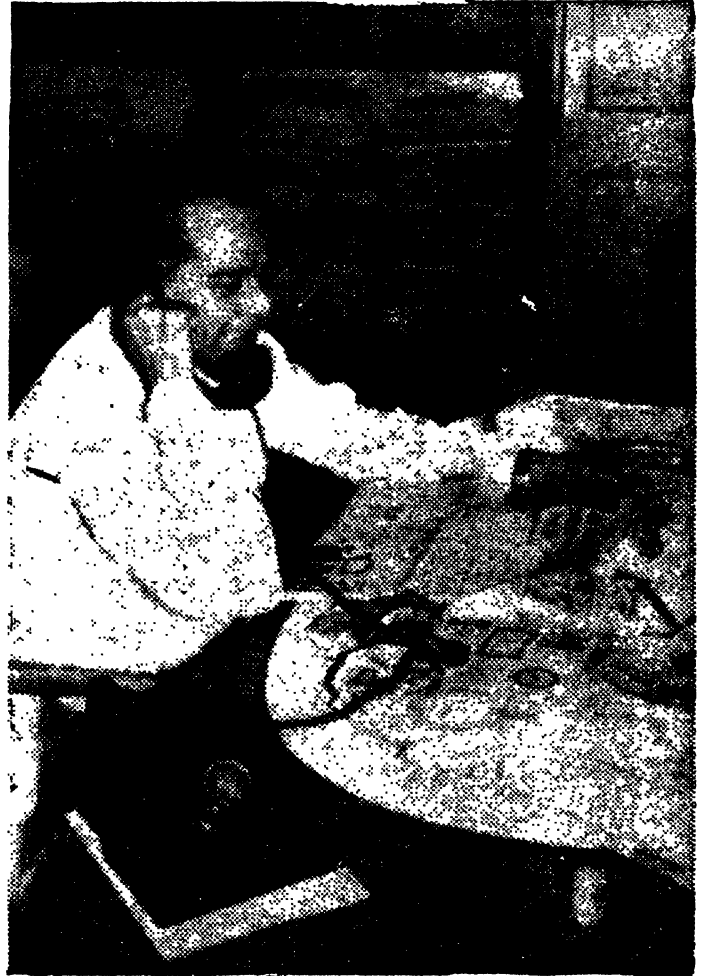
সম্পাদক প্রাণতোষ

ব্যাপার বইকি! আমার মনে হয়, তাঁদের পরিবার থেকে হয়তো তাঁকে তাঁদের বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে যোগ দেবার জন্য চেষ্টা করাও হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। এ সংবাদ আমরা অনেকেই জানি। কারণ ছাত্রজীবনের শেষের দিক থেকে এবং তারপরও কিছুকাল একদিকে যেমন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিজের রচনা প্রকাশ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে একাধিক পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে প্রকাশ করেছেন। এই মুহূর্তে 'নববাণী' বলে তাঁর সম্পাদিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কথা স্মরণ করতে পারছি। তাঁর পারিবারিক পরিবেশের পটভূমিতে তাঁর প্রবণতা ও তৎকালিক কাজকর্ম আলোচনা করলেই, তাঁর মনের আসল চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অবৈষয়িক শিল্পীর মন নিয়েই তিনি সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাই তাঁকে সেখানে প্রতিষ্ঠার অধিকার দিয়েছিল।

এর পর তিনি মাসিক বসুমতীর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন এবং সেই সঙ্গে, যতদূর মনে পড়ে, দৈনিক বসুমতীর রবিবাসরীয় বিভাগের দায়িত্বও তাঁর উপর এসে পড়ে। সেই কর্মের সঙ্গেই তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। যোদ্ধা যেমন রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয়, প্রাণতোষও তেমনি নিজের কর্মে ও পদে থেকেই আপনার কর্মের মধ্য থেকেই অন্তর্ধান করলেন। এ মৃত্যু এদিক দিয়ে গৌরবের।

প্রাণতোষ বাংলা সাহিত্যে তিনটি বিভিন্ন কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রথমত তিনি শক্তিমান উপন্যাসকার ও তাঁর শক্তি ও প্রতিভা সামান্য নয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসে কলকাতার জীবন, বিশেষভাবে পুরনো বনেদী কলকাতার জীবন তিনি সার্থকভাবে আঁকতে পেরেছেন। কারণ এই অঞ্চলের পুরনো বনেদী জীবনকে—ও কলকাতাকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন এবং সে অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে প্রকাশের শক্তি তাঁর ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'আকাশ-পাতাল' উপন্যাসখানির নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। দ্বিতীয়ত তিনি

যৌবনে প্রাণতোষ ঘটক

প্রাচীন কলকাতা নিয়ে এক ধরণের গবেষণা করেছিলেন। যে কলকাতাকে তিনি জানতেন ও ভালবাসতেন, সেই জানা ও ভালবাসাই প্রাচীন কলকাতা সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করেছিল। তারই ফলে তিনি 'কলকাতার পথঘাট' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তা প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবেই বোধহয় বিবেচিত ও গৃহীত হবে। তৃতীয়ত, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'মাসিক বসুমতী' এক সময় বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল এবং সেই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। একাধিক কীর্তি-মান লেখক তাঁর সহায়তায় মাসিক বসুমতী'র মাধ্যমে কীর্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এবং বাংলা সাহিত্যের বহু বিশিষ্ট গ্রন্থ তাঁর সম্পাদিত 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

কথাকার, সম্পাদক ও গবেষক প্রাণতোষ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অক্ষয় স্থান লাভ করবেন। তাঁর এই নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব অক্ষয় হয়ে রইল। কিন্তু যে মানুষটি শ্রদ্ধা-ভালবাসা দিয়ে স্নেহ-প্রীতি নিত, পত্রের উত্তরে পরিচ্ছন্ন অক্ষরে পত্র লিখে আপনার মনোভাব জানাত, টেলিফোনের এপার থেকে টেলিফোনের ওপারে যাঁর নম্র ও স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যেত, সেই মানুষটি, সেই বিশেষ জনটি আর আমাদের মধ্যে নেই। আমার কনিষ্ঠ পুত্রের সমবয়সী হয়েও, সে আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবে সে নিঃশেষে হারিয়ে যায় নি। তাঁকে মেধা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে খুঁজলে তাঁকে খুঁজে পাব তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে, তাঁর সম্পাদিত মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠার ভিতর। তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতরভাবে তাঁকে খুঁজবার আকুতি যদি অন্তরে জাগে তবে তাঁকে খুঁজে পাব, তাঁকে যারা ভালবাসত সেই বন্ধুজনদের মুখে তাঁর সম্পর্কে আলোচনার সময়। আর তাঁকে যদি দেখতে চাই, তবে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁর শিশুকন্যা দু'টির মুখের সামনে, যাদের মুখে স্রষ্টার অধিকর্তা অদৃশ্য অক্ষরে তাঁরই ছবি এঁকে রেখেছেন।

শ্রীমান প্রাণতোষের সাহিত্যকীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে। এর জন্য কামনা না করলেও চলবে। কামনা করি তাঁর স্মৃতি আমাদের অন্তরে অক্ষয় হোক, আর ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে আপনার অসীম স্নেহে ও ক্ষমায় নিজের কোলে স্থান দিন।

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় প্রাণতোষ

পরিণত বয়সে অনেকে বেঁচে রয়েছি আর আমাদের চেয়ে কত ছোট প্রাণতোষ অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল---জীবনের এই এক নিষ্ঠুরতম পরিহাস।

এ রহস্যের কোনও সমাধান নেই, কোনও সান্ত্বনা নেই।

প্রাণতোষের সঙ্গে আমার কতটুকুই-বা পরিচয়! কিন্তু সেই সামান্য পরিচয় যে কতখানি অসামান্য এবং কত গভীর ও হৃদয়স্পর্শী তা একমাত্র আমিই জানি। অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। সিনেমাজগতে গিয়ে নিজেকে সেখানে এত বেশি জড়িয়ে ফেলেছিলাম যে, আমার সাহিত্য-কর্ম (যা আমার জন্মগত অধিকার) অবহেলিত হয়েছিল। সাহিত্যের গল্প-উপন্যাস লেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। এমন দিনে অকস্মাৎ একদিন প্রাণতোষ অযাচিতভাবে আমার বাগবাজারের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। বললে, আপনাকে একটি অপ্রিয় কথা বলতে আমি এসেছি।

বললাম, বল।

প্রাণতোষ বললে, আপনি আত্মহত্যা করছেন কেন?

কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম, তাই আজও আমার সেই কথাটি মনে আছে।

বলেছিলাম, আত্মহত্যা তুমি কাকে বলছো?

প্রাণতোষ বলেছিল, সাহিত্যকে আপনি পরিত্যাগ করেছেন। একে আত্মহত্যা ছাড়া কী আর বলতে পারি?

বলেছিলাম, ভদ্রভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার সুযোগ সাহিত্য আমাকে দেয় নি।

---কিন্তু খ্যাতি দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে।

বলেছিলাম, সিনেমা তার চেয়ে কিছু বেশী দিয়েছে।

প্রাণতোষ বলেছিল, তাতে আপনার পেটই শুধু ভরবে, মন ভরবে না।

এই বলে সে আমাকে জোর করে ধরে বলেছিল, আপনাকে লিখতেই হবে। সাহিত্যের সম্মান আপনার চিরস্থায়ী সম্মান, আর সিনেমার যা কিছু সবই ক্ষণস্থায়ী।

খুব সত্যি কথা বলেছিল প্রাণতোষ।

এবং এই যে আমি আবার সাহিত্যে ফিরে এসেছি, সে শুধু প্রাণতোষের জন্যই।

আমাকে লেখাবে বলে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধই হয়েছিল।

একবার নয়, বারম্বার এসেছিল আমার কাছে।

আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। বলেছিলাম, সাহিত্যজগতে যাঁরা আমার অনুরাগী ছিলেন এতদিনে তাঁরা হয়ত আমাকে ভুলে গেছেন।

সাহিত্যিক প্রাণতোষ

প্রাণতোষ বলেছিল, কখখনো না। সাহিত্যজগৎ আপনাকে ভুলতে পারে না। আমি তা প্রমাণ করে দেবো।

প্রমাণ সে করেছিল। মাসিক বসুমতীতে আমাকে দিয়ে ধারাবাহিক একখানি উপন্যাস লিখিয়ে ছিল---'কয়লাকুঠির দেশে।'

কয়েক সংখ্যা বেরোবার পরেই বহু অপরিচিত পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে চিঠি আসতে আরম্ভ করলো। প্রতিটি চিঠিই আমি প্রাণতোষকে দেখিয়েছিলাম।

প্রাণতোষের সে কী আনন্দ।

তার সে হাস্যোজ্জ্বল পরম প্রফুল্ল মুখচ্ছবি আমি কখনও ভুলবো না।

হঠাৎ একদিন প্রেমেনের (প্রেমেন্দ্র মিত্রের) একখানি চিঠি পেলাম। সে লিখেছিল---তোমার 'কয়লাকুঠির দেশে' পড়ছি। খুব ভাল লাগছে। তোমার সে হারিয়ে-যাওয়া কলমটি কোথায় কুড়িয়ে পেলে?

তাকে জবাব দিয়েছিলাম। লিখেছিলাম---কলমটি সত্যিই হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেক কষ্টে প্রাণতোষ সেটি খুঁজে বের করে আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

তার পর থেকে প্রাণতোষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। ক্রমাগত চিঠি আর টেলিফোন।

বসুমতীর কাজে সে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, আমার কাছে আসবার সময় পেতো না। তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে একদিন লিখলে, আমি আপনার কাছে যাবার সময় পাই না, তার জন্যে আমার ওপর আপনি রাগ করেন নি তো। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যদি এখানে আসেন তো অত্যন্ত আনন্দিত হব।

প্রতিটি চিঠির শেষে লিখতো---লেখা বন্ধ করলেন কেন? লেখা চাই।

আমাকে লিখবার জন্য বারম্বার অনুরোধ জানাতো। অন্য পত্রিকায় আমার কোনও লেখা প্রকাশিত হলে সেটি সে মন দিয়ে পড়তো, পড়েই জানাতো---লেখাটি পড়লাম। চমৎকার লেখা।

---নিজেও সে কম লেখেনি। গল্প লিখেছে, উপন্যাস লিখেছে। কিন্তু নিজের লেখা সম্বন্ধে কোনোদিন একটি কথাও উচ্চারণ করে নি। তার বই আমাকে দিয়েছে, অথচ কোনোদিন আমার মতামত জিজ্ঞাসা করে নি।

প্রাচীন কলকাতা নিয়ে ভাল একখানি উপন্যাস তাকে আমি একদিন লিখতে বলেছিলাম।

প্রাণতোষ বলেছিল, ইচ্ছে আছে লিখবার, কিন্তু সময় পাই না।

সময় সে সত্যিই পেলে না।

প্রার্থনা করি, তার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

---শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রাণতোষ *

নামের সঙ্গে চেহারা চরিত্রের সঙ্গতি বাস্তব জীবনে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়। প্রাণতোষের বেলায় তা ছিল। নামটিই যেন তার পরিচয়।

এমন একটি স্নিগ্ধ, মধুর নম্রতা ও সৌজন্য তার কথায় বার্তায়, চলায় ফেরায়, আচরণে প্রকাশ পেত, আজকের এই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের যুগে যা স্তিমিত ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। এ স্নিগ্ধ নম্রতা কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি-সত্তার নিষ্প্রভতা নয়। সত্যকার নিঃসংশয় আভিজাত্যের আত্মস্থতাই তা অক্ষুণ্ণ প্রশান্তি ও প্রসন্নতার উৎস।

সম্পদ কি বংশমর্যাদার দান নয়, যে সহজাত আভিজাত্য বিকশিত ব্যক্তি-সত্তার সৌরভেরই নামান্তর---প্রাণতোষের মধ্যে সত্যিই তার পরিচয় পেয়েছি।

প্রাণতোষ ঘটকের একান্ত শোচনীয় অকালপ্রয়াণে শুধু ব্যক্তি হিসেবে নয়, সাহিত্যকার হিসাবেও তার কথা ভাবতে গিয়ে আজ মনে হচ্ছে, এই অকৃত্রিম আভিজাত্যই তার সাহিত্য-কীর্তির মধ্যেও সব কিছুর আগে আবিষ্করণীয়।

প্রাণতোষ ঘটকের প্রথম যে রচনা আমাকে শুধু আকৃষ্ট নয়, বেশ একটু আশ্বস্ত করেছিল, তা হল তার সুদীর্ঘ উপন্যাস আকাশ-পাতাল।

'আকাশ-পাতাল' সাধারণ স্থূল জনপ্রিয়তার কোন্ শিখরে পৌঁছেছে আমি জানি না, কিন্তু এইটুকু অসঙ্কোচে বলতে পারি যে, ওই বইটি বার হবার সময় বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে আমাদের রাজধানী ও সমাজের নাতি-দূর অতীতে কাহিনীকে প্রক্ষেপ করার যে প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে একরকম হুজুগ হয়ে উঠেছিল, প্রাণতোষ ঘটকের [illegible] মধ্যেই তার প্রধান পুষ্প, যথার্থ সার্থকতা দেখেছি।

আকাশ-পাতাল-এর মত উপন্যাসে প্রাণতোষ ঘটকের নিজস্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই তার অনুগ্র স্বাভাবিক আভি-জাত্যে ফুটে উঠেছে।

লেখক হিসাবে যেমন, সম্পাদক হিসাবেও প্রাণতোষকে একটি স্মরণীয় ভূমিকায় আমার দেখেছি। দীর্ঘকাল ধরে বসুমতী মাসিক পত্রটির সম্পাদনায় সে সর্বশ্রেণীর সকল স্তরের পাঠক সাধারণকেই সন্তুষ্ট করবার প্রায় অসাধ্য ব্রত যদি নিয়ে থাকে, তাতে অনুদার সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠিতোষণের অভিযোগ অন্তত তার বিরুদ্ধে আনা যাবে না।

প্রাণতোষ ঘটকের মত মানুষকে এমন অসময়ে হারানো আমার কাছে একটা অপূরণীয় ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি।

---প্রেমেন্দ্র মিত্র

বসুমতীর প্রাণপুরুষ প্রাণতোষ

সকালে রেডিওতে খবর শুনছিলাম। যদিও 'দুঃখের সঙ্গে বলছি' এমনি কোনো সৌজন্যের ভূমিকা ছিল না, তবু 'মাসিক বসুমতীর সম্পাদক'---এটুকু বলতেই বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খেলাম। এ যে তার কোনো সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতির ঘোষণা নয়, বুঝতে দেরি হল না। কতক্ষণ পরেই কল্যাণাক্ষর ফোন এল। সেদিনও বিশুর মুখে শুনেছিলাম। প্রাণতোষের অবস্থা ভালোর দিকে। এত শিগ্‌গির যে চলে যাবে ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি।

বেহালা থেকে ভবানী এল। দুই-জনে এক সঙ্গে গেলাম প্রাণতোষের বাড়ি। গিয়ে দেখি প্রাণতোষ সেই সুজনসুন্দর প্রাণতোষ, মধুর আলস্যে ঘুমিয়ে আছে। যেন এসেছি জানতে পেরে এখুনি চোখ চাইবে, প্রসন্নকণ্ঠে ডাকবে অচিন্ত্যদা বলে।

দেখলাম ডান হাতখানা বিছানার উপর প্রসারিত, পাঁচটি আঙুল স্পন্দনহীন। মনে হল ঐ আঙুল কটি নেড়ে-নেড়ে কত মহৎ সাহিত্য সে সৃষ্টি করেছে---আকাশ-পাতাল, রাজায়-রাজায়, তিন পুরুষ---ঐ বলিষ্ঠ হাতে কী দুঃসাহসিক নৈপুণ্যে মাসিক বসুমতীর পণ্য-সম্ভারকে সে নিয়ে গিয়েছে সুরুচিরুচির মনোহরের বন্দরে। বসুমতীর কী সুনাম হয়েছিল, প্রাণতোষকে ডেকেছিল হাল ধরতে। বসুমতীর প্রাণপুরুষই প্রাণতোষ।

কামাল পাশার তুরস্কের মত রাতারাতি সে বসুমতীর ভোল ফিরিয়ে দিয়েছিল। একটা অনড় প্রস্তরস্তূপকে সে নির্মাণ-কৌশলে করে তুলেছিল চিন্ময়ত আনন্দমন্দির। যা থেকে নি---সমস্ত স্বয়কে ডেকে এনেছিল, মিলিয়েছিল একটি উদার সমন্বয়ে। সন্তোষ ঠিকই লিখেছে, সে নির্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করে আনলেও প্রতিদানে সকলের কাছে সে ঠাঁই পায় নি। এমন আশ্চর্য, এত বড় একটা শক্তিধর মাসিকপত্রের অধিকর্তা হয়েও তার স্বীকৃতি বাজার, পুরস্কৃতির বাজার সে অর্গ্যানাইজ করেনি। দ্বেষে-বিদ্বেষে দল পাকায়নি কোনোদিন। সকলের একজন হয়ে একাকী বিরাজ করেছে। ইদানীংকালে মাসিক বসুমতীতে একটানা লেখা আমার মত আর কেউ লিখেছে বলে মনে হয় না। চার-পাঁচ বছর ধরে ক্রমানুয়ে 'পরমপুরুষ' লিখেছি এবং আশ্চর্য তখন মফস্বলে যোগাযোগ কাজকর্মে আবদ্ধ থাকলেও একটি কিস্তিরও খেলাপ হয় নি। কত দিক থেকে কত ব্যাঘাত এসেছে কিন্তু প্রাণতোষ একবিন্দু বিচলিত হয় নি। পরে বছর তিনেক 'অখণ্ড অমিয়', তার পরে 'ভাগবতী তনু'। আগে-পরে কত গল্প, কত কবিতা ও উপন্যাস—সমস্ত কিছুর পিছনে প্রাণতোষেরই প্ররোচনা কাজ করেছে। সুদীর্ঘ দিনের হৃদ্যতা তার সঙ্গে, কত গভীর অন্তরঙ্গতা—কিন্তু সমস্ত কিছুই শ্রদ্ধা ও শালীনতা দিয়ে রঞ্জিত। আগের দিনে বসুমতীর আফিসে গিয়ে বুঝতাম এ আফিস নয়, এ সত্যিসত্যিই সকলের সঙ্গে 'সহিত' হবার সাহিত্য মন্দির।

এত কম বয়সে দু'টি শিশুকন্যাকে তাদের একাকিনী মায়ের হাতে রেখে সে কোথায় চলে গেল, কী উদ্দেশ্যে, কে তার উত্তর দেবে? যদি সিয়াঁন্সে তাকে আনা যায়, তবে হয়তো শুনি সে আর স্বরাজ আর দীপেন—তিন বন্ধু মিলে এক পত্রিকা বের করেছে। এখন সে পত্রিকার নাম আর বসুমতী নয়, নাম অমরাবতী। সে পত্রিকায় লেখার জন্যে এখন কোন্ সাহিত্যিকের ডাক পড়ে তা কে জানে?

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

স্মৃতি-দ

॥ প্রাণতোষ ঘটকের হার্দ স্মৃতির উদ্দেশ্যে ॥

শমীরণ চৌধুরী

প্রশ্নের ছায়া ভাসে দুর্বিষহ বিবেকী প্রহরে।

বিক্ষত দেয়াল কাঁপে, দোলাচল, উদ্‌বেল আলোয়
অগাধ নির্জন বেলা ভরা ছিল নিগূঢ় অসুখে;

আশ্লেষে বিবমিষা, জ্যোৎস্নার হাতে হাতে ফিরে—
সহচরী রাত্রিরের বেদনায় হলুদ পাতাটা।

সুনিশ্চিত অবসরে ঘুমাও কি শান্তির ছায়ায়?
ওখানে ফুলেরা হাসে আকাঙ্ক্ষার রোদ্দুরের মত?

আমি ম্লান, বিচলিত যন্ত্রণার আত্মার খেয়ালে;
বীতশোক আমি নই বীতস্পৃহ বুদ্ধের স্বভাবে।

প্রাণতোষ-কথা

কলম চলছে না। প্রাণতোষের জন্য আমায় শোকপ্রকাশ করতে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। উলটোটাই হওয়া উচিত ছিল, শোভন হত তা হলে। আমি তার অনেক আগে পৃথিবীতে এসেছি---সে চলে গেল, আমরা পড়ে রইলাম। বাঁচবার বড় সাধ ছিল তার। নিষ্ফল জীবন-ধারণ নয়---বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে সে এসেছিল, দীর্ঘদিন বর্তমান থেকে তারই পূর্ণতম প্রকাশ চেয়েছিল। হল না। সকালবেলা কল্যাণাক্ষ ফোনে আমায় দুঃসংবাদ জানাল, বজ্রাহতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কোন্ দৃশ্য দেখবার জন্য ডাকল সে আমায়!

'মাসিক বসুমতী'র রাতারাতি খোল-নলচে পালটে গেল। প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রতিটি ছত্রে নবীনত্ব ঝলমল করছে। প্রবীণ মহীরুহে ফুল ফুটাল কেন? নতুন সম্পাদক দেখলাম---প্রাণতোষ ঘটক। নামের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় ছিল---ছোট-বড় কয়েকটি কাগজে লেখা বেরিয়েছে, নজরে এসেছে।

আমাদেরও অনুরোধ এলো লিখবার জন্য। চাক্ষুষ পরিচয়ে অবাক হলাম---সদ্য কলেজ-ফেরতা তরুণের কাঁধে এত বড় কাগজ চালানোর দায়িত্ব। দায়িত্ব যথাযোগ্য স্থানে ন্যস্ত হয়েছে, অচিরে বোঝা গেল। একেবারে জাত-সম্পাদক, 'বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে'---তেমনি ব্যাপার। বিশ্বের যাবতীয় সাময়িক পত্রের খবরাখবর রাখে---মাথায় নানান অভিনব পরিকল্পনা। এ-দল ও-দল নেই প্রাণতোষের কাছে---এমনি হয়তো সাক্ষাতে মারমুখি হয়ে ওঠেন, 'মাসিক বসুমতী'তে পাশাপাশি নির্বিকারভাবে তাঁরা নিজ নিজ সৃজনপর্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। লিখতে জানলেই হল, অন্য কোন বিচার-বিবেচনা নেই। ভুল বললাম---লিখতে জানেন না এমন অনেককে প্রাণতোষ লেখক বানিয়ে ছেড়েছে। কেমন একটা তৃতীয় নেত্র ছিল---এই হাতে অপরূপ জিনিস বেরুবে, আগে ভাগে যেন বুঝতে পারত। অখ্যাত অজ্ঞাত বিস্তর জন 'মাসিক বসুমতী'র পাতায় পাঠকদের চমক দিয়েছেন। রাতারাতি তাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন, তাঁদের বই বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এক-আধটি নয় এমন---তালিকা দিতে গেলে নির্ঘাৎ ভুল থেকে যাবে, সেজন্য বিরত হলাম। হাসি ছাড়া মুখ দেখিনি প্রাণতোষের কখনো। সবাই তাকে ভালবাসত। লেখা চাইলে 'না' বলে ফেরানোর উপায় ছিল না।

তার সম্পাদনায় 'মাসিক বসুমতী'র জনপ্রিয়তা হু-হু করে বাড়তে লাগল, বাঙালী পাঠকের প্রাণের জিনিস হয়ে উঠল কাগজখানা।

'আকাশ-পাতাল' উপন্যাস বেরুচ্ছিল মাসিক বসুমতীতে। লেখক অ-আ-ই ছদ্মনাম নিয়েছেন। গোটা দুই সংখ্যা পড়ে আমার অদ্ভুত ভাল লাগল। গতানুগতিকতার বাইরে সুবৃহৎ পট-ভূমির উপর ক্লাসিকধর্মী উপন্যাস---স্বাদের দিক দিয়ে অভিনব। প্রাণতোষ আবার একটি শক্তিমান লেখক আবিষ্কার করেছেন, মনে ভাবলাম। ফোনে প্রশংসা জানালাম। প্রাণতোষ নিরাসক্ত ভাবে বলল, লেখককে জানাব আপনার কথা। কয়েকদিন পরে সে-ই আমায় ফোন করল: আপনার মন্তব্য যদি একটু লিখে পাঠান, লেখক খুব উৎসাহ বোধ করবেন। লেখা এগুচ্ছে মাসের পর মাস---আর কয়েকটি সংখ্যা পড়ে নিয়ে অজ্ঞাত লেখকের উদ্দেশে চিঠি লিখে পাঠালাম। সে চিঠি মাসিক বসুমতীতে বেরুল। 'আকাশ-পাতাল' বই হয়ে বেরুলে, তার সঙ্গেও আমার চিঠি ছাপা হল। হরি, হরি! তখনই টের পেলাম, অ-আ-ই অন্য কেউ নয়, প্রাণতোষই স্বয়ং। বই বেরুনোর সময় সে আত্মপ্রকাশ করেছে।

---মনোজ বসু

প্রাণতোষ স্মরণে

বন্ধুর মৃত্যুতে প্রত্যেক মানুষই শোকাভিভূত হন---সে শোক আরও অসহনীয়, আরও বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে যদি মৃত্যু হয় অকালে। অনুজপ্রতিম শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে বিগত চার-পাঁচ বছর ধরে এক সঙ্গে একই পত্রিকার জন্য কাজ করেছি, প্রত্যহ এক সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করেছি, কি-ভাবে কাগজকে আরও উন্নত আর সুখপাঠ্য করে তোলা যায়, কিভাবে একঘেয়েমীর গ্লানিমুক্ত করে বসুমতীর রবিবারের সাময়িক পত্রিকার অংশটিকে সবদিক থেকে সমৃদ্ধ করা যায়। আমরা দু'জনেই চাইতাম পত্রিকাটির উন্নতি---তাই বোধ হয় একদিনের জন্যও আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য বা মতান্তর হয় নি। এর থেকে এই কথাটাই আজ বার বার মনে হচ্ছে যে, একমন, একপ্রাণ হয়ে কাজ করলে কোন কারণেই মতবিরোধ হয় না।

রবিবারের সাময়িকীতে বহু নতুন নতুন বিষয়ের---যেমন ইউরোপীয় নাটক, কাব্য, উপন্যাস, ইউরোপীয়ান ব্যালে নৃত্য, ইউরোপীয়ান মিউজিক, ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল ড্যান্স---প্রবন্ধ ছাপাবার ব্যবস্থা আমরা করেছি। কেউ এ নিয়ে নাসিকা কুঞ্চন করলে---যেমন দু'একজন বলতেন, এ সব ব্যাপার বড্ড হাই ব্রাউড। সাধারণ পাঠকের ভাল লাগবে না---প্রাণতোষবাবু বলতেন, 'ওসব কথায় কান দেবেন না। আমরা ভাল জিনিস দেব---আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের একটা আশ্চর্য শক্তি আছে, ভালকে তাঁরা সব সময়েই অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে জনসাধারণ গ্রহণ করেছিল। শিশির ভাদুড়ীর বিরাট সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা--

উদয়শঙ্করকেও জনসাধারণই অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিল।'

প্রাণতোষবাবু আরও বলতেন—'এই সব উদাহরণ যখন আছে, সাধারণ পাঠককে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের কোথায়।' কথাটা খুবই সত্যি।

প্রাণতোষ ঘটক ছিলেন অজাতশত্রু—কখনও কারোর সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ হয়েছে, এমন কথা আমার স্মরণে আসে না।

এমন নিরহঙ্কার লোকও কম দেখেছি। নিজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, কিন্তু নিজের লেখা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন না। দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সব সময়েই নানাভাবে সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন প্রাণতোষবাবু—এ আমি বহুবার নিজের চোখে দেখেছি।

'বিদ্যা বিনয় দান করে'—এই উক্তির মূর্ত প্রতীক ছিলেন প্রাণতোষ ঘটক। এমন নম্র, এমন ভদ্র, এমন বিনয়ী মানুষ আমি তো খুব কমই দেখেছি।

এ লোকটি যে আমাদের মাঝে আর নেই, একথা যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না। হঠাৎ একদিন শুনলাম প্রাণতোষবাবু কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়েছেন, পায়ে একটা ফোড়া হয়েছে। তারপর শুনলাম অসুস্থতা বেড়েছে—এর পরের খবর—অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছেন। তারপরেই পেলাম মৃত্যুর খবর—এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের খবরের মত।

প্রত্যেক মানুষকেই একদিন মরতে হয় এবং হবে। কিন্তু সে মৃত্যু যদি অকালে এবং সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ঘটে, তবে মৃতের প্রিয়জন এবং বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষে তা কত অসহনীয় হয়ে ওঠে, তা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

—অশোক সেন

প্রাণতোষ দর্পণে আমি

নানা কারণে মৃত্যু সম্পর্কে কিছু কিছু দার্শনিক চিন্তা-বিলাসিতা মাঝে মাঝে আমাকে ছেঁকে ধরে। যেমন, মৃত্যুর কল্পনায় যে সর্ব-ধ্বংসী ঘাতকের চিত্র দেখি, যদি তার মধ্যে অমৃতরূপীর পদধ্বনি শুনতে চেষ্টা করি? সব শেষ হল না ভেবে যদি ভাবতে পারি ঢের ঢের বড় কিছু শুরু হল? হারাবার দিশেহারা ভয়ের বদলে যদি অনাবিল প্রাপ্তির রূপ কিছু দেখতে চাই? বিচ্ছেদের বদলে ওটাকে যদি মিলনের সেতু মনে করতে পারি? ধরে নিই মৃত্যু মানেই চলে যাচ্ছি, কিন্তু তার বদলে যদি ধরে নিতে পারি পৌঁছুচ্ছি কোথাও? আর, মৃত্যু যখন কানের কাছে এসে গজরায়, এ মাটির দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে—তখনো যদি সেই অমৃতরূপীর মিষ্টি কৌতুক কানে আসে, ছেড়ে যাবে আমার কোথায়, আসছ তো আমার কাছে!

কিন্তু এ চিন্তা-দর্শন খাটলেও খাটতে পারে শুধু নিজের বেলায়। আসলে মৃত্যুকে আমরা জানতে পারি বুঝতে পারি যখন অতি প্রিয়জন কেউ ওই পথে পাড়ি দেয়। যখন আমরা তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েও ধরে রাখতে পারি না। সে-মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের কোনো আপস নেই।

প্রাণতোষবাবু নেই এ আমার কাছে যতখানি সত্য, মিথ্যে তার থেকে ঢের বেশি। যত পিছনের দিকে তাকাই, দেখি, ওই এক মানুষের জীবনের তাজা স্পর্শ ভিন্ন আর কোনো সত্য চোখে পড়ে না। যত সামনের দিকে তাকাই দেখি, আরো ঢের বেশি তর-তাজা মিতভাষী মানুষটি আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন, আর সকৌতুকে বলছেন, কি কাণ্ড হল বলুন দেখি!

কাণ্ড একটা হয়েই গেছে আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু এর মধ্যে মৃত্যুর ঠাঁই কোথায়? লিখতে বসে আমি বার বার ভেবেছি, কি লিখব। ভিতর থেকে বার বার কেউ বলেছে, জীবনের কথা লেখো, তাঁকে শুধু জীবনের আলোয় দেখো।

তাঁর সেই আলোটুকু আমার লেখক জীবনে বড় বিচিত্র। সংকোচ তাঁর কথা বলতে গেলে নিজের কথাই বেশি বলতে হয়। এই তাঁর দর্পণে নিজেকে দেখছি।

সেটা খুব সম্ভব উনিশ শ' একান্ন সাল। তিরিশ-একত্রিশ বছরে যে ছেলেটার চোখের সামনে অনেক স্বপ্ন ছিল, তার নাম আশুতোষ। টানা পাঁচ 'ছ বছরের ব্যর্থতার ক্ষত তার সব স্বপ্ন তখন প্রায় শুষে নিয়ে একটা ছিবড়ের আকার দিচ্ছে। বাগ্বাদিনীর দরবারে সামান্য দীন-মজুরের সম্মান পাবার আশাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। সামনেটা ধূসর পাণ্ডুর।

সপরিবারে আমাদের স্বর্গত সম্পাদক

সভয়ে সামনের দিকে তাকানো ছেড়েছি। এর আগে গল্প উপন্যাস লেখায় হাত মক্স করেছিলাম। সেই তপে জলাঞ্জলি দিয়ে খবরের কাগজে ফীচার লেখা শুরু করেছিলাম। ফরমায়েসি লেখা। তার ধকল বেশি, মজুরি সামান্য। যুগান্তরে তখন 'প্রাসাদপুরী কলকাতা' সিরিজের ফিচার লিখছিলাম। বন্ধু অমল মিত্র (সেকালের বিদেশী রঙ্গালয়ের লেখক) একদিন হঠাৎ আমাকে বললেন, মাসিক বসুমতী সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, তাঁর দপ্তরে চলুন একদিন।

সত্য গোপন করব না, সাহিত্য-সম্পাদকদের প্রতি আমার মনোভাব তখন প্রসন্ন নয় একটুও। হালছাড়া মাঝি-ছাড়া নৌকোর ভাসছি তখন, মনোভাব প্রসন্ন হবে কি করে। অনেকের নিস্পৃহতার দরুণ আত্মাভিমানী মন বিমুখ। নিজের যোগ্যতার অভাব কে আর বড় করে দেখে?

তবু ওই বন্ধুকে সঙ্গে করেই গেলাম একদিন মাসিক বসুমতীর দপ্তরে। কুড়ি-একুশ বছর আগে সেই প্রথম দর্শন, প্রথম আলাপ। হাসি-মুখের মিষ্টি মিষ্টি কথা। বললেন, আপনার কলমে যে কলকাতার পুরনো বাড়িগুলো নতুন করে কথা কইছে। সব পড়ছি, বড় ভালো লাগছে। আমাদের দৈনিক বসুমতীর রবিবারের জন্য কি ফিচার লিখবেন বলুন।

সাহিত্যের আসরে আমন্ত্রণ নয়, আবার সেই ফিচার। তবু সেদিন সেই তরুণ সাহিত্য-সম্পাদকের অন্তরঙ্গ ব্যবহারটুকু ভালো লেগেছিল। আলাপ-আলোচনা করে রবিবারের দৈনিকের পাতায় অচল মানুষ পর্যায়ে সাধারণ মেহনতি মানুষদের কথা লিখব ঠিক হল।

লিখে যাচ্ছিলাম। কাগজে-কাগজে ফিচার লেখার একটা ক্লান্তি এসে গেছল। এর মধ্যে যে কোনো সাহিত্য সম্পাদকের নীরব পর্যবেক্ষণের চোখ ছিল কল্পনাও করি নি। একদিন হঠাৎই প্রাণতোষবাবু আমাকে বললেন, আপনার প্রায় লেখার মধ্যেই এক-একটা ছোট গল্পের টাচ দেখি, আপনি গল্প লেখেন না কেন?

কেউ জানে না, সম্পাদক নিজেও না, আমার দীর্ঘদিনের কোন্ ব্যথার ওপর তিনি প্রলেপের হাত বুলিয়ে দিলেন। বললাম, ঘরের দরজা বন্ধ করে দিন-রাত তো গল্প উপন্যাসই লিখতাম আগে, কিন্তু ছাপে কে? ঝেঁটিয়ে ঘর পরিষ্কার করে ফেলেছি।

বলে রাখি, এর অনেক আগে খুব এক ছোট প্রকাশকের হাত দিয়ে আমার চলাচল, জীবনতৃষ্ণা প্রভৃতি উপন্যাস বেরিয়েছে। কিন্তু প্রকাশের আলোয় এসেও তারা মৃতপ্রায় তখন। সব বস্তা-বন্দি অবস্থা।

প্রাণতোষবাবু মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। সে চাউনি ভুলব না। আমার ব্যথার দিকটাই দেখলেন কি না জানি না। যদিও আমার আত্মাভিমানী মন সেটা চাপা দিতেই চেয়েছে। তিনি বললেন, আমার মাসিক বসুমতীর জন্য একটা গল্প লিখুন, আমি ছাপব।

বিচার করব বলেন নি, বিবেচনা করব বলেন নি, বলেছেন ছাপব।

আট-ন' বছর বাদে আবার একটা ছোটগল্প লিখলাম। নাম নার্স মিত্র। তিনি ছাপলেন। গল্প সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করলেন না। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, পরের গল্প কবে পাচ্ছি?

বলে রাখি, মাসিক বসুমতীর আমার প্রথম গল্প সেই 'নার্স মিত্র'ই বছর কয়েক বাদে 'দীপ জ্বেলে যাই' নামে ছবি হয়েছিল। আর সেই ছবি দেখে সব থেকে খুশি মুখ যাঁর দেখেছিলাম, সেই মুখ প্রাণতোষ ঘটকের।

মাসিক বসুমতীতে আমার দ্বিতীয় গল্প 'কলংকবতী'। পরে 'সাড়া-জাগানো' গল্প হিসেবে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় সেটার পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে। কিন্তু ওই গল্পটাকে আমি ভুলতে পারব না অন্য কারণে। গল্প ছাপা হবার দিন দশেক বাদে কোনো শিল্পীর একজিবিশন দেখতে গেছলাম। দোতলায় উঠতেই এগিয়ে এসে প্রাণতোষবাবু আমার কাঁধটা জড়িয়ে ধরে হাঁক দিয়ে উঠলেন, দিদি, দিদি, এদিকে——।

সেই হাঁক শুনে এক অপরিচিতা মহিলা এগিয়ে এলেন। আমাকে দেখিয়ে প্রাণতোষবাবু বললেন, এই যে, আপনার কলংকবতী।

প্রশংসার এমন অকৃপণ উদার রূপ আর কি দেখেছি? প্রাণতোষবাবু, তোমার ভিতরের শিল্পীটিকে কতজন দেখতে পেয়েছে আমি জানি না। কিন্তু আগামী দিনের লেখকদের আমি এক সম্পাদকের কথা বলে যেতে পারব। বলতে পারব, আমি সেই সম্পাদক দেখেছি, একটি লেখক সৃষ্টি করতে পারলে যাঁর আনন্দ ধরে না।

তাঁরই সস্নেহ তাগিদে মাসিক বসুমতীতে আমার প্রথম উপন্যাস, পঞ্চতপা। ধারাবাহিক উপন্যাসটির শেষের মাথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, বই ছাপার কি হবে?

তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—সে কি এখনো ঠিক হয় নি। চলুন, চলুন—

যেন তাঁরই একটা মস্ত কাজে ভুল হয়ে গেছে। নিজের গাড়িতে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন মিত্র-ঘোষে --গজেন্দ্রকুমার মিত্র যার অন্যতম মালিক। গজেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, বইটা আপনি পড়ুন, ভালো লাগবে।

গজেনবাবু বললেন, পড়ছি। ভালো লাগছে। বই ছাপব।

তখনো আমি আমার জীবনের সবুজ সংকেতের বাহক প্রাণতোষ ঘটককে দেখছিলাম। এরপর মাসিক বসুমতীর পাতায় তিনি আমাকে অসংখ্য গল্প উপন্যাস লিখিয়েছেন। তার মধ্যে অনেক গল্প উপন্যাসের চিত্র-রূপায়ণ ঘটেছে। সেগুলোর সাফল্যে প্রতিবার আমি তাঁর সেই বিচিত্রসুন্দর খুশির হাসি দেখেছি।

আজ অনেকেই জানেন, আশুতোষ আর প্রাণতোষ একাত্ম বন্ধু। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের ভিত একক হাতে যিনি রচনা

করছেন তিনি প্রাণতোষ —শুধু প্রাণতোষ।

কত দিন দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। এই সে-বছর বেনারসে বিকেল থেকে বেশি রাত পর্যন্ত কি ভর-ভরতিই না হয়েছিলাম দু'জনে। সেই স্নিগ্ধ হাসি মুখখানা মৃত্যু ছিনিয়ে নিল। কিন্তু আমার বুকের তলা থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নেবে, এত ক্ষমতা তার নেই।

প্রাণতোষবাবু, বয়সে তুমি আমার থেকে বছর দুই ছোট ছিলে। তবু, আমার জীবনে তোমার অগ্রজের ভূমিকা। অগ্রজের মতই তুমি এসে হাত ধরেছিলে। সেই তুমি অগ্রজের মতই এগিয়ে গেলে আবার। কিন্তু আমার জীবনে তুমি নেই এ যে-দিন সত্যি হবে, সে-দিন স্থির জেনো, তোমার আশুতোষও আর নেই।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবৎসল প্রাণতোষ

প্রাণতোষের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ১৯৪০ সালে। তখন আমি বিদ্যাসাগর কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এবং কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক। অধ্যাপকদের কাছ থেকে ক্লাসে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে সতীর্থদের সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়াটাই তখন আমাদের কাছে বেশী আকর্ষণীয় ছিল। বিদ্যাসাগর কলেজে তখন কমন রুম ছিল না। তাই আড্ডা দেবার জায়গা খুঁজে নিতে আমাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। তখন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর (বীণা সিনেমার ঠিক উল্টো দিকে) 'মহৎ আশ্রম' নামে একটি আবাসিক হোটেল ছিল। তার একতলায় ছিল একটা রেস্টুরেণ্ট এবং একাধিক খালি ঘর (যেখানে হোটেলের কর্মচারীরা রাত্রে শয়ন করতেন)। আমরা সেখানে একটা ঘর দখল করে আড্ডাখানা বসিয়েছিলাম। সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত সেখানে অখণ্ড আড্ডা চলত। মাঝে মাঝে বদল হত শুধু আড্ডার লোক। রাজনীতি, সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক, সিনেমা এবং খেলাধুলোই ছিল আড্ডার প্রধান উপজীব্য, কিন্তু সেখানে সবচেয়ে বেশী আদর ছিল গাইয়েদের। ফড়েপুকুরের স্বরাজ ব্যানার্জী (সাহিত্যিক) এবং দেবী ঘোষ, হেদুয়ার সুনীল বোস, (বর্তমানে লালবাজারের চাকুরিয়া), টালার জানকী দত্ত (অধ্যক্ষ অচ্যুৎ দত্তের পুত্র), হাওড়ার হিমাংশু বিশ্বাস প্রমুখ সহপাঠী গাইয়েরা নিত্য নতুন গান শুনিয়ে আড্ডাটাকে জমজমাট করে রাখতেন। আমরা টেবল বাজিয়ে তাদের গানে তাল দিতাম।

স্বরাজ তখন সবে গল্প লিখতে সুরু করেছে, আর আমি কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সেই কারণে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা আলাদা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বরাজই একদিন শ্যামপুকুরের প্রাণতোষ ঘটককে আমাদের আড্ডায় নিয়ে আসে। প্রাণতোষ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র এবং 'যুগান্তরে' নিয়মিত গল্প লিখছে। প্রাণতোষের সঙ্গে সেই যে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তা তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

১৯৪১ সালে স্বরাজ আমায় বলে, প্রাণতোষ একখানা বই লিখেছে। সেটা সে প্রকাশ করতে চায়। তখনকার দিনে নতুন লেখকের পক্ষে প্রকাশক সংগ্রহ করা খুব কঠিন ছিল। প্রাণতোষ বই লিখেছে শুনে আনন্দে, গর্বে আমার বুকটা ভরে ওঠে। বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের "বর্মণ পাবলিশিং হাউসে" তখন রাজনৈতিক লেখকদের একটা বড় আড্ডা ছিল। সেখানে ডঃ ভূপেন দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), মনোরঞ্জন হাজরা, রামনাথ দাস এবং অন্যান্য বহু লেখক, পরিব্রাজক এবং রাজনৈতিক নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁদের কথাবার্তা, গল্প-গুজব শোনবার লোভে আমিও সেখানে যাতায়াত করতাম। পাবলিশিং হাউসের মালিক ব্রজবিহারী বর্মণ আমায় খুব স্নেহ করতেন। প্রাণতোষের বই ছাপাবার জন্য আমি তাঁকেই ধরলাম। কিন্তু ব্রজবাবু ছিলেন স্বল্পবিত্ত মানুষ। তিনি প্রাণতোষের বই ছাপাতে রাজী হলেও, টাকা যোগাড় করতে পারছিলেন না। সে কথা শুনে প্রাণতোষ নিজেই তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য করে। কিন্তু মজার কথা, এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি যখন ব্রজবাবুর হাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন দেখা যায়, সেটা স্বরাজের পাণ্ডুলিপি, প্রাণতোষের নয়। দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তখন প্রাণতোষ আমায় বলে, স্বরাজের বইটা আগে ছাপা হোক, তারপর আমারটা হবে। প্রাণতোষের হৃদয়টা যে কত বড়, সেদিনই আমি সেটা প্রথম উপলব্ধি করলাম। স্বরাজ এবং প্রাণতোষ ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিল। তারা দুজন একই সঙ্গে সাহিত্যচর্চা শুরু করে। প্রাণতোষ উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কাজেই তার পক্ষে নিজের লেখা বই প্রকাশ করা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু স্বরাজ ছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তার পক্ষে নিজ ব্যয়ে নিজের বই প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। প্রাণতোষ তার প্রিয় বন্ধুর সম্ভাব্য মনোবেদনার কারণ ঘটাতে চায় নি বলেই তার লেখাটা আগে ছাপবার প্রস্তাব করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ফলে স্বরাজের সেই বই শেষ পর্যন্ত বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে ছাপা হয় নি। স্বরাজ সাহিত্য জীবনে খ্যাতি লাভ করার পর অপর কোন প্রকাশক সেই বই ছেপেছেন বলেই মনে হয়।

প্রাণতোষের এই বন্ধুপ্রীতির

ঘটনা আমার কাছে সত্যিই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

বছর দুই আগে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে স্বরাজ যখন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়, তখন প্রাণতোষ শোকে অভিভূত হয়ে বলেছিল, 'সুনীলদা, আমাদেরও দিন শেষ হয়ে এল'। তার সেই কথাটা যে দু বছরের মধ্যে তার ক্ষেত্রে এমন অমোঘ সত্যে পরিণত হবে, তা ভাবা যায় নি। প্রায় তিন যুগ ধরে আমাদের মধ্যে যে নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা চিরকালের মত ছিন্ন হয়ে গেল। তাই তার অকালমৃত্যু আমার কাছে আরও বেশী বেদনাদায়ক।

---সুনীল ঘোষ

একা আমি

পনেরো-ষোল বছর বয়েসে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম দিনটি থেকে প্রাণতোষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। এক কলেজে, এক ক্লাশে পড়ার বন্ধুত্বই নয়। সাহিত্য আরো একটি বড় যোগাযোগের সেতু। প্রাণতোষের বাল্যবন্ধু স্বরাজও এলো আমাদের মধ্যে। তিনজনে মিলে একটি গোষ্ঠী। তিনজনের একই পছন্দ-অপছন্দ, একই আশা, স্বপ্ন, আদর্শ। আমি ছিলাম সাহিত্যপাঠক, সমালোচক, শৈশবে কবে কবিতা লিখে খাতা ভরিয়েছিলাম সে সব কথা তখন স্মৃতি। প্রাণতোষ জোর করে আমাকে গল্প লেখালো। মাঝে মাঝে তিনজনেরই লেখা দু' একটা ছাপা হয়, প্রচণ্ড উৎসাহে আবার লিখি আমরা তিনজনই পরস্পরের লেখা শুনি, পরস্পরকে সমালোচনায় ছিন্নভিন্ন করি। কিন্তু যে-কোন একজনের লেখা ছাপা হলে তিনজনেই উল্লসিত হই। একজনের প্রশংসা শুনে মনে হয়, আমাদের তিনজনেরই প্রশংসা।

প্রাণতোষ যে খুব ধনী পরিবারের ছেলে তা তার হাবেভাবে সন্দেহ করারও উপায় ছিল না। ওর সমবয়েসী সহপাঠী জ্যাঠতুতো ভাই ছিল গোরা (নির্ব্বাণীতোষ); সে গাড়ি চালিয়ে আসতো। আরো অনেকেই। প্রাণতোষ কলেজের শেষ দিন পর্যন্ত ট্রামে-বাসে। আর গোরা গাড়ি চালিয়ে আসতো বটে, কিন্তু ব্যস ঐ অবধি। বাকী ব্যবহারে একেবারে মধ্যবিত্ত। প্রাণতোষের ডাক নাম কলেজের সকলের মুখে মুখে চালু হয়েছিল দিন কয়েকের মধ্যেই, সে খুব মিশুকেও ছিল। একবার, তখন বি-এ পড়ছে, একটা গল্পের বই বের করে দেবে বলে এক ক্ষুদে প্রকাশক ওর কাছে টাকা নিয়ে খুব ভুগিয়েছিল। বইও বের করে নি। টাকাও ফেরত দেয় নি। প্রাণতোষ বলেছিল, যদি কখনো পাবলিশিং ব্যবসা করি, লেখকদের ঠকাতে দেবো না। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক হয়ে প্রথম যখন বসলো, তখন সে কথা ও ভুলে যায় নি। সবচেয়ে বড় কথা, লেখকদের সম্মান দিতে মর্যাদা দিতে কখনো কার্পণ্য করে নি।

দুর্ভিক্ষের পর ও খুব ভাল একটা গল্প লিখেছিল---পঙ্গপাল। আমার তো মনে হয় ঐ বিষয়ে ওর চেয়ে ভাল লেখা কেউ লিখতে পারে নি। 'পঙ্গপাল' বইয়ে ওর আরো অনেক ভাল গল্প আছে।

ফিফ্থ্ ইয়ারের শেষেই বোধহয় ওর বিয়ে হ'লো। গোরা এবং ওর দু'জনেরই বিয়ে এক সঙ্গে, সতীশ মুখোপাধ্যায়ের দুই মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু সেই সূত্রে ও বসুমতীর রবিবারের বিভাগ বা মাসিক বসুমতীর সম্পাদক হয়ে বসে নি। আড়ালে থেকে বেশ কিছুদিন শিক্ষানবিশী করেছে, তারপর নানান সাজেশান দিয়েছে, হাতে-কলমে কাজ করেছে, যোগ্যতা যখন প্রমাণিত হয়েছে তখনও ও সম্পাদক নাম পায় নি। ওর তখন একটা সুন্দর রুচি ছিল, উদার মন ছিল, উচ্চাশা ছিল---ব্যক্তিগত নয়, পত্রিকা ও সাহিত্য সম্পর্কে। রাতারাতি ও বসুমতীকে পালটে দিল। মিষ্টার টমাসের নোংরা রুচির ছবি দূর করে---ভেবে দেখুন---তখনকার দিনে গোপাল ঘোষকে পরিচিত করালো বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সব আধুনিক শিল্পীকেই ডাক দিলো। সম্পাদকের দরজা ও খুলে দিল সব লেখক ও শিল্পীর জন্যে। যাদের রাজনৈতিক মতামত ও ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতো না, তাদের বেলাও বললে, লেখা লেখা, রস নিয়ে কথা, তা সে যে দলেরই হোক্ এত ভাল ভাল লেখা তখন মাসিক বসুমতীতে বেরিয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা মাসিক বসুমতীকে ও রাতারাতি একেবারে আধুনিক করে দিয়েছিল। তখন সকলেই জেনে গেছে প্রাণতোষই সম্পাদক, নাম অন্য থাকলেও। তারও পরে ও প্রকাশ্যে সম্পাদক হয়েছে। আমাকে প্রায়ই লিখতে বলতো, আমি লিখতাম না। বলতাম, দ্যাখ, সবাই ভাববে বন্ধু বলে ছাপছিস! ও কি বলেছিল জানেন? বলেছিল, তার লেখা যদি খারাপ লাগে তবেই বলবে; ভালো হ'লে কেউ ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তবু আমি সাহস পাই নি, বাইরে স্বীকৃতি পেয়ে তবেই ওর কথা রেখেছিলাম। ভাল লেখার খবর পেলে ও যে কোন লেখকের কাছে ছুটে যেত। আমার 'লালবাঈ' একেবারে বই হয়ে বেরুচ্ছিল, মাত্র তিন ফর্মা ছাপা হয়েছে। বাকীটা লেখাই হয়নি। প্রাণতোষ পড়তে নিয়ে গেল জোর করে। ফেরত দিল না। মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ছেপে দিলো। আমি রাগারাগি করলাম, নার্ভাস বোধ করলাম। ও বললে, বাঃ রে, এ লেখা সকলের চোখে পড়াতে না। এখন একা আমি। ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা স্বরাজের মৃত্যুর দিন। প্রাণতোষও চলে গেল।

অনেক কথা লিখেছেন। সে কত বড় সম্পাদক ছিল। আমিও তো তাই লিখলাম। কিন্তু এই গুণের কথা আমার লেখার ইচ্ছে একটুও ছিল না।

আমি খুশী হতাম, যদি বলতে পারতাম, প্রাণতোষ কত বড় লেখক দিতে গিয়ে, পরিচিত করাতে গিয়েও ও নিজের লেখক হওয়ার পথ বন্ধ করেছিল। আমার কাছে তার শ্যাম-পুকুরের বাড়ির দোতলার ঘরটা অনেক বেশী দামী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা, লেখা পড়ে শোনানো, কি পড়েছি বলতো, 'লিখতে হবে না, ভাল কিছু লিখতে হবে।' যা লিখে গেছে, তার প্রশংসায় মন ভরে না, ও যা লিখতে পারতো তার তুলনায় ওগুলো যে কিছুই নয়।

—রমাপদ চৌধুরী

প্রাণতোষ স্মরণে

স্মরণ নয়, তাঁকে ভোলা যায় না। অন্তত আমার বয়েসী মানুষ যাঁরা, তাঁরা প্রাণতোষকে ভুলবার মতো দীর্ঘ সময় পাবেন না। স্নেহদীপ্ত দৃষ্টি সেই মানুষটি হাসিমুখে এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে,---'চলুন, আজ এক জায়গায় যাবো।'

এমনি কত জায়গায় গিয়েছি প্রাণতোষের সঙ্গে। পরিচিত হয়েছি, গুণী, শিল্পী ও লেখকদের সঙ্গে। যাঁদের নাম দূর থেকে শুনেছি। অবশ্য শনিবারের চিঠির আসরে যাঁরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলাম।

গুণীজনকে খুঁজে বের করতেন প্রাণতোষ। সে যে আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। মাসিক বসুমতীর দায়িত্ব নিয়ে তাঁর সে কি বিপুল উদ্দীপনা!

আর আমার নিজের কথা বলতে গেলে,---বলতে হয়, প্রাণতোষই আমাকে আবিষ্কার করেছিলেন,---আমার একখানি বই 'ভাগ্যলিপি'র উৎসর্গপত্রে আমি প্রাণতোষের উদ্দেশ্যে সে কথা লিখেছিলম। সে সময় শনিবারের চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম। বাংলার মনীষা, প্রতিভা ও প্রখ্যাত লেখকদের সেই বিচিত্র মিলনক্ষেত্রের বিচিত্র ইতিহাস লেখার দিনও আজ এসেছে। শনিবারের চিঠির আসরেই প্রথম পরিচয় প্রাণতোষের সঙ্গে।

শনিবারের চিঠির গোড়াপত্তনের ইতিহাস স্বর্গত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের আত্মচরিতে হয়ত বিধৃত হয়েছে, তবু তার আড্ডা ও বাংলা-সাহিত্যের একটা যুগের বিশেষ ইতিহাস কেউ লেখেননি। স্বর্গত ডক্টর সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, নীরোদ চৌধুরী ও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেরই স্মৃতি-বিজড়িত সে ইতিহাস।

এরই মাঝে তরুণ দলকেও দেখেছি—প্রাণতোষ ঘটক, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী ও গৌরাঙ্গ বন্ধুর আনাগোনা গত মহাযুদ্ধ-পর্বের দিকেই শুরু হয়েছিল। সজনীদা'র পরামর্শ ও হিতৈষণার ওপর প্রাণতোষের বিশেষ আস্থা ও নির্ভরশীলতা ছিল।

একটি ঘরোয়া প্রীতি সম্মেলনে প্রাণতোষ ঘটক, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও [illegible] শর্মাচার্য

সে-সময় প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষ, বাংলার সংস্কৃতির অনবদ্য রূপকার বিনয় ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে প্রাণতোষের মাধ্যমেই আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটে। শিল্পী ও লেখকদের প্রতি তাঁর অসামান্য দরদ ছিল।

এর আগের যুগের মাসিক বসুমতী, আর এ যুগের মাসিক বসুমতী—ভোল পালটে গেল। প্রাণতোষ এ যুগের উদ্গাতা হলেন বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে। সে কি প্রাণচাঞ্চল্য। এ যুগের প্রখ্যাত ও খ্যাতিমান লেখকদের বিচিত্র সমাবেশ। এরই মাঝে প্রাণতোষের সতীর্থেরাও রয়েছেন।

'আমার ভৃগুজাতক-এর পাণ্ডুলিপি পড়েই প্রাণতোষ তা কেড়ে নিয়েছিলেন। আর আমার সর্ত ছিল, সজনীদা যদি সায় দেন, তবে তা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হবে। তার পরের কথা অবশ্য সকলেই জানেন। 'ভৃগুজাতক' বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র মতই সমাদৃত হয়েছিল।

আধুনিক যুগের প্রখ্যাত অনেক বইয়ের প্রকাশের গোড়ার কথা খুঁজলে প্রাণতোষের গুণগ্রাহিতার অকৃপণ-কাহিনীর অনেক বিচিত্র ইতিহাস হয়ত জানা যাবে। আমি যতটুকু জানি, তাই নিয়ে বলতে পারি, এই অল্প বয়সেই প্রাণতোষের মধ্যে এক দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন সম্পাদকের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের স্মৃতির পাতায়ও রয়েছে প্রাণতোষের গুণ-স্বীকৃতির কথা।

প্রাণতোষ ছবিও আঁকতেন। তিনরঙা ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি অনেক সময় তন্ময় হয়ে যেতেন। সেই কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও দেখেছি, তাঁর আঁকা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। প্রাণতোষের আঁকা ছবি একখানি সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের ঘরের দেয়ালে ফ্রেমেআঁটা দেখেছি।

প্রাণতোষের অধিকাংশ উপন্যাস আমি পড়েছি। এমন কি, তাঁর 'আকাশ-পাতাল' বইয়ের সমালোচনাও আমাকে করতে হয়। সেই উপন্যাস প্রাচীন তথা অভিজাত কলকাতার এক অনবদ্য আলেখ্য। আমার কাছে এই বইয়ের মর্মকথা শুনে অনেকেই এই উপন্যাসখানি পড়েছিলেন।

অনুজ প্রাণতোষ আজ নেই। তবু মনে হয়, সেই স্নিগ্ধ-শান্ত মানুষটি এখনো আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তির মাঝে তিনি বেঁচে থাকবেন, তাঁর আত্মজাদের মধ্যে তাঁর ধারা বহমান থাকবে।

অগ্রজ আমি,—শ্রদ্ধা জানাই সেই অনুজকে, যাঁর মাঝে ছিল গুণগ্রাহিতার এক 'পরশমণি'। বুকের খসে-যাওয়া পাঁজরের কথা একটু নড়াচড়া করলেই যে মনে পড়বে। প্রাণতোষকে ভুলতে পারবো না।

—দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

আমাদের মৃত্যুশোক

এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, এই লেখক নিজেই যখন জুনিয়র, তখন তার চেয়েও জুনিয়র যাদের খোঁজ পেয়েছিল, প্রাণতোষ তাদের অন্যতম। সে প্রায় সিকি-শতক আগেকার কথা তো হবেই। শ্যামপুকুর অঞ্চলের একটি সাপ্তাহিকে এই লেখক 'সম্পাদকীয়' লেখার ঠিকেদারি নিয়েছিল। একদিন তার চেয়েও কমবয়সী এক লেখক একটা গল্প দিয়ে যায়। সেই লেখকের নাম প্রাণতোষ ঘটক।

এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, এই প্রাণতোষই পরে 'বসুমতী'র সাহিত্য সম্পাদক হয়। তার উদ্যোগে প্রথম নববর্ষ-সংখ্যার পরিকল্পনার ও সম্পাদনা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে সুরুচি বিশেষ সংখ্যা সেই বোধহয় প্রথম। তখন তার সঙ্গী ছিলেন শ্রীবিনয় ঘোষ।

সম্পাদক হিসাবে শুধু অঙ্গসজ্জার অভিনবত্ব নয়, মত-গোষ্ঠী নিরপেক্ষভাবে সকলকে মেলানোও ছিল প্রাণতোষের আশ্চর্য কৌশল। সকলকে সে গ্রহণ করেছিল, গ্রহণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সকল মহল সে গৃহীত হয়নি। লেখক হিসাবে তো নয়ই। তার জীবনের অন্যতম ট্র্যাজেডি এই, তার বন্ধুবৈৎ উদারতার পুরস্কার এই।

ব্যক্তি প্রাণতোষ, লেখক প্রাণতোষ, না সম্পাদক প্রাণতোষ—তার কোন্ সত্তাটি শেষ পর্যন্ত স্মৃতিতে শিলমোহরাঙ্কিত হবে, বলা কঠিন। কেননা এই চলমান জগতে অবশেষে সবই চলে যায় যে। তবে এই লেখক বিশেষ করে তার প্রতি অন্তিম নৈবেদ্য নিবেদন করতে অযাচিতভাবে এগিয়ে এল কেন, এই জিজ্ঞাসার একমাত্র উত্তর: কৃতজ্ঞতা। মুষ্টিমেয় যে জন কয় বন্ধুর সৌজন্যে এই লেখক এখনও লেখকরূপে টিকে আছে, তার মধ্যে প্রধান একজন ছিল—প্রাণতোষ। এই লেখককে খাড়া রাখার একটি ঠেক্‌নো সরে গেল।

ফলত নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কোনও সুহৃদের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করছে, না তার নিজেরই সমাধিতে সে নিজেই জানে না। প্রৌঢ়দের বিয়োগে প্রৌঢ়রাই কাঁদে। প্রতি স-বা-নিকট বয়সীর মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, পরের পালা আমাদেরও হতে পারে। আমরা আসলে কাঁদি আমাদেরই মৃত্যুশোকে।

—সন্তোষকুমার ঘোষ

(আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত)

প্রাণতোষ-বিয়োগে

বিশ্ব মুখোপাধ্যায়

বিনা মেঘে বজ্রপাত সম
মৃত্যু আসি দ্বারে দিল হানা—
কোথায় সান্ত্বনা।
মূর্চ্ছাহত, মর্মাহত মোরা সবে।

না-মিটিতে সংসারে সকল আস্বাদ,
না-পূরিতে সব তৃষা—
মানিলে-না কারো কোন মানা,
নিলে যে বিদায় তুমি—
তুমি প্রাণতোষ।

নামের মাধুর্য রাখি হৃদি-ভরা
ছিল তব অসীম সন্তোষ।
দেখিনিকো কভু মোরা, কারো প্রতি
অহেতুক রোষ।

ছিলে তুমি শিল্পী কবি, ছিলে সৃষ্টিকার
গেঁথেছ কথার হার :
এঁকেছ বিচিত্র ছবি তুলির লিখনে—
অনাদি অনন্তকাল রহিবে তা
জনগণ মনে।

অফুরন্ত ভালবাসা ছিল তব প্রাণভাসা
সবাকার তরে,
কতজনে গোপনে করেছ কত দান—
মানুষের ছিল নাকো কোন ব্যবধান
তব সন্নিধানে।
সেই সব ছবি বন্ধু আজ পড়ে মনে।
অনামীকে করেছ নাম দান,
জহুরীর মত তুমি করেছ সন্ধান—
উপল বন্ধুর পথে, সাহিত্যের।
বেছে নেছ খাঁটি হিরণ্যরে
কণ্টির উপরে রাখি ;
বেছ তারে অসামান্য মান।
'বসুমতী' ছিল তব প্রাণ,
হে বন্ধু, হে অমৃত-সন্ধানী ;
অন্তর-সঞ্চিত-সুধা তার তরে
দিয়ে গেলে দানি,
জীবনের যাত্রা করি শেষ।

বিরহের মেঘে আজ অশ্রুর শ্রাবণ
ঝরে নিত্য অন্তরে-বাহিরে,
তুমি কি বুঝিবে বন্ধু আমাদের মর্মব্যথা
আজ থাকি দূরে?

অকস্মাৎ, আচম্বিতে তোমারে এ হারানোর
ব্যথা বসুধায়,
মিটিবে না কোন দিন কোন সে সুধায়।

প্রাণতোষের অকাল প্রয়াণে

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম তুলি দুই-ই চলেছে সমান শক্তি নিয়ে
নব নব উন্মেষণে ফুটল কত কথা,
হাজার প্রাণে তুষ্টি জাগে অনেক তৃপ্তি দিয়ে
ঘুচিয়ে যত ক্ষণিক চঞ্চলতা॥

নবীন কালের আরাধনা কমল-বনের মাঝে,
মানসলোকে যে প্রদীপের শিখা
উজ্জ্বল হ'ল জীবন-পথে প্রতি ফাগুন সাঁঝে
আজ দেখি তার সমাপনের লিখা॥

কতদিনের কত স্মৃতি বৃদ্ধ বটের ধারে
রচিয়াছে কত না-বলা বাণী,
ছাড়ল তরী গভীর রাতে দূরের পারাবারে
বট চেয়ে রয় নীরব মৌন প্রাণী॥

স্তব্ধ হ'ল জীবন-গীতি থামলে বীণা সঙ্গে
সাঙ্গ হ'ল কর্মসাধন এ ধরিত্রীপারে,
বোবা বট যে থাকে প'ড়ে যাত্রাপরিক্রমে
মহাকালের কোন্ খেয়ালে কোন্ ইঙ্গিতের তরে?

বন্ধু প্রাণতোষ

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

তোমার আমার দেখা ক্ষণিকের কিংবা ক'দিনের
চলমান জীবনের বিক্ষুব্ধ প্রবাহে একটি বুদ্বুদ্—
শ্রাবণের মেঘাকাশে পরিচয় দুটি চাতকের
এক লক্ষ এক তৃষ্ণা কামনা সে অব্যক্ত অদ্ভুত।

বৃষ্টিভেজা বনানীর অশান্ত অন্তরে জাগে শিহরণ
সুশ্যামল তৃণ কাঁদে বক্ষে নিয়ে ঝরা বকুলেরে-
জমাট কালোর গর্ভে লুপ্ত হ'ল প্রদীপ্ত কিরণ—
তমসার আস্তরণ নেমে আসে ধরণীরে ঘিরে।

তোমার প্রসন্ন স্মৃতি কথা কয় স্মিত হাস্যে ভরা
তীব্র হয় অনুভূতি অদর্শনে আশঙ্কার পলকে পলকে
ভেসে চল মেঘের ভেলায় মন্দানিলে মঞ্জুল মন্থরা
প্রতিচ্ছন্ন আত্মা তব মুক্তির অনন্ত গান শূন্যায় পথিকে।

বিমলশুভ্র সৌজন্যভরা দীপ্ত যার প্রভাত প্রদোষে—
প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ সে আমার বন্ধু প্রাণতোষ।

স্মৃতি

টেলিফোনের রিসিভার আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলাম। তখন অনেক রাত। দুটো প্রায় বাজে। টেলিফোনে খবর পেয়েছি প্রাণতোষ ঘটক আর নেই। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। একটি সিগারেট ধরালাম। জনপ্রাণী নেই কোথাও। হাওয়া দিচ্ছে অল্প অল্প। একটি নারকোল গাছ দুলছে। রাস্তার নিয়ন আলোর চারদিকে একটি বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশে একটু একটু মেঘ, দুটো চারটে তারা।

মনে হোলো রাত্রি একটি বিরাট আয়না।

বিশেষ কিছু যে ভাবছিলাম তা নয়। শুধু কতকগুলো টুকরো টুকরো ছবি মনের মধ্যে ফেড-ইনফেড-আউট করছিলো। ছাব্বিশ বছর আগের একটি দিন। ইউনিভার্সিটির চওড়া সিঁড়ি দিয়ে আমি নামছি আর সে উঠে আসছে।

ক'দিন তোর দেখা নেই কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এখন বসুমতীতে বসছি,--সে উত্তর দিলো, --আয় একদিন।

সেনেট হলের পেছন দিকের চায়ের দোকানে আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছি। কার্তিক এসে চা দিয়ে গেল। প্রাণতোষের গায়ে গাঢ় সবুজ রঙের সিল্কের শার্ট। মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

বসুমতী অফিস। টেবিলের ওপাশে প্রাণতোষ। এপাশে অনেকে। কয়েকটি বাংলা দেশে সুপরিচিত নাম। বাইরে প্রবল বৃষ্টি। প্রচুর হাসি। প্রচুর গল্প। তার মধ্যে প্রাণতোষ নিজের মনে একটি কাগজ নিয়ে ছবি আঁকছে। এও অনেক দিন আগেকার কথা।

প্রচণ্ড গরম। সন্ধ্যেবেলা। প্রাণতোষদের শ্যামপুকুরের বাড়ি। প্রাণতোষ, আমি আর আরেকজন বন্ধু। ঠাণ্ডা সরবৎ এলো। নিচের বারান্দায় উঁচু গলায় কারা যেন কথা বলছে।

দশ বছর আগের একটি দিন। মুষলধারে বৃষ্টি। চৌরঙ্গীর এক গাড়ি বারান্দার নিচে আমরা চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছি। আমি, প্রাণতোষ আর ওর ভাই নির্বাণীতোষ।

তারপর, তারপর, তারপর হ্যাঁ কতো বছর কেটে গেল। প্রাণতোষের বৈঠকখানা রোডের বাড়িতে অনেক সন্ধ্যার মতো একটি সন্ধ্যা। খুব নিরিবিলি। সামনে গরম গরম কচুরি। সেকেলে ইজিচেয়ারের উপর পা তুলে বসে আছে প্রাণতোষ। আমি বসে আছি ডিভ্যানের উপর গদিতে ঠেস দিয়ে। ওর মেয়ে নন্দিনী আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।

এতগুলি বছর মাসিকের পেছনেই চলে গেল, --প্রাণতোষ বললো আস্তে আস্তে, --লেখার জন্যে আর সময় দিতে পারলাম না। মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায়।

ওর আঁকা একটি ছবি দেখছিলাম। খুব অল্প বয়েস থেকেই ছবি আঁকে। এত কাজের চাপ, কিন্তু ছবি আঁকা ছাড়ে নি। লেখক প্রাণতোষ, সম্পাদক প্রাণতোষ, --এবং এই দু'জনের আড়ালে এক শিল্পী প্রাণতোষ, একেবারে নিঃসঙ্গ শিল্পী। আমার এক এক সময় তাকে মনে হোতো সমকালীন গল্পের নায়ক। কিন্তু একেবারে চাপা। কোনো বিক্ষোভ নেই, কোনো অভিযোগ নেই, নিজের আড়ালেই নিজে মৌন, নিস্তব্ধ। চিঠির প্যাডে, পুরোনো খামের পেছনে, যে কোনো কাগজের টুকরোর উপর কলম দিয়ে নিজের মনে ছবি এঁকে যাচ্ছে।

লেখক প্রাণতোষ, সম্পাদক প্রাণতোষ, --এ দু'জনের সম্বন্ধে আমি এমন কিছু বলতে পারবো না--যা নতুন। লেখক হিসেবে আমি প্রাণতোষের কাছে অত্যন্ত ঋণী, ---একথাও আমার একলার নয়, আমার মতো অনেকেরই। শিল্পী প্রাণতোষকে আমি ভাল করে চিনি না, কেউই চিনতো না, --শুধু মাঝে মাঝে দু'জনে একলা বসলে শিল্পী প্রাণতোষের মনের এক অনন্ত বিষাদের একটুখানি আভাষ পেতাম ওর একটা-দুটো কথায়।

আজ লিখতে বসে যার কথা বার-বার মনে পড়ছে, সে ছাত্রজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রাণতোষ। অল্প বয়েসের বন্ধুত্ব সবার সঙ্গে বহু বছর ধরে টেকে না। জীবনযাত্রার নানারকম ধাক্কায় অনেকেই হারিয়ে যায়। কিন্তু যে দু'-চারজনের সঙ্গে আজও ঠিক সেই আগেরই মতো, তাদেরই একজন ছিলো প্রাণতোষ।

ওর বাড়ি থেকে সেদিন যখন বেরোলাম, তখন নটা বেজে গেছে। সেও এলো সঙ্গে সঙ্গে। আমহার্স্ট স্ট্রীট পর্যন্ত পৌঁছে দিলো। যতক্ষণ না একটি ট্যাক্সি পেলাম, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলো।

তারপর ওর অফিসে কয়েকবার দেখা হয়েছে। সেটা স্মৃতি নয়। সেদিন রাত্তিরে যখন ট্যাক্সি রওনা হোলো, ওকে দেখলাম একলা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মোড়ে। আমার কাছে আজ এটাই স্মৃতি।

—বারীন্দ্রনাথ দাশ

অনুজ প্রয়াণে

জগতে যে সব পরম দুঃখের ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা কনিষ্ঠজনের বিয়োগ।

জানি মৃত্যু কোনো নিয়মের ধার ধারে না, সৃষ্টিকতার কোনো ছন্দ মানে না, স্বেচ্ছাচারী শিশুর মতো সে সাজানো খেলাঘর ভাঙে-চুরে, নষ্ট করে, এক নিমেষের খেয়ালে মানব সংসারের অনেক কিছু তচনচ করে দেয়, তবু আমরা চিরদিনই মনের মধ্যে একটি মূঢ় প্রত্যাশা বহন করে চলি। সে প্রত্যাশা-ও বুঝি নিয়ম মেনে চলবে।

যারা আগে এসেছে, ও বুঝি তাদের আগে আগে নিয়ে যাবে। যারা পরে এলো, তারা থাকবে, তারা আরো কিছুদিন এই শোভা-সৌন্দর্যময়ী বসুন্ধরার আলো-বাতাসের উপস্বত্ব ভোগ করবে।

প্রতিনিয়তই এই মূঢ় প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটে, প্রতিনিয়তই মৃত্যু নির্লজ্জ হাসি হেসে ব্যঙ্গ করে যায়। তবু আমরা চমকে না উঠে পারি না। চমকে উঠি, হাহাকার করে উঠি, আহত বিস্ময়ে বলতে থাকি, 'এ অনিয়ম! এ অনিয়ম!'

এই অনিয়মের ঘটনায় শুধু যে বেদনাবোধই থাকে তা নয়, কোথায় যেন লুকনো থাকে একটি সূক্ষ্ম অপরাধ-বোধ, একটি গভীর লজ্জাবোধ।

যেন অন্যের প্রাপ্য পাওনা চুরি করে ভোগ করছি, যেন একটা অনিয়মের অংশীদার হচ্ছি।

আমাদের থেকে অনেক কনিষ্ঠ শ্রীমান প্রাণতোষ ঘটকের মৃত্যু সংবাদটি যেদিন শুনলাম, সেদিন ঠিক ওই কথাটিই মনে হয়েছিল।

সংবাদটি আমার কাছে আকস্মিকই লেগেছিল, কারণ বেশী কোনো অসুখের কথা আগে শুনি নি। মাত্র কয়েকদিন আগে একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের উৎসব অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ-পত্রে আমার এবং শ্রীমান প্রাণতোষ ঘটকের নাম ছিল, গিয়ে শুনলাম 'শরীর ভাল নেই, আসতে পারবেন না।'

সংবাদটি এতোই সাধারণ যে, তার পিছনেই অপেক্ষা করছে এমন একটি মর্মান্তিক সংবাদ, তা ধারণাই করি নি।

শুনলাম কয়েকদিন পরেই।

বিস্ময়ে বেদনায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আর তখনি মৃত্যুর ওই খামখেয়ালী অনিয়মের নিয়মটা যেন নতুন করে আর একবার উপলব্ধি করলাম।

প্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের হলেও, নিত্য দেখায় ঘনিষ্ঠ নয়, যা দেখেছি সভা-সমিতির মঞ্চে, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান-গুলির বৈঠকে। আর তিনি খুব একটা বৈঠকী মানুষ ছিলেন না বলেই হয়তো ওই ভাসা ভাসা দূরত্বটি থেকেই গিয়েছিল। তবু---সাহিত্যিক গোষ্ঠির সকলেই যেন একটি পরিবারেরই একজন---এই কথাটি ভাবতে ভাল লাগে এবং সেইখানেই যেন থাকে একটি একাত্মার সূত্র। যে সূত্র 'আত্মীয়-বোধের' মাল্য রচনা করে চলে।

তাই পরিচয় গভীর না হলেও বেদনাটি গভীর, পরিবারের একজনের বিয়োগের মতই মর্মস্পর্শী।

প্রাণতোষ ঘটক তাঁর সাহিত্য-জীবনে অথবা কর্মজীবনে কী পরিমাণ কর্ম করে গেছেন, সে আলোচনা আমি করছি না, সে আলোচনার জন্য অন্য সময় আছে, অন্য ব্যক্তি আছেন এবং অবশ্যই বিশদ বিচারের আলোক-পাতে ধীরে ধীরে হতে থাকবে সে আলোচনা। আমি শুধু তাঁর একটি বিশেষ গুণের কথাই উল্লেখ করছি---

যে গুণটি একটি কাগজের সম্পাদকের অবশ্যই থাকা উচিত, কিন্তু আজকের দিনের সম্পাদকদের মধ্যে একান্তই দুর্লভ।

নতুন লেখকদের সম্পর্কে আজকের দিনের পত্রিকা সম্পাদকদের মনোভাব অনেক সময়ই খুব সহানুভূতিপূর্ণ বলে মনে হয় না। তাঁরা বেশীরভাগই একটি পলায়নী মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত। যাঁদের লেখা না পড়েই প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, লেখার ভালোমন্দের দায় লেখকের নামের সেই লেখকের লেখাই তাঁরা নেবেন, এইটাই ইচ্ছে।

লেখক গড়ে তোলা, নতুন লেখক-লেখিকাকে সুযোগ দেওয়া, অখ্যাতকে

সাহিত্য জগতের তিন লোকান্তরিত মহারথী—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক ও দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

খ্যাত করতে সাহায্য করা, এগুলি যে সম্পাদকের একটি বিশেষ দায়িত্ব, সেটা তেমন ভাবা হয় না। শ্রীঘটক একটি পত্রিকা সম্পাদকের সেই দায়িত্ব বহন করেছেন। অনেক নতুন লেখক-লেখিকাকে তিনি 'মাসিক বসুমতী'র পাতায় স্থান দিয়ে তাঁদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন।

সে হিসেবে আজকের দিনের বেশ কিছু লেখক-লেখিকার মাসিক বসুমতী সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের কাছে ঋণ স্বীকারের প্রয়োজন আছে।

'মাসিক বসুমতী'র প্রাণতোষ স্মরণ সংখ্যায় অনেকের সঙ্গে আমার অন্তরের বেদনাটি প্রকাশ করলাম, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে সভা-সমিতিতে, রবিবারের আসরে, সাহিত্যিক সম্মেলনে, সেই সকলের পিছনে বসে থাকা মৃদু লাজুক মানুষটিকে আর কোনোদিন দেখতে পাওয়া যাবে না। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে।

—আশাপূর্ণা দেবী

প্রাণতোষদা

১৯৫৪ সালের কথা।

'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে'র দোতলায় উঠে বড় হল্ ঘরে ঢুকতেই বাঁ দিকের কাটা সুইং ডোরটার মাথায় নজর পড়ল। সেখানে লেখা আছে 'মাসিক বসুমতী'। আমার বাঁ পকেটে একটা ছোট গল্পের পাণ্ডুলিপি; ডান পকেটে একজন প্রখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিকের সুপারিশ-পত্র। সুপারিশের জোরে গল্পটার গতি করা আমার উদ্দেশ্য।

এক মুহূর্ত থমকে রইলাম। তারপর পায়ে পায়ে সুইং ডোরটার কাছে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল; ভেতরে ঢুকবার মতন সাহসটুকু কিছুতেই সঞ্চয় করে উঠতে পারছিলাম না। বাইরে থেকে কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত চোখ-কান বুজে অথৈ জলে ঝাঁপ দেবার মতন ঢুকেই পড়লাম।

বিশাল অফিস ঘরটার মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবল্। তার ওধারে একটা চেয়ারে বসে একজন সুদর্শন যুবক মাথা নীচু করে কী লিখছিলেন। তিনি ছাড়া এ ঘরে আর কেউ নেই।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে ভদ্রলোক তাকালেন। তীক্ষ্ণ চোখে এক পলক আমাকে দেখলেন। মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমি কী করতে পারি?'

শিথিল কাঁপা গলায় কোনরকমে বলতে পারলাম, 'সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমিই সম্পাদক।'

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। কেন না, মাসিক বসুমতীর খ্যাতকীর্তি সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের নাম অনেক আগে থেকেই জানি। তাঁর ছোট গল্পের সংকলন 'পঙ্কপাল' কবেই পড়ে ফেলেছি। 'আকাশ পাতাল' তখন গ্রন্থাকারে বেরিয়ে গেছে কি না মনে পড়ছে না; খুব সম্ভব 'বসুমতী'তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাণতোষ ঘটকের সুনাম এবং প্রতিষ্ঠা এমন বিপুল যে, তার সঙ্গে তাঁর চেহারা বা বয়েস মেলে না। লেখা পড়ে এবং সম্পাদক হিসেবে নাম শুনে প্রাণতোষ ঘটকের কল্পিত ভারিক্কী একটি মূর্তি মনে মনে তৈরি করে নিয়েছিলাম। টেবলের ওধারের যুবকটি আমার সেই কল্পনার প্রতিবাদ যেন।

বিস্ময় থিতিয়ে এলে বললাম, 'বসুমতীর জন্য একটা গল্প এনেছি।'

সম্পাদক হাত বাড়ালেন। গল্পটা তাঁকে দিয়ে প্রবীণ সাহিত্যিকের নাম করে বললাম, 'উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।'

'চিঠিতে কী আছে?'

'এই আমার সম্বন্ধে—'

'কী? সার্টিফিকেট?'

কথাটা তাই, হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'মানে গল্পটার ব্যাপারে উনি কিছু লিখে দিয়েছেন।'

রূঢ়ভাবে সম্পাদক বললেন, 'সুপারিশের দরকার নেই। গল্প যদি ভাল হয় নিজের জোরেই ছাপা হবে।'

মনে মনে আহত হলাম; গল্পটার ভবিষ্যৎ ভেবে দমেও গেলাম খুব। পরে ভেবে দেখেছি, সম্পাদক হিসেবে প্রাণতোষ ঘটক ঠিক কাজই করেছেন। সুপারিশে লেখা ছাপতে হলে রাজ্যের জঞ্জালে কাগজ বোঝাই করে ফেলতে হয়।

যাই হোক, পরের মাসেই গল্পটা বেরিয়ে গেল। পত্রিকার একখানা 'কপি' আনতে 'মাসিক বসুমতী'র অফিসে গেলাম। সেদিন প্রাণতোষ ঘটকের আরেকটা চেহারা দেখলাম। আমাকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে সহৃদয় সুরে অনেক কথা বললেন। কোথায় দেশ, কী করি, কী লিখছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথায় কথায় কখন যে প্রাণতোষ ঘটক প্রাণতোষদা হয়ে গেছেন, মনে নেই। দু'ঘণ্টা পর বসুমতীর কপি আর লেখার দক্ষিণা নিয়ে যখন উঠলাম, প্রাণতোষদা বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি পার আরেকটা গল্প দিয়ে যেও। মাঝে মাঝে এসো—'

প্রথম দিন প্রাণতোষ ঘটককে মনে হয়েছে রূঢ়, গম্ভীর, কিছুটা বা দাম্ভিক। দ্বিতীয় দিন মনে হয়েছে গাম্ভীর্য বা রূঢ়তা তাঁর বাইরের আবরণ মাত্র; তার ঠিক তলাতেই রয়েছে স্নিগ্ধ মানসসরোবর।

সেই শুরু। তারপর কতবার যে মাসিক বসুমতীর অফিসে গেছি! দু-চার বছর পর পর ঘরটার কত পরিবর্তন দেখলাম। পুরনো চেয়ার-টেবলের বদলে নতুন চেয়ার-টেবল্ এল। সেগুলো ঘরের মাঝখানে থেকে একবার গেল বাঁ দিকের দেয়ালের কাছে, একবার গেল পেছনে। ঘরের মাঝখানে পার্টিশান ওয়াল তুলে এ্যাসিস্টাণ্ট এডিটর কল্যাণ আর শান্তির বসবার ব্যবস্থা হল। এত কিছু হল, কিন্তু দুপুর বারোটা থেকে পাঁচটার ভেতর মাসিক

বসুমতী অফিসে গেলে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবলের ওপাশে উজ্জ্বল অভিজাত প্রশান্ত একটি মানুষকে দেখা যাবেই। এ যেন অভ্রান্ত নিয়মের মতন। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুল কিছু পাতলা হয়ে এলেও প্রথম দিনের মতন চিরদিন প্রাণতোষদাকে তরুণ এবং সুকান্ত দেখেছি।

যখনই গেছি, দেখেছি, কথা বলতে বলতে প্রাণতোষদার হাতের কলমও চলছে। দেখতে দেখতে কাগজের ওপর একটা ময়ূর বা পায়রা কিংবা মানুষের মুখ ফুটে উঠেছে। কথা বলেন তিনি ধীর মৃদু স্বরে, কিন্তু তার সঙ্গে কৌতুকের আভা যেন মাখানো।

কাছাকাছি আসতে প্রাণতোষদাকে ভাল করে জানবার সুযোগ হয়েছে। হঠাৎ তাঁর একেক দিকের দরজা আমার সামনে খুলে গেছে। তিনি মার্জিত, সুশিক্ষিত, বড় বংশের ছেলে, বিয়েও করেছেন বড় বংশে। সম্পাদক হিসেবে তিনি কীর্তিমান; জীবনশিল্পী কথাকার হিসেবে তিনি প্রদীপ্ত, কিন্তু মানুষ হিসেবে প্রাণতোষদা তুলনা-রহিত। তাঁর উদারতা, তাঁর মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। লেখা ছেপে এবং ব্যক্তিগতভাবে কত লেখককে যে তিনি সাহায্য করেছেন! নানা কারণে সাহিত্যিকদের পরস্পরের কাছ থেকে দ্বীপের মতন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখেছি বিভিন্ন শিবিরে জমায়েত হতে দেখেছি। প্রাণতোষ ঘটক কখনও কারো কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন নি। দলমতনির্বিশেষে সবাইকে নিজের কাগজে ডেকে এনেছেন। তিনি কোন দলের নন, আবার সর্বদলের।

মাস দুই আগে একদিন বসুমতী অফিসে গিয়ে শুনলাম, প্রাণতোষদা খুব অসুস্থ। তারপর মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর খবর নিয়েছি।

প্রাণতোষদার অসুস্থতার মধ্যে পারিবারিক একটা দরকারে আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হল। সেখানে থাকতেই হঠাৎ একদিন সকালবেলা খবরের কাগজে দেখলাম, প্রাণতোষদা নেই। কে জানত, এত তাড়াতাড়ি একটি উদার মহৎ জীবনের ওপর যবনিকা নেমে আসবে।

কলকাতায় ফিরেও অনেকদিন বসুমতী অফিসে যেতে পারি নি। প্রিয়জন হারানোর বেদনা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত আগস্টের শেষের দিকে 'বসুমতী'তে গেলাম। শুনলাম, প্রাণতোষদার জায়গায় নতুন সম্পাদক হয়েছেন বিজনকুমার সেন। বিজনবাবু তখন ছিলেন না। প্রাণতোষদা যে চেয়ারটায় বসতেন সেটা শূন্য। চেয়ারটার বাঁদিকের দেয়ালে তাঁর নতুন ঝকঝকে একটা ফটো ঝুলছে।

হায়! মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়েসে প্রাণতোষদা দেয়ালের ছবি হয়ে গেলেন!

মৃত্যু মাত্রেই অপূরণীয় ক্ষতি। একজনের মৃত্যুতে কেউ হয়তো স্বামী হারান, কেউ সন্তান, কেউ ভাই। কিন্তু সেটা পারিবারিক বিপর্যয়। কিন্তু এমন অনেক মৃত্যু আছে যা পরিবারের বাইরেও অনেকখানি জায়গা শূন্য করে যায়। প্রাণতোষদার মৃত্যু সেই জাতের।

কুড়িখানা সুলিখিত গ্রন্থ এবং সম্পাদক হিসেবে বিপুল খ্যাতি —এগুলো তো আছেই। অসংখ্য মানুষের প্রীতি, শ্রদ্ধা, স্নেহ এবং অসীম কৃতজ্ঞতার মধ্যেও মৃত্যুর পর প্রাণতোষদা বহুকাল দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবেন।

—প্রফুল্ল রায়

ট্র্যাজেডী দ্বীপ

টোরেস্ প্রণালীতে রয়েছে 'ডেলিভারেন্স' দ্বীপ। এর প্রায় একশ' মাইল পূর্ব-উত্তরে 'ট্র্যাজেডী দ্বীপ' অ্যরিয়াড্। আগাগোড়া প্রবালে তৈরী, মাইলখানেক লম্বা এবং ডিম্বাকৃতি। অধুনা জন-মানবহীন অ্যরিয়াড্-এ একদা শ্বেত-বসতি ছিল। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। বিশের দশকে ফ্র্যাংকইস্ গারসিয়া নামক জনৈক ফরাসী স্ত্রী-পরিবার সহ টোরেস্ প্রণালীতে পৌঁছোন ষ্টীমার-এ চড়ে। কেউ জানে না ঠিক কখন এবং কী উদ্দেশ্যে তাঁরা এসে-ছিলেন, কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত অ্যরিয়াড্-এ থেকে যান। একটা বসতবাড়ি তৈরি ক'রে গারসিয়া নারকেলের চাষ সুরু করলেন; কিন্তু পাঁচ বছর পরে ঘটে গেল এক রহস্যময় ট্র্যাজেডী।

থারসডে দ্বীপ থেকে আনীত টুকিটাকি জিনিসপত্র গারসিয়া চান কিনা জানার জন্য জনৈক মুক্তা-উত্তোলক ওখানে গেল। সে দেখল গারসিয়া সমুদ্রতীরের কাছেই মৃত অবস্থায় শায়িত এবং বাড়ির সামনে সম্প্রতি নির্মিত কয়েকটি কবর---স্পষ্টতই ফরাসী ভদ্র-লোকের স্ত্রী এবং সন্তানদের কবর। ভদ্রলোক কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছিলেন; তিনি এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্রাদি ঠিক কীভাবে মারা যান তা আজও রহস্যাবৃত। অন্যান্যদের পাশে গারসিয়াকে সমাহিত করা হল। তাঁর কবরটিই কেবল চিহ্নিত।

তাঁর বাড়ির ভগ্নাবশেষ আজও রয়েছে, পেছনে তাঁর পরিচর্যা-পুষ্ট নারকেল গাছের সুবিন্যস্ত সারি। গাছগুলো রীতিমত বাড়ন্ত, কিন্তু কোনও আদি অধিবাসীই ওখানে যায় না; অনেক অশরীরী যে ওখানে!

অবরুদ্ধ

দণ্ডপাণি

অবরুদ্ধ বা বন্দিজীবন বিপ্রকারের। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ও কালাপানির নির্বাসনে। কোন একটা ক্রাইম্ বা অপরাধ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে আদালতে উপস্থাপিত হইলে ন্যায় বিচারের জন্য অভিযোগের প্রসঙ্গকে ঘটনার পরিবেশে সত্য ও মিথ্যার অনুপ্রবেশ দ্বারা ভাষার সাহচর্যে অলঙ্কৃত করা হইয়া থাকে। সেইজন্যই 'ইণ্টার-প্রিটেশন অব ল' বা আইনের ব্যাখ্যা সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত। যেন 'হকি' খেলার রক্ষণসীমানায় 'ইনফ্রিঞ্জমেণ্ট' বা নিয়ম লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের মধ্যে বলটিকে স্থির রাখিয়া হুকট্ স্টিক বা বক্র যষ্টি দ্বারা 'বুলির' ন্যায়। পূর্ণ ঘটনাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য উপস্থিত ঘটনার ছেদ টানিতে, অভিযোগের মাধ্যমে অপরাধের বিন্যাস ও বাদ-বিসংবাদজনিত বিশ্লেষণের সাহায্যে বিচারে অপরাধ নির্ণয় ও শাস্তিবিধান দ্বারা সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠার মনোভাব ও আতঙ্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা বা প্রয়াস। বর্তমান সামাজিক কাঠামোর এই প্রচেষ্টায় গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যদিও তাহাতে অপরাধী ব্যক্তির নিরপরাধ ও নিরপরাধ ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব নয়। তা জুরীর বিচারেই হোক বা নিরঙ্কুশ বিচারকের সিদ্ধান্তেই ঘটুক।

আমি আসামী। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। আদালতের সম্মুখে 'দোষী' কি 'নির্দোষ' আমাকে বলিতেই হইবে। আমার মনে প্রশ্ন জাগিল, আমি কি বলিব। আমাকে শেখানো হইল 'নির্দোষ' বলিতে। অথচ যে ঘটনায় আমি অভিযুক্ত, তাহা সত্য। আমার বিরুদ্ধে যে অপরাধ তাহাও মিথ্যা নয়। ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নাই। আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করারই চেষ্টা চলিবে। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণগুলিকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে মিথ্যা প্রমাণিত করা হইবে। আমার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত ষড়যন্ত্র, অস্ত্র আইন, লুণ্ঠন ও হত্যা বা হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি ইণ্ডিয়ান পীনাল্ কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারাগুলির প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গত নয় বলিয়া খণ্ডন করা বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে পুলিশের প্রস্তাবনা ও আইন ব্যবসায়ীদের আচরণ যাহাই হউক না কেন, আমার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির উপরই সমস্ত বিচার প্রহসন নির্ভর করিতেছে। অথচ আমি 'সত্য বই মিথ্যা কহিব না' হলফ করিয়া নিজেকে নির্দোষ বলিব। আমার মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। বৈপ্লবিক দর্শনের ভিত্তি ও আমার শিক্ষার নির্দেশ হইতেছে 'সত্যকে প্রশ্রয় দেওয়ার নিমিত্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত'। পুঁথিগত ও প্রযুক্তিবিদ্যার আমি সম্মুখীন হইলাম। একবার ভাবিলাম, নিরুত্তর থাকিলে কেমন হয়। আমার মৌনতা কোন্ সম্মতির লক্ষণ হইবে। দোষ স্বীকার করার, না নির্দোষ বলার। অথবা দোষ-নির্দোষ উভয়ের। এই মনোভাবের উপর আমার চিন্তা অধিক দূর প্রসারিত হইল। আমাকে মস্তিষ্ক বিকৃত বলিয়া ধরা হইবে না তো! স্বীকার বা অস্বীকারে আমার কি হইতে পারে! বিচারে আমার ফাঁসি হইলে আমি শহিদ হইব। আজীবন কারাবাস হইলে আমি নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী বলিয়া পরিচয় লাভ করিব। নির্দোষ প্রমাণিত হইলে মুক্তি পাইব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে 'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট এক্ট'-এ গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে অবরুদ্ধ করা হইবে। আমি রাজবন্দি হইব। নিজের মনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিতে লাগিলাম। মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। মরিলে শহিদ, আর বাঁচিলে কাজ করিবার সুযোগ। এর চেয়ে বিপ্লবী জীবনে আর বেশী কি বাহাদুরি থাকিতে পারে। আমি নিজেকে নির্দোষ বলিব।

আমার বিরুদ্ধে ঘটনার অংশ গ্রহণ করা প্রমাণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অন্যান্য ধারাগুলি আপেক্ষিক হইয়া দাঁড়ায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুইজন আমাকে চেনে বলিয়াছে। এই উপলক্ষে জেলের অভ্যন্তরে 'আইডেণ্টিফিকেশন্ প্যারেড্' বা সনাক্তকরণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্রের সঙ্গে আমাদের মিশাইয়া দেওয়া হয়। সনাক্তকারী ব্যক্তিরা বোরকা পরিহিত অবস্থায় আমাদের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। ভুলক্রমে একাধিক ব্যক্তিকে তাহারা সনাক্ত করে। আমার সম্বন্ধীয় দুই ব্যক্তিই আমাকে সনাক্ত করিতে ভুল করে নাই। আমার তৃতীয় সনাক্তকার আমাদেরই ট্যাক্সিচালক। ড্রাইভারকে ক্লোরফর্ম বা অজ্ঞান করিয়া নামাইয়া রাখার পর সেই গাড়ী চালাইয়া থাকে। সে আমাদেরই দলের লোক। দলভুক্তির প্রাথমিক স্তরের। তবে নিজের গাড়ী থাকায় চালনা আয়ত্তাধীন ছিল বলিয়া তাহাকে আংশিকভাবে ঐ কার্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। দলীয় পরিচিতি তাহার খুবই সীমিত ছিল। আমার নামের সঙ্গে চেহারার পরিচয় তাহার নিকট ছিল আপেক্ষিক। কেন না জেলাগত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমি নামী খেলোয়াড় ছিলাম। আমাকে চেনা অনুরাগীদের পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু ট্রেণের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড যাহাকে গুলী করা হইয়াছিল, সে আমাকে সনাক্ত করে নাই। ইহাই ছিল একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আমার বিরুদ্ধে প্রথম এবং প্রধান সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া বর্ণিত একজন সিপাই। যে থানার অধীনে ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে থানায়ই সে কর্মরত ছিল। ছয়দিনের ছুটিতে সে দেশে গিয়াছিল। আমাদের দেশের বাড়ীর সন্নিকটস্থ কোন এক গ্রামে

তাহার গৃহে। সে আমাদের পরিবারের অনেককেই চিনে। বৃহস্পতিবার দিন তাহার ছুটি শেষ হইয়াছিল। ঘটনা ঘটে শুক্রবার। তার আগের দিনই তাহার কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়ার কথা। কিন্তু সে থানার দারোগা-সাহেবকে পোস্ট কার্ডের চিঠিতে একদিন ছুটি বাড়াইবার অনুরোধ জানাইয়াছিল। সেই জন্যেই তাহার শুক্রবারে আসার দিন। আর তাহার দেশ ত্রিপুরা জেলায় বলিয়া ঐ একটি মাত্র ট্রেণ ব্যতিরেকে ঢাকায় আসার অন্য কোন সুবিধা সেইদিনে ছিল না। কাজে কাজেই সেই ট্রেণে তাহার আগমন, আমার ডাকাতি ও গুলী করা এবং ট্যাক্সিসহযোগে বহির্গমন, সবই সে পাশের কামরা হইতে দেখিতে পাইয়াছে। ইহা যেন তাহার পক্ষে একটা ত্র্যহস্পর্শ যোগ। খোদা মেহের-বানের ইচ্ছায় পদোন্নতির মহা সুযোগ। কিন্তু হইলে কি হইবে, বিধি যে বামে ছিল। নতুবা আলি হোসেনের ভবিষ্যৎ উন্নতি এমনভাবে ভেস্তে যাইবে কেন!

দ্বিতীয় সাক্ষী বছর চোদ্দ বয়সের একটি ছেলে। সেও ঐ ট্রেণেই আসিতেছিল এবং আমাকে ট্রেণ হইতে নামিয়া টাকার থলে লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। আমাদের একটি রেল স্টেশনে ওর বাবার এক চায়ের স্টল। ঢাকাতে আমাদের পল্লীতেই ওদের বাসস্থান। যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার জড়িত থাকার দরুণ আমি অনেকেরই স্নেহধন্য ও প্রিয়ভাজন ছিলাম। সুতরাং আমার পরিচিতি ছিল অসামান্য। তা ছাড়া আমি বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলাম, একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যেজন্য ঐ বয়েসী অনেক তরুণদের আমি নামে ও মুখে চেনা। সে মাস-খানেক গৃহে থাকার পর আসামে তাহার বাপজানের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। ভয়ে অথবা কৃতজ্ঞতায় তাহার ঢাকায় অবস্থানকালে আমার বিষয় লইয়া তাহার আপনারজনেরা কোন কার্যকর ব্যবস্থায় অগ্রণী হয় নাই। কিন্তু কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর সব কথা শুনিয়া তাহার বাপজান উহাদেরই এক আত্মীয় জেলা সদরের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের খানসামাকে তাহা জানায় এবং সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বলে। সাহেব শুনামাত্র ঢাকা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সেই ছেলেটিকে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে সহায়তা করে।

তৃতীয় সাক্ষী ট্রেণের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড। সে বলে, 'অ্যালারম্ চেন্' টানার ফলে গুম্‌টি ঘরের সংলগ্ন ক্রসিং বা পার হইবার স্থানে গাড়ী থামিলে, সাংকেতিক কামরার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে একটি 'হ্যাণ্ডস্ আপ্' বা হাত উঠাইবার অর্ডার বা আদেশ হয়।

"A hand thrust with revolver came towards me from inside the compartment with an order 'hands up.' I raised my hands. *After a while* I was shot at and felt down and could not say what happened."

লোকটির আকৃতি সম্বন্ধে বলে:

A black complexioned short man with short hair wearing half-shirt and a coloured-glass. সব ঠিক।

চতুর্থ সাক্ষী—বহনকারী ট্যাক্সীর আমাদের স্বরভুক্ত চালক। সে জবান-বন্দী দেয় যে, বীরেন দে গাড়ীতে উঠিয়া বলে—অনিলদা, শেষ পর্যন্ত গার্ডকে গুলী না করে পারলাম না। এই বক্তব্যও সত্য।

এখন কথা হইল, গার্ডকে যদি কামরার ভিতর হইতে গুলী করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম সাক্ষী আলি হোসেনের পার্শ্ববর্তী কামরা হইতে আততায়ীকে কি করিয়া দেখা সম্ভব। আর যদি কামরা হইতে অবতরণপূর্বক গুলী করা হইয়া থাকে, যাহা আলি হোসেনের পক্ষে দেখা সম্ভব, তাহা হইলে আহত গার্ডের বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সেজনাই কৌঁসিলী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আলি হোসেনকে সরাসরি প্রশ্ন করেন যে, সে কি বীরেনকে প্রত্যক্ষ গুলী করিতে দেখিয়াছে, না তাহার হস্তস্থিত রিভলভার হইতে গুলী ছুড়িতে দেখিয়াছে। সে ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই। সঠিকভাবে অপরাধ সাজাইতে গিয়া পুলিশ যে গোঁজামিলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতেই যত বিপত্তি হইল। গার্ডের বক্তব্যের অর্থাৎ কামরা হইতে হস্ত উত্তোলন করিবার আদেশের কিছুক্ষণ পর (after a while) সে গুলীবিদ্ধ হয়। কিন্তু গুলী কি কামরার ভিতর হইতে ছোড়া হইয়াছিল, অথবা অবতরণের পর করা হইয়াছিল, জবানবন্দীতে একথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত হয় নাই। ঘটনার ক্ষিপ্রতা, যাত্রীদের আতঙ্ক, আক্রান্ত ব্যক্তির বিহ্বলতা, অদূরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের বিস্ময়, সব মিলাইয়া যেন একটা অভিভূত পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে তাহাই। মাথা গুলিয় যায়।

তারপর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঘটনার বিক্ষিপ্ত অংশগুলির সামঞ্জস্য বিধান এক দুরূহ ব্যাপার। কেন না, মনের স্বাভাবিক চলনশীল অবস্থায় আকস্মিক ছেদে, সাময়িক শিথিলতায়, স্মৃতি শক্তির অর্থাৎ পূর্বানুভূত বিষয়ের [illegible] নিশ্চয়তার অভাব ঘটিয়া থাকে। পরবর্তী সময়ে বিক্ষিপ্ত অংশগুলির সামঞ্জস্য বিধানে যাঁহারা প্রয়াসী হন, তাঁহাদের অসম্বন্ধীয় তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেন না ইহা এক প্রকারের সাহিত্য সৃষ্টির কাজ; একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

পরিণামে বিচার্য বিষয়ের পর্যালোচনায় সত্য ও মিথ্যা এবং মিথ্যা ও সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকারের রূপায়ণ বা অরূপের রূপধারণ। ইংরাজীতে যাহাকে transfiguration বলা হয়। এইরূপ বিচার ব্যবস্থায় আজকের দিনে মানুষের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও প্রমাণাভাবে মুক্তি যেমন একটা কারসাজি, ঘটনায় সংশ্লিষ্ট না থাকিয়াও প্রমাণপূর্বক শাস্তি একটা ভোজবাজি। এই ভোজবাজির একটি অবিস্মরণীয় কাহিনী এখানে তুলিয়া ধরিতেছি।

১৯৩০ সালের অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়নের জবাবে বিপ্লবীদের পিস্তল গর্জিয়া উঠিতে লাগিল। ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় আইন অমান্যকারীদের উপর নানা প্রকারের নির্যাতন চলিতে থাকে। মহকুমা শাসক কামাখ্যা সেনের উপর জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লবীদের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড স্থির হয়। বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহাকে কয়েকবার সাবধানও করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার দমননীতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঢাকা শহরে গভীর নিশীথে তাঁহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়। ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে সেসময় কামাখ্যা নামক একটি বালকের 'অপারেশন' হইয়াছিল। অস্ত্রোপচার কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রেরক কালীপদ নামে বালকটির আপনজনের কাছে একটি টেলিগ্রাম বা তার প্রেরণ করা হয়। ইহার ভিত্তিতে ঐ গ্রামের কালীপদ মুখার্জীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া তাহার দেহের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। পুলিশের কাছে সে কামাখ্যা সেনকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া স্বীকৃতি দেয়। পরে হাকিমের নিকট জবানবন্দীতে সে তাহা অস্বীকার করে। স্পেশাল আদালতের বিচারে তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ঢাকা জেলেই তাঁহার ফাঁসি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই হত্যার ষড়যন্ত্রে কালীপদর জ্ঞাত থাকিলেও তাঁহার হাতেই কামাখ্যা সেন হত হয় নাই। আসল হত্যাকারীদের বাঁচাইবার জন্য সে সমস্ত অপরাধই নিজের স্কন্ধে লইয়াছিল। সে বিপ্লবীদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে অমর শহীদরূপে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের মামলা আরম্ভ হইবার কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার মামলার পরিসমাপ্তি ঘটে। বিচারাধীনকালে ঢাকা জেলে আমরা পাশাপাশি সেল্ বা কক্ষে আবদ্ধ ছিলাম। দিনরাত নানা বিষয়ে আলাপ ও গল্প-গুজব করিয়া আমরা সময় কাটাইয়াছি। দুইজনেই আমরা ফাঁসির আসামী। আমরা উভয়েই উভয়ের কর্মকাণ্ড বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ লইয়া আলোচনা করিয়াছি। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, আমরা মুক্তিলাভ করিব। সে বিবাহিত এবং তাঁহার এক পুত্র সন্তান বর্তমান। ইণ্টারভিউ বা সাক্ষাতের সময় ঠিকুজি-কোষ্ঠীর বিচারের বিষয় পিতা-মাতা আমাদের নিকট আবেগ ও উৎকণ্ঠাজনিত চোখের জলে জ্ঞাপন করিতেন। রুদ্ধ কক্ষে রাত্রির অন্ধকারে লণ্ঠনের মৃদু আলোতে আমরা পিতা-মাতার বর্ণিত বিষয়ে উল্লসিত হইলেও অন্তরের গভীরে একটা অজানা আশঙ্কায় আমাদের মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত। এমনিভাবে আমাদের অনেকগুলি দিন অতিবাহিত হইবার পর কালীপদর 'রায়ের' দিন উপস্থিত হইল। আদালতে যাইবার সময় উপস্থিত হইলে আমার গণ্ডে একটি চুম্বন দিয়া সে বিদায় লইল। গেটের বাহিরে যাইবার সময় আমাকে শেষবারের মত বলিল, "আমার ফাঁসির হুকুম হইলে তোরও হয়ত তাহাই হইবে।" সারাদিন সেল্ ও গেটে বার বার আনাগোনা করিয়া কোন খবর পাইলাম না। সন্ধ্যায় একজন ওয়ার্ডার তাঁহার সামান্য জিনিষপত্র লইতে আসিলে তাঁহার ফাঁসির আদেশের কথা শুনিয়া মর্মাহত হইয়া নিজেকে বড়ই অসুস্থ বোধ করিলাম। আমার সেইদিনের মনোভাব ভাষায় বর্ণনাতীত। সংসারে আমি তখন নিঃসঙ্গ একাকী। তবু একবার আপিলের কথা ভাবিয়া মনে হইতেছিল---sorrowful evening may follw a joyful day অর্থাৎ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। ধন্য আশা কুহকিনী মায়ার সংসার।

আলি হোসেনের একদিনের ছুটি বৃদ্ধির ডায়েরি বা রোজনামচা থানায় ছিল না। সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে একদিন পর তাহার আগমন বলিয়া গণ্য হয় নাই। দুই ন[illegible] সাক্ষীর জবানবন্দী সাজানো বলিয়া অনুমিত হইল। তিন নম্বর সাক্ষীর বয়ান সত্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও পরস্পরবিরোধী। কেবলমাত্র কনফেসর বা দোষ স্বীকারকারীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। সুতরাং প্রমাণাভাবে আমি মুক্তি পাইলাম এ[illegible] আমার অনুমান, যাহা পূর্বেই উ[illegible] হইয়াছে, আমি 'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল অ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট' অনুসারে বি[illegible] কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আদালত প্রাঙ্গণেই পুনরায় গ্রেপ্তার হইলাম। সতীর্থ জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তে[illegible] দশ বছরের সাজা হইল। চোখের জলে উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গন্তব্যস্থলে গমন করিলাম। আমার জীবনের ইহাও আর একটি দিন। সাহিত্যের 'দাড়ি', 'কমায়' তা লিপিবদ্ধ করা যায় না।

[ক্রমশ।

প্রচ্ছদপরিচিতি

এই সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্রটি শ্রীদেবব্রত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

খেলাধুলা

হায় ক্রিকেট !

ক্রিকেটের নন্দন কাননে ভারতের স্থান আজ কোথায়। এ প্রশ্ন আজ সকলের মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। শেষ করে, ভারতের হাজার হাজার ক্রিকেটানুরাগী দর্শক। ফুটবলে বিদেশে আমাদের স্থান নেই। হকিতে সুনামের যে সুউচ্চ চূড়ার উপর আরোহণ করেছিলাম, সেখান থেকেও আমাদের নামতে হয়েছে। যে ক্রিকেট নিয়েও আমাদের কিছুটা গর্ব ছিল, তাও আজ খর্ব হতে চলেছে। অন্ততঃপক্ষে ভারত গত কয়েক বছর আরও যে খেলা দেখিয়েছে, তাই থেকেই আমাদের এ ধারণা। খেলা যদি শুধু খেলাই হয়, তা হলে আমাদের বলার কিছু থাকত না। কিন্তু তা নয় বলেই এর আকর্ষণ খেলার মাঠ ছাড়িয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এর আগ্রহ শুধু কয়েকজন খেলোয়াড়কেই টানে নি, যারা খেলা দেখেন এবং যাঁদের খেলা দেখার সুযোগও হয় না, তাঁরাও এর প্রতি সমান আগ্রহ অনুভব করেন। দেশের উন্নততর ক্রীড়াধারার জন্য তাঁরাও তাঁদের কষ্টার্জিত রোজগারের কিছু অংশ দিয়ে থাকেন সরকারকে। স্পোর্ট সভ্যতার একটা মাপকাঠি। খেলোয়াড়ী মনোভাব যে জাতের নেই, সভ্য জগতে সে জাত অস্পৃশ্য। এই মনোভাব খেলার মাঠে জন্ম নেয়, পরে তা সমাজের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। খেলায় জয়-পরাজয় অবশ্য সব সময় বড় কথা নয়, কিন্তু স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান বলতে কিছু-না-কিছু থাকে। আমাদের তাও আজ নেই।

ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। তার মধ্যে বাঙলা দেশে খেলার প্রতি অনুরাগ বেশী। এখানকার যুবকেরা কবিতা, গান যেমন ভালবাসে, খেলাকেও তেমনি ভালবাসে। আর ভালবাসে বলেই 'হিম' মাথায় করে

বিদেশী ক্রিকেট খেলোয়াড়দল

দাঁড়িয়ে থেকে ক্রিকেটের টিকিট কেনে। আমাদের ক্রীড়ানুরাগীরা বিস্মৃত-প্রবণ নন্। তাঁরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছেন মানকড়, নাইডু, হাজারের কথা। পড়েছেন রণজিৎ সিংজী, দলীপ সিংজীর গৌরবোজ্জ্বল জীবন কাহিনী। কোলকাতার ময়দান, ইডেনের উদ্যান—সারা ভারতের খেলার জগতে তীর্থভূমির মত। বাঙ্গালা দেশের মানুষ খেলার কদর দিতে জানে, আদর দিতে জানে, দাম দিতেও জানে। এ তারুণ্য ও প্রাণ-প্রাচুর্য আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা—এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তির হাতে খেলার জগৎ আজ এমনই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, উপর উপর মৃত্যুর দিকে সে এগিয়ে চলেছে। নৈরাশ্য এসে ছেয়ে ফেলেছে। দলের আজ আর কোন শৃংখলা-সংহতি নেই। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদ নামে সরকার একটা উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করেছেন। কিন্তু জাতীয় ক্রীড়ায় সংস্থাগুলো বোর্ডের উপদেশাবলীকে প্রায়ই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে থাকেন। কর্মকর্তারা নিজেরা খেয়ালখুশী জোর করে সংস্থাগুলোর উপর চাপিয়ে দেন। বিদেশ সফরকালে জাতীয় ক্রীড়াদলকে সরকার যেমন অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন, তেমনি বিদেশী দলের ভারত সফরের অনুকূলে সরকার নিয়মিত অর্থসাহায্যও দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই অর্থ গিয়ে কার পকেটে পড়ল, সরকার কি সেদিকে লক্ষ্য করে থাকেন?

পূর্বেই বলেছি, ভারতীয় দলে শৃঙ্খলা-সংহতি আজ আর অটুট নেই। সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে খেলার সময় রাত দুপুরে তাঁরা হোটেলে ফেরেন। মাঠেও নামেন কেউ কেউ অনেক সময় মত্ত অবস্থায়। এ সবের সঙ্গে যে একাগ্র সাধনা, মনঃসংযোগ বা আত্মসংযমের কোন সম্পর্ক নেই, সে কথা সকলেই জানেন। নামী ও দামী খেলোয়াড়রাই সাধারণত এ ধরনের জঘন্যতম কাজ করে থাকেন। কিন্তু সরকার এ সব দিকে কোন লক্ষ্যই দেন না। শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে দোষী কোন ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা নেই। খেলাধূলার উন্নয়নের চিন্তায় দেশে এর আগেও সরকারী উদ্যোগে অনেক আলোচনা-সভা বসেছে। লোভনীয় অনেক প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে। ইডেনের অতীত অনেক কেলেঙ্কারীর তদন্ত করার জন্য কমিশনও বসেছে বহুবার, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সাত মণ তেলই পুড়েছে, রাধার নাচ আর হয়নি। সরকারের সঙ্গে আবার তাল রেখে চলেছেন বিভিন্ন সংস্থার ক্রীড়া-কর্তারা। তাঁরা অত্যন্ত চতুর। ছলে, কৌশলে, চক্রান্তে ক্রীড়া প্রশাসনকে তাঁরা নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছেন। ক্ষমতা, অর্থ, লোভ ও মোহের টানে তাঁরা খেলাধূলাকে জলাঞ্জলি দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তাই আজ দেশে খেলোয়াড় থেকেও খেলা নেই। দর্শক থেকেও তারিফ করার কেউ নেই। খেলার জগতে এটা যে কত বড় আত্মহত্যার সামিল, এ কথা আজ কাউকে আশা করি বুঝিয়ে বলতে হবে না। একদা সি কে নাইডুর নেতৃত্বে বা বিজয় হাজারের অধিনায়কত্বে ভারতীয় টিম বিদেশ থেকে প্রচুর সম্মান নিয়ে এসেছেন। আকাশ-বাতাস তখন তাঁদের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে। উভয়পক্ষের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দর্শক-আসন জুড়ে বসে থাকতে হয়েছে। নির্ভেজাল খেলায় দর্শকদের মন ভরে উঠেছে। কিন্তু আজ সি কে নাইডু, মুস্তাক, হাজারে, অমরনাথের যুগ নেই। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে একপেশে গতিবিধির টানে ফাইন্যাল খেলারও ফয়সালা হয়ে যাচ্ছে। নির্ধারিত সময়েরও অনেক আগে। ক্রিকেট আসর আজ নিরুত্তাপ প্রতিদ্বন্দ্বিতাবর্জিত, কাজেই প্রাণহীন। এ অবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন। সমস্ত দেশের স্বার্থেই এ কথা আজ বলতে হচ্ছে। তা হলে আজকের যে তরুণের দল সামাজিক, অর্থনৈতিক চাপে পড়ে বিপথগামী, তাদের মধ্যেও নতুন কিছু করার প্রেরণা জাগবে।

—ক্রীড়ারসিক

কলকাতার মাঠে ক্রিকেট খেলা

নাট্যলোক

সংক্রান্তি

বহু অভিনীত এবং আলোচিত নাটক মঞ্চস্থ করার একটা প্রধান অসুবিধা হল, যে, পরিচিত নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকদের মন জয় করতে হলে কিছু অতিরিক্ত যোগ্যতা দেখানোর প্রয়োজন হয়। সেই বিশেষ দক্ষতার অভাব ছিল না বলেই হয়ত সেদিনের অভিনয়ে কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্য শিল্পীরা বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটকটি মঞ্চস্থ করে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই, এঁদের এই সর্বসফল প্রযোজনা একটি প্রথম শ্রেণীর মঞ্চরূপে নজির রেখেছে। একক অভিনয়ে নৈপুণ্যের থেকে দলগত অভিনয়ের ওপর নাট্য-নির্দেশক গুণেন বসু জোর দিয়েছিলেন বেশী। ফলে বিশেষ কারোর অভিনয় তেমন দাগ কাটতে পারে নি। তবুও শঙ্করবেশী শম্ভু কর্মকার, শরদিন্দু সাহা (চন্দ্রমাধব), সুশীল সাহা (সনাতন), অমূল্য সাহা (রতন) ও অজন্তা চৌধুরী (দুর্গা)র চরিত্রচিত্রণ অনায়াসে যোগ্যতার মান অতিক্রম করেছে। অন্যান্য চরিত্রে অংশ নেন গীতা দে, লক্ষ্মণ ঘোষ, তারাশঙ্কর বক্সী, বলদেব সালুজা, দীপিকা দাশ প্রমুখ। নাটকটি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

হ্যামলেট

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমিতি রবীন্দ্র সদনে অভিনয় করলেন শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' (অনুবাদ : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়)। প্রচলিত নাট্যচর্চা থেকে এঁরা যে স্বতন্ত্র ধারায় অগ্রসর হয়েছেন তা রীতিমত দুঃসাহসের। শিল্পীদের নিষ্ঠা ও নাট্যবোধে অভিনয় সর্বত্র সুশৃঙ্খলিত না হলেও, পুরো নাটকটি কিন্তু উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সংযত অভিনয়ে ও উপস্থাপনার পরিচ্ছন্নতায় অনেক দৃশ্যই মহাকাব্যের মেজাজ রক্ষা করতে পেরেছে। বিশেষ করে হ্যামলেট ও তার মাতা গারট্রুড-এর উপকক্ষের দৃশ্যটিতে দর্শকেরা তাঁদের প্রত্যাশার অনেকখানি পেয়েছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একাধিক মনে রাখার মত মুহূর্ত রচিত হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই হ্যামলেট-রূপী বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। চরিত্রটি যথেষ্ট মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তিনি। পেরেছেন ক্লডিয়াসরূপী শম্ভুনাথ রায়চৌধুরীও। উভয় শিল্পীকেই নাটকের প্রাণপুরুষ বলা যেতে পারে। আগাগোড়া নাটক দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছেন পলোনিয়াসরূপী সুবলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয় সুন্দর ও সংযত, সে তুলনায় স্ত্রীচরিত্রাংশ কিছুটা দুর্বল। দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গারট্রুড চলনসই, কিন্তু দীপা হালদারের ওফেলিয়া দু-একটি মুহূর্ত ছাড়া বেমানান। অন্যান্য চরিত্রে তাপস বসু, শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় দত্তগুপ্ত, সুরজিৎ চক্রবর্তী, জীবনরতন মজুমদার সু-অভিনয় করেন। নাটকটির দৃশ্যসজ্জা, ধ্বনি ও আলোক সুন্দর। নাট্য পরিচালনার কৃতিত্ব শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্যের।

একতা সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব

একতা সঙ্ঘের পাঠাগারের সাহায্যার্থে ও দ্বিতীয় বার্ষিক মিলন উৎসব গত ১৬ই আগষ্ট এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ললিত মিত্র লেনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রচুর দর্শক সমাগম দেখা যায়।

সভার প্রারম্ভে সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীসুধাংশু কুণ্ডু সম্পাদকীয় বিবরণ পেশ করেন। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীরঞ্জিত ঘোষ অতিথিদের স্বাগত জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সকলেই এই পল্লীতে একটি পাঠাগারের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। সভার শেষে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান ও সমিতির সভ্যবৃন্দ শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'গোবর্ধনের চন্দ্র যাত্রা' নাটকটি অভিনয় করেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন— মাঃ তিলক, নির্মল ঘোষ, প্রণব চক্রবর্তী, হীরক চৌধুরী এবং আরও অনেকে। নাটকটি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

সঙ্গীতশিল্পী দিলীপ রায়

দিলীপ রায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আধুনিক, শ্যামা সঙ্গীত, নজরুলগীতি পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি অমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দাবী স্বীকৃতি প্রভৃতি ছবিতে কাজ করছেন।

দিলীপ রায়

কলম কাকলি

বাংলা ছায়াছবি
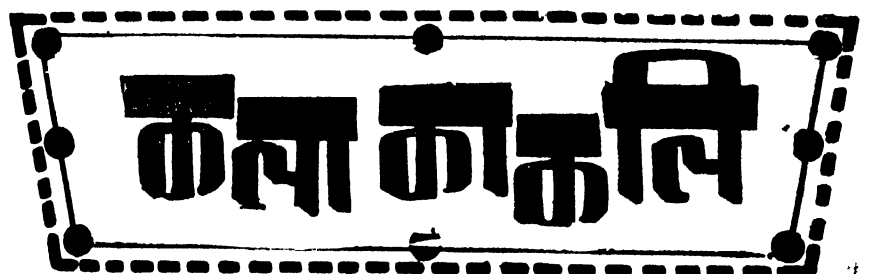
জীবন প্রভাত

টা য়ো ফিল্মসের দ্বিতীয় চিত্র 'জীবন প্রভাত'-এর কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় আছেন অজয় বিশ্বাস। যাঁর 'প্রথম প্রেম' চিত্রটি অসাধারণ সাফল্যলাভ করেছিল। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। চিত্রটির সংগঠনে আছেন শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়।

নিশিপদ্ম

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত পরবর্তী চিত্র 'নিশিপদ্ম'। বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী ও অনুপকুমার। সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ ও কাহিনী রচনা করেছেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। মুক্তিমায়া পরিবেশিত চিত্রটির প্রযোজনায় আছেন চিরন্তন চিত্র।

প্রতিবাদ

সঙ্গীতমুখর 'প্রতিবাদ' ছবিটির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিটির পরিচালনায় আছেন, তপেশ্বর প্রসাদ। এটিই তপেশ্বরবাবুর প্রথম চিত্র-পরিচালনা। ছবির নায়ক বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে আছেন: যুঁই ব্যানার্জী, সুলতা চৌধুরী, রবি ঘোষ, কালিপদ চক্রবর্তী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন---শ্যামল মিত্র। উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বজিৎ স্বকণ্ঠে এই চিত্রে একখানি গান গেয়েছেন। ছবিটির প্রযোজনায় আছেন নিমাই মৈত্র।

এখনই

কে এল কাপুর প্রডাকসন্সের পরবর্তী চিত্র 'এখনই।' ছবিটির চিত্রনাট্য, সঙ্গীত পরিচালনা ও পরিচালনায় আছেন তপন সিংহ। অভিনয় করছেন, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ি, স্বরূপ দত্ত, নির্মলকুমার, কল্যাণ চ্যাটার্জী ও অপর্ণা সেন প্রমুখ ছবির স্যুটিং দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃশ্য গ্রহণ শেষ করলেন পরিচালক দীপক গুপ্ত। শ্রীকমলা ফিল্মসের শ্রদ্ধার্ঘ্য 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রে পরিচালক একদিকে যেমন বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটাচ্ছেন, তেমনি বিপ্লবী জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও চিত্রায়িত হচ্ছে। ছবির নামভূমিকায় অভিনয় করছেন---দিলীপ রায়। অন্যান্য চরিত্রে তরুণকুমার, সমরেশ দাশ, অজিতেশ, শৈলেন মুখার্জী, সমরকুমার, এন বিশ্বনাথন, রবীন ব্যানার্জী, শমিতা বিশ্বাস, সুব্রতা, পদ্মা দেবী, গীতা দে, সুলেখা চক্রবর্তী, শেখর চ্যাটার্জী ও আরো অনেকে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার

মাল্যদান

অজয় কর পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের কাহিনী 'মাল্যদান'-এর সম্পাদনা শেষ হয়ে গেছে। মানবীয় আবেদনসমৃদ্ধ করুণমধুর এই কাহিনীটির প্রধান চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন নন্দিনী মালিয়া। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা কাহিনীটিকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন; তাঁদের মধ্যে আছেন---সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতিথিশিল্পী বিকাশ রায়। সুরসঙ্গীতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও পল্লীসঙ্গীতে সুহৃদ চক্রবর্তী। ছবিটি বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায়

মুক্তিপ্রাপ্ত মেম—এখানেই শ্রীকমল ভাস্কর

চিত্র: সমীর রায়চৌধুরী

চিত্র সমালোচনা

এই করেছো ভালো

দুর্গাশঙ্কর মুলতানিয়া নিবেদিত লাইট এণ্ড শেড প্রা: লি:-এর প্রথম নিবেদন---এই করেছো ভালো। কাহিনী ও চিত্রনাট্য — বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনা---অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। গীত পরিচালনা: অধীর বাগচী। রূপায়ণে: ---অনুপকুমার, জহর রায়, রবি ঘোষ, লিলি চক্রবর্তী, যুঁই ব্যানার্জি, সুমিতা বিশ্বাস, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগত সমরজিৎ, অজয় গাঙ্গুলী, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

কাহিনীর সুরু যদু গাঙ্গুলীর মৃত্যুর দৃশ্য দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর জানা গেল, তিনি মৃত্যুর আগে থেকেই একটি উইল করে গেছেন। তাতে লেখা আছে---তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি যথা শহর কলকাতার প্রাসাদোপম কয়েকখানি বাড়ি আর ব্যাঙ্কের জমা কয়েক লক্ষ টাকা দুই ভাগে আশীষ ও তার মাসতুতো ভাই শ্যামলকে সমানভাবে দান করে গেছেন। সংবাদপত্রে এ্যাটর্নি দিব্যেন্দুর এই বিজ্ঞপ্তি পড়ে চমকে উঠল আশীষ। যাত্রা—থিয়েটার করেই সে দিন কাটায়। অপরজন ট্রাম কণ্ডাক্টার। কিন্তু শর্ত দেখে তারা চমকে উঠলো। সম্পত্তি দখলের ত্রিশ দিনের মধ্যে দু' ভাইকে দুটি 'ডিভোর্সড' মেয়ে বিয়ে করতে হবে। তারা নিঃসন্তান এবং ২২'২৪ বছরের মধ্যে হওয়া চাই। অদ্ভুত শর্ত। কিন্তু পালন করতেই হবে, না হলে সম্পত্তি যায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। পরামর্শ চললো। তবু পাত্রী পাওয়া গেল না। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলো। অবশেষে দিব্যেন্দু, তার স্ত্রী মঞ্জু ও মঞ্জুর বান্ধবী তাপসী এক বিচিত্র রহস্যের পরিকল্পনা করলো। এর পর বহু ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দিয়ে পরস্পর পরস্পরের বাঞ্ছিত ধন লাভ করলো।

পরিচ্ছন্ন একটি হাসির ছবি 'এই করেছো ভালো।' পরিচালক হিসেবে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটিই প্রথম চিত্রোপহার। এবং বলা চলে, তিনি এতে সার্থকতা লাভ করেছেন। যদিও সম্পূর্ণরূপে তিনি দোষত্রুটিমুক্ত নন তবু তিনি সম্পূর্ণ ছবিখানির মাধ্যমে দর্শক হাসাতে সক্ষম হয়েছেন। তবে চিত্রনাট্য আরো বলিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল। ক্যামেরার কাজ মোটামুটি। আবহসঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীবাগচী সুখ্যাতি পাবেন। অভিনয় প্রথমেই নাম করতে হয় অনুপকুমারের। চিত্রটির সর্বাঙ্গ তিনিই জুড়ে রয়েছেন এবং সারাক্ষণ হাসিয়েছেন দর্শকদের। রবি ঘোষ ও জহর রায় তাঁর সঙ্গে সমান তালে চলেছেন। লিলি চক্রবর্তীর অভিনয় খুবই সাবলীল। অন্যান্য শিল্পীরাও সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। সর্বশেষে নতুন এই পরিচালকের ভবিষ্যৎ খুবই আশাব্যঞ্জক, এ কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি।

উত্তমকুমার

চিঠি বোম্বাই

এতো গেল সাধারণ মানুষের সম্পর্কে। অসাধারণ যাঁরা অর্থাৎ গায়ক, লেখক নায়ক-নায়িকা—তাঁদের ক্ষেত্রে জিনিষটা অন্য রকম হয়ে থাকে। এঁদের পৃথিবী বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত। 'বসুধৈব কুটুম্বকম'—আক্ষরিক অর্থেই রূপ নেয় এঁদের জীবনে। কতো মানুষ উৎসাহী একজন শিল্পী সম্পর্কে। লেখক, কণ্ঠশিল্পী সম্পর্কে তো বটেই, চিত্রশিল্পীদের জন্যে অনুরাগ অনেক—অনেক বেশি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও পত্র-প্রেরকদের মনের অবস্থা কল্পনা করতে অসুবিধে নেই। যে ক্ষেত্রে শিল্পীর বস্ত্রাঞ্চল কেটে নিয়ে উচ্ছ্বাস জানানো হয়, সেখানে সামান্য চিঠি পাঠানো আর এমন কি বেশি। সাগর-পারে তো এদের সংখ্যা সীমা অতিক্রম করে যায়। আমাদের দেশেও আস্তে আস্তে দলবৃদ্ধি হয়ে চলেছে—খবর মিলছে।

এখানকার জনৈক নামী এবং দামী (সর্বোচ্চ) চিত্রতারকা নাকি প্রতিদিন অর্ধলক্ষ চিঠি পেয়ে থাকেন তার ফ্যানদের কাছ থেকে। শোনা যাচ্ছিলো এ ধরনের অতিরঞ্জিত কাহিনী। কিন্তু সেটা যে স্রেফ 'কক অ্যাণ্ড বুল স্টোরী', অতোসন্দেহ নেই। অতিরঞ্জন বহু ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে কদলি প্রদর্শন করে থাকে।

যাই হোক, এখানে—এই বোম্বাইয়ে শিল্পীদের কাছে রাশি রাশি চিঠি পাঠিয়ে থাকেন অনুরাগীরা। হাজারের ঘরে অবিশ্যি সে সংখ্যা পৌছয়নি বটে, তবে নেহাৎ তা কমও নয়। যেমন ধরুন জিতেন্দ্র—(হ্যাঁ, ওঁর নামই প্রথম স্থান অধিকার করেছে তথ্যানুসন্ধানে) দৈনিক ওঁর কাছে ভক্তবৃন্দের পাঠানো চিঠির সংখ্যা দেড়শো।

এর পরই রাজেন্দ্রকুমার ও রাজেশ খান্নার নাম করতে হয়। তাঁরা পেয়ে থাকেন প্রতিদিন একশোখানা ক'রে। সুনীল দত্ত পান পঞ্চাশখানা এবং তাঁর অর্ধাঙ্গিনী নার্গিশ পনেরোখানা। মীনাকুমারী আর সায়রাবানুর পাওয়া চিঠির সংখ্যা পঁচিশ। সিমি সেক্ষেত্রে পান পঁয়তাল্লিশটি।

'জনতার আদালত' চিত্রের একটি মুহূর্তে
নবাগতা শিল্পী চৈতালী দত্ত
চিত্র : প্রবীর দে

এই যে সব চিঠি আসে, এর মধ্যে বেশ কিছু খামে টিকিটই থাকে না। কিছু বা অত্যুৎসাহের ফলে অতিরিক্ত স্ট্যাম্পে কণ্টকিত। কেউ দাবী করে সই-করা একখানা ফটো—শিল্পীকে সব সময় চোখের সামনে ধরে রাখতে, কিছু আবার খুবই বাস্তবধর্মী—স্কুল-কলেজের মাইনে মিটিয়ে দেবার ব্যাকুল অনুনয় জানিয়ে লেখা।

ফ্যান মেল দেখাশোনার জন্যে শিল্পীরা অতিরিক্ত সেক্রেটারী নিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছেন—এ মানুষটির কাজ হোলো চিঠির মোড়ক খোলা, পড়া এবং প্রয়োজনবোধে উত্তর দেয়া। তারকা হ'লেই তো হবে না, জনপ্রিয়তার তালিকায় স্থানটি যাতে বজায় থাকে, সেটাও দেখতে হবে তো!

●

লণ্ডন ফিল্ম কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। প্রথম যে ছবিটি এখানে তোলা হচ্ছে তার নাম: 'পসন্দ আপনি আপনি'। কাহিনীকার ব্রিজ কাত্যিয়াল নিযুক্ত হয়েছেন এর পরিচালক। বলা বাহুল্য, এ কাজ এই প্রথম তিনি করতে চলেছেন। মহম্মদ রফি ও হেমলতার কণ্ঠে দু'খানা গান সেদিন বোম্বাইয়ের ফিল্ম সেণ্টার ল্যাবরেটরীতে গৃহীত হয়েছে। কাহিনীর পটভূমি লণ্ডন—সেখানে বিভিন্ন জায়গায় Shoot করা হবে। নতুন দু'টি মুখকে বোম্বাই থেকে বাছাই করে নেয়া হবে, বাদ বাকি শিল্পী থাকবেন লণ্ডনের স্টেজ ও টেলিভিশন থেকে আমদানি করা। গল্পটা লিখেছেন ডেভিড জেফরিজ চিত্রনাট্য ও সংলাপ পরিচালকের রচনা। সুরকার বিষ্ণু খান্না। গত মাসে পরিচালক তাঁর ইউনিট নিয়ে বিলেত পাড়ি দিয়েছেন। সেখানে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ওখানেই ছবিটি মুক্তি পাবে।

—রমেন চৌধুরী

রূপের রাণী এলিজাবেথ টেলরের পুত্র মাইকেল আজ নিজেই এক জীবন্ত সংবাদে পরিণত হতে চলেছেন। মাইকেল অভিনয় জগতকে এই খ্যাতি অর্জনের মাধ্যম হিসাবে অবলম্বন করে মাতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। খ্যাতিলাভের একটি পৃথক পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন। তাঁর মা জগৎজোড়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁর মনমনোমোহিনী রূপের ইন্দ্রজালে এবং ঈশ্বরদত্ত এক অসামান্য অভিনয়-প্রসাদে। মাইকেল প্রসিদ্ধি অর্জন করতে চলেছেন পথিক হিসাবে। পৃথিবীর চলার পথে সকলেই পথিক, তথাপি নতুন পথিক হিসাবে মাইকেল এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জানা গেছে, তিনি ভারতে আসছেন। এখানেও কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কারণ, একালে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাত্রা কিছুমাত্র আশ্চর্যের ব্যাপার নয় এবং অতি স্বাভাবিকতারই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের বীজ সেখানেই, যেখানে জানা যায় যে, এই গমনাগমন গতানুগতিক পথের মাধ্যম অনুসরণ করে নয়। নিজের ছেলের ভারত পাড়ি সেই কারণেই বৈশিষ্ট্যের চিহ্নবাহী। শোনা গেছে, মাইকেল ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছেন কোন যানবাহনের সহায়তা নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ পদব্রজে তিনি আসছেন। হাজার হাজার মাইলব্যাপী পথের প্রত্যক্ষ স্পর্শ নিয়ে। সেই কারণেই এটি এক বিশেষ সংবাদ। মানের বয়েস বর্তমানে আঠারো।

●

বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক প্রগতি সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে-সব দেশে আপন আপন অভাবনীয় অবদানের পরিচয় দিয়ে চলেছে, তাদের মধ্য প্রথম সারিতেই যে ক'টি নাম উল্লিখিত হওয়ার দাবী রাখে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তাদের অন্যতম। পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাশিয়া স্থান পেয়েছে আজ এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী রাজনীতি, সাহিত্য, সর্বজনবিদিত কিন্তু চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে রাশিয়ার স্থান সারা পৃথিবীর মধ্যে আজ যে সর্বাগ্রগণ্য, সেই বিশেষ তথ্যটি সম্বন্ধে অনেকেই হয়তো অবগত নন। সমগ্র জগতে প্রেক্ষাগৃহের সামগ্রিক সংখ্যা হল আড়াই লক্ষের উপর আরও একটি হাজার বেশী। কিন্তু শুনলে অবাক হতে হয়, শুধু রাশিয়াতেই যতগুলি চিত্রগৃহ আছে তার সংখ্যা পূর্বোক্ত সংখ্যার অর্ধাংশেরও অধিক। বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক দু'লক্ষ একান্ন হাজারের মধ্যে শুধু রাশিয়াই চিত্রগৃহের সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ন'শো। অথচ সেক্ষেত্রে দেখছি পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের রাজধানী যুক্তরাষ্ট্রে (ক্যানাডা সহ)-র এ ক্ষেত্রে সংখ্যা হল মাত্র আঠার হাজার ছ'শো। এশিয়া মহাদেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক সংখ্যা আরও কম। সে সংখ্যা হাজার আট'শ। এই তথ্যের আলোকে রুশীয় জনসাধারণের ছায়াছবি সম্বন্ধে আগ্রহ যে কত বেশী, সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যায়।

●

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহের নানা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ও খ্যাতি থাকলেও চলচ্চিত্রের নির্মাণকে কেন্দ্র করে এ-যাবৎ তার কোন-প্রতিভাই বিশ্ববাসীর গোচরীভূত হয় নি, কারণ এতদিন এই কাজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কখনই ব্রতী হয়নি। প্রতিটি ভারতবাসী শুনে আনন্দিত হবেন যে, একজন ভারতীয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ক শূন্যতা পূরণ করেছেন। হরবংশ কুমার নামক একজন ভারতীয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ছায়াচিত্রটি নির্মাণের গৌরব অর্জন করেছেন। ইনি পূর্বে বোম্বাইয়ের চিত্রজগতের সঙ্গে অন্যতম কলাকুশলীরূপে যুক্ত ছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই প্রথম ছবিটির নাম 'দ্য রাইট এ্যাণ্ড দ্য রং। ছবিটিতে স্থানীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। ঐ দেশের এই প্রথম ছবিটিই বিদেশের এক চিত্রসমারোহে বিশেষ স্বর্ণপদক লাভ করেছে। ঐ দেশের চলচ্চিত্রের জন্মদাতা হিসাবে একজন ভারতীয় অমর হয়ে থাকবেন, এ চিন্তা যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে এই ঘোর নিরাশার দিনে অফুরান আশা ও উদ্দীপনার উৎস হিসাবে গণ্য হতে পারে।

●

পাশ্চাত্য চিত্রজগৎ যে ক'টি কালজয়ী শিল্পী বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছে, সেই তালিকায় জোয়ান ক্রফোর্ড একটি সুসমুজ্জ্বল নাম। একালের অভিনেত্রী সমাজের নেত্রী-স্বরূপা এই মহীয়সী শিল্পী দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তাঁর অভাবনীয় সৃজনকুশলতায় চিত্রলোকের সম্পদ যে কি পরিমাণ বর্ধিত থেকে বর্ধিততর করে তুলেছেন তা কারোরই অজানা নয়। ছায়ালোকে তাঁর দীর্ঘকালীন অবদান এবং সাধনা সেদিনই জনপ্রিয়তার এক উত্তুঙ্গ শীর্ষে একটি মূল্যবান আসন গ্রহণে তাঁকে সমর্থ করেছিল। এই দিক্‌পাল শিল্পী সম্প্রতি আত্মজীবনী রচনায় নিমগ্ন। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটি 'সাইমন এ্যাণ্ড সাসটার' নামে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে আত্মপ্রকাশ করবে বলে শোনা যাচ্ছে। এই গ্রন্থে শিল্পী তাঁর প্রেম-জীবনের সমস্ত ঘটনা অবিকৃত-ভাবে এবং কোন কিছু গোপনমাত্র না করে বিবৃত করেছেন। গ্রন্থটি এক বিপুল আলোড়ন আনবে বলে আশা করা যায়।

—চিত্রদূত

সাগর পেরিয়ে

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক অস্থিরতা

গত ১২ই আগস্ট ছিল ঝুলনযাত্রার উৎসব। কিন্তু সে উৎসব চাপা পড়ে গেল রাজ্য বিদ্যুৎ-পর্ষদ কর্মীদের ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট আর সি, আই, টি, ইউ, সমর্থিত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের কল-কারখানাসমূহের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সমন্বয় কমিটির আহ্বানে লাগাতর ধর্মঘট সুরুর রণ-নির্ঘোষে, ঐ একই দিনে। পদাবলী কীর্তন হারিয়ে গেল সোচ্চার দাবি আর স্লোগানের কলকোলাহলে। রাজ্য সরকার ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করে তার সম্মুখীন হলেন দৃঢ়তার সঙ্গে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কলকাতা অফিসের কর্মীরাও ধর্মঘটে সামিল হলেন। জনসাধারণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলেন এই "সুচ্যগ্র মেদিনী নাহি দিব" দ্বৈরথ সমরে। জয়-পরাজয় কি হয় দেখবার জন্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ কিছু ব্যাহত হলেও বন্ধ হল না মারাত্মকভাবে। রাজ্য পুলিশ, সি, আর, পি, কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতিরি মুখে শান্তিপূর্ণ রইল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। ১৪ই আগস্ট ধর্মঘটের সমর্থনে দুর্গাপুর বন্‌ধ্ ডাকে উদ্যোক্তারা যতটা আশা করেছিলেন ততটা সাফল্য লাভ করতে পারলেন না। এলো ১৫ই আগস্ট,---স্বাধীনতা দিবস। কলকাতায় জাতীয় পতাকা টেনে নামিয়ে পদদলিত করে পোড়ানো হল---লাঠি, ইট-পাটকেল, সোডার বোতল ইত্যাদি যথারীতি চললো। জনসাধারণ হয়তো ভাবলো ঘাস কাটতে কাটতে যেমন ডাকাত হওয়া যায়, তেমনি মিনি হামলা করতে করতে বিপ্লবী হওয়া যায়। তারপর ১৭ই আগস্ট কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় জানালেন, কোন আপোষ নয়, দরকার মত শান্তিমূলক সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১৮ই আগস্ট দুর্গাপুর ইস্পাতের কলকাতা অফিস লক-আউট হল। সংগ্রাম এবার বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত হল। ১৯শে আগস্ট বর্ধমান বন্‌ধ্-এর ডাক পড়লো, বন্‌ধ্ তো ডালভাত আজকাল। কিন্তু দুর্গাপুরের অবস্থা অশান্ত হওয়ায়, সেখানে কাঁদানে গ্যাস আর গুলী চললো। অবশ্য কাঁদানে গ্যাস, গুলীও এখন ডালরুটি। আন্দোলন তথা সংগ্রাম যখন একটু স্তিমিত, তখন ২০শে আগস্ট হিন্দুস্থান ইস্পাতের জেনারেল সেলস্ ম্যানেজার শ্রী আর, বি, পট্টনায়ক ঘোষণা করলেন যে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণ করা হবে না---হবে ভিলাই ইস্পাত কারখানা। তাছাড়া তিনটি নতুন ইস্পাত প্রকল্প রূপায়িত হবে ভিন্ন রাজ্যে। ক'দিনের সংগ্রামের ফল হাতে-হাতেই পাওয়া গেল কেন্দ্রের এই ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর মাধ্যমে। এলো ২৩শে আগস্ট---স্মরণীয় বিনা শর্তে আত্ম-সমর্পণের গ্লানিকর সেই দিনটি। কেন্দ্র আর তার সশস্ত্র বাহিনীকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করার কি কোন প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন ছিল কি এতগুলি শ্রমিক-কর্মচারীকে ঢালাও শাস্তির মুখে ঠেলে দিয়ে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করা? নিরপেক্ষ যাঁরা অর্থাৎ দেশের জনসাধারণ, তাঁরা এ জাতীয় সংগ্রামের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। এই পথে কোন পক্ষ সামান্য কিছু লাভ যদিও বা সাময়িকভাবে করেন, কিন্তু উৎপাদন ব্যাহত হয়ে কোটি কোটি টাকার লোকসান হয়ে সমগ্র জাতি অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

তারপরও আছে। ২৬শে থেকে ২৮শে আগস্ট সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট। সাজ সাজ রব। নিজেদের কর্মচারীদের মোকাবিলার জন্য সরকার জারি করলেন ১৪৪ ধারা, পুলিশ ছাড়াও সি, আর, পি এমন কি সেনা বাহিনীও অবস্থার মোকাবিলায় প্রস্তুত বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া---তিন দিনে নাটকের নির্বিঘ্নে যবনিকা পতন হল। দুর্ভোগ যা হবার হল জনসাধারণের। জনগণের কি সুবিধা হল তা জানেন নেতারা। তাই ১২ই জুলাই কমিটি রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ২৮শে আগস্ট বাংলা বন্‌ধ্ বাতিল করে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

সব ভাল যার শেষ ভাল। ৩১শে আগস্ট---শহীদ দিবস। কথা ছিল লাখ লাখ লোক এসে মহাকরণ, রাজভবন তথা সারা কলকাতা স্তব্ধ করে দেবে। রাজ্য সরকার ব-কলমে কেন্দ্রীয় সরকার আজ খুব জবরদস্ত। ৩০শে আগস্ট পুলিশ; সি, আর, পি, আর সামরিক বাহিনী টহল সুরু করলো। থমথমে আবহাওয়া। লাখ লাখ লোক আসে নি। অবশ্য ৮।১০টি এলাকা বন্ধ, লাইনে অবস্থানের ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত ও ৬ পার্টির সমর্থক ট্রাম, সরকারী বাস কর্মীদের বোমার অজুহাতে কর্ম-বিরতির দরুণ বিশৃঙখলা ছাড়া কলকাতা মোটামুটি সরবই ছিল, স্তব্ধ হয় নি।

১২ই থেকে ৩১শে আগস্ট প্রমাণ করেছে জনসাধারণ কোন্ পথে চলতে চান। গণজনের দোহাই যাঁরা দেন, তাঁদের এ-বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে হবে। তাঁদের জানা উচিত, বাড়াবাড়ি

বন্যার তাণ্ডব

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার ৬টি জেলায় ভয়াবহ বন্যার তাণ্ডবে লক্ষ লোক অবর্ণনীয় দুর্দশার কবলে পড়েছে। গ্রামের পর গ্রাম প্লাবনে ভেসে গেছে, বাড়িঘর ডুবে গেছে, ভেঙে পড়েছে। বহু লোক হতাহত হয়েছেন। ভেসে গেছে গবাদি পশু। হাজার হাজার, কিন্তু মানুষ ঘর ছেড়ে চলে এসেছে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। সরকার ত্রাণের কাজ তৎপরতার সঙ্গে করলেও বিপর্যয়ের ব্যাপকতার তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিও ত্রাণকার্যে এগিয়ে এসেছেন। এবারের বন্যা এত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে যে প্রয়োজনের দাবি মেটাতে সব চেষ্টা মিলেও দুঃখজনকভাবে অপ্রতুল। গ্রামাঞ্চল ছাড়াও কলকাতা সহ বহু শহরাঞ্চল বন্যা-কবলিত হয়ে পড়েছিল। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরামবাগ ও ঘাটাল শহর ও মহকুমা।

এই ভয়াবহ বন্যার কারণ কেবল-মাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কয়েকদিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নয়। ডি, ভি, সি'র বাঁধগুলি থেকে রাশি রাশি জল ছেড়ে দেওয়ার দরুণ প্লাবন আরও বেশি ত্বরান্বিত হয়ে পড়ে। বহুস্থানে নদী-বাঁধ ভেঙে জলরাশি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শস্যক্ষেত্রের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে।

আমরা বিনীত প্রশ্ন করতে চাই যে, প্রতি বছর বন্যা পশ্চিম বাংলায় একটা অভিশাপ। প্রাণহানি, শস্যহানি, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ত্রাণকার্যে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, তা বন্যা প্রতিরোধের বহু বিঘোষিত ব্যবস্থাদি কার্যকরী করে সাশ্রয় করতে বাধাটা কোথায়? তাছাড়া প্রতি বছর শস্যহানির দরুণ যে বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তথা খাদ্যাভাব আমাদের গ্রাস করে, তার প্রতিই বা আমাদের সরকারী দপ্তরগুলি উদাসীন কেন? রাজনীতি আমাদের এমন পেয়ে বসেছে যে, অর্থনীতি ক্রমেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। পাঁচশালা পরিকল্পনার কার্যসূচী অবিলম্বে ফাইলের পাতা থেকে মাঠে ঘাটে নেমে পড়ে রূপায়ণের পথে পা বাড়ালে আমরা ঘোর অন্ধকারে একটু আলোর আভাষ পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। আশা করি, এবারের বন্যা ও দুর্গতি, কেন্দ্রে ও রাজ্যে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিদের সজাগ করতে সক্ষম হবে, আর বিলম্বে হলেও কাজের কাজে সত্যিই হাত দেওয়া হবে সক্রিয়-ভাবে।

অমর সুজয়া গুহ

গত ২৫শে আগস্ট আমাদের যে দারুণ শোকবার্তা বহন করে আনলো, তা লাহুল অভিযাত্রী মহিলা দলের নেত্রী শ্রীমতী সুজয়া গুহের অকালমৃত্যু। হিমালয়ের কোলে একটি পার্বত্য নালা পার হতে গিয়ে তিনি ও তাঁর সহযাত্রিণী শ্রীমতী কমলা সাহা খরস্রোতে ভেসে যান। পরে শ্রীমতী গুহের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীমতী সাহা নিখোঁজ এবং আশঙ্কা, তিনিও বেঁচে নেই। সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় শেরপারা নালা পার না হবার জন্য সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও পার হতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে। নিয়তি যখন ডাকে তখন এমনটিই হয়ে থাকে। বাঙালী মহিলারা পর্বতারোহণে একাধিকবার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এবারও শ্রীমতী গুহের নেতৃত্বে এই ৫জন সদস্যা বিশিষ্ট মহিলা অভিযাত্রী দল হিমাচল প্রদেশের ২০,১৩০ ফুট উঁচু নামহীন পর্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করে এর নাম রেখেছেন "ললনা"। বিজয়িনীদের এই কৃতিত্ব মৃত্যু এসে বিয়োগান্ত আর করুণ করে দিয়ে গেল।

আজ শোকসন্তপ্ত পরিজনদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। বীরাঙ্গনার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আর চির-শান্তি কামনা করি অমর আত্মার। উপসংহারে এটুকু বলা বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে, ভবিষ্যতে দুরূহ অভিযানের অভিযাত্রীরা যদি এই শোকাবহ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান হতে পারেন, তা হলে অকারণ বিপদের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন এবং অমূল্য তাঁদের জীবন দুঃসাহসিকতার উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে তুলবেন।

শোক সংবাদ

রেভারেণ্ড অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ভারত, পাকিস্তান, বৃহ্ম ও সিংহলের প্রথম ভারতীয় মেট্রোপলিটান রেভারেণ্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায় গত ৪ঠা ভাদ্র ৭৮ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ইনি উক্ত পদ গ্রহণের পূর্বে দিল্লী ও কলকাতায় বিশপের কার্যভারও পালন করেছেন।

হীরেন্দ্রনাথ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন ইনস্পেক্টার জেনারেল হীরেন্দ্রনাথ সরকার গত ১৩ই ভাদ্র ৬৫ বছর বয়সে পরলোকযাত্রা করেছেন। ১৯২৮ সালে ইনি ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ কমিশনের সদস্যের দায়িত্বও তিনি কৃতিত্ব সহকারে পালন করেছেন।

মিহির ভট্টাচার্য

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মিহির ভট্টাচার্য গত ১লা ভাদ্র ৫৪ বছর বয়সে পরলোকগত হয়েছেন। ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি অভিনেতারূপে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরণ আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসছিলেন। প্রায় তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। রঙ্গমঞ্চ ও বেতারেরও নিয়মিত শিল্পীগোষ্ঠীর তিনি অন্যতম ছিলেন। অভিনেতৃ সংঘের সচিব ও শিল্পীসংসদের সহকারী সভাপতির আসনও তাঁর দ্বারা অলংকৃত হয়েছে।

বিভূতি চৌধুরী

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং স্বনামধন্য সমালোচক বিভূতি চৌধুরী গত ২০শে শ্রাবণ ৫৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। এম-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সিটি কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্বভার তিনি সগৌরবে পালন করেছেন। পরে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। কবি হিসাবেও তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন।

রণদা উকীল

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী রণদা উকীল গত ২২শে শ্রাবণ ৮২ বছর বয়সে কাশীলাভ করেছেন। চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিতার জন্য যে উকীল ভ্রাতৃবৃন্দ বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, রণদা উকীল ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম।

সুরেন্দ্রনাথ কর

প্রবীণ শিল্পী এবং ভারতের স্থাপত্যশিল্পের নতুন পথের প্রদর্শক সুরেন্দ্রনাথ কর গত ১৬ই শ্রাবণ ৭৯ বছর বয়সে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নব্যচিত্রকলার জনক আচার্য অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় শিল্পকলার নবজাগরণের বোধন লগ্নে যাঁরা তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম। দীর্ঘকাল তিনি বিশ্বভারতীর সচিব ও কলাভবনের অধ্যক্ষের আসনে সমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দু'খানি গ্রন্থ তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। ভারত সরকারের নিকট তিনি 'পদ্মশ্রী' লাভ করেন।

বিষ্ণুচরণ ঘোষ

সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ বিষ্ণুচরণ ঘোষ গত ২৪শে আষাঢ় ৬৭ বছর বয়সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক উপাধি অর্জন করেন, কিন্তু শরীরচর্চাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ভারতীয় যোগব্যায়াম প্রসারের জন্য বহুবার তিনি বিশ্বভ্রমণ করেছেন এবং একালে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সারা বিশ্বে যে সচেতনতা এসেছে তার মূলে তাঁর অবদানও অল্প মূল্যের নয়। শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে বহু গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। 'স্বাস্থ্য সাধনা' পত্রিকাটির তিনি সম্পাদক ছিলেন।

বিদগ্ধ শিক্ষানায়ক এবং খ্যাতনামা নাট্যতাত্ত্বিক ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য গত ২৫শে আষাঢ় মাত্র ৫৬ বছর বয়সে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি বাঙলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় এম-এ এবং কাব্যতীর্থ উপাধি পরীক্ষাতেও সসম্মানে সমুত্তীর্ণ হন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করেছেন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্য নাট্য একাডেমী এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ও নাট্য বিভাগের অধ্যক্ষ এবং চারুকলা বিভাগের ডীনের মূল্যবান ও সম্মানজনক আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। একালের নাট্য আন্দোলনে সংগঠনে ও বিকাশেও তাঁর অবদান অসামান্য। শিল্পতত্ত্ব পরিচয়, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, হোয়্যেগ ও ক্রোচের অনুবাদ এবং নাটক ও নাট্য সাহিত্যের বিচার প্রভৃতি কয়েকটি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে।

মহারাজকুমার রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

শিল্প ও ভাস্কর্যজগতের দিক্‌পাল মহারাজকুমার রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (শিল্পজগতে বরীন রায় নামে সমধিক প্রসিদ্ধ) গত ২৬এ শ্রাবণ ৬৫ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছেন। চারু ও কারুশিল্পের নানা শাখায় তাঁর কৃতি দেশের ও বিদেশের রসিক সমাজে সসমাদরে স্বীকৃত এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ মাধ্যম এবং অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হিসাবে শিল্পী সমাজে এক বিশেষ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রেসিডেন্সী ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত বরীন রায় ইলাস্ট্রেটেড উইকলি এবং ওরিয়েন্ট ইলাস্ট্রেটেড উইকলি কলা সম্পাদক হিসাবেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সন্তোষের পরলোকগত মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর তিনি মধ্যম পুত্র ছিলেন।

অস্থায়ী সম্পাদক—বিজনকুমার সেন